চিত্রসূচি

বহুবর্ণ-চিত্র

১৩৪১—শ্রাবণ

বহুবর্ণ-চিত্র

১৩৪১—ভাদ্র

বহুবর্ণ-চিত্র

১৩৪১—আশ্বিন

বহুবর্ণ-চিত্র

১৩৪১—কার্ত্তিক

বহুবর্ণ চিত্র

১৩৪১—অগ্রহায়ণ



দেবতার দান



আষাঢ়—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

মহর্ষিদেবের কবিতা ও পত্র

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

ওঁ

প্রিয় গগন,

কুসুম অক্ষর লিখিত সুন্দর মধুর ব্রহ্মনাম —
কোন্ বন হতে এনেছ কুড়ায়ে,
হৃদয় নয়ন দিয়েছ জুড়ায়ে,
এমন কোমল এমন বিমল আনন্দ অবিরাম,
তাঁর সুধাময় নন্দন বনের সৌরভ অনুপাম।
ধন্য সাধু, ধন্য তব উপহার,
এই আশীর্ব্বাদ লহ গো আমার,
শোভা ক'রে থাক্ তব কণ্ঠে, তাঁর প্রসাদ সুধাদাম—
হৃদয় তোমার হউক পূর্ণ, সফল হউক কাম।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে কবিতাটী মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে ১১ই চৈত্র ১৮০৮ শকে (ইংরাজি ১৮৮৭ অব্দে) কলিকাতা হইতে গাজীপুরে স্বর্গীয় রায় বাহাদুর গগনচন্দ্র রায়ের নিকট লিখিত। যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে নিজ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বঙ্গের তথা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গগনবাবু অন্যতম। তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারাই ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বা প্রসিদ্ধ সাধু পওহারী বাবার দর্শনলাভের



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশায় গাজীপুরে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই গগনবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী বিবেকানন্দ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গগনবাবু গভর্মেণ্টের অহিফেন বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাত্র অল্পকাল পূর্ব্বে নব্বই বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

গাজীপুরের গোলাপজল বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানকার মত সুগন্ধী গোলাপ ফুল অন্যত্র পাওয়া যায় না। গগনচন্দ্র মহর্ষি দেবকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার বিশেষ স্নেহের অধিকারী ছিলেন। মহর্ষিদেব গগনবাবুর প্রেরিত গোলাপ ফুল পাইয়া, ঐ কবিতাটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যে তারিখে ঐ কবিতাটী প্রেরিত হয়, সেই তারিখেই মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীও গগনবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রতিলিপি এইখানে দেওয়া হইল।

২৯ নং চৌরঙ্গি রোড
কলিকাতা
১১ই চৈত্র বৃহস্পতিবার

মহাশয়,

আপনি মহর্ষি পিতৃদেবকে যে ভক্তির উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধুরতান, আর সুগন্ধ পুষ্পের সুরভি এখন তাঁহাকে বড়ই আমোদিত করে।

আপনার এই গোলাপ ফুলের সুগন্ধে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সৌন্দর্য্যে তিনি সেই মহা সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছেন, রোগ তাপ সকল ভুলিয়া যোগানন্দে, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়াছেন। উপহার-দাতার প্রতি তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদ এই যে, যে ভক্তি হইতে তাঁহার এই উপহার প্রেরিত, সেই ভক্তি ক্রমে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহার নিকট অমর সুখ শান্তির আলয় প্রকাশিত করুক।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

পুরাতন পত্রাদির মধ্যে গগনচন্দ্রের নিকট লিখিত মহর্ষিদেবের স্বহস্তে লিখিত আর একখানি পত্রও পাইয়াছি। পত্রখানি চুঁচুড়া হইতে লিখিত। তাহার প্রতিলিপিও মুদ্রিত হইল।

চুঁচুড়া
৫ই মাঘ বঙ্গ

সাদর নমস্কার

তুমি অতি যত্নের সহিত সেউতি ও গোলাবি গুলকন্দ যে পাঠাইয়াছ, তাহা যথাসময়ে পঁহুছিয়াছে, এবং আমি তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এ গুলকন্দ অতি উৎকৃষ্ট—কলিকাতা বাজারে এমন পাওয়া যায় না। ইহা খাইয়া দেখিলাম অতি সুস্বাদু—চিনির সঙ্গে আর ফুলের পাতার সঙ্গে একেবারে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তবে আমার সুস্থতার পক্ষে ইহা উপযোগী কি না, তাহা এখন বলিতে পারি না।

আশীর্ব্বাদ করি তোমার ও তোমার সহধর্ম্মিণীর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ দিন দিন বাড়িতে থাকুক।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

স্বর্গীয় গগনবাবুর পুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র রায় মহাশয় পুরাতন পত্রাদি অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়াছেন। উপরে মুদ্রিত পত্রগুলি এবং কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের লিখিত বহু পত্র আমাকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ায়, আমি তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভবিষ্যতে পাঠক পাঠিকাগণকে গগনবাবুর জীবন--কথা ও তৎসঙ্গে অন্যান্য পত্রগুলি উপহার দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

ছাইভস্ম

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অনেক দিন আগে "ভারতবর্ষে" একবার "বজ্রের কথা" পাড়িয়াছিলাম। আজ "ভস্মের কথা" কহিতেছি। ভস্মের কথা—"ছাই ভস্ম" কথা। তাই প্রবন্ধের শিরোনামায় লিখিলাম। আমরা সেবারে দেখিয়াছিলাম যে—বজ্রের কথা, বাজের কথা নহে, বাজে কথাও নহে। বৃত্র, ইন্দ্র আর বজ্র—এ তিনটি বিশ্বভুবনে ওতপ্রোত তিনটি নিগূঢ় তত্ত্ব। জড়ে, মনে, প্রাণে এ ত্রিমূর্ত্তির লীলাস্থল। এ তিনই অবিনাশী। ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন কেন—এখনও করিতেছেন; করিতে থাকিবেন। সংহার মানে লোপাপত্তি যদি হয়, তবে, সংহার কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। সেবার কথাগুলো খোলসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বজ্র এমন একটা কিছু, যাহা সকল কিছু বিদীর্ণ, বিশীর্ণ করিতে সমর্থ। যেটি বিশীর্ণ হয়, সেটি শরীর। যাহা কিছু অবয়বী, যাহা কিছু পরিণামী, তাহা বজ্র ভেদ করিতে পারিবে। অবয়ব কেবল যে স্থূল অবয়ব, এমন নয়; পরিণাম শুধু যে ইন্দ্রিয়গোচর, এমন নয়। একটা মলিকিউলের যা অবয়ব, একটা এটমের যা অবয়ব, একটা জীবকোষের যা অবয়ব—সেগুলোও ধরিতে হইবে। এদের প্রত্যেকের বিশিষ্ট অবয়ব, শরীর আছে। বিজ্ঞান এ ভূত "দেখিয়াছেন"। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না দেখিলেও, ইসারায় ইঙ্গিতে যা দেখিয়াছেন, সেটা "দেখার"ই সামিল। একটা বেন্‌জিন্ মলিকিউল দেখিতে কেমন জিজ্ঞাসা কর বিজ্ঞান "ফটো" বাহির করিয়া দিবেন। অণুবীক্ষণে সে ফটো তোলা হয় নাই। অণুবীক্ষণে কুলায় না। এ ফটো মনের ফটো—মানসী ছবি। তবু সত্যি—সত্যি সত্যি সত্যি! বিজ্ঞান হলফ নিতেও রাজি। কবিই বা কোন্ গররাজি তাঁর মানসী প্রিয়ারে ভাবিতে বাস্তবী? কবি ও "সাভান্ট" একই গোত্র। এ বিশ্বের যিনি কল্পয়িতা ও শিল্পী, তাঁকে এ দেশের ব্রহ্মবিদ্যা—"কবিং পুরাণমনুশাসিতারং"—এই ভাবেই কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মা—ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে যাঁর অভিনন্দন—এই বিশ্ব-আখড়ার প্রধান "সাভান্ট" বা ওস্তাদ—বড় গামা। তাঁর সাক্রেদ দক্ষাদি প্রজাপতি। পুরাণেও দেখি—পুরাণ কবির

মৈথুন সৃষ্টি। বিজ্ঞান মলিকিউল, এটম্, জীবকোষ প্রভৃতির যে সব ফটো বাহির করিতেছেন, ফটো মিলাইয়া সাক্ষী দিতেছেন, আবার তালাকও দিতেছেন, সেগুলো, ষোল-আনা না হোক্, অনেকাংশে যে তাঁরই মানসী সৃষ্টি, তাতে বোধ হয় সন্দেহ করা চলে না। Mental image or construct বলিলেও বিজ্ঞান খাপ্পা হইবেন কি? এ মানসী সৃষ্টি তিনি গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন, বদ্‌লাইতেছেন।

উনবিংশ শতকে এটম্ ছিল অক্ষর, অব্যয়, অজ। জড়ের চরম অবিভাজ্য পদার্থ। এ শতকে এটম্ শ্রীযশোদাদুলালের মতন হাঁ করিয়াছেন, আর, তার ভিতরে আমরা ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি। রীতিমত একটা সৌরজগতের বৃষোৎসর্গের সব বন্দোবস্ত। হাঁ—সূর্য্যও বৃষ, এটম্‌ও বৃষ—বর্ষণ করেন। বিগত শতকে শ্রীযশোদাদুলাল (এটম্) নিয়মের দড়িতে বাঁধা দিয়াছিলেন। নিউটনি ডাইনামিক্স যে দড়ি পাকাইয়া দেয়, সেই দড়ি। খাসা মজবুত দড়ি। সে যুগের কারিগরেরা সেই দড়ি দিয়া শুধু যে এটম্‌কে বাঁধিয়াছিলেন, এমন নয়। সেই দড়ি বুনিয়া এক চমৎকার বিশ্ব-বেড়া জাল বুনিয়াছিলেন। সে জালের নাম ছিল বিশ্ববিধিতন্ত্র—Law of Universal Causation অথবা Uniformity of Nature। স্বয়ং নিউটন জ্ঞান-বারিধির কূলে দাঁড়াইয়া উপলখণ্ড কুড়াইয়াছেন বলিয়া বিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু, চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর আগে টিকেল হক্সলি এঁরা এ জাল ঘাড়ে করিয়া বিশ্বসায়রের কূলে দাঁড়াইয়া কি দেমাক, কি পশারই না করিয়া গেলেন! এ জাল মাথা ঘুরাইয়া ফেলিলে না কি সাগরের সপ্ত পুরুষ বাঁধা পড়িয়া যাইবেই; তিমি-তিমিঙ্গিল হইতে সুরু করিয়া ইস্তক চুনো পুঁটি কেহই না কি বাদ পড়িবে না। এমনি জালের গাঁথুনি, এমনি বহর। কিন্তু বিজ্ঞানের ভীম আস্ফালন এরি মধ্যে নাকি সুর ধরিয়াছে।

কোয়ান্টার কথা আগের বার পাড়িয়াছিলাম। এ কোয়ান্টা আমরা বুঝি না—অথচ, এটা একটা আকাট সত্য—"brute fact"। আর আর যা কিছু বুঝি বলিয়া অভিমান করি, তার সঙ্গে এই আকাট্ "আবিষ্কার"টিকে খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। এটমের অন্দরে যে আবর্ত্তন, তাতে লম্ফনও আছে, দেখিয়াছি। ইলেক্‌ট্রণ শুধু এমন নয়; লাফও মারে ("hops")। ইলেক্‌ট্রণের এই নাচে জগৎ "আলো" হইতেছে; কিন্তু এ নাচের রহস্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান প্রচণ্ড অন্ধ। এই রকম সব মারাত্মক ছেঁদা মানুষের মননবুনানী বিশ্ববেড়া জালে বাহির হইয়া পড়িতেছে। মেরামতের চেষ্টারও কসুর নেই। কেউ বলিতেছেন—জাল মেরামৎ হইবেই। আমাদের বুদ্ধির টেকোয় দড়ি কাটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সবুর কর; দড়ি যোগাইলেই ফুটোফাটা সব মেরামৎ হইয়া যাইবে। তখন কেয়াবাৎ। কোয়ানটাম্ ফোয়ানটাম্ কিছুই পাশাইবে না। কেউ কেউ বা বলিতেছেন—শুধু দড়ি নয়, একটা কলসীর যোগাড়ও চাই। বিজ্ঞান তাই গলায় বাঁধিয়া এই অতল, অকূল রহস্যসায়রে ডুবিয়া মরিবেন, ডুবিয়া মরিয়া "ভূত" হইবেন না—"দেবতা" হইবেন—প্রজ্ঞান হইবেন। তখন উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সুর ধরিবেন —"যেনামতং তস্য মতং" ইত্যাদি। ঈশাবাস্য ও কেন—এই দু'খান উপনিষদ্ একবার পড়িয়া লইবেন। "যে বলিল বুঝি, সে বুঝে নাই; যে বলে বুঝি নাই, সে বুঝিয়াছে। যে বলিল জানিয়াছি, সে জানে নাই; যে বলে জানি নাই, সে জানিয়াছে।" এডিংটন্ প্রমুখ দু' একজনের মুখে এ বুলি 'আধ' 'আধ' ফুটিতেছে। ব্রহ্মবিদ্যার পাঠশালায় বিজ্ঞান সবে এই সেদিন হাতেখড়ি দিতে সুরু করিয়াছে বৈ ত নয়! তার "বালভাষিতং" আজ "অমিয় সমান"।

তার পর জালটায় ইচ্ছাকৃত গোঁজামিলও যে কিছু না ছিল, এমন নয়। আজ কক্ষপথে ইলেক্‌ট্রণের বেয়াদবী লাফ দেখিয়া আমরা আঁৎকাইয়া উঠিতেছি! ভাবিতেছি—এ কি উদ্‌ভুট্টি ব্যাপার! এ নাচে যে বিজ্ঞানের পাকাহাতের সঙ্গৎ বানচাল হয়। কিন্তু সেই ক্লাউজিয়াস, ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েল ইত্যাদির দিনের "সঙ্গৎ"গুলোই বা কি? একটা গ্যাসের দানা বা মলিকিউলগুলো কি ভাবে ছুটোছুটি ধাক্কা-ধাক্কি করে, তার হিসাব করিতেছি। দানা ত' ঝাঁকে ঝাঁকে। ঝাঁকের হিসাব বা গড়পড়তা হিসাবই সম্ভব। কোন একটির সঠিক আপন হিসাব কে রাখে, কে দিতে পারে? ব্যক্তির খাঁটি হিসাব জানি না, সমষ্টির জাবদা হিসাব জানি। সমষ্টিতে যেটা পাই, গড় (average) কষিয়া ব্যক্তিবিশেষে সেটা বাঁটোয়ারা করিয়া দিই। যেমন, আমরা এ দেশে গড়ে ২৩ বছর বাঁচিতেছি, ৩০৲ টাকা সালিয়ানা কামাই করিতেছি। ঝাঁকের বেলায় কতকটা, ব্যক্তির বেলা বিশেষতঃ, আমাদের

হিসাব সম্ভাব্যের (Probabilityর) হিসাব। কএর খ হবার সম্ভাবনা যতটা, গ হবার সম্ভাবনা তার তুলনায় এতটা বেশী বা কম। এখন, বাঁধাবাঁধির মামলা হইতে সম্ভাবনার মামলায় গিয়া পড়িলে, অনেক কিছু "সম্ভব" হবার ফাঁক রহিয়া যায়। ইলেক্‌ট্রণ আজ "খোস-খেয়ালে," তালিমের তালকে কলা প্রদর্শন করিয়া লাফ মারিতেছে। ইলেক্‌ট্রণের এ লাথি পাতিয়া নিতেছ। একটা গ্যাসের দানা, একটা ধূলিকণাও যে "খোস-খেয়ালে" মোটেই চলে না, সেও যে বিশ্বনাট্য-লীলারসিকের একটা লীলাবিগ্রহ, লীলামন্দির নয়, তাই বা ঠিক করিয়াছ কোন্ অভ্রান্ত বেদবিধানে? তোমার হিসাবের জালের ফুটো দিয়ে সেও গলিয়া যাইতেছে না কি?

গোঁজামিলে সে ফুটো সারিবে কি? নিউটনি হিসাবের জাল জবর বুনানী বটে। কিন্তু তাতে গোঁজামিল বিস্তর। বিস্তর। কতকগুলো সংজ্ঞা বা কন্‌ভেন্‌শন্ করিয়া লইয়াই জাল বুনিতে বসিয়া গেলে! ভাবিয়া দেখিলে না—সংজ্ঞাগুলো মনগড়া না বাস্তব! বস্তু বা ম্যাস্‌কে ধরিয়া লইলে কায়েমি (constant); একটা বস্তু যেমন খুসি চলুক, তার বস্তুর "পরিমাণ" কায়েম থাকিবে। মোটামুটি থাকে বটে। কিন্তু না থাকিতেও পারে। খুব ছুটিলে হয় ত রাশভারীও হইতে পারে। এখন, রেলেটিভিটি থিওরি বলিতেছেন—ম্যাস্ কায়েমি নয়; এনার্জি বা কার্য্যকরী শক্তিরই প্রকারান্তর ম্যাস্। কাজেই, শক্তির অতিবৃদ্ধিতে ম্যাস্ বাড়িবে। নিউটনি ডিনামিক্সের ও কন্‌ভেন্‌শন্‌টি যথার্থ হয় নাই। আরও কত কি এইরূপ! এই জন্য বলিতেছিলাম—হিসাবের জালটাও যে কতকটা ময়দানবী মায়াজাল নয়, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিজ্ঞানের ফরমাসি জগৎ যে "মায়াপুরী" (Conceptual Conventional World), এ কথা আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের বেশ করিয়া শোনাইয়া গিয়াছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল, হোয়াইট্‌হেড—এঁরা আজও "কিন্তু" করিতেছেন; হয় ত "কিন্তু" আছেও। তবুও এটা ঠিক যে, বিজ্ঞানের সৃষ্টি অনেকাংশে (সর্ব্বাংশে নাই বলিলাম) মানস সৃষ্টি। এ জগতে, শুধু সৃষ্টি কেন, স্থিতি, সংহার—এ সবের সনন্দও বিজ্ঞান লইয়াছেন।

বিজ্ঞানের ঐ সব এটম্ প্রভৃতির নক্সা বা ফটো তাই আমরা মানসী বলিয়াছিলাম। • তাই বলিয়া, এগুলো একেবারে আরোপ, অধ্যাস, মিথ্যা মায়া না হইতে পারে। বিজ্ঞান লিঙ্গপূজা করেন। অর্থাৎ, যেখানে প্রত্যক্ষে কুলায় না, সেখানে লিঙ্গপরামর্শ দ্বারা সিদ্ধান্তের নিগমন করেন। ন্যায়ের কথা, অন্যায় কিছু ভাবিবেন না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী হইতে সাধ করেন; কিন্তু অনুমানাদিও তাঁকে করিতে হয়। অগত্যা। অনুমান করিতে গেলেই লিঙ্গপরামর্শ চাই; অর্থাৎ, কোন কিছু সত্যসন্ধানী অনুমিতিসূত্র হাতে পাওয়া চাই। আচম্‌কা অনুমিতি হয় না। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। পাকা অনুমান ছাড়া, উপমিতি (Analogy), থিওরি, হাইপথেসিস্—এসবেরও দরকার আছে। বিজ্ঞান এটম্ প্রভৃতির অন্তঃপুরের যে-সব নক্সা আঁকিতেছেন, সেগুলো থিওরির সামিল। প্রত্যক্ষ নয়, পাকাপোক্ত অনুমিতিও নয়। তবে, থিওরি একবারে আস্‌মানে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। প্রধানতঃ স্পেক্‌ট্রাম্ এনালিসিস্ অথবা আলোকবিশ্লেষণের সূত্র ধরিয়া এ থিওরির আঁতুড়ঘরের নক্সা হইয়াছে। আমরা আগেরবারেই দেখিয়াছিলাম যে অণুর পুরী অনেক মহল। একেবারে বাহিরের মহলের খবর পাই সাধারণ আলোক-বিশ্লেষণে; মাঝবাড়ীর খবর পাই এক্‌স্‌-রে বিশ্লেষণে; আর একেবারে ভিতর মহল বা নিউক্লিয়াসের খবর আনিয়া দেয় প্রধানতঃ রেডিও-একটিভিটি। যেমন খবর পাইতেছি তেমনি নক্‌সা আঁকিতেছি। নক্‌সা দরকারমত বদল করিতেও হইতেছে। ভবিষ্যতেও হইবে। হিসাব (calculation) আর পরখ (Observation, Experiment) —এ দুয়ের সাট রাখিয়া চলিতে হইতেছে।

বর্‌ (Bohr) হাইড্রোজেন স্পেক্‌ট্রাম্ বুঝিতে চাহিয়া কল্পনা করিলেন—কেন্দ্রে "একটি" (one unit) পুংতাড়িত (positive) রহিয়াছে; আর সেই কেন্দ্র বেড়িয়া "একটি" স্ত্রী-তাড়িত (negative = ইলেক্‌ট্রণ) পাক খাইতেছে। "ম" ইলেক্‌ট্রণের ম্যাস্ ধরিলেন; "এ" ধরিলেন তার আবর্ত্তনকক্ষের ব্যাসার্দ্ধ; "ই" ধরিলেন পুং অথবা স্ত্রী তাড়িতের "মাপ" (charge)। প্রথমে হিসাব করিলেন—কত জোরে (forceএ) ইলেক্‌ট্রণ কেন্দ্র ছাড়িয়া উধাও হইতে চাহিতেছে ("কেন্দ্রাতিগ শক্তি"); আর কত জোরেই বা কেন্দ্রস্থ পুরুষ পলাতকা স্ত্রীটিকে তাঁর টানিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন ("কেন্দ্রানুগ শক্তি")। এ দুটো বিপরীত টান সমান; কেন না, স্ত্রীটি মামুলি পথে পাক খাইয়াই যাইতেছেন।

তার পর, গতিবিজ্ঞানের সূত্রে ইলেকট্রণের মোটমাট (total) এনারজি মিলিল। এনারজি আর ফোর্স উক্ত বিজ্ঞানের পরিভাষায় এক জিনিষ নয়। তার পর দেখিলেন—স্ত্রীটি একটিবার পূরা পাক খাইয়া আসিতে মোট কতটা বেগ (impulse) পাইতেছেন। তা গণিতের হিসাবে জানা গেল। সেটা যা দাঁড়ায়, সেটা কোয়ানটামের ("এইচ্"এর) কোন একটা গুণিতক (multiple) অবশ্যই।

কোয়ান্টাম্ থিওরি তাই দাবী করে। অর্থাৎ, কোয়ান্টাম থিওরি চায় যে—কোন একটা চক্রগতি (periodic action) হইতে গেলে, শক্তির একটা বাঁধা কনিষ্ঠ মাপ আছে ("h"), সেই মাপে অথবা তার কোন গুণিতকেই ক্রিয়া (action) হইবে। সে মাপের কোন ভগ্নাংশ অচল। এই "এইচ্" ক্রিয়ার (action or angular momentumএর) "পরমাণুতত্ত্ব"। সে তত্ত্বর অঙ্গচ্ছেদ নেই। এত ছোট যে বিলিয়ান—বিলিয়ান্ গুণ এঁর তনুটি গুণিত করিলে তবে না কি ইনি সাক্ষাৎকার যোগ্য হন। হিসাবে এঁর রাশ স্থির হইয়াছে। "h"=৬৫৫কে ভাগ দিতে হইবে একের পিঠে কমসে কম সাতাশটে শূন্য দিলে যে সংখ্যাটি হয় তাই দিয়া। এটি বড় মজার সংখ্যা। এই মাপে অথবা এর কোন গোটা গুণিতকে (multiple integerএ, যথা, 2h, 3h, nh) চক্রক্রিয়া চলিতেই হইবে। ধর, ইলেক্ট্রণ সব চাইতে ছোট গোল পথে পাক খাইতেছে। কেন্দ্রের আর বেশী কাছে ঘেঁষিয়া আসা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তা যদি হয় ত, ইলেক্ট্রণের ম্যাসকে, তার গতিবেগ (velocity) দিয়া গুণ করিয়া তাকে আবার সমস্ত বৃত্ত-পরিধি ("টু পাই") দিয়া গুণ করিলে, হুবহু "এইচ্" হইবে, এক পাই কমও না বেশীও না। এর চাইতে ঠিক বড় বৃত্তপথে ঐ গুণফল দুই "এইচ্" হইবে; তার চাইতে বড়তে তিন "এইচ্" হইবে। এইরূপ। ভগ্নাংশ, টুকরা টাক্‌রার কারবার নেই। পাইকারী কারবার, খুচরা কারবার চলে না। পূরা তনখা চাই; কর্তন করিলে চলিবে না। প্রকৃতির এই "গোটা-কারবার, "পূরা" নিষ্ঠা অদ্ভুত! আগে ভাবা হইত—প্রকৃতি কেজো শক্তি বা ক্রিয়মাণ শক্তির (এনারজি) ছোট ছোট প্যাকেট্ বা বাণ্ডিল করিয়া রাখিয়াছেন—প্যাকেট বা বাণ্ডিল আস্তই কারবারে খাটিবে। বাণ্ডিল ভাঙ্গা নিষেধ। ধর, তাপ বিকিরণ হইতেছে—অর্থাৎ, ছড়ান হইতেছে। যিনি ছড়াইতেছেন, তিনি তাপশক্তি ঐ রকম ছোট ছোট বাণ্ডিল বাঁধিয়া বিলাইতেছেন। এক বাণ্ডিলের কম বিলি হয় না। দেড় বাণ্ডিল, পৌণে দু'বাণ্ডিলও না। কেন না, ওরূপ করিতে গেলে বাণ্ডিল ভাঙ্গিতে হয়। সেটি হবার যো নেই। প্রথমে প্লাঙ্ক প্রমুখ কেউ কেউ এই সব লিলিপুটিয়ান বাণ্ডিলের সন্ধান বাহির করিয়াছিলেন। ফোঁটায় ফোঁটায় তেল দেওয়া যায়; আবার একটানা ধারায় গড়িয়েও দেওয়া যায়। প্রকৃতি ফোঁটায় ফোঁটায় তেল খরচ করেন; ঢালাও, এক নাগাড়ে (continuousভাবে) করেন না। করেন না বলিয়া, তার তাপ ইত্যাদি শক্তির ভাঁড়ার শীঘ্র উজাড় হয় না। এক নাগাড়ে খরচের হিসাব দেখা গিয়াছে প্রকৃতির গেরস্থালীর বরাদ্দ খরচের চাইতে বেশী হয়। প্রকৃতি পাকা গিন্নী। এখন, সমারফেল্ড প্রমুখ অডিটাররা নতুন অডিট্ বাহির করিয়াছেন। তাতে সেই বকেয়া প্যাকেট বা বাণ্ডিল কতকটা বাতিল বটে। কিন্তু আসলে ঠিক আছে। যেখানেই প্রকৃতি টেকো কাটিতেছেন, চরকা চালাইতেছেন কোথায়ই বা না চালাইতেছেন? অণুতেও বটে, বিরাটেও বটে; বিরাট্ জ্যোতিশ্চক্রের নাভিটি "hub"—যা কি বাহির হইয়াছে), সেইখানেই ঐ "এইচের" বা কোয়ানটামের কারবার। অর্থাৎ, পাকক্রিয়াটি ঐ "এইচে" অথবা উহার কোন গোটা গুণিতকে হইবে। কথাটা সোজা তরজমা করিয়া বলিলাম। সমারফেল্ডদের অডিট্ শিটে কিছু ম্যারপ্যাঁচও আছে। পাকা মুন্সী ছাড়া আনাড়ীতে বুঝিবে না। প্রকৃতি কিন্তু পাকা হিসেবী। ধর, একটা পাকক্রিয়া (periodic action) হইতেছে। ঘুরিয়া আসা যে এক কদমে (constant velocityতে) হইবেই, এমন কথা নেই। কার্য্যতঃ হয়ও না। কদমের বেশী-কমি আছে (অর্থাৎ variable)। এখন, এই রকম "এলোমেলো" কদমে চলিয়া সারা পথটা ঘুরিয়া আসিব, অথচ, যখন ঘোরা শেষ হইবে, তখন, ক্রিয়া সাকল্যে (total action) ঐ এইচ্ বা এইচের কোন গোটা গুণিতক রহিবে—এ বড় সোজা ওস্তাদী কসরৎ নয়! ইন্‌টিগ্রাল্ কাল্‌কুলাস্ নামক গণিত-শাস্ত্রটা দেখিতেছি আমাদের গিন্নীর নথস্থ! তিনি নথ নাড়িয়া ঠিক কদম

বাতলাইয়া দিতেছেন—যাতে ঐ "এইচের" বরাদ্দ ঠিক ঠিক বজায় থাকে। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শুধু সাংখ্যের পুরুষ নন—সংখ্যাপুরুষ— The God of Number। তিনি শুধু যন্ত্রী নন, মন্ত্রী।

কোয়ান্টামের তত্ত্ব আসলে বিন্দুতত্ত্ব। শক্তির নাদ (Continuum) অবস্থাও বিন্দু অবস্থা। বিন্দু হইলে তবে ক্রিয়ার সূচনা হইয়াছে। বিন্দুর আর পরিচ্ছেদ নেই, টুকরা হয় না। কাজেই, বিন্দু বিন্দু রহিয়াই শক্তিকে ক্রিয়া করিতে হয়। এ কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন। তবে, এ কথার বিস্তার এখানে করিব না।

আমরা Bohrএর হিসাব শুনিতেছিলাম। তাঁর দেওয়া হিসাবে বিন্দুশক্তি কি আকারে দেখা দেন, তা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। বিন্দুশক্তি আর কোয়ান্টাম্‌কে আমরা হুবহু মিলাইয়া দিতেছি না। তার দেরিও আছে। বিন্দুর পথ অবন্ধুর; কোয়ান্টামের কোটে শেয়াকুল কাঁটা। তবে বিন্দু ও কোয়ান্টা—এ দুয়ের একই বোঁটা, এক পর্য্যায়ের তত্ত্ব। যাই হোক্—Bohr হিসাবের খাতায় আঁক কষিয়া R অথবা Rydberg Constantএর এক দাম বাহির করিলেন। আলোর ঢেউ—ইয়ং-ফ্রেস্‌নেলের দিন থেকে বিজ্ঞানে চলিয়াছিল, এখনও অচল হয় নাই। একটা ঢেউ কতটা লম্বা, তা ধর জানি। সেই মাপটা (চূড়ো থেকে চূড়ো) তার দ্রাঘিমা (wave-length)। এখন এক সেন্টিমিটারে সেই দ্রাঘিমাটি কতবার ভাগ যায় জানিলে, জানা গেল—সেই উর্ম্মির "উর্ম্মি-সংখ্যা" (wave-number)। Rydberg স্পেক্‌ট্রাম লাইন্‌সগুলি সম্বন্ধে এই উর্ম্মি সংখ্যার একটা "পাকা ঘুঁটি" (constant) বাহির করিয়াছিলেন। স্পেক্‌ট্রাম্‌-বিশ্লেষণে উদ্ভূত বিভিন্ন রেখাবলীতে, এমন কি, সকল মূলভূত (elements)এর স্পেক্‌ট্রাম্‌ রেখাবলীতেও উর্ম্মিসংখ্যার উক্ত পাকা ঘুঁটিটি বর্ত্তমান। সে পাকা ঘুঁটির দাম ধার্য্য—প্রতি সেন্টিমিটারে এক লাখের কিছু বেশী উর্ম্মি। এই সংখ্যাটি বিভিন্নরশ্মি-বিশ্লেষণ-সম্ভূত উর্ম্মিসংখ্যায় অনুস্যূত (involved) দেখা যায়। Neilis Bohr—স্বয়ং দিনেমার; ম্যান্‌চেষ্টারে রাদারফোর্ডের (এখন লর্ড) সহযোগে কর্ম্ম করিতেন; এবং ইয়োরোপে যে সময় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়েই তাঁর প্রসিদ্ধ অণুরহস্যবিদ্যা বিদ্বন্মণ্ডলীতে প্রচার করিয়াছিলেন। রাদারফোর্ড অণুর অন্দরের নক্সাটি দিয়াছিলেন, অর্থাৎ ডিজাইন্‌টি; বর্ সেই নক্সার উপর খড়ি পাতিয়া তার "নাড়ী লক্ষণ" গণিয়া দিতে লাগিলেন—অর্থাৎ, atomic mechanicsএর সূচনা করিলেন। এই বর্ অণুর অন্দরের নক্সায় খড়ি পাতিয়া Rydberg Constantএর যে দাম ধার্য্য করিলেন, সে দামের সঙ্গে তার পূর্ব্ব যাচাই-করা দাম মিলিয়া গেল। কাজেই, হিসাব পরখের দ্বারা পাকা হইল। বিজ্ঞানে এইরূপ হামেশা হইতেছে। রেলেটিভিটি মতটা কি সত্য?—প্রশ্ন করিলে বলিতে হয়—"কে জানে বাপু! তবে দেখিতেছি—প্রত্যেক পরখেই এ মতবাদ খাসা উত্‌রাইয়া যাইতেছে। কাজেই, সত্য হওয়াই সম্ভব।"

এটমের ভিতরে "ফাঁকা আসমান" (roomy space) কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস বা ভূতবীজ; সেই ভূতবীজেই বস্তু (mass) প্রায় ষোল আনাই দেওয়া; চারিধারে মণ্ডলাকারে (বড় বৃত্ত আঁকিয়া হিসাব করিয়াছিলেন; কিন্তু বৃত্তাভাস বা ellipse হইতেই বা বাধা কি? সমারফেল্ড প্রভৃতি মামুলি হিসাবের সংশোধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।) ইলেক্‌ট্রন (এক বা অনেক) পাক খাইতেছে। ইলেক্‌ট্রনে "বস্তু" প্রায় নেই, তবে, রোখ খুব আছে। বিরানব্বুইটি মূলভূতের ভূতবীজ আলাদা আলাদা; তাদের আণবিক সংখ্যা স্বতন্ত্র; তাদের মণ্ডল বা চক্র এবং সে সব মণ্ডলে নটন্তী ইলেক্‌ট্রণ যূথও সংখ্যায় আলাদা। এইভাবের ফিল্ম উঠিয়াছে। এখনও মাঝে মাঝে ফটোগুলি retouch (রিটাচ) করিতে হইতেছে। ১৯৩২ অব্দে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারি "নিউট্রন" বাহির করিল। স্ত্রী ইলেক্‌ট্রণই (অর্থাৎ, negative) এতদিন জানিতাম, এখন পুংজাতীয় ইলেক্‌ট্রণও (অর্থাৎ, positive) শুনিতেছি। কিছুদিন আগে Cockcroft ও Walton ঘোষণা করিলেন—এটম্‌ স্বভাবে কোথাও কোথাও নিজেই ভাঙ্গে দেখি; কিন্তু এটম্‌ ভাঙ্গার যন্ত্র মানুষ আজ বানাইল! অর্থাৎ, সেই "বজ্র" যাতে ক'রে এটম্‌ ভস্ম আমরা পাইতে পারিব! অপরম্ কিং ভবিষ্যতি?

বিজ্ঞানের "গ্রাম্যভাষা" আওড়াইয়া আপনাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছি। এ গ্রাম্যভাষা কিন্তু একটু আধটু শোনার দরকার হইতেছে। নৈলে যে বজ্রও বুঝিব না, ভস্মও বুঝিব না। আমরা

প্রকৃতির প্রকৃত কাঠামোগুলো যে কি, তা আমরা হয় ত জানি না। বিজ্ঞান যেগুলো তার "ফটো" বলিয়া বাহির করে, সেগুলো সর্ব্বাংশে সত্যকার কাঠামো না-ও হইতে পারে। তবে, সত্য বলিয়াই চলিতেছে। গত্যন্তর নেই। অন্ততঃ মননের রাস্তায়—হিসেবী মগজের মাতব্বরিতে চলিয়া। ছবিগুলোর নিত্য নূতন "রিটচিং" সত্ত্বেও সেগুলোকেই আপাততঃ আমাদের কারবারি চিন্তার বৈঠক-খানায় সাজাইতে হইতেছে। কবে আবার পেরেকশুদ্ধ পাড়িয়া ফেলিতে হইবে তার ঠিকানা নেই।

ছবি শুধু যে বামনের দেশের এমন নয়, বিরাটের দেশেরও প্রচুর মজুদ হইয়াছে। সুদূর নক্ষত্রলোক, নীহারিকালোক ফটো পাঠাইয়াছেন। ছায়াপথের পরপারের খবরও পাইতেছি। আমরা আগে দেখিয়াছি—ব্রহ্মাণ্ডের সেই "পুরাণী" ছবি একেবারে আধুনিকতম বিজ্ঞানের ক্যামেরায় আবার উঠিতেছে। সে ছবি না কি এতদিন মরিয়া "ভূত" হইয়াছিল। চন্দ্রমণ্ডলের এক পিঠই দেখি; কিন্তু পরিচয়টা খুবই নিবিড়। পৃথিবী আপন বাঁধনে চন্দ্রকে এমনি বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে, সে পৃথিবী বেড়িয়া পাকই খাইতেছে, কিন্তু "পাশ ফিরিয়া" পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে পারে না। পৃথিবীর এই টানটি "gravitational grip"। এমনি টান যে, চাঁদ তার চাঁদমুখ ফিরাইতে পায় না। তবে, ঘোম্‌টার ব্যবস্থাটি আছে। এই দুর্জ্জয় নারীপ্রগতির দিনেও! তবু ভাল! মান করিয়া "কলাটি" দেখান ত চলে! অমন ঢলঢলে কান্তি—বিদ্যাপতি শ্রীরাধার মুখশশী আঁকিতে সাধ করিয়া না ঐ "হিমধামা"কে (কি না চাঁদকে) "হরিণীহীন" (কি না, নিষ্কলঙ্ক) করিয়া "কনকলতা অবলম্বনে" উদিত করিয়াছিলেন! এ ত গেল রসিকের বিদ্যাপতি। বিজ্ঞানের বিদ্যাপতি যাঁরা, তাঁদিকে জিজ্ঞাসা কর—বলিবেন চাঁদের ও চটক বাহার বেমালুম চোরা। মায়া, মতিভ্রম! নিকট পরিচয়টি লইবে? কেবল রুক্ষ পাহাড় পর্ব্বত আর আঁধার ফাটাল গর্ত্ত; ঘাস জলের গন্ধ নেই; বায়ুভুক্ হবে তার যোও নেই; বায়ুই নেই—চাঁদের এতখানি "টান" নেই, যাতে ক'রে একটা বায়ুমণ্ডল তাকে ঘিরিয়া আটক থাকিতে পারে। অথচ, তার চাঁদের টানে ধরার সাগর ফাঁপিয়া ওঠে; আরও কত কি! তবে চাঁদে আছে কি? শুধু ছাই, আর ~~ভস্ম~~ আগ্নেয়গিরির অন্তর্দ্দাহের জ্বালায় চাঁদের হাট পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে! এ সব বিরাটের দেশের কাহিনী আর একদিন না হয় পাড়িব।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাণীর খবর, জীবের খবর নিন। চাঁদ "প্রেত"লোক, ওখানে "জ্যান্ত"র চিহ্ন নেই। প্রাণিদেহের সূক্ষ্ম জীবকোষগুলো এটম, মলিকিউল চাইতে ঢের মোটা জিনিষ। তাদের ফটো তুলিতে বিজ্ঞানকে বড় একটা লিঙ্গপরামর্শ করিতে হয় নাই। অনেক তথ্যই প্রত্যক্ষগোচর। অবশ্য—যোগদৃষ্টিতে। বিজ্ঞানের যোগ—"কর্ম্মসু কৌশলম্"—উপযুক্ত যন্ত্রপাতি। যেমন, কেউ কেউ বলিতেছেন—এটম্ ভস্ম করার যন্ত্র এইবার বানাইয়াছি। যাই হোক্—জীবকোষেও (cellএ) নিউ-ক্লিয়াস্ আছে। তার আবার ছোটকর্ত্তা, বড়কর্ত্তা আছেন। তা ছাড়া, টানাটানিকর্ত্তা (attraction sphere or Centre) না কি একটিও আছেন। জীবকোষ তখন ব্রহ্মের মতন "একোঽহং বহুঃ স্যাং" কাজটি সুরু করে, অর্থাৎ এক দুই হয়, দুই চার হয়, ইত্যাদি। তখন এক অদ্ভুত ব্যাপার! রীতিমত সুতোকাটা আর বুনানীর ব্যাপার। সেই ঋগ্‌বেদের ঋষিরা যা বলিয়াছিলেন, তাই। বুনানীর "মাকু" (spindle) সত্য সত্যই দেখা দেয়; সেই মাকুতে জীবকোষের ক্রোমোসোম্‌গুলো কি ভাবে সাজান' গোছান' হয়, তা দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হবে—এ আজব তাঁতের চাঁই তাঁতি কেউ আছেন! এটমের বেলায় যেমন, এখানেও সংখ্যাতত্ত্ব। এটমের জাতিভেদ সংখ্যা লইয়া, জীবের জাতিভেদও সংখ্যা লইয়া। বাহিরের সংখ্যা নয়, একেবারে ভিতরের। এটমের বেলায় নিউক্লিয়াসে কতটা "নেট্ চার্জ্জ" আছে, তার সংখ্যা নিই; জীবকোষের বেলা ঐ তাঁতের "সুতোর" (Chromosomes) সংখ্যা নিই। সংখ্যাতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব। প্রতি "জাতির" জাতীয় বীজমন্ত্র আছে।

প্রাণীর হিসাব লইলাম। মনের হিসাব লইব না। নিষ্প্রয়োজন। এখন, এই সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান যে সব "ছবি" তুলিতেছেন, সেগুলো হুবহু সত্য ছবি না-ও হইতে পারে। না হবার সম্ভাবনা যে না আছে, এমন নয়। সেকালের বিদ্যা (যেটাকে আমরা সিদ্ধাশ্রম বা নৈমিষা-রণ্যের বিদ্যা বলিয়াছি, কিন্তু যে বিদ্যা কেবল যে ভারতেরই, এমন নয়) কতকগুলি "ছবি" তুলিয়াছিলেন।

"পুরাণের" ছবিগুলো আমাদের ঘরের দেওয়ালে ঝুলিত। এখন, আমরা সেগুলো নামাইয়া আবর্জ্জনার গাদায় ফেলিয়াছি। নতুন ছবি—পশ্চিমের আমদানী—এখন বৈঠকখানা "আলো" করিতেছে। এ দেশেও দু'চারিজন নতুন ঢংএর ছবি আঁকিয়া যশ পাইয়াছেন। প্রফুল্ল, জগদীশ, রামানুজম্, রমণ, মেঘনাদ, ঘোষ—আরও কেউ কেউ খুব খাতির পাইয়াছেন। পাবারই কথা। যাই হোক্—এখন চোক রগড়াইয়া দেখিতেছি, নতুন, টাট্‌কা কোন কোন ছবি সেই সব বাতিল, বকেয়া ছবির সঙ্গে মিলিতে চলিয়াছে। ধুলো ঝাড়িয়া, ময়লা মুছিয়া সেই সব পুরাণী তস্‌বীর আবার পরখ করা উচিত। তাঁদের আঁকার ঢং আর এঁদের ঢং আলাদা। তাঁরা আর এঁরা এক কায়দায় তুলি ধরেন নি। রংও আলগা। তাঁরা যে উপায়ে, যেমন করিয়াই জানিয়া থাকুন না কেন, তাঁরাও তবে জানিয়াছিলেন! আমাদের মতন এমন চুলচেরা কড়াক্রান্তির হিসাব তাঁরা রাখেন নি? বলিতে পারি না।

এখন, বজ্র আর ভস্মের লক্ষণ করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। যাতে ক'রে সব কিছু বিদীর্ণ, বিশীর্ণ হইতেছে, তাই বজ্র। নানান্ রূপ, নানান্ নাম। কোথাও বজ্র মানে তাপ বা অগ্নি; কোথাও রেডিও-এক্‌টিভিটি; কোথাও রশ্মি; কোথাও রাসায়নিক ক্রিয়া, যথা—অক্‌সিডাইজেশন্; কোথাও তাড়িতক্রিয়া, চৌম্বক ক্রিয়া; কোথাও মেটাবলিজম্; কোথাও "ভস্মকীট"; কোথাও অভিনিবেশ বা অন্য মানসিক ক্রিয়া, সাইকো-এনালিসিস্। সর্ব্বত্র এই বজ্র কাজ করিতেছে। এর যেটা নিরতিশয়-সমর্থ অবস্থা (Ideal Limit), সেইটাকেই "বজ্র" বলা উচিত বটে, কিন্তু এর অনুকল্প, প্রতিনিধি, ডেপুটি সর্ব্বত্র। মঘবার হস্তে ইনি বজ্র; শিবের হস্তে শূল; বিষ্ণুর হস্তে গদা। সব কিছু বিশীর্ণ করিতে সমর্থ। সূর্য্যে, নক্ষত্রে, রেডিও-এক্‌টিভ্ ভূতে মহা-অগ্নিরূপে ইনি খোদ এটমকেই বিশীর্ণ করিতেছেন। জীবকোষে মেটাবলিজিমরূপে হোম করিতেছেন। জঠরে ইনি ভস্মকীট। অন্তঃকরণে, মনে ইনি ত সদাই ব্যস্ত! প্রতিনিধিদের দেখিয়া "খোদ"কে ভুলিলে হইবে না। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই একটা বিরাট্ যজ্ঞশালা। ঋগ্‌বেদই বলিয়া গেছেন। যজ্ঞশালায় বজ্রাগ্নিতে নিখিল ভূতের হোম হইতেছে। সবই তাতে ইন্ধন। যারা জবর, জটিল (complex), তারা ভাঙ্গিয়া "সোজা", সিদে হইতেছে। সমীকরণের (equilibrationএর) দিকে ব্রহ্মাণ্ডের ঝোঁক্। পোটেন্‌সিয়ালের ভেদ, প্রেসারের ভেদ, টেম্‌পারেচারের ভেদ—সব "এক্কাকারের" দিকে চলিয়াছে। জাতিকুলমান আর বুঝি রয় না! এই বিশ্ব-ব্যাপী কর্মটির ফলে যাহা হইতেছে—এক কিছু বিদীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া আর যা এক কিছু হইতেছে, সেইটার নাম ভস্ম। এঁরও নানান্ রূপ, নানান্ নাম। উপনিষদ্ নিজেই বলিয়াছেন—সবই ভস্ম, সবই "ছাই"। তুচ্ছ, মিথ্যা বলিয়া নয়, আর এক অর্থে। তাই নয় কি? জল, মাটি, বাতাস, প্রাণী, অন্তঃকরণ—সবই ভস্ম নয় কি? এক কিছু বিশীর্ণ হইয়া এই সব "শরীর" হয় নাই কি? এ-সবই আবার বিশীর্ণ হইতেছে না কি? অবশ্য, ভাঙ্গার দিক্ যেমন আছে, গড়ার দিক্‌ও তেমনি আছে। গড়ার দিকে এঁর নাম সোম (অমৃত)। এ বিশ্ব মহা-শ্মশান। শ্মশানবিলাসী শিবের ভস্মই বিভূতি—অঙ্গভূষণ। কিন্তু ললাটে তাঁর সোম—সোমার্দ্ধ। এ অর্দ্ধেরও মানে আছে। যাই হোক্—এই বিশুদ্ধজ্ঞান দেহ, ত্রিবেদী দিব্যচক্ষু, সোমার্দ্ধধারী মহাদেবকে আমরা অভিবাদন করি। শ্রেয়ঃ প্রাপ্তি হউক।





পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

শিশির যখন পনের ছাড়াইয়া ষোলয় পা দিল তখন দেশের হাওয়া গিয়াছে বদলাইয়া। বছর দুই হইল সন্ধ্যা বিল পাশ হইয়াছে এবং প্রত্যেক মাসিকপত্রে বি-এ, এম-এ পাশ করা মেয়েদের ছবি বাহির হইতেছে। কর্পোরেশনের মেয়ে ইস্কুলের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। আর প্রথম স্ত্রীলোক কাউন্সিলর, প্রথম মেয়ে ব্যারিষ্টার, প্রথম ডেপুটি মেয়র ইত্যাদি লইয়া কাগজপত্রে বেশ একটা সমারোহ চলিতেছে। এক কথায়, নারী-জাগরণের ব্যাপার লইয়া সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলন, একটা চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। কিন্তু শিশিরের মায়েদের আমলে এতটা ছিল না। এতটা কি, বলিতে গেলে ইহার শতাংশের একাংশও ছিল না। শিশিরের মা গল্প করেন, শিশিরের বয়সে তাঁহার তিন বছর হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছিল এবং বড়ছেলে সুধীর হইয়াছিল কোলে। কিন্তু শিশিরের মনে হয়, তাদের মায়েদের যুগের, তখনকার কালের মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ হইত বটে, এবং তাহাদের জীবনের অভাব অভিযোগ এবং অসহায়তার একটা বিরাট ফর্দ্দও মুখে মুখে আজকাল সদাই দাখিল করে বটে, কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদের জীবনযাত্রা ছিল ঢের সরল সহজ এবং সুখী।

সেদিন তার পড়িবার ঘরে বসিয়া শিশির একটা পুরাণ খাতা পড়িতেছিল। কাল লাইব্রেরী গোছাইতে যাইয়া সে খাতাখানা আবিষ্কার করিয়াছে। সেখানা তার মায়ের ডায়েরি। সেই ডায়েরির পাতাগুলির মধ্যে তাহার মা এবং বাবার বিবাহিত জীবনের প্রথম দিককার কিছু কিছু কথা লিপিবদ্ধ আছে। কী সুন্দর স্বচ্ছ আর সরল তখনকার জীবন ছিল! ছোট ছোট সুখগুলি সুমিষ্ট ফলের মত জীবনকে সুগন্ধময় করিয়া রাখিত। অথচ তাহার জন্য না করিতে হইত কোন আয়োজন, না ছিল কোন প্রয়াস। প্রদীপের যেটুকু আলো আসিয়া পড়িত এবং অধরে যেটুকু সুখহাসি জাগিয়া উঠিত তাহাই ছিল অপর্য্যাপ্ত।

"মোটর উপর···" শিশির তাহার লজিকের বইয়ের একটা পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টাইয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল, "মেয়েদের কৃতিত্বের কাহিনী তখন কাগজে কলমে এতটা বিঘোষিত না হইলেও, তখনকার জীবন ঢের সুখী ছিল। জীবনে তখন এত জটিলতা ছিল না।"

শুধু জটিলতা নয় এত দায়িত্বও ছিল না।

কাল দুপুরে তরকারি কুটিবার সময় তাহার মা তাঁহার ননদের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, "সুধীর যখন হবে, বেদনা উঠেচে, সেই রাত্রিতেই আমার খুড়তুতো বোন কমলার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে। তোমার দাদার বয়স তখন সবে বাইশ। তাঁরও আবার এমন ছেলেমানুষি স্বভাব যে এই সবেতে সমানে মেতে ওঠেন। তার পরে রাত পোহাতেই সুধীর হো'ল। তাঁর বরাবর সখ ছিল মেয়ের। ছেলেকে দেখে হতাশ হয়ে বল্লেন পুতুলের বিয়েতে কমলার ছিল মেয়ে আর তোমার ছেলে তাই এমনটা হয়েচে।"

সেদিনটায় কলেজের কি একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ছুটি ছিল। তার বন্ধু মাধবীর বাড়ী যাইবে বলিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সহিসকে গাড়ী তৈয়ারী করিতে বলিয়া

শিশির নীচে নামিয়া আসিতেছিল। ইত্যবসরে কুটনো কোটার ফাঁকে ফাঁকে পিসীমার সহিত মায়ের গল্প সে শুনিতে পাইল।

কোচ্ম্যান গাড়ী তৈয়ারী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীতে উঠিয়া গদীর এক কোণে ঠেশ দিয়া সে ভাবিতেছিল, "সে কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে যে ছেলে হইবার রাত্রিতে সে পুতুলের বিয়ে দিতেছে! প্রথম মাতৃত্বের সে কত স্বপ্ন, কত দায়িত্ব! এমনতরো একটা চিরস্মরণীয় দিনে পুতুলের বিয়ে! সে তো এখন হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছে তাহার প্রথম মাতৃত্বের আগে সে অন্ততঃ রাসেলের এড়ুকেশন্ মন্তেসরি শিক্ষাপ্রণালীর মোটামুটি বিধি বিধান গুলা এবং শিশুস্বাস্থ্য ও শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় যা কিছু নামজাদা বই আছে সমস্ত পড়িয়া রাখিবে।

··কিন্তু তাহাদের মায়েরা?···হাসি পায়, জীবনের অমন একটা গুরুভার কর্ত্তব্যের দিনে পুতুলের বিয়ে! আর হইবে না কেন, তখন তো একটা গোটা সংসারের পূরোপূরি দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছিল না। তাঁহাদের মাথার উপরে ছিল অমন কত গণ্ডা মাসী, পিসী, শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী দিদিশাশুড়ীর দল। তাঁহারা জানিতেন ছেলেটিকে জন্ম দিয়াই তাঁহারা দায়মুক্ত। তাহার পর তাহাকে দিনের মাথায় কুড়িবার ঝিনুক দিয়া দুগ্ধ গেলান, পিঁড়ি পাতিয়া রোদ্রে দিয়া ভাজা-ভাজা করা, সে সমস্ত কর্ত্তব্যভার সেই সব মা মাসী শাশুড়ীদের হাতে।

বিতৃষ্ণায় অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে শিশির বাইরের স্বচ্ছ নীলাকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহার অমন যে ঝকঝকে দাদা সুধীর—সে'ও মানুষ হইয়াছে অমনি করিয়া ঝিনুকে দুধ খাইয়া আর রোদে পুড়িয়া।···

"কিন্তু আমাদের বেলায় কখনই অমন হতে দিতে পারব না—' শিশির মনে মনে কহিল, "আমাদের গৃহের সমস্ত বিধিবিধান একমাত্র আমাদের হাতেই থাকবে। মাথার উপর অমন পঞ্চাশটা লোকের কর্ত্তৃত্ব আমরা কিছুতেই সইব না।"

গাড়ীখানা ইতিমধ্যে মাধবীদের বাড়ীর গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বেলা তখন প্রায় তিনটা সাড়ে তিনটা। রৌদ্রের মাঝে শীতের তীক্ষ্ণতাও আর নাই এবং গ্রীষ্মের ঝাঁজও এখন আসিয়া মিশে নাই। ফাল্গুনের নাতিশীতোষ্ণ মধ্যাহ্ন বেলাটি রৌদ্রকরোজ্জ্বল। কোন আবশ্যক না থাকিলেও শিশির সঙ্গে যে স্কার্ফটা আনিয়াছিল—গুছাইয়া লইল, পায়ের লেডিজ্ জুয়ের একটা বোতাম খুলিয়া গিয়াছিল—পরাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিল।

(২)

মাধবী, তাহার বন্ধু, বাড়ীতে প্রাইভেটে আই-এ পড়ে এবং এখানকার মেয়ে হাইস্কুলের নীচে ক্লাসে পড়ায়। সে তখনও স্কুল হইতে ফেরে নাই। তাহার মা রান্না ঘরে বসিয়া কেক তৈয়ারী করিতেছিলেন। কাবার্ডের উপর কাঁচের বড় বড় প্লেটে ময়দা, কিসমিস, ডিম, মাখন সাজান। বলিলেন, "এখানে ব'সে কেন মা? মাধবীর ব'সবার ঘরে যেয়ে বসোগে। সে এখনই এসে পড়ল বলে।"

শিশির একটা টুল টানিয়া আনিয়া সেইখানেই বসিয়া কহিল, "এটা তো আর আমাদের বাড়ীর রান্না ঘর নয় যে বসতে কষ্ট হবে। এটা দস্তুর মত মডার্ণ রান্না ঘর। আমি শুধু এই ভাবি মাসীমা তোমার এত হালফ্যাশনের রান্নাঘরেও তুমি গ্যাসের চুল্লি ব্যবহার কর না কেন? তাহ'লে এই নোঙ্রা কয়লা টয়লাগুলোর হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।"

মাধবীর মা স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "মডার্ণ রান্নাঘর আর কি মা, শুধু যতদূর পারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করি। আর গ্যাসের চুল্লি কি আমরা ব্যবহার করতে পারি? খরচ কত। কলকাতার কর্পোরেশনও এখন ঘরে ঘরে গ্যাসের চুল্লি তেমন সুলভ করতে পারে নি। আর এ তো মফঃস্বল।"

বাহিরে মোটর বাস দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল।

"ওই বুঝি মাধবী এসেচে। যাও মা গল্প স্বল্প কর গিয়ে। আমি হাতের কাজটা সেরে নিয়েই তোমাদের জন্যে চা করে নিয়ে যাই।"

ইতিমধ্যে মাধবীর কথা হইতে হইতেই একটি সতের বছরের সুন্দরী হাস্যমুখী তরুণী ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহার পায়ে স্লিপার, কালোপাড়ের একটি সাদাসিধা শাড়ি; হাতে দু'গাছি সরু প্লেন্ বালা।

"—বাঃ, তুমি আমাদের জন্যে চা করে নিয়ে যাবে

কেন? একেই তো সারাদিন খাটচ। আমি কি কাজ কর্ম্ম সব ভুলে গেছি!"

মাধবীর মা মেয়ের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

"—সারাদিন কোথায় খাটছিরে? বরঞ্চ তুই এইমাত্র স্কুল থেকে এ'লি।"

মাধবী কোন উত্তর না দিয়া মৃদুমৃদু স্বরে গাহিতে লাগিল—

'শ্রাবণ হয়ে এ'লে ফিরে,
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে।'

এবং তেমনি গাহিতে গাহিতেই ষ্টোভ ধরাইয়া চায়ের জল চড়াইল।

"—কী সুর রে?"

শিশির প্রশ্ন করিল।

"এই কানাড়া সুরটা যেন আমাকে পেয়ে ব'সেচে। এখনই স্কুলের মেয়েদের এই গানটা শেখাচ্ছিলুম। বেশ লাগে না রে তোর এই গানটা?"

"—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করচি মাধবী, কিছু মনে করিস নে, এত—পরিশ্রম করে তোর স্কুলের চাকরী ক'রবার কী দরকার?"

"—কাজ করতেই যে আমার ভালো লাগে। তাছাড়া দুপুরবেলায় তো ব'সেই থাকি। সে সময়টা নেহাৎ অপব্যয় হয় না।"

মাধবীর মায়ের দিকে চাহিয়া শিশির প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা মাসীমা, আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের সমাজটা খুব আপ্ টু ডেট্—নয়? এই যে মাধবী বিয়ের আগে স্কুলে চাকরী করচে—এতে আপনাদের সমাজে নিন্দে হয় না?"

"নিন্দে কেন হবে বাছা। যখন ভালো পাত্র পাব তখন বিয়ে দেব। তাই বলে কখন বিয়ে হবে সেই প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়ে দেওয়াই কি ওর জীবনের উদ্দেশ্য? ওর নিজের জীবনের একটা মানে আছে। যা ভালো লাগে ওর, নিতান্ত অবিবেচনার না হ'লে আমরা কখনই তাতে বাধা দেব না।"

শিশির একটু ভাবিয়া কহিল, "তাই ত বলছিলুম আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা আর আপনাদের পূর্ব্ববঙ্গের সমাজ আমাদের চেয়ে অনেক এ্যাড্ভান্স।"

মাধবী ক্ষিপ্রহস্তে চা তৈয়ারী করিয়া একটি ছোট টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, "কিন্তু এ্যাড্ভান্সমেন্টের গল্প রেখে এখন চা খাও দেখি। মা, কেকের প্লেট্টা আগিয়ে দাও।"

চা খাওয়া শেষ হইলে শিশিরকে তাহার পড়িবার ঘরে বসাইয়া মাধবী গা ধুইতে গেল। গা ধোওয়া মিনিট দশেকের মধ্যেই হইয়া গেল। ততক্ষণ শিশির বইয়ের শেলফটার এটা সেটা নাড়িয়া দেখিতেছিল। কত বই। আর যে বইয়ের পাতা উল্টায়, সেই বই হইতেই নানা চিহ্ন, নানা নোট্ দেখিতে পায়—কী যত্ন করিয়াই না প্রত্যেকখানি পড়া হইয়াছে।

মাধবী আসিয়া কহিল, "কিছু মনে করিস নে ভাই, আজ রান্নাঘরের ঝি আসে নি। ওদিকের জোগাড় একটু দেখে দিই। তাতে আমার বোধ হয় মিনিট পঁয়তাল্লিশের বেশি সময় লাগবে না। এই সময়টা ..."

"—এই সময়টা আমি বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার জন্যে কিছু ভেবো না ভাই। তুমি যাও।"

মাধবী চলিয়া গেল।

কক্ষান্তর হইতে মাঝে মাঝে তাহার আনন্দ-প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর এবং গানের সুরের সহিত মিশিয়া তাহার নানা গৃহকাজের শব্দ সাড়া এখানে অবধি ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

শিশির আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। মাধবীর শেল্ফ হইতে টেনিসনের একটা কবিতার বই টানিয়া সে এতক্ষণ পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল; বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া দেখিল কলের কাছে বসিয়া মাধবী রান্নার পাত্র এবং কয়েকটা থালা গেলাস মাজিয়া ধুইতেছে। জলের ঝর্ণা-ধারার সহিত তাহার গানও চলিয়াছে।

কাপড়ের আঁচলটা কটিদেশে জড়ান। সমস্ত কাজেই তাহার সমান নৈপুণ্য আর আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবার সময়েও তাহার মুখে যেমন আনন্দের আভা দেখিয়াছিল, শিশিরের মনে পড়িয়া গেল ঠিক সেই আভাই তাহার মুখে, সে যখন কলের ধারে বসিয়া রান্নাঘরের বাসন মাজিয়া তুলিতেছে তখনও।

(৩)

শিশিরের পিসীমার বিবাহ হইয়াছে শানিয়াড়ির বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারে। পর্দ্দানশীন বনেদী বংশে। তিনি দিনকতক হইল অম্বলের বুকজ্বলা গলাজ্বলা থামাইতে শিশিরদের এই স্বাস্থ্যকর পশ্চিমের সহরে বাপের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছেন।

বাপের বাড়ীতে তিনি বড়-একটা আসিতে পান না। সম্প্রতি শাশুড়ী মারা যাওয়াতে স্বাধীনতা পাওয়ায় আসিয়াছেন। তিনি এখানে প্রায় দশ-বারো বছর পরে আসিয়াছেন। সমস্ত বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গেছে। সমারোহের আর অবধি নাই। কিন্তু ইন্দুমতী এই দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর বাপের বাড়ীতে আসিয়া অবাক হইয়া গেছেন। কী প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন! তাঁহার বিবাহের আগে বাড়ীর বৌ-ঝিয়েরা শাশুড়ির অনুশাসন মানিয়া চলিত। তা সে না হয় এখন শাশুড়ী গত হইয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া এখন যে তাঁহারা জুতা পায়ে লজপৎ পার্কে আবদুল বারীর এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের বক্তৃতা শুনিতে যাইবেন, সভাসমিতিতে অবাধে যোগ দিবেন, এবং দিনের বেলাতে যখন খুসী স্বচ্ছন্দে স্বামীর সহিত হাস্যালাপ করিবেন—এতটা স্বাধীনতা তাঁহাদের, এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। নবীন যুগের প্রখর আলো ইন্দুমতীর বনেদী বংশের সাবেকি কালের অন্তঃপুরে তখনও প্রবেশ করে নাই।

তিনি কহিলেন, "করেচ কি বৌ, শিশিরকে এখনও ইস্কুলে যেতে দিচ্ছ? সেই দশটায় নাকে মুখে দু'টি ভাত গুঁজে কখন স্কুলে যায়, আর আসে বেলা গেলে। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েচে না কি?"

শিশিরের মা জ্যোৎস্নাময়ী একটু কুণ্ঠিতস্বরে কহিলেন, "কেন ঠাকুরঝি, আজকাল সব মেয়েতেই লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখে। তা ছাড়া ও তো স্কুলে যায় না। যায় কলেজে। ও চৌদ্দ বছর বয়সেই ম্যাট্রিক পাশ করেচে। তার মানে গত বছরই ওর ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছে। তোমার দাদা বলছিলেন, ও যদি ছেলে হোত—"

তাঁহার অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া ইন্দুমতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "কে জানে বৌ তোমাদের কেমন ধারা আক্কেল। শিশির যদি আমাদের ছেলে হোত তাহলে কী হোত না হোত সে খবরে আমাদের দরকারটা কোনখানে? এ জন্মে যে মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সেই মেয়ে-জন্মটাকে মেনে নিতে হবে ত।"

কিন্তু ভাজের অবাক মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দুমতী যখন দেখিলেন কথাটা এখনও তিনি ভালো করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন একটু বিরক্ত হইয়া তিনি কহিলেন, "বলি ওর রূপটা কি সামান্য যে এমন করে হেলা-ফেলায় নষ্ট হয়ে যেতে দিচ্ছ। এখন কোথায় মুখে নানারকম মাখাবে, যত্ন করবে, তা নয় মুখ শুকিয়ে মেয়ে ইস্কুল কলেজ করছেন। কেন বড় হয়ে ওকে কি জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হতে হবে? না চাকরী করে তোমাদের খাওয়াতে হবে?"

জ্যোৎস্নাময়ী ঠিক ননদের মত অমন করিয়া ভাবিতে না পারিলেও কথাগুলা তাঁহার মনে লাগিল। আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষ। শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে এ পরিবারের কড়া নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিয়াছেন। সে সময়ে স্বামী এবং দেবরেরা কলেজে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছড়াইতেন, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাহাও তিনি শুনিয়াছেন। সব কথা বুঝিতে পারেন নাই। কতক বুঝিয়া এবং কতক না বুঝিয়া সায় দিয়াছেন। এবং তাহার পর শ্বশুর-শাশুড়ীর অন্তে যখন নিজেদের আমলে স্বামী শুধু ছেলেকে স্কুলে দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, মেয়েকেও প্রথমে স্কুলে এবং তাহার পরে কলেজে দিলেন, এবং ঘরে-বাহিরে সর্ব্বত্র হাল আমলের বিধিবিধান অপরিমিত উৎসাহে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখনও তাঁহার এই নূতনত্বের ঢেউ মন্দ লাগে নাই। কিন্তু কেবলমাত্র বাইরের খোলষটা ছাড়া হৃদয়ের কোন গভীরতম প্রদেশে সে সমস্ত আদর্শ বা আইডিয়া পৌঁছায় নাই।

তাই ইন্দুমতীর কথার উত্তরে তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, "তোমার কি মনে হয় ঠাকুরঝি বেশী লেখাপড়া নিয়ে থাকে ব'লে শিশিরের চেহারা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?"

"খারাপ ভালোর কথা জানিনে বৌ, মেয়ে তো তোমার খুবই সুন্দরী। কিন্তু বিয়ের আগে এই সময়টায় একটু যত্ন তাউত ক'রো। খাওয়াও ~~মাখাও~~, দেখ্‌বে রূপের আরও জৌলুষ খুলবে।

তাহার পরে আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সেই যে আমার জ্যাঠতুতো দেওর, যার কথা তোমায় আমি বলছিলুম, তার সঙ্গে কি আমি শিশিরের বিয়ে দেওয়াতে পারি নে ভেবেচ? খুব পারি। শুধু তোমরা যদি আমার কথা শুনে চল তাহলেই হয়। তারা খুব সুন্দরী মেয়ে খোঁজে।

"কত সুন্দর চায়? আমাদের শিশিরকে তুমি এক মাস আমার কথামত যত্ন করে দে'খ, ও পড়তে পারে না। দেখাবামাত্র পছন্দ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যে রকম ভাবে চলছে, এমন ক'রে চললে কতদুর কি হবে বলতে পারি নে। এখন ওর গড়নটা যেন বড্ড রোগা। গাল আরও পুরন্ত, আরও লাল হওয়া দরকার। অবশ্য খুব মোটা আমি বলছিনে।" ইন্দুমতী অনেক কথা একসঙ্গে বলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঝিকে ডাকিয়া এক গ্লাস জল আনিতে বলিলেন।

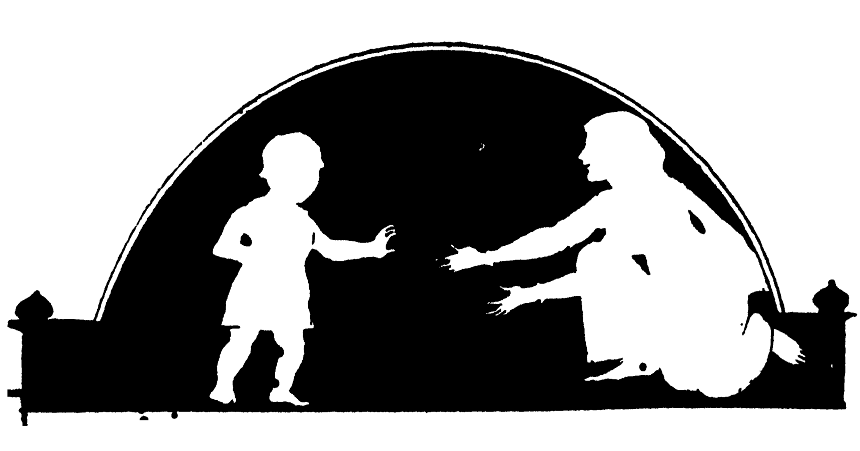
তাঁহার এই জ্যাঠতুতো দেওরটির কথা জ্যোৎস্নাময়ী অনেকবার শুনিয়াছেন; এবং ইন্দুমতীকে সঙ্গে লইয়া সে যখন কয়েক দিন আগে এখানে আসিয়াছিল, তখন তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিয়াও ছিলেন। দেখিতে সে কার্ত্তিকের মত। আর তাহার বাবা বংশের বড় ছেলে বলিয়া ইন্দুমতীর শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তির সমস্ত জায়গীর এবং শ্রেষ্ঠ অংশ পাইয়াছিলেন। মস্ত জমীদার, মস্ত বংশ। ছেলেটি অত বড় লোকের ছেলে হইয়াও মূর্খ নয়। কলিকাতা হইতে এম-এ পাশ করিয়া এখন তাহার গ্রামের বাটীতেই থাকে। লোভনীয় সম্বন্ধ সে কথা অস্বীকার করিবার জো নাই।

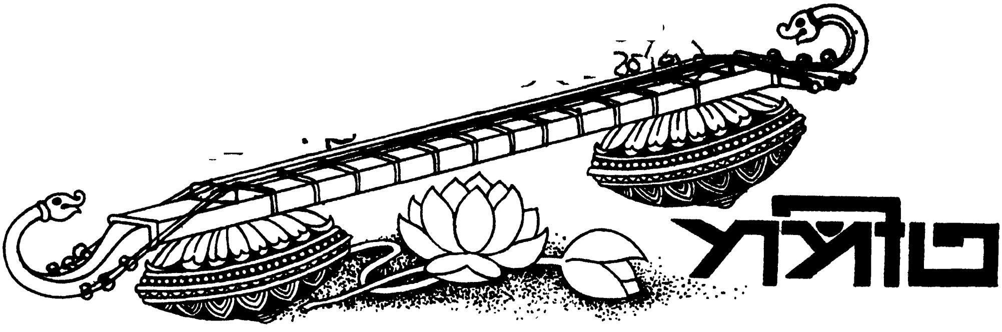
কিন্তু শিশিরের শিক্ষা দীক্ষার কথা স্মরণ করিয়া তাহার মা কহিলেন, "তোমাদের সাবেক কালের ঘর, তার কত শাসন, কত পর্দ্দা, কত ধরা বাঁধা। আর আমাদের শিশির যেমন ভাবে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে, সে কি পারবে ওরই সঙ্গে মানিয়ে নিতে?"

ইন্দুমতী বিস্ময়ে হতবাক হইয়া কহিলেন, "পারবে না! কেন পারবে না শুনি? বৌ তোর এতটা বয়স হয়েচে আর এই সোজা কথাটা বুঝিস নে যে, মেয়েমানুষের মন জলের মত। যেদিকে ফেরাবি সেই দিকে ফিরবে। আর সাবেক কালের চাল-চলনকেই বা অত ভয়টা কিসের? বদলে যেতে কতক্ষণ? এই যে মা বাবা বেঁচে থাকতে তোদের কেমন করে চলতে হোত? আর দাদাদের আমলে কতটা স্বাধীনতা পেয়েছিস? আমার জ্যাঠশাশুড়ী বেঁচে নেই। শ্বশুরও নেই। থাকবার মধ্যে বাড়ীর কর্ত্তাদের মধ্যে আছেন আমার শ্বশুর। সে'ও আর ক'টা দিন। তার পরে নিজেরা স্বাধীন হলে তখন যেমন খুসী চলবে। আসলে ওসব কোন কাজের কথা নয় বৌ। আসল কথাটা হচ্ছে টাকা। সংসারে টাকাটাকে চিনতে শেখ। ও বস্তুকে কখনো তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিসনে।"

জ্যোৎস্নাময়ীর মন অনেকক্ষণ হইতেই গলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, "আমি আর কি বলব ভাই। তোমাদের ভাইঝি, তোমরা যা ভালো বোঝ, তা-ই হবে। তোমার দাদাকে কথাগুলো আর একবার বেশ করে বুঝিয়ে দিও।"

(ক্রমশঃ)





কথা—শ্রীহাসিরাশি দেবী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাউল—দাদ্‌রা

আমার, খেয়ার নেয়ে !
এ বোঝা মোর সারাজীবন
কেমন ক'রে চল্‌বে বেয়ে !
পাথেয় মোর নাইক কিছু
তীরের মায়া টান্‌ছে পিছু
বাউল বাতাস বিশ্ব-বীণায়
কি গানখানি যাচ্ছে গেয়ে !
কেমন ক'রে চ'ল্‌বো আমি
আমার-ই সেই অচীন দেশে,
প্রদীপ আমার নিভু নিভু
আজ্‌কে দুখ রাতের শেষে ;
কোথায় যাব নেইকো জানা,
খুঁজিনি তার ঠিক ঠিকানা,
চল্‌তে যদি হবেই পথে
চল্‌ব আমার সে গান গেয়ে !

+ • + •
সা ন্‌া । II সা গা গা রগা মপা মা I গা -া -া সা
আ মা র খে য়া র নে॰ ॰ ॰ য়ে • • আ মা র

সা গা গা রগা মপা মা I গা -া -া -া -া -া I
খে য়া র নে• • • য়ে • • • • •

পা -া পা ক্ষা পা -া I ক্ষা পা -া ধা র্সা না I
এ •• বো ঝা মো র সা রা •• জী ব ন

ধা পা পা ক্ষা পা -া I গা পা মা গা রসা ন্া II

কে ম ন ক রে ০ চ ল্ বে বে য়ে০ ০

\+ ০ + ০

II ক্ষা পা -া না না র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I

পা থে ০ য় মো র না ই কো | কি ছু ০

কো থা য় যা ব ০ নে ই কো জা না ০

ধা না না র্সা র্রা -া I না র্সা না ধা পা -া I

তী রে র মা য়া ০ টা ন্ ছে পি ছু ০

খুঁ জি নি ০ তা র ঠি ক্ ঠি কা না ০

ক্ষা পা পা ক্ষা পা পা I ক্ষা -া পা ধা র্সা না I

বা উ ল বা তা স বি ০ বী ণা য়

চ ল তে য দি ০ হ বে প থে ০

ধা পা পা ক্ষা পা -া I গা পা মা | গা রসা ন্া II

কি গা ন থা নি ০ যা ০ চ্ছে | গে য়ে০ ০

চ ল্ ব আ মা র সে গা ন | গে যে০ ০

\+ ০ + ০

II সা সা সা সা ন্া -া I সা গা গা রা গা -া I

কে ম ন ক রে ০ চ ল্ বো আ মি ০

ক্ষা ক্ষা -া | ক্ষা পা -া I পা পা পা ক্ষা পা -া I

আ মা ০ | রই সে ই অ চী ন দে শে ০

মা মা মা | মা মা -া I ধা পা ধা মা গা -া I

প্র দী প | আ মা র নি ভু ০ নি ভু ০

সা সা ন্া | সা গা -া I রা পা পা | মা গা -া II II

আ জ্ কে | দু খ ০ রা তে র | শে ষে ০

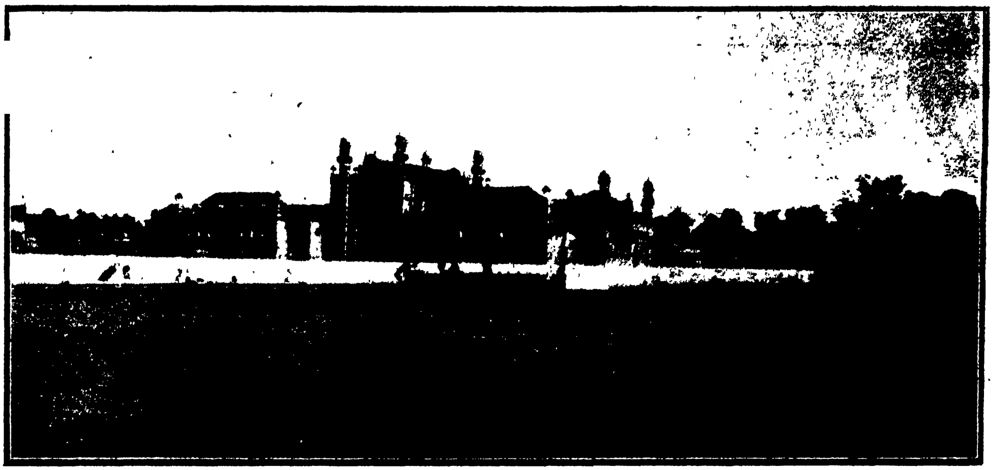
বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনে

সম্মিলনের কথা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

২৬শে ডিসেম্বর রাত্রিতে বরোদা পৌঁছিয়াছিলাম। দেখিলাম, ৪৮ ঘণ্টার একটানা রেলগাড়ীর ভ্রমণ বেশ ক্লান্ত করিয়াছে। রাত্রি প্রায় ১২টায় খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইলাম বটে,—কিন্তু কানে কেবল গাড়ীর শব্দই শুনিতে লাগিলাম। শ্রীমান বিনয়তোষের বাসার সংলগ্ন এক দালানে বরোদা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেনগুপ্ত মহাশয়ের বাসা। সেইখানেই আমার শুইবার জায়গা হইয়াছিল। বিনোদবাবুর সহিত পরিচয় হইল। অতি অমায়িক প্রকৃতির নিরীহ ভদ্রলোক। পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য আমি যাইয়া পড়াতে তাঁহাকে উপদ্রব সহিতে হইয়াছে বিস্তর,—কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি ভিন্ন বিরক্তির চিহ্ন দেখি নাই।

পরের দিন প্রাতে হাতমুখ ধুইয়া এবং জলযোগান্তে পূর্ব্বরাত্রির ঘুমের জেরই টানিয়া চলিলাম। শ্রীমান বিনয়তোষের তিনটি কন্যা, একটি পুত্র। প্রথমটি কন্যা, বয়স বছর নয়েক। দ্বিতীয়টি পুত্র, বয়স বছর সাতেক। তৃতীয়টি কন্যা—এবং চতুর্থটিও কন্যা,—মাত্র "টলি টলি পা পা, চলি চলি যায়।" কতকক্ষণ পরেই শ্রীমান শ্রীমতীগণের



সুরসাগর তীরে—ন্যায়-মন্দির

পরিবার কলিকাতায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন, নিজে নিঃসঙ্গ নীরস প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছেন। এক বৃদ্ধা 'বাই' অর্থাৎ ঝি আসিয়া দুইবেলা পাক করিয়া দিয়া যায়। আর এক 'বাই' ঘর ঝাঁট দিয়া, থালা বাসন মাজিয়া কাপড়-চোপড় কাচিয়া দিয়া যায়। অধ্যাপক মহাশয় দুপুরে কলেজে পড়ান, সন্ধ্যায় আবার মহারাজার নাতিনীটিকে প্রাইভেট পড়ান। অবসর সময়ে বসিয়া হতাশভাবে সিগারেট ফুঁকেন। সহসা তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে আগমনে আমার কক্ষ সরগরম হইয়া উঠিল। বহুদিন পরে তাহারা একজন খাস বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালী পাইয়াছে, তাহাদের আনন্দ দেখে কে? পমি (বড় কন্যা) স্কুলেও যায়, আবার ঘরে মায়ের সঙ্গে গৃহিণীপনায় শিক্ষানবিশীও করে। আমার মত বড় বড় খোকাকে শাসন করার অভ্যাসও তাহার হইয়াছে। ভ্রাতা ভগিনীর হাত হইতে নিদ্রালু অভ্যাগতকে উদ্ধার করিয়া সে জোর করিয়াই অবশেষে তাহাকে স্নান করিতে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীমান বিনয়তোষ প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনের সেক্রেটারি; তাহার উপর আবার অভ্যর্থনা, বাসস্থানবিধান, আমোদ-প্রমোদ, যাতায়াত, প্রদর্শনী, জলযোগ, নাটক, অধিবেশন ইত্যাদি সমস্ত সাব কমিটিরই সে পদমূল (Ex-officio) সম্পাদক, যদিও ঐ সকল কমিটির প্রত্যেকটিরই নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক আছে। এই ভোলা মহেশ্বর প্রকৃতির লোকটি কি আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত একা এই সমস্ত ব্যাপারের সূত্রধারগিরি করিতেছে, তাহা দেখিয়া প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। একজন বাঙ্গালী যুবক এই সুদূর বরোদায় আসিয়া এতখানি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং এমন গুরু ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার বহন করিবার যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ইহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালীর গর্ব্ব অনুভব করিবার কথা। মহারাজা সয়াজি রাও গাইকোবাড় প্রকৃতই গুণগ্রাহী, নচেৎ প্রাচ্যবিদ্যা-ভবনের (Oriental Institute) কর্ণধারও বিনয় হইতে পারিত না, প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনের সম্পাদকের পদেও সেই বাঙ্গালীকেই দেখিতাম না।

প্রথম দিন

সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ন্যায়মন্দিরে হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয়ও বিনয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। ভবতোষবাবু পিতার পাণ্ডিত্য ও সারল্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইহাঁর সাহচর্য্যে কয়েক দিন বড়ই আনন্দে কাটাইয়াছি। যথাসময়ে ভবতোষবাবুকে লইয়া বিনয়ের গাড়ীতে ন্যায়মন্দিরে গেলাম। ন্যায়মন্দির বরোদার হাইকোর্ট। বিস্তৃত সুরসাগর দীঘির প্রায় পাড়ে। পাশ্চাত্য ও দেশীয় স্থাপত্য পদ্ধতির মিশ্রণে নির্ম্মিত ইহা এক বৃহদাকারের এক-কক্ষ নিকেতন,—প্রতিধ্বনিনিবারক তারযন্ত্র, স্বরবিবর্দ্ধন যন্ত্র (loud speaker) ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাবলি-সমন্বিত। বৃহৎ কক্ষের মধ্য দিয়া লাল সালু-মণ্ডিত রাস্তা রাখিয়া দুই ধারে প্রতিনিধি এবং নিমন্ত্রিতগণের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। কক্ষের এক প্রান্তে ন্যায়-প্রতিমার মর্ম্মর-মূর্ত্তির পদতলে সভাপতি এবং মহারাজা সয়াজি রাও গাইকোবাড়ের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। দোতলার গ্যালারিতে মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। নিম্নে মূল আসরে নিমন্ত্রিগণের মধ্যেও কয়েকটি রূপসী মহিলাকে সমাসীন দেখিলাম।

পৌনে পাঁচটায় নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল আগমন করিলেন। ন্যায়মন্দিরের দ্বারে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। পাঁচটায় মহারাজের আসিবার কথা। দেরী হইতে লাগিল। আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম,—মহারাজ আর আসেন না! প্রায় ১৫ মিনিট দেরী করিয়া মহারাজ আসিলেন। সহসা সামরিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল,—নকীব মহারাজের নাম ও উপাধি সমস্ত ফুকরিতে ফুকরিতে অগ্রসর হইল,—পশ্চাতে সদলবলে মহারাজ মহারাণীসহ ধীরপদে অগ্রসর হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

এই সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি সয়াজি রাও গাইকোবাড়,—শিবাজি প্রতিষ্ঠিত বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যের এক গরিষ্ঠ অংশের উত্তরাধিকারী। সুদূর বাঙ্গালাদেশে বসিয়া এতদিন আমরা ইহাঁরই সম্পদের কথা, ইহাঁরই বিদ্যানুরাগের কথা, প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য ইহাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার কথা শুনিয়া আসিতেছি। নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, নাতিস্থূল রাজশ্রীমণ্ডিত বরবপু,—দেখিয়া সহসা আমার আকবর বাদশাহের মুখশ্রীর কথা কেন জানি না মনে পড়িয়া গেল। মুখে তেমনি একটু বক্র হাসির ভাব, সংসারটাকে যেন ভাল করিয়াই চিনিয়া ফেলিয়াছেন,—তথাপি অকরুণ নহেন। গায়ের রং বিশেষ পরিষ্কার নহে, কিন্তু উজ্জ্বল। বয়স ৭২।৭৩ বলিয়া অনুমান হইল,—তথাপি স্বাস্থ্য ভালই আছে। নিতান্ত সাদাসিধা পোষাক। অপরিচিত অবস্থায় ভীড়ের মধ্যে দেখা হইলে এটা নিশ্চয়ই বলা যাইত যে ইনি একজন কেউকেটা নহেন,—কিন্তু গাইকোবাড় বলিয়া অনুমান করা কঠিন হইত। গাইকোবাড়ের তুলনায় মহারাণী একটু দীর্ঘাকৃতি, আমাদের বাঙ্গালী ঘরের সৌভাগ্যবতী সধবা জ্যেঠিমা—পিসিমার মত,—তবে স্থূলাঙ্গী নহেন। গায়ে কি অলঙ্কার ছিল,—কি রঙ্গের কাপড় পরিয়াছিলেন, এই সকলের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়া পাঠিকাগণের মনস্তুষ্টি করিতে পারিলাম না,—কারণ লক্ষ্য করি নাই,—অথবা করিলেও ভুলিয়া গিয়াছি। তবে এইটুকু মনে আছে যে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনিগণের মধ্যে চতুর্থতম ধনশালী পুরুষ গাইকোবাড় মহারাজের মহিষীর গায়ে ঐশ্বর্য্যের গায়ে-পড়া বর্বর প্রকাশ কিছুই ছিল না। মহারাণীর মুখখানি কেন যেন একটু বিষণ্ণ ও মলিন বোধ হইল,—স্বাস্থ্য যেন তত ভাল নহে।

মহারাজ সম্মিলনের উদ্বোধন করিবেন। স্বরবর্দ্ধন যন্ত্র মহারাজের মুখের সম্মুখে স্থাপিত হইল। মহারাজ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। দোতলার গ্যালারির গায়ে লাগান চোঙ্ হইতে বর্দ্ধিত-স্বর হইয়া সেই বক্তৃতা বাহির হইতে লাগিল এবং সেই বিরাট জনসঙ্ঘের প্রত্যেকে



মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোবাড়

অতি স্পষ্টরূপে সেই বক্তৃতা শুনিতে পাইলেন। যেমন সরস পাঠভঙ্গী, তেমনি সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ;—আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

মহারাজের অভিভাষণটি সম্পূর্ণ, অথবা উহার সংক্ষিপ্তসার অনেক সাময়িক পত্রেই বাহির হইয়াছিল। কাজেই উহার অনুবাদ এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। তবে উহা হইতে দুই চারিটি উল্লেখযোগ্য কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতের প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মেলনের এই সপ্তম অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত কৃতার্থ হইয়াছি, ইহা বলাই বাহুল্য।······

প্রথমেই আমাদিগকে সদুঃখে স্মরণ করিতে হইতেছে যে প্রাচ্যবিদ্যার দুইজন শ্রেষ্ঠ উপাসককে আমরা ইতিমধ্যে হারাইয়াছি,—তাঁহারা স্যার জীবনজি জমসেদজি মোদি এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।······প্রায় আঠার বছর আগে, সংস্কৃত-পরিষদের এক অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া আমি পণ্ডিতমহাশয়গণকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলাম। আজ, এতদিন পরে, সত্যই যাঁহারা আজীবন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে এতগুলি পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমার



গাইকোবাড় মহিষী

রাজধানীতে সমবেত দেখিয়া আমার যে কত আনন্দ হইতেছে, তাহা আপনাদিগকে আর কি বলিব?

আমি নিজে কখনও প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করি নাই, কিন্তু যাঁহারা উহা করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার সীমা নাই। আমার সাধ্যানুসারে আমার রাজ্যে আমি প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দিয়া থাকি। বহু সহস্র প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমি প্রাচ্যবিদ্যা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, এবং তাহার তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ খানা প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।······দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাচ্যবিদ্যারসিক লোকের সংখ্যা দেশে প্রচুর নহে,—কত অপ্রচুর তাহা একটি

পরিস্ফুট হইবে। গাইকোবাড় প্রাচ্য গ্রন্থমালাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৭০ খানা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমরা কোন গ্রন্থই ৫০০এর বেশী ছাপি না। উহাদের মধ্যে ১২৫ খণ্ড যোগ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এবং গ্রন্থাগারের মধ্যে বিতরিত হয়। বাকী ৩৭৫ খানা বই কাটিতে ১৫।২০ বছর লাগিয়া যায়! প্রাচ্য বিদ্যায় অধিকতর আদর দেশে থাকিলে আমি গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল ডবল করিয়া দিতাম···

ভাল বই যোগ্য লোক দ্বারা সুখপাঠ্য ভাষায় অনুবাদ করাইবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জন-সাধারণ এই প্রকারের অনুবাদ দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। যে সমস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর গবেষণা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ উচ্চ উপাধি দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইতে এইরূপ অনুবাদের মূল্য অনেক বেশী। প্রাচীন 'পুঁথির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশও ঐ সমস্ত উপাধি দ্বারা পুরস্কৃত হওয়া উচিত।······

আপনাদের সময় আর আমি নষ্ট করিতে চাহি না। অপরিমিত মানসিক ভূরি ভোজন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, আমি তাহা আর দেরী করাইয়া দিতে চাহি না। আমি আসন গ্রহণের পূর্ব্বে শুধু আপনাদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি যে গবেষণা-বৃত্তির মত এমন মহৎ অথচ কষ্টসাধ্য বৃত্তি আর নাই। আমরা অধুনা ঘোর বিষয়বাদী হইয়া পড়িয়াছি, গবেষণা করিবার অথবা গবেষণার মহত্ত্ব বুঝিবার লোকের সংখ্যা নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাদের পথ তাই দুর্গম,—দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আসিয়া সময়ে সময়ে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াইবে। কিন্তু আপনাদের তাহাতে থামিলে চলিবে না, নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না,—হাসিমুখে, দৃঢ় পাদক্ষেপে আপনাদের পথ চলিতে হইবে। মনে রাখিবেন, আপনারা যে প্রদীপগুলি জ্বালাইয়া রাখিয়া যাইবেন, তাহাদের আলোকেই আপনাদের দেশবাসিগণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। এখন আমি এই সম্মেলন উন্মোচিত ঘোষণা করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের ভাষায় বলিতেছি—

"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।"

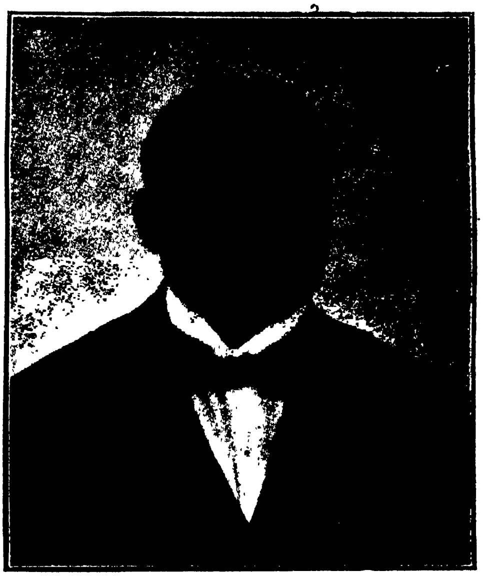
মহারাজের অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণও দৈনিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ অভিভাষণের সারাংশও এখানে দেওয়া অসম্ভব—সমালোচনার তো কথাই নাই। এই অভিভাষণের মোট কথাগুলি মিঃ কে, কে, রায় নামক একজন জয়সোয়াল-ভক্ত এপ্রিল মাসের (১৯৩৪) মডার্ণ রিভিউ পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রত্নক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে আমরা যে কয়জন আছি, আমাদের অধিকাংশেরই নেহাৎ আদামূলা লইয়া কারবার;—এই মহাসাগরতর-প্রয়াসী মহাপ্রাত্নতত্ত্বিক-চালিত মহানৌকার দিকে আমরা মূর্খের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকি মাত্র। ১৫ বছর পূর্ব্বে মহানাবিক জয়সোয়াল যখন দেখিতে দেখিতে একটির পর একটি করিয়া শিশুপালবংশীয় সম্রাটগণের সমসাময়িক খোদিত লিপির লেবেল-মারা মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তখনও অমনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে আমরা চাহিয়া ছিলাম! অবশেষে দৃঢ়োৎকচ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় যখন দেখাইয়া দিলেন যে এই মূর্ত্তিগুলি যক্ষমূর্ত্তি, এবং পাদপীঠস্থ লিপিগুলিও ইহাদিগকে যক্ষমূর্ত্তিই বলিতেছে, তখন এই মহানাবিক হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিলেন। এখন আর শৈশুনাগমূর্ত্তির নাম শুনিতে পাই না, মূর্ত্তিগুলি ফিরিয়া যক্ষ-মূর্ত্তিতেই পরিণত হইয়াছে!

ইহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। তখন চন্দ মহাশয়ের বয়স আরও ১৩।১৪ বছর কম ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, পরিশ্রম-ক্ষমতা ছিল,—ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়াইবার প্রবৃত্তি ছিল,—প্রত্নক্ষেত্রে অরাজকতায় দুঃখবোধ এবং অসহিষ্ণুতাও ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা একেবারে ভিন্ন। বাঙ্গালায় প্রাত্নতত্ত্বিকগণ, সকলেই ভাটির স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া ভাটিয়াল গান ধরিয়া নিশ্চিন্ত এবং পাঠ্যপুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত। তাই আজ মহানাবিক জয়সোয়াল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের মোনোগ্রাম বা নামসঙ্কেতচিত্র বাহির করিয়া নির্ভয়ে সেই আবিষ্কার বাজারে ছাড়িয়া দিতেছেন,—ডাক্তার প্রাণনাথ মহেঞ্জোদারোর দুর্ব্বোধ্য লিপি জলের মত পড়িয়া ফেলিয়াছেন! মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ পাঞ্চমার্ক বা পুরাণ মুদ্রার গায়ে অঙ্কিত সমস্তগুলি পাঞ্চ্ বা চিহ্নের ব্যাখ্যা কালী-বিলাসতন্ত্রে খুঁজিয়া পাইয়া জয়োল্লাসে তাহা বরোদা প্রাচ্য-বিদ্যা সম্মিলনে শুনাইয়া আসিলেন এবং জয়সোয়ালের নিকট হইতে বাহবাও আদায় করা গেল! আর, তাই, আজ অষ্টম শতাব্দী ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাচীন লিপির মধ্যে কি

প্রভেদ তাহা জানা না থাকিলেও ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নলিপি বিভাগের বড় কর্ত্তা হইতে বাধে না—এবং যশোবর্ম্মণের নাম যশোধর্ম্মণে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক পাগলামী গবেষণা বলিয়া চালাইয়া দিতেও কাহারও সঙ্কোচ হয় না। আবার এহেন কর্ম্মচারী কার্য্য হইতে অবসর লইতেছেন বলিয়া জয়সোয়াল তাঁহার অভিভাষণে কাঁদিয়া ভাসাইয়াও দিয়াছেন!

যাক্, পাঠকগণকে প্রত্নতত্ত্ব-জগতের ঘরোয়া কথা শুনাইয়া ধৈর্য্যের পরীক্ষা লওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। তবে প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনের বিবরণে এই প্রকার ছিটাফোঁটা অনিবার্য্য। কিথ্ সাহেব বলিয়াছেন,—ভারতবাসী স্বরাজ পাইতে চলিয়াছে,—নিজের দেশের প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ভারও তাহারা নিজেদের হাতেই তুলিয়া লউক,—কারণ বিলাতে না কি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-চর্চ্চায় ভাটি পড়িয়া আসিতেছে। জয়সোয়াল—প্রাণনাথ—দুর্গাপ্রসাদ—হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রমুখ মহানাবিকগণ এবার যেভাবে খুসী, যেদিকে খুসী, প্রত্নমহানৌকা চালিত করিতে থাকুন,—ম্লেচ্ছ পণ্ডিতগণ হাত পা ধুইয়া বসিতেছেন, আর বিরুদ্ধ সমালোচনার কোন ভয়ই নাই!

জয়সোয়াল ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে ভারতীয়-গণের মনোরঞ্জক ইতিহাস রচনা করিবার প্রস্তাব তাঁহার অভিভাষণে করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ শেষে মহারাজা গাইকোবাড় আবার একটি চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। এবার লিখিত বক্তৃতা নহে,—মুখে মুখে। বেশ বলেন। ভারতীয়গণ দ্বারা ভারতের ইতিহাস প্রণয়নের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তিনি উহার আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহার পরে ভারতীয় প্রত্নবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহানী মহেঞ্জোদারো সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিলেন। বড়কর্ত্তার এই বক্তৃতা সম্বন্ধে বাগ্‌বাহুল্য না করাই নিরাপদ। তবে যুদ্ধে নিজে অবতীর্ণ না হইয়া সেনাপতিগণের উপর ভার দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ হইত না কি? সম্মিলিত ভদ্রলোকগণের এক ফটোগ্রাফ গ্রহণ করিয়া তখনকার মত সভাভঙ্গ হইল। নৃত্যগীতের জন্য আসর প্রস্তুত হইতে লাগিল। মহারাজা সম্মুখের বৃহৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতর দ্বার দিয়া বাহিরের ফাঁকা জায়গায় যাইতে উদ্যোগী হইলাম। উপরের গ্যালারি হইতে নামিয়া তখন দলে দলে ভদ্র মহিলাগণ ঐ দরজা দিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন;—সেই নির্ভয় নিঃসঙ্কোচে সঞ্চরণশীল মহিলারণ্যের মধ্যে পড়িয়া আমি দিশাহারা হইয়া গেলাম। কচ্ছপ্রকটিতরবিশালনিতম্বা শ্যামলী মারাঠিনীগণ এক একজন দ্বিতীয় তারাবাইর মত দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া চলিয়াছিলেন। চম্পক-গৌরবর্ণা তন্বী গুর্জ্জরীগণ বিদ্যুল্লতার মত দিকে দিকে চমকিতে-ছিলেন। এই বজ্রবিদ্যুতের মধ্য দিয়া পথ কাটিয়া বাহির হওয়া প্রায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। তবে লেঙ্গামস্তক বাঙ্গালীকে কেহই বড় গ্রাহ্যের মধ্যে আনিতে-



শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল

ছিলেন না, তাই সমান্তরালে সজ্জিত কয়েকটা পামটবের আড়ালে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিয়া, একূলে ওকূলে প্রতিহত হইতে হইতে এবং চড়ায় ঠেকিতে ঠেকিতে দেহনৌকা কোন রকমে সেই সঙ্কীর্ণ স্থান পাড়ি দিয়া আসিয়া মোহনায় পড়িল। বাহিরে দাঁড়াইয়া দেশীয় রাজ্যের আভিজাত্যের এবং রাজৈশ্বর্য্যের জাঁকজমক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বরোদার পুলিশ অতি নিপুণভাবে সেই বিরাট জনসঙ্ঘ এবং মটরকারের বহর সংযত করিতেছিল। মহারাজা চলিয়া গেলেই সুনিয়ন্ত্রিত জলপ্রবাহের মত মটরকারের স্রোত

চলিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে ন্যায়মন্দির অপেক্ষাকৃত জনবিরল হইয়া পড়িল। বাহিরে বেশ শীত, তবু পিপাসা বোধ করিতেছিলাম,—শ্রীমান বিনয়কে ভীড় হইতে উদ্ধার করিয়া একটা লিমনেডের দোকানে যাইয়া বসিলাম।

পানীয় এবং পানযোগে তৃপ্ত হইয়া যখন ন্যায়মন্দিরে ফিরিলাম, তখন মধুচক্রে পালটিয়া বসা মধুমক্ষিকার মত প্রতিনিধি নিমন্ত্রিতগণ আবার আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। নৃত্যগীতের জন্য মধ্যে অনেকখানি গালিচামণ্ডিত জায়গা খালি রাখা হইয়াছে। উহার চারিদিকে আসনগুলি সজ্জিত হইয়াছে। সম্মুখের লাইনের একখানা আসন দখল করিয়া বসিলাম। নিকটবর্ত্তী দর্শকগণের সহিত পরিচয় হইতে লাগিল। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ প্রয়াগ দালালের সহিত পরিচয় হইল,—বোম্বের প্রিন্স অব ওয়েলস্ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ জি, ভি, আচার্য্যের সহিত পরিচয় হইল—এমন আরও কত! বহু দিন হইতে যাঁহাদের নাম শুনিয়া আসিতেছি, এবং চিঠিতে পত্রে ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া বড়ই আনন্দ হইল।

এইবার মহারাজা ফিরিলেন, আসিলেন, সঙ্গে একটি ১৯।২০ বছরের তন্বী সুন্দরী। মহারাজের শুনিয়াছিলাম দুই পক্ষ,—এই কি দ্বিতীয় পক্ষ? পার্শ্ববর্ত্তী গুজরাটি ভদ্রলোকের নিকট খোঁজ লইয়া জানিলাম,—ইনি দ্বিতীয় পক্ষ নহেন, কন্যার ঘরের নাতিনী। ইহাঁকেই আমাদের বিনোদবাবু প্রাইভেট পড়াইয়া থাকেন।

নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রথমে লাস্য নৃত্য,—ছামুজান ও আচ্ছাজান নামে দুইটি বাইজি নাচিল। ইহারা মহারাজের বেতনভোগী নর্ত্তকী। দুজনেই বয়স্কা। নাচিল যাহা, তাহা আমাদের দেশের খেমটা নাচ মাত্র। উঁচুদরের বাইজির নাচ ইহা অপেক্ষা সংযত। ভাল লাগিল না। নাচ শেষ হইলে লক্ষ্মীবাই নাম্নী বাইজি জয়জয়ন্তী গাহিলেন। আমরা প্রথম লাইনে বসিয়াছিলাম,—বেশ শুনিতেছিলাম। বাইজি গাহিতে জানে, কিন্তু গলা বড় মৃদু—ন্যায়মন্দিরের বিরাট জনতাকে সংযত করিবার মত গলা উহা নহে। গোলমালে বাইজির সুললিত মৃদুকণ্ঠ ডুবিয়া গেল,—বিরক্ত হইয়া বাইজি গান থামাইয়া প্রস্থান করিল। অমনি আবার বোম্বের জি, ভি, আচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপে রত এবং অন্যমনস্ক ছিলাম। সহসা বহু তরুণী কণ্ঠের মিলিত সুললিত সঙ্গীতলহরী কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখি, অপূর্ব্ব দৃশ্য! ১৬।১৭টি কিশোরী এবং যুবতী গাহিতে গাহিতে আসরে প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেকের মাথায় একটি করিয়া রাংতামোড়া কলসী, বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোকে ঝক্‌মক করিতেছে। প্রত্যেকের হাতে সুজিচালুনির মত গোলাকৃতি রাংতামোড়া কাষ্ঠের দণ্ড,—তাহাতে আড়াআড়ি করিয়া চারি জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি করতাল বাঁধা। যুবতীগণ মদগর্ব্বিত ভঙ্গীতে সম্মুখে এক এক পা ফেলিতেছে, আর যুগপৎ করতাল যন্ত্র দ্বারা উরুপার্শ্বে আঘাত করিয়া ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি উত্থিত করিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে অতি সুমিষ্ট কণ্ঠে গান গাহিতেছে! মুগ্ধ হইয়া গেলাম! এই তবে গুজরাটী গরবা? বাঙ্গালাদেশে বসিয়া ভদ্রমহিলাগণের এই ললিত নৃত্যপদ্ধতির কত বিবরণই না পড়িয়াছি, আর কল্পনায় কত সৌন্দর্য্যই না ভাসিয়া উঠিয়াছে! আজ নিজ চোখে সেই গরবা দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। যুবতীগণ পা ফেলিয়া ফেলিয়া আসরে আসিয়া পড়িয়াছিল। গণিয়া দেখিলাম, সংখ্যায় ১৭ জন। একজন মধ্যে বসিয়া হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। বাকী ষোলজন মাথার কলসী বামহস্তে স্বস্থানে ধরিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের করতাল যন্ত্র উরুদেশে আঘাত করিয়া ঝম্‌ঝম্ ধ্বনি উত্থিত করিতে করিতে নানা ছন্দে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চক্রাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যুবতীগণ পর্য্যায়ক্রমে মারাঠী ও গুজরাটী বেশে সজ্জিত। অর্থাৎ বাঙ্গালী মেয়েরা যে ফেশানে কাপড় পরে, একটি মেয়ে অবিকল সেই পদ্ধতিতে কাপড় পরিয়াছে।* পরের মেয়েটির আবার কাছা দিয়া কাপড় পরা। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে ষোলজন সজ্জিত। গায়ে সকলেরই এক একটি ব্লাউজ, অথবা ব্লাউজেরই মত জামা। সকলেরই প্রথম যৌবন, বয়স ১৫ হইতে ১৮ বলিয়া অনুমান হইল। সকলেই মহারাণী হাই স্কুলের ছাত্রী।

* বাঙ্গালী মেয়ের কুঁচি দিয়া কাপড় পরার সুন্দর পদ্ধতিটি যে গুর্জ্জরীগণের নিকট হইতে ধার করা, এ'খবর হয়ত বর্ত্তমানে অনেক বাঙ্গালী মেয়েই রাখেন না।

আমি যে সহরে বাস করি, তথায় সভাসমিতিতে, যাত্রা নাটকের আসরে, বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ সভায় বাঙ্গালী কুমারীগণের বৃহৎ সমাবেশ লক্ষ্য করিবার সুযোগ আজকাল সর্ব্বদাই উপস্থিত হইয়া থাকে। তুলনার জন্য এই গুর্জ্জরী-মারাঠী কুমারীগণকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রথমেই লক্ষ্যে পড়ে ইহাদের স্বাস্থ্য। ষোলজনের মধ্যে একটি মেয়ে মাত্র স্বাস্থ্যহীনা বলিয়া মনে হইল—অন্য সব কয়টিই নিটোল যৌবনা এবং সুগঠিতদেহা। মারাঠী মেয়েরা প্রায়ই শ্যামলী, গুজরাটীরা প্রায়ই গৌরবর্ণা। বাঙ্গালাদেশে সচরাচর যাহা দেখিতে পাই—তাহার তুলনায় দেহগৌরবে এই নৃত্যপরায়ণা বরাঙ্গিনীগণকে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠতর নমুনা বলিয়াই ধার্য্য করিতে হইল।

এই গরবা নাচের এক বিশেষত্ব দেখিলাম ইহার শান্ত, সুললিত ভঙ্গী। বাইজির লাস্য নৃত্যে যে লম্ফঝম্প, শ্রমসাধ্য অঙ্গবিক্ষেপ অথবা বিক্ষোভজনক নিতম্বান্দোলন দেখা যায়,—গরবাতে তাহার লেশমাত্র নাই। লাস্যে আনন্দ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু চিত্তে কিঞ্চিৎ কলুষেরও সঞ্চার করিয়া থাকে। গরবা পূজারিণী ব্রতচারিণীর নৃত্য,



ন্যায়মন্দিরে সম্মিলিত প্রতিনিধি ও নিমন্ত্রিতগণ

মারাঠী মেয়েদের মুখের হাড় দুইটি প্রকটতর, কাজেই চেহারায় লাবণ্যের অভাব। গুর্জ্জরীগণ প্রায়ই পরিপূর্ণ লাবণ্যের প্রতিমা। দলের নায়িকা ছিল যে মেয়েটি, তাহার মুখে লজ্জাসঙ্কোচের চিহ্নমাত্র দেখিলাম না। সেই প্রথমে গাহিতেছিল, দলের অন্য মেয়েরা, পরে সমবেত কণ্ঠে দোহারের কাজ করিতেছিল। এই মেয়েটি জোরে জোরে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল; প্রত্যেকবারই সামান্য একটু উল্লম্ফন সহকারে করতাল যন্ত্র দ্বারা উরুদেশে আঘাত করিতেছিল—এবং সুস্পষ্ট সবল কণ্ঠে গান গাহিতেছিল। —উহাতে ধূপ ধূনার গন্ধই পাওয়া যায়, বাসন্তীপূর্ণিমার সৌন্দর্য্যই উহাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

মেয়েরা গাহিতেছিল—

হুং রে গোবালন রে গোকুল গামনীঃ।
আম্মারাং গোরস লো রে
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।
উজলী রাতনী রে, অঙ্গে ছে ওঢ়নী।
তারানী ঢপকীবালী
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।

রঙ্গবেরঙ্গী রে সংধ্যানা ছেড় লাঃ।
ফরকে অম্বরথী উতরতাং,
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।
ভাল পরমাণে রে চাংদলো বিরাজেঃ
দামনী দেব গংগানী
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।
দেবোনী ভোমনী রে, মাথে ছে মটকীঃ
গোরাং গোরসবালী
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।
সায়রনী ছীপো নে, হৈড়াং মানবনাং
গোরস পাই পাই ঠারুং
গোবালন রেঃ গোকুল গামনী।
হুংরে গোবালন রে, গোকুল গামনী॥

ভাষা সর্ব্বত্র বোধগম্য হইল না, পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না। মোটামুটি বুঝা গেল, গোকুল গ্রামের গোয়ালিনীগণ মাথায় কলসী করিয়া দুগ্ধ বেচিতে চলিয়াছেন। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত্রি, মাথার উপর চন্দ্র হাসিতেছেন, অঙ্গে উড়নী চড়াইয়া গোরী গোরসওয়ালীগণ তাহারই মধ্যে গোরস ফেরি করিয়া বেড়াইতেছেন। জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে এই রকম একদল গোরী গোরসওয়ালীর সহিত যদি পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে কাহারও সাক্ষাৎ হইয়া যায়, তবে তিনি সুনীতি দুর্নীতির বিচার দুর করিয়া সানন্দে অঞ্জলি পাতিয়া সুন্দরীগণের নিকট দুগ্ধ ভিক্ষা করিবেন, এবং বিদায়কালে দাম দিবার সময় বিনা অনুতাপে তাহার ডবল দাম চুকাইয়া দিবেন,—এ কথা হলফ করিয়াই বলা যায়।

এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই গরবা নাচগান আমাদের দুইবার দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল। প্রথমবারে যখন গরবা হয়, তখনও সভাপতি শ্রীযুক্ত জয়সোয়াল নাচগানের আসরে আসিয়া পৌঁছেন নাই। তিনি আসিলে পরে গরবা 'এঙ্কোর' হয়।

এইবার গোরজি এবং কান্তজি নামক দুইজন বয়স্ক শিল্পী দক্ষিণী তাণ্ডব নৃত্য দেখাইল! ইহা অনেকটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের চড়কপূজায় 'কালীকাচ' নৃত্যের মত। অঙ্গভঙ্গীগুলির মধ্যে লীলায়িত ভঙ্গী নাই,—কাটা ছাটা, দ্রুত এবং আকস্মিক। এই ধরণের নৃত্য পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই, খুব ভাল লাগিল।

ইহার পরে ফয়েজ খাঁ দরবারী কানাড়া গাহিলেন কিন্তু জমাইতে পারিলেন না। তাই দ্বিতীয় গানে, বানরের গলায় মুক্তার হার দেওয়া নিরর্থক বলিয়া গীতচ্ছলে কলরবকারী শ্রোতাগণকে গালি দিয়া কুর্ণিশ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। ইহার পরে প্রায় ত্রিশটি গুজরাটী ও মারাঠী মেয়ে, বয়স ১০ হইতে ১২, গরবা নৃত্যছন্দে সরস্বতীর আবাহন গাইল—

"শাংতি স্বরূপ মনমংদিরিয়ামাং সরস্বতী পধরাবো বে"

ইহারা ফিমেল ট্রেনিংস্কুলের ছাত্রী,—বালিকাসুলভ চপল নৃত্যভঙ্গীতে তালে তালে পা ফেলিয়া নাচ ও গান শেষ করিয়া দিল। রাত্রি তখন বারটা বাজিয়া গিয়াছে। ইহার পরে আবিদ হোসেন নামক এক ওস্তাদ সেতার শুনাইতে বসিলেন—কিন্তু শ্রোতার দলের ধৈর্য্য আর ছিল না। সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিয়া পড়িলেন—দেখিতে দেখিতে ন্যায়-মন্দির খালি হইয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া দেখি বিনয়তোষের গৃহিণী গরম গরম লুচী ভাজিয়া মাংসের বাটি সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে! এই বৌটিকেই লক্ষ্য করিয়া কথাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমার বিনয়ের বৌ? সে পানটি পর্য্যন্ত সাজিতে জানে না!" আর আজ সেই বউ বিদেশে বিভূঁইএ চমৎকার নিপুণতার সহিত সংসার চালাইয়া যাইতেছে,—ছেলেপেলের আবদার অত্যাচার সহিতেছে,—অতিথি অভ্যাগতকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া সানন্দে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতেছে। জলে ফেলিয়া দিলে সাঁতার শিখিয়া লইতে মেয়েরা কত শীঘ্র পারে বিনয়ের বৌটি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সহস্র সহস্র যুগের সঞ্চিত প্রবণতা তাহাদিগকে অনায়াসে অভীষ্ট-পথে চালনা করে। (ক্রমশঃ)



সখের শ্রমিক

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

পঁচিশ বছর পূর্ব্বে প্রকৃত শুভক্ষণে শ্রদ্ধামতী ভূপতি চৌধুরীকে কেন্দ্র ক'রে শূন্যে ঘুরেছিল সাতপাক। সেই অবধি শ্রদ্ধামতী ছিল ভূপতির নেশার সামগ্রী—যেমন কলেজের ছাত্রের পক্ষে মোহনবাগানের ফুটবল প্রতি-যোগিতা, আইনজীবীর পক্ষে মুলতুবির পারিশ্রমিক, ভুজঙ্গমের সম্মোহিত ফণায় তুবড়ি বাঁশীর ভৈরবী আলাপ।

একদিন আদর ক'রে ভূপতি তাকে বলেছিল—আমার পিতামহের একসঙ্গে দুই স্ত্রী ছিল। তোমার যদি সতীন থাক্‌তো শ্রদ্ধা, তুমি কি করতে?

—এখনও যা করি তখনও তাই কর্ত্তাম।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ তোমার সুয়োরাণীর গায়ের পোকা মারতাম, গাছ-কোমর বেঁধে তাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কর্ত্তাম, এক একবার মনে হ'ত তার গায়ে এক ঝাঁক উই-পোকা ছেড়ে দিই।

পণ্ডিত হ'লেও ভূপতি মূর্খ ছিল না। কিন্তু এ গভীর হেঁয়ালী তার কাছে দুর্ব্বোধ অর্থহীন। সে বল্লে—আমার সে সুয়োরাণীটি কে শ্রদ্ধা?

—কেন এই পড়বার ঘর। ওঃ! ভাল লাগে দিন রাত এই ঘরটার ভেতর বই মুখে ক'রে বসে থাক্‌তে?

ভূপতি অপ্রতিভের হাসি হাস্‌লে। একবার চারি-দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে দেখে নিলে জ্ঞানের বটিকারূপ বইগুলা—তিন পুরুষের সংগ্রহ করা পুস্তকরাশি।

—সত্য শ্রদ্ধা, তুমি না যত্ন করলে এগুলো এতদিন পোকা আর ইঁদুরের পেটে যেত।

—তার বদলে স্বামী পেতাম।

সস্নেহে ভূপতি বল্লে—কি বলছ, বৌ-রাণী। তুমিই তো বল—যে ভালবাসে সে কি কখনো একেলা থাকে। আমি যে নিরন্তর তোমার হৃদয়ে আছি।

এবার শ্রদ্ধামতী একটু কোণ-ঠাসা হ'ল। সামলে নিয়ে বল্লে—আর তুমি। বই মুখে করে—

—বই মুখে করে তোমার ধ্যান করি যে বৌ-রাণী।

—কোন্ বইটায় আমার ধ্যান লেখা আছে বড় বাবু।

পরাজিত স্বামী বল্লে—যেতে দাও কথার মোচ্‌কোফের। বল তো অসময়ে উদয় কেন?

সহজে শ্রদ্ধামতী পাঠাগারে প্রবেশ ক'রে স্বামীকে বিরক্ত কর্ত্ত না। স্বামীর পাণ্ডিত্য তার মহা গর্ব্বের কারণ ছিল। মুখে সে কথা প্রকাশ ক'রে স্বামীকে প্রশ্রয় দেবার আশঙ্কায় এ সত্য গোপন থাক্‌তো তার হৃদয়ে। কেবল প্রকাশিত হ'ত পুত্রের কাছে যখন সে তাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্ত—ওঁর মত পণ্ডিত হও।

আজ যখন শ্রদ্ধামতী ভূপতির লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ কল্লে তখন সে পড়ছিল পুরুর সাথে সেকেন্দার শাহের যুদ্ধের কাহিনী। সে হেরোডোটাস-বর্ণিত সেই ঐতি-হাসিক কথোপকথনে এসেছে—যখন পুরুরাজা অধরকোণে হেসে সম্ভ্রমের সাথে বল্লে—আমি রাজার প্রতি রাজার আচরণ প্রত্যাশা করি তোমার কাছে।

শ্রদ্ধামতী বল্লে—কতদিন—

—কতদিন? এই দেখ না, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ আর এই ১৯৩২। পুরুরাজা—

—দাঁড়াও, পুরুরাজা না পাতলা রাজা দেখাচ্চি। তোমার ধ্যান ভাঙ্গাই। গোলাপ জলের কার্ফা থেকে অঞ্চল ভরে জল নিয়ে সে স্বামীর অতীত-চাওয়া চক্ষে নিক্ষেপ কল্লে।

চমক-ভাঙ্গা ভূপতি সপ্রতিভ হবার চেষ্টায় কালো কালীর দোয়াতে নীল পেন্‌শিটাকে চুবিয়ে দিয়ে আরও অপ্রতিভ হ'ল। সে অন্যমনস্কতার লজ্জা দূর কর্ব্বার জন্য দিন-পঞ্জীর একখানা পাতা ছিঁড়ে পৃথিবীর আবর্ত্তন এক পাক বাড়িয়ে দিলে। চোখ মুছতে মুছতে বল্লে—ওঃ! হ্যাঁ! বল কি বলছিলে।

দক্ষ সেনাপতির মত শ্রদ্ধামতী ভূপতির মনের কেল্লা অন্য দিক থেকে আক্রমণ করলে।

—তুমি আর মৌমাছি, প্রজাপতি, জোনাকী পোকাদের কথা পড় না?

—এক রকম শেষ করেছি তাদের চর্চ্চা। তবে হ্যাঁ নূতন কিছু—

—আজ বাগানে অনেক প্রজাপতি উড়ছিল। একটা এসে ঘরের ভেতর ডুলুর ছবির ওপর বসলো।

—বাঃ! তাই না কি? ওরা গরম ভালবাসে। তা হ'লে শীঘ্রই শীত পড়বে।

শ্রদ্ধামতীর তার সম্বন্ধে যে ধারণা উদ্বুদ্ধ হ'ল পতি-ভক্তি ম্লান হ'বার আশঙ্কায় তাকে চেপে মনের নীচের কোঠায় গুদাম-জাত কর্লে।

আবেগে ভূপতি ফুলদান থেকে একটা চন্দ্রমল্লিকা টেনে বার করলে। মন ছিল পরাক্জিত পুরুরাজার শৌর্য্যে। নিঃশব্দে শ্রদ্ধামতী তার হাত থেকে ফুলটা কেড়ে নিয়ে তাকে ফুল-দানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্লে। শাখা হ'তে দু ফোঁটা জল সেকেন্দারের ঘোড়ার মাথার উপর পড়েছিল। অতি যত্নে বস্ত্রাঞ্চলে ছবি মুছে শ্রদ্ধামতী মোটা ইতিবৃত্তখানা মুড়ে রাখলে।

—প্রজাপতির রঙীন পাখায় যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে তখন বেশ দেখায়। নয়?

এবার ভূপতির কল্পনা প্রজাপতির রবি-করোজ্জ্বল রঙিন পাখায় আকৃষ্ট হ'ল। সে হাসলে। স্ত্রী উৎসাহ পেয়ে বল্লে—প্রজাপতি কেন ওড়ে বল দেখি। কী শুভ—

প্রজাপতি ওড়ে কেন? তার যৌন-সংস্কার, অনুকরণ-বাদ প্রভৃতি নানা তথ্য ভূপতির মনের মধ্যে ভিড় কর্ত্তে লাগলো। ষট্পদ-তত্ত্বের কোন্ প্রবাহে স্ত্রীকে প্লাবিত কর্ব্বে ভূপতি তা স্থির কর্ত্তে পারলে না। বিরহান্তরিতা নায়িকার অন্তরের হাত-পা-ভাঙ্গা মর্ম্মকথার মত তার ভাব-গুলা তালগোল পাকিয়ে অষ্টাবক্র মুনির আকার ধারণ করলে। শ্রদ্ধামতীর প্রসঙ্গের মোটিফ কিন্তু ঘোড়দোড়ের ঘোড়ার মত তুড়ি-লাফ ও চম্পটের উৎসুকতায় চনবন কচ্ছিল; এবার সে লাগামের প্রতিরোধ মানলে না। শ্রদ্ধামতী আপনার মনে বলে ফেল্লে—প্রজাপতি উড়লে বাড়ীতে বিয়ে হয়। এবার যখন একটা প্রজাপতি আমার ডুলুর ছবির পরে বসেছে তখন ছেলের অচিরেই বিয়ে হবে।

ভূপতি এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সে বাস্তব জগতের শক্ত মাটির সন্ধান পেলে—ভস্মের স্তূপে হারানো হীরক খুঁজে পেলে। বুঝলে বায়ু-পরিবর্ত্তন না কল্লে পদে পদে তাকে স্ত্রীর কাছে অপ্রতিভ হ'তে হ'বে। বল্লে—চল বাগানে যাই।

আগন্তুক শীতের অগ্রদূত হ'য়ে শীতল বাতাস গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরছিল। অনেক মরসুমী ফুলগাছ মুকুলিত হয়ে সবুজ প্রাঙ্গণের নানা স্থলে জোট বেঁধে তাদের নবীন দেহে রবির কিরণ মেখে হাসছিল। সত্যই অনেক-গুলা প্রজাপতি দেহের রঙের অনুরূপ রঙীন ফুলের মাঝে খেলে বেড়াচ্ছিল—চেতন অচেতনের বিচিত্র বর্ণসমন্বয়—অপূর্ব্ব সমাবেশ আলো ও ছায়ার।

শ্রদ্ধামতীর অভাবের অভিযোগ শুনলে স্বামী। ছেলে বড় হয়েছে, বি-এস্‌সি পাশ করেছে। এখন তার বিবাহ না দিলে নিন্দা করবে আত্মীয়-স্বজন। শ্রদ্ধামতী যেমন তার শাশুড়ীর হাতের তৈরী গৃহিণী, তেমনি তার নিজের হাতে-গড়া গৃহ-লক্ষ্মীর জিম্মায় চৌধুরী বংশের মান-ইজ্জত বিভব-সম্পদ কুলাচারের নিয়ম-পদ্ধতি সঁপে দিতে পারলে সে দায়-মুক্ত হয়।

স্বামী বল্লে—মানলাম সব কথাগুলা। কিন্তু শ্রদ্ধা, তুমি আমি পুরাতন পঞ্জিকা। তোমার উচ্চাশার একটা প্রধান অন্তরায় আছে। ছেলে কি 'লাভ' না ক'রে বিয়ে কর্ত্তে চাইবে আজকালকার দিনে?

—লাভ না ক'রে চৌধুরীবংশের ছেলে বিয়ে কর্ব্বে না? আমার বাবা আমাকে ফুলের গহনা পরিয়ে বিয়ে দিয়ে-ছিলেন। তিনি কষ্ট ক'রে সোনার শাঁখা এক জোড়া দিতে পার্ত্তেন যৌতুকে। কিন্তু আমার উদার শ্বশুর মশায় তা' অবধি নেন নি। বিয়েতে লাভ! আমার ছেলে এত নীচ হ'বে? বিল্টুপুরের চৌধুরীবংশের ছেলে!"

এ ক্ষেত্রে ভূপতির হাসি তার সম্পূর্ণ অমনোনীত। তার অমনোনীত হাসির সময় শ্রদ্ধামতী লক্ষ্য কর্ত্ত স্বামীর সামনের দুটা দাঁতের মাঝের ফাঁক—যে ব্যবধান অন্য সময় তার পতি-ভক্তি ভরিয়ে রাখতো। দৃঢ় পতি-ভক্তিও অসহায় ভাবে ভেসে যেত শ্রদ্ধামতীর চৌধুরী-বংশের মর্য্যাদা-প্রীতির স্রোতে। এমনি একটা বন্যা এসেছিল এ সময়।

চৌধুরী-বংশের ছেলে বিবাহে লাভ করবে! বিল্টুপুরের চৌধুরী বংশের ছেলে!

—কি মুস্কিল। লাভ মানে কেনা-বেচার লাভ নয় গো। দোকানদারের লাভ না।

না। মুগের ডাল বেচার লাভ না, যবের ছাতু বেচার লাভ না। ছেলে বেচার লাভ। বিল্টুপুরের চৌধুরী বংশের ছেলে!

কি ঝঞ্ঝাট। বাঙ্‌লা লাভ না। লভ্—ইংরাজি লভ্—প্রেম—ভালবাসা। মানে অর্থাৎ—

মানে বল্‌তে হল না। শ্রদ্ধামতী বঝলে! প্রস্তাবের অন্তরালে বিল্টুপুরের চৌধুরী কুলের প্রতি প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুর অগৌরব নাই। কিন্তু পুত্র নন্দদুলাল মোটে একালের ছেলেদের মত নয়। বিবাহের নামে সে ঘাড় হেঁট্‌ ক'রে থাকে—সে কখনও প্রেম-বিবাহে আত্ম-নিয়োগ কর্ব্বে না।

করলেও ক্ষতি নাই। তবে স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণের মেয়ে হওয়া—হেই! হুট্! কই! নফ্‌রা!

কর্ত্তার শেষোক্ত অসংলগ্ন উচ্চকণ্ঠের শব্দগুলা নির্গত হল একটা ছাগল-ছানা দেখে। সে কি রকমে বেড়া ফাঁক ক'রে ফুলের বাগানে ঢুকে নষ্টারসিয়ামের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন কচ্ছিল। তার মুখ থেকে অসহায় কাতরতায় ঝুলছিল উক্ত ফুল-গাছের একটা শাখা—তার পদ্মপাতার আকারের ক্ষুদ্র পল্লব ভূপতির চোখের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ ক'রে দারুণ হৃদয়পীড়ার সৃষ্টি কর্‌লে।

একটা ছোটো-খাটো প্রলয়ের গণ্ডগোল উপস্থিত হল। নফর মালির নিঃসহায় প্রচেষ্টা ছাগ-শিশুর হাতে-পায়ে ভীষণ বল সঞ্চার কর্‌লে। তাঁর সাধের বাগানের নিরাময়তার জন্য উদ্বিগ্ন হ'য়ে বিল্টুপুরের জমিদারও ছুটাছুটি করলেন। আরও মালি এল, খালসানা এল, গোমস্তা এল। অবশেষে তিনটা এণ্টারাইম, দুইটা ডালিয়া, পাঁচটা নষ্টারসিয়াম প্রভৃতি নষ্ট করে ছাগল-ছানা ধৃত হল। তিন-কোণা বাখারী কণ্ঠ-ভূষণ পরিয়ে তাকে বাগানের বাহিরে নির্ব্বাসন করা হল।

গোলমালের প্রারম্ভেই গৃহিণী পরদা ও চৌধুরী বংশের মর্য্যাদা রক্ষার মানসে অন্দরে প্রবেশ করেছিল। পুত্রের বিবাহের অমীমাংসিত সমস্যা গুমরিয়া গুঞ্জরিয়া ছাগ-বিদ্বেষে পরিণত হল তার মর্ম্মে।

(২)

ঠিক সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিল্টুপুরের চৌধুরী বংশের গৌরব শ্রীমান নন্দলাল চৌধুরী বি-এস্‌সি কলিকাতা হগসাহেবের বাজারে পরিভ্রমণ কচ্ছিল। মুখে রঙমাখা অতি রঙীন পোষাক-পরা ভারতীয় মহিলাদের আর ততোধিক রঙ-মাখা-মুখ স্বল্প পোষাকাবৃতা য়ুরোপীয় মহিলাদের ভঙ্গী ধীরে ধীরে নন্দদুলালের হৃদয়ে অব্যক্ত ক্রোধ মেশানো বেদনার সৃষ্টি কচ্ছিল। আসল কথা, নন্দ-দুলাল হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল ও ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সেই দলের মানুষ ছিল যারা অধুনা দুঃস্থ বাঙ্গালীর জীবনে উদ্বাহ-বন্ধনকে ধুতির সঙ্গে নেকটাই বন্ধনের মত অসমীচীন বোধ কর্ত্ত। দেশের পনেরো আনা লোক যখন বস্ত্রাভাবে আট-আনা দিগম্বর তখন এই পাশ্চাত্য-পন্থী ভারতীয় মহিলারা নিজেদের অঙ্গে অত মসৃণ খাটী ও নকল রেশম ধারণ কর্ব্বার অধিকার পায় কোথায়? আর অত চূণ আর লাল রঙ—যখন শত গৃহস্থের পৈত্রিক ভিটা চূণ বালির অভাবে দৃষ্টি-ক্লেশ-কর। ভগ্নতা ও নগ্নতার বিভীষিকা চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী ওড়াচ্ছে যখন, তখন মানুষের বিশেষ মেয়ে-মানুষের কি উচিত এই বিলাসিতা। আর তার উপর বিলাতী পণ্যের স্তূপ এক একটা দোকানে যখন দেশের শিল্পী ও শ্রমিক অনশনে কঙ্কাল-সার দেহ নিয়ে বসে দিন গুণছে মরণের প্রতীক্ষায়, আর বলছে মরণ রে তুঁহু মোর শ্যাম সমান। নন্দ-দুলাল ভাবলে—অর্থাৎ বল্‌তো যদি বৈষ্ণব পদাবলীতে তাদের অভিজ্ঞতা থাক্‌তো।

তার নিজের অবশ্য আবশ্যক ছিল একটা বিলাতী পশমের কলার-সংযুক্ত গেঞ্জি—শীতকালে টেনিস খেলবার অত্যাবশ্যক সরঞ্জাম। দেশের মহিলা-বিভ্রাট প্রসঙ্গে অন্য-মন দুলাল এক বিপণিতে প্রবিষ্ট হ'ল। সর্ব্বনাশ! যে দেশে নাই সেখানে এক তরুণ বাঙ্গালী মহিলা অবলীলা-ক্রমে একরাশি পরিচ্ছদের ভিতর হ'তে মোজা, রুমাল, গেঞ্জি, সোয়েটার প্রভৃতি নির্ব্বাচন রতা। সংসারের নিষ্ঠুর বিধান—যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। নন্দ-দুলাল কি করে? নারীমর্য্যাদা শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙ্গালীর মজ্জাগত—সহজ বৃত্তি। পারত সে দোকান-দারকে জোর গলায় বলতে তার অভিলাষ তখনই পূর্ণ

করতে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকারের দাবী করলে মহিলা-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অথচ দোকানে একজন মহিলা প্রবেশ করেছে এই অতি ছোট কারণে বিপণি-বর্জ্জনও মানসিক দুর্ব্বলতার আভাস। সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল মহিলা ও তার প্রৌঢ় সঙ্গীর পিছনে। তারা কি করে না করে সে কথা জানবার তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে মানসিক ভীরুতাকে দমন কর্ত্তে হ'লে কেনই বা সে ঈশ্বর-সৃষ্ট নরনারী না দেখে মানুষ-সৃষ্ট জামা কাপড় আলমারী গজকাটী দেখবে। সে জোর করে যুবতীর পরিচ্ছদ-নির্ব্বাচন-ভঙ্গীতে দৃষ্টি সমর্পণ করলে। ঝাঁঝি পাট্টা কল্মী শাক শালুক গাছের বাধা অতিক্রম ক'রে রাজহাঁসের লম্বা গলা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হয়ে আপনার কার্য্য সিদ্ধি করে, ক্রেতার তরুণ-মরাল-ভুজ-যুগলও তেমনি দক্ষতার সঙ্গে সেই পরিচ্ছদ-সম্ভারের মধ্যে বিচরণ কর্চ্ছিল। সে হাতে রঙ মাখা ছিল না। সিন্দূরাভ হরিদ্রাটা তাদের স্বাভাবিক বর্ণ। তার কেশ-বিন্যাস মাত্র এলো গোঁপা—পুঞ্জীভূত কৃষ্ণকেশের রাশি—যেন সৌন্দর্য্যের দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্য।

যুবতীর সাঙ্গ হ'ল বেচা-কেনা। বাদামী কাগজে আবৃত হ'ল তার সওদা। সেটা নিয়ে কুলীর হাতে দেবার জন্য যুবতী মুখ ফেরালে। ওঃ! মদের নেশার মত মত্ততা চট্ ক'রে নন্দ-দুলালের মস্তিষ্ককে করলে অভিভূত। অজ্ঞাতে কলের পুতুলের মত তার দোদুল্যমান বাহুযুগল উঠে যুবতীর প্রসারিত বাহুর গুরুভার অপহরণ কর্লে। সঙ্গে সঙ্গে মাথা তার নমিত হল। রক্তের সিঁদুর মুখের ত্বক আর কানের মোটা চামড়া ভেদ করে নিজেকে দেখা দিলে।

প্রৌঢ় যুবতীর পিতা। তিনি সম্প্রতি জেলাজজের কর্ম্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করেছেন। উকীল ও মুনসেফ অবস্থায় ছিলেন বাবু ইন্দ্রভূষণ বটব্যাল। জজ হ'য়ে সরকারী কাগজে বাবু অভিব্যক্ত হ'য়েছিল মিষ্টার রূপে। মুগ্ধ বিস্ময়ে মিঃ বটব্যাল যুবকের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্লে'ন মাত্র।

মিছিলরূপে তারা তিনজনে বাজার-পথে চল্লো। অগ্রে বটব্যাল ও তাঁহার দুহিতা সন্ধ্যারাণী। পশ্চাতে বাণ্ডিল হাতে নন্দদুলাল। তারা এস্ সি দাঁর দোকানে গেল। সন্ধ্যা বাছাই-করা চন্দ্রমল্লিকা কিন্‌লে। মিষ্টভাষী দাঁ মহাশয় সেই তরল সৌন্দর্য্যকে পুঁড়ির কাগজে মুড়ে যখন দুলালের হাতে দিতে গেলেন, সন্ধ্যা আগ্রহ দেখালে ফুলভার বহনের।

—না, না—আমি নিচ্চি।

—আপনি কত নেবেন।

—বিলক্ষণ!—

মৃদু হেসে সন্ধ্যা পরাজয় স্বীকার কর্লে।

পথে একটা কুলি নন্দদুলালের ভার-লাঘবের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কর্লে। দুলাল বল্লে—হুপ্!

হুপ্! যে কথার অর্থ বোঝে না কুলি, সে কথার প্রতিবাদ সে ক'রে কিরূপে। সে রণে ভঙ্গ দিলে।

নিষ্ক্রমণের পথে মৃদুকণ্ঠে বটব্যাল মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন —ছোকরা কে?

মিস্ সন্ধ্যা বল্লে—বাবা, তুমি প্রাচীন ইতিহাস। নবীন জগতের প্রগতির কোনো খবর রাখো না।

মনে মনে নবীন জগৎ সম্বন্ধে ড পূর্ব্বক ইংরাজি অভি-সম্পাতের বাকাটি ব'লে একটি নূতন সিগারেটের মুখাগ্নি কর্লেন মিঃ বটব্যাল।

তারা বাজারের বাহিরে প্রশস্ত বারান্দায় এসে দাঁড়ালো মোটরের অপেক্ষায়। সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়ালো দুলুর দিকে। সে মুখের কমনীয় সরলতা, বিশেষ তার চোখের প্রগল্‌ভ উজ্জ্বলতা দুলালকে মদির মত্ততার আস্বাদন দিলে। সে চোখ নামিয়ে নিলে। তার মুখের বর্ণ হ'ল সিঁদুরে লাল।

—আপনি গ্রাজুয়েট?

—আজ্ঞে হাঁ।

—কতদিন এ কাজ কর্চ্চেন?

কি কাজ? কত দিন? এত সমস্যা সমাধান ক'রে অঙ্ক কষে উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে। বিশেষ অঙ্কশাস্ত্রের উপর চিরদিন সে চটা। সুতরাং সুষ্ঠু জবাব দিলে নন্দদুলাল—অল্পদি—বলবার উদ্দেশ্য ছিল—অল্পদিন। কিন্তু ন-টা অনুচ্চারিত রয়ে গেল।

—বেশ! চমৎকার! শ্রমের সম্ভ্রম বাড়ানই এখন দেশে নূতন-জীবন-রস সঞ্চারণ।

শেষের গভীর গবেষণাপূর্ণ কথাগুলো মুখস্থ বল্লে সন্ধ্যা—'মুক্তির পথে' কাগজের সম্পাদকীয় বক্তব্য থেকে।

তাদের গাড়ী এলো। সন্ধ্যা তার হাত থেকে বাণ্ডিল দুটা নিয়ে গাড়িতে রাখলে। তার হাতে একটি সিকি

দিলে। মন্ত্রমুগ্ধের মত জমিদার-পুত্র শ্রীনন্দদুলাল চৌধুরী বি-এস্‌সি সে দান অভিবাদন ক'রে গ্রহণ কর্লে।

গাড়ীতে মিঃ বটব্যাল জিজ্ঞাসা কর্লে—ব্যাপারটা কি? কে ও-ছোকরা?

সন্ধ্যা বল্লে—বাবা, ওঁরা গ্র্যাজুয়েট কুলি—শ্রমিকদের সম্ভ্রম বাড়াবার জন্য ওঁরা মোট বহেন, জুতা বুরুষ করেন—কত কি করেন। ওঁরাই প্রকৃত দেশ-হিতৈষী, না বাবা?—

বাবা বলতে যাচ্ছিলেন—তোর মুণ্ডু! কিন্তু তাতে তর্ক বাড়তে পারে এবং আণ্ডারগ্রাজুয়েট কন্যার প্রাণে ব্যথা লাগতে পারে এই ভেবে প্রত্যুত্তর দিলেন না। একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু অসাধারণ জোরে তার ধূমশোষণ কর্লেন।

(৩)

প্রথম উপার্জ্জনের অর্থ! সে অর্থ নানা লোকে নানা ভাবে ব্যয় করে। কেহ দেয় কালীঘাটে পূজা, কেহ দেয় পীরের দরগায় ফয়তা। কারও উপার্জ্জনের প্রথম অর্থ ঋণ মোচন করে, কেহ কেনে সিগারেট প্রথমেই অর্থ উপার্জ্জন করে। নন্দদুলাল তার প্রথম উপার্জ্জনের নিকেল-খণ্ড নিয়ে কি করবে তা ঠিক কর্ত্তে পারলে না। সে কাণ্ডারী-বিহীন জেলে-ডিঙ্গির মত রাত্রি আটটা অবধি গড়ের মাঠে ভেসে বেড়ালে। মাঝে মাঝে গ্যাসের আলোতে ধরে সিকিটা দেখতে লাগলো। বারকতক রাজার মুখ তার দৃষ্টিগোচর হল না। সে স্থলে দেখলে সে রাণীর মুখ—যার চক্ষে সশ্রদ্ধ করুণা, যার মৃদু হাসির তলে নয়নগোচর হয় কটা কুন্দধবল মানানসই দাঁত, যে দাঁতের প্রাকার ভেদ ক'রে ধ্বনিত হয় স্বদেশ-মঙ্গলগীতি—শ্রমিকের শ্রম সম্ভ্রমের বাণী।

নন্দদুলাল যখন হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে প্রত্যাবর্ত্তন কর্লে তখন নলিনী সেনের কক্ষের তর্কসভা হ'তে চমক-ভাঙ্গা বিদ্রূপের বুক-কাঁপানো হাসির শব্দে সে শিউরে উঠলো। তবে কি এরা কিছু জেনেছে না কি?

তার্কিকদের মধ্যে ছিল তিনটে দল—চরমপন্থী, নরমপন্থী ও সহজপন্থী। তিন পথের সন্ধিস্থল ছিল বিবাহ বন্ধনে অবজ্ঞা। চরমপন্থীর মতে দেশের অবস্থা ভেবে কারও উচিত না বিবাহ করা। নরমপন্থীর মতে মাত্র তার বিবাহ করা উচিত যার স্বোপার্জ্জিত আয় মাসিক অন্যূন দুই শত টাকা। আর সহজপন্থী বল্‌ত—বিবাহ নির্ব্বোধের দুর্ব্বলতা। যৌন-মিলন স্বাভাবিক এবং তা চাই সমাজে; কিন্তু মিলনটা হ'বে সহজে। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষে প্রেম হ'লে তারা অপেক্ষা কর্ব্বে না কারও অনুমতি, কোনো নিরর্থক সামাজিকতার অনুশাসন। নর-নারীর মিলন-স্পৃহা জীবনের একটা সহজাত আদিম স্পন্দন। নন্দদুলাল চরম পথের অধিনায়ক না হ'লেও একজন সেনাপতি। রোজগার-ক'রে-বিবাহ-করা দলের চাঁই ছিল—বিশ্ব-বিজয়। নলিনী সেন মান্‌তো আদিম বৃত্তিকে।

তর্ক কক্ষে প্রবেশ ক'রে নন্দদুলাল বুঝলে বিদ্রূপের হাসির লক্ষ্য সে নয়—অম্বিকা তালুকদার। অম্বিকার পিতার এক পত্র এদের হস্তগত হ'য়েছিল। তাতে লেখা ছিল যে মাঘ মাসে তার বিবাহ। সর্ব্বনাশ! অম্বিকা নরমপথের লোক—দু'শো টাকা কেন, দু'পয়সা রোজগারের তার আশা ছিল না আপাততঃ। সে অবস্থায় বছরে একটি, এমন কি, হ'তেও পারে যমজ—তালুকদার এই অভাগিনী বঙ্গ-মাতার ক্রোড়ে সমর্পণ করা আর দেশদ্রোহিতা, সমাজদ্রোহিতার মাঝখানে ব্যবধান কয় ইঞ্চি। সকলে সমস্বরে বল্লে—ছিঃ!

চরমদলের নিরঞ্জন বল্লে—এই জাত স্বরাজ চায়! হা অদৃষ্ট! আগে অভিনান্স ক'রে বিয়ে বন্ধ হ'ক, তার পর সাদা কাগজ।

অরুণকিরণ (নরম) বল্লে—দারিদ্র্য আর অনশন। যাত্রার রাবণ যেমন মরণকালে বলেছিল—রাম! রাম! দক্ষিণে রাম, উত্তরে রাম, চারিদিকে রাম, আমিও বলি—পশ্চিমে অনশন, পূর্ব্বে বুভুক্ষা, উপরে দারিদ্র্য, নীচে কাবুলীর দেনা।

সে অভিনয়ের সুরে অঙ্গভঙ্গী ক'রে এ কথাগুলা বল্লে। সে ইনষ্টিটিউটে 'ধনঞ্জয়' নাটকে কাটা সৈন্যের ভূমিকায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছিল। সেই অবধি তার হাবভাব আর কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে শিশির ভাদুড়ী ফুটে উঠতো।

নলিনী (সহজ) বল্লে—আরে বাবা! বিবাহ তো আবহমান কাল লোকে করে আসছে। তার ফলে পৃথিবীর এই দুরবস্থা। খানিকটে জমির টুকরোর ওপর তিন-রঙা নিশেন উড়বে কি ডোরা-কাটা নিশেন উড়বে, তাই নিয়ে লোকে গোলাগুলি বোমা নিয়ে লড়াই করে মরে। আরে ছ্যা

বিজনকুমার চরম-পন্থী হ'লেও স্পষ্টবাদী। আর তার রস-বোধ বিশ্ব-বিশ্রুত; অর্থাৎ গোলদীঘি ব্রহ্মাণ্ড খ্যাত

সে গম্ভীরভাবে বল্লে—বিশ্ব-শান্তির মাত্র উপায় কচাকচ্ বিয়ের বাঁধন কাটা। ব্যর্থ জেনিভা।

কিন্তু সবাই তারা গ্র্যাজুয়েট—বোকা তো নয়। তার প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আত্মপ্রকাশ কর্লে গাম্ভীর্য্যের চীনের প্রাচীর ভেদ করে। এমন সঙ্কটের সময় বিদ্রূপ। বহু কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল—শেম্! শেম্! লালগোপাল নূতন এসেছে কুমিল্লা আঁধার ক'রে। সে বল্লে—শ্যাম্।

শান্তি স্থাপিত হ'ল কক্ষ-মাঝে!

তালুকদার জানতো আর মানতোও নীতি—বোবার শত্রু নাই। সে নীরবে শঙ্কিত করে গোঁফের ডগা নিয়ে দড়িটানা অভ্যাস করছিল। সে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের দলে দড়ি টানতো।

অরুণকিরণ সেন বল্লে—এখন টানিছ গোঁপ। বিবাহের পরে গজাইবে দূর্ব্বা তব ঘাড়ে। তখন কাটিবে ঘাস।

মন্দিরমঙ্গল (চরম) মনস্তাত্ত্বিক। মনের-ভাব-বিশ্লেষণ-পটুতা তার গোলদীঘি-প্রসিদ্ধ। অপরে বিঁড়ী খায়, লুকিয়ে বিলাতী চুরুট ভস্মীভূত করে; কিন্তু সে শামুকের খোলে রাখে 'বঙ্কি-খোল' স্বদেশী নস্য। এক টিপ নস্য গ্রহণ ক'রে মন্দির বল্লে—দেখ, মানব-প্রকৃতি উপেক্ষিত হচ্চে তোমাদের বৃথা তর্কে। যার চরিত্র সমালোচনার বিষয় তাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে দেখতে হবে—সংশ্লিষ্ট ভাবে—তার মানসিক প্রবৃত্তিকে টুকরো টুকরো ভাবে ব্যবচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। (নস্য-গ্রহণ)

যারা মোটেই তার সারগর্ভ বক্তৃতা বুঝলে না, তারা সমস্বরে—তা বটে, তা বটে—বলে চীৎকার করে উঠলো। তাতে অম্বিকার দেহের উত্তাপ নরমালের ৫ ডিগ্রি নীচে নেমে গেল।

নলিনী সেন বল্লে—আচ্ছা বল তো তোমার সিদ্ধান্ত।

আর একটিপ নস্য নিয়ে, একটুকরা খদ্দরের কাপড়ে নাক মুছে মন্দির-মঙ্গল বল্লে—অম্বিকা জন্মেছে বিবাহের জন্য। ওর প্রতি পদক্ষেপ সূচনা কচ্চে বিবাহ। ওর কর্ণ শ্যালিকা কর-স্পর্শের জন্য লালায়িত। ও যখন চলে, অলক্ষিতে ওর বাঁ হাতের দোলন দেখেছ? ওর অগ্রভুজ চিড়িক মেরে উঠে উপর বাহুর সঙ্গে একটা রাইট-এঙ্গল সৃজন করে।

মস্তুতঃ উজ্জ্বল দুই উৎসুক নয়ন অম্বিকার হাতের দিকে ফোকাস হল। তাদের সমবেত রশ্মি এক অব্যক্ত শক্তি সঞ্চার করলে তার হাতে যার প্রভাবে তার অঙ্গুলিগুলা হিল্লোলিত হ'ল।

—তার অর্থ কি? ছেলে কোলে করা।—(উচ্চ হাস্য)।

—ওর ডান হাত ওর দেহ-রেখার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় থাকে—কেবল তর্জ্জনী তির্য্যকভাবে বক্র।

সকলে এ লক্ষণের অর্থ জানিবার জন্য ব্যস্ত হ'ল।

—মাথা ঘামাও। আকাশের স্পন্দন থেকে মস্তিষ্ক-স্পন্দন অনুভূত হ'বে। অর্থাৎ তার দক্ষিণ হস্ত চায় ছেলের হাত ধরে বেড়াতে। বাস—স্কন্ধে এক পুত্র—দক্ষিণ তর্জ্জনী ধরে একজন। আবার মস্তিষ্ক-স্পন্দনের ইঙ্গিত লাভ। কাঁধে ছেলে হাতে ছেলে অম্বিকা চলেছে—কচুরি কিনতে, লাঠি-লজঞ্জুস কিনতে—হোমিওপাথি ডাক্তারের সিকাগো ক্লিনিকে পালসেটিলা বটিকা আনতে।

হাসি থামতে প্রায় সাড়ে তিন মিনিট লাগলো। অম্বিকা মৃত্তিকাবৎ।

নন্দদুলাল এতক্ষণে ধাতস্থ হ'য়েছিল। সে এখন রোজগারি ছেলে। বল্লে—তোমাদের এ ভাবটা চিন্তা-শক্তির অভাব সূচনা করছে। তালুকদারের অনশনের ভয় কিসের। ও জমিদারের ছেলে।

এই অপ্রত্যাশিত বিস্ফোটক সভা-গৃহে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি কর্লে। অরুণ বল্লে—এ কি ভেদি ভানাম্বর!

ইন্দ (নরম) বল্লে—ভায়া, আসকে খাও তার কোড় গোণ না।

প্রবচন সংগ্রহ ইন্দর হবি।

হবিসত্য বল্লে—জমিদারদের আর সত্যযুগ নাই।

সত্যযুগে জমিদার ছিল তার প্রমাণ কি?—বল্লে তর্কবাগীশ নবীন।

—এখন ফসল না হলে প্রজারা খাজনা দেয় না। ফসল হলে তা বেচে তারা জমিদারের সঙ্গে মামলা লড়ে। জমিদারকে তাদের স্কুল খুলে প্রতিষ্ঠা করে দিতে হয়, মসজিদের জন্য জমি দিতে হয়।

বিষ্ণুপ্রিয় (সত্ত্ব) বল্লে—শীঘ্রই গ্রামে গ্রামে জমিদারের খরচায় রেডিও বসিয়ে দিতে হবে। না হলে কৃষকরা খাজনা দেবে না। গরু চরাবার গানের টেক্ কুরিয়েছে গোপাল বালকদের।

নন্দদুলাল বল্লে—অত্যুক্তি যুক্তির স্থান নিতে পারে না। মহিলার সম্ভ্রম বোঝে না মানুষ, যদি দেশ ছেয়ে যায় আইবুড়ো কার্ত্তিকে। যারা অকেজো, অবুঝ, অ-মঙ্গল।

এ কথার পর আর চিরকুমার বেকার-কুমার বা প্রেম-না-আসা-অবধি-কুমার কেহই স্থির থাকতে পারলে না। সমবেদনায়, সাধারণ বিপদে তিন দলের গণ্ডীরেখা উপে গেল। বাছা দুলাল অস্ত্রাঘাত-জর্জ্জরিত হয়ে গোলমালে অন্তর্ধান ক'র্লে সভাগৃহ হতে। অরুণ বল্লে—ভাবান্তর হয়েছে ইহার। দেখি এবে কেবা সে সুন্দরী।

তাকে ছায়ার মত অনুসরণ কর্বার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ হ'ল। নিশ্চয় সে প্রেমোন্মত্ত—তার কপালে প্রেম-বিহ্বলতার রাজটীকা দেদীপ্যমান ছিল।

নন্দির বল্লে—ওর ওষ্ঠ-স্পন্দন সূচনা কর্চ্চে ওর মগজের সাদা-ঘিতে প্রেম-হিল্লোল।

—ওকে এ বিপদে রক্ষা কর্ত্তেই হবে—এরা সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে সঙ্কল্প কর্লে।

(৪)

সন্ধ্যারাণী এখন বটব্যাল মহাশয়ের বল-বুদ্ধি ভরসা—অবশ্য সন্তানের দিক থেকে। ছোট মেয়ে বাপ-মার আদর-সম্পত্তি দায়ভাগে একটু অধিক মাত্রায় লাভ করে সাধারণতঃ। বটব্যালগৃহে এখন সে ও ছোট ভাই শান্তি মাত্র সন্তান। কর্ত্তার নাই রায় লেখবার বালাই—দুরন্ত উকীলদের অযুক্তি, কু-যুক্তি ও যুক্তিপূর্ণ দেওয়াল-ফাটা বক্তৃতা শুনে বিশ্রামের অত্যাবশ্যকতা। কাজেই নগদ স্নেহ তারাই পেত সবটুকু। তার বড় ভাই কান্তি চীনা-মাটির বাসন নির্ম্মাণের কৌশল আয়ত্ত করছিল ড্রেসডেনে। আর জ্যেষ্ঠা মিস বটব্যাল্ ঊষারাণী এখন মিসেস সদানন্দ লাহিড়ী রূপে দিল্লী-প্রবাসিনী।

উমারাণী বটব্যাল-গৃহিণী। তিনি মহাবলা মহারবা প্রকৃত গৃহিণী। থানার দারোগা যেমন সারাদিনের কাজের ডায়েরী দেয় পুলিস সাহেবকে, এ সংসারের প্রত্যেককে জানাতে হ'ত উমারাণীকে তাদের দৈনিক জীবনের কার্য্য-কলাপ। কু-লোকে বলিত বটব্যাল-সংসারের সমসাময়িক নিখুঁত ইতিবৃত্ত প্রণয়নের জন্য হচ্চে এই উপকরণ সংগ্রহ। কিন্তু এ কার্য্য-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গৃহিণীপনার পদ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা।

ভোজনান্তে বটব্যাল-পরিবারে গ্র্যাজুয়েট কুলির প্রসঙ্গ চিন্তা-উদ্দীপক আলোচনার সৃষ্টি কর্লে।

গৃহিণী বল্লেন—আমি সেকেলে মানুষ। আমার বিশ্বাস ছেলেটা সত্যিই কুলি। এখনকার শস্তা জামা-কাপড়ের দিনে মনিব মজুরের সাজে তো কোনো প্রভেদ দেখি না।

সন্ধ্যারাণী ছোট মেয়ে তার উপর ম্যাট্রিক পাশ করা। সে জননীর সঙ্গে তর্ক কর্ব্বার উচ্চ অধিকার লাভ করেছিল। সে বল্লে—মার এক কথা। ইতর ভদ্দর ব্যবহারে জানা যায় না? জন্ম-কুলি শিষ্টাচার কোথা পাবে? কুলি বাবু, একবার নয় মা, দু দুবার আমাকে নমস্কার করেছেন। আর লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠছিল। হাজার হক্ কাজটা তো, ওর নাম কি, না বাবা!

শান্তিপূর্ণ সংসারের গৃহের স্বামিত্ব চারুশিল্প। নন্দ-দুলালকে জন্ম-কুলির ঝাঁকে শ্রেণীবদ্ধ কর্লে পাশকরা কন্যার সঙ্গে একপালা মল্লযুদ্ধ অনিবার্য্য। তাতে তার সূক্ষ্ম সুকোমল প্রাণ ব্যথিত হ'তে পারে। এদিকে তাকে ভদ্রবংশীয় বলে ঘোষণা কর্লে যুদ্ধ-ঘোষণা করা হবে সহধর্ম্মিণী উমারাণীর সঙ্গে। বিবাহ-জীবনকে দুর্বিষহ রণক্ষেত্রে পরিণত ক'রে তোলেন নি তিনি কোনো দিন। সুতরাং শ্যাম ও কুল উভয়ের মর্য্যাদা অ-মলিন রেখে ভূতপূর্ব্ব জজসাহেব বল্লেন—হুঁ! তা অবশ্য! তবে কি না।

উমারাণী বল্লেন—শিক্ষার প্রথম ফল হচ্চে ভদ্র হওয়া কেবল ভদ্র ব্যবহার না—ভদ্র ব্যবসা।

ইনি বোদেপলসা হাইস্কুলের হেডপণ্ডিতের অধ্যাপনায় পিতৃগৃহে আখ্যানমঞ্জরী অবধি পড়েছিলেন।

এবার বটব্যাল সাহেব একটু সাহস দেখিয়ে বল্লেন—অবশ্য যে যে কাজ ক'রে সে যদি সে বিষয়টা গভীরভাবে বোঝে তো কাজ ভালই কর্ত্তে পারে।

অধর খানসামা বাবুর গা হাত-পা টিপছিল। এই বিবৃতিতে সে একটা মস্তিষ্ক-স্পন্দন অনুভব কর্লে। বাবুর ছেঁড়া সার্ট গেঞ্জি প্রভৃতি পদার্থ নিজস্ব কর্ব্বার সময় উদার অধর মনিবকে পর ভাবতো না। কিছুদিন পূর্ব্বে সহসা তার সংসারে কিছু অর্থের অনাটন হ'য়েছিল। জার্ম্মাণী যাবার পূর্ব্বে কান্তি বটব্যাল একবার মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল। তার একটা নরকঙ্কাল ছিল; অর্থাৎ অস্ত নরের কঙ্কালের সে অধিস্বামী।

াতালের এক আয়ুর্ব্বেদ ছাত্রের কাছে অধর সেই নর-কঙ্কালটা কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রার পরিবর্ত্তে হস্তান্তরিত করেছিল। অপর এক ভৃত্য অধরকে দেখেছে নরকঙ্কাল নিয়ে যেতে রাত্রে। এ সংবাদ সে গৃহিণী-মাকে দেয়। জেরায় ভৃত্য বলে প্রথমে সে কঙ্কাল দেখে ভূতের ভয়ে শিহরে ওঠে। পরে অধর তাকে আশ্বাস দেয় যে এটা ভূত য়—মরা মানুষের হাড়। অধরকে গৃহিণী-মা এই চুরির জন্য ড়ই উৎপীড়ন করেছেন। অধর জবাব দিয়েছে সে দেশে রখে এসেছে নরকঙ্কাল—উদ্দেশ্য এক সাধুর কাছে শব-াধনা শিক্ষা কর্ব্বে চাকরী ছেড়ে। এ প্রত্যুত্তরে কেহ সি হয় নি। সাত দিনের মধ্যে নরকঙ্কাল না আনতে ারলে তার পিঠের চামড়া থাকবে না—এ রায় দিয়েছেন জসাহেব। তিন দিন গত হ'য়েছে।

ভগবদ্দত্ত পিঠের চামড়া অক্ষুণ্ণ রাখবার আঁধারে আলো দখলে অধর বটব্যাল সাহেবের বিবৃতিতে। সে বল্লে—ামার পিসিমাও বলতেন—

সেক্সপীয়র না, রবিঠাকুর না, পিসিমার কোটেসান ন্ধ্যারাণীকে করল বিরক্ত। সে বল্লে—না, তোমার পিসিমা কি বল্লেন তা আমরা শুনতে চাই না।

—না, পিসিমা না। মানে সেই মরার হাড়ের কথা বলছিলাম।

এবার আর না শোনবার উপায় নাই। কর্ত্তার প্রবাসী ুত্রের সম্পত্তির কথা। তিনি বল্লেন—তিন দিন হ'য়ে গেছে।

আজ্ঞা হ্যাঁ, তাই বলছিলাম। এই গা টেপার কথা। ভাল করে গা টিপতে হ'লে মানে কোথায় কি হাড় আছে জানা চাই। মানে হচ্চে বুঝে সুঝে ভাল ক'রে গা টিপতে পারবো বলেই হাড়গুলা দেশে রেখে এসেছি।

এ ধৃষ্টতার পর না হাসা অসম্ভব। কর্ত্তা তার মাথায় হাতের চুরুটের পাইপের ডিমটে ঠোক্কর মেরে তার মস্তিষ্ক-স্পন্দনকে স্তব্ধ করলেন।

কুমারী বটব্যাল বল্লে—কুলি-বাবু যে ভদ্রলোক তার একটা মস্ত প্রমাণ আছে।

মিসেস্ বটব্যাল কুমারীর স্বর ভালবাসতেন। সে অমৃতভাষা তাঁরি মধ্যে মাতৃত্বকে জাগিয়ে তুলতো। সন্ধ্যার সুরে তিনি উপভোগ করতেন উমার কণ্ঠস্বর, ড্রেসডেন-প্রবাসী কান্তির মধুর নিক্কণ যা এখন চীনা বাসনের তালে তালে ধ্বনিত হচ্ছে সন্ধ্যা বোঝালে। জন্মকুলির জন্ম-গত সংস্কার অসন্তোষ। তিন দফায় রেলের কুলিকে ছ'আনা দিলে তার যত সুখ হয়, এক সঙ্গে আট আনা দিলে সে সুখের শতকরা পঁচিশ দফা সুখ তার হয় না। গ্র্যাজুয়েট কুলি সোনা হেন মুখে অবনত-শিরে নিকেলের সিকি গ্রহণ করেছিল।

কর্ত্তা বুড়া আঙ্গুলের টিপ্পনি দিয়ে পাইপে তামাক গুঁজে বল্লেন—তা বটে। ছোকরা পয়সা পেয়ে এমন ভান্ করলে যেন তার তিন পুরুষ ধন্য হ'ল।

গৃহিণী দেখলেন এবার এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে বললেন—খোঁজ নিয়েছিস্ সে বামুনের ছেলে কি না?

—তা কি করে জানব?

—এক জামাই প্রফেসার আর একজন হবে কুলি।

—মা গো—বলে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে একপাক ঘুরে গেল সন্ধ্যা।

—কেন, এর বেলা মা গো কেন? হরিজন খুব ভাল যতক্ষণ মুরুব্বিয়ানা করা যায় তাদের ওপর। কুলি ভাল যদি নিজের দাদা কিম্বা স্বামী কুলি না হয়। তোদের কি যে বলিস নবীন যুগ না কি তার জুয়াচুরি ঐখানে—মিঃ বটব্যাল বল্লেন।

অধর বল্লে—আমার পিসিমা বলেন—

—আবার পিসিমা?—তার মাথায় পাইপের আর এক ঠোক্কর মেরে বটব্যাল মশায় নবীন যুগের সবুজ সাহিত্যের আর বর্ত্তমান রাজনীতির মুণ্ডপাত করলেন নিঃশঙ্কে। কারণ উমারাণী বর্ত্তমানের উপর অপ্রসন্ন। তার আবার কারণ বর্ত্তমান, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সাগর-পারে নিয়ে গেছে অতীত কালের চিত্তাকর্ষক বিধি নিয়ম অমান্য ক'রে।

সন্ধ্যা বল্লে—বাবা, নবীন সব যদি খারাপ তবে আপনি নবীনসেনের কবিতা পড়েন কেন?

—তবে রে বেটী।

হাসতে হাসতে কন্যা পাশের ঘরে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে শান্তি নাকি সুরে বল্লে—দেখ না মা, ছোড়দিদি কি কচ্চে?

উমারাণী পাশের ঘরে গেলেন তাদের ঝগড়া মেটাতে।

উস্রিতটে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

উস্রিতটের বাড়ীগুলি পানে চেয়ে চেয়ে আজি হায়,
কল্পনা মোর মহাপথ দিয়া অনন্ত পানে ধায়।
শীর্ণ শিকের বাতায়নগুলি,—বসি হোথা সাঁঝে ভোরে
মহাযাত্রার স্বপ্ন দেখেছে কত জনই ঘুমঘোরে।
মৃত্যুঞ্জয়ের মন্ত্র জপিয়া বসিয়া বসিয়া তারা
অসীমের সনে রচিয়া গিয়াছে মনোময় যোগধারা।
তীর্থও বলা যায়,
মরণপথের পান্থশালা এ উস্রির কিনারায়।

রুগ্ন শয়ন বড় অসহন কিছুতে স্বস্তি নাই,
বৈকাল হ'তে জানালার পাশে আসন লয়েছে তাই।
জানালারি পাশে গাছে গাছে পাখী খেলিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিবসের রোদ এসেছে পড়িয়া শালবীথিকার ফাঁকে।
দিনের আত্মা অস্ত গিয়াছে দূর গিরিটির পাশে,
নিভিয়া এসেছে সকল আলোক তাহাদের নিশ্বাসে।
পাখীগুলি ভুলি তান
ধূসর গোধূলিরূপী মরণের গেয়েছে বিজয়গান।

গোণা ক'টি দিন, তাদেরি একটি হইয়াছে যবে শেষ,
কি ভেবেছে তারা দিগন্তপানে চেয়ে চেয়ে অনিমেষ?
তাদের ধেয়ানে কি ভাবে কে জানে জাগিয়াছে মহাপথ,
অজানা সে পথে কতদূর গেল তাহাদের মনোরথ?
ভেবে ভেবে তারা ও পারের কিছু পেয়েছে কি সন্ধান?
তাদের মনের রক্তসন্ধ্যা পেয়েছিল নির্ব্বাণ!
দেখেনিকি থেকে থেকে
উস্রির তটে তাদের চিতাই জ্বলিতেছে একে একে?

সুদূরের পানে চেয়ে চেয়ে তারা হয়নি কি উন্মনা?
বিধির হৃদয় সিক্ত করেনি তাদের অশ্রুকণা?
কত প্রিয় মুখ জেগেছে মানসে, কত আঁখিজলধারা,
কি ব'লে তাদের বিদায় দিয়েছে, বিদায় নিয়েছে তারা?
ব'সে ব'সে তারা চিরবিদায়ের কি করিল আয়োজন?
অশেষ পথের কি পাথেয় তারা করেছিল আহরণ?
কোন' আশ্বাস হায়
কোন সান্ত্বনা পায়নি কি তারা অসীমের ভাবনায়!

হোথা ব'সে-ব'সে ফেলিল কি তারা সব বন্ধন খুলি!
ফেলিল কি মুছে অশ্রুসলিলে জীবনের মলা ধূলি!
ধরার মমতা গেল কি ভাসিয়া অসীম চিন্তাস্রোতে,
চিরশান্তি কি হ'লো বরণীয় রোগ যন্ত্রণা হ'তে?
কি ব'লে বুঝায়ে মনটিকে রাতে ঘুমাতে পারিত তারা?
শ্রীহরির পায় সঁপি আপনায় পাইল কি কোন সাড়া?
আজি মনে জাগে সাধ
শুনিতে তাদের বিদায়-পথের হৃদয়ের সংবাদ।

জানালার শিক শীর্ণ হয়েছে তাদের হাতের ঘামে,
তাদের হেলানে দাগ ধরে আছে দেওয়ালের চূণকামে।
তাদের তপ্ত নিশ্বাস ফোঁসে আজও শালবনমাঝে,
শুষ্ক পাতায় তাদের মর্ম্ম-পীড়া মরমরে বাজে।
আজি তারা মোর পরমাত্মীয়, কালো ছায়া ছবিসম
তাদেরি ভাবনা জাগে পর পর আজি অন্তরে মম।
আজিকে সবার শোক
জাগায় এ মনে জ্যোতিঃহারা শত আয়ত কাঙাল চোখ।

কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত রচনা

শ্রীশিবরতন মিত্র

কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব স্বহস্ত লিখিত রচনাটি আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ মহোদয় সম্প্রতি উপহার প্রদান করিয়া আমায় ধন্য ও আমার রতন-লাইব্রেরীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই রচনাটি, ফেনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (১৮৮৬ খৃঃ) প্রথম বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী হইলেও, ইহা নীরস কার্য্য-বিবরণী বা স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ বা ছাত্রাদির সংখ্যা নির্দ্দেশ দ্বারা অযথা কণ্টকিত নহে;—পরন্তু, কবিবরের শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ মন্তব্য ও অন্যান্য বহু সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের কবিজনোচিত সরস বর্ণন দ্বারা সর্ব্বত্রই সমুজ্জ্বল।

কবিবর যখন চট্টগ্রামে কমিশনারের পার্শনেল এসিষ্ট্যাণ্ট ছিলেন, তখন (১৮৭৫ খৃঃ) মূলতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ফেনী সব ডিভিসন খোলা হয়। আট বৎসর পরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সবডিভিসনাল-অফিসার রূপে ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সুদীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে 'ধান্য ক্ষেত্র বেষ্টিত শেয়ালা সমাচ্ছন্ন' ফেনীর কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। এমন কি, ২॥ মাইল মধ্যে কোন হাট বাজার পর্য্যন্ত ছিল না! কিন্তু, কবিবর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অত্যল্প কাল মধ্যেই, দেখিতে দেখিতে ফেনী যেন যাদুমন্ত্র বলে অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিল; 'বাজার ঝি' দীঘির পাড়ে, নানাবিধ বিচিত্র আকারের সরকারী গৃহ-সমূহ নির্ম্মিত হইল। 'প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র আকৃতি, প্রত্যেক ঘরের পনর কি বিশ চাল, নানারূপ কোণ ও চক্রে প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র শোভা। এ অঞ্চলে, কি কোন অঞ্চলে এমন কবিত্বপূর্ণ বাঁশের ঘর কেহ কখন দেখে নাই; বাঁশের কুটীর যে এমন সুন্দর হইতে পারে এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এ সকল ঘর লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহু দূর হইতে দলে দলে লোক এ সকল গৃহ দেখিতে আসিতে লাগিল। ('আমার জীবন' ৪র্থ খণ্ড ৬৫পৃঃ)।' ফলতঃ, তিনি অত্যল্প কাল মধ্যেই জঙ্গলময় কর্দ্দমপূর্ণ ফেনীকে নানারূপে পরম রমণীয় ও উপভোগ্য করিয়া তুলিলেন। তিনি চেষ্টা করিয়া পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী দেওয়ানগঞ্জ হইতে মুনসেফী আদালত ফেনীতে তুলিয়া আনিলেন। যে ফেনীতে রাত্রিতে নূন কিনিতে না পাইয়া তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইয়াছিল—সেখানে তিনি বাজার বসাইলেন। ডিসপেন্সারী স্থাপন, রাস্তা ঘাট ও পুরাতন দীঘির সংস্কার, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দ্বারা তিনি ফেনীকে নূতন রূপ দান করিলেন। তাঁহার শাসনগুণে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা ও চোর-ডাকাতের বা দুষ্টের অত্যাচার একেবারেই কমিয়া গেল।

কবিবর যখন পুরীতে ছিলেন (১৮৭৭ খৃঃ) সেই সময় তাঁহার হৃদয়ে এক দিকে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এবং অন্য দিকে 'অমিতাভ' কাব্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এখন ফেনীতে অবস্থান-কালে (১৮৮৪ খৃঃ) তিনি তাঁহার "রৈবতক" কাব্যের অধিকাংশ এবং তাহার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯০ খৃঃ 'কুরুক্ষেত্র' কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল মধ্যেই ১৮৯১ খৃঃ ২৮এ জানুয়ারী ফেনীতে 'বঙ্গোপসাগর-তীরে' রচনা শেষ করেন। এই স্থানেই তিনি তাঁহার 'গীতা' ও 'চণ্ডীর' অনুবাদ এবং মেথুলিখিত খ্রীষ্ট-লীলার শিক্ষা-ভাগের অনুবাদ রচনা করেন।

ফেনীতে কবিবর প্রায় নয় বৎসর কাল ছিলেন; এবং বর্ত্তমান ফেনীর তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি যে সকল লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়িয়া তুলিয়া ছিলেন, ফেনীর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় তাহার মধ্যে অন্যতম প্রধান। কবিবরের বর্ত্তমান অপ্রকাশিত পূর্ব্ব রচনাটি এই স্কুলের প্রথম বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী।

সৌভাগ্যের কথা, এই বিজ্ঞাপনী বা প্রথম বার্ষিক বিবরণী, তিনি স্বহস্তে বঙ্গভাষায় রচনা করিয়া স্বয়ং পাঠ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বিজ্ঞাপনীর শেষে নিজের নাম স্বাক্ষর করেন নাই। আমরা কবির স্বহস্ত-লিখিত বিজ্ঞাপনীটি যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই রচনার কাগজ এই ৪৮ বৎসর মধ্যেই অতি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে;

অযত্নে রক্ষিত হইবার জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠার শীর্ষদেশ কতক অংশ করিয়া চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা সে সকল স্থান "...... " চিহ্নিত করিয়া দিলাম।

এই বিজ্ঞাপনী লিখিবার প্রায় বিশ বৎসর পরে কবিবর তাঁহার দৈনিক লিপি হইতে তাঁহার 'আমার জীবন' নামক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করেন। এই বিজ্ঞাপনীর লিখিত কোন কোন অংশের পোষকতা স্বরূপ আমরা পাদটিকায় 'আমার জীবন' গ্রন্থ হইতে সেই সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 'আমার জীবন' গ্রন্থে এই স্কুল স্থাপন ও পরিচালন সংক্রান্ত আরও নানা ব্যাপারের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকবর্গকে আমরা 'আমার জীবন' নামক গ্রন্থের ৪র্থ ভাগ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, একজন সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত দেশীয় রাজকর্ম্মচারী কি ভাবে এক জঙ্গলময় জলাভূমিতে অত্যল্প কাল মধ্যেই একটি সুদৃশ্য নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর কত উপকার সাধন-পূর্ব্বক অশেষ ধন্যবাদভাজন হইতে পারেন।

নবীন বাবুর বক্তৃতা

ফেনী জুবিলী বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ ইংরাজির প্রথম
বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী

আজ এই ফেনী বিদ্যালয়ের উদ্যোগকারীগণের একটি বড় সুখের দিন—আজ ফেনী উপবিভাগের একটি বড় শুভ দিন। ২ বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি আমাকে বলিত এখানে এরূপ একটি উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জন্য এতাদৃশ উপযোগী একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, আমি নিশ্চয় তাহাকে বাতুল মনে করিতাম। ২ বৎসর পূর্ব্বে এ স্থানের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর অবিদিত নাই। উপস্থিত সভাপতি মহোদয়েরও তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সম্মুখস্থ প্রশান্ত নীল-নির্ম্মল-সলিলা দীঘির উত্তর ও পূর্ব্ব পার ব্যাপিয়া অরণ্য বিভাগের একটি ক্ষুদ্র উপবিভাগ স্থাপিত ছিল। বিভাগীয় কর্ম্মচারী নেকড়ে বাঘ তাহাতে আনন্দে আধিপত্য করিতেন। ইঁহারা বোধ হয় পশুরাজের ডেপুটি ও মুন্সেফ। চিরপ্রসিদ্ধ সুচতুর শৃগাল মহোদয়েরা তাঁহাদের উকীল ও... শিয়ালিগণ টর্নী। তাহাদের কার্য্যপ্রণালী Parliamentary রকমের ছিল। দিনে তাঁহারা বড় কিছু কার্য্য করিতেন না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই টর্নিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং উকিল মোক্তারগণ তারস্বরে যেন ঘোরতর তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন। সে ঐকতান সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। পার্শ্বে চূর্দ্দান্ত বৃটিশ রাজ্যের শান্তিরক্ষক ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহাদির এরূপ অবস্থা ছিল যে বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে তাহাতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ঘোরতর বিড়ম্বনা করিতে পারিতেন। ঐদিকে বাজারে খান দুই ঘর ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের ২টী করিয়া চাল এবং তাহাতে মিলিত ২টী জিনিস—সেই পৌরাণিক চিঁড়া আর গুড়[১]। স্থানে স্থানে মোক্তার ও আমলাদের কয়েকখানি গৃহ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখন সেরূপ গৃহ বড় নাই। অন্যথা রৌদ্র ও বৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া অল্প আয়তনে অল্প ব্যয়ে কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ হইতে পারে আমাদের উত্তরাধিকারীগন শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। একদিন রাত্রিযোগে শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া নুন মিলিল না বলিয়া আমি সপরিবারে উপবাসে রহিলাম। ভারতচন্দ্রের

> খুন হয়েছিনু বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
> শেষে না কুলাল কড়ি আনিলাম চেয়ে॥

আমাদের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল

> "খুন হয়েছিল বাপু নুন চেয়ে চেয়ে।
> শেষে না মিলিল আর রহিলাম শুয়ে॥"

এই স্থানে নুনটুকু পর্যন্ত পাওয়া যাইত না।[৩]

উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াই মফঃস্বল বাহির হইলাম। সেখানে সর্ব্বত্রে দেখিলাম নুনের অভাব থাকুক না থাকুক গুণের অভাব ভয়ঙ্কর। প্রচুর পরিমাণে পাইলাম খুন আর আগুন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই খুন দুইটি একত্রে পাইলাম। এরূপ জোর নরবলি বোধ হয় আমাদের তান্ত্রিক ইতিহাসেও নাই। ত্রিপুরেশ্বরের অধিকারে সর্ব্বত্রে

১। একখানি দোতালা কুড়ে ঘর আছে। তাহাতে সীতাকুণ্ড যাত্রীদের জন্য চিঁড়ে ও গুড়মাত্র পাওয়া যায় (আমার জীবন ৪র্থ, ৬ পৃঃ)।

২। বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র।

৩। নুন 'চেয়ে' না পাইয়া একরাত্রি যে অ... বে ছিলাম, তাহা বলিয়াছি। আড়াই মাইল ব্যবধান না গেলে ...কু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। (ঐ, ঐ)

যেন দাবানল জ্বলিতেছিল। তাহার উপর ঘরের আগুন [৪] দেখিয়া আবার ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়িল—

"কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন"

দেখিলাম এই অঞ্চলের অধিবাসীগণের অন্য কোনও গুণ না থাকিলেও "কপালে আগুন" যথেষ্ট আছে। বৎসরের মধ্যে কত লোকের এখনও কপাল পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার উপর শিক্ষা-বিভাগের আগুন—শিক্ষা-বিভাগ আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিম্ন প্রাইমারি, উচ্চ প্রাইমারি, minor, model, middle class এরূপ পঞ্চরঙ্গের স্কুল পঙ্গপালের মত দেশ ছাইয়া গিয়াছে। Inspector, Assistant Inspector, Dy-Inspector, Sub-Inspector—বাপ রে, Inspectorই চারি রকমের! তাহার উপর Inspecting Guru! এই পঞ্চ রকমের তত্ত্বাবধারকেরা ছোটাছুটি করিতেছেন। দেশে এই পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ সম্পাদিত হইতেছে! 'বৎসোৎসর্গ' বলিলে বোধ হয় কথাটা আরও ঠিক হয় [৫]। একদিন বেহার অঞ্চলে আমার শিবির-ঘরে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি উপস্থিত। সে একে জাতিতে মুসলমান তাহাতে মহামূর্খ। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোম্ কোন্ হ্যায়"? উত্তর—'হজুর! ইন্স্পেক্টিং গরু!' আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"তোম্ কোন্ মৌজাকা ক্ষেত পয়মাল কর্ত্তে হো?" উত্তর—'ক্ষেতকা গরু নাহি হ্যায়, পাঠশালাকা গরু।' আমি বুঝিলাম কথাটা ঠিক্। শিক্ষা-বিভাগের দ্বারা দেশে এরূপ অপূর্ব্ব নর-গরুরই সৃষ্টি হইতেছে। গুরু নাম থাকিলে তাঁহার পুস্থগণের এরূপ বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই বোধ হয় আমাদের সুযোগ্য ডেঃ ইন্স্পেক্টার তাঁহার সুদীর্ঘ নূতন নিয়ম মানায় ইহাদের "পণ্ডিত" উপাধি দিয়াছেন। এতদিন পরে আমাদের অধ্যাপকদের অন্ন মারা গেল।

এই পঞ্চরঙ্গ শিক্ষা একমাত্র কর্ম্মের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতেছে—পেয়াদাগিরি বা কনেষ্টবলগিরি [৬]। কিন্তু পেয়াদা ও কনেষ্টবল সংখ্যায় অল্প। অতএব এই হতভাগ্যগণ একদিকে আপনার পৈতৃক ব্যবসায়ের উপর বীতশ্রদ্ধ এবং অন্যদিকে উক্তরূপ রাজ-কর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া বেনামা দরখাস্তকারী এবং টম্নি হইয়া দেশের "কপালে আগুন" জ্বালিয়া দিতেছে। এই উপবিভাগের উৎকৃষ্ট একজন সূত্রধর, একজন স্বর্ণকার,······ একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত ভুমি পাইবে না, কিন্তু পেয়াদা চাহ তবে পালে পালে পাইবে। জনৈক নিম্ন ব্যবসাজীবী একদিন তাহার একটি পুত্রকে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। আমি তাহার পুত্রকে তাহার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া আমার কাছে রাখিতে বলিলাম। সে বলিল—"কর্ত্তা! তাহাকে বিদ্যাপাঠ করাইতেছি।" তাহার পিতা নিজ ব্যবসায়ে প্রায় ১৫।২০ টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই হতভাগা উক্ত পঞ্চরঙ্গর বিদ্যাপাঠ করিয়া কি করিবে? যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ এই প্রাইমারি বা মহামারিতে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার দ্বারা যদি এই উপবিভাগের কেন্দ্র স্থলে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইত, এবং ব্যবসায়ীর পুত্রগণ স্বীয় স্বীয় ব্যবসা শিক্ষা করিতে পারিত তবে দেশের কি প্রভূত মঙ্গল হইত!

শিক্ষা-বিভাগ বলিবেন—তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"আমরা কিঞ্চিৎ General Education বা সাধারণ শিক্ষা দিতেছি মাত্র, আমরা কি কাহাকেও আপন আপন ব্যবসা ত্যাগ করিতে বলিতেছি?" বলিতেছ বৈ কি? শিল্প বা Technical Educationএর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা বা General Education সংযুক্ত হইলে সোনায় সুগন্ধের

৪। কেনীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎপাত ছিল গৃহদাহ—ঐ ৩১ পৃঃ।

৫। এত শিক্ষাদান নহে বলিদান যাহারা পাশ হইতেছে তাহাদের মধ্যে দুই একজন কোনমতে এণ্ট্রান্স স্কুল পর্য্যন্ত পড়িতে যাইতেছে। অবশিষ্ট পেয়াদাগিরি বা কনেষ্টবলগিরির উমেদার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাসায় চাকর পাইবে না, কিন্তু পেয়াদাগিরি বা কনেষ্টবলগিরি খালি হইলে দুইশত লোকে উমেদার হইবে এবং বিনা পয়সায় বাসায় চাকরী করিতে সম্মত হইবে। যাহাদের তাহাও জুটে না, তাহারা "টম্নিগিরি" করে এবং মিথ্যা মোকদ্দমায় দেশের সর্ব্বনাশ ঘটায়। যাহাদের সে শক্তি নাই, সে রাণী এলিজেবেথের সময়ের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া হাকিমদের কাছে বেনামী পত্র লেখে। আমার জীবন—৪৯, ৭ পৃঃ)।

৬। এখন "প্রাইমারী" বা মহামারী শিক্ষার কল্যাণে সকল জাতির লোক লেখাপড়া শিখে। উদ্দেশ্য পেয়াদাগিরি কি "কনেষ্টবুলি"। তাহাও অধিকাংশের জোটে না। ইহারা হয় টম্নি। দেশ টম্নিতে মোক্তারে ছাইয়া গিয়াছে। গ্রামে দুটি লোকের মধ্যে একটু সামান্য বিবাদ হইলে দুই পক্ষেই অমনি ছারপোকাবৎ টম্নি বা মোক্তার জুটিল এবং নানা মিথ্যা প্রলোভনে উত্তেজিত [illegible] দুই পক্ষের দ্বারাই অতিরঞ্জিত মিথ্যা মোকদ্দমা করিল (ঐ, পৃঃ ৩৬)।

সংযোগ হয়। কিন্তু শিল্প-শিক্ষা হইতে শিল্পীর সন্তানকে বিরত করিয়া খানিকটা সাধারণ শিক্ষা তাহার গলাধঃকরণ করিয়া দেওয়া তাহার ইহকাল ও পরকাল খাওয়া········ আর সাধারণ শিক্ষাই বা কিরূপ হইতেছে। পূর্ব্বেও ত দেশে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল। এখনও সেই পাঠশালাই আছে; তবে তাহার শত নাম সহস্র নাম হইয়াছে মাত্র। আমরা যাহাকে "মুড়ি" বলিতাম শিক্ষা-বিভাগ তাহাকে "ভাজা চাউল" বলেন মাত্র। তবে শিক্ষা-প্রণালীর অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বটে। পূর্ব্বে হিন্দু সন্তানেরা অক্ষর শিক্ষা হইলেই পড়িতে শিখিত—

"ক য়ে কমলা দেবী কমল বদনী"

কিম্বা

"ক য়ে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু করুণানিদান"

এখন পড়ে—

ক য়ে কদলি কলা কচুপোড়া খাও।"

পূর্ব্বে অক্ষর লিখিতে শিখিলে তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের এবং দেবদেবীর নাম লিখিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে লেখে—

"গণ্ডার গবয় গাধা"

তখন নীতিপূর্ণ শ্লোক সকল মুখস্থ করিত, এখন শিক্ষা করে—"মানুষ দুই পায়ে গমন করে, তাহার লেজ নাই।" তখন পড়িত—ধ্রুব চরিত, প্রহ্লাদ চরিত, কৃষ্ণ চরিত, চৈতন্য চরিত। এখন পড়ে—"ডুবাল চরিত"। তখন পড়িত দেব চরিত—এখন পড়ে পশু চরিত। তখন তাহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য—কাঠাকালি, নৌকা কালি, মাটি কালি ইত্যাদি মুখে মুখে কসিতে পারিত। এখন শ্লেট পেন্সিল লইয়া যোগ আর বিয়োগ করিতে মৃত্যুযোগ ও প্রাণবিয়োগ ঘটে। তখন হিন্দু সন্তানের শিক্ষক হিন্দু এবং মুসলমান সন্তানের শিক্ষক মুসলমান ছিল। উভয় স্থলেই শৈশব হইতে বালকের তরল হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হইত। এখন অনেক স্কুলে হিন্দু সন্তানের শিক্ষক মুসলমান, এবং মুসলমান সন্তানের শিক্ষক হিন্দু এবং সর্ব্বত্রে ধর্ম্মশিক্ষা বর্জ্জিত। ইহার পরিণাম কি হইতেছে, দিন দিন কি হইবে, তাহা ভাবিবার কথা, চিন্তা করিবার কথা। ইতিমধ্যে এই সুশিক্ষা-বৃক্ষে জাল গুরু, জাল ছাত্র এবং জাল [illegible] পর্য্যন্ত ফলিয়াছে। এখনই অধর্ম্মে দেশ উৎসন্ন যা[illegible] ধর্ম্মাধিকরণ পর্য্যন্ত জুয়া-গৃহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [illegible] বড় গুরুতর। এই

প্রদেশের ভাগ্য যাঁহার [illegible] হিত, তিনি সভাপতি আসনে আসীন। আমি সে [illegible] ই এই বিষয়টী কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

সে যাহা হউক, ভালই হউক আর মন্দই হউক, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এই শিক্ষা মাত্রই প্রচলিত ছিল না। যে ইংরাজী শিক্ষা এখন কি জ্ঞান শিক্ষার, কি উপজীবিকা লাভের একটি প্রধান সোপান, তাহার নামগন্ধও কোথাও ছিল না। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ একটি লোকও এই উপবিভাগে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইত না। চট্টগ্রাম—৬০ মাইল, কুমিল্লা—৪০ মাইল এবং নোয়াখালি—২৬ মাইল না গেলে সামান্য ইংরাজী কি বিদ্যাশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা ছিল না। অতএব এখানে একটি প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার স্থাপন করা একরূপ স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করা। প্রথম বিঘ্ন মুনসেফি আদালত দেওয়ানগঞ্জ হইতে উঠাইয়া আনিতে না পারিলে এখানে কোনও মতে এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সে এক অসাধ্য সাধন। তাহা লইয়া ১০ বৎসরব্যাপী এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আবার হাত দেওয়া মাত্র দেওয়ানগঞ্জের ভদ্রমণ্ডলী সেই পূর্ব্ব জিদে পড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে দোহাই দিয়া বলিতে লাগিলেন যে মুনসেফি ফেনীতে উঠিয়া গেলে একটি খণ্ড প্রলয় হইবে। অনেক যত্নের পর মুনসেফি উঠিয়া আসিল। ইতিমধ্যে একবার কিঞ্চিৎ ভূমিকম্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা যে ফেনীতে মুনসেফি উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া হইয়াছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তাঁহারাই বলিবেন যে যেখানের দেশ সেখানে আছে, কিছু ব্যত্যয় ঘটে নাই। কার্য্যটি যে প্রকৃত লোকহিতকর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। এই বিদ্যালয় তাহার জীবন্ত প্রমাণ এবং তাঁহারাই ইহার স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবকারী এবং প্রধান উদ্যোগী।

দ্বিতীয় বিঘ্ন টাকা। এই পাপ কলিযুগের মধ্যভাগে রূপচাঁদ

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং"

তৎপদ দর্শন লাভ·· ·পারে। [illegible]নিই প্রধান নমস্য। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, [illegible] পাপী

হইলেও সৎ, তিনি যাহাকে অকৃপা করেন সে অনাহারে চিৎ এবং তিনিই সকল আনন্দের নিদান। অতএব তিনিই সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকে লাভ করা ত সামান্য সাধনা কি তপস্যার কথা নহে। এই উপবিভাগটি দুই জন ভূম্যধিকারীর অধিকারে মাত্র প্রধানতঃ বিভক্ত। তাঁহারা উভয়ে বিদেশীয়, উভয়ে ঋণ-কর্দ্দমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অতএব একরাশি সচ্চিদানন্দ কিরূপে সংগ্রহ হইবে? কিন্তু উদ্যোগকারীগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা জানিতেন দশের লাঠি একের বোঝা। অতএব তাঁহারা গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যে যাহা দেয় তাহাই লইলেন, মুষ্টিভিক্ষা অর্থাৎ এক আনা পয়সা পর্য্যন্ত তাঁহারা আনন্দে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সফলতার পথে লোকের একটি বিশ্বাস কণ্টক (?) হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি "কৃষি প্রদর্শনী মেলা" হয়। তাহার জন্য প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়। একটি মধ্যবিৎ অবস্থার লোক উদ্যোগকারী জনৈককে বলিল —"আমাদের কাছে হইতে আর একবার কি এক পরীদর্শনীর জন্যে টাকা উঠাইয়া বলিয়াছিল, ফেনীতে গেলে কত তামাসা দেখিতে পাইবে, তোমাদের কৃষিরও কত উন্নতি হইবে। তাহা বিশ্বাস করিয়া ফেনীতে গেলাম। পরী ত দেখিলাম, ২ জন মেমটা নাচিতেছিল, তাহা দেখিতে গিয়া গলাধাক্কা খাইলাম। কৃষির উপকার ত করিলে এই পর্য্যন্ত। তোমরা নাম করিয়া পয়সা নিয়া শেষে মেমটার নাচ আর গলাধাক্কা দর্শনী করিবে না ত?" ইহাদিগকে অনেক যত্নে বুঝান হইল যে সেরূপ কোনও প্রদর্শনী হইবে না। যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহার কড়া-ক্রান্তি হিসাব তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাদের মন হইতে সে সন্দেহ গেল না। তথাপি উদ্যোগকারীগণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা তাঁহাদের আশাতীত। সৎকার্য্যে স্বয়ং ভগবান সহায় হন।

কিন্তু এবার উদ্যোগকারীগণ ঘোরতর বিপদস্থ হইলেন। তাঁহারা নোয়াখালির চিরপ্রসিদ্ধ চুকলিখোরগণের দণ্ডে নিপতিত হইলেন। 'চুকলিখোর' কথাটির সংস্কৃত কোনরূপ প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। না থাকিবারই কথা। কারণ এ পাপ পূর্ব্বে এ দেশে ছিল না। কিন্তু তাহার ইংরাজী [illegible]টির অর্থ—"পৃষ্ঠদংশক।" এই নরাধম নরককীট-দিগকে আমি মনুষ্য সমাজের "ছুঁচো" মনে করি। ইহাদিগকে তুমি দেখিবে না, ইহারা পবিত্র আলোককে ভয় করে, কেবল গন্ধের দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার সুনাম কলঙ্কিত করিয়া গেল। দেশের দুর্ভাগ্য যে রাজপুরুষগণের কাছে এ নরাধমগণেরই বিশেষ প্রতিপত্তি। ইহারা এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কিরূপ অনিষ্ট করিতে এবং ইহার উদ্যোগকারীগণকে কিরূপ বিপদস্থ করিতে চাহিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। আপনারা তাহাদের অলক্ষিত দুর্গন্ধের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারেন বুঝিয়া লইবেন। প্রয়োজনোচিত অর্থ সংগৃহীত হইলে উদ্যোগকারীগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এমন সময় নোয়াখালির "কৃষি প্রদর্শনীর" বিজ্ঞাপন আসিয়া পহুঁছিল। তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ অঞ্চলের লোকেরা কৃষিপ্রদর্শনীর অর্থ, বিশেষতঃ গলদেশের বেদনা দ্বারা যেরূপ অনুভব করিয়াছিল, ইহাদের কাছে আর অর্থ চাহিলে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। চাওয়াও উচিত নহে, কারণ এইমাত্র তাহারা এই বিদ্যালয়ের জন্যে একবার আনুকূল্য করিয়াছে। এই অর্থের এক কপর্দ্দকও কৃষি প্রদর্শনীর জন্যে পাঠাইলে ঘোরতর বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য হয়। সাধারণের যে সন্দেহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়া পড়ে।

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।"—এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়া উদ্যোগকারীগণ ফেনীর উকীল মোক্তার ও রাজকর্ম্মচারীগণ হইতে এই বিদ্যালয়ের জন্যে যে অর্থ চাহিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই অর্থের অল্পতাই তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠ দংশকগণের দারুণ দন্তে নিক্ষিপ্ত করিল। আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত ছিল, তাঁহারা উপায়হীন হইয়া ১৮৮৬ ইংরাজীর ১ম জুন দিবসে এই বিদ্যালয় খুলিলেন। ঐদিন তাহার শিরের উপর মেঘ সঞ্চয় হইতে ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এখানে পদার্পণ করিলেন। শুনিলাম তিনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে এই বিদ্যালয়ের জন্য বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। আপনারা "পৃষ্ঠ-দংশকের" দুর্গন্ধ পাইতেছেন কি? তিনি চলিয়া গেলেন। তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু তারিণীলাল চৌধুরী এই গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং এরূপ একটি বিদ্যালয় রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া বিদ্যালয় সমিতির সভ্যগণকে মুক্ত-

কণ্ঠে বলিয়া দিলেন। এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে যে এই নবাঙ্কুরিত বিদ্যালয়টি রক্ষা পাইল, সে কেবল সভ্যগণের সৎসাহস, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার এবং কার্য্যদক্ষতার ফল। এই দেশশুদ্ধ লোক কিসের জন্যে তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা এই ব্রহ্মাস্ত্র তৃণবৎ তর্জ্জনী সঞ্চালনে বিফল করিলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পৃষ্ঠ দংশকগণের প্রথম ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই অন্ধকারের কীট একবার পদাঘাতে মরে না—ইহাদের প্রাণ কুকুরের প্রাণ। ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্থানান্তরিত হইয়া যাইবার সময়েও লিখিলেন যে তিনি কোনও বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনিয়াছেন যে সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আদেশ মত ফেনীর ভূতপূর্ব্ব সব-রেজিষ্ট্রার প্রত্যেক দলিলের নিয়মিত ফিসের উপর ৵০ করিয়া স্কুলের · অতএব তিনি ফেরত ডাকে স্কুলের আয়ের হিসাব চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহা পাঠান হইল এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি মহাশয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ তিক্ত উপহারও পাঠান হইল[৭]। হিসাব ফিরাইয়া দিয়া লিখিলেন উপরোক্ত টাকা যে আয়ের হিসাবে থাকিবে সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহা প্রত্যাশা করেন নাই, অতএব ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, এবং সেই দিনই তিনি এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া যান, সেদিন তাহা ফিরিয়া পাঠাইলেন। ফেনীর সবরেজিষ্ট্রার অনুরূপ অর্থের আনুকুল্য করা দূরে থাকুক নিজে যে মাসিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহারও এক পয়সা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন না। ইহাতেই রক্ষা। কিন্তু অনেকে ত স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিও দান করিয়াছেন। মনে করুন যদি ফেনীর সবরেজিষ্ট্রার সেরূপ কিছু করিতেন, তাহা হইলে এরূপ নরাধম নর-কীটের ঘৃণাস্পদ মিথ্যাপবাদে এই বিদ্যালয় ও তাহার উদ্যোগকারীগণ কি ঘোরতর বিপদস্থ হইতেন, তাহা আপনারা একবার কল্পনাও করিতে পারিবেন কি? তবে ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরই বা করিবেন কি? দেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা পদস্থ, যাঁহাদিগকে তিনি "ভদ্রলোক" বলিয়া জানেন, তাঁহারা যে এরূপ জঘন্য ব্যবসার ব্যবসায়ী তাহা তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের এমনই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে এরূপ ঘোরতর ধর্ম্মজ্ঞানহীন স্বার্থপরায়ণ পাপিষ্ঠেরা ভিন্ন প্রকৃত "ভদ্রলোক" রাজপুরুষদের সংস্পর্শে বড় আইসেন না, আসিলেও সর্ব্বার্থ-সাধক চাটুতায় অপটু বলিয়া স্থান পান না। যাহাই হউক উদ্যোগকারীগণ এবম্বিধ কত অপবাদ ও অপমানরাশি নত-শিরে সহ্য করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কল্পনাতীত। তবে—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিত দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"[৮]—এই ভগবদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারা বুক বাঁধিয়াছিলেন। বলিয়াছি ভগবান সৎকর্ম্মের সহায়। তিনি তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের মুখ প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আর সেই বিশ্বস্ত মহোদয়েরা? নরকের কৃমি নরকে বিলীন হইয়াছে। শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক · প্রায়শ্চিত্ত এখন যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা দেখিলে পাষাণেরও দয়া হইবে।

আমাদের উদ্দেশ্য না থাকিলে আমরা এই ঘৃণিত কথার উল্লেখ করিয়া এই পবিত্র বিদ্যালয়ের পবিত্র বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী কলুষিত করিতাম না। প্রথম উদ্দেশ্য—দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু শিশুগণের মুখ হইতে যে টাকাটা আমরা কাড়িয়া নিয়া কৃষি-প্রদর্শনীর জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ হইতে যদি আমাদের সাধু, শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের সুললিত ভাষায়—"শ্রীমনানন্দ রামস্য কৃপয়া দীনবানকে পাইতে পারি, তবে এই দীনবালকগণের ও দরিদ্র বিদ্যালয়ের বিশেষ উপকার হয়।

৭। 'বাবু! আমি এক বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি আপনার এলাকায় সবরেজিষ্টারদের প্রত্যেক দলীলের রেজেষ্টারী ফিসের উপর আপনার স্কুলের জন্য ।০ করিয়া টেক্স উশুল করিতে আদেশ করিয়াছ। একথা সত্য কিনা আমি জানিতে চাহি।' আমি শান্তভাবে উত্তর দিলাম—'আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা একটা 'কালা মিথ্যা কথা' (black lie) কোন্ পাজী (blackguard) আপনাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার নাম পাঠাইবেন। আমি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদের জন্য অভিযোগ আনিতে চাহি। আপনি ইংরাজ এবং আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনি অবশ্য এরূপ পাজী পৃষ্ঠদংশককে (Rascally backbiter) [illegible] করিবেন।

৮। গীতা ৬।৪০

অতীন্দ্রিয়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(লঘুগুরু ছন্দে)

যত দোল । নন্দিল নয়নে
ঝঙ্কল শ্রবণে
শিহরিল অধরে
পরশি'—

উত্তরোল । নৃত্য অনন্তে
ছন্দি' বসন্তে
পরিমল বিতরে
উছসি' :

যত শোভা । জনমে জনমে
করমে ভরমে
বঙ্গ বিছালো
গানে—

মন লোভা । ফুটন্ত প্রাতে
ঝরন্ত রাতে
সঙ্গ বিলালো
প্রাণে :

যত বাণী । তটিনী-কণ্ঠে
বর্হি-শিখণ্ডে
দীপিল বর্ণে
রাগে—

বর দানি' মলয়-সুবাসে
বরষাকাশে
বিদ্যুৎপর্ণে
জাগে :

সবি যেন । মায়া-দীপ্তি
ছলে অতৃপ্তি
আনে জীবন
স্বাদে,—

তবু কেন । তব মধু-শান্তি-
স্নিগ্ধা কান্তি-
স্নানে না মন
মাতে ?

বাসি ভালো । ইন্দ্রিয়-রূপে
গন্ধে ধূপে
আসব-স্বপনে
বলিয়া

নাহি জ্বালো । নিহিত অতীন্দ্রিয়
আলো—হে প্রিয়,
রজনী তপনে
দলিয়া ?

ঝরো ধীর । করুণা-ভঙ্গে
প্রেম-তরঙ্গে
গাঁথিব অন্তর-
গহনে

মোর চির- । বাঞ্ছিত মালা—
ভরি' মম ডালা
সৌরভ ভরভর
শরণে ।

All eye has seen, all that the ear has heard
Is a pale illusion by that greater voice,
That mightier vision. Not the sweetest bird,
Nor the thrilled hues that make the heart rejoice
Can equal those diviner ecstasies *

SRI AUROBINDO

---

* এ-কবিতাটি শ্রীঅরবিন্দের এই কয়টি চরণ পাঠে লিখিত। যত দোল, উত্তরোল প্রভৃতি অতিপর্ব্বিক শব্দ মাত্রাবৃত্তে পাঠ্য।



ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ —গীতা।

শিল্পী— শ্রীযুক্ত শৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বি-এস্‌সি

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পাহাড়ের আড়ালে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্

গ্রামের স্কুলে মাইনর পাশ করিয়া গোরা গেল কলিকাতায়। কল-কব্জার কাজে দু'পয়সার সংস্থান হয়। তাই সে মুরুব্বি ধরিয়া একটা বড় মেকানিকাল ফার্ম্মে কাজ শিখিতে ঢোকে। প্রতি শনিবারে—তা ছাড়া ছুটীছাটার দিনে বাড়ী ফিরিত।

ছেলে ভালো। পাঁচ বৎসরে বাইশম্যানীর কাজে পোক্ত হইয়া গ্রামের অদূরে চটের কলে চাকুরি পাইল।

চাকুরির পর বিবাহ। বধূ আসিল কলিকাতা হইতে।

বাইশম্যানী করিলেও গোরার লেখাপড়ায় ঔদাস্য ছিল না। বৌ বিজলীপ্রভা মেয়ে-স্কুলে দু'চার বছর পড়াশুনা করিয়া নাটক-নভেলে রুচি-অনুরাগ পাকাইয়া তুলিয়াছে। বৌয়ের দৌলতে গোরাকেও নাটক-নভেলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে হইল।

বৌ ঘর করিতে আসিল। পিশি বলিল,—গাড়ীর কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে বসো বৌমা।

কলিকাতার মেয়ে—এ কথায় চমকিয়া সে স্বামীর পানে চাহিল। গোরা মৃদু-হাস্যে ইঙ্গিত করিল। বৌ পিশির আদেশ পালন করিল।

পিশি কহিল—বিয়ে দিয়ে একটি বছর আনতে পারিনি মা—সাধ থাকলেও! কত লোকে কত কথাই বলেছে। আমি শুধু বলেচি, ছেলেমানুষ! সহর ছেড়ে এ বনে এ বয়সে মন বসবে কেন! আগে ডাগরটি হোক—সংসার বুঝতে শিখুক—তখন নিয়ে আসবো। এনে তার ঘর-সংসার তাকে বুঝিয়ে আমি ছুটী নেবো।

সহরে এখন অনেক ফ্যাশন উঠিয়াছে। পিশি সে সবের কোনো খবর জানে না। শিশিতে ভরা লাল জল দেখিয়া পিশি কহিল—এ কিসের শিশি বৌমা? তেল নয় তো—কালির মতন!

বিজলী কহিল—তেল নয়। তরল আলতা।

পিশি কহিল—ও মা! আলতাও এমনি করে গুলে শিশি ভরে সহরে এখন বিক্রী হচ্ছে! দাম কত?

কোথায় যেন বাধিতেছিল! স্বামীর সংসার! সে সংসারে তাহারি সর্ব্বময়ী হইয়া থাকিবার কথা! শ্বশুর নাই, শাশুড়ী নাই। এক পিস্‌শাশুড়ী! তাঁর স্নেহ নাই, এমন নয়—বকেন না,—কোনো-কিছুতে মধ্যস্থতা করিতেও আসেন না! বরং কাজে-কর্ম্মে দশ হাত দিয়া দশ দিকে আগুলিয়া রাখিয়াছেন! তবু মাথার উপর বসিয়া আছেন! একটু দ্বিধা, একটু কুণ্ঠা। আর ঐ মানিয়া চলা! অস্বাচ্ছন্দ্য এইখানে।

কথাটা খুলিয়া বলা প্রয়োজন।

ছেলেবেলায় মা-বাপ মারা গেলে শশী-পিশির হাতেই গোরা মানুষ হয়। পিশি বিধবা, কোন্ সে অতীত যুগে বিবাহের পর শ্বশুর ঘর করিতে যান—সেখানে দু'বৎসর না কাটিতে সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া থান পরিয়া ভাইয়ের ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। সে কথা কাহারো বড় মনে পড়ে না। তবে সেই অবধি পিশিমা হইয়া সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইয়া আসিতেছেন। ধনীর সংসার নয়। তবু হাতের গুণে চারিদিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া অভাব-অভিযোগগুলাকে সংসারের ত্রিসীমায় ঘেঁষিতে দেন নাই! বড়র দল দুঃখ করিয়া বলিত,—এমন লক্ষ্মী! অথচ তার কপাল এমন করিয়া পুড়াইতে বিধাতার মমতা হয় নাই!

খড়ের ঘর! তা হোক! বেশ, তক্‌তকে নিকানো। কোথাও এতটুকু জঞ্জাল নাই। সামনে একটু বাগান। যখনকার যা ফুল, সে বাগানে কোনোদিন তার অভাব ঘটে নাই। বাড়ীর পিছনে শাক-সব্জী, লাউ, কুমড়া, বেগুন, ঢেঁড়স, তরী তরকারীর গাছ। সকল দিকে পিশির দৃষ্টি আছে।

সকালে উঠিয়া নদীতে যান স্নান করিতে—স্নানান্তে আহ্নিক সারিয়া রাঁধাবাড়া; ভাইপো গোরাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া স্কুলে পাঠানো। কাজ বাঁধা রুটীনে চলিয়া আসিতেছে। কোনোদিন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রোগ কাহাকে বলে, পিশি জানেননা! ভাগ্যকে আহত করিয়া তার স্বাস্থ্যের পানে ভগবান নির্ম্মম দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই!

বিজলী দাম বলিল। পিশি কহিল—এতে আর মানুষের লক্ষ্মী থাকবে কি করে! দু'পয়সার আল্‌তার পাতা এনে ঘরে রাখলে তাতে দু'মাস আল্‌তা পরা চলে যে ·

পিশি নিশ্বাস ফেলিল। বিজলী জিনিষপত্র গুছাইয়া তুলিতে লাগিল।

পিশি কহিল—রেলের কাপড় কোথায় ছেড়ে রাখলে বৌমা? কেচে আনিগে।

বিজলী কহিল,—থাক, আমি কাচবো'খন পিশিমা।

পিশি কহিল—না, না। তুমি কাচবে কি মা! যতক্ষণ আমার নড়া দুটো আছে তোমাকে কিছু করতে হবে না! কত আদরের ধন তুমি—কি বুঝবে! ঐ গোরা! বাচ্ছা ছেলেকে সকলে ফেলে চলে গেলে কি দুর্ভাবনাই হয়েছিল! ও আবার বাঁচবে! মানুষ হবে! তার বিয়ে দিয়ে বৌ আনবো!··

পিশি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—ফেলিয়া কহিল,—তাঁদের অভাগ্যি। এমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পেলে না! সব খেয়ে আমি পড়ে রইলুম সোনার রাজ্য চালনা করতে!

বধূর কাপড়-সেমিজ পুকুরের জলে কাচিয়া পিশি উঠানের দড়িতে খাটাইয়া দিল। বিজলী কহিল—কি কুটনো-কুটবো মা?

পিশিকে সে মা বলিয়া ডাকে। বিজলীর মা শিখাইয়া দিয়াছে।

পিশি কহিল—তোমাকে কিছু করতে হবেনা মা। ছেলেমানুষ—তুমি শুধু বসে দেখো। তুমি হাঁা, গোরার পাণ কটি সেজো দুবেলা—আর ওর কারখানার কাপড় চোপড় ঠিক করে রেখো।

এমনি করিয়া সংসারের কাজে বধূ বিজলীপ্রভার হাতে-খড়ি হইল।

পরের দিন সকালে স্নান সারিয়া পিশি উঠানে আসিয়া ডাকিল—বৌমা···

বিজলীর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে অনেকক্ষণ—গোরা ছাড়ে নাই। তরুণ বয়স···তরুণী স্ত্রী!

পিশির আহ্বানে বিজলী বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পিশি কহিল—সকালেই উঠো মা। এ পাড়া-গাঁ···কেউ যদি এসে দেখে বেলা অবধি ঘরে আছো, তাহলে নিন্দে করবে। বলবে, বেহায়া!

এ কথাগুলার মানে না জানিলেও বিজলী লজ্জা বোধ করিতেছিল। পিশির কথায় নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।···

পিশি আহ্নিকে মন দিল। বধূ মুখ-হাত ধুইতে গেল। আহ্নিক করিতে করিতে বধূর ডাক পড়িল—বৌমা··

বিজলী আসিল। পিশি কহিল—গোরা চা খাবে তো! সেই সঙ্গে তুমিও এক পেয়ালা খাবে। সহরে এখন রেওয়াজ হয়েচে, শুনি।

সলজ্জভাবে বধূ কহিল—আমি চা খাইনা। ·চায়ের জল গরম করতে দেবো?

পিশি কহিল—না, না। আমি উঠি। উঠে—দিচ্ছি।· উনুনে আমি আগুন দিয়ে এসেছি। তুমি শুধু ছাখো মা, আগুন ধরলো কি না

বিজলী দেখিয়া আসিয়া জানাইল, আগুন ধরিয়াছে।

পিশি কহিল—আমি গিয়ে জল চড়িয়ে দিচ্ছি। গোরা উঠেচে?

বধূ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

চা পানান্তে গোরা আসিয়া পিশির কাছে বসিল। পিশি কুটনো কুটিতেছে, বধূ তার পিছনে বসিয়া আছে।

গোরা কহিল—তুমি কেন কুটনো কুটচো পিশিমা?

পিশি কহিল—কে কুটবে? বৌমা?

গোরা কহিল—নিশ্চয়। তুমি ছুটী নাও। এখনো খাটবে! বুড়ো হয়েচো তোমার সাশ্রয় হবে বলেই তো বিয়ে করে বৌ আনা।

হাসিয়া পিশি কহিল—পাগল! বৌ না হলে চলে। সোমত্ত ছেলে ·রোজগার করচো। ঘরে না হলে মন বসবে কেন!

গোরা কহিল—তা বলে বৌকে পুতুল করে বসিয়ে রাখবে! কাজকর্ম্ম শিখবে না?

পিশি কহিল—গেরস্তর ঘরের মেয়ে দেখেই সব শেখে বাবা। দু'দিন এখন বসে একটু আরাম করুক! এ ঘানিতে একবার জুতে দিলে আর তো তিলেকের ছুটী মিলবে না! বাঙালীর ঘর!

গোরা কহিল—বাঃ! তা বলে এখনো তুমি সব আপন-হাতে করবে!

পিশি কহিল—ওকে কি কাজ করতে দিতে চাস, শুনি?

গোরা কহিল—ধরো, বাসনকোশন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া। এগুলো···

পিশি কহিল—ছেলেমানুষ পারবে কেন? ভারী সহজ কাজগুলো বললি কি না!

দু'চারিদিন বধূর ঘুম ভাঙ্গিতে দেরী হইল। কারখানার কাজ করিলেও গোরার মনে বসন্তের সবুজ রঙ ধরিয়াছে। পাশে তরুণী প্রিয়া দুজনে কত কথাই হয়—কতখানি রাত্রি জাগিয়া···

পাড়াগাঁ। দিনের বেলায় যেটুকু গৃহে থাকে—পাঁচজনে আসে। বধূর সঙ্গে গোরার দেখা হয় না। বিজলী দু'একদিন ঘরে গিয়াছিল। পিশি সতর্ক করিয়া দেয়, বলে—দিনের বেলায় গোরার সঙ্গে দেখাশুনা করো না বৌমা। পাড়াগাঁয়ে সে রীত নেই। নিন্দে হবে।

এই নিন্দার ভয়ে গোরা আর বিজলী দুজনেই একেবারে সিঁটিয়া আছে! তার উপর পিশির নিষেধ! কাজেই রাত্রিটায় তাদের কথা, হাসি, গল্প আর ফুরাইতে চায় না।

পিশি কহিল—বেলা হয়ে গেছে। এখনো কি বিছানায় পড়ে থাকতে হয় মা!

গোরা কহিল—ওর স্বভাব পিশিমা। মানে, সেখানেও একটু বেলা করে ঘুমোতো

পিশি কহিল—সে ছিল বাপের বাড়ী। এ হলো শ্বশুর-ঘর। এখানকার আইন আলাদা। এখানে বৌমানুষকে সবার আগে উঠতে হয়! নাহলে লোকে নিন্দে করে!··

আবার সেই নিন্দা!

বিজলীর অস্বস্তি ধরিতেছিল। কোনো কাজ না করিয়া পুতুলের মত চুপচাপ এমন বসিয়া থাকা অসহ্য!

গোরাকে সে বলিল—সত্যি, মা আমাকে কি ভাবেন! আমি কচি খুকী নই, দিন-রাত এমনি বসে থাকবো!

গোরা কহিল—কি করতে চাও?

বিজলী কহিল—কাজকর্ম্ম।

গোরা কহিল—পিশিমাকে আমি বুঝিয়ে বলবো।

গোরা গিয়া পিশিকে বলিল—সত্যি পিশিমা, আমি ভারী রাগ করচি···

পিশি কহিল—কেন রে?

গোরা কহিল—বৌ এমন নবাবের মত বসে থাকবে, আর তুমি এই বয়সেও এমন খেটে সারা হবে—তাহলে কি দরকার ওকে এখানে রাখবার?

হাসিয়া পিশি কহিল—বৌ তো দাসী নয়, রাঁধুনী নয়, বাবা।

গোরা কহিল—না। দাসী আর রাঁধুনীবৃত্তি করবে মা-মাসি-পিশি? বটে!

পিশি কহিল—বাড়ীর গিন্নীর কাজ এ-সব—গেরস্ত-ঘরের। বড় মানুষের ঘরে অবশ্য নয়। তাদের বাড়ী দাসী-বাঁদী থাকে, রাঁধুনী থাকে।

গোরা কহিল—এ বয়সে তুমি যদি রাঁধাবাড়া আর কাকেও না দিয়ে নিজে করো, তাহলে আমি মাইনে দিয়ে লোক রাখবো।

পিশি কহিল—সেই আশীর্ব্বাদই করি বাবা, সেই ক্ষমতাই হোক!

গোরা কহিল—না পিশিমা, এ-সব কাজ তুমি বৌয়ের হাতে ছেড়ে দাও। বৌ খুকি নয়, সত্যি···

পিশি কহিল—তাই দেবো রে! দুদিন সবুর কর! গায়ে একটু হাওয়া লাগুক। ছেলেপিলে হবে—তাদের নিয়ে সংসারে নামবে একদিন। এখনি এত তাড়া কিসের?

গোরা কহিল—জলে নেমে সাঁতার শিখতে হয়! নাহলে নৌকোডুবির মুখে জলে ভাসবার ক্ষমতাও থাকবে না যে! তাছাড়া পাঁচজনে এতে নিন্দে করবে—বলবে, এমন ভাইপো আর এমনি বৌ যে বুড়ো পিশিকে খাটিয়ে তার গতর চূর্ণ করে দিচ্ছে!

পিশি কহিল,—নিন্দে যদি কেউ করে, তখন সে নিন্দের জবাব আমি দেবো।

ব্যাপার এই অবধি আসিয়া থামিয়া যায়। নিন্দার দুটা দিক পিশি এক রকম দেখে না।··

এমনি করিয়া আরো একটা বৎসর কাটিয়া গেল। জীবনের বসন্ত। স্নেহের অভাব নাই, তবু সে স্রোত কি পথে কি ধারায় বহিয়া চলিয়াছে! প্রাণে সুখ পাওয়া যায় না।

সেদিন তাদের বিবাহ-তারিখের বার্ষিকী। আগের রাত্রে একখানি সুতির স্কার্ট শাড়ী গোরা কিনিয়া আনিয়াছে—মিলের নূতন শাড়ী উঠিয়াছে। কলিকাতার পথে সৌখীন সমাজের নারীদের পরিতে দেখিয়াছে। সাদা মিলের শাড়ী! কতই বা দাম! তাই সন্ধান লইয়া এই শাড়ী কিনিয়া আনিয়াছে। তার চোখে ভালো লাগিয়াছে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া বিজলী সেই শাড়ী পরিয়াছিল। পিশি কহিল,—কোথাও যাবে নাকি বৌমা?

বিজলী কহিল—না।

—তবে এ শাড়ী বার করে পরেচো! এ তো বেশ দামী শাড়ী দেখচি।

বিজলী কহিল—খুব দামী নয়। তবে পোষাকীতে পরা চলে। ভালো শাড়ী।

পিশি কহিল—তাই তুলে রাখতে হয়। যখন-তখন ভালো কাপড় পরা ঠিক নয় বৌমা। কখন্ মানুষের পয়সার অবস্থা কি হয়, তা তো জানা নেই। সঞ্চয় রাখা ভালো।

এখনো গোরা মাহিনা পাইলে তাহা আনিয়া পিশির হাতে দেয়। পিশি তার হাতে দিয়া বলে,—তোর কাছেই থাক্ বাবা। যখন দরকার হয়, নিস্ আর হিসেব লিখে রাখিস্। হিসেব না রাখলে মানুষের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না!

বধূ সেবারে পিত্রালয়ে গিয়াছিল। সেখান হইতে কতকগুলা পর্দ্দা কিনিয়া আনিল—তাছাড়া একরাশ কাচের গ্লাস, চায়ের পেয়ালা।

পিশি কহিল—এ-সবে কি হবে?

বিজলী কহিল—দেখে পছন্দ হলো। কিনে আনলুম।

পিশি কহিল—কাচের জিনিষ ভাঙ্গলে সব গেল। তার চেয়ে কাঁশা-পিতল ভালো মা। ভাঙ্গলেও তা থেকে কিছু আসে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিজলী কহিল—সখ হলো...

পিশি কোনো কথা বলিল না। বিজলীর অস্বাচ্ছন্দ্য ধরিল। এ-বয়সে দুচারিটা তুচ্ছ সখ যদি না মিটাইলাম তো জন্ম লওয়াই বৃথা! তাছাড়া ইহাতে কি এমন খরচ!

ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি মট্কা থান বাহির করিয়া বিজলী কহিল—আপনার জন্যে মট্কা শাড়ী এনেছি। পোরে পূজা-আহ্নিক করবেন।...

পিশি একটা নিশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া কহিল,—মিথ্যে পয়সা নষ্ট, মা। ঠাকুর-দেবতা তো দামী কাপড় বা পূজার পাত্র দেখে ভক্তির মাপ করেন না!...তবু থাক, এনেচো তুমি। এ আমার মস্ত জিনিষ—তোমার দেওয়া—পরবো বৈ কি!...

এইগুলায় বাধে! সেকালে একালে এই যে রুচির পার্থক্য...এ পার্থক্য ঘুচানো এমনি কঠিন! কেহ যেন কাহাকেও বুঝিতে চাহে না! স্নেহ-দরদ বিলাইয়া চলিয়াছে—কাল-পাত্র না বুঝিয়া! পিপাসায় যার কণ্ঠ শুকাইয়া আছে, ভালোবাসিয়া তাকে দিতেছে অনেক টাকা দামের মুক্তার মালা! আর যে মুক্তার মালার কাঙাল

সম্প্রতি একটু বিপদের সূত্রপাত ঘটিল।

বিজলীর ছিল পাখীর সখ। গোরার কাছে নিত্য বায়না লইত—ওগো, পাখী...

বাপের বাড়ীতে তার পাখী ছিল। শ্যামা, ময়না,—তা ছাড়া একঝাঁক মুনিয়া, জাভা-স্প্যারো।

জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রাখিতে গোরা গিয়াছিল কলিকাতায়। ফিরিতেছে, শাশুড়ী বলিলেন,—বিজু চিঠি লিখেচে বাবা—তার পাখীগুলো পাঠিয়ে দেবার জন্য...

গোরা কি করে! কহিল—দিন্।

ছোট খাঁচায় পাখীর ঝাঁক বহিয়া আনা—বিশেষ ট্রেণে—কঠিন ব্যাপার! কিন্তু প্রিয়া চাহিয়াছে...

পাখী পাইয়া বিজলীর মহা-আনন্দ! তখন অনেক রাত। রাত্রের মত পাখীর ঝাঁক ঘরে রহিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে পাখীর খাঁচা সে টাঙাইয়া দিল—দাওয়ায় সিকে। সিক আগে হইতে আসিয়াছে।

স্নান সারিয়া কল-কাকলীতে ফিরিয়া চাহিয়া পিশি দেখে,—পাখী! একটি ঝাঁক। পিশি ডাকিল—বৌমা...

বিজলী কহিল—মা...

পিশি কহিল—পাখী কোথা থেকে এলো?

বিজলী কহিল—আমার ছিল...

—ছিল!

—বাপের বাড়ীতে।

—ও!

পিশি বুঝিল, গোরা কাল নিমন্ত্রণে গিয়াছিল—আনিয়াছে।

পিশি কিছুক্ষণ পাখীগুলার পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আমি বাপু দেখতে পারি না। ঘর-দোর নোঙরা করে···

বিজলীর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল—আমি দেখবো। তাছাড়া খাঁচায় আছে। নোঙরা হবে না।

পিশি কহিল—পাখীকে এমন খাঁচায় পুরে রাখতে আছে কি!—জানিনা মা, তোমাদের কি সখ!

পিশি চলিয়া গেল। বিজলী গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে অভিমান হইয়াছিল। সেই সঙ্গে প্রচুর ব্যথা! একবার মনে হইল, খাঁচা খুলিয়া পাখীগুলাকে উড়াইয়া দেয়· এখনো এমন সশঙ্কিত, কুণ্ঠিত থাকিবে! একালে কোন্ বাড়ীর বৌ এমন চোর হইয়া থাকে! সে মানুষ নয়?

তার দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল।

গোরা কহিল—কি ভাবচো? স্বর মৃদু।

বিজলী জবাব দিলনা।

গোরা কহিল—পাখীর কথা তো? পিশিমা বলছিল, আমি শুনেচি। দুঃখ করো না ছেলেবেলায় আমি একটা কুকুর এনেছিলুম। ভালো বিলিতি কুকুর—পিশিমা রাগ করে বললে—এ সব কুকুর পোষে বড়লোকে, কত কি খাওয়ায়। তোর এ সখ কেন? মিছে ওকে কষ্ট দেওয়া·

একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া বিজলী কহিল—উড়িয়ে দিই?

—না।

পাখী রহিয়া গেল। পিশি কিন্তু পাখীর সম্বন্ধে আর কোনো কথা ভুলিয়াও তুলিল নাই!··

পূজার সময় বিজলীর দিদি চিঠি লিখিল—ছেলেদের অসুখ-বিসুখ নিয়ে ভুগে সারা হয়ে গেছি। একটু ঠাঁই-নাড়া করা দরকার। তা কোথায় যাই? ভাবচি, তোর ওখানে গিয়ে দুদিন থাকবো। তোরা তো একলা·· ইত্যাদি

বিজলী শিহরিয়া উঠিল। দিদির চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে এখানে পিশিমা···যদি মত না থাকে

গোরা কহিল—আসুন। কি বলে বারণ করবে?

বিজলী কহিল—কিন্তু··

গোরা কহিল—সে আমি ঠিক করচি···

পিশিমার কাছে আসিয়া গোরা বলিল—ঠাকুরবাড়ী যাবে পিশিমা?

ঠাকুরবাড়ীর অর্থ, শ্রীক্ষেত্র!

পিশি কহিল—তোরা যাচ্ছিস?

গোরা কহিল—আমরা যাচ্ছি না। যাচ্ছে আমার বন্ধু বিপিন—তার মাকে নিয়ে···

পিশি কহিল—না বাবা। আমার অত সখ নেই। আমি যাবো না।

মুস্কিল! ওদিকে বিজলীর দিদিকে চিঠি লেখা হইয়া গিয়াছে·

অন্য উপায় করিতে হইল।

তিন ক্রোশ দূরে ছিল গোরার এক খুড়তুতো ভগ্নীপতি শ্রীধর। সেখানে গিয়া শ্রীধরের সঙ্গে গোরা পরামর্শ করিয়া আসিল।

শ্রীধর আসিয়া কহিল—একটিবার আমার ওখানে যেতে হবে পিশিমা। আমি নতুন বাড়ী করেচি···তাছাড়া আমরা কি কেউ নই?

পিশির যাইবার ইচ্ছা নাই। তবু শ্রীধর জামাই—এত করিয়া বলিতেছে! অভিমান করিতেছে···

যাইতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে নানা উপদেশ—নানা কথা·

পিশির দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। বধূকে বুকে টানিয়া পিশি কহিল—এ ভিটে ছেড়ে কখনো নড়িনি মা! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে! না গেলে ওরা দুঃখ করবে। দুজনে খুব সাবধানে থেকো মা। আমি হারুর মাকে বলে যাচ্ছি—সে রান্নাবান্না করবে—তুমি আগুন-তাতে যাবে না। বুঝলে! বিশেষ এখন কাঁচা পোয়াতি! আমার মাথা খাবে—

স্নেহের সে অজস্র মিনতিতে বধূর বুক দুলিয়া উঠিল। গোরা চুপ করিয়া রহিল।

পিশিমা চলিয়া গেলে গোরা কহিল—সত্যি করে ব্যথার কথা, আব্দারের কথা জানালে ফল হয় না! পিশিমা উল্টো বোঝে। তাই না এই বাঁকা পথে··

একটা নিশ্বাস পড়িল! সে নিশ্বাসে কথার শেষাংশ উবিয়া মিলাইয়া গেল!···

বিজলীর দিদি আসিল, একদল ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া। ওদিকে পিশিমা যে করিয়া জামাইয়ের গৃহে পড়িয়া রহিল…

সেখানে পাশের বাড়ীতে পূজার ধূম। পিশির তা ভালো লাগে না।

ভাইঝী শান্ত কহিল—গোরাদা তোমার ঠাকুরের চেয়েও বেশী হয়েচে পিশিমা!

পিশিমা শিহরিয়া কহিল—ষাট—ষাট! তারা ভালো থাকুক। মার কথা তুলতে নেই শান্ত…

দশ দিন এখানে কাটিল। প্রত্যহই পিশি বলে—কাল আমি যাবো শান্ত…

শান্ত বলে—কেন পিশিমা? এখানে কষ্ট হচ্ছে?

পিশি কহিল,—কষ্ট কি! জামাই মাথায় করে রেখেচে!

শান্ত কহিল,—তবে? আমরা কি পর?

শান্তর ছেলেমেয়েরা বলে—দিদিমা…গল্প বলো!

এমনি করিয়া দিন কাটে। স্নেহ-প্রীতি! তবু মন পাগল হইয়া আগল ভাঙ্গিয়া ছুটিতে চায়—অন্তরঙ্গ!

সেদিন পুকুর-ধারে দাঁড়াইয়া পিশি বেলপাতা পাড়িতে ছিল। মনটা বাড়ীর জন্য কেমন আকুল হইয়া উঠিল।

আহ্নিক করিতে বসিয়া মনে সেই আকুলতা! আহার করিতে বসিয়া হাতের ভাত হাতে রহিয়া গেল।

বুক কেমন ব্যথায় ভারী! পিশির দম বুঝি বন্ধ হইয়া যাইবে! পিশি কহিল—আজ আমি বাড়ী যাবো শান্ত…

শান্ত কহিল—তোমার জামাই আসুক। বলি…

জামাই আসিবার তর সহিল না। দুপুর বেলায় ছেলে মেয়েদের লইয়া শান্ত গিয়া ঘরে শয়ন করিল—পিশির যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল।

আকাশখানা ভাঙ্গিয়া বুঝি মাথায় পড়িবে! গামছাখানা মাথায় চাপিয়া পিশি পথে বাহির হইল…

অলস মধ্যাহ্ন। গ্রামের পথ। পথের দুধারে বড় বড় ছায়া-করা গাছ। গাছে গাছে পাখীর বিচিত্র গুঞ্জন। পিশির মন বলিতেছে—বাড়ী…বাড়ী…

প্রতি পদে মনে হইতেছিল,—না, সে শক্তি আর নাই! কি দুর্ব্বলতা দেহে-মনে ছাইয়া বসিয়াছে!……

দীর্ঘ পথ। আগে এতখানি দীর্ঘ ছিল না। আসিবার সময় দীর্ঘ মনে হয় নাই—এখন হইতেছে।

বাজারের কাছে দেখা বনমালী গোয়ালার সঙ্গে। বনমালী কহিল—ভাইপোর যে আজ দুদিন খুব অসুখ গো পিশিমা…

অসুখ! তাই প্রাণে এমন অসহ্য আকুলতা!…

পিশি যেন ছুটিল! বুকের মধ্যে কে তখন মুগুর মারিতেছে!

বাড়ীর কাছে পুকুর। ঘাটে হাত-পা ধোওয়া হইল না! একেবারে রোয়াকে উঠিয়া পিশি ডাকিল—বৌমা…

স্তব্ধ গৃহ। পিশির বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কোনো সাড়া নাই।

বুকে যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিশি ডাকিল—গোরা…

বিজলী আসিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিল। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় লক্ষ্য করিয়া পিশি দেখিল—বৌয়ের পরণে পাড়ওয়ালা শাড়ী! আঃ! সর্ব্বনাশ তাহা হইলেও ঘটিয়া যায় নাই!

পিশি কহিল—গোরার অসুখ?

বিজলী কহিল—হাঁ।

—কি অসুখ?

—জ্বর। কাল খুব বেড়েছিলো। যে ভাবনায় রাত কেটেচে! কাকে তোমার কাছে পাঠাবো—দিশেহারা হয়ে শুধু তাই ভেবেচি।

পিশি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; ডাকিল,—গোরা… কেমন আছ বাবা?

পিশি তার কপালে হাত রাখিল। গোরা চাহিয়া দেখিল!

পিশি কহিল,—

গোরা কহিল—ভালো। জ্বর কমেছে।

বিজলী সত্যই আরাম বোধ করিতেছিল। যার আবরণকে পীড়ন বলিয়া মনে হইত, সে আজ দুদিন সরিয়া দূরে থাকিতে নিজেকে এমন অসহায় দীন বলিয়া মনে হইতেছিল! ভয়ে কাঁটা হইয়াছিল…

জ্বরের ঘোরে কাল রাত্রে গোরা যখন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল, তখন বার বার তার মনে হইয়াছে—ভগবান

ী—এত স্নেহে যে পিশি মানুষ করিয়াছে, এত বড় ছলনায়, বঞ্চনায় তাকে দূর করিয়া দিয়া আরামে থাকিবার যে বাসনা—বুঝি, সেই পাপেই···! দিদিরাও চলিয়া গিয়াছে বড় একা—বড় ফাঁকা!

পিশির পায়ের কাছে বসিয়া তাঁর পায়ে হাত রাখিয়া বিজলী কহিল—আর কখনো বাড়ী ছেড়ে তুমি যেয়োনা পিশিমা। একলা থাকতে ভারী ভয় করে!···

বিজলীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পিশি কহিল—আমি কি করে সেখানে কদিন ছিলুম, মা! তারা কি অযত্ন করেচে? তা নয়। আমার মন এইখানে ঘুরেচে সারাক্ষণ।··· আজ দুপুরবেলায় আপনা থেকে মন খারাপ হয়ে গেল··· পূজা-আহ্নিক হলো না···মুখে ভাত উঠলো না! শান্তু বললে, ওবেলায় শ্রীধর এলে তবে যেয়ো। থাকতে পারলুম না মা। —আমার মন বলছিল, এখানে কিছু হয়েচে! না হলে···

বিজলী শিহরিয়া উঠিল—ভগবান আছেন, আছেন! নহিলে এমন হয়!

তার আশা হইল, গোরা এবারে সারিয়া উঠিবে। সময় থাকিতে পিশিমা আসিয়াছে!

সত্যই তো, এতদিন কাহারো কোনো অসুখ ছিল না!

পরের দিন কালাচাঁদ ডাক্তার আসিয়া কহিলেন,—ভয় নেই। যা ভেবেছিলুম—ম্যালেরিয়াই। কুইনিনটি ঠেশে দিয়েচি··জরও অমনি পালিয়েচে!

বাংলা সাহিত্যে একশত খারাপ বই

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-ই

গোঁদোলপাড়ার প্রসিদ্ধ উন্মাদ ছিরু ক্ষ্যাপা কবে ও কি উপায়ে 'লটারি'র টিকিট কিনিয়াছিল কেহ জানিত না; কিন্তু পয়লা নম্বর ঘোড়া উঠিল তাহারই নামে! সহসা প্রচুর অর্থ পাইয়া ছিরুর উন্মত্ততা এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইল। তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, সে বাংলা দেশের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের সংস্কারভার তাহার উপরই অর্পিত হইয়াছে; কেবল সময়াভাবে সে কলিকাতা যাইতে পারিতেছে না। ছিরু ক্ষ্যাপা লেখাপড়া জানে কিনা, তাহা জানিবার সুযোগ এতদিন কাহারও হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে সে নিয়ত বড় বড় সাহিত্যিক ও তাহাদের পুস্তকাবলীর কথা আওড়াইতে লাগিল! ক্রমে তাহার খেয়াল চাপিল যে, গোঁদোলপাড়ায় সে একটি আদর্শ পাঠাগার স্থাপিত করিবে। অর্থের অভাব নাই; গ্রামে উৎসাহী নিষ্কর্ম্মারও অভাব ছিল না। দেখিতে দেখিতে এক প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মিত হইল, আর তাহার ললাটে খোদিত হইল—"গোঁদোলপাড়া আদর্শ ছিরু পাঠাগার।"

সুবৃহৎ পাঠাগার নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অদ্যাপি একখানি পুস্তকও আনা হয় নাই। পুস্তক ক্রয়ে বিলম্ব ঘটিবার কারণ, ছিরু চায়—তাহার পাঠাগারে যে সব বাংলা বই থাকিবে, তাহার মধ্যে খারাপ বই যেন না থাকে। বুদ্ধি করিয়া ছিরু তখন কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিল—"বাংলা সাহিত্যে একশত খারাপ বই" নির্ব্বাচন করিয়া আগামী ১লা এপ্রিলের মধ্যে তাহার নিকট ফর্দ্দ পাঠাইতে হইবে। যে ফর্দ্দখানি তাহার মনোনীত হইবে, তাহার নির্ব্বাচককে একটি স্বর্ণপদক উপহার দেওয়া হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, ছিরু-পাঠাগারে ওই একশত বই বর্জ্জন করিয়া বাকি বাংলা বই কিনিয়া রাখিলেই তাহা প্রকৃত পক্ষে 'আদর্শ' এই নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবে। গ্রামের লোক তবুও ছিরুকে ক্ষ্যাপা বলে!

নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে নানা স্থান হইতে "বাংলা সাহিত্যে একশত খারাপ বই"এর প্রতিযোগিতামূলক তালিকা আসিয়া জমিল। ১লা এপ্রিল তারিখে গোঁদোলপাড়ায় এক বিরাট সভা বসিল। মনোনয়নের ভার ছিরু নিজের উপরই রাখিয়াছিল। সভার প্রেসিডেণ্টও ছিরু। টেবিলের উপর একটি চমৎকার 'কেসে' একখানি মূল্যবান্ স্বর্ণপদক। ছিরু সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল।—

"গোঁদোলপাড়ানিবাসী ভদ্রমহোদয়গণ! বাংলা-সাহিত্যে একশত খারাপ বই-এর তালিকা আমি আজ পর্য্যন্ত ৫৯৭টি পাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটাই আমার

কাছে নিখুঁৎ মনে হইল না। বিশ্বভারতীর ফর্দ্দটি প্রায় মনের মতন হইয়াছিল,' কিন্তু শেষে দেখি, তাহাতে 'গোলেবকাওলি' নামক অবশ্যপাঠ্য উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পুস্তকখানির নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে! যাহা হউক, আমি ৫৯৭টি ফর্দ্দ মিলাইয়া নিজে যে ফর্দ্দটি প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাই আমার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ আমার ফর্দ্দ ৫৯৭টি ফর্দ্দ হইতে বাছাই করা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় একশত খারাপ বই নির্ব্বাচনের প্রতিযোগিতায় আমার তালিকাটিই আমি মনোনীত করিলাম। সুতরাং স্বর্ণপদক আমারই প্রাপ্য।" সঙ্গে সঙ্গে ছিরু 'কেস' হইতে পদক উঠাইয়া নিজের বুকে লট্‌কাইয়া দিল। তখন ঘন ঘন করতালি-ধ্বনিতে গোঁদোলপাড়ার মহাসভা কম্পিত হইতে লাগিল।

আমি বিদেশী ব্যক্তি, ঘটনাচক্রে সভায় উপস্থিত ছিলাম। পশ্চিম কলিকাতা রসসাহিত্য সংসদে যাইবার পথে কয়েকদিন পূর্ব্বে আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুকে একটা বাচ্চা কুকুরে কামড়াইয়াছিল। বন্ধুর বিশ্বাস, বাচ্চা কুকুরের কামড়েও বিষ হইতে পারে; তাহারই প্রতিকারার্থে বন্ধুর সঙ্গে গোঁদোলপাড়ায় গিয়া আমি উক্ত সভার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। ছিরু-নির্ব্বাচিত পুস্তকের তালিকাটি একবার দেখিবার সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছিল। নকল করিয়া আনিতে চাহিলাম,—ছিরু বলিল, সে ওই তালিকাটি যথাসময়ে প্রকাশিত করিবে সুতরাং টুকিয়া লইবার অনুমতি সে আমায় দিতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে একশত খারাপ বই-এর ছিরু-নির্ব্বাচিত তালিকা মাসিকপত্রিকার পাঠকবৃন্দ হয়ত অচিরে দেখিতে পাইবেন। তাহার মধ্যে যে সকল পুস্তকের নাম আমার এখনও স্মরণ আছে, অতি-কৌতূহলী সাহিত্যসেবিদের নিকট তাহাই নিবেদন করিতেছি।

অক্ষয়কুমার দত্ত—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সীতার বনবাস, বিধবা বিবাহ বিচার

উমেশ বটব্যাল—বেদপ্রবেশিকা

কৃত্তিবাস—রামায়ণ

কাশীদাস—মহাভারত

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত

কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম পেঁচার নক্সা

গোবিন্দ দাস—বৈজয়ন্তী, কস্তুরী

চন্দ্রনাথ বসু—বিধাতা

জগদীশচন্দ্র বসু—অব্যক্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—অশ্রুমতী

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারিচাঁদ মিত্র)—আলালের ঘরের দুলাল

তারাশঙ্কর—কাদম্বরী

তারক গঙ্গোপাধ্যায়—স্বর্ণলতা

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়—কঙ্কাবতী

দাশরথি—পাঁচালী সংগ্রহ

নবীনচন্দ্র সেন—কুরুক্ষেত্র

নিধুবাবু—পদাবলী

প্রভাত মুখোপাধ্যায়—ষোড়শী, গল্পবীথি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণচরিত্র, বিবিধ প্রবন্ধ, বিষবৃক্ষ, ধর্ম্মতত্ত্ব, রজনী, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, দেবী চৌধুরাণী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—গ্রন্থাবলী

ভারতচন্দ্র—অন্নদামঙ্গল

মুকুন্দরাম—কবিকঙ্কণ চণ্ডী

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—রাজস্থান

যোগেন্দ্র বসু—শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী

যোগীন্দ্র বসু—মাইকেলের জীবনচরিত

রামপ্রসাদ—পদাবলী

রজনীকান্ত—বাণী, কল্যাণী

রামগতি ন্যায়রত্ন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব

রামনারায়ণ (নাটুকে)—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—খেয়া, সোনার তরী, মানসী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, বলাকা, ক্ষণিকা, চিত্রাঙ্গদা

রজনী গুপ্ত—সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বৃত্রসংহার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দত্তা, দেবদাস, চন্দ্রনাথ, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল, দেনা-পাওনা

শিশির ঘোষ—অমিয় নিমাই চরিত

সতীশচন্দ্র রায় সংগৃহীত—পদকল্পতরু

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পালামৌ

সুরেন্দ্র মজুমদার—মহিলা

বলা বাহুল্য, গোঁদোলপাড়া আদর্শ ছিরু-পাঠাগারে উক্ত পুস্তকাবলীর কোনখানি থাকিবে না, ইহাই স্থির হইয়াছে। ফর্দ্দের মধ্যে বাকি যে সব পুস্তকের নাম আমার উপস্থিত মনে পড়িতেছে না, তাহার লেখকেরা যেন এখনই উৎফুল্ল না হন; কারণ ছিরুর নির্ব্বাচন হইতে তাঁহাদের পুস্তক বাদ পড়িয়াছে কিনা, সে কথা আমি হলপ্ করিয়া বলিতে পারি না।



'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে…'

শ্রীসুকোমল বসু

এখন বোধ হয় মেঘ নেমেছে রামগিরিতে ঝাপ্‌সা হ'য়ে
প্রথম ধারাপাতের সাথে মাটির বুকের গন্ধ ব'য়ে !
তাই বিরহী যক্ষ নিয়ে কুর্চ্চিফুলের অর্ঘ্য-ডালা
তুষলো মেঘে নুইয়ে মাথা—শুনিয়ে দিল বুকের জ্বালা !
দৌত্য করে মেঘ বুঝি তাই হাল্কা ডানা ভাসিয়ে দিয়ে
ঐ অলকায়, প্রিয়ার দেশে চল্‌লো তাহার খবর নিয়ে।
ময়ূর-নাচা গাছের পরে, হাঁস-ডাকা ঐ দীঘির জলে
ঝরিয়ে খানিক স্নিগ্ধ ধারা মেঘ বুঝি ফের ভেসেই চলে।
ইন্দ্রনীলে ঝল্‌মলানো শঙ্খ এবং পদ্ম-আঁকা
অট্টালিকায় যক্ষপ্রিয়া ভাবছে গালে হাতটি রাখা।
ঝাপটে ডানা ভিজিয়ে দিল কয়েক ফোঁটা অশ্রুদানে
যক্ষপ্রিয়র খবরটুকু পৌছে দিতে প্রিয়ার কানে।

তেমনি ক'রে মেঘ জমেছে আমাদেরও ধরার নভে
আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে ঝরতে সুরু বৃষ্টি যবে।
স্যাঁৎস্যাঁতে এই ছোট্ট ঘরে বন্দী আছি কষ্টে অতি,
যক্ষ থেকেও শাস্তি বেশী—বর্ণনাহীন এ দুর্গতি !
রামগিরি সে কোথায় লাগে, দেখতো যদি কালিদাসে
দণ্ড ভোগের বিধান দিত যক্ষরাজ এই মোর আবাসে।
কপর্দ্দকের ফর্দ্দ থেকে বাদ পড়েছি অনেক কালই
শীতল কিছুর স্পর্শ বিনা শুকিয়ে গেছে কণ্ঠনালি।

চাক্‌রী গেছে পাক্কা ছ'মাস—টিউশানিও একটি মোটে,
ভরসা শুধু 'পাইস্ হোটেল' তাও যদি হায় পয়সা জোটে।
'ড্রাইং ক্লিনিং' স্বপ্ন আমার—কাপড় কাচি সোডার জলে,
তাও যদি ভাই রৌদ্র ওঠে—বার হওয়া দায় তা' না হ'লে।
চৌকী-বিহীন বিছ্‌না তলে ছার-পোকা আর তেলে-পোকা
খেল্‌ছে সুখে লুকোচুরী বার হওয়া আর অমনি ঢোকা।
পুঁট্‌লি-করা চিনির ঠোঙ্গায় পিঁপড়েরা সব মিছিল করে,
ড্যাম্প্‌ লাগানো চা'য়ের পাতায় সবুজ রংয়ের ছ্যাত্‌লা ধ'রে
সিগারেটের মশলা ভিজে ঠিক যেন হয় চ্যাবন্‌প্রাস্
কাগজ খোলস্ ছেড়ে দিয়ে ল্যাতল্যাতানো ঠিক যেন ঘাস।

কুর্চ্চিফুল আর কোথায় পাবো, ফুলতোলা এই রুমাল নেড়ে
মেঘ ! তোমারে অর্ঘ্যদানি' মোর নিবেদন ফেলছি সেরে।
ঘুরতে পথে পড়বে যখন আমার প্রিয়ার অট্টালিকা
দেখ্‌বে দোরে কাঠফলকে প্রিয়ার বাপের নামটি লিখা।
দেখবে সেথায় নভেল হাতে শোফায় শুয়ে আমার প্রিয়া
প'ড়ে শোনায় গল্প প্রেমের সঙ্গীসাথী অনেক নিয়া !
ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়ায় কাঁপছে বুঝি ধীরে ধীরে
কাণের দুটি ঝুমকো অলি লাল কপোলে ঘিরে ঘিরে।
গরম চায়ে উড়ছে ধুঁয়া—হাতের কাছে কাপে কাপে
সিদ্ধ ডিমের বুকটি ভাঙ্গা চামচি এবং কাঁটার চাপে।

বোলো তারে বেঁচেই আছি অস্থি এবং পঞ্জরেতে
সাধ যেন তার না হয় এখন আমায় আবার ফিরে পেতে।
এমনি ভাবে থাকলে ক'দিন নিজেই আমি পারবো যেতে
পঞ্চভূতের বাঁধন কেটে সূক্ষ্ম আমার সেই দেহেতে।
হায় কালিদাস ! থাকতে যদি আজকে তুমি আমার কালে
লিখতে যদি আমার কথা, সুনাম আরো জম্‌তো ভালে।
যক্ষ তবু ফিরলো শেষে আপন ঘরে প্রিয়ার বুকে,
আমি হেথায় বন্দী হ'য়ে তিলে তিলেই মরবো ধুঁকে !!

লণ্ডন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

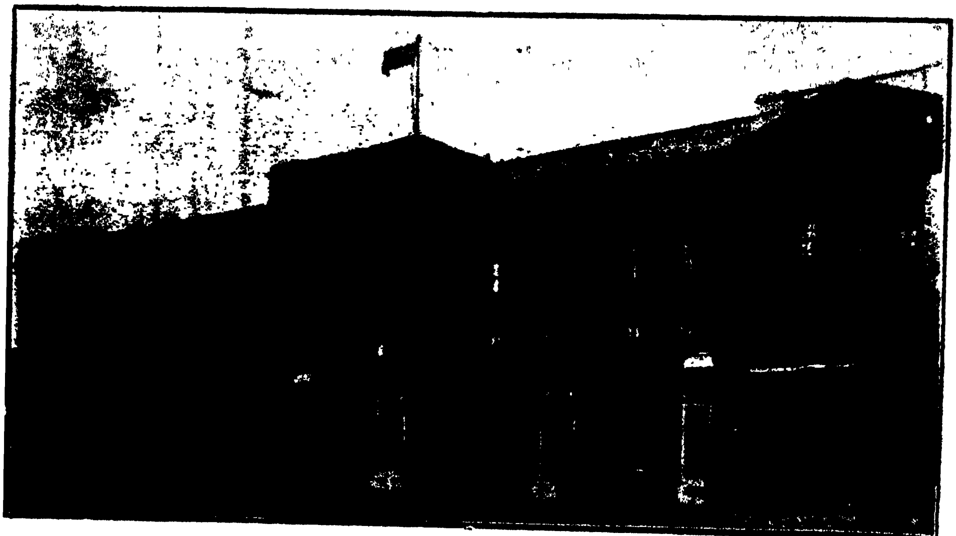
বের্লিন থেকে লণ্ডন যাবার জন্যে রাত্রের ট্রেণে চেপে বোসলাম। সঙ্গী হোলেন এক বাঙ্গালী ডাক্তার বন্ধু। তিনি বের্লিনে চোখের অসুখে বিশেষজ্ঞের উপাধি লাভ কোরে লণ্ডন চোলেছিলেন উপাধির সংখ্যা বৃদ্ধির কামনায়। আমরা দুজনে এক সঙ্গে ষ্টেশনে গেলাম। অন্য দিক থেকে এলেন একটী তরুণী। এঁকে আমি চিনতাম—বন্ধু পূর্ব্বেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ীতে। বান্ধবী বিদায় দিতে এসেছিলেন—দীর্ঘ চার বৎসর পর সাথীকে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে দিতে হবে! বান্ধবীর দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা নীরবে গড়াতে লাগলো। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে জানলার ওপর ঝুঁকে অনুভব কোরলাম—বিশ্বের বেদনা যেন ওর ঐ শুভ্র হাতখানায় পুঞ্জীভূত হোয়ে তাকে ভারী কোরে তুলেছিল।

বন্ধু বোল্লেন "ওরা সত্যিই ভালবাসে।"

বোল্লাম "আপনি কি এতটুকুও ভালোবাসেন নি ওকে?"

হেসে বন্ধু উত্তর দিলেন "পাগল! ভাল লাগতো,—বন্ধুত্ব কোরেছিলাম। বেশ মিষ্টি স্বভাব, আমাকে ভালও বাসতো খুব। তাই রোয়ে গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। তাই বোলে ভাল-বেসে কাঁদতে হবে?"

মনে হোল, হায় নারী, কাঁদবে কি তুমি একলাই! এরা



বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ—লণ্ডন। ১৭০৩ সালে প্রথম ডিউক অব বাকিংহাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, পরে ১৭৬১ সালে তৃতীয় জর্জ্জ উহা কিনিয়া লন; পরে ১৮৮৫ ও ১৯১৩ সালে উহা নূতন ভাবে সংস্কৃত হয়। ১৮৪১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড এইখানে ভূমিষ্ঠ হন

পোড়ে জার্ম্মাণ ভাবার উভয়ে কত কি বোল্লেন। গার্ড সাহেব বাঁশী দিতেই বন্ধু করমর্দ্দন কোল্লে'ন। বান্ধবী দিলেন এক খানা বই স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। ট্রেণ ধীরে ধীরে নোড়ে উঠল। তার কঠিন লৌহযন্ত্র সব কোমলতা, ভালবাসা, মমতা নির্ম্মম ভাবে দ'লে ধীরে ধীরে এগিয়ে চোল্লো। বান্ধবী এক হাতে চোখ মোছেন, অন্য হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। বেশ আসে ভালবাসার ভান করে; আবার প্রয়োজন মত উচ্ছিষ্ট পাত্রের মত ফেলে দিয়ে চোলে যায়। তার পর আর হয় ত খোঁজও নেয় না।

জিজ্ঞাসা কোরলাম "আচ্ছা, আপনি কতগুলো মেয়েকে এমনি কোরে ভালবেসেছেন?"

—"তা অনেক। বের্লিনে কাটালাম প্রায় বছর আটেক।

এর মধ্যে লণ্ডনে ছিলাম মাঝে মাস কয়েক। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে দেখি, আমার আগের মেয়েটী আর একটীকে আশ্রয় কোরেছে। তাই একে জুটিয়েছিলাম—"

যাক্! তা হোলে সহানুভূতি বোধ কোরবার প্রয়োজন নেই। বোল্লাম "ওদের ওই বুঝি পেশা? প্রেম করাটাই ওদের অভ্যাস, কি বলেন?"

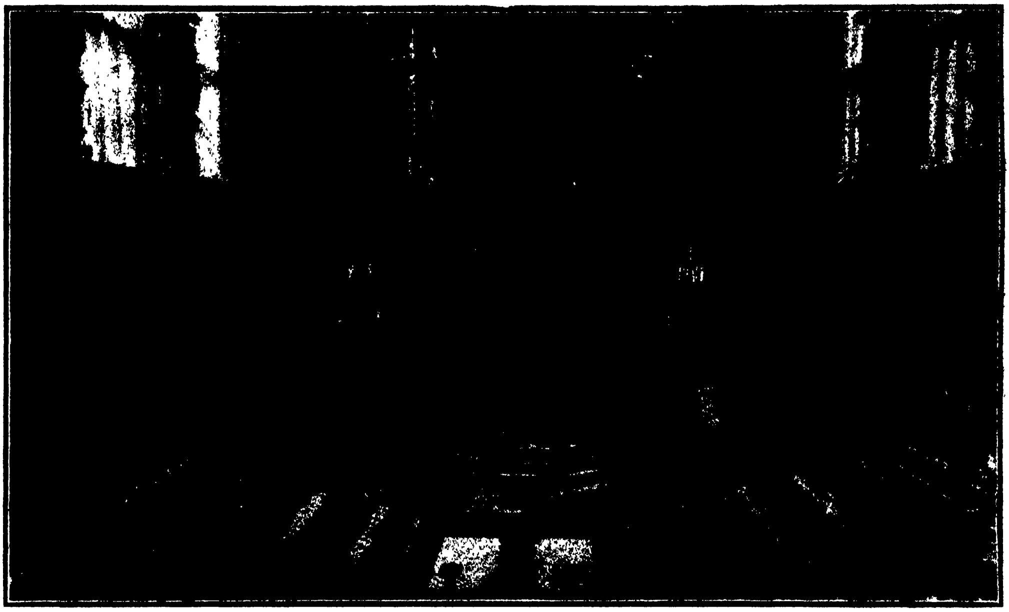
বন্ধু বাধা দিলেন "তা বোলে ওরা ছোট ঘরের মেয়ে নয়। এর বাপ বেশ অবস্থাপন্ন। ও বি-এ পোড়ছে। আমরা যেমন একটা মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটাতে চাই না, ওরাও তেমনি বিয়ে কোরে একজনের কাছে বাঁধা পোড়তে চায় না।"

কেন? আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভোগের মাত্রাটা বাড়াবার উপদেশ না দিয়ে—নিজেদের মাত্রাটা কমান না।"

গম্ভীর হেসে ডাক্তার উত্তর দিলেন "মশায়, ওসব আইডিয়েলিজ্‌মের যুগ চোলে গেছে। কেন মানুষ ভোগ কোরবে না? কিসের লোভে সে এই রক্তমাংসের দেহের সুখ ছাড়বে? আপনার স্বর্গের?—সেটা আছে কি না সেইটাই ত একটা প্রশ্ন। আর পাবে কি না সেটা আরো জটিলতর সমস্যা। কাজেই ভোগ না কোরে নিজেকে মানুষ বঞ্চিত কোরবে কেন?"

—"সমাজের কল্যাণের জন্যে—নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে—অনাগত পুত্রকন্যাদের মঙ্গলের জন্যে—"

—"প্রত্যেকটী মানুষ যদি বিয়ে না কোরে পরস্পর



হাউস অব লর্ডস্‌—পার্লামেণ্ট। এর দেওয়ালগুলি সোনালীরঙে জমকালো ভাবে চিত্রিত। সামনে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন। তার সামনের গদি-আঁটা আসনটী লর্ড চ্যান্সলারের। রাজদূত ও অন্যান্য সভ্যেরা গ্যালারীগুলিতে বসেন

বোল্লাম "এই ত প্রগতির চিহ্ন?"

সিগারেট ধরিয়ে বন্ধু বোল্লেন "ঠাট্টা কোরছেন? কিন্তু দোষটা কি বলুন ত! আপনারা যথেচ্ছ ভোগ কোরবেন, আর মেয়েদিকে বোলবেন তোমরা ঠাকুর হোয়ে ঘরে বোসে থাকো?"

উত্তর দিলাম "ভোগটা আমরাই বা যথেচ্ছ কোরব

মিলিত হয়, তাতে সমাজের অকল্যাণ কোথায়? আর স্বাস্থ্য—যে রাখতে জানে না সে বিয়ে কোরলেও রাখতে পারবে না, না কোরলেও পারবে না। পুত্র-কন্যার কথাটা বাদ দেন—তাদের প্রয়োজনই নেই—"

বিস্মিত হোয়ে বোল্লাম "অর্থাৎ সৃষ্টি বন্ধ কোরে জগৎ অচল কোরতে চান?"

হেসে বন্ধু জবাব দিলেন "সচল কোরবার জন্যে ত আপনারা রোয়েছেন—কাজেই আমাদের জন্যে জগতটা অচল হবে না। আর হোলেই বা ক্ষতি কি? জগৎটা চালাবার ভার আমার ওপর ত নেই।"

—"অর্থাৎ আপনি চান বিয়ে না কোরে—পুত্রকন্যা সংসারে না এনে পুরোদস্তুর ভোগ কোরতে?"

—"হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই তাতে—এবং কোরেছিও তাই"—

দ্বিধাজড়িত ভাবে বোল্লাম "আচ্ছা ধরুন, এখন না হয় রক্তের জোর আছে, বেশ চোলছে; যখন অসুখ কোরবে বা বুড়ো হবেন তখন কে আপনার সেবা কোরবে? সে সময় স্ত্রীর মত সেবা কার কাছে পাবেন?"

—"পয়সা রোজগার কোরব মশায়—স্ত্রীর পেছনেই খরচটা কি কম হয়?"

যুক্তির ধারাটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম······।

—"কিন্তু আপনার বাড়ীর ওপর ত একটা কর্ত্তব্য আছে—পয়সা যা রোজগার কোরবেন তাতে তাদেরও ত একটা দাবী আছে"—

—"কিসের দাবী? আমায় খরচ দিয়ে পড়িয়েচেন এই ত? তাঁদের কর্ত্তব্য তাঁরা কোরেচেন—আমায় যখন জন্ম দিয়েছেন তখন শিক্ষা দিতে বাধ্য। আর মশাই, শিক্ষাই বা কটা বাপে দেয়।"

—"যাই হোক, তাঁদের কর্ত্তব্য যখন তাঁরা কোরেচেন, তখন আপনার কর্ত্তব্যও ত আপনাকে কোরতে হবে"—



পার্লামেণ্ট ও ভিক্টোরিয়া টাওয়ার (পার্লামেণ্টে সম্রাটের প্রবেশ-তোরণ) দক্ষিণে প্রসিদ্ধ ক্লক টাওয়ার

এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার জবাব দিলেন "রোগ বা বার্দ্ধক্য কি কেবল পুরুষদেরই একচেটে সম্পত্তি মশাই? বিয়ে কোরে ঘাড়ে একটা বিষম দায়িত্ব চাপাব,—বুড়ো হোলে কি অসুখ কোরলে সেবা পাবার আশায়?—আচ্ছা, যদি রোগটা তাকেই ধরে, তখন ত তার হাঙ্গামাও পোয়াতে হবে আমাকেই! তার চেয়ে সেবা চাইও না, কোরবোও না। অসুখ হয় নার্স রাখব। তারা ছিঁচকাঁদুনে বউগুলোর চেয়ে ঢের ভাল সেবা কোরবে।"

—"নার্স ত বিনি পয়সায় পাবেন না।"

—"হ্যাঁ—আমার কর্ত্তব্য আমার ছেলের ওপর। আমি অমন আগাছার মত ছেলের জন্ম দেব না। নিজে যখন যথেষ্ট রোজগার কোরব, একটী কি দুটী ছেলের জন্ম দেব এবং তাদিকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেব—সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়ে আনব—মানুষ তৈরী কোরব। তারা আমার বিবাহিত স্ত্রীর ছেলেও হোতে পারে, অবিবাহিতেরও হোতে পারে!"

বুঝলাম ইয়োরোপের আধুনিকতম মতবাদ বন্ধুবরের প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে মিশে গিয়ে শিরা-উপশিরায় খেলছে।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হোয়ে আসতে লাগল। আমরা বোসে বোসেই নিদ্রার কোলে মাথা তুলে দিলাম; কারণ, এবারে ঘুমোবার ঘরের (sleeping berth) ব্যবস্থা করি নি।

পরদিন সকালে জার্ম্মাণ-সীমান্ত ছেড়ে ট্রেণ হল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে চোলতে লাগল। হল্যাণ্ড-সীমান্তে পাশপোর্ট দেখে গেল এবং শুল্ক দেবার মত কোনো জিনিষ আছে কি না জিজ্ঞাসা কোরলে। হল্যাণ্ডের মাঠে সাদাকালোর ছাপ দেওয়া লম্বাটে গোছের ও ককুদবিহীন অনেক বৃষ, আর বিস্তৃত শস্যক্ষেতের বুকের ওপর চার হাত মেলে অনেক উইণ্ড-মিলকে দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। হল্যাণ্ডের দুধের জিনিষ ভাল—তাই অনেকগুলো চকোলেট কিনে নিলাম। হল্যাণ্ডের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গেই "পোলট্রী ইয়ার্ড" দেখলাম। বাড়ীগুলি জার্ম্মাণীর বাড়ী থেকে কিছু অন্য ধরণের। মাঠে জমিগুলো ছোটো ছোটো কোরে ভাগ করা; তবে বেশ সমতল। ঘোড়া দ্বারাই চাষ চোলছে। গরুগুলি দিব্যি নধরকান্তি।

বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় ট্রেণ থেকে নামলাম—ষ্টীমারে চোড়ব বোলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাসিং (Flushing) থেকে ষ্টীমার ছাড়ল। ফ্লাসিংএ হল্যাণ্ড সরকারের কাছে হল্যাণ্ড ছাড়বার ছাড়-পত্র নিতে হোলো।

হল্যাণ্ড অন্যান্য দেশের তুলনায় ধনী—কাজেই জিনিষপত্রও বেশ আক্রা। কুলী ভাড়া নিলে প্রায় পাঁচ টাকা; জাহাজে মধ্যাহ্নভোজনে একটী মুরগীর দাম নিলে তিন টাকা।

ইংলিশ চ্যানেল বেশ শান্ত ছিল। তীর থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত হাঁসের মত এক রকম সমুদ্রপাখী আমাদের পাশে ঝাঁকে ঝাঁকে চোলেছিল, বোধ হয় জাহাজ থেকে পরিত্যক্ত আহারের আশায়। কুয়াশার জন্য খুব বেশী দূর নজর চোলছিল না। শীতকালে প্রায়ই ঘন কুয়াশায় সব



বাকিংহাম প্রাসাদে লিখন-রত সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ। জন্ম—৩রা জুন ১৮৬৫। বিবাহিত—৬ই জুলাই ১৮৯৩। অভিষিক্ত—৬ই মে ১৯১০।



আমাদের কলেজে প্রিন্স অব ওয়েলস্

ঢেকে রেখে দেয়। সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত উঁকি মারতে সাহস পান না।

সন্ধ্যার পর ইংলণ্ডের বন্দরে গিয়ে জাহাজ নোঙ্গ

কোরলে। মনে বড় আনন্দ হোল—এই ইংলণ্ড—শৈশবের স্বপ্ন, কৈশোরের আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হোল—ইংলণ্ডের মাটীতে পা দিলাম। জিনিষপত্র যথারীতি খানাতল্লাসী হোল—ছাড়পত্র দেখাতে হোল, তার পর গিয়ে উঠলাম ট্রেণে।

ট্রেণ ছাড়ল—অন্ধকারের বুক চিরে···মাঠ পথ সহর গ্রাম ডিঙ্গিয়ে বাষ্পযান ছুটে চোল্লো ক্রুদ্ধ অজগরের মত সর্পিল গতিতে—রুদ্ধ গর্জ্জনে—মাঝে মাঝে উচ্চ চীৎকারে রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ত্রাস্ত কোরে।

ইংলণ্ডে ট্রেণে মাত্র দুটী শ্রেণী—প্রথম ও তৃতীয়। তৃতীয়র আসনেও কুশন-গদি-বনাতে মোড়া। তাপদায়ক



প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজ হইতে যাইতেছেন। চিহ্নিত ব্যক্তি যুবরাজ

যন্ত্র প্রভৃতিও আছে এবং যাত্রীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যাত্রীর বেশী যাত্রী কোনো কামরাতে ঢোড়তে আমি দেখি নি। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীতে বিশেষ কোনো তফাৎ চোখে ঠেকে নি। কেবল প্রথম শ্রেণীর গদিগুলির মাথায় ঝালর দেওয়া থাকে।

ট্রেণ থামতেই যাত্রীদলে ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মটা ভর্ত্তি হোয়ে গেল। আমরা ট্যাক্সীতে মালপত্র সমেত উঠে পোড়লাম। বন্ধুবর পূর্ব্বে লণ্ডনে এসেছিলেন এবং তাঁর পরিচিতও আছে বোলেছিলেন; কাজেই আমি তাঁর সঙ্গেই এক জায়গায় আপাততঃ উঠব ঠিক কোরেছিলাম। তাঁর নির্দ্দেশ মত ট্যাক্সী চোল্লো।

রাতের লণ্ডন আমায় একেবারে নিরাশ কোরে দিলে। সঙ্কীর্ণ স্বল্পালোকিত কুয়াসাচ্ছন্ন রাস্তা—প্যারী কি বের্লিনের প্রশস্ত বুলেভার্দের (প্রশস্ত রাস্তা) সঙ্গে তুলনাই হয় না। দোকান-পশারীগুলো যেন নিষ্জীবভাবে জ্বলজ্বল কোরে তাকিয়ে আছে। প্যারী কি বের্লিনের পণ্যশালার জৌলুস তাদের মধ্যে নেই। সর্ব্বোপরি এক দুর্ভেদ্য কুয়াশায় সারা সহরটাকে অবগুণ্ঠনে ঢেকে ম্লান কোরে রেখেছে। রাস্তায় লোকজনের কোলাহল নাই। যানবাহন স্বল্প। কেবল দোতলা ট্রাম ও বাসগুলি মাঝে মাঝে মন্থরগতিতে চোলেছে। এই কি বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সহর?

বন্ধু যে বাড়ীতে এসে কড়া নাড়লেন—দরজা খুল্লে জানা গেল, বন্ধুর পরিচিত লোক সে বাড়ী থেকে অন্য কোথায় চোলে গেছেন; এবং আপাততঃ সে বাড়ীতে অন্য ঘর খালি নাই। অগত্যা অগতির গতি ১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীটে Y. M. C. A তে ঢুঁ মারলাম। জায়গা পাওয়া গেল একটা প্রকাণ্ড হাসপাতাল গোছ হলে। ৭।৮টা লোহার খাটে ঘরটা বোঝাই। সাধারণতঃ যারা দু একদিনের জন্যে এসে থাকেন ও পরে অন্য কোথাও ঘর ঠিক কোরে নেন, তাঁদিকে এই ঘরে জায়গা দেওয়া হয়। ভাড়া খুব বেশী নয়; পাকাপাকি থাকবারও ব্যবস্থা আছে।

জিনিষপত্র রেখে দুজনে বেরুলাম আহারের সন্ধানে। রাত্রি বেশী হওয়ায় Y. M. C. A র ভোজনশালার দরজা বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল। বন্ধু নিয়ে গেলেন "অক্সফোর্ড কর্ণার হাউসে"। এটার নীচে তলাটা সারা রাতই খোলা থাকে।

রাস্তায় আসতে আসতে বন্ধু বোল্লেন "ওই দেখুন, সখীর দল সব দাঁড়িয়ে।"

বোল্লাম "সে কি। এখানে শুনেছি ও-সব বে-আইনী—"

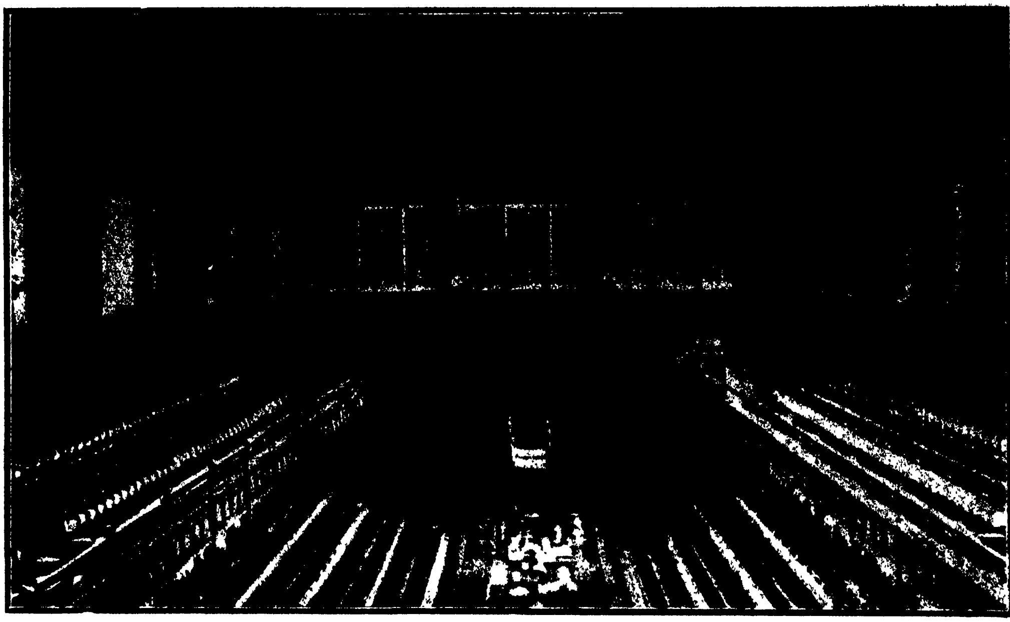
হেসে তিনি জবাব দিলেন "হ্যাঁ—সেটা শুনেছেন; এখন চোখে দেখুন।"

বোল্লাম "কিন্তু কি কোরে বুঝলেন?"

—"মশাই, ওদের গায়ে ছাপ মারা থাকে। দেশে ভাল মন্দয় তফাৎ কোরতে পারতেন ত? তা হোলে এখানে দিন কতক থাকুন; তখন আর দেখিয়ে দিতে হবে না—আপনিই বুঝবেন।"

কথাটা খুব দামী।

'অক্সফোর্ড কর্ণার হাউস' বা 'লায়ন্‌স রেষ্টুরাণ্ট' অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট আর টটেনহামকোর্ট রোডের চৌমাথাতেই প্রকাণ্ড হল। নিয়মিত ব্যাণ্ডের যন্ত্রসঙ্গীত রসনার সঙ্গে মনকেও তৃপ্ত করে। অনেকগুলো টেবিল—ওপর ও নীচে তলায় সাজান। বোসবামাত্রই পরিচারিকা এসে জিজ্ঞাসা



হাউস অব কমন্স কক্ষ—পার্লিয়ামেণ্ট। ৭৫ ফিট লম্বা ৪৫ ফিট চওড়া এবং ৪১ ফিট উঁচু

কোরে গেল কি চাই। খাবারের ফরমাস কোরে চার দিকটায় চোখ বুলিয়ে দেখছি—অসংখ্য নরনারী পাশাপাশি বোসে বিভিন্ন আহারে উদর পূরণে ব্যস্ত। সহসা বন্ধুবরের চোখ এক জায়গায় আটকে গেল। পরক্ষণেই হাসির বিনিময় হোল। বন্ধু উঠলেন। জিজ্ঞাসা কোরলাম "ব্যাপার কি?" বন্ধু বোল্লেন "আসছি, বসুন।" বন্ধুর গতিপথ অনুসরণ কোরে দৃষ্টি এসে থামল একটী টেবিলে দুটী তরুণীর কাছে। বন্ধু গিয়ে পাশের খালি চেয়ারটা দখল কোরে বোসলেন। কত কথা কত গল্প হোল। এদিকে আমাদের চা ও অন্যান্য খাবার এসে হতাশ হোয়ে জুড়োতে লাগল।

বন্ধু ফিরলেন। জিজ্ঞাসা কোরলাম "চোখে চোখেই এত আলাপ না কি?"

বন্ধু উত্তর দিলেন "অত সোজা নয়। আলাপ ছিল জার্ম্মাণীতে। এখানে ও বেড়াতে এসেছে ওর ঐ বান্ধবীর কাছে। আজ আমার নিমন্ত্রণ হোল। আপনি একলা ফিরতে পারবেন ত?"

না পারলেই বা উপায় কি? আর বন্ধু যে তাঁর অমন বান্ধবী ছেড়ে বন্ধুর টানে বাড়ী আসবেন সে আশাও ছিল না। কাজেই বো[illegible]হবে বৈ কি। আপনাকে না পেলে ত একলাই পারতে হোতো।"

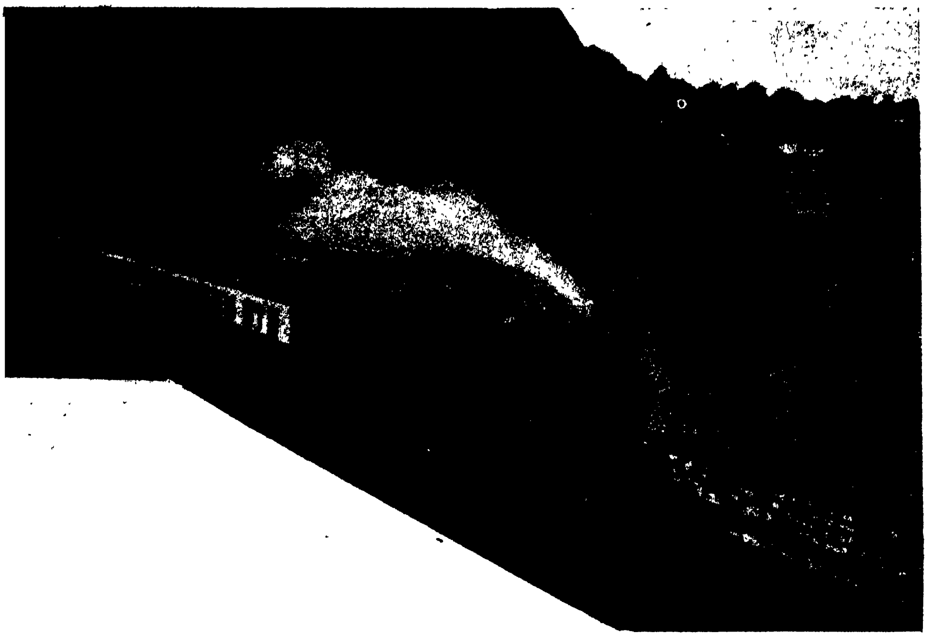
পরিচারিকা এসে জিজ্ঞাসা কোরলে "finished? Have you?"

তার বক্‌শিসের পয়সা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে দরজায় খাবারের দাম চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম। বন্ধু বান্ধবীদের দলে ভিড়লেন। একলা চোলেছি। রাস্তায় যান-বাহন খুবই অল্প। দোকানগুলির দরজা বন্ধ—দ্রষ্টব্যাধার

(show case)গুলিতে কেবল আলো জলছে। দোকান-গুলির অধিকাংশেরই সামনেটা সমস্ত কাঁচের—তার ভেতরের প্রায় সব জিনিষই দেখা যায়। আসবাবপত্রের দোকানে একখানা গোটা ঘরকেই আসবাব দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে এবং সেটা সমস্তটাই বাইরে থেকে দেখতে পাবার ব্যবস্থা কোরেছে। ফলের দোকান, খবরের কাগজের দোকান প্রভৃতি যারা ফুটপাথের ওপরেও দোকানের খানিকটা ছড়িয়ে রাখে তারা দোকান তুলেছে—কেউ বা তুলছে।

টটেনহামকোর্ট রোড থেকে মোড় ফিরেই দেখি, একটী বাড়ীর বন্ধ দরজার আবছাওয়ায় একটী শীর্ণা নারী লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে—মুখে তার প্রাণহীন একটা শুকনো হাসি যেন ভেংচাচ্ছে। তার সে মূর্ত্তি দেখে আর তাকাতে প্রবৃত্তি হোলো না। বন্ধুর কথাটা মনে পোড়ল "চোখে দেখুন।"

আমার কলেজ-জীবনের আগে লণ্ডনে বাস দিন পনেরর জন্যে। তার পরে কলেজ থেকে ফিরে আরো কিছুদিন খাস লণ্ডনে বাস করি, উৎসব-জীবন দেখবার জন্যে। কাজেই প্রথম দিকের কথায় আমি লণ্ডনের উৎসব জীবন বাদ দোব।

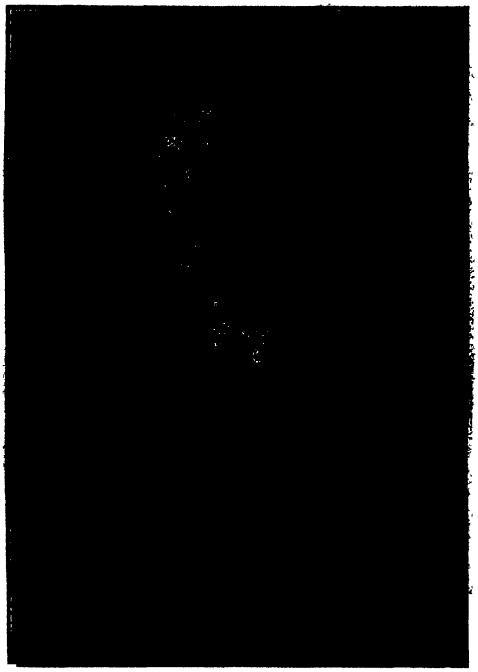


দক্ষিণ সমুদ্রকূলে ট্রেণ, ডেভোনসায়ার—ইংলণ্ড

কলেজের খোঁজে হাই কমিশনারের আফিসে যেতাম। আসন খালি আছে কি না, না জেনেই তাঁরা আমায় কয়েক জায়গায় পাঠিয়ে অনর্থক কিছু সময় ও অর্থ নষ্ট করালেন। অন্যতম বন্ধু মিঃ পি, ঘোষও আমার সঙ্গে কয়েকবার এই আফিসে গেলেন। তাঁকে তাঁরা টাইপ ফাউণ্ড্রী শেখাবার কোনো সুযোগ কোরে দিতে পারেন কি না জানবার জন্যে। প্রথম কয় দিন "খোঁজ কোরছি, পরে খবর নেবেন" ইত্যাদি কোরে কাটিয়ে শেষে প্রায় জবাবই দিলেন যে ও-সব গোত্র-ছাড়া কাজে আমাদের সাহায্য পাওয়া মুস্কিল। যদি ব্যারিষ্টারী, ইঞ্জিনিয়ারীং বা ঐ গোছের কিছু যা আর পাঁচজনে শেখে তা শেখো, তবে সাহায্য কোরতে পারি; অর্থাৎ আমাদের যা জানা আছে তাই বোলব—যা জানি না তা কষ্ট কোরে জেনে বোলবার অবকাশ আমাদের নেই। ভারতীয় ছাত্রেরা এখানে গিয়ে চাকরীপ্রার্থী উমেদারের মত বোসে থাকে—অনাবশ্যক ভাবে এদিগকে হায়রাণ করা হয়। বোসবার ঘরে যে সব খাতাপত্র পোড়ে থাকে সেগুলোর বুকে এই সব ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ প্রকাশ পেন্সিলে কালীতে অনেক আছে; যথা "High Commissioner !

who think you are ?" "Don't keep us waiting for nothing; we are not beggars at your door." ইত্যাদি। যাঁরা সরকারী বৃত্তি পান তাঁদিগকেও এখানে অনাবশ্যক ভাবে হায়রাণ হোতে দেখেছি। এত টাকা খরচ কোরে যে প্রতিষ্ঠান এ দেশের লোকেদের সুবিধার জন্যে রাখা হোয়েছে, তাদের এ আচরণ অমার্জ্জনীয়। অবশ্য এখানকার ব্যবসা বিভাগ (Trade Commissioner) থেকে আমি যথাসম্ভব সত্বর উত্তরাদি বা সাহায্য পেয়েছিলাম। এর বাড়ী—'ইণ্ডিয়া হাউসটা' প্রকাণ্ড। নীচের তলায় ভারতের নানা শিল্প সাজান আছে। গম্বুজের নীচে ভারতীয় ধারায় নানা চিত্র আঁকা আছে। সব ওপর তলায় একটা ভোজনশালা—এটাও ভারতীয়ের মতই কুঁড়ে ও ব্যবসাবুদ্ধি-বর্জ্জিত।

এই সময়ে ১১২ নম্বর বাড়ীতেই আমার অনেক নবাগত ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। তাদের অনেককে দেখে দুঃখ ও করুণা হোয়েছিল। প্রায় সকলেই বিলেত যান আই-সি-এসের মোহে। তাঁরা ভাবেন, কোনো রকমে টেনে হেঁচ্‌ড়ে ঐ ডিগ্রীটা পেছনে জুড়তে পারলেই—ব্যস! পাকা চাকরী—খায় কে? তার ওপর পয়সা ও প্রভুত্ব প্রচুর; সম্মানও বড় কম নয়—সেলামের ঠেলায় মাথা ঠিক রাখা দায়। কিন্তু কয়েক মাস বা বছর নষ্ট করার পর দেখেন, ব্যাপারটা ঠিক অত সোজা নয়। তখন বাড়ীতে চিঠি লেখেন "ওটা বেশ সুবিধে নয়—ব্যারিষ্টারী পড়ছি"। কিন্তু এইখানেই শেষ হয় না—অনেককে পর পর দুতিনটে বিষয় নিতে দেখেছি। এই ভাবে নিজের নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রলোভনের আশায় অনেকে অনর্থক বহু অর্থ ও সময় নষ্ট করেন। তার ওপর একদল এদেশী লোক বিদেশে আছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্যের লোভ দেখিয়ে এদেশের নবাগত ছেলেদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে চায়—ভাঙ্গেও। তারা হয় ত অনেক বছর ওখানে রোয়ে গিয়েছে। বাড়ী থেকে খরচ বন্ধ কোরে দিয়েছে, বা যা দেয় তাতে স্ফূর্ত্তির খরচ কুলোয় না। তাই তারা করে পরের সর্ব্বনাশ। অনেকে আবার যান টাট্‌কা বিয়ে কোরে। এমনি দুজনের সঙ্গে আমার আলাপ হোয়েছিল। দুজনেই বাঙ্গালী—হিন্দু ও মুসলমান। স্ত্রীর স্মৃতি ব্যাচারীদিগকে পাগল কোরে তুলেছিল। চিঠির আশায় দিন গুণতেন, আর পড়ার বদলে সারা সপ্তাহটা (যতদিন না আর একখানা বিমানডাকে আসে) সেইটে পোড়েই কাটাতেন। আবার কেউ বিবাহিত জীবনের কথা ধুয়ে মুছে অবিবাহিত সেজে বান্ধবী জোটাতেন। যাঁরা বিয়ে না কোরে গ্যাছেন তাঁরাও বেশ আছেন। বাড়ীতে ত কোনো বন্ধন নেই—নিজের চরিত্রের জন্য ন্যায়তঃ বা ধর্ম্মতঃ কারু কাছে বাধ্যও নই; অতএব। আসল কথা হোচ্ছে এই যে, নিজের চরিত্রবল ও মনের সংযম না থাকলে কোনো উপয়েই কাউকে বাঁধা যায় না। অধিকাংশ ছাত্রই এখানকার অভিভাবকদের কবলমুক্ত



প্রিন্স অব ওয়েল্‌স

হোয়ে এতটা স্বাধীন হোয়ে তার হাওয়া বরদাস্ত কোরতে পারেন না—পাল টানিয়ে দেন উচ্ছৃঙ্খলের দিকে। তা ছাড়া, আমাদের সামাজিক শাসনের ফলে এখানে আমরা খুব কমই মেয়েদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাই। তাই সেখানে গিয়ে একবারে হঠাৎ অমন শুভ্র সতেজ মুক্ত বিহঙ্গদের মাঝে পোড়ে মাথা গুলিয়ে ফেলি। তার ওপর যোগ দেয় আধুনিক মতবাদ—চরিত্র-সংযমের শেষ লেশটুকুও এর

"লজিকের" বন্যায় ধুয়ে মুছে যায়। এই শ্রেণীর ভারতীয় ছাত্রের ব্যবহারের ফলে লণ্ডনের কোনো কোনো অঞ্চলে ভারতীয় ছাত্রদিগকে থাকতে দেয় না—তারা কালো বোলে নয়, তারা ইতর বোলে। অনেক জায়গায় দেখেছি To Let লেখা আছে—গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়েছি—মালিক বেরিয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা কোরলাম "ঘর খালি আছে?"

"না" বোলেই বিনা বাক্যব্যয়ে তারা দরজা বন্ধ কোরে দিয়েছে। প্রথমে ভাবতাম পোড়া রংটাই বুঝি বাদী। কিন্তু পরে জানলাম, ভারতীয় ছাত্রদের পূর্ব্ব ব্যবহারই এর কারণ। যাঁরা নিজেদের স্ফূর্ত্তির জন্য বিদেশে যথেচ্ছ ব্যবহার করেন, এবং সেখানকার লোকের মতামতকে শ্রদ্ধা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, তাঁরা শুধু নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করেন না—তাঁরা দেশেরও শত্রু।



ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট, সামনে টেমস্ নদী

লণ্ডনের বুকের মধ্যে কেবল বাস চলে—ট্রাম চোলতে পায় না; কারণ, রাস্তা এত সঙ্কীর্ণ, ও এত জনাকীর্ণ থাকে যে, তার মধ্যে বাস এবং ট্রাম চলা অসম্ভব। ওপরে বাস আর নীচে "আণ্ডার গ্রাউণ্ড" অর্থাৎ ভূগর্ভ-যান চলে। লণ্ডনের ভূগর্ভ-যানের ষ্টেশনগুলি বোধ হয় ইয়োরোপের সব জায়গার ষ্টেসন থেকে ভাল। এখানকার সুড়ঙ্গগুলির গভীরতাও খুব বেশী। কিন্তু ট্রেণগুলিতে বড় বিশ্রী আওয়াজ হয়—খুব চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়। এই জন্যেই বোধ হয় ওরা গাড়ীতে চুপ কোরে বই বা কাগজ মুখে গুঁজে চলে। লণ্ডনের ভূগর্ভ-যানের দিক-নির্দ্দেশক নক্সাদি বেশ স্পষ্ট। ষ্টেশনের বাইরেও একটা নক্সা থাকে। সেখানে সেই ষ্টেশনটী চিহ্নিত করা থাকে। টিকিট-ঘর ছাড়াও অনেক জায়গায় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থেকেও টিকিট পাওয়া যায়। ভাড়া দুরত্ব হিসাবে। এই ট্রেণগুলি খুব শীঘ্র বেগ নিতে পারে এবং খুব দ্রুত যায়। এই জন্যে ট্রেণ ছাড়বার আগে গাড়ীর দরজা বন্ধ হোয়ে যায় যাতে চলতি অবস্থায় কেউ নামতে বা চোড়তে না পারে। টেমস্ নদীর নীচে দিয়ে এর সুড়ঙ্গ যে কোথায় কোথায় গিয়েছে তা ট্রেণে চেপে কিছুই বোঝা যায় না।

বাসগুলি খুব ধীরে ধীরে যায়—রাস্তার অসম্ভব ভীড় ও অপরিসর রাস্তাই এর কারণ। কোলকাতার মত ঘণ্টায় পঁচিশ ত্রিশ মাইল জোরে বা পাল্লা দিয়ে এখানকার বাস দৌড়োদৌড়ি করে না; কোরবার সুযোগও পায় না। নিয়মও নেই—ঠিক এক-টীর পর একটাকে চোলতে হবে,—পাশ কাটিয়ে আগে যেতে পাবে না। আমাদের বাসগুলির এমনি ধারা কড়া ব্যবস্থা হওয়া উচিত। জনাকীর্ণ রাস্তার মধ্যে যেভাবে তারা পাল্লা দেয় বা যে জোরে চালায় ও হঠাৎ ব্রেক কষে, তাতে পথিক ও আরোহী উভয়েই ত্রস্ত হোয়ে থাকে। এ বিষয়ে আইন থাকলেও লালপাগড়ীরা সেটা খাটাবার কষ্ট স্বীকার করে না। তাদের অনুরাগ মোষের গাড়ীর নিয়মকানুনগুলোর ওপর কিছু বেশী বোলে বোধ হয়।

এক মোড় থেকে অন্য মোড় যেতে লণ্ডনের বাসগুলিকে পুলিসের হাত দেখানর ফলে একাধিকবার দাঁড়াতে হয়—কারণ একদিকের সামনের পাঁচ ছ'খানা গাড়ী পার কোরেই আবার বন্ধ কোরে অন্য দিকের গাড়ী ছাড়ে। এই জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে হোলে লোকে ভূগর্ভ-যানই পছন্দ করে বেশী—এর ভাড়াও বাসের চেয়ে কিছু বেশী। প্রত্যেক বাসে উঠবার হাতলের জায়গায় একটা বাক্স আছে—

নামবার আগে টিকিটটা সেখানে ফেলে দেওয়া প্রথা—এতে রাস্তা নোংরা হয় না। বাসগুলি আমাদের কোলকাতার বাসের চেয়ে খারাপই—কাঠের শক্ত আসন। প্রত্যেক বাস প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকলেও দাঁড়ায়—মাঝে দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে না বা নামায় না।

সহরের আশে-পাশে ট্রাম ও বাস দুই-ই আছে। ট্রামও দোতলা এবং কাঠের আসন। আমাদের বর্ত্তমান ট্রামগুলি এদের তুলনায় অনেক ভাল—কি রংএ, কি চেহারা বা ব্যবস্থায়। শুধু লণ্ডন নয়—সারা ইয়োরোপে আমি কোলকাতার নূতনতম ট্রামগুলির মত আরামদায়ক ও বেগবান ট্রাম দেখি নি এবং আমেরিকা-প্রত্যাগত লোকের মুখে শুনেছি সেখানেও অতি অল্প জায়গাতেই এমন ট্রাম আছে।

সহরের কাছাকাছি সহরতলীতে যাবার জন্যে বৈদ্যুতিক ট্রেণ আছে। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন থেকে এমনি ট্রেণে চোড়ে আমরা ক'জন ভারতীয় একটা সহরতলীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কোরতে গিয়েছিলাম। সেখানকার "টক এইচ" (Toc H) সমিতি আমাদের কজন ভারতীয়কে সেখানে যাবার নিমন্ত্রণ করেন—পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদানের জন্যে। প্রথমে গিয়ে কফি খাওয়া হোল। তার পর একটি বাতি জ্বেলে এই সমিতির প্রার্থনা পাঠ হোল। প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ও এই সমিতির সভ্য। এদের সভ্যসংখ্যা এখন অনেক এবং নানা দেশে ছড়িয়ে পোড়েছে। গত মহাযুদ্ধের পরই এই সমিতির জন্ম। পরস্পরের মধ্যে সেবা, ভালবাসা, মৈত্রী ইত্যাদিই এই সমিতির উদ্দেশ্য। সমিতির জন্মের ইতিহাস বলার পর ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে অনেকে আমাদিগকে বোলবার জন্য অনুরোধ কোর্লেন। একজন বুড়ো ভদ্রলোক (আমাদের দলের) মধ্যপন্থীর মতবাদ (moderate) সমর্থন কোরলেন। একজন খুব ছোক্‌রা—বয়স বছর আঠার—পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী কোরলেন। অন্যজন মুসলমানদের স্বার্থরক্ষাটাকেই বেশী প্রয়োজন বল্লেন। বলা বাহুল্য তিনিও মুসলমান। এইভাবে সে সভায় প্রীতিমিলনের বদলে আমাদের মধ্যেই বেশ বচসা আরম্ভ হোয়ে গেল। যেন সেই সভাতেই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে! এতে আমরা হাস্যাস্পদভাবে প্রমাণ করলুম যে আমাদের মধ্যে মতের অনৈক্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান এবং আমরা বাইরে প্রীতিমিলনের বিতর্ক সভাতেও এক হোতে পারি না।

শীতকালে লণ্ডনে রাস্তার আলো নেবে বেলা এগারটা বারোটায়; আবার জ্বলে বিকেল চারটেয়। সহরের সমস্ত ধোঁয়া গ্যাস কুয়াসার চাপে মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে—দিনের শেষে নাকের মধ্যে রীতিমত কালি দেখা যায়। কখনও খুব কালো হোয়ে মেঘ এসে সারা আকাশটা ছেয়ে ফেলে—মনে হয় বুঝি শ্রাবণের বাদল নামবে। কিন্তু দুচার ফোঁটা পোড়েই ব্যস, আর নয়। সহরের অপেক্ষাকৃত সরু

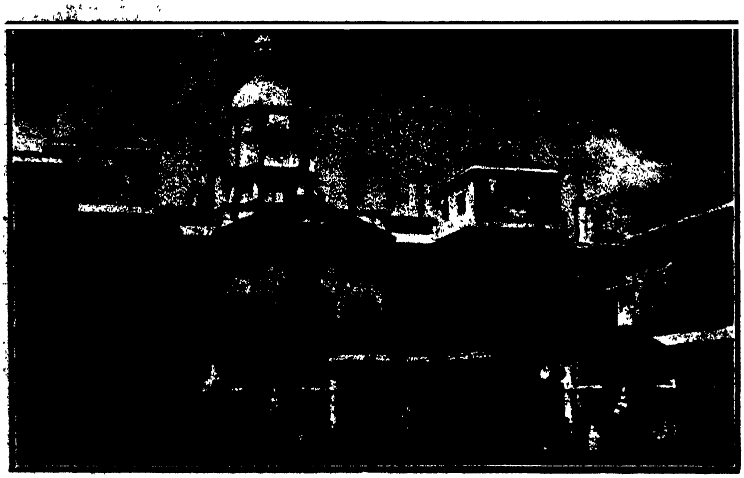


অভিষেক সিংহাসন ও তার নীচে "ভাগ্যদেবী (Stone of Destiny) এই পাথরটা ১২৯৭ সালে প্রথম এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক আনীত হয়—তার পর থেকে সমস্ত সম্রাট এর ওপরে অভিষিক্ত হোয়েছেন

রাস্তাগুলির দুধার চেপে প্রকাণ্ড পুরানো বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে—ফুটপাথগুলিও অপেক্ষাকৃত অপরিসর। সব বাড়ীর ওপর তলায় জলের কল নেই। মামুলী মত গ্যাস বা কাঠের চুল্লী জ্বেলে শীত নিবারণ কোরতে হয়। ইয়োরোপের অন্যান্য

উন্নত দেশের মত বাষ্প দ্বারা ঘরের তাপ বৃদ্ধির ব্যবস্থা খুব কম বাড়ীতেই আছে। রাত্রে পিকাডিলি, ষ্ট্র্যাণ্ড, চ্যারিং ক্রশ, হুইটন, প্রভৃতি বড় বড় নামজাদা রাস্তাগুলিও প্যারি বা বের্লিনের ঐ ধরণের রাস্তার মত দেখতে হয় না—অন্যান্য রাস্তাতেও অপ্রচুর আলোকের ব্যবস্থা। আসলে লণ্ডন সহরটা আপনা-আপনি গড়ে ও বেড়ে উঠেছে ঠিক আমাদের কাশী বৃন্দাবনের মত। কাজেই কোনো নির্দ্দিষ্ট নক্সামত সহরটী গোড়ে ওঠে নি, যেমন গোড়ে উঠেছে বেলিন বা প্যারীর অংশবিশেষ।

লোকগুলো সাধারণতঃ ভদ্র—কম বিলাসী, স্বল্পভাষী, কাজের লোক। রেষ্টুরাণ্টে প্যারীর মত হট্টগোল কোরে বা তাস দাবা খেলে খেতে কাউকে দেখি নি। প্যারী বা বের্লিনের তুলনায় খুব কম মেয়েই মুখে রোজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক ঘষে। নাচঘরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কোথাও বর্ণবৈষম্য চোখে ঠেকে নি। শুনেছি স্কটল্যাণ্ডে কোথাও কোথাও এখনও হোটেলে বা ভোজনমন্দিরে "Not for the coloured" লেখা থাকে। লণ্ডনে তেমন কিছু চোখে পড়ে নি। প্যারী বা বের্লিনের মত ফুলের আদর এখানে দেখিনি। ফুল খুব কমই বিক্রী হয়। আর যাও হয়, তা ফুলের দোকানে। লোকের বাড়ীর সামনে বা জানলা বারান্দাতেও ফুলের টবের আদর নেই। কাজেই মনে হয় এদের সৌন্দর্য্যবৃত্তি কিছু ভোঁতা।



হোয়াইট হল রাস্তায় "হর্স গার্ড" (Horse guard) ইংলণ্ডে একমাত্র ইহারাই ঘোড়সোয়ার প্রহরী

ভিক্ষুকেরা এখানে কালীঘাটের কাঙ্গালীর মত 'দেহি দেহি' কোরে পিছু নেয় না, বা সুযোগ পেলে ঘাড় চাপড়ে পিঠ চাপড়ে পয়সা আদায় করে না। হয় ফুটপাথের ওপর ছবি এঁকে বা আঁকা ছবি দেওয়ালের গায়ে ঠেসিয়ে রেখে পাশে টুপীটা পেতে দাঁড়িয়ে বা বোসে থাকে—পাশে লিখে রেখে দেয় "Please help—Thank you" বা "Blind-man Sir—Thank you" ইত্যাদি।

এখানকার দ্রষ্টব্যগুলি দেখতে আরম্ভ কোরলাম। "ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবি" গির্জ্জা দেখে এলাম। প্রকাণ্ড বড় গির্জ্জা—খুব বড় বড় থাম ও খিলান। চেহারা দেখেই বোঝা যায় বেশ বয়স হোয়েছে। এখানে বৃটিশ সম্রাটেরা অভিষিক্ত হন—সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা পরিণীত হ'ন—রাজ-পরিবারের এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃতদেহও সমাধিস্থ হয়। গির্জ্জাটীর দেওয়ালে পথে সর্ব্বত্রই সমাধিচিহ্ন বর্ত্তমান। এর এক অংশের নাম "রয়্যাল চ্যাপেল" (Royal Chapel)। এইখানেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবর আছে। এখানে পৃথক দক্ষিণা দিয়ে ঢুকতে হয়। মৃতদেহকে প্রদর্শনী কোরে অর্থার্জ্জনকে মৃতদের প্রতি অসম্মানজনক বোলে মনে হোলো। প্রায় প্রতি সমাধির ওপরেই পাথরের, রূপার, তামার প্রতিমূর্ত্তি বা লিপি আছে। দু'একটী প্রতিমূর্ত্তি বা কবরের ওপর কোনো কোনো দর্শক নিজেদের নাম লিখে বা খোদাই কোরে মৃতের কবরে অমর হোতে চেয়েছে। হায় মানুষের দুর্ব্বলতা! শ্মশানের মাঝে দাঁড়িয়েও অমরত্বের লোভ তারা ছাড়তে পারে না! অর্দ্ধজগতের সম্রাটের চরম পরিণতি চোখের উপর দেখেও তারই সমাধির সাহায্যে স্মরণীয় হবার দুরাশা! এখানকার কয়েকটী ভাস্কর্য্য খুব চমৎকার। গ্ল্যাডষ্টোন, ইঞ্জিন-আবিষ্কারক জেম্‌স ওয়াট প্রভৃতি ব্যক্তিরাও রাণী এলিজাবেথ ও অন্যান্য বহু রাজা ও রাণীর মাঝে চিরনিদ্রায় মগ্ন। রয়্যাল চ্যাপেলের বাইরে এক জায়গায় অজ্ঞাত সৈনিকের

কবর আছে। এখানে প্যারীর মত কোন দীপশিখার ব্যবস্থা নাই; খালি ওপরের পাথরটাতে লেখা আছে "...who died for...justice and freedom of the world."। সভ্যজগতের বুজরুকী এখনও ভাঙ্গে নাই—এখনও তারা নিজেদের স্বার্থ প্রণোদিত শক্তিপ্রয়াসী সকল প্রচেষ্টার ওপরে বিশ্বসাম্য বা স্বাধীনতার প্রলেপ দিতে ছাড়ে না। এখান থেকে হেঁটে ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট (Victoria Embankment), পার্লামেণ্ট প্রভৃতি দেখতে গেলাম। শনিবার পার্লামেণ্টের ভেতরে ঢুকে দেখতে দেয়। বাড়ীটা টেমস্ নদীর ওপরেই এবং গথিক ভঙ্গীতে নির্ম্মিত। পার্লামেণ্টের কাছে 'টাওয়ার ক্লকটা' লণ্ডনে প্রসিদ্ধ। এর নীচে দিয়েই চোলেছে "ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্ট"। এই প্রশস্ত পরিষ্কার রাস্তাটা টেমসের কোলে কোলে এঁকে বেঁকে চোলেছে। টেমসের গর্ভ থেকেই এটাকে উদ্ধার করা হোয়েছে। রাস্তাটা গাছপালা, বসবার আসন ইত্যাদি দিয়ে বেশ সাজান আছে। সন্ধ্যায় অনেকে এখানে বেড়াতে আসে। কেউ বা এখান থেকে ষ্টীমারে টেমসের বুকে হাওয়া খায়।

ট্রাফালগার স্কোয়ার (Trafalgar Square) থেকে লণ্ডনের সব বড় রাস্তাগুলি বেড়িয়েছে বা মিলেছে। কাজেই এটাকে লণ্ডনের কেন্দ্র বলা চলে। আবার কেউ কেউ বলেন পিকাডেলীই লণ্ডনের কেন্দ্র। বস্তুতঃ দুটাকেই কেন্দ্র বলা চলে—দুটা জায়গাই সমানভাবে প্রধান। White Hall যে রাস্তাটার নাম তার ওপরেই সরকারী দপ্তর, প্রিভি কাউন্সিল, নানা মন্ত্রীবিভাগের কার্য্যশালা। তবে এর ওপরের একটা বাড়ীর রংও সাদা (white) নয়—সবই বার্দ্ধক্য হেতু কালো হোয়ে গ্যাছে।

ইট পাথরের লণ্ডনের বুকের ওপর শ্যামলতার লেশমাত্র নেই—বিশেষ শীতকালে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হয় হাইড পার্কে এবং সেণ্ট জেমস পার্ক, গ্রীণ পার্ক, পশুশালায় ও সহরের প্রান্তদেশে কয়েকটা পার্কে। হাইড পার্কটি প্রকাণ্ড বড়—এর ভেতরে জলপ্রণালী, বাগান, ছোট পাহাড়—বক্তৃতামঞ্চ, মর্ম্মর মূর্ত্তি, বসবার আসন সবই আছে। সন্ধ্যার পর এখানকার বিখ্যাত 'মার্ব্বেল আর্কে' (Marble Arch) নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। আবার আর একটু ভেতরে অন্ধকারের আবছাওয়ায় যুবক যুবতীর প্রেম-স্বপ্ন চলে। আরো অন্ধকারে মানুষের মনের গভীরতম অন্ধকার আত্মপ্রকাশ করে। বিচিত্র জায়গা এই বিখ্যাত পার্কটা।

সেদিন সকালবেলা এই পার্কটার পাশ দিয়ে চোলেছিলাম রাজপ্রাসাদ 'বাকিংহাম প্যালেস' দেখবো বোলে। জিজ্ঞাসা কোরে চোলেছিই, অথচ প্রাসাদের সন্ধান মিল্‌ছে না। দুজন লোক রাস্তা দিয়ে চোলেছিল। বেশ দেখেই মনে হোল দরিদ্র। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম "বাকিংহাম



নেলসনের সমাধিস্তম্ভ—সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল—লণ্ডন

প্রাসাদ কোন্‌টা বোলতে পার?" তারা একটু অবাক হোয়ে বোল্লে "এই ত—তোমার সামনেই।"

সামনে একখানাই বাড়ী ছিল—সেটা দেখিয়ে বোল্লাম "কোন্‌টা? ঐটা?" তারা বোল্লে "হ্যাঁ।"

"ঐ কি রাজপ্রাসাদ?" উত্তর পেলাম "হ্যাঁ।"

খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম। এরই একজন কর্ম্মচারী, আমাদের ছোটলাট বাহাদুরের বাড়ীর পাশে তাঁর প্রভুর প্রাসাদকে স্থান দিতে লজ্জা হোল। তিনতলা সাদাসিধে বাড়ী—পাহারার আড়ম্বর নাই—তোরণে প্রহরীর ঝকমকে

পোষাক নাই—এই কি আমাদের রাজপ্রাসাদ! লণ্ডনের কথা বাদ দিলেও কোলকাতাতেই ত এমন বাড়ী কত আছে!

"আমায় দুটো পেনি দেবে? কফি খাব। আজ তিন দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি—বেকার"। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। দেখি তাদের মধ্যে একজন আমার পানে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অন্যজন চোলে যাচ্চে। বোল্লাম "তোমরা ত ডোল (Dole) পাও।"

"না—নির্দ্দিষ্ট সময় কোথাও কাজ না কোরলে পাই না। তবে আমাদের জন্যে Workers' House আছে; কিন্তু সে অবস্থা—জেলখানার চেয়েও খারাপ। সেখানে গ্লানিকর পোষাক্ পোরতে হবে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর অখাদ্য খাবার দেবে। তাতে মানুষ কোনো রকমে বেঁচে থাকতে পারে।...কিন্তু তারা ত আমার স্ত্রীপুত্রকে খেতে দেবে না।



টরকের কাছে একটা পল্লীগ্রাম—ইংলণ্ড

—"তিন দিন না খাওয়ার চেয়ে সেখানে যাওয়া ত ভাল—"

—"সেই জন্যেই আজ সেখানে যাবার একটা অনুমতি-পত্র নিয়েছি—এই দেখ।" পকেট থেকে একটা কার্ড বের কোরে দেখালে। "কিন্তু আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে—দুটো পেনি দেবে?" লণ্ডনের এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপের সুযোগ ত্যাগ কোরলাম না—বোল্লাম "চল, একসঙ্গেই খাব।" দুজনে রাজপ্রাসাদকে বেড়ে চোল্‌ছিলাম। প্রাসাদের আয়তন অনেকখানি। সে আমায় দেখাতে লাগল "ঐখানটায় ঘোড়া থাকে—ঐটায় মোটর। আচ্ছা বল ত এত বড় বাড়ী একটা লোকের কি দরকার?"

বোল্লাম "রাজপরিবারের সকলকে থাকতে হয় ত?"

বাধা দিয়ে সে বোলতে লাগল "না না—এটা কেবল রাজার বাড়ী। তার ছেলে মেয়েদের বাড়ী আলাদা। চল, তোমাকে যুবরাজের বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

জিজ্ঞাসা কোরলাম "রাজার প্রতি কি তোমরা সন্তুষ্ট নও?"

—"না, রাজার প্রতি আমাদের কোনো রাগ নেই—তাঁর হাত কি? পার্লামেন্টের নির্দ্দেশমত তাঁকে চোলতে হয়। যুবরাজও খুব লোক ভাল। শ্রমিকদিগকে খুব ভালবাসে। বহু দিন শ্রমিকদের নাচঘরে তাঁকে ছদ্মবেশে ঘুরতে দেখা যায়। তাছাড়া তিনি সম্প্রতি জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি বেড়িয়ে বৃটিশ পণ্যের প্রচার কোরে এলেন। এতে প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদিগকেই সাহায্য করা হোল"—

—"তা হোলে তোমরা কি মনে করো শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট হোলে তোমাদের অবস্থার উন্নতি হবে?"

—"কিছুই হবে না—ও-সব ভুয়ো। সত্যিকারের শ্রমিক কেউ নয়; শ্রমিকদের দুঃখ কেউ বোঝে না; ভোটের লোভে ও-সব ওদের চাল। আমাদের দারিদ্র্য কি ভীষণ জানো?" সে পকেট থেকে একটা কাগজে মোড়া কি বার কোরলে। একটার পর একটা মোড়ক খুলে সে বার কোরলে একটা অর্দ্ধভুক্ত পাঁউরুটী। সেটা দেখিয়ে বোল্লে "এই দেখ—এই পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে আমাদের জীবন কাটছে। যে-সব আফিসের কেরাণী নিজের টিফিন খেতে পারে না, তারা তাদের উচ্ছিষ্ট আহার্য্য কাগজে মুড়ে জানলা দিয়ে ফেলে দেয় আমাদের মত হতভাগ্যের জন্য। আমরা নিশ্চয়ই এমনিভাবে জীবন-যাপনের জন্য জন্মাই নি—এর জন্যে দায়ী গভর্ণমেণ্ট। জান আমি গত যুদ্ধের সময় সৈনিক ছিলাম। তখন দেশ-প্রেমের লোভ দেখিয়ে ওরা আমাদিগকে পাঠালে গোলাগুলির মাঝখানে; আর নিজেরা রইল দেশে পুত্রকন্যার স্নেহাঞ্চলের ছায়ায়। যুদ্ধশেষে প্রাণ নিয়ে ফিরলাম। সামান্য পঁয়ত্রিশটা পাউণ্ড দিয়ে বিদেয় কোরলে। তাতে কি একটা সংসার চলে? আর এদিকে রাজার প্রত্যেক ছেলে আলাদা আলাদা ভাতা পায়। কেন, তাদের ভাতা বাপ দিক্।"

বোল্লাম "এ সম্বন্ধে তোমরা সভা-সমিতি কোরে তোমাদের মতামত জানাও।"

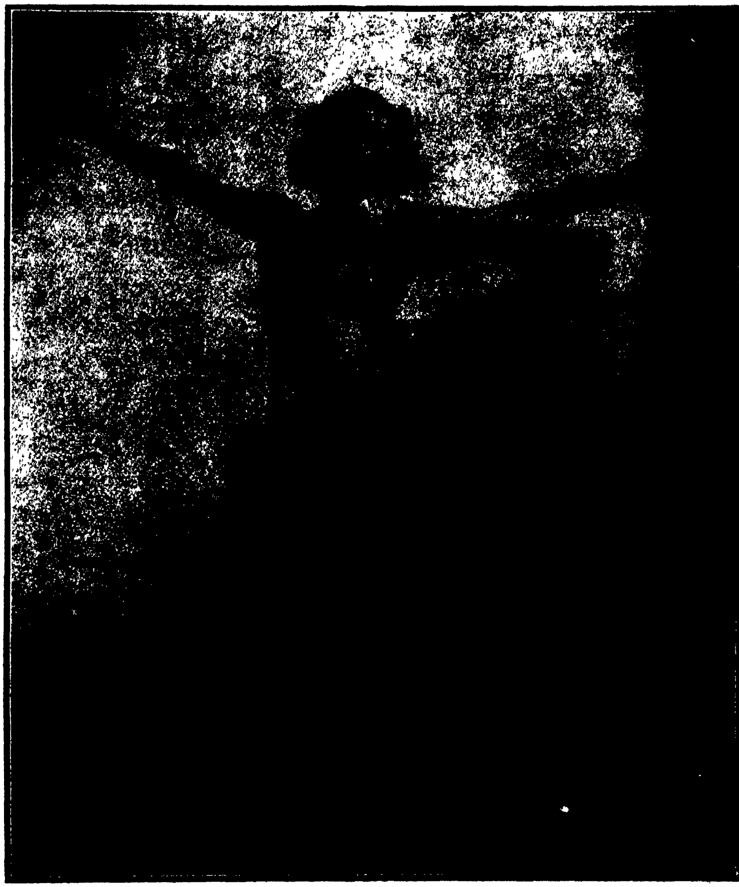
সে উত্তেজিত ভাবে উত্তর দিলে “কিছু হবে না। ও-সব ওদের গা-সওয়া হোয়ে গ্যাছে। চাই কাজ।”

রাশিয়ার মতবাদ এদের ওপর খুব সতেজে কাজ কোরছে; কারণ, চোখের ওপর তারা রাশিয়ার শ্রমিকদের উন্নতি দেখতে পেয়েছে। কথায় কথায় সে বোল্লে “এই সব আমাদের মত বুভুক্ষু দরিদ্র যদি ধনীদের কাছ থেকে অসৎ উপায়ে অর্থার্জ্জন করে, তাতে দোষ দিতে পার?” গাটা ছ্যাঁৎ কোরে উঠল—এই নিরালা পথে এ কিসের ইঙ্গিত? সে বোলে যেতে লাগল “মাঝে মাঝে যে বেকারের দল ধনীদের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরে ছ্যায়, সে ইচ্ছে কোরে ছ্যায় না—খিদের তাড়নায় উত্তেজিত হোয়ে ছ্যায়।” জিজ্ঞাসা কোরলাম “দিনে ত রাস্তায় রাস্তায় ঘোর—রাত্রে কোথায় থাক?”

—“লোকের দরজায়, নয় পার্কের বেঞ্চে। তাও পুলিশে দেখলে থাকতে দেয় না। বেঞ্চে চুপ কোরে বোসে থাক কিছু বোলবে না; ঘুমুলেই জাগিয়ে দেবে, নয় উঠিয়ে দেবে।”

রাজবাড়ী প্রদক্ষিণ কোরে আবার হাইড পার্কের সামনে এসে পোড়লাম। সামনে একটা পাথরের বেদীতে কয়েকটী কামান ও মানুষের মূর্ত্তি দেখে তাকে জিজ্ঞাসা কোরলাম “এটা কি?”

—“গত যুদ্ধে মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ।” একটা ব্যঙ্গ হাসি হেসে পরে সে বোল্লে “যারা বেঁচে তারা আজ অনাহারে মোরছে; আর মৃতদের প্রতি সম্মান দেখান হোচ্ছে!” হাইড পার্কের ভেতরে এসে পোড়লাম। ঘোড়ায় চড়বার জন্যে একটী পৃথক রাস্তা আছে। লোকটী দেখিয়ে চোল্লো—এটী বাইরণের মূর্ত্তি, ওটা শেলীর। কথায় কথায় সে জিজ্ঞাসা



ফিনিক্স থিয়েটারে “অবিরাম প্রদর্শনীর” (non-stop revue) একটী দৃশ্য

কোরলে “তুমি বুঝি বেড়াতে এসেছ এখানে?” অন্যমনস্ক ভাবে বোল্লাম “হ্যাঁ।” লোকটা অস্ফুট স্বরে বোল্লে “হুঁ;—লোকে বেড়িয়ে পয়সা খরচ…” সহসা বোধ হয় তার ভদ্র-চৈতন্য ফিরে এলো। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হোল—বোল্লাম “আমি এখানে পোড়তে এসেছি।”

আমরা বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পোড়েছিলাম। তাকে একটা শিলিং দিলাম—সে কৃতজ্ঞতাভরে ধন্যবাদ দিয়ে বোল্লে “তুমি বোধ হয় বৃটিশ রাজধানীতে এই দারিদ্র্য দেখে আশ্চর্য্য হোয়েছে? নয়?” ঘাড় নেড়ে জবাব দিলাম সত্যই।

বিদেশে সর্ব্বত্রই চিঠিপত্র বা টাকাকড়ি টমাস কুক বা আমেরিকান এক্সপ্রেসের ঠিকানায় নিশ্চিন্তে পাঠান চলে।

তারা আবার যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়। আমার ধারণা ছিল যে, বড় বড় সাহেব কোম্পানী সর্ব্বদাই বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু পি এণ্ড ওর (P & O) মত বড় কোম্পানীও সে বিশ্বাস নষ্ট কোরে দিয়েছে। আমি জাহাজে চোড়ে ভারতীয় সহযাত্রিনীর কাছে শুনি যে, তিনি, ছাত্রদের জন্যে যে বিশেষ ভাড়া জাহাজ কোম্পানী ঘোষণা কোরেছেন, সেই হারে ভাড়া দিয়েছেন। অথচ আমার কাছে পুরো ভাড়াই নিয়েছিল। তাই লণ্ডনে এসে কোম্পানীকে বাড়তি ভাড়া ফেরত দিতে লিখতেই তারা উত্তর দিলে যে, কোনো বিশেষ ভাড়া তাঁরা ছাত্রদের জন্যে ঘোষণা করেন নি। পরে আমার পরের জাহাজে আগত একজনের কাছে কোম্পানীর বোম্বাই আফিসের লিখিত একটী চিঠি পাই। তাতে তারা জানিয়েছে যে তাঁকে (যাত্রীকে) ছাত্রদের জন্যে ঘোষিত ভাড়াই



নিউটন এবটের একটী গৃহস্থের বাড়ী—ইংলণ্ড

দেওয়া হবে। ঐ চিঠিটী আমি তাদের লণ্ডন আফিসে পাঠিয়ে দিই। কিন্তু তাতেও অনেক দিন উত্তর পাই নি। শেষে অনেক তাগাদা দিয়ে প্রায় এক মাস পর ঐ টাকা ফেরত পাই।

লণ্ডনে যদি কেউ এ-দেশী জিনিষের ব্যবসা কোরতে চান তাহোলে এখানকার Director of Indian Commerce, 1 Council House St. Calcutta, থেকে পরিচয়পত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত। তাতে সেখানে Trade Commissioner অনেক সুবিধা কোরে দিতে পারেন। সেখানকার শুল্কাদি সম্বন্ধেও খোঁজ নেওয়া দরকার। সেখানে কোনো ব্যবসা ফাঁদবার আগে, ট্রেড কমিশনার, ইণ্ডিয়া হাউসে, লিখে, সে বিষয়ে সমস্ত তথ্য জানা ভাল। আমি রেশম ও চাল এই দুটো জিনিষ চালাবার চেষ্টা কোরেছিলাম ; কিন্তু এখানকার ডাইরেক্টার অব কমার্সের কোনো চিঠি না থাকায়, সে জন্যে আবার লিখতে হয়। তাদের খোঁজ খবর নিয়ে (enquiry) রিপোর্ট পাঠাতে অনেক দেরী হোয়ে যায়। অতদিন চুপ কোরে বোসে থাকা সম্ভব হয় নি।

একদিন রাস্তা দিয়ে চোলেছি—হঠাৎ একটী প্রৌঢ়া পথ আটকালেন "তুমি ত মানুষ ?" আরে গেল, এ কি প্রশ্ন ? একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম "তাই ত মনে হয়।" "তাহোলে এদের ব্যথায় কি তোমার প্রাণ কাঁদে না ?" সে আঙুল বাড়িয়ে কাচের জানলা দিয়ে পাশের ঘরে একটী কুকুরের মূর্ত্তি দেখালে। অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম "কাদের ?"

—"এই অসহায় কুকুরদের। দেখ দেখি, ওদের ওপর কি অত্যাচারটা হোচ্ছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে পরীক্ষার অজুহাতে এই সব নিরীহ জীবগুলোকে কি নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। এ নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন তোলান হোচ্ছে। এ জঘন্য হৃদয়হীন অত্যাচার বন্ধ কোরতেই হবে।"

যাহোক ব্যাপারটা বুঝলাম—বোল্লাম "তা আমি কি কোরতে পারি ?"

—"এইটায় সই করুন ; এর প্রতিবাদ জানান।"

—"কিন্তু আমি ভারতবাসী,—এখানকার আইনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ?"

"—আপনি মানুষ।"

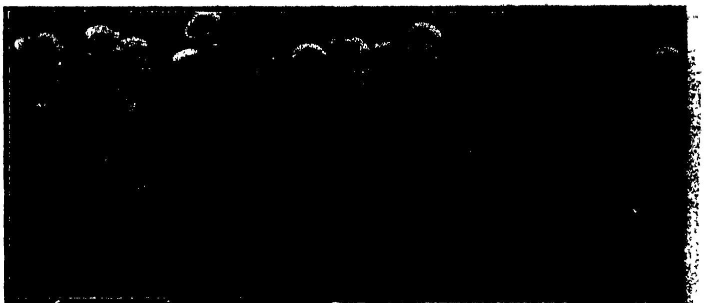
সই কোরলাম। তিনি আমার হাতে অনেকগুলো কাগজপত্র দিলেন পোড়বার জন্যে। কুকুর বাঁদর এদের ওপর যে রোগের পরীক্ষা চলে, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা মারা যায় বা স্বাস্থ্যহীন হয়। তাই এঁরা সমিতিবদ্ধ হোয়ে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আইনটা পাশ হোয়েছে কি না জানি না।—পাশাপাশি মনে পোড়ল সেই দেশেরই দরিদ্র শ্রমিকের রুক্ষ নগ্ন মূর্ত্তি—সে মানুষ ! এরা পাগল কুকুরের জন্যে !

লণ্ডনে প্রায় প্রতি মাসেই কোনো না কোনো প্রদর্শনী-প্রতিযোগিতা লেগেই আছে। আমি যখন ছিলাম, তখন

দুটো উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী চোলছিল—একটা ১৯৩৪ সালের মডেলের মোটরকার প্রদর্শনী; অপরটী 'ডেইরী শো' (Dairy Show) বা "দুগ্ধ ব্যবসা প্রদর্শনী"। দ্বিতীয়টী সম্বন্ধেই আমি কিছু বোলব; কারণ, এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হোয়েছে। এই প্রদর্শনীটীতে, আমাদের শিল্প বা কৃষি প্রদর্শনীর নামে যেমন জুয়ার আড্ডা, প্রমোদ ব্যবস্থা, মনিহারীর দোকানের সমাবেশ হয়, তেমন কিছুই ছিল না। —খালি গরু ও দুধের ব্যবসা সম্বন্ধেই দোকানপত্র, যন্ত্রপাতি ও দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। প্রদর্শনীটী ঘুরে এই ব্যাপারটী সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মাল। গরুকে কি ভাবে খাওয়াতে হয়—তার শরীর ধারণের জন্যে এবং প্রতি গ্যালন দুধের জন্যে কি হারে কি খাবার বাড়ান উচিত—কোন্ ঘাসে খাদ্যবস্তু কতটুকু আছে—তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইত্যাদিও ছিল। আবার দুধ কি ভাবে বেশী দিন রাখা যায়—তা রাখতে গেলে কি কি পদ্ধতি কোন্ যন্ত্র সাহায্যে নিতে হয়—দুধ থেকে পনির মাখন প্রভৃতি কি ভাবে তৈরী হয়—কি ভাবে তা বিক্রী করা যায়—তাদের উন্নতি করা যায় ইত্যাদি বিস্তৃত ভাবে জানাবার ব্যবস্থা ছিল। কত দোকানদার তাদের বিভিন্ন যন্ত্র এনেছে। একটী যন্ত্রে পাঁচশো ডজন বোতল এক সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে গরম জলে সোডায় পরিষ্কার হোয়ে ষ্টীমে জীবাণুশূন্য হোয়ে দুধ ভর্ত্তি হোয়ে মুখে শীলবন্দী হোয়ে বেরিয়ে যায়। এটী একটী বিরাট যন্ত্র। ছোট ছোট যন্ত্রও আছে যাতে এই কাজগুলি আলাদা আলাদা হয়। ছোট ভাবে ব্যবসা চালাবার জন্যে ছোট ছোট বয়লার—হাতে চালান দুধ দোয়ান কল—বোতলবন্দীর কল ইত্যাদি ছিল। অনেক গরু প্রতিযোগিতার জন্যে এসেছিল। এখানকার গরু সাধারণতঃ ৫।৬ গ্যালন দুধ দেয়। ওরা ক্রমশঃ খারাপ শ্রেণী বাদ দিয়ে দিয়ে গরুর জাত অনেক উন্নত কোরেছে। এখানে মুরগী হাঁস ইত্যাদিও জীবন্ত এবং ছাড়ান দুই-ই ছিল। কি ভাবে ডিম পরীক্ষা করা হয়—কি ভাবে তার শ্রেণীভাগ (grading) করা হয়—সব দেখান হোচ্ছিল। কলেজে দীর্ঘকাল পড়ার জ্ঞান এই প্রদর্শনীগুলিতে কয়েক ঘণ্টায় মোটামুটী লাভ করা যায়।

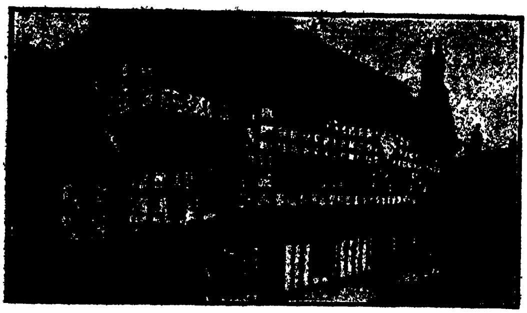
লণ্ডনের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে নাম করা যেতে পারে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ও Tussauds যাদুঘরের। প্রথমটী এত বিরাট ও এত প্রসিদ্ধ যে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা উচিত নয়, বোধ হয় প্রয়োজনও নেই। শেষেরটী একটী মোমের প্রতিমূর্ত্তির প্রদর্শনী। জগতের স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের—তা অভিনয়ক্ষেত্রে, সাহিত্যিক জগতে, রাজনীতিক গগনে বা যে দিক দিয়েই হোক—অবিকল প্রতিমূর্ত্তি এখানে রাখা হয়। প্রতিমূর্ত্তিগুলি এত সুন্দর ও নিখুঁত যে মনে হয় সত্যকার ব্যক্তি বুঝি যাদুমন্ত্রের স্পর্শে মূক হোয়ে নিশ্চল হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এইবার ইংলণ্ডের গ্রাম্য জীবনের কথা বোলব। ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশ মিডল্যাণ্ডে; রেডিংএ ও দক্ষিণে টরকে, এক্সিটার, নিউটন এ্যাবট প্রভৃতি ছোট ছোট সহর ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে বেড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সহরের ও গ্রামের যে পার্থক্য ও দূরত্ব তা শাশ্বত—সে ভারতেই হোক আর ইংলণ্ডেই হোক। অনেকেরই ধারণা—বিলেতটা অর্থাৎ ইংলণ্ডটা গোটাই বুঝি সহুরে—আমাদের মত খোড়ো বাড়ী, গেঁয়ো লোক বুঝি সেখানে দুর্লভ—সেখানে ঘোড়ায় টানা টম্‌টম্ বা লাঙ্গল ঠেলা কাদামাখা চাষা বুঝি লোপ পেয়েছে। কিন্তু সেটা একেবারেই ভুল। ইংলণ্ডেও বড় সহর, মফঃস্বল সহর, গণ্ডগ্রাম এবং একেবারে পাড়াগাঁয়ের অভাব নাই। দুচারটে ফ্যাক্টারী, পাকা বাড়ী, দুটো একটা 'বার' (bar), নাচঘর, ব্যাঙ্কের শাখা; ডাকঘর ইত্যাদি নিয়ে মফঃস্বলের সহরগুলির সৃষ্টি। গণ্ডগ্রামগুলোতে দুচারটে পাকা বাড়ী;



বুভুক্ষু শ্রমিকদের (Hunger merchers) দল—লণ্ডন

বাকী পাথরের দেওয়াল ও শ্লেট পাথরের বা টীনের ছাদ দেওয়া বাড়ী ও দু' একটা গির্জ্জা দেখতে পাওয়া যায়। আর একেবারে পাড়াগাঁয়ে পাথরের বা কাঠের দেওয়াল—খড়ের বা টীনের ছাদওয়ালা বাড়ী, মাঠে গরু মুরগীর দল, কাদামাখা বুটওয়ালা তালি দেওয়া কোট পেণ্টুলান পরা, দাড়ি না কামান, সরল, অমার্জ্জিত চাষার দল চোখে পড়ে। এ দেশের চাষারা বা কলেজের ছেলেরাও আমাদের দেশের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বা পরিশ্রমী বোলে মনে হয় নি। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা মিশুক; কিন্তু এ দেশের গেঁয়ো লোকদের মতই অন্য দেশের লোক দেখলে হা কোরে তাকিয়ে থাকে। তবে ও-দেশে পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়া, ঝোপ জঙ্গল, পচা ডোবা, বাঁশবন, পোড়ো ভিটে, হাঁটুভোর কাদাওয়ালা রাস্তা কোথাও নেই। কাজেই পিলে নেই, রুগ্ন হাড়-বার-করা লোক নেই। পর্দ্দা নেই, আধপেটা খাওয়া নেই; কাজেই যক্ষ্মাকাশও



ষোড়শ শতাব্দীর একটী বাড়ী—ইংলণ্ড

মাথা গলায় নি। এমন কি পাছে গরুগুলোর "খুড়িয়া" রোগ হয় সে জন্যে কোনো গরুকে রীতিমত কিছু দিন পরীক্ষাধীন না রেখে দেশে ঢুকতে দেওয়া হয় না। দেশের কোনো গরুর ঐ রোগ হোলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হয় এবং তার মালিককে সরকার খেসারত দেয়। ইংলণ্ডের মত এত বেশী ও এত ভাল রাস্তা বোধ হয় আর কোনো দেশে নেই।

আমার কলেজ ছিল নিউটন এ্যাবট সহরের কাছেই। এটী ডেভনশায়ারে অর্থাৎ ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে। এখান থেকে একবারে সমুদ্রকূলে 'টরকে' (Torquay) সহর বেশী দূর নয়। এখানে শীতকালে অনেকেই বেড়াতে আসে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বড় চমৎকার—এক দিকে সমুদ্র, মাঝে সহরটী—পেছনেই পাহাড়ের শ্রেণী। এক দিকে পাহাড়, অন্য দিকে সমুদ্রের মাঝে যখন ট্রেনটী চলে তখন বড় সুন্দর লাগে। কলেজে থাকতে রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা ও পালক মিঃ এল্‌মহার্ষ্ট কর্ত্তৃক একদিন মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত হোয়ে কয়েক মাইল দূর "ডার্টিংটন হলে" গিয়েছিলাম। আধুনিক নির্জ্জীব পল্লীজীবনকে সহরের মোহ থেকে বাঁচিয়ে আবার কি কোরে পুনর্জ্জীবিত করা যায় তারই পরীক্ষা চোলছে এখানে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে। তার সমস্ত বিবরণ দিয়ে কাহিনী আর দীর্ঘ কোরব না।

ইংলণ্ডের অধিকাংশ ইংরেজই ভারতের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। যারাও বা কিছু খবর রাখে তারা অনেক কিছু ভুল শোনে। আমার কলেজের একজন অধ্যাপক আমায় জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন "গান্ধীর না কি মাথা খারাপ হোয়েছে?"

অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম "মানে?"

—"তাই ত শুনেছি। সে না কি মাথার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলে মাঝখানে একগোছা রেখেছে এই ধারণায়, যে, সে মোলে ঐ চুলগোছা ধোরে স্বর্গদূতেরা তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। এ ত নিছক পাগলামো।"

বুঝলাম, মিস মেয়োর দলের প্রচারকার্য্য নিষ্ফল হয় নি। তবে এরা ভারতবর্ষে যে একটা গণ্ডগোল চোলছে এটা জানে এবং ভারতের সত্য সংবাদ জানবার জন্যে ইচ্ছুক। কলেজে থাকবার সময় প্রায়ই আমাকে অধ্যাপকেরা চায়ে বা সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ কোরতেন ভারতের গল্প শুনবার জন্যে। কথায় কথায় কাঁথি, মেদিনীপুরের কাহিনী শুনে এঁরা বিশ্বাস কোরতেন না—"horrible!" বোলে চেঁচিয়ে উঠতেন। একদিন একজন অধ্যাপক আমায় বোলেছিলেন "জান ব্যানার্জ্জী, নিজের দেশের সবচেয়ে ভাল লোকদিগকে আমরা দেশছাড়া কোরতে পারি না। তার পরের কদরের লোক যারা তাদিগকে আমরা বৈদেশিক বিভাগে দিই বটে, কিন্তু তাদের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমরা বোধ হয় আস না। তোমরা যাদের সংস্পর্শে আস তারা অতি হতভাগ্য—দেশে তাদের জায়গা হয় না বোলেই বিদেশে যায়।"

আমি বোলেছিলাম "যুক্তিটা ঠিক নয়। আপনিও

যদি আজ একটা বড় চাকরী নিয়ে ভারতে যান, তাহোলে আজকের মত চা খেতে খেতে আর আমার সঙ্গে গল্প কোরবেন না। এডেন বন্দরের গরম হাওয়ায় এ দেশের ঠাণ্ডা মাথা গরম হোয়ে যায়। তার পরই ভারতের হাওয়া উত্তপ্ত কোরে তোলে।"

এ দেশের লোকের অনেকের ধারণা—ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বাংলা দেশের, সমস্ত যুবকই ইংরেজ দেখলেই মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। কতজন আমায় বোলেছে "তুমি বাঙ্গালী? কই তোমার মধ্যে ত বাঙ্গালী যুবকের হিংস্র প্রকৃতি নেই? তারা ত শুনেছি সব খুনে।"

আমার এক কলেজের বন্ধু আমায় একদিন জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, "যদি চাকরী নিয়ে ভারতবর্ষে যাই, এবং পরে যদি বাংলায় গিয়ে পড়ি, তোমাদের যুবকেরা গুলি কোরবে না ত?"

এই সব প্রশ্ন থেকে মনে হয়, ওদের সাধারণ জ্ঞান আমাদের চেয়েও কম। এ দেশে সাপ, বাঁদর প্রভৃতির কথা ওরা খুব আগ্রহ সহকারে শুনত। বৃন্দাবনে বাঁদরেরা মানুষের জিনিষ নিয়ে পালায় আবার খাবার দিলে ফিরিয়ে দেয়, সাপে বাঁশীর আওয়াজ শুনে খেলা করে ইত্যাদি শুনে ওরা খুব আশ্চর্য্য হোত।

একদিন আমায় কলেজের সকলে ধোরলে "তোমার জাতীয় পোষাক পরো।" সময় দিলাম —বিকেল ৫টার সময় আমার ঘরে এস।

বিকেল পাঁচটায় কাপড়, সার্ট (পাঞ্জাবী ছিল না সঙ্গে) স্যাণ্ডেল ও শাল গায়ে দিয়ে তৈরী হোলাম। বন্ধুর দলও নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে দরজায় টোকা দিলেন "আসতে পারি?"

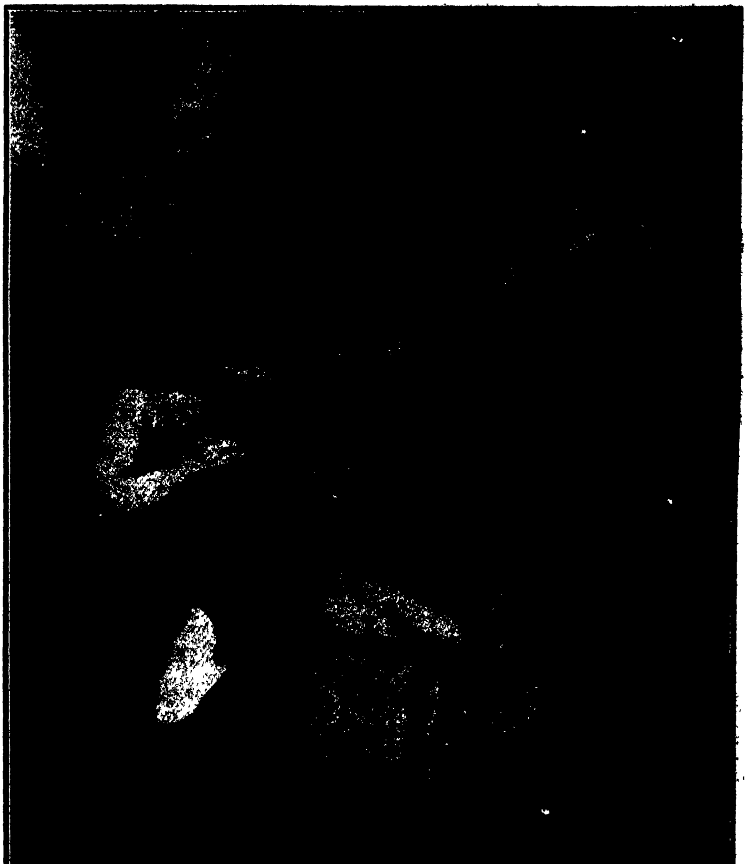
বোল্লাম "এস।"

তারা দরজা খুলেই থতমত খেয়ে বোল্লে "মাপ করো, তোমার বুঝি সব এখনও পরা হয়নি।"

বোল্লাম "সবই পরা হোয়েছে। কেন তোমাদের কি তা মনে হোচ্ছে না?"

—"সে কি? তোমার সার্ট যে ঝুলছে—তুমি ত আধা-ন্যাংটো।"—

বোল্লাম "ওই আমাদের পোষাক।"



'ভ্যারাইটী শোর' একটী চমকপ্রদ কসরৎ—লণ্ডন

একজন আমার কোঁচাটা ধোরে বোল্লে "এতটা কাপড় এখানে গোঁজা কেন? এর মানে কি?"

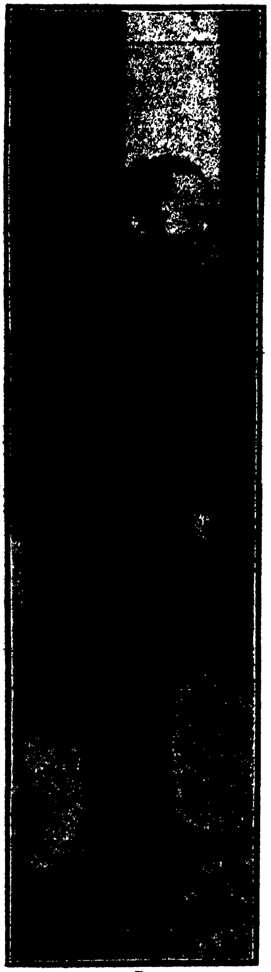
বোল্লাম "ওই আমাদের ধরণ—ওতে অনেকখানি শ্লীলতার সাহায্য করে; আর এই দেখ, রুমালেরও কাজ করে" বোলে মুখটা মুছলাম।

—"কিন্তু অত বড় কাপড়টা এখানে ঝোলানোর কোনো মানে নেই।"

—"আচ্ছা, তোমাদের নেক-টাইটার কি মানে আছে? ও ন্যাকড়ার ফালিটা গলায় না বাঁধলে আব্রুর কি কোনো ক্ষতি হয়?"

প্রশ্নটায় ওরা একটু ঘাব্‌ড়ে গেল। একজন ভেবে বোল্লে "তাই ত—সেটা ত আমরা কোনো দিন ভাবিনি। ওটা ছেলেবেলা থেকেই পোরে ও পরা দেখে আসছি।"

বোল্লাম "আমাদেরটাও তাই।"



Tassaud মিউজিয়ামে অষ্ট্রীয়ান জননায়ক ডলফাসের প্রতিমূর্ত্তি

কলেজের ছেলে এবং শিক্ষকেরা আমার সঙ্গে খুব অমায়িক ব্যবহার কোরতো। আমি ছাড়া এই কলেজে আরো কয়েকজন বিদেশী পোড়তো। আবিসিনিয়ার একজন নিগ্রো, শ্যাম রাজ্যের দুজন, স্পেনের একজন, ডেনমার্কের একজন। আমরা সকলে মিলে একটা আন্তর্জ্জাতিক সমিতি কোরেছিলুম। নিগ্রো ভদ্রলোক খুব রসিক ছিলেন — হাসিয়ে হাসিয়ে খুন কোরতেন।

তিনি বোলতেন পৃথিবীর অস্ত্র-সমস্যার সমাধানের ভার যদি আমাদের এই আন্তর্জ্জাতিক সভার হাতে দ্যায়, আমরা এক ঘণ্টায় সমাধান কোরে দোব। আর ঐ যে সব পাকা বুড়ো মাথা এক একটা দেশ পাঠাচ্ছে, ওর মানেই হোচ্ছে ওরা আসলে চায় জট পাকাতে। ঐ বড়োদের মুখে হাসি, ধর্ম্মের বুলি; আর ভেতরে কূট স্বার্থসিদ্ধির চাল।" সে তার দেশেরও নানা গল্প বোলত। তাদের রাজা তাকে এখানে চাষ শিখতে পাঠিয়েছিল।

ডেনমার্কের ছেলেটী মাঝে মাঝে এক একটা কাণ্ড বাধিয়ে আমাদিগকে খুব হাসাত। সে এখানে এসেছিল ইংরাজীটা ভাল করে শিখবে বোলে, কারণ, ডেনমার্কের ব্যবসা বেশী ইংলণ্ডের সঙ্গে। ছেলেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসার ছলে ব্লাডি (bloody) ও বাগার (bugger) কথাটা সে খুব শীগ্‌গির শিখেছিল এবং নিজেদের মধ্যে সে দেশের ছেলেরা কথা দুটো খুব ব্যবহার করে বোলে সেও সুযোগ পেলেই ব্যবহার কোরতো। একদিন সকাল-বেলা বেশ সূর্য্য উঠেছে। শীতের দিনে এটা একটা খুব আহ্লাদের বিষয়। সকলেই প্রথম সম্ভাষণে বলাবলি কোরছে "কি চমৎকার সূর্য্য উঠেছে।" সেও সকালে কলেজের অধ্যক্ষের (Principal) স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হোতেই বোলে উঠল "Good morning—What a bloody fine morning you see" (গুড্ মর্ণিং—কি ব্লাডি সুন্দর সকাল দেখছ)। ব্লাডি কথাটা আমাদের এখানেও অনেকে যখন-তখন চালান বটে, কিন্তু এটার ব্যবহার ভদ্র ইংরাজ মহলে খুবই নিন্দের বিষয়—এটা অতি ইতর ভাষা।

আর একদিন ডেইরী ক্লাসে (dairy) আমরা দুধ থেকে মাখন তুলছি। একসঙ্গে ৮।১০ জন আলাদা আলাদা মাখন-তোলা যন্ত্র (churn) ঘোরাচ্ছি। শিক্ষক মাঝে মাঝে সকলের যন্ত্র পরীক্ষা কোরছেন—কার কেমন হোচ্ছে। আমাদের সকলেরই শেষ হোয়ে গেল—ডেনমার্কের ছেলেটীর তখনো হয় নি। শিক্ষক বোল্লেন "কি হে মিগডাল, তোমার কি হোচ্ছে?"

সে মহা বিরক্তিভরে জবাব দিলে "I am turning the bloody churn but the bugger whey does not come out." (আমি 'ব্লাডি' চার্ণটা ত ঘোরাচ্ছি কিন্তু 'বাগার' ঘোল কিছুতেই আলাদা হোচ্ছে না।) তাকে বলা হোয়েছিল ও কথা দুটো বিরক্তির সময় বোলতে হয়—সূর্য্যোদয়ে আনন্দ প্রকাশের সময় নয়। তাই সে এই সুযোগে তার প্রয়োগ কোরেছিল শিক্ষকের সামনে।

এখানে কলেজে পড়ার চেয়ে খেলাকে নীচু আসন দেওয়া হয় না। বুধ ও শনিবার আদ্ধেক স্কুল—রবিবার ত ছুটীই। আদ্ধেক স্কুলের বাকী সময়টা এরা ফুটবল বা পিংপং কি বিলিয়ার্ড খেলে কাটাত। মাঝে মাঝে বড় উদ্ভট খেয়াল এদের মাথায় জাগত। একদিন আমি সন্ধ্যেয় বেড়াতে বেরিয়ে রাত্রি প্রায় ন'টায় হোষ্টেলে এসে দেখি সমস্ত হোষ্টেলটা জলে ভাসছে। বন্ধুরাও সেই ডিসেম্বরের দারুণ শীতে আপাদমস্তক জলে ভিজে এক একটা বাটী, গেলাস, মগ নিয়ে শ্রান্তভাবে স্নানের ঘরের দিকে চোলেছে—অনেকের মুখেই কালি। কোথাও যে আগুন লেগেছিল এতে আর সন্দেহ রইল না। একজনকে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা কোরলাম "কোথায় আগুন লেগেছিল?"

—"আগুন?"—সে বিস্মিত হোয়ে তাকিয়ে রইল। অপ্রতিভ হোয়ে বোল্লাম "মানে, তোমরা সব ভিজে কেন?"

—"ও! আজ আমাদের জলযুদ্ধ হোল যে। তুমি ছিলে কোথায়—ওঃ খুব বেঁচে গেছ দেখছি"—

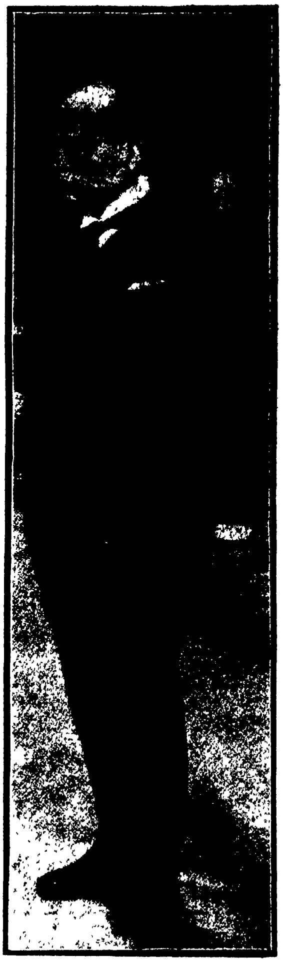
বোল্লাম "জলযুদ্ধ? অর্থাৎ—"

—"দক্ষিণ ও পশ্চিমের ব্লকের ছেলেরা আমাদিগকে দশ মিনিটের নোটীশ দিয়ে আক্রমণ কোরেছিল।" আমরা ওদের হোসে পাইপ দিয়ে এমন জল ঠেসেছি··ওরা খুব জব্দ হোয়েছে।"

—"তা তোমাদের চোখে মুখে কালি কেন?"

—"যে যা পেয়েছে সবাইকে মাখিয়েছে। আচ্ছা আসি এগুলো তুলে"—সে স্নানের ঘরের দিকে চোলে গেল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম—খুব সময়ে বেড়াতে যাবার ইচ্ছেটা জুগিয়ে দিয়েছিলে। এই ডিসেম্বরে ঐ জলযুদ্ধ কোরলে আর দেশে ফিরতে হোত না। আপনারাও হয় ত বাঁচতেন—এই দীর্ঘ লেখাগুলো আর মাঝে মাঝে কষ্ট কোরে পোড়তে হোত না। সেজন্যে ভগবানকে আপনারা দুষুণ; আমি কিন্তু ধন্যবাদই জানাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন পাশের ঘরের বন্ধুটী—একেবারে উলঙ্গ; হাতে একটা তোয়ালে। আমি অবাক হোয়ে তাকাতেই সে নির্ব্বিকার ভাবে বোল্লে "পিঠটা মুছে দাও ত ভাল কোরে। ওঃ! আজ খুব আমোদ হোয়েছে।"

সে বেরিয়ে যাবার জন্যে দরজা খুলতে দেখি, বারান্দা দিয়ে সার দিয়ে দিগম্বর বন্ধুর দল দৌড়োদৌড়ি কোরছেন। এটা ওরা বিশেষ দোষের ভাবে না। এক-একদিন ফুটবল ম্যাচের পর দেখতাম, দু'দলই স্নানের ঘরে একদম উলঙ্গ হোয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গা-হাত পরিষ্কার কোরছে। বছরের প্রথমে নতুন ছেলে যখন ভর্ত্তি হয়, তখন পুরোনো ছাত্রের দল তাদিগকে নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্যে গানের প্রতিযোগিতা করে। যারা ভাল গাইতে



Tassaud মিউজিয়ামে হিটলারের প্রতিমূর্ত্তি

পারলে তাদের ছুটী। যারা না পারে তাদিগকে অপারগতা হিসাবে খালি কোট বা শুধু পেণ্টুলান পোরে কিংবা উলঙ্গ হোয়ে কলেজের প্রাঙ্গণে প্যারেড কোরতে হয়—অবশ্য রাত্রে। বোলে রাখা উচিত—আমাদের কলেজে কোনো মেয়ে পোড়তো না। যদি কোনো দিন কোনো ছাত্রের কোনো বান্ধবী দেখা কোরতে আসত, সেদিন ছাত্রদের মাঝে উৎসাহের প্রবাহ দ্বিগুণ বেগে বইত। কেউ অনাবশ্যক চেঁচিয়ে পোড়ত, কেউ বেমাত্রা চেঁচিয়ে হাসত, কেউ বা হতাশের গান ধোরত, কেউ দিত শিস্। ও জিনিষটা সার্ব্বজনীন।

খ্রীষ্টমাসে কলেজে ভোজ হোল ও একদিন নাচ এবং ছেলেদের থিয়েটার হোল। থিয়েটারে ছাত্র, অধ্যক্ষ, অধ্যক্ষের স্ত্রী ও অধ্যাপকেরা একসঙ্গে যোগ দিলেন। অধ্যাপকদিগকে ছাত্ররা যথেষ্ট সম্মান কোরতো; কিন্তু সম্মানের

মাত্রা ছিল এখান থেকে অন্য ধরণের। ক্লাসের মধ্যে শিক্ষক বা ছাত্র কেউই সিগারেট বা পাইপ খেত না; কিন্তু বাইরে পরস্পরের সামনেই ওসব চোলত এবং বিনিময়ও হোত। জল-যুদ্ধের পর হোষ্টেলের ওয়ার্ডেন ছেলেদিগকে তলব কোরলেন—জলযুদ্ধ করার জন্যে নয়—জলযুদ্ধের পর হোস-পাইপ যথাস্থানে রাখা হয় নি এবং হোষ্টেলের উঠানের ঘাস নষ্ট হোয়েছে, এই জন্যে। জরিমানা হোলো প্রত্যেকের এক শিলিং কোরে। কলেজ মাসিকে পর মাসে প্রকাশিত হোল "We had a nice water-fight on 3. 12. 33; but the monkey from the hedgehorn said, "you can't enjoy without paying for it." (৩. ১২. ৩৩ তারিখে আমাদের চমৎকার জলযুদ্ধ হোয়েছিল; কিন্তু হেজহর্ণের (কাঁটা গাছ বিশেষ) ওপর থেকে বাঁদর বোল্লে "পয়সা না দিয়ে আমোদ কোরতে পাবে না।" আমি অবাক হোয়ে জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম "এ কি লিখেছ—ওয়ার্ডেন এতে চোটবে না?" সম্পাদক বোলেছিল "কেন চোটবে? ও ত বিশুদ্ধ তামাসা।" এমনি ধরণের আরো অনেক তামাসা কোনো যুবক অধ্যাপকের প্রণয়কাহিনী নিয়ে, কলেজের নতুন আইনকে আক্রমণ কোরে কলেজের কাগজে প্রকাশিত হোয়েছিল। তাতে অপর পক্ষকে অসন্তুষ্ট হোতে দেখি নি। তামাসাকে ওরা ঠিক তামাসা ভাবেই নেয়। যাক্, কলেজে খ্রীষ্টমাসের কথা বোলছিলাম বছরের মধ্যে এই একদিন কেবল কলেজে নাচবার হুকুম আছে। অন্যান্য কলেজে আরো ঘন ঘন নাচের আসর বসে; কারণ, সাধারণতঃ সেখানে মেয়েরাও পড়ে।

বন্ধুরা বোল্লেন "নাচবে ত?"

বোল্লাম "আমার ত প্রিয়া (fiance) নাই।"

—"জুটিয়ে দেব, ভাবনা কি?"

প্রশ্ন কোরলাম "অর্থাৎ—"

—"নিউটন এ্যাবট থেকে একটা ধোরে নিয়ে এস।"

—"মাপ করো ভাই—প্রবৃত্তি হয় না।"

একজন বন্ধু বোল্লেন "আমার প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দোব, নেচ। তোমার নাচের ভাবনা—আমাদের সবারই প্রিয়া তোমার সঙ্গে নাচবে।"

এই একটী দিন কলেজে আধা প্রকাশ্যভাবে মদ প্রবেশ করে দেখলাম। সস্ত্রীক অধ্যাপকেরা, ছাত্রেরা ও তাদেরো প্রেয়সীর দল একসঙ্গেই নাচে। নাচটাকে প্রথম প্রথম আমি বেশ সুদৃষ্টিতে দেখতে পারি নি। কিন্তু পরে দেখেছিলাম এটা একটা সামাজিক ব্যবহার ও রীতি। আমরা—যারা মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে অভ্যস্ত—ভাবি, কোনো মেয়েকে জড়িয়ে ধোরে নাচলে—তার স্পর্শ শিহরণ চাঞ্চল্য জাগাবেই; এবং কোনো মেয়ে ভ্রষ্টা না হোলে এ ভাবে নিজেকে পরপুরুষের কোলে ছেড়ে দিতে পারে না। এই আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। অবশ্য এই নাচের মাঝেই প্রেমগুঞ্জন চলে এবং নাচের পরিচয়-সূত্র থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়ে পর্য্যন্ত হয়; কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে, এ দেশের একটা পুরুষ বা নারী অন্ততঃ জীবনে কম কোরে পাঁচশো নারী বা পুরুষের সঙ্গে নাচে এবং সকলেই তারা আত্মদান করে না। নাচঘরে যে-কোনো পুরুষ এসে নাচতে চাইলেই নারীকে তার সঙ্গে নাচতে হয়—এ-ই রীতি। কিন্তু তাই বোলে সব পুরুষ স্পর্শেই তাদের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয় না। আমাদের যেমন রীতি—বিয়ের পরদিনই বৌদির সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা কোরতে পারি; তাতে কোনো পক্ষই কুণ্ঠিত হই না; অথচ অন্য নারীর সঙ্গে তেমন ঠাট্টা কিছুতেই করতে পারি না। বিয়ের আগের দিন বৌদিও ছিল পর। কিন্তু বিয়ের পরদিনই, যেই সে বৌদি হোল, অমনি প্রথামত তার সঙ্গে ঠাট্টা কোরতে পারি বোলেই ঠাট্টা কোরতে দ্বিধা বোধ করি না। এও তেমনি প্রধানতঃ রীতির ওপর নির্ভর করে। সেদিন নাচে অধ্যক্ষের ও শিক্ষকদের স্ত্রীরা ছাত্রদের সঙ্গে নাচলেন —ছাত্রদের প্রেয়সীরা অধ্যাপকদের সঙ্গে নাচলে। যদি এটা ওরা দোষের ভাবত তাহোলে কিছুতেই তা কোরতে পারতো না। এক বন্ধু আমায় বোলেছিল আমার মা আমায় নাচ শিখিয়েছে—আমরা মা, বোন, ভাই, বাবা একসঙ্গে নাচি—ওতে দোষ কি? তাই বোলে সব নাচ একসঙ্গে নাচা চলে না।"

ও-দেশের সামাজিক জীবনের অনেক দোষগুণ আমরা আজকাল সিনেমার পর্দ্দায় দেখতে পাই। তবে পর্দ্দায় প্রেমটা যত সহজ, কাজে ঠিক ততটা সহজ নয়—যদিও আমাদের সমাজের চেয়ে সহজসাধ্য। মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছার মূল্য আছে—তারা কতকাংশে স্বাধীন। তার ওপর

পুরুষদের সঙ্গে সমানে এবং বাঁধা না পোড়ে ভোগের ইচ্ছাটাও ওদের সমাজে ক্রমশঃই বাড়ছে। কাজেই পুরুষ ও নারী পরস্পরের কাছে অনেকটা সহজলভ্য। কিন্তু এখনও তারা পশুত্বের পর্য্যায়ে পৌঁছয় নাই; কাজেই সিনেমায় যে ট্রেণে যেতে যেতে বা এ্যাক্সিডেন্ট হোয়ে কিংবা ঘাড়ে ময়লা ফেলে দিয়ে প্রেম জমে, আসলে ঠিক তা নয়।

লণ্ডনে ফিরে এসে আমি ১১২নং গাওয়ার ষ্ট্রীটে না উঠে আলাদা ঘর ভাড়া কোরেছিলাম। দক্ষিণা—ঘর ও সকালের জলখাবার দৈনিক পাঁচশিলিং। অবস্থানের তারতম্য অনুসারে ঘরের ভাড়ার কম-বেশী হয়। বেশী দিন থাকলে অনেক সস্তা হয়। আমি যে বাড়ীটাতে ছিলাম, সেটার মালিক একটী প্রৌঢ়া ও যুবতী। প্রৌঢ়া রান্নাবান্না কোরতেন—যুবতীটী খাবার দেওয়া, ঘর পরিষ্কার করা এই সব কোরত। এমন কি, ভোর বেলা দরজার বাইরে রাখা জুতো শুদ্ধ পরিষ্কার কোরত। অথচ তারাই বাড়ীর মালিক। কাজের পর যখন সাজান ড্রয়িংরুমে তারা বোসে থাকত, কার সাধ্য ভাবে যে এরা জুতো সাফ করে বা রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলে। লণ্ডনের ভেতরে বা বাইরে যাঁরা পরিবারের মধ্যে বাস করেন, তাঁদের কিছু সস্তা পড়ে—অনেক সময় মায়ের স্নেহ, ভগ্নীর যত্নও তাঁদের ভাগ্যে মেলে। দশ থেকে বারো পাউণ্ডে ভারতীয় ছাত্রের মাস চলা উচিত।

কাহিনী বড় দীর্ঘ হোয়ে পোড়ছে—মানুষের প্রতিটী দিনের সুখ-দুঃখের কাহিনীই কত;—এ ত মাসের পর মাসের, কাজেই সব ত বলা যাবে না। এবার লণ্ডনের প্রমোদজীবন সম্বন্ধে বোলেই এ মাসের মত আপনাদিগকে রেহাই দোব। লণ্ডনের সিনেমা সাধারণতঃ বেলা বারোটা থেকে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে চলে। এর মধ্যে যখন যার খুসী ঢুকতে বা বেরুতে পারে। কেউ যদি সারাদিন না বেরোয় কেউ তাগাদা দেবে না—অনেক সময় অনেক বেকার লোক কিছু রুটী মাংস কিনে নিয়ে গিয়ে সারাদিন সিনেমাতেই কাটিয়ে দেয়। অনেক সিনেমা কেবল জগতের সংবাদ দেয়, আর কিছু দেখায় না। থিয়েটারকেও সাধারণতঃ দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—ভ্যারাইটী শো, আর নাটক অভিনয়। থিয়েটারেও সিনেমার মত যবনিকার ওপর ছায়াচিত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চগুলি এটা কোরতে পারেন। আইনানুসারে প্রত্যেক থিয়েটারে "সেফ্‌টী কার্টেন (Safety cu tain)" আছে—সেটী একবার দর্শকদের সামনে নামাতে ও তুলতে হয় ঠিক আছে দেখবার জন্যে। চিলড্রেন-ইন-ইউফর্ম্ম (children in uniform) ও কয়েকটী ঐ ধরণের সামাজিক বই 'অত্যাশ্চর্য্য সংযত' ও সরলভাবে অভিনীত হোতে দেখেছি। আবার "হোয়াইল পেরেণ্টস স্লিপ (While parents sleep)" প্রভৃতি কয়েকটি বইএ অশ্লীলতার চূড়ান্ত দেখেছি। ষ্টেজের মধ্যে নায়িকা যে ভাবে একটার পর একটা বহিরাবরণ খুলতে থাকে তাতে ও-দেশের দর্শকই চীৎকার কোরে ওঠে। তবে অভিনয় অপূর্ব্ব! ক্যাসানোভা (Casanova) এবং ঐ ধরণের কয়েকটী পৌরাণিক নাটকে দৃশ্যসজ্জার অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখেছিলাম। একটি গোটা মেলা ষ্টেজে দেখিয়াছিল। ষ্টেজটী ধীরে ধীরে ঘুরছে আর মেলার নূতন নূতন দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হোচ্ছে। ষ্টেজের মধ্যে অন্ততঃ একশো লোকের ভিড় জমিয়েছিল; অথচ তারা সকলেই সুসঙ্গত সংযত অভিনয় কোরেছিল। ষ্টেজের মধ্যে একটী পাঁচ ছ তলা বাড়ী ঢুকিয়েছিল। তার প্রত্যেক তলাতেই লোক চলাচল কোরে দৃশ্যটীকে সত্যকার বাড়ী বোলে ভ্রম ধরিয়ে দিচ্ছিল।



কলেজের মোটরসাইকেল দৌড় প্রতিযোগিতা

"ভ্যারাইটী শো" বা পাঁচমিশেলী প্রদর্শনীগুলোও বেশ চমৎকার। নাচগান, হাসিঠাট্টা, ব্যঙ্গ অভিনয়, নকল, শারীরিক কৌশল—সবই দেখায় ওপরে একটা নাটকীয় আবরণ রেখে। আমাদের দেশে শুধু নাচের বৈঠক বা আবৃত্তির আসর না বসিয়ে যদি এমনি 'ভ্যারাইটী শো' দেখানোর ব্যবস্থা হয়, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই চোলবে। আসল কথা প্রযোজনা ও শিক্ষা। একঘেয়েমী ভেঙ্গে দিতে পারলেই হবে। নেহাত সেকেলে কোমরদোলান নাচ আর ঠুংরী কি গজলে চলবে না। যাদুকর, যন্ত্রশিল্পী, নৃত্যবিদ্, ব্যায়ামবীর, সব রকম মিশিয়ে দল তৈরী কোরতে হবে এবং তারা একলা একলা নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবে না। এমন এক একটা নাটক বা দৃশ্য অভিনীত হবে যার মধ্যে তাদিগকে সকলকে ঢোকাতে পারা যায়। তাতে নাটকের পরিণতি বা ঘটনাসংস্থান ব্যাহত হয় হোক; কিন্তু যোগসূত্র রেখে এবং রস বজায় রেখে অভিনয় কোরলেই জমবে। শারীরিক কসরতকে শুধু কসরত হিসাবে ওরা দেখায় না—তার ওপরে থাকে সঙ্গীতের একটা আবরণ। যন্ত্রের তালে তালে ওরা নানা কসরত দেখায়, যেটাকে সঙ্গীতের তালের অভিব্যক্তি বোলে মনে হয়। ওদের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, যতই কষ্টসাধ্য কসরত দেখাক, মুখের হাসিটী অম্লান রাখতে হবে; কারণ, রঙ্গমঞ্চ হোল আনন্দের আসর। ও-দেশের ভ্যারাইটী শো যাঁরা দেখেন নি, তাঁদিগকে লিখে এ জিনিষটার রস বোঝান কঠিন। কিন্তু যেসব শিল্পী ও-দেশে দেখে এসেছেন তাঁরা এইরকম আসরের আয়োজন করেন না কেন? এই 'ভ্যারাইটী শোতে' একটী জিনিষে বেশ নূতনত্ব ছিল। একটী অভিনেত্রী কোনো বিখ্যাত পৌরাণিক কাহিনী মঞ্চের ধারে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি কোরতে লাগলেন; আর মঞ্চের মাঝে অপর একটী মঞ্চে অভিনেতারা মূকভাবে দৃশ্যগুলি অভিনয় কোরে গেলেন। আর একদিনের একটী দৃশ্য। প্রথমে রাণীর পরিচারিকা এসে গান গেয়ে গেল। তার পর সে-ই রাণী সেজে আবার ভিন্ন স্বরে গান গাইলে। তার পর সেই হোল রাণীর প্রণয়ভিখারী—পুরুষবেশে সেই গান গাইলে পুরুষের গলায় এবং পরে প্রকাশ পেলো যে সে আসলে পুরুষই অথচ স্ত্রীভূমিকায় একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে সে আশ্চর্য্য অভিনয় কোরেছিল। এ ছাড়া প্যারিসিয়ান ব্লণ্ডির (blonde) নাচ, ট্যাপ ডান্স (Tap dance), জোড়া নাচ এ সব ত আছেই। "অবিরাম প্রদর্শনী" (non stop revue) ও "ভ্যারাইটী শোর" জ্ঞাতি-ভাই।

নাটকে প্রত্যেক অঙ্ক অভিনয়ের পর সেই অঙ্কে যারা অভিনয় কোরেছে তারা একসঙ্গে দর্শকদিগকে ষ্টেজ থেকে অভিনন্দন জানায়। আর বই শেষে সকলে মিলে ষ্টেজে এসে ঘনঘন করতালির মাঝে ঘাড় নেড়ে, মেয়েরা ঈষৎ ঘাগরা তুলে ও ঘাড় নামিয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়—মরা সেপাইরাও বাদ পড়ে না। অনেক সময় অভিনয়-শেষে অভিনেতারা ষ্টেজ থেকে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বা ষ্টেজ থেকে নানারের বেলুন বা লাল নীল কাগজ ছোড়ে। তিন ঘণ্টার বেশী সাধারণতঃ অভিনয় চলে না। টিকিট ঘরে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি নেই—দুজন দুজন কোরে সারবন্দী দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যে যখন আসবে পর পর দাঁড়াবে। অনেক সময় আধঘণ্টা ধোরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অনেকে খবরের কাগজ পড়ে এই সময়। সিনেমা বা থিয়েটারে প্রায় সর্ব্বত্রই ভেতরের স্থাননির্দ্দেশক মেয়েরা —এদের অনেকেই অদ্ভুত রকমের পায়জামা পোরে থাকে। লণ্ডনে প্যারী বা বার্লিনের তুলনায় নাচঘরের সংখ্যা অল্প তা পূর্ব্বেই বোলেছি। রাত্রি দশ এগারটার পর সহরের বাহ্যজীবন প্রায় শান্ত হোয়ে আসে। যেসব শিকারী বেড়াল তখনও শিকার পায় না, তাদেরই দু'একজনকে রাস্তার ধারে দেখা যায়। এছাড়া লণ্ডনের নৈশ জীবনের অন্য কোনো সন্ধান আমি পাই নি।





কর্ণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাস

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

"মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়—"

শ্রীরাধারাণী দেবী

জীবনকুঞ্জের দ্বারে হানে কর মৃত্যু বারে বারে
আমারে সে চায় !

কায়াশূন্য ছায়া তার ক্ষণে ক্ষণে যেন অন্ধকারে
ত্রস্তে সরে যায় ।

শ্রবণে ঘর্ঘরে' তার আগমনী-রথচক্রধ্বনি,—
বাজে বজ্রভেরী !

সচকিত চিতে ভাবি, লইবারে এলো কি এখনি ?
—নাহি তবে দেরী ?

অসংখ্য সুদীর্ঘনিশা যাপি' একা তন্দ্রাহীন আঁখি
নিত্য ক্লান্তিভরে !

তাহারি প্রতীক্ষা লয়ে প্রতিক্ষণে পথ চেয়ে থাকি
বিমুখ অন্তরে !

নিয়ত সম্মুখে হেরি অবিরাম দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম
জীবনে মরণে !

আশঙ্কা-উদ্বেগ ভরে ভগ্নতনু মাগিছে বিশ্রাম
স্রষ্টার চরণে !

মৃত্যুর ভৈরবমূর্ত্তি দেখা দেয় সহসা সম্মুখে,
স্পর্শ তার হিম !

টেনে আনে অকস্মাৎ প্রলয়ের অন্ধকার বুকে
নীরন্ধ্র নিঃসীম ।

রাত্রি পরে রাত্রি গণি' দিন শেষে দিন গণে' যাই,
গণি' দণ্ড পল ;

রুদ্ধশ্বাসে যুঝি নিত্য, এ' যুদ্ধের বুঝি শেষ নাই,
—সর্ব্বাঙ্গ বিকল ।

জীবন প্রভাতে এই আনন্দের উজ্জ্বল উষায়
কালের আহ্বান

ম্লান করে দেয় মোর উৎসবের অরুণ ভূষায়,—
থেমে যায় গান ।

ব্যথিত বিস্ময়ে ভাবি মানবের শক্তি কত ক্ষীণ
নিয়তির করে

ক্ষুদ্র প্রাণতরী লয়ে কী দুর্ব্বল অসহায় দীন,
—জীবন সাগরে ।

ব্যগ্রবাহু বিস্তারিয়া অন্তহীন ব্যাকুল প্রয়াসে
প্রিয়জনে চায়

ধরিয়া রাখিতে তার স্নেহে প্রেমে আপনার পাশে
ধরার ধূলায় ।

অক্লান্ত সাধনা লয়ে অবিশ্রান্ত একান্ত আগ্রহ,
সেবা অনলস

ব্যর্থ করিবারে চাহে মোর মহাযাত্রা অহরহ,
দৈবে করি বশ ।

যদিও জীবনদীপে পরিপূর্ণ প্রাণশিখা জ্বলে
আমি জানি, তবু

ফুৎকারে নিভিয়া যাবে এ'প্রদীপ আঁধার অতলে
অকস্মাৎ কভু !

শিয়রে দাঁড়ায়ে কাল বজ্রকণ্ঠে গর্জ্জে—"চলো চলো
অবসর নাহি !—"

সম্মুখে মিনতিনতা ধরিত্রীর আঁখি ছলোছলো
মোরি মুখ চাহি ।

দিগন্তে গোধূলিলগ্নে অস্তরাগে জাগে বর্ণচ্ছটা
শান্ত নদীতটে,
আচম্বিতে ঢাকে তাহা কালবৈশাখীর ঘনঘটা।
ধৌত নভপটে
পুষ্পশুভ্র বলাকার শ্রেণীবদ্ধ পক্ষবিধূনন
অভ্র মেঘলোকে—
অনির্দ্দেশ তীর্থপানে যাত্রা মোর করায় স্মরণ
প্রদোষ আলোকে।

ঝিল্লিমন্ত্র মুখরিত স্তব্ধরাতে চাঁপার সৌরভ
উন্মত্ত উল্লাসে
বাতায়নে ছুটে এসে এ'মর্ত্ত্যের অমর্ত্ত্য গৌরব
ভাষে কলোচ্ছ্বাসে!
শারদ রজনী শেষে ঝরা শেফালীর অশ্রুভরা
সকরুণ গান,—
আমার শ্রবণে যেন বহে' আনে আলোড়িয়া ধরা
বিদায়-আহ্বান।

অনন্ত ঐশ্বর্য্যদীপ্ত বসন্তের মধু-মহোৎসব
গীতি গন্ধময়;
মেঘ-মাদলের রবে বাদলের বিচিত্রবৈভব
করে চিত্তজয়
আশ্বিনের আঙিনায় আলোকের সুবর্ণনূপুর
রণরণি' বাজে!
নির্ঝর-নটীর নৃত্যে তরঙ্গিয়া ওঠে সে কী সুর
গিরি মর্ম্মমাঝে।

শ্যামা বসুধার বুকে বিচ্ছেদের মহালগ্ন মোর
ঘনাইছে যত,—
ততই আমারে এই অখিলের আকর্ষণ ঘোর
টানিছে নিয়ত।
তারি মাঝে শঙ্কাকুল সকরুণ শান্ত আঁখি দুটি
হারাইয়া দিশা,
আর্ত্ত অসহায় হেন সকাতরে মোরি মুখে লুটি
রহে দিবানিশা।

আমার চিত্তের নৃত্য অন্তরের আনন্দের গান
পূর্ণ প্রাণলীলা
মৃত্যুর কঠিনশিলা বারম্বার করি খান্ খান্
বহিছে উর্ম্মিলা!
দুর্জ্জয় দুঃসহ ব্যাধি বাধা দেয় অবিরত তার
স্রোতের গতিরে!
দলি' সে উপলদল অবিচল প্রাণ-অভিসার—
না মানি ক্ষতিরে।

জীবন-যজ্ঞাগ্নি মোর ম্লান যেন নাহি হয় কভু,
এই শুধু চাই।
নিভুক বাহিরে দীপ, অন্তরের দিব্যালোকে তবু
কোনো দৈন্য নাই।
প্রাণের অমৃত দিয়া মৃত্যুরে করিব আমি জয়
মর-ধরণীতে!
প্রেমের দুর্লভস্বর্গে র'ব নিত্য অজয় অক্ষয়
ভাষাহীন গীতে।



নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

১

নতুন বর্ষা নামছে। আকাশের প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে মেঘে মেঘে। কোমল কাজলের ছায়ায় রৌদ্রের দাহ কমে গেল। বাণীপদ কবিতা লিখতে সুরু করেছে। সম্ভবত তাকে কেন্দ্র করেই ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটে।

দৈনিক কাগজের দপ্তরে লোকনাথ সহ-সম্পাদকের কাজটা পেয়েছে। প্রেস-টেলিগ্রামের বাংলা অনুবাদ করা তার কাজ। মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় কলমে তাকে রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখতে হয়। রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি দেওয়ায় তার হাত নাকি মন্দ নয়।

চাকরি হবার কিছুদিন পরে মাসিক বেতনের কিয়দংশ অগ্রিম নিয়ে লোকনাথ দেশ থেকে তার স্ত্রীকে এনেছে। থাকে পটুলডাঙার এক বস্তির ধারে। দুখানা করোগেটের ঘর ভাড়া নিয়েছে। একদিন তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রে স্ত্রীর হাতের রান্না খাওয়ালো। পল্লীগ্রামের মেয়ে, রান্না ভালোই জানে। কিন্তু তার স্ত্রীকে দেখে জগদীশ ভারি চ'টে গেল। অনুরক্ত স্বামীর মুখে স্ত্রীটির সম্বন্ধে নানা অতিশয়োক্তি আমরা দীর্ঘকাল ধরে শুনে এসেছি,—সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা ইত্যাদি নানা ধারণা হয়ে আছে,—সেদিন দেখা গেল কিছু তার বিপরীত। নাম পুষ্পরাণী। সুন্দরী সে নয় কিন্তু খর্ব্বকায়া। দেহের অন্যান্য গৌরবের মধ্যে মাথায় চুল আছে অনেক।

সেদিন আমরা পাঁচ ছ' জন বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলাম। সবাইকে প্রথমে একসঙ্গে দেখেই পুষ্পরাণী চোখ টিপে পাশের ঘরে লোকনাথকে ডেকে নিয়ে গেল। চাপা তিরস্কার ক'রে বললে, এমনি কল্লেই কল্‌কাতায় থাকা হয়েছে! এত লোককে খাওয়াবো কোত্থেকে শুনি? দেনা শুধবে কে?

লোকনাথ বললে, চুপ চুপ, কত আর খাবে ওরা? বন্ধু নিয়েই ত আমার সংসার!

তবে বন্ধুদের নিয়েই থেকো, আমাকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়ো। আসবার সময় আমার বাবা কি ব'লে দিয়েছেন শুনি? ছেলেপুলে হ'লে মানুষ করতে হবে না?

ছেলেপুলে যেন না হয়!—ব'লে লোকনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে সটান্ আমাদের মাঝখানে এসে ব'সে পড়ল। পুষ্পরাণীর মুখ তখনো আমরা দেখিনি, কেবল্ আসা-যাওয়ার সময় তার কাপড়ঢাকা চেহারাটা লক্ষ্য করেছি। জানিনে দেখবার কোনোদিন প্রয়োজন হবে কিনা। দ্রষ্টব্য বস্তু সে নয়।

এর পরেও অন্নগ্রহণের জন্য আমাদের অপেক্ষা ক'রে থাকতে হোলো, যেমন করেই হোক বিনামূল্যে একবেলা খেতে পাওয়াটা আমাদের কাছে খুব বড় কথা। গৃহকর্ত্তা যখন ঠিক আছে, তখন গৃহিণীর অনাদরটা গায়ে না মাখালেও চলে। আদর-আপ্যায়ন কি আর সব জায়গাতে মেলে?

জগদীশ অস্বাভাবিক পরিমাণ আহার করতে লাগল, স্ত্রীলোকের হাতের রান্না পেয়ে সে যেন দীর্ঘদিনের ক্ষুধা মিটিয়ে নিচ্ছে। এক সময় লোকনাথের দিকে মুখ তুলে সে বললে, কই রে, তোর স্ত্রী আমাদের পরিবেষণ করলেন না?

বঙ্কিম বললে, আমরা যে সবাই ওঁর ভাসুর হই, সামনে বেরোবেন কেমন ক'রে?

পাশের ঘর থেকে পুষ্পরাণী কি একটা মুখের শব্দ ক'রে উঠ্‌ল। শব্দটা অত্যন্ত অশোভন এবং অভদ্র। লোকনাথের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল। আমাদেরই পাশে বসে মাথা হেঁট ক'রে ভাতগুলো সে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

জগদীশের মুখে কৌতুক আর আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। সে বললে, ভাসুর আমরা সবাই কিন্তু সুযোগ বুঝে তোর ত দেওর হবার অভ্যেস আছে বঙ্কিম!

বঙ্কিম বললে, সেটা পাত্র বুঝে, নৈলে বেকায়দায় পড়লে আমি দিব্যি ভাসুর-মামাশ্বশুর সাজতে পারি।

সেদিন আহারাদির পর রাস্তার কলে আঁচিয়ে আমরা সরে পড়েছিলাম। পথে বঙ্কিম একসময় হেসে বলেছিল,

কিন্তু যাই বল, লোকনাথ যে বল্‌ত ওর স্ত্রী সত্যি চরিত্রবতী তাতে আর সন্দেহ নেই। পরপুরুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন না।

পুষ্পরাণীর প্রথম দিনের ব্যবহারেই জগদীশ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছিল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, মুখ দেখতে গেলে দেখাবার মতো মুখও হওয়া চাই।

গণপতি এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটিও কথা বলেনি। এইবার বললে, খেয়ে দেয়ে এসে নিন্দে কেন জগদীশ? কারো কোনো অন্যায় হ'লেই তোমরা তাড়াতাড়ি শাস্তি দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠো, কেন বল ত?

জগদীশ বললে, সময় বড় অল্প, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। পুষ্পরাণীর কথা আজকেই মনে রাখ্‌ব, কাল আর তাকে নিজের মনেই খুঁজে পাব না।

তাকে নিয়ে এত আলোচনাই বা হয় কেন? এ কথা ত ঠিক, সে আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী?

আমার শ্যালকের স্ত্রী!—জগদীশ উত্তেজিত হয়ে বললে, এই হতভাগার জন্যেই ত এত কাণ্ড। ও আমাদের ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দিয়েছে। স্ত্রীর নামে কতকগুলো বিশেষণ জুড়ে দিয়ে লোকনাথ তাকে একেবারে স্বর্গের দেবী বানিয়ে ছেড়েছিল, আজ দেখি দেবী আমাদের নিতান্তই মানবী। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আতিশয্য প্রকাশ করা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনোরূপ বিরুদ্ধ আলোচনা করা গণপতির রুচিতে বাধে। জগদীশের মন্তব্য শুনে সে চুপ ক'রে রইল।

সেদিন কি একটা ছুটি উপলক্ষ্যে গণপতির আফিস নেই, তাকে যখন পাওয়াই গেল তখন দিনটা মন্দ কাটবে না। সে ছাড়া আমরা সবাই বিখ্যাত বেকার। লোকে যা বলে বলুক কিন্তু কর্ম্মহীনতাটাই আমাদের বিলাস। সত্যকারের স্বাধীন আমরাই। সংসারে কোনো দায়িত্বের বোঝা বহন করিনে। বিশ্বাস করিনে কিছু। সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভিতর দিয়েই আমাদের পথ। নিজেদের জীবনকে পর্য্যন্ত আমরা মাঝে মাঝে বিদ্রূপ ক'রে উড়িয়ে দিই।

কথা হোলো, সিনেমায় যাওয়া হবে, একটা ভালো ছবি এসেছে। কিন্তু তার আগে অর্থসংগ্রহ করা দরকার। অর্থ দেবে কে? বাজারে আমাদের এমন কোনো ক্রেডিট্ নেই যে, গোটা দুই টাকা ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু অর্থ আজ চাই-ই চাই। আজ আমাদের উদরান্নের যতখানি প্রয়োজন, ঠিক ততখানি প্রয়োজন সিনেমা দেখার। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা হোলো, জীবনকৃষ্ণের কাছে গিয়ে মিথ্যা অজুহাতে উক্ত পরিমাণ অর্থ আদায় করতে হবে। মিথ্যা বলতে বাধবে এমন কাপুরুষ আমরা নই।

এমন সময় বৃষ্টি নাম্‌ল। ভিজতে ভিজতে গিয়ে আমরা আশ্রমে উঠলাম। জগদীশ, বঙ্কিম, গণপতি, আমাদের নতুন বন্ধু শম্ভু, মুণ্ডিতমস্তক প্রভাত এবং আমি। ভিতরে কি একটা গোলমাল চলছিল, সবাইকে ঢুকতে দেখে জীবনকৃষ্ণ তাদের থামিয়ে দিলেন। আমাদের দলটা বেশ ভারি হয়ে উঠেছে।

গোলমাল এখানে নিত্যই একটা কিছু লেগে থাকে। তবু আজকেরটা একটু যেন অন্য ধরণের। ওদিকের ঘরের দরজার চৌকাটে প্রিয়ম্বদা মাথা হেঁট ক'রে বসে রয়েছেন, আমাদের দেখেও তিনি মুখ তুললেন না। বঙ্কিম তাঁর দিকে তাকিয়ে কেবল নিঃশব্দে একটু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমরা জানি, বঙ্কিমের সঙ্গে আগে প্রিয়ম্বদার কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল, সম্প্রতি কি একটা কারণে মনোমালিন্য ঘটেছে। কারণটা কি জিজ্ঞাসা করতে বঙ্কিম হেসে বলেছিল, ব্যাপারটা ঈর্ষামূলক, খুলে একদিন বল্‌ব ঘটনাটা। কিন্তু ঘটনাটা আর শোনা হয়নি। সংসারে এমন ঘটনা অনেক ঘটে যা শোনার চেয়ে অনুভব ক'রে নিলে গোপন তত্ত্বটা সহজে অনুধাবন করা যায়।

জগদীশ সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সটান ব'লে উঠ্‌ল, স্বামীজি, কিঞ্চিৎ অর্থের দাবি আছে। সেদিন চৌধুরী মশাই বজবজে হিন্দুসভায় যে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন, তার গাড়ীভাড়াটা তিনি পাননি। আজ চেয়ে পাঠালেন।

আশ্চর্য্য মিথ্যাকথা সে ব'লে গেল, কোথাও বাধল না। আমরা হাসি চেপে সবাই ঘরে গিয়ে উঠলাম। জীবনকৃষ্ণ বললেন, আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো, যাচ্ছি। ভালোই হোলো, ভাবছিলুম টাকাটা তাঁকে পাঠিয়ে দেবো।

জগদীশ নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের সঙ্গে আমাদের কাছে এসে বসল। বললে, চুপ, যেন জানতে না পারে। পাঁচটা টাকা আজ ঠিক বাগাবো। ছ'টায় আরম্ভ, নয়?

শম্ভু বললে, হাঁ। আমি আগে গিয়ে টিকিট করব।

বৃষ্টিটা কিন্তু থাম্‌ল না, ঝিম ঝিম ক'রে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে। পাঁচটি টাকার সুখস্বপ্নে আমরা সবাই মশগুল। একসঙ্গে এতগুলি টাকা আমরা অনেকদিন দেখিনি। গত কয়েকদিন বঙ্কিম আমাদের জন্য প্রচুর খরচ করেছে। আমাদের কাছে যেই আসুক তাকে কিছু অর্থব্যয় ক'রে যেতেই হবে। এদিকে মদ্যপান ও আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য যখন বঙ্কিম কখনো কখনো নিরুদ্দেশ হয়, তখন আমরা মহাবিপদে পড়ি। জগদীশের মুখ শুকিয়ে যায়, ধনীকে মাঝে মাঝে শোষণ না করলে তার মনের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

এমন সময় বাইরে মস্‌ মস্‌ ক'রে জুতার শব্দ হোলো। একটি ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকে ভারী এবং রুক্ষ গলায় বললেন, কই, আছ নাকি এখানে?

প্রভাত বললে, ওই রে, সেনগুপ্ত এসেছে। আজ এক চোট হবে দেখছি।

সেনগুপ্তর অর্থ অবিনাশবাবু, প্রিয়ম্বদার স্বামী। লোকটির বয়স চল্লিশের উপরে, কালো, স্থূল দেহ, মাথার সুমুখের দিকটায় টাকপড়া। অবিনাশবাবুর অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। জীবনকৃষ্ণ গলা বাড়িয়ে বললেন, আসুন, উনি আছেন এখানে। আপনাকে অনেকদিন দেখিনি অবিনাশ বাবু। কেমন আছেন?

ভদ্রলোক দালানের উপর একখানা চৌকিতে এসে বসলেন। বাইরে তাঁর প্রতীক্ষমান মোটরের শব্দ শোনা গেল। আমরা সকলে সজাগ হয়ে বসলাম। মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়েছি।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, আপনি আবার এলেন কষ্ট ক'রে?

কি করব বলুন।—সেনগুপ্ত এইবার উত্যক্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এমনি ক'রে বাড়ীঘর ছেড়ে উনি চ'লে এলে ত চলে না। আমাকে আসতেই হোলো!

প্রিয়ম্বদা তীব্রকণ্ঠে বললেন, আসতে বলেছিল কে, শুনি? আমি কি হারিয়ে গেছি, না জাহান্নমে গেছি! কত কাজ আমার বাইরে, ঘরে ব'সে থাকলে আমার ত চলবে না!

কিন্তু তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়ালে আমারই কি চলবে?—সেনগুপ্ত উষ্ণকণ্ঠে বললেন,—গেলুম চ্যাটার্জ্জির বাড়ী, সেখানে নেই। সেখান থেকে গেলুম হেমনলিনী দেবীর ওখানে, সেখানেও পাওয়া গেল না। ওদিকে ছোট ছেলেটা সারাদিন কান্নাকাটি লাগিয়েছে। আমার কি এ সমস্ত ভালো লাগে? আর কি কোনো কাজ নেই?

প্রিয়ম্বদা বিদীর্ণ কণ্ঠে বললেন, ভালো আমারও লাগে না। ছেলে আছে থাক্‌, অত মাতৃস্নেহ আমার নেই বাপু। ছেলের কাছে আমি ত আর মাথা বিক্রি করিনি! আমাকে আজই রাত্রে হয়ত বর্দ্ধমান যেতে হবে, কাল সকালে সেখানে মিটিং।

কিন্তু এমন ক'রে ঘুরে বেড়ালে কি সংসার চলবে না প্রিয়ম্বদা? তোমার ঘর রয়েছে, সংসার রয়েছে—

আমাকে না হ'লে যে-সংসার অচল হয়, সে অচলই থাকুক। আমি পারব না, আমি কিছু পারব না।—

মনে হোলো তিনি মুখ ঘুরিয়ে কঠিন হয়ে বসে' রইলেন।

সেনগুপ্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি এই পাঁচ বছর ধরে যা বলেছ আমি তাই ক'রে গেছি। কোনো রকম সাহায্য করতেই আমি বাকি রাখিনি। প্রচুর স্বাধীনতা তুমি পেয়েছ। দল গড়েছ, কাজ করেছ, জেল্‌ খেটেছ, এক্‌জিবিশনে দোকান খুলেছ, সভায় গিয়ে বক্তৃতা করেছ—কিছুতেই আমি কোনোদিন বাধা দিইনি। যথেষ্ট উদারতা আমার ছিল। মুভ্‌মেণ্টের সময়ে তুমি বাড়ীতে কন্‌গ্রেস ভলাণ্টিয়ারদের জন্যে হোটেল্‌ খুললে,—পুলিশের উৎপাত সহ্য করলুম। ছেলেরা কেউ-কেউ তোমার সঙ্গে ফ্লার্ট করত, তাতেও কিছু বলিনি পাছে তুমি ক্ষুণ্ণ হও। তোমাকে খুসি রাখবার জন্য হেসে সমস্ত স্নেহের সঙ্গে ক্ষমা করেছি। যে-কন্‌গ্রেসের কাজে তোমার আহার-নিদ্রা ছিল না আজ তাও তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যে ঠিক কী চাও তা আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলুম না প্রিয়ম্বদা।

ভদ্রলোকের বক্তৃতাটা বোধ হয় একটু হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল, প্রিয়ম্বদা চুপ ক'রে গেলেন।

জীবনকৃষ্ণ বললেন, দেশের কাজে নামলে মেয়েদের এই বিপদই ঘটে। ঘরও টানে, দেশও টানে। বুঝতে পাচ্ছি অবিনাশবাবু, আপনার কিছু কিছু অসুবিধা হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা বললেন, ঘরের টানাটানি কিছু কমলেই আমি খুসি হই। আমি কি চাই একথা যারা আজো বুঝতে পারেনি তাদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাইনে। মানুষ

দেশের জন্যে জেল্ খাটে কেন, কেন বক্তৃতা দেয়, কেন দল গড়ে!

সেনগুপ্ত বললেন, তুমি ত ঠিক দেশের স্বাধীনতা চাও না প্রিয়ম্বদা!

চাইনে? তার মানে? তুমি কি মোটর হাঁকিয়ে ঝগড়া করতে এলে আমার সঙ্গে? তুমি জানো দেশের চারিদিকে অসংখ্য লোক আমার মুখ চেয়ে থাকে? আমার মুখের একটি কথার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে?

— গভীর শ্রদ্ধা ও একাগ্রতায় আমরা প্রিয়ম্বদার কথা শুনছিলাম, মুণ্ডিতমস্তক প্রভাত আর শম্ভু মুগ্ধ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়েছিল। গণপতি নির্ব্বিকার হয়ে শুয়ে তার অভ্যাসমতো ধূমপান করছে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখি, জগদীশ আর বঙ্কিম হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলাম। তাদের হাসির একটু আওয়াজ বাইরে গেলেই আজ এখুনি একটা কেলেঙ্কারী হবে। দেশের লোক যদি প্রিয়ম্বদার মুখ চেয়ে থাকে, যদি উদ্‌গ্রাব হয়ে তাঁর বাণীর অপেক্ষা করে তবে হাসবার কি আছে? আজ হয়ত আমরা কাছাকাছি আছি বলেই এই নেত্রীস্থানীয়া মহীয়সী নারীটিকে গোপনে বিদ্রূপ কচ্ছি,—তাঁর দেহ নিয়ে, তাঁর রাঙাপাড় সাড়ী পরা নিয়ে, তাঁর কাঁধকাটা ব্লাউস ইত্যাদি নিয়ে এবং এমন কি, ছেলেদের কাছে তাঁর নিজেকে আকর্ষণযোগ্য ক'রে তোলার কৃতিত্ব নিয়ে আমাদের মধ্যে তামাসা চলছে,—কিন্তু একদিন দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁর নামটাই ত সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে! আমরা সেদিন কোথায় ভেসে যাবো তার ঠিক নেই।

জগদীশ ও বঙ্কিম দুজনে নিঃশব্দে অশ্রান্ত হেসে চলেছে। এক সময় সেনগুপ্ত যখন গলার সাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তখন তাদের হাসি থামল। তিনি আহত কণ্ঠে বললেন, তাহলে বাড়ী কখন্ ফিরবে তার ঠিক নেই, কেমন? আমি কিন্তু এমন ক'রে আর পারিনে।

প্রিয়ম্বদা বললেন, আমি কি ফিরব না বলেছি?

এর চেয়ে লোকে আর কেমন ক'রে বলে? বাড়ীতে থাকাটাই এখন তোমার অনুগ্রহ। মোটর আছে সঙ্গে, এখনই চল না? তুমি গেলে তবু ছেলেটাকে শান্ত করা যায়।

প্রিয়ম্বদা আপত্তি ক'রে বললেন, একেবারে কাজ সেরে যাবো। ছেলেটাকে চাকরের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই ত হয়!

সেটা কি আর সহজ? ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে আমি বলি কি—

সেইটেই সহজ। ছেলেটাকে এনে দিক্। আমার এক জ্বালা হয়েছে ছাই। এদিকে ছেলে কাঁদবে, ওদিকে কাঁদবে সংসার,—ঘরের কোণে গিয়ে বসে থাকলেই সকলের সুবিধে, বুঝতে পেরেছি।

অবিনাশবাবু স্বামীজীর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মস্ মস্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনকৃষ্ণ ডাকলেন, তোমরা ওঘরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওহে সোমনাথ?

জগদীশ সাড়া দিয়ে বললে, ঘুমোলেই ভালো হোতো স্বামীজি।

বঙ্কিম আর গণপতি শুয়ে রইল, আমরা বাকি চার জনে বাইরে উঠে এলাম। আশ্রমের ঘড়িতে দেখা গেল, ছ'টা বাজে, টাকা নিয়ে ঠিক সময়ে সিনেমায় গিয়ে পৌঁছবার আর সময় নেই। বৌদিদির দিকে অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একবার ঠোঁট উল্‌টে হাসল।

স্বামিজী বললেন, প্রিয়ম্বদা, তোমার ভক্তদের একটু চা ক'রে খাওয়াবে নাকি?

প্রিয়ম্বদা বললেন, মাপ করবেন, ওঁরা আমার ভক্ত নন্।

জগদীশ এবার সবিনয়ে হেসে বললে, সে কি বৌদি, আমি যে আপনার পরম অনুরাগী! আর এই সোমনাথ, লোকনাথের চেয়েও এ আপনার ভক্ত! দেখেছেন ত এর বসবার ভঙ্গীটা, ভক্ত হনুমানকেও হার মানিয়েছে।

বৌদিদির সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম। অবিনাশবাবুর জন্য যে গুমোটটা সৃষ্টি হয়েছিল, এবার সেটা গেল হাল্‌কা হয়ে। জগদীশ পুনরায় বললে, আমার কথাবার্ত্তায় হয়ত সব সময়ে একটা চাপা বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, হয়ত সেইটেই আমার চরিত্র। কিন্তু মনে রাখবেন বৌদি, যা সত্যি ভালো আমি তার যোগ্য মূল্যই দেবার চেষ্টা করি।

প্রিয়ম্বদা বললেন, যা সত্যি ভালো তা আপনি না বুঝতেও ত পারেন!

বেশ ত, আপনিই বুঝিয়ে দিন্। আমি ছাড়াও ত আরো অনেকে রয়েছে, ভালোটা তারাও ত বুঝে নিতে পারে বৌদি?

আপনি কি বলতে চান্ মেয়েদের স্বাধীনতার এই আন্দোলনটা কিছুই নয় ?

জগদীশ হাসল। হেসে বললে, আমরা গল্প করতে এসেছি বৌদি, তর্ক করতে নয়। তর্ক থাক্। আপনার সঙ্গে যেদিন কন্‌গ্রেস কমিটির আফিসে দেখা হবে সেদিন ঝগড়া করব। তবু এই কথাটা আপনাকে চুপি চুপি ব'লে রাখি, স্বাধীনতা এদেশের মেয়েরা চায় না।

উপস্থিত সবাই বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকাল। প্রিয়ম্বদা হঠাৎ কোনো কথা আর খুঁজে না পেয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, চা না খেলে দেখছি আপনার মাথা ঠাণ্ডা হবে না জগদীশবাবু।

জগদীশ বললে, মেয়েদের বিদ্রূপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু চা খাবার পরেও আপনাকে আর একটা কথা বল্‌ব বৌদি, অপরাধ নেবেন না।

সেটা তবে আগেই বলুন, সেই বুঝে আপনার চায়ে চিনি দেবো।

সেটা হচ্ছে এই, আপনারা দেশ নিয়ে মাতেননি, মেতেছেন হুজুগ নিয়ে। তাতে ফল ফলেছিল ভালো, মেয়েরা পথে বেরিয়ে মনের মানুষ বেছে নেবার কিছু সুযোগ পেয়েছেন।

প্রিয়ম্বদা বললেন, আপনার এই অপমান মেয়েরা গ্রাহ্য করবে না।

অপমান ?—জগদীশ বিনম্র হাসি হেসে বললে, বিশ্বাস করুন, আমি মেয়েদের বড় ভালোবাসি। তারা যা আব্দার ধরে তাই যোগাবার চেষ্টা করি। তাদের হাসি, কথা, চোখের চাহনি আমার বড় প্রিয়। তাদের পায়ে দাসানুদাস হয়ে থাকতে আমি গভীর তৃপ্তি পাই। আপনিই বলুন ত, আপনারা খুসি না থাকলে কি আমাদের চলে ? কেমন ঘর সাজাবেন, ফুলের মালা তৈরি করবেন, মিষ্টি রান্না রেঁধে দেবেন, অসুখ করলে মাথার কাছে ব'সে—

সে দাসীবৃত্তির দিন গেছে জগদীশবাবু।

যায়নি বৌদি,—জগদীশ আবার হাসল,—চোখ খুললেই দেখতে পাবেন, আমরাই চেষ্টা করি মেয়েদের মুক্তি দিতে কিন্তু তারাই নিয়ত চেষ্টা করছে নিজেদের পায়ে বাঁধনের পর বাঁধন জড়াতে। বৌদি, তারা চায়না মুক্তি, তারা চায়না দেশ নিয়ে মাথা ঘামাতে।

প্রিয়ম্বদা বললেন, দাড়ি টানবেন না, শেষ করুন।

জগদীশ বললে, ঠাট্টা সইতে পারব কিন্তু তারা কি চায় তা আপনিও জানেন বৌদি। তারা 'বন্দে মাতরমের' ভিড়ে চাপা পড়তে চায় না, চাকরি ক'রে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে তারা নিতান্তই বিমুখ, তারা কেবল একটু ভালো ক'রে নিজেদের ঘর বাঁচাতে চায়, এই মাত্র। একটু সুস্থ হয়ে কেবল বাঁচতে চায়, আর কিছু না। বৌদি, এবারে দেখতে পেয়েছি আপনাদের আসল চেহারা। নিত্যকাল ধ'রে আপনারা ছুটছেন পুরুষের পেছনে পেছনে, চোখে কাজল মেখে, হাতে কাঁকন প'রে,—তাদের হৃদয় জয় ক'রে চলাই আপনাদের একটিমাত্র কাজ। ভালোবাসা ছাড়া আপনারা একটি দিনও বাঁচতে পারেন না। সত্যি নয় বৌদি ?

আপনার সাধুভাষায় বক্তৃতার ফাঁদে পা দেবোনা,—ব'লে প্রিয়ম্বদা চায়ের জল চড়াতে উঠে গেলেন।

তাঁর ফিরতে মিনিট পাঁচেক দেরি হোলো। ফিরে এসে আবার তিনি নিজের জায়গায় বসলেন। তাঁর মনের অশান্ত বিদ্রোহের কথাটা আমরা সবাই জানি। বাড়ীতে তাঁর মন বসে না, সন্তানের প্রতি নারীর যে স্বাভাবিক মাতৃস্নেহ, সে-বস্তু তাঁর ভিতরে অনেক পরিমাণে কম। বয়স তাঁর পঁচিশের মধ্যেই। বয়সের পার্থক্য হিসাবে অবিনাশবাবু তাঁর পক্ষে সত্যই বেমানান। সন্তানটি হয়েছে রোগা ও রুগ্ন।

তিনি যে রূপবতী তা'তে আর সন্দেহ নেই। চোখ দুটি তাঁর দীপ্ত এবং প্রাণের কথায় পরিপূর্ণ। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, বেণী বাঁধলে নিজের ভারেই চুলগুলি ভেঙে পড়ে। চওড়া রাঙা পেড়ে সাড়ী পরলে দেহের গৌরব লক্ষগুণ বেড়ে যায়। ভক্তগণ উপগ্রহের মতো তাঁর চারিদিকে ব'সে চক্ষু ভ'রে তাঁকে দেখতে থাকে। বাস্তবিক, অবিনাশবাবু তাঁর স্বামী, এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা।

জগদীশের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া ইস্তক্ ঝগড়াই চলছে। ভালো কথা কি আপনার মুখে নেই জগদীশবাবু ?

শম্ভু আর প্রভাত উঠে ভিতরে চলে গিয়েছিল। মুখের সুমুখে ব'সে দেখতে লজ্জা করে তাই তারা ঘরে গিয়ে জান্‌লার ফাঁকে অলক্ষ্যে প্রিয়ম্বদার দিকে তাকিয়েছিল।

বনকৃষ্ণ তাঁর পুঁথিপত্রে মনোযোগ দিয়েছেন।

জগদীশ হেসে বললে, এর চেয়ে কিছু ভালো কথা আছে কিন্তু তা শুনলে আপনি আরো চ'টে যাবেন। তা ছাড়া গোড়াতেই যে আপনার সঙ্গে আমার মিল নেই।

এবার আমি বললাম, মিলবে কোত্থেকে, যখন তখন মেয়েদের গালাগালি দিতে পারলে তুমি আর কিছু চাও না!

প্রিয়ম্বদা বললেন, ঠিক তাই। ঠিক বলেছ সোমনাথ।

জগদীশ বললে, সে দোষ কি আমার? গত মুভ্‌মেণ্টে মেয়েদের সর্ব্বনেশে আত্মপ্রতারণা দেখলুম। তারা বললে, পুরুষের কর্তৃত্ব আমরা মানব না। খুব ভালো কথা। কতকগুলো মহিলা-সমিতি তৈরি হোলো। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, এখানেও সেই একই কথা। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, দেশের কাজ ক'রে পুরুষকেই তারা খুসি করতে চাইল। পুরুষ খুসি না হ'লে দেশপ্রীতি আর সমাজসেবা তাদের কাছে অর্থহীন।

নানা বাদানুবাদের পর সেদিন বৌদিদির হাতে সবাই মিলে চা খাওয়া গেল। বাদ পড়ল কেবল বঙ্কিম। এক সময় উঠে সে একটা ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে চ'লে গেল। প্রিয়ম্বদা কি জানি কেন তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। উভয়ের এই মনোমালিন্যের রহস্যটা আজো আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। চা খাওয়া শেষ ক'রে আমরা উঠে পড়লাম। বৌদি বললেন, তোমার কাজকর্ম্মের কিছু সুবিধে হোলো সোমনাথ?

না।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি পুনরায় বললেন, আমার মনে হয়, বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে ফেললে তুমি ভালো করতে। যে দিনকাল!

বললাম, দেখা যাক্।

তিনি এখন কোথায়? দেশে?

না, শুনলুম এখানেই আছেন। এখন থাকবেন কিছুকাল।

তবে চল, তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই একদিন যাই তাঁর ওখানে। সব বিবাদ মিটিয়ে আসিগে, কেমন?

বেশ ত।—ব'লে আমি বেরিয়ে এলাম।

বৌদি পিছনে পিছনে দরজা পর্য্যন্ত এলেন। বললেন, স্বামীজী এখুনি য্যাবেন একটা অসবর্ণ বিয়ের সভায়। আমি কি একলা থাক্‌ব? এত সকাল সকাল ত বাড়ী ফিরব না?

কেন?

যদি ফিরি তোমাদের অবিনাশবাবু হয়ত মনে করবেন, আমার আর কোনো কাজকর্ম্ম বুঝি নেই।

জগদীশ হেসে বললে, আহা বেচারা অবিনাশবাবু! স্বামীর ওপর আপনার এত তাচ্ছিল্য কেন বলুন ত?

প্রিয়ম্বদা সে কথা কানে না তুলে বললেন, স্বামীজীর না আসা পর্য্যন্ত আপনি থাকুন না জগদীশবাবু? ওঁর ঘণ্টা দুই মাত্র দেরি হবে।

বন্ধুদের ছেড়ে থাকব আপনাকে নিয়ে?

বাপরে, এত ঔদাসীন্য সইবে না কিন্তু আপনার।

জগদীশ হেসে বললে, আচ্ছা আসব এখুনি।

আমি কিন্তু একলা রইলুম।

আসছি, ভয় নেই।

অনেকদিন পরে আজ শ্যামবাজারের বাড়ীতে এসে উঠলাম। বর্ষার দিনে কোথায় যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করি। জলের ফোঁটা আঘাত করে আমার রক্তের মধ্যে, দিগন্ত পরিব্যাপ্ত কালো মেঘ দেখলে আমার ভিতরের প্রাণ চোখের তারায় উঠে এসে কাঁপতে থাকে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, দুরবস্থার দাগ পড়েছে সর্ব্বাঙ্গে, ধীরে ধীরে ভিতরে এসে ডাকলাম, মা?

ভিতরের রোয়াকে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, তাদের একজন বললে, ওপরে যান্ না, মা আছেন।

বললাম, ভগবতী কোথায়?

তিনিও ওপরে, বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। খবর দেবো তাঁকে?

না থাক্, আমিই যাচ্ছি।

ভিতরটায় ছাত্রী-মেয়েদের মহল, বাইরের অংশটায় মা থাকেন, এবং এইদিকটাতেই বাইরের লোকজন সাধারণত যাতায়াত করে। অন্দর মহলের সঙ্গে বাইরের কোনো সম্পর্ক নেই।

সুমুখের সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে উঠলাম। প্রথম ঘরখানায় মায়ের লাইব্রেরী, তারপর বারান্দা, বারান্দার

ওপারে 'ভিজিটারদের' জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘর। সেই ঘর থেকে বঙ্কিমের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মুক্তকণ্ঠে সে রবিঠাকুরের লেখা একটি বর্ষার গান ধরেছে। তার গান শুনলেই আমি থমকে দাঁড়াই। সুরের দেশের মানুষ সে, সুরকুমার, তাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।

কিয়ৎক্ষণ পরে গিয়ে ঢুকলাম লাইব্রেরী-ঘরে। একখানা চৌকির উপরে শুয়ে একখানি বই হাতে নিয়ে মা'র চোখে তন্দ্রা এসেছে। আমার পায়ের শব্দ হয়নি, নিঃশব্দে গিয়ে হেসে তাঁর পায়ের কাছে বসলাম।

বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু কমই হবে। আমি জানি তাঁর স্বামী আছেন, কিন্তু তিনি কোথায়, মা তাঁর সঙ্গে একত্রে বসবাস করেন না কেন,—এ কথা তিনিও কোনোদিন উল্লেখ করেননি, আমরাও জানবার চেষ্টা করিনি। দু হাতে তাঁর মাত্র দু'গাছি সোনার চুড়ি, মাথায় এয়োতির চিহ্ন নেই। কেন নেই তা এ জগতে তিনি ছাড়া সম্ভবত আর কেউ জানে না। এই কয় বছরে তাঁকে নানা রকম কাপড় পরতে দেখেছি। কখন সাড়ী পরেন, কখনো পরেন ধুতি, আবার কখনো হঠাৎ হাতের চুড়ি খুলে তাঁকে ধবধবে শাদা থান পরতেও দেখেছি। তাঁর মুখে চোখে, কথায় বার্ত্তায় কোনোদিন কিছুই প্রকাশ পায় না, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছদের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখে আমরা তাঁর মনের অবস্থাটা অনুমান করবার চেষ্টা করি। মানুষ অনন্ত রহস্যময়, তার প্রকৃত পরিচয় তার স্রষ্টারও অজ্ঞাত।

মা'র তন্দ্রা ভাঙ্‌ল। চোখ চেয়ে দেখে তিনি বললেন, ওমা, তুমি কখন্ এলে বাবা? মনে পড়ল এতদিন পরে? ধন্য ছেলে! ইস্, এমন মেঘ করেছে? একেবারে যে অন্ধকার হয় গেল!—ব'লে তিনি বইখানা সরিয়ে উঠে বসলেন।

আমার না হয় এতদিন পরে মনে পড়ল, তুমিও ত খোঁজ নিতে পারতে?

কেমন ক'রে নেবো? মেসের একটা ঠিকানা ছিল তাও তুমি নষ্ট করেছ। এক লালদীঘির ধারে গিয়ে বসলে হয়ত কোনো কোনোদিন তোমার দেখা পাওনা যায়!

কেন, আশ্রমে? ওখানে ত আমি প্রায়ই থাকি!

না বাবা, ওকথা বোলো না,—পাছে সেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে আমি—

কে সে মা?

ওই যে সেই মেয়েটি, সেই তোমাদের প্রিয়ম্বদা—ওরে বাবা! অমন মেয়ে আর দুটি চারটি বেড়ে উঠলেই দেশ ছেড়ে পালাতে হবে।

বললাম, এটা তোমার নিছক হিংসে মা, মেয়েরা মেয়েদের কৃতিত্ব কিছুতেই সইতে পারে না। তুমিও কি স্বাধীন মেয়ে নও মা?

মা স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসলেন। বললেন, ওকে কি স্বাধীন বলে বাবা? ও যে ছুটছে ভূতের তাড়ায়, প্রবৃত্তির খেয়ালে। যাক গে ওর কথা।—বলে তিনি একবার বাইরের দিকে তাকালেন, পুনরায় বললেন, বঙ্কিম এসেছে বুঝি? গলার আওয়াজ পাচ্ছি!

বললাম, হ্যাঁ। বর্ষার দিনে জলো গান ধরেছে।

মা বললেন, তোমাদের দলের ওই আর এক পাগল। সারাদিন কবিতা আর গান আর হুজুগ। পাগল ছেলেদের নিয়ে আমার ঘরকন্না। তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর এই স্নেহের হাসিটিতে আমরা সব দুঃখ দুর্য্যোগ ভুলে যাই।

মিনুর কথা উঠ্‌ল। মা বললেন, বনের ফুল তুমি আমাকে এনে দিয়েছ বাবা। এমন সুবুদ্ধি মেয়ে, আমার সমস্ত সংসারটি মাথায় ক'রে রয়েছে।

বললাম, পড়াশুনোয় কেমন মনোযোগ?

যথেষ্ট। কোথাও ওর এতটুকু বাধেনি। একে বলি মেয়ে, নিজের শক্তিতে জল্ জল্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ছে।—ব'লে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আমার পরিশ্রান্ত শরীরটা তাঁর বিছানার উপর সটান্ ছড়িয়ে দিলাম। বাইরে বর্ষার ধারা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ঝরছে। মাঝে মাঝে আকাশ ডেকে উঠছে, আজকে বৃষ্টি ধরবার আর কোনো চিহ্ন নেই।

এমন সময় ভগবতী এসে দাঁড়াল। বোঝা গেল, রবিঠাকুরের গান তাকে কর্ত্তব্যচ্যুত করেনি। হাতে তাঁর ফল ও মিষ্টান্নের একখানা রেকাব। হেসে বললে, কখন্ চুপি চুপি এলেন সোমনাথদা?

এই একটু আগে। এসে মাকে পেয়েই খুসি হয়ে গেলুম। তোমাদের ঘরে গিয়ে গল্পের ব্যাঘাত ঘটাতে ইচ্ছে হোলো না।

তার মুখে চোখে খুসির রক্তাভা খেলছে। আনন্দের

চেহারাটা মেয়েদের বিচিত্র। তারা প্রচার করে না, প্রকাশ করে। ভগবতী যেন স্বপ্নলোক থেকে উঠে এসে দাঁড়াল। গ্রামে যখন সে ছিল তখনো এই প্রাচুর্য্য, এই ঐশ্বর্য্য,—ইদানীং কেবল তার রঙের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রভাতের মেঘ যেন সূর্য্যকিরণের ছোঁয়ায় গোলাপের রঙে রাঙিয়েছে আপন সর্ব্বাঙ্গ। মা একটু হেসে বললেন, আমার জন্যে এখন থাক্, ওটা দে মা সোমনাথকে।

আমার দৃষ্টিতে সে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, তাড়াতাড়ি টিপাইটা কাছে টেনে রেকাবখানা রেখে বললে, দাঁড়ান্, জল এনে দিই।

মা বললেন, বঙ্কিমকে দিয়েছিস মা?

এইবার দেবো।—ব'লে লজ্জিত সন্ত্রস্ত মুখখানি ফিরিয়ে ভগবতী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে মা হাসতে হাসতে বললেন, ভগবানের কাণ্ড!

ওঘরে গিয়ে মিনুর চাপা গলার আওয়াজটাই আবার শুনলাম,—আঃ চুপ করো বলছি, চেঁচিয়োনা। সোমনাথদা কী ভাববেন! তুমি বড় অস্থির, বঙ্কিম। ওকি, বসো চুপটি ক'রে। ভারি দুরন্ত তুমি।

বঙ্কিম তার নিষেধ বাক্যে আরও উদ্দাম হয়ে উঠ্‌ল। উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল:

'কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভী,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।'

মিনুর দ্রুত বিপর্য্যস্ত গলার আওয়াজ আবার শোনা গেল,—আঃ কাজ আছে বলছি, সরো।

মা এ-ঘর থেকে ডাকলেন, বঙ্কিম?

বঙ্কিম তাড়াতাড়ি ছুটে এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ব'সে পড়ল। বললে, কি মা?

পাগলামি হচ্ছিল বুঝি এতক্ষণ?

কী আবিষ্কার তোমার! পাগলের পাগলামি খুঁজে বা'র করেছ! সোমনাথ, জগদীশের কি খবর রে?

হেসে বললাম, বৌদির বাড়ীতে ঘন ঘন নেমন্তন্ন খাচ্ছে।

বঙ্কিম চুপ ক'রে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, তাই নাকি? হালভাঙা পাল্‌ছেঁড়া নৌকো সামলাতে পারবে ত?

মা বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলা ওরা ক'জনে এসেছিল আমার কাছে। লোকনাথ, জগদীশ, শম্ভু আর প্রভাত। বড় দুরবস্থা হয়েছে লোকনাথের। চাক্‌রি পেয়ে স্ত্রীকে আন্‌ল এখানে, বাড়ীভাড়া, সংসার খরচ, কিন্তু মাইনে পায়না আজ তিন মাস। তোমাদের দিশি খবরের কাগজের আফিসে কোনো শৃঙ্খলা নেই।

বঙ্কিম বললে, বিশেষত ওই 'স্বাধীনতা' কাগজখানার। বেকার দুর্ভাগাদের ধ'রে ব্যাগার খাটিয়ে নেওয়াই ওদের কাজ। কাগজখানার ভেতরে এত দলাদলি, এত স্বার্থপরতা যে, তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে মা।

মা বললেন, শুনেছি আমি কিছু কিছু লোকনাথের মুখে। নষ্ট ক'রে দেয়না কেন? নিজেদের ভণ্ডামি লুকিয়ে স্বার্থের লোভে যারা কাগজে স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, তোমরা তাদের ক্ষমা করো কেন? কালকে লোকনাথের মুখে কতকগুলো খবর পেয়ে আমি অবাক হয়ে গেলুম, সোমনাথ। এ তোমরা সহ্য করো?

মায়ের এই চেহারাটা আমাদের পরিচিত সুতরাং আমরা চুপ ক'রে রইলাম। সহ্য আমাদের অনেক করতে হয়, তার সব ইতিহাসটা মা'র জানা নেই। তাঁকে জানানোও চলে না।

মা বলতে লাগলেন, অত বড় ছেলে, কথা বলতে বলতে কাল তার চোখে জল এল। পাঁচ বছর তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু অভাবের জ্বালায় পাঁচ দিনও সে স্ত্রীকে নিজের কাছে রাখতে পারেনি। আজ যদি বা রাখবার একটু উপায় হোলো, যদি বা চাকরি একটা জুট্‌ল, কিন্তু যে কে সেই! কেন তোমরা উমেদারি করো তিন পয়সার চাক্‌রির পেছনে? তোমরা অকর্ম্মণ্য, তোমরা মনুষ্যত্বহীন। মরতে পারো না মাথা ঠুকে? পালাতে পারো না রাজ্য ছেড়ে? অপমান সয়ে সয়ে যক্ষ্মা ধরল যে মেরুদণ্ডে! কান্না, কান্না, মলুম কান্না শুনে শুনে! ভাতের জন্যে কান্না, কাপড়ের জন্যে কান্না, চাক্‌রির জন্যে কান্না। মারতে পারিসনে চাবুক এই ভিখিরীর জাতটার পিঠে? পারিসনে পৃথিবীর বুক থেকে এই কাঙালের বংশটাকে মুছে দিতে?

বঙ্কিম বললে, কিন্তু এর মধ্যে অনেক কথা আছে মা। আমরা যে পরাধীন, আমরা যে—

উত্তপ্ত কণ্ঠে মা বললেন, থাক্, আর বলিসনে বাবা,

শুনতে আর পারিনে। ওই কথাটা দিনকতক আর উচ্চারণ করিসনে, কান গেল ঝালাপালা হয়ে। ষষ্ঠী-তলার দোর ধরা জাত, মাদুলি-ঘুনসি পরার বংশ, ঘরের মানুষ ঘরে ঢুকলে চণ্ডাল ব'লে তাকে ঝেঁটিয়ে তাড়াস,—পরাধীন থাক্ তোরা জন্ম জন্ম।

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তাঁর কটূক্তিগুলি বসে বসে হজম কচ্ছিলাম এমন সময় ফল ও মিষ্টান্নের আর একখানা রেকাব নিয়ে ভগবতী ঘরে ঢুক্‌ল। এক হাতে জলের পাত্র। বঙ্কিম বললে, এমন অসময়ে আমি খাইনে কিন্তু।

আপনার সময় কখন আমি ত জানিনে। শিগগির খান্ নৈলে মা রাগ করবেন।

আড়ালে 'তুমি' এবং সুমুখে 'আপনি'—বঙ্কিম আর ভগবতীর এই সম্পর্কটায় বেশ কৌতুক বোধ করলাম। বঙ্কিম হেসে তার মুখের দিকে তাকাল। বললে, দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। বলেই ফেলি, কেমন?

আমার অলক্ষ্যে ভগবতী তাকে চোখ দিয়ে কি একটা ইঙ্গিত করবার চেষ্টা করল কিন্তু এত সামনাসামনি লুকোচুরি করতে তার বাধ্‌ল। নিরুপায় সাহসের সঙ্গে বললে, এমন আর কি কথা, বলুন না?

হ্যাঁ, বলেই ফেলি। সোমনাথ আমার বিশেষ বন্ধু, ওর সামনে বললে কোনোই ক্ষতি নেই।

ভগবতী তার বেফাঁস কথার আভাস পেয়ে অত্যন্ত জড়োসড়ো হয়ে গেল। থতিয়ে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল কিন্তু মুখ ফুট্‌ল না। মুখখানা দেখতে দেখতে রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। কেবলমাত্র লজ্জাই নয়, আশঙ্কায় সে যেন কাঁপছে। চোখে তার অতি ভীরু ভাষা!

বঙ্কিম বললে, বলছি যে এসব খাবার খেতে এখন আমার রুচি নেই।

আমি হেসে উঠলাম এবং তখনই দেখতে দেখতে ভয় কেটে গিয়ে ভগবতীর মুখে হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল।

আপনার কেবল তামাসা, আমি ব'লে দিচ্ছি মাকে। বলতে বলতে সে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

হেসে বললাম, তোমার ধরণ দেখে বেচারা ভারি মুস্কিলে পড়েছিল।

বঙ্কিম বললে, মেয়েদের বিপদ এইখানে। দরকারি কথা আছে বললে ভালোবাসার কথা ছাড়া তারা আর কিছু কল্পনা করতে পারে না।

এবার বললাম, কেমন মনে হচ্ছে ভগবতীকে?

অপূর্ব্ব! In every sense of the word.

হেসে বললাম, এটা ত তোমার স্বভাব। কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলেই তাকে তুমি দেবী বানিয়ে তোলো। তোষামোদটা প্রশংসা নয়।

বঙ্কিম বললে, তুমি চেনো না ভগবতীকে তাই এ কথা বলছ। মেয়েকে জানা যায় ভালোবাসলে।

তুমি ভালোবেসেছ ওকে?

Infinitely! জীবনে প্রথম ভালোবাসলাম। The last word of love.

বিয়ে করতে পারো?

মা এসে ঘরে ঢুকলেন। কথাটা চাপা পড়ে গেল। বঙ্কিম দেয়ালে মাথা হেলান দিয়ে বসল,—একটু অন্যমনস্ক, একটু চিন্তিত।

মা বললেন, লক্ষ্মণের ফল ধ'রে দুজনেই যে বসে আছ? কুটুম্বিতে না করলে বুঝি খাওয়া হবে না?

বঙ্কিম সজাগ হয়ে বললে, তুমি প্রসাদ ক'রে দাও। না দিলে কিছুতেই খাবো না।

তোমরা যা ধরবে তাই করবে, কেমন?—ব'লে মা দুজনের রেকাব থেকেই দুখানা আনারসের টুক্‌রো তুলে নিলেন। বঙ্কিম রাগ ক'রে বললে, সোমনাথকে তুমি বেশি ভালোবাসো মা, তাই ওর আনারস আগে নিলে!

বটে!—মা বললেন, আর কালকে আমার পাতে বসে খেয়েছিল কে? কোথায় ছিল সোমনাথ? তিঁস্‌টে ছেলে কোথাকার।—ব'লে তিনি কাপড়চোপড় নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন।

আমরা সবাই হাসতে লাগলাম। এমন সময় ভগবতী আবার ঘরে এসে ঢুক্‌ল। বললাম, বসো মিনু। আচ্ছা, তুমি ত ভালো গান গাইতে পারতে। এমন বর্ষায় একটা গাইলে মন্দ কি।

আমাদের মধ্যে কোথায় যেন একটা কুণ্ঠা রয়েছে, একটা সম্মান ও স্নেহের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে রয়ে গেছে,—আমরা দু'জনেই সেটাকে উত্তীর্ণ হতে পারিনি, সহজ বন্ধুত্বের বাতাস

বয় না, সঙ্কোচ একটুখানি থেকেই যায়। কারণটা বুঝি। এবং কারণটা যে কেবল আমি তার পরিবারের গোপন ইতিহাসটা জানি, তাই নয়, একই গ্রামের পটভূমিকায় আমরা মানুষ, গ্রাম সম্পর্কে সে আমার ভগ্নী—আমাদের পল্লীসভ্যতা ও শিক্ষায় আমরা পরস্পর ভাইবোন বলেই বেড়ে উঠেছি। শহরের আওতায় এসেও সেটা ঠিক কেতা-দুরস্ত আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।

ভগবতী চেয়ারখানাতেই বসতে পারত কিন্তু আমার পাশে এসে বসল, বললে, থাকগে গান সোমনাথদা। আর একদিন আপনাকে শুনিয়ে দেবো।

হেসে বললাম, আচ্ছা থাক্ থাক্।

বঙ্কিম জনান্তিকে বললে, লোকের অনুরোধ পালন করা উচিত।

মিনু চটে উঠ্ল। বললে, সে আমি বুঝবো সোমনাথদার সঙ্গে। এত যদি সখ আপনিই একটা গান্ না?

বোঝা গেল এদের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠতায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রথম থেকেই লক্ষ্য ক'রে এসেছি। মুখ রাঙা করা, ছোট হাসি, চোখের ভাষা, কাছে এলে আলোকিত হয়ে ওঠা, অসমাপ্ত উক্তি রেখে চলে যাওয়া। তারপর মান-অভিমান, পরস্পরের দাবি আর শাসন, বোঝাপড়া, বিবাদ আর আপোষ-নিষ্পত্তি,—এই ত উপন্যাস, এই ত গল্প! এর নাম প্রেম, এত সহজ, এত প্রাঞ্জল। এই নিয়ে নানা খেলা, নানা অভিনয়, এই নিয়ে নানা গোলযোগ। এই প্রেম জনসাধারণের। এই পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া, সুলভ, বহুচর্বিত, দুর্বল চিত্তোচ্ছ্বাস, এরই বিভিন্ন অনুকৃতি চলে মানুষের সমাজে, একেই নানা অসংলগ্ন কথার রাংতায় মুড়ে লোকপ্রিয় কথাশিল্পীরা সাহিত্যে চালায়, টাকা কুড়োয়। মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম বটে কিন্তু কোথায় যেন একটি গভীর অবসাদে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে এল।

মা এসে আবার দাঁড়ালেন। বৃষ্টি তখন একটু থেমেছে। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নেই। তিনি বললেন, পড়াতে যাচ্ছি, তোমরা একটু বসো বঙ্কিম। সোমনাথ, তোমাকে একটা কথা বল্ব।

আমি উঠে তাঁর সঙ্গে বাইরে গেলাম। বারান্দা পার হয়ে গেলাম তাঁর শোবার ঘরে। মা বললেন, মিনুর সামনে বললুম না, হয়ত লজ্জা পাবে। তোমার বাবার খবর কি, কোথায় তিনি?

বললাম, গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে সেদিন দেখা হোলো। সে বললে, বাবা এখানেই আছেন, কল্কাতার বাড়ীতে।

আমি না হয় একদিন যাবো তাঁর ওখানে?

কেন মা?

কেন? গিয়ে বল্ব, যার ওপর এত রাগ, সে ছেলে আপনার নির্দোষ! অন্যায় সে কোনোদিন করে নি!—এই বল্ব?

অন্যায় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তোমার সঙ্গে মিলবে কি? একটি মেয়েকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছি, এই ঘটনাটাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তোমার গিয়ে কাজ নেই।

মা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু এমন ক'রে তোর ক-দিন চল্বে বাবা?

হেসে বললাম, প্রতিদিনই ত চলছে মা।

একে চলা বলিস? অন্ন নেই, আশ্রয় নেই, আশা নেই! অমন বাপের সাহায্য নিতে আমি বলতুম না, কিন্তু নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মতো শিক্ষা যে তোদের হয়নি, যোগ্যতা নেই যে তোদের! এটা মেয়েদের বোর্ডিং, এখানে যে কোনোরকমেই তোকে রাখতে পারিনে বাবা।—তাঁর গলা অশ্রুতে ভিজে উঠ্ল।

বললাম, তোমার কাছে থাক্ব এ তুমি কল্পনাও ক'রো না। তুমি যদি এমন ব্যস্ত হও মা, তাহলে আমাকে এখানে আসা বন্ধ করতে হয়।

ব্যস্ত হই কি সাধে বাবা, হই প্রাণের দায়ে। আজ এসেছিস ভালো হয়েছে, গোটাকতক টাকা দিই, সঙ্গে রাখ্।

টাকা? টাকা কি হবে মা?

ওমা, তুই কি পাগল রে, টাকার দরকার নেই?

না, একটুও না। টাকা ছাড়া আর সব দরকার, টাকার দরকার আমার নেই।

আমার কণ্ঠে বোধ করি কিছু সঞ্চিত অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল, কণ্ঠস্বর শুনে মা আর কথা বললেন না, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে মুখ তু'লে দেখলাম, মাতৃহৃদয়ের সমস্ত দাক্ষিণ্যে তাঁর চোখ ও মুখ প্লাবিত হয়ে গেছে। আমি কী বল্ব, আমার তৃষিত ব্যাকুল মন কী যে চায় জানিনে, মাতৃহীনের গভীর অনুভূতি আমার নেই, তার জন্য আমি লজ্জিত। হয়ত আমার মাও ছিলেন এমনি, এমনি চোখ,

এমনি মুখ, এমনি রূপ, হয়ত তাঁরও অন্তরে ছিল এমনি অশ্রান্ত উদ্বেগ, অশান্ত স্নেহ।

কিন্তু সত্যের চেহারা এ নয়। মাতৃস্নেহের মধ্যে সত্য নেই, আছে মায়া, আছে পথ-হারানো ভ্রান্তি, আছে বন্দীত্ব। মানুষের পথ দুর্গম, মানুষের পথ ছায়ালেশহীন। তবু হঠাৎ মনে হোলো আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, যারা নিকটে আসতে চায় তাদের দূরে সরিয়ে দিই, যারা কাছে টানে তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে পারলে বাঁচি। আঘাত করা আমার ধর্ম্ম, ব্যথা দেওয়া আমার রীতি। আমার চরিত্রের ভিতরে প্রাণের ছোঁয়াচ কোথাও কিছু নেই, স্নেহ নেই, দাক্ষিণ্য নেই, মোহ নেই,—নির্দ্দয়ভাবে নির্লিপ্ত আমার মন। বিশ্বনিয়ন্তার মতো নির্লিপ্ত, বিশ্বনিয়ন্তার মতো উদাসীন। আমার চোখের দৃষ্টি শানিত তরবারির মতো উজ্জ্বল, নির্ম্মম। আমারই বুকের ভিতর দিয়ে যে-পথ, সে-পথ মরুভূমির,—সেই মরুভূমির প্রান্তদেশে আশার সমুদ্র, অনন্ত কামনার তরঙ্গভঙ্গ, জীবনের অনন্ত চঞ্চলতা। সেই পথ দিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে আমার অবিশ্রান্ত গতি। মাতৃস্নেহের আতিশয্যে চলৎশক্তিহীন হতে পারে না আমার মন।

মা মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন, হাতটা ধরলাম।

মা? রাগ করলে?

মা আমার মাথাটা কাছে টেনে নিলেন। মৃদু অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, কেবল আমিই তোর ওপর কোনোদিন রাগ করব না বাবা। আমি ত জানি কোথায় তোর মনে ভাঙন ধরেছে। এবার আমি যাই। বঙ্কিম, আয় বাবা, এবার এগোই।

আকাশ কিছু পরিষ্কার হয়েছিল, বৃষ্টি থেমেছে। আজকের সন্ধ্যা অতি সুখকর, মাকে আজ অত্যন্ত ভালো লেগেছে, তাঁর কাছে কেমন ক'রে যেন নূতন জীবনের উদ্দীপনা পেয়ে গেছি। ডাক শুনে তখনই বঙ্কিম আর মিন্টু বাইরে বেরিয়ে এল। মা অলক্ষ্যে তাদের দিকে চেয়ে একটু স্নিগ্ধ স্নেহের হাসি হাসলেন। সেই হাসি দেখে মিন্টু তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমরা কোলাহল করতে করতে সেদিনকার মতো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। হৃদয়ের সুরে সমস্তটা ভরে গেছে, আজকের দিনটি অপূর্ব্ব লাগছে।

কিছুদিন কাট্‌ল। বর্ষাটা পুরাতন হয়ে এসেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিন না দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি, ক্লান্ত হয়েছে মন।

লোকনাথকে তার বাসাটা ছাড়তে হোলো। না দিতে পারল ঘরের ভাড়া, না চালাতে পারল সংসার-খরচ সস্ত্রীক এসে উঠ্‌ল মাসির কাছে। যদিচ ঘরভাড়াটা লাগবেনা কিন্তু এদিকে মাসির অবস্থাও তথৈবচ, মাসিব কিছু টাকা না দিলে মাসির চলবে না। আর, বিয়ে করলে যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ জোগাতে হয়, এ কথা পাঁচবছরের ছেলেটিও জানে।

মাসির ওখানে আমাদের যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু খবর আমাদের কানে ঠিকই আসে। প্রভাত আর শম্ভু আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা। মাঝে শোনা গেল, লোকনাথ প্রায়ই লটারির টিকিট কিনছে, তারপর শুনলাম জুয়াড়ীদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যায়। একদিন 'স্বাধীনতা' আপিসে গিয়ে তার দেখা পাওয়া গেল না, সে নাকি ইচ্ছামতো আসে আবার ইচ্ছামতো চ'লে যায়। আপিসে তার চার মাসের মাইনে বাকি। একদিন কর্ত্তারা নাকি পাঁচটি টাকা লোকনাথকে দিয়েছিল, লোকনাথ তার থেকে দুটাকা তার একজন প্রিয় কম্পোজিটরকে দিয়ে বাকি তিনটাকা এমন এক পল্লীতে গিয়ে খরচ করে এসেছে, যাতে জানা যায় তার স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়েছে। স্বভাব-চরিত্র বাঁচিয়ে চলা আমাদের কাজ নয়, ওদিকটায় মনোযোগ দেবার মতো যথেষ্ট সময়ও আমাদের নেই, নানাদিকেই আমাদের উদ্বেগ, সুতরাং কা'র চরিত্রে কতটুকু প্রলোভনের আঁচ লেগেছে, চরিত্রের পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হোলো, কে হোলো না—সেদিকে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষের স্বভাব নিজের পথ ধরে চলে, এ আমরা বরাবর লক্ষ্য ক'রে এসেছি। যেমন আমাদের বঙ্কিম। বঙ্কিম মদ্যপান করে, বঙ্কিম ধর্ম্ম মানে না, স্ত্রীলোকের ক্ষণিক সংসর্গ পাবার জন্য বঙ্কিমের দুরন্ত দুঃসাহসের গল্প আমরা সবাই জানি, অথচ দেখতে পাই কোথায় যেন তার একটি কোমল স্নেহশীল মন বন্ধুদের জন্য কাঁদে, কখন্ গোপনে সে নিঃশব্দে ছুটে যায় পরের দুঃখ মোচন করতে। তার সুললিত কণ্ঠের গান শুনে কত বর্ষার রাত, কত বসন্তের জ্যোৎস্না আমরা উপভোগ করেছি

অচেতনভাবে অতিবাহিত করেছি। কাব্য-সাহিত্য ও ললিতকলা সম্বন্ধে তার গভীর উপলব্ধির আনন্দদায়ক আলোচনা শুনে কতদিন আমরা মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। সেই বঙ্কিম—সেই বঙ্কিমকে অসচ্চরিত্র ব'লে দূরে সরিয়ে রাখা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না। মেয়েরা জানে পুরুষের সত্য পরিচয় কোথায়, চরিত্রের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা ভালোবাসে বঙ্কিমকে, তারা তার নিষ্ঠুর দুরন্তপনার অনুরাগিনী।

সেবাশ্রমে এসে উঠলাম। মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে, ন'টা কি দশটা বাজে। পাশেই শিবের মন্দিরে জীবনকৃষ্ণ পূজায় বসেছেন। ঘরে ঢুকেই পাওয়া গেল জগদীশকে। বেরোবার উপক্রম করছিল, আমাকে দেখেই সে চ'টে গেল। আপাদমস্তক তাকিয়ে বললে, ঠ্যাঙানো জন্তুর মতো গুটি গুটি আসা হচ্ছে, কোথায় ছিলি দুদিন? খুঁজে খুঁজে সবাই হায়রাণ!

তিরস্কার করল কিন্তু তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল বন্ধুপ্রীতি। বললে, হতভাগা, মাকে পর্য্যন্ত বয়কট্ করেছিস্? কোথায় ছিলি?

হেসে বললাম, গত দিনের ইতিহাস জানতে চেয়ো না জগদীশ। কিন্তু তুমি এত তোড়জোড় করে কোথায় চলেছ বলো ত?

আমি? আমি কি তোদের মতো হরিজন? আজ-কাল অভিজাত সমাজে মিশি, তা জানিস্? মোটরে চ'ড়ে বেড়াই!

কলিকাতায় একটিমাত্র অভিজাতকে আমি চিনি, সে আমাদের সুবিখ্যাত কবি বাণীপদ বাঁড়ুয্যে। তাই বললাম, আমাদের সাহিত্যিকের ওখানে বুঝি?

জগদীশ বললে, তার চেয়েও হাল-আমলের অভিজাত,—আমাদের বৌদিদি রে! রাঙা পেড়ে খদ্দর-সাড়ী-পরা স্বাধীন জেনানা; পালিশ করা চুল, পালিশ করা মুখ। গহনা-গাঁটি খুলে ফেলেছেন, নব্যরুচির আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে। তরুণ বয়সের ছোকরারা তাঁর রাঙা পা দুখানির ভক্ত!—এই ব'লে সে মাদুরের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

তোমার ভক্তিই বা কম কিসে জগদীশ?

মোটেই কম নয়। সেদিন ভক্তির কিছু আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল ব'লে 'ভাই' পাতিয়েছেন তিনি আমার সঙ্গে। দাঁড়া, এই গোঁজামিলে ভর্ত্তি পাস্নে সোমনাথ। বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদের মতো এটা 'কাজিন্-ভাই' পাতানোর বুজরুকি বোধহয় নয়, কিছু সত্য হয়ত আছে।

কিন্তু তিনি অভিজাত হলেন কেমন ক'রে?—বললাম।

বলিস কি, অভিজাত নয়? সাপ্তাহিকে বৌদিদির ছবি ছাপা হয়, দৈনিক বাংলা কাগজে তাঁর বিবৃতি বেরোয়, আমার মতো তরুণ কন্গ্রেস নেতারা প্রাইভেট্লি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন,—অভিজাত কি আর গাছে ফলে রে?

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে পুনরায় বললে, বোস্, আমার পাতানো বোনের ওপর অবিচার করিসনে। স্বাধীন জেনানা ব'লে তোরা বিদ্রূপ করিস, কিন্তু চিনিসনে প্রিয়ম্বদাকে। পুরোণো কালের কাত্যায়নী-হরিলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর একটুও তফাৎ নেই। ওরে, মেয়েরা কোনোকালেই আধুনিক নয়, চিরকাল তারা একই কারণে পুরুষের পেছনে-পেছনে প্রাণের টানে ছুটোছুটি করছে। কেবলই দেবার জন্য তাদের আকুলি বিকুলি, আত্মসমর্পণ করবার জন্য নিত্যকাল থেকে তারা আমাদের দুখানা কঠিন কর্কশ পা খুঁজে বেড়াচ্ছে। বেচারিদের বিদ্রূপ করিসনে সোমনাথ।

এ কথা শোনবার পর বৌদিদি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে—

শুনেছেন তিনি, শোনাতে পেরেই ত সহজ হয়েছি তাঁর কাছে। প্রাণের ঐশ্বর্য্য রাখবার জন্য তাঁর পাত্র একটা চাই, ঘরের মানুষটি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় মেয়েদের চিত্ত উৎপীড়িত হয়ে ওঠে, তারা যে প্রকৃতির রূপ,—তাই ঘরের পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে বৌদিদি ছুটলেন দেশমাতৃকার পরাধীনতা ঘোচাতে, পুরুষের পথ নিলেন বেছে,—একেই বলে আত্মদ্রোহিতা, আপন স্বভাবের বিপরীত কাজ করা।—জগদীশ হেসে হেসে ব'লে যেতে লাগল,—বিধি নিয়ম দেখলেই মেয়েরা ভয় পায়, অশান্ত হয়ে ওঠে তাদের মন,—আমাদের বৌদিদিও তাই। স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে তিনি গ্রহণ করতে পারেননি অতএব দেশের কাজে তাঁকে নামতে হবে, বেচারা দেশ! বিধবা মেয়ে বাপের বাড়ীতে লাঞ্ছিত হচ্ছে অতএব নাম্ল পোলিটিক্যাল্ সংগ্রামে; কুমারী মেয়ের পাত্র জুটছে না, অতএব চেঁচিয়ে উঠ্ল 'বন্দে মাতরম্' ব'লে; কেরাণির বউ স্বামীর হাতে মার খেল সুতরাং লুকিয়ে মনুমেন্টের তলায় গিয়ে তার 'স্বাধীনতা-দিবস' পালন করা চাই! মেয়েদের

সমাজ-বিদ্রোহটা দেশপ্রীতির নামে বেশ চলে যাচ্ছে, সোমনাথ!

হেসে বললাম, তার জন্তে তোমার গাত্রদাহ কেন জগদীশ?

ফিরে আসি, এসে বল্‌ব। বুঝলি সোমনাথ, এটা গাত্রদাহ নয়। মেয়েরা বেড়ে উঠছে সে জন্তে আমি খুসি, কিন্তু তারা গোঁজামিল দিয়ে যথনই কাজ সারতে চায় তথনই হেসে উঠি। চলি, আর সময় নেই, বৌদি হয়ত পথ চেয়ে আছেন।—এই ব'লে সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। টুকরো হাসির শব্দ শুনলাম।

এক মিনিট পরেই দেখি সে আবার হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকছে, পিছনে শম্ভু। রুক্ষ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা নিয়ে শম্ভু পাগলের মতো এসে বললে, শিগগির এসো সোমনাথদা।

দুজনের দিকে তাকিয়ে বললাম, কেন? কি?

জগদীশ বললে, আয়, লোকনাথকে নাকি পুলিশে ধরেছে।

তৎক্ষণাৎ উঠে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। বললাম, পুলিশে? কেন?—ভয়ে আমার গলা বন্ধ হয়ে এল।

তারা দুজনেই তথন ছুট্‌ছে। আমিও ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে শম্ভু বললে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারা যায়নি। হাতকড়া দিয়ে তাকে থানায় নিয়ে গেছে।

বিশ্বসংসার যেন চোথের সুমুথে ঘূর্ণীর মতো ঘুরতে লাগল। এমন কী অপরাধ করেছে লোকনাথ যে পুলিশে ধরবে? যদি আর না ছাড়ে? জগদীশ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এক সময় বললে, কোনো রাজনীতিক কারণ নাকি? বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করেছিল?

না, সে সব কিছু নয়।—ব'লে শম্ভু ছুটতে লাগল।

তবে? কোনো স্ত্রীলোকের ওপর কিছু অন্যায় করেছে?

তাও না।

সোমনাথের কাছে টাকা ছিল, বড় রাস্তা থেকে একখানা ট্যাক্সিতে ওঠা গেল। দৌড়, দৌড়, দৌড়। তীরবেগে ছুট্‌ল মোটর। ভাড়া বাদে ড্রাইভারকে কিছু বকশিস কবুল করা গেল। আমরা সবাই বিমূঢ় হয়ে গেছি, নির্ব্বাক হয়ে আছি।

জগদীশ এক সময় বললে, তবে কী? কাগজে সিডিশন্ ছাপিয়েছে?

শম্ভু বললে, তার নাম ত আর সম্পাদক ব'লে ছাপা হয় না, তাকে ধরবে কেন?

কেমন ক'রে আমাদের পথটা ফুরোতে লাগল মনে নেই। আমাদের বেপরোয়া ট্যাক্সি যে কোনো অসতর্ক পথিকের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল না এইটেই আশ্চর্য্য। জনজটলায় রাজপথ তথন মুথরিত, আপিস-ইস্কুল থোলা,—চারিদিকে পিপিলিকার মতো মানুষ, পিপিলিকার মতো গাড়ীঘোড়া,—দ্রুত, অন্ধ, উন্মত্ত। কেউ যদি চাপা যায় আমরা দুঃখিত হবো না, সকলের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে লোকনাথের কাছে যদি পৌছতে পারি তার জন্তও আমরা প্রস্তুত। পুলিশ ত সামান্য, মৃত্যু পর্য্যন্ত গিয়েও লোকনাথকে ধরতে হবে। সে বড় মূল্যবান, সে বন্ধু। বন্ধুর সংখ্যা জগতে অতি অল্প, একজনেরো অভাব আমাদের সইবে না।

থানার কাছে এসে গাড়ী থাম্‌ল। জগদীশ লাফিয়ে পড়ল ফুটপাথের ওপর। লোহার গেটএর বাইরে অনেক লোকজন জমায়েৎ হয়েছে, তাদের চোথে মুথে কৌতুহল, নানা বক্রোক্তি, নানা আলোচনা,—কোনোটাই বোধগম্য নয়। জগদীশের পিছনে পিছনে ভিড় ঠেলে দরজায় উঠতেই একটা পাহারাওয়ালা বাধা দিল। জগদীশ বললে, ছাড়ো, আমরা আসামীর ভাই।

সে ছাড়ল না কিন্তু ভিতর থেকে দারোগা বেরিয়ে এলেন।

আরে, জগদীশবাবু যে? আপনি? কি মনে ক'রে?

জগদীশ নমস্কার জানিয়ে হেসে বললে, আপনাদের দ্বারস্থ না হ'লে আমাদের আর গতি কি! আপনাদেরই ত রাজত্ব!

দারোগা হেসে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন। হঠাৎ আজ অসময়ে পায়ের ধূলো দিলেন যে?

জগদীশ বললে, ল্যাজে পা পড়েছে ভূপতিবাবু। পায়ের ধূলো না দিয়ে উপায় কি? এমনো হতে পারে ধূলো কিছু নিয়ে যেতেও এসেছি!

কপালে হাত ঠেকিয়ে দারোগা বললেন, দুর্গা, দুর্গা,—বলেন কি, আমরা আপনাদের পায়ের থড়ম। আপনি এত বড় একজন প্রেট্রিয়ট্, কলেজ স্কোয়ারে আপনার সেই বক্তৃতাটা আমি আজো মুথস্থ বলতে পারি। কি করব

বলুন, পেটের দায়ে চাকরি করি, তাই আপনাদের য়্যারেষ্ট্ করতে হয়! তারপর, কি খবর বলুন?

শম্ভু ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জগদীশ ভূমিকা না করেই বললে, লজ্জার মাথা খেয়েছি ভূপতিবাবু, এসেছি আমাদের এক বন্ধুর খবর নিতে। তিনি আপনাদের এই মন্দিরেই আছেন।

কে বলুন ত?

তাঁর নাম লোকনাথ লাহিড়ী।

তৎক্ষণাৎ ভূপতিবাবুর চেহারা গেল বদ্‌লে। তাঁর মুখভঙ্গীর এমন বিস্ময়কর দ্রুত পরিবর্ত্তনে আমাদের মুখ পর্য্যন্ত লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বোঝা গেল, তিনি পুলিশের দারোগা ছাড়া আর কিছু নন্! বললেন, দয়া ক'রে এখনই চ'লে যান্ আপনারা, নৈলে এই নোংরা কেসে আপনারাও জড়িয়ে পড়বেন,—এই ব'লে তিনি চ'লে যাবার উপক্রম করলেন।

জগদীশ তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, আমাদের জড়ানো আপনারই হাতে ভূপতিবাবু। আমরা কেবল জানতে এসেছি তার অপরাধটা কি।

এগারোটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হবে, তখনই জানতে পারবেন আপনাদের বন্ধুর গৌরব-গাথা!

তাঁর বক্র ওষ্ঠের বিদ্রূপে রক্তের মধ্যে কোথায় যেন আগুন ধ'রে গেল, হঠাৎ কী যে একটা প্রলয়ঙ্কর ইচ্ছা জেগে উঠ্‌ল বলতে পারিনে। কিন্তু নিঃশব্দে নিজেকে সংযত ক'রে বললাম, দয়া ক'রে বলুন না?

দয়া ক'রে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই: অল্প কিছু অর্থ ছিল লোকনাথের কাছে। কাল সন্ধ্যার পর সে গিয়েছিল পল্লীবিশেষে একটি স্ত্রীলোকের ঘরে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকটিকে সে মদ্যপান করায়, ফলে স্ত্রীলোকটি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় লোকনাথ তার গলার হার খুলে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। সদর দরজায় এসে দেখে ভিতর থেকে তালা বন্ধ। ইতিমধ্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে আর একটি স্ত্রীলোক গোলমাল ক'রে ওঠে। সে ধরা পড়ে। ভোর বেলা কয়েকটি বেশ্যা মিলে তাকে থানায় দেয়। সিরিয়স্ কেস্।

জগদীশ হেসে বল্লে, এই মাত্র? ঘটনাটা এতই সাধারণ যে, চমক্ লাগে না। বুঝলি শম্ভু, লোকনাথটার অরিজিনালিটি নেই!

শম্ভুর চোখের জল গালের উপরে নেমে এসেছে, সে উত্তর দিল না। ভূপতিবাবু বললেন, আসামীর তরফ থেকে ডিফেণ্ড্ করা হবে কি?

জগদীশ বললে, হওয়াই ত উচিত, কিন্তু ভূপতিবাবু, একটা ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে। আমাদের বন্ধু, আমাদের সঙ্গী, আমরা সবাই দরিদ্র···আপনি না দেখলে উপায় নেই!

আমি কি করতে পারি জগদীশবাবু? চুরি করেছে, ফল ভোগ করবে!

এবার বললাম, কোর্টে কেস্ উঠলেই ওর কন্‌ভিক্‌শ্যন্ হবে, তার আগে আপনি মিটিয়ে না দিলে আর উপায় নেই। আমাদের মিনতি, আমাদের প্রার্থনা—

ভূপতি বললেন, আমি মেটাবো? অসম্ভব! সেই বেশ্যাটা এসে ব'সে রয়েছে ভেতরে, সে ছাড়বে কেন? তা ছাড়া ডেপুটি কমিশনারের কাছে কেস্ লেখা হয়ে গেছে!

কিন্তু সব আইনেরই ব্যতিক্রম আছে ভূপতিবাবু। এই ব'লে জগদীশ এক পা এগিয়ে দারোগার হাত ধরল। আমাদের আত্মসম্মান-জ্ঞান ইতিমধ্যেই কিছু কমে গেছে, আমরাও হাত জোড় ক'রে বললাম, সেই মেয়েটির সঙ্গে একবার দেখা করতে দেবেন?

তা দেবো না কেন, আসুন।

আমরা তিনজনে তাঁর অনুসরণ করলাম। সমস্ত থানাটার ভয়ানক আবহাওয়াটা যেন আমাদের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে। বারান্দাটা পার হয়েই দুটি স্ত্রীলোককে আমরা দেখতে পেলাম। লক্ষ স্ত্রীলোকের ভিড়ে থাকলেও বারবনিতাকে চিনতে দেরি হয় না। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দারোগা তাদের ভিতরে একজনকে ডেকে বললেন, ওগো কাননবালা, এঁরা আসামীর লোক, এঁদের সঙ্গে একটু ভাব করবে?

একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল, প্রথমটা আমাদের দিকে ফিরে তাকাল না, দারোগার দিকে তাকিয়েই হেসে বললে, আপনার কেমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা, আমি কি বলেছি যে ভাব করব না?

জগদীশ ফস ক'রে বললে, লোকনাথটার প্রবৃত্তি খারাপ

কিন্তু রুচিটা ভালো!—তারপর সে নিজেই এগিয়ে কাননবালার সঙ্গে আলাপ করলে, হেসে বললে, আহা মা যেন আমার অন্নপূর্ণা, এসো ত মা একটি কথা বলি?

কথা বলুন, আমি আপিস ঘরে আছি। ব'লে দারোগা সেখান থেকে চ'লে গেলেন। মুখে তাঁর অল্প চাপা হাসি, অর্থাৎ জগদীশের মা বলার তোষামোদটা তাঁর কানেও একটু বাজ্‌ল।

আমার চোখ ছিল থানার হাজতের দিকে, শম্ভু ব্যাকুল হয়ে লোকনাথের সন্ধান পাবার চেষ্টা করছে, অন্য মেয়েটি তার এই নিরুপায় ব্যাকুলতার দিকে চেয়ে টিপে টিপে হাসছিল। সে এক বীভৎস নিষ্ঠুর হাসি, সে হাসি সম্ভবত মেয়েদের মুখেই মানায়।

কাননবালা একটু দূরে বারান্দার ধারে গিয়ে জগদীশের কাছে দাঁড়াল। বললে, ও কি কথা আপনার? ঠাকুরের সঙ্গে নাম করলে আমাদের পাপ হবে যে?

চাপা গলায় জগদীশ বললে, দেখলি সোমনাথ, দেখলি, ধর্ম্মে মতি—কা'কে বলে? লোকনাথটা ধর্ম্মের ঘরে সিঁধ কাটতে গিয়েছিল, শালার নরকেও ঠাঁই হবে না। বড্ড মদ খাইয়েছিল তোমাকে, না মা? উঃ কী চসমখোর, চোখের চামড়া নেই!

তার উত্তরে কাননবালা লোকনাথের প্রতি যে-ভাষায় কটূক্তি করতে লাগল, সে-ভাষা আমাদের রুচি-প্রচারক 'সুনীতি-সঙ্ঘের' উন্নাসিক নীতিবিদ্‌রাও জানেন না।

কিছুক্ষণ পরে কাননবালা ঠাণ্ডা হোলো। জগদীশ তারস্বরে তাকে 'মা মা' ব'লে ডেকে কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করেছে। স্থির হয়ে সে বললে, প্রায়ই যেতো আমার ঘরে, চুরি করার মতলব কিন্তু টের পাইনি। আমাদের চোখে ধুলো দেবার জো-টি নেই। গরীব ব'লে কতবার আমার কাছে ব'সে কান্নাকাটি করেছে, মাইরি বলছি। কতদিন টাকা দেয়নি, চুপ ক'রে গেছি,—আহা, বলি যাক্ গে, টাকা ত ময়লা! আমার ঘরে আসে, আচার ব্যাভার মিষ্টি, খোসামুদ করে, পদ্য শোনায়—টাকার তাগাদা আর করিনে। কেমন যেন ভালোও লাগত লোকটাকে, কতদিন বলেছে, খেতে পাইনি,—তক্ষুণি রেঁধে দিইছি! ওমা, পেটে পেটে তোমার এমন শয়তানি! পুরুষ মানুষ বড় শঠ।

জগদীশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বললে, মা এবার রক্ষে করো, বিপদে তুমি রক্ষে করো মা। পায়ে ক'রে বৈতরণী পার ক'রে দাও এবারের মতো।

ও কি কথা গাঁ? গলায় পৈতে দেখা যাচ্ছে, বামুনের ছেলে! বড়ো মুখে ছোট কথা কও'কেন?

ধ্যানস্তিমিত দৃষ্টিতে আবেগ-উদ্বেলিত কণ্ঠে জগদীশ বললে, সন্তান আমরা, এখানে জাতিবিচার নেই মা। কে বলেছে তুমি পতিতা, বিশ্বের সকল কলঙ্ক, মানুষের দুরপনেয় লজ্জার ভার মাথায় বয়ে নিয়ে চলেছ, তুমি উদাসিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী—তোমার এক হাতে সুধাপাত্র, অন্য হাতে বিষভাণ্ড—

অলক্ষ্যে এতক্ষণে শম্ভুর মুখে হাসি ফুট্‌ল। কাননবালা খানিকটা বিপর্য্যস্ত, খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে জগদীশের মুখের দিকে তাকাল, জগদীশ ততক্ষণ কৃত্রিম অভিনয়-উচ্ছ্বাসের দ্বারা সুচতুরভাবে নিজের চোখে জল টেনে এনেছে।

আমি বললাম, মিনতি করছি, যেমন করেই হোক, লোকনাথকে বাঁচিয়ে দিন্।

কাননবালা বললে, আমি কি করব বলুন, আমি ত আর ধরাইনি। ভদ্দরলোকের ছেলে হয়ে এমন কাজ করলে—চুরি করলে কি আর কেউ ছেড়ে কথা কয়?

জগদীশ বললে, তবে কে ধরিয়ে দিয়েছে মা?

ওই ত বাড়ীউলি বসে রয়েছে, ওরাই। আমার কি তখন হুঁস ছিল? ওরা বলে লোকটা মদের সঙ্গে আমাকে মর্ফিয়া খাইয়েছিল।—তারপর চাপা গলায় কাননবালা বললে, আমি বারণ করেছিলুম। বলি, হার ত আর যায়নি তখন পুলিশে আর দেওয়া কেন, ওরা কিছুতে শুনলে না।

যাই হোক, অনেক পরামর্শ, প্রার্থনা, যুক্তি, নাকখৎ, বক্তৃতা,—এবং শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের নামে দারোগাবাবু ও কাননবালার ব্যবস্থায় স্থির হোলো, পুলিশের ফণ্ডে কিছু জরিমানা এবং কাননবালার বাড়ীওয়ালীদের কিছু আক্কেলসেলামী, এই জোগাড় ক'রে এনে দিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আর কেস্ উঠবে না,—লোকনাথকে ক্ষমা চাইয়ে মুক্তি দেওয়া হবে।

কিন্তু কত টাকা?

কথাবার্ত্তার আভাসে জানা গেল, অন্তত দুশো টাকা।

ভয়ে আমাদের প্রাণের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত শুকিয়ে ধূ ধূ ক'রে উঠ্‌ল। দুশো টাকা আমাদের কাছে স্বপ্ন, দুশো টাকা আমাদের পক্ষে এক মহাসমুদ্র। বুকের ভিতরে ধক্ ধক্ ক'রে একপ্রকার শব্দ হতে লাগল, আতঙ্কে চোখের তারা কাঁপছে।

পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে টাকার কথা ভাবছিলাম এমন সময় দারোগা এসে বললেন, একজন আসুন, আসামীকে একবার দেখে যেতে পারেন আপনাদের কেউ।

পাশেই হাজত, জগদীশই মুখপাত্র হিসেবে গেল। আমরা কাছাকাছি রইলাম। কাননবালা মৃদুকণ্ঠে আমাদের দু'জনকে শুনিয়ে বললে, কিছু টাকা ধ'রে দিন্ আপনারা, আমি ব'লে ক'য়ে মিটিয়ে দিতে পারব।—তারপর অধিকতর মৃদুকণ্ঠে পুনরায় তার বাড়ীওয়ালীর দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, আমার ওপর ও-মাগির হিংসে, বুঝলেন? লোকনাথকে ও দেখতে পারে না, এবার রাগ ভুলবে··· ভারি তাঁদোড় মেয়েমানুষ। আর কখনো আমি 'বাবু' করব না, লোকটা খুব শিক্ষা দিয়েছে!—এই ব'লে সে গিয়ে বাড়ীওয়ালীর পাশে বসল।

হাজতের দরজাটা পশ্চিম দিকে ফেরানো। দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না বটে কিন্তু দুজনের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম।

জগদীশ হেসে বললে, কি রে, জাত খোয়ালি, পেট ভরাতে পারলিনে? দুত্তোর!

লোকনাথ ভিতর থেকে উল্লসিত কণ্ঠে বললে, হারটা বিক্রি করলে কতই আর হোতো! এ বাবা বেশ রইলুম। সরকারি হোটেলের ভাত, অন্তত দু'বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। খুনের দায়ে পড়লে আরো ভালো হোতো, চোদ্দ বছরের জন্য স্বরাজ-লাভ। কাল সন্ধ্যে পর্য্যন্ত 'স্বাধীনতা' আপিসে ধন্না দিয়েছিলুম ভাই, একটি পয়সাও দিলেনা ব্যাটারা। আমার বউয়ের ওখানে একটা খবর পাঠাস, বলিস 'স্বদেশী ডাকাতি' করতে গিয়ে তোমার স্বামীদেবতা গ্রেপ্তার হয়েছেন! পাগ্‌লি কিন্তু বিশ্বাস করবে না ভাই, এই যা দুঃখ!—বলতে বলতে সে হেসে উঠ্‌ল। হাসির শব্দে তার কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই,—সে যেন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

জগদীশের সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম। দারোগাবাবু ব'লে দিলেন, এত ক'রে যখন বললেন, তিনটে পর্য্যন্ত সময় রইল, তারপরে কিন্তু আসামীকে আদালতে পাঠিয়ে দিতে হবে জগদীশবাবু, এখানে রাখার হুকুম নেই। মনে রাখবেন।

পথে নেমে পরস্পর আমরা মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে বললাম, কিন্তু টাকা? বেলা বারোটা বাজে,—এইটুকুর মধ্যে টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

শম্ভু বললে, আমার সন্ধানে পাঁচটা টাকা আছে, এনে দেবো।

জগদীশ বললে, কিন্তু পাঁচ ইনটু চল্লিশ যে চাই। আমি বৌদিদির কাছে পঁচিশ টাকা নিতে পারব, তিনি স্বামীর কাছ থেকে বজবজ যাতায়াতের মোটর ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তারপর?

আমি বললাম, তোমার কাছে আছে আমার স্যুট্‌কেস, তার মধ্যে পাবে একটা হাতঘড়ি! সস্তায় বেচলেও গোটা তিরিশ পেতে পারো,—কিন্তু তারপর?

জগদীশ বললে, সময় নেই, তুই চ'লে যা সোমনাথ। প্রথমে যাবি বঙ্কিমের কাছে, তারপর মা, ভগবতী,—তারপর যাবি স্বামীজির ওখানে। শম্ভু তুই যা বেলেঘাটায়। আমি হাতঘড়ি বেচে যাবো বৌদিদির বাড়ী।

তিনজনে তীব্রবেগে তিনদিকে ছুটলাম। কথা রইল, আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে থানার দরজায় মীট্ করব।

ভাগ্য বিমুখ, আশা মরীচিকা। বঙ্কিমকে পাওয়া গেল না, হঠাৎ কী কাজে সে ধানবাদে রওনা হয়েছে। মাথাটা ঘুরে উঠ্‌ল। বঙ্কিমের আশাই বেশিরকম করেছিলাম। তারপর? কোথায় যাবো? রাস্তাঘাট যেন চোখের উপরে লাফাচ্ছে। সময় যে বড় কম! এর মধ্যেই আধঘণ্টা কাটল। আকাশ গুমোট,—না বৃষ্টি, না রোদ। ছুটলাম বঙ্কিমের দরজা থেকে। মা—মা'র ওখানেই যাব। দৌড়, দৌড়, দৌড়। হাঁটবার সময় নেই, সময় নেই নিশ্বাস নেবার। টাকা, টাকা, টাকা। টাকা মানে আজ ধর্ম্ম টাকা মানে ভগবানের অস্তিত্ব। সর্ব্বকালের প্রয়োজন, সর্ব্বদেশের প্রয়োজন,—অনাদি অনন্ত প্রয়োজন।

সময় নেই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে লোকনাথ দূরে স'রে যাচ্ছে—যাচ্ছে নৈতিক মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে। দারিদ্র্যের প্রতিবাদ করেছে সে আত্মনির্য্যাতনে, আত্মঅপমানে। বিদ্রূপ করেছে সে মনুষ্যত্বকে, ব্যঙ্গ করেছে বিধাতাকে!—সময় নেই, ছুটতে ছুটতে চলেছি।

পথে হঠাৎ বাধা পড়ল। ফিরে দেখি সাহিত্যিক বাণীপদ।

কোথায় চলেছ সোমনাথ? কে তাড়া করেছে পিছনে?

মুখ ফিরিয়ে চেয়ে হাসতে হোলো। অতি কষ্টের হাসি, ক্লিষ্ট ভদ্রতার হাসি। নিজের হাসির প্রতিবাদ করলাম নিজে। বল্‌ব নাকি তাকে? চাইব নাকি ভিক্ষা?—বললাম, বিশেষ কাজে বিশেষ তাড়াতাড়ি। ভালো ত'?

হেসে মধুর কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, ভালো।

ভালো ত' বটেই। তার চেয়ে ভালো সংসারে আর কে? যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর তার মধ্যে সে বাস করে। দক্ষিণ বাতাসের পাল তুলে সে ভেসে বেড়ায়, ফুলের গন্ধে, মৌমাছির গুঞ্জনে তার অলস মন্থর বেলা যায় কেটে। সে ভালো, সে খুব ভালো, যুগযুগান্তরের ভালো তার মধ্যে,—বিধাতার এই দুঃখময় বিপুল সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে ভালো সে। ভালোর ভিতরেই সে যেন দীর্ঘজীবী শ্রীজীবী হয়ে থাকে।

চাইতে কিছু পারলাম না, হেসেই চ'লে গেলাম। কেন চাইব তার কাছে? চাইলেই সে দেবে, কিন্তু কেন নেবো তার সেই পরম অনুগ্রহের দান? আমাদের সে অনুগ্রহ করে, প্রশংসা করে,—কিন্তু জানি তার অসীম ঔদাসীন্য আমাদের প্রতি। সে অভিজাত সমাজের মানুষ, দরিদ্রের প্রতি, সহায়হীন দুঃস্থের প্রতি তার অনন্ত তাচ্ছিল্য, অপরিমেয় কৃপা। মূঢ় ম্লান মূক মানুষের উপরে সে কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, কিন্তু সে কবিতা তার অবকাশরঞ্জিনী, তার খেয়াল-খুসির ছন্দোবদ্ধ অনুকম্পা। সৌখীন সমাজের চিত্তবিলাস তার আর্টের উপাদান, এই তার গৌরব, এই তার সাহিত্য। তার সমস্ত রচনার মধ্যে জনসাধারণের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা, আমাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন অবহেলা। অবহেলায় সে বড় হয়ে উঠেছে, আপন সমাজের আভিজাত্য বাঁচাবার জন্য নিষ্ঠুরভাবে সে করুণা করেছে তাদের, যারা তার আভিজাত্য রক্ষার মূল ভিত্তি। তার ভিতরে বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, আছে অনুগ্রাহক, আছে এক ভিক্ষাদাতা ব্যক্তি! সে বড় ব'লে আর সবাই তার কাছে ছোট হয়ে গেছে।

ছুটতে ছুটতে চললাম। এক ঘণ্টারো উপরে কেটে গেল। সময় অতি অল্প। ঊর্দ্ধশ্বাসে, অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো। টাকা চাই, টাকা। টাকা মানে বন্ধুত্ব, টাকা মনুষ্যত্ব, টাকা জীবন।

পথ ঘুরে মা'র বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে পা দুখানা চলৎশক্তিহীন হয়ে গেল। বিপদের গুরুত্বের কথা জানালেই তিনি হয়ত টাকা দেবেন। কিন্তু—কিন্তু সুযোগ নেবো তাঁর অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহের? সুবিধা নেবো উদার বাৎসল্যের? কেমন ক'রে জানাব, আমরা তাঁর কলঙ্কময় সন্তান, আমরা বর্ব্বর, দুর্নীতিপরায়ণ, আমরা মাতাল বেশ্যার গলা থেকে হার ছিনিয়ে পালাই! কেমন ক'রে তাঁকে বল্‌ব, তুমি আমাদের সম্বন্ধে যা জেনে রেখেছ মা, আমরা তা নই, আমরা শিক্ষিত নই, ভদ্র নই, চরিত্রবান নই, ধার্ম্মিক নই। চিত্তের মালিন্য প্রকাশ করা আমাদের কাজ, দুর্নীতি নিয়ে বিলাস করা আমাদের ধর্ম্ম, চৌর্য্যবৃত্তি ও দেহলালসায় আপন আত্মাকে কলুষিত করাই আমাদের রীতি। তুমি যা জেনে রেখেছ তা ভুল, অসত্য। আমরা তোমার পতিত সন্তান!

ফিরে চললাম দরজা থেকে। বাঁচাতে পারা গেল না লোকনাথকে। কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে কারাবরণ যদি সে করেই তবে দুঃখ করবার কিছু নেই,—এই তার পণ। উদাহরণ হয়ে থাক্ সে দারিদ্র্যের,—শুধু দারিদ্র্যের নয়, শোষণতন্ত্রের; ধনিক-সম্প্রদায়ের নির্দ্দয় নির্য্যাতনের সাক্ষী থাক্ সে, ধন-বৈষম্যের ভয়াবহ পরিণামের প্রতীক্ সে। দেশের অপরিমেয় অধঃপতনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লোকনাথ।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে, ব্যর্থ হয়ে মান, অভিমান, অপমানবোধ এক সময় সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে, লজ্জা ও সঙ্কোচের টুঁটি টিপে, অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য বিসর্জ্জন দিয়ে, নতমস্তকে ভিখারীর মতো পিতৃদেবের বাড়ীর দরজায় এসে হাজির হলাম। তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন, রক্তের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন—তবু আজ তাঁর পায়ে ধরব, তাঁর শাসন আর নির্দ্দেশ মেনে নেবো, ভিক্ষা চাইব ভিখারীর মতো,—সকল দর্প আজ আমার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

এখানে না এসে লোকনাথকে বাঁচাবার আর কোনো উপায়ই ছিল না। আগে লোকনাথ বাঁচুক।

নিজেই নিজেকে একটা ঝাঁকানি দিলাম। দরজা ভেজানো, ঠেলে ঢুকলাম ভিতরে। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, ধুলায় ধুসর। প্রথমেই দেখা গেল দুখীরামকে, একটা খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে সে বাইরের ঘরে ঘুমোচ্ছে। এত গরমে চাদর মুড়ি? বোঝা গেল ম্যালেরিয়া। আমার পায়ের শব্দ সে শুনতে পায়নি। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম, কোথাও সাড়া শব্দ নেই। বাড়ীর পাশের অংশটায় ভাড়া থাকে, এদিকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

সময় বড় কম, মুহূর্ত্তের চূড়ায় চূড়ায় ছুটে যেতে হবে। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে পিতৃদেবের সন্ধানে সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে গেলাম। না, বাড়ীতে কেউ নেই বটে। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। সময় ত নেই, অপেক্ষা করব কতক্ষণ? মিনিট দুই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আজ আমি পরিত্যক্ত, এই বাড়ীঘর আসবাব-পরিচ্ছদ, এদের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এরা আর আমার কেউ নয়। আমি যে ধনাঢ্যের পুত্র একথা ভুলেই গেছি। যিনি আমার সকলের চেয়ে আপন, তিনি এখন সকলের চেয়ে দূরে। বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে একদিকে চেয়ে রইলাম।

অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্পে একসময়ে মনটা দুলে উঠ্‌ল। প্রচণ্ড আন্দোলনে আমার বহুসাধনায় প্রতিষ্ঠিত ন্যায় ও নীতির অসংখ্য ভিত্তিগুলি তাসের ঘরের মতো মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়ল। পিতৃদেবের শয়নকক্ষের ভিতরে তাকালাম। না, এখন কেউ নেই, কেউ দেখবে না। ধক্ ধক্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌ল আমার চোখ, এবং পরমুহূর্ত্তেই ভূতাবিষ্টের মতো ঘরের ভিতরে গিয়ে ক্যাশবাক্সের কাছে দাঁড়ালাম। এই ত অপূর্ব্ব অবসর!

*

* *

দরজা পার হতে গিয়ে দুখীরাম জেগে উঠ্‌ল। উচ্চকণ্ঠে বললে, কে রে? কে যাচ্ছে বেরিয়ে?

তাকে আমি চিরকাল চিনি। উত্তর না দিলে এখুনি হয়ত চেঁচামেচি ক'রে একটা কেলেঙ্কারী বাধাবে। বার্দ্ধক্যের সজল চীৎকার। থমকে দাঁড়িয়ে ভিতরে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আমি রে দুখীরাম, তোর বুঝি অসুখ করেছে?

পরক্ষণেই সে হাউমাউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—দাদা-ভাই, তুমি এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? এতদিন—

থাম্ দুখীরাম, বাবা কোথায় আগে বল্।

তোমার বাবা,—আজ তাঁর মকোদ্দমার দিন।—ধড়মড় ক'রে সে উঠে এল। তার হাত এড়ানো দায়।

বললাম, তোদের খবর নিতে এসেছিলুম। ম্যালেরিয়া জ্বর ত, কালকেই সেরে যাবে। শোন্ দুখীরাম, তোকে একটা কাজ করতে হবে কিন্তু।—পা দুটো তখনো আমার আতঙ্কে কাঁপছিল।

দুখীরাম স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, দেখা যখন হোলো না তখন তাঁকে আর জানিয়ে কাজ নেই যে আমি এসেছিলুম। তুই দিব্যি ক'রে বল্ ত, আমি যে এসেছিলুম কোনোদিন তাঁকে বলবিনে?

কম্পিতকণ্ঠে দুখীরাম বললে, বারণ কচ্ছ যখন, বেশ, বলব না।

যদি কোনো বিপদ ঘটে তোর তাহলেও বলবিনে ত?

না।

আজ তবে চললুম। বড় তাড়াতাড়ি। কিছু মনে করিসনে। আবার দেখা হবে।—তাকে উত্তর দেবার সময় আর না দিয়ে আমি বিদ্যুৎবেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে কিছুদূর এসে দেখা গেল, বেলা আড়াইটে বেজে গেছে। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, সপ সপ ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। দ্রুত চলেছি, কিন্তু চোখে আর আমার কোনো ভাষা নেই, আশা নেই। কেমন যেন মনে হতে লাগল, এ পৃথিবীর সমস্তটা লাল, গভীর লাল, অবর্ণনীয় লাল। আমার হাত, পা, সর্ব্বশরীর খুনের রক্তে রাঙা। আমি খুন করেছি আপন চরিত্রকে, খুন করেছি নিজেকে। রক্তে অবগাহন করেছে আমার আত্মা।

জানিনে কেন চোখে আমার জল আসছে। আমি ত বিজয়ী, কৃতকার্য্য, বাঁচাতে পারলাম একজনকে চিরদিনের অপমানের হাত থেকে। তবে কেন উত্তপ্ত অশ্রু জমে উঠ্‌ছে চোখে ধীরে ধীরে? কেন বুকের পাঁজরের মধ্যে এত ব্যথা, এত কাঁটা? কেন হঠাৎ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ভিতরটা হা হা ক'রে উঠ্‌ছে? এ কি কেবলমাত্র লুণ্ঠন, এর নাম কি নৈতিক মৃত্যু নয়?

—ক্রমশঃ

ডাক্তার ভোলানাথ বসু

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এম-আর-এ-এস

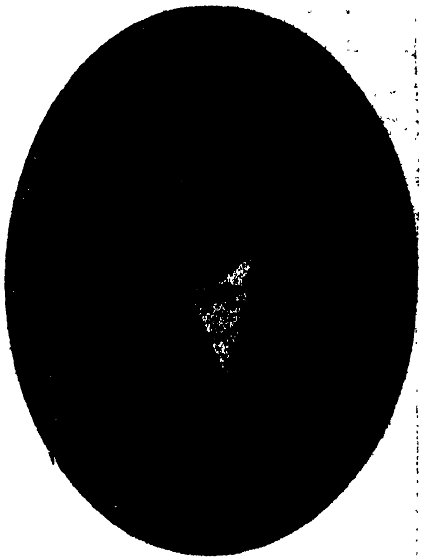
কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে ব্যারাকপুর নামক সুপরিচিত জনপদে 'ভোলানাথ বসুর ডিস্পেন্সারী' নামক একটি চিকিৎসালয় আছে। এই স্থানে শতশত রোগী প্রতিনিয়ত সেবা যত্ন ও শুশ্রূষা লাভ করিতেছে; যথাযোগ্যভাবে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভ করিতেছে বা মৃত্যুর পূর্ব্বে শান্তিলাভ করিতেছে। যাঁহার পরিকল্পনায় উহা প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার অর্থে উহা পরিপুষ্ট,—যাঁহার নামের পবিত্র স্মৃতির সহিত উহা বিজড়িত, তাঁহার পুণ্যচরিত-কাহিনী আজ



ভোলানাথ বসু

অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াও স্বাবলম্বন, অধ্যবসায় ও চরিত্রবলে যিনি একদিন অনুন্নত যুগে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, যখন কোনও বাঙ্গালী য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দুরূহ প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বাঙ্গালী ছাত্রের মানসিক শক্তির উৎকর্ষের প্রমাণ দেয় নাই তখন যিনি লণ্ডনের এম্-ডি উপাধি হেলায় অর্জ্জন করিয়া ইংরাজ সহপাঠিগণকে নিরাশ করিয়া সুবর্ণ পদকাদি লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার গবেষণাপ্রসূত চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থাদি একদা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদিত করিয়াছিল, এবং যিনি কষ্টলব্ধ স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ মৃত্যুকালে জনসেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার চরিত-কথা আলোচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ ব্যারাকপুরে (চাণক) বহুবাজার নামক পল্লীতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ বসু জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার

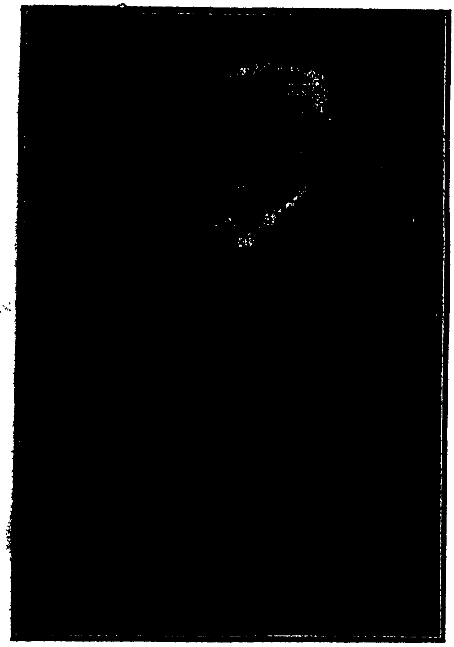


সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী

প্রপিতামহ সুবিখ্যাত বারাণসী ঘোষের বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভোলানাথের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা রামসুন্দর পরলোকে গমন করেন। ভোলানাথের জননী ভোলানাথ ও বেণীমাধব নামক আর একটি পুত্রকে লইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের বিশেষ সাহায্য না পাইলে তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইত। এইরূপ অবস্থায় পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষা দান করা তাঁহার পক্ষে

একেবারেই অসম্ভব ছিল। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ভোলানাথের সুশিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশবাসিগণকে ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না। যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সাম্রাজ্য-সংস্থাপন-প্রয়াসী ইংরাজগণ সেই শিক্ষা ভারতবাসীকে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু এতদ্দেশবাসিগণের প্রতীচ্য জ্ঞান-রত্ন লাভের আকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র ছিল; এবং প্রধানতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ ও



ডাক্তার মৌয়াট

দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইংরাজী সাহিত্য প্রভৃতির রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। অজ্ঞানান্ধকার প্রতীচ্য জ্ঞানালোকরশ্মি দ্বারা বিদূরিত করিতেই হইবে এইরূপ সঙ্কল্প লইয়া যে সকল দূরদর্শী মহানুভব য়ুরোপীয় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল জর্জ্জ ইডেন, আর্ল অব্ অক্ল্যাণ্ডের নাম চিরস্মরণীয়। ইনি ব্যারাকপুরে নিজব্যয়ে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ দিবসে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সার্দ্ধ ত্রিসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে ব্যারাকপুর পার্কে তিনি বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজী শিক্ষক রসিকলাল সেনকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করেন। ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের বেতন ত দিতে হইতই না, অধিকন্তু তাহাদের বহি শ্লেট প্রভৃতির ব্যয় এবং পুরস্কারাদির জন্য ব্যয় তিনি স্বয়ং সানন্দে বহন করিতেন। ব্যারাকপুরে অবস্থান কালে গুরুভার রাজকর্ম্মের পর বৈকালে তিনি তাঁহার বিদুষী ভগিনী মাননীয়া মিস এমিলি ইডেনের সহিত প্রায়ই বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাইতেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রগণকে উৎসাহ ও উপদেশ দিতেন। এই বিদ্যালয়ে



সার এডওয়ার্ড রায়ান

প্রবেশ লাভ করিবার জন্য বালকগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণ কিরূপ উৎসুক ছিলেন মাননীয়া মিস ইডেনের ১৭-৪-৩৭ তারিখ সম্বলিত একখানি পত্র পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি উক্ত পত্রে ইংলণ্ডীয় এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন:

"In the afternoon, a neighbour sent a note requesting admission to a new native school George has built in a park, for a Brahmin boy of good caste. I gave the

father Brahmin a note to the school master, and with the proper craft of a native, he went and fetched two more of his children and said the note was intended to admit them all three. But the schoolmaster, as all school masters should, knew how to read, and refused them, so when George and I drove to the school in the evening, we found them and about twenty others all clasping their hands and knocking their heads against the ground, because they were prevented



সার জন গ্রাণ্ট

learning English, and all saying 'Good morning, Sir,' to show how much they had acquired. They say that at all times and to every body, since the school has been opened."

জর্জ্জ পার্কের মধ্যে যে নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে জনৈক সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণ তনয়কে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য বৈকালে একজন প্রতিবেশীর নিকট হইতে পত্র পাওয়া গিয়াছিল। "আমি বালকটির পিতার হস্তে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের নামে একখানি পত্র দিলাম। ব্রাহ্মণটি এতদ্দেশবাসীদের স্বভাবসিদ্ধ চতুরতার সহিত গৃহ হইতে আরও দুইটী শিশুকে আনিয়া বলিল যে উক্ত আদেশপত্র তিনটি সন্তানেরই বিদ্যালয় প্রবেশের উদ্দেশ্যে লিখিত। শিক্ষক (যেমন তাঁহাদের নিকট আশা করা যায়) পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইতে অসম্মতি জানাইলেন। সুতরাং যখন জর্জ্জ ও আমি সন্ধ্যার সময় স্কুলে বেড়াইতে গেলাম তখন দেখিতে পাইলাম তাহারা এবং আরও প্রায় কুড়িজন বালক হাত জোড় করিয়া মাটিতে ক্রমাগত মাথা ঠেকাইতেছে—কারণ তাহারা ইংরাজী শিক্ষা করিতে পাইতেছে না এবং সকলে



ডাক্তার জন গ্রাণ্ট

তাহাদের ইংরাজী বিদ্যা কতদূর হইয়াছে তাহার পরিচয় দিবার জন্য বলিতেছে "গুড মর্ণিং স্যার।" স্কুল প্রতিষ্ঠার পর তাহারা সকলকেই এবং সব সময়েই এইরূপে অভিবাদন করিয়া থাকে।

ভোলানাথ অনায়াসেই লর্ড অকল্যাণ্ডের বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা ও অধ্যবসায় সন্দর্শনে তাঁহার শিক্ষক রসিকলাল পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রসিকলাল যেমন একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তেমনই তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও দয়ালু ছিলেন।

ভোলানাথের সাংসারিক দুঃখের কথা অবগত হইয়া তিনি নিজ বেতন হইতে মাসে মাসে তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিতেন। ভোলানাথ বাল্যকাল হইতে পরোপকারী ছিলেন এবং প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেন, এমন কি কোন কোন প্রতিবেশীর বাজার পর্য্যন্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার এক দরিদ্র সহপাঠী রাত্রিতে ভোলানাথের বাটীতে শয়ন করিতেন। তাঁহার অবস্থা ভোলানাথের অপেক্ষা মন্দ ছিল এবং রাত্রের আহারের নিমিত্ত কষ্টে-সৃষ্টে একটী পয়সা যোগাড় করিয়া রুটি তৈয়ার করিবার ময়দা কিনিতেন। কাঠ কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। ভোলানাথ



রাজা সত্যচরণ ঘোষাল

লাটসাহেবের বাগান হইতে নিজ হস্তে কাঠ কুড়াইয়া আনিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক রসিকলাল ইঁহাদের রাত্রিকালে পড়িবার তৈল দিতেন এবং পাঠ কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

ভোলানাথ শীঘ্রই তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করিলেন। বিদ্যালয়ে তিনি অভ্যুৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড, মাননীয়া মিস্ ইডেন এবং উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ প্রায়ই এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিতেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের অনুগ্রহ-দৃষ্টি ভোলানাথের প্রতি পতিত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত হইলে লর্ড অকল্যাণ্ড ভোলানাথকে পুরস্কৃত করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। প্রকাশ্য পুরস্কার বিতরণ সভায় অকল্যাণ্ড নিজের অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া শিক্ষক রসিকলালকে তাহা প্রদান করিয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রতিও তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ মেডিকেল কলেজে প্রবেশ লাভ করেন। এই কলেজে তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।



ডেভিড হেয়ার

যেরূপ উচ্চ ইংরাজী সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিতে এতদ্দেশ-বাসিগণকে শিক্ষাদান করিতে তৎকালীন গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কোনও চেষ্টা করেন নাই, প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে গবর্ণমেণ্টের সেইরূপ ঔদাসীন্য দেখা গিয়াছিল। সিপাহী পল্টনের হাসপাতালে ঔষধ প্রস্তুত, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও সামান্য চিকিৎসা করিবার জন্য কম্পাউণ্ডার শ্রেণীর কতকগুলি লোকের প্রয়োজন হয় বলিয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি 'নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসন' নামক চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

উহাতে জনকুড়ি ছাত্র ৮৲ টাকা মাসিক ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হিন্দী ভাষায় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু কিছু শিখিত। অধিকাংশ ছাত্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী পল্টনের সিপাহীদের পুত্র বা আত্মীয়; এই জন্য হিন্দীতে লিখিত ছোট ছোট পুস্তক হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ছাত্রেরা ছাগল কুকুর কাটিয়া শরীর বিদ্যা বা এনাটমি শিখিত। ডাক্তার ব্রিটন, পরে ডাক্তার টাইটলার ও তাঁহার পর ডাক্তার ডোনাল্ড রস আট শত টাকা বেতনে এই বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিতেন।

বাঙ্গালী হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য সংস্কৃত কলেজে সুশ্রুত,



রামগোপাল ঘোষ

চরক ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সনাতন চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে উহার সহিত ছাত্রগণকে ডাক্তার টাইটলার প্রতীচ্য চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কয়েক বৎসর পরে ডাক্তার গ্রান্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণকে এনাটমি ও ফিজিওলজিও পড়াইতে আরম্ভ করেন।

বাঙ্গালী মুসলমান ছাত্রদিগের জন্যও কলিকাতা মাদ্রাসাতে সুশ্রুতের শ্রেণীর ন্যায় আবিসেন্নার শ্রেণী ছিল।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক চিকিৎসা বিদ্যার অবস্থা অবগত হইবার জন্য কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি স্যার জন গ্রাণ্ট এই সমিতির সভাপতি ছিলেন, এবং স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, ডাক্তার মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতি এই সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সমিতি য়ুরোপীয় প্রথায় য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। চিকিৎসা-বিদ্যা শ্রেণী সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার টাইটলার এই মন্তব্যের ঘোর প্রতিবাদ করেন। ডাক্তার টাইটলার কিছু eccentric



প্রিন্স দ্বারকানাথ

(উৎকেন্দ্র) হইলেও সেকালের একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। কি গণিত, কি বিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি ভেষজতত্ত্ব, কি অস্ত্রচিকিৎসা সকল বিষয়েই তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নানাবিধ ভাষা জানিতেন। প্রাচ্যভাষা সমূহে তাঁহার অধিকার হোরেস হেয়্যান উইলসনের অপেক্ষা মন্দ ছিল না, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় তিনি উইলসন অপেক্ষা পণ্ডিত ছিলেন। হিব্রু ভাষাতেও তাঁহার এরূপ অধিকার ছিল যে য়িহুদী পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট হার মানিতেন। ইনি উইলসনের

ন্যায় বিশ্বাস করিতেন দেশীয় ভাষারই প্রধানতঃ এতদ্দেশবাসীর শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত ; এবং বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফল যাহা আয়ুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ আছে তাহা অবহেলার বস্তু নহে। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির সহিত প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষায় তিনি কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু ডাক্তার টাইটলারের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষিত হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি আদেশ দিলেন যে কলিকাতায় একটি প্রতীচ্য আদর্শানুযায়ী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এবং ১লা মার্চ্চ হইতে সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসার চিকিৎসাশ্রেণী এবং নেটিভ



রাজা রাধাকান্ত

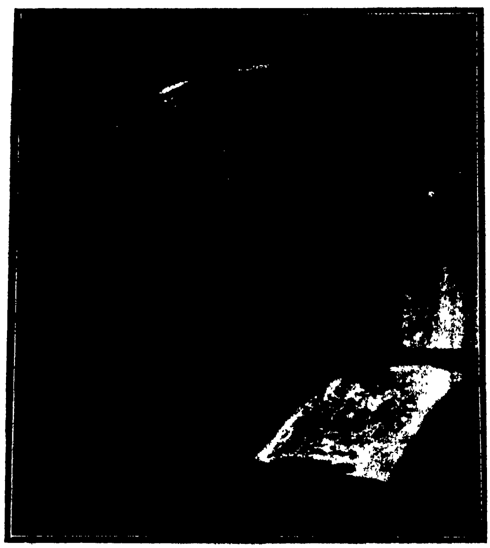
মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনও বিলুপ্ত হইবে। তখন সংস্কৃত কলেজে চিকিৎসা শ্রেণীর জন্য ব্যয় হইত—

ডাক্তার গ্রাণ্টের বেতন (অর্থাৎ অধ্যাপকের বেতন)	৩০০৲
পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত	৬০৲
১২টী ছাত্রবৃত্তি	৯৬৲
মোট	৪৫৬৲
	১২
বৎসরের খরচ	৫৪৭২৲

এই টাকা, এবং মাদ্রাসার চিকিৎসাশ্রেণী ও নেটিভ মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউসনের জন্য নির্দ্দিষ্ট খরচের টাকা সমস্তই নূতন মেডিক্যাল কলেজের জন্য অতঃপর খরচ করা হইবে স্থির হইল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইল। মিলিটারী বেতনের উপর ১২০০ টাকা অতিরিক্ত বেতনে ডাক্তার ব্রামলি উহার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং ডাক্তার এইচ, এইচ, গুডিভ ও ডব্লিউ, বি, ওশনেসী অধ্যাপক পদে বৃত হইলেন।

ডাক্তার ব্রামলি অতি সুন্দর প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড চিকিৎসাবিভাগ সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই তাঁহার পরামর্শ লইতেন এবং তিনি প্রায়ই ব্যারাকপুরে



কিশোরীচাঁদ মিত্র

গবর্ণমেণ্ট হাউসে আতিথ্য স্বীকার করিতেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মাননীয়া মিস এমিলি ইডেন তাঁহার এক বন্ধুকে তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন : "He is a very delightful person, I should say almost without comparison the pleasantest man here, more accomplished and more willing to talk and with very creditable remains of good spirits."

মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকালে যাঁহারা ডাক্তার ব্রামলিকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে এতদ্দেশবাসীর পরম বন্ধু ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। হিন্দুরা মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে সম্মত হইবে কি না এ সম্বন্ধে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। ডেভিড হেয়ার রাজা রাধাকান্ত দেব এবং অন্যান্য হিন্দু সমাজের নেতাদিগের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া, পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া এই সমস্যার সমাধানে সহায়তা করেন। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ভ্রাতা শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে তদীয় জীবনচরিতকার প্যারীচাঁদ মিত্রকে নিম্নোদ্ধৃত কাহিনী লিখিয়া জানাইয়াছিলেন :—

I will state however one fact which will show how Mr. Hare was anxious to see the project of the Medical College finally brought about and settled without opposition. One



মিস এমিলি ইডেন

evening as I was sitting with him, I saw Baboo Muddosudan Goopta the then professor of the Sanscrit Medical Science of the Sanscrit College entering the room in all haste. Mr. Hare viewing him said at once, 'well—Muddoo, what have you been doing all this time? Do you not know what amount of pain and anxious thoughts you have kept me in for a week almost? I have been to Radhacant, and I am hopeful from what he said to me. Now what you have to say. Have you found the text in your shaster authorising the dissection of dead bodies?" Muddo answering in the affirmative, said "Sir! fear no opposition from the orthodox section of the community. I and my Pundit friends are prepared to meet them if they come forward which I am sure they will not do." Mr. Hare felt himself relieved at this declaration on the part of the Professor, and said he would see his Lordship tomorrow positively meaning as far as I can recollect Lord Auckland."

'আমি একটা কাহিনী বলিব যদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে মিষ্টার হেয়ার মেডিক্যাল কলেজ সংক্রান্ত প্রস্তাব সমূহের যাহাতে বিনা গোলমালে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তজ্জন্য কিরূপ



লর্ড বেন্টিঙ্ক

আগ্রহান্বিত ছিলেন। একদিন প্রদোষকালে আমি তাঁহার নিকট বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে আমি দেখিলাম সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক বাবু মধুসূদন গুপ্ত অতি ব্যস্ততার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মিষ্টার হেয়ার তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন : "কি হে মধু এত দিন কি করিতেছিলে? তুমি কি জান না প্রায় এক সপ্তাহ কাল তুমি আমাকে কিরূপ চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছ? আমি রাধাকান্তের কাছে গিয়াছিলাম এবং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিছু

আশান্বিত হইয়াছি। এখন তোমার বক্তব্য কি? তুমি কি শবদেহ ব্যবচ্ছেদ সমর্থক কোনও উক্তি তোমাদের শাস্ত্রে পাইয়াছ?" মধু সম্মতিসূচক উত্তর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "মহাশয়, সমাজের রক্ষণশীল দল হইতে কোনও বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা করিবেন না। আমি জানি তাঁহারা কোনও বাধা দিবেন না এবং যদি তাঁহারা বাধা দিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে আমি ও আমার পণ্ডিত বন্ধুগণ তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত আছি।" অধ্যাপকমহাশয়ের এই উক্তিতে মিষ্টার হেয়ারের উৎকণ্ঠা দূর হইল এবং বলিলেন তিনি পরদিনই লাটসাহেবের (যতদূর স্মরণ হয় লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের) সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।'

বক্তৃতায় মধুসূদন কর্ত্তৃক শবব্যবচ্ছেদের দৃশ্যের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"I have had the scene described to me. It had needed some time, some exercise of the persuasive art, before Madhusudan could bend up his mind to the attempt; but having once taken the resolution, he never flinched or swerved from it. At the appointed hour, scalpel in hand, he followed Dr. Goodeve into the godown where the boly lay ready. The other students deeply interested in what was going forward but strangely agitated with mingled feelings of curiosity and alarm,



লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড



লর্ড হার্ডিং

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মেডিক্যাল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়। ডাক্তার গুডিভের নির্দ্দেশানুসারে পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। মিসেস বেল্‌নস (Mrs. Belnos) নাম্নী এক মহিলার অঙ্কিত "The First Hindu Anatomist of British India"—মধুসূদন গুপ্তের যে চিত্র মেডিক্যাল কলেজে শোভা পাইতেছে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি প্রাতঃস্মরণীয় ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহার প্রতিষ্ঠার সময় তদীয়

crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated; they clustered round the door; they peeped through the jilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when Madhusudan's knife, had with a strong and steady hand, made a long and deep incision in the breast the lookers-on drew a long gasping breath like men relieved from the weight of some intolerable suspense."

"এই দৃশ্যটি আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে। শবব্যবচ্ছেদের জন্য মধুসূদন স্থিরসঙ্কল্প হইবার পূর্ব্বে কিছু সময় অতিক্রান্ত হইয়াছিল, কিছু প্ররোচনা ও কৌশল অবলম্বিত হইবার আবশ্যকতা হইয়াছিল, কিন্তু একবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইবার পর তিনি অবিচলিত ও অনিকম্পিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে, অস্ত্রহস্তে তিনি গুদামে যথায় মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল তথায় ডাক্তার গুডিভের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উৎসুক অন্যান্য ছাত্রগণ কৌতূহলাক্রান্ত ও ভীতিবিহ্বল চিত্তে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু যে গৃহমধ্যে সেই ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইবে তথায় প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই। তাহারা প্রবেশদ্বারের নিকট ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঝিলমিলের মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়াছিল, তাহারা স্থির করিয়াছিল এই ভয়ানক ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহারা লইয়া যাইবে। যখন মধুসূদন সুদৃঢ় ও অবিকম্পিত হস্তে অস্ত্র দ্বারা শবের বক্ষ দীর্ঘ গভীর ভাবে বিদীর্ণ করিলেন তখন দর্শকগণ একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিল, যেন তাহাদের একটা মহা উৎকণ্ঠা দূর হইল!"



নবাব ফরেদুন জা



রামকমল সেন



বেথুন

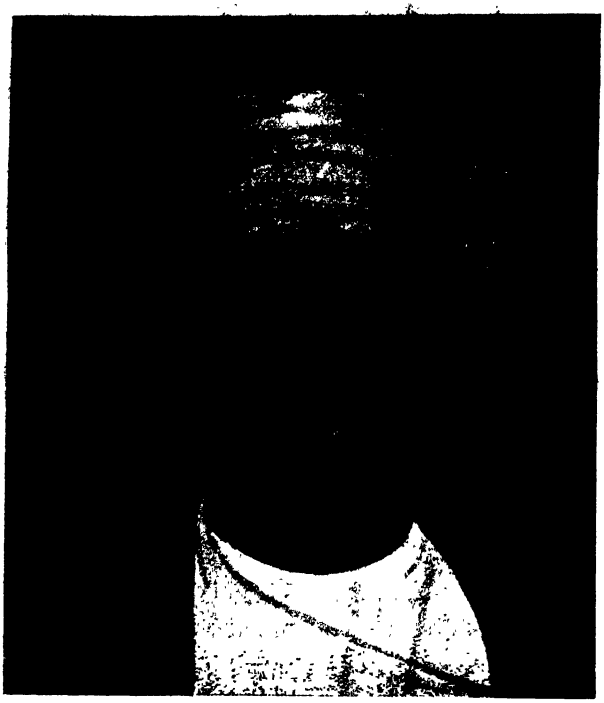
সাত দিন মাত্র জ্বরে ভুগিয়া ডাক্তার মাউণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে কালকবলিত হন। পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হইয়াছে; কিন্তু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রাচীর গাত্রে স্থাপিত প্রস্তর ফলক এখনও কলেজের ছাত্রগণকে কলেজের সর্ব্বপ্রথম অধ্যক্ষের সৎগুণাবলী স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে—

In Memory of Mountford Joseph Bramley, late Principa of the Medical College of Cal cutta, this tablet is erected by his grateful pupils to show their sense of the zeal and ability with which he watched over their privat

interests and those of their country, and the courtesy and kindness with which he won their affections, while he improved their minds. Aged 35 years, died January 19th 1837.

"Why has worth so short a date—while villains ripen grey with time?"

ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতা ও দেশবাসীর উপর অনন্য-সাধারণ প্রভাব ডাক্তার ব্রামলিকে কলেজকে সুপ্রতিষ্ঠিত



মতিলাল শীল

করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল এ কথা তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রামলির মৃত্যুর পর ডেভিড হেয়ারকে মেডিক্যাল কলেজের সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ডাক্তার উইলিয়ম ওশনেসী কলেজের সম্পাদক এবং মিষ্টার সিডন্স কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ডেভিড হেয়ার কলেজ পরিচালন সমিতির সম্মানিত সদস্য ছিলেন।

ভোলানাথ যখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন তখন ডাক্তার (পরে স্যর) উইলিয়ম ওশনেসী উহার অধ্যক্ষ ও রসায়নাধ্যাপক এবং মিষ্টার এইচ, এইচ, গুডিভ উহার ভৈষজ্যতত্ত্ব ও অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তখনও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বর্ত্তমান হাসপাতালবাটী নির্ম্মিত হয় নাই। ঐ স্থানে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বাটীতে কলেজ বসিত। ধনকুবের মতিলাল শীল প্রদত্ত দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা মুল্যের ভূমির উপর রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রদত্ত ৫০০০০৲, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল প্রদত্ত ১০০০০৲ এবং অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তি এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকায় এই হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করা হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর দিবসে। তখন ছাত্রগণকে কলেজের বেতন দিতে হইত না। পক্ষান্তরে, একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলের উপর তাহাদিগকে ৭৲ হইতে ১২৲ পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইত। ভোলানাথ কলেজের বৃত্তিভোগী ছাত্র ছিলেন। ইহার উপর লর্ড অকল্যাণ্ডও তাঁহাকে কিছু মাসিক সাহায্য করিতেন এবং পরিচ্ছদাদির মূল্য দিতেন। ভোলানাথ তাঁহার ছাত্রবৃত্তির অধিকাংশ মাতা ও ভ্রাতার ভরণ-পোষণার্থ তাঁহাদিগকে দিয়া স্বয়ং সামান্য ব্যয়ে জোড়াসাঁকোয় একটি বাসাতে অপর কয়েকজন দরিদ্র বালকের সহিত অবস্থান করিতেন। তাঁহারা নিজেরাই আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন এবং হেদুয়া পুষ্করিণী হইতে ডাক বসাইয়া জল আনিতেন। ভোলানাথ প্রতি শনিবার কলিকাতা হইতে পদব্রজে চাণকে গিয়া মাতৃদেবীর চরণ দর্শন করিয়া সোমবারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেন। অর্থাভাবে কোন প্রকার যান ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহার বাল্যগুরু রসিকলাল চেষ্টা করিয়া এই সময়ে কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীতে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্থাপিত এক পাঠাগারে তাঁহাকে বেতনভোগী গ্রন্থাধ্যক্ষ করিয়া দেন। ইহাতে ভোলানাথ অত্যন্ত উপকৃত হন, কারণ এই আর্থিক উন্নতির ফলে তিনি টাকা দিয়া একটী ব্রাহ্মণকন্যার বাটীতে আহারের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন এবং সাংসারিক কার্য্যে যে সময়

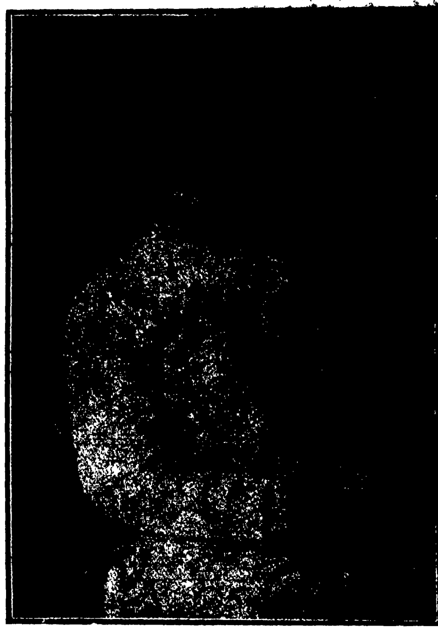
ব্যয়িত হইত তাহা তিনি পাঠ্যপুস্তক পাঠে অতিবাহিত করিবার সুযোগ পান।

মেডিক্যাল কলেজে ভোলানাথ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার পরে স্যর উইলিয়ম ব্রুক ও'শনেসী (১৮০৯-৮৯) সেকালের একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-ডি উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো (F. R. S.) নির্ব্বাচিত হন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গীয় সৈন্যদলে অস্ত্রচিকিৎসকরূপে আগমন করেন। তিনি



রাজা প্রতাপসিংহ

চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যদিও মেডিক্যাল কলেজে তিনি রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষাগারে যে সকল পরীক্ষা (experiment) করিতেন, তাহা দেখিবার জন্য কেবল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র নহে, কৌতূহলী জনসাধারণ অসাধারণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন। পরীক্ষাগারে তাঁহার গবেষণার ফলে লর্ড ড্যালহৌসীর আমলে ভারতবর্ষে প্রথম টেলিগ্রাফের সূত্রপাত হয়। তাঁহারই পরিকল্পনানুসারে ও অক্লান্ত চেষ্টায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ছয় মাসের মধ্যে কলিকাতা হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এবং পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে ৩৫০০ মাইল টেলিগ্রাফ লাইন বিস্তৃত হয়। ইনিই ভারতবর্ষের প্রথম টেলিগ্রাফ বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (ডিরেক্টর জেনারেল অব টেলিগ্রাফ্‌স)। আজিকালি কোনও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপককে ডিরেক্টর জেনারেল অব টেলিগ্রাফ্‌স্‌-এর পদে নিযুক্ত করিবার কথা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন কি না সন্দেহ। ও'শনেসী তাঁহার সৎকার্য্যের জন্য ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে



নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর

'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। বোধ হয় স্যর জন লরেন্সই বলিয়াছিলেন "টেলিগ্রাফ ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে।" বাস্তবিক, টেলিগ্রাফ লাইন যথাসময়ে স্থাপিত না হইলে, সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব হইত; এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যবিধ আকার ধারণ করিত।

ভোলানাথের সময়ে উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন প্রথমে ডাঃ এন, ওয়ালিচ, এফ্‌-আর্‌-এস এবং পরে আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—উইলিয়ম গ্রিফিথ (১৮১০-৪৫)।

তাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিকিৎসা-বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। ডাক্তার গ্রিফিথ তাঁহার পূর্ব্বগামীর ন্যায় বটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ এবং ১৮৪২—১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেডিক্যাল কলেজের উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় গাছ গাছড়া সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর জ্ঞান ছিল এবং তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী সেকালের বৈজ্ঞানিক জগতে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ সংগ্রহ এবং প্রবন্ধাদির পাণ্ডুলিপি ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিয়া যান। কোম্পানী তাঁহার পাণ্ডুলিপিগুলি নিজব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে তাঁহার স্মৃতিকল্পে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—



ডাক্তার টাইটলার

To the Memory of William Griffith, Esq., F. L. S., Madras Medical Service, born at Ham, in the county of Surry, March 1810. As Professor of Botany in this College, he was distinguished by the zeal and activity with which he imparted the knowledge he had himself acquired by personal investigation in the different provinces of British India, and in the neighbouring kingdoms, from the banks of the Helmunt and Oxus, to the straits of Malacca, where, in the capacity of civil assistant surgeon, he died 9th February 1845, in the 34th year of his age, and the 13th year of his public service in India. His early loss is deeply deplored by the head of the Government of India, and by the leading natural historians of his time. He bequeathed large collections of plants and manuscripts to the Honourable the Court of Directors of the East India Company.

শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনেও একটি প্রস্তরময় স্মৃতিস্তম্ভে অনুরূপ প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে।

ডাক্তার এইচ, এইচ, গুডিভ (পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে) ভেষজতত্ব ও যন্ত্রচিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্রগণকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় বাৎসল্যভরে দেখিতেন। তাঁহার Hints on the Management of Children in India সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইঁহার আরও পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

ভোলানাথ পাঁচ বৎসর কাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। এবং প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে সকল শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেন ও শিক্ষকগণের স্নেহ আকৃষ্ট করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রায়ই কলেজ পরিদর্শন করিয়া ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথমবার ইংলণ্ড যাত্রা করেন। যাত্রার কিছু পূর্ব্বে তিনি মেডিক্যাল কলেজের দুইজন ছাত্রকে নিজব্যয়ে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে এবং তথায় তাহাদিগের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিন্তু সমাজচ্যুতির ভয়ে এবং অন্যান্য কারণে কোন ছাত্র যাইতে সম্মত হন না। ইংলণ্ডে প্রিন্স দ্বারকানাথের সর্ব্বত্র সমাদর এমন কি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক সাদর সম্ভাষণ এতদ্দেশবাসী তরুণগণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিং হিন্দু ও হুগলী কলেজের ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ কালে তাহাদের প্রতীচ্য সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষায় অপূর্ব্ব দক্ষতার উচ্চ প্রশংসা করিয়া দ্বারকানাথ কর্ত্তৃক মহারাজ্ঞীর এবং য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সম্মানলাভ এবং মহারাজ্ঞীর নিকট হইতে কলিকাতাবাসীর জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর

প্রতিকৃতি লাভ প্রভৃতির উল্লেখ করত য়ুরোপে ছাত্রগণকে উচ্চশিক্ষা লাভার্থ গমন করিতে উত্তেজিত করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ করেন। এবারেও তিনি দুইজন ছাত্রকে তৎসমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। শিক্ষাপরিষদের ও মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ডাক্তার এফ্, জে, মৌএট মহোদয় একটী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় মেডিকাল কলেজের ছাত্রগণকে তাঁহাদের উন্নতির এই সুযোগ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। ছাত্রগণ উত্তেজিত হইলেন ; কিন্তু জাতিচ্যুতি, সমাজচ্যুতি, প্রবাসক্লেশ প্রভৃতি নানাবিধ বিঘ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা নিরুদ্যম হইলেন এবং দ্বারকানাথের প্রস্তাব এবারেও নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে ভোলানাথ নিম্নলিখিত সর্ত্তে বিলাতগমনের সঙ্কল্প কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন—

(১) দুইজনের পরিবর্ত্তে চারিজন ছাত্রকে লইয়া যাইতে হইবে।

(২) কঠিন পীড়া হইলে তাঁহারা সত্বর দেশে আসিতে পারিবেন।

(৩) গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইবেন।

(৪) দৈবক্রমে কঠিন পীড়াহেতু নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত বিলাতে থাকিতে না পারিলে বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কালের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবেন।

(৫) বিলাতে অবস্থান কালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য বৃত্তি দিবেন।

ডাক্তার মৌএট এই সকল সর্ত্ত গবর্ণমেণ্টকে অবগত করাইলে গবর্ণমেণ্ট উক্ত সর্ত্তে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। দ্বারকানাথ প্রতিশ্রুতি অনুসারে দুইজন ছাত্রের, গবর্ণমেণ্ট একজন ছাত্রের এবং জনসাধারণ (অধিকাংশ অর্থ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ও রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ দেশীয় ধনীদের প্রদত্ত) একজন ছাত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন স্থির হইল। গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার এইচ, গুডিভকে ছাত্রগণের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত ইংলণ্ডে পাঠাইবেন স্থির হইল। এই সংকল্প অনুসারে ভোলানাথ বসু ও গোপাল লাল শীল দ্বারকানাথ ঠাকুর দত্ত বৃত্তি পাইলেন, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি পাইলেন এবং দ্বারকানাথ বসু সাধারণ প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ তারিখে "বেণ্টিঙ্ক" নামক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া ডাক্তার গুডিভের সমভিব্যাহারে চারিজন বিদ্যার্থী ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইতঃপূর্ব্বে বিদ্যাশিক্ষার্থ আর কোনও



ভোলানাথ ও তাঁহার সতীর্থগণ

ভারতবাসী ইংলণ্ড যাত্রা করেন নাই—রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর অন্য উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত অর্ণবপোতেই ভোলানাথের সতীর্থগণ ব্যতীত অন্য বাঙ্গালী সহযাত্রী ছিলেন—প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গ য়ুরোপের নানা স্থান দর্শন করিয়া জুন মাসে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন। ভোলানাথ ও তাঁহার সতীর্থগণ তাহার পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তদানীন্তন শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে দ্বারকানাথের বদান্যতার জন্য গবর্ণমেন্ট এইভাবে ধন্যবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

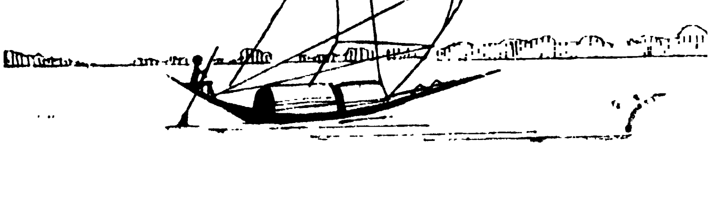
Calcutta Medical College Donation (1844-45)

To Dwarkanath Tagore for his magnificence and public spirit in taking to England with him and educating at his own expense two pupils of the Medical College, an event in the history of that useful and successful institution surpassed only by the primary introduction of human anatomy and dissection into British India. In connection with the same triumph, may be mentioned the names of His Highness the Nawab Nazim of Bengal who contributed Rs 4000 towards the expenses of a third pupil ; Maharaja Pertab Sing Bahadoor of Burdwan and several other native gentlemen, among whom is particularly distinguished Ramgopal Ghosh Esq. of this city, whose active interest and incessant exertions in this cause, with the friendly feelings evinced towards the pupils, were not a little conducive to the successful termination of the first stage of these important experiment, the detailed particulars connected with which will be found in the special report of the Medical College.

"মেডিক্যাল কলেজের দুইজন ছাত্রকে তৎসমভিব্যাহারে ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার এবং নিজব্যয়ে তথায় তাহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় যে বদান্যতা ও জনহিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। ব্রিটিশ ভারতে দেহতত্ত্ব অধ্যাপনা ও শবদেহ ব্যবচ্ছেদ প্রবর্ত্তিত হইবার পর এই মহোপকারী ও সাফল্যগর্ব্বিত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এরূপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই। এই প্রতিষ্ঠানের বিজয় যাত্রার ইতিহাসে তৃতীয় ছাত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যাঁহারা অর্থদান করিয়াছেন তাঁহারাও ধন্যবাদের পাত্র—যথা বাঙ্গালার মহামান্য নবাব নাজিম (যিনি চারি সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন) রাজা প্রতাপসিংহ বাহাদুর এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দেশবাসীগণ। ইঁহাদের মধ্যে এই নগরের রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি এই ব্যাপারে যে অক্লান্ত চেষ্টা, অবিশ্রান্ত উৎসাহ দান এবং ছাত্রদিগের প্রতি প্রকৃত বন্ধুজনোচিত সদুপদেশ দান করিয়াছেন তাহা না করিলে মহাফলপ্রসূ চেষ্টার প্রথম অঙ্ক এরূপ সুসম্পাদিত হইত কি না সন্দেহ।

রামগোপাল মেডিকাল কলেজের ও এতদ্দেশীয় চিকিৎসা বিদ্যার্থীদের জন্য যাহা করিয়াছেন এখন অনেকে তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। মেডিকাল কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহাতে অস্ত্রচিকিৎসার বহুবিধ যন্ত্রাদি উপহার দিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণকে পুরস্কারাদি দ্বারা প্রায়ই উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার অন্যতম চরিতকার সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন "যখন ডাক্তার এইচ, এইচ, গুডিভ মেডিকাল কলেজের চারিজন ছাত্রকে ইংলণ্ডে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন তখন রামগোপাল সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণ যাহাতে তাহাদের সাধু সংকল্প হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জন্য অবিশ্রান্তভাবে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। তবে কালাপানি পার হওয়ার বিরুদ্ধে দেশবাসীর সংস্কার অতি প্রবল ছিল এবং পাছে শেষ মুহূর্ত্তে ছাত্রগণের সৎসাহস তিরোহিত হয় রামগোপালের সেই আশঙ্কা হইয়াছিল। এইজন্য তিনি জাহাজে ছাত্রগণের সহিত সমস্ত রাত্রি বাস করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগত উৎসাহ দ্বারা প্রফুল্লচিত্ত রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে তিনি তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই।"

(আগামীবারে সমাপ্য)



উত্তর-প্রত্যুত্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীআশালতা দেবী

('অমিতার প্রেমের' আলোচনা)

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু

অসময়ে তোমার বইখানি পেয়েছি—অর্থাৎ সময় হাতে ছিলনা। নানা খুচ্‌রো কাজের ঝাঁক যখন অবকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন কাজের যতটা দায় তার চেয়ে তার আবিলতা বড়ো হয়ে ওঠে। যে বয়সে মন শান্তি চায় তখন গুরুতর কর্ত্তব্যেও ক্ষতি করেনা, কিন্তু ছোটো ছোটো দাবীর কাঙালী বিদায়ে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

তোমার বইয়ের ঠিক সমালোচনা করবনা। তোমার সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই। তোমার বইয়ের নাম অমিতার প্রেম—তার থেকে বোঝা যায় এই বইয়ের পট প্রধানত অমিতারই ছবি আঁকবার জন্যে। জ্ঞানে অজ্ঞানে আমাদের লেখা বইয়ে অমিতারাই বড়ো হয়ে ওঠে। তার একটা কারণ আমরা পুরুষ, মেয়েদের সেই দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণ ছবি আঁকবার পক্ষে দরকারী—আর একটা কারণ, মেয়েদের সম্বন্ধে স্বভাবতই আমাদের ঔৎসুক্য প্রবল, সেটা সৃষ্টি করবার কাজে লাগে—এই সৃষ্টিতে মেয়েরা পুরুষদের মেয়ে হয়ে ওঠে, যেহেতু তাদের সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নই। মেয়েদের লেখা বইয়ে সেইটে না দেখ্‌তে পেয়ে আমাদের বিস্ময় লাগে। কিছুদিন হোলো নন্দলাল তাঁর ছাত্র ও ছাত্রীদের বলেছিলেন, তোমাদের যে ছবি খুসি, মন থেকে আঁকো। উভয় পক্ষই মেয়ের ছবিই এঁকেছে। পুরুষ চিত্রীদের কল্পনা (বিশেষত তরুণ বয়সে) অমিতাদের কাছেই দাসখৎ লিখে দিয়েছে, তাদের জন্যে নানাঃপন্থা বিদ্যতে। কিন্তু তরুণীর তারুণ্য কি নিজের মধ্যেই আবর্ত্তিত? একজন মহিলাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, এর কারণ ছবি আঁকবার পক্ষে মেয়েদের চেহারাই উপযোগী—অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শে মেয়েদেরই বিধাতা গড়ে তুলেছেন। বোধহয় এর থেকেই প্রমাণ হয় যে বিধাতা পুরুষও নিঃসন্দেহই পুরুষ। একথা নিয়ে তর্ক করতে চাইনে, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে। তবু সংক্ষেপে একটা কথা বলা যেতে পারে সৌন্দর্য্য পদার্থটি ব্যাপক, লালিত্যকে বাদ দিলেও তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়না, এমন কি তাতে তার গৌরব বাড়ায়। সন্দেশে ছানা প্রবল না হয়ে চিনি প্রবল হলেই তার স্বাদের প্রকর্ষ ঘটে তা নয়। সৌন্দর্য্য যে সুকুমারমতি বালকদের রুচির আদর্শেই রচিত তা বললে সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিন্দা করা হয়। আপাতত একথাটা থাক্। তোমার বই পড়তে পড়তে যে প্রশ্ন আমার মনে উঠেছিল তারই আলোচনা করা যাক্।

অমিতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়েছে যে সব বই পড়ে সেই বইয়েতে মানুষের মোহ দূর করে। হৃদয়াবেগের অতিশয়তায় সাধারণ মেয়ের মনে যে চিত্তবিভ্রম ঘটায় স্ত্রীজাতীয় হলেও সেটা অমিতার কাছ থেকে আশা করা যায়না। সেই জন্যে আমার প্রথম খটকা লাগ্‌ল যখন দেখলুম বীণার মতো মেয়ের তুচ্ছ অবজ্ঞার কটাক্ষে এক-মুহূর্ত্তে এমন বিপ্লব ঘটল যে সে যেন পূর্ণিমার পরের তিথিতেই অমাবস্যা এনে দিলে। বীণা যদি ওর গুরুমা হোত, সর্ব্বদাই ভগবদ্‌গীতা ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব আউড়িয়ে ওকে পারত্রিকের অভিমুখে আর্দ্ধেক সমুদ্র পার করিয়ে দিত তাহলে বুঝতুম। সমাজবিধির আদর্শরূপেও বীণার চরিত্রে এমন মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়নি যার প্রতি শ্রদ্ধাবশত অমিতার গভীরতম সাধনাকে বিকৃত করে দিলে সেটাকে সম্ভবপর বলে ক্ষমা করতে পারি। একথাটাও হয়তো পুরুষের তরফ থেকে বলচি। অর্থাৎ যে মেয়ে অবজ্ঞার যোগ্য নয় তার কাছ থেকে এরকম অন্ধব্যবহার আমাদের ইচ্ছায় আমাদের রুচিতে অত্যন্তই বিস্বাদজনক কোনো পুরুষ যদি এই গল্প লিখত তাহলে আমি চোখ বুজে বলতুম সে স্ত্রীচরিত্র জানেনা। অবশ্য স্ত্রীচরিত্রের কেবল যে একটা শ্রেণীগত আদর্শ আছে তা নয়, এ'কে ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত স্ত্রীচরিত্রেরও স্থান নিশ্চয় আছে। অমিতা

সেই ব্যক্তিগত বুদ্ধিদৌর্বল্যের কোনো পূর্ব্বসূচনা পাইনি। বীণার কটাক্ষপাতে ওদের মধ্যে যখন বিচ্ছেদ ঘটেচে তখন অমিয় তার বাবাকে যেসব চিঠি লিখেছিল সেই চিঠি অমিতা লুকিয়ে পড়েছিল, মনে করেছিল নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর চিঠিই লিখেছে। কিন্তু পড়তে গিয়ে যখন দেখলে সমস্ত চিঠিতেই বারে বারে অমিতার জন্যে সে উদ্বেগ প্রকাশ করেচে, তখন চিঠির এই সৌন্দর্য্যহানিতে তার ধিক্কার জন্মালো। এটা সম্ভব কিনা তা বিচার করব কী করে? নিজেকে অমিতা বলে কল্পনা করা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমি যদি অমিতা হতুম তাহলে ঐটেতেই আমাকে প্রবল আনন্দ দিত। যে কোনো ভদ্র পুরুষ তার সম্বন্ধে অকৃত্রিম উৎকণ্ঠা বোধ করচে এটা কোনো মেয়েব পক্ষেই বিতৃষ্ণাজনক হতে পারে বলে তো মনে হয়না। তার মধ্যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে বিনা প্রয়োজনেও তার নিশ্চিত প্রমাণ সকল মেয়ের কাছে স্বভাবতই উপাদেয়। লেখকের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, কোনো অভাজন অর্ব্বাচীন পাঠকও যদি তার লেখার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ অনুভব করে তবে সেটা খারাপ লাগাটা অস্বাভাবিক বল্‌তেই হবে। অমিয়র এই চিঠিগুলি পড়ে অমিতার হৃদয় গভীরভাবে আন্দোলিত যদি না হয়ে থাকে তবে তার মূল্য কমে গিয়েছে। তুমি লিখেচ "যাকে অত্যন্ত ভালোবাসা যায় মেয়েদের অন্তরে কোনো না কোনো সময়ে তার উপরে দারুণ ঘৃণা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।" আমার বক্তব্য এই যে, এই দারুণ ঘৃণার একটা যথোচিত স্বাভাবিক কারণ থাকা চাই। অমিতার ইতিহাসে সেইটে তেমন করে খুঁজে পাচ্চিনে। এত বড়ো বিপ্লবের কারণটা ছিল একমাত্র বীণার ভ্রূভঙ্গীতে, অমিয়ের কোনো ব্যবহারেই নয় এটা কি মেয়েদের পক্ষেও সঙ্গত?

তোমার বইয়ের একজায়গায় অমিয় এবং অমিতার সান্নিধ্যবশত দৈহিক উন্মাদনার কথা লিখেচ। অমিতা এই ক্ষণিক উত্তেজনাকে প্রেমসম্পর্কশূন্য বলে নিন্দা করেচে। এরকম মাদকতা অসম্ভব নয়। কিন্তু ভালোবাসা যেখানে প্রচ্ছন্ন আছে সেইখানে দেহের উত্তেজনা সেই ভালোবাসার সত্যকে উদ্বোধিত করে। দৈহিক পুলকের মধ্যে ভালোবাসার যোগ তখন আর গোপন থাকেনা। অমিয়র কাছে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় ছিলনা। কিন্তু এরকম অবস্থায় ভালোবাসার রহস্যবোধ মেয়েদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আরো স্পষ্ট হওয়া স্বভাবসিদ্ধ বলে মনে করি। অমিতার কাছেও হয় তো ভালোবাসার সত্য আচ্ছন্ন ছিলনা, কিন্তু সে অমিয়কে ভোলাতে চেয়েছিল। কেন চেয়েছিল? যখন সে পিয়ানোর উপর মুখ রেখে কাঁদছিল সে কি ভালোবাসাহীন দেহের মোহাবেশের লজ্জায়? না সে কি ভালোবাসারই অনুভূতির বেদনায়? অমিয়র প্রতি ভবানীবাবুর দরদ সুস্পষ্ট—অমিতার কাছে সেইটেই অসহ্য হোলো। যখন লোকলজ্জার আঘাত বীণার সঙ্কেত থেকে সে পেয়েছে তখন ভবানীর এই অনুকম্পা তাকে আরাম দেবে এইটেই আশা করা যায়। সাংসারিক দিক থেকে ভক্তি শ্রদ্ধার দিক থেকে বীণার প্রতিকূলতার চেয়ে ভবানীর সমর্থন অনেক বেশি মূল্যবান তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুত তার সংসারে একমাত্র যাঁর ঘৃণা তার কাছে সাংঘাতিক হতে পারত সে ভবানী। তিনি যখন স্বতই ওদের মিলন ইচ্ছা করচেন, তখন সংসারে অন্য সমস্ত বাধাই অমিতার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তা না হয়ে অমিয়ের প্রতি ভবানীর স্নেহে তার রাগ হোলো এটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। অমিয়ের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও অমিতা অনায়াসে তার চিঠিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে পারলে আর অমিতার অপরাধ থাকা সত্ত্বেও অমিয় তার চিঠি না ছিঁড়ে চুম্বনের দ্বারা তাদের বিপর্য্যস্ত করে দিলে এর থেকে ব্যক্তিগত ভাবে ওদের বৈপরীত্য বর্ণনা করচ, না শ্রেণীগতভাবে বল্‌তে চাও যে ভালোবাসায় মেয়েদের চেয়ে পুরুষের সংরাগ আরও প্রবল—বলতে কি চাও স্বহস্তলিখিত চিঠির মধ্যে যে একটা প্রত্যক্ষ স্পর্শ আছে সেটা মেয়ের চেয়ে পুরুষের কাছে বেশি একান্ত?

অবশেষে অমিয় যখন দূরে চলে গেল তখন অমিতার মন থেকে ঘোর কেটে গেল, এবং অমিয় যখন বিমুখতা দেখালে তখন তার অভিমুখে অমিতার ব্যগ্রতা আর বাধ মানলেনা এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই মিলনের দৃশ্যে পাঠকের মন গভীর স্বস্তি অনুভব করতে পারত যদি বিচ্ছেদের ব্যাপারটা অমনতরো অকারণ আত্মবঞ্চনার একটা বিড়ম্বনা না হোতো।

পড়তে পড়তে বার বার মনে হয়েচে আমি হয়তো

জানিনে। আমি হয়তো যেখানে যুক্তি সঙ্গতি সুবিচার খুঁজচি সেটা পুরুষ বুদ্ধি থেকে। মেয়েদের ভালোবাসার বায়ুবিজ্ঞানে ঝড় এবং গুমট, সাইক্লোনিক এবং এন্টি-সাইক্লোনিক মেজাজ শীতাতপের যে বৈষম্যে অকস্মাৎ ঘটে সেটার গূঢ় রহস্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু হৃদয়াবেগ-প্রধান চরিত্রেও বুদ্ধি বিচারের একান্ত বিলোপ নেই। যদি থাকে তবে তার মনোহারিতা চলে যায়। আমি যদি অমিয় হতুম তাহলে আমার স্বভাবের পারুস্য কঠিন বেগে জেগে উঠত কেননা ভালোবাসার দান প্রতিদানে এরকম লঘুত্বের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই প্রচণ্ডতায়—যেমন লঘু বাতাসে টান দিয়ে নিয়ে আসে ঝড়কে। বোধকরি অমিতা নিজের অজ্ঞাতসারে সেই দুর্দ্দান্তকেই চেয়েছিল পায়নি বলেই উদ্দীপনার অভাবে অতদিন তার প্রেম অমনতরো অসুস্থ হয়ে ছিল। এরকম অবস্থায় ভালোবাসার আগুন জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে আদরের চেয়ে আঘাতই বেশি কাজ করে—রূঢ় আঘাত—এইখানেই যথার্থ পুরুষের দরকার। প্রথম থেকেই সেই অসহিষ্ণুকে সেই কঠোর পুরুষকে যদি আনতে আরও খুশী হতুম। অমিয়র প্রতি অবিচার করবার বাইরে থেকে যেমন বড়ো রকম কারণ হয়নি, তার প্রতি অনুকূল হবারও তেমন দুর্ন্বার রকমের কারণ ছিলনা। চিঠিটা সমালোচনার মত পড়তে লাগলেও বস্তুত এটা একটা প্রশ্ন। তোমারই কাছে জানতে চাই গল্পের মাঝখানে অমিতার মধ্যে যে আলোড়ন, এত ক্ষীণ প্রশাখার উপরে কি তার দোলা সয়? পুরুষেরা বলে থাকে মেয়েরা দুর্জ্জেয় কিন্তু এত দুর্জ্জেয় কি তোমার কাছেও? কিছু মনে কোরোনা—এত বড় চিঠি আজকাল আমার পক্ষে লেখা দুঃসাধ্য। তোমাকে বলেই লিখচি। পর্শু চলে যাব সিংহল দ্বীপে। যদি কিছু বল কলম্বো ঠিকানায় চিঠি দিলে পাওয়া যাবে। ইতি, ১লা মে ১৯৩৪।

স্নেহাশীর্ব্বাদক
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরম পূজনীয়
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাগলপুর

শ্রীচরণেষু—

আপনার অসীম কাজের মধ্যেও অবসর করে নিয়ে যে 'অমিতার প্রেম' এমন করে পড়েচেন এবং তার এত বিস্তৃত সমালোচনা লিখেচেন দেখে ভারি বিস্মিত হয়েচি। কিন্তু আপনার পক্ষে কোন কাজই তো অসম্ভব নয়, তাই মনে করে সে বিস্ময় দমন করে নিয়ে আপনার লেখা চিঠিখানা একান্ত মনোযোগে অনেকবার পড়লুম। যে সমস্ত প্রশ্ন করেচেন তার উত্তর যতটুকু পারি দেবার চেষ্টা করব। আপনি লিখেচেন, "অমিতার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং যে সব বই পড়ে তার বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়েচে তাতে হৃদয়াবেগের আতিশয্যকে দেয় নষ্ট করে এবং হৃদয়াবেগের অতিশয়তায় সাধারণ মেয়ের মনে যে চিত্তবিভ্রম ঘটায় স্ত্রীজাতীয় হলেও সেটা অমিতার কাছ থেকে আশা করা যায়না। সেই জন্যে আমার প্রথম খটকা লাগল যখন দেখলুম বীণার মতো মেয়ের তুচ্ছ অবজ্ঞার কটাক্ষে একমুহূর্ত্তে এমন বিপ্লব ঘটল—" ....

এখানে আমার মনে হয় অমিতার মনের সে বিপ্লব এবং বিদ্রোহ বেশির ভাগ নিজের সঙ্গে এবং অমিতার প্রেমের যত উল্টো পাল্টা বিরাগ অনুরাগের কাহিনী তার অধিকাংশই অমিতারই অন্তর্জগতের ছায়ালোকের কাহিনী, বাইরের বাধা এবং কথার ইতিহাস সামান্য মাত্র। তাই তার মানসিক বিপ্লবে বীণার পার্ট অল্প। সে অনেকটা উপলক্ষ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েচে। আপনি যে প্রশ্ন করেচেন, "গল্পের মাঝখানে অমিতার মধ্যে যে আলোড়ন এত ক্ষীণ প্রশাখার উপরেই কি তার দোলা সয়?" এর উত্তরই সমস্ত গল্পটার মধ্য দিয়ে আমি দেবার চেষ্টা করেচি।

অমিতার মন সূক্ষ্ম, গভীর এবং শিশুকাল থেকে সমস্ত বস্তুর অতি-তরলতার দিকটা সে সযত্নে পরিহার করে চলেছে। অথচ সেই অমিতা, যে নিজেকে এমন করে গড়ে তুলেছে সে'ও যখন ভালোবাসলো তখন তার ঐশ্বর্য্য শ্রী নারী প্রকৃতি প্রেমের অতলতায় নিজেকে নিঃশেষ করে ডুবিয়ে দিতে চাইলে। তখন তার বুদ্ধির কঠিনতার সঙ্গে প্রেমের উদ্বেলতার একটা সংঘর্ষ তার প্রকৃতির নেপথ্যে নিশ্চয় ঘটেছিল। তারই বাহ্য প্রকাশ আমরা পেলুম অমিয়র কোন অপরাধ না থাকা সত্বেও তার প্রতি অহেতুক অভিমান এবং নিষ্ঠুরতায়।

অমিয়কে সে যতটা ভালোবেসেছিল তার একটুখানিরও ভিতরে ভিতরে অপচয় ঘটেনি, আর অমিয়র নিজেরও কোন দোষ নেই। কিন্তু সে হাতের কাছে রয়েচে। তাই তখনকার অমিতার যে মনোভাব, প্রথম প্রেমের মোহাভিভূত

পরিবর্ত্তনের যত শঙ্কা যত বিস্ময় যত লজ্জা তার সে সমস্তই সে নিষ্ঠুর কঠিন ব্যবহারের ভিতর দিয়ে অমিয়র উপরে মিটিয়ে নিলে। অমিতার বিস্মিত মনোজগতে তখন বারংবার প্রশ্নের বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে, কেন সে এত ভালোবাসল? কেমন করে সে এতখানি অভিভূত হোল? নিজের কাছে, নিজের প্রকৃতির কাছে এই তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি। তার মনের আকাশে বিদ্রোহের বহ্নিরাগ যখন অলক্ষ্যে একটু একটু করে জমে উঠছিল ঠিক সেই সময়েই বীণার কাছ থেকে এ'ল প্রথম ধাক্কা।

অমিতার বয়স তখন সবে পনের, নিজের মনের সঙ্গে একান্তে মুখোমুখি হয়ে তাকে সর্ব্বতোভাবে চিনে নেবার বয়স তার তখনও হয়নি। নিজের মনের নানা বিপরীত নানা সাময়িক স্রোতকেও সে সঠিকভাবে তখনও চিনে নিতে পারচেনা। বীণার কাছে একটু স্ফুলিঙ্গ পেয়েই সে জ্বলে উঠ্‌ল। তার মনে হতে লাগল, বাইরের লোকে তাকে অসম্ভ্রম করবে, করবে তাকে নানা ভাবে অসম্মান, অমিয়র এমনই কি দাম আছে যে তার জন্যে এত বাঁকা হাসি এত চাপা সমালোচনা সহ্য করা যায়? কিন্তু অমিয়র দাম যে এর চেয়ে অনেক বেশি এবং বীণা যে সমাজের প্রতীক সেই সমাজের সমগ্র বাঁকা হাসি একত্র করলেও যে অমিতার ভালোবাসার একটুখানিও সত্যকার নষ্ট করে দিতে পারে না এ তথ্যটা তখনকার মত চাপা পড়েছিল। অমাবস্যার পরেই পূর্ণিমা আসার কথাটা সম্বন্ধে আমার মনে হয়, মেয়েরা যাকে খুব ভালোবাসে তাদের কোন কোন মুহূর্ত্তে ঘৃণা করা সত্যই অস্বাভাবিক নয়। এমন কি সে ঘৃণার জন্য বাইরের খুব একটা প্রবল ধাক্কাও সকল সময়ে প্রয়োজন হয়না। এর কারণ রয়েচে একমাত্র তাদেরই প্রকৃতির মধ্যে নিহিত। মেয়েদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির তাদের বিবেচনাশক্তি তাদের মননশক্তি যতই দৃঢ় প্রাকার দিয়ে বাঁধান হোক, তাদের জীবনে প্রেম যখন আসে তখন তার কাছে তারা নিঃশেষে নিজেকে সমর্পণ করে। এমন সর্ব্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণের মাঝে বিস্ময় এবং ভয়ের লেশ কি নেই? আপনারই 'আশঙ্কা' কবিতার চরণগুলি তাদের মনে কি তখন জাগেনা?

"কে জানে এ কি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা
আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো?"

ভয় হয় বই কি। যে বস্তু এমন করে তাদের সমস্তই আকর্ষণ করে নিলো, আকাশ বাতাস কোথাও কিছু আর বাকী রইলনা। সে কি? সে কেমন? কেনই বা তার এত অধিকার?—এই ধরণের প্রশ্ন বিহ্বল মনে কি জাগে-না? তখন প্রেমাস্পদের প্রতি একটা সাময়িক বিরাগ বিতৃষ্ণা এমন কি ঘৃণার ভাবও জাগা বিচিত্র নয়। অমিতার মনের যা কিছু ভাবান্দোলন, তার ঘৃণা এবং প্রতিক্রিয়া, বিমুখতা এবং উচ্ছ্বাস সমস্তই এই দিক ধরে। তাই সে সবের অনেকটাই তারই মানসিক জগতের ইতিহাস। বাইরে থেকে গল্পের প্রশাখা ক্ষীণ। মেয়েদের মানসিক ইতিহাসের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে আপনি আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। আপনার কি মনে হয় মেয়েরা মেয়েদের সম্বন্ধে বেশি জানে? আমার তা মনে হয়না। একটা ছোট্ট কাহিনী বলি। রোমাঁ রলাঁর জন্ ক্রিষ্টোফার উপন্যাসে যখন হঠাৎ একদা চোখে পড়েছিল, "মেয়েরা যাকে খুব ভালোবাসে তাকেও কোন সময়ে ঘৃণা করা অসঙ্গত নয়।" এবং যখন রলাঁর অ্যানেৎকে দেখেছিলুম, সে যাকে এত ভালোবেসেছিল যে তার সন্তানের জননী হয়ে মনে মনে বলছে, "Thou art myself. Thou art my dream. Since I could not find thee in this world, I have made thee with my flesh...And now, Love I have thee! I am he whom I love!" তখনও তার মনে প্রেমাস্পদের প্রতি থেকে থেকে একটা ঘৃণার তীব্র আলোড়ন জেগে উঠ্‌চে। যাকে জীবনে এমন করে নিয়েচে তার প্রতিও একটা অহেতুক বিতৃষ্ণা জাগচে। সে বিতৃষ্ণার মূল ধুয়া হচ্চে, 'এমন করে কাকে দিলুম? কেন দিলুম?'—যে নিজেরই সঙ্গে একটা প্রশ্নোত্তরের মালা। সে যাকে ভালোবাসি তার অপরাধের লঘুত্ব কিংবা গুরুত্বের বিচার নয়। রলাঁর অ্যানেৎ নিজেকে অমন বিনিঃশেষে দান করেও মনে মনে কি ভাবচে সে কথা রলাঁ যখন উদ্‌ঘাটন করে দিলেন, She could not forgive the man, she could not forgive

herself for having been surprised by her senses, and for the emotion ····This instinctive recoil had been the true, hidden reason (hidden from herself as from others) for her flight from him and her refusal to see him again.—In the depths of her being she hated him because she had loved him"

তখন আমার ভারি অবাক লেগেছিল বলে পুরুষ হয়েও মেয়েদের মনের এমন সঙ্গোপন তত্ত্ব জানলেন কি করে? প্রতিভার উজ্জ্বল মর্ম্মভেদী দৃষ্টির কাছে সবই কি পড়ে ধরা? মেয়েরা কি নিজেদের একটুও লুকোতে পারে না? কিন্তু তখন আরও মনে পড়ল, এই যদি না সত্য হবে তবে আপনার সেই যে কবিতা—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে?"

সে প্রশ্নের এত মধুর এত গভীর সত্য উত্তর আপনি কেমন করে দিয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর তো মেয়েদেরই দেবার কথা। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে কেউ কি পেরেছে আপনার মত করে উত্তর দিতে? কোন দেশে কোন দিন কি পারবে?—তাই মনে হয় শুধু স্বজাতীয়া হলেই কিংবা খুব কাছাকাছি থাকলেই যে হৃদয় রহস্যের নিশানা ঠাহর করা যায় এমন কথা সত্য নয়। বিরাট প্রতিভার যে স্বচ্ছ, অনাহত, অসংসক্ত দৃষ্টি তার কাছেই ধরা পড়ে জীবনের আর জগতের যত রহস্য!

আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন।

ইতি

স্নেহার্থিনী

আশালতা

উন্মনা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ এম-এ, বি-এল্

এক

আমার ভাঙা বেড়ার ফাঁকে, আমার ভাঙা বেড়ার ফাঁকে—
বন্ধু আমায় কোন্ জনা সে সকাল সাঁঝে নিত্যি ডাকে?
হয়তো আমার বক্ষ কোলে
রক্ত-জবার কণ্ঠি দোলে,
বন্ধু তুমি চল্‌ছো আলোয়, হেথায় আমি রইনু পাকে,
জীবন-রথের দোলন্-দোলায় আমি হারাই আপ্‌নাকে!

দু'

কেনা-বেচার মিট্‌লো সাধ, যাত্রা কেবল রইলো বাকী,
লেনা-দেনার খসড়া-খতেন্ তাবাই বা হায় বলবে কী?
জীবন-পথের এই যে চলা
যায়না তারে আধেক্ বলা,
বন্ধু তোমায় শুধাই আজ শিকেয় তুলে সর্ব্ব-কাজ—
একটু হাসি, একটু গান, তারপরেই কি মৃত্যু-রাজ?

তিন

আমি যখন বুঁজ্‌ব আঁখি এই পৃথিবীর পায়ের পাতায়,
হয়তো তখন একজনা সে হাত বুলোবে মরার মাথায়!
হয়তো তখন একটী ফুল
আমার কানে দুল্‌বে দুল্,
জীবন মেঘের আব্‌ছা ফাঁকে কালবোশেখী গর্জ্জে ওঠে,
বন্ধু ওগো, তাই বুঝি হায় রক্ত-জবা তপ্তবুকে লোটে।

চার

বন্ধু তুমি জগৎ-জোড়া গান শুনেছো আলোর তারে তারে—
খুসীর ভরে সেই বাণীটিই বল্‌ছো যে গো বারে বারে!
বল্‌তে গিয়ে হেসে-কেঁদে
কথায় সুরে কী গান ফেঁদে
অনেক কথায় শুধু একটী কথাই জানাও দ্বারে দ্বারে,
একটু ছায়া, একটু মায়া, তারপরেতেই শ্মশান-পারে?

পাঁচ

চিরকালের মানুষ যিনি যাত্রা তাঁরই অন্বেষণে,
হয়তো আছেন হাতের 'পরে, খুঁজ্‌চি তবু তিন ভুবনে
রক্ত-রবির কিরণ লেগে
আলোর আঁখি উঠুক্ জেগে,
সেই দাবীটি চাই যে আজ, এই কামনাই দুই চরণে;
শঙ্কা নিয়ে ডঙ্কা বাজাই তবু প্রেম পেয়েছি ওই নয়নে।

ছ'

সৃষ্টি-কালের প্রথম ভোরে গাইলে যারা বাঁচার গান,
তাদেরও হায় ওই আলোটী জ্বালিয়ে দিত যাগের প্রাণ—
সুপ্ত তারার স্বপন মাঝে
গুনগুনিয়ে যে গান বাজে,
আজ নিশীথে সেই সুরেতেই ভরব প্রাণের পাত্রখান্,
একটী নারী কাঁদবে শুধু জ্বলবে যখন আমার শ্মশান!

অমৃতলাল বসু

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

মানুষের প্রতিভার কত দিকে যে স্ফুরণ হইতে পারে, স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় নিজ জীবনে তাহা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল রঙ্গভূমি। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল তিনি বাঙ্গলার রঙ্গভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, সুদক্ষ অভিনেতা, সহৃদয় সমাজসেবক নাট্যকার এবং লোকশিক্ষক রূপে দেখিতে পাই। বঙ্গীয় জাতীয় রঙ্গশালা তিনি নিজের হাতে গড়িয়া গিয়াছেন বলিলে একটুও অত্যুক্তি করা হইবে না। প্রথম প্রথম নাট্যশালা বাঙ্গলার জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তখন লোকে থিয়েটার বলিতে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করিত, থিয়েটারকে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিত। এখন নাট্যশালার সে দুর্দ্দিন আর নাই। নাট্যশালার এই প্রতিষ্ঠা, এই জনাদর লাভ যাঁহাদের চেষ্টায় ঘটিয়াছে—অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

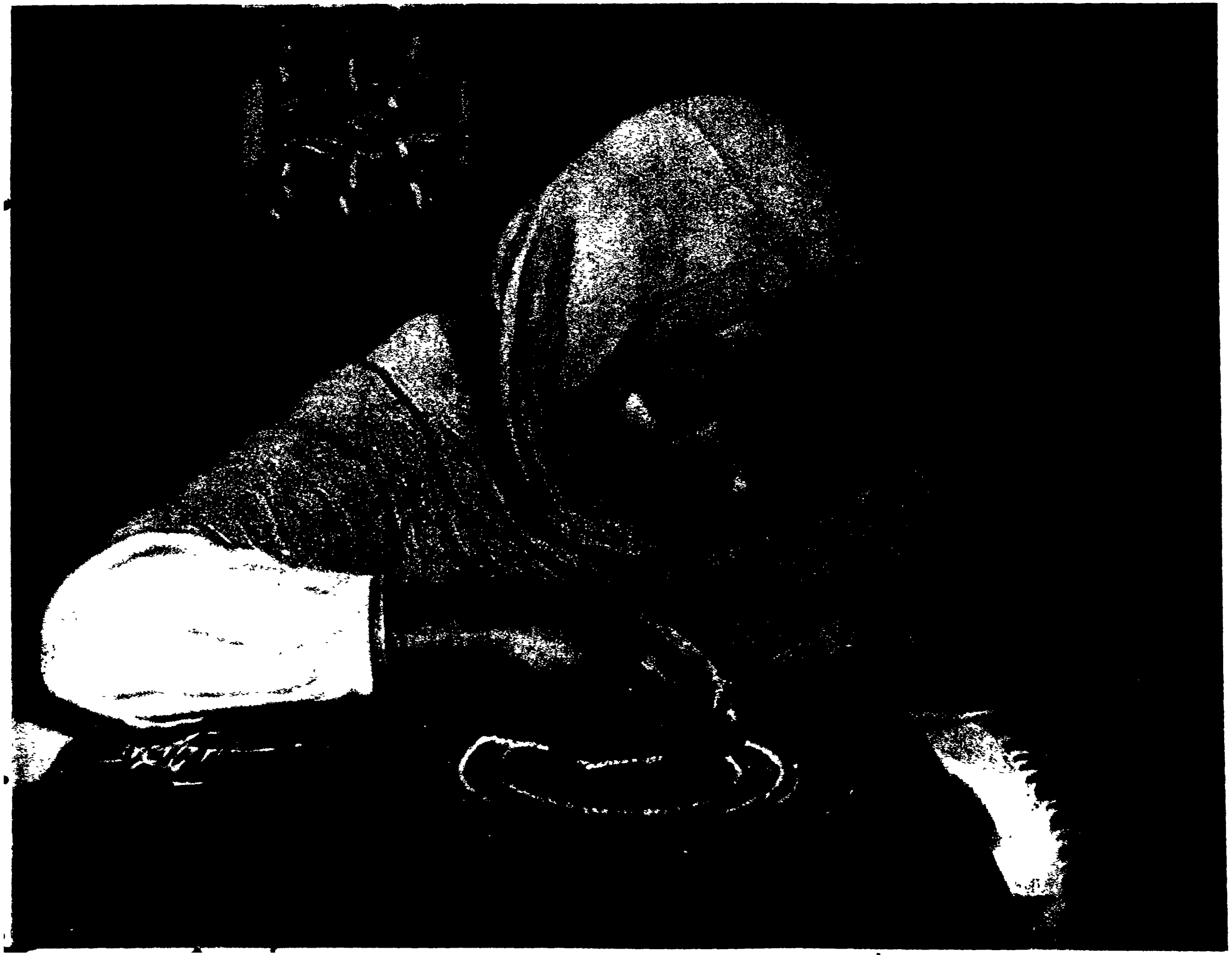
কলিকাতায় ৮৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে সন ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ রবিবারে অমৃতলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু। কৈলাসচন্দ্র কান্যকুব্জাগত দশরথ বসু হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ; সুতরাং অমৃতলালের পর্য্যায় ২৬। কৈলাসচন্দ্র সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথমে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে শিক্ষকতা করিতেন; পরে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। অমৃতলাল বহুদিন শিক্ষকতা করিয়াছিলেন—শিক্ষকতার প্রতি অনুরাগ তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বিশেষতঃ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসনের নিকট অধ্যয়ন করায় ইংরেজী তিনি অতি উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী আবৃত্তি করিতে পারা তৎকালে একটা মস্ত গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পিতার গুণ পুত্রেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

অমৃতলালের বিদ্যারম্ভ বাঙ্গালী গৃহস্থের ধরণেই হইয়াছিল—প্রথমে কিছুদিন পাঠশালা, তারপর কিছুদিন শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়, তৎপরে হিন্দু স্কুল। দুই বৎসর হিন্দু স্কুলে থাকিবার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হন। পর বৎসর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউসন হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। তিন বৎসর মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার পর, এখানকার পড়া শেষ না করিয়াই, তিনি কলেজ ছাড়িয়া দেন, এবং কাশীধামে গমন করিয়া সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্র্যাকটিশ করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করিবার পর তিনি সরকারী চিকিৎসা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করিয়া পোর্ট ব্লেয়ারের চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। কিছুকাল তথায় চাকুরী করিবার পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় আগমন করিবার অল্প কাল পরেই তিনি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মহাশয়দ্বয়ের সংস্রবে আসিয়া পড়েন। সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়।

এ যাবৎ অমৃতলাল কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বাস স্থাপন করেন নাই। কার্য্যব্যপদেশে তাঁহাকে প্রায়ই কলিকাতার বাহিরে থাকিতে হইত। তবে যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন অধিকাংশ সময় গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর প্রমুখ নট-বন্ধুগণের সহবাসে যাপন করিতেন।

এই সময়টা বাঙ্গলার জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের আদি যুগ। ইতঃপূর্ব্বে সাহেবদিগের অনুকরণে উচ্চশিক্ষিত যুবকগণের দ্বারা ধনিগণের সহযোগিতায় ও সহায়তায় ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী



সূচী শিল্প

অনুবাদ অভিনীত হইতেছিল—বাঙ্গলা নাটক অভিনয়ের কল্পনা তখনও হয় নাই।

কিন্তু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় বাঙ্গলার জনসাধারণের তৃপ্তি সাধন করিতে পারে নাই। সেইজন্য কতকগুলি বঙ্গীয় যুবক বাঙ্গলার জনসাধারণের তৃপ্তি বিধানের জন্য বাঙ্গলা নাটকের অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে থাকেন এবং তদনুযায়ী আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের চেষ্টায় কয়েকখানি বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হয় এবং তাঁহারা অভিনয়ে সাফল্যও লাভ করেন। প্রথম প্রথম এই উৎসাহী যুবকদল সখের হিসাবেই অভিনয় করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের কাহারও কাহারও মনে টিকিট বিক্রয় করিয়া পেশাদারী ভাবে অভিনয়ের বাসনা ও কল্পনা জাগিয়া উঠিতে থাকে। ইহাই বাঙ্গলার জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের সূচনা। অমৃতলালও পরম উৎসাহে এই ব্যাপারে যোগদান করেন। তাহার পর কেমন করিয়া বাঙ্গলার জাতীয় নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিল, সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। সেই ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—মালমশলা সংগৃহীত হইতেছে—দুই একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। অমৃতলাল তাঁহার জীবনের প্রধান অংশ—পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক কাল এই বিরাট নাট্যশালা গঠনে সহায়তা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় উদীয়মান অভিনেতৃগণের দ্বারা ইতোমধ্যে চুঁচুড়া ও কলিকাতায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সধবার একাদশী ও লীলাবতী নাটক সাফল্য মণ্ডিত হইয়া অভিনীত হয়। অমৃতলাল তখনও অভিনয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। তিনি এতদিন কলিকাতার বাহিরে বাহিরে থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে মাত্র কলিকাতায় আসিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণে এত দিন তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিবার সুযোগ হয় নাই। এই সময় তিনি কলিকাতার নিকটে গঙ্গার অপর পারে শালিখায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পড়াশুনা করিতেছিলেন, সেই সময়, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শালিখানিবাসী জমিদার স্বর্গীয় জয়রাম ঘোষের পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। এক্ষণে শ্বশুর-বাড়ীর সান্নিধ্যে তিনি স্থায়ী বাস স্থাপন করিলেন। এখন হইতে কলিকাতাস্থিত তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত নিয়মিত ভাবে দেখা-সাক্ষাৎ এবং অভিনয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে আলোচনা ও অভিনয়ে যোগদান সম্ভবপর হইল।

উদ্যমশীল ব্যক্তিগণের প্রকৃতিই এইরূপ যে, কোন একটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা উহার মধ্য-পথে আসিয়া থামিতে পারেন না—প্রগতিই তাঁহাদের অনিবার্য্য অবলম্বন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। সখের থিয়েটারে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ অতিমাত্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আরও অগ্রসর হইবার কল্পনা করিলেন—টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু ইহাতে সকলের মত হইল না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান অভিনেতা ও নেতা এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন যে, আমাদের উদ্যোগ আয়োজন সামান্য, অর্থবল, লোকবল অপ্রচুর, সহায়-সম্পত্তির একান্ত অভাব। এরূপ অবস্থায় টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিতে গেলে জনসাধারণের নিকট অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইঁহাদের আপত্তি টিকিল না—অপর সকলের উৎসাহের বন্যায় সমস্ত আপত্তি ভাসিয়া গেল। অগত্যা ইঁহারা অভিনয় ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং অন্যান্য অভিনেতারা ইহাতে একটুও দমিলেন না; তাঁহারা মহোৎসাহে যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর মধুসূদন সান্যালের ঘড়িওয়ালা বাড়ীর প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বাঁধিয়া দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের নীলদর্পণ অভিনয়ের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। অমৃতলাল এই শেষোক্ত দলে রহিলেন।

নাটকের পাত্র-পাত্রীগণের ভূমিকা যথাযোগ্য ক্ষেত্রে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা পাইলেন। অভিনয়কালে সৈরিন্ধ্রীকে ক্রন্দন করিতে হয়। অমৃতলালকে ক্রন্দন অভ্যাস করিতে হইল। শিক্ষাগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখর। সহজ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে ক্রন্দন আয়ত্ত করা বড় সোজা কথা নহে। অর্দ্ধেন্দুশেখর নাছোড়-বান্দা জবরদস্ত শিক্ষক। যতক্ষণ না নিখুঁতভাবে আয়ত্ত হয় ততক্ষণ তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুরুষের পক্ষে গলা ছাড়িয়া নারীসুলভ ক্রন্দন অভ্যাস যত্রতত্র যখন তখন হইবার নহে—তাহার উপযুক্ত স্থান ও কাল আবশ্যক। গৃহস্থপল্লীতে দিবাভাগে 'মড়াকান্না' অভ্যাস করিতে গেলে

লোকের অযথা কৌতুক ও কৌতূহল বোধ করা স্বাভাবিক। তাহাতে বাধাবিঘ্ন বিস্তর। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ে পরামর্শ করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত স্থান আবিষ্কার করিলেন—বাগবাজারের নবীন সরকারের গলিতে একটা পোড়ো বাড়ী। উভয়ে স্থির করিলেন গভীর নিশীথে এই বাড়ীতে ক্রন্দনের মহলা দিতে হইবে।

সুষুপ্ত পল্লী, স্তব্ধ গভীর রাত্রি। অকস্মাৎ পল্লীবাসী অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া শুনিল—বামাকণ্ঠে উচ্চ ক্রন্দন-রোল। সকলেই বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়া ভাবিল—এ কি হইল! কাহার বাড়ীতে এত রাত্রে কি দুর্ঘটনা ঘটিল! সকালে অনুসন্ধান করিয়া কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। সকলেই এই কান্না শুনিয়াছে—কিন্তু কাহার বাড়ীতে কি হইয়াছে সে খবর কেহই জানে না। সেদিন রাত্রেও ঐরূপ ক্রন্দনধ্বনি। উপরি উপরি এইরূপ তিন-চারি রাত্রি কান্না শুনিবার পর লোকে স্থির করিল, ঐ পোড়ো বাড়ীটা হইতে কান্নার শব্দ আসে। তখন লোকের মনে সংস্কার জন্মিল—ঐ বাড়ীতে দুইটী প্রেতিনীর আবির্ভাব হইয়াছে—গভীর রাত্রে তাহারাই ক্রন্দন করে। ভূতের ভয়ে ক্রমে লোক সন্ধ্যার পর সে বাড়ীর ত্রিসীমানায় যাওয়া বন্ধ করিল।

সন ১২৭৯ সাল, ২৩এ অগ্রহায়ণ, ইংরেজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর যোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীর প্রাঙ্গণে সর্ব্বপ্রথম টিকিট বিক্রয় করিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীলদর্পণে"র অভিনয় করেন, এবং এই অভিনয়ে অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। অমৃতলালের সেই জীবন্ত অভিনয় দেখিয়া দর্শকরা মুগ্ধ হইয়া গেল—সেই দিনই সুদক্ষ অভিনেতা বলিয়া অমৃতলাল জনসমাজে পরিচিত হইলেন।

না আছে অর্থবল, না আছে লোকবল; জনসাধারণও বিমুখ। এরূপ অবস্থায় গুটিকয়েক তরুণ যুবককে বঙ্গীয় জাতীয় নাট্যশালা গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। সম্বলের মধ্যে অদম্য উৎসাহ, অটুট অধ্যবসায়, আর শারীরিক পরিশ্রম। কিছুতেই তাঁহারা দমিবার পাত্র ছিলেন না। ষ্টেজ বাঁধা হইতে বিজ্ঞাপন বিলি পর্য্যন্ত সকল কাজ তাঁহাদিগকে নিজহাতে করিতে হইত। তাঁহারা অভিনয়ও করিতেন, বাঁশ খাটাইয়া ষ্টেজ বাঁধিতেন, রাস্তার ধারে দেওয়ালে দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড মারিতেন, মোড়ে মোড়ে হ্যাণ্ডবিলও বিলি করিতেন। বলা বাহুল্য, অন্যান্যের সঙ্গে অমৃতলালকেও এ সকল কাজ করিতে হইত। এইরূপে তাঁহারা জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন।

মধুসূদন সান্যালের বাটীতে জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু তাহা অল্প আয়ু লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, মাথার উপর কোন আচ্ছাদন ছিল না। একটা গোটা বর্ষা ইহার উপর দিয়া কাটিয়া গেল। ষ্টেজ ভিজিয়া, পচিয়া নষ্ট হইতে লাগিল। এই কারণে, এবং অন্যান্য অসুবিধার জন্য উদ্যোক্তবৃন্দের উৎসাহ আর বেশী দিন রহিল না। কাজেই থিয়েটারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। লাভের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতাদিগের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইল।

কিন্তু নাট্য প্রতিভা লইয়া, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাতার সৌভাগ্য লইয়া যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না—রহিলেনও না। ভুবনমোহন নিয়োগীর পৃষ্ঠপোষকতায়, তাঁহার অর্থসাহায্যে এবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গার উপরিস্থ বৈঠকখানায় মহা উৎসাহে রিহার্স্যাল চলিতে লাগিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ইহার প্রথম অভিনয় হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও অল্পায়ু হইল।

কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? এখন যেখান দিয়া সেণ্ট্রাল এ্যাভিনিউ চলিয়া গিয়াছে, বিডন ষ্ট্রীটের সেই স্থলে (অর্থাৎ যেখানে মনোমোহন থিয়েটার ছিল) অমৃতলাল প্রমুখ উদ্যোগী অভিনেতৃবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া সন ১২৯০ সালের ৬ই শ্রাবণ ষ্টার থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পরে এই জমি ও বাড়ী হস্তান্তর হইলে অমৃতলাল ও অপর তিন ভদ্রলোক স্বত্বাধিকারী হইয়া সন ১২৯৫ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে, ১৮৮৮) কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতীবাগানে বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। এখানে প্রথমে গিরিশচন্দ্রের নসীরাম অভিনীত হয়, এবং অমৃতলাল থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া নসীরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অমৃতলালের অভিনয়-নৈপুণ্য ছিল অনবদ্য। যখনই

যে-কোন ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিনেতৃ-জীবন আরম্ভ হয়। ইহার পর হইতে, মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপরের কিম্বা নিজের, নাটক অথবা প্রহসনে, নারী বা পুরুষের ভূমিকায় তিনি অসংখ্যবার অভিনয় করিয়াছেন। নিখুঁত অভিনয় করিবার জন্য তিনি কিরূপ অনন্যমনা হইয়া সাধনা করিতেন,—সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় ক্রন্দন অভ্যাসেই তাহা আমরা দেখিয়াছি। অমৃতলাল জন্ম-পরিহাস-রসিক ছিলেন; সুতরাং পরিহাস-রসপ্রধান ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় যে অনিন্দ্যসুন্দর হইত, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাই বলিয়া করুণ বা গম্ভীর রসের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় যে অসুন্দর হইত, তাহাও নয়—সকল রসেই তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল।

অমৃতলাল ছিলেন কঠোর disciplinarian। তিনি ছিলেন আদর্শ লোকশিক্ষক। তাঁহার পিতা কৈলাসচন্দ্র কিছুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। অমৃতলালও শিক্ষকতা করিয়াছেন—জীবিকা হিসাবে নহে,—সখ করিয়া। স্কুল কলেজ লোকশিক্ষার একটা ক্ষেত্র; এবং স্কুলকলেজে শিক্ষকতা বা অধ্যাপকতা করিতে হইলে নিয়মানুবর্ত্তিতা বা discipline চাই। অমৃতলাল যেমন শিক্ষকতার মনোবৃত্তি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন, নিয়মানুবর্ত্তিতাও তদ্রূপ তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ। ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াই তিনি সেখানে এমন discipline-এর প্রবর্ত্তন করিলেন যে, কাহারও বাচালতা করিবার সুযোগ রহিল না—আগেকার থিয়েটারসুলভ laxity সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার অধ্যক্ষতার আমলে ষ্টার থিয়েটার যেমন সুপরিচালিত হইত, তাঁহার পরেও সে নিয়মানুবর্ত্তিতা বরাবরই সমানভাবে অনুসৃত হইয়াছিল—তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমনই ছিল।

অভিনয় করিতে করিতে তিনি দেখিলেন অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকের একান্ত অভাব। এই হেতু তিনি নাটক প্রণয়নে মনোনিবেশ করিলেন। এবং ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক প্রহসন, ব্যঙ্গ-কাব্য, নাটক, সামাজিক নক্সা প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। তাঁহার এক একখানি নাটক এক একটি কোহিনুর। সেগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহাদের অভিনয় যেমন লোকে আগ্রহের সহিত দর্শন করিত, গৃহে সেইগুলি ততোধিক আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। তাঁহার ভক্তিরসাশ্রিত নাটকগুলির অভিনয় দর্শনে সহস্র সহস্র দর্শক রঙ্গালয়ে বসিয়া অশ্রুপাত করিয়াছে। কিছুদিন তিনি বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি ব্রজলীলা গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। এই ভক্তিরসমূলক নাটকের অভিনয় দেখিতে রঙ্গালয় লোকারণ্যে পরিণত হইত। তরুবালা তাঁহার একখানি সামাজিক নাটক—তখনকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাণ্ড সাড়া তুলিয়াছিল। তাঁহার সামাজিক নক্সা বিবাহ বিভ্রাট কেবল রঙ্গালয়ে নহে, লোকের ঘরে ঘরে আলোচিত হইত, এবং অনাবিল হাস্যরসে মজলিস সরগরম করিয়া তুলিত। পেশাদার ও এমেচার থিয়েটার ব্যতীত কত যাত্রার আসরে বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব করা যায় না। ইহার অন্তর্নিহিত শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ কত যে মর্ম্মস্পর্শী তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এই নক্সাখানিতে অমৃতলাল স্বয়ং মিঃ সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। তাঁহার সেই অভিনয়ের কৃতিত্বে অভিনয় দর্শনার্থী মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে অজস্র প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর অমৃতলালের 'সাবাস আঠাশ'। ইহাতে সে সময়ের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর আঠাশ জন সদস্যের পদত্যাগের কথা অমৃতলালের সরস লেখনীমুখে চিত্রিত হইয়া সেই ব্যাপারটাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আর এখন—থাক্, সে কথা না বলাই ভাল।

তাহার পর মনে পড়ে অমৃতলালের 'Is the'। এই 'Is the' সে সময় এমন সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছিল যে, পথে ঘাটে, ট্রামে গাড়ীতে সকলের মুখেই 'Is the'। এমন কি, সে সময় আদালতে নবীন উকিলেরা সওয়াল জবাবের সময় দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে 'Is the' ব্যবহার করিয়া আদালত-গৃহে বিপুল হাস্য-রসের সৃষ্টি করিতেন। এ বড় কম বাহাদুরী নহে।

তাঁহার "অমৃত-মদিরা" সত্যসত্যই অমৃত; এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া নিঃসঙ্কোচে কবিতা অতি কম লোকেই লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যাহা কিছু ত্রুটি, যাহা কিছু অসঙ্গতি, সেই সকল বিষয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া, তাহার সংশোধনের উদ্দেশ্যেই তিনি রঙ্গ, ব্যঙ্গ, গাম্ভীর্য্য ও রসপূর্ণ ভাষায় তাহার নাট্যগ্রন্থগুলির রচনা করিয়াছিলেন। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের হীন অনুকরণপ্রিয়তা তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছিল। বাঙ্গালীর জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইয়া অন্ধভাবে প্রতীচ্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়া জাতি যে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার দূরদৃষ্টি এত অধিক ছিল যে, তিনি কল্পনাবলে জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের যে আলেখ্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়া নিত্য নিয়তই পরিদৃষ্ট হইতেছে। আজ নারী প্রগতি যেরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বহু বৎসর পূর্ব্বে অমৃতলাল তাঁহার একাধিক প্রহসনে তাহার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

কেবল সমাজ নহে—রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁহার প্রখর দূরদৃষ্টি ছিল। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি দিব্যচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার একখানি নাটকে তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। কেবল নাটক লিখিয়া নহে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আন্দোলনের সময় তিনি স্যর স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পার্শ্বে দাড়াইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করেন, এবং বহু রাজনৈতিক সভাসমিতিতে তাঁহার চিরাভ্যস্ত রসাল ভাষায় সরস বক্তৃতা করিয়া সভাক্ষেত্রে আনন্দ-রসের সঞ্চার করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, মেডিক্যাল কলেজে তাঁহার চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করেন নাই বটে, কিন্তু গৃহে স্বয়ং অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্যামবাজার এ্যাঙ্গলো ভার্ণাকুলার স্কুলের তিনি সেক্রেটারী ছিলেন। এই স্কুলটির উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় স্কুলটির জন্য জমি সংগৃহীত হয়, সরকার হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়, স্কুলের নূতন বাটী নির্ম্মিত হয়, এবং স্কুলটি এ্যাঙ্গলো ভার্ণাকুলার হইতে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই স্কুলই ছিল তাঁহার বৈঠকখানা। তিনি যখন বাহিরে কোথাও না যাইতেন, তখন কাহারও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন হইলে, বাড়ীতে তাঁহাকে না পাওয়া গেলেও স্কুলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

অমৃতলাল ছিলেন আজীবন লোকশিক্ষক। কি বিদ্যালয়ে সখের অধ্যাপনায়, কি নাট্যজগতে নাটক রচনায়, কি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে, কি সভা সমিতিতে বক্তৃতায়, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে রাজনীতিক আলোচনায় তিনি লোকশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রে একই রকম শিক্ষা নহে—ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা বাঙ্গালী জাতি তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে।

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা।" রঙ্গ বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত একটা বিশিষ্টতা। এই রঙ্গ ফুটিয়া উঠিত বাঙ্গালীর বৈঠকে। জাতির এই রঙ্গপ্রিয়তা প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে ক্রমশঃ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। অমৃতলাল মজলিসি লোক ছিলেন। রঙ্গপ্রিয়তা তাঁহার বিশিষ্টতা ছিল। মজলিসে, বৈঠকে কথালাপে তিনি যেরূপ রসসঞ্চার করিতে পারিতেন, বর্ত্তমান যুগে আর কাহারও সেরূপ ক্ষমতা দেখা যায় না। এই হিসাবে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালীর আদর্শ—বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতার শেষ প্রতীক। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর এই জাতীয় বিশিষ্টতার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল বলিলেও চলে।

অমৃতলালের বক্তৃতা-শক্তি অসাধারণ ছিল। যত বড় সভা হউক, যত লোক সমাগম হউক, অমৃতলাল বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে সকলে নিঃশব্দে তাঁহার সরস বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন, তাঁহার বাক্‌বিভূতিতে মুগ্ধ হইয়া সভাস্থল আনন্দ-রসে আপ্লুত হইত।

বক্তৃতা করিয়া তিনি কখনও ক্লান্ত হইতেন না। ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধরবাবু মফঃস্বলের অনেক সাহিত্য সভায় অমৃতলালের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে অমৃতলালের অনুপম বক্তৃতা-শক্তি সম্বন্ধে কত কথা শুনিয়াছি। তাহার মধ্যে একটী কথার উল্লেখ করিতেছি।

একবার ময়মনসিংহ জেলার এক গ্রামের সাহিত্য-

সম্মেলনের উৎসবে অমৃতবাবু ও জলধরবাবু গিয়াছিলেন। সেখানকার উৎসব শেষ হইয়া গেলে পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয়টার ট্রেনে সে স্থান হইতে বাহির হইয়া তিন চারিটী ষ্টেসন পরে এক গ্রামে মধ্যাহ্ণ-ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্ব রাত্রিতেই নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকেরা নিবেদন করিলেন যে, পরদিন প্রাতে ৭টার সময় তাঁহারা সমবেত হইবেন; তাঁহাদিগকে বক্তৃতা শুনাইতে হইবে। অমৃতবাবু বলিলেন, তথাস্তু। পরদিন সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইল। তাহার পর ট্রেনে চড়িয়া মধ্যাহ্ণ-ভোজনের গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানেও এক মহতী সভার আয়োজন। বেলা দশটায় উপস্থিত হইয়া একটুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া অমৃতলাল বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন; বারোটা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন, শ্রান্তি ক্লান্তি নাই। স্নানাহার যখন শেষ হইল, তখন সেই গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ আসিয়া ধরিলেন, দুইটার সময় সেই স্কুলে পদার্পণ করিতে হইবে। অমৃতলাল জলধরবাবুকে বলিলেন "ভায়া, আবার বক্তৃতা। চল।" স্কুলের ছাত্রগণকে এক ঘণ্টার উপর উপদেশ দিয়া সাড়ে চারিটার ট্রেনে তাঁহারা ময়মনসিংহ যাত্রা করিলেন। ছয়টার সময় ময়মনসিংহ ষ্টেসনে পৌঁছিয়াই সংবাদ পাইলেন, ৭টার সময় ময়মনসিংহের রঙ্গমঞ্চে তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে, লোক-সমাগম তখনই আরম্ভ হইয়াছে। আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। তখন আর কি! সেই রঙ্গমঞ্চে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। সহরের সমস্ত লোক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত। অমৃতলাল সেখানে সাতটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিলেন; সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁহার মনোহর বক্তৃতা শুনিলেন। একই দিনে চারিটী বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করা কম শক্তির পরিচয় নয়। অমৃতলালের সে শক্তি ছিল; তিনি কিছুতেই ক্লান্তিবোধ করিতেন না, কিছুতেই তাঁহার রসের ধারা প্রহত হইত না।

খাটি বাঙ্গালী মৃত্যুকে কখনও ভয় করে না—সে মৃত্যুঞ্জয়। রণক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রলেখা বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গীয় তরুণ যুবক যে অন্যান্য সকল বীরজাতির ন্যায় হাসিতে হাসিতে মরণ-বরণ করিতে পারে গত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী তাহার পরীক্ষা দিয়াছে। আজন্ম সাধক রামপ্রসাদ ও অন্যান্য অনেক বঙ্গীয় সাধক গঙ্গাগর্ভে দেহ অর্দ্ধনিমজ্জিত করিয়া সঙ্গীত করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। শোভাবাজার অঞ্চলের চূড়ামণি দত্ত মহাশয় মৃত্যু আসন্ন জানিয়া নিজে নিজের মরণ-সঙ্গীত রচনা করেন—

"ভুনিয়া জিনিয়া চূড়া যম জিনিতে যায়,
তোরা দেখ্‌বি যদি আয়!"

এবং কীর্ত্তনওয়ালাগণকে ডাকাইয়া নিজেই সুর-তাল-লয়-যোগে সেই গান খোল করতালের বাদ্যসহ গাহিতে শিখাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজের গঙ্গাযাত্রা করেন। বাঙ্গালার প্রধান পরিহাসরসিক নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পায়ে ফোড়া হইয়াছিল। সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তিনি রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ফোড়া এসে পায়ে ধরেছে।" রসরাজ অমৃতলালের রসভাণ্ড মৃত্যুকালেও একটুও শূন্য হয় নাই—সন ১৩৩৬ সালের ১৮ই আষাঢ় মঙ্গলবার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরস ভাষায় মৃত্যুকে "স্বাগতম্" করিয়া তিনি অমৃতলোকে মহাপ্রয়াণ করেন।



মুদ্রা-দোষ

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ছোক্‌রাটা কেন যে আমার পিছু পিছু ঘুরিতেছে প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। যেখানেই যাই, পিছন ফিরিয়া দেখি—সেই ছোক্‌রা। গায়ে আধ-ময়লা একটা সার্ট, পরনের কাপড়টা নোংরা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, মুখখানি শুক্‌নো। দেখিলেই মনে হয়—হয়ত' চাক্‌রির প্রার্থী, কিম্বা হয়ত' কিছু ভিক্ষাও চাহিয়া বসিতে পারে।

ডিটেক্‌টিভ্‌ নয় ত?

কিন্তু জীবনে এমন কোনও অপরাধ কোনোদিন করি নাই—যাহার জন্য ডিটেক্‌টিভ্‌ পিছু লাগিবে। তাহা ছাড়া—লোকটাকে দেখিয়া ডিটেক্‌টিভ্‌ বলিয়া ভাবিতে আমি কিছুতেই পারিলাম না। মুখ দেখিয়া মনে হইল—নিতান্ত অশিক্ষিত।

রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ একসময় থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। কলিকাতা সহরের জনবহুল পথ,—ছোকরাটা ধীরে-ধীরে আমার কাছে আগাইয়াও আসিল, কিন্তু লোকজনের ভয়েই বোধ করি ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিল না। বলিল,—'এইদিকে একটুখানি আসবেন দয়া করে?'

এই বলিয়া সে আঙুল বাড়াইয়া সুমুখের একটা জনবিরল গলিরাস্তা দেখাইয়া দিল।

সর্ব্বনাশ! তবে কি কিছু গোপনীয় কথা? চোর-ডাকাত নয় ত? কিন্তু পকেটে আমার একটি টাকা মাত্র সম্বল। চোর-ডাকাতের ভয় করিবার কিছু নাই। বেলা তখন বোধকরি চারটা বাজিয়াছে। স্পষ্ট দিবালোকে এই এত লোকজনের মাঝখানে জোর করিয়া আমার পকেট হইতে টাকাটি কাড়িয়া লইতে সে পারিবে না নিশ্চয়ই।

মনের কৌতূহল কিছুতেই দমন করিতে পারিলাম না। বড় রাস্তাটা পার হইয়া ধীরে ধীরে সেই গলির ভিতর গিয়া ঢুকিলাম। দোতলা একটা বাড়ীর নীচে খালি একটা রকের পাশে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখি, সেও আমার পিছু পিছু আসিয়াছে। বলিলাম: 'বল এইবার কি বলতে চাও!'

সে আমার নিতান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। হাত জোড় করিয়া চুপিচুপি বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন না বাবু, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনার ওই পাড়াতেই আমি থাকি কি না!'

ভাল কথা। তার পর?

সে বলিতে লাগিল: 'কাল যখন সকাল বেলা আপনি বাড়ী থেকে বেরোলেন বাবু, তখনও আমি আপনার পিছু ধরেছিলাম, আপনি লক্ষ্য করেন নি। কথাটা আপনাকে বল্‌ব বল্‌ব ভাবছি, এমন সময় ওই মোড়ের কাছে সেই চশ্‌মা-পরা এক বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেল, আপনিও ট্রামে চড়ে' তার সঙ্গে কোথায় চলে গেলেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোর নাম কি?'

একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'দুখীরাম।'

'তার পর? কি বলতে চাস্‌ বল্‌ দেখি!'

দুখীরাম বলিল, 'বলতে ভয় হচ্ছে বাবু, সাহস দেন ত বলি।'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, সাহস দিচ্ছি, তুই বল।'

দুখীরাম আবার একবার এদিক-ওদিক তাকাইল। লোকজন কেহ নাই দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, 'তবে শুনুন বাবু! মজাফরপুরে ভূমিকম্প হয়ে গেছে না, সেইখান থেকে এক ব্যাটা মেড়ো এই এতগুলো একশ' টাকার নোট আর কতকগুলো সোনার গয়নাপত্তর নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এখন সে ব্যাটা ভারি বিপদে পড়েছে বাবু, গরীব লোক, একশ' টাকার নোট কোথাও ভাঙ্গাতে গেলে পাছে ধরা পড়ে তাই ভাঙ্গাতেও পারছে না, আর কি যে করবে কিছু বুঝতেও পারছে না। এখন ও কিছু টাকা পেলেই নোটগুলো দিয়ে দেশে চলে যাবে। তা আপনি যদি কিছু টাকা ওকে... একশ' টাকার নোট আপনাদের হাত দিয়ে ঠিক চলে যাবে বাবু, কেউ সন্দেহও করবে না। আর এত এত টাকা বাবু, ছাড়া উচিত নয়।'

মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। চুপ করিয়া খানিক ভাবিলাম। মাথামুণ্ড কি '.' ভাবিলাম কে জানে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ক'খানা নোট আছে? কত ওকে দিতে হবে?'

'নোট? তা বাবু বিস্তর।' দুইটা হাত একত্র করিয়া দুখীরাম বলিল, 'এই এতগুলো। আমি নিজে একদিন গুণে দেখেছিলাম বাবু, একশ' সাতাশখানা। সব একশ' টাকার। চলুন না বাবু, এই ত' কাছেই আছে ব্যাটা। আমি একবার তাকে ডেকে আনি। আপনি নিজেই তাকে জিজ্ঞেস্-টিজ্ঞেস্ করুন। আর অমনি নোটগুলোও আপনি একবার দেখে নিন। আপনি দেখলেই সব বুঝতে পারবেন বাবু, আমরা লেখাপড়া জানিনি, আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। জাল-টাল যদি হয় তাও ঠিক ধরতে পারবেন বাবু, চলুন।'

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মাথাটা তখন খারাপ হইয়া গেছে। একশ' সাতাশ খানা একশ' টাকার নোট। বারো হাজার সাত শ' টাকা। বিধাতা যে এমন করিয়া জুটাইয়া দিবেন ভাবিতে পারি নাই। লইতে দোষ কি?

দুখীরাম বলিল, 'টাকাটা ভাঙ্গিয়ে আমাকে কিছু দেবেন বাবু। আমার হাতে না পড়লে ব্যাটা এতদিন ভেগে যেতো। কোথায় কোন্ বদমাস লোকের পাল্লায় পড়লেই হয়েছিল আর কি!'

দুখীরাম আমার আগে আগে চলিতেছিল। আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলাম তাহার পিছু-পিছু। এক খানা একশ' টাকার নোট যদি সে আমার হাতে দেয়, তাহাই ভাঙ্গাইয়া আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে একশ' টাকা নগদ আনিয়া দিতে পারি। গরীব লোক, একশ' টাকাই উহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার পর দুখীরামকে না হয় ছ' শ' দিলাম। বারো হাজার টাকা আমার।—না, আর ভাবিতে পারি না। ডাকিলাম, 'দুখীরাম, শোন্!'

দুখীরাম আমার পাশে পাশে চলিতে লাগিল।

বলিলাম, 'নোটগুলো জাল নয় ত' দুখীরাম? ভাঙ্গাতে গিয়ে আবার ধরা পড়ব না ত?'

দুখীরাম বলিল, 'তবে আর আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি কেন বাবু! একখানা দেখলেই ত' বুঝতে পারবেন।'

'নোটগুলো তুই ঠিক দেখছিস্ ত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই যে বললাম আমি নিজে গুণেছি একশ' সাতাশখানা। তবে হ্যাঁ, আপনাকে বলতে ভুলেছি, ওই থেকে পাঁচখানা চলে গেছে বাবু। সেই থেকে ব্যাটা আর আমাকে ঠিক বিশ্বেস্ করে না, নইলে আগে ও আমায় গুণ্‌তে টুন্‌তে দিত। সে পাঁচখানা কেমন করে' গেল বাবু শুনুন। যেদিন গুণ্‌লাম তার পরের দিন, কার কাছে যাই কার কাছে যাই ভাবতে ভাবতে গেলাম বাবু এক পোষ্টাপিসের বাবুর কাছে। বাবুর সঙ্গে আমার একটুখানি জানাশোনা ছিল। বাবুকে অতগুলো নোটের কথা বলিনি। বলেছিলাম—পাঁচখানা আছে। বাবু বললেন, দে পাঁচখানা, ব্যাঙ্ক্ থেকে ভাঙ্গিয়ে এনে তোদের কিন্তু দু'শ' টাকার বেশি দেবো না। আমি ব্যাটাকে বুঝিয়ে বললাম, দে, বাবু খুব বিশ্বেসী লোক আছে। তাই না শুনে ব্যাটা দিলে পাঁচখানা বের করে'। সন্ধ্যেবেলায় বাবুর বাসায় আমরা দু'জনেই গেলাম টাকা আনতে। বাবু বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'টাকা কিসের? কে তোদের টাকা নিয়েছে রে হারামজাদা?' এই না বলে' বাবু তাঁর পা থেকে চটি জুতোটা খুলে—দিলেন বসিয়ে ঘা-কতক আমাকেও দিলেন, ওকেও দিলেন। দিয়েই বললেন—'চল্ ব্যাটা তোদের আমি পুলিশে দেবো।' আমরা তখন বাবু দু'জনেই মেরে দিয়েছি দৌড়! সেই থেকে আমিও বাবু ওই লোকটার সঙ্গে টাকার লোভে চোর সেজে সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর পারছিনি বাবু, দিন ওর একটা যাহোক্ কিছু ব্যবস্থা করে'—আমি ওকে টিকিট কেটে ট্রেণে চড়িয়ে দিয়ে আসি।'

এ গলি সে-গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুখীরাম আমাকে লইয়া আসিল হাতীবাগানের মোড়ে। বলিল, 'আপনি এই গলির মোড়ে দাঁড়ান বাবু, আমি তাকে ডেকে আনি।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না। দুখীরাম তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বেঁটেখাটো দারোয়ান-গোছের হিন্দুস্থানী একটা লোক, মাথার চুলগুলা ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, মুখে বসন্তের দাগ, চোখ দুইটা নিতান্ত ছোট, পরনের কাপড়টা হাঁটুর নীচে নামে নাই, গায়ে একটা আধ-ময়লা সাদা চাদর জড়ানো।

আমাকে দেখাইয়া দিয়া দুখীরাম বলিল, 'নে এইবার বাবুকে সব বল্। বাবু তোর ব্যবস্থা করে' দেবেন।'

লোকটা আমার মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহার পর আমার পাশে পাশে চলিতে চলিতে নিতান্ত কাতরকণ্ঠে

কহিল, 'হাঁ বাবু, এইসা এইসা বহুৎ থা, উস্‌মেসে এত্‌না উঠায় লিয়া।'

বলিলাম, 'চুরি করে' এনেছিস্?'

লোকটা ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বলিল, 'চুপি চুপি বোলো বাবু, ইধার্-উধার্ বহুৎ আদ্‌মি···হাঁ বাবু, চোরি কর্‌কে আন্‌ছে। ঝুটা বাৎ কাহে বোলেগা বাবু, হাঁ, চোরায়কে লে আয়া। আজ তিন মাহিনা হো গয়া।'

দুখীরামের দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম। বলিলাম, 'হাঁরে, এই যে বললি ভূমিকম্পের সময় মজাঃফরপুর থেকে এনেছে, অথচ ও বলছে, আজ তিন মাস হয়ে গেল। ব্যাপার কি রে?'

দুখীরাম বলিল, 'কি জানি বাবু, চোর শালা চুরি করে' এনেছে, এনে পঞ্চাশ বার পঞ্চাশ রকম কথা বলছে। মরবে ব্যাটা অম্‌নি করে' একদিন ধরা পড়বে কারও কাছে। বাস্! আমি আর কাঁহাতক আগ্‌লে আগ্‌লে রাখব বাবু!'

হিন্দুস্থানী লোকটা বাংলা ভাল বলিতে না পারিলেও দুখীরামের কথাগুলা বুঝিতে তাহার কষ্ট হইল না। বলিল, 'নেহি বাবু, ও ভোল্ বুঝ্‌ছে। হাম্ ঝুটা বাৎ নেহি বোলা। যিস্‌কা রোপেয়া হাম্ লে আয়া না, ও আদ্‌মি ভূকম্প্‌মে মর্ গিয়া। ও বাৎ যানে দেও বাবু যানে দেও। হামারা ছোটি কর্ দেও বাবু, হাম্ আউর্ হিঁয়া নেহি রহেগা, দেশমে চলা যায়গা বাবু।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেৎনা রোপিয়া হায় তোমারা পাশ্?'

লোকটা বলিল, 'রোপেয়া নেহি হায় বাবু, কাগজ হায়। এক একশো রোপেয়া কা এক একঠো। এৎনা হায় বাবু, বহুৎ হায়্। ছা কোড়ি সাঁতঠো থা, লেকিন্ পান্‌ঠো নিকাল্ গয়া।'

আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত টাকা তুমি চাও? কেৎনা মাংতা?'

সে বলিল, 'আধাআধি বাবু। দশ্ দশ্‌ঠো দশ্ রোপেয়াকা কাগজ হাম্‌কো দে দেও, আউর হিঁয়াসে দোঠো লে লেও। হাঁ বাবু, পান্‌ঠো নিকাল্ গয়া বাবু। পোষ্টা-পিস্‌কা বাবু মার্ লিয়া।'

বলিলাম, 'এ কি রে দুখীরাম, এ যে অনেক চায়।'

দুখারাম তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিল।—'শালার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আর্দ্ধেক চায়, শালার বাপুতি সম্পত্তি কি না, তাই আধাআধি নেবে! ওর কথা বাবু আপনি শুনছেন কেন?'

বলিয়াই সে আমার কাছে আসিয়া চুপিচুপি বলিল, 'আপনি শ' চার পাঁচ জোগাড় করুন বাবু, আমি ও-ব্যাটার কাছ থেকে সব নোটগুলো আদায় করে' দিচ্ছি। ব্যাটা চোর, ব্যাটা মেড়ো, ব্যাটা গুণতেও জানে না, নোটও চেনে না।'

দুখীরামের কথা সে শুনিতে পাইল কি না জানি না। বলিল, 'নেহি বাবু নেহি। উস্‌কা বাৎ হাম্ নেহি শোনেগা। উহিকা বাস্তে হামারা পান্ পান্‌ঠো কাগজ চলা গয়া। হাম্ এক হাঁত্‌মে লেগা, এক হাঁত্‌মে দেগা।'

দুখীরাম বলিল, 'তাই হবে বাবা তাই হবে, তুই এক হাতে নিস্ এক হাতে দিস্। পাচ-পাচটা বেরিয়ে গেছে ত' ব্যাটার যেন জীবন বেরিয়ে গেছে।—বাবু বলছিলেন—তোর ওগুলো যদি জাল নোট হয়, তাহ'লে কি হবে?'

সে আবার বলিয়া উঠিল: 'নেহি বাবুজি নেহি। জাল কাহে হোগা? একঠো তোড়ায়কে দেখ্ লেও।'

দুখীরাম বলিল, 'কই দেখি তোর একটা নোট দেখা বাবুকে। জাল কি না বাবু দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

লোকটা তৎক্ষণাৎ হাত পাতিয়া বসিল।—'রোপেয়া কাঁহা? হাম্ এক হাঁত্‌মে লেগা, এক হাঁত্‌মে দেগা।'

দুখীরাম বলিল, 'দেখেছেন বাবু? পোষ্টাপিসের জীবনবাবুর কাছে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। ব্যাটার মাথাটা গেছে খারাপ হয়ে। ভাবছে সবাই বুঝি নোটগুলো ওর ছিনিয়ে নেবে।'

এই বলিয়াই সে হিন্দুস্থানীটার হাতের কাছে হাত পাতিয়া বলিল, 'বাবু তোর নোট নিয়ে পালাবে না, বুঝলি? দে—একটা দেখা।'

লোকটা কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'থোড়া ঠাহ্‌রো, হাম লে আতা।'

দুখীরাম বলিল, 'আরো বাবা তোর বুজ্‌রুকি রাখ্। চোরাই মাল, তুমি বুঝি বিশ্বেস্ করে' কোথাও রেখে এসেছ? না, বাসায় তোমার আইরিন্ চেষ্টো আছে তাইতেই রেখেছ? দাও বাবা দাও, ও তোমার কোমরে

বাঁধা আছে আমি জানি, দাও একটা বের করে', বাবু দেখুক।'

বলিয়া দুখীরাম একবার হাসিল।

লোকটা তখন কি বুঝিল কে জানে, গায়ের কাপড়টার ভিতরে হাত ঢুকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া গিঁটের পর গিঁট খুলিয়া অতি সন্তর্পণে একখানি নোট বাহির করিয়া দুখীরামের হাতে দিল। দুখীরাম আবার আমার হাতে দিতেই দেখিলাম—সত্যই একশ' টাকার একখানি নোট। দেখিয়া জাল বলিয়া মনে হইল না। হাতে হাতে নোটখানি একটু ময়লা হইয়াছে।

বলিলাম: 'আয় না আমার সঙ্গে একটুখানি এই বড় রাস্তার ধারে। নোটখানা ভাঙ্গিয়ে এক্ষুনি আমি টাকা দিচ্ছি।'

দুখীরামের বোধ হয় যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে লোকটা কিছুতেই যাইতে চাহিল না। হাত পাতিয়া নোটখানা আমার হাত হইতে ফিরাইয়া লইয়া বলিল, 'নেহি বাবু, হাম্ নেহি যায়েগা। হাম্ এক হাঁত্‌মে লেগা, এক হাঁত্‌মে দেগা।'

বলিয়াই সে পিছন্ ফিরিয়া যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকেই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

দুখীরাম বলিল, 'দেখেছেন বাবু, কিছু টাকা ওকে দেখাতে হবে। তা নইলে ও কিছুতেই দেবে না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত টাকা হ'লে হয় বল্ দেখি ?'

দুখীরাম বলিল, 'যা পারেন বাবু আপনি জোগাড় করুন, তারপর আমি ওকে ঠিক বুঝিয়ে দেবো।'

দেখিলাম, রাস্তাটা পার হইয়া লোকটা অদৃশ্য হইয়া গেল। বলিলাম, 'ব্যাটা পালালো না ত ?'

দুখীরাম বলিল, 'ক্ষেপেছেন বাবু, পালাবে কোথায় ? ওর বাসা আমি জানি। কতকগুলো রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ও থাকে। আজ আপনি বাড়ী যান, দেখুন কত জোগাড় করতে পারেন, তারপর কাল সকালে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

বলিলাম, 'সকালে নয় দুখীরাম। আজ রাত্রে ত' কোথাও কিচ্ছু হবে না, কাল সকালেই টাকা আমায় সংগ্রহ করতে হবে। দুপুরে তুমি ওকে সঙ্গে নিয়েই আমার কাছে যেয়ো। আমার বাড়ীর ঠিকানা জানো ত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনার বাড়ী আমি চিনি।'

'আচ্ছা কত টাকা হ'লে হবে বল্ দেখি ?'

'তা বাবু আমি কেমন করে' বলব। আপনি কত জোগাড় করতে পারবেন না পারবেন···তবে ব্যাটাকে বেশি টাকা দেওয়া হবে না কিছুতেই।'

ভাবিয়া বলিলাম, 'লোকটা যে রকম বলছে তাতে বোধ হয় হাজার খানেক্ টাকা ও চায়। কিন্তু এক হাজার টাকা একদিনে জোগাড় করা বোধ হয় হয়ে উঠবে না দুখীরাম। শ' পাঁচেক্ টাকা কোনোরকমে জোগাড় করতে আমি পারব।'

দুখীরাম বলিল, 'তাহ'লেই হবে বাবু। পাঁচশ' টাকার পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট ঠিক করে' রাখবেন। দেখতে অনেকগুলো হবে তাহ'লে। একই নোট ওপর-নীচু করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুণে আমি ঠিক বুঝিয়ে দেবো ব্যাটাকে ব্যাস্ তাহ'লেই হবে।—তারপর আমায় বাবু একটা ব্যাব্‌সা ট্যাব্‌সা যা হোক্ কিছু করবার জন্যে আপনি হাতে তুলে যা দেবেন আমি তাই নেবো।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই দেবো। তোর জন্যেই পাচ্ছি তোকে দেবো না ?'

দুখীরাম হাতজোড় করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ বাবু, বড় গরীব আমি। বাড়ীতে বুড়ী মা আছে, ছোট ছোট তিন-চারটে ভাই বোন্, তার ওপর আজকাল আমার কাজকর্ম কিছু নেই। সেই যদি আপনার কাছেই প্রথম আসতাম বাবু তাহ'লে এতদিন হ'য়ে যেতো। তা না মরতে কোথায় গেলাম সেই পোষ্টাপিসের বাবুর কাছে। লোকটাও গেল খিঁচ্‌ড়ে, আজকাল তেমন বিশ্বেসও করতে চায় না, তার ওপর বাবু, ও-ব্যাটার কাছে একটি পয়সা নেই, আমাকেই পয়সা দিয়ে দিয়ে ওকে খাওয়াতে হয়। লোভে পড়ে' ওকে জিইয়ে জিইয়ে রেখেছি বাবু, নইলে কোন্‌দিন হয়ত' ফুট্ করে' অন্য হাতে গিয়ে পড়বে।—আপনার কাছে খুচরো পয়সা কিছু আছে ত' বরং দিয়ে যান বাবু।'

'বেশ ত'।' বলিয়া পাশের দোকান হইতে টাকাটা ভাঙ্গাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দেবো ?'

দুখীরাম বলিল, 'বেশি চাই না বাবু, আনা-চারেক হ'লেই হবে।'

চার আনা পয়সা দুখীরামের হাতে দিয়া সেদিন 'অ

কোথাও না গিয়া সোজা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কখন্ সন্ধ্যা হইয়াছে, শহরের পথে আলো জ্বলিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

বাড়ী গিয়া প্রথমেই স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, 'ছাখো দেখি, এমন সুযোগ ছাড়ে! কিন্তু হ্যাঁগা, তুমি তাকে হাত-ছাড়া করলে কেন? বাড়ীতে ডেকে আনলেই পারতে!'

বলিলাম, 'হাত-ছাড়া করিনি। কাল সে আসবে। এখন টাকা কোথায় পাই সেই হয়েছে ভাবনা। পোষ্টাপিসের খাতায় আমার মাত্র একশ' টাকা আছে। ওতে হবে না। আরও চারশ' চাই।'

'কারও কাছে ধার পাবে না?'

'ধার আমায় এ সময় কে দেবে?'

'তাহ'লে এক কাজ কর।' বলিয়া স্ত্রী তাহার গলার হার, হাতের চুড়ি, তাগা খুলিতে আরম্ভ করিল। বলিল, 'এইগুলো কোথাও বন্ধক রেখে চারশ' টাকা নাওগে। তার পর টাকাটা হাতে এলেই ছাড়িয়ে দিও!'

বলিলাম, 'সেই ভালো। কিন্তু থাক্, আজ রাত্রে আর কেন, কাল সকালে খুলো।'

সেই ব্যবস্থাই স্থির হইল। রাত্রে খাইতে বসিয়া দেখি, আহারে রুচি নাই, কিছুই খাইতে পারিলাম না। সারারাত্রি চোখে ভাল করিয়া ঘুমও আসিল না। স্ত্রীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিবার পর চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কোথায় ঘুম! শুধু সেই এক চিন্তা!—চুরি-করা নোট, ব্যাঙ্কে জমা দিতে গেলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং কাজ নাই ব্যাঙ্কে গিয়া। বড় বড় দোকানে গিয়া জিনিসপত্র কিনিয়া একটি একটি করিয়া ভাঙ্গাইলেই চলিবে।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা, কাল কখন্ আসবে বলেছে?'

বলিলাম, 'দুপুরে।'

'তাহ'লে সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে গিয়ে তুমি টাকাটা আগে যোগাড় করে' এনো। আসবে ত' ঠিক?'

'হ্যাঁ আসবে।—তুমিও কি ওই কথাই ভাবছ না কি? ঘুমোও।'

স্ত্রী বলিল, 'ঘুমোবো কি গো! সকাল হ'লো যে!'

বলিয়া সে শয্যাত্যাগ করিয়া জানালাটা খুলিয়া দিতেই দেখা গেল, চারিদিক ফর্সা হইয়া গিয়াছে।

বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে গিয়া দেখি, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হইয়াছে, শরীরটা যেন আগুনের মত গরম। মনে হইল যেন জ্বর আসিয়াছে।

স্ত্রী বলিল, 'আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছে। ছাখো না গায়ে হাত দিয়ে।'

কিন্তু গায়ে তাহার হাত দিয়া বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনের উত্তেজনায় এই রকমই হওয়া সম্ভব।

যাই হোক্, বেলা বারোটার মধ্যে পাঁচ শ' টাকা সংগ্রহ করিলাম।

তাহার পর দুখীরাম—এই আসে, ওই আসে!...অধীর আগ্রহে সময় যেন আর কিছুতেই কাটিতে চায় না।

দরজার কড়া নড়িয়া উঠিতেই 'যাই' বলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিতেই দেখি—ঝি আসিয়াছে।

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।—ছি ছি, সব মাটি হইয়া গেল। দুখীরাম হয়ত ভাবিয়াছে—টাকা আমি জোগাড় করিতে পারিব না। এতক্ষণ হয়ত' সে এমন কোনও লোকের কাছে গিয়া পড়িয়াছে—যাহার অনেক টাকা। সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা দিয়া নোটগুলা এতক্ষণ হয়ত সে বাগাইয়া লইয়াছে। তাহাই হয়। টাকা যাহাদের আছে, টাকাকড়ি তাহারাই এম্নি করিয়া পায়। আমাদের মত গরীব যাহারা, টাকা তাহাদের কাছে সহজে আসিতে চায় না।

স্ত্রী বলিল, 'তুমি আচ্ছা বোকা যাহোক্! দুখীরাম এই পাড়াতেই থাকে বললে তবু তুমি তার ঠিকানাটা নিতে পারলে না?'

ঠিকানা লওয়া আমার উচিত ছিল। বলিলাম, 'সত্যি ভুল হয়ে গেছে।'

'তাই ত' হবে। টাকা কি আর তোমার কাছে আসে কখনও! তুমি লক্ষ্মীছাড়ার একশেষ! তাই যাও না একবার ঘুরে ফিরে' দেখে এসো!'

উঠিতে যাইতেছিলাম। এমন সময় মনে হইল, কলিকাতা শহরে ত' আর পথ মাত্র একটি নয়! আমি

হয়ত বাহির হইয়া যাইব, আর অন্য পথ দিয়া দুখীরাম হয়ত' আমার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে।

স্ত্রী বলিল, 'তা আসেই যদি ত' আমি তাকে বসিয়ে রাখব। তুমি যাও।'

'তুমি তাকে চিনবে কেমন করে' ?'

'নাম জিজ্ঞেস্ করব।'

'পারবে জিজ্ঞেসা করতে ? যদি অন্য কেউ আসে ?'

'তবে যা খুশী তাই কর বাপু, ঘুমোও পড়ে' পড়ে'।' বলিয়া স্ত্রী বোধ হয় রাগ করিয়াই চলিয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম, গেল। বৃথাই পোষ্টাপিসের টাকা তুলিলাম। স্ত্রীর গহনাক'টা বৃথাই বন্ধক দিলাম। চারশ' টাকার এক মাসের সুদ তাহারা ছাড়িবে না। কপালে হয়ত ওইটুকুও আমার অর্থদণ্ড ছিল।

কিন্তু দুখীরাম নিরাশ আমাকে করিল না। বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, হঠাৎ দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখি—দুখীরাম দাঁড়াইয়া আছে। বিবাহের পর স্ত্রীকে দেখিয়া একবার আনন্দিত হইয়াছিলাম আমার মনে আছে। কিন্তু আজ এতক্ষণ পরে দুখীরামকে দেখিয়া যে আনন্দ আমার হইল সে আনন্দের কাছে তাহা তুচ্ছ।

জিজ্ঞাসা করিলাম : 'হাঁরে এত দেরি হ'লো যে ?'

'টাকা আপনি জোগাড় করেছেন বাবু ?'

বলিলাম, 'হ্যাঁ, এই ত' সঙ্গেই এনেছি।'

দুখীরাম বলিল, 'তাহ'লে আসুন বাবু। আমি ওদিকে এক মহা বিপদে পড়েছিলাম। ওকে ডাকতে গিয়ে দেখি ব্যাটা জ্বরে কুঁহুর্ কুঁহুর্ করে' কাঁপছে। কাল রাত্তির থেকে বাবু ওর ভয়ানক জ্বর। খানিকটা গরম জল খাইয়ে এই এতক্ষণ পরে ব্যাটাকে উঠিয়ে নিয়ে আসছি। ব্যাটা আসতে কিছুতেই চায় না। বলে—বড়রাস্তায় যাব না, কারও বাড়ী যাব না—কিছু না। ওইখানে ওই বাড়ীর নীচে একটা রকে শুয়ে আছে,—চলুন।'

গলির পর গলি পার হইয়া গিয়া সরু একটা নির্জ্জন গলির ভিতর গিয়া দেখিলাম, বাড়ীর একটা ছোট্ট রকের উপর আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া সেই হ্যাড়া হিন্দুস্থানীটা শুইয়া আছে। আমি তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে মুখ তুলিয়া আমার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'বোখার্ লাগ্ গিয়া বাবুজি, হাম্ মর্ যায়গা।'

দেখিলাম তাহার দু'চোখের কোণ বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

দুখীরাম তাহার কাছে গিয়া বসিল। হাত বাড়াইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'আহা কাঁদিস্‌নে বাবা কাঁদিসনে। বাবু তোর টাকা এনেছে। বুঝলি ?'

'কাঁহা ? হাম্ দেখেগা আগাড়ি।' বলিয়া সে তাহার ছোট ছোট চোখদুইটা মেলিয়া আমার দিকে মিট্ মিট্ করিয়া তাকাইতে লাগিল।

টাকা আমার পকেটেই ছিল। হাত দিয়া নোটের তাড়াটা পকেট হইতে তুলিয়া তাহাকে দেখাইলাম। বলিলাম, 'এক্ষুনি তুমি নিতে পারো।'

লোকটা বলিল, 'নেহি বাবুজি। হিঁয়া বহুৎ আদ্‌মি। চলিয়ে কালী-মায়ীকো মন্দিল্‌মে চলিয়ে।'

সর্ব্বনাশ! সেই কালীঘাট! বলিলাম, 'সেখানেও ত' লোকজন কম থাকবে না।'

'তব্ চলিয়ে বাবুজি গড়ের মাঠমে চলিয়ে। যাঁহা পাথল্‌কা জানোয়ার দেখ্‌লাতা—যাদুঘর না কেয়া বোল্‌তা উস্‌কো, হুঁয়াই ঠাহর্ যাঙ্গে। বাস্—আউর্ কুছ্ বাৎ নেহি।' বলিয়া সে আবার চোখ বুজিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কিন্তু আমার তখন এম্‌নি অবস্থা, এক মিনিট অপেক্ষা করিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না। বলিলাম, 'চল বাবা, যেখানে তোমার মর্জ্জি সেইখানেই চল।'

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিপদ হইল এই যে, সে আমাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। বার-বার ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'নেহি বাবুজি, হাম্ একেলা যায়েঙ্গে। কিসিকো সাঁথ্ হাম্ নেহি যায়েগা।'

দুখীরাম বলিল, 'ব্যাটা চোর কি না, ব্যাটার ভয় হয়ে গেছে।'

'কিন্তু ওই জ্বর নিয়ে এতটা রাস্তা যেতে ও পারবে ? তার চেয়ে না হয় গাড়ী করে' নিয়ে যেতাম।'

কিন্তু তাহার সেই এক কথা!—'নেহি নেহি হাম্ গাড়ী পর্ নেহি চড়েঙ্গে। দো আনা পয়সা দিজিয়ে, হাম্ টেরাম্‌মে যায়েগা। তোম্‌লোক্ আগাড়ি চলা যাও।'

তথাস্তু। দু' আনা পয়সা তাহার হাতে দিয়া দুখীরামকে সঙ্গে লইয়া আমি ত' ট্রামে গিয়া চড়িলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাঁ রে দুখীরাম, ও আসবে ত?'

দুখীরাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'প্রাণের দায়ে আসবে বাবু, না এসে ও যাবে কোথায়!'

আমরা অনেক আগে গিয়াই যাদুঘরের সুমুখে পৌঁছিলাম। দেখিতে দেখিতে দিনের আলো ডুবিয়া আসিল, চৌরঙ্গীর পথে আলো জ্বলিল, তবু সে আসিল না।

ঘন ঘন দুখীরামের মুখের পানে তাকাই আর বলি,—'এ হ'লো কি রে দুখীরাম? ব্যাটা শেষে ভয় পেয়ে গেল না কি?'

দুখীরামেরও মুখখানি শুকাইয়া গেল, কিন্তু তবু সে আমাকে সাহস দিতে ছাড়িল না। বলিল, 'না বাবু সে আসবে। আপনি ততক্ষণ আর-একটা বিড়ি-টিড়ি ধরান্, আমি একটুখানি এগিয়ে গিয়ে দেখি।'

দুখীরামকে ছাড়িয়া দিতে সাহস হইল না। বলিলাম, 'না বাবা, তুই আর যাস্ না। এই নে, তুইও বরং একটা বিড়ি ধরা।' বলিয়া পকেট হইতে তাহাকেও একটি বিড়ি বাহির করিয়া দিলাম।

বিড়ি টানিতে টানিতে দুখীরাম বলিল, 'আপনার কাছে রুমাল নেই বাবু?'

'রুমাল? কেন রে? হ্যাঁ, আছে একটা। কি হবে?'

দুখীরাম বলিল, 'আপনি এক কাজ করুন বাবু, নোট টাকা আপনার কাছে যা আছে পকেট থেকে একটি একটি করে' বের করে' দিতে গেলে ব্যাটা ভাববে হয়ত' বাবুর কাছে বেশি নেই, তার চেয়ে সবগুলো একটা রুমালে বেশ ভাল করে' বাঁধুন্ বাবু। তারপর সেই তেম্নি করে' গুণে ব্যাটাকে দেওয়া যাবে।'

'তা না হয় বাঁধছি, কিন্তু ও আগে আসুক্ দুখীরাম।' বলিয়া দুখীরামের পরামর্শ মত নোটগুলি রুমালে জড়াইয়া বেশ ভাল করিয়াই বাঁধিলাম।

যাদুঘরের সুমুখে ফুটপাথের উপর এমন করিয়া বসিয়া থাকিতে লজ্জা করিতেছিল। অথচ বসিয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। পা দুটা ধরিয়া যেন বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেও কষ্ট বোধ করিতেছিলাম।

রাত্রি তখন বোধকরি আটটা। হতাশ হইয়া উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় দূরে মনে হইল যেন বাবাজীবন ধীর মন্থরগতিতে আমাদেরই দিকে অগ্রসর হইতেছে। বলিলাম, 'দ্যাখ্ দেখি দুখীরাম, ওই কি না!'

'হ্যাঁ বাবু, আসছে।' বলিয়া দুখীরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। আমিও উঠিলাম।

সে কিন্তু আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া কোনও কথাই বলিল না। চলিতে চলিতে 'আইয়ে বাবুজি' বলিয়া সুমুখের ময়দানে যাইবার জন্যই বোধ করি রাস্তাটা পার হইতে লাগিল।

আমরাও তাহার পিছু পিছু গাড়ী-ঘোড়া সাম্লাইয়া রাস্তা পার হইলাম।

পাশেই সুবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ময়দান। আধো-আলো আধো-অন্ধকারে এখানে-ওখানে লোকজন বসিয়া আছে। অপেক্ষাকৃত একটা নির্জ্জন জায়গার সন্ধানে আমরা তিনজনেই আগাইয়া চলিলাম।

মাঠের উপর দিয়া বহুদূর চলিয়া আসিয়াছি। বলিলাম, 'আর কেন, এইখানে বসা যাক্।'

দুখীরাম বসিল, হিন্দুস্থানী লোকটাও বসিল, আমিও বসিলাম।

বসিয়াই সে লোকটা হাত পাতিল।—'দে দেও বাবু এক হাঁত্‌মে দে দেও, এক হাঁত্‌মে লে লেও।'

দুখীরাম বলিল, 'বাবু এনেছে আমি জানি, তুই আগে বের কর্।'

লোকটা বসিয়া বসিয়াই একটুখানি দূরে সরিয়া গেল, তাহার পর আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া কাপড়ের তলা হইতে বোধ করি গিঁটের পর গিঁট খুলিয়া পুঁটুলিটা বাহির করিতে লাগিল।

দুখীরাম আমার কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া চুপিচুপি বলিল, 'ভালই হ'লো, আপনার টাকা তাহ'লে আর গুণে দিতে হবে না বাবু, মালটা যদি ও আপনার হাতে-হাতে দেয় ত' আপনি ওই আলোর কাছে গিয়ে…'

হাতের ইসারায় তাহাকে চুপ করিতে বলিলাম। থাক্, আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। নোটের তাড়াটা একবার হাতে পাইলে হয়…!

দুখীরাম হাত বাড়াইয়া আমার পা দুটা একবার জড়াইয়া ধরিল। বলিল, 'এ গরীবকে কিন্তু মনে রাখবেন বাবু, কালই আমি যাব আপনার কাছে। আজ আমি এই পথেই ওকে ট্রেণে চড়িয়ে দিয়ে আসি।'

অন্ধকারেও বেশ স্পষ্ট দেখা গেল, কাপড়ে বাঁধা নোটের পুঁটুলিটি হাতে লইয়া আবার সে তেমনি করিয়াই আমাদের কাছে আসিয়া বসিল।

গুণিতে যখন হইবে না তখন এতই-বা দিই কেন? পকেটে হাত দিয়া ইত্যবসরে আমিও আমার রুমাল হইতে গোটাকতক নোট বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি তখন আর সময় নাই, হাতটাও কাঁপিতেছিল, পাঁচ টাকার কি দশ টাকার জানি না, একখানি নোট মাত্র টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম। বাকি নোটগুলি যেমন ছিল তেম্‌নি অবস্থাতেই রুমাল-সমেত বাহির করিয়া দুখীরামের হাতে দিয়া বলিলাম, 'দে ওকে বুঝিয়ে দে।'

বলিয়াই হিন্দুস্থানীর হাত হইতে তাহার পুঁটুলিটি লইয়া আমি পকেটে পুরিলাম।

কিন্তু হিন্দুস্থানীটা বলিল, 'নেহি বাবু, হাম্‌ গিণ্‌কে লেগা, গিণ্‌কে দেগা।'

দুখীরাম বলিল, 'বা রে, এই অন্ধকারে গুণবে কেমন করে'?'

সে বলিল, 'এক্‌ঠো কেরাচী গাড়্‌ডি বোলাও। গাড়্‌ডিকা অন্দর বৈঠ্‌ বৈঠ্‌কে গিণেগা।'

'আচ্ছা তাই ডাক্‌ছি বাবা। তুমি যা বলবে তাই করব।'

বলিয়া বোধ করি একখানা গাড়ী ডাকিবার জন্যই দুখীরাম উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি হিন্দুস্থানীটাও দাঁড়াইল। আমিও দাঁড়াইলাম।

কিন্তু গাড়ী ডাকিতে হইলে সুমুখে রাস্তার উপর যাইতে হইবে, অথচ দুখীরাম এবং সেই হিন্দুস্থানী—দু'জনেই চলিল বিপরীত দিকে।

বলিলাম, 'দুখীরাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস্‌?'

দুখীরাম আমার কথাটার জবাব দিল না।

জনকতক লোক সেইদিক দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল, তাহাদের ভয়েই বোধকরি তাহারা দু'জনেই অন্ধকার মাঠের উপর দিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া আগাইয়া গেল।

ডাকিলাম, 'দুখীরাম?'

কিন্তু কোথায় তাহারা?

ভালই হইল। নোটগুলা গুণিয়া গুণিয়া বুঝাইয়া দিবার দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম। আমারও আর এতগুলা টাকা সঙ্গে লইয়া অন্ধকারে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়।

হাত দিয়া নোটের পুঁটুলি সমেত জামার পকেটটা চাপিয়া ধরিয়া বড় রাস্তার দিকে আগাইয়া চলিলাম। ট্রামে বাড়ী ফিরিতে দেরি হইবে। কাজ নাই, তাহার চেয়ে একটা ট্যাক্সি করিয়া যাওয়াই ভাল।

রাস্তার পাশে সারি সারি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল। বন্ধকরা একটা গাড়ী দেখিয়া তাহাতেই চড়িয়া বসিলাম। বলিলাম—শ্যামবাজার।

ট্যাক্সি ছাড়িয়া দিল।

আর ভয় নাই। নোটগুলা এইবার অনায়াসে খুলিয়া দেখিতে পারি।

পকেট হইতে বাণ্ডিলটি ধীরে-ধীরে বাহির করিলাম। কাপড় দিয়া নোটগুলা ব্যাটা সযত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। গিঁটের পর গিঁট খুলিবার আর অবসর হইল না। কাপড়টা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! কোথায় নোট! নোটের মত থাকে থাকে ভাঁজ-করা চক্‌চকে কয়েকটা প্যাকিং কাগজের ঠোঙ্গা! হাওয়ার মত বেগে ট্যাক্সি তখন সেনট্র্যাল্‌ এভিনিউএর উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মাথাটা আমার কেমন যেন ঘুরিতে লাগিল। ড্রাইভারকে বলিলাম, 'গাড়ী থামাও।'

বাঁ দিকের ফুটপাথ ঘেঁসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। দরজা খুলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িলাম। পকেটে সেই নোটখানি মাত্র সম্বল। বাহির করিয়া দেখি—তাও আবার পাঁচ টাকার।

বারো আনা ভাড়া কাটিয়া লইয়া বাকি টাকা ড্রাইভার আমার হাতে দিল। খানিক্‌ পায়ে হাঁটিয়া, খানিক্‌ ট্রামে চড়িয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। স্ত্রী বোধকরি আমারই অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া ছিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'পেলে?'

মুখ দিয়া আমার কথা বাহির হইল না। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাহার সেই নিরাভরণ হাত দুইটির দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাহার পর খানিক্‌ থামিয়া সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিতেই সে আমার মুখের পানে কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে একবার তাকাইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সত্যি? না, না আমি কাউকে বলব না, তুমি বল। বাইরে কোথাও রেখে এসেছ, না?' বলিয়া সে আমার জামার পকেটগুলা ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

হা ভগবান! মনে হইল যেন পায়ের নীচে ভূমিকম্প সুরু হইয়াছে, আর আমার দুই কানের কাছে—এক দিকে দুখীরাম, আর এক দিকে সেই কিম্ভূতকিমাকার মুণ্ডিত-মস্তক হিন্দুস্থানীটা তাহার দন্তহীন মুখে হি হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পরলোকে অপরেশচন্দ্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(জন্ম ১২৮২ সাল ৫ই শ্রাবণ—মৃত্যু ১৩৪১ সাল ১লা জ্যৈষ্ঠ)

কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পরলোকগত হইলে আমরা সংবাদপত্রে লিখি অথবা সভায় গিয়া বলি যে দেশের সমূহ ক্ষতি হইল, এ ক্ষতি অপূরণীয়। অনেক সময় সেটা কথার কথা কিম্বা শিষ্টাচার রক্ষার প্রথা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কোন ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে। অপরেশচন্দ্রের লোকান্তরে বঙ্গ রঙ্গালয়ের তথা নাট্যসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবে না। অপরেশচন্দ্র ছিলেন প্রতিভাবান নাট্যকার, সুদক্ষ অভিনেতা, অভিজ্ঞ অভিনয়-শিক্ষক এবং রঙ্গমঞ্চের কৃতি অধ্যক্ষ। একাধারে এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি ইদানীং বাঙ্গালায় কেহ নাই।

অপরেশচন্দ্রের জন্মস্থান মহেশপুর গ্রাম—তখন ছিল নদীয়া, এখন যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত। পিতা বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় যখন "কৃষক" পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণপূর্ব্বক সপরিবারে কলিকাতায় আগমন করেন, অপরেশচন্দ্র তখন বালক। বিপ্রদাস বাবু পরে মাসিকের আকারে "পাক-প্রণালী" প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সূত্রে কলিকাতার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক এবং বিক্রেতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রভৃতি বিপ্রদাস বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। অপরেশচন্দ্র কৈশোরে একটা সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ হইয়াছিলেন। তিনি সেকালের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই; কারণ পরীক্ষার অঙ্কের খাতায় "সধবার একাদশীর" নিমচাঁদের ইংরাজী বুক্‌নীগুলি লিখিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। পরীক্ষার চার-পাঁচ মাস পূর্ব্বে তিনি একটী সখের থিয়েটারের আখড়ায় যোগদান করেন।

স্বর্গীয় ঈশ্বর গুপ্তের ভ্রাতার পৌত্র শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় সেই সময় একটী সখের থিয়েটারের দল গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন। (কলিকাতা) শ্যামপুকুরের নিকটবর্ত্তী কোন বাড়ীতে তাঁহাদের আখড়া বসিত। অপরেশচন্দ্রের একজন বাল্যবন্ধু তাঁহাকে ধরিয়া সেই আখড়ায় লইয়া যান। গুপ্ত কবির সাধের সংবাদপত্র "প্রভাকর" তখনো বাহির হইত। মণীন্দ্রকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে পরিচিত হইয়া অপরেশচন্দ্র প্রভাকরের সংস্পর্শে আসেন এবং প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা ইত্যাদি কাজে হাত মক্‌স করিতে থাকেন। বাঙ্গালা লেখার হাতে খড়ি হয় তাঁহার প্রভাকরে। তাঁহার লেখা এবং অভিনয় শেখার প্রথম দীক্ষাদাতা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। অপরেশচন্দ্র জীবনে মনীন্দ্রবাবুর কথা বিস্মৃত হন নাই। স্বপ্রণীত "রঙ্গালয়ে ত্রিশবৎসর" ইঁহারই নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এই মনীন্দ্রবাবুর সাহচর্য্যেই অপরেশচন্দ্র "রামকৃষ্ণ মঠে" যাতায়াত সুরু করেন। মঠের কোন কাজের ভার পাইলে, মঠে কোনরূপ সাহায্যের সুযোগ পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদের সেবাযত্নে তাঁহার অকুণ্ঠ আগ্রহ ছিল। উত্তর কালে স্বামী সারদানন্দকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তিনি কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

মনীন্দ্রবাবুর দল বীণা থিয়েটার ভাড়া লইয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন প্যাণ্ডোরা থিয়েটার, কিন্তু থিয়েটার করা ঘটিয়া উঠে নাই। অপরেশচন্দ্র কিছুদিন মহেন্দ্রবাবুর নিকট অভিনয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে এবং নানা কারণে তিনি মাস আষ্টেকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমে পলায়ন করেন। নানা স্থান ঘুরিয়া আসিয়া অপরেশচন্দ্র কিছুদিন ইলিসিয়াম থিয়েটারে যোগ দিয়া স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু শেখরের নিকট অভিনয় শিক্ষা ও সখের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মাঝে মাঝে কণ্ট্রাক্টারী করিতেন, এবং দিনকতক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের পার্শ্বেল অফিসেও চাকরী করিয়া-ছিলেন। মনীন্দ্রবাবুর আখড়ায় যোগদানের দিন হইতে প্রায় আট বৎসর এইভাবেই কাটিয়া যায়।

অতঃপর সন ১৩১১ সালের গোড়ার দিকে শ্রীযুক্ত

মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের অনুরোধে তিনি মিনার্ভায় যোগদান করেন এবং এই বৎসরই ৩রা ফাল্গুন তাঁহার নাম ম্যানেজাররূপে বিজ্ঞাপিত হয়। গিরীশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর তখন মিনার্ভায়। সখের দল হইতে আসিয়া একটা সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ হওয়া—আর যে রঙ্গালয়ে গিরীশ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর বর্ত্তমান—কম যোগ্যতার কথা নহে। এই যোগ্যতা তাঁহার উত্তরোত্তর বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। তিনি যে থিয়েটারেই ম্যানেজাররূপে কাজ করিয়াছিলেন, সুশৃঙ্খল পরিচানায় ও সদব্যবহারে অধ্যক্ষের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

অপরেশচন্দ্রের লিখিবার শক্তি ছিল, সাধও ছিল, তথাপি কি জানি কেন আত্মপ্রকাশ করিতে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ বোধ করিতেন। অথচ কত প্রসিদ্ধ নাট্যকারের বই তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া জুড়িয়া গাঁথিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া দিতেন। খুব বেশী বয়সেই তিনি গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনেক নাট্যকারের দেখিয়াছি প্রথম বইখানা যেমন জমে আর কোন বই সেরূপ জমে না। অপরেশচন্দ্রের বেলায় ঠিক ইহার উল্টা ঘটিয়াছে। যত দিন গিয়াছে, হাত তত খুলিয়াছে, পরের পর বই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। তাঁহার প্রথম নাটক "রঙ্গিলা" ১৩২১ সালে প্রণীত ও মিনার্ভায় অভিনীত হয়। তাহাতেও আবার গ্রন্থকাররূপে অপরেশচন্দ্রের নাম ছিল না। এই সময় বিপ্রদাসবাবুর লোকান্তর ঘটে।

অপরেশচন্দ্রের রঙ্গিলা, আহুতি, শুভদৃষ্টি, রাখীবন্ধন, ইরাণের রাণী প্রভৃতি নাটক ইংরাজীর অনুবাদ, কিন্তু পড়িয়া অনুবাদ বলিয়া ধরিবার উপায় নাই, মনে হয় মৌলিক রচনা। যাঁহারা মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাই অনুবাদ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। অথচ বইখানা হাতে লইয়া তিনি মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন, একজন লিখিয়া লইত। "সাইন্ অব দি ক্রশ" হইতে এইরূপে এক আসনে বসিয়া ঘণ্টা-দশের মধ্যে তিনি আহুতি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। "শ্রীরামচন্দ্র" লিখিতে তাঁহার চৌদ্দ দিন লাগিয়াছিল। মহাকবি ভাসের মূল নাটকের স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় কৃত অনুবাদ 'প্রতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা' হইতে তিনি 'বাসবদত্তার' আখ্যান বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অযোধ্যার বেগম, চণ্ডীদাস, ছিন্নহার, মগের মুল্লুক প্রভৃতি নাটক বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীগৌরাঙ্গ কাব্য-সম্পদে সম্পন্ন। উপন্যাসকে নাটকের রূপ দিতে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসামান্য। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'পোষ্য পুত্র', 'মন্ত্রশক্তি', 'মা' সেই কৃতিত্বের পরিচায়ক। অপরেশচন্দ্র মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে সে অনুবাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অপরেশচন্দ্রের ভাষা



স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চমৎকার। ভাষা একেবারে আধুনিক কিন্তু তাহা অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, ব্যঞ্জনায় মনোহরণ করে। ভাষা আধুনিক, কিন্তু তাহাতে গুরুচণ্ডালী দোষের লেশ নাই; প্রাদেশিকতার গোঁড়ামী ভরা ন্যাকামীর গন্ধ নাই। ভাষা আধুনিক, কিন্তু ফেরঙ্গ ভাষা নয়, ঝরঝরে তরতরে খাঁটী বাঙ্গালা ভাষা। এই সমস্ত গুণ ছিল বলিয়াই কর্ণার্জ্জুনের শত রজনীর অভিনয় উৎসবে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ উভয়ে মিলিয়া অপরেশচন্দ্রকে "নাট্যবিনোদ" উপা-

ধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কর্ণার্জ্জুন একাদিক্রমে দুইশত রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল।

অভিনয় শিক্ষাদানে সত্যই তাঁহার আচার্য্যের উপযুক্ত যোগ্যতা ছিল। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গীও শিখাইতে পারিতেন। অপরেশচন্দ্র নাটকে যেমন বহু বিচিত্র চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি নিজেও বহু বিচিত্র চরিত্রের অভিনয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির নাম—রঙ্গিলা, আহুতি, শুভদৃষ্টি, দুমুখো সাপ, অযোধ্যার বেগম, বাসবদত্তা, ছিন্নহার, অপ্সরা, সুদামা, কর্ণার্জ্জুন, পুষ্পাদিত্য, রামানুজ, ফুল্লরা, [illegible], শ্রীগৌরাঙ্গ, ইরাণের রাণী, বন্দিনী, চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ, মগের মুলুক, বিদ্রোহিনী, রাখীবন্ধন, মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, শকুন্তলা, ভদ্রা (উপন্যাস) শ্রীরামচন্দ্র, রঙ্গালয়ে ত্রিশবৎসর (আত্মকথা)।

অপরেশচন্দ্র মনে প্রাণে খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালাকে তিনি অন্তরে অন্তরে ভালবাসিতেন। অপরেশচন্দ্র মজলিসি লোক ছিলেন। তাঁহার মার্জ্জিত রসিকতায়, নানাবিষয়িণী আলোচনায়, মিষ্ট কথায়, মত-সহিষ্ণুতায় এবং বিনীত আচরণে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মিগণকে তিনি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। অপরেশচন্দ্রের কোন সহকর্ম্মী, অথবা তাহার বিধবা, কিম্বা তাহার পুত্র বিপন্ন হইয়া আসিলে কাহাকেও তিনি রিক্তহস্তে ফিরাইয়া দিতেন না। তাহাদের কাহারো বিপদের সংবাদ পাইলে অযাচিত ভাবে গিয়া সাহায্য করিতেন।

অপরেশচন্দ্র আজ দেড় বৎসর কাল রোগযন্ত্রণা ভুগিতেছিলেন। এই শয্যাশায়ী অবস্থাতেও বাণীসাধনার বিরাম ছিল না। রোগশয্যায় শুইয়াই 'মা' লিখিয়াছিলেন, রোগশয্যায় শুইয়াই আরো কয়েকখানি নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন, একখানি বোধ হয় সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অভাবের তাড়না, রোগের যাতনা কোন কিছুই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। অপরেশচন্দ্রের বিধবা পত্নী, তিন কন্যা এবং একটী পুত্র বর্ত্তমান। আমরা এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের অনপনেয় শোকে গভীর সহানুভূতি জানাইয়া অপরেশচন্দ্রের উদ্দেশে শ্রদ্ধার তর্পণাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। ভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

বর্ষামুক্তা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

সিক্ত ক্লিন্ন পরিম্লান কর্দ্দম-পিচ্ছিল
অবিশ্রান্ত বরষায় আবিল-সলিল
পড়েছিল বহুক্লেশে বিনতা ধরণী
যেন দৈন্য-জর্জ্জরিতা বিষাদ-বরণী
দুঃখনতা অশ্রুময়ী ক্ষুব্ধা ভিখারিণী।

সহসা ভেদিয়া এই বরষা-যামিনী
দেখা দিল জ্বলজ্বল্ প্রচণ্ড তপন
দুর্দ্দান্ত আঁধারজয়ী : মেঘ-আবরণ
ছিঁড়ে গেল, দূরে গেল। সোনার আলোক
ধরারে চুম্বন দিল ; চঞ্চল পুলক
অঙ্গে তার শিহরিল। ক্রমে সেই আলো
রূপার আলোক হ'য়ে সর্ব্বত্র বিলালো
সঞ্জীবন তপ্তস্নেহ। ধরণী তাহারে
অঙ্গে অঙ্গে মেখে নিয়ে অন্তর-আগারে
টানিয়া শুষিয়া লয়। সে আলোক যেন
দীপ্তময় বিশ্বপ্রাণ ; দৃপ্ত প্রাণ হেন
স্পর্শ দিল ধরণীর ব্যথা-গ্রস্ত প্রাণে ;
ধরায় চেতনা এল সে পরশ-পানে।
জীবন-পরশে সেই জিয়াইয়া ধরা—
সে পরশ হাস্যময় তৃপ্তিসুখভরা।
তৃণদলে গাছে-গাছে পাতায়-পাতায়
গৃহের প্রাচীরে ছাদে, মন্দির-চূড়ায়
অসীম আরামে পিয়ে এই রৌদ্ররস ;
ধরণীর কর্দ্দমাক্ত শরীর বিবশ
অপূর্ব্ব আবেশে কাঁপে !

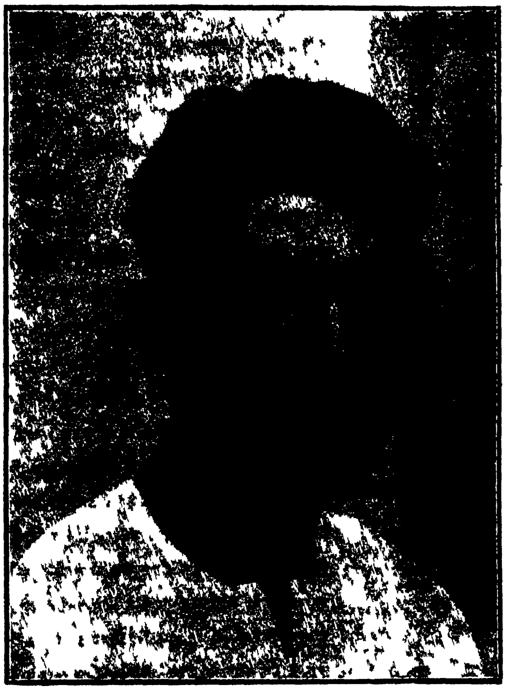
করি অনুভব—
তপনের তপ্ত স্নেহ তৃণ, তরু সব
করে পান, পায় বল, হর্ষে-মাতোয়ারা !
রৌদ্র আজি আনন্দের জীবন্ত ফোয়ারা !

বর্ষামুক্তা রৌদ্রতপ্তা রৌদ্রতৃপ্তা দেশ
জীবনে আনন্দে হাস্যে ধরে ফুল্লবেশ !

উড্‌কাট্‌ ও শিল্পী নরেন্দ্রকেশরী

শ্রীগোপাললাল সান্যাল

আপাত-দৃষ্টিতে যা সুন্দর, শোভন ও সহজ, প্রকৃতপক্ষে তাহা সাধন করা যে অত্যন্ত কষ্টকর হইতে পারে তাহার নজীর দেখাইতে অধিক দূর যাইবার প্রয়োজন নাই। ছবি আমাদের খুব ভাল লাগে, ভাল ছবির রং, তার প্রতিটী রেখা আমাদের নয়নে আনন্দ দান করে। কিন্তু একখানি ছবি আঁকিতে শিল্পীকে যে কিরূপ প্রয়াস করিতে হয়, তাহার কতটুকু বা আমরা জানিতে চেষ্টা করি? বিশেষতঃ শিল্প সাধনার পথও নির্দ্দিষ্ট নয়, ইহার রীতি নীতি নিয়তই পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে। এরূপ নিয়ত

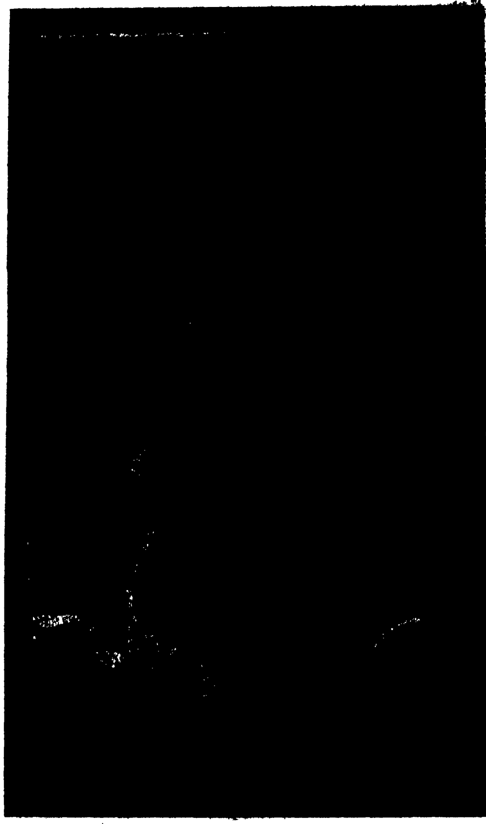


শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

পরিবর্ত্তনশীল উচ্চাঙ্গের শিল্প সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করা সত্যই ভাগ্যের কথা।

শিল্পী নরেন্দ্রকেশরী এইরূপ ভাগ্যবান ব্যক্তি। তিনি শিল্পের যে শাখায় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—তাহাকে চলতি ভাষায় "উড্‌কাট্‌" বা "কাঠখোদাই শিল্প" বলা চলে। এই নাম দেখিয়া মনে হয় শিল্প সাধনার এ পথ অতি পুরাতন—কাঠে ছবি খোদাই করার কথা কে না শুনিয়াছে? —ইহা যে আমাদের দেশে প্রাচীন মন্দির-গাত্রেও দেখা যায়, তাহা কে না জানে? আর কাঠ খোদাই করিয়া পুস্তকে ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি করা—তাহাও নূতন নয়। বটতলার এক পয়সার ছড়ার বই হইতে রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত সকল প্রকার গ্রন্থেই কাঠের খোদাই চিত্রের বহু [illegible] মেলে।

কিন্তু বটতলার সেই সকল চিত্রের সহিত আধুনিক চিত্রশিল্পী নরেন্দ্র-



রাগিণী. (রঙ্গীন-উড্‌কাটের একবর্ণ প্রতিলিপি)

শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

কেশরীর চিত্রের তুলনা করা চলে না—যদিও উভয় চিত্রের প্রকাশভঙ্গী মূলতঃ এক।

এই অতি-পুরাতন বটতলার চিত্রপদ্ধতিকে নরেন্দ্রকেশরী [illegible] শিল্পাঙ্কনের পথ রূপে নির্দ্ধারণ করিয়া আমাদের বিস্ময় ও [illegible] অর্জ্জ



ইপুরে ডাকবাংলা (উড্‌কাট্‌) শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়



পোর্ট্রেট (উড্‌কাট্‌) শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

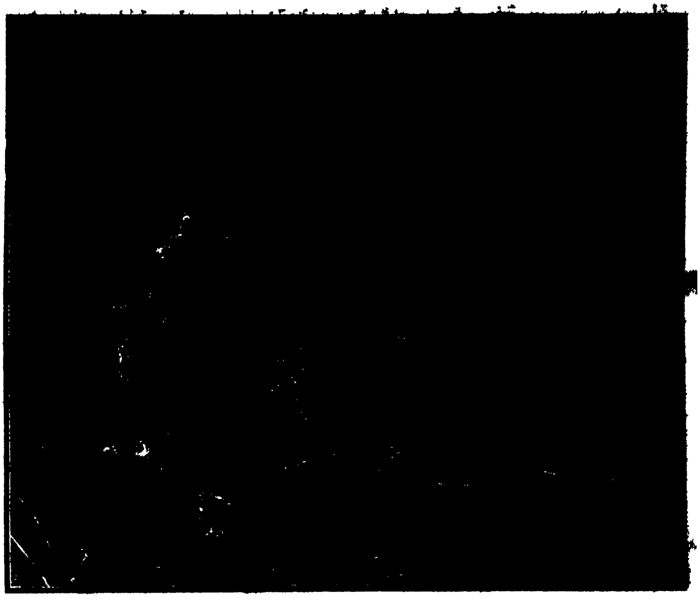
করিয়াছেন। ইঁহার প্রতি চিত্রের প্রতিটী রেখা যেন সজীব, কাঠের উপর এক একটা লাইন টানিয়া ইনি যেন এক একটা সঙ্গীতের রেশ দিয়াছেন। এই সঙ্গে যে চিত্র কয়খানি দেওয়া হইল তাহা হইতে পুরাতন শিল্পনীতির মধ্যেও নরেন্দ্রকেশরীর আধুনিক মন ও অতি আধুনিক প্রকাশ ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। কাঠের উপর খোদাই করাটাই বড় কাজ নয়। যদি তাহা হইত, তবে দেশের সূত্রধরগণই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিল্পী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। শিল্পীর মন ও দৃষ্টি লইয়া যিনি এই উড্‌কাট্‌ শিল্প সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্যই নরেন্দ্রকেশরী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

অতি বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রকেশরীর অন্তরে শিল্প শক্তির স্ফূরণ হয়। খুলনা জেলার বালি-খোলা-খালিসপুর গ্রামে ইঁহাদের নিবাস। বাল্য কালে গ্রাম্য বিভালয়ে পাঠকালেই ইনি ড্রয়িং ও চিত্রাঙ্কনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং উচ্চ বিভালয়ের পাঠ শেষ করিয়াই কলিকাতা চৌরঙ্গী রোডস্থিত গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসএ প্রবেশ করেন। এখানে প্রথম বৎসরেই ইনি নিজ শিল্পবিভাগে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তজ্জন্য তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় মাত্র দুই এক বৎসরের বেতন দিতে হইয়াছে, অবশিষ্ট কয়েক বৎসর স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ফ্রি শিপ দান করেন। ১৯২৮ সালে বাঙ্গলার সুযোগ্য শিল্পসাধক মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিল্পবিভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জ্জন করিয়া আসেন এবং বাঙ্গলায় গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তদবধি তিনি ছাত্রদের শিল্প চর্চ্চায় উৎসাহ দানের জন্য প্রতি বৎসর বড় দিনের ছুটীতে একাকী বিশেষ করিয়া ছাত্রদের শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। শিল্পী নরেন্দ্রকেশরী প্রথমাবধি এই প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করেন এবং প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন শিল্প প্রতি যোগিতায় কোনও না কোনও পারিতোষিক অর্জ্জন করেন। এই সকল প্রদর্শনীতে তাঁহার কয়েকখানি চিত্র উচ্চমূল্যে বিক্রীতও হয়। গত ১৯৩৩।৩৪ সালে কলিকাতা যাদুঘরে যে বিরাট "নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনী" হয় তাহাতেও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কেশরীর চিত্রাবলী সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ

করে এবং কয়েকখানি চিত্র উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়। ইহা ব্যতীত ইহার চিত্রাবলী ইতিমধ্যেই বহু সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত ও উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে।

মাত্র গত বৎসর (১৯৩৩) নরেন্দ্রকেশরী গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এখনো তিনি ছাত্র বলিলেই চলে। কিন্তু এই ছাত্রাবস্থায়ই ইনি শিল্প জগতে যে খ্যাতি ও প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ছাত্র কেন অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষকের ভাগ্যেও জুটিয়া থাকে।

মাত্র সাধারণ উড্‌কাট্‌ চিত্রেই যে নরেন্দ্র-কেশরী পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন তাহা নয়—তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব হইতেছে রঙ্গীন উড্‌কাট্‌ চিত্রে। জাপানী শিল্পীগণই বিশ্বের শিল্পজগতে রঙ্গীন উড্‌কাট্‌ চিত্রে জ্ঞানী ও গুণী বলিয়া পরিগণিত আছেন। এমন কি—ইংলণ্ড আমেরিকা ও ইয়োরোপের অন্যান্য শিল্প কেন্দ্র হইতে এই রঙ্গীন কাঠ খোদাই চিত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য



গিনিপিগ (উড্‌কাট্‌) শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়



একটী কুঁজো (উড্‌কাট্‌) শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়



একটী পাখী (রঙ্গীন উড্‌কাট্‌).
শিল্পী—শ্রীনরেন্দ্রকেশরী রায়

এখনো জাপানের শিল্পীদের নিকটেই ছাত্র পাঠান হইয়া থাকে এবং তাঁহারা যতটুকু শিক্ষা দান করেন তাহাই নত মস্তকে গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণ স্বদেশে শিল্পীশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হন। কিন্তু আশ্চর্য্য ও গৌরবের বিষয় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকেশরী মাত্র নিজ অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় এই শিল্প অর্জন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন।

এই রঙীন উড্‌কাট্ শিল্প আমাদের দেশে একেবারেই নূতন, এইজন্ত ইহার শিক্ষাদান ব্যবস্থা বাঙ্গলার আর্ট স্কুলে বা ভারতের অন্ত কোনও শিল্প বিদ্যালয়েও নাই। শিল্পী নরেন্দ্রকেশরী মাত্র আত্মচেষ্টায় ইহা আয়ত্ত করিয়াছেন। তাঁহার "রাগিণী" ও "একটা পাখী" চিত্র দুইখানি এইরূপ রঙীন উড্‌কাট্ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার প্রথমটী সাত রঙের ও দ্বিতীয়টী পাঁচ রঙের ছবি। রঙীন উডকাটের প্রধান বিশেষত্ব হইল এই যে, ইহার প্রত্যেকটা রঙ স্পষ্ট হইয়া ধরা দেয়। তাছাড়া হাতে খোদাই চিত্র ও যন্ত্রে তৈয়ারী ব্লকের পার্থক্য ত আছেই। গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টস্-এ তাঁহার এই রঙীন উডকাট্ ও সাধারণ উডকাট্ চিত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভের জন্ত তিনি "বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্পেশাল স্কলারশিপ" দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

উডকাট্ চিত্রাবলীর উৎকর্ষের প্রতি অতি সম্প্রতি বিদ্বজ্জন ও ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। এইজন্ত ইহার ভবিষ্যৎ সমধিক উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ যাহাকে আমরা "কমার্সিয়াল আর্ট" বলি, সেই সকল বিজ্ঞাপন চিত্রাবলীতেও আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহে উডকাটের সমধিক প্রচলন দেখা যাইতেছে। ইহা ব্যতীত সকল প্রকার পুস্তিকাতেও এইরূপ চিত্রের খুব আদর হইতেছে। আজকাল শিল্পীদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে "বিজ্ঞাপন চিত্র" অঙ্কন ব্যতীত গত্যন্তর নাই বলিলেই চলে এবং এই জন্তই উডকাট্ শিল্প ও শিল্পীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। আমরা আশা করি তরুণ শিল্প-সাধক নরেন্দ্রকেশরী এই নূতন পথে সমধিক সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন শিল্পী-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিবে তাঁহারা উডকাট্ শিল্পে এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া একাধারে খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

আমি যখন থাকিব না

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি

গানটা থামিতেই কমলেশ বলিল, না, মাথাটা যেন একটু ধরিয়াছে।

অর্গানের সম্মুখস্থ আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া শোভা তাহার ডান হাতখানা কমলেশের কপালে চাপিয়া ধরিল।

শোভা তন্বী, তরুণী। যৌবন তাহার অমলিন বিকচ পুষ্পহার তাহার দেহে দোলাইয়া দিয়াছে। সে সুন্দরী—সে সুকণ্ঠী, সে শিক্ষিতা। আজ চারি বৎসর তাহার কমলেশের সহিত বিবাহ হইয়াছে। তাহাদের মাত্র একটি শিশু পুত্র; মাস ছয়েকের।

কক্ষে আর কেহ নাই। সুসজ্জিত কক্ষ; আসবাব-পত্র খুব দামী না হইলেও সুশোভন ও যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট। শুধু সংস্কারের জন্তই কক্ষটি অপূর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। কমলেশ ও শোভা উভয়েই সৌখীন; তাই বলিয়া অমিতব্যয়িতা তাহাদের নাই। আর উভয়েই উভয়কে পাইয়া সুখী হইয়াছে।

শোভা বলিল, কই, মাথা তো গরম হয় নাই—এটা মহাশয়ের সেই পূর্ব্বতন কৌশল মাত্র।

দুই হাতে শোভার দেহলতা আঁকড়িয়া ধরিয়া কমলেশ বলিল, না শোভনমণি! এটা চুমু পাইবার লোভ নয়। কয়েক দিন হইতে আমার মনে হয় যেন আমার একটা অসুখ বিসুখ হইবে।

শোভার মুখখানা ভার হইল। বলিল, তুমি কেবল অই কথাই ভাবিবে তা' মনে হইবে না! মনের আর দোষ কি?

শোভার গালের উপর গাল রাখিয়া কমলেশ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। পরে বলিল, তা' নয় মণি! আমি তো ভাবি না, কে যেন ভাবায়। মনে হয়,—মনে হয়—কথাটা বলিতে বলিতে কমলেশ থামিয়া গেল।

শোভা বলিল, থামিলে যে বড়? কি মনে হয়?

কমলেশ বলিল, না—তা' বলা ভাল নয়—তুমি মনে কষ্ট পাইবে।

শোভার জেদ আরো বাড়িয়া গেল। বলিল, বলিতেই হইবে—বলিবে না?

কমলেশ কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। লাবণ্যে ঢলঢল একখানি সুন্দর মুখ—যেন সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। চাহিয়া আশা মিটে না। অস্তমান সূর্য্যের রশ্মি আসিয়া মুখের উপর পড়িয়াছে। সীমন্তে

সিন্দূর-বিন্দু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। সুমার্জ্জিত ও সুবিন্যস্ত কেশদাম; চক্ষু স্থির—দৃষ্টি প্রশান্ত, গভীর—মাদকতাপূর্ণ।

কমলেশ শোভাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিল। শোভা কিন্তু ভুলিল না। বলিল, কি ভাব, বল দেখি?

কমলেশ কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, হাঁ শোভা, তুমি পরজন্ম মান?

শোভা বলিল, মানি।

'কেন মান?'

'পূর্ব্বজন্ম মানি বলিয়া।'

'আর পূর্ব্বজন্ম মান কেন?'

'পরজন্ম মানি বলিয়া।'

কমলেশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, এ তো বড় সুন্দর কথা। ইহার চাইতে বল, জগতে যত কিছু কথা আছে সকলই আমি মানি; আর একটা মানি বলিয়া অন্যটাও মানিতে হয়।

শোভা হাসিল না। বলিল, হঠাৎ এত পরজন্ম পূর্ব্বজন্মের কথা কেন?

কমলেশ বলিল, হঠাৎ নয়। আজ এ সম্পর্কে একখানা ভাল বই পড়িয়াছি। বইখানা ঠিক পরজন্ম সম্পর্কে নয়—দর্শনশাস্ত্রের। মোটের উপর কথা দুঃখবাদ লইয়া। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি—

বাধা দিয়া শোভা বলিল, থাক্ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সে কথা থাক্; তুমি কি ভাব বল দেখি।

কমলেশ অপ্রস্তুত হইল। বলিল, ভাবি, একটি অতি নিশ্চিত কথা।

'সেটি কি?'

'—এই ধর মৃত্যু। আমার বয়স ত্রিশ হইতে চলিল।—আর ত্রিশ বৎসর পরে যে আমি থাকিব না, এটা নিশ্চিত। বড় জোর ত্রিশ না হয় চল্লিশ।

'তা সেটা এত ভাবনার বিষয় হইল কেন? দিনের পর রাত্রি হয় আবার রাত্রির পরে দিন আসে—কথাটা নিশ্চিত। তাহা কে ভাবে?'

কমলেশ বলিল, না, ভাবি না, তবে মনে হইল, তাই বলিলাম।

শোভা মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। কমলেশ তাহাকে আবার জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইল—বুকের অতি নিকটে টানিয়া লইল। কিন্তু তাহার মনে হইল, এ যেন পুরানো কাপড়ে তালি দেওয়া—অর্থহীন, ভঙ্গুর। জীবনের এই অসীম শূন্যতাকে এই উন্মাদনার সূত্রে বন্ধ করিবার সাধনা মানবের অনন্ত। সীমাহীন কাল অনন্ত প্রবাহে ছুটিয়া যাইতেছে—তাহার খণ্ডমাত্র আঁকড়িয়া বিশ্ব স্থির হইতে চাহে। আর সেই খণ্ডত্বকে আপন আপন অনুভূতির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া মানব এই চিরন্তন চঞ্চলতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। এ প্রবৃত্তি যেমন অর্থহীন তেমনি হাস্যকর।

শোভার সমগ্র দেহলতাকে বুকের উপর রাখিয়া কমলেশের মনে হইল, ইহা অর্থহীন। এই প্রেম, কামনা, এই আশা, আকাঙ্ক্ষা, মান, অভিমান অর্থহীন। মানুষের মনকে আঁকড়িয়া এই যে বাঁধিয়াছে তাহাও যেন কালের মতই অনন্ত, অসীম। আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পরে সে থাকিবে না—থাকিবে এই প্রবৃত্তি আর তাহার আধার হইবে ভবিষ্যতের মানব-সম্প্রদায়।

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। ঘরে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে আবছায়া—কোণে কোণে অন্ধকার বাসা বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে। বাহিরে অদূরে নারিকেলের গাছটাও আবছায়ার মত দেখা যাইতেছে। কমলেশ শোভাকে ছাড়িয়া দিল। শোভা ততক্ষণ কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

সেই রাত্রেই কমলেশের একটু জ্বর হইল। জ্বর সামান্য, সর্দ্দি আছে। চারিদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছিল, এমন কিছু ভাবনার কথা নয়। কিন্তু শোভার মন মানিল না। ভোর না হইতেই ডাক্তারের খবর পড়িল। ডাক্তার বলিলেন, অসুখ কিছুই নয়; একদিন উপবাস ও পুরোপুরি বিশ্রাম চাই।

তাহাই ব্যবস্থা হইল। শোভা সারাটা সকাল কমলেশকে বিছানা হইতে উঠিতে দিল না! নিজে বিছানার পাশে বসিয়া বেদানার রস করিয়া খাওয়াইল; দুইবার বুকের উপর মাথা রাখিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিতে চেষ্টা পাইল। পরে খোকাকে কাছে আনিয়া বলিল, খোকন-মণি! তুমি বাবার সহিত খেলা কর—আমি কাজ সারিয়া আসি।

কমলেশ বলিল, আমি তো অনেকক্ষণ হইতেই বলিতেছি। তুমি যেন আমাকেও ছোট ছেলের মত পাইয়া বসিয়াছ। তার পর ঈষৎ আড় হইয়া খোকার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল, কি খোকন্! মা একটুকুও ভাল নয়—কেমন? বাবার সাথে খেলা করিবে—এস।

খোকা অমনি হাসিয়া উঠিল। খোকা এখন চোখে চোখ পড়িলেই হাসে।

শোভা হাসিয়া বলিল, বাপ বেটায় যুক্তি কর—যত পার। খোকন্ আমার দুষ্টু নয়—ওকে ভুলাইতে পারিবে না। শোভা চলিয়া গেল।

খোকা বেশ হাত, পা, নাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বাহিরের দিকে চাহে, কি যেন দেখিয়া হাসে; কখনো বা মুখখানা একটু ভার করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করে। আবার পরক্ষণেই কি ভাবিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া নিজের শক্তির পরীক্ষা দেয়।

কমলেশ অপলক নেত্রে তাহাই দেখিতেছিল। এই ক্ষুদ্র শিশু,—অসহায়, অবোধ। মানুষের প্রবৃত্তিকে নির্ভর করিয়াই ইহার জন্ম, তাহার ব্যপদেশেই ইহার পরিপুষ্টি। মানুষ ভাবে, সে স্রষ্টা। যে ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে সে স্রষ্টা বলিয়া আপনাকে গৌরবময় করিতে চাহে সে ইচ্ছাশক্তি তো অনন্ত, অব্যক্ত। মানুষ তো তাহার আধার মাত্র। এই সৃষ্টিতে তাহার গৌরব কোথায়?

তাহার পর শৈশব, যৌবন ও জরা। সে কি মানবের করায়ত্ত? সেও তো গতিচক্র মাত্র। সেই গতিচক্রতলে মানুষ পিষ্ট হইতেছে—আবহমান কাল হইতে। তাহাতেই বা তাহার গৌরব করিবার কি আছে?

যাহা ক্ষণভঙ্গুর, তাহা সৃষ্টি করিয়া কি লাভ? আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পরে কমলেশ থাকিবে না—আজ হইতে ষাট বৎসর পরে খোকা নিশ্চিহ্ন হইবে। হয়ত রাখিয়া যাইবে তাহার আর একটি সংস্করণ। তাহার পর একটি—আরো একটি; এমন করিয়াই ধাপ চলিয়াছে! কিন্তু কমলেশের তাহাতে কি লাভ? যদি কমলেশ চিরদিন বাঁচিয়া থাকিত—যদি এই রক্ত, এই মাংস, এই মন দিয়া জগতের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা চিরদিন এমনি করিয়া অনুভব করিতে পারিত, যদি ইহার প্রত্যেকটি স্পন্দন ও প্রতিটি স্পর্শ এখনকার মত তাহার মনে ও দেহে শিহরণ ও চেতনা আনিতে পারিত, তবে তাহার লাভ ছিল। নহিলে, খোকা বাঁচিবে—তাহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া কমলেশ নিশ্চিহ্ন হইবে, খোকা যত বাড়িবে, তাহার কামনা, বেদনা ও চেতনা যত বাড়িবে কমলেশ ততই পঙ্গু ও জড় হইয়া পড়িবে—ইহাতে কি লাভ? কমলেশ খোকার মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবে না—সে রূপক চায় না; খোকার জন্মই তাহার মৃত্যুর নির্দ্দেশ ইহাই সত্য কথা।

আজ কমলেশ শোভাকে বুকে চাপিয়া যে আনন্দ পায়, ত্রিশ বৎসর পরে খোকা তাহার প্রিয়াকে বুকে লইয়া ঠিক সেই মতই আনন্দ পাইবে। কিন্তু কাহার দোষে কমলেশ সে সুখে বঞ্চিত হইবে? কেন?—কেন?

কমলেশ খোকার মুখের দিকে চাহিল। অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে মুখে কোনও চিন্তা নাই—বর্ত্তমান সম্পর্কেও সে উদাসীন। আর সুদূর ভবিষ্যতের নিশ্চিত অন্ধকারের চিন্তাও ইহাকে স্পর্শ করে নাই। অর্থহীন জড়পদার্থ—এই কি সেই অনাগত বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অধিকারী? ভবিষ্যতের সমস্ত সুখভাগী হইয়া সে আসিয়াছে; আর সেই সুখের জয়টীকা অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে কমলেশকে আপনার সমস্ত স্নেহ, অর্থ, বিত্ত নিঃশেষে দান করিয়া? এ অসহ্য—কমলেশ খোকাকে হিংসা করে—সমস্ত মন, প্রাণ দিয়া সে হিংসা করে—যতদূর পারে সে হিংসা করে। কমলেশ নিজে বাঁচিতে চাহে—অনন্ত কাল। তাহার এই যৌবনকে সে রক্ষা করিতে চাহে—অসীমতার মধ্যে। যে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে জানিয়াছে তাহাকেই বাঁচিতে দাও—নূতনের কি দরকার? কি প্রয়োজন?

কলহাস্যে শোভা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, কি গো, খোকনের মুখকমল ধ্যান হইতেছে না কি? সত্যি বল তো, খোকা দেখিতে কাহার মত হইয়াছে?

কমলেশের ধ্যান ভাঙ্গিল। ধ্যান ভাঙ্গিলে সে একান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আহা! এমন সোনার পুত্তলি নয়নমণি—তাহার সম্পর্কে কত না অলক্ষুণে কথা ভাবিয়াছে। কত তপস্যার ধন—সাত রাজার মাণিক—যুগযুগান্তের কাম্য।

পরিহাস-তরল কণ্ঠে সে বলিল, কাহার আবার? সেই রামরাখাল পতিতুণ্ডী মহাশয়ের!

চোখদুটিতে ছল-ঔৎসুক্যের পরিমাণ বাড়াইয়া একান্ত দৃষ্টিতে কমলেশের দিকে চাহিয়া শোভা বলিল, সে আবার কে গো?

'কেন জান না?'

শোভা চক্ষু তুলিল। কমলেশ বলিল, সেই যে শোভা দেবীর হইলে-হইতে-পারিত বর। সে বেচারাকে একেবারে ফাঁকি দিয়াই যে এ রত্ন লাভ করা হইয়াছে।

শোভা হাসিয়া উঠিল, বলিল, তাই বল। তাই তো খোকনের চেহারা একেবারে ময়ূরাক্ষী দেবীর মত।

'সে আবার কে?'

'ওমা, সেই যে কমলেশ বাবুর স্বপ্নলোকের মানসী প্রিয়া—যাহার জন্য দিস্তাখানেক কাগজে কবিতা পর্য্যন্ত লেখা হইয়া গিয়াছে!'

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। খোকা দেখিতে ঠিক কাহার মত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা ঠিক হইল না বটে, কিন্তু কমলেশের মনে হইল, খোকা দেখিতে ঠিক কমলেশেরই মত ত্রিংশ বয়স্ক যুবক, পাশে তাহার স্ত্রী—দেখিতে অনেকটা শোভারই মত আর তাহাদেরই সম্মুখে বর্ত্তমান কমলেশ ও শোভার কঙ্কালমূর্ত্তি! কমলেশ চক্ষু বুজিল।

সন্ধ্যার দিকে কমলেশ বলিল, শোভা, চল আমরা গ্রামের বাড়ীতে যাই। অনেক দিন সেখানে যাওয়াও হয় নাই, গ্রামও দেখা হয় নাই।

শোভা সানন্দে সম্মতি দিল। পরদিনই তাহারা দেশের দিকে রওনা হইল।

ষ্টিমারঘাট হইতে ডিঙ্গি করিয়া খাল ও নালা বাহিয়া মাইল তিনেক যাইতে হয়। সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। ভাদ্র মাসের শেষ। আমন ধানের ক্ষেতে এখনও হাত-চারি জল। জল বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধানও মাথা তুলিয়া চলিয়াছিল; সম্প্রতি ভাঁটা লাগিয়াছে; জয়ী ধান শিষ দুলাইয়া জলের বুকে এলাইয়া পড়িয়াছে। পাশে পাশেই পাটের ক্ষেত। কোনটা অর্দ্ধেক কাটা হইয়াছে—কোনটায় বা এখনও হাতই দেওয়া হয় নাই—সতেজে ও সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে।

চারি দিকে একটা বিরাট প্রশান্তি এই সজল স্নিগ্ধ শ্যামলতার মধ্যে সমাহিত হইয়া সলিলমগ্ন সমগ্র মাঠটাকে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকেই চাহিয়া দেখা যায় সে দিকেই পাট ও ধানের সারি জলের বুক অলঙ্কৃত করিয়া দাঁড়াইয়া—কোথাও জলজ গুল্ম, লতা বাসা বাঁধিয়াছে; কোথাও 'শাপ্‌লা' ফুল ফুটিয়া জলের বুক আলো করিয়া রাখিয়াছে। মাঠের এক দিকে খাল—খালের ওপারে গ্রাম—গাঢ় সবুজের টোপর পরিয়া জলের উপর মুখ জাগাইয়া রাখিয়াছে। খালের সঙ্গে মাঠের এই সম্পর্কস্রোত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের সংযোগ।

চারি দিকের এই বিশালতা ও শান্ত সমাধির মধ্যে কমলেশ ও শোভা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

কমলেশ বলিল, কেমন সুন্দর এই ধানক্ষেতের শ্যামলিমা, এই ভরপূর বর্ষার সৌন্দর্য্য! পূর্ব্ববঙ্গে না আসিলে আর এ শোভা দেখা যায় না। বর্ষার এ রূপ বিশেষ করিয়া বাল্যকালে আমার বুকে দাগ কাটিয়া দিয়াছে—কতদিন এ দৃশ্য দেখি নাই তথাপি মনে হয়, এ দৃশ্য যেন চিরপুরাতন—চিরনূতন—কতশতবার যেন মানসচক্ষে দেখিয়াছি।

তার পর একটু থামিয়া বলিল, জান শোভা, এই প... জলের গন্ধ পাইলেই আমার মনে হয়, আমি বাংলা দেশে আসিয়াছি—দেশে আসিয়াছি। তোমরা ইহাকে দুর্গন্ধ বলিয়া মনে করিলেও আমার সে দুর্গন্ধকেই অত্যন্ত আপন ও মধুর বলিয়া মনে হয়।

শোভা বলিল, সত্যি, এ সৌন্দর্য্য না দেখিলে বুঝা যায় না। তার পর খোকার দিকে চাহিয়া বলিল, কেমন খোকামণি! তাই নয়?

কমলেশ খোকার দিকে চাহিল। মনে হইল, এ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে খোকার কোনো সম্পর্ক নাই। খোকা হাসে দেখিয়া হাসাও যেমন নিরর্থক, খোকা কাঁদে দেখিয়া কাঁদাও তেমনি হাস্যকর। খোকা ক্ষণিক তৃপ্তি আনিতে পারে—যেমন আনিয়াছে এই সলিলমগ্ন ধানক্ষেত বা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি। কিন্তু কমলেশকে বাদ দিলে যেমন পারিপার্শ্বিকের কোনো মূল্য নাই, তেমনি তাহাকে বাদ দিয়া খোকারও কোনো মূল্য নাই।

শোভা বলিল, কিগো কবি, খোকার এখনও একটা নাম রাখিলে না?

খোকা! খোকা! কমলেশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। খোকা ছাড়া কি শোভার কথা নাই? খোকা ছাড়া কি তাহার অস্তিত্ব নাই? সৃষ্টি কি স্রষ্টাকে উল্লঙ্ঘন

করিয়া চলিয়া গেল? ক্ষুদ্র নারী—দুর্ব্বল নারী নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়া খোকাকে জিয়াইয়া রাখিতে চায়—কেন?—কিসের জন্য? সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্য্য কি আসিয়া এই ক্ষুদ্র শিশুর মুখেই জমাট বাঁধিয়াছে? এ অসহ্য। এ দাসত্ব অপরিমেয়—অশোভন!

মনে হইল, খোকার নামকরণ করে, কমলেশের যম। খোকাই কমলেশকে হত্যা করিবে! শোভার কাছে তাহার তো অর্দ্ধসমাপ্তিই হইয়াছে; বাকি আছে বাহিরের জগৎ। সেখানেও হয়ত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে—সে যাহাদের কাছে 'কমলেশ' ছিল, এখন তাহাদের কাহারও কাহারও কাছে 'খোকার বাপ' হইয়াছে। ক্রমে বাপের বিলুপ্তি হইয়া খোকা বাঁচিয়া থাকিবে।

কমলেশ চুপ করিয়া রহিল।

বাড়ী আসিয়া কমলেশ আরো বিব্রত হইয়া পড়িল। কাকা তাহার ভুগিয়া ভুগিয়া এখন প্রায় শেষ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; এখন একদিন সরিয়া পড়িলেই হয়। কষ্ট তাঁহার অপরিসীম—সারা দিন ও রাত্রি বিছানায় পড়িয়া কাতরোক্তি করেন। বিধবা কন্যা ও পুত্রবধূ পালা করিয়া সেবা করে। এমন রোগীর একটানা সেবা করা তো সহজ কথা নয়—নিত্য করিতে করিতে তাহারাও প্রায় শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছে। ফলে, রোগীর শেষ হইতে বাকি থাকিয়া সেবাকারীদের ধৈর্য্য নিঃশেষ হইলে যাহা হইবার হয়, তাহাই হইতেছে।

কমলেশ আসিয়া কাকার শয্যাপার্শ্বে বসিল; বলিল, কাকা, এখন কেমন আছেন?

অব্যক্ত একটা কাতরোক্তি করিয়া কাকা বলিলেন, আর থাকা, এখন যত তাড়াতাড়ি যাই, ততই মঙ্গল।

তাঁহার দেহের দিকে চাহিলে এ কথার প্রতিবাদ করা চলে না। নিম্নভাগ অত্যন্ত ফুলিয়া গিয়াছে—সমস্ত শরীর অসাড়। উঠাইলে উঠিতে পারেন, নচেৎ পড়িয়া থাকিতে হয়। মথাবয়ব বিকৃত, রক্তশূন্য। উদরে জল জমিয়াছিল—এখন কমিয়াছে বটে তবে উহা এখনও অস্বাভাবিক স্ফীত। চোখের জ্যোতিঃ মলিন, নিষ্প্রভ।

কমলেশ কথা কহিল না। কহিবারও কিছু ছিল না। কিন্তু কাকা বলিয়াই চলিলেন, তা বাবা আসিয়াছ, সুখী হইলাম। শ্রীমানরা তো আর কাছ দিয়াও যান না।

কাকার দুই ছেলে—উভয়েই সাবালক ও বাটীতেই আছে।

কমলেশ সচকিত হইল। বলিল, আসে না? কেন আসে না?

কাকা বলিলেন, বাবা, এই তো গতি। কালের ধর্ম্ম। জরাকে সকলেই ভয় করে—তা' সে বাপেরই হউক আর রাস্তার ভিখারীরই হউক। আর যৌবনকে সবাই শ্রদ্ধা করে—ভালোবাসে, সে যাহারই হউক। বৃদ্ধ পিতা অপেক্ষা সঙ্গী হিসাবে অপরিচিত যুবকও অনেক প্রিয়।

কমলেশ অতর্কিতে বলিল, আজ্ঞে, তাই বলিয়া—

বাধা দিয়া কাকা বলিলেন, কিছু নয় বাবা, কিছু নয়। পুরু যযাতির গল্প জানো তো? তুমি কি মনে কর সত্য সত্যই পুরু যযাতিকে যৌবন দান করিয়াছিল? সে কথা সত্য নয়। যযাতির মর্ম্মবেদনা যে এই জগতের মানব সমাজের চিরন্তন মর্ম্মকথা। আমি আজ ভুগিতেছি, কাল ভুগিবে আমার ছেলে! ছেলে ছোট ছিল, বুকে নিয়া শান্তি পাইতাম। একটু বড় হইল, মাথায়-দেহে হাত বুলাইয়া চুমু খাইতাম। মনে হইত, আমারই দেহ, মন, প্রাণ ও শক্তি। তার পর? ছেলের দেহে আসিল যৌবন আর আমার দেহে আসিল জরা। সেইখানেই আরম্ভ হইল প্রভেদ, বিবর্ত্তন। যতদিন শক্তি ছিল ততদিন সকলেই আপন ছিল—তার পর?

কমলেশের মন দুলিয়া উঠিল। তাই তো, কথাগুলি তো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মনে হইল, আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পরে এমনই একদিন—হয়ত এমনই অবস্থায়, কি ইহার চাইতেও অসহায় অবস্থায়—

ঝি আসিয়া বলিল, মা ডাকিতেছে। অনিচ্ছায় উঠিয়া যাইতে হইল।

দেখা হইতেই শোভা বলিল, মাগো মা, বাড়ীটা বড় নোংরা। তাহার উপর আবার অসুখ বিসুখ। খোকার শরীর এখানে কিছুতেই ভাল টিকিবে না। আমি বলি—বলিয়া কমলেশের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, শুনিতেছ?

কমলেশ স্তব্ধ হইয়া ছিল, বলিল, হুঁ।

আরো কাছে আসিয়া শোভা কমলেশের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কমলেশের মুখের উপর চোখ দুটি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, আমি বলি কি, এখান থেকে চল যাই। কয়েক দিন

না হয় পাহাড়েই কাটাইয়া আসি। এ সময়টা না কি সেখানে ভাল—খোকার শরীরও ভাল হইবে।

কমলেশের চক্ষু একবার জ্বলিয়া উঠিল। শোভা তাহা লক্ষ্য করিল না। বলিল, কি গো, বড় চুপ করিয়া যে আছ? বল না?

কমলেশ বলিল, কাকাবাবুর অবস্থাটা দেখিয়া মনটা বড় ভাল নাই।

শোভা বলিল, সত্যি—বড়ই ভুগিতেছেন। কষ্ট আর দেখা যায় না। আবার থামিয়া বলিল, তাই তো বলি, ছেলে পেলে নিয়ে এখানে থাকা ভাল নয়—রোগ তো ছোঁয়াচেও হইতে পারে। খোকার তো—

কমলেশের কানে কিছুই যাইতেছিল না। তাহার মন এখন সুদূর ভবিষ্যতের দেশে চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যু নিশ্চিত—জরা নিশ্চিত কি না সে জানে না। আজ হইতে ত্রিশ বৎসর—তার পর? অসীম শূন্য?—অনন্ত অন্ধকার? অখণ্ড নিস্তব্ধতা? খোকা—খোকা—খোকা—হায় অন্ধ নারী!

* * * *

পাহাড়ে আসা হইয়াছে। চারি দিকে প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিন কয়েক শোভা ও কমলেশ নিজেদের হারাইয়া ফেলিয়াছে। এক দিকে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, অন্য দিকে পাহাড়ের শ্যামল মূর্ত্তি ও অদূরের শুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা মনের অবসাদকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তথাপি মাঝে মাঝে কমলেশের মনে আসে কাকার সেই কথাগুলি; আর তাল পাকাইয়া আসে ত্রিশ বৎসর পরের কথা। বুকটা কখনো ছ্যাঁৎ করিয়া উঠে।

বেলা নয়টা। কমলেশ একা একাই বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। শোভা আজ আসে নাই। কমলেশ ষ্টেসনে আসিয়া বসিয়া ছিল। ডাক গাড়ী আসিবার সামান্য বিলম্ব আছে—ষ্টেসনে এখনও লোকচলাচল বেশী আরম্ভ হয় নাই।

দেওয়ালে আঁটা টাইমটেবল ও পাব্লিসিটি বিভাগের চিত্র। কোনটি দিল্লীর জুম্মা মসজিদের—কোনটি শিলং পাহাড়ের গল্ফখেলার—কোনটি বা পুরীর তীর্থ যাত্রীর। কমলেশের চক্ষু এক জায়গায় আট্‌কাইয়া গেল। ছবিটি একটি সতর্কতার বিবরণ।

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে কয়লা জ্বালাইয়া শয়ন করিলে যে মৃত্যু অনিবার্য্য এইটুকু সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য চিত্রটি অঙ্কিত করা হইয়াছে। চিত্রটির তিনটি স্তর। প্রথমে একটি লোক ঘরের ভিতর কয়লা জ্বালিয়া, সুচারুরূপে বিছানা পাতিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। দ্বিতীয়ে, পরদিন সকালে তাহাকে উঠিতে না দেখিয়া বাহিরের লোকজন আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে—ঘরের সম্মুখে লোকে লোকারণ্য—ডাক্তার আসিয়া নাড়ী ও বুক পরীক্ষা করিতেছেন।

তৃতীয় পর্য্যায়ে, তাহার চরম গতি হইয়া গিয়াছে। নগ্নদেহী চারিজন লোক তাহাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া খাটুলিতে বাহিয়া শ্মশানে লইয়া চলিয়াছে—পিছনে প্রতিবেশী ও আত্মীয়বর্গ—স্ত্রীলোক ও পুরুষ; সকলে মিলিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

কমলেশ একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল, কয়লা জ্বালাইয়া লোকটা হয়ত বিশ বৎসর আগাইয়া গিয়াছে। না জ্বালাইলেই বা কি হইত? আরো বিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিত—তার পর? সেই খাটুলি—সেই কান্না—সেই শেষশয্যা—সেই সবই তো?

কমলেশ ঊর্দ্ধে চাহিল। মেঘের স্তর সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে; সূর্য্যোজ্জ্বল প্রভাত—অদূরের বাঁকের উপর বৃক্ষরাজি শ্যামলিমায় প্রফুল্ল।

এই বিশ্ব, অনন্ত সৌন্দর্য্য মণ্ডিত, শোভায় ঝলমল—বিপুল তাহার ঐশ্বর্য্য। আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পরেও এ সকলই থাকিবে। এই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ, বাতাসের এই মদির স্পর্শ, এই পাহাড়—এই গৃহ—এই শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পত্র, স্থাবর, জঙ্গম, নদ, নদী সকলই থাকিবে—থাকিবে না কেবল কমলেশ! কমলেশ নিশ্চিহ্ন হইবে—বাঁচিয়া থাকিবে খোকা—বাঁচিয়া থাকিবে শোভা—বাঁচিয়া থাকিবে সমগ্র বিশ্ব। কমলেশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে কোথায়? হয়ত অনন্তে বর্ষার ঝড়ের মত সকলের রুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য মাথা কুটিবে—হয়ত নিরবয়ব নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়ের মত পূর্ব্বস্মৃতির দহনে জ্বলিয়া মরিবে—কোথায় যাইবে সে—কোথায়? এই বাতাসের মদির স্পর্শ যেখানে নাই—এই পুষ্পের সৌরভ যেখানে লুপ্ত—এই আলোকের উৎস যেখানে ব্যাহত—একক, অসহায়।

দূরে দুইটী পাহাড়ী যুবক, যুবতী হাস্য পরিহাস করিয়া যাইতেছিল। কমলেশ চাহিয়া রহিল, ইচ্ছা হইল, ডাকিয়া বলে, বেকুব, কিসের এই হাসি? আজ হইতে ত্রিশ বৎসর পরে যে নিশ্চিহ্ন হইবে তাহা মনে নাই? মনে হইল, ঐ পাব্‌লিসিটির চিত্রটীর মত একটী চিত্র আঁকিয়া সকলকে বিলাইয়া দেয়। তাহাতে থাকিবে মানবের এই নিশ্চিহ্নতার ইতিহাস, আর নীচে লেখা থাকিবে, ত্রিশ বৎসর পরে।

চমক ভাঙ্গিল। ডাক্তার যোগেশবাবু বলিতেছেন, কি কমলেশবাবু, পাহাড়ে আসিয়া কবিতা লিখিবেন না কি? আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখিয়াছেন—আকাশ বড় পরিষ্কার।

কমলেশের চমক ভাঙ্গিল বটে কিন্তু চিন্তার জাল ছিন্ন হইল না। বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনাদের সেই গ্লাণ্ড ট্রিটমেন্টএর খবর কি?—সেই 'ভোরোনফ' সাহেবের—ভারতবর্ষে কয়জন এ পর্য্যন্ত তাহা করিয়াছে?

ডাক্তারবাবু অবাক হইলেন। বলিলেন, কয়জন যে এ পর্য্যন্ত এই চিকিৎসা করাইয়াছে তাহা তো ঠিক জানি না, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত একজন। এখন পর্য্যন্ত ও যে ব্যয়সাধ্য—সাধারণ লোক কি আর তাহা করিতে পারে?

কমলেশ বলিল, আচ্ছা ব্যাপারটা কি হয়?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আমাদের Thyroid glandএর দুর্ব্বলতার জন্যই না কি জরা আসে; ইহাই শারীরতত্ত্ববিদ্‌দিগের অভিমত। সেই glandকে শক্তিদানই এই চিকিৎসার মূলতত্ত্ব।

বাধা দিয়া কমলেশ বলিল, একবার gland treatmentএ কত বৎসর পর্য্যন্ত চলে? কমলেশ এমন জোরে ও ঔৎসুক্য সহকারে এই কথা কয়টি বলিল যেন একমাত্র ইহার উপরেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, চলে প্রায় বিশ বৎসর।

'তার পর কি আর কোনো পরিবর্ত্তন চলে না?'

'চলে, কিন্তু কাজ হয় না।'

কমলেশ বলিল, মাত্র বিশ বৎসর। তাহার অদম্য ঔৎসুক্য যেন এক নিমেষে জল হইয়া গেল। এই অসীম কালস্রোতে বিশ বৎসর কতটুকু? কমলেশ উদ্‌ভ্রান্তের মত অযথা চঞ্চল চরণে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবু তাহার গমন-পথের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

না, অসম্ভব। মাত্র বিশ বৎসর। মানুষ চাহে, অনন্ত যৌবন, অসীম আয়ু। তাহার কাছে বিশ বৎসর সামান্য, তুচ্ছ। আজ হইতে ত্রিশ না হউক পঞ্চাশ বৎসর পরে মৃত্যু নিশ্চিত। সমস্ত জগৎ বাঁচিয়া থাকিবে এমনি ভাবে আর চলিয়া যাইবে একজন। এই প্রেম, এই শান্তি ও সমৃদ্ধি ছাড়িয়া—কোথায়? কোন্ লোকে?

সারা দিন কমলেশ চঞ্চল হইয়া ফিরিল। শোভা কিছু বুঝিল না।

রাত্রে তাহার ঘুম হইল না। অসম্ভব—তাহাকে বাঁচিতে হইবে—সে মরিতে পারে না—এই জগৎ যদি থাকে তবে তাহাকেও থাকিতে হইবে। সে বাঁচিবে—জরা নাই, মৃত্যু নাই, অনন্ত যৌবন লইয়া সে বাঁচিবে। কিন্তু কি করিয়া? নিশ্চিত মৃত্যুর কালো অন্ধকার তাহার লোল জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য পলকে পলকে, পদে পদে অগ্রসর হইতেছে। শত সহস্র সতর্ক বাণী মনে থাকিলেও তাহার সর্ব্বগ্রাসী আকর্ষণ হইতে নিস্তার নাই—অব্যাহতি নাই!

সে বাঁচিবে না—আর সকলে বাঁচিবে—সে অসম্ভব। সে থাকিবে না—আর সকলে থাকিবে—সে অসম্ভব। তাহার চিহ্ন না থাকিলে জগতের চিহ্নও থাকিতে পারিবে না। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, রৌদ্র সমস্ত লুপ্ত হইবে—ধূমকেতুর মত সে সকলকে পুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে। কোথায় মৃত্যু? কোথায় জীবন? কমলেশের সঙ্গে সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

কিন্তু আজই। এই মুহূর্ত্তেই। আর ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা করিয়া কি লাভ? যদি যাইতে হয় আজই সে সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবে—কমলেশ একা যাইবে না। কেহই বাঁচিতে পারিবে না—শোভাও নয়—খোকাও নয়।

ধীরে ধীরে কমলেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশেই শোভা ঘুমাইতেছে। ঘরে আলো আছে—অত্যন্ত কম করিয়া দেওয়া। কমলেশ চাহিয়া রহিল। সারা দেহে লেপ মুড়ি দিয়া শোভা ঘুমাইতেছে—পাশে খোকা। নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাইতেছে। মুখে একটা প্রশান্ত—অনন্ত নির্ভরতা। দুই একটি চুল আসিয়া কপালে ও গালে পড়িয়াছে। কমলেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

না, সে পারে না—সে কিছুই করিতে পারে না—সে দুর্ব্বল। কিন্তু তাহা হইলে তো চলে না। সমগ্র পৃথিবী

তাহার শত্রু—সে যাইবে আর পৃথিবী থাকিবে তাহা তো হইতে পারে না। চাই—একবারে সকলকে নির্ম্মূল করা।

কমলেশ ছুটিয়া বাহির হইল।

বাড়ীর সম্মুখেই ডাক্তারখানা। তখনও সেখানে আলো জ্বলিতেছে। একটা পাহাড়ী চাকর কম্বল মুড়ি দিয়া দরজার সম্মুখে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। কমলেশ তাহার কাছে যাইয়া সজোরে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ডাক্তার, ডাক্তার, এমন কোনও ঔষধ আছে—যাহাতে একবারে—একবারে সমস্ত জগৎ লুপ্ত হয়? আছে? আছে? আছে?

চাকর বেচারা হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার গা কাঁপিতেছে অস্পষ্ট স্বরে কেবল বাহির হইতেছে—'ইয়ো মান্‌ছেলাই ভূতলে সমাতেও' ইয়ো—

কমলেশ আবার ছুটিয়া বাহির হইল।

*   *   *   *

পরদিনের সংবাদ পত্রে এই খবরটি বাহির হইল।

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে দর্শনের অধ্যাপক কমলেশ মুখোপাধ্যায় একাকী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া সহসা খাদে পড়িয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ভদ্রলোক কুয়াসার জন্য রাস্তা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। শবদেহ Postmortemএর জন্য পাঠানো হইয়াছে। আমরা তাঁহার তরুণী পত্নীকে এই অসহ দুঃখে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। সান্ত্বনার বিষয় এই যে তাঁহার একটি শিশু পুত্র আছে।"

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন মিশরের দেবদেবী)

মিশর সম্বন্ধে হেরোডোটাস্ লিখে গিয়েছিলেন যে "দেবার্চ্চন বা দেবপূজায় মিশরীয়দের ন্যায় অবহিত চিত্ত আর কোনো দেশের অধিবাসীদের দেখিনি।" কথাটা খুবই সত্য। আমাদের মত তেত্রিশ কোটী দেবতার দেশ না হ'লেও মিশরে দেবদেবীর সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। অতি প্রাচীন কাল থেকেই সেখানে এই দেবদেবীর আরাধনা প্রচলিত হ'য়েছিল। এটা যে কেবল মিশরীয়দেরই একটা বিশেষত্ব ছিল এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রাচীন পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই দেবদেবীর পূজা অল্পবিস্তর প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গ্রামে এমন কি গ্রামেরও যখন পত্তন হয়নি, কেবলমাত্র এক একদল লোক এক একস্থানে বসতি সুরু করেছে তখনও তাদের মধ্যে যে দেবতার অস্তিত্ব ছিল এবং নিয়মিত পূজা হ'ত সে পরিচয় পাওয়া গেছে।

এত অসংখ্য দেবতার সৃষ্টি হ'ল কেমন ক'রে এ প্রশ্ন হয়ত' অনেক সময় অনেকের মনে হয়। তার উত্তর পাওয়া খুব কঠিন নয়। যদি আমরা মানুষের আদিম অবস্থার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো আদিম অবস্থায় মানুষ অসংখ্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত



শিশুদেবতা হোরাস্

হয়ে ঘুরে বেড়াতো, একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শেখেনি। তাদের প্রত্যেক দলের এক একজন রক্ষক-দেবতা

ছিল; তারা সেই দেবতার পূজা করতো। সে সময় তাদের মধ্যে 'উল্কী' পরাটা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সর্ব্বাঙ্গে উল্কী-চিহ্ন থাকতো। সেই উল্কী-চিহ্নের মধ্যে তারা নিজ নিজ দলের উপাস্য দেবতার মূর্ত্তিও শরীরে উৎকীর্ণ করে রাখতো। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে এর ফলে তারা সকল বিপদ হ'তে রক্ষা পাবে। এইভাবে অসংখ্য দলের মধ্যে অসংখ্য দেবতার সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর যখন তারা এক একদল এক একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রতে শিখলে তখন আবার সেই সেই পল্লীর



দেবী শেখমেট্—(অপর এক মূর্ত্তি, এঁর মস্তকে মুকুট নাই)

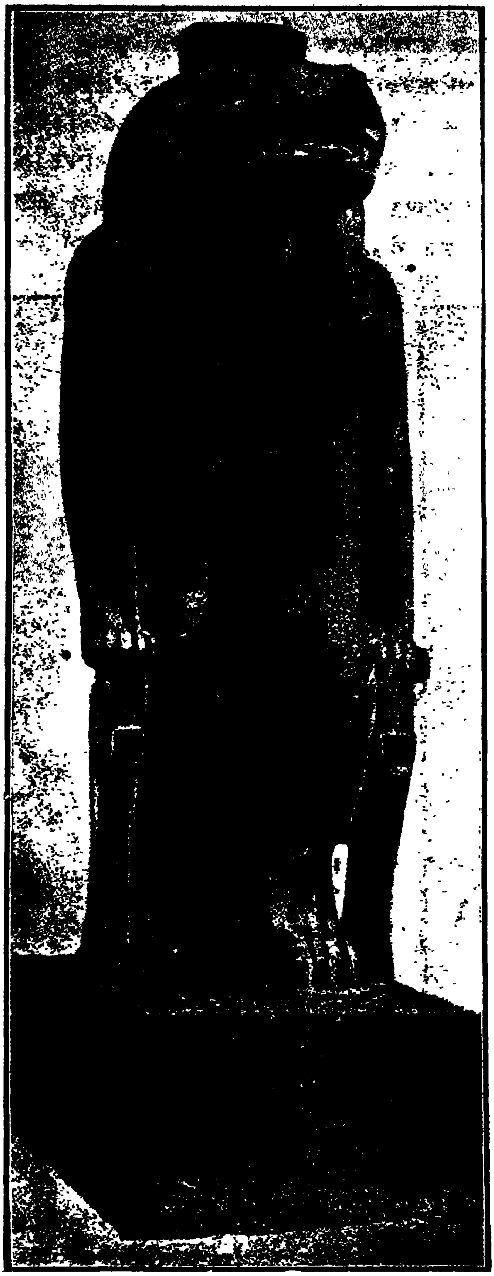
রক্ষক এক একটি গ্রাম্য দেবতার সৃষ্টি হ'ল। এইভাবে দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'তে হ'তে ক্রমে অসংখ্য দেবতার উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল।

মানুষ দেবতাকে তার কল্পলোক হ'তে সৃষ্টি ক'রলে বটে কিন্তু দেবতা হ'য়েও তাঁরা মানবধর্ম্মের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি, কারণ মানুষ, তার দেবতারও স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা সৃষ্টি ক'রে রীতিমত 'দেবপরিবার গড়ে তুললে। এই দেব-পরিবার বা দেবতাগোষ্ঠীর প্রভাব প্রতিপত্তির কাহিনী থেকেই ক্রমে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকের উৎপত্তি হয়েছে। মিশরেও প্রাচীনকালে ঠিক এইভাবেই প্রথম দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির অনুপাতে দেশ দেশান্তরে যেমন তাদের জাতীয় দেবদেবীরও রূপান্তর ঘটেছিল, মিশরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

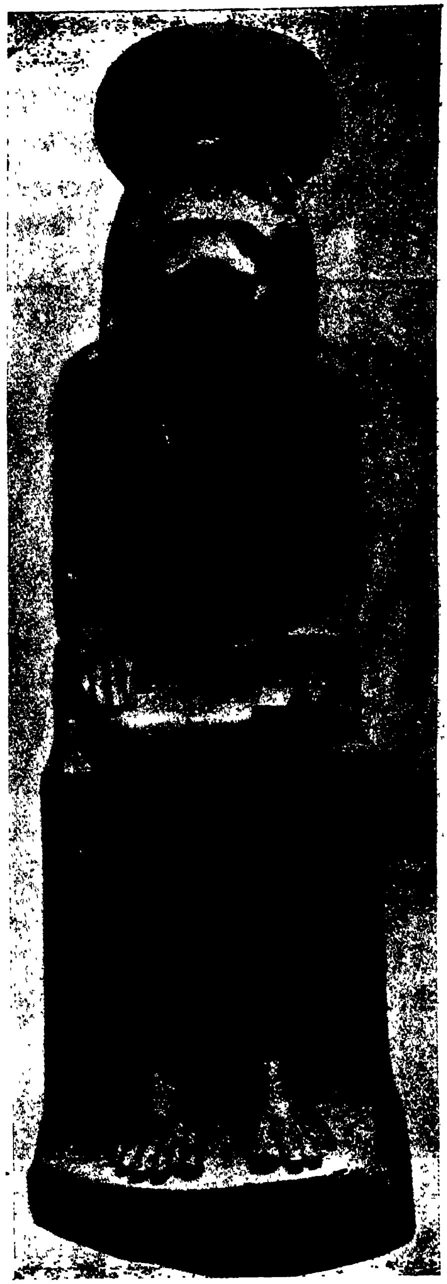


শ্যেনমুখ হোরাস্

জগতে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হবার পূর্ব্বে মানুষের দেবদেবীরা অমরত্ব অর্জ্জন ক'রতে পারেন নি। তাঁরা সে সময় সর্ব্বশক্তিমানও ছিলেন না। তাঁদের এক একজনের এক এক বিষয়ে অসাধারণ শক্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে তাঁরা মানুষের মতই দুর্ব্বল ছিলেন। এমন কি তাঁরা রোগ শোক মুক্ত বা জরামৃত্যুরও অতীত ছিলেন না। প্রাচীন পুঁথিতে এই সব দেবদেবীদের যে বর্ণনা



টাউর্ট দেবী—(জলহস্তীরূপিনী এই দেবী দেবতা শেঠের পত্নী। প্রসূতির কল্যাণে ইনি মিশরের গৃহে গৃহে পূজিতা হ'তেন। এই দেবীর কৃপায় পুত্র প্রসবে কোনো বিঘ্ন বা বিপদ ঘটে না)

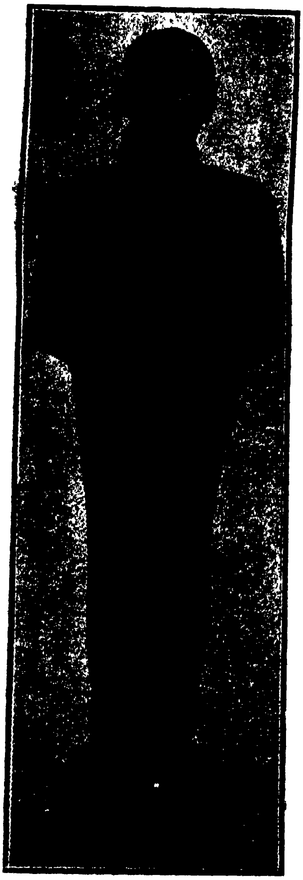


দেবী শেখমেট্—(সিংহিনীরূপিনী এই দেবী ছিলেন সূর্য্যদেবতার শক্তিস্বরূপা। এঁর মস্তকে ফণী মুকুট আছে)

পাওয়া যায় তাঁতে এমনও দেখা যায় যে তাঁরা কেউ সর্ব্বজ্ঞও নন, অন্তর্যামিও নন, এমন কি তাঁদের ভক্তেরা যদি দুবেলা নৈবেদ্য সাজিয়ে খেতে না দেন তাহ'লে তাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণাতেও কাতর হ'য়ে পড়েন।

আদিমযুগের মানুষের মধ্যে যে দেবপূজা ও ধর্ম্মাচরণ প্রচলিত ছিল তার অনেকটা সাদৃশ্য এখনও দেখতে পাওয়া যায় আফ্রিকার অসভ্য কাফ্রীদের মধ্যে। এরা আজও বর্ব্বর জাতি ব'লে পরিগণিত। এদের মধ্যে নানা অদ্ভুত অনুষ্ঠান এখনও প্রচলিত আছে। বিশেষ করে এদের মধ্যে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও স্বর্গগত আত্মার কল্যাণে যে আধিভৌতিক অনুষ্ঠান আজও প্রতিপালিত হয়, প্রাচীন মিশরের ব্যবস্থার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ঐক্য বিদ্যমান।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই দেখতে পাওয়া যায় মানুষ, শুধু দেবদেবী নয়, জীবজন্তু গাছ পাথর প্রভৃতিরও পূজা ক'রতো। প্রাকৃতিক যা কিছু তাদের বিস্মিত ভীত ও আকৃষ্ট ক'রতো তাকেই মানুষ দেবতার কোঠায় তুলে নিয়ে পূজা সুরু করে দিত। এমনি ক'রে সেদিন চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ বৃষ্টি মেঘ সমুদ্র নদী পর্ব্বত প্রভৃতিও তার কাছে দেবতার মর্য্যাদা ও পূজা পেয়ে এসেছে। জীবজন্তুর মধ্যে দেখা যায় যারা হিংস্র ভয়াবহ ও ভীষণ আকৃতির এবং



দেবতা 'পা'—(ইনি প্রাচীন মিশরে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে পূজিত হ'তেন দেবী শেখমেট ছিলেন এঁর পত্নী)



দেবতা নেফায়টেম্—(ইনি শস্য প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ জগতের দেবতা)

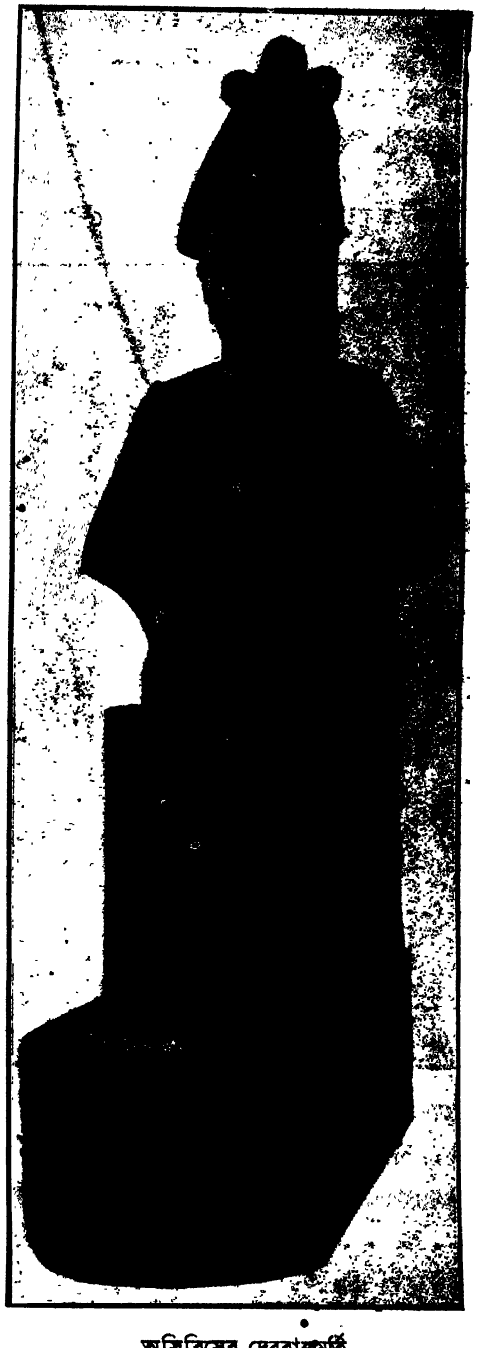


দেবতা ইম্‌হোটেপ্—(ইনি মিশরের অশ্বিনীকুমার স্বরূপ ভেষজ-লোকের দেবতা)

যে সকল জীবের সাহায্যে মানুষ উপকৃত হয়েছিল এই উভয়বিধ জীবজন্তুকেই তারা পূজা ক'রে দেবতার প্রাপ্য সম্মান অর্পণ করেছিল। জীবজন্তুর পূজা-প্রথা মানুষের ইতিহাসে যেমনি প্রাচীন তেমনি সুদীর্ঘকাল ধ'রে প্রচলিত



জননী আইসিস্—(আপন পুত্র শিশু দেবতা হোরাসকে স্তন্যপান করাচ্ছেন)



অসিরিসের দেবরাজমূর্ত্তি

ছিল। য়ুরোপে রোমানদের প্রতিপত্তির যুগেও জীবজন্তুর পূজা অনুষ্ঠিত হ'য়েছে দেখা যায়।

প্রত্যেক বিভিন্ন দলের মধ্যে এক একটা জন্তু সে সময় পূজার্হ ব'লে গণ্য হ'য়েছিল। সেই জন্তুকে অতি যত্নে লালনপালন করা হ'ত, উৎকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হ'ত, তাকে দিয়ে কোনো কাজ করানো হ'ত না, তাকে সাজিয়ে অলঙ্কার পরিয়ে মাল্য চন্দনে ভূষিত ক'রে পূজা করা হ'ত। তাকে কখনও হত্যা করা বা তার মাংস ভোজন করা



দেবরাজ অসিরিস্ ও তাঁর যুগল পত্নী—(দেবরাজ অসিরিসের প্রধানা মহিষী ছিলেন আইসিস্। পরে আইসিসের ভগ্নী দেবী নেভাত অসিরিসকে ভালবেসেছিলেন বলে উভয় ভগ্নীই তাঁর পত্নীরূপে পূজিতা হ'য়েছেন)

একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। আবার আর এক প্রকার পশু-পূজাও প্রচলিত ছিল তাতে কোনোও একটা নির্দিষ্টকালে মহাসমারোহে একটি পশুর পূজা করা হ'ত এবং পূজান্তে সেই পশুটিকে বধ ক'রে তার মাংস ভোজনের দ্বারা উক্ত ব্রতানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত করা হ'ত।

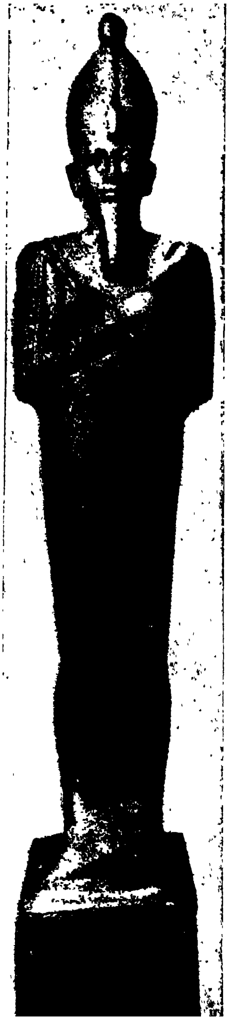
আমাদের দেশে যেমন মহাবীররূপে হনুমান, নাগদেবতা রূপে সর্প ও ভগবতী রূপে গোমাতার পূজা প্রচলিত আছে তেমনি য়ুরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য প্রদেশে প্রাচীনকালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বিড়াল বৃষ মেষ জলহস্তী শৃগাল শকুনী বাজ কুম্ভীর প্রভৃতি পশুপক্ষীর পূজা প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান যুগে আফ্রিকায় অনেক পশুপক্ষীর পূজা প্রচলিত আছে। প্রাচীন মিশরেও অসংখ্য পশু-পক্ষীর পূজা অনুষ্ঠিত হ'ত। তারপর মানুষ যখন মানবাকার দেবতার পূজা ক'রতে শিখলে তখন তারা যে যে দেশে গেল সেই সেই দেশের প্রচলিত পূজ্য



পদ্মের উপর সমাসীন দেবতা হোরাস্

পশুর সঙ্গে তাদের দেবতাকেও একাত্ম ক'রে নিলে। এমনি করে নরদেহে পশু-মুণ্ড-যুক্ত আরও অনেক দেবতার সৃষ্টি হ'ল। আমাদের দেশে যেমন বরাহ-অবতার নৃসিংহ-অবতার প্রভৃতি পশুমুণ্ডযুক্ত দেবমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় তেমনি প্রাচীন মিশরেও নানা

পশুমুণ্ডযুক্ত দেবমূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হয়েছিল প্রাচীন মিশরের সুদক্ষ মূর্ত্তি শিল্পীরা এমন নিপুণভাবে নরকলেবরে



দেবতা অসিরিস্—(ইনি স্বর্গাধিপতি দেবরাজ। মৃত্যুর পরপারে মানুষের আত্মা এঁরই আশ্রয়ে যায়)



সেবেক্ দেবতা—(এ কুম্ভীর-মুখ দেবতা হ'চ্ছেন মিশরের বরুণদেব, ইনি জলাধিপতি)



পক্ষসংযুক্ত আইসিস্ মূর্ত্তি —(ইনি এই মূর্ত্তিতে আলোক ও বাতাস সৃষ্টি করেছিলেন)

পশু-মুণ্ডের সংযোগ সাধন করেছিল যে সে মূর্ত্তিগুলির কোনোটিকেই কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা বিসদৃশ মনে হয় না। গজমুণ্ড গণেশকে দেখে যেমন আমরা একটুও বিস্মিত হইনি; বরং গণপতির ঐ মূর্ত্তিই আমাদের কাছে আজ যেমন একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে প্রাচীন মিশরের উল্লিখিত পশুমুণ্ডযুক্ত দেবমূর্ত্তিগুলিও তেমনি তাদের কাছে সেকালে সত্য হ'য়ে উঠেছিল।

কোনো কোনো অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনও একটা প্রথা প্রচলিত আছে দেখা যায় যে দেবপূজার অনুষ্ঠানে যিনি পুরোহিত হ'ন তিনি সেই দেবতার সম্পর্কিত একটি পশু-মুণ্ডের মুখোস পরিধান ক'রে দেবতার প্রতিনিধিত্ব করেন। পশুপূজার এই প্রভাব প্রাচীন মিশরে খুব বেশীরকম প্রবেশ করেছিল। তাই সেখানে "আমন" দেবতার মেষমুণ্ড, "হাথোর" ও "আইসিস্" দেবতার গোমুণ্ড, "শেখমেট" দেবতার কেশরীমুণ্ড 'বাষ্টেট্' দেব-



দেবতা আনুবীশ—(এই শৃগালমুখ দেবতা আনুবীশ সন্ধ্যার প্রতীক। ইনি যমরাজের ন্যায় মৃতের আত্মাকে বৈকুণ্ঠে বা নরকে প্রেরণ করেন)

তার মার্জ্জারমুণ্ড, 'অনুবীশের' শৃগাল মুখ, 'শেবেকের' কুম্ভীরমুণ্ড, 'হোরাস্ ও মেণ্ট্ুর' শ্যেনমুণ্ড, 'ঠোঠ্' দেবতার সারসমুখ, 'নেহেব্কার' সর্পমুখ দেখতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া প্রাচীন মিশরে প্রাকৃতিক দেবদেবীরও অভাব ছিল না। আকাশ দেবী 'নুট', ভূমি দেবতা 'গেব', শূন্য দেবতা 'ষ্যু' ও চন্দ্রাদেবী এবং সূর্য্যদেবতাও ছিলেন। প্রাচীন মিশরে সর্ব্বাগ্রে আকাশ দেবী 'নুটের' উপাসনা-বিধি প্রচলিত ছিল। আকাশ দেবী 'নুটের' নিকটে এই প্রার্থনা করা হ'ত যে "হে দেবী! তুমি আমাদের আত্মাকে



সহস্র কিরণের পূজা—(আটন দেব নামে সূর্য্য মিশরের একমাত্র দেবতা বলে ঘোষিত ও পূজিত হয়েছিলেন সম্রাট আখনাটনের শাসনকালে)

গ্রহণ কর; আমরা তোমার চরণে আত্মনিবেদন করলুম। তুমি এ আত্মাকে তোমার ধ্রুবলোকে নিয়ে যাও, তোমার আকাশে ধ্রুবতারা যেমন কোনো দিন অস্তমিত হয়না তেমনি আমার এ আত্মা যেন অবিনশ্বর হয়ে তোমার ঐ ধ্রুবলোকে চির-উজ্জ্বল হ'য়ে বিরাজ করে।"

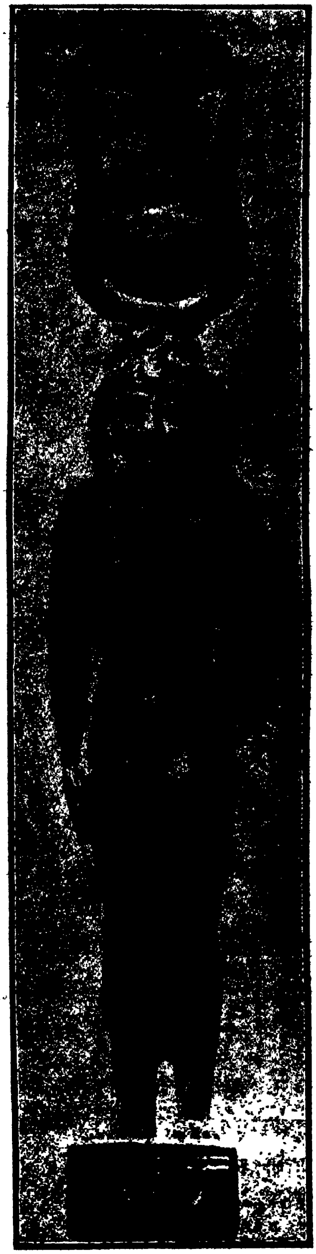
এই প্রার্থনাবাক্য আমাদের বেদমন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈদিক যুগে যেমন 'ইন্দ্র' 'আরুণী' 'পর্জ্জন্যদেব' প্রভৃতি দেবতাগণকে প্রসন্ন করবার জন্য তাদের পূজা অর্চ্চনা উপাসনা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল অথচ কোনো মূর্ত্তিপূজা ও দেব-মন্দিরের অস্তিত্ব ছিলনা, প্রাচীন মিশরেও তেমনি এই প্রাকৃতিক দেব-দেবীদেরও পূজার জন্য কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাচীন মিশরে—পশুদেবতার পরে এরাই আদি মানবাকার দেবতা। এই দেবতারাই সর্ব্বপ্রথম মিশরীয়দের কল্পনায় উদয় হয়েছিলেন।



দেবী আইসিস্—(দেবরাজ অসি-রিসের পার্শ্বে তিনি এই রাজ্ঞী মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন)



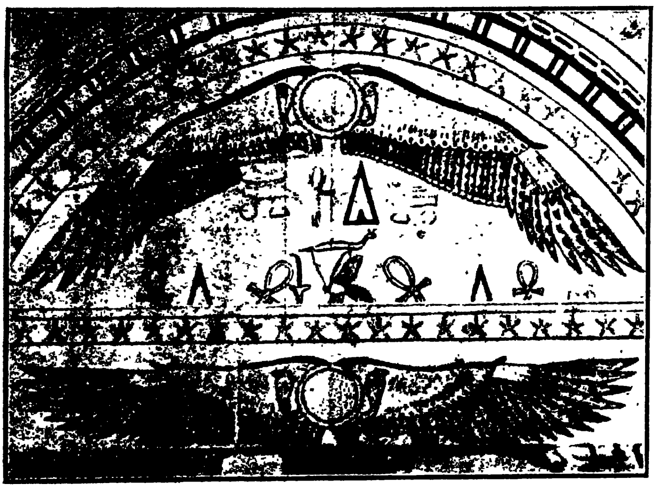
আমন্ দেবতা—(থাবসের এই আমন দেবতা পরে 'রা' দেবতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই 'আমন্ রা' মূর্ত্তিতে পূজিত হ'তেন)



দেবী আইসিস্—(চন্দ্রমুকুটধারিণী দেবী আইসিসের আর এক মূর্ত্তি)

মিশরের প্রধান দেবতাবর্গ হ'চ্ছেন 'অসিরিস্' মণ্ডলের দেব-দেবীরা। খৃঃ পূর্ব্ব আটসহস্র শতাব্দী থেকে এঁদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'অসিরিস্' মণ্ডলের দেব-দেবীরা এক একজন পূর্ব্বে মিশরীদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক ইষ্টদেবতা বা ইষ্টদেবীরূপে বিরাজ ক'রতেন। পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক পরস্পরের সঙ্গে মিলে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে পরিণত হ'তে আরম্ভ ক'রলে তখন তাদের স্ব স্ব গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক ইষ্টদেবতা ও ইষ্টদেবীও পরস্পর মিলিত হ'য়ে এক-একটি দেবতামণ্ডলীতে রূপান্তরিত হ'লেন। যেমন 'হোরাস্' ছিলেন প্রথমে একজন পূর্ণবয়স্ক দেবতা এবং "আইসিস্' ছিলেন একজন কিশোরী কুমারী দেবী। কিন্তু কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহের পর 'হোরাস্' গোষ্ঠী যখন 'আইসিশের' দলভুক্ত হ'য়ে প'ড়ল তখন 'হোরাস' রূপান্তরিত হ'লেন জননীরূপে পরিবর্ত্তিত দেবী আইশিসের শিশু পুত্ররূপে! তারপর আবার যখন এই মিলিত দল 'অসিরিস্' গোষ্ঠীর কাছে পরাস্ত হ'য়ে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হ'তে বাধ্য হ'ল তখন শিশুপুত্র হোরাসকে নিয়ে জননী আইসিস্ এসে অসিরিসের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে 'অসিরিস' দেবপরিবারের পত্তন ক'রলেন। ক্রমে মিশরের সমস্ত পশ্চিম প্রদেশ হ'য়ে উঠেছিল—অসিরিসের উপাসক। পরে পূর্ব্বাঞ্চল হ'তে এলেন দেবতা 'সেট্' ও তাঁর পত্নী 'নেভাত' দেবী। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের মিলন নিবিড় হ'য়ে উঠবার সুবিধা হয়নি কোনোদিন। কাজেই অসিরিস্ মণ্ডলের মধ্যে সেট ও নেভাত দেবদম্পতী সম্পূর্ণ মিশে যেতে পারেন নি। তাঁদের সঙ্গে এঁদের একটা যেন জ্ঞাতিশত্রুতা বরাবরই রয়ে গেছলো, ফলে তাদের মধ্যে একটা আংশিক মিলন ও আংশিক বিরোধ চিরদিনই দেখা যায়।

অসিরিস দেবতার প্রাধান্য প্রবল হ'য়ে উঠেছিল তিনি বহুবিধ শক্তিধর ছিলেন বলে। তাঁর এই বহুবিধ শক্তিধর হওয়ার কারণ হ'চ্ছে আবার 'আসরিস্' গোষ্ঠীর লোকেদের আর কোনো হোম্‌রা চোম্‌রা দেবতা ছিলনা। কাজেই অসিরিস্‌কে একাধারে হ'তে হয়েছিল ক্ষেত্রদেবতা যাঁর কৃপায় শস্যাদি এবং ফলমূল শাকসব্জী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আবার মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা অসিরিসের অধীনে থাকে এই বিশ্বাস মিশরীয়দের মধ্যে বলবৎ থাকায় অসিরিস হ'য়ে উঠেছিলেন জন্মান্তরের নিয়ামক এবং তাঁর বাসস্থানই ছিল স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ।



'রা' দেবতার চিহ্ন (কিরণ পক্ষ-সংযুক্ত সূর্য্য দেবতার প্রতীক এই চিহ্ন মিশরের বহু মন্দির রাজপ্রাসাদ ও তোরণদ্বারে অঙ্কিত দেখা যায়)

রোমানযুগেও এ বিশ্বাস মিশরে বলবৎ ছিল যে মৃত্যুর পর মানুষ অসিরিসের অধীনস্থ দেবলোকে যায়, তাই কারুর মৃত্যু হ'লে আমরা যেমন বলি অমুকের ৺গঙ্গালাভ হয়েছে বা অমুক স্বর্গে গেছেন তেমনি মিশরীরা বলতো অমুক অসিরিসের সান্নিধ্যলাভ করেছেন। তবে স্বর্গবাস করবার সৌভাগ্যলাভ করতে হলে আমাদের মধ্যে যেমন একটা বহুদিনের ধারণা যা বিশ্বাস আছে যে সে মানুষকে বহুপুণ্য সঞ্চয় করতে হবে তেমনি অসিরিসের দেবলোকে যেতে হ'লে মিশরীয়েরাও বলে যে সে লোকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা চাই।

আইসিসের পূজা শুধু মিশরে নয় প্রাচীন ইটালিতেও দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে আইসিসের বিরাট মন্দির ছিল। শিশু দেবতা হোরাসের জননীরূপে আইসিসের পূজা খৃঃপূর্ব্ব ৬০০ শতাব্দী থেকে প্রচলিত হয়েছিল দেখা যায়। রোমানরা আইসিসকে নাবিকদের রক্ষাকর্ত্রী দেবী ব'লে মনে করতো। তাদের ধারণা যে রহস্যময়ী

প্রকৃতির প্রাণশক্তি ও কল্যাণদায়িনী প্রভাবের মূল ছিলেন তিনিই।

হোরাস বহুগুণসম্পন্ন দেবতা ছিলেন। প্রথমে তিনি একাই নিজগুণে পূজিত হ'তেন, পরে শ্যেনমুখ দেবতার সঙ্গে এবং সূর্য্যদেবতা এড্‌ফ্যুর সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটে। শ্যেনমুখ দেবতা ছিলেন রাজপূজিত দেবতা। তাঁর সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে হোরাস রাজ-দেবতা বা দেবরাজরূপে পরিণত হ'য়েছিলেন। মিশরীয় পুরাণে বর্ণিত আছে যে



সিংহাসনে উপবিষ্ট দেবতা হোরাস—(এঁর উভয়পার্শ্বে জননী আইসিস্ ও নেভাতদেবী দেহ-রক্ষিণী রূপে বিরাজমানা)

দেবতা 'শেঠ' অসিরিসকে হত্যা করেছিলেন, এবং সেই 'শেঠ'কে আবার হোরাস যুদ্ধে পরাভূত করে জয়গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন। সেই থেকে যারা প্রতিহিংসাকামী 'হোরাস' তাঁদের উপাস্য দেবতা হ'য়ে উঠেছিলেন। পরে

দেবী আইসিস্—(এঁর তিনরকম মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ইনি দেবতা অসিরিসের পত্নীরূপে সমগ্র মিশরে পূজিতা ছিলেন। এটি তাঁর গোমুখী মূর্ত্তি। এঁর মস্তকে চন্দ্রমুকুট, কারণ ইনি চন্দ্রের প্রতীক্)

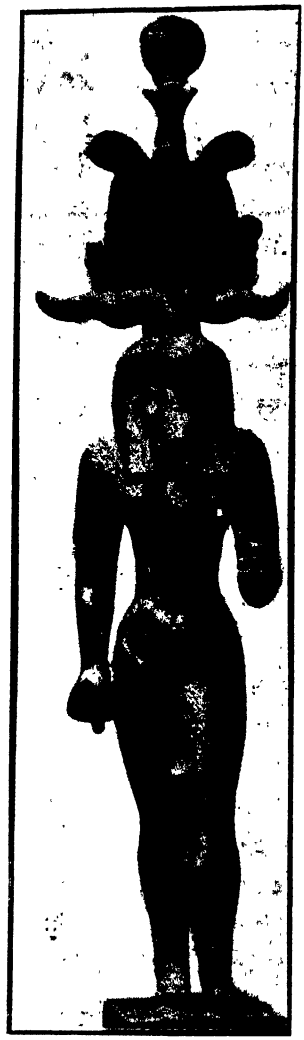
দেবী আইসিসের সম্পর্কে এসে তিনি হ'য়েছিলেন জননী আইসিসের পুত্ররূপী কিশোর দেবতা হোরাস্। দেবরাজ-রূপে তিনি আকাশদেবতা বলেও পূজিত হ'তেন। চন্দ্র এবং সূর্য্য হয়েছিল তাঁর দুই নেত্র। হোরাসের অন্যান্য মূর্ত্তিও দেখতে পাওয়া যায়। পদ্মফুলের উপর পদ্মাসনে



দেবতা হোরাস্—(ইঁনি অসিরিস্ ও আইসিসের পুত্র। মিশরে বালসূর্য্যরূপে পূজিত হ'তেন। এঁরও নানা মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এটি তাঁর শ্যেনমুখ প্রতিমূর্ত্তি)



কিশোর হোরাস (কিশোর হোরাসের এই মূর্ত্তির বিশেষত্ব হচ্ছে তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সর্ব্বদা তাঁর চিবুক স্পর্শ করে আছে)



দেবী নেহেব্কা—(সর্পরূপিণী নেহেব্কা মৃতের কল্যাণে মিশরের গৃহে গৃহে পূজিতা হ'তেন)

উপবিষ্ট হোরাস মূর্ত্তিটিকে বিশেষজ্ঞেরা বৌদ্ধপ্রভাবের পরিণাম বলে মনে করেন। আর একপ্রকার হোরাসের মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট। তার দুইপার্শ্বে আইসিস্ ও নেভাত যেন তাঁর দেহরক্ষিণী স্বরূপ রয়েছেন।

নেভাত ও শেঠ লোহিত সাগরের তীর হ'তে মিশরে এসে প্রবেশ ক'রেছিলেন। মিশরীয় পুরাণে এঁদের সম্বন্ধে

এক আজগুবি গল্প আছে। অসিরিস দেব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও শেঠ বরাবর অসিরিসের শত্রুতাচরণ ক'রেছিলেন, তারপর হোরাস তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত ক'রেছিলেন, কিন্তু, তথাপি শেঠ মিশরে বহুবার প্রাধান্য লাভ ক'রেছিলেন দেখা যায়। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ পুরুষের রাজত্বকালে শেঠের পূজা মিশরে খুব সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল দেখা যায়। তিনিই হয়ে উঠেছিলেন তখনকার রাজাদের ইষ্ট দেবতা। রোমানদের আমলেও তাঁর যথেষ্ট মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল।

নেভাত কখনও অসিরিসের বিপক্ষতাচরণ করেননি। তাঁকে মিশরীরা আইসিসের ভগ্নীরূপে পূজা করতো। অসিরিসের মৃত্যুতে নেভাত আইসিসের সঙ্গে একত্রে রোদন করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল শোক পালন করেছিলেন। সেইজন্য মিশরে মৃতের শিয়রে ও পাদদেশে নেভাতের মূর্ত্তি স্থাপন করার প্রথা প্রচলিত হয়েছিল।

প্রাচীন মিশরের আর তিনটি দেবতা 'আমন' 'মুট' ও 'ক্ষেণশু' এঁরাও পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসে মিশরে প্রবেশ করেছিলেন। আমন-মরুস্থান হ'তে মরুদেবতা 'আমন' এসেছিলেন। কার্ণাক থেকে এসেছিলেন মাতা 'মুট' দেবী। 'ক্ষেণশু' ছিলেন যাযাবর দেবতা। তিনি অনেক পরে আসাতে তাঁকে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে মিশে যেতে হয়েছিল। অম্বোশ প্রদেশে দেখি ক্ষেণশু এসে মিশেছেন শ্যেনমুখ হোরাসের সঙ্গে, এডফুতে ঠোটের সঙ্গে এবং থীব্‌সে 'ম্যু' ও 'রা'এর সঙ্গে। লাইবীয়ান প্রদেশের দেবী 'নীট্' একেবারে সম্পূর্ণ মানবী।

প্রাকৃতিক দেবতাদের মধ্যে প্রধান সূর্য্য দেবতা 'রা'। ইনি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড; বাল-সূর্য্য 'ক্ষেপেরা' ও অস্তগামী সূর্য্য 'আটুম' এরাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক দেবতারা পূর্ব্বাঞ্চল থেকে আমদানী হয়েছিলেন। মধ্যাহ্ন সূর্য্য 'রা' ছিলেন প্রাচীন মিশরের একজন প্রধান দেবতা। খৃঃ পূর্ব্ব অনুমান ৭০০০ শতাব্দীতে এঁর আবির্ভাব হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্বিতীয় দফা সভ্যতা বিস্তারের সময় সিরীয়ান প্রভাবের ফলে 'রা' দেবতার উৎপত্তি। 'রা' দেবতার মহাসমারোহে পূজা হ'ত দক্ষিণ মিশরের হেলিয়োপলিসে। হেলিয়োপলিস সহরটির তাই নামকরণ হয়েছিল এই দেবতারই নামে। হেলিয়োপলিসের অর্থ 'সূর্য্য নগর'। কিন্তু দক্ষিণে হায়রাকোপলিশ সহরে ইনি শ্যেনমুখ দেবতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় এঁর নাম হয়েছিল 'বেহুদেৎ'। অর্থাৎ পক্ষসংযুক্ত সূর্য্য দেবতা। এই পক্ষ-সংযুক্ত সূর্য্য দেবতাকে প্রাচীন মিশরের প্রায় প্রত্যেক তোরণ দ্বার শীর্ষে দেখতে পাওয়া যায়।* এই দেবতার কেবল পক্ষই ছিল না, তার সঙ্গে মুকুটে একজোড়া সর্প এবং মেষ শৃঙ্গও



গ্রহদেবতা শাহু



দেবী নীট্ (এঁর হাতে ছিল ফুলশর; ইনি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রেম-দেবী)

একজোড়া সংলগ্ন থাকতো। পক্ষদ্বয় ছিল তাঁর সর্ব্বত্র অবাধ গতিবিধির জন্য এবং শরণাগতকে রক্ষা করবার জন্য; মেষশৃঙ্গদ্বয় ছিল তার সৃষ্টির প্রতীক; তাঁর বর্ণ ছিল বিচার ও ধ্বংসের বর্ণ। সুতরাং 'রা'কে বলা যেতে পারে প্রাচীন

মিশরের প্রধান পুরোহিত দেবতা। তিনি একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু শ্যেনমুখ দেবতার সঙ্গে সম্মিলিত হবার পর 'রা' দেবতারও মানবাকারে শ্যেনমুখ প্রচলিত হয়েছে। থীরসএর গ্রাম্য দেবতা ছিলেন 'আমন'। সেখানে 'আমনের' পূজার সঙ্গে 'রা' দেবতার পূজাও যখন ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হ'তে সুরু হ'ল তখন 'রা' 'আমনের' সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে 'আমন-রা' নামে মস্ত বড় দেবতা হ'য়ে উঠলেন। উনবিংশ বংশের



দেবী শেখমেট্—(দেবী শেখমেটের আর একমূর্ত্তি)



তরুণ হোরাস্ (বিভিন্ন মূর্ত্তির মুকুটের পার্থক্য লক্ষ্য করবার যোগ্য)

রাজত্বকালে এবং তার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন—এই 'আমন-রা'।

খৃঃ পূর্ব্ব ১৩৮০ খৃঃ অব্দে সম্রাট আখনাতনের শাসন-কালে মিশরে এই দেবপূজা সম্পর্কে এক মহাপ্রলয় হ'য়েছিল। সেই সময় সিরীয়াতেও এক ধর্ম্মপ্রলয় চলছিল। সমস্ত দেবপূজা বন্ধ করে একমাত্র সহস্র কিরণ জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য দেবতার পূজাই প্রচলিত রাখবার একটা বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। এই ধর্ম্ম সংস্কারের যুগে মিশরেও বহু দেবতার পূজা না ক'রে একমাত্র সহস্রাংশু দেব দিবা-করের নূতন ধরণের পূজা পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। আখনাতনের মুখের বুলি হয়ে উঠেছিল "সত্যের মধ্যে বাস কর!" তিনি এই বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করেছিলেন যে জীবজগতের সমস্ত প্রাণীর প্রাণশক্তি সূর্য্য কিরণের মুখাপেক্ষী। তাই সূর্য্যের প্রতি কিরণ রেখা হ'য়ে উঠলো আদিত্য দেবতার অসংখ্য বাহু এবং সেই সহস্র বাহু দ্বারা সূর্য্য দেবতা জগতে কল্যাণ বিতরণ করেন, জীবজগতে প্রাণশক্তির উদ্বোধক তিনি, রাজশক্তির বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য যে তাঁরই তেজ সম্ভূত এ বিশ্বাস লোকের মনে বদ্ধমূল হ'তে বেশী বিলম্ব হ'ল না। ফলে মিশরের সমস্ত প্রাচীন দেব-দেবী নির্ব্বাসিত হ'লেন, তাদের পূজা বন্ধ হ'ল, নাম মুছে ফেলা হ'ল, মন্দির পূজাগৃহ দেবদ্বার সমস্ত ভেঙে চূর্ণ ক'রে ফেলা হ'ল। এমন কি এই ধর্ম্ম সংস্কারের খাতিরে রাজধানীর পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায় আখনাতন মিশরে এক নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। কিন্তু সনাতনীরা এই ধর্ম্ম সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাতে সুরু ক'রে দিলে, এই নিয়ে মিশরে শেষে প্রচণ্ড দলাদলি ও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জেগে উঠলো। মন্দির ভাঙা ও দেবতা বিসর্জ্জন নিয়ে রীতিমত দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হ'ল, ফলে সম্রাট আখনাতনের অকাল মৃত্যু ঘটলো এবং তাঁর স্বর্গারোহনের মাত্র তিরিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত প্রাচীন দেবতারা মিশরে আবার সদলে দেখা দিলেন।

চন্দ্র সেখানে নানা মূর্ত্তিতে পূজিত হ'তেন। কখন কাল ও সংখ্যাধীশ্বর ঠোথের সঙ্গে, কখন ক্ষেণশুর সঙ্গে, কখন মাতা হাথোর দেবীর সঙ্গে চন্দ্রের সংযোগ ও পূজা প্রচলিত ছিল দেখা যায়। প্রাচীন মিশরে আর একদল দেবতা ছিলেন যাঁরা বিবিধ গুণের প্রতীক্ স্বরূপ কল্পিত হ'য়েছিলেন। যেমন দেবতা 'পা' ছিলেন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতীক্। উদ্ভিজ্জ জগতের দেবতা ছিলেন 'নেফারটেম।' 'ইম্‌হোটেপ' ছিলেন ভেষজের দেবতা। সিংহরূপিণী দেবী 'শেখমেত' ছিলেন 'পা' দেবতার যোগ্য সহধর্ম্মিণী। এ ছাড়া পিতৃ দেবতা, মাতৃ দেবী, বিদ্যা দেবী, শিল্প দেবতা, সিরীয়ার বহু দেবতা এবং হিটাইটেদের একাধিক আর্য্য দেবতা যেমন অগ্নি ও বায়ুপ্রভৃতির পূজাও মিশরে প্রচলিত হয়েছিল।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১১)

এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়ীতে আপনি ত যাবেননা—আজ সন্ধ্যা-বেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধূলো দেন।

—কেন রাজু?

—কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজি হয়েছেন আসতে।

—কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

—তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিত ব্রজবাবু কোথাও কিছু খাননা, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধহয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা আমি যাবোনা। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ-পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়ী ভাড়ার আয়ে দিন ভালই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ অথচ, কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙে সেদিন সকালেও সে জানিতনা রাত্রিটাও কাটিবেনা, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল ত? আবার সহিল তাহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিলনা।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানেনা। যতই ভাবিয়াছে, আত্ম-ধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই, হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিম্বা, হয়ত এমনিই জগৎ,—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে নালিশ করিতে গিয়া আসামীর [illegible] মিলেনা।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেননা। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করেনা, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে নিজেকে করা মাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিলনা,—নিশেষে মুছিয়া দিল।

হয়ত, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো মায়ের মতো। বাড়ীতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চিনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে কখনো উঠানে কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে-চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে!

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর

নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুত্বার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই,—দুই চারিটা সাধারণ কথা-বার্ত্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্য্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্ত্তের মিনতি, নাই উন্মাদের ব্যভিচার,—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এই মতো—

পূবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালোই ত আছি।

—কিন্তু ভালো ত তেমন দেখাচ্চেনা? যেন শুক্‌নো-শুক্‌নো।

—কই না।

—না বললে শুনবো কেন। খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্চেননা। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন,—দুদিনেই ভেঙে পড়বে যে।

—না ভাঙবেনা শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। ওটাকে ভেঙে ফেলাই এখন দরকার,—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়ীটা পড়ে রয়েছে মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যাননা কেন?

—বেড়াতে আমি ত কোন কালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

—না।

—কালও আসেননি ত?

—না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়ত কোন বাজে-কাজে ব্যস্ত আছে।

—বাজে কাজে? ঐ তার স্বভাব, না?

—হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কই, আজ আমাকে জল দিলেনা মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয়না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া একগ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন আজ তা'হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন তিনেক পরে এমনি ধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেননা বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয় এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল, কেউ বলেনি এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ,—মিছে সময় নষ্ট হয় তো?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে। কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেননা? সত্যি বলুন তো?

একথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিলনা, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

—হাঁ প্রায়ই হয়।

—তিনি আর এখানে আসেননা—আপনি জানেন?

—জানি বই কি।

—আর কি তিনি এ বাড়ীতে আসবেননা?

—সে কথা জানিনে। বোধহয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালে ডাকে একটা দলিল এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ী রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

—জানি।

—কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল সোজা দান-পত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

—কিন্তু দান-পত্র জিনিসটা ভালোনা।

সবিতা বলিল, সে আমি জানি বিমলবাবু। আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু, বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইলনা সে খুশি হইল, কিন্তু, কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ায় তবু একটা সান্ত্বনা ছিল কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়ীটা আপনার কিনে রেখেচি।

—টাকা তিনি নিলেন?

—হাঁ, ভেতরে-ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেননা।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ-ক'টা টাকা হয়ত কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকি রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন কিন্তু আমি নেবো কি ব'লে?—না সে হবেনা—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবোনা। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয়না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে; কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই শুধু আপনি আর আমি। আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, ঐ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে ত লাভ নেই।

—লাভ নেই তা-ও জানেন?

—হাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সম্বরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

—না জানিনে। শুধু যা ঘটেছে,—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশি নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও-দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও-দুটো এক নয় নতুন বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হইলনা, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম, আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই,—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি এ কথা কি আপনার মনে আসেনা?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদিবা আস্‌তে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

—কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশি পড়েছি নতুন-বৌ।

—পড়ালে কে?

—সে তো একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাষ্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাষ্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি কোরে আপনার কাছে তাঁর নাম কোরব বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, আপনি বোধহয় খুব ধাম্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধাম্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানা-শুনো আছে নাকি?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুমনা, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্ত্তাও অনেক হলো,—না নতুন বৌ, ধর্ম্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধাম্মিক লোক আমি নয়।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ-কথা বুঝিতে তাহার বাকি নাই সমস্ত কৌতূহলের মূল কারণ সে নিজে। থামিতে পারিলনা, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—ওখানে মিল না থাক কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনকে দেবোনা, অন্ততঃ, দেবার এখনো সময় আসেনি।

—অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি কোরে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

—এ-ও শুনেছেন?

—শুনেছি বই কি।

—সমস্তই?

—সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি ক'রে বলুন ত?

—ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

—না, বলেননি বলেই ত এ-কথা এমন সত্যি ক'রে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই,—বাকি যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়ত সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়ত পারতুমনা। কিন্তু সে যে রূপ যৌবনের লোভে নয় এ-কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ-কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেননা শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল। সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, এমনি কোরে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেননা আমার?

—জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবোনা,—পাবার পথ নেই আমার।

—কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

—বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্য্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে,—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে-পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেননি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বই কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল কিন্তু খেলা ভাঙলো,—তাকে রাখতে পারলুমনা। দোষ তাকে দিইনে কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকি নেই ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায়না,—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ,—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি কোরে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকি কিছু নেই। এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোষ যে বন্ধ! জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবোনা, আবার তার চেয়েও বেশি জানি যে ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই তো বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়ীটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দ্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবোনা। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দুচোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকি নেই বিমলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহ-জীবনে বদলাবেনা। শুধু আশীর্ব্বাদ করুন যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা' যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবোনা, শুধু প্রার্থনা করবো যেমন করেই এসে থাক্ এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

—কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

—তা ও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকি আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্ব্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয় এই আশীর্ব্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিলনা, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্দ্ধমানের কোন্ একটা গ্রামে মাষ্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

—যাও।

—তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

—থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আফিস খুলেচি তার অনেক কাজ বাকি।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাইনি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ,—ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হ'লে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া

ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল, এ বাড়ীটার আর আমার দরকার ছিলনা—ভেবেছিলুম ভালোই হলো যে গেলো। একটা ঝঞ্ঝাট মিট্‌লো। কিন্তু তুমি তা হতে দিলেনা। ভাড়াটেরা রইলো, এদের দেখো।

—দেখবো।

—আর একটি অনুরোধ করবো—রাখবে?

—কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

—আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন কিছুই বলিলেননা। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিলনা কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে না বিমলবাবুকে বোধকরি নিজেও জানিলনা। একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো,—সে শুধু আমিই জানি আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে আমি বাপের বাড়ীতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিলনা। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি কোরেই বোধকরি সে বুড়োর বিচিত্র খেলায় রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বা'র কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারি অপ্রতিভ হইয়া বারবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না, কখ্‌খনো না। দেরি হয়ে গেছে আপনার,—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—বলিলেন, তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবোনা মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চল্‌লুম।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিলনা।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শেষ দান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস বি-এল

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। শিবানী তাহার স্বামী বরেনের পার্শ্বে শুইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার চোখে ঘুম ছিলনা।—মনটা রহিয়াছে বাহিরের দরজার পানে পড়িয়া। হঠাৎ বসিবার ঘরের দরজায় ঠক্ করিয়া উঠিল এবং একটা গুরু ভার পতনের শব্দ হইল। শিবানী চকিত হইয়া বরেনকে কহিল—ওগো, শুনছ, ঘুমোলে বুঝি? দাদা বোধ হয় এলেন।

স্বামী বিরক্তপূর্ণ স্বরে "হোকগে" বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল।

শিবানী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলনা। দুই-এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া দেখিল বরেনের কোনও সাড়া-শব্দ নাই। কি চিন্তা করিল, তার পর উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাহিরের দিকে গেল।

বরেন ঘুমায় নাই। রুক্ষ স্বরে কহিল—কোথায় যাচ্ছ?

শিবানী কহিল—দেখে আসি একবার।

বরেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। বলিল—কেন, কি জন্যে এত মাথাব্যথা তোমার?

শিবানী স্বামীর কণ্ঠস্বরে স্তম্ভিত হইয়া গেল। মিনতি-পূর্ণ স্বরে কহিল—ছিঃ, এ কি একটা কথা! রাগ ক'রোনা, লক্ষ্মীটি, আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।—বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরেন তাহার গমনপথের পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিবানী বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দেখে নিরঞ্জন অচৈতন্য অবস্থায় বারান্দার মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছে। কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

শিবানীর চোখে জল আসিল। স্বামীকে যাইয়া বলিতেই এইবার বরেন বিনা আপত্তিতে সঙ্গে আসিল। উভয়ে ধরাধরি করিয়া নিরঞ্জনকে তাহার নিজ শয্যায় শোওয়াইয়া দিল। বরেন যেমন নীরবে আসিয়াছিল, তেমনি নীরবে শয়নকক্ষে চলিয়া গেল।

হতভাগ্য নিরঞ্জনের কপাল দিয়া তখনও রক্ত ঝরিতেছে,—মাঝে মাঝে আবোল তাবোল বকিতেছে।

শিবানী দ্রুত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল।

ভোরের দিকে নিরঞ্জন ঘুমাইয়া পড়িলে শিবানী তাহাকে সুস্থ দেখিয়া শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। স্বামী শয্যার এক প্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে।

(২)

নিরঞ্জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এড্‌ভোকেট। বিবাহ করে নাই। বরেন তাহার সহপাঠী, বন্ধু,—নিজের অর্থে বরেনকে সে মানুষ করিয়াছে। দরিদ্র বরেন আজ তাহারি কৃপায় সমাজে পরিচিত। বিবাহ করিয়া তাহারি বাড়ীতে স্ত্রীকে লইয়া রহিয়াছে। শিবানীর ভাই নাই। নিরঞ্জন তাহার ভ্রাতৃস্থান অধিকার করিয়াছে।

নিরঞ্জনের দেহে ছিল যেমন অপরিমিত শক্তি, অন্তরে ছিল তেমনি দুর্ব্বলতা। কাহাকেও সে কঠিন অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিত না। শত অন্যায় করিয়াও তাহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইলে কিংবা দুঃখ নিবেদন করিলে সে গলিয়া যাইত।

কোন্ এক অশুভ মুহূর্ত্তে এক কুমারী তন্বীর চরণে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া দিয়া ব্যর্থতার বোঝা বুকে পুষিয়া সে অন্তরের বেদনা দমন করিতে যাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল।

এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে লইয়া শিবানীর অশান্তির অবধি ছিলনা। ইহার বেদনা কোথায় শিবানী তাহা বুঝিয়াছিল। জীবনে সে দিয়াছে অনেক, নিজের প্রাণ উজাড় করিয়া বিলাইয়াছে, কিন্তু প্রতিদানে পাইয়াছে নিষ্ঠুর আঘাত। তাই ব্যর্থতায় তার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই শিবানী আজ প্রকৃতই ভগিনীর বেশে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইতে চাহে—স্নেহ-মমতায় তাহার সমস্ত বেদনা মুছিয়া দিতে চাহে। ভগিনীর মতই তাহাকে আদর করে, যত্ন করে,—আবার শাসনও করে।

নিরঞ্জন ছোট শিশুটিরই মত তাহার সমস্ত স্নেহের অত্যাচার সহ্য করে। শিবানীর মৃদু ভর্ৎসনার পর কয়দিন আর ঘরের বাহির হয় না। কোথাও কোন ত্রুটি নাই, কোর্ট হইতে সোজা বাড়ী চলিয়া আসে।—হঠাৎ আবার একদিন ঘাড়ে ভূত চাপিলে অনেক রাত্রে হাতে পায়ে জখম লইয়া বাড়ী ফিরে; কোনও দিন বা অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ীর সম্মুখে পড়িয়া থাকে। কখনও বা পা টিপিয়া চোরের মত ঘরে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু শিবানীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। একটি স্নেহ-কোমল হৃদয় লইয়া ছুটিয়া আসে এই ব্যথিতের ব্যথা দূর করিতে।

বরেনের ইহা ভাল লাগে না। তাহার অন্তরে বিষের আগুন জ্বলিতে থাকে।

(৩)

সেদিন নিরঞ্জন বন্ধুর সঙ্গে খাইতে বসিয়া বিষম হল্লা আরম্ভ করিয়া দিল। বারুণিদেবী উদরে থাকায় মেজাজটা স্ফূর্ত্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বন্ধুপত্নী শিবানী পরিবেশন-নিরতা। সে সহসা শিবানীর একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, আয় ভাই বোনে এক সঙ্গে বসে খাই।

বরেন রাগে জ্বলিয়া উঠিল; খাবার ফেলিয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া পড়িল। মাতালের তখন কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। —সে ভ্রাতা ভগিনীর সম্পর্ক বিষয়ে অসংলগ্ন বক্তৃতা জুড়িয়া দিয়াছে।

শিবানী পড়িল সঙ্কটে। স্বামীর ক্রুদ্ধ নয়নের পানে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল—তুমি একটু থামো।

নিরঞ্জনের তখন কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে? সে বলিল, রোসো, তোমাকে আমি নিজ হাতে খাইয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল।

বরেনের আর সহ্য হইল না। বারান্দার এক কোণে হকি ষ্টিকটা পড়িয়া ছিল,—তাহাই তুলিয়া লইয়া বরেন নিরঞ্জনের মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল।

নিরঞ্জন উঃ—বলিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, সমস্ত স্থানটা রক্তে ভরিয়া উঠিল।

শিবানীর মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—“কি করলে?”

তার পর বাক্যহীন পুত্তলিকার ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৪)

কয়েক দিন পরের কথা।

বরেন তাহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের দিন কাটিতেছে নিঃসঙ্গ একাকী অবস্থায়। বাড়ীতে কেহ নাই,—কেবল মাত্র একটি ছোট্ট কুকুর, আর তাহার প্রিয় সহচর ভৃত্য শম্ভু।

সে রাত্রের কথা নিরঞ্জনের কেবলি মনে পড়িয়া যায়। সংসারের সে কঠিন মূর্ত্তি দেখিয়াছে। সেখানে মায়া নাই, মমতা নাই, কাহারও জন্যে একতিল প্রীতি, সমবেদনা নাই। আছে শুধু অবিশ্বাস, দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ। সে নিজেকে ভুলিতে চাহে। কর্ম্ম অবসানে উদাস সন্ধ্যায় ম্লান আকাশের পানে চাহিয়া থাকে। সুন্দর প্রভাতে কুসুম-উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু কেহ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না ত। ভৃত্য শম্ভু দেহপাত করিয়া তাহার সেবা করে। তাহাতে দৈহিক আরাম আছে বটে; কিন্তু অন্তরের বেদনা দূর হয়না।

নিরঞ্জন ভাবে সে রাত্রে সে কেমন করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। সে কি পশু! কিন্তু তাই বা কেমন করিয়া হইবে? সে ত কোন দিন বন্ধু-পত্নীর অমর্য্যাদা করে নাই। আপন ভগিনীর মতই তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছে। ভগিনীর মতই তাহার সঙ্গে আচরণ করিয়াছে। সেদিন ঝোঁকের মাথায় একটু বাড়াবাড়ি হইয়াছিল বৈ ত নয়! আর বরেন? তাহার বন্ধু, আবাল্য সহচর। সেও তাহার ঐ মত অবস্থায় তাহার মাথায় কঠিন আঘাত করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিলনা। কেবল বাহির দেখিয়াই সে তাহার বিচার করিল! অন্তরের দিকে এতটুকু দৃষ্টিপাত করিলনা!

এক এক সময় তাহার এই কথাটা মনে হয়—হয়ত সে রাত্রের ঘটনার জন্য বরেনকে ততটা দোষী করা চলেনা। হয়ত সে এতই মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল যে ইহা ভিন্ন বরেনের আর দ্বিতীয় উপায় ছিলনা। হয়ত ইহা একটি দিনের আকস্মিক ঘটনার ফল নয়। হয়ত তাহার অজ্ঞাতে তাহার অসংযত-ব্যবহারে দিনদিন বরেনের অন্তরে যে আগুন তিলতিল করিয়া জ্বলিতেছিল তাহাই একটা ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া সেদিন ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বরেন কি এই ত্রুটির জন্য তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতনা! এই উদারতা কি বরেনের ভিতর সে আশা করিতে পারেনা! আজ যদি সে সত্যই শিবানীর সহোদর হইত, তাহা হইলে কি সে এমনি অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিত! সে কি জানেনা কতখানি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে নিরঞ্জন তাহাকে দেখে!

তাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহাকে অপরাধী করিয়া, তা' যাউক। কিন্তু তাহার ব্যবহারে যে তাহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—এই কথাটাই নিরঞ্জনের অন্তরে বেশী করিয়া বাজে,—সকালে সন্ধ্যায়, শয়নে স্বপনে এই কথাটাই তাহার কোমল ভাব-প্রবণ অন্তরকে খোঁচাইয়া রক্তাক্ত করিয়া তোলে। ব্যথায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠে। সে কলের মত কাজ করিয়া যায়, কাজের ভিতর নিজেকে ডুবাইয়া রাখিতে চাহে বটে, কিন্তু কাজে যেন আর আনন্দ নাই, প্রাণ সাড়া দেয়না, ব্যর্থতার জ্বালায় তাহার হৃদয় ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। সে নিজেকে একেবারে ভুলিতে চাহে, কিন্তু পারেনা।—সে তীব্র সুরার আশ্রয় লইল। বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য শম্ভু নিরঞ্জনের এই অধঃপতনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল—আর কি সে করিতে পারে?

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া শম্ভু একদিন শিবানীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—দিদিমণি, বাবুকে বাঁচাও। শেষে এও দেখতে হোল! বলিয়া সে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শিবানী স্তব্ধ বিস্ময়ে সমস্ত শুনিয়া গেল, আর্দ্রকণ্ঠে কহিল—আমি আর কি ক'রব শম্ভু? আমার কথা কি আর শুনবেন তিনি?

শম্ভু তাহার চরণের ধূলি মাথায় লইয়া বলিল—খুব শুনবেন দিদিমণি, আমি বলছি খুব শুনবেন। তোমারই শাসন শুধু তিনি মানবেন। একবারটি শুধু তুমি এস। মনে আর ক্ষোভ রেখোনা দিদি।

শিবানী বহুক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাকভাবে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল। বাহিরে তখন অন্ধকার। রাস্তার দীপাবলি সেই অন্ধকার দূর করিবার ক্ষীণ প্রয়াস পাইতেছে মাত্র।

শম্ভু হতাশ হইয়া বলিল—যাবেনা দিদিমণি?

শিবানী যেন একটা আঘাত সামলাইয়া লইল। বিশ্বের

অন্ধকারের মতই তাহার হৃদয় গভীর বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিল—তা হয়না শম্ভু, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তোমার বাবুকে দেখবার লোকের অভাব হবেনা শম্ভু।

—বলিয়াই সে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৫)

নিরঞ্জন তীব্র লিভারের বেদনায় ভুগিতেছে। শরীর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। চোখ মুখ দীপ্তিহীন। দীঘ ঋজু দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আহারে রুচি নাই, খাইলেই বমি হইয়া যায়। ডাক্তার শেষ জবাব দিয়া গিয়াছেন।

সেদিন নিরঞ্জনের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে,—মৃত্যু তাহার ভুহীন শীতল পরশ লইয়া শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—আঃ, কি আরাম, কি অপার তৃপ্তি! এতদিন এই দেহ, এই মন কি তীব্রভাবেই না জ্বলিতেছিল!

নিরঞ্জন হুকুম করিল—ওবে শম্ভু, ঘর-দোর পরিষ্কার কর, বাড়ী সাজা। সে আসবে—এতদিন পরে আসবে। তার নীরব বার্ত্তা আমার কাছে পৌঁছেছে।

উত্তেজনায় নিরঞ্জন উঠিয়া বসিল।

সন্ধ্যার ম্লান আঁধার পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ধূসর আকাশে দুই একটা তারা জ্বলিয়া উঠিয়াছে মাত্র। চারিদিকে একটা বিশ্রী নীরবতা। নিরঞ্জনের জীবনদীপ প্রায় নিবিয়া আসিতেছে। ভৃত্য শম্ভু, এক হাতে চোখের জল মুছিয়া অপর হাতে প্রভুর সেবা করিতেছে।

নিরঞ্জন ডাকিল—ওরা আর এলোনা শম্ভু?

শম্ভু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল। কি আশ্বাস বাণী সে তাহার প্রভুকে শোনাইবে।

নিরঞ্জন অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

শম্ভু কহিল—বাবু, খুব কি যন্ত্রণা?

নিরঞ্জন বলিল—নারে, না। ওরা এখনও এলোনা, তাই ভাবছি।

দশ পনের মিনিট পরেই তাহার যন্ত্রণা এবং অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইল।

নিরঞ্জন ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে। রক্তহীন মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

শম্ভু কাঁদিয়া ফেলিল। ডাকিল—বাবু—বাবু—

সব শেষ হইয়া গিয়াছে—

রাত্রি প্রায় নটার সময় বাড়ীর দুয়ারে একখানা গাড়ী থামিল।

বরেন ও শিবানী আসিয়াছে।

শম্ভু প্রভুর পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে।

শম্ভু কহিল—সেই আসা এলে, তবু যদি সময়ে আসতে। তোমাদের জন্যেই—সে আর বলিতে পারিলনা।

শিবানী নিশ্চল প্রস্তর-মূর্ত্তির মত ঘরের মেজেতে দাঁড়াইয়া রহিল।—অন্তরে তাহার কাল-বৈশাখীর ঝড়।

বরেন হাহাকার শব্দে বন্ধুর মৃতদেহ আঁকড়াইয়া ধরিল। তাহার মনের গ্লানি চোখের জল হইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে।

* * * *

কয়েক দিন পরে দেখা গেল নিরঞ্জনের ড্রয়ারের ভিতর তাহার জীবন বীমার পালিসি, একখানা চেক, আর একখানি উইল পড়িয়া রহিয়াছে। পঁচিশ হাজার টাকার পলিসি শিবানীর নামে লেখা, পাঁচ হাজার টাকার চেক্‌ শম্ভুকে দান, আর চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ীখানি বন্ধু বরেনকে দান করিয়াছে।



সাময়িকী

'ভারতবর্ষে'র নববর্ষ—

'ভারতবর্ষ' এইবার দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। সুদীর্ঘ একবিংশ বৎসর নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা বিস্মৃত হইয়া প্রাণপণ যত্নে ও চেষ্টায় পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্কল্পিত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের স্বত্বাধিকারিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত এই 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছি। ত্রুটী বিচ্যুতি অসংখ্য হইয়াছে, তাহা জানি; সহৃদয় লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ী পাঠক-পাঠিকাগণ যে সে সকল ত্রুটী ক্ষমা করিয়াছেন, তাহাও জানি। যাঁহাদের অনুগ্রহে এই একুশ বৎসর 'ভারতবর্ষ' পরিচালিত হইয়াছে, এবার বৃদ্ধ সম্পাদক তাঁহাদের অধিকতর অনুগ্রহ ও সাহচর্য্য প্রার্থনা করিতেছে।

ভারতের জন-সমস্যা—

সার জন মেগ এদেশের লোকের খাদ্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সংপ্রতি তিনি বিলাতে এক সভায় ভারতে জন-সমস্যা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভারতবাসীর বিশেষ বিবেচ্য।

তিনি বলেন, ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি অল্প হইলেও, খাদ্যের অভাব, ব্যাধি, যুদ্ধ প্রভৃতি নানা কারণে লোকক্ষয় না হইলে এক দম্পতির সন্তান হইতে আট শত বৎসরে পৃথিবীর বর্ত্তমান জনসংখ্যার উদ্ভব হইতে পারিত। তাহা যে হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কিছুদিন হইতে উন্নতিশীল দেশসমূহে খাদ্যের পরিমাণবৃদ্ধি ও রোগ নিবারণ হওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাসের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তেমনই আবার নানা দেশে জীবন-যাত্রার আদর্শ উচ্চ হওয়ায় জনসংখ্যা হ্রাসে লোকের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন-সঙ্কোচই ইহার একমাত্র পরিচয় নহে। লোক এখন অধিক বয়সে বিবাহ করে—কেহ কেহ অবিবাহিতও থাকে। এ সকলও প্রজনন-সঙ্কোচক।

জাপানীরা রোগ নিবারণ ও খাদ্যবৃদ্ধি করিয়া বর্দ্ধনশীল জনসংখ্যা রক্ষার চেষ্টা করিতেছে—তথাপি তথায় মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের মৃত্যুর হার অপেক্ষা অধিক। জাপানে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে প্রায় ১৩২ ছিল, আর বিলাতে তাহা ৬৬ মাত্র। জাপানে লোকের গড় আয়ু ৪২ বৎসর ৬ মাস, আর বিলাতে প্রায় ৫৮ বৎসর। এই প্রভেদের কারণ সন্ধান করিলে দেখা যায়, জাপানে লোকসংখ্যা উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায় অধিক বাড়িতেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এ দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনেক কম ছিল। মধ্যে মধ্যে যেমন বৃদ্ধি হইত, তেমনই আবার দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে ও যুদ্ধে লোকক্ষয় হইত। কিন্তু এখন খাদ্যাদির উৎপাদন যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, তেমনই দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধি নিবারণের উপায় হইয়াছে। ফলে অল্পকালমধ্যে লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং তথাপি লোকের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ইহা যেমন আশার ও আনন্দের কথা, তেমনই আবার আশঙ্কার কথাও আছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০ বৎসরে লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ বাড়িয়াছে এবং বাড়িয়াই চলিয়াছে। যদি এইভাবে বৃদ্ধি চলে, তবে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতের লোক-সংখ্যা ৪০ কোটি হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য—(১) বর্ত্তমানে লোকের জীবনযাত্রার অবস্থা সন্তোষজনক কি না এবং (২) তাহাদিগের উন্নতি হইতেছে—না, অবনতি হইতেছে? ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়—

(ক) মৃত্যুর হার হাজারে—ভারতে ২৫ আর বিলাতে ১২;

(খ) শিশুমৃত্যুর হার হাজারে—ভারতে ১৭৯ আর বিলাতে ৬৬;

(গ) এ দেশের লোকের আয়ু বিলাতের লোকের আয়ুর অর্দ্ধেক।

এ দেশে শতকরা প্রায় ৬০ জন লোক উপযুক্ত আহার্য্য পায় না—আহার্য্য আবশ্যক পুষ্টিকর নহে। শতকরা ২২টি গ্রামে গত ১০ বৎসরে একবার অন্নকষ্ট হইয়াছে। বিলাতে প্রসূতির মৃত্যু হাজারে ৪টি, আর এ দেশে ২৪টি।

সুতরাং স্বীকার করিতে হয়—এদেশে লোকের স্বাস্থ্যের ও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে।

ভারতবর্ষে জন-সংখ্যা যে হিসাবে বাড়িতেছে, খাদ্য-দ্রব্যাদি সে হিসাবে বাড়িতেছে না, অথচ সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করিতে হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতে হয়। যদি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হয়, তবে ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পূর্ব্বে ভারতবাসীর নিন্দা করিয়া বলা হইত, ইহারা সুবর্ণ সঞ্চয় করে। এখন দেখা যাইতেছে, সেই সঞ্চিত স্বর্ণ ছিল বলিয়াই গত দুই বৎসর দেশে হাহাকার শুনা যায় নাই। কিন্তু এ অবস্থা অনিশ্চিতকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

কিন্তু উপায় কি? তিনি বলেন—কেহ কেহ বলিবেন, যখন প্রতীকারের কোন উপায় নাই, তখন এই শঙ্কার আলোচনায় ফল কি? কিন্তু কে বলিল, প্রতীকারের উপায় নাই? ভারতে দুর্দ্দশার কারণ দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রচেষ্ট হইবার পর বলা যাইতে পারে—উপায় নাই। সে চেষ্টা হইয়াছে কি? ভারতবাসীরা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইবার পর যাহা ভাল মনে করে করিবে, একথা বলা যেমন অসঙ্গত, ভারতবাসীর ধর্ম্মগত সংস্কার প্রতীকারোপায়বিরোধী—এ কথা বলাও তেমনই অন্যায়।

সার জন—বিবাহ বন্ধ, বিবাহে বিলম্ব বা কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন-সঙ্কোচ—কোন উপায় অবলম্বন করিতে বলেন না। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে প্রত্যেক জাতি তাহার সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিবে। ভারতবর্ষের লোককে কেবল প্রকৃত অবস্থা ও এ অবস্থায় অন্যান্য দেশের লোক কি করিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন। ইহার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নাই এবং ইহা জাতিগত সংস্কারসীমাবহির্ভূত। ইহা বিশেষজ্ঞদিগের কাযও নহে। ইহার সহিত ব্যাধিবারণ, কৃষিকার্য্য, শিল্প, ব্যবসা, সমাজ-নীতি এ সকলও জড়িত এবং এ সবই পরস্পর-সাপেক্ষ। অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে, ভারতে অজ্ঞতাই নানা আপদের ও বিপদের কারণ।

কি নিয়মে জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করাই সার জন প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গালার বিষয় বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই —বাঙ্গালায় যে পরিমাণ জমীতে চাষ হয়, যে পরিমাণ জমী "পতিত" আছে এবং চাষের উন্নতিতে যে পরিমাণ ফশল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে বাঙ্গালার লোক-সংখ্যা বাঙ্গালায় উৎপন্ন ফশলে জীবনধারণ করিতে পারে না—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তবুও বাঙ্গালী—"অন্ন বিনা শীর্ণ" ও "চিন্তাজ্বরে জীর্ণ" কেন? যাহাকে ইংরাজীতে বলে Planned economy অর্থাৎ কি ভাবে নিয়ম করিয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার জ্ঞানের অভাবে। আজকাল আমরা অনেকের মুখে ঐ কথা শুনি—উহার উক্তি, পুনরুক্তি হয়; যেন ঐ কথা মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিলেই মুক্তির মোক্ষদ্বার মুক্ত হইবে।

ইহাই ভুল; কেবল ভুল নহে—দারুণ ও মর্ম্মান্তিক ভুল। যাহা ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে আবার গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৌমার্য্য, বিলম্বিত বিবাহ, অস্বাভাবিক উপায়ে প্রজনন সঙ্কোচ—এ সকলে যে জাতির বিপদ নিবারণ না করিয়া বরং আসন্ন করিতে পারে, ফ্রান্সে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সার জন মেগ যে বলিয়াছেন— এ সকলের বা কোনটির অবলম্বন তিনি প্রয়োজন বলেন না; প্রয়োজন—জাতির জাতীয় জীবন—যে জীবনে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—এ সকলের সমন্বয়ে গঠিত—সেই জাতীয় জীবন নির্ব্বাহ করিবার পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ—তাহাই যথার্থ।

এই কার্য্যের গুরুত্ব ভারতবাসীকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং ইহা ভারতবাসীকেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

বাঙ্গালী এ বিষয়ে ভারতের পথিপ্রদর্শক হইবে, এমন আশা কি করা যায় না?

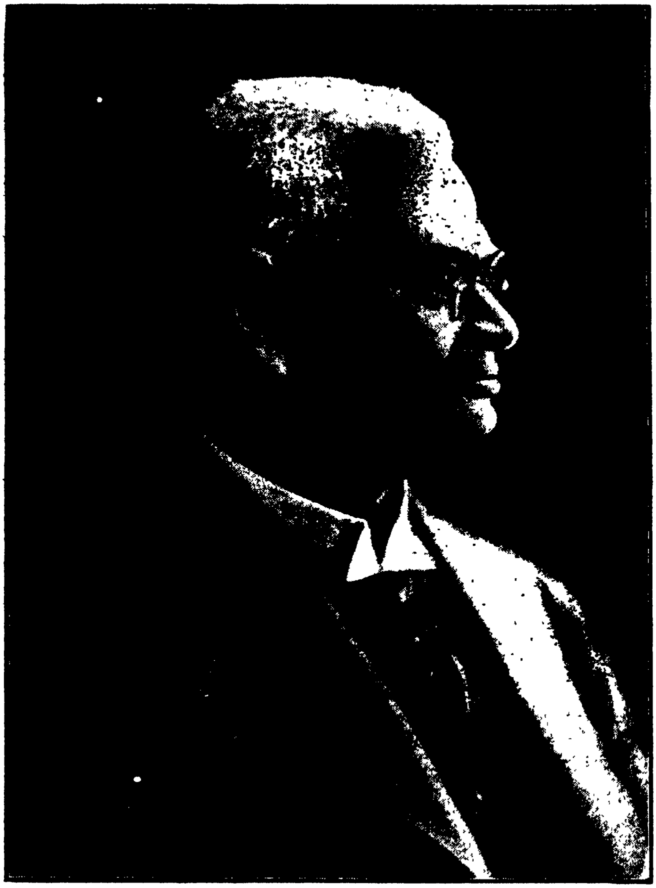
সম্রাটের জন্মদিনে উপাধি—

মহামান্য ভারত-সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবৎসরই যথারীতি উপাধি বর্ষিত হইয়া থাকে, এবারও হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের যাঁহারা উপাধি লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। মন্ত্রীবর নাজিমউদ্দীন কে-সি-আই-ই পাইয়াছেন, উত্তর-পাড়ার সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'সার' হইয়াছেন, আর আমাদের পরম বন্ধু ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও 'সার' হইয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের এ উপাধি বহুপূর্ব্বেই

পাওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক তাঁহার ও অন্যান্য ভাগ্যবানগণের উপাধি লাভে আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

বিপিনবিহারী ঘোষ—

সার বিপিনবিহারী ঘোষের মৃত্যুতে এক জন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর তিরোভাব হইল। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ জ্যেষ্ঠ সার রাসবিহারীর মত প্রসিদ্ধি লাভ না করিলেও যাহাকে আমরা সাধারণতঃ সাফল্য বলিয়া অভিহিত করি, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে লাভ করিয়া গিয়াছেন।



সার বিপিনবিহারী ঘোষ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে বিপিনবিহারীর জন্ম হয়। তিনি প্রধানতঃ কলিকাতাতেই শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসর এম, এ, উপাধি লাভ করেন। দুই বৎসর পরে রিপন কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরে—সার রাসবিহারীর উপদেশে—তিনি বর্দ্ধমানে যাইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তথায় সাফল্যলাভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠের আদেশে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ফিরিয়া আইসেন। এবার তিনি হাইকোর্টে খ্যাতি লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যতদিন জজ ছিলেন, ততদিন তিনি নানা মোকদ্দমায় রায়ে আপনার বিচার-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন এবং তিনি স্পষ্টবাদী বলিয়া, সময় সময় ব্যবহারাজীব-দিগের অপ্রীতিভাজনও হইতেন। কিন্তু তিনি যাহা সঙ্গত বিবেচনা করিতেন, তাহা করিতে কখন দ্বিধানুভব করেন নাই।

সার বিপিনবিহারী যখন হাইকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ। সরকার নানা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র গোলটেবিল বৈঠকে যাইলে তিনি দুই বার অস্থায়ীভাবে বাঙ্গালার শাসন পরিষদের সদস্যের কায করেন এবং ভারত সরকারের ব্যবস্থা সচিব সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ছুটী লইলে বিপিনবিহারী তাঁহার স্থানে কাযও করিয়াছিলেন।

তিনি শিক্ষাসম্পর্কে নানা কায করিয়াছিলেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তিনি আইন বিভাগের "ডীন" নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি একাধিক বিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে "নাইট" করেন।

তখন আমরা তাঁহার উপাধিলাভে আনন্দ প্রকাশ করিলে তিনি আমাদিগকে লিখিয়াছেন—তাঁহার বন্ধুরা যে তাঁহার উপাধি লাভে আনন্দিত হইয়াছেন, ইহাতেই তিনি আনন্দিত।

বিপিনবিহারী সদালাপী, মিষ্টস্বভাব ও সামাজিক ছিলেন। পদের গর্ব্ব কখন তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে নাই।

বিপিনচন্দ্র বিপত্নীক ছিলেন। চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া তিনি গত ২০শে মে তারিখে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

মুকুন্দ দাস—

"তবু কাঁদ—কাঁদ—কাঁদ, জনমভূমির, সে এক দরিদ্র কবি।"—মুকুন্দলাল দাস ৫৮ বৎসর বয়সে অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিসূচিকা রোগে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মুকুন্দলাল—রাজনীতিক, ব্যবহারাজীব, অধ্যাপক—এমন কি সাহিত্যিক বা সাংবাদিকও ছিলেন না। তিনি ছিলেন—যাত্রাওয়ালা। কিন্তু আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশের যে কত ক্ষতি হইল তাহা পরিমাপ করা দুষ্কর। যাত্রা—কথকতা—এ সব আজ ইংরাজী-শিক্ষিত—"সভ্য"সমাজে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইলেও এই শিক্ষিতদিগের সংখ্যা কিরূপ? বাঙ্গালার জনগণের তুলনায়, তাঁহারা আজও সমুদ্রে একবিন্দু বারি মাত্র। বিজ্ঞবর বার্ক বলিয়াছেন, যে প্রান্তরে বৃহদাকার বহু জীব নীরবে বিশ্রাম করিতেছে, তথায় গুটিকয়েক ঝিল্লী চীৎকারে প্রান্তর মুখরিত করে বলিয়া মনে করিও না—কেবল তাহারাই প্রান্তরের অধিবাসী; তাহারা তুচ্ছ নগণ্য। বাঙ্গালার বিরাট জনগণের তুলনায় ইংরাজীশিক্ষিতরা ঐ ঝিল্লীর সহিতই তুলনীয়। জনগণ এখনও যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি হইতেই আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে। তাই ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজে অনাদৃত যাত্রাওয়ালা ও কথক প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের কেন্দ্রে আজও পূর্ব্ববৎ প্রভাবসম্পন্ন। সেকালের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই—পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মতিলাল রায় যেমন 'ভীষ্মের শরশয্যা' প্রভৃতি পালা গাহিয়া বাঙ্গালীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন—মনোমোহন বসুর 'হরিশচন্দ্র' নাটক প্রভৃতি তেমনই পৌরাণিক আখ্যায়িকার ছদ্মবেশে জাতীয়তার তূর্য্যনিনাদে দেশবাসীকে আহ্বান করিত। সে সব যাত্রা গ্রামে গ্রামে অভিনীত হইত এবং জনগণের মধ্যে ভাব ছড়াইয়া দিত। মুকুন্দ বাঙ্গালায় নবযুগের নবভাবের প্রচারকল্পে যাত্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যখন স্বদেশী আন্দোলন—বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া বর্ষার বারিপাতপুষ্ট নদীর মত ভাবের বন্যায় দুই কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইল, তখনই যেমন সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে, কালীপ্রসন্নের সঙ্গীতে, বিপিনচন্দ্রের রচনায় ও বক্তৃতায়, অরবিন্দের প্রবন্ধে, অশ্বিনীকুমারের আদর্শে নবভাবের বিকাশ ও প্রচার, তেমনই মুকুন্দলালের যাত্রায় তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়।

বরিশালে দরিদ্র পরিবারের সন্তান মুকুন্দলাল যৌবনে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রভাবে পতিত হইয়া তাঁহার ত্যাগের, দেশপ্রেমের, আন্তরিকতার পূত আদর্শে আকৃষ্ট হযেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মুকুন্দলাল মনে করেন—কাঠবিড়ালীও যেমন সেতুবন্ধনে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিল, তিনি তেমনই আন্দোলনে নেতৃগণকে সাহায্য করিবেন। সেই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মুকুন্দলাল যাত্রার দল গঠন করিয়া দেশপ্রেম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বরিশালে তাঁহার "পালা" বাঁধিবার—সঙ্গীত-রচনার উপযুক্ত লোকের অভাব হয় নাই। মুকুন্দলাল যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সে যাত্রা দেশসেবার পুণ্যপথে যাত্রা—জয়যাত্রা। 'মাতৃপূজা' যাত্রা দেশের লোককে যেন মাতাইয়া তুলিল। তখন পূর্ব্ববঙ্গে ফুলারী শাসন—বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনভঙ্গ। অশ্বিনীকুমারের প্রভাব দেখিয়া সরকার মনে করিলেন—তিনি শাসনের যন্ত্র অচল করিতে পারেন। গণশক্তির সহিত সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সঙ্ঘর্ষ হইল। মুকুন্দলাল তাঁহাদিগের রোষে পতিত হইলেন—কারারুদ্ধ হইলেন। তিনি 'মাতৃপূজার' সব দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। কিন্তু তিনি 'সমাজ' 'আদর্শ,' 'পথ,' 'কর্ম্মক্ষেত্র,' 'পল্লীসেবা' প্রভৃতি পালায় গান ও কথার মধ্য দিয়া স্বদেশীর ও স্বদেশানুরাগের ভাব ছড়াইয়া দিয়াছেন। আজ তাঁহার পালাগুলি প্রায় সবই সরকার আপত্তিজনক মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

মুকুন্দলাল দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বরিশালে আনন্দময়ী আশ্রম ও বিদ্যালয় এবং রাধাগোবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠায় সমর্পণ করিয়াছিলেন—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়াছিলেন। তিনি গাহিয়াছিলেন, মা'র সন্তানের ভয় নাই—"ও পদ রাখিয়া বুকে হ'ব মরণ-জয়ী।"

হত্যাপ্রচেষ্টা—

যে সময় কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা সফল হইল এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহার মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় অনেকেই আশা করিতেছিলেন, দেশের সকল রাজনীতিক দল আবার একযোগে ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার-বিস্তৃতির চেষ্টা করিবেন, সেই সময় বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদীরা আবার আপনাদিগের অস্তিত্ব-পরিচয় প্রদান করিয়া বাঙ্গালাকে বিব্রত করিয়াছে। এ বার ঘটনার স্থান—বাঙ্গলা সরকারের গ্রীষ্মাবাস দার্জ্জিলিং; আক্রমণের উদ্দিষ্ট—বাঙ্গলার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্শন। দার্জ্জিলিং-এর ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্রে সার জন যখন অন্যান্য দর্শকের সহিত ঘোড়দৌড় দেখিতেছিলেন, তখন দুই জন বাঙ্গালী যুবক দুই দিক হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। গুলী তাঁহাকে আঘাত করে নাই—দূরে এক ইংরাজমহিলা সামান্য আঘাত পাইয়াছিলেন। গভর্ণরের রক্ষীরা গুলী চালাইলে দুই জন যুবক আহত হয় ও তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ঘটনাটি সমগ্র দেশে বিক্ষোভ ও বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে সার জনকে হত্যা করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি এ দেশে আসিয়া যে সব কাজ করিয়াছেন, সে সকলে তাঁহার রাজনীতি-কোচিত বুদ্ধির ও চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়।

এই সকল বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইবার কোন কারণ বাঙ্গালীর নাই।

তবে তিনি বাঙ্গালার শাসন-যন্ত্রের পরিচালক। সেই হিসাবে যদি তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা হয়—শাসন-পদ্ধতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে যদি লোক সেই পদ্ধতির পরিচালককে হত্যা করিতে চেষ্টা করে, তবে কোন্ সরকারের পরিচালকরা নিরাপদ? গণতান্ত্রিক সরকারও সর্ব্বদা সকলের সন্তোষ-বিধান করিতে পারে না। এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে অধিকাংশ ক্ষমতাই দেশবাসীর প্রতিনিধিদিগের দ্বারা পরিচালিত হইবে। তখন যে বিদেশীরাই আক্রমণের লক্ষ্য হইবেন, তাহা নহে; পরন্তু দেশের লোকই অধিক বিপন্ন হইবেন। ইতোমধ্যেও এ দেশের লোকই অধিক নিহত ও আহত হইয়াছেন। পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটীতে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদীদিগের দ্বারা নিহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুই অধিক।

অথচ এইরূপ হত্যা কেবল যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল নহে—প্রতিকূল, তাহাই নহে; পরন্তু ইহা নৈতিক হিসাবে নিন্দনীয় এবং আমাদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের বিরোধী। আমরা আদর্শভ্রষ্ট হওয়াতেই এই সন্ত্রাসবাদ সমাজে স্থান লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব—

শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায় জার্ম্মাণীর টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Fuel Technology-তে উচ্চতর গবেষণামূলক কার্য্য করিয়া ডক্টর অব ইঞ্জিনিয়ারী (Dr-Ing) ডিগ্রি লাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ডাক্তার দত্ত রায় ১৯২৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এস্ সি (M. Sc) ডিগ্রি লাভ করিয়া ঐ বৎসরই সুবিখ্যাত টাটার লৌহ কারখানায় রিসার্চ্চ কেমিষ্ট নিযুক্ত হন। উক্ত কারখানায় তিনি Low Temperature Carbonisation of coal, Recovery of Bye-products এবং Stock coal সম্বন্ধে নানাপ্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা করেন। অতঃপর বিগত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্ম্মাণীর Deutsche Akademine হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া Fuel Technology সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে গমন করেন। তথায় হেনোফের (Hannover) সহরের টেক্‌নিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশাঃ প্রফেসর ও টেক্‌নোলজিকেল ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ কেপলারের (Dr Keppcler) অধীনে ভারতীয় কয়লা সম্বন্ধে গবেষণামূলক কার্য্য করিয়া

উক্ত দেশীয় সর্ব্বোচ্চ ষ্টেট ডিগ্রি Dr-Ing লাভ করিয়াছেন। ভারতীয়দের ভিতর ইনিই সর্ব্বপ্রথম এই বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ডিগ্রি পাইয়াছেন। প্রফেসর ডাক্তার কেপলার ডাক্তার দত্তরায়ের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপন সহকারী (Assistant) হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেন। ডাক্তার দত্তরায় জার্ম্মাণীর আধুনিক উন্নততর বহু coke-ovens (কোক্ চুল্লী) ও Gas Works-এর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে কার্য্যকরী



শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়

অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছেন। ইয়োরোপে গমন করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার দত্তরায় "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিতেন—সুতরাং ভারতবর্ষের পাঠকদের নিকটও তিনি সুপরিচিত। তিনি দেশে ফিরিয়া পুনরায় টাটার লৌহ-কারখানায় যোগদান করিয়াছেন। ডাক্তার দত্তরায় মৈমনসিংহ জিলার একজন কৃতী যুবক। আমরা এই উদীয়মান যুবকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

সাহিত্যিকের সম্মান-লাভ—

আমাদের পরম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিদ্যোৎসাহী, দানবীর শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যভূষণ চন্দননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ফ্রান্সের উচ্চ সম্মান 'লেজিয়ঁ-দনার্' (Chevalier de la Legion d' Honneur) উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার জন্য 'অফিসিয়ে দাকেদেমি' (Officier d' academic) উপাধি পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সাহিত্যিকের এই সম্মান-লাভে বাঙ্গলা সাহিত্যও সম্মানিত হইয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত হরিহর বাবু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আরও অধিকতর সম্মান লাভ করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

বন্দীদিগকে শিক্ষার সুযোগ দান—

আজ বাঙ্গালায় শত শত যুবকযুবতী সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিনা বিচারে বন্দী হইয়া আছে। যে সরকার তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সরকারই বলিয়াছেন, বিনা বিচারে লোককে বন্দী করিয়া রাখা তাঁহাদিগের পক্ষে অপ্রীতিকর; কেবল অস্বাভাবিক অবস্থা-হেতু এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। সেই জন্যই সরকার সাধারণ ভাবে আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সহিত ইহাদিগকে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করেন না। এই বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতেছে—সরকার তাহাদিগকে সে সুযোগ দিয়া থাকেন। সংপ্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বহরমপুরে যে বন্দিনিবাস আছে তাহাতে সরকার আপাততঃ ১ শত ২০ জন বন্দীকে শর্ট-হ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটিং ও হিসাব রক্ষা শিক্ষা দিবেন। কলিকাতায় সরকারের যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, বন্দিনিবাসের ছাত্ররা সেই কমার্সিয়াল ইনষ্টিটিউটের নিয়মাধীন থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা লাভ করিবে। যদি শিক্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কেহ মুক্তি লাভ করে, তবে তাহার পর সে কলিকাতায় ঐ প্রতিষ্ঠানে তাহার শিক্ষা শেষ করিতে পারিবে। সরকারই ছাত্রদিগের পুস্তকাদি সরবরাহ করিবেন। এই ব্যবস্থার সংবাদে আমরা

সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার জন্য প্রাথমিক ব্যয় প্রায় ১২ হাজার টাকা হইয়াছে। আমরা আশা করি, বহরমপুরের বন্দিনিবাসের বন্দীরা এই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিবে এবং সরকারও অন্যান্য বন্দিনিবাসে এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলিব—যে সব ছাত্র শিক্ষায় অবহিত ও শিষ্টাচারী হইবে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তি প্রদানের বিষয়ও সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

পাট—

পাটের মূল্য হ্রাসে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বাঙ্গালা সরকার এই বিষয়ে যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে সমিতির সদস্যরা নানা মত প্রকাশ করায় তাঁহাদিগের অনুসন্ধানফলে নির্ভর করিয়া সরকার কোন কায করিতে পারেন নাই।

সংপ্রতি কৃষি গবেষণা সমিতি এ সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, ক্রীইমিয়ান যুদ্ধকাল হইতে পাটের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সেই যুদ্ধের সময় রুশিয়া হইতে শণ আমদানী বন্ধ হয়। তখন হইতে পাটের থলিয়া ও চটের ব্যবহার বাড়িয়া এখন ৯৪টি পাটকলে ৬০ হাজার তাঁত চলিতেছে। বাঙ্গালার কৃষক পাট বিক্রয় করিয়া কোন কোন বৎসর ৭০ কোটি টাকাও পাইয়াছে; অর্থাৎ বাঙ্গালীর গড় আয় পাট হইতে ১৫ টাকা হইয়াছে। গত ৩০ বৎসর পাটের দাম চড়িয়া আসিয়াছে;—

বৎসর	মণ-করা মূল্য
১৯০০—০৪	প্রায় ৪ টাকা
১৯০৫—০৯	„ ৫ „
১৯১০—১৪	„ ৬ „
১৯১৫—১৯	„ ৬ „
১৯২০—২৪	„ ৮ „
১৯২৫—২৯	„ ১০ „

১৯৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে—উৎপন্ন পাটের আধিক্য ও ব্যবসামন্দা হেতু দাম কমিতে আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর দাম—মণ-করা ৮ টাকা হইলেও তাহাতে লাভ ছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে দাম সাড়ে ৩ টাকা ও পরবৎসর ৩ টাকা ৪ আনা হয়। এই দামে পণ্যোৎপাদনের ব্যয়সঙ্কুলান হয় না।

পাট ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথাও উৎপন্ন হয় না এবং ভারতবর্ষে উৎপন্ন পাটের শতকরা ৯০ ভাগ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই মূল্যহ্রাসে ক্ষতি বাঙ্গালার।

অন্য কোন দেশ হইতে যে অন্য কোন দ্রব্য পাটের স্থান অধিকার করিতেছে তাহাও নহে এবং কৃত্রিম নীল যেমন স্বাভাবিক নীলকে স্থানচ্যুত করিয়াছে, এ ক্ষেত্রে তখনও হয় নাই। স্থানে স্থানে কাগজের থলিয়া ব্যবহারের চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা এখনও তেমন ভয়াবহ হয় নাই। সুতরাং পাটের মূল্য হ্রাসের কারণ—ব্যবসামন্দা হেতু চাহিদা হ্রাস।

ব্যবসা মন্দার পূর্ব্বে প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমীতে ১ কোটি গাইট পাট উৎপন্ন হইত—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৩৫ লক্ষ একর জমীতে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হয়। তখন ৪০ হইতে ৪৫ লক্ষ গাইট পাট রপ্তানী হইত এবং এ দেশের কলে ৫৫ হইতে ৬২ লক্ষ গাইট পাট ব্যবহৃত হইত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মোট ৩৮ লক্ষ ও পরবৎসর মোট ৩০ লক্ষ গাইট পাট রপ্তানী হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দেও ৩৫ লক্ষ গাইটের অধিক রপ্তানী হয় নাই। এ দেশের কলে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৬২ লক্ষ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৪৪ লক্ষ, পরবৎসর ৪১ লক্ষ ও ১ত বৎসর ৬২ লক্ষ গাইট পাট ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ৩০ বৎসর পাটের মূল্য যখন ক্রমেই বাড়িয়াছিল, তখন প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হইয়াছিল——এমন কথা বলা যায় না। তবে বর্ত্তমানে চাহিদার হ্রাস হেতু পাট-চাষ হ্রাস করা প্রয়োজন হইয়াছে। চাষ যে কমিয়াছে, তাহারও প্রমাণ আছে।

কেবল কথা—লোক ইচ্ছা করিয়া চাষ কমাইবে, না—আইন করিয়া তাহাদিগকে চাষ কমাইতে বাধ্য করা হইবে? আর পাট-চাষ হ্রাসে যে জমী "পতিত" হইবে তাহাতে কি চাষ করা হইবে? কারণ, ধান্যের মূল্যও যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে, তাহাতে ধান্যের চাষবৃদ্ধিতে যে লাভের সম্ভাবনা আছে, এমন নহে।

খেলাধূলা

কলিকাতায় ফুটবল ঃ—

ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে। এবার সকল দলের খেলাই আগের চেয়ে অনেকাংশে নিকৃষ্ট হচ্ছে। বিখ্যাত কলিকাতা দলের সে পূর্ব্ব খ্যাতি এখন গল্পে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ডালহৌসীরও প্রায় সেই দশা। তার কারণ মন্দা-ব্যবসা বাজারে তাঁরা বিলেত থেকে নূতন নূতন নামজাদা খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে পারছেন না। ভারতীয় দলদের অবস্থাও প্রায় সমান। যাহাও ছিল বাছাই খেলোয়াড়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়ায় দলগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মোহনবাগানের তিনজন ভালো খেলোয়াড় বিদেশে যাওয়ায় তাদের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনেক পড়ে গেছে। কে আর আরের সঙ্গে খেলায় তিন গোলে হেরে যাওয়ায় লীগ-বিজয়ী হবার আশা তাদের সুদূর পরাহত হ'য়েছে। মিলিটারীদের মধ্যে তিনবার লীগ-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ ডারহাম দলেরও সে শক্তি আর নেই। তাদের ভালো ভালো খেলোয়াড়রা এখনও লেবংএ থাকায় এ বছরের খেলায় তারা অনেক পেছিয়ে পড়েছে। কেবলমাত্র নবাগত মহমেডান স্পোর্টিং বেশ জোরের সঙ্গে খেলছে। এইরূপ ফরম্ শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারে তো তারাই প্রথম ভারতীয় লীগজয়ী দল হবে। তাঁরা দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উঠেই বেশ খেল্‌ছে। তবে বর্ষায় কি রকম খেলতে পারবে না দেখলে বিশেষ আশা করা যায় না। কলিকাতা দলের সঙ্গে খেলায় তারা অত্যন্ত খারাপ খেলে হেরে যায়। মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংএর দ্বিতীয় ম্যাচে মোহন-বাগান খুব ভাল খেলেছে। কিন্তু শেষে তাদের ব্যাকের সামান্য দোষে খেলা (১—১ গোলে) ড্র হ'য়ে যায়।



ইণ্ডিয়া বনাম গ্রেটব্রিটেন ম্যাচের খেলোয়াড়, রেফারি ও লাইন্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি। ইণ্ডিয়া এক গোলে জিতেছে —কাঞ্চন

সকলের sporting spirit নিয়ে খেলার মাঠে যাওয়া উচিত। কোনরূপ অশিষ্ট ব্যবহার প্রকাশ করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ। সে দিন যখন মহমেডান স্পোর্টিং গোল শোধ দেয়, একটি মুসলমান দর্শক খেলার মাঠের ভিতর মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের মাথার উপর একজোড়া জুতা ঘোরাতে থাকে; পরে সার্জ্জন তাড়া করলে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের দল গোল দিলে আনন্দ প্রকাশ করো, টুপি ছাতা ছোঁড়, চেঁচাও, হাততালি দাও—যা' ইচ্ছা করো তাতে

ক্ষতি নেই, কিন্তু বিপক্ষের প্রতি অপমান জনক ব্যবহার করা কাহারও উচিত নয়। আশাকরি, ভবিষ্যতে ঐরূপ অশিষ্ট ব্যবহার আর দেখতে পাবো না। এ পর্য্যন্ত মহমেডান



ডারহাম—মোহনবাগানের ম্যাচ। এক গোলে ড্র হ'য়েছে —কাঞ্চন

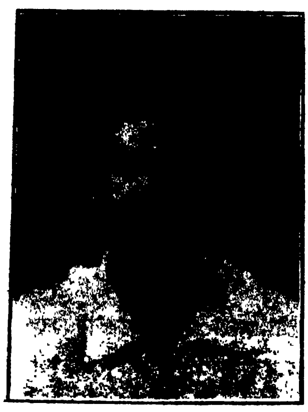
স্পোর্টিং বারটি ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট করে প্রথম ও মোহনবাগান বারটি ম্যাচ খেলে ১৫ পয়েন্ট করে দ্বিতীয় স্থানে আছে। গত দু'বছর ইষ্টবেঙ্গল দল দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উঠে লীগ প্রায় নিতে নিতে দু'বার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেই সন্তুষ্ট হয়েছিলো। এবার তাদের দল অত্যন্ত খারাপ খেলছে। তারা একজনও খেলোয়াড় বিদেশে পাঠায় নি, তবুও তাদের এরূপ খেলা দেখে সকলকেই হতাশ হতে হচ্ছে।

এদেশে ফুটবল খেলাও যেমন পড়ে গেছে, রেফারিং



হামিদ (মোহনবাগান)

টম্‌সন্ (কলিকাতা)



দুলাল (ইষ্টবেঙ্গল)

এর ষ্টাণ্ডার্ডও সেই রকম নেমে গেছে। এবার এর মধ্যেই রেফারিং সম্বন্ধে যে দু' একটি ব্যাপার ঘটেছে তাতে রেফারি এসোসিয়েশনের সুনাম রক্ষিত হয়নি। মোহন-বাগান ও কালীঘাটের খেলায় রেফারি মোহনবাগানের পক্ষে একটা গোল দেন না, কিন্তু বহু দর্শক যারা সেদিন ঐ গোলের নিকটে ছিলেন তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন যে বল গোল লাইন ছাড়িয়ে ভিতরে গিয়েছিল। শোনা যায় যে খেলা শেষে রেফারিকে ক্লাবের ষ্ট্যাণ্ড থেকে অপমানিত

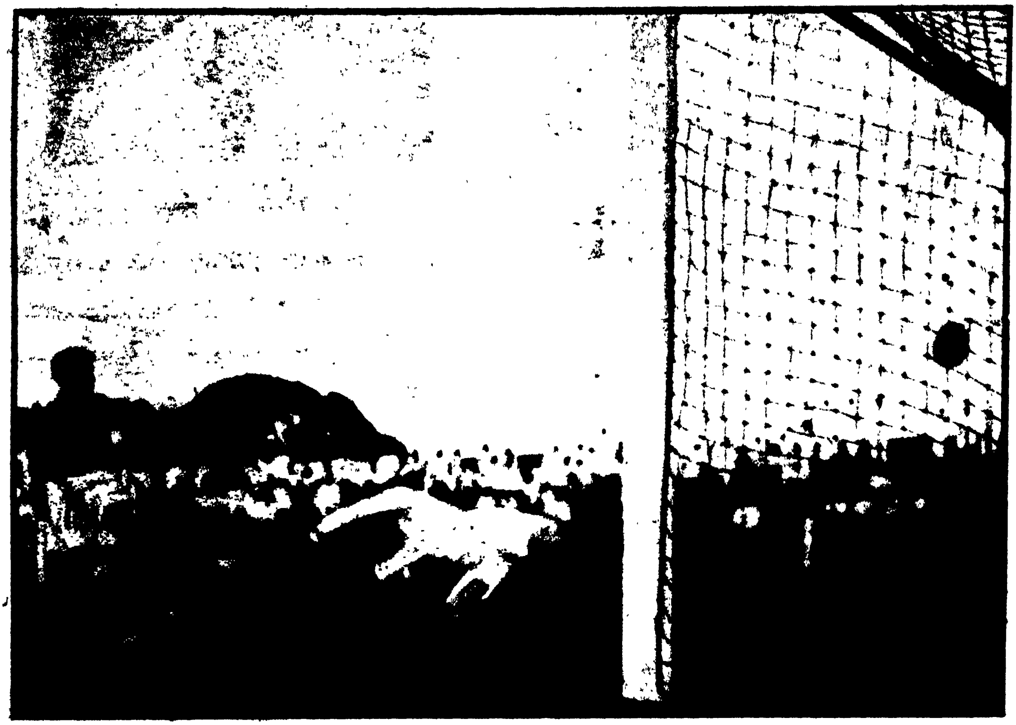


মোহনবাগান বনাম কাষ্টমস্। মোহনবাগান কাষ্টমস্‌কে গোল দিয়েছে —কাঞ্চন



মহমেডান স্পোর্টিং ও কে, আর, আরের খেলা। মহমেডান স্পোর্টিংএর গোলের সুমুখের দৃশ্য —কাঞ্চন

করতে চেষ্টা করা হয়। ইহা সত্য হ'লে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। সকলের sporting spirit নিয়ে খেলা ও খেলা-দেখা উচিত। ভুল চুক মানুষ মাত্রেরই হয়। বিলাতেও অবশ্য এ ব্যাপার যে না হয় তা' নয়। এই সেদিন সেখানে একজন রেফারিকে দর্শকরা থান ইট ছুঁড়ে এমন আহত করেছিলো যে পুলিস ডেকে তাকে রক্ষা করে পরে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। এ রকম ব্যাপার যাতে এখানে না ঘটে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখ্‌তে আমরা সকলকে অনুরোধ করি।



ইষ্টবেঙ্গল বনাম ডালহৌসী। মজিদ গোল দিয়েছে —কাঞ্চন

রেফারিং যাতে ভালো হয়, ভুল-চুক যাতে না হয় বা কম হয় তার জন্যে আই এফ্‌ এ বিশেষ চেষ্টা করছেন। তাঁরা দু'জন রেফারি প্রত্যেক খেলাতে নিযুক্ত করেছেন; যদিও বিলাতের ফুটবল এসোসিয়েশন ইহাতে মত দেন নি। এবং সেই জন্য মিলিটারী দলেরা দু'জন রেফারির অধীনে খেল্‌তে রাজী হয়নি। তাদের সঙ্গে খেলা ব্যতীত অন্য সকল লীগ খেলা দু'জন রেফারির অধীনে হচ্ছে।

ডারহাম্‌-ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় রেফারি ডারহামের বিরুদ্ধে কতকগুলি 'ফাউল' দেয়—অনেকের মতে ঐ সকল ধাক্কাধাক্কি সম্পূর্ণ আইন সম্মত ছিল। একটি গোল সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ ছিল। ডারহামের গোলরক্ষক গ্রে বল ধরবার পূর্ব্বে মজিদ তাকে 'চার্জ্জ' করে গোলের মধ্যে ঠেলে দেয়। রেফারি তখন গোল নির্দ্দেশ করে বাঁশী বাজায়। কিন্তু গোলের বদলে ইষ্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ফাউল দেওয়াই উচিত ছিল। রেফারিংএর আরো চমৎকারিত্ব এবারের প্রথম ইণ্টার-ন্যাসনাল ভারতবর্ষ বনাম গ্রেট বৃটেন ম্যাচে প্রত্যক্ষ হয়েছে। ঐদিনের রেফারি ছিলেন রেফারি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট পি গুপ্ত। গ্রেট বৃটেন দলের ইয়ং এত জোরে সুট করে যে বলটি ভারতবর্ষের গোলের ভিতরের লোহার ডাণ্ডায় লেগে খেলার মাঠে ফিরে এসেছে অধিকাংশ লোকেই মনে করে এবং উহা গোল বলে ধরে। কিন্তু রেফারি তখন মাঠের প্রায় মাঝে ছিলেন, সম্ভবতঃ না দেখতে পাওয়ায় গোল নির্দ্দেশ সূচক বংশীধ্বনি করেন না,

খেলা চলতে থাকে। লাইনস্‌ম্যান কর্পোর‍্যাল পিণ্ডার গোল সম্বন্ধে রেফারীকে বলাতেও প্রতিকার হয় নি। এই সকল



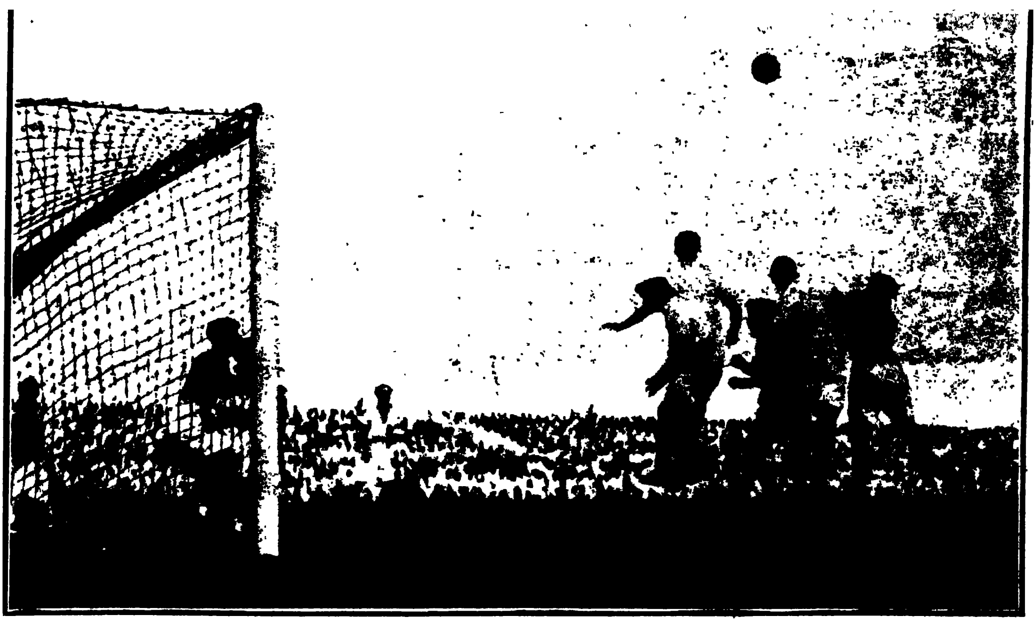
রসিদ (মহমেডান স্পোর্টিং)

ব্যাপার থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে দু'জন রেফারি হওয়া মন্দ নয়, তাতে রেফারিরা সর্ব্বদা বলের কাছে কাছে থাক্‌তে পারে; কিম্বা একজন রেফারি ও দু'জন গোল-জজ থাক্‌লেও চলে। ইতঃপূর্ব্বে গোল বাতিল হয়েছে নিয়মের ব্যতিক্রমহেতু, তাতে ভুলচুক হ'তে পারে। হয়তো অফ্‌-সাইড হয়নি, রেফারি মনে করেছে অফ্‌সাইড হ'য়েছে।



নূর মহম্মদ (ইষ্টবেঙ্গল)

কিন্তু এদিন গোল বাতিল হ'লো তার কারণ রেফারি দেখ্‌তে পাইনি বলে। এরূপ ক্ষেত্রে গোল-জজ থাক্‌লে বেশী কাজ হ'বে মনে হয়। এদিনের খেলাও ভাল হয়নি। কাগজে-কলমে ভারতবর্ষ দারুণ টীম ছিল, খেলায় কিন্তু তারা বিশেষ



মোহনবাগান ও কে আর আরের খেলায় মোহনবাগান গোল দিতে চেষ্টা করছে —কাঞ্চন

সুবিধা করতে পারে নি। বরঞ্চ গ্রেটবৃটেন তাদের টীমের তুলনায় ভালই খেলেছিলো। ভারতবর্ষের ফরওয়ার্ডের মধ্যে গুহ মোটেই খেলতে পারে নি। রসিদ পা জখম থাকায় খুঁড়িয়ে খেল্‌ছিলো সেইজন্য সেও সুবিধা করতে পারে নি। সৌম্যান অনেক সুবিধা নষ্ট করেছে। হামিদের স্থান বদলের জন্য খেলা খোলে নি। বল্‌তে গেলে ভারতবর্ষ বরাত জোরে জিতেছে। বৃটেনের পক্ষে গোলটি দিলে খেলার ফল কি হ'তো বলা যায় না। অন্তত পক্ষে ড্র তো হতোই। আলা কালার ইণ্টারন্যাসনাল খেলায় পূর্ব্বে অসম্ভব রকম ভিড় হ'তো, এবার ভিড় মোটেই হয় নি। এই সকল খেলার টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ দাতব্যে বিতরিত হয়, এবার অর্থ খুব অল্পই পাওয়া গেছে। রিজার্ভ টিকিট আরো অল্প বিক্রয় হ'য়েছে। যুরোপীয়রা অতি অল্প সংখ্যকই এ খেলায় উপস্থিত ছিলো।

দক্ষিণ আফ্রিকাগামী ভারতীয় খেলোয়াড় দল ঃ—

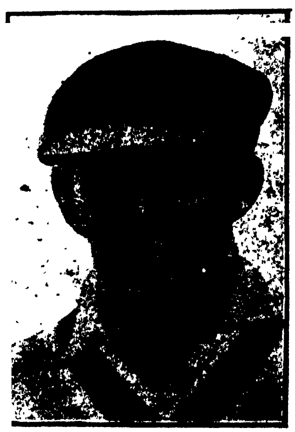
ভারতীয় বাছাই খেলোয়াড় দল ১২ই মে বোম্বাই মেলে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। খেলোয়াড়দের নাম ঃ—আমীর হোসেন, পি ব্যানার্জ্জী, এস দত্ত, এস্ এম্ নাসিম, অখিল আমেদ, এস চক্রবর্ত্তী, এন্ গুহ, এন্ বোষ, কে ভট্টাচার্য্য, এ গাঙ্গুলি, এস্ চৌধুরী ও পি কে মুখার্জ্জি (ম্যানেজার)। দু'জন বাঙ্গালোর খেলোয়াড় এল্ নারায়ণ ও রামান্না বোম্বাইতে গিয়ে পরে যোগদান করেন। জি পাল এই দলের ক্যাপটেন্ নির্ব্বাচিত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তিনি জ্বরে শয্যাগত থাকায় যেতে পারেন নি, তার বদলে দিল্লীর মহাম্মদ হোসেন গেছেন। সামাদ শেষ মুহূর্ত্তে পিছিয়ে যান, সে জন্যে তাঁকে আই এফ এর নিকট জবাবদিহি ক'রতে হয়েছিল।

ভারতীয় দল বোম্বাই ষ্টেশনে পৌছিলে প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন এবং জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়েছেন। সেখানে তাঁরা দু'টি ম্যাচ খেলেন। একটি বোম্বাইএর বাছাই ভারতীয় ইলেভনের সঙ্গে; সে খেলায় যদিও তাঁরা এক গোলে জয়ী হন, কিন্তু ভাল খেলা দেখাতে পারেন নি। কে ভট্টাচার্য্য নিজের দক্ষতায় ঐ একমাত্র গোলটি দেন। দ্বিতীয় খেলা হয় বোম্বাই মিলিটারী ইলেভনের সঙ্গে; এ খেলায় তাঁরা দুই গোলে হেরে যান, কিছুই খেলতে পারেন নি। সাগর পার হবার পূর্ব্বেই তাঁদের হার সুরু হলো। আশা করি, সেদেশে যেন তাঁরা এখানকার খেলার সুনাম রক্ষা করে জয়ী হ'য়ে আসতে পারেন।

ডারবানের ৬ই জুন তারিখের খবরে জানা গেল যে বাইশদিন সমুদ্রযাত্রার পর ভারতীয়দল সেখানে পৌছিলে দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষে মিষ্টার এ, ক্রাইষ্টফার ও ছয়শত ভারতীয় দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়েছেন। তাঁরা নাটাল কম্বাইণ্ড ইলেভনের সঙ্গে ৯ই তারিখে প্রথম ম্যাচ খেলবেন।

বিলাতে ক্রিকেট ঃ—

অষ্ট্রেলিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটিকে এক ইনিংস্ ও ১৬৩ রানে হারিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংসেই ৪৮১ রান করে, তার মধ্যে ডব্লিউ এইচ পনস্‌ফোর্ড (নট আউট্) ২২৯, সি ডার্লিং ৯৮ ও সি ব্রাউন ১০৫ রান করে। ডন্ ব্রাড্‌ম্যান্ ডেভিসের বলে আউট হ'য়ে যান—এক রানও করতে পারে নি। কেম্ব্রিজ প্রথম ইনিংস—১৫৮ এবং ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬০ রান মাত্র করতে পারে। বিলাতে অষ্ট্রেলিয়ার ইহা দ্বিতীয় জিত। বোলার সি ভি গ্রিমেট ৭৪ রান দিয়ে ৯ উইকেট নেয়।



এস জে ম্যাকক্যাব (অষ্ট্রেলিয়া)

অষ্ট্রেলিয়া বনাম এম সি সি খেলা সমতাভাবে 'ড্র' হয়। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ছয় উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) ৫৫৯ রান করে এম সি সি প্রথম ইনিংস ৩৬২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮২ (৮ উইকেট) করে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে, পনস্‌ফোর্ড (নট আউট্) ২৮১, ম্যাক্‌ক্যাব ১৯২ ও ব্রাডম্যান মাত্র ৫ রান করে। এম সি সির হ'য়ে

ই হেন্‌ড্রেন (মিডল্‌সেক্স) ১৩৯ রান করে। এই ইংরাজ খেলোয়াড়ই অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম শতাধিক রান করতে সক্ষম হলো। পরে আর ই এস্ ওয়্যাট ১৩২ রান করে।



চিপারফিল্ড (অষ্ট্রেলিয়া)

অষ্ট্রেলিয়া ও এসেক্স ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস্ ও ৯৩ রানে জেতে। সর্ব্বোচ্চ রান করে চিপারফিল্ড (১৭৫) অষ্ট্রেলিয়া—৪৩৮, এসেক্স—২২০ + ১২৫ মোট ৩৪৫।

অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার এক ইনিংস্ ও ৩৩ রানে জিত হয়। অষ্ট্রেলিয়া—৩১৯, সর্ব্বোচ্চ স্কোরার ডারলিং (১০০)। অক্সফোর্ড—৭০ + ২১৬; সর্ব্বোচ্চ স্কোর ১২৮ করে সিলোনের খেলোয়াড় ডি সারম্।



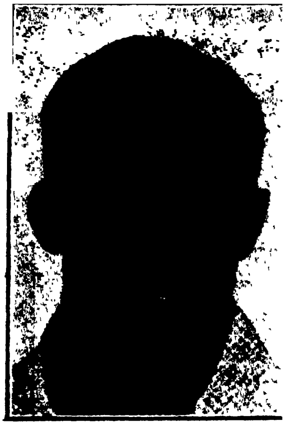
এইচ্ লারউড (নটস্)



ই পি হেন্‌ড্রেন্ (মিডলসেক্স)

হাম্‌সায়ারের সঙ্গে খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে আলো কমে যাওয়ার জন্যে বাধ্য হ'য়ে 'ড্র' করতে হয়। হাম্‌সায়ার—৪২০ + ১৬৯ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড); তন্মধ্যে—সি পি মীড ১৩৯, ডব্‌লিউ জি লাউনডেস্ ১৪০, আরনল্ড (নট আউট্) ১০৯ রান করে। অষ্ট্রেলিয়া ৪৩৩ + ১০ (১ উইকেট); চিপারফিল্ড (নট আউট্) ১১৬, ডারলিং ৯৬।

মিডলসেক্সের সঙ্গে ম্যাচে, অষ্ট্রেলিয়া ৩৪৫ + ২৯ (০ উইকেট) রান করে দশ উইকেটে জয়ী হয়; ডন্ ব্র্যাডম্যান ১৬০ রান করে। মিডল্‌সেক্স ২৫৮ + ১১৪; হেন্‌ড্রেন্ ১১৫ করে।



আর ই এস্, ওয়্যাট



আরনল্ড (হামসায়ার)

সারে বনাম অষ্ট্রেলিয়ার খেলার ফল ড্র হ'য়েছে। সারে ৪৭৫ (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) + ১৬২ (২ উইকেট); এ স্যাণ্ডহাম ২১৯, আর জি গ্রেগরী ১১৬, জ্যাক্ হব্‌স্ মাত্র ২৪। হব্‌স্ অল্প দিন হ'লো তার জীবনে ১৯৭ বার শত-রান এবং স্যাণ্ডহামের অংশীদার হ'য়ে ৬৪ বার শত-রান পূর্ণ করলে। অষ্ট্রেলিয়া ৬২৯ রান এক ইনিংসে—তার মধ্যে ম্যাক্‌ক্যাব ২৪০ রান স'ছ'-ঘণ্টায়, পনস্‌ফোর্ড ১২৫ ও ব্র্যাডম্যান ৭৭ রান করে।

লাঙ্কাসায়ারের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়াকে ড্র করতে হ'য়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ৩৬৭ + ৩৩৮, লাঙ্কাসায়ার ২৮৫। ট্রায়াল টেষ্ট ম্যাচ খেলাইংলণ্ড বনাম রেষ্ট ২রা জুন তারিখে আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড ৪ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) ৪৭২ রান করে। রেষ্ট—প্রথম ইনিংস—২৩৮ ২১৮ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৭ রান করে। ইংলণ্ডের জিততে মাত্র ১৮ রানের দরকার ছিলো, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ রান (০ উইকেটে) করে তারা দশ উইকেটে জয়লাভ করে। ওয়্যাট ক্যাপ্‌টেন ছিলেন, তিনি ৪৭ রান করে আহত হয়ে চলে যান। দ্বিতীয় দিনও তিনি খেলায় যোগদান করতে না পারায় নবাব পতৌদী ক্যাপ্‌টেন হন। তিনি (নট্ আউট) ১৫২, এইম্‌স্, (নট্ আউট) ১৪৬ রান করেন। রেষ্টের পক্ষে ভ্যালেন-টাইন্ (নট্ আউট) ১০৪ রান করেন।

পূর্ব্বের টেষ্ট খেলার ফলাফল ঃ

	খেলা	জিত	ড্র
অষ্ট্রেলিয়া	১২৯	৫১	২৭
ইংলণ্ড	১২৯	৫১	২৭

গতবারে ইংলণ্ড জয়ী হ'য়েছিলো।

৮ই জুন তারিখ হইতে ট্রেণ্ট ব্রীজ নটিংহামে, ১৩০শ টেষ্ট ম্যাচ খেলা ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে।

আর ই এস ওয়্যাট ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। আহত আঙ্গুলের জন্য খেলতে না পারায় তাঁর স্থলে সি এফ্ ওয়ালটার্স ক্যাপ্টেন হলেন।

প্রথম টেষ্টের নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ—

অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে ;—	ইংলণ্ডের পক্ষে ;—
ডব্লিউ এম্ উডফুল (ক্যাপ্টেন্),	সি এফ্ ওয়ালটার্স (ক্যাপ্টেন),
ডব্লিউ এইচ পনসফোর্ড,	এইচ সাট্‌ক্লিফ্,
ডন্ ব্রাডম্যান,	নবাব পতৌদী,
ডব্লিউ এ ব্রাউন,	ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড,
এস জে ম্যাককাব,	ই পি হেনড্রেন,
এল এস ডারলিং,	এম্ লেল্যাণ্ড,
এ জি চিপারফিল্ড,	এল ই জি এইমস,
ডব্লিউ এ এস ওল্ডফিল্ড,	এইচ ভেরেটি,
টি ডব্লিউ ওয়াল,	কে ফারনেস,
সি ভি গ্রিমেট,	জি গিয়ারী,
ডব্লিউ জে ও'রিলী,	টি বি মিচেল,
ই এইচ ব্রোমলি (দ্বাদশব্যক্তি)	এম এস নিকলস (দ্বাদশব্যক্তি)

ইংলণ্ডে এবারের টেষ্ট ম্যাচ খেলার স্থান ও কাল—

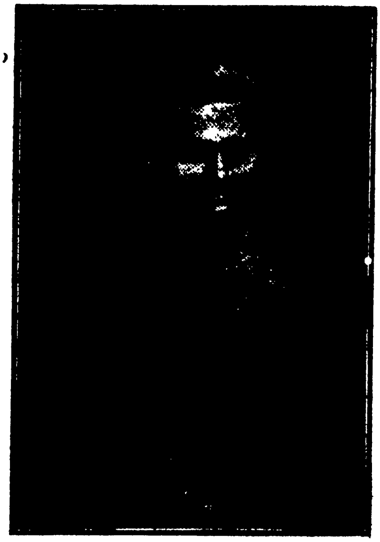
প্রথম টেষ্ট	নটিংহাম	জুন ৮, ৯, ১১, ১২।
দ্বিতীয় টেষ্ট	লর্ডস	জুন ২২, ২৩, ২৫, ২৬।
তৃতীয় টেষ্ট	ম্যানচেষ্টার	জুলাই ৬, ৭, ৯, ১০।
চতুর্থ টেষ্ট	লীডস	জুলাই ২০, ২১, ২৩, ২৪।
পঞ্চম টেষ্ট	ওভাল	আগষ্ট ১৮, ২০, ২১, ২২।

সন্তরণ নিপুণা বালিকা ঃ

বাঙ্গালোর নগরের সৌবাইরাম্মা দশ বছর বয়সের মেয়ে। সে কেম্পাসবুদি পুষ্করিণীতে অবিরাম ১৮ ঘণ্টা সন্তরণ করেছে। কলিকাতায় আট বছরের মেয়ে কুমারী খাণ্ডেলওয়ালা ১৫ ঘণ্টা সাঁতার কেটেছিল,—১৮ ঘণ্টা সাঁতার কেটে এ মেয়েটি তাকে হারিয়ে দিয়েছে।

শরীরচর্চ্চায় বাঙ্গালী ঃ

মণি রায় বাল্যকালে খুব রোগা ছিলেন। ১৪।১৫ বৎসর বয়স থেকে বড় বড় ব্যায়ামবীরদের ছবি সামনে রেখে তিনি ব্যায়াম করতে অভ্যাস করেন। 'প্যারালাল-বারের' উপরই তাঁর ঝোঁক বেশী ছিল। বিখ্যাত মাংস-



মনিরায়

পেশী সঞ্চালনকারী শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ঘোষের শিক্ষায় তিনি 'প্যারালালবার' খেলায় বাঙ্গলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন তাঁর খেলায় মুগ্ধ হয়ে একটি সার্টিফিকেট দিয়াছেন। ৮।৬।৩৪

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "সায়াহ্ন"—১৷৹

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পথ বিজন"—২৲

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত গল্পের বই "সঙ্কেতময়ী"—২৲

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "সূর্য্য মুখী"—১৷৷৹

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পাষাণ পুরী"—১৷৷৹

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত "পতিব্রতা"—১৷৹

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কুন্দনন্দিনী"—১৲

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "থিয়েটার দেখা"—১৲

রায় সাহেব কৃষ্ণলাল রায় প্রণীত উপন্যাস "পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত"—১৷৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "যাঁতার যাতনা" ৸৹ ও বর্ণচোরা মাণিক"—৸৹

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী প্রণীত গানের বই ও স্বরলিপি "উদয়প্রকাশ"—৷৹

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত "সন্ধি"—২৷৹

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, Cornwallis Street, Cal.





শ্রাবণ—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

রূপসনাতনের জাতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

শ্রীমদ্ভাগবতের লঘুতোষিণী টীকার উপসংহারে রূপসনাতনের ভ্রাতৃষ্পুত্র শ্রীজীব স্বীয় বংশের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। এ জন্য রূপসনাতনের জাতি সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে তাঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছ অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা নিজদিগকে পতিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন; ইহা তাঁহাদের দৈন্য ও বিনয়ের পরিচায়ক। কিন্তু এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কেহ যদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কুকর্মবশতঃ জাতি হইতে পতিত হয়েন, অথবা নিজকে পতিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি "নীচবংশে জন্ম" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারেন না,—তাঁহাকে বলিতে হইবে "আমার ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, কিন্তু কুকর্ম করিয়া আমার জাতিনাশ হইয়াছে।" বিনয়বশতঃ সাধুপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ নিজদের আচরণের অযথা নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু "নীচবংশে জন্ম" বলিতে পারেন না। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে সনাতন একাধিক স্থলে "নীচ জাতি" "নীচবংশে জন্ম" বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে আমরা নিম্নলিখিত অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

> সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা।
> পাদেভাগে সনাতন, কহিতে লাগিলা॥
> "মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
> একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥"
> বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
> কণ্ডু ক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥

তাহার পরেই আছে,—

> ভক্তগণ লৈয়া প্রভু বসিলা পিণ্ডার উপরে।
> হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডার তলে॥

ঐ পরিচ্ছেদেই কিঞ্চিৎ পরে আছে,—

"নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম অন্যায় যত মোর কুলধর্ম॥"

* * * *

পুনশ্চ,—সনাতন বলিতেছেন,—

"সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার"

* * * *

"সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়॥"

(সনাতনের উক্তি)

কেবল যে সনাতন 'নীচবংশে জন্ম' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন, যে, ইঁহারা নীচজাতি হইতে উৎপন্ন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে আছে, শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় যখন প্রয়াগে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি বল্লভভট্টের সহিত রূপ এবং রূপের ভ্রাতা অনুপমের আলাপ করাইয়া দেন। তখন বল্লভভট্ট রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। কিন্তু তাঁহারা দূরে সরিয়া গেলেন, বলিলেন "আমরা অস্পৃশ্য, আমাদিগকে ছুঁইবেন না।" শ্রীচৈতন্যদেব ভট্টকে বলিলেন, "ইঁহাদের জাতি অতি নীচ, আপনি কুলীন ব্রাহ্মণ, ইঁহাদিগকে স্পর্শ করিবেন না।"

"ভট্ট মিলিবারে যায় দোঁহে পলায় দূরে।
"অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইহ মোরে॥"
ভট্টের বিস্ময় হৈল প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তার বিবরণ॥
"ইহা না স্পর্শিহ ইহা জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ।"

বাস্তবিক ইঁহারা নীচজাতি না হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন ইঁহাদিগকে নীচজাতি বলিবেন?

কিন্তু যদি তাঁহারা সত্যই নীচ জাতীয় ছিলেন, তাহা হইলে শ্রীজীবগোস্বামী কেন বলিলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন? আমার বোধ হয় এ সমস্যার এই ভাবে সমাধান করা যায় যে, রূপসনাতনের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পিতা অথবা পিতামহ কেহ অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা অন্য কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহাদের বংশধরগণ আর নিজেদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন নাই। রূপসনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের নাম—দবীর খাস এবং সাকর মল্লিক,—এই অনুমান সমর্থন করিতেছে।

রূপসনাতনের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্বে পিরালি খাঁ নামক একজন মুসলমান পীরধর্ম প্রচারার্থ যশোহর জেলায় আসেন। রূপসনাতনের পিতা এই সময় যশোহর জেলায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ তিনি পিরালি ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে যবন হরিদাসও সম্ভবতঃ পিরালি ছিলেন। হরিদাসের পিতার নাম ছিল মনোহর চক্রবর্ত্তী। হরিদাসের পিতার মৃত্যু হইলে হরিদাসের মাতাও সহমৃতা হন। শিশু হরিদাস যবনের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হরিদাসের পিতা পিরালি হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার হিন্দু আত্মীয়গণ শিশু হরিদাসের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখা যায় যে, রূপ ও সনাতন হরিদাসের সহিত বাস করিতেন, একত্র বসিতেন, একত্র আহার করিতেন,—শ্রীচৈতন্যদেবের অপর ভক্তগণের সহিত একত্র বসিতেন না, একত্র আহার করিতেন না। রূপসনাতন যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হইতেন তাহা হইলে হরিদাস তাঁহাদের সহিত একত্র আহার-বিহার করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না,—যেমন হরিদাস শ্রীচৈতন্যদেবের অপর উচ্চবংশসম্ভূত ভক্তদের সহিত একত্র আহার-বিহার করিতে রাজি হন নাই। রূপ, সনাতন, হরিদাস তিনজনে একত্র আহার-বিহার করিতেন; ইহা হইতে অনুমান হয়, তাঁহাদের জাতি এক ছিল।

যশোহরের চাণ্টে পরগণায় পিরালিবংশ এখনও আছে। ব্রাহ্মণ মুনি ধোপা প্রভৃতি সব জাতি এই পিরালি জাতির মধ্যে আছে। গোমাংস ঘ্রাণ করিয়া পিরালি জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, এই মত যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাহা হইলে মুচি পিরালি হইবে কেন? বোধ হয় পিরালি খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে, হিন্দুদের জাতিভেদ রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিলে, সেরূপ চেষ্টা অধিক সফল হওয়া সম্ভব।



পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

(৪)

কিন্তু ইন্দুমতী দাদাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই জ্যোৎস্নাময়ী স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িলেন।

সৌরীন বাবু তখন চোখে চশমা আঁটিয়া বই পড়িতেছিলেন। পড়াশোনায় ঝোঁক তাঁহার অসম্ভব। সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা প্রবন্ধ পড়িয়া তিনি বিধিমত ভাবিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেখানে ছিল, "বর্ত্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। এক দিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে, অন্য দিকে ধনের সন্ধান, ধনের অভিমান, ভোগবিলাস সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় দান করে।......

আজ পল্লী আমাদের আধমরা, যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পুরো বেঁচে তবে ভুল হবে, কেন-না মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।"

সেইখানটা তিনি লাল নীল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের দুরবস্থা এবং সমস্যার কথা ভাবিয়া মন যখন তাঁহার ভারাক্রান্ত, ব্যথিত, তখনই জ্যোৎস্নাময়ী অন্যমনস্ক স্বামীর কানের কাছে ইন্দুমতীর প্রস্তাবের কথাটা বারংবার কহিতে লাগিলেন।

মেয়েদের অবিচলিত ধৈর্য্যের কাছে পুরুষের অন্যমনস্কতা কতক্ষণ টিঁকিয়া থাকিতে পারে। অবশেষে সৌরেন্দ্রমোহন সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করিয়া বোধগম্য করিয়া কহিলেন, "তা কি করে হবে? যত ভালো পাত্রই হোক তাদের বাড়ী তো সেই পল্লীগ্রামে। মস্ত জমীদার হ'লেও কি শিশির পল্লীগ্রামে যেয়ে থাকতে পারবে?"

কিন্তু, বলিয়া ফেলিয়াই তাঁহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বের পড়া সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষির মর্ম্মস্পর্শী মধুর কয়েকটি কথা মনে পড়িয়া গেল, "......আজ পল্লী আমাদের আধমরা; যদি এমন কল্পনা করে আশ্বাস পাই যে, অন্তত আমরা আছি পূরোপূরি বেঁচে তবে ভুল হবে। কেন-না মুমূর্ষুর সঙ্গে সজীবের সহযোগ মৃত্যুর দিকেই টানে।"

কিন্তু......কিন্তু কাগজে কলমে যত গভীর সমবেদনা, যত মনঃক্ষোভ প্রকাশ পাক, সত্য সত্যই বাস্তব জীবনে স্নেহের আধার পুত্র কন্যার ভবিষ্যৎ যখন ভাবিতে হয়, তখন সে সমস্ত কথা মনে রাখা যায় কি? তাই নিজেরই একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত আপোষ করিয়া লইবার জন্য তিনি পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না না, ঠিক সে কথাও হচ্ছেনা। কিন্তু শিশিরের বিয়ের কথা আপাততঃ আমি মোটেই ভাবছিনে। বেশ তো, পড়ছে পড়ুক না।"

জ্যোৎস্না রাগ করিয়া কহিলেন, "বেশ তো, পড়ছে পড়ুক না! এত পড়ে শুনে ওর হবে কী শুনি? এদিকে

মেয়ের বয়স পনের ছাড়িয়ে ষোলয় পড়েছে। বিয়ে আর কত দেরী করে দেবে?"

এ সেই মেয়েদের চিরন্তন তর্ক! এ তর্কের কোন সোজা পথও নাই, কোন কূল-কিনারাও নাই। যুক্তি-তর্কের সোজা পথে এ চ'লেনা এবং যখন কোন যুক্তিরই পালে জোর থাকেনা তখন অশ্রুজলের বর্ষণে প্রতিপক্ষের সমস্ত আপত্তিকেই এক নিমেষে ডুবাইয়া দেয়।

এখনও ঘটিল তাহাই। সৌরেন্দ্রমোহন গুছাইয়া, যুক্তি দিয়া অন্য দেশের মেয়েদের সহিত তুলনা করিয়া দু পাঁচ কথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভরাডুবি হইল। তখন তিনি নিরস্ত হইয়া কহিলেন, "মস্ত বড়লোক সে কথা চারশো বার শুনলুম। কিন্তু ছেলেটি কেমন? আর কতদূর লেখাপড়া শিখেচে? বলি আমাদের দেশের মস্ত বড়লোকের ছেলেদের মত নন্দদুলালের দ্বিতীয় সংস্করণটি নয় তো?"

"কেন তুমি কি সুবোধকে দেখনি? ঠাকুরঝিকে রাখতে এসেছিল? তাকে দেখে কী মনে হয়?"

"সুবোধ!"

"সুবোধ নয় তো কে?"

তখন সৌরেন্দ্রমোহনের স্মরণ হইল, কিছুদিন আগে একটি সুশ্রী যুবক সোণার চশমা পরিয়া তাঁহার পড়িবার ঘরে আসিয়া বসিত, তাঁহার সহিত নানাবিধ আলাপ আলোচনা করিত। তাহার সহিত কথা বলিয়া সুখ আছে। তাহার সঙ্গে কথা বলা মনের পক্ষে আনন্দময় অবাধ সঞ্চরণ। যে বিষয়েই কথা ব'ল, তাহার কাছে কিছু না কিছু নূতন তথ্য পাওয়া যাইবে। তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কিন্তু সুবোধকে দেখে তো মস্ত বড় জমিদারের ছেলে ব'লে মনে হয় না!"

"জমিদারের ছেলের সম্বন্ধে তোমার ধারণার প্রশংসা করতে পারিনে।"

সৌরেন্দ্রমোহন ভাবিতে বসিলেন। সুবোধকে ভবিষ্যৎ জামাতা রূপে কল্পনা করিতে তাঁহার কষ্ট হয়না। সুবোধের মত যথার্থ শিক্ষিত উদার স্বামীর সহিত শিশিরের মত মেয়ের জীবন যদি যুক্ত হয়, তবে তাহাদের মিলিত শক্তি দিয়া হয় তো কত কাজ হইতে পারে। হয়তো পল্লীর কত অজ্ঞান, কত অন্ধকারই না বিদূরিত হইতে পারে।

"মা, একদিন মাধবীকে নেমতন্ন করনা। আমি তাদের বাড়ী গেলে মাসীমা কোনদিনই না খাইয়ে ছাড়েননা" শিশির মায়ের কাছে অনুরোধ করিয়া কহিল। সেদিন কলেজের ছুটি ছিল। শিশিরের মা বলিলেন, "বেশ তো, আজই করনা।" শিশির তখনই খুসী হইয়া তাড়াতাড়ি নিমন্ত্রণচিঠি লিখিয়া বেয়ারার হাতে মাধবীদের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ।

কিন্তু বাড়ীর গোকুল চাকরটার কয়েক দিন হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল। দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পরে বেয়ারাটা কম্বল মুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া জানাইল, তাহারও বোখার আসিয়া গিয়াছে। অতএব সে ফলমূল কিনিতে এখন বাজারে যাইতে পারিবেনা। কোন গতিকে একটু শুইয়া পড়িতে পারিলে বাঁচে।

উড়ে বামুনটা ব্যাপার দেখিয়া বাজারের পয়সা লইয়া বাজার করিতে গিয়া অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। বেলা পাঁচটা বাজে, ছ'টা বাজে, তাহার আর দেখা নাই।

জ্যোৎস্নাময়ী ভাবিত হইয়া বলিলেন, "আজই আবার তোর বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে বসলি,—কি করে যে কি হবে আমি তো ভেবে পাইনে।"

ইন্দুমতী জাঁক করিয়া কহিলেন, "অত ভাবনা কিসের বউ। আমাদের শ্বশুরবাড়ীতে অমন খাওয়ান-দাওয়ান, দহরম-মহরম রাতদিন লেগে আছে। পোলাও পরমান্ন রেঁধে যজ্ঞির লোককে খাইয়েছি। তোমাদের এই শিশিরের বন্ধু একফোঁটা মেয়েকে আর এখন খাওয়াতে পারবনা?"

মুখে তিনি একাধারে ভরসা এবং আশ্বাস দুই-ই দিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল—এত যে মুখের বচন তাঁহার কোন কাজেই আসিলনা। ঝি দু'টা চুল্লিতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। আগুন জ্বলিয়া যাইতেছে—তিনি সম্মুখে একটা কাঠের চৌকি পাতিয়া হাঁক ডাক করিতেছেন, "পোলাও হবে না কী হবে বৌ? পোলাওয়ের চাল কই? কিসমিস পেস্তা বাছা হয়েছে রে? ওরে শিশির, এক ভরি জাফরাণ চাই। কই তোদের যে দেখছি কিছুই জোগাড় নাই। খামোখা আমাকে ডেকে আনলি। মিছিমিছি আগুন তাতের সামনে ব'সে আমার মাথাটা গেল ধরে।"

চৌকি হইতে উঠিয়া তিনি পাখার তলায় আসিয়া বসিলেন। শিশির আসিয়া মাকে বলিল, "তাহলে আমি ষ্টোভটা ধরিয়ে খানকতক লুচি ভেজে নিই, আর……আর কী হবে? সেদিনের গোটাকতক ডিম ছিলনা? কোথায় আছে বল শীগ্‌গির, বার করে নিয়ে আসি। এদিকে আবার মাধবীর আসবার সময় হয়েছে। হয়তো এখনই এসে পড়ল ব'লে।"

শিশিরের মা হতাশ হইয়া কহিলেন, "ডিম, ডিম কোথায় আছে তা তো আমি জানিনে। ও-সব বেয়ারাটা জানতো।"

শিশির অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ষ্টোভটা পাড়িয়া জ্বালিবার উদ্যোগ করিতে গিয়া প্রথমতঃ কোথাও স্পিরিট খুঁজিয়া পাইলনা। তাহার পর স্পিরিট্ যদি বা পাইল, কখনো জ্বালা অভ্যাস নাই, ঢালিতে গিয়া অনেকটা পড়িয়া গেল। পাম্প করিতে গিয়া দেখা গেল পোকার না দেওয়ার দরুণ ষ্টোভ কোনমতেই জ্বলিতেছেনা। যখন অবস্থা এইরূপ সঙ্গীন, তখন বাড়ীর দুয়ারের কাছে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ পাওয়া গেল এবং পরক্ষণেই সহাস্যমুখে মাধবী প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কী হচ্ছে গো? আ, সর্ব্বনাশ! অত করে ষ্টোভটায় পাম্প করে তেল ওঠাচ্ছিস কেন? সর সর, আমি ঠিক করে দিই। কিন্তু কী ব্যাপার ঘটেচে বল দেখি?"—মাধবী সকৌতুকে প্রশ্ন করিল।

"তেমন কিছু অবশ্য হয়নি—" শিশির হাতের ষ্টোভের কালির দাগ মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমাদের চাকর আর বেয়ারার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, আর নতুন উড়ে বামুনটা এত জ্বরের ছড়াছড়ি দেখে ভয় পেয়ে সরে পড়েছে।"

"তাই বুঝি তুই বসে বসে ভাবছিলি, আজই মাধবীকে নিমন্ত্রণ করে কি বিপদেই পড়া গেছে।"—মাধবীর কলঝঙ্কৃত হাস্যে গৃহতল মুখরিত হইয়া উঠিল।

শিশির লজ্জিত হইয়া মুখে না হউক মনে মনে স্বীকার করিল যে তাহার ভাবনার ধারাটা অনেকটা এই পথ বাহিয়াই চলিয়াছিল।

"তাতে কী হয়েছে রে?—" মাধবী হাসিয়া বলিতে লাগিল, "আমাদের বাড়ীতে যে বারোমাসই রাঁধবার জন্যে কোন লোক রাখা হয়না। আর ঠিকা ঝিটা তো মাসের মধ্যে অমন পনের দিন কামাই করতে পারলে আর কিছু চায়না। তাই বলে কি আমাদের দিন চ'লেনা? না বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে আমি খাওয়াইনে?"

তাহাদের দিন যে কত ভালো করিয়া চলে এবং কী সুন্দর কী শৃঙ্খলাবদ্ধই না সে দিন চলিবার রীতি, তাহা শিশিরের মনে পড়িয়া গেল। চোখের সুমুখে তাহার ভাসিয়া উঠিল শিশিরের মায়ের রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, খাইবার ঘরের পরিচ্ছন্ন পরিপাটি মনোহর রূপ।

দেখিবামাত্র এক নিমেষে পরম পরিতৃপ্তিতে সারা মন ভরিয়া ওঠে। আর গৃহকর্ম্মনিরত তাঁহার স্নিগ্ধ মুখের প্রশান্তি যেন কল্যাণপরিপূর্ণ বাণীর মত। অথচ মাধবীর কাছে শুনিয়াছে তিনি তাঁহার ছাত্রী-জীবনে ইংরেজীতে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন। মাধবী নিজেও অনুক্ষণ গৃহের কতরকম কাজই না করে। কিন্তু সে'ও প্রাইভেটে আই-এ পড়িতেছে এবং এখানকার হাইস্কুলের মেয়েদের পড়ায়।

শিশিরের মনে এতকাল অবধি একটা ধারণা ছিল এবং গর্ব্ব ছিল যে সে কলেজে পড়ে এবং সে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নূতনতম বই পড়ে। তাহার মত গভীরচিন্ত, তাহার মত চিন্তাশীলা দৈবাৎ দুই একটা দেখা যায়। তাহার চিন্তার যেখানে বিহার সেটা খুব উচ্চতম স্তর। সেখানে সেই মহাব্যোমের অতলতায় কেবল উনপঞ্চাশ বায়ুর আনাগোনা, সেখানে জগতের যত স্বপ্ন যত ভাব যত আদর্শ। সে কি এই কল্পলোক হইতে তুচ্ছ ভাঁড়ারঘর রান্নাঘরের সীমানায় নামিয়া আসিতে পারে? খাওয়া এবং খাওয়ান আর আহারের সর্ব্ববিধ আয়োজন করা, সে তো নিতান্ত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা, এমন কি, পশুতেও করে। ইহার মধ্যে আছে কি? কিন্তু আজ যখন পরের বাড়ীর মেয়ের সম্মুখে তাহার এই দিকের অক্ষমতার লজ্জা দুস্তর হইয়া দেখা দিল, তখন ইহাকে যেন সে নূতন করিয়া দেখিতে পাইল। মাধবী ততক্ষণে ষ্টোভ ধরাইয়া চায়ের কেৎলিতে জল ভরিয়া চড়াইয়া দিয়াছিল। বলিল, "তোদের খাবার ঘরের কাবার্ডটা আমাকে দেখিয়ে দেনা। আমি চট্‌পট্ সমস্ত ক'রে ফেলি।"

খাবার ঘরের কোণের দিকে একটা তারের আলমারী মত ছিল বটে, কিন্তু সে সমস্তই বেয়ারার তত্ত্বাবধা

থাকিত। তাহার মধ্যে কি ছিল বা না ছিল শিশির কোনদিন খুলিয়া দেখে নাই। মাধবীর কথায় খুলিয়া দেখিল খানিকটা শুক্‌নো রুটি এবং গোটা দুই ডিম ছা'ড়া খাইবার মত অপর কোন বস্তুর অস্তিত্ব তাহাতে নাই।

ডিম দু'টা ভাঙ্গিতে দেখা গেল বোধ করি অনেক দিন হইতে আনিয়া রাখার দরুণ সে দু'টা পচিয়া গিয়াছে।

মাধবীর সম্মুখে শিশির বিস্মিত অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। কিন্তু মাধবীর অপরিমিত আনন্দের প্রবাহ যেন কিছুতেই দমিতে চাহেনা, কোন মিথ্যা সঙ্কোচ বা অভিমানও যেন তাহার বিন্দুমাত্র নাই। সে হাসিয়া বলিল, "বেশ তো, কাবার্ড যদি ফেল করেচে ভয় কি, তোদের ভাঁড়ার ঘর আছে নিশ্চয়, সেইটে আমাকে দেখিয়ে দেনা। দু'জনে মিলে সব ক'রে নেব। কতক্ষণ যাবে? এই তো তোদের কয়লার উনুন জ্বলছে। বাঃ, তা হলে আর ভাবনা কি? অর্দ্ধেক কাজই তো হয়ে রয়েচে।"

তাহার পরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মাধবী শিশিরকে সঙ্গে লইয়া লুচি, ভাজা, তরকারী, কপির ডালনা, চাট্‌নী সমস্ত তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। শিশির অবশ্য তেমন সাহায্য কিছুই করিতে পারে নাই। এ সকল কাজ সে কখন করেও নাই এবং এ সকল কাজে তাহার অনভিজ্ঞতা অপরিসীম। সে শুধু অবাক হইয়া মাধবীর ক্ষিপ্র নিপুণতা দেখিতেছিল। এত কাজ একসঙ্গে এমন করিয়া গুছাইয়া সে আর কখনো কাহাকেও করিতে দেখে নাই। আর সুমুখে বসিয়া কেহ যে ঠিক এতখানি মমতা উদ্বেগ এবং আকুলতা লইয়া কাহাকেও খাওয়াইতে পারে এ খবরও তাহার জানা ছিলনা। তাই টেবিলের উপর শুভ্র আচ্ছাদন পাতিয়া মাধবী যখন কাঁচের ডিশ নিজের হাতে ধুইয়া তোয়ালে দিয়া সযত্নে মুছিয়া সর্ব্ববিধ আহার্য্য বস্তু সাজাইল এবং পেয়ালায় পেয়ালায় চা ঢালিয়া বাড়ীর সকলকে লইয়া হাসি এবং আনন্দ ও গল্পের স্রোতে মগ্ন হইয়া খাইতে বসিল, তখন সর্ব্বদিকে তাহার দৃষ্টি দেখিয়া শিশির অবাক হইয়া গেল।

প্রত্যেককেই সে অত্যন্ত স্নেহ এবং সতর্কতার সহিত পরিবেষণ করিল এবং এতটুকু কম খাওয়া লইয়া প্রত্যেকের সঙ্গে অনেক জেদাজেদি অনেক অনুরোধ উপরোধ অনেক সাভিমান অনুযোগ করিল। শিশিরের সঙ্গে তাহার অনেকদিন হইতে বন্ধুত্ব। আর সেই সূত্রে সে প্রায়ই এ বাড়ী যাওয়া-আসা করিয়া বাড়ীর মেয়ের মত হইয়া উঠিয়াছে। এ বাড়ীর নিরানন্দ ভাবিত আবহাওয়াকে সে এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। শিশিরের আজ মনে হইতে লাগিল খাওয়া এবং খাওয়ানোর ব্যাপারকে সে যতখানি ছোট মনে করিয়াছিল বস্তুতঃ তাহা নয়। স্ত্রীলোকের অসীম হৃদয়মাধুর্য্য এবং সেবার কোমলতা দিয়া তাহারা খাওয়াটাকে কেবলমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির পর্য্যায়ে রাখে নাই,—ইহারই উপর একখানি সৌন্দর্য্যের আবরণ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। একজন যে তৃপ্ত হইয়া খাইতে পারিল, এবং আর একজন সম্মুখ বসিয়া সেই তৃপ্তি সর্ব্ব দেহ মনে উপভোগ করিল;—কেবলমাত্র এইটুকুই যেন আহার প্রক্রিয়ার উপর হইতে সমস্ত স্থূলতা নিঃশেষে খসাইয়া দিয়াছে। শিশিরের মনটা দার্শনিক। সমস্ত ঘটনা লইয়াই সে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে বিচার করে এবং তাহার সবচেয়ে বড় গুণ নিজেকেও সে বিচার করিতে দ্বিধা করেনা।

তাই খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে মাধবীকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সে তাহার সঙ্গে যখন গাড়ীতে আসিয়া বসিল, তখন শিশিরের মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছে। অনেক কথাই তাহার মনের মাঝে আনাগোণা সুরু করিয়াছে। এত তুচ্ছ কারণে এত কথা চিন্তা করা অন্যের পক্ষে হয়তো অস্বাভাবিক, কিন্তু শিশিরের পক্ষে তাহা বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল। ব্রুহাম্-গাড়ীর হুড্‌টা খোলা ছিল। তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাস্তার দুপাশের গাছপালায়, সৌধশ্রেণীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মাধবীর একটা হাত নিজের হাতে টানিয়া লইয়া শিশির মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আজ অনেক কথাই মনে হচ্ছে মাধবী। মনে হচ্ছে মেয়েদের বিশেষ শিক্ষা বিশেষ পথ—এমনিতরো বড় বড় কথা নিয়ে চারিধারে কত আন্দোলনই না হচ্ছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কারিকুলামটা অবধি তাদের জন্যে কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই তা নিয়েও গবেষণার আর অন্ত নাই। কিন্তু এসব সমস্যারই সোজা সমাধানটা আজ কেমন করে জানিনা আমার চোখে পড়ে গেছে।"

মাধবী তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, "আজই হঠাৎ কোন্ দিক থেকে চোখে পড়ল ?"

"—তোমাকে দেখে।"

"আমাকে দেখে !"

"হাঁ তোমাকে দেখেই। দেখ, আমরাও কলেজে পড়চি, উচ্চ চিন্তার খবর রাখি ; কিন্তু জীবনের মাঝে একে তো মিলিয়ে নিতে পারলুমনা। তা বাইরেই রয়ে গেল। সংসারে কোন কাজই যে ছোট নয়, অত্যন্ত সামান্য কাজেও যে নিপুণতা এবং সুষমা দেওয়া যেতে পারে, সে কথাটা তোমাকে দেখে আগে আমার প্রায়ই মনে হোত বটে, কিন্তু আজ যেন তা একেবারে সুস্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি।"

মাধবী মৃদুস্বরে কহিল, "তোর কথায় হয়তো আমার দম্ভ হোত ; কিন্তু আমারও কি মনে হয় জানিস যে, মেয়েমানুষের শক্তিই বল আর সৌন্দর্য্যই বল, সংসারের কাজে তার যেমন প্রকাশ এমন আর কিছুতেই নয়।"

"এ সম্বন্ধে তোর সঙ্গে হয়তো আমার মতভেদ কিছু কিছু থাকতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষ সম্বন্ধে লেশমাত্র মতভেদ নেই। সেটা এই যে, উচ্চশিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যা কিছু পেলুম সেটাকে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দিকে দিকে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত করে দেবার শক্তি অর্জ্জন করাটাও স্ত্রীলোকের শিক্ষার একটা মস্ত বড় কথা হওয়া উচিত।"

"তোর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলুমনা।"

"কেন বুঝতে পারবিনে। জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে মেয়েমানুষেই, সে কথা মানিস তো ?"

মাধবী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "একশোবার মানি। কেবল এখন পর্য্যন্ত জানিনে তুই কার জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হতে চলেছিস।"

শিশির বাহিরের জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, "না না, এ নিয়ে অনেক ভাবলুম। সত্যই তো মেয়েদের সঙ্গে সংসারের যেমন অব্যবহিত যোগ, পুরুষদের সঙ্গে তো তা নয়। পুরুষেরা নিজেদের চিরন্তন স্বপ্ন আর আইডিয়ালের মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েচে। অকূল শূন্যতার মাঝে বোনা হয়ে চলেছে তাদের সৃষ্টির জাল। কিন্তু সংসারকে রূপে রসে রাঙিয়ে তোলবার ভার,—সে তো রয়েচে আমাদেরই উপরে। এই কথাটা মনে থাকলেই আপনাআপনি স্ত্রীলোকের শিক্ষা-সমস্যার অনেক গোলই মিটে যায়।"

শিশির চুপ করিল। কিন্তু মাধবীর নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। শিশিরও আর কোন কথা কহিলনা। গাড়ীখানা তখন যে রাস্তায় যাইতেছিল তাহা জনবিরল, নিস্তব্ধ। কেবল জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হইয়া যাইতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি যেন অতন্দ্র, মৌন, প্রতীক্ষাপরায়ণ।

(৬)

বিধাতার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ছিল। তা না হইলে শুধু ইন্দুমতীর চেষ্টায় এতটা হইতে কখনই পারিতনা। আজ কয়েকদিন হইল তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইতে আসিয়া শক্ত করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িয়াছেন। বিধিমত ডাক্তার আসিয়া বুকে পিঠে চোঙ্ লাগাইল, দুইবেলা করিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল ; কিন্তু জ্বর ছাড়িল না। কাল হইতে ডাক্তার নিউমোনিয়ার শঙ্কা করিয়াছে। ইন্দুমতী একে কখনই সংসারের এতটুকু ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে পারেননা, ধৈর্য্য বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই তাঁহার নাই, তাহার উপর আবার এতবড় বিপদে তিনি অনেকটা পাগলের মত হইয়া উঠিলেন। অনর্গল বকুনি এবং মাঝে মাঝে অশ্রুজলের বর্ষণ ছাড়া তিনি আর কোন কাজেই লাগিলেননা। কিন্তু তিনি অবশেষে একটা বুদ্ধির কাজ করিলেন। শিশিরকে ডাকাইয়া তাঁহার জবানীতে সুবোধকে একটা চিঠি লিখিয়া দিতে বলিলেন। নানা বক্তৃতা এবং মাঝে মাঝে চক্ষে আঁচল দেওয়ার অবকাশে তিনি যাহা বলিয়া গেলেন, শিশির কোনক্রমে হাসি চাপিয়া গুছাইয়া তাহাই লিখিয়া দিল। তথাপি কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাহার মুখে হাস্যাভাস কল্পনা করিয়া ইন্দুমতী জ্বলিয়া উঠিলেন।

"হ্যাঁরে শিশির, মানুষটা মরবে না বাঁচবে তার ঠিক নেই, আর তুই স্বচ্ছন্দে হাসছিস ! কলেজে পড়া মেয়ে বলে কি এতই নির্ম্মায়িক হ'তে হয় ?"

তাহার পিসীমার কাছে এই কলেজে পড়ার খোঁটা শিশিরকে দিনের মধ্যে অন্ততঃ বিশবার খাইতে হইত। তাই এটা তাহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল। রাগ না

করিয়া কহিল, "হাসচি কি আর সাধে পিসীমা, হাসচি তোমার ভয় আর ভাবনার বহর দেখে। এই তো সকাল থেকে এতক্ষণ আমি পিসেমশায়ের কাছে ব'সে ছিলুম,—ডাক্তার নার্স সবাই বলছেন, অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। কোনো ভয়েরই কারণ নেই। তবুও তুমি……"

ইন্দুমতীর সুর তখনই বদলাইয়া গেল। শিশিরের কথার মাঝখানেই তিনি সজল রোদনের কণ্ঠে কহিলেন, "তাই বল মা, তাই বল। মুখে তোর ফুলচন্দন পড়ুক। ভয় ভাবনার কথা তুই বুঝতে পারবি কী করে বল। সে একদিন ছিল বটে। আমার শ্বশুর ঠাকুরের যখন একবার খুব মরণাপন্ন অসুখ হয়, তখন আমার শাশুড়ীঠাকরুণ সাত দিন মুখে জলটুকু দেননি। সেই যে পূজোর ঘরে যেয়ে দোর দিয়েছিলেন, সেখান থেকে কেউ তাঁকে বার করতে পারেনি। এমন কি, শ্বশুর বার বার ব্যাকুল হয়ে ডেকেও তাঁকে বার করতে পারেননি। কিন্তু তোরা তো ও-সব মানবিনে। তোরা হ'লি আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়ে।"

শিশিরের একবার মনে হইল বলে যে, রুগ্ন স্বামীর শুশ্রূষার একান্ত দায়িত্ব পরিহার করিয়া ঠাকুরঘরের রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে আশ্রয় লইলেই কি চরম কর্ত্তব্য করা হয়? কিন্তু এ কথা সে বলিতে গিয়াও চাপিয়া গেল। কারণ, মনে মনে বিলক্ষণ জানে যে এমনতরো প্রসঙ্গ তুলিলেই কলেজের মেয়েদের প্রতি পিসীমার বাক্যবাণ দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। তাই সে প্রশ্নটা চাপিয়া গিয়া কহিল, "আচ্ছা পিসীমা, সুবোধবাবুকে যে চিঠি লেখালে তিনি তোমাদের কে হন?"

সুবোধের কথা উঠিবামাত্র ইন্দুমতী কথাটাকে আর থামিতে দিতে চাহিলেননা।

"আমাদের কে হয়? কেন তুই জানিসনে সে যে আমাদের দেওর। সে একবার এসে পড়লেই আমি সমস্ত ভাবনা চিন্তা থেকে রেহাই পাই। কেন তুই তো তাকে দেখেছিস। সেই যে আমাকে রাখতে এসেছিল।"

"কিন্তু তাঁকে দেখে তো খুব কাজের লোক বলে মনে হয়না।"

ইন্দুমতী মনে মনে খুসী হইলেন। তাহা হইলে শিশির সুবোধকে বিধিমত লক্ষ্য করিয়াছে। আর করিবে না কেন; অমন একগোঁটা লোকের মাঝখানে থাকিলেও সুবোধকে লক্ষ্য না করিয়া থাকিবার জো আছে?

চিঠি পাইয়া দিন তিনেকের মধ্যে সুবোধ আসিয়া পড়িল। তখন ক্ষেত্রমোহনের অসুখটা বাড়াবাড়ির সীমানা পার হইলেও তখনও যথেষ্ট সাবধান হইবার ছিল। সুবোধ আসিয়া এমন নিঃশব্দ ধৈর্য্যের সহিত রোগীর কক্ষের সমস্ত কার্য্যের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল যে, ভিতরে ভিতরে সকলেই আরাম অনুভব করিল। সৌরেন্দ্রমোহন আবার তাঁহার পড়িবার ঘরে যাইয়া আশ্রয় লইলেন এবং ইন্দুমতীরও অনুযোগ-অভিযোগের অজস্র বর্ষণ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। মাঝখানে শিশিরও কয়েকদিন কলেজ যাইতে পায় নাই, এখন সেও কলেজ যাইতে সুরু করিল। সুবোধের সামনে সে প্রয়োজন হইলে বাহির হইত। এবং তাহার চেয়ে বেশি,—দূর হইতে অনেকবার তাহাকে ভালো করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই এমন নিঃশব্দ শান্ত প্রকৃতির ক্ষীণকায় লোকটির মাঝে এত বড় শক্তির উৎস কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে! সে আসিবামাত্র কিছু না বুঝিয়া কিছু না বলিয়াও বাড়ীর সকলে যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ভরসা পাইয়াছিল।

মাধবীকে নিমন্ত্রণ করিবার সেই ব্যাপারটার পর হইতে ঘর-সংসারের কাজ-কর্ম্ম শিশির একটু আধটু করিবার চেষ্টা করিত।

সেদিন বিকাল বেলায় কলেজ হইতে ফিরিবার পর সরবতের গ্লাস এবং ফলের রেকাবিটা হাতে করিয়া সে সুবোধের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালার সম্মুখে সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সূর্য্যাস্তের আভা আসিয়া সেই নিবিড় তন্ময় মুখে পড়িয়াছিল। সে মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেন ধ্যানময়। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল।

"এই তো, আপনি আবার কষ্ট করতে গেলেন কেন?"

"কষ্ট আর কি!"

"সেটা আমার চেয়ে আপনি ভালো বোঝেন।"

"মেয়ে-মানুষের সেবা করেই আনন্দ।"

সুবোধ ফিরিয়া চাহিল। তাহার দৃষ্টিতে বিস্ময়।

"আপনার মুখে এমন কথা শুনব, ভাবতে পারিনি।"

"কেন, আমি কলেজে পড়ি এবং লোকে আমাকে আজকালকার মেয়ে বলে থাকে সেই জন্যে ?"

"আপনি জানেন, লোকের কথা শুনে কিছু চিন্তা করা বা মত গঠন আজ অবধি আমি করিনি।"

"তাহলে বললেন কেন ও-কথা ?" শিশিরের গলার স্বরে অলক্ষিতে অভিমানের আমেজ আসিয়া মিশিল।

"কেন বললুম ?—" সুবোধ আকাশের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া শিশিরের পায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনাকে যতটুকু দেখেচি তাতে আমার মনে হয় আপনি যেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে ভরা। নিজেকে নিঃশেষে দান করে সার্থকতার যে পথ, সে আপনার কিছুতেই হতে পারেনা।"

শিশিরের সমস্ত মনে অকস্মাৎ আনন্দের বন্যা নামিয়া আসিল। কিছুই না, এই তো সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু একজনের মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা শুনিয়াই তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনে হইতে থাকিল, উনি তাহা হইলে আমার কথা ভাবেন! তাহার সম্বন্ধে যে তিনি উদাসীন নহেন এইটুকু তথ্যের মাঝে এত রস এত আনন্দ কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিল, শিশির তাহা বুঝিতে পারিলনা।

দু'জনেই চুপ করিয়া আছে।

"এবারে ফলের রেকাবীটার দিকে মনোযোগ দিন।"

"এই যে।" সুবোধ ডিশটা টানিয়া লইল।

"আচ্ছা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথা তুললেন কেন ?"—শিশির একটু সঙ্কোচ-জড়িত সুরে বলিতে লাগিল, "আপনার কি মনে হয় না যে নিজের ব্যক্তিত্বের সমস্ত বিশেষত্ব বজায় রেখেও অন্যকে অনেক কিছু দেওয়া যায় ?"

"যায় বই কি। কিন্তু হাতের পাঁচ বরাবরই আপনার হাতে থাকে। আপনি নিজে কিছু নেবেন না কিন্তু অন্যকে দিতে চাইবেন তার মধ্যে একটু দম্ভ আছে বই কি।"

শিশির অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া রহিল। সুবোধের শেষের কথাটায় তাহার মনে মনে একটু রাগ, একটু অভিমানের মত হইল। সেই অভিমানে-আরক্ত মুখের একাংশ অস্ত-সূর্য্যের অপরূপ আভায় আরও রাঙা দেখাইতে লাগিল।

"আমি জানি আপনি আমার কথায় রাগ ক'রলেন। কিন্তু ও-কথাটা আমি কেন বললুম জানেন,—ঠিক আপনার মত করে আমিও এককালে ভাবতুম। মনে করতুম সংসারের সাধারণ কাজে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে আমার কষ্ট হয়,—তাদের জন্যে কিছু ক'রে বা তাদের সাহচর্য্যে আমি কিছুই পাইনে। কিন্তু তা হ'লোই বা। কিছু না পেলেও তাদের আমি অনেক কিছু দিতে পারি। কিন্তু করতে গিয়ে দেখলুম সেবা করা অত সোজা নয়। সেবা করব মনে করলেই করা যায় না। বস্তুতঃ ওর মত শক্ত কাজ বোধ করি সংসারে আর নেই।"

শিশির কোন উত্তর দিলনা। জানালার ধারে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—তেমনি করিয়াই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটা আপেলের টুকরা নাড়াচাড়া করিতে করিতে সুবোধ পুনশ্চ কহিল, "আমরা যে গ্রামে থাকি, আমাদের সেই গ্রামের লোকদের মত অজ্ঞান, নির্ব্বোধ আপনি আর কোথাও দেখতে পাবেননা। বুদ্ধি তাদের নেই বললেই চলে। কিন্তু তবুও তাদের আত্মসম্মান-বোধ এটুকু আছে যে, তাদেরই মধ্যে থেকে তাদের চেয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকব আর তাদের চেয়ে উঁচুতে থাকব, অথচ তাদের ভালো করতে যাব, এমনতরো ভালো করা তারা কিছুতেই মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনা। এমন শুভকামনার মাঝে প্রচ্ছন্ন অপমানের যে খোঁচাটুকু আছে, সেটুকু তাদের দুঃখ, তাদের মূঢ়তা, তাদের অনুভব-শক্তির অসাড়তা ভেদ করেও তাদের অন্তরে পৌঁছয়।"

শিশির কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনাদের যেখানে জমিদারি সেই গ্রামেই কি আপনি বারো মাস থাকেন ?"

"তাই তো থাকি। বছর দুই আগে এম-এ পাশ করেচি, তার পর থেকে সেখানেই রয়েচি।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস ক'রব, কিছু মনে করবেননা—" শিশির সঙ্কোচ-জড়িত সুরে কহিতে লাগিল, "আচ্ছা, সেই একটা নেহাৎ অজ পল্লীগ্রামে থাকতে আপনার কষ্ট হয়না ? কোন সঙ্গ নেই, কথা ব'লবার মত দু'টো লোক নেই—"

শিশিরের কথার মাঝখানেই একটুখানি হাসিয়া সুবোধ বলিল, "অনেকদিন থেকেই নিজের সঙ্গে নিজের কথা বলা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আর মিশবার লোক, তার

জন্যেও আমার তেমন কষ্ট নেই। কারণ বহু দিনের বহু চেষ্টার পরে আজকাল সত্যই আমার গ্রামের লোকদের সঙ্গে আমি মিশতে পারি।"

"তার মানে?"

"তার মানে নিজের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, বুদ্ধি—এক কথায় এই পঁচিশ বচ্ছরের সমস্ত ব্যক্তিত্বকে পরিহার করে তাদের সঙ্গে এক হয়ে তাদের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে পারি। নিজেকে আর পর ব'লে মনে হয়-না। নিরক্ষর চাষা-ভূষোদের সঙ্গে তখন আমি এক হয়ে যাই।"

"আপনার তা'হলে খুব ক্ষমতা।"

"তাই না কি?" সুবোধের হাসির শব্দে গৃহতল মুখরিত হইয়া উঠিল।

"আর পরের উপকার করবার খুব সখ।"

"অমন কথা ব'লবেননা"—সুবোধের হাস্যোজ্জ্বল মুখে একটুখানি ম্লান আভা পড়িল। "আপনাকে তো বলেচি, প্রথম প্রথম সেই সখই ছিল বটে। কিন্তু শেষে দেখলুম পরের উপকার করতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা আর নেই। যদি কখনো সমস্ত ভেদ ভুলে গ্রামবাসীদের একান্ত আপন হতে পারি তখনই কিছু করতে পারব, তার আগে নয়। তাই অনেকদিন ধরে সেই চেষ্টাই করেচি।"

"কিন্তু আপনি যত বড় বড় কথাই ব'লুন—এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবনা যে একজন শিক্ষিত সমধর্ম্মী বন্ধুর সঙ্গে কথা ব'লে আপনি যত আনন্দ পান, আপনার গ্রামের চাষীদের সঙ্গে মিশে তা-ই পাবেন।"

"নিশ্চয়ই পাবনা। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয় মনের যে দিকটা তৃপ্ত হবে, খুব বুদ্ধিমান বন্ধুর সঙ্গে তর্ক করেও তা হবেনা। এ তৃপ্তি যে কি, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারবনা। সেই সব নিরক্ষর, নির্ব্বোধ গ্রামবাসীদের মুখে এমন একটা বিশ্বাসের আভা, এমন একটা সরলতা আর সহিষ্ণুতার দীপ্তি আমি আবিষ্কার করতে পেরেছি যে, তাদের অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন জীবনযাত্রার আড়ালেও যেটুকু গোপন সৌন্দর্য্য আছে, তা আমার মনকে স্পর্শ করেচে।"

একটুক্ষণ থামিয়া জলখাবারের রেকাবীটা নামাইয়া রাখিয়া সুবোধ পুনশ্চ কহিল, "আপনি হয়তো ভাবতে পারেন এত কথা হঠাৎ আমি আপনাকে বলতে গেলুম কেন! আমি নিজেও কিছুক্ষণ থেকে তাই ভাবছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সহজে আমি এত কথা বলিনে। বরঞ্চ আমার স্বভাব ভয়ানক চাপা। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছেও চট্ করে কোন কথা বলতে পারিনে। অথচ আপনার কাছে কোন কথা গোপন করতে পারি এমনও মনে হয় না।"

কোন একটা কথা শেষ পর্য্যন্ত বলিতে না পারিয়া যেন সুবোধ থামিয়া গেল।

শিশির তাহার স্বচ্ছ নীলাভ চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার সমস্ত কথাই আমি এতক্ষণ ধরে বুঝবার চেষ্টা করছিলুম। বুদ্ধির দিক দিয়ে বুঝতে চাওয়া ছাড়া আর কোন সম্বল আমার হাতে নেই,—সেই দিক দিয়েই চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু মনে হোল অনেকখানিই বাকী থেকে গেল। একটা কথা কিছুতেই আমি মন থেকে তাড়াতে পারছিনে,—আপনি যেমন করে যত কথাই সাজিয়ে বলুন, এক এক সময় ঐ আবহাওয়া আর আসঙ্গের মাঝে আপনার কি একলা লাগেনা? আপনার সঙ্গোপনের যে সত্তা এক এক সময়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজের মনের মত সঙ্গ খোঁজে তাকে কি আপনি পারেন ভুলিয়ে রাখতে?"

"আপনি ভারি শক্ত প্রশ্ন করেচেন। এ কথার উত্তর দিতে হলে বলতে হয় সত্যি তাই। কোন কোন সময়ে ভারি একলা লাগে। মনে হয় নিজের নিঃসঙ্গতার ভারে যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েচি।"

"যদি কষ্ট হয়, থাকেন কেন?"

"কোথায় যাব? এক একজন লোক একলা হয়েই জন্মায়। আমি তাদেরই দলে।"

জলখাবারের শূন্য পাত্রটা তুলিয়া লইয়া শিশির বাহিরে চলিয়া গেল।

(৭)

শিশির এতদিন যে জগতের মধ্যে দিন কাটাইতেছিল সেটা জ্ঞানের জগৎ। প্রত্যেক বস্তুকে সে প্রখর বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত। কোন জিনিষকেই বিচার করিতে সে কুণ্ঠিত হইতনা। কিন্তু বিচার না করিয়া, বিতর্ক না করিয়াও কোন কোন বস্তু, বিশ্বব্যাপারের কোন ঘটনা যে অকস্মাৎ হৃদয়মূলে যাইয়া আঘাত করে, সে কথাটা

এমন করিয়া উপলব্ধি করিবার অবসর তাহার পূর্ব্বে ঘটে নাই। কলেজে যাইবার পথে সুবোধের ঘরের একাংশ কথনো কথনো নজরে পড়িয়া যাইত, ঈজিচেয়ারের উপর সে শুইয়া আছে। চোখে পড়িবামাত্র সমস্ত মনটা কি জানি কেমন করিয়া আলোড়িত হইয়া উঠিত। এত সামান্য একটুকরো দৃশ্যের সম্মুখে সারা মন যে কেমন করিয়া এমন ভাবে বিমথিত হইয়া উঠিতে পারে, সে কথাটা সে কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতনা। মনে পড়িয়া যাইত, সুবোধ নিশ্চয় এতক্ষণ রোগীর ঘরে আবদ্ধ ছিল। তাহার শিথিল শয়নের ভঙ্গীতে সেই শ্রান্তি এবং আলস্যের আমেজ। কোন একজনের সেইটুকু শ্রান্তশয়ান দৃশ্য ভিতরে ভিতরে তাহার সমস্ত মনের দৃঢ়তা এবং সংযমের শাসন যে কেমন করিয়া শিথিল করিয়া আনিতেছিল, সে কথাও সে তেমন করিয়া বুঝিতে পারিতনা। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এই একটা পরিবর্ত্তন সে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতেছিল,—আজকাল সুবোধের এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে মনে মনে কেমন করিয়া যেন উদ্বিগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুবোধ তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি, সেদিক দিয়া তাহার সুখ-সুবিধার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া কিছু অসঙ্গত নয়। বরঞ্চ এইটেই স্বাভাবিক এবং কর্ত্তব্যও তাহাই। কিন্তু অতিথির প্রতি কর্ত্তব্যের চেয়েও হৃদয়ের আরও কোন একটা রস যে প্রতিনিয়তই তাহার সহিত মিশিতেছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুবোধ কি করে, কি ভাবে, সূর্য্যাস্তের সময়কার উদ্ভাসিত আকাশের দিকে চাহিয়া কি কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যায়, এ সমস্তই জানিবার জন্য তাহার ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হয়।

সেদিন সেই যে কথাপ্রসঙ্গে সুবোধ বলিয়াছিল, আমি স্বভাবতঃই চাপা, বেশি কথা বলাও আমার কোন কালে অভ্যাস নয়; কিন্তু আপনার কাছে যে আমি কোন কথা গোপন করিতে পারি এমনও আমার মনে হয়না—সেই কয়েকটি কথা শিশির নির্জ্জনে বসিয়া কতবার কতভাবে যে আবৃত্তি করিয়াছে, মনে মনে কত আকুলতা কত মমতার সহিত সেইটুকু স্বীকারোক্তিকে লালন করিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

তাই কিছুদিন হইতে সে নিজেই মাঝে মাঝে অবাক হইয়া ভাবিতে ব'সে তাহার এতদিনকার অভ্যস্ত পরিচিত জীবনের মাঝে এ কোন্ নূতন সুর আসিয়া লাগিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কল্যাণীশ্বরী

শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

আমাদের ইন্‌টারমিডিএট্ পরীক্ষা শেষ হ'ল মার্চের মাঝামাঝি। পরীক্ষায় শ্রান্ত মন তখন উধাও হয়ে ছুটে যেতে চায় শান্তির আশায় কোন দূর-দূরান্তরে। সুযোগও পেলাম বেশ। আমার এক মামার দার্জিলিং যাবার কথা শুনলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার যাবার ঠিক হইয়া গেল। পরে তাঁহার যাওয়া পিছাইয়া যাওয়ায় আমার অন্যত্র যাওয়া স্থির হইল।

ছোটবেলা হইতেই ভ্রমণ করিতে, নূতন নূতন জায়গা দেখিতে আমার খুব ভাল লাগে। তাই এই ভীষণ গরম পড়িলেও আমি কল্যাণীশ্বরী যাইতে বিরত হই নাই।

কল্যাণীশ্বরী আসানসোল হইতে কুড়ি মাইল পশ্চিমে। ই, আই, আর মেন লাইন কিম্বা গ্র্যাণ্ড কর্ড দিয়া যাইলে কয়েক মাইল হাঁটিতে হয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়াও মোটরে যাওয়া যায় এবং এইটাই সুবিধাজনক।

আমার মামার এক মেয়ের আসানসোলে বিবাহ হইয়াছে সম্প্রতি। সেখানে যাইয়া উঠাই ঠিক করিলাম।

কলিকাতা হইতে ১১টার ট্রেনে রওনা হইলাম। দিল্লী এক্সপ্রেস্ আড়াইটার মধ্যেই আসানসোল পৌছাইয়া দিল। ভগ্নিপতি ষ্টেশনে মোটর লইয়া উপস্থিত ছিলেন। আসানসোল ষ্টেশন বেশ বড়। ওভারব্রিজ পার হইয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম।

সূর্য্যের প্রখর তেজ এবং পবনদেবের তাণ্ডব নৃত্যের সংমিশ্রণে মনে হয় যেন খুব বড় ফার্ণেসের ভিতর দিয়া

হাওয়া বহিতেছে। শুনিলাম ইহারই নাম 'লু'। মোটর দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে সেই লুয়ের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে। বাড়ী পৌছিলাম মিনিট পনেরর মধ্যেই। রাস্তা বেশ ভালই।

বৈকালে চা পানান্তে আসানসোল টাউন দেখা হইল। রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, রেলওয়ে স্কুল ইত্যাদি বেশ পরিষ্কার রাস্তার উপর। দোকান বাজারও বেশ আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে বেশীর ভাগই দেখলাম রেলওয়ে কর্ম্মচারী। বাড়ী ফিরিবার সময় পথে মোটরের টিউব পাংচার হইয়া যাওয়ায়, আমরা মাইল দুই সান্ধ্যভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিনের প্রোগ্রাম হইল কল্যাণীশ্বরী যাওয়া। ড্রাইভারকে বলিয়া রাখা হইল সেই রাত্রে গাড়ীর সব ঠিক করিয়া যেন সে বাড়ী যায় এবং ভোরেই যেন আসে।

সকালে আমরা চা জলখাবার খেয়ে তৈরী,—ড্রাইভারের দেখা নাই। ভগ্নিপতি বলিলেন, তিনিই ড্রাইভ করিবেন; কিন্তু তাঁহার সে লাইসেন্স নাই। আটটায় ড্রাইভার আসিল। আমরা এক টিফিন্ কেরিয়ার ভরা খাবার, থারমোফ্লাস্কে চা ইত্যাদি লইয়া রওনা হইলাম। ভগ্নিপতি একটী সুটকেশে স্নানের উপকরণ লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। মাইলখানেক যখন যাওয়া হয়ে গেছে, তখন ভগ্নিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার ক্যামেরা আন্‌তে ভুলে গেছ তো? আমি মৌন রহিলাম। তিনি তখনই ড্রাইভারকে গাড়ী ফিরাইতে বলিয়া আমায় বলিলেন—আজ



কল্যাণীশ্বরীর মন্দির

দূর হইতে কল্যাণীশ্বরীর মন্দির—জঙ্গলের ভিতর। মন্দিরের সম্মুখে লোকাল বোর্ডের রাস্তা মন্দিরের দক্ষিণে খরস্রোতা চালনাদহ নদী। মন্দিরের পশ্চাতে অদূরে পাহাড়শ্রেণী

আমাদের যাওয়ায় ভগবানের নেহাৎ অনিচ্ছা। বাড়ীতে পৌছিলে দিদি বলিলেন, আজ আর গিয়ে কাজ নাই।

আমার কোডাক্ ক্যামেরাটী এবং খাতা, পেন লইয়া গাড়ীতে যাইয়া উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িবার সময় কল্যাণীশ্বরী দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

গাড়ী গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া চলিয়াছে। মোটরে আমি এবং ভগ্নিপতি আর সঙ্গে চাকর ও ড্রাইভার। জঙ্গলের ভিতর দিয়া, পাহাড়ের তলদেশ দিয়া কি করিয়া অতখানি পথ যাওয়া হইবে ভাবিতে গা কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কখনও জনহীন প্রান্তরের সরু ফালির মত রাস্তাটী ধরিয়া, কখনও আবার দুধারে আকাশ-চুম্বী ধানের ক্ষেত্র দুধারে রাখিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে।

বরাকর যখন পৌছিলাম তখন বেলা দশটা। বরাকর নদীর ধারে মোটর থামান হইল এবং নদীর জল খুব ভাল শুনিয়া কিছু জলযোগও করা হইল। অদূরে বরাকর নদীর ব্রিজের উপর দিয়া একখানি ট্রেন চলিয়া গেল। কি ভীষণ তাহার শব্দ, ঠিক যেন অশনিপাতের পূর্ব্বে আকাশে দুন্দুভি বাজিতেছে।

বরাকর পিছনে রাখিয়া যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই জমি উচ্চ বলিয়া মনে হইতেছে। স্থানে স্থানে কলিয়ারী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। দূরে আয়রণ ফ্যাক্টরী দেখিলাম। আমাদের বাম পার্শ্ব দিয়া বরাকর নদীও আমাদের সঙ্গেই চলিয়াছে উষর বালুকা বক্ষে লইয়া। বহুদূরে দেখিলাম পাহাড়শ্রেণী ধরিত্রীর বক্ষে ঢেউ খেলাইয়া চলিয়া গিয়াছে বহুদূরে। ইচ্ছা হ'ল ছুটে চলে যাই দুরন্ত হরিণ-শিশুটীর মত। পাহাড় দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। মনে হ'ল ঐ ধূষর দেহে প্রাণ আছে, পাহাড়ের চেতনা শক্তি আছে।

গাড়ী হুহু শব্দে চলিয়াছে, আমি আছি তাকিয়ে ঐ পাহাড়গুলির দিকেই। ক্রমে গাড়ী পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। জঙ্গলের মধ্যে বরাকর নদীকে আমরা হারাইলাম। সম্মুখে অনতিদূরেই পাহাড়ের তলদেশে একটী স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। তাহারই এক পার্শ্বে জঙ্গলের মধ্যে শুভ্র মন্দির। [চারিধার শ্যামল; মধ্যে শুভ্র মন্দির; মনে হয়,

ঠিক যেন শ্যামা মার ভালে ললাটীকা। আমরা মোটর হইতে নামিলাম। কি সুন্দর মন্দিরটীকে এখান হইতে দেখিতে। পশ্চাতে, পার্শ্বে পাহাড় জঙ্গল এবং দক্ষিণে তটিনী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা। মন্দিরের সম্মুখে লোকাল্ বোর্ডের রাস্তা।

দেখিলাম আশে পাশে বস্তি নাই—বহুদূরে দুচারখানি পর্ণকুটীর রহিয়াছে।

কল্যাণীশ্বরী মন্দির একটী নয়। ইহা একটী দেবালয়েরই মতন প্রকাণ্ড। যাত্রীদের বিশ্রামের যথেষ্ট স্থান আছে। মন্দিরের চারি পার্শ্বের প্রাচীর প্রস্তরে প্রস্তুত—অনেক উচ্চ। আমরা সম্মুখের দরজা দিয়া প্রবেশ করিলাম। ভিতরে



দেবীর মন্দিরের একটি দৃশ্য

কল্যাণীশ্বরী দেবীর মন্দিরের দৃশ্য সম্মুখ ভাগের ভিতর হইতে। মার্ব্বেল পাথরে বাঁধান উঠান। নদীতে যাইবার দরজা। কল্যাণীশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে উপবিষ্ট আমার সঙ্গিদ্বয় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ। উঠানে দাঁড়াইয়া মালাকার—মন্দিরের চাকর। দণ্ডায়মান অপর তিনজনের মধ্যে পাশাপাশি দুইজনের একজন পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী এবং উপবীত গলায় পাণ্ডা। অগ্রভাগে দণ্ডায়মান এক সংসার ত্যাগী গৃহী। তাঁহার নাম শুনিলাম সাণ্ডেল মহাশয়। ভদ্রলোক আমাদের সকলকেই চেনেন দেখিলাম

আঙ্গিনার বাম পার্শ্বে বারান্দা, সম্মুখে বারান্দা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দুই তিনটী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঘর। উঠানের মাঝখানে একটী ছোট মন্দির। তাহাতে একটী শিবলিঙ্গ রহিয়াছে। শুনিলাম ইহা শিবচৈতন্য নামক এক ব্রহ্মচারীর সমাধি-মন্দির।

আমরা আর একটী দরজা দিয়া অগ্রসর হইলাম। পিছনে রাখিয়া আসিলাম একটী পাথরের মস্ত হাড়িকাঠ। শুনিলাম ইহাতে মহিষ বলিদান হয়। সম্মুখে উঠান, কাল ও সাদা মার্বেল প্রস্তরে বাঁধান। বাম দিকে একটী রক ও বারাণ্ডা। বারাণ্ডার শেষে এক দিকে কতকগুলি ঘর আছে। তাহারই ভিতর একখানি পাথরের ছোট অন্ধকার ঘরে শুনিলাম শিবচৈতন্য ব্রহ্মচারী থাকিতেন। বারাণ্ডার আর



নদীর ধারে দেবীর "বাথরুম্"

সম্মুখে দণ্ডায়মান দুইজনের মধ্যে যিনি [illegible] তিনি সংসারে বীতস্পৃহ সাণ্ডেল মহাশয় এবং তাঁহার পার্শ্বে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়। মন্দিরের দক্ষিণে প্রবাহিতা চালনাদহ। পশ্চাতে জঙ্গল এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে বড় বড় প্রস্তর। বহুদূরে দু'চার খানি কুঁড়ে

এক পার্শ্বে একটী মন্দির আছে। তাহার দক্ষিণে বারাণ্ডার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি। ছাদে উঠিলে মন্দিরটীর গম্বুজ দেখা যায়। মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য্যের মধ্যে দেখিলাম পাথরের দেয়ালে খোদাই নরনারীর বিভিন্ন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি রংবিরঙ্গের নহে, সাদা রঙ্গের উলঙ্গ। রোয়াক হইতে নামিলে বাম পার্শ্বে মন্দির মাতা কল্যাণীশ্বরীর এবং সম্মুখে দরজা আছে। এই দরজাটী নদীতে যাইবার।

কল্যাণীশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে একটী শিবমন্দির একটী

বেলগাছের তলায়। বেলগাছে অসংখ্য নোড়ানুড়ি ঢিল বাঁধা আছে। শুনিলাম, সন্তান না হইলে সন্তানেচ্ছু স্ত্রীলোকেরা এই সব ইষ্টক প্রস্তর বাঁধিয়া যায়। যেদিন এই ইষ্টক পড়িয়া যাইবে, সেইদিনই যে বাঁধে তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

কল্যাণীশ্বরী মন্দির বেশী উচ্চ নহে। পাথরের প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের সম্মুখে ছোট বারান্দা আছে। বারান্দার নীচেই একটী হাড়িকাঠ মন্দিরের দরজার সম্মুখে। মন্দিরের গাত্রে অসংখ্য নাম বৃথা অমর হইবার জন্য শোভা পাইতেছে।

নদীতে যাইবার দরজাটী দিয়া আমরা বাহির হইলাম। বাহিরে দেখিলাম, সম্মুখে ৮।১০ ফিট নিম্নে সেই নদী



মন্দির-গাত্রে কারুকার্য্য

মন্দির পাথরের বলিয়াই অনুমান হয় এবং শিল্পও পাথরের উপর বলিয়া মনে হয়। বিশ্রাম নিরত শ্রীযুক্ত গো পী না থ

প্রবাহিতা। ইহার নাম চালনাদহ। ছোট ছোট নদীকে এখানে দহ বলে। স্রোতস্বিনী যেদিক হইতে প্রবাহিতা সেদিকে শুধু বড় বড় প্রস্তর তাহার গতিরোধ মানসে কোন্ যুগযুগান্তর হইতে পড়িয়া আছে। নদীটীকে দেখিলে একটী জলপ্রপাত বলিয়া ভ্রম হওয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

নদীর পরপারে অদূরেই পাহাড়শ্রেণী এবং জঙ্গল। সেখানে হয় তো নির্জ্জনে কত যোগী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন। নদীর এপারেও জঙ্গল এবং নদীর তটেই একটী ছোট মন্দির। ভিতরে অপ্রশস্ত স্থান এবং একটী প্রস্তর-ফলকে পদচিহ্ন রহিয়াছে। শুনিলাম মাতা কল্যাণীশ্বরীর পদচিহ্ন। মন্দিরটী শুনিলাম দেবীর 'বাথরুম'। এই মন্দিরে বসিয়া দেবী তেল হলুদ প্রত্যহ মাখিতেন এবং সম্মুখে এই নদীতেই স্নান করিতেন।

আমরা নদীর ধারে ধারে অগ্রসর হইলাম। শুধুই বড় বড় প্রস্তর খণ্ড। এক স্থানে দেখিলাম অর্দ্ধ-নিমজ্জিত এক-খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর-গাত্রে দুই তিন ইঞ্চ পরিমাণ দু'তিনটী ছোট ছোট গর্ত্ত। একটী গর্ত্তে একখণ্ড লৌহ আটকাইয়া আছে। মনে হইতেছিল বুঝি-বা কাহারও শাবল আটকাইয়া আছে, ভাঙ্গিয়া। শুনিলাম, কোন কোম্পানীর লোক পাথর-কাটিতে আসিয়াছিল; কিন্তু এক খণ্ডও প্রস্তর কাটিতে পারে নাই। তাহারা সকলেই দেব-রোষে



মন্দিরে ছাগবলি

কল্যাণীশ্বরীর মন্দিরের সম্মুখে ছাগ বলি হইতেছে। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং ১৬।১৭টী বলি দিলেন। হস্তে খড়্গ পুরোহিত মহাশয় কার্য্যে রত। দর্শকবৃন্দ মূক রুদ্ধশ্বাসে

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেই লৌহখণ্ডটী তাহাদেরই শাবল ছিল। পাথর কাটিবার সময় শাবল ভাঙ্গিয়া অসম-সাহসিকতার নিদর্শন স্বরূপ রহিয়া গিয়াছে। নদীর জল পান করিলাম,—কি সুস্বাদু সে জল!

আমরা পুনরায় মোটরে ফিরিয়া গেলাম এবং চা-জলখাবারের সদ্ব্যবহার করিলাম। তখন আরও দু'খানি মোটর আসানসোল হইতে যাত্রী লইয়া আসিয়াছে। একখানি ঘোড়ার গাড়ীও দেখিলাম।

বেলা ১২টার সময় চার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সবনপুর নামক গ্রাম হইতে পুরোহিত আসিলেন। পূজা কখন হইবে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম আরও দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে। পুরোহিত ঠাকুরের নাম পাণ্ডা শ্রীশশিভূষণ রায় চৌধুরী। লোকটা খুব রসিক এবং আরও রসিক ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুতে তিনি বড় আঘাত পাইয়াছেন। সেই স.য় একজন গেরুয়াধারী সাঁওতাল জাতীয় লোকে ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ লোক সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল "রাধেশ্যাম"।

আমরা কোথায় স্নান করিব পূর্ব্বেই চৌধুরীমশায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন



পুরাতন মন্দির

স্বপ্নপুর নামক স্থানে বৃক্ষের নিম্নে পুরান মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। এই স্থানে দেবী কল্যাণীশ্বরী পূর্ব্বে ছিলেন। এখান হইতে সবুনপুর গ্রাম বেশী দূরে নহে। বামপার্শ্বে দূরে পাহাড়শ্রেণী দৃষ্টি গোচর হয়। পশ্চাতে বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত শশীবাবু

চালনাদহ। এখন সেই নবাগতকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা সাধু, ব্রাহ্মণদের স্নানের জল এনে দাও তো বাবা।"

চৌধুরী মহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া গেলে সেই লোকটা বলিল "রাধেশ্যাম বাবু। আমার নাম রাধেশ্যাম। রাধেশ্যাম জল এনে দেবো রাধে।" হাসি চাপিয়াই তাহার পরিচয় লইলাম। জানিলাম তিনি জাতে কর্ম্মকার, সংসারে বীতস্পৃহ। সম্প্রতি সাধু হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে পরমহংস হইবেন আশা করেন। এখনি তিনি পাকা ফলটী—ঝড়ের তোয়াক্কা তিনি করেন না মোটেই।

রাধেশ্যাম জল না আনায় আমাদের অবশ্য চালনাদহেই স্নান করিতে হইল এবং চৌধুরী মহাশয় রাধেশ্যামকে সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন "বাবা সাধু ব্রাহ্মণ না হ'লে পরমহংস হওয়া যায় না বাবা।"



মধুপুরস্থিত অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দিরে অন্নপূর্ণা মহাদেবকে অন্ন দিতেছেন

বেলা দুইটার মধ্যেই অনেক লোক-সমাগম হইয়া গেল। তখন চৌধুরী মহাশয় পূজায় বসিয়া গিয়াছেন স্নান করিয়া। মন্দিরের চাকর বংশানুক্রমিক কাজ করিয়া আসিতেছে। তাহাদের নাম মালাকার। দেবীকে দেখিলাম একটী বেদীর ন্যায়। শুনিলাম দেবীর কোন আকার নাই। দেবীর ফোটো লইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় শুনিলাম কেহই ফোটো

লইতে পান না দেবীর। দেবীকে দেখিলাম একখণ্ড প্রস্তর-খণ্ডের ন্যায়। প্রস্তরখণ্ডের উপর মুকুট পরান আছে। শুনিলাম দেড় হাত উচ্চ এবং তিন হাত দীর্ঘ স্তম্ভটী।

পূজার্চ্চনা হইয়া গেল এক ঘণ্টারই ভিতর। আরতি পূজার পরেই হইয়া যায়; কারণ দিন থাকিতে থাকিতে পাণ্ডা চলিয়া যান এবং রাত্রে এই জঙ্গলী জায়গায় কেহ আসিতে সাহস করেন না। আমরা সকলেই প্রসাদ পাইলাম। প্রসাদ হইল পায়স, পুরোহিত মহাশয়ের স্বহস্তে পাক।

দেবীর মন্দিরের সম্মুখে দেখিলাম বলির জন্য আনীত কতকগুলি ছাগ-বৎস ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে চাহিয়া আছে সেই শুভ মুহূর্ত্তটার জন্য যখন তাহাদের চক্ষু পরপারের সকল জিনিষই দেখিতে পাইবে।

চৌধুরী মহাশয় আমাদের ডাকিলেন বলি দেখিবার জন্য।



পাথরোলের রাজার নূতন প্রাসাদ;
ইঁদারাটী খুব বড়। ইঁদারার পার্শ্বে অসমাপ্ত গৃহ

প্রথম বলিটি দেখিয়াই আর দেখিতে পারিলাম না, সরিয়া গেলাম। পরে আসিয়া দেখিলাম আঙ্গিনায় রক্ত-দরিয়া বহিয়া যাইতেছে। এখানকার বলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। পাঁঠার গলা হাড়ীকাঠে দিয়া একজন টানিয়া ধরে এবং পুরোহিত নিজহস্তে একখানি বিশাল খড়্গ লইয়া মাত্র ঘাড়ের উপর রাখিয়া তাহা টানিয়া লয় এবং তাহাতেই দেহ ও মুণ্ড পৃথক হইয়া যায়। এখানে চোপ দিয়া কাটার পদ্ধতি নাই যেমন কালীঘাটে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানের এই প্রকার বলিকে বলে রেত বলি। যখন চৌধুরী মহাশয় বলি দিয়া আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন তখন কে বলিবে যে তিনি সেই হাস্য-রসিক শশিভূষণ রায় চৌধুরী।

পূজা-দক্ষিণা দিয়া আমরা একবার মন্দিরের চারি পাশ ঘুরিয়া আসিলাম। কল্যাণীশ্বরীর মন্দিরের পশ্চিম ও উত্তরে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। তাহার উপর ছোট ছোট বৃক্ষ, কোথাও বড় বড় দৃষ্টিগোচর হয়।

পাণ্ডা মহাশয়কে লইয়া আমরা সবুনপুরের দিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে কল্যাণীশ্বরীর পুরান মন্দির আছে।

মন্দিরের পূর্ব্ব দিক হইতে লোকাল বোর্ডের রাস্তা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা যদিও উঁচু নীচু, তথাপি তাহাকে পার্ব্বত্য পথ বলা যাইতে পারে না। দুই ধারে গাছ, ক্ষেত্র, অবারিত মাঠ, উপরে গগন ললাট; মধ্য দিয়া রাস্তা ছুটিয়াছে।

রাস্তার উপর গাড়ী রাখিয়া আমরা প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া নূতন একটী কোলিয়ারীর পাশ দিয়া এক স্থানে পৌঁছিলাম। খানিকটা খোলা জায়গার চারি পার্শ্বে ধানের ক্ষেত্র। এই খোলা জায়গাটার এক কোণে খুব বড় একটী বৃক্ষ আছে। তাহার নাম "আকুড়া" বৃক্ষ। এই বৃক্ষের তলায় আর একটী ছোট গাছ আছে—রেল গাছের ন্যায় দেখিতে। তাহার নাম কেহই বলিতে পারিল না। গাছটীর নিম্নে পুরাতন মন্দিরের ভগ্নস্তূপ রহিয়াছে। মনে হয় বহু পূর্ব্বে—শতাবধি বর্ষ পূর্ব্বে এখানে সুন্দর মন্দির ছিল। এখন ইষ্টক-স্তূপ এবং ইষ্টকরাশি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানে প্রথমে গ্রাম ছিল। এই গ্রামের নাম ছিল স্বপ্নপুর। ইহা এখন সবুনপুর গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা প্রণাম করিয়া রাস্তার দিকে চলিলাম। দারুণ গ্রীষ্ম গলদঘর্ম্ম হইয়া আর ঘুরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

পরদিন আমি একজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত গোপীনাথ মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া একটী নিকটবর্ত্তী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

আমরা পি, ডব্লিউ, ডির রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিলাম ধরণীদেবী তাঁহার গৈরিক উত্তরীয় বক্ষে টানিয়া পড়িয়া আছেন। দূরে দেখিলাম একটী কোল মাইন।

ভোর ছয়টায় রওনা হইয়া বেলা সাড়ে সাতটায় আসিয়া

পৌঁছিলাম। প্রায় চার পাঁচ মাইল পথ হাঁটিলাম। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম মাইলখানেক হ'বে; তাই প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। আমরা যে গ্রামে আসিলাম তাহার নাম মিজিয়াড়া। অনেক সন্ধান করিয়া মিজিয়াড়া গ্রামবাসী স্বর্গীয় বলরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী-নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বসিতে দিলেন তাঁহার বারান্দায় একটী দোকানের সম্মুখে। আমরা বসিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাইতেছিলেন পুষ্পপাত্র হস্তে পূজা করিতে, আমাদের দেখিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন; কে এক চাষী মাঠে যাইতেছিল—দাঁড়াইল। আমাদের পরিচয় একজন অপরের কাছে লইল। সেখানে অনেক লোক জমা হইল। তখন আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। অনেকেই অনেক কথা বলিলেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই অনেক খবর দিলেন। দেখিলাম কল্যাণীশ্বরীর বিষয় কেহই সেরূপ সম্পূর্ণ বলিতে পারিতেছেন না। যৎসামান্য বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম; তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

কল্যাণীশ্বরী দেবী এখন যেখানে আছেন পূর্ব্বে সেখানে ছিলেন না। দেবী ছিলেন পূর্ব্বে গড়ের জঙ্গলে। অজয় নদের ধারে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সেনপাহাড়ী নামক স্থানে গড়ের জঙ্গলের ভিতর অদ্যাপি মন্দির আছে। সেখানে মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির নাম সামরূপা। দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি। মুসলমান শাসনকালে সেনপাহাড়ী একজন হিন্দু-রাজার রাজত্বের অন্তর্গত ছিল। সামরূপা সেই রাজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন এবং তথাকার রাজকুমারীর সহিত দেবী "সই" পাতাইয়াছিলেন—স্থানীয় লোক ইহা শিবচৈতন্য ব্রহ্মচারীর নিকট শুনিয়াছিল।

দেবীর সহিত রাজকন্যার এই সর্ত্তে সই পাতানো ছিল যে রাজকুমারীর যে রাজার সহিত বিবাহ হইবে সামরূপাও সেই রাজার রাজত্বে বাস করিবেন। প্রবাদ, এই রাজকুমারী রাজা লক্ষ্মণ সেনের কন্যা। সেন পাহাড়ী সেন বংশীয় রাজাদের নামে হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

মহারাজা কল্যাণীশেখর গঙ্গাস্নান করিবার জন্য "কাঁরোয়া গড়ের জঙ্গল" নামক স্থানে গিয়াছিলেন। কল্যাণীশেখর ছিলেন কাশীপুরের রাজা। সেন পাহাড়ীর রাজা লক্ষ্মণ সেন কল্যাণীশেখরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। মহারাজ কল্যাণীশেখর স্বপ্ন পাইলেন যে তিনি যেন বিবাহের যৌতুক স্বরূপ সামরূপা দেবীকে চান।

লক্ষ্মণ সেন এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কল্যাণী-শেখর জানাইয়াছিলেন যে তিনি যে কোন উপায়ে পারেন দেবীকে লইবেন; কারণ, তিনি জানিতেন, দেবী তাঁহার সহায়। যখন কাশীপুরের মহারাজা ফিরিতেছিলেন, দেবী সামরূপাও তাঁহার অঙ্গীকারমত রাজকুমারীর সহিত চলিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ সেন যুদ্ধ বাধাইলেন।



পাথরোলরাজের কালীবাড়ী

মধুপুর হইতে দূরে অবস্থিত পাথরোলের রাজার কালী-বাড়ীর দৃশ্য। উঠানে দু'টী হাড়িকাঠ রহিয়াছে

কেহ কেহ বলেন কাশীপুরের রাজা যুদ্ধ জিতিয়া দেবীকে স্বপ্নপুরে লইয়া যান এবং কেহ কেহ বলেন যে দেবী যুদ্ধের আয়োজন দেখিয়াই স্বয়ং স্বপ্নপুরে চলিয়া যান এবং যুদ্ধ মিটিয়া যায়।

যুদ্ধে জিতিয়া যখন কল্যাণীশেখর দেবীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছিলেন, তখন দেবী বলিয়াছিলেন, যেখানে রাজা তাঁহাকে প্রথম নামাইবেন তিনি আর সে স্থান ত্যাগ করিবেন না। মহারাজ প্রায় শতাবধি মাইল দেবীকে ও রাজকন্যাকে ঘোড়ায় লইয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া

পড়েন এবং স্বপ্নপুর নামক স্থানে বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ ছিলেন। যাইবার সময় দেখেন দেবী আর উঠিতেছেন না। দেবীর কথা মহারাজের স্মরণ হইল। মহারাজ সবুনপুরের ঘেঘরেদের ডাকিয়া দেবীর সেবার জন্য নিযুক্ত করেন এবং দেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি দিয়া যান।

আবার কেহ বলেন দেবী স্বপ্নপুরে যখন স্বয়ং চলিয়া গেলেন তখন যুদ্ধ মিটিয়া গেল এবং কল্যাণীশেখর কাশীপুরে ফিরিয়া গেলেন। কাশীপুরেই মহারাজ একদিন স্বপ্ন দেখেন যে সামরূপা স্বপ্নপুর নামক স্থানে আসিয়াছেন। স্বপ্নপুর তখন একটী গ্রাম ছিল; আজকাল তাহার নাম সবুনপুর। এই সবুনপুরে একঘর রাঢ়ী ব্রাহ্মণ,—ঘেঘরে উপাধিধারী—



মধুপুরস্থিত অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির

বাস করিতেন। ঘেঘরেদের বাড়ীর কর্ত্তা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে সেনপাহাড়ীর সামরূপাদেবী স্বপ্নপুরে কল্যাণীশ্বরী নাম ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে মন্দির প্রস্তুত হয় এবং দেবী কল্যাণীশ্বরী সেখানে থাকিতে আরম্ভ করেন। দেবী এখানে প্রায় এক শত বৎসর বাস করেন। এখানে আসিয়া দেবী কল্যাণীশ্বরী নামে খ্যাত; কিন্তু সেন-পাহাড়ীতে আজিও তিনি সামরূপা নামে পরিচিত।

সামরূপা দেবীর দু'একটী আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিলাম। তাহা এখানে লিপিবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেন-পাহাড়ীতে দেবীর আজও পূজা হয়। কোন দিন পূজা বন্ধ থাকে না। কেবল মহাষ্টমীর দিন পূজা হয় না। সপ্তমীর দিন পূজা-শেষে মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া সকলে চলিয়া আসে। মহাষ্টমীর দিন সেখানে কেহ যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাষ্টমীর দিন ঠিক অষ্টমীপূজার সময় স্থানীয় লোকেরা এখনও তোপের আওয়াজ শুনিতে পায়। সেখানে দুতিনটী কামান পড়িয়া আছে। কামানের মুখ সীসা গলাইয়া বন্ধ করা। মহানবমীর দিন মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, কে যেন গতকল্য অষ্টমী পূজা করিয়া গিয়াছে। ফুলবিল্বপত্র অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে; এমন কি, যজ্ঞের কাষ্ঠ, বিভূতি ইত্যাদি সকলই রহিয়াছে। প্রবাদ—একজন লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অষ্টমী পূজা দেখিবার লোভ না সামলাইতে পারিয়া মন্দিরের নিকটস্থ একটী বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিয়া ছিল। পরদিন তাহাকে গাছের উপরেই মৃতাবস্থায় পাওয়া যায়। সুতরাং সে যে কি দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই।

আসানসোল হইতে সেনপাহাড়ী চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। আমার সেখানে যাওয়া হইয়া উঠে নাই।

একদল কয়ালী জাতীয় লোক একটি ছড়া বলিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। তাহার দু'এক লাইন পাইলাম মাত্র—

"পূর্ব্বে বাড়ী সেনপাহাড়ী, ছিলে মা কল্যাণী,

সেনপাহাড়ী ছাড়িলে মা ভবানী।

কত ভক্ত অনুরক্ত আছে মা সেখানে পড়ে।"

এই কবিতাটী সমস্ত পাওয়া গেল না অনেক চেষ্টা করিয়াও। এই কবিতাটীতে এমন সব বিষয় গাঁথা আছে যে ইহা হইতে সম্যক উপলব্ধি হয় যে সেনপাহাড়ীর সামন্তপা দেবীই স্বপ্নপুরের কল্যাণীশ্বরী; এবং ছড়াতে ইহা বর্ণিত আছে যে দেবী যে দেঘরেকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীরোহিণী দেঘরে। রোহিণী দেঘরে নিঃসন্তান ছিলেন। কেহ বা বলেন তাঁহার এক পুত্র ছিল।

সবুনপুর হইতে দু'তিন মাইল পশ্চিমে দেবীপুর গ্রামের সীমান্তে চালনাদহ নামে একটী নদী আছে। দেবী কল্যাণীশ্বরী সেই নদীতে স্নান করিতেন। একদিন একটী শাঁখারী ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য নদী পার হইয়া আসিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ দেখেন এক ষোড়শী যুবতী নদীতে স্নান করিতেছেন। ব্রাহ্মণ নিকটস্থ হইলে যুবতী বলেন ব্রাহ্মণকে তাঁহার হাতে শাঁখা পরাইয়া দিতে। ব্রাহ্মণ বলেন—শাঁখার দাম কে এখানে দিবে। বাড়ী চল পরাইয়া দিব। যুবতী বলেন—আমার পিতা রোহিণী দেঘরের নিকট দাম লইও। যদি না দেন তবে বলিও, ঘরে কোলঙ্গায় একটী কৌটায় পাঁচটী টাকা আছে, তোমার মেয়ে কল্যাণীশ্বরী শাঁখা পরিয়াছে দাম দাও।

ভাগ্যবান শাঁখারী পয়সার লোভে দেবী কল্যাণীশ্বরীকে একজন সাধারণ নারী জ্ঞানে শাঁখা পরাইয়া দিল। সে বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলে মার চরণ জড়াইয়া শুইয়া পড়িত।

শাঁখারী ব্রাহ্মণ স্বপ্নপুরে আসিয়া রোহিণী দেঘরের নিকট তাঁহার কন্যার শাঁখা পরার দাম চাহিল। রোহিণী দেঘরে শুনিয়া অবাক। দেঘরে মহাশয় বলিলেন যে তাঁহার কন্যা নাই, তিনি নিঃসন্তান। শাঁখারী যখন আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বলিয়া টাকার কথা বলিল তখন দেঘরে মহাশয় সত্যই টাকা পাইলেন এবং বাহির হইয়া আসিয়া শাঁখারী ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া ধরিলেন। শাঁখারী ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। রোহিণী দেঘরে বলিলেন "আজ তুই মার হাতে শাঁখা পরিয়েছিস, আজ তুই ভগবান। তোরই আমি পূজা করিব।" পরে তিনি শাঁখারীকে সঙ্গে লইয়া চালনাদহ যান। শাঁখারী ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন "মা তোমার বাবা এসেছেন, তুমি কি রকম শাঁখা পরেছ দেখাও।" রোহিণী দেঘরেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠেন। তখন দেবী চালনাদহ নদী হইতে শাঁখা পরা দুটী হাত উঠাইয়া দেখান। সেই রাত্রেই রোহিণী দেঘরে স্বপ্ন পান যে স্বপ্নপুরে গ্রামের ঢেঁকির শব্দ ও কান্নাকাটি সহ্য করিতে না পারায় দেবী চালনাদহ নদীর ঘাটের উপর দেবীপুরের সীমানায় থাকিতে ইচ্ছা করেন



লেখক শ্রীকালিদাস লাহিড়ী

এবং তিনি সেখানেই চলিয়া গিয়াছেন। সেই রাত্রে এই স্বপ্ন কাশীপুরের মহারাজেরও হয়। মহারাজ সেই স্থানে মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই মন্দির দুই শত বৎসরের উপর হইল স্থাপিত হইয়াছে। অদ্যাবধি দেবী সেই স্থানেই আছেন এবং এই স্থানের নাম কল্যাণীশ্বরী।

কল্যাণীশ্বরী ভ্রমণ-কাহিনী এখানেই শেষ হইল। কিন্তু

কল্যাণেশ্বরীর নাম করিয়া আসিয়া আর এক দেবীর দর্শন লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার বিষয় কিছুই জানি না। তথাপি তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

মধুপুরে অনেকেই গিয়াছেন; কিন্তু সেখানকার অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ব্যতীত পাথরোলের রাজার কালী অনেকেই দেখেন নাই।

পাথরোল মধুপুর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। আমাদের মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন পাথরোল রাজ ম্যানেজার শ্রীযুত মতিবাবু নিজের মোটরে। সেখানে যাইয়া আলাপ হইয়া গেল পাথরোল রাজ রেসিডেণ্ট ফিজিসিয়ান ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত। তিনি বলিলেন মা কালী খুব জাগ্রত এবং বহুদিনকার। প্রকাণ্ড মন্দির। সম্মুখে দুইটী হাড়িকাঠ। উঠান হইতে মন্দিরের ফটো লইলাম।

মা কালীর ফটো লইলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম উঠে নাই; কারণ মন্দিরের ভিতর খুব অন্ধকার। এখানে প্রত্যহ কুড়ি ত্রিশটী পাঁঠা বলি হয় এবং শনি মঙ্গলবার এক শত হইতে দুই শত পর্য্যন্ত বলি হয়।

মতিবাবু মা কালীকে প্রণাম করিতে আসিলে প্রধান পুরোহিত তাঁহাকে ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন এবং মন্দিরে বসাইয়া তাঁহার আমি একটী ফটো লইলাম।

পাথরোলের রাজার নাম শুনিলাম টিকায়েৎ কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ। রাজা খুব ধর্ম্মভীরু এবং একজন বিখ্যাত শিকারী। প্রকাণ্ড আঙ্গিনায়, শুনিলাম, আগে না কি সবই খাপরার ঘর ছিল; এখন নূতন নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে। একটী প্রকাণ্ড ইঁদারা দেখিলাম। শুনিলাম ম্যানেজার শ্রীযুত মতিবাবু আসিয়া অবধি রাজ্যের খুব উন্নতি হইয়াছে। মতিবাবু খুব সদাশয় ব্যক্তি। একদিন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

তার পর দেখিলাম মধুপুরের বিখ্যাত অন্নপূর্ণা মন্দির। কি সুন্দর স্থান। দেবালয়টীও প্রকাণ্ড। দেবী অন্নপূর্ণা মহাদেবকে অন্ন দিতেছেন।

আমার সুখ-দুখ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

চতুর্দ্দিকে কতই আমার অভাব,
গোলাপ ফোটে কিন্তু বাগান ভরি',
ভগ্ন ভিটায় এম্‌নি আমার স্বভাব
দিগন্তেরি সঙ্গে আলাপ করি।

২

পড়ছে গলে' আমার ঘরের দেয়াল,
ভাঙছে বাড়ী প্রবল অজয় বানে,
গৃহ-হারার সে দিকে নাই খেয়াল,
দৃষ্টি তাহার কালিদহের পানে।

৩

নিভু নিভু মাটীর প্রদীপখানি,
চাঁদের আলোর উজল আমার ঘর,
পর্ণপুটে অমৃত আমদানী,
বাইরে মরু, অন্তরে সাগর।

৪

অসন বসন দুয়ের টানাটানি,
ভগ্ন তোরণ, নাই কোনো গৌরব,
দ্বারে করে দৈন্য হানাহানি,
রঙমহলে অমৃত উৎসব।

৫

ভালবাসায় পূর্ণ যে মোর বুক,
গোলায় বটে নাই মোটে ধান্য,
দয়াল আমার ভাগ করে লয় দুখ,
গ্রহণ করেন দীনের শাকান্ন।

৬

ওগো ধনী, এতই কেন নিদয়,
দুখ দেখিছ, সুখটা আবার দেখো।
বাহির থেকে মাপ করোনা হৃদয়,
বাক্স দেখে আঙুর কিনোনাক'।

সখের শ্রমিক

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল্

(৫)

নন্দদুলাল মনে মনে হাসলে তার পর-দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে। বোকার দল! মাথা খারাপ ক'রে দেবে সামান্য একটা মেয়ে—না হয় তো—তার দুটো বড় বড় চোখই আছে ; আর চলনটা না হয় তো এরোপ্লেনের মত মসৃণ অথচ তরঙ্গায়িত। কিন্তু সে মাখন গড়া বিজলী-প্রভার এমন কি অস্ত্র আছে নন্দদুলালের মনের কেল্লা বোম্বার্ড কর্ব্বার? হগসাহেবের বাজারে কি তারা রোজ এমন সময় আসে? ফুলগুলা কখনই আর একদিনের বেশী থাকেনা। যে একদিন ফুল কেনে তাকে রোজ কিন্‌তে হয় ফুল। ফুলেদের সেইটা বদ অভ্যাস। এলেই বা তারা, বাজার কি কারও নিজস্ব। তাদের ভয়ে যদি তাকে হগ্‌সাহেবের বাজার বর্জ্জন কর্ত্তে হয় তা' হ'লে ধিক তার শিক্ষা, মিথ্যা তার সংযম। তার দৃষ্টি পড়লো দাঁত-মাজা ব্রাসের উপর। সর্ব্বনাশ! এমন টাক-পড়া বুরুষে দাঁত মাজ্‌লে দাঁত আর থাকবে ক'দিন। প্রিন্স অফ্ ওয়েলস বলেছিলেন সাধারণের দাঁতের উপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্য। সে কাগজে পড়েছিল সস্তার বুরুষে অ্যানথ্‌াক্স রোগ জন্মে। কাজেই গুটিগুটি সে নূতন বাজারে গেল।

চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে। কয়েকটা ফুলের দোকা-নের সাম্‌নে অনেক বার পাক দিলে। একবার চৌরঙ্গী অবধি এসে আবার ফিরে গেল দাঁত-মাজা বুরুষ কিন্‌তে। কিন্তু—

বাসে একজন তার পা মাড়িয়ে দিলে। এমন পা মাড়ানো বাসের আরোহীদের নবীন যুগের অধিকার। আজ কিন্তু নন্দ-দুলাল সে অধিকারকে মান্‌লে না।

—কি মশায় অমন পটল চেরা চোখে গরীবের পাটা দেখতে পেলেন না? দেখুন দেখি জুতার পালিসটা মাটি হ'য়ে গেল!

ভদ্রলোক ক্ষমা প্রার্থনা কল্লে। তাতে তর্ক থাম্‌লো কিন্তু মেজাজ চড়লো সপ্তমে। তার উপর হাওয়ার অভাবে পথে ধোঁয়া জমেছিল। বাসের দক্ষিণে বামে যে সব মোটর গাড়িগুলা যায় তাদের আরোহীদের দেখবার উপায় নাই।

রাত্রে বিশ্ব-বিজয় অরুণ-কিরণকে বল্লে—হগ্‌ সাহেবের বাজার।

অরুণ-কিরণ মন্দির-মঙ্গলকে চুপিচুপি বল্লে—মেম্। হগ্‌ সাহেবের বাজার।

মন্দির বল্লে—সেই সন্দেহই অমার হয়েছিল। কারণ ও নীলরঙের সার্ট ভালবাসে। মেয়েদের নীল চক্ষুই শ্রেষ্ঠ আঁখি।

দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন-বুরুষ কেনা হল না, কেবল বাজারে ঘুরে বেড়ানো হ'ল। চতুর্থ দিন অন্যমনস্ক ভাবে নন্দদুলাল হুমড়ি খেয়ে এক মেমের ঘাড়ে পড়ে গেল। অতি বিনীত ভাবে সে ক্ষমা চাইলে। মেম এক মুখ হেসে তাকে ক্ষমা কল্লে। চীনা পোষাক কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা কল্লে। নন্দ তাকে নিয়ে গেল দোকান দেখাতে।

দূর হ'তে তাকে 'ছায়া' কর্চ্ছিল অরুণ আর মঙ্গল। তাদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্‌লো।

নন্দ-দুলাল বাজার ছেড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ধারে বেড়ালে সাত দিন পরে। সেখানে অনেক মহিলা। রাম-ধনুকের রঙকে হার মানায় অনেকের কাপড়ের রঙ্—বিশেষ অবাঙ্গালীদের।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ পার হয়ে ঝাউগাছের রাস্তায় যাচ্ছিল সে। একখানা গাড়িকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল কজন লোক। হঠাৎ তার কাণে গেল শব্দ—কুলি। সে ফিরে দেখলে। হাঃ ভগবান! ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে কত শ্রুতিমধুর গান গেয়ে গেল বাতাস। তার সুরে তালে তার নিজের নিভৃত মন গেয়ে উঠলো—তায় রে নায়রে নায়রে না।

সে গাড়ির কাছে গেল। সন্ধ্যা বল্লে—আপনি কি পার্ব্বেন? আসল মানে, অশিক্ষিত কুলি চাই।

বটব্যাল মশায় বল্লেন—গাড়ি ঠেল্‌তে হবে।

দুলাল বল্লে—একবার দেখতে পারি?

অগত্যা তারা সম্মত হ'ল। তাদের ড্রাইভার পনেরো মিনিট চেষ্টা করেছে—ইঞ্জিন চল্‌ছে না। তার পবিত্র ইঞ্জিনে অপরের অদক্ষ হাত পড়বে—সারথি মোটেই সে ধৃষ্টতাকে নীরবে সহ্য কর্ত্তে পার্ল্লে না। সে বল্লে, হাম্‌ দেখা আন্‌জন্‌ ঠিক্‌ হায়। ঠেল্‌নে হোগা।

—উঠাও। তার মুখের দিকে দুলু তাকালে। সন্ধ্যা দেখলে সে চাহনী তার দাদার চাহনীর অনুরূপ। সে রকম ভাবে কেহ তাকালে ড্রাইভার সেলাম ক'রে বনেটের দরজা খোলে। সে তাই করলে—না ভেবে অভ্যাস বশে।

দুলু দেখেই বল্লে—কেয়া কিয়া? এক নম্বর প্লাগ দো নম্বরমে লাগায়া—দো নম্বর এক নম্বর মে, হুপ্‌।

প্লাগেরা স্থান বদল কর্ল্লে। দুলাল বল্লে—ষ্টার্ট দেও চাবীমে।

ড্রাইভার চাবি ঘোরালে। এতক্ষণ কোন দিচ্ছিল না। এবার সে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লে। দেহে প্রাণ এসেছে।

সন্ধ্যা আনন্দে বল্লে—ঠিক্‌ হয়েছে।

—না, একটু দেরি হ'বে—কার্ব্বরেটারে তেলে ভর্ত্তি।

কিছুক্ষণ পরে যখন টগ্‌ টগ্‌ শব্দ হল—কর্ত্তা হাসলে, সন্ধ্যা হাত-তালি দিলে। তখন নন্দ-দুলালের জ্ঞান ফিরে এলো। সর্ব্বনাশ! করেছে কি? কুলি সে—কোথায় গাড়ি ঠেল্‌বে, না, গাড়ি চালিয়ে দিলে।

সে গোটানো আস্তীনকে নামাতে নামাতে বল্লে—আজ্ঞে, বাবুদের দেখি কি না তাই। আমি কুলি মানুষ।

বটব্যাল মশায় বল্লেন—নিঃসন্দেহ।

সন্ধ্যা বল্লে—তা কুলির কাজ করেন বলে কি আর গাড়ি সারাতে জানেন না?

হাঁ—তা বৈ কি! এ তো শ্রমিকেরি কাজ। মানে হচ্ছে অর্থাৎ—

তারা গাড়িতে বস্‌লো। কর্ত্তা পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিলে। ড্রাইভার দেখেনি।

নন্দ-দুলাল বল্লে—আজ্ঞে, এটা।

সন্ধ্যা বল্লে—তাতে কি হয়েছে—উপার্জ্জন।

সন্ধ্যা বলেছে উপার্জ্জন! সে নতশিরে তাদের প্রণাম কর্ল্লে; গাড়ি চলে গেল। সে নম্বরটা দেখে নিলে। মুখস্থ কর্ত্তে লাগল। গানে নম্বরে মিলিয়ে চল্ল। সীমার মাঝে তিরিশ হাজার অসীম তুমি তিনশ বাজাও আপন সুর ছয়—ইত্যাদি।

বাসে একজন তার পা মাড়িয়ে দিলে। ঝাঁকানীতে একজন তার কোলে বসে পড়লো। তারা যখন মাপ চাইলে, নন্দ-দুলাল বল্লে—বিলক্ষণ! কি সর্ব্বনাশ। এমন তো হয়েই থাকে। আপনাদের তো লাগেনি। আমার পায়ে কড়া আছে।

তারা যতক্ষণ না-না-বল্লে, নন্দ-দুলাল উৎসুক নয়নে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রহিল। তারা স্বচ্ছন্দ হ'লে হাঁফ ছেড়ে নন্দ মনে মনে গান ধরলে—এমন চাঁদের আলো, মরি যদি তাও ভাল, ত্রিশ হাজার তিনশত ছয়। সে পাজি দেখেনি আর গ্যাসের আলো তাকে ভুল বুঝিয়েছিল। সে দিন অমাবস্যা।

(৬)

নভেলের নায়করা প্রেমে পড়ে—এক মুহূর্ত্তে। বাস্তব জগতে লোকে এক মুহূর্ত্তে প্রেমে পড়ে বটে, কিন্তু সে কথা বুঝতে সময় লাগে তার আট দিন। আর সে যদি হয় গোলদীঘির বিবাহ-বিরোধিনী সভার নেতা, তাহ'লে নিজের মনের কাছে সে সংবাদটা গোপন করে রাখে সে পনেরো দিন নিদেন পক্ষে।

নন্দ-দুলাল মোটর-রেজিষ্ট্রির কেতাব থেকে সন্ধান নিয়ে জাষ্টিস রমেশ মিত্র রোডে বটব্যাল মশায়ের বাড়ি দেখে এসেছিল। অধর তখন বাজারে যাচ্ছিল ফুলকপি আর মাখম সিম কিন্‌তে। নন্দ-দুলাল তাকে বল্লে—হ্যাঁ হে, বল্‌তে পার এখানে কমল চাটুয্যের বাড়ি কোথায়? এইটে নাকি?—

—কমল চাটুয্যে! ইন্দ্র বটব্যাল জজ সাহেবের বাড়ি তো এইটে। আজ্ঞে আমি শ্রীঅধর মণ্ডল। আমার পিসিমা বলেন নামের আগে সর্ব্বদা শ্রী বলবে।

—ওঃ! না—কমল বাবু। জজসাহেব কোথাকার জজ?

—এখন প্যানসেন্‌ নিয়েছেন। আমার পিসিমা বলতেন—

—ওঃ। বলতেন নাকি?—মনে মনে ভাব্‌লে যে

রোগে বৃদ্ধাদের বাক্‌রোধ হয়, এর পিসিমার সে রোগ হয় না কেন।

সে তার সঙ্গে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। অধর তার পিসিমার কথা না বলে ছাড়বে না। সুতরাং নন্দদুলালকে শুন্‌তে হল তার পিসিমার উপমা—অবসর লওয়া জজের সঙ্গে বি-পত্নীক স্বামীর।

অধরের দোষ ছিল না বল্লে সত্যের মর্য্যাদা হানি হয়। কিন্তু গুণ ছিল তার অনেক। সে একবার কথা কইতে আরম্ভ কল্লে থামে না। আর তার প্রগল্‌ভতা শ্রোতাকে সমাচার দেয় তার মনিব বাড়ির সকল ঘটনার—শান্তি হ'তে কান্তি অবধি সবার।

—মেয়ে তো আমাদের ছোট দিদিমণি। দু-দুটো পাশ করেছে। আর কি দয়া! একটা ভদ্দর লোকের ছেলে কুলির কাজ করে—

—কুলির কাজ করে? কুলির কাজ করে? ভদ্রলোকের ছেলে?—

—হ্যাঁ বাবু। কি বলে গরাজেট না কি কে জানে?

অধর তিন দিন দাড়ি কামায় নি; আর তার উপর গোঁফগুলাও তার আনজিনের মত—চুম্বন অসম্ভব। কৃতজ্ঞতা প্রকট কর্ব্বার সুবিধা না পেয়ে দুলাল বল্লে—হ্যাঁ কি বল্লে দিদিমণি?

এক চাষার কাছে টাট্‌কা কপি দেখে প্রভুভক্ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ শ্রীঅধর মণ্ডল ছুটে তাকে ধরতে গেল। নন্দদুলাল মনে মনে তার পিসিমার সজ্ঞানে গঙ্গালাভ কামনা ক'রে হোষ্টেলে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লে।

সে যখন শয্যায় শুয়ে নিদ্রাদেবীকে বার বার উপেক্ষা কর্চ্ছিল সন্ধ্যা বটব্যালের ধ্যানে, মন্দির-মঙ্গল তার কক্ষে প্রবেশ কল্লে। সে খানিকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে নন্দদুলালের দিকে তাকিয়ে রহিল। বিরক্তি ফুটে উঠেছিল সর্ব্বাঙ্গে নন্দদুলালের, কিন্তু মন্দির অতিথি। তার উপর চিত্ত-বিশ্লেষক।

—কি হে এত রাত্রে বাড়ি যাওনি?

—না। অরুণের জন্যে অপেক্ষা করছি। সে ও-ঘরে গল্প কর্চ্ছে—তোমারি কথা।

—আমারি কথা? ভাল। আমি তা' হ'লে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

—তা' নও? দেখ চৌধুরী প্রেম আগুনের মত। তার মধ্যে যে প্রবিষ্ট হয় সে দীপ্ত। হোম-শিখার মত সে জ্বলে ওঠে। তার ময়লা সব পুড়ে ছাই হয়।

এমন কথার পর একটিপ নস্য না লওয়া পেট্রোল না দিয়ে মোটর চালাবার মত ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সে মস্তিষ্ক-যন্ত্রে ইন্ধন দিলে।

নন্দদুলাল বল্লে—তাই নাকি? এখন বোঝা যাচ্চে সীতার অগ্নি-পরীক্ষাটা রূপক মাত্র। দেবী সত্য কাট-কয়লার আগুনে প্রবেশ করেন নি। বহু দিন পরে শ্রীরাম-চন্দ্রের দর্শন লাভে নিবিড় প্রেম হোম-শিখার আকার ধারণ করে তাঁকে অগ্নিময়ী দেখিয়েছিল। সেকালের বিজ্ঞরাও ছিল অজ্ঞ। ভেবেছিল অগ্নি-পরীক্ষা কাবাব রাঁধার মত প্রক্রিয়া।

মন্দির-মঙ্গল দেখ্‌লে নন্দদুলাল ভ্যাসলিন মাখানো মাগুর মাছের মত কেবল ফস্‌কে যাচ্চে। সম্মুখ-সমরে তাকে ঘায়েল করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। সে বল্লে—দেখ নন্দ, আমি ফ্রয়েড থেকে পরেশ সেন অবধি সবার রচিত যৌন-বিজ্ঞান ও মনোজ-সাহিত্য অধ্যয়ন করেছি। বিদ্যা না হয় বাদ দিলাম। চক্ষের সাক্ষ্য যে তোমায় ধরিয়ে দিয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ চীনদেশের জজেরাও মানে। মেমটি কে?

—মেমটি কে?

তার রস-বোধ জেগে উঠ্‌ছিল।

—হ্যাঁ। মেম। নূতন বাজারের মেম। আকাশ নীল স্কার্ট। রক্তাধর, গোলাপগণ্ড। পায়ে বাটার তে-রঙ্গা জুতো।

—জেনেছ? ছিঃ! ছিঃ! এ কি বন্ধুর কাজ? পুলিসের গোয়েন্দার মত ছায়া করেছ? উঃ!—

পুলিসের কথাই যখন উঠ্‌লো মন্দির বুঝ্‌লে ধৃত অপরাধীর স্বীকারোক্তিতে পুলিস কেন সার্থক-শ্রমের গৌরব অনুভব করে। বিজয়ীর মহত্ত্ব উদারতায়,—বিজেতার প্রতি সহানুভূতিতে। মহানুভবতায় কেন সে পেছ-পাও হবে এতকাল জোলা ডি-কক্‌, পরেশ সেনের নভেলস্তূপে মাছ-পোকার মত বিচরণ করে। সে বল্লে—নন্দ, তুমি লজ্জিত হ'য়ো না। যৌবনের প্রতিশ্রুতি অবিমৃষ্যকারিতা। প্রেম-পাত্রীর অভাবকে প্রেম-বর্জ্জন বলে ভুল করে যৌবন। এ কথার ইঙ্গিত স্পষ্ট পাওয়া যায় কোক্‌-শাস্ত্রে।

—বল ভাই। শাস্ত্রজ্ঞ তুমি। কিন্তু প্রেম যখন আসে—সে আসে দামোদরের বন্যার মত। উঃ!

এ সহজ সত্যে দুই বন্ধু একমত হল। শেষে উভয়ে পরামর্শ হল কেমন ক'রে গাঁথা মাছ খেলিয়ে তীরে তুলবে। নন্দদুলাল তার পিতামহ স্বর্গীয় বনোয়ারীলাল চৌধুরী মশায়ের উইলের উল্লেখ কর্ল্লে—অহিন্দু এমন কি অসমবর্ণ বিবাহের ফলে তাকে সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে।

শেষে স্থির হ'ল সহজিয়া প্রেমই আদিম প্রেম। কেভ-ম্যান পূর্ব্ব-পুরুষের আমলে না ছিল পুরোহিত না ছিল রেজিষ্ট্রি অফিস।

মন্দির নাম জেনে নিলে যুবতীর—মিস্ হচ্‌পচ্‌। ঠিকানাও জেনে নিলে। মনে মনে স্থির কর্ল্লে গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে মন্দির কুমারী হচ্‌পচ্‌কে নন্দ-দুলাল-চরিত্রের সৌন্দর্য্যটা বুঝিয়ে দেবে। পরোপকার জ্ঞান-সাগর-মন্থনের প্রথম সু-ফল। সে গাছপাকা ল্যাঙড়া অপেক্ষা মিষ্ট এবং কুল্লুর সেব অপেক্ষা সরস।

(৭)

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বেশ শীত পড়েছে, অর্থাৎ কলিকাতায় প্রথম পৌষে যে মাত্রায় পড়ে। নন্দ-দুলালের আবশ্যক হ'য়েছিল নূতন জুতা! সে সহর ছেড়ে ভবানীপুরে এসে পড়েছে—হঠাৎ উপলব্ধি কর্ল্লে জাষ্টিস রমেশ মিত্র রোডের মোড়ে এসে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে সে পূর্ব্বমুখে গেল—পশ্চিমে পড়ন্ত-রৌদ্র তার কপালে লেগে আধ-কপালে মাথা ধরার সৃষ্টি কর্ত্তে পারে এই দারুণ আশঙ্কায়। সে ধীর সংযত, প্রেমিক হ'লেও মাথা-গরম হয়নি—এ বিষয়ে সে ছিল নিঃসন্দেহ।

একটু এগিয়েই সে দেখ্‌লে মিঃ বটব্যাল ব্যস্ত হয়ে বড় রাস্তার দিকে আস্‌ছেন। সে তাড়াতাড়ি তাঁকে নমস্কার ক'রে কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ! ওঃ! তুমি। এ পাড়ায়?

—আজ্ঞে! ওর নাম কি—কাজের চেষ্টায় যাচ্চি। শুনেছি ল্যান্সডাউন মার্কেটে অনেক কাজ।

—বেশ! বেশ! আমি যাচ্চি ড্রাইভার খুঁজতে। আমার পুরানো ড্রাইভার আসবে চার দিন পরে। নূতনটা অকেজো। কুলি—এই অর্থাৎ মূর্খ কুলি। তাই জবাব দিয়েছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে উত্তর দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালে পূর্ব্বে পশ্চিমে কেবল কতকগুলা দাড়ি দেখা যায়, তাঁর দক্ষতা অতি অল্প।

—কিছু জানে না। গাড়িখানা মাটি কর্ল্লে। নূতন গাড়ি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গাড়ির অকাল-বার্দ্ধক্য অবশ্যম্ভাবী অমন ড্রাইভারের হাতে।

বটব্যাল মশায়ের সন্দেহ হচ্ছিল বুঝি বা ছেলেটা জ্যেঠা। কিন্তু তার বিনীত হাব-ভাব সে সন্দেহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর্ল্লে।

—হাঁ। আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল—

—আপনি বলবেন না, তুমি বলুন। আমি গত ফাল্গুনে বাইশ উত্তীর্ণ হয়েছি।

—হ্যাঁ তা ভাবছিলাম তুমি যদি—

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ আমিও ভাবছিলাম যদি আমি—

—হাঁ মাত্র চার দিন। সকাল সন্ধ্যা। অবশ্য এও তো শ্রমিকের কাজ। তোমার প্রিন্সিপল—

—আঁজ্ঞে না। মোটে না।

তার লাইসেন্স আছে কি না জেনে নিলেন ভূতপূর্ব্ব বিচারক। আইন-ভাঙ্গার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি কোনো দিন।

নন্দদুলাল দুরু দুরু হৃদয়ে ভদ্রলোককে অনুসরণ কর্ল্লে। সে নিজেকে বোধ কচ্ছিল দম্-দেওয়া এরোপ্লেন। মনের ব্রেক ক'ষে উড়ে যাওয়া বন্ধ কচ্ছিল। নাভি থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে সুর উঠ্‌ছিল—

এই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়েও দামী
তারে উজাড় ক'রে সাজিয়ে দিলাম তোমার বরণ-ডালা।

যাদের ব্যক্তিত্ব দৃঢ়, তাদের পছন্দ অপছন্দও খুব স্পষ্ট। উমারাণী গাড়িতে বসেই নন্দদুলালকে প্রসন্ন-চিত্তে দেখ্‌লে। ভিতরে কর্ত্তা-গৃহিণী ও কুমারী বস্‌ল। সশ্রদ্ধভাবে গাড়ির দরজা বন্ধ করে সে সস্নেহে শান্তিকে বসালে বাহিরে। তার দিকে চেয়ে একটু দাদার হাসি হাস্‌লে। কিন্তু সে হাসির পরিণামে মহিলা-দ্বয়ের প্রাণে একটা প্রীতিকর ভাব জন্মাল

এবং অনুভূত হ'ল। হাল-চাকায় হাত দিয়ে সে বল্লে—কোথা যাব ?

—এই হাওয়া খাওয়া—

বড় চক্কর দেব ?—

—বড় চক্কর! আচ্ছা।—

চক্রের কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট, সে সম্বন্ধে আরোহীদের কারও কোনো জ্ঞান ছিল না। বটব্যাল ভাবলেন—এর বাপের কি দুর্ভাগ্য! এমন ছেলে! লেখাপড়া শিখেছে—গাড়ি চালাতে পারে—চক্করের বড় ছোট জানে। এখন বড় কাজের চেষ্টা করবে, না সখের কুলি হ'য়ে বাজারে বাজারে ঘুরছে।

উমারাণী ভাব্‌লে—ছেলেটা নিশ্চয় ছদ্মবেশী রাজপুত্র। এর পরিচয় নিতে হবে।

সন্ধ্যা ভাবছিল—এ যার দাদা সে বেশ সুখী। কিন্তু যখন শুন্‌বে যে দাদা কুলি-গিরি করে—তখন আহাঃ!

বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতে গাড়ি চলছিল। হ্যাঁচ্‌কানি নাই, দমক নাই, ঝট্‌কা নাই। রাক্ষসের মত যখন দ্বিতল বাস ছুটে আসে সে সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে এগোতে দেয়,—তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। একটু হর্ণ বাজায় বেশী; কিন্তু নিঃশব্দে মানুষ মারার চেয়ে একটু শব্দ করা ভাল। তারপর লোকের অদৃষ্ট।

তারা জান্‌তো লেকে যাবার পথ। সে মোড় ছাড়ালে তাঁদের বুইক। একটা রেল পথের তলা দিয়ে তাদের পথ দৃষ্ট হ'ল। একখানা মাল গাড়ি আর দশ সেকেণ্ড পরে পুলের উপর দিয়ে যাবে। নন্দদুলাল গাড়ির বেগ খুব মন্দ কল্লে। যখন রেলগাড়ি পোলের উপর এলো সে ধীরে ধীরে তার তলায় নিয়ে গিয়ে গাড়ি থামালে। মাথার উপর বজ্র-নিনাদ ক'রে মন্থর গতিতে লৌহ বর্ত্মে যাচ্ছিল বাষ্প যান। শান্তি আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লো—হাততালি দিতে লাগ্‌লো। কুমারীরও খুব আনন্দ, কিন্তু সৌজন্য তাকে চীৎকার কর্ত্তে দিলে না। কর্ত্তা-গৃহিণী হাস্‌তে লাগলেন। নন্দদুলাল যত বা শক্তিতে গাড়ির ব্রেক্ চাপ্‌লে ততোধিক শক্তিতে হাসি চাপলে। কিন্তু একেবারে গম্ভীর হওয়া অসম্ভব ও-রকম ক্ষেত্রে। তার অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত হ'ল, আর হাসির দমক মাঝে মাঝে কাঁধটাকে উপরে ধাক্কা দিলে।

উমারাণী বল্লেন—ছেলেমান্‌ষীতে কাজ নাই। গাড়ি চালাও।

—না—মা—বলে সমস্বরে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো ছেলে-মেয়ে।

শেষ রায় দিলেন কর্ত্তা।—না চালাও। মাথায় কিছু পড়তে পারে।

গাড়ি রিজেন্ট পার্কের ধারে এসে দাঁড়ালো। তখন পশ্চিমে একরাশি নারিকেল গাছের পিছনে সূর্য্য মুখ লুকিয়েছেন। সিন্দুরের রঙে ছেয়ে গেছে পশ্চিমের আকাশ। চারিদিকে সবুজ, তার উপর লালের আভা। নূতন ড্রাইভার নন্দদুলাল মুখে কিছু না বলে সূর্য্যাস্তের শোভার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্ল্লে।

এঁরা জীবনের বেশী দিন কাটিয়েছেন কলিকাতার বাহিরে, যেখান থেকে মানুষ প্রাণপণ শক্তিতে সভ্যতার নামে প্রকৃতির গা থেকে সৌন্দর্য্যটুকু মুছে ফেলেনি। সে চিত্রে সবাই মুগ্ধ হ'ল। মেয়েটা মুখরা, বল্লে—কু-কু-কু-কুলি বাবু, আপনি যদি ডুবন্ত সূর্য্য দেখে এমন আত্মহারা হ'ন তা' হলে আপনার চালানো গাড়ি চড়া নিরাপদ নয়।—

স বল্লে—মিস্—ওর নাম কি—মিস্—

—বটব্যাল।—

সে নাম যেন সে প্রথম শুন্‌লে এইরূপ ভান দেখিয়ে বল্লে—ওঃ! মিস্ বটব্যাল। আমাদের মিশনটাই তো তাই। চাঁদের আলো আমাদের, মানে শিক্ষিতদেরও যেমন উৎফুল্ল ক'রে, তেমনি উৎফুল্ল করবে অশিক্ষিত শ্রমিকদের, তারা আর আমরা যদি ভাব্‌তে শিখি যে কুলিও মানুষ। পশু-পক্ষী আত্ম-ভোলা হয় স্বভাবের পট-পরিবর্ত্তন দেখে কিন্তু আমাদের গরীবরা—আর গরীব তো সবাই—

সন্ধ্যারাণী প্রেরণা অনুভব করছিল তার আবেগ-ভরা বাণীতে। কিন্তু পরকে ঠোক্কর দেওয়া তার স্বভাব। বল্লে—বেতারবার্ত্তা মারফত আপনি কেন প্রচার করেন না আপনাদের সামাজিক মতামত ?

সবাই হাস্‌লে। অপ্রস্তুত হ'ল দুলাল। ইপ্সিত পরাজয়ের গৌরব ফুটে উঠ্‌লো তার মুখে। সে বল্লে—বাম দিকে একটা প্রকাণ্ড দীঘি আছে; তার পিছনে জঙ্গল। আর ডান দিকে একটা মজা নদী, তার খাদে বেড়ালে মনে হয় উপত্যকায় ঘুরচি।

কর্ত্তা বল্লেন—তুমি তো বেশ গাড়ি চালাও।

প্রতিবাদ করা ডিপ্লোমেসি হ'লেও এক্ষেত্রে উমারাণী

অন্তর্নিহিত স্বামীভক্তিকে রূপ দিলেন ছোট একটি কথায় —হ্যাঁ।—

নন্দদুলাল বল্লে—মনে মনে যদি সূত্রটা ঠিক করে নেওয়া যায় তা হ'লে সব কাজ সহজে করা যায়।

আখ্যান-মঞ্জরীতে সূত্র ছিল না সুতরাং গৃহিণী বুঝলেন না, বা পড়ন্ত রোদের রঙিন আনন্দ ছেড়ে হেঁয়ালীতে মনোনিবেশ কল্লে'ন না।

অতীতকালে ইন্দ্র-ভূষণ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়েছিলেন যাতে লিপিবদ্ধ সহর্ণের্ঘঃ—কথাটা তাঁর মনে ছিল। এক রকম বুঝলেন।

সন্ধ্যার তরুণ মগজ যা বুঝ্‌লে তার অমৃত ভাষা তাকে প্রতিফলিত কল্লে'—যেমন অধরের গা-টেপ্‌বার জন্যে হাড় চুরি করা।

সে সমস্ত গল্পটা যখন বল্লে, তখন নন্দদুলালের মনে তেমনি শান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হ'ল সীতাকুণ্ডুর পবিত্র বারি যে শান্তি যে তৃপ্তি তৃষিত তীর্থ-যাত্রীর মনে আনে।

সে বল্লে—গাড়ী চালাবার রহস্য হ'চ্চে এই। ভাবতে হবে—প্রত্যেক রাস্তার লোক আমার গাড়ির তলায় পড়ে আত্ম-হত্যা কর্ব্বে এই কু-অভিপ্রায়ে বাড়ির বাহিরে এসেছে। আর আমারও ধনুক-ভাঙ্গা পণ যে আমি তাকে আমার গাড়িতে মরতে দেবনা। এ পৃথিবী ভাল না লাগে জগন্নাথের রথের চাকা আছে। তা ছাড়া কলেরা, প্লেগ, রক্তের চাপ—বই-ভরা রোগ তো আছেই। আমার এক বন্ধু বলত—

—অধরেরও পিসিমা বলত—

সবাই হাসলে। উমারাণী বললেন—সন্ধ্যা!

বে-হাওয়ায় যাওয়া ঘুঁড়ির সুতো টান্‌লে ঘুঁড়ি যেমন থাপ্পা খায় সন্ধ্যাও তেমনি সংযত হল।

কর্ত্তা বল্লেন—আর অপরের দক্ষতার অভাবে তো বিপদ হ'তে পারে।

—হ্যাঁ, সেটা হ'ল ২ নম্বরের প্রিন্সিপল। ভাবতে হবে প্রত্যেক গাড়ি আমার গাড়িকে ধাক্কা দেবার জন্য শশব্যস্ত। কাজেই পরের কর্ত্তব্যবুদ্ধির ওপর নির্ভর না ক'রে অপরের গাড়ির সামনে থেকে নিজে সরে পড়াই হ'ল গাড়ি চালাবার কৌশল।

কর্ত্তা ছেলেটার বাপের দুঃখে মনে মনে সহানুভূতি প্রকাশ কল্লে'। এখনও যদি তরুণরা সাম্‌লে চলে তো দেশটা মাটি নাও হ'তে পারে।

তারা দীঘির পাড়ে গেল। গৃহিণী এতক্ষণ কথা কননি। সন্ধ্যা ও শান্তি দীঘির জলে দেখছিল আকাশের প্রতিফলিত বর্ণ। উমারাণী পাশের ক্ষেত্রে মটর-সুঁটির চারা দেখতে যাবার ভান করে তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—বল তো বাবা, তুমি কাদের ছেলে।

—বলছি তো মা, আপনাদের ছেলে। কাজ কর্চ্ছি কুলির।

—কোথা বাড়ি? কি নাম?

—মার কাছে গোপন কর্ত্তে পার্ব্বনা। জিজ্ঞেস কর্ব্বেন-না। যখন মা-বাপ ছোট কাজকে বড় ভাববেন তখন পরিচয় দিলে তাঁদের সম্ভ্রম থাকবে। এখন লোকে আমার দিকে হাত দেখিয়ে বলবে—অমুকের ছেলে লেখা-পড়া শিখে মোট বয়, মোটার চালায়।

উমারাণী বল্লেন—মোটের ওপর তোমার মাথা খারাপ।

সে মাথা চুলকাতে লাগল।

গড়িয়াহাট, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া ঘুরে তারা ঘরে এলো।

মহা আনন্দে নন্দদুলাল সে দিন বাসায় ফিরলো।

(৮)

চার দিন চাকুরীর শেষে নন্দদুলাল পিতার নিকট হ'তে পত্র পেলে যে তিনি কলিকাতা আসছেন। মলয়ানিল হোটেলে, তাঁর আদেশ মত, পুত্র ঘর ঠিক্ করলে।

পিতা পুত্র উভয়ে আনন্দিত হ'ল মিলনে। পিতার নিকট দুলাল কলিকাতার সব কথা বল্লে, অবশ্য তার কুলি-গিরির কথা বাদে।

সে নিজেকে ক'দিন ধরে প্রশ্ন কচ্ছিল কেন সে এই মিথ্যার মুখোসটা পরে থাকে বটব্যালদের মাঝে। এখন আত্ম-গোপন ভিন্ন তার উপায়ান্তর ছিলনা। প্রবঞ্চনা ক'রে তাদের দাসত্ব করেই বা তার লাভ কি হ'চ্ছিল? প্রাণের মধ্যে গনগনে আগুন পুষে সে কেন তার উত্তাপে দগ্ধ হচ্ছিল? কোনো স্পষ্ট উত্তর তার বুদ্ধি তাকে দিলেনা। কেবল হৃদয় বল্লে, কবির কথায় কৃষ্ণ দেখার ফল কৃষ্ণ দর্শন।

তার পিতা বল্লেন—তোর মা একটু অধীর হয়েছে তোর বিয়ে দেবার জন্য। আর কিন্তু আমি অপেক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না।

দুলু বল্লে—বাবা এম্‌-এস্‌সিটা পাশ কর্ত্তে দিন্‌। মাকে আপনি বোঝালে বুঝবেন।

—অসম্ভব। তোর ব্যাপার আমার হাতের বাহিরে। তুই বড়-দিনের ছুটিতে গিয়ে বোঝাস্‌।

পিতা মাতাকে দেখতে পাবে, তাদের স্নেহের মধ্যে বাস কর্ব্বে—এ সুখস্বপ্ন দেখে এতদিন নন্দদুলাল প্রাণ ধারণ কর্চ্ছিল। কিন্তু মন্মথ ব'লে এক দেবতা আছেন। তাঁর বাণবিদ্ধ হ'য়ে মানুষ মিথ্যা বলে, খুন করে, ডাকাতি করে। স্নেহের দুলাল নন্দদুলাল বল্লে—বাবা এবার বড়দিনের ছুটিতে যেতে পার্ব্ব না। পোষ্ট গ্রাজুয়েটদের হ'য়ে ক্রিকেট খেলতে হ'বে, টেনিস টুর্নামেন্ট দেখ্‌ব। পরে যাব বাবা।

কথাগুলা সত্য। কিন্তু ভাবটা মিথ্যা। পিতা একটু বেদনা অনুভব কর্ল্লে'ন। মুখে বল্লেন—বেশ্‌ বেশ। তার পরে যাস।

উক্ত দেবতার শর আরও একটা প্রবঞ্চনার কথা ফোটালে নন্দদুলালের মুখে। ভূপতি চৌধুরী বৈকালে যেতে চাইলেন নূতন বাজারে। সর্ব্বনাশ! সদ্য হাতে-হাতে ধরা পড়বার ভয়। পিতার কুলি সাজলে পিতা হবেন হতভম্ব; আর বাপের সঙ্গে ঘুরতে দেখলে তারা চাইতে পারে পরিচয়। সুতরাং সে প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা কথা ব'লে পিতার সঙ্গ ত্যাগ কর্ল্লে'। তাতে পিতাও একটু স্বাধীনতা পেলেন। পাড়াগাঁয়ের মানুষ সাজানো দোকানে ঘুরবে; আর বিশেষ পুরাতন পুস্তকের দোকানে ঘুরে পুস্তক ঘাঁটবে। পুত্র সে ক্ষেত্রে হবে প্রতিবন্ধক। নন্দদুলাল কিন্তু ব্যথিত হ'ল নিজের দশা স্মরণ করে। ভাবলে এ কাজের একটা হেস্তো-নেস্ত হ'ক; পরে দেবতা-পিতার চরণ সেবা করে প্রায়শ্চিত্ত করব। কিন্তু কি হ'লে এ-কাজের হেস্ত-নেস্ত হবে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ছিলনা তার।

জামা কাপড়ের লোভ মোটেই ছিল না ভূপতির। কাঁচের মালা, কাঠের প্রদীপ হাসির উদ্রেক করলে তার প্রাণে। বিলাসিতার প্রসাধন একবার ভাবলে শ্রদ্ধামতীর জন্য ক্রয় করবে। কিন্তু তাতে হাসবে শ্রদ্ধা। আর ছেলেই বা কি ভাববে। সুতরাং ভ্রমর বৃত্তি অনুসরণ করে সে পুস্তকের দোকানে গিয়ে পড়ল।

অন্যমন হয়ে যখন পুস্তক-মধু পান করছে, বটব্যাল মশায় স-কন্যা সেই দোকানে এসে হাজির।

—আরে! কে হে, ভূপতি নাকি?

—হ্যাঁ! ইন্দ্র দাদা! বহুদিন পরে। বাঃ! রিটায়ার করেছেন নাকি? আপনি কেন অবসর নিলেন। তেমনিই তো আছেন।

পুরাকালের গল্প হ'ল। ইন্দ্র বাবু ভূপতির অগ্রজ শ্রীপতির অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। শ্রীপতি এমন কি তাঁর স্ত্রীও এখন স্বর্গে। বারো বছর পূর্ব্বে ইন্দ্র বাবু তাদের জেলায় মুনসফ ছিলেন। তার পর আর তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি। কেহ বদলায় নি। ভূপতি পাড়াগেঁয়ে ভূত। তা' কেন? যদি বই পড়ে লোকে সুখ পায় তো পরের ঝগড়ায় রায় লেখবার প্রয়োজন কি?

—এ কি সানু? এখন সন্ধ্যা! ওমা! ম্যাট্রিক পাশ! আহা কি দিব্য চেহারা হ'য়েছে দাদা।

—চল আমাদের বাড়ি।

—এ যাত্রায় নয়। কারণ আজ ৯ টার ট্রেণে ফিরতেই হবে। আবার বড়দিনের পর আসবো। তখন আপনার ওখানে উঠবো।

—তোমার বৌ-দিদি মোটেই তোমায় মার্জ্জনা করবেন না।

এক কাজ কল্লে তো হয়। বড়দিনে কেন তাঁরা আসুন না—বিষ্টুপুরে। খুব হৈ চৈ হবে। তার বাগান মরসুমি ফুলে ছেয়ে গেছে। মাঠে মাঠে সরিষার ফুল, মটরসুঁটি। নদীর তীরে চকাচকি। বিলে অসংখ্য হাঁস। পুকুরে রুই কাতলা।

সম্মত হলেন ইন্দ্র দাদা। গৃহিণী মত কর্ব্বেন নিশ্চয়। সন্ধ্যা উৎফুল্ল হ'ল। কেবল মনে মনে ভাবলে ফুলের নাম শেখাবার আর রেলে মোট বহিবার এক কুলির কথা। সরকারী কুলিগুলা বড় অসন্তুষ্ট আর ঘ্যানঘেনে।

সেদিন পিতার সঙ্গে এলে দুলালের একটা হেস্ত-নেস্ত হত। অর্থাৎ প্রতিপন্ন হত যে সে প্রবঞ্চক। কিন্তু যে বিধাতা আকাশের রাশি রাশি নক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছেন পরস্পরের সঙ্গে ঠোক্কর না লাগিয়ে, তিনি কি আর মাত্র এই কটা লোকের আবর্ত্তন একটা ঠোক্কর না লাগিয়ে নিয়ন্ত্রিত কর্ত্তে পারেন না?

সেই বিধাতার বিধানে ভূপতি চৌধুরী বটব্যালদের কথা দুলুর কাছে উল্লেখ না ক'রে বাড়ি গেলেন। (ক্রমশঃ)

ডাক্তার ভোলানাথ বসু

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ, এফ্-আর-ই-এস্

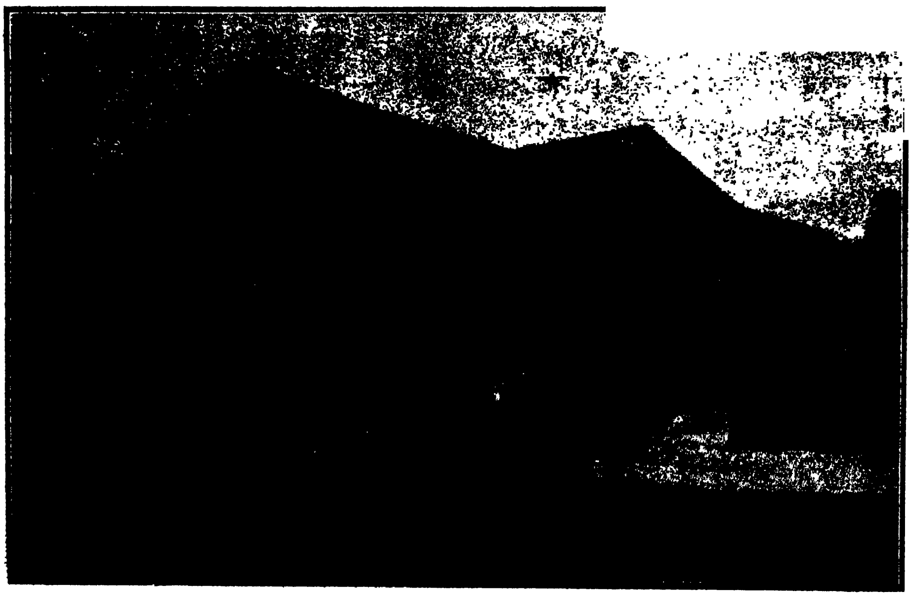
(২)

ভোলানাথের সতীর্থগণ

ইংলণ্ডে ভোলানাথের বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে তাঁহার সতীর্থগণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) দ্বারকানাথ বসু—ইনি জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসনের ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইনি মিউজিয়মে কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল কলেজ অব সার্জ্জন্‌স্ অব ইংলণ্ডের ডিপ্লোমা লাভ করিয়া কিছুদিন ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিলাতে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করিয়াই ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এদেশে আসিলে তিনি প্রথমে মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রী চিকিৎসা বিভাগে রেসিডেণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত হন এবং পরে Asstt Demonstrator of Anatomy to the English classes পদে বৃত হন। অল্প বয়সেই ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২) গোপালচন্দ্র শীল—ইনি দ্বারকানাথের ন্যায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রয়্যাল কলেজ সব সার্জ্জন্‌স্ এর ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পর বৎসর লণ্ডনের এম্-বি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে মেডিক্যাল কলেজের স্ত্রী-চিকিৎসা বিভাগে রেসিডেণ্ট সার্জ্জন ও পরে ভৈষজ্যতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি তমলুকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। এই স্থানে কার্য্যকালে তিনি দৈবদুর্বিপাকে সপরিবারে ভাণ্ডারদহ মোহানায় জলমগ্ন হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন।



পুরাতন মেডিকেল কলেজ

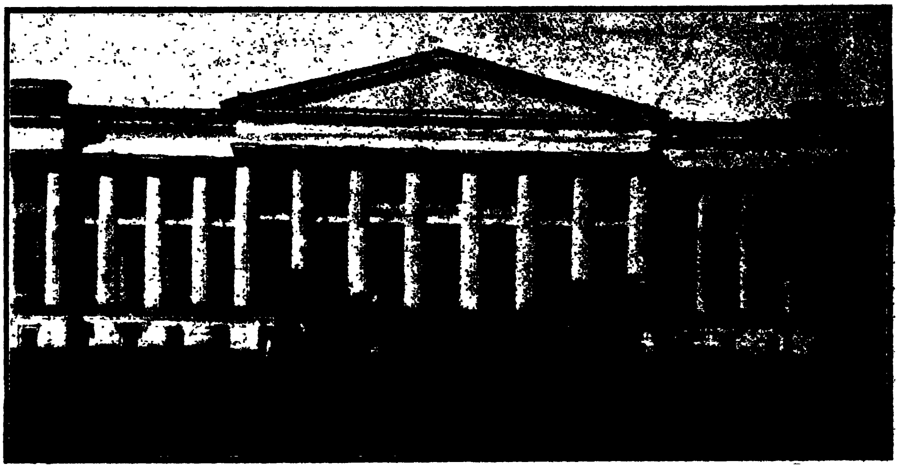
(৩) সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী—ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত কলুথা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হইয়া এক আত্মীয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং

আলেকজাণ্ডার নামক এক সিবিলিয়ানের সাহায্যে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। ভোলানাথের সহিত ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া চারি বৎসর তথায় অধ্যয়ন করিয়া এম্-বি ও এম্-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলেজ অব সার্জ্জনস্-এর সদস্য পদ লাভ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া মেডিক্যাল কলেজে সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দ অনুমোদিত হইলে ইনি চিকিৎসা বিভাগে 'চিহ্নিত' কর্ম্মচারীর পদ লাভের জন্য চেষ্টা করেন। সেই জন্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন করিয়া এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনসিপ প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দেন এবং উক্ত পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ীভাবে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রথমবার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ইনি ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহার পিতৃতুল্য গুরু ও অভিভাবক ডাক্তার গুডিভের নাম গ্রহণ করেন এবং একজন য়ুরোপীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বাস্থ্যলাভার্থ তৃতীয়বার ইংলণ্ড যাত্রা করেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। ইনি সুলেখক ও সদ্বক্তা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং কলিকাতার জাষ্টিস্ অব দি পীস্ ও অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইনি বহুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। বেথুন সোসাইটী নামক সাহিত্য সভার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং উহাতে অনেক হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বঙ্গীয় শাখারও ইনি প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার Popular Lectures on Subjects of Indian Interest প্রকাশিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ক য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে উপদংশ ঘটিত রোগে পটাসিয়াম আয়োডাইড প্রয়োগের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার এই আবিষ্কার য়ুরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে শিক্ষা

ভোলানাথ লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কলেজে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এখানেও তিনি ছাত্রমহলে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং ডাক্তার ওয়াল্‌শ্, পার্কেস, উইলিয়মস্, শার্পলি, মার্ফি, লিণ্ডলে, কোয়েন, মর্টন, গ্রাণ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদগণের স্নেহ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ছয়মাস শিক্ষালাভের পর ডাক্তার গুডিভ ভারত পরিচালনা সভাকে যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"With reference to the native Indian



নূতন মেডিকেল কলেজ *

* কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল পি-সি বয়েড আই-এম-এস্ মহোদয় এই চিত্রখানি সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

students studying in this country I beg to forward a copy of the half-yearly report furnished to me for the information of the Bengal Government by the Dean of the Faculty of University college.

The testimony borne by that officer to the progress of these young men in medical studies is exceedingly gratifying, and I am most happy to be able to confirm his opinion.

Nothing can exceed the zeal and industry they exhibit, and very few English students evince a similar degree of these qualities during their college career. The progress these young natives have made in the acquirement of professional knowledge has been proportionate to their perseverence, and is fully equal to the best of their fellow pupils during the comparatively short time that they have been associated together. This is fairly shown at the weekly Examinations of the classes they attend when I am assured by the professors that these young men invariably distinguish themselves greatly.

Hitherto they have had but one opportunity of contending for prizes—at the botanical Examination of August last. On this occasion, Bholanath Bose was third on the list, in a class of more than seventy students. He only failed in obtaining the silver medal by two marks, his number being 88 and that of his successful rival 90. So excellent indeed were his answers and so intimate a knowledge of the subject did he display, that Professor Lindley regretting he had not another silver medal to give, presented him with a copy of his own admirable work as a testimony of his approbation, accompanied by a most complimentary certificate. Lord Auckland also on the same occasion presented the young man with a valuable book."

"এতদ্দেশে ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অবগতির জন্য যুনিভার্সিটী কলেজের ডীন মহাশয় যে ষাণ্মাসিক বিবরণী পাঠাইয়াছেন তাহার একটি নকল এতৎসহ প্রেরিত হইল।

চিকিৎসা বিদ্যায় এই যুবকগণ যে উন্নতি করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে উক্ত মহাশয় যে প্রশংসাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অতীব সন্তোষজনক এবং আনন্দের সহিত আমি তাঁহার উক্তির সমর্থন করিতেছি।

তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের তুলনা নাই এবং বিদ্যালয়ে পাঠদ্দশায় অতি অল্প ইংরাজ ছাত্রের মধ্যে এইরূপ



মেডিকেল কলেজের সোপানাবলি

গুণের সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। ইঁহারা জ্ঞানার্জ্জনে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের অধ্যবসায়ের উপযুক্ত হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পকাল ইঁহারা ইঁহাদের যে অন্যান্য সহপাঠিগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণের সমতুল্য হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত উঁহারা একবারমাত্র পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন।

গত অগষ্ট মাসে উদ্ভিদ-বিদ্যার পরীক্ষায় এই সুযোগ উপস্থিত হয়। উহাতে ৭০ জন ছাত্রের মধ্যে ভোলানাথ বসু তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি দুই নম্বরের জন্য রৌপ্য পদকটি পান নাই; তাঁহার নম্বর হইয়াছিল ৮৮ এবং তাহার সফল প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছিলেন ৯০ নম্বর। বাস্তবিক তাঁহার উত্তরগুলি এরূপ সুন্দর হইয়াছিল এবং ঐ বিষয়ের জ্ঞানের তিনি এতাদৃশ পরিচয় দিয়াছিলেন যে প্রফেসর লিণ্ডলে তাঁহাকে দিবার জন্য আর একটি রৌপ্য পদক ছিলনা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করত তাঁহাকে একটি উচ্চ প্রশংসাপত্র সহ তাঁহার সুন্দর গ্রন্থাবলী একসেট প্রীতির

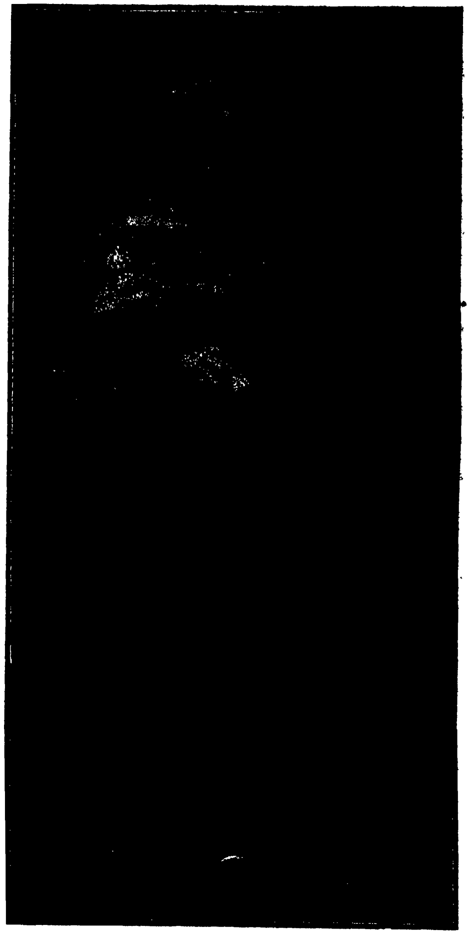


লর্ড ডালহাউসি

নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়াছেন। এই উপলক্ষে লর্ড অকল্যাণ্ডও ইঁহাকে একটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন।"

সেপ্টেম্বর মাসে কলেজের দীর্ঘ অবকাশকালে ভোলানাথ, গোপালচন্দ্র ও দ্বারকানাথ ডাক্তার গুডিভ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত ক্লিফ্‌টনে বেড়াইতে যান এবং সেখানে একমাস অবস্থান করেন। এই সময়ে তাঁহারা ব্রিষ্টল, বাথ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়ের বাসস্থান ও সমাধিক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। সূর্য্যকুমার সেই সময়ে ডাক্তার গ্রাণ্টের সহিত প্যারী নগরী সন্দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল পুরস্কার বিতরণ সভায় স্যার এডওয়ার্ড রায়্যান ভারতীয় ছাত্রগণের উচ্চ সুখ্যাতি করেন। লর্ড অকল্যাণ্ড এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।



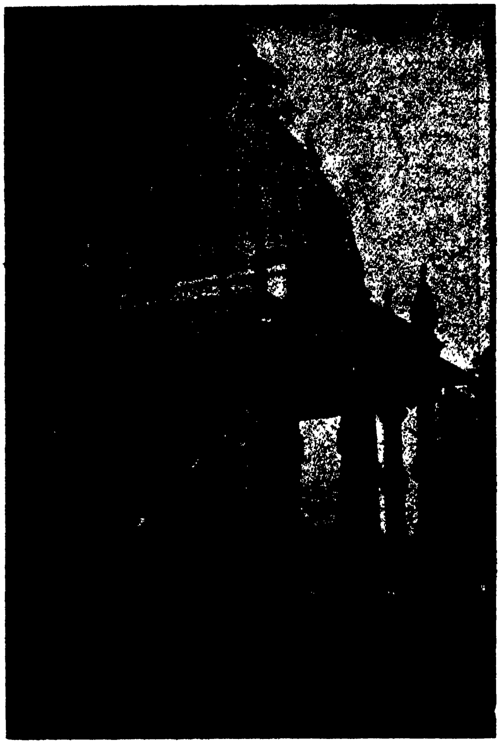
রামমোহন রায়

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ডাক্তার গুডিভ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় যে ভোলানাথ বার্ষিক পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন :—

"You will observe that the Indian Medical students continue to give great satisfaction

to the Professors of the Institution in which they are studying, and I am happy to state that my own approbation of their character and private conduct continues unabated.

Since my last report in January, the annual class Examinations at the college have been passed by these young men with the following results.



রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির

Bholanath Bose	Gold Medal in Comparative Anatomy Certificate in Surgery „ „ Practice of Medicine „ Midwifery
Surja Coomar Chuckerbutty	Certificate in Anatomy „ Physiology „ Materia Medica Chemistry
Gopal Chunder Seel	Certificate in Surgery „ Medicine

It will be thus seen as observed by Lord Brougham in his public address upon the occasion of distributing the prizes at University college on the 30th of April last, that the three Indian students have this year obtained nine honorable marks of distinction independent of the Gold Medal gained by Bhola Nath Bose, an amount of honour highly creditable to their talents and industry when we regard the variety of subjects thus embraced in their studies and the large number of students with whom they contended. Few of the English youths in the college were equally successful. Some of them it is true gained higher prizes in a single class but with two exceptions amongst more than 200 pupils no one gained distinction in so many departments of their professional studies as my young friends.

"ইহা পরিদৃষ্ট হইবে যে বিদ্যালয়ে ইঁহারা পাঠ করিতেছেন তাহার অধ্যাপকগণ ভারতীয় ছাত্রগণের উন্নতিতে পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমার যে উচ্চ ধারণা ছিল তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই একথা আমিও আনন্দ সহকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

গত জানুয়ারি মাসে বিবরণী প্রেরণের পর কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষার ফল এইরূপ :—

ভোলানাথ বসু	তুলনামূলক দেহতত্ত্বে স্বর্ণপদক	
	অস্ত্র চিকিৎসার মানপত্র	
	ভেষজতত্ত্বে	ঐ
	ধাত্রীবিদ্যায়	ঐ
সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী	শারীর-তত্ত্বে মানপত্র	
	দেহতত্ত্বে	ঐ
	ভেষজতত্ত্বে	ঐ
	রসায়ণে	ঐ
গোপালচন্দ্র শীল	অস্ত্র-চিকিৎসায় মানপত্র	
	ভেষজতত্ত্বে	ঐ

গত ৩০শে এপ্রিল য়ুনিভার্সিটী কলেজের পুরস্কার বিতরণ

সভায় প্রকাশ্য বক্তৃতায় লর্ড ব্রুহাম যাহা বলিয়াছিলেন তাহার প্রতি সহজেই মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে—ভোলানাথ বসু প্রাপ্ত সুবর্ণপদক ছাড়িয়া দিলেও এই তিনজন ছাত্র নয়টি সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়াছেন। কত বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে হইয়াছে এবং কত ছাত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে প্রতীত হইবে যে এরূপ সম্মানলাভ তাঁহাদের যথেষ্ট শক্তি ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়। কলেজের ইংরাজ ছাত্রগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র এরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সত্য বটে, এক এক বিষয়ে কেহ কেহ উচ্চতর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুইশত ছাত্রের মধ্যে কেবল দুইজন ব্যতীত আর কেহই আমার ভারতীয় যুবক বন্ধুগণের ন্যায় এত অধিক বিষয়ে এরূপ সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হন নাই।"

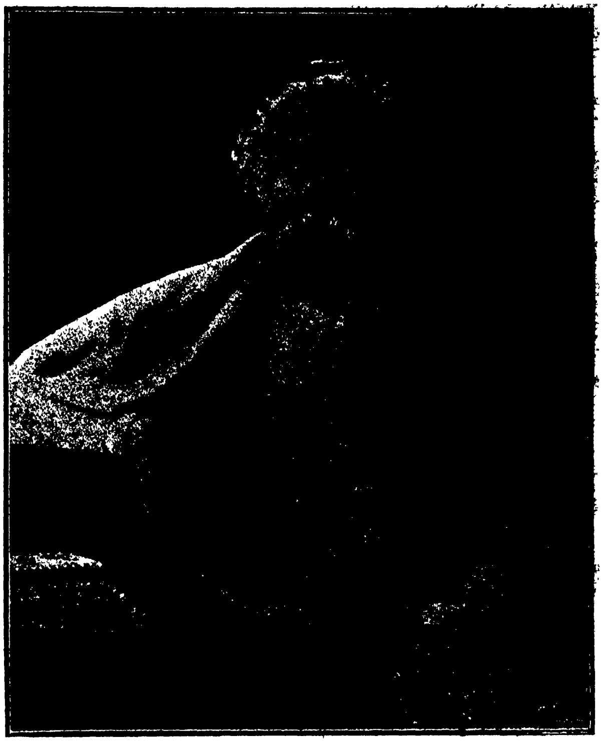
দ্বারকানাথ বসু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, নতুবা তিনিও সতীর্থগণের অনুরূপ সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।*

পরবর্তী বিবরণীতে গুডিভ কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দেন যে তিনজন ভারতীয় বিদ্যার্থীই রয়্যাল কলেজ অব সার্জ্জনস্-এর সদস্য—দুই জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি এবং একজন এম্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভোলানাথই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় এম্-ডি। সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী পরে উক্ত উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এম্-ডি পরীক্ষায় চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যতীত ন্যায়শাস্ত্রেরও পরীক্ষা দিতে হইত এবং তজ্জন্য ল্যাটিন, গ্রীক ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করা প্রয়োজন ছিল। ভোলানাথ এই সকল ভাষা শিক্ষা করিয়া এম্-ডি পরীক্ষা দেন ও অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া সুবর্ণ পদক, রসায়ন বিদ্যায় রৌপ্য পদক, ভৈষজ্য তত্ত্বে রৌপ্য পদক এবং প্রাণীতত্ত্বে সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ সম্মান লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্প ছাত্রের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক স্থানে লিখিয়াছেন :

The gaining by Bholanath of two gold nedals in two branches of study so very dissimilar as Botany and Comparative Anatomy, was the second instance on rcord since the foundation of the college of any one student obtaining such distinctions.

"কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত একজন ব্যতীত আর কেহই ভোলানাথের ন্যায় "উদ্ভিদ বিদ্যা" ও "তুলনামূলক দেহ তত্ত্বের" মত দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে সুবর্ণ পদক লাভ করিবার সম্মান প্রাপ্ত হন নাই।"

ডাক্তার গুডিভ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের বিবরণীতে ভোলানাথ ও তাঁহার সতীর্থগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—



মহেন্দ্রলাল সরকার

"These young men are now members of the Royal College of Surgeons of England, both Bachelors and one of them Doctor of Medicine of the London University, the highest professional degree which can be

procured in Europe. They have obtained their distinction not by favour or indulgence, but by severe labour, and by submission to those rigid tests of proficiency, which the highest scientific authorities, have devised to regulate their studies and by which they authorise the admission of candidates to the privilege of exercising the Medical profession. Thus, besides the ordinary diplomas, they have taken degrees which, mainly on account of high standard of the qualification required from the candidates, are sought by a very small portion of English



চার্লস হে কামেরাণ

students. In addition to these satisfactory results of their labour, they have, throughout the whole course of their precious studies, distinguished themselves among their fellow students by obtaining high honours in almost every class Examination in which they have contended for prize. Bhola Nath has been specially distinguished in this respect ; besides many certificates, he has obtained two Gold Medals and two silver ones on different subjects, an amount of collegiate honor rarely attained by the best English Medical students. They have moreover displayed a degree of zeal and energy in the acquisition of knowledge of every description, and above all, pursued a line of moral conduct which has rendered them an objeet of praise and admiration to all who have had an opportunity of witnessing their career.

Having thus completed their professional studies my principal anxiety now is, to procure for my pupils a corresponding reward as well for the great moral courage and enterprise they have displayed in coming to this country, in the face of all the powerful obstacles in the shape of national and religious prejudices and the entreaties of relations and friends which opposed their undertaking, as for the distinguished career they have pursued since their arrival.

I have no doubt that some adequate provision will be made for them by the wonted liberality of the Govt., and it would be most presumptuous in me to interfere in any way on this point. But I trust that I may be permitted to express my anxious wish that they may receive such employment as will call for the exercise of their acquirement and evince the approbation—entertained of their conduct—and at the same time it will be sufficiently honourable to encourage their fellow countrymen hereafter to make similar endeavour to place themselves upon an equality with ourselves in mental acquirements and moral dignity."

"এই যুবকগণ এক্ষণে ইংলণ্ডের রয়্যাল কলেজ অব সার্জ্জনস্‌-এর সদস্য হইয়াছেন,—দুই জন এম্‌-বি উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং আর একজন য়ুরোপের চিকিৎসা বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ উপাধি—এম্‌-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। কোনও রূপ সুপারিষ বা পক্ষপাতিত্ব দ্বারা এই সম্মান লব্ধ হয় নাই। চিকিৎসার অধিকার প্রদানের পূর্ব্বে মহা মহা বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল শাস্ত্র পাঠের নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই সকল শাস্ত্রে লব্ধ-প্রবেশ হইয়া এবং তত্তৎ বিষয়ে দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঁহারা উক্তবিধ সম্মান লাভ

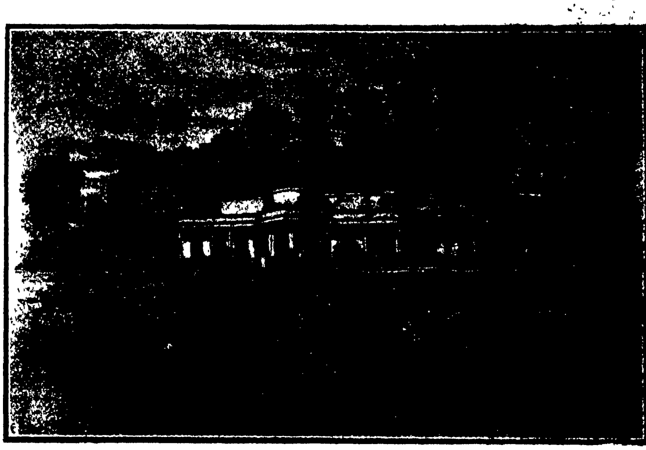
করিয়াছেন। ইঁহারা কেবল সাধারণ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন নাই, পরন্তু ডিগ্রী বা উপাধি লাভ করিয়াছেন,—যে উপাধি লাভ করিতে হইলে এরূপ চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হয় যে অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজ ছাত্র উহা লাভ করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের অধ্যবসায়ের এই সন্তোষজনক ফল ব্যতীত ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহাদের কলেজে প্রবেশাবধি তাঁহারা প্রত্যেক শ্রেণীতে পুরস্কার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় তাঁহাদের সতীর্থগণের মধ্যে উচ্চ ও সম্মানজনক স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছেন। ভোলানাথ এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি বহু মানপত্র পাইয়াছেন, তদুপরি বিভিন্ন বিষয়ে দুইটী স্বর্ণ পদক ও দুইটী রৌপ্য পদক পাইয়াছেন। এরূপ সম্মান ইংরাজ ছাত্রগণ কদাচিৎ লাভ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান অর্জ্জনে অবিচলিত উৎসাহ ও একাগ্রতা দেখাইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি ইঁহাদের নৈতিক চরিত্র যাঁহারা লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

ইঁহাদের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার প্রধান চিন্তার বিষয় এই যে আমার এই ছাত্রগণ—যাঁহারা সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নানাবিধ প্রবল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, আত্মীয় বন্ধুগণের কাতর মিনতি উপেক্ষা করিয়া অসামান্য উদ্যম সহকারে ও নৈতিক সাহস দেখাইয়া এদেশে আসিয়াছেন এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের বলে এইরূপ অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহাদিগকে কিরূপে যথোচিতভাবে পুরস্কৃত করা যাইতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ উদারতার সহিত ইঁহাদিগকে যোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন তাহাতে আমার সন্দেহ নাই এবং এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য প্রকাশ করাও অবিধেয়। কিন্তু আমি আশা করি এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তাহা দোষের বলিয়া বিবেচিত হইবে না। আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে তাঁহাদিগকে যেন এরূপ কোনও পদে নিযুক্ত করা হয় যে তাঁহারা যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে উক্ত ধারণা পোষণ করি তাহার উপযুক্ত হয়। সেই সঙ্গে পদগুলি যেন এরূপ সম্মানজনক হয় যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের দেশবাসিগণকে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণে উদ্বোধিত করে এবং আমাদের সহিত সমান ভাবে মানসিক উৎকর্ষসাধন ও চরিত্রের গৌরব অর্জ্জনে প্রোৎসাহিত করে।"

ভারতে প্রত্যাগমন

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভোলানাথ এবং গোপালচন্দ্র শীল ডাক্তার গুডিভের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।* দ্বারকানাথ বসু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া-



বারাকপুর

ছিলেন। সূর্য্যকুমার ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এম্-ডি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

ইংলণ্ড ত্যাগের সময়ে মহাত্মা লর্ড অকল্যাণ্ড ভোলানাথকে লিখেন—

Admiralty
January 13th, 1848

My dear Bholanath,—

I will not allow you to leave England

* "ডাক্তর গুডিব সাহেব গোপালচন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুইজন মেডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্য্যকুমার নামক বিপ্রকুলোত্তব ছাত্র বিলাতে রহিলেন।"

সংবাদ প্রভাকর ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮

without writing a few lines to you to say that I wish you well. I would add too that you have given very great satisfaction to me and to your other friends, by the earnestness with which you have pursued your studies, and by the distinctions which have attended your success in them.

I should like you to take away with you some token of remembrance from me, and I will beg you to purchase one that may be agreeable to you with the enclosed draft.

Yours most truly,
Auckland.

নৌবিভাগ
১৩ই জানুয়ারি ১৮৪৮

প্রিয় ভোলানাথ,

তোমার শুভকামনা করিতেছি এই কথা না জানাইয়া তোমাকে ইংলণ্ড হইতে বিদায় দিতে পারিতেছি না। তুমি জ্ঞানার্জ্জনে যে একাগ্রতা দেখাইয়াছ এবং সাফল্যে যে সম্মানলাভ করিয়াছ তাহা আমাকে এবং তোমার অন্যান্য বন্ধুগণকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে।

আমি এতৎসহ যে হুণ্ডী পাঠাইলাম উহা হইতে আমার কোনও স্মৃতি-উপহার ক্রয় করিলে সুখী হইব।

তোমার বিশ্বস্ত
অক্ল্যাণ্ড

ডাক্তার গুডিভ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগের বিবরণীতে ভোলানাথ-সতীর্থগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন!

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভোলানাথ ও তাঁহার সতীর্থ-গণের সাফল্য প্রিন্স দ্বারকানাথ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কারণ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১লা আগষ্ট তিনি ইংলণ্ডে দেহ রক্ষা করেন এবং কেলসল গ্রীণের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রণীত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংরাজী জীবনচরিত দৃষ্টে প্রতীত হয় যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, ডাক্তার গুডিভ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বন্ধুগণের সহিত ভোলানাথ ও তাঁহার সতীর্থগণও তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

লর্ড অক্ল্যাণ্ড প্রদত্ত অর্থে ভোলানাথ একটি সোনার ঘড়ি ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চরমপত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে উহা সযত্নে রক্ষা করিবে—যেন হস্তান্তরিত না করেন।

রাজকর্ম্ম

ডাক্তার গুডিভ তাঁহার রিপোর্টে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন ভোলানাথ ও তদীয় সতীর্থগণকে তাঁহাদের বিদ্যার উপযুক্ত রাজকর্ম্ম দেওয়া হয়। ভোলানাথ যে ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকবিভাগে 'চিহ্নিত' কর্ম্মচারীর কার্য্য পাইবার উপযুক্ত ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। লর্ড অক্ল্যাণ্ড, স্যর এডওয়ার্ড রায়ান, চার্ল্‌স হে ক্যামিরণ তাঁহাকে চিহ্নিত কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারত পরিচালনা সভার মতে তখনও এতদ্দেশীয়গণ উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত হন নাই! লর্ড অক্ল্যাণ্ড তখন নৌবিভাগের প্রধান মন্ত্রী। তিনি ভোলানাথকে ইংলণ্ডে নৌবিভাগে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ভোলানাথ উক্তবিধ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বদেশে নিম্নতর পদগ্রহণে সম্মতি জানাইলেন। যদিও তিনি 'চিহ্নিত' কর্ম্মচারীর শ্রেণীভুক্ত হইলেন না, তথাপি তাঁহার প্রতি যেন সর্ব্ববিষয়ে উক্ত শ্রেণীর কর্ম্মচারীর ন্যায় ব্যবহার করা হয়, এইরূপ উপদেশ হোমগবর্ণমেণ্ট ভারতগবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে ভোলানাথ সুকিয়া লেনের ডাক্তারখানা ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। এই চিকিৎসালয়টি তাঁহাকে কলিকাতায় রাখিবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভোলানাথ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে সৈনিকগণের ডাক্তার নিযুক্ত হইয়া পঞ্জাবে প্রেরিত হন। গুজরাট ও চিলিয়ানওয়ালার বিখ্যাত যুদ্ধে তিনি ফীল্ড হাঁসপাতালে কার্য্য করিতেন। এইসময়ে একবার তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, এবং শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহাকে অবিরাম ৮ মাইল দৌড়াইতে হইয়াছিল। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের সময় সাহস ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের জন্য তিনি ক্লাস্পযুক্ত রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন।

যুদ্ধাবসানে অম্বালা হইতে মীরাটে আগত আহত ও পীড়িত সৈন্যগণের চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভার তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। অতঃপর তিনি কলিকাতায় পূর্ব্বকার্য্যে পুনর্নিয়োজিত হইয়া কয়েকমাস কার্য্য করিলে তাঁহাকে পঞ্জাবপ্রদেশে গুজরাট জেলায় সিবিলসার্জ্জন নিযুক্ত করা হয়। এখানে তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত আবেদন করিলে তাঁহাকে সারণের সিবিল সার্জন পদে নিযুক্ত করা হয়। সারণে সে সময়ে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় রোগের প্রকোপ প্রশমিত হয়। অতঃপর ভোলানাথ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত তমলুকে চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তখন তমলুকে লবণের কারখানা ছিল এবং গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থান হইতে বিস্তর রাজস্ব পাইতেন। কিন্তু উহার জলবায়ু ভাল ছিল না, স্থানটিও দুরধিগম্য ছিল। সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট এইস্থানে একজন সুচিকিৎসক রাখিতেন। ভোলানাথের আগমনের পূর্ব্বে তাঁহার সতীর্থ গোপাললাল শীল এখানে চিকিৎসক ছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভোলানাথের চেষ্টায় এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ভোলানাথ ফীল্ড ফোর্সের ডাক্তার নিযুক্ত হন। ইহার পর এক বৎসর তিনি কামরূপ রেজিমেণ্টের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে ভোলানাথ ফরিদপুরে সিভিল সার্জন নিযুক্ত হন। তাঁহাকে জেলের তত্ত্বাবধান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যও ইহার উপর করিতে হইত। তিনি জেলের কতকগুলি নিয়ম সংশোধন করাইয়া কয়েদী ও গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মজীবন তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায়, অপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও উদার সহৃদয়তার পরিচয় দেয়।

অবকাশ গ্রহণ ও গ্রন্থ প্রণয়ন

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় দীর্ঘকালের জন্য অবকাশ লইয়া তিনি স্বাস্থ্যপ্রতিলাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে অবসর যাপন কালেও তিনি অলস হইয়া বসিয়া থাকেন নাই। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি দুইখানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন, যথা,—

১। *Principles of Rational Therapeutics*: an Enquiry into the respective value of Quinine and Arsenic in Ague.

২। A new system of medicine entitled *Recognizant Medicine* or the *State of the Sick.* (1877)



লর্ড রিপন

প্রথমোক্ত গ্রন্থে ভোলানাথ ভাঁট নামক বৃক্ষের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন এবং কুইনাইনের পরিবর্ত্তে—ভাঁট ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি চিকিৎসাধীন রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিবার আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ডাক্তার এফ জে মৌএটের নামে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রটী এইরূপ :—

To

Frederic John Mouat, Esq., M. D., F. R. C. S. Eng.,

Fellow & Member of the Senate of the University of Calcutta, Local Government Inspector &c &c in token of admiration of his talents, respect for his distinguished public



ডাক্তার এইচ গুডিভ

services in India, and appreciation of his constant kindness and encouragement, this work is dedicated by his former pupil and obliged friend, the Author.

বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই গ্রন্থদ্বয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান নাই। ইহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে গ্রন্থদ্বয় বিশেষজ্ঞ সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালেই ভোলানাথ রাজকর্ম্ম হইতে চিরাবসর গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন করেন। যথাসময়ে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় একটি বাটী ক্রয় করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থান করিতে আরম্ভ করেন। দুঃখের বিষয় অধিককাল তিনি পেন্সন ভোগ করিতে পান নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঘাড়ের উপর একটি ব্রণ হয়, উহাই তাঁহার অকাল বিয়োগের হেতুস্বরূপ হইল। উক্ত বৎসর ২১শে সেপ্টেম্বর দিবসে তিনি ধরণীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন।

চরম পত্র

মৃত্যুকালে ভোলানাথ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া যান। তিনি চরমপত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে (১) পঠদ্দশায় ও রাজকর্ম্মকালে তিনি যে সকল পদকাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং লর্ড অর্কল্যাণ্ডের উপহৃত সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘড়িটী তাহার বংশধরগণ heirloom স্বরূপ রক্ষা করিবেন, হস্তান্তরিত করিবেন না।

(২) এয়ার পাম্প, ব্যাটারি, স্পেক্ট্রোস্কোপ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি এবং এক সহস্র মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ মেডিক্যাল কলেজে প্রদত্ত হইবে। যন্ত্রগুলি মেডিক্যাল কলেজ মিউজিয়মে রক্ষিত হইবে এবং কাগজের সুদ হইতে কলেজের ছাত্রগণকে পুরস্কার বা বৃত্তি দেওয়া হইবে।

(৩) ব্যারাকপুর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে পাঁচ শত টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইবে। উহার সুদ হইতে স্কুলের ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

(৪) অর্দ্ধেক বিষয়ের সুদ হইতে তাঁহার জন্মস্থান চাণকে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত ও তাহার সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

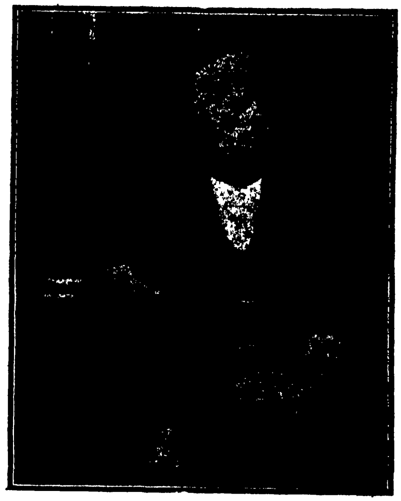
ডাক্তার ভোলানাথ বসুর নাম সংযুক্ত একটি পুরস্কার এখনও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইয়া থাকে।

চরিত্র

ভোলানাথ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছাত্রজীবনে যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও নিরন্তর পরিশ্রম শীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, কর্ম্ম-জীবনেও সেইরূপ অনন্যসাধারণ প্রতিভা, একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও উদার জন-হিতাকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দেশকে যথার্থ ভালবাসিতেন এবং তাঁহার চরমপত্র পাঠ করিলে বোধ হয় তাঁহার "বিশ্বপ্রেম" মৌখিক ছিল না। জনসেবাই প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা ইহাই তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিক ভোলানাথের ন্যায় মহাত্মা দেশের গৌরব—জাতির গর্ব্ব করিবার জিনিষ।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি ব্যারাকপুর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় পুণ্যাত্মা লর্ড রিপণ ছাত্রগণের নিকট উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র (তখন) সম্প্রতি পরলোকগত ভোলানাথের অপূর্ব্ব জীবন-কাহিনী বর্ণিত করিয়া উপসংহারে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"দেখ, ডাক্তার ভোলানাথ বসু শৈশবকালে এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কিরূপ মান্যগণ্য হইয়াছিলেন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় কিরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আমি এরূপ বলিতেছি না যে প্রত্যেকেরই ভোলানাথ বসুর ন্যায় প্রতিভা আছে—কিন্তু আমি ইহা বলি যে যদি তোমরা তাঁহার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যত্ন ও মনোনিবেশ সহকারে কার্য্য কর তাহা হইলে সম্পূর্ণ তাঁহার ন্যায় না হউক অনেকাংশে সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। তোমরা স্মরণ রাখিও তিনি দরিদ্র-



লর্ড ব্রুহাম

সন্তান ছিলেন, কেবল স্বকীয় চেষ্টা ও যত্নে এ সংসারে খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব তোমরাও তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কর, বোধ হয় ইহাপেক্ষা সৎপরামর্শ আমি তোমাদিগকে দিতে পারি না।"

ডেইজী

শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী

'কলেজ ষ্ট্রীট্'—নামটা করলেই অমনি বইয়ের কথা আর ঐ বইয়ের দোকানগুলির কথা মনে পড়ে না? সত্যিই, কলেজ ষ্ট্রীটএ যেতে আমার এমন ভাল লাগে। ওখানে যেতে আমার এতো ভাল লাগে শুধু ঐ বইগুলির জন্য—ওদের মায়ায়। এ জন্যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমায় ঠাট্টা করে বলে—'বুক-লাভার'। তবে ধন্যবাদ দিই সেই বন্ধুদের—তারা ত কেউ আমাকে আর 'বুক-ওয়ার্‌ম্' বলেনি। সবাই বলে মহানগরীতে নাকি নানান প্রলোভন—নিজেকে বাঁচিয়ে চলা বড় সোজা নয়। আমার বেলা ত দেখ্‌ছি তাই। কেমন করে যে পড়ে গেলাম এই বইয়েদের প্রেমে—রোজ বিকেলবেলা আমার কলেজ ছুটীর পরে ওরা যেন আমায় ডাকে অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে। আমি চলে যাই ছোট্ট ছেলেটির মত দৌড়ে ওদের বাড়ীতে—কলেজ ষ্ট্রীটে। একে একে এক এক বাড়ী করে ঘুরে যাই। বইয়েরা যে যে অন্দর মহলে লুকিয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে দেখা হয় ঐ অমনি করে ঘরে ঢুকে। আবার বইদের কেউ কেউ ঘরের

বাইরে দেয়ালে দোর গোড়ায়ই সেজেগুজে কাঁচের ঘরে বসে থাকে। আর কেউ কেউ একেবারে ফুটপাথের উপরেই অনেকে মিলে বসে থাকে জড়াজড়ি করে—ওরা সব বুঝি এইবার একত্রে মিলে নানান গল্প করতে থাকে চুপি চুপি—ওরা সব কত কত দেশ থেকে কত কত লোকের হাত দিয়ে—ছোট বড় উত্তম মধ্যম হরেক রকমের লোকদের কাছ থেকে—এই এখানে এসে করেছে এক মহা কস্‌মপলিটান্ কাণ্ডের সৃষ্টি। ওরা এখন বুড়ো হয়েছে কিনা—অনেক কালের পুরোনো—তাই বুঝি কোন রকমে যেখানে সেখানে পড়ে থাক্‌লেই হয়—হোক্ না ফুটপাথের উপরেই—দোষ কি? যার দরকার হবে—এসে খোঁজ করে বের করেই দেখা করবে ওদের সঙ্গে।

সত্যিই এক মহা Romance—এই বইয়ের দোকানগুলি—নূতন আর পুরানো দুই-ই। প্রথমে এসেই 'গ্লাস-সো-কেসের' দিকে তাকান—কি কি নতুন বই এসেছে—কার কার লেখা—বাঃ শুধু দেখেই যে এত আনন্দ—ওঃ এ বইটা নিশ্চয়ই সুন্দর হবে খুব—তার পর কোন্ বইটা কেমন হল—তার পর—তার পর আরও। জগতের যত মনীষীদের সাথে হয় এখানে পরিচয়—প্রাণে যায় এক মহা আনন্দের বান ডেকে। বইয়ের দোকানে ঢুকে নতুন নতুন বইগুলির গন্ধেও যেন একটা কি আনন্দ—কি মায়া জড়ান। এই মায়া—এ কি ইস্কুলে সেই নতুন নতুন বই কিনে আনা—আর প্রাইজ পাওয়া সেই বইগুলি—সেই থেকেই আরম্ভ হয়েছে! আর এ চল্‌বে কতকাল—এই তো বিকেলবেলা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই কত মহা মহা রথীদের—বুড়ো হয়ে গেছেন তবুও আসেন—এ বুঝি মৌমাছিদের চাক—সবাই আসে কিছু কিছু মধু নিতে। ঐ যখন First year-এ পড়তুম একদিন দেখলুম——আমি তখন কয়েকটা বই দেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলুম একটা দোকান থেকে—হুস্ হুস্ করে একটা মোটরকার এসে ক্যাঁক করে ব্রেক করল—গাড়ীটা থামার সাথে সাথেই এক ধাক্কা দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে এক লাফে ঐ দোকানের মধ্যে ঢুকে গেলেন নোবেল লরিয়েট্ রমণ—তার পরে বিকেলে বিকেলে অনেক দিনই দেখেছি কত কত নামকরা প্রফেসর এবং লেখাপড়া করা লোকেদের। পুরানো বইগুলির দোকানেও দেখ্‌তে পাই—কত আমার মতন নগণ্য আবার কত মস্ত বড় নামকরা লোক এসে দেখতে থাকেন পুরানো বইগুলিকে উলটিয়ে উলটিয়ে—তাদের চোখের সবটুকু জ্যোতিঃ ওরি উপরে দিয়ে। বড়লোকদের মধ্যে থেকেও হয়ত বা কেউ একেবারে জামা-কাপড় মাটীতে লুটিয়ে বসে-বসেই। জগতের কত মজার মজার বই যে আসে এখানে।

শুন্‌তে পাই কে নাকি একবার কিনেছিলেন এই পুরানো বইয়ের দোকান থেকে 'লর্ড বায়রণে'র নিজের একখানা বই—বায়রণের নিজের হাতের লেখায়—বইয়ের উপরে নিজের নাম ধাম সব লেখা। আরো এই রকমের কত গল্পই ত শুনি। গল্পগুলি একেবারে মূল্যহীন এমন নয়—কোন বড়লোকের—হোক্ কোন সাহিত্যিক—কবি বা দার্শনিক, রাষ্ট্রবিদ্ বা ঐতিহাসিক—তাদের একখানা নিজের বই—যেখানা তিনি—অত বড় একজন লোক পড়্‌তেন—তাই পাওয়া—একেবারে হাতে পাওয়া—এ ত আর কম কথা নয়। আবার কেউ কেউ বুঝি ঐ পুরানোর মধ্যেও নতুনের সন্ধান করেন—

আজ আমরা যা আছি—তার সামনেরটা—যেটা আস্‌বে বা আস্‌ছে—বা যেটা কেবল এসেছে তা'—তা তো নতুন বলে আখ্যা পাবেই—যেটা পিছনের সেটাও,—যা হয়েছিল, হয়েছিল একদিন—ছিল একদিন—তাও কিন্তু আজকের আমির কাছে—একটু নতুনই লাগে!

এই ত আজ আমি পুরানো বইয়ের দোকান থেকে নিয়ে এলাম একখানা ইংরেজী কবিতার বই—সুন্দর বইখানা। বইখানা নিয়ে হোষ্টেলে চলে এসে আমার যে এত আনন্দ লাগছে—বাঃ পুরানো বইয়ের দোকান থেকে আনলেও বইখানা রয়েছে একেবারে নতুনেরই মতন। সত্যিই কী মজা এখন—এ বইখানা চিরদিনই আমার কাছে রেখে দেব। বইখানা খুলে দেখি সুন্দর করে ফাউণ্টেন পেন দিয়ে (ফাউণ্টেন পেন দিয়ে হবে নিশ্চয়) লেখা রয়েছে 'ডেইজী ইভান্স'। এই ডেইজী—লেক ডিষ্ট্রিক্টএ এদের বাড়ী—ওখানেই এক ইস্কুলে সে পড়ে—বইয়ে ছোট্ট করে লেখা দেখে বুঝলুম।

এই ডেইজী ডেইজী—সে বোধ হয় রোজ রোজই ঘুম থেকে উঠে তাদের বাড়ীর ধারেই লেকে চলে যায় বেড়াতে—সে লেকের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়—লেকের মধ্যে খেলা করে হাঁসেরা ঝাঁকে ঝাঁকে—আর পাখীরা উড়ে উড়ে বেড়ায় লেকের পারে গাছে গাছে—ডেইজী এ সব দেখে—সে যা সব



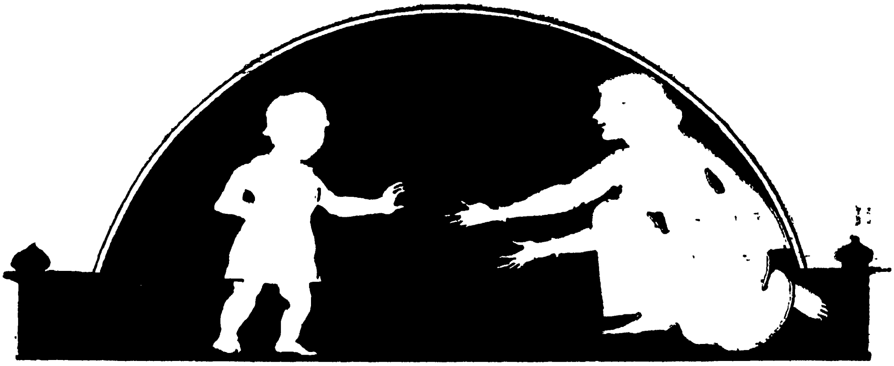
পূজারী

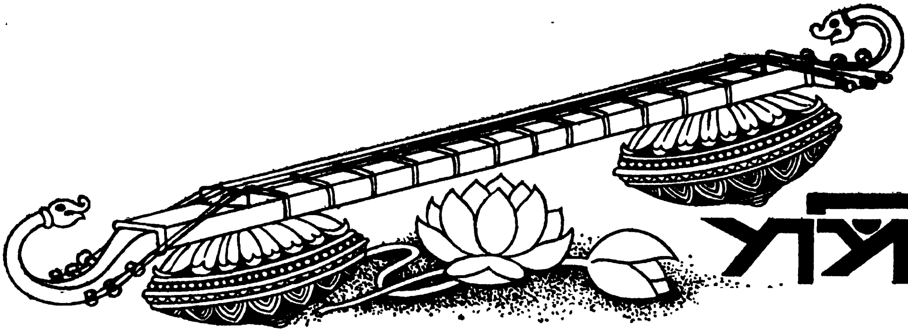
শিল্পী— শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

দেখে তা তার মনে যায়, রেখাপাত করে। তার পর—তার পর সে ঐ-সব কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আবার ফিরে আসে তাদের ঐ সুন্দর বাড়ীটাতে—বেশ একখানি বাঙ্গলোর মতন দেখতে—সাম্‌নে বাগানে বাগানে কত রকমের ফুল—বাড়ীর মধ্যে—সবই আছে, সবাই আছে—সেখানে আছে তার বাবা—মা—ছোট ছোট ভাইবোন্—বাপমা —যে বাপমা আদর করে ফুলের নামে রেখেছে তার নাম—তাকে ডাকে—তাদের ব্রেকফাষ্ট হয়—ছোট ছোট ভাই-বোনেরা চারদিকে ঘিরে বসে—আর তাদেরই পাশে বসে ছেলেবেলা থেকে দেখা জিমি কুকুরটা—ডেইজীর ইস্‌কুলের বেলা হয়—সে চলে যায় ইস্‌কুলে—তাদের ইসকুলও এক লেকের পারে—ইস্‌কুলে তার বন্ধুরা ডেইজী ডেইজী বলে ডাকে আর গুডমর্ণিং জানায়—মাষ্টাররা ডেইজীদের বলে কত দেশের কত কথা—

ইস্‌কুল ছুটী হয—ডেইজী আবার বাড়ী আসে—যারা সব তার জন্যে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে—সেই সব ছোট ভাই বোনদের সে কোলে তুলে লয়—কথায় বার্ত্তায় গানে বাড়ী হয়ে ওঠে মুখর। বিকেল হয়ে আসে—ডেইজী বেরিয়ে পড়ে—সে যাবে সেই মস্ত বড় লেকের ধারে বেড়াতে। সন্ধ্যা হয়ে আসে—আলো জ্বলে—সে চারপাশে জ্বলা আলোর ছায়া রূপের লহর ছড়িয়ে যায় লেকের জলে। জলে সেই কাঁপতে থাকা আলোর দিকে ডেইজী তাকায়—আর সেই রাস্তা দিয়ে—যে রাস্তায় দুধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর কত গাছ—সেই আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে ডেইজী বেড়ায়—কার হাত ধরে বেড়ায় সে। ডেইজীর বইখানার দিকে আবার আমি তাকাই—এ কী—এ তো আগে আমার চোখে একটুও পড়েনি—এ কী—ডেইজীর এই বইয়ের—হ্যাঁ তাই তো—ডেইজীর এই বইয়ের এক কোণে—এই ত এই যে—এই এখানে—এই ডেইজীর বইয়ে —কার হাতের লেখায়—তাই—ডেইজীর হাতের লেখায় নয়—ডেইজীর—এই—ইয়ে—এই যে এই—ঠিক লেখা রয়েছে—এই যে দেখতে পাচ্ছি—এই এই—এখানে লেখা রয়েছে, শুধু এই কথা লেখা রয়েছে—ডেইজীকে— My dearly beloved, my daisy, my Eve, my life – for ever yours Robin"—ডেইজী—ডেইজী—সে ঐ বই—হ্যাঁ ডেইজীর ঐ বইকে—তার এ বইকে দূর করে দিলে—দিলে পর করে—আমি বইয়ের দিকে—তার এই বইয়ের দিকে তাকাই—আবার—আবার তাকাই— উঃ আমি—আমি কি ভাবছি—আঃ ডেইজী, ডেইজী,— ডেইজী—তাকে—যার হাত ধরে রোজ রোজ সে বেড়াত— লেকের জল—লেকের পাখী—সেই গাছপালা—সেই রাস্তা— সেই সব—সবাই ত তারা দেখেছে—যার হাত ধরে ধরে সে বেড়াত, সেই যার সাথে মিলবার জন্যেই ডেইজীর সেই কখন ভোর হবে—কখন ভোর হবে—আবার—কই কখন— কখন হবে বিকেল—সেই যাকে না দেখলে—তাকে— তাকে—ডেইজী!···





সঙ্গীত

কথা :—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য ।

সুর :—শ্রীহিমাংশু দত্ত, সুরসাগর ।

স্বরলিপি :—শ্রীজগৎ ঘটক ।

(গান)

বাহার—জলদ্ একতালা

আলো ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে
বন-বীণা বাজে ।
পথ-চারী অলি চলে যেথা কলি
জাগে মধুলাজে ॥
মৃদু ফুল-বাসে
সমীর নিশাসে
অজানা আবেশ ধীরে ভেসে আসে
আজি হিয়া-মাঝে ॥
দোলে লতা-বেণী
সাজে বন-পরী,
বাঁধে ফুল-রাখী
বুঝি মোরে স্মরি' ।
চারু দিঠি তার
ডাকে অনিবার
এ শুভ লগনে আজিকে কেমনে
রহি' আন কাজে ॥

। । ধা II ণা র্সা না | র্সা -া -া | র্সা -া র্সা | নর্সা -র্রা -র্জ্ঞা I
০ ০ আ লো ছা য়া দো ০ ০ লা ০ উ ত ০ ০ ০

I র্সা -া র্রা | না -র্সা -র্রা | না -র্সা -ধা | -ণা -র্সা -ধা I
লা ০ ফা গু ০ ০ নে ০ ব ০ ০ ন

I -ণা পা মা | ণা -ধা -না | র্সা -নর্সা -র্রা | -র্সনা -র্সা ধা I
০ বী ণা বা ০ ০ জে ০০ ০ ০ ০ আ

I ণা র্সা না | র্সা -া -া | র্সা -া -া || { ধা -ণা পা I
লো ছা য়া দো ০ ০ লা ০ ০ প ০ থ

I মা -া মা | (জ্ঞমা -ধনা -র্সর্রা | -নর্সা -া -া) } | জ্ঞমা র্রা -া I
চা ০ রী অ০ ০০ ০০ লি ০ ০ অ০ ০ ০

I র্সা -া -া | ধা -ণা পা I মা -জ্ঞা জ্ঞা | মা -জ্ঞমা -সরা |
লি ০ ০ চ ০ লে যে ০ থা ক ০ ০

I -রাজ্ঞ -সা -া | না -র্সা ণাস I -ধা না র্সা | নর্সা -র্রা -জ্ঞর্রা |
০ লি ০ জা ০ গে ০ ম ধু লা০ ০ ০

| -র্সা -নর্সা -র্রর্সা | ণধা -মা ধা II
০ ০০ ০০ জে০ ০ আ

া া মা II মা ণা ধনা | না -া -র্সা | র্সা -া র্সা | নর্সা -র্মজ্ঞর্া -র্মা I
০ ০ মৃ দু ফু ল০ বা ০ ০ সে ০ স মী০ ০০ ০

I -র্রা -া র্সা | নর্সা -র্রর্সা -নর্সা | ণা -ধা -া | { ধা -ণা পা I
র ০ নি শা০ ০০ ০০ সে ০ ০ অ ০ জ্ঞা

I মা -া মা | (জ্ঞমা -ধনা -র্সর্রা | -নর্সা -া -া) } | জ্ঞমা র্রা -া I
না ০ আ বে০ ০০ ০০ শ ০ ০ বে০ ০ ০

I র্সা -া -া | ধা -ণা পা I মা -জ্ঞা জ্ঞা | মা -জ্ঞমা -সরা |
শ ০ ০ ধী ০ রে ভে ০ দে আ ০ ০

| -রাজ্ঞ -সা -া | না -র্সা ণার্স I -ধা না র্সা | নর্সা -র্রা -জ্ঞর্রা |
০ সে ০ আ ০ জি ০ হি য়া মা০ ০ ০

| -র্সা -নর্সা -র্রর্সা | ণধা -মা ধা II
০ ০০ ০০ ঝে ০ আ

সা -া সা II সমা -া মা | মা -জ্ঞমা -জ্ঞমা | -সরা -রাজ্ঞ সা |
দো ০ লে ল ০ তা বে ০ ০ ০ ০ গী

| সধা -া ধা I -া ধা ধা | ধণা -ণপা -পমা | -মজ্ঞা -মা -া | মনা -া না I
সা ০ জে ০ ব ন প০ ০ ০ ০ রা ০ বাঁ ০ ধে

I -া না না | নর্সা -ধনা -র্সর্রা | নর্সা -া -া | নর্সা -র্রা র্রা I
০ ফু ল রা০ ০০ ০০ থী ০ ০ বু০ ০ ঝি

I -জ্ঞর্রা র্সনা র্সা | র্সধা র্সা -ণা | -র্সধা -া -া | ধা -মা মা I
০ মো০ রে স্ম ০ ০ রি ০ ০ চা ০ রু

I ণা -ধা না | না -া র্সা | র্সা -া -া | র্সা -া নর্সা I
দি ০ ঠি তা ০ ০ র ০ ০ ডা ০ কে০

I র্মর্জ্ঞর্মা -র্রা র্সা | নর্সা -র্রর্সা -নর্সা | ণা -ধা -া | { ধা -ণা পা I
০ ০ ০ অ নি বা০ ০০ ০০ র ০ ০ এ ০ শু

I মা -া মা | (জ্ঞমা -ধনা -র্সর্রা | -নর্সা -া -া) } | জ্ঞমা র্রা -া I
ভ ০ ল গ০ ০০ ০০ নে ০ ০ গ০ ০ ০

I র্সা -া -া | ধা -ণা পা I মা -জ্ঞা জ্ঞা | মা -জ্ঞমা -সরা |
নে ০ ০ আ ০ জি কে ০ কে ম ০ ০

| -রাজ্ঞ -সা -া | না -র্সা ণার্স I -ধা না র্সা | নর্সা -র্রা -জ্ঞর্রা |
নে — - হি ০ আ ন কা০ ০

| -র্সা -নর্সা -র্রর্সা | পধা -মা ধা II II
০ ০০ ০০ জে০ ০ আ

গানখানি কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মা "হিন্দুস্থানে" রেকর্ড করিয়াছেন। স্বরলিপিতে "—·—" এই বিশেষ চিহ্নটি এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইল, যথা :— র্সা = র্রর্সর্নর্সা।

—স্বরলিপিকার।

বৈদেশিক প্রসঙ্গ

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা

ভারতবর্ষ এবং য়ুরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার তন্ত্রধার মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রথম বিকাশ এই দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারত হইতে কত নরনারী স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার লোভে সমুদ্র ডিঙাইয়া এই দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া বাসা বাঁধিয়াছে, তাহার পর নানা কারণে



জেনারেল জে বি এম হার্টজগ

তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ দুরূহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—মহাত্মা গান্ধীর প্রথম রাজনৈতিক প্রচেষ্টা সেই সকলের প্রতিকারের জন্যই। কিন্তু সে-কাহিনী পাঠক-পাঠিকাদের এত বেশী পরিচিত যে নূতন করিয়া এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা য়ুরোপের রাজনীতির সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ; কারণ, য়ুরোপ বলুন, অষ্ট্রেলিয়া বলুন, আর ভারতবর্ষ বলুন, সকল দেশের লোককে যাতায়াত করিতে হয় এশিয়ার এই বৃটিশ উপনিবেশের ধার দিয়া। বিশ্বের বহু বাণিজ্য-পোতও এই উপনিবেশের কেপ-টাউনের ধার দিয়া দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করে। সুতরাং পৃথিবীর গতি-প্রগতির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার যে নিবিড় যোগাযোগ আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দক্ষিণ আফ্রিকার বহু-জাতি-সমন্বয়ের মধ্যে ইংরাজ আছে,



জেনারেল জে সি স্মাট্‌স্

মুসলমান আছে, জাপানী আছে, হিন্দু আছে। এদিকে, সূর্য্যোদয়ের দেশ—জাপান-সাম্রাজ্য এক দিকে মাঞ্চুরিয়ায়, অপর দিকে ব্রাজিলে রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার উপকূলেও তাহাদের যাতায়াত আছে। এই কারণে, জাপানের চালচলনের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন আছে।

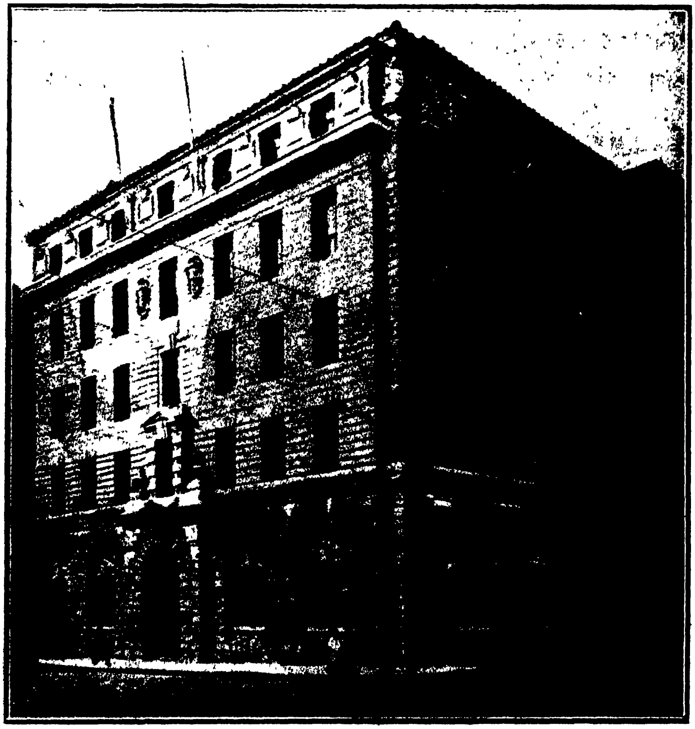
দক্ষিণ আফ্রিকার আধুনিক ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে সুরু হইয়াছে প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে—লর্ড ডার্হাম যেদিন ক্যানাডা সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করেন। লর্ড ডার্হাম সে-দিন বলিয়াছিলেন, গভর্ণর-জেনারেলকে স্থানীয় মন্ত্রীদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে হইবে। তাঁহার এই রিপোর্ট দেখিয়া চারিদিকে বাদ-প্রতিবাদ সুরু হইয়া গেল। বিপদ দেখিয়া তিনি বৃটিশ সরকারের হাতেও কতকগুলি ক্ষমতা ছাড়িয়া দিলেন; যথা: উপনিবেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের ক্ষমতা শুধু বৃটিশ সরকারের থাকিবে,



দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাচীন নেতা জাল হফমায়ারের প্রস্তরমূর্ত্তি

বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্রগত সম্পর্কের বিষয়েও উপনিবেশগুলির কিছু করিবার বা বলিবার থাকিবে না। কিন্তু তার পর ক্রমে ক্রমে এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে; লোকে বুঝিয়াছে যে বাণিজ্য এবং পররাষ্ট্রগত সম্পর্কের বিষয়ে যে জাতির বলিবার কিছুই থাকে না, তাহার স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। যে জাতি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করিতে পারে না তাহার স্বরাষ্ট্রনীতির মূল্য কি?

১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশগুলিকে লইয়া "ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা" বা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র-সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। ইহার পূর্ব্ব হইতেই অন্যান্য ডোমিনিয়ন বাণিজ্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে অখণ্ড অধিকার লাভ করিয়াছিল; সাম্রাজ্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিযুক্ত সৈন্যদল এই ডোমিনিয়নগুলি হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা তখনও এই অধিকার লাভ করে নাই। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ডোমিনিয়ন বাণিজ্য বিষয়ে বিদেশের সহিত সন্ধি করিতে লাগিল, আন্তর্জাতিক



রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—কেপ টাউন

সম্মিলনগুলিতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে লাগিল এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক সন্ধিপত্রেও স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিল। নিউজিল্যাণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া ত নিজেদের নৌ-বাহিনী গঠন করিবার জন্য বিশ্বসম্মিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিল।

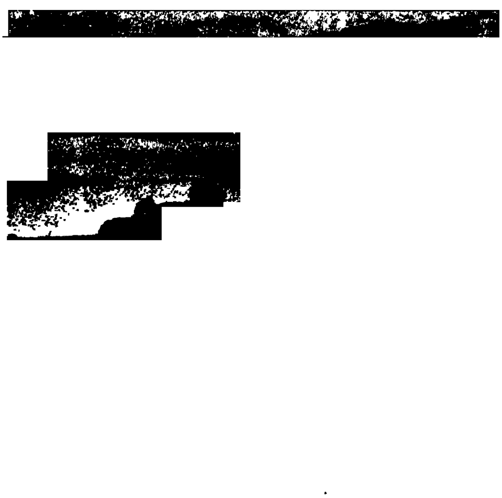
১৯০৭ সালে বিভিন্ন ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের লইয়া যে সম্মিলন হয় তাহাতে সার ষ্টার জেমসন প্রসিদ্ধ

ব্যাল্‌ফোর ঘোষণার পূর্ব্বাভাস স্বরূপ বলেন—"সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়নগুলি স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন জাতি, উহারা যুক্তরাজ্যের সমান (উপস্থিত একটু বিসদৃশ মনে হইলেও)।"



দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী প্রিটোরিয়া

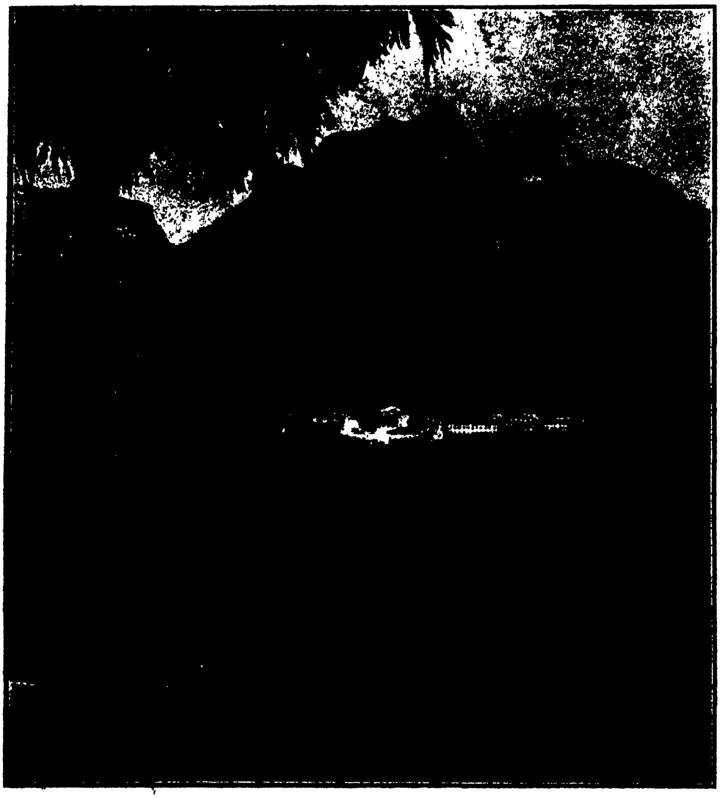
এতাবৎ কালে ডোমিনিয়নগুলির পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার ছিল না, বৃহত্তর পৃথিবীর রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তাহারা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করিতেছিল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাহারা প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে পদার্পণ করিল। এই সময় ইঙ্গ-জাপানী সহযোগিতা নূতন করিয়া পাকা করিবার যে ব্যবস্থা হয় তাহাতে ডোমিনিয়নগুলিকে সম্মতি প্রদান করিতে বলা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইল যে ভবিষ্যতেও সকল প্রকার গুরুতর বিষয়ে তাহাদের মতামত না লইয়া কাজ করা হইবে না।



রোড্‌স মেমোরিয়াল

তার পর বাধিল জার্ম্মাণ যুদ্ধ—ইংরাজকেও তাহাতে যোগ দিতে হইল এবং ডোমিনিয়নগুলির সাহায্য না লইয়া কাজ করিবার উপায়ও বৃটেনের রহিল না। সাম্রাজ্যিক সমর-পরিষদে ক্যানাডার সার রবার্ট বর্ডেন এবং "দক্ষিণ আফ্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি" জেনারেল স্মাট্‌সও স্থান

পাইলেন। ডোমিনিয়নগুলি ইহাকে মস্ত বড় সুযোগ বলিয়া মনে করিল। এত দিন অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। সুযোগ বুঝিয়া জেনারল স্মাট্‌স বলিলেন যে, তাঁহাদিগকে পররাষ্ট্রগত ব্যাপারে উপযুক্ত ও সমান অধিকার দিতে হইবে। নহিলে ভবিষ্যতে যদি এমনি সংগ্রাম বাধে এবং—ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক—উহাতে তাহাদের জড়াইয়া পড়িতে হয়, তাহা হইলে তাহারা কি করিবে?



বিশ্ববিদ্যালয়—কেপ টাউন

অনেক বাদ-প্রতিবাদ শোনা গেল, সাম্রাজ্যের স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় অনেকেই শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের দাবী উপেক্ষা করা চলিল না। যুদ্ধ-বিরতির পর সংগ্রাম-উৎপীড়িত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর বড় বড় মাথাওয়ালাদের লইয়া যে বৈঠক বসিল, বর্ডেন এবং স্মাট্‌স তাহাতে প্রতিনিধি হিসাবে স্থান পাইলেন। তার পর জাতি-সঙ্ঘের পরিষদেও (Assembly of the League of Nations) তাঁহাদের এইভাবে আসন দেওয়া হইল। জেনারল স্মাট্‌স একদিন জাতি-সঙ্ঘের নিয়ম-কানুন রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং পরিষদে আসন দাবী করিবার অধিকার তাঁহার বহু কাল হইতেই ছিল।

১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনারল স্মাট্‌স পরিচালিত মন্ত্রিসভার পতন হয়। এই সময় জাতীয় দল জেনারল হার্টজগের নেতৃত্বে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। জেনারল স্মাট্‌স তাঁহার সাহচর্য্যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সেই হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র Coalition government of General Hertzog and General Smutts নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

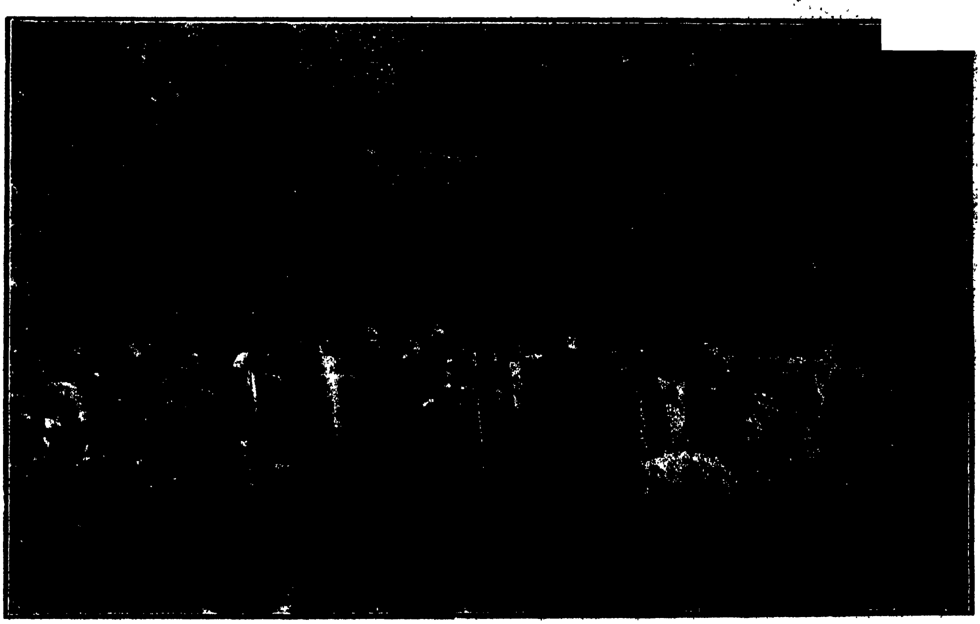
জেনারল হার্টজগ এক হিসাবে জেনারল স্মাট্‌স অপেক্ষা চরমপন্থী। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে সাম্রাজ্যের কোনরকম আধিপত্য দক্ষিণ আফ্রিকার মানিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই। এইজন্য তিনি শক্তি অর্জ্জনের প্রথম দিন হইতেই প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহারই চেষ্টায় ডোমিনিয়নগুলি আজ বিদেশী রাজ্যের রাজধানীতে দূতপ্রেরণ করিবার এবং রাজনৈতিক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। শুধু ইহাই নয়, আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের মত দক্ষিণ আফ্রিকাও আজ নিজস্ব জাতীয় পতাকার প্রচলন করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিলে সে আয়ার্ল্যাণ্ডের মত 'রাষ্ট্রীয় অভিজ্ঞান'ও ব্যবহার করিতে পারে। বিচারবিভাগীয় কমিটীতে আপীল করা না করা তাহার ইচ্ছাধীন, মন্ত্রিসভার সম্মতি না লইয়া গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা যায় না। ইচ্ছা করিলে অষ্ট্রেলিয়া ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেই মন্ত্রিসভা কাহাকেও গবর্ণর-জেনারলের পদে

নির্ব্বাচন করিতে পারেন—কোন প্রতিবন্ধকই নাই। য়ুনিয়নের মন্ত্রিদের সহিত সম্রাটের সরাসরি সম্পর্ক। লণ্ডনে য়ুনিয়নের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন হাই কমিশনার আছেন, যুক্তরাজ্যের (গ্রেটবৃটেন) প্রতিনিধিরূপে দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একজন হাই কমিশনার প্রেরণ করা হইয়াছে। ১৯২৭ সাল হইতে দক্ষিণ-আফ্রিকা নিজস্ব পররাষ্ট্র-বিভাগও স্থাপন করিয়াছে। ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিষয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা উপস্থিত স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে।

এই স্থানে ইহা উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে সম্প্রতি জেনারল হার্টজগ তাঁহাদের পরিচালনাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্প্রতি য়ুনিয়নের প্রতিনিধিসভায় একটী নূতন বিলের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে শাসন-ব্যবস্থা হইতে রাজানুগত্যের শপথ তুলিয়া



ক্রুগার পার্কের পশুশালা—জেব্রা প্রভৃতি অরণ্য... একসঙ্গে একই জলাশয়ে জল পান করিতেছে



ইডেনডেল জলপ্রপাত

ওয়া হইবে, গভর্ণর জেনারলের পদ আর থাকিবে না বং প্রয়োজন হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকা নিজস্ব অভিজ্ঞানও (Great Seal) ব্যবহার করিতে পারিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে আয়ার্ল্যাণ্ডে মিষ্টার ডিঃ ভ্যালেরা যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকাও ধীরে ধীরে সেই পন্থাই অনুসরণ করে কি না তাহা পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র ও

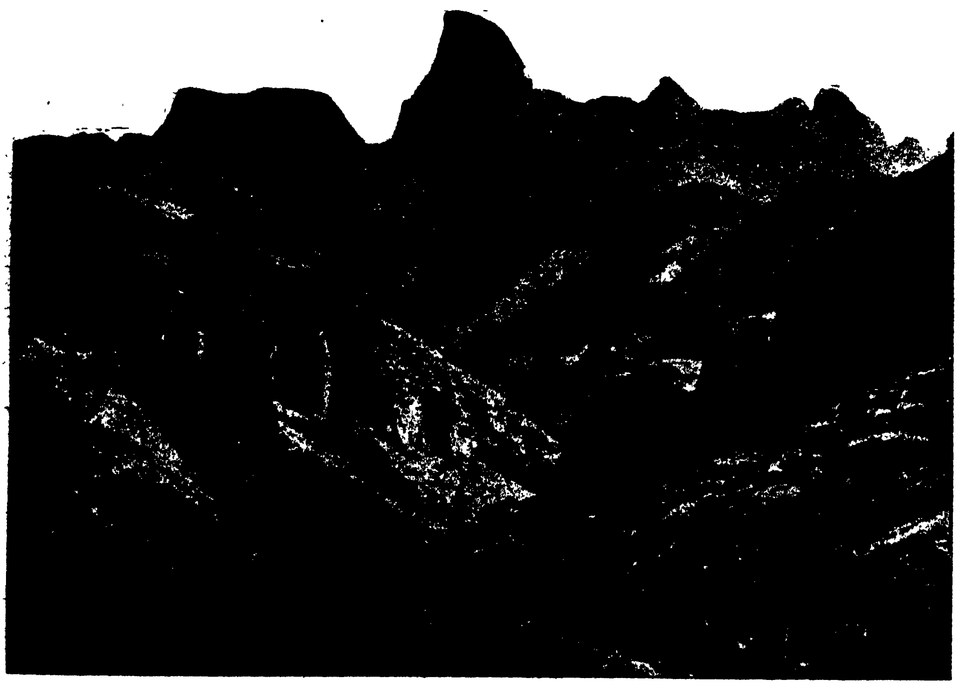
ডোমিনিয়নগুলি সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে। এই বিল প্রতিনিধি-সভায় গৃহীত ও কার্য্যে প্রচলিত হইলে জগতের



বান্টু জাতীয় যোদ্ধাদের রণনৃত্য

রাষ্ট্রসভায় দক্ষিণ-আফ্রিকার মর্য্যাদা যে অনেকগুণ বাড়িয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের এই সংক্ষিপ্ত শাসনকালের মধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকার যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে স্থানগুলি কিছুকাল পূর্ব্বেও পার্ব্বত্য-প্রস্তররাশি, ঘন-অরণ্য ও হিংস্র জীবজন্তুতে পূর্ণ ছিল, সেগুলি যেন এই কয় বৎসরের মধ্যে যাদুমন্ত্রবলে আর এক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রিটোরিয়া ইউনিয়ন গভর্ণমেন্টের রাজধানী। দীর্ঘ খর্জ্জুরকুঞ্জ ও পাহাড়পর্ব্বতের মাঝখানে সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে গঠিত এই নগরটীর দিকে চাহিলে মনেই হয় না যে এই আফ্রিকাই অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য অসংখ্য আদিমজাতির বাসভূমি। কেপটাউন, জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, নাটাল প্রভৃতি প্রধান সহরগুলির অট্টালিকাশ্রেণী একেবারে আধুনিক ভাবে নির্ম্মিত। এই প্রবন্ধের সহিত ইউনিয়ন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বাড়ীর ছবিটী প্রকাশিত হইল তাহার দিকে চাহিয়া আপনারা নিশ্চয়ই ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোন কোন সুউচ্চ অট্টালিকার কথা মনে করিতে পারিবেন। আধু-



জুলুল্যাণ্ডে আম্ব লার্সে'স গিরি

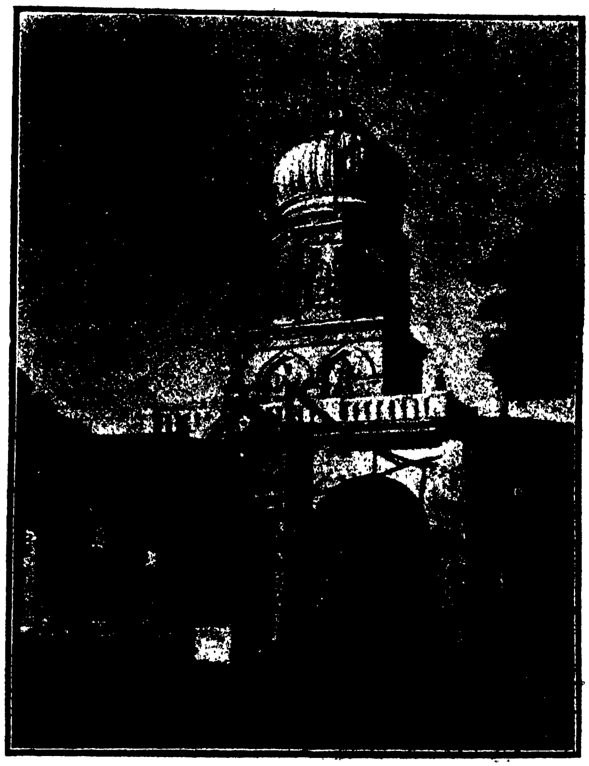
নিক কালের অন্যান্য সহরের মত উপরুক্ত সহরগুলিও আজ ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, সদাগরী প্রতিষ্ঠানের বড় বড় ইমারতে ভরিয়া গিয়াছে। ট্রাম, মোটর ও বাসের অবিশ্রান্ত কলরব, বৈদ্যুতিক আলোর সমারোহ, সরকারী আফিসগুলির নিরলঙ্কার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাইতে হইবে যে, এই আফ্রিকারই অন্যান্য অংশে অসভ্য নরনারীর দল নাক-মুখ ফুঁড়িয়া, সর্ব্বাঙ্গে উল্কি কাটিয়া, অর্দ্ধউলঙ্গভাবে, তীর-ধনুক



লুই বোথা

হাতে বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক কথায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বড়বড় সহর ও বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলিতে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা তাহার অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আটতলা দশতলা অট্টালিকার আজ আর সেখানে অভাব নাই।

শিক্ষার পথেও দক্ষিণ আফ্রিকা আজ যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয়, আফ্রিকার অন্যান্য অংশগুলি এই দিক দিয়া কোন দিনই ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় সুপরিচালিত পাঁচটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ; সেইগুলির নাম : কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়, ষ্টেলেনবশ বিশ্ববিদ্যালয়, উইট্‌ওয়াটারস্র্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, প্রিটোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ফেডারল (সংহতি) বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থানেই স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছে ; বালিকাবিদ্যালয়, আর্ট স্কুল, শ্রমশিল্প শিক্ষালয়—কোন কিছুরই অভাব নাই।



ডার্ব্বানের শিবমন্দির

বস্তুতঃ কোন শিক্ষালাভের জন্যই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের বিদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইতে হয় না এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নেতাদের মধ্যে যাঁহারা আজ শিক্ষায়, জ্ঞানে ও প্রতিভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা দেশে বসিয়াই সরস্বতীর আরাধনা করিয়া বর পাইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল ও

কলেজগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের স্থান নির্ব্বাচনের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। এইগুলির প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতা এমনই লোভনীয় যে শুধু সেইগুলির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলে চিত্তের প্রসার অনেকগুণ বাড়িয়া যাইতে পারে। মনে স্বাস্থ্য সবল করিতে সেগুলি যথেষ্ট সহায়তা করে। এখানে কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছবিটী প্রকাশিত হইল তাহার দিকে চাহিয়া এ কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ পশুশালা ক্রুগারে যত বিচিত্র জীব জন্তু আছে তেমন বোধ করি আর কোন পশুশালায় নাই। সভ্যতার আত্মপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকা জীবজন্তু ও অসভ্যজাতির রাজ্য ছিল, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ক্রুগারে এমন একটী অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে যাহা শুনিলে আপনারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন। আপনারা জানেন চিড়িয়াখানায় জীব-জন্তুদের লোহার বা সাধারণ ঘরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার এই চিড়িয়াখানাটীতে সেইরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। চিড়িয়াখানার মধ্যে কতকগুলি নকল ঝোপ-ঝাড়, জলাশয়, পাহাড় করিয়া রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন জীবজন্তুগুলি তাহারই মধ্যে খায়-দায়, ঘুরিয়া বেড়ায়। জেব্রা, সিংহ, নেকড়ে, হয়েনা···সবাই বন্ধুর মত পাশা-পাশি ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের এমন কৌশলে বশীভূত করা হইয়াছে যে দর্শকদের দেখিয়া তাহারা কোনরকম উৎপাত পর্য্যন্ত করে না, কৌতূহলী দৃষ্টি লইয়া সকলের প্রতি চাহিয়া থাকে। ক্রুগার সেখানে ন্যাশনাল পার্ক বলিয়া পরিচিত।

কর্ম্মসূত্রে বহু ভারতবাসী আজ দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী হইয়াছেন। তাঁহারা নানা স্থানে কতকগুলি দেবালয়ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখানে সম্পূর্ণ প্রাচ্য পদ্ধতিতে নির্ম্মিত ডার্ব্বানের একটী শিবমন্দিরের ছবি দিলাম।

গ্রন্থকার

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকের জরুরী তাগিদে সেদিন ন'টা পঁচিশের লোকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলাম। আন্দাজ ছিল, সাড়ে দশটা বাজিতে বাজিতে হাওড়ায় পৌঁছিয়া কলিকাতার কাজ কর্ম্ম সারিয়া দেড়টার গাড়ীতে আবার বাড়ী ফিরিব।

আমাদের ষ্টেশনে মাত্র আধ মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়; তাই, দেখিয়া শুনিয়া একটা নির্জ্জন কামরা খুঁজিয়া লওয়া সম্ভব হইল না, সম্মুখে যে ইণ্টারক্লাশ কাম্‌রাটা পাইলাম তাহাতেই উঠিয়া পড়িতে হইল। গাড়ী তখন আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইখানি করিয়া সমান্তরাল বেঞ্চি লোহার গরাদ দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে অনেকগুলা লোকাল্ প্যাসেঞ্জার একত্র হইয়া কাম্‌ড়া-কামড়ি না করে। আমি যে কুঠরীতে ঢুকিয়াছিলাম তাহাতে গুটি চার-পাঁচ ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন। দুই পাশের অন্য খাঁচাগুলিতেও দু'চারজন করিয়া লোক ছিলেন। তাঁহাদের চেহারা দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে ছাড়া পাইলেই তাঁহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিবেন। যাহোক, সাবধানে একটু কোণ ঘেঁষিয়া বসিলাম।

আমার পাশে বসিয়া একটি প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক একাগ্রভাবে একখানা বই গিলিতেছিলেন। অন্য কোনো দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। বোধ হয় আবেগের প্রাবল্যেই তাহার কাঁচা-পাকা দেড় ইঞ্চি চওড়া গোঁফ নড়িয়া উঠিতেছিল, কোটরগত চক্ষু জল্-জল্ করিতেছিল। ভারি চোয়াল চিবানোর ভঙ্গীতে নাড়িয়া তিনি মাঝে মাঝে গলা দিয়া এক-প্রকার শব্দ বাহির করিতেছিলেন—গর্‌র্‌—র্‌—

কি এমন বই যাহা ভদ্রলোককে এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে? জিরাফের মত গলা উঁচু করিয়া বইখানার নাম পড়িলাম—নীল রক্ত! বইখানা পরিচিত—লেখকের নাম প্রদ্যোত রায়। মাস কয়েক পূর্ব্বে বইটি বাহির হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল।

পাশের খাঁচা হইতে এক ভদ্রলোক গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্যারীদা, অত মন দিয়ে কি পড়ছেন ?'

পুস্তকপাঠনিরত ব্যক্তিই প্যারীদা। তিনি মুখ তুলিয়া সক্রোধে খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করিয়া হাসিলেন, বলিলেন,—'পদা ছোঁড়ার কেলেঙ্কারি দেখছি! কি ল্যাথাই লিখেছেন! মরি মরি! এই বই নিয়ে আবার তুমুল কাণ্ড বেধে গেছে। বইখানা বিশে লাইব্রেরী থেকে এনেছিল। ভাবলুম, দেখি ত পদা কি লিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই ছোঁড়াকে জানি—আমার শ্যালীর সম্পর্কে ভাসুরপো হয়।—তা, যে-বিদ্যে ছর্কুটেছেন সে আর কহতব্য নয়।'

সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। একজন প্রশ্ন করিলেন,—'নাম কি বইখানার ?'

প্যারীদা তাচ্ছিল্য-সূচক গলা খাকারি দিয়া বলিলেন,—'নীল রক্ত। যেমন নাম, তেমনি বই। আরে, তখনি আমার বোঝা উচিত ছিল, পদা আবার বই লিখবে। মেনিমুখো একটা ছোঁড়া, তিনবার মাট্রিক ফেল করেছে—'

আর একজন বলিলেন,—'নীল রক্ত! বইখানার নাম শুনেছি বটে—সেদিন বোসেদের ক্লাবে বলছিল বইখানা ভাল হয়েছে। ক্লাবে বাংলা বইয়ের খবর-টবর রাখে। তা লেখককে আপনি চেনেন নাকি ?'

প্যারীদা বলিলেন,—'বললুম না, আমার শ্যালীর ভাসুর পো ?—বাপ-আঁচড়ায় থাকে, চালচুলো কিছু নেই। রোগা গিড়িঙ্গে হাত-বার করা ছোঁড়া, মুখে বুদ্ধির নামগন্ধ নেই, কথা কইতে গেলে তিনবার হোঁচট্ খায়—সে আবার বই লিখবে! হেসে আর বাঁচি না!'

গ্রন্থকার শব্দটার মধ্যে কি একটা সম্মোহন আছে, বিশেষতঃ কেহ যদি বলে আমি অমুক লেখককে চিনি তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, দেখিতে দেখিতে সে সকলের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। প্যারীদাও গাড়ীসুদ্ধ লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক গালে এক গাল পান-দোক্তা পুরিয়া মৃদু-মন্দ রোমন্থন করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন,—'প্যারী, তুমি ত দেখছি ছোকরার ওপর বেজায় চটে গেছ। গল্পটা কি লিখেছে বল দেখি—আমরাও শুনি।'

প্যারীদা বলিলেন,—'লিখেছে আমার মুণ্ডু আর তার বাপের পিণ্ডি।'

"আহাহা, গল্পটা বলই না ছাই।'

'গল্প না ঘণ্টা—এক বুনিয়াদি জমিদার বংশের ছেলের কেচ্ছা। আস্বা দেখে হাসি পায়! তোর বাপ ত হল গিয়ে সবপোষ্ট-অফিসের পোষ্ট্‌মাষ্টার—তুই জমিদারের ছেলে কখনো চোখে দেখেছিস যে তাদের কেচ্ছা লিখতে গেলি ? একেই বলে, পেটে ভাত নেই কপালে সিঁদুর।—আমি যদি ও গল্প লিখতুম তাহলেও বা কথা ছিল। নিজে ছাপোষা বটে কিন্তু ত্রিশ বচ্ছর ধরে দু'বেলা জমিদারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিচ্ছি—তাদের নাড়ি থেকে হাঁড়ি পর্য্যন্ত সব খবর রাখি।—বলুন ত মশায় ?' বলিয়া প্যারীদা হঠাৎ আমার দিকে ফিরিলেন।

প্যারীদার কথা শুনিতে শুনিতে কেমন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম, জগৎটাই মায়াময় বোধ হইতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—'সে ত ঠিক কথা, কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নয়—খাঁটি কথা। লেখার অভ্যেস নেই এই যা, নইলে এমন গল্প লিখতে পারতুম যে পদার বাবাও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেত।'

পূর্ব্বোক্ত পান-চর্ব্বণ-রত ভদ্রলোক বলিলেন,—'কিন্তু গল্পটাই যে তুমি বলছ না হে!'

প্যারীদা বলিলেন,—'গল্পর কি আর মাথা-মুণ্ডু আছে। যত সব উদ্ভট ব্যাপার। শুনতে চাও ত বলছি।' বলিয়া একবার চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

আমার একবার সন্দেহ হইল, প্যারীদা গল্পটা সকলকে শুনাইবার জন্যই এতটা তাল ঠুকিতেছিলেন। যাহারা গল্প বলিতে জানে, শ্রোতার মনকে তৈয়ার করিয়া লইতেও তাহারা পটু। দেখিলাম, চলন্ত গাড়ীর শব্দের ভিতর হইতে প্যারীদার গল্প শুনিবার জন্য সকলেই উৎকর্ণ হইয়া আছে। প্যারীদার মুখের উপর একটা তৃপ্তির ভাব ক্ষণেকের জন্য খেলিয়া গেল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শেক্সপীয়রের মত এক একজন প্রতিভাবান লোক আছে, যাহারা পরের গল্প আত্মসাৎ করিয়া তাহার চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। দেখিলাম, প্যারীদাও সেই শ্রেণীর প্রতিভা। বইখানা কেমন হইয়াছে তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কিন্তু প্যারীদার বলার ভঙ্গীতে গল্প জমিয়া উঠিল। আমি তাঁহারই কথায় যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে গল্পটাকে উদ্ধৃত করিলাম।

এক মস্ত জমিদার বংশ; তিনশ' বছর ধরে চলে আস্‌ছে। তিন লক্ষ টাকা বছরে আয়, সাতমহল বাড়ী, এগারোটা হাতী, বাওয়ান্নটা ঘোড়া; লাঠি সড়কি বরকন্দাজ মশালচি হুঁকাবরদার—চারদিকে গিশ গিশ করছে। মোটের ওপর, একটা রাজপাট বললেই হয়।

সেকালে জমিদারেরা ভীষণ দুর্দ্দান্ত ছিল। ডাকাতি, গুমখুন, গাঁ জ্বালিয়ে দেওয়া—এমন কাজ নেই যা তারা করত না। তাদের এক বিধবা মেয়ের নাকি চরিত্র খারাপ হয়েছিল—জমিদার জানতে পেরে নিজের মেয়ে আর তার উপপতিকে ধরে এনে নিজের বৈঠকখানা ঘরের মেঝেয় পুঁতে আবার রাতারাতি মেঝে শান্‌ বাঁধিয়ে ফেলেছিল। তাদের অত্যাচার আর দাপটের কত কাহিনী যে প্রচলিত ছিল তার শেষ নেই। আশে-পাশের জমিদারেরা তাদের যমের মতন ভয় করত। শোনা যায়, সীমানার এক ঘাটোয়ালের সঙ্গে দখল নিয়ে তকরার হওয়াতে, সেই ঘাটোয়ালকে তার বাড়ী থেকে লোপাট করে এনে অমাবস্যার রাত্রে মা কালীর সাম্‌নে বলি দিয়েছিল।

আজকাল অবশ্য সে সব আর নেই—তবে রাজপাট ঠিক বজায় আছে। বর্ত্তমানে জমিদারের একমাত্র ছেলে, তার নাম অহীন্দ্র। সে-ই হল গিয়ে এই গল্পের নায়ক। সে রীতিমত ইংরিজী লেখাপড়া শিখেছে, কলকাতায় প্রকাণ্ড বাসা ভাড়া করে থাকে। সে বড় ভাল ছেলে। কথাটা লক্ষ্য করো—সে বড় ভাল ছেলে। বড় শান্ত প্রকৃতি তার—পূর্ব্বপুরুষদের দুর্দ্দান্ত স্বভাব একটুও পায় নি—সাত চড়ে মুখে রা নেই। চেহারাও চমৎকার—লেখাপড়াতেও ধারালো। এক কথায় যাকে বলে হীরের টুক্‌রো ছেলে।

এই ছেলে লেখাপড়া করতে করতে হঠাৎ এক ব্যারিষ্টারের মেয়ের প্রেমে পড়ে গেল। সে ব্যারিষ্টারের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করলে। ব্যারিষ্টারটির বাইরের ঠাট ঠিক আছে; কিন্তু ভেতরে একেবারে ভুয়ো—আকণ্ঠ দেনা। তাঁর মেয়ে মনীষা কিন্তু খুব ভাল মেয়ে; সুন্দরী শিক্ষিতা বটে কিন্তু ভেঁপো চালিয়াৎ নয়—শান্ত ধীর নম্র। সেও মনে মনে অহীন্দ্রকে ভালবেসে ফেললে।

কিন্তু প্রেমের পথ বড়ই কুটিল; এতবড় জমিদারের ছেলেও দেখলে তার প্রিয়তমাকে পাবার পথে দুস্তর বাধা। অর্থাৎ মনীষার আর একটি উমেদার আছে। উমেদারটি আর কেউ নয়—ব্যারিষ্টার সাহেবের পাওনাদার। লোকটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, অবিবাহিত, বিলেত-ফেরৎ এবং টাকার আণ্ডিল। তার নামে মাঝে মাঝে কিছু কাণাঘুষোও শোনা যেত—কিন্তু যার অত টাকা তার নামে কুৎসা কে গ্রাহ্য করে?

ব্যারিষ্টার সাহেবের চরিত্র অতি দুর্ব্বল। তিনি মেয়েকে ভালবাসেন বটে কিন্তু পাওনাদারের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। তাই, ইচ্ছা থাকলেও অহীন্দ্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না। অহীন্দ্রও স্পষ্ট করে কোনো কথা বলে না, কেবল আসে-যায়, গল্প করে, চা খায়—এই পর্য্যন্ত। তার মনের ভাব হয়ত কেউ কেউ বুঝ্‌তে পারে; কিন্তু সে মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করে না। এম্‌নি ভাবে ছ'মাস কেটে গেল।

ছ'মাস পরে একদিন কথায় কথায় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর মনের ভাব জানতে পারলে। তিনি মনীষাকে বিয়ে করতে চান না—বিয়েয় তাঁর ভারি অরুচি—তাঁর মৎলব অন্য রকম। কিন্তু মনীষা ভালমানুষ হলেও ভারি শক্ত মেয়ে, সে ও-সবে রাজি নয়। ব্যারিষ্টার সাহেব সবই বোঝেন কিন্তু পাওনাদারকে চটাবার সাহস তাঁর নেই—তিনি কেবল চোখ বুজে থাকেন। কিন্তু তবু পাওনাদার বাবু সুবিধা করে উঠ্‌তে পারছেন না।

এই ব্যাপার জানতে পেরেও অহীন্দ্র কোনো কথা বললে না—চুপ করে রইল। সে এতই ভালমানুষ যে, পাওনাদার বাবু তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনেও সে কোনো দিন তাঁর প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা দেখায় নি। দু'জনের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল। পাওনাদার বাবু অহীন্দ্রকে গোবেচারি ভ্যাড়াকান্ত মনে ক'রে ভেতরে ভেতরে একটু কৃপার চক্ষেই দেখতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর অহীন্দ্র ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ীতে এসে দেখলে, মনীষা বাগানে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁদছে। অহীন্দ্র নিঃশব্দে বাগান থেকে ফিরে চলে এল।

পরদিন বিকেল বেলা অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি দেখা করে বললে,—'আপনার সঙ্গে একটা ভারি গোপনীয় কথা আছে—কিছু টাকা ধার চাই। কাজটা কিন্তু খুব চুপিচুপি সারতে হবে—বাবা না জানতে পারেন।'

বড়লোকের ছেলেদের টাকা ধার দেওয়াই পাওনাদার

বাবুর ব্যবসা, তিনি খুশী হয়ে বললেন,—'বেশ ত! আজ রাত্রি দশটার সময় আপনি আমার বাড়ীতে যাবেন। কেউ থাকবে না—চাকর বাকরদেরও সরিয়ে দেব।'

রাত্রি দশটার সময় অহীন্দ্র পাওনাদার বাবুর বাড়ীতে পায়ে হেঁটে উপস্থিত হল, দেখলে, গৃহস্বামী ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। তখন দু'জনে টাকার কথা আরম্ভ হল।

অহীন্দ্র বিশ হাজার টাকা ধার চায়। কিন্তু সুদের হার নিয়ে একটু কষাকষি চলতে লাগল। অহীন্দ্র বললে সে শতকরা দশ টাকার বেশী সুদ দিতে পারবে না। পাওনাদার বাবু বললেন তিনি শতকরা পনের টাকার কম সুদ নেন্ না। তার কারণ, যারা তাঁর কাছে ধার নেয় তাদের নাম কখনো জানাজানি হয় না—গোপন থাকে। অহীন্দ্র তাঁর কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে। তখন তিনি লোহার আলমারি খুলে অন্যান্য তমসুক বার করে দেখালেন যে সকলেই শতকরা পনের টাকা হারে সুদ দিয়েছে।

এই সময় টেব্‌লের ওপর আলোটা হঠাৎ নিবে গেল। তার পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে কি হল কেউ জানে না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা অহীন্দ্র যথারীতি ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী গিয়ে শুনলে যে পাওনাদার বাবু হঠাৎ মারা গেছেন। কিসে মারা গেছেন কেউ বলতে পারলে না। তবে তাঁর চরিত্র ভাল ছিল না, তাই অনেকেই অনুমান করলে যে এর মধ্যে স্ত্রীলোক ঘটিত কোনো ব্যাপার আছে।

এই ঘটনার সাত দিন পরে ব্যারিষ্টার সাহেব বুক্‌-পোষ্টে একটা কাগজের তাড়া পেলেন। খুলে দেখলেন, কোনো অজ্ঞাত লোক তাঁর তমসুকখানি পাঠিয়ে দিয়েছে।

অতঃপর জমিদারের সুবোধ শান্ত ছেলের সঙ্গে ঋণমুক্ত ব্যারিষ্টারের মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। প্রেমিক প্রেমিকার মিলন হল।

প্যারীদা বলিলেন,—'শুনলে ত গল্প?'

সকলে চুপ করিয়া রহিল। ট্রেণ এতক্ষণ প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিতে থামিতে প্রায় গন্তব্য স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছিল। বেলুড়ে গাড়ী ধরিতেই, একটি পুরাদস্তুর তরুণ আমাদের কামরায় প্রবেশ করিয়া রুমাল দিয়া সন্তর্পণে গদি ঝাড়িয়া উপবেশন করিল এবং চওড়া কালো ফিতার প্রান্তে বাঁধা প্যাঁশ্‌-নে চশমার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের দিকে একবার অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিল।

গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নীল রক্ত বইখানা প্যারীদা'র হাতেই ছিল; তরুণ এতক্ষণে সেটার নাম দেখিতে পাইয়া মুরুব্বিয়ানা চালে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'কেমন পড়লেন বইখানা?' ওটা আমার লেখা।"

আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া তরুণের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। প্যারীদা কিয়ৎকালের জন্য একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেলেন, তারপর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—'তোমার লেখা? কে হে তুমি ছোকরা? এ বই পদার লেখা—আমার শ্যালীর ভাসুরপো পদা।'

তরুণ অবিচলিত ভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আপনার শ্যালীর ভাসুর থাকতে পারে এবং সেই ভাসুরের পদা নামক ছেলে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু বইখানা আমার লেখা। আমার নাম—প্রদ্যোত রায়।'

গাড়ীসুদ্ধ লোক এই অভাবনীয় ব্যাপার দেখিয়া একেবারে চমৎকৃত হইয়া গেল। যাহারা দূরের খাঁচায় ছিল তাহারা দাঁড়াইয়া উঠিয়া একদৃষ্টে তরুণকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তরুণ বলিল,—'পদা নামধারী কোনো ব্যক্তির বই লেখা সম্ভব নয়।—দেখি বইখানা।' বলিয়া তরুণ হাত বাড়াইল।

প্যারীদা'র মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি এখনি বইখানা জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিবেন, কিন্তু লাইব্রেরীকে দেড় টাকা গুণগার দিতে হইবে এই ভয়েই বোধ হয় তাহা করিলেন না। তরুণ বইখানা লইয়া কয়েক পাতা উল্টাইয়া বলিল,—'শুনুন, মুখস্থ বলছি—১০৯ পৃষ্ঠায় আছে—"সভ্যতা ও ধর্ম্মভয় মানুষের গায়ে ক্ষীণতম পালিশ মাত্র; জীবনের অবিশ্রাম ঘর্ষণে তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরের প্রকৃত মনুষ্যমূর্ত্তি কখনো কখনো বাহির হইয়া পড়ে। তখন সেই আদিম সভ্যতালেশবর্জ্জিত নখদন্তায়ুধ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি। বুঝিতে পারি না যে আমাদের সকলের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি লুকাইত আছে—প্রয়োজন হইলেই সে ছদ্মবেশ ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। অনেকের জীবনেই সে-প্রয়োজন আসে না—কিন্তু যাহার আসে—" তরুণ মুচকি হাসিয়া বলিল,—'এখনো কি আপনি বলতে চান যে এ লেখা আপনার পদার হাত থেকে বেরিয়েছে?'

প্যারীদা এবার একেবারে নিবিয়া গেলেন, অতি কষ্টে অসংলগ্নভাবে বলিলেন,—'পদা—মানে—পদার নামও প্রদ্যোত রায়, তাই আমি—'

বিজয়ী তরুণ সহাস্যে আমার দিকে ফিরিল,—'আপনি বইটা পড়েছেন কি?' আমার চেহারা দেখিয়া আমাকেই বোধ হয় সে এই দলের মধ্যে সব চেয়ে শিক্ষিত মনে করিয়াছিল।

আমি আর কি বলিব, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলাম,—'হ্যাঁ। প্রুফ সংশোধন করবার সময় একবার পড়েছিলুম, তার পর আর পড়া হয়নি।'

তরুণ বলিল,—'ও! আপনি ছাপাখানায় কাজ করেন বুঝি?'

কথাটা একটু গায়ে লাগিল। ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছিল, আমি বাহিরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, 'না। বইখানা আমারই লেখা।'

তরুণ উচ্ছ্বসিত ভাবে আমার পানে তাকাইল, একটু অস্বস্তির ভাব তাহার মুখে দেখা দিল। সে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া বলিল,—'আপনি বলতে চান—?'

মনকে কঠিন করিলাম। পকেট হইতে একটা পোষ্ট-কার্ড বাহির করিয়া বিনীতভাবে বলিলাম,—'আপনারা রাগ করবেন না কিন্তু আমিই প্রদ্যোত রায়। খাঁটি এবং অকৃত্রিম—ভেজাল নেই। বিশ্বাস না হয় এই পোষ্টকার্ড-খানা পড়ে দেখুন—'নীল রক্ত'র দ্বিতীয় সংস্করণ বার হবে তাই প্রকাশক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।'

সঙ্কুচিতভাবে পোষ্টকার্ডখানা প্যারীদা'র দিকে বাড়াইয়া দিলাম, তিনি কেবল হিংস্রভাবে আমার পানে তাকাইলেন।

গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া থামিল। আমি কার্ডখানা তরুণের দিকে বাড়াইবার উপক্রম করিতেই সে দ্রুত প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া ভিড়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নিবেদন

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

একেলা বসি' বসি'
কত না গেনু গান,
কত না অবহেলে
কেহ না দিল কান।
আজিকে মনে করি'
সকলি ভাল হরি,
তোমারি পদে ধরি
দিব এ বীণাখান,—
আমার এ গানে সুরে
কেহ না দিল কান।

এমনি দ্বার তব
কেহ না রহে দ্বারী,
আঙিনা পার হতে
করি যে ভয় তারি;
কি জানি প্রবেশিলে
রূঢ় বা কথা মিলে,
তোমার ও পদ ঘিরে
জ্বলে যে দীপদান,
সাধ সে-দীপালোকে
সাধি এ বীণাখান।

তবু গো জানি—জানি
ও-পথে বাধা নাই :—
কেহ বা হাসি' খেলি'
কেহ বা গীতি গাই,
কেহ বা আঁখি জলে
কেহ বা কুতূহলে
খুঁজি' গো চলে—চলে—
তোমারি গৃহখান,
যেথা ও পদতলে
জ্বলে গো দীপদান।

বাধা যে নাই—নাই—
তাই শিহরে প্রাণ,
তাই যে মনে জাগে
হ'ল না বুঝি গান,
আমার এ সুরগুলি
বুঝি বা গেল ভুলি
উড়ায়ে পথ ধূলি
তোমারি গৃহখান—
বোঝে না তব দ্বারে
পঁহুছে যত গান।

৺মহারাজ রাজবল্লভ সেনগুপ্ত

রায় শ্রীকালীচরণ সেনগুপ্ত বাহাদুর বি-এল

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভাগে হোসেন কুলী নিহত হইলে রাজবল্লভ তৎপদে নিযুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য বণিকদিগের নিকট প্রচলিত নজরাণা তলব করিলেন; কিন্তু উহারা রাজবল্লভের আদেশ প্রতিপালন করিতে সম্মত হইল না। রাজবল্লভ সমস্ত বণিকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে নজরাণা না দিলে উহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে। ইহার পরে বণিকগণ নজরাণা প্রদান করিয়া রাজবল্লভের অনুকম্পা লাভ করিল (Long's unpublished records of Govt., p. 17)।

আক্রামউদ্দৌলার মৃত্যুর পর মবারকউদ্দৌলা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঢাকার নবাবী পদ লাভ করেন। রাজবল্লভ এই উপলক্ষে ইংরেজ বণিকদিগের নিকট মবারকউদ্দৌলার নজরাণা দশহাজার টাকা দাবী করিলেন। উহারা নজরাণা দিতে অসম্মত হইলে রাজবল্লভ, ইংরেজদিগের পণ্য বহন করিয়া যে সকল নৌকা বাকরগঞ্জ হইতে আসিতেছিল, তাহা আবদ্ধ করিলেন। ইংরেজগণ তিন হাজার টাকা নজরাণা দিয়া মুক্তিলাভ করিলেন এবং রাজবল্লভের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইলেন।

রাজবল্লভের সহায়তায় ঘেসেটি বিবি যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেব মনে করিলেন যে ঘেসেটি বিবি বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিবেন। রাজবল্লভও দেখিলেন যে ইংরেজ ভিন্ন আর কোন জাতিই সিরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিবেন না। রাজবল্লভ ওয়াট সাহেবের সহিত গোপনে কথা-বার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। ওয়াট সাহেব দেখিলেন যে ঘেসেটি বিবি সিংহাসন লাভ করিলে ইংরেজদিগকে রাজ-বল্লভের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে হইবে। এজন্য ওয়াট সাহেব রাজ-বল্লভের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ওয়াট সাহেব কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যেন রাজবল্লভের লোক কলিকাতায় উপস্থিত হইলে নগর মধ্যে আশ্রয় দেওয়া হয়।

এই সময় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ঢাকায় বাসা করিতেছিলেন। রাজবল্লভ তাঁহাকে সংবাদ দিয়া পাঠাইলেন যে পরিবার ও ধনরত্ন সহ তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে তিনি যেন কলিকাতায় গিয়া ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পিতার আদেশে কৃষ্ণদাস প্রকাশ্যে শ্রীক্ষেত্র যাত্রার অছিলা করিয়া সপরিবারে ধনরত্ন সহ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ড্রেক সাহেব তৎকালে বালেশ্বরে বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছিলেন। কৌন্সিলের অপর সদস্যগণ ওয়াট সাহেবের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে পরিবার ও ধনরত্ন সহ কলিকাতায় আমিনচাঁদ নামক জনৈক পশ্চিম-ভারতবাসী বণিকের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবার অনুমতি দিলেন।

আলিবর্দ্দী এখন রুগ্নশয্যাশায়ী। সিরাজ রাজবল্লভকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে ঢাকায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেনাদল ঢাকা পহুঁছিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণদাস ঢাকা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া রাজ বল্লভের রাজনগরস্থ আবাসে চলিয়া যায়; এবং সাতবার রাজবল্লভের বাড়ী লুণ্ঠন পূর্ব্বক অনেক ধনরত্ন হস্তগত করিয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসে।

রিয়াজু সেলাতিনে আছে রাজবল্লভ তাঁহার পরিবারবর্গকে কলিকাতায় ইংরেজ আশ্রয়ে প্রেরণ করিলে, সিরাজ তাঁহা-দিগকে ধৃত করার অভিপ্রায়ে গুপ্তচর বিভাগের অধ্যক্ষ রাজারামকে তথায় প্রেরণ করিতে উদ্যত হইলেন। আলিবর্দ্দী সিরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন "আরোগ্য লাভ করিয়া আমি স্বয়ং রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে এখানে আনয়ন করিব।" (Riyazu-s-salatin p. 365-366)

ঘেসেটি বিবিকে দুর্ব্বল করার জন্যই সিরাজ কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ইংরেজ-আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়াই সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মাতামহ আলিবর্দ্দীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি ইংরেজগণ ঘেসেটির পক্ষাবলম্বন করিয়াছে।" তৎকালে আলিবর্দ্দী মৃত্যুশয্যায় শায়িত,—কাশিমবাজারের কুঠির চিকিৎসক ফোর্থ সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি ফোর্থ সাহেবকে এই অভি-

যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সাহেব উত্তর দিলেন শত্রুপক্ষীয়েরা ইংরাজদিগের ক্ষতি করার মানসে এইরূপ মিথ্যা গুজব রটনা করিয়া দিয়াছে ; এদেশে বাণিজ্য করা ভিন্ন ইংরেজদিগের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। এই কথার পরে আলিবর্দ্দী সিরাজকে বলিলেন—তোমার উক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস কবিতে পারি না। (Orme's Indostan, Vol, II, p. 51-52)

আলিবর্দ্দীর জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে ঘেসেটি বিবি মতিঝিলে রাজবল্লভের সহায়তায় বিপুল সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর মহিষী ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিতা হইলেন এবং জগৎশেঠের সহিত মতিঝিলে আসিয়া ঘেসেটিকে বলিলেন, সিরাজ মাতৃস্বসার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ; কাজেই সিরাজের প্রতিকূলাচারণ না করিয়া বশ্যতা স্বীকার করাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। ঘেসেটি প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া পরে জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না এবং রাজবল্লভের বিনা সম্মতিতে সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল আলিবর্দ্দী পরলোক গমন করেন। সিরাজ নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ঘেসেটি বিবির ধন-রত্ন—যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎপূর্ব্বক তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। (Sair, vol. II, p. 136) রিয়াজু সেলাতিন লিখিয়াছেন "ঘেসেটি বিবি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হইলেই নজর আলি সিরাজের ভয়ে পলায়ন করিলেন। সিরাজের সেনাগণ মতিঝিলে আসিয়া ঘেসেটি বিবিকে সমস্ত ধনরত্ন সহ ধৃত করিল। নবাব-সেনা নিবাইস-পত্নীর প্রাসাদসমূহ ভূমিসাৎ করিল এবং যে কিছু ধনরত্ন মৃত্তিকা প্রোথিত ছিল তাহা উত্তোলন করিয়া মনসুরগঞ্জে লইয়া গেল। (Riyazu-s-salatin p. 363)

অর্ম্ম সাহেব লিখিয়াছেন—ঘেসেটি বিবি বশ্যতা স্বীকার করিলেই সিরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং মতিঝিল আক্রমণ করিয়া মাতৃস্বসার সমস্ত ধনরত্ন হস্তগত করিতে বিস্মৃত হইলেন না। (Orme's Indostan vol. II, p. 55)

সিরাজ রাজবল্লভকে ঢাকার শাসন কর্ত্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়া তৎপদে রায়দুর্ল্লভকে নিযুক্ত করিলেন এবং রাজবল্লভকে কারারুদ্ধ করিলেন। (Riyazu-salatin p. 265)

ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে কলিকাতার অধ্যক্ষের নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে ফরাসিগণের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য, কলিকাতার ইংরেজগণ যেন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতার ইংরেজগণ কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করাইতে লাগিলেন। সিরাজের গুপ্তচরগণ সিরাজকে এই সংবাদ দিল। সিরাজ ড্রেক সাহেবকে আদেশ দিলেন ইংরেজগণ কোন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না এবং নির্ম্মিত অংশ ভঙ্গ করিতে হইবে। ড্রেক সাহেব তদুত্তরে জানাইলেন যে ইংরেজগণ কোন নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করেন নাই ; ফরাসী জাতির সহিত সংঘর্ষের সম্ভাবনা বলিয়া গঙ্গাতীরে কামান সংস্থাপনের স্থানগুলির সংস্কার হইতেছে মাত্র। ইতিপূর্ব্বে সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দু'এক দিন মধ্যে দূত প্রেরণ করিয়া কলিকাতার ইংরেজ অধ্যক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে কৃষ্ণদাসকে ধনরত্ন সহ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু কৌন্সিলের সদস্যগণ সেই দূতকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে সিরাজ ইংরেজদিগের প্রতি ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্গ সংস্কার সম্বন্ধে ড্রেকের উত্তর পাইয়া অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিবার জন্য সমগ্র সেনা সহ রাজমহল হইতে কলিকাতাভিমুখে অভিযান করিলেন। কৃষ্ণদাস কলিকাতায় আসিয়া আমিনচাঁদের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে ইংরেজগণের বিশ্বাস হইল যে সিরাজ আমিনচাঁদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। সুতরাং আমিনচাঁদের বাসস্থান অবরোধ করার জন্য ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হইল। ইংরেজ সেনাগণ আমিনচাঁদের পদাতিকগণকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। আমিনচাঁদের সেনানায়ক জগন্নাথ মিশ্র অন্তঃপুরের রক্ষক ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাকে বাধা দিয়া পুরমহিলাগণের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবেন না। এজন্য তরবারি হস্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একে একে সমস্ত মহিলাগণের প্রাণ সংহার করিলেন এবং নিজের প্রাণ সংহার করিতে গিয়া নিজেও মৃতকল্প হইলেন। ইংরেজ সেনাগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিয়া ইংরেজ দুর্গে লইয়া গেল। (Orme's Indostan vol. II p. 50 to 63) কয়েক

দিন মধ্যেই সিরাজ কর্ত্তৃক ইংরেজ দুর্গ আক্রান্ত হইল। অর্ম্ম সাহেব লিখিয়াছেন "দুর্গজয়ের পর অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিরাজ মীরজাফর ও অন্যান্য সেনানায়কগণের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আসিয়াই আমিনচাঁদ ও কৃষ্ণদাসকে তলব করিলেন; তাঁহারা উপস্থিত হইলে তাঁহাদের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। (Orme's Indostan vol. II, p. 73) যে কৃষ্ণদাসকে হস্তগত করার জন্য সিরাজ ইংরেজদিগের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে হাতে পাইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। সম্ভবত নবাব কলিকাতার দুর্গ জয় করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া কলিকাতা নগরী লুণ্ঠন করিতে আদেশ দিয়া কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কবি নবীন সেন পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে রাজবল্লভ দ্বারা বলাইয়াছেন—

কলিকাতা জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যেদিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সেদিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।
বিপদে বেষ্টিত ব'লে মনে বড় ভয়,
আপাততঃ তাই প্রাণ রেখেছে নির্দ্দয়।

এরূপ কোন কারণে কৃষ্ণদাস আপাতত মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা নগরী লুণ্ঠিত হইল কিন্তু জগন্নাথ সিংহের অনুরোধে নবাবের আদেশ মত আমিরচাঁদের গৃহ নিরাপদে রহিল।

যে সকল ইংরেজ দুর্গে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে সিরাজ প্রহরীর হস্তে সমর্পণ করিয়া শিবিরে চলিয়া গেলেন। ইংরেজ লেখকগণ বলেন, প্রহরী বন্দীদিগকে এক অপ্রশস্ত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং পিপাসায় ও উত্তাপে বন্দিগণের অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইতিহাসে এই ঘটনা "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ "অন্ধকূপ হত্যার" অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন না। কিন্তু ইংরেজ লেখকগণ সকলেই এই ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রণেতা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সায়র মোতাক্ষরীণের ইংরেজী অনুবাদক হাজি মস্তাফা সাহেব বলেন যে প্রকৃত ঘটনা এই—হিন্দুস্থানী প্রহরীগণ এই সমস্ত বন্দীদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে নবাব সমীপে উপস্থিত করিতে হইবে মনে করিয়া একটি অপ্রশস্ত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ কক্ষে সমুদয় লোকের স্থান হইবে কি না ভাবিয়া দেখে নাই। ইংরেজ-দুর্গে কোন কারাগার ছিল না, প্রহরীগণ সেই কক্ষকেই কারাগার মনে করিয়া বন্দিগণকে তথায় রাখিয়া দিয়াছিল। প্রহরীগণের অবিবেচনা ও অসতর্কতার জন্য ভারতবাসিগণকে নির্দ্দয় বলা সুসঙ্গত নহে। এই বলিয়া হাজি মস্তাফা ইংরেজদিগের অসতর্কতা নিবন্ধন একদা চারি শত হিন্দু সিপাহীর মৃত্যু ঘটনা এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন—'একদা ইংরেজ মান্দ্রাজে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়া চারি শত হিন্দু সিপাহীকে কয়েকখানি নৌকায় উঠাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আহার্য্য ও পানীয় সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা ছিল না। বন্যায় সমস্ত নৌকা জলমগ্ন হয় এবং সিপাহীরা তিন দিন অনাহারে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। (Sair, vol. II, p. 190)

সিরাজ কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিয়া মাণিকচাঁদের হস্তে নগর রক্ষার ভার অর্পণ পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণ বলেন—"এই মাণিকচাঁদ পূর্ব্বে বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার অনুমাত্রও যোগ্যতা ছিল না,—অথচ তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। একদা মহারাষ্ট্রীয়েরা অতর্কিত ভাবে বর্দ্ধমানে আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ করিলে মাণিকচাঁদ সসৈন্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। এরূপ অপদার্থ লোককে দায়িত্বপূর্ণ কলিকাতার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া মীরজাফর, রেহিম খাঁ, ওমর খাঁ প্রমুখ প্রবীণ সেনানী সকল অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। জগৎশেঠ এবং মুর্শিদাবাদের অন্যান্য প্রধান অধিবাসীরাও সিরাজের হস্তে নানারূপ লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন এবং রাজা রায়দুর্ল্লভ প্রমুখ চরিত্রবান্ লোকগণের প্রতিও সিরাজ কর্ত্তৃক অভদ্রোচিত ব্যবহার হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে একযোগ হইয়া সিরাজের উচ্ছেদ সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। তৎকালে রাজ্যমধ্যে মীরজাফরই প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অগ্রণী হইয়া সিরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে লাগিলেন মীরজাফর

আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রায় দুর্ল্লভ আলিবর্দ্দীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। আলিবর্দ্দীর সময়ে হিন্দুকর্ম্মচারিগণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহারা আলিবর্দ্দীর প্রতি নিরতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। হিন্দুকর্ম্মচারিগণ সাধ্যানুসারে তাঁহার অভাব পূরণ করিতে যত্নবান হইতেন। কথিত আছে মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধে শেঠ পরিবার ত্রিশলক্ষ টাকা দান করিয়া আলিবর্দ্দীর সাহায্য করিয়াছিলেন। যে হিন্দুকর্ম্মচারিগণ আলিবর্দ্দীর *প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহারাই সিরাজের দুর্ব্যবহারে তাঁহার* বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। Orme's Indostan vol. II, *P. 53*)

সিরাজ মোহনলাল নামক জনৈক ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রধান অমাত্য পদে নিযুক্ত করিয়া মহারাজ উপাধি প্রদান করিলেন এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যই মোহনলালের পরামর্শে চলিতে লাগিল। মোহনলাল অপরিমিত রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিলেন এবং রাজস্ব-বিভাগের পূর্ব্বতন কর্ম্মচারিগণকে পদচ্যুত করিয়া নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিযুক্ত করিলেন (Riyazu-s-salatin p, 363)। রাজ্যের অধিকাংশ লোক সিরাজের বিপক্ষ হইয়া উঠিল এবং কি উপায়ে এই অনুপযুক্ত নবাবকে অপসারিত করা যাইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। সিরাজের অনুগ্রহে যে সকল অব্যবস্থচিত্ত লম্পট যুবক উচ্চ পদবীতে আরূঢ় ছিল তাহারাই এখন নবাবের প্রতি অনুরক্ত রহিল (Sair, vol. II, p, 187)।

এই সময় সওকতজঙ্গ পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ সিরাজের ব্যবহারে উত্ত্যক্ত হইয়া সওকতজঙ্গকেই সিংহাসনে বসাইবার সংকল্প করিল। মীরজাফর সওকতজঙ্গকে পূর্ণিয়ায় লিখিয়া পাঠাইলেন "আমরা সকলেই আপনার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। সিরাজের দুর্ব্যবহারে রাজ্যের সমস্ত প্রধান সেনানী ও রাজপুরুষগণ তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। আপনি কয়েকটি নিয়মে আবদ্ধ হইলে আপনাকে সকলেই সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব আপনি কালবিলম্ব না করিয়া রণসজ্জা করিয়া সিরাজের উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক আলিবর্দ্দীর সমস্ত বিভব অধিকার করুন। (Sair vol. II, p. 107) এই পত্র আসিবার অব্যবহিত পরেই সওকতজঙ্গ তাঁহার বন্ধুর সাহায্যে দিল্লী হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার পদের সনদ সংগ্রহ করিলেন। সওকতজঙ্গ সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আমি দিল্লীর বাদশাহ হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা উভয়ে এক বংশজাত বলিয়া আপনার প্রাণদণ্ড করিতে ইচ্ছা করি না। আপনার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ঢাকা বিভাগের যে কোন স্থান দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজপ্রাসাদ, কোষাগার আদি আমার কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া ঢাকায় প্রস্থান করিবেন। উত্তরের অপেক্ষায় জিনপোষে পা রাখিয়া অশ্ব-*পৃষ্ঠে রহিলাম।*" (*Sair, vol. II, p. 206*) *এই পত্র পাইয়া সিরাজ পূর্ণিয়ায় অভিযান পূর্ব্বক* যুদ্ধে সওকতজঙ্গকে নিহত করিয়া পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃত্ব মোহনলালের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

কলিকাতা সিরাজের হস্তগত হওয়ার পরেই এই সংবাদ মান্দ্রাজে প্রেরিত হইল। কর্ণেল ক্লাইব ও এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব কতিপয় রণপোত লইয়া ১৭৫৬।১০ অক্টোবর কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সায়র মোতাক্ষরীণ বলেন—"বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়া ক্লাইভ স্থির করেন যে যুদ্ধ বিগ্রহের পূর্ব্বে সন্ধির প্রস্তাব করাই কর্ত্তব্য। তিনি ড্রেক সাহেবের কার্য্যের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সিরাজকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'ইংরেজদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় বাণিজ্য-কুঠি সংস্থাপনের অনুমতি দিলে তাহারা নবাবকে কয়েক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত আছে।' সিরাজ তাঁহার অনভিজ্ঞ পার্শ্বচরগণ সহ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে ক্লাইবের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া উচিত নহে।

প্রবীণ অমাত্যগণ সিরাজের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া-ছিলেন, তাঁহারা উহার উচ্ছেদ কামনা করিতেন; সুতরাং তাঁহারা নীরব রহিলেন।

ক্লাইব সিরাজের উত্তরের প্রতীক্ষায় সময়ক্ষেপ না করিয়া সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ইংরেজের রণতরী সগর্ব্বে মাণিকচাঁদের আবাসের সম্মুখে নঙ্গর করিয়া পোতস্থিত কামানের দ্বারা অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ইংরেজ সেনাগণ মাণিকচাঁদের আবা-সাভিমুখে ধাবিত হইল। মাণিকচাঁদ উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজগণ কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিয়া

বিজয় পতাকা উঠাইয়া দিলেন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া বহু সেনা ও যুদ্ধোপকরণ সহ কলিকাতাভিমুখে আসিয়া কলিকাতার সন্নিকটে শিবির স্থাপন করিলেন। ইংরেজগণ নবাবের আগমনে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া নবাব-শিবিরে দূত পাঠাইলেন। দূত সন্ধির ছলে গোপনে নবাব-শিবিরের সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিল এবং একদিন রাত্রি শেষে পশ্চাৎ ভাগ দিয়া নবাব-শিবির আক্রমণ করিল। নবাবের শিবিরের অনেক সেনা গোলার আঘাতে হতাহত হইল,—অবশিষ্ট লোক পলায়ন করিল। ঐ দিন কুয়াসা থাকায় ইংরেজ সেনাগণ নবাবের নিজ শিবির খুঁজিয়া পাইল না। এই অবসরে নবাব পলায়ন করিলেন এবং অনুচরদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরেজের প্রস্তাবিত বর্ত্তমান সন্ধিতে সম্মতি দিলেন। পূর্ব্বের সন্ধি নবাবের অনুকূল ছিল ; কিন্তু বর্ত্তমান সন্ধি দ্বারা কলিকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণ ইংরেজদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল। সিরাজ এইভাবে সন্ধি করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

মোহনলাল সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে রায়দুর্ল্লভ প্রমুখ সমস্ত প্রধান রাজপুরুষগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন এবং মোহনলালের অধীনে রায়দুর্ল্লভ কাজ করিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিলেন। সেকালে ঐশ্বর্য্যে জগৎ-শেঠের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। সিরাজ সেই জগৎশেঠকে সর্ব্বদা অপমানিত করিতেন এবং সময় সময় মুসলমান করিবার ভয় দেখাইতেন। ইহার ফলে জগৎশেঠ সম্পূর্ণরূপে সিরাজের বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইলেন। নবীনবাবু পলাশির যুদ্ধ কাব্যে জগৎশেঠ দ্বারা বলাইয়াছেন :—

* * * * কি বলিব আর,
বেগমের বেশে পাপী পশি অন্তঃপুরে,
নিরমল কুল মম—প্রতিভা যাহার
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-সম, ভূভারত যুড়ে
প্রজ্বলিত,—সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার
করিয়াছে কলঙ্কের কালিমা সঞ্চার।

* * * *
* * * *

জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা
লক্ষ মুদ্রা সমকক্ষ। * * * *

* * * *

আপনি নবাব যিনি, (অন্য কোন ছার)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।
কিন্তু অপমানে হায় ! ফেটে যায় বুক,
সে জগৎশেঠ আজ অবনত মুখ !
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম,—সমস্ত পৃথিবী
সিরাজদ্দৌলার যদি হয় অনুকূল,

* * * *

তথাপি তথাপি এই কলঙ্কের কালী
সিরাজদ্দৌলার রক্তে ধুইব নিশ্চয় !

* * * *
* * * *

প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাই আর !

রায়দুর্ল্লভ ও মীরজাফরের সহিত সিরাজউদ্দৌলার এখন মনোমালিন্যের পরিসীমা ছিল না। তাঁহারা জগৎশেঠ ও অন্যান্য সভাসদগণকে লইয়া গোপনে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। প্রায় সকল সভাসদই সিরাজের নৃশংস ও নির্দ্দয় ব্যবহারে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা এক্ষণে উৎসাহ সহকারে মন্ত্রণা সভায় যোগদান করিয়া সিরাজের উচ্ছেদ সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ঘেসেটি বিবিও সিরাজের উৎপীড়নের প্রতিফল দিতে কৃত-সংকল্প হইলেম এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লিখিয়া পাঠাইলেন—

"ভূতপূর্ব্ব নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এবং তাঁহার জামাতা নিবাইস মহম্মদ আপনাদের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এ হতভাগিনী সেই আলিবর্দ্দীর কন্যা এবং নিবাইসের ধর্ম্মপত্নী। পিতা ও স্বামীর কৃত উপকারের নিমিত্ত আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতাভাজন বলিয়া বিবেচিত হইলে আপনারা সিরাজকে উচ্ছেদ করিবার জন্য মীরজাফরের সহিত যোগদান করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত হইবেন না।"

সিরাজ কর্ত্তৃক মতিঝিলের প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ঘেসেটি বিবি-প্রাচীনা পরিচারিকা ও খোজার সহায়তায় কতক ধনরত্ন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত ধনরত্ন কৌশলে মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর সেই অর্থে প্রচুর সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর আমির বেগ নামক জনৈক বিশ্বস্ত দূতকে কলিকাতায়

ইংরেজদিগের নিকট পাঠাইলেন। আমির বেগ সিরাজের সমস্ত অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া সভাসদ্‌গণ যে সিরাজের বিরুদ্ধে মীরজাফরকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহাও দেখাইলেন। আমির বেগের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিপত্র এইভাবে লিখিত হইল যে সিরাজের উচ্ছেদ সাধনের জন্য ইংরেজগণ সেনাবল দিয়া মীরজাফরের সহায়তা করিবেন এবং মীরজাফর ইংরেজদিগকে তিন কোটি টাকা দিবেন। এই সময় রায়-দুর্ল্লভ ও জগৎশেঠ উভয়ে ইংরেজ দরবারে লোক প্রেরণ করিয়া মীরজাফরের কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিরাজ ইংরেজদিগের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজদিগকে কলিকাতা আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ছিল। সিরাজ তাহা না দেওয়ায় এই সূত্র ধরিয়া ইংরেজ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং কর্ণেল ক্লাইভ ইংরেজ বাহিনীর অধ্যক্ষরূপে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে অভিযান করিলেন। (Sair, vol. II, page 220 to 229)

সিরাজের বিরুদ্ধে যে গুপ্ত মন্ত্রণা হইয়াছিল তাহাতে রাজ-বল্লভ যে যোগদান করিয়াছিলেন এরূপ রেয়াজুস সেলাতিন, সায়র মোতাক্ষরীণ প্রভৃতি মুসলমান ঐতিহাসিক কি অর্ম্ম প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কেহই বলেন না। নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে শেঠ ভবনে যে গুপ্ত মন্ত্রণার কথার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মহারাজ রাজবল্লভ ও কৃষ্ণচন্দ্রের যোগদানের কথা আছে। কবি রাজবল্লভের মুখে বলাইয়াছেন—

যে যন্ত্রণা দুরাচার দিতেছে আমায়,
জানেন সকলে, আমি কি বলিব আর ?
যে অবধি সিংহাসনে বসিয়াছে, হায় !
সে অবধি বিষদৃষ্টি উপরে আমার।
প্রিয়পুত্র কৃষ্ণদাস সহ পরিবার
হইয়াছে দেশান্তর ; ইংরেজ বণিক্
আশ্রয় না দিত যদি, কি দশা আমার
হ'ত এতদিনে ! * * *
কলিকাতা জয়-কালে, যদিও পামর
পেয়ে গ্রাসে ছাড়িয়াছে পুত্র কৃষ্ণদাস,
যে দিন হইবে পাপী নির্ভয় অন্তর,
সে দিন আমার হ'বে সবংশে বিনাশ।

* * *
* * *

এই কালে এত বিষ !—পূর্ণকলেবর
হ'বে যবে এ ভুজঙ্গ, না জানি তখন
হ'বে কিবা ভয়ঙ্কর তীব্র বিষধর।
নাশিবে নিশ্বাসে যত মানব জীবন।

* * *
* * *

"চিন্ত সদুপায়। মম এই অভিপ্রায়—
সহৃদয় ইংরাজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্যভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা'হ'লে নিশ্চয়
নিদ্রা যা'বে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে ;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি সুধাময় !"
নীরবিলা নৃপমণি * *

কৃষ্ণচন্দ্র সথার এই মন্ত্রণায় সায় দিলেন।

আরম্ভিলা কৃষ্ণচন্দ্র, 'ধরণীঈশ্বর',
সম্বোধিয়া ধীরে রাজনগর-ঈশ্বরে
সসম্ভ্রমে—"যা কহিলা সত্য, নৃপবর !
কার সাধ্য অনুমাত্র অস্বীকার করে ?

* * *
* * *

একে ত অদূরদর্শী নৃশংস যুবক,
আজন্ম বঞ্চিত পাপে। * *
* * তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার,
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে হায় !
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল,
বলিতে বিদরে বুক ; যথায় তথায়
হাহাকার-ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল।

* * *
* * *

কিন্তু কি করিবে সখে ! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি বলিতে না পারি

লিখেছেন বিধি হায় ! কত যে কি দুঃখ
কপালে তাহার—চির অভাগিনী-নারী !
* * *
* * *
অতএব ইংরাজেরে করিয়া সহায়,
রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে—
যবনকুলের গ্লানি !—মম অভিপ্রায়,
বসাইতে সৈন্যাধ্যক্ষে সিংহাসনোপরে।
অন্ধকূপ অত্যাচার প্রতিবিধানিতে
এসেছে বৃটিশ-সিংহ বীর অবতার।
* * *
* * *
মুহূর্ত্তে ক্লাইব যুদ্ধে হ'লে সম্মুখীন,
উড়াইবে তৃণবৎ যুবা অর্ব্বাচীন।"
এ যুক্তিতে সমবেত সভ্য যতজন
কিছু তর্কপরে, সবে হ'লেন সম্মত।

কবি ইহার পরে বলিতেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নাটোরের রাণী ভবানীর মত জানিতে চাহিলেন।

বলিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ফিরায়ে নয়ন,—
"জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত ?"

ইহার উত্তরে রাণী বলিলেন—

'রাণীর কি মত ?'—শুন আমার কি মত,—
ইন্দ্রিয় লালসামত্ত সিরাজদ্দোলায়
রাজ্যচ্যুত করা নহে—আমার অমত।
* * *
"আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে ; * * *

এই মতে কেহ সায় দিলেন না, সকলেই স্থির করিলেন যে ইংরেজের সহায়ে সিরাজকে পদচ্যুত করা হউক।

'পলাসির যুদ্ধ' ১২৮২ সনে (ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার এক বৎসর পর ইং ১৮৭৭ খৃঃ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় ক্ষিতীশবংশাবলী প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন "নবাব সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজা মহেন্দ্র (রায়দুর্ল্লভ) রাজা রাম-নারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, মীরজাফর ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি শেঠ ভবনে মিলিত হন এবং সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব মতে স্থির হয় যে ইংরেজদিগের সহায়তায় সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত ও মীরজাফরকে তৎপদে অভিষিক্ত করা হইবে। পলাশির যুদ্ধ কাব্য মতে এই মন্ত্রণায় শেঠ ভবনে কেবল পাঁচ ব্যক্তি ছিলেন ; যথা—জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মীরজাফর ও রাণী ভবানী। ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বিরচিত রাজাবলিতে আছে—"সিরাজ প্রবীণ মন্ত্রিগণকে উপেক্ষা করিয়া অভিনব লোকদিগকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলে মহারাজ দুর্ল্লভরাম, মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাপ-চাঁদ, স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি পদস্থ লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলাগণের ধর্ম্মনষ্ট করিয়া এবং কৌতুক দেখিবার জন্য গর্ভিণীর গর্ভ বিদারণ করিয়া সিরাজ ক্রমেই অধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। অতঃপর রাজবল্লভকে উপলক্ষ করিয়া সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল এবং সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতায় গিয়া ইংরেজদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া ঐ নগর অধিকার করিলেন। ইংরেজেরা এই দুর্ঘটনায় ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তাঁহারা আরমানী পিত্রুর সহায়তায় মহারাজ দুর্ল্লভরাম, জাফর আলি খাঁ, জগৎশেঠ, মহতাপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপ চাঁদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণের সহিত পরামর্শ করিয়া, কতিপয় সেনাসহ পলাশীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন।" (শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্তের 'মহারাজ রাজবল্লভ সেন' হইতে উদ্ধৃত)

রাজাবলী গ্রন্থের বয়ঃক্রম ১২২ বৎসর,—বাঙ্গালা ভাষায় ইহা প্রাচীনতম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থানুসারে ষড়যন্ত্রে রাজবল্লভের নাম পাইতেছি না।

আর একটি কথা চিন্তনীয়। রিয়াজুসসেলাতিনে আছে—সিরাজ রাজবল্লভকে ঢাকার শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপসারিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। উমাচরণ-বাবু লিখিয়াছেন "কৃষ্ণদাস ইংরেজদিগের আশ্রয়ে পলায়ন করিলে সিরাজ কারাগার হইতে রাজবল্লভকে আনিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। অবশেষে রাজবল্লভের উক্তি দ্বারা নবাব তাঁহার নির্দ্দোষিতা বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া মুর্শিদাবাদে নজরবন্দী

অবস্থায় রাখিয়া দেন।" মন্ত্রণা সময়ে রাজবল্লভ মুর্শিদাবাদ নগরে বন্দী ভাবে কালযাপন করিতেছিলেন এবং তাঁহার গতিবিধি নবাবের লোকেরা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাজেই এই সময় তিনি এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার সখা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সহ যোগদান করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ স্থল। আর তর্কস্থলে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সহ একজন মন্ত্রণাকারী থাকিলেও তাঁহার প্রতি কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না। রাজবল্লভ নিবাইস মহম্মদের সহকারী দেওয়ান ছিলেন। হোসেন কুলীর হত্যার পর হইতে তিনি নিবাইসের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন। নিবাইসের মৃত্যুর পর ঘেসেটি বিবিও রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাঁহার পরামর্শে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রাজবল্লভের সহায়তার ঘেসেটি বিবিও নিবাইসের ন্যায় সিরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। সিরাজ দেখিলেন যে রাজবল্লভকে নির্য্যাতন করিতে না পারিলে ঘেসেটি বিবির বলক্ষয় হইবে না। এজন্য রাজবল্লভের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য সিরাজ ঢাকায় সৈন্য পাঠাইলেন এবং কৃষ্ণদাসকে ধৃত করিবার জন্য কলিকাতায় রাজারামকে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর নিষেধ জন্য শেষোক্ত সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মতিঝিলে রাজবল্লভের সহায়তায় ঘেসেটি বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে গর্ভধারিণী মাতার অনুরোধে ঘেসেটি রাজবল্লভের মত না লইয়াই সিরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ফল হইল, সিরাজ সিংহাসনে উঠিয়াই ঘেসেটির ধনরত্ন হস্তগত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং রাজবল্লভকে ঢাকার শাসনকর্ত্তৃত্ব হইতে অপসৃত করিয়া প্রথমত কারারুদ্ধ ও পরে নজরবন্দী কয়েদী ভাবে মুর্শিদাবাদে রক্ষা করেন। এরূপ অবস্থায় রাজবল্লভ সিরাজের উচ্ছেদ সাধন কল্পে মন্ত্রণায় যোগদান করিয়া কোন বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করেন নাই। সিরাজ তাঁহার উপর কখনও কোন বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই এবং তিনিও সেই বিশ্বাসের অপব্যবহার করেন নাই। তিনি সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নিবাইসের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং নিবাইস ও ঘেসেটি বিবির অধীন থাকিয়া তাঁহাদের সহায়তার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সিরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনগরস্থ প্রাসাদও সাতবার লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় রাজবল্লভ সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন দুষ্কার্য্য করেন নাই। এখন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহাদের মতে, ইংরেজের সহায়তায় বাঙ্গালার সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা দোষাবহ হইয়াছিল। ঐ সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রায়দুর্ল্লভ, মীরজাফর প্রভৃতি দেশের যে সকল প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ইংরেজের সহায়তা গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। রাজবল্লভ একক সকলের মত উপেক্ষা করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার এরূপ ধনবল কি জনবল ছিল না যে তিনি নবাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন। বিশেষ যখন তাঁহার সখা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজের সহায়ে সিরাজের উচ্ছেদ সাধন করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকেও সেই মতাবলম্বী হইতে হইয়াছিল।

সায়র মোতাক্ষরীণ বলেন যে যৌবনমদে মত্ত সিরাজের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াই রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মনে করিতেছিলেন, পরিণত-বয়স্ক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে লোকে সুখে কাল কাটাইতে পারিবে; এবং এই আশায় তাঁহারা সিরাজের উচ্ছেদ সাধন জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।" যখনই যে রাজ্যে কোন রাজা অত্যাচার করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তখনই রাজ্যে ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। কাজেই রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ লোকত ও ধর্ম্মত দোষী ছিলেন না।

বাঙ্গলার নবাবগণ দিল্লীশ্বরের সনদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মাত্র। আকবরের সময় হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। স্বয়ং আলিবর্দ্দীও দিল্লী হইতে নবাবী পদের সনন্দ সংগ্রহ করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। সিরাজ দিল্লী হইতে কোন সনন্দ প্রাপ্ত হন নাই। দিল্লীর দরবার হইতে সওকতজঙ্গ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বের সনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সিরাজ পূর্ণিয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। সিরাজ বিধিসঙ্গত উপায়ে বাঙ্গলার নবাবী পদ লাভ করেন নাই; বরং দিল্লীশ্বরের নিযুক্ত সওকতজঙ্গকে হত্যা করিয়া সিরাজ স্বয়ং রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। কাজেই ষড়যন্ত্রকারিগণকে কোন ক্রমেই রাজদ্রোহী বলা যাইতে পারে না। সিরাজ সনন্দ প্রাপ্ত হন নাই; বিশেষ তিনি সনন্দপ্রাপ্ত সওকতজঙ্গকে

হত্যা করিয়া নিজেই রাজদ্রোহী হইয়াছিলেন। সিরাজের উৎপীড়নে তাঁহার শ্বশুর প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা ও দেশের সমস্ত লোক তঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। অতঃপর পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইবের সংঘর্ষে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিগত—২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে দৈনিক বসুমতীতে লিখিয়াছেন "বিশ্বাস-ঘাতক রাজবল্লভ পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে ক্লাইভের বিজয় সাধিত করিয়াছিল।" এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রকাশ্যে তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিতে লেখা সত্ত্বেও তিনি আজ পর্য্যন্ত কিছু করেন নাই। যা তা লিখিয়া আসর গরম করা এই শ্রেণীর লেখকের রোগ বিশেষ হইয়াছে,—একজন প্রধান ব্যক্তির নামে কুৎসা প্রচার করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। রাজবল্লভ পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে কিরূপে ও কাহার ন্যস্ত বিশ্বাসের অবব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তিনি বলিতে বাধ্য আছেন। একজন মহাপুরুষকে অযথা গালি দিয়া তাঁহার উত্তর পুরুষ-দিগের মনোবেদনা দেওয়া তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই।

সিরাজ পলাশির প্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক সমস্ত রজনী পথ হাঁটিয়া পরদিন বেলা ৮ ঘটিকার সময় মুর্শিদা-বাদের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সিরাজ শ্বশুরকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার পদতলে শিরস্ত্রাণ সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সেনা সমাবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু শ্বশুর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সিরাজ সমস্ত দিন প্রাসাদে একাকী অবস্থান করিলেন। গভীর রজনীতে একখানি বস্ত্রাবৃত শকট আনাইয়া তন্মধ্যে বেগম লুৎফন্নেছা ও কয়েকটি রমণীকে প্রচুর ধনরত্নসহ সংস্থাপন করিলেন এবং রাত্রি তিন ঘটিকার সময় প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিলেন। ভগবানগোলায় উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে আজিমাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন। মীরজাফর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া মুনসরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করেন। এ স্থলেই সকলে মীরজাফরকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিল। রায়দুর্ল্লভ সর্ব্বপ্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের জামাতা কাশিম একদল সেনা লইয়া সিরাজের অনুসরণ করিলেন। সিরাজ তিন দিন অনশনের পর চতুর্থ দিন খিচুড়ী রন্ধন করিবার জন্য তীরে অবতরণ করেন। এই স্থানে সাহ্‌দানা নামে এক ফকির বাস করিত। ফকির সিরাজকে রন্ধনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গোপনে শত্রুপক্ষকে সংবাদ দিল। মীরজাফরের ভ্রাতা মীরদাউদ ও জামাতা কাশিম সসৈন্যে সিরাজকে বন্দী করিয়া সিরাজের পলায়নের আট দিন পরে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। মীরজাফর মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, নবাব পুত্র মীরণ সিরাজের আগমন বার্ত্তা শুনিয়াই উহার শিরশ্ছেদের আদেশ দিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই মীরণের আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করিল। কেবল মহম্মদী বেগ নামে এক ব্যক্তি এ প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই ব্যক্তি কৃপাণ হস্তে সিরাজের রুদ্ধ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিরাজকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। অতঃপর সিরাজের মৃতদেহ একটি হাতীর পৃষ্ঠে উঠাইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া সিরাজ জননী আমিনা বেগমের আলয়ের সমীপে আনীত হয়। সিরাজ-জননী পলাশির যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না; গোলমাল শুনিয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া সিরাজের মৃতদেহ দেখিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া পুত্রের মৃতদেহ চুম্বন করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের বৈমাত্রেয় ভগ্নীর পুত্র খাদম হাসেনের নির্দ্দেশ মত ভৃত্যগণ তথায় আসিয়া সেই মহিলার পৃষ্ঠে মুষ্টিপ্রহার করিতে লাগিল এবং লগুড় দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইয়া দিল। জনসংঘ এই করুণ দৃশ্যে অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

নিবাইসের আমলে রাজবল্লভ তাঁহার প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং সিরাজের আদেশে পদচ্যুত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। মীরণ এক্ষণে রাজবল্লভকে স্বীয় প্রধান সচিবের পদে নিযুক্ত করিলেন। মীরজাফর রাজকার্য্যে মনোযোগ না দিয়া কেবল বিলাসে মত্ত হইয়া রহিলেন এবং রাজ্য শাসনের ভার সম্পূর্ণ ভাবে মীরণের হস্তে সমর্পণ করিলেন (Sair, Vol. II, p. 246-271)। মীরণের বয়স এই সময় বিশ বৎসরের কিছু বেশী ছিল। আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নী সাহা খানমের গর্ভে মীরজাফরের ঔরসে মীরণের জন্ম হয়। নরহত্যাকে তিনি দোষাবহ মনে করিতেন না। তাঁহার একখানি স্মারকলিপি ছিল।

যাহাকে হত্যা করিতে হইবে তাহার নাম ঐ স্মারক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। মীরণ বলিতেন কাহারও উপর সন্দেহ হইলে তাহাকে ইহধাম হইতে অপসৃত করাই কর্ত্তব্য। (Sair, Vol. II, p. 241, 271 and 372)

সিরাজ উদ্দৌলার শাসনকালে রাজবল্লভ পদচ্যুত হইলে ঢাকা বিভাগের শাসনকর্ত্তৃত্ব রায়দুর্ল্লভের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৮ জুলাই মীরজাফর ঢাকা বিভাগের সমস্ত কাগজ পত্র ও শাসনভার রাজবল্লভের হস্তে অর্পণ করিতে রায়দুর্ল্লভকে আদেশ দিলেন। এখন হইতে রাজবল্লভ পুনরায় ঢাকা বিভাগের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন। মীরজাফর কি মীরণ কেহই রাজকার্য্য দেখিতেন না। কাজেই অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার ন্যায় রাজবল্লভকেও স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে হইয়াছিল।

উমাচরণ বাবুর মতে রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসই এই সময় পিতার প্রতিনিধি স্বরূপে ঢাকায় শাসনকার্য্য চালাইতেন; রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান স্বরূপ মুর্শিদাবাদে বাস করিতেন।

—তবু বাঁচতে হ'বে—

শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী

—ছেলেটা অ-চিকিৎসায় মারা গেল? ডাক্তার দত্তকে একবার ডাকলে না কেন?

—অতখানি অনুকম্পা সহ্য হোত না।

—কেন, তোমার শ্বশুর ত এসেছিলেন।

—তাঁকে বাড়ীর বাহির থেকেই বিদায় দিয়েছি,—বলেছি দয়া দেখাবার স্থান অন্যত্র।

—ভাল কর নি।

—জেনে শুনেই করেছি। কেউ আমায় দুটো টাকা দিয়েছে ভাবলে তাকে আমার খুন ক'রতে ইচ্ছে হয়।

—তোমার স্ত্রী আজ কেমন?

—জিজ্ঞাসা করি নি—করিও না। ভয় হয় পাছে চুরী করবার দুর্দ্দম স্পৃহাটা আবার ভিতরে মাথা নাড়া দিয়ে উঠে।

—শুনলাম টাকাগুলোর জন্য চৌধুরীরা মামলা করেছেন; একবার গেলে না কেন? বলে দেখতে যদি আর ক'টা দিন তাঁরা সবুর করেন।

—গিয়েছিলুম।

—কি বল্লেন তাঁরা?

তাঁদের কিছু বলতে হয় নি, আমিই বলে এসেছি টাকাগুলো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। টাকা পৃথিবীতে অত খেলো জিনিষ নয়।

—তোমার মামারা আর এদিকে আসেন নি?

—না। তাঁরা নির্ব্বোধ নন। তাঁরা জানেন এ বাড়ীতেও পেটভরে খেতে না পেলে পেটে ক্ষিধে থেকেই যায়।

—তোমার বিষয় কাল মিষ্টার দাসের কাছে আলাপ করেছিলাম। বল্লেন, বাজার বড় মন্দা, তাঁদের staffএ আরো Retrenchment কর্ত্তে হবে।

—কোন্ দাস?

—মনে নেই? সেই যার সঙ্গে ইম্‌পিরিয়েল্ সার্ভিসের ডক্টর সেনের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল;—বিয়ের পর যিনি গ্লাসগো যান।

—ও মনে হয়েছে—তাঁকে ক্যালকুলাস্ আর হাইড্রোষ্ট্যাটিক তৈরী করাতে আমার অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল।

—তুমি বরং নিজেও একবার তাঁর কাছে যাও না!

—কেন, পূর্ব্ব উপকার স্মরণ করিয়ে দিয়ে কিছু ভিক্ষে চাইতে?

—তা কেন। ফোর্থ-ইয়ার পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছ এবং পড়িয়েছ।

—ঐ জন্যই ত চিনতে না-পারার অজুহাত রয়েছে তাঁর। কত মাইনে পাচ্ছেন?

—বারোশ না তেরোশ।

—মাত্র। ওতে আমি ভাগ বসালে তাঁর চলবে কেন? সভ্য জগতের লোকের প্রয়োজনের সীমা নির্দ্দেশ রাখতে নেই!

—আমাদের মোহিতও পোষ্টাল সুপারইন্‌টেন্‌ডেণ্ট হয়েছে।

—হবেই ত। যোগ্য লোক—বি-এতে বার দুই ফেল করেছিল, কিন্তু তার বাপ ছিল পুলিসের বড় কর্ত্তা।

—নির্ম্মলও যে প্রভিন্সিয়াল্ সার্ভিসে কাজ পেয়ে গেল শুনেছ বোধ হয়?

—শুনেছি। তাকে আমার কংগ্রেচুলেসন্ দিও, যেহেতু সে একজন লিগাল্-রিমেম্‌ব্র্যান্সারের শ্যালক হতে পেরেছিল। এম-এতে থার্ড ক্লাশ পেয়ে একদিন সে আমার কাছে দুঃখ করেছিল; সেজন্য তাকে অনুতাপ কর্ত্তে ব'লো।

—তাদের কারো সঙ্গে তুমি দেখা কর না?

—সাহস হয় না। অমনি হয়ত বলে বসবে আমাদের অফিসে সেকেণ্ড ক্লার্কের পোষ্টটা ভেকেণ্ট্ আছে—এপ্লিকেশন্ একটা দিও দেখিন্, আমি বড় সাহেবের কাছে রিকমেণ্ড করে দেখবো। তাদের মুখের হাসির সে পরিকল্পনাও আমি সইতে পারি না,—মুখোমুখি থাকলে হাতাহাতি হয়ে যাবে।

—তোমার ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠলো না?

—অবুঝের ও ছাড়া গত্যন্তর নেই। জল দেওয়া বার্লি বার বার ভাল লাগে না, কিন্তু দুধ কেনা যে আমাদের পক্ষে কত বড় সৌখিনতা তা ও বোঝে না।

—ঐ তোমার স্ত্রী না? একেবারে যে স্কেলিটন্ হয়ে গেছেন। একটা চেঞ্জের—

—এইবার তুমি উঠতে পার। ভবিষ্যতে এলে ভদ্রভাবে কথা বলবার মহল্লা দিয়ে এসো।

—চলনা আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখে আসি।

পকেটের ওজন বইতে না পারলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিও—দেখবে কুকুরের দল ছুটে আসবে।

এক সময় ত ভাল ছবি দেখা তোমার রেগুলার হ্যাবিট্ ছিল।

—তখন বুদ্ধি অতটা পাকে নি। চার আনা হ'লে বুঝে-সুঝে খরচ করতে জানলে তিনজন লোকের এক হপ্তা বেশ চলে যায়—এই সোজা হিসেবটা তখন গণিতশাস্ত্রের কোন বড় কেতাবেই দেখি নি।

—তাহ'লে বরং চল এলবার্ট হলেই যাওয়া যাক। বেকার সমস্যা নিয়ে অনেক বড় বড় বক্তা নাকি ব'লবেন।

—মাপ কর। এখান থেকেই তাঁদের আমার নমস্কার। অন্নহীনের জন্য ঐ মায়া-কান্না বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে খাপ খায় না। বেঁচে থাকবার বাইরে বাঁচিয়ে রাখবার নির্দ্দেশ সেখানে উপহাস মাত্র।

—আজ তা হ'লে উঠলাম। কাল আমার ওখানে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ রইল।

—তোমায় নিরাশ কর্ত্তে চাই না; কিন্তু একটা চুক্তি থাকবে—ভাতের সঙ্গে মসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ ছাড়া তৃতীয় দ্রব্য আমাদের পাতে দিতে পারবে না।

—দেখা যাবে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে এ বাড়ীটা তোমায় বদলাতে হবে। তোমার এ ঘর দেখলে আমার দাঁতের ইন্‌ফারনোর কথা মনে হয়। মানুষ এতে বাঁচতে পারে না।

—কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ পৃথিবীতে শুধু মরবার জন্যই বেশীর ভাগ লোক জন্মেছে। পর্য্যাপ্ত আলো বাতাস তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এ সম্বন্ধে দেশে কঠোর আইন হওয়া উচিত।

—হ্যাঁ, তোমাকে অত নোংরা দেখলে আমার দুঃখ হয়। জামাকাপড়গুলো একটু—

—এইবার তুমি না উঠলে জোর করে তুলে দেব। আমাকে দেখে কারো দুঃখ হয় জানলে আমার গা জ্বালা করে- খারাপ ব্যাধি।

*　*　*　*

কাপড় দুযোড়া, পাঞ্জাবী দুটো, শ্লিপার এক যোড়া, বিছানার চাদর, মশারী, গ্লাকসো, হর্লিকস্, সঞ্চয়িতা, রুইমাছ এক সের, ডিম ছ'টা, সের দুই দুধ······বাঃ ফর্দ্দটা ত বেশ রাজসিকই হয়েছে। তা ভাগ্য-কুলের বাড়ী ছেড়ে ইনি এখানে এলেন কেন? একটু ঠাট্টা করতে?

—ঠাট্টা নয়। হাসছো যে?

—তাও ত বটে, হাসলে যে আবার পরমায়ু বেড়ে যায়! ও কি? চোখে জল কেন? ও-সব বাবুয়ানা আমাদের থাকতে নেই—মুছে ফেল।

—ওঠ ত। জিনিষগুলো মিলিয়ে মিলিয়ে কিনে এনো। কোনটাই বাদ দিতে পারবে না কিন্তু। এই নাও।

—এ যে মেলা টাকা, এঁরা কোন্ পথে প্রবেশ করলেন? দেখি, কানের উপরের চুলগুলো সরাও ত। সে ভয় আমার আগেই ছিল।

—ওতে দুঃখ করবার নেই। দুদ্দিনে যদি কাজে না এলো ত না থাকাই ভাল।

—হাত আর গলা ত আগেই শূন্য হয়েছে। ও দুটো আমি একদিন নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম।

তাইতেই ত অত সহজে ঐ দুখানা হাতের জোর রাখতে দিতে পারলুম।

—কিন্তু এর পরে?

—সে ভারও আমার। তুমি আর ভাবতে পারবে না।

—তাহলে তোমার ফর্দ্দটা পুরো কর। আফিং নয় ত সারেনাড্ বা আরো উগ্র কিছু। আরে কে ও? আর্গর-ওয়ালা সাহেব যে! আসুন। কত পাবেন? আটত্রিশ টাকা ন' আনা? এই নিন এক টাকা সাত আনা ফিরিয়ে দিন।

—কোথায় চল্লে?

—এক শিশি কলপ আনতে। তোমার বয়স বাইশ—আমার আঠাশ আদৌ বুঝা যায় না। তবু বাঁচতে হবে।

সমাধান

শ্রীসাহানা দেবী

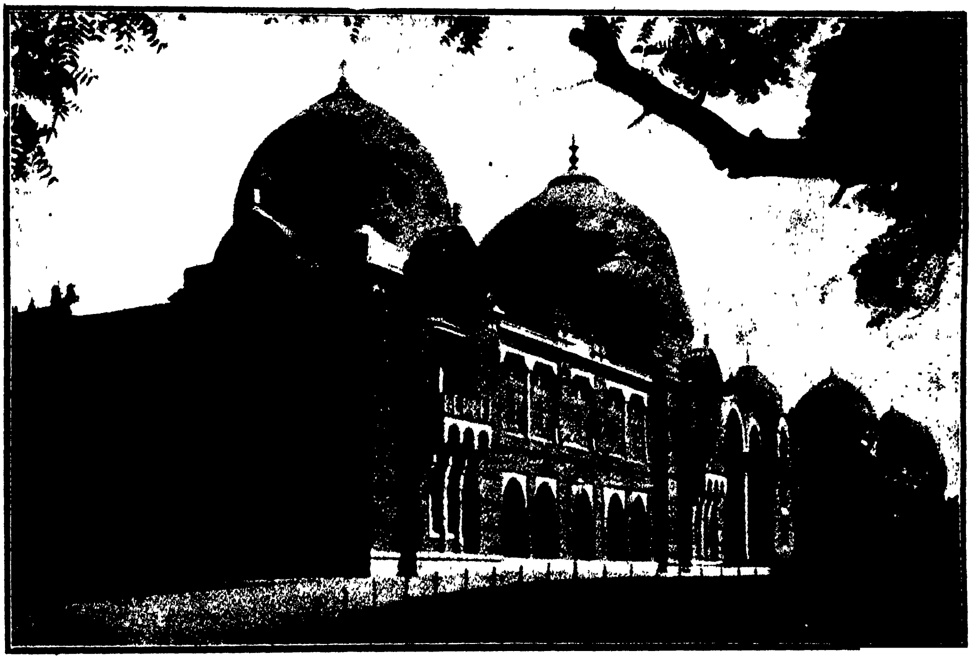
তোমারেই চেয়েছি এ জীবনে আমার যদি, ওগো অন্তর্যামী,
তবে মিছে কেন মোর ছোট সুখ বরি' আপনাতে আমি
রয়েছি মগন? মোহ-অনুরাগী মন মোর মমতা-বিহ্বল
আজিও চলেছে কেন ইন্দ্রিয়ের অনুগামী বাসনা-চঞ্চল?
অভীপ্সার বহ্নি-শিখা আজো জ্বলিল না কেন স্থির অমলিন?
কেন বলো জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তব নাহি রহে ভাতি' অনুদিন
চেতনা-অম্বুজে মোর? কেন বলো পলাতকা সৌদামিনী সম
সে আলোক-রশ্মি-মাল থমকি' মিলায় আসি' তট চুমি মম
হৃদি-সরসীর? বলো, তোমারে চেয়েছি—এই সত্য হয় যদি:
মোর চেতনার মাঝে ধ্যান-রূপে কেন নাহি থাকে নিরবধি
স্ফুটি' তব প্রেমানন? আসঙ্গের মায়া-মৃগ-তৃষিকার পানে
আজো ছুটি কেন? চিন্তা কেন চায় যেতে অতীতের অভিযানে?
তোমারেই প্রার্থি যদি তোমা পানে কেন নাহি ধাই এক-মনা?
কোথা আত্ম-নিবেদন তোমারে পাবার লাগি? কোথা আরাধনা?
কোথা প্রেম-পরিমল, কোথা ত্যাগ, তপস্যার নিষ্ঠা সুকঠোর?
তব স্বপ্ন-সূর্য্য ধ্যান করি, এ তামসী নিশা কোথা হয় ভোর?
ভক্তি-কুবলয় কলি কোথা কুসুমিল চাহি' দিনমণি পানে?
আলো ধারা আবিলায় দিঠিতে কাজল ছায় আনি' অভিমানে!
সত্য যদি তোমারেই খুঁজেছে অতৃপ্ত মম চিত্ত বার বার
শ্রীপদ-আকাঙ্ক্ষী মোর হিয়া—তবু তারে কেন ঢাকে আঁধিয়ার?
তবুও সত্য: তোমারেই চেয়েছি নিয়ত মোর চেতনার মূলে
আত্মার মৃদুল ডাকে দেছি ঝাঁপ অনুরাগে ছাড়ি প্রিয় কূলে।
একি দুর্বাসনা মিছে! ডাকিলি তাঁহারে তুই, তিনি সাড়া তোরে
দিয়েছেন সেই ডাকে, চলেছেন সাথে সাথে স্নেহে হাত ধ'রে
তোর ভার সকলি তো নিজ হ'তে আপনার করে তুলে ল'য়ে
রয়েছেন তোরে ঘেরি', রেখেছেন সমতলে করুণা-নিলয়ে।
তোর মাঝে যাহা নাই তিনি পূরাবেন তাই আপনারে দানি'
কাটিয়া লইবে নিজ ছাঁদে গড়ি' সুকৌশলী সে-তক্ষণী পাণি।
প্রেম পারাবার যিনি তিনি নিয়েছেন টানি' তবুও অধীর!
তাঁর নীলাম্বর-ছায়া ফলিতে নীলাম্বু সম তুমি থাকো স্থির।
যাঁর শক্তি বিনা কভু সম্ভবে না পথ-চলা সেই শক্তি-ধর
আছেন তোমারে ধরি', অখণ্ড বিশ্বাস শুধু রাখ তাঁর' পর।

বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনে

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

দ্বিতীয় দিন

দ্বিতীয় দিন, ২৮শে ডিসেম্বর, বরোদা কলেজে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে স্থির ছিল। দশটি প্রধান শাখায় সম্মিলন বিভক্ত হইয়াছিল ; যথা—প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস, ললিতকলা, ভাষাতত্ত্ব, উর্দ্দু, আবেস্তা, গুজরাটী। আমার প্রবন্ধটির নাম দিয়াছিলাম—"কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারবতীর সংস্থান-নির্ণয়।" সম্মিলনে নৃতত্ত্বের সহিত জাতিতত্ত্ব (Ethnology) এবং পুরাণ (Mythology) একত্র গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমার প্রবন্ধে কৃষ্ণ ও দ্বারবতীর নাম দেখিয়া উহাকে নয়তোষ পুরাণের কোঠায় ঠেলিয়া দিয়াছিলেন। প্রায় ১১½টায় সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখি, নৃতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক দাভার "বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার ভবিষ্যগণনা পদ্ধতি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন এবং গুটিদশবারো নিদ্রালু ভদ্রলোক ও একটি তন্বী গৌরাঙ্গী ভদ্রমহিলা উহা শ্রবণে জ্ঞানলাভের প্রয়াস করিতেছেন। এই প্রবন্ধ পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি শরৎবাবুকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমার প্রবন্ধ প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয়,—ভ্রমক্রমে নৃতত্ত্ব শাখায় স্থান পাইয়াছে। তিনি অনুমতি করিলে উহাকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে লইয়া যাইতে পারি। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যাইয়া দেখি, সভাপতি অকালবৃদ্ধ ইয়াজদানী সাহেব নাসিকা এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মঞ্চের উপরে চেয়ারে সমাসীন ; এবং প্রশান্ত সুন্দর-মূর্ত্তি অধ্যাপক যোশী তাঁহার পাশে বসিয়া সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। ইয়াজদানী সাহেবের কর্ম্মজীবনের আরম্ভ



বরোদা কলেজ

বাঙ্গালা দেশে,—রাজশাহী কলেজের পারস্য ভাষার অধ্যাপক রূপে তিনি প্রথম শিক্ষাবিভাগে কার্য্য আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে তিনি নিজামের রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ত্তা। বারো বছর আগে ইয়াজদানী সাহেবকে প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনের কলিকাতা অধিবেশনে দেখিয়াছিলাম। তখন তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, মেজাজও প্রফুল্ল ছিল। এবার কিন্তু তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া মনে হইল, স্বাস্থ্য মোটেই ভাল চলিতেছে না এবং তাহা সত্ত্বেও তাহাঁকে টানিয়া আনিয়া সভাপতির আসনে বসান নিষ্ঠুরতার কাজ হইয়াছে,—তাহার উপর আবার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মত কুস্তির আখড়ার সভাপতির আসনে। তাই তিনি মুখখানা যথাসম্ভব বেজার করিয়া শ্রোতৃগণের দিকে চাহিতেছিলেন,—রুক্ষমেজাজ হেড-মাষ্টার যেমন ভঙ্গীতে দুর্দ্দান্ত ছাত্রপূর্ণ ক্লাশের দিকে চাহে,—এবং পঠমান প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে উদ্যম করিলেই হস্তস্থিত পেন্সিলটি টেবিলে ঠুকিয়া সভার শান্তিরক্ষা করিতে-ছিলেন। আমি যাইয়া আমার প্রবন্ধ সমেত প্রত্নতত্ত্ববিভাগের স্কন্ধে নিপতিত হইলে—ইয়াজদানী সাহেব অধ্যাপক যোশীর দিকে চাহিলেন,—ভাবটা এই যে,—"এ আবার কি নূতন বিপদ!" শরৎবাবুর অনুমতিপত্র দেখাইয়া প্রফুল্লের মাতার মত আমার প্রবন্ধ-কন্যার জন্য একটু স্থান ভিক্ষা করিলাম। স্থান মিলিলও বটে,—তবে ভাবভঙ্গীতে বড় আশঙ্কাই হইয়া-ছিল যে হরবল্লভের মত না জানি ঝাঁটা-পেটা করিবার হুকুমই দিয়া বসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত উহাই বহাল থাকে!

একটি একটি করিয়া প্রবন্ধ পড়া হইতে লাগিল,—আমার আর ডাক পড়ে না! আমি সর্ব্বশেষ আসিয়াছি,—আসিবামাত্রই পাত পাইব, আশা করিতে পারি না। কিন্তু একেবারে যে শেষে পড়িব, এ আশঙ্কাও করি নাই। যাহা হউক দুটা বাজিয়া গেল, জলযোগের জন্য ডাক পড়িল,—সেইদিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

এখানকার জলযোগের এক বিশেষত্ব দেখিলাম—সব্বাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই জলযোগ করে। একটা লম্বা টেবিলের উপর প্লেটগুলি সাজাইয়া রাখা হয়, দুইধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিতগণ যাহাঁর যাহা ইচ্ছা, প্লেট হইতে উঠাইয়া লন। উপকরণে আপেল, কমলালেবু, কলা, আঙ্গুর ইত্যাদি তো আছেই, ডালমুট এবং ছোলার ছাতু দ্বারা প্রস্তুত আঁকা বাঁকা সলিতার মত একপ্রকার খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়।

জলযোগান্তে অন্যান্য প্রতিনিধিগণসহ মিউজিয়ম ও চিত্রসংগ্রহশালায় চলিলাম। চিত্রসংগ্রহশালার দোতলার দুইখানা কোঠা ভরিয়া কেবলি বিদেশী চিত্র রাখা হইয়াছে। উহাদের কোন কোনটা সংগ্রহ করিতে মহারাজকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এত তাড়াতাড়িতে এবং এমন ভীড়ের মধ্যে এই পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিতে হয় যে, আজ চারি মাস পরে উহাদের বিবরণ লিখিতে যাইয়া দেখি যে, উহাদের কোন একখানা চিত্রের কথাও আজ আর স্পষ্ট স্মরণে



বরোদা মিউজিয়ম এবং চিত্র-সংগ্রহশালা

নাই। দুইটি বৃহৎ কক্ষ ভরা চিত্রাবলির মধ্যে মনের উপর রাখিয়া যাইবার মত একখানা চিত্রও ছিল না, এ কথা বলিলে চিত্রবিদ্যার অপমান করা হইবে। ছাপ লইবার মত অবস্থা আমার মনের তখন ছিল না, ইহাই খাঁটি সত্য কথা। এই দুইটি কক্ষের এক ধার দিয়া একটা লম্বা বারাণ্ডায়, প্রাচীন পুঁথি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত অবোধ্য লিপিযুক্ত কয়েকটি শীলমোহর, প্রাচীন দলিল—ইত্যাদি কাচের আধারে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। ভীড়ের মধ্যে ঘুরিয়া, ঐ সকল দ্রব্যও একচোখ দেখিয়া লইলাম। চিত্রসংগ্রহশালা ও যাদুঘরের মধ্যে একটি সংযোগপথ আছে। তাহার উপরে একটি মর্ম্মরে গঠিত শয়ান স্ত্রীমূর্ত্তি রক্ষিত—মানবের আদি মাতা ইভ বা হবার প্রতিমূর্ত্তি। বেশ লালিত্যপূর্ণ গঠন-ভঙ্গী, দেখিয়া ভালই লাগিল। ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার মত আদিমাতার দেহের বিকাশ,—মূর্ত্তিটি সম্ভবতঃ ইটালী দেশ হইতে আনীত।

চিত্রসংগ্রহশালার নীচের তলায় প্রায় চারিশতাধিক চিত্র রক্ষিত আছে। চিত্রগুলি জয়পুর, কাঙ্গরা, রাজপুত এবং মুঘল পদ্ধতির বেশ ভাল নমুনা। কিন্তু পনের মিনিটের মধ্যে এই বিরাট সংগ্রহে চোখ বুলাইয়া বিশেষ লাভ হয় নাই,—একখানা চিত্রের কথাও মনে নাই। এই পরিক্রমার সময় দেখিতে পাইলাম,—ইয়াজদানী সাহেব সম্ভবতঃ কলানুশীলন-শ্রান্তিতে এলাইয়া এক কোণের এক আসনে বসিয়া আছেন। অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদি স্থানের কর্ত্তৃত্ব ইয়াজদানী সাহেবের। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রমুখ আমরা কয়েকজন বাঙ্গালী অজন্তা ইলোরায় যাইব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ সুবিধা আদায় করিবার জন্য জাঁকিয়া ইয়াজদানী সাহেবের পাশে যাইয়া বসিলাম। একথা সেকথার পরে আসল কথার অবতারণা করিলে তিনি সানন্দে আমাদের জন্য যথাসাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলিলেন,—"আমি আজই অজন্তার রক্ষকের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দিতেছি যে চারিজন বাঙ্গালী পণ্ডিত যাইতেছেন,—তাহাঁদের সুখসুবিধার জন্য যেন যথাসাধ্য করা হয়।" কুঞ্চিত ভ্রূর নীচে এতখানি সহৃদয়তা দেখিয়া বাস্তবিকই আনন্দিত ও মুগ্ধ হইলাম। দুঃখের বিষয়, অজন্তা ইলোরা আমাদের যাওয়া হয় নাই। সম্মিলন শেষে যে যার মত যে যার পথে চলিয়া গিয়াছিলাম।



বরোদার রঙ্গস্থলে হাতীর লড়াই

চিত্রসংগ্রহশালা পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া যাদুঘর দেখিতে চলিলাম। দ্রষ্টব্য স্থানের যে স্মারক পুস্তিকা একখণ্ড পাইয়াছিলাম তাহাতে যাদুঘরটি সম্বন্ধে নিম্নরূপ লিখিত আছে—"যাদুঘর সপ্তাহের প্রত্যেক দিন ৯টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। নিম্নলিখিত বিভাগে যাদুঘরের সংগ্রহ বিভক্ত,—(১) শিল্পজাত দ্রব্য (২) জীবজন্তু (৩) জাতিতত্ত্ব বিভাগ (৪) ভূতত্ত্ববিভাগ। (৫) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। (৬) কৃষিবিভাগ। অল্প সময়ের মধ্যে পরিক্রমা শেষ করিতে বাধ্য হওয়ায় এইমাত্র একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে ইহা কলিকাতা যাদুঘরের একটা ক্ষুদ্রতর সংস্করণ মাত্র। এক উর্দ্ধগ্রীব জিরাফের মূর্ত্তিটা মাত্র অদ্যাবধি চোখে ভাসিতেছে।

মঞ্চের উপর বাকে সাহেব ক্ষুদ্র একটি গ্রামোফোনের সাহায্যে সামবেদের ধ্বনিলালিত্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বেদের নামে আমাদের মাথা এমনি নত হইয়া আসে। অধিকন্তু, লেখক স্বয়ং সামবেদী ব্রাহ্মণ। ছেলেবেলায় মুখস্থ করিতে হইয়াছে,—

কোন্ বেদ ?
সাম বেদ।
কোন্ শাখা ?
কৌথুম শাখা।

কাজেই সামবেদের ধ্বনিলালিত্যে মুগ্ধ হইবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়াই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাকের



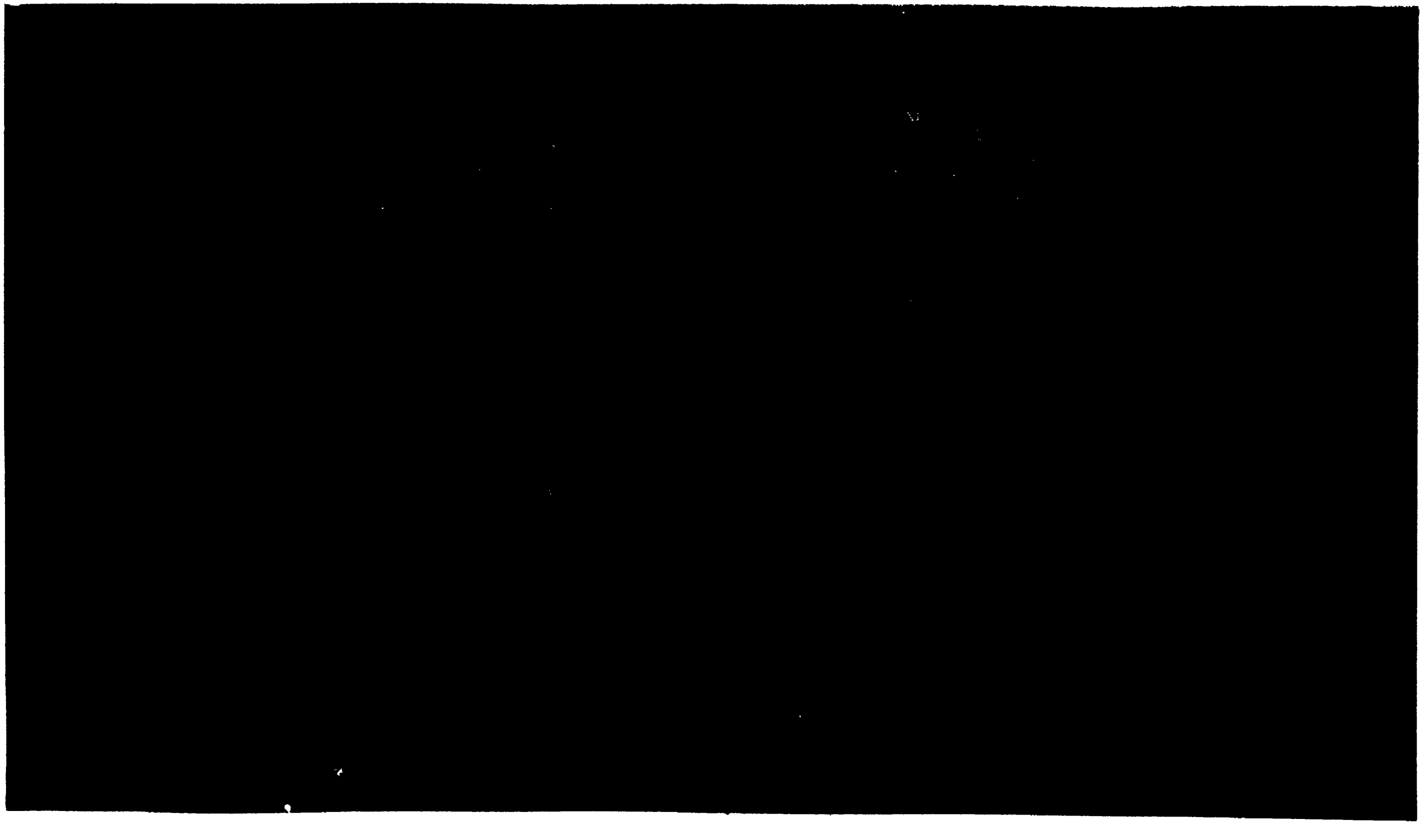
নজরবাগ প্রাসাদ

ঘণ্টাখানিকে এইরূপে চিত্রসংগ্রহশালা ও যাদুঘর দর্শন সমাপ্ত করিয়া বরোদা কলেজে ফিরিয়া আসিলাম। তথায় শান্তিনিকেতনের ওলন্দাজ অধ্যাপক বাকে "সামবেদের ধ্বনিলালিত্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন, ব্যবস্থা ছিল। কলেজের বক্তৃতা প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখি, বহু লোক হইয়াছে,—স্বয়ং মহারাজা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। (বলিতে ভুলিয়াছি, মহারাজা ইতিপূর্ব্বে একবার আসিয়া শ্রোতাদের সহিত বসিয়া নৃতত্ত্ববিভাগে এক বক্তৃতা শুনিয়া গিয়াছেন।)

ক্ষুদ্রকায় গ্রামোফোনের যে এত বিক্রম তাহা কে কবে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? উহা এমন অদ্ভুত কলরব জুড়িয়া দিল যে—এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়,—

দেখিয়া বিশ্বের লাগে, বিষম বিস্ময়!

মহারাজ নির্ব্বিকারচিত্তে ঐ 'ধ্বনিলালিত্য' কর্ণাধঃকরণ করিতে লাগিলেন—আমি প্রাণ লইয়া বাহিরে পলাইলাম। শ্রীমান বিনয়কে সংগ্রহ করিয়া, তাহার এক অনুচরের হাতে পাণ আনাইয়া কলেজের বারাণ্ডায় সুখাসীন হইয়া



মেঘমল্লার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কিরণ্ময় ধর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

উহা সহযোগে ধূমপানে মনোযোগ দিলাম এবং একদৃষ্টে কলেজ-প্রাঙ্গণের এক খর্জ্জুরবৃক্ষের গঠনলালিত্য অনুধাবন করিতে লাগিলাম। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেশ-বিখ্যাত। একবার মিছিলের এক হস্তিনীকে শাবকসহ মিছিলে বাহির করা হইয়াছিল। মিছিলের শেষে কলিকাতা হইতে আগত আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মিছিলে বিশেষ করিয়া কি ভাল লাগিল?" বন্ধু উত্তর করিলেন—"ভাল লাগিল সবই,—কিন্তু মশায় সব্বার চেয়ে আশ্চর্য্য ঐ হাতীর বাচ্চাটি! হাতী যে এত ছোট হইতে পারে, তাহা কোন দিন ভাবি নাই।" বরোদা কলেজপ্রাঙ্গণের খেজুর গাছটিও অমনি এক আশ্চর্য্য জিনিস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহাউসের থামের মত মোটা এমন নিটোল 'পুরুষ্টু' খেজুর গাছ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বোয়ালমাছের তুলনায় যথা পাব্‌তা মাছ, এই খেজুর গাছের তুলনায় তথা আমাদের বাঙ্গালা দেশের খেজুর গাছগুলি! আরব দেশ যে বরোদা হইতে বেশী দূরে নহে, এই খর্জ্জুর-বৃক্ষরাজকে দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা গেল।

বেলা সাড়ে চারি ঘটিকার সময় 'আগড়' বা চতুর্দ্দিকে উচ্চ দেওয়াল বেষ্টিত রঙ্গস্থলে হাতীর লড়াই ইত্যাদি প্রদর্শিত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই স্থান কলেজপ্রাঙ্গণ হইতে ৩।৪ মাইল পূবের দিকে। চারিদিকে উচ্চ ব্যারাক দ্বারা পরিবেষ্টিত এই স্থানটিতে বছরে দুই একবার ক্রীড়া কৌতুকাদি হয়, দর্শকগণ ব্যারেকের ছাদে আশ্রয় পায়। মধ্যের প্রাঙ্গণটি দৈর্ঘ্যে শ'তিনেক গজ বলিয়া অনুমান হইল। প্রাঙ্গণের দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দরজা কাটা আছে,—হাতী খেলাইবার সময় বিপদ দেখিলে অশ্বারোহিগণ অশ্বসমেত এই দরজা দিয়া বাহিরে পলাইয়া যায়,—বিপুল-শরীর গজরাজ উহার মধ্যে ঢুকিতে না পারিয়া নিষ্ফল ক্রোধে ফুঁসিয়া বৃংহিতে গগন কাঁপাইয়া থাকেন।

প্রতিনিধিগণের জন্য ব্যারাকের ছাদে যে গ্যালারি নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতে যাইয়া বসিলাম। ব্যারাকের ছাদ লোকে লোকারণ্য,—সমস্ত সহর ভাঙ্গিয়া লোক যেন এই খেলা দেখিতে আসিয়াছে! রাজকীয় মঞ্চে সভাপতি জয়সোয়াল এবং শাখা-সভাপতিগণ স্থান পাইয়াছিলেন। আমাদের মঞ্চ আমাদেরই মত সাধারণ প্রতিনিধি দ্বারা পূর্ণ। প্রোগ্রামে লিখিত ছিল—বৈকালিক চা-যোগ এই মঞ্চে হইবে। এই সম্মেলনের আগাগোড়া চমৎকার ব্যবস্থার মধ্যে মাত্র এই এক স্থানে গোলযোগ ঘটিয়াছিল। আমাদের মঞ্চে চা-যোগের কোন ব্যবস্থা হয় নাই,—সম্ভবতঃ সভাপতিগণের মঞ্চে হইয়াছিল।

খেলা আরম্ভ হইল। প্রথমে জোড়ায় জোড়ায় পালোয়ানদের কুস্তি,—প্রায় ১৫ মিনিটের মধ্যে কাহাকেও



মকরপুরা প্রাসাদে তরু-বীথিকাতলে প্রতিনিধিগণের বাস্

হারিতে দেখিলাম না। অতঃপর দুই দিক হইতে দুইটি বৃহৎ-শৃঙ্গ বৃষকে আনা হইল। এমন তৈলচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ দেহ এবং শৃঙ্গগুলি এত বড় যে, দূর হইতে বৃষ না মহিষ ভাল করিয়া ঠাহর করিতে পারিলাম না। এই অঞ্চলের বৃষগুলির এই এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, উহাদের শিংগুলি মহিষের শিংএরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। যুযুধান বৃষযুগলের মধ্যে এক কাপড়ের পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল। যেই ঐ পর্দ্দা সরাইয়া লওয়া হইল অমনি রক্তচক্ষু বৃষদ্বয় পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া মাথা নোয়াইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিল, এবং ধাস্ করিয়া ভয়ঙ্কর শব্দে দারুণ সঙ্ঘর্ষে উভয়ের মস্তক মিলিত হইল

উহাদের পিছনের এক পায়ে দড়ি বাঁধা,—উভয় বৃষের রক্ষকই সেই দড়ি ধরিয়া ছিল। বহুক্ষণ শৃঙ্গবদ্ধ অবস্থায় থাকিয়াও যখন কেহ কাহাকেও হঠাইতে পারিল না তখন পায়ে বাঁধা দড়ি ধরিয়া টানিয়া উভয়কে পৃথক করা হইল এবং মধ্যে আবার কাপড়ের পর্দ্দা ফেলিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে মেড়ার লড়াই হইল—ঠাস্ ঠাস্ করিয়া মাথায় মাথায় ঠোকা-ঠুকি হইতে লাগিল। অতঃপর এক সু-সজ্জিত সুশিক্ষিত গজরাজ আসিয়া লক লকে হাত অর্থাৎ সম্মুখের পা তুলিয়া কুর্ণিশ করিল, শুঁড়ে জড়াইয়া গদা ঘুরাইল, লাঠি ঘুরাইল।

সকলের শেষে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন এক গজরাজ। বৃহৎ তাহার দুই দন্ত—মদবিহ্বল ঢুলু ঢুলু তাহার ক্ষুদ্র দুই নয়ন,—চারিটি পা-ই মোটা লোহার শিকলে বাঁধা। ঝম্ ঝম্ করিয়া পায়ের শৃঙ্খল বাজাইতে বাজাইতে গজরাজ আসিয়া আমাদের মঞ্চের নীচেই দাঁড়াইলেন। একটি একটি করিয়া তাহার পায়ের শিকল খুলিয়া দেওয়া হইল। ইত্যবসরে রঙ্গীন পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া কয়েকজন অশ্বারোহী আসিয়া গজরাজের অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। মুক্তি পাইয়াই গজরাজ তাহাদিগকে তাড়া করিল। রঙ্গস্থলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি সঙ্কীর্ণদ্বার যুক্ত প্রকোষ্ঠ, অনুচ্চ মঞ্চ এবং গোড়া বাঁধান গাছ আছে। গজরাজ-তাড়িত অশ্বারোহীগণ উহাদের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়া গজরাজের সহিত লুকো-চুরি খেলিতে লাগিল। এইরূপ খেলা অনেকক্ষণ চলিল। এক অশ্বারোহীর পাগড়ীর প্রান্ত পলায়ন বেগে পিছনে পতাকার মত উড়িতেছিল,—গজরাজ একবার শুণ্ডে জড়াইয়া তাহা ছিনাইয়া লইয়া, অশ্বারোহীকে ধরিতে না পারিয়া, উহাকেই পদদলিত করিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপে হাতী-ঘোড়াতে খেলা চলিলে বারুদপূর্ণ লোহার চোঙ্গ হস্তে কয়েকজন অনুচর অগ্রসর হইয়া গেল। চোঙ্গগুলিতে আগুন দিবামাত্র শোঁ শোঁ করিয়া ঐগুলি হইতে তুবড়ীর মত অগ্নি ও ধূম নির্গত হইতে লাগিল। গজরাজ গত্যন্তর না দেখিয়া পিছু হাঁটিতে লাগিলেন। এইরূপে কৌশলে উহাকে পরিত্যক্ত শৃঙ্খলগুলির নিকট লইয়া আসা হইল এবং পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলিত অবস্থায় গজরাজ রঙ্গস্থল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।



মকরপুরা প্রাসাদে বাগান

এই সময় প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। অনেক অপেক্ষা করিয়া একখানা বাস মিলিল এবং দারুণ ক্লান্তিযুক্ত অবস্থায় বাসায় ফিরিলাম। সন্ধ্যার পরেও গুটি চারি বক্তৃতা ছিল—উহাদের কোনটায়ই যাইতে উৎসাহ হইল না।

তৃতীয় দিন

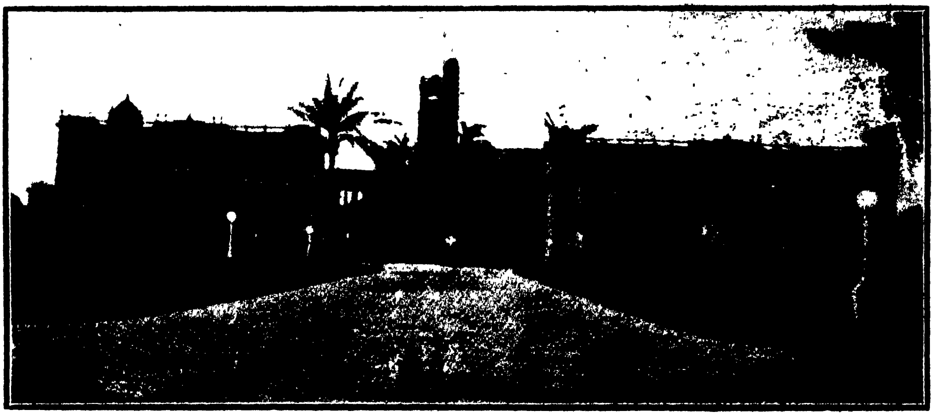
তৃতীয় দিন, শুক্রবার, ২৯শে ডিসেম্বর,—বিট্‌ঠল ক্রীড়া-ভবনে প্রাতে ৮টায় কুস্তি ইত্যাদি ব্যায়াম প্রদর্শনী ছিল।

পূর্ব্বদিন সারাদিনের ঘুরাঘুরিতে এতই ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে উহাতে আর যাওয়া হইল না। পৌনে এগারটায় কলেজ-প্রাঙ্গণে প্রতিনিধি এবং সম্মিলনের কর্ম্মচারীগণের সম্মিলিত আলোকচিত্র গ্রহণের কথা ছিল ;—খাওয়া দাওয়া চুকাইয়া তাই যথাসময়ে তথায় হাজির হইলাম।

ফটো তুলিতে সবাই কলেজ ভবনের বিস্তৃত সিঁড়ির উপর সারি দিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ছয় ফুট লম্বা দেহটা লইয়া কিঞ্চিৎ মুস্কিলে পড়িলাম। যেখানে দাঁড়াই অমনি পশ্চাতের ব্যক্তি বলেন—"মশায়, একটু সড়িয়া দাঁড়ান।" আমি কাতর হইয়া বলিলাম—"মহাশয়গণ, আমার ছয়ফুটের নীচে হইবার সাধ্য নাই, যেখানে দাঁড়াইব সেখানেই ছয় ফুট হইব —কাজেই আমাকে দয়া করিয়া সহিয়া লউন।" সমবেত হাস্যধ্বনির মধ্যে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

যতগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা এই :—বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃত—৩২। ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ—৮। জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও পুরাণ—২৬। দর্শন ও ধর্ম্ম—২১। ইতিহাস ও তারিখ—২৬। প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্নলিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব—২৩। শিল্পকলা, স্থাপত্য এবং মূর্ত্তিতত্ত্ব—২৬। আবেস্তা ও ইরাণীতত্ত্ব—৪। আরবী ও পারসী—১০। মারাঠী—৪। হিন্দী—৯। উর্দ্দু—২। গুজরাটী—১৯। পণ্ডিত পরিষৎ—১৫।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সর্ব্ব শেষ আমার প্রবন্ধ পঠিত হইয়া আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল। আদি দ্বারবতী এবং জুনাগড় সহর অভিন্ন, এবং সেই কৃষ্ণের আমলের দ্বারবতী অক্ষত অবস্থায় আজিও বিদ্যমান আছে—শুনিয়া যুগান্তরও উপস্থিত হইল না, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ একটা



মকরপুরা রাজপ্রাসাদ

এমন সময় লক্ষ্য করিলাম ডাক্তার সুনীতি চাটুয্যে খদ্দরের কোট গায়ে দিয়া মাথায় টুপি চড়াইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমি বাঙ্গালীত্ব-গর্ব্বে সগৌরবে লেঙ্গা মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। বলিলাম,—"ও কি চাটুযো ? মাথায় টুপি কেন ? শীঘ্র বাঙ্গালী হউন।" সুশীল, সুবোধ, সুরসিক সুনীতি খপ্ করিয়া মাথায় টুপি খুলিয়া পুরাপুরি বাঙ্গালী হইয়া দাঁড়াইলেন !

১১টা হইতে আবার বিভিন্ন শাখার অধিবেশন আরম্ভ হইল। আমি একনিষ্ঠ ভাবে প্রত্নতত্ত্ব-শাখায় সর্ব্বক্ষণ বসিয়া ছিলাম। কাজেই অন্য শাখাগুলির খবর কিছুই বলিতে পারিলাম না। তালিকা অনুসারে যে শাখায়

বিক্ষোভও দেখা গেল না। মাত্র একটি গুজরাটী পণ্ডিত উঠিয়া বলিলেন,—অনুরূপ প্রমাণের বলে, তিনিও পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন এবং জৈন পুরাতত্ত্ব নামক এক অধুনালুপ্ত গুজরাটী পত্রিকায় এক প্রবন্ধও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত। এই জুনাগড়-দ্বারবতী একবার দেখিয়া যাইতে হইবে, এই সঙ্কল্প কিন্তু মনে স্থির হইয়াই রহিল।

বেলা দুটায় পূর্ব্ব দিনেরই মত জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। উহা শেষ হইলে প্রতিনিধিগণ সহর পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমে গেলাম কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে। বরোদা রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থার মধ্যে এই কেন্দ্রীয়

একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। মফঃস্বলের গ্রন্থাগারগুলিতে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে সর্ব্বদাই পুস্তক প্রেরিত হইয়া থাকে। হৃৎযন্ত্র হইতে যেমন মানবের সর্ব্ব শরীরে রক্ত চলাচল করে, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহিত বরোদা রাজ্যের মফঃস্বলস্থ অসংখ্য ক্ষুদ্রতর গ্রন্থাগারগুলির সম্পর্কও তেমনি। রাজ্যের দূরতম প্রান্তের প্রজাগণও এইরূপে সর্ব্বদাই নূতন নূতন পুস্তক পড়িবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

মহারাজের নজরবাগ প্রাসাদে রাজকীয় অলঙ্কারসমূহ রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতিনিধিগণের দর্শনের জন্য নজরবাগ এবং রত্নশালা উন্মুক্ত হইয়াছিল। শুনিলাম, রত্নালঙ্কারগুলির মূল্য তিন কোটি টাকার উপরে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া আমরা নজরবাগে উপস্থিত হইলাম। ছোট-খাট কেল্লার মত আঁটসাঁট গড়নের একটি ত্রিতল অট্টালিকা, চৌরঙ্গীর বড় বড় সাহেব দোকানগুলির মত। ইহাই নজরবাগ প্রাসাদ। ইহারই নিম্নতলের এক কক্ষে সশস্ত্র প্রহরীর পাহারায় রাজকীয় রত্নাগার রক্ষিত। ১০।১২ জনের এক এক দল এক একবারে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরে প্রবেশ করিতে পারিলাম। একটা গোলাকৃতি প্রকাণ্ড প্রদর্শনীপেটিকায় রত্নালঙ্কারসমূহ রক্ষিত। দেখিয়া রোমহর্ষণ অথবা বিস্ময়, কিছুই হইল না। অনেকগুলি মুক্তার মালা দেখিলাম। কোনটার মুক্তা ছোট আকারের আমলকী ফলের মত, কোনটার বা উহার অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। আগাগোড়া মুক্তা দিয়া ছাওয়া একটি কার্পেটের আসন দেখিলাম। উহার উপর বসিলে কতটা সুখ পাওয়া যাইতে পারে তাহাও অনুমান করিতে চেষ্টা করিলাম। স্বচ্ছ স্ফটিকখণ্ডের মত নানা আকৃতির কতকগুলি পাথরের হার ঝকমক্ করিতেছে দেখিয়া রক্ষক কর্ম্মচারীকে নিতান্ত নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মশায়, এই সন্দিগ্ধ চেহারার পাথরগুলিকে যেন হীরা বলিয়া মনে হইতেছে!"

কর্ম্মচারীপ্রবর বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া বলিলেন—"এগুলি হীরাই তো,—আপনি কি মনে করিয়াছেন?"



মকরপুরা প্রাসাদ সরোবরে দাঘচঞ্চু হংস

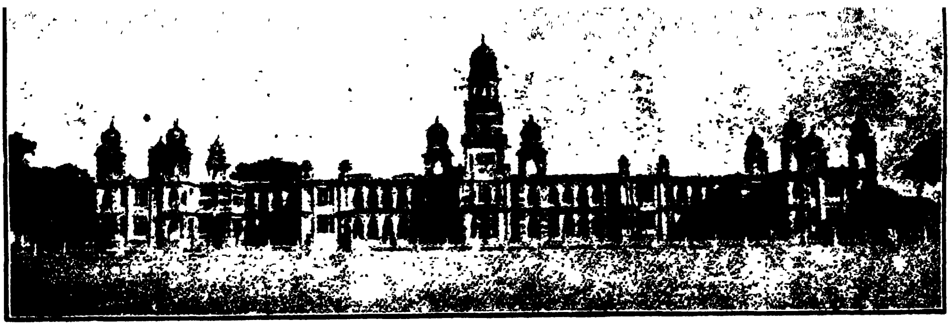
আমি বলিলাম—"আমিও তাহাই মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হইলাম!"

সঙ্গী ভবতোষবাবু বড় মনোযোগ দিয়া হীরা মুক্তা দেখিতেছেন লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দিলাম—"পরের ধনরত্ন দেখিয়া লাভ কি? নিজের যদি কোন দিন হয়, তখন দুই চোখ ভরিয়া যত খুসি দেখিবেন, আমি কোন আপত্তি করিব না।" স্মারিকা পুস্তিকায় দেখিয়াছিলাম, একটি হীরার হারের দাম নাকি চল্লিশ লাখ টাকা। ঐ রত্নারণ্যে এই বিশেষ হারটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। ব্রেজিল দেশীয় ১২৫ ক্যারেট

ওজনের একটি হীরকও নাকি এই সংগ্রহে আছে। ঔদাসীন্য বশতঃ এই হীরকরাজও নয়নগোচর হইলেন না।

এইরূপে নিতান্ত হেলা-ফেলা করিয়া তিন কোটি টাকার হীরা মাণিক দেখা তিন মিনিটে শেষ করিয়া মহারাজের মকরপুরা প্রাসাদ দেখিতে চলিলাম। ন্যায়-মন্দির হইতে প্রায় চারি মাইল দক্ষিণে এই মকরপুরা প্রাসাদ অবস্থিত। এই প্রাসাদটি বর্ত্তমান মহারাজার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজা খাণ্ডেরাও গাইকোবাড় কর্ত্তৃত নির্ম্মিত হয়। সুনির্ম্মিত রাস্তা দিয়া আমাদের বাস্ চলিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের নিকটস্থ ছায়াশীতল তরুবীথিকায় যাইয়া দাঁড়াইল। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এই-মাত্র হীরা-জহরতের ছড়াছড়ি দেখিয়া আসিয়াছি, কাজেই, ঐশ্বর্য্যের পরিচয়ে মুগ্ধ হইবার অবস্থা মনের তখন ছিল না। কিন্তু প্রাসাদ সম্মুখস্থ উদ্যানের বিন্যাস-সৌন্দর্য্য প্রকৃতই ভাল লাগিল,—বেলা তিনটার সেই ঝাঁ ঝাঁ রোদের মধ্যেও ভাল লাগিল। গোলাপ গাছগুলিতে মস্ত মস্ত গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে—স্বল্পতোয় আমলকাকৃতি কৃত্রিম সরোবরের জল রোদে ঝিকিমিকি করিতেছে,—উহার শৈবালাকুল স্বচ্ছ অগভীর জলে ছোট ছোট মাছ খেলা করিতেছে—দূরে কয়েকটি তাল, খেজুর গাছের পাতা বাতাসে ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছে,—সমস্তটা জড়াইয়া বেশ একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ জীবন্ত ভাব। গাইকোবাড় মহারাজের পয়সাও আছে, রুচিও আছে। প্রাসাদটি ত্রিতল এবং দুই মহল, মধ্যে একটি উচ্চ মঞ্চ; দেখিলে মনে হয় যেন ভূমিকম্পে উহার মাথার কতকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে, উহার গড়নই ঐরূপ। এই প্রাসাদে মহারাজা মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। প্রাসাদে ঢুকিয়া তিন তলেরই কক্ষগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। মহারাজের শয়নকক্ষও দেখিলাম। মেজেতে আগাগোড়া তুলা ভরা ফরাস পাতা—তাহার উপরে খাট বসান। খাটে আবরণ দিয়া ঢাকা বিছানা পাতা রহিয়াছে। সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—কিন্তু জাঁকজমকের চিহ্ন-বর্জ্জিত। এক কক্ষে কয়েকখানি চমৎকার তৈলচিত্র দেখিলাম। স্মারিকা পুস্তিকায় দেখিলাম, বাগানের এক প্রান্তে একটি পুকুরে একপ্রকার দীর্ঘ চঞ্চু রাজহাঁস জাতীয় পাখী প্রতিপালিত হয়।

মকরপুরা শেষ করিয়া বরোদা কলাভবন দেখিতে চলিলাম। বরোদায় রাজপ্রাসাদের এত ছড়াছড়ি যে দূর হইতে দেখিয়া উহাকেও একটা প্রাসাদ বলিয়াই ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিলাম। বস্তুতঃ এই প্রস্তর-নির্ম্মিত নিকেতন যে একটা 'ইস্কুল' মাত্র, প্রথম দর্শনে তাহা বুঝা কঠিন। মধ্যে উচ্চ একটি চূড়া—আশে পাশে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চূড়া মাথা উঁচু করিয়া আছে—দেখিয়া মনে হয় যে ফতেপুর শিকরির কোন ইমারৎ যেন দেখিতেছি! ঢুকিয়া দেখি, বাহিরে যতই পদ্য থাকুক না কেন, ভিতরে একেবারে কাঠখোট্টা গদ্যাত্মক ব্যাপার চলিতেছে। এক কোঠায় ক্লে-মডেলিং অর্থাৎ কাদামাটি, প্লাষ্টার ইত্যাদির সাহায্যে বিবিধ নক্সা ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শিখান হইতেছে। আর এক কোঠায় হাফটোন ব্লক তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিখান হইতেছে। দর্শকগণকে এক ছোকরা শিক্ষার্থী ব্লক নির্ম্মাণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছিল। সহসা আমার মনে বিজ্ঞ হইবার বাসনা উদিত হইল—হাফটোন ব্লকে স্ক্রিনের



বরোদা কলাভবন

ব্যবহারের সার্থকতা কি বুঝিবার ইচ্ছা হইল। ছাত্রপ্রবর ভাঙ্গা ইংরেজীতে অমনি অনর্গল বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কিন্তু উহার সাধ্য কি, আমার মাথায় স্ক্রিন ঢুকায়? আমাকে বুঝান ছেলেছোকরার কাজ নহে এই ভাবিয়া ধিক্কার ভরে ঐ কোঠা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। সম্মুখে সিঁড়ী পাইয়া কমলাকান্তের ঢেঁকির মত উচ্চতর লোকে প্রতিভার পরিচয় দিতে চলিলাম। দোতলায় উঠিয়াই দেখি—এক কোঠায় বিবিধ চিত্র ও নক্সার সাহায্যে ইঞ্জিনের গঠন-প্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা যেদিকে চলিয়াছেন সেই দিকেই কলাভবনের ললিত-কলার সন্ধান পাইব বলিয়া মনে ভরসা হইল,—মরুভূমিতে খর্জ্জুরবীথি দেখিয়া মরুচারী পথিক যে ভাবে অভিলষিত উৎস সমন্বিত মরূদ্যানের সন্ধান পায়। সসম্ভ্রমে কিছুটা দূরে থাকিয়া পিছনে পিছনে যাইয়া দেখি, সাহিত্যিকের সহজসিদ্ধ অনুভূতি আমাকে প্রতারণা করে নাই,—চিত্রবিদ্যা শিখাইবার কক্ষগুলি ঐ দিকেই! চারিখানি কক্ষ বহুবিধ চিত্রে পরিপূর্ণ। কয়েকখানি চিত্রে মদিরায়ত নয়নের নমুনা দেখিয়া প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়কে মনে পড়িয়া



গুর্জ্জরীগণের গরবা নৃত্য

হইয়াছে। উহা হাফটোন ব্লকের স্ক্রিন অপেক্ষাও জটিল বলিয়া মনে হওয়াতে হতাশ্বাস হইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় দেখি চলন্ত স্থলকমল তরুকুঞ্জের মত একদল গুজরাটি মহিলা আনন্দোজ্জ্বল মুখে রূপ ও রঙের ঢেউ তুলিতে তুলিতে কলাভবনের দক্ষিণ অংশে চলিয়াছেন। উহাদের সুগঠিত সঞ্চারিণী পল্লবিনী দেহলতাগুলি দেখিয়া বাঙ্গালা দেশের পক্ষ হইতে আমি গুজরাটীগণের সৌভাগ্যে বিধিমুক্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। উহারা গেল। সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় লোটাকম্বল-ত্রিশূলওয়ালা জটাধারী এক সাধুকে মঞ্চে বসাইয়া তাহার ছবি আঁকিতে-ছিলেন। সহসা স্ত্রী এবং পুরুষ জাতীয় এতগুলি দর্শকের যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া সাধুজির মুখের ভাব যেন ধরা-পড়া দাগী আসামীর মত দেখাইতে লাগিল। সহকারী অধ্যক্ষ মহাশয় বক্ষোদেশে সম্মিলনের মার্কা মারা এতগুলি বিভিন্ন প্রদেশীয় বিভিন্ন পোষাকের ভদ্রলোকের সমাগম দেখিয়া চিত্রাঙ্কন থামাইয়া আমাদের দিকে মনোযোগ দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মশায়, কয়েকখানা চিত্রে প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় মার্কা চোখ দেখিলাম; বরোদায় কেমন করিয়া ইহার আমদানী করিলেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি এই কলাভবনে কয়েক বৎসর চিত্রশিক্ষার অধ্যক্ষগিরি করিয়া গিয়াছেন।"

হুররে! "ঋষির নয়ন মিথ্যা না হেরে!" আমাদের ঘরের জিনিস দেখিয়াই ঠিক চিনিয়াছি। নিজের দৃষ্টিশক্তির উপর শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। কলাভবনে কয়েকখানি প্রকৃতই সুন্দর চিত্র দেখিয়াছিলাম। কিন্তু স্মৃতিশক্তির উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস করিয়া কোন নোট না রাখাতে উহাদের কোন বর্ণনাই দিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র মনে আছে যে কলাভবনের চিত্রশালা পরিক্রমার সময়টুকু স্মৃতিতে যেন মধুময় হইয়া আছে। *

---

* ভ্রমসংশোধন—আষাঢ় সংখ্যা, ১৮ পৃষ্ঠা, ১ম স্তম্ভ, ২০শ ছত্র। "প্রখ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র" স্থলে "প্রখ্যাতনামা মহামহোপাধ্যায় ৺কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের পুত্র" পড়িতে হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মণ্ডল

আস্‌ছিলুম বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর কর্ম্মস্থানে। খোকাকে নিয়ে আমি আছি কেবিনের মধ্যে একা,—উনি আছেন বাইরে খোলা ডেকের ওপর!

মায়ের সজল চোখ দুটী, ভাই-বোনদের কচি মলিন মুখগুলি মনে পড়চে! আবার কত দিন—কত কাল পরে তাদের সঙ্গে হবে দেখা! হায় রে মেয়েমানুষের জীবন! কত-বড় বিচ্ছেদের ভগ্নস্তূপে তোরা তোদের মিলনের সৌধখানি গড়ে' তুলিস্!…

শরতের আকাশ জুড়ে নীলিমার আর অন্ত নেই। একটু আগেই খুব খানিকটা বৃষ্টি হ'য়ে গেল! তাতেই যেন সব বিষাদের ভার নামিয়ে দিয়ে আকাশ স্বচ্ছ হাসিতে ভরে' উঠেচে। এম্‌নি বুঝি আমাদেরও! পিছনে যে বেদনাকে ফেলে এসেচি, তারই আভায় সাম্‌নের আনন্দ যেন আর থই পাচ্ছে না!

কেবিনের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম আকাশ, নদী, আর নদীর তীরে-তীরে গ্রামের আবছায়াগুলি! কী মিষ্টিই দেখাচ্ছে ঐ ভিজে সবুজের ওপর ঝক্‌ঝকে রোদের জোলুসটুকু!…

ষ্টীমারের গতি ক্রমশঃ মন্দ হ'য়ে এল। এইখানেই কোথাও থাম্‌চে বোধ হয়! ঐ যে, দূরে ঐ একখানা নৌকো রয়েচে তীরের কাছে, আর ঐ কি-একটা ঝাঁক্‌ড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ক'টি পুরুষ আর মেয়ে। ষ্টীমার সিটি দিতে-দিতে তীরের দিকে পাশ ফির্‌চে।

…ওদের বিদায়ের পালা বুঝি এখনো শেষ হচ্ছে না! আহা, মনে কর্‌তেও চোখ ভিজে ওঠে!

নৌকো করে' একটি ছেলে আর মেয়ে ষ্টীমারে এসে উঠলো। বোধ হয় স্বামী আর স্ত্রী, কে জানে!

বরাবর ওপরে উঠে এল। লোকটি কেবিনের বাইরে দাঁড়াল, মেয়েটি এল কেবিনের মধ্যে।

যেতে হবে অনেকখানি পথ, পথের খোরাক পেয়ে তাই একটু আনন্দ হোল। মেয়েটি সাম্‌নের বেঞ্চিতে বসে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল। সে চাওয়ার মধ্যে কি যেন একটা ছিল, দু'জনের বুঝি-বা একই সঙ্গে মনে হোল, যেন কোথায় কোন্ দিনে আমাদের চেনা হয়েছিল।

সে হঠাৎ হেসে বল্‌লে, এই যে, আপনি? নমস্কার!… এইটি আপনার ছেলে?

আমি তখনো অবাক্ হয়ে তার মুখের পানে চেয়ে!

মেয়েটি আমার ঘুমন্ত খোকার চিবুকটি ধরে একটু নাড়া দিয়ে বল্লে,—ছেলে তো নয়, যেন পদ্মফুল!

তার পর আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বল্‌লে, ও, আপনি বুঝি চিন্‌তেই পারেন নি এখনো? আমি কিন্তু পেরেচি! মোটে ত এক বছরের কথা।

আপনি যাচ্ছিলেন বাপের বাড়ী, আর আমি যাচ্ছিলুম আমার স্বামীর ঘরে! আজ এক বছর পরে আপনি ফির্‌চেন স্বামীর ঘরে, আমি আমার বাপের কাছে! কেমন, পড়‌চে না মনে?…বলে সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

সত্যিই এবার মনে পড়লো।

সেদিন ট্রেনে মেয়েদের গাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ের ভিড় জমেছিল।

কি-একটা ছোট ষ্টেশনে এরা উঠ্‌ল। এরা মানে, মেয়েটী একাই, আর তাকে মেয়ে-কামরায় তুলে দিয়ে গেলেন একটি পুরুষ। ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চান্ন কি ষাটই হবে! ধব্‌ধবে সাদা রঙ, মাথায় একতাড়া কাশ ফুলের মত চক্‌চকে চুলগুলি ছোট-বড় করে’ ছাটা, পরনে আগাগোড়া ধোপদস্ত সাদা কাপড় আর জামা, গলাতে একখানি সাদা কোঁচানো পাক্-দেওয়া চাদর। দেখলে মনে একটা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যেন আপনা হ’তেই জেগে ওঠে। ছেলেবেলাতেই বাবাকে হারিয়েচি, বেশ মনে পড়ে, সেদিন ঐ লোকটিকে দেখে আমার মনে বাপের অভাবের ব্যথাটা নতুন করে’ বিঁধেছিল।

মেয়েটি উঠে আমাদের কাছে বসলো। মনে পড়ে, আমিই তাকে ঠিক আমার পাশে একটু বস্‌বার জায়গা করে দিয়েছিলুম। উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে। একখানি কচি-পাতা রঙের বেণারসী শাড়ী তার গোলাপফুলের মত অঙ্গখানিকে জড়িয়ে রেখেছিল। তার ওপর আবার দেহের এমন কোনো জায়গা ছিল না, যেখানে গহনার বাহুল্য নেই। ঠিক যেন একখানি লক্ষ্মীপ্রতিমা! গাড়ীর মেয়েদের রীতিমত চমক্ লেগে গিয়েছিল। তাদের চোখের কোণে ঈর্ষার রশ্মিটুকু ধরা পড়তে আর বাকী ছিল না। মিথ্যে বল্‌বো না, সে ঈর্ষার কবল থেকে নিজেকেও রক্ষা কর্‌তে পারি নি বোধ হয়!…

ট্রেণ যেম্‌নি একটা ষ্টেশনে থামে, অম্‌নি ভদ্রলোকটী প্লাট্‌ফর্‌মে দাঁড়িয়ে জান্‌লায় মুখ বাড়িয়ে মেয়েটির খোঁজ নিয়ে যান। সে যে কতখানি স্নেহ, কতখানি একাগ্রতা, তা কারো চোখে ধরা পড়্‌তে আর বাকী ছিল না। আর, সেটুকু অনুভব ক’রে মেয়েটি যেন সঙ্কোচে কুঁক্‌ড়ে উঠছিল!

একটি প্রৌঢ়া কিন্তু আর নিজের কৌতূহল দমন কর্‌তে পারলে না। মেয়েটীকে জিজ্ঞেসা কর্‌লে, উনি কে তোমার বাছা?

সকলের মনের ঐ-প্রশ্নটি এম্‌নিভাবে একজনের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হ’য়ে যেতে গাড়ীর সবাই, আর আমি নিজেও, বেশ একটু শান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম।

সে কোনো জবাব দিলে না, চুপ করেই রইল। আর একজন বুড়ী বল্লে, শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের ঘরে যাচ্চো বুঝি? উনি তোমার বাবা তো?

মেয়েটী শুধু একটু ঘাড় নেড়ে বল্লে, না।

না? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে কোথায় যাচ্চো ভাই?

সে বল্লে, শ্বশুরবাড়ী।

প্রৌঢ়া বল্লে,—ও! শ্বশুরবাড়ী যাচ্চো, শ্বশুর নিতে এসেচেন!

কথাটা সে এমনভাবে বল্লে, যাতে সেটা প্রশ্ন বলে একেবারেই মনে হলো না। স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের ভাব তার মধ্যে এত বেশী যে, মনে হলো, মেয়েটী নিজেই তার কাছে এ-কথা স্বীকার করেচে!

মেয়েটা একটু জোরে মাথা নেড়ে ছোট্ট করে বল্লে,—না, উনি আমার স্বামী!

ট্রেণখানা যদি সেই সময় হঠাৎ তার লাইন ছেড়ে কাৎ হয়ে পড়তো, তাহলেও বোধ হয় বুকের ভিতরটা এমন করে উঠতো না!

তার পর সুরু হোল, মেয়েটীকে বাদ দিয়ে অপর সকলের মধ্যে মুখ-চাওয়া-চাওয়ির ধুম! সধবা-বিধবা যুবতী-বৃদ্ধা সকলের মনের মধ্যে ভাবের সেই ঐক্য! তার পর, বিস্ময়ের ভাবটুকু সাম্‌লে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ টিপে হাসাহাসি! আমার কিন্তু হাস্‌বার শক্তি ছিল না, ভিতরের বিপর্য্যয়টুকু কেটে উঠতে বড্ড বেশী সময় লাগছিল। সব মেয়েদের ভেতর সে যে আমারই সমবয়সী!

সহযাত্রীদের সেই টেপা-হাসির জ্বলুনিটুকু মেয়েটীর মুখে কতখানি বিকৃতি এনে দিয়েচে, তাই দেখতে তার মুখের পানে চোখ তুলে দেখি, প্রতিমার মত মেয়েটা বসে’ আছে—ঠিক একটা পাথরে-কাটা প্রতিমারই মত!……

সে আজ এক বছর আগেকার কথা। সাত মাসের খোকাটি আমার তখনো আমাকে পুরোপুরি মায়ের গৌরবে অভিষিক্ত করে নি। আজ আবার ফেরার পথে সেই মেয়েটীরই সঙ্গে দেখা! অসাধারণ তো কিছুই নয়, তবু—তবু—

বুকের মধ্যের যে বিস্ময় নিজেকে ব্যক্ত করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, মেয়েটী আপনা থেকেই তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলে। বল্লে, সেদিনও আমাকে দেখে আপনাদের যেমন আশ্চর্য্য লেগেছিল, আজও আবার তেম্‌নি লাগচে, না? কিন্তু, বাইরের পোষাকটাই তো আমার আসল পরিচয় নয়! সেদিনও ছিল না, আজও নয়।··· ···আমার জীবনের কুড়িটা বছর যা আমি ছিলুম, আজও আমি তাই। মাঝের এই একটা বছরকে মুছে ফেলতে ক'দিনই বা লাগ্‌বে বল তো?

তার কথার মধ্যে না আছে ব্যথা, না আছে কোনো অনুযোগ, এ নি শান্ত সহজ সুরে সে ঐ কথাগুলো বলে গেল। ঠোঁটের কোণে তার একটুক্‌রো অর্থহীন হাসি!

আমি কোনো কথা বল্‌তে পারার আগেই সে আবার বল্লে, সেদিনে আর আজকে আমাদের দু'জনই অনেকখানি বদ্‌লে গেছি, নয়? তোমার চাক্‌রীর মান-মর্য্যাদা বেড়ে গিয়ে উন্নতি হ'য়ে গেল, আর আমি পেয়ে গেলুম, চিরদিনের মতই ছুটি! কথায় বলে না, 'যেমন-তেমন চাক্‌রী ঘি-ভাত!' তা ছাই আমার কপালে ঘি-ভাতও জুট্‌লো না। বল্‌তে-বল্‌তে সে মুখ টিপে-টিপে হাস্‌তে লাগলো।

তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে আমি শুধু অবাক্ হ'য়ে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম।

সে আবার বল্‌তে লাগলো, ছুটী বলে' ছুটী! একেবারে যাকে বলে, সবদিক্ দিয়ে বাঁধনছেঁড়া হ'য়ে আমি বেরিয়ে এসেচি। আমাদের বাড়ীতে দাদা একবার একটা কোকিল পুষেছিল, আমার ওপর ছিল তার খাবার দেবার ভার। একদিন খাবার দিতে গিয়ে দরজাটা আল্‌গা রেখে যেমন একটু অন্যমনস্ক হ'য়েচি, অম্‌নি কোকিলটার আর দেখে কে! একেবারে উধাও হয়ে উড়লো ভাই!···আমার আজকের ছুটীতে সেই কোকিলটার কথাই বারবার মনে পড়চে।

বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বল্লুম, ছি ভাই, বল্‌তে নেই অমন করে'!···স্বামী তো!

একটু যেন শূন্য দৃষ্টিতে সে আমার পানে চেয়ে থেকে পরে বল্লে, হ্যাঁ, স্বামী।···সত্যি বলচে ভাই, বল্‌তে হয় তো সত্যি ক'রেই নেই! অন্ততঃ আমাকে তো নয়ই! তিনি আমার যা করেচেন, তা আর কারও সাধ্যি ছিল না যে! আমার বাবার যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা পড়েছিল তাঁর কাছে। আমার দুটী ভাই,—এই ঋণের বোঝা কেমন করে তাদের মাথায় তুলে দিয়ে যাবেন, তাই ভেবেই বাবার আমার না-ছিল নিদ্রা, না-ছিল আহার! আমার সম্বন্ধে ভাবনার যদিও কুল-কিনারা ছিল না, তবু কুল-কিনারা পাবার চেষ্টা করাও তাঁরা ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন।···এমন সময় পড়লুম তাঁর সুনজরে, তিনি আমার বাবাকে কন্যা আর ঋণ দু'রকমের দায় থেকেই মুক্তি দিলেন। তাই তো অবাক্ হয়ে ভাবি তাঁর কথা, আর মাথাটা নুইয়ে পড়ে তাঁর পা-দুখানির উদ্দেশে!

বল্‌তে-বল্‌তে তার দুটি চোখ ছল্-ছল্ করে' উঠলো।

···রূপনারায়ণের বুকের ওপর বেদনার তরঙ্গ তুলে দিয়ে ষ্টীমারখানা স্বেচ্ছাচারে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে আবার মেঘ ঘোর করে উঠেছে, খুব জোরে একপশলা বৃষ্টি এল বলে! আমি সেই মেঘের পানে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম।

বল্‌বার মত একটা কথাও মুখে আসা দূরে থাক্, মনের ভেতরেও উঁকি মার্‌লে না। দান যে সংসারে কত বেশী নিষ্ঠুর, আর ভক্তি কত করুণ হতে পারে, তারই একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আমার সারা মনটা কুয়াসায় আচ্ছন্ন করে তুল্‌লে।

সে বল্লে, কি দেখচো? মেঘ? বুঝেচি, পাগ্‌লের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে শেষে মেঘের পরে ভর কর্‌তে হোল!

ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, ছি! তাই কি ভাবতে পারি ভাই!

—ভাবো নি? যাক্, বাঁচলুম! সত্যিই কিন্তু আবোল্-তাবোল্ বকিনি পাগলের মত; আমি শুধু বল্‌ছিলুম তোমাকে যে, আমার জীবন দিয়ে এতবড় যে একটা কাজ হ'তে পারে, তা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি! সেই যে গল্পে আছে না, একটী ইঁদুর একদিন এক সিংহকে মুক্তি দিয়েছিল! এ যেন ঠিক তাই! ছেলেরা যা পার্‌লে না, মেয়ে হ'য়ে আমি আমার বাবাকে দিলুম মুক্তি!

জীবনটার এ-ছাড়া যে আর কোনো প্রয়োজন ছিল না, সেটা যেন বুঝতে পারি! তাই তো, ছুটী যখন এল, তখন দু-হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিতেও এতটুকু কিন্তু কর্‌লুম না!

আমি তার মুখের ওপর আমার ব্যথা কাতর চোখদুটী তুলে শুধুই চেয়ে রইলুম। সে তাতে নিবৃত্ত না হয়ে বল্লে, তাও, ছুটী কি শুধু তিনিই দিলেন, আমার মেয়েরাও তার পুরোপুরি ব্যবস্থা করে দিলে যে!

বল্‌লুম, সে আবার কি ভাই?

সে বল্লে, টাকা-কড়ি বিষয়-আশয়ের নাকি অভাব ছিল না তাঁর। জামাইরা তাঁর দেহের সৎকার করে এসে তাঁর আত্মার সদ্গতি কর্‌তে বস্‌লেন। একখানা কাগজে কি-সব লেখাপড়া হোল, যাতে করে স্বামীর সম্পত্তির মালিক হলেন তাঁর নাতিরা, আর আমি যদি সচ্চরিত্র হয়ে তাঁর বাড়ীতেই থাকি, তাহলে আমার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা হবে।

—বল কি গো? তোমার স্বামী মরার পর হোল উইল্?

—কেন হবে না, বা-রে! তাঁর মনের ইচ্ছেটা কি এই ছাড়া আর-কিছু থাক্‌তে পারে? বড়-জামাই আমাকে সই কর্‌তে বল্লে, সই করে' দিলুম।

—সই দিলে? বল কি? নিজের পায়ে এম্‌নি করে—

—কুড়ুল মার্‌লুম বল্‌চো? নইলে যে আমার চাক্‌রীর জের মেটে না ভাই! নইলে ছুটীটাকে ছুটী বলেই আমি নিতে পার্‌তুম না যে!

আমি হতাশ কণ্ঠে শুধু বললুম, এ কিন্তু অন্যায়—ভয়ানক অন্যায়!

সে শুধু বল্লে, তা হবে। দাদা বল্‌ছিলেন, ঐ নিয়ে নালিশও না-কি চল্‌বে! কিন্তু আমি ভাবি, ঐ নালিশ দিয়েই সব নালিশের বিচার হ'য়ে যাবে না-কি?

একটা খুব ক্ষীণ হাসির শিখা তার পাতলা গোলাপী ঠোঁটদুখানা পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

আফগানিস্থান

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আফগানিস্থানের নতুন যুগ সুরু হয় ভারতবর্ষে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। সে যুগ আফগানিস্থানের পক্ষে কল্যাণের যুগ নয়। কিন্তু তা হ'লেও আফগানদের ভিতরে আজ যে জাগরণ ও জাতীয়তার সাড়া তাকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টায় ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছে, তার সত্যিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সময়েই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল রুশ-ভীতি। ভারতবর্ষের উপরে রাশিয়ার যে একটা প্রকাণ্ড লোভ আছে—এ কথা ইংরেজেরা প্রতিনিয়ত মনে ক'রে এসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এ আশঙ্কাও করেছেন যে, এই লোভ মিটাবার জন্য রাশিয়া গ্রহণ কর্‌বে আফগানিস্থানের সাহায্য। আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে নিয়েই তারা এসে হানা দেবে ভারতবর্ষের উপরে। এই ভয়ের জন্য ইংরেজেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশে কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন নি এবং সেইজন্যই আফগানিস্থানের রাজনীতিও ইংরেজ রাজনৈতিকেরা ক'রে তুল্‌তে চেয়েছিলেন তাঁদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপার। এর ফলে আফগানিস্থানের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হ'য়ে উঠেছিল, আফগানি-



অক্সাস নদীতীরে গ্রাম

স্থানে অন্তর্বিপ্লবও বার বার দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও আফগানিস্থানের জাতীয়তা-বোধকে সত্যিকারের রূপ নিয়ে দানা বেঁধে উঠ্‌বার সুযোগও দিয়েছে আফগানিস্থানের সম্বন্ধে বিদেশীদের এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলি। আফগানিস্থানের ইতিহাসের ভিতর দিয়েই কথাটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে জার আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়ানের ভিতর সন্ধি হয় টিলসিটে (Tilsit)। পারস্য এবং আফগানিস্থানের ভিতর দিয়ে ফরাসী ও রুশ-সৈন্যের ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় ইংরেজেরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। সুতরাং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান এবং পারস্য—এই উভয় স্থানেই ব্রিটিশ রাজদূতেরা গিয়ে হাজির হ'লেন পরস্পরের সাহায্যলাভের জন্য মৈত্রী স্থাপনের দাবী নিয়ে। কিন্তু সে সময়ে আফগানিস্থানের ভিতরে চলেছিল ভীষণ অন্তর্বিপ্লব। মামুদশাকে পরাজিত ক'রে শাহ্ সুজা রাজা হ'লেন বটে, কিন্তু বেশী দিন সিংহাসনের অধিকার তিনি বজায় রাখ্‌তে পার্‌লেননা। তাঁকে পরাজিত ক'রে মামুদ শা আবার রাজদণ্ড তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। শাহ সুজা কোনোরকমে প্রাণ বাঁচালেন পালিয়ে। তারপর তিনি এসে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের কাছে। শাহ সুজা সিংহাসনে থাক্‌লে হয়তো আফগান ও ব্রিটিশ সন্ধি একটা পাকা বনিয়াদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌ত। কিন্তু এই রকমে সে সম্ভাবনা তাসের প্রাসাদের মতোই অকস্মাৎ ভেঙে পড়্‌ল।

মামুদ শার সিংহাসন এবারেও স্থায়ী হ'লো না। সিংহাসনে উঠে' তিনি কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হ'য়ে উজির পেইন্দাহ খাঁর পুত্র ফতে খাঁকে হত্যা কর্‌লেন। আর তারই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ফতে খাঁর পুত্র দোস্ত মহম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে তুলে' ধর্‌লেন বিদ্রোহের পতাকা। রাজ্যের ভিতরে এই বংশটির প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। দোস্ত মহম্মদের মগজে বুদ্ধিও ছিল প্রচুর। সুতরাং মামুদ শাকে পরাজিত ক'রে তাঁর হাত থেকে কাবুল কেড়ে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হ'লো না। রাজপুত্রদের কাউকে সাম্‌নে শিখণ্ডীর মতো দাঁড় না করিয়ে এইবার দোস্ত মহম্মদ নিজেই কাবুলের সিংহাসন অধিকার ক'রে বস্‌লেন।



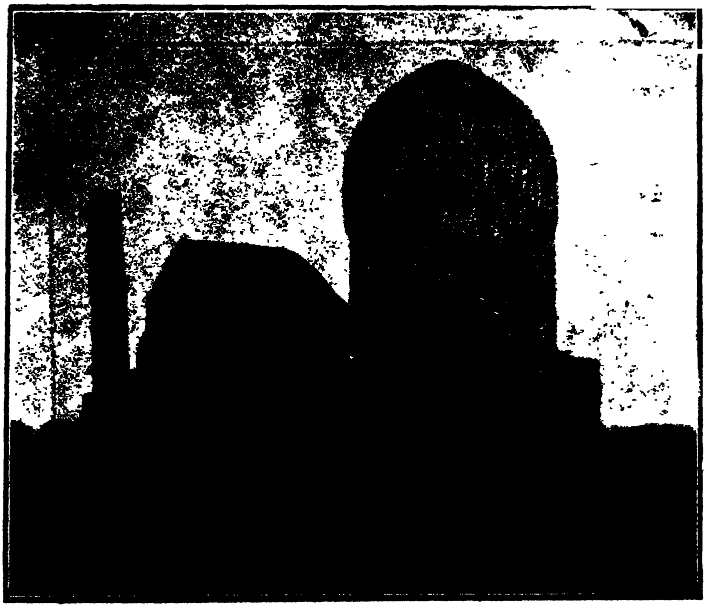
পারস্য-আফগান সীমান্তে ধর্মোৎসব

এই দোস্ত মহম্মদের রাজত্বকালেই আফগানিস্থানে প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যের অভিযান সুরু হয়। দোস্ত মহম্মদ যে গোড়া হ'তেই ব্রিটিশ বিদ্বেষী ছিলেন তা নয়, বরং ইংরেজদের সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় ক'রে তোল্‌বার দিকেই তাঁর ছিল সত্যিকারের ঝোঁক। কিন্তু এই মৈত্রীর বন্ধন

মেনে নেবার গোড়াকার কথা ছিল তাঁর—আফগানিস্থানকে পেশোয়ার-অধিকারে সাহায্য কর্‌তে হ'বে। পেশোয়ার তখন রণজিৎসিংহের করায়ত্ত। রণজিৎ সিং ইংরেজদের শক্তিমান বন্ধু। সুতরাং দোস্ত মহম্মদকে খুশী কর্‌বার জন্য তাঁকে শত্রু ক'রে তুল্‌তে ইংরেজেরা রাজি হ'লেন না। আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় এইখানেই প্রথম ঘা পড়্‌ল।

কিন্তু তবু হয়তো সন্ধি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার্‌ত যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পারস্য ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তৎপরতার সঙ্গে আফগানিস্থানকে সাহায্য কর্‌তে স্বীকৃত হতেন। কিন্তু সেদিকেও ইংরেজদের তরফ হ'তে তৎপরতার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে রাশিয়ার সেনাপতির অধীনে তখন পারস্য সৈন্য এসে একেবারে হীরাটে হানা দিয়েছে। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজদের জবাবের প্রতীক্ষা ক'রে ক'রে অবশেষে হতাশ হ'য়ে রাশিয়ার রাজদূতকেই গ্রহণ কর্‌লেন।

রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্থানের সন্ধির সংবাদে ইংরেজদের মাথার টনক ন'ড়ে উঠ্‌ল। ভারতবর্ষের মসনদে তখন লর্ড অকল্যাণ্ড। ক্রুদ্ধ হ'য়ে তিনি স্থির কর্‌লেন এই অপরাধের জন্য দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁর জায়গায় বসাতে হ'বে রাজ্যচ্যুত শাহ সুজাকে। একটি স্বাধীন জাতির সিংহাসনের ব্যাপার নিয়ে এ-ভাবে জোর-জবরদস্তি চালাবার অধিকার অন্য জাতির যে নেই—ঝোঁকের মাথায় লর্ড অকল্যাণ্ড ভুলে' গেলেন সে কথাটা। সুতরাং তিনি রণজিৎ সিংকে অনুরোধ কর্‌লেন—তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যের পথ ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু রণজিৎসিংহের বিবেক-বুদ্ধি তাতে সায় দিল না। সুতরাং গবর্ণর জেনারেলের সে প্রস্তাব তাঁর কাছে প্রত্যাখ্যান লাভ করল। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ডের জেদ তখন চ'ড়ে উঠেছে। তিনি আদেশ দিলেন—পাঞ্জাব যদি পথ দিতে রাজি না হয়, সিন্ধুদেশের ভিতর দিয়ে ইংরেজ-সৈন্য পথ ক'রে নিয়ে আফগানিস্থানে প্রবেশ কর্‌বে।



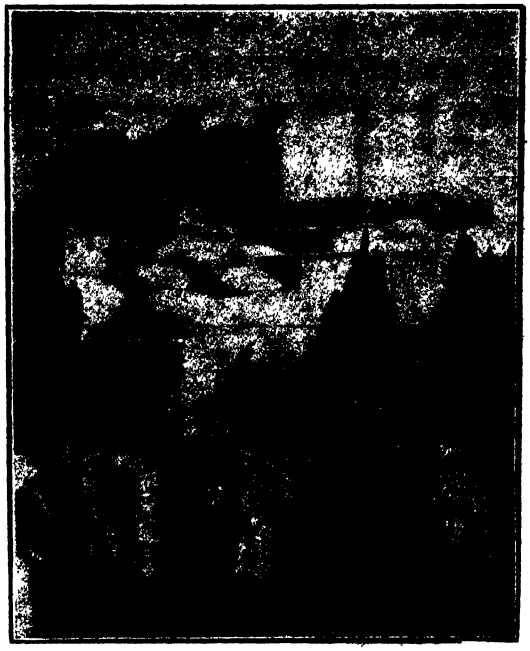
গুর আমীর

লর্ড অকল্যাণ্ডের এ নীতি যে ন্যায়-সঙ্গত নয়—তখনকার দিনের নিরপেক্ষ ইংরেজ রাজনীতিকদের অনেকেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা এ নিয়ে প্রতিবাদের সুর কড়া ক'রে তুল্‌তেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড সে কড়া সুরে আমল না দিয়েই আফ-গানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে বস্‌লেন। ব্রিটিশ-সৈন্য প্রথমে কান্দাহার, তারপর গজনী তারপর কাবুল দখল ক'রে নিলে। ইংরেজরা দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে বন্দী কর্‌লেন এবং তাঁর স্থানে শাহ সুজাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লেন আফগানিস্থানের সিংহাসনে।

এই বিজয়ের প্রথম ধাক্কাটা অবশ্য খুব চমকপ্রদ। এবং সে ধাক্কায় সারা ইংল্যাণ্ড স্পর্দ্ধায়, গর্ব্বে, আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়েও উঠেছিল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সাধারণতঃ যা হ'য়ে থাকে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। একটা জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্ব্বল অনভীপ্সিত একজন লোককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লে তার যা ফল হয়, এক্ষেত্রেও তাই

হ'লো। একদিন অকস্মাৎ আফগানদের ভিতরে জ্ব'লে উঠ্‌ল বিপ্লব ও প্রতিহিংসার আগুন। তারা ইংরেজদের প্রতিনিধি স্যার আলেকজাণ্ডার বার্ণস্‌কে তাঁর বাড়ী থেকে টেনে এনে নৃশংসভাবে হত্যা কর্‌ল। প্রত্যেকটি ইংরেজের জীবন বিপন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল আফগানিস্থানে। তাদের রসদ গেল বন্ধ হ'য়ে। ব্যাপার দেখে স্যার উইলিয়ম ম্যাক্‌ন্যাটেন প্রস্তাব কর্‌লেন—ইংরেজ সৈন্যদের দলবল নিয়ে যদি নিরাপদে ফিরে যেতে দেওয়া হয় তবে দোস্ত মহম্মদকে ছেড়ে দেওয়া হ'বে এবং শাহ সুজাকে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে আবার সঙ্গে ক'রে ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা হ'বে। প্রস্তাবটা পাকা হ'তে পার্‌ল না, তার আগেই গুপ্তঘাতকের হাতে ম্যাক্‌ন্যাটেন নিহত হ'লেন।

কিন্তু ফেরা ছাড়া ইংরেজ সৈন্যদের আর গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে ১৫০০০ ব্রিটিশ-সৈন্য কাবুল পরিত্যাগ ক'রে ভারতবর্ষের পথ ধর্‌ল। এই প্রত্যাবর্ত্তনের মত ভয়াবহ ব্যাপার ইতিহাসের পাতায় আর কখনো লেখা পড়েছে কিনা সন্দেহ। পার্ব্বত্য-পথে শীতে, অনাহারে, উপজাতিদের দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ১৫ হাজার ব্রিটিশ-সৈন্য নিঃশেষে ধ্বংস হ'য়ে গেল। কেবল তাদের দুর্ভাগ্যের কথাটা জগতের সাম্‌নে প্রচার কর্‌বার জন্য জালালাবাদে এসে পৌছালেন রক্তাক্ত দেহে, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় একজনমাত্র লোক—ডাঃ ব্রাইডন।



হীরাটের কেল্লা



কান্দাহার নগর-প্রাচীর

এই অত্যাচারের এবং অন্যায়ের যে প্রতিশোধ ইংরেজেরা নিয়েছিলেন, নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে তার পরিমাণ এর চেয়ে যে খুব বেশী কম ছিল তা নয়। জালালাবাদ, হিরাট ও গজনীর ইংরেজ সেনাপতিরা কাবুল অধিকারের জন্য শীঘ্রই যে

পণ করলেন। কাবুল অধিকৃত হ'তেও দেরী হ'লো না। তারপর ক্ষিপ্ত সেনাদল কাবুলের বাজার হাস্‌তে হাস্‌তে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রে নিলে। গজনীর মামুদের কবর ভেঙে তার ভিতর থেকে তার চন্দনকাঠের দরজাটা তারা তুলে' নিয়ে এলো। ইংরেজেরা বলেন—এ দরজাটা সোমনাথের মন্দির চূর্ণ ক'রে গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ হ'তে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই রকমে দীর্ঘদিনের একটা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হ'লো। কিন্তু তাঁদের সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা যে ভারতবর্ষের অতদিনের পুরানো একটা অপমানের প্রতিশোধ নেওয়াই ছিল না বলাই বাহুল্য। তা তাঁরাও জান্‌তেন, ভারতবর্ষও জানে। তাছাড়া এর ভিতরে সব চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যে দরজাটা নিয়ে এত হৈ-চৈ করা হ'লো সোমনাথের মন্দিরের দরজার সঙ্গে তার কোনো কালে কোনো রকমের সম্বন্ধ ছিল না।

কাবুল জয় করলেও ইংরেজেরা বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, যাকে খুশী তাকে এনেই আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসালে চলবে না—যার উপরে আফগানদের বিশ্বাস নেই তার হাতে রাজ্যভার ন্যস্ত করলে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা আফগানিস্থানের ব্যাপারে মাথা ঘামানো সুরু করেছেন তা সফল হবার সম্ভাবনা নেই। ইংরেজেরা গ'ড়ে তু'তে চেষ্টা করছিলেন আফগানিস্থানে এমন একটি মিত্র-রাজ্য যার সাহায্যে রাশিয়ার ভারত আক্রমণের স্পর্দ্ধাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। তাই তাঁদের চেষ্টা ছিল সেই রকমের একজন আমীরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা যে ইংরেজদের হাতের পুতুলমাত্র। কিন্তু পুতুল আফগান জাতের রাজা হ'তে পারে না, এ ভুল তখনকার মত যে ইংরেজদের ভেঙেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তাই দোস্ত মহম্মদকে মুক্তি দিয়ে তাঁরা তাঁর হাতেই আফগানিস্থানের রাজ্যভার ছেড়ে দিলেন; ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ঘোষণাও করা হ'লো যে, ভবিষ্যতে আফগানেরাই তাদের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করবে, এবং আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশের জাতিসমূহ ও গিরি-সঙ্কট সমূহ রক্ষিত হ'বে ব্রিটিশ সৈন্যদের দ্বারা।



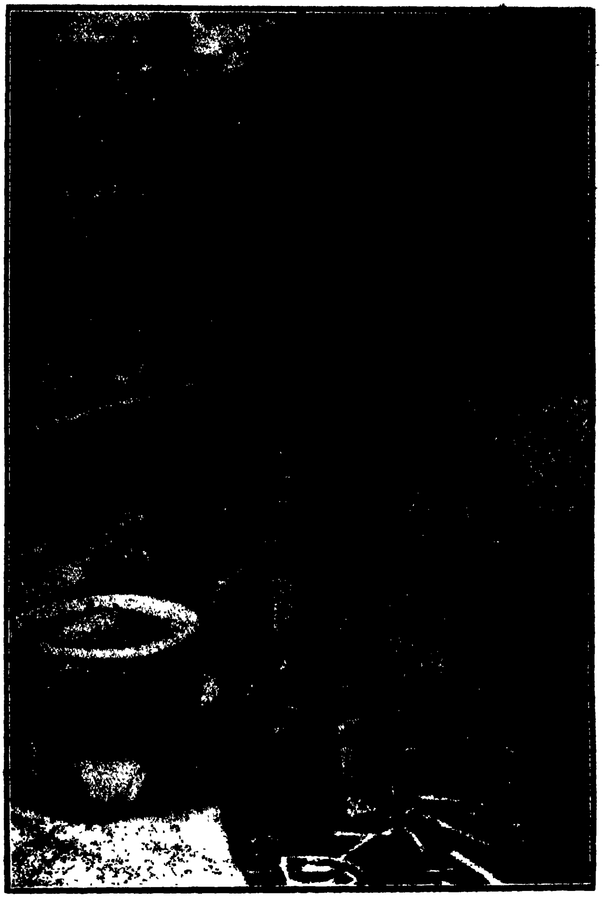
আফগান বারোয়ারীতলা

এর পর কয়েকটি বৎসর আফগানিস্থানের বেশ শান্ত ভাবেই কেটে গেল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে দোস্ত মহম্মদ পরলোকের পথে যাত্রা করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরেই সুরু

হ'লো আফগানিস্থানে আবার অন্তর্বিপ্লবের উৎকট অভিনয়। দোস্ত মহম্মদের ছেলে ছিল অনেকগুলি। কিন্তু শের-আলিই ছিলেন তাঁর সব চেয়ে প্রিয় পুত্র। তাই জ্যেষ্ঠ না হ'লেও পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসন অধিকার ক'রে বস্‌লেন। রাজ্যলাভের পর ভ্রাতৃহত্যার যে সনাতন পদ্ধতি অনুসৃত হ'য়ে এসেছে আফগানিস্থানে এতদিন ধ'রে, শের-আলির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। কয়েকটি ভাই-এর রক্তে তাঁর রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থাও কলঙ্কিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু এই রক্তপাতের দ্বারাও তিনি তাঁর সিংহাসন নিরাপদ ক'রে তুল্‌তে পার্‌লেন না। দোস্ত মহম্মদের জ্যেষ্ঠ-পুত্র আফজল খাঁ কান্দাহার থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে' ধর্‌লেন। তাঁর পুত্র আবদার রহমন ছিলেন যেমন বীর তেমনি সাহসী সুনিপুণ রাজনৈতিক। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে শের আলিকে পরাজিত ক'রে তিনি পিতা আফজল খাঁকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপন কর্‌লেন। কিন্তু আফজল খাঁ জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। পরের বৎসরই তিনি বেরিয়ে পড়্‌লেন পরলোকের পথ পাড়ি দিবার নিরুদ্দেশ যাত্রায়। তার পরেই আবার সুরু হ'লো অন্তর্বিপ্লব। শেরআলি আবার কাবুল ছিনিয়ে নিলেন আফজল খাঁর পুত্রদের হাত থেকে এবং পরাজিত আবদার রহমন তখনকার মতো গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন তাসকান্দে রুষ-সরকারের দরবারে।

শের আলি দুর্ব্বল রাজা ছিলেন না, তাঁর ভিতরে সত্যিকারের শক্তির ছাপ ছিল। তাই তাঁর অধীনে আফগান জাতি ধীরে ধীরে সংযত হ'য়ে শাসনের বন্ধন স্বীকার ক'রে নিলে।

আফগানিস্থানের ভিতরে যখন অন্তর্বিপ্লবের মেঘ ঘোরালো হ'য়ে উঠেছে, তখনই চল্‌ছিল এশিয়ায় রাশিয়ার রাজ্য বিস্তারের পালা। খিবা, বোখারা, তাস্‌কান্দ, সমারকন্দ প্রভৃতি স্থানগুলো ধীরে ধীরে রাশিয়ার শাসনের আওতার ভিতরে এসে পড়্‌ল। রুশ-রাজ্যের এই বিস্তারে ইংরেজেরা হ'য়ে উঠ্‌লেন ভীত ও উচ্চকিত। সুতরাং তাঁরা আফগানিস্থানের সঙ্গে সন্ধির সূত্রটা জোরালো ক'রে তুল্‌বার জন্য অধীর হ'য়ে পড়্‌লেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারেল শের আলিকে উপহার দিলেন ৯ লক্ষ টাকা এবং অনেকগুলো ভালো ভালো হাতিয়ার। পরের বৎসর শের আলি নিমন্ত্রিত হ'লেন আম্বালায় বড়লাটের সঙ্গে দেখা ক'রে বন্ধুত্বের বাঁধনটা দৃঢ় ক'রে তোল্‌বার জন্য।



আফগান-যুবতী গম ভাঙ্গিতেছে

ভারতবর্ষের বড়লাট তখন লর্ড মেয়ো। শের আলিকে আপ্যায়িত কর্‌বার জন্য এমন বিরাট আয়োজন করা হ'লো যে, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সম্রাটকেও সেভাবে অভ্যর্থনা কর্‌লে তা তাঁর পক্ষে অনুপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হ'তো না। কিন্তু অভ্যর্থনা যেমনই হোক্, সন্ধির ব্যবস্থা খুব বেশী দূর

অগ্রসর হ'তে পার্‌ল না। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের কাছে শের আলির দাবী ছিল—বার্ষিক একটা অর্থের তোড়া, প্রয়োজন হ'লে বা তাঁর সিংহাসন বিপন্ন হ'লে সৈন্য ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য এবং তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব খাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাকে তার উত্তরাধিকারী ব'লে মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি। লর্ড মেয়ো সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'রে এ-সব দাবী স্বীকার ক'রে নিলেন না বটে, কিন্তু আমীরকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দানের মৌখিক আশ্বাস দিতেও তিনি ইতস্ততঃ কর্‌লেন না। লর্ড মেয়োর পর ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড এলো লর্ড নর্থব্রুকের হাতে। তাঁর সময়েই শের আলি ঘোষণা

সম্ভবতঃ ইয়াকুবের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা আমীরের উপরে একটা সন্দেহও জাগিয়ে তুলেছিল ইংরেজদের মনে। শের আলি যে-কোনো সময়ে রাশিয়ার পক্ষ গ্রহণ কর্‌তে পারে—এমনি ধরণের একটা ধারণা তাঁরা ক'রে বস্‌লেন। অথচ এ ধারণার সত্যিকারের কোনো ভিত্তি ছিল না। লর্ড সেলিসবেরী তখন ভারত-সচিব। সুতরাং তাঁর মারফৎ বিলেত থেকে হুকুম এলো যে, অতঃপর কাবুলে একটি ব্রিটিশ রেসিডেন্স রাখ্‌তে হ'বে। লর্ড নর্থব্রুক জান্‌তেন যে, এ ধারণা ভিত্তিহীন। তাই তিনি তার প্রতিবাদ ক'রে পাঠালেন। কিন্তু সে প্রতিবাদ টিক্‌ল না। লর্ড নর্থব্রুক



অক্সাস নদী সন্নিহিত প্রদেশের তরুণদল

কর্‌লেন, তাঁর মৃত্যুর পর আফগানিস্থানের মসনদ অধিকার কর্‌বেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লা, জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবকে অতিক্রম ক'রে। শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকুব খাঁকে কারা-প্রাচীরের ভিতরে অবরুদ্ধও করা হ'লো। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপূত ছিল না। তাঁরা এর প্রতিবাদ ক'রে এক তীব্র পত্র লিখ্‌লেন শের আলিকে। সুতরাং ইংরেজের প্রতি যে শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল আমীরের মনে আম্বালায় তাঁর অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে, সে শ্রদ্ধাও ঝিমিয়ে গেল।

পদত্যাগ কর্‌লেন। ঠিক এই কারণেই তিনি পদত্যাগ ক'রেছিলেন কি না সে কথা জোর ক'রে বলা যায় না—তবে তাঁর পদত্যাগের ভিতরে এ কারণটাও থাকা একেবারে অসম্ভব ব'লে মনে হয় না।

তার পরে এলেন ভারতবর্ষের বড়লাটের দায়িত্ব নিয়ে লর্ড লিটন। তিনি কাবুলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণী শোনাবার অছিলা নিয়ে আফগানিস্থানে ব্রিটিশ মিশন পাঠাবার একটা প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন শের আলির কাছে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো না।

শের আলির এই আপত্তির ভিতরে লর্ড লিটন পেলেন গর্ব্ব ও ব্রিটিশ শক্তিকে অবহেলা করার পরিচয়। কিন্তু রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টি যাঁদের আছে তাঁরা পেয়েছিলেন অন্য রকমের জিনিস। তাঁরা দেখেছিলেন—এ মিশন গ্রহণ করবার শের আলির উপায়ই ছিল না। কারণ ব্রিটিশ মিশন গ্রহণ করতে হ'লেই রাশিয়ার মিশন গ্রহণ না করবার শক্তিও তাঁর থাক্‌বে না। তা ছাড়া তার চেয়েও বড় কথা—যে প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করেছেন আফগান জাতিদের ভিতর সাহস, ধৈর্য্য এবং বিদেশী শক্তি কাছে মাথা নত ক'রে না-চলার মনোবৃত্তি দেখিয়ে, এ মিশন গ্রহণ করলে তাও নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। কারণ আফগান জাতির একটা বৈশিষ্ট্যই এই যে, রাজ্যের ভিতর বিদেশীদের প্রভাব তাদের কাছে অসহ্য এবং যখনই তাদের কোনো রাজা বা সর্দ্দার এই প্রভাব মেনে চলার প্রবৃত্তি দেখায়, জাতির বিশ্বাসও তখনই সে হারিয়ে ফেলে। ব্রিটিশ মিশন গ্রহণের দ্বারা জাতির মনের উপরে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা, তাও নষ্ট করতে শের আলি প্রস্তুত ছিলেন না।

ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের কেহ কেহ লর্ড লিটনকে শের আলির উদ্দেশ্যটা বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদের সফল হয়নি। ঠিক এই সময়টাতেই



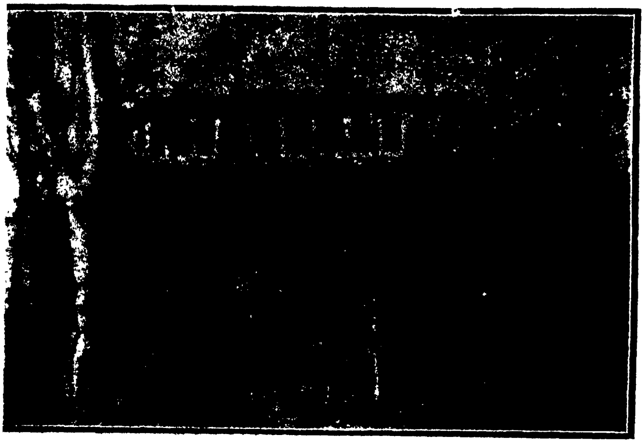
চুঙ্গী শুল্ক আদায়ের স্থান

খেলাতের খাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা সন্ধিও হ'য়ে গেল। এই সন্ধিতে ইংরেজেরা কোয়েটাতে সৈন্য রাখ্‌বার অধিকার লাভ করলেন। কোয়েটাতে সৈন্য রাখার ব্যবস্থায় আমীরের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল বিপদের আশঙ্কায়। এ ব্যবস্থার ভিতরে আফগানিস্থানের সত্যিকারের বিপদের



তূলার ক্ষেত্রে আমুদরিয়া নদী হইতে জল সেচন

সম্ভাবনাও ছিল; কারণ এখানকার ঘাটিটা ইংরেজ সৈন্য অধিকার ক'রে ব'সে থাক্‌লে বোলান গিরি-সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যে কোনো সুযোগে সৈন্য পরিচালনা ক'রে একেবারে কান্দাহারের ভিতরে এসে পড়া কিছু কঠিন ব্যাপার নয়।



আমীরের গ্রীষ্মাবাস—ইন্দিকী প্রাসাদ

সুতরাং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আবার সুরু হ'লো আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধির আলোচনা। যুক্তির দ্বারা ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির মন হ'তে মিথ্যা ধারণা দূর কর্‌বার উদ্দেশ্য নিয়ে পেশোয়ারে এলেন শের আলির উজির, সৈয়দ নুর-মহম্মদ। রাশিয়ার প্রতি তাঁদের যে কিছুমাত্র পক্ষপাতিত্ব নেই, বরং ইংরেজদের সাহায্য ও সহানুভূতিই যে তাঁদের কাম্য, অনেক রকমে সেই কথাটাই তিনি বোঝাতে চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু লর্ড লিটন তাঁর কোনো কথাতেই কর্ণপাত কর্‌লেন না। তিনি শুধু বল্‌লেন—যতক্ষণ না আফগানিস্থানে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি গ'ড়ে তোল্‌বার প্রস্তাবে তাঁরা স্বীকৃত হ'ন, ততক্ষণ আর কোনো বিষয় নিয়েই তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চল্‌তে পারে না। সুতরাং সন্ধির আলোচনার সেইখানেই যবনিকা প'ড়ে গেল।



জেলালাবাদে আব্দর রহমানের প্রাসাদ

এর পর আফগানিস্থানের আমীরের রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে' পড়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বস্তুতঃ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে দেখা গেল যে, আমীর শের আলি রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন এবং রুশ-মিশনকেও গ্রহণ করেছেন। ইংরেজেরা এর ভিতরে আফগানিস্থানের রুশপ্রীতিরই পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু আফগানেরা বলেন যে, এটা একান্তভাবেই জোর-জবরদস্তির ব্যাপার। রুশ সেনাপতি ষ্টোলেটফ হঠাৎ কাবুলে এসে রুশ-সৈন্যের সাহায্যে আবদর রহমনকে সিংহাসনে বসাবার ভয় দেখিয়েই শের আলিকে রুশ-মিশন গ্রহণ কর্‌তে বাধ্য করেছিলেন এবং আবদার রহমনকে ভয় কর্‌বার যে তাঁর যথেষ্ট কারণ ছিল তা, আবদার রহমনের শক্তি, বীরত্ব ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনি নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার কর্‌বেন।

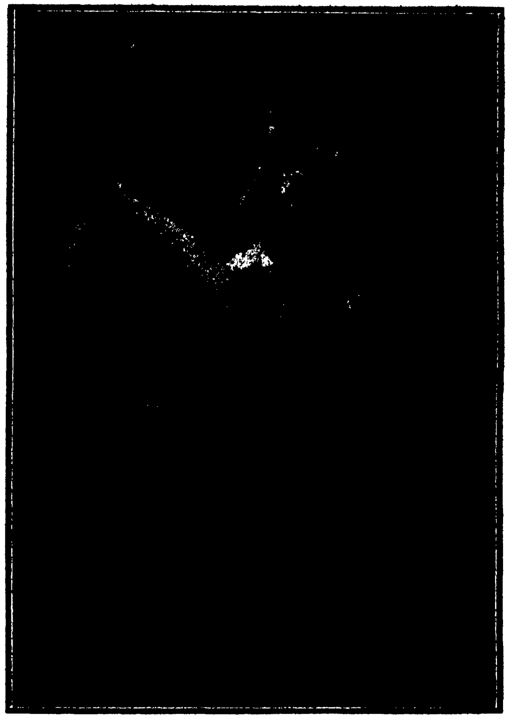
কিন্তু কারণ যাই হোক্‌, রুশ-মিশনকে গ্রহণ কর্‌বার সংবাদ শুনেই লর্ড লিটন দাবী ক'রে বস্‌লেন যে, ব্রিটিশ-মিশনকেও আফগানিস্থানের গ্রহণ কর্‌তে হ'বে এবং কেবল তাই নয়, ইংরেজদের অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো জাতির সঙ্গে আফগানেরা আর কখনো সন্ধিও কর্‌তে পার্‌বেন না। তা ছাড়া ব্রিটিশ রেসিডেন্টকেও স্থায়ীভাবে তাঁদের রাজ্যের ভিতরে আস্তানা গাড়্‌বার অধিকারও দিতে হ'বে। সঙ্গেসঙ্গেই মেজর ক্যাভেগনারী ব্রিটিশ-মিশন নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন পেশোয়ার থেকে কাবুলের অভিমুখে। কিন্তু তাঁদের মিশন কাবুলে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌ল

না। পথে আফগান-সরকারের লোক তাঁদের বাধা দিয়ে জানিয়ে দিলেন—কাবুলের অনুমতি ছাড়া মিশনকে পথ ছেড়ে দেবার অধিকার তাঁদের নেই। সুতরাং মেজর ক্যাভেগ-নারীকে পথ হ'তেই আবার পেশোয়ারের অভিমুখে ফিরে' আস্‌তে হ'লো। ব্যাপারটা যে আফগানিস্থানের পক্ষে একটা বড় রকমের অবমৃশ্যকারিতা হ'য়েছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সময়টাতেই শের আলির প্রিয় পুত্র আবদুল্লা মারা গিয়েছিলেন। ছেলেটাকে আমীর অসাধারণ ভালো



আমীরের দেহরক্ষী সৈন্যদল

বাস্‌তেন। তার সিংহাসন নিরাপদ কর্‌বার জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াকুবকে কারারুদ্ধ কর্‌তেও তিনি দ্বিধা করেন নি। সুতরাং শের আলির মনের অবস্থা তখন কি রকমের ছিল তা বোঝা কঠিন নয়। বস্তুতঃ কোনো কাজ বিচার ক'রে কর্‌বার শক্তিই তখন তাঁর ছিল না। ব্রিটিশ-মিশন সম্বন্ধে তাঁর নির্লিপ্ততার জন্য দায়ী হয়তো তাঁর তখনকার সেই শোক-বিহ্বল মনের অবস্থাই। কিন্তু কারণ যাই হোক্, এ অপমান লর্ড লিটন বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌লেন না। তিনি আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার সম্মতি চেয়ে পাঠালেন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কাছে। অনুমতি পেতেও দেরী হ'লো না। কিন্তু যুদ্ধ-ঘোষণার পূর্ব্বে আফগানিস্থানকে এই অনুগ্রহ দেখানো হ'লো যে—২০শে নবেম্বরের ভিতর ব্রিটিশ দাবীগুলো যদি সে মেনে নেয়, এবং কেন ব্রিটিশ-মিশন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে তার যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখতে পারে, তবেই এই যুদ্ধ বন্ধ করা হ'বে। সঙ্গে সঙ্গে



আফগান আমীর হিজ হাইনেস হবিবুল্লা খান

এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হ'লো—২০শে নবেম্বর জবাব না পেলে ২১শে নবেম্বর ইংরেজদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠ্‌বে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে।

২০শে নবেম্বরের ভিতর কোনো জবাব এলো না—এলো ৩০শে নবেম্বর। তাতে ব্রিটিশ-মিশন গ্রহণ কর্‌বার অভিপ্রায় জানিয়েছেন শের আলি ইংরেজকে, কিন্তু আগের বারের মিশন গ্রহণ না কর্‌বার কোনো হেতুই দেখানো

হয়নি। জবাব এলো বটে, কিন্তু তার আগেই আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে লর্ড লিটন যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ সুরু হ'য়ে গেল। এই যুদ্ধ নিয়ে ইংরেজ রাজনৈতিকদের মহলেও প্রচণ্ড মতদ্বৈধের সৃষ্টি হ'য়েছিল। গ্লাডষ্টোন প্রমুখ রাজনীতি-বিশারদেরা তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে প্রতিবাদে তখনকার দিনের ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারেরা কর্ণপাত করেন নি।

তিন দিক থেকে ইংরেজেরা আফগানিস্থানকে আক্রমণ করেন। মেজর জেনারেল রবার্ট তাঁর সৈন্য-বাহিনী পরিচালনা কর্‌লেন কুরাম উপত্যকার অভিমুখে, খাইবার গিরি-সঙ্কটের পথে স্যার স্যামুয়েল ব্রাউন অগ্রসর হ'লেন জালালাবাদের



আলী মসজিদ দুর্গ

দিকে, জেনারেল ষ্টুয়ার্টের সৈন্য-বাহিনী বোলান গিরি-সঙ্কট ভেদ ক'রে ছুটে চল্‌ল কান্দাহার অধিকার কর্‌বার জন্য।

তিন দিন থেকে আক্রমণের এই বিপুল বন্যাকে রোধ কর্‌বার শক্তি আফগানিস্থানের ছিল না। রাশিয়ার কাছে তাঁদের অঙ্গীকার অনুসারে সাহায্য প্রার্থনা করা হ'লো। কিন্তু রুশ-সেনাপতি কাউফম্যান সে সাহায্য প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর্‌লেন। একা দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্‌বার সাহসও তখন আর ছিল না শের আলির মনে। তাই তিনি আর কোনো উপায় খুঁজে' না পেয়ে পুত্র ইয়াকুব খাঁকে কারামুক্ত ক'রে দিলেন এবং তারপরেই রুশ-তুর্কিস্থানের অভিমুখে পলায়ন কর্‌লেন। এর কিছুদিন পরেই বাল্‌খে শোক-দুঃখের আঘাতে বিহ্বল জর্জ্জর শের আলির আত্মা তাঁর দেহের মায়া কাটিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা কর্‌ল।

শের আলির মৃত্যুর পর ইংরেজেরা ইয়াকুব খাঁকেই আমীর ব'লে ঘোষণা কর্‌লেন। আফগানিস্থানের উপরে তাঁরা যে যে অধিকার চেয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটিকে বজায় রেখে এবং তা ছাড়াও আরো কতকগুলো নতুন অধিকার আদায় ক'রে নিয়ে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের সঙ্গে ইংরেজদের যে সন্ধি হ'লো তাতে স্থির হ'লো যে, কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের একটা স্থায়ী আস্তানা প্রতিষ্ঠিত করা হ'বে; হিরাট এবং অন্যান্য সহরেও ব্রিটিশ এজেণ্ট থাক্‌বেন। অন্য কোনো স্বাধীন জাতির সঙ্গে ইংরেজদের অনুমোদন না নিয়ে আমীর সন্ধি কর্‌তে পার্‌বেন না, কুরাম ও লেলান গিরি সঙ্কটের রক্ষার ভার ছেড়ে দিতে হ'বে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের হাতে। ইংরেজেরা অবশ্য এ অধিকারগুলি শুধু হাতে নেবেন না। এর বিনিময়ে তাঁরা আমীরকে অর্থ, অস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে ত সাহায্য কর্‌বেনই, তা ছাড়া বৎসরে ৬ লাখ টাকাও তাঁর তহবিলে পৌঁছে দেবেন।

সন্ধি হ'লো। স্যার লুই ক্যাভেগ্‌নারী কাবুলে ব্রিটিশরাজদূতের পদ গ্রহণ ক'রে আড্ডাও গাড়্‌লেন, কিন্তু আফগান জাতিকে ইংরেজদের তখনো ভালো ক'রে চেনা হয় নি। চিন্‌লে এ সন্ধিতে তাঁরা উৎফুল্ল হ'তেন না, এবং এই সন্ধির জন্য এত মেহনত কর্‌বার যে প্রয়োজন ছিল না, তাও তাঁরা বুঝ্‌তে পার্‌তেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইউরোপ নিজেকে অতি বড় সভ্য এবং প্রাচ্যের দেশগুলোকে অসভ্য ব'লে মনে কর্‌তে সুরু করে। আর তারই ফলে প্রাচ্যের সম্বন্ধে কোনো অন্যায়কেই তারা অন্যায় ব'লে মনে কর্‌তে ভুলে যায়। সুতরাং আফগানিস্থানের সম্বন্ধে বিজয়ী ইংরেজদের ব্যবস্থা যে খানিকটা নিরঙ্কুশ হ'বে তা বলাই বাহুল্য। আফগানিস্থান বর্ত্তমান আদর্শের হিসেবে সভ্য ছিলনা সত্য, কিন্তু সভ্য না হ'লেও স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা-বোধ প্রত্যেক আফগানের দেহের সঙ্গে একেবারে তার অস্থি-

মজ্জার মতো এক হ'য়েই মিশে' আছে। তাই নিজের দেশে বিদেশীদের প্রভাবকে বরদাস্ত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব একটা ব্যাপার হ'য়েই দাঁড়ালো। ব্রিটিশ-মিশনকেই তাঁদের রাজ-দরবারে তারা সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিল না, তার উপরে জয়-স্পর্দ্ধায় স্ফীত ইংরেজরা আবার তাদের রাজ-কার্য্যেও যখন তখন হস্তক্ষেপ কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। আফগানদের চিত্ত এর বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সুতরাং পাঁচ সপ্তাহ পার হ'তে-না-হ'তেই আফগানিস্থানে আবার সেই বার্ণস-ম্যাগন্যাগটেন এর অভিনয়ই অভিনীত হ'য়ে গেল। উন্মত্ত আফগানেরা পরিণামের কথা ভাব্‌ল না—ভবিষ্যতের নিশ্চিত বিপদের কথা ভাব্‌ল না—ইংরেজ রাজদূত স্যার ক্যাভেগনারীর বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে তারা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের নৃশংসভাবে হত্যা কর্‌ল।

অপরিহার্য্য প্রতিহিংসার আগুনও জ্ব'লে উঠ্‌ল। ৫০০০ সৈন্যের একটা ইংরেজ বাহিনী স্যার ফ্রেডেরিক রবার্টের অধীনে প্রেরিত হ'লো আবার আফগানিস্থানে। কুরাম গিরিবর্ত্ম দিয়ে তারা কাবুলে প্রবেশ কর্‌লে। ইয়াকুব খাঁ যুদ্ধ করলেন না—নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌বার জন্য এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা কর্‌লেন তিনি এই ব্রিটিশ বাহিনীকে। কিন্তু তাঁর এ অভ্যর্থনা একান্তভাবেই ব্য হ'লো; তা করুণার রেখা আঁক্‌তে পার্‌ল না ইংরেজদে মনে। তাঁরা তাঁকে বন্দী ক'রে ১৮৭৯ সালের ডিসেম্ব মাসে ভারতবর্ষে প্রেরণ কর্‌লেন। আফগানিস্থান ইংরেজে পতাকার তলে তখনকার মতো মাথা নত কর্‌ল।



ডাককার বণিক যাত্রীদল

এই পরাধীনতার হাত হ'তে আফগানিস্থানকে যিনি উদ্ধার ক'রেছিলেন তিনিই আমীর আবদার রহমন খাঁ পরের অধ্যায়ে আমরা তাঁর অদ্ভুত শক্তি, মনীষা ও বীরত্বে পরিচয় দিতে চেষ্টা কর্‌ব।

কিশোরী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

নিদ্রাহীন পৃথিবীর যৌবনের প্রথম উৎসবে,
মেলিয়া নিবিড় দুটি অনিমিখ নয়ন নীরবে
চেয়েছিলে কার মুখপানে, নাহি জানে কবি;
আনন্দ সঙ্গীতে কার ফুটিয়া উঠিল তব ছবি
মানুষের চিত্তপটে যুগান্তের সঞ্চিত আভায়,
নানা বর্ণে ছন্দে-তালে! বিগলিত কাঞ্চন ধারায়
সদ্য স্নাতা হে কিশোরী মরকত কুণ্ডল দোলায়ে,
গ্রামপ্রান্তে তমালের নীলবনে কুন্তল এলায়ে,
স্বপ্নময় দিক্‌চক্রে ছায়াঘন পাহাড়ের কোলে—
অফুরন্ত লীলাভরে জ্যোছনার হাস্য কলরোলে,
বিকশিলে প্রাণময়ী, দ্বাদশীর শশিকলা সম;
আপন রূপের স্রোতে তরঙ্গিতা নিত্য অনুপমা।
জাগিল শ্যামল তৃণে নীপবনে প্রেম-চঞ্চলতা;
সজল কাজল মেঘে বায়ুবেগে ছড়ালো বারতা।

বেদে বিজ্ঞানের কথা

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

হিন্দুর বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয় ; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন ইহা চাষার গান মাত্র। তজ্জন্য হিন্দু মাত্রেরই মনে যে বিষম ব্যথা লাগিবে তাহা সুনিশ্চিত।

তবে চাষা অর্থে যদি বুঝা যায় কর্ষণকারী, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশেষ কোন দুঃখ করিবার থাকে না। কারণ যিনিই উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে যে কেবল ভূমিকর্ষণের কথা আছে তাহা নহে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়বিধ তত্ত্বের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ষণের ফল বেদে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ইহাই The highest culture possible. (চাষ = culture, কৃষ্টি বা অনুশীলন)।

আর গান অর্থে যদি সুর, লয়, তাল, মান সুবলিত বাক্য বুঝায়, তাহা হইলেও দেখা যায়, যে সামবেদের মত গান জগতের মধ্যে কেহ কখনও শুনে নাই অথবা গাহে নাই।

বেদের মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে, সে সমুদয় আলোচনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধে কেবল বেদের মধ্যে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহাই অনূদিত করিয়া আমার যতদূর সাধ্য তাহাই দেখান।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ছেলে ধরতে পারে না—কেউটে ধরিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। হয়ত ইহা সত্য। তবে আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় আমাদের বেদের যে যে মন্ত্রগুলি অনূদিত হইয়াছে তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়া আমার মনে যে সমুদয় ভাবের উদয় হইয়াছে অথবা আমি যেরূপ ভাবে বুঝিয়াছি, তাহাই একে একে দেখান, আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আশা করি, উদারচেতা পণ্ডিতগণ, আমার দোষ পরিহার পূর্ব্বক, যাহাতে আমার ভ্রমের সংশোধন হয় তদ্‌বিষয়ে কৃপণতা করিবেন না ; কারণ বেদের মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব সুনিশ্চিত। এবং আমার উদ্দেশ্য শিক্ষা দেওয়া নহে, শিক্ষা করা। এবং তৎসঙ্গে যদি আমার মত অন্য কাহারও এইরূপ ইচ্ছা থাকে তাঁহাকেও উদ্দীপিত করা।

তাঁহারাও দেখুন বেদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কি কি উক্তি আছে। এবং সেই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা, বেদের অন্যান্য মন্ত্র মধ্যেও ঐরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা কিরূপ ভাবে নিহিত আছে।

হয়ত কেহ কেহ বলিবেন—যে বেদ মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির জন্য নহে। কিন্তু তাঁহারা যদি যজুর্ব্বেদোক্ত নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটী পাঠ করেন, দেখিবেন—বেদ আপামর সাধারণ ব্যক্তির জন্য। ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। সুতরাং তাঁহার আদেশ পালন করা ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বরং অবহেলা করা মহাপাপ।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাম্ শূদ্রায় চার্য্যায চ স্বায় চারণায।
প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ
ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু॥

যজুর্ব্বেদ ২৬।২

অন্বয়ঃ—যথা ইমাম্ কল্যাণীম্ বাচম্ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাম্ শূদ্রায় চ অর্য্যায় চ স্বায় চ অরণায়জনেভ্যঃ আবদানি—প্রিয়ঃ দেবানাম্ দক্ষিণায়ৈ দাতুঃ ইহ ভূয়াসম্—অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্ মা অদঃ উপ নমতু।

বাক্যার্থঃ—

(১) যথা—যেমন
(২) ইমাম্—এই
(৩) কল্যাণীম্—মঙ্গলদায়িনী
(৪) বাচম্—বেদবাণী
(৫) ব্রহ্মরাজন্যাভাম্—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে
(৬) শূদ্রায়—শূদ্রকে। চ = এবং
(৭) অর্য্যায়—বৈশ্যকে

(৮) স্বায়—নিজ নিজ স্ত্রী ও সেবকাদিকে

(৯) অরণায়জনেভ্যঃ—অন্যান্য সমগ্র মানবকে

•(১০) আবদানি—উপদেশ দিতেছি

(১১) প্রিয় দেবানাব—বিদ্বানের যেমন প্রিয়

(১২) দক্ষিণায়ৈ—দানের জন্য

(১৩) দাতুঃ—দানশীল পুরুষের

(১৪) ইহ—এই সংসারে

(১৫) ভূয়াসম্—প্রিয় হইয়াছি

(১৬) অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্—আমার ইচ্ছা বেদবিদ্যার প্রচার হউক।

(১৭) মা অদঃ উ নমতু—আমাকে এই পরোক্ষ সুখ প্রাপ্তি হউক।

বঙ্গানুবাদ—(শ্রীভগবান প্রত্যেক মানবের প্রতি উপদেশ দিতেছেন) আমি যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য ও তাঁহাদের স্বায় স্বীয় স্ত্রী ও সেবকাদি এবং অন্যান্য সকল মানবকেই সমভাবে এই মঙ্গলদায়িনী বেদবাণীর উপদেশ দান করিয়াছি—তোমরাও সেইরূপ কর। আমি যেমন বেদবাণীর উপদেশ দিয়া বিদ্বানের প্রিয় হইয়াছি—তোমরাও সেইরূপ হও। আমি দানের জন্যই এই সংসারে দানশীল পুরুষের যেমন প্রিয় হইয়াছি, তোমরাও সেইরূপ হও। আমার ইচ্ছা বেদবিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি হউক। আমার মধ্যে যেমন সর্ব্ববিদ্যাহেতু সুখ রহিয়াছে তোমরাও সেইরূপ বিদ্যার গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা মোক্ষসুখ লাভ কর।

ইহার পরেও যাঁহারা বলেন—

"স্ত্রী শূদ্রৌ নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ"

অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র (বেদ) পাঠ করিবে না—ইহাই শ্রুতি বাক্য ; হয় তাঁহাদের ভগবানের উপর—না হয়, বেদবাক্যে তাঁহাদের তেমন বিশ্বাস নাই।

তাই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—ইহা শ্রুতিবাক্য নহে—কোন এক মহাপণ্ডিতের স্বকপোল-কল্পিত উক্তি মাত্র। শ্রুতির দোহাই দিয়া ফতেয়া জারি করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা আপনারা ত পাঠ করিবেন না—অপরকেও পাঠ করিতে দিবেন না—এই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ইহাকেই বলে Dog in the manger—আপনিও খায় না, অপরকেও খাইতে দেয় না।

সৃষ্টি তত্ত্ব

সৃষ্টির পূর্ব্বে—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নসীদ্রজো নো ব্যোমাপরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্।

ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১

অন্বয়ঃ—তদানীম্ ন অসৎ আসীৎ, নো সৎ আসীৎ, রজঃ ন আসীৎ, যৎপরঃ ব্যোমানো, কুহ কিম্ আবরীবঃ, কস্যশর্মন, কিম্ গহনং গভীরম্ অম্ভঃ আসীৎ!

শব্দার্থঃ—

তদানীম্ = সেই সময়ে—অর্থাৎ—সৃষ্টির পূর্ব্বে

ন অসৎ আসীৎ = পরিবর্ত্তনশীল ছিল না—(যাহা নাই তাহা ছিল না)

নো সৎ আসীৎ = সৎ অর্থাৎ তন্মাত্র তত্ত্বও ছিল না—(যাহা আছে তাহাও ছিল না)

রজঃ ন আসীৎ = পরমাণুময় অন্তরিক্ষও ছিল না

যৎপরঃ ব্যোমানো = যাহার পরে আকাশও ছিল না (অতি দূর-বিস্তৃত)

কুহ কিম্ আবরীবঃ = কোথায় কি আবরণ ছিল—(বা স্থান ছিল)

কস্যশর্মন = কাহার আশ্রয়ে

কিম্ গহনং গভীরম্ অম্ভঃ আসীৎ—কি অতি গভীর জল সদৃশ ছিল?

বঙ্গানুবাদঃ—এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা নাই তাহা ছিল না—যাহা আছে তাহাও ছিল না। পরমাণুপূর্ণ অন্তরিক্ষও ছিল না, এবং যাহাতে আকাশ অবস্থিত তাহাও ছিল না। সে সময়ে কোথায় কি, কিসের আবরণ ছিল—কিসের আশ্রয়েই বা কি ছিল! সেই সময় কি গভীর জলরাশিই ছিল!

পুনশ্চ—

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তাস্মাদ্ধান্যন্নঃ পরঃ কিঞ্চ নাস॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৯।২

অন্বয়ঃ—মৃত্যুঃ ন আসীৎ, তর্হিঅমৃতং ন, রাত্র্যা অহ্নঃ, প্রকেতঃ ন আসীৎ তদ্ একম্, স্বধয়া—অবাতম্ আনীৎ, তস্মাৎ অন্যৎ, হ কিঞ্চনপরঃ ন আস।

শব্দার্থঃ— (সে সময়ে) মৃত্যু ন আসীৎ = মৃত্যু ছিল না
তর্হি অমৃতং ন = সেইজন্য অমরত্বও ছিল না
রাত্র্যাঃ অহ্নঃ = রাত্রিদিন বিভাগের
প্রকেতঃ ন আসীৎ = কোন জ্ঞান ছিল না
তদ্ একম্ স্বধয়া = একমাত্র তত্ত্ব প্রকৃতির সহিত
অ-বাতম্ = প্রাণবায়ু ছাড়াই
আনীৎ = প্রাণরূপে ছিল
তস্মাৎ অন্যৎ হ = তাহা ছাড়া অন্য নিশ্চয়ই
কিঞ্চন পরঃ ন আস = কেহই শ্রেষ্ঠ ছিল না

বঙ্গানুবাদ ঃ—তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও তজ্জন্য ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না—সে সময়ে কেবল এক আত্মতত্ত্বই প্রকৃতির সহিত বিদ্যমান ছিল—তাঁহার অস্তিত্ব প্রাণ বায়ুর উপর নির্ভর করিত না; তাঁহার অপেক্ষা নিশ্চয়ই কেহ শ্রেষ্ঠ ছিল না।

তবে ছিল কিরূপ ?

তম আসীত্তমসা গূঢ় মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যোনা ভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৩

অন্বয় ঃ—অগ্রে তমসা গূঢ়ম্ তমঃ ইদং সর্ব্বম্ অপ্রকেতম্ সলিলম্ আসীৎ যদা ভুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতম্ তপসঃ মহিনা তৎ একম্ জায়ত।

শব্দার্থ ঃ—অগ্রে = প্রারম্ভে—সর্ব্ব প্রথমে
তমসা গূঢ়ম্ তমঃ = অন্ধকারে আচ্ছন্ন মূল প্রকৃতি (ছিল)
ইদং সর্ব্বম অপ্রকেতম্ সলিলম্ আসীৎ = এই সমস্ত জগৎ অজ্ঞেয় অবস্থায় জলরাশির ন্যায় একাকার ছিল
যদা ভুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতম্ = যখন শূন্যতা দ্বারা ব্যাপক প্রকৃতি আবৃত ছিল
তপসঃ মহিনা তৎ একম্ জায়ত = তপের মহিমায় সে এক হইল।

বঙ্গানুবাদ ঃ—মূল প্রকৃতি প্রথমে অন্ধকারে আবৃত ছিল এবং এই সব জগৎ অজ্ঞেয় অবস্থায় জলরাশির ন্যায় একাকার ছিল। যখন শূন্যতা দ্বারা সেই ব্যাপক প্রকৃতি আচ্ছাদিত ছিল—তখন জ্ঞানময় তপের মহিমায় এক পদার্থ রচিত হইল। ইহাই জগতের আরম্ভ।

তাহার পর কিরূপে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইল—তাহা মানব-বু[illegible]য়।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভুব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্ৎসো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৭

অন্বয় ঃ—ইয়ং বি সৃষ্টিঃ যতঃ আবভুব যদি বা দধে যদি বা ন যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সঃ অংগ বেদ বা ন বেদ ?

শব্দার্থ ঃ—ইয়ং বি সৃষ্টিঃ = এই বিবিধ প্রকারের সৃষ্টি
যতঃ আবভুব = যাহা হইতে রচিত হইয়াছে
যদি বা দধে = তিনি কি ইহাকে ধারণ করেন
যদি বা ন = অথবা করেন না
যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ = যিনি ইহার অধিষ্ঠাতা
পরমে ব্যোমন্ = গভীর আকাশে
সঃ অংগ বেদ = তিনি নিশ্চিতরূপে জানেন
বা ন বেদ = অথবা জানেন না ?

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে পরমাত্মা হইতে এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি রচিত হইয়াছে, তিনি ইহাকে ধারণ করেন বা না করেন! অসীম আকাশে যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি নিশ্চিতরূপে ইহাকে জানেন বা না জানেন ?

ভাবার্থ ঃ—এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা পরমাত্মা—তিনিই ধাতা—তিনিই ইহার জ্ঞাতা।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা॥

ঋগ্বেদ—১০।১২৯।৪

অন্বয় ঃ—তৎ অগ্রে কামঃ সমবর্ত্ত যৎ মনসোঽধি প্রথমং রেতঃ আসীৎ = সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল—যাহা হইতে সর্ব্বপ্রথমে উৎপত্তির কারণ বিনির্গত হইল।

সতো বংধুমসতি নিরবিংদন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা = বুদ্ধিমানেরা আপন হৃদয়ে বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

বঙ্গানুবাদ ঃ সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনপূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তির স্থান নিরূপণ করিলেন।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতম্ যচ্চভাব্যম্।
পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতন্দিবি ॥

যজুর্ব্বেদ ৩১।২, ঋগ্বেদ ১০।৯০।২

অন্বয় :—পুরুষ এব ইদং সর্ব্বম্, যৎভূতম্, যৎ চ ভাব্যং, পাদঃ অস্য সর্ব্বাভূতানি, ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতংদিবি।

অর্থ :—পুরুষঃ—পরমাত্মান্ এব—ই
ইদং সর্ব্বং—এই সমস্ত
যৎ ভূতম্—যাহা উৎপন্ন হইয়াছে
যৎ চ ভাব্যম্—যাহা উৎপন্ন হইবে
পদঃ অস্য সর্ব্বাভূতানি—চতুর্থাংশ ইহার সমস্ত উৎপন্ন জগৎ
ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি—তিন চতুর্থাংশ ইহার অমৃতরূপ জ্যোতি স্বরূপে অবস্থিত

বঙ্গানুবাদ—যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল—যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে জগৎ উৎপন্ন হইবে—সকলেতেই সেই পুরুষ। সমস্ত উৎপন্ন জগৎ ও প্রাণী তাঁহার এক চরণ, তাঁহার তিন চরণ স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে বিনাশ রহিত অমৃতরূপে অবস্থিত।

ভাবার্থ :—এই যে জগৎ বিকারপ্রাপ্ত হয়—ইহা ব্রহ্মের এক অংশ আর তাঁহার অপর তিন অংশ সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপে অবস্থিত।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ।
সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষাবেধম্।

যজুর্ব্বেদ ১৩।৪

অন্বয় :—হিরণ্যগর্ভঃ ভূতস্য জাতঃ পতিঃ একঃ আসীৎ—সঃ অগ্রে সমবর্ত্তত—ইমাম্ উত দ্যাম্দাধার—কস্মৈ দেবায় হবিষাবিধেম।

শব্দার্থ :—হিরণ্যগর্ভঃ—ব্রহ্ম যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ
ভূতস্য—উৎপন্ন জগতের
জাতঃ পতিঃ—প্রসিদ্ধ স্বামী
একঃ আসীৎ—একাই ছিলেন
সঃ অগ্রে সমবর্ত্ততঃ—তিনি অগ্রে বর্ত্তমান ছিলেন
ইমাম্ উত দ্যাম্দাধার—এই পৃথিবীকে এবং দ্যুলোককে ধারণ করিয়া আছেন
স্মৈ কর্ম্মে দেবায় হবিষা বিধেম—সেই সুখ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রেমের সহিত পূজা করি।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলকে গর্ভে স্থান দিয়াছেন—যিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রসিদ্ধ রক্ষক এবং যিনি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন—তিনিই এই পৃথিবী এবং সূর্য্যাদিকে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা সেই সুখস্বরূপ শুদ্ধ পরমাত্মাকে প্রেমের সহিত পূজা করি।

অন্যত্র—

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্যদেবাঃ
যস্যচ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষাধিয়েম।

যজুর্ব্বেদ ২৫।১৩

অন্বয় :—যঃ আত্মদা বলদা যস্য প্রশিষম্ বিশ্বে দেবাঃ উপাসতে যস্য ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম।

শব্দার্থ :—যঃ—যিনি; আত্মদা—আত্মজ্ঞানের দাতা;
বলদা—বলদাতা; যস্যপ্রশিষম—যাঁহার আজ্ঞাকে; বিশ্বে দেবাঃ উপাসতে—সব দেবগণ উপাসনা করিতেছেন; যস্য ছায়া—যাঁহার আশ্রয়; অমৃতম্—মোক্ষদায়ক; মৃত্যু—মৃত্যু; কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম—সেই পরমাত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা পূজা করি।

বঙ্গানুবাদ—যিনি আত্মজ্ঞানের ও শক্তির দাতা—সমগ্র মনুষ্য ও দেবতাগণ যাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন—যাঁহার আশ্রয় মোক্ষদায়ক এবং যাঁহার উপাসনা না করা মৃত্যু আদি দুঃখের হেতু—আমরা সেই সুখ স্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা করি।

অন্যত্র—

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম ॥

যজুর্ব্বেদ ৩২।৬

অন্বয় :—যেন দ্যৌঃ উগ্রা চ পৃথিবী দৃঢ়া—যেন স্বঃ স্তভিতম্ যেন নাকঃ যঃ অন্তরিক্ষে রজসঃ বিমানঃ—কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম।

অর্থ :— যেন দ্যৌঃ উগ্রা চ পৃথিবী—যাঁহা দ্বারা দ্যুলোক তেজস্কর এবং পৃথিবী দৃঢ় রহিয়াছে। যেন স্বঃ স্তভিতম্—যাঁহা দ্বারা সূর্য্যাদি মণ্ডল ধৃত রহিয়াছে। যেন নাকঃ—যাঁহা দ্বারা মোক্ষ।—যঃ অন্তরিক্ষে

রজসঃ বিমানঃ—যিনি অন্তরিক্ষে লোক লোকান্তর সমূহের নিয়ামক। কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম—সেই সুখ স্বরূপ পরমাত্মাকে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করি।

বঙ্গানুবাদ:—তেজস্কর দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহা দ্বারা দৃঢ় রহিয়াছে, সূর্য্যাদি লোক লোকান্তরকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহা দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, যিনি অনন্ত শূন্যে লোকলোকান্তর সমূহের নিয়ামক—আমরা সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করি।

বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগুলিতে সৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। তবে উহা যুক্তি-তর্ক দ্বারা প্রতিপন্ন করেন নাই। এখানে অনুভবই প্রমাণ। অথবা ব্রহ্মার বাক্য, তাহার আবার প্রমাণ কি?

ইহাকে বিজ্ঞান বলা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা প্রতিপন্ন করা আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থে যেরূপভাবে সৃষ্টি-তত্ত্ব লিখিত আছে—আমাদের বেদেও তদ্রূপই লিখিত আছে। অথবা তদপেক্ষা এমন সুন্দরভাবে লিখিত আছে যে, ইহাকে বিজ্ঞান বলা যায়।

এই বিশ্বতত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্বকে ইংরাজী ভাষায় cosmogony বলে—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বিশ্বোৎপত্তি বা প্রকৃতি-বিজ্ঞান বলা যায়। সুতরাং ইহাকে বিজ্ঞানের কথা বলা বোধ হয় অন্যায় নহে।

পৃথিবীতত্ত্ব

১। পৃথিবী গতিশীলা

অহস্তা যদপদী বর্দ্ধত ক্ষা শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরিপ্রদক্ষিণিদ্ বিশ্বায়বে নিশিশ্নথঃ।

ঋগ্বেদ ১০।২২।১৪

অন্বয়:—ক্ষাঃ যদ্ অহস্তা অপদী বর্দ্ধত বেদ্যানাম্ শচীভিঃ শুষ্ণম্ পরি প্রদক্ষিণিৎ বিশ্বায়বে নিশিশ্নথঃ।

পদার্থঃ—

(১) ক্ষাঃ—পৃথিবী (২) যদ্—যদিও
(৩) অহস্তা—হস্তরহিত (৪) অপদী—পদবিহীন
(৫) বর্দ্ধত—চলিতেছে (৬) বেদ্যানাম্ শচীভিঃ—জানিবার যোগ্য পরমাণুশক্তিদ্বারা
(৭) শুষ্ণম্ পরি—সূর্য্যের চারিদিকে
(৮) প্রদক্ষিণিৎ—প্রদক্ষিণ করিয়া
(৯) বিশ্বায়বে—মানবের বিশ্বাস উৎপাদন জন্য
(১০) নিশিশ্নথঃ—এইরূপ রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গানুবাদ—পৃথিবী যদিও হস্তপদবিহীন তথাপি ইহা চলিতেছে অবশ্য জ্ঞাতব্য পরমাণুশক্তিদ্বারা সূর্য্যের চারিদিকে ইহা প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে পরমাত্মন্—সমগ্র মানবের মধ্যে আস্তিক্য বোধ জাগাইবার জন্যই তুমি এইরূপ রচনা করিয়াছ।

অন্যত্র—

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভং ত্যক্তুভিঃ।
প্রনা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জ্জুনি।

ঋগ্বেদ—৫।৮৪।২

অন্বয়:—স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি—হে বিচিত্র গমনশীলা পৃথিবি; প্রতিষ্টোভং ত্যক্তুভিঃ—ভূমি প্রতি রাশি পরিত্যাগ করিয়া; বাজং ন হেষন্তং—সশব্দ অশ্বের ন্যায়; অর্জ্জুনি—শ্বেতবর্ণা গমনশীলা বা; পেরুমস্য প্রণা—সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ কর।

বঙ্গানুবাদ—হে বিচিত্র গমনশীলা পৃথিবী, ভূমি রাশি সমূহে বিচরণকারিণী, তুমি শ্বেতবর্ণা ও গমনশীলা। তুমি প্রতি রাশি ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ কর।

অন্যত্র—

কতরা পূর্ব্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ঃ কো বিবেদ
বিশ্বংস্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম কি বর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব।

ঋগ্বেদ ১।১৮৫।১

বঙ্গানুবাদ—দ্যু ও পৃথিবী ইহাদের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন; কে পরে উৎপন্ন হইয়াছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ এ কথা কে জানে? উহারা অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করে এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে।

অন্যত্র

ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে
নিত্যং ন সূনং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো

অভ্বাৎ। ঋগ্বেদ ১।১৮৫।২

বঙ্গানুবাদ—দ্যাবাপৃথিবী পদযুক্তা হইয়া পদরহিতার ন্যায়;

সচলা হইয়াও অচলার ন্যায়; গর্ভস্থিত বহুপ্রাণীকে পিতা ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অহরহ ধারণ করিতেছে। দ্যাবা অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে।

পুনশ্চ—

স ইৎস্বপা ভুবনেম্বাস য ইমে দ্যাবপৃথিবী জজান।
উর্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ॥

ঋগ্বেদ ৪।৫৬।৩

বঙ্গানুবাদ—যিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা সুরূপা আধার রহিত দ্যাবা পৃথিবীকে কর্ম্ম বলে সম্যকরূপে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি ভুবন সমূহের মধ্যে সুন্দর কর্ম্ম বিশিষ্ট।

(শেষোক্ত তিনটীর অন্বয় বা শব্দার্থ দিবার আবশ্যক নাই বোধে উহা দেওয়া হইল না। এইরূপ আরো অনেক শ্লোকে ঐ কথা আছে। তাহাও উদ্ধৃত করা হইল না।

পৃথিবীর অন্যান্য কথা

বর্ষচক্র।

দ্বাদশ প্রধয়শ্চ ক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত।
তস্মিন্ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাশঃ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৮

অন্বয়—চক্রং দ্বাদশ প্রধয়ঃ—ত্রীণি নভ্যানি—ক উ তৎচিকেত—তস্মিন্ সাকম্ শঙ্কবঃ ত্রিশতা ষষ্টিঃ অর্পিতাঃ—ন চলা চলাশঃ।

শব্দার্থ :—চক্রম্—এই বর্ষচক্রে, দ্বাদশ—বারটি, প্রধয়ঃ—প্রধি অর অর্থাৎ চাকার পাখি ন্যায় আছে। ত্রীণি—তিনটী ঋতু, নভ্যানি—ইহার নাভিস্থানে (তিনটী ঋতু রহিয়াছে) (কঃ উৎচিকেত)—এই তত্ত্ব কে জানে (তস্মিন্ সাকম্ শঙ্কবঃ) সেই বর্ষের সহিত কীলক (ত্রিশতা ষষ্টিঃ) তিনশত যাইট (অর্পিতাঃ) স্থাপিত (ন চলা চলাশঃ) তাহা বিচলিত হয় না।

বঙ্গানুবাদ—বর্ষচক্রে দ্বাদশ মাস অরের ন্যায় আবর্ত্তন করে। ইহার কেন্দ্রস্থলে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এই তিন ঋতু রহিয়াছে। এই তত্ত্ব কে জানে? এই বর্ষচক্রে ৩৬০ দিন কীলকের ন্যায় স্থাপিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না।

অহোরাত্র—

দ্বাদশারং ন হি তজ্জরায় বর্বতি চক্রংপরিদ্যা মৃতস্য।
আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চতস্থুঃ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১

অন্বয় :—ঋতস্য চক্রম্ দ্যাম্পরি বর্বতি দ্বাদশারম্ ন হি তৎজরায় অগ্নে অত্র পুত্রাঃ সপ্তশতানি বিংশতিঃ চ আতস্থুঃ।

শব্দার্থ :—ঋতস্য—সত্যস্বরূপ কালের। চক্রম্—সম্বৎসর রূপ চক্র। দ্যাম্পরি—আকাশের চতুর্দ্দিকে। বর্বতি—ঘুরিতেছে। দ্বাদশারম্—তাহাতে দ্বাদশ অর আছে। মেষাদি দ্বাদশরাশিই দ্বাদশ অর। ন হি তৎজরায়—সেই চক্র কখনও জীর্ণ হয় না। অগ্নে—হে অগ্নি—পরমাত্মন্। অত্র—এই চক্রে। পুত্রাঃ—পুত্রবৎ। সপ্তশতানি বিংশতি চ—সপ্তশত ও বিংশতি—৭২০টী। আতস্থুঃ—স্থির রহিয়াছে।

বঙ্গানুবাদ—হে পরমাত্মন্—তোমার রচনা অদ্ভুত। সত্য-স্বরূপ কালের সম্বৎসর চক্র আকাশের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে দ্বাদশটী অর আছে, তাহা কখনও জীর্ণ হয় না। এই চক্রে ৩৬০টী দিন এবং ৩৬০ রাত্রি—তাহারা ৭২০টী পুত্রের ন্যায় বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে।

মলমাস—

বেদ-মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ।
বেদা য উপজায়তে।

ঋগ্বেদ ১।২৫।৮

বঙ্গানুবাদ—যিনি (বরুণ) ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয় তাহাও জানেন।

[সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি দ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে তাহা অপেক্ষা কয়েক দিন কম হইয়া পড়ে; এই জন্য সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিবার জন্য চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটি অধিক মাস (মলিম্লুচ বা মলমাস) ধরিতে হয়। এ ঋক হইতে প্রতীয়মান হইতেছে

যে প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জানিতেন, এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিতেও জানিতেন।]

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত)

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১৫ সূত্রেও মলমাসের উল্লেখ আছে। "সপ্তযমাহুরেকজং" এই ত্রয়োদশ মাস—এক মাসেই ঋতু হয়—তিনি একক।

বিবর্ত্তন বাদ—Evolution Theory--

অয়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা জ্যোতির্জরায়ূরজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্য্যাস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি॥

ঋগ্বেদ ১০।১২৩।১

এই ঋকের অর্থ নানা পণ্ডিত নানারূপ ব্যাখ্যা করেন—তবে অনেকেই নিম্নলিখিত ভাব গ্রহণ করেন।

মেঘমধ্যে গর্ভবৎ অবস্থিত বীজাণু—বৃষ্ট্যুদকের সহিত ভূতলে নিপতিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সমাহিত করে। সেই সৃষ্টি আপনা আপনিই ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়—

তাঁহারা আরো বলেন যে—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি মন্ত্র থেকে প্রকারান্তরে ক্রমবিকাশ প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমে—এক সৃষ্টিকর্ত্তা (হিরণ্যগর্ভ) আবির্ভূত হইলেন। তারপর—তাঁহা হইতে ক্রমে ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল।

উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ—

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহুঃ পরে অর্ধে
পুরীষিণং।
অথে মে অন্য উপরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রেষলর আহুরর্পিতং॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২

অন্বয়ঃ—পঞ্চপাদং দ্বাদশাকৃতিংপিতরং দিব অর্ধেপরে পুরীষিণং আহুঃ অথ ইমে অন্য উপরে সপ্তচক্রেষলর বিচক্ষণং অর্পিতং আহু।

পঞ্চপাদং—পঞ্চঋতুবিশিষ্ট (ঋতু যদিও ছয়টি তথাপি হেমন্ত ও শিশির একই বলিয়া গণ্য করা হয়। তাই পঞ্চঋতু)।

দ্বাদশাকৃতিং পিতরং—দ্বাদশরাশিস্থ দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট সূর্য্য।

দিব অর্ধে পরে—দ্যুলোকে উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে।

পুরীষিণং—(পুরীষ—জল) পুরীষী—বৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য—যিনি জল আকর্ষণ করিয়া মেঘের সৃষ্টি করেন।

অথ ২ম অন্য উপরে—যখন সেই সূর্য্য দ্যুলোকের অপর অর্দ্ধে অবস্থিত থাকে।

সপ্তচক্রেষলর বিচক্ষণং—ছয়টী অর বিশিষ্ট সপ্তচক্রে দ্যোতমান সূর্য্যকে।

অর্পিতং আহুঃ—অর্পিত বলে।

বঙ্গানুবাদ—পঞ্চপদ ও দ্বাদশ আকৃতিবিশিষ্ট আদিত্য যখন দ্যুলোকের উৎকৃষ্ট অর্দ্ধে থাকেন তখন তাহাকে পুরীষী কহে। আবার ছয় অর বিশিষ্ট সপ্তচক্রবিশিষ্ট রথে দ্যোতমান আদিত্যকে অর্পিত কহে—যখন তিনি দ্যুলোকের অপর অর্দ্ধে অবস্থিত।

[উত্তরায়ণ সময়ে মেঘ সকল সঞ্চিত হয় এবং দক্ষিণায়ন সময়ে বারিরাশি বিমুক্ত করে। এই ভারতে দক্ষিণায়নের সময়ই বর্ষা আরম্ভ হয়]

বর্ষারম্ভ বা মনসুন্ (monsoon)

স সর্গেণ শবসা তক্তো অত্যৈরপ ইন্দ্রো দক্ষিণতস্তুরাষাট্
ইথা সৃজানা অনপাবৃদর্থ দিবেদিবে বিবিষুরপ্রমৃষ্যং।

ঋগ্বেদ ৬।৩২।৫

বঙ্গানুবাদ—স্বভাবতঃ তেজস্বী অশ্বগণের অধিপতি-তুরাষাট্ দক্ষিণ হইতে বারিরাশিকে বিমুক্ত করেন, এইরূপে বিসৃষ্ট বারিসমূহ সেই ক্ষোভশূন্য গন্তব্য স্থানে (অর্থাৎ সমুদ্রে) প্রত্যহ ব্যাপ্ত হইয়া পতিত হয়—যাহা হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভবে না।

ইন্দ্র তুরাষাট্ অপঃ দক্ষিণতঃ—সূর্য্যের দক্ষিণায়নের সময়ে ইন্দ্র বারিরাশি বিমুক্ত করেন।

সপ্তগ্রহ—

অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত
দ্যামনড্বান্ দাধারোর্বন্তরিক্ষম্।
অনড্বান্ দাধার প্রদিশঃ
ষড়ুর্বীরনড্বান্ বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

অথর্ব্ববেদ ৪।১১।১

অন্বয়ঃ—অনড্বান্ পৃথিবীম্ দাধার, অনড্বান্ উত দ্যাম্ উরু অন্তরিক্ষম্ দাধার, অনড্বান্ প্রদিশঃ দাধার, অনড্বান্ ষড্ উর্বীঃ।

অনড্বান্—ইন্দ্র, (অর্থাৎ সূর্য্যের আর এক নাম) এই সূর্য্য।

পৃথিবীম্ দাধার—পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে।

অনড্বান উতদ্যাম্ উরু অন্তরিক্ষম্—সূর্য্য দ্যুলোক এবং সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে। দাধার—ধারণ করিয়া আছে।

অনড্বান ষড্ উর্বীঃ - সূর্য্য অন্যান্য ছয় গ্রহকে ধারণ করিয়া আছে।

বঙ্গানুবাদ - সূর্য্য এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে—তদ্রূপ দ্যুলোক ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে, দিক্‌সমূহ ও অন্যান্য ছয় গ্রহকেও সূর্য্যই ধারণ করিয়া আছে।

রাহু—স্বর্ভানু

যত্ত্বা সূর্যস্বর্ভানুস্তমসা বিধ্যদাসুরঃ
অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধোভুবনান্যদীধয়ুঃ।

ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫

অনুবাদ—হে সূর্য্য—যখন আসুর স্বর্ভানু (রাহু) তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল—নিজ স্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়—তৎকালে ত্রিভুবন ও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল—

অন্বয় :—সূর্য্য যৎ ত্বা আসুরঃ স্বর্ভানু তমসাবিধ্যৎ—হে সূর্য্য যখন তোমাকে আসুর স্বর্ভানু অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল—

অক্ষেত্র বিদ্যথা মুগ্ধঃ—নিজস্থান নিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ভুবনানি—ত্রিভুবন। অদীধয়ুঃ—লক্ষিত হইয়াছিল। আসুরঃ স্বর্ভানুঃ—বলবান্ স্বর্গীয় দীপ্তি। ঋগ্বেদে—রাহু শব্দ নাই—স্বর্ভানু শব্দ আছে।

স্বর্ভানু = স্বর্গীয় দীপ্তি ; চন্দ্র ও পৃথিবীর নিজের আলোক নাই, স্বর্গ হইতে—অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আলোক পরে—তাহাদের ছায়ায় গ্রহণ হয়।

অক্ষ—Axis of the Earth

ইন্দ্রায় গিরো অনিশিতসর্গা অপঃ প্রেরয়ং সগরস্যবুধ্নাৎ।
যো অক্ষেণেব চক্রিয়া শচীভি বিষ্বাক্তস্তংভ পৃথিবীমুতদ্যাং॥

ঋগ্বেদ—১০।৮৯।৪

বঙ্গানুবাদ :—ইন্দ্রকে অকাতরে স্তব করা হইয়াছে, আকাশের মস্তক হইতে জল আনয়ন করিয়াছি—যেমন অক্ষ দ্বারা চক্র ধারিত হয় তদ্রূপ সেই ইন্দ্র নিজ কাষ্ঠের দ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোককে উত্তম্ভিত করিয়া রাখেন।

(ইন্দ্রের নিজ কাষ্ঠ—অর্থে—Axis of the Earth বুঝাইতেছে)

(আচার্য্য লুডউইগ)

পৃথিবীর পরিধি—

সদৃশীরদ্য সদৃশীরিদু শ্বো দীর্ঘং সচংতে বরুণস্য ধাম।
অনবদ্যা স্ত্রিংশতং যোজনান্যেকৈকা ক্রতুং পরি যংতি সদ্যঃ॥

ঋগ্বেদ—১।১২৩।৮

বঙ্গানুবাদ :—অদ্যও যেরূপ কল্যও সেইরূপ উষা দেবীগণ অনবদ্য। প্রতিদিন তাঁহারা বরুণের অবস্থিতিস্থান হইতে ত্রিংশৎ যোজন অগ্রে অবস্থিত হয়েন। এক এক উষা উদয়কালেই গমনাগমনরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

বরুণ অর্থে এখানে সূর্য্য। সায়ন বলেন সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করেন। তাহা হইলে সূর্য্য প্রত্যেক দণ্ডে ৭৯ যোজন ভ্রমণ করেন। অতএব উষা যদি সূর্য্যের ৩০ যোজন পূর্ব্ব গামী হয়েন তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ের প্রায় অর্দ্ধদণ্ড (৩/৮ দণ্ড) পূর্ব্বে উষার উদয়।

সূর্য্যের দৈনিক গতি সম্বন্ধে পণ্ডিত বেণ্টলী এইরূপ লিখিয়াছেন—

The reckoning of the Sun's daily journey, cited by Sayana, perhaps from some text of the Vedas, is much nearer the truth than that of the Purnas being something more than 20,000 miles and being in fact the Equatorial circumference of the Earth. (Bentley—Hindu Astronomy.)

(৺রমেশচন্দ্র দত্ত)

পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বগুলি সম্যক্ আলোচনা করিয়া টমাস (Thomas Colebrooke) কোলব্রুক সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—

"Hindus had undoubtedly made some progress at an Early period in the astronomy cultivated by them for the regulation of time. Their calendar both *civil and religious* was governed chiefly, not exclusively, by the moon and the sun ; and the motions *of these iuminaries were carefully* observed by them and with such success, that their determination of the moon's synodical revolution which was what they were principally concerned with, is

much more correct one than the *Greeks ever achieved.* They had a division of the Ecliptic into twenty seven and twenty eight parts suggested evidently by the moon's period in days and *seemingly their own*; it was certainly *borrowed by the Arabians.*"

বাষ্পীয় পোত (?)

স্থলপথে, জলপথে এবং আকাশ-পথে গতিবিধির নিদর্শনও বেদের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান আছে।

আ নো নাবা মতীনাং যাতং পারায় গন্তবে।
যুঞ্জাথামশ্বিনা রথং। ৭
অরিত্রং বা দিবস্পৃথ্ তীর্থে সিন্ধুনাং রথঃ
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥ ৮
ঋগ্বেদ সংহিতা ১৪।৪৬।৭-৮

উক্ত ১ম ঋকে—জলপথে গতির জন্য 'নাবা' এবং স্থলপথে গতাগতির জন্য "রথং" পদদ্বয়ের প্রয়োগ আছে। উহাতে সাধারণ নৌকা এবং শকটের কথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ৮ম ঋকে—"রথ" এবং অরিত্র—এই দুই পদ যানাদি সম্বন্ধে প্রযুক্ত আছে।

সে রথ বা যান কেমন? তদুত্তরে আছে—"দিবস্পৃথ্" "সিন্ধুনাং"—যে যান বা অরিত্র স্বর্গে বা আকাশ-পথে গতায়াত করিতে পারে এবং যে রথ 'সিন্ধু' বা সাগর সমূহে পারাপারে প্রযুক্ত হয়, এখানে সেই অরিত্র ও সেই রথ পরিদৃশ্যমান। তবে কি কৌশলে বা কি বিজ্ঞান বলে সে রথ নির্ম্মিত হইত তাহা অবশ্য উক্ত মন্ত্রে প্রকাশ নাই। তবে যখনই এই দুই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে—

শ্বসিত্যপ্সু হংসো ন সীদন্ ক্রত্বা চেতিষ্ঠো বিশামুষর্ভুৎ।
সোমো ন বেধা ঋতপ্রজাতঃ পশুর্নশিশ্বা বিভুর্দূরেভাঃ।
ঋগ্বেদ ১ম।৬৫।৫

শ্বসিতি অপ্সু হংসো ন সীদন্—এই বাক্যাংশ হইতে বাষ্পীয় যানের উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের মধ্যে প্রাণ ধারণ, হংসের ন্যায় অবস্থান ও গমনাগমন অগ্নি দ্বারা এতদনুযায়ী কার্য্য বাষ্পীয় পোতের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

তক্বা না ভূর্ণির্বনা সিষক্তি পয়ো ন ধেনুঃ শুচির্বিভাবা।
ঋগ্বেদ ১।৬৬।১

-এই উপমা হইতে সিদ্ধান্ত হয় অগ্নি অশ্বের ন্যায় বাহক ছিলেন। অগ্নি দ্বারা বাহনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। সুতরাং বাষ্পীয় যানের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়।

অগ্নি সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করিয়া 'অরিত্র' বল বা যান পরিচালিত হইত। সেভাব নিম্ন ঋক হইতে গ্রহণ করা যায়—

অস্থা জরাসো দমামরিত্রা অর্চদ্ধূমাসো অগ্নয়ঃ পাবকাঃ
ঋগ্বেদ ১০ম।৪৬।৭

এখানে 'অরিত্রা,' 'ধূমাঃ' 'অগ্নয়ঃ' 'পাবকাঃ' প্রভৃতি পদে বাষ্পীয় যানাদির বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। আবার ব্যোমযান (?) সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদেও আছে—

বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত
আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্।
সবিশ্বাচীরভি চষ্টে ঘৃতাচী
রন্তরা পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্। যজুর্ব্বেদ ১৭।৫৯

অন্বয়ঃ—দিবঃ মধ্যে—এষঃ বিমান আস্তে—রোদসী অন্তরিক্ষম্ আপপ্রিবান্ বিশ্বাচীঃ ঘৃতাচীঃ সঃ পূর্ব্বম্ অপরম্ চ অন্তরা কেতুম্ অভিচষ্টে—

শব্দার্থ—দিবঃ মধ্যে—আকাশের মধ্যে,
এষঃ বিমানঃ আস্তে—ইহা বিমানের তুল্য বিদ্যমান
রোদসী অন্তরিক্ষম্—দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এই তিনলোক
আপপ্রিবান্—ভাল ভাবে পরিপূর্ণ হয়
বিশ্বাচীঃ—সম্পূর্ণ বিশ্বে গতিশীল
ঘৃতাচীঃ—মেঘের উপর গতিশীল (ঘৃত - জল - মেঘ)
সঃ—ব্যোমযানে অধিষ্ঠিত পুরুষ
পূর্ব্বম্—এই লোক। অপরম্ চ - এবং অন্য লোকের
অন্তরা—মধ্যে অবস্থিত। কেতুম্—জ্যোতিকে
অভিচষ্টে—সকল দিক হইতে দেখে।

বঙ্গানুবাদ—আকাশের মধ্যে ইহা বিমান সদৃশ বিদ্যমান। দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোক—এই ত্রিলোকে ইহার অব্যাহত গতি। ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বে গমন করে, মেঘের উপরও বিচরণ করে। বিমানাধিষ্ঠিত পুরুষ এই লোক ও অন্য লোকের মধ্যবর্ত্তী জ্যোতিকে সব দিক হইতেই দেখে।

তারবিদ্যা—Telegraphy না Telephone ?

যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ।
শর্য্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্ক্ত্যমিন্দ্রমিবচর্ষ্যণীসহম্॥

ঋগ্বেদ ১।১১৯।১০

অন্বয়ঃ—অশ্বিনা যুবম্ পেদবে স্পৃধাম্ পৃতনাসু চর্ক্ত্যম্ শ্বেতম্ পুরুবারম্ দুষ্টরম্ চর্ষণীসহম্ শর্য্যৈঃ অভিদ্যুম্ ইন্দ্রমিব তরুতারম্ দুবস্যথঃ।

ঋগ্বেদ ১।১১৯।১০

শব্দার্থ :—আশ্বিনা (রাজা ও প্রজা)। যুবম্—উভয়ে
পেদবে—শীঘ্র গমনাগমন হেতু
স্পৃধাম্—যুদ্ধেচ্ছু রাজপুরুষের
পৃতনাসু—সেনাদের মধ্যে
চর্ক্ত্যম্—নিরন্ত কার্য্য চালাইবার যোগ্য
শ্বেতম্—শুদ্ধ ধাতু নিৰ্ম্মিত
পুরুবারম—বহু কর্ম্মের উপযোগী
দুষ্টরম্—দুর্ল্লংঘ্য
চর্ষ্যনীসহম্—শত্রুর আক্রমণ যাহা দ্বারা সহ্য করা যায়
শর্য্যৈঃ—নানারূপ কলা কৌশলে নিৰ্ম্মিত
অভিদ্যুম্—বিদ্যুতের অগ্নিতে জ্যোতিৰ্ম্ময়
ইন্দ্রমিব—সূর্য্যের সদৃশ
তরুতারম্—সংবাদকে ইতস্ততঃ পৌছাইবার তার যন্ত্রকে
দুবস্যথঃ—সেবা কর।

বঙ্গানুবাদ—হে রাজা ও প্রজা—তোমরা উভয়ে শীঘ্র-গতিতে গমনাগমন হেতু, যুদ্ধকামী সেনাদের মধ্যে নিরন্তর কার্য্য চালাইবার যোগ্য, শুদ্ধ ধাতুনির্ম্মিত, বহু কর্ম্মের উপযোগী, দুর্ল্লংঘ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষাকারী নানা কলকৌশলে নির্ম্মিত বিদ্যুতের অগ্নিতে জ্যোতিৰ্ম্ময়, সূর্য্যরশ্মি সদৃশ এবং বার্ত্তাকে নানাস্থানে পৌছাইবার তারযন্ত্রকে যথাযোগ্য ব্যবহার কর।

এই ঋকের অর্থ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় অন্যরূপ দেখাইয়াছিলেন—হে অশ্বিদ্বয় তোমরা পেদুকে বহুলোকের বঞ্চিত এবং স্পর্দ্ধীদিগের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ দীপ্তিমান্ যুদ্ধে অপরাজিত সকল কার্য্যে সংযোজ্য এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য বিজয়ী।

আর প্রথম অর্থটী ৺দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা ব্যাখ্যাত। এক্ষণে পাঠকগণ যে অর্থ ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। ইহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

(ক্রমশঃ)

নবীন যুবক

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

লোকনাথের কলঙ্কের কাহিনীটা শুনে পুষ্পরাণী হাউমাউ ক'রে খানিকক্ষণ কাঁদল, তার তীব্র ও দীর্ঘ চীৎকারে পাড়ার লোক এসে জড়ো হোলো। চরিত্রহীন জামাতা বাবাজীবনের প্রতি মাসি সনাতনী ভাষায় গাল্ পাড়তে লাগলেন। পাড়ার লোক মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হেসে বলতে লাগল, আহা, পুরুষ মানুষ না হয় একটা অন্যাই করেই বসেছে, তার জন্যে আর অত কেন বাছা ? তোমাদের সবই বাড়াবাড়ি।

পুষ্পরাণী বললে, আমি আফিঙ খেয়ে মরব।

কিন্তু আত্মহত্যা যারা করে তারা পূর্ব্বাহ্নে ঘোষণা করে না। পুষ্পরাণী আফিঙ খেল না বটে, কিন্তু দেখা গেল, জিনিসপত্র বাক্স তোরঙ্গ নিয়ে পরের দিন সে বাপের বাড়ী রওনা হোলো। আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য সে যে আলোক-প্রাপ্তা মেয়ের মতো চরিত্রহীন স্বামীকে ছেড়ে গেল তা নয়, খুনে-ফাঁসুড়ে মানুষের হাত থেকে নিজের জিনিসপত্র ও সোনার গহনাগুলি বাঁচিয়ে নিয়ে চল্ল, এই মাত্র। বললে, অমন সোয়ামীর যদি আবার মুখ দেখি তবে আমি বাউনের মেয়ে নই, এই তোমাদের ব'লে গেলুম। গাড়ী চাপা মরুক।

লোকনাথ আমাদের কাছে এসে হেসে বললে, বাঁচলুম বাবা। অমন স্ত্রীলোক আমার অসহ্য।

তার এই রূঢ় স্পষ্টবাদিতায় জগদীশ পর্য্যন্ত আহত হোলো, বললে, স্ত্রীর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে নেই লোকনাথ।

স্ত্রী? স্ত্রী বলো তুমি ওকে? এদের মতন মেয়েকে নিয়ে তুমি ঘর করতে পার?—লোকনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল, নতুন-নতুন এদের চেনা যায়না, ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেমের কথা হয়, পতি পরম-গুরুমার্কা চিরুণী মাথায় চড়িয়ে স্বামী সোহাগিনীরা পদসেবা করতে বসে। কপালে টিপ পরে, পায়ে আল্‌তা মেখে পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে ওরা মনে করে পুরুষ-জীবনে ও-ছাড়া বুঝি আর আনন্দ নেই। এমনি করেই ওরা আমাদের কুকুর বানিয়ে রাখে। তারপর, বুঝলে জগদীশ, কিছুকাল বাদে দেখতে পাই ওদের প্রকৃত চেহারা।

জগদীশ বললে, তোর মতো লোকের গালাগাল দেবার অধিকার নেই লোকনাথ। তারা আমাদের যোগ্য নয়, কিন্তু আমরাই বা তাদের যোগ্য কিসে?

লোকনাথ হাসল। বললে, এবার যা বল্‌ব সে তোমারই কথা জগদীশ। তাদের যোগ্য হয়ে ওঠার সময় নেই আমাদের, আমাদের অনেক কাজ, কিন্তু আমাদের যোগ্য হয়ে ওঠাই তাদের একমাত্র সাধনা হওয়া উচিত। যা কিছু সৃষ্টি সবই পুরুষের, সমস্ত পৃথিবীই আমাদের। এখানে মেয়েদের ঠাঁই আছে কিন্তু অধিকার নেই। তাদের রূপ আর যৌবন কিসে আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে এই তপস্যাই মেয়েদের।

কিন্তু ভালোবাসার বেলা কেঁদে মরিস কেন? কেন তাদের পায়ে ধরতে যাস?

ওটা মায়া, ওটাই রস। কাঁদিনে ভালোবাসার জন্যে, পুরুষ কাঁদে সন্তানের আশায়, সৃষ্টির ব্যথায়, প্রতিনিধির প্রয়োজনে। চোখ মেলে চেয়ে ঢ্যাখো, জীবনের সহজ অর্থটা কী।

কিন্তু যে অমৃতটা হৃদয়ের?

সেটা পুরুষের। পুরুষ বিতরণ করে অমৃত, মেয়েরা দাক্ষিণ্য। আমাদের হৃদয়, তাদের মন। আমাদের পেয়ে তাদের মন খুসি হয়, কিন্তু তাদের পেয়ে আমাদের হৃদয়ে জেগে ওঠে অনির্ব্বাণ অতৃপ্তি। এই বৃহৎ অতৃপ্তি আর ক্ষুধাই আমাদের উন্নতির সোপান। মেয়েরা মনের মানুষ খুঁজে পায় সহজে কিন্তু আমরা কি পাই আমাদের মানসীকে? দুর্লভের দিকে আমাদের সাধনা, মেয়েদের তপস্যা লভ্যের প্রতি, নির্দ্দিষ্টের প্রতি। দেখলে ত তোমরা পুষ্পরাণীকে। এমন স্বার্থপর, লোভী, অনুদার, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক তোমরা অবশ্য অনেক দেখেছ, অথচ একেই আমি আমার ধ্যানে, চিন্তায় এবং প্রত্যহের জীবন-যাত্রায় আদর্শ নারী ব'লে পূজা করেছিলাম। পূজাটা পড়ল অপাত্রে—

অপাত্র সে, না তুই? শ্রদ্ধা পেতে গেলে শ্রদ্ধা দিতে হয়, শ্রদ্ধেয় হতে হয় লোকনাথ।

শ্রদ্ধা দিতে যাব দেহসর্ব্বস্ব পুষ্পরাণীদের? মরুভূমির ওপরে বর্ষণ? ব'লো না তার কথা জগদীশ, আমার মোহ ভেঙে গেছে। মেয়েরা আসলে এক, তফাৎ কেবল চামড়ার, কেবল পোষাকের। শিক্ষিতা আর অশিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে প্রভেদটা কোথায় শুনি? একজনকে দেখলে আসে বিতৃষ্ণা, অন্যজনকে দেখলে আসে বৈরাগ্য।

জগদীশ আর আমি হেসে উঠলাম। হাসিটা লোকনাথের ভাল লাগল না। সে উঠে দাঁড়াল, তারপর বললে, অথচ এই ছোটাছুটি চলবে চিরকাল, যেমন গ্রহের সঙ্গে ফেরে উপগ্রহ। মুক্তি হবে কেমন ক'রে? এই প্রবৃত্তি চিরদিন সক্রিয় ক'রে রেখেছে আমাদের। অথচ—অথচ তাদের সর্ব্বান্তঃকরণে আমি গ্রহণ করতে পারিনে, কোথায় একটা গোপন ঘৃণা তাদের সম্বন্ধে পোষণ করি, একটা বিজাতীয় আক্রোশ—

লোকনাথ একবার আমাদের মুখের দিকে তাকাল, যাবার সময় পুনরায় বললে, হ্যাঁ, একটা স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা, যুক্তিহীন, লক্ষ্যহীন।—এই ব'লে সে ক্লান্ত এবং অবসন্ন পদক্ষেপে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সন্ধ্যার একটা চাপা অন্ধকার দল বাঁধতে লাগল ধীরে ধীরে। বাইরের আকাশ মেঘময়, বাতাস নেই। এই ঘনায়মান অন্ধকারে ব'সে কেবলই যেন মনে হতে লাগল, লোকনাথের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সংশয় এবং অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত সে কিন্তু সে-কেবল মেয়েদের সম্বন্ধেই নয়, সংসারের সব কিছুর প্রতিই তার মন বিমুখ হয়ে উঠেছে। এখন থেকে বেঁচে থাকাটা তার পক্ষে কঠিন হবে, কঠিন হবে মানুষের সমাজে তার টিঁকে থাকা। কেবলমাত্র স্ত্রীলোক সম্বন্ধেই তার মোহভঙ্গ হয়েছে তা নয়, নিজেও

সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, সমস্ত জীবন তার মালিন্যে ভ'রে গেছে, হলাহলে ভ'রে উঠেছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম। ভিতরে একটা গুমোট সৃষ্টি হয়েছে, বাইরেও জলকাদা, পথ দিয়ে চলবার উপায় নেই। জগদীশের পুরনো ছাতাটা মাথায় দিয়ে এবং আমার জুতোটা প'রে শম্ভু বেরিয়ে পড়েছে, তার জন্যও অপেক্ষা করতে হবে।

জগদীশ এতক্ষণে সাড়া দিল। হাতটা তুলে আমার কাঁধের উপর রেখে বললে, মেয়েদের সঙ্গে অতি-পরিচয়ের ফল ফলেছে লোকনাথের জীবনে। এর নাম চরিত্রের বিকৃতি, মরবিডিটি। পরিণাম?—সে বোধহয় অন্ধকারে একটু হাসল, বললে, পরিণামে শোচনীয় মৃত্যু!

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে জগদীশই আগে ডাক্‌ল, মা?

তাঁর গলার সাড়া পাওয়া গেল। বললেন, ওই ঘরে বসো বাবা, আসছি। সোমনাথ আসেনি?

হ্যাঁ, এসেছে। ব'লে জগদীশ তাঁর পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল, আমিও তার অনুসরণ ক'রে গিয়ে খাটের উপরে বসলাম।

আমাদের খোঁজ নেবার আগেই ভগবতী এসে দাঁড়াল। পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি তার সাজসজ্জা, সম্ভবত একটু আগে সে সাবান মেখে স্নান ক'রে উঠেছে। চোখে ও মুখে তার একটি বিনম্র শুচিতা দেখলে মনে কেমন যেন একটি সম্ভ্রম আসে। আপন যৌবনের প্রাচুর্য্যে সে যেন লজ্জিত, কুণ্ঠিত। দেহের কোনো অংশ পাছে দেখা যায় এজন্য সে সর্ব্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত। হাত দুখানা পর্য্যন্ত সে যথাসম্ভব ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। ফল ও ফুলের ভারে সে যেন ঝুঁকে পড়েছে।

মুখ তুলে জগদীশ বললে, কেমন আছিস রে মিনু?

ভগবতী দুষ্টামির হাসি হেসে বললে, ভাল নেই।

কই, তা ত মনে হচ্ছে না। গায়ে সেরেছিস দেখা যাচ্ছে—বলতে বলতেই সে খপ ক'রে ভগবতীর হাতখানা ধরে ফেললে।

চক্ষুলজ্জা করবার মানুষ জগদীশ নয়। শোভনতা ও ভব্যতা এ দুটো শব্দের সহিত তার পরিচয় কম। প্রথম দিন থেকেই ভগবতীকে সে তুই-তুকারি আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, তাকে কোনো রকমেই রেয়াৎ করে না, এমন কি তাকে চড়-চাপড়টা দিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না।

উঃ উঃ, ছাড়ো বড়দা, ছাড়ো, লাগছে—

জগদীশ তার মাথার খোঁপাটা খুলে দিল, তারপর চুলের মুঠি ধ'রে বললে, মুখপুড়ি, পাশের খবর বেরিয়েছে, নেমন্তন্ন করিসনি যে? বঙ্কিম ছাড়া কি দুনিয়ায় মানুষ নেই?

ঘাট হয়েছে বড়দা, এইবার তোমাকে পেট চিরে খাওয়াবো, ছাড়ো।

তার সম্ভ্রমের পরিচ্ছন্নতাটুকু জগদীশ নষ্ট ক'রে দিল, এবং তার একখানা হাতে পাঞ্জা কসতে কসতে বললে, পাশ করেছিস, এবার বিয়ে করবি ত?

ভগবতী তার পাশে বসে পড়ল। হেসে বললে, বিয়ে করব? কি দুঃখে?—চুলটা সে আবার ফিরিয়ে বাঁধতে লাগল।

তা ছাড়া তোদের আর কাজ কি বল্। বিয়ে হবার জন্য তোরা তৈরী, পাশ করাটা উপরি গুণ।

কেন, স্বাধীন জীবিকা?

বড় কথা বলিসনে ভাই, ওটা তোদের নয়। অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টাটাও মেয়েদের কাছে একটা রোমান্স্, ওটা তাদের যথাসময়ে ফুরিয়ে যায় অর্থাৎ মোহ ভাঙে। যদি ভালবাসায় প'ড়ে থাকিস তবে দেখবি, বাইরের জীবনটা তোর অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। তোদের চরম লক্ষ্য, ঘর বাঁধা, জীবিকা অর্জ্জন নয়।

এইবার ভগবতী আমার দিকে ফিরে বললে, সোমনাথদা, চা খাবেন?

দিতে পারো। আজ ওটা জোটেনি সারাদিন।

জগদীশ বললে, এমন বালীগঞ্জী অভ্যর্থনা শিখলি কবে থেকে? আমাদের চা খেতে দিয়ে তুই হারমোনিয়ম্ পেড়ে রবিঠাকুরের গান সুরু করবি, কেমন? মা বোধকরি পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর পালিতা কন্যার গুণগান করবেন? এবং তারপরেই ঝড়ের মতো বঙ্কিম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে, আর তুই লজ্জায় লজ্জাবতীর মতো নুইয়ে পড়বি, এই ত?

ভগবতী সোজা তার দিকে চেয়ে বললে, থামলে কেন বড়দা? তোমার দাঁতে ধার কম্‌ল কেন?*

জগদীশ হেসে বললে, মেয়ে দেখলেই আমার ঝগড়া বাধাতে ইচ্ছে করে। জানিস ত—

খুসি হলুম শুনে। তাই ব'লে যারা ঝগড়া করে না তাদের কাছে বাহাদুরি দেখাবে? নরম মাটি, কেমন?

এমন সময় মা এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখের চেহারা দেখে আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। চোখ দুটি তাঁর রাঙা। কেন রাঙা, সেকথা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করব না, সে সাহস নেই, তাঁর একটা দুর্বোধ্য জায়গা আছে যেখানে আমাদের ভাষা পৌছয় না। আমরা দুঃখ বোধ করতে পারি, সান্ত্বনা দিতে পারিনে।

অন্যদিন তিনি হেসে কথা বলেন, আজ তাঁর মুখে কেমন একটি ঔদাস্য। বললেন, তোমরা না এলে আমি ভাবিত হই জগদীশ, ভাবছিলুম তোমাদের কাছে খবর পাঠাবো। তোমার ছেলেটি কেমন আছে? খবর পেলে কিছু?

জগদীশের বাচালতা কখন্ অন্তর্হিত হয়েছিল। মাথা নিচু ক'রে বললে, সেই কথাই তোমাকে বলতে এলুম, খবর ভাল নয়।

ভাল নয়? চিঠি পেয়েছ?

হেমন্ত চিঠি দিয়েছেন, সত্বর যাবার জন্যে বলেছেন।

বেশ, এখুনি যাও। মিনু, এদের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দাও ত মা। একেবারে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীর খোঁজ নিয়ো।

মিনু উঠে দ্রুতপদে চ'লে গেল। মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, বিপদে একা যেয়ো না। সোমনাথ, তুইও যা বাবা জগদীশের সঙ্গে। তেমন কিছু দেখা গেলে আমাকে তার করিস, গিয়ে পড়ব—কেমন?

আমরা সবিনয়ে সম্মত হলাম। মা পুনরায় বললেন, দুঃখের সন্তান, মা-মরা সন্তান, তাকে তোরা বাঁচিয়ে তুলিস বাবা।—এই ব'লে তিনি আল্‌মারি খুলে একগোছা নোট্ বা'র করলেন।

তাঁর এই উদার বিবেচনা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর টাকা বা'র করা দেখে জগদীশ প্রতিবাদ করল না, প্রতিবাদ জানালে তিরস্কারের ভয় আছে, সে নিঃশব্দে মাথা হেঁট ক'রে রইল। এক সময় তাকে হাতও পাততে হোলো, অর্দ্ধেকগুলি নোট্ মা তার হাতে দিয়ে বললেন, তোর ছেলের অসুখ শুনেই টাকা আনিয়েছিলুম। বলা যায় না ত, হয়ত হেমন্তদের হাতে এখন কিছু নেই। ছেলের চিকিৎসে যেন বন্ধ হয়না বাবা।

যার সন্তান এমন পীড়িত, এবং যেটি একমাত্র সন্তান, তার পক্ষে হাসি-তামাসা করাটা যে কী অসঙ্গত একথা জগদীশ ভালই জানে কিন্তু তার বেপরোয়া চরিত্র কোনো বিপদেই বিপর্য্যস্ত হয় না। নিজের জন্যও নয়, পরের জন্যও নয়। দুর্য্যোগে, দুঃখে, বিপদে এমনি করেই তাকে হাসতে দেখেছি, রসিকতা করতে শুনেছি। স্ত্রীর মৃত্যুদিনের কথাটা মনে পড়ে। নিজেকে সে সান্ত্বনা দেয়নি, পরের সহানুভূতি প্রার্থনা করেনি। বন্ধুবান্ধবের ভিতরে অমন সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা স্ত্রী আর কারো ছিল না। জগদীশ সেদিনো যেমন আজো তেমনি, ইস্পাতের কাঠামো দিয়ে তার চরিত্র গড়া। সন্তানের এই সাংঘাতিক রোগের সংবাদটা আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সঙ্গে গোপন রাখতে দেখে ভগবতীও স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। জগদীশ তখন পরম তৃপ্তিতে আহার ক'রে চলেছে। এমন নির্লিপ্ত মানুষ সংসারের পক্ষে বিপজ্জনক।

আহারাদির পর যথাসময়ে আমরা যাত্রা করলাম। আজ সকাল থেকে চড়া রোদ ফুটেছে। গাড়ীর সময়টা জানতে পারা গেছে, অর্থাৎ সময় আর নেই, আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে গিয়ে পৌছলাম। দুখানা টিকিট কেটে গাড়ীতে ওঠার পর জগদীশ টাকাগুলো আমার হাতে দিয়ে বললে, তুই এগুলো রাখ্ সোমনাথ, আমার হাত সুড় সুড় করে খরচ করবার জন্যে। চাইলেও আমাকে দিসনে।

কিন্তু এ যে তোমার ছেলের অসুখের খরচ!

থাম্। বাৎসল্যের সুবিধে নিয়ে শাসন করিসনে। ও আমার জানা আছে।

জানা তার সব। সংসারে জেনেছে সে অনেক; সব জেনেই সে নির্বোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীন। পাঁচটি ক'রে টাকা সে কাশীতে তার মায়ের কাছে কেন নিয়মিত আজো পাঠায় এই প্রশ্ন একদিন লোকনাথ তাকে করেছিল। উত্তরে সে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলেছিল, মাতৃভক্তি নয়, কর্ত্তব্যও নয়, জীবে দয়া!

অথচ জীবে দয়া তার বিন্দুমাত্রও নেই। নিজের হাতে পাঁঠাবলি দিয়ে সে কতবার আমাদের খাইয়েছে। বিড়াল

কোথাও দেখলেই তার মাথায় হত্যাকারী জেগে ওঠে। জীবে দয়া তার ত্রিসীমানাতেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘণ্টা দুই হোলো ট্রেণ ছেড়েছে। এতটা সময় সে প্রায় ঘুমিয়েই কাটাল। পথ প্রান্তর খাল বিল উত্তীর্ণ হয়ে গাড়ী চলছে। সেটা শনিবার। কিন্তু ডেলি-প্যাসেঞ্জারের ভিড়ও এইবার ধীরে ধীরে কমে গেল। গাড়ীতে লোকজন অল্পই। আসবার সময় ভগবতী ছোট একটা স্যুট্‌কেশ দিয়েছে এবং একটি পুঁট্‌লি, এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে আর কিছু নেই।

এইবার জগদীশ উঠে বসল। বললে, ছেলেকে গিয়ে ভালই দেখব ভয় পাসনে।

বললাম, ভয় তোমার যদি না থাকে আমার থাকবে কেন?

আমার কিছু ভয় নেই।

একখানা কাপড়ে কিছু বেদানা আর কমলা লেবু ছিল, তার থেকে একটা লেবু নিয়ে ছাড়িয়ে এক কোয়া জগদীশ মুখে দিল এবং আর এক কোয়া দিল আমার হাতে। তার-পর বললে, আচ্ছা, বৌদিদিকে তোর কেমন মনে হয় রে সোমনাথ?

বললাম, বেশ সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী।

কথাটায় জগদীশের মুখে হাসি দেখা দিল। আমি সে কথা জিজ্ঞেস করছিনে তোকে, কেমন মানুষ তিনি তাই বল্‌।

কেমন বললে তুমি খুসি হও?

জগদীশ কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে রইল। পুনরায় বললে, হ্যাঁ, তাঁর প্রশংসায় আমি খুসি হই বটে, এ এক অদ্ভুত রহস্য!—চেয়ে রইল সে, উদাস হয়ে, উন্মনা হয়ে। এটা তার চিত্ত-চাঞ্চল্য নয়, চিত্ত-বৈলক্ষণ্য। যার প্রতি সে নির্ম্মম তার প্রতিই তার গোপন আকর্ষণ। বৌদিদির প্রতি তার প্রকাশ্য বিরোধিতা সর্ব্বজনবিদিত, নিদ্দয় হাসি আর নিষ্ঠুর সমালোচনায় প্রিয়ম্বদাকে ক্ষতবিক্ষত করা তার কাজ, অকারণ ব্যঙ্গে স্ত্রীলোকদের খেলো ক'রে দেওয়া তার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি,—এ সবই জানি, কিন্তু যেটা জানিনে সেটা কেবল আমাদের কাছেই রহস্যময় নয়, তার কাছেও। সে আত্মবঞ্চনা করেনা কিন্তু নিজের ভিতরে এক এক সময় বিচিত্র চেহারা দেখে নিজেও সে বিস্মিত হয়।

জানি জগদীশ একজন উঁচুদরের নীতিবিদ্‌। কোথাও সে মিথ্যার আশ্রয় নেয় না। রাজনীতিকদের প্রবল ভণ্ডামীর জন্য সে 'দেশপ্রেম' বিসর্জ্জন দিয়েছে, বিশেষ একটা দলের প্ররোচনায় কারাবরণ করার জন্য সে অনুতপ্ত। তার ধারণা, দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে গেলে আগে জনকয়েক 'স্বদেশী স্বার্থান্বেষীকে' দেশ থেকে নির্ব্বাসন দেওয়া প্রয়োজন। এদিকে চরিত্রের শুচিতা সম্বন্ধেও তার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের মতো। নরনারীর যৌন-সম্পর্ক সম্বন্ধে তার মতামত অতি প্রাচীন। প্রেম ও ব্যাভিচারের প্রতি সে খড়্গহস্ত। এমনি সে।

তোর কী মনে হয় প্রিয়ম্বদাকে বল্‌ ত?

তিনি আমাদের বৌদি, এই কেবল মনে হয়।

কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে?

অতি উন্নত। তরুণ সমাজের আদর্শ!

ইয়ার্কি করিসনে সোমনাথ।

এইবার আমি বললাম, তোমার কথাটা শুনবে? তুমি আমাদের মধ্যে একমাত্র রূপবান যুবক, অটুট স্বাস্থ্য, অসামান্য বুদ্ধি, অসাধারণ শিক্ষা। তোমার চরিত্রটাও ত ছোট নয় জগদীশদা।

জগদীশ অবাক হয়ে বললে, তোর এতদূর অধঃপতন হয়েছে সোমনাথ? প্রিয়ম্বদার আলোচনায় আমার প্রশংসাটা অত্যন্ত লজ্জাকর আর বেআইনী।

বললাম, জগদীশদা, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা হয়েছে এমন আমি বলিনে, কিন্তু তুমিই বলেছ মেয়েরা রূপের ভক্ত, তারুণ্যের ভক্ত। তারা যে সব সময় দেহের সম্পর্ক কামনা করে তাই নয়, তারা সৌন্দর্য্যের সংসর্গও চায়। এ তোমারই কথা, তোমারই মত।

তুই কি বলতে চাস্‌ প্রিয়ম্বদাও আমার সংসর্গ চান্‌?

চান্‌, কিন্তু এ কামনা তাঁর অতি নিগূঢ়। ওপরে তোমাদের বাদানুবাদ, বিতর্ক, এমনি ঝগড়া-বিবাদ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তোমরা পরস্পরের সান্নিধ্যটাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করো।

একেই ত তোরা প্রেম বল্‌বি?

না, এর নাম সাথীত্ব। এ প্রেমে দেহের প্রশ্ন সামান্য। প্রিয়ম্বদার নির্ব্বাচনশক্তি ভালো, তোমার মতো চরিত্রবান যুবককে বেছে নিয়েছেন। এখানে ভোগের আয়োজন কম, উপভোগ্যই বেশি।

জগদীশ হেসে বললে, বঙ্কিমের কথাটা মনে পড়ল। বঙ্কিম বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল প্রিয়ম্বদার সঙ্গে। কিন্তু অল্প বয়স কিনা, ছোকরার ধৈর্য্য কম। একদিন মাত্রা ডিঙিয়ে গেল; ফলে, বন্ধু-বিচ্ছেদ।

তুমি জানলে কি ক'রে?

প্রিয়ম্বদার মুখে। কিন্তু বন্ধু বিচ্ছেদের আসল কারণটা কেবলমাত্র আসক্তি নয়। মেয়েরা যখন বুঝতে পারে এর মধ্যে হৃদয়ের কোনো কথা নেই তখনই ভদ্রনারীর মন উত্যক্ত হয়ে ওঠে। ব্যভিচারকে মেয়েরা সমর্থন করে একথা বলা আইনে বাধে কিন্তু দুর্নীতিমূলক প্রণয়ের মধ্যে মেয়েদের একটি গভীর ও অত্যুগ্র আনন্দ দেখা যায়। এই মতবাদটা পৌরাণিক প্রাচীন ভারতের। ব্যাভিচারীর বাঁশী কালিন্দির কূলে বাজলেই প্রাণময়ী প্রিয়তমা কুল ছেড়ে অকূলের দিকে পাড়ি দিতেন; কিন্তু উপায় কি বল্, মহাভারতের কথা অমৃত সমান!

হাসলাম তার কথার ভঙ্গিতে। হেসে বললাম, কিন্তু তুমি আসল কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ।

জগদীশ বললে, আসল কথাটা বল্‌ব না। ও তত্বটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি এবং সম্ভবত প্রিয়ম্বদারো অজ্ঞাত।

কিন্তু তিনি যদি তোমাকে ভালোবেসে থাকেন? যদি কাছে পেতে চান্?

খুসি হবো।

উষ্ণকণ্ঠে বললাম, তোমার নৈতিক বুদ্ধিতে বাধবে না? তুমি না 'দুর্নীতি দমন সঙ্ঘের' একজন সভ্য?

সেইজন্যই ত একটু সঙ্কোচ। ভাবচি তাদের তালিকায় এবার প্রিয়ম্বদার নামটাও তুলে দেবো।

এমন সময় ট্রেন এসে ষ্টেশনে থামল। বেলা পাঁচটা বাজে। স্যুটকেস ও পুঁটুলি নিয়ে নেমে প্রথমেই দেখা গেল, আকাশ কোমল কালো মেঘে আচ্ছন্ন। সম্ভবত আমাদের পথে বৃষ্টি নামবে। পল্লীগ্রামের ষ্টেশন জনবহুল নয়। শহরের কোলাহল ও উদ্বেগের ভিতর থেকে এসে চারিদিকের এই দূরবিস্তৃত নীল প্রান্তরের দিকে চেয়ে চোখ ও মন স্নিগ্ধ হয়ে এল। এমন মেঘ, তার নীচে এমন ঘনশ্যাম অবকাশ অনেকদিন দেখিনি। ষ্টেশনের বাইরে এসে বললাম, হেঁটেই যাওয়া যাক্ জগদীশ।

তবে মাঠের ভিতর দিয়ে চল্।

তাই চলো। এখনো বেলা অনেকটা রয়েছে।

নিকটে চাষীদের কয়েকখানা দোকান। কাঁচা রাস্তা খানিকটা পার হয়ে মাঠে এসে পড়া গেল। মেঘ ঘন হয়ে উঠতেই জোরে জোরে বাতাস বইতে লাগল। দিগন্তজোড়া ধানের ক্ষেত সেই বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু মাঠে নেমেই বোঝা গেল, চলবার উপায় নেই। বর্ষায় মাটি নরম, পা ব'সে যাবার সম্ভাবনা। তখন অগত্যা কাঁচা পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত হোলো। পথ কিছু বেশি ভাঙতে হবে।

পথে আমাদের নানা কথা, নানা আলোচনা চলছিল, কিন্তু সমস্ত অতিক্রম ক'রে আজ এই আসন্ন বর্ষার আকুলতার দিকে চেয়ে আমার মন ধান্যশীর্ষগুলির মতো আন্দোলিত হচ্ছে। কণ্ঠে কিছু জলের তৃষ্ণা ছিল কিন্তু স্নিগ্ধ বাতাসে প্রাণের মূল পর্য্যন্ত রসে সিক্ত হয়ে উঠতে লাগল, কোনো তৃষ্ণাই আর নেই। কেমন ক'রে যেন আজ সব ভাল লাগছে। ছোট গাছ, ছোট ছোট নাম-হারা ফুল, শীর্ণ দূর্ব্বাদল, এই সঙ্কীর্ণ পথ, উড্ডীয়মান বকের সারি, দূরের বনশ্রেণী—মনে হোলো এরা যেন নিতান্তই আত্মীয়, এরা বন্ধু, এরা যেন সবাই আমাদের আলিঙ্গন করছে। এ কেবল পল্লীর শোভা নয়, সুলভ কাব্য নয়, ভাবের উচ্ছ্বাস নয়—এরা যেন আমাদের জীবনীশক্তি, আমাদের দুঃখময় উৎপীড়িত জীবনের সান্ত্বনা, আমাদের পরম আশ্রয়।

ছোট একটা সাঁকো পার হয়ে গ্রামের ভিতরে ঢুকলাম। গাছপালা ছাওয়া পথ, একটি পুরাতন মন্দির, নিকটে একটি পুকুর, কয়েকখানা গোলদারি দোকান, তাদের পাশে একটা ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা থেকে দু তিনটি লোক আমাদের দেখে বেরিয়ে এল। জগদীশ এ গ্রামের জামাই।

একটি ছোকরা দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করছিল, এবার কাছে এসে জগদীশকে থামিয়ে তার পায়ের ধূলো নিলে। বললে, আপনি এই গাড়ীতে আসবেন মনে ক'রে ওঁরা সবাই অপেক্ষা করছেন।

জগদীশ বললে, বাঃ, তুই ত বেশ ভালো বাংলায় কথা বলিস রে?

ছোক্‌রা হেসে বললে, এইবার আপনাদের কল্‌কাতায় যাবো।

অমন কাজ ক'রো না বাবা, রাজধানীর বেকার সমস্যা আর বাড়িয়ো না। আয় সোমনাথ।

ছোকরাটি হেসে চ'লে গেল। আমরা আবার অগ্রসর হলাম। নবাগত দুই যুবককে দেখে এখানে ওখানে কানাকানি সুরু হয়েছে। যদিচ আমরা ধূলিমলিন এবং পথশ্রমে বিপর্য্যস্ত তবুও আমাদের চেহারায় শহরের একটা ছাপ রয়ে গেছে। আমরা দূরের মানুষ, আমাদের ধাতুর সঙ্গে তাদের মিল নেই, তারা পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াতে লাগল।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে আমরা একবার দাঁড়ালাম। সুমুখে খানিকটা খোলা জায়গা। বাড়ীখানা দেখে মনে হোলো, অবস্থা এদের ভালোই। জগদীশের মতো হতভাগ্য পাত্রের সঙ্গে এরা কী আশায় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তাই ভাবতে ভাবতে দরজা পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

খবর পেয়ে যে সব স্ত্রী-পুরুষ এসে আমাদের অভ্যর্থনা ক'রে অন্দর মহলে নিয়ে গেলেন তাঁদের অনেককে জগদীশও চেনে না। কিন্তু দেখা গেল তা'র শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা এ বাড়ীতে কম নয়। তার স্বর্গীয়া স্ত্রীর জন্য অনেকেই অশ্রুপাত করলেন। ছেলেটি কেমন আছে জিজ্ঞাসা করায় একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বললেন, সেই একই অবস্থা বাবা, তুমি দেখবে চলো।

তিন মহলা প্রকাণ্ড বাড়ী। জগদীশের শ্বশুর নেই, শাশুড়ী আছেন। দুই জন শ্যালকই বিদেশে চাকরী করে। এরা সবাই জ্ঞাতি-গোষ্ঠি। উপরে উঠে এসে একে একে সবাই নিজ নিজ মহলে অদৃশ্য হলেন। জগদীশ ও আমি তার শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিলাম। তিনি বললেন, এ ছেলেটি কে বাবা?

এ আমার বন্ধু, সোমনাথ। হেমন্ত কই, তাকে দেখছিনে যে?

সে আছে তোমার ছেলের কাছে ব'সে। তোমরা ঘরে যাও বাবা। আমি রান্নার ব্যবস্থা করেই আসছি। এই ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

আত্মীয়তায় আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিলাম। এ আমার কাছে নতুন। বললাম, আমি ওই খালি ঘরটায় বসি, তুমি আগে দেখা শোনা করো।

ভয় পাস কেন রে, কল্‌কতার বদ্‌নাম হবে যে।

চুলোয় যাক্‌ কল্‌কাতা, ক্ষিধেয় আমার নাড়ি চোঁ চোঁ করছে। তোমার শ্বাশুরবাড়ী আদর আছে, আহার নেই।

চুপ, চুপ, কুটুম-বাড়ী এসে···হ্যাংলা কোথাকার।—তারপর সেও গলা নামিয়ে বললে, আমারো ক্ষিধে পেয়েছে, মাইরি।

তোমার ছেলে, তোমার শ্বশুরবাড়ী, তোমার ভাবনা কি বলো?

জগদীশ হেসে বললে, ছেলে! হ্যাঁ, ভুলেই গিছলাম ছেলেটা আমার, ওর জন্য একটা দায়িত্ব নেবার আছে। জন্মদাতা হওয়া সহজ, পিতা হওয়া বড় কঠিন। আয়।

বড় দালান পার হয়ে একটা ঘরের ভিতরে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে, ঘরে অন্ধকার জমেছে। জগদীশ সোজা গিয়ে বিছানার ধারে বসল। ঘরে আর কেউ নেই। রোগী জেগেই ছিল, জগদীশকে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ছেলেটির বয়স আন্দাজ বছর চারেক, এত অসুখেও তার চেহারা বিশেষ ম্লান হয়নি। অবাক হয়ে অনিমেষ দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল।

পিতা ও পুত্র!

কিন্তু অপরিচিত পিতা, বিদেশী পিতা, রক্তের সম্পর্ক আছে কিন্তু স্নেহের সম্পর্ক তৈরি হয়নি। তার এই ক্ষুদ্র জীবনে সে যে জগদীশকে কবে দেখেছে মনেই করতে পারছে না, কল্পনাই করছে না এই মানুষটা তার পরমাত্মীয়, এরই জন্য পৃথিবীতে সে আসতে পেরেছে। ছেলেটি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ চেয়ে এদিক ওদিক মুখ ফিরাতে লাগল। কা'কে যেন খুঁজছে।

জগদীশ তার একটি হাত ধরে নাড়ল, কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিল। ওই পর্য্যন্ত, ওইটুকু তার পিতৃত্ব। তারপর বললে, এর মুখখানা এর মায়ের মতো হয়েছে, নারে সোমনাথ?

বললাম, জগদীশ, তোমার গলার মধ্যে জল জমেছে।

আমার?—জগদীশ গলা ঝাড়া দিল, পুনরায় বললে, পাগল, পাগল তুই সোমনাথ। মায়া যেখানে জন্মায়নি, প্রাণের সুর সেখানে আসবে কোথা থেকে?

এমন সময় আলো হাতে নিয়ে একটি মেয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে জগদীশ সোজা হয়ে বসল। বললে, হেমন্ত, আমরা এসেছি যে?

চকিত আনন্দে মেয়েটি চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। আলোটা নামিয়ে রেখে বললে, কি ভাগ্যি আমাদের। ছেলেটা না থাকলে কি আর আপনাকে আনা যেত জামাইবাবু?—এই ব'লে সে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, আমাদের একেবারে ভুলে গেছেন আপনি।

প্রায় উঠে পালাবার চেষ্টা করছিলাম, জগদীশ আমার হাতখানা ধ'রে বললে, মেয়ে দেখলেই আমার বন্ধু গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করে হেমন্ত, এর নাম সোমনাথ। ব'স্ চুপটি ক'রে। এরা বাঘ না ভাল্লুক, শুনি? এটি কে বুঝতে পেরেছিস ত? শ্রীমতী শ্যালিকা, হেমন্তকুমারী!

নমস্কার বিনিময় হোলো। হেমন্ত চট্‌ ক'রে বললে, মেয়ে দেখে ভয় পান্, এখনো বিয়ে করেননি বুঝি?

বিনীত কণ্ঠে বললাম, ভয় আমি পাইনি, জগদীশদা অমন বলে!

একেবারে কিন্তু মিথ্যে বলেননি।—ব'লে হেমন্ত তার ভগ্নিপতির কাছে এসে বসল। তার মাথাটা আমাদের মাথা ছড়িয়ে উঠ্‌ল। বলশালিনী মেয়ে। রুক্ষ চুলগুলি তার খোলা, পরণে একখানা রাঙা সাড়ী, হাতে সামান্য দুগাছি চুড়ি। আর কোথাও আভরণ কিছু নেই। সাড়ীখানা সর্ব্বাঙ্গে সে এমন ক'রে জড়িয়ে বসল যে, মনে হয়, তার গায়ে জামা নেই। পল্লীসভ্যতায় জামা পরাটা অশোভন।

ছেলেটার অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা উঠ্‌ল। আজ তেরো দিন ভারি জ্বর। ডাক্তার বলেছে, টাইফয়েড। বিষ্ণুপুর থেকে ডাক্তারবাবু একদিন অন্তর আসেন, প্রতিদিন তাঁর কাছে খবর পাঠানো হয়। ছেলেটি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মাথায় বরফ দেওয়া হয় না। পথ্য—ছানার জল।

বেদানা আর কমলালেবুর পুঁটুলিটা খুলে হেমন্ত খুসি হোলো। এগুলি বাৎসল্যের চিহ্ন। জগদীশ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, আমাদের মা এসব কিনে দিয়েছেন আসবার সময়। তুমি বিশ্বাস করো, নিজের গরজে আমি আনিনি।

হেমন্ত বললে, একথা কি সত্যি সোমনাথবাবু?

বললাম, খুব সত্যি। ও বরং ট্রেণে আসতে আসতে একটা লেবু নিজে ছাড়িয়ে খেয়েছে। অবশ্য আমাকেও ভাগ দিয়েছিল।

সবাই হাসলাম। জানি হাসাটা উচিত নয় এখানে। পরলোকগতা এক নারীর একমাত্র পীড়িত সন্তানের নিকট বসে হাসাহাসিটা যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু এটা যে জগদীশের এলাকা, এখানে গাম্ভীর্য্য কিছু নেই, চক্ষুলজ্জার বালাই নেই, প্রচলিত বিধি নিষেধের আধিপত্য নেই।

ছেলেটি নিঃশব্দে এতক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করছিল, জগদীশ তার শীর্ণ হাতখানি ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম রেখেছ এর?

হেমন্ত বললে, ওর নাম বাবু।

এইবার মা এসে ঢুকলেন। হাতে তাঁর গ্রাম্য জলযোগের উপকরণ। বাড়ীর একটা চাকর আলাদা রেকাবে ফলমূল এনেছে। হেমন্ত উঠে গিয়ে দুখানা আসন পেতে দিল। এইবার আলোতে দেখা গেল, তার পরণের সাড়ীখানা ঠিক লাল নয়, রঙটা তার গৈরিক, রাঙা পাড়। রূপ? রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। কঠিন বলিষ্ঠ তার দেহ, চওড়া হাড়, ছাড়ালো গড়ন, বলবান পুরুষের মতো তার স্বাস্থ্য। সে যেন বন্য বর্ব্বর দেশের মরুচারিণী মেয়ে। তার প্রতি পদক্ষেপে ঘরের মেঝেটা কাঁপতে লাগল। আমি কুণ্ঠিত হয়ে গেলাম।

মা বললেন, বাইরে জল আছে, হাত পা ধুয়ে এসে বসো বাবা। আলোটা ধর্ ত কালাচাঁদ?

আহারের পালাটা প্রথম দফায় সাঙ্গ হোলো। এটা ভূমিকা। আসল আহারটা বাকি। বাইরে এতক্ষণে ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি সুরু হোলো। গ্রাম এর মধ্যে নীরব হয়ে গেছে। গাছপালায় জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

হেমন্ত রেকাবে ক'রে পান এনে কাছে ধরল। বললাম, পান ত খাইনে? আপনার জামাইবাবুকে দিন্।

খান্ না কেন শুনি?

খাওয়াটা অভ্যাস করিনি।

বন্ধুর শ্বশুরবাড়ীতে এলে অনেক অভ্যাসই ভাঙতে হয়। ধরুন।

প্রতিবাদ করবার সাহস নেই। পরের বাড়ী ব'লে নয় কিন্তু আমার চেয়ে তার শারীরিক শক্তি অনেক বেশি।

জগদীশের মতো আমিও একটা পান তুলে নিলাম। আমার বিপন্ন অবস্থায় জগদীশের মুখ চোখ খুসিতে ভ'রে উঠেছে। কিন্তু আমি খুসি হলাম না। সংসারে এমন আত্মীয়তা আছে যা মানুষকে উৎপীড়ন করে, তার রুচি এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে অসম্মান করে, তার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করে। এ আত্মীয়তায় আমি সন্তুষ্ট হইনে। এমন ঘটনা নিত্যই দেখতে পাই, এমন মেয়েদের অনুরোধ প্রায়ই আদেশ হয়ে দাঁড়ায়। সম্মান এবং প্রীতির সম্পর্কটা অবশেষে প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে ওঠে। প্রতিজ্ঞা করলাম, রাত্রি প্রভাতে প্রথম সুযোগে আমি এদেশ ত্যাগ ক'রে যাব।

এতক্ষণ কাট্‌ল। এবার কিছু সহজ হতে পেরেছি। আস্তে আস্তে উঠে আমি বাইরে এলাম। আশ্চর্য্য, পিছনে পিছনে হেমন্তও উঠে এল। বললে, আপনি তামাক কি সিগারেট কিছু খান্? আনিয়ে দেবো?

ওসব আমি খাইনে।

ও, আপনি আড়ালে যাচ্ছেন দেখে আমার কিন্তু তাই মনে হয়েছিল। দেখবেন, নতুন জায়গা, হোঁচট খেয়ে পড়বেন না যেন।—ব'লে সে আবার গিয়ে বসল।

পথ চিনে চিনে আমি নীচে নেমে এলাম। এবার ভালো লাগছে। খানিকটা একাকী থাকার সুযোগ না দিলে আমি নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হই। এ বাড়ীটা প্রকাণ্ড। কতগুলো দালান আর কতগুলো মহল, অব্যবহৃত ঘরের সংখ্যাই বা কত, স্থায়ীভাবে কয়েকদিন না থাকলে এর হদিস পাওয়া যায় না। এতগুলি লোকজন দেখা গেল, তারা যেন এই রহস্যপুরীর অতল তলে কোথায় তলিয়ে গেছে। এদিকটায় জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। বড় একটা গাছের শিকড় উঠান থেকে দালানের একটা কোনে উঠে এসেছে। মাটি আর শিকড়ের এক প্রকার ভিজা বন্য গন্ধ বাতাসে থম্‌থম্ করছে। পোকামাকড়ের টুক্-টাক্ আওয়াজ কানে আসছে। একে মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণের রাত, তার উপর গাছের ছায়া, অন্ধকারে এদিকটায় যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। তবু ভালো লাগছে, তবু যেন মুক্তি পেয়েছি। আমি যেন কী ভাবছিলাম, কি যেন ভাববৈলক্ষণ্য ঘটেছিল, তার থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পেরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌ছি। হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেয়ালটা ছুঁলাম, ঠাণ্ডা, হিম। দেয়ালটা পর্য্যন্ত অন্ধকার, কত উঁচু কে জানে, সেও যেন রহস্যপুরীর অন্ধ প্রহরীর মতো আপন কর্ত্তব্য নিয়ে দণ্ডায়মান।

রাত্রির আহারের পর নিচের একটা বড় ঘরে আমাদের শোবার জায়গা নির্দ্দিষ্ট হোলো। কালাচাঁদ আর হেমন্ত দুজনে মিলে কোমর বেঁধে সেই রাত্রে সেই বহুদিনের অব্যবহৃত ঘরখানা ঝেড়ে মুছে ভদ্রলোকের যোগ্য ক'রে তুল্‌ল। খাট এল, বিছানা এল, জলের কুঁজো এল। তারপর নতুন ধোয়া মশারি এনে হেমন্ত নিজের হাতে টাঙিয়ে দিল। জগদীশ হেসে বললে, এত আদর অভ্যর্থনা সবই অপাত্রে পড়ছে, কি বলো হেমন্ত?

হেমন্ত বললে, ঠিক বলা যায় না জামাইবাবু, পাত্রের গুণ কি পাত্র নিজে জানে?

তবে ভাই এখানেই থেকে যাই বাকি জীবনটা। গরীব ব্রাহ্মণ, কোথায় আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবো। কি বল সোমনাথ?

বললাম, কাল সকালে ক'টার গাড়ী?

হেমন্ত হাত থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে তাকাল। তারপর বললে, খেয়ে পেট ভরেনি আপনার সোমনাথবাবু?

ভরেছে বৈ কি।

তবে রাগ করছেন কেন?

রাগ?—হেসে বললাম, রাগ করব কেন? কালকে যাবার কথা শুধু বলছি।

কাল?—হেমন্ত হেসে ঘরখানা চুরমার ক'রে দিল, তারপর আলোটা রেখে পুনরায় বললে, এটা তবে জ্বালিয়েই রাখবেন জামাইবাবু। আজ আসি।—তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, কালকের কথা কালকে। আজ এখন ঘুমোন্ ত? একেবারে জলে পড়েননি। এই ব'লে সে চ'লে গেল। জগদীশ দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।

বৃষ্টি আবার নাম্‌ল। আজ জলের শব্দটা পর্য্যন্ত যেন অদ্ভুত লাগছে। পাখীর ডানা ঝাপটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, জানিনে সে পাখীটা কেমন! জলের এমন আর্ত্তনাদ কখনো শুনিনি। এমন বর্ষা—এমন বর্ষা আমার জীবনে কখনো নামেনি। জান্‌লায়, দরজায়, দেয়ালে, বাইরের দিক দিগন্তে, আমার বিছানায়, জগদীশের

দলে দলে যেন বর্ষা নেমেছে। আমার সর্ব্বশরীরে শ্রাবণ যেন থেকে থেকে ফুঁপিয়ে উঠ্‌ছে। বর্ষা আমাকে অভিভূত ক'রে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে চোখ বুজে থেকে জগদীশ একসময় বললে, হেমন্তকে আগে তুই দেখিসনি, নয়?

জলে যেন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। অতি কষ্টে বললাম, দেখিনি তাই বাঁচোয়া, এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

কেন রে?—জগদীশ একটু হাসল।

বললাম, ভয় করে ওকে দেখলে। পাঠান মুলুকের মেয়ে, এদের সঙ্গে আমাদের খাপ খায় না।

কিন্তু রূপ?

রক্ষে করো ভাই। এমন মেয়ে দেখলে পৌরুষ আসে সঙ্কুচিত হয়ে।

হেমন্ত বড় ভালো মেয়ে রে!—ব'লে জগদীশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার চুপ ক'রে রইল। বলতে ইচ্ছা হোলো তোমার ভালো তোমার কাছেই থাক্, আমাকে বিদায় দাও। কিন্তু কথাটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাবে, তাই চুপ ক'রে রইলাম।

মুখ বুজে কেবল মেয়েরাই এতকাল কাটিয়ে দিতে পারে, দেখছিস ত?—জগদীশ বলতে লাগল, আমারই মতো এক হতভাগ্যের হাতে ও পড়েছিল, সে ছোকরা সন্নিসি হয়ে বেরিয়ে গেছে আজ সাত বছর।

এমন মেয়ের স্বামী সন্নিসিই হয় জগদীশ। তুমি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করবার চেষ্টা ক'রো না ভাই। তোমার ছেলের এই অসুখ, তার কথাই এখন ভাবো।

জগদীশ আর কথা বললে না, বোধ হয় একটু আহত হয়েছে। স্নেহসিক্ত মন তার, তাই অভিমান বাজল। তার মতো মানুষের হৃদয়েও যে কোমলতা স্থান পায়, সেও যে এই বর্ষার গভীর রাত্রে ছেলেমানুষের মতো সুলভ হৃদয়াবেগের প্রশ্রয় দেয় এজন্য আমি অধিকতর নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম। বললাম, অনেক আছে, অনেক আছে, এর চেয়ে অনেক বড় দুঃখ, বড় ব্যথা সংসারে রয়েছে। ভাতের জন্যে কান্না আর ভালোবাসার জন্যে কান্না, শুনে শুনে অরুচি ধরে গেছে। আর কি কিছু নেই কাঁদবার? সভ্য মানুষ আজো কাঁদবে অন্নক্ষুধা আর যৌনক্ষুধা নিয়ে? একটা মেয়ের দেহভোগী একটা পুরুষ পালিয়ে গেছে ব'লে তুমি—জগদীশ চক্রবর্ত্তী—তোমার মতো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কাঁদবে তার সেই পাশবিক দুঃখে?

তা নয়। ব'লে জগদীশ এদিকে মুখ ফিরাল, বললে, তা নয়। কিন্তু একটা জীবন যে শুকিয়ে গেল, তার সব সম্ভাবনা যে স্তব্ধ হয়ে গেল,—যাকে বলে, কুঁড়িতে বিনষ্ট হওয়া,—নিরর্থক হবার দুঃখটা যাবে কোথা?

কে বলে এমন কথা? সন্তান হলেই সার্থক হোতো?

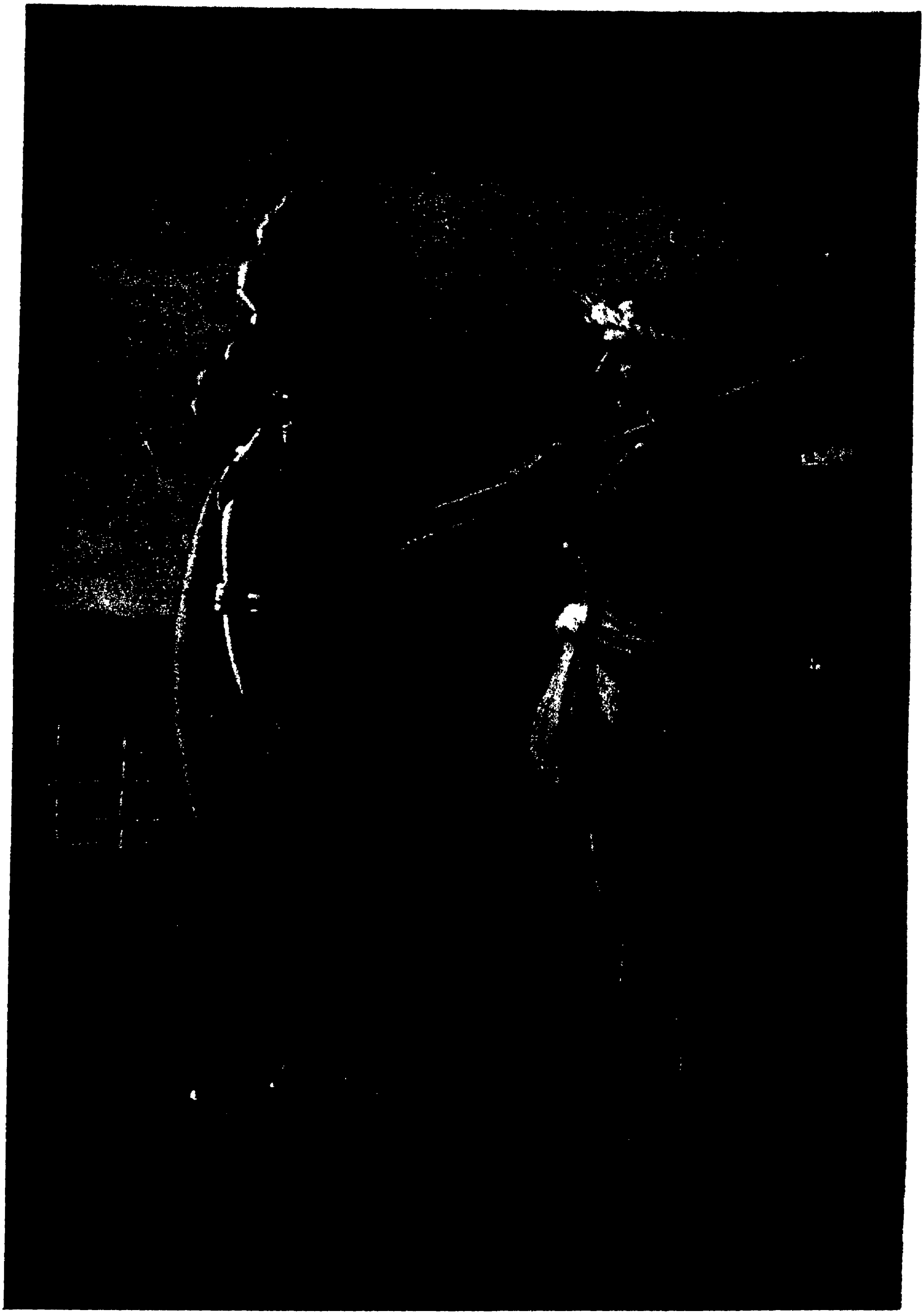
অনেকটা তাই, এই তাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। কিন্তু এখানে অন্য কথা। হেমন্তর গর্ভে হয়ত জগতের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ জন্মাতে পারত। উপকৃত হতে পারত পৃথিবীর মানুষের সমাজ।

হয়ত পারত না, হয়ত আমাদের মতো অকর্ম্মণ্যের দল বাড়ত, কে জানে। কিন্তু হেমন্তর ব্যক্তিগত কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী হতে পারল না এ দুঃখ তার থাকবে কি জন্যে? তার সুমুখে কি বৃহৎ জীবন প'ড়ে নেই? বৃহত্তর মুক্তির পথ সে কি বেছে নিতে পারে না? চলে যে গেল তাকে হতভাগ্য বলে বর্ণনা করছ, কিন্তু এমনো হতে পারে ত, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা নিয়ে সে-ছোকরা সংকীর্ণ সংসার থেকে মুক্তি নিয়ে গেছে? ও জগৎটার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই জগদীশ, সব পেয়েও মানুষ সর্ব্বত্যাগী হয় কেন, আত্মার সাধনায় কেন সে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে, কেন ছোটে অনির্ব্বাণ আলোর নেশায়, কেন মানুষ হয়ে অতিমানুষ হবার দুর্ব্বার যোগ-সাধনায় সে আত্মসমাহিত হয়, এ আমরা জানিনে।

গলার আওয়াজে সকাল বেলা ঘুম ভাঙল। চোখ চেয়ে দেখি, হেমন্ত। ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠে বসলাম। পাশে জগদীশ নেই। মশারিটা তোলা। হেমন্ত হেসে বললে, ধন্য ঘুম। পরের বাড়ী পেয়ে কি এমনি করেই নিশ্চিন্তে ঘুমোতে হয় সোমনাথবাবু?

ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমি,—কিন্তু লজ্জায় আমি আর মাথা তুলতে পারলাম না।

হেমন্ত বললে, সকাল বেলা উঠে ট্রেণ ধরবার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন? কাল মণিব্যাগটা কোথায় রেখেছিলেন মনে পড়ে?



"ফেরার পথে"

শিল্পী—শ্রীযুক্ত শিবপদ ভৌমিক

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

ব্যস্ত হয়ে বললাম, কেন, আমার জামার পকেটে ?

আজ্ঞে না মশাই, পড়েছিল সিঁড়ির ধারে, সকালবেলা কুড়িয়ে পেলুম। যাবার দিনে চেয়ে নেবেন।

আজ কি আমাদের যাওয়া হবে না ?

বন্ধুর ছেলের এই অবস্থা দেখে যেতে মন উঠবে ?

শয্যাত্যাগ ক'রে উঠে বললাম, আমাদের মায়া দয়া বড় কম। হয়ত আমার আগে জগদীশই যেতে চাইবে। কোথায় গেল সে ?

হেমন্ত বললে, তিনি এ গ্রামের জামাই। সকালবেলা নানা লোক এসে তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

এরই মধ্যে হেমন্তর স্নান হয়ে গেছে। আজ সকালের আলোয় স্পষ্ট ক'রে তাকে দেখলাম। চুল সে বাঁধে না। কাল বাঁধেনি, আজও তার সেই রাশিকৃত চুল খোলা। চুলগুলি ভিজা কিন্তু রুক্ষ, কোথাও তার মধ্যে চিরুণীর দাগ নেই। মুখখানা বড়, বড় বড় চোখ, বড় নাক, বিস্তৃত ওষ্ঠাধর। সুন্দর ও দীর্ঘ তার দুখানা হাত, আঙুলগুলিও দীর্ঘ এবং ততোধিক সুন্দর।

রূপবর্ণনাটা করলাম মনে, মুখে বললাম, আপনি গেরুয়া রংয়ের কাপড় পরতে ভালো বাসেন ? কালও দেখেছি, আজও—

হেমন্ত বললে, হঁ্যা, আমার সব কাপড়ই এই। আসুন এখন, স্নান ক'রে আসুন, কালাচাঁদ যাচ্ছে সঙ্গে। জলখাবার তৈরি হয়ে রয়েছে।

এত সকালে আমার স্নান করা অভ্যাস নয় কিন্তু।

সকাল ? বেলা ন'টা বাজে যে। ও কথা বললে আমি শুনব না। ডেকে দিই কালাচাঁদকে।—এই ব'লে হেমন্ত বেরিয়ে চ'লে গেল।

কাপড় চোপড় আমরা সঙ্গে আনিনি কিন্তু কিছুরই অভাব ঘট্‌ল না। যথাসময়ে সবই হাতের কাছে পাওয়া গেল। মা পড়লেন পর্দ্দার আড়ালে, আজও তিনি এ বাড়ীর বউ, তাঁর উচ্চ বাচ্য কম, আদর অভ্যর্থনা যা কিছু সবই হেমন্তর হাতে। সে অতিরিক্ত স্পষ্ট। সবাই এসে তাকেই খোঁজে, সব ব্যবস্থার ভার তার ওপর। তার গলার আওয়াজটাই এ বাড়ীর সকলের কণ্ঠকেই ছাপিয়ে ওঠে। অবাক হয়ে দেখলাম, কোনো মুহূর্ত্তেই তার বিশ্রাম নেবার সময় নেই।

এক সময় আবার সে ঘরে এসে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বাবুর অবস্থাটা কেমন মনে হচ্ছে আজ ?

হেমন্ত বললে, মন্দর দিকে যাচ্ছে না এটা বেশ বোঝা যায়। আপনার আর কি বলুন, মায়া দয়ার ত ধার ধারেন না !

গলার আওয়াজটি তার মিষ্ট। সকলের চেয়ে ভালো লাগে, তার চোখে ও মুখে কোথাও ছলনা নেই। পুরুষের মনে কারণে ও অকারণে মোহ সঞ্চার করবার যে প্রকৃতি মেয়েদের ভাবভঙ্গীতে লক্ষ্য করা যায়, সে-বস্তু এর মধ্যে নেই। এর যে আবেদন সেটি সহজ সরলতার। কিন্তু একটি কারণে আমি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হচ্ছি। সে আমাকে খানিকটা নির্বোধ ও স্নেহভাজন ব'লে ঠাউরে নিয়েছে। সে যেন অনেক বড় আমার চেয়ে। আমি যা বলি তাই সে সস্নেহ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসিমুখে শোনে। যেন কোনো শিশুর কথা সে শুন্‌ছে। এটা বড় লাগে।

বললাম, ও কথাটায় যে আপনি দুঃখিত হবেন তা আমার মনে হয়নি। মায়া দয়া আর কেমন ক'রে থাকবে বলুন, আমাদের জীবন বড় দুঃখের।

তাই নাকি ?—হেমন্ত হেসে উঠ্‌ল, আপনার চেহারার কোথাও দুঃখের চিহ্ন নেই কিন্তু। বিয়ে করেছেন ?

স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। এমন অশোভন জবাব আমি প্রত্যাশা করিনি। এর কাছ থেকে সহানুভূতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করায় মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। আমার দুঃখের এমন কদর্থ—এ কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই সম্ভব। নিতান্ত সৌজন্যের অভাব ঘটবে তাই উত্তর দিলাম, বিয়ে সবাই করে না।

বোধ হয় খানিকটা সময় তার হাতে ছিল। চৌকির উপর ব'সে এক একটি পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট প্রশ্নে সে আমার সমস্ত পরিচয় জেনে নিল। সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। এমন ভঙ্গীতে কথা বলিনি যাতে আমার কোনোরূপ হৃদয়াবেগ প্রকাশ পায়। তবু বার দুই তার চোখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল, সে হাসিতে বিদ্রূপ জড়ানো। একপ্রকার শক্ত বাঁধনে তার মন বাঁধা, সেখানে উচ্ছ্বাসের ঠাঁই নেই।

এক সময় সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি খেতে বেশি ভালোবাসেন ?

আমি ? কেন বলুন ত ?

এমনি জিজ্ঞেসা ক'রে রাখি। যা ভালো লাগে আপনার তাই খাওয়ানোই ত আমার কাজ।

হেসে বললাম, এমন বাধ্য বাধকতা ত থাকার কথা নয়!

আছে বৈ কি, আপনি যে আমাদের অতিথি। জামাই-বাবুর কথা ছেড়ে দিন্, আপনার দেখা কি আর সচরাচর পাওয়া যাবে?

উত্তরটা ছিল খুব সহজ, কিন্তু আত্মসংযম করলাম। সুলভ আত্মীয়তা করাটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নারীর এমন আগ্রহে পুরুষ খুসি হয়, তাদের আত্মাভিমান স্ফীত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে বাধে স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কাছে আতিথ্য নেওয়াটা। যা কিছু সাধারণ, যা কিছু চল্‌তি তার প্রতি আমার নিষ্ঠুর অবহেলা। যা আমার জানা, যা আমার বোধের মধ্যে আছে তারই একটা অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি আমি নিজ জীবনে প্রতিফলিত দেখতে চাইনে। সংসারে বহু সংখ্যক হেমন্তর ইতিহাস আমার জানা আছে। এমনি তাদের কথা, এমনি হাসি, এমনি আগ্রহ আর চাল-চলন। চিরপুরাতনকে চাই চির নূতনের রূপে, অসাধারণ অভিনবত্বে তার আবির্ভাব হোক।

চুপ ক'রে আছি দেখে হেমন্ত বোধকরি একটু আহত হোলো। বললে, উত্তর দিলেন না যে? এখানে বুঝি আপনার ভালো লাগছে না?

বললাম, ভালো লাগছে কিনা বলা কঠিন। ভালো লাগবারো হয়ত কিছু নেই কিন্তু চ'লে গেলেও হয়ত ভালো লাগবে না।

হেমন্ত আমার হেঁয়ালি শুনে হাসল। বললে, কি রকমটি থাকতে পারলে আপনি খুসি হন্?

তাই কি জানি?

তবে আমিই জানবার চেষ্টা করব।—ব'লে হেমন্ত চলে গেল।

তুমি জানবার চেষ্টা করবে? মন উঠল হেসে। তুমি কে? আজ আছো কাল নেই! এই ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ আর আতিথেয়তা, এই মন ভুলানো রঙিন মেঘ, এর মূল্য কি আমার জীবনে? আমাকে তোমার এই সামান্য ভালো-লাগাটুকু, এর জন্মবৃত্তান্ত ত জানি! তুমি আমাকে চাওনা, একটি অবলম্বনকে মাত্র তোমার প্রয়োজন। প্রাণের ঐশ্বর্য্য রাখবার মতো পাত্র তোমার নেই, হায় কাঙালিনী, তুমি একটি উপলক্ষ্যকে পেয়ে খুসি হয়ে উঠেছ।

কিন্তু এই ত জীবনের চেহারা! এর চেয়ে কী বেশি আর পাওয়া যায়! সামান্য স্নেহ আর প্রীতি, সামান্য সেবা আর সাগ্রহ, মানুষ ত এই নিয়েই খুসি। আমি? আমিও দুর্ব্বল। আমিও কোথায় যেন প্রত্যাশা ক'রে আছি, এই মেয়েটি আরো কিছু বলুক। আমার কানে ঢেলে দিক্ তার মধুরতম ভাষা, সুমুখে এসে দাঁড়াক্ তার মধুরতম রূপ নিয়ে। অসীম প্রত্যাশাই পুরুষের প্রকৃতি, অনন্ত আশা। কিছুই আমি চাইব না, যদি চাই সব চেয়ে বেশি চাইব। আমার বৈরাগ্য সন্ন্যাস নয়, দুরন্ত কামনার রূপান্তর। আজ তাই চোখ, কান, মন খুলে রেখে বসে আছি।

এমন সময় জগদীশ এসে ঘরে ঢুক্‌ল। সজাগ হয়ে তার দিকে তাকালাম। হাতে পায়ে তার কর্ম্মব্যস্ততা। জামাটা খুলে সে বিছানায় ছুড়ে রাখল। তারপর বললে, অনেক ভক্ত জুটে গেল গ্রামে, আমি যে জনপ্রিয় হতে পারি এ জানতুম না।

বললাম, কি রকম?

দেখিয়ে দেবো বিকেলবেলা, আসবে সবাই। ওদের লাঞ্ছিত ক'রে ওদের খুসি করেছি। জেল্-ফের্‌তা মডার্ণ্ নেতা আমি। একটি ভক্ত চুপি চুপি বলেছে, টাকার একটা তোড়া আমাকে উপহার দেবে।

তুমি সব জায়গায় এমনি লোক ঠকিয়ে বেড়াতে চাও? তোমাকে কী গুণে দেবে শুনি?

গুণ ত নয়, কৃতিত্ব। কৃতিত্বের দাম। আর ঠকালুম কোথায় বল্, এ ত ভক্তের পূজা-নিবেদন। চুপ, তোকেও কিছু ভাগ দেবো।

চুপি-চুপি তৎক্ষণাৎ বললাম, কত দেবে জগদীশদা?

পাঁচ টাকাও যদি পাই আড়াই টাকা তোর।

দেবে ত ঠিক?

মাইরি।

এমন সময় হেমন্ত এসে ঢুক্‌ল। বললে, আর দেরি নয়, এবার আসুন, ঠাঁই করা হয়েছে।

জগদীশ বললে, দাঁড়াও হেমন্ত, আচ্ছা বলো ত, এই ছোক্‌রাকে তোমার ঠিক কেমন মনে হয়?

হেমন্ত কিয়ৎক্ষণ নীরবে আমাদের দিকে তাকাল, তারপর হেসে বললে, আমিও তাই ভাবছি জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে মেশেন কিনা এই যা ভয়।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম। হেমন্ত পুনরায় বললে, এখন খাবেন আসুন, খাওয়া-দাওয়ার পর ভালমন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাবে।

আমি আর জগদীশ তার অনুসরণ করলাম।

বড় একটা দালানে আসন পাতা হয়েছে। দুখানা বড় বড় থালায় আহারের অপরিমেয় উপকরণ দেখে মুখ দিয়ে আমাদের আর কথা সর্‌ল না। আয়োজন বটে। এই প্রকাণ্ড বনেদি পরিবারের সঙ্গে এই আয়োজনের একটি ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। আজ দালানের চারিদিকে জনতার জটলা দেখতে পাওয়া গেল। এ বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধবনিতা এসে জড়ো হয়েছে। এতগুলো চোখের সুমুখে আহার করতে হবে ভেবে থতিয়ে গেলাম। জগদীশের শাশুড়ী মাথায় ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে। তিনি এ বাড়ীর বউ।

পাশাপাশি দুজনে গিয়ে বসলাম। জগদীশ ফস ক'রে বললে, এ যে ফাঁসীর খাওয়া, করেছ কি হেমন্ত?—তারপর মুখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে বললে, এই ক্ষুধার্ত্ত জনতার জন্য প্রসাদ রাখতে হবে নাকি?

ওকি জামাইবাবু, ওঁরা যে সবাই আপনার গুরুজন?

ও, তা বটে। তাহলে ওঁরা আগে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিন্‌, আমরা প্রসাদ পাই।—তারপর আবার জগদীশ হেসে তাদের দিকে তাকাল,—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, এবার অনুমতি করুন, অন্নগ্রহণ করি।

বসুন বসুন, বসো বাবা বসো, বসো হে—প্রভৃতি শব্দের ভিতর দিয়ে আমরা আচমন ক'রে ভাত নিয়ে বসলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বিদ্রূপেও তারা স্থানত্যাগ করলে না।

এই সময় একবারটি হেমন্তর সঙ্গে আমার চোখচোখি হোলো। হবামাত্র হেসে সে কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, ভয় কি, এই ত আমি আছি। লজ্জা ক'রে খেয়ো না ভাই, এ তোমার নিজের বাড়ী।

হাতখানা আমার অবশ হয়ে থেমে গেল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম। নিজের বাড়ী নয় একথা সেও জানে, কিন্তু ভিড়ের মাঝখানে সবাইকে শুনিয়ে আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে তাকে দিল? কোনোমতে আহারে প্রবৃত্ত হলাম বটে কিন্তু মনটা রি রি ক'রে জ্বলতে লাগল। একটিমাত্র কথায় সে আমাকে ছাড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াল। বড় হয়ে ওঠবার জন্য তাকে কষ্ট করতে হয় না, আমার চেয়ে সে দেখতে বড় একথা সবাই স্বীকার করবে। হ্যাঁ, সবাই স্বীকার করবে কিন্তু আমি নয়। বয়স তার আমার চেয়ে কম এ আমি জানতে পেরেছি। শুধু কি তাই? আঘাত লাগে যে আত্মাভিমানে! আমার সঙ্গে তুলনায় আমারই চোখের সুমুখে কোনো স্ত্রীলোক বড় হয়ে উঠবে, শিক্ষিত পুরুষের মনের কাছে এ অসহ্য!

আবার আহারে বসলাম কিন্তু রুচি চ'লে গিয়েছিল। হেমন্ত আমাদের সুমুখে বসে আমাদেরই গায়ে বাতাস করছে। মাথার খোলা চুল তার মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে, চুলগুলি অনেকটা তাম্রবর্ণ। পরণে তেমনি গেরুয়া। আপন যৌবন সম্বন্ধে সে অবশ্যই সচেতন কিন্তু বিশেষভাবে নয়। যদি বা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় তবে সে এমন কিছু লজ্জিত হবে না। প্রথমত আমাকে সে ছেলেমানুষ ব'লে ধরে নিয়েছে, দ্বিতীয়তঃ আমরা তার অনাত্মীয় নই। এতেও আমি আহত হই। পুরুষ ব'লে আমাকে সে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনবে না, একি স্পর্দ্ধা! আমার কাছে তার লজ্জা করবার কিছু কি নেই?

জগদীশ আপন মনে গিল্‌ছে। বাস্তবিক, ক্ষুধার চেহারা বোধ করি এমনিই। এমনি অন্ধ ও করুণ। জগদীশ বহুদিন এমন আনন্দে খেতে পায়নি। এই সময় আর একবার মুখ তুলে বললাম, থাক্‌ থাক্‌, আর বাতাস করবেন না।

করব না? মুখে যে রক্ত ফেটে পড়ছে!· তুমি ভাই ভারি লাজুক। দেখো ত জামাইবাবুর কাণ্ডটা!

জগদীশ বললে, পাখী যখন খায় তখন ডাকে না। সত্যি, আহারের আনন্দ এমন অনেককাল পাইনি, স্বর্গীয় পিতার নাম পর্য্যন্ত ভুলে গেছি!

হেমন্ত হেসে উঠ্‌ল। শুদ্ধ ভাষাটা উপস্থিত যারা বুঝলো তারাও মুখ চাওয়াচায়ি ক'রে হাসল। আমি তাকালাম হেমন্তর দিকে। নিমেষমাত্র, কিন্তু একান্ত ক'রে আজ তার চোখ দুটি দেখতে পেলাম। কালো চোখ?

শরৎ শেষের আকাশ কি কালো? এমনি গভীর চোখ ছিল আমার স্বপ্নে! সে এত চঞ্চল, এত কর্ম্মব্যস্ত, কিন্তু কে বলে, চোখের দৃষ্টিও তার অস্থির? এমনি চোখের চিত্র আঁকা ছিল আমার প্রাণের পটে। হ্যাঁ, এমনি। কবে মনে মনে এই চিত্র এঁকেছিলাম জানিনে। হয়ত জনবহুল নগরীর কোনো এক প্রান্তে, হয়ত কোনো রেল-ষ্টেশনে, হয়ত কোনো নদীর ধারে। আদর্শ সুন্দরীর একটা রূপ পুরুষের মন কল্পনা ক'রে রাখে। আমিও রেখেছিলাম। তারই একটা লক্ষণ মিলে গেছে হেমন্তর চোখে। সেই চোখের গভীরতম ভাষায় আমারই প্রাণের একটি সুদূরতম ঐক্য খুঁজে পেলাম।

আহারান্তে সেদিন জগদীশকে সবাই টানাটানি ক'রে নিয়ে গেল। আমি গিয়ে বসলাম বাবুর বিছানার পাশে। কপালে হাত দিয়ে তার জ্বর পরীক্ষা করলাম। ডাক্তার বলেছেন, একুশ দিনে জ্বর ছাড়বার সম্ভাবনা। তার আর দুদিনমাত্র বাকি। সেবা ও যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই।

ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে দিনগুলো কেমন ক'রে কাটছে। চ'লে যাবার তাগিদটা মন থেকে কিছু কমে গেছে, কিন্তু কেন? এটা কিসের নেশা? এই যে উন্মুখ কৌতূহল নিয়ে দরজার দিকে চেয়ে বসে রয়েছি, একি আমার নূতন রূপ? আমি ভাবতে পারিনে, একান্ত নিঃসঙ্গ না হলে আমার মন কথা কয়না। যেমন নদী নেমে আসে নিম্নগামী পথে, কোরক যেমন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ফুল হয়ে ফোটে, সন্ধ্যার তারা যেমন আত্মপ্রকাশ করে স্বাভাবিক গতিতে, আমিও তেমনি। পিছনে আমার রয়েছে একটি অলক্ষ্য নিয়তি। বিচার করব, বিশ্লেষণ করব, সমালোচনা করব, কিন্তু নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে আমাকে হবেই। দাঁড়াবার উপায় নেই, বাধা দেবার সাধ্য নেই, মান্‌তে তাকে হবেই হবে।

দ্রুতপদে হেমন্ত এসে ঘরে ঢুক্‌ল। চমকে উঠি, ভয় পেয়ে যাই। ঘর কাঁপে তার পায়ে। সোজা হয়ে বসলাম। প্রথমে সে কথা কইল না, সময় ছিলনা কথা বলবার। দ্রুত সে থার্ম্মমিটারটা বা'র করে ঝেড়ে বাবুর হাতের তলায় গুঁজে দিল, তারপর ওষুধ ঢেলে তার মুখের কাছে ধ'রে বললে, খাও ত বাবা, লক্ষীটি, খেয়ে ফেলো ত? তিন মিনিট দেরি হয়ে গেছে, আমার হুঁস ছিল না।

ওষুধ খাইয়ে সে বাবুর মুখ মুছিয়ে দিল।

বললাম, আপনাদের এখনো খাওয়া হোলো না?

হোলো বৈকি, পোড়া খাওয়ার জন্যেই ত এই দেরিটুকু হোয়ে গেল। এই যাবার সময় ছানার জল খাইয়ে গেছি। —এই ব'লে হাতের তলা থেকে থার্ম্মমিটারটা নিয়ে বললে, দেখুন ত কত জ্বর?

পরীক্ষা ক'রে বললাম, একশো পয়েণ্ট্‌ চার।

কমে গেছে!—ব'লে আনন্দে ও স্নেহে হেঁট হয়ে সে বাবুর মুখের উপর একটি মৃদু চুম্বন করল। তারপর নিশ্চিন্তে সোজা হয়ে উঠে বসে সে পুনরায় বললে, ধন্য রাগী লোক আপনি। 'তুমি' ব'লে ডাকলে কি এত বড় অপরাধ হয়? কি ভাগ্যি যে লোকজনের মাঝখানে আমার পিঠে চড় চাপড়টা বসিয়ে দেননি?

হাসলাম। হেসে বললাম, লোকজনের মধ্যে 'তুমি' আর একলা থাকলে 'আপনি' এই বা কেমন?

একটা কারণ আছে পরে বল্‌ব। সবাইকে জানানো দরকার আপনি সত্যিই ছেলেমানুষ, নৈলে আপনার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা, মেলামেশা · এটা পল্লীগ্রাম, বুঝতে পারছেন ত?

বললাম, না। এমন বঞ্চনা অসহ্য।

অসহ্য আপনার, আমাদের নয়। আমরা মেয়েমানুষ। আপনি দুদিন বাদে থাকবেন না, আমাকে চিরদিন বাস করতে হবে।

বললাম, আচ্ছা, আপনি গেরুয়া কাপড় পরেন কেন?

ভালো লাগে তাই।

এ ত' অদ্ভুত ভালো লাগা? মেয়েদের বৈরাগ্য কি কেউ বিশ্বাস করবে?

কেনই বা করবে? বৈরাগ্য ত আমার নেই?

কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। এই নীরবতাকে সেই ভাঙ্‌ল। বললে, আমার স্বামীর কথাটা আপনার জানবার ইচ্ছে, কেমন? আমারো জানাবার ইচ্ছে। তিনি এই গ্রামেরই ছেলে। ছোট থেকেই তিনি অন্য মেজাজের লোক ছিলেন। ধরে বেঁধে লোকে তাঁর বিয়ে দিল। দিলে কি হবে, সংসার তাঁর সইল না। যাবার সময় তিনি আমাকে ব'লে গিয়েছেন, আমি তাঁকে বাধা দিইনি। বাধা দিয়ে সন্ন্যিসিকে আট্‌কানো যায় না।

কথার মধ্যে তার কোথাও দুঃখের সুর নেই। এ তার বিচার-বুদ্ধির কথা। এখানে সহানুভূতি প্রকাশের চেষ্টাটা বিড়ম্বনা। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এমন ক'রে এঘরে বসে কথা বলাটা সঙ্গত নয়। বললাম, কালাচাঁদ কোথায়?

কেন, কিছু চাই আপনার?

একটু খাবার জল চাইতাম।

ধড়মড় ক'রে হেমন্ত উঠ্‌ল। হাত ধুয়ে পরিষ্কার কাঁচের গেলাসে জল আন্‌ল। হাত বাড়িয়ে জল নিতে গেলাম, হেসে সে হাত সরিয়ে নিল। বললাম, বারে, দিন্?

না, দেবো না, আগে দিব্যি করুন?

হঠাৎ যেন ভূত চাপলো তার মাথায়। চেহারাটা তার গেল বদ্‌লে। হেসে বললাম, কিসের দিব্যি?

ব'লে দিতে হবে কিসের দিব্যি? আচ্ছা, আচ্ছা বলেই দেবো,—উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল হেমন্তর মুখ, ঘাম ফেটে পড়্‌ল তার কপাল বেয়ে, আগুনের আভার মতো সে দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল,—চেষ্টা করলে আপনিও বুঝতে পারতেন।

অকস্মাৎ তার হাতটা ফসকে গেলাসটা মেঝের উপর পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। জলে গেল বিছানাটা ভিজে। চমকে জেগে উঠ্‌ল বাবু। আমরা পরস্পর মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু সে কেবল একটি মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই ছুটে হেমন্ত বাবুর পাশে গিয়ে বসল। তার মুখে হাত বুলিয়ে বললে, ভয় কি বাবা, এই যে আমি···আপনি নিচে যান্, দিচ্ছি এখুনি আপনার খাবার জল।—দ্রুত নিশ্বাস পড়ছিল তার। সে হাসতে লাগল,—আমি নতমস্তকে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে গেলাম।

সারা বাড়ীটা যেন ভূমিকম্পে দুলছে। কোনোমতে নিচে নেমে এসে ঘরে ঢুকলাম। এমন আমার কখনো হয়নি, এ নতুন, এ অভিনব। নারীর যৌবন-চাঞ্চল্য আমি কখনো দেখিনি, কিন্তু এই কি তাই? অনেক চিন্তাই আমি জীবনে করেছি, অনেক অভিজ্ঞতার উপর দিয়ে ভেসে গিয়েছি, কিন্তু সত্য বলতে কি, স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসা প্রণয় ইত্যাদির কোনো চেহারা আমি কোনোদিন লক্ষ্য করিনি। 'প্রেমের' চিত্রটা ঠিক আমার জানা নেই। ওটাকে বরাবর এড়িয়েই এসেছি, কারণ, মনে হয়েছে, ওটা অতি সাধারণ, অতি সামান্য। আজ ধারণা কিয়ৎপরিমাণে বদলাতে হোলো। মানুষের সমস্ত জীবনকে চক্ষের নিমেষে ওলোটপালট করবার মতো এত বড় শক্তি আর নেই। তার হিতাহিতবুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক, আদর্শ, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত এই বস্তুটি অবাধে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এরই প্রভাবে দানব হয়, দেবতা হয়। পা কাঁপছে, প্রাণ কাঁপছে। আশ্চর্য্য, চোখ চেয়ে যা কিছু দেখছি সকলের ভিতর যেন একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। এই বাড়ীটা, ওই জান্‌লা, বাইরের গাছপালা, তাদের পিছনে শ্রাবণের মেঘময় দিন, সকলের চেহারা যেন আলাদা। আমি যেন নতুন ক'রে এদের ভিতর এসে পড়েছি। সব যেন আমার কাছে রহস্যময়, অপরিচিত, দুর্জ্ঞেয়।

কালাচাঁদ এসে দাঁড়াল, হাতে তার জলের গেলাস। হাত কাঁপছে, তবু তার হাত থেকে গেলাস নিলাম। সে বললে, আপনি একটু ঘুমোন, দিদিমণি ব'লে দিলেন। ওকি আপনার পায়ে···অত রক্ত ইস, কেমন ক'রে কাটলেন?

তাইত, চেয়ে দেখি মেঝেয়, তক্তার উপরে, আমার পায়ে রক্ত ছড়াছড়ি। কালাচাঁদ দ্রুতপদে চলে গেল এবং তার এক মিনিট পরেই ঝড়ের মতো হেমন্ত এসে ঘরে ঢুক্‌ল।

কেমন ক'রে কাট্‌ল?

বললাম, বোধ হয় গ্লাসের কাঁচে। থাক্, ব্যস্ত হবেন না।

হেমন্ত কাছে বসে জোর ক'রে আমার একটা পা টেনে নিল এবং তার বাঁ হাতের চুড়ি থেকে একটা সেফ্‌টিপিন্ খুলে ছোট এক টুক্‌রো কাঁচ সেই পা থেকে খুঁটে বা'র করল। তারপর শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা সুরু হোলো, সে চিকিৎসার পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রক্রিয়াগুলি যে কোনো অবিবাহিত যুবকের কাছে লোভনীয়। এতক্ষণে সহজ ক'রে হাসতে পারলাম। বললাম, আমার এই রক্তপাতের জন্য আপনার উত্তেজনাটা দায়ি, একথা মানবেন ত?

মুখখানি সে নিচু ক'রে রইল, সে-মুখ করুণ আর দুঃখিত। কিয়ৎক্ষণ পরে বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা আমি করব না, শাস্তিই দেবো। আপনার পরণের কাপড় ছিঁড়ে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিন্।

দিতে গেলে ত বাধাই দেবেন। ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে সে তাকাল। আরো যেন কিছু তার বলবার ছিল কিন্তু নীরবে হেসে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব'সে ব'সে আপন বক্ষস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। পৃথিবীর সব মানুষ এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। একা আমি জাগ্রত,

কোথাও এখন আমার মধ্যে নিদ্রা নেই, রন্ধ্রে রন্ধ্রে উৎসব জ্ব'লে উঠেছে, সব তন্ত্রী উঠেছে বেজে, শব্দের ঝঙ্কারে প্রবল কোলাহলে মন উঠেছে মেতে। এই বিশেষ একটা মুহূর্ত্ত আমার সমস্ত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, এই মুহূর্ত্তটির জন্ম এত আয়োজন, এত উদ্বেগ আর কৌতূহল। এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা।

মন রয়েছে সচেতন। চক্ষের নিমেষে এই চিত্তচাঞ্চল্যকে জয় করতে পারি, আমি অন্ধ নয়। দুর্নীতির চেহারাটা জানি, জানি তথাকথিত প্রেমের প্রকৃতিটা। আপন ক্রটি বিচ্যুতির দিকে আমার নির্লিপ্ত মানসচক্ষু জেগে রয়েছে, রাশ কতটুকু আল্‌গা হয়েছে আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে, কিন্তু আপন চিত্তের এমন অনির্ব্বচনীয় আলেখ্য এর আগে ত দেখিনি! এটা প্রেম নয়, এ যৌবনের রঙ। কে জান্‌ত আমার ভিতরে ছিল এত রঙ, এত রূপ, এত সঙ্গীত! আমার দেহে অদ্ভুত এক জ্যোতি, অদ্ভুত একটা আভা, অদ্ভুত আলো। প্রাণের উদয়াচলে যেন সোনার বর্ণ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে! হ্যাঁ, জানি প্রেমের তথাকথিত চেহারা। শুধু প্রেম, সে উন্মার্গগামীর জন্ম, সেটা যোগী তপস্বীর স্বপ্ন, তার মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে, কিন্তু আত্মহারা আবেশ নেই। শুধু প্রেম নয়, শুধু দেহ নয়, দুইয়ের সংমিশ্রিত রূপ, সে-রূপের তীর্থসঙ্গম যৌবনে। নীতি বড় নয়, রুচি বড়, সৌন্দর্য্য বড়।

শাদা পরিস্কার কাপড়ের টুক্‌রো ও এক বাল্‌তি জল নিয়ে হেমন্ত আবার ঘরে ঢুক্‌ল। তাকাল সে আমার দিকে। কী দেখ্‌ল সে আমার অনিমেষ চক্ষুতারকায়? তার নিজেরই ছায়া? কাছে এল, বসল মেঝের উপর, সযত্নে টেনে নিল আমার পা, বাঁধতে লাগল কাপড়ের টুক্‌রোটা। কী যেন প্রশ্ন করলে সে। সাড়া দিলাম না। আমি অবশ, অচেতন, পাথর, বরফ। কী উত্তর দেবো? প্রশ্ন শুনলাম, তাকে শুনলাম, তাকে অনুভব করলাম। তার চোখ, মুখ, আঙুল, সব যেন কথা কইছে। উত্তর না পেয়ে সে উঠ্‌ল। বাল্‌তির জল নিয়ে ঘরের ভিতরকার রক্তের চিহ্নগুলি ধুয়ে পরিস্কার ক'রে দিল।

হঠাৎ মনে পড়ল এমন অক্লান্ত সেবা জীবনে পাইনি, এমন আন্তরিক, এমন প্রাণময়। অনন্তকাল ধ'রে এই মেয়েটি যেন নিঃশব্দে আমার সেবা ক'রে চলেছে; আহার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, আগ্রহ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে আমাকে যেন পরিপ্লাবিত করেছে, আমাকে মূল্যবান করেছে, গৌরবান্বিত করেছে! এমন আপন জন, এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু আর কেউ নেই।

এমন কী জমা হয়ে আছে আমার পরমায়ুর পাতায়? কিছু না। কিছু পাইনি। শৈশবে মাতৃহীন। বোন একটিও নেই। পিতার বাৎসল্য অভিশপ্ত। গ্রাম বিমুখ। আর যা কিছু সব মৌখিক বোঝাপড়া, চুক্তি, বিনিময়। ভঙ্গুর কোনো কোনো সম্পর্ক আছে কারো কারো সঙ্গে, পরীক্ষায় তা টি'কবে না। ব্যথায় টন্‌টন ক'রে উঠ্‌ল বুক। কাঙাল যখন রাজৈশ্বর্য্য পায়, চোখ ফেটে তার কান্না আসে। কিছু পাইনি জীবনে, কিছুই ছিল না, হা হা ক'রে মরেছি। আজ মনে হচ্ছে তৃষ্ণায়-তৃষ্ণায় আমার বঞ্চিত আত্মা জ্বলে-পুড়ে গেছে। আদর্শবাদী নই, বাস্তবী নই, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ আমি। শূন্তকে নিয়ে এতদিন কাটিয়েছি, শূন্তে উড়িয়েছি মন, চিত্ত নিয়ে বিলাস করেছি। কত সান্ত্বনা, কত প্রলেপ, কত আবরণ—সমস্ত বিদীর্ণ ক'রে আমার বিদ্রোহী আত্মা চোখে মুখে কণ্ঠে বক্ষের স্পন্দনে নিজেকে প্রকাশ করছে, নিজেকে মুক্তি দিতে চাইছে।

কাছে এসে হেমন্ত দাঁড়াল। কাছে এলে একটি অপূর্ব্ব আনন্দে শরীর রোমাঞ্চ হয়। গন্ধ—একটি গন্ধ আছে তাকে ঘিরে, যেমন গন্ধ আছে বনপথের উদাসী বাতাসে, যেমন গন্ধ জ্যোৎস্নায়, যেমন গন্ধ পরিশ্রান্ত পথিকের দিবাস্বপ্নে। বললে, আপনাকে হয়ত বিরক্তিই করছি।

একি তার কণ্ঠস্বর! সে যেন জলে ডুবে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার গলার আওয়াজ বেরুচ্ছে না, স্বর ভেঙে পড়েছে। কাঁপছে তার গলা, কাঁপছে চোখ। পুনরায় বললে, বাবুর জ্বর আজ ছেড়েছে, মা শোবেন তাঁর কাছে। জামাইবাবু যাবেন বিষ্ণুপুরে, কাল ডাক্তার নিয়ে ফিরবেন।

আরো নিচে নেমেছে তার কণ্ঠ, আরো অস্পষ্ট। কিন্তু তার বক্তব্যটা অনুভব ক'রে এতক্ষণ পরে আমি কথা বললাম,—রাত্রে একলা থাক্‌ব এ ঘরে, ভূতের ভয় নেই ত?

যদি থাকেই, ভয় পাবেন কেন পুরুষ মানুষ হয়ে? কই, আমি ত ভয় পাইনে।—ব'লে হেমন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—ক্রমশঃ

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের সমস্যা

শ্রীরামেন্দ্রনাথ রায়

সরকার পক্ষ হইতে প্রায়ই বলা হয় যে, পৃথিবীব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের তুলনায় ভারতের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু খারাপ নহে ; এবং এ দুরবস্থায়ও ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। এ যেন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সান্ত্বনার বাণী ! স্যার চার্লস এলিয়ট্ বাংলার একজন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর ছিলেন। তাঁর মতে ভারতের প্রায় চা'র কোটি লোক প্রত্যহ অনাহারে থাকে। তাঁর সময় দেশের লোকসংখ্যা অনেক কম ছিল ; এখন লোক সংখ্যা অনেক বেশী, অথচ আর্থিক অবস্থা যতদূর শোচনীয় হইতে পারে হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনশনে কত কোটি লোক যে কাল কাটাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের লোকসংখ্যার চা'র ভাগের তিন ভাগ কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সকলেই জানেন যে কাঁচা মাল যে দামে বিকাইতেছে, তাহাতে চাষী তাহার উৎপাদন করিবার খরচও উঠাইতে পারিতেছে না,—লাভ ত দূরের কথা। ইহার উপর বেকারের সংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। আমাদের বাংলা দেশেই প্রায় পাঁচ কোটি লোক। তার মধ্যে দেড় কোটি লোক আয় করে এবং সাড়ে তিন কোটি লোক এই দেড় কোটি লোকের উপার্জ্জনের উপর জীবনধারণ করে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রতি ৪০ জন লোক বেকার হইলে ইহারা ছাড়াও ইহাদের মুখাপেক্ষী আরও ১০০ জন, অর্থাৎ মোট ১৪০ জন লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। এবং হইতেছেও তাহাই।

পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের যখন তুলনা করা হয় তখন অতি দুঃখেও হাসি আসে। তাঁরা বাঁচে গড়ে ৫০ বৎসরের উপর, আর আমাদের গড়ে ২৫ বৎসর পার হয় না। তাদের শতকরা একশ জনই শিক্ষিত, আর আমাদের ৫ জন। তারা মাথা-পিছু আয় করে মাসে প্রায় ১০০৲ আর আমাদের হয় ৪৲। তারা (বিশেষতঃ আমেরিকায়) মাথা-পিছু জীবন বীমা করে ২৫০০৲ আর আমাদের হয় ৫৲। তাদের দেশে কেউ না খেতে পেলে গভর্ণমেণ্টকে খাওয়াতে হয়, আর আমাদের দেশে না খেতে পেলে তার খোঁজও কেউ নেয় না,—তাকে জীবনের বাকী দিন কয়টি নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির আশাতেই কাটাতে হয়। এই ত আমাদের দশা। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় মহাত্মা গান্ধী যখন বিলাতে ছিলেন, তখন ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীরা তাঁকে মজুরদের পাড়ায় লইয়া যায় এবং উহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া বলে যে, ভারতে বিলাতী কাপড়ের বয়কটের ফলেই এইরূপ হইয়াছে। মহাত্মা কিন্তু শ্রমিকদের সুন্দর ও সুসজ্জিত বাড়ী-ঘর-দুয়ার দেখিয়া বলেন যে আমাদের দেশের সাধারণ বড় লোকেরাও ত' এ ভাবে থাকিতে পারে না। গত ১৯১৮ সালে আমি যখন জার্ম্মাণীতে গিয়াছিলাম, তখন জার্ম্মাণ বন্ধুদের মুখে প্রায়ই শুনতাম "আমাদের কি আর কিছু আছে, আমরা গত যুদ্ধের ফলে একেবারে গরীব হ'য়ে গেছি।" কিন্তু বার্লিন, মিউনিক্, ড্রেস্‌ডেন্ প্রভৃতি সহর দেখে আমার সর্ব্বদাই মনে হ'ত, যাদের সহরে এমন পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্যের ও ঐশ্বর্য্যের লীলাখেলা চ'লেছে, তারা যদি হয় গরীব, তবে আমরা, বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা ?

পাশ্চাত্য দেশের সমস্যা প্রকৃত পক্ষে অন্ন-সমস্যা নয়, তাদের হ'চ্ছে বিলাস-ব্যসন সমস্যা। অর্থ-সঙ্কটে জীবনযাত্রা প্রণালীর একটু খর্ব্বতা হইলেই তারা পাগল হ'য়ে ওঠে, গভর্ণমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হয়। আর, এই অর্থ-কষ্টের ফলে আমাদের দেশে যারা দু'বেলা খেতে পেত তাদের জোটে একবেলা, আর যাদের একবেলা জুটত তাদের হাঁড়ি আর সিঁকে থেকে নামে না। কিন্তু আমরা চিরদিন মূক, আজীবন দুঃখ কষ্ট স'য়ে স'য়ে বোধশক্তিও লোপ পেয়ে যাচ্ছে—সর্ব্ববিষয়ে নির্ব্বাক নির্লিপ্ত উদাসীন। তাই কেউ দেখেও দেখে না, জেনেও জানে না আমাদের অবস্থাটা কি। আমাদের বুকফাটা ক্রন্দনের ভাষা নাই, স্বর নাই, তাই বিশ্ববাসীর নিকট এ ক্রন্দন পৌঁছায় না। বোম্বাই কলিকাতার সৌধরাজি, মহারাজাদের মণি-মাণিক্য এবং সর্ব্বোপরি শাসনকর্ত্তাদের নিখুঁত আঁকা ছবি যে সব গল্প শোনায় তাতে, বিশ্ববাসী কেন, আমরাও হয় ত মুহ্যমানের মত কোন কোন সময় ভাবি, আমরা না জানি কোন্ পরীরাজ্যে বাস ক'রছি !

এই চির-দারিদ্র্যের কারণ কি ? উত্তর অতি সহজ। ভারতে শিল্প বাণিজ্য একরূপ নাই বলিলেও চলে,—সে নির্ভর করে শুধু কৃষির উপর। কি অদৃষ্টের পরিহাস ! যে কাঁচা মাল সে বিদেশীর নিকট এক টাকায় বিক্রী করে, তাহা হইতেই উৎপন্ন দ্রব্য আবার সে বিশ টাকায় ক্রয় করে। সুতরাং বন্যার জলের মত হু হু ক'রে ভারতের অর্থ বিদেশ ধাবিত হইতেছে। এই অর্থ নির্গমন রোধ ক'রে দেশকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় বড় বড় ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী প্রভৃতির স্থাপন এবং ইংলণ্ড জাপান প্রভৃতি দেশের প্রথায় ব্যবসায় পরিচালন। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে দেশবাসী এই সত্য এখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিকে তদনুযায়ী কর্ম্ম-প্রচেষ্টাও পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের উপযুক্ত শিক্ষা অভিজ্ঞতা এবং সংস্কার (tradition) আমাদের না থাকায়, অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তায় (imitation without assimilation) এবং অর্থ ও সহযোগিতার অভাবে সাফল্য এবং অগ্রগতি ত হইতেছে না, বরং, অঙ্কুরেই বিনাশের আশঙ্কা অনেক ক্ষেত্রে রহিয়াছে। এই প্রবন্ধে আমি এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

বিশ্বের আর্থিক ব্যাপার যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহা সাধারণে হয়ত অনুভব করিতে পারেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। গত বৈশাখের [illegible]

প্রকাশিত আমার "ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক পাঁচটি এবং ইহারা আন্তর্জ্জাতিক ব্যাঙ্ক জগতে প্রথম শ্রেণীর। ইহাদের এক একটির বার্ষিক লাভ (gross profit) হইত ৫২—৬ কোটি টাকা। খরচ-খরচা বাদে নিট্ লাভ (net profit) ৪২—৫ কোটি টাকা। সকলেই হয়ত জানেন, যে, গত ১৯২৯ সাল হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমাগত মন্দার দিকে যাইতেছে এবং দুনিয়ায় দারুণ অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আমি উক্ত পাঁচটি ব্যাঙ্কের বিগত কয়েক বৎসরের নিট্ লাভের হিসাব নিয়ে দিতেছি। উহা হইতে দেখিবেন যে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ক্রমাগত মন্দার দিকে চলিয়াছে।

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২
	পাঃ	পাঃ	পাঃ	পাঃ
বার্ক্লেস্ ব্যাঙ্ক	২,৩৩১,৫৮০।	১,৮২১,২০৭।	১,৭১৪,৮২৫।	১,৫৭৪০১৩।
লইড্স ব্যাঙ্ক	২,৫৪২০৮৪।	২,১২৯,৫১৬।	১,৯২৬,৯০৪।	১,৫৫০,৫১১।
মিড্ল্যাণ্ড "	২,৬৬৫,০৪২।	২,৩১৮,৬৮৯।	২,০৫৬,৯৮৬।	২,০১৯,১৪২।
ন্যাশানাল প্রভিঃ	২,১৮৯,৭০৪।	১,৯৩০,৮৫৪।	১,৭৪৭,০০৭।	১,৫৯৩,১৪২।
ওয়েষ্টমিন্ষ্টার "	২,১৬০,৩৮৪।	১,৮২১,৮৮৮।	১,৬০১,৮২২।	১,৪৯৫,১৭২।

এই দুরবস্থার কারণ কি? এ নিয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনীষী বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং প্রতীকারের উপায় স্থির করিতেছেন। বিষয়টি এত জটিল যে সাধারণের কাছে সহজে বোধগম্য হয় না। বিগত মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল দেশের লোকের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়—মূলতঃ সুখ সম্ভোগের উদ্দীপনা এবং তাহারই পরিপূরণের জন্ম কর্ম্মোদ্দীপনা। দশ বৎসর যাবৎ এই ভীষণ অস্বাভাবিক অবস্থা মানুষকে পাগলের মত ছুটাইয়াছে। সে মনে করিয়াছে যে চিরদিনই বুঝি এইভাবে কাটিবে, এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে সে বিরাট্ আয়োজন করিতেছিল যেন অনন্ত কালের জন্ম। স্রোতের গতি দশ বৎসর যাবৎ অপ্রতিহত ভাবে ধাবিত হবার পর যখন কালের নিয়মে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ফিরল তখন তার আঘাতে মানুষের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল (dismantling and dislocating)। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বিপন্ন করতে আর একটি অবস্থা উদ্ভূত হইল। কাঁচা মাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী দেশগুলিও যতদূর সম্ভব পাকা মাল (Finished Products) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল—যেমন আমাদের দেশে হয়েছে। এর ফলে পাকা মালের এবং কাঁচা মালের আন্তর্জ্জাতিক চাহিদা স্বভাবতই কমিতে লাগিল। সর্ব্বোপরি, ব্যবসা বাণিজ্যের যখন খুব উঠন্ত অবস্থা (boom) তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ জমিতে লাগিল বড় বড় আমেরিকান ও ফরাসী ব্যাঙ্কারদের হাতে; এবং যখন ব্যবসা জগতে মন্দার লক্ষণ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল, ফলে, ১৯২৯ সালে আমেরিকায় বিস্তর ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফেল হইয়া গেল (Wall Street Crush), তখন হইতে ব্যাঙ্কারেরা এমনি ভাবে হাত উঠাইলেন, যে, বাজারে সোনার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অনেকেই হয়ত জানেন যে আন্তর্জ্জাতিক ক্রয় বিক্রয়ের মূল্য নিরূপণ হয় স্বর্ণমানের দ্বারা। এক টাকায় এত জার্ম্মাণ-মার্কের জিনিষ পাওয়া যায় ততক্ষণ যতক্ষণ বিক্রেতা জানে যে টাকার মূল্য এত পরিমাণ স্বর্ণে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সে চাহিলেই স্বর্ণ পাইবে। আজ আমাদের টাকার স্বর্ণ-মান নাই, অথচ জার্ম্মাণির আছে। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা দিয়া এখন জার্ম্মাণ জিনিষ কিনিতে হয়। পূর্ব্বে ১২০ মার্ক মূল্যের জিনিষ ১০০ টাকায় পাওয়া যাইত; এখন ১০০ মার্ক মূল্যের জিনিষ ১০০ টাকায় কিনিতে হয়। কাজে কাজেই দেখুন স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমান রক্ষা করিতে না পারিলে আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের হার (rate of exchange) স্থির থাকে না এবং প্রায় প্রত্যহই ওঠা নামা করে।

এই অবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য করা দারুণ বিপদসঙ্কুল। একটা উদাহরণ নিন্। জার্ম্মাণি হইতে কোন জিনিষের অর্ডার দিলেন যার মূল্য ৫০০ মার্ক। যখন অর্ডার পাঠান তখন বিনিময় হার ছিল ১১০ মার্ক = ১০০ টাকা। আপনি এই হিসাবের উপর, ধরুন ১০% লাভ রাখিয়া কাহাকেও মাল বিক্রী করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রায় ৪৫০৲ টাকার জিনিষ ৪৯৫৲ টাকায় বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু মাল আসিলে দেখা গেল যে বিনিময়ের হার হইয়াছে ১০০ মার্ক = ১০০ টাকা। অর্থাৎ ৫০০ মার্কের জিনিষ কিনিতেই আপনার ৫০০৲ লাগিল, অথচ আপনি বিক্রী করিয়াছেন ৪৯৫৲ টাকায়। কোথায় লাভ হইবে তা নয়, আপনার হইল লোক্সান। স্বর্ণ-মান বজায় রাখিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল দেখিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ স্বর্ণ-মান ত্যাগ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের অধীন রাজ্য বলিয়া আমাদেরও ত্যাগ করিতে হইয়াছে। অন্তর্বাণিজ্যেও বহু অর্থের দরকার। টাকা ভিন্ন কিছু হয় না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যত খুসী টাকা ও নোট্ তৈয়ারী করিয়া বাজারে ছড়াইয়া দিতে পারেন না, যদি না সেই টাকা ও নোটের পিছনে আইনমুযায়ী স্বর্ণ মজুত থাকে। সুতরাং মজুত স্বর্ণে ঘাটতি পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টকে টাকা ও নোট্ কমাইয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বর্ণের অভাবে অন্তর্বাণিজ্য এবং বহির্বাণিজ্য উভয়ই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হইয়াছেও তাহাই। বর্ত্তমানে টাকা ও নোটের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট স্বর্ণ দিতে বাধ্য নহেন।

এই সব নানা কারণে পৃথিবীর অর্থনৈতিক (রাজনৈতিকও) অবস্থার এমন ওলোট্ পালোট্ হইয়াছে যে ইহা বর্ণনা করিয়া বোঝান দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ হেন সময় যখন বিরাট্ শক্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতিরা ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইতেছেন তখন আমরা উঠিয়া নব বলে শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছি। আমাদের পিছনে ঐশ্বর্য্যও নাই এবং কোন

অভিজ্ঞতাও নাই ; এমন কি উপযুক্ত শিক্ষাও নাই। সুতরাং আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে অতি সন্তর্পণে।

ব্যবসা বাণিজ্য করিব এই ইচ্ছা এখন প্রবল ভাবে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়াছে। আমদানী, রপ্তানী, দালালি প্রভৃতি কায ছাড়াও কল কারখানা স্থাপন করিয়া নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিবার জন্যও অনেক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। শুভ লক্ষণ। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যবসা বাণিজ্য সুষ্ঠু ভাবে করিতে হইলে যে সব অনুকূল অবস্থার দরকার তাহার কিছুই আমাদের নাই ; যথা, ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা, অর্থ, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য, ব্যাঙ্কিং সুযোগ, মাল প্রেরণে রেল ও জাহাজ কোম্পানী হইতে সুবিধা, ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে জঙ্গলের মধ্য দিয়াই, কিন্তু অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে এবং সুন্দর রাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের পরবর্ত্তীগণ অনুকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কর্ম্মশক্তি অব্যাহত রাখিয়া একাগ্রমনে দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

একটা কিছু করিবার ইচ্ছায় শুধু হুজুগে মাতিয়া এবং অমুকে অমুক কায করিতেছে সুতরাং আমিও তাহাই করিব এই মনোবৃত্তির বশীভূত হইয়া কোন কর্ম্মারম্ভ করিলে তাহা পরিশেষে ফলদায়ক হয় না। বাজারে বহুপ্রকার দেশীয় প্রসাধন সামগ্রী দেখা যায় এবং সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু জিনিষের উৎকর্ষতা ত' তেমন বৃদ্ধি হইতেছে না। কারখানাওয়ালাদের এদিকে বেশী খেয়াল আছে কি না সন্দেহ। এ যেন পাল্লা দিয়া একটা কারখানা স্থাপন এবং যা' তা' তৈয়ারী করিয়া স্বদেশী দ্রব্যের চাহিদার সুযোগে বাজারে চালাইবার চেষ্টা! যাঁহারা এরূপ কারখানা স্থাপন করেন তাঁহাদের অনেকেই নিজেরা দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী, ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা করিবার নিয়ম পদ্ধতি, ব্যবসা পরিচালন প্রভৃতি জানেন না। মনে করেন নিজেরা যে টাকা দিয়া এবং সেয়ার বিক্রী করিয়া যে টাকা উঠাইয়া ব্যবসায় নিয়োজিত (invested) করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। আর ব্যবসা চালান মুস্কিল কি,—দুই একজন বেতনভোগী বিশেষজ্ঞ রাখিলেই ষোল কলা পূর্ণ হইল। দেশে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলে রহিয়াছে একের বা বহুর খেয়াল চরিতার্থতা এবং পরশ্রীকাতরতা। প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতরে কোন প্রেরণাও নাই, ব্যবসা পরিচালনের উপযুক্ত বুদ্ধি, শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাও নাই। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং অনেকেরই অবস্থা অতি শোচনীয়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে অনেকে হয়ত সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং উপযুক্ত, শুধু অর্থাভাবে ব্যবসা চালাইতে পারিতেছেন না। মোট কথা, যে অবস্থার মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি রহিয়াছে তাহাতে ইহাদের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হওয়া অসম্ভব। মাল ভাল নয়, দাম সস্তা নয়, চাহিদা মিটাইতে পারে না, আকৃতি বা প্যাকিং ভাল নয়, বিজ্ঞাপন তেমন দেওয়া হয়না, সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেক স্বদেশজাতদ্রব্য এইরূপ কোন না কোন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে পারিতেছে না। এখন এই সব কারখানা ফেল হইয়া গেলে দেশের পক্ষে অবর্ণনীয় ক্ষতি হইবে। শুধু যে এই সব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অর্থ নষ্ট হইবে—যাহা এই গরীব দেশের পক্ষে সামান্য নয়—তাহা নয়, ভবিষ্যতেও মূলধন (which in our country, is proverbially shy) সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে। দ্বিতীয়তঃ কোন দেশীয় প্রতিষ্ঠান সাধারণের আস্থা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবে না। শুধু নানারূপ দ্রব্য তৈয়ারীর প্রতিষ্ঠান নয়, অনেক বীমা কোম্পানী (Specially Provident Insurance Cos.) ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে যাহাদের কর্ম্মপদ্ধতি এবং পরিচালনা উৎকৃষ্ট নীতি অনুমোদিত নহে। এই সব অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, যে, পাশ্চাত্য দেশে এবং জাপানে যে "র‍্যাশানালিজেশন" পদ্ধতি প্রচলিত আছে, উহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। এই "র‍্যাশানালিজেশন" (rationalization) পদ্ধতি অনুসারে কোন এক শ্রেণীর ব্যবসাকারী ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলি, যাহাদের অবস্থা টলমল, (Struggling for very existence) তাহাদের একত্র করিয়া—অবশ্য সমস্ত দেনা পাওনা সহ—এক একটি বড় প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত পরিচালকবর্গের অধীনে স্থাপনা করা হয়, অথবা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান কোন বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, সব দিক রক্ষা হয়। অনেকেরই মনে আছে, টাটা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের অবস্থা যখন অত্যন্ত কাহিল, তখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক উহাকে নিজের সঙ্গে মিশাইয়া লয়—টাটা ব্যাঙ্কের শেয়ার হোল্ডারেরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেয়ার পান। কাহারও কোন ক্ষতি হইল না। অবশ্য র‍্যাশানালিজেশনের ফলে অনেক লোকের চাকুরী যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই কেউ কেউ এই পদ্ধতির বিরোধী। কিন্তু কোম্পানীগুলি ফেল হইয়া গেলে কি হয়? চাকুরী ত যায়ই, অধিকন্তু বিস্তর লোকের অর্থ যায় এবং ভবিষ্যতে ব্যবসাবাণিজ্য করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া ওঠে। বিদেশী বিশেষতঃ জাপানী প্রতিযোগিতা দিন দিন যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে র‍্যাশানালিজেশনের আশ্রয় না হইলে আমাদের আর কোন উপায় নাই। আমাদের দেশে ত' কত কাপড়ের কল, মোজাগেঞ্জীর কল, প্রসাধন দ্রব্যের কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু জাপানের সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি কি? আমেরিকার সঙ্গেও ত পারি না। একখানা সাধারণ বিদেশী সাবান যে দামে পাওয়া যায় তাহার দ্বিগুণ দামেও ত ঐরূপ একখানি ভাল স্বদেশী সাবান পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন যে বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর উচ্চ হারে শুল্কধার্য্য আছে। তা' দিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে আনিবার খরচ দিয়া এবং মোটা লাভ রাখিয়া বিদেশীরা যে দামে তাহাদের প্রস্তুত মাল বিক্রী করিতে পারে তাহার ডবল দামেও আমরা পারি না। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমার পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির মধ্যেই পাইবেন। এই ভীষণ সমস্যার সমাধানের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়—র‍্যাশানালিজেশন। আমি এই র‍্যাশানালিজেশন চারি শ্রেণীতে ভাগ করিতেছি: (১) বিদ্যমান ছোট ছোট কলকারখানাগুলির র‍্যাশানালিজেশন (২) বিদ্যমান ছোট ছোট বীমা কোম্পানীগুলির র‍্যাশানালিজেশন (৩) বিদ্যমান ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির র‍্যাশানালিজেশন এবং (৪) ধনীদের বর্ত্তমান নিজ নিজ ব্যবসা

প্রচেষ্টার র‍্যাশানালিজেশন (rationalization of the present individual Commercial activities of the rich)।

আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা উন্নত প্রণালীর সাহায্যে মাল প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে না পারিলে পড়তা বেশী পড়ে, সুতরাং বিক্রয় মূল্যও বেশী ধার্য্য করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য দৃশ্য, ডিজাইন এবং প্যাকিং প্রভৃতিও সুশ্রী করিতে হইলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি দরকার। মাল সস্তা অথচ সুন্দর করিতে হইলে বহু মূলধন আবশ্যক, যদ্দ্বারা আধুনিক কারখানা স্থাপন এবং বহু অভিজ্ঞ ও শ্রমিক লোক লইয়া প্রচুর পরিমাণে মাল প্রস্তুতের ((mass production) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহা না হইলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার টেকা সম্ভবপর হইবে না। মানুষ চায় সস্তা অথচ সুন্দর জিনিষ। স্বাদেশিকতার হুজুগে যে কোন জিনিষ যে কোন দামে চিরদিন চালান যায় না। তারপর লোকের আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। খদ্দরের আজ কি অবস্থা মনে করুন। খাদি বিক্রেতারা কতভাবে কত উপায়ে প্রত্যহ সংবাদপত্রে খদ্দরের জন্য বিজ্ঞাপন দিতেছেন, কিন্তু ফল ত তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না। বর্ত্তমান যুগে ছোট ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বহুদিন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে না। কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র জিনিষ, তাহাকে ঠিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Commercial organization) বলা চলে না। একজন কি দু'চারজন মিলিয়া ছোটো খাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যে কিছু তৈয়ার করিয়া গ্রামে বা পাড়ায় বিক্রী করিয়া নিজেদের পেট চালাইতে পারে, কিন্তু সে ভাবে প্রকৃত ব্যবসা চলে না এবং বিদেশী আমদানী অথবা দেশেই বড় বড় কলে প্রস্তুত জিনিষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। মাল বহু পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারিলে দাম কিরূপ সস্তা হয় তাহা নিম্নোক্ত উদাহরণে সহজেই বোঝা যাইবে—

১৯০৩ সালে ফোর্ড ১৭০৮ খানা মোটরগাড়ী তৈরী করেছিলেন এবং প্রত্যেকখানির দাম হয়েছিল ১০০ ডলার (১ ডলার=প্রায় ২৸০), ১৯০৯ সালে ১৮৬৬৪ খানা, দাম ৯৫০ ডলার এবং ১৯২১ সালে ১,২২,০০০খানা, দাম ৩৫৫ ডলার।

সুতরাং আমরা পরিষ্কার দেখিতেছি যে মধ্যবিত্ত লোকের মত মাঝারী কল কারখানার অবস্থা বড়র ধাক্কা সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকাই দুষ্কর ব্যাপার। যাহারা নেহাৎ ছোট তাহাদের কোন বালাই নাই। আমি দূরদর্শী ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি ও মনোযোগ এ দিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমান অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, বর্ত্তমানে র‍্যাশানালিজেশনের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এবং ভবিষ্যতে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে তাঁহারা বিদেশী প্রতিযোগিতার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন কি না।

অনেকে মনে করেন যে শুল্কপ্রাচীর (tariff wall) চতুর্দ্দিকে খাড়া করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিব, আর আমাদের পায় কে? এ যেন সেই বালকের মনোবৃত্তি, যে ভাবে, যে, দৌড়াইয়া আসিয়া একটু উঁচু যায়গায় উঠিয়া বসিলে যে পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে সে আর নাগাল পাইবে না। কাঁচা মাল অথবা তৈয়ারী মাল বিক্রয়, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারে প্রত্যেক সভ্য দেশকে অপর সভ্য দেশসমূহের প্রতি নির্ভর করিতে হয়। আমরা যদি অন্য দেশের মালের উপর অস্বাভাবিক রূপে অধিক আমদানী শুল্ক ধার্য্য করি তবে তাহারাও যে আমাদের দেশ হইতে সে দেশে রপ্তানী মালের উপর তদনুযায়ী শুল্ক (retaliative duty) ধার্য্য করিবে তাহা ত' স্বতঃসিদ্ধ। জার্ম্মাণি পরিষ্কার বলিয়াছে যে, যে সব দেশ তাহাদের জিনিষ লইবে না তাহারাও সে সব দেশ হইতে জিনিষ লওয়া বন্ধ করিবে। আমি নিম্নে একটি হিসাব দিতেছি, তাহাতে দেখিবেন যে জার্ম্মাণি আমাদের দেশ হইতে কয়েকটি দ্রব্য কিরূপ ভাবে কম লওয়া ধরিয়াছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা (retaliative measure) অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যেন কেহ মনে না করেন।

জার্ম্মাণি ভারত হইতে চাউল আমদানী করিয়াছে :—

১৯৩১—২৩৪, ২১৪ টন্

১৯৩২—২০৬, ৫৫১ „

১৯৩৩—১৬৪, ৭৮৪ „

এখন জার্ম্মাণি ইটালিয়ান চাউল বেশী লইতেছে।

জার্ম্মাণি ভারত হইতে চাউলের কুঁড়ো (for cattle food) আমদানী করিয়াছে—

১৯৩২—৫৩, ৫৪২ টন্

১৯৩৩—১০, ৮১৪ „

জার্ম্মাণি ভারতীয় চা আমদানী করিয়াছে—

১৯৩২— ১১২৬ টন্

১৯৩৩—১০০৪ টন্

এখন জার্ম্মাণি যাভা দেশের চা বেশী কিনিতেছে। অটোয়া চুক্তি এবং আমাদের চির নাবালকত্ব কি চিরদিন আমাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে ষ্টেটস্‌ম্যান্ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে খাঁটি কথা বলিয়াছেন যে র‍্যাশানালিজেশন, কঠোর পরিশ্রম এবং স্বল্প লাভে সন্তুষ্টি জাপানের সাফল্যের মুখ্য কারণ; ইয়েনের (ইয়েন জাপানী মুদ্রা, পূর্ব্বে ১০০ ইয়েনের দাম ছিল ১৩০৲, এখন মাত্র ৮০৲) অবনতি গৌণ কারণ।

শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বীমা কোম্পানীগুলিও দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সাহায্য দ্বারা যথেষ্ট পরিপুষ্ট করিতে পারে। কিন্তু এগুলি নিজেরাই যদি চিরদিন ক্ষুদ্রকায় থাকে এবং অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই সর্ব্বদা যদি ইহাদের ব্যাকুল থাকিতে হয়, তাহা হইলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যকে পর্য্যাপ্ত সাহায্য করিবার শক্তি সামর্থ্য কোথায় পাইবে। শিল্প-বাণিজ্যের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী স্থাপিত হওয়া দরকার। অল্প সুদে (cheap credit) টাকা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না পাইলে শিল্প প্রতিষ্ঠান কখন বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

আমি ধনীদিগের বিভিন্ন ব্যবসা প্রচেষ্টার ও র‍্যাশানালিজেশনের

বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ধনের খুব বেশী অভাব (অন্ততঃ ধনীদিগের হাতে) দেশে আছে মনে হয় না, কিন্তু অভাব হইতেছে সহযোগিতার এবং সাহসিকতার। হিংসা এবং 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি কখন কোনঋড় কায ও বড় সাফল্যের পথে কাহাকেও লইয়া যাইতে পারে না। ভাগ্যকুলের রায় মহাশয়দের সঙ্গে যোগ দিয়া অন্ততঃ সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর মতও আর একটি জাহাজ কোম্পানী খুলিবার মত অর্থ সরবরাহ করিতে পারেন এরূপ আর দু চার জন ধনী কি বাঙ্গালা দেশে নাই? অনেকে হয়ত খেয়ালে পড়িয়া কয়খানি ষ্টীমার কিনিলেন, এবং কিছুদিন এদিকে ওদিকে চালাইয়া লাভের পরিবর্ত্তে বেশ কিছু লোক্‌সান দিয়া কপালে হাত দিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত ব্যবসা অত সহজে হয় না। আজ সিণ্ডিকেট না হইলে কলিকাতায় বাসের ব্যবসা বহু পূর্ব্বে উঠিয়া যাইত।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরা এখনও অতি ক্ষুদ্র শিশু। আমাদের এখন গঠনের সময়। ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে আমাদের উঠিতে হইবে, যাহাতে পদস্খলন হইয়া পড়িয়া না যাই। আর, আমরা যে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করি না কেন তাহা যেন সততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, 'দশ জনকে ফাঁকি দিয়া রাতারাতি বড়মানুষ হইব' এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়াই আজকাল বিস্তর লোক ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আসিতেছেন। কতকগুলি যৌথ কোম্পানীর স্থাপয়িতা এবং পরিচালক-বর্গের কার্য্য কলাপে এইরূপ জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্যা শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ক্রমেই গুরুতর ভাব ধারণ করিতেছে এবং দেশের দ্রুত বাণিজ্য প্রসারে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া, বহু 'সব-জান্তা'র অর্ব্বাচীন খেয়াল চরিতার্থতা (unwise speculation) অনেক স্থানে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের এই সব কার্য্যাবলীর নজির ইয়োরোপীয় দু চার জন লোক বা প্রতিষ্ঠান। প্রকৃত শিক্ষার, অভিজ্ঞতা এবং প্রেরণার অভাবে মানুষের যাহা হয়, আমাদেরও তাহাই হইতেছে। আমি এই স্থানে আচার্য্য রায়ের কোন বক্তৃতার একাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না—"ইংরাজের কায করিবার পদ্ধতি অনুকরণ করিবার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র যত্নবান নহি। তাঁহাদের ব্যবসায়ে কৃতী হইবার জন্য যে যত্ন ও অধ্যবসায় আছে, তাহা আমাদের নাই, কিন্তু বাহিরের আড়ম্বর চটক্ ও জাঁক জমক এবং ধরণ-ধারণ নকল করিয়াই আমরা সফল হইবার আশা করি। ইংরাজের ব্যবসায়ে সততা আমরা অনুকরণ করি না। অনেকে নিজেদের ব্যবসায়ে কু-কীর্ত্তি দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীর আচরিত জুয়াচুরীর দোহাই দিয়া স্খালন করিতে চাহেন। তাঁহারা ভুলিয়া যায়েন, কদাচিৎ দুই একটা ইংরাজ কোম্পানীই ইহা করিয়া থাকে। অধিকাংশই সততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অংশীদারদের স্বার্থকতা করিয়া থাকে।" ইংলণ্ডের হার্টির, ফ্রান্সের ষ্ট্যাভিস্কির, সুইডেনের ক্রয়গ্যারের, আমাদের দেশে য়্যালায়ান্স ব্যাঙ্ক অফ সিমলার বোণ্টোনের ব্যবসায় যে অসাধারণ শক্তি ছিল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু অর্থগৃধ্নুতা এবং সততার অভাবে তাহারা নিজেরও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোককেও পথে বসাইয়াছে। এরাই কি আমাদের অনুকরণীয়? আর কি লোক নাই? ফোর্ড, বাটা প্রভৃতির দৃষ্টান্ত কি অনুকরণ করিতে মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে না? ফোর্ড, বাটা যে কি ধনের অধিকারী তাহা কাহারও অবিদিত নাই, এবং সকলেই হয়ত জানেন যে ইহাঁরা সাধারণ মিস্ত্রী এবং মুচির ন্যায় শিক্ষা এবং জীবনারম্ভ করিয়া সারা পৃথিবীময় আজ ব্যবসা বিস্তার করিয়াছেন। ফোর্ডের জীবনালোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি দেবতুল্য লোক—সততা এবং অধীনস্থ লোকজনের প্রতি স্নেহানুরাগ ও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের উন্নতি বিধান তাঁহার ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীর প্রথম লক্ষ্য হওয়া চাই সেবা, লাভের চিন্তা পরে। ভারতের সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয় সেবাধর্ম্ম। সেই সেবা ধর্ম্মই আমাদের ব্যবসাজীবনে যাহাতে আমাদের চালিত করে, ভগবান করুন, আমাদের লক্ষ্য যেন তাহাই হয়।

আমাদের সামাজিক জীবনে এবং ব্যবসায়িক জীবনে, উভয় ক্ষেত্রেই, জাঁক জমকের স্পৃহা ক্রমেই বাড়িতেছে। পেটে না খাইয়াও বেশভূষা ও বিলাস-ব্যসনে আমরা অর্থব্যয় করি। তেমনি কোন ব্যবসা আরম্ভ না করিতেই প্রথমে প্রয়োজন হয় সুসজ্জিত আফিস ঘর, মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ, সুন্দর একখানি মোটর গাড়ী এবং তক্‌মাধারী বয় বেয়ারা। এ-সব না হইলে না-কি খরিদ্দারদের বিশ্বাস-ভক্তি আকর্ষণ করা যায় না। তাহাই যদি হয়, তবে ইহা বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে, যে, খরিদ্দারদের সঙ্গে প্রতারণা করাই আমাদের উদ্দেশ্য? জাঁকজমক করিয়া লোকের মন ভুলানর অর্থ আর কি হয়? দ্বিতীয়তঃ, এই জাঁকজমকের খরচ উঠাইতে গেলে বিক্রেয় জিনিষের দাম বাড়াইতে হয় এবং ইহাও প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক বীমা কোম্পানীর হিসাবে দেখা যায় যে তাঁহারা আয়ের ৪৫%-৫০% পর্য্যন্ত ব্যয় করেন। এই অবস্থায় পলিসি হোল্ডারদের স্বার্থ কি নিরাপদ থাকে? ইংরাজেরা জাঁকজমক করেন এবং তাহা করিয়াও তাঁহারা কত বড় হন্, সুতরাং আমরা কেন করিব না? একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে তাঁহারা আমাদের মত ফাঁকা জাঁক্‌জমক্ করেন না। আর যাহা করেন তাহা এই প্রজার দেশে, স্বদেশে নয়। গ্রিণ্ডলে কোম্পানীর বিলাতের বড় আফিসের ম্যানেজারের বসিবার একখানি স্বতন্ত্র ঘর নাই। লণ্ডনে ন্যাশানাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও তাঁহার সহকারী যে ঘরে বসেন এখানকার অনেক ক্ষুদে ব্যাঙ্কের কেরাণীরাও তার চেয়ে ভাল ঘরে বসেন। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রীট্ অপেক্ষা আমাদের দারোগাবাবুদের বাড়ী নিঃসন্দেহ অধিক পছন্দ কবিবেন। নিরর্থক জাঁকজমক ও আড়ম্বরের কোন আবশ্যকতা নাই। অবশ্য এ কথায় ইহা বুঝায় না যে আপনি আপনার ব্যবসাস্থান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবেন না, আবশ্যক আস্‌বাবপত্র রাখিবেন না, অথবা বিক্রয়ার্থ জিনিষগুলি সুন্দরভাবে গোছাইয়া সাজাইয়া রাখিবেন না যাহাতে খরিদ্দাররা আকৃষ্ট হয়। আর একটি কথা আমি ব্যবসায়ীদের এ স্থলে বলা আবশ্যক মনে করি। আমাদের দেশে বেকার যুবকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং তাহারা কোন বিভাগে এম কোন কার্য্যকরী শিক্ষা পাইতেছে না যদ্দারা ভবিষ্যতে কোন কায প

অথবা কোন ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারে। সেই হেতু আমি প্রস্তাব করি যে ব্যবসায়ীদের বেয়ারা উঠাইয়া দিয়া এই সব যুবকদিগকে শিক্ষানবীশ হিসাবে লওয়া উচিত। আজকালকার যুবকেরা শ্রমের সম্মান বুঝিতে পারিয়াছে এবং কোন কায তাহারা এখন সম্মানহানিকর মনে করে না। সুতরাং শিক্ষানবীশ যুবকদের কর্ত্তব্য হইবে আফিষ পরিষ্কার করা, চিঠিপত্র বিলি করা এবং অন্যান্য ফাই ফরমাইস্ খাটা এবং অবসর সময়ে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম শেখা। এই ভাবে প্রথম বৎসর যাইবে। দ্বিতীয় বৎসর তাঁহারা আফিসে কর্ম্মচারী হিসাবে কায করিতে পাইবেন এবং তৃতীয় বৎসর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের উপযুক্ত হইয়া ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। ইয়োরোপে প্রত্যেককে এইভাবে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম বৎসর শিক্ষানবীশদের মাসিক ১৫৲ এবং দ্বিতীয় বৎসর ২৫৲ ভাতা সাধারণতঃ নিরূপণ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে যুবকদিগের পক্ষ হইতেও আন্দোলন করিতে হইবে। তাঁহারা এইরূপ ভাবে শিল্পবাণিজ্য-ক্ষেত্রে ঢুকিতে না পারিলে তাঁহাদের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ উভয়ই অন্ধকার। আমি এই বিষয়ে গত বৎসরের বৈশাখ মাসের "প্রদীপ" পত্রিকায় "ব্যবসায়ে সাফল্য" নামক প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। আমি যে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পূর্ব্বে সংশ্লিষ্ট ছিলাম তাঁহাদের জার্ম্মাণ আফিসের ভার প্রাপ্ত হইয়া ১৯২৮ সালে আমি জার্ম্মাণিতে প্রেরিত হই। ১৯২৯ সালে এক জার্ম্মাণ ছোক্‌রাকে আমি শিক্ষানবীশ লইয়াছিলাম মাসিক ২৫ মার্ক (এখনকার হিসাবে ২৫৲) ভাতায়। সে সাধারণ বেয়ারা ও ডেচ্‌পাচারের কায করিত। আফিসে আমাকে চা তৈয়ারী করিয়া দিত এবং চাকরের ন্যায় অন্যান্য ফরমাইস্ খাটিত। বিকালে আফিস হইতে আমি বাড়ী যাইবার সময় আমার ওভারকোট্ ব্রাশ করিয়া হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত এবং আমি সদর দরজার কাছে আসিলে পরাইয়া দিত। আজ সে এই দেশেই বেশ মোটা টাকা বেতনে কোন ইয়োরোপীয় ফার্ম্মে কায করে। ওদেশে খুব বড় বড় প্রতিষ্ঠানে দুইচারজন বেয়ারা দেখা যায়। সাধারণতঃ শিক্ষানবীশেরাই এসব কায করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কাযও শেখে। আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনেক বেয়ারা বেকার হইবে, কিন্তু তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অনেক প্রকার উপায় আছে। দেশের আশা স্থল ভদ্রযুবকদিগের যে কোন পথ খোলা নাই। আমি সকল যুবককে আচার্য্য রায়ের আত্মজীবনী পড়িতে অনুরোধ করি। উহাতে তিনি বহু স্বনামধন্য মনীষীর বাল্য জীবনের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কত ছোট হইতে কত বড় হওয়া যায়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ যৌথ কারবারের পরিচালকবর্গের উপযুক্ত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কর্ম্মপ্রেরণা বা অন্তর্দৃষ্টি নাই। উচ্চাভিলাষ অথবা দুরভিলাষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসাবাণিজ্য স্থাপনে এবং পরিচালনে আমাদের প্ররোচিত করে। সাধারণকে সেয়ার কিনিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে তিনটি উপায় অবলম্বিত হয়:—(১) কয়জন প্রতিষ্ঠাপন্ন বড় লোককে (ব্যবসাবাণিজ্যে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক) ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত করা হয়; (২) নানারূপ চমকপ্রদ বিবরণে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তাহা পড়িয়া সাধারণে মনে করে, হয়ত বা কুবেরের ধনই লাভ হইবে; (৩) মূলধন ভাজিয়া ও কোন রূপ রিজার্ভ ফাণ্ড না রাখিয়া উচ্চ লভ্যাংশ ও (dividend) ঘোষণা করা হয়। একে ত, আমাদের দেশের লোক অশিক্ষিত; এবং হিসাবের মারপেঁচ বুঝিবার মত বুদ্ধি ও ধৈর্য্য অনেক তথাকথিত শিক্ষিতেরও নাই; তার পর, এই সকল 'ব্যবসায়ী' ধুরন্ধরদের যুক্তির জাল হইতে আত্মরক্ষা করা বড় সহজসাধ্য নহে। অনেক লোক এই-সব কোম্পানীর সেয়ার কিনিয়া অথবা উচ্চ সুদ প্রাপ্তির আশায় টাকা ধার দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এই অবস্থার প্রতিবিধানের উপায় কি? আমার মনে হয়, যৌথ কোম্পানীর উদ্যোক্তারা (Promoters) যখন কোম্পানীর ব্যাঙ্কার নিযুক্ত করিবার জন্য কোন ব্যাঙ্কের নিকট যান্, তখন সেই ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য, সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এবং উদ্যোক্তাদের হিসাব প্রভৃতি (estimates) বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ব্যাঙ্কার হইতে স্বীকৃত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রারেরও বিশেষ বিবেচনা এবং পরীক্ষা না করিয়া কোন কোম্পানী রেজেষ্ট্রী না করা কর্ত্তব্য। ইহা হইলে ফাঁকিবাজ (bogus) কোম্পানীগুলি প্রথমেই বাধা (check) পাইয়া বেশীদূর অগ্রসর না হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য প্রতি বৎসর কোম্পানীগুলির হিসাব নিকাশ (Balance Sheets) অভিজ্ঞ গভর্ণমেণ্ট হিসাব পরীক্ষক দ্বারাও পরীক্ষা করাইয়া তাঁহার অভিমতসহ সমস্ত হিসাবগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করা। গভর্ণমেণ্ট হিসাব পরীক্ষকের অভিমতে কোন কোম্পানীর কার্য্যাবলী সন্দেহজনক মনে হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এই balance sheet প্রস্তুত সম্বন্ধেও কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উল্লেখ করিতে কোম্পানীগুলি বাধ্য হয়। প্রস্তাবিত পুস্তকের একটি বিভাগে সেই বৎসর যে সব কোম্পানী নূতন হইয়াছে তাহাদের নাম এবং অন্যান্য বিবরণ এবং যেগুলি ফেল হইয়াছে, তাহাদেরও নাম এবং ফেল হইবার কারণ দেওয়াও কর্ত্তব্য। আমেরিকায় এই প্রথা আছে। গত ১৯০৮ সালের আমেরিকার একটি বিবরণী হইতে দেখা যায়, যে, এই বৎসর ১৪০০০ কোম্পানী ফেল হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২১% অজ্ঞতা নিবন্ধন, ৩৪% ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত মূলধনের অভাবে, ১৯% অভাবনীয় বিপদের জন্য, ১১% অসাধুতার জন্য, ৪% অনভিজ্ঞতার জন্য, ২% অনবধানতার জন্য, ১% অবিবেচকের মত ধারে মাল দিবার জন্য, ইত্যাদি।

আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা মুখে বলেন 'খরিদ্দার লক্ষ্মী'; কিন্তু মা লক্ষ্মীর সেবায় এবং খরিদ্দার লক্ষ্মীর সেবায় আমরা একই মনোবৃত্তির পরিচয় দিই। অর্থাৎ, অভাবে যখন পড়ি তখন মা লক্ষ্মীকে ডাকি এবং তাঁর সেবায় তৎপর হই, কিন্তু সুদিন আসিলে মা লক্ষ্মীর প্রতি টান্ কমিয়া আসে। যেমনি জিনিষ না কেনা পর্য্যন্ত হবু খরিদ্দারকে আমরা 'জামাই আদর' করি; কিন্তু কায হাসিল হইয়া গেলে আর বড় আমল্ দিতে চাই না। এই মনোবৃত্তি আমাদের ব্যবসা বুদ্ধির অভাবের প্রকৃষ্ট

প্রমাণ। একবার একটি মেসিন বিক্রয় উপলক্ষে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। এক সাহেব কোম্পানীর প্রতিনিধিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। সাহেবের দাম আমার দাম অপেক্ষা ৫০০৲ বেশী ছিল। খরিদ্দার বলিলেন, "মিঃ রায়, যখন দামের ব্যবধান ৩০০৲ তখন আমার মনে হয় যে সাহেব কোম্পানী হইতেই মেসিনটি কেনা ভাল।" আমি কহিলাম 'সাদা মুখের জন্ত ৩০০৲ দক্ষিণা দিতে চান্ না-কি ?" তিনি একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন 'না, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। সাহেবদের নিকট হইতে জিনিষ লইলে উহারা সর্ব্বদা বিক্রয়ের পরও সেবা (after-sale service) করিতে তৎপর থাকিবে; কিন্তু আপনাদের তখন নাগাল্ পাওয়া সহজ হইবে না। যদি মেসিন লইয়া কোন মুস্কিলে পড়ি এবং আপনাদের বলি, তখন আপনাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে করিতে আমার কত ৩০০, লোক্সান হইয়া যাইবে।' কথাটা খাঁটি। বিলাতে কোন জায়গায় আপনি এক শিলিংএর জিনিষ কিনিলে যেরূপ ব্যবহার পাইবেন ১০০ পাউণ্ডের জিনিষ কিনিলেও সেইরূপ ব্যবহার পাইবেন। এমন কি এক পেনির জিনিষ কিনিলেও দোকানদার সুন্দর করিয়া প্যাক না করিয়া আপনার হাতে দিবে না। তার পর, কোন জিনিষ কিনিয়া দোকানদারকে বলিলে সেই আপনার বাড়ীতে পৌছিয়া দিবে। বড় বড় দোকানের, মাল খরিদ্দারের বাড়ী পৌছাইয়া দিবার জন্ত, অনেক মোটর ভ্যান্ থাকে। মোট কথা, সেদেশে একবার এক জায়গা হইতে জিনিষ কিনিলে আর অন্যত্র যাইতে আপনার ইচ্ছা হইবে না।

আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে মস্ত একটি অসুবিধা হইতেছে ক্রমশঃ শোধ্য প্রথায় (Instalment system) মাল বিক্রয় করিবার অক্ষমতা। সর্ব্বত্রই শতকরা ৯০ জন ক্রেতা "চীনা টাকায়" (Chinese money) ক্রয় মূল্য শোধ করিতে চায়; অর্থাৎ, ক্রীত দ্রব্য পুনরায় বিক্রয় করিয়া অথবা তদ্দারা বা তৎসাহায্যে প্রস্তুত মাল বিক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে ধার শোধ করিতে চায়। এ কথা পুনর্বিক্রেতাদের (re-sellers) পক্ষেও যেমন খাটে, গৃহস্থ ক্রেতাদের (home Consumers) পক্ষেও তেমন খাটে। সকলেই চায় ক্রমে ক্রমে টাকা পরিশোধ করিতে এবং এ ভাবে পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। সুতরাং এইরূপ প্রথায় মাল বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ব্যবসা বিস্তারের সম্ভাবনা কম। সিঙ্গার সেলাইএর কল মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে দিবার অঙ্গীকারে পাওয়া না গেলে এত বিক্রয় হইত কি-না সন্দেহ। আমেরিকার শিল্প-বাণিজ্য এত বিশাল ভাবে (নিজের দেশে এবং সারা দুনিয়ার বাজারে) গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ ধারে এবং ক্রম-শোধ্য প্রথায় মাল দিতে পারার ক্ষমতা। কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যাঙ্ক বা ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ত গঠিত কোম্পানীর (Commercial Credit Companies) সহযোগিতা ও সহায়তা না পাইলে সম্ভবপর হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিও যেমন নাবালক শিশু, আর্থিক সাহায্য করিবার প্রতিষ্ঠানগুলিও তেমন অসহায় দুর্ব্বল। যাঁহারা মাল প্রস্তুতকারক (manufacturers) তাঁহাদের যদি সর্ব্বদা বিক্রয় করিবার চিন্তা এবং তদুপরি আর্থিক চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলে প্রস্তুত বিষয়ে তাঁহারা সেরূপ মনোযোগী হইতে পারেন না। কে.ডি, জেনেরাল মোটরস্ প্রভৃতি বড় বড় কোম্পানীর প্রস্তুত বিভাগ, বিক্রয় বিভাগ এবং আর্থিক ব্যবস্থা বিভাগ স্বতন্ত্র আছে; কোন বিভাগের সহিত কোন বিভাগের সম্পর্ক নাই এবং সেই জন্ত সমস্ত কায অতি সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে এরূপ বিরাট্ ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। তাহাদের মাল বিক্রয়ের জন্ত উপযুক্ত এজেণ্ট এবং অর্থ যোগাইবার জন্ত ব্যাঙ্ক অথবা কমার্শিয়াল ক্রেডিট্ কোম্পানী প্রভৃতির সহযোগিতা আবশ্যক। কোন প্রস্তুতকারী কোম্পানী মাল সাধারণতঃ বিভিন্ন স্থানে নিযুক্ত এজেণ্টদিগের নিকট বিক্রয় করেন, অথবা, এজেণ্ট না থাকিলে, সাক্ষাৎ ব্যবহারকারীর (direct consumers) নিকট বিক্রয় করেন। মনে করুন সর্ত্ত হইল যে এজেণ্ট অথবা ব্যবহারকারী ক্রেতা ক্রয় মূল্য বার মাসে মাসিক কিস্তিবন্দীতে দিবে। তজ্জন্ত তাহার নিকট হইতে ১২ খানা ড্রাফ্ট্ বা অঙ্গীকারপত্র লওয়া হয় এবং ঐগুলি ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কোম্পানীগুলিকে এন্ডোর্স (অর্থাৎ ইহাদের টাকা দিবার জন্ত খরিদ্দারের উপর অঙ্গীকার পত্র বরাত করিয়া দেওয়া) করিয়া দিলে মাল প্রস্তুতকারী টাকা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং আরও মাল প্রস্তুত করিবার জন্ত কাঁচা মাল কিনিতে, লোকজনের বেতন দিতে এবং অন্যান্য খরচ করিতে সক্ষম হইলেন। এখানে বড় বড় ইয়োরোপীয় কোম্পানীগুলির 'বেনিয়ান' থাকে। কোম্পানীরা বিক্রীত মালের জন্ত খরিদ্দারের উপর বিল ও ড্রাফ্ট্ গুলি বেনিয়ানদের দিয়া দেন। বেনিয়ানেরা শতকরা হিসাবে কতক টাকা কোম্পানীকে অগ্রিম দেয় এবং তজ্জন্য সুদ ও কমিশন আদায় করে, খরিদ্দারের নিকট হইতে ড্রাফ্ট্ বা বিলের টাকা আদায়ের ভার বেনিয়ানের উপর। মোট কথা আমাদের দেশীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে উপযুক্ত আর্থিক সুবিধা (financial facilities) উপভোগ করিতে পারে তদনুযায়ী প্রচুর ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আর একটি কথা বলিয়া আমার প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য যে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইতেছে বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট। যখন আমরা পুরাতন গোঁড়ামিপূর্ণ মনোবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্য সংগঠনে বদ্ধপরিকর হইলাম, সেই সন্ধিক্ষণে দেখা দিল বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট। ভারত চিরদরিদ্র, এর উপর আরও অর্থাভাব। দারিদ্র্যের ষোল কলা পূর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বত্র হাহাকার। গত ১৯২৯ সাল হইতে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবনতি ছাড়া উন্নতি ত' দেখা যাইতেছে না। প্রচুর জিনিষপত্র, দাম সেই সস্তা যুগের মত সস্তা। কিন্তু কেনে কে? পয়সা কোথায়?

সার সুরেন্দ্রনাথ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুরেন্দ্রনাথ দেশের কি ও কে ছিলেন? তিনি ছিলেন দেশের সর্ব্বস্ব! তিনি ছিলেন বাঙ্গলার অনভিষিক্ত রাজা। তিনি ছিলেন তাঁহার সময়কার ছাত্র সমাজের idol। তিনি ছিলেন নিখিলভারতীয় নেতা এবং ভারতের অদ্বিতীয় বক্তা। যে ইংরেজরা তাঁহার রাজনীতিক মতের জন্য যে মুখে তাঁহাকে গালি দিত, তাঁহার অনন্যসাধারণ বক্তৃতা-শক্তির জন্য সেই মুখেই তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিত। তিনি একবার যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহার চূড়ান্ত না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না। লর্ড মর্লির settled fact বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদকে সুরেন্দ্রনাথই unsettled করাইয়া রহিত করাইয়াছিলেন—বিলাতী রাজনীতিক ইতিহাসে যাহা কস্মিন কালেও ঘটে নাই, সুরেন্দ্রনাথ তাহাই সংঘটন করাইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী জাতিকে, তথা Indian Nation স্বহস্তে গঠন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বলিতে গেলে, সুরেন্দ্রনাথই বাঙ্গালীকে রাজনীতি শিখাইয়াছেন—তাহাদিগকে জগতের রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সুপরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভাবলে নিখিলজগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি এত অধিক ছিল যে, জগতের মধ্যে কেবল মাত্র নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কর্ম্মশক্তির সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনেও (private life) তিনি শাসন-সংযত নিয়মিত বাঁধাধরা জীবন যাপন করিয়া, নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিয়া সুস্থ, সবল দেহে প্রায় শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া দেশের আদর্শ স্থল হইয়া রহিয়াছেন।

কলিকাতা তালতলা নিয়োগী পুকুর ওয়েষ্ট লেনের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রোগনির্ণয়-নৈপুণ্যে অতিপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তার দুর্গাচরণের আদি নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বারাকপুরের নিকটবর্ত্তী মণিরামপুরে ছিল। চিকিৎসা-ব্যবসায়-সূত্রে তিনি কলিকাতায় বাস করিতেন। সন ১২৫৫ সালের ২৬এ কার্ত্তিক (১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর) তালতলায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ইনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাহার জননীর নাম জগদম্বা দেবী। এই বন্দ্যোপাধ্যায়বংশের বাসবাটী মণিরামপুরে এখনও বর্ত্তমান আছে। মধ্যজীবনে সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং মণিরামপুরে নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। সুরেন্দ্রনাথেরা পাঁচ ভাই। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ক্যাপ্টেন জে, এন, ব্যানার্জ্জি, ব্যারিষ্টার, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীটে অবস্থান করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। অপর সকলে অধুনা পরলোকগত।

পাঁচ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ তালতলার এক গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হন। তাঁহার পিতা পরে তাঁহাকে পটলডাঙ্গা বঙ্গবিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি দুই বৎসর মাত্র ছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে তাঁহাকে ডভটন কলেজের স্কুলবিভাগে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এখানে তিনি ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী বালকদিগের সহিত শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। উত্তর কালে ইংরেজী ভাষায় তিনি যে অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, এইখানেই তাহার সূচনা হয়।

শৈশব কাল হইতেই সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাভ্যাসে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তখন হইতেই তিনি আহার, শয়ন, বিশ্রাম, পরিশ্রম, ব্যায়াম এই সকলের জন্য সময় নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং চির জীবন এই routine ধরিয়া যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই তিনি পর জীবনে বহু কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কখনও কোন কার্য্যের জন্য সময়ের অভাব অনুভব করেন নাই। সুস্থ সবল শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভের মূলেও ছিল তাঁহার এই নিয়মানুবর্ত্তিতা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সাতাশ টাকা বৃত্তি পান। সুরেন্দ্রনাথ বৃত্তির টাকা নিজের জন্য খরচ না করিয়া তদ্দ্বারা দুঃস্থ সতীর্থগণের অধ্যয়নে সহায়তা করিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মণিরামপুর গ্রামবাসী চন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়ের কন্যা চণ্ডী দেবীর সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের পর সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন—পুনঃপুনঃ জরাক্রান্ত হইতে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য "মুলতান" নামক ডাকবাহী জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন।

সিবিল সার্ব্বিস পড়িবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং অধ্যাপক ইলির নিকট ল্যাটিন, অধ্যাপক হেনরী মর্লের নিকট ইংরেজী এবং অধ্যাপক ডাক্তার থিয়োডোর গোল্ডষ্টুকরের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৩৩০ জন ছাত্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দেন। তন্মধ্যে চারিজন মাত্র ভারতবাসী—সুরেন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, বিহারীলাল ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর। ইঁহারা চারিজনেই উত্তীর্ণ হন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুরের বয়স লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। এ সময়ে কলিকাতায় পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ রুগ্নশয্যায়। সুরেন্দ্রনাথ তারযোগে পিতাকে এই গোলযোগের সংবাদ জানাইলেন। ইহাতে দুর্গাচরণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ উদ্যোগী পুরুষসিংহ। সিবিল সার্ব্বিস কমিশনারদিগের অবিচারে তিনি হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি বয়সের বিষয় পুনর্ব্বিবেচনা করিবার জন্য কমিশনারদিগের নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কমিশনাররা কর্ণপাত করিলেন না। তখন সুরেন্দ্রনাথ কুইন্স বেঞ্চে অভিযোগ রুজু করিলেন। কুইন্স বেঞ্চের বিচারপতিরা কমিশনারদিগের উপর রুল জারি করিলেন। রুলের শুনানী হইবার পূর্ব্বেই কমিশনারদিগের সুবুদ্ধির উদয় হইল, তাঁহারা বয়সঘটিত আপত্তির প্রত্যাহার করিলেন—সুরেন্দ্রনাথ ও শ্রীপদবাবাজী ঠাকুর উভয়েই সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ লাভ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এই শুভ সংবাদ তারযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু পুত্রের এই সাফল্যের সংবাদে যিনি আনন্দ করিবেন, সংবাদ পৌঁছিবার মাত্র এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই ডাক্তার দুর্গাচরণ—যেখানে এই মরজগতের ভালমন্দ কোন সংবাদই পৌঁছে না, সেই লোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন—পুত্রের সফলতার সংবাদ তিনি শুনিয়া যাইতে পারেন নাই। বিলাতে থাকিতে পিতৃবিয়োগ সংবাদ শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পরীক্ষার্থীদিগকে আরও দুই বৎসর কার্য্যকরী শিক্ষালাভ করিতে হয় এবং আবার পরীক্ষা দিতে হয়। বয়সের গোলযোগে সুরেন্দ্রনাথের এক বৎসর সময় নষ্ট হয়। কঠোর পরিশ্রম করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমুদয় অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর সুরেন্দ্রনাথ দুই বন্ধু রমেশচন্দ্র ও বিহারীলালের সহিত ভারতে প্রত্যাগমন কল্পে অর্ণবপোতে আরোহণ করেন।

দেশে আসিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে শ্রীহট্ট জেলায় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। এক বৎসরের মধ্যে যোগ্যতার সহিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পান। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে শ্রীহট্টের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট—সুরেন্দ্রনাথ একটি মোকদ্দমায় আইনানুগভাবে কাজ করেন নাই বলিয়া অভিযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কৈফিয়ৎ দিলেন যে, তাঁহার একজন কর্ম্মচারী তাঁহার স্বাক্ষরের জন্য নথী-পত্র উপস্থিত করিলে, তিনি উক্ত কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস করিয়াই কাগজপত্র আদ্যোপান্ত পাঠ না করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তাহাতেই এই ভ্রম হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাদারল্যাণ্ড সাহেব এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। এই ব্যাপার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইল এবং সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চৌদ্দ দফা অভিযোগ স্থাপিত হইল। নবেম্বর মাসে একটি কমিশন গঠিত হইল। কমিশন শ্রীহট্টে গিয়া সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিলেন। কমিশনের বিচারে সুরেন্দ্রনাথ দোষী সাব্যস্ত হইলেন, এবং মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি সহ কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন। কমিশনের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য পর বৎসর মার্চ্চ মাসে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি ভারত-সচিবের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অগত্যা তিনি ব্যারিষ্টার

হইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতেও সফল-মনোরথ হইলেন না।

পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই বিপন্নের সহায়। সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুপুত্রকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এইবার নিজের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র পাইলেন।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জুলাই পরলোকগত আনন্দমোহন বসুর সহিত মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন বা ভারত সভা স্থাপন করেন। সভা স্থাপনের দিন পূর্ব্বাহ্ণে তাঁহার তথনকার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়। পুত্রশোক বুকে চাপিয়া রাখিয়া তিনি অপরাহ্ণে সভায় আগমন করেন এবং ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ করদাতৃগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার হন। ইহার পরও সাত আটবার নির্ব্বাচিত হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কমিশনার ছিলেন।

স্বয়ং সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রগণের অসুবিধার কথা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া বয়সের বাঁধাবাঁধি নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রধান। সুদূর বিলাতে সম্পূর্ণ নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আত্মীয়-স্বজন-বিচ্যুত ভারতীয় তরুণ যুবকগণকে বিদেশী ভাষায় পৃথিবীর মধ্যে কঠোরতম পরীক্ষা—সিবিল সার্ব্বিসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার বয়স তখন ছিল একুশ বৎসর। তৎকালীন ভারত-সচিব পরীক্ষার বয়স কমাইয়া উনিশ বৎসর করিলেন। এই সংবাদ ভারতে পৌছিলে সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। দুই বৎসরব্যাপী আন্দোলনের ফলে ভারত-সচিব লর্ড স্যালিসবেরীর নূতন বিধি রহিত হইয়া উনিশ বৎসরের স্থলে উর্দ্ধতম বয়সের সীমা বাইশ বৎসর নির্দ্ধারিত হইল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ লর্ড লিটনের গবর্ণমেণ্ট সুবিখ্যাত ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৯ আইন পাশ করিলেন। ইহার দ্বারা দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব্বীকৃত হইল।

এই আইনের বিরুদ্ধেও দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথও এই আন্দোলনে অন্যতম নেতার পদ গ্রহণ করিলেন। আন্দোলনে সুফল ফলিয়াছিল, আইন রহিত হইয়াছিল।

"বেঙ্গলী" পত্র সম্পাদন ও পরিচালন সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। ইহার পরই রিপণ কলেজের স্থান। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সুরেন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক বেঙ্গলীর সম্পাদন ও পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। কলুটোলার স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহযোগে তিনি উহাকে দৈনিকে পরিণত করেন। তাঁহার সম্পাদনায় দৈনিক বেঙ্গলীর প্রচার সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়। সুরেন্দ্রনাথ মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত বেঙ্গলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভাবলে বেঙ্গলী রাষ্ট্রশক্তির একটি প্রবল অংশে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে সুরেন্দ্রনাথ বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত বেঙ্গলী আফিস হইতে "বাঙ্গালী" নামে একখানি বাঙ্গলা দৈনিক পত্রের প্রচার করেন। প্রথমে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার সম্পাদক হন। কাগজখানি কিন্তু চলে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ যেমন যোগ্যতম সাংবাদিক ছিলেন, ততোধিক যোগ্যতম অধ্যাপকও ছিলেন। মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি ছাত্রসমাজের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু সিটি কলেজ স্থাপন করিলে, আনন্দমোহনের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া মাসিক এক শত টাকা বেতনে সিটি কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। এখানেও অচিরে ছাত্রসমাজ সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে সুরেন্দ্রনাথকে মেট্রোপলিটান ছাড়িতে হইল। কিছু দিন সিটি কলেজের এক শত টাকার উপর নির্ভর করিয়া থাকিবার পর সুরেন্দ্রনাথ ফ্রি চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে সিটি কলেজ ত্যাগ করিতে হইবে না এই সর্ত্তে মাসিক তিন শত টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে

সুরেন্দ্রনাথ সিটি কলেজ ও ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক বহুবাজারে প্রেসিডেন্সী ইনষ্টিটিউসন নামে ক্ষুদ্র একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। উহার ছাত্র সংখ্যা ছিল এক শত। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় সম্পূর্নরূপে ছাড়িয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে স্কুলটির দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। উহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে উহা কলেজে পরিণত হইল—ছাত্র সংখ্যা হইল ১৭০০। সুরেন্দ্রনাথ তৎকালীন বড় লাট লর্ড রিপণের নামে বিদ্যালয়টির নাম রাখিলেন রিপণ কলেজ। উত্তর কালে তিনি একটি কমিটির হস্তে কলেজটি ছাড়িয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথের সাধের বেঙ্গলী বিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারত-সভা ও রিপণ কলেজ দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্যতম অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর কাল তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। মধ্যে একবার আদালতের অবমাননার অপরাধে দুই মাস কাল কারাবাস করিলেও এই অনারারী চাকুরীটি খসে নাই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস সাহেবের এজলাসে একটি মোকদ্দমা উপলক্ষে একটি শালগ্রামশিলা হাইকোর্টের বারান্দায় আনীত হয়। ইহাতে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছে বিবেচনা করিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র বিচারপতি নরিসের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া উহার একাধিক সংখ্যায় কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তদবলম্বনে তাঁহার বেঙ্গলীতে নরিস সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু তীব্র উক্তি করিয়াছিলেন। এ জন্য সুরেন্দ্রনাথ এবং বেঙ্গলীর প্রিণ্টার রামকুমার দের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ আনীত হয়। হাইকোর্ট হইতে রুল জারি হইল যে, সুরেন্দ্রনাথ কেন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন। সুরেন্দ্রনাথ অতঃপর শালগ্রামশিলা আদালতে আনয়ন সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের প্রার্থনা মতে এবং আদালতের কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া নরিস সাহেব আদালতে শালগ্রামশিলা আনয়নের অনুমতি দিয়াছিলেন—কোনরূপ জোর-জবরদস্তি হুকুম দেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথের মামলার বিচার করিবার জন্য প্রধান বিচারপতি সার রিচার্ড গার্থ, রমেশচন্দ্র মিত্র, মিঃ নরিস, মিঃ কানিংহাম ও মিঃ ম্যাকডনেল এই পাঁচজন বিচারপতিকে লইয়া ফুলবেঞ্চ গঠিত হইল। জ্যাকসন, গ্রিফিথ এভান্স, ট্রিভেলিয়ান, রবার্ট এলেন প্রভৃতি বড় বড় ইয়োরোপীয়ান ব্যারিষ্টাররা কেহই সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্রিফ লইতে সম্মত হইলেন না। সরকার পক্ষে চারিজন বড় সাহেব ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে রহিলেন ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি, এবং এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্র।

৪ঠা মে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ এফিডেভিট করিয়া প্রবন্ধের সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, আদালতের অবমাননা করার বা বিচারপতির মনে ক্লেশ দিবার অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। তিনি সরল বিশ্বাসে সাধারণের হিতার্থ কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার উক্তি ভ্রান্ত জানিয়া তাঁহার সমালোচনা প্রত্যাহার করিতেছেন এবং ত্রুটি স্বীকার ও দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

৪ঠা মে মামলা মুলতবী হইল। পর দিন বিচারপতিরা রায় দিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথ অপরাধী; তাঁহার দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের এই মোকদ্দমা উপলক্ষে দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রেই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর সকল সংবাদপত্রই দণ্ডের বিরুদ্ধে অভিমত এবং শোক প্রকাশ করেন।

সুরেন্দ্র-কারাবাসে কেবল দুঃখ-শোক প্রকাশ ও প্রতিবাদ করিয়াই দেশবাসী ক্ষান্ত থাকেন নাই। আপীল করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার জন্য কমিটি গঠিত হইল এবং চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল। এ দিকে কারাগার হইতে সুরেন্দ্রনাথ "ন্যাশনাল ফণ্ড" বা জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তদনুযায়ী ন্যাশনাল ফণ্ডও প্রতিষ্ঠিত হইল ও সে জন্যও চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল। আপীলের ব্যবস্থা করিবার জন্য স্বর্গীয় মনোমোহন

ঘোষ মহাশয় বিলাত চলিয়া গেলেন। প্রিভি কাউন্সিলে আপীল রুজু হইল। প্রিভিকাউন্সিলাররা কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ই বলবৎ রাখিলেন।

ইহার পর ইলবার্ট বিল উপলক্ষে দেশব্যাপী আন্দোলন এবং সভা-সমিতি আরম্ভ হয়। ইতঃপূর্ব্বে দেশীয় সিভিলিয়ানগণের ইয়োরোপীয়দের অপরাধের বিচার করিবার অধিকার ছিল না। প্রথমে লর্ড নর্থব্রুক দেশীয় হাকিমদিগকে এই অধিকার দিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। পরে সমদর্শী লর্ড রিপণ সেক্রেটারী ইলবার্ট সাহেবকে এই মর্ম্মে একটি আইন রচনা করিবার আদেশ দেন। ইহাই ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। ইরোরোপীয়ানরা ইহার ঘোর প্রতিবাদ এবং দেশীয়গণ সমর্থন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জানুয়ারী বিলটি আইনে পরিণত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বেঙ্গলীতে ইহার পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতারূপে সুরেন্দ্রনাথ দিল্লীর দরবারে গমন করিয়াছিলেন। দরবার উপলক্ষে দিল্লীতে ভারতের সকল প্রদেশের লোক এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্মিলিত হন। ইহা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের মনে এই কল্পনার উদয় হয় যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের প্রতিনিধিগণের একত্র সম্মিলন সম্ভবপর হইবে না কেন? এই কল্পনার পরিণতি স্বরূপ সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২৯, ৩০ ও ৩১এ তারিখে কলিকাতার এলবার্ট হলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন করিলেন। এই সভায় গণ্যমান্য বাঙ্গালী ভদ্রলোক ব্যতীত কয়েকজন ভিন্ন প্রদেশবাসী ভদ্রলোকও যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভা প্রতি বৎসরই ঐ সময়ে হইতে থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৮, ২৯ ও ৩০এ ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। মিঃ ডবলিউ সি ব্যানার্জ্জি প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সে ব্যস্ত থাকায় যাইতে পারেন নাই। এই একবার ব্যতীত সুরেন্দ্রনাথ সুরাট কংগ্রেস পর্য্যন্ত কোনবারই কংগ্রেসে অনুপস্থিত থাকেন নাই। কংগ্রেস ও কনফারেন্সের উদ্দেশ্য একই হওয়ায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দুইটি মিলিয়া এক হইয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন—প্রথমবার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণা নগরে একাদশ বার্ষিক কংগ্রেসে এবং দ্বিতীয়বার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে অষ্টাদশ অধিবেশনে। কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে স্থির হয় যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির সংস্কার কল্পে আবেদন করিবার জন্য বিলাতে একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করা হউক। তদনুসারে যে ডেপুটেশন ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, সুরেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সময়ে বিলাতে সুরেন্দ্রনাথ বহু স্থলে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই সকল বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা-শক্তি দেখিয়া বিলাতবাসী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। একজন ইংরেজ এই একমাত্র বাঙ্গালী বক্তাকে একাধারে উইলিয়ম পিট্, ফক্স, বার্ক ও সেরিডানের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। আর একজন ইংরেজ ভদ্রলোক বলেন, তিনি গ্লাডষ্টোন ব্যতীত আর কাহারও মুখে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই।

জুরীর বিচার এ দেশবাসীর একটা বড় অধিকার। ইহাতে বিচার বিভ্রাটের আশঙ্কা কম হয়, বিচারকরা যথেচ্ছ ভাবে কার্য্য করিতে পারেন না। কিন্তু জুরী প্রথার বিরোধী এক সম্প্রদায় লোকও এ দেশে আছেন। তাঁহারা জুরী প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে আন্দোলন করিয়া থাকেন। সুরেন্দ্রনাথের আমলে একাধিকবার এইরূপ আন্দোলন হয়; এবং তদনুযায়ী দুইবার গবর্ণমেণ্ট হইতে জুরি-নোটিফিকেসন প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় জুরি-নোটিফিকেসন প্রত্যাহৃত হয়, এবং জুরির বিচারাধিকার অধিকতর বিস্তৃত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অবৈতনিক চেয়ারম্যান এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে সহরের অনেক উন্নতি সাধন এবং সুবিচার বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে দুইবার এবং চব্বিশ পরগণা জেলা বোর্ড হইতে দুইবার নির্ব্বাচিত হইয়া ১৮৯৩ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের কার্য্য করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে উহা স্বায়ত্তশাসনের খর্ব্বতামূলক বিবেচনা করিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে তিনি ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। এই সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে কমিশন ভারতের আয়ব্যয় এবং রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিলটি লইয়া কলিকাতায় বিষম সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সদস্যগণ, এবং সহরে সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন। বিলটি তৎকালীন ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জী সাহেবের প্ররোচনায় রচিত বলিয়া উহা পরে মেকেঞ্জী এ্যাক্ট নামে পরিচিত হইয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার ফলে বিলটির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় বিলটি আইনে পরিণত হয়। কলিকাতাবাসীর অজস্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আইন পাশ হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আটাশজন কমিশনার পদত্যাগ করেন। এই আইন উপলক্ষে কলিকাতায় এমন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল যে কমিশনারগণের পদত্যাগ উপলক্ষে স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "সাবাস আটাশ!" প্রহসনখানি রচনা করেন ও তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর তিনি ফেলো ছিলেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব হইবামাত্র উহার প্রতিবাদসূচক আন্দোলন আরম্ভ হয়—দেশের নানা স্থানে প্রতিবাদ-সভা হইতে থাকে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ কলিকাতা টাউনহলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। এই সভায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, টাউন হলের উপরতলায় একটি ও নিম্নতলে একটি এই দুইটি সভা করিতে হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে উপর তলায় বক্তৃতা করিয়া নিম্নতলে আসিয়া আবার বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর ২৩এ এপ্রেল মৈমনসিংহে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ সূচক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে চির স্মরণীয় বয়কট সভা হয়। লোকাধিক্যবশতঃ টাউন হলের উপর তলায় একটি, নিম্নতলে একটি ও সম্মুখের ময়দানে একটি সভা হয়। সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যায় ক্রমে তিনটি সভাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভায় বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ মন্তব্য গৃহীত হয়। এই সভাতেই, বাঙ্গলার এই বিষম বিপদের দিনে সুরেন্দ্রনাথকে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। জন-নায়কগণের সে অনুরোধ সুরেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করিলেন না—জাতীয় যজ্ঞে মাতৃপূজার পৌরোহিত্য-ভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী ভাবের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-বালক-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী মাত্রেই এই আন্দোলনে মাতিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় সমগ্র ভারতবর্ষ অল্প-বিস্তর তাতিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথের সুদক্ষ পরিচালনায় অতি সুশৃঙ্খল ভাবে বাঙ্গালী জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইল।

পরবর্ত্তী ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন বাঙ্গলার রাজ-নীতিক ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন সরকারী ঘোষণা বলে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল; কলিকাতায় একজন ও ঢাকায় একজন ছোট-লাট এই দুই খণ্ড বঙ্গদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালী তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ পরস্পরের হস্তে রাখী বন্ধন করিয়া অখণ্ড ভ্রাতৃভাবের সূত্রে আবদ্ধ হইল। মৃতকল্প আনন্দমোহন বসু মহাশয় একটি খাটে দ্বাদশ বাহক স্কন্ধে আসিয়া বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ-উত্তেজনার মধ্যে ফেডারেশন হল বা অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন।

বয়কট আন্দোলন পরিচালনে ছাত্রসমাজ পরম সহায়; অতএব ইহাতে বাধা দিতে হইলে ছাত্রসমাজকে সংযত ও দমন করা আবশ্যক বিবেচনায় কার্লাইল সাহেব সার্কুলার জারি করিয়া ছাত্রসমাজকে আন্দোলন হইতে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। ইহার ফলে উল্টা উৎপত্তি হইল। একটি এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি স্থাপিত হইল, এবং সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজে প্রবল আন্দোলন উত্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনেরও নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ফলে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ বা National Council of Education এবং একটি শিল্পবিদ্যালয় বা Technical College স্থাপিত হইল। চারিদিকে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ধুম পড়িয়া গেল।

জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ নানা উপায়

অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল (১৩১৩ সালের ১লা বৈশাখ) বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে স্থির ছিল। যথাসময়ে বরিশাল—রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে সভার অধিবেশন আরম্ভ হইল। বরিশালের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব সদলবলে সভায় উপস্থিত ছিলেন। উদ্যানের বাহিরে বিরাট জনতা। সহসা তথায় একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ গোলমাল থামাইতে অসমর্থ হইলেন। কেম্প সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন সাহেবের খাস কামরায় লইয়া গেলেন। সুরেন্দ্রনাথের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হইল। পরে আপীলে হাইকোর্টের আদেশে দণ্ড রহিত হয় এবং টাকা সুরেন্দ্রনাথকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল। সুরাট দক্ষযজ্ঞের পর দেশে দুইটি রাজনীতিক দলের সৃষ্টি হইল—মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী। সুরেন্দ্রনাথ চিরদিন constitutional agitationএর পক্ষপাতী—তিনি প্রথম দলে রহিলেন। কংগ্রেস চরমপন্থীদলের হাতে চলিয়া গেল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তথাপি দেশের অবিসম্বাদী নেতাই রহিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন বন্ধ হইল না। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথের সাধনা একদিন জয়যুক্ত হইল—ভারত-সচিব লর্ড মর্লের settled fact unsettled হইল—ভাঙ্গা বাঙ্গলা যোড়া লাগিল—দুইজন শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা আবার একজন শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন হইল—বাঙ্গালী আবার এক হইল।

ইহার পর হইতে সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক মতামতের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইল—তিনি অপেক্ষাকৃত শান্ত সংযত হইয়া পড়িলেন।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সহিত পরামর্শ ও লেখালেখি করিয়া নূতন ভারতশাসন-বিধির খসড়া প্রণয়ন করিলেন। এই মণ্টফোর্ড স্কীম বিলাতী পার্লামেণ্টে আইনে পরিণত হইয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসরের জন্য ভারতে প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাতে পুরাতন শাসন ব্যবস্থা একেবারে বদলাইয়া গেল। প্রদেশে প্রদেশে ছোটলাটের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক গবর্ণরের পদের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক প্রদেশে কয়েকজন করিয়া নির্ব্বাচিত মন্ত্রীর পদের সৃষ্টি হইল, এবং দেশ শাসনের কয়েকটি বিভাগ মন্ত্রী-মণ্ডলের হস্তে অর্পিত হইল। ইহাতে ভারতবাসী অল্প কিছু স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিলেন। এই নূতন শাসন-বিধি চরমপন্থীদলের মনঃপূত হইল না বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ মধ্যপন্থীরা ইহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এখন গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইয়া 'স্যার' সুরেন্দ্রনাথ হইলেন এবং বার্ষিক ৬৪০০০ টাকা বেতনে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রী হইবার পর তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—নূতন কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন। এই আইনবলে আরও কিঞ্চিৎ স্বায়ত্তশাসন ভার কলিকাতাবাসীর হাতে আসিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিরও আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সন ১৩৩২ সালের ২২এ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট—বয়কট ঘোষণার বার্ষিক তিথি) ভারতের এই প্রচণ্ড কর্ম্মবীর লোকান্তরিত হইয়াছেন।



অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন রোমের ভাস্কর্য্য-শিল্প)

প্রাচীন রোম একদিন শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, সভ্যতায় জগদ্বিখ্যাত হয়েছিল। রোমের প্রথম সম্রাট অগষ্টাসের শাসনকালই রোমের শ্রেষ্ঠতম যুগ বলে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অথচ রোমের এই শ্রেষ্ঠতম যুগের শিল্পকলা কোনোদিনই তার যোগ্য সমাদর লাভ করতে পারেনি।



সম্রাট অগষ্টাসের প্রতিমূর্ত্তি

(রোমের আদি সম্রাট অগষ্টাসের বিশ্ববিজয়ী মূর্ত্তি। পদতলে পৃথিবী বিলুণ্ঠিত। পৃথিবীর সন্তান তাঁর চরণস্পর্শ করে শান্তি ভিক্ষা করছে)

সম্রাট অগষ্টাস্ থেকে সুরু ক'রে কনষ্ট্যান্টাইনের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত রোমের শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যকে লোকে অবহেলার চক্ষেই দেখে এসেছে। গ্রীক্ ভাস্কর্য্যের অক্ষম অনুকরণ ব'লে রোমের ভাস্কর্য্য-শিল্প সেদিন সবার অনাদর পেয়েছে। কিন্তু, বর্ত্তমান যুগের শিল্প-সমলোচকেরা বহু গবেষণা ক'রে সপ্রমাণ করেছেন যে এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। রোমের শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য গ্রীকের অনুকরণ ত' নয়ই, বরং ক্রিশ্চিয়ান শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ব'লে এতদিন যা চলে এসেছে তার অধিকাংশই হ'চ্ছে অখৃষ্টান রোমের অনাদৃত শিল্পকলারই অপূর্ব্ব দান।

প্রাচীন গ্রীকশিল্প ও ইটালীয় শিল্পের নব অভ্যুদয়ের

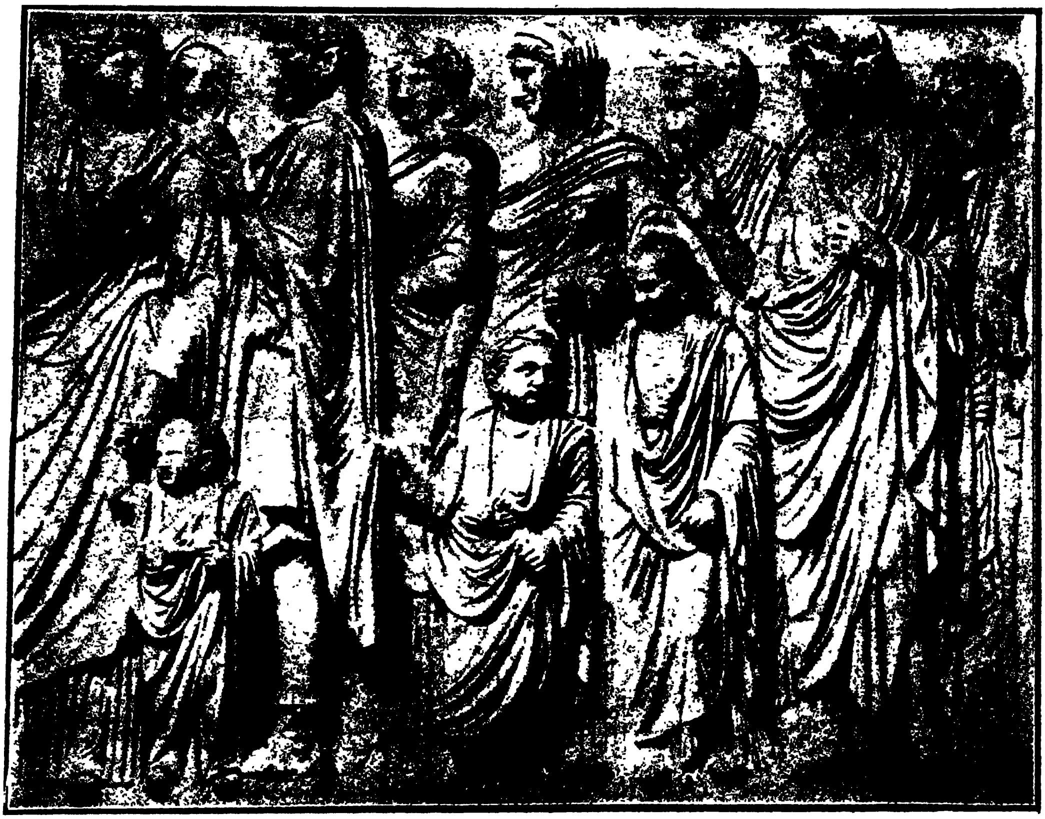


সম্রাট ভেস্পেসিয়ানের মর্ম্মর মূর্ত্তি

(খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত রোঁদার ভাস্কর্য্যের তুলনায় কোনো অংশে হীন নয়)

মধ্যে প্রাচীন রোমের শিল্পকলাই সেতুবন্ধনের কাজ ক'রেছে। গ্রীক শিল্পীরা তাঁদের কলাপদ্ধতির মধ্যে যে সমস্যাটাকে

এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন, রোম তার শিল্পে সেই সমস্যারই সমাধান করতে চেষ্টা করেছিল এবং আংশিক সাফল্যও অর্জ্জন করতে পেরেছিল। রোমের পর সহস্র-বৎসরের মধ্যে শিল্পরাজ্যে আর সে সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টাই দেখা যায় না। শিল্পে 'ক্রমপর্য্যায়ক'-ভঙ্গী (Continuous Style) রোমের সৃষ্টি। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে-গেছে নানা-দেশের শিল্পরাজ্য শিল্পকলার এই 'ক্রমপর্য্যায়ক' ভঙ্গী শুধু মেনে নিয়ে নয়, আদর্শ করে জনক স্বরূপ। রোমের শিল্পীরা চিত্র জগৎকে আর এক নূতন পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছিল। শ্রেষ্ঠ রূপ বা আদর্শ সৌন্দর্য্যের চিত্র আঁকতে হ'লে যে সব বাঁধা-ধরা নিয়ম-পদ্ধতি ও পরিমাপ মেনে তুলি ধ'রতে হ'ত রোম সে গতানুগতিক পথে না গিয়ে-রূপের অভিব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বতার ও চারিত্রিক বিশেষত্ব কি—তারই সন্ধান নিয়ে সেইটেই চিত্রে পরিস্ফুট করে তুলতে শেখালে · ফলে, যা ছিল এতদিন শুধু পটে আঁকা ছবি তা হ'য়ে উঠেছিল ব্যক্তির



শান্তি পীঠের চতুর্পার্শ্বে উৎকীর্ণ শিলা-চিত্র। (রাজদর্শনে সমাগত নরনারী বালক বৃদ্ধ)
(খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোমের রাষ্ট্রসভা সম্রাট অগষ্টাসের বিজয়কীর্ত্তি স্মরণীয় ক'রে রাখবার জন্য এই শান্তিপীঠ নির্ম্মাণ করেছিলেন)

নিয়ে। ট্রাজান স্তম্ভের গাত্র বেষ্টন ক'রে যে উদ্গত শিলা-চিত্রমালা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন ক'রছে, তারাই গ্নোটোর বাইবেল সংক্রান্ত পৌরাণিক প্রাচীর-চিত্র এবং হগার্থের বিখ্যাত "Marriage a la Mode" শীর্ষক চিত্রাবলীর প্রকৃত স্বরূপ। এই পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিত্র জগতে রীতিমত একটা যুগান্তর এসেছিল।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে রোমের শিল্পীরা যদি এতই প্রতিভাবান, কলাক্ষেত্রে যদি তারা এমন নব নব দানই করে

থাকে এবং শিল্প-পদ্ধতিকে একটা নূতন দিকে পরিচালিত করতে পেরে থাকে তবে তাদের সে যুগে খ্যাতির অভাব হয়েছিল কেন? রোমের প্রাচীন শিল্পীদের নামই বা কেউ জানে না কেন?—এর উত্তরে বল যেতে পারে রোমের শিল্পীদের এই দুর্ভাগ্যের জন্য রোমানরা নিজেরাই সবচেয়ে বেশী অপরাধী। রোমের ঐশ্বর্য্য বীর্য্য সাম্রাজ্য সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে রোমানরা গর্ব্ব করেছে এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠেছে, কিন্তু, নিজেদের শিল্পকলা সম্বন্ধে কোনোদিনই তাদের একটা গৌরববোধ জাগেনি। তাদের মস্তবড় একটা ভুল ধারণা ছিল যে শিল্পকলার ক্ষেত্রে



হার্কিউলিসের বেশে সম্রাট কমোডাসের মূর্ত্তি
(এই মূর্ত্তির চোখদু'টি বিশেষ ভাবে দেখবার; কারণ, পাষাণে গঠিত মূর্ত্তির চোখ এমন সজীব ও স্নিগ্ধ খুব অল্পই দেখা যায়)

বিদেশীদের কৃতিত্বই বেশী। রোম এ বিষয়ে সকলের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে আছে। ভারতবর্ষেও ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে একদিন অনুরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে আর্টের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিশেষ দান কিছু নেই! তাই স্বদেশী শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে তারা ইটালী রোম গ্রীস ও প্যারিসের শিল্প-সম্ভারে নিজেদের গৃহশোভা বর্দ্ধন ক'রতে লজ্জা বোধ করা দূরে থাক, বরং একান্ত গৌরব বোধই করতো!

যাই হোক নিজেদের স্বদেশজাত শিল্পকলা ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ উদাসীন থাকার ফলে রোমের কোনো লেখক তাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ও ভাস্করদের কোনো বিবরণই কখন লিখে রেখে যাননি; ফলে রোমানদের মধ্যে যাঁরা শিল্পকলায় ও ভাস্কর্য্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন জগতের লোক আজ তাদের কারুরই নাম জানে না।



এ্যান্টিনোসের প্রতিমূর্ত্তি (সম্মুখ দিক)
(আদর্শ সৌন্দর্য্যকে রূপায়িত করে তোলবার জন্য রোমের ভাস্কর্য্য শিল্পীরা একসময় গ্রীকদের অনুকরণ করেছিলেন, এ মূর্ত্তি তারই নিদর্শন)

অথচ এই রোমান লেখক ও শিল্প সমালোচকরা গ্রীক-শিল্পী ও ভাস্করদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন; কাজেই জনসাধারণের মধ্যেও এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে পড়েছিল যে রোমান শিল্পকলার তেমন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন সম্রাটের শাসনকালে রোমের উপর দিয়ে যে পরিবর্ত্তনের ও সংস্কারের স্রোত প্রবাহিত হ'য়েছিল, যেমন লঙ্কাদহনের মত নীরোর রোম দগ্ধ করা, ট্রাজানের ও এণ্টোনাইনের ব্যাপক ভাবে নগর সংস্কার ও পূর্ত্তকার্য্য প্রভৃতি এই সকল নব সংগঠনের প্রাবল্যে সম্রাট অগষ্টাস্ ও তাঁর পূর্ব্ব যুগের শিল্প ও ভাস্কর্য্য-কলার নিদর্শন অতি সামান্যই আর খুঁজে পাওয়া যায়। রোমের প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতিস্তম্ভগুলি আজ যে শুধু ধ্বংসাবশেষে পরিণত তাই নয় এই সব জয়-স্তম্ভের খণ্ডাংশ নানা দেশের যাতুঘরের শোভা-



এ্যাণ্টিনোসের প্রতিমূর্ত্তি (পাশের দিক)
(সম্রাট হ্যাড্রিয়ানের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল এই অতি সুদর্শন কিশোর কুমার এ্যাণ্টিনোস্। এই অজ্ঞাত কুলশীল বালকের নারীসুলভ সৌন্দর্য্য সম্রাটকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। নীলনদে জলমগ্ন হয়ে এই সুকুমার বালকের অকাল-মৃত্যু ঘটে)

র্দ্ধনের জন্য রোমের বাইরে চলে গেছে। শিল্পরাজ্যে সম্রাট অগষ্টাসের যুগের যে মহত্তর দান "Ara Pacis" অর্থাৎ 'শান্তিপীঠ' যা খৃঃ পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেনেটের সদস্যেরা সম্রাটের গল ও স্পেন বিজয়ের গৌরব স্মৃতি-স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, আজ তার ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে! এই শান্তিপীঠের বেদীমূলে উদ্গত শিলা-চিত্রে বিবিধ রূপক আলেখ্য উৎকীর্ণ করা ছিল। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল একটি মিছিলের ক্রমপর্য্যায়ক চিত্র-শ্রেণী; তার মধ্যে সানুচর সম্রাট ও রাজপরিবারের সকলের মূর্ত্তিই উৎকীর্ণ ছিল। এই শান্তিপীঠের ধ্বংসাবশিষ্ট কয়েকখণ্ড শিলা-চিত্র পোপের প্রাসাদ ভিলা মেডিসি, রোমের যাতুঘর Museo delle Terme ফ্লোরেন্সের য়ুফিজ্জি এবং প্যারিসের ল্যুভারে দেখতে পাওয়া যায়।

অষ্ট্রিয়ার প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ইয়ুজিন পীটার্স'ন দীর্ঘকাল পরিশ্রম করে নানাস্থানে সংগৃহীত এই ভগ্নাংশগুলিকে মূলের সঙ্গে সনাক্ত করেছেন এবং সেগুলির আলোকচিত্র নিয়ে পরস্পর মিলিয়ে শেষ পর্য্যন্ত ছবিতে এর একটা সম্পূর্ণ রূপ খাড়া ক'রে তুলেছেন। রোমের মিউজিয়মে এই বিজয়-স্মৃতি-মন্দিরের পাদপীঠের যে অংশটুকু পাওয়া গেছে তার ভাস্কর্য্য-ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের সহজ রূপ বিকশিত হয়ে উঠেছে যে সে দেখে বিশেষজ্ঞেরা অগষ্টাইনযুগের শিলাশিল্পীদের "পাষাণের যাতুকর" বলে অভিনন্দিত ক'রতে দ্বিধাবোধ করেননি। পাথর কেটে তার কঠিন বুকে তারা যে শাখা-পল্লব উৎকীর্ণ করে গেছেন প্রকৃতির সহজাত তরুপত্রের তুলনায় তার বিনম্র কমনীয়তা কোনো অংশে কম নয়। অনন্নুকরণীয় স্বভাবশ্রীকে সে যুগের শিলাশিল্পী যেন কোন যাতুমন্ত্রে পাষাণ-নিগড়ে বন্দিনী করে রেখে গেছেন!" রোমান শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য এই খানেই। এই যে রূপ রেখাকে (Outline) তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের মধ্যে বিলীন ক'রে দেওয়ার পদ্ধতি তাঁরা আবিষ্কার করে গেছেন গ্রীক শিল্পের সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য। গ্রীক শিল্পীরা এতদূর অগ্রসর হ'তে পারেননি। তাঁদের কল্পনার গতি যেখানে যাত্রা শেষ ক'রেছে রোমান শিল্পীরা সে সীমা রেখা পার হ'য়ে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছিল। তাই, কলালক্ষ্মীর অন্তঃপুরের যে অনবদ্য ঐশ্বর্য্যের সন্ধান রোমানরা আমাদের দিতে পেরেছে গ্রীকরা তা পারেনি।

খৃষ্টাব্দ ৮১ সালে সুরু হয়ে ৯৬ সালে রোমে টাইটাসের যে 'বিজয়-তোরণ' নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়েছিল আজও সে কীর্ত্তি-স্তম্ভ বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করছে। রোমের ফ্যোরমে টাইটাসের এই বিজয়-তোরণ এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই তোরণের উভয় পার্শ্বস্থ ভিত্তি-গাত্রের ভিতর দিকে যে ভাস্কর্য্য-চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে—শিল্প জগতকে সে ছবি কলা-বিজ্ঞানের এক নবতর ঐশ্বর্য্যের সন্ধান দিয়েছে। চিত্রের বিষয়বস্তুও এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা—"রোমানরা জেরুশালেম আক্রমণ করেছে!" কিন্তু এমন অতুলনীয় শিলা-শিল্পও বহুদিন অনাদৃত পড়েছিল। মাত্র ১৮৯৪ খৃঃঅব্দে শ্রীযুক্ত Franz Wickhoff এই তোরণ-দ্বারের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য্য কলার অভিনবত্ব ও বিশেষত্বের দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সকলকে বিস্ময় চকিত ক'রে দিয়েছিলেন।

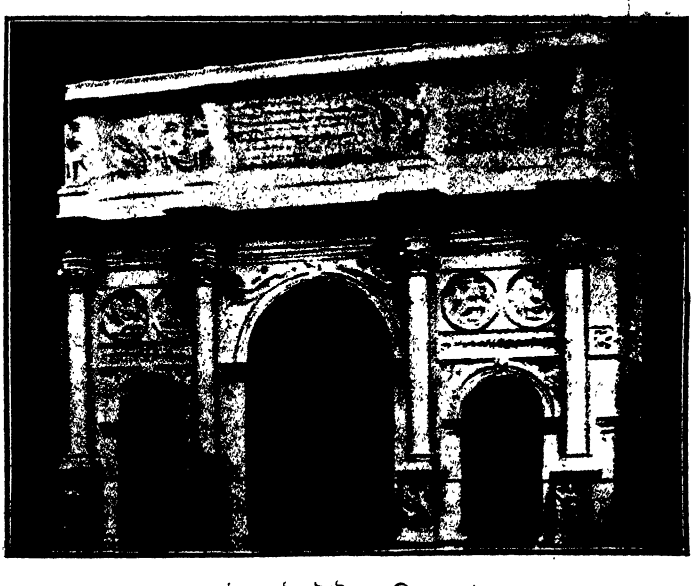
টাইটাসের এই বিজয়-তোরণের একদিকে আছে বিজয়ী রোমান সৈনিকেরা সুসমৃদ্ধ প্রাচীন নগর জেরুশালেমের যা কিছু মূল্যবান সম্পদ লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। দেব-মন্দির পর্য্যন্ত তারা মানেনি। জেরু-শালেমের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবালয় তার মধ্যে ঢুকেও তারা পূজার স্বর্ণপাত্র, নৈবেদ্য নিবেদনের সুবর্ণ বেদী, ভক্তগণকে পূজার সময় আহ্বান করবার জন্য মন্দিরের স্বর্ণ-ভেরী এবং আরতির যে সপ্তশাখা সুবর্ণ দীপাধার, সমস্তই লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, এই চিত্রগুলির উল্লেখ ক'রে উইকোফ্ লিখেছেন:—পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ এই চিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় চখের সামনে রোমান সৈনিকেরা যেন বিজয়োল্লাসে মত্ত হ'য়ে জেরুশালেমের বুকের উপর দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে। এ যেন পটে আঁকা স্থির চিত্র নয়, সম্পূর্ণ গতিবেগময়



জনৈক প্রৌঢ়ের প্রতিমূর্ত্তি
(রোমান মূর্ত্তিশিল্পের অপূর্ব্ব উৎকর্ষের পরিচায়ক)



সম্রাট কারাকাল্লার প্রতিমূর্ত্তি
(পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্পের মধ্যে এইটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত)

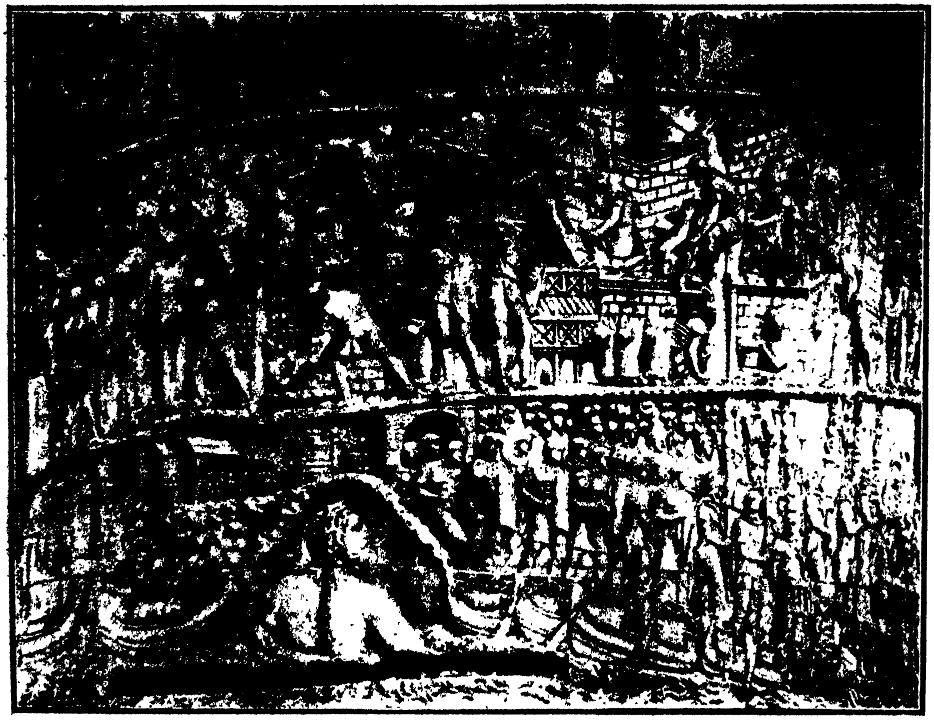


সম্রাট্ কনষ্ট্যান্টাইনের বিজয়-তোরণ

চলচ্চিত্র। প্রতি রেখার বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা, প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুসঙ্গত সুষমা প্রভৃতি চিত্রবিদ্যার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিকে যেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এ যুগের শিল্পী একাগ্রমনে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে এক অখণ্ড ও অবিরাম গতিবেগে স্পন্দমান আলেখ্য করে তুলতে। এ চেষ্টায় তাঁরা ব্যর্থকাম হন নি, আশাতীতরূপে সফল ও জয়যুক্ত হয়েছেন। যাদুকর শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে পাষাণও প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে!

এ পর্য্যন্ত শিল্পকলায় কি চিত্রে কি ভাস্কর্য্যে আমরা কেবলমাত্র দু'টি দিকের সন্ধান পেয়েছিলেম—দৈর্ঘ্য এবং কলাসৃষ্টির মধ্যে ব্যক্ত করতে পেরেছিলেন। মূর্ত্তি যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থান করছে এতদুভয়ের পরস্পরের ব্যবধান-ক্ষেত্র যেটা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে space চিত্রকলায় এই space-এর সন্ধান পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্পীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল অথবা জানা থাকলেও এতাবৎ তাঁরা চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে সেটা ব্যক্ত ক'রতে সক্ষম হননি। ফ্রেবীয়ান যুগে রোমের শিল্পকলার সর্ব্বপ্রথম চিত্রবিদ্যার এই অতি প্রয়োজনীয় দিকটি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল।

এরপর রোমান শিল্পের ধারা কি চিত্রে কি ভাস্কর্য্যে



ট্রাজান স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিলাচিত্রাবলী (সম্রাট ট্রাজানের এই বিজয়স্তম্ভে তাঁর বীরত্বের কীর্ত্তি-গাথা রোমান শিল্পীরা অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে উৎকীর্ণ করে গেছেন)

প্রস্থ। কিন্তু, টাইটাসের এই তোরণ-প্রাচীর যে সুদক্ষ শিল্পীরা উদ্গত শিলাশিল্পে অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন তাঁরা আমাদের চিত্রকলার তৃতীয় দিকের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ছাড়া চিত্রের পশ্চাৎ ভূমির যে একটা বেধ বা গভীরতা ও প্রত্যেক মূর্ত্তির যে একটা ঘনত্ব (depth) আছে এটা রোমান শিল্পীরাই প্রথম তাঁদের আর একবার সম্পূর্ণ রূপান্তর গ্রহণ ক'রেছিল দেখতে পাওয়া যায়—সম্রাট ট্রাজানের রাজ্যকালে। "ট্রাজান স্তম্ভ" যা এখনও পর্য্যন্ত রোমের ফোরামে অটুট অবস্থায় খাড়া হ'য়ে ট্রাজানের নাম অক্ষয় অমর করে রেখেছে তার আপাদ-মস্তকে ভাস্কর্য্য শিল্পের চরম পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণের চক্ষে এ স্তম্ভ যেমন এক বিস্ময়কর কীর্ত্তি

বলে মনে হয়, ভাস্কর্য্য বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের চক্ষে এ স্তম্ভ তার চেয়ে আরও বহুগুণে অধিকতর বিস্ময়ের বস্তু বলে প্রতিভাত হয়। এ স্তম্ভটিকে বেষ্টন করে প্রায় এক গজ প্রশস্ত যে একটি উদ্গত শিলাশিল্প সমম্বিত বেষ্টনী স্তম্ভের মূলদেশে থেকে ঘুরে ঘুরে স্তম্ভশীর্ষ পর্য্যন্ত উঠেছে সেটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২১৭ গজ। স্তম্ভের মূলদেশে এই বন্ধনীটি ১ গজ চওড়া হ'লেও যত স্তম্ভের উপর দিকে উঠেছে ততই এর প্রস্থের পরিমাণ প্রসারিত হ'তে সুরু হয়েছে, কারণ, তা' না করলে স্তম্ভের উচ্চ চূড়ার দিকের ছবিগুলি নীচে থেকে বড্ড ছোট ও অস্পষ্ট দেখাবে। দৃষ্টি দৌর্ব্বল্যের এই সমস্যা সমাধানের জন্যই সেদিনের শিল্পীরা এই অভিনব উপায় আবিষ্কার ক'রেছিল। সুতরাং এ কথাও বলা চলে যে রোমান শিল্পীরাই প্রথম চিত্রে শিল্প-বিজ্ঞান-সম্মত perspective বা আপেক্ষিক পরিমাপ প্রচলিত করেছিলেন।

ট্রাজান স্তম্ভের আপাদ মস্তক তেইশ পাকে জড়িয়ে উঠেছে এই উদ্গত শিলাশিল্পের সচিত্র বন্ধনী। ২১৭ গজ দীর্ঘ এই বন্ধনীর বুকে প্রায় ১৫৫ খানি শিলাচিত্র উৎকীর্ণ করা আছে। সম্রাট ট্রাজানের প্রথম ও দ্বিতীয় ডেসীয়ান অভিযান এই চিত্রগুলির মধ্যে দেখানো হয়েছে। এই দুই অভিযান চিত্রিত ক'রতে পাষাণের বুকের উপর ভাস্কর শিল্পীকে ২৫০০ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ক'রতে হ'য়েছে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'চ্ছে এই আড়াই হাজার মূর্ত্তির প্রত্যেকটির ভঙ্গী বিভিন্ন, কেউ কোনোটির অনুকরণ নয়। সম্রাটের উভয় অভিযান একত্রে মিলিয়ে এমনভাবে এই স্তম্ভগাত্রে তার প্রতিচ্ছবি উৎকীর্ণ করা আছে যে দেখে মনে হবে এ যেন একই অভিযানের নানা ঘটনার এক অবিচ্ছিন্ন চিত্রাবলী! গতিভঙ্গীর একটা স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিকতা এই বিভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন দিকের সুদীর্ঘ চিত্রাবলীর মধ্যে এমন একটি সুসঙ্গত সুষমা বিস্তার করে আছে যে—অভিযান—আক্রমণ—যুদ্ধ—বিজয়—লুণ্ঠন—শান্তি সব কিছুই এই অল্প পরিসরের মধ্যে অত্যন্ত সহজ ভাবেই দেখা দিয়েছে। কোথাও হয়ত দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম



শান্তিপীঠের বেদীমূলে উৎকীর্ণ শাখা পল্লব শোভা (এই উদ্গত শিলা-শিল্পের বিশেষত্ব হ'চ্ছে পল্লবশাখার বিনম্র কমনীয়তা—যা রোমের যাদুকর শিল্পীরা পাথরের কাঠিন্য জয় করে সৃষ্টি করেছেন)



কনষ্ট্যাণ্টাইনের বিজয়-তোরণের একটি শিলাচিত্র (সানুচর সম্রাট অশ্বারোহণে ছুটে চলেছেন সংহারমূর্ত্তিতে শত্রুসৈন্য পদদলিত করে)

চলেছে—সিংহ-বিক্রমে সম্রাট শত্রু সংহার করছেন, কোথাও বা আবার শান্তির প্রশান্ত পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিজয়ী সম্রাটকে রোমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমা সাদর অভিনন্দনে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছেন এবং জয়লক্ষ্মী স্বয়ং তাঁর শিরে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন। এই পরস্পর বিপরীত ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা এবং আবহাওয়ার চিত্রও একই স্তম্ভগাত্রে কোথাও এতটুকু বেমানান বা অস্বাভাবিক মনে হয় না। সুদক্ষ শিল্পীর পরিকল্পনা এমন নিপুণভাবে এখানে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে যে সেই অজ্ঞাত রোমান কলাবিদদের উদ্দেশে লীলায়িত ভঙ্গীর সুকুমার লাবণ্য প্রভৃতি চিত্রকলার বিবিধ ঐশ্বর্য্যের জন্য বহুবিখ্যাত শিল্পকেই এই প্রাচীন রোমানদের দ্বারে এসে হাত পাততে হ'য়েছে। ট্রাজান স্তম্ভ য়ুরোপের শিল্প জগতে এক অভিনব কলাপদ্ধতি প্রচলিত ক'রে দিয়েছিল। চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে কোনো স্মরণীয় ঘটনার ইতিহাস বা বর্ণনা রেখে যাওয়ার প্রথা রোমান শিল্পীরাই জগৎকে শিখিয়েছে।

ট্রাজানের পর রোমের শিল্পীরা আবার কিছুকালের জন্য গ্রীক আদর্শের অনুকরণ ক'রতে সুরু করেছিল। গ্রীক্



কনষ্ট্যাণ্টাইনের বিজয়-তোরণে সন্নিবেশিত আর দু'খানি উদ্গত শিলাচিত্র (বামে—সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস একটি উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে তাঁর সৈনিকদের আদেশ দিচ্ছেন, পশ্চাতে তাঁর দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে। দক্ষিণে—সম্রাট অরেলিয়াস বিজয় কামনা করে দেবমন্দিরে শূকর বলি দিতে এসেছেন, সঙ্গে রাজ-অনুচরবৃন্দ)

র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো থেকে আরম্ভ করে গিওটো, হগার্থ পর্য্যন্ত বিশ্বের বরণীয় শিল্পীরা তাঁদের অজস্র শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে গেছেন। তাঁরা যে তাঁদের সৃষ্টির অসামান্য সৌন্দর্য্যের জন্য এই অপরিচয়ের অন্তরালে বিলুপ্ত রোমান শিল্পীদের কাছে বহুপরিমাণে ঋণী এ কথা তাঁরা অকপটে স্বীকার করে গেছেন। গতির নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি, শিল্পীরা এই সময় অপরূপ সুন্দরী তরুণীর সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠব বা সুদর্শন যুবকের বলিষ্ঠ সুন্দর মূর্ত্তি খোদিত করার দিকেই বেশীরকম ঝুঁকে পড়েছিল এবং বলা বাহুল্য যে এ সকল মূর্ত্তির অধিকাংশই নগ্ন সৌন্দর্য্য।

নরনারীর নগ্নদেহের সৌন্দর্য্য গ্রাসের ন্যায় রোমকেও অচিরে আকৃষ্ট করাতে রোমের শিল্পীরাও ক্রেতার মন

যোগাতে এই জিনিসই সৃষ্টি ক'রতে লেগে গেল। এর ফলে কিন্তু মূর্ত্তিশিল্পের দিক দিয়ে রোম গ্রীক্-ভাস্কর্য্যকে অনেক পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছিল। দেশপূজ্য ব্যক্তি যাঁরা এবং দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরনারী যাঁরা, রোমের শিল্পীরা তাঁদের যে মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি গড়ে রেখে গেছে এমন অবিকল প্রতিরূপ—এমন প্রত্যক্ষ ও জীবন্তপ্রায় প্রতিমূর্ত্তি আর কোনো দেশের ভাস্করেরা সে যুগে গড়তে পারেনি। এমন কি এ বিষয়ে রোমান শিল্পীদের যারা গুরু সেই গ্রীক-রাও এত বেশী উন্নতি লাভ ক'রতে পারেনি। রোমে ট্রাজানের পর এ্যাণ্টোনাইন্ ও অরেলীয়ান্ যুগের শিল্পে গ্রীক কলাপদ্ধতির ছাপ খুব বেশী মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল দেখা যায়। তবে, গ্রীক্‌প্রভাব সত্বেও রোমের শিল্পী কিন্তু সেদিনও তার বিশেষত্ব হারায়নি। তাই, আজ তার সৃষ্টি এই প্রগতি পাগল জগতেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে।

এর পর আবার রোমকে তার নিজস্ব প্রাচীন কলাপদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তন ও অনুসরণ করতে দেখা যায় সেপ্টিমীয়াস্ সেভিরুশ ও তৎপুত্র কারাকাল্লার রাজত্ব কালে। সেই রণজয়ের কীর্ত্তিকাহিনী, দিগ্বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাস অবিচ্ছিন্নভাবে পরের পর উদ্গাত শিলা-চিত্রে উৎকীর্ণ করে যাওয়ার রীতি রোমের শিল্পজগতে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়েছিল বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত ও নির্দ্দোষ হয়ে দেখা দিয়েছিল সে সৃষ্টি! এ যুগের ভাস্কর্য্যকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'চ্ছে সম্রাট কনষ্ট্যাণ্টাইনের গঠিত তোরণ-দ্বার। রোমে যত কিছু ভাস্কর্য্য শিল্পের অবিনশ্বর কীর্ত্তি চ'খে পড়ে তার মধ্যে এই কনষ্ট্যাণ্টাইনের তোরণ-দ্বার গঠন-নৈপুণ্যে ও ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্যে শিল্পীর অতুলনীয় গৌরবগাথা হ'য়ে উঠেছিল। রোমের ভাস্কর্য্যকলার যারা অনুসন্ধানী ছাত্র তাদের পক্ষে কনষ্ট্যাণ্টাইনের এই তোরণদ্বার এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ! কারণ, এই তোরণের প্রাচীরগাত্রে রোমের বিভিন্ন যুগের ভাস্কর্য্য কলার আশ্চর্য্য সম্মিলন দেখতে পাওয়া যায়।. কনষ্ট্যাণ্টাইনের এই বিজয়-তোরণ তাঁরই রাজত্বকালে নির্ম্মিত হ'য়েছিল বটে, কিন্তু—রোমের বহু প্রাচীন পরিত্যক্ত ও ধ্বংসাবশেষ স্মৃতিমন্দিরের উদ্গাত শিলা-চিত্র ও ভাস্কর্য্য শিল্প সংগ্রহ ক'রে এনে এই তোরণ প্রাচীর অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। কাজেই, এই তোরণ-প্রাচীরের শিলা-চিত্রগুলির অনুশীলন করলে রোমের ভাস্কর্য্য-কলার ক্রমবিকাশ ও পরিণতির একটা ধারাবাহিক পরিচয় অতি সহজেই জানতে পারা যায়।

কনষ্ট্যাণ্টাইনের এই বিজয়-তোরণ-দ্বারে রোমের যে সকল ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন আছে তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হ'চ্ছে আটটি চক্রাকার পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ শিলা চিত্র। রাজন্যগণের মৃগয়া, দেবপূজা, পশুবলি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রভৃতিই এই চিত্রগুলির বিষয়বস্তু। বিশেষজ্ঞগণের মতে এগুলি ডোমিটিয়ানের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়েছিল, কারণ, এর মধ্যে যে ভাস্কর্য্য-কলার পরিচয় পাওয়া যায় সে পদ্ধতিতে ঐ যুগেরই বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বন্যবরাহ শিকারের যে শিলা-চিত্রটি এখানে দেওয়া হ'ল সেটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে সে যুগের শিল্পীরা কত বেশী স্বাভাবিকতার পক্ষপাতি



সম্রাট মার্কাস্ অরেলিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি (সম্রাটের এই অশ্বারোহী মূর্ত্তি রোমান ভাস্কর্য্যের এক অভিনব নিদর্শন)

ছিলেন। প্রত্যেক বেগবান অশ্বটির ক্ষিপ্র পদধ্বনি যেন পাষাণের বুকে প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে! পলায়মান বরাহের বিকট গর্জ্জন যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এমনিই জীবন্ত সে চিত্র!

এই তোরণদ্বারের প্রধান প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীর-গাত্রে যে চিত্রিত পাষাণ-ফলক সংলগ্ন আছে, সেগুলি ট্রাজোনের আমলে নির্ম্মিত এবং তাঁরই বিজয়কীর্ত্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে তার বুকে। একখানিতে শিল্পীর কল্পনা এঁকেছে বিজয়ী সম্রাটকে সংহার মূর্ত্তিতে। ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সম্রাট অসংখ্য শত্রুর মৃতদেহ পদদলিত ক'রে! শিরে তাঁর শিরস্ত্রাণ নেই, বায়ুভরে রাজবেশ দুপাশে উড়ছে! প্রাণভয়ে শত্রুদল তাঁর কাছে সকাতরে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছে। পশ্চাতে রাজঅনুচরগণ তাঁর জয়ভেরী নিনাদিত ক'রছে। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এতগুলি মানুষের এত রকম কার্য্যকলাপ যেভাবে এতে দেখানো হ'য়েছে—তার সংস্থিতি সংস্থান ও ও গঠন পারিপাট্য বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য্যেরও বিস্ময় উৎপাদন করে।



বরাহ শিকার (এই উদ্গত শিলা-শিল্পে যে গতিবেগ ও প্রাণস্পন্দন ফুটে উঠেছে তা' যথার্থই বিস্ময়কর)

রোমান ভাস্কর্য্য-শিল্পের এই সব নিদর্শন দেখে এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা চলেনা যে গ্রীক ভাস্কর্য্যের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া রোমান শিল্পের আপন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। গ্রীক্ শিল্পের প্রভাব মধ্যে মধ্যে রোমের কলা-ভবনকে প্রভাবান্বিত করেছে বটে, কিন্তু শিল্পজগতে রোমের নিজস্ব দানও অসামান্য।

গোঁদলপাড়ায় "হলাতঙ্ক"

স্বামী মুদ্গরানন্দ

চিত্রগুপ্তের জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ানেও না-কি একটা সামঞ্জস্য রাখতেই হয়; নচেৎ অডিটে (auditএ) ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে, ধর্ম্মরাজের এজলাসে ফৌজদারীতে পড়বার ভয়ও আছে। তাই যখন জগতে কালাজ্বর, ডিপ্থিরিয়ায় মৃত্যুহার ক্রমেই কম্‌তে সুরু হ'ল, তখন ইনফ্লুয়েঞ্জা, বেরিবেরি বেশ পুরাদমে কাজ চালাতে আরম্ভ ক'রল।

কলকেতায় কুমারটোলার বড় রাস্তার ওপর পাস্তুর ইনসটিটিউট্ খোলা হল। জলাতঙ্কের সংখ্যা ক'মতেই থাক্‌লো। এদিকে গোঁদলপাড়ার ভাঙ্গন দশা আরম্ভ হ'ল। জলাতঙ্কগ্রস্ত লোক আর এদিকে বড় আসেনা। কিন্তু কালাজ্বর যায় ত' ইনফ্লুয়েঞ্জা আসে, ডিপথিরিয়া যায় ত বেরিবেরি আসে। গোঁদলপাড়ায় এক নূতন রোগ দেখা দিল; জলাতঙ্কের পরিবর্ত্তে "হলাতঙ্ক" কয়েকজনের শরীরে প্রতিক্রিয়া সুরু করে দিল। কেউ বল্লে "এটা infection", কেউ বল্লে "উঁহু—parasitic disease" আবার কেউ বল্লে "না বাপু, এটা ultramicroscopic organismএর কাজ।"

যা'হোক মোট কথা শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল এই ব্যাধির সঙ্গে দাড়ীর যেন একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

• নিরীহ ভদ্রলোক, পরের ভালর জন্য বিদ্যালয় তৈরি করে দিলেন। হলঘর হ'ল। আর যেই জনকয়েক দাড়ীওয়ালা বীরপুঙ্গব স্কুলের হল দেখলেন অমনি "হলাতঙ্কে"র প্রথম আক্রমণ (first attack) !!

পাড়ার ছেলেগুলো তেমাথার মোড়ে, দীঘির ঘাটে কলের মাঠে ভেসে ভেসে বেড়ায়। পাড়ায় একটা পুরানো-গোছের লাইব্রেরী ছিল, কিন্তু বড় দুরবস্থায়। জন কয়েক উৎসাহী কর্ম্মী ভদ্রলোককে ধরল গিয়ে। তিনিও লোক-হিতার্থে মুক্তহস্তে সে কাজে এগিয়ে এলেন। লাইব্রেরির বাড়ী হ'ল; হল তৈরী হ'ল। আর রক্ষে নেই দাড়ী-বাবাজীদের "হলাতঙ্কের" second attack। Apoplexyর মত প্রথম আক্রমণের চেয়ে দ্বিতীয় আক্রমণ অধিকতর serious। আর ফেলে রাখা চলে না—একটা চিকিৎসা ত' চাই। কবরেজ এলেন—নাড়ী টিপে মুখ বাকালেন—কিন্তু উপায় ঠাওরাতে পারলেন না। উপরন্তু বেশী মেলা-মেশায় তাঁরও "হলাতঙ্ক" দেখা দিল। ওদিকের ভায়ারা না কি মন্তর-তন্তর জানেন অনেক, অন্ততঃ বচন ঝাড়তে অদ্বিতীয়, তাঁরাও এলেন; ডান দিকে চোখের তারা স্থির রেখে বাঁ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অনেক কসরৎ করল। লাভ কিন্তু দাঁড়াল একই,—ভায়াদেরও "হলাতঙ্কের" ছোয়াচ্ লাগল। একজন হকিমি বিদ্যেতে অপটু ডেটকেও আনান হ'ল। তিনি এসে প্রত্যেকের দাড়ী বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে "হালুয়া খিলাও" করলেন; কিন্তু যথা পূর্ব্ব তথা পরং—তেনার শরীরেও হলাতঙ্কের লক্ষণ প্রকটিত হয়ে উঠ্‌ল।

হসন্ত ঠাকুর একদিন অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রে স্বপ্ন পেল যে যদি এমন লোক পাওয়া যায়, যিনি এক বিষয় অধ্যয়ন করেন কিন্তু অপর বিষয় চর্চ্চা করেন এবং এক তৃতীয় বিষয়ে specialist তবেই তিনিই এই ব্যাধির রোজাগিরি করতে পারবেন।

প্রতিপদের সন্ধ্যাতেই চাল্‌তা গাছের অনতিদূরে চাচার বাড়ীর মাচার তলায় ফরাস পেতে এই স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে deliberations আরম্ভ হয়ে গেল। অনেক logic, ফিজলফি (philosophy নহে) ও আইন সংক্রান্ত আলোচনার পর ঠিক হয়ে গেল "লোক পাঠাও—" হসন্তের স্বপ্নানুযায়ী রোজার তল্লাস কর।" আর পায় কে—বেঁড়ে দাড়ী, লম্বা দাড়ী, ঘন বুনো দাড়ী, পাতলা টেকো দাড়ী, খ্যাংরা দাড়ী সবাই ছুটলো 'হলাতঙ্কে'র জ্বালায় রোজা খুঁজ্‌তে।

এদিকে দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাসও যায় যায়,—এমন সময় খ্যাংরা দাড়ী এসে খবর দিল "Eureka" অর্থাৎ "পেয়েছি।" এই বলে এক রোজাকে এনে introduce করে দিলেন—"ইনি যদিও চিত্রগুপ্ত নন্ কিন্তু ইনিও গুপ্ত অর্থাৎ তাঁরই অর্দ্ধাঙ্গ। আমি পণ্ডিত লোক তাই এই সর্ব্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে আমি প্রথম—অর্দ্ধং ত্যজতি ক'রে পরার্দ্ধ অর্থাৎ শুধু গুপ্তটিকে প্রকাশ করছি আপনাদের কাছে। রসসাহিত্য-সংসদে অনেকগুলি সং বসে ছিলেন; তার মধ্যে বেছে বেছে আমি এটিকে বার করেছি। ইনি জীবিকা হিসাবে হাতুড়ী পেটা শিখেছিলেন; কিন্তু সাহিত্যের চর্চ্চা রাখেন এবং খরচাও করেন; উপরন্তু হাতুড়ীপ্যাথিতে এঁর হাতযশ আছে এবং specialist, তাই এঁর degree হচ্ছে "হাতুড়ে"।" আবার বৈঠক বসল। দেওয়ালে placard পড়ল। গোদলপাড়ার কর্ম্মীর দল সেই বদান্য ভদ্রলোকটিকে নিয়ে হলাতঙ্ক রোগের হাতুড়ের দ্বারা হাতুড়ী-প্যাথি চিকিৎসা দেখতে গেলেন।

ফল কিন্তু দাঁড়াল অন্যরূপ। বৈঠকের মাঝখানে সেই বদান্য ভদ্রলোকটিকে দেখে হাতুড়ে গুপ্ত কেমন চন্ মন্ করতে লাগল। তার পর হাতুড়ী ফেলে ছুটে গিয়েই তাঁকে মারল এক ছোবল্। কর্ম্মীর দল হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। তার পর স্থির হ'ল ভদ্রলোককে একবার পর দিন পাস্তুার ইনষ্টিটিউটে নিয়ে যাওয়া হবে।

সেখানকার কর্তৃপক্ষরা সব শুনে বললেন "হুঁ এরকম প্রাণীর কামড়েই জলাতঙ্ক হয়ে থাকে। হলাতঙ্ক ব্যামো মশাই কখনও শুনিনি—এই প্রথম। তবে যদি পারেন সেই হাতুড়ীপ্যাথ্ specialistটিকে দিন দশেক observationএ রাখবেন। যদি তার পরও তিনি টেঁকেন তবে বুঝতে হবে বিষ নেই innocuous।—

সাময়িকী

চা—শতবার্ষিকী—

ভারতবর্ষে চা'র চাষের শত বর্ষ পূর্ণ হইল। সেকালের কথা—প্রাগৈতিহাসিক যুগের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন; তবে কেহ কেহ এই মত ব্যক্ত করেন যে, তথাগতের ধর্ম্মমত প্রচার-কল্পে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যখন হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া চীনে গমন করেন, তখন তাঁহারাই তথায় অরণ্য চা'র চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এ দেশে চা'গাছের অস্তিত্ব প্রজাপতির দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। কোন য়ুরোপীয় আসামে একটি নূতন প্রকার প্রজাপতি ধরিয়া স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রজাপতিটি চীনে ধরা হইয়াছে। যখন তিনি শুনেন, উহা ভারতে ধরা হইয়াছে, তখন তিনি মত প্রকাশ করেন—তাহা হইলে ভারতে চা গাছ আছে; কারণ ঐ প্রজাপতি চা গাছের।

চা'র চাষ এ দেশের হইলেও ইহা বিদেশীর চেষ্টায় ও মূলধনেই পুষ্ট হইয়াছে। কয় বৎসর পূর্ব্বের হিসাব, সমগ্র ভারতে মোট ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৩ শত একর জমীতে চা'র চাষ হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৪ শত একর জমীর গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা হয়। মোট যে জমীতে চা'র চাষ হয়, তাহার শতকরা ৮৩ ভাগ আসামে এবং বাঙ্গলায় (দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ী জিলায়) এবং দক্ষিণ ভারতে জমী শতকরা ১৩ ভাগ মাত্র। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোট উৎপন্ন চা'র পরিমাণ ছিল—৩৭ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড। সে বার মাত্রায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলন হয়। বিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ চা' রপ্তানী হয়। ঐ বৎসর চা-বাগানে মোট ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ৬ শত লোক কায করে। ইহাদিগের সাধারণ পারিশ্রমিকের হার—

	টাকা	আনা	পাই
পুরুষ	৮	৮	১১
স্ত্রীলোক	৬	৯	৮
বালিকবালিকা	৩	১৫	৮
গড়	৬	৬	১

এই ব্যবসায়ে যে প্রভূত মূলধন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের হিসাব—

	টাকা
ভারতীয় কোম্পানীর	৮,৭৫,৩১,৭৫০
বিলাতী কোম্পানীর	২৯,৫৮,৫২,০৬৫
মোট—	৩৮,৩৩,৮৩,৮১৫

অর্থাৎ মোট মূলধনের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ মাত্র দেশীয় কোম্পানীর।

সমগ্র ভারতের কথা ছাড়িয়া এখন বাঙ্গলার কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। বাঙ্গলায় যে সব কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থাগম হয়, চা সে সকলের অন্যতম। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়—বাঙ্গলায় চা-বাগানের সংখ্যা—৩৮৮ (ত্রিপুরা এই হিসাবে বাঙ্গলার মধ্যে ধরা হইয়াছে); আর এই সব বাগানে মোট ২ লক্ষ ১ হাজার ৯৬ একর জমীতে চা'র চাষ হয়। উৎপন্ন চা'র পরিমাণ—৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং তাহার মূল্য ৬ কোটি টাকারও অধিক। অধিকাংশ বাগানই যৌথ কারবারের। বিস্ময়ের বিষয় চা-বাগানের শ্রমিকরা প্রায় সকলেই বাঙ্গলার বাহিরের লোক। পূর্ব্বে প্রায় সব বাগানই য়ুরোপীয়দিগের সম্পত্তি ছিল—এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এখন দার্জ্জিলিং, তেরাই, ডুয়ারস প্রভৃতিতে অনেক বাগান বাঙ্গালীদিগের। পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন—চা'র চাষ তাঁহার জন্মভূমি আসামের শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমিকে এখন উদ্যানে পরিণত করিয়াছে। ইহা কত সত্য, তাহা যাঁহারা চা বাগান লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চীনেই চা'র চাষ হইত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলাতে চা'র ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সে সময় পর্য্যন্ত বিলাতে যে চা যাইত, তাহার পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার পাউণ্ড ছিল—শতাব্দীর কিছু অধিক কালে উহা ৫০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে য়ুরোপের দেশসমূহের মধ্যে বিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চা ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে

রুশিয়ায় বহু পরিমাণে চা রপ্তানী হয় বটে, কিন্তু যখন বিলাতে চা পানের প্রচলন হইয়াছে, তখনও রুশিয়ার দূত চা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন—চা রুশিয়ায় ব্যবহৃত হয় না।

খৃষ্টীয় ১৮১৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার ছাড় শেষ হইলে—চা'র ব্যবসা যে কেহ করিবার অধিকার লাভ করিলেন। চীন হইতে চা চালান দিয়া য়ুরোপের যে কোন দেশ লাভবান হইতে পারেন—ইহাতে ইংলণ্ডের লাভের ভাগ হ্রাস পাইবে, এ বিষয় ভারতে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। ভারতবর্ষে চা'র চাষ করিতে পারিলে ব্যবসায়ে ইংরাজের লাভ অক্ষুণ্ণ থাকিবে বুঝিয়া তিনি অনুসন্ধানের সঙ্কল্প করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, আসামে—বিশেষ ব্রহ্মের সীমায়—চা গাছ আছে—তাহার চাষ হয় না বটে, কিন্তু তাহা স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হয় এবং পাহাড়ীরা তাহার পাতা সিদ্ধ করিয়া শ্রমহারক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করে। সেই জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে —অর্থাৎশ ত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে চা'র চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করা হয় এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন জেনকিন্সকে অনুসন্ধান-ভার প্রদান করা হয়। তিনি মত প্রকাশ করেন, ভারতে চা'র চাষ হইতে পারে। তদনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই অংশে চা'র চাষ আরম্ভ করিবার জন্য চীন হইতে চা গাছ আমদানী করা হয়। কিন্তু গাছগুলি ভাল না থাকায় এবং চাষে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুখের বিষয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বুঝিয়াছিলেন—

"যে মাটীতে পড়ে, লোক উঠে তাই ধরে ;
বারেক হতাশ হয়ে, কে কোথায় মরে ?"

সুতরাং "আজিকে বিফল হ'ল, হতে পারে কাল।" তখন আসামে যে চা গাছ স্বচ্ছন্দজাত ছিল তাহারই চারা লইয়া চাষ আরম্ভ করা হইল। এ বার সাফল্যে আর সন্দেহ রহিল না। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে চা প্রথম বিলাতে রপ্তানী হইল। সে চা বিলাতে ৮ টাকা হইতে ১৭ টাকা পাউণ্ড দরে বিক্রয় হইল! ইহার ১০ বৎসর পরেই বিলাতের লোক প্রত্যেক বৎসরে গড়ে দেড় পাউণ্ড চা পানীয়ের জন্য ব্যবহার করিতে লাগিল।

চা'র চাষ সম্ভব ও লাভজনক হইতে পারে প্রতিপন্ন হওয়ার পরই—১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সরকারের চা-বাগান আসামে একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীকে প্রদান করা হয়। মার্কিনের সহিত চা লইয়া বিলাতের বিবাদ এবং বোষ্টন বন্দরে আমেরিকানদিগের দ্বারা চা নিক্ষেপ ও তাহার পর যুদ্ধ-ঘোষণা ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাহাতে দেখা যায়, তখনই চা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার পণ্য হইয়াছে।

আজ আসামেই বৎসরে প্রায় ২৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। সমগ্র জগতে যে প্রায় ৯০ কোটি পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়, তাহার হিসাব—

ভারতবর্ষ হইতে	৪০ কোটি পাউণ্ড
সিংহল হইতে	২৫ " "
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, চীন	
পূর্ব্ব আফ্রিকা ও ফরমোজা হইতে	২৫ " "

যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন সেনাপতি জফ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, বিলাতের ৪ লক্ষ লোক রণক্ষেত্রে পরিখার যুদ্ধ করিতেছে, আর তাহাদিগের জন্য চা উৎপন্ন করিতে ৪ লক্ষ লোক কার্য্যরত।

বাস্তবিক ভারতে চা উৎপন্ন হইবার ১০ বৎসর পরে যে স্থানে বিলাতের লোক প্রত্যেক বৎসরে গড়ে দেড় পাউণ্ড চা ব্যবহার করিত, সেই স্থানে আজ প্রত্যেক বৎসরে ১২ পাউণ্ড চা ব্যবহার করে। বিলাতে চা'র এই ব্যবহার-বৃদ্ধির কারণ—ভারতীয় চা। বিলাতে চা পান প্রবর্ত্তিত হইবার পর ১৮০ বৎসর কাল বিলাতের লোক চীনা চা'ই ব্যবহার করিত ; বর্ত্তমানে চীনে চীনে চা'র ব্যবহার থাকিলেও চীন হইতে বিলাতে চা রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে।

আমাদিগের বাল্যকালেও আমরা এ দেশে চীনা চা পান করিয়াছি। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে চা'র প্রচলন ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ। পৃথিবীর আর সব দেশ যত চা আমদানী করে, কেবল বিলাতেই তত চা'র আমদানী হয়। বিলাতের লোক-প্রতি চা'র ব্যবহার বৎসরে প্রায় ১২ পাউণ্ড ; অষ্ট্রেলিয়ায় ও আয়ার্লণ্ডে প্রায় ৮ পাউণ্ড ; নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে ও কাণাডায় প্রায় ৫ পাউণ্ড। মার্কিণে চা'র প্রচলন অল্প—যুক্তরাজ্যে মোট ৯ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ লোক-প্রতি গড়ে .১ পাউণ্ডও নহে।

ইটালীতে ও স্পেনেও প্রায় ঐ অবস্থা। সুতরাং এ সব দেশের লোককে কৃপার মাত্র মনে করা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে পৃথিবীতে মোট চা রপ্তানীর হিসাব দিয়াছি, এখন বিলাতের হিসাব দিতেছি। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যে ৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা গিয়াছিল তাহার হিসাব—

ভারতবর্ষ হইতে	৩১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড
সিংহল হইতে	১৭ কোটি ২ „ „
ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে	৭ কোটি ৪০ „ „

কয় বৎসর চা'র মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় ব্যবসার দুর্দ্দশা ঘটে। সেই জন্য চা'র উৎপাদন-পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। তথাপি বর্ত্তমান বৎসরে প্রথম দেড় মাসেই বিলাতে ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছে।

অটাওয়ায় যে বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যোজাত পণ্য বলিয়া ভারতবর্ষের চা'র প্রচলন বিলাতে ডাচ ইণ্ডিজের চা'র প্রচলন অপেক্ষা অধিক হইবে, এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়।

চা'র দাম অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় চা উৎপাদনকারী ভিন্ন ভিন্ন দেশ যে স্বেচ্ছায় উৎপাদন হ্রাস করিতে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে এবং ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজও তাহাতে অসম্মত হয় নাই, ইহাতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের যে রূপ দেখা যায়, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। যখন একই বিপদ সকলকে অভিভূত করে, তখন অনৈক্যের মধ্যে যে ঐক্যের উদ্ভব হয়, ইহাতে তাহাই বুঝা গিয়াছে।

বিদেশের বাজার যে খুবই মূল্যবান, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। সুতরাং বিদেশের বাজারে—বিশেষ মার্কিণ প্রভৃতি যে সব দেশে চা পানের প্রচলন অধিক নহে সে সব দেশের বাজারে চা'র প্রচলন-বৃদ্ধির চেষ্টা করার প্রয়োজন ও সার্থকতা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর দুইটি কায করিবার জন্য চা উৎপাদনকারীদিগকে পরামর্শ দিব—প্রথম, চা উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস ও চা'র উৎকর্ষ রক্ষা; দ্বিতীয়, স্বদেশে যে বিশাল বাজার রহিয়াছে তাহা অধিকার।

সে দিন কলম্বো সহরে সিংহলের গভর্ণর বলিয়াছেন, তিনি যখন জামেকায় তখন জামেকায় নারিকেলের মূল্য হ্রাস হওয়ায় সে দেশের সরকার ও লোক একযোগে নারিকেল তৈল রন্ধনের জন্য ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করিয়া এবং আরও নানা ভাবে প্রযুক্ত করিয়া নারিকেলের মূল্যবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্তটি আমরা এ দেশে লোকের অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করি—এ দেশে যথেষ্ট চা'র ব্যবহার-বৃদ্ধির সুযোগ আছে।

নূতন মন্ত্রী—

বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাজা সার নাজীমউদ্দীন গভর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার পদ শূন্য হইয়াছিল। তাঁহার স্থানে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কিছুদিন আলোচনা চলিয়াছিল



খান বাহাদুর মৌলবী আজিজ্‌উল হক

এবং কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অর্থকষ্টের সময় গভর্ণর হয়ত শূন্য স্থান আর পূর্ণ করিবেন না। কিন্তু গভর্ণর ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য কার্য্যবৃদ্ধি হেতু বর্ত্তমানে মন্ত্রীর সংখ্যা হ্রাস করা যায় না। এখন তিনি খান বাহাদুর মৌলবী আজিজ্‌উল হককে ঐ পদ প্রদান করিয়াছেন। খান বাহাদুর নদীয়া জিলার শান্তিপুরের অধিবাসী—কৃষ্ণনগরে উকীল ছিলেন। কিছুদিন হইতে তিনি রাজনীতি-চর্চ্চাতেই অধিক অবহিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের-

মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সমবায় বিভাগ প্রভৃতির কার্য্যেও তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কি ভাবে বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করা যায়, তাহাই তাঁহার প্রথম প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইবে। তিনি বাঙ্গালী—বিশেষ মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালাকে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা করিতে অসম্মত, তিনি তাঁহাদিগের দলভুক্ত নহেন। আমরা আশা করি, যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত তিনি তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস—

বাঙ্গালায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রানুসারে যাঁহারা চিকিৎসা করিতেন—গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাঁহারা এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে বাঙ্গালাকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের স্থান কত উচ্চে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা নৈপুণ্য যেমন অসাধারণ ছিল, দেশপ্রেম ও ত্যাগও তেমনই প্রবল ছিল। তিনি অর্জ্জিত অর্থ দেশের ও দেশের কল্যাণকল্পে অকাতরে ব্যয় করিতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অনুরোধে তিনি আপনার বিদ্যালয়টিকে আরোগ্যশালা সম্বলিত বিদ্যালয়ে পরিণত করেন এবং সেই বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক নত হয়। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী চুপী গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি কলিকাতায় আসিয়া আপনার প্রতিভা-বলে শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাঁহার সমাদর ছিল। কিশোর বয়স হইতে তিনি আমার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং সে বন্ধুত্ব জীবনান্ত পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আমি সত্যসত্যই একজন পরম বন্ধু হারাইলাম। কিছুদিন হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। চারি পাঁচ দিন সামান্য রোগভোগের পর গত ১৮ই আষাঢ় সহসা তাঁহার অবস্থা শঙ্কাজনক হয় এবং ঐ দিন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার কত ক্ষতি হইল, তাহা স্থির করা দুষ্কর। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি অসাধারণ ত্যাগ দ্বারা যে বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আজ তাহার ভার দেশবাসীকে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে ইহার গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত শেষ হয় ও ইহা যথাযথরূপে পরিচালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা বাঙ্গালীকে করিতে হইবে।



কবিরাজ শ্যামাদাস শিরোমণি

আজ আমরা তাঁহার যোগ্য পুত্র শ্রীমান বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে তাঁহার এই দারুণ শোকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

অন্নপূর্ণা দেবী চৌধুরাণী—

উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলায় কুণ্ডির জমিদার রায় চৌধুরী বংশ বঙ্গদেশে অতি প্রসিদ্ধ। এই বংশের এক শাখার স্বর্গীয় কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে ও বদান্যতার প্রভাবে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীনকুল-

সর্ব্বস্ব নামক প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। এই বংশের অন্যতম শাখার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী রায় বাহাদুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণা দেবী চৌধুরাণী গত ১৩৪০ সালের ১৭ই চৈত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত রচয়িতা দেওয়ান রঘুনাথ (অকিঞ্চন) রায়ের বংশের কন্যা। পিতৃগৃহে ও শ্বশ্রূগৃহে ইনি কুলবধূচিত সকল প্রকার সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন



৺অন্নপূর্ণা দেবী চৌধুরাণী

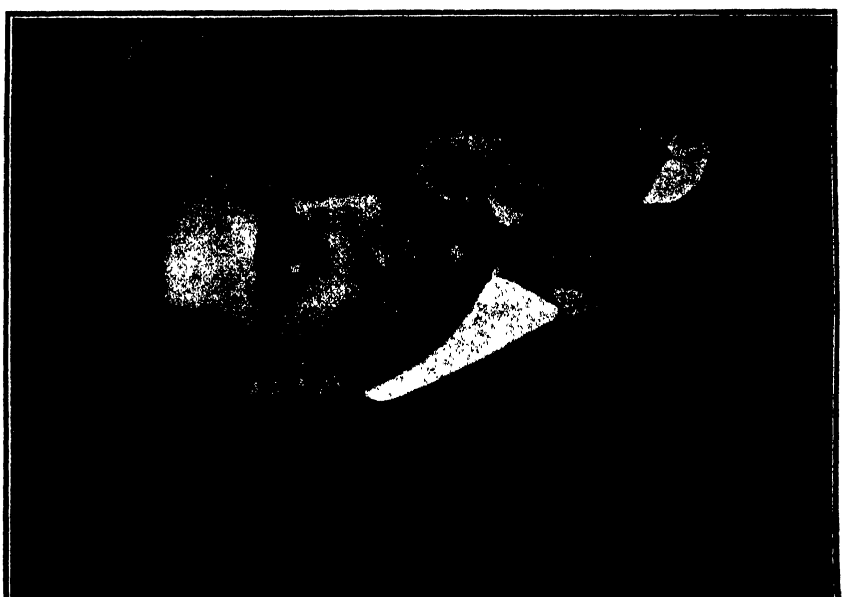
এবং হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরিকার সকল সদ্গুণ রাশিতে ভূষিতা ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে তিনি সাংসারিক, বৈষয়িক ও সামাজিক সকল প্রকার আকস্মিক সমস্যার সুসমাধান করিতে পারিতেন। শ্বশুর পল্লীর সন্নিহিত গ্রামসমূহের সর্ব্বসাধারণের তিনি 'বড়মা' ছিলেন এবং সকলকেই তিনি সন্তানতুল্য স্নেহযত্ন করিতেন। তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য ও মায়ামমতায় সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। ইংরেজ রাজদরবারেও তিনি সুপরিচিতা ছিলেন। ইংরেজী ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসে মহামান্য ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় লাটপ্রাসাদে যে রাজকীয় খাসদরবার (Royal Court) হইয়াছিল, অন্নপূর্ণা দেবী সেই দরবারে নিমন্ত্রিতা হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা দেবী রন্ধনেও সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার স্বহস্ত প্রস্তুত ভোজ্যে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান অতিথিবৃন্দ পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার রন্ধন নৈপুণ্যের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঙ্গলার গবর্ণর সার জন এণ্ডারসন ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার স্বামী মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রার্থনা করি, সতীলোকে দেবীর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

কলিকাতার মেয়র ও ডিপুটী মেয়র,—

অনেক অপ্রীতিকর, লজ্জাজনক অভিনয়ের পর সেদিন নির্ব্বিরোধে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর মেয়র ও ডিপুটী মেয়রের নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। অক্লান্তকর্ম্মা, স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় মেয়র এবং সন্তোষ-রাজপুত্র, প্রিয়দর্শন, তীক্ষ্ণধী শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় ডিপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। কলিকাতা করপোরেসনের কার্য্য এই কয়মাস একেবারে বন্ধ ছিল বলিলেই হয়; এখন নব-নিযুক্ত মেয়র ও ডিপুটী মেয়র এই কয় মাসের ক্ষতি বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত পূরণ করিবেন বলিয়া আমাদের আশা আছে। পূর্ব্বের কথান্তর, মনান্তর, ভাবান্তর বিস্মৃত হইয়া সকলে একযোগে কার্য্য করিয়া বাঙ্গলা দেশের এই সর্ব্বপ্রধান প্রতিষ্ঠানের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন, ইহাই আমরা কামনা করি।



মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার



ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

পথের কথা—

অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় এ দেশে পথের স্বল্পতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। রাজপথ কেবল যে ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তাহাই নহে, পরন্তু শিক্ষার বিস্তার-সাধনেও তাহার প্রয়োজন অসাধারণ। কৃষি কমিশন এ দেশে পথ-বিস্তারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেই প্রস্তাবানুসারে এখন "রোড বোর্ড" গঠিত হইয়াছে। সংপ্রতি জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালার রাজপথ বিস্তার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া স্থির করিয়াছেন—পাঁচ বৎসরে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুই শত মাইল নূতন রাস্তা গঠিত হইবে।

এখন কেন্দ্রী সরকার রাজপথ রচনার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে যে টাকা দিয়া থাকেন, তাহাতে পাঁচ বৎসরে নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি রচিত হইবে। পাঁচ বৎসরে সব রাস্তা সম্পূর্ণ হইবে না বটে কিন্তু কাজ অনেকটা অগ্রসর হইবে।

রাস্তা		মোট দৈর্ঘ্য (মাইল)	মঞ্জুরী টাকার পরিমাণ
কলিকাতা হইতে			
যশোহর	...	প্রায় ২৯	৫,০০,৫৮১
ডায়মণ্ডহারবার	...	প্রায় ২৫	৬,৭০,০০০
বাদশাহী সড়ক	...	৫৩	৯,৩১,৫১৩
ময়নামতী হইতে			
বারকাণ্ডা	...	৯	২,৭৭,৪০০
পাবনা হইতে			
ঈশ্বরদী	...	১৭	৮,০৫,৫৭০
ঘোষপাড়া	...	প্রায় ১৫	৪,৬৩,৫০৩
টাঙ্গাইল হইতে			
মৈমনসিংহ	...	৫৮	৩,৪০,৭০৫
মাগুরা হইতে			
ঝিনাইদহ	...	প্রায় ৮	৩,৭৫,২২৩
ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ		৯	৫,৫৬,৫০০
চট্টগ্রাম—আরাকান		৯৬	৫,০০,০০০
বর্দ্ধমান হইতে আরামবাগ		২৫	৫,০০,০০০
কৃষ্ণনগর-জলাঙ্গী	...	প্রায় ১৬	৪,২০,০০০
ইলামবাজার—			
দুবরাজপুর	...	প্রায় ১৬	৩,৫০,০০০

এই সব রাস্তার কোন কোনটিতে কায আরম্ভ হইয়াছে।

কেন্দ্রী সরকার ১৯২৯—৩০ খৃষ্টাব্দে পেট্রলের উপর প্রতি গ্যালনে যে ৬ আনা অতিরিক্ত কর আদায় করিতেছেন, তাহা হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে রাস্তা রচনার জন্য টাকা দিয়া থাকেন। যে প্রদেশে যত পেট্রল ব্যবহৃত হয়, তাহার অনুপাতে সেই প্রদেশকে টাকা দেওয়া হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ৬ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালা এই হিসাবে যে টাকা পাইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯২৯—৩০ (১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস ধরিয়া)	...	১৩,৯৯,৪৩৫ টাকা
১৯৩০—৩১ খৃষ্টাব্দ	...	১৩,২৮,৯০৩ "
১৯৩১—৩২ "	...	১৩,৭৯,০৫৩ "
১৯৩২—৩৩ "	...	১২,৭৩,৬৬৪ "
১৯৩৩—৩৪ " (প্রথম ৬ মাস)	...	৬,৪০,০০০ "
মোট	...	৬০,২১,০০৫ টাকা

বাঙ্গালায় কোন্ কোন্ রাস্তা কি ভাবে রচিত হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সে সমিতিতে কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও সরকারের কয়জন মনোনীত সদস্য আছেন।

বাঙ্গালা সরকার ৫ বৎসরে যে রাস্তার জন্য মাত্র ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন, তাহা বাঙ্গালার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও এই অর্থকৃচ্ছ্রতার সময় ইহার জন্য অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। আশা করা যায়, বাঙ্গালা সরকারের অর্থের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে এই কার্য্য দ্রুত অগ্রসর করা সম্ভব হইবে।

এ দেশে মোটর যানের ব্যবহার বৃদ্ধিতে পথের প্রয়োজন আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষ বাঙ্গালায় নদীনালার বাহুল্য হেতু রাজপথ রচনায় ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। কারণ :—

(১) পথে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ অনিবার্য্য।

(২) জলনিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা যেমন প্রবল হয়, শস্যহানির ও ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা তেমনই অনিবার্য্য হয়।

এই সব বিশেষ বিবেচনা করিয়া কায না করিলে চলে না।

ভ্রম-সংশোধন—

আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষে' রসরাজ অমৃতলালের যে জীবন-কথা লিখিত হইয়াছিল, রসরাজের পৌত্র শ্রীমান্ প্রীতিভূষণ তাহার কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন ; যথা—(১) অমৃতলাল জেনারেল এসেমব্লি কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; (২) তিনি চিকিৎসা-বিভাগে কর্ম্ম-গ্রহণ করিয়া পোর্টব্লেয়ারে গমন করেন নাই, পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন ; (৩) তিনি কখন শিক্ষকতা করেন নাই, তবে মধ্যে মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্যামবাজার, এ, ভি, স্কুলের ছেলেদের শিক্ষাদান করিতেন। এই কয়েকটি ভ্রম-প্রদর্শনের জন্য শ্রীমান প্রীতিভূষণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১২)

রমণীবাবু আর আসেননা হয়ত, ছাড়াছাড়ি হইল। দু'জনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায়না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ,—পূর্ব্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ। জ্যৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-শষ্পে, গাছে-গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে গগনে-পবনে সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিলনা তাঁর কোনদিনই তথাপি, কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে-দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ীর মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো; কাহারো ভালোতেও না মন্দতেও না। মাঝে:মাঝে ভাড়া-বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া-যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত-পথে নতুন মার সকল কালী যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্ত্তে তাহারা উল্লাস বোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্ম্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে নাথাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়। আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো —তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবেনা মা বলে দিলেন।

—তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেননা সারদা?

—যাবেন কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেশিদিন থাকবেননা বললেন। আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্ব্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশি সময় লাগিতনা কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহ-কর্ম্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তারপরে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, না-জানি কত ভুল-চুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুল-চুক শুধ্‌রে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটাত কিছুই এগোয়নি দেখচি।

—না। সময় পাইনে যে।

—পাওনা কেন?

—কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

—নতুন-মার দাসী চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলোনা কেন তোমারো সময়ের দরকার, তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারি অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইলনা সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেবতা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটেনা। এত রোগা দেখচি কেন বলুনত?

রাখাল বলিল, রোগা নই বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয়তো কি! হলো জ্বর তা-ও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওই

লিখেই না হয় দিলুম কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি ?

—কাজে লাগবেনা ? তুমি বলো কি সারদা ?

সারদা কহিল, এই বলচি যে এ-সব কিচ্ছু কাজে লাগবেনা। আর যদিই বা লাগে আমার কি ? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। এক ছত্রও আর আমি লিখবোনা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবেনাত আমার ধার শোধ দেবে কি কোরে ?

—ধার শোধ দেবোনা ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিলনা। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারোনা ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে ?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রাণ করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রার দলের বক্তৃতা। ও সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো ?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশি হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলা তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু মহলে প্রকাশ করেনা, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায়না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কুলান হয়না। তাহার ইচ্ছা নয় যে উপার্জ্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারি লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়ত তাহা সত্য নয়, হয়ত বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়ত বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইনষ্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় হয় পাছে গর্ত্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া নাপাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি কোরে ?

সারদা হাসি চাপিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি ?

—ওঠোনি ? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি ?

—বল্‌চি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেননি কেন ?

—শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

—মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশি। এ কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন সে-ও ছিল শয্যাগত। ষ্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েছে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন ?

প্রশ্নটা রাখালের নূতন নয়,—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল,—এ-কথা স্বীকার করিতে পারিলনা যে সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব।

সারদা বলিল, তারা যাক্, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেননা কেন ?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা ! নতুন মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো পড়া বাসায় সেবা করতে ? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে ?

সারদা কহিল, যেই দিক কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলেনা। শুনে নতুন-মা বললেন রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন জুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা কোরে নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টায় কল থেকে জল আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিদের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলেনা আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু

আমাকে খবর দেবে কেন মা,—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম কোরে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে,—তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরাণী-গিরি কোরে আজও টাকা শোধ দিইনি সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো কোরেই তুলচো। জ্বর কি কারো হয়না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে-দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারি খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেননা—হাঁসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তা-ও আপনার সইলোনা। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেননা? কি করেছিলুম আপনার? এ-জন্মের ত দোষ দেখিনে এ কি গত-জন্মের দণ্ড না-কি?

রাখাল জবাব দিতে পারিলনা, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখ-চোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিলনা। দিনের বেলার কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতে বলিতে পারিতনা, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্যজন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত বাহির হইয়া আসিল হিতাহিতের তর্জ্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিলনা। বলিতে লাগিল, জানেন দেবতা, জানি আমি কেন আপনি আজো বিয়ে করেননি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারি ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতের নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল আজ তোমার হলো কি বলোত?

—সত্যিই-আজ আমার ভারি রাগ হয়েছে।

—কেন?

—কেন! কিসের জন্যে আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন।

—দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুমনা ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

—তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

—ফিরে আসবেননা তা আপনাকে অনেকবার বলেচি। আপনি বলবেন তুমি জানলে কি কোরে? তার জবাব এই যে, আমি জানবোনা ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ-ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ-বাড়ীতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে বসে,—যদি যেতে না দিই ধরে রাখি কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাসা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষত সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে-লজ্জা বাড়িবে বই কমিবেনা তাই জোর করিয়া কোন মতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতোনা। কিন্তু আজ এলে তাঁকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে-সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো,—যে কত যে সয়েছে তার সাক্ষী আছে শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে-সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ-সারদা অন্য জন। তার পুনর্জ্জন্মে তার পরে আর কারো দাবী নেই

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা, হাঁসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেছেন, তুমি কোথায় যেতে চাও, উত্তরে আমি বারবার কেঁদে বলেছি আমার যাবার যায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ কোরে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি শুধু বাড়ীর লোকের মুখে তার নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নয়? সবই মিথ্যে?

—হাঁ সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নয়।

—তবে কি তুমি বিধবা?

—হাঁ আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনি বুঝিল এ উল্লেখ অনধিকার চর্চ্চা, এ তাহার আপন অপমান। এ কি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল।

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ তিনি আমার মা-ই তো। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপ দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাওনা, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবেনা এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

—কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়,—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকি, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয়না।

সারদা বলিল, যত টাকারই দরকার হোক আপনার কেরাণী-গিরি করতে আমি পারবোনা। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে তো ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবেনা,—ঘুম দিয়ে লোকে বলেনা—আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহিরে হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

—মা'র আহ্নিক কি শেষ হয়েছে?

—হাঁ, হয়েছে বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেননা মা'র সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও আমি পরে যাবো।

—পরে কেন? চলুননা দুজনে একসঙ্গে যাই,—বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে-রসে, মাধুর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কত দিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্থলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে ভাষা বুঝা যায়না কেন? কত-শত মেয়েকে সে চেনে, কত দিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্য্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—মনের

কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটি মাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে বিস্ময় আজ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে-অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়-গানের অন্ত নাই, এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেলনা?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তবের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়,—গাড়ীর বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তারপরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখের সেই প্রাণ ফিরে পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ। সেই দুচোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবোনা দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল,—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উল্টাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না-আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেননা, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জ্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেচি ততো আপনার রেণুও না। তারপরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে,—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরওয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়েনা মা ত্রিসংসারে আমার কোথাও কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেননা,—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়ালে হইতে বোধহয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্‌তাকে খেয়ে যেতে বলুননা মা, সেই তো বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তারপরে স্মিত-হাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধতে হয় এ-যেন ও সইতে পারেনা—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন, এ কথা সারদা একটি দিন ভোলেনা।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রীকে যে কি কোরে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন। এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেননা।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে

ছু চার দিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ,—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন ওর না আছে বাড়ী-ঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জ্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম। কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু-বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেননা।

সারদা বলিল, কিন্তু দিলে ?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরি হইয়াছে। রাখাল বুঝিল এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরী করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন কয়েক গিয়ে তার ও-খানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

—প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি ?

—চিঠিতে নয়, দিন দুয়ের ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে! যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায় ? কই আমি ত জানিনে।

সবিতা বলিলেন, জানোনা ? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দু'টো দিনের ছুটি কিনা ?

রাখাল আর কিছু বলিলনা, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্ব্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে বলিয়াছে ইদানিং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন কয়েকের ছুটী লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়ীতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

(ক্রমশঃ)

খেলাধূলা

অষ্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট ঃ

৮ই জুন হ'তে নটিংহামে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্ট খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়া টসে জিতে, উডফুল ও পন্সফোর্ডকে ব্যাট করতে পাঠালে। প্রথম দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ২০৭ রান করলো। আলো কমে যাওয়ায় বেলা ৫-৪০ মিনিটে খেলা বন্ধ হ'লো। মাঝে আরো দু'বার বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হ'য়েছিল। চিপারফিল্ড মাত্র এক রানের জন্য সেঞ্চুরি পেলে না।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া সকলে মিলে রান তুল্লে ৩৭৪। ইংলণ্ড পক্ষে ব্যাট নিলো—ওয়ালটার্স ও সাট্‌ক্লিফ্। দিনের শেষে চার উইকেট খুইয়ে মাত্র ১২৮ রান করলে, তখন নবাব পতৌদী (৬) ও হেনড্রেন (২) দু'জনে ব্যাট করছে।



ইংলণ্ডের লর্ডসের মাঠ—এখানে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা হ'য়েছে

তৃতীয় দিনে, লাঞ্চের সময়ে হেনড্রেন ও গিয়ারী ইংলণ্ডের রান ছয় উইকেটে ২৪০এ তুললে ; একটা চারের বাড়ী মেরে হেনড্রেন্ ২২৬ করে 'ফলো অন্' বাঁচালে। তার পরে হেনড্রেন ৭৯ রানে ও'রিলীর বলে আউট্ হয়ে গেলো,

গিয়ারীও ৫৩ রান করে গ্রিমেটের একটা বলকে এগিয়ে তেড়ে মারতে গেলে ওল্ডফিল্ড তাকে ষ্টাম্প আউট্ করে দিলে। ভেরিটি ও ফারনেস্ মাত্র এক রানে আউট্ হয়ে গেলো—ইংলণ্ড যখন সর্ব্বসমেত ২৬৮।

পেটাতে লাগলো। লাঞ্চের আগে ২৭৩ রান হ'তেই উড্ফুল ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করলে।

বেলা ১২।৪৫ মিনিটে ইংলণ্ড ব্যাট্ করতে নামলো। মাত্র চার ঘণ্টা সময় তখন আছে, তার মধ্যে ৩৮০ রান করতে হবে। ইংলণ্ড জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে সময়


ও'রিলী (নিউ সাউথ ওয়েলস্)


সি ভি গ্রিমেট্ (অষ্ট্রেলিয়া)


ওয়াল (সাউথ অষ্ট্রেলিয়া)

অষ্ট্রেলিয়া আবার ব্যাট নিলে, সেদিনের খেলার শেষে তারা তিন উইকেটে ১৫৯ রান করেছে।

শেষ দিন অষ্ট্রেলিয়া যেন জিতবার প্রতিজ্ঞা করে মাঠে নেমেছে, তারা তাড়াতাড়ি রান তোলবার দিকে লক্ষ্য রেখে

কাটিয়ে ড্রএর চেষ্টায় রইল। একা ও'রিলীই সাতটা উইকেট নিলে, আর গ্রিমেট দুটো। মোট ১৪১ রানে ইংলণ্ডের সবাই আউট্ হ'য়ে গেলো—তখনও দশ মিনিট সময় আছে। অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের বিপক্ষে নটিংহামে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ ২৩৮ রানে জিতলে।

স্কোর দাঁড়িয়েছিলো :

অষ্ট্রেলিয়া

(প্রথম টেষ্ট—নটিংহাম)

প্রথম ইনিংস্				দ্বিতীয় ইনিংস্		
ডব্লিউ এম্ উড্ফুল—কট্ ভেরিটি, বোল্ড ফারনেস্	···	২৬	—	বোল্ড ফারনেস্	···	২
ডব্লিউ এইচ্ পনস্ফোর্ড—কট্ এইম্স্, বোল্ড ফারনেস্	···	৫৩	—	বোল্ড হ্যামণ্ড	···	৫
ডব্লিউ এ ব্রাউন—এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড গিয়ারী	···	২২	—	কট্ এইম্স্, বোল্ড ভেরিটি	···	৭৩
ডি জি ব্র্যাডম্যান—কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড গিয়ারী	···	২৯	—	কট্ এইম্স্, বোল্ড ফারনেস্	···	২৫
এল এস্ ডারলিং—বোল্ড ভেরিটি	···	৪	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ফারনেস্	···	১৪
এস্ ম্যাকক্যাব—কট্ লেল্যাণ্ড, বোল্ড ফারনেস্	···	৬৫	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ফারনেস্	···	৮৮
ডব্লিউ এ চিপার্ফিল্ড—কট্ এইম্স্, বোল্ড ফারনেস্	···	৯৯	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ফারনেস্	··	৪
ডব্লিউ এ ওল্ডফিল্ড —কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড মিচেল	···	২০	—	নট্ আউট্	···	১০
সি ভি গ্রিমেট—বোল্ড গিয়ারী	···	৩৯	—	নট্ আউট্	···	৩
ডব্লিউ জে ও'রিলী—বোল্ড ফারনেস্	···	৭	—	কট্ ভেরিটি, বোল্ড গিয়ারী	···	১৩
টি ডব্লিউ ওয়াল— নট্-আউট্	···	০	—			
অতিরিক্ত	···	১০	—	অতিরিক্ত	···	৩৬
		—		(৮ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)		—
		৩৭৪				২৭৩

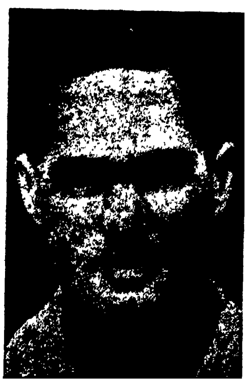
ইংলণ্ড

(প্রথম টেষ্ট—নটিংহাম)

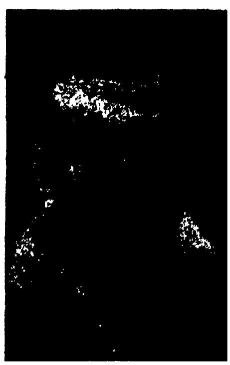
প্রথম ইনিংস্			দ্বিতীয় ইনিংস্	
সি এফ্ ওয়ালটার্স—এল্ বি ডব্লিউ, বোল্ড গ্রিমেট	১৭	—	বোল্ড ও'রিলী	৪৬
এইচ সাট্ক্লিফ্—কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	৬২	—	কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী	২৪
ডব্লিউ আর হ্যামণ্ড—কট্ ম্যাক্ক্যাব, বোল্ড ও'রিলী	২৫	—	ষ্ট্যাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	১৬
নবাব পতৌদী—কট্ ম্যাক্ক্যাব্, বোল্ড ওয়াল	১২	—	কট্ পনস্ফোর্ড, বোল্ড গ্রিমেট	১০
এম্, লেল্যাণ্ড—কট্ ও বোল্ড গ্রিমেট	৬	—	কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী	১৮
ই পি হেনড্রেন্—বোল্ড ও'রিলী	৭৯	—	কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী	৩
এল ই জি এইম্স্—কট্ ওয়াল, বোল্ড ও'রিলী	৭	—	বোল্ড ও'রিলী	১২
জি গিয়ারী—ষ্ট্যাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	৫৩	—	কট্ চিপারফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	০
এইচ্ ভেরিটি—বোল্ড ও'রিলী	০	—	নট্ আউট্	০
কে ফারনেস্—বোল্ড গ্রিমেট	১	—	কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী	০
টি বি মিচেল— নট্ আউট্	১	—	এল্ বি ডব্লিউ, বোল্ড ও'রিলী	৪
অতিরিক্ত	৫	—	অতিরিক্ত	৮
	২৬৮			১৫১

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

দ্বিতীয় টেষ্ট লর্ডসে ২২শে জুন তারিখে সুরু হলো। ওয়্যাটের আঙুল ভাল হওয়ায় তিনিই ক্যাপ্টেন হ'লেন। টসে জিতে ওয়াল্টার্স ও সাট্ক্লিফ্কে ব্যাট করতে এসে যোগ দিলেন। ব্র্যাডম্যানের চমৎকার ফিল্ডিংএর জন্যে ওয়ালটার্সের অনেক রান কম হতে লাগলো। ৮২ রান করে ওয়ালটার্স ও'রিলীর বলে ব্রোমলির হাতে 'কট্' হয়ে গেলেন। লেল্যাণ্ড এলেন ও খুব পেটাতে সুরু



সাট্ক্লিফ্ (ইংলণ্ড)



এইম্স্ (ইংলণ্ড)



হ্যামণ্ড (ইংলণ্ড)

নামালেন। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে বোলার নামলো ওয়াল ও ম্যাক্ক্যাব্। ওয়ালের বলে ওয়ালটার্স ৪৮এর কোটায় বড় বেঁচে গেলো, ম্যাক্ক্যাব্ লুফ্তে পারলে না। সাটক্লিফ্ চিপারফিল্ডের বলে এল্ বি ডবলিউ হয়ে গেলেন। ওয়্যাট করলেন। ওয়্যাট চিপারফিল্ডের একটা বল তেড়ে মারতে গিয়ে উইকেটকিপার ওল্ডফিল্ডের হাতে ধরা পড়ে গেলেন মাত্র ৩৩ রানে। এইম্স্ ব্যাট করতে নামলেন ও দু'টা বাউণ্ডারী করে স্কোর দু'শোর কোটায় তুললেন—

তখন ২৫৫ মিনিট খেলা হ'য়েছে। এ দিনের খেলায় ব্যাটিং ও ফিল্ডিং দুই চমৎকার হ'য়েছে। ব্র্যাডম্যান, ব্রোমলি, ব্রাউন ও ডার্লিং অনেক রান বাঁচিয়েছেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে মোট ২৯৩ রান করলো।

দ্বিতীয় দিন খেলা যখন আরম্ভ হ'লো, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, হাওয়া বেশ জোরে বইছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের আড়াল থেকে সূর্য্যদেব উঁকি মারছেন। রাত্রের বৃষ্টির পরেও মাঠ ভালই আছে। গতদিনের লেল্যাণ্ড (৯৫) ও এইম্‌স (৪৪) ব্যাট করতে এলেন। চিপারফিল্ড ও ওয়াল বল দিতে সুরু করলেন। লেল্যাণ্ড এক করে তার পরেই চারের বাড়ী মেরে এ বছরের টেষ্টে তিনিই প্রথম শত রান তুললেন। ইংলণ্ডের ৩০০ রান উঠ্‌লো যখন তারা ৩৭০ মিনিট খেলেছে। লেল্যাণ্ড ওয়ালের বল







লেল্যাণ্ড (ইংলণ্ড) ফারনেস্ (ইংলণ্ড)

পেটাতে গিয়ে বোল্ড আউট্ হ'য়ে গেলেন ২১০ মিনিটে ১০৯ রান করে। গিয়ারী এলেন চিপারফিল্ড তাকে সুন্দর লুফ্‌লেন যখন তিনি মাত্র ৯ রান করেছেন। ভেরিটি যোগ দিলেন, এইম্‌স্ তখন ৮৩ করেছেন। ওল্ডফিল্ড এইম্‌সের একটা সোজা বল লুফ্‌তে পারলেন না। এইম্‌স্ তার শোধ দিলেন বলটা বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে চেঞ্চুরি করে। ৪৩৫ মিনিট খেলার পরে ইংলণ্ডের ৪০০ রান এইম্‌স তুললেন।

নূতন বল দেওয়া হলো। প্রথম ওভারেই এইম্‌স্ ম্যাক্‌ক্যাবের বলে ওল্ডফিল্ডের হাতে ১২০ রান করে ধরা পড়ে গেলেন, ৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট খেলে। ইংলণ্ডের রান তখন ৪০৯। ফার্নেস্ এলেন ও একরানে আউট

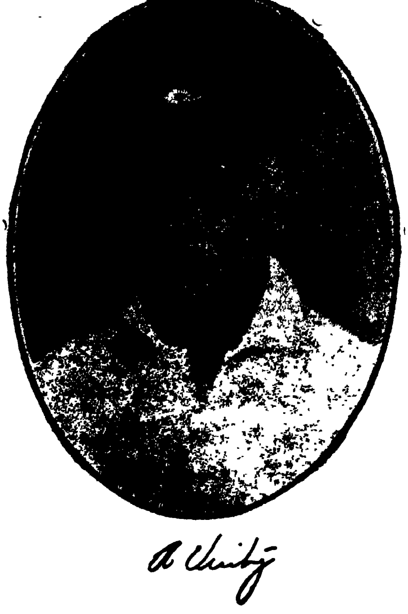
ইংলণ্ডের প্রথম টেষ্টের ক্যাপ্‌টেন্

হ'য়ে গেলেন। লাঞ্চের পরে, ভেরিটি কয়েকটি ভাল মার মেরে ২৯ রানে ষ্টাম্পড্ হ'য়ে যেতে ইংলণ্ডের ইংনিস্ ৪৪০ রানে ৫৫০ মিনিট খেলার পরে শেষ হ'লো। অষ্ট্রেলিয়া নিখুঁত ফিল্ডিং করেছেন, একটাও 'বাই' হয়নি—মাত্র ১২টা অতিরিক্ত লেগ বাই হ'য়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে উডফুল ও ব্রাউন ৩-১০ মিনিটে ব্যাট করতে নামলেন। একঘণ্টা খেলার পরে ৫০ রান উঠ্‌লো। চায়ের পরে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট্ পড়লো। উড্‌ফুল ২২ রান করে আউট্ হলেন। ব্র্যাডম্যান এলেন। ব্রাউন ৫০ করলেন ৯০ মিনিটে, অষ্ট্রেলিয়ার মোট রান তখন ১০১, ১০১ মিনিটে। ব্র্যাডম্যান খুব চমৎকার পেটাতে সুরু করেছেন, দর্শকদের আনন্দ আর ধরে না। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং বিশেষত্বহীন। ব্র্যাডম্যান ৩৬ রান করে ভেরিটির বলে ও তারই হাতে আউট্ হয়ে গেলেন। ম্যাক্‌ক্যাব এসে যোগ দিলেন। ব্রাউন ১০০ রান তুললেন ১৫০ মিনিটে। বেলা শেষে অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ১৯২ রান করলে।

তৃতীয় দিন—সকালে ১০৷৫৫ মিনিট পর্য্যন্ত বৃষ্টি হ'লো। মাঠের উপরটা নরম ও ভিতরটা শক্ত থাকায় মাঠ বেশ tricky হ'য়েছে। ১১টার সময় খেলা আরম্ভ হয়েই

আলোর জন্য বন্ধ হলো। কিন্তু পনের মিনিট পরেই আবার সুরু হ'লো। ম্যাক্‌ক্যাব্‌ একটা বাউণ্ডারী করে ২০২ রান তুললে, ১৯০ মিনিটে। ব্রাউন ১০৫ রান করে বাউসের বলে এইম্‌সের হাতে ধরা পড়ে গেলো। ডারলিং একটি রানও না করে ভেরিটির বলে সাট্‌ক্লিফের হাতে গিয়ে পড়লো। তারপরে ম্যাক্‌ক্যাব্‌ গেলেন ৩৪ রান করে ভেরিটির বলেই। চিপারফিল্ড ও ব্রোম্‌লি স্কোর তুললেন ২০৫ থেকে ২১৮তে। ব্রোমলি ৪রান করে গেলেন, ওল্ডফিল্ড এলেন। চিপারফিল্ড একটু ক রইলেন, স্কোর উঠ্‌লো ২২৯। হ্যামণ্ডের বল



(ইয়র্কসায়ার) ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেষ্টের বীর

চিপারফিল্ডের পায়ে লাগলো। দু'মিনিট ধরে তাকে যন্ত্রণায় 'নৃত্য' করতে হয়েছিল। তারপরে হ্যামণ্ডের বলটাকে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে তার শোধ দিলেন। ওল্ডফিল্ড স্কোর তুললেন ২৫২, অষ্ট্রেলিয়ার ২৭৫ মিনিট খেলার পরে। সাটক্লিফ্‌ ভেরিটির বলে ওল্ডফিল্ডকে লুফ্‌লে। গ্রিমেট এসে ৯ রানে বাউসের বলে বোল্‌ড হয়ে গেলে, লাঞ্চ হলো।

ও'রিলী আর ওয়াল মাত্র ৪ রানের মধ্যেই পর পর আউট্‌ হয়ে গেলে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস্‌ মোট ২৮৪ রানে শেষ হ'য়ে গেলো।

মাত্র ৭ রানের জন্য অষ্ট্রেলিয়াকে ফলো করতে হলো। ২-৪৫ মিনিটে, দ্বিতীয় ইংনিস্‌ খেলা সুরু হলো, প্রথম উইকেট পড়লো ১০ রানে। ব্র্যাডম্যান আধঘণ্টা খেলে ১৩ করে ভেরিটির বলে এইম্‌সের হাতে আটকে গেলেন। চায়ের সময়, অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র ৭৩ রান হয়েছে ৩ উইকেটে।

উড্‌ফুল ও ডারলিং আউট্‌ হলো ৯৪ স্কোরে। ব্রোমলি, ওল্ডফিল্ড ও গ্রিমেট ৯৫ স্কোরে চিপারফিল্ড স্কোর ১০১এ তুললে, অষ্ট্রেলিয়ার ১৩৫ মিনিট খেলার পরে। চিপারফিল্ড ১৪ রান করে আউট্‌ হলে হেনড্রেন ওয়ালকে লুফ্‌লে। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস্‌ ১৭০ মিনিট খেলে মাত্র ১১৮ রানে শেষ হ'লো।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ এক ইনিংস্‌ ও ৩৮ রানে হেরে গেল। অষ্ট্রেলিয়ার এরূপ শোচনীয় হারের কারণ ঐরূপ ভিজা বিশ্বাসঘাতক মাঠ, আর ভেরিটির ভয়াবহ বোলিং। ভেরিটিই দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার একমাত্র বীর যে ইংলণ্ডকে এরূপ সম্মানজনকভাবে জিতিয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ৪টা উইকেট ও মোট ৭টা উইকেট নিয়ে ভেরিটি রেকর্ড করলে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের পর লর্ডসের মাঠে ইংলণ্ডের এই প্রথম জয়।

ইংলণ্ড

(দ্বিতীয় টেষ্ট—লর্ডস্‌)

প্রথম ইনিংস্‌

ওয়ালটার্স—কট্‌ ব্রোমলি, বোল্‌ড ও'রিলী	...	৮২
সাট্‌ক্লিফ্‌—এল্‌ বি ডব্‌লিউ, বোল্‌ড চিপারফিল্ড	...	২০
হ্যামণ্ড—কট্‌ ও বোল্‌ড চিপারফিল্ড	...	২
হেনড্রেন্‌—কট্‌ ম্যাক্‌ক্যাব্‌, বোল্‌ড ওয়াল	...	১৩
ওয়্যাট্‌—কট্‌ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড চিপারফিল্ড	...	৩৩
লেল্যাণ্ড—বোল্‌ড ওয়াল	...	১০৯
এইম্‌স্‌—কট্‌ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড ম্যাক্‌ক্যাব্‌	...	১২০
গিয়ারী—কট্‌ চিপারফিল্ড, বোল্‌ড ওয়াল	...	৯
ফারনেস্‌—বোল্‌ড ওয়াল	...	১
ভেরিটি—ষ্ট্যাম্পড্‌ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড গ্রিমেট	...	২৯
বাউস্‌— নট্‌ আউট্‌	...	১০
অতিরিক্ত	...	১২

অষ্ট্রেলিয়া

(দ্বিতীয় টেষ্ট—লর্ডস্)

প্রথম ইনিংস্				দ্বিতীয় ইনিংস্		
উড্‌ফুল—বোল্ড বাউস্	...	২২	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ভেরিটি	...	৪৩
ব্রাউন—কট্ এইম্‌স, বোল্ড বাউস্	...	১০৫	—	কট্ ওয়ালটার্স, বোল্ড বাউস	...	২
ব্র্যাডম্যান—কট্ ও বোল্ড ভেরিটি	...	৩৬	—	কট্ এইম্‌স্, বোল্ড ভেরিটি	...	১৩
ম্যাক্‌ক্যাব—কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ভেরিটি	...	৩৪	—	কট্ হেনড্রেন্, বোল্ড ভেরিটি	...	১৯
ডারলিং—কট্ সাট্‌ক্লিফ, বোল্ড ভেরিটি	...	০	—	বোল্ড হ্যামণ্ড	...	১০
চিপারফিল্ড— নট্ আউট্	...	৩৭	—	কট্ গিয়ারী, বোল্ড ভেরিটি	...	১৪
ব্রোমলি—কট্ গিয়ারী, বোল্ড ভেরিটি	...	৪	—	কট্ ও বোল্ড ভেরিটি	...	১
ওল্ডফিল্ড—কট্ সাট্‌ক্লিফ, বোল্ড ভেরিটি	...	২৩	—	এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড ভেরিটি	...	০
গ্রিমেট—বোল্ড বাউস্	...	৯	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড ভেরিটি	...	০
ওয়াল—এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড ভেরিটি	...	০	—	কট্ হেনড্রেন্, বোল্ড ভেরিটি	...	১
ও'রিলী—বোল্ড ভেরিটি	...	৪	—	নট্ আউট্	...	৮
অতিরিক্ত	...	১০		অতিরিক্ত	...	৭
		২৮৪				১১৮

তৃতীয় টেষ্ট ঃ

৬ই জুলাই থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ড, ম্যান্‌চেষ্টারে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হয়েছে। আকাশের অবস্থা বেশ পরিষ্কার, মাঠের অবস্থা আরো ভাল। ইংলণ্ড টসে জিতে ব্যাট করতে নামলো—ওয়ালটার্স ও সাট্‌ক্লিফ। ওয়াল ও ম্যাক্‌ক্যাব্ বল দিতে সুরু করলে। সাট্‌ক্লিফ্ ম্যাক্‌ক্যাবের বলে একের বাড়ী মেরে আরম্ভ করলে। আধ ঘণ্টা খেলার পরে মাত্র ২০ রান হ'লো। ব্র্যাডম্যান খুব ভালো ফিল্ডিং করে অনেকগুলি বাউণ্ডারী বাঁচালে। ২৩ রান হ'লে গ্রিমেট ম্যাক্‌ক্যাবের জায়গায় বল দিতে এলো। চিপারফিল্ড হাতে আঘাত পেয়ে চলে গেলে বদলি হয়ে ব্রোমলি এলো। সাট্‌ক্লিফ্ গ্রিমেটের বলকে চমৎকার কার্পেট ড্রাইভ করে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিলে গুগলি বোলারকে সে ভয় করে না। ওয়ালটার্স সাট্‌ক্লিফ্‌কে (১৫) এগিয়ে গেলো, ৫২ রান ২৫ মিনিটে করে।

আম্পায়ার ওয়াল্‌ডেন্ বলে দোষ দেখে, তাঁবু থেকে পূর্ব্ব বলের অবস্থার অনুযায়ী আর একটি বল এনে দিলেন। বল বদলে ইংলণ্ডের ভাগ্যও বদলে গেলো। ও'রিলীর প্রথম বলেই ওয়ালটার্স সর্ট-লেগে ডারলিংএর হাতে কট্ হলেন। সাট্‌ক্লিফ্ এলেন, তার আঙুল তখনো এলুমিনিয়ম ঢাকনায় ঢাকা। ও'রিলীর দ্বিতীয় বলে তার ক্রিকেট বেল উড়ে গেলো। হ্যামণ্ড এলো, প্রথম বল (ও'রিলীর তৃতীয় বল) লেগ-বাউণ্ডারী করে দ্বিতীয় বলেই (ও'রিলীর চতুর্থ বলে) বোল্ড হ'য়ে গেলেন। হেনড্রেন্ যোগ দিলেন। চিপারফিল্ড গ্রিমেটকে ছুটি দিলো আর ওয়াল এলো ও'রিলীর জায়গায়। সাট্‌ক্লিফ ওয়ালের বলকে লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ১০০ রান তুললে ৯০ মিনিটে।

লাঞ্চের পরে সাট্‌ক্লিফ ৬৩ রান করে চিপারফিল্ডের হাতে ১৫০ মিনিট খেলার পর ধরা পড়ে গেলো, ইংলণ্ডের স্কোর তখন ১৪৯। লেল্যাণ্ড এলেন। ব্র্যাডম্যানের অসুস্থতার জন্য ব্রোমলি এলেন ফিল্ডিং করতে। হেনড্রেন তার ৫০ রান তুললেন ১১০ মিনিটে। ১২৫ মিনিটে ইংলণ্ডের ২০০ রান উঠলো। ওয়াল ও ম্যাক্‌ক্যাব্ নূতন বল নিয়ে আরম্ভ করলে। চিপারফিল্ড অসুস্থ হওয়ায় বার্ণেট তার বদলি এলেন।

চা পানের সময় লেল্যাণ্ড ৫০ রান ৯৫ মিনিটে ও হেনড্রেন্ ৮০, মোট স্কোর ২৫৩ চার উইকেটে। ৩০০ স্কোর ২৮০ মিনিটে হ'লো। হেনড্রেন ১৩০ রান্ করে ও'রিলীর বলে তারই হাতে আট্‌কে গেলো ২৬১ মিনিট খেলার পরে।

৫ উইকেটে, হেনড্রেন্ ও লেল্যাণ্ড মিলে ১৯১ রান যোগ করলে। এইম্‌স্ এলেন ব্যাট করতে। সেদিনের খেলার শেষে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে মোট ৩৫৭ রান করেছে, লেল্যাণ্ড (৯৩) ও এইম্‌স্ (৪) নট্ আউট্।

দ্বিতীয় দিন,—উজ্জ্বল রৌদ্র ছিল, গরমও বেশ, তাপ ৮২ ডিগ্রী। অষ্ট্রেলিয়ার ভাগ্য মন্দ—ডাক্তার ব্র্যাডম্যান্ ও চিপারফিল্ডকে আজ খেলতে অনুমতি দিলেন না। বার্ণেট ও ব্রোমলি বদলি হয়ে নামলেন। উড্‌ফুলের চোখ দিয়ে ঠাণ্ডা লাগার জন্য জল পড়ছে, তবু তিনি (নট্-আউট্) ১২৪, এইমস্ (নট্-আউট্) ৩১। ওয়াল ও ম্যাক্‌ক্যাব নূতন বল নিয়ে এলেন। এইম্‌স্ তার ৫০ রান করলে দু' ঘণ্টায়, লেল্যাণ্ড ১৫২ করলে ৩০০ মিনিটে। তার পরে লেল্যাণ্ড পেটাতে গিয়ে বোলার ও'রিলীর পিছনে বদলির হাতে অনায়াসে ধরা পড়ে গেলেন। তিনি মোট ৩১২ মিনিটে ১৫৩ রান করেছেন। হপউড এসে দুই করেই ও'রিলীর বলে বোল্ড হয়ে গেলেন। ও'রিলী এ পর্য্যন্ত সাতটা উইকেটই নিয়েছে। এলেন এলেন, তিনি ২ করে একটা বল তুলে দিলে ওয়াল ঐ অতি



প্রথম ও একমাত্র শিল্ড বিজয়ী ভারতীয় দল—মোহনবাগান (১৯১১)

দাঁড়াইয়া :—রাজেন সেনগুপ্ত, নীলু ভট্টাচার্য্য, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, মনমোহন মুখোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, সুকুল

বসিয়া :—কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় ভাদুড়ি, শিবদাস ভাদুড়ি

নেমেছেন। লেল্যাণ্ড ও এইম্‌স্ ব্যাট আর ওয়াল ও ও'রিলী বল নিলেন। লেল্যাণ্ড ২১০ মিনিটে শত রান পূর্ণ করে টেষ্টে তার দ্বিতীয় শত রান করলেন। ও'রিলী লেল্যাণ্ডকে লুফ্‌তে পারলেন না, বল তাঁর বাঁ হাতে লেগে পড়ে গেল।

ইংলণ্ডের ৪০০ রান ৪০০ মিনিটে হ'লো। লেল্যাণ্ড সহজ বল না লুফ্‌তে পারায় তিনি রয়ে গেলেন ও পরে ৬১ রান করলেন। পনস্‌ফোর্ড এইম্‌স্‌কে 'মিডন' থেকে দৌড়ে এসে অতি চমৎকার লুফ্‌লেন। এইম্‌স্ আড়াই ঘণ্টা ব্যাট করে ৭২ রান করেছে। ভেরিটি এসে যোগ দিলেন ৫১০ স্কোরে।

লাঞ্চের পরে, এলেন ও ভেরিটি মিলে স্কোর তুললেন

৫৫০এ, ৫১৫ মিনিট খেলে। উড্‌ফুল কেবলি বোলার বদলাচ্ছেন। এলেন ওয়ালের বল লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ৫৭৮ করলেন। ইংলণ্ডের অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাচে ইহাই সর্ব্বোচ্চ স্কোর। ১৮৯৯ সালে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫৭৬ করেছিল। পরে ১৯০৫ সালে ইংলণ্ড ৪৪৬ রান করে। ৫৪০ মিনিটে ৬০০ স্কোর উঠ্‌লো। তারপরে এলেন ম্যাক্‌ক্যাবের বলে ৬১ করে আউট্ হয়ে গেলো, ৯৫ মিনিট খেলার পরে। তিনি ১১বার চারের বাড়ী মেরেছেন।

মেঘমুক্ত আকাশ, রবিকরোজ্জ্বল মাঠে তৃতীয় টেষ্টের তৃতীয় দিন আরম্ভ হ'লো। আজ বাতাসও ঠাণ্ডা ছিল। ম্যাক্‌ক্যাব্ [তার টেষ্ট ম্যাচে প্রথম শতরান ১৫০ মিনিটে তুললেন। ১৮০ মিনিট খেলার পর ম্যাক্‌ক্যাব্ হ্যামণ্ডের দু'চারটে বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ২০০ স্কোর করলে।

ক্লার্ক নূতন বল নিয়ে এলেন। ব্রাউন ক্লার্কের বলে সহজেই স্কোয়ার লেগে ধরা পড়ে গেলেন ওয়ালটার্সে'র



য়ুরোপীয়ান লীগ ক্লাব বনাম ভারতীয় লীগ ক্লাব। য়ুরোপীয়ানরা (৪-০) গোলে জয়ী হয়

য়ুরোপীয়ান দল :—ডেভিস ; টম্‌সন (ক্যাপ্‌টেন) রিডল্ ; ডেভিস, এক্রড, বারেট ;
ম্যাকেঞ্জি, গোল্ডস্মিথ, কার্, ময়েল, নেলসন।

ভারতীয় দল :—তালুকদার ; ডি ঘোষ, এস দে ; মিশ্র, নুরমহম্মদ, এ হামিদ (ক্যাপ্‌টেন) ;
দুলাল, হবিব, রসিদ, রহমত, সামাদ।

রেফারি :—সি ডান্‌কান্ লাইন্সম্যান্—এস আমেদ ও প্রাইভেট ওয়াইল্ডি

ক্লার্ক এসে যোগ দিলেন। ভেরিটি ১৯ স্কোর আরো তুললে, ইংলণ্ড বেলা ৩-৫০ মিনিটে ৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড করলো, তাদের তখন মোট স্কোর ৬২৭।

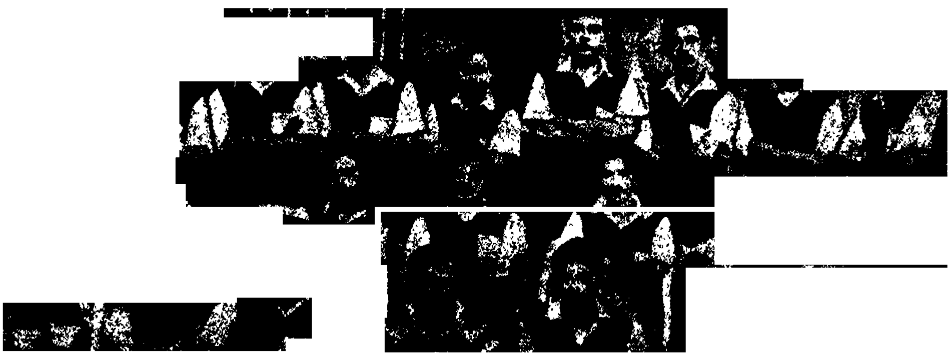
হাতে। তিনি ২৪৫ মিনিটে ৭২ রান করেন, তার মধ্যে ৯টা বাউণ্ডারী। উড্‌ফুল এলেন, তিনি কোন রান না করেই হেনড্রেনের হাতে যেতে যেতে বড় বেঁচে গেলেন।

ওয়ালটার্স ম্যাক্‌ক্যাবের একটা জোর নিচু বল লুফ্‌লে। ম্যাক্‌ক্যাব ২১৫ মিনিট চৌকস খেলে ১৩৭ রান করেছেন, তার মধ্যে ১৮টা বাউণ্ডারী হয়েছে। ডারলিং এসে উড্‌ফুলের সঙ্গে যোগ দিলেন। উড্‌ফুল ক্লার্কের বলে ৩ রান করে স্কোর ২৫০, ২৫০ মিনিটে তুললেন। ইংলণ্ড লাঞ্চের মধ্যে আরো একটা উইকেট নিতে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো।

এলেন ও হপ্‌উড্‌ বল দিতে লাগলেন। অষ্ট্রেলিয়া 'ফলো অন্' বাঁচাতে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলছে। উড্‌ফুল হপ্‌উডের পায়ের ভেতর দিয়ে ৩ করে ৩০১ স্কোর উঠালে, ৩০০ মিনিটে। উডফুল ৩১ করে এইম্‌সের হাতে খুব বেঁচে গেলো। ভেরিটির বলে ব্রাউন ৩৭ করে বোল্ড্‌ হ'য়ে গেলে অসুস্থ ব্রাড্‌ম্যান মাঠে নাম্‌লেন, তাকে ম্রিয়মাণ ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। ভেরিটির বলে এক করতেই, দর্শকরা তাকে উৎসাহিত করলে। উড্‌ফুল স্লিপের মধ্য দিয়ে বাউণ্ডারী করে নিজের ৫০ রান তুললেন, ১৭০ মিনিটে।

চা পানের পরে হ্যামণ্ডের হাত থেকে ব্র্যাডম্যানের বল লাফিয়ে পড়ে গেলো। ব্র্যাডম্যান আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি হ্যামণ্ডের বলে এইম্‌সের হাতে আটকে গেলেন ৩০ রানে। উড্‌ফুল তখন ৫৭ করেছেন, ওল্ডফিল্ড এসে যোগ দিলেন। এর পরে অষ্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্য আরম্ভ হ'লো। ৪১ রানের মধ্যে চার উইকেট গেলো। উড্‌ফুল রান-আউট্‌ হ'লেন ৪০৯ রানের সময়, ওল্ডফিল্ড ওয়্যাটের হাতে ১৩ রান করে ৪১১র মাথায় আর গ্রিমেট ৪১৯এ মোটে রান না দিয়ে গেলেন। উড্‌ফুল ৭৩ রান করেন, ১৩০ মিনিটে। তখন চিপারফিল্ডকে রোগশয্যা থেকে উঠে ব্যাট নিয়ে নামতে হ'লো। বেলা শেষে খেলা বন্ধের সময় চিপারফিল্ড (১৭) ও ও'রিলী (১) রান করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার মোট স্কোর ৪২৩, ৮ উইকেটে।

চতুর্থ দিন, খুব প্রখর গরম ছিল। লেল্যাণ্ডের বদলি কীটন্‌ এসেছে। ক্লার্ক নূতন বল নিয়ে এলো। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং খুব খারাপ হ'চ্ছে, তাদের ভালো ভালো ফিল্ডাররাও ভুল করছে। হেনড্রেন্‌ চিপারফিল্ডকে লুফ্‌তে ফসকে গিয়ে সকলকে বিস্মিত করলেন। এলেন দু'বার ও'রিলীর উইকেট একটুর জন্যে উড়াতে পারলে না। ইংলণ্ড খুব শীঘ্র শীঘ্র বোলার বদল করতে লাগলো। চিপারফিল্ডের মারের বল হ্যামণ্ডের আঙুল ছুঁয়ে বাউণ্ডারীতে গিয়ে পড়লো। তারপরে স্লিপে হ্যামণ্ড ও হেনড্রেন্‌ দু'জনেই ও'রিলীকে ফস্‌কে গেলো। চিপারফিল্ডকে ওয়ালটার্স ভেরিটির বলে চমৎকার আন্দাজ করে দৌড়ে এসে স্কোয়ার-লেগে লুফ্‌লে। চিপারফিল্ড ৯৫ মিনিটে ২৬ করে অষ্ট্রেলিয়াকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। ওয়াল এসে যোগ দিলেন, দর্শকরা খুব উত্তেজিত, কারণ অষ্ট্রেলিয়ার তখনও



লীগবিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল—মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

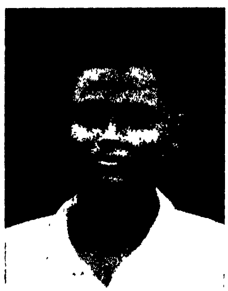
দাঁড়াইয়া :—রহমান, সত্তার, মাসুম, হবিব্‌ (বড়), আমির, হবিব্‌ (ছোট), জাফর, সাবু ও মহিউদ্দীন।

বসিয়া :—শেখ, সামাদ, আনওয়ার (ক্যাপ্‌টেন্‌) রসিদ ও রহমত। সুমুখে :—জুম্মা খাঁ, শিরাজী, আব্বাস।

২৪ রান করতে বাকী 'ফলো অন্' বাঁচাতে। ও'রিলী বোলারের মাথার উপর দিয়ে তোলা মেরে, উপরি উপরি দু'টো বাউণ্ডারী করলে। ও'রিলী রান-আউট্ হ'তে ভাগ্যবলে বেঁচে গেলো, হপ্‌উড্ তাড়াতাড়ি বল ছুঁড়তে পারলে না। এলেন লেগ্ গ্লাইডে একটা বাউণ্ডারী করলে। মাত্র ছয় রান বাকী, ও'রিলী একটী দুই করে, পরের বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে 'ফলো অন্' থেকে বাঁচালে। ওয়াল হ্যামণ্ডের বলে সুন্দর বাউণ্ডারী করে, পরের বলটা স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে দুটো রান নিতে গিয়ে রান্ আউট্ হয়ে গেলো ১৮ রানে, কীটন দূর থেকে ছুঁড়ে উইকেটে মারলে। ও'রিলী (নট্ আউট্) ৩০, দু'ঘণ্টা খেলে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস্ ৪৯১ রানে শেষ হ'লো।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইংনিস্ আরম্ভ করলে ১-৫ মিনিটে।





এস্ চৌধুরী (মোহনবাগান)　　মোনা দত্ত (মোহনবাগান)

ওয়ালটার্স ও সাট্‌ক্লিফ্ ব্যাট করতে ও ওয়াল ও ম্যাক্‌ক্যাব বল দিতে লাগলো। লাঞ্চের সময় স্কোর উঠ্‌লো, ওয়ালটার্স (১২) ও সাট্‌ক্লিফ্ (৮)।

ইংলণ্ড ড্র অবশ্যম্ভাবী মনে করে যেন ব্যাট করছে। ১৫ মিনিটে মাত্র ৫ রান হ'লো। ৬৫ মিনিটে ৫০ রান হয়েছে, ওয়ালটার্সের ৩০ ও সাট্‌ক্লিফের ১৮। সাট্‌ক্লিফ্ ম্যাক্‌ক্যাবের বলে একটা ছ'য়ের বাড়ী মেরে নিজের ৫০ রান করলেন ১১৫ মিনিটে। ওয়ালটার্স আর একটু হ'লে গ্রিমেটের হাতে ধরা পড়তেন। ইংলণ্ডের শতরান উঠ্‌লো দু'ঘণ্টায়, ওয়ালটার্স নিজের ৫০ করলেন ১৪০ মিনিটে, তিন ঘণ্টা খেলে। সাট্‌ক্লিফ্ ন'টা ৪ ও একটা ৬ করেছেন। ৪-১৫ মিনিটে ওয়্যাট ডিক্লেয়ার করলেন যখন স্কোর ১২৩, এক উইকেটও না খুইয়ে।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস্ সুরু করলো, বেলা ৪-৪০ মিনিটে। ব্রাউন এক রান করে স্লিপে হ্যামণ্ডের হাতে ধরা পড়লে, ম্যাক্‌ক্যাব্ এসে পনস্‌ফোর্ডের সঙ্গে যোগ দিলেন। এরা দু'জনে শেষ বেলা পর্য্যন্ত খেলে নট্ আউট্ রয়ে গেলেন। পনস্‌ফোর্ড ৩০ ও ম্যাক্‌ক্যাব্ ৩৩, অষ্ট্রেলিয়ার মোট রান ৬৬ (১ উইকেটে)। পনস্‌ফোর্ডের হাজার রান সম্পূর্ণ হ'লো দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯ রান করার সঙ্গে।

অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ সমান সমান হ'লো। ইংলণ্ড প্রথম ইনিংসে সর্ব্বোচ্চ স্কোর ৬২৭ করেও জয়ী হ'তে পারলে না। ইহার জন্য দায়ী তাদের খারাপ ফিল্ডিং, ওয়্যাটের নেতৃত্ব ও এইম্‌সের উইকেট কিপারিং।

ইংলণ্ড

(তৃতীয় টেষ্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার)

প্রথম ইনিংস্

ওয়ালটার্স—কট্ ডারলিং, বোল্‌ড ও'রিলী	...	৫২
সাট্‌ক্লিফ্—কট্ চিপারফিল্ড, বোল্‌ড ও'রিলী	...	৬৩
ওয়্যাট—বোল্‌ড ও'রিলী	...	০
হ্যামণ্ড—বোল্‌ড ও'রিলী	...	৪
হেন্‌ড্রেন্—কট্ ও বোল্‌ড ও'রিলী	...	১৩২
লেল্যাণ্ড—কট্ বদলি, বোল্‌ড ও'রিলী	...	১৫৩
এইম্‌স্—কট্ পনস্‌ফোর্ড, বোল্‌ড গ্রিমেট	...	৭২
হপ্‌উড্—বোল্‌ড ও'রিলী	...	২
এলেন—বোল্‌ড ম্যাক্‌ক্যাব	...	৬১
ভেরিটি— নট্ আউট্	...	৬০
ক্লার্ক— নট্ আউট্	...	২
অতিরিক্ত	...	২৬
(৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)		৬২৭

দ্বিতীয় ইনিংস্

ওয়ালটার্স— নট্ আউট্	...	৫০
সাট্‌ক্লিফ্— নট্ আউট্	...	৬৯
অতিরিক্ত	...	৪
(০ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)		১২৩

অষ্ট্রেলিয়া

(তৃতীয় টেষ্ট—ওল্ড ট্রাফোর্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার)

প্রথম ইনিংস্

পনসফোর্ড—কট্ হেনড্রেন, বোল্ড হ্যামণ্ড	...	১২
ব্রাউন—কট্ ওয়ালটার্স্, বোল্ড ক্লার্ক	...	৭২
ম্যাক্‌ক্যাব—কট্ ভেরিটি, বোল্ড হ্যামণ্ড	...	১৩৭
উড্‌ফুল—রান আউট্	...	৭৩
ডারলিং—বোল্ড ভেরিটি	...	৩৭
ব্র্যাডম্যান—কট্ এইম্‌স্, বোল্ড হ্যামণ্ড	...	৩০
ওল্ডফিল্ড—কট্ ওয়্যাট, বোল্ড ভেরিটি	...	১৩
চিপারফিল্ড—কট্ ওয়ালটার্স্, বোল্ড ভেরিটি		২৬
ও'রিলী—নট্ আউট্	...	৩০
ওয়াল—রান আউট্	...	১৮
অতিরিক্ত	...	৪৩
		৪৯১

দ্বিতীয় ইনিংস্

পনসফোর্ড—নট্ আউট্	...	৩০
ব্রাউন—কট্ হ্যামণ্ড, বোল্ড এলেন	...	০
ম্যাক্‌ক্যাব—নট্ আউট্	...	৩৩
অতিরিক্ত	...	৩
(১ উইকেট)		৬৬

কলিকাতায় লীগ খেলা ঃ

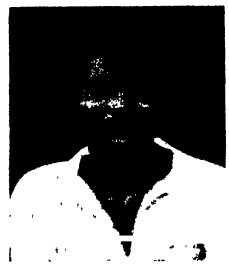
লীগ খেলা শেষ হ'য়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং সর্ব্বোচ্চ ২৭ পয়েন্ট করে লীগ জয়ী প্রথম ভারতীয় দল হ'য়েছে। ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ trophy ভারত বিখ্যাত আই এফ এর শিল্ড ভারতীয় দলের মধ্যে একমাত্র মোহন-বাগান জয় করতে সক্ষম হ'য়েছিল ১৯১১ সালে। কিন্তু কলিকাতার দ্বিতীয় trophy লীগ কাপ্ জয় করতে কোন ভারতীয় দলই সক্ষম হয়নি। এবার মহমেডান দল লীগ জয়ী হয়ে ভারতীয়দের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। আমরা তাদের এই বিজয়ে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করছি। ডালহৌসী ও মোহনবাগান ২৪ পয়েন্ট লাভ করে একযোগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বর্ষার জন্য ভারতীয়রা বহুবার লীগ জয়ী হ'তে হ'তে হতে পারে নি।

এদেশে বর্ষাকালেই ফুটবল খেলা হয়। বুট পায় দিয়ে খেলতে অভ্যস্ত না হ'লে ভারতীয়দের ফুটবল খেলায় জয়ী হবার সম্ভাবনা খুব কম।

এখানে ফুটবলই প্রধান ও লোক-প্রিয় খেলা—বর্ষাকাল থেকে সরিয়ে অন্য সময়ে খেলবার ব্যবস্থা করলেই সকল দিকে সুবিধা হয়। আমরা মনে করি রাগ্‌বী খেলাটা আগে হ'য়ে আগষ্ট মাস থেকে ফুটবল খেলা আরম্ভ করলে মন্দ হয় না। আই এফ একে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। বাংলার—বলতে গেলে ভারতের—বিখ্যাত আই এফ এ শিল্ড খেলা অতি বর্ষার মধ্যে হওয়ায় অনেক ভালো দলের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ডও নেমে যায়। এমন কি অনেক বিখ্যাত শক্তিশালী য়ুরোপীয় ও



নাইট্ (ক্যালকাটা)



কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান)

সৈনিকদলও জলের জন্য নিকৃষ্ট দলের কাছে হেরে যায়। সম্পূর্ণ ভাগ্যের উপরই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয়, প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা হয় না।

মহমেডান স্পোর্টিং দল বৃষ্টির দিন অধিকাংশই বুট পায়ে খেলতে আরম্ভ করেছে। প্রথম প্রথম তারা বুট পায়েও ভিজা মাঠে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যস্ত হচ্ছে। বৃষ্টিতে তারা নগ্নপদ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ভালই খেলতে পেরেছে, যদিও সাহেব ও গোরাদের সঙ্গে এখনও পেরে উঠছে না। উহারা ভিজা মাঠে প্রথম বুট পায়ে খেলতে নামে ডারহামের বিরুদ্ধে, কিন্তু ৩-০ গোলে হেরে যায়। তার পরে কাষ্টম্‌সের সঙ্গে খেলে, তাতেও সুবিধা করতে পারে নি। যদিও খেলাটি ড্র হয়, কিন্তু কাষ্টম্‌স্‌রাই ভাল খেলেছিল। তাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড অব্যর্থ গোল দু'তিনবার

যেন ইচ্ছা করে নষ্ট করলে। আর তাদের বিখ্যাত ব্যাক ও গোলকিপারের দোষেই শেষ মুহূর্ত্তে গোলটি শোধ হয়।

• মোহনবাগান ভিজা পিচ্ছিল মাঠে ক্যালকাটার সঙ্গে ৪-০ গোলে হেরে, আর বৃষ্টিতে ইষ্ট বেঙ্গল ও ডালহৌসীর সঙ্গে 'ড্র' করে লীগ জয়ী হ'তে পারলে না। লীগে মোহনবাগান এবার নিয়ে পাঁচবার রানার্স আপ্ হ'লো। প্রত্যেকবারই মিলিটারী বা কোন ইউরোপীয়ানরা প্রথম হ'য়ে তাদের লীগ বিজয়ী হতে দেয় নি।

লীগে মহমেডান স্পোর্টিং খেলেছে বেশ ভালো, তাদের ভাগ্যও ভাল ছিলো। খেলায় ভাগ্য অনেকটা সাহায্য করে। এখানে ফুটবল খেলার সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দল নিয়ে যাবার বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি হয়েছিলো। কিন্তু আই এফ এ টীম পাঠান স্থগিত করেন নি। মহমেডান স্পোর্টিং থেকে মাত্র অখিল আমেদ গেছে। মহমেডান স্পোর্টিং বলতে গেলে অল ইণ্ডিয়া টীম—বাংলার তো নয়ই—তাতে স্যাণ্ডিমনিয়ন ও বাঙ্গলোর খেলোয়াড়ই বেশী। এক-জনকে বিদেশে পাঠাতে তাদের দলের ক্ষতি হয় নি। কিন্তু অন্যান্য দলের যে সব ভালো খেলোয়াড়রা চলে গেছেন তাদের সমকক্ষ বদলি খেলোয়াড় সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। এরিয়ান দল মজুমদার, গাঙ্গুলি, চক্রবর্ত্তীর স্থান পূরণ করতে না পারায়, আগামী বৎসর দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে বাধ্য হ'লো। মোহনবাগানও সন্মথ দত্ত, এস্ চৌধুরী, কে ভট্টাচার্য্যের স্থান পূর্ণ করতে পারে নি। এই কারণে তাদের দলের খেলাও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট হ'য়েছে। ঐ তিনজন খেলোয়াড় থাক্‌লে লীগে তারা আরো ভাল ফল দেখাতে পারতো মনে হয়। তাদের পক্ষেও এবার লীগ জয় করা হয় ত অসম্ভব হ'তো না। এবার গত তিন বৎসর লীগ-জয়ী ডারহামদলের ভাল খেলোয়াড়রা এখানে না থাকায় লীগের প্রথমার্দ্ধে তারা তেমন শক্তিশালী ছিল না। দ্বিতীয় বিভাগের টীম নিয়ে খেলে অনেক পয়েন্ট নষ্ট করে। শেষ ভাগে ভাল খেলোয়াড়রা এলে চেষ্টা করে। কিন্তু অত বিলম্বে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। ইষ্টবেঙ্গল গত দু'বৎসর 'রানার্স আপ্' হয়েছিলো। দু'এক পয়েন্টের জন্য ডারহামস্ তাদের লীগ জয়ী হতে দেয় নি।

প্রথম বিভাগ লীগে কে কিরূপ স্থান অধিকার করেছে

	স্থান	খেলা	জিত	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মহামেডান স্পোর্টিং	১	২০	১০	৭	৩	৩৬	১৯	২৭
ডালহৌসী	২	২০	৮	৮	৪	১৯	১৩	২৪
মোহনবাগান	২	২০	৭	১০	৩	২৮	২৫	২৪
কে আর আর	৩	২০	৯	৫	৬	৩০	১৮	২৩
ডারহাম্‌স্	৪	২০	৮	৫	৭	৩৩	২৫	২১
হাওড়া ইউনিয়ন	৫	২০	৬	৮	৬	১৭	২৩	২০
কাষ্টম্‌স্	৬	২০	৬	৭	৭	১৮	১৮	১৯
ইষ্টবেঙ্গল	৭	২০	৫	৮	৭	২০	২২	১৮
ক্যালকাটা	৮	২০	৭	৪	৯	২১	২৬	১৮
কালীঘাট	৯	২০	৩	৮	৯	১৭	৩৫	১৪
এরিয়ানস	১০	২০	৫	২	১৩	১৭	৩২	১২

রেফারিং ঃ

১৫ই জুন তারিখে, মহমেডান স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় তিনজন রেফারি খেলা তদারক করেছেন। হাফ টাইমের পরে বৃষ্টির মধ্যে খেলা আরম্ভ হোলে দেখা গেল আর ডব্‌লিউ বেনেট একা রেফারিং করছেন। তার কিছু পরেই বি, ম্যাগ্‌ননির স্থলে করপোর‍্যাল পিণ্ডার রেফারি হয়ে নামলেন। একই খেলায় তিনজন রেফারি ফুটবলের ইতিহাসে এই প্রথম।



ডেভিস্
(ড্যালহৌসী)



ইয়ং (কে আর আর)
লীগে সর্ব্বোচ্চ গোল করেছে

ডারহামস্ ও হাওড়া ইউনিয়নের খেলায়, ডারহামস্ বল মারলে বল হাওড়ার গোলের বারে লেগে মাঠে ফিরে আসে, রেফারি গোল হ'য়েছে মনে করে গোল নির্দ্দেশ করেন। দর্শকরা চীৎকার করে প্রতিবাদ জানালে রেফারির সন্দেহ হওয়ায় (ডারহামসের) লাইনস্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করে গোল হয়নি জানতে পেরে তখনি নিজ ভুল সংশোধন করে গোল বাতিল করে দেন। ইহার জন্য আমরা রেফারি ও



এস মজুমদার (এরিয়ান)



এ গাঙ্গুলি (এরিয়ান)

লাইনসম্যানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক হয়। তা বলে ত্রুটি দেখেও তা' পাল্‌টাবো না ইহা কথনই সঙ্গত নয়। Bonafide mistake স্বীকার করায় যশই আছে।

মোহনবাগান ডালহৌসীর শেষ ম্যাচে, রেফারি মোহনবাগানের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে অফ সাইড্ দিলে খেলোয়াড় রেফারিকে অন্য পক্ষের ব্যাকের উপস্থিতি দেখিয়ে দিলেও, তিনি সেই ভুল নির্দ্দেশই রাখলেন। অনেকেই নিজের ভুল দেখতে পেলেও সংশোধন করতে চান না—বোধ হয় ভাবেন তাতে তাঁর অপমান হয়। ঐ দিন অন্য রেফারি বল গোলের পাশের জালে লাগতেও আউট্ দেন নি। সেদিন যারা গোলের পিছনেই বসে ছিলেন, তারা আউট্ হয়েছে বলেছেন।

আন্তর্জাতিক চ্যারিটি খেলা ঃ

৭ই জুন, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চ্যারিটি—য়ুরোপীয়ান-লীগ ক্লাব বনাম ইণ্ডিয়ান-লীগ ক্লাব খেলা হ'য়েছে। য়ুরোপীয়ান দল চার গোলে ইণ্ডিয়ান দলকে হারিয়েছে। গত দুই বৎসর ভারতীয়রা জিতেছিল। কয়েকদিন অনবরত বৃষ্টি হওয়াতে এবং ঐ দিনেও বৃষ্টি না থামাতে মাঠ অত্যন্ত ভিজা ও কর্দ্দমাক্ত ছিল। ভারতীয়দের জেতবার কোন আশাই ছিলনা। ভরসার মধ্যে ছিল যে মহমেডান স্পোর্টিংএর চারজন বাছাই ফরওয়ার্ড যারা বুট পায়েও খেলে তারা অন্ততঃ ভালো খেল্‌বে। কিন্তু তারাও সকলকে হতাশ করেছে। ফরওয়ার্ডের মধ্যে নগ্ন পদের খেলোয়াড় দুলালই সবার চেয়ে ভালো খেলেছে। রসিদ, হবিব, রহমত এরা গোল দেবার সুযোগ কখনও ছাড়ে না। কিন্তু সেদিন তারা অনেকগুলি সুযোগ নষ্ট করেছে। প্রথমার্দ্ধে খেলা সমান সমান ছিল, বরঞ্চ ভারতীয়রাই বেশী আক্রমণ করেছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধে য়ুরোপীয়েরা খুব চেপে ধরে ও পর পর চার খানা গোল দেয়। একখানা গোল যদিও ভারতীয় দলের ব্যাকের পায়ে লেগে সেম্ সাইডে হয়ে যায়। রেফারিং ভাল হয় নি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত গল্পের বই "পরাজয়"—১৷৹
শ্রীসীতাদেবী প্রণীত উপন্যাস "মাতৃঋণ"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "ঘূর্ণি হাওয়া"—২৲
শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "রঙের পরশ"—২৷৹
শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত উপন্যাস "দেবার"—১৷৹
শ্রীলীলাদেবী প্রণীত "শিঞ্জন"—১৲
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত "আকাশ-পাতাল"—৸৹
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত গল্পের বই "বৈরাগীর চর"—১৲
শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন জ্যোতির্ভূষণ সম্পাদিত ও অনূদিত "শ্রীবালাত্রিপুরসুন্দরী প্রশ্ন:" (জ্যোতিষ প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ)—।৹
শ্রীতারকেশ্বর সেন শাস্ত্রী প্রণীত উপন্যাস "মিলন-মালা"—৸৹
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অভিনব উপন্যাস "চোরবাগান"—৷৹
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত শিশু-উপন্যাস "অজানা দেশ"—১৲
শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মৈত্র প্রণীত "কাটার্স গাইড"—২৷৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পূর্ব্বরাগ"—১৲
শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত "বাঙ্গালাসাহিত্যে গদ্য"—২৲
শ্রীসুশীলকুমার শীল রচিত "বয়ের চিঠি"—৷৴৹
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ক্রৌঞ্চমিথুন"—১৷৹
শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত কাব্য "হৈমন্তী"—১৷৹
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "সচিত্র বর্ণমালা"—।৵৹
শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্ততীর্থ অনুবাদিত "ব্রহ্মসূত্রম্ বা বেদান্তদর্শনম্" দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ—২৲
শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত গল্প-পুস্তক "রুদ্রকান্ত"—২৲

Publisher—SUDHANSHUSEKHAR CHATTERJEA
OF MESSRS. GURUDAS CHATTERJEA & SONS
201, Cornwallis Street, Calcutta

Printer—NARENDRA NATH KUNAR
THE BHARATVARSHA PRINTING WORKS
203-1-1, Cornwallis Street, Cal.

ভারতবর্ষ

ভাদ্র—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতি-স্থান

রায় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

যে নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের প্রথম ২৪ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন সেই নবদ্বীপ ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা লইয়া বাঙ্গালার পণ্ডিত সমাজে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই বিষয় লইয়া এই তর্ক চলিতেছে এবং অনেক পুস্তক-পুস্তিকা প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় সদস্য এই বিষয়ে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করায়, এই সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু চেষ্টা করিয়াছি এবং সেই চেষ্টার ফল আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদস্যগণ যে এই বিষয়ে নানা-প্রকারে আমার সহায়তা করিয়াছেন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এ কথাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে আমার সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন।

যাঁহারা আজীবন বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন এবং নবদ্বীপ অঞ্চলে বহুকাল বাস করিয়াছেন, এইরূপ অনেক ভক্ত-বৈষ্ণব-পণ্ডিতের সঙ্কলিত বহু পুস্তক-পুস্তিকা থাকা সত্ত্বেও প্রাংশুলভ্য ফললোভে উর্দ্ধবাহু "বামনের" মত আমার এই ধৃষ্টতা কেন তাহার আরও একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। শ্রদ্ধাভাজন সজ্জনগণ কোন আদেশ বা অনুরোধ করিলেও নিজের অযোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া অসাধ্য-সাধনে হস্তক্ষেপ করা কখনও কর্ত্তব্য নহে। তবে যে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, তাহার কারণ নিজের উপর অনুচিত বিশ্বাস নহে; তাহার কারণ ইতিহাস আলোচনা ক্ষেত্রে আমি যে বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি সেই প্রণালীতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং নবদ্বীপ-সমস্যা সম্বন্ধে সেই প্রণালী প্রয়োগ করিলে কি ফল পাওয়া যায় তাহা দেখিবার একটা কৌতূহল। এই প্রণালীর অন্তর্গত দুইটী প্রধান নিয়ম:—(১) প্রমাণ মাত্রকেই আদৌ

সংশয়ের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য এবং নানা প্রকারে তাহার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া লইয়া তবে তাহার উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য ; (২) সকল প্রকার রাগ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঠিক প্রমাণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য।

এই অনুসন্ধান-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আমি পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মতামত বিশেষভাবে আলোচনা করি নাই কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে প্রমাণের সন্ধান পাইয়া উপকৃত হইয়াছি এবং সেই সকল ও অন্যান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের উপর আমার যথোচিত শ্রদ্ধা নাই, অথবা তাঁহাদের মতামত আমি আলোচনার যোগ্য মনে করি না। অবসরের অভাবই আমার পরমত বিচারে বিরত থাকার কারণ। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপনগর ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা তর্কের বিষয় ; কিন্তু বর্ত্তমানে যে স্থান নবদ্বীপ নামে কথিত হয় তাহা সকলের পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দেও এই স্থানই নবদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বর্ত্তমানের সুপরিচিত নবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া, অষ্টাদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের স্থিতি সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ আছে তাহা আলোচনা করিয়া অতীতের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া, ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের স্থিতি-স্থান নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর চৈতন্যদেবের নবদ্বীপের ঠিক স্থলবর্ত্তী কিনা উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের প্রথম ভাগে বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার বিবরণ লেখক হাণ্টার সাহেব তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলার বিবরণে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"The caprices and changes of the river have not left a trace of old Nadia. The people point to the middle of the stream as the spot where Chaitanya was born. The site of the ancient town is now partly Char land, and partly forms the bed of the stream which passes to the north of the present town. The Bhagirathi once held a westerly course, and old Nadia was on the same side with Krishnagar, but about the beginning of this century, the stream changed and swept the ancient town away."

১৮৮৮ সালের জানুয়ারী সংখ্যা লণ্ডনের "নাইণ্টিন্থ-সেঞ্চুরী" পত্রে প্রকাশিত ভাগীরথীর প্রাচীন কীর্ত্তিনাশের বিবরণে (A River of Ruined Capitals) নবদ্বীপ সম্বন্ধে হাণ্টার পুনরায় লিখিয়াছেন :—

"I landed with feelings of reverence at this ancient Oxford of India (Nadia). A fat benevolent abbot paused in fingering his beads to salute me from the verandah of a Hindu monastery. I asked him for the birthplace of the Divine Founder of his Faith. The true site, he said, was now covered by the river. The Hugli had first cut the sacred city in two, then twisted round the town, leaving anything that remained of the original capital on the opposite (East) bank."

হাণ্টারের এই দুইটী উক্তির মধ্যে প্রথমটিতে নিবদ্ধ সংবাদের মূলও বোধ হয় একই ব্যক্তি, নবদ্বীপের এক স্থূলকায় মহান্ত বাবাজী। এই আলাপের সময় বাবাজীর বয়স কত ছিল তাহা হাণ্টার লেখেন নাই। বাবাজী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই অবশ্য হাণ্টারকে বলিয়াছিলেন। বাবাজী শুনিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নবদ্বীপ অঞ্চলে একটা গুরুতর নদীর ভাঙ্গন ঘটিয়াছিল, এবং তৎকালে যে স্থান চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া গণ্য ছিল এই ভাঙ্গনে সেই স্থান ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং হাণ্টারের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় সেই স্থান গঙ্গাগর্ভগত বলিয়া গণ্য হইত। কেবল হাণ্টারের বিবরণ অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া গণ্য স্থানটী অনুসন্ধান করিতে গেলে বিশেষ সুবিধা হইবে না ; কারণ হাণ্টারের বিবরণের ভাষার নানারূপ অর্থ হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সঙ্ঘটিত নদীভাঙ্গনের পূর্ব্বে নবদ্বীপের স্থিতিস্থান ঠিক কোথায় ছিল তাহা জানিতে হইলে রেনেল (James Rennell) সাহেবের অঙ্কিত এই অংশের ম্যাপ দেখা আবশ্যক।

১৭৬৪ সালের মে মাসে রেনেল সাহেব গভর্ণর হেনরী ভান্‌সিটার্ট (Henry Vansittart) কর্ত্তৃক সার্ভেয়ার

বা প্রধান আমীন্ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় নদীগুলি জরীপ করিবার জন্য গঙ্গার এবং জলঙ্গীর পথে নৌকায় চড়িয়া পদ্মানদীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। রেনেল জলঙ্গীর এবং গঙ্গার সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :—

"The 12th, fair weather all day, the evening heavy and threatening. At 8 in the morning entered the Jelunghee River. The Cossimbazar River at its conflux with the Jelunghee appears to be very narrow; I judge it cannot at this season be above 50 yards over. The people informed me that it is now navigable for middle-sized boats." *

সেকালে গঙ্গার যে অংশ কাশীমবাজারের নিকটবর্ত্তী ছিল তাহাকে কাশীমবাজারের নদী বলিত। এই প্রথম যাত্রার পর রেনেলের তত্ত্বাবধানে সেকালে কোম্পানীর সমস্ত এলাকার জরীপ করা হইয়াছিল। এই জরীপ অবলম্বনে রেণেল যে সকল বড় বড় ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপেক্ষাকৃত অল্পায়তন ম্যাপ সঙ্কলিত করিয়া তিনি একখানি এ্যাটলাস (Atlas) প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব সার্ভেয়ার জেনারেল হার্ষ্ট সাহেব (Major T. C. Hirst) ১৯১৭ সালে রেনেলের ৫ মাইলে ১ ইঞ্চি স্কেলের ম্যাপগুলি প্রকাশিত করিয়াছেন। তদন্তর্গত নদীয়া জেলার ম্যাপের নবদ্বীপের অংশ প্রদর্শিত হইল। এই ম্যাপে দেখা যাইবে, নদীয়া বা নবদ্বীপ নামক ক্ষুদ্রসহর একটী দ্বীপের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে অবস্থিত। এই নবদ্বীপের উত্তর এবং পূর্ব্বদিক্ দিয়া জলঙ্গীর দুই শাখা প্রবাহিত। গঙ্গার খাত নবদ্বীপ সহর হইতে তিন মাইলের অধিক দূরে (পশ্চিমে) অবস্থিত। এই খাত গ্রীষ্মকালে মাত্র ৫০ গজ চওড়া থাকিত। এই খাতের পশ্চিম পাড়ে জান্নগর এবং সমুদ্রগড় অবস্থিত। জান্নগর এবং সমুদ্রগড় গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু গঙ্গার স্রোত আর এখন তাহাদের নিকট দিয়া প্রবাহিত হয় না, অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। রেনেলের এই ম্যাপে দেখা যাইবে, গঙ্গার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে জলঙ্গী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ; এক শাখা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া মাণিকপুরের কিছুটা উত্তরে গঙ্গায় পড়িয়াছে ; আর এক শাখা সোজাসুজি পশ্চিম দিকে যাইয়া গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। এই শাখার উত্তর দিকে রেনেল "বরাডাঙ্গা" নামক গ্রাম চিহ্নিত করিয়াছেন। এই গ্রাম বর্ত্তমানে "ভারুইডাঙ্গা" নামে পরিচিত। রেনেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ বরাডাঙ্গার বরাবর দক্ষিণে ন্যূনাধিক এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে জলঙ্গীর দক্ষিণবাহিনী শাখা শুকাইয়া গিয়াছে ; তাহার খাত এখন অলকানন্দা নামে পরিচিত।

নবদ্বীপের মোটা মহান্ত বাবাজী গঙ্গার খাত পরিবর্ত্তনের কালে যে নবদ্বীপ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা হাণ্টারকে বলিয়াছিলেন সেই নবদ্বীপ রেনেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ সহর। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সহর ভারুইডাঙ্গার বরাবর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। হাণ্টারের সংবাদ-দাতা বাবাজী বোধ হয় বিশ্বাস করিতেন এই নগরেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান অবস্থিত ছিল। ভারুইডাঙ্গার পশ্চিম দক্ষিণ দিকে প্রায় ৪ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ তখন নবদ্বীপের অন্তর্গত চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া গণ্য হইত না। রেনেলের জরিপের সময়ের এবং চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময়ের (১৫১০ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে আড়াইশত বৎসরের অধিক ব্যবধান। এই আড়াইশত বৎসর কালের মধ্যে আর কখনও যে নবদ্বীপ অঞ্চলে নদীর ভাঙ্গন ঘটে নাই এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। সুতরাং চৈতন্যের জন্মস্থানের স্থিতি সম্বন্ধে হাণ্টারের লিখিত জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া আরও প্রাচীনতর প্রমাণ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলীতে, কাশীমবাজারে এবং রাজমহলে কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হেজেস্ (William Hedges) বাঙ্গালায় কোম্পানীর এজেণ্ট এবং গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ১৬৮৭ সাল পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হেজেসের ডায়েরী (Diary) মুদ্রিত হইয়াছে। ১৬৮২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কাশীমবাজার হইতে জলপথে হুগলী যাওয়ার বিবরণে হেজেস্ লিখিয়াছেন :—

"December 27—We lay at Nuddia in Ye point of Cassumbazar Island, and after our

* The Journal of Major James Rennell (1764—1767). Edited by T. D. H. La Touche, Memoirs of the A. S. B. Vol. III, Page 11.



জেনারেল হার্ষ্ট সাহেবের প্রকাশিত রেনেলের ম্যাপ

boatmen had eat n, rowed all night, and Ye next morning by 2 O'cl ck wer past Sanctarpoor Santipur)".

১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে হেজেস্ জলপথে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। এই যাত্রার প্রসঙ্গে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিত হইয়াছে—

"April 12—We got as high as Nuddia, in Cassumbazar River, by 8 O'cl ck in Ye morning, and lay Ye night at a place called Goalparra."

রেনেলের মত হেজেস্ও কাশীমবাজারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গা কাশীমবাজার নদী নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। হেজেসের কথিত কাশীমবাজার দ্বীপ অর্থ গঙ্গার অন্তর্গত দ্বীপ। হেজেস্ এই দ্বীপের কোণে, গঙ্গার তীরে নবদ্বীপ অবস্থিত দেখিয়াছিলেন। রেনেল এই দ্বীপের যে আকার দেখিয়াছিলেন, হেজেসের সময় ইহার আকার বোধ হয় অন্যরূপ ছিল। এই সময়ের নবদ্বীপের বিবরণ সার ষ্ট্রেন্সাম্ মাষ্টারের (Sir Streynsham Master) ডায়েরীতেও পাওয়া যায়। ষ্ট্রেন্সাম্ মাষ্টার ১৬৭৬ সালে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কোম্পানীর কারবারের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সালের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী হইতে নৌকাযোগে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। তাঁহার ডায়েরীতে লিখিত আছে—

"September 20—At noone we came to Nuddea (Nadia) where there is an ancient college of the Bramans. There we dined. About three O'clock sett forward againe and rowed until 10 at ight and then rested."

তিন বৎসর পরে আবার ষ্ট্রেন্সাম্ মাষ্টার হুগলী হইতে কাশীমবাজার গিয়াছিলেন। এই যাত্রা প্রসঙ্গে ডায়েরীতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :—

"4th November :—In the evening we met the Cassumbazar Budgera near Amboa, which we passed by, and laid too to eat at Hur Nuddy (Nadia) a small towne"

পরলোকগত সার রিচার্ড কার্নাক্ টেম্পল্ (Sir Richard Carnac Temple) টীকা টীপ্পনি সহ ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টারের ডায়েরী প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি "হার" শব্দটী মাঠ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এখানে "হার" শব্দ ভুলক্রমে "চর" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে "চর" পাঠ করিলে ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টারের বিবরণের সহিত হেজেসের বিবরণের একবাক্যতা সাধিত হইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গঙ্গার একটী দ্বীপের ঠোঁটায় নবদ্বীপ নামক ক্ষুদ্র সহর অবস্থিত ছিল। রেনেলের সময়ের নবদ্বীপও একটী দ্বীপের ঠোঁটায় অবস্থিত ছিল। কিন্তু সে ছিল দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব ঠোঁটায় জলঙ্গীর তীরে, গঙ্গার তীরে নহে; আর হেজেসের সময়ে ছিল বোধ হয় একটী চরের উত্তর-পশ্চিম ঠোঁটায়, গঙ্গার তীরে। এই স্থান পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা বৃথা। হেজেসের এবং ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টারের সময়ে বাঙ্গালার নবাব নাজিম ছিলেন সায়েস্তা খাঁ। তখন বাঙ্গালায় কোম্পানীর কোন এলাকা ছিল না এবং সেই এলাকার জরীপ জমাবন্দীও হয় নাই। সে আমলে পাটনা, রাজমহল, কাশীমবাজার ও হুগলী হইতে বঙ্গোপসাগরে কোম্পানীর মাল বোঝাই নৌকার যাতায়াত ছিল বলিয়া নৌকার মাঝিদিগের সুবিধার জন্য গঙ্গার চার্ট (Chart) বা নক্সা করা হইত। এই সকল চার্ট (Chart) এবং তৎকালে প্রচলিত ম্যাপ অবলম্বনে ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টারের ডায়েরীর প্রকাশক টেম্পল্ সাহেব একখানি ম্যাপ প্রস্তুত করিয়া ডায়েরীর সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। এই ম্যাপে দেখা যাইবে নদীয়া জলঙ্গী এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। এই ম্যাপ পরিসরে ক্ষুদ্র। এই ম্যাপে কোন দ্বীপ দেখান হয় নাই। কিন্তু দ্বীপের কথা যখন হেজেস্ স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন তখন মনে করিতে হইবে নবদ্বীপের পূর্ব্বদিক্ দিয়া জলঙ্গীর একটী শাখা তখনও প্রবাহিত ছিল, এবং এই নিমিত্তই সেই কালের নবদ্বীপ একটী দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টারের ডায়েরী ছাড়িয়া প্রাচীনতর সময়ের নবদ্বীপের পথে আমরা আর কোন পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শকের সন্ধান পাই না। কিন্তু পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শক, যে আর নাই এমন কথা বলা যায় না। সেই আমলে হুগলীতে এবং কাশীমবাজারে ডচ্ বণিকদিগেরও কুঠী ছিল। সুতরাং ডচ্ কোম্পানীর কাগজ পত্রে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহার শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বাবধি পর্টুগিজ বণিকগণ গঙ্গার পথে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া-

ছিলেন। ডুবেরোজ নামক একজন পর্টুগিজ ঐতিহাসিক ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত বাঙ্গালা দেশের একখানি ম্যাপও প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। ডুবেরোজ কখনও বাঙ্গালা দেশে পদার্পণ করেন নাই। দপ্তরের কাগজপত্র এবং নক্সা দেখিয়াই অবশ্য এই ম্যাপ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। এই ম্যাপে গঙ্গার খাত অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু নবদ্বীপের



টেম্পল সাহেবের ম্যাপ

অবস্থান চিহ্নিত হয় নাই। এই ম্যাপ আয়তনেও ক্ষুদ্র। কিন্তু যে মূল কাগজ পত্র এবং নক্সা অবলম্বন করিয়া ডুবেরোজ এই ম্যাপ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, সেই সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করিলে শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসময়ের নবদ্বীপের স্থিতি সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু এই সকল অপ্রকাশিত প্রমাণ ব্যতিরেকেও ষ্ট্রান্সাম্ মাষ্টার ও হেজেসের বিবরণ এবং তৎকালের মানচিত্র স্মরণ রাখিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবতে" নিবদ্ধ প্রমাণ আলোচনা করিলে চৈতন্যদেবের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান নিরূপণ করা অসাধ্য নহে। এখন জিজ্ঞাস্য, "চৈতন্যভাগবত" কোন্ সময় রচিত হইয়াছিল? ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসে, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পূর্ব্বাশ্রমে বিশ্বম্ভর এবং নিমাই নামে পরিচিত চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ১৮ বৎসর বয়সে গয়াধামে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বৃন্দাবনদাসের ভাবী গর্ভধারিণী নারায়ণীর বয়স মাত্র ৪ বৎসর ছিল। নারায়ণীকে কৃপা করিবার পরে চৈতন্যদেব ৩০ বৎসর কাল, অর্থাৎ ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ জগতে ছিলেন, কিন্তু ১৫১১ খৃষ্টাব্দের পরে আর কখনও গৌড়ে (বাঙ্গালায়) পদার্পণ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে "চৈতন্যভাগবত" নামে পরিচিত "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য-চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

(আদি ১।৮০)

নিত্যানন্দ যখন বৃন্দাবনদাসকে চৈতন্য-চরিত লিখিবার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন তখন অবশ্য বৃন্দাবনদাস প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিত্যানন্দের জীবদ্দশায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন তিনি অবশ্য

চৈতন্যের জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঠিক চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের সহিত বৃন্দাবনদাসের পরিচয় থাকা অসম্ভাবিত নহে। কবিকর্ণপূর "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"র একটী শ্লোকে বলিয়াছেন—

"বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা"

"যিনি বেদব্যাস ছিলেন তিনি এখন বৃন্দাবনদাস।"

"চৈতন্যচরিতামৃতে" (আদি ১১।৫৫) এই কথার তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। যথা—

"ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥"

"চৈতন্য-মঙ্গল" বা "চৈতন্যভাগবত" রচনা করিয়া বৃন্দাবনদাস চৈতন্য-লীলার বেদব্যাস বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সুতবাং মনে করিতে হইবে কবিকর্ণপুরের "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" রচনার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবত" ভক্ত সমাজে আদর লাভ করিয়াছিল, এবং গ্রন্থকার বেদব্যাসের অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং "চৈতন্যভাগবত" "গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কবিকর্ণপুর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক সমাপ্ত করিয়াছিলেন। "চৈতন্যভাগবত" ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল এইরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

"চৈতন্যভাগবতে"র উপাদান সংগ্রহ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে।
তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥ (আঃ ১।৮৪)

বৃন্দাবনদাস অনেক চৈতন্যকথা বোধ হয় নিত্যানন্দ প্রভুর নিকটও শুনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"আর কত লীলারস হইল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দস্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে।
কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে॥"

বৃন্দাবনদাসের পূর্ব্বে রচিত চৈতন্যের পার্ষদ মুরারিগুপ্তের এবং দামোদরের কড়চা বা সংক্ষিপ্ত চরিত-কথা দেখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-মঙ্গল" বা "চৈতন্যভাগবতের" প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং নিজের মহান্ গ্রন্থকে "চৈতন্যমঙ্গলের" পরিশিষ্ট মাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর চিরতরে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পর বৎসর রামকেলি যাইবার পথে নবদ্বীপ সন্নিকটস্থ গঙ্গার অপর (পশ্চিম) পারে কুলিয়া গ্রামে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। তারপর আর কখনও তিনি এদিকে আসেন নাই। চৈতন্যের নবদ্বীপ ত্যাগের পরে, এবং "চৈতন্যভাগবত" রচনার পূর্ব্বে, কখনও যে নবদ্বীপ অঞ্চলে গুরুতর নদীভাঙ্গন ঘটিয়াছিল এমন কথা বৃন্দাবনদাস লেখেন নাই। সুতরাং মনে করিতে হইবে, "চৈতন্যভাগবতের" রচনা কাল পর্য্যন্ত নিমাইর নবদ্বীপ অটুট ছিল। "চৈতন্যভাগবতে" এই নবদ্বীপের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

চৈতন্যভাগবতের নানা অংশে চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল অংশের মৌলিক পাঠ উদ্ধারের জন্য আমি গৌড়ীয়মঠের প্রকাশিত চৈতন্যভাগবতের সহিত একখানি হস্ত-লিখিত চৈতন্যভাগবতের পাঠ মিলাইয়া লইয়াছি। এই পুঁথিখানি আমার ছাত্র শ্রীমান্ অচ্যুতকুমার মিত্রের নিকট পাইয়াছি। এই পুস্তকের শেষে লিপিকাল এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

"শুভমস্তঃ শকাব্দ॥ ১৭'৪ মাহ ভাদ্রপদং॥"
শন ১২৩৯।১৮

লিখিতং শ্রীপরমানন্দ মীত্র দাস
শাং জেজুর"

মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এই পুঁথির পাঠের বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই। মুদ্রিত পুস্তকের স্থানে স্থানে বানান সংশোধিত হইয়াছে। প্রাচীন ধরণে লিখিত জেজুরের পুঁথি হইতেই চৈতন্যভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিব।

"চৈতন্যভাগবতের মধ্য খণ্ডের ২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত কাজিদলনের জন্য আরব্ধ নগর-কীর্ত্তনের বিবরণে সে কালের নবদ্বীপ নগরের একটী চিত্র পাওয়া যায়। নবদ্বীপের "কাজি" কীর্ত্তনের বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিমাই নিত্যানন্দকে বলিলেন—

"সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন"। (মধ্য ২৩।১২১)

সংকীর্ত্তনের দল লইয়া সন্ধ্যার পর নগর কীর্ত্তনে

বাহির হইয়া নিমাই কোন্ কোন্ পথে "সর্ব্ব নবদ্বীপ" প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন বৃন্দাবনদাস তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

"ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোকে ধায়॥

* * * *

হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখ নবদ্বীপে।
নাচিয়ে জায়েন সভে গঙ্গার সমীপে॥

* * * *

গঙ্গাতীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র পরিষদে নাচি যায়॥

* * * *

এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সভার সহিত আইসেন গঙ্গা পথে॥

* * * *

নাচে বিশ্বম্ভর সভাব ঈশ্বর
ভাগীরথী তীরে তীরে।

* * * *

গঙ্গাতীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি জায় গৌর রায়॥
(১) আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
(২) তবে মাধাইর ঘাটে গেলা গৌর হরি॥
(৩) বারকোণা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া। (৪)
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া॥

* * * *

নদীয়ার একান্তে নগর সিমলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥

* * * *

কাজির বাড়ীর পথ ধরিল ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥

* * * *

সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥

* * * *

আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥"

এই বিবরণে দেখা যাইবে নিমাইর বাড়ী হইতে সংকীর্ত্তন যাত্রা করিয়াছিল, এবং এই নিজের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাটে পহুঁছিয়া গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া কীর্ত্তনিয়াগণ গঙ্গানগর উপনীত হইয়াছিল। আপনার ঘাটের এবং গঙ্গা নগরের মধ্যে কীর্ত্তনিয়াগণকে আরও তিনটি ঘাট অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। গঙ্গানগর পহুঁছিয়া কীর্ত্তনিয়াগণ গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গঙ্গানগরের ভিতর দিয়া এবং নবদ্বীপের সীমান্তবর্ত্তী সিমলিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া কাজির বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাস কাজির বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় নগরের অপর ভাগে ভ্রমণের এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেন :—

"কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে হরিবোলে জায়েন নাচিয়া॥

* * * *

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ বণিক নগর॥
শঙ্খ বণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ
হরিবলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥

* * * *

এই মত সকল নগর শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি জয় কোলাহল।
তন্তুবায় সব হইলা আনন্দে বিহ্বল॥

* * * *

সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধর বাসার।
উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাহার দুয়ার॥

* * * *

জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥

* * * *

সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদি গাছা পার ডাঙ্গা মাজিদা (১) দিয়া জায়॥"

---

(১) জেজুরের পুঁথিতে "মাজিদা দিয়া" স্থানে "আদ দিয়া" পাঠ আছে

নবদ্বীপ থানার এলাকার আধুনিক ম্যাপে দেখা যাইবে ১২৯নং মৌজার নাম গঙ্গানগর। এই গঙ্গানগরের ঠিক উত্তর-পূর্ব্বদিকে বামনপুকুর নামক গ্রাম। এই বামনপুকুর গ্রামের মধ্যেই কাজির বাড়ীর সম্মুখে অবস্থিত একটি মুসলমানের সমাধি চৈতন্যের সময়ের কাজির সমাধি বলিয়া পূজিত। সুতরাং বর্ত্তমান বামনপুকুর গ্রামের প্রান্তকে চৈতন্যের সময়ের সিমলিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বামনপুকুর বা সিমলিয়া ছিল চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের উত্তরসীমা। নিমাইর নগর-কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস আর যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছেন তন্মধ্যে আরও দুইটি, গাদিগাছা এবং মাজিদা বা মাজিদিয়া, এখনও বর্ত্তমান আছে। এই থানার ম্যাপে দুইটি গাদিগাছার নাম দেখা যায়। একটি গাদিগাছা-বালিচর নামে পরিচিত ১৭১নং মৌজা। এই মৌজা বর্ত্তমান পশ্চিম বাহিনী জলঙ্গীর তীরে অবস্থিত। এই গাদিগাছা-বালিচরের দক্ষিণে জলঙ্গীর দক্ষিণ পারে ১৭২নং মৌজা মহেশগঞ্জ। মহেশগঞ্জের দক্ষিণে ১৭৩নং মৌজা গাদিগাছা। এই দ্বিতীয় গাদিগাছার দক্ষিণে ১৭৪নং মৌজা মাজিদহ বা মাজিদা। চৈতন্যভাগবতের মতে চৈতন্যের সময়ে উত্তরে সিমলিয়া বামনপুকুর হইতে দক্ষিণে মাজদহ পর্য্যন্ত অখণ্ড 'সর্ব্ব নবদ্বীপনগর' বিস্তৃত ছিল। এই নগরের উত্তরপ্রান্তস্থ বামনপুকুর গঙ্গার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূভাগের অন্তর্গত, এবং দক্ষিণপ্রান্তস্থ গাদিগাছা এবং মাজিদাও গঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। প্রভুর ঘাটের নিকটবর্ত্তী নিমাইর বাড়ী এই দুই সীমার মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

এখন জিজ্ঞাস্য, গঙ্গা কি চৈতন্যের সময়ে গঙ্গানগর হইতে মাজিদা পর্য্যন্ত বরাবর দক্ষিণবাহিনী ছিল, না, গঙ্গানগর হইতে পশ্চিমমুখী হইয়া বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) মৌজার উত্তর দিয়া ঘুরিয়া, বর্ত্তমান নবদ্বীপের পশ্চিম দিক্ দিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া গাদিগাছার বা মাজিদার নিকট বর্ত্তমান দক্ষিণমুখী খাতে পড়িয়াছিল? চৈতন্যভাগবতে আছে প্রভুর ঘাটের এবং গঙ্গানগরের মধ্যে আরও তিনটি ঘাট,—মাধাইর ঘাট, বারকোনা ঘাট, এবং নগরিয়া ঘাট অবস্থিত ছিল। বহু জনপূর্ণ নগরে এবং গ্রামেও নদীর ঘাটগুলি কাছাকাছি হইয়া থাকে। সুতরাং গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণে চতুর্থ ঘাটের নিকট অবস্থিত মহাপ্রভুর বাড়া গঙ্গানগর হইতে আধ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত ছিল এরূপ অনুমান করা অসাধ্য। গঙ্গানগর হইতে বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ (রামচন্দ্রপুর) প্রায় ৪ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত। যদি বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জকে (রামচন্দ্রপুরকে) চৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুমান করিতে হয় চৈতন্যের সময়ে বহু জনপূর্ণ নবদ্বীপনগরের গঙ্গার ঘাটগুলি এক এক মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচার-সঙ্গত নহে। প্রভুর ঘাট এবং বাড়ী গঙ্গানগরের নিকটতর স্থানে অবস্থিত ছিল ইহাই মনে করিতে হইবে। চৈতন্যের সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলি যে খুব কাছাকাছি ছিল "চৈতন্য-ভাবগতে" তাহার অন্য প্রমাণও আছে। যথা, অধ্যয়ন-লীলা প্রসঙ্গে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :—

"পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এই মত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥ ৫০।
প্রতি ঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঁই ঠাঁই॥ ৫১।
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥ ৫২।"

গঙ্গানগর হইতে গঙ্গা যে সোজাসুজি দক্ষিণ বাহিনী ছিলেন এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রেনেলের ম্যাপে চিহ্নিত নবদ্বীপ হইতে তদানীন্তন গঙ্গা পশ্চিমদিকে প্রায় ৩ মাইল ব্যবধানে প্রবাহিত দেখা যায়। বর্ত্তমানে গঙ্গানগরের ঠিক পশ্চিমে ১৩০নং মৌজা ভারুইডাঙ্গা অবস্থিত। রেনেলের ম্যাপে জলঙ্গীর পশ্চিম বাহিনী খাতের উত্তর দিকে বরাডাঙ্গা গ্রাম চিহ্নিত হইয়াছে। এই বরাডাঙ্গাই বর্ত্তমানে ভারুইডাঙ্গা নামে পরিচিত। রেনেলের চিহ্নিত নবদ্বীপ বরাডাঙ্গার বরাবর একটু পূর্ব্ব দক্ষিণে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই বরাডাঙ্গা (ভরাডাঙ্গা) নাম হইতে বুঝা যায় যে গঙ্গা পশ্চিমদিকে সরিয়া যাওয়ায় নদীভরাটে এই ডাঙ্গার বা শুষ্ক ভূমির সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং রেনেলের সময়ে গঙ্গা অনেক পশ্চিমদিকে সরিয়া গিয়া থাকিলেও এক সময়ে যে গঙ্গা গঙ্গানগর হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকেই প্রবাহিত হইত রেনেলের ম্যাপের বরাডাঙ্গা এবং নবদ্বীপ তাহা সপ্রমাণ করে। এই সিদ্ধান্তের আর এক প্রমাণ ট্রেন্‌সাম্ মাষ্টারের ডায়েরীর সহিত প্রকাশিত

ম্যাপ। এই ম্যাপে নবদ্বীপ গঙ্গা-জলঙ্গী সঙ্গমে গঙ্গার পূর্ব্বতীরেই অবস্থিত। এই সকল ম্যাপের হিসাবে বৃন্দাবন দাসের বিবরণ বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে, চৈতন্যের সময়ে গঙ্গা নবদ্বীপের উত্তরভাগস্থ গঙ্গানগর হইতে দক্ষিণপ্রান্তস্থ মাজিদা পর্য্যন্ত দক্ষিণবাহিনী ছিল। গঙ্গানগর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জকে এই সীমার অন্তর্ভুক্ত করা অসাধ্য।

উপরে লিখিত হইয়াছে সিমুলিয়া হইতে মাজিদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নবদ্বীপ একটী অখণ্ড নগর ছিল। ইহার ভিতর দিয়া কোন নদী প্রবাহিত হইয়া এই স্থানকে তখন খণ্ডিত করে নাই। তবে জলঙ্গী তখন কোথায় ছিল? বৃন্দাবনদাস তাহারও সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ১৫১১ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য পুরী হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলে শচীমাতা এবং নবদ্বীপের অন্যান্য ভক্তগণকে সংবাদ দিবার জন্য নিত্যানন্দ ঠাকুর নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে চৈতন্য হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ফুলিয়া গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং চৈতন্যের আগমনের সংবাদ পাইয়া নিত্যানন্দের সঙ্গে নবদ্বীপবাসীরা ফুলিয়া চলিলেন। বৃন্দাবনদাস ফুলিয়া যাত্রা-প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন (অন্ত্য ১।১৮৫-১৯৬) ;—

"ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সর্ব্বলোক হর্ষ হঞা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সভে বলি হরি হরি॥

*　　*　　*　　*

এই মত বলি লোক মহানন্দে ধায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে জায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
কেহো বান্ধে ভেলা কেহো ঘট বুকে করে।
কেহো বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যে মতে পারে সেই মতে পার হয়॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
কথোদূর গিয়া মাত্র নৌকাডুবি পড়ে॥
তথাপিও চিত্তে কেহো বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্বলোক হরিবোলে উচ্চৈস্বরে॥
যে না জানে সাঁতারিতে সেহো ভাসে সুখে।
ঈশ্বর প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে॥
কত দিগে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরিধ্বনি॥
এই মতে আনন্দে চলিলা সর্ব্বলোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহকর্ম্ম শোক॥
আইলা সকল লোক ফুলিয়া নগরে।"

নবদ্বীপবাসী দলে দলে খেয়াঘাটে আসিয়া এই যে নদী পার হইলেন এই নদী কোন্ নদী? এই নদী যদি গঙ্গা হইত, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর উহা উল্লেখ করিতে কখনও ভুলিতেন না। সুতরাং এই নদী যে জলঙ্গী এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবদ্বীপ হইতে জলঙ্গীর খেয়াঘাটে পৌছিতে খানিকটা পথও যে অতিক্রম করিতে হইত বৃন্দাবনদাস ইঙ্গিতে এ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং মনে করিতে হইবে চৈতন্যের সময়ে এবং বৃন্দাবন দাসের সময়ে জলঙ্গী মাজিদহের দক্ষিণে কোন স্থানে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে খেয়া নৌকায় এবং অন্যান্য নানা উপায়ে জলঙ্গী পার হইয়া শান্তিপুর ফুলিয়ায় যাইতে হইয়াছিল। নবদ্বীপ তখনও অবশ্য দ্বীপের উপরই অবস্থিত ছিল। নবদ্বীপ নগর হয়ত তখন সমস্ত দ্বীপ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। পশ্চিমে গঙ্গা,—পূর্ব্বে দক্ষিণবাহিনী জলঙ্গী মাত্র থাকিলে অবশ্য দ্বীপ নামে কথিত হইত না। চৈতন্যের সময়ে সিমলিয়ার (বামনপুকুরের) উত্তরে বোধ হয় জলঙ্গীর পশ্চিমবাহিনী আর একটা শাখা ছিল। বামনপুকুরের খানিকটা উত্তরে এইরূপ শাখার খাত এখনও বর্ত্তমান আছে। জলঙ্গীর এই শাখার খাত দক্ষিণে সরিয়া আসায় চৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপ প্রথমে দ্বিখণ্ডিত এবং পরে তাহার মধ্যভাগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। উত্তরে গঙ্গানগরের এবং দক্ষিণে গাদিগাছা ও মাজিদার অবস্থিতি এই কথার সাক্ষ্য দান করিতেছে।



পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

(৮)

"আচ্ছা, আপনি আমার জন্যে এত কষ্ট করতে যান কেন?" রুটির প্লেটে খানিকটা মার্ম্মালেড্ চামচে করিয়া ঢালিয়া লইতে লইতে সুবোধ কহিল। একটু দূরে দাঁড়াইয়া শিশির চায়ের সরঞ্জাম সুমুখে লইয়া টি-পটে গরম জল ঢালিতেছিল।

সে তেমনি নত মুখেই কহিল, "আপনি যত কষ্ট করে অবিশ্রান্ত রোগীর সেবা ক'রচেন, তাতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার এটুকু ব্যবস্থা না করতে পারলে, আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা কোথায় থাকে বলুন তো?"

সুবোধ ঈষৎ হাস্যমুখে বলিল, "ও, তাহলে এটা আমার কাজের প্রতিদান। অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য। নয়?"

শিশির কোন উত্তর দিতে না পারিয়া তাহার রক্তিম মুখ আরও নত করিল। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সুবোধের খাওয়া দাওয়া শোওয়া-ব'সার এতটুকু ত্রুটি সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টি যে এত সতর্ক, এমন যক্ষের মত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মধ্যে কর্ত্তব্যের নিশানদিহী ছাড়া আরও কোন ব্যাকুলতা আছে।

চা ঢালিয়া দিয়া এবং খাবারের আরও দুই চারিটা পাত্র তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া শিশির কোন এক সময়ে নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বিকালের আলো অন্তঃপুরের আঙ্গিনার এক কোণে আসিয়া পড়িয়াছিল। হাস্নাহানার ঝাড় ছাদের আলিসার নিকট হাওয়ায় দুলিতেছিল। শিশির স্তব্ধভাবে কতক্ষণ প্রকৃতির সেই মধুর শান্ত রূপের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আকাশের ওই কোমল ম্লান আলো তাহার মনকে আশ্চর্য্যভাবে নাড়া দিতে লাগিল। তাহার হৃদয় মন যেন কতদিনের সুপ্তির পর জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের আকাশ বাতাস আলো সমস্তকেই সে বিস্ফারিত হৃদয়ে স্পর্শ করিতেছে। কোন কিছু হইতেই নিজেকে আজ দূরে সরাইয়া রাখিবার, পরের মত পাশ কাটাইয়া যাইবার ক্ষমতা তাহার নাই। পিসে মশায়ের ঘরের পর্দ্দাটা হাওয়ায় অল্প অল্প নড়িতেছে, সেইদিকে তাকাইবামাত্র তাহার মনটা দুলিয়া উঠিল। ওই ঘরে ওই পর্দ্দার পাশে বসিয়া তিনি কত রাত্রি পিসেমশায়ের শিয়রের কাছে বসিয়া রাত্রি জাগিয়াছেন। রান্নাঘরের কাতি ঝি সামনে দিয়া একরাশ মাজা বাসন লইয়া গেল এবং গোলক চাকরটা প্রতিদিনের মত তাহার মলিন উত্তরীয়-খানা গায়ে জড়াইয়া ঘরে ঘরে ঝাঁট দিয়া বেড়াইতেছিল। অন্য সময়ে দৈনন্দিন সংসারযাত্রার এই সকল পরম তুচ্ছ কাজ কর্ম্ম শিশিরের কাছে নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইয়াছে, কিন্তু আজ সে এই সমস্ত দৃশ্যকেই হৃদয়ের করুণা এবং মনের অন্তর্দ্দৃষ্টি লইয়া দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিদিনের এই সকল অভ্যস্ত সাধারণ দৃশ্যের মাঝেও অনেক দেখিবার, অনেক কিছু অনুভব করিবার আছে। তাহাদের ভৃত্য গোলকের সেবাপরায়ণ সহিষ্ণু মুখচ্ছবি, এবং কুণ্ঠিত ত্রস্ত পদক্ষেপের মধ্যে সে একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমার আভাস দেখিতে পাইল। যাহাদের আমরা বেতনের টাকা বলিয়া গুটি দুই চারি মুদ্রা দেওয়া ছাড়া আর কোন ভাবেই কিছু দিইনা, আমাদের সেই সব উপেক্ষা সহ্য করিয়াও প্রতিদিনের এই নম্র নির্ব্বাক সেবার মধ্যে তাহারা নিজেদের কতখানি কেমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছে, সে কথা যেন সে অকস্মাৎ উপলব্ধি করিতে

পারিল। তাহার অনুভবের তীক্ষ্ণতা, তাহার চেতনার জাগ্রত সীমা আজ যেন বহু বহু দূর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। চেতনার সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ যে আনন্দের প্লাবনে কবি একদা গাহিয়াছিলেন—

"আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান।
না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।"

ঠিক সেই রকম করিয়াই প্রথম প্রেমের দুঃসহ অভিঘাতে শিশিরের জীবনের দুই কূল ছাপিয়া যেন আনন্দের বন্যা ছুটিয়া চলিল। কিন্তু সে কবি নয়, তাই কথা দিয়া ইহাকে প্রকাশ করিতে পারিল না। কেবল তাহারই জীবনের মধ্য দিয়া তাহার সখী, তাহার আত্মীয়-স্বজন, স্নেহের পরিজনেরা ইহার স্পর্শ পাইতে লাগিলেন। এতদিন অবধি কেবল কলেজের পড়া তৈয়ারী করিয়া তাহার শরীরে যে কৃশতা এবং মুখমণ্ডলে লাবণ্যের যে অভাব ঘটিয়াছিল, আজ দেখিতে দেখিতে কখন তাহার পরিবর্ত্তে সুকুমার ললাটে সলজ্জ ছায়া এবং অধরোষ্ঠে মাধুর্য্যের সরসতা ঘনাইয়া আসিল। তাহার চলা ফেরা, ওঠা বসা, কাজ কর্ম্ম সমস্তই হৃদয়ের নিগূঢ় আভায় অপরূপ হইয়া উঠিল। স্বামী এখন অনেকটা ভালো আছেন বলিয়া ইন্দুমতী পুনরায় তাঁহার ব্লাউসের ছাঁট এবং মুখের ক্রীম লইয়া সবেমাত্র গবেষণা সুরু করিয়াছিলেন। তিনি শিশিরের পানে চাহিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, কমলালেবুর খোসা এবং সাদা সরিষা না মাখিয়াও মেয়েটার শ্রী দিব্য হইয়াছে; আগের চেয়ে যেন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে।

শিশিরের সখী মাধবী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তোকে দেখতে আজকাল এত ভালো লাগে শিশির, যে কী বলবো। কী হয়েচে বল্ দেখি?"

শিশির কহিল, "হবে আবার কী?"

"যেন সত্যি কিছু হয় নি। সেই যে তোদের বাড়ীতে আমি সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলুম, সন্ধ্যেবেলায় তুই সেই গানটা গাইলি,—'এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!' অমন করে গান করতেও তোকে এর আগে কখনো শুনি নি।"

মাধবীর কথার কোন উত্তর না দিয়া শিশির অন্যমনস্ক হইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল,—

"এ কি আকুলতা ভুবনে! এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির রস রাশি আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
এ কি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্ব জগৎ জন জাগে,
আজি নিখিল নীল গগনে সুখ পরশ কোথা হতে লাগে!"

মাধবী কিছু কাল স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, শিশির যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা এমনি করিয়া গানের সুরের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা যায়, অপর কোন ভাবে বলা যায় না।

(৯)

শিশিরের মানসিক জগতের এই আনন্দোচ্ছল হাওয়া অপর সকলকেই স্পর্শ করিয়াছিল—শুধু কি সুবোধকেই করে নাই? করিয়াছিল। কিন্তু সে স্বভাবতঃই অত্যন্ত চাপা। নিজেকে লইয়া নিজের মনে থাকাই তাহার অভ্যাস। সকলের নিকট হইতে নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতে রাখিতে তাহার এমনই হইয়াছে যে, এখন আর তাহাকে চেষ্টাও করিতে হয়না। মনের মধ্যে যাহাই থাক, উপরে ধীর স্থির অচঞ্চলতার এতটুকু ব্যতিক্রম হয়না। আকাশের চাঁদকে লক্ষ্য করিয়া সমুদ্র যেমন জোয়ারের জলে স্ফীত হইয়া উঠে, অনেক দূর হইতে সঙ্গোপনে তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন দিনের আলো সেই সবেমাত্র শেষ হইয়াছে, সন্ধ্যা হয়তো ঠিক তখনও সুরু হয় নাই। শিশির নিত্যকার মত বাগানে বেড়াইতেছিল। যেখানে চন্দ্রমল্লিকার টব সারি সারি সাজান আছে, সেইখানে আসিয়া পৌঁছিতেই দেখিল, একটা কাঠের বেঞ্চিতে সুবোধ বসিয়া আছে। পাশে কি একখানা বই রাখা। হয়তো পড়িতেছিল, আলো কমিয়া আসাতে পাশে রাখিয়া দিয়াছে। দু'জনেই দু'জনকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইল, সুখী হইল।

"কী পড়চেন?"

"রবীন্দ্রনাথের বাঁশরী"

"কী মনে হ'ল আপনার ?"

"সকলে যা মনে করে তা নয়।"

"তার মানে ?"

"অতি-আধুনিকতার বিরুদ্ধে তিনি কোথাও কিছু বলেছেন কি না জানিনে, কিন্তু যা বলেছেন সেটা চিরন্তন অসৌন্দর্য্য এবং নোঙরামির বিরুদ্ধে।"

"তা, শুধু বাঁশরী কেন, সে তো তিনি সব লেখাতেই বলেচেন।"

"হ্যাঁ, দেখুন, কল্পনার মহত্ত্ব এবং বিশালতা আর শক্তি থাকলে যা নিয়ে মানুষ স্বভাবতঃই আত্মহারা হয়, কেন্দ্রচ্যুত হয়ে পড়ে, তেমন বস্তু থেকেও সুবিমল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। রবীন্দ্রনাথেরই 'বিজয়িনী'র মত কবিতা মনে করুন, মনে করুন তাঁর সেই ধরণের সব কবিতা 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।" কোথাও কি মন এতটুকু বাধা পায় ?"

শিশির কোন উত্তর দিতে পারিলনা। উত্তর দিবে কি, সমস্ত কথা তাহার ভালো করিয়া মনেও থাকিতেছিলনা। যে কথা বলিতেছে তাহার মৃদু গম্ভীর কোমল কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। সমস্ত চেতনা অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

"কী ভাবচেন ?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুবোধ পুনরায় কহিল, "আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার ভারি আনন্দ হয়। এত গভীর ভাবে অনুভব করতে, আর সমস্ত কথাই এমন করে বুঝতে আমি আর কাউকে দেখিনি।"

আনন্দের প্রবলতায় শিশিরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তার মানে আমার বুঝবার ক্ষমতা নয়,—আপনি সাধারণতঃ কারো সঙ্গে মেশেননা, তাই যার সঙ্গে মিশছেন তাকেই ভালো লাগছে।"

"হবে।"

"ও কি, হাসচেন যে !"

"আপনার বিনয়ের বহর দেখে। না না, রাগ করবেন না যেন। যাক্ ও সব কথা। কিন্তু বুদ্ধি করে এমন সুন্দর বাগানখানি কি করে তৈরী করলেন বলুন দেখি ? কাল আপনার মা'র কাছে শুনছিলুম এ সমস্তই আপনার হাতের সৃষ্টি। এখানে এ'লে আমি ভারি আশ্রয় পাই। এই সমস্ত গাছপালার মধ্যে ব'সে থাকতে এত ভালো লাগে।"

"ভালো কেন লাগবেনা ? সারাদিন রোগীর ঘরে বসে থাকেন। সমস্ত দিন বন্ধ ঘরে থেকে তার পরে খোলা হাওয়া তো ভালো লাগবেই। আচ্ছা এখন অত পরিশ্রম করেন কেন ? পিসেমশায় ভালো হয়ে এসেচেন। না হয় আপনি একটু বিশ্রাম ক'রলে আমরাও তো খানিকক্ষণ করে থাকতে পারি। আগের থেকেই আমাদের এত অপদার্থ ঠাওরালেন কেন ?"

"সর্ব্বনাশ! আপনাদের অপদার্থ মনে করি এমন কথা কে আপনার মাথায় ঢুকিয়েছে ?"

"অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে ধারণা আপনার তার চেয়ে উচ্চ নয়।"

সুবোধ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা কি, আপনি তা কেমন করে জানবেন ?"

কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। যেন উভয়ের মাঝে সম্ভ্রম এবং সঙ্কোচের যে একখানি আবরণ ছিল, ঈষৎ উতলা বাতাসে তাহার একাংশ অর্দ্ধ-আবরিত হইয়া গেল। সুবোধ একটা জিরেনিয়াম ফুলের পাপ্ড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে হঠাৎ একবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাই। গোটাকতক চিঠি লিখবার ছিল, লিখব লিখব করে হয়ে উঠছেনা, এই সময় লিখে রাখি।"

সুবোধ সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া টেবিলের সম্মুখে আলো লইয়া সবেমাত্র বসিয়াছে, সৌরেনবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

খানিকক্ষণ ক্ষেত্রমোহনের স্বাস্থ্যের কথা, বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির কথা, নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা চলিল। অবশেষে সৌরেন্দ্রমোহন উজ্জ্বল বাতিটার দিকে তাকাইয়া একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "শিশিরকে অনেক সখ ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েচি, এখন শুধু ভাবচি কার হাতে দিতে হবে, হয়তো কত কষ্ট পাবে।"

সুবোধ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। টেবিলের উপর এটা রাখে তো ওটা নাড়ে। একবার একটা কলমদান উল্টাইয়া ফেলিল, ব্লটিং কাগজটা অন্যমনস্ক হইয়া টুকরা টুকরা করিয়া শতছিন্ন করিয়া ফেলিল।

অবশেষে একটু কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমাকে এ সব বলছেন কেন ? আমি কী করতে পারি ?"

"তুমি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করতে পার। তোমার

সত্যকার অভিভাবক কেউ নেই, তাই আমাকে বাধ্য হয়ে কথাটা তোমার কাছেই পাড়তে হ'ল। আমি ইচ্ছা করেচি, শিশিরকে তোমার হাতে দেব। আশা করি এতে তোমার কোন আপত্তি হবেনা।"

সুবোধ প্রথমে যেন কথাটা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিলনা। তাহার পরে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "জানিনা, এ খেয়াল আপনার কেন হয়েচে। কিন্তু আমি কি ওঁর যোগ্য ?"

সৌরেন্দ্রমোহন হাসিয়া কহিলেন, "বাবা, কে কাহার যোগ্য আর কে কাহার নয় সে তো আজ অবধি বিধাতা পুরুষ ঠাহর করতে পারলেননা; তুমি আমি কী করে করি ব'ল ?"

"কিন্তু ওঁর মতামতের কথাটাও আপনাদের ভাবা উচিত। ওঁর নিজের এখন একটা স্বতন্ত্র মতামত এবং বিচারশক্তি জন্মেছে।"

"সে আমি জানি, এবং এ'ও জানি যে শিশিরের মন তোমার প্রতি বিমুখ নয়।"

সুবোধের অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু ভারি ভালোও লাগিতেছিল যেন। কোন মতে সঙ্কোচ কাটাইয়া অতিশয় মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেমন করে জানলেন ?"

"কেমন করে জানলুম ? তুমিও একদিন আমার মত করেই জানতে পারবে, যেদিন মেয়ের বাপ হবে।"

সুবোধের দিশাহারা ভাব দেখিয়া তখনকার মত সৌরেন্দ্রমোহন তাহাকে অব্যাহতি দিলেন।

(১০)

ক্ষেত্রমোহন সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু ইন্দুমতী তাঁহাকে আরও কয়েকদিন আটকাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার জিদ্ যে শিশিরের বিবাহটা দেখিয়া যাইবেন। বাপের বাড়ীর যত বড় আমূল সংস্কারই ঘটিয়া থাক, এবারে আসিয়া প্রথম হইতেই এতবড় অনূঢ়া শিশিরকে তাঁহার অত্যন্ত চোখে লাগিয়াছিল। এই ব্যাপারটাই দিয়াছিল তাঁহার সংস্কারে সবচেয়ে ধাক্কা। তাই প্রথম হইতেই তিনি পণ করিয়াছিলেন, যেমন করিয়া পারেন শিশিরকে পাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা করিবেন শীঘ্রই। অনেকটা তাঁহারই উদ্যোগে এবং চেষ্টায় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি শিশিরের বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গেল।

উদ্যোগ আয়োজন ঘটা-পটা যতদূর হইবার হইল। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ীর বংশে ধনের যে গরিমা ও খ্যাতি আছে, ইন্দুমতী উৎসবের আয়োজনে সর্ব্বত্রই সে কথাটা পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন।

বিবাহের পরদিন দুপুর বেলায় সুবোধ পালঙ্কের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্তই তাহার কেমন অদ্ভুত অপরূপ লাগিতেছে। সে কোথায় ছিল, কতদূরে। কিছুদিন আগে এ সহরের, এ-বাড়ীর, ইঁহাদের নাম অবধি জানিতনা। তখন কে জানিত তাহার এতদিনের স্বপ্ন দিয়া গড়া ধ্যানলোকের মানসী এখানেই আছে; অবশেষে এখানেই তাহার দেখা মিলিবে।

'বি-বা-হ বলিতে হিন্দুসন্তানের কতটা বোঝায়'—সুবোধ তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল, 'অন্য দেশের হাজার রকমে শ্রেষ্ঠ জাতিও তাহার কী বুঝিবে ? বিবাহ নামটার সঙ্গে যে আমাদের কত স্বপ্ন, কত আশা, কত আদর্শ, তাহা কি বোঝান যায় ?'

কিন্তু তাহার চিন্তার তন্ময়তার মাঝে বাধা পড়িল। দরজার বাহিরে খুট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। অলঙ্কারের শিঞ্জন শোনা গেল এবং তাহার সঙ্গে চাপা হাসির সহিত একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি, "আই-এ পাশ কনের আবার অত লজ্জা কী বাপু ? আজ, বিয়ের পরদিন রাত্রি বেলায় কালরাত্রি পড়বে। এই বেলায় একটু দেখা শোনা গল্প-গুজব করে নাওগে।"

সামনের খোলা জানালাটা দিয়া শিশিরদের বাগানের পুষ্পিত মাধবীমঞ্জরী এবং আমের মুকুলে পরিপূর্ণ একটা আম্রবৃক্ষের শাখা নজরে পড়িতেছিল। গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের তপ্ত বাতাসের সঙ্গে একটা সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এই নির্জ্জন মধ্যাহ্নে এই আতপ্ত বাতাস, এইটুকু ফুলের সুগন্ধ, এবং তাহারই সহিত মিশিয়া এই অলঙ্কারের শিঞ্জন, এই চাপা হাসি, এই সরম-সঙ্কুচিত ত্রস্ত পদক্ষেপ সুবোধের কাছে স্বপ্নের মত সুদূর এবং রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এতদিন সে কেবল কাব্যের বই পড়িয়াছে। দেশ-বিদেশের কত শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসাস্বাদ করিয়াছে। 'কিন্তু'—

সুবোধ মনে মনে উতলা এবং পুলকিত হইয়া ভাবিল, 'তাহার সবগুলা একত্র করিয়াও কি জীবনের এমনই সব মুহূর্ত্তের সমান হয় ?'

এসেন্সের এবং মাথাঘষার একটা সুগন্ধ পাওয়া গেল। দরজা বন্ধ হইবার শব্দ হইল। পাশে আসিয়া কে দাঁড়াইয়াছে।

সুবোধ তাড়াতাড়ি পালঙ্ক ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

(১১)

"বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?" পালঙ্কের একটা বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া নত নেত্রে হাতের হীরার বালা খুঁটিতে খুঁটিতে শিশির কহিল।

সুবোধ অবাক হইয়া দেখিতেছিল। সাদা কাপড় পরিয়া স্বল্পাভরণা যে শিশিরকে সে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, যাহার সঙ্গে কত তর্ক, কত কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছে, বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল সদা-সপ্রতিভ সেই শিশিরের সঙ্গে আজিকার এই মূর্ত্তির কতই না প্রভেদ। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন বেলায় এই যে সে ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল,—এ যেন আসা নয়, আবির্ভাব। একটি হাত কেমন করিয়া খাটের বাজুর উপর রাখা, সেই হাতে সুবোধের স্বর্গগতা জননীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ হীরার কঙ্কণ ইন্দুমতী পরাইয়া দিয়াছেন। পরনের ঘন নীল কাপড়ের প্রান্ত পায়ের কাছে কেমন করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে,—এ সমস্ত ছোট-খাট ব্যাপারও স্বভাবতঃ অন্যমনস্ক প্রকৃতির সুবোধের চোখে কী আশ্চর্য্য এবং কী স্পষ্ট রূপেই না পড়িয়াছে।

সসম্ভ্রমে সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'এই যে আমি বসছি। কিন্তু তুমিও বোস। কাল রাত্রি থেকেই খুব শ্রান্ত হয়ে রয়েচ।'

শিশির খাটের এক পাশে ব'সিল। পাশে একখানা হাতপাখা রাখা ছিল, সেখানা তুলিয়া লইয়া নিজেকে হাওয়া করিবার ছলে সে সুবোধের গায়ে মৃদু মৃদু বাতাস দিতে লাগিল। তাহার গায়ে একটা গরদের পাঞ্জাবি ছিল। গরমে কপোলের উপর স্বেদজাল ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"আমাকে বাতাস দিতে হবে না, কোন দরকার নেই।" সুবোধ ক্রমশঃ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল।

"ব্যস্ত হ'য়ো না। তোমার গরম করচে।"

সুবোধ সহসা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "তোমার মুখ থেকে এই যে 'তুমি' শুনলুম, এর পরে আর 'আপনি' কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা।"

শিশির ভারি মধুর একটু হাসিল।

"বলতুমই তো কিছুদিন পরে।"

"সেই কিছুদিন পরে আজ থেকেই সুরু হোক।"

"আচ্ছা গরদের পাঞ্জাবিটা খুলে রাখলেই তো পার। তলায় গেঞ্জি রয়েচে। এত গরমে কী দরকার ?"

সুবোধ চকিত কটাক্ষে তাহার পানে চাহিয়া কহিল, "আর তুমি ?"

"আমি কি ?"

"এই গরমে এত গয়না এত কাপড় !"

"আজ এ-সব পরতে হয়।"

"বাঃ বিধাতার কাছে সাজ করবার পরোয়ানা শুধু কি একলা তোমরাই নিয়ে এসেচ ? আজ আমাকেও নিশ্চয় এই সব পরতে হয়।"

"কী ছেলেমানুষ !"

দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া ফেলিল।

"দেখ, কী আশ্চর্য্য, মনে হচ্ছে শুধু আজই নয়, তুমি যেন চিরকাল আমাকে এমনই শাসন করে এসেচ। আচ্ছা, না হয় পাঞ্জাবিটা খুলেই রাখচি। কিন্তু একটা কাজের কথা শুনবে ?"

"বল।"

"তোমার একটুও আপ্‌শোষ হচ্ছেনা তো ?"

"কিসের জন্যে ?"

"কিসের জন্যে ? তা'ও আবার বলে দিতে হবে ? আমার মত এমন অভাজনের ভার চিরকালের মত হাতে তুলে নিলে ব'লে।"

"দেখ, বিনয়েরও একটা সীমা আছে। সেটাকে ছাড়িয়ে যেও না।"

সুবোধ যেন একটু অন্যমনস্ক, একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "না না, বিনয় নয়। তুমি আমাকে জান না শিশির, নিজেকে নিয়ে আমি এত সঙ্কুচিত যে, তোমার সঙ্গে ছাড়া এ পর্য্যন্ত আর কারো সঙ্গে কখনো ভালো করে মুখ তুলে কথাও বলিনি। এ অবধি যা কিছু কথা বলা সে শুধু বলেচি আমার নিজের সঙ্গেই।"

"কেন, তোমার কেউ বন্ধু ছিলনা ?"

"না। সেই ছোট্ট বয়স থেকে, যখন স্কুলে পড়তুম তখন থেকে আরম্ভ করে কত বছর কেটে গেল, কলেজের সমস্ত পড়া নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু এত দীর্ঘ দিনেও মন খুলে কারও সঙ্গে মিশতে পারলুমনা। লোকে মনে করত, এ বুঝি বড়লোকের ছেলের দম্ভ। কিন্তু বড়লোকের ছেলের তারা কতটুকু জানে ?"

সুবোধের কণ্ঠস্বরে এমন একটা বিদ্ধ বেদনার আভাস ছিল যে, কিছু না জানিয়াও শিশিরের মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। আস্তে আস্তে সে কহিল, "আমি তোমাকে যতটুকু জানি তাতে বড়লোকের ছেলেটির পরিচয় আমিও তো কিছু কিছু পেয়েছি। সেখানে আর কিছু না জেনে থাকি অন্ততঃ এইটুকু জেনেছি তোমার চরিত্রের দীপ্তিতে ধনের কালিমা কোথাও এতটুকু দাগ ফেলেনি।"

"তুমিও আমার অল্পই জান শিশির—" সুবোধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে জন্ম দিয়েই আমার মা মারা গেলেন। আমি যখন ছ'মাসের তখন বাবাও মারা পড়লেন। তাঁদের কথা আমার স্মরণেও নেই। আমার রাশভারি দাদাবাবু বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। সেখান থেকে আমার এক পয়সা লোকসান ঘটল না বটে, কিন্তু হৃদয়ের দিক থেকে আমি চির-উপবাসী থেকে গেলুম। সেই যে কোন স্মরণাতীত শিশুকাল থেকে আমাদের বৃহৎ সংসারের অগণ্য লোকজন, অবিরাম কোলাহলের মাঝে আমি একলা এক পাশে নিজেকে লুকিয়ে ফিরতে লাগলুম, সেদিন থেকে আজ অবধি আমার এমনই করে কাটল। কারো কাছে নিজেকে ধরা দিতে পারলুমনা। আর কেউ আমাকে জোর করে ধরে রাখতেও চাইলেনা।

"তুমি বুঝতেই পারচ শিশির, এমন রুদ্ধ উপবাসে যার এতগুলো বছর কেটে গেছে, তার পক্ষে লোকের কাছে সহজ হওয়া, লোকের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করা কত কঠিন। আমারও হয়েচে তাই।"

স্বামীর পূর্ব্ব-জীবনের ইতিহাস শুনিতে শুনিতে করুণায়, ব্যথায়, স্নেহে শিশিরের মন ছলছল করিতে লাগিল। তবুও সে মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "কই গো, আমি তো কোন জটিলতাই দেখতে পাচ্চিনে। আমি যে মানুষটিকে দিব্য সহজ সরলই দেখচি।"

শিশিরের হাতে তখনও হাত-পাখাটা ধরা ছিল এবং সে মৃদু মৃদু বাতাস দিতেছিল। পাখা শুদ্ধ তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া সুবোধ কহিল "তোমার কথার উত্তর আমি জানিনে। কিন্তু এই যে তুমি ঘরে ঢুকেই আমার সামান্য একটু গরম বোধ করছিল সেটুকুও লক্ষ্য করলে, তখন থেকে বসে বসে বাতাস করচ। এসব কোনদিন অভ্যাস নেই আমার। তোমার কাছে এইটুকু সময়ের মধ্যে যা পেলুম, আমার পঁচিশ বছরের জীবনে এতদিন কোথাও তা পাইনি। আমার একটুখানির জন্যে এত উদ্বিগ্ন, এত সচেষ্ট কেউ কোনদিন হয়নি।"

"দেখ, তুমি অমন করে ব'লোনা, আমার ভারি কষ্ট হয়। বেশ, একটু পাখা করলেই যদি তোমার অত বক্তৃতা দিতে ইচ্ছে করে, এই না হয় বন্ধ করলুম।"

"না না, তোমার কাছে সব কথাই বলতে ইচ্ছে করে, তোমার দৃষ্টির তলায় নিজেকে উন্মুক্ত করে ধরতে মন যায়। তাই এত সব বলছিলুম। কিছু মনে ক'রোনা। কিন্তু আসল কথাটাই যে এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি শিশির। আমি থাকি পল্লীগ্রামে। সেখানে যেয়ে তুমি থাকতে পারবে তো ? তোমার কোন কষ্ট হবেনা ? এ সমস্ত কথাই ভালো করে ভেবে দেখ।"

"ও নিয়ে বাবার সঙ্গে আমার কথা হ'য়েছিল। আমি স্বচ্ছন্দে সেখানে যেয়ে থাকতে পারব। সেখানে আমাদের জন্যে অনেক কাজ অপেক্ষা করে রয়েচে।"

এমন সময় বাহিরের দরজায় সকৌতুক হাসি এবং মাধবীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

"দরজা খোল শিশির রাণি! তোমার সময় গেছে। বিকেল হয়ে এ'ল। মাসীমা সরবৎ আর ফলের থালা সাজাতে গেলেন।"

সুবোধ দরজা খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "দিদি, বসুন।"

মাধবী হার্ম্মোনিয়ামের কাছের চেয়ারটায় ব'সিয়া কহিল, "একেবারেই দিদি! কিন্তু তখন থেকে এত কী কথা হচ্ছিল ? শিশির যে ক'দিনের আলাপে কারো সঙ্গেই এত কথা বলতে পারে তা আমি জানতুমনা। দেখুন, আমার এই সইটিকে ছেলেবেলা থেকে আমি জানি। ওর মনের উপরের স্তরটা কঠিন। সেইটে ছিন্ন করে তলার

স্নেহতরল সরস অংশে পৌছতে সময় লাগে। ওর মন পাওয়া শক্ত, কিন্তু যে পায় সে অবশেষে খুব বড় জিনিষটিই পায়। অথচ আপনার বেলায় যে দেখচি কিছুই শক্ত রইলনা। আপনি মনও পেলেন আর সময়ও লাগলনা।"

"আমি যে এত অনায়াসে পেলুম সে শুধু আমি অযোগ্য ব'লে।"

"জানেননা, মেয়েদের মন পাবার ওটাই যে পরম উপায়।"

"হবে। ওঁকেও পেলুম, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের হৃদ্যতাও পেলুম। আমার ভাগ্য বই কি।"

"এই যে, বেশ কথাও বলতে শিখেচেন। আচ্ছা, মাসীমার ফল আর খাবার নিয়ে আসতে যতক্ষণ দেরী ততক্ষণ আমি একটা গান গাই। ভাই শিশির, রাগ করিসনে, তোর স্বামীকে চিরদিন নিজের অন্তঃপুরে তো বন্ধ করেই রাখবি। মাঝে থেকে এই ক'টা দিন আমরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করে নিই।"

হার্ম্মোনিয়ামে সুর দিয়া মাধবী গান ধরিল,—

"ওহে, সুন্দর মম গেহে
আজি পরমোৎসব রাতি।"

(১১)

শিশিরের শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে কাছাকাছি কি একটা ষ্টেশনে নামিয়া মোটর, ঘোড়ার গাড়ী বা গরুর গাড়ীতে করিয়া যাইতে হয়। সে গ্রামখানা রেলোয়ে ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে। শিশির প্রথম দিনে স্বামীর কাছে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়াছিল বটে যে, পল্লীগ্রামে যাইয়াও সে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিবে, কিন্তু প্রথম হইতেই তাহার মন কেমন দমিয়া গেল।

যে ষ্টেশনটায় নামিতে হয়, সেখানে যখন ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘন ঘোর মেঘের স্তূপ দাঁড়াইয়াছে। আকাশের কোথাও যেন আর এতটুকু ফাঁক নাই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে আকাশের সমস্ত আলো লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই খুব জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শিশিরকে টিনের শেড্ দেওয়া প্ল্যাটফর্ম্মের এক প্রান্তে একটা বেঞ্চির উপর কোনক্রমে জলের ছাঁট একটুখানি বাঁচাইয়া বসাইয়া রাখিয়া সুবোধ সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া জিনিষপত্রগুলা কোন গতিকে নামাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করিল; কারণ এই ছোট ষ্টেশনটায় দু'তিন মিনিটের বেশি কোন ট্রেণই দাঁড়ায়না।

অবশেষে ট্রেণ যখন ছাড়িয়া দিল, বৃষ্টিসিক্ত সেই নিরানন্দ অপরাহ্ণে তীক্ষ্ণ বাঁশি বাজাইয়া এবং প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া ট্রেণখানা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল, তখন সুবোধ একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "এত তাড়াতাড়ি ক'রেও তোমার সেই ছোট হাতবাক্সটা নামাতে পারলুমনা শিশির। রয়ে গেল। কী করেই বা পারব, এত বৃষ্টি! একটা কুলির অবধি দেখা পাওয়ার যো নেই। আর আমাদের বাড়ী থেকে যে লোকগুলো আমাদের নিতে এসেচে, তারা যেন মানুষ নামের বাইরে। পাড়াগাঁয়ের লোক, ট্রেণ কখনো দেখেনি। কী যে করবে, আর কী করবে না তার ঠাহর পায়না।"

সুবোধের সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে। চশমার কাঁচে জলের বিন্দু, সিল্কের পাঞ্জাবিটা জলে এত ভিজিয়াছে যে গায়ের সঙ্গে বসিয়া গিয়াছে। মাথার চুলগুলা অবধি ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া শিশিরের চোখের পলক যেন পড়িতে চায়না। এই তাহার স্বামী! এত সুন্দর, এত অসহায়! এক নিমেষের মধ্যে একই কালে সে তাহার স্বামীর প্রতি নব-পরিণীতা পত্নীর সলজ্জ অনুরাগ এবং মাতার মত ঐকান্তিক মমতা অনুভব করিল। চুপি চুপি কহিল, "আমার হাতবাক্সের ভাবনা তোমাকে একটুও ভাবতে হবেনা। ওতে এসেন্স, সাবান, চিঠি লিখবার কাগজ এমনি ধরণের টুকি টাকি জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। কিন্তু আর এক মিনিটও দেরী না করে তুমি এইগুলো ছেড়ে ফেল দেখি। না'হলে আমি সত্যি ভারি রাগ করব।"

ঝিকে দিয়া কাপড়ের ট্রাঙ্ক এই দিকে আনাইয়া সে শুষ্ক তোয়ালে এবং শুক্‌নো কাপড় জামা বাহির করিয়া দিল।

আরও এক ঘণ্টা বৃষ্টি থামিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে শিশির তাহার স্বামীর সহিত একটা মোটরে চড়িয়া তাহার অজানা শ্বশুরবাড়ীর দিকে যখন যাত্রা করিল, তখন বিকালের আলো মিলাইয়া আসিয়াছে। আকাশের কোলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মেঘের ফাঁকে একটুখানি পাণ্ডুর রৌদ্রের

আভা বৃষ্টিস্নাত গাছপালার উপর পড়িয়া কেমন যেন করুণ, সজল দেখাইতেছে। সঙ্গের অনেক লোকজন দাস-দাসী জিনিষপত্র লইয়া পিছনে কেহ ঘোড়ার গাড়ীতে কেহ বা গরুর গাড়ীতে আসিতে লাগিল। কেবল তাহারা দুইজনে আগাইয়া গেল।

(১২)

প্রায় ঘণ্টাখানেক আসিবার পর সহরের রাস্তা শেষ হইয়া অসমতল মেঠো জমি পাওয়া গেল এবং আর অল্পক্ষণ পরেই আকাশের হাল্কা মেঘের অন্তরালে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে কখনো বা ম্লান কখনো উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার দ্বারা অভিনিষিক্ত করিতে লাগিল এতদূর অবধি শিশিরের মন্দ লাগে নাই। সে স্বামীর আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, "কী সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গার উপর চাঁদের আলো আমি অনেক দেখেচি। কিন্তু মাঠে জ্যোৎস্নার আলো এত চমৎকার দেখায় আগে তা জানতুমনা।"

সুবোধ তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া কহিল, "তুমি আমার বাড়ী আসবে তাই সমস্ত কিছুই সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাই তো, দেখনা একটুক্ষণ আগেই এত ঝড় বৃষ্টি হওয়া সত্বেও আবার চারিদিক চাঁদের আলোয় ভাসচে।"

"বেশ, আমার স্তুতি আর করতে হবেনা। কিন্তু তোমাদের বাড়ী আর কতদূর?"

"এখনও দশ বার মাইল। কিন্তু 'তোমাদের' বাড়ী কেন বলচ শিশির? আমাদের বাড়ী বল। সে কি এখন থেকে তোমারও বাড়ী নয়?"

"যতই আগিয়ে আসচে ততই আমার যেন কী রকম ভয় ভয় করচে।"

"ভয় কিসের জন্যে?"

"সেখানকার লোকে আমায় কী ভাবে নেবে, তাদের পছন্দ হবে কি না। পিসীমার কাছে শুনেছি তোমাদের বাড়ীর ধরণ-ধারণ সাবেক কালের, তোমাদের পরিবারের সম্মান কোন্ বাদশাহী আমলের। অতবড় প্রবল বংশ-মর্য্যাদার মাঝে আমি মনে ধরব তো?"

"কেন তোমার অত ভাবনা শিশির। যাকে একটুখানি দেখে আমার এত মনে ধরেচে, আমাদের সংসারে তাকে ধরাবার মত জায়গা কি পাওয়া যাবে না? তা ছাড়া তুমি যেয়ে দেখবে, তারা, তোমার সংসারের সেই সমস্ত মূঢ় অশিক্ষিত পরিজনেরা কত অজ্ঞান, কত দুর্ব্বল, কত অক্ষম। তাদের উপর কোন কারণেই তুমি লেশমাত্র রাগ বা অভিমান করে থাকতেই পারবেনা। যদি তারা তোমার উপর অন্যায় করে, তবুও না। কারণ তুমি যে তাদের চেয়ে অনেক উপরে। তারা তোমার রাগের যোগ্য নয়। এ কথাটা ঠিক আমার মত করে আজ না হোক দু'দিন পরে তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে।"

চাঁদের আলোয় সুবোধের প্রশস্ত ললাট এবং প্রশান্ত অধরের দিকে চাহিয়া হৃদয়-মনের ঔদার্য্যের দিক হইতে এই লোকটির কাছে শিশিরের নিজেকে যেন ছোট মনে হইতে লাগিল।

এখন মোটরখানা যে রাস্তায় চলিতেছে সেটা আর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঁধান রাস্তা নয়; বস্তুতঃ সেটা বোধ করি কোন প্রকার রাস্তাই নয়।

মেঠো জমির আশে পাশে যে সরু সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে মোটরখানা অগ্রসর হইতে লাগিল। তথাপি অসমতল গ্রাম্য পথে চলিতে তাহার এত অসুবিধা হইতেছিল যে আরোহীরা নিরন্তর ঝাঁকুনি খাইতে লাগিল।

সুবোধ বারংবার শিশিরের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিতেছিল, "তোমার কোন কষ্ট হচ্ছেনা তো? দেখো একটু সাবধানে ব'সো। অন্যমনস্ক হয়ে থেকোনা। যেমন জোরে ঝাঁকুনি লাগচে, ওই তো মাথাটা হুডে ঠুকে গেল। আঃ! ড্রাইভার, একটু আস্তে, একটু সাবধানে চালাতে পারচনা?"

ড্রাইভার একান্ত বিনয়ে জানাইল, সে যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত চালাইতেছে। কিন্তু হুজুর তো জানেন রাস্তা কী রকম খারাপ। এ রাস্তায় এক রকম জোর করিয়াই মোটর চালান হয়।

আরও বিশ পঁচিশ গজ আসিয়া কাদার মধ্যে গাড়ীর একটা চাকা বসিয়া গেল। আজ বিকালে যে জল হইয়াছে তাহাতেই এই গ্রাম্য পথ কর্দ্দম-সিক্ত হইয়া গেছে।

শিশির ভয় পাইয়া কহিল, "গাড়ী কি আর চলবেনা

না কি? এই মাঠের মাঝে এমনই করে আমরা আটকে থাকব?"

"না না, পাগল আর কি! এসব তোমার কখনো অভ্যেস নাই, তাই এত ভয় পাচ্ছ। দাঁড়াও এখনই সব ঠিক করে দিচ্ছি।"

হাতের আস্তিন গুটাইয়া সুবোধ গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মোটরের ড্রাইভার আর ক্লীনার আসিয়া যোগ দিয়া বিস্তর ঠেলাঠেলি করিতে করিতে অবশেষে কাদার মধ্যে প্রোথিত হইয়া পড়া চাকা উঠিল এবং খুব ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল।

শিশির অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "মোটরে চড়বার সখ আমার ফুরিয়ে গেছে।"

সুবোধ কেমন অন্যমনস্কের মত কহিল, "এইটুকুতেই এত বিচলিত হয়ে পড়চ শিশির। কিন্তু আচার-বিচার, শিক্ষা-সংস্কার সব দিক থেকে আমাদের চেয়ে বিভিন্ন এক বিরুদ্ধ পল্লী-সমাজের মাঝে বসবাস করতে হ'লে জীবনের রথ কতবার অচল হয়ে যাবে, সে খবর এখনও পাও নাই।"

"তাই তো আমি বলছিলুম তোমাদের গ্রাম যত আগিয়ে আসচে, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করচে। আচ্ছা সেখানে জীবন-যাত্রার যদি এতই অসুবিধে, তুমি স্বচ্ছন্দে অন্য কোথাও সরে যেয়ে থাকলেই তো পার। তোমার তো কোন বিষয়ে অভাব নেই। সেখানেই যে পড়ে থাকতে হবে এমন কী কথা রয়েচে?"

"তোমার মত করে একদিন আমিও ভাবতুম। সেই কথাই তবে বলি।"—সুবোধ বলিতে লাগিল, "এতদিন সেখানে ছিলুমনা। ক'লকাতায় পড়েচি, ছুটির সময় বেশির ভাগ বাড়ী না এসে কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে কিংবা একলা দেশে দেশে বেড়িয়ে কাটিয়েছি। এমন করেও অনেক দিন কাটল। অবশেষে যখন পড়াশোনার শেষে আমাদের গ্রামের বাড়ীতে দীর্ঘকালের জন্য এ'লুম তখন বাইরের জগতের অবাধ বিস্তৃত মুক্তির পর সেখানকার সঙ্কীর্ণ কলুষতা আমার মনকে যেন চাবুক মারলে। কিছুতেই সেখানে মনকে বসাতে পারতুমনা। মনে হো'ত এ যে চারিদিকে বদ্ধ নিরানন্দ কারাগার। দিকে দিকে যেখানে চাও কোথাও এতটুকু আলোর ছটা চোখে পড়বেনা। সবারই মাঝে শুধু বাদাবাদি, শুধু নিরর্থক দ্বেষ, পর্ব্বত পরিমাণ তামসিকতা।"

শিশির যেন একটু অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা অত ভালো করে এম-এস্‌সি পাশ ক'রেও তোমার পাড়া-গাঁয়ে বসবাস করবার খেয়াল কেন হোল? তোমার তো টাকার অভাব নাই। ইচ্ছে করলে ইউরোপ ঘুরে আসতে পারতে, ইচ্ছে করলে আরও কত কিই করতে পারতে, তা না করে এমন অসঙ্গত ইচ্ছা হোল কেন? শুধু কি বিষয় সম্পত্তি তদারক করবার জন্যে?"

"তুমি তো জান আমার ধাতে বিষয়ী হওয়া একেবারেই নেই।"

"তবে?" "তবে? সে অনেক কথা।" "বলনা।" "এখন কি সময় হবে?"

"মোটরটা যেমন আস্তে যাচ্ছে তাতে মনে হয় পৌঁছতে এখন সময় লাগবে।" "তা লাগবে।" "তবে?"

"কিন্তু কি জান শিশির, সে সমস্ত কথা কোথা থেকে যে আরম্ভ করব, কোথায় তার সুরু আর কোন্‌খানে তার শেষ, আজও তা ভালো মতে ঠাহর করতে পারিনে। জীবনের এই সব গভীর কথার উৎস কোন্‌খানে যে শিকড় মেলে থাকে।"

"তুমি সামান্য কথাও রঙ ফলিয়ে বলবে। কেমন যেন স্বাভাবিক শোনায়না।"

"সেইটেই যে আমার দোষ। কারো সঙ্গে কথা বলতে ন পেয়ে পেয়ে অভ্যেসটা এমনই দাঁড়িয়েছে। এখন সহজ কথাগুলো বলতে ব'সলেও বইয়ে পড়া কথার মত শোনায়। কিন্তু যা বলছিলুম। ছাত্র জীবনেই আমরা পল্লীসমাজ প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধ নানা মতামত নিয়ে আলোচনা করতুম। বাংলার নিরানব্বুই পার্সেণ্ট লোক যে থাকে পল্লীগ্রামে, আর সেই পল্লীর শোচনীয় অধোগতি, অপরিসীম দৈন্য—এসব নিয়ে এককালে কাগজে কলমে অনেক লেখালেখি করেচি। কিন্তু তা ওই কাগজ কলমেই আবদ্ধ ছিল। মনের মধ্যে রেখাপাত মাত্র করেনি। কলেজের যখন পরীক্ষা এগিয়ে আসত, সব ভাবনা ছেড়ে দিবারাত্রি বইয়ের উপর ঝুঁকে থাকতুম, এবং ছুটি হ'লে আরও পাঁচটা অন্য চর্চ্চার সঙ্গে একবার করে বাংলার পল্লীর দুরবস্থায় ব্যথিত হতুম। কিন্তু ছুটির সময় দেশে যেয়ে দু'টো দিনও টি'কতে পারতুমনা। মনে হোত এখানে থাকা যেন শাস্তি। তা

পরে একটা দিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। সভায় সেদিন স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বক্তৃতা ছিল। যেয়ে এক পাশে বসলুম। কত কলরব হচ্ছিল, কত কি আলোচনা, কত মন্তব্য, কত বাদ-প্রতিবাদ। আমি কেবল চুপ করে তাঁর দিকে চেয়ে ছিলুম। তাঁর মুখে একটা যেন কিসের আভাস যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের, আমাদের এই সমস্ত তর্কাতর্কির অতীত। তার পরে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। কোন আড়ম্বর নেই, বিশেষণের ঘটা নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি কথা কী আন্তরিক, কী গভীর ব্যথা এবং স্নেহে ভরা। বাংলাদেশের পল্লীর কতই না দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী তিনি যেন চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছেন এমনই করে বলতে লাগলেন। সে সমস্ত যেন অতি গভীর, অতি তীক্ষ্ণ করে তিনি নিজেই অনুভব করছেন। তার পরে তিনি বললেন, 'মা, বেশি চাইনে, আমাকে শুধু আর দশটি বছর বাঁচিয়ে রেখ। আমি যেন তোমার দুঃখ দৈন্যের সমস্ত চিহ্ন অপসারিত করে যেতে পারি।' এই তো কয়েকটি কথা শিশির। কিন্তু সে যে কি, তা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবনা। ঠিক তেমনি করে কারও মুখ থেকে যদি কখনো তেমনি কথা শুনতে পেতে তাহলে বুঝতে পারতে। মনে মনে ভাবলুম জ্ঞানে, গরিমায়, বিত্তে কোন দিক থেকে তো এই মানুষটি লেশমাত্র কম ন'ন, তবে কিসের জোরে তিনি বাংলাদেশের পাড়াগাঁকে এত ভালোবাসলেন? এতদিনে যে সব তথ্য আমার কাছে কাগজ কলমে লেখা যুক্তি মাত্র ছিল, আজ একজনের ব্যক্তিত্বের দীপ্যমান আভায় তাকে যেন সত্যকার আলোকে দেখতে পেলুম।"

"তার পরেই যা কিছু বাধা তোমার কাছে সহজ হয়ে গেল?"

"না, তা ঠিক নয়। এমন অনেক বাধা আছে যা আমি আজও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। কিন্তু দেশকে ভালোবাসা যে কী বস্তু, সেইদিন থেকেই তার আভাস পাই। কিন্তু শিশির আমরা এসে পড়লুম যে। গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেচি। তুমি এবারে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দাও। যদি অসুবিধা বোধ না কর তাহলে গায়ের চাদরটাও ভালো করে ঢাকিয়ে নাও। আর আমিও এইবারে কথা বন্ধ করি!"

রাত্রি তখন বোধ করি আটটা সাড়ে আটটা হইবে। আকাশের সমস্ত মেঘ এতক্ষণে একেবারে নিঃশেষ হইয়া কাটিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে। চাঁদের আলোয় গ্রামের মধ্যকার খোড়োচালের শ্রেণী, কলার বাগান, কোথাও বা পুকুরের জল ঝিকমিক করিতেছে। একটুখানি দূর হইতে সানাই এবং ব্যাণ্ড বাজনার শব্দ আসিতেছে। বোধ করি তাহা এই বিবাহ উৎসবের বাদ্য। বিবাহ-বাড়ী আর বেশি দূরে নাই। শিশির এতক্ষণ তন্ময় হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল এবং জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ গ্রাম্য পথের দৃশ্য দেখিতেছিল। সুবোধের কথায় এখন একটুখানি চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি মাথার কাপড়টা টানিয়া দিতে দিতে সে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমিও এই সব মান না-কি? এই মাথায় ঘোমটা টানা, এই সব অনর্থক কুসংস্কার—"

সুবোধ তাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া কহিল, "আমার কথা বলচ? আচ্ছা ব'লো ত, আমার নিজেরই কি ভালো লাগবে ঘোমটায় মুখ ঢাকা তোমাব দিকে তৃষিত নয়নে বারংবার চেয়ে দেখতে? এতক্ষণ কেমন দিব্য স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার সঙ্গে গল্প করতে পাচ্ছিলুম।"

"তা'হলে?"

"তা'হলেও মানতে হবে। নইলে অনেকের সেন্টিমেণ্টে আঘাত দেওয়া হবে।"

"আমি কিন্তু বাপু মুখে এক রকম মনে আর একরকম কিছুতেই করতে পারবনা।" শিশির অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিল।

"শিশির, শিশির, এত অস্রে এত উতলা হ'য়োনা। আমি যখন সময় পাব সমস্ত কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা ক'রব।" সুবোধ তাহার গলার সুরে মিনতি মিশাইয়া কহিল।

কিন্তু আর কথা বলিবার সময় নাই।

ততক্ষণে বৃহৎ জমিদার-বাটী একেবারে সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। দেবদারু দিয়া সাজান গেট্, সারি সারি আলোকমালা। দ্বারের দুই পার্শ্বে মঙ্গল-কলস। এক সঙ্গে নহবৎ, ব্যাণ্ড, ব্যাগ-পাইপ, ঢোল, কাঁসি—কত রকমের বাজনা যে বাজিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দ্বারের নিকট স্ত্রী-পুরুষ অনেকে দাঁড়াইয়া। কেবল ভদ্রলোক ছাড়াও বাজনদার, ঢুলি, বাগ্দী নানা জাতির প্রজা আর কত ছোট-লোকই যে কাতারে কাতারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার সংখ্যা হয়না। তাহাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে-

গুলা অবধি সম্পূর্ণ নগ্নগাত্রে অত্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে বর কন্যার গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। এই বিপুল জনতার মাঝে ক্রমাগত হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে মোটরখানা অতি সন্তর্পণে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দুমতী বরকন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিবেন বলিয়া পূর্ব্ব-দিন এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকজন পুর-স্ত্রী।

একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া ইন্দুমতীকে কহিলেন, "মেজ-বৌ, তোমার ভাইঝিকে তুমিই কোলে ক'রে নামিয়ে নিয়ে এস। আমি তো ভাই পারবনা।"

"সে কী করে হবে? জোড়ে নামাতে হয় যে, আমি যদি শিশিরকে নামাই তা'হলে ওঁকেও যে সুবোধকে নামাতে হবে। কিন্তু এই সেদিন শক্ত ব্যারাম থেকে উঠেচেন, উনি তো পারবেননা। ফুলদি যদি না পাবে, নকাকীমা তুমি নামাওনা।"

মোটা-সোটা স্থূলাঙ্গী একজন প্রৌঢ়া মহিলা কিছু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, "শেষে ন-কাকীমার উপরে তো যত তাল এসে পড়বেই। কিন্তু বলি মেজবৌ এখন না হয় মরে কুটে যেমন করে পারি বৌকে আমি এখান থেকে কোলে করে তুলে নিয়ে যেয়ে ছানলাতলা অবধি নিয়ে যাবই। আমাদের বংশে আজ পর্য্যন্ত পায়ে হেঁটে কোন বৌ ছানলাতলায় যায়নি। কিন্তু তুমি যে বড় আমাদের কাছে বলেছিলে, মেয়ে মোটে তেরো ছাড়িয়ে চৌদ্দয় পড়েচে। এ আঠারো উনিশের কম হবেনা বলে রাখচি।"

ঘোমটার ফাঁক হইতে শিশির অবাক নয়নে সেই প্রৌঢ়ার ফাঁদিনথ নাড়িবার ঘটা দেখিতেছিল। কাহারো বয়স লইয়া এমন অভব্য এমন নিষ্ঠুর আলোচনা যে কোন গতিকেই কেহ করিতে পারে তাহা তাহার ধারণাতেই আসিতেছিল না।

সুবোধ সন্ত্রস্ত হইয়া সেই প্রৌঢ়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বেশ তো নকাকীমা, ওসব আলোচনা তো পরেও হতে পারবে। এখন বৌকে নামিয়ে নাওনা। রাস্তায় যা কষ্ট আর হয়রাণি গেছে! ঝড় জল—"

আর একবার পূর্ণ উৎসাহে সমস্ত বাজনা কয়টা বাজিয়া উঠিল। শাঁখ বাজিতে লাগিল। ঘোমটা এবং চাদর জড়ান শিশিরকে একজন কোলে উঠাইয়া লইল। সমস্তটা মিলিয়া শিশিরের এত অদ্ভুত লাগিতেছিল, বিতৃষ্ণায় এবং ভয়ে সে চক্ষু বুজিল।

যখন চক্ষু খুলিল তখন একটা কাঠের পিঁড়ির উপর প্রৌঢ়া মহিলাটি সশব্দে তাহাকে নামাইয়াছেন। প্রদীপের আলোকে শিশির দেখিল স্বামীও তাহার পাশে আছেন। এত মন্তব্য, এত আলোচনা, এত কোলাহলেও তাঁহার মুখ তেমনি প্রসন্ন, প্রশান্ত। কিন্তু আজ সে মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়াও শিশির বিশেষ কোন সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইলনা। (ক্রমশঃ)

নিঃসঙ্গ ঘরে

বন্দে আলী মিয়া

ক্ষীণ শুক্ল-শশী কাঁপে তালবৃন্ত আড়ে
শুভ্র রৌপ্য-রেখা সম, শুনি চারিধারে
ঝিল্লির করুণ ধ্বনি—কাঁদে পৃথ্বী যেন,
তরঙ্গে দুলিচে তার অশ্রু সম ফেন
নীলাম্বুধি বুকে। নিঃসঙ্গ গৃহেতে আজ
নির্ব্বাণ লভেচি আমি—শেষ সব কাজ।

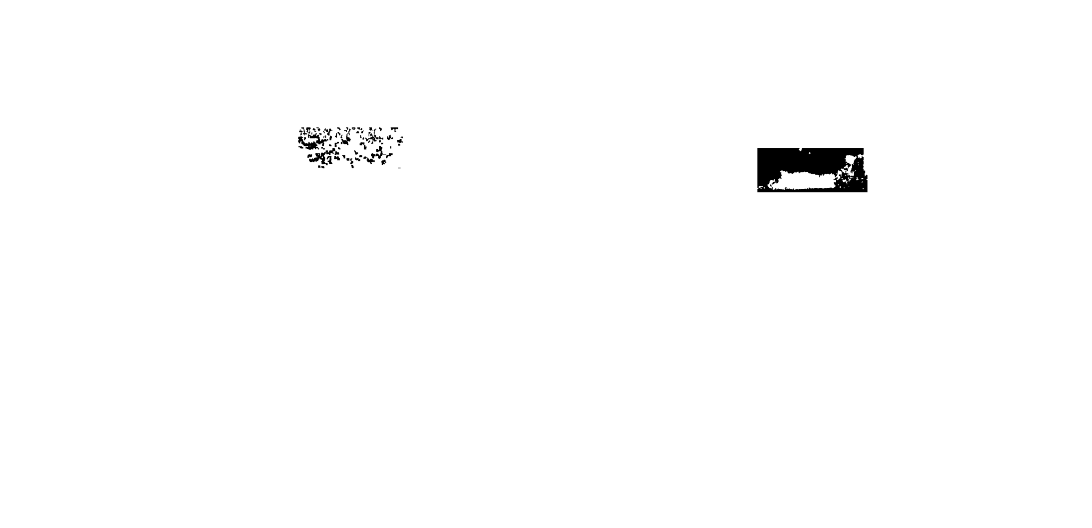
একান্তে এসোগো তুমি এসো প্রিয়তমা
পাণ্ডুর আঁধারে হের তারকা প্রথমা
এখনো জাগিয়া আছে, এসে বসো পাশে;
হাতে তব রাখি হাত,—ইঙ্গিতে আভাসে
জানাই গোপন কথা। পুরানো কাহিনী
আজ রাত্রে দু'জনার হোক জানাজানি।

প্রথম-যৌবন-দিনে হয়নি যে-কথা
নিঃসঙ্গ দিনেতে তার হোক প্রগল্ভতা।

মহীশূরের পথে

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ভারতীয় মিত্র ও করদ রাজ্যসমূহের মধ্যে মহীশূর সর্ব্বাগ্রণী ও উন্নতিশীল। শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তারে কেবল বরোদা ও ত্রিবাঙ্কুর ইহার সমকক্ষ। নীলগিরি ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের মিলন-স্থান প্রায় ২৫০০ ফুট উচ্চ একটী উপত্যকার উপর মহীশূর অবস্থিত। নাতিশীতোষ্ণ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর এই রাজ্যে চির-বসন্ত বিরাজমান বলিলে ভুল হইবে না। মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর হইয়া আসিলে ২৫ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনে মহীশূর শহরে পৌছান যায়। উতকামণ্ড হইতে মোটর বাসে আসিলে ৮ ঘণ্টায় আসা যায়। মহীশূর অপভ্রংশ মহীশূর। সপ্ত-শতীতে দেবী চামুণ্ডী কর্তৃক যে মহিষাসুরের বধ হইয়াছিল—তাহার নামানুযায়ী এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। প্রবাদ যে, এই রাজ্য পৌরাণিক যুগে উল্লিখিত অসুরের শাসনাধীন ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত ৺চণ্ডী বা সপ্তশতীতে যে চামুণ্ডীদেবীর আরাধনা বিবৃত আছে সেই দেবীর নামানুযায়ী মহীশূরে ৩৪৯০ ফুট উচ্চ একটী পাহাড় আছে। উহা ৪।৫ মাইল দূরে সহরের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই চামুণ্ডী পাহাড়ে নাকি ৺দুর্গাদেবী মহিষাসুর বধ করেন। এই হিসাবে



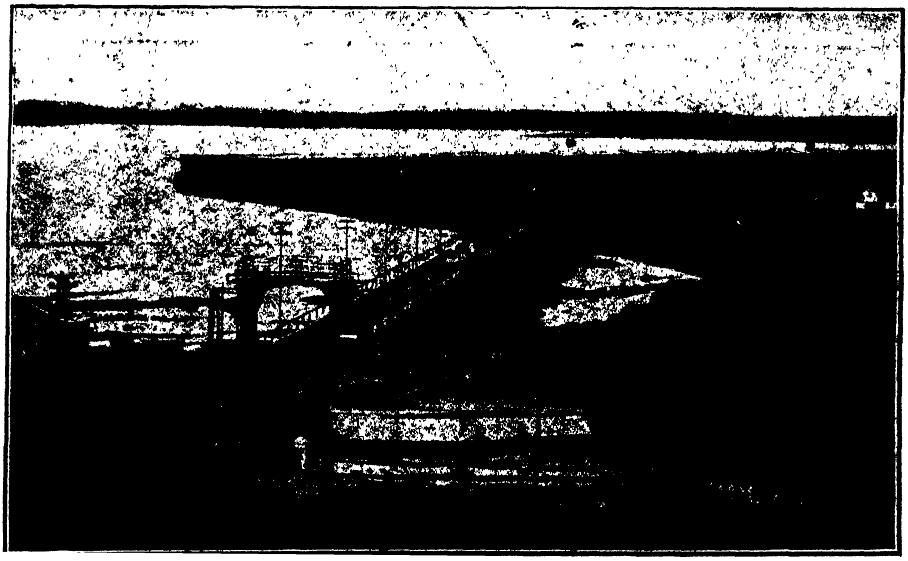
কৃষ্ণরাজা সাগর। বাঁধের সাধারণ দৃশ্য

রাজ্য পূর্ব্ব-পশ্চিমে ২৯০ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ২৩০ মাইল প্রস্থ। প্রায় ৩০০০০ হাজার স্কোয়ার মাইল পরিমিত এই ষ্টেটে অল্লাধিক ৬০ লক্ষ লোকের বাস। তার মধ্যে শতকরা ৯০ জন হিন্দু। পরিমাণ ও লোক-সংখ্যায় ইহা প্রায় সিংহলের মত।

মহীশূর শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে মহিষ+উর হইতে। উর অর্থে গ্রাম। প্রথমে ইহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল এবং উক্ত গ্রাম মহিষবহুল ছিল। কেহ বলেন মহিষাসুর শব্দের বাঙ্গালীর চির-আদরের ৺দুর্গাপূজার সহিত মহীশূরের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। এই পাহাড়োপরিস্থ চামুণ্ডীদেবীর মন্দির মহীশূর রাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। মন্দিরটি অতি প্রাচীন ও মহারাজার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ১২০০ ধাপ চড়াই করিয়া উঠিলে মন্দিরে পৌছান যায়। সদা-জাগ্রতা দেবীর নিত্যপূজার বন্দোবস্ত আছে। মহীশূর একটী পীঠস্থান এবং ভারতের ৫২টী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানের অন্যতম। আশ্বিন দেবী-পক্ষে দশহরার সময় এই মন্দিরে

দশদিবসব্যাপী একটী বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দশলক্ষ যাত্রী এখানে সমাগত হয়। মহারাজা নিজে উপবাস পূর্ব্বক পূজাদি সম্পন্ন করেন।

প্রাচীন কাল হইতে মহীশূর রাজবংশ এই মন্দিরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন। মন্দির-সংলগ্ন বিশাল গোপুরম্ ও বড় বড় নানা গৃহাদি আছে। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাহাড়ব্যাপী একটী আলোকের মালা জ্বলে। তাহাতে একটী স্বর্গীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। দেরাদূন হইতে মসূরী পাহাড়ের আলোকমালা দেখিতে যেমন সুন্দর, আলোকমণ্ডিত চামুণ্ডী পর্ব্বতের শোভাও প্রায় তদ্রূপ। এই পাহাড়ের উপর মন্দিরের কপাট ও দরজাদি সমস্ত রৌপ্য-নির্ম্মিত। মহাবীর হনুমানের রৌপ্য-নির্ম্মিত একটী প্রতিমাও আছে। রামনাম সংকীর্ত্তনের সহিত মহাবীরের পূজা প্রত্যেক একাদশীতে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী ব্রহ্মানন্দ দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ কালে এই অঞ্চলের নানা স্থানে মহাবীরের পূজা দর্শন করিয়া মিশনের সমস্ত আশ্রমগুলিতে ব্রহ্মচর্য্য-মূর্ত্তি হনুমানের পূজা প্রচলন করেন। চামুণ্ডী পাহাড়ের মন্দির সংলগ্ন গৃহগুলির মধ্যে একটী ঘর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের জন্য পৃথক আছে। মিশনের সাধুগণ এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে তপস্যাদি করেন। বর্ত্তমান মহারাজার শয়নাগারে চামুণ্ডী-



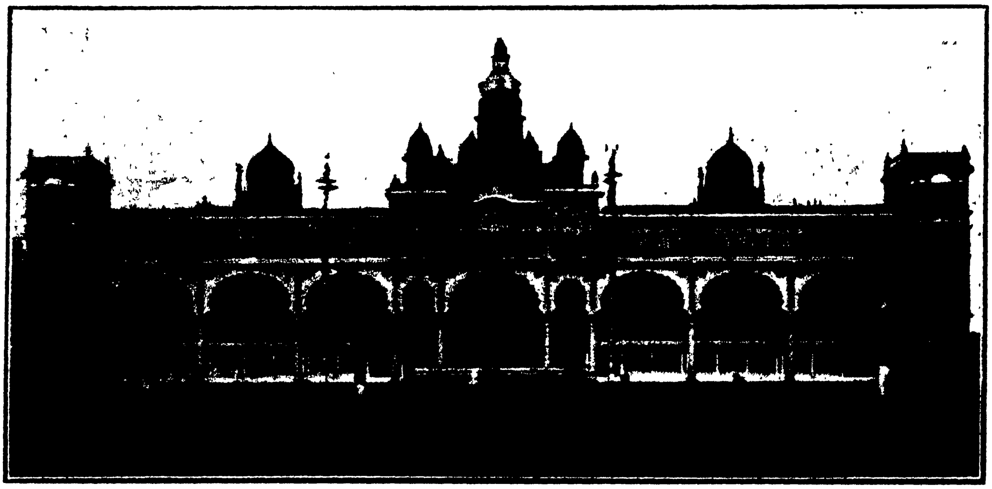
কৃষ্ণরাজা সাগরের বাঁধ।—মহীশূরের বৃহত্তম বাঁধ

হইতে মহীশূর শহরের রাত্রির দৃশ্য অতীব চমৎকার। শহরটীকে নক্ষত্র-খচিত আকাশতুল্য প্রতীয়মান হয়। পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠিবার একটী মোটর রাস্তা আছে। মহারাজা ও রাজ-পরিবারের সকলে মোটরে করিয়া মন্দিরে দেবী দর্শন করিতে যান। মহারাজ সপ্তাহে প্রায় দু'বার মন্দিরে যান। তিনি মন্দিরে গেলে দুটী বড় বড় আলো জ্বলে। এই পাহাড়ের মন্দির প্রাঙ্গণে একটী ১৬ ফিট উচ্চ অখণ্ড-প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড ষাঁড় আছে। তাঞ্জোরের ষাঁড় অপেক্ষাও উহা বৃহত্তর। ভারতে এত বড় ষাঁড় আর নাই। দেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ছবি আছে। তিনি উভয়ের বিশেষ ভক্ত। তিনি মন্দিরে আসিলে দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন।

মহীশূরের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। উহার পুরাতত্ত্ব রামায়ণ ও মহাভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট। উহার বর্ত্তমান ইতিহাস অবশ্য ১৮০০ খ্রীঃ হইতে আরম্ভ। মহীশূর প্রথমে চালুক্য ও হয়শালা সাম্রাজ্যের ও শেষে বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। বিজয়নগরের পতন হইলে স্থানীয় পলিগার বা ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গের মধ্যে উহা বিভক্ত

হইয়া যায়। পরে গুজরাট হইতে দুইজন যাদব রাজপুত মহীশূরে আসিয়া বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মহীশূরের রাজবংশ এইরূপে আর্য্যবংশ সমুৎপন্ন হইলেও দ্রাবিড় সংমিশ্রিত হইয়াছে।

রাজবংশের "ওদিয়ার" উপাধি রাজগুরু লিঙ্গায়েত সাধু কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ওদিয়ার শব্দের অর্থ 'মালিকজী'। রাজবংশের জ্ঞাতিগণের নাম 'উরস্' অর্থাৎ রাজা। পরে শঙ্কর সম্প্রদায় হইয়াছেন রাজগুরু। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হায়দর আলী ও তৎ পুত্র টিপু সুলতান আসিয়া মহীশূরের হিন্দুরাজ্য অধিকার করেন ও নিজেরা রাজা হন। টিপুর মৃত্যুর পরে মহীশূর আবার বৃটিশ সরকারের সাহায্যে হিন্দু রাজার অধীন হয়। মহীশূর শহরের



রাজ-প্রাসাদ—মহীশূর

কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীরঙ্গপত্তনে এখনও টিপুর ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও মসজিদ প্রভৃতি দেখা যায়। টিপু ও হায়দরের রাজত্বকালে শ্রীরঙ্গপত্তন মহীশূরের রাজধানী ছিল। তথায় দরিদা দৌলতবাগ, ও গুম্বজ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। উহার পরে প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ মহীশূর সার মার্ক কাবন্ প্রভৃতি ব্রিটিশ কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ উহা বর্ত্তমান রাজবংশের করতলগত হয়। দেওয়ান পুর্ণিয়া রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। মহীশূরের খুব সৌভাগ্য যে, প্রথম হইতেই একদল উপযুক্ত ভারতীয় দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী পাইয়াছে। তাঁহাদের শাসন-প্রতিভার ছাপ এখনও রাজ্যের সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম দেওয়ান সি, রঙ্গচালু ১৮৮৩ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পরে সার কে, শেষাদ্রি আয়ার ১৯০১ সাল অবধি ১৮ বৎসর কাল দেওয়ান ছিলেন। তিনি ভারতের একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। অসীম বুদ্ধি ও দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি রাজ্যের নানা উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কাবেরী জলপ্রপাত আবদ্ধ করিয়া রাজ্যের কৃষির শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে সার পি, এন, কৃষ্ণমূর্ত্তি, ভি, পি, মাধবরাও, ও টি, আনন্দরাও এই কয়জন দেওয়ান তাঁহার পরে রাজ্যের উন্নতি বিধান করেন। আনন্দরাওএর পর দেওয়ান হইলেন সার এম, বিশ্বেশ্বরাইয়া। তিনি প্রথমে বিখ্যাত বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ও পরে মহীশূরের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে কৃষ্ণরাজ সাগর নির্ম্মিত হয়। তাহা ছাড়া মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় ও ভদ্রাবতী লৌহ কারখানার গোড়াপত্তন এবং এসেম্ব্লি ও কাউন্সিলের সংগঠনও তিনিই করেন।

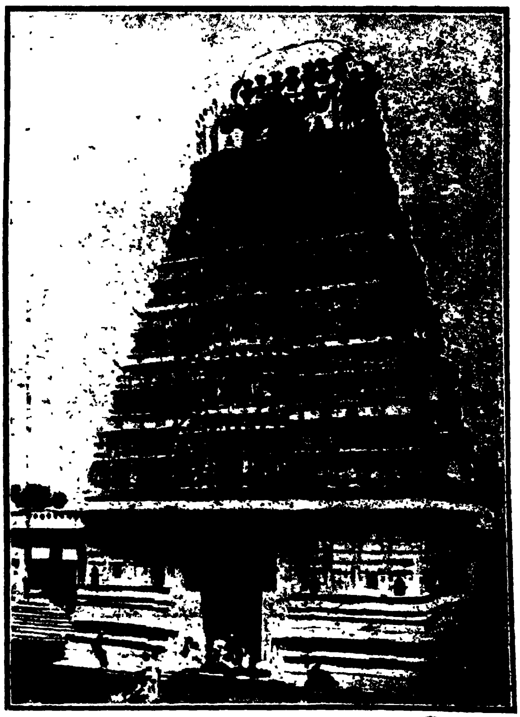
সার বিশ্বেশ্বরাইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা জগৎ-প্রসিদ্ধ। কথিত আছে আমেরিকার কোন ল্যাবরেটরী ৩ লক্ষ টাকা মূল্যে তাঁহার মস্তিষ্ক ক্রয় করিতে চাহিয়াছিল। তাঁহার পরে, মহারাজার শ্যালক সার কান্তরাজ উরশ্ দেওয়ান

হন। তিনি উল্লেখ-যোগ্য কিছুই করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তী দেওয়ান সার আলবিয়ান রাজকুমার ব্যানার্জ্জির সময়ে অনেক রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হয়। ষ্টেটের শাসন-কার্য্যও তাঁহার সময় অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। বাংলার গৌরব আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অনেক বৎসর স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে নানা উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে স্থানীয় ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীতে চীন ভাষায় গবেষণা আরম্ভ হয়। জনৈক ছাত্র বিশ্বভারতীতে মহাপণ্ডিত বিধুশেখরের নিকট চীন-ভাষা শিখিয়া আসিয়া তিব্বতীয় ভাষা হইতে বিখ্যাত বৌদ্ধ-ভাষা দীঙ্‌নাগের "প্রমাণ সমুচ্চয়" সংস্কৃতে উদ্ধার করিয়াছেন। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জিও স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। বাংলার বাহিরে বিশেষতঃ দেশীয় রাজ্যগুলিতে সেদিন অবধি বাঙ্গালীর কৃতিত্ব ও প্রভাব প্রচুর ছিল। বরোদা রাজ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি প্রতিভাশালী বাঙ্গালীগণ অদ্ভুত সাফল্য দেখাইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মহীশূরে আর বাঙ্গালী নাই বলিলেই চলে। কেবল স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমে কয়েকজন বাঙ্গালী সাধু থাকেন। রেঙ্গুন হইতে লাহোর অবধি বাঙ্গালীর প্রভাব এক সময় থাকিলেও দক্ষিণ-ভারতে বাঙ্গালীর বিজয়-অভিযান আদৌ অগ্রসর হয় নাই। বাঙ্গালী জীবন যুদ্ধে বর্ত্তমান বাধা-বিপত্তির মধ্যে বাঁচিবে কি মরিবে সেই প্রশ্ন এখন উপস্থিত। নচেৎ বাঙ্গালী ভারতে সদা অগ্রগামী ছিল ও থাকিত।

সার আলবিয়নের পরে দেওয়ান হইয়াছেন সার ইস্‌মায়েল মির্জ্জা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনিই বর্ত্তমান দেওয়ান। তিনি পার্শী মুসলমান। তাহার পূর্ব্ব পুরুষ পারস্য হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ভূতপূর্ব্ব মহারাজের এ, ডি, সি। তিনি বর্ত্তমান মহারাজার বাল্যসাথী ছিলেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রাজুয়েট মাত্র এবং পূর্ব্বে মহারাজার



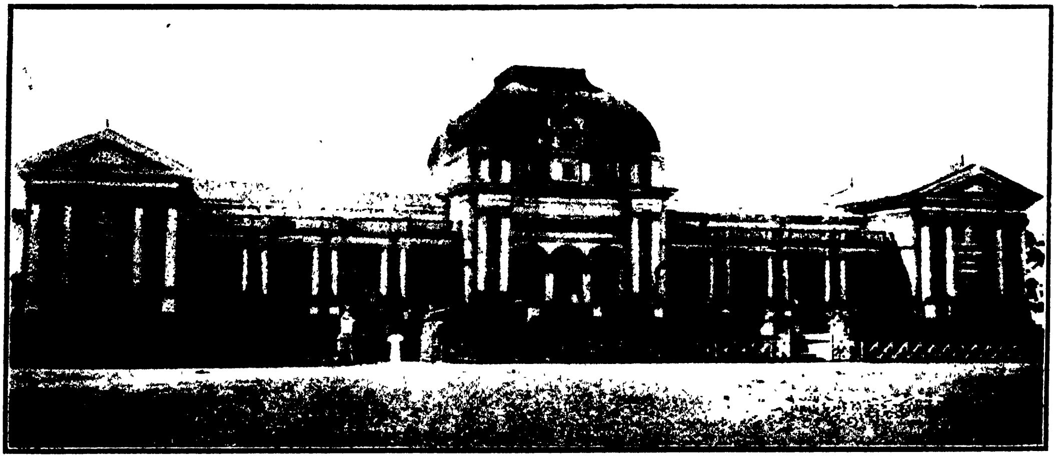
চামুণ্ডী পর্ব্বতে অখণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃষ



চামুণ্ডী মন্দির

প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ৪২ বৎসর বয়সে দেওয়ান হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে একবার মহাত্মা গান্ধীকে ষ্টেট্ গেষ্টরূপে আমন্ত্রণ করিয়া ষ্টেটে খদ্দর প্রচার করিয়াছেন। মহীশূরে খদ্দর বেশ জনপ্রিয় হইয়া পড়িতেছে।

ধ্যানাদিতে অতিবাহিত করেন। তিনি পুত্রকন্যা হীন ও কখনও কালাপানি পার হন নাই। তাঁহার ছোট ভাই এখন যুবরাজ এবং মাতা রিজেণ্ট মহারাণী। মান্দ্রাজ উতকামণ্ড প্রভৃতি স্থানে তিনি স্বীয় ব্যয়ে অনেকগুলি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নৈতিক চরিত্র হিসাবে তিনি



ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী

বর্ত্তমান মহারাজা সার কৃষ্ণরাজেন্দ্র ওদিয়ার অতিশয় প্রজারঞ্জক ও জনপ্রিয়। বোধ হয় দেশীয় অন্য কোন মহারাজার এ সৌভাগ্য হয় নাই। তিনি প্রায় ৩০ বৎসরের



শিবসমুদ্রম্—জল প্রপাত

অধিক কাল রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার পিতা মহারাজা চামরাজেন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজা অতি ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা পূজা

সত্যই একজন রাজর্ষি। অন্যান্য ভারতীয় রাজার সহিত তাঁহার এই বিষয়ে তুলনাই হয় না। প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বা শিক্ষিত সন্ন্যাসীদের সহিত তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। তিনি সংস্কৃত অধ্যয়নে খুব উৎসাহী এবং রাজ্যে প্রায় ৩০টী সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিচালন করেন। তিনি সম্প্রতি কৈলাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রচারে খুব উৎসাহী এবং মন্দির ও মঠে অনেক অর্থ দান করেন। মহীশূরের রাজবংশ কুমার জাতীয়। বৃহৎ রাজবংশ নানা স্থানে দারিদ্র্য পীড়নে দুরবস্থায় বাস করিত। মহারাজা নিজে অতিশয় মহানুভব। তাই তিনি লজ্জাবোধ না করিয়া এইগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্প্রদায়ের নাম উর্শু জাতি। এই উর্শু বালকগণের শিক্ষার জন্য মহারাজা একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।

মহারাজের বিশেষ চেষ্টায় তাহারা এখন অনেক সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া ষ্টেটের নানা উচ্চপদে কাজ করিতেছে।

মহীশূরে একটী বৃটিশ রেসিডেণ্ট ও ক্যাণ্টনমেণ্ট আছে। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যে শিক্ষা-প্রচারে খুব সাহায্য করিতেছে। রাজ্যে শতকরা প্রায় ১০জন লোক শিক্ষিত। প্রায় ৫।৬ হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাধীন। ষ্টেটে ৪।৫টী কলেজ ও২০।২৫টী স্কুল আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, মূক ও বধির ও অন্ধদের জন্য স্কুল, প্রভৃতি আছে। বাঙ্গালোরে প্রসিদ্ধ টাটা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট বিদ্যমান। তথাকার ডিরেক্টর স্যার সি, ভি, রমণ। এখানে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়া হয়।



মহীশূরের সাধারণ দৃশ্য

বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল কলেজে প্রায় ১৫০০ শত ছাত্র, যদিও তথায় আইন বিভাগ নাই। ষ্টেটের দুটী আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ ও হাসপাতাল আছে। চক্ষু রোগের চিকিৎসার জন্য এখানে একটী বৃহৎ হাসপাতাল আছে। উহা কলিকাতার মেয়ো হাসপাতাল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। বাঙ্গালোরে ১৭০০ মোটর ও অন্যত্র বাহিরে প্রায় ২০০০ মোটরগাড়ী আছে। ষ্টেটের সর্ব্বত্র মোটরবাস যাতায়াত করে। বাঙ্গালোরের লোক-সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ। শহরের রাস্তাগুলি বেশ বড় ও সুন্দর। মহারাজার এক ভগ্নী যক্ষ্মা রোগে মারা যান। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটী যক্ষ্মা হাসপাতাল তিনি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। উহা ভারতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ টি, বি, হাসপাতাল। এখানকার আবহাওয়া অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ভারতের নানা স্থান হইতে যক্ষ্মা রোগীগণ এখানে চিকিৎসিত হইতে আসে। কোচিন, বরোদা ও হায়দরাবাদ প্রভৃতি ষ্টেটের ন্যায় মহীশূরে ৩৭৫ মাইল বিস্তৃত ষ্টেট্ রেলওয়ে আছে। রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৩॥০ কোটী টাকা। তার মধ্যে ২৮ লক্ষ টাকা রাজপ্রাসাদেই ব্যয় হয়। ললিতাদ্রি নামক ছোট পাহাড়ের গাত্রে ললিত মহল নামে একটী বিশাল প্রাসাদ আছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। একমাত্র Ball Room নির্ম্মাণ করিতেই ৮।১০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। ভাইসরয়, গভর্ণর ও অন্যান্য ষ্টেটের মহারাজাগণ আসিলে এইখানে থাকেন। ষ্টেটের প্রায় ৫০০০ সৈন্য আছে। রাজকীয় মোটরগ্যারাজে প্রায় ১০০ ভাল ভাল মোটর আছে।

ষ্টেটে পাগলা গারদ ও কয়েকটী ভাল ভাল হাসপাতাল আছে। মহীশূরের চন্দন কাঠ জগৎ-প্রসিদ্ধ। চন্দন-ফাক্টরীতে প্রত্যহ ২॥০ মণ চন্দন তৈল তৈরী হয়। মহীশূরের চন্দন-সাবান, ধূপকাঠি ও রেশমী কাপড় পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানী হয়। বিদেশ হইতে চন্দনের ধূপকাঠি, চন্দনের তৈল প্রভৃতির জন্য প্রায়ই অর্ডার আসে। চিনি, কাপড়

ও সাবানের কারখানা মহীশূরের নাম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। মহীশূরে একটী বড় ব্যাঙ্কও আছে। উহার রিজার্ভ ফণ্ড প্রায় বিশ লক্ষ। মহীশূর ও বাঙ্গালোর শহর অতি সুন্দর। সহর দুটীতে বড় বড় পার্ক অনেক আছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও প্রচুর। ষ্টেটের হাইকোর্ট, এসেম্ব্লি ও সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি বাঙ্গালোরে। বাঙ্গালোর ভারতের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যকর শহর। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চ বলিয়া উহার আবহাওয়া শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের দুইটী আশ্রম আছে মহীশূর ও বাঙ্গালোরে। মিশনের কাজকর্ম্ম মহারাজার



রেলওয়ে-সুড়ঙ্গ

সহায়তায় অতি উত্তমরূপেই চলিতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন দুটী ছাত্রাবাসও আছে। মিশনের কার্য্যে ষ্টেটে হিন্দু-ধর্ম্মের পুনর্জাগরণ অনেক পরিমাণে হইয়াছে। মিশনের সাধুগণ স্কুল, কলেজ ও হোষ্টেল প্রভৃতি স্থানে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যাদি দ্বারা সমাজের ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে অনেক সাহায্য করিতেছে। মহারাজা মিশনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পিতার ন্যায় মিশনের ভক্ত।

মহীশূর শহরের পশুশালাটী দর্শনযোগ্য। কলিকাতার চিড়িয়াখানার ন্যায় উহা বৃহৎ না হইলেও উহার কিছু বিশেষত্ব আছে। উহা ষ্টেট্ পরিচালিত নহে—মহারাজার প্রাইভেট সম্পত্তি। এখানে cross breedএর খুব experiment হইতেছে। সিংহ ব্যাঘ্রী ও সিংহী ব্যাঘ্রের মিলনের দ্বারা একটী নতুন জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। নাম Liger (লাইগার) —Tiger নহে। এইগুলি পৃথিবীর অন্যান্য পশুশালায় খুব উচ্চ দামে বিক্রয় হইতেছে। প্রাচ্য হইতে পশ্চিমে নানা জীবজন্তু চালান দিয়া কলম্বোতে জনৈক জার্ম্মাণ ব্যবসায়ী খুব লাভবান হইতেছেন। তাহা ছাড়া এখানে deer ও antilope, মহিষ ও গরু প্রভৃতির cross breedএর চেষ্টা হইতেছে। নানা প্রকার bison, bear, Hippopotemus, Zebra, wate-dog প্রভৃতি আছে। একটী arctic Bear দেখিলাম। ঠিক ভল্লুকের মত, তবে বড় সাদা, কাল নহে। তার জন্য বরফের জল রাখা হইয়াছে ; ঠাণ্ডা ব্যতীত থাকিতে পারে না। এখানে একপ্রকার Iyer monkey আছে—মান্দ্রাজের বাবুনের মুখের মত মুখটী ও খুব ধূর্ত্ত।

মহীশূর শহরের আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান জগমোহন চিত্রশালা ও Indian Art Gallery. একটী প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদে এই museumটী অবস্থিত। মহীশূর রাজ বংশের সিংহাসনারূঢ় মহারাজগণের নানাপ্রকার ছবি ও ব্যবহৃত দ্রব্য এখানে আছে। এখানে বাঙ্গালীর স্মৃতি ও কীর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলাম। মনে খুব আনন্দও হইল। হায়! আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি আবার কবে তোমার সুদিন ফিরিয়া আসিবে! কোননগরের বিজলীনাথ বসু মহাশয়ের কেবল paper ও knife দ্বারা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত উপনিষদের প্রসিদ্ধ শ্লোক "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থু॥ বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুং এতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। কাচ ও ফ্রেমে বাঁধান হইয়া দেওয়ালে টাঙ্গান আছে। এতদ্ব্যতীত অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, সারদা উকিল, রণদা উকিল, বি, সেন, দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, মধুসূদন সরকার, প্রমদা চট্টোপাধ্যায়, মণীষি দে, অজিতকুমার রায়, প্রভৃতি অনেক বাঙ্গালী শিল্পীগণের অঙ্কিত ছবি দেখিয়া আনন্দে ও গৌরবে মন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। তাহা ছাড়া মহীশূরের

বিখ্যাত শিল্পী ভেঙ্কটাপ্পার অনেক ছবি এখানে আছে। ভেঙ্কটাপ্পা শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য। তিনি কলিকাতায় অনেক দিন ছিলেন এবং বাঙ্গালা জানেন। তিনি অবিবাহিত ও ঋষির মত পবিত্র জীবন যাপন করেন। তিনি প্রতিভাশালী শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার ছবি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যে চরকাটী মহারাজাকে উপহার দিয়াছিলেন —তাহা এই যাদুঘরে সুরক্ষিত আছে। একটী বৃহৎ বাদ্য-যন্ত্র আছে যাহাতে নানা প্রকার বাদ্য ও সুর একসঙ্গে কনসার্টের মত বাজে। হাতির দাঁতের Toy palace ও চন্দন কাঠের নানা প্রকার জিনিষপত্র এখানে দেখা যায়।

মহীশূর শহরকে একটী city of palaces বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ও নবীন রাজপ্রাসাদ, মহারাজার ছোট ও বড় বোনের জন্য দুটী প্রাসাদ। ললিত মহল, প্রাসাদ অফিস প্রভৃতি বহু বৃহৎ প্রাসাদে শহরটী পূর্ণ। প্রধান প্রাসাদেই অর্দ্ধেক শহর ভরিয়া আছে। দরবার গৃহও অতি মূল্যবান আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ। মহীশূর রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। কৃষ্ণরাজ সাগর তাদের অন্যতম। উহা ভারতের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ—এমন সিন্ধুদেশের সুকুর হ্রদও এত বড় নহে। মিশর দেশের আসুয়ান ড্যাম—যাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ হ্রদ—তাহা অপেক্ষা বড়। কাবেরী নদীর জল আটকাইয়া চাষ আবাদের জন্য এই হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। নদীর উভয় পার্শ্বে ফল, ফুল ও শাকসব্জীর আবাদ হইতেছে। রাজ্যের ইলেকট্রিক Power House—যাহা শিবসমুদ্রং নামক স্থানে অবস্থিত, তাহাও কৃষ্ণরাজ সাগরের দ্বারা পরিচালিত। ড্যামটী ১২৪ ফিট উচ্চ এবং ৬৫৫০ ফিট লম্বা। ১২৫০০০ একর জমির এই জলে আবাদ হয়। মহীশূর রাজ্যের এই একটী আশ্চর্য্য বা miracle বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শারাবতী নদীর পার্শ্বে গারশোপা জলপ্রপাত (falls) মহীশূরের আর একটী দ্রষ্টব্য স্থান। উহা শিমোগা রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত। জলপ্রপাতটী ২৫০ গজ চওড়া। ৯৩০ ফিট উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে জল পতিত হয়। এইরূপ সুন্দর ও বৃহৎ জলপ্রপাত পৃথিবীতে অল্পই আছে। শীতকালে উহার দৃশ্য অতিশয় মনোরম। কোলারের পৃথিবী-বিখ্যাত স্বর্ণখনি এই মহীশূরেই আছে। এইরূপ বৃহৎ স্বর্ণখনি ভারতে আর নাই; এমন কি, পৃথিবীতে খুব কমই আছে। মাসিক ত্রিশলক্ষ টাকার স্বর্ণ এখানে প্রস্তুত হয়। উহা একটী বিদেশী কোম্পানীর অধীন। উহা হইতে মহীশূর গভর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হয়। শ্রবন-বেলগোলার গোমতেশ্বর নামক জৈনধর্ম্মাচার্য্যের মূর্ত্তি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। উহা ৫৭½ ফিট উচ্চ। এইরূপ বৃহৎ ও বিশাল প্রস্তর-মূর্ত্তি অন্যত্র নাই। চামুণ্ড রায়ের আদেশে উহা ৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বেলুড় ও হালিবিড নামক স্থানে আরও অনেক বৃহৎ মন্দির আছে। এই সব মন্দিরের ভাস্কর্য্য, কারু ও শিল্প-কার্য্য অতুলনীয়। প্রায় ৩য় শতাব্দী হইতেই এই স্থানে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখনও কিছু জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী প্রজা মহীশূর রাজ্যে আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে



কাটেরী জল-প্রণালী

ইস্‌লাম ও ১৭শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মহীশূরে প্রবেশ করে। রাজ্যে এখন বহু খ্রীষ্টান আছে। বীর শৈব ধর্ম্ম, শৈব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্মও এখানে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মহীশূরের কথিত ও লিখিত ভাষা কানাড়ী। কানাড়ী ভাষায় এখন খুব জাগরণ আসিয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের অনেক পুস্তক কানাড়ীতে অনূদিত হইয়াছে। কানাড়ী ভাষায় অনেক দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ প্রভৃতি কানাড়ীতে অনু-বাদিত হইয়াছে। অনেকে বাঙ্গালা শিখিয়া কানাড়ী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত বেদান্তের আচার্য্য মাধব, রামানুজ ও শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের প্রধান মঠ মহীশূরে আছে। দশনামী সন্ন্যাসীদের

গুরুস্থান শৃঙ্গেরী মঠ ও সারদাপীঠ তুঙ্গা নদীর তীরে অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। ভারতের চতুঃসীমায়—অর্থাৎ পুরীতে গোবর্দ্ধনমঠ, দ্বারকা ও বদরিকাশ্রমে ও মহীশূরে যে ৪টী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিভণ্ডক ঋষি এই স্থানে অনেক তপস্যাদি করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নামানুযায়ী এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। মহীশূর ও বাঙ্গালোর শহরেও শঙ্কর মঠ আছে। উদিপিতে মাধ্বাচার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের পশ্চাতে প্রকাণ্ড মাধ্ব সরোবর। মন্দিরের পার্শ্বে অনোশাসন ও চন্দ্রমৌলিশ্বরের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরদ্বয়ের চতুর্দ্দিকে আটটা সন্ন্যাসীর আটটা মঠ। মাধ্বনবমী, লক্ষদ্বীপোৎসব, বসন্তোৎসবে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রামানুজের প্রধান মঠ মেলকোটে। মেলকোট অতি মনোরম স্থান। পর্ব্বতশৃঙ্গে নরসিংহ দেবের মন্দির দর্শন করিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়। দিল্লীর কোন বাদশাহের কন্যা সম্পৎকুমার দেবের পূজা করিতেন। বাদশাহের সম্মতিক্রমে রামানুজ উক্ত মূর্ত্তি লইয়া আসিয়া মেল কোটে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাদশাহের কন্যাও ভক্তিবশতঃ এই স্থানে আসিয়া পূজা ও ঈশ্বর-চিন্তায় জীবনপাত করেন। উহার নামে এখনও একটী মন্দির আছে। রামানুজের জীবনকালে তিনি শিষ্যগণের আগ্রহাতিশয্যে নিজের যে মূর্ত্তি শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন প্রায় ১০০০ বৎসর সেই মূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতেছে। মূর্ত্তিটী দেখিলে মনে হয় যেন রামানুজ সাক্ষাৎ বসিয়া আছেন। রামানুজের জন্মতিথিতে এখানে বিরাট মেলা ও উৎসব হয়। রামানুজের সম্প্রদায়ের নাম শ্রী সম্প্রদায়। মহীশূরে অনেক শ্রীবৈষ্ণব আছে। নারায়ণের মন্দিরই এই তীর্থে প্রধান। রামানুজ স্বয়ং এই স্থানে পূজা করিতেন।



জলাশয় ও চামুণ্ডী পর্ব্বতের দৃশ্য—মহীশূর

মহীশূরের আর এক দ্রষ্টব্য হইতেছে শিশু বিহার। উহা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর গোপালস্বামী পি এইচ, ডি মহাশয় উহার প্রতিষ্ঠাতা। এখানে ৩ হইতে ১০ বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখন প্রায় ৮৬ জন শিশু আছে। এই শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী খুব কৃতকার্য্য হইতেছে। মহীশূরে আরও অনেক ঐতিহাসিক স্থান ও স্তম্ভ আছে। এই দেশীয় রাজ্যটীতে এখনও ভারতের গৌরব-রবি যেন কিরণ দিতেছে। বাঙ্গালী ভ্রমণকারীগণ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে আসিয়া মহীশূরে কয়েকদিন কাটাইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সখের শ্রমিক

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(৯)

যৌন-তত্ত্বের অভিজ্ঞতারূপ সোনার উপর মন্দির-মঙ্গলের বন্ধুপ্রীতি ছিল সোহাগা। সে ভাবলে নন্দ-দুলালটা ইষ্টুপিড্—একটা কেলেঙ্কারীর ফলে মিস্ হজপজকেও হারাবে, আর বাঙলার তরুণের মাথা হেঁট করিয়ে দেবে ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজে। তার ফলে তার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা এ ক্ষেত্রে সে কর্ত্তব্য ব'লে নির্দ্ধারণ কর্লে।

কিন্তু তার পরিশ্রমের কোষ্ঠীফল যেন বিস্ময়। তুঙ্গে শনি নিঃসন্দেহ। সে ঠিকানা পেয়েছিল নন্দ-দুলালের কাছে মিস হজপজের গৃহের। প্রথম দিনের প্রহরায় সে দেখলে এক কাবুলীওয়ালাকে সে গৃহ হ'তে নির্গত হ'তে। অনেক ইঙ্গ-ভারতীয় টাকা ধার করে পাঠানের কাছে—মিস বাবা নিশ্চয় তাই করেছে। সে তার সাম্‌নে দেখলে আশা। প্রেমের সঙ্গে কিছু অর্থ দিলে নন্দর প্রেম সার্থক হবে—গগন পবন ট্রামের ঘড ঘড় শব্দ গৌরবে গাহিবে প্রেমের বিজয় গান।

দ্বিতীয় দিন সে মেমের প্রত্যাশায় পাহারা দিলে সেই বাড়ী! দেখ্‌লে কাবুলী—আরও কাবুলী—যে আসে যে যায় সবাই কাবুলী। এবার তার মনে ভীষণ সন্দেহ উপস্থিত হল। কোথায় একটা কি ভ্রম প্রবেশ করেছে তার যুক্তিতে কিম্বা নন্দ দুলালের সমাচার দানে।

তার বুদ্ধি যে পরিমাণে ছিল প্রবল, তার দেহের বল ছিল তার উল্টা পরিমাণে। একটা জলজীয়ন্ত কাবুলী ধ'রে তার কাছ থেকে তথ্য-সংগ্রহ করার মাঝে কতকটা শারীরিক বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আভ্রবে নিয়ম নাই—সখ্য দাবী করে স্বার্থ বলিদান—বন্ধুর কাঁচা মাথা।

তৃতীয় দিনে সে ওরই মধ্যে একটু কম ভীম-দর্শন এক কাবুলীকে একটু দূর থেকে বল্লে—ও আগা সাহেব—এ কিস্‌কা বাড়ী।

—ক্কিস্‌কা ব্বাড়ি।

একবার সে বুঝে নিলে ডেন্‌জার জোন্‌টা কতদূর এবং সে তার বাহিরে আছে কি-না। উভয় প্রশ্নেরই সুবিধা-জনক প্রত্যুত্তর পেয়ে—অবশ্য নিজের মনে—সে আবার তার প্রশ্ন দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করলে।

—ক্কিসকা ব্বাড়ি। আম্মার ল্লোককা ড্ডেরা।

—কোনো মেমসাহেব এ ডেরামে বসবাস কর্ত্তা—

কোনো মেম-সাহেব সেখানে বাস করে না। তারই স্বদেশবাসী গুল্ খাঁ, সানেবাজ খাঁ, গুবগন খাঁ, আট্টা খাঁ প্রভৃতির বাসস্থান সে অট্টালিকা।

এতখানি দুরূহ পরিশ্রমের পর নন্দ-দুলালের সাক্ষাৎ হল তার অভীষ্ট।

—চৌধুরী, তুমি কি মিস্ হজপজের বাড়ী দেখেছ?

—মিস হজপজ? ও, না। পথের অতিথি পথের প্রেম। তার বাড়ী ঢুকে কি তার অশিষ্ট নীচ-মন স্বামীর সঙ্গে বক্সি' লড়ব?

—স্বামী! তুমি না বলেছিলে মিস—

—বলেছিলাম? তোমার কাছে না বলবার কি আছে ভাই মন্দির। মিস্ বজবজ—

—বজ বজ? না হজপজ?

—ঐ তা-ই। মিস্ হজপজ এখন মিসেস্—

—হ্যাঁ!

—আর কি বলব ভাই? সে এখন মিসেস ডায়মণ্ড।

—বল্‌তে যাচ্ছিল হারবার। সামলে নিলে।

সহানুভূতি প্রকাশ কর্লে মন্দির মঙ্গল। বল্লে—এখন উপায়?

—উপায় ক্রিকেট ব্যাট আর টেনিস র‍্যাকেট।

কিন্তু নিম্ন-লিখিত ভাবে ধরা পড়ল সে বিশ্ববিজয়ের কাছে।

সেদিন ২০শে ডিসেম্বর। বৃষ্টির হাওয়া গগনে পবনে। বড়দিনের আমোদের পূর্ব্বাভাষ যেন সহরের সর্ব্বাঙ্গে বড়দিনের রূপ দেখাচ্ছিল ছায়া চিত্রে। সকাল দুপুর ময়দান

ভরে ওঠে মানুষে। সন্ধ্যার সময় ময়দান ভর্ত্তি থাকে চর্ব্বিত আখের টিক্‌লিতে আর চীনা বাদামের খোলায়। ছুটির মাদকতা বটব্যাল সংসারকে আলোড়িত করেছিল। ২০শে ডিসেম্বর রবিবার। সকালে দুলাল গেল বটব্যাল ভবনে।

পূর্ব্ব রাত্রে এরা যেতে চেয়েছিল সে মজা নদীর খাদে যার ভিতর বেড়ালে উপত্যকা-বোরার আনন্দ-লাভ হয় কলিকাতায় বসে। তাদের পুরাতন ড্রাইভার পাড়াগাঁয়ের লোক—কলিকাতার সহরতলীর সৌন্দর্য্যের ঘাঁটিগুলা তার অবিদিত। প্রভাতে তাকে দেখে বটব্যাল পরিবারের সৌন্দর্য্য-পিপাসা জেগে উঠ্‌লো। ড্রাইভারকে বাজার কর্ত্তে পাঠিয়ে তারা দুলালের পরিচালনায় রসা অতিক্রম করে আদি-গঙ্গার খালে পৌঁছিল। মাত্র এক টাকার ওয়াগ্ন আর কুলি-বাবুকে এক টাকা দিতে মিঃ বটব্যালের পেন্সনের থলি বেদনা অনুভব করে না।

বিশ্ব-বিজয়ের বাতিক আছে ছবি আঁকবার। সে ভোরে উঠে একখানা ছবির খাতা আর পেনসিল নিয়ে পুঁটুরের খালের সঙ্গে আদি-গঙ্গার সঙ্গম-স্থল চিত্র কর্ব্বার উচ্চাভিলষিত প্রাণে আদিগঙ্গার খাদে বসে ছিল। মহানন্দে ছুটে সন্ধ্যা ও শান্তি নন্দদুলালের সঙ্গে এসে পড়ল প্রায় বিশুর ঘাড়ের উপর।

—হাঃ বিধাতা।—মনে কর্ল্লে নন্দ-দুলাল।

—ওঃ! ছুঁচো।—মনে কর্ল্লে বিশ্ব-বিজয়।

তার চক্ষের কাতরতা বিনীত ভাবে নিবারণ কর্ল্লে বিশুকে জানাতে যে নন্দদুলাল তার পরিচিত।

—ওপারের ওটা কি কুলিবাবু।—জিজ্ঞাসিল শান্তি খালের ফটক দেখিয়ে।

—ওটা খালের লক-গেট নয় কু-কু কু—

সন্ধ্যা আর স্পষ্ট কুলিবাবু কথাটা উচ্চারণ করলে না। বিশেষ একটা অপরিচিত চিত্রকরের সম্মুখে।

কিছু পরে এসে গেলেন সেখানে উমারাণী আর ইন্দ্রবাবু।

কুলিবাবু তখন লক্‌-গেটের নির্ম্মাণ কৌশল বোঝাচ্ছিল তরুণ বটব্যালদের। গৃহিণী খানিক শুনলে। যখন জলের চাপের সঙ্গে জলের ওজনের এবং তার সঙ্গে কি হারাহারি হিসাবে লৌহ কবাটের প্রতিরোধ শক্তি মাপতে হয়—এই প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেচে বক্তৃতা প্রবাহ, উমারাণী বল্লেন—আমার কুলিবাবার সব বিদ্যাই আছে।

বিশ্ব বিজয় ঔৎসুক্য চেপে রাখ্‌তে পাচ্ছিল না তার মাত্র ৩২ ইঞ্চি বুকের মাঝে।

কুলিবাবু, কু-কু কু, কুলি বাবা! ওরে বাবা! এবার কর্ত্তা বোধ হয় বল্‌বে কুলি-খুড়ো। কিন্তু কর্ত্তা তা বল্লেন না। বল্লেন—আচ্ছা মিঃ কুলি ও খালটা গেছে কোথা?

—ডায়মণ্ড হারবার। ওপারে খালের ধারে ভারি মোলায়েম গ্রাম আছে।

হুঁ! মোলায়েম গ্রাম। বিশু আর আত্ম-সংযম কর্ত্তে বুঝি পারে না।

—ওপারে যাওয়া যায় না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এই যে নৌকা রয়েছে।

কিন্তু ওপারে গেলে গাড়ি আগলায় কে? কল্ টেপবার সদুদ্দেশ্য নিয়ে অনেকগুলা ছেলে বুইককে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কোমরে ঘুনসি বাঁধা একটা শিশু দিগম্বর একবার ভেঁপু টিপে ভোঁ-শব্দ ক'রে ভোঁ-দৌড় দিয়ে পালিয়েছে।

কাজেই তাদের ফিরতে হ'ল।

বটব্যাল-গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করে নগদ এক টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে শেলির কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ঘরে ঢুকে নন্দ-দুলাল দেখ্‌লে তার বিছানায় আড় হ'য়ে শুয়ে বিশ্ব-বিজয় সরকার।

—কাউকে বলেছ না কি?—

—সে নির্ভর কর্চ্চে তোমার ব্যবহারে। যদি কোনো কথা গোপন কর তো অপরের সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তে হবে।

একটা চুক্তি হল উভয়ের মধ্যে। নন্দদুলাল সব কথা বল্‌বে তাকে। বিশু তার গোপন কথা কাকেও বলবে না।

সব কথা শুনে বিশ্ব বিজয় বল্লে—কুলি থেকে ভদ্রলোক হবি কি ক্রমে?

—ও কথা তো ভাববার সময় নাই।

স্থান নাই স্থান নাই ক্ষুদ্র এ তরী
তোমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু এ খেলার শেষ কিসে। এ মজুরির লাভ কি?

—কৃষ্ণ দেখার ফল কৃষ্ণ-দর্শন।

—একেবারে গোল্লায় গেছে।—চরম সিদ্ধান্ত কর্ল্লে মিঃ বিশ্ব-বিজয় সরকার বি-এ।

(১০)

ভূপতি চৌধুরী এবং তাঁর সহধর্ম্মিণীর আন্তরিক আতিথেয়তায় বটব্যাল পরিবার অভিভূত হ'ল। বৃহৎ প্রাসাদের একটা দিক তাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। পুরাতন গালিচাগুলি রৌদ্রস্নাত হয়ে লগুড়াঘাতে পরিষ্কৃত হ'ল। অবশ্য দু'একখানার স্থানে স্থানে টাক পড়েছিল। কিন্তু হ'লে কি হয়? তারা যে প্রাচীন। প্রাচীনত্বই চৌধুরী বংশের প্রথম পরিচয়। চূণ মেখে সারসীর কাচ স্বচ্ছ হ'ল। জানালায় রঙিন পর্দ্দা পড়ল। ভিক্টোরিয়া আমলের কৌচদের অঙ্গে উঠলো নানা রঙের জামা। উক্ত স্বর্ণ যুগের ফুলদানীতে কিন্তু বিরাজিত হ'ল আধুনিক ফুল—গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, জিনিয়া, গাঁদা। আর তারা এখন ঠেস বেঁধে তোড়ার আকার ধারণ করলে না। নব্যভাবে নিজের নিজের বৃন্তে দাঁড়ালো তারা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতায়।

উমারাণীর সুখ্যাতিতে শ্রদ্ধামতী বিন্টুপুরের চৌধুরী-বংশের মর্য্যাদার নিম্মলতা উপলব্ধি কর্ল্লে। কিন্তু চৌধুরী বংশের মর্য্যাদা তার গোপন মনের সিংহাসনের অধিবাসী। সে তাঁর কৃত-কর্ম্মে কতকটা গৌরব দান কর্ত্ত মাত্র। কোনোদিন মুখে সে মর্য্যাদার উল্লেখ করে শ্রদ্ধামতী পরের বিরক্তি বা অসূয়ার সৃষ্টি কর্ত্ত না। তার প্রাণ ছিল সবল, উদার, প্রেমে ভরা। সে অতিথির সেবা কর্ত্ত সেবার প্রীতিতে। কাজেই উমারাণী নিজেকে ভাবতে পার্ল্লে না পর। আর যখন নগ্নদেহ কৃষ্ণকায় গামপাট্টাধারী ভৃত্যেরা কোনো ভার বহন করে নিয়ে আসতো তখন সন্ধ্যারাণী বটব্যালের নয়নপথে ভেসে আসতো একটি মজুরের মুখ—যার বর্ণ শ্যাম,—যার সুদৃঢ় মাংসপেশীগুলার একটা সহজ কমনীয়তা আছে; আর লজ্জিত হ'লে যার মুখে আবিরের রঙ্ ছড়িয়ে পড়ে। যখন এ বাড়ীর সরলা গৃহকর্ত্রী মায়ের আদরে বুকের ভেতর তাকে টেনে নিত, তখন কোনো সন্দেহ তার তরুণ প্রাণে ওঠেনি যে এই স্নেহ-ভরা কোমল বুকের মাঝে মানুষ হ'য়েছে সেই কু—কু—কু—কুলিবাবু যার মৌলিক আচরণ তার প্রাণে—যাক। সে জানতো সে ভাবটা ভ্রাতৃভাব যার সঙ্গে মেশানো ছিল করুণা—কলিকাতার গোয়ালার দুধে জলের সংমিশ্রণের মত।

পুকুরপাড়ে বসে দুই গৃহিণীতে গল্প হ'চ্ছিল। সেদিন বড়দিন। প্রভাতের রৌদ্র এসে জলের ওপর পড়েছে, কিন্তু উত্তরের হাওয়াটার ব্যবহার ছিল নিষ্ঠুর। কাজেই উঠন্ত-রৌদ্রে পিঠ্ দিয়ে যতক্ষণ বসে থাকা যায় ততক্ষণই ভাল।

—কি খাসা আপনার মেয়েটি। যার ঘরে পড়বে সে উদ্ধার হ'য়ে যাবে, দিদি।—

—ও কথা মোটেই ভেব না ভাই বৌ-রাণী। এমন জাত বাঙ্গালী নয়। এরা কথা কয়ে দেশের রাজা হয়। ছেলের বিয়ের সময় কিন্তু কামড় সেই আগেকার মত।

—কি দুঃখের কথা। আমার যখন বিবাহ হয়—ইত্যাদি সেই গল্প যেটা এর পূর্ব্বে তিনশো সাতাশ বার সে করেছে।

—এই ভাবনা ভাই উষার কথা। ছেলে বিলেত ফেরত প্রফেসার—উষা আমার পাশ করেনি। নগদ নেয়নি বটে। উনি দেনা করে তাকে সোনায় জহরতে মুড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা কি ভাই কম্ শুনেছি?

—ওমা! কি বিপদ।

—আর এটা বুঝিনি ছেলের মা মেয়ের মা কথার তাৎপর্য্য। বেয়ান খুব ভাল। ছেলের এক পিসি আছে সে কথায় কথায় আমায় মনে পড়িয়ে দেয় যে আমি মেয়ের মা। মেয়ের মা কি চোর না কি রে বাবা!—

—যে ছেলের পিসি আছে তার সঙ্গে মানুর বিয়ে দেবেন না।

উমারাণী হাসলেন। এক পা জলে বাড়িয়ে আবার নিমেষে পা তুললেন শুকনো সিঁড়িতে। শ্রদ্ধামতী লক্ষ্য করে বল্লেন—চলুন দিদি গরম জল করে দিই। সত্যি অসুখ করবে এত সকালে পুকুরে স্নান করলে। উমারাণী তা শুনলেন না। যদি ঘরেই স্নান কত্তে হবে তা হলে পাড়াগাঁয়ে আসবার আবশ্যক কি ছিল?

মহা-শব্দে সন্ধ্যা ও শান্তি এলো সেখানে। শান্তির পিছনে সন্ধ্যা। উভয়েই দৌড়াচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটা কাচের গেলাস। গেলাসে অস্বচ্ছ জল। শান্তি

এসে মাতাকে প্রদক্ষিণ ক'রে জলের দিকে দাঁড়ালো। শ্রদ্ধামতী শান্তুকে ধরে বল্লে—কিসের ঝগড়া মা?

তার গোলাপী গাল দুটা, তার দেহের সৌষ্টব শ্রদ্ধামতীর মনে অনেক কোমল বৃত্তিকে জাগিয়ে তুলছিল।

উভয়ে সমস্বরে বল্লে—দেখুন না কাকীমা। কাকীমা দেখলেন অর্থাৎ মনের চোখে আড়াই মিনিট প্রশ্নোত্তরের পর। এক ঝারি খেজুর রস এসেছিল। শান্তি এক গ্লাস ঢেলে নিয়েছে, সন্ধ্যার ভাগ্যে পড়েছে সিকি গ্লাস—তাও তলানী।

যবে থেকে গিরি-গুহাবাসী আদিম মানব পুরুষ প্রভু আর ভোগী। সে নারীকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বটে, কিন্তু সুবিধা পেলেই ভাল খায়, নরম বিছানায় শোয়। নব্য-নারী সন্ধ্যা সে অধিকার নরকে বিশেষ চার বছরের ছোট ভাই রূপ নরকে দিতে মোটে নয় সম্মত। বুদ্ধিতেও নর বড়। সুতরাং মামলা শুনানীর অবসরে শান্তি গেলাসের খেজুর রস প্রায় তিন ভাগ পান করে নিলে।

—দেখুন কাকীমা—

কিন্তু সে দেখার পর হাসি অনিবার্য্য। তিনি গাল ধরে গলা ধরে সন্ধ্যাকে সন্ধ্যার খেজুর রসের উৎকর্ষতা বুঝিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সন্ধ্যার রস পুরো এক গ্লাস তাকে পান কর্ত্তে দেবেন। শান্তি বাকিটুকু শেষ করে বল্লে—আর আমায়।—

—এক ফোঁটা না। কেমন কাকীমা?—

—না দেবেন না?—

কিন্তু এ ঝগড়া থেমে গেল দাসী বিন্দুর আগমনে। সে সংবাদ দিলে—আজ বিকেলে দাদাবাবু আসবেন।

এত সুখের মধ্যে বিষাদ ছিল শ্রদ্ধামতীর মনে দাদাবাবুর অনুপস্থিতির। পুত্রের আগমন সমাচারে তিনি অতি মাত্রায় আনন্দিত হলেন। স্বর্গ হতে অরুন্ধতী শচী প্রভৃতি পাকা গৃহিণীরা যদি সে সময় নীচের দিকে তাকাতেন তো ঈর্ষান্বিতা হতেন। ভাবতেন স্বর্গ কেবল স্বর্গেই থাকে না—মর্ত্তেও স্বর্গ আছে।

বিন্দু আরও সংবাদ দিলে। দাদাবাবুর সঙ্গে দু-তিনজন বন্ধু আসবেন। ষ্টেশন থেকে এ-যোল মাইল দাদাবাবু মোটরে আসবেন না—হাতীতে আসবেন। হালিম মাহুৎ জঙ্গ বাহাদুরকে নিয়ে রাত্রিকালেই রওয়ানা হ'য়েছে।

শান্তি বল্লে—আমি হাতী চড়ব। কাল চড়া হল না,—আজ না।

শ্রদ্ধামতী বল্লেন—আজ দাদা আসছেন। কাল খুব হাতী চড়াবে। নৌকা চড়াবে। একটা মাত্র ছেলে এমন ডান-পিটে দিদি কি বল্ব।

সন্ধ্যা ভাবলে এ ডান-পিটে না এলে মন্দ হ'ত না। এতখানি স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার হবে সে একটা প্রতিবন্ধক। আর যদি সে মুখের দিকে অসভ্যের মত তাকায়—মাগো!

(১১)

ডান-পিটে ছেলের মাতৃভক্তি অকস্মাৎ সজাগ হবার একটা কারণ ছিল। ২৪ ডিসেম্বর বটব্যালদের বাড়ী গিয়ে সে শুনলে বটব্যাল মশায় স পরিবারে প্রবাস-যাত্রা করেছেন। কোন্ দেশে গেছেন কেহ জানে না। তবে তাঁরা গেছেন রেলে—সে রেল ছাড়ে শিয়ালদহ হতে।

এ সমাচারে প্রেমিক শ্রমিক প্রথমটা একটু নিরাশ হ'ল যেমন হয় সব গল্পের নায়ক। কিন্তু ধীরে ধীরে তার নিজের অবস্থাটা তার সঠিক চিত্র প্রকাশ কর্ল্লে তার মনের মাঝে। পরের পিছনে এমন করে ঘুরে বেড়াবার বোকামী সে উপলব্ধি করলে। সন্ধ্যা কোনো দিন তার হবে না, হতে পারে না। বটব্যাল কোন্ জাতীয় এতাবৎ কাল তাদের সঙ্গ সুখের নেশায় মসগুল হ'য়ে, সে সংবাদও সে সংগ্রহ করে নি। তার আসল স্বরূপ জানলে তারা তাকে ভাববে প্রবঞ্চক, বকাটে। আর সে যদি শ্রমিক থেকে যায় তো জজের কন্যা তার লাভ হবে না। তার ব্যথিত প্রাণ তাকে দেখালে সেই বিবাহ বিরোধিনী সভার গণ্ডগুলে তরুণদের। আজ তারা সুখী আর সে—তার প্রাণে একটা ফাঁকের সৃষ্টি হ'ল। বিপন্ন নাবিকের মত তার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় অন্বেষণ কর্ত্তে লাগলো।

সেই মুহূর্ত্তে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে রঙীন হয়ে ফুটে উঠ্লো একখানি স্নেহভরা মাতৃ-মুখ। স্নেহ ভাগীরথীর প্রবাহের স্মৃতি তাকে পবিত্র কর্ল্লে। তার পর দেখলে সে মানস-নেত্রে সেই বাণী-মন্দিরের ঋত্বিককে—অনন্ত সরলতা যার সহজ প্রবৃত্তি, ধপ্ ধপে সাদা জ্ঞানের আলোয় সে সদা সমুজ্জল। ঘুম-ভাঙ্গা কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাকে অস্থির করলে। পথশ্রান্ত গৃহহারা পথিক—আজ গৃহের শান্তি তাকে আহ্বান কর্চ্ছিল একমুখ আশ্বাসবাণী নিয়ে।

বিশ্ব-বিজয় বহুদিন হ'তে বিণ্টুপুরে যেতে চায়; আর চায় যাদবপুরের স্থাপত্য-বিদ্যার শিক্ষানবিশ নাটুকে অরুণ-কিরণ। সে তাদের সংগ্রহ করলে। তারা হাতী চড়লে সুখী হবে। পিতাকে তারে সংবাদ দিলে। সংক্ষেপে আড়ালে বিশুকে নৈরাশ্যের সংবাদ দিলে। পিতার জন্য কতকগুলা পুস্তক ক্রয় করে ঘরের ছেলে ঘরের দিকে যাত্রা কর্ল্লে—রাত্রের ট্রেণে। ট্রেণ, ষ্টীমার,—ট্রেণ শেষে বেলা দশটার সময় বাড়ীর কাছে ষ্টেসনে পৌঁছবে বিণ্টুপুরের ষোল মাইল দূরে। রাত্রি বারোটায় তার পেলেন ভূপতিবাবু। আনন্দে তখনই মাহুতকে হুকুম দিলেন হাতী নিয়ে যেতে। ভোরে সংবাদ পাঠালেন তিনি নফরের দ্বারা বিন্দুকে, বিন্দুর দ্বারা স্ত্রীকে। অতিথিরা আছেন বলে তিনি অন্দর-মহল সম্বন্ধে পুরাতন মোগলাই নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

তরুণত্রয় সারারাত ট্রেণে নিদ্রা গেল না। তাদের প্রকোষ্ঠে অপর একটি যুবক ছিল। সে পান্নাদার সাল, নূতন পাম্পস্ জুতা, সার্জ্জের কোট, স্কার্ফ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত।

অরুণ বল্লে—মন্দির নাই সাইকো-এনালিসিস করে কে? এ নিশ্চয় শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে।

—পোষাক পরিচ্ছদ অন্ততঃ শীতের তত্ত্বে পাওয়া।—

গণ্ডগোলের ফলে নন্দ-দুলালের ভাঙ্গা প্রাণ ধীরে ধীরে জোড়া লাগছিল। সে বল্লে—আচ্ছা পরীক্ষা করা যাক্।

জামাই-বাবুকে শুনিয়ে বল্লে—কি দুর্ভাগ্য ভাই। হাতের বিয়ে এমন করে ফস্কে যায়। ওঃ!

অরুণ-কিরণ বল্লে—ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

কেন বল্লে তা সে জানে না। কথাগুলা সুরে গাঁথা যায় বোধ হয় সেইজন্য।

—বল কেন? বৃত্তি বাছা শক্ত কাজ। যৌবনে যদি পুরুত-মশায় স্থির কর্ত্তেন পৌরোহিত্য কর্ব্বেন কি বাঁশবাজী কর্ব্বেন উদরান্নের জন্য, তা হলে আমার আর হাতের বিয়ে ফস্কায় না। উঃ!

এবার জামাইবাবু বল্লে—কি ব্যাপার মশায়?

—কেন বলেন মশায়। আমি তো বর-বেশে বিবাহ সভায় গেলাম। পুরোহিত মশায় এই আসেন এই আসেন। শেষকালে তিনি এসে পৌঁছালেন না। লগ্নভ্রষ্ট হলাম। পৌষ মাস পড়ে গেল, বিবাহ আর হল না।

—বলেন কি? কেন অন্য পুরোহিত।—

—আসছেন আসছেন করে সময়ে এলেন না। নূতন পুরোহিত বাহাল কর্ব্বার সময় রইল না। বিজ্ঞাপন দিলে দরখাস্ত পড়তো তো দু'হাজার গ্রাজুয়েট্ পুরোহিতের। তার পর বাছাই ছাঁটাই করা তাতেও লগ্ন স্থানান্তরিত হত।—

সকলে সম-বেদনা জানালে। দুলাল বল্লে—ব্যাপারটা তুচ্ছ। আমার বিবাহের মন্ত্র পড়বেন বলে তিনি মাচা থেকে পুঁথি নামাচ্ছিলেন। একখানা জলচৌকির উপর টুল তার ওপর পিঁড়ে দিয়ে বেঁটে মানুষ মাচাতে উৎকৃষ্ট পুঁথিখানিতে হাত দিয়েছেন, এমন সময় এক নেংটি ইঁদুর পুঁথির ভেতর থেকে লাফিয়ে পড়লো। পুরোহিত মশায়ের বিড়াল নিরামিষ-ভোজী। বহুদিন পরে একটু আমিষ আহারের সুযোগ বুঝে তার ভাগ্নের মত বিক্রমে মারলে লাফ। তার পর কি হল সে সংবাদ সঠিক পাবার উপায় নাই। মোটের উপর পুরোহিত মশায়ের পা গেল ভেঙ্গে; আরও কি কি দুর্ঘটনা ঘট্‌লো—তার মধ্যে প্রধানটা হচ্চে আমার আইবুড়ো নাম না খণ্ডানো।

অরুণ বল্লে—নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা রে দূত!

হাতীর পিঠে নিজেকে বেশ সামলে নিয়ে বিশ্ব-বিজয় বল্লে—আচ্ছা বলতে পার এত রোলেস রয়েস, রেসের ঘোড়া সব থাকতে ইন্দ্র রাজা কেন হাতী চড়তো।—

ইন্দ্রের নামে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস দুলালের শ্বাসনালীর ভিতরের বিশুদ্ধ অম্লজানের ভিড় ঠেলে উপরে ঘননীল আকাশে মিলিয়ে গেল। হলেই বা আরোগ্য পথের ঘা, খোঁচা তাকে নিশ্চয়ই অসুস্থ করে। বিশ্ব-বিজয় বন্ধু-প্রেমিক—সে জিভ কেটে ক্ষমা প্রার্থনা কর্ল্লে। ইন্দ্র-রাজাও এই গোলদীঘির অসুরদের বাক্য-বাণ হতে পরিত্রাণ পেলেন।

যে কখনও হাতী চড়েনি তার পক্ষে ষোল মাইল হাতীর পিঠে চড়ে অমিত্রাক্ষর গৈরিশিক বা মাইকেলি ছন্দে কথা বলা শক্ত। অরুণ-কিরণের কাব্য জ্যোতি ক্রমশঃ ম্লান হচ্ছিল। চারিদিকে সরিষার ফুল, কপির ক্ষেত্র, জলের ধারে কাদা খোঁচার ভয়ের ডাক—ক্ষিপ্র টং টং টং টং। মাঝে মাঝে কাঠঠোকরা ঝুঁটি ফুলিয়ে গাছের ফাটলে ঠোঁট ঠুক্‌ছে—আনন্দ ঝাঁক বেঁধে এসে প্রেমিক দুলালকে মুগ্ধ কচ্ছিল। কিন্তু মনের একটা সুর বল্‌ছিল—আহাঃ!

স্বভাবের তারের সঙ্গে তার হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা—সে যদি এসব দেখতো।

অরুণ একবার বলে উঠেছিল—রৌদ্র মাথানো অলস বেলায়—কিন্তু হাতী একটা বকুল গাছের ডাল ভাঙ্গার চেষ্টায় নড়ে উঠে তাকে চুপ করিয়ে দিলে।

যখন তারা বাড়ী পৌছাল বেলা প্রায় তিনটা। তখন বটব্যালেরা কপট নিদ্রায় নিজেদের কক্ষে শায়িত। বিদেশী ছেলে ঘরে আসছে—মা-বাপের সে আনন্দ নীরবে ভোগ করা উচিত। তাদের ছেলে একদিন ড্রেস্‌ডেন থেকে এমনি আনন্দের পশরা নিয়ে ঘরে ফিরবে। চীনা মাটির বাসন দেখলে যাদের প্রাণে পুত্র-স্নেহ জেগে উঠতো, অন্যের ঘরে-ফেরা পুত্র তো তাদের প্রাণে বিরহ জাগিয়েই তুল্‌বে।

দুলু একেবারে গিয়ে মার পায়ের ধূলা নিলে।

—দুষ্টু ছেলে ছুটিতে আসবিনি বলেছিলি না-কি? তুই কেনরে এমন ডান-পিটে।—

—মা, দুজন বন্ধু এনেছি; তাদের কাছে বলো আমি শান্ত-শিষ্ট। কারা সব এসেছে না-কি মা?—

—হ্যাঁ তোর জ্যেঠা মশায়ের বন্ধুরা। তোরা তিনজনে যে চেঁচাচ্চিস্ তাঁদের ঘুম না ভাঙ্গে।—

কর্ত্তা এলেন। নন্দ-দুলাল পায়ের ধূলা নিল। বল্লে—বাবা আপনার জন্য অনেকগুলা খৃষ্টমাস বার্ষিক এনেছি।

—দেখেছ তোমার ছেলের ঘুঁষের ব্যবস্থা!—

জননী জিজ্ঞাসা কল্লেন তাঁর জন্য পুত্র কি উপঢৌকন এনেছে।

—মা, ভাল কাশ্মীরী জাফরান আর মুলতানী হিং। অনেক ফল এনেছি মা—ন্যাসপাতি, আপেল, বাদাম, পেস্তা আর চন্দনের ধূপ।

সত্য এ মিলনে বাহিরের লোক থাকলে অপরাধী হত।

সে অরুণ-কিরণের উল্লেখ করলে, পরিচয় দিল। তার সঙ্গে ঠিক কর্ব্বে কোথায় বিজলী-ঘর হবে। সে ধানের কল বসাবে। তার জন্য যতটা বিজলী উৎপাদিত হবে তার ঝড়তি পড়তিতে তাদের বাড়িতে আলো-পাখা হ'য়ে যাবে।

—আচ্ছা যা এখনি স্নান ক'রে আয়। আর ছেলে দুটোকে নাইয়ে নিয়ে আয়। স্নানের ঘরে—

—মা, একটু পুকুরে নাইব।

—না। মুক্কুন্না। ঠাণ্ডা লাগবে। কাল বিবেচনা করা যাবে তোর দরখাস্ত।—চৌধুরী মশায় বল্লেন। তিনি মানস-চক্ষে দেখছিলেন লাইব্রেরী ঘরে বিজলী-পাখা ঘুরচে। এমন না হলে ছেলে! কে বলে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে গোলাম-খানা।

'তিনটে ছেলে' ভোজনান্তে মার অনুমতি নিয়ে ছোট মোটরে মহেশপুরের বিল দেখ্‌তে গেল। পথে বিশ্ব-বিজয় বল্লে—অমন মা-বাপের তুই এমন ছেলে হলি কি করে রে?

—সংসর্গ দোষাৎ—বল্লে অরুণ।

—খারাপ ছেলে কেমন করে?—জিজ্ঞাসিল নন্দদুলাল।

—কু—কু—কু—বলে বিশ্ব আবার জিভ্‌ কামড়ালে।

অরুণ বল্লে—দূর বোকা—সহরের ভূত। শীতকালে কি কোকিল ডাকে?

—মজা নদীর খাদের কোকিল ডাকে।

(১২)

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার দুই পরিবার একত্র হ'ল—অর্থাৎ মেয়েরা বসলো পুকুর ধারে; উভয় কর্ত্তা বসিল বাহিরের বাগানে।

পুত্রের প্রসঙ্গ শতমুখে কহিলেন শ্রদ্ধামতী। সন্ধ্যার ভাল লাগলো না তার নাম—নন্দ-দুলাল তো নাম হয় অন্ততঃ ঠাকুরদাদাদের। বি-এসসি পাশ করা ছেলের দুলু, দুলি, দুল্লি সব আদরের নামও করালে তার হাসির উদ্রেক।

তোমার ছেলেকে তো ভাই আর খেটে খেতে হবে না। আমার নন্দ-দুলাল যে ফিরে এসে কি করবেন তাই ভাবি।

—আমার দুল্লিও বলে খেটে খাবে। দেশের ধান সব কিনে কলে ভানবে। আক্ মেরে চিনি করবে। আরও কি সব করবে। আমি বলি দেখিস যেন কর্ত্তাদের নাম ডুবাসনি।

বংশ-মর্য্যাদার কথা সে খুব মোলায়েম করে বল্লে পাছে দিদি অপরাধ নেন।

—তা আজকালকার ঐ সব হ'য়েছে।

আম বাগানের পিছনে সূর্য্য ডুবছিল। সন্ধ্যা একটা সন্ধ্যার কথা মনে কল্লে যেদিন গৌরবের লাল নিশান উড়িয়ে সূর্য্য নারিকেল বনের পিছনে অস্ত গিয়েছিল।

শ্রদ্ধামতী বল্লে—অপরাধ নিয়ো না, দিদি। ছেলেমানুষ বাড়ি এসেছে সঙ্গে আর দুটা ছেলে। কাল সকালে তোমার পায়ের ধূলা নেবে।

বাহিরে ভীষণ একটা শব্দ হল। রাজ্যের কুকুর সমস্বরে না হক সম-সময়ে চীৎকার করে উঠলো। গাঁয়ের ছেলেদের কণ্ঠস্বরেও আকাশ হল মুখর। শান্তি ছুটে এলো হাঁফাতে হাঁফাতে—বাঘ মা বাঘের বাচ্ছা দিদি। শীগ্‌গির।

কিন্তু দিদির বাহিরে যাবার উপায় নাই এ দেশে। সে ছুটে দোতালার ঘরে গেল, যার জানালা দিয়ে বাহিরের বাগান দেখা যায়। ভিড়ের মাঝে দুজন কৃষকের কাঁধে একটা বাঁশ। বাঁশে দোদুল দোলায় দুলছে একটা ধামা যার মুখ আর একটা ওল্‌টান ধামা দিয়ে বন্ধ। দুটা ধামা পরস্পর দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। যেন যাদুবলে ধামাটা নাচচে আর তার ভিতর হতে একটা শব্দ আস্‌ছে। শান্তি ধামার খুব কাছাকাছি যাচ্চে আর পালাচ্ছে। হাসিমুখে ভূপতিবাবু সেনাপতির মত আদেশ দিচ্চেন কি কর্ত্তে হবে আর গম্ভীরভাবে দেখছেন জজসাহেব।

নানা প্রকার আধার এলো বাঘের বাচ্ছাকে ধারণ কর্ব্বার জন্য। কোনোটাই মনোনীত হল না। শেষে সিদ্ধান্ত হ'ল যার বাঘ সে এসে যা হয় কর্ব্বে—এখন ঝুড়িটা আমতলায় বাঁধা থাক্‌।

কর্ত্তা বললেন—হ্যাঁরে বাবু গেল কোথা ?

—কি করে বল্‌ব হুজুর। হাওয়াগাড়ি করে বড় সড়ক দিয়ে মহেশপুরের দিকে গেলেন। আমার ওপর হুকুম হ'ল বাচ্ছাকে মুনিব বাড়ি আনবার।—ব্যাঘ্রবাহক বল্লে।

—ওকে ধরলে কি করে ?—

—বুনোদের কাছে মেগে নিলে। ওর গলার দড়ি ধরে দাদাবাবু খেললেন। তারপর আমায় বল্‌লেন—মামুদ ভাই এরে বাড়ি পৌছে দাও।—

—ওর গলায় দড়ি বাঁধা আছে তবে খোলনা ধামা।—

—হুকুম হলেই পারি !

ভূপতিবাবু হাসলেন। বল্লেন—তোদের ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকে। কত বড় বাঘরে ?—

—আজ্ঞে ছাওয়ালটা।—

কি সর্ব্বনাশ ! একটা শিশু বাঘকে এমন করে ধামা চাপা দিয়েছে ! অবলীলাক্রমে মামুদ ঢাকা খুললে—বিড়ালের মত একটা শিশু-বাঘ গুঁড়ি মেরে ঘুরতে লাগলো। গোমস্তা কাজিসাহেব তার গলার দড়ি ধরে তাকে কোলে তুল্‌লে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াতে ছেলের দল পালিয়ে গেল দশ হাত দূরে। কুকুরগুলা ডেন্‌জার জোনের বাহিরে গিয়ে বিকট চীৎকার আরম্ভ করে দিলে। কাজি অ...তঃ তাকে হানতু সহিসের জিম্মা করে দিলে; আর নসা ছুতোরের উপর কড়া হুকুম দিলে যেন কাল ভোরের মধ্যে বাঘের গরাদে দেওয়া খাঁচা তৈরী হয়। নফর দুধ এনে দিলে। হানতু অর্দ্ধেকটা নিজের জন্য রাখলে, আর অর্দ্ধেক দুধের দ্বারা শার্দ্দূল-শিশুর সম্মিলিত ক্ষুধা-তৃষা নিবারণ করলে। এক টুক্‌রো কাঠ নিয়ে সে কেরোসিন তেলের বাক্সর ভিতর ক্রীড়ায় মন দিলে। দেশে শান্তি স্থাপিত হল।

বটব্যালেরা নিজেদের কক্ষে যাবার পর নন্দ-দুলাল বন্ধুদ্বয় সমভিব্যাহারে বাড়ি ফিরলো। সঙ্গে এলো পাঁচটা গুলি-বিদ্ধ হাঁস।

তারা একসঙ্গে ভোজন কর্ল্লে। মা উপদেশ দিলেন। পরের ছেলেদের দেশে এনে এ রকম ক'রে জঙ্গলে ঘোরালে তারা কি ভাববে ?

যাদের ভাবনার জন্য তিনি উদ্বিগ্না, তারা এক বাক্যে বল্লে—এই জন্যই তো এখানে আসা মা।

—আচ্ছা আর এত অনাচারের দরকার কি ? বাঘের বাচ্ছা ধরে আনবার কি আবশ্যক।

—কেন মা বাঘেদের মারা তো কামনা করে যে ওদের বাচ্ছাদের মানুষে ধরে নিয়ে যাক। বাচ্ছাও প্রতিপালন হবে, ওরাও ঝাড়া হাত-পা হয়ে ছাগল গরু ধরতে পারবে।

এবার মা হাসলেন। বল্লেন—সত্যি দুলু নিন্দা হবে। বাড়ীতে কুটুম এসেছে; মনে করবে এদের ছেলেটা ডান্‌পিটে।

অরুণ আর বিশু এই নূতন মার প্রতি ভারি ভক্তিমান হয়ে উঠছিল। অরুণ বল্লে—যাদের এমন মা তাদের কি কেউ খারাপ ভাবতে পারে। কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কদাপি নয়।

তাকে অন্তর-টিপ্পনী দিয়ে বিশু বল্লে—থাম মূর্খ।

নিজেদের ঘরে এসে বিশু বল্লে—অরুণ, তোমার ধারণাগুলাকে পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে।

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চি ন্ন ভাষতে। হাডুডি ঠোক, দেবভাষা বোঝনা তো।

অরুণকিরণ বল্লে—যা অতীতকালে নীতি ছিল এখন তা' দুর্নীতি। অত বড় নিউটন অনসোয়্যানের মধ্যে পড়ে

গেল, আর চাণক্য। এখন কার বাক্য নীতি জানিস্ মূর্খ। যে যত ভুল কোটেসান কর্ব্বে আর দুর্ব্বোধ কথা বলবে সেই জ্ঞানী। দেশের, দশের, সমাজের নেতৃত্বের এক সোপান। বচন বচন বচন। যার বচনের যত মিথ্যা ও ননসেন্সের উপর ভিত্তি, জন-মন-সিংহাসনে তার স্থান তত দৃঢ়।

তারা যখন এই সব চিন্তা-ওস্কানো প্রসঙ্গে ব্যাপৃত, তখন ডুলু জনক-জননীর সঙ্গে গ্রাম-হিতকর প্রসঙ্গে ছিল ব্যাপৃত। গ্রামে কৃষি-বিদ্যালয়, মশা-মারা সঙ্ঘ, ধানমাড়া কল, ইঁদুর-মারা নকুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনে লাইব্রেরির মামুলি শান্তি বিপর্য্যস্ত হ'ল।

আর এঁরা যখন পাঠাগারের শান্তিভঙ্গের উপক্রমে নিযুক্ত, মিঃ ও মিসেস বটব্যাল এঁদের শান্তিময় সংসারকে পুণ্যময় ব'লে নির্দ্ধারণ করছিলেন।

গৃহিণী বল্লেন—কাজ কম্ম করে না, বাড়ীতে বসে থাকা লোক—প্রথমে আমার ভয় হয়েছিল। কিন্তু মানুষটি সদাশিব, আর গিন্নিটি আঃ হাঃ!

কর্ত্তা বল্লেন—আমাদের মত খেটে খাওয়া লোকেদের একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে জীবনে। আমাদের উন্নতিতে আমাদের কম্-ভাগ্যবান আত্মীয়েরা চটে। আবার যারা চটে তারাই আমাদের উন্নত-অবস্থার কাছে হাত পাতে সাহায্যের জন্য। যদি সাহায্য পায় তো শত্রু হয়; আর সাহায্য না পেলে ভাবে সমৃদ্ধ আত্মীয় দুর্ব্বৃত্ত।

গৃহিণী জবাব দিলেন না। কারণ এই হেঁয়ালীর অর্দ্ধেকটা স্বামীর মুখ থেকে নির্গমনের পূর্ব্বেই তিনি হয়েছিলেন নিদ্রা-মগ্না এবং দেখতে আরম্ভ করেছিলেন সেই স্বপ্ন যার শেষে তাঁর কান্তি এক অপূর্ব্ব চক্চকে চীনামাটির পেয়ালায় সোনার রঙের গরম চা তাঁর মুখে ধরেছিল।

যখন পিতার বক্তৃতা মাতার পক্ষে ব্রোমাইডের কাজ কচ্ছিল, তখন সন্ধ্যার চাঞ্চল্যটা একটু বেড়ে উঠেছিল। চঞ্চলতা জন্মেছিল সেই মুহূর্ত্তে যখন কলম্বাসের মত ঘুরতে ঘুরতে সে কাকীমার ঘরে তার বাছা নন্দ-দুলালের চিত্র দেখেছিল। এই ছবিকেই একদিন প্রজাপতি আসন ক'রে শ্রদ্ধামতীর প্রাণে দুষ্ট দুরন্ত সামলানো-যায়-না এমন একটি সবল পুষ্টদেহ নাতীর চিত্র এঁকে দিয়েছিল। কে এ রাজ্যের হাতী-চড়া বাঘের-বাচ্ছা-ধরা ক্রাউন-প্রিন্স যার আলোক-চিত্র মোট-বহা ঘুঁষি-ডোবা দেখানো মোটর সারথিকে হুবহু স্মরণ করিয়ে দেয়—ভাবছিল সন্ধ্যারাণী। কোথা দিয়ে কোথায় কি একটা রহস্যের বেড়াজাল তার শান্ত মনকে ধ'রে টানাটানি করছিল। মাস্তুতো ভায়েরা না-কি এক রকম দেখতে হয়। চোরে চোরে তো মাস্তুতো ভাই হয়; কিন্তু বাঘের বাচ্ছা ধরায় আর আদি-গঙ্গার খাদে যোরায় কি মাসতুতো ভাই হতে পারে। আর যদি হাতী-চড়া ও মোটর সারা ওর নাম কি এ-এ-এক্ হয়? ওঃ—

বালিকার মুখে অব্যক্ত ভাবটা ফুটে উঠ্লো উচ্চারিত—ওঃ—শব্দে।

তখন ভাবছিল শান্তি মজার কথা—বাগ কথার বাঙলা মানে বাঘ আর ইংরাজি মানে ছারপোকা।

ভ্রাতৃ-প্রেম ও ভাষা-রহস্য সম্মিলিত হয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি কল্লে কি ছোড়দিদি, ছারপোকা না-কি?

কিন্তু রহস্য-মীমাংসায় যেমন ব্যাপৃত, ছেলেমানুষি প্রশ্ন—হ'ক না সে আদরের—ক্ষত-মুষল শুকা-পটীর স্থান অধিকার কর্ত্তে পারে না। সন্ধ্যা বিরক্ত হয়ে বল্লে—তোর মুণ্ড।

সন্ধ্যা ভাবলে—কাল চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গবো। কাল ডুলিবাবুকে দেখতেই হ'বে। কুলিতে ডুলিতে কি সম্পর্ক।

ভ্রাতা বল্লে—আচ্ছা ছোড়দি, বাঘটা যদি আমাদের দেয়।

—আঃ! কি বাজে বকে শান্তি। মা আদর দিয়ে এর মাথাটা খেয়েছেন। (স্বগতঃ)

প্রকাশ্যে বল্লে—তোকে খেয়ে ফেলে বাগ-বাজারের রসগোল্লার মত।

কর্ত্তা বল্লেন—হাঁারে তোরা দুজনে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও ঝগড়া করবি।

পাঁচ মিনিট স্থির থেকে শান্তি বল্লে—বিছানায় একটা ডিগ্‌বাজী খাব দেখবে ছোড়দি?

কোনো দিক থেকে উৎসাহ না পেয়ে সে মল্লবৃত্তি দমন করলে। তার শেষ জাগ্রত অনুভূতি ছিল—গুণের কদর নাই।

সকালে সন্ধ্যার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গলো না। কারণ ভোরে উঠে তিন বন্ধুতে গিয়েছিল কোদালঘাটির চরে চকা-চকী মারতে। তাদের নিয়ে গেলেন শ্রদ্ধামতী খানিক-খানিতে জাগ্রত বুড়োশিবের তলায়। সেখানে দুই গৃহিণী

নিজ নিজ পুত্রের মঙ্গল কামনা করলেন। ফেরবার পথে বটব্যাল-গৃহিণীর মনে অব্যক্ত বেদনা জাগলো যে দেশে এত মাটি থাকতে কর্ত্তা আরস্মুলো-খেকো চীনেদের মাটির রহস্য বোঝবার জন্য পুত্রকে জার্ম্মাণী পাঠালেন কেন? দুটো জাতই সৃষ্টিছাড়া। চীনেগুলো কি বলে বোঝা যায় না; আর জার্ম্মাণগুলা লড়াই করে মরে। বল্লে—বলব কি ভাই, এক ডাক-পেয়াদাই ছেলে হয়ে উঠেছে।

শ্রদ্ধামতী বল্লে—তা আর জানিনি দিদি। আমার দুলি তো বাড়ীর পাশে কলকাতায় থাকে। তবু—

সন্ধ্যা মনে মনে বল্লে—তোমার দুলি কুলির কে হয় গো বাছা।

শান্তি বল্লে—আচ্ছা কাকীমা, বাঘেতে ভাল্লুকে লড়াই হলে কে জেতে?

সমস্যার চরম সিদ্ধান্ত হ'ল না; কারণ সবাই হাসলে, আর সন্ধ্যা তার মাথার উপর একটা টোকা মারলে।

(১৩)

বিকেলে তিন বন্ধুর প্রকৃত বাঙ্গালী-পনা ফুটে উঠ্‌লো চার মতে। তাদের এখন কি কর্ত্তব্য সেই প্রসঙ্গে।

অরুণ বল্লে—গিরিশ ঘোষ তিন বাঙালীর দু'মত প্রত্যাশা করেন নি; কিন্তু কালের গতিতে আজি তিন হ'ল চার।

সুতরাং স্বার্থত্যাগের বন্যা এলো। যে যার মত প্রত্যাখ্যান কর্ল্লে। ফলে তিন বাঙালীর একটিও কার্য্যকরী মত রহিল না—যা গিরিশচন্দ্র বলেন নি অথচ যা নিত্য ঘটে।

নন্দ-দুলাল বল্লে—যতক্ষণ না একটা নূতন বুদ্ধি বার হয় আমি মার সঙ্গে দেখা করে আসি।

দুই গৃহিণী আমতলায় বসে গল্প করছিলেন। পুকুর পাড়ে বকুলতলায় বসে সন্ধ্যা জলে ঢিল ফেলছিল। শান্তি কাগজের নৌকা নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিল বসন্ত-বায়ু-সঞ্চারিত পুকুরে ভাসাবার জন্য।

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখলে শান্তি। এ কি! ডোরা-কাটা শিল্কের সার্ট, যোধপুরী ব্রীচেস্‌, নীল ব্লেজার কুলি বাবু পেলে কোথা? আর কুলি বাবু এখানেই বা এলো কেমন করে চৌধুরীদের অন্তঃপুরে, যেখানে পুরুষ-ভৃত্যেরাও আস্‌তে পায় না। আঃ মোলো! পৃথিবীতে এত রকম মজাও থাকে? হাতী, বাঘের বাচ্চা, ও ওপর কুলী বাবু!

—ওমা! কুলি বাবু।—

—হ্যাঁ, তাই তো, সেই কুলি-ছেলেই তো। বেশ মানিয়েছে বাবু সেজে। ওমা!—ভাবলে উমা-রাণী।

সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখ্‌লে। তার পর দেখলে নাচ। গাছ নাচে, পুকুর নাচে, মা নাচে, কাকীমা নাচে। সে বকুল গাছ ধ'রে নিজেকে স্থির রাখ্‌লে।

শান্তি তার হাত ধরে বল্‌লে—কুলি বাবু! বাঘের বাচ্চা দেখেছেন?

শ্রদ্ধামতী হেসে বল্লেন—দূর বোকা ছেলে। কুলি না দুলি। দুলি দাদা।

উমা-রাণী নিজেকে খুব সংযত করে বল্লে—কেমন আছ দুলি বাবা।

সত্য কথা বল্‌তে গেলে তো বলতে হয় দুলিবাবা নাই। অথচ দেহটাও জলজীয়ন্ত বর্ত্তমান। সুতরাং সে না রাম না গঙ্গা ব'লে সমবেত মহিলা মণ্ডলীকে তার থাকা না থাকা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার উদার অবসর দিলে। কিন্তু তার জননী তার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হ'লেন। ছেলে এত কথা কয়—এমন কাঠ মেরে গেল কেন এঁর সামনে? বিষ্ণুপুরের চৌধুরী বংশের নন্দ-দুলাল! কোথা গেল আজ তার সৌজন্য?

ভ্রান্ত তনয়কে কর্ত্তব্যের পথে মোড় ফেরাতে গেলে কঠোরতা আশ্রয় না করা অসম্ভব। একটু রুক্ষ স্বরে শ্রদ্ধামতী বল্লেন—প্রণাম কর জ্যেঠিমাকে।

কলের পুতুলের মত সে প্রণাম কর্ল্লে উমা-রাণীকে।

সভার কার্য্যাবলী শান্তির কাছে কেমন খাপছাড়া মনে হ'ল। কুলি যদি হয় দুলি তা হলে মজার বাড়িটাও ত' হ'তে পারে তাদের। কিন্তু আর ধোঁকায় না পড়বার প্রকৃষ্ট উপায় আসামীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ। সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কর্ল্লে—এ বাড়িটা আপনাদের কু—দুলি দাদা?

এবার সে ধাতস্থ হ'ল, বল্লে—হ্যাঁ ভাই। তুমি বাঘের বাচ্চা দেখেছ?

দেখে নি? সে ছুটে আর একবার সে দুর্ল্লভ পদার্থ দেখ্‌তে গেল। তার দেওয়া কদলী সম্বন্ধে শার্দ্দূল-শাবক বড় ঔদাসীন্য দেখিয়েছে।

মজার কাজ কর্ত্তে পারে—নিশ্চয়ই বাঘের-বাচ্চার নীতি-জ্ঞান ও রুচি পরিবর্ত্তন কর্ব্বার ক্ষমতা রাখে।

নন্দ-দুলালের চক্ষু যাকে খুঁজছিল তাকে দেখ্‌লে গাছ-তলায়। তার পাতলা ঠোঁট দুখানা রক্তহীন। যত রক্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। চক্ষু তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে মার মুখ-পানে চাওয়া জানকীকে যখন তিনি তাঁর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় যাচিঞা করছিলেন।

দুলাল বল্লে—স-স-সন্ধ্যা না-কি ?

মূর্ত্ত সরলতা—শ্রদ্ধামতী বল্লেন—হাঁ বাবা ঐ সন্ধ্যা। মা যেন আমার লক্ষ্মী। আয় মা কাছে আয়। লজ্জা কি মা। দুলি যে তোমার দাদা।—

গোড়া-কাটা কলাগাছের মত সন্ধ্যা তার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

মনোভাব লুকাবার জন্য তার জননী হাসলে। বল্লে—খুব তো ভক্তি দেখিয়েছিস্ দাদাকে।

সে উঠে এক পাশে দাঁড়ালো।

অতি কাতর দৃষ্টিতে উমারাণীর দিকে তাকিয়ে নন্দ-দুলাল চলে গেল। লোকালয় তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

এক নির্জ্জন ঝোপে গিয়ে নন্দ-দুলাল মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লো। দূরে অতি করুণ স্বরে একটা ঘুঘু ডাক্‌ছিল। নন্দদুলাল ভাববার চেষ্টা করলে—সংযত ভাবে যুক্তি-পূর্ণ ভাবনা ভাবতে পার্লে না। একটা অব্যক্ত বেদনা তার সমস্ত সত্বাকে অভিভূত করে নিষ্ঠুরভাবে তাকে টিট্‌কিরি দিচ্ছিল। তার শিক্ষা সাধনা সমস্ত পণ্ডশ্রম, তার দেব-তুল্য পিতার সে অতি-মূর্খ সন্তান; তার মূর্ত্তিময়ী করুণা দেবী জননীর সে অনুপযুক্ত। একটা মুহূর্ত্তের অবিমৃষ্য-কারিতা, একটা অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা আচরণ মিথ্যার পর মিথ্যায় নিয়ে গিয়ে আজ তাকে এই অসম্ভব গিরি-শৃঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে। একটা সরলা বালিকার প্রথম জীবনে সে কালো দাগ কেন দিলে—প্রথমে কত শ্রদ্ধার সঙ্গে সে তাকে দেখেছিল আর আজ! তার প্রবঞ্চনা কী ঘৃণা না তার তরুণ প্রাণে জাগিয়েছে। মাতা যখন শুনবেন। পিতা যখন বুঝবেন। ওঃ হরি! তার চক্ষু ফেটে পবিত্র অনুতাপের অশ্রু নির্গত হ'ল প্রবল বেগে। সাধু পিতা! দেবী মাতা! হে হরি! কেন এমন দুর্ব্বলতা দিয়েছিলে।

সন্ধ্যা! রৌদ্রে পোড়া মাধবী-লতার মত সে যেন শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা আশ্রয় কর্লে।

উমারাণীর বুদ্ধি কেবল বিপর্য্যস্ত হ'ল না। সে সমস্ত ব্যাপারটা দেখ্‌লে। সমস্ত কাজটার মধ্যে সে ভগবানের হাত দেখলে। কি একটা অপূর্ব্ব যোগাযোগের ভিতর দিয়ে ভগবান তার একটা পুরাতন সাধ মেটালেন। বড় মেয়ের পিসি-শাশুড়ির রূঢ় ব্যবহারে সে বড় আন্তরিকতার সঙ্গে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে জানিয়েছিল ভগবানকে যে কুলির সঙ্গে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবো।

তবে কি ভগবান তার মন-বাসনা পূর্ণ করবেন ?

সে বল্লে—ছেলের বিয়ে দেবে না বৌ-রাণী ?—

—আমি তো সে চেষ্টায় আছি। কিন্তু ছেলে চায় আরও দেরি করে বিয়ে করতে।

উমারাণী হেসে বল্লে—আমি যদি ছেলেকে রাজি কর্ত্তে পারি তো আমি যার সঙ্গে বলব তার সঙ্গে বিয়ে দেবে ?—

—আপনার ছেলে দিদি। আপনার পছন্দ করা বৌ কি আমি অপছন্দ করব।—

ঝোপ থেকে বেরিয়ে নন্দ-দুলাল সেই দিকেই আস্‌ছিল। নিদেন উমারাণীর পায়ে ধরে তাকে বলবে তার বোকামীর কথাটা মা বাপের কাছে গোপন কর্ত্তে।

তাকে দেখে উমারাণী বল্লে—শোন বাবা একটা মজার কথা।

মজার কথা! হা ভগবান! হাঁড়ি বুঝি এই হাটে চূর্ণ হয়!

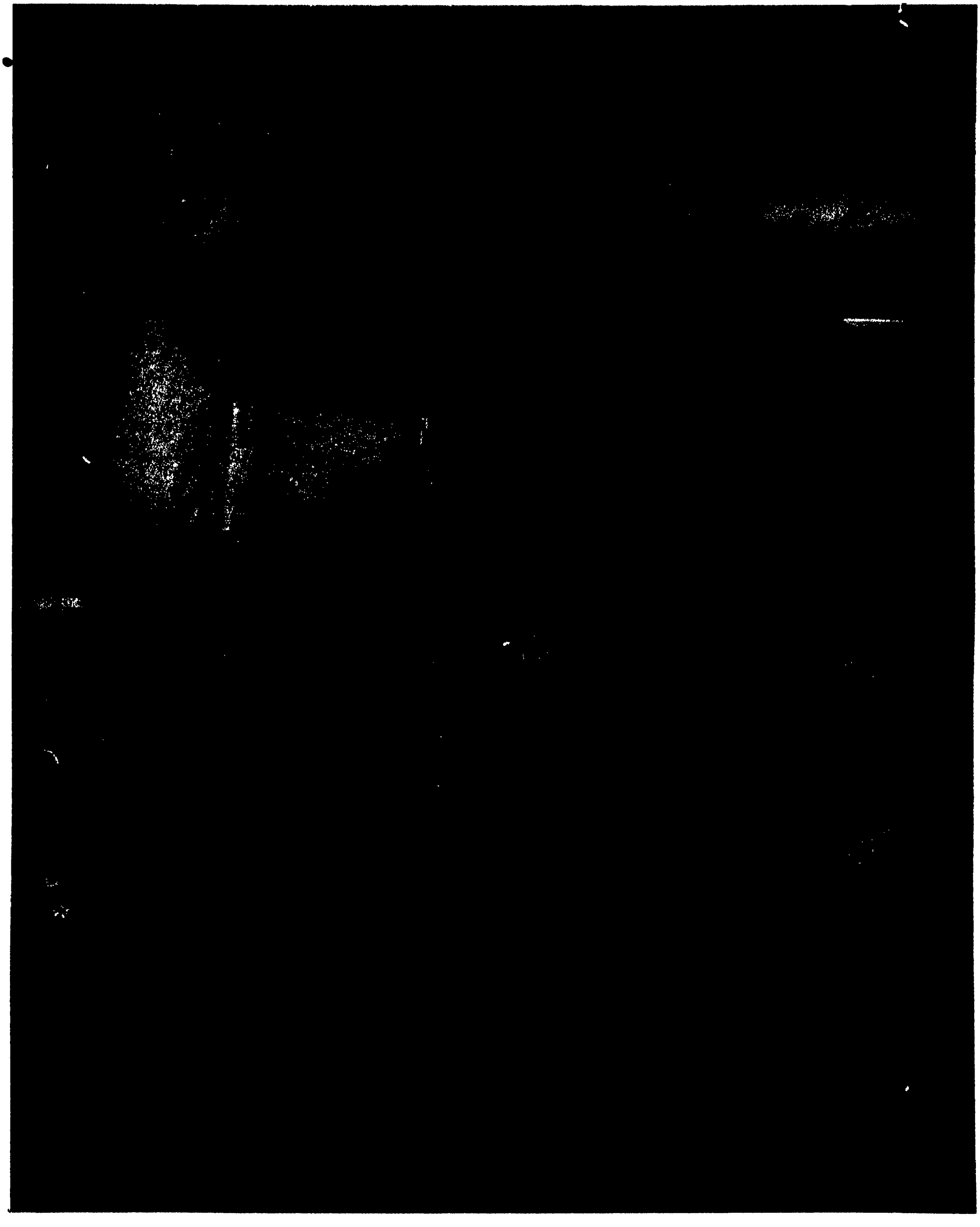
কোনো কু-অভিসন্ধির চিহ্ন তার মুখে ছিল না।

উমারাণী বল্লেন—আমি একবার ঈশ্বরকে ডেকে বলেছিলাম—হে ভগবান যেন কুলির সঙ্গে সন্ধ্যার বিয়ে হয়।

বুকের ভিতর একটা অব্যক্ত বেদনা পুঁটুলী বেঁধে দুলুর গলার দিকে ভেসে উঠ্‌ছিল। কুলি-কুল নির্ম্মূল কেন হয় না!

—তা বাবা কুলি কোথা পাই। দুলি পেতে পারি যদি আমার সোনার বোন দয়া করে—

পুঁটুলীটা নেমে গেল। তাঁর করুণ আঁখির দিকে দুলাল যখন চাইলে, তখন সেটা একেবারে উপে গেল।



রূপসনাতন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শ্রদ্ধামতী আনন্দে খুঁজতে গেলেন সন্ধ্যাকে।

দুলাল বল্লে—জ্যেঠিমা, পায়ে পড়ছি আপনার, যেন বাবা মা না শোনেন আমার বাঁদরামীর গল্প। আমার কেন এমন কুবুদ্ধি হ'য়েছিল জানি না।

—আমি জানি। যা করেছ তাতে অনুতাপ কর্ব্বার কিছু নাই। এখন যদি মন বদ্‌লাও তা হ'লে পাপ হবে।

সে হেট-মুণ্ড হল। অমৃত! এ অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে!

বেচারা নিঃসন্দেহ সন্ধ্যাকে ধরে নিয়ে এলো যখন শ্রদ্ধামতী তখন ছুটে পালালো নন্দ-দুলাল।

পথে আশঙ্কা হ'ল নন্দ-দুলালের অন্দর মহলের বন্দোবস্তে কর্ত্তারা রাজি হ'বেন তো।

তার মন উত্তর দিলে দুই ফারমের ম্যানেজিং পার্টনারের চুক্তি ভাঙ্গে নিদ্রিত বখরাদারের সাধ্য কি?

নির্জ্জন মাঠের ধারে গিয়ে বিবাহ-বিরোধিনী সভার তিন সভ্যে উচ্চ-মন্দ্রে গাহিল—

তাইরে নারে নাই—রে না—
আইবুড়ো থাকা হ'ল না।

শেষ

মোহনলালের স্ত্রীর দানপত্র

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

"গর্জ্জিল মোহনলাল নিকট সমন"—বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার দুইজন সেনাপতির—মীর মদন ও মোহনলালের বিশেষ পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সেনাপতি দুইজনই হিন্দু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। মীর মদনের কথা বলিতে পারি না, তবে মোহনলাল যে কায়স্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই,—লালা উপাধিধারী পশ্চিমা কায়স্থ। প্রায় আড়াই শত তিন শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম হইতে লালা উপাধিধারী কায়স্থগণ বাঙ্গালায় আসিয়া মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। যাঁহারা বীরভূম রাজনগর রাজের দরবারে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারো কাহারো বংশধর বর্ত্তমানে সিউড়ী সহরে বাস করিতেছেন, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবাররূপে ইহাঁদের খ্যাতি আছে। রাজনগর রাজের অধীনস্থ চাকুরীয়াগণ প্রায় মসীজীবী ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে যাঁহারা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই অসিজীবী রূপে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। এইরূপ একটী পরিবারের সঙ্গে বীরভূমের লালাগণের বৈবাহিক আদান প্রদান ছিল। ইহাঁদের বংশধরগণ আজিও সে কথা স্মরণ করেন। আমার মনে হয় নবাব সেনাপতি মোহনলাল এইরূপই এক পশ্চিমাগত লালা পরিবারের বংশধর ছিলেন। ইতিহাসে পলাসীর যুদ্ধের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, মোহনলাল তাহার এক প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছেন। সেই অস্পষ্ট চিত্রের মধ্যেও এই কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীর্য্যশালী তেজস্বী যোদ্ধার মহিমময় আলেখ্য এক অপরূপ দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ মীরজাফরের হীন ষড়যন্ত্র অন্তরায় না হইলে মোহনলালের যুদ্ধকৌশল বাঙ্গালার ইতিহাসকে আজ কোন্ পথে পরিচালিত করিত অনুমান করা কঠিন নহে। আমরা এই মোহনলালের স্ত্রীর লিখিত দুইখানি দানপত্রের সন্ধান পাইয়াছি।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী, পাঁচথুপি, যশজান প্রভৃতি গ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস। বরং স্থানগুলি কায়স্থপ্রধান বলিয়াই মনে হয়। বীরভূম বিবরণ সংকলনকালে আমি এই সমস্ত স্থানে অনুসন্ধান ব্যপদেশে যশজান গ্রামের শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট এই দানপত্রের বিষয় অবগত হই। স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয় এই সমস্ত স্থানে অনুসন্ধানের সুযোগ পাইয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ পরিচয় না পাইয়া, এবং বীরভূমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়াই আমি এই সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এতদঞ্চলের নানা স্থানে সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন লিপিযুক্ত বহু দেবমূর্ত্তি ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। যশজান গ্রামেই একটী লিপিযুক্ত গঙ্গামূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই সমস্ত লিপির পাঠোদ্ধার হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব রহস্যের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। আমরা এদিকে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সিংহ মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে দুইখানি দানপত্রেরই নকল লইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দানপত্রের নকল হারাইয়া যাওয়ায় এবং প্রথম দানপত্রখানির তারিখ লিখিতে ভুল হওয়ায় আমি পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। দুঃখের বিষয় তিনি অসুস্থ থাকায় সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই। তিনি এখন কেমন অবস্থায় আছেন জানি না, কেহ অনুসন্ধান করিলে হয় তো দ্বিতীয়খানির সন্ধান ও প্রথম-খানির তারিখ উদ্ধার করিতে পারেন। নলিনীবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম মোহনলালের পরিত্যক্ত বিষয়ের একটা সামান্য অংশ কি সূত্রে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি এমন অনেক কাগজপত্র দেখিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক মোহনলালের স্ত্রীর উপর নানারূপ উৎপীড়নের কথা ছিল। এই

দানপত্রখানি যাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছিল তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ না কি জাফরাগঞ্জের মোহান্ত নামে পরিচিত। জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্যে একটী সুপরিচিত স্থান। এখানকার গদীর আয় নিতান্ত অল্প নহে। জাফরাগঞ্জের বর্ত্তমান মোহান্তের নিকট অনুসন্ধান করিলেও হয় তো পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে মোহনলালের বা মোহনলালের স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-অনুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এদিকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। দানপত্রে মোহনলালের স্ত্রীর নিজ হস্তের নামসহি আছে। তাঁহার নাম বামুবিবি। পিতার নাম লাল ভগবান। বামুবিবি নিজ হস্তে নাম সহি করিয়া নামের নীচে লিখিয়াছেন "জওজে মোহনলাল"। দানপত্রখানি উদ্ধৃত হইল। তাড়াতাড়ি নকল করিতে গিয়া দানপত্রের বানান ঠিক্ রাখিতে পারি নাই। যতদূর স্মরণ হয় দানপত্রের সময় সন ১১৬২ সাল। পরের দানপত্রখানি প্রায় বার শত সালের কাছাকাছি সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল। বামুবিবি দীর্ঘজীবিনী হইয়াছিলেন।

গোস্বামী জি শংকর গিরিমহান্ত (স্বাক্ষর) বামুবিবি জওজে মোহনলাল

আমি বামুবিবি ভগবান লালার কন্যা মৃত লালা মোমনলালের বনিতা সাং জাফরাগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ সজ্ঞানচিত্তে ও স্মরণশক্তি বহাল থাকিতে অন্তের বিনা অনুরোধে ও বিনা জবরদস্তি শাস্ত্রানুযায়ী প্রসিদ্ধরূপ একরার এই মত করিতেছি যে মবলকে ১।৩৲২ নাখরাজ জমি তাহাতে কয়েক ঘর প্রজা বসবাস আছে তাহার চৌহদ্দি নিম্নে লিখিত হইয়াছে ঐ জমি সহর মুর্শিদাবাদ নসীপুর মহল্লায় আছে আমার স্বামীর খরিদা এতাবৎ দখলে আছে তাহাতে অন্ত কাহারও সরাকৎ নাই ও কাহারও দখলে স্বত্ত নাই আপন দখলে রাখি এক্ষণে এই সমস্ত জমি আখড়াস্থিত মহাদেব জিউর মন্দির যাহা আমার মৃত্ত স্বামীর প্রস্তুত করা তাহার মেরামত ও সেবার জন্ম প্রশংসিত গোস্বামী মহাশয়কে দিলাম আর কোবালা ও সাবেক যাহা দলিল ছিল তাহাও গোস্বামী মালকেরকে দিলাম জমির মজকুর আপন ভোগদখল হইতে মহান্ত মহাশয়ের ভোগদখলে ছাড়িলাম মহান্ত মহাশয়ের উচিত যে প্রজাদিগের রাজস্ব ও জমিনের উপস্বত্ত পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উশুল তহসিল করিয়া ভোগদখল করিতে থাকিবেন আমি কি আমার ওয়ারীশান কোন দাবী দরপেশ করি ও করে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর এতদর্থে সনন্দপত্র লিখিয়া দিলাম। ইসাদি রামগোপাল খিদ্‌মদগার।

দানপত্রখানি হইতে বুঝা যায় মোহনলাল আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, তিনি শিবমন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীরও স্বামীর পুণ্যকীর্ত্তি রক্ষণার্থ এই দান প্রশংসার যোগ্য। মোহনলালের খরিদা মূল দলিলখানিও যখন আখড়ায় অর্পিত হইয়াছিল, তখন অনুসন্ধান করিলে সেখানির সন্ধান মিলিতে পারে, এবং তাহাতে মোহনলালের পিতার নামও পাওয়া যাইতে পারে। নলিনীবাবু বলিয়াছিলেন যে কোম্পানী পাছে কাড়িয়া লন, এই ভয়েও না কি বামুবিবি কতকগুলি সম্পত্তি নানা উপায়ে হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন। আমরা তরুণ ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের অপেক্ষায় রহিলাম।

সার্থক প্রেম

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দু'টি গুপ্ত বাসনার এ কি সার্থকতা,
দু'টি প্রেম লভে আজ কি পরিপূর্ণতা
অপরূপ! সম্মিলিত দুইটি জীবন
তৃতীয় জীবন মাঝে লভে জাগরণ
আনন্দ-উজ্জ্বল। প্রেমিক ও প্রেমিকার
মাঝখানে আসে যেই শিশু ক্ষুদ্রাকার
তনয় তনয়া রূপে, সে তো পর নহে;
তারি প্রাণে দু'টি প্রাণ এক-স্রোতে বহে;
লভে যেন দু'টি আশা একটি আশ্রয়।
দোঁহার ভাবনা, রীতি, দুঃখ, হর্ষ, ভয়
সকলি একের মাঝে লভিছে মিলন।
দুইটি প্রকৃতি-ধারা একত্রে স্ফুরণ।

নর-নারী দু'টি চিত্ত দুইটি বোঁটায়
এক হ'য়ে পুষ্প সম সন্তান ফুটায়।



নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

দিন চারেক পরে মা'র চিঠি এল। হেমন্তর হাত থেকে নিয়ে জগদীশ খুলে পড়ল। তার নামেই চিঠি। মা লিখেছেন, বাবু ভালো হয়েছে শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। তার অন্নপথ্য করার পর তুমি যদি নিতান্তই না আসতে পার সোমনাথকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি বোধ হয় শীঘ্রই বিদেশ যাবো। ছেলেমেয়েরা ভালো আছে। ভগবতীর চাকরি হয়েছে। লোকনাথের কোনো খবর নেই। প্রিয়ম্বদা ইতিমধ্যে একদিন লোক পাঠিয়েছিলেন তোমার খবর নেবার জন্য। আশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি তোমাদের মা।

হেমন্ত জিজ্ঞাসা করল, প্রিয়ম্বদা কে জামাইবাবু?

জগদীশ বললে, তিনি বর্ত্তমান বাংলার দেশপূজ্যা নেত্রী।

কই, নাম শুনিনি ত?

ঠিক সময়ে পাবে শুনতে। তোমাদের এই হতভাগ্য গণ্ডগ্রামে তাঁর আলো এখনো এসে পৌছয়নি।

কেমন মানুষ তিনি?

একালের ঠিক উপযোগী। শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বয়সে নবীনা। তোমরা তাঁর বাঁ-পায়ের নখের যোগ্য নও।

হেমন্ত হেসে বললে, আপনি কি তাঁর মতবাদের প্রচারক?

রক্ষে করো ভাই, তাঁর মতবাদ কিছু নেই তাই বাঁচোয়া। তিনি কেবল চান্ স্বাধীনতা। এ নাকি তাঁর জন্মগত অধিকার।

হেমন্ত কি যেন চিন্তা করল। তারপর বললে, পরের বুলি আউড়ে বাহাদুরি কেবল মেয়েরাই নেয়। এবার তাঁকে বুঝতে পেরেছি। যাক্‌গে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক জামাইবাবু?

জগদীশ দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রিয়ম্বদার উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে বললে, আমি তাঁর একজন অনুগত ভক্ত হেমন্ত।

বিস্ময়ে প্রকাশ ক'রে হেমন্ত একবার আমার দিকে তাকাল, এবং তারপরে জগ

আপনি ভক্ত তাঁর? কেন?

কেন'র কৈফিয়ৎ আছে বিজ্ঞান শাস্ত্রে। কিন্তু আমি তাঁর রাঙাপাড় সাড়ী আর রাঙা দুখানি চরণের একনিষ্ঠ পূজারী!

আপনিও কি তাঁর ভক্ত সোমনাথবাবু?

বললাম, উত্তরটা লোকনাথ দিতে পারত, আমি নয়। তিনি আমার বৌদিদি, আমি তাঁকে মান্য করি।

জগদীশ বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। হেমন্ত আমার দিকে ফিরে হেসে বললে, জামাইবাবুর কথাটা বোঝা গেলনা, উনি প্রিয়ম্বদার ভক্ত, না প্রিয়ম্বদাই ওঁর ভক্ত এ সন্দেহটা রয়েই গেল আমার মনে।

জগদীশও হেসে উঠ্‌ল,—এক হাতে কি তালি বাজে হেমন্ত?

হেমন্ত আমার দিকে চেয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিছানার ধারেই আমি বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আমাদের যাওয়া ঠিক করলে কখন্?

জগদীশ বললে, ছেলে ত অন্নপথ্য করেছে, কাল কি পরশু যাই চল্?

কাল, না পরশু?

হেমন্তর কল্যাণে আহারাদিটা ভালই চলছিল, যেতে আর ইচ্ছে নেই। এমন খাওয়া অনেকদিন খাইনি রে।

তোমার শ্বশুরবাড়ী তোমার ভালো লাগছে, আমার কিন্তু অনেক কাজ জগদীশদা।

কিন্তু তোরও ত ভালো লাগার কথা?

কেন?

নিজের প্রশ্নটাই নিজের কানে বেয়াড়া শোনাল, মন প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌ল। জগদীশ মুখ ফিরিয়ে শুয়ে বললে, আমাকে এমন নির্বোধ মনে করিস কেন? আমি ত তোর জন্যেই রয়েছি নৈলে অনেক আগেই চ'লে যেতাম।

অর্থাৎ হেমন্তর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তার আর অবিদিত নেই। এইটেই আমাকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ক'রে তুল্‌ল। বললাম, আমার জন্যেই যদি থাকতে হয় তবে চলো আজকেই বেরিয়ে পড়ি। মানসিক বিকারকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মুখ তুলতেই দেখা গেল দরজার কাছে হেমন্ত দাঁড়িয়ে, আমার নিষ্ঠুর উক্তি দুই কান ভ'রে সে শুনেছে। হাতে ছিল তার দুই পেয়ালা চা। আমার দিকে বিমূঢ়ের মতো সে একবার তাকাল, তারপর নিঃশব্দে পেয়ালা দুটি এনে কাছে রেখে সে যখন স'রে দাঁড়াল, মনে হোলো আমি যেন তার সমস্ত আতিথেয়তাকে অপমানিত করেছি। বেশ করেছি। অধিকতর ক্রুদ্ধকণ্ঠে নির্দ্দয়ভাবে পুনরায় বললাম, মানুষের কাছে কিছু আশা করা অত্যন্ত অন্যায়, তারা কী দিতে পারে? সংসারে আত্মীয়তার কি কোনো দাম আছে জগদীশদা?

উত্তরটা কারো কাছেই শুন্‌তে পাওয়া গেল না, আমি যেন আরো হাল্‌কা হয়ে গেলাম। নিজের সম্ভ্রমটা হঠাৎ যেন নিজের কাছেই বিপন্ন হোলো। কিন্তু পাছে আরো কিছু বেফাঁস বেরিয়ে পড়ে এজন্য ভয়ে-ভয়েই চুপ ক'রে রইলাম। সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করল হেমন্ত। বললে, আজকেই কি তবে যাওয়া ঠিক করলেন জামাইবাবু?

জান্‌লার বাইরে মেঘমেদুর অপরাহ্ণের দিকে একবার চেয়ে জগদীশ বললে, তাই ত ভাবছি, তুমি কি বলো?

বলতে যে আর ভরসা পাইনে। অসুবিধে হ'লে কেনই বা থাকবেন? তা ছাড়া মা দিয়েছেন চিঠি।

অসুবিধে যে হচ্ছে না একথা আমিও জানি, সোমনাথ আরো বেশি জানে। হ্যাঁ, মা'র চিঠি। আজ না গিয়ে যদি কাল যাই তবে মাতৃস্নেহ কিছু কম্‌বে না এটা নিশ্চয়।

কিয়ৎক্ষণ জগদীশ চুপ ক'রে রইল তারপর তার স্বাভাবিক লঘুকণ্ঠে বললে, পুরুষ মানুষ কেবল বিশ্বাসঘাতক নয়, অকৃতজ্ঞ। এই ছোক্‌রার যে স্বাস্থ্যও ফিরে গেল একথা এ যাবার সময় কিন্তু স্বীকার ক'রে যাবে না।

বললাম, আমার কাজ রয়েছে জগদীশদা।

তবে কি এই বৃষ্টিতে এখনই বেরোতে চাস?

চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিলাম। ং এমন করেই ব'লে গেলাম যে তাড়াতাড়ি যাবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। কোথাও কোনো কাজই আমার নেই, কোনো কাজেই মন ব্যস্ত নয়। এই খেলা শেষ হয়ে গেলে জানিনে আবার কোন্ খেলায় মাতবো। গত কয়-দিনের ইতিহাস সোনার অক্ষরে একটু একটু ক'রে লিখেছি, অমৃত রসে অভিষিক্ত হয়েছে হৃদয়। যা পেয়েছি তা সহজে অল্প দিনেই পাওয়া, কিন্তু এইটুকু পেতেই ত শুনি অনেকে আজীবন তপস্যায় বসে। নিজেকে কোথাও কোথাও প্রশ্রয় দিয়েছি, কৌতুকের খেলা খেলেছি আপনার সঙ্গে, কৌতূহলের রসে মন উঠেছিল মেতে, তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয় দুলেছিল ক্ষণে ক্ষণে।

হেমন্তর মুখে আর হাসি ছিল না, থাকার কথাও নয়। তার নির্ব্বাক এবং নির্লিপ্ত মুখে কোনো নালিশ নেই। অপ্রত্যাশিত অসম্মানের খোঁচায় তার সমস্ত যত্ন ও সেবা যেন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যেখানে সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস, সেইখানেই সব চেয়ে বড় আঘাত। ঠিক জানি চোখে তার জল এসে পড়েছে। চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললাম, বাস্তবিক, কাজ থাকলেই যে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে এই বা কে বললে জগদীশদা? মা যেতে লিখেছেন? বেশ ত, বাবু এখনো অন্নপথ্য করেনি এই কথা জানিয়ে একখানা কার্ড লিখে দিলেই ত হয়।

মা'র কাছে মিথ্যে বলার চেয়ে আমি বলি কালকেই আপনারা চ'লে যান্ জামাইবাবু।—এই ব'লে হেমন্ত চ'লে গেল।

জগদীশ ঘাড় ফিরিয়ে তার শ্যালিকার পথের দিকে চেয়ে একটু হাসল। হাসিটা তার করুণ স্নেহে সিক্ত। বললে, চিরদিন সোজা পথেই যে হাঁটে বাঁকা পথ দেখালে তার মন বিরূপ হয়ে ওঠে, এমন কাজ করিসনে সোমনাথ।

তার কথার উত্তর আমার মুখে ছিল না। কিন্তু আমি ত আগন্তুক, অতিথি, এমন পক্ষপাত আমার ভালো লাগল না। বললাম, তুমি ত বলবেই জগদীশদা, তোমার শালী। তবুও তোমার কথা তোমাকেই বলি, জীবনের পথ সোজা নয়।

জগদীশ বহুক্ষণ নীরবে রইল, আমিও তার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বসে রইলাম। এক সময় সে বললে, মান-অভিমানের পালায় সাক্ষী থাকতে আমার ভালই লাগে,

কিন্তু আমার মনে হয় হেমন্তকে তুই চিনতে পারিসনি সোমনাথ।

কণ্ঠ নীরব কিন্তু মন প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌ল। চিন্‌তে আমি পেরেছি। চিনেছি বলেই ত এত আঘাত এত প্রতিঘাত। পরমাত্মীয় ব'লে জেনেছি তাই ত এই পরম অবহেলা। আত্মার সঙ্গে আত্মার পরিচয় ঘটেছে তাই ভয় হয়েছে পাছে বন্ধন স্বীকার করতে হয়। যা পাওয়া যায় তাই চিরস্থায়ী ক'রে ভোগ করা, এত বড় বন্ধনকে মন মান্‌তে চায় না। আঘাত করিনি হেমন্তকে, করেছি নিজেকে, সেই আঘাতে আপনাকে ছিন্ন ক'রে দূরে নিক্ষেপ ক'রে দেবো। ভাসিয়ে দেবো কালের অক্লান্ত স্রোত-প্রবাহে। কেবল গতি, কেবল ছুটে চলা, অশ্রান্ত ও অতৃপ্ত।

সন্ধ্যাটা এমনি করেই কাট্‌ল। বাইরে খানিকটা ঘোরাফেরা ক'রে এসে আবার জগদীশের পাশে বসলাম। ঘরে আলো দিয়ে গেছে। জগদীশ তেমনি করেই পড়েছিল, কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু একবার ডাকতেই তার সাড়া পাওয়া গেল! এটা তার অভ্যাস, নিঃশব্দে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখ বুজে প'ড়ে থাকতে পারে।

বললাম, এবার ফিরে গিয়ে কি করা যায় বলো ত?

কিছু করব এই বা কেন ভাবছিস?

কিন্তু কিছু একটা ত করতে হবে। এমন ক'রে আর কতদিন?

চাকরি করবি?

মুরুব্বি নেই, চাক্‌রি দেবে কে?

ব্যবসা?

তার মূলধন দরকার। কে দেবে?

জগদীশ বললে, আমি কিছুই করব না, এমনি করেই দিন কাটিয়ে দেবো। মাঝে মাঝে কিন্‌ব লটারির টিকিট, মাঝে মাঝে হাত দেখাবো জ্যোতিষীকে, দিন বেশ কেটে যাবে।

কিন্তু ভাত-কাপড়ের ভাবনাটা? আশ্রয়?

তখন আছেন প্রিয়ম্বদা।

স্ত্রীলোকের অনুগ্রহ নেবে? সম্মানে ঘা লাগবে না?

লাগলেও সহ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু লোকনাথ শম্ভু প্রভাত—এদের উপায়? না জগদীশ, তার চেয়ে এসো আমরা নতুন ক'রে সব আরম্ভ করি। আমাদের কিসের অভাব? শক্তি স্বাস্থ্য অধ্যবসায়, কি নেই? প্রথমে খুঁজে দেখি ত্রুটি কোথায়। জান্‌বার চেষ্টা করা যাক্‌, সত্যি অপরাধটা কা'র! আমরা পদদলিত হয়ে আছি কাদের জন্যে! সংসারে এসে সামান্য অন্ন-সংস্থানও করতে পারছিনে কাদের স্বার্থপরতায়? আমাদেরই অসংখ্য দুঃস্থ ভাই বোন বার বার মাথা তুল্‌তে গিয়ে বারে বারে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হচ্ছে কাদের অন্যায়ে—এসো একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্‌।

তারপর?

তারপর কিছু নয়। সকলে মিলে একটা দল গড়া যাক্‌। তুমি, লোকনাথ, মা, শম্ভু, প্রিয়ম্বদা, প্রভাত, বঙ্কিম, ভগবতী এবং আর যাদের হাতের কাছে পাবো তাদের নিয়ে এসো আমরা একটা নতুন উপনিবেশ তৈরি করি। আমাদের চেয়ে দেখতে দাও আমরা ঠিক কোথায় আছি।

তারপর? ক্ষুধার অন্ন?

এই থেকেই হবে। সবাই মিলে পরিশ্রম করব, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকবে না, সব কাজ সকলে ভাগ ক'রে নেবো, সকলের মজুরি সমান, একটা বিরাট পরিবারের আমরা হবো সমান অংশীদার। তুমি কি মনে করো ক্ষুধার অন্ন কখনো ভিক্ষায় মেলে? তুমি কি ভাবো অনুগ্রহ নিলেই জীবনের সব কিছু পাওয়া হয়ে গেল? প্রিয়ম্বদা কি তোমায় চিরদিন সুনজরে দেখবেন? স্ত্রীলোকের চরিত্র কি তুমি এখনো জান্‌তে পারোনি?

জগদীশ হেসে বললে, তুই নিজে কি জেনেছিস?

জানতে পারিনি তাই ত ভয় করে। কেবলই সন্তর্পণে হাঁটি পাছে চোরাবালির ওপর পা পড়ে। তাদের জানতে জানতেই হয়ত আয়ু শেষ হয়ে যাবে কিন্তু সত্যি ক'রে জানতে হয়ত এ জীবনে পারব না। কিন্তু এ জানার চেয়েও বড় জানা আছে। চলো জগদীশদা, আমরা সেই প্রশ্নের গভীর উত্তরের সন্ধান করিগে। জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা, বিপুল তার ভবিষ্যৎ, এমনিই কি একে শেষ হতে দেবো?

জগদীশ বললে, কিন্তু এত আশা করচিস কিসের আশায়? কি পাবি?

পাবনা কিছুই কিন্তু দিতে ত পারব? শক্তি দেবো, দেবো স্বাস্থ্য, দেবো পরিশ্রম। চলো, গঠনের দিকে মন দেওয়া যাক্‌। পদদলিতের দল নিয়ে একবার কাজে নেমে দেখি,

একবার দেখি এদের মেরুদণ্ডকে সোজা ক'রে দাঁড় করানো যায় কিনা। তুমি ত সংগ্রামে নেমেছিলে, কিন্তু সত্যি পরাধীন যে আমরা নিজেদেরই অন্দর মহলে। অজ্ঞান আর অশিক্ষার বোঝায় প্রাণ যে কণ্ঠাগত হোলো। অপরের কাছে মুক্তি ভিক্ষা করতে করতে মানুষের মুক্তির পথ যে অবরুদ্ধ হয়ে এল!

তোর লক্ষ্যটা কি বল্ ত?

আমার লক্ষ্য, এই জীবনধারাকে ত্যাগ করা। আমরা নবীন, আমরা গড়ব নতুন শাস্ত্র আর ধর্ম্ম। সে-ধর্ম্মের গতি মানুষের পথ দিয়ে। এই শহর-সভ্যতাকে ত্যাগ করো, এই যন্ত্রের যন্ত্রণা থেকে নিজেকে অব্যাহতি দাও—

তারপর?

ফিরে চলো দেশের দুর্গম অন্ধকারের দিকে, সেই আমাদের পথ, সেই আমাদের কাজ। নতুন সমাজ তৈরি করবে চলো, আসবে নতুন মানুষ, বাঁচবে তারা নতুন পন্থায়।

অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, মশা, কচুরিপানা—জগদীশ হেসে বললে, জঙ্গল পরিস্কার করা, চাষবাসে মন দেওয়া,—এই ত? সেই পুরনো কথা আর প্রাচীন বুলি! থাম্ সোমনাথ, আর জ্বালাসনে। কচুরিপানা আর ম্যালেরিয়া, ওদের অনেক ভাড়াটে সংস্কারক পাওয়া যাবে, ও কাজের লোক আলাদা। আমরা ত্যাগ ক'রে যাবো শহরকে? ফিরে যাবো বর্ত্তমান থেকে অতীতের দিকে?

বললাম, ভুল বুঝোনা জগদীশদা। আমি বলছি মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ রাখতে, যে-মাটিতে আমরা আমাদের সোনার স্বপন বুনব। শহর ত্যাগ ক'রে যাবো শহরই গড়তে। কিন্তু সে হবে আদর্শ শহর। যন্ত্রকে রাখ্‌ব পায়ের তলায়, তার ঔদ্ধত্যকে মাথায় উঠতে দেবো না। আমরা হবো কর্ত্তা সে হবে কর্ম্ম—বুঝতে পেরেছ?

আমরা উভয়েই নীরব হয়ে রইলাম। এই আলোচনাটাই আমাদের জীবনে ইদানীং সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে-সমস্যাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে, সেটা প্রধানত জীবন-ধারণের। সুখের মধ্যে বাঁচা নয়, সহজ হয়ে বাঁচা। ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দেহকে বাঁচান যায়, কিন্তু প্রাণ কেবলমাত্র অন্নে বাঁচে না, তার ধর্ম্ম আলাদা। আমাদের ভিতরে রয়েছে একটা ভাঙনের সুর, একটা সামাজিক বিপ্লবের ইসারা, একটা সংস্কারের ইঙ্গিত, —সুসঙ্গতিপূর্ণ কোনো গঠনের কাজ আমাদের দ্বারা হয়ত সম্ভব নয়। এটা জগদীশ জানে। সে জানে, পাপ জমেছে চারিদিকে, আকণ্ঠ গ্লানি আর গরল, সে বোঝেনা আপোষ, বোঝেনা জোড়াতালি। তার হৃদয়ে আছে সেই বৃহৎ কল্যাণবোধ, বহু মানবের প্রতি শুভকামনা। অন্যায় অসত্য এবং পাপের মূলোচ্ছেদ ক'রে নূতন স্বাস্থ্য আনবে দেশের মানব-সমাজে, নব ধর্ম্মরাজ্য গ'ড়ে তুলবে। আমাদের স্বপ্ন আছে, শক্তি নেই, সাধ আছে, নেই সাধ্য—তাই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের ব্যাকুল দৃষ্টি, আমাদের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা।

জগদীশ নীরবেই রইল, আমি উঠে বাইরে এলাম। আজ সমস্ত দিন ছিল ঘন বর্ষার আয়োজন, কিন্তু রাত্রে এখন আর মেঘ নেই, আকাশের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় তারা উঠেছে। ভিজা হাওয়া মুখে চোখে লাগছে, তার সঙ্গে জড়ানো কেয়াফুলের মুখচোরা গন্ধ। গাছের পত্র-পল্লবের ভিতরে বাতাসের দোলার সঙ্গে বৃষ্টিবিন্দুর এক একবার শব্দ হচ্ছে। স্বচ্ছ আকাশ অনেক দিন পরে দেখে চোখ খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। প্রায় পনেরো দিন এখানে কাট্‌ল, অন্ন এবং আশ্রয়ের চিন্তা ছিল না তাই নিজের সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে খানিকটা পরিচয় করতে পেরেছি। অন্ন সংগ্রামের জন্য আমাদের হৃদয় গেছে শুকিয়ে, কোনো উদার আদর্শের পথ ধ'রে চলার আর আমাদের উপায় নেই, সময় নেই কোনো বৃহৎ ভাবকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার,—সেইটুকু অবকাশ আমরা উদরের ক্ষুধার জন্য ব্যয় করব। আমরা মধ্যবিত্ত, ওজনকরা সংস্থান নিয়ে কায়ক্লেশে আমাদের দিনযাপনে ব্যস্ত থাকতে হয়। দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্ত্রী, উপবাসী সন্তান, অভাবাপন্ন সংসার, দরিদ্র সমাজ—এদের অতিক্রম ক'রে আমাদের আর কিছু নেই। আমরা অন্ধ, বর্ব্বর। বাঁচতে পারলেই নিশ্চিন্ত, মরতে পারলেই আনন্দ।

কিন্তু দূর তারকার জ্যোতির্লিখনে কী জিজ্ঞাসা? কালো-চুল-এলো-করা যোগিনী অন্ধকার মুখ তুলে চেয়ে রয়েছে তার দিকে, চির অনাগত দিন এবং রাত্রির চিরনির্ব্বাক বাণী! মনে হোলো, কী সংগ্রহ করেছি এই ক'দিনে? এইখান থেকে যাবার আগে জেনে যাবো আমার পথ কোন্ দিকে!

ফেনবুদ্বুদের মতো অনন্ত দ্বন্দ্ব, অগণ্য প্রশ্ন। আমার খুসির চোখ ক্লান্তিতে ভ'রে এল।

পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালাম। বললাম, কে, হেমন্ত ?

হ্যাঁ, খাবার কি বাইরের ঘরে আনিয়ে দেবো ?—ব'লে হেমন্ত ঠিক যেন কর্ত্তব্যপরায়ণা দাসীর মতো কুণ্ঠায় স'রে দাঁড়াল।

বললাম, কাল সকালে আমরা চ'লে যাচ্ছি হেমন্ত।

হেমন্ত বললে, তাই ত শুনলাম।

তোমার কি কিছু বলবার নেই ?

না। বলবার আর কি থাকতে পারে বলুন ?

নীরব হয়ে গেলাম। কিন্তু এমন ভাবে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা শোভন নয়, সম্ভবত এই কথা স্মরণ ক'রে হেমন্ত পুনরায় বললে, তবে এইখানেই খাবার এনে দিই আপনার ?

বললাম, আমি কাঙাল নই হেমন্ত যে রাতদিন খাবার কথাতেই খুসি থাক্‌ব। খাবার জন্যে তোমাদের বাড়ীতে আমি আসিনি।

হেমন্ত মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম, যে-অপরাধ তোমার প্রতি করেছি তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইব না হেমন্ত—

মৃদুকণ্ঠে হেমন্ত বললে, সে-কথা আমি ত বলিনি আপনাকে ?

বলোনি কিন্তু আমার কথাটাও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি বুঝবে আমার মনের চেহারা, আমার চিত্তের দাহ। তোমার বাড়ীতে এসে যদি তোমাকেই অপমান ক'রে থাকি তবে ছোট হয়েছি আমি, তুমি নয়। তুমি কি মনে করো আমরা খুব সম্ভ্রান্ত ? চেয়ে ছাখো ত আমাদের জীবনের দিকে ? তুমি সবই শুনেছ, সবই জানতে পেরেছ। আমরা কোথায় নেমে এসেছি বলো ত ? মাঝে মাঝে আত্মবিদ্রোহে মন তিক্ত হয়ে ওঠে, তখন কোনো ভালোবাসারই আর অর্থ খুঁজে পাইনে। যাদের নিয়ে জীবনের দুঃখটা কাটিয়ে দেবো ভাবি তারা কোথায় আছে দাঁড়িয়ে ? জগদীশ সহায়-সম্পদ-শূন্য, লোকনাথ সমাজচ্যুত, শম্ভু-প্রভাত নিরাশ্রয়, গণপতি দরিদ্র, সংসারের ভারে ভারাক্রান্ত, রঘুপতি করল অভাবের জ্বালায় আত্মহত্যা! অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে হরিচরণ পানের দোকান করেছে, নলিনাক্ষ জুটিয়েছে উকীলের মুহুরিগিরি, কুঞ্জলাল করছে বীমা কোম্পানীর দালালি,—এমনি আর আর সব। এদের মাঝখানে আমি নিঃসঙ্গ একা। তারপর মা। মায়ের দুঃখ মানুষের ঘোচাবার সাধ্য নেই ; তার পরে ভগবতী, ভগবতীর কপালে গভীর অপকলঙ্ক আঁকা, প্রিয়ম্বদার জীবনে নানা সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব,—এদেশের মেয়েদের অবস্থা আমার চেয়েও তুমি ভালো জানো হেমন্ত, তাই ত বলছিলাম জগদীশকে, নিজেদের ব্যক্তিগত চিত্তবিলাস নিয়ে দিন কাটাবার অবস্থা আমাদের নয়, অনেক উদ্বেগ আর অশান্তির কাঁটায় আমরা ক্ষত-বিক্ষত।

চুপ করলাম। হেমন্ত মৌনমুখে চ'লে গেল। আমার কণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ পেল কিনা আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না, আবার দালান পার হয়ে ঘরের ভিতরে জগদীশের বিছানার এক ধারে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরেই হেমন্ত ফিরে এল। বাড়ীর অন্যান্য দিকের গোলমাল তখন শান্ত হয়েছে। হেমন্ত বললে, আসুন, আপনাদের খাবার দেওয়া হয়েছে।

জগদীশ উঠে পড়ল। বললে, চলো। কিন্তু এর মধ্যেই দিলে হেমন্ত ?

কাল সকালে যাবেন, খেয়ে দেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন।—এই ব'লে সে অগ্রসর হোলো।

যে-দীপশিখা এই কদিন উজ্জ্বল হয়ে জ্বল্‌ছিল তা যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। অপরাধটা আমার তাতে আর সন্দেহ নেই। সত্য স্নেহের পাশেই থাকে সত্য অভিমান। হেমন্ত দূরে সরে যায়নি কিন্তু নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছে, আত্মশাসন ক'রে আপনাকে সতর্ক করেছে।

আহারাদির পর জগদীশ সোজা উঠে চ'লে গেল বাবুর কাছে। কাল সকালে চ'লে যাবে, সুতরাং শ্বশ্রুমাতার নির্দ্দেশে ছেলেটির কাছে কিছুক্ষণ ব'সে গল্প করতে গেল। কিন্তু জগদীশের হাতে ছেলে-ভুলানো গল্প সংগ্রহ বিশেষ ছিল না। এক সময় সবিস্ময়ে দেখা গেল, নিদ্রিত বাবুর গায়ে ডান হাতখানা রেখে জগদীশ পরম নিশ্চিন্ত মনে বিছানার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তাকালাম হেমন্তর মুখের দিকে, হেমন্ত তাকাল আমার চোখের প্রতি। বললাম, তোমার জায়গাটা ত দখল করল, তুমি শোবে কোথায় ?

তাই ত ভাবছি। না হয় মা'র কাছেই শোবো আজ।

কিন্তু রাত্রে যদি বাবু ওঠে? রোগা ছেলে।

ওঠে যদি আসব। আপনি একা নিচে শুতে পারবেন ত?

শুতেই হবে। লোকে নির্ভয়ে উত্তর মেরু আবিষ্কার করতে যায় আর আমি দরজা বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে শুতে পারব না?—এই ব'লে উঠে দাঁড়ালাম।

একটু দাঁড়ান, আলোটা দেবো আপনার সঙ্গে। আগে এ ঘরের মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই।

মশারিটা ফেলে বিছানার তলায় তার প্রান্ত গুঁজে দিয়ে আলোটা কমিয়ে সে যখন ফিরে দাঁড়াল তখন অকস্মাৎ মশারির ভিতর থেকে জগদীশ কথা ক'য়ে উঠ্‌ল। বললে, নরম বিছানা আর শরীরে ক্লান্তি, উঠতে আর ইচ্ছে হোলো না হেমন্ত।

বেশ ত জামাইবাবু, থাকুন না?—হেমন্ত হেসে বললে।

তুমি গিয়ে সোমনাথের মশারিটাও টাঙিয়ে দিয়ে এসো ভাই, নৈলে ও হতভাগা ম্যালেরিয়া নিয়ে গিয়ে আমাকেই বিপদে ফেলবে। আচ্ছা, গুড্ নাইট্ হেমন্ত।

গুড্ নাইট্ জামাইবাবু।—ব'লে আলোটা একটু কমিয়ে দিয়ে হেমন্ত বেরিয়ে এল। মুখ চোখ তার দীপ্ত ও উৎসাহিত। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে বললে, মা বোধ হয় ঘুমিয়েছেন, সাড়াশব্দ নেই।—এই ব'লে সে অগ্রসর হোলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে পুনরায় বললে, জামাই-বাবু ওঘরে শুলেন কেন জানো?

কেন?

দিদি থাকতে ওই ঘরেই উনি শুতেন। দিদির মৃত্যুর দিনে ওই ঘরেই উনি শুয়েছিলেন বাবুকে নিয়ে।

আজ শুলো কেন?

বোধ হয় এই জন্যে যে, কাল চ'লে যাবেন। আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, বাবুকে আমি যেন ওঁরই মতন ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে পারি।

ওঁর মতন ক'বে? ছেলে দুঃখ পাবে যে হেমন্ত?

পা'ক্ কিন্তু চরিত্রটা হবে বড়। দুঃখের সাধনা করেই বড় হবে তোমরা। বড় হবে বলেই তোমরা এত নিচে পড়েছ।'

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, একথা তুমি বিশ্বাস করো হেমন্ত?

করি, তাই তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনে আমি আহা বলিনে, কেবল চেয়ে থাকি। চেয়ে থাক্‌ব তোমাদের পথের দিকে, দেখ্‌ব কোথা থেকে তোমাদের যাত্রা, কোথায় গিয়ে শেষ। তুমি কি মনে করো সোমনাথ, ভগবান তোমাদের দুঃখ দিয়েছেন শুধু মাথা হেঁট ক'রে দেবার জন্যে? এত বড় অবিবেচক তিনি নন্। দুঃখই তোমাদের পরীক্ষা, পুড়ে-পুড়ে তোমরা খাঁটি হবে, বলশালী হবে। দুঃখ তাদেরই জন্যে দুঃখ যারা সইতে পারবে।

বললাম, কিন্তু ততদিন কি জীবন থাকবে?

থাকবে, থাকবে, ভয় করো না জীবনকে। সবই মেনে নেবে, সবই অস্বীকার করবে তবে পাবে গতি। উপদেশ তোমাকে দেবে না সোমনাথ, কিন্তু একদিন দেখবে সুখ-দুঃখের অর্থ তোমার উদার আদর্শবাদের কাছে সব তুচ্ছ হয়ে গেছে। তোমার কাছে এই কদিন থেকে অন্তত এইটুকু আমি শিখেছি।

তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হঠাৎ ব'লাম, তোমার এই সান্ত্বনা আমি কোনোদিন ভুল্‌বে না হেমন্ত।

হেমন্ত হাতখানা ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমি যেন তোমার মনে থাকবার যোগ্য হতে পারি। আমার ত সবই ভেঙে গেছে সোমনাথ, শেষকালে তোমাকে পেলুম অনেক আরাধনায়, অনেক সৌভাগ্যে। তোমার জন্যে নিজের জীবন প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে, ভাবছি ভালো ক'রে বাঁচবো তোমারি জন্যে।

কিন্তু আমি ত কাল চ'লে যাবো হেমন্ত?

যাও। দূরে গেলেই জান্‌ব তুমি কাছে আসবে। তুমি কোথাও যাবে না এ আমি জানি। আমি যদি খাঁটি হই তবে একদিন আমাকে না হ'লে তোমার চলবে না সোমনাথ, —এই আমার অহঙ্কার, এই আমার জীবনের মূল প্রেরণা।

বললাম, কিন্তু এর কলঙ্কের দিকটা কি তোমার জানা নেই?

ভয় করিনে। দেখলুম অনেক, জানলুম অনেক। আজকের সত্যটা কালকে তুচ্ছ হয়ে যায়। আজকের নিন্দা কালকে হয়ে ওঠে সুখ্যাতি। আজকের কলঙ্ক কাল হবে

জয়ন্তিলক। সমাজের বিচার-ব্যবহারের কি কোনো সঙ্গত অর্থ খুঁজে পেয়েছ কখনো? এই বাংলা দেশেরই এক উচ্ছৃঙ্খল কবিকে সমাজ একদিন আহার ও আশ্রয় দেয়নি, জ্বালায়-যন্ত্রণায় শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে তাঁর, অথচ আজ সভাসমিতি ক'রে সেই ভদ্রলোকের মৃত্যুতিথি পালন করা হয়, সমাধির ওপরে পড়ে চোখের জল আর ফুলের মালা। এই নিয়ম চিরদিনের। ওঠো, মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাই।

উঠলাম না। তার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। হেমন্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসল। বললে, পাগলামি ক'রো না, ওঠো। কালাচাঁদটা বোধ হয় এখনো ঘুমোয়নি।

বললাম, মশারি টাঙাবার দরকার নেই।

সে কি?

আলোটাও জ্বলুক, দরজাও থাক্ খোলা, আজ সমস্ত রাত তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে যাব।

হেমন্ত পুনরায় হেসে বললে, এমন আব্দার ধ'রো না, এ তোমার অল্প বয়সের নেশা সোমনাথ।

বললাম, যে সময়টুকু আর আছি তোমার কাছেই থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কাছেই ত আছো। আমার দুই ডানার তলায় তোমায় রেখেছি। আরো কাছে আসবে যেদিন পড়বে বিপদে।

কোথায় পাবো সেদিন তোমাকে?

ডাকলেই পাবে। যদি না ডাকো ক্ষতি নেই। তোমার অফুরন্ত পথে আমার মন থাকবে তোমার পিছু পিছু। তুমি নেবে ফুল আমি নেবো কাঁটা।

কিয়ৎক্ষণ নীরবে রইলাম। পরে বললাম, তুমি শুনেছ জগদীশের সঙ্গে যা স্থির করেছি?

কি?

সবাই মিলে দল বাঁধব। মা'কে আনব পুরোভাগে। দল বেঁধে সবাই মিলে যাবো উপনিবেশ গড়তে। আদর্শ সমাজ গড়ব। যে দুঃখ অন্তরের তা হয়ত ঘুচবে না, কিন্তু যে অভাব নিত্যদিনের তা হয়ত মোচন করতে পারব।

হেমন্ত বললে, আদর্শ সমাজটা কি?

এই ধরো মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ। শিক্ষায়, জ্ঞানে, সভ্যতায়, চিন্তাধারায় সবাই পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। সম্পত্তির সবাই সমান অংশীদার, সবাই সম-অবস্থাপন্ন।

ঘুচবে না তা'তে দুঃখ। কাজে কর্ম্মে সবাই হয়ত খাটি হবে কিন্তু জানো ত, সমস্ত অন্যায়ের বাসা মানুষের মনে। মানুষের দল যেখানেই যাবে সেইখানেই জমবে জঞ্জাল, এক সমস্যা থেকে অন্য সমস্যা। তোমাদের সৃষ্টির ভিতরেই থাকবে ধ্বংসের বীজমন্ত্র, আবার এক নতুন দল নেবে সেই মন্ত্রে দীক্ষা, তোমাদের দেবে চুরমার ক'রে, যাবে আবার নতুন উপনিবেশ গড়তে।

বললাম, হেমন্ত, এরই নাম চক্রগতি। চিরস্থায়ী কিছুই নয় তাই জেনেই যাবো,—আমাদের কর্ম্মক্ষয় হবে ত। এর দার্শনিক দিকটা যদি বাদও দাও তাহলেও দেখবে আমাদের একটা উপায় হোলো। আমাদের বাঁচারও একটা কৈফিয়ৎ পাবো, জীবন ধারণের একটা অর্থ মিলবে। লাঙ্গল কাঁধে নিয়ে যদি মাঠে চাষ করতে নামি তবে প্রতি মুহূর্ত্তের সন্দেহ আর সংশয় থেকে নিজেদের নিষ্কৃতি দিতে পারব। বলতে পারব মানুষের দরবারে যে, এইজন্যে একদা আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম। খুসি করব নিজেদের।

হেমন্ত বললে, নিজেদের কথাটাই কেবল ভাবলে, আমার ব্যবস্থা কি করলে?

হেসে বললাম, ওই ত বললে তোমার মন থাকবে আমার পিছু পিছু?

ঠাট্টা ক'রো না।

তোমার জন্যে কি করব বলো? বলো কি চাও?

কিছু না। তোমার জন্যে কি করব তাই জিজ্ঞেসা করো।

ভয় করে হেমন্ত, জিজ্ঞাসা করতে। আমার জন্যে সব তোমার তুচ্ছ হবে তাই ভয় করে। সবাইকে খুসি করা ভালো, না সবাইকে অস্বীকার করা ভালো একথা আজো বুঝতে পারিনি।

হেমন্ত বললে, তোমার জন্যে সব তুচ্ছ হবে সেই আমার গৌরব। যেখানে ত্রুটি থাকবে সেইখানেই থেকে যাবে তোমার প্রতি আমার ফাঁকি। বুঝতে পেরেছ?

না।

তবে বুঝবে না কোনোদিন। বিধাতার বুদ্ধিহীনতার দিকটা প্রকাশ পেয়েছে পুরুষ জাতটার মধ্যে, তাই আমাদের এত জ্বালা। রোগে-দুঃখে যেদিন হেমন্তকে দরকার তার

সেদিন তাকে পাবার ব্যবস্থাটা কি করলে?—এই ব'লে হেমন্ত ডান্ হাতে সস্নেহে আমার মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিল।

সে ব্যবস্থা তোমার হাতে। দাও এবার মশারি টাঙিয়ে। ব'লে হেসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বিছানাটা সে গুছিয়ে পাততে লাগল, আমি বাইরে এলাম। রাত গভীর হয়েছে, অনুমানে ঠিক বোঝা গেল না কত। এদেশে যে মানুষের বসতি কোথাও আছে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। গ্রামের চৌকীদারও অনেকক্ষণ পূর্ব্বে দু'একটা হাঁক দিয়ে চ'লে গেছে। লোকটার ভূতের ভয় অত্যন্ত বেশি, এবং এতই বেশি যে তাড়ি খেয়ে বেহুঁস হয়ে তবে টহল্ দিতে বেরোয়।

আকাশ যে অন্ধকারে কখন্ স্বচ্ছ হয়ে গেছে জানতে পারিনি, শ্রাবণের দিনে সচরাচর এমন নক্ষত্রভূষিত পরিচ্ছন্ন আকাশ চোখে পড়ে না। পশ্চিম দিকে তাল ও খেজুরের জঙ্গলের পাশে শুক্লপক্ষের চন্দ্র এইমাত্র অস্তে নেমেছে, তারই আভাসটা চারিদিকে ছড়ানো। রাত্রি যে এত নিবিড় এত রহস্যময় হতে পারে এ আমার জানা ছিল না। শরীরে চেতনা রয়েছে কিন্তু মনে নেই। চোখ বুজে যতদূর পর্য্যন্ত দেখতে পাই, অবশ ও অভিভূত। এমন ঐশ্বর্য্যবান নিজেকে আর কোনো অবস্থাতেই মনে হয়নি। মনো হোলো, ভালোবাসা দেবত্বলাভ করে তখনই যখন প্রেমাস্পদ সম্বন্ধে বৃহৎ কল্যাণবোধ জাগ্রত হয়। কেমন যেন চলৎশক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি, একটি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎপ্রবাহ সমস্ত শিরা উপশিরার রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে, জানিনে আর কতক্ষণ আমি সচেতন থাকতে পারব। যেন এক অত্যাশ্চর্য্য পানীয় আকণ্ঠ সেবন ক'রে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছে।

হাতটা বাড়ালাম। অতি ধীরে, বাতাসের উপর ভর দিয়ে। একটা লেবুগাছের ডালে হাতটা ঠেক্‌ল। ধীরে, ধীরে, ধীরে অনুভব করলাম। রোমাঞ্চকর আনন্দে আঙুলগুলি যেন কাঁপছে। অদ্ভুত একটা গন্ধে নেশা ধরেছে, সে-গন্ধে প্রাণের মূল পর্য্যন্ত সজীব হয়ে উঠেছে। পাশেই ছিল দেয়াল, অতি ধীরে তার গায়ে মুখ রেখে আবার—আবার সেই গন্ধ আস্বাদ করলাম। সমস্ত স্নায়ু অবসন্ন হোলো সেই অদ্ভুত গন্ধে। এ যেন এক বিশাল মায়াপুরী, বহির্জ্জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই, এর স্বভাব আলাদা, মানুষ এখানে এলে তার চরিত্র যায় বদ্‌লে।

ঘরের ভিতরে এলাম। সেই টেবি্ল্, জলের পাত্র, জামা, কাপড়ের আল্‌না, একখানা ইজি-চেয়ার, কয়েকখানা বই, ছোট স্যুটকেস্, বিছানা ও মশারি,—কিন্তু এরা সেই অতি-পরিচিত বস্তু নয়, এরা যেন কোথা থেকে অনির্ব্বচনীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। এরা যেন কথা কইছে পরস্পরের সঙ্গে, সেই দুর্জ্ঞেয় ভাষা আমি চক্ষু দিয়ে স্পর্শ করতে পাচ্ছি। কাছে-কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তন্ন তন্ন ক'রে তাদের পরীক্ষা করলাম। সবই চেনা, সবই নিত্য ব্যবহারে সুপরিচিত, কিন্তু আজকের রাত্রে তারা সব যেন এক দুর্ব্বোধ্য রহস্যে আবৃত, আমার ও তাদের মাঝখানে সুদূর ব্যবধান। সর্ব্ব-শরীরে আমার আলো এসে পড়েছে, প্রতি রোমকূপের ভিতরে আলো প্রবেশ করেছে, আত্মার দেশ হয়ে উঠেছে আলোকিত, —অস্তিত্বের পারাপার আনন্দের তরঙ্গে আন্দোলিত।

সোমনাথ?

মুখ তুললাম হেমন্তর দিকে। তাকে আর চিনতে পাচ্ছিনে। সে যেন কোন্ মায়াকাননের মেয়ে।

কি হচ্ছে বলো ত?—ব'লে সে কাছে স'রে এসে দাঁড়াল, আঁচল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, পাগোল, পাগোল তুমি। এই চব্বিশটা বছর যে তোমার কেমন ক'রে কেটেছে আমি তাই ভাবি। ঘুমোও এবার, আমি চললুম। কাল তুমি যাবে বটে কিন্তু জানিনে আর কতদিন তোমাকে দূরে রাখতে পারব।

বললাম, তোমাকে যিনি এনে দিলেন, তাঁর পায়ে আমি প্রণাম জানাই হেমন্ত।

হেমন্ত ক্ষণেকের জন্য একবার দাঁড়াল তারপর গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে আমার পায়ের ধূলো নিলে। এবং তারপর আর দাঁড়াল না, আলোটা কমিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দ্রুতপদে সে চ'লে গেল।

কলিকাতার পথে নেমে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। জনসাধারণের কোলাহলে কদিনের স্বপ্ন যেন ভেঙে গেল, চোখের উপর থেকে যেন একটা পর্দ্দা স'রে গেল। জানিনে সত্য কোন্‌টা।

বললাম, কোন্‌দিকে যাবে জগদীশ ?

জগদীশ বললে, সোজা যাব আশ্রমে।

তারপর ?

তারপর প্রিয়ম্বদা-সন্দর্শনে যাত্রা।

বৌদিকে এখনো মনে আছে তোমার ?

জগদীশ হেসে বললে, তাঁর মনে আছে কিনা তাই ভয় হচ্ছে।

বললাম, দেখোগে হয়ত এতদিনে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে স্বামীর ঘরকন্নায় মনোনিবেশ করেছেন।

তাই দেখলে খুসি হবো।

কিন্তু তাহলে তোমার স্থান হবে কোথায় জগদীশ ?

রাস্তার মোড় পার হয়ে এসে জগদীশ হাসল। বললে, যথাস্থানে। তোরা কি মনে করিস চোরাবালিতে আমি ঘর বেঁধেছি ? যাবি ত আয়।

বললাম, আমি যাবো মা'র ওখানে। তোমারো যাওয়া উচিত ছিল,—মা'র চেয়ে তোমার আপনার আর কে আছে বলো ?

তা ত বটেই, সেই জন্যেই সব শেষে যাবো তাঁর কাছে। তুই তবে এখন যা, গিয়ে বাবুর কুশল-সংবাদটা দিস।

আচ্ছা।

জগদীশ দ্রুতপদে গিয়ে মোটর-বাসে চ'ড়ে বসল। চীৎকার ক'রে তখনি একবার বললাম, আবার কোথায় দেখা হবে ?

গলা বাড়িয়ে সে বললে, কাল বেলা দুটোয় 'দুর্নীতি-দমন-সঙ্ঘের' আপিসে। লোকনাথের সঙ্গে দেখা হলে তাকেও নিয়ে যাস।

আচ্ছা, ব'লে আমি অগ্রসর হলাম।

জামার পকেটে কিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল, কাছেই একটা হোটেল্ দেখে ঢুকে পড়লাম। উদরের ক্ষুধা সকলের চেয়ে বড় সত্য।

চায়ের সঙ্গে কিছু জলযোগ সেরে বাইরে এসে ট্রামে উঠে পড়লাম। পকেটে অর্থ না থাকলে সভ্য জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, থাকলে ব্যয় করতে কার্পণ্য করিনে। সঞ্চয়ের ক্ষুধার চেয়ে ব্যয়ের ক্ষুধা আমাদের প্রবল।

মায়ের বাড়ীতে এসে যখন পৌছলাম তখন অপরাহ্ণ। মেঘে ঢাকা দিন, বেলা চেনা যায় না। সুসংবাদের স্রোতে ভাসতে ভাসতে উপরে গিয়ে উঠলাম। দরজার সুমুখে পর্দ্দা টাঙানো। প্রথমেই পরুষ কণ্ঠের অস্পষ্ট কথাবার্ত্তা কানে এল। সাড়া না দিয়েই পর্দ্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। সুমুখেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মা বসেছিলেন তাঁর কাছে, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, এসো বাবা, কখন্ ফিরলে ?

বললাম, এই চারটের গাড়ীতে মা। বাবু বেশ ভালো আছে, আর ভয়ের কারণ নেই। জগদীশ পরে আসবে।

মা ভদ্রলোকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন,—এঁর নামে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চৌধুরী। হাইকোর্টে ওকালতি করেন।

প্রসন্নবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কে ?

ওটি আমার ছোট ছেলে। শ্রীমান সোমনাথ চৌধুরী।

তুমি কি করো বাবা ? পড়ো ?

বিনীত কণ্ঠে বললাম, আজ্ঞে না।

চাক্‌রি করো ?

চাক্‌রি খুঁজে পাচ্ছিনে।

প্রসন্নবাবু হঠাৎ মুখ তুলে মা'র দিকে চেয়ে বললেন, এরই কথা তুমি বলছিলে সেদিন ? বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে ?

হ্যাঁ, এরই কথা।

প্রসন্নবাবু সস্নেহ হেসে বললেন, অন্যায় তুমি কিছুই করোনি বাবা, আমি সব শুনেছি তোমার মায়ের মুখে। আশা করব একদিন তোমার বাবা নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

আমি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলাম।

আরো দু'চার কথার পর প্রসন্নবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ তবে আসি মৃণালিনী।

আজ এতকাল পরে মায়ের নাম শুনতে পেলাম। মায়েরো যে একটা নাম আছে এ আমরা কেউই খেয়াল করিনি। মা কেবল ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন, এবং প্রসন্নবাবুর পিছু পিছু বাইরে গেলেন।

শোনা গেল না আর কী কথাবার্ত্তা তাঁদের হোলো কিন্তু পর্দ্দার নিচের ফাঁকে ক্ষণেকের জন্য আমার দৃষ্টি একবার পড়তেই দেখলাম, মা'র একখানি হাত প্রসন্নবাবুর জুতা পরা পা দুখানাকে স্পর্শ করল। আমার জীবনে এ এক বিস্ময়কর

দৃশ্য। সংসারে আমার চোখে যাঁর আসন সকলের চেয়ে উঁচুতে, তাঁরো যে কেউ প্রণম্য থাকতে পাবে এ আমার ধারণার অতীত ছিল।

সিঁড়ি দিয়ে প্রসন্নবাবু নামতে লাগলেন। মা আবার এসে ঢুকলেন ঘরে। মেঝের উপর একখানা সতরঞ্চি বিছানো ছিল, মা তার উপরে ব'সে জান্‌লার দিকে চেয়ে রইলেন। অনেক কথা আসতে আসতে ভেবেছিলাম। প্রথমেই বল্‌ব হেমন্তর কথা, বল্‌ব কেমন সে লক্ষ্মী মেয়ে, বল্‌ব সে আমার কত আপন। তারপর প্রস্তাব করব উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা, পল্লী জীবনের সারল্যের কথা, আমাদের নব আদর্শের কথা। মাকে আমরা টেনে নিয়ে যাবই, মায়ের পিছনে থাকবে নব দীক্ষায় দীক্ষিত নবীন সন্তানের দল, গড়ব গিয়ে মাতৃমন্দির, সৃজন করব অভিনব আনন্দমঠ। কিন্তু কেমন যেন হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম, প্রথমটা কথা ফুট্‌ল না।

এদিক ওদিক একবার চেয়ে আস্তে আস্তে বললাম, ভগবতীর কোথায় চাক্‌রি হোলো মা?

মা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন, চাক্‌রি? হ্যাঁ, ভালো চাক্‌রি হয়েছে তার, আমাদেরই ইস্কুলে।

এইবার সে একদিন আমাদের খাওয়াবে ত?

না সোমনাথ, চাক্‌রি তার শীঘ্রই নষ্ট হবে।

কেন মা?

কেন? মা অকস্মাৎ বিদীর্ণ কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, কেন তা তোরা কি বুঝবি, তোরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, যা কিছু ভালো যা কিছু সত্যি, সব তোরা চুরমার ক'রে ভেঙে দিতে চাস অবহেলায়। যারা নিরপরাধ, তোদের আওতায় প'ড়ে তারা ধ্বংস হয়। তোদের নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াব আমরা? মরণ কেন হয় না আমাদের?

মায়ের চিত্তবিকারের কারণটা কিছুই বুঝতে পারলাম না, নিঃশব্দে কেবল তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি কিন্তু থামলেন না, বলতে লাগলেন, যা যা, জাহান্নমে যা তোরা, সভ্য ব'লে আর অহঙ্কার জানাসনে লোকের কাছে। তোদের মনুষ্যত্ব আর তোদের শিক্ষা। ছাই! বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার দাম কত তা জানিস তোরা? জানতো প্রাচীন কালের তারা, মানুষের ধর্ম্ম ছিল তাদের। তোরা কি দিলি আমাদের বাবা, বুকের রক্ত দিয়ে গড়লুম তোদের, তার বদলে তুঁষের আগুনের ব্যবস্থা করলি? জান্‌লি কেবল স্বেচ্ছাচার, জান্‌লি বিপ্লব, উন্মাদের বেপরোয়া মতি-ভ্রমকে বল্‌লি বিদ্রোহ? জান্‌লিনে যে সর্ব্বনাশেরো একটা ছন্দ আছে?

কি হোলো মা?

মায়ের চোখ দুটি তখন অশ্রুতে ভ'রে এসেছে। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, বলতে পারব না বাবা কি হয়েছে। কিন্তু ভাবছি, আবার বাড়লো পাপের ভার এ যুগে, আবার ভারী হোলো অপমানের বোঝা, লজ্জায় হোলো মাথা হেঁট। সোমনাথ, আমি ভেবেছিলুম তোরা বুঝি মানুষের মধ্যে গণ্য, তোরা বুঝি উচ্ছেদ করবি স্বার্থপরতাকে মানুষের সমাজ থেকে, তোরা বুঝি মেয়েমানুষের বাঁচার পথ দেখিয়ে দিবি, কিন্তু আবার দিলি ডুবিয়ে, আবার কলঙ্ক মাখিয়ে দিলি জীবন জুড়ে? মনে কি নেই যে, যুগের পাপ যুগান্তরে গিয়ে ফলে?

মনে আছে মা।

না নেই। একশোবার নেই। কে বলেছে তোরা স্বাধীন হবার যোগ্য? পাপ রয়েছে তোদের রক্তে, অজ্ঞান রয়েছে নাড়িতে নাড়িতে জড়িয়ে। রুচির বড়াই করিস বাণীপন্থর দল নিয়ে, ত্যাগের বড়াই করিস সন্নিসির পাল লেলিয়ে দিয়ে? মনের জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে ফেল্‌তে পেরেচিস?

এবার বললাম, তোমার গোড়ার কথাটা এখনো বুঝতে পারলুম না, কেবল ধমকই দিয়ে যাচ্ছ।

মা চোখের জল মুছলেন। উত্তেজনা কিয়ৎপরিমাণে কমলে তিনি পুনরায় বললেন, আমাকে এ সমস্ত তুলে দিয়ে চ'লে যেতে হবে সোমনাথ, আর থাকার উপায় নেই।

উত্তরটা তিনি নিজেই দিলেন। বললেন, ভয়ানক বিপদে আমি পড়েছি বাবা, এর থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলে আমাকে সমস্ত ত্যাগ ক'রে কোনো একদিকে চ'লে যেতে হবে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মা মুখ তুলে বললেন, কোথা যাস?

বললাম, ভগবতী কোথায়?

আছে তার ঘরে। দাঁড়া, আগে শুনে যা, ভগবতী বলেছে, সংসারে আর কারো মুখ সে দেখবে না।

থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, তাই যদি হয় তবে আমিও তার মুখ দেখতে চাইব না কোনোদিন।

মা বললেন, বেশ, যাও এবার।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হয়ে ভগবতীর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বিছানায় মুখ গুঁজে প'ড়ে সে কাঁদছিল। বোঝা গেল আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই সে শুনেছে। কাঁদছে সে ফুলে ফুলে, ডুকরে ডুকরে। কি যে করব, কি যে বলব তা আর থৈ পেলাম না।

অত্যন্ত বিসদৃশ লাগল। বিছানার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার একখানা হাত ধ'রে ডাকলাম, মিনু ? ও মিনু ?

উত্তরও দিল না, কান্নাও তার থাম্‌ল না। বললাম, এর মধ্যে এমন কি হোলো মিনু যার জন্যে এমন প্রতিজ্ঞা করলে ? তুমি পাশ করেছ, চাক্‌রি পেয়েছ, তোমার আর ত কোনো দুশ্চিন্তাই থাকা উচিত নয়। আমরা সবাই কত আনন্দ করলাম। কেঁদোনা, ওঠো ভাই। কি হয়েছে বলো ত ? মা অমন করছেন কেন ?

সে আমার হাতের ভিতরে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বললে, সোমনাথদা, ব'লে দিন্‌ আমার কেমন ক'রে মৃত্যু হবে, আর আমি একদিনো বাঁচতে চাইনে।

হেসে বললাম, বাঁচতে চাও না ? সত্যি ? কিন্তু মরবার চেষ্টা করলেও যে পুলিশে ধরবে। বলো, শোনা যাক্‌ তোমার মামলাটা। আমি খুব ভালো ওকালতি করতে পারি তা জানো মিনু ?

কান্নায় সে ফুল্‌ছিল তখনো। বললাম, মা আজ চ'টে রাঙা, কি হয়েছে বলো ত ভাই ? দুর্ভাগ্য বশত আমিই আজ সামনে প'ড়ে গেছি। তুমি ত দেখে আসছ বরাবর, মাতৃস্নেহের বেলা আর সবাই কিন্তু মাতৃলাঞ্ছনার বেলা কেবল-মাত্র আমি। বলো ত মা'কে ঠাণ্ডা করা যায় কি ক'রে ?

ঠাণ্ডা আর উনি হবেন না সোমনাথদা।

হবেন না ? চেনো না তুমি মা'কে। থাকতো এখানে বঙ্কিম, দেখতে। কোথায় গেল বঙ্কিম ? আসেনি আজ ? তুমি যে-কান্নাটা আজ কাঁদলে,—আমি কিন্তু সব ব'লে দেবো বঙ্কিমকে। শুনবে নতুন খবর ? তোমার আর বঙ্কিমের গল্পটা ক'রে এলাম হেমন্তর কাছে।

ভগবতী একটি কথাও বললে না, কেবল বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে বালিশের তলা থেকে একখানা খাম বা'র ক'রে আমার হাতে দিল, এবং দিয়েই সে বিছানা ছেড়ে নাম্‌ল, বললে, আমার মৃত্যুই শ্রেয় সোমনাথদা।

খামখানা তাড়াতাড়ি খুললাম। চিঠিখানা বঙ্কিমের। দেখি ভগবতীর চিঠির সঙ্গে সে আমাকেও একখানা চিঠি লিখেছে। আমার চিঠিখানাই বড়, ভগবতীকে লিখেছে মাত্র তিনটি ছত্র।

এ কি, এর মধ্যে সে বম্বে চ'লে গেল ? জানালোনা আমাদের ?—বলতে বলতে চিঠিখানা পড়তে সুরু করলাম—

সাণ্ডহার্‌ষ্ট্‌ রোড, বম্বে।

ভাই সোমনাথ,

অনেক দৌরাত্ম্য ক'রে এবার নিলেম বিশ্রাম। এ চিঠি যখন তোমাদের হাতে পড়বে তখন আমি জাহাজে। বিলাতে গিয়েই ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ব। ছ' বছর লাগবে। তারপর আশা আছে আমেরিকায় যাবো চাক্‌রি নিয়ে। কিন্তু সেখানকার স্থায়ী নাগরিক হয়ত আমায় হতে দেবে না, দেখা যাক্‌ কি হয়। দেশ আর আমার ভালো লাগল না, তাই চললুম দেশান্তরে। দেখ্‌ব পৃথিবীকে, জান্‌ব নিজেকে।

হঠাৎ এসেছি চ'লে। কারো কাছেই বিদায় নেওয়া হয়নি। মা'কে প্রণাম জানিয়ো, বন্ধুদের প্রীতি। আশ্রমের ঠিকানায় মাঝে মাঝে চিঠি দেবার ইচ্ছা রইল, তখন তুমিও চিঠি দিয়ো।

তোমাদের বঙ্কিম

ভগবতীকে লিখেছে মাত্র তিনটি ছত্র। তার পত্রও পড়লাম—

স্নেহের ভগবতী,

আশা করি ভালো আছ। আমি দীর্ঘকালের জন্য যাচ্ছি, জানিনে ফিরবো কবে। তোমাকে যখনই মনে পড়বে, এই প্রার্থনাই কেবল করব, তোমার কর্ম্মজীবন সফল হোক, সুন্দর হোক।

বঙ্কিম

তাকালাম ভগবতীর দিকে, বুঝলাম সব। মনে হচ্ছে ঘরের ভিতরে যেন বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিক যেন স্তম্ভিত, নিস্পন্দ। একবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোথায় যাবো ? কা'র কাছে জানাবো বঙ্কিমের দুর্ব্যবহারের কথা ? সে যে আমারই বন্ধু !

বললাম, ভগবতী, বঙ্কিম যেদিকে গেছে সে পথে যদি তার জীবনের উন্নতি হয় এ তুমি চাও না ?

ও চিঠির মানে তা নয় সোমনাথদা।

তা জানি। যাবার আগে কি তুমি কিছুই জানতে পারোনি ?

না।

কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল?

একটুও না।

আশ্চর্য্য, তবুও গেল চ'লে? বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মানুষকে এমন নিষ্ঠুর করে? মান্‌ল না কোনো স্নেহের বন্ধন? মান্‌ল না ভালোবাসা?

ভগবতী পাষাণ-হয়ে ব'সে রইল। এর পরে কী কথা বলা সঙ্গত, খুঁজে পেলাম না। কেবল এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, বেশ, নিষ্ঠুর যখন সে নিতান্তই হোলো, তুমিই বা কেন চোখের জল ফেল্‌বে মিনু? কে অপেক্ষা করে কা'র জন্যে? ভালোবাসা? তার আগে আত্মসম্মান! তুচ্ছ ক'রে দাও হৃদয়াবেগ, পথের জানাশোনা পথের মাঝখানে শেষ ক'রে দাও, মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও মিনু।

মাথা হেঁট হোয়ে গেছে সোমনাথদা।

হয়নি। তুলতে জান্‌লে আবার উঠ্‌বে মাথা। একদিন যে তোমাকে ভালবেসেছে তাকে ছোট ক'রো না। যেটুকু পেয়েছ তাই বড় ক'রে নাও, ওই তোমার পাওনা। ব্যর্থ হয়েছ? কাঁটা ফুটেছে? তাই মেনে নাও। সার্থক হবে জীবন, এ আশাই বা কেন? আজ যাই মিনু, আবার আসব। এসে যেন দেখি, তোমার মনে আর কোনো নালিশ নেই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু দেখা গেল আমার সমস্ত উপদেশ মিথ্যা, ভগবতীর মুখে উৎসাহের রেখাপাতটি পর্য্যন্ত হয়নি, বর্ষণ-পাণ্ডুর আকাশের দিকে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রয়েছে। সান্ত্বনা তাকে দেওয়াই ভুল।

ঘর থেকে বেরিয়ে মা'র কাছে পুনরায় গিয়ে দাঁড়াতে আর যেন পা সর্‌ল না। এদিককার সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নেমে আমি চ'লে গেলাম।

পথে নেমে চলেছি কিন্তু অভিমান জমছে মনে মনে। আজ বঙ্কিমকে কাছে পেলে কিছু প্রশ্ন করতাম। জীবনে সে বহুবার ভালোবেসেছে এবং তার সব ভালোবাসাই আন্তরিকতাপূর্ণ। কোনো ফাঁকি নেই, সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ এই কি তার নীতি? আজ অকস্মাৎ উদ্বেগ ও আশঙ্কায় আমার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। কোথায় চলেছে এরা? কী-পরিণাম? হৃদয় নিয়ে খেলা, ক্ষণিক-বাদের খেলা, আপন দাহে আপনাকে ভস্মীভূত করে। ক্লান্তিহীন তৃপ্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতায় কী পাওয়া যায়? কেন যায় ছুটে নীতিজ্ঞানহীন আত্মবিনাশের দিকে? কেন এই প্রবঞ্চনা? কেন ভালোবাসার নামে মনুষ্যত্বের প্রতি এত বড় অপমান? আমার চোখে জল এল।

তবু জানি, অসচ্চরিত্র নয় বঙ্কিম। দেখেছি তার দাক্ষিণ্য, দেখেছি তার স্বার্থলেশহীন বন্ধুতা, দেখেছি তাকে বিপদের দিনে বিপন্নের সাহায্যের মধ্যে। ভুল ত করিনি, তার কবিপ্রাণের অসীম উদারতার কথা বন্ধুদের ভিতরে কে না জানে! ধনীর সন্তান, ভোগের মধ্যে সে লালিত, তবু দরিদ্র সঙ্গীদের সঙ্গে সে বেড়াত পথে পথে, আমাদেরই কল্যাণ-কামনায় কাট্‌ত তার দিনরাত। জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার তরঙ্গে তরঙ্গে সে ভেসে বেড়িয়েছে, তার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি, বহু সংবাদ ও বহু নিন্দা-প্রশংসা। কোথাও কোনো দায়িত্ব তার নেই, কোনো বন্ধনকে সে স্বীকার করেনি, কিছুতেই তার অপ্রতিহত গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই তাকে ভালো লাগে। এই সংসারের সকল খেলায় বিজয়ী সে, নির্লিপ্ত সে। আমি ত জানি তার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন চরিত্রের ভিতরে আছে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য। হাসি ও কান্নার বিচিত্র আলোছায়ার ভিতর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে তার সেই বৈরাগ্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি যেন তাকে অবিচার না করি।

অথচ দেখলাম তারই দস্যুপনায় বুক ভাঙ্‌ল এক নারীর। নিরপরাধ নিষ্পাপ পল্লীবালা আপন বক্ষের সর্ব্বোত্তম লাবণ্যটুকু দিয়ে পূজা দিয়েছিল তার পায়ে,—প্রতারণায় বিষাক্ত ক'রে দিয়ে গেল সে সেই নারীর সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন। দয়াহীন, বিবেচনাহীন সে চাইল না পিছনে, চাইল না সুমুখে? নীতি—নীতির জন্য আজ প্রাণ উঠ্‌ছে কেঁদে। এ চল্‌বে না, এর মধ্যে তৃপ্তি নেই। এই শূন্যবাদ, এই খেয়াল, এই চৌর্য্যবৃত্তি,—এদের পিছনে রয়েছে ধ্বংসের ভয়ানক ইঙ্গিত। সততা ও সাধুতা, বিশ্বাস ও দায়িত্বজ্ঞান, মানবতা ও চিত্তের স্থৈর্য্য,—এদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে মন। আজ কেমন ক'রে যেন মনে হোলো, বঙ্কিমের মতো দরিদ্র আমাদের ভিতরে আর কেউ নেই।

অনেকদিন পরে গণপতির বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালাম। পা দুটো আপনা থেকে চ'লে এল। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো জ্বলেছে পথের মোড়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতর থেকে গোলমালের শব্দ কানে এল। ভাবলাম, চলেই যাই। কিন্তু কি ভেবে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, গণপতি আছ?

হঠাৎ সবাই চুপ ক'রে গেল। পর মুহূর্ত্তেই সবিস্ময়ে দেখলাম, ঝপাৎ ক'রে আমার মুখের উপরেই দরজাটা গেল বন্ধ হয়ে। কারণটা বোঝা গেল না। এমন কী অন্যায় করেছি আমি? দরজাটায় একবার ধাক্কা দিয়ে আবার ডাকলাম, গণপতি?

ভিতর থেকে নারীকণ্ঠের জবাব এল, কে তুমি?

গণপতিকে একবার ডেকে দিন্ ত?

না, তুমি যাও।

বিস্ময়ে হঠাৎ নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। কিন্তু এমনভাবে অপমানিত কেন আমি হবো সেটা শুনে যাওয়া দরকার। আবার দরজায় আঘাত ক'রে বললাম, তাকে একবার বলুন যে সোমনাথ ডাকছে।

তখনই দরজা খুলে গেল। গণপতি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমাকে আর কোনো কথা বলতে না দিয়েই বললে, আয় ভাই, বুঝতে পারিনি যে তুই এসেছিস। ভেতরে চ'লে আয়, এখুনি একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে।—এই ব'লে সে আমাকে সভয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিল।

বললাম, ব্যাপার কি গণপতি?

ঘরের ভিতরে এসে গণপতি বললে, মেয়েদের সাবধান ক'রে রেখেছি। এখনি দাশু আসবে লোকজনকে নিয়ে। ভাগ্যি তুই এসে পড়লি সোমনাথ, প্রাণটা আমার ধড়ে এল।

বললাম, দাশু কে?

আমার ভগিনীপতি। খবরদার, তুই আগে এগোবিনে, পুলিশে তাহলে 'কেশ' খারাপ হবে। ওরা দরজা না ভাঙলে কিছু বল্‌ব না।

লোকজন নিয়ে আসবে? কেন?

আমার বোনকে নিয়ে যাবে ব'লে।

বেশ ত, স্বামী আসবেন, দেবে পাঠিয়ে?

পাঠাবো তার সঙ্গে? গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে নয়—গণপতি উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌ল,—কী করেছে আমার বোনকে জানিস? নেশার পয়সার জন্যে সব গয়নাগুলো একে একে খুলে নিয়েছে। এমন মারে যে বনের পশুপক্ষী কেঁদে যায়, ছেলেমেয়েগুলোকে খেতে দেয় না,—তারপর কত যে অত্যাচার তার একটি একটি কাহিনী শুন্‌লে তোর চোখেও জল আসবে সোমনাথ। সাধে কি আমার রঘুপতি ভাইটি গলায় দড়ি দিয়ে অকালে মরেছে?

বললাম, তার হাতে যখন দিয়েছ তখন না পাঠালে চলবে কেন গণপতি?

হাতে দিয়েছি আবার ফিরিয়ে নেবো। ন্যায়বিচার কি নেই? প'ড়ে প'ড়ে কি শুধু মারই খেয়ে যাবো? দেখ্‌বি আমার বোনকে? কান্না পাবে। ডাক্তার দেখে কাল বলেছেন, যক্ষ্মা ঢুকেচে শরীরে। মা কাঁদচেন।

তুমি ত দুর্ব্বল, বাধা দেবে কেমন ক'রে?

বাধা দেবোই। যদি না মানে, আগে আমি মরব তার পায়ের তলায়। ওই বুঝি এসেছে,—চুপ।

বাইরের দরজায় ধাক্কা পড়ল। গণপতি আমার হাত চেপে ধরল। কিন্তু তখন নিষেধ করার আর কোনো অর্থ নেই। ঘরের ভিতর এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলাম, অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কিনা। কিছু নেই, দুর্ব্বলের কাছে অস্ত্র থাকাও অপরাধ। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, মেয়েদের ওপরে পাঠিয়ে দাও।

আবার দরজায় ভয়ানক জোরে ধাক্কা পড়ল। গণপতি বললে, গুণ্ডা ভাড়া ক'রে আন্‌বে ব'লে গেছে। বোধ হয় তারাই।

দ্রুতকণ্ঠে বললাম, পাড়ার লোককে দিয়ে পুলিশে খবর দিলেনা কেন?

পাড়ার লোককে হাত করেছে দাশু। বাগ্দিরা সব তার দিকে। দরকার হ'লে মোড়ের বিড়িওয়ালা তাকে লোক জোগাবে। তা ছাড়া পুলিশে খবর দেবো? জানিসনে তুই পুলিশকে? পাশের বাড়ীর একটি ছোট ছেলের হাতে চিঠি দিয়ে মা'র কাছে খবর পাঠিয়েছি, এই একটু আগে।

সব কথা বলেছ?

বাইরে কর্কশ কণ্ঠে কয়েকজন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল। গণপতি বললে, হ্যাঁ। ছেলেটা এখন বাড়ী খুঁজে পেলে হয়।

দুমদাম শব্দে দরজা ভাঙাভাঙি সুরু হয়েছে। নানা কুশ্রী কটূক্তি, অশ্লীল গালিগালাজ। বোঝা গেল তাদের কারো কারো হাতে লাঠি আছে। নীরবে আর বসে থাকা চল্‌ল না। ভিতর থেকে সাড়া দিয়ে বললাম, সাবধান!

উত্তরে দরজায় লাথি পড়তে লাগল। এত দুরবস্থার ভিতর দিয়ে এতদিন চ'লে এসেছি কিন্তু আজও রক্ত ঠাণ্ডা হয়নি। উন্মাদের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দাঁড়ালাম। তাদের হাতে ছিল টর্চ্চ্ লাইট্ আর লাঠি। আলোয় আমার মুখ দেখে একজন বললে, গণপতি কই ?

কি দরকার তাকে ?

আমার বউকে বা'র ক'রে দিতে বলো।

তোমার স্ত্রীকে সে তোমার কাছে পাঠাবে না।

আলবৎ পাঠাবে। স'রে যাও তুমি।

বললাম, এক পা এগোবে না, তাহলে বিপদ ঘটবে।

সেও জোর ক'রে ঢোকবার চেষ্টা করল, আমিও ছাড়ব না পথ। দেখতে দেখতে গণপতি এসে যোগ দিল, বিড়িওয়ালাদের লোক এল। পাড়ার দু'চারজন আধা গৃহস্থ আমাদের পক্ষে এসে যোগ দিল। পথ হোলো লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর দরজা ছেড়ে বিবাদটা এগিয়ে এল পথের মোড়ে, সরকারি আলোর নিচে। যারা হক্ কথা বলতে এসেছিল আমাদের পক্ষে, তাদের সঙ্গে শত্রুদলের আগেই মারামারিটা বাধল। আমরা একটু ভদ্র সুতরাং একটু ভীরু। মুখটা সহজে খুলতে পারি, হাতটা সহজে তুলতে পারিনে। কিন্তু এ সংযমও শেষ পর্য্যন্ত আর রইল না। কি একটা ভয়ানক কটূক্তির উত্তরে 'মারো শালাকো' আরম্ভ হয়ে গেল। প্রথমত হাতাহাতি, তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি, তারপর মারামারি, তারপর যে কাণ্ডটা ঘটতে লাগল তাতে সম্ভ্রম লজ্জা সভ্যতা ও মর্য্যাদার হোলো চরম সমাধি।

হাতে একখানা বাঁকারি সংগ্রহ করেছিলাম তাই বীরবিক্রমে ঘোরাতে লাগলাম। জানিনা অন্ধের মতো কতক্ষণ সেখানা ঘুরিয়েছি, কতজনকে আহত করেছি। কোথা থেকে একটা কাবুলীওয়ালা এসে জুটল। চিনি লোকটাকে। সুদ আদায় করতে এসেছিল গণপতির কাছে। কিন্তু গণপতির মৃত্যু হ'লে সুদ দেবে কে ? সুতরাং সে আমাদের পক্ষ নিয়ে লাঠি চালাতে লাগল। এমন সময় ভয়ানক একটা হৈ হৈ রৈ রৈ সুরু হোলো। চার পাঁচখানা মোটর গাড়ী এসে থামল। জনকয়েক হিন্দুস্থানী লাঠিয়াল বিদ্যুদ্বেগে ব্যাঘ্রের মতো রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছনের একখানা গাড়ীর পা-দানিতে মায়ের মূর্ত্তি দেখা গেল। রণচণ্ডীর মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে মা উচ্চকণ্ঠে উৎসাহ দিয়ে চীৎকার করতে লাগলেন।

ভয়ানক কোলাহল, আহতের আর্ত্তনাদ, লাঠি ও বাঁকারির শব্দ, ইট-পাটকেলের বৃষ্টি, চারিদিকে লুটপাট,—দিশাহারা হয়ে গেলাম।

সরকারি আলোটা হঠাৎ চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল। অন্ধকার পথে পিশাচের নৃত্য চলতে লাগল।

মায়ের কণ্ঠ হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে চোখে। দুলছে সব। দুলছে পৃথিবী, দুলছে আকাশ। জানিনে আমি কোথায়। বিলোল তন্দ্রা নামছে দৃষ্টির সুমুখে। বহুদূর থেকে যেন জনতার অস্পষ্ট কোলাহল একবারটি কানে এল,—পুলিশ, পুলিশ,—পালাও—

সঙ্গে সঙ্গে আরো অস্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ! গভীর নিদ্রায় আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

*

* *

চোখ চেয়ে দেখি সকাল হয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় হাঁসপাতালে শুয়ে রয়েছি। মা ব'সে আছেন কাছে, তাঁরও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মাথার কাছে অশ্রুমুখী ভগবতী। ওপাশে গণপতি চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। তার পাশে দাশু ও তার প্রিয় বিড়িওয়ালা। স্বপ্নের মতো গতদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, স্বপ্নের মতো ভুলেও যাচ্ছি। ডাক্তার এসে দেখে বললেন, আর ভয় নেই। হাঁ, ভালো কথা। দেখেছেন ত কালকের খবরটা কাগজে উঠেছে ?

মৃদুকণ্ঠে বললাম, কি খবর ?

মা মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। ডাক্তারবাবু একখানা দৈনিক বাংলা কাগজ আমার চোখের সুমুখে ধরলেন। বড় বড় হরপে সরকারি সংবাদ ছাপা হয়েছে—

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা

পারিবারিক কলহের পরিণাম

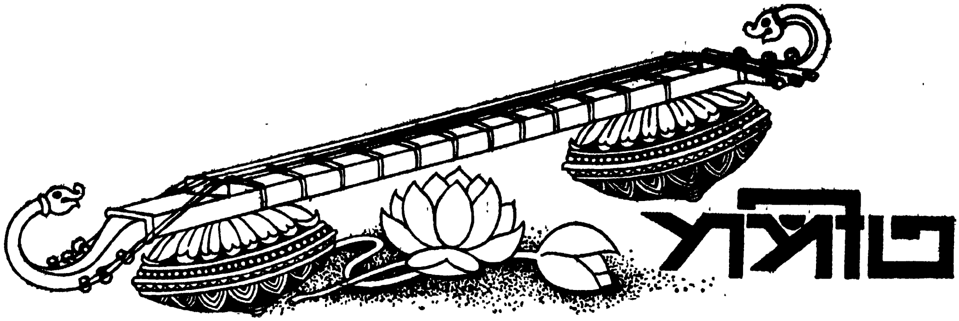
ঘটনাস্থলে হিন্দুরমণীর চমকপ্রদ বিক্রম

হতাহতের সংখ্যা এখনও অজ্ঞাত

হিন্দুদের পক্ষে এক কাবুলীওয়ালার অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ

পুলিশের গুলীতে জনতা ছত্রভঙ্গ

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে]



বরণডালা

মহুয়া

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গ মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে
বাণী হিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে,
এ বরণ গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে ॥

অর্ঘ্য তোমার আনিনি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধন হারা
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক্‌না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে,
সচকিত আলো নেচে উঠে মোর সকল্ কাজে ॥

II সা সা রা | রা গা গমা I রা পা মা | গা গা মা I পধ -না -না | ধনা ধপা -া I
আ জি এ নি রা লা কু ন্ ০ জে আ মার্ অ ০ ঙ্গ মা ঝে ০

I পা দা দা | দা দা ণা I ণপা -া দা | দা পা -া I মা পা পা | পমা -পদা -পা I
ব র ণে র ডা ০ লা ০ সে জে ছে ০ আ লো ক মা ০ ০

I মগা -া -গা | গা গা মা I পা ধনা না | ধনা ধা -া II I রা পা মা | গা -া -া I
লা ০ র্ সা জে ০ অ ০ ঙ্গ মা ঝে ০ আজি এ নিরালা কু ন ০ জে ০ ০;

৫১

II পা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা -া -া | র্সা র্সা না I ধা র্সা না | পা -া -া I

ন ব ব স ন্ ০ তে ০ ০ ল তা য় ল ০ ০ তা ০ ০

I পা -া -র্সা | ধা না না I ধা র্সা না | ধপা ০ ০ I পা দা দা | দা দা পা I

য় ০ ০ পা তা য় ফু ০ ০ লে ০ ০ বা ণী হি ল্ লো ল

I গমা দা পা | গা -া গা I গা গা -মা | পা ধা না I ধনা ধপা -া | ধা না -র্সা I

উ ০ ০ ঠে ০ প্র ভা তে র স্ব র্ ণ কূ লে ০ পা তা য়

I ধনা ধপা -া | -া -া -া I র্সা র্সা না | র্সা র্জ্জা র্জ্জা I র্জ্জা -া র্জ্জা | র্রা -া র্রা I

ফু লে ০ ০ ০ ০ আ মা র্ দে হে র বা ০ ণী তে ০ ০

I র্রা র্জ্জা র্সা | র্সা র্রা -া I র্সর্রা র্জ্জা র্রা | না -া -া I -া -া -া | সা সা সা I

সে গা ন্ উ ঠি ০ ছে ০ দু লে ০ ০ ০ ০ ০ এ ব র

I র্রা রা রা | রা গা রা I গা গা গা | গ গমা মা I মা মা ০ | মা পা পা I

ণ গা ন্ না হি পে লে মা ন্ ম রি ব লা জে ০ ও হে প্রি

I পা পা -দা | পদ না -া I -ধা -পা -া | পা দা দা | দা দা -ণা | ণপা -া -া I

য় ত ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ দে হে ম নে ম ০ ম ০ ০

I দা মা -া | মা পা দা I

০ ০ ০ ছ ন্ দ

I মপা -পা -া | মা পা -া I ধা না ধপা | পা ধনা না I ণনা ধপা -া | -া -া -া II

বা জে ০ দে হে ০ ম নে ০ ছ ন্ দ বা জে ০ ০ ০ ০

II রা রা পা | মা গা গা I রা গা গা | গা মা গরা I রা রা গমা | গা রসা সা I

অ র্ ঘ তো মা র আ নি নি ভ রি য়া বা হি র হ তে ০

I রা রা পা | মা গা গা I গা গপা পা | পা পা -া I মা -পা -া | ধা -না -ধপা I

অ র ঘ তো মা র ভে সে আ সে পূ ০ জা ০ ০ ০ ০ ০

I পা না না | ধা -ণা -ধপা I পা ধা পা | মগা রগা সা I রা -রা -পা | মা গা গা II

পূ র্ ণ প্রা ণে র আ প ন স্রো তে ০ অ র্ ঘ তো মা র্

II পধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I পর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সর্সা না I ণা র্সনা ধপা | ধা না -া I
মো র্ ত স্থ ম য় উ ছ লে হৃ দ য় বাঁ ধ ন হা রা ০

I পা না না | না ধা না I নপা -া -া | ধা না ধপা I পা পনা -না | ধা পা মপা I
অ ধী র তা তা • রি ০ ০ ০ ০ • মি ল নে তো মা •

I গা -া -া | মা পা -া I পধা না না | ধনা ধপা -া I ধা না নর্সা | ধনা -ধপা পা I
রি ০ • ০ ০ ০ হো ক্ না সা রা ০ বাঁ ধ ন হা রা -া

I সা সা সা | রা রা রা I রা গা রা | গা গা গা I গমা মা মা | মা মা -া I
ঘ ন যা মি নী র্ আঁ ধা রে যে ম ন্ জ্ব লি ছে তা রা ০

I মা পা পা | পা পা পা I পা দা দা | দা দা নদাপা I পা দা ণা | দণা দপা -া I
দে হ্ যে রি ম ম প্রা ণে র চ ম ক তে ম নি রা জে •

I না র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্রা I র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্রর্জ্ঞা র্সনা -া II II
স চ কি ত আ লো নে চে উ ঠে মো র্ স ক ল কা জে •

বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনে

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

তৃতীয় দিন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহারাজের মতিবাগ প্রাসাদে মহারাজ প্রতিনিধিগণকে এবং বরোদার গণ্যমান্য সমস্তকেই পাঁচটার সময় এক গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যথাসময়ে যাইয়া দেখি, প্রাসাদ-সংলগ্ন উন্মুক্ত ময়দানে, মধ্যে অনেকখানি জায়গা খালি রাখিয়া, বৃত্তাকারে অনেকগুলি তাঁবু খাটান হইয়াছে। উহাদের একটার মধ্যে এক বৃদ্ধ বীণকার বীণা বাজাইতেছেন, সঙ্গে বাঁয়া তবলায় সঙ্গৎ চলিতেছে। অপর এক তাঁবুতে দেখিলাম, বৃহৎশৃঙ্গ ভীমাকৃতি দুই বলীবর্দ্দ-বাহিত স্বর্ণময় রাজশকট। তাহার পরের তাঁবুতে বিখ্যাত স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় কামান। কামান দুইটিই লম্বায় প্রায় এক গজ, মুখের লম্ব ইঞ্চি দশেক হইবে। মধ্যে ইঞ্চি তিনেক লম্ব পরিমাণের একটি লোহার নল বসান। উহার চারিদিকের বেষ্টনী একটি কামানে বিশুদ্ধ স্বর্ণ, আর একটিতে বিশুদ্ধ রৌপ্য। বরোদা রাজ্যের ইহাই গোল্ড রিজার্ভ। সোনার কামানটিতে কি পরিমাণ সোনা আছে তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। পঞ্চাশ ষাট মণ হইবে বলিয়া পাঠক সাধারণের উপকারার্থ একটা বেজায় মোটা রকমের অনুমান দিতে পারি—কিন্তু এই অনুমানের বিশুদ্ধির জন্য দায়ী হইতে পারিব না। কামানটি যদি ওজনে পঞ্চাশ মণ হয় তবে ৩০ ভরি সোনার দর ধরিয়া হিসাব করিলে উহার দাম প্রায় অর্দ্ধকোটি টাকা। অপর এক তাঁবুতে দুইজন যুবক নানা-বিধ ব্যায়াম-কৌশল দেখাইতেছিল। ইহার পরেই বড় এবং

সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে বহু চেয়ার সাজাইয়া এক আসর করা হইয়াছিল। মহারাজা আসিয়া উহার নীচে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন,—আমিও প্রতিনিধ্যোচিত আকুতোভয়ে প্রথম লাইনের একখানা চেয়ার দখল করিলাম।

সম্মুখে কয়েকখানা চৌকি জোড়া দিয়া একটি অনুচ্চ মঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছিল। উহার উপর একটি সুগঠিত-দেহ যুবক আসিয়া মহারাজাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পরেই দেখি, সমীরণ স্পর্শে স্থিরজল সরোবরের বক্ষ যেমন বীচি-বিভঙ্গে ছাইয়া যায়, যুবকের সর্ব্ব শরীরেও তেমনি মাংসপেশীর ঢেউ উঠিয়াছে। নানা ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া যুবক সর্ব্ব শরীরের মাংসপেশীর খেলা দেখাইল। এই খেলাটি চমৎকার হইলেও নূতন নহে; অনুরূপ উৎকৃষ্ট খেলা বাঙ্গালা দেশেও কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু ইহার পরে একটি নাতিক্ষীণদেহ যুবক যে খেলা দেখাইল তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ।

একটি মৃদঙ্গাকৃতি দুই-মুখ-খোলা কাঠের পিপা লইয়া যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। পিপাটি লম্বায় হাত দেড়েক হইবে। উহার বৃত্তাকৃতি মুখের লম্ব এক ফুটের বেশী হইবে না বলিয়া অনুমান করিলাম। এই দুই-মুখ-খোলা পিপা দ্বারা কি খেলা হইতে পারে, এই চিন্তা করিতেছি, এমন সময় চেয়ারে বসার মত পিপার খোলা-মুখের উপর যুবক বসিয়া পড়িল—আর গভীর পঙ্কে পতিত লোক যে ভাবে ধীরে ধীরে তলাইয়া যায়, যুবক পিপার মধ্যে তেমনি করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে লাগিল! অবশেষে তাহার মাথা এবং পদযুগল মাত্র পিপার বাহিরে দেখা যাইতে লাগিল—সমস্ত শরীরটা দুই ভাঁজ হইয়া পিপার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে! দেখিতে দেখিতে মাথা এবং পা দুটিও পিপার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং পিপার অপর মুখ দিয়া নির্ব্বিঘ্নে কিন্তু অনেক চেষ্টায় যুবক বাহির হইয়া পড়িল। কোন অস্থিবান্ মানবদেহ যে ঐ নাতিপরিসর পিপার মধ্য দিয়া দুই ভাঁজ হইয়া এই ভাবে এক ধারে ঢুকিয়া আর এক ধারে বাহির হইতে পারে, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কাহারও বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এইরূপ বিবিধ ভঙ্গীতে যুবক পিপার মধ্যে ঢুকিল ও বাহির হইল। আমরা সকলেই উহার অদ্ভুত শিক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

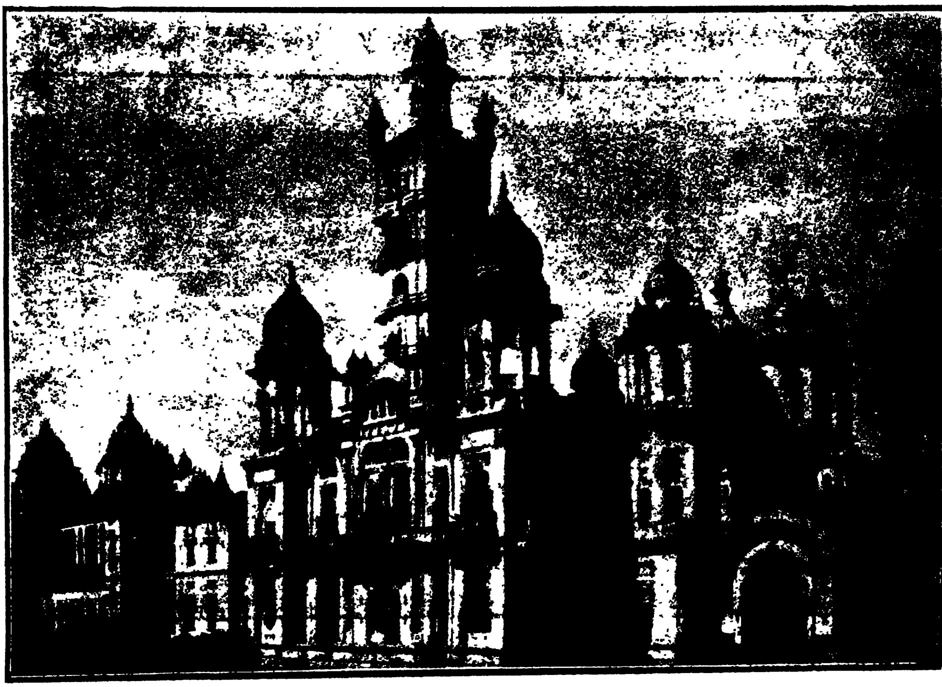


লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ (দূর হইতে)

ইহার পরে আরম্ভ হইল পাখীর খেলা। টুনি পাখীর মত ক্ষুদ্র আকৃতির পাখীগুলি, কিন্তু উহাদের মালিক উহাদিগকে কি চমৎকার শিক্ষাই না দিয়াছে! এক পাখী ট্রাইসিকেল চড়িয়া চলিল, অপর পাখী তাহাকে মটর চাপা দিল—অমনি উহা মৃতবৎ ভূমিতে পড়িয়া রহিল। মোট-রিষ্ট পাখী উহাকে ঠোঁটে করিয়া টানিয়া মোটরে লইয়া উঠাইল এবং হাসপাতালে লইয়া গেল। ডাক্তার পাখী আসিয়া স্টেথোস্কোপ দিয়া আহত পাখীর বুক পরীক্ষা করিল—এক অপারেশন করিল। অমনি আহত পাখী জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া পাখা ঝাপটিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষুদ্র পাখীদের এই মানুষের মত অভিনয় যে কি কৌতুকাবহ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান কঠিন। ইহার পরে পাখী ধনুক ছুঁড়িল, তীর যাইয়া ১২।১৪ গজ দূরে পড়িতে লাগিল। শেষ খেলা, পাখী গোলন্দাজ ক্ষুদ্র একটি কামানে ঠাসিয়া ঠাসিয়া

বারুদ পুরিল, নিজে দিয়েশালাই জ্বালিয়া তাহাতে আগুন দিল—বেশ জোরে শব্দ করিয়া কামানের আওয়াজ হইয়া গেল। স্বভাবতঃ অগ্নি ও উচ্চশব্দ-ভীরু ক্ষুদ্র পাখীকে এই খেলা শিখাইতে যে কি পরিমাণ অধ্যবসায়ের দরকার হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। পরে বিনোদবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম যে পাখীর এই খেলা না-কি রাজকীয় নিমন্ত্রণাদি ব্যাপারে প্রায়ই দেখান হইয়া থাকে।

ইহার পরে জলযোগ। প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে জলযোগের বসান এবং উহা নেটের ঘেরাটোপে ঢাকা। ঘেরাটোপের নীচে চারিখানি প্লেটে খাদ্য-দ্রব্য রক্ষিত। ডালমুট, সেউভাজা, ইত্যাদি সহ ছানার মিষ্টি এবং বিস্কুটও আছে। আপেল, সান্ত্রা, আঙ্গুর, কলা, এই চারি প্রকার ফল দেওয়া হইয়াছে। সমাপন আইসক্রীম ও লিমনেড দিয়া। এই পার্টিতে মহীশূর, ত্রিভাঙ্কোর এবং মাদ্রাজ অঞ্চলের কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত পরিচিত হইলাম এবং তাঁহাদের দেশে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণও পাইলাম। জীবনে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিব, এমন সম্ভাবনা অল্প। তবে আগামী বছর

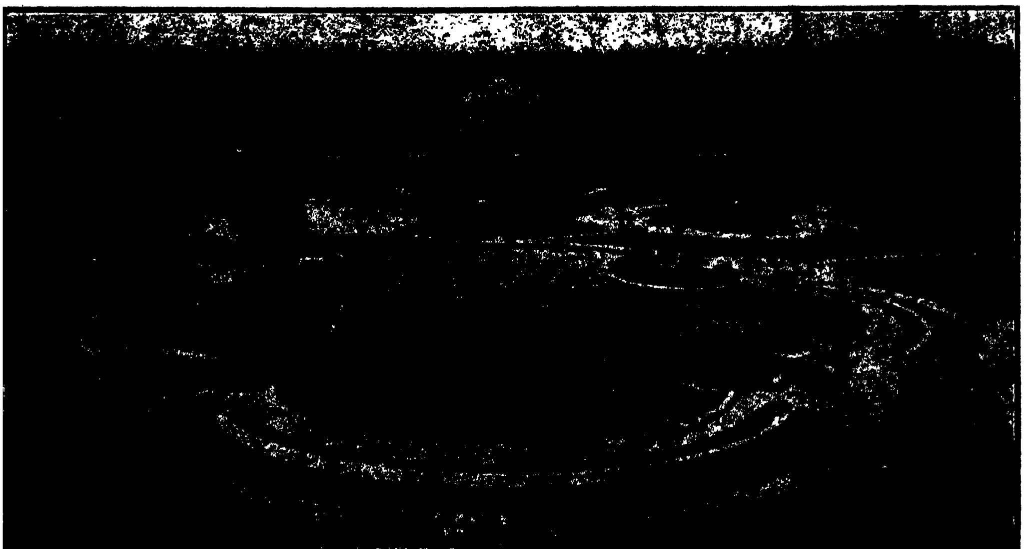


লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ (নিকট হইতে)

ব্যবস্থা হইয়াছিল। উহারই সম্মুখে একটি কুঞ্জ-কুটীর, তাহাতে মহারাজ মাননীয় অতিথি এবং নিমন্ত্রিতগণকে লইয়া জলযোগে বসিলেন। সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রাঙ্গণে স্থান করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দাঁড়াইয়া জলযোগ করা এ দেশের প্রথা। কিন্তু এইখানে দুই রকম ব্যবস্থাই ছিল। চেয়ারে অভ্যস্ত যাঁহারা, তাঁহারা চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন। রাজবাড়ীর টেবিলগুলিতে একটু নূতনত্ব দেখিলাম। প্রত্যেক টেবিলের মধ্যে চৌকা রেলিং যদি প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলন মহীশূরে হয় তবে হয়ত বা নিমন্ত্রণ রক্ষা হইয়াও যাইতে পারে।

পার্টিতে পারসী, গুজরাটী এবং মারাঠী মহিলাগণের যে সম্মিলন হইয়াছিল তাহার বর্ণনা আমি করিব না। করিলে আমার বাঙ্গালী পাঠিকাগণ আমাকে স্বদেশিনীদ্রোহী পর্য্যায়ে ফেলিবেন, আশঙ্কা আছে। কাজেই হেমচন্দ্রের,—"কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙ্গ কুসুমে"—প্রকাশ্যে তাহাই বাচ্য।

পার্টি হইতে ফিরিবার পথে দেখি, শ্রীমান বিনয়তোষ দুই হাত উঁচু করিয়া লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের ফটকের সম্মুখে রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রতিনিধিগণের বাস থামাইতেছে। ক্ষত্রিয়ের বাড়ীতে সদ্‌ব্রাহ্মণ জলযোগ করিয়া আসিয়াছি—সম্ভবতঃ এইখানে দক্ষিণা মিলিবে,—এই আশায় উৎফুল্ল চিত্তে বাস হইতে নামিলাম। দক্ষিণা মিলিলও বটে কিন্তু cashএ নহে, kindএ। বিনয় বলিল,—প্রতিনিধিগণের দেখিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদের দরবার-কক্ষ খুলিয়া দিয়াছেন। মহারাজের গুটি পাঁচেক প্রাসাদের মধ্যে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদই স্থাপত্য-গৌরবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ছবি দেখিয়াই পাঠক-পাঠিকা উহার গঠন-লালিত্য অনুধাবন



লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান

করিতে পারিবেন। বৃহৎ দরবার-কক্ষের সাজসজ্জা বিধি-ব্যবস্থা প্রাসাদেরই অনুরূপ।

সম্মিলনের উপসংহার সভার জন্য কলেজ-প্রাঙ্গণে যখন ফিরিলাম তখন রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। যথাসময়ে সভা বসিল—মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী প্রতিনিধি-গণকে ধন্যবাদ দিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের দেয় চাঁদা ৫৲ হইতে ১০৲ করা হইল। আগামী বৎসর সম্মিলন মহীশূরে আহূত হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হইল। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আহ্বান আসিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। শেষ পর্য্যন্ত বারাণসী না মহীশূর স্থির হইল, বুঝিতে পারিলাম না। রেভারেণ্ড হিরাস বরোদার মহারাজাকে এবং সম্মিলনের কর্ম্মচারী ও ভলান্টিয়ারগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বাস্তবিক, এমন সুশৃঙ্খলা, সৌজন্য ও কর্ত্তব্যানুরাগের সহিত বরোদার ভলান্টিয়ার ও কর্ম্মচারীগণ আগাগোড়া এই সম্মিলনের সমস্ত ব্যাপারের পরিচালনা করিয়াছেন, যে, ফাদার হিরাসের প্রশংসা-বাণীর সহিত সমস্ত প্রতিনিধিই অন্তরের সহিত যোগ দিয়াছেন বলিয়া আমার ধারণা। বাঙ্গালা দেশের প্রতিনিধিগণের খাওয়ার কষ্ট কিঞ্চিৎ হইয়াছিল,—কিন্তু উপকরণের অভাবে নহে, অনভ্যস্ত খাদ্যজনিত। এই বিষয়ে আমি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াও সমবেদনা ভোগ করিতে পারি নাই বলিয়া লজ্জিত, কারণ বিনয়ের বৌর হাতের পাক খাইয়াই আমার বরোদা প্রবাসের দিন কয়টা সুখে কাটিয়াছে। যাহা হউক, মহারাজের ও জয়সোয়ালের বক্তৃতায় সম্মিলন এবারকার মত সমাপ্ত হইল। মহারাজের বক্তৃতার মোট কথা এই যে তোমরা এ ভাবে মুখের উপরই প্রশংসা করিয়া আমাকে লজ্জা দিবে জানিলে আমি নিশ্চয়ই সভায় আসিতাম না।

ফাঁসির পরে তদারকের মত মূল সম্মিলন সমাপ্ত হইবার

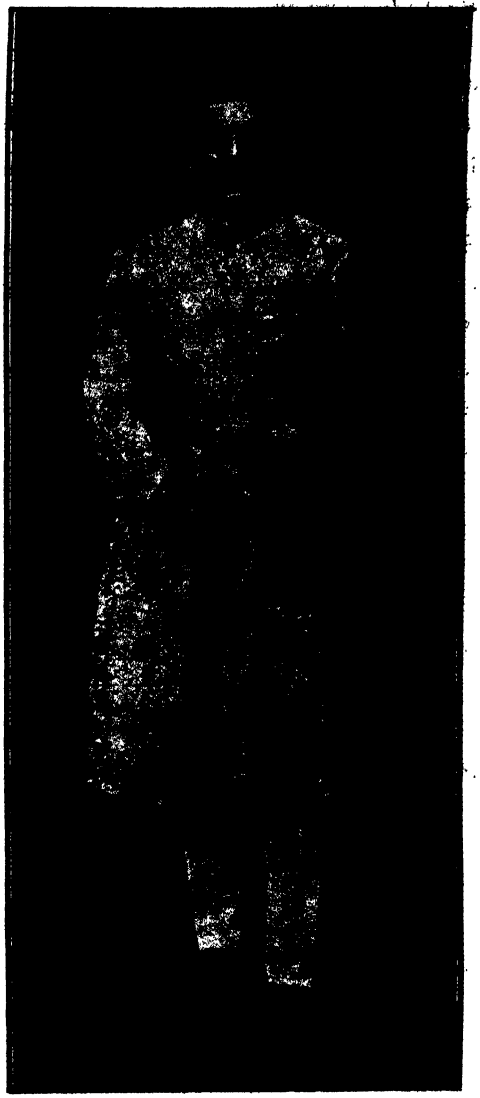
...রেও আবার গুটি দুই বক্তৃতা ছিল। তাহার মধ্যে সম্মিলনের উপসংহারের আসরেই বক্তৃতা দিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী। বাগ্‌চী মহাশয় অল্প বয়সেই গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন, লেখেনও তিনি ভাল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতেই ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতার জন্য তিনি মূল আসর পাইয়াছিলেন এবং স-নাতিনী মহারাজ বক্তৃতা শুনিবার জন্য সম্মিলনের উপসংহার হইয়া গেলেও অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাগচী মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় ছিল—"মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতার সম্পর্ক।" এই বিষয়ে বাগ্‌চী মহাশয়ই বিশেষজ্ঞ। ইহার পরে আর কি লিখিব? শুধু এইটুকুমাত্র বলিতে পারি,—এই রকম বিদ্বজ্জন সম্মিলনে বিশেষ ভাবে তৈয়ার হইয়া বক্তৃতা দিতে যাওয়া উচিত ছিল।

রাত্রি ৯·১৫ মিনিটে সংস্কৃত নাটক মালবিকাগ্নিমিত্রের অভিনয় ছিল। ভবতোষবাবু অভিনয় দেখিতে গেলেন। আমার যাইতে ইচ্ছা হইল না।

চতুর্থ দিন

চতুর্থ দিন, ৩০শে ডিসেম্বর, শনিবার, প্রাতে উঠিয়াই চিন্তা করিতে লাগিলাম বরোদা প্রবাসের কি অভিজ্ঞান লইয়া বাঙ্গালা দেশে ফেরা যায়। গুর্জ্জরীগণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমার মুখে শুনিয়া এক বন্ধু যে পরামর্শ দিলেন, তাহা মদীয়া গৃহিণীর পক্ষে একান্ত ভয়াবহ। উহাতে কর্ণপাত মাত্রও করিলাম না। তাহার অপেক্ষা নিরাপদ এবং অল্পব্যয়সাধ্য গুর্জ্জর দেশপ্রচলিত কিছু বাসনপত্র কিনিয়া লইয়া যাইব, ইহাই স্থির করিলাম। ন্যায়মন্দিরের দিকে বাসনপত্রের কয়েকটি দোকান দেখিয়াছিলাম। উহাদের একটি হইতে বাটি ও গেলাসের মধ্যবর্ত্তী এক রকম কাপ কয়েকটি কিনিলাম। আরও কিছু বাসন-পত্র কিনিয়া পদব্রজে বাসায় রওনা হইলাম। এই ক্রয় ব্যাপারে জানিতে পারিলাম বরোদায় বিলিতী পাউণ্ডের ওজন প্রচলিত,—অর্থাৎ আমাদের অর্দ্ধসেরে উহাদের সের। ন্যায়মন্দিরে খাদ্যদ্রব্য প্রদর্শনী হইতেছিল, উহা দেখিবার জন্য ন্যায়মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। প্রদর্শনীতে তরিতরকারী, ফল মূল, নানাবিধ খাদ্যশস্য, আটা, ময়দা, বিস্কুট, জ্যাম, জেলি ইত্যাদি প্রদর্শিত হইতেছিল। খুব জমকালো ব্যাপার কিছু নহে, তবে দেখিবার ও শিখিবার যথেষ্ট ছিল।

প্রদর্শনী দেখিয়া সুরসাগরের তীরস্থ রাস্তা দিয়া বাসার দিকে ফিরিলাম। সুরসাগরের পারেই মাঝারি আকারের



মহারাজা গাইকোবাড়

একটি সুন্দর পার্ক, বেশ ছায়াশীতল। রাস্তায় দেখি এক-দল ভদ্র মহিলা, উহাদের মধ্যে মারাঠিনী এবং গুর্জ্জরী দুই-ই আছে,—পুস্তক হস্তে, যেন কোন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত

করিয়া, বাড়ী ফিরিয়া চলিয়াছেন। বরোদায় নিম্নশিক্ষা বাধ্যতা-মূলক,—বর্ণজ্ঞানহীনা গৃহিণীগণকেও পড়িতে বাধ্য করা হয় কি না জানি না। আমি যে দলটি দেখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে বালিকা একটিও ছিল না, সকলেই যুবতী ও বয়স্কা।

পথে প্রতিনিধিগণের একটি ক্যাম্প পড়িল। ইহার নাম ছিল রাওপুরা ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে ময়মনসিংহ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইব বলিয়া ক্যাম্পে ঢুকিলাম। ক্যাম্প মানে তাঁবু নয় কিন্তু,—প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী; উহাতে একটি হাইস্কুল বসে। যাইয়া দেখি লক্ষ্ণৌ মিউজিয়মের কিউরেটর শ্রীযুক্ত প্রয়াগ দালাল ভৃত্য দ্বারা স্বীয় ক্ষীণ গাত্রে তৈল মর্দ্দিত করাইয়া স্থূল হইবার সাধনায় নিমগ্ন। রাজমহেন্দ্রী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুববা রাও বসিয়া মনোযোগ সহকারে এই তৈলমর্দ্দন প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন! কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু আহার সমাপনান্তে আসিয়া করুণ বিলাপ আরম্ভ করিলেন—এবং আমার হাতের বাটি দুই চারিটি ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। "উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহ মুপৈতি বাটি"—এই উপদেশ দিয়া দ্রুত ঐ স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম। কাশীর মুদ্রাতত্ত্ববিৎ মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ এই ক্যাম্পেই ছিলেন। ইনি না-কি ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রা সমূহের সমস্ত রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় কলেজ হলে প্রাচীন ভারতের "পুরাণ" মুদ্রা সম্বন্ধে ইঁহার বক্তৃতা ছিল। তথায় যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া রাওপুরা ক্যাম্প পরিত্যাগ করিলাম।

দুপুরে বিনয়ের সঙ্গে তাহার কর্ম্মস্থল "প্রাচ্যবিদ্যা মন্দির" বা Oriental Institute দেখিতে গেলাম। এই মন্দিরে প্রায় ১৪০০০ সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি রক্ষিত হইয়াছে। "গাইকোবাড় প্রাচ্যবিদ্যা পুস্তকমালা"ও এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। এই দালানটি এমন মালমশলায় নির্ম্মিত যে অগ্নিদাহে ইহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সংগ্রহ হিসাবে যে ইহা একটা বিরাট সংগ্রহ, তাহা নহে। তবে পুঁথি যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা পরম যত্নে রক্ষিত হইতেছে,—মূল্যবান পুঁথিগুলি একে একে উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিতও হইতেছে। ইহার তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুঁথির সংগ্রহ অনেক বড়, বর্ত্তমানে বোধ হয় উহার মোট পুঁথির সংখ্যা ২০০০০এর উপরে। ইহার দুই চারিখানা ব্যতীত সমস্ত পুঁথিই বাঙ্গালা দেশের সংগ্রহ এবং এই সংগ্রহে এত প্রাচীন তারিখযুক্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালা দেশের মত জল কাদা-বৃষ্টির দেশ হইতে এমন পুরাণা পুঁথি পাওয়া যাইবে বলিয়া পূর্ব্বে কেহই বিশ্বাস করিত না। মেদিনীপুর হইতে প্রথম ১৩৮৮ শকের নকল সম্পূর্ণ বিষ্ণুপুরাণ একখানা এবং ১৪২৩এর সম্পূর্ণ হরিবংশ একখানা মিলিল। তুলনার জন্য মনে রাখা আবশ্যক, ১৩৩৯ শকে রাজা গণেশ বাঙ্গালা দেশে রাজা ছিলেন এবং ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরে ছিলেট হইতে "শ্রীশ্রীমতাং গয়াসুদ্দিন দেব পাদানাং বিজয় রাজ্যে" নকল করা ১৩১১ শকের একখানা পদ্মপুরাণ মিলিল; বগুড়া হইতে ১৩৯৩ শকের মহাভারতের এক পর্ব্ব মিলিল। ফরিদপুর হইতে ১৪২৪এর এক বিষ্ণুপুরাণ এবং ১৪২৭এর এক শারদাতিলক-তন্ত্র মিলিল। সম্প্রতি বর্দ্ধমানের পূর্ব্বস্থলী হইতে শারদা-তিলকতন্ত্রের ১৩৬১ শকের একখানি চমৎকার পুঁথি মিলিয়াছে এবং নোয়াখালি জেলা হইতে অনুরূপ সময়ের একখানা বজ্রটের পুত্র উবটের বৈদিক মন্ত্রভাষ্য মিলিয়াছে, —"ভোজে পৃথ্বিং প্রশাসতি" উহা রচিত হইয়াছিল। আরও অনেক প্রাচীন পুঁথির নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু সংগ্রহের বিরাটত্বে এবং সংগৃহীত পুঁথির প্রাচীনত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা যতই সমৃদ্ধ হউক না কেন, মহারাজা গাইকোবাড়ের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুক্ত-হস্তে ব্যয়ে বরোদার প্রাচ্যবিদ্যা মন্দিরে পুঁথিগুলি যেমন সুরক্ষিত হইতেছে—উহাদের মধ্যে গুণগরিষ্ঠগুলিকে যেমন সাধারণ্যে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে,—আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন করা সম্ভবপর হয় নাই। কর্ত্তৃ-পক্ষের কাহারও কাহারও মত এই যে এই সমস্ত "নোংরা প্রাচীন কাগজের স্তূপ" বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কক্ষে জমাইয়া আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাতাস দূষিত করিতেছি। অগ্নিসাৎ করাই উহাদের একমাত্র সদ্গতি। এই মনের ভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পুঁথির মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন কর্ত্তৃপক্ষ-গণের দয়ায় আমাদের সংগ্রহ কার্য্য যে বজায় রাখিতে

।ছি, ইহাই ঢের। তবে ঢাকায় আমরা যেমন ট্রেভেলিং এজেণ্টের সহায়তায় বাঙ্গালার দূরতম প্রান্তের হইতেও পুঁথি সংগ্রহ করিতেছি, বরোদায় সম্ভবতঃ সংগ্রহের জন্য তেমন চেষ্টা কিছু চলিতেছে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালার পুঁথি সংগ্রহ অধিকাংশই আমার হাত দিয়া হইয়াছে, প্রত্নলিপিবিৎ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ও ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। ঢাকার পুঁথিগুলির চেহারা আমার পরিচিত, কাজেই বরোদার সংগ্রহের গুণগরিষ্ঠ এবং প্রাচীনতম পুঁথিগুলি দেখিবার খুবই আগ্রহ আমার ছিল। কিন্তু পরিচিত ও অপরিচিত এত প্রতিনিধি ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে বিনয়ের সহিত দেখা করিতে আসিতে লাগিল যে আমি প্রাচ্যবিদ্যা মন্দিরে ঘণ্টাতিনেক শুধু শুধুই বসিয়া কাটাইয়া দিলাম, পুঁথি দেখা আর বড় হইল না।

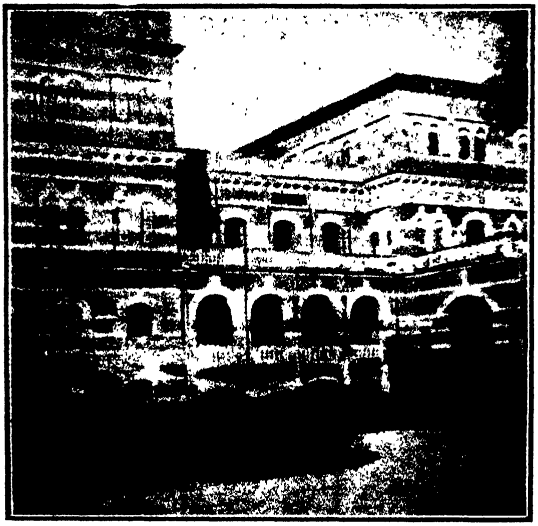
সন্ধ্যায় বিনয়ের সহিত বরোদা কলেজে পাঞ্চ্ মার্ক্ বা 'পুরাণ' মুদ্রা সম্বন্ধে মুন্সী দুর্গাপ্রসাদের বক্তৃতা শুনিতে চলিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া বক্তৃতা চলিল। সাধারণের অবগতির জন্য এই স্থানে বলা দরকার, যে, 'পুরাণ' ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রা, এই রৌপ্য মুদ্রার ওজন ৩২ রতি বা ৫৬ গ্রেণ্। রূপার পাত চৌকা বা গোল করিয়া কাটিয়া লওয়া হইত। পরে কোণ বা ধার হইতে কতক কাটিয়া উহাকে ওজনে ঠিক ৩২ রতি করা হইত। পরে উহার এক পীঠে নানারূপ চিহ্ন পাঞ্চ্ বা মুদ্রিত করা হইত। পুরাণ মুদ্রাগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া উহাদের গায়ে মুদ্রিত চিত্র বা চিহ্নগুলির তালিকা করিয়া দেখা গিয়াছে যে উহা সংখ্যায় প্রায় তিন শত হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রাপ্ত পুরাণ মুদ্রায় একই প্রকার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এই চিহ্নগুলির প্রত্যেকটিরই অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা বহুকাল ধরিয়াই সন্দেহ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত এই চিহ্নগুলির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ দাবী করেন যে, তিনি এই চিহ্নগুলির ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য যতদূর বুঝিতে পারিলাম তাহা এই যে, কালীবিলাস তন্ত্রে কতকগুলি বীজমন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, প্রত্যেকটি বীজের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ঐ বর্ণনা অনুসারে এক একটি চিত্র অঙ্কিত করা সম্ভব। এই চিত্রগুলি আঁকিলে যাহা দাঁড়ায়, পুরাণ মুদ্রার গায়ে অঙ্কিত চিত্রগুলির সহিত তাহাদের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। কাজেই পুরাণ মুদ্রার গায়ের চিত্রগুলি বিবিধ দেবতার বীজমন্ত্রের চিত্র। আমরা এতকাল



গাইকোবাড় মহিষী

জানিতাম যে ঐ বীজমন্ত্রগুলির বর্ণনায় যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের গূঢ় তান্ত্রিক অর্থ আছে। ঐ শব্দগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা করিলে ওঁ, হ্রিং, ক্লিং ইত্যাদি বীজ ঐ বর্ণনাগুলি হইতে লব্ধ হয়। কাজেই বীজমন্ত্রের

বর্ণনার সোজা ব্যাখ্যা করিয়া মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ যে চিত্রগুলি উদ্ধার করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা পণ্ডিত-সমাজে গ্রাহ্য হইবে কি-না বলা যায় না। মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ পুরাণ মুদ্রা লইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন বিস্তর। এই বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত সচিত্র প্রবন্ধ শীঘ্রই বাহির হইবে। তখন যাঁহারা এই বিষয়ে আগ্রহবান্, তাঁহারা মুন্সী দুর্গাপ্রসাদের ব্যাখ্যার মূল্য ভাল করিয়াই নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। তাহার পূর্ব্বে এই বিষয়ে রায় না দেওয়াই সঙ্গত। তবে মহেঞ্জোদাড়োর দুর্ব্বোধ্য লিপির ব্যাখ্যাও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতির অধ্যাপক ডাক্তার প্রাণনাথ তন্ত্র হইতেই খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং পুরাণ মুদ্রার গায়ে আঁকা চিত্রগুলির



প্রাচ্যবিদ্যা মন্দির

ব্যাখ্যাও বারাণসীর মুন্সী দুর্গাপ্রসাদ তন্ত্রেই পাইলেন,—এই দুইএর মধ্যে যেন তন্ত্র—কম্‌প্লেক্সমূলক মাসতুত ভাই সম্পর্ক আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে!

শ্রীমান বিনয় বরোদায় এমেচার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারিও করেন। এ ডাক্তারীতে তাঁহার বেশ নাম। এই নামের জোরে বিনয় বরোদার হোমিওপ্যাথিক এসোসিয়েসনের সভাপতি। বাসায় ফিরিয়া দেখি, বিনয় ডাক্তারি করিতে ভারতবিখ্যাত মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত আব্বাস তাএবজির বাড়ীতে চলিয়াছেন। আমিও সঙ্গী হইলাম। রাত্রি তখন প্রায় ৮টা। আমরা গিয়া দেখি তাএব্‌জি মহোদয় কয়েকজন অতিথিসহ আহারে বসিয়াছেন। আমরা কিছু অপ্রস্তুত হইলাম, কিন্তু তাএব্‌জি-গৃহিণী আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে বৈঠকখানায় বসাইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাএব্‌জির বিদুষী কন্যা আসিয়া নানা আলাপ আরম্ভ করিলেন। দেখিলাম, বিনয় এই পরিবারে পুত্রবৎ আদর ও স্নেহ পাইয়া থাকেন। আরও কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং তাএব্‌জি আসিলেন। সৌম্য শান্তমূর্ত্তি আবক্ষ-বিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু ঋষিকল্প বৃদ্ধ,—বহুবার ছবিতে এই মূর্ত্তি দেখিয়াছি। অপরিচিত আমাকে তিনি চির-পরিচিতবৎ গ্রহণ করিলেন। নানা আলাপের পরে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম,—সেই কন্‌কনে শীতের মধ্যে বৃদ্ধ অনেকখানি হাঁটিয়া আসিয়া আমাদিগকে রাস্তা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। বাসায় ফিরিয়া বিনয়ের বাসার বেতার যন্ত্রযোগে বরোদায় বসিয়া কলিকাতার গান শুনিয়া সুখী হইলাম।

পঞ্চম দিন

পঞ্চম দিন ৩১ শে ডিসেম্বর, রবিবার। বিনয় বলিল—"যাও দাদা, "সয়াজি সরোবর" দেখিয়া আইস। অনর্থক বসাইয়া মোটরকে পয়সা দিই কেন?"

এই অবোধ এবং পয়সার মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মূঢ় যুবক সম্মিলনের সম্পাদকের গুরু কার্য্যভার ভাল মত বহন করিবার জন্য দৈনিক ১৫৲ টাকা ভাড়ায় সাত দিনের জন্য এক মোটর গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সম্মিলন তহবিল হইতে এই খরচ আদায় কর না কেন?"

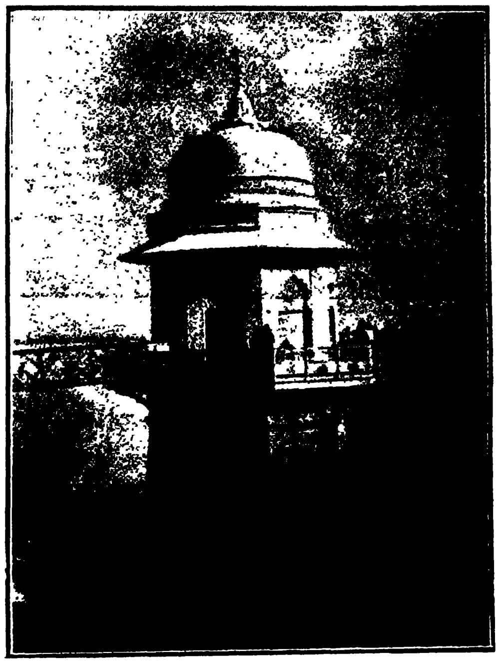
বিনয় বলিল—"ও যাক্‌গে, ১০৫৲ টাকা বই তো নয়? সম্মিলন তহবীল থেকে নিলে কেউ না কেউ যেয়ে মহারাজের কাছে লাগাত—ভট্‌চাজ্‌ সম্মিলন তহবিল লুট করচে। আরে দাদা, জান তো না! দেশী রাজ্যে কত হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হয়!"

আমি কিন্তু এই হুঁসিয়ারির অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এই সম্মিলনের কার্য্যে খাটিতে খাটিতে লোকটা ওজনে ১০ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে। সময়ে স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই! প্রকাণ্ড এই সম্মিলনের সাফল্য বহু পরিমাণেই বিনয়ের আপ্রাণ পরিশ্রমের ফল। খরচও হইয়াছে হাজার হাজার টাকা। আর সম্পাদকের অপরিহার্য্য মোটরের

ভাড়া সম্পাদক নিজের পকেট হইতে না দিলেই সম্মিলনের তহবিল লুট করা হইল? যাহা হউক, আমি বিনয়ের মোটর ভাড়া দেওয়া নিবারণ করিতে সানন্দেই সম্মত হইলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ এবং বিনয়ের পুত্র-কন্যাগণ লইয়া সয়াজি সরোবর বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পুত্রকন্যাগণের খবরদারি করিবার জন্য বিনয়ের ভৃত্য "ঘ'টে"ও সঙ্গে চলিল। বলা বাহুল্য নহে,—"ঘ'টে"র গৌর বর্ণ ও পোযাক পরিচ্ছদের বহর দেখিয়া কাহার সাধ্য চিনে যে 'ঘ'টে' ভৃত্যজাতীয় আর আমরা মনিব জাতীয়! প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দিল্লীতে মুড়াপাড়াব জমিদার মাননীয় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বানাজ্জি মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। তথায় তাহাঁর বাসায়ও দুইটি গাড়োয়ালী ব্রাহ্মণ জাতীয় ভৃত্য দেখিয়াছিলাম। যেমন তাহাদের গায়ের রং, তেমনই তাহাদের সুকুমার সুন্দর চেহারা,— সাধারণ কথায় আমরা বলি রাজপুত্রের মত চেহারা। আমাদের ঘ'টেকে রাজপুত্র বলিয়া চালান না গেলেও উজীর-পুত্র নিশ্চয়ই বলা চলিত।

সয়াজি সরোবর একটি কৃত্রিম হ্রদ,—সহর হইতে ১৪ মাইল দূরে কতকটা উঁচু যায়গায় অবস্থিত। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীকে বাঁধ দিয়া আটকাইয়া আজোয়া নামক স্থানে হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই হ্রদের রক্ষিত জল মোটা মোটা পাইপ দ্বারা বাহিত হইয়া পাঁচ মাইল দূরে নিমেঠা নামক স্থানে আনীত হয়। এই স্থানে জলের কল বা জল শোধনের কারখানা আছে। নিমেঠার কারখানায় পরিশোধিত হইয়া মধ্যাকর্ষণের বলে জল বরোদা সহরে চলিয়া যায় ও বিতরিত হয়।

যে রঙ্গস্থলে হাতীর খেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম, সেই স্থানটি বামে রাখিয়া সুরক্ষিত রাস্তা দিয়া আজোয়া অভিমুখে চলিলাম। রাস্তার দুই ধারের গাছগুলির গোড়া ৩৷৪ ফুট পর্য্যন্ত শাদা-কাল রঙ্গে রঞ্জিত। এই রাস্তায় গরুর গাড়ী চলা নিষেধ। গরুর গাড়ীর জন্য এই রাস্তার সমান্তরালে একটি কাঁচা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার দুইধারে বসতি-বিরল শস্য-শ্যামল মাঠ। অনেকগুলি ক্ষেতেই কার্পাস গাছের আবাদ দেখিলাম। আজোয়া পৌছিয়া দেখি, বেশ উঁচু একটি সুদীর্ঘ বাঁধ, তাহার পাদদেশ ঘেঁসিয়া একটি রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। বাঁধটি লম্বায় প্রায় দেড় মাইল হইবে বলিয়া অনুমান করিলাম। সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধের মাথায় চড়িয়া দেখি, চমৎকার দৃশ্য। স্বচ্ছ জলপূর্ণ নাতিবৃহৎ হ্রদটি সূর্য্য-কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গভীর জলের মধ্যে একটি জলটুঙ্গি, বাঁধের সহিত একটি মজবুত সাঁকো দিয়া সংযুক্ত। জলটুঙ্গির মধ্যে জল পাম্প করিবার বিবিধ যন্ত্র। জলটুঙ্গির চূড়াটি মন্দিরের চূড়ার মত সুদৃশ্য। হ্রদটি আয়তনে প্রায় ৫½ বর্গ মাইল। জলের গভীরতা ১১ হইতে ২৩ ফুট পর্য্যন্ত। হ্রদের পূর্ব্ব পারে পাবাগড়ের পাহাড়টি মাথা উঁচু করিয়া নৈবেদ্যের তণ্ডুলস্তূপের মত



সয়াজী সরোবর ও জলটুঙ্গি

দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলাম এই পাহাড়টির উপর একটি দুর্গ এবং দেবমন্দিব আছে। হ্রদের ওপারের পাহাড়টি কি রহস্যময় মায়াময়ই যে বোধ হইতে লাগিল, তাহার বর্ণনা দিতে গেলে কবি অখ্যাতি কপালে জুটিয়া যাইবে। কবি-বন্ধু দুর্গামোহন কুশারীর "পল্লী" নামক কবিতা গ্রন্থের একটি কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়িতে লাগিল—

কোথায় কে যে ডাক্‌ছে মোরে
বুঝ্‌তে নাহি স্মরি!

কোন্ তটিনী কোন্ পারাবার,
কোন্ সে মাঠের এপার ওপার,
কোন্ পাহাড়ের ধ্যানের টানে
স্থির রহিতে নারি!

স্বচ্ছ জলপূর্ণ হ্রদের বিশাল বুকে একটি পানা পাতার আবরণ পর্য্যন্ত নাই। ওপারে শুধু নলখাগড়া জাতীয় দুই চারিটি গাছ জল হইতে মাথা তুলিয়া আছে। তাহারই



নিমেটা জল শোষণের কারখানা

পরে পাবাগড় পাহাড়ের ধ্যান গাম্ভীর্য্যের যে কি মারাত্মক আকর্ষণ, তাহা পাঠকগণকে কেমন করিয়া বুঝাইব? ওপারের বংশীনিনাদের মোহিনী-শক্তির মহিমা অনেক কবিই গাহিয়া গিয়াছেন,—

ও-পার হতে বাজায় রে বাঁশী,
এপার বসে শুনি।
আমি ত অবলা নারী
সাঁতার নাহি জানি রে—
বাঁশী বাজান জান না! [illegible]

এ-ও যেন তাহাই! মনে হইতে লাগিল, পাবীগড়ের পাহাড়ের নিকটে যাওয়া চাই-ই,—উহার মাথায় চড়িয়া উহার মন্দিরের দেবতা দর্শন করিয়া না গেলে, বাঁচিয়া থাকিবার আর কোন সার্থকতা রহিল না। কষ্টে-সৃষ্টে উহার মাথায় উঠিয়া শিখরে দাঁড়াইলেই মনে হইবে—

পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন
গণিবারে পারি।

নীলকণ্ঠের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—"চল না, পাহাড়টা দেখিয়া আসি?" নীলকণ্ঠ বলিল—"পাগল হইয়াছেন? ত্রিশ মাইল ঘুরিয়া গেলে তবে পাবাগড়ে যাওয়া যায়!"

পাগলই হইয়াছিলাম বটে, অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্য। দূরত্ব শুনিয়া উন্মত্ততা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। নীলকণ্ঠ কয়েকখানা ফটোগ্রাফ তুলিলে পর রাস্তায় নিমেঠা জলের কল দেখিয়া প্রায় ১১টায় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

বৈকাল সাড়ে পাঁচটার ট্রেণে রৈবতক পর্ব্বত দ্বারা রক্ষিত আদি দ্বারবতী দেখিতে জুনাগড় রওনা হইলাম।

আলো-ছায়া

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঘুনাথের সঙ্গেই বিরাজমোহিনীর বিবাহ হইবে,—কথাটা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলেই জানিতে পারিয়াছে; এবং রঘুনাথের সমবয়সী বন্ধুরা ইহা লইয়া তাহাকে মাঝে-মাঝে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে। ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণ, বিরাজ অসাধারণ সুন্দরী, আর রঘুনাথের চেহারাটা ঠিক সুপুরুষের মত নয়, অর্থাৎ গায়ের রঙ্‌টা ময়লা, হাত দু'খানা লম্বা, নাকের গড়নটা যেন চাপা-চাপা, ইত্যাদি।

রঘুনাথের বন্ধুরা বলে—তোর স্ত্রীভাগ্য চমৎকার!

কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপ যে যতই করুক, কুৎসিত হইলেও বিরাজ রঘুনাথকে পছন্দ করে।

বিরাজের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় ওর বাবা, রঘুনাথকে শহর হইতে গ্রামে, নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখেন। রঘুনাথ না-কি একটা চায়ের হোটেলে চাক্‌রি করিত। ওর ত্রিসংসারে 'আপন' বলিতে কেউ বাঁচিয়া নাই শুনিয়া, বিরাজের পিতা ঘোষাল মশায়ের মনে দয়া হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে পনের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এক সঙ্গে, একই বাড়ীতে সমান ভাবে লালিত-পালিত হইয়া, বিরাজ যে রঘুনাথকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে, ইহা অস্বাভাবিক নয়।

বিবাহের কথাটা যখন বাড়ী হইতে পাড়ায়, এবং পাড়া হইতে সমস্ত গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বিরাজ তখনও রঘুনাথের জামা-কাপড়ে সাবান ঘষিতে-ঘষিতে বলে—তুমি মাঠে-মাঠে লাঙল চষে' বেড়াও না কী? এ-সব কি ভদ্রলোকের কাপড়-জামা? কাল থেকে এ-গুলো গিরি-মাটীতে রঙ্‌ করে নিয়ো, ময়লা হবে না।

লজ্জা-সরমের বালাই নাই, সঙ্কোচ নাই, লোকজন মানামানি নাই,—ওরা দু'জনে যেন কাহারও তোয়াক্কা রাখে না।

যেদিন ঘোষালমশায় পুরোহিতকে ডাকিয়া, বিবাহের দিন স্থির করিতে বলিলেন, সেদিন বিরাজই সভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিয়া বসিল—এ-মাসে তো হবে না বাবা,—এ-মাসটা ওর জন্মমাস।

পুরোহিত অবাক্! এ কোন্ দেশের মেয়ে! লজ্জার সঙ্গে এতটুকু সম্বন্ধ নাই! হ'লই বা বাপের আদুরে মেয়ে, তাই ব'লে এতটা বাড়াবাড়ি!

ঘোষাল মশায় মনে-মনে খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওর জন্মমাস···তুই কি করে জান্‌লি?

বিরাজ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবা।

ঠিক এমনি সময় রঘুনাথ পাড়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। ওর হাতে একখানি বেহালা।

রঘুনাথ ভালো বেহালা বাজাইতে শিখিয়াছে—গানও করে সুন্দর। গ্রামের যাত্রাপার্টিতে আজকাল রঘুনাথের ভয়ানক খাতির।

বিরাজ বলিল—ঐ-তো,·· তুমিই ওকে জিজ্ঞেস কর না বাবা।·· এ মাসটা তোমার জন্মমাস নয়?

রঘুনাথ বলিল—হুঁ,···তাছাড়া দোলের রাত থেকে আমাদের বায়না আছে সাত দিনের। শহরে যাবো।

পুরোহিত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—তাহ'লে বিয়ে করবার ফুরসৎটা কতদিনে হবে, বাবাজী? আস্‌চে মাসে হবে? দিন দেখ্‌বো?

বিরাজ তখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেছে। রঘুনাথের 'বায়না' আছে শুনিয়া ওর অভিমান হইয়াছিল। মা বাঁচিয়া নাই, একটি ছোট ভাই কি বোনও নাই;—বিরাজের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে বাড়ীর ভিতর আর একজনও নাই।

রঘুনাথও পুরোহিতের কথার জবাব না দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বিরাজের ভাবান্তরটুকু ওর নজরে পড়িয়াছিল।

পুরোহিত বলিলেন—রঘুনাথের আশা ত্যাগ করো ভায়া। ওর ভাব-গতিক ভালো নয়। তাছাড়া শুন্‌লাম, —গাঁজা-মদ—কিছুই ওর বাদ যায় না আজকাল।

ঘোষাল মশায় হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।—রঘুনাথের

মদ-গাঁজা কিছুই বাদ যায় না! হবে-ও বা! ইতর যে··· চায়ের দোকানে চাক্‌রি করতো—ছত্রিশজাতের এঁটো ধোয়া···

শহরে, কোনো ধনী জমিদার-বাড়ীতে যাত্রা হইবে। যাত্রার দলে যত লোক ছিল, সকলেরই মনে-মনে অহঙ্কার দেখা দিয়াছে। বিশেষতঃ দলের ওস্তাদ্ রঘুনাথের তো কথাই নাই। ধরাকে রঘুনাথ সরার মত দেখে। রাত-দুপুরে বাড়ী ফিরিয়া, ঘুমন্ত বিরাজের বন্ধ দরজায় ঘা দেয় আর ডাকে—ভাত দাও বিরাজ!—ওঠো।

বিরাজ অনেক ডাকাডাকির পর উঠিয়া দুয়ার খুলিলে, রঘুনাথ চোখ দু'টা কপালে তুলিয়া বলে—সন্ধ্যে হ'তে-না হ'তেই এত ঘুম!···যদি তোমার কষ্ট হয়, কাল থেকে 'রিয়েসাল্'-ঘরেই না হয় চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে প'ড়ে থাক্‌বো।

বিরাজ ভাতের থালাটা সুমুখে ধরিয়া দিয়া বলে—আর দিনের বেলায়?

রঘুনাথ রাগ-রাগ ভাবে জবাব দেয়—ভেব' না যে, তুমি ছাড়া ত্রিসংসারে আমাকে ভাত রেঁধে দেওয়াব লোক নেই। দলে এক পাল ছেলে আছে, যাকে ব'ল্‌বো মুখের কথা খসাতে দেরী।

বিরাজ আর সাম্‌লাইতে পারে না, বাঁ-হাতে চোখ দু'টা মুছিয়া লইয়া বলে—তা'হ'লে সেই ব্যবস্থাই ক'রো। মিছি-মিছি আমাকে এ-বেলা ও-বেলা কষ্ট দেওয়া কেন? সুবিধে যখন রয়েচে—

'করবোই তো ব্যবস্থা। কী অত ভয় দেখাচ্ছো তুমি? বলিয়া একদিন রঘুনাথ ভাতের থালাটা বিরাজের বাঁ-পায়ের বুড়ো-আঙুলের কাছাকাছি ঠেলিয়া দিয়া, আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরাজ একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—তুমি গাঁজা খাও!··গাঁজা খাও তুমি?

বলিতে বলিতে, রঘুনাথের পকেট হইতে সদ্য-পড়িয়া-যাওয়া গাঁজার কলিকাটি তুলিয়া লইয়া রঘুনাথের মুখের কাছে ধরিল।

রঘুনাথের মুখখানা এক নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। ওর কথা বলিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত যেন লুপ্ত হইয়া গেছে!

বিরাজ আর দাঁড়ায় না, অভুক্ত রঘুনাথকে একটিবারও আহারের জন্য অনুরোধ করে না—রঘুনাথেরই চোখের সাম্‌নে, বিরাজের ঘরের দুয়ারটা সশব্দে বন্ধ হইয়া যায়

পরের দিন সকালে উঠিয়াই বিরাজ দেখিল—রঘুনাথ ঘরে নাই,—কখন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেছে। বোধ'হয় সেই আড্ডাঘরে।

বিরাজ ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। গামছা, জামা চাদর, টীনের সুটকেস্‌টা, বেহালার খালি বাক্স সমস্তই ঠিক আছে। বালিশের পাশে দেশ্‌লাই এবং এক তাড়া বিড়ি পর্য্যন্ত পড়িয়া আছে।···যাইবার জায়গা কোথায় যে যাইবে?···যেখানে গান-বাজ্‌না হয়, সেখানে কি উনুন জ্বালিয়া ভাত-তরকারি রাঁধিবার অবসর থাকে? থাক্ না একপাল ছেলে, তাহারা রান্নার জানে কী? তাহারা শুধু রঘুনাথের বেহালার সুরে সুর মিলাইয়া, মুখ-চোখ লাল করিয়া চীৎকার করিতে জানে।

ঘরের মেজেয় কিছু না হবে তো কুড়ি-পঁচিশটি পোড়া বিড়ির টুক্‌রা পড়িয়া ছিল,—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করে আর বিরাজ মনে-মনে হাসে—বাবুর রাগ ক'রে কাল ভাতই খাওয়া হ'ল না। সারারাত যে উপোসী রইলি বাপু, পেট জ্ব'ললো কি আমার? ওঃ · ভা-রি আমার আব্দার!· শোঁ শোঁ ক'রে গাঁজায় দম্ মারচেন, আর আমি বুঝি তাই স'য়ে থাক্‌বো?

সারা বাড়ীখানা রোদ্রে ভরিয়া গেছে। গত সন্ধ্যায় তুলসী বেদীর উপর যে প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, একটা পথ-চল্‌তি কুকুর আসিয়া তাহারই বাসি-সলিতাটির ঘ্রাণ লইতেছিল—

ঘোষাল মশায় গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—বিরাজ!

বিরাজ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ বলিলেন—তুলসীগাছের বেদীটুকু পর্য্যন্ত বাসি হ'য়ে রইলো, ঘর-দোর তো দূরের কথা!—সকালবেলায় গেলি কি-না ঐ মাতালটার বমি সাফ্ করতে!···বেরিয়ে আয়! ওর সঙ্গে আজ থেকে তোর বাক্যালাপ বন্ধ। মনে থাকে যেন।

বিরাজ অবাক্ হইয়া যায়!

বাপকে ওর প্রতি এতখানি রূঢ় হইতে আর কোনো দিনই ও দেখে নাই। তবু ভয়ে-ভয়ে প্রতিবাদ করিতে গেল—কিন্তু মদ তো···

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মদ খায়। আমি নিজের কানে শুনেছি। তা ছাড়া দেখ্-না? দাঁড়িয়েই তো আছিস, ঘরখানা দেখ্-না—তক্তাপোষটার তলায় বোতল আছে ক' ডজন?

রাগ করিয়া থাকিতে পারিল না,—রঘুনাথ বেলা দু'টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

ঘোষাল মশায় ভিতরেই ছিলেন। রঘুনাথকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

—রোজগার ক'রে এলে? কিন্তু এটা তোমার আপন বাড়ী নয়,—তা মনে আছে তো?

রঘুনাথ ফ্যাল্ ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল। ওর মুখের রঙ্ ফ্যাকাশে হইয়া গেছে—পা দু'টায় কাঁপন ধরিয়াছে। এতখানি অপমানজনক ভৎ'সনার জন্য রঘুনাথ কোনো দিনই প্রস্তুত ছিল না। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

ঘোষাল মশায় বলিলেন—ফের্ যদি ঐ ছোট লোকের দলে তোমায় দেখি, এক-কাপড়ে বাড়ী থেকে বিদেয় করবো। যেমনটি এসেছিলে, যাবেও ঠিক তেম্নি হ'য়ে। ভাত কাপড় দিয়ে পুষেছি এতকাল, শাসন করবার অধিকার আমার আছে।

খালি বাক্সটা খুলিয়া, বেহালাখানি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে রঘুনাথ ভাবিল,—সমস্তই বিরাজের চক্রান্ত। গাঁজার কলিকা পাইয়া, বিরাজই বাপের কাছে সাতখানি করিয়া লাগাইয়াছে। বিরাজকে এত ছোট ভাবিতে ওর সমস্ত মন গ্লানিতে ভরিয়া গেল। ধরা পড়িবার পর, আজ সারাদিন একটি বারের জন্যও সে নেশা করে নাই। অথচ অপমান সহিতে হইল প্রচুর!···

স্নানের পর, রঘুনাথ কেবলই ঘর বাহির করে। 'ভাত দাও' বলিয়া বিরাজকে ডাকিতে সাহস পায় না, অথচ না খাইয়া, রাগ করিয়া পলাইতেও ওর কুণ্ঠা আসে।

বিরাজ ভাত বাড়িয়া, থালাখানি আসনের সুমুখে রাখিয়া দিয়া নীরবে বসিয়া বসিয়া নানা কথা চিন্তা করে। কিন্তু রঘুনাথকে 'এসো—খাবে' বলিয়া ডাকে না। একটু আগে ঘোষাল মশায় রঘুনাথকে যে তীব্রভাষায় অপমান করিয়াছেন—তাহাতেই বিরাজের মনে নিদারুণ লজ্জা আসিয়াছিল। ওর বাবা চিরকালকার বদ্-মেজাজি মানুষ, সময় অসময়ে অনেককে এমন কথা শুনাইয়া দেন, যাহা শোনানো তাঁর পক্ষে কোনো দিনই উচিত নয়। রঘুনাথও এই অহেতুকী অপমানের হাত হইতে রেহাই পায় না। কিন্তু আজিকার অপমান···

আন্‌মনা বিরাজের সুমুখেই, একটা কুকুর আসিয়া রঘুনাথের জন্য বাড়া ভাতগুলা খাইতে সুরু করিয়াছে!

রঘুনাথ দেখিল, কিন্তু কথা কহিল না।

বিরাজ টের পাইয়াই কুকুরটাকে তাড়াইয়া দিয়া, চোখে আঁচল চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এইবার রঘুনাথ কথা কহিল,—আমি তাহ'লে চ'ল্লাম বিরাজ। এক কাপড়েই চ'ল্লাম।

বিরাজ আর সহ্য করিতে পারিল না,—অভিমানে, দুঃখে, রাগে ওর মুখখানায় তখন দেহের সমস্ত রক্তই জমা হইয়া গেছে, গলা দিয়া স্বর বাহির হয়না।

রঘুনাথ বলিল—তোমার বাবাকে ব'লো,—যেমনটি এসেছিলাম···

বিরাজ চীৎকার করিয়া উঠিল—তাই যাও—তাই যাও তুমি। তোমার জন্যে আমি অনেক স'য়েছি, আর সইবো না, চ'লে যাও তুমি—দূর হও!···মাতালের সঙ্গে কথা কইতে আমার লজ্জা করে।

রঘুনাথ রান্নাঘরের দাওয়ার নিকটে, বিরাজের খুব কাছাকাছি দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার কাছে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই, আমি তেত্রিশ কোটী দেবতার নামে শপথ ক'রেছি,—জীবনে মদ-গাঁজা আর ছোঁব না।·· তাহ'লে আসি,···তোমার বাবা এলে ··

বিরাজ মুখ নীচু করিয়া রহিল। চোখে ওর জল আসিতেছিল। কিন্তু মুখ তুলিয়া যখন চাহিল, তখন রঘুনাথ আর দাঁড়াইয়া নাই—চলিয়া গেছে।

বিকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কিছু না হবে তো দশবার যাত্রাপার্টির লোক আসিয়াছে,—'রঘুদা আসেনি?' 'মাষ্টার মশায় আসেন নি?' 'রঘুনাথ ফেরেনি এখনো?'

কিন্তু বিরাজ 'না' ছাড়া আর একটি কথাও বলিতে পারে নাই। রঘুনাথ যে অভিমান বা রাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেছে, হয়তো চিরদিনের জন্যই নিরুদ্দেশ হইয়াছে—এ কথা বলিতে ওর কষ্ট হয়,—লজ্জাও হয়।···

বিরাজ সমস্ত দিন মুখে অন্ন-জল দেয় নাই—রাত্রিতেও

দিল না। বাপকে খাওয়াইয়া হাঁড়ি তুলিতে তুলিতে ভাবিল, রঘুনাথের জন্য এক থালা ভাত বাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখে। হয়তো সে রাত-দুপুরে আসিয়া ডাকাডাকি করিবে··· হয়তো সে-ও সারাদিন না খাইয়া রহিয়াছে।

*   *

*

দশ বারোদিন পরে, একদিন ঘোষাল মশায় বিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন—কাল নলডাঙার বাবুদের বাড়ী থেকে লোকজন আসবে মা, রামরতন বাবু স্বয়ং আসবেন। রাখুর মাকে ব'লে এসেচি, রান্না-বান্না সব ক'রে দেবে। তোর চুল-টুল যা বাঁধ্‌তে হয়—সকাল সকাল শেষ ক'রে নিবি।

নলডাঙার বাবুরা বড় জমিদার,—এ কথা বিরাজ জানে, রামরতন বাবুর নামও শুনিয়াছে, কিন্তু কেন যে তিনি আসিতেছেন তাহাই বিরাজ ভাবিয়া পায় না।

রঘুনাথ যে সত্য সত্যই আর আসিবে না,—এ কথা বিরাজ বিশ্বাস করে না। কোন্‌ দিন রাত-দুপুরে অথবা ভোরবেলায় বিরাজের ঘরের পথের দিক্‌কার জানালাটায় খুট-খুট শব্দ করিয়া সে ডাকিবে—'বিরাজ।'

বিরাজ তো সারা রাত্রিই জাগিয়া কাটায়, ধড়-মড় করিয়া উঠিয়া বসিবে, অন্ধকারেই হাত্‌ড়াইয়া-হাত ড়াইয়া দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিবে তারপর কতকাল পরে দেখা হইবে: শীর্ণ কঙ্কালসার রঘুনাথ, না খাইয়া মুখখানি শুকাইয়া গেছে, গলার আওয়াজ হইয়াছে ক্ষীণ, মুখে এক-মুখ গোঁফ দাড়ী, পরণের কাপড়খানা কয়লার দোকানের কুলীটার মত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ!

ঘোষাল মশায় কন্যাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—রামরতন বাবুর ছেলে, ক'লকাতায় পড়ে,—রাজপুত্তুরের মত চেহারা,—আর সত্যিই তো রাজপুত্তুর। রামরতন বাবু রাজা বিশেষ লোক। একটা পয়সা আমার খরচ হবে না,—অথচ মেয়ে হবে রাণী। গ্রহ আর বলে কা'কে?—কোথাকার এক হাড়-হাবাতে ছোট লোককে নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে এসেছিলাম জাতি-মাহাত্ম্য যাবে কোথা? ভগবান বাঁচিয়েছেন! মাতাল · গাজাখোর··· শয়তানের রাজা···

বিরাজের হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়,—রঘুনাথ যাবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জানাইয়া গেছে—'তেত্রিশকোটী দেবতার নামে শপথ ক'রেছি, জীবনে মদ-গাঁজা আর ছোঁবনা বিরাজ।'

রঘুনাথের ঘরে, সেই বেহালার বাক্সটার গায়ে জানালা দিয়া পশ্চিমের পড়ন্ত রৌদ্র আসিয়াছে। বিরাজ তাহাই এক দৃষ্টে দেখে, আর ভাবে—ঐ জিনিসটিই ছিল রঘুনাথের সব চেয়ে প্রিয়!

মেয়ে দেখিয়া রামরতন বাবু সঙ্গে সঙ্গে দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। আর একুশ দিন পরে বিরাজের বিবাহ।

রূপের খ্যাতি তো বরাবরই আছে, আজ আবার জমিদারবাবু স্বয়ং সেই রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গেলেন। নারীমাত্রেই আপন রূপের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসে। বিরাজও যে না বাসে এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু আজ ওর ইচ্ছা হয়, কালো চুলের রাশ আপন হাতে কাঁচি ধরিয়া কাটিয়া ফেলে,—খোঁপার কাঁটা খুলিয়া লইয়া, সেই কাঁটার সাহায্যে চোখ দু'টা উপড়াইয়া দিয়া মনের আনন্দে হাত-তালি দিয়া হাসে। আর হাসিতে হাসিতে উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়। যেখানে রঘুনাথ দিনের পর দিন না খাইয়া উপবাসে দিন কাটাইতেছে—তবু জেদ্‌ ভুলিয়া যায় নাই,—সেইখানে পৌঁছিয়া বলে—আমাকে চিন্‌তে পারো? আমি বিরাজ নলডাঙার জমিদার বাড়ীর বউ আমি রাণী।

ঘোষাল মশায়ের মেজাজটা আজকাল অসম্ভব রকম বদলাইয়া গেছে। কথায় কথায় হাসি, প্রতি অঙ্গ ভঙ্গীতে গর্ব্ব · জমিদারের বৈবাহিক কি না, এখন নিজেকে সামান্য ভাবিতে ওঁর লজ্জা হয়।

কিন্তু যখন তখন রঘুনাথের কথা তুলিয়া অজস্র গালি গালাজ করাটা যেন আজকাল ওঁর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বলেন—পেটে নাই এক কড়া বিদ্যে, 'ক' লিখতে হ'লে কেঁদে ভাসায় ও আবার একটা মানুষ! চায়ের হোটেলে হাড়ি-ডোম্‌ মুচি-মুদ্দোফরাস্‌—ছত্রিশ জাতের এঁটো বাসন মাজতো। কপাল আর বলে কাকে? সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয় কি-না! বাবুর বড়লোকি রোগ ধরলো! · ওঃ—ব্যাটা হ'লো কি-না যাত্রাপার্টির ম্যাষ্টার!···এখন দিব্যি সুখে আছেন!—জানিস বিরাজ? এখন ব্যাটা করে কি



শাঁখারী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সাহা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

জানিস ?—একটা 'গুপীযন্তর' বাজিয়ে বেশ্যা পল্লীতে গান গেয়ে বেড়ায়। এক পয়সায় একটা গান, দু'পয়সায় ...

বিরাজ গম্ভীর হইয়া বলে—কিন্তু দশবারো দিনের ভেতর তুমি তো কই শহরের দিকে যাওনি বাবা! এটা নিশ্চয় তোমার শোনা কথা!

ঘোষাল মশায় জবাব দেন—কিন্তু এটা স্বয়ং ভগবানের মুখের কথার মতই সত্যি কথা বিরাজ। আমাদের পুরুত ঠাকুর সেদিন স্বচক্ষে দেখে এসেচেন।

বিরাজ বলিতে গিয়াও পারে না যে,—পুরুত-ঠাকুর বেশ্যা পল্লীতেও ঘোরেন তাহ'লে ?

ঘোষাল মশায় বলেন—গাঁ শুদ্ধ লোক আমাকে দফায় দফায় ব'লেছিল—'রঘুনাথ মদ খায়, গাঁজা টানে'···কিন্তু কারুর কথায় আমি কান দিইনি। যেদিন পুরুত-ঠাকুরের মুখে শুনলাম, ··নইলে এক কথায় আমি ওকে বাড়ী থেকে তাড়াই ?

বিরাজ মুখ নামাইয়া বলে—কিন্তু যাবার দিন সে ব'লে গেছে—'ও-সব আর ছোঁবে না কখনো।'

ঘোষাল হাসিয়া ওঠেন।

—মাতালের কথা তো? পাগলের চেয়েও সরেশ। পুরুত ঠাকুরই তো শুনে এসেচেন,—একদিন থানায় ধ'রে নিয়ে গেছলো। পঁচিশ ঘা বেত মেরে পিঠের এক ইঞ্চি চাম্‌ড়া তুলে' দিয়েছে। · মাতালে কখনো মদ ছাড়তে পারে ?

বিরাজ আর দাঁড়ায় না। ঘরের মধ্যে গিয়া গালে হাত দিয়া ভাবে—এই তা'র তেত্রিশ কোটী দেবতার নামে শপথ! কিন্তু আজ যদি একটিবার দেখা পাওয়া যায়,—বিরাজের সুমুখে সে কেমন করিয়া মদ খায়, গাঁজার কলিকা টানে—বিরাজ একবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে।

বিবাহের তিন দিন আগে···

'গায়-হলুদে'র তত্ত্ব আসিয়াছে।

সারা গাঁ-খানার লোক ভাঙিয়াছে—জমিদার-বাড়ীর তত্ত্ব দেখিতে।

কাপড় জামা, এসেন্স্-পমেটম্, তেল-সাবান, বাক্স-গহনা—কত-কি! এত জিনিস এক সঙ্গে এ-গাঁয়ের লোক কখনো দেখিতে পায় নাই। সন্দেশের থালাই আসিয়াছে কুড়ি-বাইশখানা। হরেক রকমের সন্দেশ—সবগুলির নামও জানা নাই! দারোয়ান-দু'টার পোষাক দেখিয়াই তো গ্রামের লোকের চক্ষু স্থির হইয়া গেছে! তা'দের হাতে বড় বড় বন্দুক—কোমরে ছোরা ঝুলিতেছে,—গোঁফ জোড়া দেখিয়া ভয়ে পেট কামড়াইয়া ওঠে!···গাঁজাখোর রঘুনাথ আর রামরতনবাবুর কার্ত্তিকের মত ছেলে!—আরে ছ্যা-ছ্যা!···বিরাজের অদৃষ্টের তারিফ্ করে সবাই, আবার হিংসা করিতেও ছাড়ে না।

পুরোহিত মশায় ঘুরিয়া-ফিরিয়া চারিদিকের খোঁজ-খবর লইয়া বেড়ান, আর মাঝে মাঝে বলেন—বলি ঘট্‌কালি করেছিল কে-হে? এ শর্ম্মা লোহায় হাত দিলে সোনা হয়, শুক্‌নো গাছে ফুল ফোটে।···

বিরাজ চোখ বুজিয়া, দাঁতে দাঁত চাপিয়া নিজের কপালটা এয়োস্ত্রীদের সামনে বাড়াইয়া দেয়।—যথা নিয়মে 'গায়-হলুদে'র পালা শেষ করিয়া, মেয়েরা বিরাজকে লইয়া হলুদ-তেল মাখাইতে বসে।—হাসি-তামাসার আর শেষ নাই!

বিরাজ মনে-মনে যাতনা অনুভব করে। ওর দেহটা যেন কয়লার দগ্‌দগে আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া যায়। পোষা কুকুরের মত,—ফাঁসীর আসামীর মত ও-যেন লোকের হুকুম তামিল করে।

এখনো যদি আসিয়া পড়ে! যদি এই দিন-দুপুরে, উঠানের মাঝখানে আসিয়া রঘুনাথ একটিবার দাঁড়ায়,—হোক্ না তার রুক্ষ চুল, শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ! যদি আসে একটিবার,—এই বাড়ীশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিরাজ আজ অবলীলাক্রমে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেয়। রঘুনাথের ধূলি-কাদায় ভরা খালি-পা'দুখানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বিরাজ মার্জ্জনা ভিক্ষা করে। বলে—তুমি স'য়ে এসেছিলে, তাইতো আমি তোমার ওপর অভিমান ক'রেছি। স্পর্দ্ধা যদি তুমিই আমার না বাড়িয়ে দিতে, তাহ'লে তুচ্ছ বিরাজ, তোমার মুখের ভাত কুকুরকে খাইয়ে কাঁদে?···আমি তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছি,···কিন্তু তুমি তো জান্‌লে না, আমার দেহ, আমার মন, আমার আত্মা—দু'হাত বাড়িয়ে তোমাকে আঁকড়ে' ধরে রাখতে চেয়েছিল! শুধু অভিমানকে বশে আন্‌তে পারিনি ব'লে তোমায় 'দূর হও' ব'লেছিলাম। আমার মন তুমি বুঝেও বুঝলে না। তুচ্ছ মুখের কথা—'দূর হও' শুনে, তুমি সত্যি-সত্যিই দূরে পালিয়ে গেলে!···

বিবাহের দিন আবার তত্ব আসিল।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড রুই মাছ, হাঁড়ি-হাঁড়ি দই, ভারে-ভারে সন্দেশ-রসগোল্লা!···তার সঙ্গে পুরোহিত মশায়ের নামে লম্বা একখানা চিঠি।

ঘোষাল মশায়ে'র আর মাটীতে পা পড়ে না। এতখানি সৌভাগ্য এখন সহ্য হইলে হয়। গরীবের ঘরে রাজ-ভাণ্ডার আসিয়া জমা হইয়াছে,—গরীব আজ রাজা।

চিঠি পড়িয়া পুরোহিতের মুখখানি অসাধারণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘোষালকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন—জেনো ভায়া,—ভগবান যখন যা করবেন, সবই মঙ্গলের জন্যে। আমি মনে-মনে যা চেয়েছিলাম, চিঠিতে অবিকল তাই-ই লেখা রয়েচে। যেন এ চিঠি স্বয়ং ভগবানই লিখেচেন!···রামরতনবাবুর ছেলে, ক'লকাতার বেহ্ম-সমাজে নাম লিখিয়েচে। বিয়েও করেছে বেহ্ম-জ্ঞানীর বাড়ীতে।

ঘোষাল মশায় হাঁ করিয়া চাহিলেন। ওঁর মুখখানা কাগজের মত সাদা—যেন একবিন্দু রক্ত নাই! রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—তাহ'লে উপায়?

—শোনো আগে, উপায় আছে বই কি। রামরতনবাবু সদাশয় লোক, এ যুগের রাজর্ষি। শোনো কি লিখেচেন—

'······আমি নিজেই ঘোষাল মশায়ে'র কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। যখন কথা দিয়াছি, তখন এ-ছাড়া আর উপায় কি?···ঘোষাল মশায়কে আমার প্রণাম দিবেন। তাঁহার নামে পাঁচ হাজার টাকার 'চেক্' পাঠাইলাম। অবশ্য ঘট্‌কালির দরুণ আপনিও ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন না। ছেলেকে আমি 'ত্যজ্যপুত্র' করিলাম। আমার যাবতীয় সম্পত্তি ভবিষ্যতে বিরাজমোহিনীই ভোগ করিবে।···যথাসময়ে উপস্থিত হইব। কোনো গণ্ডগোল বা ধুমধামের নামগন্ধ থাকিবে না;—ওখানেও যেন না থাকে।

—দেখ্‌লে ভায়া? কী লোক দেখ্‌লে? ঐ তো ব'ল্‌লাম,—এ যুগের 'রাজর্ষি'। আমি জান্‌তাম ছেলেটা ব'য়ে গেছে। যাক্‌···ভালোই হ'লো। বিরাজ আমাদের সত্যিই রাণী হ'লো,—মহারাণী!···তাহ'লে 'চেক্'খানা রেখে দাও!···সাত বছর স্ত্রীবিয়োগ হ'য়েচে, ভুলেও বিবাহের নাম করেন নি। কিন্তু আজ হঠাৎ···এরই নাম কর্ত্তব্য···ধর্ম্মজ্ঞান।

'চেক্'খানা হাতে লইয়া ঘোষাল মশায় একদৃষ্টে চাহিয়া দেখেন, আর ভাবেন—'পাঁচ হাজার টাকা!' এক আধ্‌শো নয়—পঞ্চাশশো!···আর বৈবাহিক নয়,—এখন [illegible] রাজর্ষির শ্বশুর।

পুরোহিত আপন মনেই বকিয়া যান—সরকার থেকে পাঁচ-পাঁচবার 'রায়-বাহাদুর'—'রাজা'—'মহারাজা'—কত কি খেতাব্ দিতে চেয়েছিল, উনি তা' নিলেন না। বলেন—'ওতে মানুষের অহঙ্কার বাড়ে···মন তো বশের নয়, হয়তো কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘট্‌বে।'···ছেলে বিয়ে করলে না, মা-ঠাক্‌রুণ মনের দুঃখে কাশীবাসী হ'লেন। মাস-মাস সেখানে হাজার টাকা মাসোহারা পাঠাতে হয়···এইবার বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বাড়ী ফিরে আস্‌বে।···আর বয়েসই বা কত? আমাদের হ'লো পঞ্চান্ন,—তেরো-শো-সাত-সালের বন্যার সময় ওঁকে দেখেছিলাম—চাল-ডাল কাপড়-চোপড় নিয়ে গ্রামে-গ্রামে সেবা ক'রে ফিরচেন। বছর-কুড়ি হয়তো বয়েস তখন যেমন শক্তি, তেমনি মন

বিনাড়ম্বরে, সামান্য দু'চারজন লোক সঙ্গে করিয়া রামরতনবাবু বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেছে। বর কন্যা বাসর-ঘরে। বাহিরের বিস্তৃত উঠানে, মহাসমারোহে ভোজন-পর্ব্বের আয়োজন হইতেছিল।

রামরতনবাবু ধুমধাম করিয়া বিবাহ করিতে না আসিলেও, ঘোষাল মশায় স্থানীয় ইতর-ভদ্র বহু লোকজনকে নিমন্ত্রণ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। মনের গর্ব্বটুকু বাহিরে—জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রামরতনবাবুর মত ধনী জমীদারের শ্বশুর হইতে পারিয়াছেন—এ-সংবাদ আজই দিকে-দিকে ছড়াইয়া পড়ুক—এই ইচ্ছা প্রাতঃকাল হইতেই তাঁর মনে জাগিয়াছিল।

যাত্রা পার্টির উপর তাঁর বরাবরই একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। না থাকিবার কারণ, এই যাত্রার দলে মিশিয়াছিল বলিয়াই তিনি রঘুনাথকে অনায়াসে তাড়াইতে পারিয়াছেন; উপযুক্ত সময়ে রঘুনাথ বিতাড়িত হইয়াছিল বলিয়াই তো আজ বিরাজ রাজরাজেশ্বরী!

ঘোষাল মশায় যাত্রার দলের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

অধিক রাত্রে, বিবাহ শেষ হইয়া গেলে, দলের লোকেরা গান-বাজনার জন্য আসর সাজাইতে লাগিল। ঘোষাল মশায় কোনো আপত্তি করিলেন না। আপত্তি করিবেনই বা কেন? বাড়ীতে ধুমধাম হোক, লোকজন মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ-আহ্লাদ করুক—ইহাই তো তিনি চান!

বর আর বধূ,—বাসরঘরে আর কেহ উপস্থিত নাই।

বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—অনেকক্ষণ। বধূ বিরাজেরও যেন তন্দ্রা আসিয়াছে। ওর ললাট কুঞ্চিত হয়, মাঝে-মাঝে ঠোঁট দু'টি নড়ে, মুখে কখনো আনন্দের চিহ্ন আসে—কখনো বিষণ্ণতা—কখনো বা মৃদু হাসির আভা ফুটিয়া ওঠে!

তন্দ্রার ঘোরে বিরাজ হয়তো স্বপ্ন দেখিতেছিল। হঠাৎ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, ব্যগ্র দৃষ্টি দিয়া ঘরখানার চারিদিকে কি যেন খুঁজিতে লাগিল!

ওর কানে বাজিতেছে বেহালার সুর!

এইমাত্র স্বপ্নের ঘোরে রঘুনাথের সহিত বিরাজের কত কথা হইয়াছে! কত হাসি, কত গান, কত আনন্দের কলহ! কত মান—কত অভিমান!

বিরাজের দৃষ্টি পড়ে আপনার দেহের প্রতি। সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার—মণি-মুক্তা-হীরা-জহরৎ—যেখানে যেমনটি দিলে মানায়। ওর ললাটে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা—মাথায় সোনার মুকুট!

সমস্ত অন্তর বিরাজের হাহাকার করিয়া ওঠে! আজ দীন-দরিদ্র রঘুনাথ তাহারই জন্য হয়তো অপমান সহিয়াছে, তাহাকে রাণীর সাজে দেখিয়া অভিমানে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেছে!—ঐ-তো বেহালার করুণ সঙ্গীত এখনো বিরাজের কানে-কানে কত কথা—কত অতীতের মর্ম্মবাণী শুনাইয়া দিয়া যায়!

বিরাজ চোখ-মুখ মুছিয়া স্থির হইয়া শুনিল—তখনো সেই সুর—বেহালার করুণ রাগিণী! ও আর স্থির থাকিতে পারিল না—দুয়ার খুলিয়া আলুথালু বেশে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যাত্রাপার্টির নিমকহারাম লোকগুলা হারমোনিয়াম্ আর বেহালা বাজাইয়া বিকট সঙ্গীত সুরু করিয়াছে!

বিরাজের আপদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ওর মনে হইল, দলশুদ্ধ লোক আজ তাহাকে তামাসা করিতে আসিয়াছে, তাহারই সম্মুখে নিরুদ্দিষ্ট রঘুনাথের প্রতি অতি নিকৃষ্ট উপায়ে অবজ্ঞা জানাইতে আসিয়াছে।

বাড়ীতে তখন দস্তুর মত ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। কেউ কাহারো খোঁজ রাখে না।

বিরাজ টলিতে টলিতে একেবারে সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ তেজের সহিত স্খলিতকণ্ঠে ডাকিল—দারোয়ান্!

তন্দ্রাচ্ছন্ন শিখ্ দারোয়ান্ চোখ মেলিয়া চাহিয়াই অবাক্ হইয়া গেল!

—রাণী-মা!!

—এত সৌন্দর্য্য, এই অপূর্ব্ব বেশভূষার পারিপাট্য··· এ যে রাণী-মা স্বয়ং···

বিরাজ তখনো টলিতেছে—সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারেনা। যেন বেহালার আওয়াজ ওকে আজ মাতাল করিয়া দিয়াছে!

—হুকুম—মহারাণী···

বিরাজ হাত বাড়াইয়া কহিল—ঐ যে···বেহালা বাজিয়ে গান গায়···ওদের তাড়িয়ে দাও—এক্ষুনি··!

তার পর টলিতে টলিতেই আবার ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল স্বামী তখনো নিদ্রিত।

* *
*

রামরতনবাবু মাকে প্রণাম করিবার জন্য নববধূকে লইয়া কাশী যাইবেন।

গাড়ী-গাড়ী জিনিসপত্র বোঝাই হইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেছে। বিরাজ স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে আহারে বসিয়াছে—ঘোষাল মশায় আসিয়া দুঃসংবাদ দিলেন—যাত্রাপার্টির ছোঁড়ারা গতরাত্রে তাঁর ঘর-বাড়ী সমস্তই জ্বালাইয়া দিয়াছে; তিনি এখন নিঃস্ব এবং নিরাশ্রয়।

বিরাজ কথা বলিল না। ওর আজ মনে মনে হাসি পায়। বিবাহের পর এখনো পনের দিন অতীত হয় নাই, ইহারই মধ্যে পিতা অভাবের ফর্দ্দ লইয়া হাঁটাহাঁটি সুরু করিলেন।

কিন্তু কন্যা কিছু না বলুক বা না করুক, জামাতা

করিলেন। লোহার সিন্ধুকের চাবিটা বিরাজের হাতে গুঁজিয়া দিয়া রামরতনবাবু বলিলেন—পাঁচ হাজার টাকা তোমার বাবাকে দিয়ো। আর কাশী যাবার জন্যে···যা তোমার খুশী সঙ্গে নিয়ো। টাকাকড়ির হিসেব-নিকেস এখন থেকে আমি ছেড়ে দিলাম বিরাজ, ও-সব তোমাকেই দেখ্‌তে হবে।······

টাকা তো সামান্য নয়,—সিন্ধুক খুলিয়া দরিদ্রের কন্যা অবাক্ হইয়া যায়! চোখে কোনো দিন দেখে নাই, ভাবেও নাই কোনো দিন যে, একটা মানুষের এত টাকা থাকিতে পারে!

পিতাকে দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকার নোট গণিতে-গণিতে বিরাজ আন্‌মনা হইয়া ভাবে,—যাত্রাপার্টিই যত সর্ব্বনাশের মূল! মনে পড়ে সেদিনের কথা—তন্দ্রার ঘোরে সেই বেহালার সুর শুনিয়া······

কিন্তু আর সময় নাই,—পাল্কী আসিয়া ফটকে অপেক্ষা করিতেছে, রামরতনবাবু তাড়া দিলেন—ট্রেন ফেল হবে বিরাজ, আর দেরী ক'রো না। রাত ন'টা বাজে!······

মণিমুক্তার ঝালর দেওয়া সাজানো পাল্কী, গায়ে তার সোণার জলে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—'বিরাজমোহিনী'।

আগে-পিছে শিখ্-ঘোড়-সওয়ার,···বিরাজ ষ্টেশনে রওনা হইয়াছে। রামরতনবাবুর পাল্কী বিরাজের পাল্কীর পিছনে চলিতেছিল।

প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরা।

রামরতনবাবু হাত ধরিয়া বিরাজকে গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন। নিজের হাতে ইলেকট্রিক পাখা খুলিয়া দিলেন।

বিরাজের কপালে তখন বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। গাড়ীর উজ্জ্বল আলোকে ভুবনমোহিনী বিরাজের অপরূপ রূপ দেখিয়া বৃদ্ধ জমিদার আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারেন না; ভাবেন,—আমি ভাগ্যবান—বিরাজকে পাইয়া আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।···

মাঝারি ষ্টেশন, এখানে ট্রেন পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়ায় না।

বিরাজ জানালায় মুখ বাড়াইয়া কত কি দেখিতেছিল। কত ভিক্ষুক,—কত অন্ধ, খঞ্জ, বোবা··কেউ মন্দিরা বাজাইয়া গান করে, কেউ করুণ কণ্ঠে বলে—'সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি রাজা-বাবা!'

রামরতনবাবুর পিপাসা পাইয়াছিল, জলের কুঁজো নিজের হাতেই জল ঢালিয়া পান করিলেন, বিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জল খাবে, বিরাজ?

বিরাজ তখন আন্‌মনা। প্লাটফর্ম্মের এ-মোড় হইতে ও-মোড় পর্য্যন্ত ওর দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আছে। আন্‌মনা ভাবেই বলিল—হুঁ···

কিন্তু এখানেও বেহালার সুর! অস্পষ্ট হইয়া যেন বাতাসে মিশিয়া যায়!···কী সুন্দর··বোধ হয় কোনো ভিক্ষুক···

হাঁ, ভিক্ষুকই তো! গাড়ীর সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কাঁধের বেহালাটা ভালো করিয়া ধরিয়া, ভিক্ষুক করুণ সুরে বাজাইয়া উঠিতেই, বিরাজ অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—তুমি···!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বেহালার সুর ও বিরাজের আর্ত্ত-নাদের সাড়াকে ছাপাইয়া গার্ডসাহেবের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

গাড়ী তখন ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভিক্ষুক আর বেহালা বাজাইল না। কাঁধের বেহালা ওর কাঁধেই রহিয়া গেল। দু'টি চোখ বিস্ফারিত করিয়া হাঁ করিয়া বিরাজের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

গাড়ী তখনও প্লাটফর্ম্ম অতিক্রম করে নাই।

রামরতনবাবু রূপার ঝক্‌ঝকে গ্লাসে জল লইয়া বিরাজের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন—জল খাও!

বিরাজ তখন জানালার পথে মুখ বাড়াইয়া সেই ভিক্ষুককে আর-একবার ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে।

রামরতনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—অমন ক'রে দেখ্‌ছো কি? কে ও? ওকে তুমি চেনো নাকি বিরাজ?

জানালা হইতে বিরাজ তাহার মুখখানি জোর করিয়া সরাইয়া লইল এবং প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল—না।

কণ্ঠ দিয়া বিরাজের আর বাক্ সরিল না। চোখের জল গোপন করিবার জন্য অতি সন্তর্পণে বোধ করি ও মুখ ফিরাইতে যাইতেছিল, কিন্তু রামরতন বাবু হঠাৎ ওর মুখের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি! চোখে তোমার জল কেন বিরাজ?

—'কি-যেন পড়লো!' বলিয়া সেই সুযোগে আঁচল দিয়ে চোখ দুইটা ভালো করিয়া মুছিয়া লইল। মনে হয়, মনের সমস্ত বেদনা ও-যেন ওর চেলাঞ্চলে নিশ্চিহ্ন করিয়াই মুছিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু গাড়ীর চাকার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য ভিক্ষুকের সর্ব্বনাশা সেই বেহালার সুর আজ এই রাজেন্দ্রাণীর দুই কানের ভিতর দিয়া ঝম্-ঝম্ করিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। সমস্ত অন্তরটাকে আলোড়িত—মথিত করিয়া দিয়া চোখের জল কিছুতেই যেন বাধা মানিতে চাহিল না।

কামরায় যাত্রী মাত্র ওরা দু'জন। রামরতন বাবু ওর পাশে আসিয়া বসিলেন, এবং ক্রমাগত এই বলিয়া সাবধান করিতে লাগিলেন যে, চলন্ত গাড়ীর জানালার কাছে কখনও বসিতে নাই, বসিলে এম্নি দুর্ভোগ প্রায়ই ভোগ করিতে হয়।

পুরাণ-কথা

শ্রীআনন্দলাল মুখোপাধ্যায়

মান্ধাতার নাম আমরা শুনিয়াছি, মান্ধাতার আমলের কথাতে আমরা অবাক্ হই, তাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না; সুতরাং তার আগেকার কোন কথা যে নিশ্চয়ই গল্প-কথা সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কাজেই পুরাণও গল্প-কথা; কারণ, পুরাণের ইতিহাসে মান্ধাতা অর্ব্বাচীন, তাঁহার বহুপূর্ব্বে (বোধ হয় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে) স্বায়ম্ভুব মনু বর্ত্তমান ছিলেন; এবং স্বায়ম্ভুব হইতেই পুরাণের ধারাবাহিক ইতিহাসের আরম্ভ। স্বায়ম্ভুবের পর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে বেণ চক্রবর্ত্তী রাজা হন; কিন্তু তিনি অসচ্চরিত্র ও প্রজাপীড়ক হওয়ায় ঋষিগণ তাঁহাকে বর্ষাগ্রভাগ দ্বারা নিহত করেন (খুঁচাইয়া মারেন)। বেণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পৃথু নিষাদগণকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে তাড়াইয়া দিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। সে সময় তাঁহার পূর্ব্ব দিকের দেশে সুধর্ম্মা, দক্ষিণে সর্ব্বেশ্বর, পশ্চিমে কেতুমান্ ও উত্তরে হিরণ্যরোমা রাজত্ব করিতেছিলেন। বিহার প্রদেশে 'সরণ' পৃথুর রাজধানী ছিল এবং নৈমিষারণ্যে তাঁহারই যজ্ঞসভায় পুরাণ-ইতিহাস সর্ব্বপ্রথম রচিত ও গীত হয়। তিনি স্থানেশ্বরের পশ্চিমে সরস্বতী তীরে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পাদন করেন। এতৎ প্রদেশের পৃথূদক, পৃথুবন প্রভৃতি নগর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তখন ভারত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পৃথুর পর প্রচেতস্-দক্ষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষ লোক-গণনা করাইয়াছিলেন। তদনুযায়ী তাঁহার ৮০ কোটি প্রজা ছিল। তদ্ভিন্ন বহু ম্লেচ্ছ যবনাদিও তাঁহার রাজ্যে বাস করিত। এই সময়ে হর্য্যক্ষ ও শবল নামে দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত দুই সহস্র ব্যক্তি পৃথিবীর অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশ যাত্রা করেন। দক্ষের কিছু পরে বৈবস্বত মনু। বৈবস্বতকে সূর্য্যের তনয় বলা হইয়াছে; কারণ, তাঁহার রাজত্বকালে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে ভারতের পুরাণ-ইতিহাস রচনায় কোন উপাদানের অভাব নাই।

পুরাণ নির্দেশ করেন, ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি তড়িতের ন্যায় প্রকাশ পায়; এবং দেব পরিমাণে বর্ষ সহস্রান্তে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইলে বায়ু দ্বারা সেই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক ভাগ স্বর্গ, অপর ভাগ পৃথিবী ও মধ্যস্থ উচ্চ ভাগ সুমেরু হইল। তড়িৎ প্রকাশের প্রস্তাবটি আধুনিক নীহারিকাবাদের মত শোনায়। পুরাণান্তরে ব্রহ্ম সৃষ্টি বর্ণনায় 'নীহারময় তনু' কথাটিরও প্রয়োগ আছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের পরমায়ু দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্ব্ব পরার্দ্ধ ও দ্বিতীয় পরার্দ্ধ। পূর্ব্ব পরার্দ্ধের নাম সনাতন কল্প (পরকাল),—ইহা অতীত হইয়াছে। পূর্ব্ব পরার্দ্ধের অন্তর্গত ষষ্ঠ কল্পের পর পদ্মকল্প,—ইহা দ্বিতীয় পরার্দ্ধের নামান্তর এবং ইহার অন্তর্গত বরাহ কল্প এখন চলিতেছে। পুরাণের কল্পবিভাগ এক অদ্ভুত ব্যাপার। নানা ভাবে ইহা কল্পিত এবং তাহা দ্বারা নানাবিধ period ও epoch নির্দ্দেশিত হইয়াছে। তা ছাড়া ভূতত্ত্বের Time-division এবং Time-intervalও বোধ হয় উপলক্ষিত। একটি কল্পের শেষ ও তৎপরবর্ত্তী কল্পের আরম্ভের দিন নির্ণয় করা যায় না; কেন না, প্রথমটির শেষ হইতে না হইতেই পরেরটির লক্ষণ সমুদায় ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে। যে কালে ইহা ঘটিয়া থাকে তাহাকে প্রতিসন্ধি যুগ কহা যায়।

পূর্ব্ব পরার্দ্ধের বিবরণে ব্রহ্মাণ্ডকে প্রজাপতির মূর্ত্তি বলা হইয়াছে; প্রজাপতি একার্ণব জলে (Hydro-sphere) শয়ান অবস্থায় তাঁহার বহু যুগ যাপিত হয়, তদবস্থায় তাঁহাকে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপেই কেহ বিদিত হইতে পারে না। অনন্তর সেই মহাত্মা পরমপুরুষ লোকসৃষ্টির কামনায় চিত্ত-নিয়োগ করিলে প্রবল ঝটিকা ও একার্ণবে তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। তখন ক্ষুব্ধ জলরাশি হইতে বৈশ্বানর বহ্নি প্রকাশ পাইয়া বহু জল শোষণ করিয়া লন। তদনন্তর তাঁহার নাভিদেশ হইতে পদ্মের উদ্ভব হয়। পুরাণজ্ঞগণ এই পদ্মকে পৃথিবী বলিয়া থাকেন। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, একার্ণবের জল ক্ষরিত হইয়া তাহা কাঞ্চনগিরিরূপে পরিণত হয় এবং তাহার পর অন্যান্য সহস্র সহস্র শৈলও সমুদ্ভূত হয়। পদ্ম ও কাঞ্চনগিরি দ্বারা মেরু ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থানই নির্দ্দেশিত। অন্যত্র 'নাভিবন্ধন হইতে সুবর্ণময় মেরুর উৎপত্তি' এই কথাই আছে এবং শৈল, সঞ্চিত হইয়া গঠিত হয়। পুরাণ-কর্ত্তা হিমালয়ে জলজাত কপর্দ্দক শুক্তি ও শঙ্খ এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মকর, মৎস্য ও কচ্ছপের

উল্লেখও করিয়াছেন। মনুপতি পুরূরবা এ সমস্ত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং পুরাণজ্ঞগণ মধ্য এসিয়ার সাগর সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অতএব তাঁহাদের উপরিউক্ত মত অর্থাৎ একার্ণবের জল ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া পদ্ম ও কাঞ্চনগিরির উৎপত্তি একেবারে অমূলক নহে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা পদ্ম মধ্যস্থিত বর্ষগুলিকে পতনোন্মুখ পর্ব্বতে আবৃত বলিয়াছেন। পতনোন্মুখ পদে 'abrupt folding' বুঝায় না কি? এই সকল কথা মধ্য Tertiary যুগের বিবরণ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; কারণ, এখনকার ভূবিদ্‌গণ প্রমাণ দিয়া বলিয়া থাকেন যে ঐ যুগেরই কোন সময়ে মধ্য এসিয়ার Tethys সাগর লোপ পায়, হিমালয় জাগিয়া উঠে এবং সমগ্র ভারত আধুনিক আকার লাভ করে।

সৃষ্টির পর প্রলয় আবার প্রলয়ের পর সৃষ্টি, ইহা চিরন্তন ধারা। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি ব্যাপার সংঘটিত হইলে পুনরায় প্রলয়কাল আসে। তাহাতে দেব পরিমাণে সহস্র যুগ কাটিয়া যায়। তদন্তে পৃথিবী (ব্রহ্মাণ্ড নহে) একার্ণবীভূত হইয়া পড়ে। সেই সময় শ্রীবিষ্ণু বরাহ রূপ ধরিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। বরাহ দেব সম্পর্কে অণ্ড সৃষ্টি বা অণ্ড উদ্ধারের কথা নাই। তিনি জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। তদনন্তর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন, পরন্তু সৃজ্যবস্তুর শক্তিই সৃজন বিষয়ে প্রধান—ব্রহ্ম নিমিত্ত মাত্র হন। পদ্মের উদ্ভাবন কালে সনাতন কল্পের শেষ ও পদ্ম কল্পের আরম্ভ। পুনশ্চ পদ্ম সমুদ্ভূত হইবার বহু পরে বরাহ কল্প।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রলয়ের বর্ণনা এইরূপ,—প্রথমে দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি বশতঃ জীবসমূহ অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ে। তৎপরে তাহাদিগকে বিলয় করিবার জন্য স্বয়ং রুদ্রদেব সাতটি বিভিন্ন সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া ভূতল পাতালাদির সমস্ত জল শোষণ করেন। সেই সময় পাতালস্থ কালাগ্নির প্রভাবে ভূতাপের বৃদ্ধি হওয়ায় যাবতীয় বৃক্ষাদিও সমূলে শুকাইয়া যায়। তখন বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠাকারে প্রতিভাসমান হয়, চারিদিকে অগ্নি-হল্কা ছুটিতে থাকে, বায়ু বহে না। পৃথিবী এই অবস্থায় পরিণত হইলে, অনন্তদেবের শ্বসনে সততই ভূকম্প হইতে থাকে এবং বিষানল দ্বারা উদ্দীপ্তাকৃতি সঙ্কর্ষণ নামক অগ্নি পাতালসমূহকে দগ্ধ করিয়া ত্রিজগৎ ভক্ষণে লোলজিহ্বা প্রসারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। তদবস্থায় অনন্তদেবের মুখনিঃশ্বাস-জাত প্রলয় মেঘ এবং ত্রিভুবন বিধ্বংসী বিদ্যুৎ ও বিকট বজ্রধ্বনিবিশিষ্ট অপরাপর মেঘমালা চারিদিক ঘোর অন্ধকার করিয়া ভীষণ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে থাকে। এই ভাবে কিছুকাল কাটিবার পর লোকপিতা হরি সমস্তই দগ্ধ করিয়া স্বয়ং বৃষ্টিরূপে প্রকাশ পান এবং অজস্র বারিবর্ষণে ভূমণ্ডল একার্ণবীভূত হইয়া পড়ে। পূর্ণ শত বৎসর বারিবর্ষণ হইয়াছিল। দৈব-শত বৎসরে মানবের ৩৬০০০ বৎসর। মেরুর আবির্ভাবের কালেই যদি পদ্মকল্প আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আধুনিক মতোক্ত Tertiary যুগের শেষ ভাগে (Plioceneএর শেষাংশে) পুরাণোক্ত জলপ্লাবন ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। ইতোমধ্যে সহস্র যুগব্যাপী প্রলয়কাল কাটিয়া গিয়াছে। প্রলয় বিবরণে পুরাণ ও আধুনিক মতবাদিগণের যেগুলির মিল আছে তাহা এই—সূর্য্য কর্ত্তৃক জল শোষণ—Solar evaporation; ভূমির শুষ্কতা (কূর্ম্মপৃষ্ঠের তুলনা)—dessication of land; ভূতাপ—igneous action, plutonic and volcanic; অনন্তদেবের শ্বসনে ভূকম্প—Crust-movements এবং Earthquakes (Tectonic); সঙ্কর্ষণ অগ্নি—Volcano; লোলজিহ্বার আত্মপ্রকাশ—eruption; মুখনিঃশ্বাসজাত প্রলয় মেঘ—Smoke and Vapour। পুরাণকর্ত্তা এইগুলি নিরূপণ করিয়া যে জলপ্লাবনের (denundation) উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও তখনকার দিনের আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে।

জলপ্লাবন বশতঃ পৃথিবী একার্ণবীভূত হয়। বেগহীন বিশাল জলরাশিকে একার্ণব বলে। অন্যত্র সরোবরের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। বরাহ দেব সনকাদি ঋষিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া একার্ণব হইতে পৃথিবীর উদ্ধার করেন ও তৎপরে ব্রহ্মা সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্ব কথিত প্রলয়কালীন অগ্নিতে পর্ব্বতসমূহ দগ্ধ হইয়াছিল। আবার ঠিক তৎপরবর্ত্তী কালে একার্ণবে নিদারুণ শীত হয়। এই শীত এতই অধিক হইয়াছিল যে একার্ণবের জলবায়ুর শীতলতায় স্থানে স্থানে বায়ুদ্বারা সঞ্চিত জলসকল কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়া পর্ব্বতে পরিণত হয়। ব্রহ্মা পর্ব্বত সকলকে স্থাপন করিলেন। সে সময়ে তিনি অনেক বিষম ভূভাগের সমতা বিধান ও সাধারণ পর্ব্বতসমূহ নির্ম্মাণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি জলরাশিরও বিভাগ করিলেন। তাহাতে সমুদ্র-জল সমুদ্রে, নদ জল নদীতে ও পার্থিব জল পৃথিবীতে স্থাপিত হইল। অতঃপর অসুরাদির সৃষ্টি। পশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির বর্ণনা এখানে নাই। শীতকালের পূর্ব্বে সনকাদি বর্ত্তমান ছিলেন এবং শীতের পরে অসুরাদির সৃষ্টি, অতএব বুঝা যাইতেছে যে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যেই কোন সময় পৃথিবীতে শৈত্যাধিক্য বশতঃ জলসমূহ কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রলয়ের পর উপরিউক্ত শীত বর্ণনা ও সেই সময়ে মানবের আবির্ভাব Pliocene এর পর Glacial যুগের বিবরণের সহিত তুলনা-যোগ্য। একার্ণবের নিদারুণ শীত, জলের কাঠিন্য লাভ ও তৎসমুদায়ের পর্ব্বতে পরিণত হওয়া ice-making যুগের নিদর্শন। জলবিভাগ, শৈলাদি স্থাপন, ভূমির সমতা বিধান ও জলপ্লাবন ice meeting যুগের বিবরণ। প্রলয়ের পর যে একার্ণবের সৃষ্টি হয় তাহাকে সরোবরও বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বরফ ক্ষেত্রই উপলক্ষিত কি না তাহা বিচার্য্য। ভূবিদ্‌গণ বলেন, হিমযুগে হিমালয় ও তৎসন্নিহিত দেশের বরফ ক্ষেত্রগুলির অধিকাংশই ২১৩ মাইলের, অধিক আবার কয়েকটি ২৪ মাইল বা তাহারও অধিক বিস্তৃত। এ ছাড়াও কয়েকটির প্রত্যেকটিই ৫০ মাইলেরও অধিক দীর্ঘ। পুনশ্চ কাহারও কাহারও মতে হিমালয় প্রদেশের তৎকালীন বরফক্ষেত্র উত্তর মেরুর (North Pole) বরফ ক্ষেত্রের সহিত তুলনীয়। পুরাণ বলিয়াছেন, বেগহীন বিশাল জলরাশিই একার্ণব এবং ইহাতে নিদারুণ শীতের লক্ষণও বর্ত্তমান ছিল। এই শীত যুগের পর অদ্যাবধি আর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রলয় ঘটে নাই। সে তুলনায় এখন পৃথিবী শান্তিময়ী।

(এই রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু, মৎস্য, বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ; Geological works of Oldham, and Wadia; Ancient Geography of India—Cunningham; History of India—Vincent Smith; Ency. Britt.—Asia. India etc; J. A. S. B. এবং ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের বক্তৃতা—'পৌরাণিক যুগ নিরূপণ')

ভারতীয় মুগুর শিক্ষা

শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত পৌষ মাসে ভারতীয় মুগুরের ইতিহাস ও মুগুর লইয়া ব্যায়াম অথবা ড্রিল করিবার বিষয় কতকগুলি উপদেশ ও মুগুরের কতকগুলি ঘুরাইবার কৌশল বাহির করিয়াছিলাম। এই সংখ্যায় মুগুরের আরও কতকগুলি ব্যায়াম-কৌশল এবং মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিবার কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যায়াম-কৌশলের বর্ণনা করিলাম।



আরাম

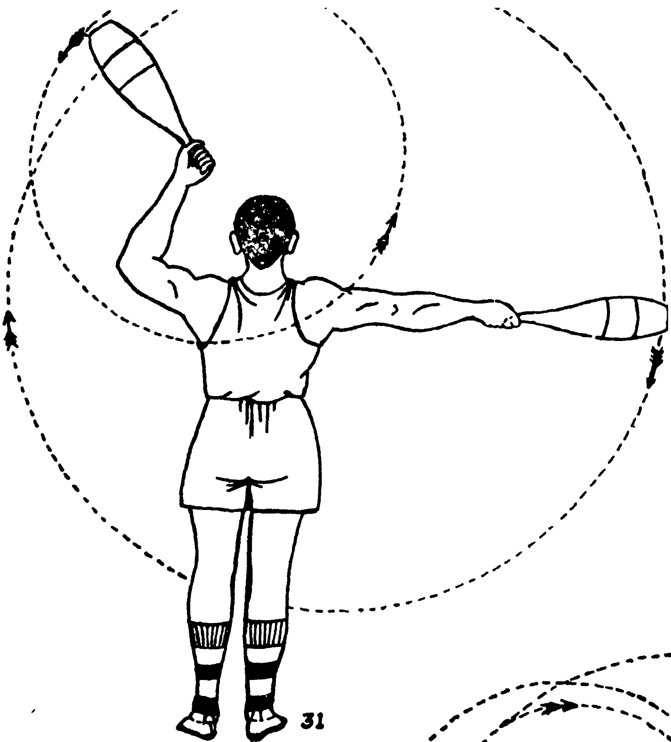
এই আনুষঙ্গিক ব্যায়ামগুলিতে কোমরের নিম্নাঙ্গেরও ব্যায়াম হয়।

মুগুর লইয়া ড্রিল করিবার সময় 'আরাম' (stand at ease), প্রস্তুত (Attention) প্রভৃতি অবস্থাতে মুগুর দুইটী স্কন্ধে থাকে (চিত্র 'আরাম')। কিন্তু কোন ব্যায়াম-কৌশল আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে "স্থিতি" (position) অবস্থাতে মুগুর দুইটী স্কন্ধ হইতে তুলিয়া ঋজুভাবে সম্মুখে ধরিতে হয় ও পদদ্বয় অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ পৃথক করিয়া নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসমূহ শক্ত করিয়া ও পেটের মাংস-



স্থিতি

পেশী ভিতরে টানিয়া, পেটটী কমাইয়া সম্মুখে চাহিয়া দাঁড়াইতে হয় (চিত্র 'স্থিতি')। মুগুর লইয়া ব্যায়াম করিবার সময়ও উপরিউক্ত ভাবে পদদ্বয় পৃথক করিয়া ও পেটটী কমাইয়া দাঁড়াইতে হয়।



৩১নং চিত্রঃ

৩১নং ব্যায়াম

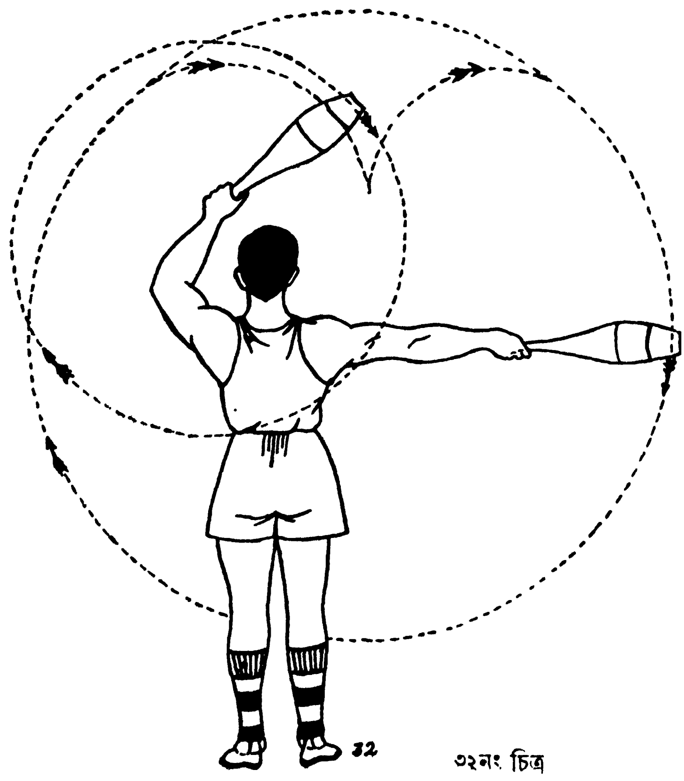
বৃহৎ চক্র বাহির ও ক্ষুদ্র চক্র বাহির (Large circle—outside and small circle—outside)

এই ব্যায়ামটী যেদিক দিয়া করা হইবে সেই দিকের মুগুরটীকে ৫নং ব্যায়ামের ন্যায় বাহির দিয়া একটী বৃহৎ চক্র ঘুরাইতে হয় ও একই সময়ে অপর হস্তের মুগুরটীকে ১নং ব্যায়ামের ন্যায় বাহির দিয়া একটী ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইতে হয়। দুইটী মুগুর ঠিক একই সময়ে আরম্ভ ও শেষ হইবে; সুতরাং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইতে ঠিক একই সময় লাগিবে। এই ব্যায়ামটী কেবল 'তন্ত্র' ও 'একান্তর' এই দুই প্রকারে করা যায় এবং প্রত্যেকবার ব্যায়ামটী করিয়া 'স্থিতি'তে আসিয়া থামিতে (৩১নং চিত্র)

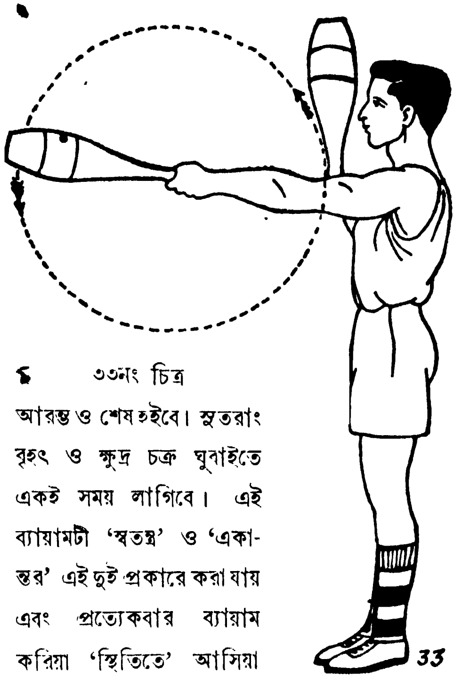
৩২নং ব্যায়াম

বৃহৎ চক্র বাহির ও ক্ষুদ্র চক্র ভিতর (Large circle—outside and Small circle—inside)

এই ব্যায়ামটী যে দিক দিয়া করা হইবে সেই দিকের হস্তের মুগুরটীকে ৫নং ব্যায়ামের ন্যায় বাহির দিয়া একটী বৃহৎ চক্র ঘুরাইতে হয় ও একই সময়ে অপর হস্তের মুগুরটীকে ২নং ব্যায়ামের ন্যায় ভিতর দিয়া একটী ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইতে হয়। দুইটী মুগুর ঠিক একই সময়ে

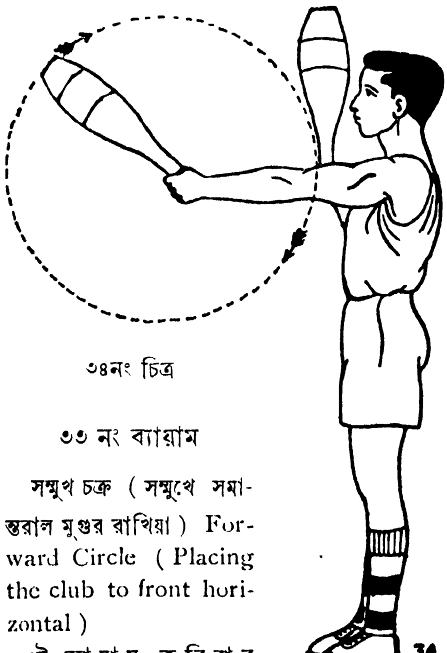


৩২নং চিত্র



৩৩নং চিত্র

আরম্ভ ও শেষ হইবে। সুতরাং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইতে একই সময় লাগিবে। এই ব্যায়ামটী 'স্বতন্ত্র' ও 'একান্তর' এই দুই প্রকারে করা যায় এবং প্রত্যেকবার ব্যায়াম করিয়া 'স্থিতিতে' আসিয়া থামিতে হয়। (৩২নং চিত্র)

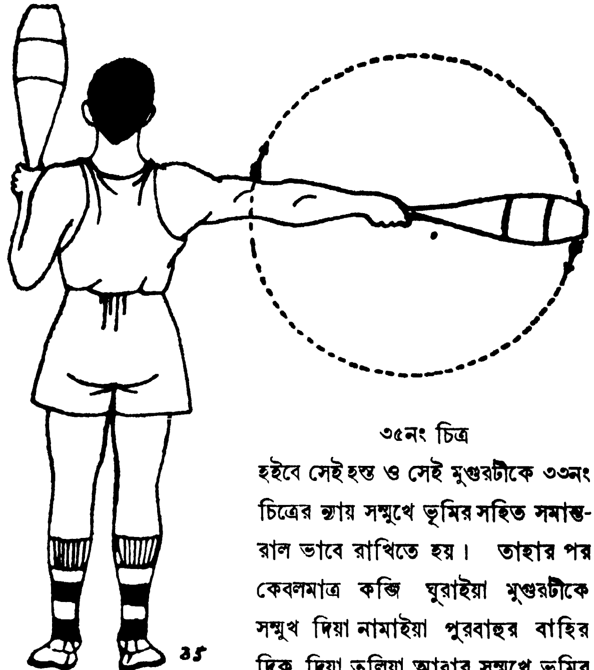


৩৪নং চিত্র

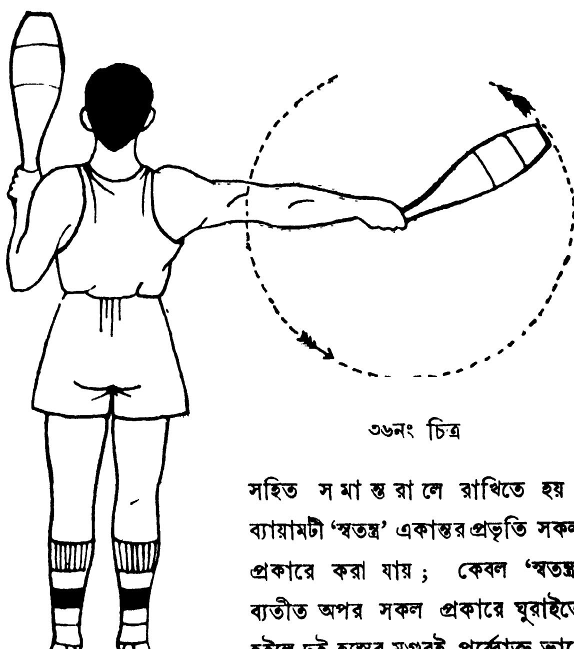
৩৩ নং ব্যায়াম

সম্মুখ চক্র (সম্মুখে সমান্তরাল মুগুর রাখিয়া) Forward Circle (Placing the club to front horizontal)

এই ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে যে হস্তের ব্যায়াম করা হইবে সেই হস্ত ও সেই মুগুরটীকে ৩৩নং চিত্রের ন্যায় সম্মুখে ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। তাহার পর কেবলমাত্র কব্জি ঘুরাইয়া মুগুরটীকে সম্মুখ দিয়া নামাইয়া পুরবাহুর বাহির দিক দিয়া তুলিয়া আবার সম্মুখে ভূমির সহিত সমান্তরালে রাখিতে হয়। ব্যায়ামটী 'স্বতন্ত্র' একান্তর প্রভৃতি সকল প্রকারে করা যায়; কেবল 'স্বতন্ত্র' ব্যতীত অপর সকল প্রকারে ঘুরাইতে হইলে দুই হস্তের মুগুরই পূর্ব্বোক্ত ভাবে ভূমির সহিত সমান্তরালে রাখিতে হয়।



৩৫নং চিত্র



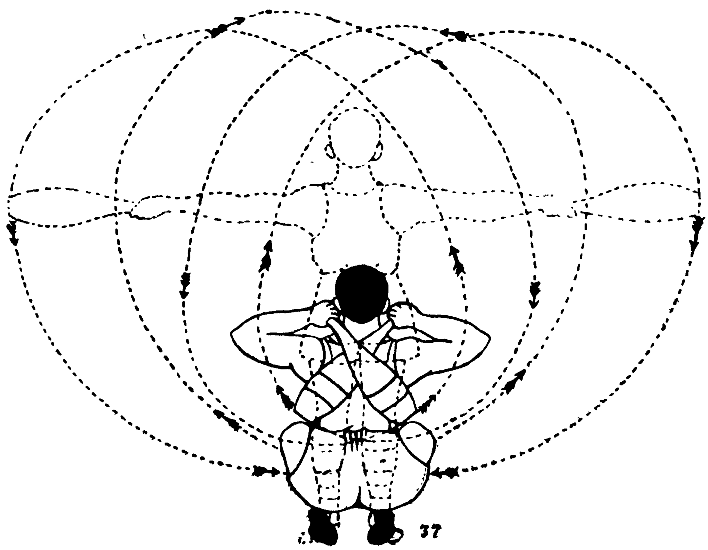
৩৬নং চিত্র

৩৪ নং ব্যায়াম

পশ্চাৎ চক্র (সম্মুখে সমান্তরালে মুগুর রাখিয়া) Backward circle (Placing the club to front horizontal)

এই ব্যায়ামটী করিবার পূর্ব্বে যে হস্তের ব্যায়াম করা হইবে সেই হস্ত ও সেই হস্তের মুগুরটীকে ৩৩নং ব্যায়ামের ন্যায় সম্মুখে ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। তাহার পর কেবলমাত্র কব্জি ঘুরাইয়া ৩৪নং চিত্রের ন্যায় মুগুরটীকে তুলিয়া পুরবাহুর বাহির দিক দিয়া নামাইয়া আবার সম্মুখে ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া রাখিতে হয়।

এই ব্যায়াম 'স্বতন্ত্র' 'একান্তর' প্রভৃতি সকল প্রকারে করা যায়—কেবল 'স্বতন্ত্র' ব্যতীত অপর সকল প্রকারে করিতে হইলে দুই হস্তের মুগুরই পূর্ব্বোক্ত ভাবে সমান্তরালে রাখিতে হইবে। (৩৪নং চিত্র)

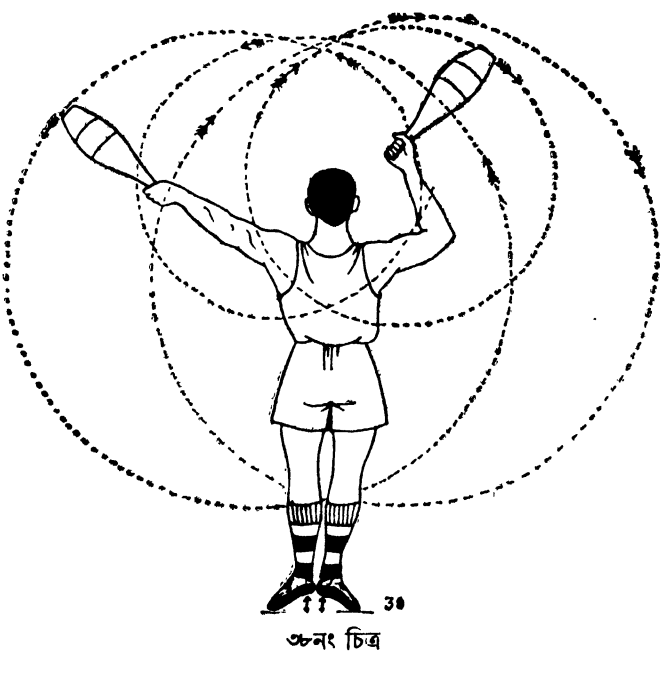


৩৭নং চিত্র

৩৫ নং ব্যায়াম

বাহির চক্র (পার্শ্বে সমান্তরালে মুগুর রাখিয়া) Outside circle (Placing the club to side horizontal)

এই ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে যে হস্তের ব্যায়াম করা হইবে সেই হস্ত ও সেই হস্তের মুগুরটীকে ৩০নং চিত্রের ন্যায় পার্শ্বে ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। তাহার পর কেবল মাত্র কব্জিটী ঘুরাইয়া মুগুরটীকে বাহির দিক দিয়া নামাইয়া পুরবাহুর পশ্চাৎ দিক দিয়া তুলিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। এই ব্যায়াম 'স্বতন্ত্র' প্রভৃতি সকল প্রকারে করা যায় ; কেবল 'স্বতন্ত্র' ব্যতীত অপর সকল প্রকারে করিতে হইলে দুই হস্তেরই মুগুর পূর্ব্বোক্ত ভাবে সমান্তরাল করিয়া রাখিতে হয়। (৩৫নং চিত্র)



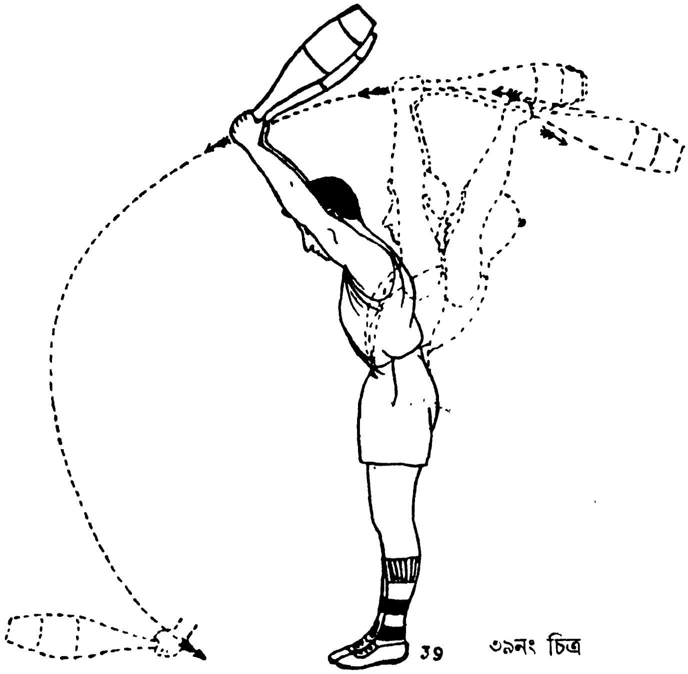
৩৮নং চিত্র

৩৬নং ব্যায়াম

ভিতর চক্র (পার্শ্বে সমান্তরালে মুগুর রাখিয়া Inside circle (Placing the club to side horizontal)

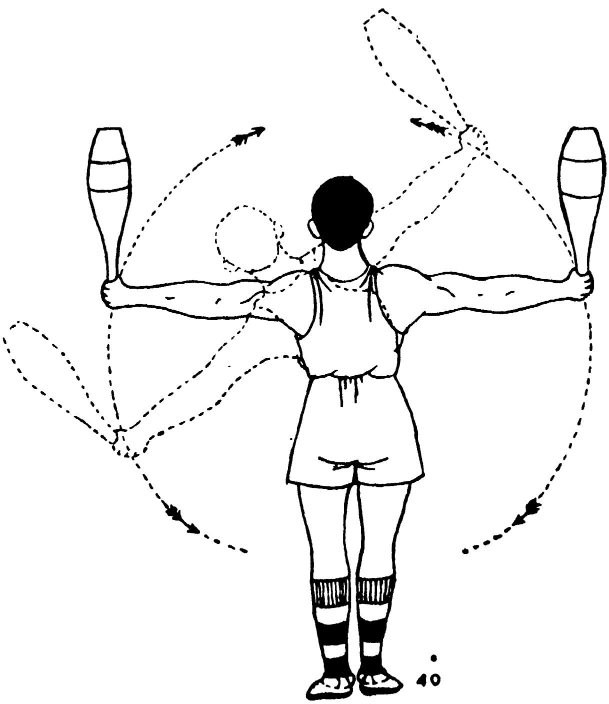
এই ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে যে হস্তের ব্যায়াম করা হইবে সেই হস্ত ও সেই হস্তের মুগুরটীকে ৩৫নং ব্যায়ামের ন্যায় পার্শ্বে ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। তাহার পর কেবলমাত্র কব্জিটী ঘুরাইয়া মুগুরটীকে ৩৬নং চিত্রের ন্যায় উপর দিয়া উঠাইয়া পুরবাহুর পশ্চাৎ দিক দিয়া নামাইয়া আবার ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে রাখিতে হয়। এই ব্যাযাম 'স্বতন্ত্র' প্রভৃতি সকল প্রকারে করা যায়; কেবল 'স্বতন্ত্র' ব্যতীত অপর সকল প্রকারে করিতে হইলে দুই হস্তের মুগুরই পূর্ব্বোক্ত ভাবে সমান্তরালে রাখিতে হয়। (৩৬নং চিত্র)

মুগুর লইয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যায়ামগুলি করিলে কোমরের উপরের সকল মাংস-



৩৯নং চিত্র

পেশীর ব্যায়াম হয়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই ব্যায়ামগুলি ছাড়াও মুগুর লইয়া কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যায়াম করা যাইতে পারে যাহাতে কোমরের নিম্নাঙ্গেরও ব্যায়াম হয়। এইরূপ কতকগুলি আনুষঙ্গিক ব্যায়াম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

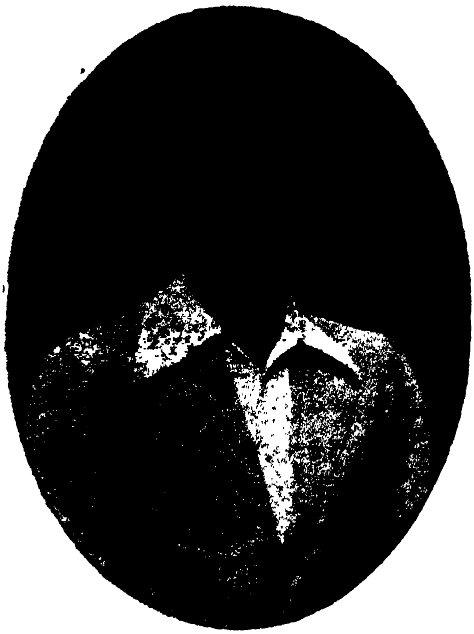


৪০নং চিত্র

৩৭নং ব্যায়াম

এই ব্যায়ামটী করিতে হইলে প্রথমে স্থিতিতে বা Positionএ দাঁড়াইয়া পদদ্বয়ের পাঞ্জা অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ পৃথক করিয়া সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসমূহ টানিয়া শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পর ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হয়। মুগুর দুইটী ঠিক ১০নং ব্যায়ামের ন্যায় ঘুরিবে। প্রথমে মুগুর দুইটীকে ৫নং ব্যায়ামের "উভয়" এর ন্যায় একই সময়ে সম্মুখে বাহির দিয়া দুইটী বৃহৎ চক্র ঘুরাইয়া না থামাইয়া মুগুর দুইটীকে ১নং ব্যায়ামের 'উভয়'এর ন্যায় পশ্চাতে বাহির দিয়া দুইটী ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইবার

সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালী উত্তোলন করিয়া কোমরের উপর হইতে শরীরটী সোজা রাখিয়া যতদূর সম্ভব হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিতে হয়। তাহার পর মুগুর দুইটী না থামাইয়া পরবর্ত্তী বৃহৎ চক্র ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু সোজা করিয়া গোড়ালী নামাইয়া ও পদদ্বয়ের মাংসপেশীগুলি টানিয়া শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আবার পশ্চাতে বাহির দিয়া দুইটী ক্ষুদ্র চক্র ঘুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে গোড়ালী উত্তোলন করিয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া বসিতে হয় ও এইরূপ ভাবে ব্যায়াম করিয়া যাইতে হয়। বৃহৎ চক্র ঘুরাইবার সময় দাঁড়াইতে হয় ও শ্বাস লইতে হয় এবং ক্ষুদ্র



লেখক

চক্র ঘুরাইবার সময় বসিতে হয় ও শ্বাস ছাড়িয়া দিতে হয়। এই ব্যায়াম তাড়াতাড়ি করিতে নাই। (৩৭নং চিত্র)

৩৮নং ব্যায়াম

৩নং, ৯নং, ১০নং, ১২নং, ১৩নং, ১৭নং, ৩২নং প্রভৃতি কতকগুলি ব্যায়াম করিবার সময় পদদ্বয়ের ডিমের (calf) ব্যায়াম করা যায়। ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে গোড়ালী দুইটী সংলগ্ন করিয়া পদদ্বয়ের পাঞ্জা প্রায় সমকোণ করিয়া নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসমূহ টানিয়া শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে হয় ও তাহার পর যে ব্যায়ামটীর সহিত ডিমের ব্যায়াম করা হইবে সেই ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হয় এবং ব্যায়ামটীর প্রত্যেক চক্রের (বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র) প্রথমার্দ্ধে গোড়ালী তুলিতে হয় ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে গোড়ালী নামাইতে হয়। চিত্রে ৯নং ব্যায়ামের সহিত এই ব্যায়ামটী দেখান হইয়াছে। (৩৮নং চিত্র)

৩৯নং ব্যায়াম

এই ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়াইতে হয়—

১। গোড়ালী দুইটী সংলগ্ন থাকিবে ও পদদ্বয়ের পাঞ্জা প্রায় সমকোণ হইয়া থাকিবে এবং নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসমূহ টানিয়া শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

২। হস্ত দুইটী সোজা করিয়া মস্তকের উপর ঋজুভাবে রাখিয়া মুগুর দুইটীকে পশ্চাৎ দিকে রাখিয়া ভূমির সহিত সমান্তর ও হস্তের সহিত সমকোণ করিয়া রাখিতে হয়।

এইরূপে দাঁড়াইবার সময় শ্বাস গ্রহণ করিতে হয় ও পরে শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাহু দুইটী মস্তকের ধারে লাগাইয়া রাখিয়া কোমর হইতে দেহের সমগ্র উর্দ্ধভাগ সম্মুখে নত করিয়া মুগুর দুইটী দিয়া ভূমি স্পর্শ করিতে হয়। দেহ নত করিবার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত দুইটীকে যতদূর সম্ভব আগাইবার চেষ্টা করিতে হয় এবং ভূমি স্পর্শ করিবার সময় হাঁটু সোজা রাখিয়া, পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে মুগুরের মণ্ডি দুইটী অন্ততঃ ১৩-১৪ ইঞ্চি সম্মুখে রাখিতে হয়। ভূমি স্পর্শ করিবার পর শ্বাস গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত ও মুগুর ঠিক রাখিয়া শরীর তুলিয়া সোজা করিয়া পশ্চাতে যতদূর পারা যায় শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আবার শরীর সম্মুখে নত করিতে হয়। ব্যায়ামটী করিবার সময় বাহু দুইটী সর্ব্বদা মস্তকের দুইধারে লাগিয়া থাকিবে ও মুগুর দুইটী সর্ব্বদা হস্তের সহিত সমকোণ হইয়া থাকিবে। (৩৯নং চিত্র)

৪০নং ব্যায়াম

এই ব্যায়ামটী করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ভাবে দাঁড়াইতে হয়—

১। গোড়ালী দুইটী সংলগ্ন থাকিবে ও পদদ্বয়ের পাঞ্জা প্রায় সমকোণ হইয়া থাকিবে এবং নিম্নাঙ্গের মাংসপেশীসমূহ টানিয়া শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

২। হস্ত দুইটী পার্শ্ব দিকে ভূমির সহিত সমান্তরালে রাখিয়া মুগুর দুইটীকে ঋজুভাবে ও হস্তের সহিত সমকোণ করিয়া রাখিতে হয়।

এইরূপে হস্ত দুইটী রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোমর হইতে শরীরটী বাম পার্শ্বে যতদূর পারা যায় নত করিতে হয়। ইহাতে ৪০নং চিত্রের ন্যায় দক্ষিণ হস্ত উপরে উঠিতে থাকিবে ও বাম হস্ত নিম্নে আসিতে থাকিবে। যতক্ষণ না দক্ষিণ হস্ত উপরে ঋজুভাবে উঠে ও বাম হস্ত বাম পায়ের সহিত লাগে, ততক্ষণ শরীর বাম পার্শ্বে নত করিতে হয়। তাহার পর শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হয়। পরে শ্বাস গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোমর হইতে শরীরটীকে দক্ষিণ পার্শ্বে যতদূর সম্ভব নত করিতে হয় ও আবার শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হয়। এইরূপে ব্যায়ামটী করিয়া যাইতে হয়। (৪০নং চিত্র)

মুগুরের ব্যায়াম-কৌশলগুলি যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। নূতন কোন ব্যায়াম করিবার পূর্ব্বে সেই ব্যায়ামের কৌশলটী পড়িয়া ও চিত্রের সহিত মিলাইয়া উত্তম রূপে বুঝিয়া লইয়া তাহার পর চিত্রটী সম্মুখে রাখিয়া অভ্যাস করা উচিত। প্রথমে হাল্‌কা মুগুর লইয়া ব্যায়াম-কৌশলটী ভাল করিয়া অভ্যাস করিলে ভারী মুগুর ঘুরাইবার সময় অনেক সুবিধা হয়।

স্মৃতির পূজারী

কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(১)

দৃপ্ত স্বরে ঝঙ্কার তুলিয়া সগর্ব্বে আভা বলিল, "না, না, মোটেই ওরা ভদ্রলোক নয়, লেখাপড়া শিখেও চাষা!"

ক্রুদ্ধা তরুণী তৈলচিত্রখানিকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিতে গিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিভা ননদী আভার ব্যবহারে হাসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এই কোপচঞ্চলা তরুণীর পুষ্পিত দেহ সত্যই কি সুন্দর! হাসিতে হাসিতে সে বলিল, "পোড়ারমুখী! রেগেই মলেন! মামাবাবুর ছবিখানাকে মালা পরিয়ে দিতেই ভুলে গেলি? দেখ্, মেয়ে মানুষের এত তেজ ভাল নয়, আভা।"

আভার আননে তখনও ক্রোধের রেখা মিলাইয়া যায় নাই। সে তীব্র স্বরে বলিল, "দেখো, তোমাদের ঐ কথাটা বড় বিশ্রী লাগে, বৌদি! মনে হয় তোমরা কোন কালে লেখাপড়া শেখো নি। মেয়েমানুষকে ছোট করে দেখো বলেই তোমরা সংসারে ছোট হয়ে আছো।"

প্রতিভা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তেমনই হাসিতে হাসিতে বলিল, "কে বলে রে আমরা ছোট? আমরা হলুম মা, তা জানিস?"

প্রতিভার আয়ত নয়নযুগল সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময়েই ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে একটি শিশু ছুটিয়া আসিল। মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল, "মা, ওমা, এই চিঠি দেখো, জগুয়া দিলে।"

পুত্রকে সস্নেহে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার নবকিশলয় তুল্য ওষ্ঠ চুম্বনে ভরাইয়া দিয়া প্রতিভা বলিল, "কার চিঠি মাণিক! দেখি।"

"অমিয়!"

পিসীমার ডাক কাণে যাইবামাত্র মাণিক অমিয় সুড় সুড় করিয়া মার কোল হইতে নামিয়া একছুট দিয়া পলায়ন করিল। ভয়ে তাহার চক্ষু আনত হইয়াছিল।

প্রতিভা পত্রের মোড়ক খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিল, "বাবা, বাবা! পিসী ত নয়, যেন গুরুমশাই! দেখবো কোলে পিঠে একটা হোলে কি করিস! হ্যাঁ!"

আরক্ত মুখে আভা বলিল, "তোমাদের ঐ অসভ্য ইয়ার্কিগুলো মোটেই ভাল লাগে না বলে দিচ্ছি, বৌদি!"

প্রতিভা পত্রপাঠেই মগ্ন ছিল। হঠাৎ সহর্ষে সে বলিয়া উঠিল, "ওমা! একলা আসছেন না এবার—সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব!"

আভা বলিল, "কে, ম্যাজিষ্ট্রেট? সে আবার কে?"

প্রতিভা বলিল, "চাঁদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট লো—সেই গেল পুজোয় তুই যখন দার্জ্জিলিঙে গেলি রেণুদের সঙ্গে, তখন আমরা চন্দ্রনাথ হয়ে এসে যাঁর ওখানে উঠেছিলুম রে! মনে নেই?"

আয়ত নয়ন আরও বিস্ফারিত করিয়া আভা বলিল, "চাঁদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সোমেন রায়? উনিও ত ঐ চাষার দলের!"

কথাটা ক্রোধ ও ঘৃণা মিশ্রিত।

প্রতিভা সবিস্ময়ে বলিল, "চাষার দলের? তার মানে?"

আভা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তার মানে এই যে, উনি যদি মিঃ সোমেন রায় আই-সি-এস হন, তা হলে উনিই গেল মাসের 'কুহেলীতে' আমাদের যা ইচ্ছে তাই বলে গাল পেড়েছেন। এ সব লোককে ফার্ষ্ট ক্লাস ম্যাগাজিনে লিখতে দেওয়া হয় কেন জানি না। লিখতেও যদি দেওয়া হয় তাহলে সে সব কাগজকে ভদ্রসমাজে প্রশ্রয় দেওয়া হয় কেন বা ভদ্রলোকের অন্দরে ঢুকতে দেওয়া হয় কেন, তা বুঝতে পারি না।"

প্রতিভা উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া বলিল, "তাই না-কি? তা, এবার থেকে তোর ওপরেই যাতে মাসিকপত্রের প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ভার পড়ে তাই করে দেবো।"

আভা বলিল, "ঠাট্টা নয়, বৌদি। আচ্ছা ঠিক করে বল দিকি, এসব লোককে ভদ্র বলে, শিক্ষিত বলে সমাজে স্থান দেয় কেন?"

প্রতিভা বলিল, "তা হলে তোর দাদাও অভদ্র? না হলে এমন লোককে আদর করে ঘরে আনছেন কেন?"

আভা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "দাদা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, কিন্তু আমিও বলে রাখছি বৌদি, দাদা যদি সত্যিই ও-রকম লোককে নিয়ে আসেন এখানে, তা হলে আমিও বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো।"

আভার চোখে অপরূপ দীপ্তি, নাসারন্ধ্র কম্পিত। দ্রুত পাদবিক্ষেপে সে কক্ষত্যাগ করিতেছিল, প্রতিভা বাধা দিয়া বলিল, "বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি? কোথায় যাবি?"

"যেখানে ইচ্ছা!"

"তা যখন যাবি তখন যাবি, এখনও ত তোর দাদা সেই অসভ্য চাষাটাকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন নি। চিঠিতে লিখছেন, আসছে হপ্তায় আসবেন। মিঃ রায় আলিপুরে বদলী হয়েছেন। বাসা ঠিক করতে আর সাজাতে গোছাতে এক হপ্তা ছুটি নিয়েছেন। এখানে দুইচার দিন থেকে বাড়ী দেখে নেবেন—নেবেন আর কেন, তোমার দাদাই দেখে শুনে দেবেন,—তা আমাদের ভবানীপুর কালীঘাটেই হোক, আর টালিগঞ্জ আলিপুরেই হোক।"

আভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "এসব ঠিকুজী কুলুজীতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। আচ্ছা, এই মিঃ সোমেন রায়ই না দিন কতক মেহেরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিল?"

প্রতিভা বলিল, "হাঁ—কেন বল দিকি?"

আভা বলিল, "দাদার এই বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেটই না মামাবাবুর সর্ব্বনাশ করেছিল?"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কৈ, তা ত শুনি নি। তা যদি হোতো তা হলে তোমার দাদার সঙ্গে এ-রকম বন্ধুত্ব থাকতো কি করে? গেল পূজোয় আমরা চন্দ্রনাথ দেখে চাঁদপুর হয়ে আসার সময় যা খাতির-যত্ন তিনি করেছিলেন, সে আর কি বোলবো! না, না, এমন চমৎকার মাটীর মানুষ—"

আভা উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, ঐ বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেটই মামাবাবুর অকালমৃত্যু ঘটিয়েছিল। ছিঃ ছিঃ! দাদা তাকেই ঘরে আনছেন? তুমি লিখে দাও—না, আমিই লিখে দিচ্ছি দাদাকে, ও লোকটাকে এখানে নিয়ে আসবার টেলিগ্রাম পেলেই আমি রেণুদের ওখানে চলে যাব।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আহতা সিংহীর মত গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপে আভা কক্ষত্যাগ করিয়া গেল।

(২)

আহারান্তে বন্ধু সোমেন রায় জরুরী কার্য্যে অন্যত্র চলিয়া যাইবার পর সুরেশচন্দ্র অন্দরে আসিয়া শুনিল, আভা চেতলায় রেণুদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। রেণু আভাদের

সতীর্থ, সম্পর্কে তাহাদের নিকট আত্মীয়া। সেথানে আভার যাওয়া-আসা আছে।

সুরেশচন্দ্র প্রথমটা নির্ব্বাক বিস্ময়ে পত্নীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে বলিল, "চিঠিতে লিখেছিল বটে—কিন্তু—সত্যিই চলে গেলো?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "তা গেলো বৈ কি! যে করে বোনটিকে গড়ে তুলেছো—যা ধরবে তা ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও ছাড়াতে পারে না। চিঠিতে কি লিখেছিলো?"

সুরেশচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে জনবিরল রাজপথের দিকে চাহিয়া ছিল, অঙ্গুলীর মধ্যে ধৃত সুগন্ধি সিগারেটটি আপনিই পুড়িয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তন্দ্রা-ভঙ্গের পর যেন চেতনা পাইয়া সে বলিল, "ভারী অভিমানী আভা। ছেলে বেলায় বাপ মা মারা যাবার পর মামাবাবু ওকে কি আদরে মানুষ করেছিলেন, তা ত তুমি জান না। মামাবাবুকে তাই ও দেবতা বলে জানতো, আর তাইতেই যত মুস্কিল বেধেছে।"

প্রতিভা স্বামীর আরও নিকটে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, বল ত এত রাগ কেন ওর সোমেন বাবুর উপর? লোকটি ত খুব ভাল বলেই মনে হয়। কাগজে তিনি কি লিখলেন না লিখলেন, তাতে আভার এত দুর্জ্জয় রাগ কেন হবে? এমন ত আরও অনেকে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কথাই কাগজে লিখে থাকেন। আবার জিজ্ঞাসা করছিল, সোমেন বাবুই কি এক সময়ে মেহেরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন? মামাবাবুকে না-কি উনিই মেরে ফেলেছেন?"

সুরেশচন্দ্র ইজিচেয়ারে দেহ এলাইয়া দিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সে অনেক কথা। মামাই আমাদের বিষয়-আশয় দেখতেন শুনতেন। কত মামলা মোকদ্দমা করে, কোন দিন একবেলা না খেয়ে, কোন দিন বা একেবারে উপবাস দিয়ে, আদালত উকীলবাড়ী ছুটোছুটি করে বিষয় রক্ষা করেছেন। না হলে আমাদের নাবালক অবস্থায় ভায়াদরা কি কিছু রাখতো? মামা শেষে আমাদের জন্যে প্রাণটা পর্য্যন্ত দিলেন! তাঁর নিজের ছেলে মেয়ে ত কিছু ছিল না, কাসির ব্যামো ছিলো বলে বিয়েই করেন নি।"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রাণ দিলেন? তার মানে?"

সুরেশচন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "চিঠিতে আমায় কি লিখেছিল আভা জানো?—দাদা, যে লোকটা আমাদের মামাবাবুকে হত্যা করেছে, যে লোকটার জন্যে মামাবাবু অকালে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন, যে লোকটা মামাবাবুর মত মানী লোককে দশজনের কাছে চোর সাজিয়ে দিয়েছিল, তার সঙ্গে তুমি কলেজের বন্ধুত্ব সম্বন্ধ রাখতে পারো, কিন্তু আমি পারি না।"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "এসব কি বলছো? আমি ত এতদিন এর কিছুই শুনি নি।"

সুরেশ বলিল, "দরকার হয় নি তাই বলি নি। গেল বছর তোমাদের নিয়ে যখন চন্দ্রনাথ যাই, তখন তিনচার দিন চাঁদপুরে সোমেনের বাসায় ছিলুম—কি করে আমাদের আদর যত্ন করেছিল—লোকটা কেমন দেখেছিলে ত?"

প্রতিভা উচ্ছ্বাস ভরে বলিল, "তা কি কখনও ভুলতে পারি,—এমন মানুষ প্রায় দেখাই যায় না। বয়েস হয়েছে, বিয়ে করেন নি, ঘর সংসার দেখবার কেউ নেই,—কিন্তু আমাদের যেন মাথায় করে রেখেছিলেন,—কি খাওয়াবেন, কি দেখিয়ে আনবেন, এই করেই ছুটিটা কাটিয়ে দিয়েছিলেন।"

সুরেশ প্রশংসমান দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল, "এমন মানুষ কি কাউকে খুন করতে পারে তোমার বিশ্বাস হয়?"

প্রতিভা দৃঢ় স্বরে বলিল, "না, কখনই নয়। খুন ত অসম্ভব! দেখ, সোমেনবাবু আমাদের জাতের সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে, নারী বিদ্যাবুদ্ধিতে সকল বিষয়েই পুরুষের চেয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু নারী যাই হোক, আপনাকে রক্ষা করতে পারে না। এ জন্য নারীকে পুরুষের উপর নির্ভর করতেই হয়। সকল যুগেই সকল দেশেই তাই হয়ে আসছে। এতেই তোমার বোন একেবারে ক্ষেপে গেছে।"

সুরেশ বলিল, "তা মন্দ কি লিখেছে? আভার দেখছি সব তাতেই বাড়াবাড়ি—"

প্রতিভা বলিল, "না, না, ও কথা বোলো না। ওর ঐ একটা খেয়াল আছে বটে, কিন্তু আর সব তাতেই ওর মনটা খুবই উঁচু। থাক, কি হয়েছিল মামাবাবুর সঙ্গে সোমেন বাবুর?"

সুরেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর ও নীরব হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, —"কথাটা কি জান, মামাবাবু আমাদের দুই

ভাই-বোনের ছিলেন অভিভাবক। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যে করেন নি এমন কাজ নেই। আভা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতো, ভালবাসতো। দেখেছো ত, এখনও কেমন করে তাঁর ছবি পূজো করে, ফুল দিয়ে সাজায়? তাঁর ভেতরকার কথা কিছু জানতো না তো। একটা মামলার বিচারে বসে সোমেন যখন তাঁর পক্ষের লোককে কঠোর দণ্ড দিয়েছিল, আর তার জন্যে মামাবাবু বুকে দারুণ ব্যথা পেয়ে শয্যা নিয়ে মারা গেলেন, তখন থেকেই আভা সোমেনকে রাক্ষস নরপিশাচ বলে মনে করে আসছে,—আমি বোঝালেও কিছুতেই বুঝতে চায় নি।"

প্রতিভা বলিল, "তা এতে সোমেনবাবু তোমাদের মামাকে হত্যা করলেন কেমন করে?"

সুরেশ বলিল, "বিষ খাইয়ে বা গলা টিপে মারা না হতে পারে, কিন্তু মানী লোকের সমাজে অপমান হলে তাকে তিলে তিলে পুড়িয়ে মারা হয় না কি?"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "তার মানে?"

সুরেশ সে কথার জবাব না দিয়া আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল, "সে আজ ছ বছরের কথা, তখন তুমি আমাদের ঘরে আস নি। আমি তখন এটর্ণির আপিসে কাজ শিখ্‌ছি। মামা ছিলেন মেহেরগঞ্জের লোন অফিসের সেক্রেটারী, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, আরও কত কি। আমাদের ভায়াদের সঙ্গে এক মামলা বাধলো—তাতে লাঠালাঠি, খুন-জখম, এমন কি দলীল-দস্তাবেজ জালও হয়েছিল শুনতে পাই।"

প্রতিভার বিস্ময় যেন সীমা অতিক্রম করিল। সে বলিল, "খুন জখম? জাল জোচ্চুরী?"

সুরেশ বলিল, "হাঁ, তাই। আমাদের সদর নায়েবের নামে মামলা রুজু হোলো। কেবল খুন জখম দলীল জাল নয়, সঙ্গে সঙ্গে লোন অফিসের টাকা তছ্‌রুপ।"

প্রতিভা বলিল, "মামাবাবুর নামেও?"

সুরেশ বলিল, "হাঁ, মামাবাবুকেও জড়িয়ে পড়তে হলো। যা হোক, তবিল তছরুপের অপরাধ প্রমাণ হোলো, আর কিছু প্রমাণ হোলো না। সোমেন রায় দিলে, লোকটা ওপর-ওয়ালার বাহন মাত্র, তাই তাকে কম সাজা দেওয়া হল, না হলে তাকে দায়রা সোপর্দ্দ করা হোতো। ওপরওয়ালার বিপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই বলে তাঁর বিপক্ষে রায়ে সে কোনও মন্তব্য করলে না।"

প্রতিভা বলিল, "অর্থাৎ সোমেন বাবু মামাবাবুকেই প্রধান অপরাধী বলে ইঙ্গিত করেছিলেন?"

সুরেশ বলিল, "না, ঠিক তা নয়। ওর ভিতর অনেক কথা আছে। সে তোমায় একদিন বোলবো। এখন আভাকে এখানে আনবার কি করা যায় বল দিকি। ছিঃ ছিঃ, সোমেন কি মনে করছে!"

প্রতিভা বলিল, "যে জেদী বোন তোমার, কারুর কথা শুনবে?"

সুরেশ বলিল, "দেখো, কাল বিকেলের দিকে তুমি একবার রেণুদের ওখানে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমার আবার কাল সোমেনকে নিয়ে আলিপুরের বাড়ীখানা দেখে শুনে আসতে হবে। আমি চল্লুম সোমেনকে নিয়ে আসতে ভবেশদের ওখান থেকে।"

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেল। প্রতিভা স্বামীর নিকট শ্রুত ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার মনে তোলাপাড়া করিতেছিল। হঠাৎ কাহার পদশব্দে চমকিত হইয়া ভিতরের দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিল, আভা দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার মুখ-চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। প্রতিভা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া কক্ষমধ্যে টানিয়া আনিল, বলিল, "বাঁদরী! কখন এলি? এমনি করে আমাদের কষ্ট দিতে হয়?"

আভা ভ্রাতৃজায়ার বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া বলিল, "দেখো, আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। দাদা যা খুসী তাই করতে পারেন, তা বলে মনে ভেবো না যে, তুমি বা তিনি গেলেই আমি বাড়ী ফিরে আসবো। তোমাদের মান অপমান জ্ঞান না থাকতে পারে, তা বলে সকলের যে নেই তা মনে কোরো না।"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, মান দেখাবি'খন পরে, এখন চল ত ভাই খেয়ে নিবি। ওঁদের ওসব সারা হয়েছে, এখন বাইরে চরতে গেছেন।"

আভা বলিল, "খাওয়া দাওয়া? যত দিন এ বাড়ীতে তোমাদের সোমেনবাবু থাকবেন তত দিন নয়!"

প্রতিভা বলিল, "আচ্ছা তাঁর অপরাধটা কি হোলো? তিনি হাকিম—"

আভা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "হাকিম? কিসের হাকিম? একটা মানী লোক—জমিদার—সামান্য সাত হাজার টাকা ভেঙ্গে হাত গন্ধ করেছিল, এ ধারণা যে হাকিম করতে পারে, সে যত বড়ই পণ্ডিত হোক, তার ঘটে যে সামান্য একটু বুদ্ধি নেই, তা আমি বড় গলায় বলবো। সে যাই হোক, তোমরা কি বলে এমন লোককে মাথায় করে ঘরে এনে তুলেছো? ছিঃ ছিঃ! ছিঃ ছিঃ! যাঁর বিপক্ষে কোন প্রমাণ ছিল না—যিনি মনে করলে অমন দুদশটা হাকিম মাইনে দিয়ে চাকর রাখতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে তোমাদের হাকিম রায়ে লিখলে কি-না, চোরটা ওপর-ওলার বাহন মাত্র! আমার মামাবাবু কি-না সেই ছোটলোক চোরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছিলেন?"

উচ্ছ্বসিত আবেগে আভা কাঁদিয়া ফেলিল। প্রতিভা তাহাকে আবার বুকে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল,—"ছিঃ বোন কাঁদে না। জানিস ত, হাকিম—তাকে আইন মানতে হবে—সাক্ষী প্রমাণ মানতে হবে—"

মুহূর্তে আভার কান্না থামিয়া গেল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমরাও তা হলে বিশ্বাস কর যে, মামাবাবু চোর, জোচ্চোর? না, না, কথ্‌খোনো থাকবো না তোমাদের এখানে।"

প্রতিভা তাহাকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাপরে! আস্ত কেউটে!"

আভা বলিল, "না বৌদি, ছেড়ে দাও। আমি সত্যি বলছি, কথ্‌খোনো এখানে থাকবো না, কথ্‌খোনো না।"

প্রতিভার বাধা ঠেলিয়া সে বিদ্যুৎ ঝলকের মত কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল।

(৩)

সোমেনবাবুর আদর যত্নের কোনও ত্রুটি হইল না। বরং স্নেহময়ী বন্ধু-পত্নীর খবরদারীতে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল,—অনুক্ষণ লজ্জা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিল। আলিপুরে বাসা ঠিক হইয়া গিয়াছে। সে তথায় চলিয়া যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেও, বন্ধু ও বন্ধুপত্নী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না, বলিল, কাজে যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে তাহাদের কাছে থাকিতে হইবেই!

সংসারে যাহার আপনার জন বলিবার কেহ নাই, দাবীর অধিকার জারি করিবার মত কেহ নাই, এমনই আত্মীয়-স্বজন-বিরহিত যে ব্যক্তি, সে যদি অপরের কাছে অযাচিত অনাবিল অকৃত্রিম স্নেহ মমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার মনে কি ভাবের উদয় হয়? সোমেন মনে মনে তাহার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতি নিবেদন করিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কোন কথাই প্রকাশ করিতে পারিল না।

আহার-বিহার আমোদ-প্রমোদের এ কয় দিন যেন অন্ত নাই। কিন্তু এই অফুরন্ত আনন্দের মাঝে সোমেন কেমন যেন আত্মহারা অবস্থায় থাকে,—পাঁচ ডাকের পর একটা কথার জবাব দেয়। প্রতিভা তাহার এই অবস্থা ধরিয়া ফেলিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "মনটা কি পদ্মাপারে ফেলে এসেছেন, সোমেনবাবু?" কিন্তু সোমেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল দেখিয়া প্রতিভা তাহার রঙ্গ-রহস্যের বন্যা-প্রবাহকে সংযত করিল।

একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সোমেন আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হল কেনের একখানা উপন্যাস পড়িতেছিল। হঠাৎ প্রতিভা বিশ্রাম-কক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সত্যিই তা হলে কাল যাচ্ছেন আলিপুরে, সোমেনবাবু?"

সোমেন তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি?" তাহার মুখেচোখে বিস্ময়ের ভাব। এ সময়ে ত প্রতিভা বাহিরে আসেন না—বিশেষতঃ সুরেশ আফিসে গেলে!

উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে প্রতিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "এখানে আদর সেবার ত্রুটি হচ্ছে বুঝি? তা দেখুন, ছেলে মেয়ে নিয়ে একলা আমি। এই সময়টা আভা গেল চেতলায় বন্ধুর বাড়ী।"

সোমেন সহসা মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, কালই যেতে হবে, পরশু জয়েনিং ডেট কি-না। তা ছাড়া পিসীমা—তা আপনার যত্নের কথা—তা মুখে কি বোলবো? মার পেটের বোনও কি—"

প্রতিভা নিষ্পলক দৃষ্টিতে সোমেনের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিল সেই জানে। সহসা বাধা দিয়া সে বলিল, "আচ্ছা, সোমেন বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরবো, সত্যি জবাব দেবেন?"

সোমেন বলিল, "কি বলুন না।"

প্রতিভা বলিল, "শুধু বলুন না বললে হবে না। বলুন, যা বলবেন সত্যি বলবেন ?"

সোমেন মহা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। একেই সে স্বল্পভাষী, তাহার উপর সে যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, তাঁহার কট হইতে এই পীড়াপীড়ি! এমন সময়ে সুরেশ যদি থাকিত!

কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর সোমেন ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "আপনার কাছে মিথ্যে বোলবো না। বলবার হলে সবই বোলবো।"

প্রতিভা বলিল, "আচ্ছা আপনি এত বয়স পর্য্যন্ত বিয়ে করেন নি কেন ?"

হঠাৎ সম্মুখে কালসর্প দেখিলে মানুষ যেমন চমকিত ও শঙ্কিত হয়, তেমনই ভাবে সোমেন বলিল, "বিয়ে ?"

প্রতিভা বলিল, "হাঁ বিয়ে—আকাশ থেকে পড়লেন না-কি ? নিজে রোজগার করছেন, সংসারে দেখবার কেউ নেই আপনার"—

অকূলে যেন অবলম্বনের তৃণগাছটা পাইয়া সোমেন বলিল, "এই জন্যেই ত করিনি এতদিন—কে দেখবে শুনবে বলুন"—

প্রতিভা গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "দেখুন সোমেনবাবু, বাজে কথা বলে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আপনার মত শিক্ষিত রোজগেরে লোকের ত সেকালের চেলীর পুঁটুলী ঘরে তোলবার দরকার হবে না। এখনকার কালে বেশী বয়সের শিক্ষিতা বিবাহযোগ্যা মেয়ে যথেষ্ট পাওয়া যায়। তারা এসে কি আপনার ঘর-সংসার গুছিয়ে নিতে পারবে না?"

সোমেন ঘামিয়া উঠিল। এ ভীষণ পরীক্ষানল হইতে সে কিসে ত্রাণ পায়! কিন্তু নির্ম্মম তাহার পরীক্ষক। অনুক্ষণ যাঁহার মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আজ তাঁহার সে হাসি কোথায় লুকাইয়াছে! সোমেন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "হিল্লী দিল্লী ঘুরতে হয়, স্থিতভিত ত হতে পারি নি"—

প্রতিভা বাধা দিয়া বলিল, ছিঃ "সোমেনবাবু, ও-সব ছেলে ভুলোনো কথায় আমায় ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি এইমাত্র আমায় স্নেহময়ী ভগ্নীর অধিকারে অধিকারিণী করেছেন—সেই জোরে বলছি, আপনার মার পেটের বোন থাকলে যা করতেন, আমায় তা করতে দিন।"

কম্পিত কণ্ঠে কথাটা বলিতে বলিতে প্রতিভার নয়নপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

সোমেন ব্যথিত স্বরে বলিল, "দেখুন, সত্যিই আপনাকে আমি আমার ভগিনীর মত শ্রদ্ধা ভক্তি করি—আপনি আমায় যা করতে বলবেন ন্যায্য হলে আমি তা নিশ্চয়ই কোরবো। কিন্তু আপনার পায়ে ধরে মিনতি করছি, কেবল ঐ অনুরোধটি আমায় করবেন না। আমি ভিক্ষা চাইছি"—

প্রতিভা অনুকম্পা-স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "সোমেন বাবু, আপনি না পুরুষমানুষ—এই দুর্ব্বলতা আপনাকে কেমন মানাচ্ছে আপনিই বলুন দিকি ? দেখুন, আমি সব জানি, সব শুনেছি। তা আপনি যদি পুরুষ হন, মানুষের মত শক্ত হন, তা হলে সবই ঠিক হয়ে যাবে, না হলে জগতের কেউ আপনার মনের ব্যথা ঘোচাতে পারবে না।"

সংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী গৃহিণীরই মত গর্ব্বিত পাদবিক্ষেপ করিয়া প্রতিভা অন্দরের দিকে চলিয়া গেল, নিষ্পলক বিস্মিত দৃষ্টিতে সোমেন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

(৪)

"কি হোলো—গাড়ী অচল ?"

আভারাণীর প্রশ্নে সোফার কালীচরণ বলিল, "হাঁ হুজুর—চলবার কোন আশাই নেই—বিশেষ জল যতক্ষণ না থামে, ততক্ষণ ত নয়ই।"

আভা বিরক্তিভরে বলিল, "তাই ত! কি চমৎকার এই মোটরের কল!"

সারা দিনই থাকিয়া থাকিয়া আকাশ হইতে জল ঝরিতেছিল,—সন্ধ্যার পর হইতে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছিল। সেই দারুণ দুর্য্যোগে সহরের ও সহরতলীর অনেক অঞ্চল খাল বিলে পরিণত হইল। আলিপুর চেতলায় জল না দাঁড়াইলেও রেণুদের বাড়ীর সকলেই আভাকে ধরিয়া বসিয়াছিল, আজিকার দিনটা কিছুতেই তাহার যাওয়া হইবে না। কিন্তু আভারাণীও ছাড়িবে না। ভাই মোটর পাঠাইয়াছে, বোন যাইবেই। তাহার মত নির্ব্বন্ধপরায়ণা তরুণী কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইবে না—চেতলা হইতে ভবানীপুর আর কতটুকু ? এমন বৃষ্টি ত হয়ই।

কিন্তু পথে আসিয়া এই বিপত্তি। এ সময়ে একখানা খালি, ট্যাক্সি অথবা ঘোড়ার গাড়ী ? কিন্তু আভা দেখিল শুধু আকাশের বুক চিরিয়া জল ঝরিতেছে, পথে জীবজন্তু যান বাহন কিছুই নাই।

গাড়ীর ভিতরের বিজলীর আলোক দিনের আলোককেও হারি মানাইয়াছে। চারিদিকে ঝুপঝুপ বৃষ্টির সঙ্গে নামিয়াছে গাঢ় স্পর্শানুমেয় অন্ধকার! দূর দুরান্তরে রাস্তার এক আধটা গ্যাসের আলো কোনরূপে অন্ধকার ভেদ করিয়া আপনাদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। বৃষ্টি যে শীঘ্র থামিবে, তাহারও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

আভারাণীর বিরক্তি মাত্রা ছাপাইয়া ক্রমশঃ দুর্জ্জয় ক্রোধে পরিণত হইল। ইহাকে কি বাঁধিয়া মার খাওয়া বলে না? তাহার আপত্তি সত্বেও যদি তাহার দাদা এই লোকটাকে তাহাদের বাড়ীতে আনিয়া না তুলিত, তাহা হইলে তাহাকে ত চেতলায় গিয়া এই কয়টা দিন কাটাইতে হইত না!

হতভাগা বৃষ্টিরও কি মরণ নাই? আকাশের যেন মুখ পুড়িয়াই রহিয়াছে! আর এই লোকটা?—তাহাদের গুণময় আরাধ্য দেবতা মামাবাবুর শত্রু এই লোকটা—দাদা কি বলিয়া তাহাকে ঘরে ঠাঁই দিল? ছিঃ ছিঃ!

যত ক্রোধ গিয়া পড়িল সেই 'লোকটার' উপর। হঠাৎ কাছেই গাড়ীর চাকার আওয়াজ হইল। হর্ষভরে আভা পরদা তুলিয়া দেখিল ওমা! একখানা গোযান! দূর, দূর—কিন্তু? এই সামান্য গোযানও ত তাহাদের দামী গাড়ী হইতে ঢের ভাল,—তাহার ত কল বিগড়ায় না!

গাড়ীর ভিতরের বিজলি বাতির আলোকে রিষ্ট ওয়াচটা দেখিয়া আভা চমকিয়া উঠিল,—ইস্! সওয়া ৯টা! হতভাগা গাড়ী খোঁড়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও খোঁড়া। মানুষের জারিজুরি কতটুকু! তবে কি রাত্রি ভোর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের ঝুপ ঝুপ আওয়াজ শুনিয়াই তাহাকে কাটাইতে হইবে? দূর হউক,—আর নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে পারা যায় না!

আভা গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "রাম অবতার, কাছে কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছ? – কোন বাড়ীতে বা বাগানে?"

রাম অবতার বাড়ীর বিশ্বাসী বৃদ্ধ দ্বারপাল। সে বলিল, "না, দিদিজী। কোথাও ত দেখছি না কুচ্ছু।"

রুষ্টস্বরে আভা বলিল, "না ত' সারা রাত্রি এই পথে কাটাতে হবে না কি?"

সোফার কালীচরণ বিনীতস্বরে বলিল, "না হুজুর, তা হবে কেন? জল একটু ধরলেই কলটা ঠিক করে নোবো'খন।"

বিরক্তিভরা সুরে আভা বলিল, "হাঁ, ও আর ঠিক হয়েছে; যাও দিকি ছাতাটা নিয়ে এগিয়ে। দেখে এস কাছে কোন বাড়ী আছে কি-না—যদি তাদের সাহায্য নিয়ে একখানা গাড়ী যোগাড় করতে পারি। যাও-দেরী কোরো না।"

ততক্ষণ কালীচরণ দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছে। বরং কর্ত্তা গৃহিণীর হুকুমে সাড়া দিতে সে দুই দশ মিনিট বিলম্ব করিতে পারে, কিন্তু হুজুরালি দিদিজীর? বাপস্! স্কন্ধে দুইটি মস্তক থাকিলেও বরং তাহা সম্ভব হইলেও হইতে পারিত!

বাহিরে প্রকৃতি তখন রুদ্রতালে নৃত্য করিতেছিল, সে নৃত্যের যেন বিরাম নাই—শ্রান্তি নাই—ছেদ নাই। আভা নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাহাই দেখিতেছিল, যেন সে সেই প্রলয় তাণ্ডবের নৃত্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছিল। কেবল অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণের একঘেয়ে রুম ঝুম্ নূপুরধ্বনি, মাঝে মাঝে পার্শ্বের পুষ্করিণী হইতে মত্ত দাদুরীর কর্ণেটবাদ্য বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। আর পথের উভয় পার্শ্বের নালা দিয়া বৃষ্টির জলধারা গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ গম্ভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আভা জিজ্ঞাসা করিল, "চাঁদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাল কখন চলে গেলো?"

অতর্কিত প্রশ্নে চমকিয়া উঠিয়া রাম অবতার বলিল, "কাল না দিদিজী, পরশু রোজ সাহেব চলিয়ে গিয়েছে আপনে মোকামমে।"

আভা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হুঁ।"

রাম অবতার ভরসা পাইয়া বলিল, "ও সাহেব খুব ভালা আদমী আছে, দিদিজী। কোঠিকে সব নোকর উকরকে ভারী বকশিস দিয়ে গেলো।"

ব্যঙ্গের সুরে আভা বলিল, "আর তোমার বাবুজীকে মায়ীজীকে?" বলিবার সময় তাহার নাসাগ্রভাগ ঘৃণায় কম্পিত হইল।

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। কথাটা বলিয়াই কিন্তু সে মরমে মরিয়া গেল! ছিঃ ছিঃ—এত নীচ, এত সঙ্কীর্ণ সে—সে কি সত্যই পথের ধূলায় নামিয়া আসিতেছে! এই বাড়ীর ভৃত্য পরিজন—ইহাদের সাক্ষাতে—

আভা তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরাইয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "আর একটা ছাতা আছে রাম অবতার?"

রাম অবতার বলিল, "হাঁ, দিদিজী। দিবো ?"

সত্যই এরূপ নির্জ্জনে নীরবে বন্দিনীর মত গাড়ীর গহ্বরে আটক থাকা আভার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। এ-ভাবে বেশীক্ষণ থাকা তাহার ধাতুসহ ছিল না। আলস্য ত্যাগ করিয়া সে বলিল, "দাও ত ছাতাটা।" ছাতাটা লইয়াই সে গাড়ীর দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

রাম অবতার চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "দিদিজী, আপ"—

আভা বলিল, "হাঁ, নেমে একটু হাত পা ছড়িয়ে নেবো—এই যে কালীচরণ, কি করে এলে ?"

সোফার বলিল, "ঐ যে পুকুরের ওপারে বাগান বাড়ীটার আলো দেখছেন হুজুর, ওটা একটা সাহেবের। তার পরেরটাও সাহেবের। তার পরেই একজন বাঙ্গালীবাবুর বাংলা। কিন্তু যে বৃষ্টি"—

আভার একটু 'হুঁ' সাড়া পাইয়াই সোফার নীরব হইল। আভা পথে নামিয়া দুই এক পা চলিবার পর বলিল, "বাঙ্গালীবাবুর বাড়ীর কারুর সঙ্গে দেখা হোলো ?"

সোফার বলিল, "হাঁ হুজুর! দরোয়ান বল্‌লে, বাবুজী এ বাড়ীতে নতুন এসেছে।"

আভা বলিল, "বাবুর বাড়ীতে মেয়েছেলে আছে ত ?"

সোফার লজ্জিত হইয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে, তা ত জিজ্ঞাসা করি নি।"

আভা রুষ্টকণ্ঠে বলিল, "তা ত জিজ্ঞাসা কর নি!—নির্ব্বোধ! গাড়ী নিয়ে হাজির থেকো এখানে। এস, রাম অবতার।"

উত্তরের বা সেলামের প্রতীক্ষা না করিয়াই আভা বাংলোর আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল।

(৫)

"এ কি মা, একেবারে নেয়ে এসেছ ? এসো, এসো, কাপড় ছাড়বে এসো।"

বর্ষিয়সী গৃহিণী আভার হাত ধরিয়া হলঘরের পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেলেন। সাহেবী ফ্যাসানের বাড়ী, তবে যতটুকু সম্ভব বাঙ্গালীর বাসোপযোগীই করা হইয়াছে,—যেন তাহাতে ব্যস্ততার ছা' এখনও লাগিয়া রহিয়াছে।

কাপড় ছাড়াইবার সময়ে বর্ষিয়সী আপশোষ করিয়া বলিলেন, "কিই বা ছাই দিই পরতে তোমায়, মা। এক কাপড়েই এইছি বল্‌লেই হয়, তাও আবার আবাগী পোড়া কপালীর থান, মা। থাকগে, হিমুরই একখানা কাপড় এনে দিচ্ছি। তা বলে ত ঝি মাগীর কাপড়-চোপড় তোমায় দিতে পারি নে। নাও মা, এইবার বোসো ঐ তক্তপোষের উপর। ওটা রাজশয্যা মা। আমি শীগ্‌গীর একটু চা গরম করে আনছি—ও কেটলি রাত দিন চাপানো আছেই মা। হিমু আমার ঐটে পেলেই নিশ্চিন্তি—কোন ঝঞ্চাট ওর নেই, মা। নাও এই মোটা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে বোসো, আমি এই এলুম বলে।"

বর্ষিয়সী রান্নাঘরের দিকেই বোধ হয় চলিয়া গেলেন।

আভা একবার ঘরটা দেখিয়া লইল। দেওয়ালের গায়ে পেরেক মারা আর সদ্য বালি ভাঙ্গার চিহ্ন দেখিয়া তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গৃহস্থরা অতি অল্প দিনই এই বাড়ী অধিকার করিয়াছে। দেওয়ালে তখনও নতুন চূণকাম, ময়লা হয় নাই,—ঘরের মধ্যে চূণকামের গন্ধ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এই সাহেব পাড়ার মধ্যে হংসো মধ্যে বকো যথার মত কে ইহারা ?

একখানা সুঁদরী কাঠের তক্তপোষ—তাহার উপর একখানা কম্বল বিস্তৃত। এক পাশে ওয়াড়বিহীন বালিস। রাজশয্যাই বটে! চারিদিকেই বিশৃঙ্খলার স্পর্শ।

শিয়রের দিকে একখানা জলচৌকীর উপর রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, তাহার পায়ের তলায় ফুলতুলসী। আর কুলুঙ্গীর মধ্যে পঞ্চপাত্রে গঙ্গা জল, তুলসীর মালা, কণ্ঠী কুঁড়োজালি।

ছোট একটি টেপয়ের উপর বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা পকেট গীতা আর কি কয়খানা উপনিষদ সংহিতা। টেপয়ের এক পার্শ্বে একখানা কম্বলের আসন ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে। বিগ্রহের সম্মুখে তখনও ধূপ জ্বলিতেছিল, ধূনার গন্ধে তখনও কক্ষ সুরভিত।

এ-সকল যে এই বর্ষিয়সী হিন্দু বিধবার আসবাব, তাহা বুঝিতে আভার বিলম্ব হইল না। কে ইহারা এমন গোঁড়া হিন্দু, যাহারা সাহেবপাড়ায় আসিয়া বাস করে? তাড়াতাড়িতে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই ত। গৃহস্বামী কোথায়, তাঁহার পুত্র পরিবারই বা কোথায়? নাম শুনিল হিমু। হিমু কি হেমন্ত না হেমচন্দ্র ?

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া গৃহিণী কক্ষে প্রবেশ

করিয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "এস মা এ-ঘরে, তোমার চা হয়েছে।"

আভার চায়ের তৃষ্ণাটা খুবই প্রবল হইয়াছিল। সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়াছে, এমন সময় দেখিল পাচক ব্রাহ্মণ একথাল খাবার সাজাইয়া আনিতেছে,—পশ্চাতে দাসীর হস্তে জলের গেলাস।

আভা বলিল, "সর্ব্বনাশ! এ করেছেন কি মা! এত লুচি তরকারী আবার তার উপর একরাশ মিষ্টি—আমি যে রেণুদের ওখান থেকে পেট ভরে খেয়ে আসছি। আপনার ছুটী পায়ে পড়ি—"

বিধবা বাধা দিয়া বলিলেন, "ছি মা, ও-কথা বলতে নেই,—কিছু মিষ্টি-মুখ করবে বৈ কি, মা।"

আভা মহা বিব্রত হইয়া বলিল, "আচ্ছা মা, ছুটো মিষ্টি তুলে দিন আমায় ও থেকে, আর ওসব নিয়ে যেতে বলুন। রাত প্রায় দশটা হোলো, বাড়ীতে ভাবছে। আমার গাড়ী অচল, ড্রাইভার বসে রয়েছে। যেমন করে হোক একখানা ভাড়া গাড়ী যোগাড় করে দিতেই হবে, মা।"

বিধবা বলিলেন, "তা দিচ্ছি মা, কিন্তু হিমু না এলে—আর সে এই এলো বোলে—এই পাশের সাহেব-বাড়ীতে কি বিলিয়র না কি খেলতে যায়। দশটা বাজলে আর কোথাও থাকে না—ওমা, বেঁচে থাকুক বাছা হেমন্ত, ঐ তার গলা পাওয়া যাচ্ছে মা হলঘরে। আঃ বিষ্টিটাও ধরেছে মা—বাঁচলুম।"

অগত্যা আভাকে কিছু খাবার খাইতে হইল। আহার করিতে করিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "হেমন্তবাবু কি করেন?"

এক গাল হাসিয়া বিধবা বলিলেন, "কে হিমু? ওমা, সে যে হাকিম কলকাতার। হিল্লী ডিল্লী ঘুরে এইবারে কলকাতায় বদলী হয়েছে বলে, বুড়ী পিসীকে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে সংসার পাতাতে। এমন ছেলে কি কারু হয়, মা! এখনও ছেলেমানুষটি, সংসারের কোন ধার ধারে না, যা ভরসা চাকর বামুন।"

আভা বলিল, "কেন, তিনি বিয়ে করেন নি, ছেলে-পুলে নেই? বাপ মা?"

বিধবা ব্যথিত স্বরে বলিলেন, "কেউ নেই মা, বাছার কেউ নেই। ছেলেবেলায় বাপ মা হারিয়েছে, ওর গরীব পিসেই ওকে মানুষ করেছে। আমি তার ভায়ের বউ, তাই ও আমায় পিসী বলে। জান মা, রোজগার করতে শিখে অবধি আমায় দেশের বাড়ীতে রাজরাণী করে রেখেছে। পিসে মারা যাবার পর থেকে সে আমার হাতেই টাকাকড়ি সব ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তি। যখনই বাড়ী আসে, তখনই ছেলেমানুষের মত আবদার করে বলে, পিসীমা তোমার হাতের অড়োর ডাল খাব্রো। ও কি মা, দুধটুকু—"

বিধবার চোখে মুখে হাসি কান্নার মাখামাখিটা আভার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। সে বলিল, "না মা, আপনার মিষ্টি গল্প শুনেই পেট ভরে গেছে—"

হলঘর হইতে ডাক পড়িল, "পিসীমা!" সে যেন আবদারের সুর।

আভা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "চলুন মা।"

বিধবা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমিও যাবে মা বাইরে?"

আভা বলিল, "কেন? যাবো না? যাঁর বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম—চলুন।"

বিধবা বলিলেন, "বেশ। এ কি, কাপড় ছাড়ছো যে? না বাছা, ভিজে কাপড়-চোপড় পরে যেতে পাবে না বলে দিচ্ছি।"

আভা হাসিয়া বলিল, "না মা, দেখুন না, আপনার লোকজন উনুনে সেঁকে এগুনো শুকিয়ে দিয়েছে। চলুন, আমি যাচ্ছি।"

বিধবা হলঘরে চলিয়া গেলেন। আভা যখন হলঘরে প্রবেশ করিল, তখন বিধবা একটি লোকের সহিত কথা কহিতেছেন। লোকটি সটান একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িয়াছিল। আভা তাহার মাথার পশ্চাৎ দিকটা দেখিতে পাইতেছিল।

বিধবা আভাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে মা লক্ষ্মী এসেছেন, এত করে বললুম—"

লোকটা তীরের মত আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অগাধ বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "এ কি, আপনি!"

আভা বিস্মিত হইল, বলিল, "আপনি আমায় চেনেন না কি?"

লোকটি বলিল, "না, না, তা, না, তবে এই গিয়ে আমি ভেবেছিলুম অন্য রকম। আপনার মত ছেলেমানুষ এই

রাতে একলা—তা যাক, আজকের রাতটা এখানে পিসীমার কাছে—"

আভা বলিল, "না, তা হতে পারে না, বাড়ীতে সবাই ভাবছে। আপনি দয়া করে আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দিন, এইটুকুই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।"

বিধবা বলিলেন, "না, না, তা কি হয় বাছা,—এই দুর্য্যোগ, না হয় তোমার লোকজন বাড়ী ফিরে যাক্, সে সব বন্দোবস্ত হিমু করে দেবে'খন।"

হেমন্ত বলিল, "সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি। জল সরে গেছে, লোক পাঠিয়েছি আপনার গাড়ীখানা এখানে ঠেলে নিয়ে আসতে। আপনাদের ফোন নম্বর কত? আমি এখনই ফোন করে দিচ্ছি। পিসীমা, তুমি যাও ওঁর খাবার-দাবার যোগাড় করো গিয়ে। আপনি বসুন।"

পিসীমা চলিয়া গেলেন। আভা আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, "আচ্ছা গাড়ীখানা আসুক ততক্ষণ, হয়ত গাড়ী এবার চলবে। দেখুন হেমন্তবাবু, শুনলুম আপনি আলিপুরের হাকিম। নতুন ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানেন?"

হেমন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, "নতুন ম্যাজিষ্ট্রেট? কেন বলুন দিকি?"

আভা বলিল, "মিঃ সোমেন রায় বলে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আলিপুরে বদলি হয়ে এসেছেন। তাঁকে চেনেন আপনি?"

হেমন্তর মুখখানা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর সে বলিল, "হাঁ, না, তা এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন দিকি? যে ভাবে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে মনে হচ্ছে, তাঁর উপর আপনার ধারণাটা যেন ভাল না।"

আভা দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, তাই-ই। এ লোকটাকে কেন যে আপনারা এত বড় দায়িত্বের কাযে বসিয়েছেন, তা ভেবে পাই নে।"

হেমন্ত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "আমরা বসাবার কে বলুন? আপনার কাছে সে গুরুতর কিছু অপরাধ করে থাকলেও গভর্ণমেণ্ট হয়ত তার এমন কিছু গুণ দেখেছেন, যাতে—"

বাধা দিয়া ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে আভা বলিল, "না, কখ্খোনো দেখতে পারেন না। এ লোকটা যে এ কাজের একবারেই উপযুক্ত নয়, তা আমি বড় গলায় বলতে পারি। আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট বলে আপনাকে জানিয়ে রাখছি।"

সুন্দরী তরুণীর ক্রোধোদ্দীপ্ত নয়নে যেন অগ্নিবর্ষিত হইতেছিল। গৃহস্বামী শুষ্কমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "জানি না সে কি অপরাধে অপরাধী আপনার কাছে। অন্ততঃ যদি সে কারণটা জানতে পারতো, তাহলে হয়ত তার নিজের পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ কিছু থাকতে পারতো—"

আভা চীৎকার করিয়া বলিল, "না, কোন কৈফিয়ৎই থাকতে পারে না তার। জানেন হেমন্তবাবু, আমার মামা শিবতুল্য মানুষ, পৃথিবীতে তাঁর মত মানুষ হতে পারে না, হবেও না কখনও। তাঁকে এই লোকটা তবিল ভাঙ্গার মামলায় আসামী করে জেল দেবার চেষ্টা করেছিল। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ, তাই ভগবান এই লোকটার সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানী লোকের দুর্নাম—মামা সেই যে শয্যা নিলেন, আর উঠলেন না।"

বলিতে বলিতে আভার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। হেমন্ত ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিল। পরে বেদনাজড়িত স্বরে বলিল, "কিন্তু নিষ্পাপ মানুষকে মিছিমিছি সাজা দেবার সোমেনবাবুর কি কারণ ছিল?"

আভা বলিল, "তা ঠিক বলতে পারি নে। তবে দাদার কাছে শুনেছি, এই লোকটা মামাবাবুর কাছে কি চেয়েছিল, তিনি তা দেন নি, বরং উল্টে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

হেমন্ত ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আপনার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব উঁচু—খুব বড়—"

আভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার সম্বন্ধে? আমায় ত তিনি চেনেন না, জানেন না। আপনি এ কথা জানলেন কি করে? আপনার সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে তা হলে?"

হেমন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমিই সোমেন রায়।"

কক্ষমধ্যে হঠাৎ বজ্র পতিত হইলেও বোধ হয় আভা অধিক চমকিত হইত না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া আভা বলিল, "আপনিই মিঃ সোমেন রায়? তা হলে—তা হলে আপনি জেনে শুনে এতক্ষণ নাম ভাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে—"

চোখে তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, ঘন ঘন শ্বাসত্যাগে কক্ষ কম্পিত হইতেছিল।

প্রশান্ত কণ্ঠে সোমেন বলিল, "না, জোচ্চুরী করি নি। আমার ডাক নাম হেমন্ত। এ কি, কোথায় যাচ্ছেন?"

সিংহীর মত গ্রীবাভঙ্গী করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া আভা বলিল, "জানলে যেখানে কখনও আশ্রয় নিতুম না, আপনি জেনে শুনে আমায় সেখানের পরিচয় দিলেন না কেন? আমায় ।ক আপনার অপমান করবার ইচ্ছা ছিল না?"

সোমেন দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া মিনতিভরা ছলছল নেত্রে চাহিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "অপমান? আপনাকে? আমার কৈফিয়ৎটাও শুনবেন না?"

আভা চীৎকার করিয়া বলিল, "না।"

ব্যথাহতকণ্ঠে সোমেন বলিল, "আদালতের যে আসামী, সেও তার কৈফিয়ৎ দেবার অধিকার পায়। আভা, তোমার গাড়ী তৈরী—বেশী দেরী হবে না, আমার একটা কথা শুনে যাও—পাঁচ মিনিট"—

"না, আপনার কোন কথা শুনতে চাই নে," ঝড়ের বেগে আভা ঘরের বাহির হইয়া গেল।

(৬)

"বাঁদরী! রেগে রেগেই মলেন! আক্কেলটা তোর কি বল দিকি?"

প্রতিভার হাসি মুখের এই সম্ভাষণে আভা যে কিছুমাত্র নরম হইল, এমন ভাব দেখা গেল না। বরং তাহার মুখখানি যেন রাগে আরও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তা বাঁদরীর সকল ত্রুটি ত তোমরা দুজনে সেরে নিয়েছ, তাহলেই হ'ল। মান সম্ভ্রম বলে দাদার যদি কিছু জ্ঞান থাকে!"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "এবারে দাদাকে ব'লে তোদের জমিদারীর খাতায় যে কালির দাগটা লেপ্টে গেছে, সেটাকে ভাল করে ব্লটিং দিয়ে তুলে ফেলতে বলিস।"

আভা হাসিয়া বলিল, "তা সত্যিই ত কালি পড়েছে। তবে এত দিনের পুরোনো দাগটা ব্লটিংএ উঠবে না, বৌদি। ওটা তুমিই না হয় জীবে করে চেটে তুলে দিও।"

প্রতিভা বলিল, "তাই কোরবো লো তাই কোরবো। আচ্ছা বল দিকি, মানুষটা কেমন দেখলি?"

আভা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "মানুষটা? তার মানে?"

প্রতিভা তাহার ফুল্ল গোলাপ-কোরকের মত গণ্ডে টোকা মারিয়া বলিল, "আহা, মানুষটা—যেন কচি খুকিটি, ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না!"

আভা বলিল, "সত্যি বলছি বৌদি—ওঃ তোমাদের সেই মস্ত সভ্য হাকিম সাহেবের কথা বলছো?"

প্রতিভা বলিল, "তাকে অসভ্য চোয়াড় বলিস বল্, কিন্তু কোন্ আক্কেলে তুই আমায় চিঠিতে লিখলি যে, লোকটাকে কোন ভদ্র লোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়, বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে দেওয়া উচিত নয়। ছিঃ ছিঃ! রাগ নয়ত চণ্ডাল! দুধের মত সাদা মন যার, বয়েস হয়েছে তবু একেবারে ছেলেমানুষটি—"

আভা অত্যন্ত রুষ্ট স্বরে বলিল, "তোমার ছেলেমানুষটি তোমারই থাক, ওর কোন কথা বলবার দরকারই নেই আমায় বলে দিচ্ছি, বৌদি।"

প্রতিভা এইবারে একটু উষ্ণ স্বরে বলিল, "নিজের গোঁ ত ছাড়বি নি কখনও, সেটা তোদের গুষ্টির ধারা। দেখ্ সে এত সরল যে পেটের ছেলে যেমন করে আবদার করে, তেমনই করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে একদিন দুপুরবেলা কেউ যখন কোথাও ছিল না তখন আমার হাত দুটো ধরে তার মনের কষ্ট জানিয়েছিল। উঃ কি চাপা মানুষ—এত দিন মুখটি বুজে বুকের মধ্যে তুষের আগুন পুষে রেখেছিল।"

আভা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিল, "বলে যাও, গল্পটা মন্দ লাগছে না। একবারে রোমান্স!"

প্রতিভা গম্ভীর স্বরে বলিল, "ঠাট্টাই কর, আর যাইই কর,—আমি ছেলের মা হয়ে বলছি,—সে সত্যিই পেটের ছেলের মত জানিয়েছিল তার মনের গোপন ব্যথার কথা। কেন সে এতকাল বিয়ে করে নি জানিস?"

আভা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, "দরকার?"

প্রতিভা বলিল, "হাঁ, দরকার আছে বলেই বলছি। তাকে সবাই ভুল বুঝে আসছে এই তার নালিশ, বিশেষ তুই।"

আভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি? আমার বোঝা না বোঝায় তার কি?"

প্রতিভা বলিল, "তার সব। শোন, সবটা খুলেই বলছি। যখন ওরা একসঙ্গে কলেজে পড়তো, তখন সে একটা মেয়েকে দেখেছিল, সে মেয়ে তখন বারো বছরেরটি।

পিঠে বিনুনী ঢুলিয়ে স্কুলে যেতো। তাকে আজও সে ভুলতে পারে নি।"

আভা বলিল, "এ বায়োগ্রাফির হঠাৎ কি দরকার হল?"

প্রতিভা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ কর পোড়ারমুখী, আমায় সবটা বলতে দে আগে।"

আভা বলিল, "বেশ, বল শুনি।"

প্রতিভা বলিল, "ঠাট্টা না, এর পর কাঁদতে হবে বলে রাখছি। বি-এ একজামিনে ফাষ্ট ক্লাসে ফাষ্ট হয়ে সে তার বন্ধুকে দিয়ে বন্ধুর মামার কাছে সেই মেয়েটিকে ভিক্ষে চেয়েছিল। মামা কি করেছিল জানিস?"

আভা প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতিভা বলিল, "তোর মামা তাকে গরীব বলে শেয়াল কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল!"

"তার পর থেকে সে আর তার বন্ধুর বাড়ী মাড়ায় নি। কিন্তু এমন দিন এল, যেদিন তার কাছেই তোর মামাকে ভিক্ষে চাইতে ছুটতে হয়েছিল।"

মামার নাম শুনিয়া আভা বলিল, "ভিক্ষে?"

প্রতিভা বলিল, "হাঁ, ভিক্ষে। মামা মামলা বাধিয়ে ছিলেন একটা বড় রকমের তা ত জানিস। তাতে তহবিল ভাঙ্গার অপরাধ তাঁর নামে প্রমাণ হয়ে যেতো।"

আভা বলিল, "তা হলে বলতে চাও মামাবাবু এই ছোট লোক চোরের কাজ করেছিলেন? তোমার কথা শুনতে চাই না।"

প্রতিভা তাহাকে ধরিয়া হাসিয়া বলিল, "সত্যিই মামাবাবু অপরাধ করেছিলেন—সে তোমাদেরই জন্যে। পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও তাই তোমার দাদা আমাদের কাছে কোন কথা ভাঙ্গেন নি। মামাবাবুর অপরাধ আদালতে প্রমাণও হয়ে যেতো, কেবল তোমার দাদার বন্ধু তখন মেহেরগঞ্জের হাকিম ছিলেন বলেই রক্ষে হল। এমন লোককে—"

আভা গম্ভীরভাবে নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল, এইবার বলিল, "তা তিনি এ কাজ করলেন কেন? দাদার জন্যে!"

প্রতিভা বলিল, "হাঁ, কতকটা তাই বটে, তবে তার চেয়েও আর একটা মস্ত বড় কারণও ছিল।" প্রতিভার মুখ-চক্ষু হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আভা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "কি এমন বড় কারণ? তাঁকে ত মামাবাবু অপমানই করেছিলেন।"

প্রতিভা তখনও হাসিতেছিল। সে সহসা আভার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এই রকম একখানি চাঁদপানা মুখের জন্যে, বুঝলি বাঁদরী! না, না, পালাস নি আভা, ভাব দেখি কত জন্ম তপস্যা করেছিলি যে, এমন সোনার চাঁদ ছেলে তোর স্মৃতির দুয়ারে বাঁধা রয়েছে।"

আভা লজ্জারক্ত মুখখানি স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়ার বক্ষোমধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়াছিল, তাহার নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত!

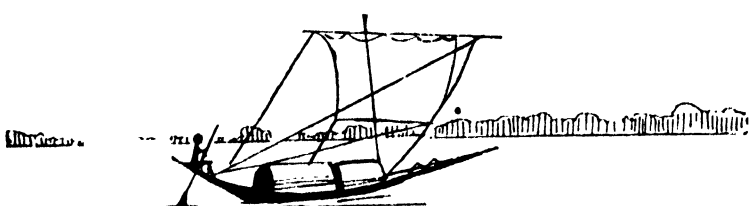
প্রতিভা সস্নেহে তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ চূর্ণ কুন্তল লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, "সত্যিই ভাই, এমন ছেলে দেখি নি কখনও। তোর দাদা কত দিন তার মত চেয়েছে তোকে সব ভেঙ্গে বলতে, কিন্তু সে বাধা দিয়ে বলেছে, না, না, ওর ভুল ভেঙ্গো না, মনে ব্যথা পাবে।"

আভা ভ্রাতৃজায়ার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিল, মাঝে মাঝে তাহার দেহ কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল।

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ হইল। আভা ত্রস্ত চকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পদ্মনেত্র জলে ভাসিতেছে।

সোপানশীর্ষ হইতেই সুরেশচন্দ্র বলিল, "নাও, গো, জঙ্গলীটাকে আজ ধরে আনলুম। আসতে চায় কি কিছুতে? এ কি আভা, কাঁদছিলি না কি?"

সুরেশের পশ্চাতে সোমেন। মুহূর্ত্তে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। সোমেন সেই আয়ত নীলোৎপল নয়নের মধ্যে আজ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল কেন?



একটি অপরাহ্ন

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

ফাল্গুনের অপরাহ্ন, কি জানি কি অজানা কারণে
মনটা প্রসন্ন নয়, গৃহ ছাড়ি গেলাম ভ্রমণে
পুরপথে। কোথা যাই, ভেবে ভেবে আগাতে আগাতে
এক-পা দুই-পা করি নগরেরে ফেলিনু পশ্চাতে।
অজানা ফুলের গন্ধ বহি আনি চপল পবন
উত্তরীয় ধরে টেনে নিয়ে গেল। কর্ম্মক্লিষ্ট মন
সহসা ব্যাকুল হয়ে মম চিন্তাকঙ্কথানি ছাড়ি
সর্ব্বত্র ছড়ায়ে প'ড়ে বেদনায় উঠিল ফুকারি।

ঘুরিনু খানিকক্ষণ নদীতটে বনের কিনারে
শেষ তপ্ত শ্বাস ছাড়ি দিনকর গেল অস্তপারে;
মাথার উপর দিয়া ডেকে গেল এক দল কাক,
শেষ হরিধ্বনি তুলি হ'লো দূরে শ্মশান-নির্বাক।
মনে হলো ব্যর্থ সব মৈত্রী-প্রীতি মিলন আরতি
অই যে ফিরিছে গৃহে নদীপথে মরাল দম্পতি
কালিকে একটি হ'বে পুর-হাটে হয়ত বিক্রীত,
সঙ্গী তার গ্রীবাপরে কণ্ঠখানি করি কুণ্ডলিত
করিবে বিলাপ শুধু। আগাইতে হেরি পথপাশে
উঠেছে একটি লতা জড়াইয়া সরল বিশ্বাসে
সরল তরুর গায়ে, দুচারিটি ফুটায়েছে ফুল,
মনে হ'লো যেন তারা রঙ্গভরা ব্যঙ্গভরা ভুল,
মনে হলো প্রত্যাসন্ন বৈশাখের ঝটিকার কথা,
কোথা র'বে তরুবর—কোথা র'বে ও আশ্রিত লতা?

পশিলাম গ্রাম-পথে। শুকাইছে মাছধরা জাল
জেলের অঙ্গন ঘেরি রচিয়াছে আধ অন্তরাল,
জেলেনী মুখের বায়ে সন্তর্পণে চুলোর আগুন
করিছে জোরালো আরো,—পাশে তার দয়িত তরুণ
চাহিয়া দেখিছে সেই তরুণীর অরুণ বদন;—
মনে মনে বলিলাম,—ওরে মূঢ়, তরুণীর মন
জাননা ত কোথা আছে? ছলে বলে মাছ ধরো জেলে,
হয়ত পলাবে বধূ মায়াজাল সব ছিঁড়ে ফেলে
শিকারী রাখ কি খোঁজ? পুর-পথে করিনু প্রবেশ;
বাজিছে সানাই ঢোল কানে প্রবেশিল তা'র রেশ।
পরিণয় মহোৎসবে স্নেহোচ্ছ্বাস উঠিছে উছলি,
মনে হলো গৃহস্থেরে অন্তরালে ডেকে শুধু বলি'
হয়ত দুদিন পরে কেটে যাবে সুখের স্বপন,
কেন এত সমারোহ, ভবিষ্যত জান না যখন।
এই মন নিয়ে আজ ফিরিলাম ভবনে আমার
শুনি শুধু হাহাকার, নিরানন্দ হেরি চারিধার।
আমি যেন পাইয়াছি নিয়তির গূঢ় গ্রন্থখানি
সমস্ত রহস্য তার লুকাইয়া সব আজি জানি।

রহস্যভেদের এই স্বপ্নাবেশ বিভীষিকাময়
আজিকে আমার চিত্ত কেন হায় করিল আশ্রয়?
আত্মা কেঁপে উঠে হেরি নিয়তির বলির তালিকা,
চাহিনা রহস্য-ভেদি এই দৃষ্টি,—ফেল যবনিকা।
এই কি প্রজ্ঞার দৃষ্টি কালাতীত? না না, তা ত নয়,
নির্বিকার অনাসক্ত কই তার প্রাজ্ঞেয় হৃদয়?
ইহা ত বৈরাগ্য নয়, অবসন্ন মনের প্রমাদ
হে বাসন্তী সন্ধ্যা, মোরে ফিরে দাও চিত্তের প্রসাদ।

হরিনাথ দে

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতবর্ষে যাঁহারা বহুভাষাবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—হরিনাথ দে মহাশয়কে তাঁহাদের শীর্ষ দেশে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। এমন কি সমগ্র বিপুলা পৃথিবীতেও তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত অধিক নাই। ভাষা শিক্ষা বোধ হয় তাঁহার একটা নেশার মত ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার যত বৎসর (৩৪) বয়স হইয়াছিল, তিনি ততগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন—বয়সের প্রত্যেক বৎসরে একটি করিয়া ভাষা! ইহা কি সামান্য ক্ষমতাব কাজ! তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গজননী যে একটি অমূল্য রত্নহারা হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

কলিকাতার অদূরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনভূমি —দক্ষিণেশ্বর। তাহার সান্নিধ্যে এঁড়িয়াদহ নামে গ্রাম। সন ১২৮৪ সালের ২৯এ শ্রাবণ (ইংরেজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট) রবিবার চব্বিশ-পরগণার এই বিখ্যাত গ্রামখানিতে হরিনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রায় ভূতনাথ দে এম এ, বি-এল বাহাদুর মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

রায়পুরেই হরিনাথের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। তিনি রায়পুরের বিদ্যালয় হইতে মধ্য প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া মাসিক পাঁচ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্বে আরও কয়েকটি পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রত্যেকটিতে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার সেণ্টজেভিয়র কলেজে হরিনাথ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে সেণ্টজেভিয়র কলেজ হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ হইতে এফ-এ পরীক্ষায় ইংরেজী ও ল্যাটিনে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া ডাফ স্কলারসিপ পাইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই উচ্চ সম্মানের সহিত বি এ পাশ করিবার পর ল্যাটিন ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। ১৮৯৭ সালে State scholarship পাইয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে হরিনাথ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করায় এবং ভাষা শিক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু গ্রীক ভাষায় উচ্চ সম্মানের সহিত এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। কেম্ব্রিজে অবস্থানকালেই তিনি Classical Triposএ First Class পান। হরিনাথ ইংল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজের, ফ্রান্সের সোরবোর্ণের, জার্ম্মাণীর মারবর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ইটালী প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া সেই সেই দেশের ভাষায় সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা সমূহে উত্তীর্ণ হন; এবং ঐ সকল দেশের অধিবাসীরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় যেরূপ লিখিতে ও পড়িতে এবং কথা বলিতে পারেন, হরিনাথও তদ্রূপ অনায়াসে অনর্গল সেই সেই ভাষায় কথা বলিতে, লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। ইয়োরোপের প্রায় সকল দেশের ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। ইংল্যাণ্ডে থাকিতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় কাব্য রচনার প্রতিযোগিতায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং স্মিথস প্রাইজ ও লর্ড চ্যান্সেলারের মেডাল পান। এই সকল কৃতিত্বের ফলে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যরূপে গৃহীত হন।

তিনি এইরূপে অনন্যসাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পর ভারত সচিব মহোদয় তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ব্বিসে গ্রহণ করেন, এবং ঢাকা কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতিকালে হরিনাথ কুড়িটি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে তখনকার

দিনে I. E. S. চাকুরী লাভ বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ১৯০১ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া ঢাকা কলেজে অধ্যাপকতা করিতে আরম্ভ করেন। স্বদেশে কলেজের অধ্যাপকতা করিতে করিতে তিনি ক্রমান্বয়ে তিন মাস, ছয় মাস বা এক বৎসর অন্তর একটির পর একটি ভাষায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে থাকেন। ১৯০৪ সালে হরিনাথ ঢাকা কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলী হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনি সংস্কৃত, আরবী ও উড়িয়া ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া যথাক্রমে ২০০০, ২০০০ ও ১০০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ সালে হরিনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়া হুগলী গমন করেন। এই বৎসরই তিনি পালি ভাষায় এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইয়োরোপে কুড়িটি এবং ভারতে চৌদ্দটি মোট ৩৪টি ভাষায় তিনি উত্তমরূপে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল থাকিবার সময় হরিনাথ আব একবার বিলাতে গিয়াছিলেন, এবং পিসেল, রীজ ডেভিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সাহচর্য্যে জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন।

হুগলী কলেজ হইতে হরিনাথ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এতদিনে যেন তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র মিলিল। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবি এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি যেন কৃতকৃতার্থ হইলেন। এখন হইতে তিনি মনের সাধে অধিকতর জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহাচীনের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার গৃহে অতিথি হন। ইতঃপূর্ব্বে অপর কোন ভারতবাসী এই সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। চীনের অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাড়ীতে থাকিতেন। কেবল চীন কেন, অন্যান্য দেশের ও জাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা, বিশেষতঃ, ভাষাবিৎ পণ্ডিতেরা কলিকাতায় আসিলে অধিকাংশ সময়ে হরিনাথের আতিথ্য স্বীকার করিতেন।

শিক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হরিনাথ যত বৃত্তি ও পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, বোধ হয় আর কেহ তত পান নাই। কথিত আছে, তাঁহার ৩৪ বৎসর ব্যাপী জীবনে প্রাপ্ত বৃত্তি ও পুরস্কারের পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।

হরিনাথ ছিলেন আজীবন ছাত্র। পাশের পর পাশ করিয়া, বহুবার এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ভাষার পর ভাষা শিক্ষা করিয়াও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা যেন কিছুতেই মিটিতে চাহিত না। এই স্পৃহার প্রধান লক্ষণ গ্রন্থ-সংগ্রহ। স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনে দেখিয়াছি, গ্রন্থ সংগ্রহে তাঁহার অতি প্রবল আগ্রহ ছিল। আর হরিনাথের জীবনেও সেইরূপ প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিতেছি। পুরাতন, মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সন্ধান পাইলেই তিনি তাহা ক্রয় করিয়া তাঁহার নিজ গৃহের গ্রন্থশালাকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর সেই সকল গ্রন্থ অখণ্ড মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি ১৭।১৮ ঘণ্টা অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। এমন কি, অধ্যয়নকালে আহার নিদ্রার কথাও তাঁহার মনে থাকিত না। এ বিষয়ে সার আইজাক নিউটনের সহিত তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে।

হরিনাথের জীবনের আর একটি বিশেষত্ব ছিল—গোপন দানশীলতা। তিনি নিজে ছিলেন শিক্ষার্থী—দরিদ্র শিক্ষার্থীদিগের প্রতি তাঁহার একটা স্বাভাবিক মমতা ও সহানুভূতি ছিল। কোন ছাত্র অর্থাভাবে শিক্ষালাভে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে জানাইলেই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাহার শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে কত দুঃস্থ ছাত্র তাঁহার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া দশজনের একজন হইয়া সমাজে মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছেন। কেবল ছাত্র কেন, কন্যাদায় ও অপর দায়গ্রস্ত ব্যক্তিরাও তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত থাকিত না। কিন্তু এই সকল দান এত গোপনে সম্পাদিত হইত যে লোকে তাহা জানিতে পারিত না। দক্ষিণ হস্তে দান করিবার সময় বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে,—তাঁহার দানের ইহাই ছিল রীতি। তাঁহার দানশীলতা বৃত্তি এত অধিক ছিল যে, হাতে টাকা না থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় হরিনাথ ঋণ করিয়াও দান করিতেন।

মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় দেশ ও জাতিকে তিনি বেশী কিছু দিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার এই স্বল্প জীবনকাল কেবল তাঁহার নিজের জন্য জ্ঞান-রত্ন আহরণেই কাটিয়া গিয়াছিল। হরিনাথের জ্ঞান-ভাণ্ডার এতই সমৃদ্ধ ছিল যে, শুনা যায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের পার্সিভাল সাহেব একদা বলিয়াছিলেন, "As regards Latin and French I have to learn many things from Harinath. তিনি পালগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজারীর চতুর্থ খণ্ডের একখানি উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বসওয়েলের জনসন-জীবনীরও একখানি টীকা তাঁহার আছে। শকুন্তলার কিয়দংশের তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। গদ্য রচনা অপেক্ষা ইংরেজী কবিতা রচনায় তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। তাঁহার রচিত ও অনূদিত বহু ইংরেজী কবিতা সমসাময়িক মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইত। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তিব্বতী ভাষায় রচিত নাগার্জ্জুনীয়ম্ এবং চীন ভাষায় রচিত তাঞ্জোর নামক অতি প্রাচীন ও বহুমূল্য পুঁথির অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সন ১৩১৮ সালের ১৪ই ভাদ্র (ইংরেজী ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট) টাইফয়েড জ্বরে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে হরিনাথের মৃত্যু হয়।

অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা বহুভাষাবিৎ বলিয়াই হরিনাথ সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, এই ভাষা শিক্ষানুরাগ তাঁহার জননীর নিকট হইতে লব্ধ। কারণ শুনা যায়, হরিনাথের জননীও বিদুষী মহিলা, এবং তিনি বাঙ্গলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, আরবী ও হিন্দী এই পাঁচটি ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন। এই মহিলা উপযুক্ত পুত্র-বিয়োগ-শোকে মৃতকল্পা অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছেন। হরিনাথের পুত্র শ্রীমান প্রাণধন দে কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট।

ঝড়ো হাওয়া

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

বৈদ্য বলতে বলভদ্রেরা এক ঘর। সেই জন্য এ গাঁয়ে যে বৈদ্য আছে লোকের তা ভুলই হোয়ে পড়ে সব সময়।

বাড়ীটার যে সত্যিকার অধিকারী সে একদিন ভিটে-মাটি সব তার দূর সম্পর্কীয় এই আত্মীয়ের নামে লিখে দিয়ে সরে পোড়েছে। সেই হিসাবে বলভদ্রকে বাড়ীর মালিক বলতে হয়।

ওখানা সেকেলে দালান-বাড়ী, কবুতরের খাঁচার মত ছোট ছোট ঘর, বাতাস পাবে না, আলো তো নয়ই। ওর দেয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে দু-একটা পুঁচ্‌কে পুঁচ্‌কে জানালা আছে, সেখানে চড়ুই পাখীরা বাসা বেঁধেছে। চারদিকে দেয়ালের খসা চূণ বালির গাদি—বাড়ীতে নোনা ধোরেছে, ইটগুলো সব বেরোনো বেরোনো।

বলভদ্র হোমিও ডাক্তার।

যা দিনকাল চোলেছে, ডাক জুটবে কোত্থেকে। আসলে যে লোকের ঘরে পয়সা নেই সে কথা কে শোনে। লোকে বলবে, চিকিৎসা বোঝেনা তার ডাক জুটবে না ছাই জুটবে। অবশ্য লোককে এ কথা জানতে দেওয়া হয়না। সকাল বেলা উঠে তিনশ ৬৫ দিন এই যে সেজে-গুজে বিষ্ণুপুর, গোয়াল-বাথান, দীঘিপাড়া হোয়ে ঘেমে-ঘুমে গ্রামে ঢোকা হয়, তারও তো একটা দাম আছে।

লোকে হয়ত জিজ্ঞাসা করে: কোথা গেছলেন ডাক্তারবাবু।

আর বোলোনা ভায়া, ঐ বিষ্ণুপুরে একটা ডাক জুটেছিল, দীঘিপাড়াতেও আর একটা। এক্ষুনি আবার ছুটতে হবে মহামায়ায়। এ হাড়ে আর কাঁহাতক এত পারা যায় বল দিকি। হ্যাঁ, শুনছি না-কি সতের মেয়ের অসুখ হোয়েছে। তা ঘরের পাশে আছি, না হয় ডেকে একটু বল। আচ্ছা আমি,—ঐ মহামায়ার রুগীটা আবার—

কাজেই বাইরের লোকের বোঝবার জোটি নেই যে অবস্থা কোন্ ভাবে চোলেছে। কিন্তু তাতে কি? বিধির নির্বন্ধের ৳ অংশ গৃহে বর্ত্তমান, অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ এই তিনটির একটি,—মানে স্বয়ং স্ত্রী গৃহে আসীন। সুতরাং

সেদিক থেকে, ঐ রকম আসে,—চিকিৎসা বোঝেনা তার ইত্যাদি।

বলভদ্র এসে বারান্দায় ওঠে। বলে : পাখাখানা কৈ? ওগো, পাখাখানা কৈ?

রাজলক্ষ্মী ওর বৌর নাম। ছেলেকে ঠেলা দিয়ে বলে : যা রে ঝান্নু, পাখাখানা দিয়ে আয়।

বলভদ্র পাঞ্জাবীটা খুলে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসে হাওয়া খাচ্ছিল।

ঝান্নু বাবার পিঠ জড়িয়ে ধরে।

আঃ, বিরক্ত করিসনে, ওর বাবা বলে। তারপর তখনই আবার আহ্লাদ করে : আয়, কোলে এসে বোস্।

রাজলক্ষ্মী ওঘর থেকে হাঁকে : তা হোলে কি রাঁধবো বলো, ঘরে কিন্তু ঐ এক কলা ছাড়া আর কিছু নেই।

—বাঃ, চুপ করে আছ যে।

বলভদ্র চোখ রাঙ্গিয়ে ওঠে : তার আমি কি জানি, এলাম সাত ক্রোশ পথ মেরে—সবই আমি বোলবো।

ছোটছেলে মান্নু। তাকে একটা ঠেলা দিয়ে রাজলক্ষ্মী তাড়া দেয় : সরে যা না, ফেচাং জুটেছে এক।

তারপর গঁ গঁ কোরে নিজের মনেই বলে : থুচ্ছি কলার ঝোল কোরে, যে যত পারে গিলুক। কপালের ভোগ।

এমনি সময় ওপাড়া থেকে একটা ডাক এসে জুটলো। বলভদ্র পাঞ্জাবীটা গায়ে দিতে দিতে বলে : কি বলছিলে তখন, রান্নার নেই বুঝি কিছু? হুঁঃ, আগে বলতে পারনা। কি আনবো তা হোলে? ডাল আর—হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিম আনলে হয়না, বেশ হবে'খন কিন্তু।

রাজলক্ষ্মী পিছু পিছু এসে বলে : খানিকটা সোডা এনো, কাপড় চোপড়ের যা চেহারা দাঁড়িয়েছে।

বলভদ্র বেরিয়ে গেল।

রান্নার কাঠ ফুরিয়ে গেছে, রাজলক্ষ্মী দুখানা বাঁশ টেনে আনে। সত্যি, লোকটা সেই আর এই ছোটাছুটি কোরে বেড়াচ্ছে, তাকে আর এ সময় কাঠ কাটতে বলা চলেনা।

তার এই ২৪ বৎসর বয়সে রাজলক্ষ্মী সংসারের অনেক কিছু শিখলো। যেদিন সে বধূরূপে এ ঘরে প্রথম এসেছিলো সেদিন যেমন এ সংসার ছিল লোকহীন, আজিও তাই। তাকে কাঠ কাটার মত খুঁটি নাটি কাজ কোরতে হয়ই।

বলভদ্র খানিক পরে বাড়ীতে এল, ওর মুখে কথা নেই।

রাজলক্ষ্মী কাছে এসে বলে : ডিম পাওয়া গেল—কৈ সোডা আননি?

নাৎ তেরিকা, এরা দেখছি জ্বালালে আমায়! বলি আনবো কি আমার মুণ্ড দিয়ে?

কথাটা বোলে বলভদ্র স্ত্রীর মুখের দিকে চোখ রাঙ্গিয়ে চায়। তারপর একটা ঢোঁক গিলে আবার বলে : যত সব ছোটলোকের কাণ্ড কি-না, নইলে ভিজিটের টাকা আবার বাকি চলে না-কি। বলে রোগটা সেরে গেলেই সব শোধ কোরবে। আসলে জাতে তো ওই তার আর কত হবে শুনি। আবার বলে—শীগ্‌গির কোরে সেরে দেন ডাক্তার বাবু,—এ যেন ডাক্তারবাবুর বাবার ঘরের কথা, সেরে দিলেই হোলো।

রাজলক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পা বাড়ায় : ওরা চায় এখন বিনি পয়সায় ওষুধ দাও, রুগী দেখো; কিন্তু তা আমরা পারবো কেন। দিলে না কেন কড়া কথা শুনিয়ে তুমি, ঐ তোমার আবার ন্যাকামি সব সময়। অত কি ওদের সাথে।

বোলে বারান্দায় এসে খ্যাচ্ খ্যাচিয়ে কলা কুটতে বসে। বলে : তা হোলে এরই ঝোল রাখছি কোরে, মান্নুর মুখে যা উঠবে সে তো বোঝা যাচ্ছে এখনই, ওকে যে কি খেতে দোবো।

বলভদ্র উঠে দাঁড়ায় : আচ্ছা দেখি, ঠেলাজালিখানা নিয়ে নদীতে যাই, যদি কিছু মেলে।

চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে : এলাম ঘুরে কানাই ওঝার ওখান থেকে। সেদিন টাকার কথা বলার পর থেকে ব্যাটার আর টিক্‌রের খোঁজ নেই, ভাবলাম বুঝিবা বৌটা ভাল হোয়ে গেছে। ভগায়—ব্যাটা মতি ডাক্তারের কাছে গেছে। শালাদের কাছে টাকা চাওয়ার জো নেই, অমনি যাবে অন্যের কাছে। সব পেয়েছে সুবিধা মন্দ নয় কিন্তু।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলো।

নদীটা মজে গেছে, কচুরিপানা আর কাদায় ভরা। তার জায়গায় জায়গায় প্রায় শুকিয়ে উঠেছে। মাটির থাল গেঁথে গেঁথে পথ বানান, তার ওপর দিয়ে সব এপার ওপার করে।

ওর মধ্যে ঠেলাঠেলি কোরে কুচো কুচো চিংড়ি পাওয়া যায়, শামুক ওঠে। শামুকগুলো ফেলে দিতে হয়। শুধু চিংড়ি মাছ।

বলভদ্র বলে : চচ্ছড়ি কেন, টাটকা টাটকা আছে, খাসা ঝোল হোতে পারে। তাই কোরো।

সত্যি খাসা ঝোল হয়, ঝান্নু অনেকখানি ভাত খেয়ে ফেল্লো, মান্নুও, ওদের বাবাও। কতদিন পরে পেটে মাছ পোড়লো, ওদের অরুচি ভাঙ্গলো এবার।

বলভদ্র বলে : মান্নুকে আর দুটো দাও—না, না, আমাকে আবার কেন—থাক থাক, তোমার জন্য রেখো কিন্তু। কি মজা হোয়েছে জান,—

তারপর মুখ ঘুরিয়ে হামিদকে দেখে বলে : কিরে কি কাজে এসেছিস এই সময় ?

কথাটা শেষ হোতেই তার মনে পড়ে যে হামিদ তার কাছে কিছু পাবে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অর্থ-হীনতার কথা মনে হোতেই বলভদ্র লজ্জায় বেকুব হোয়ে পড়ে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজকে চাঙ্গা কোরে নিয়ে এমনি গাঁ গাঁ কোরে চীৎকার কোরে ওঠে, যেন কি একটা মারাত্মক ব্যাপার চোলছে।

হামিদ তার কথাটা আরম্ভ কোরতে পারেনা। আরে ধূর, এটা কি ও-কথা বলার সময়, পাঁচটা কথাতে এখন রাগারাগি হোচ্ছে। সে চোলে গেল।

আসলে ও রাগ নয়, হামিদকে তাড়ানর একটা প্রচেষ্টা মাত্র। সুতরাং এ চেঁচামেচিতে মনের কিছু পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবুও বলভদ্রের মুখে মাছ বেজায় রকমের বিস্বাদ হোয়ে পড়ে।

রাজলক্ষ্মী বলভদ্রের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। প্রথম পক্ষের শ্বশুরবাড়ী কাছাড় পাড়ায়। সে বৌ মরার পর থেকে বলভদ্র ওদের সংস্রব এড়িয়ে চলে চিরকাল। কিন্তু তারা একটা পুরাতন স্মৃতি মনে কোরে এখনও সেই ভাঙ্গা সম্বন্ধটাকে জোড়া তালি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। তাদের সংসারের অবস্থা ভাল নয়, সেই জন্য বিশেষ কিছু দিতে থুতে পারেনা। কিন্তু তাই বোলে সম্বন্ধটাকেও তো ছাড়া চলে না।

হয়ত আশিস নিয়ে দু একখানা চিঠি এলো, হয়ত বলভদ্রকে একবার যেতে বলা হয়। হয়ত বা ওর শ্যালক মহেশ নিজেই দেখা কোরতে আসে।

মহেশের বিয়েতে বলভদ্রদের নিতে এসেছিল।

বলভদ্র নিজে যেতে পারেনি, বৌ গেছলো, ছেলেদুটো গেছলো, আর বলভদ্রের পিসীশাশুড়ী কিছুদিন থেকে এখানে আছেন।

আজ ওরা ফিরে এসেছে। গল্প হচ্ছিল।

বলভদ্রের পিসীশাশুড়ীর গলা : ও বিয়ে না ছাই, ৪৫ টাকা দিয়ে একটা—

জামাই-এর দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ঘোমটা টেনে দেন, তারপর বাকিটুকু শেষ করেন—

মাগী কিনে আনা। ওকে আবার বিয়ে বলে কে ? আর হ্যাঁ, মহেশ সেনের বৌ—বিনোদপুরের মহেশ সেন, তার বৌ গেছলো ঐ বিয়েতে। সে একেবারে আমার হাত জড়িয়ে ধোরলো, কিছুতেই ছাড়বে না, আমার সতীশের সঙ্গে ওর নাতনীর বিয়ে দিতে চায়। তা আমি বাপু মত দিয়ে এসেছি।

বলভদ্র বলে : মেয়ের বাবা কি করেন ?

উকিল, ভারি বড় উকিল গো। আর তা ছাড়া মেয়েটার সবই ভাল, খালি—তা হোক, রং-এ কি আসে যায়, কালোতেই আমার ঘর আলো করুক।

সতীশ রাজলক্ষ্মীর দাদা। কোথায় ৪ টাকা মাইনার কাজ করে। যা এদের সংসারের হাল, তাতে যার একটু কিছু আছে সে আর এ ঘরে মেয়ে দেবে না। সেই কথাটা বলভদ্র বুঝিয়ে বলে। বলে : উকিল মেয়ে দেবে আমাদের ঘরে ? তা হোলে বোধহয় সে রকম আয়টায়—

বুড়ীর ঝোলা চামড়া কুঁচিয়ে ওঠে, পিট্ পিট্ কোরে তাকায়। তারপর মাথাটা এক ঝাঁকি দিয়ে ঘুরিয়ে এনে মুখ ঝাড়ে : তোমার বাপু সব তাতেই ঐ এক কথা, সাধে কি তোমার সাথে বনেনা আমার। যা দেখতে পারিনে—

বলভদ্র চালাক ছেলের মত সরে পড়ে। তাই আর তাকে কিছু শুনতে হোলো না।

বোসগিন্নি ছিল ওদিকে বোসে, পিসী তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায় : শুনলে তো বাপু জামাই-এর কথা, সাধে কি অমন জামাই-এর মুখ দর্শন করতে—আমার সতীশের মত ছেলে হয় না, আর তাকে কি-না বলে—হুঁঃ। সতীশ আমার জানেনা হেন কাজ নেই, ডালা তৈরী করতে জানে, জাল বুনতে জানে, ঘর পর্য্যন্ত ছেতে জানে। বিষ্ণু কি বলে জানো, বিষ্ণু বলে—

বোসগিন্নি এ সব কথা আবার ভাল বোঝেনা। তবুও কথার উত্তর দু একটা তো দেওয়া দরকার। তাই বলে : আহা খাসা ছেলে, পাঁচজনের আশীর্ব্বাদ বেঁচে-বত্তে থাক—

সেই কথা তোমরা বল বাছা, ছেলে আমার তোমাদের আশীর্ব্বাদে—অমন ছেলেটি পাবে না আর। লেখাপড়া যা জানে ওতেই কত বি-এ, এম-এ পারেনা বলে। দেখো ওর কপালে সুখ আছেই, এ তোমরা দেখে নিও। সেবার এক গণক ওর হাত দেখে বোলেছিল কি-না—ওর কপালে সুখ আছে সে বোলেছিল। আর হ্যাঁ, ঐ বিয়ের কথাটা, এ বিয়ে হবেই, নিশ্চয় হবে আমি বলছি।

বোসগিন্নি হাই তুলে উঠে দাঁড়ায়, পা বাড়াতে বাড়াতে বলে : তারা কি বলে ?

বোলবে কি গো—তারা তো সাধছে। আমার হাত ধোরে মহেশ সেনের বৌ—শোনোনি বুঝি সে কথা—সে কি কাকুতি-মিনতি। তা আমাদেরও তো চেষ্টা করা উচিত। হাজার হোক বড়লোক তো তারা, আমাদের ঘরে মেয়ে দিতে চাইবে কেন। সাধে কি জামাই-এর ওপর রাগ হয় বাছা, কোথায় একটু চেষ্টা চরিত্তির কোরবে, তা নয় শুধু নিন্দে।

রাজলক্ষ্মী এতক্ষণ চুপ কোরে বোসে ছিল। এবার ওদিক থেকে বোলে ওঠে : কেন মিছিমিছি তুমি অত বক পিসীমা। খুঁটির গায় হরিনামের মালা রোয়েছে—বরং হরিনাম করগে, পরলোকের কাজ হোক। শুধুশুধি সব বাজে কথা!

বুড়ী হাঁক ছাড়ে : কি বল্লি লা, তোর বাড়ীতে এসেছি বোলে তুই এত বড় কথা বল্লি। এ কি কেনা বাঁদি পেয়েছিস,—মুখ যে ছেড়ে দিয়েছিস বড়। যাচ্ছি লো, যাচ্ছি এখনি চোলে। তোর ঘরে আর নয়। আসুক জামাই, দিক গাড়ী ঠিক কোরে।

আজ রাজলক্ষ্মীর মাথা ঠিক ছিলনা। সংসারের নিত্যি অভাব, তার ওপর এসব খিচ্‌খিচ্ আর কত সহ্য হয়। চিরুণীর অভাবে কতদিন মাথা আঁচ্‌ড়ান হয়নি, জট ধোরে গেছে। আজ ঐ জট নিয়ে কি হাঙ্গামই না হোলো। তার ওপর পিসীর অত সব বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগেনা।

বলভদ্র ওদিকে খাবাচি কাটছিল, রাজলক্ষ্মী কাছে যেয়ে দাঁড়ায়। বলে : পিসীমাকে তাহোলে পাঠিয়ে দাওগে। কেন ওসব মিছিমিছি হাঙ্গাম পোয়ান।

বোলে বলভদ্রের মুখের পানে একটুখানি চেয়ে নিয়ে চোখ নামায়। এতক্ষণ ওর মন ছিল পিসীমাকে পাঠানর যুক্তিতর্কে অভিভূত হোয়ে,—অন্য কোন চিন্তার সময় ছিল-না এতক্ষণ। কিন্তু কথাটা শেষ কোরেই রাজলক্ষ্মীর কি রকম লজ্জা কোরে ওঠে। ছিঃ, হাজার হোক পিসীমা, পর তো নয়।

কিন্তু যা বলা হোয়েছে তাকে প্রত্যাহার করা চলেনা। তাই আর একটু ঠেস দিয়ে বলে : কি বোলছো তা হোলে।

বলভদ্র মুখ না তুলেই বলে : বনিবনাও হোলোনা বুঝি। দাও তা হোলে পাঠিয়ে, এর আর কি বোলবো।

সেই কথাই তো হোচ্ছে, গাড়ি একখানা দেখতে হবে না ?

হুঁ।

কিছুটা সময় নিস্তব্ধে কাটে। রাজলক্ষ্মী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু গাড়ি আনা না আনা সম্বন্ধে কোন ভাব সে বুঝতে পারেনা। তাই কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে : কি বোলছো, জিনিষপত্তর গুছিয়ে দোবোগে ? তা হোলে যাই দেখি—

আরে না না, আরও কিছুদিন যাক না—আসলে হাতে বিশেষ কিছু—বুঝলে না ?

রাজলক্ষ্মী চেঁচিয়ে ওঠে : হাতে আবার কোন্ কালে থাকে শুনি। ও তো তোমার লেগেই আছে চিরকাল, তাই বোলো সংসার কি বন্ধ হোয়ে থাকবে ?

বোলে সে চোখ রাঙ্গিয়ে চোলে যায়।

বলভদ্র উঠে দাঁড়ায়। আরে ধুৎ কচু, এ খচ্‌খচানি ঘোড়ার ডিম ভাল লাগেনা আর। হ্যাঁ, ঐ বারুইদের কাছে কিছু পাওয়া যাবে, একবার দেখে এলে হয়। ব্যাটারা ওষুধ খেলে, রুগী দেখালে—দেওয়ার নামে ঢন্‌ঢন্।

বারুইবাড়ীর সম্মুখে আসতেই বলভদ্র বাড়ীর ভেতরকার কথা শুনতে পায় :

এই ভাদি, দেখ তো ঘড়াতে মুড়িটুড়ি দুটো আছে কি-না। সেই বেরিয়েছে কোন সকালে, চাল আনতে পারে উনুন জলবে, নয় তো ঐ পর্য্যন্ত। কি কপাল

নিয়েই যে এসেছি—মরণ হোলেই বাঁচি। ছোঁড়াটা কেঁদেই যে মোলো।

বলভদ্র থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে একটুখানি ভাবে। তারপর সোজা গড়গড়িয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে।

বারুইগিন্নি বারান্দায় বোসে,—ওর নোংরা ছেঁড়া কাপড়খানা আলগাভাবে গায়েব ওপর পোড়ে আছে, চুল উসখুসে। ছোট ছেলেটা ওর গলা জড়িয়ে ধোরে কাঁদছে, কিছু খেতে চায়।

বলভদ্র এক-নজর ওদের দিকে চেয়ে নিয়ে বলে : মহেশ কোথায়? ওগো শুনছো, মহেশ কৈ? কি যে লোক সব, সেই কবে খেয়েছ ওষুধ, তা টাকা দেওয়ার—

বারুইবৌর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতেই বলভদ্র কাঠ হোয়ে ওঠে। ও কি, বৌটা কি পাগল হোয়েছে না-কি?

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ নিশ্চল হোয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে।

আশ্বিনে চারদিক থেকে রোগ কিলবিল কোরে ওঠে। বলভদ্রের সময় নেই। এখন আর ঘুম থেকে উঠেই নিরর্থক বিষ্ণুপুর, গোয়ালবাথান, দীঘিপাড়া ছোটাছুটি কোরে মরতে হয়না, এখন প্রচুর ডাক এবং প্রচুর অর্থ। পায়ে হেঁটে সে কতই বা সামলাবে। এবার একখানা বাইসিকল কিনতে হবে। পায়ে হেঁটে কি ডাক্তারী পোষায় বাপু, হাজার হোক ভদ্রলোক তো। নাঃ, পরের জঞ্জাল পো[illegible]তে পোয়াতে দিন গেল দেখছি।

খাওয়া-দাওয়ার সময়ই হোয়ে ওঠেনা, একটা, দুটো, কোন কোন দিন তিনটেও হয়। তারপর উঠেই আবার ছুটতে হবে।

রাজলক্ষ্মী এবার চুড়ি গড়বে, না হয় ত হার। ওর বাইসিকল একখানা কিনতে হবে, কাপড় পাঞ্জাবী, ছেলে-দুটোর আর তার কাপড়-চোপড় কতকগুলো। আর যদি টাকা কম পড়ে, না হয় গয়না এখন না হবে, এর পর আস্তে আস্তে যা হয় দেখা যাবে।

কিন্তু বলভদ্রকে এসব জঞ্জাল আর পোয়াতে হোলো-না, হঠাৎ নিজেই একদিন শয্যা নিলো। তারপর দুমাস পরে যে দিন তার অন্নপথ্য হোলো, সেই দিনই সে অন্ন চিন্তায় চমৎকার হোয়ে ওঠে। জমান টাকা রোগের সেবায় শেষ হোয়েছে। আস্তে আস্তে বেশ শীত পোড়ে উঠলো, এবার বিধিদত্ত ঢাকনিতে আর চলবেনা। ভাগ্যি ভাল যে ঘরে কতকগুলো পুরোনো কাঁথা ছিল, তাই রক্ষা। এদিকে শরীর দুর্ব্বল, চলাফেরা করা চলেনা। কিন্তু ঘরে অর্থ নাই, খাদ্য নাই, সুতরাং সেদিকে নজর দিতে হয়।

বলভদ্র বাইরে যায়। দেনাদারদের সঙ্গে দেখা হলে ডেকে একটু তাড়া দেয়, হয়ত বা একটু কাকুতি মিনতি করে।

কিন্তু এতে দিন চলেনা। তাই টুক্‌টাক্ কোরে হেঁটে এবাড়ী-ওবাড়ী কোরতে হয়। হয়ত এক কাঠা মটর মেলে কিম্বা দুচার আনা পয়সা। ওতেই আর কিছু দিন চোলবে।

ক্রমে শরীর সুস্থ হোয়ে উঠলো, আবার সেই একঘেয়েমি —নেই নেই।

বলভদ্র দেখেশুনে শেষকালে একটা দোকান কোরলো। সরষের তেল, নারকেল তেল, কেরাসিন, লবণ, জিরে মরিচ সব থাকে।

যা দিন কাল চোলেছে, আর উপায় কি, ডাক্তারীতে কি ছাই আর কিছু আছে।

তা বিক্রি হোচ্ছে মন্দ নয়। গেরস্ত ঘরের লোক সব, ছেলেপুলে নিয়ে বাস কোরতে হয়—কোন্ না ভালমন্দ আছে? তাই ডাক্তারকে সন্তুষ্ট রাখতে হয় সবাইকে। বিশেষত কিনতে যখন হবেই, ডাক্তারের ওখান থেকে কেনাই ভাল।

লোকে বলভদ্রের দোকানের সম্মুখে ভিড় কোরে দাঁড়ায়।

লবণ এক সের দেবেন।

আমাকে সরষের তেল এক পোয়া—এই দাঁড়াও না বাপু অত ঠেলাঠেলির কি দরকার আছে।

দেশলাই আছে দেশলাই?···এক পয়সার।

···হ্যাঁ, কেরাসিন আধ সের।

ধুৎ কচু, সব মেছোহাটা লাগাও কেন?—ওহে ডাক্তার, আমাবে··-

এই মতে পয়সা দি.এনে···বাঃ, দুদিনের বাকি রোয়েছে —তোরা কি পেয়েছিস বলতো। এসব চোলবে না তা বোলে রাখছি আগে থেকেই, হুঁ।

খুব বিক্রি চোলছে, বলভদ্র মেতে উঠেছে। এই রকম না হোলে কাজ। ঐ ডাক্তারী—ছোঃ। দেবো ছেড়ে ওসব, শুধুশুধু এক হাঙ্গাম পোয়ান।

দোকানটা যদি টিকে যায় তাহোলে তো হয়ই। ভগবান যদি করেন—হ্যাঁ, ঐ নিত্য সা'র কাছ থেকে ব্যবসার মারপেঁচগুলো একটু শিখে নিতে হবে। এসব কাজে একটু অভিজ্ঞতাও দরকার কি-না।

তবে ধারটা একটু বেশী চোলেছে, এই যা। তা চলুক, নিত্য সা' তো বোলেছে ওসব হবেই। গিন্নিটার সব তাতে বাধা দেওয়া অভ্যাস। নইলে অতবড় ব্যবসায়ী—সে বুঝি এ সব বোঝেনা। আসলে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কি-না।

বলভদ্র রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে: কি নিবিরে ছোঁড়া বল··· জিরে?—এই যে পোদ্দার মশায় যে, আসুন আসুন; তারপর কি মনে কোরে?

বলভদ্র মোড়াটা এগিয়ে দেয়।

পোদ্দার বোসতে বোসতে বলে: এই ঘুরতে ঘুরতে এক পাক এলাম। তারপর হিসাবটাও দেখা হয়নি কতদিন, বাবু বল্লেন একটু ঘুরে আসতে।

বেশ বেশ।—এই ছোঁড়া কতটুকু জিরে বলনা ঝট্ কোরে বাপু।

পোদ্দারের বাবু ব্যবসায়ী লোক, বলভদ্র তার কাছ থেকে পাইকারী দরে জিনিষ কেনে।

জিরেটা দেওয়া হোলে বলভদ্র ঘুরে বলে: কি গরম পোড়েছে দেখছেন। যেন একেবারে—

থেমে বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: এই ঝান্নু, পাখাখানা আন দেখি শীগ্‌গির।

পোদ্দার খাতাখানা খুলতে খুলতে বলে: আমাকে আবার দীঘিপাড়ায় যেতে হবে কি-না—

ও, আচ্ছা, দেখি কি রকম হোলো। বোলে বলভদ্র ওর হাত থেকে খাতা নেয়। ৫২ টাকার মাল নেওয়া হোয়েছে, জমা হোয়েছে ১০ টাকা ৮ আনা। বলভদ্রের ভ্রূ কুঁচিয়ে আসে।

পোদ্দার বলে: বড্ড বেড়ে যাচ্ছে কি-না, বাবু আবার গণ্ডগোল কচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়ে দেবেন, বেশী দিন ফেলে রাখা চলেনা তো। আমি তবুও যাহোক বাবুকে বোলে—তা তিনি আবার—

ও আচ্ছা, এই দিই শোধ কোরে। মাধববাবুকে বলবেন দু এক দিনের মধ্যেই—

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। ঝান্নু পাখা এনেছে, সেখানা ওর হাত থেকে নিয়ে বলভদ্র পোদ্দারের দিকে এগিয়ে ধরে: তা হোলে বোসবেননা, একটু জিরিয়ে—

আমাকে আবার দীঘিপাড়ায় যেতে হচ্ছে কি-না। ওদিকে বেলাও বেড়ে চোল্লো।

পোদ্দার পা বাড়ায়: তাহোলে আচ্ছা, নমস্কার।

নমস্কার। মাধব বাবুকে বোলবেন, দু এক দিনের ভেতর—

বলভদ্র দিনরাত ছোটাছুটি করে, কিন্তু পয়সা আদায় হোয়ে ওঠেনা। শুনতে হয়—

দুদিন পরে আসবেন···আজ্ঞে, এই ধানগুলো বিক্রি কোরে···বলছি তো আর কদিন পরে এসো···দেখ দেখ, পাঁচজনের কাছে দেখ একটু···

ঘরে যে পাঁচ টাকা ছিল তাই, আর আদায়ের দু টাকা পাঁচ পয়সা, মোট সাত টাকা পাঁচ পয়সা সে জমা দিয়ে এসেছে। কিন্তু তারা তা শুনবে কেন, তারা আর মাল দেবে না বোলেছে। সত্যিই তো আরম্ভ না দিতেই তারা আর কত ধার দেবে।

বলভদ্রের রঙ্গিন স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। বাড়ী-বাড়ী ঘুরে সে মিথ্যে পা ব্যথা করে, খামাকা মাথা গরম কোরে ঘরে আসে।

দেখি দাও, মাধববাবু নাকি নালিশ কোরবে, ওদের ওখানে একবার যেতে হয়। তারপর এসে আবার পাঠশালাটা খোলার চেষ্টা দেখতে হবে, গাঁয়ের ছোঁড়ারা যদি আসে, বোলে দেখি একবার। বোলে বলভদ্র চাদরটা দেওয়ার ইঙ্গিত কোরে হাত বাড়ায়।

বেদে বিজ্ঞানের কথা

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

চন্দ্র

(১) সূর্য্যের রশ্মিতেই চন্দ্র আলোকিত হয়।

সামবেদ সংহিতা—ঐন্দ্রপর্ব্ব—২য় অধ্যায়—৪র্থী দশতি।

অত্রা হ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।

ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে। ৩ (ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৫)

অন্বয় :—অত্র হ চন্দ্রমসঃ গৃহে ত্বষ্টুঃ—অপীচ্যং গোঃ নাম—ইত্থা অমন্বত।

অন্বার্থ :—অত্রহ—এই ; চন্দ্রমসঃ গৃহে—চন্দ্রমণ্ডলে—(যে স্নিগ্ধরশ্মি উপলব্ধি হইতেছে)

ত্বষ্টুঃ = সূর্য্যদেবের

অপীচ্যং = রাত্রিকালে অন্তর্হিত স্বকীয়

গোঃ নাম = কিরণরূপ তেজ বলিয়াই

ইত্থা = এই প্রকারে

অমন্বত = তোমরা জ্ঞাত হও।

বঙ্গানুবাদ—এই চন্দ্রমণ্ডলে যে স্নিগ্ধরশ্মি উপলব্ধি হইতেছে তাহাকে সূর্য্যদেবের রাত্রিকালে অন্তর্হিত স্বকীয় কিরণরূপ তেজ বলিয়াই (হে মনুষ্যগণ) এই প্রকারে তোমরা জ্ঞাত হও।

অর্থাৎ—সূর্য্যরশ্মিই চন্দ্রমাতে প্রতিফলিত হইলে চন্দ্রের জ্যোতিঃ জ্যোৎস্না রূপে প্রকাশিত হয়। এবং অমাবস্যা রাত্রে চন্দ্র সূর্য্যে প্রবেশ করে।

আবার উক্ত সামবেদ সংহিতায় পবমান পর্ব্বে ৫ অধ্যায়। ৩য়া দশতি।

উপোষু জাত মপ্তুরং গোভির্ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্।

ইন্দুং দেবা অয়াসিষুঃ।১

অন্বয় :—দেবাঃ সুজাতং অপ্তুরং ভঙ্গম্ পরিষ্কৃতম্ ইন্দুং গোভিঃ অয়াসিষুঃ।

অন্বার্থ :—দেবাঃ = দিব্যগুণ সম্পন্ন সূর্য্যকিরণ সমূহ

সুজাতং = সাধুজন্মা

অপ্তুরং = তরঙ্গমালা আলোড়নকারী

ভঙ্গম্ = অশুভনাশক

পরিষ্কৃতং = শোধিত নির্ম্মল, স্বচ্ছ

ইন্দুং = চন্দ্রকে

গোভিঃ—স্বীয় কিরণদ্বারা

অয়াসিষু = আশ্রয় করে।

বঙ্গানুবাদ :—দিব্যগুণ সম্পন্ন সূর্য্যকিরণ সমূহ সাধুজন্মা তরঙ্গ আলোড়নকারী অশুভ নাশক নির্ম্মল স্বচ্ছ চন্দ্রকে স্বীয় কিরণদ্বারা আশ্রয় করে। অর্থাৎ সূর্য্যকিরণেই চন্দ্রদের প্রকাশিত হল।

অন্যত্র—

অস্মভ্যং ত্বা বসুবিদমভিবাণীরনূষত।

গোভিষ্টে বর্ণমভি বাসয়ামসি। ১০।

৫ অধ্যায়। ১০ম দশতি।

হে সুধাকর চন্দ্র (অস্মভ্যম্) আমাদের হিতার্থ (বসুবিদং ত্বা) অন্নাদি ধনদাতা তোমাকে বর্ণনা করিতে (বাণীঃ) আমাদের বাক্য সকল যেন (অভ্যনূষত) স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতেছে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে (গোভিঃ) সূর্য্য কিরণ দ্বারাই (তে বর্ণং) তোমার বর্ণ (অভিবাসয়ামসি) সুরঞ্জিত রহিয়াছে।

ঋগ্বেদেও আছে—

স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যততং তুং

তন্বানস্ত্রিবৃতং যথাবিদে। ৯।৮৬।৩২

এই সোমদেব যেন সূর্য্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন—আমার বোধ হয় ইনি ত্রিগুণ সূত্র টানিতেছেন। (ইত্যাদি)।

জোয়ার ভাটা

সামবেদ—পবমান পর্ব্ব—৫ম অধ্যায়—২রা দশতি

প্র সোমাসো বিপশ্চিতোঽপো নয়ন্ত ঊর্ম্ময়ঃ

বনানি মহিষা ইব।২

অন্বয়:—বিপশ্চিতঃ সোমাসঃ বনানি মহিষাঃ ইব অপঃ ঊর্ম্ময়ঃ প্রণয়ন্ত।

অন্বার্থঃ—বিপশ্চিতঃ = বিচক্ষণ

সোমাসঃ = চন্দ্রমণ্ডল

বনানি = সমস্ত বনে

মহিষাঃ ইব = মহিষাদি দুর্দ্ধর্ষ পশ্বাদির মত

অপঃ উর্ম্ময়ঃ = জল সমূহের উর্ম্মিমালা

প্রণয়ন্ত = উত্থিত করে।

বঙ্গানুবাদ—বিচক্ষণ চন্দ্রমণ্ডল বন সমস্তে মহিষগণের প্রবেশের ন্যায় জলসমূহের উর্ম্মিমালা উত্থিত করে।

অর্থাৎ বনে যেরূপ মহিষাদি জন্তু সকল প্রবেশ করিয়া বনকে আকুলিত করে—সেইরূপ চন্দ্রদেব জলকে আলোড়িত করিয়া জোয়ার আনয়ন করেন।

অন্যত্র—

হরিঃ সৃজানো অত্যো ন সত্বভির্ব্বৃথা পাজাংসি
কৃণুষে নদীষ্বা ।৫

সামবেদ—পরমান পর্ব্ব—৫ অধ্যায়—৯মী দশতি।

অন্বয় :—হরিঃ সত্বভিঃ সৃজানঃ অত্যঃ ন বৃথা পাজাংসি নদীষু কৃণুষে।

অন্বয়ার্থ :—সত্বভিঃ = ঈশ্বর শক্তিদ্বারা

সৃজানঃ = সৃষ্ট হইয়া

হরিঃ = তমহরণকারী সোম

অত্যঃ ন = গমনশীল অশ্বের ন্যায়

বৃথা = অনায়াসে

পাজাংসি = স্বকীয় বেগসমূহ

নদীষু = নদী সকলে

কৃণ্বতে = প্রকাশ করিয়া থাকেন

বঙ্গানুবাদ—ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃজিত হইয়া চন্দ্রদেব গমনশীল অশ্বের ন্যায় অনায়াসে স্বকীয় বেগসমূহ নদীসকলে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ চন্দ্রদেব স্বীয় বেগদ্বারা নদী সকলে জোয়ার ভাটা সম্পন্ন করেন।

জল চন্দ্রের অনুকুল

ঋগ্বেদ ১০ম।৩০।৬

এবেদ্যূনে যুবতয়ো নমং ত
যদীমুশন্নুশে তীরেত্যচ্ছ।
সং জানতে মনসা সং চিকিত্রে
অধ্বর্যবো বিষণাপশ্চ দেবীঃ॥

বঙ্গানুবাদ :—যখন কোন যুবাপুরুষ প্রেমের সহিত প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদিগের দিকে গমন করে—তখন যেমন যুবতীরা সেই যুবার প্রতি অনুকুল হয়—তদ্রূপ জল সোমের প্রতি অনুকুল হইতেছে। [পুরোহিতগণ ও তাঁহাদের যে স্তুতিবাক্য সকল—ইঁহাদের সহিত জলস্বরূপ দেবদিগের বিশেষ পরিচয় আছে—উভয়েই স্ব স্ব কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।]

চন্দ্রের গতি

চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।

সামবেদ—পবমান পর্ব্ব—৫ম অধ্যায়। ৯মী দশতি।

অসাবি সোমো অরুষো বৃষাহরী
রাজেব দস্মো অভিগা অচিক্রদৎ।
পুনানো বার মত্যেষ্যব্যং শ্যেনো
ন যোনিং ঘৃতবন্ত মসাদৎ॥ ৯।

অন্বয় :—অরুষঃবৃষা দস্মঃ হরিঃ সোমঃ রাজেব অসাবি গাঃ অভি অচিক্রদৎ—পুনানঃ অব্যং বারং অত্যেষি—ঘৃতবন্তং যোনিং আসদৎ—শ্যেনঃ ন।

অন্বয়ার্থঃ—অরুষঃ—রূপবান্

বৃষা—সুধাবর্ষণশীল

দস্মঃ—দর্শনীয়

হরিঃ সোমঃ—তমোহর চন্দ্রদেব

রাজেব—নক্ষত্রমণ্ডলীর রাজার ন্যায়

অসাবি—সৃষ্ট হইয়াছেন

গাঃ অভি—পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টন করতঃ

অচিক্রদৎ—সশব্দে সতত ভ্রমণ করিতেছেন

পুনানঃ—পবিত্র স্বভাব এই সোম ও নভমণ্ডলে

অব্যং বারং—স্বীয় অব্যয় কক্ষাকে অবলম্বন করিয়া

অত্যেষি—একটীর পর আর একটী নক্ষত্র ভোগকরতঃ অতিক্রম করেন

ঘৃতবন্তং যোনিং—জলময় স্বীয় স্থান

আসদৎ—প্রাপ্ত হন

শ্যেনঃ ন—বিমানচারী বাজপক্ষীর ন্যায়

বঙ্গানুবাদ :—রূপবান্ সুধাবর্ষণশীল—দর্শনীয় তমোহর চন্দ্রদেব—নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে রাজার ন্যায় সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি পৃথিবীর চারিদিক বেষ্টন করতঃ সতত সশব্দে ভ্রমণ করিতেছেন। পবিত্রস্বভাব এই সোম নভোমণ্ডলে স্বীয় অব্যয় কক্ষাকে অবলম্বন করিয়া একটীর পর আর একটী

নক্ষত্র ভোগকরতঃ অতিক্রম করেন—তদনন্তর জলময় স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ তিনি স্বীয় স্থান ত্যাগ করেন না। যেমন বিমানচারী শ্যেনপক্ষী স্বীয় স্থান অর্থাৎ কুলায় প্রাপ্ত হয়।

শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ

সামবেদ—পবমানপর্ব্ব—৫ম অধ্যায়—৯মী দশতি

প্রদেব মচ্ছা মধুমন্ত ইন্দ বো
সিষ্যদন্ত গাব আ ন ধেনবঃ।
বর্হিষদো বচনবন্ত উধভিঃ
পরিস্রুত মুস্রিয়া নির্ণিজং ধিরে। ১০

অন্বয়ঃ—বর্হিষদঃ মধুমন্তঃ ইন্দ্রবঃ দেবম্ অচ্ছ প্রাসিষ্যদন্ত ধেনবঃ গাবঃ ন বচনবন্তঃ উস্রিয়াঃ উধভিঃ পরিস্রুতং নির্ণিজং আধিরে।

অন্বয়ার্থঃ—বর্হিষদঃ—অন্তরীক্ষস্থ স্বীয় উদকময় মণ্ডলস্থিত

মধুমন্তঃ—মধুমান্

ইন্দবঃ—সুধাস্রাবী সোম স্বীয় জ্যোৎস্না সমূহের সহিত

দেবন্ অচ্ছ—বৎসস্বরূপ সূর্য্যাকে পাইবার জন্য

প্রাসিষ্যদন্ত—সতত গড়াইয়া চলিয়া যান

ধেনবঃ গাবঃ ন—যেরূপ সদ্যপ্রসূতা গাভিগণ

বচনবন্তঃ উস্রিয়াঃ—হাম্বারব সহ

উধভিঃ—স্তনগুলি বৎসকে পান করাইবার জন্য

পরিস্রুতং = স্রবণশীল

নির্ণিজং = বিশুদ্ধ দুগ্ধ

আধিরে = প্রদান করে

বঙ্গানুবাদ—যেরূপ সদ্যপ্রসূত গাভিগণ হাম্বারব যুক্তা হইয়া স্তনগুলি বৎসকে পান করাইবার জন্য স্রবণশীল বিশুদ্ধ দুগ্ধ প্রদান করে তদ্রূপ অন্তরীক্ষস্থ স্বীয় উদকময় মণ্ডলেস্থিত মধুমান্ সুধাস্রাবী সোম ও স্বীয় জ্যোৎস্না সমূহের সহিত বৎসরূপ সূর্য্যাকে পাইবার জন্য অর্থাৎ স্বীয় সুধারস পান করাইবার জন্য সতত গড়াইয়া চলিয়া যান।

অর্থাৎ চন্দ্রের গতি গড়াইয়া গড়াইয়া চলায় পৃথিবীতে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

সত্যেন্দ্র তপণ

শ্রীপ্রতাপ সেন বি, এস, সি

অমরার কবি আজ, তবু আজো আমাদেরই তুমি
কেমনে ভুলিবে, বন্ধু, গঙ্গাহৃদি তব বঙ্গভূমি ?

ভুলেছ মোদের তুমি', ভাবিতেও অভিমান জাগে,
বরষার বারিধারা তব অশ্রু বলি মনে লাগে।

বাহিরের বরষারে অন্তরে এনেছে তব শোক
সঙ্গে তোমা নিয়ে নামে বঙ্গভূমে সারা ইন্দ্রলোক।

উর্দ্ধপানে চায় আজ জনারণ্যে এ নগণ্য কবি,
অস্তাচলে নামে যত মেঘাচ্ছন্ন ক্লান্ত রক্তরবি

ততই তোমারে স্মরি। শুনি আজ বহুদূর হতে
তোমার মৃদঙ্গনাদ ভেসে আসে সুরধারা স্রোতে।

এত বারিধারা ঝরে ঘুচেনা যে তবু মর্ম্মদাহ,
বর্ষা আসে তুমি তার আমন্ত্রণী আর নাহি গাহ,

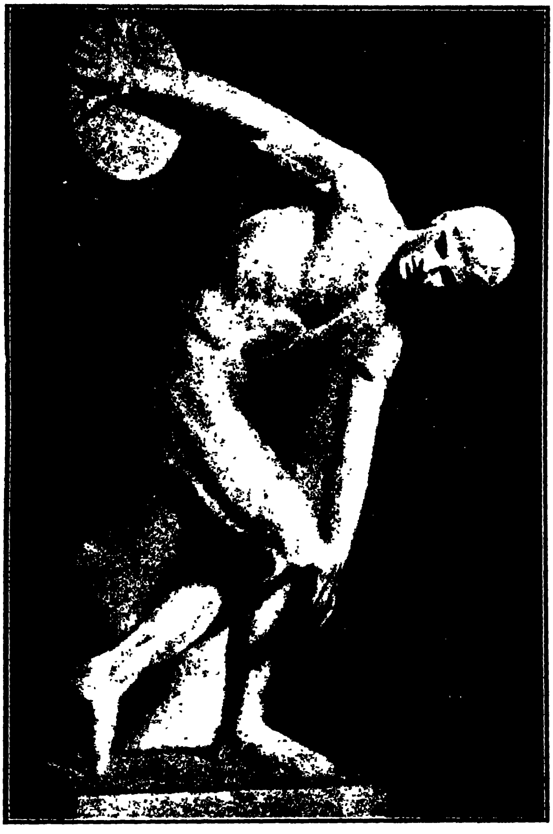
এ বরষা আনেনাক কাজরী বা ঝুলনের গান,
তোমা ছাড়া এ বরষা শুধু বন্ধু অশ্রুর তুফান।

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য)

প্রায় দু'হাজার বছর আগে যে শিল্পীর দল গ্রীসের অখ্যাত অজ্ঞাত জনপদে জন্মগ্রহণ করে দেহ-সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য্য সাধনায় ধ্যান মগ্ন হ'য়েছিলেন, এবং আপনাদের তপঃসিদ্ধ শক্তির প্রভাবে যাঁরা সুকঠিন পাষাণের মর্ম্মচ্ছেদ ক'রে নর-নারীর তনু-রূপ গরিমা অপূর্ব্ব মহিমায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন আজ তাঁরা কেউ এ জগতে নেই বটে, কিন্তু তাঁদের সে অতুলনীয় সৃষ্টি আজও অম্লান গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে, এই সুদীর্ঘ কালের অবিরত চেষ্টায় কোনো দেশেরই শিল্পী গ্রীসের এই প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্পীকে এখনও পর্য্যন্ত অতিক্রম ক'রতে পারেন নি; এমন কি সমতুল্য হবার যোগ্যতাও এঁদের মধ্যে আজও দেখা যায়নি।



চক্র-ক্ষেপক (Discobolus)



ভল্ল বাহক (Doryphorus)

গ্রীক ভাস্কর্য্যের সৌন্দর্য্য ও সুষমা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা বাহুল্য মাত্র, কারণ এ বিষয়ে কারুর মতভেদ থাকা সম্ভব নয়। এটা এমন একটা প্রত্যক্ষ সত্য যে এ নিয়ে কাউকে বিশদভাবে বোঝাবার প্রয়োজন হয়না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি মূর্ত্তির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—'মাইলোর ভেনাস!' (Venus of Milo) গ্রীক ভাস্কর্য্যে

অপরূপ দান এই বিশ্ব-বিশ্রুত ভেনাসের মূর্ত্তি ১৮২০ খৃঃ অব্দে প্রাচীন (Melos—Milo) নগরে আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাই এ মূর্ত্তিটি 'মাইলোর ভেনাস' নামেই জগতে পরিচিত। এই মাইলোর ভেনাস্ মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর সকল লোকই মুগ্ধ। যদি কেউ এমন কথা বলেন যে 'মাইলোর ভেনাস্' এমন কি অপরূপ? আমার ত ভাল লাগেনা! তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি একটু অসাধারণ বলে নিজেকে জাহির ক'রতে চান!



দেহ নির্ম্মলকারী (Apoxyomenos)

কিন্তু সে যাই হোক্, মানুষের কল্পনা তার এই দেহের সৌন্দর্য্যকে যতটা অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ দিতে পারে প্রাচীন গ্রীসের ভাস্কর শিল্পীরা কেমন ক'রে তারই আদর্শ গড়ে রেখে গেল যা যুগে যুগে শিল্প জগতের চির বিস্ময় হ'য়ে রয়েছে? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হ'তে পারে। এর উত্তরে বলা যায়—গ্রীসের শিল্পীরা ছিলেন—ভাব-বিলাসী বস্তু-তান্ত্রিক। তাঁরা যা গড়েছিলেন তা সবটাই কল্পনার রাজ্য থেকে আহরণ ক'রে এনে নয়; তাঁদের চোখের সম্মুখে উপস্থিত বাস্তব মূর্ত্তির নমুনা থেকেই তাঁরা আদর্শ সৌন্দর্য্যের সন্ধান পেয়েছিলেন! প্রাচীন গ্রীসের নর-নারী দেহের সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে ছিলেন—বিশ্বের অতুলনীয়! সুতরাং গ্রীক ভাস্কর-শিল্পীরা এই সাফল্যের জন্য প্রধানতঃ তাঁদেরই কাছে ঋণী। তবে এ কথাও ঠিক যে এইটেই তাদের সেই অসামান্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের একমাত্র কারণ নয়।



মাইলোর ভেনাস মূর্ত্তি (দক্ষিণ পার্শ্ব)

কেউ কেউ হয়ত জানতে চাইবেন যে সেকালের মানুষদের মধ্যে গ্রীকরাই বা এমন শারীরিক সৌন্দর্য্যে সকলকে অতিক্রম করলে কেমন করে? ভগবান কি পক্ষপাত বশতঃ কেবল ওদেরই দেহে সকল রূপের

সমাবেশ ক'রেছিলেন ? অবশ্য এ কথার উত্তর দিতে হ'লে আরও অনেক কথাই বলতে হয়, কিন্তু সে সমস্ত এখানে অবান্তর হ'তে পারে ; সুতরাং, কেবল দু'একটা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ কারণ মাত্র এখানে উল্লেখ ক'রে ক্ষান্ত হবো। কৌতূহলী পাঠকবর্গ আশা করি এতেই পরিতুষ্ট হবেন। প্রথমতঃ, গ্রীসের প্রাকৃতিক অবস্থান ও নৈসর্গিক আবহাওয়া



মাইলোর ভেনাস মূর্ত্তি (বাম পার্শ্ব)

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের অনুকুল, দ্বিতীয়, গ্রীকদের সামাজিক জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি অতি সুন্দর। স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবকেরা সেকালে খোলা আলো বাতাসে মুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে বিবিধ ব্যায়াম ক্রীড়া ও শক্তি চর্চ্চাতেই অধিক সময় অতিবাহিত ক'রতো। তৃতীয় ও সর্ব্ব প্রধান কারণ হচ্ছে, পুরাকাল হ'তেই পুরুষ পরম্পরায়—প্রাচীন গ্রীক্ শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রীসের সন্তান সন্ততিদের শারীরিক সৌন্দর্য্যের সাধনায় দীক্ষিত করেছে।

যিনিই গ্রীক্‌শিল্প ও ভাস্কর্য্যের আলোচনা করবেন, তা সে যতই সংক্ষেপে তিনি করুন না কেন, তাঁকে গ্রীসের বিবিধ ব্যায়াম-অনুশীলন ও পৌরুষ-পরিচায়ক ক্রীড়াকলার সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলতেই হবে, কারণ এই ক্রীড়া কলার সঙ্গে



সারথী (The Auriga)

গ্রীসের শিল্পকলা প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ! গ্রীসের দেহ-সৌন্দর্য্যের মূলে তার এই বীরোচিত ব্যায়াম-চর্চ্চার প্রভাব ওতোপ্রোতভাবে বিদ্যমান। আধুনিক ক্রীড়া-পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের ক্রীড়া-বিধির প্রধানত তিন রকম পার্থক্য ছিল দেখা যায়। প্রথমতঃ গ্রীসের খেলওয়াড়রা বাহবা পেত

তাদের খেলার ধরণ বা ভঙ্গীর (style) বৈশিষ্ট্যের জন্য ; তাই খেলার ফলাফলের আগে খেলার রকমটাতে বাহাদুরি প্রকাশের চেষ্টা ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। 'যেমন ক'রে' হোক্ জিৎতেই হবে!' ছলে বলে কৌশলে এ মনোভাব তাদের ছিলনা। তারা খেলায় জিৎতে চায় কিন্তু কদর্য্যভাবে নয়, সুন্দর ভাবে। শোভন ও সুষ্ঠুরূপে যদি 'জয়'কে বরণ করতে পারে তবেই তারা জেতার গৌরবে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে, আর তা' যদি না পারে তাহ'লে সে জয়ে তারা সুখী হয়না, সাধারণের কাছেও প্রশংসা অর্জ্জন করতে পারে না।



এ্যাপোলোর মুর্ত্তি (The Apollo)

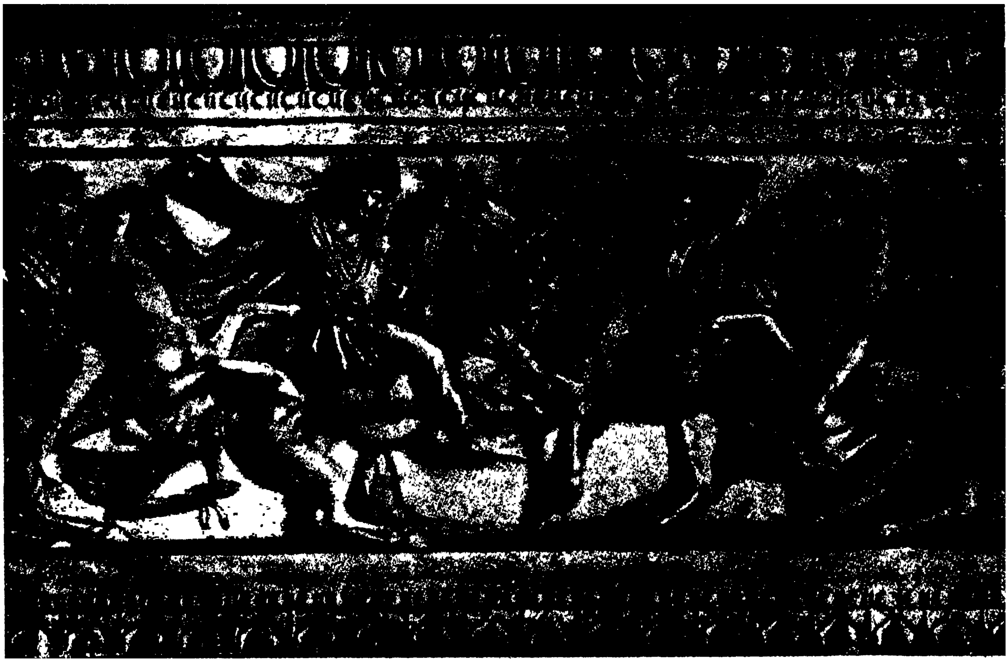
আমাদের দেশে যেমন কি খেলায়—কি যুদ্ধে—কি ব্যবসায় সকল বিষয়েই পুরাকালে প্রত্যেকে একটা ধর্ম্মনীতি ও ন্যায়বিধি একান্তভাবে মেনে চলতেন, তেমনি গ্রীসের খেলোয়াড়রাও সেকালে খেলায় কোনো অধর্ম্ম বা অন্যায় ক'রতনা। প্রতিপক্ষ যদি জয়ী হ'ত তাকে নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শক্তিমান বলে স্বীকার ক'রে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানাত। দেহের বল তারা দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ মনে করতো এবং তার অপব্যবহারে দেবতা রুষ্ট হবেন ও তাকে বলহীন করে ফেলবেন এ অন্ধ বিশ্বাস তাদের মধ্যে বেশ প্রবল ছিল। তারা কায় মন বাক্যে মানতো যে "যদি আমি ধর্ম্মপথে থেকে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে আমার শক্তিবলে ও ক্রীড়া-নৈপুণ্যে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত ক'রতে পারি তাহ'লে সর্ব্বত্র লোক-সমাজে আমার সুনাম ও সুযশ প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রবো এই যে—স্বয়ং ইষ্ট দেবতা আমার উপর প্রসন্ন হবেন। দেবতা প্রীত হ'লে আমি অখিলবিজয়ী হ'তে পারবো।"

জগতের আধুনিক ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব ও দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেকালে গ্রীক্‌দের মধ্যে যে ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল তার মধ্যে কোনো নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত ছিলনা বটে, তবে সেটা বেশ সরলবিশ্বাসে সকলে মানতো। তার একটা সার্ব্বজনীন আবেদনও ছিল। তারা জানতো মানবের যা কিছু শক্তি সামর্থ্য প্রতিভা সবই দেবতার দয়ার উপর নির্ভর করে। সুতরাং, তারা সব কিছুই দেবতার প্রীতির জন্য অনুশীলন ক'রত। তা ছাড়া ব্যায়াম, শরীর-চর্চ্চা, শক্তির পরিচায়ক ক্রীড়া প্রভৃতি গ্রীসের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গ্রীক যুবক শক্তিমান ও স্বাস্থ্যবান হবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা ক'রতো। গ্রীসে সম্পূর্ণ উলঙ্গদেহে শরীরচর্চ্চা করাই বিধেয় ব'লে বিবেচিত হ'ত। এই জন্যই সে দেশের ভাস্কর-শিল্পীরা সুগঠিত বলিষ্ঠ-

দেহ তরুণ যুবকের নগ্ন সুন্দর দেহের প্রত্যেক রেখাটির সঙ্গে প্রতিদিন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার অবাধ সুযোগ পেতো যা এ যুগের ভাস্কর-শিল্পীরা বহুব্যয়ে ও আজীবন চেষ্টায় মাত্র দু'চারবার হয়ত পেতে পারে।

গ্রীক ভাস্কর্য্যের এই শ্রেষ্ঠত্বের আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে যে তাঁরা তাঁদের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার সময় কল্পনাকে কোনোদিনই অবহেলা ক'রতেন না। তাঁরা যার মধ্যে যেটুকু ভাল দেখতেন সেই সেই সুন্দর অনুভূতিগুলি একত্র করে একটি আদর্শ রূপবানের মূর্ত্তি সৃষ্টি ক'রতেন। বাস্তব রাজ্যেও তাঁরা যে ভাব-বিলাসী ছিলেন তার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাঁদের হাতে-গড়া ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির বিভিন্ন পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন মানব প্রতিরূপের আশ্চর্য্য প্রভেদ আমাদের চোখে পড়ে! শক্তির অধিপতি হিরাক্লিস (Heracles) গতি-দেবতা হার্মিস্ (Hermes) এবং সৌন্দর্য্যনাথ এ্যাপোলোকে (Apollo) কল্পনা করবার সময় গ্রীক শিল্পীরা যে ভাবলোকের উচ্চ স্তরে পৌছতে পেরেছিলেন এ কথা স্বীকার না করে পারা যায়না। আবার, মানুষ গড়বার সময় দেখতে পাই তাঁরা কঠিন বাস্তব জগতের মধ্যে এসেই নেমে দাঁড়িয়েছেন। কুস্তিগীর পালওয়ান বা মল্ল যোদ্ধার মূর্ত্তির যা যা বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে একজন সন্দেশবহ দূতের আকৃতির যে যে পার্থক্য, গ্রীক্ ভাস্কর-শিল্পীরা সেই প্রভেদের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আশ্চর্য্যরূপ সতর্ক ছিলেন! তাই গ্রীক্ ভাস্কর্য্য আজও শিলা-শিল্পের আদর্শ হয়ে রয়েছে।

পুরুষের নগ্ন দেহের সঙ্গে অবাধ পরিচয়ের সুযোগ পাওয়ায় গ্রীক ভাস্কর্য্যে এই পুরুষ মূর্ত্তিরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নির্দ্দোষ নারী-মূর্ত্তির আদর্শ রূপ গড়তে শেখবার বহু পূর্ব্বেই গ্রীসের শিল্পীরা পুরুষের সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। গ্রীক ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রথম যুগে যাঁরা নগ্ন নারী মূর্ত্তিকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা এ বিষয়ে তাঁদের অক্ষমতাই প্রকাশ ক'রে গেছেন মাত্র, কারণ আদর্শ নারীমূর্ত্তির নগ্ন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ তাঁরা জীবনে অতি অল্পই লাভ করতে পারতেন; কাজেই নারীর অপেক্ষা পুরুষের মূর্ত্তি



সিংহ শিকার (প্রস্তর-নির্ম্মিত শবাধারের গাত্রে উদ্গত শিলাচিত্র)

নির্ম্মাণেই তাঁরা অধিকতর দক্ষতা লাভ করতে পেরেছিলেন। তাই, খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে আর গ্রীক ভাস্কর্য্যে আদর্শ সুন্দরী নারী মূর্ত্তির অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পর থেকে অবশ্য নরনারী উভয়েরই আদর্শ সুন্দর মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে গ্রীক ভাস্কর-শিল্পীরা সমানভাবে তাঁদের অসামান্য দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। এথেন্‌সের গ্রীক রমণীরা সকলেই সে যুগে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। তাঁরা পর্দ্দানসীন না হ'লেও বাইরের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল খুব কম। গৃহকর্ম্মে তাঁদের সময় এত বেশী দিতে হ'ত যে বাইরে আসবার অবসরই পেতেন না তাঁরা। কাজেই শিল্পীরাও তাঁদের সাক্ষাৎ পেতেন না। অথচ, এই সময় ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় যে স্পার্টান তরুণীরা ঠিক পুরুষের মতই নগ্ন দেহে নিত্য নিয়মিত শক্তি-চর্চ্চা ও শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা করতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্পার্টানদের মধ্যে সে সময় কোনো ভাস্কর-শিল্পী না থাকায় স্পার্টান সুন্দরীদের সেই সুঠাম দেহ-সৌষ্ঠবের অনাবৃত কান্তি এ পর্য্যন্ত কেউ পাষাণে কুঁদে অক্ষয় করে রেখে যেতে পারেন নি।



মল্ল-যুদ্ধ

কোন্ কোন্ অবস্থায় মানব দেহের কোন্ কোন্ ভঙ্গী সৌন্দর্য্যে ও সৌষ্ঠবে আর্টের কোঠায় এসে পৌঁছয় গ্রীক্ শিল্পীদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি তা লক্ষ্য ক'রতে ভোলেনি। গতির মধ্যেও যে দেহের একটা ছন্দ আছে এবং সেটা ধ'রে রাখতে পারলে যে তনু-লাবণ্যের একটা অভাবনীয় সুন্দর ভঙ্গিকে রূপ দেওয়া যায় খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক ভাস্কর মায়রণ (Myron) প্রথম সে সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর নির্ম্মিত 'ডিস্‌কোবোলাস্ (Discobolus) বা চক্র-ক্ষেপকের মূর্ত্তি মানব-দেহের গতিভঙ্গির এমন একটি সুষ্ঠু রূপকে লোক-চক্ষের গোচর করেছে যে আজও তা শিল্প জগতে অতুলনীয় হয়ে আছে। মায়রণের সমসাময়িক অপর একজন গ্রীক ভাস্কর পলিক্লাইটাস্ (Polycleitus) ভল্ল বাহকের (Doryphorus) যে অনিন্দ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে গেছেন মূর্ত্তি শিল্পে আজও তা অখিল ভাস্কর-সমাজে মানবের দেহ-সৌষ্ঠবের আদর্শ হয়ে আছে।

গ্রীক ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাদের সৃষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে একটা বেশ মধুর গম্ভীর প্রশান্তি বিরাজমান। প্রাচীন মূর্ত্তি-শিল্পের মধ্যে যেগুলি অতুলনীয় বলে সমঝদার সমাজে আদৃত হয়েছে তার প্রত্যেকটির মধ্যে এই গুণ বিশেষভাবে বিদ্যমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে ডেল্‌ফীতে প্রাপ্ত 'সারথী' (Auriga) মূর্ত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মূর্ত্তিটির সর্ব্বাঙ্গে যে বিরাট গাম্ভীর্য্যের গুরুত্ব ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে তাতে এর মর্য্যাদা যেন আরও শতগুণ বেড়ে গেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের গ্রীক ভাস্কর্য্যের মধ্যে আর এই অতল গাম্ভীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায় না। খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক ভাস্কর স্কোপাশ

(Scopas) প্রথম মূর্ত্তি-শিল্পের এই ঐতিহ্য অস্বীকার করে তাঁর সৃষ্ট মর্ম্মর-মূর্ত্তির চোখে মুখে একটা চঞ্চল আবেগ ও প্রবল আসক্তি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে পাষাণ যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। স্কোপাশের এই সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী



হার্মিসের মূর্ত্তি (The Hermes) ক্রোড়ে শিশু ডায়োনাইশাস্ (Dionysus)

ভাস্কর-শিল্পীরা সকলেই তাঁর অনুসরণ করতে সুরু করেছিল। কিন্তু মর্ম্মর মূর্ত্তিকে যদি যথার্থ কেউ সজীব ক'রে তুলতে পেরে থাকে তবে সে এথেন্সের প্রসিদ্ধ ভাস্কর প্র্যাক্সাইটেলিস্ (Praxiteles)। স্কোপাশের দেওয়া আবেগ ও আসক্তির উপরও ইনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন মূর্ত্তির অন্তর্নিহিত মনোভাবটিকে। মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি যেদিন পাষাণ মূর্ত্তিরও সর্ব্ব অবয়বে প্রকাশ করা সম্ভব হল সেদিন যা ছিল জড়পিণ্ড, তা' হ'য়ে উঠলো সচেতন ও প্রাণময়!

প্র্যাকসাইটেলিস্ কেবল যে দুঃখ শোক রাগ অভিমান বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি মানবের নানা মনোভাব পাষাণে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি মূর্ত্তি-শিল্পের গঠন-পদ্ধতিতেও একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করে গেছেন।



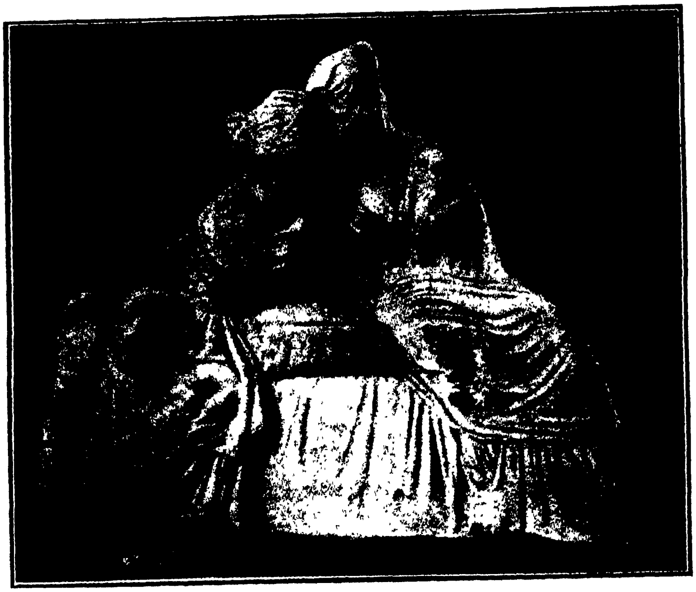
বিজয়িনী (সম্মুখদিক)

দেহের আকৃতিগত সীমারেখায় (Contours) এমন একটা স্বভাব-কোমল নমনীয়তা তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যে কঠিন পাষাণ-মূর্ত্তির শিলাতনু যেন সজীব রক্ত মাংসের লীলায়িত দেহ বলে অনুমান হ'ত। তাঁর নির্ম্মিত হার্মিসের প্রতিমূর্ত্তি দেখলে মনে হয় এ যেন এক সুস্থ সবল সুদর্শন ও সমুন্নতমনা যুবকের জীবন্ত সাদৃশ্য!

মূর্ত্তি-শিল্পে গ্রীক ভাস্কর্য্য যেমন অসামান্ত দক্ষতার

পরিচয় রেখে গেছে স্থাপত্য ভাস্কর্য্যেও তাদের দান তেমনিই অসাধারণ। মূর্ত্তি-শিল্পে শ্বেত মর্ম্মরের প্রাধান্য দেখে যদি কেউ ধারণা করে বসেন যে স্থাপত্য-কলাতেও গ্রীক শিল্পীরা এই শ্বেত মর্ম্মরের ছড়াছড়ি করেছেন তাহ'লে তিনি অত্যন্ত ভুল করবেন; কারণ, গ্রীক্ স্থাপত্যের প্রাণই হ'ল তার অপূর্ব্ব বর্ণ-বিন্যাস! এমন কি মন্দির ও প্রাসাদ প্রভৃতির বহিরঙ্গ শোভা ও আভ্যন্তরীণ অলঙ্কারের জন্য যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ও উদ্গাত শিলাচিত্র ব্যবহার করা হ'ত এবং প্রধান প্রধান দেব দেবী বা কলা-কল্পিত নানা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা হ'ত, সে সমস্তই বহু বর্ণ সংযোগে সুরঞ্জিত ক'রে তোলা হ'ত। তাছাড়া, মূর্ত্তির সাজ-সরঞ্জামের স্বাভাবিকতা রক্ষার্থে অর্থাৎ—অসি ভল্ল বর্ম্ম চর্ম্ম অশ্বভূষা অলঙ্কার প্রভৃতি বোঝাবার জন্য উজ্জ্বল ধাতু-নির্ম্মিত জিনিসও ব্যবহার করা হ'ত।

গ্রীক ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যে এই রংয়ের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল হ'তেই প্রচলিত ছিল। তবে পুরাকালে দু'তিনটির বেশী রংয়ের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় না। নীল সবুজ ও মেটে লাল রং এই তিনটি বর্ণ-ই প্রধানতঃ চোখে পড়ে। এই তিনটি রং নিয়ে নাড়া-চাড়া ক'রেই তাঁরা সেকালে অতি সুন্দর ভাবে তাঁদের শিল্পকে রঙীন করে গেছেন। যদিও স্বাভাবিকতার দিক থেকে বিচার করলে তার অনেক ত্রুটী ধরা পড়ে কিন্তু আর্টের বিচারে তা নির্দ্দোষ বলেই গ্রাহ্য হবে। যেমন ধরুন মানুষের মাথার চুল তাঁরা গাঢ় নীল বর্ণে রঞ্জিত করে গেছেন, বা বৃষকে সবুজ রংয়ে এঁকেছেন; এগুলো সত্য না হলেও পারিপার্শ্বিক বর্ণ-সমাবেশের মধ্যে মানিয়েছে অতি সুন্দর!

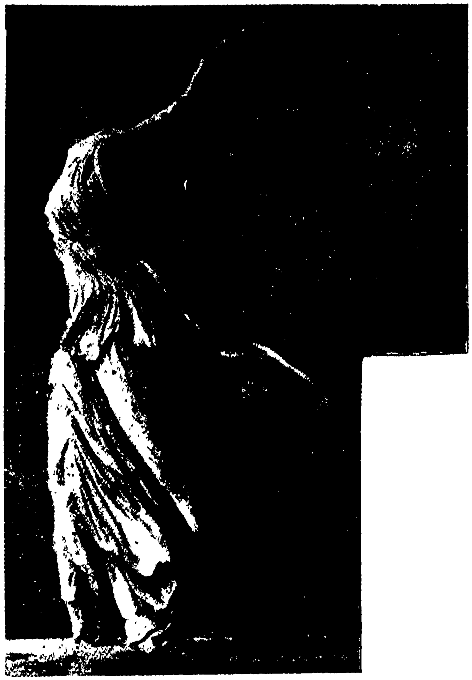


সখী সংবাদ (লাজনতমুখী নবোঢ়া তার সখীর কাছে গোপন কথা বলছে, অতি আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে সখী তার কথাগুলি শুনছে)

পরবর্ত্তী যুগের গ্রীক স্থাপত্যে বর্ণ-বিন্যাসের মধ্যে রংয়ের একটা সুসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছিল। পূর্ব্বকালের মত আর এলো মেলো রং ব্যবহার না ক'রে তাঁরা স্বাভাবিক বর্ণ-সঞ্চারে অবহিত হয়েছিলেন। এর চমৎকার নিদর্শন পাওয়া গেছে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত শবাধারের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলাচিত্রে। এই শবাধার সীডনে আবিষ্কৃত হয়েছিল। উপস্থিত কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌লের যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তর-নির্ম্মিত শবাধারের উভয়পার্শ্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের জীবনের দুটি ঘটনা উদ্গাত শিলাচিত্রে সুরঞ্জিত হয়েছে। একটিতে দেখানো হয়েছে সানুচর মহাবীর আলেকজান্দার কিরূপ দুঃসাহসীর ন্যায় অরণ্যে সিংহ শিকার করছেন। অপরটিতে আছে তাঁর পারস্য বিজয়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চিত্রের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ব্যাপারটি পর্য্যন্ত যথাযোগ্য বর্ণে রঞ্জিত। অশ্ব ও তার সজ্জা, অশ্বারোহী ও তার রণবেশ এবং অস্ত্রশস্ত্র, পদাতিক ও তার বেশভূষা এবং হাতিয়ার—তাদের চুল চোখ এমন কি নখাগ্র পর্য্যন্ত স্বাভাবিক রংয়ে রঞ্জিতও করা হয়েছে। সমগ্র চিত্রের পটভূমিও রং করা। আবার, এই রং এমন সুকৌশলে লাগানো হয়েছে যে মর্ম্মর-ফলকের স্বচ্ছতা তাতে কিছুমাত্র আবিল হয়নি।

কেবলমাত্র রংয়ের সামঞ্জস্য ও বৈচিত্র্যই এই উদ্ধৃত শিলাচিত্রের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। এ চিত্রের মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার অপূর্ব্ব মিলন সাধিত হয়েছে। গ্রীক্ ভাস্কর্য্য-শিল্পের এইটাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরাই প্রথম প্রকৃতির অনাবৃত কণ্ঠে চারুকলার অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছিল। স্বভাবের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারই ছিল এদের প্রধান অবলম্বন। বাস্তব আদর্শকে সম্মুখে রেখে এদের কল্পনা তাকে নানা মঙ্গল উপচারে বরণ করতো। কথিত আছে—ক্রোটোনের (Croton) অধিবাসীরা যখন প্রসিদ্ধ চিত্রকর জুক্সিশ্‌কে (Zeuxis) আহ্বান ক'রে এনেছিল ট্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী লোকললামভূতা হেলেনের একখানি প্রতিকৃতি এঁকে দেবার জন্য, তখন চিত্র-শিল্পী জুক্সিশ্‌ এই সর্ত্তে তাদের অনুরোধ রক্ষা ক'রতে সম্মত হয়েছিলেন যে নগরের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের শরীরের গঠন অনুশীলন করবার অবাধ সুযোগ তাঁকে দেওয়া হবে। শিল্পীর আদর্শ হবার জন্য যে ক'জন সুন্দরী সেদিন সানন্দে সম্মতা হয়েছিলেন জুক্সিশ তাঁদের মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে নির্ব্বাচন করে নিয়েছিলেন। সেই পঞ্চকন্যা সেদেশে আজও 'স্মরেণিত্যং' হয়ে আছেন। ডায়োনাইশিয়াসের (Dionysius) মত ঐতিহাসিকও সেই পাঁচজনের নাম তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে গেছেন।

শিল্পকলাকে এতখানি মর্য্যাদা দিতে পেরেছিল বলেই গ্রীকশিল্প আজও জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে রয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের মত গ্রীকশিল্পীরাও সেদিন ক'রে নিয়েছিল তাদের —"দেবতারে প্রিয় আর প্রিয়রে দেবতা!"



বিজয়িনী (পার্শ্বদিক। জয়ের উল্লাসে পক্ষ বিস্তার করে আকাশ উড়ে যেতে চায়! বায়ুভরে তার বসনাঞ্চল চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে)



আই সি এস্

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

একই দরের ষ্টিল, দেশী ও বিলাতী নাম,
টাটা নগরের সাথ মিলেছে বার্মিংহাম,
দেয় ডোভারের ক্লিফ, হিমগিরি করে কর
মিলেছে টুইড টেমস্ মেঘনা ও দামোদর।
মিলনের খুস্‌রোজে ফুলেদের প্রীতিভোজ,
টগর নাগেশ্বর, অর্কিড প্রিমরোজ।
পূব পশ্চিম দুই হইয়াছে একাকার,
তাজমহলের পাশ ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার।
কাঁদে বুঝি কিপলিং, হেরি এই সমাবেশ,
ভারত সেবাব্রতী তোমরা আই সি এস্!

২

কখনো তোমরা লাট, কখনো বা বিচারক,
কভু খাতা খতিয়ান করে ফের তদারক।
কখনো দেখিছ জেনে হাজিরাটা কয়েদীর,
কভু কর সংগ্রহ ইতিহাস জেনাটীর।
কখনো বা সেন্‌সাসে পূরণ করিছ খাতা,
ভাষাতত্ত্বের লাগে কখনো ঘামাও মাথা।
জরিপ-আফিসে কাল আছিলে কর্ত্তা সাজি,
টেলিফোন মন্দিরে আদরা আঁকিছ আজি।
চৌকশ চৌদিকে কাজের নাহিক শেষ,
ভারত সেবাব্রতী তোমরা আই সি এস্।

৩

লোহাজং হতে লাভান্ লেবং কালিম্পং,
পৌরি হইতে পুণা, কাঁথি হতে চিটাগঙ,
ভ্রমিতেছ চারিদিকে চাকুরী যে অদ্ভুত,
রেঙ্গুনে বাঁধাও বাঁধ, কাবুলেতে রাজদূত।
কভু নাচ রায়বেঁশে, কখনো বা পড় গীতা,
কখনো সম্পাদক, কভু দাও বক্তৃতা,
চারিদিকে রাখ কান, চৌদিকে রাখ আঁখি,
কোনো দিকে কোনো কাজ, পড়েনাক যেন ফাঁকি।
সকল কাজেই লাগ, বহু কাজ কর পেশ,
ভারত সেবাব্রতী তোমরা আই সি এস্।

৪

তোমরা পারনা হতে রবীন্দ্র জগদীশ
বহু কাজে যাপি দাও বছর বিশ কি ত্রিশ,
গুঞ্জরি ফের শুধু বসিতে পাওনা হে,
তোমাদের মাঝে নাই 'রমণ' কি ফ্যারাডে।
নহ ব্রাহ্মণ নহ করিতে পাও না যোগ,
নহ ক্ষত্রিয় নহ করিতে পাওনা ভোগ,
বৈশ্য তোমরা নও ব্যবসায়ে নাই মতি,
তোমরা শূদ্র শুধু ভারত সেবাব্রতী।
প্রতিভাটা তোমাদের ভাতাতেই হয় শেষ,
অভাগা ভাগ্যবান তোমরা আই সি এস্।

৫

ক্ষণিকের যোগী হয়ে ত্যজিয়াছ শাশ্বতে,
বিপুল স্বার্থত্যাগী জাতির জীবন পথে।
কস্তুরী-মৃগ যূথ ভূর্জ্জ কানন ছাড়ি,
মনের আনন্দেতে টানিতেছ স্লেজ গাড়ী।
খর সন্ধানী দীপ হয়েছে গলির আলো,
মুক্তার ডুবারীর মাছ ধরে দিন গেল,
'এডামসনের' তরী যাত্রী করিছে পার
ভুলে গেছে একদম মেরুর আবিষ্কার।
না হও দেশের নেতা তবুও সেবিছ দেশ,
ভারত সেবাব্রতী তোমরা আই সি এস্।

সাময়িকী

বাঙ্গালায় শিক্ষার ব্যবস্থা—

বাঙ্গালায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাদান হইবে, এই প্রস্তাবে সরকার সম্মত হইয়াছেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা ও সরকারের পক্ষে কয় জন আলোচনা করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা স্থির করিবেন। এক মাস কালের মধ্যেই আলোচনায় সভার অধিবেশন হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদিগের নাম জানিতে পারা গিয়াছে। ইঁহাদিগের কেহ কেহ কোন্ অধিকারে বাঙ্গালায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব আলোচনা করিবার জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। সরকার পক্ষ হইতেও এইরূপ জন কয়েক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন কি না, বলিতে পারি না।

কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিলে মনে হয়, বাঙ্গালার লোকের পক্ষে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন এ দেশে বড়লাট, তখন দেশীয় ভাষায় এ দেশের লোককে শিক্ষা প্রদানের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচিত হইয়াছিল। ১৮৩৫, ১৮৩৬ ও ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ও বিহারে ছাত্রের মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে এডামের রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এ সম্বন্ধে লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রথম বিবৃতিও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে (২০শে জানুয়ারী তারিখে) প্রচারিত হয়।

অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য এডামকে কয়জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল; সকলের বেতন বাবদ মাসিক ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

১ জন মৌলবী	...	৬০	সিক্কা টাকা
১ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ	...	৫০	" "
১ জন লেখক বা নকল-নবিশ		৪০	" "
১ জন দপ্তরী	...	৮	" "
২ জন হরকরা (৬ টাকা হিসাবে)		১২	" "
২ জন বরকন্দাজ (৮ টাকা হিসাবে)		১৬	" "
মোট		১৮৬	" •"
কাগজ কলম ইত্যাদি	...	৩২	" "

এডামের বিস্তৃত রিপোর্ট পাঠ করিলে বাঙ্গালায় সে সময় শিক্ষার অবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন জিলায় শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য যে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায়, সে সকল বাঙ্গালার ইতিহাসে অমূল্য না হইলেও বহুমূল্য উপকরণ সন্দেহ নাই।

এডাম বাঙ্গালায় দেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন যেমন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তেমনই তাহাকেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। রিপোর্টের উপসংহারে তিনি ডিফেলেনবার্গের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন,—'রাজদ্রোহের কারণ, এবং অপরাধের, বধমঞ্চে জীবনাশের কারণ বিকৃত শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এডাম শতবর্ষ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এ দেশে ইংরাজ দেশের লোকের প্রীতি অর্জ্জন করিবার জন্য যেমন অতি সামান্য চেষ্টা করিয়াছেন, তেমনই লোকের অপ্রীতি লাভের অনেক কারণ ঘটাইয়াছেন। দেশের লোকের কোন সম্প্রদায় অসন্তোষ গোপন করিতে চাহেন না; লোকের মনে ইংরাজদিগের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও তাঁহার স্থানে যে আগ্রহহীন, নিষ্পন্দ ভাব আছে তাহাতে আগামী কল্য ইংরাজের স্থানে অন্য কোন জাতি রাজদণ্ড লইলে লোক তাহাতে কোন আপত্তি বা কোনরূপ দুঃখ-প্রকাশ করিবে না। যদি সমীচীন ভাবে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করা যায়, তবে ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে নবভাবের উদ্ভব হইবে। "আমরা যে ভাবে এ দেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতায় বঞ্চিত, তাহাতে বিদেশী শাসকদিগের গর্ব্ব ও এ দেশের লোকের কুসংস্কার শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, জাতীয় শিক্ষাই তাহা দূর করিতে পারিবে।" শিক্ষা যতই বিস্তার লাভ করিবে ততই সরকারের সহিত দেশের লোকের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে। প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে এইরূপে সরকারের সহিত সংযোগের উপায় হইবে। ফলে কেবল যে লোক সরকারের কার্য্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহাই নহে; পরন্তু লোক would be "morally disposed

to appreciate the good intentions of Government, and to co-operate into carrying them fnto effect."

সেই সময় একদিকে যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালীরা দেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদানেব প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া আপনাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই লর্ড ষ্টানলী তাঁহার ডেস্প্যাচে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সে কথা লিখিয়াছিলেন এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও তাহাই বলেন।

শতবর্ষ পূর্ব্বের এই কথা আজ আবার স্মরণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। তখন যে ভাবে কায আরম্ভ হয় যদি সেই ভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত, তবে যে আজ দেশের শিক্ষার বিশেষ বিস্তার লাভ ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে সময় এই সব আলোচনা হয়, তখন বাঙ্গালায় নানা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার আয়োজন হয়। অনেকে হয়ত জানেন না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ হইতে 'সীতার বনবাস' পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াই নিবৃত্ত হয়েন নাই; পরন্তু ইংরাজ লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালায় বঙ্গদেশের ইতিহাস রচনাও করেন। রবিনশন ইংরাজী 'রবিনশনক্রুশো' পুস্তকের অনুবাদ করেন; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'টেলিমেকশ' রচনা করেন এবং গোপীকৃষ্ণ মিত্র সতিকস কৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান সংশোধিত করেন। এইরূপে তখন বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ পুষ্ট হইয়া উঠে।

অনুবাদের প্রয়োজন তখনই উপলব্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এডাম প্রভৃতির এই মত ছিল যে, ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ মাত্র না করিয়া ঐ সকল পুস্তকে লিখিত বিষয় বাঙ্গালী পাঠকদিগের, বিশেষ শিক্ষার্থীদিগের, পাঠোপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করাই প্রয়োজন।

তখন এ কায সরকারের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই ইহার জন্য আর সে সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই। বাঙ্গালায় যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষানুরাগের অভাব ছিল না। সেই জন্যই বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষায় মনোযোগ দিয়াছিল। এখন সেই আগ্রহ সমগ্র প্রদেশে আত্মপ্রকাশ করিল এবং বাঙ্গালা লেখকদিগের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি—নানা বিভাগে পাঠ্যপুস্তক রচিত হইতে লাগিল। ভাষায় কিরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, তাহা 'লিপিমালা'র সহিত 'বোধোদয়ের' তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

তাহার পর যে অবস্থার উদ্ভব হইল, তাহাতে এই উন্নতির পথে বাধা স্থাপিত হইল। যেভাবে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল, তাহাতে পাঠ্যপুস্তকে "বায়বা শিকড়" ও "সার্থক গবাক্ষের" আবির্ভাব হইল। ছাত্রদিগকে সব বিষয়ে "পণ্ডিত" করিবার চেষ্টায় শিক্ষা বিভাগ পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং তাহার পর কি ভাবে বিদ্যার মন্দিরে সাম্প্রদায়িকভাব আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

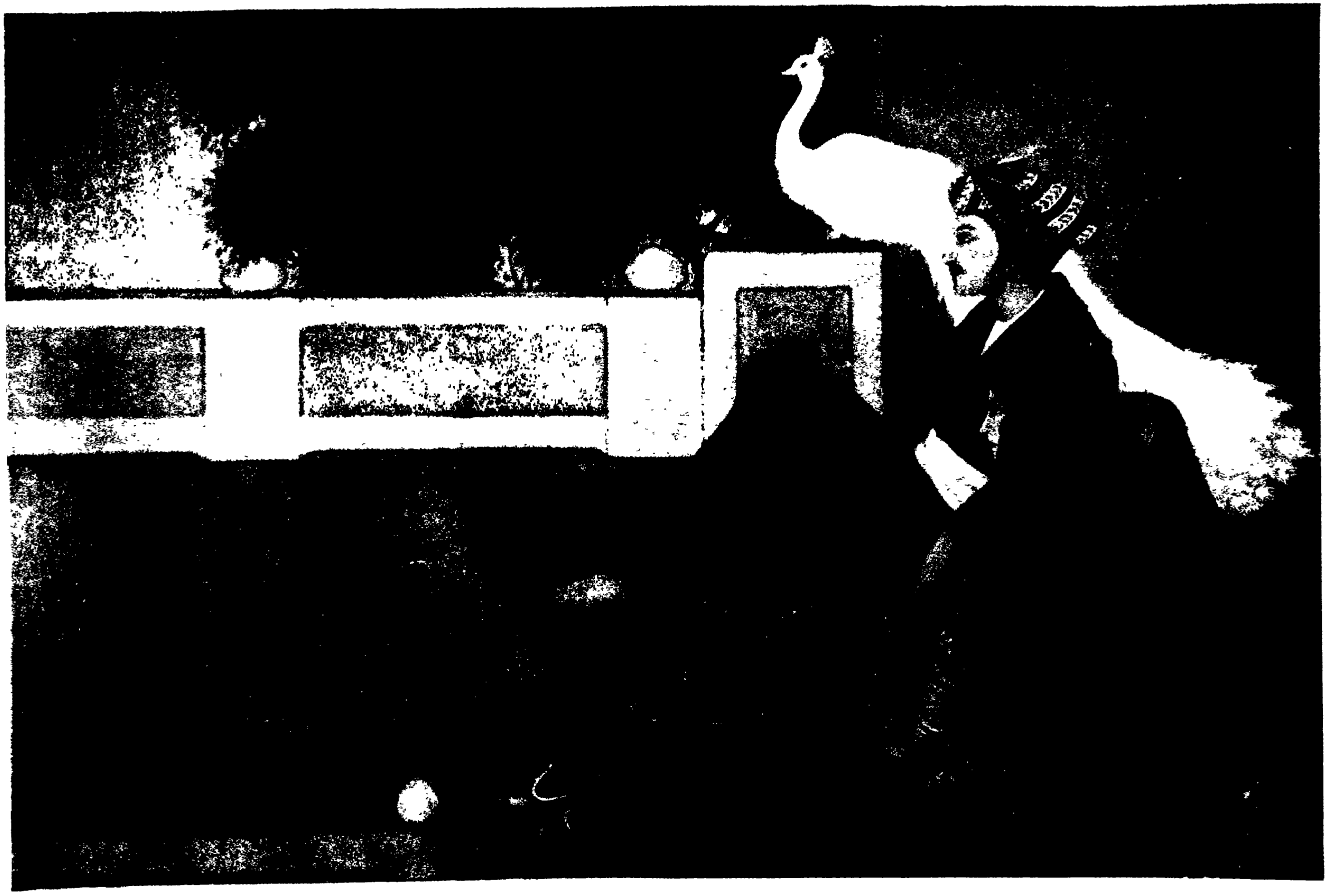
আর এক দিকে সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে বিঘ্ন ঘটিল। ডাক্তারী বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আরম্ভ হইল। আর কোন দেশে এমন অব্যবস্থা সম্ভব হইত, এমন মনে হয় না।

ইহার পর বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালাকে একটু আদর দিলেন; কিন্তু যে সমাদর বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মাতৃভাষার অবশ্য প্রাপ্য, তাহা দিতে সাহসী হইলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টির সাহায্য হইল না। কিরূপ যোগ্য লোকের দ্বারা—কিরূপ অযত্ন ও অসাবধানতা সহকারে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক রচনায় বা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার একটি মাত্র প্রমাণ যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার সহজ উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন—আপনারা পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত করেন। বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তকে দীনবন্ধু মিত্রের কাব্য হইতে কলিকাতার বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে রহিয়াছেন :—

"হের মাত, গোলদীঘী বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।"

দীনবন্ধু "রক্ত" লিখিয়া আপনার অজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই;



যৌবন স্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত কিরণময় ধর

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তিনি লিখিয়াছিলেন—"বক্ত" অর্থাৎ ভাগ্য। কোন প্রকাশক কর্ত্তৃক প্রকাশিত দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর সংস্করণে ঐ ভুল রহিয়া গিয়াছিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা তাহাই "কাঁচিকাটা" করিয়া প্রমাদ ঘটাইয়াছেন।

এত দিনে বাঙ্গালা সরকার বিস্মৃত সত্য আবার উপলব্ধি করিয়াছেন—ছাত্রের মাতৃভাষাই তাহার শিক্ষার বাহন হওয়া সঙ্গত।

আজ যখন নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে, তখন—পাঠ্যপুস্তকের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। বাঙ্গালায় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের আরম্ভে এ বিষয় বিবেচিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সার সৈয়দ আহম্মদ আলিগড়ে মুসলমানদিগের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় ইংরাজী হইতে বিজ্ঞানাদি বিষয়ক অনেক পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাহা আজ "আলিগড় মুভমেণ্ট" নামে পরিচিত। তাহাতে মুসলমানদিগকে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষা প্রদান-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

হায়দ্রাবাদে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও এইরূপে পাঠ্য-পুস্তক রচনার উপায় করিতেছেন এবং তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের অন্যতম কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এখন—যখন দীর্ঘকালের ত্রুটি সংশোধিত হইতেছে, যখন বাঙ্গালাকে শিক্ষার বাহন করিয়া বাঙ্গালী শিক্ষার্থীর শিক্ষাপথ সুগম করিবার উপায় হইতেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় সর্ব্ববিষয়ক পুস্তক রচনার আয়োজন নূতন করিয়া করিতে হইবে। আমরা আজ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ওয়েবার, ম্যাক্সমূলার, হুগোউইজার, গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতির পুস্তকে পাঠ করি, অথচ বাঙ্গালায় সংস্কৃত সাহিত্যের কোন উল্লেখযোগ্য ইতিহাস নাই। ডয়সেনের বেদান্ত ও ম্যাক্স-মূলারের ষড়্দর্শন বিষয়ক পুস্তক আমরা পাঠ করি, বাঙ্গালায় কোন গ্রন্থ নাই। ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাস বাঙ্গালায় যাহা আছে, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে। এমন কি কোন বিদ্যার্থী যদি বাঙ্গালা ভাষায় ইংলণ্ডের, মার্কিনের, ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে তৃপ্ত করিবার কোন উপায় আমরা করিতে পারি না। বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। এমন কি উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বৈদিক প্রবন্ধের মত প্রবন্ধও আজকাল দেখিতে পাই না। বাঙ্গালায় স্থপতি বিদ্যার ইতিহাস নাই,—অথচ এই দেশে ব্যবসা করিতে আসিয়া ফার্গুশন যে সব পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল আজও আমাদিগের আশ্রয়।

এই অভাব দূর করিবার কার্য্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঔদাসীন্য অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত হইতে পারি না। বাঙ্গালার ইতিহাস যেমন হিন্দুরই ইতিহাস নহে, বাঙ্গালা ভাষা তেমনই কেবল হিন্দুর নহে, ইহা বাঙ্গালী মুসলমানেরও মাতৃভাষা। এই ভাষার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হিন্দুর মত মুসলমানেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষা কত ফার্শী শব্দ আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের নিম্নলিখিত কয় ছত্রেই পাওয়া যায়:—

"রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর উমরা হৈলা যত অবতার॥
বিশ্ব বাড়ী মুঝচা বুরুজ বার রাশি।
গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সাতাশি॥"

ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা প্রয়োজনে বহু ইংরাজী শব্দও আত্মসাৎ করিয়াছে।

বাঙ্গালাভাষার যে শক্তি আছে, তাহা অসাধারণ—মুসলমানরা যেন বাঙ্গালার সেই শক্তিতে প্রত্যয় রাখিয়া কায করেন; তাঁহারা যেন বাঙ্গালাকে সম্প্রদায় বিশেষের ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা না করেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই; অথচ তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের কেবল অনিষ্টই সাধিত হইবে।

ইহার পূর্ব্বে মুসলমানরা নানারূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতেও তাঁহারা তাহাই করিবেন। যে ভাষা বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই মাতৃভাষা, সেই ভাষা যাহাতে পুষ্টি লাভ করে—বাঙ্গালা সাহিত্য যাহাতে সমৃদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন—সকলেরই কর্ত্তব্য।

আজ যখন বাঙ্গালার অধিকার স্বীকৃত হইতেছে, তখন

বাঙ্গালা—যে বাঙ্গালায় কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মশারহফ হোসেন প্রভৃতি আপনাদিগের ভাব প্রচার করিয়াছেন, সে বাঙ্গালা যেন সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কলেপে মলিন না হয়; তাহার উন্নতি যেন সাম্প্রদায়িকতার জন্য প্রহত না হয়।

এ কায সরকারের নহে, দেশের লোকের। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ও এই কথা বিস্মৃত হইবেন না।

পুনর্গঠন—

বিপদের মত চৈতন্যদায়ক আর কিছুই নাই। পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতি সকল দেশকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করাইয়াছে। প্রথমে রুসিয়া এ বিষয়ে পথিপ্রদর্শক। রুশিয়া আপনার সমাজ-বিন্যাস ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য যে উৎকট উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সাফল্যজন্য রুশ সরকার পঞ্চবর্ষে পুনর্গঠনের পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন। তাহার পর তুর্কী সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি হ্যারী এডনগুস রচিত বিলাতের পুনর্গঠন বিষয়ক পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে—তবে এই পুস্তকের প্রস্তাব সরকারের নহে। আবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, গত ১৭ই মে তারিখে ফ্রান্সের মন্ত্রিমণ্ডল পঞ্চবর্ষ কালমধ্যে পুনর্গঠন জন্য যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ফরাসী সরকারের সোসাল ইনস্যুরেন্স ফাণ্ড হইতে এই টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহার কার্য্যে প্রথম বৎসর ২ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইবে এবং কার্য্য অগ্রসর হইলে ৪ লক্ষ লোকের কায মিলিবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী কায শেষ হইলে ফ্রান্সে বহু উৎকৃষ্ট রাজপথ রচিত হইবে, পল্লীগ্রামে জল হইতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে, নূতন নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অতি ক্ষুদ্র স্থানও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থার ও জলসরবরাহের সুবিধা সম্ভোগ করিবে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার আয়তন ৮২,২৭৭ বর্গ মাইল—ফ্রান্সের আয়তন ইহার প্রায় তিন গুণ। সুতরাং যে স্থলে ফ্রান্স ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে উদ্যত, সে স্থলে বাঙ্গালা যদি ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিতে পারিত, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিত না। বিশেষ ফ্রান্সে এখনই ভাল রাজপথ আছে, তাহার জলপথ নষ্ট হয় নাই, তাহারা কোন বর্ণজ্ঞানহীন নহে। তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব বিবেচনা করিলে নির্দ্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ অধিক বলা যায় না। কিন্তু বাঙ্গালায় এইরূপ অর্থব্যয়ের কল্পনা কি করা যাইতে পারে? বাঙ্গালায় ৫ বৎসরে প্রায় ২শত মাইল রাজপথ রচিত হইবে, ইহাই আমরা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতেছি।

তবুও—অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যেও—যে বাঙ্গালার গভর্ণরের উদ্যোগে বাঙ্গালা সরকার পুনর্গঠন কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন, ইহাই আমরা আশার কথা মনে করি। এ বিষয়ে কায এই কয়মাসে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমরা আজও জানিতে পারি নাই। যখন অর্থনীতিক তদন্ত বোর্ড গঠিত হয়, তখনই আমরা বলিয়াছিলাম, বোর্ডের দ্বারা যে বিশেষ কায হইবে, এ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। আমরা আশা করি, ডেভেলপ্‌মেণ্ট কমিশনার দ্রুত কায করিবেন। কমিশনার যে বাঙ্গালীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার চেষ্টা করিতেছেন—৫০টি করিয়া গ্রামের লোকের গড় আয় ও ব্যয় কিরূপ তাহা জানিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত আছি। আমাদিগের বিশ্বাস, এই অনুসন্ধানফলে দেখা যাইবে—স্বামী, স্ত্রী ও ৩টি পুত্র কন্যা পরিবার ধরিলে প্রত্যেক পরিবারের বার্ষিক ব্যয় গড়ে ১শত ২০ টাকা হইবে। গড় আয় যদি ১ শত ২০ টাকা না হয়, তবে—

(১) কিরূপে আয় বাড়াইয়া ১শত ২০ টাকা করা যায়?

(২) ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধের কোন উপায় হইতে পারে কি?

(৩) ঋণ পরিশোধের উপায় না থাকিলে পুনর্গঠনের জন্য সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে?

বাঙ্গালায় যদি সেচের ব্যবস্থা হয় এবং উৎকৃষ্ট ধান্যের বীজ ব্যবহৃত হয়, তবে ধান্যের ফসলে ফলন শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িতে পারে। জমী যদি—সেচের বা সার প্রদানের ফলে—উর্ব্বর না হয়, তবে উৎকৃষ্ট বীজেও ফলন কম হয়। সার প্রদান ব্যয়সাধ্য—সেচে তাহা নাই। সেই জন্য কিরূপে সেচের সুব্যবস্থা করা যায়, স্থির করিতে জরীপের ব্যবস্থাও হইতেছে।

এইরূপে যদি প্রজার আয়বৃদ্ধি হয়, তবেই তাহারা অধিক কর দিতে পারিবে এবং তাহা হইলে ব্যয়সাধ্য পুনর্গঠন কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে। স্থলপথ ও জলপথ উভয়ের উন্নতি সাধন ব্যতীত পণ্য বাজারে লইয়া যাইবার সুবিধা হইতে পারে না। সুতরাং স্থলপথের ও জলপথের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। অজ্ঞতাই অনেক-স্থলে উন্নতির সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। সেই জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতেই হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাগত শিল্প-বিস্তারের উপায় করিতে হইবে।

ফ্রান্সে কিরূপ অর্থব্যয় হইবে, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। বাঙ্গালায় কি হইবে? সুখের বিষয়—আশার কথা, বাঙ্গালার গভর্ণর বলিয়াছেন—পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য যে টাকা প্রয়োজন হইবে, তাহা দিতে হইবে। কিরূপে আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ তৎপরতা সহকারে প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি উপায় স্থির করিয়াছেন। এই কার্য্যে যে সরকারের বহু বিভাগ সংশ্লিষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। কমিশনার সকল বিভাগের সহযোগ-ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তাঁহাকে স্বতন্ত্র-ভাবে কতটা ক্ষমতা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে, তাহার উপর কার্য্যের সাফল্য বহু পরিমাণে নির্ভর করিবে, সন্দেহ নাই।

আমরা মনে করি, বাঙ্গালায়ও পুনর্গঠনের কার্য্য-পদ্ধতি ও সেই পদ্ধতি অনুযায়ী কায করিবার জন্য কালনির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে—অন্ততঃ ৫ বৎসরের মধ্যে ফল দেখিতে না পাইলে এরূপ কাযে লোকের উৎসাহ ও আগ্রহ থাকে না—বিশ্বাসের স্থান সন্দেহ অধিকার করে।

বিজ্ঞান সভা—

যে সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য বাঙ্গালী গর্ব্বানুভব করিতে পারে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভা সে সকলের অন্যতম। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কল্পনা অভিব্যক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রলাল এই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। সেই সময় "জ্ঞানাৎ পরতরোনহি"—লিখিয়া আরম্ভ করিয়া তিনি যে "অনুষ্ঠান পত্র" প্রচার করেন, আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্য সাধনজন্য তিনি "ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা" করেন, "তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।" ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র অনুষ্ঠানপত্রখানি পুনঃপ্রকাশিত করিয়া তাহার অনতিদীর্ঘ আলোচনা করিয়া বলেন—"এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন" এবং বাঙ্গালার লোককে এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে বলেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার মিষ্টার উড্রো যে বাঙ্গালীর বিজ্ঞানানুরাগ শৈথিল্যের কথা বলিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"তিনি কেন একবার স্বজাতীয়গণকে এই মঙ্গলকর কার্য্যের সাহায্য করিতে বলুন না। যদি তালিকাতে একটিও শ্বেতাঙ্গের নাম না প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কত আক্ষেপের বিষয় হইবে!"

মহেন্দ্রলালের উৎসাহ ও উদ্যম যেমন অসাধারণ ছিল, তাঁহার ধৈর্য্যও তেমনই। তিনি চেষ্টা শিথিল করেন নাই এবং শেষে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজ্ঞানসভা স্থাপন করেন। ক্রমে বিজ্ঞান-সভা বাঙ্গালার অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ করে। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফাষ্ট আর্টস" পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন অবশ্যপাঠ্য ছিল এবং কলিকাতার অধিকাংশ কলেজে যন্ত্রাদিসমন্বিত বিজ্ঞান-বিভাগ ছিল না, তখন সেই সকল কলেজের বহু ছাত্র এই বিজ্ঞানসভায় ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিত।

এই বিজ্ঞানসভায়—বিজয়নগরের (মাদ্রাজ) মহারাজা যন্ত্রালয় নির্ম্মাণার্থ ৪০ হাজার টাকা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যন্ত্র ক্রয় জন্য ২৫ হাজার টাকা ও কুচবিহারের মহারাজা শিক্ষকের পারিশ্রমিক জন্য ১৫ হাজার ২ শত টাকা প্রদান

করেন। ইহা ব্যতীত ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ—১ লক্ষ ৬৯ হাজার ২ শত ৭৮ টাকা। কয় বৎসর পূর্ব্বে রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুরের লক্ষ টাকা দানে ইহার ভাণ্ডার পুষ্ট হয়।

মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর ইহার কার্য্য-পরিচালন-ভার তাঁহার পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ইহার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার পর হইতে সার চন্দ্রশেখর রামণ ইহার পরিচালন সমিতির কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করেন। তিনি মাদ্রাজী হইলেও বাঙ্গালার এই প্রতিষ্ঠানে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব প্রদানে কেহ যে আপত্তি করেন নাই, তাহা বাঙ্গালীর প্রাদেশিক ভাবের অভাবেরই পরিচায়ক। কিন্তু তিনি নানা ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় দেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে বিজ্ঞানসভায় মদ্রদেশীয় অধ্যাপক নিয়োগ ঘটে এবং তিনি যে ভাবে পরিচালক-সমিতি গঠিত করেন, তাহাতে সাধারণের পক্ষে সভায় প্রবেশের পথ সঙ্কীর্ণ হয়। তিনি বাঙ্গালোরে চাকরী লইয়া যাইলেও কলিকাতার বিজ্ঞানসভার সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন নাই। সংপ্রতি বিজ্ঞান সঙ্ঘ গঠন ব্যাপারেও তিনি কলিকাতার অর্থাৎ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকদিগের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা কোবিদোচিত হয় নাই।

তিনি বিজ্ঞানসভার নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সম্মতি ব্যতীত কেহ আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন না। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল—যে কেহ ২৫০ টাকা দিলেই ঐ শ্রেণীর সভ্য হইতে পারিবেন। তাঁহার এই প্রস্তাবের বিষয় অবগত হইয়া ঐ চেষ্টা ব্যর্থ করিবার আয়োজন হয় এবং গত জুন মাসে সভার বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব দিন ৬৮ জন বাঙ্গালীর প্রত্যেকে ২৫০ টাকা দিয়া সদস্য হয়েন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সার চন্দ্রশেখর—স্বয়ং বিজ্ঞানচর্চ্চার অজস্র সুবিধার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের নিকট ঋণী হইলেও—ইহার উন্নতির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই সকল সদস্যের সদস্য হইবার অধিকার নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মত আইনবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সভায় পর-বৎসরের জন্য সার নীলরতন সরকারকে সভাপতি ও ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্রকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করা হয়।

আমরা ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী যে বৃহত্তর বাঙ্গালা রচনা করিয়াছিল, তাহা হইতে বাঙ্গালী বিতাড়িত হইতেছে—এমন কি বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও সরকারী চাকরীতে যেমন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে ও চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত হইতে বাঙ্গালীর অধিকার তেমনই সঙ্কোচ করা হইতেছে। বাঙ্গালা এ বিষয়ে যে উদারতা দেখাইয়া আসিয়াছে, সে উদারতা সে আর কোন প্রদেশের কাছে পায় নাই। বরং অন্যান্য প্রদেশ তাহার সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা জাতীয়তার পরিপোষক নহে।

আজ সে সকল কথার আলোচনায় কোন ফল নাই। আমরা আশা করি, অতঃপর বাঙ্গালীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার এই প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর গবেষণাকেন্দ্র হইবে এবং ইহাতে গবেষণা করিয়া মদ্রদেশাগত সার চন্দ্রশেখর রামণ যেমন সমগ্র সভ্যজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তেমনই বাঙ্গালী গবেষকগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন ও বিজ্ঞান সভার গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও সার তারকনাথ পালিত বাঙ্গালার তিনটি বিজ্ঞান-গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙ্গালায় অক্ষয় যশঃ লাভ করিয়াছেন—বাঙ্গালী যেন তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে—আপনারা যশস্বী হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষা-বিভাগে বাঙ্গালী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার হাসান সুরাবর্দ্দীর কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে। তাঁহার স্থানে কে ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কিছুদিন নানা লোক নানা কথা বলিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্র। তিনি পিতার মৃত্যুর পরই বিশ্ববিদ্যালয়ে "ফেলো" নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিয়া আসিবার পর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাদিগের

অন্যতম হইয়াছেন। তিনি মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলারের পদ পাইয়াছেন। এই কার্য্যের দায়িত্ব অসাধারণ। এত অল্প বয়সে আর কেহ পৃথিবীর আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। আমরা আশুতোষের পুত্রকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার অধিকৃত স্থানে অধিষ্ঠিত দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে এই পদ পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমধিক উপকারই হইবে। কারণ, তিনি যে উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, সে উদ্যম ও উৎসাহ পরিণত বয়সে থাকে না। সার আশুতোষ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারকের শ্রমসাধ্য কার্য্য শেষ করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল ভার বহন করিতেন। শ্যামাপ্রসাদ পিতার কার্য্য-পদ্ধতি লক্ষ্য করিবার—তাঁহার নিকট শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন এবং তাহার পর স্বয়ং কার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনও করিয়াছেন। তাঁহার সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সুপ্রযুক্ত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত ত্রুটি দূর করুক, ইহাই আমাদিগের একান্ত কামনা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত ত্রুটি আছে, তাহা আর তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে না—সে সকলের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া শ্যামাপ্রসাদকে কায করিতে হইবে।

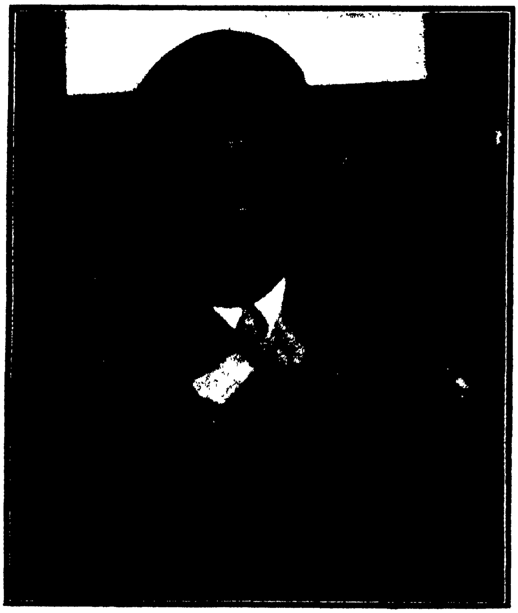
বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিষ্টার উইলকিন্‌সন চার মাস অবসর গ্রহণ করায় ডাইরেক্টার মিষ্টার বটমলী তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শ্রীমান অপূর্ব্বকুমার চন্দ তাঁহার স্থানে ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান হইয়াছেন। এ পদে ইনিই প্রথম বাঙ্গালী নিযুক্ত হইলেন। প্রায় ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন সার্কল ইনস্পেক্টার ছিলেন, সেই সময় তিনি একবার অস্থায়ী ভাবে শিক্ষা কমিটীর সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাহা কতকটা ইহারই অনুরূপ। তদবধি আজ পর্য্যন্ত আর কোন বাঙ্গালীকে—বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃত্বে বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হয় নাই। সেই জন্যও অপূর্ব্বকুমারের নিয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপূর্ব্বকুমার শিলচরের প্রসিদ্ধ উকীল ও বাঙ্গলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র।



শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কামিনীবাবু যৌবনে একটা গুরুতর হত্যার মামলায় যেরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অপূর্ব্বকুমারের জন্ম হয়। তিনি প্রথমে বোলপুর বিদ্যালয়ে ও পরে বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে যাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তথায় তিনি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পাঠ শেষ করিয়া অধ্যাপক রেলের সহিত কায করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চাকরী লইয়া তিনি প্রথমে ঢাকায় অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক থাকিবার সময় কানাডায় শিক্ষা-সম্মিলনে প্রতিনিধিরূপে গমন করেন। প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ও চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া পরে সহকারী ডাইরেক্টারের পদ গ্রহণ করেন।



শ্রীমান্ অপূর্ব্বকুমার চন্দ

আমরা তাঁহার এই নূতন পদলাভ উপলক্ষে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি উত্তরোত্তর যশস্বী হউন।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন বাঙ্গলার শিক্ষা-বিভাগের সহকারী ডাইরেক্টারের পদে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দের স্থান লাভ করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি, উপাধি লাভ করিয়া লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে শিক্ষকের ডিপ্লোমা ও লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এড উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তিনি কয় বৎসর ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার সম্পর্কে ইঁহার কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন মন্ত্রীর কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য জিতেন্দ্রমোহনকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করা হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি লইয়া তিনি বিদেশে শিক্ষা-বিস্তার-ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রমোহন বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত



শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন

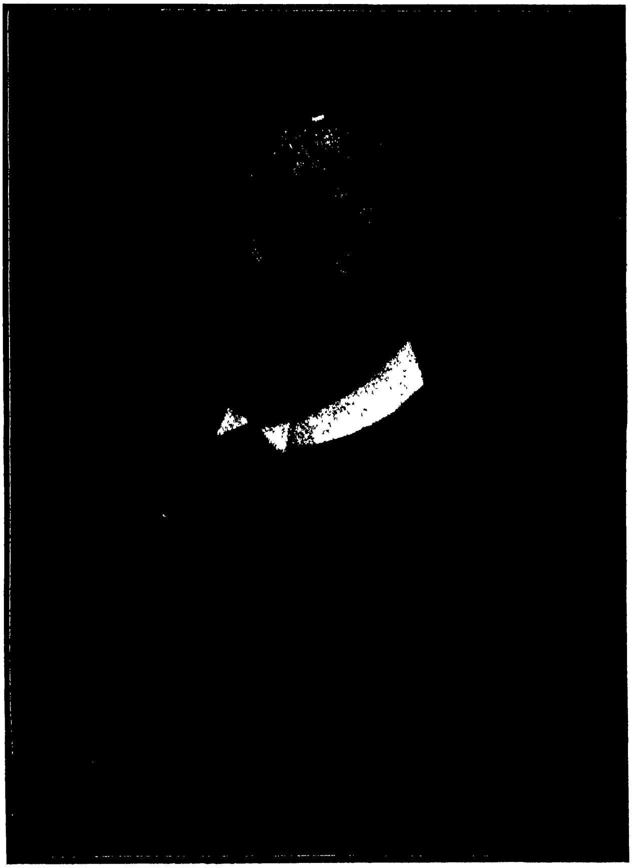
নহেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহার 'মনস্বিতার মাপ' পুস্তক বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে। ইনি শিক্ষা বিষয়ে কয়খানি পুস্তক ইংরাজীতে রচনা করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা আইন, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতি ও ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকে তাঁহার অনুসন্ধিৎসার ও অধ্যয়নের বিশেষ পরিচয় পরিস্ফুট। যত দিন বাঙ্গলায় প্রাথমিক

শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হইবে, তত দিন বাঙ্গালীর উন্নতির পথের বাধা দূর হইবে না। এই শিক্ষা-সমস্যার সমাধানে জিতেন্দ্রমোহনের চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিচারালয়ে বাঙ্গালী

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারকের পদ শূন্য হওয়ায় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই পদে নিযুক্ত করায় বাঙ্গালী বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছে। মন্মথবাবুর পরিচয় বাঙ্গালায় নূতন করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে উকীল রূপে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন এবং এক সময় ফৌজদারী মোকদ্দমায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাহার পর তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অবসর লইবার সময় হইয়া আসিয়াছে। বিচারকরূপে তিনি যে কেবল অসাধারণ আইন-জ্ঞানের পরিচয়ই দিয়াছেন তাহা নহে ; পরন্তু তাঁহার শ্বশুর পরম শ্রদ্ধাভাজন সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অসামান্য ন্যায়নিষ্ঠা তাঁহার কার্য্যে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার প্রধান বিচারকপদ লাভ উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সময় উকীলদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু বলিয়াছিলেন—শত বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতা হাই কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তদবধি ইহা ন্যায়ের মন্দির—দুর্ব্বলের সঙ্গত অধিকার রক্ষাকারী বলিয়া খ্যাতি সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছে। যে কারণেই কেন হউক না, সম্প্রতি লোকের মনে সেই বিশ্বাস বিচলিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে ; এখন মন্মথনাথের নিয়োগে সে সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

আমরা নরেন্দ্রকুমারের কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। মন্মথবাবুর নিয়োগও অস্থায়ী কেন ? কলিকাতা হাইকোর্টে বহু বাঙ্গালী জজ যে বিচারবুদ্ধির ও আইনজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকল বিদেশী জজের অধিকার গত নহে। কিন্তু সার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী জজকে স্থায়ী প্রধান বিচারক করা হয় নাই। সার রমেশচন্দ্র, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সার চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উকীল ও ব্যারিষ্টার জজদিগের কাহাকেও স্থায়ী প্রধান বিচারক করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? ইহাতে মনে



শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়

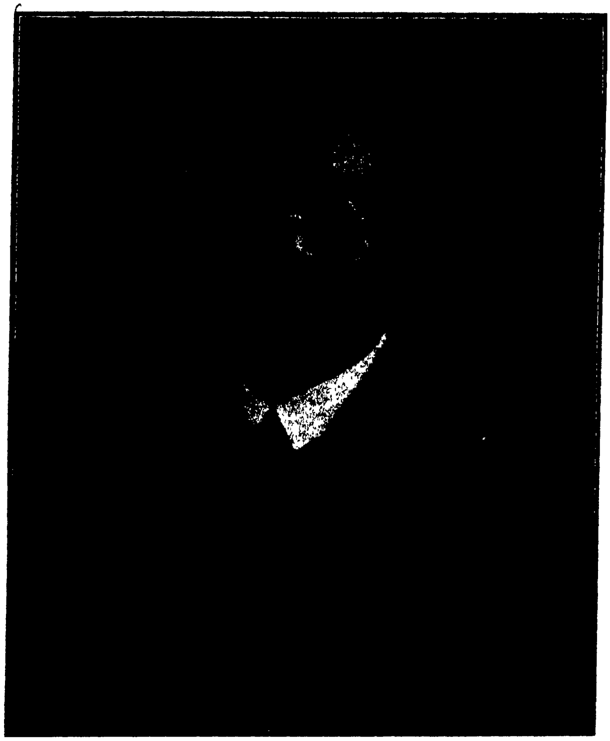
করিবার কারণ থাকিতে পারে না যে, বাঙ্গালী জজ যত উপযুক্তই কেন হউন না, তিনি কখন বিদেশী জজের সমকক্ষ হইতে পারেন না ? ইহাই যদি বাঙ্গালী জজকে স্থায়ী প্রধান বিচারক না করিবার কারণ হয়, তবে ইহাতে আমরা আপত্তি করিব না।

আমরা জানি লর্ড হলডেন বলিয়াছিলেন—যাঁহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান আইন লইয়া কায করিতে হয়, তাঁহারা কেন যে বিলাতে আসিয়া অনেক অর্থব্যয় করিয়া ব্যারিষ্টার হয়েন, তাহাই বুঝিতে পারা যায় না। সেই প্রসঙ্গে তিনি এ দেশের সাবজজদিগের রায়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজরা সর্ব্ববিধ মামলায় সুবিচার করিতে পারেন, অস্থায়ী ভাবে তাঁহারা প্রধান বিচারকের কাজ করিতে পারেন, কেবল স্থায়ী প্রধান বিচারক হইতে পারেন না—ইহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা মনে করি, এ বিষয়ে বাঙ্গালী জজদিগের প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, তাহা লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর।

বাঙ্গালীর নূতন পদ—

ভারতবর্ষীয় কোম্পানী আইন (Indian Companies Act) এবং বীমা আইন (Insurance Act) এই দুইটি আইনকে বর্ত্তমানকালের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ভারত গবর্ণমেণ্ট সুবিখ্যাত দত্ত, সেন এণ্ড কোম্পানীর কর্ণধার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন এম-এল-এ মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান সুশীলচন্দ্র সেন এম-এসসি, বি-এল, এটর্ণী-এট-ল'কে এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই এই পদে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পদের মাসিক বেতন তিন হাজার টাকা। সুশীলচন্দ্র আগামী সেপ্টেম্বর মাসে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহার বয়স অধিক নহে; এই বয়সেই তিনি আইনে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাতে, তিনি যে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাঁহার এই পদ প্রাপ্তি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয়। আমরা তাঁহার এই উচ্চ পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহাকে সানন্দে অভিনন্দন জানাইতেছি। আর এই নিয়োগ হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আইন-জ্ঞানে এবং আইন-ব্যবসায় পরিচালনে বাঙ্গালী এখনও ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

—



শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র সেন

বোম্বাইয়ে বাঙ্গালী জজ—

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টে ইনিই প্রথম বাঙ্গালী জজ। এ দেশের যুবকদিগের মধ্যে যিনি প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কবিবর মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—

"সুরপুরে সশরীরে শূর-কুলপতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্যবলে
ফিরিলা কাননবাসে, তুমি হে তেমতি
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী
ধন্য ভাগ্য, হে সুভাগ্য তব ভব-তলে"

সেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোম্বাই প্রদেশে জজ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তথায় হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন নাই। শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না ঘোষালও তথায় হাইকোর্টের জজ হয়েন নাই। সে হিসাবে বাঙ্গালী ক্ষিতীশচন্দ্রের নিয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্ষিতীশচন্দ্র পঠদ্দশায় মনীষার পরিচয় দেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও এফ-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েন। পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি



শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

কলেজ হইতে ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে গমন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পঠদ্দশায় তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের মাসিকপত্র সম্পাদন করেন। বিলাতে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইংরাজী রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাইয়ে চাকরী আরম্ভ করেন।

তিনি টানা, বেলগাঁও প্রভৃতি স্থানে ও সিন্ধু—হায়দ্রাবাদে জজের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের, বোম্বাই সরকারের ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্‌ব্র্যানসার ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারীর কাযও করিয়াছেন। হায়দ্রাবাদে দায়রা জজের কায করিয়া তিনি ছুটি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পত্নী ও কন্যাদ্বয় তখন তথায় ছিলেন।

এই সময় বোম্বাই হাইকোর্টে একজন জজের পদ শূন্য হইলে তাঁহাকে ঐ পদ দিয়া ছুটী হইতে আনান হইয়াছে।

ক্ষিতীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন এখন বাঙ্গালায় স্বায়ত্ত-শাসন-বিভাগে "স্পেশ্যাল অফিসার।"

ভারতের সকল প্রদেশে—বাঙ্গালার বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী আপনাদিগের প্রতিভাবলে বাঙ্গালার যশঃ রক্ষা করিতেছেন—ক্ষিতীশচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা আশা করি, নূতন পদে তিনি যশঃ অর্জ্জন করিবেন।

বাঙ্গালী হঠযোগীর কৃতিত্ব—

কিছুদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজী হঠযোগী নরসিংহ স্বামী নাইট্রিক এসিড, ষ্ট্রীকনাইন, কাচ, পেরেক ইত্যাদি ভক্ষণ



হঠযোগী গগানন্দ স্বামী

করিয়া কলিকাতাবাসীদিগকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে। আমরা এক্ষণে একজন বাঙ্গালী হঠযোগীর সহিত পাঠক-পাঠিকার পরিচয় করাইয়া দিতেছি। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ লাহিড়ী

ওরফে স্বামী খগানন্দ। ইনিও নরসিংহ স্বামীর অনুরূপ ক্ষমতাপন্ন। গত ২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রেল ১৯৩৪) স্বামী খগানন্দ স্যার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর সমক্ষে তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। প্রথমে তিনি একটা কাচের গ্লাস চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করেন। তৎপরে উগ্র নাইট্রিক এসিড আনীত হইল। একটা কাচের প্লেটের উপর পয়সা রাখিয়া তাহার উপর ঐ নাইট্রিক এসিড ঢালিয়া তাহার উগ্রতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইল। পয়সার উপর এসিড পড়িবা-মাত্র তামা ও এসিড সংযুক্ত হইয়া ফস্‌-ফস্ শব্দ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।. তার পর স্বামীজী এই উগ্র এসিড প্রায় অর্দ্ধ আউন্স আন্দাজ হাতের তালুতে ঢালিয়া লইয়া মধুর ন্যায় লেহন করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। নরসিংহ স্বামী এই সকল দ্রব্য খাইবার পর হঠযোগের প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিতেন। স্বামী খগানন্দ এই সমস্তই হজম করিয়া ফেলেন। ইনি বলেন, ইনি তিন দিন মাটীর ভিতর শ্বাসরোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন। প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যেও তিনি থাকিতে পারেন বলিয়াও শুনা যায়। খগানন্দ স্বামী ভারতের বহু স্থানে সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে তাঁহার এই অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। গত ১৪ই জুলাই ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটেও তাঁহার এক প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। ৬০ বৎসর বয়সেও তিনি যুবকের ন্যায় সুস্থ, সবল ও সমর্থ। তাঁহার জন্মস্থান চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার মালঙ্গপাড়া গ্রামে। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা, মাণিকতলা, ১৬নং বারিক লেনে অবস্থিতি করিতেছেন। মান্দ্রাজী ও বাঙ্গালী এই দুই স্বামীর কার্য্যকলাপ বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, যোগশাস্ত্র এবং তন্ত্রমন্ত্র নেহাৎ বুজরুকী ব্যাপার নহে।

বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা—

প্রাথমিক শিক্ষা বর্ত্তমানে সকল সভ্য দেশেই অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইতেছে। বাঙ্গলায় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা কিছুদিন হইতে হইতেছে এবং সেজন্য আবশ্যক অনুসন্ধানও হইয়াছে—আইনও প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু আবশ্যক অর্থের অভাবে এখনও আইনানুসারে কায করা সম্ভব হয় নাই। সংপ্রতি বাঙ্গলার প্রেস অফিসার বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক ব্যয়—বালকদিগের জন্য ৬৭ লক্ষ ও বালিকাদিগের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। প্রায় ৪৪ হাজার ৬ শত প্রাথমিক স্কুলে ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার বালক এবং প্রায় ১৮ হাজার স্কুলে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার বালিকা শিক্ষালাভ করে। যে প্রায় ৮২ লক্ষ টাকা বৎসরে ব্যয় হয়, তাহার মধ্যে সরকার প্রদান করেন—প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা; জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলি হইতে প্রায় ২০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছাত্রদত্ত বেতন—দান প্রভৃতি হইতে আসিয়া থাকে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গড় বার্ষিক ব্যয় ১ শত ৩০ টাকা এবং প্রত্যেক ছাত্রের জন্য গড় ব্যয় প্রায় ৩ টাকা ৮ আনা।

বাঙ্গলার লোক-সংখ্যার হিসাব ধরিলে দেখা যায় শিক্ষার্থীর বয়সের বালকদিগের শতকরা প্রায় ৫০ জন ও বালিকাদিগের শতকরা প্রায় ১৩ জন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে।

মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যায় মনে হয় প্রত্যেক ২ বর্গ মাইলেরও কম স্থানে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। ইহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়-গুলির স্থান নির্দ্দেশ সর্ব্বত্র দূরত্বানুসারে না হওয়ায় কোন কোন স্থানে বিদ্যালয়ের অভাব অনুভূত হয়। গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা—৩৮; এই সংখ্যা যদি বাড়াইয়া ৭০ হইতে ৮০ করা যায়, তবে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ স্কুল আছে, তাহাতেই বাঙ্গলার বালক বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। কিন্তু সেজন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হয়।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যায় বটে, বাঙ্গলার শিক্ষালাভের বয়সের বালকদিগের শতকরা ৪৫ জন বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, শতকরা ৪ বা ৫ জন ছাত্র মাত্র নিম্নতম শ্রেণী হইতে উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকে—অবশিষ্ট ৯৫ জন পাঁচ বৎসর শিক্ষা সম্পূর্ণ করে না। প্রথম অন্ততঃ চার বৎসর পাঠ না করিলে শিক্ষার্থীকে বর্ণজ্ঞান সম্পন্ন বলা যায় না। ছাত্রের অভাব জন্য অনেক প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে নিম্নতর শ্রেণীত্রয় ব্যতীত শ্রেণীর ব্যবস্থা নাই এবং তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেও তাহাদিগের দ্বারা শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং কি উপায়ে ছাত্রদিগকে পাঁচ বৎসরে পাঠ শেষ করিতে প্রবৃত্ত করান যায়, তাহাই বিবেচ্য। বলা বাহুল্য—দারিদ্র্য বালক-বালিকাদিগকে পাঁচ বৎসর বিদ্যালয়ে না রাখিবার প্রধান কারণ। সেই জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার প্রস্তাব। বিদ্যালয়গুলিতে যাহাতে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয়, সে বিষয়েও আবশ্যক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের প্রথম ফল—পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কুলের ব্যবস্থা। তখনও ইউনিয়ন বোর্ড সৃষ্ট হয় নাই। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক পঞ্চায়েতী ইউনিয়নে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখিবার কথা। উহার কর্তৃত্ব জিলাবোর্ডের। সরকার প্রত্যেক স্কুলের জন্য এককালীন এক হাজার টাকা দিবেন এবং শিক্ষকের বেতন ও গৃহ-সংস্কারের ব্যয়ের দুইতৃতীয়াংশ সরকার দিবেন। বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর চার হাজার স্কুল আছে। এ সব স্কুলে শিক্ষা অবৈতনিক নহে।

মিষ্টার বিস সরকার কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারোপায় সন্ধানের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যেরূপ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, তাহাতে বিদ্যালয়ের ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ সরকার ও অপরার্দ্ধ জিলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটী বহন করেন। দুঃখের বিষয় চট্টগ্রাম, বহরমপুর, বর্দ্ধমান, হাওড়া, রংপুর, ঢাকা, আসানসোল ও বজবজ মিউনিসিপ্যালিটী ব্যতীত অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় প্রদান করে নাই। এ বিষয়ে জিলাবোর্ডগুলি অধিক তৎপরতার পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ শত ৫০ অপেক্ষা কিছু অধিক। কলিকাতা কর্পোরেশন আপনারা স্বতন্ত্র-ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রায় ২ শত ৩০টি বিদ্যালয় পরিচালিত করিতেছে। বিসের পদ্ধতিতে পরিচালিত কলিকাতা কর্পোরেশনের বিদ্যালয়গুলি লোকপ্রিয় হইয়াছে। তাহার কারণ—এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপযুক্ত বেতন পাইয়া থাকেন এবং শিক্ষার্থী-দিগকে বেতন দিতে হয় না।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় আইন ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়—

(১) শিক্ষা-কর স্থাপিত করিয়া সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করা;

(২) শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা;

(৩) যে স্থানে শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, তথায় শিক্ষা অবৈতনিক করা;

(৪) প্রত্যেক জিলায় প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ জন্য জিলা-স্কুল-বোর্ড স্থাপন।

আর্থিক দুরবস্থা হেতু লোক কর দিতে কষ্ট বোধ করে বলিয়া এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিলম্ব অনিবার্য্য বুঝিয়া সরকার স্থির করেন—যে সব জিলায় জিলাবোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব ও জিলাবোর্ডের শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ স্কুল বোর্ডকে দিবে, কেবল সেই জিলাতেই আইনানুযায়ী পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে।

যে সকল জিলা এই পদ্ধতি অবলম্বন করিবে সে সব জিলায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে; কারণ, সে সব জিলায় শিক্ষাকর স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্দ্দেশ, শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ণয় প্রভৃতি হইয়া যাইবে এবং কর স্থাপিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে নূতন ব্যবস্থায় কায হইতে থাকিবে। এখন স্কুল বোর্ডকে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ভার দিলে জিলাবোর্ডগুলির কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি নাই।

যত দিন নূতন শিক্ষাকর আদায় আরম্ভ না হয়, ততদিন আবশ্যক অর্থের অভাব অনুভূত হইবেই। সরকার স্থির করিয়াছেন, স্কুল বোর্ডের কার্য্যালয়ের ব্যয় প্রভৃতি নির্ব্বাহ জন্য তাঁহারা অগ্রিম টাকা দিবেন ও শিক্ষাকর আদায় আরম্ভ হইলে তাহা পরিশোধ হইবে। সরকার জিলায় পল্লীগ্রামে শিক্ষার জন্য যে ব্যয় করেন, তাহাও বোর্ডকে দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাবানুসারে বীরভূম, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম—এই সাতটি জিলায় কায হইতেছে। ঢাকা ও নদীয়া জিলাদ্বয়ও এই প্রস্তাবানুসারে কায করিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

যে সাতটি জিলায় এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, সেইগুলিতে সরকার তাঁহাদিগের অংশ হিসাবে ৬, লক্ষ ৪৫ হাজার ২ শত ২ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই

কয়টি জিলায় ২৫ হাজার বিদ্যালয় বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে।

প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী সরকার ঘোষণা করেন—

সরকারের অভিপ্রায় এই যে, অতঃপর যাহাতে কোন পল্লীগ্রামে অজ্ঞ পরিবার ও কোন পরিবারে অজ্ঞ লোক না থাকে, সেইভাবে শিক্ষা-বিস্তার করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে জাপান প্রায় বর্ণজ্ঞানহীনতা নির্ব্বাসিত করিয়াছে।

সমগ্র ভারতের কথা ত্যাগ করিয়া আমরা আজ বাঙ্গলার কথাই বলিব। যাহাতে আগামী বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার প্রত্যেক অধিবাসী প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয় —কোন গ্রামে অজ্ঞ পরিবার ও কোন পরিবারে অজ্ঞ লোক না থাকে—তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙ্গলা সরকার ইহার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন; বাঙ্গলার লোক ইহার জন্য আগ্রহশীল। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে কেন?

বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া—

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, তাহা ভুক্তভোগী বাঙ্গালীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়—এই বৎসর বাঙ্গালায় এগার লক্ষ তের হাজার তিন শত বারো জন লোকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুসংখ্যার হিসাব—

কলেরায় (সহরে)	৩,১৩৩	জন
" (মফঃস্বলে)	৭৫,৭৪০	"
বসন্তে	৯,২০৭	"
জ্বরে	৭,৩১,৭০৪	"

ম্যালেরিয়া জ্বরই বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক-ক্ষয়কর। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে তিন লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার এক শত এগার জনের মৃত্যু হইয়াছিল। এদেশে গভর্ণর হইয়া আসিয়া লর্ড রোণাল্ডসে বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই যে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষ হইতে চার লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাই বাঙ্গালার ক্ষতির পরিমাণ নহে। কারণ, সম্ভবতঃ যে স্থলে এক জনের মৃত্যু ঘটে, সে স্থানে শত জন ম্যালেরিয়ায় পীড়িত হয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, ইহাতে বাঙ্গালার লোক বৎসরে ২০,০০,০০০,০০০ দিন রোগ ভোগ করে। দেশের আর্থিক দুর্গতির ইহা যে প্রবল কারণ তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? কোন কোন জিলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ম্যালেরিয়ায় যাহারা পীড়িত তাহাদিগের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং উদ্যম থাকে না।

বাঙ্গালা সরকার যে ম্যালেরিয়ার এই প্রকোপ লক্ষ্য করেন না, এমন নহে। তাঁহারা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার জন্য কুইনাইন বিতরণ করেন। কিন্তু যে ঔষধ বিতরণ করা হয়, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। কারণ, আমরা যে বৎসরের হিসাবের আলোচনা করিলাম, তাহার পূর্ব্ব বৎসর (১৯৩০ খৃষ্টাব্দে) বিলাতে পার্লামেণ্টের সদস্য মেজর গ্রাহাম পোল ভারতবর্ষের বোটানিকাল সার্ভের ডাইরেক্টারের বার্ষিক বিবরণ হইতে দেখান, ভারতবর্ষের লোক এত দরিদ্র যে, তাহারা কুইনাইন কিনিতে পারে না এবং বহু দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার্থ আগত রোগীদিগকে যথেষ্ট কুইনাইনযুক্ত ঔষধ দেওয়া যায় না।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হাণ্টার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থার প্রয়োজন এদেশে যত অধিক তত আর কোথাও নহে; অথচ সরকারের অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতে যেমন সে জন্য অর্থের অভাব ঘটে, তেমনই দেশের লোকের অজ্ঞতা নানা উন্নতিজনক কার্য্য পরিচালন পথে বাধা স্থাপিত করে।

লোক যে এখন স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ চাহিতেছে, তাহার প্রমাণও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিভাগের বার্ষিক বিবরণে পাওয়া যায়। সরকারের এই বিভাগ যে প্রচারকার্য্য পরিচালন করেন তাহার জন্য দেশের লোকের আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং যে স্থানেই প্রদর্শনী বা মেলা হয় সেই স্থানেই অনুষ্ঠাতারা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগকে লোককে শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে বলেন।

সংপ্রতি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দমনের জন্য যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার বিবরণ বাঙ্গালীর নিকট আদরণীয় হইবে। এতদিন ম্যালেরিয়াবাহী মশক নাশ করিবার দিকেই

অধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইত। গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্স ন বর্দ্ধমানে বলেন—এখন দেখা গিয়াছে, কুইনাইন সেবনে মানবদেহে ম্যালেরিয়ার বিষ জমিয়া যায় ও তাহার অস্তিত্ব সহজে উপলব্ধ হয় না বটে, কিন্তু লুপ্ত হয় না—কাযেই সেরূপ লোককে দংশন করিয়াও ম্যালেরিয়াবাহী মশক ম্যালেরিয়ার বিষ বিসর্পিত করিতে পারে। এখন একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যদি কেহ তিন দিন কুইনাইনের সঙ্গে এই ঔষধ—(প্লাসমোচিন) সেবন করে, তবে তাহাকে দংশন করিলে মশক আর তাহার দেহ হইতে ম্যালেরিয়ার বিষ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

সরকার কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় পঞ্চাশ বর্গ মাইল স্থানে ইহার ফল পরীক্ষা করিতে সঙ্কল্প করেন। সেদিন স্বাস্থ্য-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এক বৎসর এই ঔষধ ব্যবহারের ফল বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা ইহা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য বিবৃত করিব—ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে জ্বর প্রকাশের পরই এই ঔষধ প্রয়োগের উদ্দেশ্য—(১) শীঘ্র শীঘ্র তাহাকে সুস্থ করা; (২) তাহার রোগ ভোগকাল স্বল্প করা; (৩) সে যত দিন অকর্ম্মণ্য থাকে তাহার পরিমাণ হ্রাস করা; (৪) যাহাতে অন্য কোন লোক (তাহার নিকট হইতে মশক কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিষে) রোগাক্রান্ত না হয়, তাহা করা।

দেখা গিয়াছে, যে প্রায় ৪৪ বর্গ মাইল স্থানে পরীক্ষা হইতেছে তাহার লোকসংখ্যা প্রায় ২১ হাজার। এই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী বাসাৎপুর গ্রামে যে স্থানে গত নভেম্বর মাসে শতকরা পঞ্চাশজন রোগী ম্যালেরিয়ায় কষ্ট পাইয়াছে পরীক্ষার স্থানে সেস্থলে শতকরা ১৬ জন মাত্র রোগ ভোগ করিয়াছে। গত পূর্ব্ব জুলাই মাস হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ছয়টি চিকিৎসালয়ে জ্বর রোগীর সংখ্যা এক হাজার তিন শত ছেষট্টি হইতে দু হাজার পাঁচ শত তেষট্টি হইয়াছিল; আর পরীক্ষার স্থানে জুলাই মাসে রোগীর সংখ্যা এক হাজার আটান্ন থাকিলেও নভেম্বর মাসে নয় শত ছেষট্টি হইয়াছিল। দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালক-বালিকার রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়—পরীক্ষার স্থানে শতকরা সতের জনের ও বাহিরে তেত্রিশ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গিয়াছিল। বিশেষ পরীক্ষার স্থানে উগ্র (malignant tertian) ম্যালেরিয়া উৎপাদক জীবাণুর সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায়।

এক বৎসরের পরীক্ষার ফলে কোন কিছুর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সেরূপ সিদ্ধান্তে নির্ভর করিয়া কাজ করিলে অনেক সময় অর্থের ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র হয়। কিন্তু এই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবে ইহার প্রসার বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, ছয় বৎসর বার্ষিক তেরো লক্ষ টাকা হিসাবে ব্যয় করিলে, অর্থাৎ মোট আটাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে ইহার ফলে বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানসমূহে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই ব্যয় কখনই অধিক বিবেচনা করা যায় না।

মেদিনীপুরে কতকটা স্থানে সেচের ব্যবস্থায় এক বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ প্রশমনের সংবাদ আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে দিয়াছি।

যে সকল উপায়ে বাঙ্গালাকে ব্যাধিমুক্ত করা যায়, সে সব উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ উপায় সর্ব্বাপেক্ষা ফলোপধায়ক তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্স ন বলিয়াছেন, বাঙ্গলার স্বাস্থ্যের পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন জন্য আবশ্যক অর্থ দিতেই হইবে। তিনি ও তাঁহার সরকার বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, ভগ্ন-স্বাস্থ্য লোকের দ্বারা কোন কষ্টসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতেই হইবে। সেই উন্নতি সাধনের প্রথম সোপান—বাঙ্গলা হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়ন। ম্যালেরিয়া যে নিবারণ করা যায়, তাহা অন্যান্য দেশে প্রমাণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে, বাঙ্গলায় তাহা অসম্ভব হইবে কেন?

কয় বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে এক সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বাঙ্গলার স্বাস্থ্যোন্নতি-সম্পর্কে সরকারের কার্পণ্যের

উল্লেখ করিয়াছিলেন; কারণ, অন্যান্য বিভাগেই সব রাজস্ব ব্যয়িত হইয়া যায়। বাঙ্গলা সরকার এতদিন দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন শাসন-সংস্কার প্রস্তাবে তাহা কতকটা দূর হইবে। আমরা আরও অর্থ চাহি; বাঙ্গলা সরকারও তাহাই বলিয়াছেন। বাঙ্গলায় সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য অর্থব্যয় প্রয়োজন।

তরুণ ব্যায়াম-শিল্পী—

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা একটি তরুণ উদীয়মান ব্যায়াম-শিল্পীকে 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের সহিত পরিচিত করাইয়া দিতেছি। শ্রীমান মুরারিমোহন বসু



শ্রীমান্ মুরারিমোহন বসু

বাল্যকাল হইতে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত সিমলা ব্যায়াম-সমিতিতে ব্যায়াম অভ্যাস করিতেন। গত ৭ই বৈশাখ রামমোহন লাইব্রেরী হলে বয়েজ এথ্‌লেটিক ক্লাবের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় শ্রীমান মুরারিমোহন একটি সিকি ইঞ্চি পুরু তিন ইঞ্চি চওড়া এগার ফিট লম্বা লৌহপাত অবলীলাক্রমে বক্র করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া একটি রৌপ্যপদক উপহার প্রাপ্ত হন। শ্রীমান মুরারি মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক। ইতোমধ্যেই তিনি কুস্তি, যুযুৎসু, বড় লাঠি, ছোট লাঠি, ছোরা ইত্যাদি খেলায় ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার কল্যাণ হউক।

পরলোকে পুণ্যবতী মহিলা—

বিগত ১১ই শ্রাবণ রাত্রে কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট নিবাসী প্রধান জমিদার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ত্রাণদাসুন্দরী দেবী বৈদ্যনাথধামে পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স উনসত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্বামী, পাঁচটী কৃতি পুত্র, দুইটী কন্যা এবং অনেকগুলি পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ ধার্ম্মিকা ও দয়াবতী মহিলা ছিলেন এবং সংসারে সুদীর্ঘ জীবনে কখনও



স্বর্গীয়া ত্রাণদাসুন্দরী দেবী

কোন শোক পান নাই। সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটে একটী মহিলা চিকিৎসালয় ও মাতৃসদন স্থাপনার জন্য তিনি দশ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন এবং মৃত্যুকালে ঐ কার্য্যের জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। কাটোয়া মহকুমার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র মহিলা চিকিৎসালয় হইবে। দুঃখের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানটীর কার্য্যারম্ভও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী—

বিগত ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার মহাত্মা গান্ধী তিন দিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এবার যখন ভারত-ভ্রমণে বাহির হন, তখন বাঙ্গালা দেশও তাঁহার ভ্রমণ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং এখানে উদ্যোগ-আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু নানা কারণে তাহা না হইলেও বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার হরিজন ভাণ্ডারে এই তিন দিনের মধ্যেই ৭১ হাজার টাকা দান করিয়াছে। কলিকাতা করপোরেশন ৫ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে চারিটার সময় টাউন হলে মহাত্মাকে একখানি মানপত্র প্রদান করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ছয়টার সময় দেশবন্ধু পার্কে মহাত্মার সংবর্দ্ধনার জন্য প্রায়



দেশবন্ধুপার্কে মহাত্মা-গান্ধী

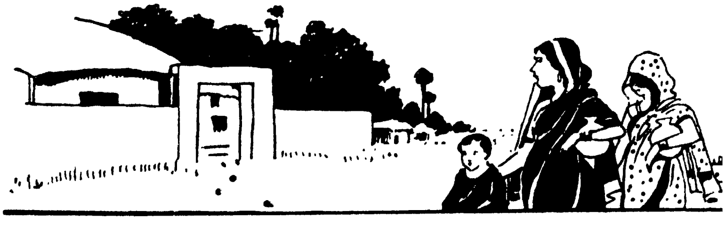
তাঁহার বাঙ্গালা-দেশ ভ্রমণ-সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। তাহার পর, বাঙ্গালা দেশের কনগ্রেসী দলের মধ্যে যে মতান্তর ও মনান্তর চলিতেছে, তাহার মীমাংসা করিবার জন্যই মহাত্মা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশের আর কোথাও যান নাই। হরিজন ব্যাপার এ আগমনের কারণ নহে। লক্ষাধিক লোক-সমাগম হয়। মহাত্মা হিন্দী ভাষায় সকলকে উপদেশ দান করেন। সেই রাত্রিতেই মহাত্মা কলিকাতা ত্যাগ করেন। তিনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, কনগ্রেসের সেই দলাদলির মীমাংসা কিন্তু তিনি করিতে পারেন নাই।



জীবনলাল-ভবনে মহাত্মা গান্ধী

পরলোকে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—

গত ৬ই শ্রাবণ (১৩৪১) রবিবার মৈমনসিংহ—মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় ১৫ দিনের জ্বরে লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু মৈমনসিংহ অঞ্চলে সর্ব্বজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর সংবাদে মৈমনসিংহ জেলার আবালবৃদ্ধ-বণিতা শোকার্ত্ত হইয়াছেন। তিনি মৈমনসিংহ জেলার লোকহিতকর সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি মৈমনসিংহ হিন্দুসভার এবং নারীরক্ষা সমিতির সভাপতি এবং মৈমনসিংহ জমিদার-সভার সম্পাদক ছিলেন। এই শেষোক্ত সভাও তিনিই গঠন করিয়াছিলেন। তিনি বিপন্নের সহায় ও আশ্রয় ছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু সাধারণ্যে মদনবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। মৈমনসিংহের আচার্য্য চৌধুরী বংশ যে জন্য ভারত-বিখ্যাত সেই শিকার ক্রীড়াতেও ব্রজেন্দ্রবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। "শিকার-কাহিনী" নামে তাঁহার রচিত শিকারানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই সুখপাঠ্য একখানি গ্রন্থ আছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।



খেলাধূলা

শীল্ড খেলা ঃ

শীল্ড খেলা এবার আর শেষ হলো না। ১৯৩৪ সালে শীল্ড অজেয় হয়ে রইল। অত্যন্ত অপ্রিয় ও unsporting ভাবে শীল্ডখেলা বন্ধ হয়েছে। শেষের দিকে মনে হয়েছিল যে এবার স্থানীয় দলের মধ্যেই কেহ না কেহ শীল্ড জয় করে ন' বছর পরে শীল্ড কলিকাতায় রাখতে সমক্ষ হবে। কার্য্যতঃ হয়ে এসেছিলোও তাই। এবার স্থানীয় দুই গোরার দল কে, আর, আর ও ডি, এল, আই ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনাল খেলাও ৩০শে জুলাই তারিখে হয়। দু'পক্ষ দু'টি করে গোল দিলে খেলা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়। পরদিন খেলা হবার কথা, কিন্তু দু'পুরে সহরে রাষ্ট্র হয়ে পড়লো যে দুই দলই ফাইনালের পুনর্ব্বার খেলায় আর যোগ দেবে না। ১৮৯৩ সাল থেকে ৪১ বৎসর শীল্ড খেলা হচ্ছে, এরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে খেলা কখনও বন্ধ হয়নি। ফাইনালে গোরা-দলের এই অসহযোগ নীতি অবলম্বনের কারণ খারাপ রেফারিং।



আই এফ এ শীল্ড

ফাইনালে রেফারি এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ পি, গুপ্ত রেফারি ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ রেফারি বলে পরিচিত। বহু ম্যাচে রেফারি হয়েছেন। ভুল ভ্রান্তি যে করেন নি তা বলতে পারি না। তবে মোটের উপর তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর রেফারি। সে দিনের খেলায় কে, আর, আর দল (২—১) গোলে জিতছিলো। খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও, রেফারির বাঁশি বাজলোনা। অনেকে সময় শেষ হয়েছে দেখে বেরিয়ে যেতে লাগলো, তবু বাঁশি বাজে না। প্রায় দুই মিনিট অতীত হয়ে গেল, যাঁরা তখনও খেলা দেখছেন, চেঁচিয়ে উঠলেন পেনালটি দিয়েছে বলে। যাঁরা চলে যাচ্ছিলেন, আবার ফিরে গ্যালারিতে দাঁড়ালেন। পেনালটি নয়—পেনালটি এলাকার বাইরে ফ্রি কিক্। রেফারি ধীরে ধীরে পা মেপে কে আর আর দলের খেলোয়াড়দের নিয়মানু-যায়ী দশগজ ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগলেন। ভাবলুম বুঝি বল মারবার আগেই বাঁশি দিয়ে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া করে খেলা শেষ করে দেবেন। না তা নয়—বাঁশি দিয়ে স্যুট্ করতে নির্দ্দেশ দিলেন, স্যুট্ হ'লো—আর সেই স্যুটে গোলও হয়ে গেল। ভাগ্য বলে ডারহাম হার খেলা উত্তীর্ণ সময়ে ড্র করলে। অনেকের মতে ঐ ফ্রি কিকটি দেওয়াও অন্যায় হয়েছিল। কারণ ডারহামের লোকই অন্যায় ধাক্কা মেরে কে. আর আরের খেলোয়াড়কে ফেলে দিলে তার হাতে বল লাগে। ফ্রি কিক্ দিতে হলে ডারহামের বিপক্ষেই দিতে হয়। ঐ দিন প্রথম গোল দেয় ডারহামস্। সে গোল সম্বন্ধেও গণ্ডগোল হয়েছিল। রেফারি গোল না দিয়ে কর্ণার দেন। ডারহামদের খেলোয়াড়রা রেফারিকে লাইনস্ ম্যানদের গোল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে অনুরোধ করে। লাইসম্যান গোল হ'য়েছে বললে, রেফারি গোল নির্দ্দেশ করেন। ভুল

বুঝতে পারলে, সংশোধন করায় অপযশ হয়না। আমরা পূর্ব্বেও এ কথা বলেছি। ঐ গোল যে হয়েছিল তা রেফারি ছাড়া ঐ গোলের দিকের অধিকাংশ লোকই দেখতে পেয়েছিলেন, এমন কি দূরস্থিত প্রেস বক্স থেকেও উহা স্পষ্ট লক্ষিত হয়েছিল।

খেলার শেষে, কে আর আর দল প্রতিবাদ করে ; কিন্তু তা টিঁকে না। কারণ, নিয়মই হচ্ছে যে রেফারির মতামতই চূড়ান্ত। অতএব পরদিন খেলা হবে বলে ঘোষিত হলো। কে আর আর অন্য রেফারি চেয়েছিল তাহাও দেওয়া হলো না। গোরাদলের কমাণ্ডাররা মিলিত হয়ে স্থির করেন যে দু'দলই ফাইনাল খেলা থেকে প্রত্যাহার করবেন। সেই অনুযায়ী বাঙ্গলা ও আসাম বিভাগের মিলিটারীদের জি ও সী জেনারাল বেথল আই এফ এ কে পত্রাঘাত করে জানান যে ফাইনালে রেফারিং অবর্ণনীয় ও অসন্তোষজনক হয়েছে, সেই কারণে দু'পক্ষই আর শীল্ড ফাইনাল খেলায় যোগ দেবে না। তিনি আরো ভয় দেখিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে ভাল রেফারিং হ'বে এই গ্যারাণ্টি না দিলে তিনি আর্ম্মি কণ্ট্রোল বোর্ডকে জানাতে বাধ্য হবেন যে কোন মিলিটারী দলকে যেন ভবিষ্যতে শীল্ড বা লীগ খেলায় যোগ দিতে না দেওয়া হয়। আই এফ এ কাউন্সিলের জরুরী মিটিংএ তারা রেফারিং যে নির্দ্দোষ হয়নি তা' স্বীকার করেছেন। এবং ভবিষ্যতে যাতে রেফারিং উন্নততরো হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন বলেছেন, এমন কি বিলাত থেকে পেশাদার রেফারি আনার বিষয়েও ভাববেন বলে জেনারেল বেথলকে জানিয়েছেন। দু'দলই ফাইনাল খেলা থেকে প্রত্যাহার করাতে ১৯৩৪ সালের শীল্ড খেলা বাতিল করে দিতে বাধ্য হলেন। আই এফ এ যদি প্রথমে তাদের জিদ্ বজায় রাখতে চেষ্টা না করতেন তবে এইরকম অপ্রিয় ব্যাপার মোটেই ঘটতো না। কে আর আর-এর প্রতিবাদের প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল অন্যায় রেফারিং এবং তারা অন্য সুদক্ষ রেফারি দ্বারা দ্বিতীয় দিনের খেলা তদারক করবার আবেদনও করেন।



ডারহামস্ লাইট্ ইন্‌ফেন্ট্রি —কাঞ্চন

কিন্তু, আই এফ এ তাও মঞ্জুর করেন নি। আইনে যদিও আছে যে রেফারির মীমাংসাই চরম; কিন্তু যদি দেখা যায় তাতে সত্যই ভুল ছিল, পুনর্ব্বার খেলার দিনও উভয় দলের আপত্তি সত্ত্বেও তাকেই রেফারি রাখতে হবে ইহা অনুচিত। শীল্ড খেলায় রেফারিং যে খুব উৎকৃষ্ট হয় নি, বহু ভুলচুক ঘটেছে তা' সর্ব্ববাদী সম্মত।

আমরা আই এফ এর জিদের আর গোরাদলের খেলা থেকে প্রত্যাহার দুইই অনুমোদন করি না। খেলা খেলাই, সকলকে খেলোয়াড় জনোচিত হয়ে খেলতে হবে। হার জিত স্পোর্টিংলি মেনে নিতে হবে। ভুলভ্রান্তি সকলেরই হয়। এমন কোন রেফারি বিলাতী বা দিশী পৃথিবীতে থাকতে পারে না যার কখনও ভুল হয় নি। বিলাতে এফ এ কাপ্ খেলাতেও রেফারীর ভুলের নজির আছে। এর আগেও বহুবার বহুস্থলে রেফারিংএব ভুল দেখা গিয়াছে। মিলিটারীদের ডুরাণ্ড টুরামেন্টেও বহুবার খারাপ রেফারিং হয়েছে। কই তখন তো কোন মিলিটারীদল খেলা থেকে প্রত্যাহার করে নি বা জি ও সী পরিচালক সমিতিকে পত্রাঘাত করেন নি। আজ হঠাৎ শীল্ড খেলা থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে অসহযোগনীতি অবলম্বন করবার কারণ কি—শুধুই খারাপ রেফারিং না আর কিছু! ১৯২৫ সালে মোহনবাগান ডুরাণ্ডের সেমি-ফাইনালে স্হেরউড্ ফরেষ্টারের কাছে হেরে যায়। ঐ খেলা দু'মিনিট কম খেলান হয়েছিল। ১৯২৩ সালে শীল্ড্ ফাইনেল খেলা এমন মাঠে খেলান হয় যে ওয়াটার পোলো খেলা ব্যতীত অন্য কোন খেলা সে মাঠে হতে পারে'না, কিন্তু রেফারি প্যাট্রিজ সে মাঠও খেলার পক্ষে উপযোগী বিবেচনা করে ফাইনাল খেলান। মোহনবাগান স্পোর্টিংলি খেলে ও হেরে যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করে নি। তবে কি বাঙ্গালীরা গোরাদের চেয়ে স্পোর্টিং বলবো?



কিংস্ রয়েল রাইফেল —কাঞ্চন

জি ও সী পত্রে জানিয়েছেন, লীগ খেলা থেকে বহুবার খারাপ রেফারিং সম্বন্ধে শুনে আসছেন। তাই যদি তবে ইতঃপূর্ব্বেই তাঁর এ বিষয়ে ষ্টেপ নেওয়া উচিত ছিল। ফাইনাল খেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে শীল্ড খেলাকে নাটকীয় পরিণতি করার দরকার ছিল না। আর ডারহামস্ দলও যদি মনে করে থাকেন যে রেফারি অন্যায় রূপে দু'মিনিট বা এক মিনিট বেশী খেলিয়েছিলেন এবং

সেই সময়ের মধ্যে তারা গোল করে ঐদিনের খেলা ড্র করেছেন, স্থায়তঃ সেদিনের খেলায় কে আর আর দলই জয়ী হয়েছেন, তাহ'লে স্পোর্টিং স্পিরিট দেখিয়ে নিজেরা ফাইনাল খেলা থেকে প্রত্যাহার করে শীল্ড কে আর আরকে ছেড়ে দেওয়াই তাদের উচিত ছিল। আমরা মিলিটারীদের আচরণ অনুমোদন করতে পারছি না। তা বলে বলছি না যে রেফারিং নির্দ্দোষ হয়েছিল। শীল্ড প্রতিযোগিতায় রেফারিং সত্যই অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। ডালহৌসী ও নরফোক্ রেজিমেণ্টের খেলায় অত্যন্ত খারাপ রেফারিং-এর জন্যেই নরফোক্ হেরে যায়। ডি সি এল আই ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় গোলকিপার বল কর্ণার করে দিলেও অপব্যয়িত সময়ের জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে দেখা যায় নি। ফাইনাল খেলায় মোটেই বৃথা সময় নষ্ট হয় নি, যার জন্যে অতিরিক্ত সময় দেওয়া আবশ্যক হ'য়েছিল।

রেফারির গেট ঃ

এ বৎসর চ্যারিটি ম্যাচগুলিতে রেফারিদের জন্য পৃথক গেট করা হয়েছিল, সেই গেট দিয়ে রেফারিরা অর্দ্ধ মূল্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। কোয়লি ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর চ্যারিটি ম্যাচে রেফারির গেটে যথাযথ নিয়ম পালিত হয় নি বলে অভিযোগ হ'য়েছিল।

পরের চ্যারিটি ম্যাচে, রেফারি এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ ইউ, কুমার স্বয়ং ঐ গেটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রত্যেক রেফারির ব্যাজ বা নিদর্শন দেখে তবে অর্দ্ধ মূল্যে



শীল্ড খেলায় ব্ল্যাকওয়াচ মোহনবাগানকে দ্বিতীয় গোল দিয়াছে —কাঞ্চন

কর্ণার বা আউট না দেওয়ায় সেই বল থেকে ডি সি এল আই গোল করে। ঐ খেলায় স্পোর্টিংএর গোলকিপার সন্তোষ দত্ত ডি সি এল আইএর ফরওয়ার্ডকে ইচ্ছা করে ঘুসি মারায় তিন বৎসরের জন্য 'সাস্‌পেণ্ড' হয়েছেন। ডারহাম ও ইষ্ট ইয়র্ক খেলাতে অনেকের মতে ডারহামের বিরুদ্ধে একটা পেনালটি দেওয়া রেফারির উচিত ছিল। ফাইনালে অতিরিক্ত সময় খেলান সম্বন্ধে রেফারি বলেছেন যে তিনি খেলার সময় নষ্ট হওয়ার জন্য একমিনিট চার সেকেণ্ড ইচ্ছা করেই বেশী দিয়াছেন, ১৩নং ফুটবল আইনানুযায়ী। এ বছর কয়েকটি প্রধান খেলায় মিঃ গুপ্ত রেফারিং করেছিলেন, কিন্তু কোন খেলাতেই তাকে টিকিট দিয়েছিলেন। জনসাধারণের সমিতির সাধারণের কার্য্যে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তী হওয়াই উচিত। ঐ গেট সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি প্রস্তাব করি। যথা,—রেফারির স্বতন্ত্র গেট না রাখা,—একটাকার মূল্যের আসনে অর্দ্ধ মূল্যে খেলা দেখতে হলে রেফারিদেরও সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে একাসনে বসতে হবে, তারাও রিজার্ভ সিট পাবেন না এবং প্রবেশ লাভ করতে সাধারণের মতন অন্যান্য অসুবিধাও ভোগ করতে হবে,—রিজার্ভ আসনে অবশ্য অর্দ্ধ মূল্যেও রিজার্ভ সিট পাবেন,—উভয় গেটেই রেফারিরা নিজেদের ব্যাজ দেখালে তবে অর্দ্ধ মূল্যে টিকিট পাবেন, নচেৎ নহে। এই নিয়মগুলি যথাযথ পালিত হ'লে জনসাধারণের অভিযোগের আর কোন কারণ থাকবে না বলে মনে হয়। আশা করি, আই এফ এ ও রেফারি এসোসিয়েশন এ বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

১৯৩৪ সালের আই, এফ, এ শীল্ড খেলার ফলাফল

প্রথম রাউণ্ড	দ্বিতীয় রাউণ্ড	তৃতীয় রাউণ্ড	চতুর্থ রাউণ্ড	সেমিফাইনাল	ফাইনাল
নেপিয়ার স্পোর্টিং ০					
ইউনিয়ন স্পোর্টিং (খুলনা) ১	ইউনিয়ন স্পোর্টিং ০	প্রপ্‌সায়ারস্ ০	লয়াল রেজিমেণ্ট ৪	লয়াল রেজিমেণ্ট ২	কে, আর, আর (২--×)
	প্রপ্‌সায়ারস্ ৫				
	এরিয়ান্স ০	লয়াল রেজিমেণ্ট ১			
	লয়াল রেজিমেণ্ট ৮				
	মহমেডান স্পোর্টিং (১—১)	মহমেডান স্পোর্টিং ০	ই, বি, আর্ ০		
	কে, ও, ওয়াই, এল, আই (১—০)				
ই, বি, আর্ ০					
ইয়ং মেন্‌স্ ইউনিয়ন (দানাপুর) ০	ই, বি, আর্ ২	ই, বি, আর্ ১			
	চেশায়ার ০				
	ইয়র্ক ও ল্যান্‌স্ ০	ই, আই, আর্ ৩	ই. আই, আর্ ০	কে, আর, আর্ ৩	
	ই, আই, আর ১				
	ড্যালহৌসী ২	ড্যালহৌসী ০			
	নর্‌ফোকস্ ০				
	ইষ্টবেঙ্গল ০	কে, আর, আর ৩	কে, আর, আর্ ২		
	কে, আর্, আর্ ২				
ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং (ঢাকা) ৪	ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ১	ক্যামারন্ হাইল্যাণ্ডারস্ ০			
ভবানীপুর ২	ক্যামারন্ হাইল্যাণ্ডারস্ ২				
কুমারটুলি ০	জামসেদপুর ০	ক্যামারোনিয়ান্‌স্ ০	ডার্‌হাম্‌স্ ৩	ডার্‌হাম্‌স্ ১	ডার্-হাম্‌স্ (২—×)
জামসেদপুর ৫	ক্যামারোনিয়ান্‌স্ ৫				
	ডার্‌হাম্‌স্ ৫	ডার্‌হাম্‌স্ ১			
	পি ডবলিউ ভলেনটিয়ার্স ০				
	ক্যালকাটা এফ্, সি ৩	ক্যালকাটা ৩	ক্যালকাটা ০		
	ওয়ারী এ, সি ১				
	টাউন ক্লাব ০	কিংস্ লিভারপুল্ ১			
	কিংস্ লিভারপুল্ রেজিমেণ্ট ১				
	মোহনবাগান ০	ব্ল্যাক্‌ওয়াচ ০	ইষ্ট ইয়র্ক (১—২)	ইষ্ট ইয়র্ক ০	
	ব্ল্যাক্ ওয়াচ ২				
	ইষ্ট ইয়র্ক ১	ইষ্ট ইয়র্ক ১			
	হাওড়া ইউনিয়ন ০				
	কাষ্টম্‌স্ ২	কাষ্টম্‌স্ (১—০)	ডি, সি, এল, আই (১—১)		
	কালীঘাট ০				
স্পোর্টিং ইউনিয়ন ২	স্পোর্টিং ইউনিয়ন ০	ডি, সি. এল, আই (১—১)			
বৌবাজার ০	ডি, সি, এল্, আই (বিজয়ী) ২				

বিলাতে চতুর্থ টেষ্ট ঃ

সকালে ন'টায় এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। ২০শে জুলাই, আকাশে মেঘের ঘনঘটা, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে—ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট খেলা লিডসের হেডিংলের মাঠে আরম্ভ হলো। সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ—ওয়্যাটের ভাষায়, পালকের বিছানার মতো। অষ্ট্রেলিয়ার দলে কোন বদল হয়নি, কিন্তু ইংলণ্ডের পক্ষে দু'জন নূতন খেলোয়ার এসেছে—কীটন্, অসুস্থ সাট্‌ক্লিফের বদলে, আর মিচেল, ক্লার্কের স্থলে। ইংলণ্ডের ক্যাপ্‌টেন ওয়্যাট ডান হাতে চারবার টস্ করতে অপারগ হয়ে বাঁ হাতে টস্ করে জিতলেন।

ওয়ালটার্স ও কীটন্ ব্যাট করতে এলো। ওয়ালটার্স ওয়ালের প্রথম বলটাই কভার বাউণ্ডারীতে আর তৃতীয় বলটা লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দর্শকদের প্রশংসা পেলেন। আধঘণ্টা খেলার পরে স্কোর উঠ্‌লো ২৫। প্রথম উইকেট পড়লো ৪৩এ। কীটন ২৫ করে ও'রিলীর বলে ওল্ডফিল্ডের হাতে ধরা দিলে। হ্যামণ্ড এসেই গ্রিমেটের বলকে বাউণ্ডারীতে পাঠালে। ব্র্যাডম্যান একটা ভয়ানক জোর মার থামিয়ে সকলকে আশ্চর্য্য করলেন। চিপারফিল্ড গ্রিমেটকে ছুটি দিলে ৬৯ স্কোরে। হ্যামণ্ড বোল্ড হতে হতে বেঁচে গেলো কিন্তু ওয়ালটার্স চিপারফিল্ডের বলে তারই হাতে সোজা আটকে গেলো ৫৪ করে। হেনড্রেন এলো।



ড্রবাও বিজয়ী গ্রপ সায়ার্স

—কাঞ্চন

লাঞ্চের পরে হেনড্রেন গ্রিমেটের বল লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ১২০ মিনিটে ১০০ রান তুললে। হ্যামণ্ড ও হেনড্রেন দু'জনেই বোল্ড হয়ে গেলো ১৩৫ রানে, ওয়াল ও চিপারফিল্ডের বলে। ওয়্যাট ও লেল্যাণ্ড ব্যাট নিলেন। লেল্যাণ্ড মাত্র ১৬ করে এল্ বি ডবলিউ হয়ে গেলে এইমস্ এলেন, কিন্তু পনের মিনিট খেলেও কোন রান করতে পারলেন না। ওয়্যাট গ্রিমেটকে এগিয়ে পেটাতে গিয়ে ফস্‌কে যেতে ওল্ডফিল্ড তাঁকে চমৎকার ষ্টাম্পড করে দিলে, ১৯ রানেতে। হপউড এলো, চায়ের সময় স্কোর উঠেছে ১৮৯, ৮ উইকেটে। এইমস্ আউট হয়ে গেলো ৯ করে, আর হপ্‌উড ৮ করে বোল্ড হলো। মিচেল এসে স্কোর ২০০য় তুললে ২৮৫ মিনিট খেলে। তার পরেই সহজে ষ্ট্যাম্প হয়ে গেলো, আর পন্‌স্‌ফোর্ড চমৎকার লুফ্‌লে বাউসকে। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস্ ২৮৬ মিনিট খেলে মাত্র ২০০ রানে শেষ হলো।

৫-৪০ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে ব্যাট করতে নামলেন, ব্রাউন ও পনস্‌ফোর্ড, ইংলণ্ডের হ'য়ে বল দিতে লাগ্‌লো, বাউস্ ও হ্যামণ্ড। ব্রাউন বোল্ড হ'লো ১৫ করে বাউসের বলে, আর ওল্ডফিল্ড ও উডফুল এক রানও না করে বাউসেরই বলে। দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে মাত্র ৩৯ রান করেছে।

লীডসে বৃষ্টি হয়নি, মাঠ শুকনো ছিল। সূর্য্য উঠেছে, আকাশও অনেকটা পরিষ্কার। দর্শকদের ভিড় বেশ। ভোর ৪টা থেকে লোক আসতে আরম্ভ করেছে। দ্বিতীয় দিন খেলা আরম্ভ হলো, ছাব্বিশ হাজার লোক জড়ো হয়েছে। পনস্‌ফোর্ড ও ব্র্যাডম্যান বাউস্ ও মিচেলের বলে ব্যাট করতে সুরু করলেন। ব্র্যাডম্যান বাউসের পরপর দু'টো বলকেই বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে শুভ আরম্ভ করলেন। একটা কভার বাউণ্ডারী, আরটা চমৎকার মারে স্কোয়ার লেগে পাঠিয়ে দুই করে, ব্র্যাডম্যানের পূর্ব্ব গৌরবময় খেলা দেখাতে লাগলেন। পনস্‌ফোর্ডও বেশ সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন। মিচেলের

বদলে ভেরিটি এলেন। তার বলে ব্যাটম্যানরা তেমন স্কোর তুলতে পারলো না। এমন কি ১৭ মিনিটে ব্র্যাডম্যানও কোনো রান করতে পারলেন না। ভেরিটির দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ওভারে কোন রানই হ'লো না। পনস্‌ফোর্ড ভেরিটিকে লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে ১০১ রান তুললেন, দু'ঘণ্টা খেলে। আর একটা বাউণ্ডারী করে নিজের স্কোর ৫২ এ তুল্‌লে, ১২১ মিনিটে। ব্র্যাডম্যানও ৯০ মিনিট খেলে ৫০ করলে, তার মধ্যে ৮টা বাউণ্ডারী। ৫৪ করে পনস্‌ফোর্ড হ্যামণ্ডের হাতে ভারি বেঁচে গেলো। লাঞ্চের সময় স্কোর উঠ্‌লো ১৬৮।

পুনরায় যখন খেলা আরম্ভ হলো, দর্শকের সংখ্যা উঠেছে আট-ত্রিশ হাজারে, প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে গেছে। যারা ভিতরে আসতে পারেনি, তারা বাড়ীর ছাতে, গাছের উপরে, ষ্ট্যাণ্ডের মাথায় চড়েছে। বাউস্‌ ও মিচেল বল দিচ্ছে। ব্র্যাডম্যান পনস্‌ফোর্ডের চেয়ে তাড়াতাড়ি রান তুলছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ২৬৫ মিনিট খেলে ২৫১ রান হ'লো। ওয়্যাট নূতন বল নিয়ে বাউস্‌ ও হ্যামণ্ডকে বল দিতে দিলেন। ব্যাটম্যানরা বোলারদের গ্রাহ্যই করেন না এমনি ভাবে খেলতে লাগলেন। দু'জনের ২০০ রান ২১০ মিনিটে হলো। পনস্‌ফোর্ড হপ্‌উডের ও লেল্যাণ্ডের বল পরপর বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে চতুর্থ উইকেটে নূতন রেকর্ড স্থাপন করলে। পূর্ব্ব রেকর্ড —১৯৩০ সালে ব্র্যাডম্যান ও জ্যাকসনে মিলে ২৪৩ রান।

তিন শত রান উঠ্‌লো ৩১০ মিনিট খেলে। ব্র্যাডম্যান ২৫৫ মিনিটে নিজের ১৫০ রান করলেন। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং উঁচুদরের হ'চ্ছে, এইম্‌সের উইকেট রক্ষাও খুব ভালো হ'য়েছে, একটাও 'বাই' হতে দেয় নি। দু'জনের ৩০০ রান উঠ্‌লো ২৮০ মিনিটে।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ও ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট রেকর্ডকে ছাড়িয়ে স্কোর উঠ্‌লো ৩৬৩। পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ



ডি সি এল আই (১৯৩৩ সালের শীল্ড বিজয়ী) —কাঞ্চন

স্কোর হ'য়েছিল ৩২৩ হবস্‌ ও রোডসে মিলে প্রথম উইকেটে ১৯১১-১২ সালে মেলবোর্ণে। পনস্‌ফোর্ডের যখন ১৫৫,



ব্ল্যাকওয়াচ —কাঞ্চন

ওয়্যাট তাকে বাঁ হাতে লুফতে পারলেন না। ব্র্যাডম্যান হ্যামণ্ডের বলে এক ওভারে ৯ রান করে নিজের রানের সংখ্যা তুললেন দু'শোর কোটায়, তিনশো মিনিটে। তার পরই

অষ্ট্রেলিয়ার মোট স্কোর উঠলো ৪০০তে, ৩৭০ মিনিট খেলে। মোট ৪২৭ রানে, পনস্‌ফোর্ড ভেরিটির বলকে পেটাতে গিয়ে উইকেটে ব্যাট লাগায় আউট্ হয়ে গেলো, ১৮১ রান করে



ক্যামারণ হাইলাণ্ডার্স —কাঞ্চন

৩৮৫ মিনিট খেলে, তার মধ্যে ১৯টা বাউণ্ডারী। তার ও ব্রাডম্যানের একত্রে মোট রান হ'য়েছে ৩৮৮, ৩৩৫ মিনিটে। ম্যাক্‌ক্যাব্ যোগ দিলো। ব্রাডম্যান খুব দ্রুত রান তুলতে



নর্ফোক —কাঞ্চন

লাগ্‌লেন। ভেরিটির বলকে প্রথম ছ'য়ের বাড়ী মেরে স্কোর তুললেন ৪৫০, ৪০০ মিনিটে। ছ'ঘণ্টা খেলবার পরে নিজের ২৫০ হ'লো, পরে হপ্‌উডের বলকে ওভার বাউণ্ডারী করে আর একটা ছয় করলেন। এ দিনের খেলা যখন শেষ হ'লো ব্রাডম্যান নট্-আউট্ ২৭১, ম্যাক্‌ক্যাব নট্-আউট্ ১৮। অষ্ট্রেলিয়ার মোট স্কোর ৪৯৪, চার উইকেটে।

গতরাত্রে লণ্ডনে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, লীডসে কিন্তু এক-ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। রৌদ্রতাপে মাঠ খুব শুক্‌নো, ধূলো উড়ছে, জোরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভিড় আগের দিনের মতো নয়। তৃতীয় দিন খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বেড়ে হ'লো পঁচিশ হাজার। সোয়েটার গায়ে ব্রাডম্যান ও ম্যাক্‌ক্যাব্, বাউস্ ও হ্যামণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নামলেন। হ্যামণ্ডের নূতন বল ব্রাড্‌ম্যান ওভারে পাঠিয়ে ছয় রান নিয়ে স্কোর তুললেন ৫০১এ, ৫৩০ মিনিটে। ভেরিটি ব্রাডম্যানকে স্লিপে একটা সোজা ক্যাচ্ ফস্‌কাতে দর্শকরা বিরক্ত হলো। অষ্ট্রেলিয়ার খেলা দেখে মনে হ'লো যে তারা তাড়াতাড়ি পিটিয়ে রান তুলে লাঞ্চের মধ্যেই ডিক্লেয়ার করবে। ব্রাডম্যান বিপজ্জনক বলও পেটাতে লাগলেন, ৪২০ মিনিটে নিজের ৩০০ রান তুললেন। চমৎকার ছ'য়ের বাড়ী মেরে ব্রাডম্যান মোট রান তুললে ৫৫০, ৪৭৫ মিনিটে। তারপরে বাউসের বলে বোল্‌ড হয়ে গেলেন ৩০৪ রানে, ৪২৫ মিনিট খেলে। তার মধ্যে ২টা ছয়, ৪৩টা চার আর অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মার—'ড্রাইভ্‌ ও কাট্'। ডারলিং এলেন ও বাউসের বলে ১২ করেই বোল্‌ড হলেন। বাউস্ ৩টা উইকেট ২০ রানে নিলো। চিপারফিল্ড ওয়্যাটের হাতে এক রান করেই ধরা পড়ে

গেলেন। গ্রিমেট ১২ রানে ও ওয়াল ১ রানে আউট হয়ে গেলো। বাউস্ ক্রমান্বয়ে ১০০ মিনিট বল দিয়েছে ও ৬টা উইকেট্, ১২৪ রানে নিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইংনিস শেষ হ'লো মোট ৫৮৪ রানে।

আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, যখন ইংলণ্ড পক্ষে ওয়ালটার্স ও কীটন ব্যাট করতে নামলো। তারা এত সতর্ক হয়ে খেলছেন যে ১০ মিনিটে মাত্র ৩ রান হ'লো। কীটন ১২ রানে গ্রিমেটের বলে আউট হ'লে, হ্যামণ্ড এলো। দু'জনে মিলে রান ৫০এ তুললে। ওয়ালটার্স ও'রিলীর বলে দু'টা পর পর বাউণ্ডারী করলে, হ্যামণ্ডও গ্রিমেটকে দু'বার লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠালে। ওয়ালটার্স ও হ্যামণ্ডে বোঝবার ভুলে রান নিতে গিয়ে, হ্যামণ্ড রান-আউট হয়ে গেলো, ২০ রানে। হেনড্রেন যোগ দিলেন। ও'রিলীর বলে ওয়ালটার্সের উইকেট উড়ে গেলো। ওয়ালটার্স ৪৫ রান করেছে ৮০ মিনিটে, তার মধ্যে ছ'টা বাউণ্ডারী। ওয়্যাট এলেন। ও'রিলীর বদলে ওয়াল বল দিতে ওয়্যাট তার প্রথম বলই বাউ-ণ্ডারীতে পাঠালেন। ওয়্যাট এর আগে ২০ মিনিটে একটা রানও করতে পারেন নি। হেনড্রেন ১০০ রান তুললেন ১১০ মিনিটে। গ্রিমেট ৮০ মিনিট বল করবার পরে চিপারফিল্ড তাকে ছুটি দিলো। ব্যাটিং অত্যন্ত ঢিমে ও বিশেষত্বহীন, ১৫০ রান উঠলো ১৯৫ মিনিটে। ওয়্যাট তিনবার গ্রিমেটের বল লেগে হাঁক্‌রাতে ফস্‌কে পরের বলটায় বোল্‌ড হয়ে গেলেন ৪৪ করে ১১৫ মিনিটে, তার মধ্যে ৮টা চার ছিল! লেল্যাণ্ড যোগ দিলেন।

কালো মেঘ সূর্য্যদেবকে ঢেকে ফেলেছে। বৃষ্টির ভয়ে মাত্র পাঁচ হাজার দর্শকদের উপস্থিতিতে চতুর্থ টেষ্টের চতুর্থ দিন আরম্ভ হলো। হেনড্রেন ও লেল্যাণ্ড ব্যাট নিয়ে মাঠে নামলো—১১-৭ মিনিটে। গ্রিমেট ও ও'রিলীর বলে দু'টো ওভারে এক রানও হ'লো না। বৃষ্টি আরম্ভ হ'তে খেলা বন্ধ হলো। ১০ মিনিট পরে, বৃষ্টি ধরতে ১১-৪২ মিনিটে আবার খেলা আরম্ভ হলো। হেনড্রেন গতরাত্রের পরে এক রানও না করে এল্ বি ডবলিউ হ'লে, এইম্‌স্ এলো। ইংলণ্ডের ২০০ রান হ'লো, ২৮৫ মিনিট খেলার পর। এইম্‌স্ গ্রিমেটের বলটা মেরে ব্রাউনের হাতে তুলে দিলো। হপ্‌উড এলো, তার ভাবে মনে হচ্ছিলো যে বেশীক্ষণ টিকবে না। এইম্‌স্ ৪০ মিনিটে মাত্র ৮ রান করেছে। ১২-২৫ মিনিটে মেঘগর্জ্জন ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। ইংলণ্ডের স্কোর তখন ৬ উইকেটে, ২২৯।



চেশায়ার —কাঞ্চন

দশ মিনিট বৃষ্টিতেই মাঠ ভেসে গেলো। ১-১৫ মিনিট, তখনও বৃষ্টি হচ্ছে। ২টার পরে বৃষ্টি থাম্‌লো, আবার ২-২০তে আরম্ভ হলো। প্যাভিলনের সুমুখে প্রায় ১০ গজ বিস্তৃত জলস্রোত বইছে। কিছু পরে বৃষ্টি থেমে গেলো, আকাশও পরিষ্কার হতে লাগলো। ২-৫০ মিনিটে দু'দলের ক্যাপটেন্ মাঠ পরিদর্শন করতে এলেন, মাঠ তখন কর্দ্দমের সমুদ্র বিশেষ। উড্‌ফুল মাঠের অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। খেলা অমীমাংসিত হয়ে বন্ধ হলো, যখন অষ্ট্রেলিয়ার জয় অনিবার্য্য। ইংলণ্ডের পক্ষে—বরুণদেব যস্মিন পক্ষে জনার্দ্দনরূপে তাকে রক্ষা করলেন।

স্কোর বোর্ড :

ইংলণ্ড

(চতুর্থ টেষ্ট—লীডস্)

প্রথম ইনিংস্		দ্বিতীয় ইনিংস্	
ওয়ালটার্স—কট্ ও বোল্ড চিপারফিল্ড	৪৪	বোল্ড ও'রিলী	৪৫
কীটন—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্ড ও'রিলী	২৫	বোল্ড গ্রিমেট্	১২
হ্যামণ্ড—বোল্ড ওয়াল	৩৭	রান আউট্	২০
হেনড্রেন—বোল্ড চিপারফিল্ড	২৯	এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড ও'রিলী	৪২
ওয়্যাট—ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	১৯	বোল্ড গ্রিমেট	৪৪
লেল্যাণ্ড—এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড ও'রিলী	১৬	নট আউট	৪৯
এইম্স্—বোল্ড গ্রিমেট	৯	কট্ ব্রাউন, বোল্ড গ্রিমেট	৮
হপউড—এল্ বি উবলিউ, বোল্ড ও'রিলী	৮	নট্ আউট	২
ভেরিটি—নট্ আউট্	২		
মিচেল—ষ্টাম্পড ওল্ডফিল্ড, বোল্ড গ্রিমেট	৯		
বাউস্—কট্ পনস্ফোর্ড, বোল্ড গ্রিমেট	০		
অতিরিক্ত	২	অতিরিক্ত	৭
		(৬ উইকেট)	
	২০০		২২৯

অষ্ট্রেলিয়া

(চতুর্থ টেষ্ট—লিডস্)

প্রথম ইনিংস্	
ব্রাউন—বোল্ড বাউস্	১৫
পনস্ফোর্ড—হিট্ উইকেট, বোল্ড ভেরিটি	১৮১
ওল্ডফিল্ড—কট্ এইম্স্, বোল্ড বাউস্	০
উড্ফুল—বোল্ড বাউস্	০
ব্র্যাডম্যান—বোল্ড বাউস্	৩০৪
ম্যাক্ক্যাব—বোল্ড বাউস্	২৭
ডারলিং—বোল্ড বাউস্	১২
চিপারফিল্ড—কট্ ওয়্যাট, বোল্ড ভেরিটি	১
গ্রিমেট—রান আউট্	১৫
ও'রিলী—নট্ আউট্	১১
ওয়াল—এল্ বি ডবলিউ, বোল্ড ভেরিটি	১
অতিরিক্ত	১৭
	৫৮৪

চতুর্থ টেষ্টের বীর



ডন্ ব্র্যাডম্যান

বিস্ময়ের কিছু নাই

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ

কোর্ট হইতে ফিরিয়া পোষাক খুলিতে বসিয়াছি—এমন সময় আমার সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা রাণী একমুঠ লজঞ্চুস লইয়া এবং একটি মুখে পুরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল—বাবা, জগন্নাথ ভারী দুষ্টু—এ্যাদ্দিন যা ঠকিয়েছে আমাদের।

আমি পায়ের মোজা খুলিতে খুলিতে মুখ তুলিয়া কহিলাম—বটে! কি করে ঠিক পেলি বল্ দেখি?

জগন্নাথ একজন ক্ষুদ্র দোকানদার—পাড়ার ছেলে-মেয়েরাই তাহার প্রধান খরিদ্দার। ছেলেমেয়ের মাদেরও কিছু কিছু জিনিষ সে রাখিয়া থাকে। সস্তা বিস্কুট, নানা রকমের লজেন্স, অল্প দামের খেলনা, বাঁশী, কাপড়কাচা সাবান, মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা প্রভৃতি টুকটাক জিনিষের কারবার সে করে। এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি—জগন্নাথের মত লোক হয় না,—সে না-কি এক পয়সার জিনিষ কিনিলেই 'ফাউ' স্বরূপ কিছু-না-কিছু দিয়া থাকে। রাণী তাহার এমন ভক্ত ছিল যে কারণে-অকারণে সে জগন্নাথের দোকানে গিয়া হাজির হয় এবং তাহার সহিত নানা রকমের প্রশ্নোত্তর করিয়া তাহার মন ভিজাইয়া একটা কিছু খাইবার জিনিষ আদায় করিয়া থাকে। এ হেন জগন্নাথ রাণীর কাছে সহসা এতটা হেয় হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না।

কিন্তু জবাব পাইতেও দেরী হইল না। রাণী হাত নাড়িয়া বলিল—সত্যি বাবা ভারী দুষ্টু ও। আগে কি জানি ওর পেটে-পেটে এত বজ্জাতি!

বাচাল মেয়ে! তাহার মায়ের মুখে যে সব কথা সে শুনিয়া থাকে—তাহা সে স্থানে-অস্থানে এমন বেমালুম প্রয়োগ করে যে কে বলিবে একটি ছোট্ট মেয়ে কথা বলিতেছে! আমি হাসিতে লাগিলাম।

আমাকে হাসিতে দেখিয়া বোধ করি রাণীর আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা পড়িল, কহিল—তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু—আমি আর ঐ উনুনমুখো জগন্নাথের দোকানে যাচ্ছি নে—তা বলে রাখলুম। দিন দুপুরে ডাকাতি—মাগো যাব কোথা? এক পয়সায় মাত্র ছ'টা লজেঞ্চুস? এই দেখ! এই বলিয়া সে ডান হাতের মুঠি খুলিয়া কহিল—কটা?

কহিলাম—সাতটা।

রাণী কহিল—হ্যাঁ সাতটা। রাস্তায় আসতে আসতে খেয়েছি একটা আর এই মুখে একটা। তাহলে নয়টা হ'লো না?

অঙ্কশাস্ত্রে মেয়ে আমার পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—কারণ নাম্‌তার সাতের ঘর পর্য্যন্ত তার না-কি মুখস্থ। সুতরাং আমাকে স্বীকার করিতে হইল—হ্যাঁ নয়টাই হইল।

রাণী চোখ ঘুরাইয়া কহিল—তবে? জগন্নাথ কটা দেয় জান? পাঁচটা, আর তার সঙ্গে ফাউ একটা। ফাউটা বাদ দিলে চারটা কম পড়ছে কি না? একদিন অন্তর তুমি একটা করে পয়সা দেও তো—মাসে হ'লো পনরো পয়সা। তাহলে কতটা ঠকিয়েছে বল দেখি বাবা?

আমি কন্যাকে নিজের কাছে টানিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলাম—তুই বল্ দেখি রাণী।

রাণী চোখ ঘুরাইয়া কহিল—বা রে, আমি বুঝি পনরোর ঘরের নাম্‌তা পড়েছি?

আমি পরাস্ত হইয়া কহিলাম—পয়সায় চারটি করিয়া কম হইলে পনরো পয়সায় ষাটটি কম হয়।

রাণী একেবারে শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—উঃ! কি ঠকানোটা ঠকিয়েছে দেখলে তো! আর যদি ওর দোকান থেকে কক্‌খনো কিছু কিনি। গলির মোড়ে যে নতুন বড় দোকানটা করেছে না—ভারী ভাল লোক সে। পয়সায় ন'টা করে লজঞ্চুস, পাঁচখানা করে ইয়া বড় বড় বিস্কুট। আচ্ছা বাবা একটা দোতালা বাস কিনে দেবে? দম দিলেই চল্‌তে থাকে। ওই নতুন দোকানে পাওয়া যায় উঃ, কি সব ফাইন্ ফাইন্ জিনিষ বাবা—দেখলেই লোভ হয়।

এতক্ষণে ব্যাপার বুঝিলাম। নতুনের আকর্ষণ যে কতটা প্রবল—আমার এই বয়সে তাহা জানিতে বাকি নাই।

বেচারা জগন্নাথ—ক্ষুদ্র দোকানের মালিক সে! এতদিন যে ক্ষুদ্র সম্ভার দিয়া সে পাড়ার বালক-বালিকাকে তুষ্ট রাখিয়াছিল- তাহা দিয়া আর কি ইহাদের মন ভুলাইতে পারিবে সে? অতি নিকটে রকমারি জিনিষের আমদানি করিয়া যে নব্য দোকানি বিপণি সাজাইয়াছে—তাহার মোহ এই শিশুর দল কাটাইবে কি করিয়া? যে জগন্নাথ ইহাদের এতদিন নানা রকমে তুষ্ট করিয়াছে, এক পয়সার জিনিষ কিনিলেও যে কিছু-না-কিছু 'ফাউ' দিয়াছে, দোকানে গিয়া তাহার সহিত গল্প করিলেই একটা-না-একটা কিছু উপহার দিয়াছে—কোথাকার কোন্ একজন লোক আসিয়া নতুন একটা দোকান খুলিয়া বসিতেই সে এমন 'খেলো' হইয়া গেল! কিন্তু রাণীকে যদি বলি ওরে দুষ্টু মেয়ে, যে জগন্নাথ তোকে না পাইলেও কতদিন বিস্কুট দিয়াছে, লজঞ্জুস খাওয়াইয়াছে, সাবানের বাক্স, সিগারেটের ছবি উপহার দিয়াছে—আজ নেই কোন এক অপরিচিত ব্যবসাদার শুধু ব্যবসার ফিকিরেই পয়সায় নয়টা করিয়া লজঞ্জুস দিয়াছে—অমনি সে 'উনুনমুখো' হইয়া গেল? দুদিন পরে যখন এই লোকই পয়সায় তিনটি করিয়া দিতে থাকিবে—তখন যে আর জগন্নাথের দেখাও মিলিবে না, সে তাহার দোকানে গুটাইয়া হয় তো ততদিন কোথায় সরিয়া পড়িবে।

রাণী আর একটি লজেন্স গালে পূরিয়া কহিল, দোতালা বাস তাহলে কিনে দেবে তো বাবা? না দিলে আমি কিছুতে শুনবো না—হ্যাঁ!

চায়ের পেয়ালা ও জলখাবারের রেকাব হাতে লইয়া রাণীর মা কক্ষে প্রবেশ করিল। কন্যাকে দেখিয়াই তাহার মা কহিল—দুষ্টু মেয়ে এখনই জ্বালাতে এসেছ? কোর্ট থেকে এলেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দে দেখি। বক্ বক্ করবার ঢের সময় পাবি।

মাকে দেখিলে রাণীর কথা কমিয়া যায়। আর সুবিধা হইবে না ভাবিয়া আমার কানে কানে 'মনে থাকে যেন'—এই কথা বলিয়াই সে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

জলখাবার ও চা শেষ করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় গৃহিণী হাসিমুখে কহিলেন—দেখ, বেড়িয়ে ফিরবার সময় দুটো ব্রোচ এনো দেখি—বেশ ডিসেণ্ট দেখে এনো কিন্তু। এখন আর জিনিষ কিনবার তো বিশেষ ভাবনা নেই—পাড়ায় যখন একটা বড় দোকান হ'লো। অনেক রকমারি জিনিষ 'মূরলা-গ্রাজুয়েট' কোম্পানীতে পাওয়া যাবে।

বিস্মিত হইয়া কহিলাম—মূরলা গ্রাজুয়েট কোম্পানী?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ ঐ যে নতুন দোকান গলির মোড়ে খুলেছে—দেখো নি? বাব্‌বা—দুবেলা ঐ পথ দিয়ে যাতায়াত করছো—চোখ দুটো কোথায় রেখে পথ চলো বল দেখি? যিনি দোকান খুলেছেন—তাঁর স্ত্রী পাড়ার সব বাড়ীতে বিজ্ঞাপন বিলি করে গেলেন কি-না। আমরা সবাই কথা দিয়েছি—ওঁদের দোকান থেকেই জিনিষ কিনবো। আর ওদের দোকানে দামও সস্তা।

মনে ভাবিলাম—সস্তা না হইয়া যায়! কোন্ এক ভদ্রলোক দোকান খুলিয়া বসিয়াছেন—ক্যানভাস করিতেছেন তাঁহার স্ত্রী। না—লোকটাকে তারিফ্ করিতে হয়—ব্যবসা-বুদ্ধি আছে বটে। কন্যাকে পয়সায় নয়টা লজেন্স দিয়া বশ করিয়াছে স্ত্রী তো দেখিতেছি জিনিষ না কিনিয়াই সার্টিফিকেট দিয়া বসিল। এই নতুন দোকানটিকে আশ্রয় করিয়া মাসিক কতটা অর্থ পকেটচ্যুত হইতে পারে একবার আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিলাম।

স্ত্রী বলিলেন—আর দেখ, একটা স্নো আর একটা 'সেণ্ট'ও ঐ সঙ্গে এনো। নতুন দোকান খুলেছে—ওদের একটু ব্যাক করা দরকার। অমনি তোমার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো? বাব্‌বা! এমন কি জিনিষের ফর্দটা দিলাম। তিন মাস অন্তর একটা সেণ্টও কিনতে চাও না? আর এই গরমের দিনে 'স্নো' না হলে এক মুহূর্তও চলে?

হাসিয়া কহিলাম—আরে রাম, তাই কি আর আমি বলছি। গোটা পাঁচেক টাকা বের কর দেখি। আর কিছু আনতে টানতে হবে না তো?

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ বাক্স হইতে পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া হাস্যোজ্জ্বল মুখে কহিলেন—না গো না, একদিনে আর বেশী আনতে হবে না, আর কাছেই যখন ভাল দোকান খুললো—তখন আর কি, যখন দরকার আনলেই হবে। আর তোমারও তো এ দোকান সে দোকান করতে হবে না—এক জায়গায় গেলেই বাস্। দেখ যদি পয়সা কিছু বাঁচে ভরিখানেক বেশ ভাল জরদা নিয়ে এসো দেখি।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটুখানি দিয়ে গেছে—ভারী চমৎকার জরদা কিন্তু।

মন যতই অপ্রসন্ন হোক না কেন—মুখের হাসিটুকু বজায় রাখিতেই হইবে। হাসিমুখে কহিলাম—তথাস্তু। মনে ভাবিলাম—'মূরলা-গ্র্যাজুয়েট' কোম্পানী শিঙা ফুঁকিবে কবে?

সান্ধ্য ভ্রমণ ও তাসের আড্ডা শেষ করিয়া যখন বাসায় ফিরিতেছিলাম—তখন রাত্রি বোধ হয় নয়টা। গলির মোড়েই চোখে পড়িল—নতুন দোকানটি, উপরে সাইনবোর্ড 'মূরলা গ্র্যাজুয়েট এণ্ড কোম্পানী'। জিনিষ কিনিতে হইবে—সহসা এই কথাটা মনে পড়িয়া গেল। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম। না, সত্যই দোকানটিকে সুন্দর-ভাবে সজ্জিত করিয়াছে—দুদণ্ড চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে।

দোকানে অন্য কোনও খরিদ্দার ছিল না—দোকানী বোধ হয় ঝিমাইতেছিল। আমার কণ্ঠস্বরে সে সচকিত হইয়া কহিল—কি চাই আপনার? একটা স্নো? দেশী না বিলাতি? জরদা? হ্যাঁ ভাল জরদা আছে বৈ কি। কাশীর না লক্ষ্ণৌয়ের চাই আপনার?

দোকানীর কণ্ঠস্বরে আমি বিস্মিত হইলাম—পাকা ব্যবসায়ীর কথার ছাদের মধ্যেও আমার অতি-পরিচিত একজনের সুরের রেশ যেন কানে বাজিল। চেহারাতেও অনেক সাদৃশ্য আছে বটে। মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কে—বিনয়?

দোকানী একবার ভাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—সুরেশ—তুমি!

—ব্যাপার কি বিনয়? তুমি দোকানদার?

বিনয় আমার হাত ধরিয়া দোকানের ভিতর টানিয়া আনিয়া কহিল—আরে ভাই—এস এস। কতদিন পরে দেখা—দশ বচ্ছরের ওপর হয়ে গেল। তার পর, কেমন আছিস? ছেলেপিলে কটি? একটি মেয়ে? খুব সুখী রে ভাই তুই। চিরকাল দেখে এসেছি—তোর বরাতজোর ভয়ানক। আমার তো এই সাত বছরে পাঁচটি।

কথা বলিতে যেন গলায় বাধিতেছিল। অস্ফুট স্বরে কহিলাম—তোমার ছেলে মেয়ে? আশ্চর্য্য!

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিনয় কহিল—এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে বল দেখি?

কিছুই নাই বটে কিন্তু তবু মানুষের মন তো! অথচ আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিলে এ কথা কি বিশ্বাস করা যায়—আমার পরম বন্ধু বিনয়, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে পত্নীর মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিল, সে আজ পাঁচটি সন্তানের জনক! এ কথা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে যে আমার আবাল্যসুহৃদ্ বিনয়—যাহার কবিপ্রাণ কল্পনার রঙ্গিন আলোয় সর্ব্বদা রঞ্জিত হইয়া থাকিত, সে আজ বিপণি সাজাইয়া পাকা ব্যবসাদার হইয়া বসিয়াছে! আমি অতি বিস্ময়ে তাহার গুম্ফশ্মশ্রুহীন সুগোল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

বিনয় আমার হাতটি একবার সজোরে ঝাঁকাইয়া দিয়া কহিল—হাঁ করে চেয়ে দেখছিস্ কি রে—আমি তোর সেই প্রিয় বন্ধু বিনয়ই। হ্যাঁ, কিছু যে পরিবর্ত্তন হয়েচে সে আমি নিজেও টের পাই রে—কিন্তু সবই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে কি-না। তার পর পরাধীন চাকুরি ছেড়ে তো মফস্বল কোর্টে প্র্যাক্‌টিস্ করছিলি—এখন হাইকোর্টে ওকালতি চল্‌ছে বুঝি? বেশ, বেশ। আর আমার কথা শুনবি কি রে ভাই—সে সাতকাণ্ড রামায়ণ। দশ বচ্ছর আগেকার মনের অবস্থা সে তো আর কিছু তোর জানতে বাকি নাই। নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম কাশী। দিন আর চলে না—এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দোকানে অগত্যা এক চাকুরি নিলাম। কারবার তাঁর মন্দ ছিল না। মনটাও তখন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল—অবশেষে তাঁরই একমাত্র কন্যা মূরলাকে বিয়ে করে—

এতক্ষণে 'মূরলা-গ্র্যাজুয়েট' কোম্পানীর কতকটা অর্থ বুঝিলাম, হাসিয়া কহিলাম—'মূরলা গ্র্যাজুয়েটে'র মূরলার হদিস্ পাওয়া গেল—কিন্তু মূরলা গ্র্যাজুয়েটটি কি বস্তু?

হো হো করিয়া বিনয় এক দমকা হাসিয়া লইল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম হাসির দাপটে তাহার পেটের মাংসগুলি ওঠানামা করিতেছে। অতি কষ্টে হাসি থামাইয়া বিনয় কহিল—সে এক মজার কথা। যখন এই দোকানের কল্পনা করি—তখন এর নাম কি হবে আমাদের দুজনের মধ্যে জল্পনা চল্‌তো। মূরলার নাম তো থাকবেই—কারণ তার বাপের কাশীর দোকানটি বেচে সেই টাকায় এই

দোকানের পত্তন। ভাবলাম 'মুরলা-বিনয় এণ্ড কোং' নাম দেওয়া যাক। কিন্তু তেমন মনঃপুত হলো না—লোকে বলবে কি? শেষটায় মুরলাই বুদ্ধি বাত্‌লে দিল। আমি গ্র্যাজুয়েট সুতরাং মুরলার সঙ্গে এই গ্র্যাজুয়েট কথাটা যোগ করলেই সুন্দর হবে এবং নামের মধ্যে মৌলিকতাও থাকবে। হ'লোও তাই—দোকানের নামটা খুব ষ্ট্রাইকিং হয় নি?

শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলাম—নিশ্চয়। তা হলে আজ আসি বিনয়—রাত অনেক হয়ে গেল।

বিনয় কহিল—এখনই যাবি? তাহলে কি কি জিনিষ চাই তোর? ওগুলো দিয়ে দি।

—না, না। আজ আর দরকার নাই। কাল না হয় আসবো।

এই বলিয়া পথে নামিয়া পড়িলাম। বিনয় উচ্চ স্বরে কহিল, তোদের যা কিছু প্রয়োজন—আমার দোকান থেকেই নিবি কিন্তু। আরে তুই আমার পুরানো বন্ধু—এখন না হয় অবস্থা ফিরিয়েছিস—তাই বলে কি ভুলে যাবি। আমিও একদিন তোদের ওখানে যাচ্ছি—বৌদিকে বলিস্। তাহলে জিনিষগুলো নিতে কাল সকাসেই—

আমি যাইতে যাইতে কহিলাম—হ্যাঁ হ্যাঁ—ওর জন্য আর ব্যস্ত হতে হবে না।

বোধ করি একটু দ্রুতই চলিয়া আসিয়াছিলাম। রাগ ও দুঃখ মনের মধ্যে কোনওটারই নাগাল পাইলাম না। মনে হইল—সমস্ত বুকখানি যেন আমার ফাঁকা হইয়া গিয়াছে—কিছু ভাবিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই।

জগন্নাথের ছোট্ট দোকানের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম একটি মিট্‌মিটে আলোর কাছে বিষণ্ণ বদনে জগন্নাথ বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে দুই হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিল। বলিলাম কি হে জগন্নাথ, তোমার দোকান কেমন চলছে আজকাল?

জগন্নাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আর বাবু দোকান! আজ তিন্‌টি পয়সার বিক্রি করেছি মাত্র। ঐ এক জোচ্চোর এসে মস্ত দোকান ফেঁদেছে না—নাম দিয়েছে আবার 'মুরলা গ্র্যাজুয়েট কুম্পানী'—ঐ শালাই তো আমার পেছনে লেগেছে বাবুজি। দুঃখের কথা কি আর বলবো—রাণীদিদিও আজ তিন দিন আমার দোকানে আসে নি।···কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটিও যেন ছলছল করিয়া উঠিল।

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম—রাণীকে কাল পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা জগন্নাথ, তোমার এই দোকানটা একটু বাড়ানো যায় না? ধর না, ঐ দোকানটার মত তুমিও যদি জাঁকিয়ে বস—তাহলে কেমন হয়? তুমি এ পাড়ার পুরোনো লোক—যদি সবাই তোমারই দোকানে সব রকমের জিনিষ পায় তাহলে 'মুরলা কোম্পানী' তিন দিনে উঠে যাবে।

জগন্নাথ কহিল—আজ্ঞে, সে কথা তো জানি হুজুর। কিন্তু দোকানটাকে বাড়াতে গুছাতে যে অনেক টাকার দরকার কর্ত্তা। ভেবেছিলাম—এই ছোট্ট দোকান নিয়েই আমার জীবনটা আপনাদের দয়ায় কেটে যাবে। কিন্তু দেখ্‌ছেন তো ঐ বাটপাড়ের কাণ্ডটা। আবার শুন্‌ছি ওর বৌ নাকি পাড়ার সব বাড়ীতে গিয়ে মা গিন্নিদের মন ভিজিয়ে বেড়াচ্ছে। আমিও দেখে নিতাম—যদি হাতে কিছু রেস্ত থাকতো। ও দিকে তো মন দিই নি বাবু—নইলে পাঁচশো টাকার এ সময়ে আমার অভাব হ'তো না। কিন্তু আমার নামও জগন্নাথ দোলই। ও ব্যাটাকে আমি কেমন জব্দ করি দেখে নেবেন। কিছু টাকা যদি পাই—ও-সব গ্র্যাজুয়েট ফ্র্যাজুয়েট আমি দুদিনে ঠাণ্ডা করে দেব বুঝলেন? কাল কিন্তু সকালেই রাণী-দিদিকে পাঠিয়ে দেবেন—তার জন্যে ভাল বিস্‌কুট আলাদা করে রেখেছি।

বাড়ী ফিরিতেই গৃহিণী সহাস্য মুখে কহিলেন—দেখি দেখি, কেমন জিনিষ আন্‌লে? তার পর শূন্য হস্ত দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন—আনা হয় নি তো? তা জানি। একবার বল্লেই যদি তোমাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যেত—তাহলে আর দুঃখু ছিল কি? কত যে অছিলা তোমার আছে—সে তো জান্‌তে আমার বাকি নেই। কাছে ভাল দোকান হ'লো—দুটো জিনিষ হাতে করে আন্‌বে—তাতেই এত। বাব্‌বা, এমন লোক আর দেখা যায় না। সাধে কি বলি—কেমন পরাধীন জাত আমরা।

কোনও কথা বলিলাম না—আমার পড়িবার কক্ষে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিলাম। ছোট্ট একটি সুটকেশের ভিতর রক্ষিত অনেক দিনের চিঠির তাড়া বাহির করিয়া মেঝেতে

স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিলাম। যাহার সহিত আমার পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় ছিল—যাহার সহিত কোনও দিন বিচ্ছেদের কথা কল্পনাও করিতে পারি নাই—আজ তাহার স্মৃতির নিদর্শনের দিকে চাহিতেও মনটা বিষাইয়া উঠিল। কিন্তু এইগুলি নিশ্চিহ্ন করিবার পূর্ব্বে এক যুগ পূর্ব্বের ঘটনাগুলির কথা মনের মাঝে ফুটাইয়া তুলিতে ক্ষতি কি? যৌবনের প্রান্তে উপনীত হইয়া একবার কি প্রথম বসন্তের দিনগুলির মধুর স্মৃতি উপভোগ করিব না? চিঠির স্তূপের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া পড়িতে লাগিলাম।

* * * *

১৩২৬ সাল, ৬ই মাঘ

ভাই সুরেশ,

আজ প্রভাতে তন্দ্রা ভাঙ্গিতে প্রথমেই তোমার কথাই মনে পড়িল। আমার এই অসহ্য পুলকের দিনে আমার পাশে তোমাকে দেখিতে পাইব না—এ কথা কি আমি আগে ভাবিতে পারিয়াছিলাম। আমার জীবনের এমন একটি স্মরণীয় দিনে আমার প্রিয় বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে না—ইহা কি আমাদের দুই জনের কেহই কল্পনা করিয়াছিলাম? কিন্তু উপায় নাই—কর্ম্মের শৃঙ্খলে তুমি বাঁধা পড়িয়াছ—বন্ধুর পাশে আজকার দিনে আসিয়া দাঁড়াইতে তোমার মন যতই ব্যাকুল হোক—তোমার পায়ের শৃঙ্খল সেই ব্যাকুলতা আরও বাড়াইবে।

কাল প্রায় সারারাত্রি আমি ঘমাইতে পারি নাই। যাহাকে পাইবার জন্য আমি দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াছি, বহু বাধা-বিঘ্নের পর যাহাকে লাভ করিবার নিশ্চয়তায় আর সন্দেহ নাই—তাহারই কথা কাল সারারাত্রি ভাবিয়াছি। কি আশ্চর্য্য মানুষের মন! যাহাকে এখনও আমি নিজের বলিয়া পাই নাই, তাহাকে যদি কোনও দিন হারাই, তাহা হইলে আমার জীবন কি হইয়া যাইতে পারে, ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই কথাই সারারাত্রি মনে পড়িয়াছে। ভোর বেলায় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, স্বপ্নে দেখিলাম—একগাছি ফুলের মালা লইয়া রমা আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ঘুম ভাঙ্গিতেই স্বপ্ন ঘুচিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তোমারই কথা মনে পড়িয়া গেল সুরেশ। আজ তুমি কাছে থাকিলে এই কথা লইয়া নিশ্চয় হাসাহাসি করিতে এবং নানা রকমে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতে। সেইটা যে আমার কত বাঞ্ছনীয় হইত তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিবে না?

আচ্ছা বল দেখি বন্ধু, যাহাকে আমি জীবন-সঙ্গিনী করিতে যাইতেছি—সে কি আমাকে ঠিক বুঝিতে পারিবে? অনেক দিন তুমি বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছ—আমার কবিত্ব, আমার রঙ্গিন স্বপ্ন তাহাকে যেন পাগল করিয়া না দেয়! তুমি বলিয়াছিলে—আমরা নারীকে যতদিন চিনি না—ততদিন ভাবি তাহারা কল্পনাবিলাসী, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তাহারা অত্যন্ত প্র্যাক্‌টিকেল—তাদের কাছে কল্পনা-বিলাস বেশী দিন চলে না। কিন্তু রমা যদি প্র্যাক্‌টিকেল হয় আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ভাববিলাসী—সে তাহার বিপরীত হোক—তাহা হইলেই তো হইবে ভাল। শুধু এইটুকু আমি চাই, যেন আমার কবি-চিত্তকে একটুখানি বুঝিয়া চলে।

আজ মাঝে মাঝে বিনা কারণেই বুকের যে কম্পন অনুভব করিতেছি—ইহার ঝঙ্কার কি রমার বুকেও লাগিতেছে না? না ভাই, আর বেশী বাড়াবাড়ি করিব না—তুমি নিশ্চয়ই হাসিতেছ। কিন্তু আমার এ দুর্ব্বলতা তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবে। আমার মনে আজ যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে তাহার প্রত্যেকটির সহিত আমার প্রিয়তম বন্ধুর যদি পরিচয় করিয়া না দিতে পারি—তাহা হইলে আর কি করিলাম। আজ যদি তুমি কাছে থাকিতে!

* * * *

১৩২৭ সাল, ৬ই মাঘ

প্রিয় সুরেশ,

গত বৎসর এমনি দিনে যাহার সহিত জীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়াছিলাম—তাহাকে ফুলশয্যার রাত্রে কি বলিয়াছিলাম জান? বলিয়াছিলাম—বৎসরের তিনশত চৌষট্টি দিন যদি দূরে থাকিতে হয়, তবু আমাদের বিবাহের দিনটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য এই দিন আমরা একত্র মিলিত হইব। সহস্র বাধা-বিঘ্নও আমাকে এ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আজ সেই দিন। অথচ রমা আজ একশো মাইল দূরে আমার প্রতীক্ষায় সময় কাটাইতেছে; আর আমি রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত কলম ঠেলিয়া কিছুক্ষণ হইল মেসে ফিরিয়া

আসিয়াছি। আমার প্রতিজ্ঞা কেমন রক্ষা করিলাম—দেখিলে তো ?

ইচ্ছা হইয়াছিল—আজ চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়া চলিয়া যাইব—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। এই অল্প দিনের মধ্যেই কেমন ভীরু হইয়া পড়িয়াছি! আশিটি টাকার মায়া আমার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল—অথচ পরাধীনতার শৃঙ্খলে তুমি বাঁধা পড়িয়াছ বলিয়া তোমায় কতই না বিদ্রূপ করিয়াছি।

মনে হয়—বিবাহ করা আমার মত দরিদ্রের পক্ষে উচিত হয় নাই। যাহাকে পরের দাসত্ব করিতে হয়—বিবাহের সৌখিনতা তাহার সাজে না। অথচ রমাকে যদি না লাভ করিতাম—তাহা হইলে আমার জীবন কি একেবারে নীরস হইত না ?

আমার আজকার মনক্ষোভের একমাত্র কারণ আমাদের আফিসের বড়বাবু। দুইটি দিন ছুটির জন্য তাঁহার পায়ে ধরিতে বাকি রাখিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার দয়া হইল না। —পরিবর্ত্তে পাইলাম—শ্লেষ, বিদ্রূপ, প্রেমের প্রতি কটাক্ষ !

আজ এই পর্য্যন্ত। অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। রমা লিখিয়াছিল—একবার তোমাকে সঙ্গে লইয়া দেশে আসিতে। কিন্তু কর্ম্ম-জগতে তোমার ও আমার মধ্যে যে ব্যবধান গড়িয়াছে—তাহা কি দূর হইবে না ?

আচ্ছা, রমাকে যদি আমার কর্ম্মস্থলে লইয়া আসি—কেমন হয় ? এই সহরে এত অল্পে চালাইতে পারিব কি ? কিন্তু এমন জীবন আর ভালও লাগে না !

*   *   *   *

১৩২৮ সাল, ৬ই মাঘ

প্রিয়তম বন্ধু,

আজ তোমাকে যে চিঠি লিখিতেছি—ইহাই বোধ হয় আমার শেষ পত্র। কারণ সংসারের নিকট আমার বিদায় লইবার সময় হইয়াছে। আমার ভৌতিক দেহের অবসান হয় তো হইবে না—কিন্তু আমি সংসারের নিকট মৃত বলিয়াই বিবেচিত হইব।

তুমি হয় তো আমার কথার হেঁয়ালী বুঝিতে পারিতেছ না—আমিই কি একদিন পূর্ব্বে কল্পনাও করিয়াছিলাম যে সংসারে আমি শুধু তাসের ঘর বাঁধিতেছিলাম—একটি ফুৎকারে তাহা উড়িয়া যাইবে ?

রমা আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে—চিরজীবনের মত। কিন্তু ইহা এমনি আকস্মিক যে এখনও আমি ইহার নিদারুণত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। টেলিগ্রাম পাইয়া যখন পৌছাই—তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার দেহাবশেষ তখনও ছিল বটে—কিন্তু তাহা প্রাণহীন।

তুমি বোধ হয় জান—তিনটি মাস আগে আমি নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগে পড়িয়াছিলাম। আমার প্রাণের আশা ছিল না—সমস্ত ডাক্তার জবাব দিয়াছিল। রোগশয্যায় যখনই চোখ মেলিয়াছি—দেখিতাম রমা সেই একই ভাবে শিয়রে বসিয়া আমার মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার মুখে রঙ্গিন আভা—সীমন্তের সিন্দুর জ্বলজ্বল করিতেছে। যেদিন আমার রোগের অবস্থা ভালর দিকে ফিরিল—সকলে বলিল—মিরাকল্! কেহ বা বলিল—যাহার সীমন্তের সিন্দুর স্বামীর মরণাপন্ন অসুখের সময় এমন দীপ্তি পায়—তাহার স্বামীকে কে ছিনাইয়া লইতে পারে ? যেদিন আমি অন্ন পথ্য করি—সেদিন রমা অশ্রুপ্লাবিত স্বরে বলিয়াছিল—ভগবান আমার মুখরক্ষা করেছেন—এখন যদি আমি যাই, আমার আপশোষ নাই। তখন কি জানি—সে তাহার নিজের জীবনের বিনিময়ে পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছে !

কিন্তু এত শীঘ্র সে চলিয়া গেল ? এই তো সেদিন সে লিখিয়াছিল—কোন্ গণক তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছে বায়ান্ন বছর তাহার পরমায়ু। বায়ান্ন দূরের কথা—বাইশেও সে পৌছিতে পারিল না !

আজ মনের মধ্যে যত কথা ভিড় করিয়া উঠিতেছে—সব যদি লিখি তাহা হইলে হয় তো প্রকাণ্ড একখানি বই হইবে। কিন্তু লিখিবার সামর্থ্য আমার নাই। শুধু এই কথা ভাবি—ভগবান কেন এই কাঙ্গালকে এমন অমূল্য সম্পদ দিয়াছিলেন—আবার কেনই বা তিনি এমনি করিয়া কাড়িয়া লইলেন।

রমাকে বিবাহ করিয়া শুধু তাহাকে কষ্ট দিয়াছি মাত্র। তার বড় সাধ ছিল মনের মত করিয়া সংসার পাতিবে—তাহার গৃহ আদর্শ গৃহ করিয়া গড়িয়া তুলিবে। হইতও তাই। যে ছয়টি মাস তাহার সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম—তখনই বুঝিয়াছিলাম একজনের হাতে নিঃশেষে সঁপিয়া দেওয়া কি বস্তু। কিন্তু

এত সুখ আমার সহ্য হইবে কেন? আমি রোগে পড়িলাম। তার পর সুস্থ হইবার সঙ্গেসঙ্গেই তাহাকে তাহার জননীর নিকট পাঠাইতে হইল—কারণ সে সন্তানের জননী হইতে যাইতেছিল। মনে হইতেছে—আমার কাছে যদি রাখিতাম —হয় তো তাহা হইলে সে আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

মনে পড়ে কি সুরেশ, দুই বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনে তাহাকে লাভ করিয়াছিলাম? আজিকার এই সূর্য্যের আলো, শীতের বাতাস, পাখীর ডাক, আকাশের স্বচ্ছতা —দুই বৎসর পূর্ব্বের দিনটিরই পুনরাবৃত্তি করিতেছে। শুধু যে আমার হৃদয়ে স্বর্গীয় আলো জ্বালাইয়াছিল—সেই আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এখনও মনে হইতেছে—সে আছে, আমার হইয়াই আছে এবং চিরকাল থাকিবে। গঙ্গার উপকূলে চিতা সাজাইয়া যখন তাহাকে তুলিয়া দেওয়া হইল—আমারই চোখের সম্মুখে যখন তাহার সোনার অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল— তখনও আমার মনে হইতেছিল সে আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই, সে আছে—আছে—আছে। আমার রমা—সে কি কখনও আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে!

কিন্তু এ স্বপ্ন! সে আমার হৃদয় জুড়িয়া আছে বটে —কিন্তু তাহাকে চোখে না দেখিয়া কি করিয়া বাঁচিব? তুমি বলিতে পার কি বন্ধু—কতদিন—আর কতদিন আমাকে এই অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে হইবে?

আমি কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি—অথচ শত সহস্র অপমানও আমাকে পূর্ব্বে বিচলিত করিতে পারে নাই। একটা ঘটনার কথার উল্লেখ করিব। সেদিন অত্যন্ত দুর্য্যোগ। সন্ধ্যা হইয়া গেল—কিন্তু কাজের চাপে ছুটি মিলিল না। মনে অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল—রমা একলা কি করিতেছে। রাত্রি যখন আটটা, বড়বাবুকে কহিলাম— বাড়ী যাচ্ছি। তিনি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন—এই ঝড়বৃষ্টিতে? আপনি যে বিল্বমঙ্গলকেও হারালেন দেখছি!

সে রাত্রে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া বাসায় ফিরিলাম। কিন্তু অপমানের আগুন মাথায় জ্বলিতেছিল—বৃষ্টিতে ভিজিয়াও সে আগুন ঠাণ্ডা হইল না। রমা আমার অস্থিরতা দেখিয়া বলিয়াছিল—কে কি বলেছে তাই নিয়ে তুমি ক্ষেপে গেলে? তুমি পুরুষ মানুষ নও?

সুরেশ, সে আমাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে—কিন্তু আমি তো এমন মুক্তি চাই নাই!

* * * *

চিঠি পড়া শেষ করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম— সেই বিনয় আজ দোকানদার! তাহার দোকানে যাহাতে জিনিষ কিনি—এই অনুরোধ করিতেই ব্যস্ত। দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া চিঠির স্তূপে আগুন জ্বালাইয়া দিলাম —মুখে আমার ক্রূর হাসি।

কাগজ-পোড়া গন্ধে গৃহিণী ছুটিয়া আসিয়া কহিল—এ কি ব্যাপার? ঘরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড কেন?

আমি হাসিয়া কহিলাম—এমনি একটু সখ হ'লো। বাজে কাগজ কি-না!

গিন্নি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি পাগল হলে না-কি?

আমি তাহাকে সজোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে একটি চুম্বন করিয়া কহিলাম— এটা কি আমার পাগলামির লক্ষণ না-কি?

গৃহিণী এইবার ফিক করিয়া হাসিয়া কহিল—হঠাৎ এত ঘটা যে?

আমি কথাটা ফিরাইয়া কহিলাম—নতুন দোকান থেকে জিনিষ কেনা হ'লো না—লোকটা আস্ত জোচ্চোর বলে মনে হ'লো। কাল মনে করছি তোমাকে নিয়েই মার্কেটিংএ বেরোবো। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে— হ্যাঁ দেখ, আজকাল যা ফ্যাসানেবল্ সিল্কের সাড়ি বেরিয়েছে—তোমার তো দেখছি অনেকদিন ভাল কাপড় জামা কেনাই হয় নি। কাল কিন্তু গোটা পঞ্চাশ ষাট টাকার কম নিয়ে বেরুলে চলবে না—এদিকে যা তুমি কৃপণ হচ্ছ!

গৃহিণী সহাস্যে কহিল—হঠাৎ মুখ দিয়ে খই ফুটছে কেন? যখন বেড়িয়ে এস মুখ অত গোমসা ছিল যে? জিনিষের কথা বলতে চটেই লাল। তোমার মতি গতি সত্যিই বোঝা ভার। এখন তো বেশ ভিজে বেড়ালটি। এদিকে যে কাগজ-পোড়া ছাই ঘরময় উড়তে লাগলো— এমন নোংরা তুমি—বাব্‌বা! দাঁড়াও ঝাঁটাটা নিয়ে আসি।

আমি বলিলাম—আর ছাঁথ, জগন্নাথ তো আজ

কেঁদেই আকুল—খুকি না-কি তিন দিন ওর দোকানে যায় নি। আহা বেচারী, ঐ নতুন দোকান দেখে বড্ড ভড়কে গিয়েছে। বলছিল—এ পাড়া থেকে ওকে উঠ্‌তে হবে। আহা বড্ড ভাল লোক ছিল কিন্তু—আর রাণীকে এমন ভালবাসতো! আমি বলি কি—অবিশ্যি তুমি যদি মত দেও—জগন্নাথকে শ' দুই তিন টাকা দিই। ও বলছিল —একটা বড় দোকান করলে নতুন দোকানকে দেখে নেবে। অনেকদিনের পুরোনো দোকান ছিল ওর—উঠে গেলে—আর ছ্যাখ, ও যদি বড় দোকান করে তাহলে আমাদেরই স্থবিধে। যখন যে জিনিষ ইচ্ছে—একেবারে ঘরের লাগাও—বড় স্থবিধে হবে কিন্তু।

গৃহিণী মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল—হুঁ, বুঝেছি। এই জন্যই নতুন দোকান থেকে জিনিষ কেনা হয় নি বুঝি? তা বেশ করেছ—জগন্নাথের কথা শুনে আমারই মনটা খচ খচ করছে। কাল সকালেই ওর কাছে রাণীকে পাঠিয়ে দেব।

পরদিন প্রাতে রাণী দুই হাতের মুঠিতে লজেন্স ও বিস্কুট লইয়া এবং একটি চুষিতে চুষিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল—দেখ বাবা, জগন্নাথ ভারী ভাল লোক কিন্তু—এক পয়সায় পনরোটা লজেন্স আর পাঁচখানা বিস্কুট দিয়েছে আজ। নতুন দোকানীটা কি জোচ্চোর—বুঝলে বাবা—ওর ওখানে মাত্তর নয়টা লজেন্স। জগন্নাথ বল্‌ছিল—ও একটা মস্ত শয়তান—তাই নয় বাবা?

আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

চিঠি আসায়

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চিঠির উপর কেবল আসে চিঠি,
লিখ্‌তেও ত এত সময় পায়!
কেবল চিঠি লিখ্‌তেই কি তবে
ফয়রা ক'রে বিদেশেতে যায়?

আমাদের কি কাজ নাইকো ঘরে,
ব'সে ব'সে পড়্‌বো কেবল চিঠি,
জবাব দিতে থাক্‌বো পরে পরে,
বুঝে ত কেউ দেখ্‌বে নাকো ইটি!

পোষ্টকার্ড্‌ আর টিকিটগুলো ছাই
কিন্‌তেও ত খরচ আছে তাতে,—
মানুষটির আর যোড়া মিলে নাই,
পয়সা যেন কামড়াচ্ছে হাতে!

চিঠি না আসায়

রাত পোহালে বৃহস্পতিবার,
ন' দিন হবে—
বুধে বুধে আট দিন আজ যায়,
কোনও খবর এলো না কই তার,
কালকে তবে
বিপিন, কি তুই যাবি কল্‌কাতায়?

বিদেশেতে আথ্‌ছারই ত যায়,
চিঠি দিতে
কিন্তু এমন করে না ত দেরি,
চিঠির উপর চিঠি আসে ঠায়,
খবর পেতে
না পেতে ঠিক চিঠি আসে ফেরই।

আমরা বরং করি তাতে ঘৃণা,
দেখি দোষই—
চিঠি লেখা এ লোকটার এক বাই
আজ বুধবার—আট আট দিন কি না
সেই মানুষই
কাগের মুখেও খবর দিল নাই!

দৈব-প্রেরণা

অধ্যাপক শ্রীফণীভূষণ রায় এম-এ

(মূল ফরাসী হইতে)

আথেন্স হ'তে নির্ব্বাসিত হয়ে অলিম্পিয়ার নির্জ্জন শৈলবাসে ফিদিয়াস্ শ্বেত পাথর, হাতীর দাঁত এবং সোণা দিয়ে দেবতার ঐশ্বর্য্যময় বিগ্রহ গড়ে তুল্‌ছিলেন—তাঁর অতবড় সৃষ্টির সুখ্যাতি গ্রীস দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বর্ব্বর দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল—সেই সময় একদিন অলিম্পিয়ার খ্যাত-নামা ব্যক্তিগণ তাঁকে দেখ্‌তে এলেন। ফিদিয়াস্ তখন শিল্পাগারে বসে যন্ত্রপাতি নিয়ে নাড়াচাড়া কচ্ছিলেন। "কোন্ দুষ্ট দেবতা একে পেয়ে বসেছে"—তাঁর মুখের সাম্‌নেই সকলে বলাবলি কর্ত্তে লাগল। কারণ, ফিদিয়াস্ কাউকে নমস্কারও কল্লেন না—চোখ তুলে কারো দিকে তাকালেনও না। অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে তারা মনে কর্ল্লে—"লোকটা কি সত্যসত্যই পাগল ?"—কারণ, চোখে তাঁর আকুল বিস্ময়ের স্বপ্ন-জড়িমা—অথচ অঙ্গ-ভঙ্গীতে কেমন যেন একটা অধীর ক্ষিপ্রতা। সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন—কপাল রেখেছেন তাঁর দু'হাতের উপর। কপালের কুঞ্চিত রেখায় মূর্ত্তি গড়বার শ্রমের চিহ্ন-স্বরূপ পাথর ইত্যাদির গুঁড়ো লেগে রয়েছে। দেখলে কিন্তু মনে হয় তিনি এই বাস্তব জগতের সীমা ছেড়ে কোন্ উর্দ্ধে উঠে গিয়েছেন—কোন্ অজানা রাজ্যের অনন্ত প্রসারের মধ্যে মন তাঁর মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত পাখা মেলে দিয়েছে।

রাত্রির পর রাত্রি অনাহারে, অতন্দ্রায় কাটিয়ে ফিদি-য়াস ধারণা কর্ব্বার চেষ্টা কর্ত্তেন—দেবাদিদেব জুপিটারের প্রশস্ত ললাটের মহিমাব্যঞ্জনা কোন্ পরিমাপের পরিমাণ তিনি শ্বেত পাথরে ফুটিয়ে তুল্‌বেন। প্রদীপালোকিত কক্ষে বসে এই উদ্বিগ্ন চিন্তায় তাঁর সারা রজনী কেটে যেত। কিন্তু এই নিদ্রাহীন তপস্যায় কোনো ফলোদয় হ'ল না। একদিন গভীর রাত্রিতে কোনো কিছু সমাধান না কর্ত্তে পেরে তিনি কক্ষ হ'তে বেরিয়ে এলেন। মাথার উপর দ্বিপ্রহর রজনীর সুপ্তিমৌন নীলাকাশ—অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের দ্যুতিমান সমারোহ দিগ্‌দিগন্তে এলিয়ে পড়েছে। মধ্যরাত্রির আকাশের এই শ্যাম-গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখে—মেঘ-সঙ্কাশ দেবাদিদেবের ললাটের বঙ্কিম-মাধুর্য্য কল্পনা করে নিতে তাঁর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হ'ল না। এইরূপে বিফলতার মোহ হ'তে মুক্ত হয়ে, যুক্তকরে তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন—বাক্যহীন ভাষায় তাঁর প্রাণের আকুলতা দেবদেবের চরণে নিবেদন করে। নাস্তিক সোক্রাতেসের বন্ধু বলে এবং দেবমূর্ত্তিতে মনুষ্যোচিত লক্ষণা আরোপ কর্ব্বার জন্য তাঁর যে দুর্নাম রটেছিল—তাঁর সেই রাত্রিকার ভক্তি-বিনম্র মূর্ত্তিখানা দেখ্‌লে আর কেউ সে কথা মনে রাখ্‌ত না।

পরদিন প্রভাত হ'তে তক্ষণ-কার্য্য সুচারুরূপে চল্‌তে লাগ্‌ল—এবং অল্প দিনের মধ্যেই মহামহিম দেবমূর্ত্তির নির্ম্মাণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হ'ল। বজ্রক্ষেপী জুপিটারের ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তি দেখে জনসাধারণ অবাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। যে ললাট-ফলক হ'তে "আথেনা" দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল—সেই মহত্ত্বব্যঞ্জক, বঙ্কিম ললাট দেখে তাদের কৌতূহল এবং বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। তারা বলাবলি কর্ত্তে লাগ্‌ল—কি বিশাল মূর্ত্তি—মন্দিরে কুলায় না—আকাশের নীচে রাখলে এ মূর্ত্তি নিশ্চয় আকাশ স্পর্শ কর্ব্বে। যাক্—ফিদিয়াসের অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের কথা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। তখন একদিন অলিম্পিয়ার নাগরিকগণ "লরেল" পত্রাচ্ছন্ন এবং পুষ্পাকীর্ণ রাজপথে শোভাযাত্রা করে এসে ফিদিয়াসকে সংবর্দ্ধনা কল্লে'ন। সংবর্দ্ধনা কর্ব্বার সময় তাঁরা বলেছিলেন—"আথেন্সকে ফিদিয়াসের জন্মস্থলী বলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী বলা যায়। আজ হ'তে অলিম্পিয়াও নগরী-মুখ্যা বলে শোভন পরিচয় লাভ কল্ল'"। তার পর ফিদিয়াসকে লক্ষ্য করে তাঁরা বল্‌তে লাগলেন—"কি প্রকারে এই অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি তুমি গঠন করেছ—হে শারমিদের পুত্র—তুমি কি "সাতুর্ণের" পুত্র জুপিটারের মুখোমুখী কোন দিন দাঁড়িয়েছিলে!—কারণ, তোমার গঠিত মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গে-অঙ্গে—প্রতি রেখায়-রেখায় দৈব

ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য ক্ষরিত হচ্ছে। যদি সত্যসত্যই দেবতা থাকেন, তবে তোমার গঠিত মূর্ত্তিতে তিনি চিরকালের জন্য আপনাকে ধরা দিয়েছেন। কি মাধুর্য্যব্যঞ্জক—মহত্ত্বব্যঞ্জক দেবাদিদেবের আ-বঙ্কিম ললাট দেশ—উদয়-সূর্য্যের রশ্মি-রঞ্জিত পূর্ব্ব-দিকচক্রবাল শোভায় ইহার কাছে পরাস্ত। হে শারমিদের পুত্র, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হ'ল—কে তোমার গঠনপটু হস্তে প্রেরণা দিল—তুমি কি স্বপ্নে দেবমূর্ত্তি দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলে—না অন্য কোনো প্রকারে তুমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছ" ?

ফিদিয়াস সহজ কণ্ঠে বল্লেন—না, না—হোমারের কাব্য থেকেই, হে বন্ধুগণ, আমি প্রেরণা পেয়েছি। সেই যে হোমার কাব্যের দুইটি ছত্র—যেখানে কবি দেবভাষায় বর্ণনা কর্চ্ছেন—কেমন করে জুপিটারের ভ্রূভঙ্গীতে বিশ্ব-চরাচর কাপুরুষের মত কম্পিত হয়ে উঠে। তবে একদিন গভীর রাত্রিতে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জের—বল্‌তে-বল্‌তে ফিদিয়াসের কণ্ঠরোধ হ'ল।

অলিম্পিয়ার নাগরিকগণ অজস্র পুষ্পমাল্যে তাঁকে ভূষিত করে, নতজানু হয়ে দেবতার মত তাঁকে বন্দনা করতে লাগলেন। ফিদিয়াস এই অপূর্ব্ব সম্মানলাভে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়েছিলেন। কিন্তু অলিম্পিয়ার বয়োবৃদ্ধগণ নাগরিকাগণকে উৎসাহিত করে বল্লেন—তোমরাই যথার্থ রসকুশল। এই যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অপার্থিব সৃষ্টি—ইহা কি কথনো দৈবানুগ্রহ ছাড়া হ'তে পারে? দেবপ্রিয় ফিদিয়াসকে দেবোচিত সম্মান করে, তোমরা সম্যক শীলের পরিচয় দিয়েছ।

প্রায় দুই শত প্রৌঢ়া শ্বেত পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে, পুষ্পস্তবক হাতে করে দেব-শিল্পীকে ঘিরে ঘিরে বল্‌তে লাগল—ধন্য সেই রমণী যে এই রকম সুসন্তান গর্ভে ধারণ করে! হে আথেন্সবাসিনী সত্যই তুমি রত্নগর্ভা, যে, এই দেবানুগৃহীত সন্তানকে তুমি জন্ম দিয়েছ। এলায়িত কেশে, আন্দোলিত বক্ষে, সমস্বরে তারা দেবাদিদেবের স্তোত্রগান কর্ত্তে লাগল; বারংবার তারা ফিদিয়াসকে প্রদক্ষিণ করে-করে জুপিটারের পবিত্র নাম উচ্চারণ কর্ত্তে লাগল। তাদের এই উচ্ছ্বাসে ফিদিয়াস মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুঠে উঠল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় "পানতারকুশ" এবং "পোলিদামি" ছাড়া ইহা কেউ লক্ষ্য করে নাই। তারা ফিদিয়াসকে মনে প্রাণে ভালবাস্‌ত। তাই তাদের মনে ভয়ের সীমা ছিল না—পাছে এই নিয়ে কোনো অপ্রিয় ব্যাপার সংঘটিত হয়—যাক্। উৎসব-শেষে ফিদিয়াস বাড়ীতে ফিরে দেখ্‌লেন—ইউরিপিদিস হাস্য-মুখে তাঁর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে বল্লেন—আসুন, আসুন, হে ধার্ম্মিকপ্রবর, আপনার এই মহতী সৃষ্টি সাধারণ্যে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে বেশ সহায়তা কর্ব্বে। আপনি ধন্য, ধন্য। সোক্রাতেসের গৃহে অনেকবার ইউরি-পিদিসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং ইউরিপিদিসের গৃহেও ফিদিয়াস বহু দিন আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২)

ইউরিপিদসের বিদ্রূপোক্তি সেদিন ফিদিয়াসের মর্ম্মে আঘাত কর্ল্ল। পৃথিবীর সর্ব্বত্র—কেবল গ্রীস দেশে নয়—ইজিপ্টে—কালডিয়ায়—যেখানে অরণ্যের মত অসংখ্য মন্দির-চূড়া আকাশের দিকে মাথা উঠাত—এমন কি ভারতবর্ষে—সর্ব্বত্রই জুপিটারের পূজা প্রচলিত ছিল। অগণ্য ধনরত্ন অসংখ্য তীর্থযাত্রীদিগের কল্যাণে পূজা-স্থানে আস্‌ত। গ্রীস দেশের নাগরিকগণ ত নূতন-নূতন মন্দির নির্ম্মাণে সাধ্যের অতিরিক্ত ধনরত্নাদি ব্যয় কর্ত্ত। তাদের সুনিশ্চিত, ঐশ্বর্য্যময় মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কাব্যের উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ভক্তেরা বল্‌ত—হাঁ, পৃথিবীশ্বরের মন্দির বটে—হাঁ পৃথিবীশ্বরের মূর্ত্তি বটে। তার পর নতশিরে তারা মন্দিরের দ্বারে লুটিয়ে পড়িত। সুচতুর পুরোহিতেরা জন-সাধারণের এই উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগাতে কোনো ত্রুটি কর্ত্ত না। ইউরিপিদিসের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাক্য ফিদিয়াসের মনে সেদিন অনেক কথা জাগিয়ে তুল্‌ল—"এ আমি কি কর্ল্লাম! অন্ধ জন-সাধারণকে অন্ধ-বিশ্বাসের পথে চালনা কর্ব্বার সহায়তাই কেবল কি কর্ল্লাম? তথন তাঁর মনে হ'ল—দেবমূর্ত্তির হস্তে "রাজদণ্ড" বৃথাই দেওয়া হয়েছে—প্রস্তর মূর্ত্তির অঙ্গে-অঙ্গে লাবণ্য ও ঐশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি বৃথাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কারণ, দেবমস্তকের চতুর্দ্দিকে যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে, তা আলোর পথ নয়—অন্ধকারেরই পথ দেখাবে।

তুমি জান, কি তুমি করেছ?—ইউরিপিদিস বল্‌তে

লাগলেন। তোমার গঠিত মূর্ত্তিটি হয়েছে তিলোত্তম। মানুষেরই সকল সদ্‌গুণ এ' মূর্ত্তিতে তুমি আরোপ করেছ। এই মূর্ত্তির প্রশান্ত বদনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বিচারের প্রভা ফুটে উঠেছে—যা' ইহার শত্রু প্রমিথিউসের চরিত্রগত ধর্ম্ম—যা' জুপিটারের মুখে কোনোদিনই ফুটে উঠতে পারে না। তুমি আমাদের "বিশেষত্ব"—মানব-ধর্ম্মই মহামহিম দেবমূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছ—যা' দেখে অগণ্য দেবমণ্ডলী বিস্ময়ে মূক হয়ে গেছেন। তবে কি জান—আসল কথা "মানুষ",—মানুষের উপরে কিছু নেই। তাই আমি বিশ্বাস করি—সগর্ব্বে বলি—মানব-আত্মা এই মূর্ত্তি হ'তে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ···

পৃথিবীতে ইউরিপিদিস হ'তে দেবতাদিগের বড় শত্রু আর কেউ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজের কাল্‌কে বুঝতেন—যুগধর্ম্ম মেনে চল্‌তেন। তাই নাস্তিকতার মধ্যেও দু' চারিটি এমন আস্তিক্য-বুদ্ধির কথা তিনি বল্‌তেন—যা' মানুষের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আঘাত কর্ত্ত। ফিদিয়াস কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক ছিলেন; কোনো কথা গোপন করা তাঁর অভ্যাস ছিল না—বরঞ্চ বিবৃতিতেই ছিল তাঁর আনন্দ—যে আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ তাঁর গঠিত মূর্ত্তিগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। তবে পাথর পালিশ কর্ত্তে যেয়ে ভাস্করেরা পাথরের মতই ভারী এবং রূঢ় হয়ে ওঠে। ফিদিয়াস বল্‌তে লাগলেন—দেবতা! দেবতা কোথায়? মর্ম্মর পাদপীঠের উপর শারমিদের পুত্র ফিদিয়াসের কীর্ত্তি-চূড়াই আমি গড়ে তুলেছি। দেবতা কোথায়? তবে অসংখ্য তীর্থ-যাত্রীরা "জুপিটার" দেবের কথাই মনে রাখবে—জুপিটারের স্রষ্টা ফিদিয়াসের কথা স্মরণেই আন্‌বে না। এইরূপ কথা বলাবলির সময় তাঁরা দেখলেন—প্রায় হাজার জন যাত্রী সমারোহ করে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কি তাদের উচ্ছ্বাস—কি তাদের স্ফূর্ত্তি! মন্দিরের সোপানে তারা নতজানু হয়ে প্রণত হল। চোখ ঝল্‌সে যাবে বলে—দেবমূর্ত্তির কুঞ্চিত আঁখির দিকে কেউ তাকাতে সাহস কর্‌ল না। কিন্তু তারা অলিম্পিয়া ছেড়ে যাবার আগে মূর্ত্তি-গঠকের নাম পর্য্যন্ত জান্‌বার চেষ্টা কর্ব্বে না—এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত ছিলেন।—নির্ব্বোধ—গাধা···ফিদিয়াস বলে উঠলেন।

অল্প বয়সের যুবতীরা সাদা-টে রংএর পোষাকে দেহাবৃত করে, যুক্তকরে দলে-দলে মন্দিরে যেতে লাগল—এবং কবুতর ও ঘুঘু উপঢৌকন দিয়ে প্রণয়ীদের কুশল কামনা কর্ত্তে লাগল। কি ধনী কি নির্ধন—সকলেই মহামান্য জুপিটারের মন্দিরে—একবারের জন্যও হো'ক—এলেন। তাঁদের দত্ত দ্রব্যাদিতে পুরোহিতদের লাভ হতে লাগল—প্রচুর। ফিদিয়াসের মনে এই ক্ষোভ হ'ল যে তিনি যে কেবল মহিমা হ'তে বঞ্চিত হ'লেন তাই নয়—তাঁর আর্থিক লাভও পুরোহিতদের তুলনায় খুব যৎসামান্যই হ'ল। অথচ তাঁর গঠন-পটু দক্ষিণ হস্তই—সব কিছুর—দেবতার মহিমার এবং পুরোহিতদের লাভের—হেতু স্বরূপ।

(৩)

কিছু দিন পরে "নব দেবীমূর্ত্তি (Nine Muses) নির্ম্মাণের জন্য ফিদিয়াস আহূত হলেন। মূর্ত্তিগুলি যে কি অপরূপ সুন্দর হয়েছিল—তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফুলের মতন পেলব শুভ্র, সুন্দর নারীদেহের প্রতি রেখা-ভঙ্গীটি যেন গানের সুরের মত লীলায়িত হয়ে উঠেছে। নয়টি দেবীমূর্ত্তি—তাঁরা সকলেই নৃত্য-দোদুল পদে "আইও" দেবীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁদের সুন্দর নয়নের তির্য্যক দৃষ্টি "আইও" দেবীর মুখের উপর সন্নদ্ধ। আইও দেবীর মুখে অপার্থিব কারুণ্য—চোখে ভীতিজনক উদ্বেগ। তবু তিনি যেন কাণ পেতে দেবীদের গান শুনছেন এবং নর্ত্তন দেখছেন। একটু দূরে "পেলিম্নি" দেবীর অঙ্গুলী পরিচালনা লক্ষ্য করে একজন রাখাল বাঁশের বাঁশী বাজাচ্ছে···

রাখাল তুমিই ধন্য! তুমি ত তবু বল্‌তে পার্ব্বে যে গীতি-কবিতার দেবী তোমাকে প্রেরণা দিয়েছেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি কোনো দেবীর কাছে প্রেরণা পেয়েছি, তবে—একটা কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে ফিদিয়াস কক্ষ ভরে তুল্লেন···

ফিদিয়াসের ভক্তেরা দলে-দলে তাঁর এই অদ্ভুত সৃষ্টি দেখতে আস্‌তে লাগল। পোলিদামি এবং পান্‌তার কুস্‌ও এসেছিল। নগ্ন দেবীদেহের অকুণ্ঠিত সৌন্দর্য্য অবলোকন করে তাদের অনেকেরই চোখমুখ লাল হয়ে উঠল—এমন কি ইউরিপিদিসও ভ্রূভঙ্গী করে উঠলেন। কারণ, কোনো কিছুরই আতিশয্য তিনি পছন্দ কর্ত্তেন না।

ফিদিয়াস সকলের সাম্‌নেই বল্‌তে লাগলেন—যদি আমি

কোনো দৈব-প্রেরণা পেয়ে থাকি, তবে যেন আমি এখনই মরে যাই। দৈব-প্রেরণা—দৈব-প্রেরণা···লোকে যে কি বলে—তা' জানি না—বারবার তিনি এইরূপ বল্‌তে লাগলেন এবং কঠিন বিদ্রূপের হাসিতে তাঁর শিল্পাগার ভরে তুল্লেন।

* * * *

অকস্মাৎ সারা বন কাঁপিয়ে একটা সুকরুণ, বহুক্ষণ-স্থায়ী—ক্ষুব্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস বয়ে গেল। ফিদিয়াসের হাতের যন্ত্র হাতেই রইল এবং সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যন্ত্র-পুত্তলীর মত দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে ফিদিয়াস ঘাড় ফিরিয়ে দেখ্‌লেন—কি আশ্চর্য্য! সুগঠিত নারীমূর্ত্তিগুলি—দিগন্তে বিলীয়মান ছিন্ন মেঘের মত ক্রমশঃ অন্তর্হিত হচ্ছে। বিস্ফারিত নয়নে তিনি দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—সৌন্দর্য্যের উপমা দেবীমূর্ত্তিগুলি স্বপ্ন-সংদৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের মত ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। শেষবারের মত একবার তিনি দেখ্‌বার চেষ্টা কর্ল্লেন; কিন্তু তাঁর চোখের সাম্‌নে—পোলিম্নি (গীতি-কবিতার দেবী) দেবীর হস্ত হ'তে বীণা ভ্রষ্ট হয়ে পড়ল—এবং "আইও" দেবীর সুন্দর, সুকরুণ মুখখানা ঝটিকার মুখে দীপশিখার মত—সহসা নিভে গেল।

ঠিক সেই সময়ে মহামান্য জুপিটার দেবের মন্দিরেও সেই করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিঃশ্বাস ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে সেখানে বহু লোক সমবেত হ'ল এবং পুরোহিতবর্গ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এবং বিষণ্ণ মুখে, দেবাদিদেবের সম্মুখে এসে "হত্যা" দিয়ে পড়ল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! বেদীর প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি সহসা নির্ব্বাপিত হয়ে গেল এবং জুপিটারের মহত্ত্বব্যঞ্জক ললাটদেশ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে উঠ্‌ল। তাঁহার হস্ত হ'তে সুমহৎ "দণ্ড" স্খলিত হয়ে পড়ল; এবং পাষাণ-মূর্ত্তিতে প্রাণের যে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল—তা' মৃত্যুর তুহিন-স্পর্শে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। চোখের সাম্‌নে যদি একটা সাগর শুকিয়ে যায়—একটা পাহাড় খণ্ড খণ্ড হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে—তা'হলে জনগণ যেমন বিস্ময়ে স্তব্ধ এবং নির্ব্বাক্ হয়—দেব-মন্দিরে সমবেত জনসমূহও সেইরূপ আড়ষ্ট এবং মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বহুক্ষণ পরে—মর্ম্মন্তুদ ভগ্ন কণ্ঠে তারা চীৎকার করে উঠল—"হায়-হায়, মন্দির পড়ে রইল—দেবতা চলে গেলেন! হায়-হায়, মন্দির পড়ে রইল—দেবতা চলে গেলেন!" মহামান্য জুপিটার দেবের আশে-পাশে ফিদিয়াস যে সব বিজয়ী মূর্ত্তি অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত খোদিত করেছিলেন—সেগুলোও যেন মৃত্যুর স্পর্শে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। তবে—অন্য ভাস্করের সৃষ্ট মূর্ত্তিগুলিতে কোনো রূপান্তর লক্ষিত হয় নাই।

কি করে এই অলৌকিক ব্যাপার ঘটল—এই আলোচনা যখন সকলে ভীত এবং ত্রস্তভাবে কচ্ছিলেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী অশ্রুসিক্ত চোখে ফিদিয়াসের গৃহ হ'তে বেরিয়ে এলেন। পোলিদামি এলায়িত কেশে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর অনুসরণ কর্ল্ল। পোলিদামির পিছনে পিছনে রোরুদ্যমান কণ্ঠে অনেকেই বেরিয়ে এল। "পানতারকুশ্"কে তার বন্ধুরা সাম্‌লাতে পার্চ্ছিল না—সে বেচারী এত অধীর হয়ে পড়েছিল। সর্ব্বশেষে এল জনতা—ফিদিয়াসের মৃতদেহ বহন করে। মৃতদেহের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আস্‌ছিলেন স্বয়ং ইউরিপিসিদন্—যে তরবারি দ্বারা ফিদিয়াস নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করেছিলেন—সেই তরবারির হাতল তখনও তাঁর হাতে ধরা ছিল···।



সাহিত্যিক যশ

প্রবোধকুমার সান্যাল

অর্থের প্রতি আসক্তি একদিন যদি বা শেষ হয়, যশের লোভ মানুষের অনন্ত। প্রশংসা-বাক্যে দেবতাও আত্ম-প্রসাদ পান্, বর দান করেন, যোগীরও ধ্যান ভাঙে। এটা প্রকৃতির সঙ্গে জড়ানো, গ্রন্থিমোচন করা কঠিন। যারা সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্যাগী, কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, তারাও খুসি হয়ে ওঠে আপন জয়ন্তীতে, ভক্তের প্রতি সদয় হয় বন্দনা পেয়ে। কিন্তু এই প্রকৃতির আছে নানা পথ, নানা বিকাশ। এমনো দেখা যায় যশের লোভ মানুষকে কোথাও মহিমান্বিত করেছে, গৌরব এনে দিয়েছে, নানা কর্ম্মে ও নানা নীতিতে জীবনকে সে ঐশ্বর্য্যবান করেছে। অন্যদিকে এই লোভের হীনতায় সে ডুব দিয়েছে, আপন কুপ্রবৃত্তির জঘন্য দাসত্বে সে মলিন হয়ে গেছে। এর দৃষ্টান্ত বাংলা দেশে অগণ্য।

কিন্তু সাহিত্যের এলাকাতেও এই যশোলোভের রাজ-রাজত্ব। এখানেও দল, এখানেও স্বার্থ, এখানেও উৎকট সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু সমস্তটার পিছনে রয়েছে যশের প্রতি প্রবল মোহ, প্রতিষ্ঠা আদায় করার অশোভন মত্ততা। বিদ্বেষ প্রচারের অক্লান্ত উৎসাহে কেউ স্বনামধন্য হয়ে ওঠার চেষ্টায় রয়েছে, কেউ বা সাহিত্যে কেবলমাত্র বিলেতী কাগজের ফুল বেচে লোকনিন্দায় আপনাকে মূল্যবান মনে করছে। অথচ যারা সত্যকারের শক্তিমান লেখক তারা থাকে যবনিকার আড়ালে, তাদের আত্মপ্রচারের বাহুল্য নেই।

প্রশংসা আদায় ক'রে বেড়ানো একশ্রেণীর লেখকের কাজ। সুখ্যাত হবার আগে চেয়ে বসে সুখ্যাতি। বই লিখেই তারা ছোটে নামজাদা লোকের বাড়ী। অনেক হীনতা স্বীকার ক'রে আনে দু'লাইন প্রশংসা। বন্ধুমহলে বিলি করে বই, একজন আর একজনের প্রশংসা লেখে, তারপর সেই অযথা প্রশংসা ছাপা হয় কোনো উৎকোচগ্রাহী সম্পাদকের চারপেনী মাসিকপত্রে।

সম্প্রতি মস্কোতে এক সাহিত্যিক-সম্মেলন বসে, এর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের একত্র গ্রথিত করা,—এই উপলক্ষ্যে রুশ সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় সাহিত্যিক ম্যাক্সিম্ গর্কী একটি তীব্র সমালোচনা লিখে পাঠিয়েছেন। বর্ত্তমান সোভিয়েট্ সাহিত্যের বিরুদ্ধে তাঁর নিদারুণ অভিযোগ। দু'খানা প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রে * তাঁর লেখাটি ছাপা হয়েছে, তা'তে তিনি বলেছেন, 'এখনকার লেখকরা অত্যন্ত বিরক্তিকর ভাবে পরস্পরের প্রশংসা করেন আর সেই আনন্দে মদ্যপান করেন অতিরিক্ত। ফলে এই হয়, অক্ষম লেখকরা পান্ অকারণ প্রাধান্য।

এই প্রবীণ ঔপন্যাসিক ও বিপ্লবী বলেছেন, 'সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অনেকেই যতখানি লেখেন তার চেয়ে বেশি পরিমাণে মদ খান্। ঘরে বসে তাঁরা মদ খেতে থাকুন, পথে ঘাটে এখানে ওখানে এমন কুকাজের প্রশ্রয় তাঁরা নাই দিলেন।

কোকিল প্রশংসা করে মোরগের, কারণ, মোরগ প্রশংসা করে কোকিলের, তার ফলে এই ঘটে যে, শক্তিহীন লেখকরা যশ পায় যা তাদের প্রাপ্য নয়।'

সোভিয়েট্ রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে যে নূতন মনস্তত্ত্ব বিস্তারলাভ করেছে, তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য গর্কি লেখকদের অনুরোধ জানিয়েছেন। বলেছেন, যে গণতান্ত্রিক মনোভাব আজ মজুরদল থেকে কৃষকদের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে তাদেরই সংজ্ঞা দিয়ে চরিত্র-সৃষ্টি করা দরকার।

'লেখকদের মধ্যে সৎশিক্ষা ও সভ্যতার অভাব, এ জন্য নিজের প্রতি প্রত্যেকেই তাঁরা মোহাচ্ছন্ন ; তাঁদের স্ব-স্ব-প্রধান হয়ে ওঠার গোড়াতে রয়েছে নেতাগিরি করার তৃষ্ণা।' - গর্কির নিন্দা এইখানেই থামেনি, তিনি পুনরায় বলেছেন, 'সুতরাং কৃষকগণের মধ্যে যেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ বিলুপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার চিত্র এখনকার লেখকরা সত্য ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না।'

বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে ঢুকে দলাদলির চেষ্টা আছে কতকগুলি লেখকের মধ্যে, গর্কি এই নীতিরও তীব্র নিন্দা করেছেন।

বাংলা দেশের সমসাময়িক সাহিত্যের লেখকগণ হয়ত গর্কির কোনো কোনো কথায় উপকৃত হতে পারেন।

---

* Pravda ও Izvestia

সাহিত্য-সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে 'মোক্ষদাসুন্দরী সুবর্ণ পদক' ও 'নলিনীসুন্দরী সুবর্ণ পদক' নামে যে দুইটি পদক আছে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা হইয়াছে। উভয় পদকের জন্যই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গ্র্যাজুয়েটরা মাত্র প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। যে সকল মহিলা গ্র্যাজুয়েট 'মোক্ষদাসুন্দরী পদকে'র জন্য প্রতিযোগিতা করিবেন, তাঁহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় হয় 'বাঙ্গলার মহিলা কবি', আর না হয় 'অশ্বিনীকুমার দত্ত' সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে। যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, সুবর্ণ পদকটি তাঁহাকে প্রদত্ত হইবে। আর 'নলিনীসুন্দরী পদকে'র প্রার্থিনী মহিলা গ্র্যাজুয়েটদিগকে হয় (কৃষ্ণকান্তের উইলের) 'ভ্রমর' না হয় 'বাঙ্গলার শারদশ্রী' সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিতে হইবে। যাঁহার কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে, তিনিই পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন। পরীক্ষার্থিনীরা নিজ নিজ নির্ব্বাচিত বিষয়ে বিরচিত প্রবন্ধ বা কবিতা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ নবেম্বরের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অব্ একজামিনেশন্‌সের নিকট পাঠাইবেন। প্রত্যেক রচনার শীর্ষদেশে রচনার বিশেষত্বজ্ঞাপক একটি মটো' (Motto) লিখিত থাকিবে। ঐ সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি শিলমোহর করা খামের ভিতর রচয়িত্রীর নাম লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, এবং ঐ খামের উপর তাঁহার রচনার শীর্ষে ব্যবহৃত 'মটো'টি লিখিয়া দিতে হইবে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নব নাট্যমন্দিরে অভিনীত নাটক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিরাজ-বৌ" নাটকাকারে—১৲

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত উপন্যাস "শেষ পথ"—২৲

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত "সুরলিপি"—১৷৹

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্য "মধুচ্ছন্দা"—১৷৹

ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত "বিদ্যাসুন্দর"—সচিত্র সংস্করণ—৩৷৹

শ্রীসত্যচরণ লাহা এম-এ, পিএইচ-ডি, এফ্ জেড-এস্, এম্-বি-ও-ইউ প্রণীত "কালিদাসের পাখী"—৬৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত শিশুপাঠ্য "বেড়ে মজা"—।৹

Indian Science of Pulse, Vol. 1, by Sj. Pravakar Chatterjee M. A.—2/8/-

শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রত্যাখ্যান"—৸৹

শ্রীরামদেব স্মৃতিতীর্থ-সম্পাদিত "বিশুদ্ধ আহ্নিক-কৃত্য বা নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান"—১৷৹

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র দত্ত প্রণীত "ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা"—১৲

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "কুয়াশা"—১৷৹

বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "বনশ্রী"—১৸৹

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "অনন্যা"—২৲

শ্রীসুশীল রায় প্রণীত উপন্যাস "একদা"—১৷৹

শ্রীতারাপদ রাহা প্রণীত উপন্যাস "যে শাখে ফুল ফোটে না"—১৷৹

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "প্রেমের বিচিত্র গতি"—১৷৹

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তৃষিত"—১৲

শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "শ্বেতপত্র"—১৷৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষ আগামী ২৫শে ভাদ্র এবং কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ ১৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ আশ্বিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন ১০ই ভাদ্রের মধ্যে এবং কার্ত্তিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন ১লা আশ্বিন মধ্যে ছাপিতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjee for Messrs Gurudas Chatterjea & sons,
at the Bharatvarsha Printing Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



[illegible]

শিল্পী—শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



আশ্বিন—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

সাধনতত্ত্ব

অধ্যক্ষ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ বিদ্যাবাচস্পতি এম-এ

অভীষ্ট-সিদ্ধির উপায়কে বলে সাধন। অভীষ্টের গুরুত্ব অনুসারে সাধনের গুরুত্ব। আমাদের যে অভীষ্টটী সর্ব্বাপেক্ষা বড়, তাহার সাধনের গুরুত্বও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই সাধনটা কি? কিন্তু, সর্ব্বাগ্রে আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভীষ্ট আমাদের কি?

আমাদের মধ্যে এমন কোনও বাসনা যদি থাকে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহা আমাদের সমস্ত চেষ্টার মুখ্য প্রবর্ত্তক—আমাদের সমস্ত চিন্তা ও কার্য্য, আমাদের সমগ্র জীবন-যাত্রা যাহার অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত—তাহা হইলে সেই বাসনার লক্ষ্য বস্তুটীই হইবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভীষ্ট।

আমাদের মধ্যে বস্তুতঃই এরূপ একটী বাসনা আছে; তাহা হইতেছে সুখের বাসনা। আমরা সুখ চাই। জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের সমস্ত চেষ্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় সুখের বাসনা দ্বারা। আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই লক্ষ্য সুখ—আহার-বিহারের সুখ, যশঃ-প্রতিপত্তির সুখ, মান-সম্ভ্রমের সুখ, কাব্যালোচনার সুখ, ধর্ম্মালোচনার সুখ, পরোপকার বা স্বদেশ-সেবার আত্মপ্রসাদ, বা কর্ত্তব্যপালনের সুখ। অন্য যাহা কিছু করি, তাহাই সুখবাসনা-পূর্ত্তির আনুকুল্য-বিধায়ক, তাহার অনুপূরক বা পরিপূরক।

প্রশ্ন হইতে পারে, দুঃখ নিবৃত্তির বাসনাকেই আমাদের মুখ্য বাসনা বলা যাইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে—সুখলাভের বাসনার ন্যায় দুঃখনিবৃত্তি-বাসনার ব্যাপকতা নাই, চিরন্তনতা নাই। দুঃখ আমরা চাই না সত্য; কিন্তু কেন চাই না? সুখ চাই বলিয়াই তদ্‌বিপরীত বস্তু দুঃখ চাই না। আলো চাই বলিয়াই আলোর অভাব অন্ধকার চাই না। দুঃখ চাই না বলিয়াই যে সুখ চাই, তাহা নহে; কারণ, দুঃখের অভাবস্থলে কেবলই যে সুখ থাকিবে, তাহা

বলা যায় না; সুখদুঃখের অভাবসূচক একটা অবস্থাও আছে; এই অবস্থাটীও আমাদের বিশেষ কাম্য নহে। যখন সুখলাভের কোনও সম্ভাবনাই থাকে না, অথচ দুঃখের তীব্রতাও অসহ্য হইয়া উঠে, কেবলমাত্র তখনই আমরা—অগত্যাপক্ষে—সুখদুঃখের অভাব কামনা করিয়া থাকি; কিন্তু এই কামনা সাময়িক; এই অবস্থা পাওয়া গেলে তখনই আবার সুখের বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে; সুতরাং সুখলাভের বাসনার আনুষঙ্গিকভাবেই দুঃখনিবৃত্তির বাসনা উদিত হয়; দুঃখনিবৃত্তি-বাসনার প্রাধান্য নাই।

দুঃখনিবৃত্তিবাসনার সর্ব্বাবস্থার প্রবর্ত্তকত্বও দেখা যায় না। এ কথা বলার হেতু এই। জন্ম, জরা, মৃত্যু—এই তিনটী ব্যাপারের দুঃখের কথা অনেকের মুখেই শুনা যায়। জন্মের—মাতৃগর্ভবাসের—দুঃখ হয়তো আছে; তাহা হয়তো আমরা অনুভবও করিয়াছি। কিন্তু সেই অনুভবের স্মৃতি আমাদের নাই; স্মৃতি নাই বলিয়া তাহা আমাদের চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইতে পারে না। মৃত্যুকালের দুঃখ সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। জরার দুঃখ আমরা দেখি; কেহ কেহ অনুভবও করিয়া থাকেন; এই দুঃখের নিবারণের জন্য চেষ্টাও করা হয় যথাসাধ্য। কিন্তু এই দুঃখ সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কেন? বাঁচিয়া থাকার সুখ—আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গসুখ, নাম-যশের সুখ—ভোগ করার নিমিত্তই জরার কষ্ট সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়। এ স্থলেও সুখলাভের বাসনারই প্রাধান্য দেখা যায়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখাদি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সকল রকম দুঃখ সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে চায়—সুখভোগের আশায়। ভাবী সুখের আশায় আমরা অনেক সময়ে দুঃখকে বরণ করিয়াও লই। পারলৌকিক সুখের আশায় সংসার-সুখ ত্যাগ করিতে লোককে দেখা যায়। আবার, বর্ত্তমানে অতি অল্পকালস্থায়ী সুখের লোভেও আমরা এমন কাজ করিয়া থাকি, যাহার ফল পরিণামে দুঃখময় বলিয়া আমরা সকল সময়েই জানি। এ স্থলেও সুখবাসনারই প্রবর্ত্তকত্ব; সুখ-বাসনাই ভাবী দুঃখের জ্ঞানকে পরাজিত করিয়া স্বীয় প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া থাকে।

এক্ষণে বুঝা গেল—দুঃখনিবৃত্তিবাসনার প্রবর্ত্তকত্ব সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। সুখবাসনার আনুষঙ্গিকভাবেই ইহার অভিব্যক্তি। ইহার ব্যাপকত্ব নাই। ব্যাপকত্ব সুখ-বাসনার।

সকল মানুষের উপরেই সুখবাসনার ব্যাপ্তি আছে; এই বাসনা স্বভাবসিদ্ধ, জন্মগত; তাই সদ্যোজাত শিশুও মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড়ের সন্ধান করে—নিজের অজ্ঞাতসারে। কি চায়, তাহা সে অবশ্য জানে না; মাতৃস্তন্য এবং মাতৃক্রোড় পাইলেই তাহার সান্ত্বনা আসিতে দেখা যায়; তাহাতেই তাহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু একটু বড় হইলে, যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহাদের কোলে যাইতে চায়—ভালবাসার সুখের লোভে, অথচ তখনও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় নাই। এই যে ভালবাসার সুখলাভের লোভ, ইহা তাহার বিচারবুদ্ধির ফল নহে; ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ জন্মগত সুখলোভ। এই সুখবাসনাই শিশুরও সমস্ত চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়া থাকে।

কেবল মানুষ নহে; পশু-পক্ষী আদি ইতর প্রাণীও এই সুখবাসনা দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। বৃক্ষ-লতাদির অবস্থাও তদ্রূপ। ঘরের ছায়ায় কোনও গাছ জন্মিলে আলোর দিকে তাহার শাখা ঝুঁকিয়া পড়ে। আলো পাইলে তাহার চাকচিক্য ও স্নিগ্ধতা বর্দ্ধিত হয়। এই চাকচিক্যাদি তাহার সুখপ্রাপ্তিতে তৃপ্তি বা প্রফুল্লতার পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা যায়—সর্ব্বদেশ-কাল-পাত্রেই সুখবাসনার ব্যাপ্তি আছে; সুতরাং সুখবাসনাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান বাসনা এবং তাহার লক্ষ্য সুখই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভীষ্ট বস্তু।

যাহা হউক, যে সুখের জন্য আমাদের এই চিরন্তনী বাসনা, তাহার স্বরূপ কি?

স্বরূপ সম্বন্ধে বোধ হয় আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই; তাই সুখের অনুসন্ধানে আমাদের ইতস্ততঃ ছুটাছুটি। আমাদের অবস্থা অনেকটা—অপরিচিত বনপ্রদেশে সুগন্ধলুব্ধ পথিকের মত।

অপরিচিত নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক পথিক উপস্থিত। এক অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব সুগন্ধ বাতাসে ভর করিয়া তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিল। ইহা কিসের গন্ধ, কোথা হইতে আসিল—পথিক কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার মন উতালা হইল। পথিক পথ চলিতে লাগিল, আর অনুসন্ধান করিতে

লাগিল—গন্ধের মূল কোথায়? পথিপার্শ্বে এখানে ওখানে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; পথিক এক একটী ফুলের নিকটে যায়, আর তাহা তুলিয়া নাকের কাছে ধরে—বুঝি বা এই ফুলের গন্ধই তাহাকে উতালা করিয়াছে—এইরূপ মনে করিয়া। ক্ষণপরেই বুঝিতে পারে, ঐ অপূর্ব্ব গন্ধ এ-ফুলের নহে। এইরূপে নানা ফুলের নিকটে যাইয়া পথিক পরীক্ষা করে; কিন্তু উদ্দিষ্ট বস্তুটী মিলে না।

সংসারে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। সুখের বাসনা আমাদিগকে চালাইয়া লইতেছে। আমরা নানা রকম সুখের অনুসন্ধান করিতেছি; সুখ কিছু পাইয়াও থাকি; কিন্তু যে সুখ পাই, তাহাতে সুখবাসনার তৃপ্তি হয় না, সুখানুসন্ধান ঘুচে না। নূতন সুখের নব-উন্মাদনা কাটিয়া গেলে নূতনতর সুখের সন্ধানে মন ব্যগ্র হয়। সারা জীবন ভরিয়াই আমাদের এই অবস্থা। যাহা পাই, তাহাতে তৃপ্তি নাই; মনে হয়—তাহা পরিমাণে অল্প, বৈচিত্র্যেই সীমাবদ্ধ, আস্বাদন-মাধুর্য্যে অকিঞ্চিৎকর, স্থায়িত্বে নগণ্য। বুঝি বা একটা নিত্য, শাশ্বত, অপরিসীম এবং অনন্ত বৈচিত্রীময় সুখের সন্ধান না পাইলে আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার পরিতৃপ্তি হইবে না।

কিন্তু এ জগতে তাহা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণানুরূপই কার্য্য। জগৎ সীমাবদ্ধ এবং বিনশ্বর; তাহা হইতে অপরিসীম, অবিনশ্বর সুখ পাওয়া যাইতে পারে না। তাই ঋষি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি।" জগৎ ক্ষুদ্র, তাহার সমস্ত ব্যাপারই ক্ষুদ্র—সীমাবদ্ধ, অল্প; তাহাতে বা তাহা হইতে সুখ পাওয়া যায় না। কারণ, সুখবস্তুটী অপরিসীম, বিভু। "ভূমৈব সুখম্।" সংসারে যাহাকে আমরা সুখ বলি, বস্তুতঃ তাহা সুখাভাস—সুখ নহে।

যে নিত্য, শাশ্বত, অপরিসীম আনন্দের নিমিত্ত আমাদের বাসনা, আমাদের অজ্ঞাতসারে, আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে, সেই আনন্দটী বা সুখটী ভূমাবস্তু, বিভুবস্তু—ব্রহ্ম। এই বিভুবস্তু ব্রহ্মের স্বরূপই আনন্দ—আনন্দং ব্রহ্ম, আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্। নির্ব্বিশেষ আনন্দই নহেন, তিনি অনন্ত বৈচিত্রীময় আনন্দ; তাঁহার আস্বাদন-চমৎকারিতাও অনন্ত-বৈচিত্রীপূর্ণ; তাই শ্রুতি তাঁহাকে রস বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" এই রসস্বরূপ ব্রহ্মের সন্ধান পাইলেই, ব্রহ্মানুভব লাভ হইলেই, জীবের চিরন্তনী সুখ-বাসনা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, আনন্দের অনুসন্ধানে তাহার ছুটাছুটি তিরোহিত হইতে পারে। "রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

ইহাই হইল আমাদের অনুসন্ধেয় সুখের স্বরূপ। ইহাই আমাদের মুখ্যতম অভীষ্ট বস্তু—আমাদের মুখ্যতম সাধ্য, শ্রেয়ঃ ও প্রেয়।

সুখ বা আনন্দ ব্যতীত আরও একটী জিনিস আছে, যাহার জন্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে—আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল; এই জিনিসটী হইতেছে প্রীতি—যাহার অপরাপর নাম স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম বা ভক্তি। ছোট শিশু—যে কথা বলিতে শিখে নাই, চিন্তা করিতে শিখে নাই, আপন-পর জানে না, রাগদ্বেষ কাহাকে বলে জানে না, সেই ছোট শিশুও—প্রীতির জন্য লালায়িত। তাই, যে তাহাকে আদর করে, তাহারই কোলে সে ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রীতির স্পর্শে শিশুর কান্না থামিয়া যায়, তাহার মুখে হাসির লহরী খেলিতে থাকে। যে তাহার প্রতি আদর-স্নেহ প্রদর্শন করে, শিশুও তাহাকে তাহার প্রতিদান দিয়া থাকে, তাহার প্রতিও প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রীতির জন্য শিশুর এই লালসা তাহার জন্মগত—মজ্জাগত সংস্কার; ইহা তাহার প্রাণের লালসা।

ইতর প্রাণীর মধ্যেও এইরূপ প্রীতিবাসনার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশু পক্ষী আদিও স্নেহ-প্রীতি অনুভব করিতে পারে এবং তাহার প্রতিদান দিতে পারে। স্নেহ-প্রীতির জন্য কুক্কুর বিড়ালাদিকে লালায়িত হইতেও দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায়- সুখবাসনার ন্যায় প্রীতিবাসনাও সার্ব্বজনীন, সার্ব্বত্রিক এবং চিরন্তন।

কিন্তু সুখবাসনার ন্যায় প্রীতিবাসনাও যেন এ-সংসারে পরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আদি স্বভাবলব্ধ আত্মীয়-স্বজনের প্রীতিতে আমাদের সাধ মিটে না, যেন অতৃপ্তি থাকিয়া যায়; তাহার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ইঁহাদের প্রীতির বিকাশ সম্বন্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাহা সম্বন্ধের সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা চাই যেন প্রীতির অপ্রতিহত বিকাশ। এই অপ্রতিহত-বিকাশময়ী প্রীতির লোভে আমরা সখ্য, বন্ধুত্ব, দাম্পত্য আদি প্রীতিমূলক এবং প্রীতিপ্রধান সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়া থাকি। এ-সকল সৃষ্ট-সম্পর্কজাত প্রীতির পরিধি স্বভাবজাত সম্বন্ধমূলক প্রীতি অপেক্ষা

অধিকতর ব্যাপক; কিন্তু তাহাতেও আমাদের প্রীতি-বাসনার তৃপ্তি হয় না; এই প্রীতিতেও কিছু বাধা-বিঘ্ন—কিছু সঙ্কোচ—আত্মবিকাশ করিতে থাকে।

প্রীতির একটা স্বাভাবিক ধর্ম্মই এই যে, ইহা নিজেকে ভুলাইয়া দেয়। যেখানে প্রীতির বিকাশ যত বেশী, সেখানে স্বার্থের অভাবও তত বেশী; স্বার্থবুদ্ধিই প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। সংসারে কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ করিতে পারে না; তাই যেখানে স্বভাবজাত সম্বন্ধের সীমার বিঘ্ন নাই, সেখানেও—সখ্য-বন্ধুত্ব-দাম্পত্যাদি স্থলেও—স্বার্থবুদ্ধি প্রীতির পরিধিকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। কাহারও স্বার্থবুদ্ধি স্থূল, কাহারও বা সূক্ষ্ম, আবার কাহারও বা অতি সূক্ষ্ম। অতি সূক্ষ্ম হইলেও তাহা প্রীতিকে সঙ্কুচিত করিতে পারে। তাই সংসারে আমরা আমাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইবার অনুরূপ প্রীতি পাই না।

একমাত্র স্বার্থবুদ্ধিই প্রীতির অপ্রতিহত বিকাশের বিঘ্ন নহে; আরও বিঘ্ন আছে। সংসারে আমরা যে প্রীতি পাই, আমাদের বিবেচনায় তাহা পরিমাণে সামান্য, মাধুর্য্যে অপ্রচুর, বৈচিত্রীতে অপর্য্যাপ্ত; আমরা যেন চাই সর্ব্ববিষয়ে অপরিসীম প্রীতি; কিন্তু সীমাবদ্ধ এই সংসারে অপরিসীম প্রীতি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। আরও একটা হেতু আছে; প্রীতিবাসনার চিরন্তনত্ব ও সার্ব্বজনীনত্ব হইতে বুঝা যায়—ইহা জীবস্বরূপের, জীবাত্মারই বাসনা; জড়দেহের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হয় বলিয়া দেহের বাসনারূপে প্রতীয়মান হয়। জীবাত্মা স্বরূপে নিত্য এবং চিন্ময়; সংসারের যাবতীয় বস্তু হইল অনিত্য, জড় বা অ-চিৎ—সুতরাং—জীবাত্মার পক্ষে বিজাতীয়। দুইটী ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে সত্যিকার প্রীতি সম্ভব নয়; কারণ, প্রীতির বিষয় ও আশ্রয়ের ভেদ তিরোহিত করাই প্রীতির ধর্ম্ম: দুইটী স্বরূপতঃ ভিন্নজাতীয় বস্তুর ভেদ কোনও সময়েই তিরোহিত হইতে পারে না, চিদ্‌বস্তু কখনও অ-চিৎ হইতে পারে না; অ-চিদ্‌বস্তুও কখনও চিদ্‌বস্তু হইতে পারে না; বস্তুর স্বরূপ কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। তাই চিদ্‌বস্তু জীবাত্মার সহিত জগতের অচিদ্‌বস্তুর প্রকৃত প্রীতি অসম্ভব। তথাপি, পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি, কিম্বা অন্য লোকের বা অন্য প্রাণীর প্রতি আমাদের যে প্রীতি দেখা যায়, স্বরূপতঃ তাহা পিতা-মাতাদির বা অন্য লোকের বা প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মার প্রতি আমাদের অভ্যন্তরস্থ জীবাত্মারই প্রীতি; জীবাত্মা জীবাত্মার স্বজাতীয় বস্তু বলিয়া তাহাদের মধ্যে প্রীতি সম্ভব। এই প্রীতি বিজাতীয় বস্তু দেহাদির ভিতর দিয়া কিম্বা দেহাদিকে উপলক্ষ্য করিয়া বিকশিত হয় বলিয়াই ক্ষীণ, বিকৃত ও অপরিস্ফুট হইয়া পড়ে।

জীবাত্মার পক্ষে একমাত্র স্বজাতীয় বস্তু হইল ব্রহ্ম বা ভগবান্; কারণ, উভয়েই নিত্য, অপ্রাকৃত, চিন্ময়। সুতরাং ব্রহ্মের বা ভগবানের সহিতই জীবাত্মার প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা। স্বজাতীয় বস্তুতেই প্রীতি জন্মিতে ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে। ভগবান্ প্রেমময়—প্রেমস্বরূপ বলিয়া তাঁহার সহিত প্রীতি জন্মিবার সম্ভাবনা আরও বেশী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রীতি পরিমাণে, মাধুর্য্যে এবং বৈচিত্রীতে অপরিসীম, বিভু। ব্রহ্ম বা ভগবান্‌ও স্বরূপে, শক্তিতে, শক্তির ক্রিয়ায়, রসবৈচিত্রীতে এবং মাধুর্য্যে অপরিসীম, বিভু। সুতরাং জীবের প্রীতি-বাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে একমাত্র ব্রহ্মে বা ভগবানেই।

এ স্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। আমি কখনও ব্রহ্ম, কখনও বা ভগবান্ শব্দের ব্যবহার করিতেছি। বাচক-শব্দ যাহাই হউক, বাচ্যবস্তু কিন্তু এক, অদ্বিতীয় এবং অভিন্ন। এই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুটীর অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি, অনন্ত অপ্রাকৃত গুণ, অনন্ত-রসবৈচিত্রী। অনন্ত-শক্তিবাচক, অনন্ত-গুণবাচক এবং অনন্ত-রসবৈচিত্রী-বাচক তাঁহার অনন্ত নামও আছে এবং থাকিতে পারে। সমস্ত নামেরই বাচ্য সেই এক এবং অদ্বিতীয় বস্তু; যেমন, একই রমণীকে স্ব-স্ব-সম্পর্ক এবং প্রীতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেহ মাতা, কেহ ভগিনী, কেহ কন্যা, কেহ পত্নী, কেহ বা বধূ নামে অভিহিত করেন—তদ্রূপ। ব্রহ্ম সেই অদ্বিতীয় বস্তুর বৃহত্ত্ববাচক নাম, ভগবান্ তাঁহার মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবাচক নাম, নারায়ণ তাঁহার সর্ব্বাশ্রয়ত্ববাচক নাম, বিষ্ণু তাঁহার ব্যাপকত্ববাচক নাম, শিব তাঁহার মঙ্গলময়ত্ববাচক নাম, অম্বা বা ভগবতী তাঁহার জগজ্জননীত্ববাচক এবং জননী-জনোচিত স্নেহময়ত্ববাচক নাম, আর অনন্ত-বৈচিত্রীময় রসস্বরূপে তাঁহার সর্ব্বচিত্তাকর্ষকত্ব বাচক নাম হইল কৃষ্ণ; তাঁহার অন্যান্য নামেরও এইরূপ দ্যোতনা আছে। শাস্ত্রে

যে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্ত সেই একই অদ্বিতীয়বস্তু বিভিন্ন বৈচিত্রীরই নিদর্শন। বিভিন্ন বৈচিত্রীর পরিচায়ক এ সকল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপেও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি একেই বহু এবং বহুতেও তিনি এক।

যাহা হউক, যে প্রীতির কথা এতক্ষণ পর্য্যন্ত আলোচিত হইল, সেই প্রীতির সহিত আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না?

কার্য্য-দ্বারা কারণ অনুমিত হয়। আদর পাইলে নির্ব্বোধ শিশুর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠে, আনন্দের লহরী খেলিয়া যায়। হাসি সুখের দ্যোতক। ইহাতে বুঝা যায়, আদর বা প্রীতিকে উপলক্ষ্য করিয়াই শিশুর চিত্তে সুখের উদয় হয়, সুখ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। হাসি দ্বারা তাহা বাহিরে অভিব্যক্ত হয়।

বয়স্কদের মধ্যেও দেখা যায়, প্রীতিকে উপলক্ষ্য করিয়াই সুখ আসে। প্রীতি না থাকিলে সুখের উপাদান বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সুখ পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি না থাকিলে পতিপত্নীর সম্বন্ধও বিষময় হইয়া উঠে। বাস্তবিক প্রীতিই হইল সুখের বাহন। যে স্থলে প্রীতি যত বেশী পরিস্ফুট, সে স্থলে সুখও তত বেশী আস্বাদ্য, তত বেশী মনোরম। তাহা হইলে বুঝা গেল, প্রীতি হইল সুখের বাহন এবং পরিপোষক; সুখ চাই বলিয়াই আমরা প্রীতি চাই, প্রীতি ব্যতীত সুখ আসিতে পারে না। এতদুভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধও মনে করা যাইতে পারে—সুখ অঙ্গী, প্রীতি অঙ্গ; সুখবাসনা অঙ্গী, প্রীতিবাসনা অঙ্গ।

মাধুর্য্যের আস্বাদনেই সুখ; প্রীতি ব্যতীত মাধুর্য্যের আস্বাদন হয় না। কুৎসিত সন্তানকে স্নেহ করিয়াও মাতা অত্যন্ত আনন্দ পাইয়া থাকেন; ইহার হেতু এই যে, সন্তানের প্রতি মাতার বাৎসল্য-প্রীতি আছে; এই বাৎসল্য-প্রীতিই সন্তানের শ্রীহীনতার জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে এবং সর্ব্বচেষ্টায় এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য স্ফুরিত করিয়া দেয়—যাহার আস্বাদনে স্নেহময়ী জননী অতুলনীয় তৃপ্তি লাভ করেন। আবার প্রীতি না থাকিলে যাহা স্বরূপতঃ আস্বাদ্য, তাহাতেও কোনও রূপ মাধুর্য্য অনুভূত হয় না। দুগ্ধ স্বরূপতঃ স্বাস্বাদ্য; কিন্তু এমন লোকও আছে, দুধ দেখিলেও যাহার উদ্গারের উপক্রম হয়; ইহার কারণ এই যে দুগ্ধে তাহার প্রীতি নাই।

ভগবান্ স্বরূপতঃ পরমাস্বাদ্য রসস্বরূপ হইলেও প্রেম ব্যতীত তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে পারে না। যাঁহার ভগবৎ-প্রীতি যতটুকু বিকশিত হইয়াছে, ভগবন্মাধুর্য্য তিনি ততটুকুই আস্বাদন করিতে পারিবেন, ভগবন্মাধুর্য্য ততটুকুই তাঁহার নিকটে বিকশিত হইবে; সুতরাং ভগবানে যাঁহার মোটেই প্রেম নাই, ভগবানের মাধুর্য্যময়ী বৈচিত্রীও মোটেই তাঁহার নিকটে বিকশিত হইবে না, ভগবন্মাধুর্য্যও তিনি মোটেই আস্বাদন করিতে পারিবেন না। ইহা অতি সহজ যুক্তিসঙ্গত কথা। তাই ভগবানেরই কথায় ভক্তিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়॥ শ্রী চৈঃ চঃ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুখস্বরূপ ব্রহ্মের বা ভগবানের অনুভব লাভ হইলেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে। আনন্দস্বরূপ ভগবানের অনুভব বলিতে তাঁহার আনন্দবৈচিত্রীর, তাঁহার রসবৈচিত্রীর মাধুর্য্যাস্বাদনই বুঝায়। একমাত্র ভগবৎ-প্রীতির সহযোগেই এই মাধুর্য্যের আস্বাদন সম্ভব।

ভগবানে যখন প্রীতি জন্মিবে, তখন ঐ প্রীতির পূত ধারায় সমস্ত স্বার্থ-বাসনা বিধৌত হইয়া যাইবে; প্রীতি তখন অপ্রতিহতরূপে ব্যাপকতা লাভ করিতে ও সমগ্র বৈচিত্রীর সহিত বিকশিত হইতে পারিবে। প্রীতির প্রবল স্রোত তখন জীবের সুখবাসনার গতিকে ফিরাইয়া নিজের দিক হইতে ভগবানের দিকে লইয়া যাইবে; কারণ, প্রীতির গতিই হইল ভগবানের দিকে। তখন নিজের সুখের জন্য আর বাসনা থাকিবে না; বাসনা হইবে ভগবানের জন্য। ভগবৎ-প্রীতি যতই পুষ্টিলাভ করিবে, ভগবানের সুখের জন্য লালসা ততই বলবতী হইবে। এই সংসারেও আমরা দেখি, যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার সুখের জন্যই আমরা চেষ্টিত হই, তাহাকে সুখী করিতে পারিলে আমাদের নিজের চিত্তেও—নিজের সুখের জন্য বাসনা না থাকিলেও—একটা সুখ জন্মে; ইহাও প্রীতিরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, প্রীতিরই প্রতিক্রিয়া। ভগবানে প্রীতি জন্মিলেও ভগবানের সুখের জন্য তদ্রূপ লালসা জন্মিবে এবং ভগবৎ-প্রীতিরই প্রতিক্রিয়ায়

বা প্রতিফলনে স্বীয় চিত্তেও অপরিসীম সুখ প্রতিফলিত হইবে · সেই প্রীতির প্রভাবেই জীব ভগবানের রসবৈচিত্রীর আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

এক্ষণে, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—আনন্দস্বরূপ এবং অনন্তরসবৈচিত্রীময় ব্রহ্মের সহিত জীব-স্বরূপের বা জীবাত্মার একটা প্রীতিমূলক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিলেই জীব আনন্দ-আস্বাদনে সমর্থ হইতে পারে এবং তাহাতেই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনা ও প্রীতিবাসনা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আমাদের স্বরূপতঃ কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিতে পারে কি-না এবং এরূপ সম্বন্ধ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিলে দেখিতে হইবে, আনন্দ আস্বাদনের স্বাভাবিকী যোগ্যতা বা যোগ্যতার উপাদান আমাদের মধ্যে আছে কি-না।

শ্রুতি হইতে জানা যায—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত আমাদের একটা নিত্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে; কারণ, আনন্দ হইতেই আমাদের জন্ম, আনন্দ দ্বারাই আমরা জীবিত থাকি এবং শেষকালেও আনন্দেই আমরা প্রবেশ করিয়া থাকি। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" যাহা হউক, আনন্দ হইতেই আমাদের জন্ম কি-না এবং শেষকালে আনন্দেই আমরা প্রবেশ করি কি-না, তাহার কোনও অনুভূতি আমাদের না থাকিলেও আনন্দ দ্বারা যে আমরা জীবিত থাকি এবং আনন্দের আত্যন্তিক অভাব হইলে যে আমাদের বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহই নাই। আনন্দের সহিত আমাদের যে একটা ঘনিষ্ঠ ও অনুকূল সম্বন্ধ আছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। অধিকন্তু আনন্দের বা সুখের নিমিত্ত একটা চিরন্তনী বাসনা যে আমাদের মধ্যে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে এবং এই বাসনার প্ররোচনাতেই যে আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া সুখকণিকা-সংগ্রহে ব্যস্ত রহিয়াছি, ইহাই কি আনন্দের সহিত আমাদের একটা ঘনিষ্ঠ ও অনুকূল সম্বন্ধের পরিচায়ক নহে? এ জাতীয় সম্বন্ধ না থাকিলে আনন্দের আকর্ষণে আমরা আকৃষ্টই বা হইব কেন?

আনন্দের সহিত এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধটীও প্রীতিমূলক সম্বন্ধ; বিদ্বেষমূলক সম্বন্ধ নহে; বিদ্বেষমূলক হইলে আনন্দ আস্বাদনের বাসনা জন্মিত না। যেখানে প্রীতি নাই, সেখানে আস্বাদনের কথা উঠিতে পারে না। প্রীতিই আস্বাদনের অধিকার দান করে এবং আস্বাদনকে বহন করিয়া আনে।

তাহা হইলে বুঝা গেল—আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বা ভগবানের সহিত স্বরূপতঃই আমাদের অর্থাৎ জীবস্বরূপের একটা প্রীতিমূলক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে; এই সম্বন্ধের জ্ঞান অবশ্য আমাদের নাই; এই সম্বন্ধের জ্ঞানকে পরিস্ফুট করিতে পারিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে; এবং সম্বন্ধ যখন স্বরূপতঃ বর্ত্তমানই রহিয়াছে, তখন তাহার জ্ঞানকে পরিস্ফুট করা সম্ভবও হইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—আনন্দ আস্বাদনের স্বাভাবিকী যোগ্যতা বা যোগ্যতার উপাদান আমাদের মধ্যে আছে কি-না। সংসারে আমরা যাহা কিছু সুখ পাই, তাহা আস্বাদনও করিয়া থাকি এবং আস্বাদন করিয়া সামান্য কিছু তৃপ্তিও পাইয়া থাকি। ইহাতেই বুঝা যায়, সুখ আস্বাদনের যোগ্যতা বা যোগ্যতার উপাদান আমাদের মধ্যে আছে। যদিও এই সুখ ব্রহ্মাস্বাদজনিত সুখ নহে, তথাপি উভয়েরই তৃপ্তিদায়কত্ব এক জাতীয়—অবশ্য পরিমাণে একরূপ নহে। চিটাগুড়ের মধ্যেও সামান্য একটু মিষ্টত্ব আছে; যে জিহ্বায় তাহার আস্বাদন লাভ হয়, মিছরির মিষ্টত্বের আস্বাদন লাভের যোগ্যতাও স্বরূপতঃ সেই জিহ্বার আছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এক্ষণে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। আনন্দের সহিত যখন আমাদের স্বরূপতঃ একটা প্রীতিমূলক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং আনন্দ আস্বাদনের যোগ্যতাও যখন আমাদের আছে, আবার আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মও যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন—আমাদের ভিতরে বাহিরে, আমাদের দেহের এবং আত্মার প্রতি অণু-পরমাণুর ভিতরে এবং বাহিরেও সর্ব্বত্র—প্রতি পরমাণু পরিমিত স্থানেও যখন আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন, আনন্দসাগরেই যখন আমরা এবং আমাদের প্রতি পরমাণু পর্য্যন্ত নিমগ্ন,—তখন আমরা সেই আনন্দ অনুভব করিতেছি না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, আস্বাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব এবং আস্বাদক ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই আস্বাদনের একমাত্র হেতু নহে; ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংযোগ থাকা

দরকার। ত্বক্ ও বরফের মধ্যে যদি খুব পুরু কম্বল থাকে, তাহা হইলে চর্ম্মে বরফের শীতলত্ব অনুভূত হইবে না। জিহ্বা ও মিছরির মধ্যে যদি জিহ্বার ক্লেদের পুরু আবরণ থাকে, তাহা হইলে মিছরির মিষ্টত্ব অনুভূত হইবে না; কারণ, আবরণ ভেদ করিয়া মিছরি জিহ্বার সংস্পর্শে আসিতে পারিবে না। এ সমস্ত হইতে অনুমান হয়,—আনন্দের বিদ্যমানতা এবং আমাদের আনন্দ-আস্বাদন-যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আনন্দের অনুভব যখন আমাদের জন্মিতেছে না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, আমাদের এবং আনন্দের মধ্যে কোনও এক অভেদ্য বিজাতীয় আবরণ রহিয়াছে। এই আবরণটী দূরীভূত না হইলে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

কিন্তু এই আবরণটী কি?

আমাদের বহির্ম্মুখতা এবং সংসারাসক্তিই এই আবরণ। আত্মবস্তুতে—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে আমাদের সুখ-বাসনার পরিতৃপ্তি না খুঁজিয়া বাহিরের অনাত্ম বস্তুতে—সংসারের জড় বস্তুতে যে তাহার অনুসন্ধান করিতেছি, ইহাই আমাদের বহির্ম্মুখতা। জীবের স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারই এই বহির্ম্মুখতার হেতু।

জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও জীবের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয় না। জীবস্বরূপের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা অস্বীকার করিলে স্ব-স্ব কর্ম্মফলের দায়িত্ব জীবের উপর আরোপ করা চলে না, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—এ কথাও বলা চলে না, সাধন-ভজনের সার্থকতা থাকে না, সাধন-ভজনের ফলও সাধকেরই প্রাপ্য হয় না। বয়স্ক লোকের কথা দূরে থাকুক, যাহার বুদ্ধিবৃত্তি বা বিচারশক্তি বিকশিত হয় নাই, এরূপ শিশুও—কেহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিলে—তাহার ইচ্ছার ক্রিয়ায় বাধা দিলে—বিরক্ত হয়, রুষ্ট হয়। ইহা তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যেরই অভিব্যক্তি; স্বাতন্ত্র্যের ধর্ম্মই এই যে ইহা অন্যের শাসন বা নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতে বা সহ্য করিতে পারে না; তাহারই ফলে অপরের বিরুদ্ধাচরণাদিতে বিরক্তি বা রুষ্টি। যাহা হউক, জীব যেমন অনাদি, তাহার এই স্বাতন্ত্র্যও অনাদি; আবার সৃষ্টিপ্রবাহও অনাদি। যাহার স্বাতন্ত্র্য আছে, সে যথেচ্ছভাবে তাহার ব্যবহার করিতে পারে, অপব্যবহারও করিতে পারে। জীবও বোধ হয় তাহাই করিল, অনাদিকালেই তাহার সুখ-বাসনার তৃপ্তি খুঁজিতে ইচ্ছা করিল অনাত্ম সংসারে; তাই সে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের দিকে পেছন দিয়া সুখ লাভের আশায় বাহিরের সংসারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এইভাবে ঝুঁকিয়া পড়াই তাহার অনাদি কর্ম্ম। এইরূপে ভ্রান্ত জীব আমরা গোড়াতেই একটা অতি বড় ভুলের ফলে অনাত্মবস্তুর মোহে আত্ম-বস্তুকে উপেক্ষা করার ফলে আমাদের অণুস্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহারের ফলে—বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রাকৃত প্রপঞ্চে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাহারই বেড়াজালে সর্ব্বদিকে আবদ্ধ হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অনাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আবার কত নূতন নূতন কর্ম্ম করিতেছি; তাহার ফল ভোগ করিতে করিতে আবার আরও কত কত কর্ম্ম করিতেছি; এইরূপে কর্ম্মধারা, ভোগ বাসনার ধারা কেবল বাড়িয়াই যাইতেছে, নূতন নূতন তন্তুজালে কেবল আবদ্ধই হইয়া পড়িতেছি; এইরূপ আবদ্ধ অবস্থাতেই যেন প্রাকৃত ভোগাসক্তির তলহীন সমুদ্রে ক্রমশঃ নিমজ্জিত হইয়া পড়িতেছি। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র ভোগাসক্তি, নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি আসক্তির আবহাওয়া, চারিদিকে দেখিতেছি কেবল আসক্তির ইন্ধন, বাসনার অগ্নিতে তাহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া আমাদিগকে কেবল দগ্ধ করিতেছে; তথাপি পলায়নের ইচ্ছা হয় না; এমনই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি আমরা। কোনও ভাগ্যে যদি কখনও একটু আধটু পলায়নের ইচ্ছা হয়, পলায়নের উপায় নাই; প্রপঞ্চের বন্ধন ছিন্ন করিবে কে? প্রাকৃত প্রপঞ্চ ভগবানেরই পরাপ্রকৃতি—তাঁহারই শক্তি মায়া। জীবের এমন কি শক্তি আছে, নিজের চেষ্টায় ঐশ্বরী শক্তি মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাইবে? মানুষ নিজের হাতে নিজের গলায় ফাঁসি লাগাইতে পারে; কিন্তু ফাঁসিরজ্জুতে টান পড়িয়া গেলে নিজের হাতে তাহা মুক্ত করিতে পারে না। নিজে ইচ্ছা করিয়া আমরা মায়ার বন্ধন অঙ্গীকার করিয়াছি; সেই বন্ধন ছিন্ন কবার শক্তি আমাদের নাই। ভগবান নিজেও এ কথাই গীতায় বলিয়াছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া (জীবের পক্ষে) দুরতিক্রমণীয়া।"

তাহা হইলে উপায়? ভগবানের শক্তি মায়াকে ভগবান্ নিজে যদি অপসারিত না করেন, তাহা হইলে আর কেই বা তাহাকে সরাইতে পারিবে? উপায় ভগবান্ই বলিয়া দিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে"—যাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হইবে, তিনি তাহাদিগকে মায়া হইতে উদ্ধার করিবেন।

শরণাপন্ন-শব্দে সম্যকরূপে আত্মসমর্পণ বুঝায়। আত্মসমর্পণ বলিতে নিজের শক্তি সামর্থ্যাদির স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনার অভাব বুঝায়—ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি—এই বাক্যের অনুকূল মনোভাব বুঝায়। কিন্তু এইরূপ মনোভাব পাইতে হইলে, মনকে ভগবানে আত্মসমর্পণের যোগ্য করিতে হইলে, সাধনের প্রয়োজন।

কিন্তু ভগবানে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভের সাধনটী কি? এ কথার উত্তর দিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, অযোগ্যতার হেতুটী কি? সেই হেতু নিরাকরণের প্রয়াসই হইবে যোগ্যতালাভের অনুকূল সাধন।

আত্মসমর্পণে অযোগ্যতার হেতুটী কি?

যাঁহার দিকে পেছন ফিরিয়া থাকা যায়, তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণের কথাই উঠিতে পারে না। যাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার দিকে আভিমুখ্য থাকা দরকার, তিনিই যে আমার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ এবং তিনি ব্যতীত অপর কেহ বা কোনও বস্তুই যে আমার অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ নহে—এরূপ অনুভূতি থাকা দরকার এবং সর্ব্বোপরি, তাঁহাতে প্রীতিসম্পন্ন হওয়া দরকার; প্রীতিসম্পন্ন হইলেই সমগ্র মনোবৃত্তি তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তাঁহাতে মনোবৃত্তি কেন্দ্রীভূত না হইলে—মন তদেকনিষ্ঠ না হইলে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে না। অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—ভগবানের আভিমুখ্য এবং ভগবৎ-প্রীতিই তাঁহাতে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা দিতে পারে; এ দুটী বস্তুর অভাবই অযোগ্যতার হেতু; এক কথায় বলা যায় বহির্ম্মুখতাই আত্মসমর্পণের অযোগ্যতার হেতু।

বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইলেই, ভগবৎ-করুণা হৃদয়কে স্পর্শ করিবে; সেই সঙ্গে ভগবৎ-প্রীতি থাকিলেই করুণাধারা আত্মসমর্পণের যোগ্যতা দান করিবে।

ভগবৎ-করুণা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমানভাবে সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে; পাত্রভেদে অবশ্য তাহার স্পর্শলাভের বা গ্রহণ-যোগ্যতার তারতম্য হইয়া থাকে। দর্পণ সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া না ধরিলে তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইবে না; সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া ধরিলেও তাহাতে যদি মলিনতা থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কিরণের স্পর্শ ঘটিবে না। তাহা হইলে দেখা গেল—দর্পণের পক্ষে কিরণস্পর্শের নিমিত্ত দুইটী জিনিসের দরকার—সূর্য্যের আভিমুখ্য এবং মালিন্যহীনতা। এই দুইটী জিনিস থাকিলে দর্পণে কিরণস্পর্শ ঘটিবে এবং সূর্য্যের প্রতিবিম্বও প্রতিফলিত হইবে; কিন্তু সাধারণ দর্পণের কিরণরাশিকে কেন্দ্রীভূত করার ক্ষমতা নাই। সাধারণ দর্পণ না হইয়া যদি সূর্য্যকান্তমণি হয়, তাহা হইলে উক্ত দুইটী জিনিসের বিদ্যমানতায়—সূর্য্যরশ্মি তাহাতে গৃহীত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া দহন-শক্তি লাভ করিতে পারে। তদ্রূপ, জীবের চিত্তকে যদি ভগবদভিমুখে ধরিয়া রাখা যায় এবং তাহাতে যদি মলিনতা না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে সতত-সর্ব্বত্র-বর্ষিত কৃপাধারার স্পর্শ ঘটিতে পারে, ভগবত্তত্ত্ব তাহাতে প্রতিফলিতও হইতে পারে। কিন্তু যদি সেই চিত্তে ভগবৎ-প্রীতিও থাকে, তাহা হইলে সেই প্রীতির প্রভাবে তাহাতে কৃপাধারা গৃহীত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া এক অপূর্ব্ব শক্তি ধারণ করিতে পারে—যাহার প্রভাবে ভগবত্তত্ত্ব সেই চিত্তে কেবল প্রতিফলিত নহে, অনুভূতও হইতে পারে। এইরূপে কেন্দ্রীভূত ভগবৎ কৃপাধারাই ভোগাসক্তিরূপ জীব-চিত্তের সমস্ত আবিলতা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত করিয়া তাহাকে আত্মসমর্পণের পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্যতা দান করিতে পারে।

তাহা হইলে দেখা গেল, বহির্ম্মুখতা এবং ভোগাসক্তি দূরীকরণের সাধনই হইল আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভের সাধন এবং তজ্জন্য তাহাই মায়ানির্ম্মুক্তিরও সাধন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আমাদের বহির্ম্মুখতা এবং ভোগাশক্তিই হইল আমাদের পক্ষে ব্রহ্মানুভবের পরিপন্থি এবং বহির্ম্মুখতা ও ভোগাসক্তির ফলেই আমরা মায়াজালেও জড়িত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইলে মায়াবন্ধন আপনা-আপনিই ছুটিয়া যাইবে; কারণ অপসারিত হইলে কার্য্যও অপসৃত হইবে।

আবার বহির্ম্মুখতা এবং ভোগাসক্তি দূরীভূত হইলেই জীবস্বরূপ এবং ব্রহ্মানন্দের মধ্যস্থিত দুর্ভেদ্য আবরণ দূরীভূত

হইবে; তখনই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনা ও চিরন্তনী প্রীতিবাসনার পরিপূর্ত্তির পথে আর কোনও বিঘ্ন থাকিবে না।

তাহা হইলে, বহির্ম্মুখতা এবং ভোগাসক্তি দূরীকরণের সাধনই হইল একমাত্র মুখ্য সাধন।

কিন্তু এই মুখ্য সাধনটীর স্বরূপ কি? কি উপায়ে আমাদের বহির্ম্মুখতা এবং ভোগাসক্তি দূরীভূত হইতে পারে?

ব্রহ্মকে বা ভগবান্‌কে ভুলিয়া রহিয়াছি বলিয়াই তিনি যে আনন্দস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ, একমাত্র তাঁহাতেই যে আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনা ও প্রীতি-বাসনার পরিপূর্ত্তি সম্ভব, ইহা আমরা জানিতে পারি নাই বা পারিতেছি না; এবং ইহা জানিতে পারি নাই বলিয়াই বাহিরের অনাত্ম সংসারে আমরা সুখ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, সুখলোভে অনাত্মবস্তুতে আমরা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি—আমরা বহির্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছি।

এই বহির্ম্মুখতা দূর করিতে হইলে আমাদের বহির্ম্মুখী গতিকে প্রশমিত করিতে হইবে এবং প্রশমিত করিয়া ইহার মুখ ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে ইহা করিতে হইবে?

উপায় এই। যাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি বলিয়া আমাদের মনের গতি বহির্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার স্মরণ করিলেই—আমাদের বাসনাপূর্ত্তির উপকরণ যে একমাত্র তাঁহাতেই বর্ত্তমান, এ কথা স্মরণ করিলেই গতি অন্তর্ম্মুখতা প্রাপ্ত হইতে পারে; ইহাই স্বাভাবিক পন্থা বলিয়া মনে হয়। কারণের অন্তর্দ্ধান হইলেই কার্য্যের অন্তর্দ্ধান হইবে। ভগবদ্-বিস্মৃতি দূরীভূত হইলেই বহির্ম্মুখতা অন্তর্হিত হইবে; বহির্ম্মুখতা অন্তর্হিত হইলেই অন্তর্ম্মুখতা আসিয়া পড়িবে। কারণ, আমাদের চিরন্তনী সুখ-বাসনা কখনও গতিহীন হইতে পারে না; যে দিকে সুখ আছে বা সুখ থাকার সম্ভাবনা আছে, সেই দিকে তাহা ছুটিবেই। সংসারে সুখ আছে বলিয়া মনে করায় সুখবাসনা সেই দিকে ছুটিয়াছিল। সংসারের সুখে তৃপ্তি না পাইলে এবং একমাত্র ভগবানেই তৃপ্তিসাধক সুখ আছে বলিয়া জানিতে পারিলে বহির্ম্মুখী গতি প্রশমিত হওয়ার এবং অন্তর্ম্মুখী গতি জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবের একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। অনাদি কাল হইতেই বহির্ম্মুখী গতি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহার বেগও ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতেছে; ইহাকে প্রশমিত করিতে হইবে নিজের চেষ্টায়; কারণ, বাহিরের চেষ্টাকে স্বাতন্ত্র্য সহ্য করিতে পারে না। চেষ্টা হইবে নিজের পক্ষ হইতে; ভগবৎকৃপাদি বাহিরের শক্তি সহায়তা করিতে পারে। এইরূপে নিজের চেষ্টায় ভগবৎ-স্মৃতির রজ্জু দ্বারা টানিয়া টানিয়া ভোগবাসনার গতিকে প্রশমিত করিতে হইবে; হয়তো ছুটিয়া যাইবে; আবার তাহাকে টানিয়া আনিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা গতির মুখ ফিরিয়া যাইবে। গরু ছুটিয়া যাইতেছে বাহিরের দিকে; শিঙ্গে বাঁধা দড়ি ধরিয়া রাখাল তাহাকে টানিতেছে ঘরের দিকে; কতক্ষণ পর্য্যন্ত গরুই হয়তো রাখালকে টানিয়া লইয়া যাইবে; কিন্তু রাখাল যদি অধিকতর শক্তিতে অনবরত ঘরের দিকেই টানিতে থাকে, তাহা হইলে শেষকালে তাহারই জয় হইবে; ইহাই গতিবিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্ত। গরুটী একবার ঘরের দিকে ফিরিলে ঘরে যদি তাহার লোভনীয় তৃণাদি দেখিতে পায়, তাহা হইলে আর বাহিরের দিকে যাইতে চাহিবে না, ঘরের দিকেই ছুটিয়া যাইবে। তদ্রূপ, ভগবৎ-স্মৃতির শক্তিতে ভগবদ্-বিস্মৃতির ফলস্বরূপ বহির্ম্মুখতা প্রশমিত হইলে চিত্তের অন্তর্ম্মুখতা সাধিত হইতে পারে এবং অন্তর্ম্মুখতা একবার সাধিত হইলে ভগবন্মাধুর্য্যাদির লোভনীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া চিত্ত ভগবানের দিকেই ধাবিত হইবে, আর বাহিরের দিকে যাইতে চাহিবে না। অন্তর্ম্মুখতা সাধনের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা।

কিন্তু একটা ভাবনার বিষয় এই যে,—আমাদের চিরন্তনী সুখ-বাসনার পরিপূর্ত্তি যে ভগবানের উপলব্ধিতেই পাওয়া যাইবে, এই উক্তিতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে কিরূপে? তাহা না জন্মিলেই বা বহির্ম্মুখতা ঘুচাইয়া মনকে অন্তর্ম্মুখ করার চেষ্টা বা ইচ্ছা আসিবে কোথা হইতে?

বাস্তবিক ভগবানের করুণাময়ত্বে এবং তাঁহার রস-স্বরূপত্বে প্রতীতি না জন্মিলে সাধনের প্রকৃত ইচ্ছাই জন্মিতে পারে না। তাই ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছে—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। শ্রীচৈঃ চঃ।" শ্রদ্ধা-শব্দে শাস্ত্রবাক্যাদিতে - ভগবানের করুণাময়ত্বাদিতে দৃঢ় প্রতীতি বুঝায়। কাহারও চিত্তে আপনা-আপনি এরূপ শ্রদ্ধা বা প্রতীতি জন্মিবার সম্ভাবনা সাধারণতঃ খুব বেশী আছে বলিয়া মনে

হয় না। কিরূপে এই শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে? শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, সৎ লোক বা সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে চিত্তে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইতে পারে।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সংবিদঃ
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তি রনুক্রমিষ্যাতি ॥৩।২৫।২৪

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও বলেন—"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ ক্ষণকালের সাধুসঙ্গও ভবার্ণব-তরণের পক্ষে নৌকাস্বরূপ হয়।"

সৎ বা সাধু বলিব কাহাকে? অসৎ-বস্তুতে অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুতে যাঁহার কোনওরূপ আসক্তি নাই, একমাত্র সৎ-বস্তুতে, আত্মবস্তু ভগবানেই যাঁহার স্থিরা মতি, তিনিই সৎ; সৎ ও সাধু একই; সাধন প্রভাবেই সৎ হওয়া যায় বলিয়া সৎকে সাধুও বলে; মহৎ শব্দেও সাধুকেই বুঝায়। বিষয়াসক্তি যাঁহার সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়াছে, যিনি ভগবদুপলব্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সৎ, সাধু বা মহৎ। এইরূপ সৎ বা সাধুকেই শ্রুতি ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মবিৎ বলিয়াছেন। বাস্তবিক এরূপ লোক স্পর্শমণিতুল্য; তাঁহার স্পর্শে লোহা সোনা হইতে পারে, বহির্ম্মুখতা ভগবদুন্মুখতায় পরিণত হইতে পারে। ভগবদনুভূতির স্পর্শে তিনি জলন্ত অঙ্গার তুল্য হইয়া যান। জলন্ত অঙ্গারের স্পর্শে কালো কয়লায় যেমন আগুন ধরিতে পারে, এতাদৃশ সাধুলোকের কৃপায়ও বিষয়-বাসনা ছুটিয়া যাইতে পারে, চিত্ত ভগবানের দিকে গতিবিশিষ্ট হইতে পারে নারদের কৃপায় ধ্রুবের যেমন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, জলন্ত অঙ্গারের সংসর্গ ব্যতীত কেবল কালো অঙ্গারে শত সহস্র ফুঁ দিলেও যেমন তাহাতে আগুন ধরিবে না, তদ্রূপ নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের কৃপা ব্যতীত কেবল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই বিষয়-বাসনা বা বহির্ম্মুখতা ঘুচিবে না।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্জ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ শ্রীভাঃ ৫।১২।১২

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রও তাহাই বলেন—"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়॥ কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ চৈঃ চঃ।"

বাস্তবিক এরূপ শক্তিধর মহাপুরুষের কৃপার, তাঁহাদের মঙ্গলেচ্ছার, একটা অসাধারণ শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি, তাঁহাদের উপদেশ প্রাণে যে প্রেরণা জাগাইতে পারে, তাহার দ্বারা সংসারাসক্তি তরলীভূত হওয়া বিচিত্র নহে।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল - ভগবানের আনন্দময়ত্বে, তাঁহার আস্বাদনের মাধুর্য্য বৈচিত্রীতে এবং তাঁহার করুণাময়ত্বে কোনও কারণে প্রতীতি জন্মিলেই তাঁহার স্মৃতির আবশ্যকতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাঁহার স্মৃতির প্রভাবে বিস্মৃতি তিরোহিত হইতে পারে, বহির্ম্মুখ চিত্ত অন্তর্ম্মুখতা লাভ করিতে পারে, সুখের অনুসন্ধানে বাহিরের দিকে আমাদের ছুটাছুটির অবসান হইতে পারে।

কিন্তু আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার পরিতৃপ্তি হইতে পারে ভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদনে। মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইতে হইলে তাঁহাতে প্রীতির প্রয়োজন, তাঁহার সহিত প্রীতিমূলক একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন। এই জাতীয় অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করিতে হইলে ভগবৎ-স্মৃতিটী হওয়া চাই প্রীতিমিশ্রিতা। ভগবানের সহিত আমার বা আমাদের একটা প্রীতিমূলক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এতাদৃশভাবে পরিষিক্ত ভগবৎ-স্মৃতিকেই হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। ইহাই স্বাভাবিক সাধন-পন্থা এবং বিভিন্ন সাধন-প্রণালীও এই পন্থারই সমর্থন করিয়া থাকে।

রসস্বরূপ ভগবানে রসের বৈচিত্রী অনেক। লোকের রুচিও বিভিন্ন। সকল বৈচিত্রীতে হয়তো সকলের চিত্ত সমানভাবে আকৃষ্ট হয় না। যে বৈচিত্রীতে যাঁহার চিত্ত অধিকরূপে আকৃষ্ট হয়, সেই বৈচিত্রীর অধিকরূপে আস্বাদনের অনুকূল সাধন-পন্থাই তিনি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইরূপে জগতে অনেক রকম সাধন-পন্থাই প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু বিভিন্ন সাধন-পন্থার মধ্যে একটা সাধারণ জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সাধারণ জিনিসটীর কথা বলাই অদ্যকার আমার উদ্দেশ্য। সেই সাধারণ জিনিসটী হইতেছে—ভগবৎ-স্মৃতি। যিনি

ভগবানের বা ব্রহ্মের যে বৈচিত্রীর উপাসক, তাঁহার সাধনের প্রতি অঙ্গেই সেই বৈচিত্রীপ্রধান ভগবানের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী, তিনি চিন্তা করেন—"সোঽহম্"—আমি সেই ব্রহ্ম। এই চিন্তার মধ্যে, যেই ব্রহ্মের সহিত সাধক নিজের অভেদ-মনন করেন, সেই ব্রহ্মের স্বরূপের স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপে যিনি "শিবোঽহম্—আমি শিব" বলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহার চিন্তায় শিবের স্মৃতি বিদ্যমান থাকিবে। যিনি পৃথক্ দেহে স্বীয় উপাস্যের সেবা কামনা করেন, তিনি স্বীয় উপাস্য-স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় এক পৃথক্-স্বরূপের স্মৃতি যুগপৎ মনে রক্ষা করেন। যাঁহারা ভগবানের কোনও বিশিষ্ট রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও উপাসনাদিতে তাঁহার দয়ালুতা, ভক্তবৎসলতা প্রভৃতি গুণের চিন্তা করেন; এই সমস্ত গুণই তাঁহার চিন্তাসহায়ক রূপ।

উপাসনা শব্দের অর্থ হইতেও তাহাই উপলব্ধি হয়। উপাসনার অর্থ নিকটে থাকা; উপাসনার তাৎপর্য্য হইল—উপাস্যের সান্নিধ্য চিন্তা করা। তাঁহার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয়, তাঁহার সান্নিধ্য চিন্তা করিয়া যেন সাক্ষাৎ-ভাবেই সে সমস্ত প্রার্থনা করা হইতেছে, এইরূপ মনে করা। ধ্যান শব্দেও উপাস্যের রূপ-গুণাদির চিন্তা বা স্মরণই বুঝায়।

এইরূপে দেখা যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও সকলের মধ্যে একটা জিনিস সাধারণ পাওয়া যায়—ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবচ্চিন্তা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবদুন্মুখতা জাগাইবার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক পন্থা। তাই সাধন-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রাদিতেও ভগবৎ-স্মৃতির অপরিহার্য্যতার কথাই পাওয়া যায়।

সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

সাধন সম্বন্ধে যত রকম বিধি আছে, তাহাদের সার বিধি হইতেছে একটী—সর্ব্বদা বিষ্ণুর (স্ব স্ব উপাস্যের) স্মরণ করিবে। আর যত রকম নিষেধ আছে, তাহাদের সার নিষেধও একটী—কখনও বিষ্ণুকে বিস্মৃত হইবে না। অন্যান্য যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই এই দুইটী বিধি-নিষেধেরই কিঙ্কর—অনুপূরক ও পরিপূরক মাত্র। যে বিধির সঙ্গে ভগবৎ-স্মৃতি জড়িত নাই, কিম্বা যে বিধি ভগবৎ-স্মৃতির আনুকূল্য বিধান করে না, বিধি হিসাবে তাহার কোনও মূল্যই নাই—রাজার অভাবে রাজভৃত্যের যেমন সত্ত্বা থাকে না, তদ্রূপ। উক্ত বিধি-নিষেধ দুইটার মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতির বিধানটীরই প্রাধান্য; স্মৃতি জাগ্রত হইলে বিস্মৃতি আপনা হইতেই দূরীভূত হইবে; স্মৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল হইল বিস্মৃতি।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যতিরেকীভাবেও ঐ কথাটাই বলা হইয়াছে। সাধন দুই রকমের—সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ। আসঙ্গ শব্দের অর্থ হইল ভজন-নৈপুণ্য; ভজন-নৈপুণ্য বলিতে সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তি, অথবা উপাস্যের সান্নিধ্যের চিন্তা, অথবা উপাস্যের স্মৃতিকে বুঝায়। এতাদৃশ নৈপুণ্য যে সাধনে আছে, তাহাকে বলে সাসঙ্গ-সাধন; আর যাহাতে তাহা নাই, তাহাকে বলে অনাসঙ্গ-সাধন বা ভগবৎ স্মৃতিহীন সাধনানুষ্ঠান। আবার ভগবদ্ভক্তিকেও সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে॥ এই সুদুর্ল্লভত্বও দুই রকমের—এক কিছুতেই পাওয়া যায় না, একেবারেই অলভ্য; আর, পাওয়া যায় বটে, তবে সহজে নহে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে জানা যায়,—অনাসঙ্গ-সাধন দ্বারা ভগবদভক্তি একেবারেই অলভ্য,—কিছুতেই কস্মিন্ কালেও পাওয়া যাইবে না; "সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।" এ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিয়াছেন—অনাসঙ্গভাবে "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ লীলা—ভগবল্লীলার স্মরণই সাধন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"—যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণ যেমন শৃগাল-কুক্কুর-পিপীলিকাদি তাহাকে স্পর্শ করে না, কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলেই যেমন দেহখানা লইয়া শৃগাল-কুক্কুরাদি টানাটানি করিতে থাকে, তদ্রূপ যতক্ষণ মনের মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ তাহাতে কোনওরূপ কুচিন্তা প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু ভগবৎ-স্মৃতিহীন মনের পক্ষে কাম-ক্রোধাদির লীলাভূমিরূপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাই বেশী।

এ সমস্ত হইতে বুঝা যায়, ভগবৎ-স্মৃতিই হইল সাধনের প্রাণ। সাধনের বিভিন্ন অঙ্গ ভগবৎ-স্মৃতি-উদ্দীপনেরই এবং তাহার পরিপুষ্টিরই সহায়ক। সূত্রে মণিগণের ন্যায় ভগবৎ-

স্মৃতিতেই সাধনাঙ্গসমূহের অবস্থান। ভগবৎ-স্মৃতিহীন সাধন সাধন-নামের অযোগ্য। ভগবৎ-স্মৃতিহীন আচারও আচার-নামের অযোগ্য। যে আচার ভগবৎ-স্মৃতির সহায়তা না করিয়া প্রচ্ছন্ন অহমিকা বা সাম্প্রদায়িকতারই প্রশ্রয় দেয়, তাহাকে সদাচার না বলিয়া সাধন-সম্পর্কে কদাচার বলাই যেন সঙ্গত হইবে। আবার, শাস্ত্রে যাহার উল্লেখ নাই, এমন কোনও অনুষ্ঠান বা আচরণও যদি ভগবৎ-স্মৃতি-উদ্দীপনের বা পরিরক্ষণের অনুকূল হয়, তবে তাহাকেও সাধন এবং সদাচার বলাই সঙ্গত হইবে।

এইরূপে দেখা যায়—ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবচ্চিন্তাই হইল মুখ্য সাধন; ইহাই সাধনাঙ্গসমূহকে সাধনত্ব দান করিয়া থাকে, ইহার সার্ব্বজনীনতা এবং সার্ব্বত্রিকতাও দৃষ্ট হয়।

কিন্তু এই ভগবৎ-স্মৃতি কিসের সাধন?—কেবলই কি মায়াবন্ধন হইতে উদ্ধার পাওয়ার সাধন? না কি কেবল ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের সাধন? না কি উভয়েরই সাধন?

ইহার উত্তর পাইতে হইলে স্মৃতি বা চিন্তার শক্তি কিরূপ, তাহা বিবেচনা করা দরকার।

চিত্তের উপরে চিন্তা বা স্মৃতি একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ক্রোধের উদ্দীপক বিষয়ের চিন্তা করিলে, চিত্তে ক্রোধের উদ্রেক হয়; প্রীতিভাজন ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করিলে কিম্বা তাহার কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলেও হৃদয় প্রীতিরসে সিঞ্চিত হইয়া উঠে, মুখে পর্য্যন্ত প্রীতির দীপ্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি যেরূপ চিন্তা করে, তাহার চিত্ত এবং প্রকৃতিও তদনুরূপ হইয়া যায়। চিন্তা দ্বারা লোকের ভবিষ্যৎ গঠিত হয়। একটা কথা আছে - কাঁচপোকা দ্বারা কবলিত হইয়া ভয়ে কাঁচপোকার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তেলাপোকাও না-কি কাঁচপোকা হইয়া যায়। এই উক্তিরই মর্ম্মকথার প্রতিধ্বনি করিয়া প্রাচীনেরা বলিয়া গিয়াছেন—"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী যাহার যেরূপ চিন্তা, তাহার সিদ্ধিও তদ্রূপ।"

ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যিনি প্রীতির সহিত ভগবানের কথা স্মরণ করিবেন, চিন্তা করিবেন - ভগবান্ যে অনন্ত বৈচিত্রীময় রসস্বরূপ, যিনি তাহা চিন্তা করিবেন, চিরন্তনী সুখবাসনার তাড়নায় স্বীয় অভীষ্ট রসের আস্বাদনের অনুকূল কোনও সম্বন্ধের ভাবে ভাবিত হই। রসস্বরূপ ভগবানের মাধুর্য্যাস্বাদনের কথাও যিনি চিন্তা করিবেন - ভগবানের কৃপায় তিনি যে পরিণামে অভীষ্ট ভগবন্মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। স্বরূপানুবন্ধি করুণাবশতঃ ভগবানও যখন তাঁহাকে স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করাইবার জন্য নিজের দিকে টানিয়া লইতে উৎসুক এবং তিনি নিজেও যখন ভগবচ্চিন্তার প্রভাবে সেই মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য উৎসুক হইলেন, তখন উভয়ের মিলন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কোনও হেতু দেখা যায় না।

সুতরাং ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবচ্চিন্তা ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনেরই সাধন হইল। মায়ানির্ম্মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র কোনও সাধনের প্রয়োজনই হয় না। কারণ, বহির্ম্মুখতার ফলেই মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি—তাহাতেই জীবের মায়াবন্ধন। ভগবৎ-কৃপায় ভগবচ্চিন্তার ফলে উন্মুখতা জন্মিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হইবে, মায়িক বস্তুতে আসক্তি তিরোহিত হইবে, মায়াবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ভগবৎ স্মৃতির উদয়ে, আনুষঙ্গিকভাবেই দুর্ব্বাসনাদি চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইবে, চিত্ত ভগবানে আত্মসমর্পণের যোগ্যতা লাভ করিবে।

এক্ষণে দেখা গেল—আমাদের চিরন্তনী সুখবাসনার পরিপূর্ত্তিই সাধনের লক্ষ্য; রসস্বরূপ ভগবানের উপলব্ধিতেই সেই বাসনার সম্যক্ পরিপূর্ত্তি। আর ভগবৎ-স্মৃতি বা ভগবচ্চিন্তাই তদনুকূল সাধনের প্রাণ।





পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

১৩

সমস্ত ঘটনারই কল্পনায় এক রকম চেহারা থাকে, আবার বাস্তব জগতে সেই বস্তুরই রূপ এবং রঙ দুই-ই যায় বদ্‌লাইয়া। শিশির যখন লজিকের বই পড়িতে পড়িতে দীপালোকিত শান্ত সন্ধ্যায় পিতার সহিত পল্লীগ্রামে বসবাসের সুখ-সুবিধা লইয়া আলোচনা করিয়াছিল, তখন তাহার কল্পনার মনশ্চক্ষে এই বস্তুটি যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সত্যকার জীবনে নামিয়া সে দেখিল, কতই না প্রভেদ !

শিশিরের বাবাও পল্লীগ্রামে জীবনে ক'খন থাকেন নাই, —এ সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু জ্ঞান পুঁথি পড়িয়া। তাই একদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, সুবোধ ছেলেটি কী পরিমাণ ধনী হইয়াও কতদূর নিরহঙ্কার, আর তাহার শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রসারটাই বা কী পর্য্যন্ত গভীর,—তখন সে সম্বন্ধে তাঁহার মেয়েরও কোন মতদ্বৈধ দেখা গেলনা। শেষে তিনি বলিলেন, "আর দেশকে যে ও কী রকম ভালোবাসে সে কথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারবনা শিশির। এই তো ওর যুবা বয়স, এখনই তো আমোদ আহ্লাদ করবার সময় ; কিন্তু সে সবে ওর রুচিও নেই, প্রবৃত্তিও নেই। ওর সারা মনটা পড়ে রয়েচে স্বদেশের চিন্তায়। কি করলে পল্লীগ্রামের অঙ্গ থেকে নানা দুঃখ-দুর্গতির চিহ্নগুলোকে মুছে ফেলতে পারা যায়, কি করলে সর্ব্ববিষয়ে এর উন্নতি হয় সে সম্বন্ধে নানা রকম প্ল্যানও তার রয়েচে। কিন্তু যার এত বড় হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রচুর অর্থ, সে'ও যা সব সময়ে নিজের আদর্শকে কাজে খাটাতে পারেনা।"

শিশির উৎসুক হইয়া শুনিতেছিল। তাহার মত বয়সে মনে-মনে আদর্শবাদের দিকে একটা ঝোঁক থাকে। এখন প্রশ্ন করিল, "কেন কাজে খাটাতে পারেনা ?"

সৌরেন্দ্রমোহন একটুখানি হাসিয়া মাথাটা একবার হেলাইয়া কহিলেন, "এই সোজা কথাটা আর বুঝতে পারছনা মা,—সব তৈরী থাকলেও প্রেরণা না পেলে মানুষে কোন কাজ করতে পারেনা। এ-সব কাজে একজন সঙ্গিনী চাই, যে যথার্থ মমত্ব দিয়ে ওর আশা-আদর্শের ভিতরের কথাটি ধরতে পারবে।"

এই সোজা কথাটা শিশির অনেকক্ষণ হইতেই ধরিতে পারিয়াছিল। কোন শুভ অনুকূল অবসরে তাহার হৃদয়ও ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এখন পিতার কথার নিহিত ইঙ্গিতে সে লজ্জা-আনমিত মুখখানি আর একদিকে ফিরাইল।

সৌরেন্দ্রমোহন তখন মহা উৎসাহে অনেকগুলা প্যাম্ফ্‌লেট, অনেক কাগজ, অনেক সমবায়-সমিতির নানা প্রকার মাসিকপত্র লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। পাড়াগাঁয়ে চাষা-ভূষা, দিন-মজুর, যাহারা সামান্য অবস্থার লোক খাটিয়া খায়, তাহারা দায়ে পড়িয়া বেশি সুদে টাকা ধার করিয়া আস্তে-আস্তে হৃদয়হীন ধর্ম্মহীন নিষ্ঠুর মহাজনের হাতে কেমন করিয়া ধনে প্রাণে মারা যায় ; সে-সব জায়গায় কো অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কিং প্রথা কেমন করিয়া ব'সান যায়।

কেবল মাত্র জলকষ্টেই এক একটা রোগ শুধু উপলক্ষ্য করিয়া পাড়াগাঁয়ে যত লোক প্রাণ দিতেছে, সেখানে টিউব-ওয়েল বসাইলে কতদূর প্রতীকার করা হয়—এই সকল বড় বড় কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

শিশির তাঁহার কথা কতক বা শুনিতেছিল কতক শুনিতেছিলনা। তাহার মুগ্ধ প্রাণ ভরিয়া যে সঙ্গীত বাজিতেছিল তাহারই সুরে তাহার সমস্ত মন আবিষ্ট হইয়াছিল। কেবল এই কথাটা সেখানে জাগিয়া ছিল,—তাহার প্রেমাস্পদের হৃদয় উদার। বিশ্বজনের দুঃখে সে মন আর্দ্র হয়। প্রেমের নিবিড়তার মাঝে যদি আদর্শবাদের একটা সু-উচ্চ সুর আসিয়া মেশে, সে তো ভালোই।

১৪

কিন্তু হায় রে, তখন কে জানিত যে, প্রাত্যহিক জীবনে নামাইয়া আনিলে আদর্শের সুরে পদে-পদে এমন তাল কাটিয়া যায়! দেশের দুঃখ কেমন করিয়া কি বাবদে কতখানি দূর করিবে, সে চিন্তা আজ শিশিরের মন হইতে নিঃশেষে দূর হইয়া গেছে। সে এখন কেবল নিজের কথা ভাবিয়াই আকুল। চারিদিকে এত বাধা, এত নিয়মের গণ্ডী, এত চাপা হাসি, বাঁকা কথার টিট্‌কারি। বিবাহের পর মোটে সাতটি দিন কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

শিশিরের শ্বশুরবাড়ী প্রকাণ্ড সাত-মহল বাড়ী, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন। সকলেই একত্র এক অন্নে থাকেননা বটে, কিন্তু সাবেক কালের কর্ত্তাদের আমলের প্রকাণ্ড বাড়ীতেই এখানে একটা ওখানে একটা প্রাচীর তুলিয়া যে যাহার পৃথক হইয়া আছেন। তাহাতে বাড়ীটার কুশ্রীতা বাড়িয়াছে এবং অন্তঃপুরের অন্তহীন কল-কোলাহলেরও আর বিরাম নাই।

বধূবরণ করিয়া আনিবার সময় সেই যে শিশিরের বয়স লইয়া একটা আলোচনা উঠিয়াছিল, তাহার জের এখনও মিটিলনা। কথাটা শাখা এবং পল্লব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

তখন সকালবেলাটা কাজের সময়। মেয়েরা অনেকে একত্র হইয়া বড় বড় বারকোস বঁটি চুপ্‌ড়ি সামনে লইয়া তরকারি কুটিতে বসিয়াছে। কেহ ডাল বাছিতেছে, কেহ পাণ সাজিতেছে। কেহ ক্রন্দনপরায়ণ কোলের শিশু সন্তানকে দুধ খাওয়াইতেছে। ত্রিতলের উপর শিশিরের শয়ন-কক্ষ। সে সকালবেলায় উঠিয়া দেখিল শয্যাপার্শ্বে স্বামী নাই। বাপের বাড়ীতে থাকিতে ভোরবেলাটি তাহার কাছে অতিশয় প্রিয় ছিল। খুব ভোরে উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, প্রস্তুত হইয়া সে বাগানে বেড়াইত, বই পড়িত। উষার প্রথম উদয়কে মনে প্রাণে আবাহন করিয়া লওয়াই তাহার নিত্য-কালের অভ্যাস। কিন্তু আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেই নিজেকে অত্যন্ত একলা লাগিল। যেন সমস্ত দিনে তাহার কিছুই করিবার নাই, তাহার চারিদিকের জীবন অদ্ভুত নিরবলম্ব একটা শূন্যতায় মিশিতেছে। এখানে কাহারও সহিত তাহার মিল নাই, এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে কোথাও কোনখানে তার যোগ নাই। এমনি শূন্য ভারাক্রান্ত মন লইয়া সে ঘুম হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইবার কোন উদ্যোগ মাত্র না করিয়াই খাটের বাজুর উপর একটা হাত রাখিয়া বাইরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ঝি ঘর ঝাঁট দিতে আসিল। এই ঝিটি অনেকদিনের পুরান। সুবোধের স্বর্গগতা জননীর আমলের। সে ঘরে ঢুকিয়া শিশিরকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "অমন করে বসে কেন নতুন বৌমা? এই ঘরের পাশেই নাবার ঘর আছে, উঠে চল। আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিইগে। মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

শিশির শ্রান্ত কণ্ঠে কহিল, "এই যে যাচ্ছি। আচ্ছা বলতে পার ঝি, বাবু সকালে উঠেই কোথায় গেছেন?"

"কেন ব'লতে পারবনা বৌমা, সুবোধ যে সকাল হ'লেই ক্ষেতখামার দেখতে বার হয়। এত বড়লোকের ছেলে, চার পাচটা পাশ, কিন্তু ছাতা মাথায় জমির আলের উপর ব'সে চাষা-ভূষোর সঙ্গে তাদেরই ঘরের পাঁচটা সুখ-দুঃখ নিয়ে এমন গল্প ক'রবে যে, কে বলবে ও আবার জমীদার, ওর পেটে আবার এত বিদ্যে আছে।—" বলিতে বলিতে ঝিয়ের গলার স্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। মা মারা যাওয়ার পর সেই কোলে-পিঠে করিয়া ছোটটি হইতে সুবোধকে মানুষ করিয়াছিল।

ঝাঁটাটা রাখিয়া পুনশ্চ কহিল, "অনেক তপস্যা করেছিলে বৌমা, তাই এমন সোয়ামী পেয়েছিলে। আমি আর কি বলব, তুমি নিজেই ক্রমে ক্রমে সব বুঝতে পারবে।" ঝি তাহার মুগ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া হয়ত আরও অনেক কিছু কহিত; কিন্তু তাহার বাক্য স্রোতে বাধা পড়িল। ইন্দুমতী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া

কহিলেন, "ও কি রে শিশির, এখন অমন করে ব'সে রয়েচিস? ওঠ ওঠ।" তিনি এক রকম জোর করিয়া শিশিরকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া দুই তিন্ রকম সাবান বাহির করিয়া তাহাকে ঘষা-মাজা করিতে লাগিলেন। "ও কি পিসীমা, সকালবেলায় উঠেই সাবান মাখানোর অত ঘটা কেন?"

"তুই একটু চুপ কর দেখি। সব বিষয়ে আমি যা বলি শুনে চল। দেহটার একটু যত্ন না নিলে রঙের জৌলুষ খুলবে কেন?"

গা ধোয়ান শেষ হইলে শুষ্ক তোয়ালে দিয়া খুব জোরে ঘষিয়া ঘষিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া ইন্দুমতী কাপড়ের তোরঙ্গ খুলিলেন। একটা ফিরোজা রঙের পাতলা ভয়েলের শাড়ি ও সেই সঙ্গে মানানসই জামা পরাইলেন। মাথার চুলগুলি পরিপাটি করিয়া পিছনের দিকে ফাঁপাইয়া জাপানী ধরণের এলো খোঁপা বাঁধিলেন। তার পর বাছাই করা দুই চারিখানি স্বর্ণালঙ্কার গায়ে দিয়া দিলেন। মুখে পাউডার, কপালে টিপ, এমন কি, ঠোঁটে একটুখানি রুজ মাখাইয়া দিতেও ভুলিলেননা। ইন্দুমতী অবশেষে তাহার গালে যখন ক্রিমের সহিত সিন্দূর গুলিয়া লাগাইতে গেলেন তখন সে আরক্তমুখে অসম্মতি জানাইয়া কহিল, "সকালবেলা উঠে এমন সং সাজতে আমি কিছুতেই পারব না,—তা তুমি যাই বলো পিসীমা।"

লজ্জা এবং বিতৃষ্ণায় আরক্ত তাহার মুখখানির দিকে চাহিয়া ইন্দুমতী স্বচ্ছন্দে সম্পূর্ণ অবলীলাক্রমে বলিলেন, "আচ্ছা সিঁদূর থাক। এমনিতেই তোর গাল দু'টি টুকটুকে।"

সেই সজ্জিত সুন্দরীর মুখের পানে আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, "বুঝলি শিশির, এসবই কেবল হিংসে। নিছক হিংসে, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

শিশির তাঁহার বক্তব্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

"দেখলিনে সেদিন তোর বয়সের কথা তুলে নকাকীমা খামোখা আমাকে কেমন অপমানটা করলে। আসল কারণ যে কি তা আমি জানি। ভিতরে ভিতরে বুক যে ওঁর জলে যাচ্ছে। কুলীন কুলীন করে ক্ষেপে পাঁচথুপি না কোথায় ও-বছরে ছেলের বিয়ে দিলেন,—বৌ হয়েচে যেন পোড়াকাঠের মত। না আছে শ্রী, না আছে বুদ্ধি। সংসারের মধ্যে শিখেচে কেবল ছুঁই ছুঁই। মস্ত শুচিবাই রয়েচে মায়ের —সেইটুকুই কেবল পেয়েচে। কোথায় পাবে তোর মত বৌ। তাই হিংসেতে চোখে কাণে আর দেখতে পাচ্ছেনা।"

শিশির অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার শিক্ষিত ভদ্র অন্তঃকরণ এই ধরণের আলোচনায় যেন মরমে মরিয়া যাইতেছিল।

কহিল, "থাকনা পিসীমা। লোকের কথায় অত বিচলিত হ'ও কেন? তাছাড়া আমার বয়স এই আষাঢ়ে সতেরো পূর্ণ হবে। লোকে যদি তা-ই বলেই থাকে ক্ষতি কি?"

ইন্দুমতী তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তাই বলে এখনই তো আর কিছু সতের পূর্ণ হয়নি। আর আইবুড় মেয়ের বয়স দু'চার বছর কমিয়ে বলাই নিয়ম। তোকে যদি কেউ বয়সের কথা জিজ্ঞেস করে তুইও তাই বলবি।"

"পিসীমা, আমি তো কখনোই মিথ্যে বলিনে।"

"রাখ রাখ, আর পাকামো করতে হবেনা। ওকে তো আর মিথ্যে বলা বলেনা, ওকে বলে ঘুরিয়ে বলা। এখন থেকে হিঁদু বাড়ীতে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিস্, এখন থেকে দেখতে পাবি কত কথা ঘুরিয়ে বলতে হয়, কত কথা রেখে ঢেকে না বললে চলেনা। আমাকে আর কিছু বলতে হবেনা। নিজেই সব শিখে নিবি। আয় এখন নীচে যাবি চল।"

শিশির আর কিছুই বলিল না; নিঃশব্দে রহিল। বস্তুতঃ এ-ধরণের কথা-কাটাকাটি করিতে তাহার একান্ত বিতৃষ্ণা বোধ হইতেছিল। আই-এ পড়িবার সময় সে সংস্কৃত লইয়াছিল, এবং বিশেষ করিয়া এই বিষয়টার প্রতি তাহার অনুরাগের সীমা ছিলনা বলিয়া আই-এ ষ্ট্যাণ্ডার্ডের চেয়ে ঢের বেশি করিয়া সে সংস্কৃত পড়িয়াছিল। তাই বিবাহের সময়কার অধিকাংশ মন্ত্রই সে মনের সহিত বুঝিতে পারিয়া হিন্দু বিবাহের এবং নববধূর প্রতি হিন্দু পরিবারের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধায় আবেগে বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যে নববধূকে সম্বোধন করিয়া তাহার স্বামী গম্ভীর উদাত্ত মন্ত্রে কহে, 'আজ হইতে তুমি আমার গৃহের সাম্রাজ্ঞী হইলে'···ইত্যাদি ইত্যাদি···সে সমস্তই সে তো নিছক অর্থহীন মন্ত্রের আবৃত্তি বলিয়া মনের মধ্যে লয় নাই। সে সকলকে সত্য জানিয়াই মনে মনে পুলকিত হইয়াছিল।

পিসীমার সহিত সাজ-সজ্জা করিয়া নীচে নামিয়া যাইতে যাইতে সে ভাবিল, সেই সংসারের এই রূপ! হিঁদুর শ্বশুর-বাড়ী করিতে হইলেই এত মিথ্যা, এত দ্বেষ, এত ঈর্ষার আশ্রয় লইতে হয়!

১৫

অন্তঃপুরশালার রঙ্গমঞ্চে যখন তাহার পিসীমা শিশিরকে লইয়া যাইয়া হাজির করিলেন, তখন তাঁহাদের দেখিয়াই সমবেত সকলের চোখে-চোখে একটা ইসারার, একটা ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া গেল। যিনি হাত পা নাড়িয়া মহা উৎসাহে কি একটা বোঝাইবার চেষ্টা পাইতেছিলেন তিনি সহসা চুপ করিয়া গিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আনাজ কুটিতে লাগিলেন। যিনি অত্যন্ত জোরে কি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উচ্চ স্বরে হাসিতেছিলেন, তিনি মুখ নামাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন।

একজন গিন্নী বান্নি গোছের তাড়াতাড়ি একটা আসন পাতিয়া দিয়া কহিলেন, "বোস মা বোস। আহা, মা যেই ঘরে ঢুকলেন ঘর যেন রূপে একেবারে আলো হয়ে উঠ্‌লো।"

ন-কাকীমা কাছেই ভাঁড়ার ঘরে বড়ি দিবার জন্য কলাই ভিজাইতেছিলেন। তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত খাটো একটা মটকার কাপড় পরিয়া চৌকাটের কাছে দাঁড়াইয়া খনখনে আওয়াজে কহিলেন, "ছোট খুড়িমা, তুমি সব তাতে কথা বলতে আস কেন? কথা যখন কইতে জাননা চুপ করে থাকলেই পার।"

বিধবা ছোটখুড়িমা কিছুই বলিতে পারিলেননা। কেবল একবার ম্লান ভীরু দৃষ্টিতে বড়তরফের ন' গৃহিণীর দিকে, আর একবার সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট শিশির এবং ইন্দুমতীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার দীন ভাব হইতে বেশ বোঝা গেল তিনি এ বাড়ীর বড় কেহ ন'ন,—আশ্রিতামাত্র। অনেকের মন জোগাইয়া তাঁহাকে বাস করিতে হয়।

"...ও খুড়ি একবার এদিকে এসে বলে কয়ে দিয়ে যাওনা গো। এ বেলা হেঞ্চা মুসুরি রাঁধতে দোব না কি?"

"মা মা! বলি তোরা কালে-কালে কি হলি লো! রবিবার দোয়াদশীর দিনে মুসুরি কলাই খাবি কি বলে? এখন কলির চার পো পূর্ণ হয়নি লো মনে রাখিস।"

"তা খুড়ি, সকালবেলায় উঠে গালমন্দ দাও কেন? গেরস্থর ঘরে সকালবেলা থেকে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে কে বসে আছে বল? একটা কথা জিজ্ঞেসা করলেই অমন ঝাঁঝিয়ে ওঠ কেন গো?"

দুইজনের কলহ বোধ করি আরও উচ্চগ্রামে উঠিত, কিন্তু তদপেক্ষা মুখরোচক প্রসঙ্গ জুটিল। প্রাঙ্গণের কূয়াতলায় খিড়কির দুয়ার দিয়া আট-হাতি নরুণ পাড়ের ধুতি পরা একজন মোটাগোছের বিধবা এক হাতে দড়ি বালতি ও অন্য হাতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের হাত ধরিয়া ঢুকিলেন।

"বলি কাকী, শাপুরের হাটে আজ বেগুনের সেরটা কত করে নিলে গো?" তাঁহার গলার আওয়াজ এত মোটা এবং সহজ কথা এত জোরে যে, হঠাৎ শুনিয়া শিশির চমকাইয়া উঠিল।

"বেগুনের সের আজ দু' পয়সা করে গেল। তবে হাটের দর আলাদা, আর কামিন মাগীগুলো ঠকায়। গলায় পা দিয়ে পয়সা নেয়। তুমি কত করে নিলে? কিন্তু ও কায়েত পিসী তোমার কাপড় অকাচা নয় তো? আমার ওদিকের ছোট বালতিটা ছুঁয়ে ফেলনি?"

"না বাছা, আমি ঘাট থেকে এখনই কাপড় কেচে আসচি।" দড়ি ও বালতি এক পাশে রাখিয়া তিনি সরিয়া আসিয়া শিশিরের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, "এইটি বুঝি তোমাদের নূতন বৌ? তা বেশ হয়েছে। অমন বাড়ন্ত গড়ন আজকাল অনেক মেয়েরই হয়।"

বড়তরফের ন' গৃহিণী এতক্ষণ পরে একগাল হাসিয়া কহিলেন, "বোস কায়েত-পিসী। না না, বাড়ন্ত গড়ন নয়। বৌয়ের বয়সই সতের আঠারো হবে।"

"এ্যাঁ!"

চোখে চোখে ইসারা কি একটা হইল, কায়েত-পিসী চক্ষের পলকে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িল, "কিন্তু বলি ন'-গিন্নী তোমাকে বাপু এর একটা বিচার করে দিতেই হবে। সাত কায়েতের মাঝে ঘোষেদের চণ্ডী ঐ যে একটা ছোটলোকের মেয়েকে এনে বসিয়েছে—"

অত্যন্ত মুখরোচক একটা প্রসঙ্গের আভাস পাইয়া কামিনী মাসী হেঞ্চার শাক বাছা বন্ধ রাখিয়া গলা খাটো করিয়া খাঁগস্বরে প্রশ্ন করিল, "কে গা পিসী? কী হয়েছে?"

"কী আবার হবে, নিত্যি যা ঘটে তাই হয়েচে। প্রথম

পক্ষের অমন বৌটা স্মৃতিকে ধরে অসময়ে মারা গেল। তাও বলি, কপালে দুঃখ না থাকলেই বা এমনটা হবে কেন। তার পরে এই যে চণ্ডী ন'বছরের একটা ক্ষুদে মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ী ঢোকালে, তা বাপু বেশ করলি, মেয়েমানুষে একবার বিয়ের জল গায়ে লাগলেই হু হু করে বেড়ে ওঠে। তাতে কি আর সময় লাগে? কিন্তু মেয়ের মা-মাগী এই যে ক্ষুদে মেয়ের ঘরকন্না গোছাবার ছল করে উড়ে এসে জুড়ে ব'সল, তার কী করবি এইবার কর!"

"··কেন চণ্ডীর শাশুড়ী আজ আবার কার সঙ্গে কোঁদল করলে?"

"কোঁদলের আর বাকী আছে কি! একতলার বৌদের দুয়োর হয়ে পেরিয়ে আসছিলাম, আমাকে ডেকে বললে, শোন মাসী, কাল চণ্ডীর শাশুড়ী ঘাটে যেয়ে বলে কি না, বেশ হয়েচে। কায়েত-পিসীর এতদিনের গুমোর ভাঙ্গল তো এইবার! ওই যে বড় মেয়েটা বিধবা হয়ে ফিরে এ'ল, খালি হাত করে বেড়াচ্ছে। কেমন হয়েচে!"—বলিতে বলিতে কায়েত পিসী চক্ষে অঞ্চল লইলেন, "কে আর জন্মাবধি লোহায় হাত বাঁধিয়ে আসে মা। রাঁড় হওয়া তো দৈবের কথা।"

কয়েকজন প্রবীণা অস্ফুট সহানুভূতিসূচক স্বরে কায়েত-পিসীকে সমর্থন করিলেন।

শিশির স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। এ কোন্ অজানা বীভৎস দেশ হইতে এসব দৃশ্য, এসব কথা তাহার বিস্ময়ে অবরুদ্ধ দুই কর্ণরন্ধ্রে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে! পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নিশীথে দূরশ্রুত বাঁশির মত অস্ফুট মধুর—মধুর প্রথম প্রেমের সঙ্গীতে যখন তাহার হৃদয়-মন উদাস হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেইক্ষণে এ কী দারুণ দুঃস্বপ্ন! এই সঙ্গ, এই আবেষ্টনের মাঝে তাহাকে প্রতি দিন, প্রতি রাত্রি কাটাইতে হইবে, এই সকল কথা, এই সকল আলোচনা প্রত্যহ শুনিতে হইবে, হয়ত বা কোন একদিন এমনি করিয়া ইহাদের মত সে-ও তাহাতে যোগ দিবে। এই উৎকট আশঙ্কার কাছে তাহার জীবনের আর সমস্ত সুখ, সব আনন্দ নিষ্প্রভ পাণ্ডুর হইয়া গেল।

১৬

ভিতরবাড়ীর বারান্দায় সুবোধের মিষ্ট গলার গুন গুন আওয়াজ পাওয়া গেল,—

"তুমি এসেছ মোর ভুবনে
তাই রব উঠেচে গগনে—"

"কই খুড়িমা, আমার 'চা' এখন হয়নি?"

"এই যে এস বাছা এস। ঝি মাগী আজ আবার দেরী করে আথায় আগুন দিয়েছে—তাই এখন জল গরম হয়নি। যেটি আমি নিজে না দেখব সেইটি হবার জো নেই।"

দিনের বেলায় এতগুলি গুরুজন এবং আত্মীয়-স্বজনের মাঝে স্বামীর উপস্থিতিতে মাথায় যে পরিমাণ ঘোমটা টানিয়া দেওয়া উচিত, যতখানি ত্রস্ত সঙ্কুচিত এবং জড়সড় হইয়া বসা প্রয়োজন, শিশির তাহার কিছুই করিলনা। বরঞ্চ নানা অসুন্দর এবং বিসদৃশ আলোচনার মাঝে হঠাৎ স্বামীকে দেখিয়া অকারণে তাহার সমস্ত মন স্বামীর উপর প্রবল অভিমানে ছল ছল করিয়া উঠিল। সে অনেকটা নিজের অজ্ঞাতেই সুবোধের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বধূর এবম্বিধ বেহায়াপণায় অনেক যোড়া তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী চক্ষু তাহার উপর কটমট দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। সে সব লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা শিশিরের ছিলনা। কিন্তু সুবোধ সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "থাক, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমি নিজের ঘরে যাচ্ছি খুড়িমা। চা' তাহলে সেইখানেই পাঠিয়ে দিও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।"

সুবোধ চলিয়া যাইবার পরেই, শিশিরও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সে মনে মনে বারংবার আপনাকে আপনি কহিতে লাগিল, না না, এসব আমি কখনই মানিবনা। আমার স্বচ্ছ শুভবুদ্ধি আমাকে যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে আমি তাহাই করিব। বৃথা লোকনিন্দা এবং লোকমতের ভয়ে যে সঙ্গে ও যে আবহাওয়ায় আমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘটে সেখানে আমি কিছুতেই থাকিবনা।

সে উঠিয়া ত্রিতলে আপন শয়ন-কক্ষের অভিমুখে গেল। পিছনে আসিতে আসিতে মন্তব্য শুনিল, "ও মা! বৌ যে উঠে চলে গেল। ও নদি, বৌকে জল খেতে দিলেনা?"

নদিদি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "আমি কি করে জানব বাছা, অত বড় মেয়ে সকালে উঠে আহ্নিক-টাহ্নিক একটা কিছু না করেই জল খাবে। হ্যাঁ সে ছিল বটে আমাদের পাঁচথুপির বৌ। সক্কালবেলায় দু' তিন গাছি

মালা না করে, ঠাকুরের পুষ্প-ধোয়া জল না খেয়ে জলটুকু মুখে দিতনা।"

শিশির পিছনের মন্তব্য এবং শ্লেষের প্রতি লেশমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে একেবারে সোজা তেতালার ঘরে ঢুকিল।

জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া সুবোধ কি একটা বই লইয়া পড়িতেছিল; পায়ের শব্দে মুখ ফিরাইল, "এই যে এসো। আমার কী ভাগ্য, না চাইতেই দেখা পেলুম।"

সুবোধের মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে, গলার স্বরে আনন্দ যেন শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

"সকালবেলায় উঠেই কোথায় গেছিলে?"

"আমার কাজে।"

"সে কাজের বিবরণ আমি শুনেচি। আচ্ছা, ওই গুলোকে কাজ বল কী করে? আর এই সব নিরর্থক কাজের জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে তোমার ভালও লাগে?"

"একটুকুও নিরর্থক নয় শিশির। আমি যাদের মাঝে এতক্ষণ ছিলুম, তুমি যদি শুধু তাদের জানতে। তারা কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল।"

"আর আমিও এতক্ষণ যাদের মাঝে ছিলুম তাদের যদি শুধু জানতে—"

বাহিরে একটা কাশির আওয়াজ পাওয়া গেল, পরমুহূর্ত্তে ঝিয়ের হাতে জলখাবারের থালা এবং নিজে একবাটি চা হাতে করিয়া ইন্দুমতী ঘরে ঢুকিলেন।

গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "শিশির নীচে চল। জলটল খাবে।"

"আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না পিসীমা। তুমি যাও। আমি একেবারে স্নান সেরেই যাব।"

তাঁহার আদেশ এমন সুস্পষ্ট করিয়া অমান্য করাতে ইন্দুমতীর মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। তিনি জোরে জোরে পা ফেলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। চায়ের বাটিটা তুলিয়া লইয়া সুবোধ আস্তে কহিল, "গেলেনা কেন?"

"গেলুমনা আমার ইচ্ছে।"

তাহার পর অত্যন্ত শ্লেষের সহিত একটুখানি হাসিয়া কহিল, "কেন, এসব বিষয়েও তোমাদের পাড়াগাঁয়ের কোন স্পেশাল দণ্ডবিধি আছে না কি?"

সুবোধ ম্লান হইয়া কহিল, "না, আমি তা মনে করে বলিনি। অনেক বেলা হয়েচে তোমার কিছু খাওয়া প্রয়োজন। হয় তো তোমার এখন চা'ও খাওয়া হয়নি।"

ক্ষণকাল পূর্ব্বেই স্বামীর যে আনন্দোজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, তাহারই সহিত তাঁহার এখনকার ম্লান মুখ মনে মনে তুলনা করিয়া শিশিরের মনে ঘা লাগিল। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। তাহার পরেই সে উদ্ধত ভাবে জবাব দিল, "চা না খেয়ে থাকি, কিন্তু তাই বলে আমি নীচে যেতেও পারবনা। দেখ একটা কথা তোমাকে সহজ করে খুলেই বলি। এদের মাঝে আমি থাকতে পারবনা। কিছুতেই পারবনা। আমি মরে যাব। ওগো, তার চেয়ে বরঞ্চ আমাকে বাপের বাড়ীতে রেখে এসো। আমাকে তোমরা এমন করে তিলে তিলে মেরে ফেলোনা।" সুবোধ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল—

"শিশির!"

"বল।"

"বাপের বাড়ীতে কেন রেখে আসব? তোমার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের কথা কি আমাকে বলা যায়না? আমাকে কি তোমারই নিজের ব'লে ভাবতে পারনা?"

স্বামীর শান্ত করুণ কথায় শিশিরের মন আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

সুবোধ বলিল, "যাদের কথা তুমি বলচ, তাদের উপর রাগ বিরক্তি বা অভিমান করে কী হবে শিশির? তারা কি তার যোগ্য? তারা যে তোমার চেয়ে অনেক ছোট, অনেক বঞ্চিত।"

"ছোট হতে পারে, কিন্তু বঞ্চিত কিসের? এদিকে কথায় তো কেউ কম যাননা। ও কি! তুমি যে কিছুই চা না খেয়ে বড় চায়ের বাটিটা ঠেলে রাখলে?"

"কেমন যেন খেতে ভাল লাগচেনা।"

"কেন, আমার কথায় রাগ করে নাকি?"

"না না, কী যে বলো—" সুবোধ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আমি শুধু ভাবছিলুম আমাদের 'আমিত্ব'টা কী প্রচণ্ড, কী সর্ব্বব্যাপী। যাকে খুব ভালোবাসি তার এত কাছে থেকেও তাকে বুঝতে পারিনে। নিজেকে নিয়েই সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রয়েচি। জান শিশির, আজ সকালবেলায় কোন কাজকেই আমার যথেষ্ট শক্ত বলে মনে হচ্ছিলনা। অন্য সময়ে প্রজাদের নানা কচ্‌কচি শুনতে, নানা মোকর্দ্দমা,

বিবাদের সালিশি করতে করতে এক এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠতুম, এক এক সময় ধৈর্য্য থাকতনা। কিন্তু ক'দিন থেকে কিছুতেই আর আমার বিরক্তি আসচেনা, কিছুতেই আর আমি শ্রান্তি বোধ করচিনে। সমস্ত দিনের প্রত্যেকটি তুচ্ছ কাজ যেন ফুলের মত ফুটে উঠছিল কেবল এই মনে করে যে, কাজের শেষে তুমি আছ। সমস্ত দিনের কাজের পর সন্ধ্যেটি যেই সুরু হবে, সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে তোমার চোখের দিকে চেয়ে দেখতে পাব। ভেবেছিলুম, মনের মত বই তোমার সঙ্গে একত্রে পড়তে পাওয়া, কাজ কর্ম্মের পরে তোমার কাছে এসে বসতে পাওয়া—এর চেয়ে বেশি জীবনে আর কি চাইবার থাকতে পারে? কিন্তু এখন দেখচি, নিজের কথাটাই কেবল স্বার্থপরের মত ভেবেছিলুম। তোমার যে এসব ভালো না'ও লাগতে পারে এমন সম্ভাবনা মনে ওঠেনি।"

"তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে, কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকব সে কথাটা তো একবারও ভাবনি।"

"সেইখানেই যে হয়েছিল আমার ভুল। আমার কাজ যে তোমারও কাজ হয়ে উঠবে, এমন কথা মনে করেছিলুম আমি কোন্ দম্ভে?"

"সত্যি বলচ?"

"সত্যি নয়ত কি।"

"তোমার অভিমানের বলা নয় তো? তা'হলে আমি বলব, সত্যি তুমি ভুল করেচ। এখানে আমি বেশি দিন আসিনি বটে, কিন্তু এইটুকু বুঝেচি—পল্লীসমাজে মেয়েদের প্রভাব যতখানি এমন আর কারও নয়। তুমি মেয়েমানুষ নও বলে বাইরে বাইরে কাজ করে অনেকখানি অব্যাহতি পেয়ে বাঁচবে। আর আমাকে এই মেয়েদের আবেষ্টনে থেকে এর বিষাক্ত পুচ্ছপাশ অহরহ সহ্য করতে হবে।" বলিতে বলিতে সকালবেলাকার দৃশ্যটা মনে পড়িতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবিমিশ্র ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল, "ছি ছি, কত ছোট এদের মন! আর কত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কত নোঙরা পরনিন্দা পরচর্চ্চা করেই না এদের দিন কাটে।"

"তাই তো তোমার আরও বেশি করে এদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল শিশির।"

"ক্ষমা কর, আমি তা পারবনা। ওরাও আমাকে অহরহ বিঁধতে থাকবে, আর আমিও কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কোন ভাবেই ওদের কোন কাজে লাগবনা।"

সুবোধ আর কোন কথা কহিলনা। জানালা দিয়া গ্রীষ্ম-প্রভাতের বিমল শান্তি এবং স্নিগ্ধ বাতাস ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সুবোধ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তোমার সম্বন্ধে কোন একটা উপায় যেমন করে পারি আমি খুঁজে বার করবই। তোমার যে এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে সে কথাটা আজকের আগে আমি বুঝতে পারিনি।"

"আর আমি মুখ ফুটে না বললে বোধ করি কোন কালেই বুঝতে পারতেনা। কিন্তু উপায় আর কি খুঁজে বার করতে যাবে, তার চেয়ে দাও সোজা আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে।"

"শিশির, মানুষকে ব্যথা দেওয়ারও একটা সীমা আছে। তুমি জান তোমার এই কথাটায় আমি মনে মনে ত কষ্ট পাই।"

"কেন বাপের বাড়ী আর কোন কালে যেতে দেবেনা নাকি? তোমাদের বংশের বৌয়ের বাপের বাড়ী যাওয়াও নিষেধ?"

"ছি ছি, কী যে বলো। আমি কি তোমাকে কোন জিনিষ নিষেধ করতে পারি? সবই তো তোমার। তোমার যখন খুসী যেদিন খুসী যাবে। কিন্তু অমন করে ব'ল কেন? আমার উপর কি একটুও নির্ভর করতে পারনা? তোমার কথা যে আমি সকল সময়েই ভাবি, তোমার কষ্টের কারণ প্রাণপণে দূর করবার, করতে চেষ্টা করবার দুর্লভ অধিকার যে আমি পেয়েছি, এটুকু ভাবতেও কি আমাকে দেবেনা?"

শিশির চুপ করিয়া রহিল।

সুবোধ মৃদুস্বরে অনেকটা আপন মনেই যেন বলিতে লাগিল, "তোমার কেন যে এত কষ্ট হচ্ছে তার কিছু কিছু আমি বুঝতে পারচি। তোমাকে প্রথমে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম তোমার সমস্ত হৃদয় মন একান্ত নির্জ্জনে কী নির্ম্মল শুচি আবেষ্টনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কিন্তু যাদের উপর তোমার মনে এত বিতৃষ্ণার উদ্রেক হচ্ছে, তারা যে সব দিক দিয়ে কত বঞ্চিত, তা যদি শুধু একবার বুঝতে পারতে।"

"বঞ্চিত কিসের ?"

"দেখনি, কলকাতা সহরে মধ্যবিত্ত ঘরের বাপ মা, যাঁদের আয় কম, তাঁরাও যেমন করে পারেন ছোট মেয়েটিকে স্কুলে দে'ন। কষ্টে সৃষ্টে যেমন ভাবেই হোক মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শেখান। আজকাল প্রায় সব সহরেই তাই। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে দেখনা—চার পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে, যাদের ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে হাসিখুসী মুখে খেলে বেড়াবার কথা, তারাই তাদের ছোট ভাই কি ছোট বোনকে অষ্টপ্রহর বয়ে বেড়াচ্ছে। অতি অল্প বয়স থেকে ছেলে বয়ে বয়ে তাদের আর বাড় নেই, মনে স্ফূর্ত্তি নেই, ব্যবহারে প্রাণের সজীব চঞ্চলতা নেই। তাদের দেখলেই আমার মন কেমন করতে থাকে। এই তো শিশু বয়স থেকে তাদের জীবন। ছেলে ধরা, মায়ের ফরমাস খাটা, আর বাড়ীতে মা দিদিমায়ের হাজার রকম কুসংস্কার, শুচিবাই, পরনিন্দার মাঝখানে থেকে নিরন্তর সেই সব শেখা। এমন করে যারা মানুষ হয়েছে, শৈশব জীবন থেকে যাদের এত অল্প দিয়েচি, তাদের কাছে কত আশা করতে পারি ? তুমিই বল শিশির ?"

"আচ্ছা তুমি এত সব ভাব কখন ? আর পুরুষ মানুষ হয়ে এত খোঁজ রাখই বা কি করে? আমি তো মনে করতুম তিনবার এম-এ দিয়েচ, পণ্ডিত মানুষ, দিবারাত্রি পড়াশোনার ঝোঁকেই থাক। ভিতরে ভিতরে যে তোমার মনে এত বেদনা, এত ভাবনা, তা কে জানত ?"

সুবোধ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ও সব কথা থাক। তোমার এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, এ কথাটা জানবার পর থেকে মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিনে। তুমি আমার ঘরে এসে কষ্ট পাচ্ছ, তা কি আমি সহ্য করতে পারি? ভেবে দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি। খুব সম্ভব আমরা কলকাতায় যেয়ে থাকব। কিন্তু চারটে পাঁচটা মাস তোমাকে আমায় ক্ষমা করতেই হবে।"

"কেন ?"

"এখানে আমি একটা ভালো ডাক্তারখানা আরম্ভ করিয়েছি। তৈরী শেষ হয়ে গেলে আমাদের ষ্টেট্ থেকে মাইনে দিয়ে একজন এম-বি পাশ করা ডাক্তার রাখব। এদিককার সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ হয়ে গেলেই তোমার সঙ্গে যেতে পারব।"

"কেন অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করবে? ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ডাক্তার তো রয়েচে।"

"তুমি তো ছোট থেকে কখনো পাড়াগাঁয়ে থাকনি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ডাক্তার যে কী পদার্থ তা জাননা। কি বলব তোমায়—আশে-পাশের আট-ন-খানা গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের এই একটিমাত্র ডাক্তার। তাই তার স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচারেরও যেন আর সীমা নেই। ম্যালেরিয়ার সীজ্‌নের সময় দেখেচি কেবলমাত্র উপযুক্ত মাত্রায় ভালো কুইনাইনের অভাবে কত লোক অনর্থক ভুগে ভুগে মারা পড়েচে।"

শিশির কিছুকাল অধোমুখে থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, তুমি যে এর পর থেকে কলকাতায় যেয়ে থাকবে, তাতে করে তোমার অনেক দান থেকে তোমার গ্রামকে বঞ্চিত করা হবে না কি ?"

"আমি দূরে থেকেও যতটুকু পারি করবার চেষ্টা করব।"

"কিন্তু তুমি তো এখান থেকে চলে যাবে। কেবল তোমার এখানে থাকাটাই যে এদের পক্ষে কতখানি, সে কথাটা আমি যেন কিছু কিছু বুঝবার কিনারায় এসেচি।"

সুবোধ কি একটা বলিতে গিয়াও বলিলনা। মুখ নামাইয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, "মাপ কর। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন আমাকে কোরোনা শিশির। এবারে আমি যাই। সত্যি সত্যি এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে সমস্ত শেষ করে তুলতে হ'লে এই ক'টা মাস আমাকে খুব পরিশ্রম করতে হবে। ব'সে থাকলে চলবেনা।"

"সত্যি কি ব'সতে একবারও একটুও ইচ্ছে করেনা ?" শিশির হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল।

দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"সে কথার উত্তর আমার চেয়ে তুমি ভালো করে জান। আমি শুধু এইটুকু জানি, কাজই করি কিংবা বিশ্রামই করি, তুমি সকল সময়েই আমার সঙ্গে আছ। কিন্তু এইবারে অনুমতি কর আমি যাই।"

"আচ্ছা যাও। কিন্তু যে কথাটার উত্তর এড়িয়ে গেলে, সে কথার জবাব আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে পাবেনা। একদিন না একদিন উত্তর তোমাকে দিতেই হবে।"

(ক্রমশঃ)

"ধর্‌বে বঁধু ভাবিস্ না রে"

শ্রীশান্তিপ্রকাশ মিত্র

(বাউল-গান)

ওরে পাগল !
আর উঠিস্ নে তুই ধূলা ছেড়ে,
যদি তোর নীরব কথা, মরম ব্যথা
পরাণ-বঁধু বুঝ্‌লো না রে !
আকাশে জ্যোৎস্না ভরা,
দখিণা আকুল করা,—
ব্যাকুল প্রাণে জাগিস্ না রে।
মিছে তুই ফুল তুলিলি কান্তারে ;
যদি তোর ফুলের ডালা, গলার মালা
পরাণ-বঁধু চাইলো না রে !
দিল না কেহই আশা,
পেলি না রে ভালবাসা,—
কাঙাল সেজে থাকিস্ না রে।
বৃথা তুই বাজাস বাঁশী আঁধারে,
যদি তোর বাঁশীর সুরে, ব্যথায় ভোরে
পরাণ-বঁধু কাঁদলো না রে !
পেলি না কোথাও সাড়া,
কেন আর নড়া-চড়া,
ওদিকে আর চাহিস্ না রে।
মিছে তুই ঘুরে বেড়াস্ সংসারে ;
যদি তোর খোঁজার শেষে, করুণ হেসে
পরাণ-বঁধু আস্‌লো না রে !
পথেতে কতই কাঁটা,
কত না ঝড়্-ঝাপ্‌টা,—
কিছুই তুই মানিস্ না রে।
কেন তুই কেঁদে মরিস্ এ পারে ;
নাই তোর পারের কড়ি, পারের তরী
পরাণ-বঁধু বাইলো না রে !
দিয়েছে সবাই-ফাঁকি,
ছেড়ে দে' পরাণ-পাখি,—
ধর্‌বে বঁধু ভাবিস্ না রে।

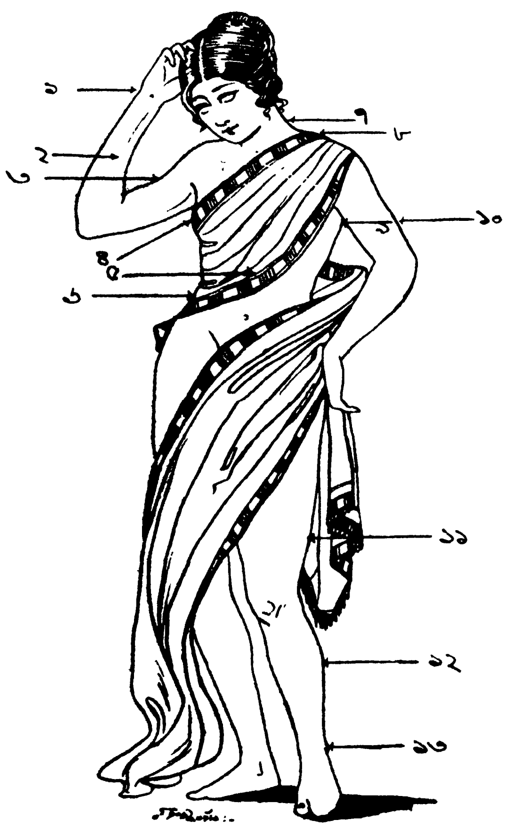
মাতৃজাতির শরীরচর্চ্চা

শ্রীনীলমণি দাশ

বাংলায় দিন দিন দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার, নারীহরণ ইত্যাদির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বাংলার নারী যেন টাকাকড়ি, তৈজস-পত্রের সামিল ! সদাই ভয়—এই বুঝি কোন দুর্ব্বৃত্ত অপহরণ করে। পুরুষকে তাঁদের রক্ষা করতে হয়। যে স্থলে পুরুষ দুর্ব্বল, সে স্থলের ত কথাই নেই—নরাধমেরা বিনা আয়াসে তাদের কার্য্য সমাধা করে। কিন্তু যদি বাংলার নারীদের নিজেদের রক্ষা করবার ক্ষমতা থাকত, তাহ'লে ত তাঁদের এরূপ ভাবে অপদস্থ হ'তে, আপনাদের অমূল্য সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হ'ত না। কোন সভ্যদেশে এইরূপ পৈশাচিক ঘটনার কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় না, কারণ, সে সব দেশের নারী বাংলার নারীর মত এত দুর্ব্বল নয়—তারা এত পরমুখাপেক্ষী নয়। সে সব দেশের মেয়েরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার্থ শক্তিশালিনী এবং কর্ম্মক্ষমা হবার জন্যে ব্যায়ামাদি অভ্যাস করেন। কিন্তু দুর্ভাগা বাংলার কথা স্বতন্ত্র। এ দেশে মেয়েদের যদিও শিক্ষার কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের শারীরিক উন্নতির কোন ব্যবস্থাই নেই। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষার চাপে তাঁদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে পড়ছে। জিজ্ঞাসা করি, এই বিদ্যা, যার বেদী-মূলে আমাদের মেয়েরা, মায়েরা, ভগিনীরা তাঁদের অমূল্য স্বাস্থ্যকে বলি দিচ্ছেন, সেই বিদ্যা তাঁদের কি কাজে লেগেছে

বা লাগছে ? সত্যই বড় দুঃখ হয়, যখন দেখি, স্কুল কলেজ থেকে মেয়েরা পাঁচ ঘণ্টা প'ড়ে বাড়ী ফেরে, বইয়ের ভারে সোজা হ'য়ে চলতে পারে না, মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে। এই সব নারীই পরে গৃহিণী হবেন—সন্তানের জননী হবেন। সেই সব সন্তানের কাছ থেকে জননী ও জন্মভূমি কি আশা করতে পারে ?

আধুনিক লেখক ও শিল্পী রমণী-সৌন্দর্য্য বর্ণনায় গোলমালের সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসের বা গল্পের যেখানে



আধুনিক রমণী

নায়িকার রূপ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানেই দেখতে পাওয়া যায়, নায়িকা ক্ষীণাঙ্গী, তন্বী—রং তাঁর ফ্যাকাসে, যেন গায়ে এক ফোঁটা রক্ত নেই, anaemia হয়েছে। কিন্তু আপনারা বঙ্কিমের নারীর রূপ বর্ণনা নিশ্চয় দেখেছেন। তাঁর তিলোত্তমা, তাঁর বীর-রমণী দেবী চৌধুরাণী সত্যই অতুলনীয়। আবার চিত্র-জগতে বিপ্লব পাগলামীর পরিচয় দিচ্ছে। কোন শিল্পী যদি আজ সুন্দরী রমণীর ছবি আঁকেন ত দেখবেন—এক ক্ষীণকায়া তন্বী ভাবে লতিয়ে পড়ছে, যার হাত পা শরীরের তুলনায় বড়, বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলগুলি সরু, লম্বা যেন পাঁকাটি। কোমর এত সরু যে সে দেহের সহিত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে। প্রকৃতপক্ষে এত অস্বাভাবিক যে Anatomyকে ছাড়িয়ে গেছে।

নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য্যের পূজারী; সৌন্দর্য্য নারীর একমাত্র কাম্য। এই সৌন্দর্য্য পাউডার, স্নো, নানারূপ মূল্যবান বস্ত্র-সম্ভারে লাভ করা যায় না। "ব্যায়ামই সৌন্দর্য্য লাভের ও সংরক্ষণের একমাত্র উপায়।"

এই সৌন্দর্য্য বংশপরম্পরায় ভোগ করা যেতে পারে। মায়েরা তাঁদের সন্তানের জন্য টাকাকড়ি উইল করে হয় ত নাও যেতে পারেন; কিন্তু তাঁরা যদি ব্যায়ামাদি অভ্যাসের দ্বারা নিজেদের শরীরের প্রতি সামান্য একটু যত্ন করেন, তা হলে, তাঁরা যে কেবল নিজেরা সুন্দরী হবেন, এমন নয়, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাও সুন্দর হবেন।

পুরুষদের খেলাধূলা করবার,—ড্রিল, জিম্‌নাষ্টিক্ এবং আরও নানা রকম শারীরিক ব্যায়াম করবার উপায় আছে; কিন্তু মেয়েদের শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা করবার সেরূপ কোন উপায় নাই,—যদিও নারীদের শারীরিক উন্নতির উপর ভবিষ্যৎ বংশধরদের তথা জাতির শারীরিক উন্নতি যত নির্ভর করে, পুরুষের শারীরিক উন্নতির উপর তত নির্ভর করে না। সুতরাং জাতিকে সুস্থ সবল করতে হ'লে কেবল পুরুষের নয়, নারীরও ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত।

অধিকন্তু কি পুরুষ, কি নারী, সকলেরই ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী-চৌধুরাণীতে দেবীরাণীর কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় বৎসর ভবানীঠাকুর বলিলেন, বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে। প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল এবং শেষে বলিল, ঠাকুর যা বলেন, তা শিখিব, এটা পারিব না।

ভবানী—এটা নহিলে নয়।

প্র—সে কি ঠাকুর, স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে ?

ভবানী—ইন্দ্রিয় জয়ের জন্যে। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় হয় না।"

সুতরাং বেশ বুঝা যাচ্ছে যে আদর্শ নারী হ'তে হ'লে ব্যায়ামের প্রয়োজন।

নারীর ব্যায়াম-প্রণালী পুরুষের ব্যায়াম-প্রণালী হ'তে ভিন্ন হওয়া উচিত। কারণ, তাঁদের শরীরের গঠন পুরুষের শরীরের গঠন হ'তে ভিন্ন। নারীজাতির মাংসপেশী পুরুষের মাংসপেশী হ'তে ভিন্ন। পুরুষের মাংসপেশী পুরু এবং ব্যায়াম করলে ফুলিয়া উঠে ও শক্ত হয়। নারীজাতির মাংসপেশী পাতলা। উপযুক্ত ব্যায়াম করলে বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পুরুষের মাংসপেশীর মত পুরু ও শক্ত হয় না বা ফুলিয়াও উঠে না। স্থতরাং উপযুক্ত ব্যায়াম করলে নারী জাতির পুরুষের মত শক্ত ও পুরু মাংসপেশী হবে না; বরং ইহাতে তাঁদের যে



১ (ক)

সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে, তাহা ভাল কাপড় ও গহনার সাহায্যে পাওয়া যায় না।

অনেকের ধারণা—ব্যায়াম করলে অধিক আহার করতে হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তাঁদের মনে রাখা উচিত—We eat to live and not live to eat. অর্থাৎ আমরা জীবন-ধারণের জন্য আহার করি, আহারের জন্য জীবন-ধারণ করি না। আবার অনেকের মতে, আমরা অত্যন্ত গরীব—আমাদের পেট পূরে দুবেলা আহার জুটে না। তার উপর যদি আবার ব্যায়াম করি, আহার জুটবে কোথা থেকে? ইহা ব্যায়াম না করবার একটা অজুহাত। প্রকৃত পক্ষে সাধারণ



১ (খ)

ব্যক্তি যেরূপ আহার করেন, ব্যায়ামকারিণীরও সেরূপ আহার করলেই যথেষ্ট। ব্যায়ামের পর সাধারণতঃ ক্ষুধার



২ (ক)

উদ্রেক হয়। তখন কিছু ভিজা ছোলা গুড় সংযোগে খাওয়া উচিত। ব্যায়াম করলে ঘর্ম্মাকারে যে জলীয় পদার্থ শরীর হ'তে নির্গত হয়, তার পূরণের জন্য এই সময় কিছু তরল পদার্থ, যেমন দুগ্ধ, চিনি বা মিছরীর সরবৎ, অভাবে ঠাণ্ডা



২ (খ)

জল পান করা বিধেয়। এই প্রবন্ধের ব্যায়ামপ্রদর্শনকারিণী অত্যন্ত সাধারণ আহার ক'রে থাকেন।

ব্যায়াম অভ্যাস করবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নারীর



৩ (ক)

নিম্নলিখিতভাবে দেহের ওজন ও মাপ লওয়া উচিত। প্রতি মাসে একবার ক'রে দেহের ওজন ও মাপ নিলে সহজে বুঝতে পারবেন যে ব্যায়ামে তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে কি না।

নাম

বয়স তারিখ

উচ্চতা ওজন

বাইসেপ্ (Bicep)	(না ফুলাইয়া)	(ফুলাইয়া)
ফোর-আরম্ (Fore-arm)	„	„
রিষ্ট (Wrist)	„	„
নেক (Neck)	„	„
ব্রেষ্ট্ (Breast)	„	„
ওয়েষ্ট (Waist)	„	„
থাই (Thigh)	„	„
কাফ (Calf)	„	„

ব্যায়াম আরম্ভ করবার পূর্ব্বে ব্যায়ামকারিণীর একটি ছবি তুলে রাখলে ভাল হয়।

ব্যায়াম-পদ্ধতির ছবি দেবার পূর্ব্বে এটা জানান উচিত—কত বয়সে কত ওজনের ডাম্বল নিয়ে ব্যায়াম করা বিধেয়। ১০ বৎসর থেকে ১২



৪ (ক)

বৎসর বয়সের বালিকারা ২ পাউণ্ড করে ৪ পাউণ্ড যোড়া ডাম্বল ব্যবহার করবে। ১২ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর

বয়সের বালিকারা ৬ পাউণ্ড যোড়া ডাম্বল এবং ১৪ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের বালিকারা ও মহিলারা ৮।১০ পাউণ্ড যোড়া ডাম্বল নিয়ে ব্যায়াম করবেন। ১০ বৎসরের নিম্ন বয়সের



(খ)



৫ (খ)



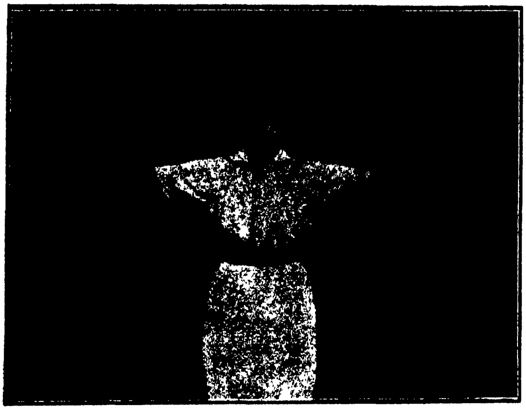
৫ (ক)



৬ (ক)

বালিকারা নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি মুক্ত হস্তে (অর্থাৎ ডাম্বল না নিয়ে) হাত মুঠ করে ব্যায়াম অভ্যাস করবেন।

ব্যায়ামকারিণীর নিজ শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাংস-পেশীসমূহের নাম ও অবস্থানের অবগতির জন্য একটা ছবি দেওয়া গেল।



৭ (ক)



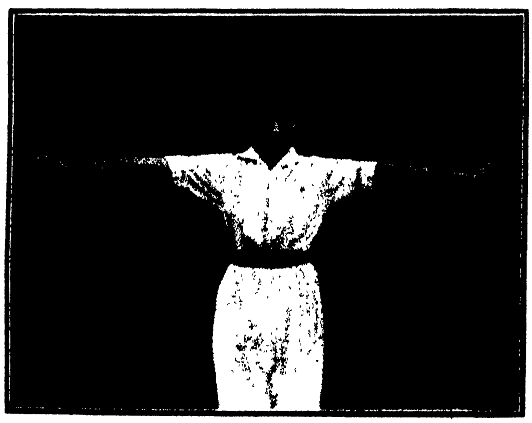
৭ (খ)



৮ (ক)

ছবির পরিচয়

(১) রিষ্ট (কব্জি) (২) ফোরআর্ম (কনুই হইতে কব্জি পর্য্যন্ত হাতের অংশ) (৩) বাইসেপ্ (স্কন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বাহুর সম্মুখের মাংসপেশী) (৪) ব্রেষ্ট (বক্ষ)



৮ (খ)

(৫) রেক্টাস্ এব্ডমিনি (৬) ওয়েষ্ট্ (কটি) (৭) নেক্ (গলা) (৮) ডেল্‌টইড্ (স্কন্ধের মাংসপেশী) (৯) ল্যাটিসিমাস-ডরসাই, (১০) ট্রাইসেপ্ (১১) থাই (উরু) (১২) কাফ্ (গুলতি) (১৩) এংকল্ (গুল্‌ফ)।



৯ (ক)

Fig I

ডাম্বল হাতে ক'রে ১ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। শরীর সোজা রাখ এবং হাত শরীরের সহিত সংলগ্ন কর।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে কনুই ভেঙ্গে ডান হাত তোল এবং ১ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত নামাও ও ১ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। এইবার বাঁ হাত পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্বাস নিয়ে তোল এবং পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামাও। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একবার ডান হাত আর একবার বাঁ হাত তোল ও নামাও।

এইরূপ ১০বার করলে বাইসেপ্ বা হাতের গুলির আকার বৃদ্ধি পাবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে।



৯ (খ)

Fig II

ডাম্বল হাতে ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। শরীর সোজা রাখ।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে ডান হাতের কনুই ভেঙ্গে হাত মোড় এবং ২ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত সোজা কর এবং ১ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। ঠিক ঐরূপভাবে বাঁ হাতের কনুই ভেঙ্গে বাঁ হাত মোড়। এইরূপে একবার ডান হাতের একবার বাঁ হাতের কনুই ভেঙ্গে হাত মোড়। যখন যে হাত মুড়িতেছ, তখন সেই হাতের দিকে চাও।



১০ (ক)

এইরূপ ১০ বার করলে বাইসেপ বা হাতের গুলির আকার বৃদ্ধি হয়।



১০ (খ)



১১ (ক)



১১ (খ)

Fig III

ডাম্বল হাতে ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে প্রশ্বাস নিয়ে উভয় হাতের কনুই এক সঙ্গে ভেঙ্গে এক-সঙ্গে উভয় হাত মোড় এবং ৩ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পূর্ব্বের আকার অর্থাৎ ২ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপ ১০ বার করলে বাই-সেপের আকার বৃদ্ধি হবে।

Fig IV

ডাম্বল হাতে ক'রে হাত বুকের উপর রাখ এবং ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে ডান হাত প্রসারিত ক'রে দাও এবং ৪ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। এই স্থানে লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে (tricep) ট্রাইসেপে জোর পড়ে। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত মুড়ে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইবার পূর্ব্বের ন্যায় বাঁ হাত প্রসারিত কর ও পরে মোড়।

• এইরূপ ১০ বার করলে ট্রাইসেপের আকার বৃদ্ধি হবে।

Fig V

ডাম্বল হাতে ক'রে ৫ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। হাত দেহের সহিত সংলগ্ন রাখ।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে ডান হাত তোল এবং ৫ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত



১২ (ক)

নামাও এবং ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। এইবার পূর্ব্বের ন্যায় বাঁ হাত তোল ও পরে নামাও।

এইরূপে প্রতি হাত ১০ বার ক'রে তুল্লে ও নামালে Forearm বা পুরবাহুর আকার বৃদ্ধি হবে।

Fig VI

ডাম্বল হাতে ক'রে ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে ডান-হাত তোল এবং ৬ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত নামাও এবং ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। এইবার পূর্ব্বের ন্যায় বাঁ হাত তোল এবং পরে নামাও।

এইরূপে প্রতি হাত ১০ বার ক'রে তুল্লে ও নামালে ডেলট্যেডের (Deltoid) আকার বৃদ্ধি হবে।

Fig VII

ডাম্বল নিয়ে হাত তুলে ৭ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। যাতে হাত ভূমির সহিত Parallel থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখ।



১২ (খ)

পরে প্রশ্বাস নিয়ে শরীরের উপরিভাগ (কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত) বা দিকে বাঁকাও এবং ৭ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। এই অবস্থায় যাতে হাত ভূমির সহিত Perpendicular থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখ। পরে পূর্ব্বের আকার অর্থাৎ ৭ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় শরীর ডান দিকে বাঁকাও।

এইরূপ ভাবে ২০ বার উভয়দিকে বাঁকালে ওয়েষ্ট বা কোমর সরু হবে। এবং মেরুদণ্ড শক্ত হবে।

Fig VIII

ডাম্বল হাতে ক'রে হাত সামনের দিকে তুলে ৮ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে উভয় বাহু প্রসারিত কর এবং ৮ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পূর্ব্বের আকার ধারণ কর।

এইরূপ প্রতিদিন ১০ বার করলে Heart ও Lungs-এর শক্তি বৃদ্ধি হবে :



১২ (গ)

Fig IX

এই বার খালি হাতে সোজা হ'য়ে শোও। পরে প্রশ্বাস নিয়ে ডান পা দেহের সহিত Perpendicular কর এবং ৯ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা নামাও। তার পর বাঁ পা পূর্ব্বের ন্যায় তোল এবং দেহের সহিত Perpendicular কর। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১৫ বার কর।

Fig X

ডন্—মেঝের উপর উপুড় হ'য়ে ১০ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে সোজা নীচে নাম ও এবং ১০ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে পূর্ব্বের আকার অর্থাৎ ১০ (ক) ছবির আকার ধারণ



১৩ (ক)

কর। নামিবার সময় যাতে দেহ মাটী না স্পর্শ করে, সে দিকে নজর রাখতে হবে।

এই ডনে দেহের উপরকার প্রায় সমস্ত অংশের ব্যায়াম হয়।

Fig XI

বৈঠক—কোন একটা কিছু ধ'রে (যেমন চেয়ার, ঘরের কপাট ইত্যাদি) পায়ের গোড়ালী তুলে ১১ (ক) ছবির মত সোজা হয়ে দাঁড়াও।

পরে প্রশ্বাস নিয়ে বস এবং ১১ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। বসবার সময় গোড়ালী নাবিয়ে দাও। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে উঠে দাঁড়াও এবং ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ কর।

এইরূপ প্রত্যহ ২০।২৫ বার করলে Thigh ও Calf muscleএর আকার বৃদ্ধি হবে।

Fig XII

১২ (ক) ছবির মত দাঁড়াও। পরে প্রশ্বাস নিয়ে মাথা উপর দিকে তোল এবং ১২ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। এইরূপ ভাবে ২ সেকেণ্ড থাকবার পর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাথা নীচের দিকে নামাও এবং ১২ (গ) ছবির আকার ধারণ কর। এইরূপ ভাবে ২ সেকেণ্ড থাকার পর প্রশ্বাস নিয়ে আবার মাথা তোল এবং ১২ (খ) ছবির আকার ধারণ কর। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫ বার করবার পর ১২ (ক) ছবির আকার ধারণ কর এবং ২ মিনিট বিশ্রাম কর।

Fig XIII

বিশ্রামের পর প্রশ্বাস নিয়ে মাথা বাঁ দিকে বাঁকাও এবং ১৩ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। পরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ কর। ২ সেকেণ্ড এইরূপ অবস্থায় থাকবার পর প্রশ্বাস নিয়ে মাথা ডান দিকে বাঁকাও। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫ বার একবার ডান দিক আর একবার বাঁ দিকে মাথা বাঁকাও। ১২ এবং ১৩র figure করলে ঘাড়ের জোর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহের সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়।

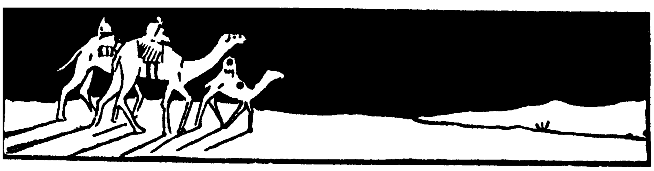
এই প্রবন্ধের ব্যায়ামপ্রদর্শনকারিণীর নাম কুমারী মীরা ব্যানার্জ্জী—বয়স ১৩ বৎসর। বালিকা লেখকের ছাত্রী। নিজ গৃহে বিদ্যা অভ্যাস ও ব্যায়াম চর্চ্চা করেন। অনেকের মতে কোন বিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে না গেলে বিদ্যা বা ব্যায়াম চর্চ্চা করা যায় না—এটা যে ভুল তার ইনি জ্বলন্ত উদাহরণ। উপরন্তু কুমারী মীরা গৃহস্থের কন্যা। সাংসারিক কাজকর্ম্ম সমস্ত করেন। ইনি লাঠি ও ছুরি খেলিতে পারেন। ইহা ছাড়া শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা ইনি এত শক্তিশালিনী হয়েছেন যে অনায়াসে লৌহ-দণ্ড বক্র করতে পারেন। কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে শারীরিক



কুমারী মীরা ব্যানার্জ্জি লৌহের পাত বক্র করিতেছেন

ব্যায়াম কৌশলের ক্রীড়া দেখিয়ে প্রভূত যশ এবং কয়েকটি পদক লাভ করেছেন। এই বালিকা নবীন বাংলার রমণীদের আদর্শ।

[এই প্রবন্ধের সমস্ত ছবি তুলেছেন লেখকের বন্ধু শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র গুপ্ত।]



পান্থনিবাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

তেরো নম্বর মেস।

ওই বলিলেই হইবে। ও-পাড়ার যে-কোনো লোক আঙুল দিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে মেসটা দেখাইয়া দিবে। রাস্তার নাম বলিবার দরকার নাই। পাড়ায় আরও দুটা মেস আছে বটে, কিন্তু সেগুলি নূতন হইয়াছে। এটি বহু কালের মেস,—আদি ও অকৃত্রিম। যে কালে এই মেসটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে কালে শুধু এ পাড়ায় নয় সমস্ত কলিকাতা সহরেই মেসের সংখ্যা আঙুলে গোণা যাইত।

এই মেসের প্রথম অধিবাসীদের কেহই বোধ হয় এখন আর জীবিত নাই। থাকিবার কথাও নয়। তার পরে কত লোক আসিয়াছে, কত লোক গিয়াছে; কিন্তু অতি-বৃদ্ধ মেসটি তাহার জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে,—সেই তেরো নম্বর মেস।

আর আছেন দাদু। নাম নরহরি তালুকদার,—কিন্তু সে নাম অনেকেই জানে না। সবাই বলে দাদু,—মেসের ঠাকুর, চাকর হইতে বাবুরা পর্য্যন্ত। পঁয়ত্রিশ বৎসর এই একটা মেসের একই ঘরে তিনি কাটাইতেছেন। বয়স হইয়াছে বলিয়া মধ্যে কিছুদিন মেস ছাড়িয়া দিয়া পল্লীগৃহে জীবনের শেষ কয়টা দিন নিশ্চিন্তভাবে কাটাইবার ইচ্ছায় গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু থাকিতে পারেন নাই। দুইটি মাস যাইতে না যাইতে তিনি আবার তাঁহার বাক্স-বিছানা লইয়া উপস্থিত হন। আর যান নাই।

ভদ্রলোক একটা দেশী ঔষধের দোকানে চাকরী করেন। কি করিয়া করেন ভগবান জানেন। বোধ হয় অভ্যাসের গুণে। নহিলে সকালে আটটা হইতে এগারোটা এবং বিকালে দুটা হইতে আটটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিবার শক্তি তাঁহার বয়সে সাধারণ বাঙালীর থাকে না। অথচ নিতান্তই পেটের দায়ে বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে তাহাও নয়। স্ত্রী বহু কাল পূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ছেলেপুলে নাই। দেশে যেটুকু জমি জায়গা আছে তাহাতে তাঁহার বাকী জীবন নিশ্চিন্ত ভাবেই চলিতে পারে। কিন্তু অবসর গ্রহণের কোনো সঙ্কল্প তাঁহার মনে আছে বলিয়া মনে হয় না।

মেসের ছেলেরা মাঝে-মাঝে তাঁহাকে প্রশ্নও করে:

—আর কেন দাদু? বুড়ো বয়সে মেসের ডাঁটা চচ্চড়ি আর ভাত! ভালোও লাগে?

প্রায়ই দাদু উত্তর দেন না। বিরলকেশ শীর্ণ মাথাটি সুমুখের দিকে ঝুঁকাইয়া শুধু বলেন,—হুঁ। এইবার যাব।

কেবল যেদিন মনটা ভালো থাকে না, সেদিন বিরক্ত ভাবে বলেন,—যাব কি হে! আমার ভাইপোটি সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত যে কাণ্ড আরম্ভ করেছেন, তাতে আর যেতে ভরসা হয় না। তিন শামুক ধান, তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে দিনরাত্তির কুরুক্ষেত্র! বাড়ীতে তিষ্ঠনো দায়!

হয় তো তাই। চাকুরীজীবী শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধের এত গোলমাল ভালো না লাগিবারই কথা। কিন্তু ছেলের দল সে কথা মানিতে চায় না। তাহাদের কেহ বা চাকুরী করে, কেহ বা চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহারা চাকুরী করে তাহাদেরও আয় এত সামান্য যে বাসা করা চলে না। বৃদ্ধের এ কৈফিয়ৎ তাহারা মানিবে কেন? স্ত্রী ছাড়িয়া যাহারা বিদেশে চাকুরী করিতে আসে তাহাদের কাছে দেশের কুঁড়ে ঘরখানির মতো আর কিছুই নয়।

ইহারা তেতালার কয়খানি ঘর জুড়িয়া হাসিতে গানে গল্পে সরগরম করিয়া থাকে। দোতালায় থাকে কয়েকজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। ইহাদের তালায় সাড়া শব্দ কম। আর একতলায় একখানি ছোট ঘরে থাকেন দাদু,—তামাক খান আর দাবা খেলেন।

এই মেস। কয়টি প্রবাসী প্রাণী সমস্ত দিন অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় হুড়াহুড়ি করিয়া বেড়ায়; আর রাত্রে ক্লান্ত মনে, শ্রান্ত দেহে এখানে আসিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা হাসে, চীৎকার করে, গানও গায়। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে যাহারা ক্ষত-বিক্ষত, তাহাদের জীবনে এমন অসম্ভব যে কি করিয়া সম্ভব হয়, তাহা মানব মনের অগোচর। তবু তাই হয়।

সেদিন রবিবার। বেলা সাড়ে আটটার বেশী নয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালের বেলা, ইহারই মধ্যে রোদ চন্‌চন্‌ করিতেছে। ভাগ্য ভালো বলিতে হইবে, এই মেসটি এমন চমৎকারভাবে তৈরি করা হইয়াছে যে, বাহির হইতে কোনো দিক দিয়া সূর্য্যালোক প্রবেশ করিবার উপায় নাই। এ বাড়ীটির ভিতর হইতে বুঝিবার উপায় নাই যে, বাহিরের মাটি তাতিয়া আগুন হইয়াছে, কিম্বা বেলা কত।

নীচে কলতলায় জন চারেক যুবক গামছা পরিয়া মহাসমারোহে কাপড়ে সাবান দিতেছে, আর তাহারই তালে-তালে গানের নামে বিকট চীৎকার করিতেছে। সপ্তাহে এই একটি দিন ছুটি। কাপড়-জামা পরিষ্কার করার সুযোগ অন্য দিন মেলে না।

পাশে দাঁড়াইয়া আরও কয়েকজন বাবু তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতেছে। ডান হাতে সাবান ও বাঁ হাতে কতকগুলা কাপড়-চোপড় লইয়া তাহারা অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে। ঊর্দ্ধোত্থিত বাম হাতটি ব্যথা করিতেছে, তবু চলিয়া যাইতে পারিতেছে না, পাছে অপর কেহ জায়গা দখল করিয়া লয়।

দোতালার বারান্দায় অবিনাশবাবু ও মুখুয্যে দুই প্রবীণ ব্যক্তিতে মিলিয়া মেসের শুভাশুভ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতেছেন। আর মাঝে-মাঝে নীচে চাহিয়া ছেলেদের কাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেছেন। অবিনাশবাবু কি একটা মার্চ্চেণ্ট আফিসের বড় বাবু। লম্বা-চওড়া, নাদুস-নুদুস চেহারা। গোঁফে পাক ধরিতে সুরু করিয়াছে। দরাজ গলা, আস্তে আস্তে কথা বলেন।

অবিনাশবাবু উপর হইতে হাঁকিলেন—ওহে, একটু জল রেখো। শুধু তোমাদের কাপড় কাচলেই তো হবে না। আমাদেরও নাইতে হবে।

ও-দলের কাপড় কাচা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। গানও মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। তবু তাহাদের সাড়া দিবার সময় নাই। কেবল শীর্ণদেহ উমেশ,—বেচারার সঙ্গীতস্পৃহা কম—মিহি কণ্ঠে সাড়া দিল,—আজ্ঞে, তা থাকবে।

আশ্বস্ত হইয়া অবিনাশবাবু আবার মুখুয্যের সহিত গল্পে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ছেলে আসিয়া নমস্কারান্তে প্রশ্ন করিল,—দেখুন, আপনাদের এখানে সীট্‌ খালি আছে?

মুখুয্যে এবং অবিনাশ দুজনেই তাহার পানে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন।

চাহিয়া দেখিবার মতো চেহারা বটে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে দেহ, দেখিলেই মনে হয় বেশ চট্‌পটে। ললাটে ও চোখে বুদ্ধির ছাপ জ্বলজ্বল করিতেছে।

অবিনাশবাবু বলিতে যাইতেছিলেন, হ্যাঁ, সীট্‌ আছে। কিন্তু মুখুয্যে অত্যন্ত সাবধানী লোক। তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিতে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ছেলেটি সবিনয়ে জানাইল,—এইখান থেকেই। থাকতাম ছেষট্টি নম্বর মেসে। কিন্তু আসছে মাস থেকে উঠে যাচ্ছে। শুনলাম এখানে সীট্‌ আছে। তাই এলাম একবার খবর নিতে। এই দিকে থাকলেই আমার সুবিধা হয় কি না।

—আপনার দেশ কোথায়?

—নদীয়া জেলায়।

মুখুয্যে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করা হয়?

—আজ্ঞে, করা বিশেষ কিছুই হয় না। গোটা দুই ট্যুইশান আছে। সকালে-সন্ধ্যেয় তাই করি। আর দুপুরে চাকরীর চেষ্টায় একটু ঘোরাঘুরি করি।

মুখুয্যে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—যা দিন কাল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। দেখি কি হয়।

অবিনাশ কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কতদূর পড়া হয়েছিল?

—আজ্ঞে, বি-এ পাশ করে আর পড়্‌বার সুবিধা হ'ল না। স্কলারশিপের টাকাতেই পড়াটা হচ্ছিল কি না।

মুখুয্যে এবং অবিনাশ দুজনেই সমস্বরে এবং সবিস্ময়ে বলিলেন,—হুঁ?

ছেলেটি বলিতে লাগিল,—কিন্তু নিজের পড়ার খরচ আর এই কটা বছর চালিয়ে নেওয়া হয় তো কষ্টকর হ'ত না। কিন্তু এইবারে বাড়ীতে কিছু সাহায্য না করলে আর চলছে না। তারা বড় কষ্টে আছে। ছোট ছোট অনেকগুলি ভাই। তাদের পড়াশুনো আছে। বোনটিরও

বিয়ের বয়স ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তাই ভেবে-চিন্তে দেখলাম···

ছেলেটির বিদ্যা-বুদ্ধির কথা শুনিয়া মুখুয্যের মন নরম হইয়া গেল। মিষ্টি কণ্ঠে কহিলেন,—এত কথা জিগ্যেস করলাম ব'লে মনে কিছু করবেন না। দেখছেন তো দিন-কাল। কি বল হে অবিনাশবাবু! এখন আর সীট্ চাই বললেই সীট্ দেওয়ার উপায় নেই। একটু খবরাখবর নিতে হয়। না কি বল অবিনাশ!

অবিনাশ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, এবং কহিলেন,—মুখুয্যে, তোমার ঘরের সীট্‌টাই তো দিতে পার। ওটা তো খালিই আছে।

মুখুয্যের মুখে ঈষৎ বিরক্তির ছায়া পড়িল। তাঁহার ঘরে দু'খানি সীট্। একটি তিনি দখল করেন, আর একটি খালি। ফলে সমস্ত ঘরটিই একা তাঁহার দখলে। অথচ ভাড়া দিতে হয় একটি সীটেরই। মেসে এ বড় কম সুবিধা নয়।

তিনি বলিলেন,—না, না, ছেলে মানুষ। ওঁকে তেতালায় পাঠাও। এখানে ওঁরই সুবিধে হবে না।

—তেতালায় সীট্ কই?

তাও বটে। এ ব্যাপারে মুখুয্যের আর 'না' বলিবার উপায় রহিল না। মেসে সীট্ খালি থাকার অর্থ সেই সীটের ভাড়া সকল বাবুদের ভাগ করিয়া লইতে হয়। লোক আসিলেও তাহাকে সীট দেওয়া হয় নাই এ খবরটা বাবুদের কর্ণগোচর হইলে তাহারা মুখুয্যেকে ছিঁড়িয়া খাইবে। অথচ সমস্ত ঘরটি একলা লইয়া ব্যয়-বাহুল্য করিবার পাত্রও মুখুয্যে নন।

তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে হইল,—তবে তাই হোক।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—এ মেসে খরচ কত পড়ে?

মুখুয্যে বিরক্তভাবে বলিলেন,—তা কি ঠিক আছে মশাই। এ তো আর বোর্ডিং নয়। মেসে থেকেছেন বলছেন, অথচ এটা জানেন না?

এ উত্তরের পরেও ছেলেটি সবিনয়েই বলিল,—তবু? আন্দাজ?

—আন্দাজ পনেরোর কম নয়, কুড়ির বেশী নয়।

অবিনাশ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—না, না, মুখুয্যে, কুড়ি পড়ে না। পনেরো, বড় জোর ষোলো। আমরাও তো ছাপোষা-মানুষ।

অবিনাশ গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন।

মুখুয্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—না, না, অবিনাশ। এ আইনের কথা। পড়ুক যাই কিছু, মোট কথা কিছু ঠিক নেই। কুড়ি পড়লেও 'না' বলতে পারবেন না।

ছেলেটি একটু বিব্রতভাবে বলিল,—কুড়ি!

মুখুয্যে তেমনি ভাবে বলিলেন,—তা পড়তে পারে।

অবিনাশ ছেলেটির কাছে আসিয়া সস্নেহ কণ্ঠে কহিলেন,—না, না, আজকালকার সস্তার বাজারে ষোলোর বেশী কখনও পড়ে না। আপনার কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন। তাছাড়া আপনি ভালো ছেলে, এর মধ্যে চাকরী একটা হবেই। কেন ভয় পাচ্ছেন?

ছেলেটি নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—আচ্ছা, তা হ'লে তাই হবে। পরশু পয়লা, আমি সকালেই আসব।

অবিনাশ তাহাকে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া বলিলেন,—তাই আসবেন।

বলিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া মুখুয্যের পাশে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মুখুয্যে হঠাৎ রেলিঙের বাহিরে গলা বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া বলিলেন,—শুনছেন? ও মশাই!

ছেলেটি তখন একতালায়। ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—আমাকে ডাকছেন?

মুখুয্যে বলিল,—আজ্ঞে হাঁ। তাহ'লে পরশু আসছেন ঠিক তো?

—তাই তো ব'লেই গেলাম।

—তাহ'লে কালকে কিছু অগ্রিম দিয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে যদি কেউ এসে অগ্রিম দিয়ে যায় তাহ'লে কিন্তু সীট্ হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। বুঝলেন না?

ছেলেটি এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। তার পরে বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে।

—আর শুনুন।

ছেলেটি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—আপনার নামটি ?

—শ্রীতপনকুমার অধিকারী।

২

মঙ্গলবার সকালেই তপন তাহার অতি সামান্য আসবাব-পত্র লইয়া উপস্থিত। একটা বিছানা, একটা ষ্টীলের বাক্স, আর একখানা আমকাঠের চৌকি।

মুখুয্যে চৌকি দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, ছারপোকা আছে তো ?

তপন মাথা চুলকাইয়া বলিল,—তা··

—বুঝতে পেরেছি। ওটা বাইরেই রাখুন। একটু পরে চাকর দিয়ে ছাদে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন ?

তথাস্তু। তপন সেখানাকে বাহিরেই রাখিয়া দিল। তার পরে মুস্কিল বাধিল ঘর লইয়া। এ ঘরে আর কেহ আসিবে না সিদ্ধান্ত করিয়া মুখুয্যে নির্ভাবনায় সমস্ত ঘরটি জুড়িয়া আসবাবপত্র সাজাইয়া বসিয়া ছিলেন। এখন সেগুলি সরাইতে হইবে। সরানো অবশ্য যায়, কিন্তু ঘরে আর জায়গা নাই। মুখুয্যের বিছানাপত্র আছে, গোটা দুই বাক্স আছে। গোটা দুই শেল্‌ফ্‌ আছে, তাহাতে দাঁতের মাজন, মাখিবার তেল, জুতার কালি ও বুরুষ এবং আরও বিবিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থাকে। আর আছে দেওয়াল জুড়িয়া হরেক রকমের সচিত্র দেওয়ালপঞ্জী। কিন্তু সেগুলাকে লইয়া অসুবিধা নাই। সম্প্রতি নিলামে মুখুয্যে একটা টিপয় আর একটা র‍্যাক কিনিয়াছেন। সে দুটিকে বাহিরেও রাখিতে সাহস হয় না। অথচ বুকে করিয়া না শুইলেও তপনের শোয়ার স্থান হয় না।

তপন ঘরখানির চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে জোড়া দুই জুতা বাদুড়ের মতো ঝুলিতেছে। এক কোণে মস্ত বড় একটা টবের প্যাকিং কেসের মধ্যে মুখুয্যের তামাক, টিকা, হুঁকা ও কলিকা সযত্নে রক্ষিত। মাথার উপর কড়িকাঠে একটা লেপই বোধ করি মেঝের সহিত সমান্তরালভাবে ঝুলিতেছে।

দেখিয়া তপনের চোখের পলক আর পড়ে না।

মুখুয্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ মাথা চুলকাইলেন। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, ও এখন ওই রকমই থাক্। ফিরে এসে সব ঠিক হবে এখন। রবিবারে তো এলেন না! আজকে এখন আফিসের তাড়া। কোথায় কি করি বলুন তো ?

কিছুই করা গেল না। মুখুয্যে যথাসময়ে আপিস চলিয়া গেলেন। আর তপনও আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আফিস-অঞ্চলে দৈনন্দিন টহল দিতে বাহির হইল। ফিরিল পাঁচটার পর।

মুখুয্যে ঘরের তালার দ্বিতীয় চাবিটি দিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই সাহায্যে দ্বার খুলিয়া তপন মেঝের উপরই পা ছড়াইয়া বসিল। একটু পরেই তাহার নজরে পড়িল ওদিকের বারান্দা ঘুরিয়া একটি অতি শীর্ণ, দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক তাহারই ঘরের সুমুখ দিয়া আসিতেছে। এক একটা ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া দেখা যায় প্রকাণ্ড বড় চেহারা, দেখিলে মনে হয় ওয়েলারের সগোত্রীয়। কিন্তু হাড়গোড় বাহির করা এবং চলেও ঢিমা তালে। এই ভদ্রলোকও তেমনি। রৌদ্রে পুড়িয়া মুখ কালো হইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি আকাশের দিকে, পা যে কোথায় পড়িতে কোথায় পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই। আপনার মনে শিশির ভাদুড়ির অনুকরণে বলিতে বলিতে আসিতেছে :

"প্রজানুরঞ্জন! প্রজানুরঞ্জন!
প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে দিছি
বিসর্জ্জন·"

তপন সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিল। এতক্ষণে ভদ্রলোকের দৃষ্টি খলোক হইতে ভূলোকে ফিরিয়া আসিল। একবার তাহার পানে অপাঙ্গে চাহিয়াই সুর নামাইয়া ফেলিল।

— এই যে, কতক্ষণ এলেন ?

—সকালেই।

—সকালেই ? বেশ, বেশ।

ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়া তেতালায় চলিয়া গেল। তপন ঘরে বসিয়া শুনিতে লাগিল,—প্রজানুরঞ্জন, প্রজানুরঞ্জন

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইতে তপনের বেশী ক্ষণ লাগিল না। বিকালে ছাদের উপর দুজনে বেশ গল্প জমিয়া গেল।

ভদ্রলোক ঠিক নয়। দেখিলে মনে হয় বয়স ত্রিশের

ওঁধারে। কিন্তু সে কতকটা তাহার দীর্ঘ দেহের জন্য, কতকটা শীর্ণ মুখের উপর পরিপুষ্ট গোঁফের জন্য। আসলে সে তপনেরই সমবয়সী, কিম্বা দুই এক বৎসরের বড়। নামটি বিলাস, কিন্তু দেহের কোথাও বিলাসের চিহ্নমাত্র নাই। হয় তো মনের মধ্যে আছে, এবং শিশিরবাবুর অনুকরণে বক্তৃতা ও বাদল গোস্বামীর ঢঙে গান হয় তো তাহারই প্রকাশ।

তপন বলিল,—বেশ আছেন মশাই! চাকরী বাকরী করছেন, বাড়ীতে টাকা পাঠাচ্ছেন, আর মেসে ফূর্ত্তি ওড়াচ্ছেন। বেশ আছেন।

বিলাস বেশ থাকার কথা অস্বীকার করিল না। কেবল বাড়ীতে টাকা পাঠাইবার কথায় আপত্তি করিল।

কহিল,—বাড়ী? নাহি মোর গৃহ।

সংবাদটা শুনিয়া তপন দুঃখিত হইল। বেচারীর হয় তো কেহই নাই। মেসেই বারো মাস পড়িয়া থাকে।

সহানুভূতির স্বরে কহিল,—আপনার কি কেউ নেই? আত্মীয়-স্বজন?

বিলাস প্রসারিত দক্ষিণ বাহুর দুইটি অঙ্গুলি আন্দোলিত করিয়া কহিল,—

তা নয়, তা নয়, বন্ধু,
আছে জ্যেষ্ঠ পঞ্চজন,
সবার কনিষ্ঠ আমি।
গৃহ তাহাদের। মোর গৃহ নাই।

তপন হাসিয়া বলিল,—অর্থাৎ আপনি বিয়ে করেন নি। এই না?

বিলাস আবার বক্তৃতা করিয়া বলিল,—

ঠিক তাই। নহি গৃহী, নহি সন্ন্যাসী;
চাকরী থাকে না যবে, দাদারা পাঠান অর্থ।
আমি মেসে বসি; করি তার সদসদ্ ব্যবহার।
আমার শ্রমের অর্থ চান না তাঁহারা।

দেখছেন? কি রকম শক্তি? মুখে মুখে আমি অনর্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে বক্তৃতা করে যেতে পারি। পারেন আপনি? বিয়ে তো পাশ করেছেন অনার্স নিয়ে। আর আমার বিদ্যে জানেন? ম্যাট্রিকুলেশন।

তপন সবিস্ময়ে একবার বিলাসের মুখের দিকে চাহিল। লোকটি পাগল নয় তো? কিন্তু বিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া সে আশ্বস্ত হইল। চশমার অন্তরালে লোকটির বড় বড় দুটি চোখ কৌতুকভরে নাচিতেছে। পাগল নয়। অমনি থিয়েটারী ঢঙে কথা বলাই তাহার আনন্দ।

বিলাস জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু এসে পর্য্যন্ত দেখছি আপনি দিন-রাত্রি মুখ শুকিয়ে থাকেন। কি ব্যাপার কি, বলুন তো? সম্প্রতি বিয়ে-থা করেছেন নাকি?

তপন তাড়াতাড়ি বলিল,—নাঃ, মশাই, বিয়ে করব কি?

—তবে আর কি? একটা গান ধরুন, আমি এই ভাঙা তক্তাপোষটা বাজিয়ে তাল দি। ধরুন!

তপন হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল,—গান ধরব কি মশাই?

—কেন, দোষটা কি?

—না, দোষ কিছুই নয়। আসলে গান আমার আসে না।

বিলাস তক্তাপোষে দুটা চাটি দিয়া বলিল,—ও, আসে না। তাহ'লে আর কি করবেন? দেখুন, আমি যদি বাদল গোঁসায়ের মতো গলা পেতাম, তাহ'লে don't care···don't care! বুঝলেন?

বলিয়া তপনের একেবারে নাকের উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা উঁচু করিয়া ধরিল।

এই ছেলেটিকে তপন যতই দেখিতেছিল ততই মুগ্ধ হইতেছিল। ইহার উদার মন কেবলই আপনাকে সুমুখের দিকে প্রসারিত করিয়া চলে, কোথাও সূক্ষ্ম প্যাঁচ মারে না। দশটা-পাঁচটা আফিস করে। সে কাজে খাটুনিও যথেষ্ট। কত যথেষ্ট তাহা সে আজ বিকালেই তাহার পরিশ্রান্ত বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়াই বুঝিয়াছে। কিন্তু কিছুই যেন অধিকক্ষণ ইহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিতে পারে না।

এই কথাই তপন ভাবিতেছিল। হঠাৎ বিলাস চীৎকার করিয়া উঠিল,—আরে, এই যে ভুবন-দা' আসুন, আসুন।

তপন ভুবনদার স্থান সঙ্কুলানের জন্য একটু সরিয়া বসিল। কিন্তু ভুবনদা তক্তাপোষে বসিলেন না; নীচেই উবু হইয়া বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার কাঁচা পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়া একসঙ্গেই প্রসন্ন হাসি ও তামাকের ধোঁয়া নির্গত হইতে লাগিল।

ভুবনদার বয়স পঁয়তাল্লিশের নীচে নয়। মাথার চুলেও পাক ধরিয়াছে,—গোঁফেও। পাক ধরে নাই শুধু মুখে।

তাহাতে মা-মরা দুষ্টু ছেলের মতো একটু সলজ্জ হাসি লাগিয়াই আছে। কাছেই কি একটা দোকানে কাজ করেন। কিন্তু সেখানে তামাক খাইবার সুবিধা নাই বলিয়া একটু ফাঁক পাইলেই মেসে আসিয়া তামাক খাইয়া যান।

নিজের বয়স সম্বন্ধে তিনি কদাচিৎ সচেতন থাকেন। সেজন্য মেসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গেই তাঁহার ব্যবহার একই রূপ। বিশেষ, সম্প্রতি দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করার পর হইতে তিনি প্রবীণ অপেক্ষা নবীনের দলেই মিশিতেছেন বেশী।

বিলাস হঠাৎ গলা নামাইয়া বলিল,—আপনার একখানা চিঠি এসেছে ভুবনদা। পেয়েছেন?

ভুবনদার গোফের ফাঁকে আবার একটুখানি সলজ্জ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মুখের মধ্যে খানিকটা হুঁকার জল গিয়াছিল। সেটুকু পিচ্ করিয়া পেছনের দিকে ফেলিয়া দিয়া ভুবনদা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—পেয়েছি।

—খবর সব ভালো?

চিন্তিত ভাবে ভুবনদা বলিলেন,—না, ভালো খুব নয় ভাই। তোমার বৌদির পেটের অসুখ করেছে, শালাটি জ্বরে ভুগ্ছে। আবার বিপদের ওপর বিপদ শোনো, একটা নতুন কম্‌লি বাছুর হয়েছিল সেটা হঠাৎ ট্রেনে কেটে মারা গেছে। ওদের সময়টা এবার ভালো যাচ্ছে না। বুঝলে?

বলিয়া বুকপকেটে একবার হাত দিয়া দেখিয়া লইলেন, চিঠিখানা ঠিক আছে কি না।

বিলাস সশ্রদ্ধভাবে কহিল,—চিঠিখানা পকেটেই আছে বুঝি? কই দেখি চিঠিখানা?

এমন চমৎকারভাবে সে চিঠিখানা চাহিল যে ভুবনদার অস্বীকার করিবার কথা মনেই হইল না। তিনি বাঁ হাত দিয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।

বিলাস চিঠিখানা খুলিয়াই দেখিল, ভুবনদা একবিন্দুও অতিরঞ্জিত করেন নাই। সত্যই একখানি দশলাইনের চিঠিতে কেবল ওই কয়টি অতিপ্রয়োজনীয় সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়াই প্রণাম নিবেদন করা হইয়াছে, এবং তার পরেই 'ইতি'।

বিলাস সবিস্ময়ে কহিল,—ক'রেছেন কি ভুবনদা?

ভুবনদা চমকিয়া হাতের হুঁকা নামাইয়া বলিলেন,—কেন? কি হয়েছে?

—এমনি ক'রে কি লোকে চিঠি লেখে?

আশ্বস্ত হইয়া ভুবনদা আবার হাতের হুঁকা তুলিয়া লইলেন।

—আমাদের ওই রকমই চিঠি লেখালেখি। তোমাদের মতো নবীন ছোকরা তো নই।

বিলাস নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—আপনিও নিশ্চয় এমনি চিঠি লেখেন, না ভুবনদা?

এবারে ভুবনদা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল,—আবার কি? বুড়ো বয়সে··হুঁঃ!

বিলাস বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়িয়া বলিল,—কাজটা কিন্তু ভালো করছেন না, ভুবনদা। এ চিঠি রাগের চিঠি।

আশঙ্কায় ভুবনদার মুখ ছোট হইয়া গেল। বলিলেন,—কি রকম?

—সেই রকমই। ভুবনদা, আপনার না হয় দ্বিতীয় পক্ষ, ওঁর তো আর তা নয়। ওঁর সাধ আছে, আহ্লাদ আছে, সবই আছে। না, না. এ ঠিক নয়। আপনি কাল সকালেই আমার ঘরে আসবেন। আমি আছি, এই ইনি আছেন। বি-এ পাশ ইনি, জানেন ভুবনদা? তিনজনে মিলে ভেবে-চিন্তে লেখা যাবে এখন।

ভুবনদা আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন,—পাগল আর কি।

—না, পাগল নয়। তাই করতে হবে। আচ্ছা, ভুবনদা, আপনি কবিতা লিখতে পারেন?

ভুবনদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—কখনও চেষ্টা ক'রে দেখি নি তো।

ভাবটা এই, চেষ্টা করিয়া কোনো দিন তিনি দেখেন নাই বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে নিশ্চয় লিখিতে পারিতেন।

বিলাস হাসি চাপিয়া কহিল,—চেষ্টা করুন। করতে হবে। আজকাল কবিতায় চিঠি লেখাই রেওয়াজ। কি বলেন তপনবাবু? আপনি তো সব সমাজেই মেশেন?

কিন্তু তপন কোনো কথাই বলিল না। সে ভুবনদাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল।　　　(ক্রমশঃ)

আদি দ্বারবতী ও রৈবতক সন্দর্শনে *

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ

জরাসন্ধের ভয়ে কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণ মথুরা পরিত্যাগ করিয়া সৌরাষ্ট্রে যাইয়া দ্বারবতী পুরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়া, মৌষলযুদ্ধে যাদবগণের বিনাশ এবং কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত, নিশ্চিন্তে পরম সুখে বসবাস করিয়াছিলেন। পৌরাণিক ইতিহাসের ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে, রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ কালে, কৃষ্ণ নিজেই এই কাহিনী যুধিষ্ঠিরের নিকট নিম্ন রূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"(অনুবাদ) মগধরাজ জরাসন্ধের দুহিতা সেই রাজীব-লোচনা কংস-ভার্য্যা পতির মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়া যখন পিতার নিকট যাইয়া—"আমার পতিহন্তাকে বিনাশ করুন" বলিয়া পিতাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিল,—হে মহারাজ, তখন আমরা আমাদের পূর্ব্বমন্ত্রণা (অর্থাৎ বলে যে আমরা জরাসন্ধের সহিত শেষ পর্য্যন্ত আঁটিয়া উঠিতে পারিব না, সেই মন্ত্রণা) স্মরণ করিয়া বিমর্ষ হইলাম। আমরা আমাদের অতুল বিভব ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করিয়া লঘু করিয়া পুত্র, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত (মথুরা হইতে) নির্গত হইয়া পলায়ন করিব স্থির করিলাম। এইরূপে আমরা পশ্চিম দিকে চলিয়া রৈবতক পর্ব্বত দ্বারা উপ-শোভিতা রম্যা কুশস্থলী পুরীতে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিলাম। ঐ স্থানে দেবগণের পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য এক যে দুর্গ ছিল তাহার সংস্কার সাধন করিলাম। ঐ দুর্গের আশ্রয়ে স্ত্রীলোকগণও যুদ্ধ করিতে পারে, বৃষ্ণিকুলের মহারথ-গণের তো কথাই নাই! হে শত্রুঘ্ন, আমরা এখন সেই স্থানে নির্ভয়ে বাস করিতেছি। সেই গিরিশ্রেষ্ঠের সংস্থান পর্য্যালোচনা করিয়া এবং মগধরাজের ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি এই চিন্তা করিয়া মাধবগণ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছে। এইরূপে আমরা জরাসন্ধের নিকট হইতে শত্রুতা প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াও গোমন্ত পর্ব্বতের (অর্থাৎ রৈবতকের) আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করিয়াছি। এই পর্ব্বত আয়তনে তিন যোজন, এক এক যোজনের মধ্যে তিনটি করিয়া শিখর এবং যোজনান্তে উহাতে শত সংখ্যক সঙ্কট আছে, বীরগণের বিক্রমই ঐ সঙ্কট রক্ষায় তোরণ স্বরূপ। * * * হে মহারাজ, সেই কালে আমরা জরাসন্ধের ভয়ে এইরূপে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে চলিয়া গিয়াছিলাম।"

সভাপর্ব্বের এই বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যাদবগণ একটি তৈয়ারী সহর এবং দুর্গ পাইয়া অধিকার করিয়াছিলেন। সহরটির নাম ছিল কুশস্থলী বা দ্বারবতী। ইহা রৈবতক পর্ব্বত দ্বারা রক্ষিত ছিল এবং ইহার যে দুর্গ যাদবগণ সংস্কার করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা এত দুর্ভেদ্য ছিল যে স্ত্রীলোকগণও অনায়াসে উহার আশ্রয়ে যুদ্ধ করিতে পারিত।

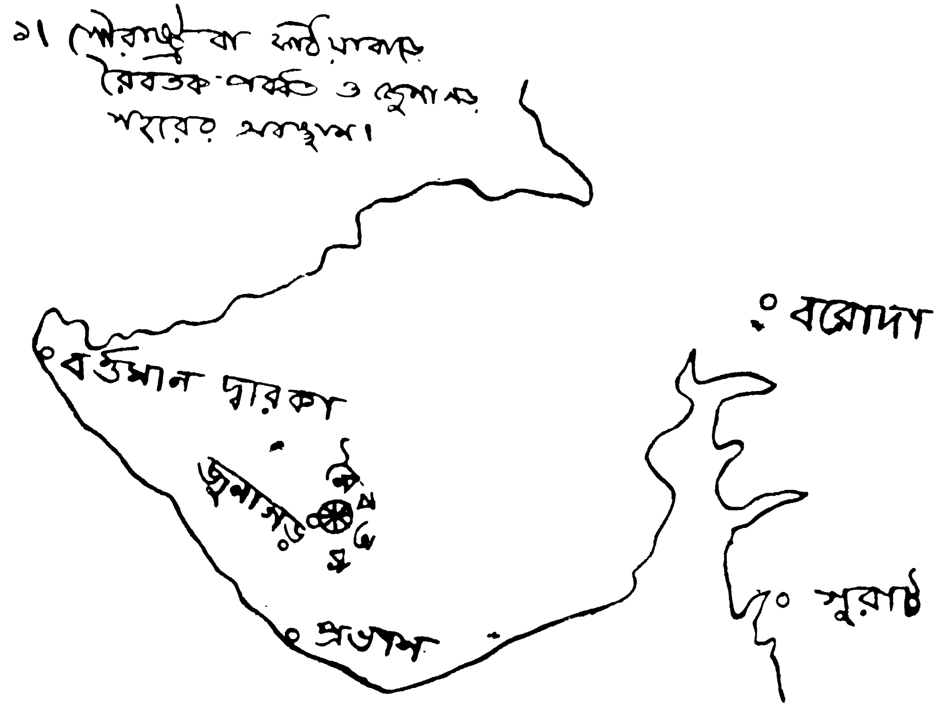
রৈবতক পর্ব্বত দ্বারা রক্ষিত একটি মাত্র সহরের অস্তিত্বের কথাই জানা যায়, তাহা বর্ত্তমান জুনাগড় সহর। উহার দুর্গ সত্যই অদ্ভুত-নির্ম্মাণ এবং অত্যন্ত দুর্ভেদ্য। এই সহরের কে প্রতিষ্ঠা করিল, তাহার খবর বর্ত্তমানে কেহই রাখে না। ইহা জঙ্গলে আবৃত হইয়া পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল—খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দে ইহা দৈবাৎ আবিষ্কৃত হয়, এবং ঐ আমলের হিন্দু রাজা উহাকে পরিষ্কার করাইয়া নিজের রাজধানী করেন। কৌতূহলী পাঠক এই বিষয়ে এই পত্রিকারই ১৩৩৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত মল্লিখিত "ভারতে যাদব বংশ" নামক প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

এই জুনাগড়ের দুর্গের মধ্যে কয়েকখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এই নগরের প্রাচীন নাম গিরিনগর এবং খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া এইখানে প্রবল-প্রতাপ মহাক্ষত্রপগণ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। জুনাগড় দুর্গের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে রৈবতক বা গির্ণার পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে যাইবার রাস্তা আটকাইয়া দুর্গটি নির্ম্মিত। এই রাস্তার ধারে পাশার গুটির মত

* "বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে"—কাহিনীর জের।

আকারের, হাত আটেক উচ্চ, একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের গায়ে অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপি বিদ্যমান। এই পাথরেরই অপর ধারে সৌরাষ্ট্রের শক জাতীয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাসের রাজত্বকালের একটি লিপি বিদ্যমান। এই লিপির তারিখ ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই লিপিতে বড় বিচিত্র এবং ঐতিহাসিক হিসাবে একান্ত আদরণীয় সংবাদ লিখিত আছে। এই লিপি পাঠ করিয়া জানা যায় যে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের আমলে উর্জয়ৎ (রৈবতক বা বর্ত্তমান গির্ণার) পর্ব্বত হইতে নির্গত স্বুবর্ণ-সিকতা এবং পলাশিনী ইত্যাদি নদী-

আমলে উহার বাঁধ দৃঢ়ীকৃত হয়। মৌর্য্য আমলের এই পাকা ব্যবস্থায় ৪০০ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বেশ কাজ চলিয়াছিল। শকক্ষত্রপ রুদ্রদাম যখন উজ্জয়িনী হইতে আসিন্ধুকচ্ছ সমগ্র পশ্চিম-ভারত শাসন করিতেছিলেন, এই সময় পহ্লব জাতীয় কুলৈপ নামক ব্যক্তির পুত্র সুবিশাখ আনর্ত্তও সৌরাষ্ট্রের অর্থাৎ সমগ্র কাঠিয়াবার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রুদ্রদামের রাজত্বে শকাব্দের ৭২ তম বৎসরে (খৃষ্টাব্দের ১৫০ এ) অর্থাৎ তড়াগ প্রতিষ্ঠার ঠিক সাড়ে চারি শত বৎসর পরে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ



সৌরাষ্ট্র বা কাঠিয়াবাড়ে রৈবতক পর্ব্বত ও জুনাগড় সহরের অবস্থান

স্রোতে বাঁধ দিয়া সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা বৈশ্য পুষ্যগুপ্ত গিরিনগর হইতে অদূরে সুদর্শন নামে এক তড়াগ অর্থাৎ বৃহৎ জলাশয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের নাতি মৌর্য্য অশোকের আমলে সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা যবনরাজ তুষাস্ক অতিরিক্ত উপচিত জল যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সরিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য ঐ বাঁধে উপযুক্ত প্রণালী সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই হিসাবে প্রায় ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে সুদর্শন তড়াগের সৃষ্টি হয়.এবং ২৫০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোকের

তারিখে ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হয়, এবং পার্ব্বত্য নদীগুলি দিয়া বিপুল বেগে জল নামিতে আরম্ভ করে। এই ঝড় ও বন্যার বেগে সুদর্শন তড়াগের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় এবং সুদর্শন নিতান্ত দুর্দর্শন হইয়া পড়ে। বাঁধ এতটাই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল যে রুদ্রদামের মন্ত্রীগণ তাঁহাকে বুঝাইলেন, এই বাঁধ পুনর্নির্ম্মাণের চেষ্টা একেবারে অনর্থক। মহারাজ রুদ্রদাম কিন্তু তাহা শুনিলেন না। তিনি বাঁধ ফিরিয়া তৈয়ার করাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কিন্তু এই জন্য দেশের

উপর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিলেন না, এই কাজে জোর করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকে খাটাইলেনও না। নিজের ধনাগার হইতে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া বাঁধটি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষাও শক্ত করিয়া ফিরিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। পহ্লব সুবিশাখের তত্ত্বাবধানে এই পুণ্যকার্য্যটি সুসমাপ্ত হইল। এইরূপে গিরিনগরের অদূরস্থ সুদর্শন তড়াগ ফিরিয়া জীবন পাইল।

এই শিলালিপির প্রস্তরখণ্ডটির পূর্ব্ব ধারে অশোকের চতুর্দ্দশ লিপি। পশ্চিম ধারে রুদ্রদামের লিপি। আবার উত্তর ধারেও আর একটি লিপি আছে। এই লিপিটি গুপ্ত সম্রাট স্কন্দ গুপ্তের আমলের। ইহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে স্কন্দ গুপ্তের শাসনকালে ৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ রুদ্রদামের মেরামতির প্রায় ৩০০ বৎসর পরে, যখন পূর্ণদত্ত সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র চক্রপালিত গিরিনগরের নগরপাল ছিলেন, তখন আবার বিষম ঝড়ে সুদর্শনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায় এবং অবরুদ্ধা বিরহিনী নদীগুলি তাহাদের সাগরভর্ত্তাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে সমুদ্র পানে ধাইতে আরম্ভ করে। প্রকৃতির ভীষণ করাল মূর্ত্তি দেখিয়া রৈবতক যেন ভয় পাইয়া গেল এবং সাগরের বন্ধুত্ব লাভের আশায় তটপুষ্প দ্বারা সুশোভিত নদীময় হস্ত সাগরের দিকে বাড়াইয়া দিল। অবশেষে গিরিনগরের নগরপাল চক্রপালিতের চেষ্টায় এই বাঁধ আবার মেরামত হয়।

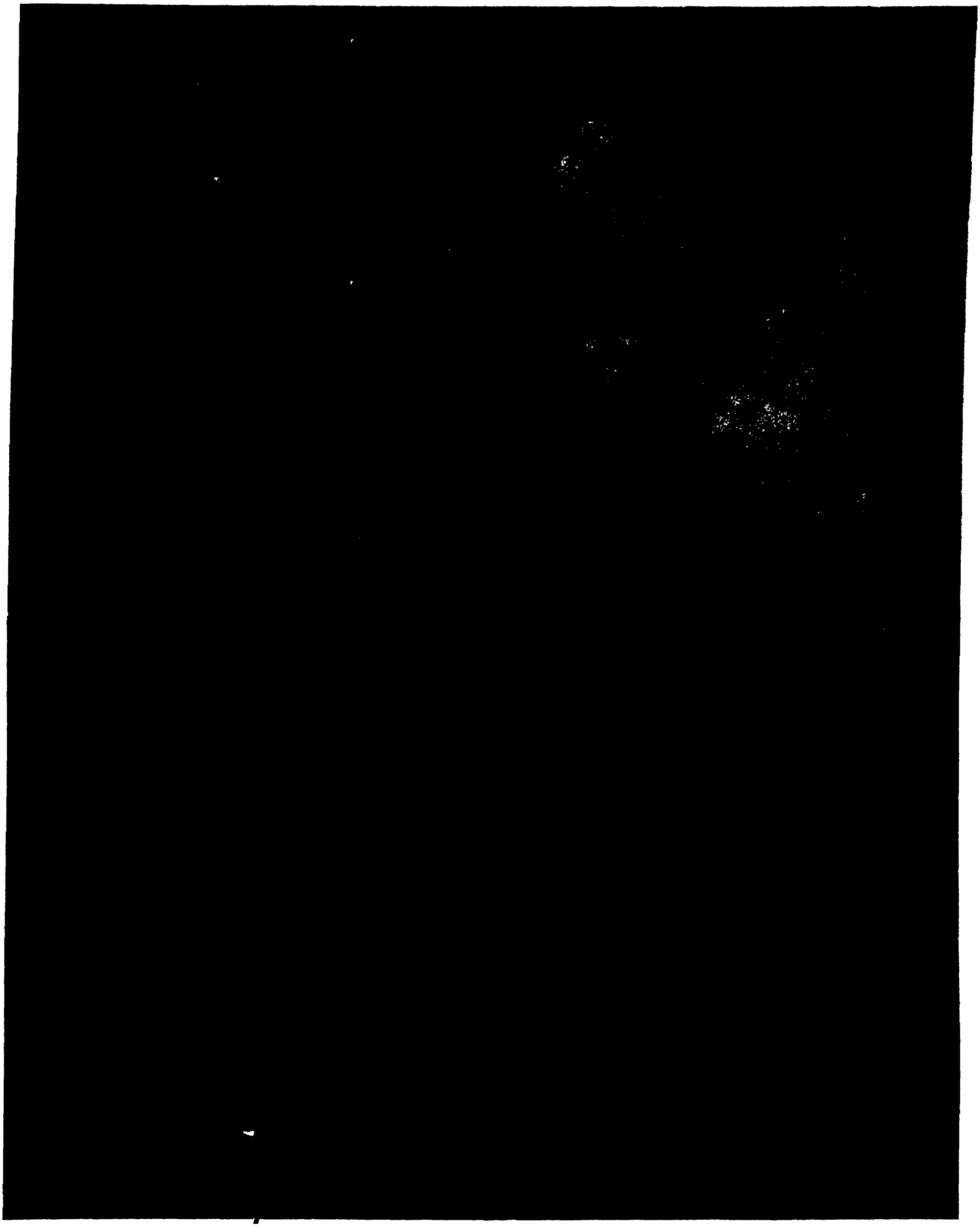
এই সকল অকাট্য প্রমাণ হইতেই বুঝা যাইবে যে এই শিলালিপির নিকটস্থ অধিষ্ঠান গিরিনগর অন্ততঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমল হইতে বিদ্যমান আছে। মহাভারতের যুগে অর্থাৎ প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ঠিক এই স্থানেই সদুর্গ দ্বারবতী নগরী অবস্থিত দেখিতে পাই। ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের গিরিনগর (বর্ত্তমান সদুর্গ জুনাগড়) এবং ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের দ্বারবতী যে এক ও অভিন্ন এই সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

এই সিদ্ধান্ত যদি বিদ্বজ্জন-সমাজে গ্রাহ্য হয়, তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রে একটি নূতন তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মথুরা, গোকুল, ইন্দ্রপ্রস্থ, অযোধ্যা, কাশী, গিরিব্রজ ইত্যাদি মহাভারত-প্রসিদ্ধ স্থানে এমন একটিও ইমারৎ খাড়া নাই, যাহা নিঃসন্দেহে মহাভারতের যুগের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু জুনাগড়ে কৃষ্ণের আমলের দ্বারবতী দুর্গ আজিও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। কাজেই দ্বারবতী দুর্গে এবং উহার আশপাশের স্থানগুলিতে ভাল করিয়া অনুসন্ধান হইলে ঐ আমলের শিলালিপি ইত্যাদির আবিষ্কার অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান জুনাগড় এবং উহার দুর্ভেদ্য দুর্গই যে কৃষ্ণের আমলের দ্বারবতী, বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মিলনে তাহাই আমার প্রবন্ধের প্রমেয় ছিল। সম্মিলন-শেষে একবার কৃষ্ণের আমলের সেই দ্বারবতী নিজ চোখে দেখিয়া যাইব, এই সঙ্কল্প লইয়াই ঢাকা হইতে বাহির হইয়াছিলাম।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩, রবিবার বৈকাল ৫॥ টার ট্রেইনে বরোদা হইতে জুনাগড় রওনা হইলাম, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এইস্থানে পাঠকগণকে মহাভারতীয় কাহিনী মনে করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে রৈবতক পূজা শেষ করিয়া সুভদ্রা যখন দ্বারবতীতে ফিরিতেছিলেন, এমনি সময়ে অর্জ্জুন সুভদ্রা হরণ করিয়াছিলেন। সেই সুভদ্রা হরণ-স্মৃতি রঞ্জিত কৃষ্ণ-বলরামের স্মৃতি পূত রৈবতক-দ্বারবতী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা এতদিনে সফল হইতে চলিল, ইহা ভাবিয়া মনে বড়ই আনন্দ হইতেছিল।

রাত্রি ৮টার পরে গাড়ী যাইয়া আহ্‌মেদাবাদ পৌছিল। দূর হইতে বহু সংখ্যক চিমনি দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল যে আহ্‌মেদাবাদে পৌছিয়াছি। এই আহ্‌মেদাবাদে প্রস্তুত ধুতি ও শাড়ী বাঙ্গালা দেশে আমরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকি। অন্ধকারে ভাল করিয়া কিছু দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু বহু সহস্র বিজলী বাতি সহরখানির গায়ে হীরকের মত জ্বলিতেছিল, সবটা জড়াইয়া বেশ একটা জীবন্ত লক্ষ্মীমন্ত ভাব। আহ্‌মেদাবাদ হইতে ছাড়িয়া গাড়ী শীঘ্রই শাবরমতী নদীর পুলের উপর দিয়া চলিল। সঙ্গীয় এক ভদ্রলোক গাড়ীর জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ আশ্রম কোন্ দিকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলাম, কিছুই দেখা গেল না। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখা গেল মসৃণগাত্রী বৃহৎ অজগর নন্দিনীর মত অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া শাবরমতী অলস মন্থর গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাগরে চলিয়াছে—তাহার সারা গায়ে তারার আলো



শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চৌধুরী
চিত্রাধিকারী— স্যর এইচ, জি ষ্টোন

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রতিফলিত হইয়া মাঝে মাঝে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছে। বালুকাময় দুগ্ধধবল শয্যার দীর্ঘ দুই প্রান্ত আঁধারে রহস্যময় দেখাইতেছে। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইলাম।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় গাড়ী বিরম্‌গামে আসিয়া থামিল। এই বিরম্‌গাম্‌ই কাটিয়াবাড়ে প্রবেশের সদর দরজা। এই স্থানে গাড়ী বদলাইয়া ভেরাওয়ালগামী গাড়ীতে চড়িতে হইল। কাটিয়াবাড়ে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে প্রভাসপত্তন বা সোমনাথ তীর্থের বন্দরের নামই ভেরাওয়াল। ভাগ্যক্রমে এই গাড়ীতে বেঞ্চ খালিই পাইলাম এবং মধ্যের একখানা বেঞ্চের অর্দ্ধাংশ দখল করিয়া বিছানা বিছাইয়া লইলাম। খানিক পরে অপরার্দ্ধে একটি গুজরাটী যুবক আসিয়া তাহার বিছানা বিছাইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী ভরিয়া গেল, কিন্তু আমাদিগকে বিছানা গুটাইতে কেহই বলিল না। পার্শ্বের বেঞ্চে স্থান লইয়াছিল একটি হরিজন জাতীয়া বৃদ্ধা ও তাহার যুবতী নাতিনী। নাতিনীটির কোলে একটি বছর-খানিক বয়সের শিশু। উহাদের সঙ্গে পুরুষ অভিভাবক কাহাকেও দেখিলাম না,—কিন্তু স্ত্রীলোকের এই রকম স্বাধীনভাবে বিচরণ গুজরাট কাটিয়াবাড়ে নিত্যপ্রচলিত প্রথা। নাতিনীটির পরিধানে একটি মলিন ঘাগরা, বক্ষের আবরণ একটি পাতলা কাপড়ের জামা, আনাভি উদর উন্মুক্ত! এক সন্তানের জননী এই অষ্টাদশীর নিটোল যৌবন আমাদের বাঙ্গালা দেশের যে কোন চতুর্দ্দশীর হিংসাস্থল হইতে পারে। পাতলা জামাটিতে সেই যৌবন কিছুমাত্র আবৃত হইতেছিল না, বরং শরচ্চন্দ্রের ভাষায়—সেই "ভীষণ যৌবন-শ্রী" উহাতে প্রকটিততর হইতেছিল মাত্র! যুবতী গাড়ীশুদ্ধ লোকের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া উহা একেবারেই প্রকটিত করিয়া শিশুকে স্তন্যদান আরম্ভ করিল। বৃদ্ধা উহাদের বেঞ্চেই কোন রকমে শুইবার জায়গা করিয়া লইয়া-ছিল। আমার বেঞ্চের অপরার্দ্ধের ভোগদখলকারী গুজরাটী যুবকটি যুবতীর জাগরণ ক্লেশে সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া বারে বারেই বলিতে লাগিল "ওগো বাই, তুমি দুই বেঞ্চের মধ্যে গাড়ীর মেজের উপর শুইয়া পড়।" যুবতী কতক্ষণ বসিয়া বসিয়া ঢুলিল; পরে ক্রোড়স্থ শিশুকে দিদিমার কোলে শোয়াইয়া একখানা মলিন কন্থা জড়াইয়া সত্য সত্যই দুই বেঞ্চের মধ্যস্থ মেঝেতে শুইয়া পড়িল। শেষ রাত্রিতে উহারা এক ষ্টেশনে নামিয়া গেল।

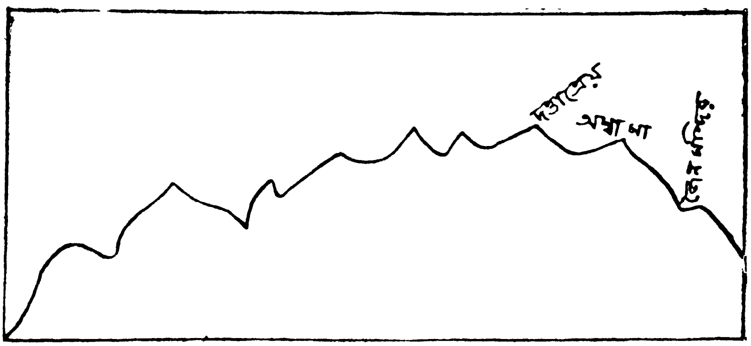
রাজকোটে আসিয়া প্রভাত হইল। রাজকোটের রাজ-বাড়ী হইতে ঘন ঘন তোপের আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম, ইংরেজী নববর্ষ ১৯৩৪কে তোপের আওয়াজ দ্বারা সসম্মান অভ্যর্থনা জানান হইতেছে। রাজকোট একটি বড় জংশন্‌। এই স্থান হইতে সোজা পশ্চিমে কাটিয়াবাড়ের শেষ প্রান্ত দ্বারকা পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। আবার সোজা দক্ষিণে সোমনাথ বা প্রভাসের বন্দর ভেরাওয়াল পর্য্যন্তও রেল লাইন গিয়াছে। রাজকোটে অনেকক্ষণ গাড়ী থামিয়া রহিল,—প্রায় ঘণ্টা খানিক। এক ফেরিওয়ালা ডালিম ফেরি করিয়া বেচিতেছিল। প্রকাণ্ড একটি কাঠের থালার উপর বিবৃত-হৃদয় ডালিমগুলি সজ্জিত। উহাদের লাল-সাদা দানাগুলিতে থালাখানি যেন চুণি-মুক্তায় খচিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। বেশ বড় বড় রসাল ডালিম, এক একটি এক এক আনা মাত্র। লাল টক্‌টকে সুপুষ্ট দানা দেখিয়া একটি কিনিলাম। এত রসাল ও মিষ্টি যে মধ্যে শক্ত বীচি না থাকিলে উহাকে অনায়াসে বেদানা বলিয়া চালান যাইত। এক ফেরিওয়ালা পেঁপে বিক্রি করিতেছিল। পেঁপে অধিকাংশই ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা, এক ফুট লম্বাও দুই একটি আছে। দাম চারি পয়সা হইতে ছয় পয়সা। আর এক ফেরিওয়ালার নিকট দেখিলাম ছোলা আকের টুকরা, ওজন দরে বিক্রয় হইতেছে। আপেল আখরোট, ইত্যাদি ফলও বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু মূল্যে সুলভ নহে। এক ফেরিওয়ালা হলুদ রঙ্গের এক পদার্থ লইয়া খুব চেঁচাইতেছিল "চিঃ হিঃ হিঃ, তাজো মাল।" এই হ্রেষানুকারী ফেরিওয়ালা কি আজব চিজ বেচিতেছে, দেখিতে ভারী ইচ্ছা হইল। কাছে যাইয়া দেখি, উহা এক প্রকার চিঁড়ার পোলাও; চিঁড়াগুলি হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত এবং সম্ভবতঃ বিবিধ মশল্লা সহযোগে ঘৃতপক্ক,—একটার গায়ে আর একটা লাগিয়া পিণ্ডে পরিণত হয় নাই,—বেশ ছাড়া ছাড়া আছে। মধ্যে মধ্যে কাঁচা লঙ্কা গুঁজিয়া চিঁড়ার স্তূপের শোভা বাড়ান হইয়াছে। এই "চিহিহি তাজো মাল" চাখিয়া দেখিবার প্রলোভন খুবই হইয়াছিল, কিন্তু এই বিষম বিদেশে পাকস্থলীকে বিপন্ন করিতে সাহসে কুলাইল না।

রাজকোট হইতে এইবার আমরা সোজা দক্ষিণ দিকে চলিলাম। রাজকোটের পরবর্ত্তী বড় জংশন জিতালসর। এই স্থান হইতে এক রেল লাইন সোজা পশ্চিমে সমুদ্রতীরে পোরবন্দর গিয়াছে। জিতালসর ছাড়াইয়া কতক দূর

দক্ষিণে চলিতেই সহসা সম্মুখে মেঘের মত রৈবতক পর্ব্বত-শিখরগুলি ভাসিয়া উঠিল। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই শিখরগুলি স্পষ্টতর দেখা যাইতে লাগিল। শিখরগুলি দেখা দিবামাত্র আমি আকুল নয়নে উহাদের দিকে চাহিয়াছিলাম, কতকাল পরে যেন ফিরিয়া প্রিয়তম বান্ধবগণের সহিত দেখা হইল! সভাপর্ব্বে কৃষ্ণের প্রদত্ত বিবরণে আছে—

ত্রিযোজনায়তং সদ্ম ত্রিস্কন্ধং যোজনাবধি।
যোজনান্তে শতদ্বারং বীর-বিক্রম তোরণম্॥

"এই সদ্ম অর্থাৎ স্থান তিন যোজন বিস্তৃত, প্রত্যেক যোজনের মধ্যে তিনটি করিয়া শিখর এবং প্রত্যেক যোজনের পরে শতসংখ্যক দ্বার বা সঙ্কট, বীরগণের বিক্রমই যাহাদের তোরণ স্বরূপ।"



উত্তর হইতে গির্ণার পর্ব্বত-মালার শিখরের দৃশ্য

এই হিসাবে রৈবতক পর্ব্বতমালার নয়টি শিখর হওয়া উচিত। ফিরিবার পথে আমি বিশেষ করিয়া শিখরের সংখ্যা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। জুনাগড় সহর রৈবতকের পশ্চিমে উহার পাদদেশে অবস্থিত। গাড়ী হইতে রৈবতক-পর্ব্বতমালার শিখরাংশের রেখা-চিত্র যাহা চোখে পড়ে, তাহা একটুকরা কাগজে আঁকিয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহা যথাদৃষ্ট ঠিক আঁকিতে পারিয়াছি বলিয়া ভরসা করি না, তবে ইহা হইতেই পাঠক-পাঠিকা রৈবতক পর্ব্বতমালার একটা ধারণা পাইবেন। ইহাতে গুটি আটেক শিখর ধরিতে পারিয়াছি, একেবারে পশ্চিমাংশের দাতার পীর শিখরটি এই চিত্রে ধরা পড়ে নাই, উহা অম্বা-মা শিখরে ঢাকা পড়িয়াছে। কাজেই কৃষ্ণের বর্ণনানুযায়ী শিখরের সংখ্যা মোটামোটি নয়টি বলিয়াই বোধ হয়। আমার আকুলতা দেখিয়া গাড়ীস্থ একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"আপ কাঁহাসে আয়া বাবু?"

আমি বলিলাম—"আমি ঢাকা হইতে আসিয়াছি।"

ভদ্রলোক বিস্ময়ে চোখ বড় করিয়া বলিলেন—"ঢাকে বাঙ্গালা?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, ঢাকে বাঙ্গালা।"

"কল্‌কাত্তা কা নজদিক্?"

"হ্যাঁ কল্‌কাত্তা সে তিন শও মাইল পূব তরফ।"

অতদূর হইতে আমি গির্ণার পাহাড় (রৈবতকের বর্ত্তমান নাম) দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া তিনি ভক্তিভরে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া স্বীকার করিলেন যে গির্ণারজি তীর্থের মত তীর্থ বটে। সেই তীর্থে তিনি গিয়াছেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলে সদুঃখে স্বীকার করিলেন যে আজিও তাঁহার ঐ তীর্থরাজ দর্শন হয় নাই।

মধ্যে মধ্যে রৈবতক হইতে বিনির্গত ছোট ছোট নদীর খাত রাস্তায় পড়িতেছিল। উহাদের মধ্য দিয়া অতি ক্ষীণ স্রোতের রেখা বহিয়া যাইতেছিল। স্থানে স্থানে সেই ক্ষীণ জলস্রোত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দহ সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ সকল দহে কিঞ্চিৎ জল জমিয়া আছে। গুর্জ্জর পুরুষ ও রমণীগণ ঐ সকল স্থানে বসিয়া কেহ বা কাকস্নান করিতেছিল,—কেহ আবার কাপড় কাচিতেছিল। রাস্তার দুই ধারে পুকুর একটিও চোখে পড়িল না, মধ্যে মধ্যে ইন্দারা অবশ্য দেখিতে পাইয়াছিলাম।

গাড়ী জুনাগড় সহরের নিকটবর্ত্তী হইল। এইবার রৈবতক শিখরে অম্বা-মার মন্দির এবং তাহার কিছু নিম্নে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত জৈন মন্দিরগুলি দেখা যাইতে লাগিল। সহরের দিকে চাহিয়া দেখি, সহরের প্রস্তর প্রাচীর এবং উহার মধ্যে আবার উপরকোট দুর্গের ভীমাকান্ত উচ্চতর প্রাচীর দোলমঞ্চের দুইটি ক্রমোচ্চ মঞ্চের মত দেখা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী যাইয়া জুনাগড় ষ্টেশনে দাঁড়াইল।

জুনাগড় বর্ত্তমানে একজন মুসলমান নবাবের অধীন করদ রাজ্য। রাজ্যের অধিবাসী শতকরা ১২ জন মাত্র মুসলমান, বাকী সমস্তই হিন্দু ও জৈন। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে প্রভাসপত্তন বা সোমনাথ এবং উহার বন্দর ভেরাওয়াল পর্য্যন্ত এই জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত। জুনাগড়ে একটি কলেজ আছে, একটি সাধারণ পুস্তকাগারও আছে। রাজ্যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং মধ্য ও নিম্ন বিদ্যালয় অনেকগুলি আছে। কাজেই একটা শিক্ষা-বিভাগও আছে। এই শিক্ষা-বিভাগের নিয়ন্তা অথবা ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্শন শ্রীযুক্ত নবাব আলি সাহেব বরোদা প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই, তাই উক্ত সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীমান বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। বোম্বের প্রিন্স্-অব-ওয়েলস্ মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জি ভি আচার্য্যের বাড়ী এই জুনাগড় সহরে। প্রাচ্যবিদ্যা সম্মিলনে তাঁহার সহিত দেখা ছিল। তিনি সদুঃখে বলিয়া ছিলেন—"আপনি আমার সহরে চলিলেন—আমাদের বাড়ীতেই আপনি বেশ উঠিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের পরিবারে আমরা সকলেই চাকুরে, কেহই দেশে থাকি না।"

ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে টাঙ্গাওয়ালারা আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। জৈন ধর্ম্মশালার পাণ্ডাও যাত্রী জুটাইতে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল। দেখিলাম নবাব আলি সাহেব টাঙ্গাওয়ালা-দের সুপরিচিত। তিনি সহরের বাহিরে একটি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকায় থাকেন। তাঁহার এক পুত্র গুরুতর পীড়িত, এই খবরও টাঙ্গাওয়ালার নিকট মিলিল। প্রাচীরবেষ্টিত সহরের পশ্চিম প্রাচীরের নীচের রাস্তা দিয়া সমস্ত সহরটি অতিক্রম করিয়া বামে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে দাতার পীর শিখরের ভীমকান্ত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে নবাব আলি সাহেবের বাঙ্গালায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। বারাণ্ডায় কয়েকটি সুশ্রী ছেলে মেয়ে খেলা করিতেছিল। বিদেশী অভ্যাগতকে দেখিয়া তাহারা তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। বিনয়তোষের পরিচয়পত্র পাঠ করিবামাত্র নবাব আলি সাহেব নামিয়া আসিলেন। প্রশান্ত মূর্ত্তি গৌরবর্ণ পুরুষটি, দেখিয়াই শ্রদ্ধা হয়। বাড়ী শুনিয়াছি লক্ষ্ণৌ। জুনাগড়ে আসিবার পূর্ব্বে বরোদা কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। মুসলমানদের তখন রোজা চলিতেছে, কাজেই মুখখানি একটু ম্লান দেখিলাম। নবযুবক পুত্র কঠিন বাত-জ্বরে শয্যাগত, ম্লানিমার ইহাও এক কারণ হইতে পারে। আমাকে কিন্তু হাসি-মুখেই অভ্যর্থনা করিলেন এবং আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি জানাইলাম, স্নান ও কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে আমি ঐ দিনই উপরকোট দুর্গ পরিদর্শন শেষ করিতে চাই। তিনি হাসিমুখে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিলেন এবং মোটর গাড়ী তৈয়ার করিতে হুকুম দিলেন। এই উপরকোট দুর্গকেই যে আমি কৃষ্ণবর্ণিত দ্বারবতী দুর্গ বলিয়া মনে করি, পাঠকগণকে তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি।

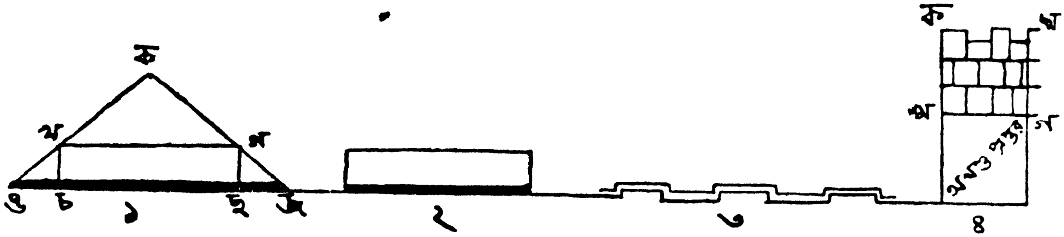
গাড়ীতে নবাব আলি সাহেব এবং তাঁহারই একজন মুসলমান বন্ধু আমার সহিত চলিলেন। জুনাগড় সহরটি পাথরের দেয়ালে ঘেরা। বিভিন্ন দিকে কয়েকটি দ্বার আছে। প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র প্রহরীর পাহারা। আমরা দক্ষিণের দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। প্রহরী নবাব আলি সাহেবকে সামরিক কায়দায় 'সেলুট' করিল। এই রাস্তাটি সেতুযোগে একটি শুষ্ক পার্ব্বত্য নদী বা ছড়ার খাত অতিক্রম করিয়া সহরে ঢুকিয়াছে। ছড়াটি একেবারেই শুষ্ক, বক্ষে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড ছড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর-মুখ হইয়া সহরে ঢুকিতে ডাহিনে দেখা যায়, দাতার পীর শিখর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর, সহরের সমস্ত স্থান হইতেই উপরকোট দুর্গের সু-উচ্চ প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের মোটর দ্রুত উপরকোটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ছোট ছোট বালকেরা মোটর লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতে লাগিল। ইহা হইতেই অনুমান করিলাম, মোটর গাড়ী জুনাগড়ে প্রচুর নহে, উহা এখনও এই সহরের বালকগণের ভয় এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সহরের দক্ষিণাংশেই জনবসতি বেশী,—উপর-কোটের দিকে ক্রমশঃই বসতি কম। উপরকোট তো একেবারেই জনশূন্য।

গাড়ী উপরকোটের নিকটবর্ত্তী হইলে উহার সুদৃঢ় প্রাচীরের গঠন-কৌশল দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। শুধু কথায় বর্ণনা দিয়া উপরকোট সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠকগণের মনে জন্মাইতে পারিব কি-না সেই বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। তবে চেষ্টা করিতে দোষ

নাই। অর্দ্ধ মাইল দৈর্ঘ্যে, সিকি মাইল প্রস্থে খর্ব্বাকৃতি চেপ্টা ও চৌকা একটি বিরাট প্রস্তরময় পাশার গুটি পাঠকগণকে কল্পনা করিতে হইবে। যে পাহাড়টির উপরে উপরকোট দুর্গটি নির্ম্মিত, তাহার আদি আকৃতি নিঃসন্দেহ এই রকমই ছিল। চিত্রে উহার মাথা যে রকম সূক্ষ্মাগ্র করিয়া দেখান হইয়াছে, আদিতে হয়ত মাথা সে রকম সূক্ষ্মাগ্র না হইয়া কূর্ম্ম-পৃষ্ঠাকৃতি ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে কৃষ্ণের বর্ণনা হইতে এবং হরিবংশের ১০ম, ১১শ এবং ১১২শ অধ্যায় হইতে বুঝা যায় যে যাদবগণ যখন দ্বারবতী দুর্গ অধিকার করে, তখন উহা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। হরিবংশ-মতে নিষাদরাজ একলব্য এই দুর্গের নির্ম্মাতা। (হরিবংশ ১১২।২৭—৩০) পরে উহা প্রাংশুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের হস্তগত হয়। বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর ছেলে সর্য্যাতি। সর্য্যাতির ছেলে আনর্ত্ত। আনর্ত্তের নামানুসারে সৌরাষ্ট্র রাজ্য বা রাজ্যাংশ আনর্ত্ত নাম ধারণ করে। আনর্ত্তের পুত্র রেব আনর্ত্ত রাজ্য এবং কুশস্থলী বা দ্বারবতী নগরীর উত্তরাধিকারী হ'ন। রেব-পুত্র রৈবত। তাঁহার নামানুসারে দ্বারবতীর নিকটস্থ গিরি রৈবতক নাম ধারণ করে। রৈবত অত্যন্ত সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। কন্যা রেবতীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। একদা কন্যা রেবতীকে লইয়া তিনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সঙ্গীত শুনিতে গমন করিলেন। এই সুযোগে রাক্ষসেরা আসিয়া রৈবতের পুত্রগণকে দ্বারবতী হইতে তাড়াইয়া দিল এবং তাঁহারা নানা দেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। লুটপাট করিয়া রাক্ষসেরা চলিয়া গেলে দ্বারবতী শূন্য পড়িয়া রহিল। এই সময় কংসের ভয়ে যাদবগণের মথুরা বাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং উপযুক্ত উপনিবেশ-স্থান খুঁজিয়া কৃষ্ণের দূতগণ দেশে দেশে ঘুরিতেছিল। কৃষ্ণানুচর গরুড় যাইয়া খবর দিল যে রাক্ষসগণ দ্বারবতী ছাড়িয়া গিয়াছে এবং দ্বারবতী শূন্য পড়িয়া আছে। তখন যাদবগণ মথুরা হইতে সদলবলে বাহির হইয়া সৌরাষ্ট্রে আসিয়া দ্বারবতী অধিকার করিল। বহুদিন পরে রৈবত, কন্যা রেবতীকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, উহা যাদবদের অধিকারে। তখন তিনি বলরামের সহিত রেবতীর বিবাহ দিয়া তপস্যায় চলিয়া গেলেন।

এই কাহিনীর কতখানি ইতিহাস আর কতখানি উপন্যাস তাহা বলা সহজ নহে। প্রাংশুবংশের তালিকায় গলদ আছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় : মনুর পরেই প্রাংশু হইতে পারে না। রৈবতের ব্রহ্মলোক যাত্রাও উপন্যাস,—সঙ্গীতানুরাগে সম্ভবতঃ তিনি দেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে গিয়াছিলেন। আদৌ দ্বারবতী নিষাদ-প্রতিষ্ঠিত ছিল,—রৈবতের অনুপস্থিতির সুযোগে অনার্য্য রাক্ষসগণ আসিয়া আবার উহা অধিকার করে। অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা মোটামোটি ঐতিহাসিক বলিয়াই বোধ হয়।



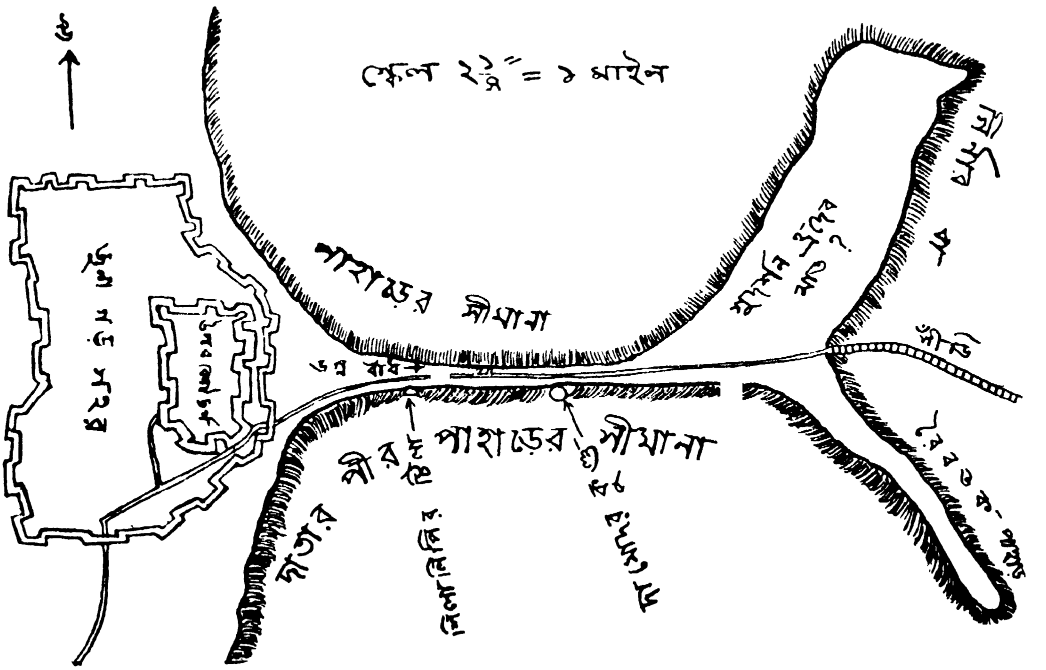
উপরকোট-দুর্গের গঠন-প্রণালী

যাহা হউক, হরিবংশ হইতে এইটুকু আমরা পাই যে কৃষ্ণেরও বহু পূর্ব্বে এই দ্বারবতী দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং যাদবগণ পরিত্যক্ত তৈয়ারী দুর্গই অধিকার করে ও মেরামত করিয়া আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া লয়।

দ্বারবতী দুর্গ প্রতিষ্ঠাতা নিষাদরাজ একলব্য যে দৈত্য জাতীয় ছিলেন, তাঁহার নির্ম্মিত দ্বারবতী দুর্গই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চেপ্টা চৌকা পাশার গুটির মত আকৃতির $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ মাইল একটি পাহাড় কাটিয়া তাহার উপর দ্বারবতী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে উহার পাদদেশের চারিদিক্ হইতে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য) খ—ঙ—চ এবং গ—ছ—জ অংশগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল। পরে ক—খ—গ অংশের যতখানি দরকার উড়াইয়া দিয়া উহাকে

একটি $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ মাইল সমতলপৃষ্ঠ প্রস্তর মঞ্চে পরিণত করা হইয়াছিল। পরে এই বিরাট প্রস্তর-মঞ্চের ধার-গুলিতে দুর্গ-গঠন প্রয়োজনানুরূপ খাঁজ কাটিয়া করা হইয়াছিল। পরে প্রস্তরমঞ্চের চারিধারে ৪নং চিত্রের ক—খ—গ—ঘ-এর ন্যায় পাথরের উপর পাথর সাজাইয়া সুউচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাহির হইতে দেখা যায়, অখণ্ড মসৃণ ধূসরাভ শ্বেতপ্রস্তর আনুমানিক ১০০গজ পর্য্যন্ত ভূতল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার গাত্র একেবারে মসৃণ—বোধ হয় টিকটিকি গিরিগিটিও উহার গা বাহিয়া উঠিতে পারে না। এই অখণ্ডপ্রস্তর যেখানে শেষ

বড়ভূধরে একটা গোটা পাহাড়কেই মন্দিরে পরিণত করিবার কাজ, অথবা কাম্বোজের বিশাল এঙ্কোরভাট মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কাজ ইহা অপেক্ষাও পরিশ্রমসাধ্য। অজন্তায় পাহাড় খুঁড়িয়া ৩০।৩৫টা মস্ত মস্ত গুহা নির্ম্মাণ এবং উহাদের অভ্যন্তরভাগ বিচিত্র চিত্রে বিভূষিত করা; ইলোরায় আস্ত পাহাড় কাটিয়া মন্দির বাহির করা; ইত্যাদি পরম বিস্ময়জনক কার্য্যাবলিও ঐতিহাসিক যুগেরই কার্য্য। যেই যুগের ইতিহাস আমরা পুরাণ-পর্য্যায়ে ফেলিয়া গালগল্পের সামিল করিয়া এতদিন তুচ্ছ করিয়াই আসিয়াছি; সেই যুগে এই অজন্তা—ইলোরা—বড়ভূধর—



মানচিত্র

হইয়াছে তাহার পর হইতে আবার প্রস্তরখণ্ড নির্ম্মিত পুরু দেওয়াল আরও আনুমানিক একশত গজ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কাজেই ভূতল হইতে সমগ্র দেওয়ালের উচ্চতা আনুমানিক দুইশত গজ। মাথার এবং চারিধারের প্রস্তর ছাটিয়া ফেলিয়া একটা আস্ত পাহাড়কে মঞ্চে পরিণত করিতে কি অমানুষিক পরিশ্রম আবশ্যক হইয়াছিল, পাঠকগণ একবার কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন, তবেই নিষাদরাজ একলব্যের প্রতাপ হৃদগত হইবে। জাভায়

এঙ্কোর-ভাটের শিল্পিগণের পূর্ব্বপুরুষ শিল্পিগণ দ্বাববতীতে যে একটা আস্ত পাহাড় কাটিয়া দুর্গ নির্ম্মাণ করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় বিশেষ কিছু নাই।

উপরকোট দুর্গের একটি দ্বার গির্ণার পাহাড়ের দিকে থাকা সম্ভব;—ছিল বলিয়া কোন চিহ্ন আছে কি-না, খোঁজ করিবার অবসর পাই নাই। বর্ত্তমানে উহার একমাত্র প্রবেশদ্বার পশ্চিম দিকে। (মানচিত্র দ্রষ্টব্য) গাড়ী যাইয়া ধীরে ধীরে সেই নাতিবিস্তৃত দ্বারে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ-পথেই একটি ক্ষুদ্র মন্দির, মহাবীর হনুমান প্রহরী হইয়া সেই মন্দিরে থাকিয়া দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সংলগ্ন উচ্চতর স্থানে একজন পীরের মাদারও প্রতিষ্ঠিত।

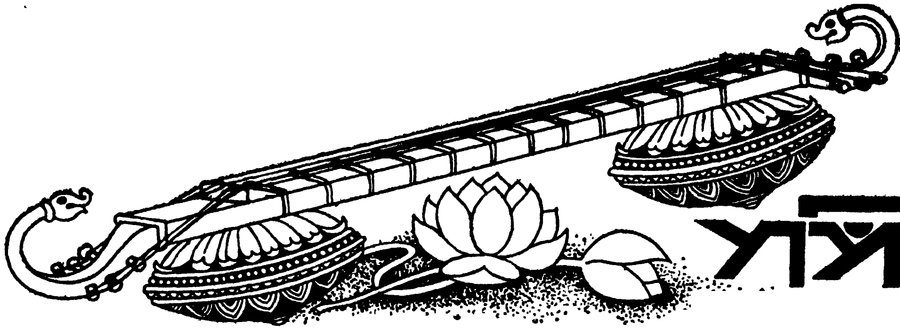
গুপ্ত বংশের শাসনের পরে গুপ্ত সেনাপতি ভটার্ক সৌরাষ্ট্রে স্বাধীন হ'ন এবং বলভীপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৌরাষ্ট্র শাসন করিতে থাকেন। হিউএন সঙ যখন এই প্রদেশে আগমন করেন তখন তিনি বলভীপুরেই রাজধানী দেখিতে পান। রাজধানী এইরূপে বলভীপুরে স্থানান্তরিত হওয়াতে প্রাচীন গিরিনগর আবার পরিত্যক্ত হয় এবং ঘন বনে আবৃত হইয়া পড়ে। ভটার্ক বংশের পতনের পরে দেশময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জুনাগড়ের আট মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে বামনস্থলী নগরকে রাজধানী করিয়া একটি রাজবংশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকে। আনুমানিক ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই বংশীয় রাজা গ্রহরিপু রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত গিরিনগর আবার আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে যে এই কালে দেশ ঘন জঙ্গলে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বামনস্থলী ও গির্ণার পাহাড়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য বন বিরাজ করিত। এই বনের মধ্যে প্রাচীন রাজধানী গিরিনগর লুক্কায়িত এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সিংহের ভয়ে এই ভয়াবহ বনে প্রবেশ করিতেও কেহ সাহস করিত না। একদিন এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতে কাটিতে দৈবাৎ এই প্রাচীন দুর্গের সম্মুখীন হয় এবং এই বিশাল ও পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ পাথরের দুর্গ দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুর্গদ্বারে যাইয়া কাঠুরিয়া দেখে, তথায় একজন সন্ন্যাসী ধ্যানে বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে কাঠুরিয়ার জিজ্ঞাসায় সন্ন্যাসী বলিলেন, দুর্গের নাম 'জুনা'। কাঠুরিয়া যাইয়া রাজা গ্রহরিপুকে এই দুর্গের সংবাদ জানাইলে রাজা বনজঙ্গল কাটাইয়া দুর্গ বাহির করিলেন। তদবধি উহা জুনাগড় নামে বিখ্যাত হইল। *

নানা কারণেই এই কাঠুরিয়ার গল্পে বিশ্বাস করা কঠিন। বন জঙ্গল যতই গভীর, এবং গাছগুলি যতই উচ্চ হউক না কেন, তাহাতে উপরকোটের পর্ব্বতপ্রতিম দুর্গ-প্রাচীর ঢাকা পড়া অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। গির্ণার পাহাড়ের ক্রোড়স্থ এবং মস্তকস্থ তীর্থস্থানগুলি কোন দিনই পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাত্রীগণ সর্ব্বদাই পাহাড়ে উঠিত ও নামিত। পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে গির্ণারে আসিবার রাস্তা রোধ করিয়া কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত উপরকোট দুর্গ দাঁড়াইয়া আছে। কাজেই উপরে প্রদত্ত গল্পের মধ্যে এইটুকু মাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় যে রায় গ্রহরিপুর সময় বহুদিনের পরিত্যক্ত উপরকোট দুর্গ ফিরিয়া মেরামত করিয়া ব্যবহারযোগ্য করা হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

* Wilberforce—Bell's History of Kathiawad p. 55—56.





সঙ্গীত

কথা ও সুর—নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম। স্বরলিপি—জগৎ ঘটক।

গান

আসে রজনী, সন্ধ্যামণির প্রদীপ জ্বলে।
ছায়া-আঁচল-ঢাকা কানন তলে॥
তিমির দুকূল দুলে গগনে
গোধূলি-ধূসর-সাঁঝ-পবনে,
তারার মাণিক অলকে ঝলে॥
পূজা আরতি ল'য়ে চাঁদের থালায়
আসিল সে অস্ত-তোরণ নিরালায়।
ললাটের টীপ জ্বলে সন্ধ্যাতারা
গিরি-দরী-বনে ফেরে আপন-হারা;
থামে ধীরে বিরহীর নয়ন-জলে॥

II ন্‌া সা গা মা | মপা -া -া -ধা I ধমা -পা মপধা পা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞরা -সা I
আ সে র জ নী ০ ০ ০ স ন্ ধ্যা ০ ম ণি ০ ০ ০০০ র্

I সজ্ঞা জ্ঞরা সরা সন্‌া | সা -া -া -া I মপা পমা পা ধা | পধা -ণা ধা পা I
প্র ০ দী ০ প০ জ্ব লে ০ ০ ০ ছা০ য়া০ আঁ চ ল০ ০ ঢা কা

I পধা ধপা মা গা | মা -া -গমা -পদা I মপা -পমা জ্ঞা রা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞরা -সা I
কা০ ন০ ন ত লে ০ ০০ ০০ স০ ০ন্ ধ্যা ম ণি ০ ০০০ র্

I সজ্ঞা জ্ঞরা সরা সন্‌া | সা -া -া -া II
প্র ০ দী ০ প০ জ্ব লে ০ ০ ০

II না না না না | র্সা -া -া পা I না -পা না না | র্সা -া -া ণা I
তি মি র দু কূ ০ ল্ দু লে ০ গ গ নে ০ ০ ০

I ণা ণা ণা ণধা | র্সণা -া -ধণধা -পা I পধা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
গো ধূ লি ধূ স ০ ০০০ র্ সাঁ০ ঝ্ প ব নে ০ ০ ০

I পা ধা ণা ধণধা | পা -া -া -া I পধা ধপা মা গা | মা -া -গমা -পদা I
তা রা র মা০০ ণি ০ ০ ক্ অ০ ল কে ঝ লে ০ ০০ ০০

I মপা -পমা জ্ঞা রা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞরা -সা I সজ্ঞা জ্ঞরা সরা সন্া | সা -া -া -া II
স০ ০ন্ ধ্যা ম ণি ০ ০০০ র্ প্র০ দী০ প০ জ্ব লে ০ ০ ০

II { সা সা রা রা | রা -া রা গা I মা পা পধণা ধণধা | পা -া -া -া I
পূ জা আ র তি ০ ল' য়ে চাঁ দে র০০ থা০০ লা ০ ০ য়্

I পা ধা ণা ধা | পা -পধা পধপা পা I মা -গা মা পা | মপা -া -মজ্ঞা -রসা } I
আ সি ল সে অ ০স্ ত০০ তো র ণ্ নি রা লা০ ০ ০০ ০য়্

I মা মা পা ধা | না -র্সা র্সা র্সা I না -নপা না না | র্সা -া -া -া I
ল লা টে র টী প্ জ্ব লে স ০ন্ ধ্যা তা রা ০ ০ ০

I র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা I র্সরা রর্মা জ্ঞরা র্সনা | র্সা -া -া -া I
গি রি দ রী ব নে ফে রে০ আ০ প০ ন০ হা০ রা ০ ০ ০

I নর্সা -র্সরা র্সা ণধা | ণা -া -ধণধা -পা I পধা ধর্সা র্সণা ণধা | পা -া -া -া I
ণা০ ০০ মে ধী০ রে ০ ০০০ ০ ধী০ রে০ বি০ র০ হী ০ ০ র্

I পা পধা পধপা মগা | মা -া -গমা পদা I মপা -পমা জ্ঞা রা | মজ্ঞা -া -রজ্ঞরা -সা
ন য়০ ন০০ জ০ লে ০ ০০ ০০ স০ ০ন্ ধ্যা ম নি ০ ০০০ র্

জ্ঞরা সরা সন্া | সা -া -া -া II II
প্র০ দী০ প০ জ্ব লে ০ ০ ০



মিলন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠিক বস্তীপল্লী না হইলেও পাড়াটা তেমন সুবিধার নয়। ছিটেবেড়ার একটা ছোট বাড়ী। দুটী ঘর ও একটু বারান্দা—এই লইয়াই বাড়ী। বারান্দায় রান্নাবান্না হয়; ছোট ঘরটীতে ভাঁড়ার ও বাক্সপত্র থাকে। অন্য ঘরে একটা জীর্ণ তক্তাপোষে ময়লা বিছানায় একজন শীর্ণকায় যুবক রোগশয্যায় শায়িত। রোগীর বয়স বোধ হয় ত্রিশের কোঠা পার হয় নাই; কিন্তু রোগ তাহাকে বার্দ্ধক্যের সীমানায় টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঐ ঘরটিতেই সুষমা তাহার বছর ছয়েকের শিশু পুত্র লক্ষ্মীকে লইয়া বাস করিত,—আর দ্বিতীয় ঘর ত ছিল না।

রোগীকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মুখখানা তাঁহার থমথমে, কপাল ঈষৎ কুঞ্চিত, বিপদের ঘন ছায়া তাঁহার দুই চোখে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সুষমা ডাক্তারের হাতে ফিএর টাকাগুলি দিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল "বাঁচবে না, ডাক্তারবাবু, কিছুতেই? কোনো উপায়ই নেই?" স্বরে তাহার উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা উপচিয়া পড়িতেছিল। ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "অবস্থা খুবই খারাপ। বুঝতেই পারছেন—এত অত্যাচার—মানে এত মদ খাওয়া—ওষুধে কোনো কাজ হবে বোলে ত মনে হয় না। এখানকার সঙ্গ ওঁকে ছাড়ান দরকার।" সুষমা কাতর কণ্ঠে কহিল, "ওঁকে আমি এত অসুখেও মদ ছাড়াতে পারছি না; কোথা থেকে কেমন কোরে যে আনাচ্ছেন জানি না; কিন্তু স্কুল থেকে ফিরে এসে রোজই আমি ওঁর মুখে গন্ধ পাই……"

মুখের কথাটা কাড়িয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন "সেটা ওঁর ইচ্ছাকৃত নয়। এখন উনি যে অবস্থায় এসে পৌচেছেন, তাতে ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অভ্যাস ওঁকে ঐ পথে টানবে। এখন ওঁকে যদি কোনো ভাল জায়গায় চেঞ্জে নিয়ে যেতে পারেন; হাওয়া বদলালে কিছু উপকার হওয়া সম্ভব। আর বন্ধুবান্ধবের অভাবে অভ্যাসটাও সংযত হবে। তবে আর বেশী দেরী করা চোলবে না।"

সুষমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারই স্কন্ধে এই ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত ভার। কোনো গতিকে কর্পোরেশনের একটা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া দিনপাত করে। যা বেতন পায়, রুগ্ন স্বামীর ঔষধ পথ্য ও ডাক্তারের খরচ যোগাইতেই প্রায় চলিয়া যায়। দোকানের অন্যান্য দেনা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ছেলেটা বড় হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আজও সে করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার উপর বায়ু-পরিবর্ত্তনের খরচ সে কেমন করিয়া যোগাড় করিবে? অথচ ডাক্তার স্পষ্টই বলিয়া গেলেন ঔষধে কোনো ফল হইবে না; বায়ু-পরিবর্ত্তনে উপকার হইতে পারে…।

*

ঘরে ঢুকিতেই ব্যাকুল আগ্রহে যতীন জিজ্ঞাসা করিল "কি বোল্লে ডাক্তার? বাঁচবো না আমি?"

সুষমা ধীরে ধীরে মাথার কাছে বসিয়া বলিল "ছিঃ, ও-কথা ভাবতে নেই। ডাক্তার বোল্লেন চেঞ্জে গেলেই সেরে যাবে।"

—"চেঞ্জে? কোথায়? দেওঘর মধুপুর না পুরী না দার্জ্জিলিং?" সুষমার এত দুঃখেও হাসি পাইল। গত তিন বছর ধরিয়া যতীন কোনো কাজকর্ম্মে মন দেয় নাই। পূর্ব্বের অর্জ্জিত অর্থ জলের মত বদখেয়ালে উড়াইয়াছে—আজ ছয় মাস হইতে শেষে শয্যা লইয়াছে। বাধ্য হইয়া তাহাকে চাকরী লইয়া সংসার চালাইতে হইতেছে; অথচ স্বামীর মেজাজ এখনও ঠিক পূর্ব্বের মতই রহিয়াছে।

যতীন পরক্ষণেই কহিল "তুমি হাসছ…তা বটে, আমি মাঝে মাঝে নিজের অবস্থাটা ভুলে যাই; ছেলেবেলার বড়-লোক মেজাজটা মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দেয়। তাই ত সুষমা, আজ চেঞ্জে যাবার অর্থের অভাবে এমনি কোরে প্রাণ খোয়াতে হবে? অথচ সত্যিই ত আমি অভাবী নই…।"

তাহার স্বর বেদনায় কাঁপিয়া উঠিল। কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই সুষমা কহিল "ছিঃ! ও চিন্তা মনেও এনো না। যে বাপ স্পষ্টই তোমায় বোলে দিয়েছে যে তুমি

তার কাছে মৃত, তার কাছে যাবে জীবনের জন্যে অর্থ ভিক্ষা কোরতে? তাই যদি কোরবে তবে আমায় এ দাসীবৃত্তি করিয়ে আরো হেয় কোরলে কেন?"

যতীনের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। সে কহিল "আমার জন্যে তোমায় চাকরী কোরতে হোচ্ছে বোলে তুমি কি নিজেকে অপমানিত বোধ কর সুষমা? তা যদি··"

সুষমা যতীনের ম্লান মুখখানা দুহাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "না লক্ষ্মী, তা ভেবো না। ওটা আমি ঝোঁকের মাথায় বোলে ফেলেছিলাম। আমার জন্যই যে আজ তোমার এ দশা, তা আমি কি কখনও ভুলতে পারি। আমার মত একটা গরীব মেয়েকে বিয়ে করার জন্যেই ত আজ রাজার ছেলে হোয়েও তোমার এ দুর্দ্দশা।"

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া রহিল। সুষমা স্বামীর চুলগুলার মধ্যে হাত বুলাইতে লাগিল। লক্ষ্মী হাতে পায়ে কাদা মাখিয়া আসিয়া ডাক দিল "মা"। সুষমা তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল "লক্ষ্মীছাড়া, কোথায় কাদা মেখে এলি?"

যতীন তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল "ছিঃ! লক্ষ্মী-ছাড়া বোলো না ওকে; ও যে লক্ষ্মীহারার লক্ষ্মী।" দারিদ্র্য-পিষ্ট পুত্রের ধূলিধূসরিত চেহারা দেখিয়া যতীনের কোটরগত চোখ দুইটীর কোণে-কোণে জল টলমল করিতে লাগিল।

*

সুষমা লক্ষ্মীকে বারান্দায় একটা মুড়ির ঠোঙ্গা নামাইয়া দিয়া ঘরে আসিয়া যতীনের হাতে ও বুকে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিল। যতীন ম্লান হাসিয়া কহিল "কি আর দেখছ—দিন দিন মৃত্যু আমায় তার কোলে টেনে নিচ্ছে।" সুষমা নীরবে চোখ মুছিল। মৃত্যুর ধীর নিঃশব্দ অথচ নিশ্চিত আগমন দুজনেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছিল। কাজেই কেহ কাহাকেও মিথ্যা প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত না।

যতীন সুষমার হাতটা নিজের মুঠায় টানিয়া কহিল "লক্ষ্মী কৈ সুষমা?"

সুষমা জবাব দিল "মুড়ি খাচ্ছে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যতীন কহিল "শুকনো বোধ হয়?"

সুষমা কোনো উত্তর দিল না।

যতীন সুষমার হাতটা আরো একটু চাপিয়া ধরিয়া কহিল "সুষমা আমার একটা কথা রাখবে?"

সুষমা ব্যাকুল আগ্রহে কহিল "কি বল? অমন কোরে বোলছ কেন?"

যতীন অসীম অনুরোধ ভরে কহিল "তুমি একবার বাবার কাছে যাও—আমার জন্যে না যাও, ছেলেটার জন্যে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর। আমার নিজের কাজের ফলভোগ আমি কোরব; কিন্তু ঐ নিরপরাধ বালককে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করবার কোনো অধিকার ত আমার নাই। আমার জন্যে ঐ নিরপরাধ শিশু কেন না খেয়ে শুকিয়ে মোরবে? তুমি জান আমি বাপের একমাত্র ছেলে,—আমারও ঐ একটা সম্বল। বাবার পর ওরই ত বিলাসপুরের রাজতক্তে বসবার অধিকার।"

সুষমা ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে কহিল "বিলাসপুরের বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর ত তাঁর বংশধরের খোঁজ নিতে পারতেন! তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?"

অবসন্ন অথচ শান্ত কণ্ঠে যতীন কহিল, "সুষমা, একদিন ঠিক তোমার মতই উদ্ধত অবুঝ আমি ছিলাম। তোমার চেয়ে বেশীই ছিলাম, কারণ, আজ যা তুমি বোলছ তা আমারই কাছে শেখা। এই ঔদ্ধত্যের ফলেই আমি আজ সর্ব্বহারা। এরই জন্যে তোমার ঐ নিষ্পাপ কোমল কুসুম ম্লান হোয়ে আজ ধূলোয় ঝোরে পড়বার উপক্রম হোয়েছে। শুধু আমারই বা দোষ কি. আমাদের বংশের ধারাই ঐ। বাবাও যদি অবুঝ না হোতেন, নিজের মত ও মর্য্যাদার জন্যে অন্ধ না হোতেন, তা হোলে বিলাসপুরের চাটুজ্যে পরিবার এমন ছন্নছাড়া হোত না। লক্ষ্মীটি, একবার মান-অভিমান ভুলে ছেলেটার জন্যে তুমি বাবার কাছে যাও।"

সুষমা চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করিয়া যতীন কহিল "যাবে না?"

সুষমা শান্ত কণ্ঠে কহিল "যাব, কিন্তু তিনি হয়ত আমাকে চিনবেন না, চিনলেও হয়ত বাড়ী ঢুকতে দেবেন না।"

যতীন ম্লান হাসিয়া কহিল "সে অপমান ত বিয়ের পর হোয়েই গেছে—তার বেশী ত কিছু হবেনা।"

*

বিলাসপুরের রাজাবাহাদুর বনমালী চট্টোপাধ্যায়ের নাম এদিকে সকলেই জানে। অত বড় ধনী, দানশীল ও ব্যক্তিত্বশীল পুরুষ খুব কমই দেখা যায়। প্রজারা তাঁহাকে ভয় করে যত, ভক্তিও করে তত। এদিকে রাজাবাহাদুর

বলিতে তাঁহাকেই বোঝায়। সরকার হইতে ঐ উপাধি তিনি বংশানুক্রমে পাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন ; কিন্তু নিয়তি তাঁহার সঙ্গে নির্ম্মম পরিহাস করিয়াছে। যাক্ সে কথা···।

পুরাতন ভৃত্য রূপলাল আসিয়া খবর দিল "রাস্তায় গাড়ীতে একটা মেয়েমানুষ আপনার সঙ্গে দেখা কোরতে চান।"

বৈঠকখানায় তখন কেহ ছিলনা। মুখ হইতে গড়গড়ার নলটা নামাইয়া একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন "কে সে? কি চায়? রাস্তায় গাড়ীতে কেন?"

রূপলাল সঙ্কুচিতভাবে কহিল "আজ্ঞে বোল্লেন দাদা বাবুর বউ।"

রাজাবাহাদুর গম্ভীর অথচ বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন "কি?"

রূপলাল আরো শঙ্কিতভাবে কহিল "আজ্ঞে বৌদি—একবার আপনার সঙ্গে··" আর সে ভয়ে বলিতে পারিল না।

রাজাবাহাদুরের মুখমণ্ডল আষাঢ়ের ঘন মেঘের মত সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। চোখ দুইটা ক্ষুদ্রতর হইল, কপালে কুঞ্চনের রেখা প্রকট হইয়া উঠিল ; গড়গড়ার ডাক বন্ধ হইল। রূপলালের বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে রাজাবাহাদুর বলিলেন "বোলে দে, দেখা হবে না।"

রূপলাল বজ্রাহতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজাবাহাদুর ধমক দিয়া উঠিলেন "যা না হতভাগা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শুনতে পাসনি?"

রূপলাল ছেলেবেলা হইতে কোলে পিঠে করিয়া যতীনকে মানুষ করিয়াছিল। এই নিঃসন্তান, পৃথিবীর সঙ্গে অন্য বন্ধনহীন বৃদ্ধ অন্তরের সমস্ত স্নেহ উজাড় করিয়া তাহাকে ঢালিয়া দিয়াছিল। তাহাকে যখন রাজাবাহাদুর ত্যাগ করেন, সে ভয়ে কিছু বলিতে পারে নাই ; কিন্তু আজ সে রাজার ঘরের আদরের দুলালের গৃহলক্ষ্মীর ও আত্মজের বেশভূষা দেখিয়া এবং সুষমার মুখে যতীনের অসুখের সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল।

সে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দাদাবাবুর বড় অসুখ, চিকিৎসার টাকা নাই, তাই—"

তেমনি অবিচলিত গম্ভীর কণ্ঠেই রাজাবাহাদুর কহিলেন, "খাজাঞ্চীখানায় গিয়ে দশটা টাকা দিতে বোলে দিগে যা।"

এই অমানুষিক কঠোরতায় বৃদ্ধ রূপলালের অন্তরের সমস্ত স্নেহ মমতা কোমলতা রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া সহস্র ধারায় বাহির হইয়া পড়িল। সে নিজেকে আর সংযত করিতে না পারিয়া সহসা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজাবাহাদুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "আপনার পায়ে পড়ি হুজুর, একবার—একবার আপনি তাকে ডাকুন, একবার দেখুন কি হালে আপনার সোণার পুতুলরা রোয়েছে। অমন কার্ত্তিকের মত খোকা রাজা তালি দেওয়া জামা পোরে একটা ভিকিরীর ছেলের মত দাঁড়িয়ে আছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন "ছেলেটিকেও এনেছে বুঝি?" অসীম আগ্রহে রূপলাল কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। একবার দেখুন কেমন কার্ত্তিকের মত চেহারা··"

ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া রাজাবাহাদুর বলিলেন "আচ্ছা থাম।" গড়গড়ায় আরো বারকয়েক টান দিয়া ক্ষণপরে তিনি আবার বলিলেন "তাকে এইখানে ডেকে আন।"

রূপলাল চোখ মুছিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। রাজাবাহাদুর গম্ভীর মুখে পুত্রবধূর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি খবর রাখিতেন যে তাঁহার নিকট হইতে কোনো সাহায্য না লইয়া সংসার চালাইবার জন্য সুষমা শিক্ষকতা করে। এই তেজস্বী মেয়েটীর প্রতি কেমন একটা প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বলতা তাঁহার হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণে লুকান ছিল ; তিনি নিজেই তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন না।

* * * * *

রূপলাল প্রায় লাফাইতে লাফাইতে গাড়ীর কাছে আসিয়া দরজাটা নিজেই টানিয়া খুলিয়া কহিল "বাড়ীর ভেতরে আসুন, বাবু ডাকলেন।"

স্মিতমুখে শান্তকণ্ঠে সুষমা কহিল "বাড়ীর ভেতর ত যেতে পারব না রূপলাল। তুমি ওঁকে মানুষ কোরেছ, এখনও তাঁকে তুমি ভালবাস ; সেই জন্যেই তাঁর কথামতই এখানে এসে তোমার সাহায্য চেয়েছি। তোমার মুনিবের কাছেও সাহায্য ভিক্ষা কোরতেই এসেছি ; কিন্তু তাই বোলে তাঁর বাড়ীতে ত আমি যেতে পারিনা।"

রূপলাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মালিকের ডাক যে এমন করিয়া কেহ, বিশেষ তাঁহার পুত্রবধূ, উপেক্ষা

করিতে পারে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারিতনা। সে সভয়ে কহিল "রাজাবাহাদুরের ডাকেও আপনি আসবেন না? তিনি আপনার শ্বশুর···গুরুজন···" শান্তকণ্ঠেই সুষমা কহিল "তিনি ত আমায় পুত্রবধূ বোলে গ্রহণ করেন নাই; আমার জন্যে তিনি পুত্রকে শুদ্ধ ত্যাগ কোরেছেন। যে বাড়ীর ন্যায্য অধিকার থেকে আমার স্বামী বঞ্চিত, সে বাড়ীর ছায়াও আমি মাড়াবনা।"

এতটা জেদ রূপলালের ভাল লাগিল না; এই তেজস্বী মেয়েটীর উপর সে মনে মনে ঈষৎ চটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই মেয়েটাই আবার মিলনে বিঘ্ন ঘটাইবে। ইহারই জন্য এমন সুখের সংসারটা ভাঙ্গিয়াছে। আজ যদি বা মিলনের রাস্তা সে বহু কষ্টে তৈয়ারী করিল, ঐ জেদী মেয়েটাই তাহাতে বাধা দিবে। সে ঈষৎ শ্লেষের সুরে কহিল "যার কাছে ভিক্ষে কোরতে এসেছ, তারই বাড়ীর ছায়া মাড়াবে না, এটা কি তোমার মত লেখাপড়া জানা মেয়ের কথা মা?"

সুষমা কহিল "ভিক্ষে আমি নিজের জন্যে চাইতে আসিনি রূপলাল। না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মোরলেও কোনো দিন আমি তোমার মুনিবের দরজায় হাত পাতব না। তিনি আমার জন্যে তাঁর ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র কোরে আমার যে অপমান কোরেছেন, সে অপমান কুকুর-বেড়ালও ভুলতে পারে না। আমি যাব তাঁর বাড়ীতে মাথা গলাতে?"

রূপলাল কহিল "তা হোলে এসেছ কেন মা। কর্ত্তাবাবু ত এখানে আসবেনা।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া সুষমা কি ভাবিল। তাহার মনে হইল স্বামীর অনুরোধে সে আসিয়াছে, তাঁহার অভিপ্রায় মত রাজাবাহাদুরকে তাহার কথাগুলা জানাইতে হইবে, এ সময় নিজের জ্বালার বশে স্বামীর অনুরোধ পণ্ড করা উচিত নহে।···কিন্তু ঐ বাড়ীতে সে কিছুতেই ঢুকিতে পারেনা··· ঐ ফটক হইতেই তাহার স্বামী ও তাহাকে উদ্ধত মর্য্যাদা-গর্ব্বিত বৃদ্ধ ফিরাইয়া দিয়াছিল, বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেয় নাই।···না—উহার ভিতর আর সে মাথা গলাইবে না··· ।

সুষমা কিছুক্ষণ পর বলিল "আমি এসেছি তাঁর নাতির ভবিষ্যৎ ও তাঁর ছেলের চিকিৎসা খরচের জন্যে, নিজের জন্যে নয়—এই কথাটা গিয়ে তোমার মুনিবকে বলো। তাতে তিনি আসেন আসবেন, নয়ত আমাকে শুধুই ফিরে যেতে হবে।"

রূপলাল আপন মনে গজগজ করিতে লাগিল। লক্ষ্মীর দিকে হাত বাড়াইয়া সে কহিল "এস খোকা রাজা, দাদুর কাছে যাবে।"

লক্ষ্মী মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "ঈস, আমার মাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছিনা।"

রূপলাল বিরক্ত হইয়া কহিল "ঈস্! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এমন জেদীর গুষ্টি ত দেখিনি বাপু।"

অধোমুখে রূপলাল একলাই ঘরে ঢুকিল। বিস্মিত হইয়া রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন "কিরে, তারা কৈ?"

শুষ্ককণ্ঠে রূপলাল বলিল "আজ্ঞে তিনি বোল্লেন বাড়ীতে তিনি আসবেননা।"

রাজাবাহাদুর ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন "কি বোল্লে তোকে?"

রূপলাল কুণ্ঠিত ভাবে কহিল "তিনি বোল্লেন আমি ও বাড়ীতে যাবনা; তাতে যদি শুধুই আমাকে ফিরতে হয় তাও ভাল। আপনার পায়ে পড়ি একবার আপনি বাইরে চলুন। তাঁর কথায় মনে হোল অসুখ খুব বাড়াবাড়ি। না খেতে পেয়ে ছেলেটাও শুকিয়ে কাঠ হোয়েছে। কষ্টে না পোড়লে আপনার কাছে আসবে কেন?"

রাজাবাহাদুরের গম্ভীর মুখে মৃদু একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; কিছুক্ষণ নলটায় টান দিয়া কহিলেন "চল দেখি।"

* * * *

পায়চারী করিতে করিতে রাজাবাহাদুর বলিলেন "কি চাও তুমি, স্বামীর বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সাহায্য?"

সুষমা থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। এই লোকটির কথা সে শুনিয়াছিল; কিন্তু কখনও সামনাসামনি কথা কহে নাই। নিজের একমাত্র পুত্রের এতবড় অসুখের সংবাদ লইয়াও যে পিতা এমন নির্ব্বিকার ভাবে কথা কহিতে পারে, তাহার নির্ম্মম হৃদয়ের হিমস্পর্শে তাহার যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এই লোকটার কাছে স্বামীর চিকিৎসার খরচ চাহিতে তাহার মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল—এত হীন ও!

মৃদুকণ্ঠে সুষমা কহিল "আপনার নাতির ভবিষ্যতের জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম। যাকে আপনি

ত্যাগ কোরেছেন, তার জন্যে অন্যায় অনুরোধ আমি কোরবো কেন? তবে অসুখের সংবাদটা দেওয়া কর্ত্তব্য বোলে জানালুম। সে ত আপনার কাছে মৃতই—তার মৃত্যুতে আপনার যায়-আসে কি?"

বৃদ্ধের মুখমণ্ডল রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটা ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি কহিলেন "তুমি নিজে এসেছ তার সাহায্যের জন্যে—আমি তার বায়ু পরিবর্ত্তনের সমস্ত খরচ দোব, আর তোমার ছেলের ভারও আমি নোব।" গভীর কৃতজ্ঞতায় সুষমা তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজাবাহাদুর কহিলেন "কিন্তু একটা কথা—আমি যা সাহায্য কোরব, তার প্রতিদানে তোমার ছেলেকে একেবারে আমাকে দিতে হবে।"

বিস্ময়-উচ্ছলিত কণ্ঠে সুষমা বলিল "মানে—আপনার কাছেই থাকবে সে।"

বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "নিশ্চয়ই। তাকে আমি আমার বংশের উপযুক্ত কোরে শিক্ষায়, সংস্কারে মানুষ কোরে তুলব। তোমাদের আবহাওয়ায় তাকে আমি রাখব না।"

সুষমার রক্তিম গণ্ড ক্ষণিকের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া গেল। শুষ্ক কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল "আর কখনও তাকে দেখতে পাব না।"

রাজাবাহাদুর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "দেখতে পেতে পার; কিন্তু যতদিন না সে একেবারে তোমাদিগকে ভোলে, ততদিন সামনে এসে দেখা দিতে পাবেনা। তোমাদের স্মৃতি, তোমাদের নোংরা আবহাওয়া, তার বাপের উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব, সব ভুলিয়ে দিয়ে তাকে আমার বংশের উপযুক্ত কোরে গোড়ে তুলব। সে-ই হবে বিলাসপুরের ভবিষ্যৎ রাজাবাহাদুর।"

সুষমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করিতে লাগিল। কথাগুলার গুরুত্ব ঠিক যেন সে ভাল ভাবে অনুভব করিতে পারিতেছিলনা; এমন কঠোর হৃদয়হীন প্রস্তাব কি কোনো সন্তানের জনক করিতে পারে! লোকটা নিজে যেমন হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা, মানবধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাথর হইয়া বসিয়া আছে, পরের বুকগুলাও উঁহার কাছে অমনি কঠিন, মায়ামমতাবর্জ্জিত পাষাণ! কিন্তু পাশাপাশি ভাসিয়া উঠিল রুগ্ন স্বামীর কঙ্কালসার জীর্ণ দেহখানি, কাণে বাজিতে লাগিল মৃত্যুপথযাত্রীর জীবনের জন্য কাতর ক্রন্দন। তাহাকে বাদ দিয়া নিজেরই বা বাঁচিয়া লাভ কি? পুত্র ত তাহার রহিলই—ভাল ভাবেই থাকিবে। তাহাকে না দেখার দুঃখ কি স্বামীর জীবনের বিনিময়ে সে ভুলিতে পারিবেনা?

সুষমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া রাজাবাহাদুর কহিলেন "রাজী?"

সুষমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ।

রাজাবাহাদুর বলিলেন "কাল সকালবেলা আমার গাড়ী যাবে খোকা রাজাকে আনতে। সেই সময় তোমার দরকার মত টাকাও দিয়ে আসবে। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও।" পরে লক্ষ্মীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "কৈ হে খোকা রাজা, কাল ত আসবেই—আজ একটা চুমু দিয়ে যাও।" লক্ষ্মী মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "চুমু দোবো মা?" রাজাবাহাদুর মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত ভুলিয়া দুই বাহু দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমায় চুমায় তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া কহিলেন "ওরে শালা, মাতৃভক্ত।"

সুষমা বাড়ী ফিরিতেই যতীন পরম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "হ'ল? বাবা কি বোল্লেন? টাকা দিলেননা?"

সুষমা নীরবে আসিয়া বিছানায় বসিল। তাহার এই নীরবতায় যতীন হতাশ হইয়া কহিল "দিলেনা? বাপ এত কঠোর হোতে পারে? আমি মোরছি জেনেও সাহায্য কোরলেনা? কৈ আমি ত লক্ষ্মীর ওপর এত রূঢ় হোতে পারিনা।"

সুষমা কহিল "সাহায্য দেবেন বোল্লেন কিন্তু···" আনন্দে যতীনের কোটরগত চক্ষু দুইটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল "দেবেন! দেবেন! আবার কিন্তু কি?"

সুষমা শুষ্ককণ্ঠে কহিল "বিনিময়ে লক্ষ্মীকে দিতে হবে।" যতীন উৎফুল্ল হইয়া কহিল "বটে, তার ভারও তিনি নেবেন? হাজার হোক বাপ ত!"

সুষমা কহিল "কিন্তু সর্ত্ত এই যে, তুমি আমি কেউ তাকে আর দেখা দিতে পাবনা,—আমরা তার কাছে স্বপ্ন হোয়ে যাব,—লুপ্ত হব···।"

যতীন কহিল "এতে তুমি এত বিচলিত কেন? সে ত সুখে থাকবে।"

সুষমা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু কহিল "হুঁ।"

অনেকক্ষণ পর আবার সে কহিল "কাল সকালে

খোকাকে নিতে গাড়ী আসবে। আর সেই সঙ্গে তোমার চেঞ্জে যাবার টাকা আসবে।"

সহসা বালিসের নীচে একটা কালো বোতলের খানিকটা সুষমার চোখে পড়িল। সে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল "আবার ঐ ছাই আনিয়েছ? নিজে যদি ইচ্ছে কোরে যমকে ডাক তাহোলে আর আমাকে পরের দোরে পাঠিয়ে অপমানিত করা কেন?"

যতীন চুপ করিয়া রহিল। সুষমা বালিসের নীচে হইতে বোতলটা বাহির করিতে গেল, যতীন তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল "লক্ষ্মীটি, এক ঢোকও খাইনি, ফেলে দিওনা। সমস্ত শরীরে আমার হাতুড়ি পিটছে—একটু আমায় দাও।"

সুষমা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহা ফেলিয়া দিবার জন্য বিছানা হইতে উঠিতেই যতীন রাগ করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়া কহিল—"ভালো কথায় হোলো না বুঝি। ও দাও আমাকে, নইলে খুন কোরব।"

*　　*　　*　　*

খাওয়া দাওয়ার পর রাত্রে রাজাবাহাদুর বিছানায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া তামাক টানিতেছিলেন। নিত্যকার অভ্যাস মত সামনে একটা বই খোলা পড়িয়া ছিল; কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার সেদিকে ছিলনা—চোখ বুজিয়া কি যেন তিনি ভাবিতেছিলেন। রূপলাল আসিয়া কহিল "পা দুটো দিন, তেল এনেচি।"

চোখ মেলিয়া রাজাবাহাদুর পা দুইটা আগাইয়া দিয়া কহিলেন "দেখলি রূপলাল, আমিই জিতেছি।" সহসা এ কথার কোনো অর্থই রূপলাল করিতে পারিলনা। বিকাল বেলা সুষমা চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর তিনি বেড়াইয়াছেন, সন্ধ্যায় কাছারী করিয়াছেন, রাত্রে খাইয়াছেন,—এ সম্বন্ধে আর কোনো কথাই হয় নাই। কাজেই রূপলাল সহসা এ কথার যোগসূত্র বুঝিতে না পারিয়া নির্ব্বোধের মত তাকাইয়া রহিল।

বনমালী কহিলেন "বুঝতে পারলিনা হারামজাদা? তুই যে বোলেছিলি আমি বাপ, আমাকেই হারতে হবে, তাকে আবার আমাকেই শেষে আনতে হবে,—কিন্তু দেখ্ বেটা, সেই লোক পাঠিয়েছে, আমি তাকে আনতে যাইনি।"

রূপলাল কহিল "তিনি ত নিজে এ বাড়ীতে আসতে চাননি, তিনি ত…"

রাজাবাহাদুর ধমক দিয়া উঠিলেন "তুই বেটা চাষা, মুখ্যু—তুই বুঝবি কি? সে যে আমারই বেটা রে, সে কি নিজে আসতে পারে, তাই পাঠিয়েছে তার বৌকে। বৌটী খুব তেজী,—নয় রে? আমি ভেবেছিলুম গরীবের ঘরের মেয়ে, বংশ তেমন উঁচু নয়; কিন্তু একে দেখে মনে হোল গরীব হোলেও বনেদী বংশের মেয়ে—কি বলিস?"

রূপলাল সোৎসাহে কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কি তেজ দেখলেন না,—স্পষ্ট আপনার মুখের ওপর কি রকম জবাব কোরলেন।"

বনমালী গড়গড়ায় বার কয়েক জোরে জোরে টান দিয়া নিঃশব্দে একরাশ ধোঁয়া ছাড়িলেন।

রূপলাল সাহস পাইয়া কহিল "কর্ত্তা, বৌদিকে শুদ্ধ নিয়ে দাদাবাবুকে আসতে বোলব কাল—কেমন? খোকা রাজা ছোট ছেলে, মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন,—তার যে বড় কষ্ট হবে। দেখলেন না, তার মায়ের ওপর কত টান…"

রাজাবাহাদুরের গম্ভীর মুখ দেখিয়া রূপলাল আর কিছু বলিতে সাহস করিলনা, চুপ করিয়া গেল।

রূপলাল ঢুলিতেছিল, রাজাবাহাদুর কহিলেন "ওরে, তামাকটা একবার পাল্টে দিয়ে শুয়ে পড়। ব্যাটা ঢুলতে ঢুলতে যে আমার ঘাড়েই পড়বি।"

রূপলাল অপ্রস্তুত হইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে গেল।

রাজাবাহাদুর বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিলেন। নির্ম্মল আকাশ হইতে লক্ষ ধারায় জ্যোৎস্না ফিনকী দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁহার বড় মিষ্টি লাগিল। যতীন যেদিন তাঁহার অমতে জেদ করিয়া বিবাহ করিয়া স্ত্রী লইয়া বাড়ী ঢুকিতে আসে, তিনি তাহাকে বাড়ীর মাটীতে পা দিতে দেন নাই—সেই গাড়ীতেই বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। মাতৃহারা একমাত্র পুত্রকে হারাইয়া অবধি তাঁহার কাছে বিশ্বটা কেমন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজাবাহাদুর খেতাব পায়, এই জন্য ঐ খেতাবকে বংশানুক্রমিক করিতে তিনি জলের মত অর্থব্যয় করিতেছিলেন; অথচ সেই পুত্র এমনি করিয়া ঐশ্বর্য্য, সম্মান, উপাধি সব কিছু উপেক্ষা

করিয়া কোথাকার একটা অজ্ঞাতকুলশীল কলেজের মেয়েকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিল! তাঁহার অন্তরের ঝড় বাহিরের কাহাকেও তিনি বুঝিতে দিতেন না। কেহ যতীনের কথা তুলিয়া সহানুভূতি দেখাইতে আসিলে বিরক্ত হইয়া কহিতেন "সে লক্ষ্মীছাড়ার কথা তুলে আমায় বিরক্ত কোরোনা।"

সে গিয়াছে আজ কত দিন···বহু দিন তিনি ইচ্ছা করিয়া খোঁজ লন নাই। মাঝে শুনিয়াছিলেন তাহার একটী সন্তান হইয়াছে—তাহার পর গোপনে সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন। সে অসুস্থ ও তাহার স্ত্রী চাকরী করিতেছে এ সংবাদও পান। কিন্তু তাহার ঠিকানা সঠিক কেহ তাঁহাকে দিতে পারে নাই। আর প্রকাশ্যে তাহার সন্ধান করিতে তাঁহার আত্মমর্য্যাদায় বাধিত। আজ বহু দিন পর তাহার খোঁজ মিলিয়াছে। সে হয়ত নিজের ভুল বুঝিয়া আসিতে চায়··· কিন্তু ঐ অজ্ঞাত-কুলশীল মেয়েটাকে বিলাসপুরের রাজবাড়ীর বধূ বলিয়া তিনি গ্রহণ করিবেন কি বলিয়া?

রূপলাল আসিয়া কহিল "তামাক দিয়েছি ঘরে।" "আচ্ছা যা" বলিয়া তিনি রেলিংএ ভর দিয়া পৃথিবীর যৌবন-দৃপ্ত রূপ দেখিতে লাগিলেন।

রূপলাল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতেছিল, রাজা-বাহাদুর ডাক দিলেন "ওরে শোন।"

সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজাবাহাদুর কপট ক্রোধে বলিলেন "তোর নিজের ওদের আনতে ইচ্ছে হোয়ে থাকে সে আলাদা কথা, কিন্তু খবরদার আমার নাম কোরবিনা তা বোলে দিচ্ছি—আমি তাদের জন্যে মোটেই ভাবিনা—আমি বনমালী চাটুয্যে। তোর কথায় আসে ত আসবে; নয়ত তুই খোকা রাজাকে নিয়ে চোলে আসবি। সে হারামজাদা বুঝবে যে বাপের প্রাণটা···"

রূপলাল দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। রাজাবাহাদুরের কণ্ঠ কেমন অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি একটু কাসিয়া কহিলেন "যা না হারামজাদা, ঘুমোগে না। কাল আবার নটার আগে নবাবের ঘুম ভাঙ্গবেনা।"

রূপলাল ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিয়া খাটের পাশে মেঝের উপর তাহার নির্দ্দিষ্ট শয্যায় আশ্রয় লইল।

বনমালীবাবুর আজ কিছুতেই ঘুম আসিতেছিলনা। অনেকবার তিনি শুইলেন, মাথায় জল দিলেন, বারান্দায় ঠাণ্ডা হাওয়ায় পায়চারী করিলেন; কিন্তু ঘুম পলাতক প্রজার মত কিছুতেই তাঁহার কাছ ঘেঁষিলনা।

ভোরের দিকে তিনি ডাক দিলেন "রূপলাল, ওরে হারামজাদা ওঠ, সকাল হোল যে! আজও কি ন'টা পর্য্যন্ত ঘুমোবি? আজ যে সকালে সেখানে যেতে হবে, মনে নেই বুঝি হারামজাদার, ওঠ।"

রূপলাল চোখ কচলাইতে কচলাইতে উঠিয়া, হাই তুলিয়া বারান্দায় আসিয়া ভাল করিয়া চারিদিকটা দেখিয়া কহিল "আজ্ঞে এখনও যে রাত্রি রোয়েছে।"

রাজাবাহাদুর প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিলেন "তোর কথায় রাত্রি আছে—দেখ দেখি ঘড়ি।"

ঘড়িটা পাশের ঘরে ছিল, রূপলাল দেখিয়া আসিয়া কহিল "আজ্ঞে এখন সাড়ে পাঁচটা।"

—"তবে?—আবার রাত্রি কোথায় পেলি। তুই ত আমার চেয়েও নবাব,—তোর মুখ হাত ধুতেই ত আধ ঘণ্টা যাবে। তার পর গাড়ী বের কোরবে, ঘোড়ার সাজ চড়াবে। হ্যাঁ দেখ, তুই মুখ ধুতে যাবার আগে সহিস কচুয়ানগুলোকে তুলে দিয়ে যা—বুঝলি। আজ ঘোড়ার দলাই-মলাই ফিরে এসে কোরবে, নয়ত তাইতেই দেড় ঘণ্টা লাগবে। আর ছাখ, বড় ল্যাণ্ডো গাড়ীটা, আর কালো জুড়ীটা নিয়ে যাবি বুঝলি।"

রূপলাল ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল সে বুঝিয়াছে।

* * * *

সারারাত্রি সুষমাও ঘুমাইতে পারিল না। ঘুমন্ত লক্ষ্মীকে সে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া শুইয়া রহিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাহার চোখের পাতা এক হইল না—কে যেন তাহার ঘুম আজ কাড়িয়া লইয়াছিল।

কাল, কাল সকালে এই আদরের ধনকে উহারা লইয়া যাইবে···মূল্য লইয়া সর্ত্তবদ্ধ হইয়া তাহাকে জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে। না না না, সে পারিবে না···ইহারই হাসিমুখ চাহিয়া, ইহাকেই অবলম্বন করিয়া সে দিন কাটাইতেছে—এই অসহায় ননীর পুতলীর জন্যই সে মাতাল স্বামীর শত নির্য্যাতন মূক হইয়া সহিয়া চলিতেছে—ইহারই ভবিষ্যতের ছবি বুকের মাঝে লইয়া সে শত দুঃখের মাঝেও ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ম্মসমুদ্রে সাঁতার দিয়া চলিয়াছে। তাহার

ভবিষ্যৎ গড়িবার দায়িত্ব যে আজ তাহার! বাপ ত ধীরে ধীরে পশুত্বের পর্য্যায়ে নামিয়াছে,—দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহার লোপ পাইয়াছে। তা না হইলে যাহার জন্য সে অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়াছে, মাতাল হইয়া তাহাকেই এমনি করিয়া লাঞ্ছিত করে? ঐ শিশুর ভবিষ্যৎ, উহার আদর আব্দার—এই সবই ত তাহার এই দুঃখময় কণ্টকিত সংসারে একমাত্র সান্ত্বনা—একমাত্র অবলম্বন। উহাকে ছাড়িয়া সে থাকিবে কি লইয়া? স্বামী···? তাহার যে অবস্থা কতদিন যে জোড়াতাড়ি দিয়া চলিবে বলা যায় না। বায়ু-পরিবর্ত্তনেই যে নিশ্চিত আরোগ্য হইবে এমন কথা ত ডাক্তার বলিতে পারে নাই। যদি আরোগ্য না ই হয় · এই একমাত্র অবলম্বনকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া,—কাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে নিত্যকার কর্ম্মজাল বুনিয়া যাইবে? না না না, সে উহাকে দিবে না,—দিতে পারিবে না,—যাহা হয় হউক। হঠাৎ লক্ষ্মী বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল "মা মা, ও মা।"

সুষমা অপরিমেয় স্নেহে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "কি বাবা, এই যে আমি, কি হোয়েছে?"

লক্ষ্মী মাকে ভাল করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "তুমি সরে যেও না মা, আমার ভয় করে; তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবনা।"

সুষমা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিল "না বাবা, তোমায় ছাড়ব না।"

ভোর বেলার নিস্তব্ধতা কাঁপাইয়া জুড়ী-ঘোড়া আসিয়া গলিটার মোড়ে দাঁড়াইল। দুইজন উর্দ্দিপরা দারোয়ান ও রূপলাল গাড়ী হইতে নামিয়া জীর্ণ বাড়ীটার দিকে আগাইয়া চলিল।

সুষমা জানালা হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি লক্ষ্মীকে চুপি চুপি কহিল "তুমি ঘর থেকে বেরিও না—লক্ষ্মীটী, এইখানে শুয়ে থাক।"

লক্ষ্মী বিস্ময়ে কহিল "কেন মা? ছেলেধরা এসেছে?"

সুষমা তেমনি চাপা গলায় বলিল "হ্যাঁ, ঐ দেখ, চুপ কোরে শুয়ে থাক, কথা কোয়োনা।"

লক্ষ্মী মাথা তুলিয়া উর্দ্দিপরা বিপুলকায় দারোয়ান দেখিয়া ভয়ে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

রূপলাল আসিয়া দরজায় ডাক দিল "বৌদি।"

সুষমা দরজা খুলিয়া দিল। রূপলাল একখানা সই-করা সাদা চেক সুষমার হাতে দিয়া কহিল "দাদাবাবুর জন্যে যত টাকার দরকার ওতে বসিয়ে নিও; এখন দাও আমাদের জিনিষ দাও; দাদাবাবু কোথায়? ওঃ কতদিন দেখিনি; ছাই ঠিকানাটাও কি দিতে নেই। ছিঃ এই ঘরে কি থাকে, না কখনো ও থেকেছে। ও-সব ছেলে-মানুষী রাখো তোমরা; চলো সবাই বাড়ী চলো; এখানে থাকলে অসুখ না করাই ত আশ্চর্য্য।"

কথা কহিতে কহিতে রূপলাল ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া পড়িয়াছিল।

সুষমা তাহার হাতে চেকটা ফেরত দিয়া কহিল "ও আমি নোবনা, তুমি ফেরত দাও গে; আমার জিনিষও আমি দোবনা। ছেলেবেচা আমার ব্যবসা নয়।"

সহসা সুষমার এরূপ পরিবর্ত্তনে রূপলাল আশ্চর্য্য হইয়া গেল; সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে কহিল "সে কি, কাল যে বোল্লে?"

সুষমা কঠিনভাবে বলিল "তখন আমার মাথার ঠিক ছিলনা। তোমার বাবুকে বলো গে তিনি ছেলের জীবনের দাম নিতে পারেন; কিন্তু আমি ছেলের দাম নিতে পারিনা। অত ইতর আমরা এখনও হইনি।"

রূপলাল ক্ষণিক স্তম্ভিত হইয়া রহিল; এই তেজস্বিনী মেয়েটীর কথাগুলা সে খুব লঘুভাবে উড়াইয়া দিতে পারিলনা।

বারান্দায় ছেলেধরার দল দেখিয়া লক্ষ্মী ভয়ে ডাকিল "মা, ওরা যে এসে পোড়ল, আমায় নিয়ে যাবে। আমার ভয় কোরছে মা, তুমি এখানে এস।"

সুষমা কহিল "ভয় কি বাবা, এই যে আমি রোয়েছি।" সে ঘরের মধ্যে পা দিয়া সহসা চমকাইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া যতীনের মুখটা তুলিয়া ধরিল—নিশ্চল, মৃত্যু-শীতল! চোখ দুইটী পলকহীন পাথর! সুষমা শুধু একবার চীৎকার করিয়া উঠিল "উঃ ভগবান—এ কি কোরলে দয়াময়।"

মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া লক্ষ্মী আসিয়া তাহাকে ভয়ে জড়াইয়া ধরিল। রূপলালেরও ব্যাপারটা বুঝিতে দেরী হইলনা। সে উচ্চ চীৎকারে যতীনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুষমা নিশ্চল পাথরের প্রতিমার মত বসিয়া রহিল—নির্ম্মম ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া তাহার

অন্তরের কোমল বৃত্তিগুলি কঠিন হইয়া যেন অনুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

*   *   *   *

রাজাবাহাদুর বারবার কোচম্যান ও রূপলালকে হিসাব করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এত সকালে রাস্তায় নিশ্চয় গাড়ীর ভিড় থাকিবেনা,—কাজেই সেখানে চেক দেওয়া ও বলা-কওয়ায় খুব বেশী—আধ ঘণ্টার বেশী যেন কিছুতেই দেরী না হয়। কিন্তু আধ ঘণ্টার জায়গায় যখন এক ঘণ্টা হইয়া গেল তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেননা; আর একটা গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

বড় গাড়ীর পিছনে তাঁহার গাড়ী দাঁড়াইতেই তাঁহার কাণে রূপলালের ক্রন্দনের স্বর গিয়া বাজিল। তিনি সহিসকে বলিলেন "রূপলালের গলার আওয়াজ নয়?" সে কহিল "তাই ত মনে হোচ্ছে।"

রাজাবাহাদুর তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুত পাদক্ষেপে বাড়ীটার দিকে আগাইয়া চলিলেন। এই অপরিচ্ছন্ন গলিটায় চলিতে আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠার মাঝেও তাঁহার গা কেমন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তিনি নীচু চালাটার সামনে বারান্দার নীচে দাঁড়াইতেই রূপলাল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আছাড় খাইয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "এতদিনে কি দেখতে এলেন হুজুর? যদি এলেনই আর একটু আগে এলে যে···" সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজাবাহাদুরের সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তি কে যেন ইন্দ্রজালে হরণ করিয়া লইল—তাঁহার সমস্ত শরীরটা সহসা এত ভারী হইয়া উঠিল যে, পা দুইটী তাহার ভারে কাঁপিতে লাগিল। তিনি শুধু শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। যতীনের নিশ্চল দেহটা ভাঙ্গা তক্তাপোষের উপর জীর্ণ মলিন একটা কাঁথার উপর পড়িয়া ছিল সুষমা তাহার মাথাটা কোলে লইয়া পাষাণ-প্রতিমার মত বসিয়া ছিল। আর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উলঙ্গ রুক্ষকেশ, অনাহারক্লিষ্ট লক্ষ্মী শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া ছিল।

সে দৃশ্য দেখিয়া বনমালীবাবুর সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। একটা অব্যক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া তিনি সহসা দেওয়াল ধরিয়া মাটীর উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট পাণ্ডুর গণ্ড বাহিয়া নীরবে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। *

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে—লেখক।

বাসনার বিসর্জ্জন

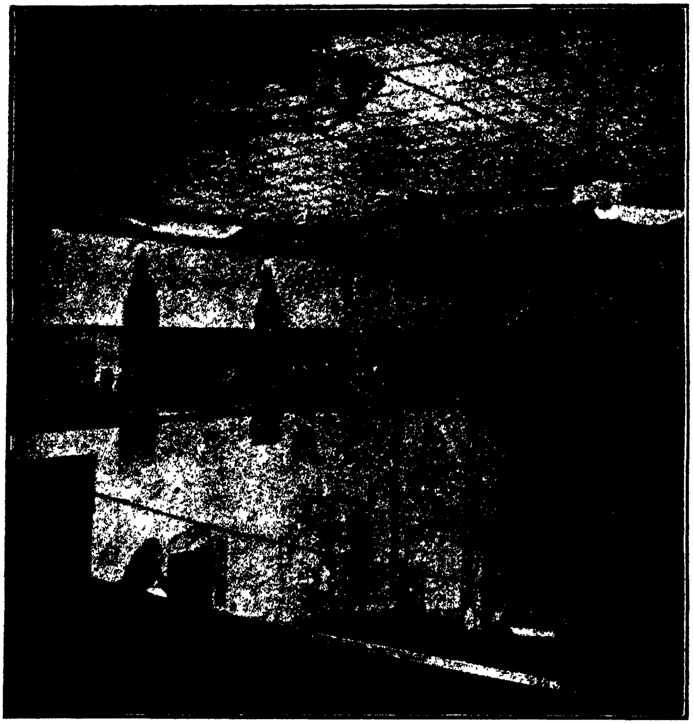
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

শূন্য এ মন্দির মাঝে পেতেছিনু তোমার আসন,
তোমার চলার তরে হয়েছিনু আমি রাজপথ;
তব প্রশংসায় ছিল উচ্ছ্বলিত আমার ভাষণ,
প্রাণপণে চেয়েছিনু হইবারে তব মনোমত।
চাহিনু আমারে আমি পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতে,
চাহি নাই রাখিবারে বন্ধ করে অন্ধকারে ঘরে;
চাহি নাই দস্যু সম কেবল লুটিয়া সব নিতে,—
তোমার পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়াছিনু থরে থরে।
পৃথিবীর সাথে মোর পরিচয় হয়েছে যখন,
তখন আলাপ হল আকাশের চন্দ্রমার সনে,—
আমার জীবনে হল যৌবনের নব জাগরণ
কত আশা গুঞ্জরিয়া উঠে মোর সুপ্তিভাঙ্গা মনে।
হৃদয় গগনে উঠে ভাসি রবি চন্দ্র মনোহর,
ঢালে সে কিরণ-ধারা, প্রতি কোণ করে আলোকিত;
তার মাঝে দৃপ্তরূপে দাঁড়াইয়া ছিলে হে সুন্দর
তোমারে হেরিয়া আমি হয়েছিনু বিস্ময়ে চকিত।
কত ফুটেছিল ফুল,—রাত্রি ক্রমে ফুরাইয়া আসে;
পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমে ঢলে পড়ে পশ্চিমের কোলে।
শ্রান্ত দেহ লুটে পড়ে;—ভবিষ্যৎ খিলখিল হাসে;
দূরেতে কে থাকি যেন অন্ধকার যবনিকা তোলে।
জয়ের বাসনা ছিল,—সে বাসনা গিয়াছে মিলায়ে;
পরাজিত, ক্লান্ত আমি, ধূলিমাঝে পেতেছি শয়ন।
ফুল গেছে ঝরে পড়ে সারারাত সুগন্ধ বিলায়ে,
প্রভাত আলোকে মোর বাসনার হল বিসর্জ্জন।

ধীরেন্দ্রনাথের ভিত্তিচিত্র ও ভারত-শিল্পের নূতন ধারা

অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আর্ট সাধনার বস্তু নয়, আর্ট তুলি ঝাড়লেই হয়,—এই এক ধুয়ো উঠেচে দেশময়। আবার একদল বলেন য়ুরোপের চরণতলে বসে 'নিগ্রোয়েট' আর্ট শেখ এবং বাজার-হাট তাতেই পূর্ণ কর। তাঁরা জোর গলায় বলচেন যে য়ুরোপ ছবির ভিতর ভাব-উপলব্ধি করা আর চায়না—ছবিটা "ছবি"—একেবারে 'প্যাটার্নের' মত মূক—কেবল বাহ্য পাগলামী। অতি অসভ্য, অতি প্রাচীন, প্রাগ্‌ঐতিহাসিক বর্ব্বর শিল্পীরা যেমন কেবল তাঁদের গৃহস্থালীর সজ্জা-উপকরণ হিসাবে শিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন,—তার ভিতর ভাব নেই, আছে কেবল ভঙ্গীটি—তাই হল আসল আর্ট এবং সেই অশিক্ষার ভাব ফোটানোই হ'ল একটা বড় কেরদানী।



দেয়ালে Fresco Painting. শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

আমরা এটা তলিয়ে দেখিনা যে, একটা কোনো ব্যাপার একটা দেশের পক্ষে খাটলেও যে অপর দেশের পক্ষেও সেটি ঠিক খাটবে, তারই বা মানে কি আছে? য়ুরোপের আর্টের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসের দিকটা দেখতে গেলে দেখা যায় যে, য়ুরোপ শিল্প-কলার সাধনায় অগ্রসর হতে হতে ক্রমশঃ এমন একটা রক্তমাংসওয়ালা বস্তু-তান্ত্রিকতার স্তরে এসে পড়ল যে, আর্ট সেখানে বিজ্ঞানে পরিণত হয়ে গেল। তাই তখন শিল্প-সাধনার পথ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হল যে, সেই পথ ধরলেই কতক পরিমাণে শিল্পী আখ্যা লাভ সকলের পক্ষেই সুলভ হয়ে গেল। একাডামীর শাসনে ও মডেলের সাহায্যে শিল্পকলা অগ্রসর হ'ল—পরিকল্পনার চেয়ে কলা-কৌশলই শিল্পের দ্বার চেপে ধরলে। কল্পনাটা কেবল ততটাই দরকার হ'ল, যতটা ছবিটিকে মডেলের রেখাভঙ্গীর ছন্দে-বন্ধে সে বাঁধা ও সুসজ্জিত হয়ে থাকুক—তাহলেই তার কাজ হয়ে গেল। তাঁরা হয়ত এখন বলবেন, র‍্যাফাল মাতৃমূর্ত্তিতে মার মুখে যে ভাব ফোটাবার চেষ্টা করেছিলেন, মাইকেল আঞ্জিলো বাইবেলের বিষয় নিয়ে যে-সব চিত্র এঁকে রেখে গেছেন, সে-সব সেকেলে শিল্পীদের সাহায্যে সাজিয়ে তুলতে প্রয়োজন হয়। তার পরেই দেখা যায় যে, এইরূপ বাইরের আবরণ নিয়ে আর্ট অগ্রসর হতে হতে তার চূড়ান্ত পরিণতির সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রতি বিতৃষ্ণার ভাবও উদয় হতে লাগল; এবং তারই ফলে "মেটেসি" "পিকাসো" প্রভৃতি শিল্পীরা পোঁচ-পাঁচ তুলির টানে ঘ্যাঁচ-

ঘোঁচ করে বর্ব্বর আর্টের নকলে ছবি আঁকতে সুরু করে দিলেন য়ুরোপে। ভাবটা হ'ল এই, যেমন একটী ছোট শিশু (যে ছবি আঁকার কিছুই জানেনা সে) আঁকতে গেলে হয়ত অসম্ভব রকমের বড় গোল মাথায় দুটো বড় বড় রসগোল্লার মত চোখ জুড়ে গুণে গুণে তাতে দাঁত ও দাড়ী চুল এঁকে দেবে—তেমনি শিক্ষিত শিল্পী শিল্প-শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও নিজেকে ঠিক সেই "প্রিমিটিভ ষ্টেজে" ধ্যানের দ্বারা বসিয়ে চোখ বুজে পোঁচ-পাঁচ ছবি আঁকতে লাগবেন। এইরূপ একটা পরীক্ষা (Experiment) হয়ত য়ুরোপে এখন দরকার হয়েচে; এবং তার ফলে য়ুরোপের পণ্য-বস্তুর নক্সারও একটা বিশেষত্ব প্রকাশ পাচ্চে এবং বোঝা যাচ্চে যে, "পিকাসো" "মেটেসির" এই বর্ব্বর ভাবের আর্ট decorative pattern মণ্ডন-শিল্প হিসাবে কার্পেটের উপর, টেবিল- ঢাকার উপর, পর্দ্দার উপর রেখা ও বর্ণ সন্নিবেশের বাহাদুরীর দরুণ বেশ নয়নাভিরাম হয় বটে, কিন্তু সেগুলি ছবি বা চিত্রকলা নয়—ছবি বলতে জগৎ যা বোঝে—তাতে কেবল রেখা ও বর্ণ-সমন্বয় ছাড়াও আরো কিছু বেশী দাবী করে থাকে। যেমন



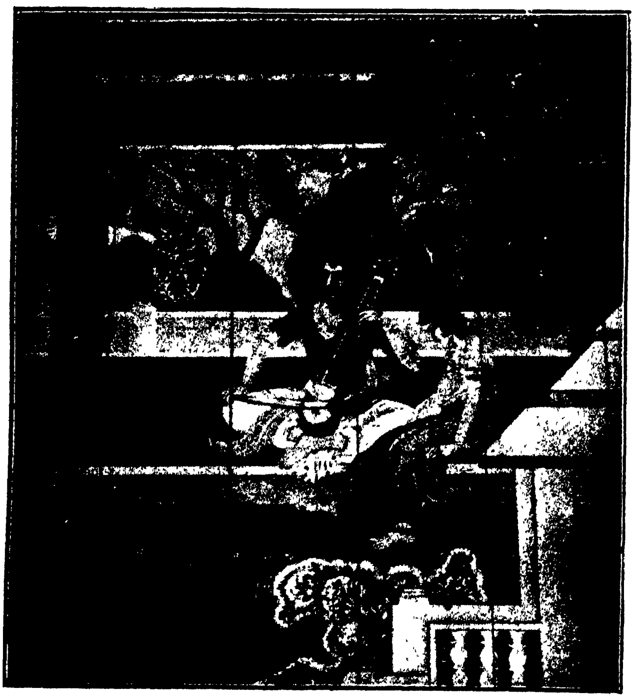
Fresco Painting.
মেঘমল্লার রাগ ছবির খানিকটা অংশ—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু-প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা অঙ্কিত



Fresco Painting.
বেহাগ-রাগের ছবির খানিকটা অংশ শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা



গোষ্ঠলীলার খানিকটা অংশ—দেয়াল চিত্র শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা



Fresco Painting. বসন্ত-রাগ ছবির খানিকটা অংশ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

কেবল ছন্দের আনন্দে কতকগুলি অবোধ্য শব্দ তালমান রেখে লিখে গেলেই কাব্য হয়না—বা গৎ বাজিয়ে গেলেই গান হয়না, তার মধ্যে শব্দের ধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গে কথার ভাবেরও প্রয়োজন,—ছবি আঁকার সার্থকতাও ঠিক সেইখানে। তবে decorative দিকটাও যে ছবিতে একটা আছে সেটা কেউই অস্বীকার করবেন না—কেন না, ছবি যে ফটো নয়, সে কথা নূতন করে এ-যুগে কাউকে আর বোঝাবার প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে প্রাচীন শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় যে, এ দেশে প্রকৃতির হুবহু নকল করবার চেষ্টা অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন শিল্পীরা কখনো করেন নি। তাঁরা কল্পনার ডানা মেলে দিয়ে যে কল্পলোকে বিচরণ করেছেন, সেখানে পৌঁছে আবার নিগ্রোদেব বর্ব্বর আর্টের পায়ের কাছে নেমে আসবার এ দেশের শিল্পীদের কোনোই প্রয়োজন দেখিনা। দেশের শিল্পীরা যদি দেশের ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে শেখেন, তাহলে তাকে

কেউ যে সহসা নাড়াতে পারবে না, তা আমরা জোর গলায় আজ বলতে পারি। কেবল noveltyই যদি আর্টের প্রতীক হয়, তবে originality, যেটা শিল্পীর পরিকল্পনার বিকাশের দ্বারা ধরা পড়ে, তার স্থান কোথায়? অবশ্য novelty হল পণ্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটি অস্ত্র, তাতেই তার পণ্য তীক্ষ্ণ ধারে না কাটলেও কাটে তার ভারে। এই noveltyর খোরাক এতাবৎকাল যোগাচ্ছেন "কিউবিষ্ট", "ফিউচারিষ্ট" প্রভৃতি শিল্পীরা; এবং এঁদের "লিষ্ট" ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। এখন বাকি আছি আমরা ভারতের শিল্পীরা। আমরাও কেননা তাদের সঙ্গে তালে-তালে পা ফেলে চলি? চাহিদা যেরূপ সেইরূপ যোগান দিলে চলবে না কেন? তা' বেশ ত। আমাদের দেশের চাহিদাটাই যে কি সেটাই একবার দেখা যাক্‌না। যদি বিদেশ আমাদের দেশ থেকে কি কি জিনিষ পণ্য হিসাবে আমদানী করতে চায় ভেবে দেখি ত দেখব যে Raw materials এবং art ware (পণ্য-শিল্প) কিউরিও হিসাবে ছাড়া অন্যান্য জিনিষ বড় বেশী কিছু তারা চায়না। তবে এ ক্ষেত্রে শিল্প-কলায় ও দেশী "মডার্ণিজিম্"—অর্থাৎ বর্ব্বর আর্টের আমদানী না করলেই কি নয়? অন্ততঃ শিল্প-কলায় দেশের শিল্পী যদি খাঁটি থাকেন তাতে দোষ কি?

একটু মনস্থির করলে বোঝা যাবে যে এখনকার দিনে যাই হোক চিরকালই শিল্প-কলা কোনো বাইরের প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে ওঠেনি। শিল্পীরাই তাদের অন্তরের চাহিদায় প্রকাশ করেচেন এবং পরে তার কদর ক্রমশঃ দেশে-দেশে হয়েচে। তাই দেখা গেছে যে ভাল-ভাল শিল্পীরা না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। হয়ত বা কোনো-কোনো শিল্পী মারা যাবার শত বৎসর পরে সম্মান লাভ করেচেন। বৌদ্ধ ও মোগল চিত্রকলা কত কাল ধামাচাপা পড়ে থাকার পর মাত্র ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের দ্বারা ভারত-শিল্পের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে দেশে-দেশে আদর পায়। তাই দেখা যায়, শিল্পীরা কেবল চাহিদার মুখ চেয়ে বসে থাকেননা। তাঁর সৃষ্টির আনন্দ তাঁকে পেয়ে বসে এবং তাঁর ব্যথা তিনি ভোগ করেন প্রসূতি যেমন সন্তানের জন্যে ভোগ করে থাকেন।

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে আনন্দের সংবাদ তাঁর নব-প্রবর্ত্তিত ভারত-শিল্পের ভিতর এনে দিয়েচেন, তার সাধনার পথে বাইরের দিকের নানান জঞ্জাল আজ নানা দিক থেকে এসে পড়লেও, আমাদের ভরসা এই যে, ভারত-শিল্পের প্রাচীন গরিমার ভিতর যদি কিছু সত্য নিহিত থাকে এবং শিল্পগুরু তার রস কিছুমাত্রও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিবেষণ করে দিয়ে থাকেন, ত, তার ফল যে ফলবেই তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।



বসন্তরাগের ছবি শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

আমরা এখানে যে শিল্পীর বিষয় বলতে গিয়ে এত অবান্তর কথা বললুম, ইনি, অর্থাৎ শ্রীমান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসের ভিত্তিগাত্রে ছবি আঁকার জন্যে প্রেরিত চার জনের মধ্যে একজন। ইনি বিলাতে

গেলেও সেখানকার অতি-আধুনিকতার ভূত এঁর কাঁধে ভর করে নাই; এবং ইনি দেশী-পন্থীর একজন যাঁরা শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথের দলভুক্ত। ধীরেন যখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়ে শিশু বিভাগে পড়েন, তখন থেকেই এঁর শিল্পানুরাগ জন্মে এবং এই লেখকের নিকট মুকুল, মণি গুপ্ত প্রভৃতির মত শিক্ষালাভ করেন। মণিভূষণও এঁরই মত শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়ন করার সময় থেকেই এই পাকাচ্চেন; এবং আধুনিক সভ্যতার যে দিকে ক্রমশঃ বিকাশ দেখা যাচ্চে, তাতে মনে হয় যে, অর্থ ও সামর্থ্য থাকলেই লোকে ক্রমশঃ তাঁদের আপন-আপন বাসভবনগুলিকে শিল্প-কলায় মণ্ডিত করে তুলবেন। এককালে রাজপুতনা অঞ্চলে শয়নকক্ষের দেয়ালে মথুরা বৃন্দাবন বা কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকার রীতি ছিল এবং এই সুখভবনে সুখ-নিদ্রা ত্যাগ করে উঠেই তীর্থ ও দেবলীলা দর্শনের কাজ হ'ত।



দেয়াল-চিত্রে "যশোদা ও কৃষ্ণ"— শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

লেখকের নিকট চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন। মুকুল ছিলেন এঁদের অগ্রজ।

ইণ্ডিয়া হাউসের শিল্পী-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু এখন না বলাই ভাল—গতস্য শোচনা নাস্তি। তবে ধীরেন্দ্রনাথ যে জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর দেশের বোনেদী-শিল্পের বোনেদ গড়ে এসেচেন, সেইটিই হ'ল তাঁর গৌরব করবার বস্তু। ধীরেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ দেয়ালের ছবি আঁকায় হাত এখন দেশের রুচির বদল হওয়ায়, শয়নকক্ষের স্থলে গোলকামরায় এবং তীর্থ ও দেব-দেবীর স্থলে নানা প্রকার ভাবব্যঞ্জক চিত্রকলা স্থান লাভ করতে পারে। মনে হয়, কালে আবার এই দেয়ালে ছবি আঁকার রেওয়াজ ফিরে আসবে; এবং দেশের শিল্পীদের মনের ভিতর যে সব ভাবরাজ্য অভাবের তাড়নায় শুকিয়ে যাচ্চে, তার বিকাশ হবার সুযোগ হবে।



উইক্ এণ্ড

শ্রীপ্রভাতকুমার দেবসরকার

…'না, জ্বালালে! রোজ রোজ আর পারা যায়না,'—বলিতে বলিতে বঙ্কু কাপড়ের পাড়ের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রোজই শুতে যাবার সময় মশারীর একটা না একটা কোণের দড়ি কম পড়বেই। কে যে দয়া করে, আজ পর্য্যন্ত তার তল্লাস পাওয়া গেলনা।—রাত্রে শুয়ে শুয়ে' উপায় ঠাওরান হয়; সকালে উঠে, শেষ পর্য্যন্ত কিছু হ'য়ে ওঠেনা,—এই যা!…সারাদিন খেটেখুটে কোথায় ঝপ্ ক'রে বিছানা পেতে শুয়ে পড়বে· তা' নয়; রোজ একটা না একটা ফ্যাসাদ লেগেই আছে,—হয় দড়ির কোন পাত্তা মিলবেনা, নয় পেরেক কয়টা দেওয়াল-গাত্র হ'তে অপসারিত হবে,—বরাত আর কি!…অনেক খোঁজ-খবরের পর যদি বা একটু দড়ি জুটলো, তাও আবার ছোট—কুলায়না। শেষটা রাগ-মাগ ক'রে মশারী গায়ে দিয়েই শুয়ে পড়ল,—বড্ড মশা কি না! হয় মশারী খাটাও, নয় গায়ে দাও—দুটোর একটা করতেই হ'বে। নইলে আধরাত্রে টেনে রাস্তায় এনে ফেল্‌বে—এমনি ওদের প্রতাপ।…আজ শুক্রুরবারের রাত। বঙ্কুর মেজাজটা অন্য দিন অপেক্ষা একটু ভাল,—কাল বাড়ী যাওয়া হ'বে। লোকে গরমের চোটে ঘরে টিক্‌তে পারেনা, আর বঙ্কু কি না নির্ব্বিবাদে মশারী গায়ে, ছোট্ট দেড়মানুষ সঙ্কুলান ঘরের মধ্যে শুয়ে রইল,—একটুও কষ্ট হলোনা।

সারারাত মশার কামড়ে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, বঙ্কু দেশের বাড়ীর স্বপ্ন দেখ্‌ল। সকালে উঠে দেখে, গা-হাত-পা বেশ চুলকাচ্ছে,—রসগোল্লার রসের মত চট্‌চট্‌ও করছে বটে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চুলকানির চোটে, গা-হাত-পায়ে বেশ দাগড়া-দাগড়া দাগ হয়েছে। আজ কিন্তু বঙ্কুর সেদিকে লক্ষ্যই নেই। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নিজের ঘরটীতে এসে, পেতলের বাটীতে ভিজান ছোলা চিবুতে বসে গেল। এটা বঙ্কুকে রোজই করতে হয়। বউ অনেক ক'রে মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছে,—ছোট মেয়েটা এখনও গিন্নিবান্নি হ'তে পারেনি, নইলে সেও একটা কিছু বলত।

…বঙ্কুবাবু আপনায় গিন্নিমা ডাক্‌ছেন—ওপরে,—বলে' ভজুয়া এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াল। ছোলা চিবুতে চিবুতে বঙ্কু বল্‌ল, 'যা, আমি যাচ্ছি।' গিন্নিমা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। ঘন ঘন 'হাই' উঠছে। বঙ্কু আস্‌তেই হাতের নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে কহিলেন, 'দেখ আজ একটু ভাল ক'রে বাজার কোরো,—রাত্রে নীলির 'মিসা' দিদিমণি এখানে খাবেন। মাংস-টাংসগুলো একটু দেখে নিও—যেন পচা-টচা না-হয়।'

বঙ্কু ছোট ক'রে ঘাড় নেড়ে 'আঁজ্ঞে হ্যাঁ' বলে বিদায় নিল।

·· ন'টা বাজতে-না-বাজতেই বঙ্কু অফিস্ বেরিয়ে পড়ল। গিন্নীমা জিজ্ঞেস করলেন, বঙ্কুর যে আজ এত তাড়া? বঙ্কু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, না, আজ শনিবার কি না! এদিক-ওদিককার কাজ করতে করতে প্রেসে দুটো বেজে গেল। বঙ্কুর এই সময়টা যেন দেরিতে কেটেছে বলে মনে হ'ল, ঘড়ির দিকে চেয়ে, অনেক কাজই গোলমেলে হ'য়ে গেল। বকুনি খেলেও যথেষ্ট। আজ বঙ্কুর থোড়াই কেয়ার, দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিটের ট্রেণ। বঙ্কু একটু সকাল সকাল ষ্টেশনে এসে হাজির হল। ছোট্ট লাইন। ভিড় বেশী। আগে থাক্‌তে না-গেলে, বাদুড়ের মত ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে যেতে হ'বে—বিশেষতঃ শনিবার। ট্রেণে নিঝ্‌ঝুম হয়ে' সারাপথ চলল। তার আশেপাশে সকলই ব্যস্ত। ছেলে বউকে মোটে এক সপ্তাহ দেখেনি। এতেই যেন কত যুগ দেখেনি বলে' মনে হচ্ছে। অনেক কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে চলল।…সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ী এসে পৌছল। 'কইরে অণি,—তোরা সব কোথা গেলি?'—বলে দোর-গোড়ায় পা দিতেই ছ'বছরের মেয়ে অণিমা, ওরফে অণি, দৌড়ে এল, বাপের হাত থেকে পোঁটলা নিয়ে এগিয়ে চলল। অণির মা তুলসীতলায় আলো দেখাচ্ছিলেন,—মেয়ের হাঁক-ডাকে তাড়াতাড়ি গড় সেরে দালানে এলেন। মেয়ে দিব্বি পোঁটলা খুলে,—আপনার জিনিষ বুঝে নিয়েছে। মা আস্‌তেই, চীৎকার ক'রে মাকে জানিয়ে দিল,—বাবা এ-ও-তা, কত-কী এনেছে। মেয়েদের বাচালতা সম্বন্ধে মায়েদের ভয়টা একটু বেশী। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে, না—করবে,—এই ভয়টা হয় সবচেয়ে বেশী। তাই খুব ছোটবেলা থেকেই শাসন আরম্ভ

হয়। অণির মায়ের সে ভয় আছে। তাই কিছু না বলে, মেয়ের পিঠে 'গুম্' ক'রে এক কীল বসিয়ে দিলেন। বঙ্কু বেচারা অত ভাবেনি, 'আহা! কী করলে,'—বলে মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল। অণির মা পা ধোবার জল এনে দেখে—মেয়ে তখনও সোহাগ ক'রে কোলে শুয়ে। 'নাও, নাও; অত আর—' বলে মেয়ের হাত ধরতে যেতেই,—বঙ্কু বাধা দিল। অণির মা গেল চোটে,—'অত আদিখ্যেতা আমি দেখতে পারিনে বাপু!' পরে স্বামীর পা পুঁছিয়ে রোয়াকে মাদুর পেতে বালিশ দিয়ে, চায়ের যোগাড়ে গেল। এতক্ষণ অণি চুপচাপ ছিল। মা চলে যেতে, বাপের সঙ্গে আবোল-তাবোল অনেক কথাই বলতে লাগল।

··রাত দশটা। অণি অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। বঙ্কু তক্তাপোষে বসে' বিড়ি টানছে আর ভাবছে,- 'তব্ যাই হোক্, বাবা কোঠাবাড়ীটা রেখে গেছ্‌লেন বলে' এক রকম চলে যাচ্ছে। নইলে এই বাজারে বঙ্কুর হাড়েও এমন বাড়ী ও করতে পারতো না। মেটে বাড়ীতে বাস করতে হতো, তায় আবার, প্রতি বছর খড় যোগাবার চিন্তায় মাথার ঝিকুর নড়ে যেত।' অণির মা রান্না-বান্নার কাজ সেরে ঘরে ঢুক্‌ল। গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীকে প্রণাম ক'রে নিল। বঙ্কু বেচারা আজ পর্য্যন্ত এর মানে ঠিক ক'রে উঠতে পারেনি। জিজ্ঞেস করলে উত্তর পায়—'করতে হয় যে!' ব্যাস্ এই পর্য্যন্ত। কেন? কী বিত্তান্ত? এ-সবের ধার অণির মা ধারে না। রাত বারটা-একটা পর্য্যন্ত অণির মা স্বামীকে জাগিয়ে রাখল। অণির মা আরম্ভ করল,—"ও-পাড়ার সিধুর মা এসেছিল,– দুধের দাম চাইতে; ক্ষেত্তর কাকা বলে গেছে, গোলায় যা ধান আছে, টেনে কসে আর এক সপ্তা চলবে; ভিখীরি দুর্গীর ছেলে, কী বাপু রোজ পায়, তার তাগাদা করতে এসেছিল; ভাল কথা মনে পড়েছে,—তুমি কাকে বাঁশ-বনটার কঞ্চিগুলো দেবে বলে' গেছলে? সে বাপু রোজ হাঁটাহাটি করে' পা ক্ষইয়ে ফেললে—তার যা' হোক করো। আর এক কথা, ওপাড়ার চুণী সেখ বড্ড বদমাইশি আরম্ভ করেছে। গরু ছেড়ে রাখে। বারণ করলে শোনে না। ফলন্ত ঝিংয়ে গাছগুলোকে খেয়ে গেছে,—তার একটা ব্যবস্থা করো। ফক্‌রে কাওরাকে রোজ বলে বলে আর পারলুমনা,—রোজ দুপুরে ছিপ ফেলে পুকুরে যে কয়টা চুণাপুঁটী আছে তাও শেষ করবে দেখছি। আর দেখো এ'মাসে আমার আর কাপড়চোপড় চাইনা, বরং সেই পয়সায় তোমার নিজের জামা কাপড় করো,—পেটে খেও। শরীরটাকে নষ্ট আমি করতে দেবনা,—কিছুতে।" বঙ্কুর ঘুমে চোখ ঢুলে এসেছিল। কতক কথা কাণে গেল, কতক বা গেলনা। অণির মা ঠেলা দেয়,—ওগো শুনছো? বঙ্কু জড়িয়ে বলে, হুঁঃ। বঙ্কু শুনুক আর নাই শুনুক,—অণির মায়ের ঘুম হয়না। রাত পুইয়ে যায়।

রোব্‌বার এসে যায়। বঙ্কু মেয়ের হাত ধরে, সেই সকাল খেকে পাড়ায় বেরিয়েছে। বারোটা একটার সময় ফিরতেই, অণির মা রেগেই অস্থির হলো। স্বাস্থ্যহানির নানা ওজর দেখাল। তাকে কোন রকমে শান্ত করে, বঙ্কু পিঠে মাথায় তেল চাপড়িয়ে চানটা সেরে এল। দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটে। অণির মায়ের এ'সময়টা ফুরসত নেই। তা নাহ'লে স্বামীকে জাগিয়ে রাখত। সন্ধ্যের সময় ওপাড়ার দীনু বাগ্দী ডেকে নিয়ে গেল, শালিশীর জন্যে। বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। আজও অণির মায়ের কথা ফুরোয়না। বকেই চলে। বঙ্কু,—হাঁ না, উত্তর দেয়। উপায় নেই। অণির মা যে চটে যাবে!

সোমবারে সকাল। আজ বঙ্কুকে যেতেই হ'বে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে সে কোন দিনই ফার্ষ্ট ট্রেণে যেতে পারেনি। অণির মা কিছুতে ছাড়েনা। আলুভাতে ভাত, আলুর ঝোল খাইয়ে তবে ছাড়ে। এর জন্যে প্রথম প্রথম অণির মা কত কান্নাকাটিই না করেছে, তবে স্বামীকে বাগে আনতে পেরেছে। দাঁতন করে, চানটা সেরে বঙ্কু বাড়ী ঢুকলো। সাড়ে আট্‌টার ট্রেণ। অণির মা জায়গা করে ভাত বেড়ে পাণ সাজতে বসে যায়। আজ চোখটা একটু ছল ছল করে। বঙ্কু ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে,—পাণের কথা মনে পড়ে না। অণিমা এসে দিয়ে যায়। মায়ে-ঝিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। বঙ্কু কোন দিকে না চেয়ে সোজা চলে। অণির মার চোখ ঝাপসা হ'য়ে আসে। অণিমা কেঁদে ফেলে। তাদের চোখের সামনে থেকে বঙ্কু অদৃশ্য হয়ে যায়।

······আফিসে আস্‌তে দেরী হ'য়েগেল। অনেক কথা শুনতে হল। দু'চার আনা ফাইনও হল। আজ দিনটা ম্যাচ্‌ম্যাচ করে। বঙ্কুর কোন কাজেই মন লাগেনা। তার মন আফিস ঘর ছেড়ে, ত্রিশ মাইল দূরে ঝোপের আড়ে বাঁশ-বনের পাশে ছোট্ট একটা কোঠাঘরের মধ্যে ছুটে যায়।······

বিধবা বনানী

শ্রীবিমলজ্যোতিঃ সেনগুপ্ত

সন্ধ্যা আসে ঘিরে
দূরপ্রান্তে শান্ত নদী-তীরে
নিঃস্তব্ধ চরণ ফেলে ধীরে অতি ধীরে ;
সাঁঝের তিমিরে
বনানীর শির হ'তে শেষ রশ্মি মুছে যায়,
ঘুচে যায়
অভাগীর সীঁথির সিঁদুর,
শোকাকুলা বিবশা বধূর
বক্ষ হ'তে নেমে আসে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস,—
বহিছে বাতাস,—
রবির বিয়োগে তার
বেদনার
অস্ফুট প্রকাশ।

হে বনানী! বিধবা বধূর বেশে রজনীর মৌন অভিসারে
পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকারে
নিস্ফল আঘাত হানি' আলোকের অন্ধ বন্ধদ্বারে,
অশ্রুসিক্ত ক্লান্ত আঁখি মেলি,—
উপেক্ষায় ঠেলি'
কল্লোলের আহ্বান ইসারা,
নীড় খুঁজে হবে নাকি সারা,
ওগো নীড়-হারা ?
সহসা ফুটিবে হাসি' নভতলে যবে ধ্রুবতারা
নির্ম্মল উজ্জ্বল
আলোয় উছল,
চিনিবেনা প্রতিচ্ছবি বিগত রবির
বিরহী কবির ?—
সুনীল অঞ্চল-প্রান্তে মুছি' আঁখিনীর,
কর দু'টি যুড়ি' শিরোদেশে
প্রশান্ত প্রণাম করি' তাঁহার উদ্দেশে,
বিহ্বল নয়নে
অনিমেষে চেয়ে তার পানে
হেরিবেনা তপনের বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ ?
ওগো মূর্ত্তিমতী
সুচরিতা সতী !

সূর্য্যাস্তের সাথে
আলোকের অন্তর্দ্ধানে অন্ধকার রাতে
যদি তুমি ভুলে যাও প্রিয় দয়িতরে,
দ্বিধাভরে
দুখের দেউল হতে দেবতারে দূর করি দিয়া,—
দুই বাহু প্রসারিয়া
অনন্ত প্রান্তরে,
ডেকে নাও অজানা পান্থরে,
যদি তব ক্লান্ত দেহখানি
নবীন পথিক আসি নিজ দেহ 'পরে লয় টানি,
তারার বিমলজ্যোতিঃ তব মন প্রাণে
আকুলতা নাই যদি আনে,
তবু তব বিস্মৃতির অনন্ত বেদনা
ভরিবে তাহার বুক—এ তার সান্ত্বনা।



নবীন যুবক

প্রবোধকুমার সান্যাল

৬

একদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। দুর্ব্বল দেহ বাতাসে দুলছে। যারা আহত হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে। গণপতি এখনো সেরে উঠতে পারেনি, কিন্তু তার মা তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। দাশু পুলিশের হেপাজতে। আমরা সবাই জানি, যেমন করেই হোক নিজেকে সে খালাস ক'রে নেবেই। দাঙ্গার নায়ক সেই বিড়িওয়ালার অবস্থা খুব খারাপ। রক্ত বমি করছে। বিশেষ আশা নেই।

কিন্তু জীবনের এই ত রূপ! কেন ছুটেছিলাম অন্যায়ের প্রতীকার করতে? কী ফল পেলাম? মানুষকে কোনোদিনই সংস্কার করা যায় না, এই সামান্য কথাটা মানুষ কেনই বা এত সহজে ভুলে যায়! পৃথিবীতে এত ধর্ম্মশাস্ত্র, এত নীতি-কথা, এত হিতোপদেশ, তবু ত অন্যায়ের প্লাবনে সব গেল ভেসে; বলদর্পী আর দুর্ব্বলের সেই চিরন্তন প্রশ্ন রয়ে গেল।

অনেক দুঃখে খুঁজে পেলাম আপন সত্যকে। আর দেবোনা নিজেকে ফাঁকি। আর বল্‌ব না সংসারে ভালোবাসা আছে, দাক্ষিণ্য আছে, সদ্বিবেচনা আছে। কে করে কা'কে আঘাত, কে প্রতারিত করে তোমাকে, কে কা'র পায়ের তলায় হয় দলিত—এ নিয়ে ভয়ানক আন্দোলন করার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলের পিছনে রয়েছে প্রকাণ্ড একটা নিয়ম, দুর্ব্বার একটা ইচ্ছাশক্তি, তুমি এবং আমি তার অঙ্গুলি হেলনে উঠি বসি। মানবচরিত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করবে? দানবকে করবে দেবতা? কালোকে করবে শাদা? সামান্য একটি ফুল ফোটাবার সাধ্য আছে তোমার? গাছের একটি পাতা তুমি নড়াতে পারো?

মায়ের কাছে যখন এসে পৌঁছলাম তখন অপরাহ্ণ। ঘরের ভিতরে নানা কণ্ঠের আলাপ শোনা যাচ্ছিল। আর রুচি নেই। মানুষের মুখ দেখে বেড়াবার আর উৎসাহ নেই, আর শুনব না তাদের কথা। কথায় ভ'রে উঠ্‌ল জীবন, কথার ভারে ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। সকলের কথা থাম্‌ল।

মা উঠে এসে হাত ধ'রে বসালেন। ও-পাশে জগদীশ, এদিকে বাণীপদ, শম্ভু ও প্রভাত,—লোকনাথ এখানেও নেই।

আদর অভ্যর্থনার পর আমার প্রশংসা সুরু হোলো। সংবাদপত্রে আমার সুখ্যাতি বেরিয়েছে। দাঙ্গা থামাতে গিয়ে আমি নাকি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছিলাম। আমার মতো তরুণ যুবক জাতির গৌরব, আমি আদর্শ।

ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অপরিসীম ক্লান্তিতে সব প্রশংসা ডুবে গেল। বড় ক্লান্ত, আমি বড় অবসন্ন। সুখ্যাতি আর শুন্‌তে পারিনে, এদের পাশে আছে গভীর একটা বিরক্তি, বিপুল অবসাদের বোঝা। কিন্তু নীরবে বসে রইলাম।

বাণীপদ বোধ করি অনেকক্ষণ আগে এসেছিল, এবার বললে, আমি উঠি তবে আজকের মতো।

তার মতো অভিজাত মানুষের পক্ষে আমাদের ভিতর আসাই একটা নূতন ঘটনা। মা বললেন, বিশেষ খুসি হলুম তোমাকে দেখে, মাঝে মাঝে এসো বাবা। তুমি কবি আর দার্শনিক, মুখোজ্জ্বল করেছ দেশের, তোমার ভরসা করি আমরা সবাই—

বাণীপদ বললে, আপনাদের খবর আমি নিয়মিতই রাখি। মাঝে কেবল দাঙ্গাহাঙ্গামা আর পুলিশের কাণ্ড দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেম।

মা হেসে বললেন, জানি এটা তোমার সহ্য হয় না। তুমি থাকো অনেক দূরে। হাঙ্গাম-হুজ্জতে তোমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রুচি, নীতি আর সৌন্দর্য্যবোধ উৎপীড়িত হয়। সবই জানি বাণীপদ। এদের সঙ্গে জীবনের কোনো অবস্থাতেই তোমার ঐক্য ঘটবে না তাও জানি বাবা। কিন্তু তার জন্যে তুমিও দুঃখ ক'রো না, এদেরো কোনো দুঃখ নেই।

বাণীপদ বললে, খবরের কাগজে লক্ষ্য করেছিলেম ঘটনাটা, কিন্তু আশা করিনি সোমনাথরা আছে এর মধ্যে, জানিনি যে আপনার উৎসাহ ছিল এই রক্তপাতে—

মা হাসলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন, আগুনটা জ্বল্‌ল না তাই আমার দুঃখ বাণীপদ। খবরের কাগজে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ব'লে ছাপা হয়েছে, এত বড় ভুল আর নেই। বিবাদ কেবল দাশু আর গণপতির মধ্যে, উদ্ধত অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল প্রতিবাদ। আমরা যোগ দিয়েছিলুম, অন্যায় করিনি।

তাঁর উত্তরে বাণীপদ বোধ হয় খুসি হোলো না, মা সেটা লক্ষ্য করলেন। তাঁর মুখ দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠ্‌ল। বললেন, তুমি ব'সে আছ ঐশ্বর্য্যের রত্নবেদীতে। বাণীর পূজো করো, বাণী শোনাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। আত্মীয়দের দূরে ঠেলে আত্মার উৎকর্ষ সাধন করেছ। এরা তোমার পর হয়ে গেছে তুমি বুঝতে পারোনি। কিন্তু এরা কি চেয়েছিল জানো? ঘোচাতে গিয়েছিল লজ্জা, মোছাতে গিয়েছিল কলঙ্ক। দুর্ব্বলের চিত্তগ্লানি তুমি বুঝবে না বাবা।

তাঁর কণ্ঠ আবেগে কেমন যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

মায়ের কণ্ঠে আঘাতও ছিল, অভিনন্দনও ছিল। দুটোই তরবারির মতো ধারালো। উপস্থিত সবাই স্পষ্ট জানে, বাণীপদর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নেই। ঘনিষ্ঠতা মাও চান্ না, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির ছায়ায় দাঁড়ানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। বাণীপদ নীরবে বসে রইল, মায়ের মেজাজটা সম্ভবতঃ তার ভালো লাগেনি। না লাগারই কথা। যদিও জানি তার চরিত্রটা তার সাহিত্যের মতোই শান্ত ও স্নিগ্ধ; কিন্তু দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তার, সেখানে মায়ের মতো তারও আপোষ নেই।

ভদ্র এবং বিনীত ভাবে এক সময়ে বিদায় নিয়ে সে উঠে গেল। বাইরে তার মোটর দাঁড়িয়ে ছিল।

মা কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। আপন মনে একবার হাসলেন। পরে বললেন, গণপতির কি খবর সোমনাথ?

বোধ হয় একটু সুস্থ আছে।—বললাম। কিন্তু কোনো কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর করতেই আজ আমার কিছুমাত্র উৎসাহ নেই।

জগদীশ বললে, তা ত থাকবেই, জীবন সংগ্রামের দুঃখ দহন এখনো তার অনেক বাকি।

মা উঠে গিয়ে ফস ফস ক'রে একখানা চিঠি লিখে বললেন, প্রভাত, তুমি একবার যাও বাবা গণপতির ওখানে। কাল সকালে আমি যাবো বলে এসো। আর এই টাকা ক'টা দিয়ো তার মার হাতে।

চিঠি ও টাকা নিয়ে প্রভাত তখনই চ'লে গেল। মা বাইরে গেলেন তার পিছনে পিছনে।

এবারে বললাম, তোমাকে দেখে বাঁচলুম ভাই জগদীশদা। কিন্তু তোমার মুখ শুক্‌নো কেন বলো ত?

জগদীশ নিশ্বাস ফেলে বললে, তোদের জন্যে ভেবে ভেবে। বাস্তবিক পরদুঃখকাতর হবার কারণটা নিজেই বুঝতে পাচ্ছিনে। আমার কি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য ঘটেছে?

কই, তোমার ত এ বালাই ছিল না?

তাইত, ভাবছি আর একবার তোদের জন্যে স্বরাজ আনার চেষ্টা করা যাক্। যাই জেলে। আর এই ধরো, বার দুই জেল্ খাটলেই নেতা। যেমন তেমন নেতা হলেও অন্তত দুবেলা ঘি-ভাতটা কেউ মারবে না। যাবো নাকি?

হঠাৎ তার এই বৈরাগ্যের ভণিতায় কৌতূহল এলো মনে। হেসে বললাম, বৌদিদির খবর কি?

প্রিয়ম্বদার? নতুন ভক্তের দল জুটেছে তাঁর। খুসি আছেন। স্ত্রীলোকের খবর কি পুরুষের কাছে নিতে আছে! ও খবর জানতে হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে।

তুমি কি সেই দুঃখেই জেলে যাবে?

অনেকটা তাই বটে। আশা ছিল পূজায় দেবী খুসি হবেন, বরদান করবেন। সোমনাথ, মেয়েরা প্রশংসার তোয়াজেই কেবল বাঁচে, সমালোচনার আঘাত সইবার মতো মেরুদণ্ড তাদের নেই।

বললাম, তোমার মেরুদণ্ড আরো পল্‌কা জগদীশদা। তুমি কি আগে তাঁকে বুঝতে পারোনি?

তিনি ত দেশের কাজ করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাজ গোছাতে। প্রশংসা না শুনলে তিনি চটে যান, জনসাধারণের আয়নায় আপন রূপের চাকচিক্য না দেখলে তিনি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন

এখন তিনি কোথায়?

কেন, বাড়ীতে। বাড়ীতে না থাকলে তাঁর চলবে কেমন ক'রে ?

মানে ?

মানে, অবিনাশবাবুর মোটর আছে, টেলিফোন্ আছে, এবং চাঁদা জোগাবার সাধ্য আছে। অবিনাশবাবুর মতো স্বামী না হ'লে দেশের কাজে যথেষ্ট অবসর মেলে না, এ কথা তোর বুঝতে দেরি হয় কেন রে বোকা !

এমন সময় মা এসে দাঁড়ালেন। আমাদের কথাবার্ত্তা থাম্‌ল। মা বললেন, তাহলে লোকনাথের খবর তোমরা পেলে না, কেমন ?

জগদীশ বললে, কই আর পেলুম মা, তার মাসির ওখানে গিয়েছিলুম, তিনিও জানেন না। আমার বিশ্বাস সে কল্‌কাতায় নেই মা। কিছুদিন থেকেই তার মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। আশ্রমের স্বামীজী বললেন, সে নাকি আসামের বন্যার স্বেচ্ছাসেবক হয়ে চ'লে গেছে। তার অনেক দুর্ব্বুদ্ধি ছিল কিন্তু পরোপকার করার বোকামিটা ছিল না মা।

পরের কাজে তার উৎসাহ আছে ?

না। কিন্তু বোধকরি ওইটে উপলক্ষ্য। সবাইকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাওয়াটাই তার অভিসন্ধি। এখন যদি সে সন্ন্যাসী হয় তবে বুঝবো ভবিষ্যতে দেশে গাটকাটার অভাব ঘটবে না।

মা প্রথমটা জগদীশের কথায় হাসলেন। পরে বললেন, ভুল করেছে সে। ছেড়ে যাবে কোথায়, মন যে যায় সঙ্গে। কিছু না পেয়ে যারা সন্ন্যাসী হয়, কিছু পেলেই আবার তারা ফিরে আসে। আমার ছেলেরা দরিদ্র আর নিরুপায়, তাই তাদের জীবনে এমন বিশৃঙ্খলা। বাণীপদর সঙ্গে তোদের বন্ধুত্ব চলে না বাবা, সে পেয়েছে সব। পেয়েছে ঐশ্বর্য্য, নিশ্চিন্ত অন্ন, অবারিত স্বাচ্ছন্দ্য,—সংসারের সব জাতের স্নেহ তার দরজায় বাঁধা। নির্ব্বিঘ্নে বাঁচে ব'লেই তার কাব্য আর সাহিত্য-সৃষ্টির অবকাশ আছে যথেষ্ট। তার সমাজ আর তোদের সমাজ এক নয় বাবা।

শম্ভু চুপ ক'রে বসে ছিল। মা তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, শম্ভু, তুই যা বাবা আসামে, খুঁজে নিয়ে আয় লোকনাথকে। সবাইকে সে ত্যাগ ক'রে গেছে কিন্তু আমি তাকে ছাড়তে পারব না।

শম্ভু উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। বললে, পারব বলেই যাচ্ছি। যতদিন না পারব ফিরব না মা। আশীর্ব্বাদ করো মা, যারা দুঃখী, যারা পতিত, দুর্ভাগ্যে যাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, তোমার কাছেই তাদের যেন এনে হাজির করতে পারি।

মা আশীর্ব্বাদ ক'রে হেসে বললেন, তোদের যদি আশ্রয় দিই তবে জান্‌বি আমি নিজেও আশ্রয় পেলুম।

কিন্তু আমাদের সকল আলাপের পিছনে কেবল যে একটা কঠিন সমস্যাই ছিল তাই নয়, ভয়ানক একটা নিরুৎসাহও ছিল। ভগবতীকে নিয়ে আমরা সবাই বিব্রত। বঙ্কিম আর ভগবতীর সমস্যা কেবলমাত্র মা, জগদীশ আর আমি জানি। ঘটনাটা গোপনীয়।

একদিন বললাম, মা, তোমাকে কেন্দ্র ক'রে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রের দল ঘুরব তুমি রাজি আছো ত ?

মা আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, একদিন তোরাই ত আমাকে ত্যাগ করবি বাবা।

এই কথাটা বহুবার শুনেছি তাঁর মুখে। কখনো অর্থ বুঝেছি, কখনো যেন শুনতেই পাইনি এমনি ভাবে চুপ ক'রে গেছি।

বললাম, আমরা তোমাকে ত্যাগ করব এ তুমি কল্পনা করতে পারো ?

মা বললেন, পারি বৈ কি বাবা। এ ত' অতি সহজ কথা। দেশে দেশে তোরাও মা পাবি আমিও পাবো দেশে দেশে সন্তান। ছাড়াছাড়ি হতে পারে একথা ভাবা ত কঠিন নয় !

একটু আহত হলাম। বললাম, তবে কি বুঝবো তোমার সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক, স্থায়িত্বের দিক থেকে তার কোনো দাম নেই ?

নাও থাকতে পারে সোমনাথ। তোরা ভাবিস, আমি কিন্তু ভাবিনে। যে মা গর্ভে ধারণ করেছে, অনেক সন্তান বিশেষ বিশেষ কারণে তাকেও ত ছেড়ে আসে।

উত্তেজিত হয়ে বললাম, তারা পশু, তারা ইতর, তারা—

মা হেসে বললেন, সবাই ত পশু নয় বাবা, তাদের মধ্যে

মানুষও আছে। বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ববোধের যে ধারা তাকে মান্‌তে গেলে অনেক মা'কে হয়ত ছাড়তেই হয়, অনেক সন্তানকেও দিতে হয় ভাসিয়ে, এ কথা বোঝা ত' কঠিন নয় সোমনাথ ?

তুমি কী বলতে চাও মা ?

বলছি যে মাতৃস্নেহটা বড় কিন্তু তার চেয়েও বড় নির্ম্মল নির্লিপ্ত বিবেক-বুদ্ধি, নিরভিমান জ্ঞান, উদার জীবনাদর্শ— এ যেখানে নেই সেখানে মাতৃস্নেহ কেবলমাত্র অন্ধ একটা পাশবিক বন্ধন, তাকে ছিঁড়ে ফেলাই স্বাস্থ্যকর।

বললাম, তুমি কি বলতে চাও তোমার আদর্শ আর মতবাদের সঙ্গে আমাদের না মিললে তুমি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে ?

হ্যাঁ। যদি তোদের গর্ভেও ধরতুম তাহলেও ত্যাগ ক'রে যেতুম সেই কারণে।

পারতে ?

নিশ্চয় পারতুম বাবা, সেই ত আমার ধর্ম্ম, সেই আমার মনুষ্যত্ব। যদি না পারতুম তবেই ঘট্‌ত আমার অপমৃত্যু !

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। আমার মাথার উপর তাঁর হাতখানা স্থির হয়ে ছিল। এক সময়ে মৃদুকণ্ঠে বললাম, আচ্ছা মা, তোমার কি এমন কোনো কথা আছে যার সঙ্গে আমাদের আদর্শের বিরোধ ঘট্‌তে পারে ?

মা হেসে বললেন, থাকা কি সঙ্গত ? আমি আশা করব, মা ও সন্তানের মধ্যে কোথাও বিরোধ নেই ; আর যদি থাকেই তাতেই কি আমি ভুল্‌ব যে তোরা আমার দুঃখের সন্তান ? আমি ত পাথর নই বাবা।

এমন সময় নিচে থেকে কা'র গলার আওয়াজ শোনা গেল।

মা উঠে বাইরে গেলেন। কে যেন জগদীশের খোঁজে এসেছে। অস্পষ্ট গলার আওয়াজে বোঝা গেল, স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। তিনি যে প্রিয়ম্বদা এ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইল না।

নীরবে বসে রইলাম। সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দ উপরে উঠে এল। মা বললেন, জগদীশ ত এখানে থাকে না, আসে মাঝে মাঝে। তোমাকে ত চিন্‌তে পাচ্ছিনে মা ?

উত্তরে শোনা গেল, সোমনাথবাবু আছেন ? তাঁকে হলেও চলবে।

পরিচিত কণ্ঠ শুনে তৎক্ষণাৎ উঠে বাইরে এলাম। সুমুখে দাঁড়িয়ে হেমন্ত। তাড়াতাড়ি সে মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় নিলে। আমি বললাম, চিনতে পারলে না মা, এ যে হেমন্ত।

তুমি হেমন্ত ? ওরে আমার লক্ষ্মী, এসো মা এসো।— মা তার চিবুক ধরে আদর করলেন। বল্লেন, কতদিনের সাধ, তোমাকে দেখ্‌ব। হঠাৎ আবির্ভাব ঘট্‌ল কিসের টানে ?—মা হাসতে লাগলেন।

রুক্ষ চুল, শুষ্ক শরীর, উপবাসী ও পথশ্রান্ত,—হেমন্তর চঞ্চল চোখে উদ্বেগ। কিন্তু মায়ের দিকে একটিবার মাত্র তাকিয়ে দ্রুত আমার কাছে এসে মায়ের সুমুখেই বললে, তুমি নাকি মার খেয়ে হাসপাতালে গিছ্‌লে ? এই ত মাথায় দাগ, এই ত হাতে দাগ,– কে করেছিল এমন সর্ব্বনাশ ? কা'র জন্যে তোমার এই শাস্তি ?—চোখে তার জলের রেখা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

আমি বিব্রত, বিপর্য্যস্ত—মায়ের সম্মুখে মাথা হেঁট ক'রে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। লজ্জায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছিল।

মা চলে যাবার পর বললাম, তুমি যে এলে ঝড়ের মতন ? খবর দিলে কে ?

হেমন্ত বললে, জামাইবাবু চিঠি দিয়েছিলেন।—তারপর সে ছেলেমানুষের মতো পুনরায় বললে, আমি কিন্তু এবার দিনকতক কল্‌কাতায় থেকে যাবো—কেমন ?

তথাস্তু। এখন ঘরে গিয়ে বসবে চলো।

হেমন্ত জানে না কোথায় ভেঙেছে আমার মন। কোথায় কখন্ কা'র মন ভাঙে, কোথায় অলক্ষ্যে গ'ড়ে ওঠে, কেই বা জানে তার গোপন ইতিহাস ! একদিন যে আগ্রহ ও আয়োজন নববর্ষার মেঘের মতো আমার সকল আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল আজ তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, পরিচ্ছন্ন ও পরিমার্জ্জিত, বিবর্ণ ও নির্লিপ্ত। জলে রঙ ধুয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে রামধনু,—বৃহৎ বৈরাগ্যে এখন সমস্ত মন যেন নিস্পৃহ।

বললাম, কিন্তু আমার অন্য কাজ আছে হেমন্ত।

কী কাজ ?

এখনই পরিষ্কার ক'রে বলতে পারিনে। কিন্তু অন্য কাজ আমি করব। এমনও হতে পারে ভাববোই কেবল,

কাজ কিছু করব না। এক সময় সব কিছুর প্রতিই থাকে আমার আগ্রহ, অত্যন্ত নিবিড় ক'রে জড়িয়ে থাকি সংসারের সব হাসিকান্নার সঙ্গে, কিন্তু তারপর দেখতে দেখতে রং আসে ফিকে হয়ে। এ কেন? এর পিছনে কী রহস্য?

নিচে পায়ের শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হয়ে ফিরে তাকালাম। চেয়ে দেখি, জগদীশ গুটি গুটি এসে দাঁড়িয়েছে।

হেমন্ত হেসে উঠে গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে। বললে, আপনার জন্যে সেই কখন্ থেকে ব'সে আছি জামাইবাবু।

সত্যি বলচিস ত? বেশ, চিঠি পেয়েই তুই যে আসবি এ ত' জানা কথা। এবার সাম্‌লা তোর সোমনাথকে। বাবুকে সঙ্গে আনলেই ত পারতিস, তাকে উপলক্ষ্য ক'রে একটা বাসা ভাড়া নিলে একরকম ভালোই হোতো। মায়ের চেয়ে মাসির দরদটাও মানিয়ে যেতো।

হেমন্ত বললে, এই বা মানাবে না কেন?

জগদীশ বললে, কোম্পানীর রাজত্বে বিপত্নীক ভগ্নিপতি আর প্রোষিত ভর্তৃকা শালীর একত্র থাকার আইন নেই ভাই।

আমার দিকে ফিরে হেমন্ত বললে, আপনি কোথায় থাকবেন?

উত্তরটা দিলে জগদীশ। বললে, ওর কথা আর বলিসনে হেমন্ত। শীতের মরা ডালে শেষ পাতাটির মতন ও সংসারকে ছুঁয়ে রয়েছে, যাই যাই করছে। ওর ভরসা যে করে বালির ওপর সে ঘর বাঁধে। ও দয়িত হতে পারে দায়িত্ব নিতে পারে না,—ও যে তরুণ! ভরসা করিসনে ভাই তরুণদের, বর্ষার বন্যার মতন ওরা ক্ষণস্থায়ী, ভয়ানক গতিশীল। তৃষ্ণার জল ওরা দেয় না, ওরা ভাসায় প্লাবনে।

হেসে বললাম, জগদীশদা, বৃদ্ধ বয়সে তোমার ঈর্ষা?

ঈর্ষাটা কি বল্? আমার শালী তোকে ভালোবাসে এইজন্যে? হরি হরি, আমি যে বড় গাছে নৌকো বেঁধেছি রে, আমার ভাবনা কি! ফ্যাশনেবল্ সমাজে এই হেমন্তর দাম তিন পয়সা।

অনেকক্ষণ হেসে আমাদের হাসি থাম্‌ল। তারপরে কথা হোলো, মা এসে হেমন্তর থাকার ব্যবস্থা করবেন। যদি এখানে সুবিধা না হয় তবে আশ্রমে জীবনকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানে হেমন্তকে কিছুকাল রাখা যাবে, অতঃপর বাসা ভাড়া করবে জগদীশ। বাবুকে আনা হবে।

প্রিয়ম্বদা দেবীর কি খবর জামাইবাবু?

তাঁর খবর ভাই নিত্যনূতন।

কেন?

আমি তাঁর যশপ্রচারের কর্ম্মচারী; যাকে বলে, 'পাব্‌লিসিটি অফিসার।'

কি কাজ তাঁর?

দলাদলি। অর্থাৎ দলিত করবেন তিনি সবাইকে। তিনি যে-পাড়ায় থাকবেন আর কোনো নেতা অথবা নেত্রী মাথা তুলবেন না সে-পাড়ায়।

এই দলে আপনি থাকেন জামাইবাবু?

মুহূর্ত্তের মধ্যেই জগদীশ আত্মসম্বরণ করল। বললে, বেশ লাগে তাঁকে, আরো বেশ লাগে তাঁকে বিদ্রূপ করতে।

এমন সময় মা এসে পড়লেন। সস্নেহ হেসে বললেন, বিশেষ কাজে বিশেষ ব্যস্ত, তোমাদের আলাপে যোগ দিতে পাচ্ছিনে। তুমি ত এখন থাকবে মা?

হেমন্ত বললে, যদি সুবিধে হয় তবে কিছুদিন থেকে যেতে পারি মা।

বেশ ত, জগদীশ করবে তোমার থাকার ব্যবস্থা। তুমি যখন রইলে তখন একটু অবসর পেলেই আমি গল্প করতে বসে যাবো। তুমি কোথায় নিয়ে রাখবে ওকে, জগদীশ?

কোথায় আপনি রাখতে বলেন?—জগদীশ বললে।

আশ্রমে যদি রাখো?

কিন্তু সেখানে ওকে ত একলা থাকতে হবে মা?

ক্ষতি কি? থাকবে জীবনকৃষ্ণর তত্ত্বাবধানে, কোনো ভয় নেই। বেশিদিন ত' হেমন্ত আর থাকবে না!

বেশ, তাই ওকে নিয়ে যাই।

তাই যাও, কারণ আমি ত এখানে থাকচিনে। বোর্ডিংও তু'লে দিচ্ছি। কেবল ভগবতী থাকবে আমার কাছে। এই ব'লে তিনি অগ্রসর হলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বারান্দা পার হয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি খাটের একান্তে ভগবতী শুয়ে রয়েছে। স্কুলে সে পড়ায় কিন্তু বিশেষ কারণে দিন আষ্টেকের জন্য তাকে ছুটি নিতে

হয়েছে। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েও সে জাগল না, কিন্তু জানি এ তার ঘুম নয়। চোখে তার ঘুম আর নেই। কথাবার্ত্তা বলা একরূপ সে ত্যাগই করেছে।

ভিতরে এসে মা দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। পরে বললেন, মুখেই আমার সাহস কিন্তু আমি আর কিছু ভেবে স্থির করতে পাচ্ছিনে। আমি অত্যন্ত বিপন্ন, অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষায় পড়েছি বাবা, জানিনে এর থেকে কেমন ক'রে উত্তীর্ণ হবো। বঙ্কিম আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে।

মাথা হেঁট ক'রে বললাম, কারো কোনো অপরাধ নেই মা, এই আমাদের নিয়তি।

মা বললেন, তাই ব'লে চুপ ক'রে থাকলে ত চলবে না বাবা, প্রত্যেকটি দিন এখন থেকে দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠবে। এদিকের অবস্থা বুঝতে পারচিস ত? বোর্ডিং যাবে উঠে, আমার হবে দুর্নাম, কলঙ্ক রট্‌তে আর বাকি নেই। কা'র মুখে হাত চাপা দেবো? ভগবতীর মাথা ত হেঁট হোলো চিরদিনের জন্য, আর কোনোদিন ও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমাকে বল্ বাবা, আমি—মেয়েমানুষ কী করতে পারি!

তাঁর এই অসহায়তায় ভিতর থেকে আমি যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠলাম। বললাম, আমাকে আদেশ করো কি করতে হবে? আমি তোমার জন্য সকল রকমের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবো মা।

পারবি বাবা?

পারব। তুমি আদেশ করো মা।

পারবি বাবা?—উগ্র আনন্দে তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে উঠ্‌ল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন, আবার বলছি, পারবি ত?

আমি তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, তবে আজ রাত্রে একবার আসিস বাবা আমার কাছে—যত রাতই হোক—

ভগবতী পিছন ফিরে উঠে ব'সে চোখের জল মুছলো। আমি সেইদিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে এলাম।

সিঁড়িতে নামবার আগে ফিরে দেখি, জগদীশ আর হেমন্ত আগেই চ'লে গেছে। আমারো আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। সোজা নেমে পথে এসে পড়লাম।

পথে সন্ধ্যা নাম্‌ল। কোনো কাজ নেই, মায়ের আদেশ পালন করবার আগে আজ কেবলমাত্র একবারটি নিজের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ক'রে নেবার চেষ্টা করছি।

অনেক কথা ভাবছিলাম এমন সময় পিছন দিক থেকে এসে কে আমার হাত চেপে ধরল। অন্ধকারে মুখ ফিরিয়ে দুখীরামকে চিনতে আমার বিলম্ব হোলো না। সে বললে, দাদাভাই?—বলেই কেঁদে উঠ্‌ল।

তার কান্না দেখে হঠাৎ আমারো চোখে জল এসে পড়ল। এই বৃদ্ধের উপর বাল্যকাল থেকে আমি অত্যাচার করে এসেছি, সেও নিঃশব্দে আমার সকল উৎপাত সহ্য ক'রে এসেছে, কিন্তু আমি তার স্নেহের যোগ্য মূল্য কোনোদিন দিইনি।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার হাত ধ'রে বললাম, তোর এমন অবস্থা হোলো কেন দুখীরাম?

দুখীরাম জানালো, বাবা তাকে বিতাড়িত করেছেন। চাক্‌রী আর তার নেই। সবই জানি, তা'র দুর্ভাগ্যের আদ্যোপান্ত ইতিহাস আমিই সব জানি। আমারই কৃতকর্ম্মের শাস্তি মাথা পেতে নিতে সে একটুও কুণ্ঠিত হয়নি। একসময় সে বললে, তিনমাস আমার জেল্ হয়েছিল। জেলে গিয়ে এই বাঁ-চোখটায় অসুখ করে, কিন্তু এ আর ভাল হয়নি ভাই, একটা চোখ নষ্ট হয়ে গেল।

আমি তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললাম, আয় তুই আমার সঙ্গে। তোকে আমি আশ্রয় দেবো কিন্তু আমাকেও তুই দিবি আশ্রয়। তোর শেষ বয়সের ভার আজ থেকে আমি তু'লে নিলুম দুখীরাম। আয়।

আশ্রমে এসে যখন পৌছলাম তখন কিছু রাত হয়েছে। সেটা শুক্লপক্ষ, হয়ত একাদশী অথবা দ্বাদশী হবে। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আশ্রমটা শাদা হয়ে উঠেছে। আলো জ্বালাবার আর প্রয়োজন হয়নি, সব আলো নেবানো। রোয়াকে উঠে দুখীরামকে আমাদের ঘরখানা দেখিয়ে দিলাম। বললাম, মাদুর বিছনো আছে, শুয়ে পড়। আমি খাবার ব্যবস্থা ক'রে আনিগে।

সে প্রতিবাদ করতে গেল, কিন্তু তার আগেই আমি

পথে নেমে গেলাম। আজ তার কিছু সেবা ক'রে আমি ধন্য হবো।

দুখীরামকে সুস্থ ক'রে শুইয়ে মেয়েমহলের দিকে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম, দরজার কাছে ঘোমটা দিয়ে হেমন্ত বসে রয়েছে এবং তারই অদূরে দালানের ধারে জীবনকৃষ্ণ নতমস্তকে দাঁড়িয়ে। আলোটা আমি জ্বেলে দিলাম। কিন্তু দু'জনের কেউই আমার সঙ্গে কথা বললে না, বরং আমাকে দেখে ব্রহ্মচারী তাঁর আহ্নিকের ঘরে চ'লে গেলেন।

জগদীশ কোথায় গেল হেমন্ত ?

হেমন্ত একরকম বিস্ময়কর কণ্ঠে জবাব দিল, ঘর খুঁজতে গেছেন।

ঘর খুঁজতে ? তুমি থাকতে চাওনা এখানে ?

না।

আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, এতক্ষণ সে কাঁদছিল। সম্পূর্ণ নূতন ঘটনা। সে যে চোখের জল ফেলবে এমন আশা আমি করিনি। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বললাম, এত কষ্টই যদি হবে তবে মাকে আর বাবুকে ছেড়ে এলে কেন ?

হেমন্ত উত্তর দিল না। বললাম, বেশ ত, এখানে যদি ভালো না লাগে এখনই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তুমি ত আর জলে পড়োনি।

হেমন্ত মুখ তুলে বললে, কেন তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে বলো ত ?

তার কণ্ঠ শুনে আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সে পুনরায় বললে, চিরদিনের জন্য যাকে মন থেকে মুছে দিয়েছি, তাকে দেখবার দরকার নেই ত আমার ? কেন তোমরা আমাকে এই বিপদে ফেলেছ ?

কী হোলো হেমন্ত ?

চলো এখান থেকে আমাকে নিয়ে। এখনই চলো, একদণ্ডও আর থাক্‌ব না।

বেশ ত, এখনই যাবে। কিন্তু ব্যাপার কি ?

জীবনকৃষ্ণর ঘরের দিকে চেয়ে হেমন্ত বললে, উনি যে এখানে এসে আশ্রম করেছেন আমি কি জানতুম ?

স্বামীজীর কথা বল্‌চ ? চেনো তুমি ওঁকে ?

হ্যাঁ, চিনতাম আট বছর আগে। এখন আর চিনিনে। তোমাদের মতো আমিও ওঁকে শ্রদ্ধা করতে পারব কিন্তু সম্পর্ক রাখতে পারব না। চলো, যেদিকেই হোক তুমি আমাকে নিয়ে চলো। এই ব'লে হেমন্ত উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে সমস্তটা উপলব্ধি করলাম। বললাম, আমি ত জানতুম না জীবনকৃষ্ণ বিয়ে করেছেন, কোনো লক্ষণই তার পাইনি। তোমার স্বামী উনি ? আশ্চর্য্য, এ কথা আমরা কেউই ত জানতুম না ?

জ্যোৎস্না রাত্রির জনহীন পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছলাম মায়ের ওখানে।

মা ছিলেন জেগে। ডেকে নিয়ে গেলেন ভগবতীর ঘরে। জগদীশ এলো, এলো হেমন্ত।

ভগবতী আলোটা জ্বেলে দিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে একপাশে বসল। মা ঘরের সব জান্‌লাগুলি খুলে দিলেন। ভিতরের আলোর সঙ্গে বাইরের জ্যোৎস্নার একরূপ মিলিত আলোয় আমাদের ঘরের চেহারা গেল বদ্‌লে।

মা, ভগবতীকে ডাকলেন, ভগবতী কাছে এসে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়াল। মা তার হাতখানি নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এর সামাজিক সম্মানের দায়িত্ব আজ থেকে তোর হাতে বাবা। তোকে যেন ভগবতী স্বামী ব'লে পরিচয় দিতে পারে।

চমকে উঠলাম, বললাম, কিন্তু মা, ও যে—

জানি বাবা, কিন্তু যে-বিপদে বঙ্কিম ওকে ফেলে গেছে, বন্ধু হয়ে তোকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সোমনাথ। স্বামীর পরিচয় না থাকলে ওর সমস্ত জীবন আজ থেকে নষ্ট হতে থাকবে। এ কি তুই সইতে পারবি ?

হেমন্ত আমার দিকে চেয়ে বললে, মার আদেশ অমান্য ক'রো না, এই সামান্য কর্ত্তব্য তোমাকে করতেই হবে। এ ভার তোমার, এ ভার আমার।

জগদীশের দিকে তাকালাম, সে হেসে বললে, মন্দ কি রে, জীবনে এমন খেলা ত খেলতেই হয়। বিনামূল্যে তুই ত সংসারের সবই পেলি রে গাধা !

যে দ্বিধাটুকু আমার এসেছিল তার জন্য লজ্জিত হলাম, তাড়াতাড়ি মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, ক্ষমা করো মা, ভীরুতায় এসেছিল সঙ্কোচ। তোমার আশীর্ব্বাদই আমার কাছে বড়ো।

মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে সাশ্রুনেত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন। ভগবতী তখন ফুলে ফুলে কাঁদছিল। হেমন্ত তার পাশে বসে মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

হঠাৎ জগদীশ বললে, সবারই একটা যাহোক উপায় হোয়ে গেল। কেউ পেলে স্ত্রী, কেউ পেলে স্বামী—

মা হেসে জগদীশের হাত ধরলেন। বললেন, তোকে আদর দেবো না জগদীশ, তোর প্রাপ্য কিছু নেই, স্নেহ বঞ্চিত হয়ে চিরদিন ঘুরবি তুই সংসারের আনাচে কানাচে—

মায়ের কথায় সচকিত হয়ে আমরা সবাই ফিরে তাকালাম। মা বললেন, আশীর্ব্বাদ নয়, তোকে দেবো অভিসম্পাৎ। তুই বেড়াবি মরুভূমিতে—

কি বল্‌চ মা?—আমি বললাম।

ঠিকই বল্‌চি বাবা।—ব'লে মা তাকালেন জগদীশের দিকে। আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, তোকে কাজ দেবো যা সকলের চেয়ে কঠিন। জীবন যেখানে মিথ্যায় ভ'রে উঠেছে, যেখানে ছদ্মবেশ আর অসাধুতা বেঁধেছে বাসা,—তাদের ভিতর ঘুরবি তুই। যা কিছু অসত্য তাদের তুই করবি বিদ্রূপের আঘাত, বাণে বাণে জর্জ্জরিত ক'রে তুল্‌বি; ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিবি ধারালো ব্যঙ্গের অস্ত্রে, তাচ্ছিল্য আর অবহেলায় মানুষের চরিত্রগত নীচতাকে করবি শাসন—এই কাজ তোকে দিলুম বাবা।

জগদীশ তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে, এই কাজই আমি ভালোবাসি মা।

শেষ

ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

রাজা শুনিলেন ইতিহাস না পড়িলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন। অবিলম্বে পৃথিবীর ইতিহাস সঙ্কলন করিবার জন্য ঐতিহাসিকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ রাজার আদেশ। কিন্তু তবুও প্রায় বিশ বৎসর পরে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইল মাত্র ১২০০ খণ্ডে; প্রত্যেক খণ্ডে ১০০০ পৃষ্ঠা। রাজা প্রমাদ গণিলেন, কারণ এত বই পড়িবার অবসর কই? কাজেই তিনি 'সার' সঙ্কলনের আদেশ দিলেন। আবার বিশ বৎসর পরে ইতিহাস শত খণ্ডে সঙ্কলিত হইল, প্রত্যেক খণ্ডে ৫০০ পৃষ্ঠা। রাজার অবসর নাই। কাজেই আরো সংক্ষিপ্ত করিবার আদেশ দেওয়া হইল। ১০ বৎসর পরে জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এক খণ্ডে সহস্র পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়া রাজদরবারে প্রেরিত হইল। কিন্তু রাজা তখন মৃত্যুশয্যায়; কাতর কণ্ঠে মন্ত্রীকে বলিলেন "মন্ত্রী, এ জীবনে ইতিহাস পড়িয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করার আর অবসর পাইলাম না, বড় ক্ষোভ রহিয়া গেল।"

মন্ত্রী আশ্বাস দিয়া রাজার কাণে কাণে কহিলেন "মহারাজ ক্ষুব্ধ হইবেন না, পৃথিবীর ইতিহাসের সার মর্ম্ম আমার জানা আছে, আপনাকে নিবেদন করিতেছি—মানুষ জন্মেছে, দুঃখ পেয়েছে এবং মরেছে, ইহাই পৃথিবীর ইতিহাসের সার মর্ম্ম।" ইহা হইতেই বুঝা যায় সেই পুরাতন সত্য, ইতিহাসের ধর্ম্ম—অতীতের পুনরাবৃত্তি করা। বেকন্ বলিয়াছেন, History makes a man wise। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের সভ্যতার উত্থান ও পতনের ইতিহাস আলোচনা করিলে যে আমাদের শিক্ষার প্রসারতা হয় ও বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বার্ণাড শ "সিজার ও ক্লিওপেট্রা" নাটকে ইতিহাস সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা চলে না। সিজার গ্রন্থশালায় ইতিহাসরাশি ভস্মীভূত হইতেছে শুনিয়া বলিতেছেন, "Let it burn—a shameful memory."

শ (Shaw) যে কথা বলিয়াছেন তাহার প্রমাণ ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। হিংসা, দ্বেষ, অত্যাচার, অবিচার, নর-শোণিতপাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ, জাতির প্রতি

জাতির বিদ্বেষ, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, শক্তির অপব্যবহার, লেলিহান লালসা মানবকে দানবে পরিণত করিয়াছে। এই ত ইতিহাসের সাক্ষ্য।

আমাদের শাস্ত্রে ইতিহাসকে বলা হইয়াছে "প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাম্"। সর্ব্ব শাস্ত্রকে আলো দেখায় এই ইতিহাস। অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্ত্তমানের প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে নির্দ্দেশ করে ইতিহাস। ইতিহাস ব্যতীত মানব-জীবনের ধারা ও পারম্পর্য্য রক্ষা করা যাইতে পারে না। কার্লাইলের মতে ক্রনোলজী ও জিওগ্রাফী ইতিহাসের হাতে আলো,—অতীতের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার "নান্যঃ পন্থা"। ইতিহাস মানবজীবনকে ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। ইতিহাস কতকটা (cosmic) বিশ্ব-জনীন,—ইহার বন্ধন হইতে কাহারও মুক্তি নাই। মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, আকাশ, বায়বীয়, তরল এবং ধাতব পদার্থ, দর্শন, বিজ্ঞান, সকলেরই ইতিহাস প্রয়োজন।

ইতিহাসের মূল এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয়। ঐতিহাসিক উকীল নন্, তিনি বিচারক; কিন্তু ঐতিহাসিক মানুষ, কাজেই মানুষের দোষগুণ তাঁহাতে থাকিবেই। কাজেই তাঁহার বিচারবুদ্ধি সংস্কার-পীড়িত স্বজাতির ও স্বধর্ম্মের প্রশংসায় তিনি উন্মুখ; এবং বিধর্ম্মীর নিন্দা করা তাঁহার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস, সুলতান মামুদের সমসাময়িক আলবুরানী, চীন সভ্যতার ঐতিহাসিক গাইল্‌স্ Bury ও Lord Actonএর ন্যায় সত্যাশ্রয়ী ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পৃথিবীতে বিরল। "মৌক্তিকং ন গজে গজে"—প্রতি গজেই মুক্তা পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য বড়ই কঠিন। রাশিকৃত মিথ্যা ও আবর্জ্জনার মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় এক রকম অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যনিষ্ঠা, প্রভূত পাণ্ডিত্য, বহুকালব্যাপী গবেষণারূপ সাধনার দ্বারা প্রকৃত ঐতিহাসিক হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে লিখিত অধিকাংশ ইতিহাস ছিল সত্যনির্ণয়ের পরিপন্থী; স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরবে পরিপুষ্ট, পরজাতি ও পরধর্ম্মের নিন্দায় কলুষিত। ইতিহাস কতকটা গল্পকাহিনী, পুরাণ বা উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল; ইতিহাসকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করিলেন (Niebuhr) নাইবুর। ইয়োরোপে জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক গবেষণার পথ নির্দ্দেশ করেন, Wolfa তাঁর ইলিয়াডের ভূমিকায়। Trojan War বা ট্রয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি বিচার করিলেন যাহাতে ইয়োরোপের পণ্ডিত-সমাজ চমৎকৃত হইলেন। তিনি প্রমাণ করিলেন যে ট্রয়ের যুদ্ধ কবিকল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন Pargiter প্রমাণ করিয়াছেন যে আমাদের পুরাণ-বর্ণিত কলিযুগ এবং রাজবংশাদি বাগবাজারের গল্প নহে; ঐতিহাসিক সত্য। নাইবুর লিখিলেন রোমের ইতিহাস, কিন্তু তিনি এমন বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার করিলেন যে তাহা দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই ইতিহাস এখনও পাঠকের ভীতিসঞ্চার করে। সেইজন্য তিনি তাঁহার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই বক্তৃতা এমন মর্ম্মস্পর্শী হইল যে, লোকে উপন্যাস ফেলিয়া ইতিহাস পড়িতে মনোযোগী হইল। নাইবুরকে বর্ত্তমান জগতে ইতিহাস-বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়। ১৮০০খৃঃ তাঁহার লেখা ইতিহাস প্রকাশিত হয়। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিকেরা, সূক্ষ্ম গবেষণা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। Rauke, Dollinger: Dahbmann, Mammsen, Sybel ও Stein ঐতিহাসিক জগতে গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফরাসি দেশেও ঐতিহাসিকের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু ফরাসিরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও কল্পনাকুশল; কাজেই তাঁহাদের লেখা ইতিহাস অপূর্ব্ব সুনামমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী এবং মনোরম। রচনা-মাধুর্য্যে ইহা অতুলনীয়। Taine, Michlet Thiers ও Lamartine যে ইতিহাস লিখিলেন তাহাকে Romantic History বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ওকালতি করিয়াছেন, নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা ব্যাকুল। কিন্তু Tocqueville Aulard, Rambaud. Lavasse ও Madelin জার্ম্মাণ পন্থা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস লিখিলেন। কিন্তু ফরাসীর রচনাকৌশল জার্ম্মাণ হইতে সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য। ফরাসীর style বা রচনা-পদ্ধতি অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যানুসন্ধিৎসার সহিত অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী রচনা-ভঙ্গীতে Laris Madelin জগতে অতুলনীয়। ইংলণ্ডে Grote, Gibbon. Clarendonএর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

Gibbonএর পুস্তক ইয়োরোপের প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হইল। Macaulay এমন ইতিহাস লিখিলেন যাহা Michletএর ন্যায় romantic হইয়া উঠিল। কিন্তু অত্যুক্তি ও একদেশদর্শিতা এবং পক্ষপাতিত্ব উঁহার প্রধান দোষ। Green নূতন পথ দেখাইলেন। একটা দেশের ইতিহাস এক রাজাকে উপলক্ষ্য করিয়া গড়িয়া উঠে না; সেই জন্য তিনি লিখিলেন History of the English People। একটা জাতির ইতিহাসে রাজার স্থান কতটুকু ইহাই প্রমাণ করিয়া দিতে তিনি ইংরাজ জনগণের সামাজিক অর্থনৈতিক ধর্ম্মজীবন ও আচার ব্যবহার ও বেশভূষার ক্রমবিকাশ দেখাইয়া ইতিহাসের এক নূতন ধারা উদ্ভাবন করিলেন। এই জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। Feeman, Stubbs, Hallam, Acton, Bury ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভারতে অর্থাৎ ইংরাজ-শাসিত ভারতে যে-সব ঐতিহাসিক যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহাদের অগ্রণী; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রাজেন্দ্রলালের শিষ্য। হরপ্রসাদের ঐতিহাসিক গবেষণায় যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং মনোরম রচনা কৌশল ও প্রকাশ-ভঙ্গী দেখিতে পাই তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়। ঐতিহাসিক গবেষণা এতটা হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি তাঁহার সংগৃহীত তথ্যের সদ্ব্যবহার করিয়া যান নাই। তাঁহার নিকট আমাদের আশা ছিল অনেক; কিন্তু তিনি আমাদের সে আশা পূরণ করিয়া যান নাই। পশ্চিমভারতে সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর গবেষণা দ্বারা বহু সত্যের নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। গুণে, বেল্‌ভেল্‌কার, ডাঃ সুখঅঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাঁহারই শিষ্য। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে সার্দ্দেসাই (Sardesai) রাজবাড়ে (Rajwade) প্রভৃতি মনীষিগণ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। মাদ্রাজের কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গার, বোম্বাইয়ের অধ্যাপক Herras, Prof. Rawlinson বহু সত্য নির্ণয় করিয়াছেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে স্যর যদুনাথ সরকারের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। Kennedy, কানুনগো Irvine, ডাঃ সুরেন সেন, ডাঃ বালকৃষ্ণ ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে নব নব অধ্যায় উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। Vincent Smith, Sir John Marshall কাশীপ্রসাদ জয়-জোয়াল, ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধার করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভূদেববাবু ভারতের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে রামপ্রাণ গুপ্ত ও রজনীকান্ত গুপ্ত ইতিহাসের আলোচনা করেন। উমেশ বটব্যাল ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হিন্দুর গৌরবময় অতীত যুগকে মূর্ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দ্বারা। পাষাণের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা চিরদিন আদর পাইবে। তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস সত্যনিষ্ঠা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। কিন্তু রচনা-মাধুর্য্যের অভাবে তাহা অতীব দুষ্পাঠ্য, Niebuhrএর রোমের ইতিহাসের ন্যায়। ইতিহাসে রচনা-কৌশল বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইতিহাস সুখপাঠ্য না হইলে ঐতিহাসিক শ্রম পণ্ড হইয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিক Pollard বলিয়াছেন কল্পনা ও রচনা-মাধুর্য্য বাদ দিলে ইতিহাসের পাখা কাটিয়া দেওয়া হয়। ভারতের ইতিহাস-লেখককে মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস লিখিতে হইলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ভাষা ও রচনা-কৌশলকে আদর্শ করিতে হইবে, এবং ইংরাজিতে লিখিত হইলে Rushbrooke Williams and Rawlinsonএর ভঙ্গীকে আদর্শ করিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজদ্দৌলা, নিখিলনাথ রায়ের মুরশিদাবাদ কাহিনী, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নবাবী আমল", ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বেগম সমরু" এবং রমাপ্রসাদ চন্দের "গৌড় রাজমালা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাতে ইতিহাস রচিত হইবার দিন আসিয়াছে। কাজেই আমাদের এখন কর্ত্তব্য বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতের ইতিহাসের উদ্ধার করা। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা Thornton হইতে Dodwell পর্য্যন্ত সকলেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতের কল্যাণের জন্য ইংরেজের আগমন এবং এই হতভাগ্য দেশের এত গরম, মশা ও মাছির অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহারা যে আমাদের শাসন করিতেছেন তাহার জন্য আমাদের

চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এবং Clive হইতে Reading পর্য্যন্ত সকলেই যীশুখৃষ্টের ন্যায় ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই সব কালা আদমীদের উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের নিকট ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তাঁহার Rise of the Christian Power in India গ্রন্থখানি একটি অমূল্য রত্ন। সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপস্বরূপ যে ইতিহাস তাহাই যদি মলিন হয় তবে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কি করিয়া? সেই জন্য ঐতিহাসিককে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে "নহি সত্যাৎ পরো ধর্ম্ম" সত্যের চেয়ে আর বড় ধর্ম্ম নাই। এবং "সত্যমেবজয়তে, নানৃতম"—সত্যই জয়লাভ করে; মিথ্যার জয় হইতে পারে না; ইতিহাসের ইহাই চরম দান।

ইতিহাস দুইভাবে লেখা হইয়াছে; একটি হিরো-ডোটাসের প্রদর্শিত পথ—আমাদের দেশের দধিসমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্রের মত। আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কালে তাঁহার অনুসঙ্গী ঐতিহাসিকেরা লেখেন ভারতে এত বড় বড় পিঁপড়ে আছে দেখতে মানুষের মত বড়; সোনা খোঁড়াই তাদের কাজ; আরেক রকম মানুষ আছে তাদের কান এত বড় যে রৌদ্র হইতে বাচিবার জন্য সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া নিদ্রা যায়'। অর্থাৎ খাঁটি বাগবাজারী জিনিস ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইত। ভারতবাসীরা পাণ খায়, যে থুতু ফেলে তাহা লাল। তাহা দেখিয়া গ্রীক্ ঐতিহাসিকেরা গম্ভীরভাবে লিখিয়াছেন ভারতবাসীরা সর্ব্বদা রক্তবমন করিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যায় তাঁহাদের বিচারবুদ্ধি কত কম ছিল এবং ঠাকুরমার গল্পকেও তাঁহারা ইতিহাসভুক্ত করিতেন।

দ্বিতীয় পন্থা থুকিডাইডিসের পন্থা। প্রত্যেক কথাটি ওজন করিয়া বলা এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, সত্যবাদিতা ও নিরপেক্ষতা, যাহা স্যর যদুনাথ ও অন্যান্য বিখ্যাত ঐতিহাসিকের মধ্যে দেখিতে পাই।

যে পবিত্র ভূমি ভগবান তথাগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবে মহিমান্বিত হইয়াছে, যেখানে "সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল ত্যাগের মন্ত্র" যে-ভূমির আকাশে বাতাসে এখনও ধ্বনিত হইতেছে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' জগতের অর্দ্ধমানব যাহার অষ্টমার্গ ও দশশীল অবলম্বন করিয়া অন্তরে শান্তি পাইয়াছে, নির্ব্বাণের অধিকারী হইয়াছে সেই মহামানবের স্মৃতির প্রতি ভক্তিঅর্ঘ্য অর্পণ করিয়া আমি আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম।

হাসজুনি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

অস্ত্র-চিকিৎসক কমলাপতি সেনের জন্ম-লগ্নের একাদশে ছিল বৃহস্পতি। চেঙ্গিস খাঁ, নাদীর শাহ প্রভৃতি অতীত কালের অতিমানবদের কথা স্বতন্ত্র। এ কালের কোনো বীর তার রেকর্ড অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ নিত্যই সে বহু মানুষের গায়ে ইস্পাতের ছুরি বসাত। এই দশ বছরের ভিতর পাঁচজন স্ত্রীলোকেরও পেট কেটে সে পাঁচটি শিশুকে সূর্য্যালোক দেখিয়েছে। সিরাজদ্দোলার বিপক্ষ পক্ষের কল্পনাও নবাববাহাদুরকে এতখানি বাহাদুরি-মণ্ডিত কর্ত্তে পারে নি।

ডাক্তার প্রগতি মিত্র ডি-লিট প্রভৃতি যখন টেলিফোনে তার অনুমতি প্রার্থনা কল্লে বৈধব্য-দমন সমিতির বিশিষ্ট সভ্যশ্রেণীতে তার নাম লেখবার, তখন তুষ্ট হয়ে ডাঃ সেন বল্লে—হালো! প্রগতি! বেশ্ বেশ্।

বৈধব্য দমন সমিতির কর্ম্মক্ষেত্রের চতুঃসীমা সম্বন্ধে তখন কমলাপতির প্রকৃত জ্ঞান ছিল না। নিত্যই তাকে বিবাহিত পুরুষের দেহে অস্ত্রোপচার কর্ত্তে হত। কাজেই বৈধব্য-দমনের প্রচেষ্টা তার দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তবে বন্ধু প্রগতির পর-সেবাব্রতে সেও যে আজ সহব্রতী হ'ল—এ চিন্তার মাঝে সে একটু তৃপ্তি পেলে। অর্থাগম একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত মানুষ যদি

দশের সেবায়, দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ না করে তো ধিক্ ইত্যাদি, ভাবলে ডাঃ কে পি সেন এফ্-আর-সি-এস।

রাত্রি দশটার পর ডাঃ প্রগতি মিত্রের নিকট বৈধব্য-দমন সমিতির স্বরূপ সমাচার পেলে ডাঃ সেন। তখন তার বিজ্ঞান পুষ্ট মনে এক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অনৈক্যতান বাজনা বেজে উঠ্‌লো।

—সমাজ এক্ পা এগুতে পাবে না।—আগ্রহের সাথে বল্লে প্রগতি—বিদ্যাসাগর, আশুতোষের আসল বাণী তাকে কান পেতে শুন্‌তে হবে। বিধবাদের বিবাহ না দিলে হিন্দু সমাজের শুকনো মুখে আনন্দের হাসি ফুটবে না।

বিধবার একবার কেন বারবার বিশ বার বিবাহ হলেও কমলাপতির কিছু আসে যায় না। কিন্তু যখন অতি শিশু সে তখন তার পিতামহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সেন কবিকণ্ঠাভরণ মহাশয় আর্য্য-ধ্বজা কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখতেন বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে। বিধবা-বিবাহ শব্দটাই তিনি অবৈধ ভাবতেন। তাই প্রজাপতির দ্বিতীয় নির্ব্বন্ধকে তিনি বিধবা নারীর পুরুষান্তর গ্রহণ ব'লে বর্ণনা করতেন। তাঁর পৌত্র কমলাপতি যদি রাজ্যের বিধবা ধরে বিয়ে দেবার আয়োজন করে তো লোকে বলবে কি?

প্রগতি পোষাক-পরিচ্ছদে বা চলা-ফেরায় রেল আফিসের কেরাণীর অনুরূপ হ'লেও বিদ্যায় সে অক্সফোর্ড ও প্যারিসকে তাক লাগিয়ে একরাশ সম্মান নিয়ে দেশে ফিরেছিল। তর্কে সে সার্জ্জেন সেনকে অচিরেই কোণ্-ঠাসা কর্ত্তে পাত্ত। তার বিবৃতি শুনে প্রগতি বল্লে—তোর একটি উপ—ঠাকুমা ছিলেন। তোর উপ-ওর-নাম-কি আছে কি?

—চুপ্ চুপ্—পাশের ঘরে হান্না আছে। সেটা কি জানিস্,—যুগ-ধর্ম্ম।

—ঠিক কথা। এটাও যুগ-ধর্ম্ম। তোমার ঠাকুরদাদা শুনেছি মরা মানুষকে বাঁচাতে পার্ত্তেন। তোমার মত তাঁর অন্যূন ৩২্ টাকা ভিজিট্ ছিল কি? তুমি পাষণ্ড নিরীহ লোকের গায়ে তো অবাধে অস্ত্র চালিয়ে যাচ্ছ।

—না, তাঁর ফি ছিল না বটে। কিন্তু জমিদার রাজা রাজড়ারা সব রাশি রাশি অর্থ দিতেন তাঁকে। একা নবাব বাহাদুর—

—হুঁ! আর মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ?

—ব্রাহ্মণ হ'লে আশীর্ব্বাদ কর্ত্ত। আর অপরে পায়ের ধূলা নিত।

—হুঁ! তুমি কেন সেই রীতিতে রোগের চিকিৎসা কর না? আর শুনেছি সেকালে বদ্দিরা রোগীকে বাপ্ তুলে গালাগালি দিত। তোমরা চেষ্টা কর্লে লোকে তুলে আছাড় দেবে।

বেচারা কমলাপতি। সে একেবারে নদীর কূলে এসে পড়েছিল—আর এক ধাক্কায় একেবারে ঘাড় গুঁজে পড়তো অতল জলে। তার সাধ্বী স্ত্রী হান্না এসে তাকে উদ্ধার কর্লে।

যখন তার পিতা নাগাশকিতে দেশলায়ের কারখানায় কাজ শিখতো, তখন হান্না জন্মেছিল—অবশ্য খানাকুল কৃষ্ণনগরে। তখন জাপান হান্নাহানা ফুলের গন্ধে ভরপুর। তাই তার জাপানী নাম রেখেছিল—হান্নাহানা। হান্না জাপানী সরঞ্জামে ঘর সাজাতো, রাত্রে কিমোনা পরতো। সে ম্যাট্রিক পাশকরা; তাই অধ্যাপক প্রগতি মিত্রের উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। সে পাশের ঘরে ব'সে তাদের তর্ক শুন্‌ছিল। তবে প্রগতির উপকথার ভয়ে নিজেকে নেপথ্যে রেখেছিল। এখন সুবিধা বুঝে এসে বল্লে দুই বন্ধুতে কিসের তর্ক হ'চ্ছে?

প্রগতি সশ্রদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে নমস্কার কর্লে। সার্টের হাতের বোতাম আঁটবার চেষ্টা করলে, কিন্তু যখন দেখলে বোতাম নাই, তখন বুকের বোতাম এঁটে বস্‌লো। গলার বোতাম ছিল না সে কথা সে জানতো; কাজেই সেদিকে সংস্কারকামী হ'ল না।

কমলাপতি নিজের মাঝে শক্তির অনুভূতি বোধ কর্লে। চিরদিন হান্না তার শক্তির খুঁটি। সে বল্লে—তর্ক এমন কিছু না। প্রগতি পণ্ডিত-মূর্খ। তর্কের যুক্তি তার লেখা পুস্তকের মত—যা' সে ভিন্ন কেহ পড়ে না।

এতক্ষণে প্রগতি সামলে নিয়েছিল। এমনি সামলাতে পার্লে ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ান, কে জানে জগতের ইতিহাস কি আকার ধারণ কর্ত্ত। সে বল্লে—এ কথাও কমলাপতি ঠিক করে বল্‌তে পাবলে না। আমি ছাড়া আমার বই অন্ততঃ আরো দুজন পড়ে—যে বেচারারা কম্পোজ করে, আর, যে প্রুফ দেখে।

যা সত্য তা শাশ্বত। কমলাপতি উদারতা দেখালে নিজের ভ্রম স্বীকার ক'রে।•

হাম্না শুন্লে বৈধব্য-দমন সমিতির কথা। সে বল্লে—শুভ অনুষ্ঠান। কিন্তু আমার একটা আশু উপকার কর্ত্তে পারে সমিতি।

দুই বন্ধু মগজের মধ্যে সিভালরির প্রেরণা অনুভব কর্ল্লে। তারা এক সঙ্গে বল্লে—অবশ্য।

হাম্না বল্লে—একটি অনাথা বিধবার বিবাহ দিয়ে আপনারা আর একটি বেচারা স্ত্রীলোকের প্রাণ বাঁচাতে পারেন।

প্রগতি বল্লে—বিলক্ষণ। একটির কেন দু'টিরই—

হাম্না বল্লে—বালাই ষাট। বেচারাটি সধবা। আশীর্ব্বাদ করুন সে স্বামীর কোলে মাথা রেখে তাঁরই অস্ত্রোপচারকে ধন্য করে প্রাণত্যাগ কর্ত্তে পারে।

তার হেঁয়ালী ক্রমশঃ নিজেরই বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিল। আসল ডাক্তার অর্থাৎ চিকিৎসক বল্লে দয়া ক'রে সোজা কথা কও—একে প্রগতির কথার ইন্দ্রজাল তার ওপর তোমার জামাই-ঠকানো হেঁয়ালী।

হাম্না হেসে বল্লে—বলছিলাম তোমার শিশুকালের ধাত্রী আমার বিবাহিত জীবনের কষ্টদাত্রী নীরদা দাসীর বিবাহের ব্যবস্থা কর্ত্তে।

এবার ডাক্তারেরা হাসলে। হাম্না বল্লে—আমি যত তার তোষামোদ করি সে ততই আমাকে বাক্যবাণে বেঁধে। আমি ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুয়ে আছি। কিন্তু আমার অসহায় স্বামীকে কার জেম্মায় দিয়ে যাব এই দুশ্চিন্তার ফলে আমার মরা হচ্চে না।

তারা হাসলে। এর পর কি তার আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বিজয়-লক্ষ্মী রগচটা কবিরাজ পণ্ডিতের অনুকূল হ'তে পারে? সে বিদ্যাসাগরের কেতন আশ্রয় কর্ল্লে। নগদ এক শত টাকা চাঁদা দিয়ে কমলাপতি শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান কর্ল্লে।

(২)

থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—তার যেমন কি সব ঝঞ্ঝাট হয়েছিল নূতন কাজে ব্রতী হয়ে—তেমনি ঝঞ্ঝাট সব গজিয়ে উঠ্লো কমলাপতির জীবনে বৈধব্য-দমন সমিতির সভ্য হ'য়ে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কেহ রকফেলার নন। প্রত্যেকেরই সংসারে মা-লক্ষ্মীর কৃপার অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন মা ষষ্ঠী। কে জানে কবে কার ফোড়া হয়। পুলিসের আর প্রেস-সেন্সারের তাড়ায় নিজেদের যে অন্ত্রবৃদ্ধি বা এপেণ্ডিসাইটিস হবে না—এ কথা কে বলতে পারে। কমলাপতির মত ডাক্তারকে হাতে রাখা—পারিবারিক রাজনীতির ডিপ্লোমেসি। তার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সুখ্যাতির সম্ভার বুকে নিয়ে প্রকাশিত হ'ল অনেক সংবাদপত্র। সমাচার-জীবী-সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তাকে ডাঃ সেনের বিনয় যখন সাক্ষাত-সন্দর্শন দিতে অস্বীকৃত হ'ল, তখন কর্ম্মকর্ত্তা তাঁর নিকট হতে একখানা টাকে চুল গজাবার ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়ে নিলে।

কলিকাতার এমন কোনো ভাগ্যবান লোক নাই, উষার আলোর সঙ্গে সঙ্গে যার গৃহে লিখিত বা মৌখিক সাহায্যের অনুরোধ আসবে না। সে ভাগ্য কমলাপতির ছিল। কিন্তু সমাচার-জীবী-সঙ্ঘের কৃপা-দৃষ্টির পর তার গৃহে প্রার্থীর ভিড় খুব বেড়ে গেল। কাজেই ডাক্তার তার সহকারী ড্রেসার ষষ্ঠীচরণের উপর ভার অর্পণ কর্ল্লে সাহায্য প্রার্থীদের আবেদন শোনবার।

ষষ্ঠীচরণ তার এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি-খুড়ো। শৈশবে ও বাল্যে সঙ্গী খেলার সাথী ছিল কমলাপতির। যত উগ্র এবং বিপজ্জনক কাজের ভার গ্রামের খেলোয়াড়দের ছিল ষষ্ঠীর উপর।

একদিন বাল্যলীলা বর্ণনা-প্রসঙ্গে কমলাপতি বল্লে প্রগতিকে ষষ্ঠীর একটা কীর্ত্তি।—কালোজাম গাছ থেকে পেড়ে না খেলে কারও সুখ হ'ত না। পাড়াগাঁয়ে কালো-জামের তখন দাম ছিল না। বিষ্ণুর মার কাছে চুরি-বিদ্যার আদর ছিল না—তাই লোকে তারই গাছের ফল চুরি ক'রে খেত। ষষ্ঠীচরণ কোমরে বিষ্ণুর মারই পাতকুয়ার দড়ি বেঁধে গাছে উঠে ফল-ভরা ডালে দড়ির একটা দিক বেঁধে দিয়ে আসতো। একজন শিষ্ট সেজে তাকে খবর দিত হনুমানে তার দড়ি গাছের ডালে বেঁধে দিয়েছে। দড়ি উদ্ধার কর্ত্তে বিষ্ণুর মা দড়ি ধরে টান্তো আর পাকা জামগুলি টুপটাপ পড়তো। তারা আনন্দে জাম-ভোজন কর্ত্ত।

গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যখন পড়াশুনা কঠোর রূপ ধারণ কর্ল্লে ষষ্ঠী তখন কসরত ক'রে দেহের বল বাড়াতে লাগলো। পরে সে ব্যগ্র-ক্ষত্রিয় সর্দ্দার নিধু পাইকের নিকট লাঠি-খেলা

শিক্ষা কর্ত্ত। সে দেহের বলকে যত বাড়িয়ে তুল্‌তো তার সঙ্গে তার হৃদয়ের বল যেত বেড়ে। দয়া-মায়া ছিল তার প্রাণ জুড়ে।

সুতরাং যখন কাঁচা গলায় ধপধপে পৈতে ঝুলিয়ে পিতৃ দায়গ্রস্ত এক তরুণ স্বয়ং ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা কল্লে, শেষোক্ত ব্যক্তির নিষেধ অমান্য করে তাকে পাঠিয়ে দিলে ষষ্ঠীচরণের করুণা ডাঃ কমলাপতি সেনের খাস্‌-কামরায়।

ডাক্তারের স্মৃতি-শক্তি প্রবল। লোকটি পিতৃ-দায় উপলক্ষে তাঁর কাছে পনেরোটি টাকা নিয়ে গিয়েছিল গত বৎসর। এ বৎসর বোধ হয় লোকটার মাতৃ-দায় উপস্থিত। কমলাপতি বল্লে—আপনার কি প্রয়োজন?

—আজ্ঞে পিতৃ-দায়। বৈদ্য সন্তান শাস্ত্র-মতে তো শুদ্ধ হ'তে হবে। ওঃ— আর বাক্য-স্ফূরণ হ'ল না তার মুখে।

লোকটা কাঁদতে লাগলো। ক্রন্দন-বেগ চাপতে গিয়ে তার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠলো।

এবার ডাক্তার কুপিত হ'ল। কি বিড়ম্বনা! কি শয়তানী! ঠিক্‌ গত বৎসর এই রকম কেঁদে এই রকম কেঁপে লোকটা পিতৃ দায় উপলক্ষে তার নিকট নগদ পনেরো টাকা নিয়ে গেছে, আজ আবার এই অভিনয়। নিশ্চয় এ জুয়াচোর। ইচ্ছা-ক্রন্দন ও ইচ্ছা-কম্পন এর আয়ত্ত বিদ্যা। একেবারে তাকে বিদায় দেবার পূর্ব্বে একটু পরীক্ষা করাও উচিত। ডাক্তার জিজ্ঞাসা কল্লে—কবে আপনার পিতা-ঠাকুরের কাল্‌ হ'য়েছে?

—আজ্ঞে আজ আট্‌ দিন। আপনি বিধবা-বিবাহের ওর নাম কি হ'য়েছেন—উঃ হুঃ—

আবার ক্রন্দন! এবার ডাক্তারের আত্ম-গ্লানি এল। বল্লে—ওঃ, আপনার প্রথম বাবা তো গত বৎসর মারা—

ভিক্ষুক ভাবলে ধরা তো পড়েছি। একবার শাসিয়ে দেখি, বল্লে—কি বলছেন!

তীব্র ভাষা! রুক্ষ স্বর। ডাক্তার বল্লে—গত বৎসর আপনার এক পিতা মারা গিয়েছিলেন। তার পর বিধবা বিবাহের ফলে যদি দ্বিতীয় বাবা পেলেন—

লোকটা দে-ছুট। বুঝলে ডাক্তার ধরে ফেলেছে। নিজে গালাগালি খেতে পারে কিন্তু জননীর কুৎসা!

বেলা দুটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন কর্ব্বার সময় ডাক্তার বল্লে—হাস্না, সমাজ-সেবা আমার দ্বারা হ'ল না। একটা বিধবা-বিবাহের প্রথম পক্ষের সন্তান যদি দেখতে পেলাম তো লোকটা আমল দিলে না। তোমার নীরদার কেশটাও তো ভেস্তে গেল।

(৩)

প্রগতিকে বল্লে ডাক্তার—ভাই কুত্তা বোলায় লেও।

—কেন?

—আরে রাজ্যের ফ্যাসাদ। আজ একটা গোঁপ-কামানো, চক্‌চকে পাটিপারা চুল, প্যাণ্ট-কোট পরা লোক এসে বড় জ্বালিয়েছে। হাস্নাকেও টিট্‌কিরি দিয়ে গেছে।

হাস্না তখন ঘরের জাপানী টেবিলে চীনা মাটীর ফুল-দানে সূর্য্যমুখী ফুল সাজাচ্ছিল। সে পিতার নিকট শুনেছিল যে জাপানীরা ঘরে এক দিনমান একখানা ছবি রাখে, এক রকমের ফুল রাখে। প্রতিদিন ঘরের সাজ বদলায়। একখানা ছবি রাখলে লোকে নিরীক্ষণ করে তার দোষ গুণ দেখে। এক রকম ফুল এক ঘরে সাজালে লোকে বিশেষ করে তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়। আজ দেওয়ালে টাঙ্গিয়েছিল সে—মাদল-বাদক। ফুলদানে রাখছিল সূর্য্য-মুখী।

সে বল্লে—আর বেচারা হাস্না কেন?

ডাক্তার বল্লে—লোকটা এসে বলে—যারা জেলে গেছে তাদের পরিবারেরা যাতে সিনেমা দেখতে পারে, বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যেতে পারে তার জন্য চাঁদা দিন।

এ কথার পর আর জাপানী গৃহ সজ্জা হাস্নাকে বন্ধুদের কথাবার্ত্তায় উদাস্‌ রাখতে পারলে না। সে বল্লে—তা মন্দ কি? আমাদের যদি সখ থাকে তো তাদের থাক্‌বে না কেন?

—হ্যাঁ সেই কথাই সে বল্লে।

প্রগতি বল্লে—আরও মজার কথা বলি শোন। সেদিন একদল লোক এসে বলে—পাঁচ হাত কাপড় সমিতির সভ্য হ'তে হ'বে।

—পাঁচ হাত কাপড় সমিতি?

—হ্যাঁ। তারা বলে দশ হাত কাপড় বিলাসিতা। কোঁচা নিষ্প্রয়োজন। যত লোকের দশ হাত কাপড় আছে তারা পাঁচ হাত করে কেটে গরীবদের দিক—ইত্যাদি—

ডাক্তার বল্লে—লাইব্রেরী যে কত আছে তার ঠিক্ নাই। আর সবার সভাপতি বম্‌-ভোলানাথ জজ সাহেব।

যখন তাদের সামাজিক আলোচনা পরনিন্দারূপ নির্দোষ আমোদে আত্ম-নিয়োগ করেছে একটু সবেগে ষষ্ঠী এসে হাজির হল। হান্নার হৃদ্‌কম্প হল—বুঝি স্বামীকে সশস্ত্র হয়ে বাহিরে যেতে হয়। তার কন্যার বিবাহের সময় সে নিজের অবস্থা বিস্মৃত হবে না। ডাক্তার জামাই—কভি নেহি।

ষষ্ঠী বল্লে একটা ঝাঁঝাঁলো মেয়ে-ছেলে বড় হাসজুন্নি কর্চ্চে।

—কি করছে?

—হাসজুন্নি করছে। হতে চায় চার চক্ষু।

প্রগতি লোকটাকে ভালবাসে। উত্তেজিত হয়ে তার কথা শোনে। সে বাংলার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কি একখানা বই লিখেছিল। বল্লে—কি করছে স্ত্রীলোকটি?

—হাসজুন্নি—

—ষষ্ঠীখুড়ো কতবার তোমায় বলেছি বাংলা বলতে। কি হয়েছে—স্ত্রীলোক কি চায়?—বিরক্তি দেখিয়ে বল্লে কমলাপতি।

হান্না হাসি দমন কর্ব্বার জন্য ভাবছিল পণ্ডিত মশায়ের ফাঁস বাঁধা টিকি। ঐ পদার্থ ভাবলেই তার হাসির উৎস চাপা পড়ে।

ষষ্ঠী বল্লে—মানে মেয়েছেলেটা দেখা করবার জন্যে ঝাঁপাই ঝুরছে।

প্রগতি পকেট-বহি বার করে লিখে নিলে—হাসজুন্নি, চার-চক্ষু, ঝাঁপাই ঝুরছে।

ডাক্তার বল্লে—তোমার মাথা কর্চ্চে।

এবার হান্না তাকে প্রশ্ন কল্লে—হাঁ বুঝেছি। একজন স্ত্রীলোক এঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই তো?

—বলছি তো বউমা। যদি না বোঝেন উনি তো কি পাঁয়তাড়া কষব?

—ঐ নাও! আবার পাঁয়তাড়া কষছে।

প্রগতি লিখলে—পাঁয়তাড়া কষছে।

হান্না আবার তার মোলায়েম স্বরে বললে—হ্যাঁ! তা দেখা করবার জন্য কি করছে স্ত্রীলোক?

—টগাবগ করছে। তিড়বিড় করছে।

এবার তারা বুঝলে টগাবগ করে ঘোড়া দ্রুত যায়।

—ওঃ তাড়াতাড়ি করছে?

—তাই তো মা বলছি।

—অসম্ভব! আচ্ছা খুড়ো, বদ্দিব ঘরে এমন চাষা তুমি কোত্থেকে জন্মালে?

থো করোনা বাবা? এখন মেয়ে-লোককে উধাও করে দ'ব না ভেড়াব?

হান্না বল্লে—স্ত্রীলোক তো। এইখানেই আসুক না। তুমি নিচে গেলেই প্রগতিবাবু টগাবগ করবেন আর আমি একেলা বসে বিচার কর্ব্ব গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল না গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে।

কাজেই বিপত্নীক হবার ভয়ে হান্না প্রাণ কমলাপতি অনুমতি দিল তাকে উপরে আনবার।

ষষ্ঠী দরজার কাছে এসে বল্লে নাকের সোজা বেয়ে যান্।

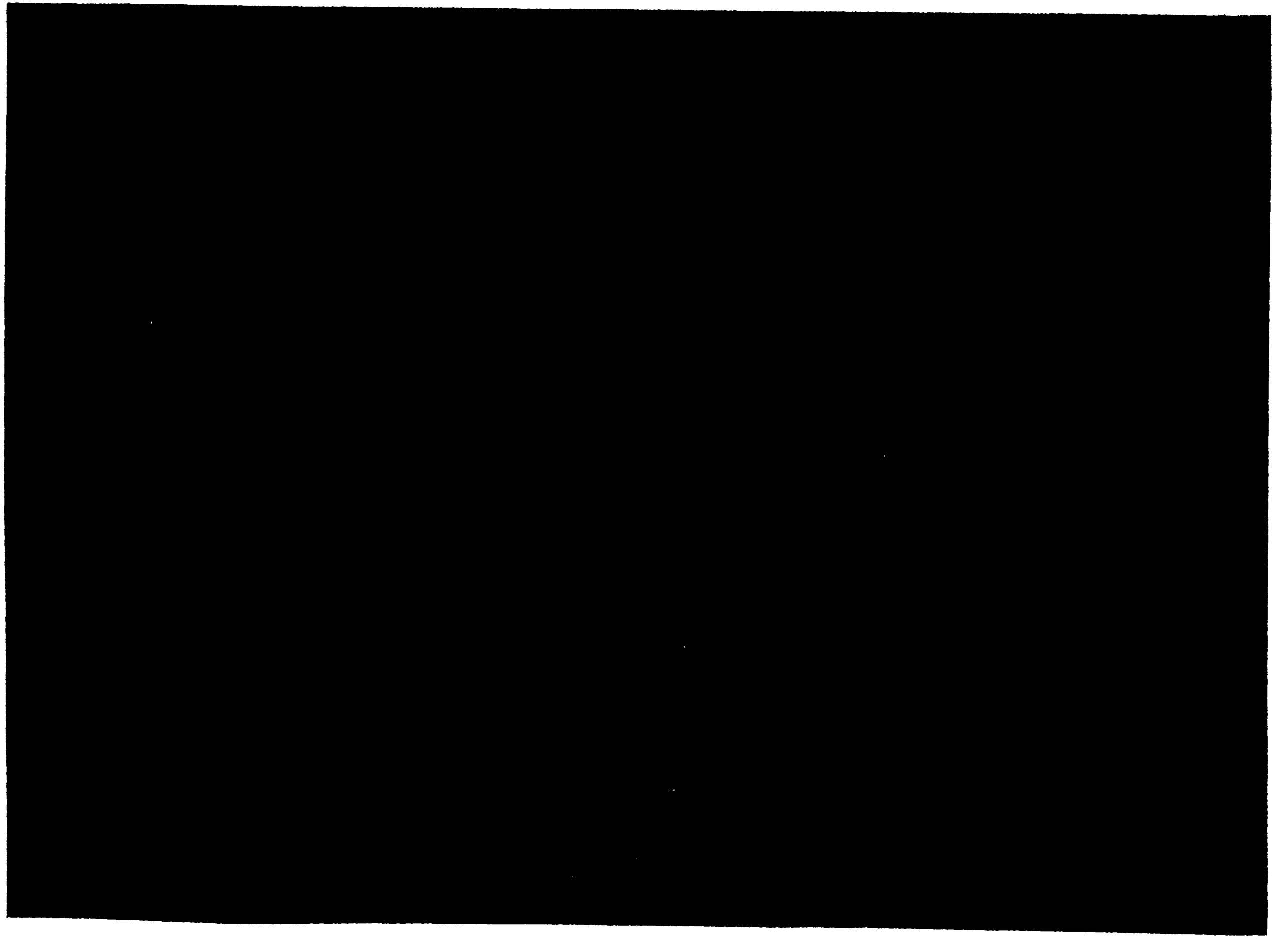
একটি স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ কর্ল্লে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পলায়নরত ষষ্ঠীকে বল্লে দাঁড়ান। ডাক্তারবাবু কে?

কমলাপতি আগন্তুকের ব্যবহারে যে একটু ভীত হয় নাই—একথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। সে বিনীত ভাবে বল্লে আজ্ঞে এই অধীন।

হান্না কার্পেটে সুচাঁকাজ করছিল আর আড়চোখে স্ত্রীলোকটিকে দেখছিল। তার গায়ের রং কাগ্‌জি বাদামের মত—মুখখানা অবশ্য এলো গোঁপা নিয়ে দশমীর চাঁদের মত। নাকটার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল বেশ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আকার ধারণ কর্ব্বার উচ্চাভিলাষ নিয়ে। কিন্তু তিন পো পথ চলে কেমন থেমে গিয়েছিল তার গতি। স্ত্রীলোকটি বিহ্বলকণ্ঠ, অবশ্য কোকিলকণ্ঠও নয়, হাঁড়িচাঁচা গলাও নয়! মোটামুটি গাং-শালিখের মত তার গলার আওয়াজ।

সে বল্লে—আপেনি তো সার্জ্জেন। বাড়িতে পাগল পুষে রাখেন কেন?

সে ষষ্ঠীচরণের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালে তার ঝাঁঝ সহিতে পারে এমন বীর বাংলাদেশে দু'চারকুড়ি থাকলে কাবুলী মহাজনদের পক্ষে লাঠির ঘায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় করা সুলভ হ'তনা। সে বল্লে বাপ্। বেজায় ঝাল। পগার-পার হ'লাম।



তিন বোন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভৌমিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রগতি বল্লে—আপনি কাকে কি বলছেন? ষষ্ঠীচরণ সেনের নাম শোনেন নি?

বীর প্রগতি! যে বল্লে—না সে সৌভাগ্য হয়নি। যদিও এই বয়সে বারদুই জেল খেটেছি দেশের জন্য, দশের জন্য।

শেষ সংবাদটা সে দিলে বিবেকানন্দের অভিভাষণের ভঙ্গীতে চারিদিকে চেয়ে।

প্রগতি মরিয়া হয়েছিল। সে বল্লে—ইনি হাসজুন্নি রাজার উপ-মন্ত্রী।

এবার আগন্তুক একটু কাবু হল। বাঙ্গালী জব্দ অচেনার কাছে। সে বল্লে—হসিজ্জদী রাজা আবার কে? মন্ত্রী তো জানি উপ-মন্ত্রী আবার কি?

হাসিজ্জদী না হাসজুন্নি। সেখানে পাঁয়তারা হয়—ঝাঁপাই ঝোড়া হয়—

স্ত্রীলোক নীরব হ'ল। মোটা খাদির কাপড়ের অঞ্চল দিয়ে মুখ মুচ্‌লে। বল্লে—যাক্। কাজের কথা কই।

কাজের কথা শোনবার জন্য তাদের মন টগবগ্ কর্ত্তে লাগলো। দুবার দেশের কাজে এমন স্বাধীনচিত্ত মহিলা নিজের স্বাধীনতাকে কারারুদ্ধ করেছে—তার উপর হান্নার ভক্তি হ'ল।

হান্না বল্লে—আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ।

তার সঙ্গে চোখোচোখি কর্ত্তে অবশ্য তার সাহস হ'ল না। তার পটোল-চেরা চোখের জ্যোতিঃ সূচি-শিল্পে নিবদ্ধ ছিল যখন সে অতিথিকে আপ্যায়ন কর্ল্লে।

প্রগতির দিকে চেয়ে বল্লে—স্ত্রীলোক—ইনি কে?

হান্না তার ধীরস্বরে প্রগতির পরিচয় দিল।

—হুঁ প্রফেসার! জেল গেছেন ইনি কখনও?—

প্রগতি হাতজোড় করে বল্লে সে সৌভাগ্য হয়নি। একবার ভুলে মিসেস সেনের একটা কব্জি-ঘড়ি বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম—আমার স্ত্রী তার পরদিন চৌদ্দপয়সা রিক্সা-ভাড়া দিয়ে এনে সেটা ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিজের মনে বল্লে—এরা সবাই বায়ুগ্রস্ত।

হান্নাকে আবার ভাব্‌তে হ'ল পণ্ডিতমশায়ের ফাঁস-বাঁধা টিকি।

আগন্তুকের বাপ্-মার দেওয়া নাম নলিনী দেবী। প্রথমবার যখন শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে আইন-ভাঙ্গাদের দলে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যায়, তাদের দলপতি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পুলিসের হুকুমে নিজের বা বাপের পরিচয় দেওয়া হীন দাস-বৃত্তি। অথচ মিষ্টভাষী ইন্‌স্‌পেক্টার যখন তাকে বল্লে—"দেখুন এটা আমাদের কর্ত্তব্য—দেশোদ্ধার যেমন আপনাদের"—তখন সে বল্লে লিখে নিন—মহাত্মাজী আমার পিতা। রসিক ইন্‌স্‌পেক্টর বল্লে—তাহলে মা কস্তুরীবাই আপনার জননী।

সে বল্লে অবশ্য।

তাহলে আপনি কস্তুরী-সুতা। সেই নামই লিখে নিলাম।

সেই অবধি দেশ-প্রাণ-নর-নারী তাকে কস্তুরী-সুতা বলে।

কস্তুরী-সুতা চিকিৎসককে বল্লে—আপনি কি অস্ত্র ব্যবহার করেন?

—আপনি হয় পাগল না হয় গোপাল ভাঁড়। বলুন তো ইংরাজের ফোড়া হ'লে তারা কি—

—দেশী কুড়ুনী বঁটি দিয়ে কাটে?

কস্তুরীসুতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে। বল্লে—আমি তো আপনার সঙ্গে কথা কইছি না।

হান্না বল্লে—কি জানেন, ওটা জীবন-মরণের কথা। একটু ভেবে বল্‌তে হয়।

—খদ্দরের ব্যাণ্ডেজ। তাও কি ভেবে বল্‌তে হবে?

প্রগতি যা ভাবছিল তা' বলতে সাহস কর্ল্লে না। তাদের খাবার ঘর থেকে মিষ্ট জাপানী ঘণ্টা বেজে উঠলো। প্রগতি ব'লে—আরতি আরম্ভ হ'য়েছে।

তারা সবাই উঠ্‌লো। হান্না নলিনীর দিকে স্পষ্ট তাকিয়ে বল্লে—তা হ'লে দয়া করে আর একদিন আসবেন।

নিঃশব্দে সে ঘরের বাহিরে গেল। উভয় পক্ষ একই কথা ভাবলে—পাগল।

(৪)

নীচের কোঠায় ষষ্ঠীচরণ তাকে ধর্ল্লে।

—আমি কীর্ত্তনের ধারে ধারে টহল্ মারছিলাম।

—চোপ।

উপর কোঠার প্রতি প্রগাঢ় বীতশ্রদ্ধা প্রকাশিত হ'ল। সে ঘৃণার স্বরে উচ্চারণ কর্ল্লে, মাত্র একটি কথা—চোপ।

প্রথমটা ষষ্ঠীচরণ ভীত হ'য়েছিল। কিন্তু তখনই সে সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—খুব ঝাঁঝ আছে আপনার। প্রায় ধোবীপাট ঝেড়েছিলেন। হন্তদন্ত হ'য়ে গেছি।

উপর কোঠার স্বচ্ছন্দ বিলাসিতা ওদের আপন-ঘেরা গুরুত্ব, প্রগতির শ্লেষ-ভরা রসিকতা, কস্তুরীসুতার মনে চরম ধারণা উৎপন্ন করেছিল যে সে পরাজিতা। সে যে ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করে সে পৃথিবী ভিন্ন—সেথায় অনুভূতি আছে, শ্রদ্ধা আছে, অন্ততঃ মৌখিক সাম্য আছে। এরা নিজেদের মহিমার বজ্রবাঁধনে নিজেরা আবদ্ধ। এই পুষ্ট-দেহ, শিশু-মন লোকটার প্রলাপ বচন দুর্বোধ হলেও তার চোখে ও চালচলনে শ্রদ্ধা আছে। সে অন্ততঃ মানুষকে মানুষ বলে ভাবে।

তাই কস্তুরীসুতা বল্লে—আপনার ভাষা আমি বুঝি না। বাঙলা বলুন।

ষষ্ঠীচরণ তাকে একখানা কেদারা দিয়ে বসতে অনুরোধ করলে। নলিনীর মনে গুমোট গরমের পর মলয় বাতাসের তরল সঞ্চারণ উপলব্ধি কল্লে। একটু হাসলে।

ষষ্ঠীচরণ আরও মোলায়েম হ'ল। বল্লে—আপনি যখন কথা কইছিলেন আমি আনাচে কানাচেয় ঘাই দিচ্ছিলাম। আপনার অস্ত্র আমি বেচে দব—সোঝা লাঠিতে হবে না—বেনেটি পাক চাই।

অসম্ভব। কস্তুরীসুতা বল্লে—আমি অস্ত্র বেচতে চাই না। মানুষ চিন্‌লাম এই যথেষ্ট। এত স্বার্থত্যাগ—

ষষ্ঠী এ কথা শুনবে না। সে বল্লে—ভুল একেবারে ভুল। এরা লোক সিধে—নারকল্ গাছের মত। কালা-পাণির ফেরত লোক একটু হাসজুন্নি করে।

নলিনীর মন্দ লাগছিল না এই নির্বোধ বলিষ্ঠকে। তার অভিমান-ভরা প্রাণ বিয়োগান্ত নাটকের পর প্রহসনের রস আস্বাদন করছিল। কি দম্ভ! আরও অসহ্য সেই ননীর পুতুল স্ত্রীলোকটার সস্তা সৌজন্য।

বলিষ্ঠ পুরুষ মুগ্ধ নেত্রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—মাটির দিকে চেয়ে থাকলেও নলিনী তা বুঝেছিল। তার সরল মনের নির্বাক প্রশংসার মদিরা তৃপ্তি দান কর্চ্ছিল যুবতীকে। সে বল্লে—আপনাদের বাড়ী কোথা?

—ভাজনঘাট। আমরা গোসাই বংশ। ডাক্তার আমার ভাইপো। কলকাটি আমার হাতে। শর্ম্মা কোম্পানী যন্তর ফোটায়।

নলিনী হাসলে এবার। তেজে-ভরা মুখ, ধবধবে দাঁত। সে বল্লে—আপনি রাঁচি না গিয়ে এখানে কেন?

—সেয়ান পাগল, বুঁচকী আগল। রোজ ভোরে আমি ডাক্তারের অস্তর সিদ্ধ করি টগবগে গরম জলে। আমি বদলে দব। আমায় দেবেন দেশী অস্ত্র।

সর্ব্বনাশ! হাম্নার কথা তার স্মরণ হল—জীবন মরণের ব্যাপার। জবরদস্ত কস্তুরীসুতা—সে একবার ইংরাজ সার্জ্জেণ্টকে ধাক্কা মেরেছিল। কিন্তু সে প্রতারণার পাঠ পড়ে নি।

—ছিঃ! ও সব করবেন না। যদি স্বেচ্ছায় উনি না নেন দেশী অস্ত্র, ক্ষতি ওঁর! কিন্তু দেশী জিনিষ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় না মিথ্যা পরিচয়ে।

কি করে! বাধ্য হয়ে তাকে অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী কতকগুলা অস্ত্রের নাম কর্ত্তে হ'ল।

—আঃ! আপনাদের সবার মাথায় ছিট্ আছে।

প্রগতি বল্লে - আপনি কি বলতে চান সোজা কোরে ভিড়িয়ে দিন্ না। পাছে ভুলে যায় তাই সে ষষ্ঠীচরণের বাকধারা অভ্যাস কচ্ছিল।

হাম্না ভাবলে—টিকি। কিন্তু বেচারা কি একটা মানষিক প্রক্রিয়ার ফলে চেঁচিয়ে ব'লে ফেল্লে—টিকি!

এবার কস্তুরীসুতা বিস্মিত হ'ল। ভাবলে এরা সবাই পাগল। তার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দেখে তারাও ভাবলে স্ত্রীলোকটা নিশ্চয় পাগল। ভাব-ধারার স্রোত এ দুই পক্ষের বিরুদ্ধ মুখ।

হাম্না অপ্রস্তুত হ'য়েছিল। সে বল্লে—কিছু খাবেন?

—না।—তীক্ষ্ণ রুক্ষ স্বর।

ডাক্তার সেন বিমর্ষ হ'ল। আগন্তুক স্বদেশ সেবিকা ভদ্রলোকের মেয়ে—তার অতিথি। তার নির্ভীক তেজস্বিতা কিন্তু আপন-ভোলা। সে নিজে অপরের জানাশুনা কোনো খাতে বহিতে একেবারে নারাজ। প্রগতিও বুঝলে উভয় পক্ষ যে যে আদর্শে গঠিত তাদের মধ্যে মিলন-ক্ষেত্র নাই। পরমহংস দেবের মানুষের বর্ণনা সে স্মরণ করলে। দু পক্ষেরই পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে নিশ্চয় একটা মানবতার স্তরে পৌছান যাবে যেখানে তারা পরস্পরকে চিনবে। সে

অতি সাদরে বল্লে—আপনার আসার উদ্দেশ্যের কথা তো বল্লেন না।

নলিনী ভাবছিল—এই স্বার্থপর বিলাসিতায় লালিত শিক্ষা-গৌরবে ভরা লোকগুলা অপোগণ্ড। এরা যদি মানুষ হোতো।

সে বল্লে—হ্যাঁ, সেই কথাই বলি। আমি অস্ত্রায়ুধ লিমিটেডের ক্যানভ্যাসার। তারা দা বঁটি, কাস্তে কুড়ুলি থেকে আরম্ভ ক'রে ডাক্তারী অস্ত্র অবধি নির্ম্মাণ করে।

হাস্না মুগ্ধ হ'ল। স্ত্রীলোক স্বাধীন ভাবে ব্যবসা কর্চ্ছে—এর উপকার করা উচিত। সে বল্লে আমাকে দু'খানা খুব ধারালো ডাব্‌কাটা দা দেবেন তো। একখানা নিজে রাখবো একখানা মুকুলমণিকে দেব।

মুকুলমণি প্রগতির স্ত্রী হাস্নার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

প্রগতি ভাবলে শ্রীমতী সেন এতখানি বদান্যতা দেখিয়ে আমাদের ডাব-কাটা অস্ত্র দিতে ইচ্ছুক এ উপকারের প্রত্যুপকার আবশ্যক। এতে অস্ত্রায়ধ কোম্পানীর প্রতিনিধিরও কিছু উপকার হ'বে। সে বল্লে—আর আমাকে খান দুই আম-কাটা বঁটি আর পেন্সিল-কাটা ওর নাম কি—

নলিনী এবার শ্রীমতী নায়ডুর মত উপর নীচে মাথা নেড়ে বল্লে—বঁটি কাটারী বেচবার জন্য কস্তুরীসুতা কারও দারস্থ হয় না।

তারা তিনজনে বিস্মিত হয়ে সমস্বরে বল্লে—কে ?

"কস্তুরীসুতা।"—ব'লে সে তার নিজের স্ফীত বক্ষের উপরে বুড়া আঙুলের গোজা মারলে।

হঠাৎ মাঝরাত্রে শোবার ঘরে যদি ঝলমলে পোষাক পরা একটা কাবুলীওয়ালা ঢুকে সিমেন্টের মেঝেতে লাঠি ঠুকে বলে—রূপ্পা লাও তো মানুষে এত বিস্মিত হয় না। কস্তুরীসুতা!

তাদের ভাব-ভঙ্গী দেখে কস্তুরীসুতার মনে ভীষণ বিরক্তির সঞ্চার হ'চ্ছিল, সে ভাবছিল—এই নির্ব্বোধগুলা না জানে নিজের সমাজের আদব-কায়দা, না জানে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। তাদের সৌজন্যের মুখোস পরা দম্ভ নলিনীকে অভিভূত করেছিল। অথচ হঠাৎ চলে গেলেও দুর্ব্বল দাস-বৃত্তির পরিচয় দেওয়া হবে।

ডাক্তার সেন বল্লে—আমি ঠিক্ বুঝতে পার্চ্ছি না আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য।

সোঝা কথা বলা ভাল—ভাবলে কস্তুরীসুতা। সে বল্লে—আমি চাই ডাক্তারী অস্ত্র বেচতে। দেশী অস্ত্র—

—ওঃ! বাবা!—বলে ফেল্‌লে ভিষক যখন ক্ষিপ্র-কল্পনা তাকে দেশী লান্‌সেটের গায়ে কোটী কোটী জীবাণু ও বীজাণু দেখালে।

একটু উত্তেজনার সঙ্গে কস্তুরীসুতা বল্লে—ওঃ! বাবা! কেন? লজ্জা করে না দেশের লোকের গায়ে বিলাতী অস্ত্র চালাতে। স্বরাজ চান না?

ডাক্তার নিজের মনে বলে ফেললে যদি বঁটি দিয়ে ফোড়া কাটতে হয়—মোটেই না।

মোটেই না? ছিঃ।—বল্লে নলিনী। তার দুই চক্ষু হ'তে দুটা আগুনের স্রোত বহির্গত হচ্ছিল।

প্রগতি সামলাবার জন্য বল্লে—উনি সেভাবে ব্যাপারটা দেখেন নি। অস্ত্র শস্ত্র প্রায় বিলাত থেকেই আসে। দেশীর মধ্যে দমদম বুলেট যা জেনিভা—

শেষটা শ্রীমতী নায়ডুর ভঙ্গীতে। প্রগতি শুন্‌লে বলতো—তাই দেশী জিনিষে পালিস থাকে না।

হাত জোড় করলে ষষ্ঠী। নলিনী বল্লে—ছিঃ! মনে ভাবলে—এমন সরল বিনয়ী ভেড়া নেকড়ে বাঘের দলে কেন?

ষষ্ঠী বললে—আপনার ডেরাডাণ্ডা কোথা? আপনি বেশ! আমি যাব আপনার ডেরায়।

নলিনী খুব হাসলে। বল্লে—আসবেন। আমার বাবাকে দেখবেন। দেবতা। আমি ত বৈদ্যের মেয়ে।

সে বাহিরে গেল। ষষ্ঠী বল্লে—ফরর‍্যাও।

ফরর‍্যাও! সে আবার কি? নলিনী তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করবে—ভাজ্‌ংঘাটা কোন্ দেশে—আর সেখান-কার ভাষা কি?

ষষ্ঠী নীরবে ভাবলে। জীবনে সে কার্য্য বোধ হয় সে এই প্রথম কর্ল্লে। তার ভাবনা তাকে লজ্জিত কর্ল্লে। ছিঃ! আজ ত্রিশ বৎসর সে কৌমার্য্য অবলম্বন করেছে, বিবাহিত জীবনকে দুর্ব্বলতা মাত্র ভেবেছে—না। কিন্তু বিবাহ যদি কর্ত্তে হয় তো ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্‌পেনে পরিবার হ'তে এমনি জাঁহাবাজ স্ত্রী ভাল। কি হাস্‌জুন্নি।

লোকের সামনে সে কমলাপতির সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে কথা বলত। কিন্তু—আড়ালে ডাক্তার তাকে বাল্য-বন্ধু ভাবতো।

প্রগতি অবশ্য লোক নয়। ষষ্ঠীচরণ নলিনীর বিপক্ষের কথা-গুলা ভাবলে। বারকোস-মুখ, পুঁটুলী নাক—দৃষ্টি? বেশ যখন হেসে কথা কয়। কিন্তু যখন বগ্য না মানে। বাপ্‌স্—তুরপুন। যত ঘোরে তত ছ্যাদা করে। কিন্তু—

কিন্তু—কিন্তুই মাটি করলে বেচারা ষষ্ঠীর দাসকে।

ভোজনান্তে হাস্নাহানা যখন গেল মেয়েকে ঘুম্ পাড়াতে তখন ষষ্ঠীচরণ গুটি গুটি গেল ডাক্তারের কাছে। প্রগতি বল্লে—ষষ্ঠীখুড়ো আজ তুমি ফরমে আছ—অনেকগুলা নূতন কথা শিখিয়েছ।

ষষ্ঠী বল্লে—ওপরে চাকুম চুকুম—বাবা ভেতর ফোঁপড়া।

কি ব্যাপার! এমন বৈরাগ্যের বাণী তো কোনো দিন তার মুখে শোনা যায়নি। সে যে সদানন্দ পুরুষ।

—তোমরা নাকি বেওয়াদের নোয়া পরাও—জিজ্ঞাসা করলে সে।

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে কমলাপতি বল্লে—আচ্ছা খুড়ো—বিধবাদের বিয়ে দাও—বলা কি সোজা না?

সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে ষষ্ঠী বলে—বাপ্‌স্ কামার-শালের ফুলকী।

ওরা হাসলে। কি ব্যাপার! খুড়োর দীর্ঘশ্বাস।

—কে ফুল্‌কী খুড়ো?

—বারকোস্ বদন, তুরপুন আঁখি—

মিনিট পাঁচেকের যৌথ জেরার পর তারা খুড়োর রোগ-নির্ণয় কল্লে—ষষ্ঠীচরণ সেন প্রেমে পড়েছে।

কি আনন্দের দিন আজ তাদের। ষষ্ঠীচরণ পড়েছে প্রেমে।

—কিন্তু খুড়ো মেয়েটি বিবাহিত কিনা তাতো জান্‌লে না।

--তা কি আর না জেনেছি প্রগতি মাষ্টার! হাতে যার নাই নোয়া—সিঁথিতে নাই সিঁদুর তার কি স্বোয়ামী থাকে? বিধবা হয় তো তোমরা আছ।

এর পর কে বলে খুড়ো সরল আর অজ্ঞ! প্রগতি বল্লে কিন্তু খুড়ো কস্তুরীসুতার ফোঁস দেখেছ?

—তাই তো ছুব্‌লেছে বাবা! দেখ ভাইপো, কাণ যদি চুলকাতে হয় তো গোখরো সাপের ল্যাজই ভাল—পায়রার পালক কিছু না।

প্রগতি ভাবলে দশখানা বাজে বই পড়ার চেয়ে অধিক শিক্ষা হয় তাদের কাছে থাকলে যাদের সমাজ ভাবে বোকা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

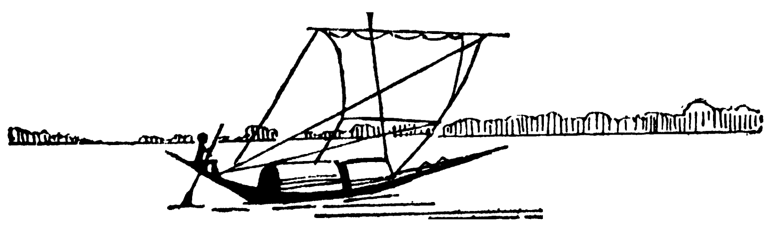
"মন্-মাঝি মোর কূল হারালো—"

শ্রীমতী বনমালা দেবী

মন্‌মাঝি মোর কূল হারালো
জীবন নদীর অকূলে হায়!
হাতের বৈঠা শিথিল হ'ল
নয়নজলে বুক ভেসে যায়।

আকাশে মেঘ ঢল ঢল
ঘোর তুফানে টল মল
বানের জলে তীর মেলেনা
ভীড়বে তরী কোন কিনারায়

মন্‌মাঝি মোর কূল হারালো
জীবন-নদীর অকূলে হায়!



বেদে বিজ্ঞানের কথা

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

সূর্য্য

(৩)

ইতিপূর্ব্বে পৃথিবী ও চন্দ্রের কথা বলিতে বলিতে সূর্য্য সম্বন্ধেও অনেক কথাই বলা হইয়াছে যেমন—

(১) সূর্য্যের আকর্ষণেই পৃথিবী উহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে।

অহস্তা যদপদী·· নিশিশ্নথঃ। ঋগ্বেদ ১০।২২।১৪

(২) পৃথিবীর ন্যায় আরও ছয়টী গ্রহ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তির বলে।

অনড়্বান্ দাধার পৃথিবীং··· আবিবেশ।

অথর্ব্ব বেদ ৪।১১।১

(৩) চন্দ্র ও পৃথিবীর নিজের আলোক নাই—সূর্য্যের আলোকেই আলোকিত হয়।

অত্রাহ····· চন্দ্রমসো গৃহে। ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৫

(৪) কি কি কারণে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণ হয়

যত্ত্বা সূর্য্য স্বর্ভানু · ভুবনান্যদীয়ুঃ॥ ঋগ্বেদ ৫।৪০।৫

(৫) পৃথিবী হইতে বোধহয়—সূর্য্য প্রত্যহ ৫০৫৯ যোজন ভ্রমণ করিতেছে। ইহা পৃথিবীর গতিমাত্র। সূর্য্যের গতি নহে।

সদৃশীরদ্য···যান্তি সদ্যঃ। ঋগ্বেদ ১।১২৩।৮

(৬) সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ কাহাকে বলে?

পঞ্চপাদং··· আহুরর্পিতং ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১২

(৭) বর্ষারম্ভ বা মনসুন—কি কারণে হয় অর্থাৎ সূর্য্যের দক্ষিণায়ণের সময়ে বারিরাশি বর্ষণ হয়।

স সর্গেণ···বিবিষুরপ্রমৃষ্যং। ঋগ্বেদ ৬।৩২।৫

(৮) বর্ষচক্র কিরূপে গণনা করা হয়—

দ্বাদশ প্রধয়শ্চ···চলাচলাশঃ॥ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৮

(৯) অহোরাত্র— ৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি

দ্বাদশারং······তস্থুঃ ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১

(১০) মলমাস কাহাকে বলে? অর্থাৎ সৌর বৎসর ও চান্দ্র বৎসর মধ্যে ঐক্য বিধান জন্য যে মাস গণণা করা হয়।

বেদমাসো···উপজায়ত ঋগ্বেদ ১।২৫।৮

ইত্যাদি····· ইত্যাদি।

মেঘের উৎপত্তি সূর্য্যদ্বারা

অনুপ্রত্নাস আয়বঃ পদং নবীয়ো অক্রমুঃ।
রুচে জনন্ত সূর্য্যম্। সামবেদ ৫।৪।৬

অন্বয়ঃ—প্রত্নাসঃ আয়বঃ নবীয়ঃ পদং অক্রমুঃ সূর্য্যম রুচে জনন্ত।

অস্যার্থ :—প্রত্নাসঃ = প্রাচীন (পুরাতন)

আয়বঃ = গমনশীল জলকণা সকল সূর্য্য কিরণে আকৃষ্ট হইয়া

নবীয়ঃ = নূতন তর

পদং = মেঘ রূপ অবস্থা

অক্রমুঃ = ধারণ করে

সূর্য্যং = সূর্য্যের

রুচে = দীপ্তি (তাপ)

জনন্ত = বৃদ্ধি পায়

বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট হইয়া প্রাচীনদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতনতর আকার (মেঘরূপ) ধারণ করে—তাহাতেই সূর্য্যের তাপ আরো বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ—জল সমূহ সূর্য্যের রশ্মি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘের আকার ধারণ করে। ইহাতেই সূর্য্যের তাপ আরো প্রখর হইয়া উঠে। এবং সূর্য্যদ্বারাই বৃষ্টি হয়।

যদী বহন্ত্যাশবো ভ্রাজমানা রথেষ্বা।
পিবন্তো মদিরং মধু তত্র শ্রবাংসি কৃণ্বতে
সামবেদ ৪ অধ্যায় ।১মা।৫ (ঐন্দ্রপর্ব্ব)

অন্বয়ঃ—হে সূর্য্যদেব—যদি রথেষু ভ্রাজমানাঃ আশবঃ আবহন্তি তত্র মদিরং মধু-পিবন্তঃ শ্রবাংসি কৃণ্বতে।

অন্বয়ার্থ :—যদিরথেষু ভ্রাজমানাঃ—যখন রমণীয় অন্তরিক্ষ পথে দেদীপ্যমান

আশবঃ = শীঘ্রগামী বায়ুসমূহ তোমার কিরণ সমূহ

আবহন্তি = আহুতি দ্বারা প্রদত্ত যজ্ঞীয়হবি তোমাকে প্রাপ্ত করায়

তত্রৈ = তখন

মদিরং মধু = মদকর মধুরসোমরস

পিবন্তঃ = পান করতঃ

শ্রবাংসি = অন্নসকল

কৃণ্বতে = বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন কর

বঙ্গানুবাদ—হে সূর্য্যদেব যখন রমণীয় অন্তরীক্ষপথে শীঘ্রগামী বায়ুসমূহ তোমার কিরণসমূহ আহুতি দ্বারা প্রদত্ত যজ্ঞীয়হবি তোমাকে পান করায় তখন যজ্ঞে প্রদত্ত মদকর মধুর সোমরস পানকরতঃ অন্ন সকল বৃষ্টিদ্বারা উৎপন্ন করাও।

মাধ্যাকর্ষণশক্তি (gravitation)

অবদ্রপ্সো অংশুমতী মতিষ্ঠদিয়ানঃ
কৃষ্ণো দশভিঃ সহস্রৈঃ।
আবত্ত মিন্দ্রঃ শচ্যা ধমন্ত মপ
স্নীহিতিং নৃমণাঃ অধদ্রাঃ।

সামবেদ ৩।১০।১

অন্বয়ঃ—দ্রপ্সঃ অংশুমতী অবতিষ্ঠৎ দশভিঃ সহস্রৈঃ ইয়ানঃ কৃষ্ণঃ—ইন্দ্রঃ—তং আবৎ ধমন্তং নৃমণাঃ অধদ্রাঃ স্নীহিতিং শচ্যা উপ।

অন্বয়ার্থ :—দ্রপ্সঃ—দ্রবণশীল বৃষ্টির জল

অংশুমতী = সর্ব্বৌষধীযুক্তা পৃথিবীকে

অবতিষ্ঠৎ = প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিত থাকে

দশভিঃ সহস্রৈঃ = দশ সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য সূর্য্যরশ্মিদ্বারা

ইয়ানঃ = সঞ্চারিত হইয়া

কৃষ্ণঃ = কৃষিহেতু

ইন্দ্রঃ = বৃষ্টিপ্রদ তুমি (সূর্য্য)

তং = কৃষিহেতু সেই জলকে

আবৎ = বর্ষণ জন্য রক্ষাকর

ধমন্তং = এবং বৃষ্টিকালে মেঘ গর্জ্জনাদি দ্বারা শব্দকারী

নৃমণাঃ = নরগণের মননীয় (প্রার্থনীয়)

অধদ্রা = অধোপতনশীল

স্নীহিতং = মেঘহনন জল বৃষ্টির জলকে

শচ্যা = স্বীয় শক্তিদ্বারা

উপ = পৃথিবীতে প্রস্রাবিত কর।

বঙ্গানুবাদ :—হে সূর্য্যদেব, তুমি বৃষ্টিপ্রদ তুমি কৃষি হেতু জলকে বর্ষণ জন্য রক্ষাকর এবং বৃষ্টিকালে মেঘ গর্জ্জনাদি দ্বারা শব্দকারী নরগণের প্রার্থনীয় অধোপতনশীল—মেঘ হইতে বৃষ্টির জলকে স্বীয় শক্তিদ্বারা পৃথিবীতে প্রস্রাবিত কর। এবং দ্রবণশীল বৃষ্টির জল সর্ব্বৌষধীযুক্তা পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থিত থাকে যেখানে তুমি সহস্র সহস্র রশ্মিদ্বারা কৃষি হেতু বৃষ্টির জল সঞ্চারিত কর।

সূর্য্যরশ্মি বাষ্প গ্রহণ করেন—এই সেই বাষ্প ক্রমশঃ মেঘ রূপ ধারণ করিয়া অবশেষে বারিবর্ষণ হয়।

সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্যরেতো
বিষ্ণোস্তিষ্ঠন্তি প্রদিশা বিধর্মণি।
তে ধীতিভি মনসা তে বিপশ্চিতঃ
পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ॥ ঋগ্বেদ ১। ৬১।৩৬

বঙ্গানুবাদ :—সপ্তরশ্মি অর্দ্ধবৎসর পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া (বৃষ্টির উপাদান গ্রহণ করিয়া) এই ভুবনে রেতঃ স্বরূপ হইয়া (অর্থাৎ বৃষ্টিপ্রদান করিয়া) বিষ্ণুর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। (অর্থাৎ বিষ্ণুর আদেশ মত এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। উহা বিপশ্চিৎ ও সর্ব্বতোব্যাপি। উহারা প্রজ্ঞোদারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে।

পুনশ্চ :—

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি
তেন জীবন্তি প্রদিশ শ্চতস্রঃ।
ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপ জীবতি।

ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪২

বঙ্গানুবাদঃ—তাঁহার নিকট হইতেই মেঘসকল বর্ষণ করে—তাঁহা হইতে চতুর্দ্দিক আশ্রিত ভূতজাত রক্ষা হয়। তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়—জল হইতে সমস্ত জীব প্রাণ ধারণ করে।

অন্যত্র :—

কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা
অপো বসনা বিদমুৎপতন্তি।
ত আববৃত্রন্ৎ সদনাদৃত স্যাৎ
ইদ্ঘৃতেন পৃথিবী ব্যুদ্যতে॥ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৭

বঙ্গানুবাদঃ—সুন্দর গতিবিশিষ্ট জলহারী সূর্য্যরশ্মি সকল কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়মিত গতি মেঘকে জলপূর্ণ করতঃ দ্যুলোকে গমন করিতেছে। উহারা বৃষ্টির স্থান হইতে নিম্নমুখে আগমন করে এবং তদনন্তর পৃথিবীকে জল দ্বারা বিশেষরূপে ক্লিন্ন করে।

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহন্তমপাং
গর্ভং দর্শতমোষধীনাং।
অভীপতো বৃষ্টিভি স্তর্পয়ন্তং
সরস্বন্তমবসে জোহবীম।৫২
ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫২

বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যদেব স্বর্গীয় সুন্দর গতিবিশিষ্ট গমনশীল—প্রকাণ্ড—জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধি সমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টি দ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন—এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থে তাঁহাকে আহ্বান করি।

ঋগ্বেদ মধ্যে সূর্য্যের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির কথাও সুন্দর-ভাবে বর্ণিত আছে।

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো
নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা
দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্। ঋগ্বেদ—১।৩৫।২

অন্বয় :—সবিতা কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানঃ অমৃতং মর্ত্ত্যং চ আনিবেশন দেবঃ হিরণ্ময়েন রথেন ভুবনানি পশ্যন্ আয়াতি।

অস্যার্থ :—সবিতা = সূর্য্য
কৃষ্ণেন রজসা = আকর্ষণ শক্তিযুক্ত পৃথিব্যাদি সহ
বর্ত্তবানঃ = থাকিয়া
অমৃতং মর্ত্ত্যং চ = নশ্বর ও অবিনশ্বর উভয়কে
আ নিবেশন্ = নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া
দেবঃ = এই মহান্ দেব
হিরণ্ময়েন = নিজের দিকে আকর্ষণকারী
রথেন = রথদ্বারা
ভুবনানি পশ্যন্ = চতুর্দ্দিকের ভুবনকে যেন দেখিতে দেখিতে
আয়াতি = গমনাগমন করে।

বঙ্গানুবাদ :—সূর্য্য আকর্ষণযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর ও অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মাধ্যাকর্ষণরূপে রথে চড়িয়া যেন সারা লোক লোকান্তরকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছে।

সামবেদ সংহিতাতেও ঐরূপ উক্তি দেখা যায়—

যে তে পন্থা অধো দিবো যেভির্ব্যশ্বমৈরয়ঃ
উত শ্রোষন্ত নো ভুবঃ।
সামবেদ ঐন্দ্রপর্ব্ব ২ অধ্যায়। ৬ দশতি।৮

অন্বয় :—দিবঃ অধঃ যে পন্থা—যেভিঃ বিশ্বং ঐরয়ঃ উত নঃ ভুবঃ শ্রোষন্ত।

অস্যার্থ :—দিবঃ = সূর্য্যলোকের
অধঃ = অধোভাগে
যে পন্থাঃ = যে সকল পথ আছে
যেভিঃ = যে পথদ্বারা তুমি
বিশ্বং = এই বিশ্বকে (গতিশীল গ্রহগণকে)
ঐরয়ঃ = চালিত করিতেছে
উতঃ নঃ ভুবঃ = আর ও আমাদের পৃথিবী
শ্রোষন্ত = আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমেশ্বর সূর্য্যলোকের অধোভাগে যে সকল পথ রহিয়াছে—যে সকল পথদ্বারা তুমি বিশ্বজগৎ (গ্রহাদিগণকে) চালিত করিতেছ, সেই সব পথ—অর্থাৎ তৎপথব্যাপিনী তোমার অদ্ভুত শক্তি সকল—আর আমা-দের নিবাসস্থল এই পৃথিবী—আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করুন—অর্থাৎ আপনার কৃপায় সমস্তই আমাদের অনুকূল হউক।

সূর্য্যরশ্মি—

উৎ পুরস্তাৎ সূর্য্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা।
দৃষ্টাং শ্চঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন ক্রিমীন্।
অথর্ব্ব বেদ ৫।২৩।৬

অন্বয়ঃ—পুরস্তাৎ সূর্য্যঃ উৎ এতি বিশ্বদৃষ্টঃ অদৃষ্টহা দৃষ্টান্ ঘ্নন্ চ অদৃষ্টান্ সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রমৃণন।

অস্যার্থ :—পুরস্তাৎ = পূর্ব্ব দিকে
সূর্য্য উৎ এতি = সূর্য্য উদয় হয়
বিশ্বদৃষ্টঃ = সকলেই তাহাকে দেখে

অদৃষ্টহা = অদৃষ্ট রোজ-বীজাণু নষ্ট করে

দৃষ্টান্ ঘ্নন্ = দৃষ্ট রোগবীজাণুকেও নষ্ট করে

অদৃষ্টান্ সর্ব্বান ক্রিমীন্ = অদৃষ্ট রোগবীজাণুকে

প্রমৃণন্ = নষ্ট করে।

বঙ্গানুবাদ :—সকলেই দেখে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে শুধু উদিতই হয় কিন্তু কয় জন জানে—যে সূর্য্যের উদয়ে রোগ সমূহের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজাণু বিনষ্ট হয়।

ঋগ্বেদেও ঐরূপ রোগনাশের কথা লেখা আছে—

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষ ণিরুভে

দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীয়তে।

অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্যমভি

কৃষ্ণেণ রজসা দ্যামৃণোতি ॥

ঋগ্বেদ - ১ম।৩৫।৯

বঙ্গানুবাদ :—হিরণ্যপাণি বিবিধদর্শনযুক্ত সবিতা উভয় লোকের মধ্যে গমন করিতেছে, রোগাদি নিরাকরণ করিতেছেন এবং তমোনাশকে তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া সূর্য্যের দিকে যাইতেছে।

সবিতা অর্থে প্রাতঃসূর্য্য। অস্তকালীন ইহাকে সূর্য্য নামে অভিহিত করা হইতেছে।

সুতরাং প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিই রোগাদি নাশক ইহাই বলা হইয়াছে। অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মি সেরূপ গুণযুক্ত নহে।

সপ্তাশ্ব (seven prismatic colours)

সূর্য্যের রথ সপ্ত অশ্বে বহন করে। এইরূপ লেখা আছে। টীকাকারগণ একবাক্যে বলেন যে সূর্য্যালোকে সপ্ত বর্ণ রশ্মি নিহিত আছে ইহাই সূচিত হইয়াছে।

সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।

শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ।৮ ঋগ্বেদ ১।৫০।৮

বঙ্গানুবাদ :—হে দীপ্তমান সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য—হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব রথে তোমাকে বহন করে। জ্যোতিই তোমার বেশ। (হরিৎ = হৃঞ হরণে) জলাশয় হইতে সূর্য্যের রশ্মি বাষ্প হরণ করে বলিয়া উহার নামান্তর (হরিৎ)।

এই সপ্ত রশ্মি যথাক্রমে—Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange and Red. বর্ণবিশিষ্ট।

সাঙ্কেতিক নাম—Vibgyor.

আর এই সপ্তরশ্মির মধ্যেই ultra violet নামক এক প্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে—যদ্দ্বারা দুরারোগ্য ব্যাধি সমূহেরও উপশম হইতেছে। তবে ঐ রশ্মি সেবন করিতে হইলে—আদুর গায়ে সেবন করিতে হয়—কোট ওয়েষ্টকোট প্রভৃতি আবরণ দেহের উপর থাকিলে কোন উপকার পাওয়া যায় না—এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপদেশ। শ্রুতি ও পুরাণাদি মধ্যে যে সকল ব্যাধি সূর্য্যালোকে আরোগ্যের কথা লেখা আছে, তাঁহারা সকলেই বোধ হয় ঐরূপ ভাবেই সূর্য্যালোক সেবন করিতেন।

এইজন্যই বোধ হয় কণ্বঋষির পুত্র প্রস্কণ্বঋষি সূর্য্যের এইরূপ স্তব করিয়াছেন।

উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং

হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয়।

ঋগ্বেদ ১।৫০।১১

বঙ্গানুবাদ :—হে অনুকূল দীপ্তযুক্ত সূর্য্য অদ্য উদয় হইয়া—এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া আমার হৃদরোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশকর।

কথিত আছে—যে সূর্য্য প্রস্কণ্ব মুণি দ্বারা এইরূপ স্তুত হইয়া সেই মুনির হৃদরোগ ও শ্বেতি রোগ আরোগ্য করিয়া দেন।

পুনরায় তাই উক্ত ঋষি বলিতেছেন—

উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।

দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধং ॥

ঋগ্বেদ · ১।৫০।১৩

বঙ্গানুবাদ :—এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন তিনি আমার অনিষ্টকারী রোগ বিনাশ করিয়াছেন—আমি সেই অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি নাই।

তাই অথর্ব্ব বেদের আদেশ—

মেধাং সায়ং মেধাং প্রাত

র্মেধাং মধ্যন্দিনে পরি।

মেধাং সূর্য্যস্য রশ্মিভি

র্বচসা বেশয়ামহে ॥

অথর্ব্ব বেদ—৬।১০৮।৫

অন্বয় :—সায়ম্ প্রাতঃ মধ্যন্দিনে—সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ বচসা মেধাম্ আবেশয়ামহে।

অস্যার্থ :—সায়ং প্রাতঃ মধ্যন্দিনে = সায়ংকালে,

প্রাতঃকালে ও দ্বিপ্রহরে

সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ = সূর্য্যের রশ্মির সহিত

বচসা = বাণীদ্বারা

মেধাম্ = মেধাকে

অবেশয়ামহে = আমরা ধারণ করি।

বঙ্গানুবাদ :—সায়ংকালে প্রাতঃকালে এবং দিবা দ্বিপ্রহরে সূর্য্যরশ্মির সহিত বাণী দ্বারা মেধাকে ধারণ করি। তাই আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-সন্তানই গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন ত্রিসন্ধ্যা।

ঋগ্বেদের ৩য় মণ্ডলে ৬২ সূক্তে ১০ম ঋকে আছে—

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যঃ ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

এই মন্ত্র উচ্চারিত করিবার পূর্ব্বে—

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ

উচ্চারণ করিতে হয়—উহার অর্থ—

ওঁ (অ + উ + ম) = পরমাত্মা (সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা)

ভূঃ = প্রাণস্বরূপ

ভুবঃ = দুঃখনাশক

স্বঃ = সুখ স্বরূপ।

অর্থাৎ—পরমাত্মাই জগতের স্রষ্টা এবং জীবের দুঃখ নাশক ও সুখ প্রদাতা।

কেহ কেহ বলেন—ভূ ভুবঃ স্বঃ অর্থে—ত্রিলোক

ইদং লোকত্রয়ং ব্যাপৈব—তৎ কারণং জপং ব্রহ্ম নিত্যমবতিষ্ঠতে।

তাহার পর—

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

অন্বয় মুখে অর্থ :—

তৎ সবিতুঃ = তস্য সবিতুঃ

দেবস্য = দীপ্তিমানস্য

বরেণ্যং = বরণীয়ং

ভর্গঃ = পাপনাশক তেজঃ

ধীমহি = ধ্যয়েমঃ

ধিয়ঃ = বুদ্ধিবৃত্তীঃ

যো নঃ = যঃ অস্মাকং

প্রচোদয়াৎ = প্রেরয়তি—(সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠায়)

বঙ্গানুবাদ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ—"যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন—আমরা সেই সবিতা দেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।"

সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আমরা সবিতৃ দেবতার সেই তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।"

আর স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এইরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন—

"সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি—যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।"

৺দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে উহার ভাবার্থ এই—

পরমাত্মাই জগতের স্রষ্টা এবং জীবের কর্ম্মফলদাতা তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্য দেবতা, তাঁহার স্বরূপ চিন্তাই উপাসনা—তাঁহার উপাসনা করিলে বুদ্ধিবৃত্তির শুভ গুণ কর্ম্ম ও স্বভাবের দিকে চালিত হয় এবং ইহাতেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে—সূর্য্যদেব যে কেবল আমাদের রোগ নাশ করেন তাহা নহে তিনি জীবের বুদ্ধিকেও চালাইতেছেন। আবার সূর্য্যকে প্রণাম করিতে হয় "সর্ব্বপাপ" বলিয়া তিনি সকল পাপ নাশ করেন।

তবে ইহাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তার নাম জপ। কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেই জপ করা হয় না। মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করাই জপ। পাতঞ্জলদর্শনে—"তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনম্"।

পণ্ডিতেরা বলেন—এই গায়ত্রী মন্ত্র জপের কথা (Science) বিজ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ নহে। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তবে উক্ত ঋকের অর্থ ধারণা করা যায়। তবে ইহাও সত্য যে—মতিস্থির রাখিয়া একমনে উক্ত মন্ত্র জপ করিলে হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়। যখন এইরূপ জ্ঞান লাভ হইবে—তখন ইহাকে বিজ্ঞান বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—যে এহেন সূর্য্যদেব—বশিষ্ঠ ঋষির মতে—

গৃৎসা রাজা বরুণশ্চক্রে এতং দিবি

প্রেংখং হিরণ্যয়ং শুভেকং॥ ঋগ্বেদ – ৭।৮৭।৫

বঙ্গানুবাদ—স্তুতিযোগ্য রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় সূর্য্যকে দীপ্তির জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ইহার অর্থ পণ্ডিতগণের মতে জড় সূর্য্য বরুণের সূক্ষ্ম একটী জড় আলোকের দোলা মাত্র।

অন্যত্র সূর্য্যকে ইন্দ্রের দর্শন যন্ত্ররূপে কল্পনা করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

তদেবং বিশ্বং যৎ পশ্যামি চক্ষুসা সূর্য্যস্য

ঋগ্বেদ—৭।৯৮।৬

এই বিশ্ব তোমার, সূর্য্যের আলোকের ভিতর দিয়া, তুমি তাহা দেখিয়া থাক।

অন্যদিকে বিশ্বামিত্র ঋষির মতে—

সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি—যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।

উক্ত দুইটী ধারণা কত পৃথক তাহা বলা যায় না।

তবে ইহাও সত্য যে—

প্রাতঃসূর্য্যালোকে বসিয়া একমনে পরমাত্মার ধ্যান করিতে পারিলে নানাবিধ দুষ্ট রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

তাই আদিত্য হৃদয়স্তোত্রে আছে—

বিস্ফোটক সমুৎপন্নং তাবজ্জ্বর সমুদ্ভবম্।
শিরোরোগং নেত্ররোগং কণ্ঠরোগ বিনাশনম্॥
কুষ্ঠব্যাধি স্তথা দদ্রু রোগশ্চ বিবিধাশ্চ যে।
জপমানস্য নশ্যন্তি শৃণু ভক্ত্যাতদর্জ্জুন॥

(ক্রমশঃ)

রাষ্ট্রতন্ত্র ও গণশিক্ষা

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, এম্‌-এল্‌ সি

গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রচারের যে প্রবল চেষ্টা চলিয়াছে, সেটা প্রথম আরম্ভ হয় আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে। পুস্তক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দশমিক শ্রেণীবিভাগের আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার মেলভিল্‌ডিউই এবং তাঁহার দুইজন বন্ধু ডাক্তার পুল (Dr. William F. Poole) এবং মিষ্টার উইন্‌স্টার আমেরিকায় প্রথম লাইব্রেরী আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। তাহার ফলে একমাত্র যুক্তরাজ্যে ছয় হাজার লাইব্রেরী নব ভাবে গড়িয়া উঠে। অচিরে এ আন্দোলন আমেরিকার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া য়ুরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসানে সভ্যজগতে একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। নবজাগ্রত এবং নবগঠিত জাতিদের মধ্যে গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া জ্ঞানপ্রচারের যে বিপুল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের প্রথম



লেনিন



ষ্টালিন

আমদানী করেন বরোদারাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতি সয়াজি রাও গাইকোয়াড। তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করিয়া এই অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে লাইব্রেরীর মত জ্ঞানপ্রচারের সহজ উপায় আর দ্বিতীয় নাই। জ্ঞানসমৃদ্ধ না হইতে পারিলে কোনও জাতি জগতে মাথা তুলিতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার প্রজাদের কল্যাণের জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের সর্ব্বত্র লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমেরিকা হইতে লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাঁহার উপর লাইব্রেরী আন্দোলন পরিচালনের ভার ন্যস্ত করেন। যিনি প্রথম ভার প্রাপ্ত হন তাঁহার নাম মিঃ বর্ডেন (Mr. W. A. Borden)। বরোদারাজ্যে Central লাইব্রেরী ছাড়া ৪৫টী নাগরিক লাইব্রেরী এবং ৮১৮টী পল্লী ল্যাইব্রেরী, ১১৯টী সংবাদপত্র পড়িবার পাঠগৃহ, মেয়েদের জন্য ৮টী পৃথক লাইব্রেরী ও ৩টী পাঠগৃহ এবং শিশুদের জন্য ৪টী পৃথক লাইব্রেরী ও ৫টী শিশু পাঠগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া ভ্রাম্যমান বা travelling লাইব্রেরীর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। লাইব্রেরী, স্কুল বা অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট পুস্তকপূর্ণ বাক্স পুস্তক বিলির জন্য পাঠান হইয়া থাকে। এক একটী বাক্সে ১৫ হইতে ৩০খানি বই পাঠান যায়। এই বাক্স পাঠানর ও ফেরৎ আনার খরচা সরকার বহন করিয়া থাকেন। বরোদারাজ্যে ১১৯টী লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সব লাইব্রেরী সংক্রান্ত যাবতীয় খরচের একতৃতীয়াংশ সরকার বহন করেন—এক তৃতীয়াংশ জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপ্যালিটী দিয়া থাকেন, বাকী এক তৃতীয়াংশ সাধারণের মধ্যে চাঁদা করিয়া দিতে হয়। বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে পৃথক মহিলা বিভাগ ও পৃথক শিশু বিভাগ আছে। শিশু বিভাগে খেলা ধূলার সহিত শিশুদের নানারূপ শিক্ষার উপাদান যোগান হইয়া থাকে। তা ছাড়া সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ও প্রকাশ বিভাগ আছে।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এই বিভাগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানের শিক্ষার ও ব্যবস্থা আছে।

বাঙলার লাইব্রেরী আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯২৫ সালে আমাদের বাসগ্রাম বাঁশবেড়িয়ায়। এই আট বৎসরের মধ্যে কি কাজ হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এই আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় আমার পক্ষে এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলা শোভা পায় না। তবে আমরা যে আশানুরূপ কার্য্য করিতে পারি নাই, তাহাতে আমাদের অক্ষমতার পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে যে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। সরকার এ আন্দোলন সম্বন্ধে এতকাল উদাসীন ছিলেন। আমাদের ক্ষীণ প্রচেষ্টার ফলে সেই ঔদাস্যভাব হ্রাসের লক্ষণ ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। পল্লী লাইব্রেরী-



গ্লোব মানচিত্রের সহিত শিশুদের পরিচয়

গুলিকে এতদিন জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ড সাহায্য করিতে পারিতেন না। ইহাতে আইনগত যে বাধা ছিল—আইন সংশোধন করিয়া সে বাধা দূর করা হইয়াছে। নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনে



মস্কো নগরের জিপ্সি শিশুদের একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল

লাইব্রেরীর ব্যয় নির্ব্বাহ বা সাহায্যকল্পে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে।

সরকার এক্ষণে স্বীকৃতি দিয়াছেন যে এবার হইতে লাইব্রেরীয়ানের

পদ খালি হইলে লাইব্রেরী-বিভাগে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। আবা' সরকারী প্রস্তাব মত লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষার ব্যবস্থা জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে কমিটি গত ১লা ফেব্রুয়ারী স্থির করিয়াছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই ভার লইতে



আরমেনিয়ার একটি কিণ্ডারগার্টেন স্কুল

হইবে এবং তাহাতে সরকারকে সাহায্য করিবার জন্তও অনুরোধ করা হইয়াছে। কমিটির নির্দ্দেশ অনুমোদন করিয়া সিণ্ডিকেট গবর্ণমেণ্টকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক প্রস্তুত জন্ত ক্লাস খুলিবার অভিমত জানাইয়াছেন।



ইভানোভো নগরের জারঝিনস্কি কারখানা সংলগ্ন কিণ্ডারগার্টেন স্কুল

বর্ত্তমান কালে অন্যান্য সভ্যদেশে লাইব্রেরী সাহায্যে জনশিক্ষার যে অভিনব প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলে লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পাল্টাইয়া গিয়া নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সে সব স্বাধীন দেশে অর্থের জন্ত কোনও কাজ আটকায় না। সরকারী অর্থ ছাড়া এণ্ড্রু কার্ণেগীর মত দানবীরের অভাব নাই। সেজন্ত লাইব্রেরী আন্দোলন উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইতেছে। আর আমাদের এই গরীব ও পরমুখাপেক্ষী দেশে এই আন্দোলনের সাফল্যলাভ কত দিনে হইবে তাহা বলা যায় না। তবে আমার বিশ্বাস আট বৎসর পূর্ব্বে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল, তাহার অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে। তাহাতে আশা হয়—দ্রুতগতিতে না হউক, ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া কালে ইহা মহীরুহে পরিণত হইয়া সুফল প্রদান করিবে। যে কোনও জনহিতকর কার্য্য করিতে হইলে যেমন নিষ্কাম কর্ম্মীর আবশ্যক সেইরূপ অর্থ-সামর্থ্যেরও প্রয়োজন। আমাদের দেশে কর্ম্মীর অভাব তো আছেই; তাহার উপর দারুণ অর্থাভাব। এরূপ স্থলে দ্রুত উন্নতির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। একে তো আমাদের দেশ অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে। যে দেশের শতকরা ৯৭জন লোক নিরক্ষর, সে দেশ যে কত পিছাইয়া পড়িয়া আছে, তাহা ভাবিতে গেলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না,—মন অবসাদে পূর্ণ হইয়া যায়। তাই আশার বাণী আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। যখন দেখি ক্ষুদ্র জেকোস্লোভাকিয়া রাজ্য জ্ঞানপ্রচারকল্পে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৬,০০০ লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছে এবং নবজাগরিত অন্যান্য জাতিদের মধ্যে নিরক্ষরতা বিদূরণ এবং জ্ঞানালোক বিতরণ জন্ত একরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে, যখন দেখি ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে লাইব্রেরীর পাঠক আকর্ষণের জন্ত কি বিপুল চেষ্টাই না হইতেছে, তখন মনে হয়, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে, সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও তদনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব নহে। জ্ঞানই শক্তির আধার—শক্তিসঞ্চয়ের জন্ত জ্ঞানার্জ্জন আবশ্যক। সোভিয়েট রাশিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়া অজ্ঞানতা বিদূরণ জন্ত যে বিরাট আয়োজন করিয়াছে তাহার বিরাটত্ব আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। পাঁচসালা বন্দোবস্ত যেমন অভিনব আবার তাহার কার্য্যকারিতাও ততোধিক বিস্ময়কর। সোভিয়েট রাশিয়া বলিতে এক রুশীয় জাতি বুঝায় না। সেখানেও বহু জাতির বাস—পরস্পরের সহিত জাতি বা ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নাই। আর অজ্ঞানান্ধকারে সমগ্র দেশ ডুবিয়াছিল—আমাদের অপেক্ষা পিছিয়ে পড়া জাতির

অভাব ছিল না। কিন্তু পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

রাশিয়ার জারের রাজত্বকালে ধনিক, জমীদার, রাজকর্ম্মচারী এবং পাদরীদের জন্ত বিদ্যার্জ্জন একচেটিয়া ছিল—যাকিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তা প্রধানতঃ তাদেরই জন্ত। সাধারণ লোকের উচ্চ শিক্ষা দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষার বা অক্ষর পরিচয়েরও ব্যবস্থা ছিল না। তাই নিরক্ষরতায় দেশ ভরিয়া গিয়াছিল। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট আপামর সাধারণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন আর কাহাকেও বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়সের ছেলে-মেয়েদের কিণ্ডারগার্টেন বিভাগে ভর্ত্তি করা হয়। কলকারখানার সহিতও কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস স্থাপিত হয়। প্রত্যহ ১০।১২ ঘণ্টা কাল সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। রাত্রিতেও সেখানে থাকিবার বোর্ডিং আছে—তাহার যাবতীয় ব্যয় গবর্ণমেণ্ট বহন করেন। এই সব শিশু-শিক্ষায়তনে শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এবং তদুপযুক্ত সেবিকা বা nurse নিযুক্ত করা হয়। খেলাধূলা, গল্প বলা, বেড়ান, হাল্কা সাংসারিক কাজ, শারীরিক ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার নিয়ম পালন শিক্ষা, আঁকাজোকা or drawing, নমুনা তৈয়ারী আর লেখা-পড়া প্রভৃতি শেখান হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তে কিণ্ডারগার্টেন বিভাগের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে দেখুন—



লেনিনগ্রাডের একটি বিদ্যামন্দির



আর্ম্মেনিয়ার অন্তর্গত লেনিনাকানের একটি বিদ্যালয় গৃহ

১৯২৭।২৮ সালে মোট পাঁচ হাজার আট শত আটাত্তটী

কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ছিল। আর তাহার ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ আট হাজার তিন শত দুই। চারি বৎসর মধ্যে ১৯৩০।৩১ সালে ঐরূপ স্কুলের সংখ্যা ৬ গুণের উপর বাড়িয়া গিয়া তেত্রিশ হাজার নয় শত আটচল্লিশ দাঁড়ায়। আর ১৯৩১।৩২ সালে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা সাতাইশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার নয় শত ষাট দাঁড়াইয়াছে। এ তো গেল প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ব্বকার শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষা ৮ হইতে ১১ বর্ষ বয়স্ক ছেলেদের চারি বৎসর কাল দেওয়া হয়। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটা প্রদেশের কথা বলিতেছি। কাজান সাধারণ তন্ত্রে ছত্রিশ হাজার নয় শত ষাট ছাত্র স্থলে আট লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় শত একান্ন ছাত্র, উজবেক সাধারণ তন্ত্রে ৬০টা স্কুল স্থলে ২১৬ টা



একটি উজবেক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ স্বরে পাঠাভ্যাস

স্কুল এবং ৪,৫৪,৪৬৩ ছাত্র, টার্কমেনিয়াস্থানে তিপান্নটা স্কুল স্থলে দুই হাজার উনচল্লিশটা স্কুল এবং চারি হাজার এক শত পঞ্চাশ ছাত্র স্থলে একশ লক্ষ চারি হাজার এক শত ছাত্র দাঁড়াইয়াছে। ১৯২২.২৩ সালে তেত্তর লক্ষ চুরানব্বই হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর স্থলে এখন দুই ক্রোড় চল্লিশ লক্ষে পৌছিয়াছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও একানব্বই হইতে ছয় শত পঁয়তাল্লিশ দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষকের সংখ্যা এখন সাত লক্ষ। সে দেশে কেবল বই-পড়া বিদ্যা শিখান হয় না—সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে শ্রমশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। লেখাপড়া শিখিতে শিখিতে সকলেই উপার্জ্জনক্ষম হইয়া উঠে।

পাঁচসালা বন্দোবস্তে সোভিয়েট রাশিয়ার পাঠকুটীর এবং ক্লাবের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পঞ্চান্ন হাজার নয় শত ছেয়ানব্বই। সমগ্র রাশিয়ার রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে খাস রাশিয়ার শতকরা ত্রিশ জন লোকেরও এবং দূর প্রদেশে শতকরা একজন লোকেরও অক্ষর পরিচয় ছিল না। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত শতকরা ৯০ জন নরনারী লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং স্থানে স্থানে নিরক্ষরতা একেবারেই দূর হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের মধ্যে সুদূর প্রদেশেও একজনও নিরক্ষর থাকিবে না তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। পল্লী মাত্রেই লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানানুশীলন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চলন্ত লাইব্রেরীর সংখ্যাও অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়ান হইয়াছে। সকল কল কারখানায় ভাল ভাল লাইব্রেরী শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।



মস্কো নগরে শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রদর্শনী

জনশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্রও বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ছিল তিন শত মাত্র; এখন দাঁড়াইয়াছে দুই হাজার সত্তর। পূর্ব্বে তাহার শিক্ষার্থী ছিল পাঁচ হাজার; এখন হইয়াছে ত্রিশ হাজার। তা ছাড়া গবেষণাগার (Research Institute) এর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ছয় শত ছিয়াত্তর, বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী দুই শত সত্তর, ট্রাস ও কর্ম্মকেন্দ্র গবেষণাগার (Trust and Factory Laboratories) এক শত সাতষট্টি, পরীক্ষাকেন্দ্র (Experimental Stations) দুই শত বাষট্টি, মানমন্দির (Observatories) তের, সামুদ্রিক ও আবহাওয়া ঘর (Hydro-meteorological

Stations and weather bureaus) আটষট্টি, প্রকৃতি সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠান (Nature Protection Institutes) তেইশ, সরকারী যাদুঘর (State Museum) ছেয়াত্তর, স্থানীয় যাদুঘর (Local Museum) এক শত ছাব্বিশ, সরকারী দপ্তরখানা (State Archives) বাইশ। মোট সতের শত সাতটী বিদ্বজ্জন সমিতি (Learned Society) আছে। এ বিষয় এতটা বিশদ-ভাবে বলিবার উদ্দেশ্য আছে। এত দিন ধনিক পরিচালিত সাম্রাজ্য-বাদীরা বলিয়া আসিতেছেন যে সোভিয়েট রাশিয়া আভিজাত্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। এখন উহা চাষাভুষা এবং মজুরের রাজ্য। এই অল্প কাল মধ্যে যে দেশে এতগুলি উচ্চাঙ্গের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে সে দেশ অচিরে সভ্য জগতের শীর্ষস্থান

জ্ঞানার্জ্জনে সমান পদবিক্ষেপে চলিয়াছে। কি প্রাথমিক, কি উচ্চ শিক্ষা, তাহারা কিছুতেই পশ্চাৎপদ নহে। সর্ব্ববিধ শিক্ষাকেন্দ্রেই স্ত্রীলোকেরা সমান আগ্রহে অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে রাশিয়া বস্তুতঃই এক মহা বিপ্লব ঘটাইয়াছে। এই বিপ্লব সংঘটনেও বহু বাধা পথ আগলাইয়া ছিল। প্রথম বহিঃশত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত বিরোধের ফলে যুদ্ধ বিগ্রহ; তাহার পর অর্থনৈতিক চরম দুরবস্থা; পরিশেষে ভল্‌গা (Volga) প্রদেশের ভীষণ দুর্ভিক্ষ। এই সব প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। তা সত্ত্বেও নেতাদের জ্ঞান-বিতরণের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই—আর জ্ঞানপিপাসুদের আগ্রহও অতি মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল।

রাশিয়ায় এখন এমন জেলা নাই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; এমন সহর নাই যেখানে সঙ্গীত-বিদ্যার কেন্দ্র এবং বড় বড় রঙ্গমঞ্চ



লুইসিয়ানিয়ার একটি লাইব্রেরী কক্ষ

অধিকার করিতে পারিবে বলিয়াই তো মনে হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় নিরক্ষরতা বিদূরণের বিরাট চেষ্টা ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার সফলতায় ধনিক পরিচালিত জাতিরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এত বড় একটা জাতি-সমষ্টি যদি জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান হইয়া উঠে, তাহার নিকট সকলকেই মস্তক নত করিতে হইবে। জ্ঞানই শক্তির আকর—জ্ঞানের নিকট সকলকে পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়াছে বলিয়াই এখন সকল জাতির দৃষ্টি রাশিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বে রাশিয়া স্ত্রীশিক্ষায় অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছিল। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নিরক্ষর ছিল। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত

নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার বিশেষত্ব হইতেছে বিশুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জন। তাই সঙ্গীতচর্চ্চা এবং রঙ্গাভিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে। কলাবিদ্যা ও সূক্ষ্ম শিল্পানুশীলনেরও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় পুস্তকের সংখ্যাও হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। ২০ বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে (১৯১৩ সালে ১১৮, ৮৩৭,০০০ আর এখন ৮৫১,০০০,০০০)। • সংবাদপত্র-সংখ্যা ৬,৬৭৫ ও তাহার গ্রাহক-সংখ্যা তিন কোটি সাতাশী লক্ষ। পাঁচ বৎসরে সাড়ে তিন গুণ বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি ৬০জনে একখানি সংবাদপত্র পড়িতে

পাইত ; এখন ৪১৫জনে একখানি দাঁড়াইয়াছে। এত দ্রুত উন্নতির কারণ কি ? সরকার শিক্ষার সকল ভারই গ্রহণ করিয়াছেন। তা ছাড়া এ দেশের শিক্ষার ধারা এক অভিনব পথে চলিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষের কেবল সংখ্যাধিক্যের দিকে নজর নাই—প্রকৃত শিক্ষার ও জ্ঞানলাভের দিকেই তাঁহাদের সমধিক দৃষ্টি। শিক্ষা বিষয়ে সমাজের অতি নিম্ন স্তর হইতে



কারখানার শিক্ষানবীশদের বিস্তালয়

উচ্চ স্তরের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নাই। জ্ঞানানুশীলনের সকল বিভাগে যোগ্যতা অর্জ্জনে সকলের সমানাধিকার। সুদূর মরুপ্রদেশবাসী ও পর্ব্বতকন্দরনিবাসী পিছিয়ে-পড়া জাতি বা সুসভ্য মস্কো সহরবাসী



ভিয়েনার প্রদর্শনীতে শিশুরা নিমন্ত্রণ কার্ড ছাপিতেছে

সকলকেই সব বিষয়ে সমান সুবিধা ও সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এই সমানাধিকার জ্ঞানরাজ্যে এই মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে।

আমাদের দেশে Co-education বা ছাত্র-ছাত্রীর সহশিক্ষা লাভ সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা চলিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় সবে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে Co-education আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১৮ সালের ৩১শে মে ঘোষণা করা হয়—"Co-education of the sexes is herewith introduced in all schools. After publication of the present order all schools shall admit on equal terms students of either sex wherever vacancies occur."

অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আদেশে সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতি দেশের যেখানে যা-কিছু জ্ঞানের উপাদান সংগৃহীত ছিল, সব সাধারণের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। Yussupoo—Sumarokoo—Elstons, Guchkoos, Riabus- hionskys এবং ধনীর অট্টালিকায় এবং বড় বড় রাজপ্রাসাদে যুগ-যুগ ধরে যে সব অমূল্য আর্টের জিনিস সংগৃহীত ছিল, সে সব সর্ব্বসাধারণের শিক্ষোন্নতিকল্পে, শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ত্তার (People's Commissariat of Education) জেম্বায় দেওয়া হয়। ছোট-বড় যত লাইব্রেরী ছিল, তা privateই হউক আর সাধারণেরই হউক, সব তাঁহার অধীনে আসিয়া পড়ে। এই সব লাইব্রেরী এবং শিল্পসম্ভার সবই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর লাইব্রেরীর সংখ্যা রাজ্যের সর্ব্বত্র অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সুদূর পল্লীতেও চলন্ত লাইব্রেরী পাঠাইয়া ঘরে ঘরে নরনারীর পাঠস্পৃহা বাড়াইবার ব্যবস্থা হয়। জ্ঞানবিস্তারের এই সব বিপুল ব্যবস্থার ফলে অতি অল্পকাল মধ্যে রাশিয়ায় জ্ঞানপ্রচারে যুগান্তর ঘটিয়াছে। জ্ঞানানুশীলনে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, শ্রমশিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিভাগে দ্রুত উন্নতির চিহ্ন দেদীপ্যমান। রাজ্য শাসনভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে, যথাযথভাবে কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করিলে এবং সঙ্কল্পানুযায়ী অর্থব্যয় করিতে পারিলে, অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। সোভিয়েট রাশিয়া তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। তাহা বলিবার জন্য সোভি-য়েট রাশিয়ার কথা এত বিস্তৃতভাবে বলিলাম। রাশিয়ার জুলুমবাজী আমরা না চাহিলেও, তাহার এই জ্ঞানস্পৃহা আমাদের অনুপ্রেরণা দিবে। অনেক সময় তুলনা অপ্রীতিকর হইয়া উঠে—তাই আমাদের এ হতভাগ্য দেশের কথা না তোলাই ভাল। জগতের সর্ব্বত্র দিকে-দিকে জ্ঞানের মোহনীয় স্পন্দন অনুভূত হইতেছে—আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছি।

এ নবযুগে শিক্ষার ধারা পাল্টাইয়া গিয়াছে—গ্রন্থাগারের লক্ষ্যও ভিন্ন পথে গিয়াছে। লাইব্রেরী বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ভিন্ন আধুনিক গ্রন্থাগার পরিচালন সম্ভব হইতেছে না।

পাঠক এবং পুস্তক এই দুইটীর সংযোগ বিধান নবযুগে গ্রন্থাগারিকের প্রধান কর্ত্তব্য দাঁড়াইয়াছে। জনসংখ্যা এবং পুস্তকসংখ্যার সামঞ্জস্য সংরক্ষণ এবং অধিবাসীমাত্রকেই পাঠকশ্রেণীভুক্ত করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হইতেছে। যদি পাঠক পুস্তকে আকৃষ্ট না হয় এবং পুস্তক অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা লাইব্রেরী পরিচালকের কলঙ্কের কথা—এই ভাব পোষণ করিয়া গ্রন্থাগারিক পাঠক আকর্ষণ এবং পুস্তকের সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান যন্ত্রস্বরূপ লিপিবদ্ধ বাক্যের স্রোতকে লইয়া সাধারণ পাঠাগারের কারবার। মানুষ মরে, প্রতিষ্ঠান লোপ পায়, শাসনতন্ত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু লিপিবদ্ধ বাক্য কেবল বাঁচিয়া থাকে না, দিন দিন শক্তিমান হইয়া উঠে। সত্যের সন্ধান মিলিবে পাঠাগারে— অতীত বর্ত্তমান ও ভাবী যুগের ভবিষ্যৎ-বাণী সেইখানে সহজলভ্য হইবে।

জ্ঞানবিস্তারই সাধারণ পাঠাগারের উদ্দেশ্য। ইহার লক্ষ্য হইতেছে প্রত্যেক পাঠককে পুস্তক সরবরাহ এবং প্রত্যেক পুস্তকের জন্য পাঠক সংগ্রহ এবং নূতন নূতন গ্রন্থের চাহিদা বাড়ান।

সাধারণ পাঠাগারে সকলের সমান অধিকার—কোনও রূপ ইতর-বিশেষ নাই; বয়ঃক্রম, ধর্ম্মবিশ্বাস, জাতি বা সামাজিক তারতম্যের এখানে বালাই নাই।

সাধারণ পাঠাগার তো গণতান্ত্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। নাগরিকের জ্ঞান ও শক্তির ভিত্তির উপর শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাধারণ পাঠাগার হইতেছে জ্ঞান ও শক্তির মূলাধার। বিদ্যালয়ে হাজিরা না দিয়াও নাগরিক এখানে শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ এবং সুবিধা পাইতে পারে।

সাধারণ পাঠাগারের মত চিত্তবিনোদনের স্থান আর দ্বিতীয় নাই। অধ্যয়নের ন্যায় চিত্তবিনোদক আর কি আছে? তা ছেলেই হউক আর বুড়োই হউক সকলের উপযোগী নব নব পুস্তক পাঠকের চিত্তাকর্ষণ জন্য সদা উন্মুখ থাকিবে।

প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারের সহিত শিশুবিভাগ অপরিহার্য্য হইয়াছে। আর বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলিরও উন্নতিবিধানের সময় আসিয়াছে। ছেলেদের শিক্ষণীয় অথচ চিত্তাকর্ষক পুস্তকে স্কুল লাইব্রেরী পূর্ণ রাখিতে হইবে। স্কুল লাইব্রেরীর তত্ত্বাবধানও ছেলেদের শিখাইয়া দিতে হইবে। তাহারা সেই লাইব্রেরী নিজের জিনিস যাহাতে মনে করিয়া অসঙ্কোচে পুস্তক ব্যবহার করিতে পারে এরূপ আবহাওয়া তৈয়ার করিতে হইবে। তবে এখানেও শিশুদের উপযোগী গ্রন্থাগারিক অত্যাবশ্যক।

বিদেশে কি প্রণালীতে স্কুল লাইব্রেরী আজকাল চলিতেছে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি।



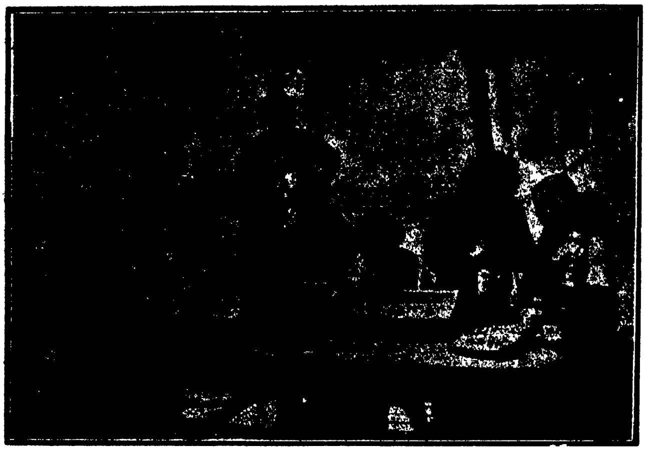
ক্যামেনোভ শ্রমিক উপনিবেশে শিক্ষাগার

ছেলেরা আজকাল ভূগোল পড়ে না। তারা শেখে কেমন করিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া থাকে। তাহার আশ্রয় কোথায় আর ভরণপোষণের কি ব্যবস্থা আছে। ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে বুঝিবার জন্য আহ্বান করা



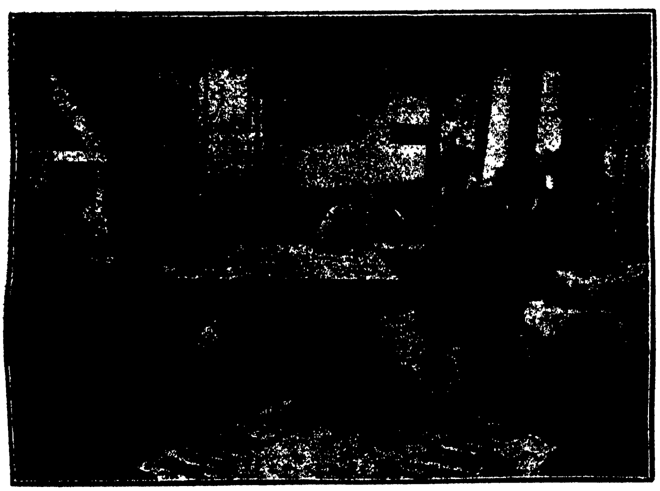
শিশুরা একটি ডিরিজিব্‌ল্ বিমানের মডেল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে

যাইতে পারে অথবা সংহতির সভ্য হিসাবে সে সহায়তা করিতে পারে। শিক্ষার্থী বা মুখস্থকারী হইলেও যে দিক দিয়াই হউক সে তখন অনুসন্ধিৎসুর চক্ষে বিষয়টী অনুধাবন করিবার প্রয়াস পায়। ব্যক্তিগত বা সমষ্টি বা সঙ্ঘের ভিতর দিয়া স্কুল লাইব্রেরী ক্লাসে ক্লাসে অধিষ্ঠিত হয়;



প্রকৃতি দেবীর ছাত্র ছাত্রীগণ

লাইব্রেরীয়ান এবং শিক্ষক সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করেন। এ গুরুভার লাইব্রেরীয়ানকেই লইতে হয়। বয়স, পাঠানুরাগ এবং পারদর্শিতা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতানুযায়ী যতদূর সম্ভব প্রত্যেক ছেলের উপযোগী বই বাছাই করিয়া দেন। তা করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। স্বাধীনভাবে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার পন্থাও তিনি প্রত্যেক ছেলের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া বুঝাইয়া দেন। সে শেপে কেমন করিয়া কোনও কিছুর সারাংশ লইতে হয়; প্রদত্ত বিষয় হইতে কি উপায়ে পুস্তকের মূল্য বিচার করিতে হয় এবং কি করিয়া নির্ঘণ্ট এবং কার্ড-তালিকা সহজসাধ্য যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে হয়। তা, স্কুল লাইব্রেরীতে ধরাবাঁধা নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দলবদ্ধ পাঠক লইয়া, বা ব্যক্তিগতভাবে Dalton প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাই থাক, সূত্রের টানা পড়েনের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষার গতি আগাইয়া চলিয়াছে। গ্রন্থাগারিকের



ছেলেমেয়েদের ক্লাব

বিদ্যার দৌড় বেশী রকম চাই; আর লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে তো বিশেষজ্ঞ হইতেই হইবে। তার উপর শিখাইবার সহজ প্রণালীতে অভিজ্ঞতা চাই। তা'হলে তিনি স্কুলের সঙ্গে লাইব্রেরীকে মিশাইয়া দিতে পারিবেন। তখন আর তাহা স্কুলের একটা লেজুড় বা পাঠ্য-পুস্তকের অতিরিক্ত শিক্ষার একটা আলাদা অনুষ্ঠান বলিয়া মনে হইবে না।

স্কুল লাইব্রেরীর প্রধানতঃ তিনটি মুখ্য উদ্দেশ্য—উদার শিক্ষার আদর্শ সজাগ রাখিয়া প্রতিভা উন্মেষের আনন্দ উপভোগ, ধরাবাঁধা পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞান যাহাতে উপচাইয়া পড়ে সেইভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা, আর গৃহে স্কুল এবং সাধারণ পাঠাগারে পুস্তকের সদ্ব্যবহার অভ্যাসের ভিত্তি এমন পাকা করিতে হইবে, যেন আজীবন পাঠের অভ্যাস সমভাবে থাকে।

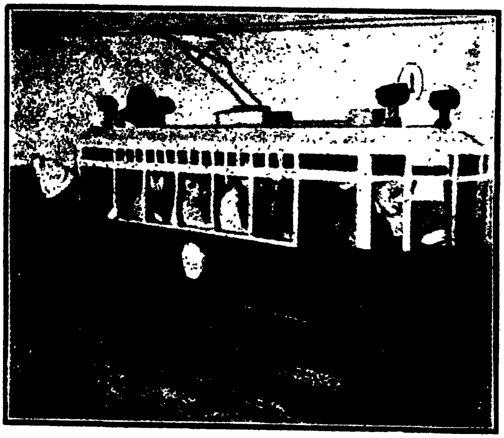


মস্কো নগরের ক্রেজার ফ্যাক্টরীর কিণ্ডার-গার্টেন স্কুলের ক্রীড়ারত শিশুগণ

উদার শিক্ষা বলিতে আগে ধারণা ছিল প্রাচীন ভাষা শিক্ষা বা উচ্চাঙ্গের গণিত শিক্ষা। এখন সে ধারণার আরও প্রসার হইতেছে, পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, ওজন বুঝিয়া তারতম্যবোধ ও চিন্তাশক্তির বিকাশ। সাবেক জ্ঞানার্জ্জন অপেক্ষা এখন নূতন নূতন তথ্য এবং সম্বন্ধ বিচারের অনুভূতি হইতেছে প্রধান লক্ষ্য। আধুনিক কালে মানসিক আদর্শের উপর বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। যুগধর্ম্মই হইতেছে কলকজা,—ঐহিক ও হাতে কলমে শ্রমশিল্প কর্ম্মকে বড় করিয়া তোলা।' এই উদার উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে পরিপোষণ করিলে মন ও জ্ঞানের বিকাশ পূর্ণভাবেই হইতে পারে।

বর্ত্তমান শিক্ষার কল্পনা—অদূর-ভবিষ্যতে অধিকতর উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ্য-পুস্তক স্কুল পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট

হইবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তদুপযোগী পাঠ্যপুস্তক দিতে হইবে। আর যাহারা অতিরিক্ত প্রতিভাসম্পন্ন তাহাদের প্রতিভা স্ফুরণের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে। কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া পর্য্যালোচনা এবং অভিজ্ঞতার উপর পুস্তক বাছাই সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভর করিতে হইবে। তাহার



খেলা ঘরের সত্যিকারের মোটর গাড়ী

ফলে পাঠ্যের বিষয়ীভূত বস্তু আয়ত্ত করিবার অধিকতর সুবিধা হইবে। সাবেক ব্যবস্থায় পুস্তক নির্ব্বাচন কার্য্য এ কালে চলিবে না। বর্ত্তমান ধারণা লইয়া গ্রন্থাগারিককে খুব সতর্কতার সহিত এই গুরু কার্য্য করিতে হইবে।

মার্কিনমুলুকে বেকার সমস্যা সমাধানকল্পে এখন সপ্তাহে পাঁচ দিনের বেশী কাহাকেও খাটিতে হয় না। এই দীর্ঘ অবসরকাল কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে। লাইব্রেরীর জ্ঞানের আবহাওয়ার মধ্যে অবসরকাল ছেলেদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। তাহারা দেখিয়া শুনিয়া নিজ হইতে কি কি বই বাছিয়া লয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনা হইতে যে বই বাছিয়া লইবে তাহা আয়ত্ত করা সাধারণতঃ সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

লাইব্রেরীর সেবায় সকলের সমান অধিকার আছে। ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিপুষ্টির এবং জনতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্কুল অপেক্ষা লাইব্রেরী বেশী উপযোগী। স্কুলের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে প্রত্যেক ছেলে যাহাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য আগ্রহান্বিত থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ লোকে চিত্তবিনোদনের জন্যই পুস্তক পাঠ করিয়া থাকে। অনেকগুলি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াও অনেকে আনন্দ পায়। কেহ বা একখানি বই বার বার পরমোল্লাসে পাঠ করে। আবার কেহ কার্য্যতৎপরতার নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য পুস্তককে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে। জীবনচরিত পাঠ অনেক সময় ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। উড়ো জাহাজ সংক্রান্ত সাহিত্য অদ্ভুত উপন্যাসের ন্যায় লোককে মোহিত করিয়া রাখে। পুস্তকের সংস্পর্শে আসিলে ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া মনের প্রসার দিঙ্‌মণ্ডল অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে প্রধাবিত হয়।

মার্কিনমুলুক সুবর্ণযুগের অভ্যুদয়ের আশাপথ চাহিয়া আছে। জ্ঞানালোক-উদ্ভাসিত জনসাধারণ যেদিন জ্ঞানই মানবজীবনের সার্থকতা বলিয়া উপলব্ধি করিবে—জ্ঞানের মহিমায় যেদিন বিমল আনন্দ এবং শক্তি তাহাদের করতলগত বলিয়া ধারণা করিবে, সেদিন কত আনন্দের হইবে। নবযুগের আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। মানবজীবনের কাম্য সুন্দরের উপাসনা—নানা দিক দিয়া নানা ভাবে তাহা স্ফুরিত হইতেছে—সাহিত্যে বৈচিত্র্য, শক্তি এবং সৌন্দর্য্য, বিশাল হর্ম্ম্যে শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা, অতুলনীয় নয়নাভিরাম পোষাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীত-বিজ্ঞান এবং অভিনয়-শিল্পের উৎকর্ষতা, শূন্যের উপর আধিপত্য। দৈনন্দিন জীবনে কল্পনা এবং বাস্তবের আকর্ষণ, ব্যোমযানে অজানা রাজ্যের অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন,—এ-সবই ভাবী যুগের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সূচী।

জগৎ জাগিয়া উঠিতেছে। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানস্পৃহা উদ্রিক্ত হইতেছে। সভ্যতার সারাংশ নব নব চিন্তার ধারা সবই পুস্তকে নিবদ্ধ আছে। সেটা উপলব্ধি করিতে হইবে—আয়ত্ত করিতে হইবে।

আমি এই লাইব্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে যা কিছু লিখি বা বলি তাহা বিদেশের কথায় পূর্ণ থাকে। এ আন্দোলনের উৎপত্তি বিদেশে, ক্রমবিকাশ ও প্রতিপত্তি বিদেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সে সব দেশের আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া থাকি। আমাদের



নবোদ্ভাবিত ক্রীড়নক

দেশে এ ভাবের আন্দোলন কোনও কালেই ছিল না। যা ছিল তা সে সব কালের উপযোগীই ছিল। কেবল প্রাচীনকে আঁকড়াইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। আধুনিকের সহিত প্রাচীনের যেখানে খাপ খাইতে

পারে তাহা খাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু কালের গতিরোধ সম্ভবপর নহে। আমাদের দেশে জ্ঞানপ্রচারের গতি যেরূপ মন্থরভাবে



খেলা-ঘরের মোটর বোট

চলিতেছে—নিশ্চেষ্ট থাকিলে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই ভাবেই কাটিয়া যাইবে। সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে এই দুই শত বৎসরে যেমন শতকরা ৭ জনের নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন হইয়াছে আরও দুই শত বৎসরে আরও ৭ জনের ঐরূপ কলঙ্ক দূর হইতে পারে—হাজার বৎসরেও এ কলঙ্ক সম্পূর্ণ ঘুচিবে কি-না সন্দেহ। তাই বলিতেছিলাম জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞান-গৌরবে গরীয়ান করিয়া তুলিতে হইবে। সেজন্য যাহার যতটুকু সাধ্য এই গুরু কার্য্যে নিয়োগ করার সময় আসিয়াছে। উপরকার দশজন লইয়া সমাজ বা দেশ নহে। প্রত্যেক নরনারায়ণকে জ্ঞানজ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছোটকে হাত ধরিয়া বড় করিয়া তুলিতে হইবে। ছোট বড় উচ্চ নীচ বিচ্ছেদের কাল চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক নরনারীতে নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন সেই সুপ্ত নারায়ণকে জ্ঞানের বাতি জ্বালাইয়া সজাগ করিতে হইবে। দেশের পনের আনা লোক জ্ঞানপঙ্গু থাকিতে কিছুতেই ভাবস্থতা নাই। তাই আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সকলে যেভাবে যতটুকু সময় দিতে পারেন—এই জ্ঞানপ্রচার ব্রতে ব্রতী হউন। নিরক্ষর অজ্ঞ ভাইদের কাছে বসাইয়া নিরক্ষরতার কলঙ্ক মোচন করুন—তাহাদের অজ্ঞানতা বিদূরণে অবহিত হউন।

গোপীমোহন ঠাকুর

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট নামে একটি রাস্তা আছে। এই দর্পনারায়ণ ঠাকুর মহাশয় ছিলেন ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ২৮শ পুরুষ। ইনি জয়রাম ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। দর্পনারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের দুই পত্নীর গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় গোপীমোহন ঠাকুর।

এতদ্দেশবাসিগণকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার জন্য যাঁহাদের চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয় ছিলেন তাঁহাদিগের অন্যতম। সুতরাং বলিতে হয়, তাঁহার আমলে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার তখনও তেমন বিস্তার হয় নাই। তবে তৎকালীন ধনী সন্তানরা বাড়ীতে ইংরেজী গৃহ-শিক্ষকের কাছে কিছু কিছু ইংরেজী শিক্ষা করিতেন ; এবং সাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের জন্য দুই একটি করিয়া ইংরেজী স্কুল তখন সবে মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই হিসাবে গোপীমোহন গৃহে কিছু ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তৎকাল প্রচলিত প্রথা অনুসারে সংস্কৃত, ফার্সি, উর্দ্দু ও বাঙ্গলা রীতিমত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত, ফরাসী ও পোর্তুগীজ ভাষাও তিনি কিছু কিছু জানিতেন। আর সাধারণ ভাবে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত ছিল এ বিষয়েও গোপীমোহনের কোন ঔদাসীন্য দেখা যায় নাই—তিনি বংশানুক্রম রক্ষা করিয়া বংশের শিক্ষা-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার শিক্ষানুরাগ এতাদৃশ অধিক ছিল যে, হিন্দু কলেজ স্থাপনার্থ যে পাঁচজন ভদ্রলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, গোপীমোহন তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের গ্রন্থাগারে এই দাতৃপঞ্চকের নাম খোদিত একটি মর্ম্মর ট্যাবলেট আছে। তাহাতে এই পাঁচজনের নাম নিম্নলিখিত ভাবে সন্নিবিষ্ট দেখা যায় ; যথা, (১) বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজেশ্চন্দ্র বাহাদুর ; (২) গোপীমোহন ঠাকুর, পাথুরিয়াঘাটা ; (৩) বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ, যোড়াসাঁকো ; (৪) বাবু গোপীমোহন দেব, শোভাবাজার ; ও (৫) বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস। গোপীমোহন হিন্দু কলেজের গভর্ণিং বডিরও সদস্য ছিলেন, এবং তাঁহার

সম্পর্কে এই সদস্তপদ বংশানুক্রমিক করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সেকালে কলিকাতার প্রায় তাবৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হইত। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর বাড়ীতেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত না। গোপীমোহনের আমলে তাঁহাদের গৃহে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সমারোহের চূড়ান্ত হইত—নাচ-তামাসা ও আমোদ-প্রমোদের সীমা থাকিত না। এই উৎসবে অনেক ইয়োরোপীয়ান নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল ওয়েলেসলী,—যিনি উত্তর কালে ওয়াটারলু-সমরে নেপোলিয়ন-বিজয়ী ডিউক অব ওয়েলিংটন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন,—তাঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একবার তিনি নিমন্ত্রণে আসিয়া নাচ-তামাসা দেখিতেছেন, এমন সময়ে মাথার উপরিস্থিত টানা পাখার দড়ি ছিঁড়িয়া পাখা পড়িয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে পাখাখানা জেনারেল ওয়েলেসলীর মস্তকের নিকট দিয়া নামিয়া পড়ে—মাথায় বা দেহের কোন স্থানে আঘাত লাগে নাই।

সেকালের ধনী ব্যক্তিরা পণ্ডিত ও গুণী লোকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোপীমোহনও সংস্কৃত চর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন, সঙ্গীতজ্ঞ ও ব্যায়ামচর্চ্চাকারীদিগের সমাদর করিতেন। বহু পণ্ডিতকে তিনি প্রতিপালন করিতেন। অনেক কালোয়াত ও সঙ্গীতজ্ঞ গুণী ব্যক্তি এবং পালোয়ানকে তিনি নিয়মিত ভাবে বৃত্তি দান করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত নামক একজন সঙ্গীত-রচয়িতা, কালী মির্জা নামক কালোয়াত, রাধা গোয়ালা নামক পালোয়ান তাঁহার বৃত্তিভোগী থাকিয়া তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। গোপীমোহনের শুঁড়ার বাগানে পালোয়ানদিগের প্রায়ই শক্তি-পরীক্ষা হইত। মিঃ জোসেফ বারেট্টা নামক কলিকাতার মেসার্স বারেট্টা এণ্ড কোম্পানীর একজন অংশী গোপীমোহনের প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তিনিও পালোয়ানদিগের উৎসাহদাতা ও প্রতিপালক ছিলেন; তাঁহারও কয়েকজন বেতনভোগী পালোয়ান ছিল। শুঁড়ার বাগানে কুস্তিগীর পালোয়ানদিগের কুস্তির লড়ায়ের তিনি একজন নিয়মিত দর্শক ও সমজদার ছিলেন। দেশের নানা স্থান হইতে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিরা কলিকাতায় আগমন করিলে গোপীমোহন তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে আহ্বান করিয়া জলসার আয়োজন করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া গুণের বিচার করিয়া যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেন; কাহাকেও কাহাকেও মাসিক বৃত্তিও দান করিতেন।

সেকালের হিন্দু সমাজ নানা প্রকার সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। স্বধর্ম্মে গোপীমোহনের নিষ্ঠার অভাব ছিল না। তাই বলিয়া তিনি সংস্কারেরও একান্ত দাস ছিলেন না। শিক্ষার প্রভাবে এবং ইয়োরোপীয়ানদিগের সাহচর্য্যে তিনি সংস্কারের মোহ কিছু কিছু কাটাইতে পারিয়াছিলেন। সংস্কারের প্রভাব কেবল আমাদিগের সমাজের একচেটিয়া অধিকার নহে—ইয়োরোপীয় সমাজেও সংস্কারের প্রভাব দেখা যায়। তখনকার কালের অনেক হিন্দু ভদ্রলোকের সংস্কার ছিল যে, নিজের ছবি তুলাইলে বা আঁকাইলে আয়ুক্ষয় হয়। ইয়োরোপীয়ানদিগেরও সংস্কার ছিল যে, 'উইল' করিলেই মৃত্যু অগ্রসর হইয়া আসে—আয়ুক্ষয় হয়। এই কারণে তখনকার কালের হিন্দু ভদ্রলোকরা সহজে নিজ নিজ চিত্রাঙ্কন করাইতে সম্মত হইতেন না। চিনেরী নামক একজন চিত্রকর কলিকাতায় আগমন করিলে, হিন্দু ভদ্র সাধারণ এই কারণেই তাঁহার দ্বারা ছবি আঁকাইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু গোপীমোহন সাধারণের এই সংস্কারের মর্য্যাদা রাখিলেন না—চিনেরী সাহেবকে দিয়া তিনি নিজের চিত্রাঙ্কন করাইলেন। সম্ভবতঃ সেই চিত্রের প্রতিলিপি এবার 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট অলঙ্কৃত করিল। [সেকালের অনেক দেশবিখ্যাত ব্যক্তির চিত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি, প্রায়ই তাঁহাদের চিত্র পাওয়া যায় না; এমন কি, ফটোগ্রাফি প্রচলিত হইবার বহুদিন পর পর্য্যন্ত, সম্ভবতঃ এই সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারায়, অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চিত্র দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।]

গোপীমোহন ছিলেন পরম আশ্রিতবৎসল ও বন্ধুবৎসল। গোপীনাথের বন্ধু বিশ্বনাথ চৌধুরী নামক এক ধনী জমিদার-সন্তান ভাগ্যবশে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে গোপীমোহন বহুদিন তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। চন্দননগর গোন্দলপাড়া নিবাসী রামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপীমোহনের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে, গোপীমোহন তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে রাজসাহী জেলায় প্রচুর টাকা মুনফার একটি

জমিদারী তাঁহার নামে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। রামমোহনের বংশধরগণ এখনও সেই জমিদারী ভোগ করিতেছেন।

গোপীমোহনের সম্বন্ধে অনেক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। একবার তিনি পাল্‌কী চড়িয়া রাইটার্স বিলডিংস-এর সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছেন এমন সময় দেখিলেন, কয়েকটি ইংরেজ যুবক ঐ বাটীর ভিতর একটি 'ধর্ম্মের ষাঁড়'কে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিতেছে। পথচারীদের মধ্যে কেহই সাহেবদিগের এই নিষ্ঠুর আমোদের প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই। গোপীমোহন এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী হইতে অবতরণ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া সক্রোধে সাহেবদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করায় তাহারা নিরস্ত হইয়া ষণ্ডটিকে বাহিরে যাইতে দিল। এই ব্যাপার লইয়া তখন অনেক আন্দোলন হইয়াছিল, এবং সকলেই গোপীমোহনের ন্যায়নিষ্ঠা ও সাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গোপীমোহনের সহিত শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা রাজকৃষ্ণের বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে নিজ নিজ উষ্ণীষ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচায়ক। কিন্তু এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় নাই। রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের পিতা রাজা গোপীমোহন দেবের বিষয় সম্পত্তি ঘটিত একটি মামলায় গোপীমোহন ঠাকুর তাঁহার namesake গোপীমোহন দেবের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই কারণে রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয়।

রাজা রাজকৃষ্ণের স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল না—তিনি বরং মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। একদা তিনি এক ধর্ম্ম সংক্রান্ত শোভাযাত্রার সহিত নগ্নপদে দলবলসহ গোপীমোহন ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। গোপীমোহন তখন নিজ বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি রাজকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজা, আপনাকে আমি কখনও হিন্দু ধর্ম্মে যোগ দিতে দেখি, কখনও মুসলমান ধর্ম্মে যোগ দিতে দেখি। আপনি কোন্ দলের তাহা আমি আজও ঠাহর করিতে পারিলাম না। রাজকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, আমি সকল দলেই থাকি বটে, কিন্তু আপনাকে আমি কোনও দলেই দেখিতে পাই না। গোপীমোহন পৈতা দেখাইয়া উত্তর করিলেন, না রাজা,—আমি আপনার অপেক্ষা বহু—বহু উর্দ্ধে অবস্থিত।

গোপীমোহন স্বীয় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত মূলাজোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে প্রচুর অর্থব্যয়ে দ্বাদশ শিবলিঙ্গ এবং ব্রহ্মময়ী দেবী নামে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবার ও অতিথি সৎকারের জন্য প্রচুর আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

গোপীমোহনের ছয় পুত্র—সূর্য্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। তন্মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হরকুমার ঠাকুরের দুই পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমারের পুত্র সর্ব্বপ্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সন ১২২৫ সালের ১লা আশ্বিন বুধবার গোপীমোহন লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তিনি ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান।



পদকর্ত্তা বলরাম দাস

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল হইল পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা সুরু হইয়াছে, কিন্তু পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় সম্বন্ধে আজিও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি। যে কয়জন এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, উপযুক্ত অবসর এবং অনুসন্ধানের অভাবে তাঁহাদের দুই এক জন ভিন্ন অপর কেহই এই দুর্গম পথে উপযুক্তরূপ আলোক-সম্পাতে সমর্থ হন নাই। পদাবলী-সাহিত্য এতই গহন এবং তাহার রচয়িতৃগণের পরিচয়ে এমনই জট পাকাইয়া গিয়াছে যে, ইহার সুপরিষ্কৃত শৃঙ্খলা বিধান দুই এক জনের সাধ্যায়ত্ত নহে। তরুণগণের মধ্যে যদিই বা কেহ এ পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু খেয়ালের বশে চলিতে গিয়া তিনিও প্রকৃত গন্তব্য পথ নির্ণয়ে অবহিত হইতেছেন না। পদকর্ত্তৃগণের পরিচয় নির্দ্ধারণে সাধারণতঃ যে কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক, তাহারই সংক্ষিপ্ত দিক্-দর্শন হিসাবে আমরা পাঠক-সমাজের সমক্ষে পদকর্ত্তা বলরাম দাসের পরিচয় উপস্থাপিত করিলাম।

বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থে যে কয়জন বলরামের নাম পাওয়া যায়, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় গৌরপদতরঙ্গিনীর পদকর্ত্তৃ-পরিচয়ে তাঁহাদের প্রায় সকলেরই নাম করিয়াছেন। কিন্তু সব কয়জনেই পদ লিখিয়াছিলেন অথবা সকলেরই পদ গৌরপদতরঙ্গিনী বা পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না; ভদ্র মহাশয়ও বলেন নাই। তবে পদকর্ত্তৃ-নির্ণয়ে প্রকৃত কবির পরিচয়ে তিনি ভুল করিয়াছিলেন। আজিও সেই ভুলই চলিয়া আসিতেছে। পদ-কল্পতরুর মঙ্গলাচরণে সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস "জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস নরোত্তম" পদে পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তাদের বন্দনা করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং নরোত্তম ঠাকুরের শাখা ও উপশাখা ভুক্ত। ইঁহাদের সকলের পদ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবদাস এই পদে লিখিয়াছেন—

কবি নৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুঁহুজন নিরুপম গুণ গুণ
গৌর প্রেমময় ধাম॥

এই বলরামের পরিচয় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরাই সর্ব্বপ্রথম এই পরিচয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। সম্প্রতি বিবিধ-বৈষ্ণব-গ্রন্থ-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় গৌর-পদতরঙ্গিণী গ্রন্থের সম্পাদন করিতেছেন। আমরা তাঁহাকে এই নবাবিষ্কৃত বলরামের কথা জানাইলে তিনি সানন্দে আমাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং গৌরপদ-তরঙ্গিনীর পদকর্ত্তৃ-পরিচয়ে এই পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই ঘনশ্যাম বলরামকে লইয়া বহু গবেষণা হইয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম কবিরাজ যে গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র সে বিষয়ে সকলেই এক মত। এখন ঘনশ্যামের সঙ্গে যখন বলরামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তখন তাঁহার একটা পরিচয় না থাকা অশোভন বিধায় সুপ্রসিদ্ধ ডক্টর রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা বলে বলরামকে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। অথচ বৈষ্ণব গ্রন্থে কবি বলরামের সুস্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। প্রেমবিলাসে রামচন্দ্র কবিরাজের শাখানির্ণয়ে—

"আর শাখা বলরাম কবিপতি হয়।
পরম পণ্ডিত তিঁহ বুধরী আলয়॥"

গোবিন্দ ও রামচন্দ্র বুধরীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ঘনশ্যাম বুধুরী নিবাসী, তাই বুধরীর কবিরাজ বলরাম ঘনশ্যামের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছেন। উভয়েই শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিবারভুক্ত, এক গ্রামে বাস, দুই জনেই কবি, সুতরাং সম্প্রীতি থাকা স্বাভাবিক। কবিপতি উপাধিও তাঁহার পদকর্ত্তৃত্বের পরিচায়ক। নরোত্তম বিলাসেও এই বলরাম কবিরাজের নাম পাওয়া যায়। হরিরাম এবং রামকৃষ্ণ শক্তি-উপাসক পিতার আজ্ঞায় বলির ছাগাদি পশু লইয়া গৃহে ফিরিবার পথে রামচন্দ্র কবিরাজকে কহিতেছেন—

বলরাম কবিরাজ বৈদ্য ভাল মতে।
হিতাহিত বুঝাইলা ইহ পর পথে ॥
তথাপি না বুঝে পিতা এ বড় দৈবাত।
ছাগাদি লইতে আইনু তাঁহার আজ্ঞাত ॥

"নরোত্তম বিলাস" ১০ম বিলাস

অন্যত্র—

ছুঁহে নিজ ইষ্ট পদধূলি লইয়া মাথে।
খেতরী হইতে আইলা গোয়াস গ্রামেতে ॥
বলরাম কবিরাজ সহ দেখা হইল।
তাঁর ঘরে গিয়া সেই রাত্রিবাস কৈল ॥

প্রেমবিলাসের অনেক পরে নরোত্তম বিলাস রচিত হয়। হইতে পারে বলরাম কবিরাজের বুধরী ও গোয়াস উভয় স্থানেই বাসবাটী ছিল। সেকালে অনেকেরই এইরূপ দুই তিন স্থানে বাসের পরিচয় পাই। উভয় কবিরাজ যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ আছে। গোয়াস এবং বুধরীর দূরত্বও অধিক নহে। শিবাই আচার্য্য স্বীয় পুত্র হরিরাম ও রামকৃষ্ণের উপর বিরক্ত হইয়া বহু পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পণ্ডিতগণ হরিরাম ও রামকৃষ্ণের নিকটে বিচারে পরাস্ত হইল। তখন তিনি মিথিলা হইতে মুরারী নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে লইয়া আসিলেন। মুরারী বলরামের সঙ্গে বিচারে হারিয়া গেলেন।

বলরাম কবিরাজ আসি তাঁর পাশে।
তাঁর বাক্যে তাঁরে হারাইলা অনায়াসে ॥

খেতরীর মহোৎসব সাঙ্গ হইবার পর—

শ্রীমহাশয়েরে রামচন্দ্র কহি কত।
হইলা বিদায় কথো দিবসের মত ॥
হরিরাম রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণ।
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোপীরমণ ॥
বলরাম কবিরাজ আদি কত জনে।
আচার্য্য রাখিলা মহাশয় সন্নিধানে ॥

ইঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ও গঙ্গানারায়ণ গোপীরমণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ও গোবিন্দ আচার্য্যের শিষ্য এবং হরিরাম ও বলরাম রামচন্দ্রের শিষ্য। ইঁহারা সকলেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের আজ্ঞাধীন।

এখন বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে এই কবিরাজ বলরামই বৈষ্ণবদাসের পদে ঘনশ্যামের সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছেন, এবং পদকল্পতরুর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ইঁহারই রচিত।

প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব্বনাম ছিল বলরাম দাস, ইনিও জাতিতে বৈদ্য। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া ইনি শ্রীল জাহ্নবা দেবীর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। শ্রীজাহ্নবা দেবীই ইঁহার নাম রাখেন নিত্যানন্দ দাস। ইনি নিত্যানন্দ দাস নাম দিয়াই প্রেমবিলাস রচনা করেন। নিত্যানন্দ দাস ভণিতার পদও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং নিত্যানন্দ দাস বাল্যের নাম স্মরণ পূর্ব্বক বলরাম ভণিতা দিয়া কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর নহে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত একজন বলরামের নাম পাওয়া যায়।

চৈতন্য ভাগবত—

প্রেম রসে মহা মত্ত বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস ॥

চৈতন্য চরিতামৃত—

বলরাম দাস কৃষ্ণ প্রেম রসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী ॥

বৈষ্ণব বন্দনায়—

সঙ্গীত কারক বন্দ বলরাম দাস।
নিত্যানন্দ চন্দ্রে যাঁর অধিক বিশ্বাস ॥

অনেকেই ইঁহাকে দোগাছিয়া নিবাসী বলরাম বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামীর স্বরূপ বর্ণন গ্রন্থে এক বলরাম দাস সুমন্দিরা সখী নামে অভিহিত হইয়াছেন। জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে যে বলরাম দাস খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত বলরাম দাস। ভক্তি রত্নাকরে—

মুরারী চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর।
পরমেশ্বর দাস বলরাম বিজ্ঞবর ॥

স্বর্গীয় গুরুদাস গোস্বামী জগদ্বন্ধু বাবুকে লিখিয়াছিলেন—তিনি এই বলরামের বংশধর, এই বলরাম পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার গোষ্ঠের পদ প্রসিদ্ধ এবং দ্বিজ বলরাম ভণিতাযুক্ত. গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় বলরামের পরিচয়ে লিখিয়াছেন—দ্বিজ বলরাম ভরদ্বাজ গোত্রীয় পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণ, পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চগ্রামে, পিতার নাম সত্যভানু উপাধ্যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষা লইয়া দোগাছিয়ায় বাস

করেন। ইনি বালগোপালের উপাসক। নিত্যানন্দ প্রভু দোগাছিয়ায় আসিয়া ইহাঁর সেবা-পারিপাট্যে সন্তুষ্ট হইয়া নিজের পাগড়ী দান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করেন। দোগাছিয়ায় সেই পাগড়ী আজিও আছে। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে বলরামের তিরোভাব ঘটে। এই তিথিতে প্রতি বৎসর দোগাছিয়ায় একটী উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। বলরামের পাঁচ পুত্র, কৃষ্ণবল্লভ জ্যেষ্ঠ, বলরাম হইতে গুরুদাস অষ্টম পুরুষ অধস্তন। এ পরিচয়ে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। পদকল্পতরুর গোষ্ঠলীলা পর্য্যায়ে বলরাম ভণিতার কয়েকটী পদ আছে। দ্বিজ ভণিতা না থাকিলেও এই পদগুলি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত দোগাছিয়ার বলরাম রচিত বলিয়াই মনে হয়। একটী পদ উদ্ধৃত হইল—

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
সঘনে বিষম থাই নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কাঁদে মায় পথ পানে চাইয়া॥
বেলা অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

খুব সাদাসিধা কথায় গ্রাম্য রাখালের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। পদগুলি কবিত্ববর্জ্জিত নহে। আমরা দ্বিজ বলরাম ভণিতার পদও পাইয়াছি।

দীন বলরাম নামে একজন কবি ছিলেন। ইনি "উদ্ধব সংবাদ" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থ শেষে ভণিতা এইরূপ—

কৃষ্ণের কিঙ্কর দীন বলরাম দাস।
উদ্ধব সন্দেশ পদ করিলা প্রকাশ॥

অন্যত্র—

গদাধর পদে আশ　　দীন বলরাম দাস
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলা পয়ার।

গদাধর পণ্ডিতের শাখার মধ্যে কোন বলরামের নাম পাওয়া যায় না। এই বলরাম বোধ হয় দাস গদাধরের শাখাভুক্ত ছিলেন। দীন বলরাম ভণিতাযুক্ত কোন পদ পদকল্পতরু বা অন্য মুদ্রিত গ্রন্থে পাই নাই। দীন বলরামের একটী পদ তুলিয়া দিলাম।

নন্দরাণী কুতূহলে　　গোপালে লইয়া কোলে
বসিলেন কনক আসনে।
নীলমণি জলধর　　জিনি শ্যাম কলেবর
সাজাইছে নানা আভরণে॥
রুচির চাঁচর চুল　　দিয়া নানা বনফুল
চূড়া বান্ধি বামদিকে টালে।
নব গোরচনা আনি　　সুন্দর করিয়া রাণী
তিলক রচিয়া দিল ভালে।
অলকাতে সারি সারি　　দিল মুকুতার ঝুরি
তাহে দিল চন্দনের বিন্দু।
কদম্ব মঞ্জরী সনে　　কুণ্ডল পর্য্যাল কানে
ঝলমল করে মুখ ইন্দু॥
গলে গজমতি হার　　কনক জিঞ্জির আর
গাঁথিয়া দিলেন চারুমণি।
হেমের বলয়া ভুজে　　পীত বসন কটীমাঝে
চাঁদমুখে হাসির লাবণি॥
বিরিঞ্চী বাসকী ভব　　অরুণাদি যত দেব
করে সবে পদরেণু আশ।
হেন পদাম্বুজে রাণী　　পরায় নূপুরখানি
কহে দীন বলরাম দাস॥

পূর্ব্বে যে গোষ্ঠের পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সঙ্গে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। পদকল্পতরুতে যে কয়েকটী বলরাম ভণিতার গোষ্ঠলীলার পদ পাইয়াছি, তাহাতে শব্দ ঝঙ্কারের কোন বাহুল্য নাই, বিশেষ কোন ভাব-গাম্ভীর্য্যও নাই। কিন্তু দীন বলরামের পদে শব্দ চয়নে পারিপাট্যের প্রয়াস, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবের মাধুর্য্য লক্ষ্য করিবার মত।

পদকল্পতরুর একটী পদে বলরাম দাস বলিতেছেন—

"কিয়ে বিহি রাই প্রেম দেই নিরমিল রসময় নাগর শ্যাম।
কনক মঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়নে রোয়ব কব বলরাম॥"
(পদ সং ২৫০০)

অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর মধ্যেও পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর ৩০৭১ সং পদে—হরি হরি সবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই। কনক মঞ্জরী মুখ হেরব জাগাই॥ রাগমার্গে যুগল ভজননিষ্ঠ ভক্তগণের এক একটী সিদ্ধ নাম থাকে।

কে কোন যূথভুক্ত তাহারও তালিকা আছে। গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকায় ছয় গোস্বামী প্রভৃতির এইরূপ সিদ্ধ নামের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণের সিদ্ধ নাম প্রেমবিলাস আদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীপাদ অদ্বৈতের পরবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভুর সিদ্ধ নাম যথাক্রমে মণিমঞ্জরী, বিলাসমঞ্জরী (পরে চম্পকমঞ্জরী) ও কনকমঞ্জরী। শ্রীপাদ সনাতনের সিদ্ধ নাম রতিমঞ্জরী। কেহ কেহ রঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও রতিমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। সুতরাং এই পদের বলরাম যে শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ পদ বলরাম কবিরাজের হইতে পারে না, কারণ, তাঁহার ইষ্টদেব রামচন্দ্র কবিরাজ করুণামঞ্জরী নামে খ্যাত। এক যূথের ভক্ত কখনো অন্য যূথের অনুগা হইয়া ভজন করেন না। সে কালের বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীই ভজনের অন্যতম অবলম্বন ছিল। শ্যামানন্দ শাখার মধ্যে আমরা কোন বলরামের নাম খুঁজিয়া পাই না। হয় তো প্রেমবিলাস আদি গ্রন্থ রচিত হইবার পর শ্যামানন্দ পরিবারে বলরাম নামে কোন কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। রতিমঞ্জরী এই কবির গুরুর নাম হইতে পারে। কনকমঞ্জরী তাঁহার পরম গুরু। কিম্বা শ্যামানন্দ রতিমঞ্জরী যূথভুক্ত ছিলেন। তাই কবি রতিমঞ্জরীকে স্মরণ করিয়াছেন।

পদকল্পতরুর একটী পদ নরোত্তম শিষ্য বলরাম পূজারী রচিত। পদটী উদ্ধৃত হইল।

প্রথমে জননী কোলে স্তনপান কুতূহলে
অজ্ঞান আছিলুঁ মতিহীন।
তবেত বালক সঙ্গে খেলাইলুঁ নানারঙ্গে
এমতি গোঁয়াইলুঁ কথো দিন॥
দ্বিতীয় সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয় জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যমরায়॥
তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে
পুত্র কলত্রে গৃহে বাস।
আশা বাড়ে দিনে দিনে ত্যাগ নাহি হয় মনে
হরিপদে না করিলুঁ আশ॥
চারিকাল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাখ মহাশয়
ভক্তিদান দেহ রাঙ্গা পায়॥

"মহাশয়" বলিতে যে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে বুঝাইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই বলরাম খেতরী-নিবাসী। উপাধি চক্রবর্ত্তী। ইনি নরোত্তম প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের অন্যতম পূজারী ছিলেন।

পদকল্পতরুর বলরাম ভণিতার একটী পদের (সংখ্যা ৩০০০) ভণিতা এইরূপ—

চন্দন তরুর কাছে যত বৃক্ষলতা আছে
আত্মসম বায়ু দিয়া।
হেন সাধু সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভবকূপে রহিলাম পড়িয়া॥

এ পদ কোন বলরামের রচিত? যিনি নরোত্তম বা রামচন্দ্রের সঙ্গ পাইয়াছেন তিনি কখনো এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। এ পদ পরবর্ত্তী কালের কোন অর্ব্বাচীন বলরামের রচিত বলিয়াই মনে হয়। পদকর্ত্তা সাধু সঙ্গ না পাইয়াই আক্ষেপ করিয়াছেন। কোন প্রকৃত সাধুর সঙ্গ পাইয়াও এ কথা বলা আর বৈষ্ণবাপরাধ একই কথা। ইহা বিনয়ের কথাও নহে।

বলরাম কবিরাজের কথা প্রথমেই বলিয়াছি। এইবার তাঁহার পদের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। পদকল্পতরুর ২৬৫৩ সং পদে—বলরাম দাস বলিতেছেন—

সব সখীগণ সঙ্গে রাই সুধামুখী কানুক ভোজন শেষ।
ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ কৌতুকে গুণমঞ্জরী পরিবেশ॥

গুণমঞ্জরী গোপাল ভট্টের সিদ্ধ নাম। গোপাল ভট্ট শিষ্য শ্রীনিবাস, তৎ শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ, তৎ শিষ্য বলরাম কবিরাজ স্বীয় যূথেশ্বরী পরমেষ্ঠী গুরুকে স্মরণ করিয়াছেন। গুণমঞ্জরী পরিবেশন করিতেছেন—শ্রীরাধা সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ ভুক্তাবশেষ ভোজনে বসিয়াছেন—ইহাই পদের বর্ণনীয় বিষয়।

কবি রবীন্দ্রনাথ এক সময় বলরাম দাসের একটী পদের এই দুই ছত্রের খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন—

"হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন—

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তভু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস সে দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥
ছি ছি কি শারদ চাঁদের ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি হানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার ছাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান॥
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতর স্থইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পঁহু চিত নহে থির॥

"যাহাকে হৃদয়ে রাখিয়া সোয়াস্তি হয় না, তাহাকে হৃদয় হইতে কে বাহির করিল"! কিন্তু এরূপ উপমা, এই ভাবাবেগ বৈষ্ণব কবিতায় সর্ব্বত্র। জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

তোমায় আমায় একই পরাণ ভালে সে আনিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি॥

জ্ঞানদাস ও বলরাম সম-সাময়িক হইলেও জ্ঞানদাস বলরামের পূর্ব্বজ—বয়োবৃদ্ধ। বলরামের পূর্ব্ববর্ত্তী বিপ্র পরশুরাম বলিতেছেন—শ্রীরাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ বর্ণনা করিতেছেন—

নিষ্কলঙ্ক হয় যদি শরদ সুধাকর।
কাঞ্চন দর্পণ যদি হয় মৃদুতর॥
পরাগ রহিত যদি হয় পদ্মফুল।
তভু নাহি হয় তার বদনের তুল॥

কিন্তু এইরূপ উপমা প্রয়োগই বলরামের বৈশিষ্ট্য নহে। সরল ভাষায় অতি সহজ ছন্দে হৃদয়ের গভীর ভাবের অভিব্যক্তিই বলরামের কবিতার নিজস্ব সৌন্দর্য্য। এই দিক দিয়া চণ্ডীদাসের পরেই জ্ঞানদাসের পার্শ্বে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। কবি রূপানুরাগে বলিতেছেন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি কালারূপ খানি॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙ্গা নয়ান নাচনে॥

প্রিয়তমের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন —

মরম কহিলুঁ মো পুন ঠেকিলুঁ তাহার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে বিবশ পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকে তবু সে সদা হারায়।
ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে আমারে রাখিতে চায়॥

তাই সেই প্রিয়তমের জন্য—

খাইতে সোয়াথ নাই নিদ দূরে গেল গো
হিয়া ডহ ডহ মন ঘুরে।
উত্থু উত্থু আন ছান ধক ধক করে প্রাণ
কে হৈল রহিতে নারি ঘরে॥

প্রিয়তমকে দেখিয়া বলিতেছেন—

মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে।
চাঁদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥
এ তোমার ভুবনমোহন রূপখানি।
ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥
গুরু ভয় লোক লাজ নাহি পড়ে মনে।
সাধের পুতলি যেন থাকি রাতি দিনে॥

আপন প্রিয়তমকে দুঃখের কথা নিবেদন করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা।
কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
বসনে মুছিয়ে ধারা ঢাকি যদি গায়।
আন ছলে ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শ্বাশুড়ী।
কালহার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥
দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চান্দমুখ।
দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥

বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥

চণ্ডীদাস ভণিতার অনেক পদ বিভিন্ন পুঁথিতে বলরাম দাস ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। উপরের পদের সঙ্গে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদের নিম্নলিখিত ছত্রগুলি তুলনীয়—

গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পর সঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিফল॥

অন্যত্র—

সতীসাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

বলরাম দাসের একটী পদের ভণিতা এইরূপ—

রসের মুরতি সে দেখিলে না রহে দে
পরশে পাষাণ হয় পানি।
বলরাম দাসে বলে সে অঙ্গ পরশ হলে
প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সেই প্রসিদ্ধ পদ স্মরণ করুন—

নাম পরতাপে যার ঐ ছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

এই সমস্ত কথা কাহার পদে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, স্থির করা দুষ্কর হইলেও, এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগেই ইহার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল।

জীবনাধিক প্রিয়তমের অদর্শনে বহুবার মৃত্যু কামনা জাগিয়াছে, কিন্তু মরণাধিক যাতনা সহিয়াও কেন মরিতে পারেন নাই, কবি তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে।
শুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥
বন্ধুহে তোমারে বুঝাই।
সভাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥

রায়শেখর, কবিরঞ্জন এবং গোবিন্দদাসের পর ব্রজবুলিতে পদ রচনা কবিদের পক্ষে প্রায় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানদাস ব্রজবুলি এবং বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুকরণের যুগে সাময়িক প্রভাবকে উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীদাসের অনুসরণে বলরাম বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই শক্তিশালী কবির কবিত্ব বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। নিম্নে দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কবিরাজ বলরামের গৌরলীলারও বহু পদ পাওয়া গিয়াছে।

আঁধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী।
কোন বিহি সিরজিল কুলবতী নারী॥
কথার দোসর নাই যারে কহোঁ দুখ।
দেখিতে না পাই চাঁদ সুরুজের মুখ॥
কহ সখি কি হবে উপায়।
না জানি কি গুণ কৈলে বিদগধ রায়॥
ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ।
তভু তো না গুণে মনে এত পরমাদ॥
ও রূপ দেখিয়া কৈলুঁ মরণ সমাধি।
রাতিদিনে কান্দে প্রাণ বিষম সমাধি॥
আনকথা কহোঁ গুরুজনার সমুখে।
ভরমে তখনি শ্যামের নাম আইসে মুখে॥
ভাবে বিভোর তনু গদগদ বাণী।
ধরিতে ধরণে না যায় দুটী চোখের পানি॥
সে রূপে মজিল চিত পাসরিল নয়।
বলরাম দাস বলে না জানি কি হয়॥

কি বা রূপ কি না বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে পাসরিতে নারি।
কি যে যশ অপযশ না রহিল গৃহে বাস
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
সখি সে যদি নয়ান কোণে চায়।
জাতি-কুল জীবন এরূপ যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিনু কানু পায়॥
শিরে ধরি কুলডালা বাহিরিব কুলবালা
কবে বা পূরিবে মনোসাধ।
কবে প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিধি
কবে হবে কালা পরিবাদ॥
নিশিদিশি অনুখন অনিমিখ দুনয়ন
থাকিব ও চাঁদ মুখ চাঞা।
এই দঢ়াইনুমনে প্রবেশ করিব বনে
কালা মাণিক গলায় গাঁথিয়া॥
এ কুল ও কুল যাঞা মো মলুঁ আপনা নিঞা
মোরে কেনে করহ যতন।
বলরাম দাসে বলে ছাড়িব কাহার ডরে
সেই মোর পরাণের ধন॥

অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

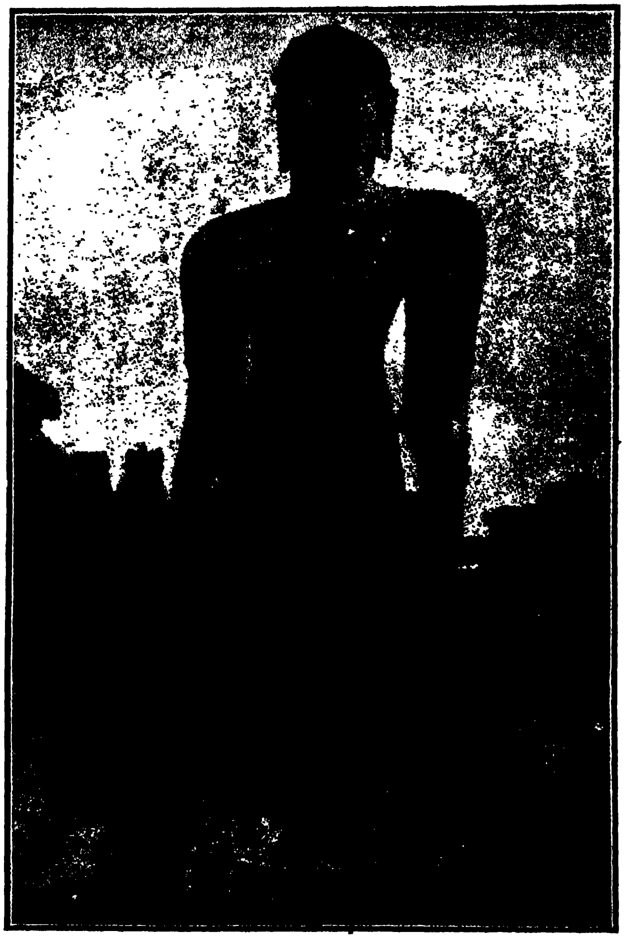
(মহীশূরের প্রাচীন জৈন মন্দির)

মহীশূর রাজ্যের একেবারে মধ্যস্থলে এক বিরাট বিগ্রহ সব কিছুর মাথা ছাড়িয়ে উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে আজ প্রায় হাজার বছর হল।

একটি নির্জ্জন গিরিশৃঙ্গের উপর এই অতিকায় পাষাণ মূর্ত্তিটি দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়েরই চূড়া কেটে কোনো অসামান্য শিলা-শিল্পী এই বিরাট বিগ্রহ গড়ে রেখে গেছেন। পনেরো মাইল দূর থেকেও এই মূর্ত্তি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীল আকাশের বুকে তার কালো ছায়া ফেলে এই গগনস্পর্শী শিলা-মূর্ত্তি তার চরণ-তলে বিস্তৃত বিশাল মহীশূর রাজ্যের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে আছে যেন!

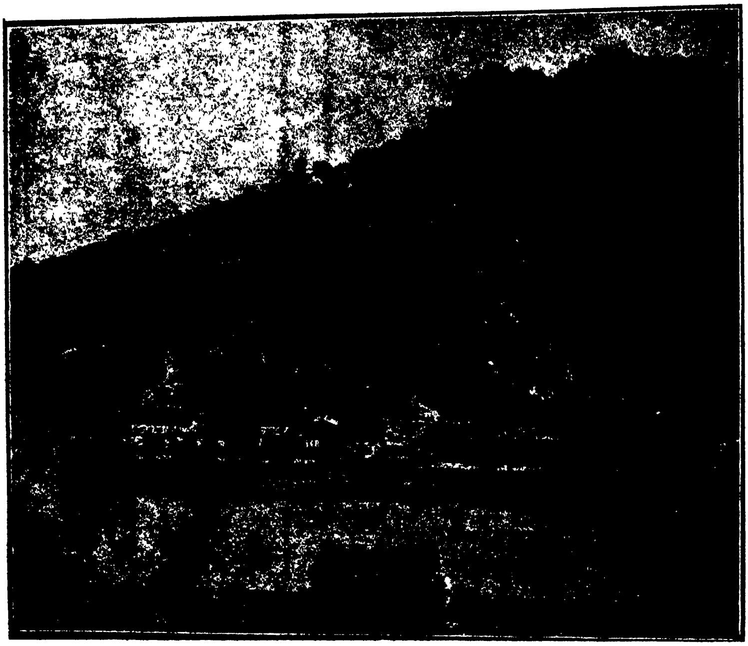
শ্রাবণবেলগোলা পল্লীকে ঘিরে যে দুটি গিরি-শিখর প্রহরীর মতো অহোরাত্র খাড়া হয়ে রয়েছে তারই মধ্যে যেটি উচ্চতর, শ্রাবণ-বেলগোলা পল্লীতে সেটি ইন্দ্রগিরি নামে পরিচিত। এই পর্ব্বতটি ৪৭০ ফিট উঁচু এক কঠিন বিশাল শিলাস্তূপ। একগাছি তৃণ পর্য্যন্ত এর কঠোর বক্ষে উদ্গত হ'তে পারেনি আজও। শিল্পী এই শুষ্ক কঠোর রুক্ষ প্রস্তরের তুঙ্গ শৃঙ্গ আপন অস্ত্রে বিক্ষত ক'রে যে মহান, ধ্যানরূপকে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন—এর অভ্রংলিহ শীর্ষে আজও সে মূর্ত্তি অখিল তীর্থ-যাত্রীর বিস্ময় হয়ে রয়েছে।

এই বিরাট মূর্ত্তির চরণ ঘিরে বহুদিন পরে এক প্রাচীর-বেষ্টিত প্রশস্ত অঙ্গন নির্ম্মিত হয়েছিল এবং সেই অঙ্গন-প্রান্তে ক্রমে ক্রমে দেবগৃহ, পূজামণ্ডপ ও মন্দির স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে অনেকেই যান কিন্তু তাঁদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এই সুদূর সুন্দর জৈন তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্য অর্জ্জন করতে পারেন। কঠিন পর্ব্বত-গাত্র ভেদ করে সাতশত সোপান নির্ম্মিত হয়েছে এই মূর্ত্তির পাদ স্পর্শের জন্য। একটি স্নিগ্ধ শীতল সরোবর যাত্রীদের স্নান পানের জন্য বুকভরা সুমিষ্ট জল নিয়ে যেন উচ্ছ্বসিত আনন্দে এখানে অপেক্ষা করছে।



গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি

দীর্ঘ সোপানশ্রেণী চলেছে পর্ব্বত শৃঙ্গের শীর্ষদেশে দুটি শিলা-শিল্প সমলঙ্কৃত সুবৃহৎ পাষাণ তোরণ-দ্বারের মধ্য দিয়ে। সোপান-পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট কয়েকটি দেব-মন্দির দেখতে পাওয়া যায়, আর দেখতে পাওয়া যায় এই সোপানের উপর থেকে ইন্দ্রগিরির ক্রোড়ে শায়িত সুন্দরী পল্লী শ্রাবণবেলগোলার নারিকেল-কুঞ্জ-বেষ্টিত কত তড়াগ পুষ্করিণী—কত মন্দির মঠ দেবালয়।



জৈনততীর্থ ইন্দ্রগিরি



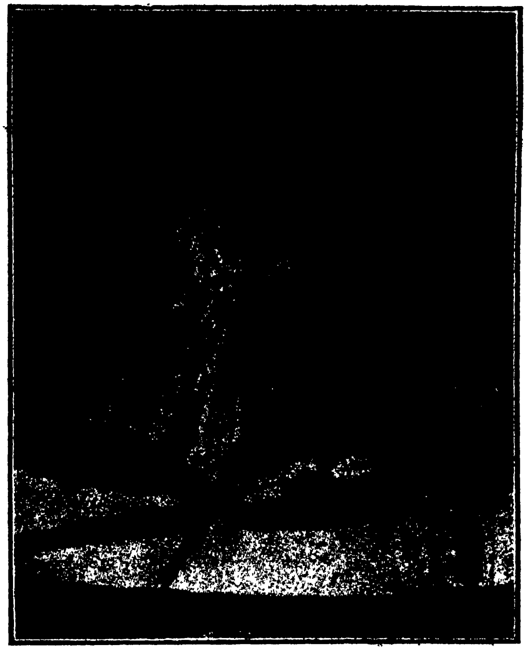
গোমতেশ্বর মন্দিরের প্রবেশদ্বার

সাতশ' সিঁড়ি পার হ'য়ে এসে পৌঁছানো যায় প্রধান মন্দিরের চত্বরে। এই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত দেবাঙ্গন যেন ইন্দ্রগিরি শিরে মুকুটের ন্যায় মনে হয়। এই দেবাঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে সেই বিরাট মূর্ত্তির পাদমূলে এসে উপস্থিত হওয়া যায়।

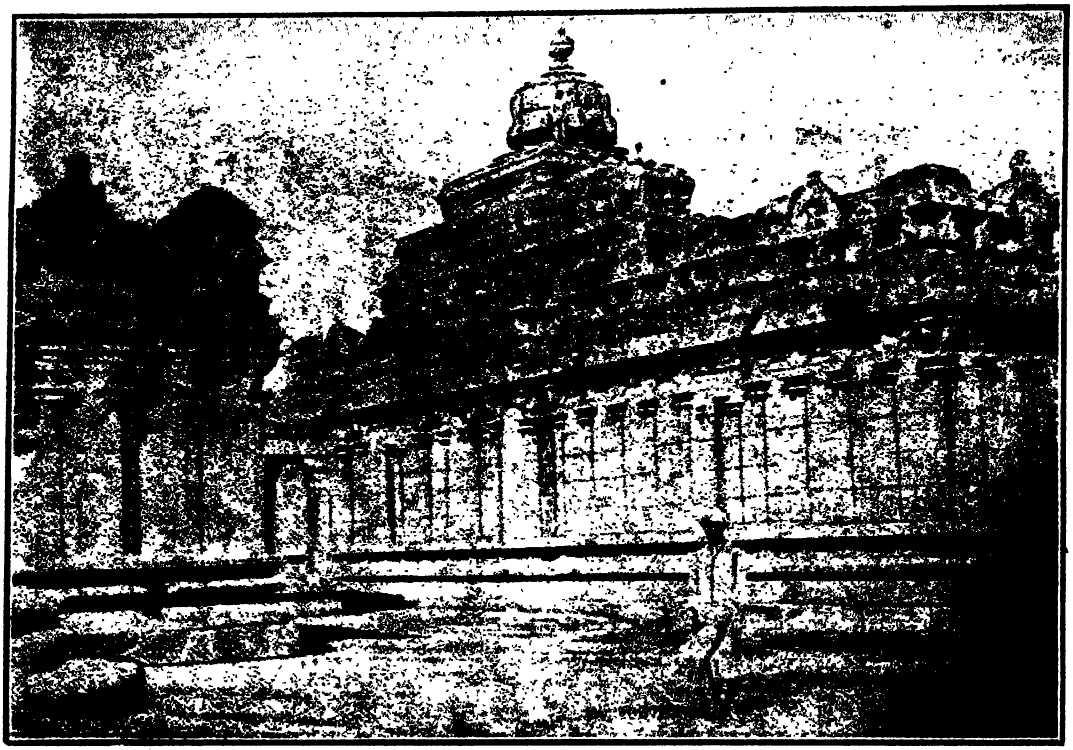
তীর্থযাত্রীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে আড়াল করে এইখানে দাঁড়িয়ে আছে সেই বিরাট পাষাণ-মূর্ত্তি। সুদীর্ঘ সহস্র বৎসরেও সে মূর্ত্তির এতটুকু কোথাও ম্লান হয়নি। সম্পূর্ণ অক্ষত অটুট অবস্থায় আজও দাঁড়িয়ে আছে অতীত ভারতের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ! এই মূর্ত্তিটির আপাদমস্তকের দৈর্ঘ্য ষাট ফুট। দক্ষিণ স্কন্ধ হ'তে বাম স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রস্থে ছাব্বিশ ফুট। এক একটি পদাঙ্গুলির পরিমাপ দু'ফুট ন'ইঞ্চি। করাঙ্গুলির মধ্যে মধ্যমাটি পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা! এই সুবৃহৎ মূর্ত্তিটির কোনো বসন কল্পনা করা হয়নি। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ নগ্ন। একটি পাষাণে প্রস্ফুটিত কমলের বুকে পা'দুখানি রেখে এই বিরাট প্রস্তর-মূর্ত্তি উত্তর মুখে চেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে যেন সম্মুখস্থ পাহাড়ের উপর কোনো দেব-মন্দিরের চূড়া লক্ষ্য করে! এত বড় বিরাট মূর্ত্তি পাছে ভেঙে পড়ে যায় বলে ভাররক্ষার উদ্দেশ্যে পদ প্রান্ত হ'তে

জানুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত পশ্চাৎ দিকে একটি বিপুল বল্মীক্-স্তূপ কল্পনা করা হয়েছে। এই বল্মীকস্তূপ হ'তে যেন নির্গত হ'য়েছে এক সুপল্লবিনী লতা। তার প্রস্তর-খোদিত শাখা বেষ্টন ক'রে উঠে গেছে এই মহান মূর্ত্তির জঙ্ঘা উরু ভুজদ্বয় ও বাহুমূল। বল্মীকস্তূপ হ'তে একাধিক বিষধর সর্প যেন ফণা বিস্তার করে বেরিয়ে আসছে! এই বল্মীক্ এই লতা-পল্লব-আবেষ্টন ও ভুজঙ্গ সমাবেশ ইঙ্গিত ক'রছে হিংস্র জীবসঙ্কুল গভীর অরণ্যের মধ্যে এই সর্ব্বত্যাগী মূর্ত্তির সুদীর্ঘ কঠোর তপশ্চর্য্যা।

মূর্ত্তি-শিল্পের দিক দিয়ে বিচার করলে এ মূর্ত্তির একমাত্র ত্রুটী দেখতে পাওয়া যায় যে পদদ্বয়ের নিম্নদেশ যতটা দীর্ঘ হওয়া উচিত তা হ'য়ে ওঠেনি, এবং স্কন্ধদেশ একটু অধিক প্রশস্ত হ'য়ে পড়েছে! এছাড়া এত বড় বিরাট পাষাণ-মূর্ত্তির মধ্যে আর কোনো খুঁত নেই। যে আসামান্য শক্তিশালী ভাস্কর সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাষাণ কেটে এই মূর্ত্তিটি গড়েছিলেন তিনি যে কত রকম অসুবিধা ও অভাবের মধ্যে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন করেছেন তা মনে রেখে বিচার ক'রলে এ ত্রুটীকে আর ত্রুটী বলে মনে হয় না! এত বড়


গোমতেশ্বরের চরণে পুজাঞ্জলি


জৈন তীর্থ চন্দ্রগিরি

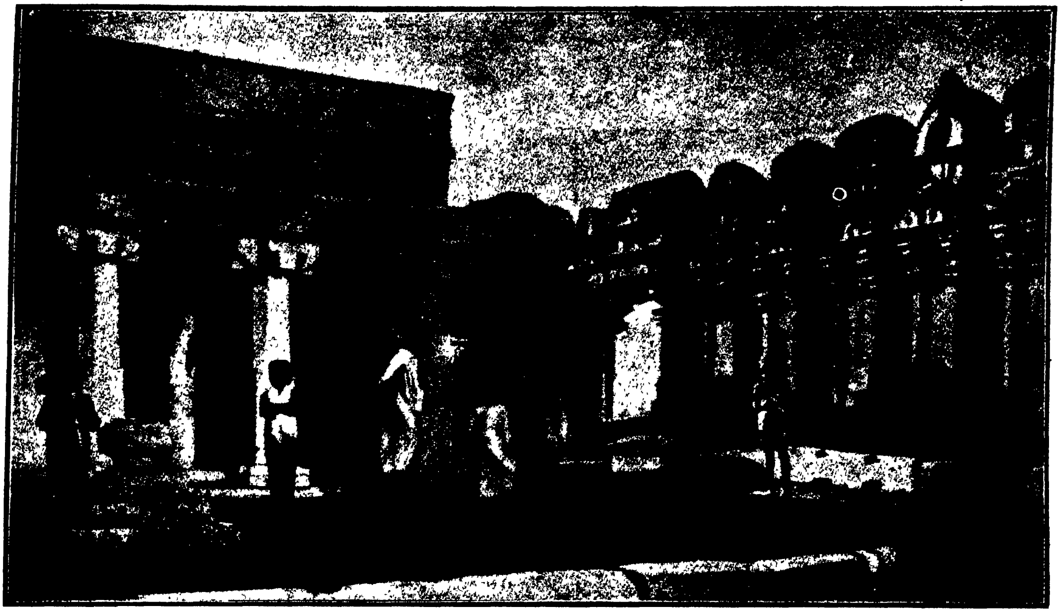


চন্দ্রগিরির জৈন মন্দির

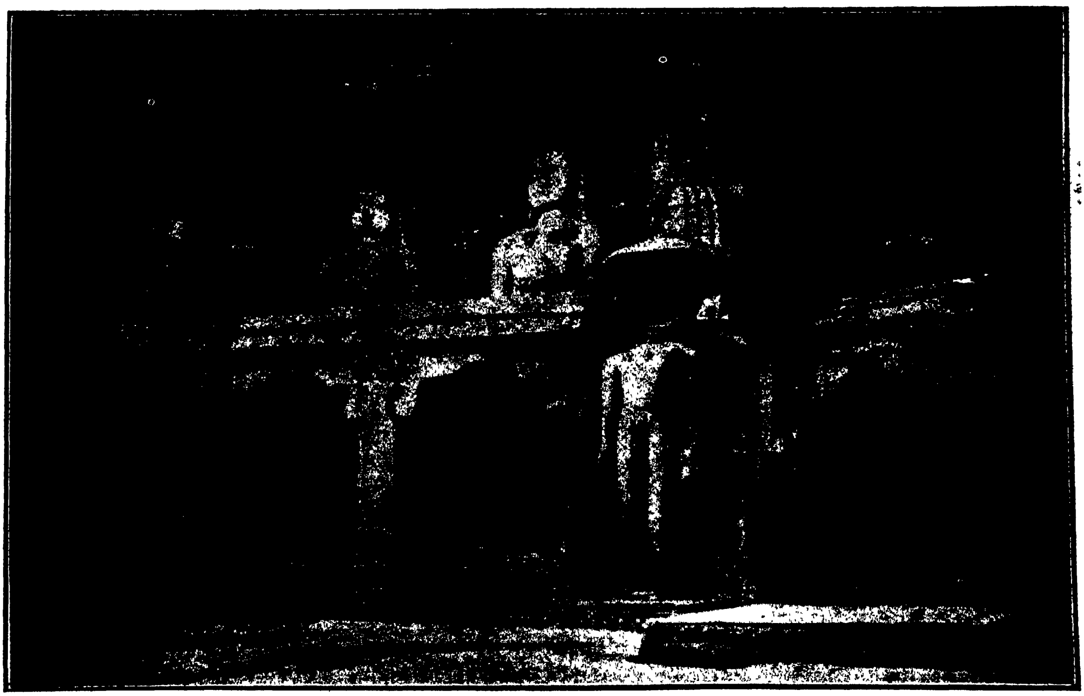


চন্দ্রগুপ্তের সমাধি-গৃহ—(এই গৃহ সংলগ্ন শিলা জালায়নের গাত্রে নবতি সংখ্যক উদগত শিলাচিত্রে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও ভদ্রবাহুর জীবনের বহু ঘটনা উৎকীর্ণ করা আছে)

সুবৃহৎ মূর্ত্তির আপেক্ষিক পরিমাপ নির্দ্দোষ করতে হ'লে যে সুযোগ ও সুবিধা থাকা শিল্পীর পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন এখানে তার একান্ত অভাব ছিল। ষাট ফুট উঁচু একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রতে হ'লে প্রতি পদে তার পরিক্ষেপ পরিদর্শনের জন্য আশে-পাশে এমন উচ্চ স্থান থাকা চাই যেখান থেকে সে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হ'তে পারে। পাহাড়ের চূড়ায় এ মূর্ত্তি গড়তে এসে শিল্পী সে সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি যে এত সুন্দর করে এত বড় বিরাট মূর্ত্তিটি গড়তে পেরেছিলেন —বিশেষ ক'রে এত বড় মূর্ত্তির এই মনোহর মুখ যে তিনি এমন মধুর করে কুঁদতে পেরেছেন এ জন্য তাঁর অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভার উচ্চ প্রশংসা না ক'রে থাকা

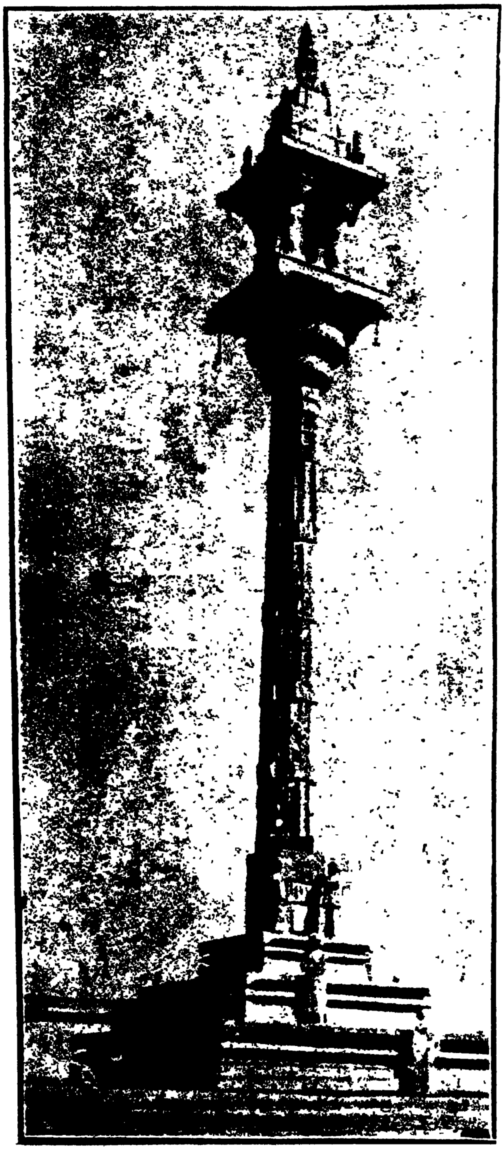


চন্দ্রগুপ্তের বস্তি



গোয়ালিয়রের জৈন মন্দির—

যায় না। মূর্ত্তির সর্ব্ব অবয়ব বেশ সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত। মস্তকে কুঞ্চিত কেশভার জটা-যুক্ত হ'য়ে উঠেছে। দুটি শ্রবণমূলে কুণ্ডলদ্বয় মূর্ত্তির অতীত মর্য্যাদা নির্দ্দেশ



চন্দ্রগিরির দীপস্তম্ভ

ক'রছে। মূর্ত্তির পাদপীঠে এবং বল্মীকস্তূপের গাত্রে নানা ভাষায় যে লিপি উৎকীর্ণ করা আছে তার পাঠোদ্ধার ক'রে জানা গেছে যে গঙ্গাবংশাবতংস মহারাজ দ্বিতীয় রাজমল্লের প্রধান মন্ত্রী মহামান্য শ্রীযুক্ত চামুণ্ডারায়ের আদেশে ও আনুকুল্যে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল। রাজমল্লের রাজত্বকাল ৯৭৪ খৃঃ অব্দ হ'তে ৯৮৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মাত্র দশ বৎসর চলেছিল। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন এই রাজমল্লের রাজ্যকালের শেষ ভাগে অর্থাৎ ৯৮৩ খৃঃ অব্দে এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত হয়েছিল। এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মূর্ত্তির চারিদিক বেষ্টন করে বিস্তৃত দেবালয় ও প্রাঙ্গণ নির্ম্মিত হয়েছে।

পর্ব্বত-শৃঙ্গকেই কেটে যে এই বিরাট মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। কারণ, প্রায় পাঁচশ ফিট উঁচু ইন্দ্রগিরি—এমন সোজা ও সমান হ'য়ে উপরে উঠেছে যে এই ষাট ফিট এক বিরাট পাষাণ প্রতিমূর্ত্তিকে অন্য কোথাও নির্ম্মাণ ক'রে তার পর এই পর্ব্বত চূড়ায় টেনে তোলা অসম্ভব এবং তার চেয়েও অসম্ভব এই ষাট ফিট উঁচু মূর্ত্তিকে পাহাড়ের মাথার উপর খাড়া ক'রে দাঁড় করানো! পাহাড় কেটে মন্দির ও মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করা ভারতীয় ভাস্করদের একটা প্রধান বিশেষত্ব ছিল। মধ্য ভারতের 'ইলোরা' ও 'অজন্তা' গুহা এবং দক্ষিণের 'মহাবলীপুরম্' এর প্রত্যক্ষ পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মহীশূরের এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ ফার্গুসন্ বলেন "মিশর ব্যতীত জগতের আর কোথাও এত বড় বিরাট কল্পনাকে রূপ দিতে দেখা যায় না! কিন্তু, সেখানেও সমস্ত অতিকায় দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলির মধ্যে একটিও এমন ষাট ফিট উঁচু বা এত বড় নয়!" এই আকাশস্পর্শী মূর্ত্তি হ'চ্ছে দক্ষিণ-ভারতের জৈন উপাস্য-দেবতা গোমতেশ্বরের প্রতিরূপ! বৌদ্ধ যুগের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী যে জৈন ধর্ম্ম তা' দু'টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একটি 'শ্বেতাম্বর' এবং অপরটি 'দিগম্বর' সম্প্রদায়। দক্ষিণ-ভারতের জৈন ধর্ম্মাবলম্বীরা সকলেই প্রায় এই 'দিগম্বর' সম্প্রদায় ভুক্ত। মহীশূরের শ্রাবণবেলগোলা পল্লীসীমায় ইন্দ্রগিরি শীর্ষে এই যে গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি, এ ওই জৈন দিগম্বর সম্প্রদায়েরই আরাধ্য-দেবতা। জৈন তীর্থঙ্করগণের মধ্যে প্রায়—সকলেরই নগ্ন মূর্ত্তি! এই বিবসন সর্ব্বত্যাগী সাধকের মূর্ত্তি ছিল দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের আদর্শ রূপ। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় কিন্তু আংশিক বস্ত্রাবরণের



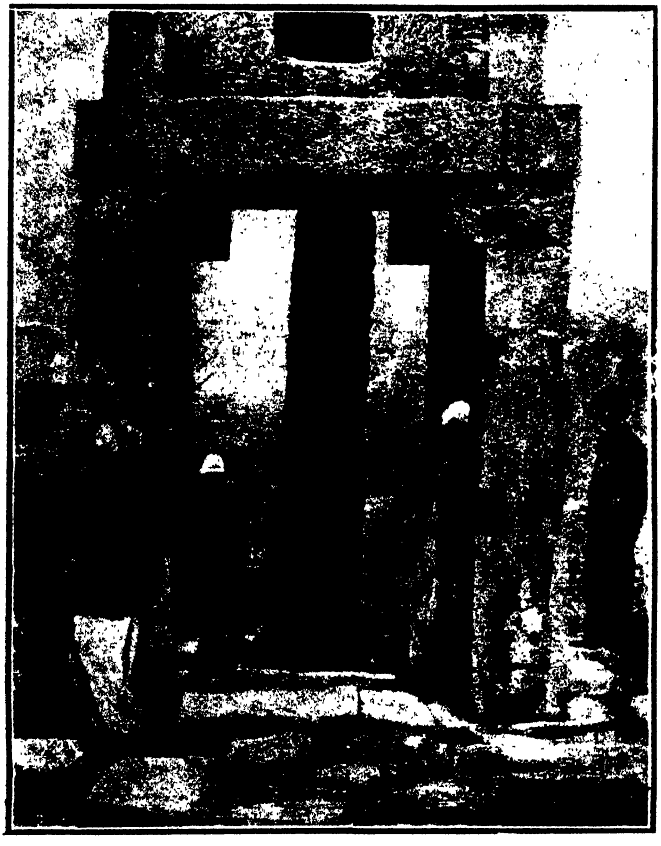
গোমতেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণ



পঞ্চামৃত স্নানের জন্য মঞ্চ নির্ম্মাণ

পক্ষপাতী। জৈন মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ মূর্ত্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্যই—এইখানে! বুদ্ধের মূর্ত্তি কটিবাস ও উত্তরীয়-বাসে সমাবৃত, কিন্তু, জিনের মূর্ত্তি বিবসন!

গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি ঘিরে ইন্দ্রগিরি চূড়ায় যে দেব দেউল ও পূজাঙ্গন নির্ম্মিত হয়েছে তার মধ্যে চতুর্ব্বিংশ জৈন তীর্থঙ্করের চব্বিশটি পৃথক মন্দির ও দেবাঙ্গন আছে। আরও ছোট বড় অনেকগুলি দেউল এই গিরিতীর্থে



ইন্দ্রগিরি শিরে চামুণ্ডা রায়ের লিপিস্তম্ভ। (এই স্তম্ভটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি শূন্যে অবস্থিত। দেখলে বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু এই স্তম্ভের মূলে একখানি কাগজ বা তালপাতা অনায়াসে গলে চলে যায়। এই স্তম্ভ-তলে চামুণ্ডা রায়ের শিলালিপি উৎকীর্ণ ছিল)

দেখতে পাওয়া যায়। এই বিরাট বিগ্রহ সম্বন্ধে এখানে একটি প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে। এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ যেদিন সমাপ্ত হল সেদিন চামুণ্ডা রায় প্রতিষ্ঠা উৎসবে বিগ্রহকে পঞ্চামৃতে স্নান করাবেন সঙ্কল্প করলেন। অর্থাৎ দধি দুগ্ধ, ঘৃত মধু ও শর্করায় মূর্ত্তিটির অভিষেক করা চাই—এই অভিলাষ জানালেন। তৎক্ষণাৎ অসংখ্য বড় বড় পাত্রে ভারে ভারে পঞ্চামৃত সংগ্রহ করে আনা হ'ল। মূর্ত্তির চারিপার্শ্বে এক বিরাট মঞ্চ নির্ম্মাণ করে পূজারীবৃন্দ তার উপর দাঁড়িয়ে বিগ্রহ-শিরে সেই রাশি রাশি পঞ্চামৃত ভারে ভারে ঢেলে দিলেন, কিন্তু সেই বিপুল পঞ্চামৃতধারার প্লাবনেও গোমতেশ্বরের মূর্ত্তির কটিদেশ পর্য্যন্তও ভিজলনা! দেশে আর কোথাও কারুর ঘরে সেদিন একফোঁটাও পঞ্চামৃত ছিলনা, রাজ-অনুচরেরা যেখানে যা পাওয়া গেছে সমস্তই সংগ্রহ করে এনেছে। কিন্তু দেবতার তা'তে স্নান হওয়া দূরে থাক—কটিদেশও সিক্ত হল না। চামুণ্ডা রায় তাঁর সঙ্কল্প রক্ষা ক'রতে পারলেন না দেখে ক্ষোভে লজ্জায় ও নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়লেন! সেই সময় একটি বৃদ্ধা নারীর বেশে কোনো দেবী এসে চামুণ্ডা রায়ের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। তাঁর হাতে একটি ছোট রজত-ভৃঙ্গারে সামান্য একটু পঞ্চামৃত ছিল। বৃদ্ধা মহা-অমাত্যের অনুমতি প্রার্থনা করলেন যে এই অজেয় দেবতাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাবার সুযোগ তাকে একবার দেওয়া হোক। যে কার্য্যে মন্ত্রীবর অক্ষম হয়ে আজ এমন বিষণ্ণ কাতর, আমি তাঁর হ'য়ে সে কার্য্য সুসম্পন্ন করবো!

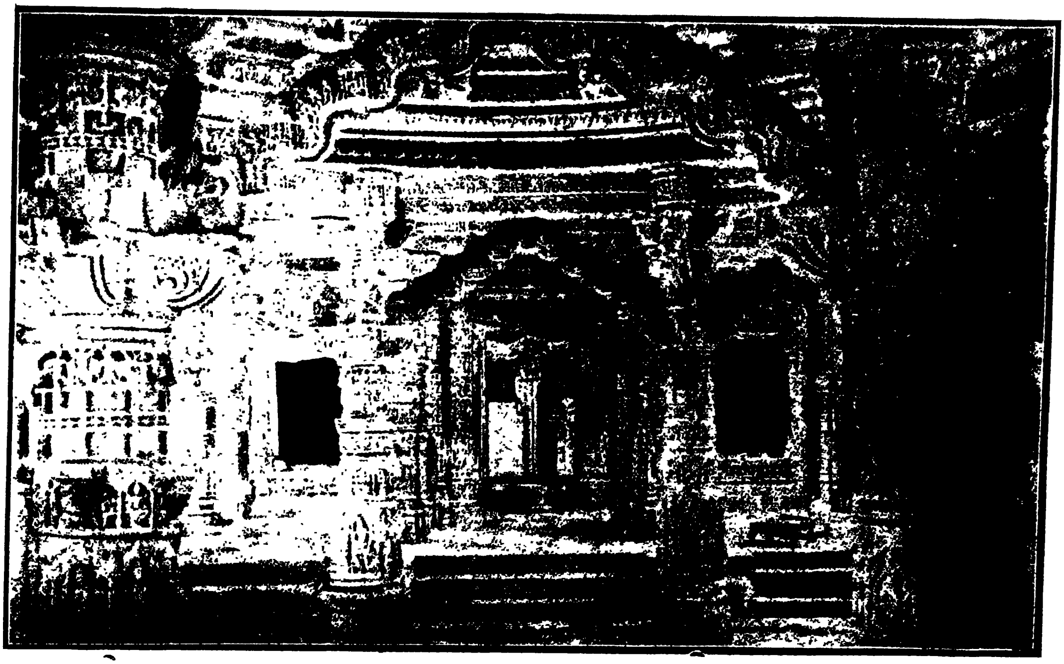
মন্ত্রী শুনে হাসলেন, তার হাতের সেই ক্ষুদ্র পঞ্চামৃত পাত্র দেখে বুঝলেন বৃদ্ধার বয়োধিক্য বশতঃ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে, তথাপি তার আগ্রহ দেখে তিনি বৃদ্ধাকে তার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আদেশ দিলেন।

মন্ত্রীমহাশয়ের মহাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে দেবতার পঞ্চামৃত-স্নান দর্শনের জন্য রাজ্যের সমস্ত প্রজা সেই

গিরিতীর্থে সমবেত হ'য়েছিল, কিন্তু স্নান সফল হলনা দেখে তারাও সকলে হতাশ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। তাই বৃদ্ধা যখন তার সেই ক্ষুদ্র ভৃঙ্গার নিয়ে মঞ্চে উঠছিল তারা সকলে মিলে উচ্চহাস্তে তাকে উপহাস ক'রতে লাগলো। বৃদ্ধা কিন্তু সে সব গ্রাহ্য না করে মঞ্চের উপর উঠে, সেখান থেকে বিগ্রহ শীর্ষে তার ভৃঙ্গার উপুড় ক'রে ধরল। অজস্র ধারায় পঞ্চামৃত ঝরে পড়তে লাগলো সেই ক্ষুদ্র ভৃঙ্গারের মুখে! সমবেত জনতা বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো সেই ক্ষুদ্র ভৃঙ্গারের অফুরন্ত পঞ্চামৃত ধারায় সেই মহাবিগ্রহমূর্ত্তির আপাদমস্তক স্নাত বিধৌত ও সিক্ত হয়ে ইন্দ্রগিরি-শীর্ষ প্লাবিত হ'য়ে গেল! কোটীকণ্ঠে আনন্দ কলরব ও জয়ধ্বনি উঠ্‌লো! কিন্তু সে বৃদ্ধাকে আর কোথাও দেখতে পাওয়া গেলনা! সেই থেকে ইন্দ্রগিরিমূলে যে শ্রাবণ পল্লী ছিল তার নাম হ'ল "শ্রাবণবেলগোলা" ('বেল গোলা'র অর্থ—ক্ষুদ্র পাত্র) এবং বিগ্রহের এই যে পঞ্চামৃতে স্নান এটা বর্ষে বর্ষে একটা প্রধান বার্ষিক উৎসব রূপে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হ'তে লাগলো।

মধ্যে বহুকাল এই স্নানোৎসব বন্ধ ছিল। দেশের রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় এবং অর্থাভাবই তার প্রধান কারণ। ১৮৮৭ সালে কোলহাপুরের মহারাজার ইচ্ছায় এই স্নানোৎসব আর একবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাজ এই উৎসবের জন্য তিরিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেছিলেন। তারপর ১৯১০ সালে আর একবার ভারতের নানা জৈন প্রতিষ্ঠান চাঁদা তুলে এই স্নানোৎসব সম্পন্ন করেছিলেন।

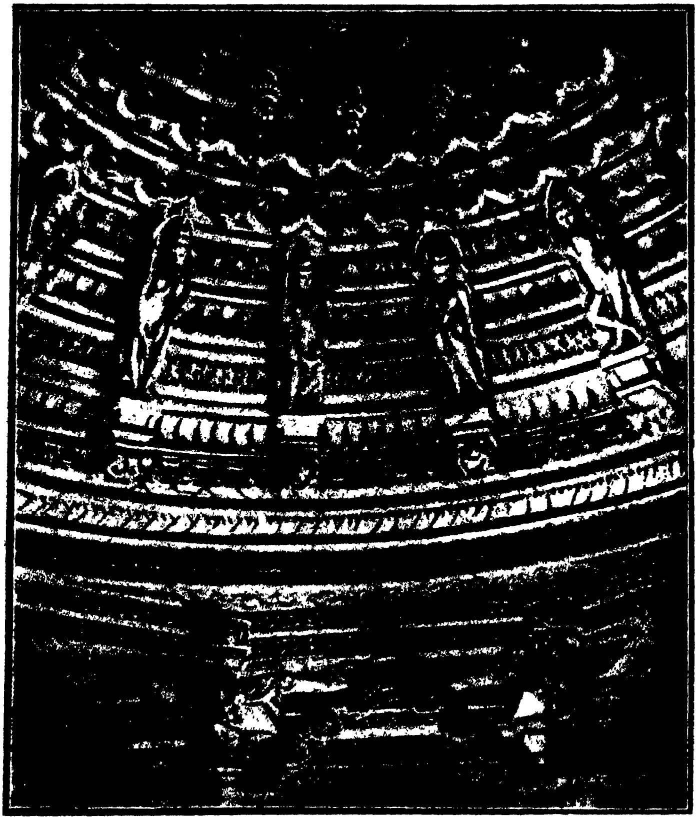
মহীশূরের এই মূর্ত্তির অনুকরণে দক্ষিণ ভারতে আরও দু'টি গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্ত্তি পর্ব্বত কেটে নির্ম্মিত হয়েছিল। একটি কারকালায় এবং অপরটি য়েন্নুর প্রদেশে। কারকালার মূর্ত্তিটি ১৪৩১ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়েছিল। এটি ৪১ ফিট দীর্ঘ। য়েন্নুরের মূর্ত্তিটি ১৬০৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়েছিল, এবং সেটির দৈর্ঘ্য ৩৭ ফিট। এ দু'টি বিরাট মূর্ত্তিও এখনো অক্ষত অবস্থায় আছে।



আবুপর্ব্বতের জৈন মন্দির

ইন্দ্রগিরির পার্শ্বে শ্রাবণবেলগোলা পল্লীর পশ্চাদ্‌ভাগে চন্দ্রগিরি নামে আর একটি পর্ব্বত আছে। এটি ইন্দ্রগিরি অপেক্ষা আয়তনে একটু ছোট। কিন্তু তীর্থ হিসাবে ইন্দ্রগিরি অপেক্ষা প্রাচীন। এই পর্ব্বতের উপর অসংখ্য প্রাচীন দেবমন্দির ও মূর্ত্তির অধিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়।

পর্ব্বতগাত্রে চারিদিকেই শিলালিপির ছড়াছড়ি! এই শিলালিপি থেকে জানতে পারা গেছে যে খৃঃ পূর্ব্ব তিন শতাব্দীতেও চন্দ্রগিরি দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান তীর্থ ব'লে পরিগণিত ছিল। কারণ এই সময় জৈনসাধু ভদ্রবাহু বহু জৈন-শিষ্য সমভিব্যাহারে উত্তর ভারত ত্যাগ করে এইখানে চলে এসেছিলেন। উত্তর ভারতে এই সময় দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা হয়েছিল এবং



বিমলা মন্দিরের অপূর্ব্ব জৈন স্থাপত্য

সাধু ভদ্রবাহুই সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এই আসন্ন দুর্ভিক্ষের কবল হ'তে আত্মরক্ষার জন্য তিনি অসংখ্য ভক্ত সঙ্গে উত্তর ভারত পরিত্যাগ করে দক্ষিণ ভারতে চলে এসেছিলেন। এই শ্রাবণ-পল্লীর সন্নিকটে এসে ভদ্রবাহু বুঝতে পারলেন যে তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হ'য়ে এসেছে। তিনি তখন তাঁর দ্বাদশ সহস্র সঙ্গীকে মহীশূর রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর হ'তে বলে একজনমাত্র শিষ্যকে নিয়ে এই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করেন এবং একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নেন। অল্পদিন পরেই সেই গুহার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভদ্রবাহুর মৃত্যুর পর দ্বাদশ বর্ষকাল তাঁর সেই সঙ্গীটি একাকী এই পর্ব্বতে ভগবানের আরাধনায় দিনযাপন ক'রে কঠোর সাধনা ও দুস্তর তপশ্চর্য্যায় জীবনপাত করেছিলেন। এই সঙ্গীটির নাম ছিল চন্দ্রগুপ্ত। শিলালিপি ও লোক-প্রবাদে জানা যায় ইনিই সেই ইতিহাস-বিশ্রুত মগধেশ্বর মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত। ভদ্রবাহুর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাজ্যভার পরিত্যাগ করে ইনি তাঁর দক্ষিণাপথের সহযাত্রী হয়েছিলেন। এঁরই নামে পর্ব্বতের নামকরণ হয়েছিল চন্দ্রগিরি। এখনও তীর্থযাত্রীদের সেই গুহা দেখিয়ে দেওয়া হয় যেখানে ভদ্রবাহু দেহরক্ষা করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের যেখানে মৃত্যু হয়েছিল সেখানে এখন সুন্দর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। এই মন্দির ও দেবাঙ্গন 'চন্দ্রগুপ্তবস্তি' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এই 'চন্দ্রগুপ্তবস্তি' বহুকাল ধরে প্রায়োপ-বেশন ব্রতচারী নরনারীর আদর্শ তীর্থ-রূপে গণ্য ছিল। কত অগণিত তীর্থ-যাত্রী এখানে এসে প্রায়োপবেশনে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছে। সকল ধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মে ও আত্মহত্যা মহাপাপ; কিন্তু ধর্ম্মাচরণ হিসাবে প্রায়োপবেশন-ব্রত ধারণে যে স্বেচ্ছামৃত্যু তা জৈনশাস্ত্র অনুমোদন করে। এই চন্দ্রগুপ্তবস্তির মধ্যে প্রায় পনেরোটি ভিন্ন ভিন্ন মন্দির গড়ে উঠেছে। স্থাপত্যকলা হিসাবে এই মন্দিরের প্রত্যেকটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত দেব-দেউল—যেন পাষাণে বিরচিত এক একখানি খণ্ড দৃশ্য-কাব্য! এই সব মন্দিরে এবং তার আশেপাশে এই চন্দ্রগিরির উপর অসংখ্য জৈন বিগ্রহ মূর্ত্তি ও দেবদেউল আছে। একটি দশ ফুট উঁচু গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি এই ছোট পাহাড়েও রয়েছে। চন্দ্রগিরির মধ্যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য হচ্ছে একটি

চমৎকার স্তম্ভ! কয়েকটি সোপান-বেষ্টিত একটি বেদীর উপর এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভশীর্ষে একটি চতুষ্পার্শ্ব মুক্ত সুদৃশ্য দীপাধার আছে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন—উৎসবাদি উপলক্ষে এই স্তম্ভের উপর উজ্জ্বল দীপ জ্বেলে রাখা হত। অনুমান খৃঃ পূর্ব্ব ৯৭৩ অব্দে এই কারুকার্য্যখচিত সুদীর্ঘ পাষাণস্তম্ভটি নির্ম্মিত হয়েছিল।

প্রাচীন জৈন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় এই চন্দ্রগিরির চূড়ায় চূড়ায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য কলার তুলনায় এই জৈন মন্দিরগুলি সকল গুণে শ্রেষ্ঠ। জৈন স্থাপত্যের প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে তাঁরা কখনো একটি বড় মন্দির গড়তেন না, অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির একই স্থানে একসঙ্গেই নির্ম্মাণ করতেন। তা' ছাড়া পাহাড় কেটে মন্দির ও মূর্ত্তি গড়া জৈন স্থপতিদের যেন একটা প্রবল নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছল! ভারতের সর্ব্বত্র জৈন স্থাপত্যের এই নিদর্শন চোখে পড়ে। গুর্জ্জরের পলিতানা পর্ব্বতে অন্ততঃ পাঁচশত জৈন মন্দির এবং চব্বিশ জন জৈনতীর্থঙ্করের অন্ততঃ সাত হাজার মূর্ত্তি আছে। গোয়ালিয়রের খাজরাহো প্রদেশে পার্শ্বনাথের মন্দির ও আরও অসংখ্য দেউল, আবুপর্ব্বতের জৈনমন্দির প্রভৃতি আজও এই বিশেষত্বের পরিচয় বহন ক'রছে।

অকারণ ?

শ্রীজ্যোতির্ম্মালা দেবী বি-এ

ষ্টেশনে নেমেই দু'খানা ট্যাক্সিতে দু'জনকে দুই দিকে যেতে হ'ল। আগের বন্দোবস্ত মত দাদাকে সাউথ কেনসিংটন ক্লাবে এবং আমাকে বোর্ডিংএ নিয়ে যাবার ভিন্ন ভিন্ন লোক এসেছে। দাদার ইচ্ছা আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যায়, কিন্তু অন্য সহযাত্রীরা বল্‌ল তার কোন দরকার নেই। এ কল্‌কাতা সহর নয়,—ওরা আমাকে ঠিকই নিয়ে যাবে।

ন'টার পরে বোর্ডিংএ পৌঁছালাম। মেড্ ওপরে একটি অফিসমত ছোট ঘরে বসিয়ে কর্ত্রীকে খবর দিতে গেল। একটু পরেই পাতলা ছিপ্‌ছিপে মিস্ ইয়ং এসে, "এই কি মিস্ গাঙ্গুলী? ও মা, এ যে দেখি নেহাৎ ছোট মেয়ে। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো?"—ইত্যাকার নানা সরস সম্ভাষণে বোধ হয় আমার পথশ্রম লাঘবেরই চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন। "এক গ্লাস গরম দুধ খাবে?—না? এখনই শুতে যাবে? আচ্ছা বেশ, এতটা পথ এসেছ, কিন্তু কিছুই কি খাবে না?"

"ভাত তরকারী পাওয়া যায়? তাই পেলে খাব—"

"ভাত তরকারী? না বাছা, সে সেই তিন বছর পরে দেশে ফিরে খাবে,—এখানে তো ও সব পাবে না। বড় মন কেমন কর্‌ছে তোমার, না? এসো দেখি আমার সঙ্গে, তোমাদের দেশের আর একটি মেয়ে আছেন এ বাড়ীতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই চল।"

মিস্ ইয়ং লোক ভাল, বয়সও বেশী নয়। ভারতীয় মেয়েরা তাঁর এখানে প্রায়ই আসে। কেউ দিনকতক, কেউ বা মাস দুই তিন থেকে অন্যত্র চ'লে যায়। তাঁর ইচ্ছা লণ্ডনেই যারা পড়্‌বে তারা এখানেই থাকে; এবং সে জন্যে ভারতীয় মেয়েদের তিনি সাধারণ বোর্ডারদের চাইতে অনেকটা আরাম ও সুবন্দোবস্তে রাখ্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু বেশী দিন বড় কেউ এখানে থাকে না। আমার যার সঙ্গে সে রাত্রে পরিচয় হ'ল, এ পর্য্যন্ত একমাত্র সেই মেয়েটিই বছরখানেক র'য়ে গেছে। পার্শী মেয়ে, বয়সে আমার অনেক বড়, ভারি সহৃদয়। দাদা বার্মিংহামে চ'লে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম ওরই সঙ্গে যাওয়া-আসা কর্‌তাম। মনে মনে স্থির কর্‌লাম খর্সেদের সঙ্গে আমিও এখানেই বরাবর থেকে যাব।

মাসখানেক পরে যখন লণ্ডন সহর একটু অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে ও ছুটির দিনে খর্সেদের সঙ্গে এদিক ওদিক দেখে-শুনে বেড়াচ্ছি, এক রবিবারে ওর এক বন্ধুনী—আসামী

মেয়ে—এসে প্রস্তাব কর্‌লেন Y. M. C. A.-তে খেতে যাওয়া যাক, শুধু খাওয়ার জন্যে নয়—Konan Doyl-এর বক্তৃতাও শোনা হ'বে। উভয় প্রস্তাবেই বিশেষ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লাম। একে তো এ-বিদেশে ভাত খেতে পাওয়া একটা মস্ত সৌভাগ্য, তার উপর কোনান ডয়েলকে দেখা—একেবারে জীবন্ত, চোখের সাম্‌নে! সেই কোনান ডয়েল যাঁর বই পড়্‌বার সময় কল্পনাও করি নি যে তাঁকে চাক্ষুষ দেখ্‌তে পাব। স্বনামধন্য লোকদের সঙ্গে একেবারে এই মর-জগতে এমনভাবে সাক্ষাৎ হ'য়ে যাওয়াটা আমার তখনকার অনভিজ্ঞ কল্পনাবিভোর মনে যে কী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ব'লে মনে হ'ত, ভাব্‌লে এখন হাসি পায়।

[illegible] রবিবারে এমনিতেই যথেষ্ট লোক হয়। তার উপর আজকের বিশেষ বন্দোবস্তের জন্যে সন্ধ্যা না হ'তেই রেস্তোরাঁয় আর তিল ধারণের স্থান নেই। আমরা তিনটি মেয়ে অপ্রস্তুতভাবে এদিক্ ওদিক্ তাকাচ্ছি এবং চ'লে যাব কি একটু অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌ব স্থির কর্‌তে না পেরে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ইতস্ততঃ কর্‌ছি, এমন সময় সামনের টেবিলেরই এক ভদ্রমহিলা ইঙ্গিতে আমাদের দেখিয়ে তাঁর পাশের ছেলেটিকে নিম্নস্বরে কি বল্‌লেন। সে অমনি উঠে খর্সেদের কাছে এসে বল্‌ল, "আপনারা এই টেবিলে আসুন, এখানে বসে পড়ুন—আমি আরো দু'খানা চেয়ার এনে দিচ্ছি এক্ষুণি। আজ বড় ভিড় কি-না, কিছু মনে কর্‌বেন না অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'য়েছে আপনাদের।"

পরে হল-এও আমাদের সেই মহিলাটির সঙ্গে সম্মুখের দিকে বস্‌তে দেওয়া হ'ল। কোনান ডয়েল সেদিন ঠিক্ কি নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। কিন্তু এটি বেশ স্পষ্ট মনে আছে যে, বক্তব্য শেষ হওয়ার পর ইউনিয়নের এবং বাইরের অভ্যাগত ছেলেরা তাঁকে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব নানান্ প্রশ্ন ক'রে এবং 'সাদা-কালো' নিয়ে কি-একটা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলার জন্যে শেষের দিকে যথেষ্ট উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল। মেজেতে পা ঘসা, শিষ্ দেওয়া, অকারণে কাসি ইত্যাদিতে এমন গোলমালের সৃষ্টি হ'ল যে এর পরে আর সভা জম্‌তে পারে না। ডয়েল চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যেদিকে পার্‌ল উঠে পড়্‌ল। খর্সেদ আমার হাত ধ'রে একটি অপেক্ষাকৃত নীরব স্থানে এনে বল্‌লে—"যূথিকা, মিনিট কয়েক অপেক্ষা কর, আমি একবার ঐ বন্ধুটির সঙ্গে দু'টো কথা ব'লে আসি।" আসামী মেয়েটির ভাই এখানেই থাক্‌তেন—তাঁরাও কি প্রয়োজনে উপরে গিয়েছেন। আমি একা অপেক্ষা কর্‌ছি এমন সময় পূর্ব্ব-দৃষ্টা সেই মহিলা সেখানে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"তোমার সঙ্গীরা কোথায়?" আমি বল্‌লাম, "তারা ওদিকে গেছে—এখনি আস্‌বে।"

"ওঃ, তুমি বুঝি নতুন এসেছ? এখানে কোথায় থাকো? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?"

আমি যথাযথ উত্তর দিলাম।

"পড়্‌তে এসেছ নিশ্চয়?—কী পড়?"

এবার একটু আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। ইংরেজরা তো 'গায়ে-পড়ে' আলাপ করে না ব'লে শুনেছি। ইনি যেন আমাদের দেশেরই একজন। মনে পড়ে, ছুটি ফুরোলে কল্‌কাতায় যাবার পথে ষ্টীমারে ইণ্টারে যে কয়জন মহিলা থাক্‌তেন—বৃদ্ধা থেকে যুবতী পর্য্যন্ত—সবাই বড়জোর মিনিট-দুই নীরবে আমাদের দেখে নিয়ে, সেই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যেতেন—"কি কর? কোথা যাবে? এত বয়স পর্য্যন্ত বাপ-মা বিয়ে না দিয়ে রয়েছে কেমন ক'রে গো—তোমরা কি কল্‌কাতার স্কুলের মাষ্টারণী না-কি গা?"—এই জিজ্ঞাসাবাদ থাম্‌ত শুধু তখন, যখন আমরা স্থানাভাব সত্ত্বেও বাইরে থার্ডক্লাসে ডেকে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হ'তাম। এমনি একবার নয়। ওঁদের না আছে এতটুকু সংকোচ, না জিজ্ঞাসিতের বিরক্তির ভয়। ঘণ্টা-কয়েকের জলযাত্রা বা ট্রেণযাত্রার পরেই যে-যার পথে চ'লে যাবে, এ-জীবনে কারোর সঙ্গে কারোর আর দেখাই হ'বে না, সেসবও মনে রাখ্‌বার দরকার করে না—এত অন্তরঙ্গ হ'য়ে এমন সব ঘরের ও ভিতরের কথা জানতে আগ্রহ দেখান যেন ওই জানাটুকুর উপরে তাঁদের কত-কি নির্ভর কর্‌ছে। উত্তর না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে ব'সে দেখেছি—তাতেও রাগ করেন, অহংকারী মনে করেন। উত্তর দিলে আরো মুস্কিল—কত যে অযাচিত উপদেশ শুন্‌তে হয়, সেসব এখানে না বলাই ভাল। আমাকে নীরব দেখে মহিলাটি একটু হেসে বল্‌লেন, "কিছু মনে করো না মা, আমার একটু বাচাল স্বভাব—তা ছাড়া বুড়োমানুষ, দেখ্‌ছ তো—তোমাদের বয়সী ছেলে-

মেয়েদের সঙ্গে অত আদব-কায়দা মেনে চল্‌তে পারি না।” আমি বড় লজ্জা পেলাম। তার পরে খর্সেদ ও তার বন্ধু ফিরে আস্‌তে আস্‌তে বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ সহজ হ’য়ে এল। সেক্রেটারী এতক্ষণ ওদিকে ব্যস্ত ছিলেন, এবার কাছে এসে বল্‌লেন, “মিস্ টমাস, আপনাকে টিউব ষ্টেশনে পৌছে দেব?”

“ধন্যবাদ মিঃ পাল, আমি একাই যেতে পার্‌ব। এতক্ষণ চলেও যেতাম, কেবল ভিড় কম্‌বার আশায় এদিকে একটু দাঁড়াতে এসে, এই বন্ধুটির সঙ্গে আলাপে কখন যে সময় কেটে গেল!” সেক্রেটারীর কাছে আমরা মিস্ টমাসের পরিচয় পেলাম—ইউনিয়নের অনেক দিনের মেম্বর, প্রায়ই না-কি এখানে আসেন। ভারতীয় ছেলেমেয়েরা ওঁকে খুব ভালবাসে, তিনিও ওদের জন্যে যথাসাধ্য করেন। এর পরে আরো কয়েকবার এখানে এসেছি এবং প্রায় প্রতিবারেই ওঁর সঙ্গে দেখা হ’য়েছে। এমন মিষ্ট স্নেহশীল স্বভাবের মানুষ আমি কমই দেখেছি। অল্পদিনেই আমরা পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ’য়ে পড়্‌লাম।

একদিন কথায় কথায় বল্‌লাম আমি শীঘ্রই বোর্ডিং থেকে অন্যত্র চ’লে যাব। খর্সেদের ভিয়েনায় পড়্‌তে যাওয়া ঠিক হ’য়েছে—আমি আর একলা বোর্ডিংএ থাক্‌তে চাই না। মিস টমাস জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, “কিন্তু কোথায় যাবে, তা ঠিক করেছ কি? হাজার হোক এটা চেনা জায়গা এবং নিরাপদে আছ,—নতুন জায়গায় অসুবিধা হ’বে না?”

“আমি এবার কোন ইংরেজ-পরিবারে গিয়ে থাক্‌তে চাই; বাবার বিশেষ ইচ্ছা। আপনার জানা-শোনা সে-রকম কেউ আছেন কি?”

মিস্ টমাস একটু ভেবে বল্‌লেন, “ঠিক সে-রকম আর আছে কই? তোমরা ভদ্রঘরের মেয়ে, যে সে বাড়ীতে তোমাদের পাঠানো যায় না। আবার এদিকে এদেরও বর্ণবিদ্বেষ যথেষ্ট—সহজে কি বিদেশীকে ঘরে নিতে চায়? নেহাত দারিদ্র্যের জন্যে বা সে-রকম কোন দায়ে ঠেকেই paying guest রাখে।” শুনে ভারি হতাশ হলাম।

মিস্ টমাসকে ও-কথা বল্‌বার দিন পাঁচ ছয় পরে অফিসে আমার ডাক পড়্‌ল। গিয়ে দেখি টেলিফোনে তিনিই আমাকে ডাক্‌ছেন—সামনের শনিবার অবশ্য তাঁর ওখানে চা-এ যেতে।

হ্যাম্প্‌ষ্টেডে তাঁর বাড়ী। চা খাওয়ার পর নির্জ্জন ড্রইংরুমটীতে এসে আগুনে শুক্‌নো কাঠ আরো কয়েক টুকরা ফেলে দিয়ে আমাকে ডেকে তিনি সোফায় নিজের পাশে বসালেন এবং অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর বল্‌লেন, “যূথি, তুমি যদি ইচ্ছা কর আমার এখানেই থাক্‌তে পার।” আমি এতটা আশা করিনি, খুসী হ’য়ে বল্‌লাম, “এ যে আশাতীত সৌভাগ্য মিস্ টমাস, আপনি আমার উপর বড় সদয়।”

“না যূথি, হঠাৎ কিছু ঠিক করে ফেলো না। আগে সব শোন। আমার এখানে লোকজন বেশী নেই তা দেখ্‌তেই পাচ্ছ। থাক্‌বার মধ্যে আমি আর আমার ছোট বোন। Maid সকালে আসে, সন্ধ্যার চ’লে যায়, মালীর বাড়ীও কাছেই। তুমি ছেলেমানুষ, এত নির্জ্জনতা হয়ত ভাল লাগবে না—আমি বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে থাকি কি-না।” একটু থেমে, আমি কিছু বল্‌বার আগেই, তিনি আবার বল্‌লেন—“শুধু এ-ই নয়। আসল কথা—যে জন্য বাড়ীতে লোকজন রাখতে পারি না, এমন কি চাকরাণীও নয়—কেউ থাক্‌তেও চায় না, দু’দিনেই চ’লে যায়”—ব’লে আগুনটা উস্কিয়ে উজ্জ্বলতর ক’রে দিয়ে একটু নড়ে চড়ে বস্‌লেন। তার পর বল্‌লেন—“সব খুলেই বলি তোমাকে”—ব’লেই আবার কি ভাবতে লাগলেন। আমি নীরবে অপেক্ষা ক’রে রইলাম এবং মনে মনে আশ্চর্য্য হ’য়ে ভাবলাম, কী এমন কথা থাকতে পারে যা বল্‌তে মিস্ টমাসের এত সংকোচ বোধ হ’চ্ছে—স্নেহমণ্ডিত সদাহাসি মুখখানি এমন বিষণ্ন দেখায়! বড় কৌতূহল হ’তে লাগ্‌ল। তবু তাঁকে ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে বল্‌লাম, “আমাকে না বল্‌লেই নয় কি?”

“না যূথি, বলাই ভালো। আমার বাড়ীতে থাকাই যদি ঠিক হয়, আমার ইচ্ছা তুমি সব জেনে-শুনে আস। কথাটি এই—আমার বোন—সুস্থ নয়। তাকে ঠিক পাগলও বলা চলে না; অথচ সহজ অবস্থাও নয়। বেশী কি আর বল্‌ব মা, তুমি নিজ চোখেই সব দেখ্‌বে। কেবল এই অনুরোধ, সে যদি কখনো অভদ্রতা করে বা কোন কঠিন

কথা বলে, তাকে মাপ ক'রে চলো—এর বেশী উপদ্রব সে আজকাল বড়-একটা করে না।"

"ও, এই! এ আর বেশী কথা কি?. আমার ও-রকম লোক দেখা অভ্যাস আছে, একটি আত্মীয় ছেলেবেলা হ'তে আধ-পাগল—"

"এ ঠিক সে-রকম নয়, যূথি। তবু তোমাকে জানিয়ে রাখ্‌লুম। আমি—কেন জানি না, তোমার প্রতি ভারি একটা আকর্ষণ অনুভব করি, তাই এই বাধা সত্বেও তোমাকে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছি—জানি না ভাল করছি কি-না। তোমাকে দেখে মনে হয় নিতান্ত অনভিজ্ঞ, অপরিচিত লোকের বাড়ীতে পাঠাতেই ভয় করে—নিঃসন্তান নারীর আসক্তি! বুঝে ক্ষমা করো, মা।"

"ছি, ছি, মিস্ টমাস, আপনি এ সব কি বল্‌ছেন বলুন দেখি? আপনার মত এমন স্নেহময়ীর আশ্রয় পাব, এ কি আমি কখনো কল্পনাও করেছিলাম? বাড়ীতে লিখে দিলে কত খুসী হ'বেন সবাই—দাদাকেও আমি কাল্‌কেই জানাচ্ছি সব।—আর, আপনার বোনের কথা—দেশে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে আমাদের কত রকম লোকের সঙ্গে কত যে গোলমালের ভিতর থাক্‌তে হয়, সে আপনি জানেন না ব'লেই অত ভাব্‌ছেন। সাংসারিক অভিজ্ঞতা আমার কম তো বটেই,—সে-জন্যেও আপনার বাড়ীতে স্থান পেলে নিশ্চিন্ত হ'ব।"

"বেশ মা, তবে তা-ই থেকে দেখ দিনকতক। কোন বাধ্যবাধকতা নেই, ভাল না লাগ্‌লেই চ'লে যেতে পারবে।"

সপ্তাহখানেক পরে নূতন বাড়ীতে উঠে এলাম। মিস্ টমাসের গৃহখানি বড় সুন্দর, ট্রাম লাইনের থেকে রে—একেবারে "হীথে"র (Hampstead Heath) কাছেই। সে পল্লীতে সবই প্রায় একই ধরণের বাড়ী—সামনে পিছনে বাগান। যেমন নির্জ্জন তেমনি মনোরম। সহরের গণ্ডগোল হ'তে এসে মনটা স্নিগ্ধ শান্তিতে ভ'রে যায়। এখান থেকে কলেজে যাতায়াতে কিছু বেশী সময় লাগ্‌লেও, অপর সকল রকমে এত সুবিধা যে, আমি মিস্ টমাসের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম। এই বিদেশিনী মহিলার মায়ের মত সকরুণ স্নেহে পরের বাড়ী দু'দিনেই আমার আপন গৃহতুল্য প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ল।

আশ্চর্য্য এই যে, যাঁর ভয়ে এ-বাড়ীতে লোকজন থাকে না, আমি এসে কিছুদিন তাঁর কোন উদ্দেশই পেলাম না। মিস্ টমাসকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বাধে, কারণ এ-বিষয়ে তাঁর সংকোচ কত, তা প্রথম দিনই সেই প্রসঙ্গে বুঝেছি। তার পরে তাঁর নীরবতা থেকেও। চাকরবাকরকে প্রশ্ন করা তো চলেই না। ক্রমে আমার ভয় কেটে গেল। মাঝে মাঝে কৌতূহল হ'ত, তা-ও প্রায় কমে এসেছে। এমন সময় একদিন খুব ভোরেই উঠ্‌তে হয়। ডান দিকে স্নানের ঘরের দিকে যেতে দেখি, কে একজন পাশ কাটিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "কে ওখানে?"—কোন উত্তর নেই। সেখানে তখনও রীতিমত অন্ধকার—ফিরে সিঁড়ির কাছে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। দেখি—মিস্ টমাসেরই যেন একখানি দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার মুখের দিকে একটু-খানি তাকিয়ে হঠাৎ হেসে বল্‌লেন, "গুড্ মর্ণিং!"

"গুড্ মর্ণিং" ব'লে আমি যাবার উপক্রম কর্‌তে খুব কাছে এসে বল্‌লেন—"তোমার নাম কি, মেয়ে?"

নাম বল্‌লাম; তার পর সেই যে প্রশ্ন সুরু হ'ল—একটার পর একটা—সে আর থামেই না। অবশেষে কাতর হ'য়ে ভাবলাম, ইনি বোধ হয় আমাকে যেতেই দেবেন না—চলে গেলেও যদি রাগ করেন! ঠিক কোন্ রকম ব্যবহার কর্‌লে বা কি যে বল্‌লে খুসী হ'বেন তাও তো জানা নেই! ভয়ে ভয়ে তাই কেবল যথাসম্ভব সত্য উত্তরই দিতে লাগলাম। কিন্তু ওঁর আর নড়বার নাম নেই—পথ আগলে দাঁড়িয়ে এক একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন আর মুখের দিকে তাকিয়ে অসংকোচে হাসেন। হঠাৎ বল্‌লেন—"কে বল্‌লে তুমি বাঙালী? মিছে কথা, তুমি জাপান থেকে এসেছ—জাপানী মেয়ে!"

"না মিস্, সত্যি কথাই বলেছি—"

"সত্যি কথা? কখ্‌খনো না—আমি বল্‌ছি তোমাকে—তুমি জাপ, নিশ্চয় জাপানী মেয়ে—"

ভাল বিপদেই পড়া গেছে! কুড়ি বছর পরে আজ হঠাৎ এক কথায় প্রমাণ হ'য়ে গেল নিজেকে যা ব'লে জান্‌তুম তা আগাগোড়া ভুল! কী করি এখন এঁকে নিয়ে? উদ্ধারের কোন পথ আছে কি-না ভাব্‌ছি, এমন সময় মিস টমাস পাশেরই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, "রিণা, মেয়েটিকে যেতে দাও,—ওর ক্লাস আছে খুব সকালেই।"

"ওঃ ডোরা, ডোরা, দেখ কি আশ্চর্য্য—একেবারে জাপানী মেয়ে, তেমনি চোখের কোণ, তেমনি ভুরু—হাস্‌লে অবিকল জাপ। এ নীল গাউনটাও তো জাপানী। —তবু বল্‌বে তুমি বাঙালী ?"

অদৃষ্টদোষে সেদিন একটা 'কিমোনো' প'রে উঠেছিলাম। মিস্ টমাস চোখ টিপে আমায় ইসারা করলেন। তখন হেসে বল্লাম, "বেশ মিস্, জাপানী হ'লেই যদি আপনি খুসী হন, না-হয় আমি তা-ই।"

"তা-ই তো—আমাকে ফাঁকি দিতে পার ? মানুষ চিনি না আমি ? কিন্তু কি নাম বললে তোমার ?—নাঃ, ও-তো ঠিক নাম নয়—ডোরা, এর নাম বোধ - হাঁ বেবি।"

"আচ্ছা, তুমি ওকে 'বেবি' ব'লেই ডেকো, রিণি। লক্ষ্মী বোন, এখন ওকে যেতে দাও, আছেই তো বাড়ীতে, কত দেখ্‌বে রোজই।" মিস্ টমাস সস্নেহে বোনের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেলেন। এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ। তার পর থেকে রিণাকে যখন-তখন দেখি। বাড়ীর একেবারে উপরের তলায়—atticএ—একটি ঘরে থাকেন তিনি। সেখানে কারো যাবার উপায় নেই, লোক-জনের ছায়াও সহ্য করতে পারেন না। খুব ভোরে উঠে দোতলায় নিজের বিশেষ দরকারী কাজগুলো সেরে এক-পেয়ালা কফি হাতে সেই যে উপরে চলে যান, তার পর সেখানেই সারাদিন থাকেন—সেখানেই খাওয়া শোওয়া সব কাজ। সন্ধ্যার সময় কোথাও কেউ না থাক্‌লে আবার একবার নেমে আসেন। বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত এলে রিণা সেই অত উপরেও জানলা দরজা বন্ধ ক'রে বসে থাকেন —এত তাঁর জনতাবিদ্বেষ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে সেদিন থেকে আমাকে কি ব'লে কাছে কাছে রাখ্‌বেন, কি দিয়ে খুসী করবেন, এই হ'ল ওঁর মস্ত ভাবনা। আমি কোথাও বেশীক্ষণের জন্যে বেড়াতে যাব বল্‌লে ওঁর চোখে নেমে আসে এক শঙ্কিত ব্যাকুল দৃষ্টি—নানা রকমে বাধা দিয়ে বাড়ীতে ধ'রে রাখ্‌তে চেষ্টা করেন। আমি তো এ রকম অদ্ভুত ব্যবহারের কোন কারণই খুঁজে পেলাম না।

মিস্ টমাস ভয় করেছিলেন পাগলের বিদ্বেষকে—কিন্তু তার আসক্তিও যে কী ভীষণ হ'তে পারে তা বোধ হয় তিনিও জানতেন না। ক্রমে আমার অবস্থা এমন হ'ল যে বাড়ী ফিরতে ভয় হয়। সন্ধ্যার সময় কলেজ হ'তে ফিরে অতি সাবধানে চাবিটি লাগিয়ে ততোধিক সাবধানেই দরজাটি খুলি—তবু, যেন হাওয়ায় খবর পেয়ে রিণা এসে জড়িয়ে ধরে। "বেবি, বাছা—মণি আমার" ব'লে আদরে আদরে আমাকে ব্যাকুল ক'রে দিয়ে ছাতা, কোট, ব্যাগশুদ্ধ টেনে বস্‌বার ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে পরিচর্য্যার সে কী ঘটা! খাবারের কত কী আয়োজন! প্লেতে খেতে এবং ওর আদেশমত একবার শরীরের এদিক আবার ওদিক আগুনের তাপে শুকোতে শুকোতে চোখে আমার জল আসে—অভিমানে কেবলই মনে হয়, মিস্ টমাস এই পাগলের হাতে এমন ক'রে আমায় ছেড়ে দিয়ে কেন যে এত বাইরে বাইরে ঘোরেন! খাওয়ার পরেও ছুটি নেই; তার পর সেখানেই গন্‌গনে আগুনের ধারে সোফাটার উপর শুয়ে থাক্‌তে হ'বে —গায়ে একটা গরম "রাগ্" চাপা দিয়ে। হাতের কাছে আরো যা গরম কাপড়-চোপড় পাওয়া যায়, রিণা সে সমস্তই আমার পায়ের উপর দিয়ে ভাল ক'রে ঢেকে ঢুকে দেয়। কোন বই পড়্‌তে পারব না, কারণ নাকি সারাদিনই তো পড়েছি—অতএব এখন থেকেই হয় ঘুমোতে হ'বে, নয়ত চুপ ক'রে শুয়ে ওর গল্প শুনতে হ'বে।—অত আগুনের তাপে সেই গরমেও একটা মোটা কম্বল জড়িয়ে শোওয়া, সেই ভয়ে ভয়ে জোর ক'রে খাওয়া, অনেক রাত পর্য্যন্ত একটি বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের অনিমেষ স্নেহ-ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে একলাটি থাকা—সে সব মনে হ'লে আজও আমার মন অস্বস্তিতে কালো হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু উপায় নেই। রিণা কোন আপত্তিই শোনে না। মিস্ টমাসও ওকে রীতিমত ভয় ক'রে চলেন। রাত্রে বাড়ী ফিরলে তাঁর অনেকদিনকার অভ্যস্ত ও প্রিয় এক পেয়ালা চা-এর পরিবর্ত্তে রিণা যখন তখন আপন খেয়াল মত কফি এনে দিলে যতই অরুচি হোক, ফেল্‌বার জো নেই। কেউ বিরুদ্ধে কিছু করলে বা বল্‌লেই রিণার পাগ্‌লামী বেড়ে যায়। এতটুকু আপত্তির সূত্রপাতে এমন ভয়ঙ্কর রাগারাগি করে যে সে এক কুরুক্ষেত্র।

মাস তিনেক থাক্‌বার পরে মনটা এমন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল যে ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল যত শীগ্‌গির পারি এখান থেকে চ'লে যাই। এমন সুবিধামত বাড়ী আর কোথাও পাব না বটে, কিন্তু সুখের চাইতে আমার স্বস্তিই ভাল। কিন্তু কথাটা কিছুতেই মিস্ টমাসকে বল্‌তে পারি কই ?

জেনেই এসেছে এ-সংসারে ওদের ব্যথা পাওয়াই হ'বে সার এবং সেই জ্ঞানের অঞ্জনেই যেন চোখ দু'টি তাদের নিত্য এত করুণ—ছায়াময়! এমনি চোখ ছিল আমার আইরিণের, এবং আবার বল্‌ছি, কিছু মনে করো না, মা—প্রথম সাক্ষাতে তোমারও চোখে এ-ধরণের একটা বিষণ্ণ-কোমল ভাব দেখে আমি অত আকৃষ্ট হই।"

"তাই না-কি?"—আমি একটু হেসে বল্‌লাম, "কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আজ পর্য্যন্ত আমার জীবনে তেমন কোন দুঃখই পাইনি, মিস্ টমাস। সব ক্ষেত্রে হয়ত এক রকম ঘটে না—"

"তাই যেন হয়, যূথি। তবু কথাটা তোমায় ব'লে রাখ্‌লাম, যদিও জানি অদৃষ্টের হাত কেউ কখনো এড়াতে পারেনি। যা বল্‌ছিলাম—আইরিণ আমার একমাত্র বোন, তাকে এক রকম কোলে-পিঠে ক'রেই মানুষ করেছি। বাবার মৃত্যুর পর মার মন একেবারে ভেঙে যায়। এ সময় ঠাকুরদা নানা কৌশলে অর্থসাহায্য না কর্‌লে হয়ত দারিদ্র্যে ও মনঃকষ্টে অচিরেই আমরা মাকেও হারাতাম। আজীবনের যে সচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে জীবিকা-উপার্জ্জন-অনভ্যস্ত পিতা দুঃখে চিন্তায় উৎকণ্ঠায় অকালেই মারা যান, মার আমার কেমন জেদ হ'ল—সেই ধনসম্পদের এক কাণাকড়িও নেবেন না। সন্তান দু'টির জন্যে অপ্রত্যাশিত বৈধব্যের প্রথম অবস্থায় বাধ্য হ'য়ে কিছু নিলেও তা যেন দিনরাত তাঁকে শেল হ'য়ে বাজ্‌ছিল। একটু সুস্থির হ'য়েই সব সাহায্য প্রত্যাখ্যান ক'রে তিনি আপন ভার আপনিই নেবেন বল্‌লেন। কিন্তু অনাথা নিঃসম্বল রমণী, তার উপর শারীরিক শ্রমে অনভ্যস্তা। কে তাঁকে চাকরী দেবে? অবশেষে—অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি ভদ্রপরিবারে ছোট শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পাওয়া গেল। তাতেও তিনজনের বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট অর্থাগম না হওয়ায় আমাদের বাড়ীর সবচেয়ে ভাল দু'টি ঘর ভাড়া দিতে বাধ্য হ'লেন। এর পরে কিন্তু আর ঠাকুরদা আমাদের মুখ দেখ্‌লেন না। তাঁর অন্য পুত্রসন্তান কিংবা আমাদেরও কোন ভাই না থাকায় পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'য়েছিল তাঁরই কোন্ এক দৌহিত্র।

দিনের বেলায় মা কাজে চ'লে যেতেন আইরিণকে দেখা-শুনা ও বাড়ী আগ্‌লাবার ভার আমার উপর দিয়ে। ভাড়াটেরা শুধু দু'টি ঘর নিয়ে থাক্‌ত, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজের হাতেই। এমনি সুখে দুঃখে দীর্ঘ কয়টি বছর কেটে গেল। আইরিণ তখন ১৬।১৭ বছরের তন্বী মেয়ে। আমি তার বছর ছয়েকের বড়—প্রতিদিন ঘণ্টা হিসাবে এক রুগ্না মহিলার সহচরী (companion) ও প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর কাজ করি। আইরিণ প্রায়ই একলা বাড়ীতে থাকে।

একদিন কি একটা কাজে কাছেই দোকানে যাবার জন্যে ফটক খুলে বাইরে আস্‌তে দেখি একটি যুবক দরজার পিতলফলকের উপর আমাদের নাম পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। আমি জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাতেই বল্‌লে, "আমি মিসেস্ টমাসের বাড়ী খুঁজ্‌ছি।" আমি বল্‌লাম, "এই বাড়ীই। কি দরকার, আপনি কাকে চান?"

—"আমি তাঁর আত্মীয়, বিশেষ কাজ আছে।"

—"মা বাড়ী নেই, সন্ধ্যার আগে আস্‌বেন না—আমাকে বল্‌তে যদি আপত্তি না থাকে—"

—"ও, আপনি তাঁর বড় মেয়ে?"

—"হাঁ, ডরোথী।"

পরিচয় পেলাম—ছেলেটি জন রবার্ট, আমাদের পিস্‌তুতো ভাই, যে এখন ঠাকুরদার ধনসম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। বাড়ীতে ওকে সকলে "জন" ব'লে ডাকে। এমনি আলাপ-পরিচয়ের পর ও বল্‌লে, "কিন্তু কাজের কথা তো আপনার মার সঙ্গে ছাড়া হ'তে পার্‌বে না। আমি না হয় সন্ধ্যার পরে আবার আস্‌ব।"

রাত্রে মার সঙ্গে জনের দেখা হ'ল। ঠাকুরদাই পাঠিয়েছেন ওকে। মার জীবিকা-অর্জ্জনের ধারায় তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত। বর্ত্তমানে কঠিন রোগে শয্যাগত, আর বেশী দিন বাঁচ্‌বেন না। জীবনে যে মস্ত ভুল করেছেন তার অন্ততঃ খানিকটাও শোধ্‌রাবার অবসর কি তাঁকে দেওয়া উচিত নয়? মা না হয় তাঁর বংশমর্য্যাদার কথাটা না-ই ভাব্‌লেন, কিন্তু তিনি কি তাঁর পৌত্রী দু'টিরও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর্‌বার অধিকারী নন? ইত্যাদি। বয়সের গুণে মার ক্লান্তিও এসেছিল। ঠাকুরদার খেদের কথাগুলো মনে লাগ্‌ল। তাছাড়া শোকের আঘাতে যে প্রচণ্ড অভিমান এসেছিল, সময়ের প্রলেপে, শোক কম্‌বার

সঙ্গে সঙ্গে সে জেদ অভিমানও হয়ত একটু ফিকে হ'য়ে এসেছিল। তিনি রাজি হ'লেন। ঠাকুরদা তাঁর স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির যে কতকাংশে দানবিক্রয়ের অধিকার ছিল, তারই কিছু এবং দু'খানা বাড়ী আমাদের দু'বোনকে সমানে ভাগ ক'রে দিলেন। একখানা বাড়ী এই, আর একখানা ভাড়া দেওয়া হয়। তাছাড়া, গ্রামেও এক বড় বাড়ী ও কিছু জমিজমা আছে—সেখানা farm-house ক'রে দীর্ঘ দিনের leaseএ ভাড়া দিই।

ঠাকুরদা মাকে বল্লেন শেষ কয়দিন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে থাকি। তার পর তাঁর মৃত্যুর পর যে যার জায়গায় চ'লে যাবে। মৃত্যুর আর দেরীও ছিল না।

মা বাড়ীওয়ালাকে নোটিশ দিলেন। আমাদের ভাড়াটেকেও অন্যত্র বাড়ী দেখ্তে বলা হ'ল।

পুরোনো বাড়ী ছাড়্বার দিনকতক আগে আইরিণের হঠাৎ বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্লাম। ওর সেই বালিকা-সুলভ হাসিখুসী ভাব, সেই কথায় কথায় আদরে-আবদারে গলে-পড়া, যখন-তখন মাকে বোনকে অনর্গল যা তা ব'লে হাসানো—কোথায় যেন সব উবে গেছে। সে বিষণ্ণ-মুখে কেমন অদ্ভুত ধীরভাবে চলাফেরা করে, আমাদের কাছে বড়-একটা আসে না—যতটা সম্ভব একা একাই থাকে। আমরা তখন বড় ব্যস্ত ছিলাম, ওর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কর্লেও দু'জনেই মনে কর্লাম এ শুধু পুরোনো বাড়ীর উপর বালিকার মায়া আর তার জন্যে মন কেমন করা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ছোট হ'তে ও' এখানেই মানুষ তো।

ভাড়াটে উঠে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় একটু কি দরকারে আমি সেদিককার শোবার ঘরখানিতে ঢুকে দেখি, সে ঘরের আব্ছা অন্ধকারে টেবিলের উপর মুখটি গুঁজে আইরিণ একা ব'সে আছে। দেখে বড় আশ্চর্য্য লাগ্‌ল—হরিণ-শিশুর মত এ সদাচঞ্চল বালিকার এমন কি ভাবনা, এ-বাড়ীর উপরও তার এত কিসের টান যে এমন সময়ে একলা বসে চিন্তায় যেন একেবারে ডুবে গেছে? কাছে গিয়ে ডাক্‌লুম—"রিণি!" আইরিণ ভীষণ চম্‌কে উঠে একেবারে যেন শতধা ভেঙে পড়্‌ল। আমার মনটা অজানা ভয়ে অসাড় হ'য়ে গেল। একটু পরে দরজাটা বন্ধ ক'রে খুব কাছে এসে ওকে জড়িয়ে ধর্‌লাম—"কি হ'য়েছে বোন, এমন কর্‌ছ কেন?" অনেক জিজ্ঞাসাবাদ, অনেক আদর আর অভয় দেওয়ার পর সে যা বল্‌ল—আঃ যুথি, আজও সেদিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে,—সে ব্যথা, সে-সব অপমানের আগুন আজও এ বুকে তেমনি যেন জ্বল্‌ছে—" বৃদ্ধার ঠোঁট দু'টি থরথর ক'রে কেঁপে উঠে শীর্ণ কপোল বেয়ে দু'টি ধারা নাম্‌ল। আমি দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লাম—"আর দরকার নেই এ-সব ব'লে—"

"ক্ষমা করো, যুথি—কিন্তু ওঃ ভগবান, স্মৃতিতেও এখনো এত জ্বালা! মনে হয় যেন সেদিনে ফিরে গিয়েছি,—যেন এই আজই ঘটেছে ব্যাপারটা।" একটু স্থির হ'য়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—"তোমার কাছে ব্যথার বোঝা নামাচ্ছি, স্বার্থপর বুড়ো মানুষের দুঃখের কাহিনী ধৈর্য্য ধ'রে শুন্‌ছ, এত-ই বা আমি কোথায় কার কাছে পেয়েছি? যাক, শোন—অল্প কথাতেই—আমাদের শেষ ভাড়াটে ছিল এক—এক জাপানী যুবক। তখনকার দিনে বিদেশী ভাড়াটে নেওয়া আরো সাহসের কথা ছিল। কিন্তু এই ছেলেটি সম্ভ্রান্তবংশীয়, ছাত্র, ভারি সহৃদয়—মা ওকে বিশেষ জেনেশুনেই ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। কি পড়্‌ছিল জিজ্ঞাসা করিনি, সেও নিজে থেকে কখনো বলেনি। শুধু এইটুকু জান্‌তাম যে মাঝে মাঝে সে ইংলণ্ডের নানা জায়গায় ঘুরে কলকারখানা, শিল্পবিদ্যা, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি পরিদর্শন ক'রে বেড়াত। ওর সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। নিজের ঘরে আপন ভাবে থাকৃত, আমরা কখনও ওর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কর্‌তাম না—কিন্তু কবে থেকে যে আইরিণের ওকে এত—" মিস্ টমাস জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—"ঐটুকু মেয়েও যে ভালবাস্‌তে পারে এবং এতই গভীর ভাবে—সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম? তখনকার দিনকাল, যুথি, অন্য রকম ছিল। এখন আমাদের মেয়েরা অতিমাত্রায় অকালপক্ক।—কিন্তু এ-ই কি সব?—তাহ'লে আর কাঁদি কেন?—সেই শিশু-স্বভাব আইরিণ—যে তখনও স্কুলের মেয়েদের মত বেণী ঝুলিয়ে বেড়াত—"

আমি সস্নেহে তাঁর অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বল্‌লাম—"আজ এ পর্য্যন্ত থাকুক, বাকিটা আর একদিন শুন্‌ব—"

"আর বড় বেশী নেই।—মাকে সব বল্‌বার পর তিনি কি-একরকম হ'য়ে গেলেন। বল্‌লেন—তাঁর দোষেই এতটা হ'তে পেয়েছে। তিনি যদি ছেলেটিকে মাঝে মাঝে চা-এ না ডাক্‌তেন, আইরিণের তো ওকে এত ঘনিষ্ঠভাবে জান্‌বার

সুযোগই হ'ত না। তিনি না-কি কতবার লক্ষ্য করেছেন যে ও আস্‌লেই আইরিণ ভয়ানক খুসী হ'ত। ছেলেটিও ওকে যথেষ্ট যত্ন কর্‌ত, প্রায়ই নানা রকম জাপানী জিনিস উপহার দিত, জাপানের গল্প বল্‌ত। জান তো—ওরা কি রকম ভদ্র, সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাত! আইরিণের ওকে ভালো লাগায় আশ্চর্য্য হইনি, কিন্তু সে ভালো-লাগায় যে কোন বিশেষত্ব ছিল, তা কে জান্‌ত?" মিস্‌ টমাস অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চুপ ক'রে রইলেন। একটু পরে সচেতন হ'য়ে বল্‌লেন, "মা কিছুতেই আর ঠাকুরদার বাড়ী যেতে চাইলেন না। অনেক অনুনয় ক'রে, শরীর খারাপের দোহাই দিয়ে আইরিণকে নিয়ে সুদূর ইটালিতে চ'লে গেলেন। আমি ঠাকুরদার কাছে রইলাম; তিনি দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে মা বাবার মৃত্যু ক্ষমা কর্‌তে পারেননি ব'লেই ও-বাড়ী গেলেন না।

প্রায় বছরখানেক মা ও আইরিণ ইটালিতে ছিল। সেখান হ'তে খুব সাধারণ কথাবার্ত্তা ছাড়া চিঠিতে মা আর কিছুই লিখ্‌তেন না। ইতিমধ্যে আমারও—অনেক পরিবর্ত্তন। জন আমাকে বিয়ে কর্‌তে চাইলে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ঠাকুরদা মত দিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি জনকে বল্‌লাম মার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে। ভেবেছিলাম, চিরদুঃখিনী জননীকে অন্ততঃ এই একটুখানি সুখ দিতে পার্‌ব। তখন কি জান্‌তাম কি ঘোর অভিশপ্ত ছিল সমগ্র পরিবারটা?

বৎসর পরে মা ফির্‌লেন, সঙ্গে—এ কাকে নিয়ে? এই কি সেই ননীর পুতলী, দুধের বালিকা রিণা?—ভগ্নদেহ ভগ্নপ্রাণ জননীর কাছে সকল শুন্‌লাম। পাছে চিঠিপত্রে লিখ্‌লে কোন রকমে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, সেই ভয়ে লিখ্‌তে পারেননি।—আইরিণ—" ব'লে মিস্‌ টমাস নীরবে কাঁদতে লাগ্‌লেন।—"সেখানে ওর একটি মেয়ে হয়—ক্ষীণ, দুর্ব্বল, তিন মাসের বেশী বাঁচেনি। মার তাতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু সে শোকে একেবারে ভেঙে পড়্‌ল। যেখানে শিশুটিকে কবর দেওয়া হয়, দিনরাত না-কি সেখানে প'ড়ে থাকতে চাইত। এর উপর ওর হয় দারুণ ব্রেণ ফিভার। কোন ক্রমে বাঁচানো গেল তো—" মিস্‌ টমাস সনিশ্বাসে বল্‌লেন—"এখন যা দেখ্‌ছ। কেবল তখন আর একটু বাড়াবাড়ি ছিল। সর্ব্বদা আত্মহত্যা কর্‌তে চাইত; লোকজন বিশেষতঃ পুরুষমানুষ এখনও ওর দু'চোখের বিষ। অনেকদিন ওকে নার্সিং হোমে রাখ্‌তে হ'য়েছিল। মা আর বেশী দিন বাঁচেননি,—মৃত্যুর আগে ওকে আমার হাতে দিয়ে যান। তাঁর আশা ছিল যদি কখনো ভাল হয়—কিন্তু ভাল সে আর হয়নি।" মিস্‌ টমাস চুপ কর্‌লেন। একটু পরে আবার বল্‌লেন—"তাই তোমাকে পেয়ে অমন করে—তোমার মুখের আদলটা "

—"জানি"—

—"ও তো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই—ওটুকুতেই তোমার ওপর এত টান হ'য়েছে।"

অনেক কিছুই এখন পরিষ্কার হ'য়ে গেল। এই জাপানী-প্রীতি, "বেবি" ব'লে ডাকা, বেবির মতনই সেবা-যত্নের ঘটা, যেখান-সেখান থেকে যখন-তখন জাপানী ফানুস, ফ্যান, বাক্স কিনে নিজের ঘরে সঞ্চয় ক'রে রাখা।—হঠাৎ চমক ভেঙে দেখি, মিস্‌ টমাস মগ্ন হ'য়ে কি ভাব্‌ছেন। আস্তে স্পর্শ ক'রে সসংকোচে বল্‌লাম—"আপনি বুঝি আর বিয়ে কর্‌তে পার্‌লেন না?"

—"এর পরে কি আমার মনের অবস্থা ঠিক ছিল? তাছাড়া এই যে এত ব্যাপার ঘটে গেল, জন তার কিছুই জানত না—লোকে জান্‌ত টাইফয়েড হ'য়ে রিণা পাগল হ'য়ে গেছে। যাকে জীবনের গূঢ়তম কথা বল্‌তে পার্‌ব না, তাকে বিয়ে ক'রে ঠকাব কি করে? আর সে যদি সব শোনে, তবে কি আমাকে আগের মত শ্রদ্ধা কর্‌তে বা ভালবাস্‌তে পার্‌বে?—তাই নিজেই স'রে দাঁড়ালাম। তবু—সে এসেছিল।"

—"কি বল্‌লেন তিনি?"—

—"বল্‌লে, 'ডোরা, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?' আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লাম—'এ কথা কেন?' জন বল্‌ল—'রিণার দেখাশুনার জন্যে তুমি বিয়ে কর্‌তে চাও না,-কিন্তু এটা কেন ভাবোনি যে সে যেমন তোমার, তেমনি আমারও বোন?'—দেখ্‌লাম ও কিছুই সন্দেহ করেনি। আমার বাধা আরো বেড়ে গেল। একদিকে ওকে বলা, আর ওর চোখে নিজের এক মাত্র ছোট বোনটিকে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে, ছোট করা, আর এক দিকে চিরদিনের জন্যে প্রিয়তমকে হারানো। এই দ্বিধার দ্বন্দ্বে আমি কি যে কর্‌ব স্থির কর্‌তে না পেরে কিছুদিনের জন্যে অন্যত্র চ'লে গেলাম। সেখানে

গিয়ে জনের মাত্র একখানা চিঠি পাই—'তুমি কেবল বোনের কথাই ভাব্‌লে ? আমি তবে তোমার কেউ নই ? বেশ, ডোরা, তাই হোক, আমি আর কখনও তোমায় বিরক্ত করব্‌ না'।"

আমি সাগ্রহে বল্‌লাম, "তার পর কি হ'ল ? ক্ষমা করবেন—এতটা ঔৎসুক্য "

—"তার পর, যূথি, তার সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হয়নি। বলেছি না অভিশপ্ত পরিবার ? জন আমি ফিরবার আগেই মারা যায়। ওর হার্ট দুর্ব্বল ছিল বরাবরই। একদিন সকালে ওকে বিছানায় মৃত পাওয়া যায়—রাত্রেই কখন্—'

চোখে আমার জল ভ'রে এল। উঠে ব'সে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লাম—"কেঁদো না, মা, ভগবানের গূঢ় উদ্দেশ্য কি, আমরা বুঝ্‌ব কি ক'রে ?"

"যূথি, ভারতবাসী যে পরজন্ম মানে—"

আমি তাঁর হাতখানি হাতে নিয়ে নীরবে ব'সে রইলাম। —কতক্ষণ এমনি ভাবে ছিলাম জানি না, হঠাৎ উপরে ও সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল এবং একটু পরেই রিণা দরজার কাছে এসে উদ্বিগ্নভাবে বল্‌লে—"ডোরা, তুমি কি আজ সারারাত বেবিকে ঘুমোতে দেবে না ? এত রাত অবধি আলো জ্বালিয়ে করছ কি ?"

—"এই যে রিণি, এই যাই বোন।—সত্যি, রাত কম হয়নি।"

বৌদিদি

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

ছোট্ ঠাকুরপো ! ছোট্ ঠাকুরপো ! ও ভাই কবি !
শুনছো কি ?
দ্যালের গায়ের ক্যালেণ্ডারের মেমের দন্ত গুণছো কি ?
মিলছেনাকো পদ্য বুঝি তাই কি তুমি চিন্তিত ?—
আমার কথা শুনলে তোমার আট্‌কাবেনা কিঞ্চিৎ-ও।
দিচ্ছি শোনো যুক্তি শুভ
পদ্য যাতে মিলবে ধ্রুব ;
ছন্দ নিয়ে দ্বন্দ্ব তোমার বন্ধ হবেই সন্দ নেই !—
মন্দাকিনীর সঙ্গে—বুঝ্‌লে ? সাজলে চেলী চন্দনেই।

আহা—হা—হা, চট্‌ছো কেন ? মন্দা মোটেই মন্দ নয় !
ও—ও, বুঝেচি ! প্রেমের ঠাকুর সকল দেশেই অন্ধ হয় !
কুন্দকে ভাই পছন্দ ?···তা' খুলেই পষ্ট বল্লে কোন্ !
তাই তো ভাবচি কেনই ভায়ার হঠাৎ এত উদাস মন !!
গন্ধ-বিহীন কুন্দমালা
ভরলো কবির প্রাণের ডালা ;—
মন্দারই সে মাস্তুতো বোন্,—রংটি একটু ফরসা বই
এমন কি আর গুণ আছে তার?—কাব্যি বুঝবে ভরসা কই ?

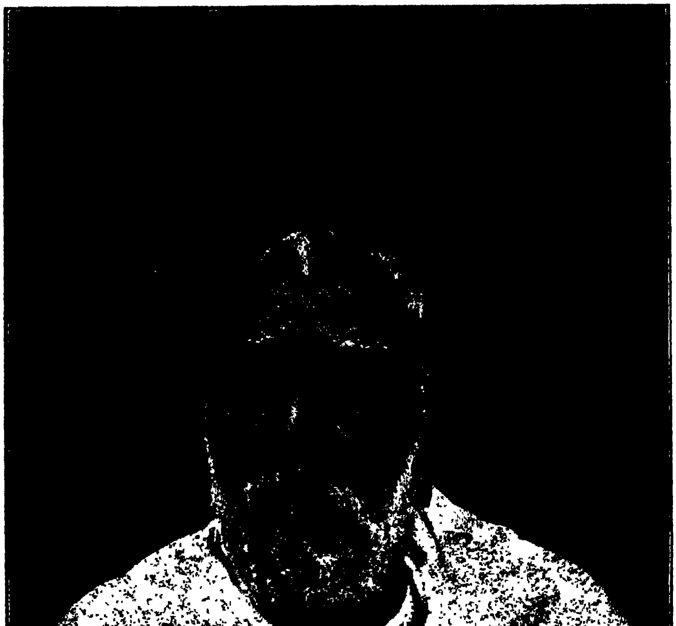
ঐ যাঃ!···চা'টা জুড়িয়ে গ্যালো! হালুয়া হোলো ঠাণ্ডা হিম!
কলম ছেড়ে খাও তো আগে ! পদ্য রাখো ঘোড়ার ডিম !!
উঠ্‌লেনাকো ?···শীগ্রি ওঠো !···নইলে খাতা ছিঁড়চি এই !
আমার সঙ্গে পারবে জোরে ?—এমন সাধ্যি তোমার নেই !
হালুয়া কেন এমন কালো ?—
—ফেল্‌লে গালে লাগবে ভালো।
বানিয়েছি যে নতুন গুড়ে ! একটু না হয় মুখেই দাও !
কাট্‌লেটে কি ঝাল্ লেগেছে ?—রাই মেখোনা, অমনি খাও!

শ্যামকে বলি চা দিক্ তোমায় গরম-গরম আরেক কাপ্ !
হালুয়া টুকুন্ সব খাওয়া চাই।—নৈলে তোমার নেইকো মাপ !
হ্যাঁ এক কথা!—শুনচি আজকে প্লাজায় হচ্চে "লাভ্ প্যারেড"
যাচ্চো ?—সত্যি ? উচিত্ নয়কো !—কারণ তোমরা
আন্‌ম্যারেড্।
বউদিদিদের সঙ্গেতে নাও,—
এই পয়েতেই বৌ যদি পাও !!
জানোই তো ভাই আমরা হলুম প্রজাপতির আপন জাত্ !
খরচটা নয় দিচ্চি আমিই।—ওম্মা! অম্‌নি পাত্‌ছো হাত্ !!

সাহিত্যিক-সম্বর্দ্ধনা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁহার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে গত ২রা ভাদ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়গৃহে তাঁহাকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা গত মাসের অন্যতম



রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহার পরদিন সালিখা নাট্যপীঠ (হাওড়ায়) ঐ উপলক্ষে এক সম্মিলন ও তাহার পর দিন আলবার্ট হলে একটী সঙ্গীতসম্মিলন হইয়াছিল।

২রা ভাদ্রের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য--কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুত্র বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমীদার মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের নেতৃগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিবার সময় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগকে বাঙ্গলা সাহিত্যের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিভাগের পুষ্টি ও শ্রী সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ ও আহ্বান করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা আজ যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যের সকল বিভাগ এখনও আশানুরূপ পুষ্ট হয় নাই। যাহাতে সেই ত্রুটি অচিরে সংশোধিত হয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি বাঙ্গলা ভাষাকে সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই আশুতোষের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলা ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষার বাহন হইবার সময় যে এই আহ্বান জানাইয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে স্থান কাল ও পাত্রের উপযোগী হইয়াছে।

দেশবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অভিনন্দন পত্রে যে লিখিত হইয়াছিল—

"তোমার দীর্ঘ জীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানস-লোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ"—

তাহা সমগ্র বাঙ্গলার মনের কথা। বাঙ্গলার ও বাঙ্গলার বাহিরের বহু প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক পত্রাদিতে তাহারই পরিচয় প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙ্গলার মহিলাদিগের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয় তাহা পাঠ করিয়াছিলেন—মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

বাঙ্গালী যে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবককে তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে ও দিতে আগ্রহশীল, এই অনুষ্ঠানে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জলধরবাবু তাঁহার প্রতিভাষণে বলিয়াছেন—তিনি কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন—সেজন্য এমন আদর লাভ করিবার কথা তাঁহার স্বপ্নাতীত ছিল। তিনি বলেন—

"আপনারা বলুন, আমাকে উপলক্ষ করে আপনারা বঙ্গজননীকে অভিনন্দিত করেছেন; তা' হ'লে আমি আপনাদের এই সমস্ত অভিনন্দনপত্র ও উপহার তাঁর চরণে পৌঁছিয়ে দেবার ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।"

আমরা আশা করি, বাঙ্গলার সকল সেবকই এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ও করিবেন।

আমরা এই অনুষ্ঠানে বাঙ্গলার মাতৃভাষানুরাগের পরিচয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

বাঙ্গালা রচনায় বিরাম-চিহ্নের (Punctuation) উদ্ভব

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ

বাংলায় যিনি যত বড় পণ্ডিতই হ'ন, এ' কথা খুব জোর গলায় বলা যেতে পারে যে ইংরেজি রচনার সহিত তাঁহার মুখ্য পরিচয় না থাক্‌লে তিনি বাংলা বিরাম-চিহ্ন (Punctuation) নিখুঁত শুদ্ধ ক'রে তাঁ'র রচনায় ব্যবহার করতে পারবেন না। এ'র প্রধান এবং একমাত্র কারণই হ'ল যে রচনায় বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থবোধক বিরামচিহ্নের ব্যবহার বাংলা রচনায় সর্ব্বপ্রথম ইংরেজি ভাষা থেকেই আমদানী করা হ'য়েছিল এবং ঐ ভাষায় কি অর্থে কোথায় ঐ সকল চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়, তা'র সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাক্‌লে, সেই সেই চিহ্নগুলোকে বাংলায় এ'নে বসানো নেহায়েৎ বে-মানানসই হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যজনক নয়।

বাংলায় চল্‌তি বিরাম-চিহ্নগুলোর নামগুলো থেকেই এ'দের বিজাতীয় উদ্ভব সূচিত হচ্চে। যেমন 'পূর্ণচ্ছেদ'; এ'টি ইংরেজি ফুলষ্টপের নিছক বাংলা অনুবাদ! তার পর 'কমা', 'সেমি-কোলন', 'কোলন', 'ডট্', 'ড্যাস্' ইত্যাদি ত একমাত্র ইংরেজি নামেই বাংলা ভাষায়ও পরিচিত। তবে 'পূর্ণচ্ছেদে'র মত দু' একটা ইংরেজি কথারও ভাষাবিচ্ছেদ ঘটেছে; যেমন 'আশ্চর্য্যবোধক চিহ্ন'; এ'র খাঁটি ইংরেজি কথা হ'ল Sign of exclamation. এম্‌নি আরও দু'একটি কথারও ভাষান্তর ঘট্‌লেও কতকগুলো মূল বিরামচিহ্ন আজও ইংরেজি নামের মধ্য দিয়েই আমাদের ভাষায়ও গড়িয়ে এ'সেছে।

তবে কথা হচ্ছে যে আমাদের ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবের আগে এ'র বিরাম-চিহ্নাদির কি রকম ব্যবস্থা ছিল? এপ্রশ্নটির জবাব বড় সোজা। তা' হচ্চে এই যে আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যাদিতে বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার একেবারে ছিল না। অবশ্য প্রাচীন সাহিত্য কথাটাকে আমি খুবই ব্যাপকভাবে দেখেচি। অর্থাৎ এ' বল্‌তে আমি বোঝাতে চাই ভারতীয় প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে প্রাগ্‌ব্রিটিশ বাংলা সাহিত্যের যুগ পর্য্যন্ত কোন প্রাদেশিক ভাষার রচনায়ই কোন বিরামচিহ্নেরই অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি বর্ত্তমান অর্থে পূর্ণচ্ছেদেরও নয়। বিষয়টার একটু ঐতিহাসিক আলোচনা ক'রে দেখা যা'ক্।

ভারতের প্রাচীনতম কাব্য-সাহিত্যের অর্থাৎ বিভিন্ন বেদগুলোর যে লিপিভঙ্গী দেখ্‌তে পাওয়া যায় তা'তে বিরাম-চিহ্নাদির কোন চিহ্নও নেই। এ'র একটা কারণ অতি সুস্পষ্ট। তা' এই যে বেদের কোন নির্দ্দিষ্ট স্তোত্র পাঠ কর্‌বার আগে, তা'র ছন্দ, ঋষি ও দেবতার নাম জেনে নিতে হ'ত:

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ।
যোঽধ্যাপয়েৎ জপেৎ বাপি পাপীয়াং জায়তে তু স॥

এখন ছন্দের পরিচয় যখন স্তোত্রের পাঠারম্ভেই জানা থাক্‌ল, তখন আবৃত্তির জন্য আর বিরাম-চিহ্নের নির্দ্দেশ না খুঁজ্‌লেও চলে। আর বেদের স্তোত্রগুলোর বিরাম-চিহ্নের চাইতেও ও'দের বেশি প্রয়োজনীয় হ'চ্চে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ প্রভৃতি হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ। বিশেষ ক'রে বিরামচিহ্নের ব্যবহার গদ্যরচনায় যতখানি প্রয়োজন পদ্যরচনায়

ততখানি নয়। কারণ উদ্গাতার আবৃত্তির জন্য শুধু স্তোত্রের রচনা; সায়ণের টীকা-ভাষ্যের জন্য ত আর নয়! কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ কিম্বা উপনিষদের গদ্যযুগেও কোন রকম বিরামচিহ্নেরই কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। তবে এ' সকল গদ্যরচনায় একটু বিশেষত্ব এই দেখা যায় যে এদের প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে একটি এক সংখ্যা দ্বারা ঐ অনুচ্ছেদের সংখ্যা নির্দ্দেশ ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে। যেমন, "ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত ॥ ১ ॥ ওমিতি হ্যুদ্গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানম্ ॥ ২ ॥ এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ.... সাম্ন উদ্গীথো রসঃ ॥ ৩ ॥"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তার পর রামায়ণ মহাভারতের অনুষ্টুপ্ ছন্দের যুগের ব্যবস্থায়ও এ অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায়নি। অতি পুরোনো তালপাতায় লেখা সংস্কৃত মহাভারতের যে সমস্ত অনুলিপি পাওয়া গেছে তা'র মধ্যেও প্রত্যেক শ্লোকার্দ্ধ নিরূপক একটি ছেদচিহ্ন ও শ্লোকশেষে শ্লোকসংখ্যা-নির্দ্দেশক অঙ্কচিহ্নের বন্ধনীরূপে যুগ্মচ্ছেদ ছিন ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। একটা কথা এখানে ভুললে চল্‌বে না যে তালপাতার পুরোনো পুঁথিগুলিতে অনুষ্টুপের পাদগুলি একই ছত্রে গদ্যের মত টানা ক'রে লেখা হত; আজকালকার পদ্যের মত নীচে নীচে সাজিয়ে লেখা হ'ত না। সে'জন্যই শ্লোকার্দ্ধে একটি ছেদচিহ্ন টেনে পাদনির্দ্দেশ করা হ'ত। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখালেই বিষয়টি স্পষ্ট হ'বে;—যেমন, "একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ। তত্রোপবনভাণ্ডারে চারয়ামাস গোকুলম্ ॥ ১ ॥ সরঃসু স্বাদু-তোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ। উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ ॥ সংস্কৃত পদ্যের বেলায় এই রকম শ্লোকার্দ্ধে ও শ্লোকশেষে এক রকম একটা বিরাম-চিহ্নের ব্যবস্থা থাকলেও গদ্যের বেলায় একেবারে কোন ব্যবস্থাই ছিল না। দীর্ঘ সমাস-বহুল বাক্যসমূহেও সংস্কৃত লেখকগণ তাঁদের পাঠকদের কোনও বিরামের ব্যবস্থা ক'রে দিতেন না। অবশ্য এ'তে যে পাঠকেরা রুদ্ধশ্বাসেই কর্ত্তব্যসাধন করতেন তা' নয়; প্রত্যেক সমাসান্তরালেই তাঁদের স্বরচিত বিরাম-স্থানের ব্যবস্থা ক'রে নিতে হ'ত। অনেক সময় পূর্ণচ্ছেদের কাজ চলত 'ইতি' এই একটি কথাতেই! তা' ছাড়া এর অন্য কোন ব্যবস্থা একেবারে ছিল না বল্লেই চলে।

সংস্কৃত কাব্যে বিরামচিহ্নের যে অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা ছিল, পুরোনো বাংলা কাব্যেও তাই অনুসৃত হ'তে লাগল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে এরও ব্যতিক্রম না হ'ত এমনও নয়। আগেই বলেছি যে সে'কালের পুঁথিগুলো কি গদ্য কি পদ্য সমস্তই একরকম টানাভাবে লেখা হ'ত! রচনাটিকে পদ্য ব'লে বুঝ্‌তে হ'লে তা'র প্রথম পদান্তে একটি ক'রে অন্ততঃ বিরাম-চিহ্ন না থাক্‌লে অনেক সময় বুঝে উঠ্‌তে অসুবিধায় পড়্‌তে হয়। এ' সত্ত্বেও অনেক পুরোনো পুঁথিতেই একমাত্র শেষপাদের যুগ্মচ্ছেদচিহ্ন ছাড়া আর কোথাও একটু আঁচড় পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনি। যেমন, "কাজা তরুবর পঞ্চ বি ডাল চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল ॥ ধ্রু ॥ দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥ ধ্রু ॥ ইত্যাদি। এখানে দেখা যায় 'ডাল' পর্য্যন্ত এক পাদ; কিন্তু কোন চিহ্ন দিয়ে এ'টি নিরূপণ ক'রে দেওয়া নেই। তার পর একেবারে 'কাল'তে গিয়ে যুগ্মচ্ছেদ চিহ্নের অবতারণা করা হ'য়েছে। তেম্‌নি 'পরিমাণ' আর 'জাণ' এ' দুটি মিল দ্বারা এখানেও আর দু'টি পাদের পরিচয় পাওয়া গেল! পুরোনো বৈষ্ণব কবিতাগুলোও ঠিক এই ধরণেই তালপাতায় পুঁথিতে লেখা হ'ত। প্রথম পাদে কিম্বা শেষপাদেরও শেষ শব্দের আগে কোন রকম বিরামসূচক চিহ্নের কোন দর্শনই মিল্‌বে না; তার পর পাদশেষে একেবারে গিয়ে ডবল পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা।

"কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর কবে ঘুচব বিহি বাম দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লু বিসরল গোকুল নাম ॥ ১ ॥ হরি হরি কাহে কব এ সংবাদ সুমরি সুমরি লেহ ছিন ভেল মধু দেহ বিসরল গোকুল নাম ॥ ২ ॥ *

তার পর যখন পয়ারের বন্যা এ'ল, তখনও এ' ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি'। একটু পরবর্ত্তীকালের পুঁথিগুলোতে প্রথম পাদান্তে একটি ক'রে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকৃতে দেখা যায়; যেমন,—

"মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার। তখন রাবণ তুমি হইবে সংহার ॥ ৭ ॥ অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে। তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র র'বে তব ঘরে ॥ ৮ ॥" ইত্যাদি।

অবশ্য এই যে প্রথম পাদান্তে একক ছেদচিহ্ন এটা পাদশেষের যুগ্মছেদচিহ্নেরই সংক্ষিপ্ত লিখন এবং এই রীতি সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোকার্দ্ধের ছেদনীতি থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সংস্কৃত অনুষ্টুপ ও বাংলা পয়ারে এদিক দিয়ে কোন বিরোধ নেই।

তার পর বাংলা প্রাচীন গদ্যের কথা বলতে হয়। আগেই বলেছি যে সংস্কৃত গদ্যে কোন বিরাম-চিহ্নেরই ব্যবস্থা ছিল না। তবে বাক্য-শেষ বোঝাতে হলে কোন বিরাম-চিহ্নের অবতারণা না ক'রে শুধু 'হ'ত' কথাটি দ্বারা বাক্য শেষ নির্দ্দেশ করা হ'ত। যেমন,—

"শ্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিপিতৈষা পুস্তিতি"

এখানে 'ইতি'ই পূর্ণচ্ছেদের কাজ করল। প্রাচীন বাংলা গদ্যেও এই রীতির বেশী ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এ'র কারণও খুবই স্পষ্ট; কারণ পদ্য যেমন সংস্কৃত অনুষ্টুপের অনুকরণে লেখা, বাংলা গদ্যও তেমনি সংস্কৃত গদ্য রচনার ছায়া-প্রভাবান্বিত হ'য়েছে। সংস্কৃতের মত বাংলাতেও অনেক স্থলে 'ইতি' দ্বারাও পূর্ণচ্ছেদ সূচিত হ'য়েছে। কিন্তু অনেক সময়েই অনেক জায়গাতে গদ্য রচনায় পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারের পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতাও দেখা যায়। স্থানে অস্থানে এ'র প্রয়োগ অনেক জায়গাতেই দৃষ্টিকটু হ'য়ে পড়ে। যেমন,—

"শ্রীরাধাবিনোদ জয় ॥ অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণের বস্তু নির্ণয়।.....রাগে তারে সেবা।....সাধক অভিমান ত্যাগ করিবে। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা। দ্বারকালীলা।" ইত্যাদি

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উক্ত রচনার একমাত্র বিরাম-চিহ্ন পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহারে লেখকের অত্যাধ্য স্বেচ্ছাচারিতা একেবারে

* মূল তালপাতার পুঁথি হ'তে।

চয়নে উঠেছে। কোন রকম অর্থ-বিচার না ক'রে লেখকের যেখানে খুসী সেখানে এ চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে মোটের উপর পাঠকের বিশেষ কোনই সুবিধা হয়নি'; বরং বিরক্তিরই কারণ হ'য়েচে।

প্রাচীন গদ্য সাহিত্য থেকে আর একটি বিরামচিহ্ন অপব্যবহারের একটি নমুনা তুলে পাঠকদের উপহার দে'বার লোভ সম্বরণ করতে পারচি নে। তাহা এই রকম—

"গোঁসাই চেলা সহস্র কামিনী ডোমা চাঁড়াল পাই মুই অকাটন বিষ হাতে এ গুয়া পান খাইয়া ।"

রচনায় বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের এই ঔদাসীন্য অনেক সময় উদ্দিষ্ট বস্তুর অর্থ পরিগ্রহ দুর্ঘট ক'রে তুলে! অথচ এই রকম ঔদাসীন্য গেল শতাব্দীর আট দশক পর্য্যন্তও চলে আস্‌ছিল। সে জন্যই সেকালের খ্যাতনামা গদ্যলেখকদের মধ্যেও এ' ব্যবস্থার কোনও ব্যতিক্রম দেখতে পাই নে।

এ' বিষয়ে আর একটা খুব কৌতূহলজনক কথার উল্লেখ করব। শ্রীরামপুরের পাদ্রি উইলিয়ম্ কেরি সাহেব যে বাংলা লিখতেন তা'তে তিনি পূর্ণচ্ছেদের উচ্ছেদ ক'রে ইংরেজি punctuationএর রীতি অনুযায়ী Full stop এর ব্যবহার করতেন। শুধু Full stop কেন? বাংলা গদ্যে সর্ব্বপ্রথম এই পাদ্রি সাহেবের রচনায়ই 'কমা', সেমিকোলেন', 'কোলন' ইত্যাদি আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু সেকালের পণ্ডিতেরা তাঁ'দের বহু প্রাচীন সংস্কার মুক্ত হতে না পেরে পূর্ণচ্ছেদটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন। আর অন্যান্য চিহ্নগুলো ইংরেজি রচনা অনুযায়ী চ'লে আস্‌তে লাগল। একটা কথা এ' বিষয়ে অ'শ্য মনে রাখতে হ'বে যে কেরি সাহেবের আমলেও বাঙ্গালী গদ্য লেখকেরা বিরাম-চিহ্নের ব্যবহারকে বড় একটা আমলেই আনতেন না। সেই জন্যই সে যুগে যতগুলো বই দেখেছি, যেমন, কালীকৃষ্ণ দাসের "কামিনীকুমার" রাজীবলোচনের "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" রামবসু রাজা রামমোহন প্রভৃতির গদ্য রচনা, সকলের মধ্যেই বিরাম চিহ্নের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অন্য কিছুরই ব্যবহার একেবারে চোখে পড়ে না। এ'র কারণই হ'ল এ' সম্বন্ধে সে সময়কার বাঙ্গালী লেখকদের পরিপূর্ণ অজ্ঞতা! যাই হোক্ কেরি সাহেব প্রথম পথ দেখালেন এবং তা থেকেই এ' ধারণার বাঁধ আমাদের ভাঙলো যে ইংরেজি চিহ্নগুলো আমাদের ভাষার রচনায় চলবে না। কিন্তু তবু তখনকার যাঁরা একটু সংস্কৃত-ঘেঁষা লেখক ছিলেন, তাঁরা বিজাতীয় কেরীর নির্দ্দেশ না মেনে নিজেদের পথেই চল্‌লেন এবং আমাদেরই একমাত্র পূর্ণচ্ছেদটিকে দিয়ে ইংরেজি Full stopএর কাজে খাটাতে লাগলেন। অর্থ বিসর্জ্জিত হোক আর না হোক তবু তা'র সুনির্দ্দেশের জন্য বিজাতীয় শিক্ষা প্রথমে কেউ একটা গ্রহণ করলেন না। সে'জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার গদ্য রচনায় বিরাম-চিহ্নের মধ্যে একমাত্র পূর্ণচ্ছেদ (ও একমাত্র কেরির Full stop ইত্যাদি) ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কয়েকজন যে মনে-প্রাণে-ইংরেজি ভাবাপন্ন বাঙ্গালী লেখক জন্মেছিলেন তাঁরাই প্রথম তাঁ'দের রচনায় অকুণ্ঠে এই বিজাতীয় রীতি রচনার মধ্যে স্থান দিলেন। অ'শ্য দেশীয় একমাত্র চিহ্ন পূর্ণচ্ছেদটি তাঁ'রা Full stopএর স্থান দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেন। এই সময়কার সর্ব্বপ্রথম যিনি এ' রীতি নিখুঁত ভাবে নিজের রচনায় ব্যবহার করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত! তাঁহার পাশ্চাত্য ভাষায় গদ্য পদ্য রচনায় অপূর্ব্ব দক্ষতা এ' কার্য্যে সহায়ক হয়েছিল।

শারদ লক্ষ্মী

বন্দে আলী মিয়া

বাতাসে বাজে নূপুর এমন বেলা
এলো কে ভাসিয়ে নভে মেঘের ভেলা,
সবুজ ঘাসের 'পরে জ্বলিছে নীহার
সফেদ শেফালী হলো কণ্ঠের হার ;—
কাশের ফুলেতে তার চামর দোলে
মেঘেতে মেঘেতে ঘন মৃদঙ্গ বোলে।
বানেতে গন্ধরাজা কামিনী ফুল
বাতাসে হলো তাদের মন আকুল,

সোনালি জরির বাস আলোক লতা
টগর শাখায় জাগে চঞ্চলতা ;
পাপ্‌ড়ি মেলিয়া ডাকে কুমুদ কুঁড়ি
আল্‌পনা আঁকে মাঠ আঙণ জুড়ি।
বকুলে চাঁপায় গেছে কানন ছেয়ে
তার 'পরে পদ রাখি কে আসে মেয়ে।
যে-আসে মোদের ধরায় একা একা
ভুবন ভরিয়া তার পাইছি দেখা।

সাময়িকী

ধর্ম্ম ও চাকরী—

ধর্ম্মভেদে অধিকারভেদের নীতি যদি একবার শাসন-পদ্ধতিতে স্থানলাভ করে, তবে তাহা মানবদেহপ্রবিষ্ট বিষের মত—কিরূপ দ্রুত চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়, তাহার প্রমাণ আমরা প্রতিদিনই পাইতেছি। এ দেশে মুসলমানরা ইংরাজীশিক্ষাবিমুখ থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বিলম্ব হয়, এবং সেই জন্য চাকরী, ব্যবহারাজীবের ব্যবসা, রাজনীতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রভৃতিতে হিন্দুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন হিন্দু নেতৃগণ দেশে রাজনীতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং স্বৈর-শাসনপ্রসূত ক্ষমতা পরিচালনে অভ্যস্ত ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অধিকাংশ তাহাতে বিচলিত হয়েন, তখন কয় জন মুসলমান সেই সুযোগে তাঁহাদিগের অনুগ্রহভাজন হইয়া সরকারী চাকরী প্রভৃতিতে লাভবান হইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-দিগের কয়জন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর দরবারে যাইয়া বলেন, মুসলমানদিগের গুরুত্ব তাঁহাদিগের সংখ্যায় বিচার না করিয়া তাঁহাদিগের রাজনীতিক অবস্থায় ও সাম্রাজ্যের জন্য তাঁহারা যাহা করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া বিচার করা সঙ্গত। এই কথার যথার্থ অর্থ কি, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু এই স্থানে লর্ড মিণ্টো ভেদনীতির বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেন।

একান্ত পরিতাপের বিষয় মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে লর্ড মর্লিও এই নীতিপ্রসূত ব্যবস্থা সমর্থন করেন এবং ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—জাতীয় মহা-সমিতি বা কংগ্রেসও ঐক্যের আশায় সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা সমর্থন করেন। তখন অবশ্য ইহা ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার বিস্তার লাভে বিলম্ব হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভা হইতে এই সাম্প্রদায়িকতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ইহা যে জাতীয়তার বিরোধী, তাহা বুঝিয়াও এক দল হিন্দু রাজনীতিক ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সাহস করেন নাই। ফলে ইহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া জাতীয়তার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সংপ্রতি ভারত সরকার সরকারী চাকরীতেও এই নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়াছি। স্থির হইয়াছে—সরকারী চাকরীতে শতকরা ২৫টি পদে মুসলমান ও ৮⅓ ভাগ পদে অন্যান্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের লোক নিযুক্ত করা হইবে। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া যদি ইহারা এইরূপ সংখ্যক পদ না পায়, তবুও সরকার মনোনয়ন দ্বারা এইরূপ সংখ্যা পূর্ণ করিবেন; অর্থাৎ যোগ্যাযোগ্য বিচারের আর অবকাশ রাখিবেন না।

ধর্ম্মভেদে চাকরীতে সংখ্যানির্দ্ধারণ নীতি যে অসঙ্গত ইহা এ দেশে ইংরাজ শাসকরা বহুদিন পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর সহযোগ ও সাহায্য ব্যতীত ভারতবর্ষ শাসন করা তাঁহারা যেমন অসম্ভব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তেমনই সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে "কোম্পানীর" ছাড় নূতন করিয়া দিবার সময় বিলাতে যে আইন হয়, তাহাতে লিখিত হইয়াছিল কোন ভারতবাসী ধর্ম্ম, জন্ম, স্থান, বংশ-মর্য্যাদা বা বর্ণের জন্য কোন চাকরীলাভে বঞ্চিত হইবে না—

No native * * shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the Company."

সিপাহী বিদ্রোহের পর সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন "কোম্পানীর" নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি যে ঘোষণায় ভারতে ইংরাজের শাসন-নীতি বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসী তাঁহাদিগের অধিকারের ছাড় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহা রাজনীতিক দলিল এবং তাহাতে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভারতবাসীর রাজনীতিক আন্দোলনের ভিত্তি। তাহাতে ছিল—

"So far as may be, Our Subjects, of whatever Race or Creed, be freely and impartially admittead to Offices in Our Service, the Duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrety, duly to discharge."

এখন ভারত সরকার যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহার সহিত এই উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। কারণ, এই ব্যবস্থায় হিন্দুর পক্ষে সরকারী চাকরীতে শতকরা ২৫টিরও অধিক পদলাভ সম্ভব হইবে না—নির্দিষ্ট সংখ্যক চাকরীর দ্বার হিন্দুর সম্বন্ধে—হিন্দু বলিয়াই—অর্গলবদ্ধ থাকিবে।

হিন্দুর অপরাধ কি?

মুসলমানরা কি মনে করেন, সরকারী চাকরীতেই তাঁহাদিগের অভাব ঘুচিবে?

আর সরকারকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সরকারী চাকরীতে যোগ্যতার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার মাপকাঠি গ্রহণ করিলে—যোগ্যকে ত্যাগ করিয়া অযোগ্যকে আসন দান করিলে কি শাসন-পদ্ধতি পরিচালনে অসুবিধাই ঘটিবে না? তাহাতে কি শাসন-পদ্ধতিতে ত্রুটি প্রবেশের পথই মুক্ত হইবে না?

সম্প্রদায় হিসাবে চাকরী প্রদানের ব্যবস্থাকে নাকি ভারত সরকারের ব্যবস্থা-সচিব সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার "দ্বিতীয় রোয়েদাদ" বলিয়াছেন। এ বিষয় প্রথম রোয়েদাদ—ব্যবস্থাপক সভাদি প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সিদ্ধান্ত। আর তাহারই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ—গান্ধীজীর প্রায়োপবেশনফলে পুণায় গৃহীত চুক্তি।

সরকার এই যে নীতি প্রবর্ত্তিত ও প্রসারিত করিতেছেন, ইহার ফল কি, আশা করি, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন।

শিল্প বিভাগে নূতন পদ—

বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এঞ্জিনিয়ার শ্রীমান সতীশচন্দ্র মিত্র ঐ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান ডিরেক্টার মিষ্টার ওয়েষ্টন ঐ পদ হইতে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত উহা শূন্য রাখা হইয়াছিল। সতীশচন্দ্রের নিয়োগে আমরা প্রীত হইয়াছি। সতীশচন্দ্র সার রমেশচন্দ্র মিত্রের তৃতীয় পুত্র সার বিনোদচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। ইনি এ দেশে শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিল্প বিভাগে নিযুক্ত হয়েন। সতীশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিভাগের মামুলী কায না করিয়া বাঙ্গালার শিল্পোন্নতি বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা সমাধান জন্য যে উপায় গৃহীত হইয়াছে—যে জন্য যাযাবর শিক্ষকদল কেন্দ্রে কেন্দ্রে



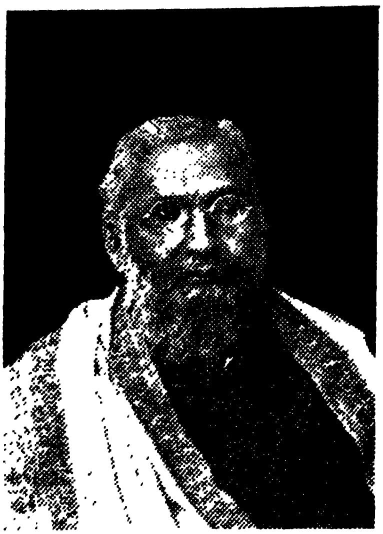
শ্রীমান সতীশচন্দ্র মিত্র

যাইয়া নানা ক্ষুদ্র শিল্পে উন্নত পদ্ধতি লোককে শিক্ষা দিতেছেন, সে উপায় ইঁহারই সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীমান নরেন্দ্রকুমার বসু নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তাহা বাঙ্গলার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সতীশচন্দ্রের নিয়োগে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন, তিনি চাকরীতে যে বেতন পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালার শিল্পোন্নতি বিধানের কাযে তদপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় করেন। সংপ্রতি ইনি ৫ বৎসরে বাঙ্গালার আর্থিক উন্নতি সাধনের উপায় আলোচনা করিয়া এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কৃষি ও উটজ শিল্প হইতে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সেচ, স্বাস্থ্য, প্রাথমিক

শিক্ষা জাতি গঠনের সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই পুস্তকে বাঙ্গালার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য হইবে। আমরা শ্রীমান সতীশচন্দ্রের পুনর্গঠনচেষ্টা সফল দেখিলে সুখী হইব।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়—

প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে বাঙ্গালার এক জন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের লোকান্তর ঘটিয়াছে। তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসস্থান—হালিসহর। যৌবনে তিনি



৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়

খৃষ্টধর্ম্মযাজক ডল ও কেশবচন্দ্র সেন এই দুই জনের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যৌবনকাল হইতেই তিনকড়িবাবু সাহিত্যের সংবাদপত্র বিভাগে প্রবেশ করিয়া মৃত্যুর ৮ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানা বাঙ্গলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন 'প্রভাতী' পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন। 'হিতবাদী' ও 'বসুমতী' পত্রদ্বয়ের সহিত তিনি দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রদ্বয়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তদ্ভিন্ন তিনি 'কমলা' নামক ব্যবসাবাণিজ্য-বিষয়ক পত্রিকার পরিচালনে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনকড়ি বাবু একবার ২৪ পরগণা সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিপদে বৃত হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল। তিনি রামপ্রসাদের রচনা সকলের একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তিনি রামপ্রসাদ সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। তিনি তালতলা লাইব্রেরী ও গীতা সমিতি সংস্থাপনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু মনোজ্ঞ বক্তৃতায় তথাগতের মত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বিনয়ী ও নম্র এবং সামাজিক সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাংবাদিক মণ্ডলীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার পুত্রকন্যা ও পৌত্রদৌহিত্রদিগকে তাঁহাদিগের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

গভর্ণরের বক্তৃতা—

বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর সার জন উডহেড শফরে ঢাকায় যাইয়া যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য - (১) বাঙ্গালায় নারী-নিগ্রহ ও (২) সন্ত্রাসবাদ। বাঙ্গালায় নারী-নিগ্রহঘটিত ব্যাপার দিন দিন কিরূপ শোচনীয়রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। গভর্ণর বলিয়াছেন—গত বৎসর যে এই জাতীয় ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ। ইহার প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এইরূপ অপরাধে অপরাধীকে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা হইবে কি না, সরকার তাহাও বিবেচনা করিতেছেন। যে দণ্ড-ব্যবস্থাই কেন হউক না—ইহাতে কঠোর দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সার জন বলিয়াছেন—পুলিস যে এই জাতীয় অপরাধ নিবারণে অনেক কায করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অপরাধ যে বাঙ্গালার ললাটে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত করিতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং পুলিস যাহা

করিতে পারে, যদি তাহাতে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করে, তবে সে বিষয়ে পুলিসকে সতর্ক করা অবশ্যই সরকারের কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারে যাহারা অত্যাচারী তাহারা পুলিসকে ফাঁকি দিবার চেষ্টাই করে, কিন্তু যাহারা অত্যাচার ভোগ করে, তাহারা যে পুলিসকে সাহায্য করে না, এমন কথা বলা যায় না। অল্পদিন পূর্ব্বে উল্টা-ডাঙ্গায় জলটুঙ্গীর ঘটনায় দেখা গিয়াছে, অন্য লোকও দুর্ব্বৃত্তদিগকে দণ্ডিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। সংপ্রতি সিমলায় এইরূপ ঘটনায় বিচারক দুর্ব্বৃত্তদিগকে যেরূপ কঠোর দণ্ড দিয়াছেন, বাঙ্গালায় যদি বিচারকগণ সেইরূপ কঠোর দণ্ডের—আইনে যতদূর কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে ততদূর কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তবে উপকারের সম্ভাবনা।

গভর্ণর সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রয়োজন নাই। আমরা বহুবার বলিয়াছি, দেশের লোক এই অনাচারে বিব্রত ও বিপন্ন, তাহারা ইহা হইতে অব্যাহতি লাভই করিতে ব্যস্ত। সুখের বিষয়, গভর্ণর বলিয়াছেন, মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বার্জ্জের হত্যায় ও দার্জ্জিলিংএ গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টায় যদিও প্রতিপন্ন হইয়াছে, দেশ হইতে এই পাপ দূর হয় নাই, তথাপি ইহা দমিত হইয়াছে। কেহই এমন আশা করেন না যে, দেখিতে দেখিতে ইহা দূর হইয়া যাইবে। লর্ড পাশফিল্ড বলেন, কোন মত প্রতিষ্ঠিত করিতে যেমন, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে দূর করিতেও তেমনই এক পুরুষ অর্থাৎ প্রায় ১৯ বৎসর প্রয়োজন। বাঙ্গালায়, যে কারণেই কেন হউক না, সন্ত্রাসবাদ প্রায় ৩০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছে, সুতরাং তাহার উচ্ছেদসাধন সময়সাপেক্ষ। আর এই সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে আবশ্যক চেষ্টা করিতে হইবে। সার জন এণ্ডারশন পুনঃ পুনঃ যাহা বলিয়াছিলেন, সার জন উডহেডও তাহাই বলিয়াছেন, এ বিষয়ে দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা নাই। দেশের লোক যে এ বিষয়ে সাহচর্য্য করিতে এবং আপনারা স্বতন্ত্রভাবে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দেশের লোকই ইহাতে সমধিক বিপন্ন। তদ্ভিন্ন ইহার জন্য যে দেশের রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক উন্নতির গতি প্রহত হইতেছে, তাহাও লোক বুঝিয়াছেন। ইহারই ছল ধরিয়া বিলাতের এক দল লোক, ও অন্যান্য প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কয়জন ভারতীয় বাঙ্গালীকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অর্থাভাবে যে বাঙ্গালায় শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানও সম্ভব হইতেছে না, তাহাতেও বোধ হয়, কোন কোন প্রদেশের নেতারা আনন্দানুভব করিতেছেন। কারণ, অর্থনীতিক ব্যাপারে বাঙ্গালার স্বার্থ ও তাঁহাদিগের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। বাঙ্গালায় যত পণ্য ব্যবহৃত হয়, তত উৎপন্ন হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাপড়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় বৎসরে যে ১৪ কোটি টাকার কাপড় আমদানী হয়, তাহার প্রায় ১০ কোটি টাকার কাপড় বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আমদানী হয়। কাযেই বাঙ্গালায় যত কাপড় উৎপন্ন হইবে, তত সেই সব প্রদেশের আয়সঙ্কোচ ঘটিবে। তাহার পর চিনির কথা ধরা যাউক। ইহার মধ্যেই বিহার ও যুক্তপ্রদেশ বলিতেছে, সেই প্রদেশদ্বয়েই বাঙ্গালার প্রয়োজনীয় চিনি উৎপন্ন হইতে পারে; সুতরাং বাঙ্গালায় আর চিনি উৎপাদনের চেষ্টা না করা সঙ্গত। বাঙ্গালায় সরকারের পক্ষে শিল্প-সংস্থাপনে সাহায্যার্থ, স্বাস্থ্যোন্নতিকর ব্যবস্থার জন্য এবং শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থব্যয়ের প্রয়োজন দিন দিন অধিক অনুভূত হইতেছে। সুতরাং যাহাতে বিপ্লবাত্মক অনাচারদ্যোতক আন্দোলন দলন করিতে অর্থের অপব্যয় না হয় এবং বাঙ্গালার লোক যাহাতে স্থির ও নিরাপদ হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়া বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে বাঙ্গালী তাহাই চাহে। সার জন উডহেড বলিয়াছেন, বাঙ্গালার লোক এ বিষয়ে অবহিত। সংপ্রতি বাঙ্গালার বিবিধ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একযোগে যে সভা আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের বিশ্বাস, এই সভায় লোকমত এই বিপদবারণের উপায়ের সন্ধান লাভ করিবে। অতঃপর বাঙ্গালার জনমত যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহাতে এ কথা আর কেহই বলিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালী তাহার আপনার কল্যাণ বুঝে না। বাঙ্গালীকে এখন তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প—এই সকলের উন্নতি সাধনের চেষ্টাই করিতে হইবে এবং যাহাতে সেই উন্নতিসাধনের পথ বিঘ্নাস্তৃত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে—তাহা দূর করিতে হইবে।

সংবাদপত্র ও রাষ্ট্র—

শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন সে দিন এক সভায় সংবাদপত্র ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। সে সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি ছিলেন। সেন মহাশয় কয় বৎসর বাঙ্গালা সরকারের পক্ষে সংবাদপত্র পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকদিগের কৌতূহল স্বাভাবিক। তিনি প্রথমেই ঐতিহাসিক ওয়েল্‌সের উক্তি উদ্ধৃত করেন—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে যদি রোমক সাম্রাজ্য সংবাদপত্রের ও



শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন

প্রতিনিধিমূলক শাসনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিত, তবে তাহার উন্নতি অত্যন্ত অধিক হইত। সংবাদপত্র শাসিতের পক্ষে যেমন, শাসকের পক্ষেও তেমনই প্রয়োজন। বিলাতে লর্ড নর্থক্লিফের সংবাদপত্র পরিচালকরূপে আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের কায ছিল—লোককে উপদেশ দান, লোকমত গঠন। সংবাদপত্র যথাযথভাবে সংবাদ প্রকাশ ও দেশবাসীর ও রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা কল্যাণকর সেই মত ব্যক্ত করিত। সেই জন্য সংবাদপত্র তখন ব্যক্তিবিশেষের বা দলবিশেষের প্রচারযন্ত্রমাত্র ছিল না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা জাতির সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং গণতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তাহার জন্মগত অধিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষের বিদেশী, সুতরাং দেশের লোকের ভাব ও অভাব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, শাসকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ তাহাই মনে করিতেন। মেটকাফ্ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা বলিয়া এ দেশে সম্মানলাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ জন্য এ দেশের অধিবাসীরা তাঁহার নামে উৎসৃষ্ট গৃহে এক পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লর্ড রিপণ তাহা পুনরায় প্রদান করিয়াছিলেন। লর্ড লিটন যখন এ দেশে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন, তখন বিলাতের পার্লামেণ্টে গ্ল্যাডষ্টোন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিলাতের লোক সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিত। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে যেমন, বিলাতেও তেমনই সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। এ দেশে লর্ড আরউইনের সরকার যখন সংবাদপত্রের সম্বন্ধে অর্ডিনান্স জারি করেন, তখন 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সম্পাদক সার এলফ্রেড ওয়াটশন বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় যে বিলাতে প্রকৃত সংবাদ প্রকাশে বাধা প্রদান করা হইত, তাহার ফলে লোক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ আর বিশ্বাস করিত না। তাই "At the conclusion of the War the public had lost all faith in the newspapers." ইহাতে সংবাদপত্রের অসাধারণ ক্ষতি হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সার আলফ্রেড বলিয়াছিলেন বটে, সরকারের নিয়ন্ত্রণ অপসারণের পর সংবাদপত্রগুলিকে আবার সত্যসংবাদ প্রচারনিষ্ঠা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ যে নাই, এমন নহে।

বিশেষ জার্ম্মাণ যুদ্ধ সমগ্র য়ুরোপের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করে। তাই লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধ সামান্য বর্ষণমাত্র নহে—ইহা প্রবল ভূমিকম্প। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর রুশিয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে—তাহার জাতীয় জীবন সর্ব্বতোভাবে সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে; সংবাদপত্র সে নিয়মের গণ্ডীর বাহিরে যায় নাই। জার্ম্মাণীতে ও ইটালীতে গণতন্ত্রের নামে নিয়ন্ত্রণকারী—"ডিক্টেটারের"শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয় দেশেই সরকার

কঠোরভাবে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন—সংবাদপত্রে সরকারের কার্য্যের বা নীতির স্বাধীন সমালোচনা হয় না।

সে সকল দেশের তুলনায় বিলাতের ব্যবস্থা যে বহু পরিমাণে উন্নত অর্থাৎ বিলাতে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মাত্রা অধিক, তাহা স্বীকার্য্য। সেই জন্যই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—যদি সেই সকল দেশের ও বিলাতের ব্যবস্থার মধ্যে আমাদিগকে বাছিয়া লইতে হয়, তবে আমরা বিলাতের ব্যবস্থাই গ্রহণ করিব। কিন্তু তিনি, বোধ হয়, একটি বিষয় হিসাবে ধরেন নাই—বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা আমাদিগের নাই।

প্রত্যেক দেশের সরকার আপনার প্রবৃত্তি ও দেশের প্রয়োজন অনুসারে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। যে ইংলণ্ডের সম্বন্ধে ইংরাজ কবি টেনিসন গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন---যে দেশ শত্রুবেষ্টিত সে দেশের লোকও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার সম্ভোগ করে—সেই ইংলণ্ডেও যে জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে লোক আর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত না—"রচা কথা" মনে করিত, তাহা সার আলফ্রেড ওয়াটশনের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এ দেশে আমরা দেখিতে পাই, দলের প্রয়োজনানুসারে সংবাদ অনুরঞ্জিত করা হয়। ইহা যে সংবাদপত্রের ক্ষমতার অপব্যবহার, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সেন মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বর্ত্তমানে নানা দেশে সংবাদপত্র সম্বন্ধে সরকারের ব্যবহার-ব্যবস্থার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এ দেশের বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। সভায় কোন বক্তা বা সভাপতি যদি বিলাতের ও ভারতের বর্ত্তমান ব্যবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিতেন, তবে ব্যবস্থার প্রভেদ ও সেই প্রভেদের কারণ উপলব্ধি করিবার সুবিধা লোকের হইত।

রায় বাহাদুর শ্রীশশিভূষণ দে—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। কলিকাতায় শিক্ষাবিস্তার কল্পে তাঁহার অকুণ্ঠিত হস্তের দানের বিষয় কলিকাতাবাসীর অজ্ঞাত নহে। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কলিকাতা করপোরেশনের হস্তে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পার্ব্বত্য কার্সিয়ঙে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের শাখা প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা মায় ১৩ বিঘা নিষ্কর জমি—যাহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা—দান করিয়াছেন। তথায় যাদবপুরের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আরো বহু শাখা প্রতিষ্ঠার দরকার। আমরা



রায় বাহাদুর শ্রীশশিভূষণ দে

আশা করি, এ বিষয়ে সাহায্য করিতে দেশের ধনী লোকের অভাব হইবে না।

পরলোকে শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী—

বিগত ১১ই আগষ্ট, ১৯'৪ (২৬এ শ্রাবণ, ১৩৪১), শনিবার, কলিকাতা পুলিশের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দারোগার (Sub-Inspector of Police)

পদে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। পরে নিজ কর্ম্মকুশলতায় তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে। প্রথমে তিনি মেদিনীপুরের রিজার্ভ ইনস্পেক্টর এবং পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিশের রিজার্ভ ইনস্পেক্টর হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইনস্পেক্টর এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা পুলিশের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনারের পদ লাভ করেন। ইহার পর মধ্যে কিছু দিন তিনি ডিটেকটিভ বিভাগে অস্থায়ী ভাবে ডেপুটী কমিশনারের



ভূতপূর্ব্ব এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী

পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং আট মাস পোর্ট পুলিশের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। সরকার তাঁহার কর্ম্মকুশলতার জন্য তাঁহাকে এতাদৃশ শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর দিবসে বেলা দুই ঘটিকার সময় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কলিকাতার সমস্ত পুলিশ কোর্ট বন্ধ হয় এবং লালবাজার হেড কোয়ার্টারের পতাকা অর্দ্ধনমিত করা হয়। এই উপলক্ষে সমগ্র পুলিশবাহিনী তথায় উপস্থিত থাকিয়া সামরিক কায়দায় তাঁহার উদ্দেশে সম্মান প্রদর্শন করে। তাঁহার পত্নী, বৃদ্ধা মাতা, তিন পুত্র, চারি কন্যা ও ছয় ভ্রাতা বর্ত্তমান। আমরা এই সুযোগ্য জনপ্রিয় পুলিশ কর্ম্মচারীর পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী—

গত ভাদ্র মাসে আমরা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার চিত্রের ব্লকখানি যথাসময়ে প্রস্তুত না হইয়া উঠায়, শোকসংবাদের



ব্রজেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

সঙ্গে ব্লকখানি ছাপা হইতে পারে নাই; সেইজন্য এ মাসে ছাপা হইল।

বাঁশবেড়িয়ায় স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী—

হুগলী জেলায় জাহ্নবী-তীরে বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটী গ্রামখানি ছোটখাট নগরে পরিণত হইতে চলিল। কলিকাতার আদর্শে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের চেষ্টায়, বাঁশবেড়িয়ায় পীচ দিয়া বাঁধানো রাস্তা, পাকা পয়ঃপ্রণালী, জলের কল, বিজলী-আলো, চারিটি সাধারণ উদ্যান (park), অবৈতনিক

প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি বালিকা বিদ্যালয়, দুইটি গ্রন্থাগার (library), একটি শিশু পাঠাগার, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, শান্তিরক্ষক সেনাদল, হাসপাতাল ও মাতৃসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। গত ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৪, রবিবার বাঙ্গলার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বাঁশবেড়িয়ায় গমন করিয়া জলের কল (water works) ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং মিউনিসিপ্যালিটির নবগৃহ, হাসপাতাল ও মাতৃসদনের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া আসিয়াছেন। বাঁশবেড়িয়ায় জলের কল স্থাপনের সাহায্যকল্পে সরকার বত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ব্যয় চাঁদা তুলিয়া নির্ব্বাহ করা হইয়াছে—একটি পয়সাও কর্জ্জ করিতে হয় নাই। অনুষ্ঠাতৃবৃন্দের পক্ষে ইহা অতি প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। এইরূপে বাঁশবেড়িয়া পল্লী গ্রামসমূহের আদর্শ হইয়া উঠিল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে সকল অসুবিধার জন্য বঙ্গের সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ পল্লীনিবাস ত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়া নগরগুলিকে বাসের অযোগ্য করিয়া তুলিতেছেন, সেই



স্বায়ত্ত-শাসন মন্ত্রী কর্ত্তৃক বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির নবগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন



স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় কর্ত্তৃক বাঁশবেড়িয়া জল সরবরাহ ব্যবস্থার এবং হাসপাতাল ও মাতৃসদনের উদ্বোধন

উপবিষ্ট—মধ্যস্থলে স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী, বামদিকে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, দক্ষিণে হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, ম্যাকফারসন এবং পশ্চাতে দণ্ডায়মান মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ

সকল অসুবিধার প্রতিকার করা একেবারেই অসম্ভব নহে। এই সঙ্গে যদি পল্লীগ্রামেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অন্নসংস্থানের একটা ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের আর সহরে আসিবার প্রয়োজন থাকে না।

অতুলপ্রসাদ সেন—

বাঙ্গালার কবিতাকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল অতুলপ্রসাদ সেন অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার লক্ষ্ণৌ সহরস্থ ভবনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ঢাকা বিক্রমপুরের ডাক্তার রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পুত্র। তিনি ঢাকায় ও কলিকাতায় পাঠান্তে বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন এবং কয় বৎসর কলিকাতায় ব্যবহারাজীবের কায করিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে যাইয়া ব্যবসা করেন। তথায় তিনি যে কেবল ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তাহাই নহে; পরন্তু রাজনীতি ও সাহিত্যালোচনারও কেন্দ্র হইয়াছিলেন। তিনি যুক্ত-প্রদেশে লিবারল দলের অগ্রতম নেতা ছিলেন ও বারাণসীতে ঐ দলের সম্মিলনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।



কবি অতুলপ্রসাদ সেন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের জন্য তিনি বিশেষ পরিশ্রম করিতেন এবং 'উত্তরা' পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে ভাইস চান্সেলারের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল; তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার বাহিরে যাঁহারা বাঙ্গালীর সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন—তাহা উজ্জ্বলতর করিতে পারিয়াছেন, অতুলপ্রসাদ তাঁহাদিগের অন্যতম, এবং সেজন্যও তিনি বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন।

কবি বলিয়াই তিনি বিশেষ আদৃত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যখন প্রথম গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রেমগীতি রচনায় অধিক অবহিত ছিলেন। তিনি প্রথম যে সব গান রচনা করিয়া আপনি গান করিয়া বন্ধুজনকে বিমোহিত করিতেন, সে সকলের মধ্যে একটিতে প্রেমাস্পদের প্রেম ও নিজ প্রেমে প্রগাঢ় বিশ্বাস যেরূপ স্ফুরিত হইয়াছিল, সেরূপ সচরাচর দেখা যায় না—

"আজি স্বরগ আবাস তুমি এস ছাড়ি।
আজি বরিষে বরষা বিরহ বারি।
আজি ফুলে নাহি মধু গন্ধ,
পবনে নাহিক মৃদু মন্দ;
জীবনে নাহি গীতছন্দ তোমারে ছাড়ি।"

আর তুমিই বা কেমন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া রহিয়াছ?—

"মোর এ ভালবাসা পা'বে না নন্দনে—
এত সুধা উঠে নি সাগর-মন্থনে।"

না জানি আমাকে ছাড়িয়া তুমি কত দুঃখই পাইতেছ!

ইহার পর তিনি দেশপ্রেমাত্মক গীত রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন—

"ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে?"

সেই ভারতবর্ষ আছে, কিন্তু—

"আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব!
আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী কূলে।"

তাঁহার বহুদিন পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশে যমুনার কূলে আর এক জন বাঙ্গালী কবি—গোবিন্দচন্দ্র রায় এমনই ভাবে "যমুনা-লহরী" রচনা করিয়াছিলেন! তিনিই অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

"কত কাল পরে, বল, ভারত রে
দুঃখ-সাগর সাঁতারি' পার হ'বে?"

অতুলপ্রসাদের বহু জাতীয় সঙ্গীত আজ বাঙ্গলায় ও বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে পরিচিত।

আজ প্রবাসে বাঙ্গলা সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ সেবকের মৃত্যুতে শোকার্ত্ত হৃদয়ে আমরা বলিতেছি—তাঁহার কথা সার্থক হউক।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী বড়দিনের অবকাশ সময়ে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। এতদিন পরে স্বদেশবাসিগণ প্রবাসী-ভ্রাতৃবৃন্দকে বাঙ্গালাদেশে আহ্বান করিয়াছেন। সম্মেলনের সদস্যগণকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মেলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ একটী অভ্যর্থনা-সমিতিতে মিলিত হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের সাহিত্যিক ও সর্ব্বসাধারণ যে এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে অগ্রসর হইবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ—

কয় বৎসর পাটের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস হওয়ায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের একটা কথা উঠিয়াছে। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে পরলোকগত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পাট চাষ হ্রাস করিবার জন্য বাঙ্গালার কৃষকদিগকে পরামর্শ দিয়া প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। তখন পাটের দাম চড়া ছিল। তবুও যে তিনি সেই প্রচারকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যখন পাট বাঙ্গালার প্রায় একচেটিয়া সম্পদ তখন তাহার চাষ কমাইলে—পণ্যের পরিমাণ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পাটের দাম বাড়িবে। পাট যে শত করা ৯০ ভাগ বাঙ্গালায় উৎপন্ন হয়, তাহা সত্য। এ কথাও সত্য যে অন্যান্য দেশ পাটের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টা করিয়া আজও সফলকাম হইতে পারে নাই। কিন্তু পণ্য-মূল্য যদি অকারণ বৃদ্ধি পায়, তবে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টাও অধিক হয়। পাটের মূল্য অল্প বলিয়াই পাট সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে পারে। সুতরাং পাটের মূল্য অকারণ বর্দ্ধিত করা অসঙ্গত। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহা করিতেই হইবে। সেই জন্য পাট চাষ হ্রাসের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থপরতার পরিচায়ক নহে, পরন্তু কৃষকের স্বার্থরক্ষাই তাহার একমাত্র কারণ। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রায় ৩০ লক্ষ একর জমীতে ১ কোটি গাঁট পাট উৎপন্ন হইত;—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৩৫ লক্ষ একর জমীতে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাঁট পাট উৎপন্ন হয়। তখন ৪০ হইতে ৪৫ লক্ষ গাঁট পাট বিদেশে রপ্তানী হইত; আর এ দেশের কলে ৫৫ হইতে ৬২ লক্ষ গাঁট পাট ব্যবহৃত হইত। তাহার পর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ—৩৪ লক্ষ গাঁট ও তাহার পর বৎসর মাত্র ৩০ লক্ষ গাঁট। এ দেশের কলে ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ ৬২ লক্ষ গাঁট হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৪৪ লক্ষ গাঁট

দাঁড়ায়। এখন প্রায় ১০ লক্ষ একর জমীতে পাটচাষ পরিত্যক্ত হইলেও যে পাটের দর চড়িতেছে না, তাহার কারণ—পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা মন্দা ও লোকের ক্রয়-শক্তি হ্রাস। সেই জন্য—যতদিন পাটের চাহিদা না বাড়ে—ততদিন পাট চাষ হ্রাস করিতেই হইবে—বিদেশী বা স্বদেশী পাটকলের স্বার্থ রক্ষার্থ নহে—বাঙ্গালার কৃষককে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য। আমরা আইনের বলে পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নহি। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাতে বাঙ্গালার ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। কারণ, আইনের বলে পণ্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণের নীতি যদি গৃহীত হয়, তবে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলওয়ালারা বলিবেন, যখন তাঁহারা বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলে লাভ দেখাইতেছেন না, তখন বাঙ্গালায় আর কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিতে দেওয়া হইবে না। তাঁহারা বাঙ্গালায় লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও আপত্তি করিবেন। পাট চাষের জমী আরও এক কারণে হ্রাস করিতে হইবে। যত উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহৃত হইবে, ততই অপেক্ষাকৃত অল্প জমীতে অধিক পাট উৎপন্ন হইবে। তখন যে জমী অন্যান্য ফসলের চাষের জন্য পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোথায় কোন্ ফসলের চাষ করিলে অধিক লাভ হইবে, তাহা স্থির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সেই জন্য বাঙ্গালায় জমীর পরীক্ষা (soil survey) প্রয়োজন। ইটালীতে পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, যে জমীতে ধানের চাষ হয়, তাহা পর্য্যায়ক্রমে গোচররূপে ব্যবহার করিলে দুই দিকে লাভ হয়—ফসলের ফলন যেমন বর্দ্ধিত হয়, গবাদি পশু তেমনই পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া সবল হয়। বাঙ্গালায় গোচরের অভাব ও গবাদি পশুর দুর্দ্দশা কাহারও অবিদিত নাই। কাযেই ইটালীতে যে ব্যবস্থা সফল হইয়াছে, বাঙ্গালায় তাহা সফল হয় কি না, দেখা প্রয়োজন। তাহা সফল না হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

জার্ম্মাণী ও জাপান পাটকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, পাট চাষ নিয়ন্ত্রণচেষ্টা এ দেশে বিদেশী পাটকলওয়ালাদিগের স্বার্থ হেতু, তাঁহারা ভ্রান্ত। অন্যান্য দেশ যদি পাটকল করে ও বাঙ্গলা হইতে তাহাদিগের পণ্যোপকরণরূপে পাট ক্রয় করে, তাহাতে বাঙ্গালী তুষ্ট হইতে পারে না। যে দ্রব্য বাঙ্গালায় উৎপন্ন হয়, তাহা পণ্যোপকরণরূপে বিদেশে যোগাইয়া কতটুকু লাভবান হওয়া যায়? সেই দ্রব্যে পণ্য প্রস্তুত করিয়া তাহা বিদেশের বাজারে বিক্রয় করাতেই লাভ অধিক। বাঙ্গালী কেন সে লাভে বঞ্চিত হইবে?

পাট চাষ চাহিদা অনুসারে না করিলে, কৃষকের অসুবিধা অনিবার্য্য, গত কয় বৎসর তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পাট চাষ করা হয়—অর্থের জন্য। বাঙ্গলায় যে সব কৃষিজ দ্রব্য বিক্রয় করিয়া আমরা টাকা পাই, সে সকলের মধ্যে পাটই সর্ব্বপ্রধান। যদি এই অর্থাগম না হয়, তবে পাট চাষ করিয়া কেবল যে লাভ নাই, তাহাই নহে; লোকসান আরও অনেক দিকে। প্রধান লোকসান স্বাস্থ্যে। পাট চাষ যে ম্যালেরিয়া বিস্তারের জন্য কতকটা দায়ী এমন মতও ব্যক্ত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন ইহাতে (পাট পচানয়) যে পানীয় জলের বিশুদ্ধি নষ্ট হয় এবং ফলে উদরাময় প্রভৃতি নানা পীড়ার উৎপত্তি হয়, তাহা সরকারের পক্ষ হইতে অনুসন্ধানকারী চিকিৎসকরাও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং যে পরিমাণ পাটের চাহিদা থাকে, তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন করা বাঙ্গলার পক্ষে ক্ষতিজনক। অপেক্ষাকৃত অল্প জমীতে যদি চাহিদার মত পাট উৎপন্ন করা যায়, সে চেষ্টা করা প্রয়োজন। তাহা হইলে যে জমী পাওয়া যাইবে, তাহাতে অন্যান্য ফসলের চাষ করা যাইবে।

বাঙ্গালায় পাটের চাষ হ্রাস করিবার চেষ্টা পূর্ব্বে যখন চিত্তরঞ্জন দাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কৃষকদিগের লাভের আশায় তাহা করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, দাম অধিক চড়িলে লোকের পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন দ্রব্য ব্যবহারের চেষ্টাও বাড়িবে। এবার পাট চাষ হ্রাস করিবার জন্য যে কৃষকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহার কারণ, নানা কারণে পাটের চাহিদা কমিয়াছে। ব্যবসা মন্দা যে ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাহা স্বীকার করিলেও বলা যায়—বাজারে পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থায় যে ত্রুটি নাই, তাহা নহে এবং সেই ত্রুটি সংশোধিত হইলে পাটের বিক্রয় বাড়িতে পারে।

এ দেশে কৃষকদিগকে চাহিদা সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। পৃথিবীর কোন্ দেশে কত পাট মজুদ আছে এবং তাহা বাদ দিলে কত পাটের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া লোককে সে সম্বন্ধে

সংবাদ দিলে লোক তদনুসারে চাষের ব্যবস্থা করিতে পারে। সেরূপ সংবাদ প্রদানের উপায় করা প্রয়োজন।

পাটের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আর পাট চাষ হ্রাস করিলে ত্যক্ত জমীতে কিসের চাষ করিয়া কৃষক লাভবান হইতে পারে, তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গালার প্রয়োজন ও জমীর পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে পদ্ধতিতে এখন চাষ চলিতেছে, তাহা ত্যাগ না করিলে লাভ হইবে না। বাঙ্গালায় খাদ্যের জন্য ধান্যের চাষেই আরও জমী প্রয়োজন। সুতরাং যদি তাহাতে সুবিধা হয়, তবে পাট চাষ সঙ্কোচ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিতে হইবে। যে ফসলের চাষে অধিক লাভ তাহারই চাষ করিতে হইবে।

বাঙ্গালায় কিরূপ চাষের প্রয়োজন ও কি কি ফসলের চাষ কি পরিমাণ করিলে লাভবান ও স্বাবলম্বী হওয়া যায়, তাহার হিসাব করা দুঃসাধ্য নহে। আমরা সে বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে বলি। ইহা যে সরকারের কৃষি-বিভাগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

জলের ব্যবহার—

আমরা জলের ব্যবহার করি, স্নানপানাদির জন্য আর কৃষিকার্য্যে। কৃষিকার্য্যে যেভাবে জলের সদ্ব্যবহার মানুষ চেষ্টা করিলে করিতে পারে, তাহা সেচের খালে দেখা যায়। তদ্ভিন্ন জলের স্রোতোৎপন্ন শক্তির দ্বারা বিদ্যুৎও উৎপন্ন করিয়া তাহা নানা কাযে ব্যবহার করা যায়। এ বিষয়ে বাঙ্গালা যত উপেক্ষিত তত ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশ নহে। সংপ্রতি ভারত সরকার যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে সেচের খালে ২ কোটি ৯৬ লক্ষ একর জমীতে সেচ দেওয়া হইয়াছিল—দুই বৎসর পূর্ব্বের হিসাবে দেখা যায়—সে বৎসর ৩ কোটি ১৬ লক্ষ একর জমীতে সেচ দেওয়া হয়। ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দের হিসাব—পঞ্জাবে ১ কোটি একরের অধিক, মাদ্রাজে প্রায় ৭৪ লক্ষ একর ও যুক্তপ্রদেশে প্রায় ৩৫ লক্ষ একর জমীতে সেচ দেওয়া হইয়াছিল। আর বাঙ্গালায়? বাঙ্গালায় সেচের খালের পরিমাপ—

মেদিনীপুরের খাল	...	৪১৪ মাইল
ইডেন খাল	...	৪৫ "
বক্রেশ্বর খাল	...	২১ "
মোট	...	৪৮০ মাইল

এই সব খালের জলে গত বৎসর মাত্র ৫২ হাজার ৫ শত ৭৪ একর জমীতে সেচ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত সেচের খালে ৯৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৬ শত ৭৪ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই।

গত ২১ আগষ্ট তারিখে মাদ্রাজের গভর্ণর মাটুর সেচের ব্যবস্থার উদ্বোধন করিয়াছেন। শত বর্ষ পূর্ব্বে সার আর্থার কটন কাবেরীতে বাঁধ দিয়া জলের সদ্ব্যবহার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শত বর্ষে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। এই বাঁধের দ্বারা যে কায হইবে, তাহাতে ৩ লক্ষ একরেরও অধিক জমীতে সেচ দেওয়া যাইবে। ইহার ব্যয় প্রায় ৬ কোটি টাকা পড়িয়াছে এবং ইহা পৃথিবীর মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাঁধ তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়:—

দেশ	ব্যয়				সমাপ্তি কাল
মিশর (আশুয়ান বাঁধ)	৩ কোটি		৬৭ লক্ষ		৪ বৎসর
আমেরিকা (নিউক্রোটন)	২	"	১২	"	১৪ "
আফ্রিকা (সেনার)	৮	"	৪৭	"	৭ "
মহীশূর (কৃষ্ণরাজসাগর)	২	"	৫০	"	৬ "
হায়দ্রাবাদ (নিজামসাগর)	৩	"	৬৬	"	——
ভারতবর্ষ (লয়েড)	১	"	৭২	"	৬ "
মাটুর	৪	"	৭৮	"	৬ "

সমগ্র ভারতে সেচের খালের পরিমাপ—প্রায় ৭৫ হাজার মাইল; আর তাহাতে মোট প্রায় ৫ কোটি একর জমীতে সেচ দেওয়া যায়। আমেরিকায় প্রায় ২ কোটি ও জাপানে প্রায় ৭ লক্ষ একর জমীতে সেচের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যে দিক হইতেই কেন দেখা যাউক না, বাঙ্গালা সেচের ব্যাপারে বিশেষরূপ উপেক্ষিত হইয়াছে। আর বাঙ্গালার রাজস্বে অন্যান্য প্রদেশ সেচ বিষয়ে বিশেষ উপকৃত যে হয় নাই, এমন নহে। অথচ বাঙ্গালায় সেচের ব্যবস্থা কৃষি-কার্য্যের জন্য ও লোকের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান জন্য বিশেষ প্রয়োজন। সমগ্র ভারতে ৭৫ হাজার মাইল সেচের খালের মধ্যে বাঙ্গালার ভাগ্যে ৫ শত মাইলও পূর্ণ হয় নাই।

প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার উইলিয়ম উইলকক্স যে ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও করা হয় নাই। আর পঞ্জাবে সেচের খাল খনন করায় ৯০ লক্ষ একর পতিত জমীতে এখন চাষ হইতেছে—মাদ্রাজে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের জলে ৯০ লক্ষ লোক অনাবৃষ্টিতে শস্যহানির শঙ্কামুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার সম্বন্ধে এই যে অবজ্ঞা—ইহা উপেক্ষা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন, এমন আশা কি আমরা করিতে পারি না ?

—

বাঙ্গালার উচ্চ শিক্ষা—

সংপ্রতি বাঙ্গালা সরকারের প্রেস অফিসার বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। বাঙ্গালায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছিল; এখন উহার কতকাংশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফীস হইতে বহু অর্থ লাভ করেন এবং পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষক প্রতিষ্ঠানই ছিল। কিন্তু এখন ইহার পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগে শিক্ষাদান হয় এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগে ৯৮৯ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১৪৮৩ হয়। অর্থনীতিক দুর্গতি ও রাজনীতিক চাঞ্চল্য হেতু পরবৎসর ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইলেও উহা আবার বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসাবিভাগে গত বৎসর ১০৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫৬ জন ছাত্রীর স্থানে পর বৎসর ছাত্রীসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা বিদ্যালয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করে। ইহার ছাত্রসংখ্যা ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে হ্রাস হইতেছে। গত বৎসর ছাত্রসংখ্যা ৯২৭ মাত্র ছিল।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাঙ্গলায় সাহিত্যশিক্ষার জন্য ৫১টি কলেজ ছিল—৪৫টি পুরুষদিগের ও ৬টি ছাত্রীদিগের জন্য। কলিকাতায় কলেজের সংখ্যা অধিক। গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে আই-এ; আই-এসসি; বি-এ; বি-এসসি, পরীক্ষার্থীদিগের শতকরা ৫৮ জন কলিকাতার। কলিকাতার কলেজগুলি যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে ছাত্রদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে।

ছাত্রদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত ৪৫টি কলেজের ১ টি সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত ও অবশিষ্টগুলি বে-সরকারী।

গত দুই বৎসরে পুরুষ শিক্ষার্থীদিগের জন্য উদ্দিষ্ট কলেজগুলির ব্যয় কত ও কিরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্যয়	১৯৩১-৩২ খৃঃ (টাকা)	১৯৩২-৩৩ খৃঃ (টাকা)
প্রাদেশিক	১২,৯৪,৯৯৩	১১,৫৫,৪৯১
জিলা ও মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড	৩,৫৬৭	২,৫৭৫
ফীস	১৭,৭২,৫২২	১৮,৭৫,৪৫৮
অন্যান্য	৩,২৬,৩৭৬	২,৯১,৩৫৯
মোট	৩৩,৯৭,৪৫৮	৩৩,২৪,৮৮৩

ছাত্রসংখ্যা—

	১৯৩১-৩২ খৃঃ	১৯৩২-৩৩ খৃঃ
হিন্দু	১৬,৫১৬	১৭,০৯০
মুসলমান	২,৫৭৪	২,৮১৮
অন্যান্য	২৮৮	৪১৫
মোট	১৯,৩৭৮	২০,৩২১

গত বৎসর বে-সরকারী কলেজগুলিতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ১,৯৯,৩৩০ টাকা।

গত বৎসর—

(১) ১০টি সরকারী কলেজে ৩,২০৫ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। এই কয়টি কলেজে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৩,৩৬০৩২ টাকা।

(২) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ২০টি কলেজে ছাত্র-সংখ্যা—৯,৪২৮ ও ব্যয়ের পরিমাণ—১২,১১,২৮৭ টাকা।

(৩) স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত ১৫টি কলেজে ছাত্র-সংখ্যা—৭,৬৭৬ ও ব্যয়ের পরিমাণ—৭,৭৭,৫৬৫ টাকা।

মাঝ দরিয়ার নাও

শ্রীবিমল মিত্র

পীতাম্বরের ছুটাছুটির অন্ত নাই। একবার এ-পাড়া একবার সে-পাড়া করিতে করিতে তাহার পা ব্যথা হইয়া উঠিল। কারণে এবং বিনা কারণেই পীতাম্বর এই কয় দিন হইল বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন! মালোপাড়ায় যাইতে যাইতে হঠাৎ তাঁহার মনে পড়ে উত্তরপাড়ার কথা! পীতাম্বরের বয়স হইয়াছে এ-বয়সে এত পরিশ্রম সহ্য না হওয়ারই কথা—তবু সে কথা কে শুনিতেছে! উপীনের চাকরী হইয়াছে—সেই খবরটা এ-পাড়া ও-পাড়া কোনও ছলে ছড়াইয়া না বেড়াইলে মনের তাহার শান্তি হইতেছে না!

একমাত্র ছেলে—এতদিন বেকারই বসিয়া ছিল; ঘরের খাইত আর ঘরেই বসিয়া বসিয়া ঘুমাইত! লেখাপড়া শিখিয়া এমনভাবে বসিয়া থাকা—ইহা সকলের চোখেই দৃষ্টিকটু ঠেকে! কিন্তু সে কথা থাক্—এতদিনে উপীনের একটা চাকরী হইল;···বাবা রুদ্রেশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

উপীনের চাকরী হইয়াছে! একটা দিন দেখিয়া যাত্রা করিতে হইবে! অনেক দিনের মত ছেলে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে—আবার কবে আসিবে কে জানে! ছুটি-ছাটা মেলে কি না বলা যায়না! চাকরী যখন, তখন মনিবের খেয়াল মর্জ্জির উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে! সুতরাং কবে আবার দেশে আসা হয় কে বলিতে পারে! তাই পীতাম্বর বাজার হইতে ভাল ভাল মাছ আনিতেছেন—অমুক গাছের অমুক ফলটা, অমুক বাড়ীর অমুক জিনিষটা—এটা সেটা চারিদিক ঘুরিতে ঘুরিতে পীতাম্বর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ষ্টেশনের বাজার হইতে পাত-ক্ষীর আনিলেন—কোন্ গোয়ালা ভাল দই করে তাহাই আনিলেন-কাহার গাছের কালোজাম, কাহার বাতাবী নেবু—কোথায় কদ্মা—কিছু আর বাদ রহিলনা! যত দিন আগাইয়া আসিতেছে—পীতাম্বরের ব্যস্ততা ততই বাড়িয়া চলিল! তা' হোক্—উপীনের চাকরী হইয়াছে; দশটা নয়, বারোটা নয়, ওই একটি মাত্র ছেলে; যে-ছেলে এতদিন বসিয়া ছিল সেই ছেলের চাক্রী হইয়াছে!

কিন্তু চাক্রী যেন হইল—ইহার পর স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে তবেই ত! স্বাস্থ্য নহিলে সকলি মিথ্যা! বসিয়া বসিয়া কোন্ আপিস খাওয়ায়? নিয়মিত খাওয়া—সময়মত বেড়ান ইত্যাদি করিলে তবেই না শরীর ভাল থাকে! এই ক'দিন হইতে বিকালের দিকে একগ্লাশ করিয়া মিছরির সরবতের ব্যবস্থা হইয়াছে! দুপুরবেলা উপীন বরাবরই ঘুমায়! ইহার জন্য পীতাম্বর কতদিন বকাবকি করিয়া আসিয়াছেন: দিবানিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, পাপ প্রভৃতি কত কথা বলিয়াছেন; কিন্তু এ কয়দিন উপীনকে কেহ কিছু বলে নাই। ঘুম আসেই যদি ঘুমাক্ না! আহা, আর ক'দিনই বা। ইহার পরই ত আপিসে গিয়া খাটিতে হইবে—সকাল দশটা হইতে বিকাল পাঁচটা; ঘুম তখন মাথায় উঠিয়া যাইবে।

সোমবার দিন যাওয়া ঠিক হইল: আজ শনিবার। মাঝে আর কেবল একটি দিন আছে।

গত ক'দিন ধরিয়া বাড়ীতে উপীনের আদর সহস্র গুণ বাড়িয়া গিয়াছে! আগে উপীন কখন কোথায় যায় কেহ খেয়াল রাখিত না। ভবঘুরের সামিল—সকালবেলা আড্ডা দিতে বাহির হইয়া ফিরিত খাইবার সময়ে; আবার দুপুরবেলা দিবানিদ্রা দিয়া সেই যে বাহির হইত—আসিত কখন ঠিক নাই! রাত্রি বারোটার সময় কোন্ থিয়েটারের দলে রিহার্সেল দিয়া উপীন হয়ত বাড়ী ফিরিতেছে; দরজায় ভীরু হাতের টোকা দিয়া উপীন দরজা খুলাইবার চেষ্টা করিল।···

—ও কাল্দাসী, কাল্দাসী,·· ওরে ও খুকী··

উপীনের মেয়ে কালিদাসী তখন অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। সুষমারও ঘুম তত পাৎলা নয়। বাধ্য হইয়া উপীনকে আরো একটু জোরে চীৎকার করিতে হইল—

—ওরে কাল্দাসী—কাল্দাসীরে···মরেচে সব···

গলা শুনিয়া পীতাম্বরের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে উপীনকে লক্ষ্য করিয়া সে কী চীৎকার। পাড়ার লোকে জাগিয়া গেল। দরজা খুলিয়া দিয়া পীতাম্বর বলিলেন—যে চুলোয় গেচ্লে সেখানে জায়গা হোলনা—ভাত গিলতে এলে বাড়ীতে!···

আরো যা' যা' বলিলেন তাহা শুনিলে কাণে আঙুল দিতে হয়। সত্যসত্যই অত বড় বয়স্ক ছেলেকে তাহা বলা মানায়না! স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে; তাহাদেরই সামনে পীতাম্বরের ওই কথাগুলি ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়! শেষে স্বর্ণময়ী আসিয়া হাতে ধরিয়া কর্ত্তাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যান। রাগ হইলে পীতাম্বরের আর জ্ঞান থাকেনা। সেই অবস্থায় কর্ত্তা যে কী করিয়া বসেন তাহা কে বলিতে পারে! ঘরে ফিরিয়া যাইতে যাইতে গজ্ গজ্ করিয়া বলেন: বুড়ো ধাড়ি ছেলে, বাড়ীর একটা কুটো তুলে উবগার করবেননা—কেবল খাবার কুমীর—কাল থেকে এ-বাড়ীতে আর তোমার স্থান হবেনা তা' বলে' দিচ্ছি—

উপীনের ঘরে ঢাকা দেওয়া ভাত থাকে। সন্ধ্যাবেলার রাঁধা সেই ভাত রাত্রি বারোটায় শুকাইয়া হয়ত চাল হইয়া আছে;···অযত্নে বাড়া সেই ভাত আর তাহারই পাশে পাশে শাক কচু এম্নি আরো কী কী রহিয়াছে। ভাতের থালা টানিবার শব্দে সুষমা বুঝি একটু কাত হইয়া চোখ তুলিল—

উপীন বলিল—শুন্ছো—

বউ শুইয়া শুইয়াই উত্তর দিল—কী?

উত্তর দিবার ধরণ দেখিয়া উপীন সেই সুর অনুকরণ করিয়া বলিল—কী! তোমার উত্তর শুনে আমার গা' জ্বলে' যায়;—বলছিলাম এই শাক কচু ঘেঁচু দিয়ে ত আর খেতে পারিনে, মাছ বুঝি হয়নি আজ?···এই দিয়ে মানুষে খেতে পারে?···

সুষমা উত্তর দিল—খেতে না পারো খেওনা; এক পয়সার মুরোদ নেই যা'র তা'র আবার সুখ-অসুখ!·· বাড়ীর মানুষ সবাই ওই দিয়ে খেলে—আর তোমার সুখের মুখে রুচলোনা!·· না রোচে ফেলে দাও -

অথচ এই সুষমা আগে এমন ছিলনা। বিবাহের প্রথম একটা বছর বেশ কাটিয়াছিল। উপীনকে সুষমা রীতিমত সমীহ করিয়া চলিত। উপীন বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত ভাত আগলাইয়া না খাইয়া বসিয়া থাকিত! এতটুকু অনাদর দেখাইলে অভিমান করিত—তার পর সেই অভিমান ভাঙাইতে উপীনকে কত সাধ্য সাধনা করিতে হইত! কিন্তু আজকাল সুষমার এই কঙ্কালের মধ্যে সে-সুষমাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায়না! আজিকার এই সমাধিস্তূপ খুঁড়িলে সেদিনকার একটি অস্থিকণাও বাহির হইবে কি-না সন্দেহ! সমস্তর মূলে সে-ই তাহার বেকারত্ব!

কিন্তু যাই হোক—এখন উপীনের চাকরী হইয়াছে!

চাকরী হইবার চিঠি যেদিন প্রথম আসিল সেদিন পীতাম্বর স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে এমন হইবে! সকালবেলা ছোট একখানি গামছা পরিয়া পীতাম্বর বাগান হইতে ফিরিতেছিলেন - সামনে উপীনকে দেখিয়াই চটিয়া উঠিলেন। মুখ বেঁকাইয়া বলিলেন—সকালবেলা বেরুন হচ্ছে ছেলের—কাজের মধ্যে কাজ—আড্ডা··

উপীন কিন্তু কাছাকাছি আসিয়া একখানি টাইপকরা কাগজ পীতাম্বরকে দেখাইল। বলিল এই চিঠি এল—সেই যে দরখাস্ত করেছিলাম - লিখেছে: চাকরী হয়েছে –

পীতাম্বর প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাগজটা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন ইংরাজীতে লেখা। বলিলেন—দরখাস্ত করেছিলে না-কি?

উপীন বলিল—সেই যে পুজোর আগে করলাম?···

—তা' হ'বে—পীতাম্বরের কিন্তু মনে পড়িলনা!

ভাল করিয়া সকাল হইল। একে একে লোকজন পথে চলিতে সুরু করিয়াছে। চেনা-শোনা লোক যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রাস্তার উপর নবীন ঘোষালকে দেখিয়াই পীতাম্বর ডাকিলেন—কে—ঘোষাল, না? এস একবার ইদিকে—

নবীন ঘোষাল কাছে আসিল। বলিল—মনটা ভারী ভারী দেখ্ছি যে?··

পীতাম্বর হাসিলেন। ভারী ভারী? তা' হবে একটু বৈ কি! একটু বিচলিত হ'য়ে পড়েছি ভাই···মানে··· উপীনের চাকরী হ'য়ে গেল কোলকাতায়—হোল ত ভাই—ভালই হোল—কিন্তু বিদেশ বিভুঁই—বুঝলেনা?·· সেই চিন্তাতেই মনটা···

খবরটা লইয়া ঘোষাল চলিয়া গেল। আসিল ও-পাড়ার মতি মল্লিক। মতি মল্লিকের ছেলেটা উপীনের বন্ধু! তাহাকে শুনাইয়াও বলিলেন—খবরটা শুনেছ বোধ'য়?··

মতি মল্লিক কিছুই শোনে নাই। বলিল—কিসের খবর?···

পীতাম্বর বলিলেন—শোননি এখনও? আমার উপীনের চাকরী হ'য়ে গেল—কোলকাতায়, তা' ভাই এই

একটু আগেই ঘোষালকে বলছিলাম : তোমাদের পাঁচ-জনের আশীর্ব্বাদেই ও···শেষ জীবনে ওদের সুখ ওদের সম্পদ দেখেই শান্তি—না কি বল ?

মতি মল্লিকও গেল, আসিল রাজেন আচায্যি; রাজেন আচায্যির পরে আসিল কার্ত্তিক সান্ন্যাল—এবং পর পর বড় রাস্তা দিয়া অনেকেই আসিল গেল। এবং যাইবার সময় খবরটা শুনিয়া গেল।

দুপুরবেলা পীতাম্বর হুঁকা লইয়া বাহির হইলেন। ব্রজ ঠাকুরের পাশার আড্ডায় গিয়া কথাটা কথায় কথায় পাড়িয়া ফেলিলেন। সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন বিপিন কামারের দোকানে—সেখানেও ছোট খাট একটা আড্ডা বসে! খবরটা সেখানকার সবাইকে শোনান হইল। সকলেই উপীনকে ধন্য ধন্য করিল!

শশী মাইতি বলিল—উপীনের বুদ্ধি আছে বিদ্যে আছে বুঝ্‌তাল্লেন্ কাকা—এ আমি এইটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি কি-না—কিন্তু মাটি করলে ওই উত্তর-পাড়ার থিয়েটারের দলটি—ওরাই ওকে—

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন পীতাম্বর বাড়ী আসিলেন তখন বিকাল হইয়া আসিয়াছে। সামনে দিয়া উপীন যাইতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়াই পীতাম্বর প্রশ্ন করিলেন—শরীর ভালো আছে ত—কি র'ম যেন দেখাচ্ছে—

বলিয়া পীতাম্বর যাহা কখনও করেন নাই তাহাই করিয়া বসিলেন : হাতের উল্টা পিঠ দিয়া উপীনের কপাল-দেশ স্পর্শ করিলেন।

উপীন বলিল—না বেশ আছি ত—কিছুই হয়নি—

পীতাম্বর মনে মনে বলিলেন—না হ'লেই ভালো—শেষকালে এই সময় যদি একটা জ্বর বাধিয়ে বস তা'লেই চিত্তির। প্রকাশ্যে বলিলেন—মিছ্‌রির জলটা খেয়েছিলে আজ ?

—হ্যাঁ—

—বাতাবু নেবু? কি রকম? মিষ্টি ছিল? চারটি পয়সার কমে বেটা ছাড়লেনা।··এখন কোথায় যাচ্ছ? তা' যাও—একটু খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে এস···আগে শরীর তার পরে···

করিতে করিতে সেদিনও উপীনের বাড়ী ফিরিতে রাত বারোটা হইল। আজ আর দরজা নাড়া দিতে হইলনা। পীতাম্বর তখনও ঘুমান নাই—বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

কাছে আসিতেই পীতাম্বর বলিলেন কে—উপীন নাকি? ভাবলাম : কী হোল, কী হোল—শরীর ভালো আছে ত দেখো—

বাড়ীর ভিতর আসিয়া উপীন দেখিল : কেহই খায় নাই; মা বসিয়া আছে - সুষমাও তাই।

খাইতে বসিয়া উপীন বলিল—তোমরা আগে খেয়ে নিলেনা···কেন? জানো ··এই রকম দেরী···

স্বর্ণময়ী বলিলেন—কী যে বলিস্ ··এই রকম সেখেনে করলেই হয়েছে আর কি!···সেখানে কে তোর জন্যে হাঁড়ি কোলে করে' বসে' থাকবে! হোটেলে যা' ব্যবস্থা তা' ত জানি—

ভাত গরম নাই। তবু পাশেই বসিয়া সুষমা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল।

স্বর্ণময়ী বলিলেন—তুই এত ঢিলে মানুষ—সেখেনে পাঁচ ভূতের সংসারে কী যে করবি, তা' ভেবে পাচ্ছিনে। টাকাটে সিকিটে যেন যেখানে সেখেনে ফেলে রেখোনা, তোমার যা' বদ্ অভ্যেস্—চাকর বাকর—কে কী রকম—বলা যায় কী—আর একটি কথা বলে' দিই; খরচ পত্তোর যা' কিছু করবে, হিসেব রেখো—

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; বাহির হইতে হুঁকা হাতে করিয়া পীতাম্বর ভিতরে আসিলেন। বলিলেন—উপীনের দুধ দিয়েছো?

—ওমা, দেখেছ, একেবারে ভুলে গেছ্‌লাম—বলিয়া স্বর্ণময়ী উঠিয়া দুধ আনিতে গেলেন।

উপীন আপত্তি করিয়া বলিল—না না—ওসব দুধটুধ আমি খাইনে—

সত্য সত্যই সেই ছোটবেলা হইতে উপীন দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে; এতদিন এজন্য কেহ পীড়াপীড়িও করে নাই। পীড়াপীড়ি করিলে খাইত কি-না কে জানে।···

পীতাম্বর বলিলেন—ওই ত তোমাদের দোষ—দুধ খাবেনা; কেন?···দুধ কত লোকে এক ফোঁটা পায়না—

এক ফোঁটা দুধের জন্যে গরীবের ছেলেরা হা পিত্যেশ করে, আর তোমরা···

শেষে সত্য সত্যই উপীনের আপত্তি টিকিলনা। দুধ দিয়া তাহাকে ভাত খাইতে হইল।

পীতাম্বর বলিলেন—শুন্‌ছো, কদ্‌মা দাও ত ওর সঙ্গে, দুধের সঙ্গে কদমা দিয়ে খেয়ে দেখ দিক্‌, ভুলতে পারবেনা···

খাওয়া দাওয়া সারিয়া উপীন ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। বিছানার চাদরটি আজ সংস্কার হইয়াছে। কত বছর পরে যেন তাহাকে প্রথম সাবান দিয়া কাচা হইয়াছে। মাথার বালিশের কাছে কয়টা চাঁপা ফুল;—সুষমারই কাজ! · এই সব নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া উপীন হাসিয়া ফেলিল। আগে কতদিন সুষমাকে উপীন বলিয়াছে চাদরটা কাচিয়া দিতে—ঘরটা গুছাইয়া রাখিতে। তখন সে কেবল মারিতে বাকি রাখিয়াছে। কতবার বলিয়াছে জামাটা সেলাই করিয়া দিতে—তখন কেহ তা' শুনিতনা। আজ সবই বিপরীত—কারণ তাহার চাকরী হইয়াছে।

আগে একটা পয়সার জন্য উপীনকে কত অপমান পোয়াইতে হইয়াছে! একটা পয়সা! টাকা নয়—আধুলি নয়—একটা পয়সা! পীতাম্বরের চিরকালই হাত টান!—একটি পয়সা কাহাকেও দিতে তাহার বুকের পাঁজরা খসিয়া যায়! কোমরের ঘুন্‌সির সঙ্গে সিন্ধুকের চাবিটি তাহার প্রাণ-ধন! ওই সিন্ধুকের ভাবনাতেই তার ঘুম অত তরল। রাত্রিতে খুট্‌ করিয়া কোথাও শব্দ হইলে আলো জ্বালিয়া উঠিয়া চারিপাশ দেখিয়া বেড়ান! ঘরের কোণে লোহার সিন্ধুকটি দেয়ালের সঙ্গে সিমেন্ট দিয়ে আঁটা! প্রাণ ধরিয়া উপীনকে পীতাম্বর কখনও একটা পয়সা দিয়া বলেন নাই—এই নাও! রথের মেলায় আর সব ছেলেরা যখন পুতুল, খেলনা, মেঠাই কিনিত—উপীন তখন এক পাশে চুপ করিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিত! তার পর একটু একটু করিয়া বড় হইল টাউন ইস্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিল। কিন্তু যে কে-সেই; এতটুকু তফাৎ হয় নাই পীতাম্বরের ব্যবহারে। একটা আধলা দিয়া উপীনকে পীতাম্বর বিশ্বাস করেননা। তার পর বিবাহ হইয়া গেল একদিন—এমন কি মেয়েও হইল একটা—কিন্তু তখনও তাই! উপীনকে কোনও দিন বাজার করিতে দেন্‌না পাছে পয়সার অপব্যয় হয়।··এত বয়স হইল—কিন্তু এ-পর্য্যন্ত উপীন হাতে একটা পয়সা পায় নাই।···কতদিন নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া উপীন কাঁদিয়াছে—কতবার মনে হইয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া পলাইয়া যায়—আরো কত কী মতলব করিয়াছে—শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য কিছুই করা হয় নাই। এর ওর কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া একটা বিড়ী একটা অমুক—এই করিয়া উপীন এতদিন কাটাইয়াছে।···কিন্তু আজ আর চিন্তা নাই; বাড়ীশুদ্ধ লোক তাহাকে আদর করিতে সুরু করিয়াছে—সে আর যে-সে নয়—তাহার চাক্‌রী হইয়াছে!

সুষমা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

—ওমা, ঘুমিয়ে পড়লে না-কি?

উপীন চোখ না চাহিয়াই উত্তর দিল—হুঁ—

—পাণ সেজে আনলুম যে তোমার জন্যে··

—পাণ আমি খাই কোনও দিন?

সুষমা পাণের ডিবাটি মাথার কাছে রাখিয়া বসিয়া বলিল না খেলেই বা, বাবা এনেছেন তোমার জন্যে তাই···তুমি যে কেমন মানুষ তা' তো বুঝতে পারিনে—খাবার পর কিছু মশলা চিবুতেও ভাল লাগেনা?··

—তা' দাও, এনেছ যখন—একটি পাণ লইয়া উপীন মুখে পুরিল।

সুষমা খানিক পরে বলিল—পরশুই তা' হ'লে যাওয়া ঠিক?

—হ্যাঁ পরশুদিন ভোরবেলা—

সুষমা বলিল—ছুটিছাটা করে' আসবে ত মাঝে মাঝে—ভুলে যাবে না ত আমাদের—

সে-কথার জবাব উপীন দিলনা; খানিক পরে বলিল—আজ তোমার ঘুম পাচ্ছেনা?···অন্য দিন যে ঘুমিয়ে পড় এতক্ষণে—

—তোমার মতন না কি?—সুষমা চুপ করিয়া গেল।

খানিক পরে সুষমা আবার ডাকিতে লাগিল—ঘুমিয়েছ না কি?

কী?

—বলছিলাম: যদি সুবিধে হয়—বুঝলেনা একটা ছোট খাট বাড়ী যদি কম ভাড়ায়—বুঝলেনা—আজই যে হবে তা' ত নয়—পরে হ'লেও চলবে—একটা সুবিধে মতন যদি—তা' তুমি যে আলগা মানুষ—তুমি আবার তাই···আম্‌তা

আম্‌তা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সুষমা কথাটা শেষ করিতে পারিলনা।

তার পর খানিক পরে আবার বলিল—তুমি ত কোনও কথাই ভালভাবে শুনবেনা—বলছি কি—টাকা পয়সা যেন নিজের হাতে পেয়ে এদিক ওদিক—বুঝতে পারছ ত—ওই মেয়েটা দিন দিন বড় হ'য়ে উঠছে—বিয়ে থা' তোমাকেই ত সব দিতে হবে—বাবা আর ক'দিন ··

ঘুমের মধ্যে উপীন কতক শুনিল আর কতক শুনিলনা; আজ সুষমার এত কথা! অন্য দিন জাগিয়া থাকিলেও কথার উত্তর দিতনা! যা হোক সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপীন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—অত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া বউএর উপদেশ শুনিবার মত অবস্থা তখন তাহার নাই; অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া উপীন নাক ডাকাইতে লাগিল।

সকালবেলা উপীন উঠিয়া দেখিল: বাড়ীতে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। কাল যাওয়া, সুতরাং সকাল হইতেই তোড়-জোড় হইতেছে।

বাজারে গিয়া পীতাম্বর এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। তরী-তরকারী মাছ সবেরই আজ চড়া দাম। এক জায়গায় গিয়া পীতাম্বর বলিলেন—ও ঘোষের পো, বেগুন কত করে' বেচ তেছ?

—তিন আনা—

—তিন আনা! পীতাম্বর লাফাইয়া উঠিলেন: কী যে বল, দাও যা' দর হবে তাই দাও দিকি সেরটাক্—তিন আনা বেগুনের সের!—বিলেত পেয়েছো? ···

ঘোষের পো তিন আনার কমে ছাড়িবেনা—পীতাম্বরও কম দরে লইবেন। আপোষ নিষ্পত্তি একটা হইতেছিল—এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আশু ভস্‌চায এ গাঁয়ের অর্থবান লোক। পাটের ব্যবসা আছে—গুড়ের কারবার করে—ভিতরে ভিতরে মহাজনীটাও চলে—সুতরাং অবস্থা তাহার ভালই বলিতে হইবে। ঠিক সেই সময়ে আশু ভস্‌চায সেইখানে আসিয়া দর-দস্তর না করিয়া তিন আনার দরেই পীতাম্বরের চোখের সামনে দিয়া এক সের বেগুন লইয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বরের বেগুন কেনা আর হইলনা। মনে মনে ফুলিয়া উঠিলেন—দেখেছ, তেজ দেখেছ, পয়সা হইয়াছে বলিয়া মাটিতে আর পা পড়েনা! আচ্ছা! পীতাম্বর দাঁতে দাঁত চাপিলেন: এবার পীতাম্বর দেখাইবে! এখন আর তাহার ভয় কী! উপীনের চাকরী হইয়াছে! একটা ভাবনা তাহার চুকিয়া গিয়াছে! এবার গাঁয়ের লোককে দেখাইয়া দিবেন পীতাম্বর—একটা চাকরীর জন্য সেই তাহার উপীনের কাছেই খোসামোদ করিতে হইবে! পয়সা হইয়াছে বলিয়া একেবারে যেন মাথা কিনিয়া ফেলিয়াছে—দেখনা!

এদিকে বাড়ীতেও ধুমধাম!

ঘরের ভিতর সুষমা একটু ফাঁক পাইয়া উপীনের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়াছিল। বাহির হইতে স্বর্ণময়ী ডাকিলেন—বৌমা—

লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সুষমা রান্নাঘরে যাইতেই স্বর্ণময়ী বলিলেন—ভাঁড়ার ঘর থেকে কিশ্‌মিশ্‌ বের করে' নিয়ে এসো ত বৌমা, উপীনের আজ জন্মদিন—ভুলেই গেচ্‌লাম—কাল চলে' যা'বে—ভাল-মন্দ কোথায় কী খেতে পায় না-পায়—

বিকেল বেলার দিকে উত্তর-পাড়ার থিয়েটারের দলের ছোক্‌রারা আসিয়া হাজির হইল!

ছেলেরা ধরিয়া বসিল—চাকরী হইয়াছে, চাঁদা দিতে হইবে!

উপীন হাসিয়া বলিল—আরে, এখন কিসের চাঁদা—আগে যাই, সেখানে গিয়ে চাক্‌রী করি—তবে ত! আগে থেকেই—

দলপতি ছোকরা আগাইয়া আসিয়া বলিল—না উপীনদা'—ফাঁকি দেবার মতলব—পূজোর সময় এবার আমরা 'দক্ষযজ্ঞ' ধরছি, কলকাতা থেকে ড্রেসার পেণ্টার আন্‌বো; ড্রেস-ভাড়াটা তোমায় দিতে হবে—তা' আগে ভাগে বলে' রাখছি—

উপীন আপত্তি করিল—ওঃ, পূজোর এখন বহুত্‌ দেরি—দেখা যাবে তখন—

সকলে একযোগে বলিল—দেখা-যাবে-টাবে নয় উপীনদা', কথা দিতে হবে, তবে আমরা রিহার্সেলে নামবো—

শেষ পর্য্যন্ত উপীনকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল। মুখের কথা লইয়া তবে তাহারা চলিয়া গেল!

সন্ধ্যা হইতে জিনিষপত্তর বাধা-ছাঁদা হইতে সুরু হইল।

স্বর্ণময়ী পীতাম্বর সুষমা সকলেই হাত লাগাইল। একটা বিছানা হইল। দু'টা বালিশ—দু'টা বালিশ না হইলে উপীনের ঘুম হয়না। কোনও রকমে দু'তিনজনে মিলিয়া বিছানাটাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। আর বাসন থালা বাটি গেলাস ইহারই একটা পোঁটলা। ছোট একটি মাটির হাঁড়ির মুখটি বেশ ভাল করিয়া কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিয়া স্বর্ণময়ী বলিলেন—এইটিতে খানিকটা ঘি পুরে দিলাম, বুঝলি?…সেখানকার যা' ঘি, কত ভেজাল তার কি ঠিক আছে—

শুধু ঘি-ই নয়, আমসত্ব আচার এমনি আরো কত কি দিয়া জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখা হইল—গোণা হইল: মোট ছয়টি মোট্! কাল সকালেই যাওয়া—অন্ধকার থাকিতে থাকিতে বাহির হইতে হইবে! ষ্টেশন খুব দূরেও নয়, আবার খুব কাছেও নয়। একখানি গরুর গাড়ী না বলিলে চলিবেনা। তা' সে ব্যবস্থা করিলেন পীতাম্বর। পাশেই নন্দ কলুর বাড়ী—সে-ই গাড়ী লইয়া যাইবে কাল।

এক ফাঁকে পীতাম্বর উপীনকে ডাকিয়া বলিলেন—এদিকে এস তো একবার—

উপীন পিছন পিছন চলিল। পীতাম্বর নিজের ঘরে গিয়া বলিলেন—বোস এইখানে—

উপীন বসিল; পীতাম্বর সিন্দুকের চাবি লইয়া সিন্দুক খুলিতে খুলিতে বলিলেন—কত টাকা তোমার দরকার বল ত—একমাস ত ঘর থেকেই খরচ—

উপীন কিছু কথা বলিলনা! এতদিন বাবাকে সে কৃপণ দেখিয়া আসিয়াছে—কিন্তু এই গত কয়দিন ধরিয়া বাবা যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছেন। সে কেমন করিয়া বলিবে—কত টাকা তাহার দরকার।

পীতাম্বর ততক্ষণে সিন্দুক হইতে নোট বাহির করিয়া গণিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া বলিলেন—পঞ্চাশ নয় ষাট্ টাকাই দিলাম। প্রথম মাসটা—কিছু রেখে দিও পোষ্টাপিসে—একটা কথা: দেনা কোরনা—যা' করবে হিসেব করে কোর—

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া উপীন শুইতে গেল। আজ সকলের কেবল নাম মাত্র ঘুমান! কাল ভোরবেলাই যাওয়া—তাহার আগে উঠিতে হইবে! সমস্ত ঠিক বন্দোবস্ত হইয়া আছে! সুষমা কী অনেকক্ষণ বকিয়া বকিয়া উপীনকে জ্বালাতন করিল! শেষে এক সময়ে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; সুষমার নিঃশ্বাস মৃদুগতিতে পড়িতেছে; উপীন আস্তে আস্তে বিছানা ছাড়িয়া উঠিল—উঠিতে গিয়া কালিদাসীর একটা পায়ে একটু চাপ লাগিয়া গেল।… এপাশ ওপাশ করিয়া কালিদাসী আবার নিঃসাড় হইল! এবার অতি সন্তর্পণে উপীন উঠিয়া জামা পরিল, জুতো পরিল—তার পর বাক্সর ভিতর হইতে পঞ্চাশটি টাকা গণিয়া গণিয়া ভাল করিয়া কোটের ভিতরের পকেটে পুরিয়া রাখিল।…তারপর এত নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলিল যে কেহ এতটুকু নড়িলনা—কেহ এতটুকু জাগিলনা—কেহ জানিতে পারিলনা।

ভোর হইতে না হইতে পীতাম্বর উঠিয়াছেন! স্বর্ণময়ী উঠিয়া রান্নাঘরে গিয়া উনুনে আগুন দিলেন: সকালেই উপীন যাইবে—কিছু খাওয়া তাহার দরকার! পীতাম্বর উঠিয়াই তামাক খাইয়া লইয়া গোটাকতক কাজ সারিয়া লইলেন। ইতিমধ্যে নন্দ গাড়ী লইয়া আসিয়া হাজির—স্বর্ণময়ী রান্নাঘরে ছিলেন; পীতাম্বর আসিয়া বলিলেন—উপীন ওঠেনি এখনও—?…তার পর উপীনের ঘরের দিকে গিয়া ডাকিলেন - বৌমা—অ বৌমা—

সুষমা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল; কালিদাসী অঘোরে ঘুমাইতেছে; দরজা ভেজান ছিল। বাহিরে আসিতে পীতাম্বর বলিলেন—উপীন বুঝি ঘুমোচ্ছে?

সুষমা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পীতাম্বর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু উপীন ত বিছানায় নাই! কোথায় গেল তবে! হৈ চৈ পড়িয়া গেল সারা বাড়ীতে! কোথায় গেল তবে! সুষমা হতবাক্ হইয়া গেল। স্বর্ণময়ী রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিলেন! কাহাকেও বলিয়া যায় নাই—কোথায় গেল তবে! আধঘণ্টা কাটিয়া গেল—উপীনের তবু দেখা নাই!

কিন্তু সমাধান হইল কিছু পরেই—

দেখা গেল: টিনের বাক্সটির ওপর উপীনের হাতের লেখা চিঠি পড়িয়া আছে!

পীতাম্বর কম্পিত বক্ষে পড়িয়া চলিলেন—যথা নিয়মে চিঠি আরম্ভ করিয়া উপীন লিখিয়াছে:

বাবা, আমার চাকরীর কথা সমস্ত মিথ্যা! চাকরী আমার কোথাও হয় নাই। কেবল কিছু টাকা হস্তগত করিবার জন্য এই কৌশল করিয়াছিলাম মাত্র! ছোট বেলা হইতে জীবনে একটা পয়সা হাতে পাই নাই—তাই আজ নিজের ভাগ্য পরীক্ষার জন্য এই ক'টি টাকা মিথ্যা কথা বলিয়া আদায় করিয়া চলিয়া যাইতেছি। জীবনে যদি কোনও দিন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারি তবেই ফিরিব—নহিলে নয়! আমায় খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনিবার বৃথা চেষ্টা করিবেননা—নিজগুণে ক্ষমা করিবেন! যদি কোনও দিন তেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি তবেই আবার ফিরিয়া আসিয়া সকলের দেনা শোধ করিব। ইতি আপনার

উপীন।

চিঠিটা পড়িয়া না পীতাম্বর, না স্বর্ণময়ী, না সুষমা কাহারো মুখ দিয়া কথা বাহির হইলনা!

খেলাধূলা

অষ্ট্রেলিয়া—ইংলণ্ডের পঞ্চম টেষ্ট ঃ—

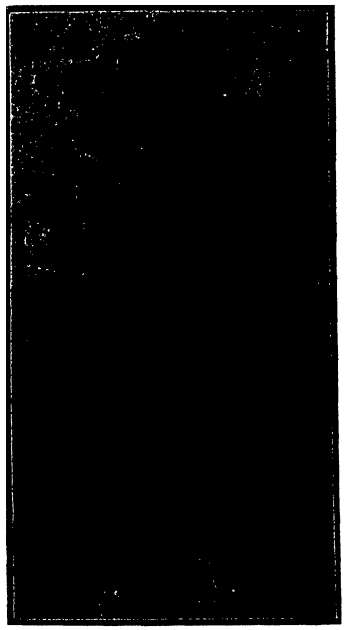
১৮ই আগষ্ট, ওভাল মাঠে পঞ্চম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হ'লো। আব-হাওয়া খুব ভালোই ছিল। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মাঠের অবস্থা চমৎকার। ৯টার সময় পাঁচ হাজার দর্শক এসেছে, ১০-৫৫ মিনিটে ভিড় বেড়ে হলো পনেরো হাজার। মাঠের এক দূরপ্রান্তে অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রাক্‌টিস্ সুরু করলে বেলা ১১টায়।

সাড়ে এগারটায় অষ্ট্রেলিয়া টসে জিতে পনস্‌ফোর্ড ও ব্রাউনকে ব্যাট দিলে, ইংলণ্ডের হয়ে বল দিতে লাগলো বাউস্ ও হ্যামণ্ড। প্রথম ১৮ মিনিটে ১৫ রান হলো। নিকটবর্ত্তী হোটেলের ছাদ থেকে ছবি তোলবার দুটো আলো খেলোয়াড়দের ও দর্শকদের ভারি বিরক্ত করছিলো। ক্লার্ক বাউসের বদলে এসে পঞ্চম বলেই ব্রাউনের বেল-ষ্টাম্প উড়িয়ে দিলে, যখন সে মাত্র ১০ করেছে। ব্র্যাডম্যান এসে যোগ দিলেন। দর্শকরা তাঁকে রাজোচিত ভাবে অভ্যর্থনা করলে। ব্র্যাডম্যান বাউসের বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে সুরু করলেন তার পরেরটা কভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। হ্যামণ্ড বাউসকে ছুটি দিলে। ব্র্যাডম্যান তাকে স্কোয়ারলেগ বাউণ্ডারীতে পাঠালে, আরো পরপর চারটা ৪ করে মোট স্কোর ৫২ করলেন ৫১ মিনিটে। একঘণ্টা খেলায় মোট রান হলো ৬১, পনস্‌ফোর্ড ২৯ আর ব্র্যাডম্যান ১৯। ক্লার্কের জায়গায় এলেন এলো। তার বল পছন্দমাফিক হওয়ায় পনস্‌ফোর্ড বেশ পেটাতে লাগ্‌লেন। দু'জন ব্যাটম্যানই বোলারদের অগ্রাহ্য করে উপর্য্যুপরি বাউণ্ডারী করতে লাগলেন।



উইলিয়াম মল্‌ডেন উড্‌ফুল
অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্‌টেন

ওয়্যাট হ্যামণ্ডকে বদলে ৮৫ স্কোরে ভেরিটিকে আন্‌লে; খেলার ধরণও বদলে গেলো। ব্র্যাডম্যানও আর রান করতে পারলে না, মেডেন হলো। পনস্‌ফোর্ড নিজের ৫০ রান করলে ৮০ মিনিটে। পনস্‌ফোর্ড ৫৩ রানে ওয়্যাটের হাতে বেঁচে গেলো। ওয়্যাট পনস্‌ফোর্ডকে কট্ করবার আর একটা সুযোগ পেয়েও কৃতকার্য্য হলেন না। ব্র্যাডম্যান শত রান পূর্ণ করলেন, ইনিংস্ ৯০ মিনিট খেলার পর। লাঞ্চের সময়, অষ্ট্রেলিয়া ১২৩ রান ১ উইকেটে করেছে। পনস্‌ফোর্ড ৬৬, ব্র্যাডম্যান ৪৩।

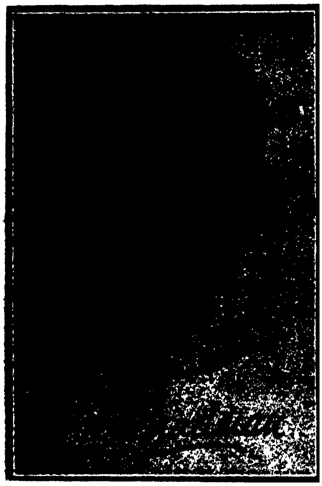


ওয়্যাট (তিন বৎসর বয়সে)
ইংলণ্ডের ক্যাপ্‌টেন

জলযোগের পর খেলা আরম্ভ হলো যখন, ভীড় বেড়েছে ত্রিশহাজারে। ব্র্যাডম্যান বাউসের বলে ৪ করে, পরের ওভারে ক্লার্কের বলেও ৪ করে নিজের ৫০ রান করলেন ৫৯ মিনিটে, তার মধ্যে ৩৬ রান বাউণ্ডারী থেকে হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার ১৫০ রান হ'লো ১৬০ মিনিটে। পনস্‌ফোর্ড আর একবার বাঁচলো—তার একটা জোর মার উলির ডান

হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলো। ইংলণ্ডের আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় ক্লান্তি এসে পড়েছে মনে হয়। ১৭৫ মিনিটে পনস্‌ফোর্ড তার শত রান করলে। ক্লার্কের দুটো বল তার পিঠে লাগলো। ১৬৫ মিনিটে, ব্র্যাডম্যানও নিজের শত রান তুল্‌লেন। ব্র্যাডম্যান চমৎকার খেলেছেন, ১৫ বার বাউণ্ডারী করেছেন। পনস্‌ফোর্ডের সঙ্গে একত্রে ২০০ রান পূর্ণ হলো ১৭০ মিনিটে।

ম্যাক্‌আর্থে ও উড্‌ফুলের সহযোগিতায় দ্বিতীয় উইকেটে লীডসে ১৯২৬ সালে ১৩৫ রান হয়েছিলো। সে রেকর্ড ছাড়িয়ে গেলো। অষ্ট্রেলিয়ার মোট স্কোর ২৫০ উঠ্‌লো সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলে। ৪ ঘণ্টা ৫ মিনিটে



ব্র্যাডম্যান

অষ্ট্রেলিয়ার ৩০০ রান উঠ্‌লো, দ্বিতীয় উইকেটের সকল টেষ্ট রেকর্ড ছাড়িয়ে গেলো। পূর্ব্ব রেকর্ড ছিলো ২৭৪ রান, উড্‌ফুল ও ব্র্যাডম্যানে সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯৩১-৩২ সালে।

ওয়্যাট নিজে বল নিলো ৩৮৭ রানে। এ বৎসরের টেষ্ট খেলায় ইহাই তাঁর প্রথম বোলিং। ব্র্যাডম্যান তার দু'শত রান তুললে ২৮৫ মিনিটে এবং ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার সকল টেষ্ট ম্যাচের রেকর্ড, নিজের ও পনস্‌ফোর্ডের লীডস্ মাঠে এ বৎসরে সর্ব্বোচ্চ স্কোর ৩৮৮ রানকেও ছাড়িয়ে গেলো। খেলা শেষ হবার ঠিক আগেই ব্র্যাডম্যান বাউসের বলে এইম্‌সের হাতে আটকে গেলেন ২৪৪ রান করে। ম্যাক্‌ক্যাব্ এসে ১ রান করলে সেদিনের মতন খেলা শেষ হলো। অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ৪৭৫ রান করেছে।

দ্বিতীয় দিন, বেলা ১০৷৷০টায় আধ ঘণ্টার জোর বৃষ্টি দর্শকদের ভিজিয়ে দিলে। ঢাকার মধ্য দিয়েও জল উইকেটে প্রবেশ করেছে। লোকের আশা হতে লাগলো যে নূতন বল নিয়ে ভিজা মাঠে ইংলণ্ড তাড়াতাড়ি উইকেট নিতে পারবে। ১১টার সময় সূর্য্যদেবও মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারতে লাগ্‌লেন।

১১-১৫ মিনিটে, উড্‌ফুল মাঠের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সঙ্গে মাঠ পরিদর্শন করতে এলে, উইকেটের ঢাকা খোলা হলো ও রোলার দিয়ে দাগ দেওয়া হ'লো। ঠিক ১১·৩০



পনস্‌ফোর্ড

মিনিটে খেলোয়াড়রা দর্শকদের করতালি ধ্বনির সঙ্গে মাঠে নাম্‌লেন। ম্যাক্‌ক্যাব এলেনের বলে সুরু করলে, দুই হ'তে তার এ যাত্রায় হাজার রান পূর্ণ হলো। নূতন বল এলে ম্যাক্‌ক্যাব তাকে বাউণ্ডারীতে পাঠালে। তারপরেই এলেনের বলে বোল্‌ড হয়ে গেলো, মাত্র ১০ রানে। উড্‌ফুল এলেন। পনস্‌ফোর্ড স্কোর ৫০১এ তুললে যখন ইনিংস্ ৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট হ'য়েছে। ৫০১এ এলেনের বদলে বাউস্,, আর ৫০৬এ ক্লার্কের বদলে হ্যামণ্ড বল দিতে এলো। উডফুল হ্যামণ্ডকে লেগে পাঠিয়ে ৩ করলে। ভেরিটি হ্যামণ্ডের জায়গায় ৫২৮এ এলো। দক্ষিণ-পশ্চিম

থেকে জোর বাতাস কাগজের কুচি ও ধূলো উড়িয়ে মাঠে ফেল্‌তে লাগলো। লেল্যাণ্ডের তৎপরতা অনেক রান বাঁচিয়ে দিলে। উলি উড্‌ফুলের জোর-মারের বলটা ফসকে গেলো। পনস্‌ফোর্ড ব্র্যাডম্যানের স্কোর ২৪৪ করতে তাঁর চেয়ে ২ ঘণ্টার বেশী সময় নিলে। ভেরিটির হাতে পনস্‌ফোর্ড আর একবার আশ্চর্য্য রকমে বেঁচে গেলো। ৫ মিনিটের মধ্যে দু' দুটো ক্যাচ্‌ ফসকে যাওয়া ইংলণ্ডের খারাপ ফিল্ডিংএর প্রমাণ।

অষ্ট্রেলিয়ার ৫৫০ রান উঠ্‌লো, ৪৩০ মিনিটে। পনস্‌ফোর্ড নিজের ২৫০ রান তুললে। উড্‌ফুল খুব ধীরে খেলছে, মোটেই সুযোগ নিচ্ছে না। পনস্‌ফোর্ড জোর বল এলেই পিছু ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়, তাতে দর্শকরা ঠাট্টা করেছে। এবারও সেই রকম পিছু ফিরতে গিয়ে নিজেই নিজের উইকেটে আঘাত করে আউট হয়ে গেলো ২৬৬ রানে, ৪৫৫ মিনিট খেলে। পনস্‌ফোর্ড যদিও ছ'বার বেঁচে গেছেন তবু বেশ ভাল ও চৌকস খেলা দেখিয়েছেন, ৫টা পাঁচ আর ২৭টা চার করেছেন। কিপ্যাক্স এসে যোগ দিলেন। তিনি কোন রান করবার আগেই জলযোগের জন্য খেলা বন্ধ হ'লো।



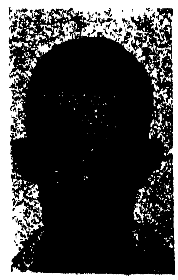
কীটন্‌

লাঞ্চের পর, বিশ হাজার লোকের ভীড় হয়েছে। ক্লার্কের বলে উড্‌ফুল ১ করলে, আর কিপ্যাক্স বাউণ্ডারী করলে। এইম্‌সের উইকেট রক্ষা নিখুঁত হ'চ্ছে—এ পর্য্যন্ত মাত্র একটি বাই হ'য়েছে। কিপ্যাক্সের ১ রান ওয়ালটার্সের এলোপাতাড়ি ছোঁড়ার জন্য ৪ হয়ে গেলো। অষ্ট্রেলিয়ার ৬০১ রান হ'লো, ৪৮৫ মিনিটে। ৬২৬ রানে, বাউসের বলে উড্‌ফুলের উইকেট উড়ে গেলো। তিনি আড়াই ঘণ্টা খেলে ৪৯ রান করেছেন, তার মধ্যে ১টা পাঁচ, ২টা চার। চিপারফিল্ড এলো এবং মাত্র ৩ রান করেই বাউসের বলে বোল্‌ড হয়ে গেলো। বাউস্‌ বেশ ভাল বল দিচ্ছে, ৪ ওভারে ৩ উইকেট নিলে। অষ্ট্রেলিয়া লাঞ্চের পরে ১ ঘণ্টার মধ্যেই ৬৪ রানে ৩ উইকেট খোয়ালে। ওল্ডফিল্ড এসে বাউস্‌কে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে টেষ্ট খেলায় নিজের হাজার রান পূর্ণ করলে যখন অষ্ট্রেলিয়ার স্কোর ৬৫০, ৫৫০ মিনিটে হয়েছে। ওল্ডফিল্ড তেড়ে এসে ভেরিটির বল পিটিয়ে স্কোর তুললে ৭০০। গ্রিমেট ৭ করে এইম্‌সের হাতে আর এব্‌লিং এলেনের বলে ২ করে আউট্‌ হয়ে গেছে। ও'রিলী ৭ করে ক্লার্কের বলে বোল্‌ড হয়ে গেলে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস্‌ মোট ৭০১ রানে ১০ ঘণ্টা ৫ মিনিট খেলার পরে শেষ হ'লো। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং ভাল হয় নি। ৮টা 'ক্যাচ' করতে পারে নি—ওয়্যাট ও উলি প্রত্যেকে ৩টা আর ভেরিটি ২টা।

ইংলণ্ডের পক্ষে ওয়ালটার্স ও সাট্‌ক্লিফ ব্যাট নিলে, আর এব্‌লিং ও ম্যাক্‌ক্যাব বল দিতে লাগ্‌লো। ওয়ালটার্স ২০ মিনিটে ৩০ রান করলে, তার মধ্যে ১৬ বাউণ্ডারীতে।



কিপ্যাক্স



ব্রাউন্‌

দিনের শেষে, ইংলণ্ড এক উইকেটও না খুইয়ে ৯০ রান করেছে, ওয়ালটার্স ৫৯ আর সাটক্লিফ্‌ ৩১।

তৃতীয় দিন, সকালবেলাটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল, বৃষ্টি হবার খুবই সম্ভাবনা। দু'দিনের খেলায় মাঠের কিছুই ক্ষতি হয় নি। ৮টার সময় চার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। সাট্‌ক্লিফ লেল্যাণ্ডকে নিয়ে কয়েক ওভার প্রাক্‌টিস্‌ করে নিলে। খেলা আরম্ভ হবার সময় ভীড় বেড়ে তের হাজার হলো। গ্রিমেট ও ও'রিলী বল দিতে লাগ্‌লো। ব্র্যাডম্যান ব্যাণ্ডেজ করা ডান হাত নিয়েও ফিল্ডিং করতে নেমেছেন। আর ঐ হাতেই ওয়ালটার্সের দুটো জোর মার থামিয়ে বাহবা নিলেন।

সাট্‌ক্লিফ গ্রিমেটের বল লেগ্‌-এ পাঠাতে গিয়ে ওল্ড-

ফিল্ডের হাতে চমৎকার ধরা পড়ে গেলো ৩৮ রানে, ১১০ মিনিট খেলে। উলি এলেন। দর্শকরা তাকে বিশেষ অভিনন্দিত করলে। উলি গ্রিমেটের প্রথম ওভারে দু'টো ১ রান করলে। ওয়ালটার্স ও'রিলীর বল তেড়ে পেটাতে গিয়ে মিড্-অনে কিপ্যাক্সের হাতে সহজে আটকে গেলো, ১১৫ মিনিটে ৬৪ রান করে। তার মধ্যে ৫ বার বাউণ্ডারী হয়েছে। উলি ৪ রানে ম্যাক্‌ক্যাবের হাতে পড়লো। অষ্ট্রেলিয়া ২৫ মিনিটে ২১ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিলে। ওয়্যাট ও হ্যামণ্ড ব্যাট নিলে ও বেশ দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে খেলতে লাগলো। ওয়্যাট ১৭ রান করে গ্রিমেটের বলে আউট হয়ে গেলো। হ্যামণ্ড ৪৫ মিনিটে মাত্র ১০ করেছে। ও'রিলীর বদলে এব্‌লিং বল দিতে এলো, তার বল হ্যামণ্ড যেমন হাঁক্‌রাতে গেছে অমনি ওল্ডফিল্ডের হাতে পড়ে গেলো, ১৫ রান করে। ইংলণ্ড তার ভাল



ওল্ডফিল্ড



এব্‌লিং

ভাল পাঁচটা উইকেট ৭৫ মিনিটে ১৫২ রানের মধ্যেই খুইয়েছে। লেল্যাণ্ড ও এইম্‌স্ খেলতে নামলো।

গ্রিমেট সকাল থেকে ৯০ মিনিট একাদিক্রমে বল দিয়েছে। চিপারফিল্ড এব্‌লিংএর কাছ থেকে ও এব্‌লিং গ্রিমেটের কাছ থেকে বল নিলে। ৬ষ্ঠ উইকেট সহযোগিতায় ৫০ রান হলো ৩৫ মিনিটে। ইংলণ্ডের মোট দুই শত রান উঠ্‌লো ২০৫ মিনিটে।

জলযোগের পর, মাত্র ১৬ রান হ'য়েছে, এইম্‌স্ দৌড়ে একটা রান নিতে গিয়ে পিছনের পেশী জখম হ'য়ে চলে যেতে বাধ্য হলো, ৩৩ রান করে। তখন লেল্যাণ্ডের ৫১ ও মোট স্কোর ২২৭, ৫ উইকেটে। এলেন এলো, এদের দু'জনের খেলাতে দর্শকরা খুসি হলো। লেল্যাণ্ড ও'রিলীর বলে ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম ছয় করলে। ২৫০ রান উঠ্‌লো ২৬০ মিনিটে। এব্‌লিং এলেনের উঁইকেট উড়িয়ে দিলে, যখন সে ১১ করেছে। ভেরিটি এলো ও গ্রিমেটকে সোজা বাউণ্ডারীতে পাঠালে। অষ্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং নিখুঁত—বিশেষতঃ ব্র্যাডম্যানের। লেল্যাণ্ড মোট স্কোর ৩০০ করলে, ৩১০ মিনিটে। তার পরে কভারে একটা বাউণ্ডারী করে নিজের শত রান পূর্ণ করলে, ১৪৫ মিনিট খেলে। ভেরিটি এব্‌লিংএর বলে বোল্‌ড হয়ে গেল, বল তার প্যাডে লেগে উইকেটে লাগলো। আর দশ রান পরে গ্রিমেট লেল্যাণ্ডের উইকেট উড়িয়ে দিলে, যখন সে ১১০ রান করেছে ১৬০ মিনিটে। লেল্যাণ্ড সুন্দর খেলেছে, ১টা ছয় ও ১৫টা চার করেছে। বাউস্ নালীঘায়ের জন্য ও এইম্‌স্ অসহ্য বাত বেদনার জন্য খেলতে না পারায় ইংলণ্ডের ইনিংস্ এইখানেই শেষ হ'তে বাধ্য হ'লো, মোট স্কোর ৩২২এ। উড্‌ফুল ইংলণ্ডকে ফলো-অন্ করালে না। অষ্ট্রেলিয়া ৩৮০ রানে এগিয়ে আছে।

চা পানের পর পনস্‌ফোর্ড ও ব্রাউন ব্যাট নিলে। ইংলণ্ডের পক্ষে উলি উইকেট রক্ষক হলো, আর গ্রেগরী ও ম্যাক্‌মারে বদলি হয়ে ফিল্ডিং করতে নামলো। এলেন ও ক্লার্ক বল দিতে আরম্ভ করলে। ক্লার্কের বলে মাত্র ১ রান করে ব্রাউন এলেনের হাতে ধরা পড়ে গেলো। ব্র্যাডম্যান যোগ দিলেন। ক্লার্ক আবার কৃতকার্য্য হলো, ২২ রানে পনস্‌ফোর্ডকে হ্যামণ্ড লুফ্‌লে, ব্র্যাডম্যান ক্লার্কের বলে ছয় করে পনস্‌ফোর্ডের আউটের শোধ নিলে ও নিজের ৫১ রান ৪৭ মিনিটে করে মোট স্কোর তুললে ৭৩। সাট্‌ক্লিফ ম্যাক্‌ক্যাবকে ফসকে গেলো যখন সে ১৫ করেছে। ম্যাক্‌মারে 'মিড্-অফে' সুন্দর ফিল্ডিং করার জন্য বারবার প্রশংসা পেলো। শত রান উঠ্‌লো, ৮২ মিনিটে। দিনের শেষে, অষ্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে ১৮৫ রান করলে। ব্র্যাডম্যান ৭৬ আর ম্যাক্‌ক্যাব্ ৬০।

শেষদিনে টেষ্ট খেলায় সাধারণের কৌতূহল বিশেষ আর রইল না। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেষ্টে জিত অনিবার্য্য হয়ে গেছে। সকালে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে, মাঠ ভিজে স্যাঁতসেঁতে। বেলা ৯॥টায় মাত্র কয়েক সহস্র দর্শক এসেছে। খেলা আরম্ভ হবার সময় তপনদেব প্রখর তাপ বিতরণ করছেন, মনে হয় দিনটা খট্‌খটে যাবে। ভিজা

মাঠের জন্য, খেলা আরম্ভের সময় দর্শকের ভিড় বেড়ে আট হাজার হলো। সকলেরই আশা ইংলণ্ড বরুণদেবের কল্যাণে সেবারের মতো অসাধারণ কিছু করতে পারে।

এইম্‌স্‌ খেলতে নামে নি। বাউস্‌ নেমেছে ও বল দিতে আরম্ভ করলে।০ তার দ্বিতীয় মধ্যম-কদম শ্রেণীর বলে ব্র্যাডম্যানের উইকেট গেলো দু'ঘণ্টা খেলে ৭৭ রানে। তার মধ্যে একটা ছয় ও সাতটা চার। উড্‌ফুল এসে স্কোর ২০০এ তুললেন ১৪৫ মিনিটে। ক্লার্ক নূতন বল নিলে। ম্যাক্‌ক্যাব দু'ঘণ্টা খেলে ক্লার্কের বলে ওয়ালটার্সের হাতে ৭০ করে গেলেন, ন'বার বাউণ্ডারী করেছেন। ক্লার্কের জায়গায় বাউস্‌ এসে দ্বিতীয় বলেই উড্‌ফুলকে নিলো ১৩ রানে। অষ্ট্রেলিয়া ৫০ মিনিটের মধ্যে মাত্র ৩৮ রান করে ৩ উইকেট খুইয়েছে। বাউস্‌ মধ্যম-কদমের বলে বেশ সফল হ'য়েছে, মাত্র ছয় রান দিয়ে দুটো উইকেট নিলে। কিপ্যাক্স এলো ও প্রথমেই বেশ চালের সঙ্গে কভারে পাঠালে, কিন্তু বেশীক্ষণ টেঁকলো না, মাত্র ৮ করে ক্লার্কের বলে স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীতে ওয়ালটার্সের হাতে আটকালো। দর্শকরা বেশ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলো, যখন বাউসের দ্বিতীয় বলেই হ্যামণ্ড ওল্ডফিল্ডকে লুফলে। বাউস্‌ ১২ রান দিয়ে ৩টা উইকেট নিলে। গ্রিমেট এসে চিপারফিল্ডের সঙ্গে যোগ দিলে ও ক্লার্কের বলকে সুন্দর 'কাট্‌' করে দু'বার বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দিলে। চিপারফিল্ড মোট স্কোর ২৫০এ তুললে, সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলার পরে। চিপারফিল্ড ক্লার্কের বলে উলির হাতে গেলো ১৬ রানে। গ্রিমেটও ১৪ করে বাউসের বলে হ্যামণ্ডের হাতে আট্‌কালো। এব্‌লিং ও ও'রিলী যোগ দিলো। এব্‌লিং দৃঢ় প্রত্যয়শীল হয়ে ব্যাট করছে, বাউসের দুটো বল সোজা পিটিয়ে ৪ করলে। ও'রিলীও ২বার ৪ করলে।

লাঞ্চের পরে, এব্‌লিং ও ও'রিলীতে মিলে ৫০ রান তুললে ৩৫ মিনিটে। তার পর এব্‌লিং এলেনের হাতে স্কোয়ার লেগ-এ অতি সহজে আটকে গেলো ৪১ রান করে, তার মধ্যে ৭বার বাউণ্ডারী ছিলো। দ্বিতীয় ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার মোট ৩২৭ রান হলো।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস্‌ আরম্ভ করলে ওয়ালটার্স ও সাট্‌ক্লিফকে দিয়ে। ওয়ালটার্স মাত্র ১ রানে ম্যাক্‌ক্যাবের বলে আউট হয়ে গেলো। উলি এসে এক রানও না করেই ম্যাক্‌ক্যাবের বল তোল্লা মারায় পনস্‌ফোর্ড তাকে লুফলে। ম্যাক্‌ক্যাব এক রানও না দিয়ে ২টা উইকেট নিলে। হ্যামণ্ড এসে বেশ ভালই খেলছে, একটা ছয় করে স্কোর ৫০ রানে তুললে ৬৫ মিনিটে। সাট্‌ক্লিফও ও'রিলীর বলে ২বার ৪ করলে। পরে গ্রিমেটের বলে ম্যাক্‌ক্যাবের হাতে ২৮ রান করে আউট্‌ হলো। লেল্যাণ্ড এলো ও ৯রান এক ওভারে করলে। ও'রিলী ঢিমে বলে হ্যামণ্ডকে নিজেই লুফলে ৪৩ রানে। ওয়্যাট্‌ এসে ৮৯ রানের মাথায় ও'রিলীর 'নো' বলে ১টা ছয় করলে। শত রান পূর্ণ হলো ২ ঘণ্টা খেলে। ৯ রান পরে লেল্যাণ্ডকে ব্রাউন কভারে চমৎকার লুফলে। ওয়্যাট্‌ ও এলেনে মিলে ১৩ রান করলে ৬ষ্ঠ উইকেটে। ওয়্যাট্‌ পনস্‌ফোর্ডের হাতে 'মিড-অনে' ২২ করে গেলেন যখন মোট রান ১২২ হয়েছে। ভেরিটি



ফ্রাঙ্ক উলি



এলেন

ম্যাক্‌ক্যাবকে একটা সোজা 'ক্যাচ' দিলে, বাউস্‌ও ব্র্যাডম্যানকে লুফতে দিলে ১৪১এ। তার পরে, এলেন গ্রিমেটের বল তেড়ে মারতে গিয়ে ফস্‌কে গেলো, আর ওল্ডফিল্ড তাকে ষ্টাম্প করে দিলে। এইম্‌সের অনুপস্থিতির জন্য ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস্‌ এইখানে শেষ হলো—মোট রান হয়েছে মাত্র ১৪৫।

এলেন ষ্টাম্পগুলি আঁকড়ে তুলে নিয়ে প্যাভিলনে চলে গেলো। অষ্ট্রেলিয়ার দর্শকদের বিপুল আনন্দ ধ্বনি ও আগ্রহে উডফুল ও তাঁর দলকে বারাণ্ডায় এসে দেখা দিয়ে তাদের আনন্দিত করতে হলো।

এই পঞ্চম টেষ্ট শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যত দিন লাগে খেলবার কথা ছিল, অর্থাৎ এক পক্ষকে হার স্বীকার

করতেই হবে। সেই টেষ্টে চার দিনের মধ্যেই অষ্ট্রেলিয়া অনায়াসে ৫৬২ রানে জয়লাভ করলে। ফলো-অন্ করালে এক ইনিংস্ ও ২৩৫ রানে জিত হতো। ১৯৩২ সালে অষ্ট্রেলিয়া এ্যাসেস্ (Ashes) হারিয়েছিল এবার তা' ফিরে পেলে। ক্যাপ্টেন উডফুল তাঁর ৩৭শ জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার স্বরূপ ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার ১৩৪শ টেষ্টে জয়লাভ করলেন।

অষ্ট্রেলিয়া দলের এই টেষ্টের বীর হচ্ছেন,—ব্র্যাডম্যান, পনস্‌ফোর্ড, গ্রিমেট, এব্‌লিং, ও'রিলী ও ওল্ডফিল্ড। এঁদের চমৎকার ব্যাটিংও মারাত্মক বোলিংএর জন্যই উড্‌ফুল খেলায় জয়লাভ করতে পেরেছেন। ইংলণ্ডের পঞ্চম টেষ্টে হারের কারণ কতকটা তার দুরদৃষ্ট আর খেলোয়াড়দের অসুস্থতা ও জখম। তথাপি তারা বেশ সাহসের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত যুঝেছিল। আমরা পরের টেষ্টে তাদের জয়ের আশায় রইলাম।

স্কোর বোর্ড :—

অষ্ট্রেলিয়া

(পঞ্চম টেষ্ট—ওভাল)

প্রথম ইনিংস্			দ্বিতীয় ইনিংস্	
পনস্‌ফোর্ড—হিট্ উইকেট, বোল্‌ড এলেন	২৬৬	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্‌ড ক্লার্ক	২২
ব্রাউন—বোল্‌ড ক্লার্ক	১০	—	কট্ এলেন, বোল্‌ড ক্লার্ক	১
ব্র্যাডম্যান—কট্ এইম্‌স্, বোল্‌ড বাউস্	২৪৪	—	বোল্‌ড বাউস্	৭৭
ম্যাক্‌ক্যাব—বোল্‌ড এলেন	১০	—	কট্ ওয়ালটার্স, বোল্‌ড ক্লার্ক	৭০
উড্‌ফুল—বোল্‌ড বাউস্	৪৯	—	বোল্‌ড বাউস্	১৩
কিপ্যাক্স—এল্ বি ডব লিউ, বোল্‌ড বাউস্	২৮	—	কট্ ওয়ালটার্স, বোল্‌ড ক্লার্ক	৮
চিপারফিল্ড—বোল্‌ড বাউস্	৩	—	কট্ উলি, বোল্‌ড ক্লার্ক	১৬
ওল্ডফিল্ড— নট্ আউট্	৪২	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্‌ড বাউস্	০
গ্রিমেট—কট্ এইম্‌স্, বোল্‌ড এলেন	৭	—	কট্ হ্যামণ্ড, বোল্‌ড বাউস্	১৪
এব্‌লিং—বোল্‌ড এলেন	২	—	কট্ এলেন, বোল্‌ড বাউস্	৪১
ও'রিলী—বোল্‌ড ক্লার্ক	৭	—	নট্ আউট্	১৫
অতিরিক্ত	৩৩		অতিরিক্ত	৫০
	৭০১			৩২৭

ইংলণ্ড

(পঞ্চম টেষ্ট—ওভাল)

প্রথম ইনিংস্			দ্বিতীয় ইনিংস্	
সাট্‌ক্লিফ—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড গ্রিমেট	৩৮	—	কট্ ম্যাক্‌ক্যাব্, বোল্‌ড গ্রিমেট	২৮
ওয়ালটার্স—কট্ কিপ্যাক্স্, বোল্‌ড ও'রিলী	৬৪	—	বোল্‌ড ম্যাক্‌ক্যাব্	১
উলি—কট্ ম্যাক্‌ক্যাব্, বোল্‌ড ও'রিলী	৪	—	কট্ পনস্‌ফোর্ড, বোল্‌ড ম্যাক্‌ক্যাব	০
হ্যামণ্ড—কট্ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড এব্‌লিং	১৫	—	কট্ ও বোল্‌ড ও'রিলী	৪৩
লেল্যাণ্ড—বোল্‌ড গ্রিমেট	১১০	—	কট্ ব্রাউন্, বোল্‌ড গ্রিমেট	১৭
ওয়াট—বোল্‌ড গ্রিমেট	১৭	—	কট্ পনস্‌ফোর্ড, বোল্‌ড গ্রিমেট	২২
এইম্‌স্— (জখম হয়ে চলে গেছে)	৩৩	—	(অসুস্থতা হেতু অনুপস্থিত)	×
এলেন—বোল্‌ড এব্‌লিং	১৯	—	ষ্টাম্পড্ ওল্ডফিল্ড, বোল্‌ড গ্রিমেট	২৬
ভেরিটি—বোল্‌ড এব্‌লিং	১১	—	কট্ ম্যাক্‌ক্যাব্, বোল্‌ড গ্রিমেট	১
ক্লার্ক— নট্ আউট্	২	—	নট্ আউট্	২
বাউস্— (অসুস্থতা হেতু অনুপস্থিত)	×	—	কট্ ব্র্যাডম্যান, বোল্‌ড ও'রিলী	২
অতিরিক্ত	৮	—	অতিরিক্ত	৩
	৩২১			১৪৫

সন্তরণ প্রতিযোগিতা ঃ—

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ন্যাসনাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী সুধা দেবী মেয়েদের ৫০ মিটার (৫৫ গজ) সাঁতার রেসে প্রথম হ'য়েছেন। সময় লেগেছিল ৭০ সেকেণ্ড।

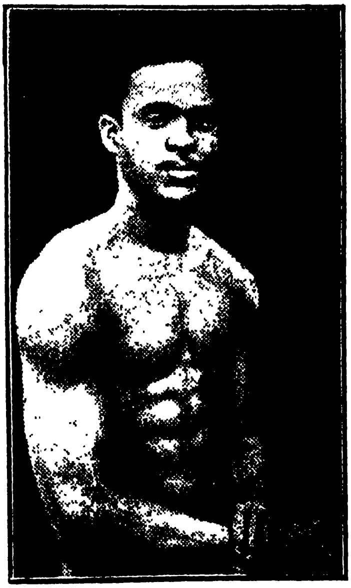


সুধা দেবী

কুমারী বাণী ঘোষ মেয়েদের ১০০ মিটার (১১০ গজ) সাঁতারে প্রথম হয়েছেন এবং পুরুষদের ১০০ মিটার সাঁতারেও যোগ দিয়ে বুক সাঁতারে তৃতীয় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বস্থাপন করেছেন।

ব্যায়াম কৌশলী রণজিৎ মজুমদার—

শরীরচর্চা দ্বারা কি উপায়ে ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থা থেকে শারীরিক উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করা যায়

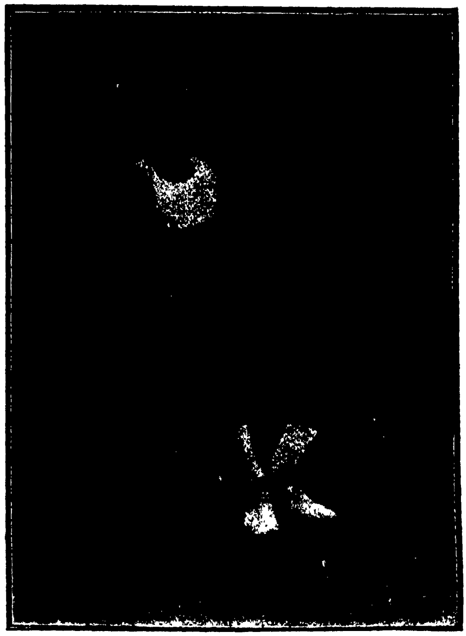


রণজিৎ মজুমদার

তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রণজিৎ মজুমদার। বাল্যকালে ম্যালেরিয়া রোগে একেবারে ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন, কিন্তু শারীরিক শক্তি ও অদ্ভুত ক্রীড়া কৌশলাদি দ্বারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ইনি আজ বাংলার যুবকদের নিকট বিশেষ ভাবে পবিচিত হয়েছেন। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের শরীর শিক্ষা কলেজে কিছুদিন ব্যায়ামচর্চা করে শারীরিক উন্নতি সাধন করেন। পরে ঐ কলেজেই একজন ব্যায়াম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯২৩ সালে প্যারালেল বারের খেলায় বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেন। হাতে পেরেক ঠোকা, হাতের মাংসপেশীর উপরে লৌহদণ্ড বক্রকরণ ইত্যাদি ক্রীড়া প্রদর্শনে ইনি বিশেষ অভিজ্ঞ। পাবনা বনমালী ইনষ্টিটিউটের মেম্বরগণ তাঁর ক্রীড়া কৌশলাদি দেখিয়া স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাঁহাকে একটি মেডেল উপহার দেন। আমরা আশা করি যে ইঁনি কালক্রমে আরও অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশলাদি প্রদর্শন প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিবেন।

বাঙ্গালী ব্যায়াম-বীর ঃ—

প্রায় বৎসরাধিক হইল শ্রীমান কালিদাস বসু ভবানীপুর এথ্‌লেটিক্ ক্লাবের ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত



কালিদাস বসু

মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ব্যায়াম শিক্ষা করছেন। ইঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। অল্পদিন মধ্যেই স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি লাভ করে চুলে ভার উত্তোলন করতে অভ্যাস করেন। এখন চুলে বাঁধিয়া ৩২৮ পাউণ্ড ওজন তুলতে পারেন। কলিকাতায় ও বাহিরে বহু স্থানে চুলের কসরৎ দেখিয়ে তিনি খুব প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। এই তরুণ যুবকের ভবিষ্যতে আরও উন্নতি হউক, আমরা আশা করি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "উড়ো খৈ"—১৷৷৹

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস "রঙীন ফানুস"—২৷৷৹

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "বিদ্রোহী বালক"—১৲

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এসসি প্রণীত "রহস্য-জাল"—১৲

ডাঃ বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী বি-এ প্রণীত উপন্যাস "মানবেন্দ্র"—২৲

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের "ভুতুড়ে বই"—৷৷৹

শ্রীমতী হেমলতা রায় প্রণীত "মহাতাপস"—১৷৹

ডাঃ শ্রীঅজিতশঙ্কর দে প্রণীত "কৃপণের দ্বিতীয় পক্ষ" (রঙ্গনাট্য)—৷৹

কবিরাজ শ্রীগিরিজানাথ রায় কবিরত্ন সঙ্কলিত "মুষ্টিযোগ ও স্বাস্থ্যকথা"—৷৷৴৹

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কৌতুক-নাটক "ভ্রান্তি-বিলাস"—১৲

শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "পায়ে চলার পথে"—২৷৹

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "যমুনাধারা"—২৲

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত ছেলেদের "কাজললতা"—৷৹

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক "মহামানব"—১৲

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর প্রণীত "পৌরাণিকী"—২৷৷৹

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "এগারো-ই ফাল্গুন"—১৷৹

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রণীত উপন্যাস "স্পর্শের প্রভাব"—২৲

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ ডি প্রণীত "বৌদ্ধ যুগের ভূগোল"—১৲

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "জামাই-ই চোর"—৷৴৹

শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "তাই ত !"—৷৹

সুন্ত ঠাকুর প্রণীত কাব্য "ডিঃকণ্টার"—১৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু-সম্পাদিত ছেলেমেয়েদের শারদীয় উপহার "ঝলমল"—১৷৷৹

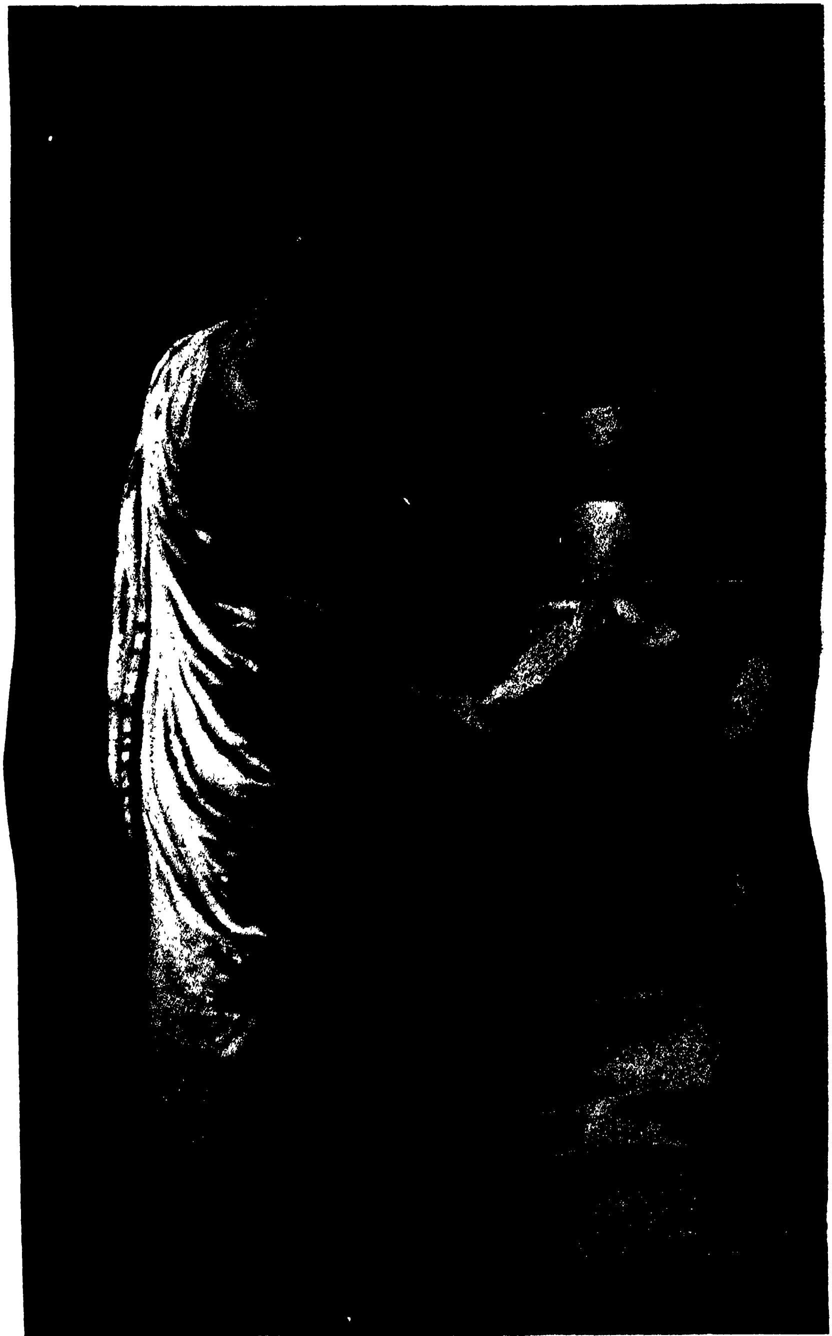
শ্রীরণজিৎ দাস প্রণীত ছেলেদের "টুংটাং"—৷৷৹

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্পের বই "৭০৩"—১৷৷৹

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ ১৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ কার্ত্তিক সংখ্যার বিজ্ঞাপন ১লা আশ্বিন মধ্যে ছাপিতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করিবেন।



Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjea for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons
at the Bharatvarsha Printing Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



সন্ধ্যাবাঃ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



কার্ত্তিক—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

সমাজ ও ধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম্-এ

মানুষের সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ভিত্তি ও আশ্রয় ধর্ম্ম। রাষ্ট্র বা ষ্টেট্ তাহার আইনে সেই ধর্ম্মকে সৃষ্ট করিতে পারে না, পারে বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে এবং সর্ব্বত্র তাহাই করিয়াছে। অনেকেই এ দেশে অধুনা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধিকেই সমষ্টি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং মনে করেন বিভিন্ন সব ধর্ম্মে ও ধর্ম্মানুগত সমাজে ভারতীয় জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক যে ভেদ-বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা লোপ করিয়া একমাত্র রাষ্ট্রীয় সাম্যের ভিত্তিতে সমান রাষ্ট্রীয় স্বার্থে মিলিত নূতন এক জন-সংহতি গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সেই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি লাভ ভারতের হইবেনা। এইরূপ জন সংহতিকে ইংরেজিতে সাধারণতঃ 'নেশন' বলে এবং যে ভাবের প্রেরণা এই সংহতিকে গড়িয়া তোলে এবং তাহার সাধনার পথে তাহাকে পরিচালিত করে, তাহাও 'ন্যাশনালিজম্' নামে পরিচিত। আমরা 'জাতি' ও 'জাতীয়তা' এই দুইটি নামে সাধারণতঃ এই দুইটি কথার অনুবাদ আমাদের ভাষায় করিয়া থাকি। এইরূপ 'জাতীয়' বা 'নেশন' রূপ একটা সংহতি ব্যতীত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি যে বর্ত্তমান এই যুগে সহজে লাভ হইতে পারেনা, এ কথা সত্য। কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মে আশ্রিত বিভিন্ন সমাজ বা সামাজিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সমান স্বার্থের মিলনে নেশন রূপ একটা সংহতি ভারতে গড়িয়া তোলা অসম্ভব কিছু নয়, যদি সামাজিক ভাবে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যেও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সমতার যে সত্য, তাহা অনুভব করিয়া সেই ভাবে সকলে চলিতে পারে। কিন্তু এদিকটায় ইঁহাদের দৃষ্টিই বড় আকৃষ্ট হয়না। মনে করেন, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি লাভ হইলেই সকল সমস্যার সমাধান হইবে, এবং ভারতীয় সমাজকে নূতন সেই স্বরাষ্ট্রই তাহার অনুমোদিত আদর্শে গড়িয়া তুলিবে। কিন্তু তাহার আগে যে 'নেশন' সেই

রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি লাভ করিবে, ধর্ম্মীয় ও সামাজিক সব ভেদ-বৈষম্যের লোপে ইহাদের আদর্শানুরূপ সেই 'নেশন' গড়াই সম্ভব কিনা, এবং সেরূপ কোনও শক্তি কাহারও হাতে আছে কিনা, এ কথাটা ইহারা কখনও ভাবেন বলিয়াও মনে হয়না। ইহাও ইঁহারা ভুলিয়া যান, যে ইয়োরোপের যে গণ-তান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধি লাভ করিতে ইঁহারা চাহেন, সেই গণতান্ত্রিক কোনও রাষ্ট্র ইয়োরোপীয় সমাজকে গড়িয়া তোলে নাই, তুলিয়াছে তাহার বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই সমাজের মধ্যেই তাহার এই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহা সাধারণ সামাজিক ধর্ম্মের পরিপোষক থাকিয়াই সমাজকে রক্ষা করিতেছে, আইনের বলে ভাঙ্গিয়া তাহাকে নূতন আকারে গড়িতেছেনা। ধর্ম্মকে লোপ করিয়া একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইনের শাসনে নূতন একটা সমাজ গড়িতে চেষ্টা করিতেছে নব্য রুষিয়া এবং কতক পরিমাণে নব্য তুরস্ক। কিন্তু কড়া একটা ষ্টেট বা রাষ্ট্রের শাসনে মাত্র নিয়ন্ত্রিত জনগণের আর্থিক বা ব্যবসায়িক এবং সাধারণ ব্যাবহারিক একটা সমবায় ব্যতীত প্রকৃত পক্ষে সমাজ বলিতে মানবের যেরূপ সংহতি বুঝায়, তাহা নব্য রুসিয়া কি নব্য তুরস্ক গড়িতেছে কিনা, গড়িতে পারিবেই কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এরূপ সমবায় যতদিন শাসনের জোর আছে, ততদিনই মাত্র চলিতে পারে। কিন্তু সমাজ রূপ সংহতি এরূপ শাসনের অপেক্ষা বড় রাখে না; ধর্ম্মের বলেই তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহার ক্রিয়া পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রের ভিত্তি ও আশ্রয় তাহার দণ্ড। দণ্ডের ভয়ে লোকে আইন মানিয়া চলে। আর সমাজের ভিত্তি ও আশ্রয় যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মকে লোকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করে, শ্রদ্ধায় আপনা হইতেই তাহার সব অনুশাসন মানিয়া চলে। কোনও নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিলে, বর্জ্জনই মাত্র সমাজের চরম দণ্ড। তবে কোনও কোনও বিষয়ে ধর্ম্মকে রাষ্ট্রের উপরে নির্ভর করিতে হয়। যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন হয়, তখন সেই বিষয়েই মাত্র ধর্ম্মরক্ষায় কি ধর্ম্মদ্রোহী দুষ্টের দমনে রাষ্ট্রীয় দণ্ড প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শিষ্ট সামাজিকবর্গের ধিক্কার, সামাজিক কিছু অর্থ দণ্ড, অথবা বর্জ্জনের উপরে সমাজকে বড় উঠিতে হয়না।

এখন এই ধর্ম্ম কি? 'রিলিজন'? না, এই রিলিজন কথাটাকে বুঝাইতে 'ধর্ম্ম' কথাটাই আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ধর্ম্মের অতি বড় একটা ব্যাপক দ্যোতনা আছে, যাহার বিশিষ্ট একটা ভাব বা অঙ্গ মাত্র এই 'রিলিজন'। ধারণার্থ বা 'ধৃ' ধাতু হইতে 'ধর্ম্ম' কথাটির ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে সনাতন ও শাশ্বত যে সব নীতি লোক-স্থিতিকে সকলের শৃঙ্খলায় ধারণ করিয়া রাখে এবং তাহার বলে অধোগতি রোধ করিয়া অভ্যুদয়ের পথে তাহাকে পরিচালিত করে, তাহাই সেই লোক-স্থিতির বা মানব-সমাজের ধর্ম্ম।

বিশ্বজগৎ—ভগবৎসত্তার ব্যক্ত রূপ এই নিসর্গ—তাহার এক মহা ধর্ম্মে ধৃত, আশ্রিত। মানব জীবন এই নিসর্গেরই বিশিষ্ট একটা ভাব বা রূপ এবং মানব ধর্ম্ম নৈসর্গিক সেই মহাধর্ম্মেরই বিশিষ্ট একটি প্রকাশ। কিন্তু এই প্রকাশ তাহার কি ভাবে কি লক্ষণে হইয়াছে? মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে এই তত্ত্বটি যেরূপ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অপেক্ষা বিশদতর আর কি যে হইতে পারে, তাহাও জানি না।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥"

(অর্থাৎ বেদবিৎ পণ্ডিতগণের পরিজ্ঞাত, রাগদ্বেষমুক্ত সাধুগণের সেবিত এবং শ্রেয়ঃ বলিয়া হৃদয়ে অনুভূত যে ধর্ম্ম, তাহার কথা আপনারা শ্রবণ করুন।)

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভেই এই শ্লোকটি আছে। এই উক্তি করিয়াই ভগবান্ মনুর আদেশে মহর্ষি ভৃগু সমবেত ঋষিবৃন্দের নিকটে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন।

পরবর্ত্তী পঞ্চম শ্লোকে আবার মহর্ষি ভৃগু বলিতেছেন,—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥"

(অর্থাৎ অখিল বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও শীল (অর্থাৎ চরিত্রগত বিশেষ কতকগুলি গুণ), সাধুগণের আচার এবং আত্মতুষ্টি, এই সবই ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ স্বরূপ।)

পর দ্বাদশ শ্লোকে আবার তিনি বলিতেছেন—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

(অর্থাৎ বেদ স্মৃতি সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ এই চারিটি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া ঋষিরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।)

বেদ

ধর্ম্মদ্যোতক এবং ব্রহ্মপ্রতিপাদক চিরন্তন যে সব সত্য আপ্ত বাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণ বুদ্ধিসুলভ যুক্তি-বিচারের অতীত যাহা এবং শ্রদ্ধায় গ্রহণ করিয়া সেই সব আপ্ত বাক্যের প্রদর্শিত পথে চলিয়া ক্রমে সত্য বলিয়াই লোকে যাহা অনুভব করিতে পারে, তাহাই বেদ বা আগম। এই দেশে বিশিষ্ট যে শাস্ত্রে এই সব কথা সঙ্কলিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্রও বেদ নামে পরিচিত। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না, যে 'বেদ' কেবল মাত্র এই ভারতেই প্রকাশিত হইয়াছেন এবং বিশিষ্ট এই শাস্ত্রের বাহিরে বেদ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। পৃথিবীর বহু দেশে, বহু জাতির মধ্যেই আপ্ত ঋষির (অর্থাৎ Prophetদের) আবির্ভাব হইয়াছে, এবং এই সব সত্য তাঁহাদের মুখেও প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব সত্যকে অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং সেই সব ধর্ম্মের যে সব Scriptures বা আদিশাস্ত্র—যেমন বাইবেল কোরাণ আবেস্তা প্রভৃতি—সে সবও এই হিসাবে সেই সব ধর্ম্মের বেদ বা আগম।

তবে এ কথাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে, যে যেমন আমাদের বেদশাস্ত্র, তেমন অন্যান্য দেশেরও বেদশাস্ত্র বা Scriptures সব সঙ্কলিত হইয়াছে, এই সব আদি আপ্ত ঋষিদের আবির্ভাবের অনেক পরে, এবং তাহার পরেও এই সব সঙ্কলনের অনেক অনুলিপি হইয়াছে। ভুলেই হউক কি অন্য যে কোনও কারণেই হউক, এই সব সঙ্কলনে ও অনুলিপিতে এমন অনেক কথা হয়ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা ঠিক আপ্ত বাক্য নহে, অথবা আপ্ত বাক্যের সত্যের জ্যোতিঃ যাহাতে কিছু মলিন বা আবৃত কি বিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জ্ঞানী যাঁহারা, তাঁহারা যে জলের মধ্য হইতে খাঁটি দুধটুকু বাহির করিয়া লইতে না পারেন, তাহা নয়। ভক্তিভরে জ্ঞানী আচার্য্যের কাছে উপনীত হইয়াই তাই বেদাধ্যয়ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

তবে বিভিন্ন ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে (in Creed and Rituals) কোনও কোনও স্থলে পার্থক্য কেবল নহে, বিরোধের ভাবও কিছু কিছু লক্ষিত হয়। ভগবৎ-প্রেরিত এবং ঋষিমুখে প্রকাশিত সত্যই যদি সব ধর্ম্মের মূল হয়, তবে এরূপ কেন হইবে ?

ইহার একটি উত্তর ঋষি উপনিষদে দিয়াছেন—

"যৎভাবং দর্শয়েৎ যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তঞ্চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহং সমুপেতি তম্‌॥"

(অর্থাৎ গুরু যাঁহাকে যে ভাব পরমতত্ত্ব বলিয়া দেখান, তিনি সেই ভাবে ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম সেই ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। সেই ভাবই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ করিয়া রাখে।)

ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ। অনন্ত ভাবে মায়ামুগ্ধ মানব তাঁহাকে ধরিতে পারে না। তবে যে যে ভাবেই তাঁহাকে দেখে বা দেখিতে শেখে, সেই ভাবই তাহার পক্ষে সত্য, সেই ভাবেই সে তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। যে দেশে যে জাতিতে যে যুগে যে ভাবে যে রূপে তিনি ধরা দিয়াছেন, সেই ভাবে সেই রূপেই লোকে তাঁহাকে ধরিয়াছে, বুঝিয়াছে। ধরা দিয়াছেনও তিনি দেশ-কাল-পাত্রের অবস্থানুযায়ী রূপে ও ভাবে। তাই দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, যুগে যুগে, ধর্ম্মমতের বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ও সাধনপ্রণালীর এত বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই। অনন্ত সত্যের এই বৈচিত্র্যময় প্রকাশই মানবের নিকটে সব চেয়ে বড় সত্য।

গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক স্থলে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

আবার মহাভারতে দেখিতে পাই, রাক্ষসের 'কঃ পন্থাঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

অন্যান্য বিষয়ে যত পার্থক্য বা বিরোধই লক্ষিত হউক, 'মহাজনো যেন গতঃ'—সে পন্থা সাধুর উন্নত দৃষ্টিতে এক। আপাত দৃষ্টিতে বহু হইলেও ভগবৎ-প্রাপ্তির মূল পন্থা তাহার প্রকৃতিতে একই। পথের প্রবর্ত্তক তিনি। যে যেমন

অধিকারী, পথ তাহাকে তিনি সেইরূপই দেখাইয়াছেন। সেই একই পথ অধিকারী-ভেদেই যেন ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। যাহা ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে একটা বৈপরীত্য বা বিরোধও অবশ্য দেখা যাইবে। আর একটি তথ্য হইতে আমরা ধরিতে পারি এই, যে মানবত্বে মূল একটা সাম্যের মধ্যেও দেশ কাল-পাত্রভেদে তাহার বহিঃপ্রকৃতিতে একটা বৈষম্য আছে।

স্মৃতি

তার পর স্মৃতির কথা। পুরুষপরম্পরাক্রমে বেদানুগত যে সব সুনীতির পথে লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, এবং এই ভাবে লোকস্থিতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া বিশেষ ভাবে যাহা ধর্ম্মপদবাচ্য হইয়াছে, সেই সব স্মরণ করিয়া যে শাস্ত্রপদ্ধতি ঋষিরা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহারই সাধারণ নাম 'স্মৃতি'। ধর্ম্মবিধির নির্দ্দেশ ও বিবৃতি বিশেষ ভাবে ইহার মধ্যে আছে বলিয়া এই স্মৃতির আরও একটি নাম এদেশে হইয়াছে 'ধর্ম্মশাস্ত্র'।

যুগে যুগে অবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবননীতিরও পরিবর্ত্তন হয়। যে পরিণাম বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বিশ্বসংসারের অপ্রতিবাধ্য ধর্ম্ম, এই পরিবর্ত্তন মানব-জীবনে তাহারই একটা বিশিষ্ট ভাব। মূল কতকগুলি নীতির মধ্যে স্থির থাকিয়া তাহার নিয়ন্ত্রিত পথেই এই পরিণাম বা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিভিন্ন যুগের স্মৃতির বিধিও এই কারণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাতন বিধির, পুরাতন সব নীতির, নির্দ্দেশের স্থলে তাই বহু নূতন নূতন বিধির, নূতন নূতন নীতির, নির্দ্দেশ বিভিন্ন যুগের স্মৃতিতে দেখা যায়। স্মৃতি যদি জাগ্রত ধর্ম্মের শাস্ত্র হয়, কঠোর ভাবে ছাঁদা-বাঁধা একটা 'অচলায়তন' হইয়া তাহা থাকিতে পারে না। এ দেশের স্মৃতিও তাহা থাকে নাই। প্রাচীন কল্পোক্ত ধর্ম্মসূত্র, মনুসংহিতা, অত্রি বিষ্ণু হারীতাদি ঋষিদের প্রবর্ত্তিত পরবর্ত্তী উনবিংশসংহিতা এবং নব্যস্মৃতি যাঁহারা তুলনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই এই সত্যের প্রমাণ পাইবেন।

যেমন বেদ বা আপ্ত বাক্যের শাস্ত্র, তেমনই স্মৃতি বলিতে যে সব ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে বুঝায়, সে সবও যেমন এ দেশে, তেমন অন্যান্য ধর্ম্মানুবর্ত্তী অন্যান্য দেশেও আছে। য়িহুদিদের 'ট্যালমাড' (Talmud), মুসলমানদের 'এজমা' 'কেয়স' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং খৃষ্টানদের 'ক্যানন ল' (Canon Law) এই সব শাস্ত্রের মধ্যে।

সদাচার

বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের যাহা কিছু ব্যবস্থা, সামান্যতঃ বা সাধারণ ভাবেই তাহা সব দেওয়া আছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মানুষ কখন কি করিবে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সব এই শাস্ত্রে বড় পাওয়া যায় না। এই সব বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিভিন্ন সময়ে মানুষের জীবনে এমন অশেষ রকম ঘটে, যে তাহার সম্বন্ধে বাঁধা-ধরা কোনও ব্যবস্থা কোনও শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করাও সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া ধর্ম্মের নীতি কি, কোন্ শাস্ত্র কোন্ অবস্থায় কোন্ কার্য্যে কোন্ আচরণ সুনীতি-সঙ্গত বলিয়াছেন, এবং কেনই বা তাহা সুনীতি সঙ্গত, সর্ব্বদা সকল কার্য্যে এত হিসাব-কিতাব করিয়াও লোকে চলিতে পারে না। শাস্ত্রবিৎ সাধুগণের জীবনের দৃষ্টান্তে এবং পুরুষ পরম্পরাগত লোক-প্রবাদে ও লোক ব্যবহারে ধর্ম্মানুগত জীবনযাত্রার একটা আদর্শ ধারা পড়িয়া যায়। এই ধারাই সদাচারের ধারা, এই পন্থাই 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। ধর্ম্মানুগ লোকশিক্ষা এবং প্রধান ব্যক্তিগণের চরিত্র ও ব্যবহার এই ধারাকে জাগ্রত রাখে এবং ইহার অনুকূল এমন একটা সাধারণ মনোভাবেরও সৃষ্টি করে, যাহাতে সহজেই লোকের চিত্ত ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যানুশীলন, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধান ও ব্যাবহারিক প্রয়োগ, রসচর্চ্চা, শিল্প-সাধনা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিচালনা, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বহু ব্যবহার ইত্যাদি এমন অনেক বিষয়ও আছে, যাহা ঠিক ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশিষ্ট অধিকারের মধ্যে আইসে না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রও অনেক স্থলে এসব বিষয়ে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, মতিগতি ও চরিত্রের নীতি যদি আপনা হইতেই সাধারণ ভাবে ধর্ম্মানুগত হইয়া ওঠে, এসব ক্ষেত্রেও তাহার কর্ম্মের ধারা ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া বড় চলে না। আপনা হইতেই এমন পথে চলে, এমন সব রীতি-নীতি তাহা হইতে গড়িয়া ওঠে, যাহা কেবল ব্যক্তিগত খেয়ালের তৃপ্তি কি স্বার্থসিদ্ধির দিকে নয়, লোকসমাজের মঙ্গলের দিকেই, সকল প্রচেষ্টাকে, সকল

ব্যবহারকে পরিচালিত করে। এই সব রীতি-নীতি এই সব ক্ষেত্রে তখন প্রায় শাস্ত্র-বিধিরই অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। সাধারণতঃ 'লোকাচার' বা 'দেশাচার' নামে ইহা পরিচিত। 'সদাচার' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই সমপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া আমরা ইহাকে ধরিয়া লইতে পারি। তবে ইহা অবস্থানুসারে প্রয়োজন মত যেমন গড়ে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে প্রয়োজনমত তেমন আবার বদলায়ও।

কাজ কর্ম্মের এবং লোক-ব্যবহারের যে সব নিয়ম মোটের উপর জীবনযাত্রার স্বচ্ছন্দতায় সহায়তা করে, জীবনযাত্রাকে প্রীতিকর করিয়া তোলে, অথবা বিশেষ কোনও কোনও অবস্থায় যাহা ব্যতীত জীবনযাত্রা সম্ভবই হয় না, সেই সব নিয়মই ক্রমে স্থায়ী আচারে (custom বা conventionএ) পরিণত হয়। কোনও রূপ আচার-পদ্ধতি যদি দীর্ঘকাল যাবৎ কোনও সমাজে চলিয়া আসিতেছে দেখা যায়, বুঝিতে হইবে, মোটের উপর মঙ্গলই তাহাতে হইতেছে। কেন, কি ভাবে হইতেছে, সর্ব্বদা তাহা বুঝা যায় না। জীবনযাত্রার প্রচলিত কোনও 'থিওরী' (Theory) বা মতবাদ অনুসারে তেমন কোনও যুক্তিসঙ্গতিও হয় ত ইহাতে দেখা যাইবে না। কিন্তু তবু হইতেছে। এই সব মানিয়া চলাতেই জীবনযাত্রা লোকের স্বচ্ছন্দ ও প্রীতিকর হইতেছে, কোনও বাধা কি অসুবিধা কেহ বড় বোধ করিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষ কখনও কিছু করিলেও মোটের উপর যে স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ দশ জনে ইহার অনুবর্ত্তনে ভোগ করিতেছে, তাহার তুলনায় ইহা নগণ্য। দেশ কাল-পাত্র সম্বন্ধীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনে বিশেষ কোনও আচার (custom বা convention) যখনই লোকযাত্রার সুখস্বচ্ছন্দতার এবং মঙ্গল কি উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়, আপনা হইতেই তাহা পরিবর্ত্তিত হয়, কখনও একেবারেই লোপ পায়। পরিবর্ত্তিত অবস্থার অনুরূপ নূতন আচার-ব্যবহার আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচারের দাস এবং এই দাসত্ব হেতু কোনও উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে না, এইরূপ অভিযোগ অনেকেই ইহার বিরুদ্ধে করিয়া থাকেন। কিন্তু গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে, লক্ষ্য যদি কেহ করিয়া থাকেন, তিনি বলিবেন, এই বিষয়ে প্রায় একটা যুগান্তর ইহার মধ্যে হইয়া গিয়াছে। এ-সব পরিবর্ত্তন অবস্থার পরিবর্ত্তনে সময়ে সময়ে এমন করিয়াই হয়। আচার ব্যবহার এই ভাবেই আসে, এই ভাবেই চলে, আবার এই ভাবেই যখন যেমন দরকার বদলায়। স্বাভাবিক পথে সমাজ-জীবনের স্বচ্ছন্দ গতির লক্ষণই এই। তবে এই গতি কখনও ঊর্দ্ধ দিকে, কখনও অধো দিকেও ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান এই গতি সর্ব্বথা ঊর্দ্ধ দিকেই ঘটিতেছে, এমন কথা বলা যায় না। তবে পূর্ব্বে স্মৃতিমার্গের কথা যেমন বলিয়াছি, আচার-মার্গেও যুগে যুগে এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

আত্মতুষ্টি

এখন আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদের কথা। পূর্ব্বে উদ্ধৃত তিনটি শ্লোকে তিনটি কথায় মহর্ষি ভৃগু এই সত্যটিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ', আত্মন স্তুষ্টি,
'স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ'।

মূল সত্তায় মানুষ 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিত্য মুক্ত স্বভাববান্'। সৎস্বরূপে যাহা সে সত্য বলিয়া না অনুভব করিবে, চিৎস্বরূপে যাহা ভাল বলিয়া না জানিবে বা বুঝিবে, আনন্দ স্বরূপে যাহা তাহার প্রীতিকর না হইবে, তাহা সে শ্রদ্ধার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। 'নিত্য মুক্ত স্বভাববান্' সে, ধর্ম্মের পথে তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই চলিতে হইবে। নতুবা সে পথ তাহার দাসত্বের পথই হইতে পারে; 'মুক্ত' ও 'স্বভাববান্' মানবের যোগ্য পথ হইতে পারে না।

কিন্তু মানব যদি সত্যসত্যই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ও নিত্য মুক্ত স্বভাববান্ স্বয়ং ভগবানেরই প্রতিকৃতি হয়, তবে তাহার চিত্তে প্রতিভাত ধর্ম্মের উপরে আবার বেদাদি প্রদর্শিত ধর্ম্মের কি আবশ্যকতা আছে? তাহার কি অধিকারই বা মানবের সেই নিজস্ব ধর্ম্মের উপরে থাকিতে পারে?

এইখানে বড় একটি সত্যকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না। বেদস্মৃতি-সদাচারে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং মানবের আত্ম-চিত্তে যাহা প্রতীত বা অনুভূত হয়, দুই-ই একই মহাধর্ম্মের দুইটি দিক্ মাত্র। উভয়ে উভয়ের সাপেক্ষ ও সমঞ্জস; একটি অপরটির বিরোধী নহে।

জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ, জীবের অন্তরে অন্তরে স্বয়ং যে ভগবান্ শিব বিরাজ করিতেছেন, আগমোক্ত এই সত্যই তাহার প্রমাণ। এই সত্যেই সে 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ' ও 'নিত্য মুক্ত স্বভাববান্'। এই সত্যের সমগ্রতায় যাহা বুঝায়, সবই মানুষকে বুঝিয়া নিতে হইবে। একটি দিক্ মাত্র ধরিয়া কেবল তাহারই ভাবে যাহা খুসী তাই সে করিতে পারে না, সে অধিকারও তাহার নাই।

যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই ইহার ধারকশক্তি বা ধর্ম্ম হইয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নিসর্গ-সংঘাতে ইহাই নিসর্গধর্ম্ম, মানব সংঘাতে ইহাই মানবধর্ম্ম। ইংরেজি কথায় বলা যাইতে পারে, Cosmic orderএর মধ্যে Moral order অথবা, Moral order রূপে Cosmic orderএর একটা বিশিষ্ট ভাব। এই মানবধর্ম্ম বা moral order সমষ্টির দিক্ হইতে বেদ-স্মৃতি-সদাচার বলিতে যাহা বুঝায়, তাহারই স্বরূপে মানব-সমাজে ব্যক্ত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক মানব ক্ষুদ্র ভাবে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতিরূপ ক্ষুদ্র এক একটি ব্রহ্মাণ্ড —ইংরেজি কথায় macrocosmএর মধ্যে microcosm। পরমাত্মার জীবাত্মারূপে প্রকাশ যে মানব, মানবত্বের মূল সত্তায় সে যে ব্রহ্মস্ফুলিঙ্গ, এই সত্যই তাহাকে জীবাত্মার পূর্ণ স্বভাবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপতা দিয়াছে। সুতরাং বহির্বিশ্বের এই মানবধর্ম্ম বা moral order সূক্ষ্মভাবে প্রত্যেক মানবের অন্তরে রহিয়াছে। সহজ যে ধর্ম্ম বুদ্ধি মানবের অন্তরে আছে, যাহার প্রভাবে ভাল মন্দ সে অনুভব করে, তাহার মূলই হইতেছে মানুষের অন্তরস্থিত এই moral order বা মানবধর্ম্মের সূক্ষ্ম প্রতিরূপ। ঋষি ও মহাজনগণ যে সব ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, বেদ-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং অন্যান্য বহু ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা সঙ্কলিত আছে, তাহা যখন আমরা পড়ি, কি কোনও আচার্য্যের মুখে শুনি, অথবা যখন কোনও সাধু-জীবনের সংস্পর্শে আসি, অন্তরে অন্তরে আমরা অনুভব করি, হাঁ, ইহাই সত্য, ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই সার্থক মানবজীবনের আদর্শ! সমস্ত চিত্ত অতি আগ্রহে ইহার দিকে উদ্বেলিত হইয়া ওঠে, ইহাকেই আপন ধর্ম্ম বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে চাই, ইহারই সত্তার সঙ্গে আপনার অন্তর্বৃত্তিকে মিলাইয়া যেন এক করিয়া দিতে চাই। কারণ এই ধর্ম্মই আমার অন্তরে আমার ধর্ম্ম হইয়া আছে, এক তারে ইহা তাহার সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে। একটিতে ঘা পড়িলে আর একটিও সমান সুরে বাজিয়া ওঠে।

স্মৃতি ও সদাচারে বাহিরে ধর্ম্মের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, সাধারণতঃ 'ধর্ম্মনীতি' এই নাম তাহাকে আমরা দিতে পারি। এই ধর্ম্মনীতি ও আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের যে স্বরূপ রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যে সমান এক তারে বাঁধা নিবিড় এই যোগসূত্রের যে সত্য, তাহা যদি আমরা অনুভব করিতে পারি, তবে বহিঃপ্রকাশিত ও প্রচলিত সেই ধর্ম্মনীতির সঙ্গে বিরোধ ত করিবই না, আগ্রহে আপনা-হইতেই বরং তাহার পথে চলিতে চাহিব। তাহার জন্য পার্থিব স্বার্থ কি পার্থিব ভোগসুখ যদি বহু ত্যাগ করিতে হয়, দৈহিক ক্লেশও যদি বহু সহ্য করিতে হয়, অনায়াসে তাহা করিতে পারিব, এবং তাহাতে আনন্দ বই কোনও দুঃখ কখনও অনুভব করিব না।

তবে ধর্ম্মনীতি অনেক সময়ে বিকৃত হইতে পারে। এই সম্বন্ধের সত্য সকল মানবের চিত্তে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে না। নানা কারণে অযোগ্য লোকের হাতেও ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব গিয়া পড়ে। কখনও ভুল বুঝিয়া, কখনও নিজেদের স্বার্থবুদ্ধি করে, এমন অনেক নীতির প্রবর্ত্তন ইহারা করেন, যাহা ঠিক সত্য ধর্ম্মের নীতি নহে; এবং কতক নানা কৌশলে লোকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া, কতক বা অন্যায় শাসনে বাধ্য করিয়া, জন-সমাজকে তাহার পথে পরিচালিত করিতে চাহেন। সাধারণতঃ এইভাবেই ধর্ম্মনীতি বিকৃত হইয়া পড়ে। আবার কখনও মানবজীবনের নূতন কোনও পরিণতিতে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে, পুরাতন বহু নীতি অচল হইয়া পড়ে; পুরাতনের পরিবর্ত্তন ও নূতনের প্রবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ধর্ম্মনীতির ধারক যাঁহারা, তাঁহারা অনেক সময়ে উচ্চতর জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে নূতন অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারেন না, পুরাতনকেই ধরিয়া রাখিতে চান। ইহাকেও ধর্ম্মের একরূপ বিকারের লক্ষণ বলা যাইতে পারে।

এই বিকার যখন বড় বেশী হইয়া ওঠে, প্রচলিত ধর্ম্ম-নীতির সঙ্গে আত্মপ্রতীত ও আত্মপ্রীতিকর ধর্ম্মের মিল রাখিয়া লোকে চলিতে পারে না, জীবন-যাত্রার পথে পদে পদে এরূপ বাধাই অনুভব করে, লোকমত তখন ইহার বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া ওঠে, এবং এই বিকার ব্যাধির প্রতিকারকল্পে ধর্ম্মনীতির সংস্কারের প্রয়োজন হয়।

যথাযোগ্য কালে ধর্ম্মবিৎ ও ধর্ম্মশীল নায়কদের আবির্ভাবে যুগে যুগে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মনীতির সংস্কার হইয়াছে। সংস্কারই ইহাঁরা করিয়াছেন; অসত্যের অভিভাব হইতে সত্যকে, অপধর্ম্মের চাপ হইতে ধর্ম্মকে, ইহাঁরা উদ্ধার করিয়াছেন। এই সত্য কেবলই অসত্য, ধর্ম্ম কেবলই অপধর্ম্ম, এইরূপ মনে করিয়া একেবারে তাহাকে লোপ করিয়া ফেলিতে অথবা মানবজীবনকে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহেন নাই।

আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াছি এই, যে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে অন্তরস্থিত আত্মধর্ম্মের সম্বন্ধের সত্য সর্ব্বদা সকলে অনুভব করিতে পারেনা। অনেকেই যে পারেনা, একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, এমন সকলের কাছেই ইহা এমন একটা প্রত্যক্ষ সত্য, যে কোনও প্রমাণ দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন হয়না। তবে কেন পারেনা, এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন সকলেরই মনে উঠিতে পারে। মূল সত্তায় জীব সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ বটে, কিন্তু এই স্বরূপতা মায়ার আবরণে আবৃত। এই আবরণ যে জীবে যত ঘন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ তাহাতে তত ম্লান, তত অপরিস্ফুট। এই আবরণই—অন্য কথায় প্রকৃতি সম্ভব রজস্তমো গুণের অভিভাবই জীবকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। জীবের জীবত্বের স্বভাবই হইল এই। এই আবরণ যে অধিকাংশ জীবের পক্ষেই অতি ঘন, প্রকৃতি সম্ভব রাজস ও তামস গুণের অভিভাবই যে জীবস্বভাবে সাধারণতঃ অতি প্রবল, এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা। কিন্তু কেন যে ব্রহ্মস্বরূপ বা শিবরূপ জীব মায়ার জালে জড়িত হন, এই রহস্যের ভেদ কেহই করিতে পারেন নাই। শিবের ইচ্ছাই এই, মহাযোগিনী মহামায়ার লীলাই এই, এই ভাবেই শিব জীব হইয়াছেন, ইহার উপরে মানবের বুদ্ধি পৌছিতে পারে নাই।

কিন্তু জীব ত বহুকাল জন্মিয়াছে; জন্মের পর কত জন্ম তাহার গত হইয়াছে। এই জালের কবল হইতে মুক্তির পথেও বহু জীব বহু দুর অগ্রসর হইয়াছে। ব্রহ্মজ্যোতিঃও অনেকের মধ্যে অনেক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকলের মধ্যে সমানভাবে ফোটে নাই কেন? সকলেই সমানভাবে এই মুক্তির পথে অগ্রসর হয় নাই কেন? ইহাও জীব জীবনের আর একটি বড় রহস্য। এই রহস্যের একটা উত্তর তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ দিয়াছেন। মানবরূপে সকল জীবের জীবনযাত্রা ঠিক একই সময়ে সমান একপথে আরম্ভ হয় নাই। যে ভাব লইয়া যে পথেই যে যখন যাত্রা আরম্ভ করুক, যথাসময়ে সকলেই এই আবরণের জাল হইতে মুক্ত হইয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্ম জ্যোতিঃতে পরা স্থিতি লাভ করিবে। যে যত পুরাতন যাত্রী, সে তত আগে গিয়াছে। নূতন যাত্রী পিছনে রহিয়াছে। পথ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সকল পথই সেই এক ব্রহ্মমহালয়ের অভিমুখে চলিয়াছে। পথের মধ্যে যাত্রী যেখানেই যে থাক্, সেই মহালয়ে গিয়া একদিন উপনীত হইবেই। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, এক জাতির মধ্যেও সমাজের স্তরে স্তরে, যে ভেদ বা বৈষম্য দেখা যায়, তাহার তত্ত্ব এই। এই ভেদ চিরন্তন বা নিত্য ভেদ নহে, সাময়িক বা আপেক্ষিক ভেদমাত্র। কিন্তু সাময়িক বা আপেক্ষিক হইলেও, যতদিন আছে, ততদিন সত্য। এবং এই সত্যকে অঙ্গীকার করিয়া আমাদের চলিতেই হইবে।

যাহা হউক, ধর্ম্মনীতির সঙ্গে আত্মপ্রতীতির ও আত্মতুষ্টির এই যোগের সত্য বহু লোকের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই বলিয়াই যে আপন আপন মায়ামুগ্ধ চিত্তের গতি অনুসারে অথবা রাজস ও তামস প্রকৃতির প্রেরণায় অবাধে সকলে চলুক, তারপর যতদিনে যাহার পক্ষে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে উঠুক, এ ভাবেও মানুষকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। ভগবদভিপ্রায়ও সেরূপ নহে। তাহা যদি হইত, আত্মপ্রতীতি ও আত্মতুষ্টির বাহিরে বেদ স্মৃতি-সদাচারে ধর্ম্মনীতির বহিঃপ্রকাশ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠাও লোক-সমাজে হইত না। প্রবৃত্তিমুখ মানুষকে নিবৃত্তিমুখ করিয়া সমষ্টিভাবে লোকস্থিতি রক্ষার জন্য এবং ব্যষ্টিভাবেও মানবের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবদিচ্ছায়ই ইহা হইয়াছে। শিষ্ট সমাজে ইহার অনুশীলনে সুনীতির যে একটা আদর্শধারা পড়িয়া যায়, যথোপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষাদির প্রভাবে ও সাধুদৃষ্টান্তে তাহার পথে চলিতে মানুষ যত অভ্যস্ত হয়, তত সে অনুভব করে বাহিরের এই ধর্ম্ম ও তাহার অন্তরের ধর্ম্ম এক এবং ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তিতায় যে আত্মতুষ্টি বা আত্মপ্রসাদ সে লাভ করে, ইহার বিরোধী কোনও সম্ভোগের সাধ্য নাই তাহা তাহাকে দিতে পারে। বিষবৎ তখন সে ইহা বর্জ্জন করিতে আগ্রহশীল হইয়া উঠে।



শেষের পরিচয়

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারি অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা ?

—খাবো বই কি। যেদিন বলবে।

—তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবেনা কেউ শুনবেনা।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন ? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি ?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপি-চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনে।

—সত্যি পারোনা, না বলতে হয় তাই বলচো ?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবোনা, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল বেশ, তাই হবে - পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশি নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিলনা। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়ত আপনার রাত হবে, - কিম্বা হয়ত ভুলেই যাবেন আসবেননা।

—ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই ?

—দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতে নাই। রাখাল খুসি হইয়া বলিল, ঠিক এম্‌নিই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে। কত জিনিস হয়ত ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি।

সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেব্‌তা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হতোনা, হয়ত করতুমও —নষ্টও হতো।

—ভালো বুদ্ধি তোমার !

—ভালোই ত। নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় ত কম নয়। দেনা শোধ করেনা আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল,-টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবেনা, ভাবতেও হবেনা। কেবল খাতাটা দাও আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তাহলে ছাড়-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেননা আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারি দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলেনা?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেব্‌তা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে কেউ চিনতেই পারেনা।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যিই আমাকে তিনি চিনতে পারেননি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিলনা।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

—উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

—বললে ভার নিতে?

—নিতুম বই কি। ভেবেছেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে মেয়েরা পারেনা? পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

—ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এই জন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুমনা তো,—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করেননি কেন? সত্যি বলুননা।

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে। সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবোনা আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিলনা বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরিব বলে। জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিচ্ছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেব্‌তা। গরিব বলে কি মানুষের বিয়ে হবেনা? তার সে অধিকার নেই? জগতে তারা এম্‌নি আসবে আর যাবে কোথাও বাসা বাঁধবেনা? কিন্তু সে তো নয়, আসলে আপনি ভারি ভীতু লোক,—কিচ্ছু সাহস নেই।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ,—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

—কিন্তু ভাগ্য ত চিরকালই অনিশ্চিত দেব্‌তা, সে ছোট-বড় বিচার করেনা আপন নিয়মে আপনি চলে যায়।

—তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই। নিজেকে ত বদলাতে পারবোনা সারদা।

—না-ই বা পারলেন। যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে,—নইলে কিসের স্ত্রী? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

—করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে নইলে কিছুতে আমি ছাড়বোনা। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিলনা বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরিবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়। কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরিবের সৃষ্টি করেননি। এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সে না পারে,

—শিখতে না যদি চায় তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ-কথা সে বুঝবেনা, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারেনা দেব্‌তা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবোনা।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিলনা যে মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায়না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কই কিছুই ত বললেননা দেব্‌তা?

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে? ভাবতে সময় লাগে যে!

—সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি?

—সে কথা আজই বলবো কি ক'রে সারদা? যেদিন নিজে পাবো উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজ্জে মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না তো! একটু পরে বলিল, পরশু বোধহয় আমরা হরিণপুরে যাচ্চি দেব্‌তা।

—পরশু? তারকের ও-খানে?

—হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়ীতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

—যাওয়া স্থির হলো কি ক'রে?

—কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

—তারক এসেছিল কলকাতায়? কই, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি!

—একদিন বই ত ছুটি নয়,—দুপুর বেলায় এলেন আবার সন্ধ্যার গাড়ীতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

—ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারি বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেননা দেব্‌তা।

রাখাল স্বীকার করিল, না আমি পারতামনা সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্ব্বল।

—কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেননি। তারকবাবু বলছিলেন চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলেনা কেন? তার জবাবটা হয়ত আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ, জিজ্ঞেসা করবো। কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবেনা। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর উপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

—কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েছে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিলনা।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট যায়গার ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েছে সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েছে মাথা হেঁট করে, তাই সহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার না তার সারদা?

—না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

—শুনে নতুন-মা কি বললেন?

—শুনে মা খুসিই হলেন। বললেন তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

—করবেন কি ক'রে?

সারদা বলিল, শক্ত নয়তো দেব্‌তা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানেনা। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বল্‌চি।

মিনিট কয়েক পরে হাত-মুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তারপরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

—চলে গেছেন? কই না। কোথায় গেছেন?

—কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন কিন্তু এখানে আর আসেননা। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিলনা -কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল ক'রে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছ থেকে জীবনবাঃও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘট্‌তোই কিন্তু উপলক্ষ্য হলেন আপনি। সেই যে বেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙে গড়লো, এ-ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেননা। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই ই,—নইলে বাঁচবোনা। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তারপরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ী, কিন্তু সব খালি সব শূন্য। নোটিশ ঝুলছে বাড়ী ভাড়া দেবার। জানা গেলনা কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়ত বেঁচে আছে,—হয়ত বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলচে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু-চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম,—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে,—বললেন চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটী-পতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না সে হবেনা। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা' নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ-দেখানো ছিল বোধকরি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলামনা। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছু কাল আগে ছবি আপনার দেখেছি, আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারেনা, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি,—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ী আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্ব্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেননা?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

—না আমি যেতে পারবোনা।

তারপরে সুরু হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে-যে কত কটু আমি বলতে পারবোনা দেব্‌তা। ঘূর্ণি

হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে যত ছিল নোঙরামির আবর্জ্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলোনা যে মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়,—রক্ষিতা। সতীর মুখোস প'রে ছদ্মবেশে রয়েছে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি এক-পাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এত বড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেব্‌তা ?

রাখাল নিষ্পলক চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া ছিল এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্ত্তি।

রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কি না বলো ? ভাবচো কি বসে ?

মার কণ্ঠস্বর পূর্ব্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম। কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙেচে। আর তুমি এসোনা এ-বাড়ীতে, আর যেননা আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ বাড়ী কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ী আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ-জবাব রমণীবাবু আশা করেননি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো,—ভয় পেয়ে নানা ভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েছে কিছুতেই সে আর ফিরবেনা।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা' কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে ?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মা'র অপমান তাঁর কি-যে লাগলো,—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ী কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুসি করিতে পারিলনা, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়ত তাঁর কাছে কিছুই নয়,—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়।

সারদা বলিল, হয়ত তিনি আর পর নয়, হয়ত নেওয়ার চেয়ে না-নেওয়ায় অন্যায় হতো ঢের বেশি।

রাখাল বলিল, এ-ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়ত দেখা হবে।

সারদা তড়িৎ বেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন ক'রে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবোনা।

—তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে,—যাবোনা ?

—যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেননা ?

—আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার সর্ত্তও তো ছিলনা। চুপি-চুপি এসে তেমনি চুপি-চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না সে সর্ত্ত আর আমি মানবোনা। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই ?

রাখাল বলিল, যে-প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে —সে কখনো ঘুচবেনা,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখ্‌তে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিলনা, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি

চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি, দেব্‌তা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেব্‌তা বলে ডাকি দেব্‌তা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবেনা।

—আমি না বললে যাওয়া হবেনা? তার মানে?

—মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হ'লে তার মত নিতে হয় মা। জানি রাজু বারণ করবেনা কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবোনা সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিলনা, তথাপি [illegible] অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বোলো তাঁকে কাল আসবো পায়ের ধূলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলনা। (ক্রমশঃ)

আদি দ্বারবতী ও রৈবতক সন্দর্শনে

অধ্যাপক শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উপরকোটের প্রবেশ-দ্বারটি সঙ্কীর্ণ,—বোধ হইল, হাত আটেকের বেশী প্রশস্ত হইবে না। প্রবেশ-দ্বারের পরেই একটি তোরণ,—দুই ধার হইতে প্রস্তরখণ্ড বাড়াইয়া বাড়াইয়া তোরণ গঠন করা হইয়াছে,—খিলানের সাহায্য লওয়া হয় নাই। এই সুদৃশ্য তোরণটি প্রাচীনতম কাল হইতেই আছে,—না রায় গ্রহরিপু কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত,—শুধু দূর হইতে চোখে দেখিয়া তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। খিলানের অভাব প্রাচীনত্ব সূচনা করে বটে, কিন্তু একমাত্র ইহা দেখিয়াই প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা নিরাপদ নহে। গাড়ী অগ্রসর হইয়া কিছু দূর যাইয়া থামিল। নবাব আলি সাহেব গাড়ীতেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার বন্ধুটি আমাকে লইয়া গাড়ী হইতে



জুনাগড় সহর ও উপরকোট দুর্গ

নামিলেন। দুর্গ-দেওয়ালের পশ্চিম ধারের মাঝামাঝি একটি উন্নত স্থানে যাইয়া পৌছিলাম। এখানে প্রকাণ্ড-কায় একটি লোহার কামান পড়িয়া ছিল। উহার গায়ে একটি পারসী লিপি খোদিত। কামানটি পশ্চিম-মুখ করিয়া স্থাপিত। এই কামানের সহায়তায় দুর্গের পশ্চিমাংশ রক্ষা করা হইত। জুনাগড়ের আদি মুসলমান নবাবগণের একজন (নাম ভুলিয়া গিয়াছি) কামানটি এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, লিপিতে তাহাই লিখিত আছে।

নির্ম্মিত মস্‌জিদ আছে; ইহাও জুনাগড়ের আদি নবাব-গণের কাহারও কীর্ত্তি। গাড়ী যাইয়া মসজিদের দরজায় দাঁড়াইল। আমরা সকলেই নামিয়া গেলাম। মসজিদটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া এক ধারের এক সীঁড়ি দিয়া উহার ছাতে চলিয়া গেলাম। ছাতটি সমতল, গম্বুজওয়ালা নহে। উহার ছাতে দাঁড়াইয়া পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া রৈবতকের যে ভীমকান্ত মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল, তাহার কি বর্ণনা করিব? পাঠকগণ ছবিতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইবেন।



উপরকোটের মসজিদের ছাত হইতে রৈবতক—(একশত বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র হইতে]

এই স্থানে দাঁড়াইয়া সমস্ত সহরটি ছবির মত দেখা যাইতে লাগিল। পশ্চিমে বহু দূর পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হইল। দুর্গ রক্ষাকারিগণ জুনাগড়-দুর্গ-দেওয়ালে কামান সাজাইয়া দাঁড়াইলে উহা আক্রমণ করিতে বীরাগ্রগণ্যেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইবার কথা। বহু যোজন দূর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশটি দুর্গ-দেওয়াল হইতে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।

উপরকোটের উচ্চতম স্থানে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর-

দুই ধার হইতে দুইটি পাহাড় গড়াইয়া আসিয়া প্রায় উপর-কোটের দুর্গ-দেওয়ালে এবং পরস্পরের গায়ে লাগিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়া রৈবতকে যাইবার রাস্তা। সেই রাস্তার ফাঁকটি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া যে ব্যোমকেশ সুক্ষ্মাগ্রচূড় দেবতা গর্ব্বভরে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নেত্রে দ্বারবতী দুর্গের দিকে চাহিয়া আছেন, তিনিই ভৈরব রৈবতক। তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার পিপাসা যেন আর মিটিতে

চাহিতেছিল না। কতক্ষণ যে রৈবতকের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, বলিতে পারি না। সঙ্গিগণের আহ্বানে চৈতন্য হইল, নীচে নামিয়া আসিলাম।

নবাব আলি সাহেব গাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। অপর ভদ্রলোকটি আমাকে অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখাইতে লইয়া চলিলেন। মসজিদ-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়া আমরা কতক দূর নামিয়া গেলাম। এইবার যাইয়া উপস্থিত হইলাম এক পাতাল-পুরীর দরজায়। বার্গেস্ সাহেব এই পাতালপুরীকে বৌদ্ধ বিহার বলিয়া অনুমান করিয়াছেন,—তদীয় Report on the Antiquities of Kathiawar and Cutch নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। পাথর খুঁদিয়া এই পুরী নির্ম্মিত,—ক্রমাগত ত্রিতল পর্য্যন্ত ভূগর্ভে চলিয়া গিয়াছে। সঙ্গী ভদ্রলোক সহ আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তলের পর তলে নামিতে লাগিলাম, আর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম উহাদের স্থাপত্যপ্রথা এবং ভাস্কর্য্যের মূর্ত্তিগুলি। এই শ্রেণীর প্রাচীন কীর্ত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে যে প্রকার সাজ-সরঞ্জাম শুদ্ধ যাওয়া উচিত, আমার সঙ্গে তাহার কিছুই ছিল না। না ছিল ক্যামেরা, না ছিল একটা বৈদ্যুতিক টর্চ্চ, না ছিল একটা রেলসূতা। কাজেই যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহার সূক্ষ্ম বিবরণ কিছুই লিখিতে সমর্থ হইলাম না, মাপজোঁকও দিতে পারিলাম না। উপরকোট দুর্গের দেওয়ালের মাথা হইতে পূবের দিকে পাথরের টুকরা বাঁধিয়া একটি সূতা নামাইয়া দিলে মাটি হইতে দুর্গ-দেওয়ালের উচ্চতা ঠিক মত জানিতে পারিতাম। কিন্তু সূতা সঙ্গে না থাকাতে অনুমান মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে।

আমি যে দৃষ্টি লইয়া এই ত্রিতল পাতালপুরী দেখিতে লাগিলাম, বার্গেস্ সাহেব সেই দৃষ্টি লইয়া উহা দেখেন নাই। আমি মনে করি, উপরকোট যে কৃষ্ণের আমলের বা তাহারও পূর্ব্ববর্তী দুর্গ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বার্গেস্ সাহেব উহাকে বড়জোর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলের মনে করিয়াছেন। কাজেই তিনি এই পাতালপুরীকে বৌদ্ধ বিহারের বেশী আর কিছু মনে করিতে পারেন নাই। আমি কিন্তু সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও এই পুরীর ভাস্কর্য্যে বিশেষরূপে বৌদ্ধত্বের চিহ্ন বড় বেশী কিছু দেখিলাম না। মূর্ত্তি যে দুই চারিটি আছে তাহা সাধারণ স্থাপত্যালঙ্করণ (Decorative) মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হইল। পুরুষ ও বিপুলনিতম্বা নারী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে এই প্রকারের মূর্ত্তি অর্থাৎ মিথুন মূর্ত্তি দুই তিনটি দেখিলাম। অধিকাংশ মূর্ত্তিই এমন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে যে ভাল করিয়া চেনাই কঠিন। চকমিলান অট্টালিকার প্রথায়, অর্থাৎ আকাশ হইতে আলো বাতাস আসিবার জন্য মধ্যে চৌকা ফাঁক রাখিয়া সেই ফাঁকের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্যালারিগুলি নামিয়া গিয়াছে। ত্রিতল পর্য্যন্ত নামিয়া প্রদর্শক মহাশয় বলিলেন যে আরও তল না কি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গ্যালারিগুলিতে যে জায়গা আছে, তাহাতে বাস করা চলে বটে, কিন্তু আরামে বাস করা চলে না। কাজেই ইহাদিগকে অর্জ্জুন-সুভদ্রার বাসরঘর রূপে কল্পনা করিতে পারিলাম না। এই রকম একটি গ্যালারিতেই বার্গেস্ সাহেব একটি ক্ষত্রপ-লিপি খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। এরকম পাতালপুরী বা গ্যালারি না-কি উপরকোট দুর্গে কয়েকটিই আছে। আরও কত অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, কে জানে? ভারতীয় প্রত্নবিভাগ হইতে পণ্ডিত ও প্রত্নানুরাগিগণ একে একে বিদায় লইতেছেন,—ডিপার্টমেণ্টটি অন্যবিধ লোকে ভরিয়া উঠিতেছে। সেই সত্যি কালে বার্গেস্ সাহেব একবার উপরকোট দুর্গে কিছু খননাদি করিয়া তাঁহার Antiquities of Kathiawar and Cutch নামক পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তাহার পরে অর্দ্ধ শতাব্দ চলিয়া গিয়াছে, উপরকোটে আর কোন কাজই হয় নাই। বার্গেস্ সাহেব খুঁড়িয়া যাহা বাহির করিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহাও ঢাকিয়া যাইতেছে। কবে যে আবার উপরকোটের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে, ভগবানই জানেন! এই দুর্গটি প্রাগৈতিহাসিক কালের, এই জ্ঞান লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার সর্ব্বত্র অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আমি যে ভূগর্ভস্থ ত্রিতল গ্যালারিটি দেখিয়াছি, তাহার গায়ে স্থানে স্থানে সুপ্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত দুই একটি ক্ষুদ্র লিপির মত লক্ষ্য করিলাম। সঙ্গে টর্চ্চ না থাকায় ভাল করিয়া সেগুলি পরীক্ষা করিতে পারিলাম না। রোজায় উপবাস-কাতর সঙ্গী ভদ্রলোকটির মুখ চাহিয়া আমার পর্য্যবেক্ষণ সংক্ষিপ্ত করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

প্রদর্শক মহাশয় ইহার পরে আমাকে যাহা দেখাইতে লইয়া গেলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের দৈত্যগণের কীর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু বলিয়া তাহাদের বর্ণনা করা চলে না। প্রদর্শক মহাশয় বলিলেন, রাজার দুই পত্নী বা উপপত্নী ছিল,—একজনের নাম এড়ি, আর একজনের নাম চেড়ি। দুইটি কূপ এখন এই নামে পরিচিত,—উহাদিগকে এড়ি-চেড়ির বাউরি বলে। ঢাকা সহরে পূর্ব্বে কূপোদকই প্রশস্ত ছিল। মিউনিসিপালিটি তিন শত টাকা সেলামী ছাড়া বাসায় কাহাকেও জলের কল লইতে দেন না। তাই আজিও ঢাকার অধিকাংশ বাড়ীতেই কূপ বিরাজমান। ইন্দারা বা বাউরিও ঢাকায় দুই চারিটি আছে। বৃহৎ কূপ বা ইন্দারায় যদি জলে নামিবার সিঁড়ি থাকে তবে তাহাকে বাউরি বলে। বৈদ্যনাথ ধামে পাথরের বক্ষ ভেদ করিয়া নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ ইন্দারাও অনেক দেখিয়াছি। বৈদ্যনাথে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার প্রধান এক দফা খরচ পাথরের বুকে ইন্দারা বসান। ভাবিলাম, এড়ি-চেড়ির বাউরিও উহাদের মতনই হইবে। কাছে যাইয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম! পাঠকগণকে কি করিয়া যে এই বিস্ময়াবহ বাউরিদ্বয়ের আভাস দিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। গোলদীঘি যদি প্রকৃতই গোলাকৃতি দীর্ঘিকা হইত, তবে উহার যে আয়তন দাঁড়াইত, এই বাউরিগুলি আয়তনে তাহার অপেক্ষা ছোট হইবে বলিয়া মনে হইল না। এইরূপ গোলাকৃতিতে পাথর কাটিয়া বোধ হয় দুই শত গজ নামান হইয়াছে, জল অত নিম্নে রহিয়াছে। উপর হইতে জল পর্য্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। বাউরির দেওয়ালে পাথরের স্তরের যে বিচিত্র বিন্যাস উপর হইতে দেখা যায়, তাহা ভূতত্ত্ববিদের পরম শিক্ষা ও আনন্দের উপকরণ। সিঁড়ি বাহিয়া একটি বাউরির জল পর্য্যন্ত নামিবার খুবই ইচ্ছা ছিল। বাউরির গায়ে কোথাও কোন শিলালিপি আছে কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে, মুসলমান সঙ্গিগণের রোজা ভাঙ্গিবার সময় আসন্ন। তাই আর দেরী করা সঙ্গত মনে করিলাম না। দুর্গাবরোধ কালে পানীয় জলের যাহাতে অভাব না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যেই প্রাগৈতিহাসিক কালেই এই ভীমাকৃতি বাউরি দুইটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, আমার এমনই বোধ হইল। শিলালিপি আবিষ্কারের জন্য ইহাদের দেওয়ালগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষিত হওয়া উচিত। আমার এই প্রবন্ধ পড়িয়া যদি কাহারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় এবং তিনি উপরকোট দেখিতে যা'ন, তবে সঙ্গে বাইনোকুলার এবং উজ্জ্বল টর্চ্চ্ লইতে ভুলিবেন না। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে হয়ত তিনি বাউরির দেওয়ালে শিলালিপি আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেও পারেন। এই বাউরি দুইটি উপরকোটের পূর্ব্ব দেওয়াল হইতে বেশী দূরে নহে। বাউরি হইতে একটু অগ্রসর হইলেই পূর্ব্ব দেওয়াল। তাহার মাথায় দাঁড়াইয়া রৈবতক যাইবার রাস্তা বহু দূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য হয়। খোদ রৈবতক অচলের তো কথাই নাই।

এড়ি-চেড়ির বাউরি দেখা শেষ করিয়া প্রদর্শক মহাশয়ের সহিত চলিলাম বর্ত্তমান কালের প্রতিষ্ঠান জুনাগড় সহরের জল সরবরাহের কারখানা দেখিতে। উপরকোটের দক্ষিণ দেওয়াল ঘেঁসিয়া চারিটি বড় বড় পাথরের পুকুর নির্ম্মিত হইয়াছে। রৈবতকের পাদদেশে এক পুকুরে কয়েকটি ঝরণার জল আসিয়া সঞ্চিত হয়। সেই পুকুর হইতে পাইপ যোগে এবং পাম্পের বলে জল আসিয়া উপরকোটের পাথরের পুকুরে সঞ্চিত ও পরিস্রুত হয়। শেষ পুকুরটি হইতে মাধ্যাকর্ষণের বলে জল সমস্ত সহরে সরবরাহ হয়। উপরকোটের দক্ষিণ দেওয়ালে জুনাগড়ের এক হিন্দু রাজার একখানি শিলালিপি খোদিত দেখিলাম, উহার কাল খ্রীষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দ হইবে।

এইরূপে উপরকোট দেখা সমাপ্ত করিলাম। অর্থাৎ ভাল করিয়া কিছুই দেখা হইল না। ভবিষ্যতে বাঙ্গালা দেশ হইতে প্রত্নপ্রেমিক যদি কেহ উপরকোট দেখিতে যা'ন, তবে, আশা করি, যথেষ্ট সময় হাতে লইয়া উপযুক্ত যন্ত্রাদি সহ যাইবেন। আমার অদৃষ্টে—"ভাল করি পেখন না ভেল।"

গাড়ী উপরকোট হইতে বাহির হইয়া আসিলে নবাব আলি সাহেব বলিলেন—"চলুন, এবার বাসায় ফিরি।"

সন্ধ্যা হইতে তখনও ঘণ্টা-আধেক বাকী আছে দেখিয়া সসঙ্কোচে বলিলাম,—"শিলালিপিগুলি আজই দেখিয়া যাইতাম,—যদি আপনাদের বেশী তথ্‌লিফ না হয়।"

নবাব আলি সাহেব হাসিয়া শফরকে শিলালিপির নিকট যাইতে আদেশ দিলেন।

জুনাগড় সহরের পূর্ব্ব ফটক দিয়া বাহির হইয়া গাড়ী গির্ণারের রাস্তা ধরিয়া পূর্ব্ব-মুখে চলিল এবং অল্পক্ষণের

মধ্যেই রাস্তার পারে এক মন্দিরের নিকট থামিল। নামিয়া দেখি মন্দিরটি শিলালিপির পাথরটিকে আশ্রয় দিবার জন্যই নির্ম্মিত। উহারই ভিতরে সেই বিখ্যাত পাশার গুটির আকৃতির নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, যাহার প্রায় সারা গায়েই প্রাচীন লিপি। পূর্ব্বধারে অশোকের চতুর্দ্দশ গিরিলিপি। পশ্চিম ধারে রুদ্রদামের লিপি। উত্তর ধারে স্কন্দ গুপ্তের লিপি। অশোকের লিপি খুব স্পষ্ট আছে। রুদ্রদামের লিপিও বিনষ্ট অংশগুলি ভিন্ন ভাল অবস্থায়ই আছে। স্কন্দ গুপ্তের লিপি কতকটা মোছা-মোছা। কিছু দিন পূর্ব্বে আশ্রয়দাতা মন্দিরটিতে মজুরগণ চূণকাম করিয়া গিয়াছে। শিলালিপির পাথরের সর্ব্বাঙ্গে চূণের ফোঁটা পড়িয়া এবং ধূলা পড়িয়া লিপি প্রায় ঢাকিয়া গিয়াছে। লিপির রক্ষার জন্য পাথরটিকে ঢাকিয়া কত বছর হয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমার সঙ্গিদ্বয়ের কেহই বলিতে পারিলেন না।

আমি নবাব আলি সাহেবকে ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—"লিপির পাথরের আবরণ মন্দিরটির তো বেশ যত্ন লওয়া হয় দেখিতেছি,—উহা আপনাদের ষ্টেটের নির্ম্মিত ;—কিন্তু যাহাকে রক্ষা করিতে মন্দিরের নির্ম্মাণ, তাহারও কিঞ্চিৎ যত্ন লওয়া আবশ্যক!"

ধূলি ও চূণের ফোঁটা পড়িয়া লিপির যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া নবাব আলি সাহেব লজ্জিতই হইলেন। সাধারণ সোডা ও ব্রাস যোগে উহা ধুইয়া ফেলিতে পরামর্শ দিলাম। মন্দিরের দক্ষিণে একখণ্ড পাথরের উপর গুপ্ত আমলের দক্ষিণী ধাঁচের লেখায় কয়েকটি অক্ষর খোদিত দেখিলাম। কি পড়িয়াছিলাম মনে নাই।

গাড়ীতে ফিরিয়া নবাব আলি সাহেবকে বলিলাম,—"উপরকোটের দেওয়ালের একেবারে নীচে যাওয়া যায় না?"

নবাব আলি সাহেব বলিলেন—"যাওয়া যায়, তবে বড় ময়লা,—আর সাপ-টাপ হয়ত আসিতে পারে।"

উপরকোটের দেওয়ালের গায়ে কোন শিলালিপি আবিষ্কার করা যায় কি না, আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাই। আমার অনুরোধ মত গাড়ী উপরকোটের উত্তর দিয়া চলিল। উত্তর-পূর্ব্ব কোণের নিকট গাড়ী থামাইয়া আমি আর নবাব আলি সাহেবের বন্ধু, দুইজনে চলিলাম উপরকোটের দেওয়ালের নীচে। একেবারে কাছে যাইয়া পাথরের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম,—যেন কত কাল পরে পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইল। ঐ অংশে কোন শিলালিপি নজরে পড়িল না। উপরকোটের সমগ্র চারিদিকের ঘেরটিই এইরূপে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।

বাসায় যখন ফিরিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। পরদিন ভোরে জুনাগড় ষ্টেট মিউজিয়ম দেখিয়া রৈবতক দর্শনে রওনা হইয়া যাইব, এই ব্যবস্থা করিয়া যথাসময়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম।

২রা জানুয়ারী, ১৯৩৪,—প্রাতে জলযোগের কালে দেখিলাম, একটি সুদর্শন, দীর্ঘাকৃতি, ১৯।২০ বছরের যুবক আমার সহিত এক টেবিলে বসিয়াই বেশ পেট ভরিয়া জলযোগ করিল। নবাব আলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই যুবক জুনাগড়ের Boy scoutদের একজন scout,—নবাব সাহেবের অনুরোধে scout master কর্ত্তৃক আমার সহিত রৈবতক আরোহণের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। যুবক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বলিতে পারে, উহার সাহায্যে কথাবার্ত্তা একরকম চলিয়া যায়। নাম যমুনা রাও, ব্রাহ্মণ জাতীয়। উহার পিতা স্থানীয় কোন স্কুলের সংস্কৃত-শিক্ষক পণ্ডিত।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি পড় যমুনা রাও?"

"পড়ি না, ছাড়িয়া দিয়াছি।"

"কি কর?"

"নাটকের দলে হার্ম্মনিয়ম বাজাই, আর গান বাজনার প্রাইভেট টুইশন করি।"

এই রকম একজন গাইয়ে-বাজিয়ে সঙ্গী রৈবতক-যাত্রায় পাইয়া খুশী হইয়া গেলাম।

৭টায় নবাব আলি সাহেব যমুনা রাওকে ও আমাকে লইয়া মিউজিয়ম দেখাইতে চলিলেন। নবাব আলি সাহেবের আফিসের এক কেরাণীর তত্ত্বাবধানে এই ক্ষুদ্র মিউজিয়মটি রক্ষিত হইতেছে। মিউজিয়ম সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বটে, কিন্তু আমি যে দুইদিন গিয়াছি তাহাতে সর্ব্বসাধারণের কাহাকেও মিউজিয়মে যাইতে দেখি নাই। ১৮৮৮ সালের অক্টোবর সংখ্যা ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী পত্রিকায় বিখ্যাত প্রত্নলিপিবিশারদ বুলার সাহেব জুনাগড়জাত পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজীর জীবন-কথা লিখিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন—

"Like other compatriots of his who live in the shade of the Girnar mountain, he felt more attracted by the historical traditions of his native province, which, as a matter of necessity, are kept alive by its numerous ancient buildings and epigraphic monuments." (P. 293)

"গির্ণার পর্ব্বতের ছায়ায় বসতিকারী তাঁহার (পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজীর) অপর স্বদেশবাসিগণের মত, তিনিও নিজের প্রদেশের ঐতিহ্য দ্বারা অধিকতর আকৃষ্ট হইতেন, যে ঐতিহ্য ঐ অঞ্চলের অসংখ্য প্রাচীন ইমারৎ এবং শিলালিপি জন্য সদাই লোকের মনে জাগরূক থাকিতে বাধ্য হয়।"

তিন দিন জুনাগড়ে ছিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে উপরের উদ্ধৃত উচ্ছ্বাস বুলার সাহেবের নিছক কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। গির্ণারের ছায়া এবং প্রাচীন ইমারৎ ও শিলালিপির প্রাচুর্য্য মাত্র একটি ইন্দ্রজীরই জন্ম দিয়াছিল, —তাহাতে গণ্ডায় গণ্ডায় ইন্দ্রজী জন্মে নাই, জুনাগড়ের আবালবৃদ্ধবনিতাকে ঐতিহ্যপ্রিয়ও করে নাই।

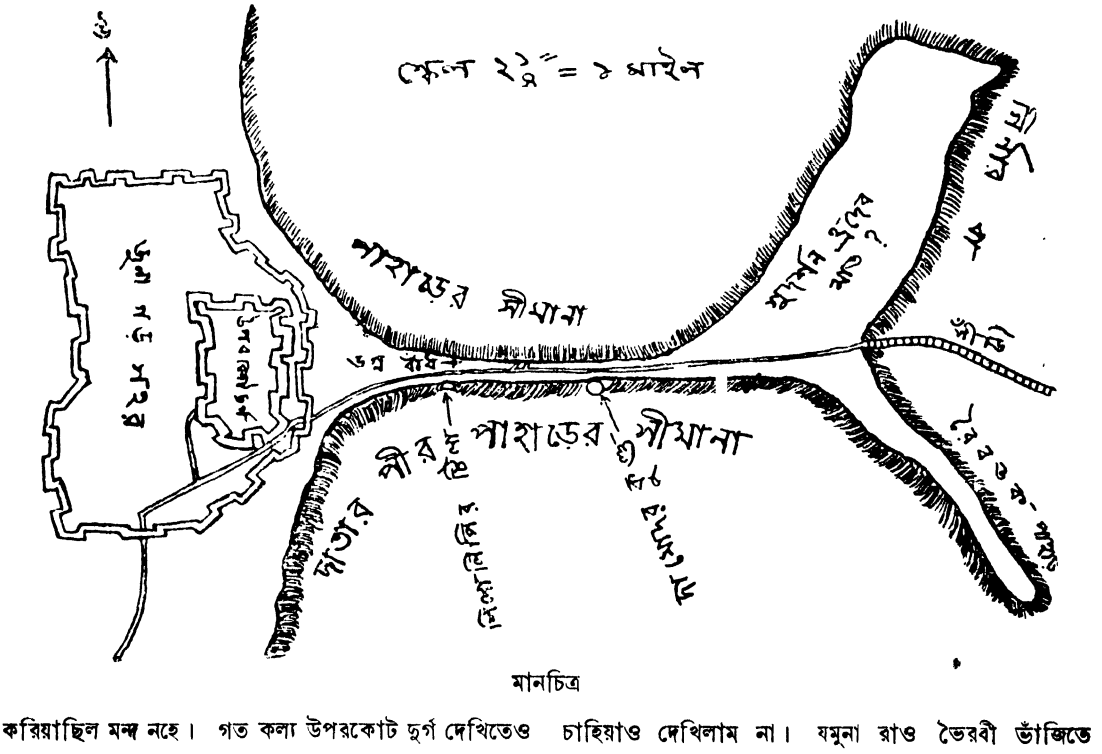
যাদুঘর দেখিতে গিয়া এই সত্য আরও প্রবল ভাবে উপলব্ধি করিলাম। নবাব আলি সাহেবের আফিসের সংলগ্ন একটি দালানের দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে যাদুঘরটি স্থাপিত। একটি খাড়া সিঁড়ি বাহিয়া উহাতে উঠিতে হয়। সিঁড়িতে কয়েকটি পাথরের দেবমূর্ত্তি স্থাপিত। খোদ যাদুঘরে ঢুকিয়া দেখি, উহাতে ক্ষত্রপ আমলের বহু মুদ্রা রক্ষিত। পরবর্ত্তী রাজাদের তাম্রশাসন এবং শিলালিপিও প্রচুর। কিন্তু উহাদের পরিচয়পত্রের একান্ত অভাব। অর্থাৎ কোন্ শাসনে বা লিপিতে কি আছে, সঙ্গীয় লেবেলে তাহার কোন বিবৃতি নাই। দুইখানা ক্ষত্রপ আমলের শিলালিপিও রহিয়াছে, দেখিলাম। উহাদের কোন লেবেল নাই। এগুলি প্রকাশিত কি অ-পূর্ব্ব-প্রকাশিত, তাহাও জানিবার জো নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইলাম অপর দুইখানি লিপি দেখিয়া। ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় এই দুইটি এক টেবিলের নীচে পড়িয়া ছিল। টানিয়া বাহির করিয়া দেখি, দুখানিই অশোক-লিপির ভগ্নাংশ! একখানি বেশ বড় ভগ্নাংশ, উহার আয়তন ২´×১½ ফুট হইবে। গায়ে সুস্পষ্ট অক্ষরে অশোকলিপি খোদিত। মোট তের লাইন লেখা আছে। অপরখানিতে মাত্র পাঁচ লাইন লেখা আছে—তাহারও প্রত্যেক লাইনে কয়েকটি অক্ষর মাত্র পাঠযোগ্য! এই অশোকলিপি এখানে কেমন করিয়া আসিল, নবাব আলি সাহেব অথবা তাহাঁর কেরাণী তাহার কোন হদিস্ই বলিতে পারিলেন না। অপ্রকাশিত অশোকলিপি আবিষ্কৃত করিতে পারিয়াছি মনে করিয়া প্রথমটা খুবই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। পরে ঢাকায় ফিরিয়া পুঁথি পুস্তক পড়িয়া জানিয়া নেহাৎই বোকা বনিয়া গিয়াছিলাম যে উহা গির্ণারের রাস্তার পার্শ্বস্থ মূল অশোকলিপিরই ভগ্নাংশ। এক জৈন ভক্ত যখন গির্ণারে যাইবার রাস্তা বাঁধাইয়া দেন, তখন তাঁহারই কনট্রাক্টারগণের ডিনামাইটের কৃপায় মূল অশোকলিপির দুইটি টুকরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং এক সাহেবের চেষ্টায় জুনাগড় মিউজিয়মে স্থান পায়। ফরাসী পণ্ডিত Senart সাহেব ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই খণ্ড দুইটির পাঠ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। খণ্ড দুইটিই ত্রয়োদশ অনুশাসনের অংশ। হুলজ্ সাহেব সম্পাদিত অচির-প্রকাশিত "অশোকের অনুশাসন" (Inscriptions of Asoka) নামক পুস্তকে যথাস্থানে ইহাদের পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রায় পোনে নয়টায় যাদুঘর পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া রৈবতক আরোহণের জন্য রওনা হইলাম। জুনাগড় সহরের পূর্ব্ব দেওয়াল হইতে রৈবতকের সিঁড়ির আরম্ভ প্রায় দুই মাইল দূর। আধ মাইল গেলেই শিলালিপির পাথরটি, একেবারে রাস্তার ধারেই। তাহারও আধ মাইল পরে হাতের ডাহিনে থাকে দামোদরকুণ্ড নামক দেবস্থান। এই দুই মাইল রাস্তা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাকা রাস্তা। রাস্তার উত্তর ধার দিয়া সোনারেখা নামে নদী নামিয়াছে। নদীর খাতশুদ্ধ রাস্তাটি প্রায় দুই শত হাত হইবে। রাস্তার দুই ধারেই ঢালু পাহাড় নামিয়া আসিয়াছে। কতক দূর যাইয়া দেখি, রাস্তার দক্ষিণ হইতে একটি ঝরণাধারা এক পুলের নীচে দিয়া রাস্তা ভেদ করিয়া উত্তর ধারের নদীটির সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। নদী বলিতে কেহ পদ্মা মেঘনা বুঝিবেন না,—এগুলি পাহাড় হইতে ঝরণা ও বৃষ্টির জল নামিবার অপ্রশস্ত খাত মাত্র।

রৈবতক শিখরে উঠিবার জন্য নীচে হইতে একেবারে

শিখর পর্য্যন্ত পাথরের সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির আরম্ভ স্থানে আমাদিগকে নামাইয়া দিয়া নবাব আলি সাহেব চলিয়া গেলেন। কথা রহিল, বৈকালে পাঁচটায় আমাদের জন্য এখানে মোটর আসিবে।

সিঁড়ির যেখানে আরম্ভ সেখানে কয়েকখানি দোকান জমিয়া উঠিয়াছে। দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি বেশ বড় রকমের ধর্ম্মশালাও নিকটেই। যাঁহারা ডুলিতে চড়িয়া পাহাড়ে উঠিতে চাহেন তাঁহাদের জন্য এইখানে ডুলিও প্রাপ্তব্য। ১০৫° জ্বর হইতে উঠিয়া বরোদা সম্মিলনে রওনা হইয়াছিলাম। সম্মিলনের কয়দিন ঘুরাঘুরিতে ক্লান্তও করিয়াছিল মন্দ নহে। গত কল্য উপরকোট দুর্গ দেখিতেও বেশ পরিশ্রম হইয়াছে। তাই ইচ্ছা ছিল, যদি সস্তায় হয়, তবে ডুলিতেই চাপিব। ফিরতি রাস্তায় আরও অনেক স্থান দেখিয়া যাইব, ইচ্ছা আছে। শরীরকে অনর্থক ক্লান্ত করিয়া লাভ নাই। কিন্তু চারিজন ডুলিওয়ালা যখন উপরের জৈন মন্দির পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে ৬৲ দাবী করিল তখন বঙ্গবীরের আত্মমর্য্যাদা জাগিয়া উঠিল। ছিঃ, মেয়েছেলের মত ডুলিতে বসিয়া পাহাড়ে চড়িব? কলেজ জীবনে জিমনাষ্ট্ বলিয়া বেশ একটু নামই ছিল; এখনও শরীর খারাপ বোধ করিলেই ডন্-বৈঠক লইতে আরম্ভ করি, এবং অজ্ঞাতসারে কোন্ দিন ছাড়িয়া দিই টেরও পাই না! কামাখ্যা পাহাড়ে উঠিয়াছি, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তো প্রায় দৌড়িয়াই উঠিয়াছি! আর এই বিদেশে আসিয়া হারমনিয়ম-শিক্ষক যমুনা রাওকে সাক্ষী রাখিয়া ডুলি চড়িয়া বঙ্গদেশের অমর্য্যাদা করিব? ডুলিওয়ালাদের দিকে অবজ্ঞাভরে চাহিয়া যমুনা রাওকে বলিলাম "চল",—এবং স্বয়ং সদর্পে সীঁড়ির পর সীঁড়ি উঠিয়া যাইতে লাগিলাম। শিকার ফস্কাইয়া যাওয়াতে ডুলিওয়ালাদের মুখের ভাব কেমন হইল, ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিলাম না। যমুনা রাও ভৈরবী ভাঁজিতে ভাঁজিতে যেন শ্বশুরবাড়ী চলিয়াছে এমনি সানন্দ আয়াস শূন্য পাদক্ষেপে আমার সহিত সমানে উঠিতে লাগিল।



মানচিত্র

বঙ্গবীরের গতি কিন্তু ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতেছিল! রাস্তার দুই ধারে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট বিশ্রাম-কক্ষ ছিল। পাথরে নির্ম্মিত, সম্মুখে খোলা, ছোট একটি কক্ষ,— সামনে পাথরে বাঁধান একটু বারাণ্ডা। এ রকম গুটি দুই বিশ্রাম-স্থান সদর্পে অতিক্রম করিয়া চলিলাম। বুকের

মধ্যে ততক্ষণে কিন্তু তাণ্ডব কাণ্ড আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। হৃৎপিণ্ড এমন উন্মত্তের মত লাফাইতেছে যে, প্রত্যেক মুহূর্তে মনে হইতেছিল যে উহা শেষ লম্ফ দিয়া চিরদিনের মত থামিল বুঝি বা! তৃতীয় বিশ্রাম-কক্ষ নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হুড়মুড় করিয়া উহার বারাণ্ডায় যাইয়া বসিয়া পড়িলাম!

যমুনা রাও বলিল—"এখনি বসিলেন, বাবুজি?"

কাতর হইয়া বলিলাম—"আর কত দূর আছে ঠিক করিয়া বল তো যমুনা রাও!"

যমুনা রাও চক্ষু কপালে উঠাইয়া বলিল—"এ আপনি কি বলিতেছেন, বাবুজি? আপনি তো মোটে চারি শত পনর * সীঁড়ি উঠিয়াছেন। জৈন মন্দির পর্য্যন্ত মোট সীঁড়ির সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার!"

বাস্! রৈবতক আরোহণ এইখানেই খতম্! হতাশ হইয়া কোমরের আলোয়ান খুলিয়া ভাঁজ করিয়া মাথার নীচে দিয়া পাথরের বারাণ্ডায় সটান চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িলাম!

যমুনা রাও বলিল—"হ্যাঁ, একটু বিশ্রাম করিয়া লিন্,—প্রথম প্রথম বুক বড় ঢুপ্-ঢুপ্ করে আর 'শোয়াস' ধরে। তার পরে সহিয়া যায়।"

বিশ্রাম-কক্ষ-সংলগ্ন একটা তেঁতুল গাছ ছিল—যমুনা রাও সুদক্ষ শাখামৃগের মত পায়ের জুতা শুদ্ধই গাছে চড়িতে লাগিল। বলিল—'ইম্‌লি' মুখে রাখিয়া পর্ব্বত আরোহণে নাকি কষ্ট কম হয়। 'ইম্‌লি' গাছে বড় ছিল না, তবু অনেক খুঁজিয়া যমুনা রাও তিন চারি ছড়া পাড়িল। একটি হরিজন জাতীয়া শ্যামবর্ণা যুবতী এই সময় পাহাড় হইতে সীঁড়ি বাহিয়া নামিতেছিল। প্রাতঃকালে বোধ হয় সে কোন বোঝা লইয়া পাহাড়ের উপর গিয়াছিল,—সঙ্গে একটি খালি চুপড়ি দেখিলাম। যমুনা রাওর বৃক্ষারোহণ দক্ষতা দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ দুই একখণ্ড তিন্তিড়ীর লোভে সে আসিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইল।

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম—"ইম্‌লি খাওগি বাই?"

কেন জানি না, যুবতী যেন বেজায় লজ্জা পাইল! ঈষৎ হাসিয়া মুখ লাল করিয়া—সে বলিল—"নে—হি,—ইম্‌লি খাট্টা"। বলিয়াই ত্রস্তা হরিণীর মত তর্ তর্ করিয়া সে দৌড়িয়া সীঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল!

যমুনা রাও তেঁতুল গাছ হইতে নামিয়া কাঁচা তেঁতুল চর্ব্বণ করিয়া কণ্ঠ সরস করিতে লাগিল। আমি পাষাণ-শয্যায় শুইয়া অলস উদাস দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম,—সম্মুখের সীঁড়ি দিয়া অনবরতই লোক উঠা-নামা করিতেছে। একদল গৈরিকধারী সাধু হাতের লাঠি সীঁড়িতে ঠক্‌ঠক্ করিতে করিতে অশ্রান্ত গতিতে সীঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল। একদল ভাটিয়া সপরিবারে গির্ণার দর্শন শেষ করিয়া সীঁড়ি দিয়া নামিতেছিল। দলের শোভা যুবতী কন্যাটি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কৃপার দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বক্ষের ঈষৎ কম্পনে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য-চপল গতিতে সীঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। অবশেষে যখন দেখিলাম, একটি একপদহীন খঞ্জ লাঠি ও বিনষ্ট পায়ের কাঠের খুঁটি দ্বারা সীঁড়িতে যুগল শব্দ করিতে করিতে সীঁড়ি দিয়া উঠিতেছে, তখন উঠিয়া না বসিয়া আর পারিলাম না! ছেলে বেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি—"পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।" চোখের সাম্‌নে তাহার এমন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকিব এবং "যাব কি যাব না"—এই চিন্তায় আকুল হইয়া উঠিব?

যমুনা রাও বলিল,—"বিশ্রাম হইল, বাবুজি?"

আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ হইয়াছে। তুমি এক কাজ কর। একটা গাছের ডাল কাটিয়া আমাকে দাও,—উহা দিয়া লাঠি বানাইয়া লই।"

পকেট হইতে চাকু বাহির করিয়া দিলাম—যমুনা রাও দুইটি ডাল কাটিয়া আনিল। লাঠি বানাইয়া একটি আমাকে দিল, একটি নিজে লইল। তাহার পরে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মরি কি বাঁচি করিয়া সীঁড়ির পর সীঁড়ি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

* সীঁড়িগুলিতে ক্রমিক নম্বর দেওয়া আছে।



শারদলক্ষ্মী

শ্রীরাধারাণী দেবী

—প্রকৃতি—

স্বচ্ছ সুনীল শান্ত আকাশে নিতল নয়ন জাগে,—
স্নিগ্ধ হাসিটি বিকশি' উঠেছে শিশির-আর্দ্র ফুলে।
রক্ত-কমল হংস মিথুন—চিত্রিত অঞ্চল
নির্ম্মল-নীর নদীর বসনে আবরি' সোণার তনু
শারদ-লক্ষ্মী এলো!—

কক্ষে কাঁপিছে ধান্যের ঝাঁপি শস্য-উছল ক্ষেতে।
নব-রবিকর-গলিত কনকে প্লাবিত চরণতল।
অস্ত ভানুর গোধূলি সিঁদুরে রচি' সীমন্ত-শোভা,—
রজত ধবল পেলব কোমল জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠনে
শারদ-লক্ষ্মী এলো!—

চঞ্চল লঘু নিবারি মেঘে ধ্বনিছে শঙ্খরোল;
ভোরের শুভ্র অভ্র ভরিছে প্রভাতী পাখীর সুর।
চ্যুত-শেফালির আলিপনা ঘেরা শ্যাম তৃণঅঙ্গনে
চারু চরণের চিহ্ন আঁকিয়া ধীর পদ সঞ্চারে
শারদ-লক্ষ্মী এলো!—

শিথিল মুঠিতে কাশমঞ্জরী চিকণ চামর দু'লে'।
কোমল কণ্ঠে স্থলকমলের কমনীয় ফুলহার!
কবরী আবরি' করবীগুচ্ছ কুসুমিত কুরুবক,
অতি সুন্দর অতসীবলয়ে বাহুবল্লরী বেড়ি'
শারদ-লক্ষ্মী এলো!—

চরণপদ্মে রক্তজবার নব অলক্ত-লেখা,
স্বর্ণ নূপুর-নিক্কণ শুনি শিশুতরু মর্ম্মরে!
সাগরে শৈলে প্রান্তরে বনে বিথারি বর্ণবিভা!
দিগ্ দিগন্ত দীপ্ত করিয়া দিব্য প্রভায় আজি
শারদ-লক্ষ্মী এলো!—

—প্রতিমা—

ভিখারী চলেছে আগমনী গেয়ে পথে,—
ব্যাকুল বিহ্বল হইল কঠিন হিয়া!—
নীলাকাশ তলে নীলকণ্ঠের সারি
উড়িয়া চলিল দূর হতে বহুদূর
ওগো বলো কার লাগি?—

না টুটিতে নিদ্, নহবতে সকরুণ
ভৈরবীসুর ভেসে আসে যেন কাণে!
হৃদয় ভুলানো মধু মূর্চ্ছনা তানে
ভোরের স্বপ্ন ভেঙেও ভাঙেনা আজ!
বলো কেন ওগো, কেন?—

আকাশে বাতাসে বোধনের বাঁশী বাজে,
ঢাকে ঢোলে তোলে উৎসব-কলরোল;
হারানো যুগের শৈশব-সুখ বেলা
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে পড়ে অকারণ
কেন জানো?—জানো ওগো?—

চন্দন ধূপ গুগ্ গুলু—সৌরভে
চির-চেনা কোন্ বিস্মৃত—স্মৃতি জাগে!
বিরহ বিধুর হতেছে উদাসী-মন!
মিলনোৎসুক অধীর উতল প্রাণ
ওগো বলো কার লাগি?

শারদ-লক্ষ্মী শরতে করিলো ধনী
আলোকে পুলকে ঝলকে অলকা-শোভা।
শারদ-লক্ষ্মী এলো কি জননী রূপে?—
বিশাল-বঙ্গ উৎসব অঙ্গনে
মঙ্গলা দেখা দিলো॥

পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

(১৭)

মাধবী নানা সংবাদের মাঝে তাহার চিঠিতে লিখিয়াছে, "এখানে আনন্দবাজারের মেলা আরম্ভ হইয়াছে। তোমার অভাব আমরা সকলেই অত্যন্ত বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি। কাল তোমার মা মেলা দেখিতে আসিয়া আমার নিকট ক্ষোভ করিয়া কহিতেছিলেন, 'তাড়াতাড়ি ঝোঁকের মাথায় শিশিরের কোন্ এক অজ পল্লীগ্রামের জমিদারের সহিত বিবাহ দিয়া এখন আর আমাদের ক্ষোভের অবধি নাই।'—জানিনা এমন কথাটা তিনি কেন বলিলেন। কিন্তু বোন, তুমি যাঁহাকে পাইয়াছ তাঁহাকে দুই তিন দিন দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি তাঁহার জন্য পৃথিবীতে যে-কোন কষ্ট সহ্য করাও যথেষ্ট সহ্য করা নয়। আর এ তো সামান্য পল্লীগ্রামে বাস করিবার কষ্ট মাত্র। যাহারা আজীবন সহরে বাস করিয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রথম প্রথম গ্রামে যাইয়া বাস করা একটুখানি কষ্টকর বটে। কিন্তু অনভ্যস্ততার দরুণ সে কষ্ট যত পাহাড়-প্রমাণ মনে হয়, সত্যই ততখানি নয়। আমার মামার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, ছোট-বেলায় অনেক দিন আমি সেখানেই কাটাইয়াছি। এ সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিছু আছে, তাহারই জোরে এ কথা লিখিতেছি।"

মাধবীর চিঠি পড়িতে পড়িতে শিশিরের মনে হইল, পাড়াগাঁয়ে বাস করিবার কষ্ট সম্বন্ধে সে তাহার বাপের বাড়ীতে চিঠিতে কখনো কিছু লিখিয়াছে না-কি? ভাবিতে বসিয়া মনে পড়িল হাঁ, তাহার বিরক্তির, তাহার উষ্মার কিছু কিছু ছাপ তাহার চিঠিতেও পড়িয়াছিল বই কি। বোধ করি সেই জন্যই তাহার মা অমন ধরণের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে তাহার স্বামীর কথা আলাদা। মাধবী ঠিকই লিখিয়াছে। অমন স্বামী পাওয়া সকল মেয়েমানুষের অদৃষ্টে ঘটেনা। বস্তুতঃ এই দুই মাস তাহার স্বামীর উপর ভালোবাসার সহিত তাহার অন্তরের আদর্শের অবিশ্রান্ত দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছে। সে মনে প্রাণে বুঝিতে পারে তাহার স্বামীর স্বপ্ন এবং আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তিটা। যাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালোবাসি তাহার স্বপ্ন যদি আমারও স্বপ্ন হয় তবে সে কত সুখ। শিশির প্রাণপণে চেষ্টা করে, কেন তাহা হয়না। যে দেশকে তাহার অনন্ত দৈন্য দুর্গতি সত্ত্বেও, তাহার বিরাট তামসিক জড়তা সত্ত্বেও, আমার স্বামী এমন করিয়া ভালোবাসেন, তাহাকে আমি কেন মনের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিনা? তাহার সমস্ত দোষকে বিচার না করিয়াই আমিও কেন ভালবাসিতে পারিনা? তাহার সম্বন্ধে সেই বিরাট স্নেহময় অপূর্ব্ব মমত্ববোধ আমি কেমন করিয়া পাইব?

তখন বেলা প্রায় বারোটা একটা, গৃহস্থের খাওয়া দাওয়া সেই সবেমাত্র সারা হইয়াছে। মাধবীর চিঠিখানার জবাব লিখিবে বলিয়া শিশির রাইটিংপ্যাড্ কলম প্রভৃতি চিঠি লিখিবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া তাহার শয়নগৃহের জানালাটার ঠিক নীচে আসিয়া বসিল। এই জানালা হইতে অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণের অনেকখানি দৃশ্য চোখে পড়ে। নীচের বাগান হইতে একটা প্রকাণ্ড নিম গাছের শাখা প্রশাখা ছাদের আলিসা এবং জানালার জাফ্রির নিকট অবধি উঠিয়াছে। তাহারই পুষ্পিত মঞ্জরী মধ্যাহ্নের বাতাসের সঙ্গে সুরভি মিশাইতেছে। মাধবীকে লিখিতে বসিয়া শিশিরের অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। মধ্যাহ্নকালের এই বিরাম অবসরে, সমস্ত পৃথিবী যখন ক্ষণকালের জন্য নিস্পন্দ, স্থির, তখন সুপ্ত অবচেতন মনের প্রান্তদেশ হইতে কত অস্ফুট ভাবনা, অস্পষ্ট কল্পনার রাশি একে একে মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয়। মেঘহীন স্তব্ধ আকাশ ঘন নীল। নীচের ঘরে এ বাড়ীর কে একজন ছেলে রেকর্ড দিয়াছে, এখান অবধি সেই গানের চরণ মৃদুতর হইয়া আসিতেছে,—

"তোমার বাণী নয়গো শুধু হে বন্ধু হে প্রিয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও।"

শিশিরের হঠাৎ মনে হইল সে যেন বড় একলা। বিবাহের

আগে সে নিঃসঙ্গ ছিল, কিন্তু সে নিঃসঙ্গতার মাঝে শূন্যতা ছিলনা। এখন সে অনেকের মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু এ সজনতার মাঝে কোথাও তাহার হৃদয় মিশিলনা। অনেকের মাঝে থাকিয়াও যে একলা, তাহার শূন্যতার যে অন্ত নাই। এমন কি, আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার স্বামীর জীবনের সঙ্গেও সে পরিপূর্ণভাবে মিলিতে পারিলনা। তিনিও যেন তাঁহার একাগ্র হৃদয়ের কর্ম্মনিষ্ঠা লইয়া তাহার কাছ হইতে বড় বেশি দূরে সরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সে কাজের ধারার সহিত শিশিরের হৃদয়ের সহানুভূতি মিশিলনা।

মাধবীর চিঠিতে 'প্রীতিভাজনাসু' অবধি লিখিয়াই সে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। সুবোধের সাড়া পাইয়া চমকিয়া উঠিল।

"তোমার কাজ সারা হোল?"—রাইটিং প্যাড্‌টা সরাইয়া রাখিতে রাখিতে সে জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ, ডিস্পেন্সারির একরাশ ওষুধপত্র কলকাতা থেকে এসে পড়েচে, সেগুলো সম্বন্ধে অনাথকে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে এ'লুম।"

গায়ের শার্টটা খুলিয়া রাখিয়া একটা হাতপাখা লইয়া শিশির স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল।

"তুমি আমাকে এমন করে যখন সেবা কর আমার ভারি লজ্জা করে।"

"একটু যদি বাতাস করি তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কিন্তু এই দেখ মাধবী তোমার সম্বন্ধে কি লিখেছে।"

শিশির রাইটিং প্যাডের মধ্য হইতে চিঠিখানা বাহির করিল। সেই কয়েক লাইন পড়িয়া সুবোধ চুপ করিয়া রহিল। কিছুই বলিলনা।

"কী এত ভাবচ?"

"ভাবছি—তোমার সখী তোমাকে বুঝতে পারেননি। আর আমাকে অযথা বাড়িয়েছেন।"

"জান তার সঙ্গে আমার সাত আট বছর বয়স থেকে ভাব—"

তাহার কথা কাড়িয়া লইয়া সুবোধ সহাস্য মুখে মাঝখানেই কহিল, "আর তোমার সঙ্গে মোটে মাস তিনেক বিয়ে হয়েচে,—কেমন, এই কথাই না তুমি বলতে চাও? তার চেয়ে কি আমি তোমাকে বেশি বুঝি? কিন্তু আমি তোমাকে কত ভালোবাসি, সে কথাটা কেন তোমার মনে পড়চেনা শিশির? সেই ভালোবাসাই তো তোমার সম্বন্ধে আমার অন্তর্দৃষ্টিকে করেচে এত গভীর। তুমি যদি খুব একজন সাধারণ মেয়ে হতে, তাহলে তো তোমার সম্বন্ধে কোন ভাবনাই ছিলনা। কিন্তু তোমার অনুভব-শক্তি তীক্ষ্ণ, তোমার মন এত জাগ্রত যে যাকে সত্য বলে অনুভব করনা—কোন ছল, কোন সুবিধার খাতিরেই তার সঙ্গে আপোষ করে নিতে পারবেনা। তাই তোমাকে আমি দোষ দিতে পারিনা।"

সামনের জানালাটা খোলাই ছিল। সেই দিক পানে চাহিতে শিশিরের নজর পড়িল—ও-পাড়ার দুর্গাদাসের মা একটা থাট শুদ্ধ কাপড় পরিয়া, এক হাতে ঘড়া এবং অন্য হাতে দড়ি ও বালতি লইয়া, নানা প্রকারে শুচিতা বাঁচাইয়া, হাঁটুর উপর অবধি কাপড়ের প্রান্ত তুলিয়া, বলিতে গেলে প্রায় একরকম লাফাইতে লাফাইতে প্রাঙ্গণের কুয়াতলায় জল তুলিতে আসিতেছেন। হাতে ও পায়ে অবিরাম শুচিতার ফলে তাঁহার হাজা ধরিয়াছে। শিশির তাঁহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "অন্তরের··· আদর্শ, · তীক্ষ্ণ অনুভূতি · মিথ্যার সঙ্গে আপোষ···ও-সব বড় বড় কথা রেখে দাও। একবার কেবল চেয়ে দেখ ওঁর পানে। তোমাদের কে দূর-সম্পর্কের আত্মীয়া হ'ন। আজ সন্ধ্যেতে ওঁরই বাড়ীতে আমার খাওয়ার নেমত্যন্ন। দেখ, তোমরা নিজেদের মনের সৃষ্টি বড় বড় আইডিয়াল নিয়ে থাক। বাইরের জগৎটা তোমাদের কাছে অতিপ্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের চারি পাশের সংসারের খুঁটি-নাটিকে 'কিছুনা' বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনে। তাই এই অত্যন্ত অসুন্দরতার সঙ্গে যখন গায়ে গা ঠেকাঠেকি হয়ে যায়, তখন মনটা কেমন করে ওঠে। উনিও আমার সমালোচনা করেন, সে আলোচনাও আমাকে কাণ পেতে শুনতে হয়; অথচ খবর পেয়েচি—দিনের মধ্যে তেইশ ঘণ্টা কাটে ওঁর ওঁদের বাড়ীর পাশের ডোবাটায় আবক্ষ ডুবে থেকে। আর সারাদিন কেবল জল ঘেঁটেই যে তিনি ক্ষান্ত থাকেন তা নয়, সংসারের খোঁজও বিলক্ষণ রাখেন। তাঁর বড়ছেলে তাঁদের বাড়ীর কোন অল্পবয়সী ঝিয়ের প্রতি একটুখানি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিল। খবর পাবামাত্র তিনি বৌকে একরকম জোর করে বাপের বাড়ী

পাঠিয়ে দিয়ে সেই ঝিকে তাঁর খাস ঝি করে নিয়েচেন। সে দাসীটার এখন গরবের আর অন্ত নাই। তোমার বড় আদরের গ্রামে এত অনাচার!"

উত্তেজনার আতিশয্যে শিশিরের হাত হইতে পাখাটা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার সুন্দর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুবোধ পাখাটা তুলিয়া লইয়া নিজেকে বাতাস করিতে করিতে শান্তকণ্ঠে কহিল, "এ আর এমন কি শুনেচ। এর চেয়ে আরও কত বেশি কত অনাচারের কাহিনী আছে। কিন্তু তুমি দুর্গাদাসের মা, ও-পাড়ার জেঠিমার ইতিহাসও কিছু জাননা। ওঁর বধূজীবনে ওঁর শাশুড়ী ওঁকে দিনের মধ্যে দশ বারো বার করে নাওয়াতেন; আর দাসী এবং পাচিকা থেকে সুরু করে সংসারের যাবতীয় কাজ ওঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হো'ত। আর ওঁর স্বামী দিনের আর রাত্রির বেশির ভাগ সময়টা গাজা ভাঙ্গ ও যাত্রার আখড়ার মধ্যে ডুবে কাটিয়ে দিতেন। যে মেয়ে জীবনের প্রারম্ভ থেকেই অদৃষ্টের কাছে এমন বঞ্চিত হয়ে এসেচে, সেই বঞ্চনার ক্ষোভই তার প্রকৃতিকে করেচে এমন নিষ্ঠুর, এত শুষ্ক।"

"তুমি তো কখনই এদের দোষ দেখতে পাবেনা। তোমার মুখে সর্ব্বদাই সে দোষের একটা না একটা কৈফিয়ৎ আছে।"

"দোষ দেখতে পাই শিশির। জানি যে পল্লীসমাজের মাঝে আছে অনেক বিকৃতি, অনেক দৈন্যের কাহিনী। কিন্তু তবুও চট করে বিচার করতে আমি পারিনে। কারণ এদের আমি ভালোবেসেচি। এদের সম্বন্ধে আমার মনে একটি বেদনা বোধ আছে। আমার মনে হয় তুমিও একদিন বাসবে। কারণ তোমার হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয় এখনও জাগেনি। জানি তুমি সংস্কৃত আর ইংরেজী সাহিত্যে অনেক ভালো ভালো কাব্য পড়েচ, তুমি সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক গভীরচিত্ত, অনেক চিন্তাশীল। কিন্তু তোমার মন সংসারকে তার সুন্দর আর অসুন্দরতা, পাপ আর পুণ্য এ সবের মাঝে মিলিয়ে এখনও গ্রহণ করতে পারেনি। তোমার মন যেন এখন স্পর্শ সকাতর বিকচোন্মুখ পদ্মের মত। অল্পতেই আঘাত পায়, নিজের মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নেয়। কিন্তু জীবনের উত্তাপে একদিন তুমি ফুটে উঠবেই। আমি তোমার মনকে সব দিক দিয়ে জাগাতে পারলুমনা। কিন্তু জীবনে এমন অনেক জিনিষ আছে যা তোমাকে জাগাবেই।"

(১৮)

সেদিন স্বামীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যে চিঠিখানা শিশির শেষ করিতে পারে নাই, আজ সকালবেলায় সেইখানা লইয়াই সে পড়িয়াছিল। লিখিতেছিল,

"প্রীতিভাজনাসু

মাধবী, তোমার চিঠি পাইয়াছি। পল্লীগ্রামে থাকিতে আমার কেন কষ্ট হয় জানিতে চাহিয়াছ। এখানকার নানা আচার নানা ব্যবহার আমার রুচিকে পীড়া দেয়, মনকে করে উদ্‌ভ্রান্ত।

তোমাকে একদিনের ছোট একটা কাহিনী বলি মাত্র। তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবে—অজ্ঞতার পরিমাণ এখানে কী গভীর, কী প্রচণ্ড। কাল সন্ধ্যেবেলায় আমার শ্বশুর বাড়ীর কে এক জ্ঞাতি সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইয়া দেখিলাম, যেখানে ঠাঁই করা হইয়াছে, তাহারই সুমুখে পাখা হাতে যে মেয়েটি বসিয়া আছে, সে মাথা নীচু করিয়া কোন মতে চোখের জল চাপিয়া রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার কী হইয়াছে আমাকে বল ভাই।'

বোধ হয় এইটুকু মিষ্ট বাক্যও সে কখনো কাহারও কাছে পায় নাই। তাই ঝরঝর করিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পরে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিতে পারিলাম, চার-পাঁচটি সন্তান আঁতুড়েই মারা যাইবার পর, তাহার একটি মেয়ে পাঁচ ছয় মাসের হইয়া আজ দুই দিন হইল মারা গিয়াছে।

আমি প্রশ্ন করিলাম তার কী হইয়াছিল?

সে কহিল, "কী আর হবে দিদি। তাকে ডেনে খেয়েছিল। কী যে আমার দুর্ম্মতি হয়েছিল, বাগ্দী বৌয়ের সঙ্গে তাকে একদিন বাইরে পাঠিয়েছিলাম। আর না পাঠিয়েই বা কী করি বল? বাড়ীশুদ্ধ সবারই তখন জ্বর। একা হাতে বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, রান্না করা, সবাইকার মুখে জল দেওয়া। মেয়েটা ক'দিন থেকে ভারি কাঁদুনে হ'য়েছিল। কোন রোগ অসুখ নেই, তবু সারা রাত্রি দিন

কাঁদে। তাই বলেছিলাম, হাত জোড়া আমার, তুই একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয়। তা সেই যে মাগী চাষা পাড়া না কোন পাড়া দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এ'ল, সেইখানে ডেনে নজর দিয়ে দিলে। তার পর মোটে আর তিন চারটি দিন বেঁচে ছিল। বাছাঁরে—"বৌটি হাতের পাখা ফেলিয়া দিয়া এইবারে আঁচল মুখে গুঁজিয়া নিজের উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন প্রাণপণে চাপা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খবর লইয়া জানিলাম সে এ বাড়ীরই একমাত্র পুত্রবধূ। জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ছেলেগুলি তাহার আঁতুড়েই অকালে নষ্ট হইয়া গেছে, তাহাদের কী রোগ হইয়াছিল? বৌটি কহিল, রোগ তেমন কিছুই নয়। জন্মিয়া অবধি দিবারাত্রি কেবল কাঁদে, মাথার চুল উঠিয়া যায়, বিনা কারণে শুকাইয়া আসে। শেষে মরিবার দিন কয়েক আগে মাথায় ও মুখে কী এক প্রকার বিশ্রী ঘা হয়। এখানকার ডাক্তার বাবুর দেওয়া মলম কত লাগান হয়, কিছুতেই একটুখানিও সুরাহা হয় না। শেষে একদিন—

······ডেনে খাওয়া অর্থটা এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম কোন ডাইনীর কবলে তাহার কচি ছেলে-মেয়েগুলি যাইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটির অশ্রুস্তম্ভিত মুখের পানে চাহিয়া সমস্ত খাদ্যবস্তুর প্রতি তৃষ্ণা এক মুহূর্ত্তে চলিয়া গেল। কিন্তু না খাইয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিব তাহার জো কি! মেয়েটির শাশুড়ী এক হাতে হরিনামের মালা লইয়া এখানে জলটা ওখানে খড়ের কুটোটা বহু কষ্টে ডিঙ্গাইয়া অদূরে উপবেশন করিয়া কহিলেন, "কিছুই যে খাচ্চো না মা? তা তোমারই বা দোষ দিই কি করে বাছা, তোমরা হ'লে সহরের মেয়ে, যা তা কি মুখে দিতে পারো? আর আমার বৌমাটির রান্নার হাত আজকাল যা হয়েচে, আমরাই বলে কিছু মুখে দিতে পারিনে।"

আমি সন্ত্রস্ত হইয়া কহিলাম, "না না, বেশ খাচ্চি মাসীমা। আপনার বৌটি ভারি লক্ষ্মী তো। একা এত সব রান্না করেচে?"

অবাক হইয়া গেলাম যে বেচারার মনে শোকের এত বড় গুরু ভার চাপিয়া রহিয়াছে, তাহারও এতটুকু বিশ্রামের অধিকার নাই। তাহার খাশুড়ী ঘরকন্নার কাজ হইতে তাহাকে এতটুকু ছাড়া দিবেন না যে সে নিভৃতে নিজেকে লইয়া একটু একলা থাকে।

কিন্তু মাধবী, চিঠিখানা ক্রমশঃ লম্বা হইয়া পড়িতেছে। মনের আবেগে হয় ত অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিলাম। তবে আমার স্বামীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ, সে বিষয়ে আমার মতভেদ নাই। তাঁহার জন্য কোন কষ্ট সহ্য করাই যথেষ্ট নয়। তবে তিনি নিজেও এখানে আর থাকিবেননা। শীঘ্রই আমরা কলিকাতা যাইব। তাঁর সম্বন্ধে তুমি যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছ, তাহা আমার স্বামীকে পড়িতে দিয়াছিলাম। তিনি পড়িয়া বলিলেন, তোমার সখী অযথা আমাকে বাড়াইয়াছেন। শোন একবার কথাটা! মানুষটির বিনয়ের যেন আর অন্ত নেই।

(১৯)

শিশিরের চিঠির কোন উত্তর আসিবার আগেই কলিকাতার একটা আর্ট এগ্‌জিবিশনে মাধবীর সহিত একেবারে তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল। দুইজনেরই বিস্ময় আর আনন্দের অবধি নাই।

"হঠাৎ কোথা থেকে?"

মাধবী কহিল, প্রায় মাসখানেক হইতে সে এখানে তার কাকার বাড়ীতে আই-এ পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে। "কিন্তু তুই কতদিন? কার সঙ্গে এগ্‌জিবিশন দেখতে এসেছিস? সঙ্গে সুবোধবাবু আছেন তো?"

"না, তিনি নেই। কি একটু কাজে বেরিয়ে গেছেন। তাঁর বন্ধু অনিলবাবুর সঙ্গে এসেছি। চমৎকার লোক। ওই ওধারে আছেন। এদিকে এলেই তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। কিন্তু আমরা যে ক'লকাতায় প্রায় মাস তিন চার হোল এসেচি। শেষের চিঠির জবাব দিস্‌নি তাই রাগ করে আমিও আর লিখি নাই।"

"কি করব ভাই, পরীক্ষার তাড়া। আর তুইও যে সেই বিয়ের পর গিয়েছিস, তার পরে কি আর একদিনের জন্যেও বাপের বাড়ী আসতে নেই? মাসীমা বলছিলেন, হাজার আদর যত্ন করে মানুষ কর, বিয়ে দিলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়।"

"আমার তেমন দোষ নেই। একটি দিনের জন্যে বাপের বাড়ী যাব বললেও ওঁর মুখ কেমন শুকিয়ে আসে। দেখলে মায়া করে।"

"মায়াবিনী! এর মধ্যেই এত মন ভুলিয়েছ?"

"যাঃ, আর বলতে হবেনা। নিজের যখন হবে তখন দেখা যাবে। কিন্তু বাজে কথা রাখ। আমাদের বাড়ী কবে যাচ্ছিস বল ?"

"যেদিন বলবি। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন ছুটি। ভাবচি রেজাল্ট বার হলে এইবার কলেজে ভর্ত্তি হব। ক'লকাতায় থাকব কাকার বাড়ীতে। এবার থেকে তোমায় আমায় প্রায়ই দেখা-শোনা হবে।"

* * * *

দুপুরবেলায় সুবোধ ঈজিচেয়ারে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' হইতে পড়িয়া শোনাইতেছিল, শিশির নিকটে বসিয়া শুনিতেছিল। যে কোন ভালো বইয়ের মনের মত জায়গা শিশিরকে না শোনাইলে তাহার তৃপ্তি হয় না।

সুবোধ পড়িতেছিল, "—সেই পঞ্চুকে যেন আজ দেখ্‌লুম হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে প'ড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয় ক্লান্তিতে। ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্ত্তি। দেখতে পেলুম্ পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোট নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দীঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষবুদ্‌বুদ উদ্‌গার ক'রচে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-একদিকে মুমূর্ষুর রক্ত শোষণে স্ফীত হ'য়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত ক'রে প'ড়ে আছে, শেষ পর্য্যন্ত তা'র সঙ্গে লড়াই ক'রতে হবে,—এই কাজটা মুলতবি হ'য়ে প'ড়ে র'য়েচে শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক্, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হ'য়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন! আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সাম্‌নের দিকে ছুটে চ'লে যাবো, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আন্‌তে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরী ক'রে দিচ্চে সেই আমাদের সহধর্ম্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুন্‌চে, তা'র ছদ্মবেশ ছিন্নভিন্ন ক'রে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই,—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা ভঙ্গ ক'রতে না পাঠাই!—"

এতটা পর্য্যন্ত যখন পড়া হইয়াছে, তখন শিশির বাধা দিয়া কহিল, "আচ্ছা, তোমার কাজের ক্ষেত্র থেকে এই যে আমি তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এ'লুম আমার উপর তোমার রাগ হয়না? তোমার ধর্ম্ম তোমার স্বপ্ন যে আমি নিজের করে নিতে পারলুমনা আমি কি তোমার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ?"

তাহার হাতের উপর সস্নেহে একটু চাপ দিয়া সুবোধ কহিল, "অমন কথা কেন বলচ শিশির? তুমি তো কাউকে ঠকাতে চাওনা। তোমার কাছে যা সত্য সে তো কেবল মুখের কথা নয়, তা অন্তরের একান্ত অনুভবের বস্তু। আমি জানি তুমি আমার তপস্যা ভঙ্গ করতে চাওনা, তুমি তা সফল করতেই চাও। কিন্তু এখনও তুমি এতে সায় দিতে পারচনা। অন্য সব মেয়েদের চেয়ে তোমার প্রকৃতি আলাদা। এতদিন নিজের মধ্যে নিজেই মগ্ন হয়ে একলা ছিলে। বিয়ের পরে পল্লীসমাজে যেয়ে বাস করতে তোমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগ্‌লো। তার কারণ পল্লীর আয়তন ছোট, সেখানকার যত সঙ্কীর্ণতা যত কলুষ যত সৌন্দর্য্যের অভাব সমস্তই সংহত হয়ে এক জায়গায় প্রকাশ পায়। কিন্তু তুমি একটা ভুল করেচ, পল্লীকে তুমি যতটা মন্দ ভেবেচ তত মন্দ সে নয়। দেখবে, ঠিক ওই ধরণের অনেক ছিদ্র অনেক দোষ সহরের আবহাওয়াতেও রয়েচে। কিন্তু ছড়িয়ে রয়েচে ব'লে বোঝা যায়না।"

(২০)

এই কথাটা যে কত সত্য তাহা কলিকাতায় আসিয়া শিশির ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে। সেদিন অণিমা দেবীর একটা পার্টিতে তাহার ও সুবোধের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে টেবিলে বসিয়া আইসক্রীম্ খাইতে খাইতে সকলেই একবার করিয়া মন্তব্য করিলেন—এমন বিশ্রী শীত কলিকাতায় তাঁহারা কখনো দেখেন নাই।

শিশিরের কাণের এয়ারিংটা লইয়া অণিমা উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাউ লাভ্‌লি মিসেস্ রায়! কোন্ দোকানের কেনা আমাকে একটু ঠিকানা দিতে পারেন ?"

তাঁহার বোন তটিনী কহিলেন, "আর আপনার হাতেব হীরের বালা যোড়াটা খুব গর্জ্জাস্ হ'লেও যেন একটু সেকেলে।"

শিশির কহিল, "এটা আমার শ্বাশুড়ীর। তিনি বহুদিন মারা গেছেন; কিন্তু আমাদের পরিবারের সংস্কার অনুসারে আমি তাঁর পুত্রবধূ, তাঁর আশির্ব্বাদী জিনিষ হিসেবে এটা ব্যবহার করচি।"

অণিমা কি একটা বলিতে গিয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইলেন। তটিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "হাউ ফুলিশ অফ ইউ!" (How foolish of you!)

শিশির কিছু বলিলনা। কিন্তু তাহার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল।

মাধবী তাহার পাশে বসিয়া ছিল, সে নির্ব্বিকার চিত্তে আইস্‌ক্রীম খাইতে লাগিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে মাধবী কহিল, "শিশির, নিজের আইডিয়ালিজম্ থেকে বেরিয়ে এসে জগৎটাকে একটু দেখতে শেখ্, চিনতে শেখ্। আমি জানি আজ তুই মনে মনে আঘাত পেয়েছিস। কিন্তু সংসারে নিরানব্বুই জন লোকই অমনি। পাড়াগাঁ থেকে পালিয়ে এলি। এখন ক'লকাতার সোসাইটিতে মিশে দেখ। দেখবি এখানেও সেই গরম আর শীত,—আব্‌হাওয়ার চর্চ্চা। গরমকালে দার্জ্জিলিং আর যায়না, বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে,—এই গোছের আলোচনা। কাণের এয়ারিং এবং ব্লাউজের ছাঁটের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ। না না, শিশির, জীবনকে তুই এখানে দেখতে পাবিনে। যেখানে দেখতে পাবি, সেখান অবধি কি তোর দৃষ্টি চলবে?"—বলিতে বলিতে মাধবীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। "সেখান অবধি কি তুই দেখতে পাবি? বালিগঞ্জের মুষ্টিমেয় সোসাইটি ছাড়াও বাংলার অগণ্য নারী যেখানে স্নেহে, সেবায়, ধৈর্য্যে, তিতিক্ষায় সমস্ত সমাজের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত করে দিয়েচে—মাধুর্য্যে সিক্ত করে রয়েচে?"

সুবোধ ড্রাইভারের আসনের কাছে বসিয়া নিজেই মোটর চালাইতেছিল। এই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "না না, ওকে অমন করে ব'লবেননা। শিশির যে জীবনকে কখন অমন অব্যবহিত ভাবে দেখেনি। তার মনের সারল্য, তার মনের প্রথম প্রভাতের মত নির্জ্জনতা, সেইটুকু আমি রক্ষা করে চলতে চাই। সংসারের সমস্ত উদ্যত আঘাত থেকে তাকে আমি বাঁচাব। এই আমার পণ।"

"তাকে হয় তো বাঁচাবেন। কিন্তু তার প্রতি অন্যায় করা হবে।"

শিশির এ সমস্ত কথাবার্ত্তায় একেবারে যোগ দেয় নাই। চুপ করিয়া নির্লিপ্তের মত বাহিরের জ্যোৎস্নাধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল।

সুবোধ মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ কহিল, "কিন্তু একটা কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই, আপনি এতটুকু বয়সে এত কথা জানলেন কী করে? আর এত অভিজ্ঞতাই বা আপনার হোল কেমন করে?"

মাধবী একটুখানি হাসিয়া কহিল, "আমরা দরিদ্রের ঘরে জন্মেছি। ছোট থেকেই অনেক জিনিষ দেখতে হয়েচে, অনেক জিনিষ শিখতে হয়েচে। জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের বেশি হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছি বলে জীবনের এমন অনেক দিকের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েচে, শিশির যার কিছুই জানেনা।"

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র একতলা গৃহের সম্মুখে আসিয়া মোটরখানা দাঁড়াইল। মাধবী নামিয়া গেল।

শিশির তখন উঠিয়া আসিয়া সুবোধের আসনের পাশে সুমুখের দিকে বসিল। কেহ কোন কথা বলিলনা। কেবল শিশির তাহার গভীর ভারাক্রান্ত দৃষ্টি লইয়া স্বামীর দিকে একবার চাহিল। তাহার মনের সমস্ত সংশয় যেন তাহার স্বামীর প্রশান্ত দৃষ্টির মাঝে বিলীন হইয়া যাইতে চাহিল।

(২১)

শিশির বলিল, "দেখ, আমাকে তুমি বারবার এত পরীক্ষার মধ্যে ফেল কেন?"

সুবোধ কৌতূহলী হইয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল।

"তোমার বন্ধুদের মাঝে একলা ফেলে আমাকে কোথায় উধাও হয়ে যাবে। ইচ্ছে করে এমন ভাব দেখাবে যেন এ বাড়ীর তুমি কেহ নও।"

"আমি যে এ বাড়ীর কর্ত্তা সে কথাটা তো আমি ভুলেই থাকতে চাই। আমার পরিচয়ের মাঝে সেটা খুব গৌরবের পরিচয় নয়।"

"তোমার পরিচয় তবে কি ?"

"আমার পরিচয়, আমি তোমার জীবনে অতিথি।"

"এ সমস্ত কাব্যের কথা আমার কাছে কেন ? আমি শুধু জানি আমি তোমার।"

"কিন্তু আমি জানি তুমি আমার আর তুমি সবারই। বাইরের বিস্তৃত পরিধিতে তোমাকে রেখে তবেই তোমার সত্যকার পরিচয় পাব।"

"ও সব রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরের কথা।"

"আমারও কথা।"

শিশির আর কিছু বলিলনা, চুপ করিয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার জীবনে প্রচণ্ড একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতে সুরু হইয়াছে। সুবোধ পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় থাকিত, তাহার বন্ধু-বান্ধব তেমন কেহ ছিলনা। থাকিলেও প্রত্যেক দিন দিনান্তে একবার করিয়া অন্ততঃ সুবোধকে না দেখিলে যে তাহারা মরিয়া যাইবে এমন কোন লক্ষণ তাহারা দেখায় নাই। কিন্তু যখন হইতে সে সস্ত্রীক আসিয়া এখানে রহিয়াছে, তখন হইতে একজন দুইজন করিয়া অনেক বন্ধু জুটিয়াছে। সকালে বিকালে এখানে চা খাইবার লোভ তাহারা কিছুতেই আর কাটাইয়া উঠিতে পারেনা। চা খাইবার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল আলোচনা চলে, তাহাদের কোন মতেই পরনিন্দা বা হীন আলোচনা বলা চ'লেনা। রেডিওর ভবিষ্যৎ, টকির উৎকর্ষ, বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারা, এমনিতরো হাই সার্কেলের আলোচনার কিছুই বাদ পড়েনা। কিন্তু শিশিরের মন যে ইহাতে খুব ভরিয়া উঠিয়াছে এমন বলিয়াও বোধ হয়না। এই সমস্ত আলোচনার ভিতরকার অসারতা ক্রমশঃ যেন তাহার কাছে ধরা পড়িতেছে।

বিশেষ করিয়া সুবোধের কয়েকজন তরুণ বন্ধু তাহার সহিত এমন করিয়া কথা বলে, এমন সাহসিক সুরে এমন সকল বিষয়ের অবতারণা করে যে, শিশিরের সূক্ষ্ম রুচি অত্যন্ত ঘা খায়।

* * * * *

শ্রাবণের শেষে সেদিন আকাশ ঘন স্নিগ্ধ মেঘভারে আচ্ছন্ন। শিশির নিজের ঘরে ব'সিয়া সেলাই করিতেছিল। বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, অনিলবাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন।

"বাইরের ঘরে ব'সতে ব'লো। বাবু তো বাড়ী নেই।"

সে ইচ্ছা করিয়াছিল সুবোধ যখন বাড়ী নাই তখন অনিল নিজেই কিছুক্ষণ বসিয়া নিশ্চয় চলিয়া যাইবে। কিন্তু বাদলের অন্ধকারে মুখ নীচু করিয়া অনেকক্ষণ সেলাইয়ের ফোঁড় তুলিবার পরেও সে বাহিরের ঘরে অনিলের সাড়াশব্দ পাইল। বেয়ারাকে ডাকিয়া সে যেন কি জিজ্ঞাসা করিতেছে। তখন সেলাই রাখিয়া সে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুলটা একটু আধটু ঠিক করিয়া লইল। তাহার পর ধীর পদে বাহিরে আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "চা-টা খাবেন ? উনি এই কতক্ষণ হোল একটু কাজে বেরিয়ে গেছেন।"

"বিলক্ষণ ! চা খাবনা এমন বাদলার দিনে ? আনতে বলুন। কিন্তু সুবোধের এত কাজের তাড়াটা কিসের ? প্রায়ই শুনি বাড়ী থাকেনা।"

স্বামীর স্থির গম্ভীর সংযত বাক্য এবং ব্যবহারের সহিত তাঁহারই বন্ধুদের এমন গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতার মনে মনে তুলনা না করিয়াই সে পারিলনা।

শান্ত স্বরে কহিল, "কাজ কি তাঁর একটা ? না ভাবনা শুধু তাঁর নিজের পরিবারের জন্যে ? তিনি গেছেন কোন একটা কোম্পানীর সঙ্গে দেখা করতে। দেশে যেখানে আমাদের জমিদারি সেখানে গুটিকতক টিউব ওয়েল বসান হবে, তারই ব্যবস্থা করতে।"

"বলতে পারেন এমন বাজে খেয়াল ওর আরও কতগুলো আছে ?"

"না, বলতে পারিনে।" শিশির অন্য দিকে চাহিয়া জবাব দিল।

দুয়ারের কাছে প্রদ্যোৎ ও হীরেনের চেহারা দেখা গেল। শিশির বুঝিল আজ সভা জমকাইয়া উঠিল, সহজে সে ছাড়া পাইবেনা।

অনুপস্থিত গৃহস্বামী বন্ধুর হইয়া অনিল সোৎসাহে তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। প্রদ্যোৎ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সেদিন আর্ট এগ্‌জিবিশনের ছবিগুলো আপনার কেমন লাগলো ?"

"আর্টের আমি কতটুকু বুঝি ?"—শিশির মৃদুস্বরে কহিল।

"আলবৎ বোঝেন !" হীরেন এক হাতে চায়ের প্লেটটা ধরিয়া অন্য হাতে টেবিলে সশব্দে একটা চাপড় মারিল।

"আমাদের কোন একটা লম্বা চওড়া তক্‌মা নেই বলেই

যে আমরা আর্টের বর্ণ-পরিচয় বুঝিনে এমন কথা এমন বিশ্বাস কে আপনার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েচে?"

প্রদ্যোৎ কহিল, "আমরা সহজিয়া, সহজ-অনুভবের রাস্তা আমাদের।"

অনিল।—আসল সেদিন আর্ট-এগ জিবিশনে যতগুলো ছবি দেখেচি তাদের মধ্যে কৃতিত্ব এবং কারিকুরি যতই থাক, তাদের প্রচ্ছন্ন সুরে সাহসের অভাব ছিল।

শিশির কি বলিবে ভাবিতেছে এমন সময় দ্বারপথে মাধবীর শাড়ীর চওড়া পাড়টা ঝলকিয়া উঠিল। সে যেন অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। মাধবী আজকাল বিকালের দিকের এই সময়টা প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত।

"এই যে মাধবী দেবী! আসুন, বসুন।" অনিল একটা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিল। মাধবী কটাক্ষে শিশিরের পানে চাহিয়া তাহার ভিতরকার অবস্থাটা বুঝিল। এবং তাহার হইয়া কথাবার্ত্তার ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

দুয়ারের কাছে একটা ভারি জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। স্বামীর পদধ্বনি নিশ্চয় চিনিতে পারিয়া শিশির উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "একটু ক্ষমা করুন, আমি এখনই আসচি।"

আর্ট এবং বস্তুতন্ত্রের এই সকল উলঙ্গ সাহসিক আলোচনার মাঝে কর্ম্ম-ক্লান্ত স্বামীর সঙ্গে চোখোচোখি করিতে ইচ্ছা হইলনা।

পাশের ঘরে আসিয়া হেঁট হইয়া সুবোধের জুতার ফিতা খুলিয়া স্লিপার জোড়া অগ্রসর করিয়া দিয়া, গায়ের শার্টটা খুলিয়া লইয়া হাতপাখার মৃদু মৃদু বাতাস দিতে দিতে কহিল, "সেই কখন বেরিয়েচ, আজকের মত তোমার সমস্ত কাজ সারা হয়েচে তো?"

সুবোধ হাস্যমুখে তাহার হাত হইতে পাখাটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল, "কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে আর কোথাও বার হবার প্রয়োজন হবেনা। একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, তিনি সাতটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু ও-ঘরে অনেকের গলার আওয়াজ পাচ্ছি,—অতিথ্‌দের ফেলে পালিয়ে এসেচ বুঝি?"

"সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবেনা। ওঁদের কাছে মাধবী আছে। তোমার চা'টা তাহলে এইখানেই আনতে ব'লি?"

"বাঃ, তা কী করে হয়? ভালো না লাগলেও একটা সামাজিক কর্ত্তব্য আছে তো। ও-ঘরেই দিতে ব'লো।"

শিশিরের মনে আজ কয়েক দিন হইতেই একটা পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিতেছিল। তাই সে স্বামীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, ব'লতে পার, তোমার এত রূপ, এত গুণ থাকা সত্ত্বেও, তোমার কারও উপর জোর করবার ক্ষমতা এতটুকু নেই কেন?"

"তার কারণ আমি কখনই কারো ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছা চাপাতে চাইনে।"

"যদি বুঝতে পার যে কারো ইচ্ছার মধ্যে অন্যায় লুকিয়ে আছে, তবুও তাকে নিজে একটু জোর করে নিরস্ত ক'রবেনা?"

"কিন্তু সবারই ন্যায় অন্যায়ের ধারণা তো আমার ধারণার সঙ্গে মিলবেনা।"

"যতই তুমি তর্ক ক'রো, কিন্তু আমি বলব, যে তোমার চেয়ে কম বোঝে, তাকে জোর করে বুঝিয়ে দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।"

"আজ এসব কথা কী বলচ শিশির?"

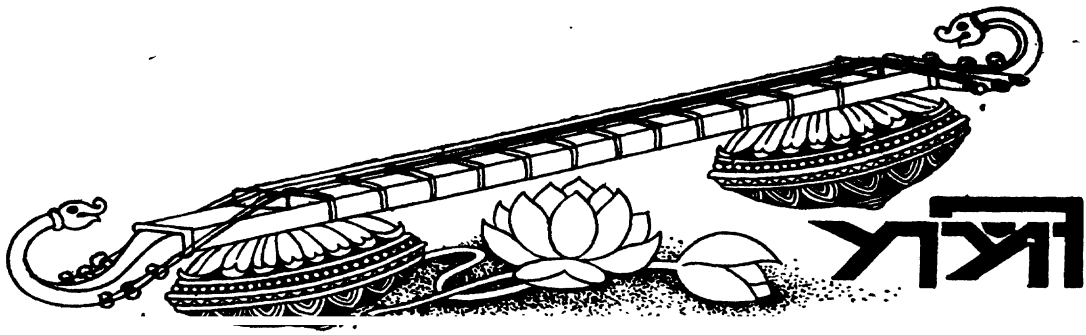
"কেন বলচি? তা কি বুঝতে পারচনা? আমি যখন তোমাদের গ্রাম নূরপুর থেকে চলে আসতে চাইলুম, কেন তুমি বারণ করলেনা? নিজের একান্ত কামনাকে দমন করে, হাজার অসুবিধা স্বীকার করেও কেন তখনই রাজী হয়ে গেলে?" শিশির গাঢ়স্বরে কহিল।

"আশ্চর্য্য! তোমার যেখানে থাকতে ভালো লাগবে-না, সেখানে জোর করে আমি তোমাকে ধরে রাখব। এতদিন পরে তোমার স্বামীর কি এই পরিচয় পেলে শিশির?" সুবোধ সরিয়া আসিয়া সস্নেহে তাহার মাথায় একটা হাত রাখিয়া কহিল, "আজ কোন কারণে নিশ্চয় তোমার মন ভালো নেই। চল ও-ঘরে যেয়ে বসিগে। চা'টা কি আজ আর আমাকে খেতে দেবেনা না-কি?"

তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শিশির কহিল, "ও-ঘরে যাবার জন্যে ঠিক আমি মরে যাচ্ছিনে।"

তাহার রোষারুণ মুখের প্রতি চাহিয়া সুবোধ মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে কহিল, "এত অল্পেই তুমি এমন চটে ওঠ, আর রাগ করলে তোমাকে এমনই সুন্দর দেখায়!"

(আগামীবারে সমাপ্য)



জন্মাষ্টমী

সুর, কথা, স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

মিশ্র কীর্ত্তন···সুর ফাঁকতাল

অন্তর বন মঞ্জিল   মন্থর মন ছন্দিল
পলাল হেমন্ত দূরে
বন্ধনভয় খণ্ডিয়া   নন্দনজয় ডঙ্কিয়া
নিখিলে বসন্ত ঝুরে
কান্ত অনিল ভঙ্গিমা   পাণ্ডুরে দিল রক্তিমা
ধূলিবুকে বহাল সুধা
সন্ধ্যায় বুনি' স্বপ্নে সে   চন্দ্রমা মণিলগ্নে এ
আঁধারের মিটাল ক্ষুধা।
চন্দননতি-অর্চ্চনে   বন্দনারতি-মূর্চ্ছনে
গাঁথিল সে মিলন সুরে
চুম্বন, ক্ষমি' শূন্যতা   জন্মাষ্টমী পুণ্যদা
লঙ্ঘিল মরণ পুরে।

The Presage

The heart is a woodland singing its pæan of flowers,
The arid mind rings with the laughter of showers,
Winter is melting awa
Now ends the dread of bondage and its story,
And Heaven peals its glad triumphant glory—
For spring has come to sta
The zephyr's winding beauty now has kissed
The languid to the joy-blush it missed—
The sands with honey are drenched
In jewelled moonrise streams He has come to weave
The dream of dreams into the eye of eve,—
The darkness's thirst is quenched

He quickens the soul with worshipping frank incense,
And round our rapture weaves He his intense
Garland of union ;
His kiss forgives our wanness of life's flame
His holy birth of births is here to shame
Death's dominion.

Translated by Dilipkumar ; corrected by Sri Aurobindo.

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II গা রগা সা গা | মা পা | ধপা মপা মগা মা I পা ধা রর্সা নর্সা | ধর্সা ণা | পণা ধপা মা গা I
অন্ - ত র ব ন মন্ - জি ল মন্ - থ র ম ন ছন্ - দি ল

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মা পধণা ধপা ধা | পমা পা | মগা মা রগা মপা I হ্মপা হ্মধা ধধা ধা | ধণা ধর্সা | ণণা ধধা ণর্রা র্সা I
প লা ল হে মন্ - ত দূ রে - দূ - - - রে - - - হে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ধর্সা ণা পণা ধা | মধা পপা | রা গা মা পা I ণা ধণা ধা পা | ধণা র্সর্রা | সণা ধপা মা ণা I
মন্ - ত - দূ - রে - - হে মন্ - ত দূ রে - - - প লা

ণা ণা ধা পধা | পমগা মা | পা -া -া -া II পা না পা না | পা না | মা র্সা ণা ধা I
ল হে মন্ - ত দূ রে - - - ব ন্ ধ ন ভ য় থ ন্ ডি য়া

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা র্রা র্সা ণা | ধা পা | পপা হ্মপা গমা গা I সগা মপা ধনা র্সা | গর্রা র্সনা | ধপা হ্মপা পগা -া I
ন ন্ দ ন জ য় ডঙ্ - কি য়া নি খি লে ব সন্ - ত ঝু রে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
গমা গপা পপা পা | হ্মপা হ্মধা | ধধা ধনা হ্মপা ধা I পধা পনা ননা না | ধন. ধর্সা | নধা ধনা পধা না I
ঝু - - - রে - ঝু - - - ঝু - - - রে - - - - -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্রা র্সা ণা | ধা পা | হ্মা পা মগা রসা II রা গা রা মা | মা মগরা | গা রগা রসনা সা I
নি খি লে সু গ ন্ ধ ঝু রে - কা ন্ ত অ নি ল ভঙ্ - গি মা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
রা মা মা গমপা | পা পরা | মমা রপা ধা পা I পধা ধর্সা র্সা র্সর্রা | র্সণা র্সণা | পধা ণা র্সপা -া I
পা ন্ ডু রে . দি ল র ক্ তি মা ধূ লি বু কে ব হা লো সু ধা -

২
পধা ণর্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সর্রা র্সণা | ধণা পধা র্সণা ধপা I ধর্সা ণা পণা ধা' | জ্ঞধা পণা |
গো - - - - - - - - - - - . কী ম ধু সু ধা -

৩
ধর্সা ণধা র্সণা ধপা I

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা না ধা র্সা | না র্রা | র্গর্রা র্সর্রা র্সা র্সা I না র্সা ধা ণা | পা ধা | র্রর্সা ন্সর্সা ণা ধা I
স ন্ ধ্যা য় বু নি স্ব প্ নে সে চ ন্ দ্র মা ম ণি ল গ্ নে এ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা পা পদা পদা | পা মপা | মগা মা পা -া I পদা ণণা ধণা র্সা | র্রর্সা ণণা | ধণা ধণা পদা পা I
আঁ ধা রে র মি টা লো ক্ষু ধা - গো - - - - - - - - - - - -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা ধা ণা র্সা | ণর্সা র্রজ্ঞা | র্রর্সা ণধা র্সণা পা I পা পা পা পধা | পজ্ঞা পা | পা ধা ধা না I
যু গে র ক্ষু ধা - - - - - চ ন্ দ ন ন তি অ র্ চ নে

পধা নর্সা র্রর্সা নধা | পজ্ঞা পা | গপা ধর্সা নধা পা I পধা ধনা র্সনা ধপা | পা ধা | ধা না ধনা -া I
বন্ - দ না র তি মূ র্ ছ নে গাঁ থি ল সে মি ল ন সু রে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্সা র্সা ন্সর্সা | র্সা র্সর্রা | ন্সর্সা না না র্সা I ধা র্সা না ধপা | পা ধা | ধা র্সা না -া I
গাঁ থি ল - গাঁ থি ল - চু ম্ ব ন মা লা মি ল ন সু রে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্সা ঋা ন্সর্সা | না -া | র্রর্সনা না র্সনধা পা I পধা ক্ষপা ধা র্সা | না -া | না র্রা র্সা র্সর্রা
কু ঙ্ কু ম চ ন্ দ ন ঢা লা মা লা র সু রে - চু ম্ ব ন

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্সা নর্সনা ধা | নর্গা র্রা | নর্রা র্সা নধা পজ্ঞা I পা না র্সা র্রা | র্গা র্রা | র্সা নর্সা ধনা র্সর্রা I
আ লো জ্বা লা মি ল ন পু রে - তি র পি বি র হী বি ধু রে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না নর্সা না ধপা | পা ধা | ধা না না -া I নর্সা র্রর্গা র্রর্সা নধা | নর্সা র্রর্সা | নধা ধনা পধা ধনা I
গাঁ থি ল সে মি ল ন সু রে - গো - - - - - - - - - - -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা না না নর্সা | ॰ ধনা ধা | না র্সা ধনা -া I না র্রা র্ঋা গর্রা | নর্রা র্সনা | ধনা র্সা ধনা -া I
ম ন্ থ র অ ন্ ত র সে - ম র্ ম র গন্ - ধ র সে -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্সা নধা না | ধপা ধা | হ্মা পা ধা না I নর্রা র্সনা ধপা ধা | নর্রা র্সনা | ধনা পধা ধনা ননা I
উ ছ লি ল মা য়া নূ পু রে নূ পু রে নূ পু রে - - - - -

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
না র্সা না ধপা | পা ধনা | পা ধা না -া I না র্সা নর্সা নর্সর্রা | র্ঋা র্রা | র্রা -া র্ঋা র্রধা I
ঝ রা লো গো মি ল ন সু রে - চু ম ব ন ক্ষ মি শূ ন্ ন তা

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ধা না না র্সা | র্গা র্রা | র্রা র্সর্রা র্সা না I না র্সা ধনা ধা | না র্সা | র্রা -া র্রা র্গা I
জ ন্ মা ষ্ ট মী পুন্ - ন দা এ লো রে - শ্যা ম ল - এ লো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
র্রা র্গা র্ঋা র্রা | নর্রা র্সর্রা | র্সা না র্সা র্গা I র্রা র্সা না ধা | না র্সা | র্রা -া র্রা র্রা I
জ ন্ মা ষ্ ট মী দি নে জী ব ন ক রি য়া উ জ ল - এ লো

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
পা ধা ধা না | র্সনা ধা | নধা পা ধা না I ধপা -া গা মা | মা পা | -া -া -া -া I
ম র ণ বি দ - লি - অ ল - পে ল লা - - - - জ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
মা ধা পা ধপা | মা ধা | পা ধা পহ্মা পা I মগা মা মা পা | -া -া | -া -া পা -া I
পে ল ম ধু শ্যা ম ল জ ন ম রু পে লা - - - - জ যু গ

১ ২ ৩ ১ ২
পা পধনা না না | না ধনর্সা | র্সা র্সা র্সা নর্সর্রা I র্রা র্রা র্গর্সা র্সা | র্রর্সা না |
ম র ণ বে সু র য ত লা জ পে ল জ ন ম সু

৩
র্সনধা ধা নধপা পা॰ I
রে - - -

১ ২ ৩ ১ ২

পণা দদা দা দপমা | মা পা | মগা মা রগা মপা I ক্ষপা ক্ষপা ধপা ক্ষপা | ধপা মগা

ল জ্ জি ল ম ব ণ পু বে - পু ন্ ন - সু -

৩

পমা গবা মগা রসা | II

বে - - *

* এ গানটির ছন্দ সুর ফাঁকতাল হইতে সৃষ্ট। অর্থাৎ

অ ন্ত ব | ব ন | ম ঞ্জি ল I । । । । | । । । । | । । |

ম স্থ র ম ন ঝ ঙ্কৃ ল প লা ল হে ম ন্ ত দূ রে (যতি)

ইহাকে মাত্রামাত্রিক করিয়া পড়িতে গেলে যতিভঙ্গ দোষ ঘটিবে তৃতীয় পংক্তিতে। তৃতীয় পংক্তির পর্ব্বভাগ ৪+৪+১+১ যতি, কিন্তু গানের সা ৪+২+৩+১ যতি এই ভাবেই (অর্থাৎ সুর ফাঁকতালের ছন্দেই পড়িবে)। এ ধরণের ছন্দে আমার বোধ হয় বাংলা গান অদ্যাবধি লেখা হ নাই—কারণ সুরফাঁকতাল লোকপ্রিয় তাল নহে ইহার ৪+২+৪ পর্ব্বভাগ প্রথমে কানে সুললিত বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু নূতন ছন্দ তাল অনভ্যাসে প্রায়ই সুললিত মনে হয় না কিন্তু একবার অভ্যাস হইয়া গেলে রস সহজেই পাওয়া যায়। তবে যাঁহারা স্বরলিপি দৃষ্টে এ গান শিখিবেন—তাঁহাদের পক্ষে এ-গানটির ছন্দরসটি সহজেই উপভোগ্য হইবে। কিন্তু সব কাব্যরসিক সঙ্গীত রসিক নহেন, তাহাই এ কয়টি ক পাদটীকায় বলা দরকার মনে করিলাম। ইতি। শ্রীদিলীপকুমার রায়।

শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান

বনাম

মিঞাপুর

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

বহুদিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রে মিঞাপুর সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সন ১৩৩১ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এতদিন পরে দেখিতেছি আবার সেই কথা উঠিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, গত ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে "শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। রমাপ্রসাদবাবু নিশ্চয়ই জানেন যে মিঞাপুর লইয়া ভয়ানক গণ্ড-গোলের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠ মিঞাপুরকে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া প্রচার করায় বাঙ্গালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং ঐতিহাসিকগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধে, নিবন্ধে, বক্তৃতায়, বহু পত্রে, পুস্তিকায় ও সভায় তাহা প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মিঞাপুর শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নহে। আজি পর্য্যন্ত তাঁহার কোন যুক্তিই খণ্ডিত হয় নাই। কাজেই গৌড়ীয়-মঠ অভিভাবক অনুসন্ধানে রমাপ্রসাদ বাবুকে ধরিলে তিনি সুকৌশলে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান"। প্রবন্ধের নাম "নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" হইলেও তাঁহার লক্ষ্য "রামচন্দ্রপুর"। কারণ রামচন্দ্রপুরই যে শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান, তাহাও বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক

বিচার-প্রণালীর দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এখন রামচন্দ্রপুরকে মিঞাপুরে টানিতে পারিলেই রমাপ্রসাদ বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শীর্ষকে "নবদ্বীপের স্থিতিস্থান" লিখিয়া অভ্যন্তরে রামচন্দ্রপুরকে লইয়া টানাটানি কোন্ দেশীয় বিচার-পদ্ধতি বুঝিলাম না।

রমাপ্রসাদবাবু লিখিয়াছেন—গৌড়ীয় মঠের কতিপয় সদস্য নাকি এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি-কেন? তাঁহার অভিমত গ্রহণের হেতু কি? আর অভিমতই যদি দিতে বসিলেন তবে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের লেখার বিচার করিলেন না কেন? বিরুদ্ধ-পক্ষের যুক্তির খণ্ডন করিলেন না কেন? ইহাও কি "ঐতিহাসিক"-সম্মত বিচার-প্রণালী? যে বিষয়ে স্যর যতুনাথের মত ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন, বহু সুধী সুবিদ্বান্ পণ্ডিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন—সে বিষয় কি এতই অবহেলার? না সে বিষয়ে অভিমত দেওয়া এতই সহজ? সদস্যগণ বলিলেন, আর তিনি অমনি অভিমত দিয়া বসিলেন? তিনি কোনও দিনই এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাই, বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহু তথ্যই তাঁহার অজ্ঞাত, সুতরাং তিনি এ বিষয়ে অভিমত দিতে আসিলেন কোন্ সাহসে? ইতিহাস আলোচনা-ক্ষেত্রে তিনি যে "বিচার-প্রণালী" অবলম্বন করিয়া থাকেন, সে বিচার-প্রণালী কি বলে যে, কোনও তর্ক-সঙ্কুল বিষয়ে মত দিতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মতের আলোচনা করিও না, খণ্ডন মণ্ডন করিও না? তিনি লিখিয়াছেন—"অবসরের অভাবই আমার পরমত-বিচারে বিরত থাকার কারণ।" যদি অবসরই ছিল না, তবে এ বিষয়ে নীরব থাকিলেই তো পারিতেন। তিনি প্রবীণ, সুতরাং এ অযথা অনধিকার-চর্চ্চার কৌতূহল দমন করাই তাঁহার উচিত ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মত বিচারে "অবসর" নাই, অথচ অভিমত দিবার "অবসর" আছে, এ তো মন্দ যুক্তি নয়!

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীল ব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। আমরাও সময়মত এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুরানো কথার পুনরুক্তি করিয়া পুঁথি বাড়াইব না। রমাপ্রসাদবাবু খান-দুই ম্যাপ ছাপাইয়া, পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শক দুই চারিজনের ভ্রমণ-কাহিনী বা রোজনামচার বুকনী দিয়া যে চটক্ লাগাইবার,—একটা ধাঁধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে সেই বিষয়েই দুই চারিটী কথা বলিব। নবদ্বীপের সীমা নির্ণয়ে যে চারিটী ঘাটের কথা বহুবার বলা হইয়াছে—তাহার একটী নবদ্বীপের উত্তরে নিদয়ার ঘাট। দক্ষিণে কুলিয়ার ঘাট আর একটী, যে ঘাটে গঙ্গাপার হইয়া লোকে কুলিয়া গিয়াছিল। পশ্চিমে বিদ্যানগরের ঘাট, পূর্ব্বে রমাপ্রসাদবাবু কথিত ফুলিয়া যাইবার ঘাট। এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর অধিষ্ঠিত ছিল। কাজী-দলনের দিনে যে কয়টি ঘাটে কীর্ত্তনের কথা আছে, সেগুলি নবদ্বীপের নরনারীর স্নানাদির জন্য ব্যবহার্য্য গঙ্গার ঘাট মাত্র। এই ঘাটে ঘাটে নৃত্য করিয়া সঙ্কীর্ত্তন-দল-সহ শ্রীমহাপ্রভু কাজীকে দলন করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা নবদ্বীপের ভৌগোলিক সীমা নির্দ্ধারিত হয় না। আমরা অন্য দিক্ দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে নবদ্বীপ ও রামচন্দ্রপুরের বিষয় বিবৃত করিতেছি। পরে প্রয়োজন হইলে চৈতন্য-ভাগবতাদির আলোচনা করিব।

রমাপ্রসাদবাবু লিখিয়াছেন "১৭৬৪ সালের মে মাসে রেণেল সাহেব গভর্ণর হেনরী ভান্সিটার্ট কর্ত্তৃক সার্ভেয়ার বা প্রধান আমীন নিযুক্ত হইয়াছিলেন"। আমরা পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শকদিগের ভ্রমণ-কাহিনী, ম্যাপ ইত্যাদি লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং রেণেলের সামান্য পরবর্ত্তী একজন দেশীয় পথ-প্রদর্শকের কথা তাঁহাকে নিবেদন করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ "তীর্থমঙ্গল" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনায় সময়—

"এগার শ সাতাত্তরি সনে ভাদ্র মাসে।
বিশারদ কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥"

এই কৃষ্ণচন্দ্র ভূ-কৈলাসের রাজা, বিজয়রাম বিশারদ তাঁহার সভা-কবি। বাঙ্গালা ১১৭৭ সাল বোধ হয় ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা হইলে বিশারদ রেণেলের সম-সাময়িক। তিনি "তীর্থ-মঙ্গলে" লিখিতেছেন—খিদিরপুর হইতে ঘোষাল মহাশয় গঙ্গাপথে উত্তর দিকে যাইতে—

"বাম ভাগে থাকিলেক অম্বিকা সহর।
হরি নদী ডাহিনে রাখি চলিল সত্বর॥

কালনা আসিয়া সবে স্নান পূজা করি।
ভোজন করিয়া কর্ত্তা চড়িলেন তরী॥
ছয় দণ্ড বেলা যখন আছয়ে গগনে।
নবদ্বীপ আসি নৌকা দিল দরশনে॥
চলাচল চলে নৌকা নগ্যা (নদীয়া) বামভিতে।
তে-মোহানী দিয়া নৌকা পড়িল খড়্যাতে॥
গঙ্গার তীরেতে গ্রাম অতি পুণ্য স্থান।
ইহ দেশে নবদ্বীপ কাশীর সমান॥
নবদ্বীপে বুড়া শিব আর নিত্যানন্দে।
উদ্দেশে প্রণাম করি চলিলা আনন্দে॥"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে,—গঙ্গার পশ্চিম পারে নবদ্বীপ ছিল। নদীয়ার ঈশান কোণে তে-মোহানী,—খড়ে অর্থাৎ জলাঙ্গীর ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল ছিল। এখন পাঠক বুঝিবেন কতকগুলি পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শকের নামাবলী গায়ে দিয়া কয়েকখানি ম্যাপের ছাপ আঁটিয়া রমাপ্রসাদবাবু কেমন একটা ভ্রান্তসিদ্ধান্ত ফাঁদিয়াছেন! রমাপ্রসাদ বাবু রেণেলের দোহাই দিয়া নদীয়াকে ক্ষুদ্র সহর বলিতেছেন;—তীর্থমঙ্গলে প্রত্যা-গমন-পথের বর্ণনা শুনুন—(তীর্থমঙ্গল—২০৩-২০৪ পৃষ্ঠা) কাটোয়া ও অগ্রদ্বীপ দিয়া গঙ্গাপথে দক্ষিণ দিকে আসিবার সময়—

"শিকিড়াগাছি বালাডাঙ্গা থাকিল বামেতে।
মেহেড়তলা কাষ্ঠশালী রাখি ডানি ভিতে॥
নবদ্বীপ আইলা নৌকা বাইয়া ত্বরা ত্বরি।
ঘাটে ঘাটে স্নান করে নবদ্বীপের নারী॥
সতের শত ব্রাহ্মণ আছে নগ্যার (নদীয়া) ভিতরে।
আর কত কত লোক কে বলিতে পারে॥
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য না যায় গণন॥
আশি জন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে বিশারদা।
রাজার সভায় তাঁরা থাকেন সর্ব্বদা॥
পঞ্জিকা করিতে গণক আছেন বিদ্যানিধি।
অব্যর্থ গণনা তাঁর যথা শাস্ত্র বিধি॥
সুবর্ণ বণিক কত কাঁসারী শাঁখারী।
বাজার সড়কে কত মুদি সারি সারি॥
লোচন কবিরাজ আর শ্যাম কবিরাজ।
বড়ই উত্তম দোঁহে স্থিতি নগ্যা মাঝ॥
বিস্তর লোকের বাস নদীয়া সমাজ।
রচিতে না পাইয়া ক্ষমা দিলা কবিরাজ॥
তে-মোহানী দিয়া নৌকা পড়ে খড়্যার জলে।
অর্দ্ধ গঙ্গা অর্দ্ধ খড়্যা স্রোতে নৌকা চলে॥
নবদ্বীপের যত দেব প্রণাম করিয়া॥
স্নান পূজা করি ঘোষাল চলিলা বাহিয়া॥"

এই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে অপর কোন্ পাশ্চাত্য পথ-প্রদর্শকের কথা বিশ্বাসযোগ্য? রমাপ্রসাদবাবু যে বলিতে-ছেন, "এই নবদ্বীপের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিক্ দিয়া জলাঙ্গীর দুই শাখা প্রবাহিত"—তাহার প্রমাণ কোথায়? তীর্থমঙ্গল হইতেই প্রমাণিত হইল এই উক্তি ভিত্তিহীন।

রমাপ্রসাদবাবু মোটা বাবাজীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। নবদ্বীপের ভাঙ্গনের বিষয় রেণেল সাহেব কি বলিতেছেন দেখুন—

"During eleven years of my residence in Bengal the outlet or head of the 'Zellingy' river was gradually removed 3 quarters of a mile further down and by two surveys of a part of the ancient banks of the Ganges, taken about the distance of a year of each other, it appeared that the breadth of an English mile and a half had been taken away."

[Rennel—1788, "Memoir of a map of Hindusthan"]

ভাঙ্গনের কথাই শেষ করিয়া দিই। স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তীর্থপর্য্যটন-ব্যপদেশে নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তারিখটা বোধ হয় ১৮৪৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী। তাঁহার লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "The Travels of a Hindu" পুস্তকে লিখিত আছে—

"The caprices and changes of the river have not left a trace of old Nuddea. It is now partly char land and partly the bed of the stream that flows to the north of the town. The Ganges formerly held a westerly course and old Nuddea was on the same side with Krishnagar. Fifty years ago it was swept away by the river."

রেণেল যে ভাঙ্গনের কথা বলিয়াছেন, ভোলানাথবাবুর উক্তি দ্বারা তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। ভোলানাথ

বাবু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান বিষয়েও অনুসন্ধান লইয়াছিলেন। তাঁহার কথাতেই বলি—

"To nothing does Nuddea owe its celebrity so much as for its being the scene of the life and labours of Chaitanya. On enquiring about the spot of His birth, they pointed to the middle of the stream which now flows through old Nuddea."

স্বর্গীয় যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ১৮৫৭ খ্রীঃ নবদ্বীপ দেখিয়া তাঁহার "তীর্থভ্রমণ" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের জন্মস্থান জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে, কিন্তু সে স্থান গঙ্গাগত"। গৌড়ীয় মঠের বিমলানন্দবাবুর পিতা কেদারবাবু ১৮৯০ খ্রীঃ "বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন—"বৈষ্ণবপ্রবর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় গঙ্গানগরের পশ্চিম অংশে শ্রীরামচন্দ্রপুর নামক একটী নগর পত্তন করতঃ তথায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন নির্ম্মাণ করেন"। বেলপুকুর জমিদারী সেরেস্তার একখানি ম্যাপে জজ-আদালতের মোহর ও জজের নাম স্বাক্ষরিত আছে। (মোহর আদালত, আপীল কলিকাতা ১২০০ সাল, ১৭৯৩ খ্রীঃ)। ইহাতে গঙ্গাগঞ্জ, রামচন্দ্রপুর, ও উক্ত মন্দির চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮২০ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারী তারিখের "সমাচার-দর্পণে" মন্দির মেরামতের কথা এবং ১৮৪৬ সালের "কলিকাতা রিভিউ"এ উক্ত মন্দির (উচ্চতা ৬০ ফুট) ১৮২১ সালে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার কথা আছে। এই সমস্ত আলোচনা করিলে কি মনে হয় না যে, রামচন্দ্রপুর আধুনিক স্থান নহে, এবং সেই স্থানেই মহাপ্রভুর পিত্রালয় ছিল। তাই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তথায় মন্দির প্রতিষ্ঠা ও জগন্নাথ মিশ্রের নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদবাবু কৌশলে মিঞাপুরের প্রশ্ন এড়াইয়া বলিতেছেন—"গঙ্গানগর হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে প্রায় ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বর্ত্তমান বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জকে এই সীমার অন্তর্ভুক্ত করা অসাধ্য"। রমাপ্রসাদবাবু সরেজমিনে তদন্ত করিলে বুঝিতে পারিতেন যে, দূরত্ব ৪ মাইল নহে, উহা মাত্র দুই মাইলও হইবে না। গৌড়ীয় মঠের "প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি মীমাংসা" পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"এই রামচন্দ্রপুর কোথায়? উহা নবদ্বীপ সন্নিহিত একটী গ্রাম, এবং উহা গঙ্গানগরের পশ্চিমাংশে এবং শ্রীমায়াপুর (?) [মিঞাপুর] হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত"। আমাদের মতে এক ক্রোশেরও কম।

রেণেল সাহেব বলিতেছেন, নদীয়ার মাইল খানেক কি দেড় মাইল স্থান গঙ্গার ভাঙ্গনে ধ্বসিয়াছে। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ সালে বলিতেছেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে উহা ঘটিয়াছে। চন্দ্র মহাশয় আরো বলিতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানও ঐ সঙ্গে গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে। সুতরাং ঘটনাটী রেণেলের সময়ই ঘটিয়াছিল। ১৮৫৭ সালে যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় পুনরায় সেই কথাই বলিতেছেন। ঐ ভাঙ্গনের সময়েই যে মন্দিরটীও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল ১৮২০ সালের সমাচার-দর্পণের কথায় তাহা প্রমাণিত হয়। কলিকাতা রিভিউ হইতে দেখা গেল ১৮২১ সালে মন্দিরও গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ১৭৬৪ খ্রীঃ হইতে রেণেলের এগার বৎসরের চাকুরীর সময়েই রামচন্দ্রপুর চড়ার সৃষ্টি—১৭৭৫ খ্রীঃ মধ্যেই ধরিলাম। ভোলানাথ চন্দ্রের "প্রায় পঞ্চাশ বৎসর" ঠিক ঐ সময়েই গিয়া পড়ে। সুতরাং মোটা বাবাজী যদি হাণ্টারকে বলিয়া থাকেন শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে, তাঁহার অন্যায়টা কোথায় হইল? রামচন্দ্রপুরে চড়া পড়িলেও মন্দিরটী বাঁচিয়া ছিল, চড়া পড়ার বছর কয়েকের মধ্যে তাহাও গেল। ইহার মাঝখানে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে গঙ্গানগর, রামচন্দ্রপুর ও মন্দির চিহ্নিত রহিয়াছে। মহাপ্রভুর জন্মস্থানের আশে-পাশে মুসলমানগণের কবর থাকিবার কথা নহে। সেটা ব্রাহ্মণপল্লী ছিল। মিঞাপুরের চারিদিকে কোন ব্রাহ্মণের পুরানো ভিটা পাওয়া যায় না। আর রামচন্দ্রপুরের অতি নিকটে কৃষ্ণানন্দ-আগমবাগীশের ভিটা, শ্রীচৈতন্যের শ্বশুর রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের ভিটা ইত্যাদি এখনো বর্ত্তমান। মহামহোপাধ্যায় অজিত ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সকলেই আগমবাগীশের ভিটা ও সনাতন মিশ্রের ভিটাকে মহাপ্রভুর সম-সাময়িক বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। বহু প্রাচীনের নিকটও ইহা শুনিয়াছি। সনাতন মিশ্রের ভিটা যে সুবুদ্ধি রায়ের দত্ত ব্রহ্মোত্তর, তাহারও জনশ্রুতি বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। নবদ্বীপে অনুসন্ধান করিলেই রমাপ্রসাদবাবু তাহা জানিতে পারিবেন।

রমাপ্রসাদবাবু "চৈতন্য-ভাগবত" হইতে কুলিয়া, ফুলিয়া,

ইত্যাদি লইয়া অনেক গবেষণা করিয়াছেন। কাজী-দলনের দিনের নগর-কীর্ত্তনের হিসাব দেখাইয়াছেন। সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের এই কস্‌রতের উত্তরে আমরা একটী সোজা সিদ্ধান্ত নিবেদন করি। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে শ্রীমহাপ্রভু বিদ্যানগরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আচ্ছা, মিঞাপুরেই যদি তিনি বাস করিতেন, তাহা হইলে প্রতিদিন তাঁহাকে কি দুই বেলা চৌদ্দ ক্রোশ পথ ভাঙ্গিয়া বিদ্যানগরে যাতায়াত করিতে হইত? নবদ্বীপ ষ্টেশনের পশ্চিমে গঙ্গার প্রাচীন খাতের উপর সেকালের বিদ্যানগর আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথা হইতে মিঞাপুরের দূরত্ব তিন চারি ক্রোশের কম হইবে না। "অদ্বৈত-প্রকাশে" দেখিতে পাই—

"গৌর কহে শুন গুরু বেদপঞ্চানন।
বিদ্যানগর হইতে আইলুঁ তোমার স্থান॥
সুদর্শন স্থানে ষড়্‌দর্শন পড়ি দুই বর্ষে।
তবে গেলাম বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাশে॥
তাঁর স্থানে তর্ক শাস্ত্র পড়ি দ্বিবৎসরে।
এবে তুয়া স্থানে আইলাম বেদ পড়িবারে" ॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতাই বিদ্যাবাচস্পতি। ইহাঁরই বাড়ী হইতে শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু কুলিয়ায় গমন করেন। মহাপ্রভু বিদ্যানগরে শুভাগমন করিলে নবদ্বীপবাসী নৌকারোহণে বিদ্যানগরে গিয়াছিলেন। বিদ্যানগরের চতুষ্পাঠীর কথা বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপরিচিত। অথচ রমাপ্রসাদবাবু এই বিদ্যানগরের প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন নাই।

এইবার "চৈতন্য-ভাগবতের" কথা বলিতেছি। "আপনার ঘাটে", "মাধাইয়ের ঘাটে", "বারকোণা ঘাটে" ও "নগরিয়া ঘাটে" নৃত্য করিয়া শ্রীমন্‌-মহাপ্রভু গঙ্গানগর দিয়া সিমলিয়া গেলেন, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে ইহাই লিখিত আছে। এই চারিটী ঘাটই তখন বিখ্যাত ছিল। এক ক্রোশের মধ্যে চারিটী ঘাট জনাকীর্ণ সহরে এমন কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাহার পর এই ঘাটগুলির মাঝখানে ছোট খাট, কোন নামহীন অখ্যাত ঘাট থাকিলে কাহারো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। হয়তো ঐরূপ ঘাট ছিল এবং তাহা চৈতন্য-ভাগবতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। চৈতন্য-ভাগবতকার রমাপ্রসাদবাবুর ন্যায় বিচার-প্রণালী-সিদ্ধ কৌতুহলী ঐতিহাসিক ছিলেন না, ভৌগোলিকও ছিলেন না। সুতরাং চারিটা প্রধান ঘাটের কথাই তিনি লিখিয়াছেন। "মাধাইয়ের ঘাট" নাম হইতেই বুঝা যায় যে এই ঘাট পূর্ব্বে ছিল না, কিম্বা ইহার অন্য নাম ছিল। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় মাধাই ভক্তিপথে আসিয়া যে ঘাটে নামজপ করিতেন, তাহাই মাধাইয়ের ঘাট নামে চৈতন্য-ভাগবতে স্থান পাইয়াছে। চৈতন্য-ভাগবতেই পাইতেছি, এই চারিটী ঘাট হইতে গঙ্গানগর দিয়া শ্রীমহাপ্রভু সিমলিয়া গিয়াছিলেন। তাহা হইলে ঐ চারিটী ঘাটের লাগাও গঙ্গানগর। রামচন্দ্রপুর যে গঙ্গানগরেরই একটী পাড়া, তাহা সকলেই জানেন। আর গঙ্গানগর হইতেই সিমলিয়া গেলেন, ইহার অর্থ যে গঙ্গানগর আর সিমলিয়া গায়ে গায়ে লাগাও, ইহাই বা কে বলিবে? রমাপ্রসাদবাবু চৈতন্য-ভাগবতের যে পয়ার তুলিয়াছেন, তাহার শেষে রহিয়াছে—

"জলপানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
* * * * *
সর্ব্ব নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন রায়।
গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥"

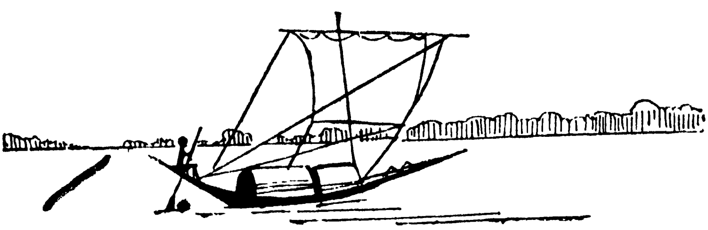
আচ্ছা ঐ যে "নগরে আইলা পুনঃ" এ কথার অর্থ কি? কাজী দলন করিয়া কোন্ দিকে তিনি শ্রীধরের বাড়ী গিয়াছিলেন? সেখান হইতে পুনরায় নগরে আসিলেন কোন্ স্থানে? নগরের কোন্ স্থান হইতে গাদিগাছা পারডাঙ্গা মাজিদা দিয়া তিনি কোথায় গেলেন? চৈতন্য-ভাগবত প্রণেতা শ্রীচৈতন্যের নগর-কীর্ত্তন ও কাজী দলনের কথা লিখিয়াছেন। আনন্দে উন্মত্ত জনতা কোথা দিয়া কোথায় যাইতেছে, তাহার সঠিক হিসাব কেহ রাখে নাই। ভাগবতকার মোটামুটী একটা বর্ণন দিয়াছেন। ইহার মধ্য হইতে পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস ও ভূগোলের সন্ধান না করিয়া অন্য উপায় দেখা আবশ্যক। আমরা সেবার শ্রীধাম বৃন্দাবন গিয়া সুপ্রসিদ্ধ পদগ্রন্থ "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণির" সম্পাদক রসজ্ঞ পণ্ডিত অধুনা নিত্যধাম-গত শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকটী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদ তিনি আমাকে নকল করিয়া লইতে দিয়া অনুগৃহীত করেন। তাহার মধ্যে উদ্ধবদাস ভণিতার কাজী দলনের একটী পদ আছে। এই উদ্ধবদাস শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী।

ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এবং শ্রীমহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ-কালে সঙ্গী ছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণপদ দাস মহাশয় গুরু-পরম্পরাক্রমে উদ্ধবের পরিচয়-কথা এইরূপই শুনিয়া আসিতে-ছেন বলিয়াছিলেন। এই উদ্ধব দাসের আরো অনেক পদ আছে। আমরা কাজী দলনের পদটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উদ্ধব গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য,—সুতরাং ইনি যে প্রত্যক্ষদর্শী সে বিষয়ে সংশয় নাই।

"যেদিনেতে গৌরহরি কাজীরে দলন করি
নবদ্বীপে করিলা গমন।
চারি ঘাট উত্তরিয়া গঙ্গানগর গ্রাম দিয়া
পাইলা জলাশয় সুশোভন॥
পাইয়া আপন ঘাট মাধাই ঘাটে করি নাট
নিকটেতে শ্রীবাস ভবন।
তাহার ঈশান কোণে বারকোণা ঘাট নামে
যাঁহা হয় শুক্লাম্বরাশ্রম॥
নাচি নাচি কিছু দূরে নগরিয়া ঘাট পরে
অদূরে বিস্তীর্ণ সরোবর।
তাহাতে কমল নাচে তরঙ্গ তাহার পাছে
নাচে পক্ষী গাহিছে ভ্রমর॥
জলাশয় ঐশানেতে চাঁদ কাজী করে স্থিতে
শিমলিয়া নামে সেই স্থান।
কাজীরে দলন করি ভক্ত সঙ্গে গৌরহরি
দক্ষিণেতে করিলা প্রস্থান॥
অলকানন্দার কূলে নাচে গোরা বাহু তুলে
পদভরে ধরা টলমল।
সেতু হইলা শ্রীঅনন্ত দেখিলেন ভাগ্যবন্ত
অতিক্রান্ত কীর্ত্তন মণ্ডল॥
শ্রীধরের গৃহ হইয়া গাদিগাছা মাজিদা দিয়া
নাচি নাচি চলে গোরা রায়।
দেবতা মানুষ মিলি সঙ্গে নাচে কুতূহলী
হাসে কাঁদে গড়াগড়ি যায়॥
পারডাঙ্গা উত্তরেতে রাজপণ্ডিতের ভিতে
ভক্তগণে মহা সুখী করি।
বায়ু কোণে কিছু দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে
নিজ গৃহে আইলা গৌরহরি॥
ত্রিভুবনে হরিধ্বনি ইহা বই নাহি শুনি
জুড়াইল ভক্ত মন-প্রাণ।
এ উদ্ধব মন্দমতি শোধিতে আপন মতি
বিরচিল কাজী দলন গান॥"

এই পদের আলোচনা করিলে সমস্ত বিষয়টী পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। রমাপ্রসাদবাবু সমস্ত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবতের সঙ্গে ভক্তিরত্নাকর ও অপরাপর বৈষ্ণব-গ্রন্থ এবং পদাবলী মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, রমাপ্রসাদবাবুর সিদ্ধান্তের কোন ভিত্তি নাই। অলকানন্দার কথা জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলেও পাওয়া যায়। রমাপ্রসাদ-বাবু জলঙ্গী ও অলকানন্দার সংস্থান ধরিতে পারেন নাই। পদের উল্লিখিত জলাশয় বোধ হয় বর্ত্তমানের বল্লাল-দীঘি।

জেনারেল হার্ষ্ট সাহেবের প্রকাশিত রেণেলের ম্যাপে নদীয়ার মধ্যে পরগণে কোবাজপুরের নাম দেখিলাম। কোবাজপুর নামে কোন স্থান বা পরগণা বা গ্রাম নদীয়ায় নাই। বর্দ্ধমান জেলায় কোবাজপুর নামে একটা স্থান আছে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের কাগজপত্রে কোবাজপুরের স্থানে উখরা পরগণার নাম পাই। ঐ সমস্ত কাগজ আদালতের সহি মোহরযুক্ত আছে, সুতরাং কৃত্রিম নহে। গাদিগাছা মাজিদা এই উখরা পরগণার অন্তর্ভুক্ত। অতএব রমাপ্রসাদবাবুর প্রকাশিত ম্যাপে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না।



কোবেনহাউন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

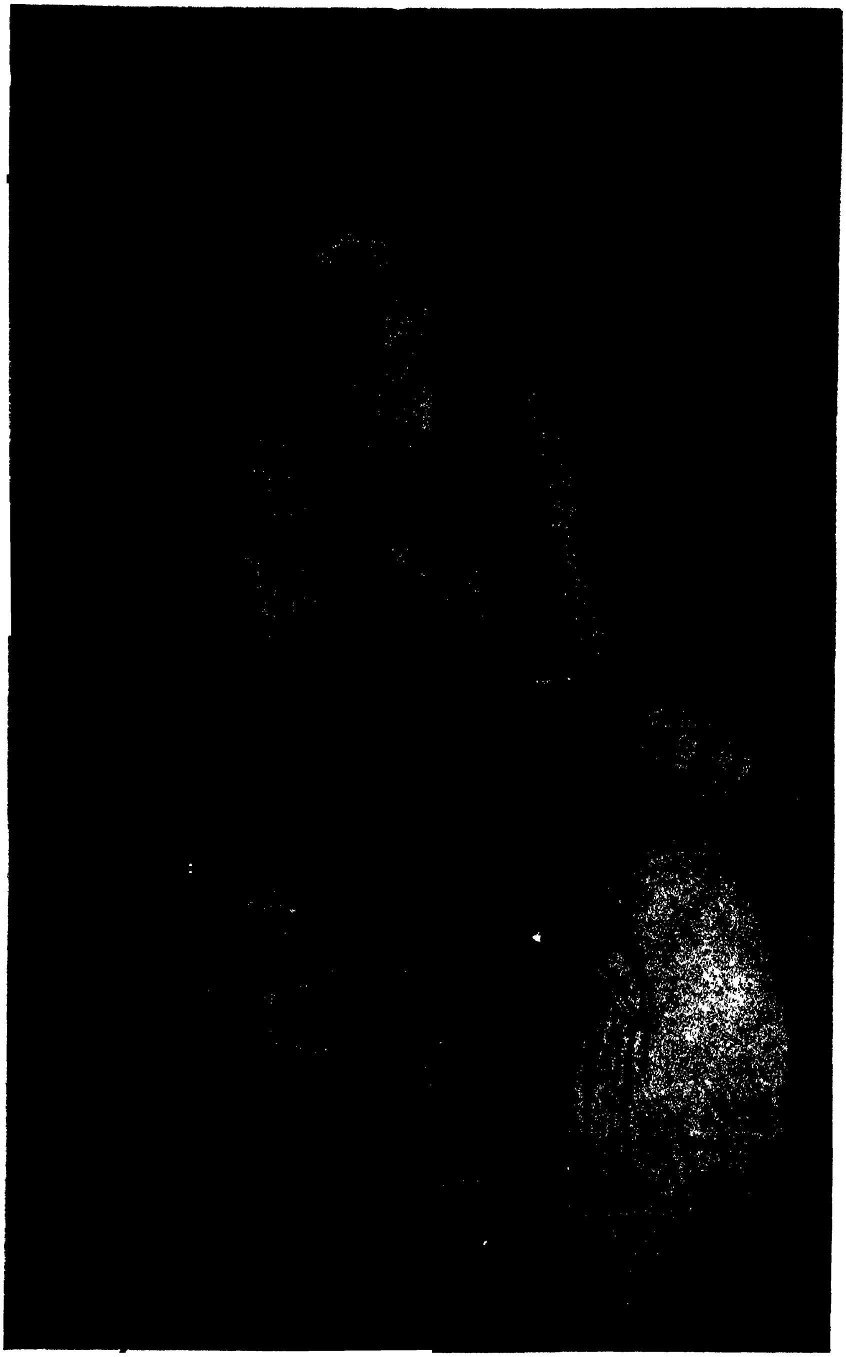
ঘন কুয়াসাবৃত স্তিমিত-আলোকিত রাস্তা দিয়ে মোটর এসে দাঁড়াল ষ্টেশনে। টিকিট কিনে সাড়ে সাতটার ট্রেণে চেপে বোসলাম লণ্ডন ছাড়বার জন্যে। লণ্ডন আমায় মুগ্ধ করেনি, তার ওপর আমার কোনো আকর্ষণ নেই বোলেই জানতাম। কিন্তু বিদায়বেলায় মনে হোল অজ্ঞাতসারে এখানকার অনেকে আমায় বেঁধে ফেলেছে। কলেজের বন্ধুবান্ধব, লণ্ডনের স্বদেশী ও পরদেশী বন্ধু ও বান্ধবী, লণ্ডনের অনেক রাস্তাঘাট আজ মনের পথে স্মৃতির অর্ঘ্য নিয়ে এসে দাঁড়াতে লাগল। পরিব্রাজক আমি—দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানতেই আমার আনন্দ, ভাল লাগলেও এক দেশে রুদ্ধস্রোত হোয়ে বোসে থাকতে পারি না, তাতে প্রাণের অপচয় হবে, অভাব ঘোটবে। তাই আমাকে চোলতে হবে।

এবারের গন্তব্য 'কোবেনহাউন' যার ইংরেজী বিকৃত উচ্চারণ কোপেনহেগেন। এটী ডেনমার্কের রাজধানী, কাজেই ড্যানিসদের উচ্চারিত নামকেই এর যথার্থ পরিচয় বোলে মান্‌তে হবে। ড্যানিস ভাষায় এর বানান Kobenhavn যার ইংরেজী উচ্চারণ কতকটা এমনি Kobenhawn কিন্তু Copenhegen নয়। ইংরেজীর মারফত অন্যান্য দেশের নাম শেখার ফলে আমরা অন্যান্য দেশগুলির নাম হাস্যাস্পদভাবে উচ্চারণ করি, যা সে দেশের কোনো লোক বুঝতে পারবে না। জার্ম্মানরা জানে না তারা German বা তাদের দেশের নাম Germany। তারা জানে তাদের দেশের নাম "ডয়েসলান্ড"। Russiaকে কেউ বলি রাশিয়া, কেউ বা ফেরঙ্গ সুরে উচ্চারণ করি রাশ্যা; কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা জানে তাদের দেশ "রেঁসিয়া"। আমরা জানি ফিনল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম Helsingforse; কিন্তু ফিনিসরা জানে তাদের রাজধানী Helsinki। সব চেয়ে ঘরোয়া উদাহরণ কলিকাতা ও Calcutta, যা আবার ইংরেজ আমেরিকান ছাড়া অন্য দেশবাসী দ্বারা উচ্চারিত হয় "কালকুত্তা"।

ট্রেণ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমায় বন্দরে নামিয়ে দিলে। এখানে জাহাজ তৈরীই ছিল, উঠে বোসলাম। এ জাহাজগুলি কেবল উত্তর সাগরে (North Sea) যাওয়া আসা করে, মহাসাগরে পাড়ি জমায় না; কাজেই অপেক্ষাকৃত ছোট। জাহাজের ঝি, চাকর, বাবুর্চ্চি ড্যানিস বোলেই মনে হোল। তবে তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী বোলতে পারে। এ জাহাজে প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণী আছে; এর মাঝামাঝি অন্য কোনো শ্রেণী নাই। দুই শ্রেণীর ভাড়ার পার্থক্য প্রায় দ্বিগুণ। এখানে জাহাজ ভাড়ার মধ্যে মহাসাগরগামী জাহাজের মত খাওয়ার খরচ শুদ্ধ ধরে না,—খাওয়ার বিল আলাদা মেটাতে হয়। ইংলণ্ড ছাড়বার সময় কেবল পাসপোর্ট দেখেই ছেড়ে দেয়, জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করে না। সে দিক দিয়ে ভাগ্যবান ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ ত্যাগ করবার সময় শুধু আমার প্রত্যেকটী বাক্স, চিঠিপত্র, কাপড় জামা তল্লাসী কোরেই শেষ হয় নি, শেষে আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত দিয়ে পরীক্ষা কোরে তবে ভারতের ভূমিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়।

রাত্রি ৯-৪০ মিনিটে জাহাজ ধীরে ধীরে ইংলণ্ডের মাটীর ছোঁয়াচ ছাড়ল। খাওয়ার পর্ব্ব ট্রেণেই সেরে নিয়েছিলাম, কাজেই সে রাত্রের মত কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম করা ছাড়া অন্য কোনো হাঙ্গামা ছিল না।

পরদিন ভোর বেলা উঠে জাহাজের ডেকে মুক্ত বায়ুর আশায় পা দিতেই উত্তর সাগরের ডিসেম্বরের তুষারশীতল কনকনে বায়ু এসে এমন ভাবে গলাগলি কোরতে আরম্ভ কোরলে যে, বেশ বুঝলাম, আর কিছুক্ষণ তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকলে অতঃপর তারা বুকের মধ্যে মৌরসী পাট্টা নিয়ে আড্ডা জমাবে। তাড়াতাড়ি ডেকের দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে বোসলাম। শরীরটা কেমন ভাল বোধ হোল না। শরীরের অসোয়াস্তিটা যে কোথায় ঠিক বুঝতে পারছিলাম না; কিন্তু শরীরটা যে বেশ সুস্থ নয় সেটা অনুভব কোরছিলাম। বইএর মাঝে মন বসিয়ে শরীরের চিন্তা ছাড়বার চেষ্টা কোরলাম; কিন্তু তাতে মাথাটা কেমন ঘুরতে লাগল। বইটা রেখে দূরে নীল দিগন্তে চাইলাম। দেখি,



শিল্পী— শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

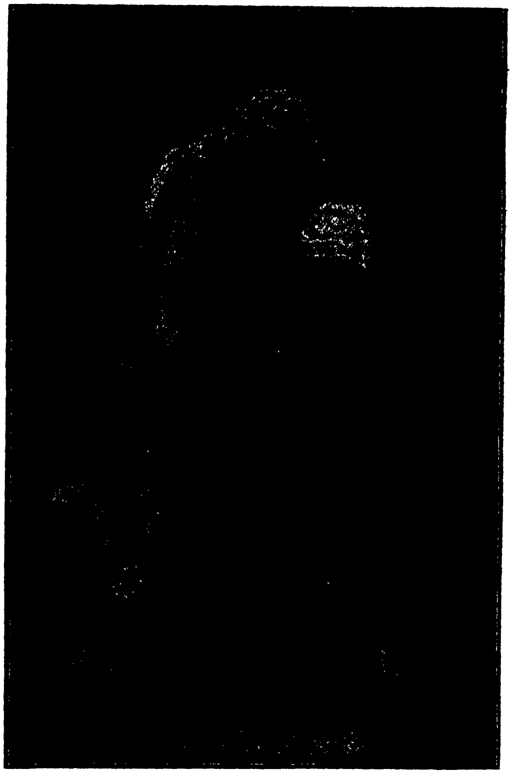
Bharatvarsha Halftone & Printing Works

সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড নীল কার্পেটের মত জাহাজের জানলার মাথা পেরিয়ে উঠছে আর নামছে। নীচের তলায় রেষ্টুরাণ্টে খেতে গেলাম। সিঁড়িতে নামতেই নীচেকার ভারী ও ... হাওয়ায় শরীরটা কেমন গুলিয়ে উঠল। আমি আবার ফিরে এসে ড্রয়িংরুমে বোসলাম ও সকালের চা সেখানেই দিতে বোল্লাম। চা খেয়েও শরীরটাকে চাঙ্গা কোরতে পারলাম না। বাইরের মুক্ত হালকা হাওয়ার জন্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতে লাগল। ঘরের জানলা একটা খুলে দিতেই তীব্র কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে তুল্লে। কাজেই আবার জানলা বন্ধ কোরতে বাধ্য হোলাম। শরীরের অবস্থা দেখে চিন্তিত হোয়ে উঠলাম। আত্মীয়-বান্ধবহীন বিদেশে পরিচয়হীন বিদেশী আমি। এ সময়ে



ডেনমার্ক—বিন্দু চিহ্নগুলি সমবায় সমিতির অস্তিত্ব জ্ঞাপক

শরীর যদি অক্ষমতার নোটীশ দেয়, তার চেয়ে নিঃসহায় নিরুপায় অবস্থা যে আর নাই। কর্ম্মশীল জনবহুল এই বিদেশী জগতে সম্বল আমার শরীর ও অর্থ। এর যে কোনোটীর অভাবেই আমি পঙ্গু। পেছনের ভিড় আমায় পিষে ফেলে, বড় জোর পাশে ফেলে দিয়ে চোলে যাবে, কেউ ফিরেও তাকাবে না। শরীরকে বিশ্রাম দেবার জন্যে আবার নিদ্রা দিলাম, দুপুরের খাওয়াটাও বাদ দিলাম। বিকেলে শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হোলেও সুস্থ বোধ কোরলাম না। তা হোলেও পাছে অনাহারে অধিকতর দুর্ব্বল হোয়ে পড়ি, এই ভয়ে বিকেলবেলা রেষ্টুরাণ্টে চা খেতে গেলাম। পরিচারক চা দিয়ে গেল। মুখে দিয়ে এমন বিস্বাদ ঠেকল যে বেচারী পরিচারক খামকা কতকগুলো তিরস্কার খেয়ে আবার চা কোরে আনতে গেল। আমি বহু কষ্টে একটুকরো রুটী শেষ কোরে, বাকী টুকরোটা মুখে দিতেই সর্ব্বাঙ্গ এমন ঘুলিয়ে উঠল যে শুয়ে পড়বার জন্যে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেলাম। মাঝ-পথেই সিঁড়ির ওপর বমি হোয়ে গেল,—সকালের ও



অভিশপ্ত আডাম ও ইভ—গ্লিপটোটেকের একটী মূল্যবান শিল্প

বিকালের সমস্ত কিছু উঠে গেল। সামনেই একটী পরি-চারিকা দাঁড়িয়ে ছিল। সে সমবেদনার সুরে বোল্লে "Sea sick you?" ঘাড় নেড়ে, অপ্রস্তুতভাবে অজীর্ণ জিনিষগুলো দেখিয়ে প্রায় টোলতে টোলতে কেবিনে গিয়ে শুয়ে পোড়লাম। এই প্রথম আমি জাহাজের দোলায় পীড়িত হোলাম। খবর পেয়ে আমার কেবিনের পরি-

চারিকা এসে বমি কোরবার পাত্রাদি দিয়ে গেল এবং প্রয়োজন হোলেই ডাকতে অনুরোধ জানাল। উত্তর সমুদ্র প্রায়ই এই সময়ে খারাপ থাকে। শুয়ে পড়ার পর অসুস্থতা ভাব কেটে গেল,—ধীরে ধীরে কখন ঘুমিয়ে পোড়লাম। যখন ঘুম ভাঙ্গল দেখি বেশ রাত্রি হোয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জাহাজের চলার গতিবেগ বা স্পন্দন অনুভব কোরলাম না। বিস্মিত হোলাম, তবে কি বন্দরে এসে পৌছেছি, বাকী সব যাত্রী কি নেমে গ্যাছে? তাড়াতাড়ি আহ্বান-যন্ত্রের বোতামটা টিপলাম। পরিচারিকা এসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কোরলে "উঠেছ? এখন সুস্থ বোধ কোরছ ত? আজ সমুদ্র বড় বিশ্রী।" ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা কোরলাম "জাহাজ দাঁড়িয়ে কেন? আমরা কি বন্দরে এসে পোড়েচি?" পরিচারিকা হেসে জবাব দিলে

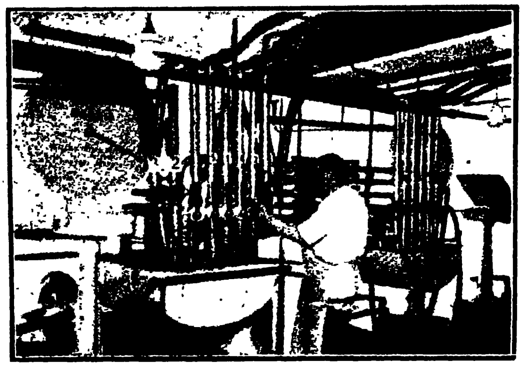


সমবায় কেন্দ্র-সমিতির পোষাক তৈরী বিভাগ

"না, বন্দরে যেতে দেরী হবে। এখন মাঝ সমুদ্রে জাহাজ দাঁড়িয়ে গেছে, অত্যন্ত ঘন কুয়াসার জন্য পথ দেখতে পাচ্চে না।" সর্ব্বনাশ! এ আবার কি ফ্যাসাদ! বোল্লাম "এ রকম কি প্রায়ই হয়? জাহাজ পৌছতে যদি দেরী হয় তা হোলে ত ডেনমার্কে বন্দরে নেমে কোবেনহাউন যাবার ট্রেণ পাব না।" সে সহাস্যে উত্তর দিলে "না, জাহাজ না দেখে ট্রেণ ছাড়বে না। এই জাহাজের যাত্রী নিয়েই ট্রেণ ছাড়ে।" আমি কি একটা বোলতে যাচ্ছিলাম, সহসা গুড়ুম কোরে কামানের আওয়াজের মত কি একটা আওয়াজ হোল; আমি সভয়ে চমকে উঠলাম। ইয়োরোপের অবস্থা যা চোলেছে—যে-কোনো মুহূর্ত্তে একটা লড়াই দাঙ্গা বাধা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কে জানে, এই হতভাগ্য, শত্রুপক্ষের প্রথম শীকার কি-না। সভয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম "ও কি?" পরিচারিকা বোধ হয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। সে ঈষৎ হেসে জবাব দিলে "ও fog signal। অত্যন্ত ঘন কুয়াসার জন্যে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তাই অন্যান্য জাহাজকে সাবধান করবার জন্যে আমাদের জাহাজ কামান ছুঁড়ে নিজের অবস্থিতি জানাচ্ছে।" জিজ্ঞাসা কোরলাম "এ কুয়াসা পাতলা হোয়ে জাহাজের রাস্তা দেখে চোলতে কত দেরী হবে?"

সে বোল্লে "যত দেরীই হোক, উপায় ত নেই। তুমি আর একটু ঘুমোও; সময় হোলে আমি তোমায় তুলে দোব।"

অগত্যা তার আশ্বাসবাণীতে আস্থা স্থাপন কোরে পুনরায় বিছানার কোলে দেহটাকে এলিয়ে দিলাম।



সমবায় মার্গারিণ কারখানার একাংশ

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার ঘুম ভাঙ্গল। আবার মনে হোল জাহাজ দাঁড়িয়ে। কী সর্ব্বনাশ! আজ কি আর এই ভাসা দ্বীপ নোড়বে না! আবার ঘণ্টাধ্বনি কোরে পরিচারিকাকে ডাকলাম। সে জানালে জাহাজ প্রায় তীরের কাছে এসে পোড়েছে। তবে আবার কুয়াসার জন্যে অপেক্ষা কোরছে। পরে সে হাত মুখ নেড়ে আধ আধ ইংরেজীতে আমাকে বোঝাতে লাগল কেমন কোরে আমরা একটা ভীষণ বিপদের হাত থেকে আজ দৈবাৎ রক্ষা পেয়েছি। মাঝে মাঝে কামানের আওয়াজ এবং fog light সত্ত্বেও একটা জাহাজ যে কখন আমাদের একদম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা আমাদের জাহাজ টেরই পায় নি। যখন দুটী জাহাজ একদম পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে

—মাঝে মাত্র ফুট কয়েকের ব্যবধান—তখন দুই তরফই উভয়ের অস্তিত্ব জানতে পেরে সাবধান হোয়েছে। আর ফুট কয়েক আমাদের দিকে এলেই সেদিন একটা প্রচণ্ড দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে ঘটত এবং তাতে এই হতভাগ্য যাত্রীদের যে কি দশা হোতো তা আজ বলা মুস্কিল।

রাত্রি ৯॥টায় জাহাজ ৩৩৯ মাইল ঠিক ২৭ ঘণ্টায় সাঁতার দিয়ে ডেনমার্কের তীরে Edjborg বন্দরে মাথা ঠেকাল। আমরা তীরে নেমে ট্রেণে চড়বার আগেই জিনিষপত্র মোটামুটী খানাতল্লাসী হোলো। কার কাছে বেশী সিগারেট আছে কি-না এবং কোনো আপত্তিকর জিনিষ আছে কি-না মোটামুটী সেইটাই প্রধানতঃ জিজ্ঞাসা করে।



আমালিয়েনবোর্গ স্তম্ভ—কোবেনহাউন

বন্দরের পাশেই কয়েকখানা রেলের কামরা দাঁড়াইয়া ছিল। রাত্রে চার জায়গায় ফেরীবোটে জলপ্রণালী পার হোতে হয়। সেজন্যে আমি ঘুমোবার গাড়ীর টিকিট কিনেছিলাম। এতে আর বারবার সেই শীতের কনকনে রাত্রিতে ট্রেণ বদল কোরে ফেরী ও ফেরীর পর ট্রেণে চড়বার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। দিব্যি নিশ্চিন্তে গাড়ীর মধ্যে লেপের ভিতর ঘুম দিলেই হোল, গাড়ী শুদ্ধ সব জায়গাতেই জাহাজের ভিতর তুলে দিয়ে পার কোরে দেয়, যাত্রীকে আর ওঠা-নামা কোরতে হয় না। এর জন্যে মাত্র ১৩ ক্রোণার * দক্ষিণা বেশী দিতে হয়। কিন্তু সে তুলনায় সুবিধে অনেক,—বিশেষ শীতের রাত্রে ও অপরিচিতের পক্ষে।

কখন যে নদনদী জলপ্রণালী ডিঙ্গিয়ে গাড়ী কোবেন-হাউনের কাছে এসেছে বুঝতেই পারি নাই। সহসা দরজায় টোকার আওয়াজ পোড়ল; বোল্লাম "কে? ভেতরে এস।"

ট্রেণের পরিচারক জবাব দিলে "কোবেনহাউনে আসতে আর দেরী নাই, তৈরী হোয়ে নিন।" অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ এসে ষ্টেশনের ভেতরে মাথা লাগাল। রাত্রি ১২টায় এজবোর্গ (Edjborg) ছেড়ে ভোর ৭॥০টায় কোবেন-হাউনে গাড়ী পৌছল। এখানে সকাল ৮॥০ কি ৯॥০-টাতেও রীতিমত ভোর। রাস্তায় আলো জ্বলে, সমস্ত সহর সুপ্তিমগ্ন না হোলেও বেশ কর্ম্মশীল বলা চলে না। আবার গ্রীষ্মকালে ঠিক তেমনি উল্টো—সহরে জাগরণের সাড়া না উঠতেই ভোর হয়।

* ১০০ ওরে (ORE) = ১ ক্রোণার = প্রায় একশিলিং = প্রায় ॥৴০ আনা।

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের ওপরেই বিভিন্ন হোটেলের প্রতিনিধি সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ খদ্দের পাকড়াবার জন্যে অনাবশ্যক হুড়োহুড়ি করে না; একের পর একজনা নিজের হোটেলের পরিচয়পত্র (card) নিয়ে এসে তার হোটেলের বিশেষত্ব বোঝায়, কিন্তু অতি ভদ্র ভাবে। এখানে খালি থাকবার ঘরের ভাড়া মাঝারি হোটেলে দৈনিক ৩ থেকে ৫ ক্রোণার।

ডেনমার্ক আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এখানকার কৃষি



একটী রাস্তা ও কারখানা

ও সমবায় আন্দোলন নিজের চোখে দেখা এবং তাদের উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করা। এই জন্যে লণ্ডনে থাকতে সেখানকার ড্যানিশ রাজপ্রতিনিধির (Consul General) কাছ থেকে এবং আমার কলেজের এক ড্যানিস বন্ধুর কাছ থেকে কোবেনহাউনের কৃষি বিভাগের কর্ত্তার (Chief of Agricultural Bureau) নামে চিঠি এনেছিলাম। সকালে চা খেয়েই ঠিকানা খুঁজে কৃষিকর্ত্তার সন্ধানে বের হলাম। ঠিকানা খুঁজে বের করলাম; কিন্তু ব্যক্তিকে পাওয়া গেল না। ঘণ্টাখানেক পরে আসবার উপদেশ পেয়ে সহর দেখতে বের হোলাম।

এখানকার রাস্তায় শান্তিরক্ষক বা যান-পরিচালক শাস্ত্রী চোখে পড়ে না বোল্লেই হয়। যানবাহন সর্ব্বত্রই স্বয়ংক্রিয় আলোকসঙ্কেতে পরিচালিত হয়। এই সব আলোর নির্দ্দেশ দেবার জন্যে কোলকাতার মত কোনো লোকের প্রয়োজন হয় না; কয়েক মিনিট অন্তর আলোগুলি আপনাআপনি জ্বলে ও নিবে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। সব মোটরেই ডাইনে বা বাঁয়ে যাবার বৈদ্যুতিক নির্দ্দেশযন্ত্র আছে। বার্লিনেও এ ব্যবস্থা আছে; কিন্তু লণ্ডনে নাই। রাস্তার দুধারে সিগারেট, ফল, ফটো, চকোলেট প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (automat) আছে; নির্দ্দিষ্ট পয়সা ফেল্লেই ঈপ্সিত জিনিষ বেরিয়ে আসবে। ইয়োরোপের অন্যান্য সহরের সঙ্গে কোবেনহাউনের পার্থক্য বেশ চোখে ঠেকে যানবাহনে। ইয়োরোপের কোনো দেশের রাজধানীতে এখন পর্য্যন্ত এত পায়ে ঠেলা সাইকেল ও মালটানা ঘোড়ার গাড়ী রাস্তায় দেখি নি। এইখানে সাইকেলের সংখ্যা সমস্ত যানবাহনের মধ্যে বোধ হয় বেশী। এখানকার সমতল রাস্তা এবং দেশের কৃষক মনোবৃত্তিই বোধ হয় এর কারণ। এরা অন্যান্য দেশের মত অত ধনী নয়, অথচ কর্ম্মী। কাজেই দ্রুতগামী সস্তা যান হিসেবে সাইকেলকেই আশ্রয় কোরেছে। এখানকার ট্রাম দোতলা নয়; কোলকাতার মত দুখানা পর পর জোড়া। এখানে ট্রামে গাড়ী হিসেবে ভাড়ার পার্থক্য নাই; অর্থাৎ শ্রেণী-বিভাগ নাই। কেবল একটী ধূমপায়ীদের জন্য, অন্যটী "ভালো ছেলে মেয়েদের জন্যে"। এই ব্যবস্থা ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই। ডেনমার্ক, সুইডেন ও রাসিয়া ভিন্ন ইয়োরোপের অন্যত্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা শোবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কাজেই সেদিক দিয়ে এদের ঢের বেশী গণতান্ত্রিক বলা যেতে পারে। এখানকার রাস্তাঘাট বেশ পরিচ্ছন্ন, এবং ভিড় অপেক্ষাকৃত কমই। সাধারণ লোকগুলিকে প্যারী বা বের্লিনের অধিবাসীর তুলনায় কম সুন্দরই মনে হোল। হয়ত তার কারণ—এদের কৃত্রিম রূপসজ্জার অভাব। এখানে ভূগর্ভযান নেই, কারণ, ভিড় কম।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার কৃষিদপ্তরে ফিরে এলাম। অবিলম্বে

ডাক এল। একটা বইপত্র ঠাসা ঘরে এক স্বল্পকেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোসে ছিলেন। আধ আধ ইংরেজীতে তিনি জিজ্ঞাসা কোরলেন "কোত্থেকে আমি আসছি।" আমার পরিচয় দিয়ে আমি বন্ধুর পরিচয়-পত্রখানি তাঁর হাতে দিলাম। পত্রখানি ড্যানিস ভাষায় লেখা ছিল কাজেই কি যে লেখা ছিল তা আমি জানতাম না। ভদ্রলোক পরম বিস্ময়ে বোল্লেন "আপনি জুনিয়র মিগডালের (Mygdal) বন্ধু? সে তার বাপকেও আপনার আগমন জানিয়ে তার কোরেছে। তিনি আমাদের পূর্ব্বতন কৃষিমন্ত্রী। তিনিও আমায় জানিয়ে রেখেছেন আপনি এলে যেন তাঁকে খবর দিই এবং যথাসাধ্য সাহায্য করি।"

পছন্দ কোরত। তার মানে ভোর ছ'টায় উঠে গোয়াল পরিষ্কার করা, দুধ দোয়া, গরু চরান, ঘোড়া ডাকিয়ে বা ট্রাকটার ঠেলিয়ে চাষ করা, মুরগীর ময়লা পরিষ্কার প্রভৃতি সব কিছুই, যা আমাদের সাধারণ গৃহস্থের ছেলেও নিজে হাতে কোরতে হবে শুনলে গৃহত্যাগী হবে, নয় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা কোরবে। শিক্ষার সত্য রূপ ওরা চিনেছে; তাই তাকে পরিপূর্ণভাবে ওরা গ্রহণ কোরতে পারে।

কৃষিবিভাগের প্রধান মিঃ স্নিগার্ড (Sniggard) সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু মিগডালের বাপকে ফোন কোরে জানালেন যে তাঁর পুত্রবন্ধু এখানে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে



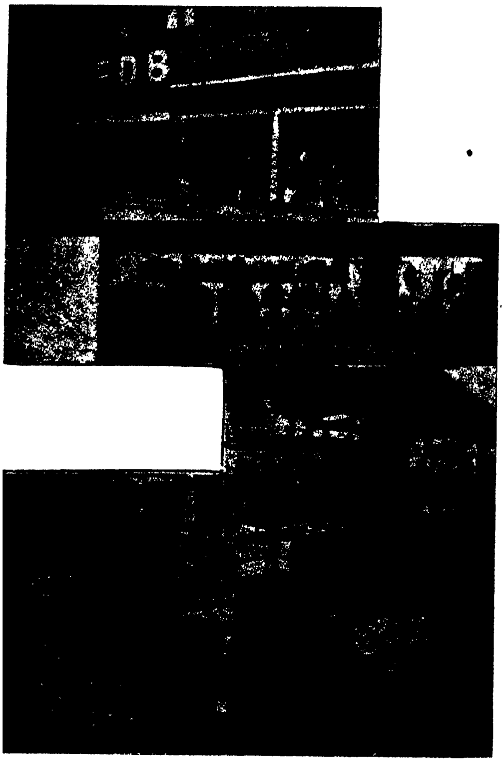
টিভোলি উদ্যানের বাদ্যমণ্ডপ—কোবেনহাউন

আহ্বারের ও তাঁর নিজের চাষবাড়ী দেখবার আমন্ত্রণ এল। পরের সোমবার তাঁর বাড়ী যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে রেহাই পেলাম। এদিকে প্রধান মশায়ের সঙ্গে বোসে আমার ডেনমার্কে কৃষি ও সমবায় দেখবার একটা ভ্রমণতালিকা তৈরি কোরে নিলাম। তিনি ষ্টেটের দ্বারা প্রকাশিত ডেনমার্কের কৃষি ও সমবায় বিষয়ে একখানি ইংরেজি বই উপহার দিলেন এবং দু একখানি ইংরেজি বইএর নাম কোরে দিলেন। আমার ডেনমার্ক ভ্রমণের সময় এই বৃদ্ধের

বিদেশের স্বল্প দিনের পরিচয়ে যে বিদেশী বন্ধু এতখানি কোরবে তা ভাবি নি। আমাদের স্বদেশী বন্ধুরা কতটা উপকার সাধ্য-সত্ত্বেও কোরে থাকেন? কলেজের সেই সরল সদালাপী অল্পবয়স্ক বন্ধুটী যে একটা স্বাধীন দেশের মন্ত্রীপুত্র, এ কথাও সে কোনো দিন জানায় নি। তার ব্যবহার, জীবনযাত্রা, এ সবের কোনো দিন সে পরিচয় ব্যক্ত করে নি। সে শুধু মতবাদের (Theoretical class) চেয়ে হাতে কলমে শিখতে (practical class) বেশী

ও মিঃ সিনিয়র মিগডালের এবং তাঁর স্ত্রীর অযাচিত সাহায্যের কথা আমার বরাবর মনে থাকা উচিত।

ব্যবস্থামত পরদিন ভোর ৮৷৷০টার ট্রেণে হিলেরোড (Hillerod) নামে একটা জায়গায় গেলাম। এখানে দুগ্ধ-ব্যবসার (Dairy) সরকারী গবেষণাগার ও পরীক্ষা-কেন্দ্র। টিকিট কেনা, কোন প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে গাড়ী ছাড়ে ইত্যাদি জানতে ভাষানভিজ্ঞতার দরুণ বেশ বেগ পেতে হোয়েছিল। শুধু গন্তব্য স্থানের নাম উচ্চারণ কোরে কোনো



সমবায় কেন্দ্র ভাণ্ডারের বিভিন্ন অংশ

রকমে নিজেকে চালিয়ে নিলাম। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলাম। শীতকালে এখানে সারাদিনেও সূয্যিমামার সঙ্গে ভাগ্নেদের সাক্ষাৎ হয় না, এবং বেলা ৯টার আগে ভোরের আলো ফোটে না। কাজেই সকালের শীত যে প্রচণ্ড সে কথা বলাই বাহুল্য। তার উপর এই দিন সকাল থেকে তুষার-বৃষ্টি আরম্ভ হোল। ইয়োরোপে শীতে বাড়ীতে বা ট্রেণে বিশেষ কাবু কোরতে পারে না; কারণ, সর্ব্বত্রই বাষ্পউত্তাপ-যন্ত্রের (Steam heater) ব্যবস্থা আছে। এই ডেনমার্কেই বাড়ীতে এক একদিন গরমের চোটে রাত্রে লেপ সরিয়ে দিতে হোত; আবার বাইরে পাঁচটা জামা চাপিয়েও ঠকঠক কোরে কাঁপতে হোতো।

ষ্টেশন থেকে সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রের দূরত্ব সঠিক না জানায় একটা ট্যাক্সী কোরে নিলাম। বোধ হয় এক মাইল গিয়েই ট্যাক্সী ঠিকানায় পৌঁছে দিলে।

এই পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রধানতঃ পনির (cheese) ও মাখন তৈরী হয় এবং তাদের উন্নতির চেষ্টা চলে। তাছাড়া কেউ দুধ সম্বন্ধীয় কোনো নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার কোরলে তার পরীক্ষাও এখানে হয়।

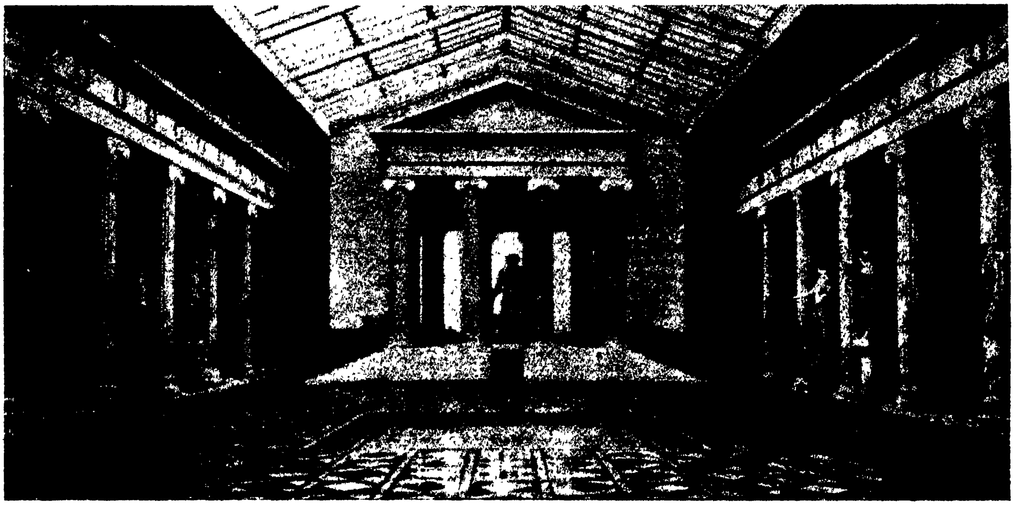
এখানকার অধ্যক্ষ মিঃ হেনসন (Henson) যাবা-মাত্রই বোল্লেন "আপনার কথা কাল মিঃ স্নিগার্ড (Sniggard) আমায় ফোন কোরে বোলেছেন। আপনি ত মিঃ ব্যানার্য্যী (Banerjee র j ইংরেজী ছাড়া প্রায় সব ভাষাতেই y এর মত উচ্চারিত হয়) ?" তিনি নিজে সঙ্গে কোরে একে একে এঞ্জিন বয়লার থেকে সব কিছু দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। কি ভাবে খাঁটী দুধ থেকে, এবং মাখন-তোলা দুধ মিশিয়ে পনির তৈরী হয়, কোন পনির কি হিসাবে শ্রেণীগত হয়, এই সব অত্যন্ত যত্ন সহকারে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। মাখনতোলা যন্ত্র (churn)গুলি এখানে কলে ঘোরানো হোচ্ছে।

প্রায় পাশ্চাত্য সব সভ্য দেশেই দুধকে জীবাণুশূন্য কোরে নেওয়া হয় প্যাসচারাইজ (Pasteurise), ষ্টেরিলাইজ (Sterilise) প্রভৃতি নানা উপায়ে। তার মধ্যে প্রথমোক্ত-টাই বেশী চলিত। নানা রকমের যন্ত্র সাহায্যে এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়ায় দুধকে না ফুটিয়ে তার অন্যান্য গুণ বজায় রেখে জীবাণু ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যন্ত্রের নাম Stasaniser। এর কথা ইংলণ্ডে শুনেছিলাম, এই কেন্দ্রে ঐ যন্ত্র দেখলাম। অত্যন্ত অল্প সময়ে ও স্বল্প পরিসরের মধ্যে এই যন্ত্রে কাজ হয়। আমি এই যন্ত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ কোরতে চাইলাম। মিঃ হেনসন বোল্লেন তিনি তাকে ফোন কোরে দেবেন হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। যাঁদের দুধের কারবারে ঝোঁক আছে তাঁরা ইয়োরোপে গেলে Hillerodএর এই

কেন্দ্রে যেতে অনুরোধ করি। সাধারণ পাঠকদের বিরক্তির আশঙ্কায় এই বৈজ্ঞানিক (technical *) প্রসঙ্গ চাপা দিলাম।

এখান থেকে বেরিয়ে কাছেই সরকারী পশুশালা (Poultry yard) দেখতে গেলাম। এখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন না; একটী শিক্ষানবীশ এসে দেখাতে নিয়ে গেল। প্রধানতঃ এখানে শুয়ারের চাষ করা হয়। দিব্যি নধরকান্তি জীবগুলি দুধ, আলুসিদ্ধ ও যব-গমের ভুষো খেয়ে পরমানন্দে মৃত্যুদিনের প্রতীক্ষা কোরছে। অনেক জীব পূর্ব্ব ভাগ্যফলে দোতলায় বাসের সুবিধা পেয়ে কৃতার্থ হোয়েছে। সব ঘর-গুলিরই মেঝে সিমেণ্ট বাঁধান; কোথাও নোংরা জঞ্জাল নাই। এমন পরিচ্ছন্নভাবে লালিত ও দুধ আলুতে পরিপুষ্ট জীবকে টেবিলের ডিসে তুলে সম্মান দিতে আমাদের অনেকেরও সংস্কার ছাড়া অন্য কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। আমাদের দেশে ঐ জীবটীর পারিপার্শ্বিক অবস্থাই বেচারাকে বেশী ঘৃণ্য কোরে তুলে অপাংক্তেয় কোরেছে।

বেলা দুটোর সময় Stasanising যন্ত্রের প্রতিনিধি হোটেলে হানা দিলেন। অনেকক্ষণ নিজের যন্ত্রের নানা সুবিধার কথা আলোচনা কোরে আমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর মোটরে তুল্লেন সহরের একটী বড় দুধের কারখানা দেখাবার জন্যে। সেখানে ঐ যন্ত্র কাজ কোরছে। কারখানাটী প্রকাণ্ড, পরিষ্কার তকতক কোরছে। দৈনিক প্রায় বার হাজার গ্যালন (১ গ্যালন = প্রায় ৫ সের) দুধ এখানে জীবাণুমুক্ত হোয়ে বোতলে ভর্ত্তি হোয়ে বাজারে বিক্রী হয়। ইয়োরোপের অন্যান্য সহরের তুলনায় এটী তেমন বড় কার-খানা নয়। লণ্ডনে দু তিনটী কারখানা দেখেছিলাম, যেখানে দিন ৪০ থেকে ৪৫ হাজার গ্যালন দুধের কারবার চলে। আমাদের দেশে এমন একটী দুধের কারখানা এখনও কল্পনাতীত। এখানে তাঁর যন্ত্রটীকে চলন্তি অবস্থায় দেখিয়ে, রাস্তায় একটী বাড়ীতে দাঁড়িয়ে, তন্বী তরুণী এক বান্ধবীকে শুদ্ধ গাড়ীতে নিয়ে সহরের সেরা রেষ্টুরাণ্টের দরজায় গাড়ী দাঁড় করালেন। এখানে বৈকালিক জলযোগ সেরে সন্ধ্যার সময় তাঁর গাড়ীতেই হোটেলে ফিরে এলাম। এ দেশের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে আশ্চর্য্য হোলাম। যেখানে ব্যবসার কিছুমাত্র আশা আছে, সেখানে হাজির হোতে এরা বিন্দুমাত্র বিলম্ব করে না। অথচ পরম নির্লোভ ও নিঃস্বার্থপরের মত এমন ব্যবহার করে যে, ওদের ভদ্রতায় মুগ্ধ না হোয়ে থাকা যায় না।



গ্লিপটোটেকের প্রকাণ্ড সজ্জিত কক্ষ—কোবেনহাউন

* Technicalএর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ এক কথায় কি, কেউ জানালে বাধিত হব।

সেদিন হোটেলের ভোজনশালায় মধ্যাহ্নের আহারের চেষ্টায় গেলাম। আহারের তালিকার ওপরে fishএর নীচে মাছের অনেকগুলি পদ ছিল। তার কোনটী কি এবং তখন শুধু দুধ পাওয়া সম্ভব কি না এই জানবার জন্যে ভোজনশালার পরিচারিকার সঙ্গে উভয়েই অশ্রুতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ভাষায় মহোৎসাহে আলাপ জমিয়েও যখন কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারলাম না, তখন ঘরের অন্য কোণের একটী টেবিল থেকে একজন সুদর্শন যুবা এসে আমাদিগকে উদ্ধার



কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির দপ্তরখানা

কোরলেন। তিনি বেশ পরিষ্কার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কোরলেন আমার কি চাই ও কি আমি জানতে চাই। পরে ড্যানিশ ভাষায় তার তর্জ্জমা কোরে পরিচারিকাকে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিনের আলাপেই লোকটীর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হোয়ে গেল। এর পর থেকে তিনি প্রায় প্রত্যহই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিকেলে দুপুরে সহর দেখাতে যেতেন। প্রথমতঃ আমি তাঁর এই গায়ে-পড়া বন্ধুত্বকে বেশ সহজ ও সুদৃষ্টিতে দেখতে পারি নাই,—মনের মাঝে কেমন একটা খট্‌কা বাধত। কি প্রকৃতির লোক এ, কে জানে, এত গায়ে-পোড়ে বন্ধুত্ব করার গূঢ় উদ্দেশ্য বোধ হয় কিছু আছে, ইত্যাদি। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম অমনি উদার, সরল, পরোপকারী বন্ধুও এই কুটিল নীচ স্বার্থপর জগতের বুকেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে তারা অত্যন্ত বিরল; আর তাই তাদের মূল্যও বেশী।

সেদিন এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য গ্লিপথোটেক (Glyptothotek) যাদুঘর দেখতে গেলাম। মাঝারি গোছের সংগ্রহ। অনেকগুলি চমৎকার মর্ম্মর-মূর্ত্তি আছে। সংগ্রহের মধ্যে মিশরীয় সংগ্রহের কক্ষটী উল্লেখযোগ্য। মাঝে একটী প্রকাণ্ড বড় চমৎকার হল আছে। এখানে কোনো দ্রষ্টব্য নেই। কি জন্য যে হলটী ব্যবহৃত হয় জানবার সুযোগ পাই নাই। গ্লিপথোটেকের বাড়ীটী বেশ বড় ও একটু নতুন ধরণের। এর পর একে একে রয়্যাল অপেরা, বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটী গির্জ্জা, পার্লামেণ্ট প্রভৃতি দেখে এলাম। পার্লামেণ্টটী একটী প্রাসাদের অংশবিশেষ। শুনলাম, পূর্ব্বে এইটাই রাজপ্রাসাদ ছিল। পরিখা-পরিবেষ্টিত। এখন এখানে সরকারী দপ্তরখানা। প্রাসাদের উঠানটী পাথর মোড়া, পাথরগুলি এখন অবিন্যস্ত। এর অংশবিশেষে ঢুকে দেখতে দেয়, কতকাংশে আলাদা দক্ষিণা দিয়ে যেতে হয়। এর পাশেই ফট্‌কাবাজার (stock exchange market)। এ বাড়ীটী অত্যন্ত পুরোনো বোলে মনে হোল। এর অতি কাছেই সমুদ্রের জল দেখা যায়। কোবেনহাউন সহরটী তিনটী সুদৃশ্য হ্রদ দ্বারা বিভক্ত। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Thorvaldseu's যাদুঘর, Rosenborg দুর্গ, Our Ladies Church, State Museum of Art, Royal Library ; Amalienborg দুর্গ, পশুশালা, বোট্যানিকেল গার্ডন, টিভোলী উদ্যান (Tivoli), Townhall কারখানা প্রভৃতি অনেক কিছু। টিভোলী উদ্যান এখন শীতকালে বন্ধ। গ্রীষ্মে এই বিচিত্র উদ্যান লোকে লোকারণ্য হয় শুনলাম। এর ভেতর জল-প্রণালী, বাদ্যমণ্ডপ প্রভৃতি সবই আছে।

ডেনমার্কে এসে রাশিয়ার ভ্রমণবিভাগ Intouristএর আপিসে খবর পেলাম যে, রাশিয়া এখন বিদেশী যাত্রীদের সুবিধার জন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ট্রেণের ভাড়া কমিয়ে দেওয়া হোয়েছে। রাশিয়া যাবার এত বড় প্রলোভন

আমায় জানুয়ারীর দুর্দ্দান্ত শীতেও দমাতে পারলে না। রাশিয়ার পথে ও সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যে যে দেশের মাটীতে পা দিতে হবে সেগুলির ছাড়পত্রের (Visa) ছাপ পাবার জন্যে আমার পাসপোর্টটী এখানকার কুক কোম্পানীকে দিয়ে এলাম এবং বৃটীশ রাজদূতেরও অনুমতি নেবার জন্যে তাদিগকে অনুরোধ কোরলাম, যদিও রাশিয়া সরকার সেটী না থাকলেও অন্য দেশের মত আপত্তি করে না। সব জায়গা থেকেই ছাড়পত্র যথারীতি সই হোয়ে ফিরে এল ; কিন্তু বৃটীশ রাজদূত তাঁর প্রজাটীকে স্বয়ং চাক্ষুষ না কোরে ছাড়পত্র দিতে অসম্মতি জানালেন। অগত্যা



'নিপেলসব্রা' রাস্তা ও সেতু। সেতুটী দরজার মত উপর দিকে খোলা যায়

যেতে হোল। বাসে উঠে পরিচালককে (conductor) আমার গন্তব্য বলবার জন্যে ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে দেখি, নোট বইটী ঠিক সময়েই ফেলে এসেছি। ব্রিটীশ কনসাল, কনসুলেট আংলে ইত্যাদি নানা বিদেশী ও বিকৃত ভাষাতেও কণ্ডাকটারকে আমার গন্তব্য বোঝাতে পারলাম না, সেও টিকিটের পয়সা পাওয়ার পর এ বিষয়ে আর মাথা ঘামানর প্রয়োজন বোধ কোরলে না। লক্ষ্যহীনভাবে আমার বাস না চোল্লেও আমি চোলেছিলাম। হঠাৎ দেখি, একটা বেশ বড় বাড়ীর গায়ে দু'তিনটী রাজপতাকা উড়ছে। সেইখানেই নেমে পোড়লাম কপাল ঠুকে,—এর কাছাকাছিই কোথাও ব্রিটীশ রাজদূতের আড্ডা হবে। আন্দাজ আমার ব্যর্থ হোল না,—একটু ঘোরাঘুরি কোরতেই ব্রিটীশ দূতের আবাস বেরিয়ে পোড়ল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ডাক এল। ছাড়পত্র দেখে রাজদূত প্রশ্ন কোরলেন "মাত্র কয়েকদিন আগে লণ্ডনে এতগুলি দেশে যাবার অনুমতি নিয়েছেন অথচ সেখানে রাশিয়া যাবার অনুমতি নেন নি কেন ?" উত্তর দিলাম "তখন স্থলপথে দেশে ফিরবার সঙ্কল্প ছিল, তাই প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতির ছাড়পত্র নিয়েছিলাম। রাশিয়া যাবার সঙ্কল্প এখানে হোল, সেখানে যাবার সুবিধা দেখে।" দ্বিতীয় কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই অনুমতি পেলাম।

দেখতে দেখতে মিঃ মিগডালের নিমন্ত্রণ রক্ষার দিন এসে পোড়ল। বেলা ১১টায় ট্রেণ ধোরে মালোভ (Maalov) ষ্টেশনে নামলাম। ষ্টেশনটী খুব ছোট, মাত্র একখানি ঘর। বাইরে কোনো যানবাহন না দেখে ষ্টেশন মাষ্টারকে ইসারায় বোল্লাম "এডেলগেভ (Edelgave)

যাব মিঃ ম্যাডসেন মিগডালের (Madsen Mygdal) বাড়ী।" তিনি তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হোয়ে ট্যাক্সী আড্ডায় ফোন কোরলেন এবং আকারে ইঙ্গিতে বোঝালেন, "গাড়ী আসছে, বসুন।"

ষ্টেশন থেকে প্রায় তিন মাইল দূর এডেলগেভে এসে



চর্ব্বির কারখানায় গবেষণাগার

ট্যাক্সী একটী প্রকাণ্ড বাড়ীর দরজায় দাঁড়াল। ড্রাইভার নেমে বাইরে ঘণ্টার বোতাম টিপতেই পরিচারিকা দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলে। ড্রাইভারই উত্তর দিলে। পরিচারিকা ভেতরে গিয়ে মিগডাল-গৃহিণীকে পাঠিয়ে দিলে।



সমবায় কাপড়-কলের একাংশ

আমি কোবেনহাউন থেকে আসছি এবং মিঃ ব্যানার্জ্জি বোলতেই প্রৌঢ়া খুব খাতির কোরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং মিঃ মিগডালকে খবর দিলেন। অনতিবিলম্বেই বৃদ্ধ মিগডাল এসে সহাস্যবদনে করমর্দ্দন কোরলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব ভাল ইংরেজী বোলতে পারেন। ক্রমে ক্রমে দেখি একে একে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে এসে নম্রভাবে ঈষৎ হাঁটু নামিয়ে অভিবাদন কোরে আমার চারিপাশে ঘিরে বোসল। সেদিন ছিল নববর্ষের পরের দিন। পর্ব্ব উপলক্ষে মিঃ মিগডালের শালী এখানে সপুত্রদল বেড়াতে এসেছিলেন। তিনিও বেশ ইংরেজী জানেন। মিগডালের নিজেরও আমার বন্ধুটী ছাড়া দু'তিনটী ছেলে। বড়রা বেশ ইংরেজী বলে, ছোটরা সবেমাত্র শিখছে।

মিসেস মিগডাল জিজ্ঞাসা কোরলেন "তুমি লণ্ডন ছেড়েছ কবে? আমার ছেলে তোমার কথা অনেক লিখেছে। সে তোমাকে বন্ধু পেয়ে ভারী খুসী হোয়েছে। সে ভাল আছে ত?"

এতগুলি কথার জবাব কি ভাবে দোব ভাবতে ভাবতে



রাত্রে সমবায় কেন্দ্র ভাণ্ডার

মিঃ মিগডাল প্রশ্ন কোরলেন "সে বেশ ভাল ইংরেজী বোলতে শিখেছে ত? ইংলণ্ডের সঙ্গেই আমাদের কারবার কাজেই ওদের ভাষাটা জানা দরকার।"

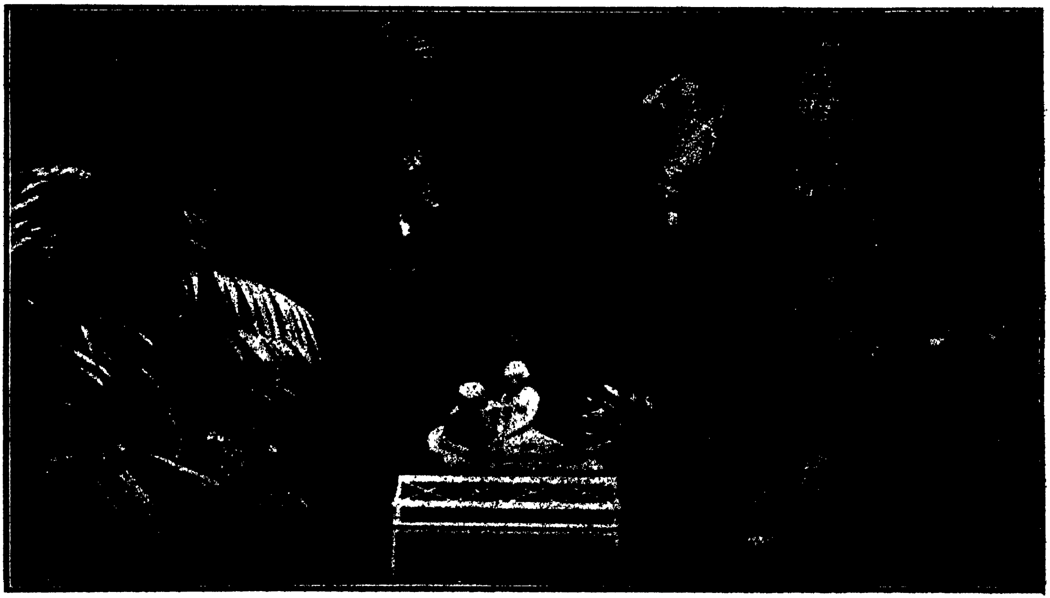
মিসেস মিগডাল উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন "ওঃ তুমি তাকে মাত্র ক'দিন আগে দেখেছ, আমি তাকে সেই গেল বছর দেখেছি; সে এবার নববর্ষে আসতে পারে নি। লিখেছে, এই শীতের ছুটীতে বোধ হয় আসবে। এলেই হোত তোমার সঙ্গে। সে এলে আরো ভালো লাগত তোমার, কি বল?"

প্রবাসী সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহার্ত্ত মনের ব্যাকুল ক্ষুধা সকলের অজ্ঞাতসারে আমার মনকে কেমন দুর্ব্বল

কোরে তুল্ল। স্মৃতিপটে ভেসে উঠল আর একটী প্রবাসী পুত্রের স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ!

মিঃ মিগডাল বোল্লেন "চল তোমায় আমার চাষ-বাড়ী দেখিয়ে আনি।"

বাড়ীর সংলগ্নই গোয়াল, ও ঘোড়ার আড্ডা, একটী ছোট দুগ্ধশালা (dairy)। একটু দূরে শুকনো ও জলীয় সারের (liquid) আধার। আর চারদিকে দুশো হেকটেয়ার (hectare) অর্থাৎ প্রায় দেড় হাজার বিঘে জমি। এই জমির ১৭৫ হেকটেয়ার (১ হেকটেয়ার = ২২/৫ একর = ৭॥ বিঘা) আবাদী জমি, ৫ হেকটেয়ার চরাট এবং ২০ ও ৫ম বৎসর সার দেয় এবং ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম বৎসর একদম সার দেয় না। ফসলগুলি এমন পর্য্যায়ে লাগান হয়, যা'তে একটী অপরের জন্য কিছু খাদ্য জমিতে রেখে যায়, এবং একটীর শিকড় গভীরতর দেশ থেকে রস শোষণ করে, অপরটী অপেক্ষাকৃত ওপর দিকেই শেকড় ছড়িয়ে দেয়। ডেনমার্কে ফসল উৎপন্ন করা হয় মানুষের জন্য নয়, পশু-খাদ্যের জন্য। ডেনমার্ক যে আজ কৃষিজগতে শীর্ষস্থান লাভ কোরেছে ও কোনো খনিজ পদার্থের অবলম্বন না থাকা সত্ত্বেও কেবল কৃষিকেই জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ কোরে দেশকে সমৃদ্ধ কোরে তুলেছে, তার প্রধান কারণ এরা



গ্লিপটোথেকের দুটী চমৎকার মর্ম্মর শিল্প

হেকটেয়ার জঙ্গল। ডেনমার্কে আধুনিকতম পন্থায় বৈজ্ঞানিক ভাবে চাষ হয়। এখানে একই জমিতে প্রতি বৎসর একই ফসল উৎপাদন করে না। মিঃ মিগডালের এডেলগেভ ষ্টেটটীতে এইভাবে ফসল উৎপাদিত হয়:—১ম বৎসর গম, ২য় বৎসর লুসার্ণ (মূলা জাতীয় কন্দ ফসল), ৩য় বৎসর ওট (Oat), ৪র্থ বৎসর লুসার্ণ, ৫ম বৎসর বার্লি, ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম বৎসর লুসার্ণ, আবার ৯ম বর্ষে গম। গমের সময় জমিতে একদম সার দেয় না, দ্বিতীয় বৎসর ভাল ভাবে সার দেয়, ৩য় বৎসর সার দেয় না, ৪র্থ কৃষিজাত দ্রব্য নিজেরা খেয়ে ফেলে না। জমিতে এরা যা উৎপাদন করে তা গরুকে খাওয়ায়। গরুর দুধ স্থানীয় সমবায় দুগ্ধশালায় বেচে দিয়ে আসে। তারা কেবল মাখনটুকু তুলে নিয়ে বাকী দুধটা চাষাকে ফেরত দেয়। চাষা আবার তা শূয়ারকে খাইয়ে দিয়ে তাদিগকে মোটা করে। এই ভাবে তারা গম, যব, বা লুসার্ণ থেকে দুচার পয়সা পায়—একবার মাখনের দাম (পরে বৎসরান্তে সমবায় দুগ্ধশালার লভ্যাংশ) ও পরে শূয়ারের দাম। যাক্ সে কথা। কেউ কেউ হয়ত ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে

কৃষিপ্রবন্ধের গন্ধ পেয়ে এই চাষা লেখকের ওপর বিরক্ত হবেন।

মিঃ মিগডালের ২০টী ঘোড়া; ১৬০টী বেশ ভাল জাতের গরু, ১২০টী বাছুর আছে। ইনি কোনো শূয়ার পোষেন না, কারণ তাঁর দুধ দৈনিক ১৫০০ বোতলবন্দী হোয়ে



কাপড়-কলের একাংশ

সহরে খাবার জন্যে বিক্রী হয়। শূয়ারকে খাওয়ানর জন্যে মাথনতোলা দুধ ফেরত আসে না। সব গরুই দুবার দোয়ান হয়। কেবল পঞ্চাশটী ভাল গরুকে ইনি দিনে রাত্রে চারবার দোয়ান। তাতে তাঁর এক একটী গরু পিছু



সমবায় জুতার কারথানা

প্রায় সিকি পরিমাণ দুধ বেড়েছে। মিঃ মিগডাল প্রতি গরুর দুধের হিসাব রাখবার বই থেকে দেখালেন, যে গরু দুবার দোয়ানর সময় ১৬·৬ কিলোগ্রাম দুধ দিত, সেই গরুই চারবার দোয়ানয় ২৩·৪ কিলোগ্রাম (kg-gram) দুধ দিয়েছে। এতে তাঁর ৫০টী গরুর দুধ মিলিয়ে আয় প্রায় সিকি বেড়ে গ্যাছে। আমাদের এখানেও দোয়ানর সময় বাড়ালে দুধ বাড়ে; কিন্তু দুধের পরিমাণ অল্প বোলে বাছুরগুলির ওপর দয়া কোরে কিছু ছাড়াই ভাল। মিঃ মিগডালের এই এষ্টেটটীর ইতিহাস শুনলুম যে প্রথম ১৬৮২ খৃঃ অব্দে লেডী এডেল উলফেল্ড্ (Edel Ulfeldt) স্থানীয় অনেকগুলি ছোট ছোট চাষীর জমি রাজার কাছ থেকে উপহার পান, এবং সেই থেকেই এখানকার নাম এডেলগেভ। এর বর্ত্তমান বাড়ীগুলি ১৭৯০ সালে তৈরী হয়। এঁদের বাড়ীর একটী ছবি আমায় উপহার দিয়েছিলেন। দুরদৃষ্টবশতঃ সেটী হারিয়ে গেছে।

এই এষ্টেটটীতে তখন ১২ জন শিক্ষানবীশ, ৬জন কুমারী ও ৭ জন বিবাহিত শ্রমিক ছিল। এদের সকলেরই থাকবার জন্যে ভাল বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। যতক্ষণ এইসব ঘুরে দেখছিলাম, উৎসুক ছেলেমেয়ের দল নবাগতের চারধারে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। এমন রঙ্গের, এমন কালো চুল ও চোখওয়ালা লোক তাদের বয়সের মধ্যে তারা দেখে নি। কাজেই ঔৎসুক্য হবারই কথা।

সন্ধ্যার সময় (বেলা প্রায় ৫টা) সকলে একসঙ্গে বোসে চা খেলাম। মিঃ মিগডালের বড় মেয়ের বয়স প্রায় বছর উনিশ, অবিবাহিতা—ঠিক বাঙ্গালী ঘরের বয়স্থা কুমারী মেয়ের মতই সলজ্জ, চাপল্যহীন ও মধুর। আমার ফিরবার ট্রেণ ছিল প্রায় ৫৷৷০টায়, সেই সময় ট্যাক্সী আসতে বোলেছিলাম। মিসেস মিগডাল ও ছেলেরা ধোরে বোসল এ ট্রেণে যাওয়া হবে না। আমার আপত্তিতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না কোরে তারা ফোন কোরে ট্যাক্সীকে বারণ কোরে দিলে। রাত্রে একসঙ্গে খেয়ে তবে কোবেনহাউন ফেরবার অনুমতি মঞ্জুর হোল। এর ভেতর ছেলেরা জোর কোরে খেলতে নিয়ে গেল। ছোট বিলিয়ার্ডের মত খেলা, বোর্ডটি ক্যারম বোর্ডের মত। কথনও খেলি নি, কাজেই নিয়ম কানুনও জানতাম না – তারাও কেউ ইংরেজী জানে না, অথচ আমার সঙ্গে খেলা চাই। আমি কথনও বিপক্ষের গুটী ফেলি, কথনও লক্ষ্য ব্যর্থ হয়, কথনও বা জোড়া জোড়া পার—এতে তাদের কৌতুক আরো বেড়ে গেল। খেলা শেষে তাদের মধ্যে একটী মেয়ে গান গাইলে। পরে আমায় ধোরল 'তোমার দেশের গান গাও।' জীবনে

অনেক ব্যাপারে অনধিকার চর্চ্চা কোরে অপরাধ কোরেছি ; কিন্তু সঙ্গীতকে বরাবরই শ্রদ্ধা কোরে চলি। কাজেই কথনও তার অসম্মান করি নি—কিন্তু তারাও নাছোড়বন্দা। কেউ হাত ধরে, কেউ আঙ্গুল ধরে, কেউ এসে এমন মিনতিভরা চোখে চাইতে লাগল যে, আমার নিজের ওপর বড় করুণা হোল—হায় হতভাগ্য! এতগুলি সরল শিশু-অন্তরের আকুল আগ্রহ মেটাতে আজ তুমি অক্ষম! শেষে তাদের মা ও মিসেস মিগডাল এসে আমায় শিশুসৈন্যের কবল মুক্ত কোরে নিজেদের কাছে নিয়ে এলেন। শিশুদের তখন অপরিচয়ের দূরত্ব কেটেছে ; কাজেই তারা তখন ভারতবর্ষকে দু'ভাগেই ভাগ করা আছে।" নিজেও দেখলাম। হায় হতভাগ্য ভারত, শুধু শ্বেতপত্র নয়—বিদেশী মানচিত্রেও তুমি বিভক্ত! ডেনমার্কের অনেক কথার সঙ্গে উচ্চারণে ইংরেজীর বেশ মিল আছে, যেমন Ekstra, Vinc, Malk (milkএর মত উচ্চারণ), Teatre (থিয়েটার) Ingenior (Engineer) ইত্যাদি।

রাত্রে একসঙ্গে বোসে খাওয়া হোল। তখনও খাবার ঘরে নববর্ষের মোমবাতি ও 'খ্রীষ্ট মাসের বুড়ো' ছিল ; আবার সেদিন সেগুলো সাজান হোল। মিঃ মিগডাল বোল্লেন "আমাদের নববর্ষ এবার একসঙ্গে ৪৮ ঘণ্টা।"

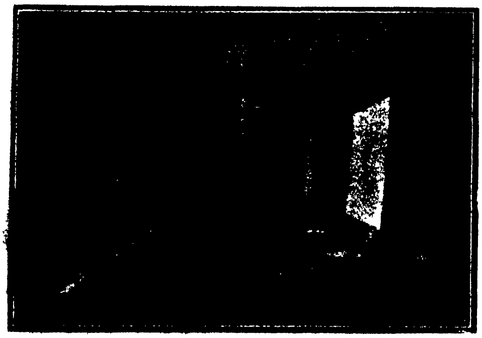


'আমাগারটাও' রাস্তা—কোবেনহাউন

কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। শেষে একখানা মানচিত্র এনে আমায় দিয়ে বোল্লে "তোমার বাড়ী কোথায় দেখাও, —পূর্ব্ব ভারতে না পশ্চিম ভারতে?" আমি বোল্লাম "ভারতবর্ষ একটাই। পশ্চিম ভারত (West Indies) নামে একটা দ্বীপ আছে বটে, কিন্তু সেটা আসল ভারতবর্ষ নয়।" তাদের মধ্যে যারা একটু বড় (৮।৯ বছরের) তারা ভূগোল রীতিমত পোড়েছে। তারা তর্ক তুল্লে "কিছুতেই না, এই দেখ।" মিঃ মিগডালও বোল্লেন "মানচিত্রে বাড়ীর মেয়েরাই পরিবেষণ কোরলে। খাওয়ার পর পিতা-পুত্র একসঙ্গেই চুরুট খেলে। মেয়েদের মধ্যে সকলে সিগারেট খায় না। ক্রমে আমার ট্রেণের সময় হোয়ে এল। ট্যাক্সীকে ফোন কোরতে বোল্লাম। মিসেস মিগডাল বোল্লেন "আমার বড় ছেলে বাইরে গিয়েছিল, সে ত ফিরেছে। এখন সেই তোমায় তার মোটরে ষ্টেসনে পৌছে দেবে।" রাত্রি ক্রমেই বেড়ে উঠল, আমি সকলের কাছে বিদায় চাইলাম। ছেলেরা সকলে তাদের কার্ড দিলে। যাদের ছাপা ছিল না, তারা

হাতে লিখে দিলে। তাদের সেই স্নেহের দানগুলি আমি আজও রেখেছি। ওর মধ্যে যে বিশ্বশিশুর প্রাণের ভাষা কচি হাতে লেখা। আমার নাম ইংরেজী ও বাংলায় প্রত্যেকে লিখিয়ে নিলে।

মোটরে চেপে বোসলাম। প্রচণ্ড শীত, অল্প অল্প তুষারপাত হোচ্ছিল। ছেলেরা সকলে ঝোঁক ধোরে বোসল আমার সঙ্গে ষ্টেশনে যাবে। তাদের মা ও মিঃ মিগডাল এবং বড় ছেলেরা নিষেধ কোরলে; কিন্তু তারা জিদ ধোরে বোসল। ষ্টেশনে এসেও তারা যেন আমাকে ছাড়তে চায় না; অথচ আমার একটী কথা না তারা বোঝে, না বুঝি আমি তাদের কোনো ভাষা। তবু ইসারায় ও চোখের ভাষায় অনেক কথাই হোল,—যেন তারা আমার নিজের ভাই বোন। ট্রেণ এসে পোড়ল, আমি ট্রেণের জানলা



সমবায় কেন্দ্র-ভাণ্ডারের পোষাক-বিভাগ

দিয়ে মুখ বাড়ালাম। তারা হাঁটু নামিয়ে আমায় বিদায় অভিনন্দন জানাল। যতক্ষণ দেখতে পেলাম, দেখলাম, তারা ষ্টেসন প্ল্যাটফর্ম্মে ট্রেণের দিকে তাকিয়ে সেই তুষারের মাঝেও দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন আমার মনে হোয়েছিল ভাষা লুপ্ত হোলেও ভাবের আদান প্রদান কোনো দিন বন্ধ হবে না।

ডেনমার্কের সমবায় নীতির সাফল্যের কথা বহুদিন থেকেই শুনছি। আমাদের দেশে সমবায় সমিতিগুলি মোটেই জনপ্রিয় হয় নাই। এগুলি মাঝে মাঝে দু একজন উৎসাহী কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রেরণায় কিছুদিন চলে; আবার স্থবির হোয়ে নির্জ্জীব হোয়ে পড়ে। অর্থাৎ এদের নিজেদের চলবার মত প্রাণশক্তি নেই। অথচ কৃষিপ্রধান ডেনমার্ক আজ সমবায় নীতির জোরেই বিশ্বের বিপুল অস্তিত্ব-যুদ্ধে জিতে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে।

ডেনমার্কের সমবায় সমিতির প্রধান আড্ডায় গিয়ে ঢুঁ দিলাম। এঁরা সঙ্গে লোক দিলেন কেন্দ্রীয় সমবায় ভাণ্ডার এবং সমবায় গেঞ্জী কারখানা ও জুতার কারখানা দেখাতে। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারটীকে বিরাট বলা যেতে পারে। ভাল তামাক, ঝালমসলা থেকে, কাপড়, জামা, জুতো, লাঙ্গল, কোদাল, বাসন, সবই পাওয়া যায়। পোষাক বিভাগের পেছনের একটী হলে সার সার সেলায়ের কল আছে। সেখানে খালি পোষাক তৈরী হোচ্ছে। যে জামা কাটছে সে খালি কেটেই চোলেছে। যে সেলাই কোরছে সে আর বোতামের ঘর কাটছে না। অর্থাৎ জামা করার এক



সমবায় কেন্দ্র-ভাণ্ডারের সেলাই বিভাগ

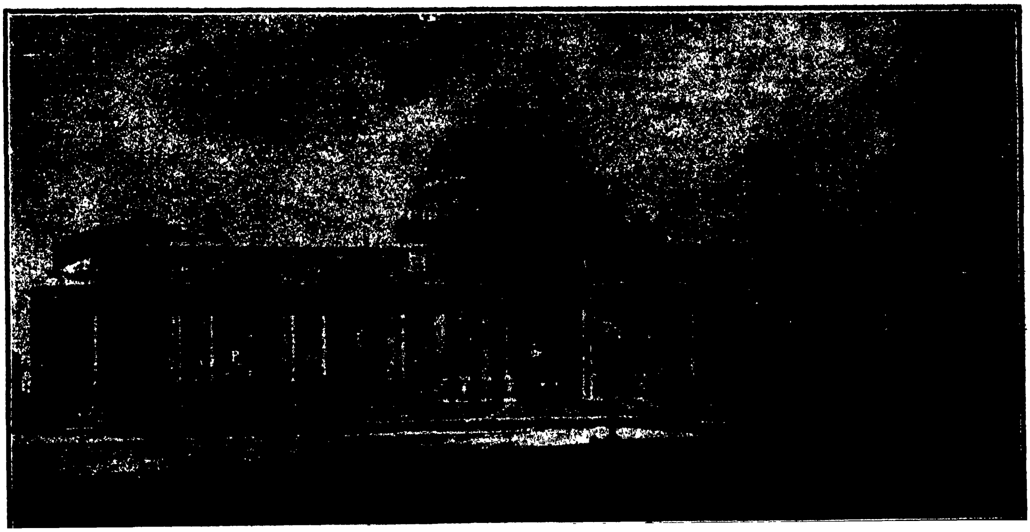
একটী বিষয়ে এক একজন ওস্তাদ,—সব-জান্তা কেউই নয়; এতে কাজ হয় নিখুঁত ও দ্রুত। এ বিভাগটীতে প্রায় শতকরা ৯৯জনই নারী কর্ম্মী দেখলাম।

জুতোর কারখানাটীও প্রকাণ্ড, দিন এক হাজার জুতো তৈরী হোয়ে বেরিয়ে আসে। এখানেও এক একটী যন্ত্রে এক এক অংশের কারিগর কাজ কোরছে। গোটা জুতোটা প্রথমে উল্টো কোরে তৈরী কোরে, তলায় সোল (sole) দেবার আগে উল্টিয়ে সেলাইটা ভেতরে দিয়ে দেয়। কলকারখানা বিদ্যুত প্রবাহে চোলছে। পশমের গেঞ্জীর কারখানাতেও কর্ম্মীদের অধিকাংশই নারী। পুরুষেরা বোধ হয় বাইরের কঠিনতর কাজে খাটে। এই কারখানাটীর এক একটী অংশ অপরটী থেকে লোহার

দরজা দিয়ে আলাদা করা, যাতে কখনও এক অংশে আগুন লাগলে অন্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এখানকার সমবায়সমিতিগুলি রাষ্ট্র থেকে ঋণ নেয় এবং সাধারণতঃ ফটকাবাজারে (stock exchange) নিজেদের নামীয় তমশুক (bond) বিক্রী কোরে মূলধন সংগ্রহ করে। রাষ্ট্র এই সব ঋণের সুদ দেবার জন্য দায়ী থাকে বোলে দেশের বা বিদেশের ধনীরা সহজেই এতে টাকা খাটায়। যখন কোনো সমিতির কোনো সভ্য সমিতির কাছে ঋণ চায়, তখন সমিতি তার সম্পত্তি নিজেরা বন্ধক রেখে, তার জন্যে ফটকাবাজারে, যত টাকার প্রয়োজন, তত টাকার ঋণপত্র (bond) নিজের দায়িত্বে বেচবে। যা টাকা তাতে পাওয়া যাবে, তার থেকে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কমিশন বাদ দিয়ে বাকী টাকা ঋণ-গ্রহীতাকে দেওয়া হয়। তাতে ৫০০০৲ টাকার ঋণপত্রে ঋণগ্রহীতা ৫৫০০৲ টাকাও পেতে পারে, আবার ৪৫০০৲ টাকাও পেতে পারে। ঋণপত্র যে সমিতি বাজারে পেশ করে তার সুনামের ওপর এটা কতকটা নির্ভর করে। এখানকার কোনো সমবায়-সমিতিতে ঋণদাতা বা মূলধনদাতা সমিতির লভ্যাংশ পায় না। ক্রেতা বা কাঁচা মাল সরবরাহকারক সভ্যেরাই ক্রীত বা প্রদত্ত জিনিষের দামের অনুপাতে বৎসরান্তে লভ্যাংশ পায়। মূলধনদাতারা কেবল নির্দ্দিষ্ট সুদ পায়।* কেন্দ্রীয় সমবায় কর্ম্মশালার (office) অধ্যক্ষ আমায় ডেনমার্কের গত কয়েক বৎসরের সমবায়সমিতিসমূহের কার্য্যসূচী, অগ্রগতির হিসাব প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেকগুলি বই দিলেন ও আমাকে আমাদের দেশের সমবায় সম্বন্ধে তাঁদের কেন্দ্রীয় পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ জানালেন। এঁরা সকলেই অতি ভদ্র ও অমায়িক। আমাদের দেশের অমনি সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সাধারণ অপরিচিত আগন্তুকের সঙ্গে ব্যবহার পাশাপাশি মনে পোড়ল।

একদিন সন্ধ্যায়, হোটেলের ভোজনশালায় পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে স্কালা (scala) নামে একটী খুব বড় নাচঘর ও ভোজনশালায় খেতে গেলাম। উদ্দেশ্য—অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয়। পানমণ্ডপটী চমৎকার ভাবে সাজান। কৃত্রিম ও সত্যকার গাছপালা, লতাপাতায় মনোহারী আলোক-সম্পাতের ফলে এবং তার নীচে সুবেশা তন্বী তরুণী ও তরুণদের গুঞ্জনালাপ চমৎকার যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক মাদকতাভরা আবহাওয়ার সৃষ্টি কোরছিল।



গ্লিপটোথেক

* ডেনমার্কের সমবায় প্রথা ও কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছুক হইলে পাঠককে লেখকের প্রণীত Modern Agriculture পড়িতে অনুরোধ করি।

আমাদের এখানে এমন সস্তায় সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঠিক এমন শ্রান্তিহারী চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা কোথাও নেই—হওয়া উচিত্‌।

আমরা দুই বন্ধুতে খেতে খেতে আলাপ কোরছি, এমন সময় একটী সুশ্রী তরুণী যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকল। কিছু বিস্মিত হোয়ে ভাল কোরে তাকাতেই তাকে চিনলাম। ডেনমার্কে নেমে ট্রেণ ছাড়বার অবসরে ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে এঁর সঙ্গে আলাপ হোয়েছিল। এক সঙ্গে চা, দুধ খেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক গল্পগুজব চোলেছিল। ইনি ভাল ইংরেজী জানেন। জাতিতে জার্ম্মাণ, বিয়ে কোরেছেন ড্যানিশ এবং শৈশবে মায়ের সঙ্গে অনেকদিন ইংলণ্ডে কাটিয়েছেন। উঠে গেলাম। তিনি পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন "ইনি আমার স্বামী।" ভদ্রলোক অত্যন্ত কষ্টে ভাঙ্গা-



সমবায় জুতার কারখানার চামড়া বিভাগ

ভাঙ্গা ইংরাজীতে 'গুড ইভনিং' জানালেন। এখানে এঁদের সঙ্গে অনেক কথা হোল। স্কাণ্ডিনেভিয়ার (Scandinavia —ডেনমার্ক নরওয়ে ও সুইডেন) মধ্যে কোবেন-হাউন সব চেয়ে বড় সহর বোলে এঁরা গর্ব্ব করেন। লোকজনের স্বল্পতা ছাড়া ও সাইকেল এবং ঘোড়ার গাড়ীর আধিক্য ছাড়া আলোকসজ্জা রাস্তাঘাট ইত্যাদিতে ইয়োরোপের অন্যান্য রাজধানীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।

এখানে হঠাৎ কুক কোম্পানীর আপিসে একদিন এক বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা। বিদেশে প্রথমে বাঙ্গালী বোলে চেনা মুস্কিল। তবে গায়ের রং দেখে ও মুখের ডোল দেখে স্বদেশী এ কথা বুঝতে দেরী হয় না। অল্পক্ষণ ইংরেজীতে আলাপ কোরে, যেই প্রদেশের একত্বের খবর বেরিয়ে পোড়ল, অমনি বাংলাভাষায় কথা বোলে দুজনেই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। ইনি ডেনমার্কে ক্রাউনকর্ক তৈরী শিখছিলেন ও কতকগুলি ওষুধপত্রের এজেন্সী নিয়ে শীঘ্র দেশে ফিরছেন জানালেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ডায়রীটী হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর নাম ও ঠিকানা আমি ভুলে গেছি। বিদেশে আলাপ জমতে বেশীক্ষণ লাগে না যদিও সব সময়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা করার কিছু বিপদও আছে। আমরা দুজনে সেদিন যতক্ষণ সম্ভব একত্রে বেড়ালাম।

এর পর একদিন এখানকার সত্যিকার চাষীদের সঙ্গে পরিচয়ের জন্যে ও গ্রাম্যজীবন দেখবার জন্যে ফিউনেন দ্বীপে (Fuhnen) বেরিয়ে পোড়লাম। খানিকটা ট্রেণে গিয়ে



কেন্দ্র ভাণ্ডারের পোষাক বিভাগের অপরাংশ

ছোট জাহাজে একটা জলপ্রণালী পার হোতে হয়। জলপ্রণালী মানে আমাদের গঙ্গা নয়। জাহাজে প্রায় ১।১॥ ঘণ্টা লাগে এবং যাত্রীদের জন্যে জাহাজে খাবারের ব্যবস্থা রাখতে হয়। ডেনমার্কে শীত খুব বেশী না হোলেও এখানে অনবরত জোর হাওয়ার জন্যে শীতটা বেশ কনকনে হোয়ে শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়ে যেন হাড়ের ভেতর কাঁপুনী ধরায়। বিশেষ জাহাজের খোলা ডেকে ত অতিষ্ঠ কোরে তোলে। শীতকালে আকাশ অধিকাংশ সময়েই মেঘলা।

জলপ্রণালীর পর আবার ট্রেণ ধোরে ফিউনেন দ্বীপে ওডেনসী (Odense) সহরে নামলাম। ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সী নিয়ে 'হুসম্যানড্‌স্কোলেন' (Husmandsskolen) অর্থাৎ চাষীদের বিদ্যালয়ে (Small holders' school)

পৌঁছতে বেশী বেগ পেতে হয় নি। সেখানে নেমে অধ্যক্ষের হাতে Mr. Sniggardএর পরিচয়পত্রটী দিলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক সাগ্রহে নিয়ে গিয়ে তাঁর বৈঠকখানায় বসালেন। টেবিলের ওপর থেকে একটা খোলা চিঠি তুলে দেখিয়ে বোল্লেন "Mrs. Mygdalএর কাছ থেকে আপনার জন্যে এই চিঠি আজ পেয়েছি।" Mrs. Mygdalই আমায় এই দ্বীপের চাষীদের ঘর-বাড়ী ও এই বিদ্যালয়টী দেখতে অনুরোধ কোরেছিলেন, কিন্তু তিনি যে আমার জন্যে এতটা চেষ্টা করবেন তা ভাবি নি। অনুকরণীয় ভদ্রতা নিশ্চয়ই!

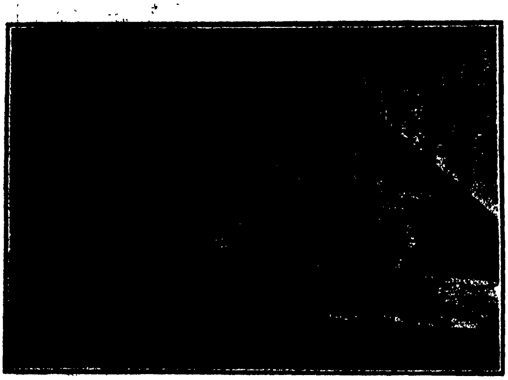
এর পর অধ্যাপক-গৃহিণী এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ সহজেই জোমে উঠল। অধ্যাপকের বড় ছেলেটীর বয়স বছর আটেক, বেশ ইংরেজী বোলতে পারে; অল্পক্ষণ আলাপের পরই সে আমাকে তার গবেষণাগার (laboratory) দেখাতে নিয়ে গেল। একটী ছোট ঘরে একটী টেবিলের ওপর ৪।৫টী কাঁচের পরীক্ষানল (test tube), কয়েকটী রাসায়নিক দ্রব্যের শিশি, একটী স্পিরিট ষ্টোভ—এই হোল গবেষণাগারের সম্পত্তি। কোনো দুটো ওষুধ মিলিয়ে হয়ত সোডা বা অন্য ধাতবিক জল (mineral water) বা কোনো দুটো রং মিশিয়ে একটা রং তৈরী করা, কি স্মেলিং সল্ট আবিষ্কার করা, এই সব ছোটো-ছোটো খেলাই তার গবেষণাগারের গবেষণা। শিক্ষার মূল ভিত্তি কি ভাবে গোড়ে ওঠে বুঝলাম। আমাদের দেশের ছেলেরা ঐ বয়সেও অনেক সময় পুতুলের বিয়ে, ঠাকুর-পূজো, বড় জোর চোর চোর নয়ত লুকোচুরি খেলে; বিজ্ঞানের খেলা ক'জনের মা বাপ শেখায়! আমার নিজের অজ্ঞতার কাহিনীই বলি—জাহাজে উঠে স্নানপাত্রের লোনা জলে গায়ে সাবান ঘষতে গিয়ে বেকুবের চূড়ান্ত; সাবান নির্ম্মম পাষাণ হোয়ে উঠলেন, গলতে একেবারেই নারাজ, ফেণার নামগন্ধ নাই, অথচ ভাল জলে সেই সাবানই দয়ার অবতার, গলেই আছেন। যদি আমার বিন্দুমাত্র রাসায়নিক-বিজ্ঞানের সঙ্গে পারচয় থাকত—এবং যা ও-দেশের যে কোনো শিক্ষিত যুবকের আছে, তা হোলে এমন লজ্জাকর ভাবে ঠকে এটা শিখতে হোত না। এর পর ছেলেটী বার কোরলে তার টিকিট-সংগ্রহের খাতা। সেই খাতাতেই তার বাবার সংগৃহীত টিকিট আছে। সে আবার তার ওপর আরো যোগ কোরে চোলেছে। এ সখটা ও-দেশের ছেলে বুড়ো সকলেরই অল্প-বিস্তর আছে—অনেক সময় এতে পয়সাও বেশ আসে। কত দেশের কত



গ্লিপটোটেক যাদুঘরে প্রবেশ পথে মর্ম্মর মূর্ত্তি—কোবেনহাউন

রকমের কত রঙের যে টিকিট বইটাতে আছে, তা বলা কঠিন! এ বইখানি ছেলেটার একটা গর্ব্বের সামগ্রী। অধ্যক্ষ বেশ বিদ্বান লোক; তাঁর আলমারীতে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্ণার্ড স'র বইএর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও বই দেখে খুবই খুসী হোলাম। সত্যকার সাহিত্য মানুষকে বিশ্বমানব মনের কাছে এমনিই আত্মীয় কোরে তোলে।

এর ভেতর একটা দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী তরুণী ঘরে ঢুকলেন। অধ্যক্ষ পরিচয় করিয়ে দিলেন "ইনি গ্রামের মেয়েদের শিক্ষক, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লেখা-পড়া, বাগান-করা, গৃহিণীপনা করা, রান্না ইত্যাদি শিখিয়ে বেড়ান।" বোল্‌লাম "আপনি দেখছি তা হোলে সবজান্তা।" ভদ্রভাবে হেসে পরিষ্কার ইংরেজীতে নবপরিচিতা উত্তর দিলেন "হ্যাঁ, হোতে হোয়েছে, নইলে চলে কৈ?"



সমবায় চুরুট কারখানায় তামাকপাতা মোড়া হইতেছে

বৈকালিক চা পান আমি, কর্ত্তা, গিন্নি ও মহিলা শিক্ষক একত্রে বসে শেষ কোরলাম। স্থির হোল বেলা দু'টোর সময় মহিলা-শিক্ষক আমাকে তাঁর মোটরে নিস্‌লেভ (Nislev) চাষী-কেন্দ্রে সেখানকার কৃষি-পদ্ধতি দেখাতে নিয়ে যাবেন।

যথাসময়ে তিনি তাঁর মোটর নিয়ে এলেন। আমি ওভারকোটটা গায়ে চড়িয়ে মোটরে উঠতে গেলাম। অধ্যক্ষ হাঁ হাঁ কোরে ছুটে এলেন "শীতে জমে যাবেন, দাঁড়ান দাঁড়ান।" এর পর এলো দুখানা মোটা ভারী কম্বল, একটা পা-ঢাকবার জন্যে, একটায় গলা পর্য্যন্ত সমাধিস্থ হবার জন্যে; এর ওপর এল আবার একটা প্রকাণ্ড ওভারকোট; সেটা আমার ওভারকোটের ওপর জোর কোরে চড়িয়ে তবে তিনি ছাড়লেন। হেসে বোল্‌লাম "এত ব্যস্ত হোচ্ছেন কেন? মোটরেই ত এসেছি এই পোষাকে।" তিনি কপট গাম্ভীর্য্যে উত্তর দিলেন "তবে সে গাড়ীটা এমন নতুন ও নতুন ডিজাইনের নয়।" আমরা সকলে উচ্চহাস্যে তাঁকে অভিনন্দন জানালাম। গাড়ীখানি একটী পুরোনো টুরিং ফোর্ড। এখানে এই একটী ছাড়া টুরিং গাড়ী ইয়োরোপের অন্যত্র শীতকালে আমার চোখে পড়েনি।

আমি পেছনে বসতে যাচ্ছিলাম, সঙ্গিনী বাধা দিয়ে বোল্‌লেন "সামনে বসুন, পেছনে ঠাণ্ডা হাওয়া বেশী লাগবে।" তাঁর সহজ নিঃসঙ্কোচ স্বরে আমার সঙ্কোচ কেটে গেল। অন্যের সঙ্কোচ অপরকে বেশী সঙ্কুচিত করে।

মোটর ছুটল—কখনও সমুদ্রের কূল দিয়ে, কখনও গ্রামের মধ্যে দিয়ে, কখনও দিগন্ত-প্রসারী মাঠের বুক চিরে। এমন শিক্ষিত ভদ্র অমায়িক বান্ধবীর সাহচর্য্যে সময় যে ভালই কাটল এ বলাই বাহুল্য। গাড়ীখানি তাঁকে ষ্টেটই দিয়েছে এবং তেলের খরচ বাবদ মাসিক বাঁধা বৃত্তি আছে। আমার জন্যে এই প্রায় চল্লিশ মাইল রাস্তার তেলের খরচ তাঁর মাসিক বৃত্তি থেকে কাটান উচিত নয় বলে তেলের দাম নিতে অনুরোধ করলাম। সঙ্গিনী হেসে উত্তর দিলেন "আমি ত মানুষ, আমার ত সখ আছে, সখের জন্যে খরচও করি, আমি আজ সখের জন্যে এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে এসেছি।" বলা বাহুল্য, কিছুতেই তাঁকে তেলের দাম নেওয়াতে পারি নি।

নিসলেভে পৌছে এক চাষীর বাড়ীতে গেলাম। তারা স্বামী-স্ত্রী ও দুটী শিশুপুত্র। এখানে ষ্টেট থেকে টাকা ধার দিয়ে ছোট ছোট কৃষক সৃষ্টি করা হোয়েছে। এক-একজনের ৫ হেকটেয়ার অর্থাৎ প্রায় ৩৭৷৷০ বিঘে জমি, একটী করে পাকা বাড়ী ও একটী ঘোড়া গরু এবং মুরগী থাকবার চাষবাড়ী। এর সমস্ত দামের ১/১০ ভাগ চাষাকে দিতে হোয়েছে; বাকী ৯/১০ ভাগ রাষ্ট্র দিয়েছে। এই জমীর উৎপন্ন দ্রব্য থেকে ঐ দেনা বার্ষিক ২৷৷/৩৲ টাকা সুদ সহ ৪৫ বছরে দিতে হবে; তখন এই সমস্ত জিনিষই চাষীর নিজের হবে। এদের অনেকের চাষের জন্য একটী ঘোড়া; সাধারণতঃ এরা পরস্পরের ঘোড়া নিয়ে সমবায় নীতিতে কাজ চালায়। দুধের কারখানা থেকে প্রতিদিন

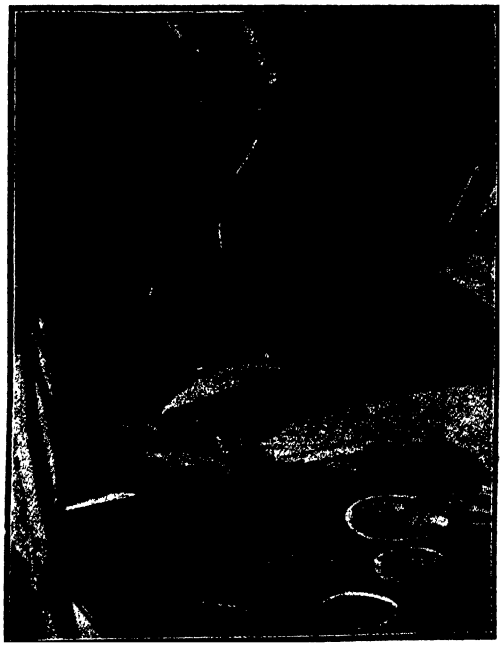
মোটর-ভ্যান এসে এদের দুধ নিয়ে যায়, দুধ পরীক্ষা-সমিতি থেকে লোক এসে সপ্তাহে দু-তিন দিন দুধ পরীক্ষা, গরুর স্বাস্থ্য, খাবার ইত্যাদি দেখে যায় ও নিয়মিত উপদেশ দিয়ে যায়। গ্রীষ্মে যে পশুদের খাদ্য ক্ষেতে উঠল, তা এরা বড় বড় সাইলো (silo) কোরে রাখতে পারে না বোলে, ঘাসগুলো মাটির নীচে পুঁতে রাখে ও প্রয়োজনমত মাটী থেকে তুলে পশুদের খাওয়ায়। ঘাস প্রায় কাঁচার মতই সরস থাকে। ৩৭॥ বিঘে জমির মধ্যে কতক জমি গ্রীষ্মে গরু চরবার জন্যে এরা পৃথক করে রাখে। এদের বাড়ীগুলি প্রায় এক ধরণেরই—সাধারণতঃ একটী বস্‌বার ঘর (drawing room)। এই ঘরেই ছোট একটী গ্রন্থাগার, দুটী শোবার ঘর, একটী খাবার ঘর, পাশেই উনুন। ঘরগুলি বেশ সুশ্রী ও সহজভাবে সাজান। আমরা তার বাড়ী গিয়ে কিছুক্ষণ গল্পগুজব



ফিউনেন দ্বীপে ওডেনসীর কৃষি-বিদ্যালয়

করলাম। সে এখানকার চাষীদের সংবাদপত্রের সম্পাদক; কাজেই বইএর সংখ্যা তার বাড়ীতে কিছু বেশী। বাড়ীর গৃহিণীরাই ছেলেদের ও নিজেদের সমস্ত জামা কাপড় তৈরী করে, কেবল কর্ত্তার বাইরে যাবার কোটটী কয়েক বছর অন্তর বাইরে বাজার থেকে তৈরী করাতে হয়। বাড়ীর প্রাঙ্গণেই একটী নলকূপ বসান আছে। এ-সব দেশে চাষে সেচনের জলের জন্যে ভাবতে হয় না, কাজেই তার ব্যবস্থা নাই।

সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে সান্ধ্যভোজন করলাম। এ বিদ্যালয়ে সব ছাত্রকেই ছাত্রাবাসে থাকতে হয় এবং আহারাদি ছাত্র শিক্ষকে একত্রে করে। আমার অধ্যক্ষ আমাকে ভারতবাসী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সেখানে একজন জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি ইংরেজি বা ড্যানিশ কিছুই বলতে পারেন না, অথচ ডেনমার্ক গেছেন সেখানকার সমবায়-পদ্ধতি আয়ত্ত কোরবার জন্যে। অধ্যক্ষ এ নিয়ে একটু শ্লেষের সুরেই মন্তব্য করলেন। আমার পাশে অধ্যক্ষের দুটী ছোট ছেলে বসে ছিল। বছর পাঁচেকের ছেলেটী তার বাবাকে প্রশ্ন কোরল "বাবা ওর চুল কালো ও কোঁকড়া কেন?" অধ্যক্ষ হেসে আমাকে তার প্রশ্ন জানালেন। আমি সহাস্যে জবাব দিলাম "ওকে জিজ্ঞাসা করুন ওর চুল



পরীক্ষারতা

সোণালী ও পাতলা কেন?" বালক উত্তর দিলে "আমাদের ত সবারই অমনি। তুমি কি নিগ্রো?" সকলেই তার এই প্রশ্নে হেসে উঠল। শিশু ছবিতে গল্পে ছোট থেকেই শিখেছে নিগ্রোদের কালো কোঁকড়া চুল। এর পর সে "তোমার গায়ের রং অমন কেন? চোখ দুটো অমন কেন?" ইত্যাদি নানা শিশুসুলভ প্রশ্ন করতে লাগল। তাদের অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। এবং সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয়। আমাদের দেশের মত গুরুজনেরা নিজেদের

অজ্ঞতা স্বীকার না করার জন্যে বা বিরক্তিভরে ধমকে শিশুদের অনুসন্ধানের উৎস বন্ধ করেন না।

এই বিদ্যালয়টী প্রাদেশিক কৃষক-সমিতি কর্তৃক ১৯০৮ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির বাৎসরিক সভায় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্য (Managing Committee) মনোনীত হয়। যতক্ষণ বিশেষভাবে ব্যয়ের সীমা অতিক্রান্ত না হয় ততক্ষণ সাধারণতঃ অধ্যক্ষের ক্ষমতায় হস্তার্পণ করা হয় না। ব্যবস্থা-পরিষদ সাধারণতঃ লক্ষ্য রাখে, যাতে বিদ্যালয়টী নিজের আয় থেকেই ব্যয় চালাতে পারে। বিদ্যালয়ের চারিদিকেই বাগান, প্রদর্শনী-ক্ষেত্র (demonstration field) আছে। এর নিজস্ব প্রায় ৫০ বিঘে জমি আছে, যেখানে ছাত্ররা হাতে-কলমে চাষ করে। কৃষকদের ছেলে-মেয়েদের ব্যবহারিক ও মানসিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারিক শিক্ষার



কিউনেন দ্বীপের প্রাচীন কৃষিপদ্ধতির যাদুঘর

ভিতর পশুপালন, গাছ-পালার চাষ, সার-সংরক্ষণ এবং সেই সঙ্গে হিসাব-নিকাশ রাখা, বাগান করা ইত্যাদি শেখান হয়। মানসিক শিক্ষার মধ্যে সাধারণ পুঁথি পড়া বিদ্যে অর্থাৎ সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদি তারা পড়ে। সাধারণতঃ বছরের মধ্যে দুটী দল কোরে ছাত্র নেওয়া হয়। শীতের সময় ৫ মাসের জন্যে পুরুষ ছাত্র নেওয়া হয়, কারণ সে সময় তাদের মাঠে কাজ থাকে না, আর গ্রীষ্মের ৫ মাস মেয়েদের নেওয়া হয়। এ ছাড়া যে সব চাষা বা চাষাদের ছেলে-মেয়ে গিন্নীরা বেশী দিন বাড়ী ছেড়ে থাকতে পারে না, তাদের জন্যে ৬ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে এক একটী বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মকালে বহু চাষী এখানকার পরীক্ষাকেন্দ্র ও প্রণালী-ক্ষেত্র দেখতে আসে। প্রাদেশিক সমিতির যে সব কৃষি-মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা (Adviser) আছে, তারা এই বিদ্যালয়েও পড়ায়। ডেনমার্কের অন্যান্য বিদ্যালয়ের মত এই বিদ্যালয়টীও বছরে কিঞ্চিদধিক ৬৫০০৲ টাকা (৫০০ পাউণ্ড) সরকারী সাহায্য পায়। এ ছাড়া দরিদ্র ছেলেদিগকে সরকারী বৃত্তি দেওয়া হয়, তাতে তাদের পড়ার অর্দ্ধেক খরচ কুলিয়ে যায়। খাওয়া, থাকা ও পড়াশুদ্ধ এই বিদ্যালয়ের খরচ পড়ে মাসে প্রায় ৫৫৲ টাকা (৪ পাউণ্ড)। সাধারণতঃ ৫০।৬০ জন ছাত্র এখানে পড়ে; এদের ভেতর পুরুষ ছাত্রদের গড় বয়স ২৫, মেয়েদের ২৩। ডেনমার্কে এমনি আরো তিনটী বিদ্যালয় আছে।

এটী ছাড়া আর একটী বিদ্যালয় এখানে দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ফোন পাওয়ায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র নিজে সব বিভাগ ও শ্রেণীগুলি (class) ঘুরিয়ে দেখালেন। সকালবেলা এখানকার ছাত্রেরা শিক্ষকের অধীনে নিয়মিত ব্যায়াম করে দেখলাম—খালি হাতেই। এই শিক্ষায়তনের সংলগ্ন একটী ছোট দুধের কারখানা আছে। এর পাশেই একটী ছোট যাদুঘর; এখানে ডেনমার্কের প্রাচীন কৃষিপদ্ধতি, কৃষকদের কুঁড়ে, জীবনযাত্রা-প্রণালী, পুরোনো গ্রাম, সেকেলে কৃষির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আছে। ১৫০ বছর আগে ডেনমার্কের কৃষিপদ্ধতি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের বর্ত্তমান কৃষকদের তুলনা অনায়াসে করা যেতে পারে। এই যাদুঘরটী পূর্ব্বে একটী চাষার বাড়ী ছিল।

কিউনেন দ্বীপে অধ্যক্ষের ও গ্রাম-শিক্ষয়িত্রী, আমার নিসলেভের সহযাত্রীনীটীর কথা বহুদিন মনে থাকবে।

কোবেনহাউনে ফিরে এসে আমার সেই ড্যানিশ বন্ধুর সঙ্গে হোটেলের ভোজনাগারে দেখা হোল। তিনি একদিন তাঁর বাসায় ধরে নিয়ে গেলেন। অবিবাহিত যুবক (আমাদের হিসেবে প্রৌঢ় কারণ বয়স বছর ৩৭।৩৮), প্রায় ৮ বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন, এখানে কি একটী সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইনি আমায় নিয়ে গেলেন এখানকার "গান্ধী-সমিতির" সম্পাদকের কাছে। যদিও সমিতিটী এখানে খুব বিখ্যাত নয়, তবু অনেকেই এর অস্তিত্ব অবগত আছে। এখানে মহাত্মাজীর পুস্তকাবলী আছে এবং সভ্যেরা মাঝে মাঝে মিলিত হোয়ে গান্ধীবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন

গান্ধী সম্বন্ধে এঁরা সে সময়ে (১৯৩৩ সালের জানুয়ারী) অতি অল্প সংবাদই পেতেন—সেনসারের ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে যেটুকু সংবাদ বাইরে যেত, তা যেমন অস্পষ্ট, তেমনি অপ্রচুর। তবু কোনো সংবাদ পেলেই মহাত্মাজীর ছবি এখানকার সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় দিয়ে সে সংবাদ ছাপত। ভারতবর্ষের তিনটী লোককে ইয়োরোপের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক চেনে—মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ ও ক্রিকেট খেলোয়ার রণজিৎ।

একদিন আমরা দুজনে এখানকার একটী প্রসিদ্ধ নাট্য-শালায় গেলাম। যদিও ভাষা বুঝলাম না, বহুদিন ভাবরাজ্যে বিচরণ করার ফলে ভাবটী বুঝতে কষ্ট হোল না। আমেরিকার অতি-আধুনিক যৌনবাদকে আক্রমণ কোরে বইখানি লেখা। রঙ্গমঞ্চে আধ-নেংটো মেয়েদের কুটিল কটাক্ষভরা লাস্যের ও সুগোল-নগ্নপদ-বিক্ষেপের অভাব ছিল না। দর্শকের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল ; প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে কেউ ধূমপান করে না। প্যারী, বের্লিনেও এই নিয়ম ; ইংলণ্ডে অত কড়াকড়ি নাই।

কাহিনী বেশ দীর্ঘ হোয়ে পোড়েছে—এর পর শ্রোতাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে ; বলবার জিনিষও এবার ফুরিয়ে এসেছে ; কাজেই আজ এইখানেই ইতি।

"আই-সি-এস্"

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস্

[ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' আই-সি-এস্ কবিতা পড়িয়া]

ভারত ও বৃটেনের মোরা মিলছন্দ
চৌদিকে চৌকোস্, মুক্ত ও বন্ধ।
ভ্রমি নব নব দেশে নব বেশে নিত্য
কর্ম্মের সাধনায় উৎসাহী চিত্ত।

মুখর প্রশংসায় কবি তুমি ধন্য,
—শূদ্র বলিয়ে গালি কি দোষের জন্য ?

আমরা নহিক' বটে সুকবি রবীন্দ্র
হইনিক' কোনো দিন জগদীশচন্দ্র।
আমাদের জীবনের পন্থা স্বতন্ত্র,
আমরাই তোমাদের শাসনের যন্ত্র।

সর্ট পরে রবিবাবু যান যদি রেঙ্গুন,
জগদীশ সেন্সাস্ নেন যদি তেলঙ্গুন,
ফ্যারাডে নাচেন যদি রায়বেঁশে নৃত্য—
কোন্ সুকবির তাতে জ্বলিবেনা চিত্ত ?

'সার্ভ্যান্ট' বলি বলে নহি মোরা শূদ্র,
বিনয়ের আবরণে ঘোরতর রুদ্র।

এক রাত্রের অতিথি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সামান্য একটা রাতের জন্যেও ঘরটা খালি পেলুম না।

রাত তখন প্রায় দশটা, ঘরের সামনেকার ফালি বারান্দাটুকুতে দাঁড়িয়ে ভরা-পেটে একটা সিগারেট টানছি, ম্যানেজার এসে খবর দিলো, আজই নাকি আবার তার কোত্থেকে এক নতুন মেম্বার জুটেছে।

—আপনার এখেনেই তাকে চালান দিতে হ'বে দেখছি।

—বলেন কী? খবরটা বিশেষ মোলায়েম নয়, সিগারেটটা বিস্বাদ হ'য়ে উঠলো: এইখেনেই?

—উপায় নেই, ম্যানেজার সুগোল মুখে বললে,—সমস্ত ঘর full।

অথচ বরেনবাবু, যিনি এই টু-সিটেড্ ঘরটায় এতোদিন আমার রুম-মেট ছিলেন, আজ সন্ধ্যায় সবে বাড়ি গেছেন। তাঁর তিরোধানের চিহ্নগুলি পর্য্যন্ত এখনো মুছে যায় নি: খালি তক্তপোষের উপর এখনো তাঁর সিগারেটের খোলা প্যাকেট, দাড়ি কামাবার ব্লেড, ক্যাশ-মেমো, জুতোর বাক্স ইত্যাদি পড়ে' আছে। এরি মধ্যে, তাঁর ট্রেণটা ছাড়তে না ছাড়তেই, অনায়াসে আরেকজন এসে তাঁর শূন্য তক্তে গদিয়ান হ'লো, ম্যানেজারের ভাগ্যই আলাদা।

—কি আশ্চর্য্য, একটা রাতও কি আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে একলা থাকতে পাবো না?

ম্যানেজার সৌখিন একটা বন্ধুতার ভান করলো: বা, খালি ঘরে আপনারই বরং একজন সঙ্গী জুটলো। একা ঘরে কথা না বলে' কতোক্ষণ মানুষে টিকতে পারে?

—রক্ষে করুন, সিগারেটের টুক্‌রোটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম,—একেক সময় কথা বলতে না-পারাটা মানুষের জীবনে আশীর্ব্বাদ।

—এতোদিন তবে পাশের সিটে বরেনবাবুকে নিয়ে ছিলেন কি করে'?

—তার কথা আর বলবেন না। নতুন বিয়ে করেছে, তা'ও বিয়ে করেছে কিনা বড়লোকের মেয়ে। সে এক লম্বা হিষ্ট্রি, মশাই। বসে'-বসে' আদ্যোপান্ত তুমি তার বিবরণ শোনো। সে এক প্রাণান্তকর পরিশ্রম। সাধে কি আর বলে মশাই, ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি?

—আদ্যোপান্ত না হোক্, ম্যানেজারের গলাটা ঈষৎ লালায়িত হ'য়ে উঠলো: চুম্বকটাই না-হয় শুনলুম।

বিরক্তিতে বলে' ফেললুম আগাগোড়া, হয়তো বা অনুপস্থিত বরেনবাবুর উপরই প্রতিশোধ নিতে; বিয়ে করেছে এক চোখ-ঝলসানো বড়োলোকের মেয়ে, মাটিতে না দাঁড়িয়ে যে মখমলের ওপর পা রাখে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সে ঘর করতে রাজি নয়, যে-স্বামী পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি বাড়ি-ভাড়া দিতে পারবে না, দরকার হ'লে যে-বাড়িতে গিয়ে তার উনুন ধরিয়ে রান্না করতে হ'বে। স্বামীকে সে বললে: তার চেয়ে তুমি এখেনেই থাকো, আমার বাবার বাড়িতে, তেতালায় আমাদের জন্যে কেমন দক্ষিণ-খোলা ঘর, মেঝেটা আগাগোড়া কেমন রঙিন পাথরে ঢালাই করা। বরেনবাবুও পুরুষের বাচ্চা, স্ত্রীর খুরে দণ্ডবৎ হ'য়ে সটান সরে' পড়লেন, বললেন: 'রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, বাপ-মা'রে লয়ে থাকো।' সরে' পড়লেন মানে, এ-মেসে এসে চড়াও হ'লেন, চড়াও হ'লেন আমারই ঘাড়ে। বউকে ত্যাগ করে' এসেছেন বটে, কিন্তু তার জন্যে তাঁর স্নেহের আর অন্ত নেই। বসে'-বসে' শোনো সে সব তার বিস্তৃত কাহিনী। শোনো, কেমন সে সুন্দর, সাদা, মস্ত একটা রাজহাঁসের মতো, কেমন সে ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ না হ'লে কি আর নিজের স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে আসে না? জোরে হেসে উঠলুম; রাতের পর রাত সে এক নারকীয় অত্যাচার, মশাই। পুরুষের বাচ্চা হ'লে কী হ'বে, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা।

—তারপর আর উপায় না দেখে, ম্যানেজার শুকনো গলায় বললে,—সোজা শ্বশুর-বাড়ীতে, স্ত্রীর আঁচলের তলায় গিয়েই মুখ লুকোলেন নাকি?

—না, সেই দিকে দন্ত আছে ষোলো আনা। স্ত্রীকে ভালবাসেন মানে, স্ত্রীর বিচ্ছেদকেও ভালোবাসেন।

আরেকটা সিগারেট ধরালুম : আর উপায় না দেখে স্ত্রীই শেষকালে ফিরে এসেছে। সেই খবর পেয়ে—তখন দেখতেন যদি বরেনবাবুর চেহারা, মশা, শুকনো একটা ডালে যেন সবুজ আগুন লেগেছে—শূন্যের উপর দিয়ে হাউয়ের মতো বেরিয়ে গেলেন। বলে' গেলেন : যাবে কোথায়, আমাকে ফেলে সে কোথায় যাবে? সে এক আমার মর্ম্মান্তিক পরিচ্ছেদ গেছে, মশাই, ক'টা দিন আমাকে রীতিমতো রুগ্ন করে' তুলেছিলো। ভাবলুম, গেছে, আপদ গেছে, আজকের রাতটা অন্তত নিশ্চিন্তে পাশ ফিরতে পারবো। না, আপনাদের নিয়ে আর পারলুম না, আমাকেও এবার পথ দেখতে হ'বে।

—কিন্তু আপনার জন্যে তো আর দক্ষিণ-খোলা ঘর নেই, ম্যানেজার হাসিমুখে বললে,—আজকের রাতটা তো অন্তত আপনাকে এই গরিবের মেসেই কাটিয়ে দিতে হ'বে।

এমন সময় দরজার বাইরে জুতোর আওয়াজ শোনা গেলো। আধখানা বেরিয়ে গিয়ে ম্যানেজার ডাকলে : এই যে, আসুন, এই দিকে।

আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করলো, একটু দ্রুত অথচ দ্বিধাগ্রস্ত। শীর্ণতায় কেমন যেন অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেখাচ্ছে। সমস্ত মুখে সকাতর শুষ্কতা। বেশ-বাস অপরিচ্ছন্নই বলতে হয়, সার্টের ঝুলটা হাঁটু অবধি নেমে এসেছে, অথচ সেই অনুপাতে কোঁচার ঝুলটা পায়ের পাতার কাছে আলম্বিত হয় নি। মাথার চুল অত্যন্ত ছোট করে' ছাটা—সদ্য ছেঁটে এসেছে মনে হয় : পায়ে নতুন এক জোড়া স্যাণ্ডেল। সমস্ত পোষাকের সঙ্গে এতোটুকু সেটার ছন্দ মেলে না।

বয়েস ত্রিশ পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু এরি মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত্ত সে যেন কিছু কথা বলতে পারছে না।

ম্যানেজার বললে,—এই ঘর।

আগন্তুক চারদিকে একবার দ্রুত দৃষ্টি বুলালো; ক্লান্ত, ধূসর গলায় বললে,—না, মন্দ কী।

শূন্য তক্তপোষের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ম্যানেজার ফের বললে,—আর এইটে আপনার সিট।

—আর ঐটে বুঝি আপনার? লোকটা হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করলে, গলায় অযাচিত উৎসাহ এনে বললে,—ভালোই হ'লো। কথা বলবার লোক পেলুম।

বলা বাহুল্য আমি বিশেষ উৎসাহিত হ'তে পারলুম না। বরং আপাদমস্তক কুণ্ঠিত হ'য়ে অসাড় গলায় প্রশ্ন করলুম : আচ্ছা, আপনাকে আমি কোথায় দেখেছি বলতে পারেন?

আগন্তুক বিস্ময়ে একেবারে শুকিয়ে গেলো : আমাকে?

—হাঁ, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

লোকটা অদ্ভুত হেসে উঠলো : পাগল! আমাকে দেখবেন কোথায়!

—না, কোথায় যেন দেখেছি। ব্যস্ত হ'য়ে মনের অন্ধকার ঘাঁটতে লাগলুম : ট্রেণের কামরায়, না পার্কের বেঞ্চিতে, না কোনো বিয়ের নেমন্তন্নে—বলুন না কোথায়? একেকটা মুখ এমন মনে থাকে। বলুন না—

আগন্তুক বিরক্ত মুখে বললে,—বা রে, আপনাকে আমি দেখে থাকলে তো বলবো?

—কিছু মনে করবেন না, এক পা এগিয়ে এলুম : আচ্ছা, আপনার নাম, আপনার নাম কি—

—আমার নাম?

—হ্যাঁ, আপনার নাম কি—

লোকটা উঁচু গলায় বিশীর্ণ হেসে উঠলো : নাম—নাম তো মানুষের কতোই হ'তে পারে। ধরুন না, রামতারণ, সতীশচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, অরুণকুমার—শুধু নামেই মানুষকে চেনা যায় নাকি?

—হ্যাঁ, বিভূতি, বিভূতি।

—আশ্চর্য্য, কী করে' জানলেন?

বললুম,—আপনি আমার পাশে একদিন বায়স্কোপে বসেছিলেন—এতোক্ষণে ঠিক মনে পড়েছে—পিকচার-প্যালেসে। আপনার ও-পাশে বসেছিলেন একটি মহিলা। তাঁকে আপনাকে যেন বিভূতি বলে' ডাকতে শুনেছিলুম।

—ভুল শুনেছিলেন। আগন্তুক স্মিতহাস্যে বললে,—ম্যানেজার মশাইকে জিগগেস করুন, আমার নাম শ্রীসহায়রাম খাস্তগির। বোর্ডের খাতায় এই মাত্র মোটা অক্ষরে সই করে' আসছি।

—কী বললেন? সহায়রাম?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভালো করে' মুখস্থ করে' রাখুন—এমন বিদঘুটে নাম, যে আমারই কেমন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কী করবো বলুন, বাপ-মায়ের অত্যাচার। আর কিছু

দিতে না পারুন, অসহায় শিশুকে একটা নাম দিয়ে যেতে পারেন।

লজ্জিত হ'য়ে বললুম,—মাপ করবেন। কিন্তু বলতে কি, ঠিক আপনার মতো চেহারা।

—আমিও তো সেদিন আপনার মতো চেহারার একজনকে মোটরের তলায় সটান মরে' যেতে দেখলুম। তাই বলে', কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কি আমি তার ভূত বলে' সম্ভাষণ করতে পারি? না সেইটেই খুব ভদ্রতা হয়? সহায়রাম পশ্চিমের জানলা পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলো: আরে মশাই, বিভূতি নামে তো কোনো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু সেই নাম ধরে' ডাকবার তেমন লোক কোথায়?

—যাক গে। ম্যানেজার হঠাৎ আমাদের মাঝখানে নিজেকে নিক্ষেপ করলো; বললে,—কিন্তু সহায়রামবাবু, আপনার জিনিষ-পত্র সব কোথায়?

—পরে আসছে।

—পরে আসছে—কিন্তু আপনি শোবেন কোথায়?

—কেন, এই ঘরে। চঞ্চলতায় সহায়রামের দু' চোখ ধারালো হ'য়ে উঠলো।

—আপনার বিছানা?

—আমার তো আজ একেবারে ফুলশয্যা কিনা। সহায়রাম খালি তক্তপোষটার উপর বসে' পড়লো: এই তো চমৎকার তক্তপোষ। এতে এক রাত দিব্যি গড়িয়ে নিতে পারবো। কাল ভোরেই সব জোগাড় হ'য়ে যাবে।

ম্যানেজার বললে,—আপনার রাতের খাবার?

আঙুল ঢুকিয়ে কোমরের কসিটা দিতে-দিতে সহায়রাম বললে,—ব্যস্ত হ'বেন না, আমি খেয়ে এসেছি। বিয়ের নেমন্তন্ন ছিলো মশাই। সহায়রাম দস্তরমতো একটা ঢেঁকুর তুললো: আপনার?

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বললুম,—আমার হ'য়ে গিয়েছে।

—ভালো, এখন তবে ঘুমোবার পালা। ভরা পেটে শরীর একেবারে ভেঙে পড়ছে। একবার তেমন করে' ঘুমিয়ে পড়তে পারলে এটা কাঠ না গদি কিছুই মশায় খেয়াল থাকবে না। সহায়রাম ম্যানেজারকে ইসারা করলো: আপনি যেতে পারেন, আমার কিছু আর লাগবে বলে' তো মনে হচ্ছে না।

ম্যানেজার আমার দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করে' প্রস্থান করলো।

আর সিঁড়িতে তার জুতোর শব্দও হয়তো সুরু হয় নি, সহায়রাম তক্তপোষ থেকে উঠে পড়ে' আস্তে দরজাটা বন্ধ করে' দিলো।

বলতে কি, সেই মুহূর্ত্তে, সহায়রাম যখন পিছন ফিরে নিঃশব্দ হাতে দরজায় খিল দিচ্ছে, আমার পায়ের দিকে কেমন একটা ঠাণ্ডা ভয় করতে লাগলো। নামহীন, নিরবয়ব ভয়। তার ঘাড়টা কেমন ঢিলে, কেমন না-জানি লম্বা, বিশীর্ণ দেখাচ্ছে। কাঁধের মাঝখানে যেন কেমন আঁট হ'য়ে বসে নি।

সহায়রাম তক্তপোষের দিকে সরে' এসে সাদা, শুকনো মুখে বললে,—ঘরে জল আছে?

জানলার উপরের কুঁজোটা দেখিয়ে দিলুম।

সহায়রাম নিচু হ'য়ে গ্লাশে করে' জল গড়াতে বসলো। সমস্ত মুখ তৃপ্তিতে নিটোল করে' বললে,—রাজ্যের যা সব গিলে এসেছি মশাই, এখন কেবল বারে-বারে জল খেতে হ'বে। আপনি আমার মুখের দিকে অতো তাকিয়ে আছেন কী?

অল্প একটু হেসে বললুম,—খুব বেশি খেয়ে এসেছেন বলে' তো মনে হচ্ছে না।

—পান, শেষ পর্য্যন্ত ভিড়ের মধ্যে গোলমালে একটাও পান পাই নি যে। গ্লাশের মাঝপথে সহায়রাম থেমে পড়লো: পান খেয়ে ঠোঁট দু'টো রাঙিয়ে এলেই বুঝি বিশ্বাস করতেন। নইলে বুঝি একেবারে ঠিক অনাহারীর মতো দেখাচ্ছে? হাসতে গিয়ে সহায়রামের প্রায় বিষম লাগার জোগাড়: দেখুন, বাইরে থেকে লোকে কতো কম বোঝে! পান খাই নি মানে নেমন্তন্নই খাই নি। যেন, সহায়রাম জল খেতে-খেতে গ্লাসের মধ্যে থেকে অদ্ভুত গলায় বললে,—যেন কোনো মেয়েকে পেলুম না বলে' তাকে আর ভালোবাসতেই পারলুম না।

সহায়রাম আরো এক গ্লাশ জল গড়ালো।

কিন্তু এবার খেতে নয়, হাত ধুতে।

ফালি-বারান্দাটার দিকে শ্লথ পায়ে এগিয়ে যেতে-যেতে সহায়রাম বললে,—হাতটা এমন বিশ্রী হ'য়ে আছে মশাই, সমস্ত গা ঘিনঘিন করছে। সাবান আছে আপনার?

তাকের উপর সাবানের বাটিটা তাকে দেখিয়ে দিলুম।

হাতের চেটোয় সাবানের তালটা নিষ্ঠুরের মতো চটকাতে-চটকাতে সহায়রাম বললে,—হাত দিয়ে খাওয়াটা এতো কদাকার যে কিছুতেই যেন পরিষ্কার হ'তে চায় না। বাঃ, হাতটা সে হঠাৎ নাকের নিচে নিয়ে এলো: বাঃ, আপনার সাবানটার তো বেশ গন্ধ। গা ভরে' মেখে স্নান করতে ইচ্ছে করছে।

—এতো কোথায় খেলেন মশাই?

—তা-ও সব আগাগোড়া খেতে পেলুম কই? বলছি, জলটা কোথায় ফেলবো?

— রাস্তায়ই ফেলুন না বারান্দা থেকে।

সহায়রাম যেন চমকে উঠলো: রাস্তায় যে লোক, মশাই। আচমকা কারুর গায়ে পড়লেই হয়েছে! শেষকালে একটা হল্লা বেধে যাক আর-কি।

বললুম,—এতো রাতে রাস্তায় লোক কোথায়? চারদিক তাকিয়ে, ফাঁকা দেখে—

—দরকার নেই। এই তো, ঘরেই তো একটা নর্দমা দেখা যাচ্ছে। সহায়রাম সেখানেই হাত ধুতে বসলো এবং তা অতি নিঃশব্দে: দেখতে-দেখতেই শুকিয়ে যাবে। কিছু মনে করবেন না।

ধোয়া শেষ করে' সহায়রাম কোঁচার খুঁটে হাত দু'টো হাড়ের মতো শুকনো করতে লাগলো! নখের ভেতরে এখনো যেন তার এঁটো লেগে আছে, বাঁ হাতটাও যেন এই সম্পর্কে কতো অপরাধী।

আমার কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ সেই শুকনো, শীর্ণ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, একটা সিগরেট দিতে পারেন?

পাখির মতো ঠোঁট করে' তার সিগরেট ধরাবার কায়দা দেখে না হেসে থাকতে পারলুম না। বললুম,—আপনি কোনো দিন সিগরেট খান বলে' তো মনে হয় না।

—তাই তো আজ একবার খেয়ে নিতে ইচ্ছে হ'লো। ভরা-পেটে সিগরেট খাওয়ার মতো নাকি সুখ নেই।

—ভরা-পেট? এই খানিক আগে বলছিলেন আগাগোড়া কিছু খেতে পান নি?

—কী করে' খাবো বলুন? সহায়রাম তক্তপোষের সঙ্গে হাত ঠুকে-ঠুকে সিগরেটের ছাই ঝাড়তে লাগলো: এদিকে যে কেলেঙ্কারি হ'য়ে গেলো, মশাই। বিয়ে-বাড়ির নেমন্তন্নটাই আজ পণ্ড হ'য়ে গেলো।

—বিয়ে-বাড়ি? পাঁজিতে আজ বিয়ে ছিলো নাকি?

—তবে এতোক্ষণ আপনাকে কী বলছিলুম? সিগরেটের ধোঁয়ায় সহায়রামের চোখ দু'টো কেমন নীল দেখালো: আজ বিয়ে ছিলো কিনা তাই আপনি জানেন না? আর এমন একটা বিয়ে!

গলায় একটা হতাশার টান দিয়ে বললুম,—কী করে' জানবো বলুন? থাকি মেসে, খোড়-বড়ি-খাড়ার জীবন, পাঁজিতে কবে বিয়ের দিন আসে বা যায়, কী করে' তার খবর পাবো?

—বলেন কী? সহায়রাম তার তক্তপোষে গিয়ে বসেছিলো, উৎসাহের ঢেউয়ে উঠে দাঁড়ালো: আজ যে বিয়ে তা জানতে পাঁজি উলটোতে হয় নাকি? চারিদিকে তাকিয়ে তা আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না? বিয়ে কি কেবল দু'টি মানুষেরই বিয়ে নাকি, তাতে সমস্ত রাত, এই কালো অন্ধকার রাতের কোনো অংশ নেই?

সহায়রাম ধীর পায়ে তাকের দিকে এগিয়ে গেলো। সাবানের বাটিটা হাতে নিয়ে চুমুক দেবার মতো করে' দীর্ঘ নিশ্বাসে সে তার আমর্মমূল ঘ্রাণ নিলে। বললে,—আপনার সাবানটার চমৎকার গন্ধ, বারে-বারে শুঁকতে ইচ্ছে করে। যেন কোন চেনা একটি দিন।

তার হাসিটা বিশেষ ভালো দেখালো না। অমন একটা কথার শেষে এমন একটা ভাসমান হাসি কেমন যেন অশরীরী, অবাস্তব মনে হ'লো।

উৎসুক হ'য়ে বললুম,—কিন্তু কেলেঙ্কারির কথা কী বলছিলেন? খেতে পেলেন না কেন?

—আর বলবেন না মশাই, সহায়রাম ফের তার তক্তপোষে ফিরে এসেছে: বিয়ের লগ্নের আর দেরি নেই, বর এসে গেছে, মাংস দিয়ে পোলাওটা সবে মেখেছি—অমনি বাড়ির মধ্যে থেকে তুমুল একটা সোরগোল উঠে গেলো। সহায়রামের গলায় এতোটুকু একটা ভাঁজ পড়লো না: সে মশাই এক বিরাট অধ্যায়। এখানকার লোক ওখানে পড়ছে ছিটিয়ে, খাবার দাবার ছত্রখান, কান্নাকাটি, হৈ চৈ, চোখে-মুখে পালাবার কেউ পথ খুঁজে পায় না। দেখুন না, হোঁচট খেয়ে পায়ের এই নোখটা আমার কেমন থেঁৎলে গেছে।

—কেন, কী ব্যাপার? গল্পের গন্ধ পেয়ে বিছানায় গিয়ে গ্যাঁট হ'য়ে বসলুম।

—কনে নেই।

এতোটা কথনো আশা করি নি। বিছানার ধারে অলক্ষ্যে এগিয়ে এসে বললুম, - কেন, কনের কী হ'লো?

—কী হ'লো তা কে জানে? এতোক্ষণে সহায়রামের যেন পায়ের নোখের কথা মনে পড়েছে, তার উপর হাতের আঙুল বুলোতে-বুলোতে যন্ত্রণাবিদ্ধ মুখে সে বললে,—কনেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—বলেন কী, মশাই? এ যে রাত-দুপুরে রূপকথা শোনাচ্ছেন! শেষকালে বিয়ের সভা থেকে কনে চুরি হ'য়ে গেলো?

—সভা কোথায়? নখের থেকে আঙুলে কিছু লাগলো কিনা তাই সূক্ষ্ম চোখে পর্য্যবেক্ষণ করতে-করতে সহায়রাম বললে,—কনে তখনো ঘরে বসে' সাজছে।

—সাজুক, তাই বলে' এতো লোকের সামনে থেকে সে চুরি হ'য়ে যাবে?

—অতো বড়ো মেয়েকে দুই হাতে কুড়িয়ে নিয়ে কে চুরি করবে, মশাই, বাঙলা-দেশে এতো বড়ো বীর আপনি কা'কে দেখলেন? পশুরা হাসতে জানে না, কিন্তু এখনকার এই হাসিতে সহায়রামকে কেমন পাশবিক দেখালো: কনে নিজে থেকেই কোথায় পালিয়ে গেছে।

বিস্ময়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেলুম: পালিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, তাই তো সবাই বলাবলি করছিলো। সহায়রাম কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আবার তার হাত ধুলো, বললে,—শুনলুম, নতুন লাল বেনারসি পরে', মাথার ওপর আধখানা ঘোমটা তুলে, কনে নাকি এই খানিক আগে ওদিককার কোন ঘরের মধ্যে চুপ করে' বসে' ছিল। শুনলুম, তখনো নাকি তাকে সাজানো শেষ হয় নি। তবু, কপালে নাকি তার চন্দন দিয়েছে লেপে, লাজুক চোখের কোল ভরে' কাজলের রেখা, অলস দু'টি হাতে সমস্ত পৃথিবীর নম্রতা, বসে' আছে যেন কোন সে অতিথির প্রতীক্ষায়। এই খানিক আগেও নাকি সে বসে' ছিলো, বাজছে সানাই, জ্বলছে আলো, খেতে বসেছে বরযাত্রীরা, হায়, চক্ষের নিমেষে কনেকে আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেই বেনারসি পরে', লাল, রক্তের মতো লাল সেই বেনারসি পরে'ই কনে গেছে পালিয়ে।

—পালিয়ে গেছে, বলছেন কী! কোথায় সে পালিয়ে যাবে?

—যে পালায়, সহায়রাম হাসবার চেষ্টা করলো: পালাতে যে জানে, সংসারে তার আর পথের ভাবনা!

– তাকে তারপর খুঁজে পাওয়া গেলো না?

—আপনাকে তবে বলছিলুম কী! হাট-হদ্দ তন্ন-তন্ন করে' খোঁজা হ'লো, বাড়ির চৌবাচ্চাটা পর্য্যন্ত, কিন্তু কোথাও মেয়ের দেখা নেই। চুলের ফিতেটি পর্য্যন্ত নয়।

—এ যে মশাই উপন্যাসের মতো লাগছে। অবাক হ'য়ে গেলুম: কিন্তু কেন পালিয়ে গেছে বলতে পারেন?

—কে না বলতে পারে মশাই? সহায়রাম একটা ভ্রূকুটি করলো।

—তার মানে?

—মানেটা তো অত্যন্ত পরিষ্কার। সেই মেয়ের যে একজন প্রেমিক ছিলো। এটা বুঝতে পাচ্ছেন না?

– প্রেমিক ছিলো?

—তাই তো সবাই বলাবলি করছিলো শুনছিলাম। সহায়রামের গলা হঠাৎ কেমন স্তিমিত হ'য়ে এলো: আমি অবিশ্যি কিছু স্পষ্ট করে' জানি না মশাই, তবে এখানে-ওখানে চাপা গলায় যা ফিসফিসানি শুনছিলাম—

—কি?

—সেই মেয়েটির প্রেমিক নাকি আজ বিয়ের রাতে হঠাৎ তার সাজঘরের সামনে এসে উপস্থিত—একেবারে সশরীরে। একটি কথাও নাকি সে বললেনা, শুধু মেয়েটিকে ইসারা করলে।

—আর মেয়েটি অমনি সোজা বেরিয়ে গেলো?

—তাই তো সবাই বলছে। সহায়রাম নির্লিপ্ততায় ধূসর হ'য়ে এলো: তেমন করে' ডাকতে পারলে সব ছেড়ে-ছুড়ে সোজা অমনি বেরিয়ে না পড়ে' উপায় কী বলুন?

—এ যে মশাই, ভীষণ প্রেম।

—বেঁচে থেকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। নইলে ভাবুন, বিয়ের সব ঠিকঠাক, কয়েক মিনিট পরে' লগ্ন সুরু হ'বে, বর এসে গেছে সভায়—আশ্চর্য্য, চোখের পলকে সব, সব মেয়েটি ভুলে গেলো। যাকে সে ভালোবাসতো, এতোদিন ধরে' ভালোবাসতো, যেই সে তার আজ সামনে এসে দাঁড়ালো, মেয়েটি আর তাকে ফিরিয়ে দিতে পারলো·

না। সহায়রাম উঠে পড়ে' ক্লান্ত পায়ে একটু পাইচারি করলে: তেমন করে দাঁড়াতে পারলে ফিরিয়ে দেয় তার সাধ্য কী!

—তারপর দু'জন তারা পাশাপাশি বেরিয়ে গেলো? কেউ তাদের ধরতে পারলো না!

—দু'জন—দু'জন না-ও হ'তে পারে। হয়তো প্রেমিকের আবির্ভাবের কথাটা একেবারে মিথ্যে। হয়তো মেয়েটিই একা চলে' গেছে, জানলার কাছেকার অন্ধকারে সহায়রামকে কেমন অদ্ভুত দেখালো: কে জানে, কেবল মেয়েটিই সেখানে নেই।

—আর বর? তার কী হ'লো?

সহায়রাম জানলার অন্ধকার থেকে সরে' এলো না। বললে,—মেয়ের কী হ'লো তার ঠিক নেই, কোথাকার কে বরকে নিয়ে ভাবনা?

আমার কিন্তু বেচারা বরের উপরেই বেশি মায়া হচ্ছিলো। বললুম,—এতোই যখন প্রেম, তখন ঠাট করে' সে-মেয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলো কেন?

—মেয়েদের কথা আর কিছু বলবেন না মশাই। কোন্‌টা যে তাদের বিয়ে আর কোন্‌টা যে তাদের ভালোবাসা, এ কথা তাদের কে বোঝায়! যখনকার যা তখনকার তাই। আদ্ধেক প্রেম আর আদ্ধেক প্রবঞ্চনা দিয়ে তারা তৈরি।

—কিন্তু এ-মেয়ের সম্বন্ধে আপনি সে-কথা বলতে পারেন না। এ মেয়ে প্রেমের জন্যে—

শীতের হাওয়ার মতো সহায়রাম হঠাৎ হেসে উঠলো। বললে,—এ-মেয়ে প্রেমের জন্যে আমাদের এই চমৎকার ভোজটা মাটি করে' দিলে।

—কিন্তু প্রেমের জগতে উজ্জ্বল একটা দৃষ্টান্ত রেখে গেলো বলতে হ'বে। গলায় আমার হয়তো উষ্ণ একটি চঞ্চলতা ফুটে উঠলো: এদের বাড়িটা কোথায়?

সহায়রাম আস্তে-আস্তে আলোয় এসে দাঁড়ালো। বললে,—কেন?

—কাছাকাছি হ'লে একবার গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসতুম।

—কিসের?

—মেয়েটিকে সত্যি পাওয়া গেলো কিনা?

—পাওয়া গেলে আপনার কী লাভ? সহায়রাম আমার দিকে কি রকম করে' যে তাকালো বলতে পারি না: তাকে পাওয়া যাক তাই আপনি চান নাকি?

—না, তা হয়তো চাই না, আমতা-আমতা করে' বললুম, —কিন্তু ধরা তো একদিন পড়বেই। বাড়ির লোকেরা কি আর পুলিশে খবর দেয় নি ভেবেছেন?

সহায়রামের সমস্ত মুখ যেন এক ফুঁয়ে নিবে গেলো। বোবা গলায় বললে,—পুলিশ—পুলিশ এসে কী করবে? প্রেমের সে কী বোঝে জিগগেস করি?

—না, তবু—

—আর ধরা পড়লেই বা তাদের কী! তাদের প্রেমকে তো আর জেল খাটাতে পারবে না। তাদের এই অমরতাকে তো আর ফাঁসিকাঠে দিতে পারবে না ঝুলিয়ে।

—না, তাই তো, সম্ভব হ'লে, মেয়েটির একবার দেখা পেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

সহায়রাম বন্ধ ঘরের চারদিক একবার দ্রুত দৃষ্টিতে দেখে নিলো। পরে হঠাৎ আমার কাছে সরে' এসে গলা নামিয়ে বললে,—আপনি তো তাকে দেখেছেন।

—আমি? বিস্ময়ে আমার গলা থেকে প্রায় একটা আর্ত্তনাদ বেরিয়ে এলো: আমি তাকে দেখলুম কোথায়?

গলাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে' সহায়রাম বললে,—সেই পিকচার-প্যালেসে। মনে নেই?

সহায়রামের বাঁ-হাতটা আমি প্রাণপণে চেপে ধরলুম—সাদা, শুকনো সেই হাত: পিকচার-প্যালেসে? তবে, আপনি—আপনার নাম বিভূতি?

—পাগল! প্রেতায়িত গলায় সহায়রাম হঠাৎ হেসে উঠলো: তাকে দেখেছেন বলে' আমার নাম বিভূতি হ'তে যাবে কেন? তাকে দেখেছেন মানে, সেই ছবিঘরের নিভৃত অন্ধকারে বসে' আপনি এক অবিনশ্বর পুরুষের পাশে এক অবিনশ্বর প্রেয়সীকে দেখেছিলেন। কী আসে-যায় তাদের নামে, তাদের পরিচয়ে? সহায়রাম আবার আমার কাছে ঘন হ'য়ে দাঁড়ালো: সেদিন আপনি দেখেন নি—দেখেন নি সেই মেয়ের মুখ? সেদিন দেখেন নি আপনি প্রেম? সেই প্রেম—সেই মেয়ে।

অভিভূতের মতো বললুম,—অন্ধকারে ভালো করে' আর দেখতে পেলুম কই?

সহায়রাম ক্লান্তিতে রাশীভূত হ'য়ে আমার বিছানার উপর বসে' পড়লো। বললে,—সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখাই তাকে সত্যি করে' দেখা। সেদিন সে কী সাড়ি পরেছিলো বলে' আপনার মনে হয় ?

—সাদা।

—তার পবিত্রতার মতো। তার আজকের সাড়িটা লাল, রক্তের মতো কলুষিত। মাথার চুল কি-ভাবে বাঁধা ছিলো কিছু মনে করতে পারেন ?

—পিঠের ওপর দীর্ঘ একটা বেণী ছিল বোধহয়।

—তার মুক্তির প্রখরতা। আজ সেই বেণী খোঁপায় উঠেছে উদ্ধত হ'য়ে। তার দম্ভ, তার পরিস্ফীতি। সহায়রামের সমস্ত শরীরে যেন ঘুম নেমে আসছে: আর তার আঁচল ? কাঁধের উপর খসে পড়া এলোমেলো তার সেই আঁচলের ভার ?

—হাওয়ায় উড়ছিলো হয়তো।

—যেন কোন পাখির উদাস পাখা-মেলে-দেয়া। বনের ফাঁকে-ফাঁকে নীল আকাশের টুকরো। আজ সেই আঁচল বিস্মৃতির মতো উঠেছে রাশীভূত হ'য়ে। সেই আঁচল আজ দেয়ালের দুর্ভেদ্যতা দিয়ে তৈরি। সহায়রাম শোবার একটা আধখানা ভঙ্গি করলে: আর চারদিকের আব-হাওয়াটার কথা আপনার মনে পড়ে ?

—আবহাওয়া ? হ্যাঁ, চারদিক ছিলো স্তব্ধ।

—হ্যাঁ, চারদিক ছিলো স্তব্ধ, সহায়রাম নয়, যেন ঘরের দেয়াল কথা কইলো: মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। সে-স্তব্ধতা আজ আপনি শুনতে পাচ্ছেন ?

চুপ করে' রইলুম।

—সেদিন তার কথা কইবার কোনো দরকার হয় নি, তবু তাকে আপনি বুঝেছিলেন। আজ তার অনেক কথা, অনেক হাসি, অনেক বিকীরণ। আজ আর নেই সেই অন্ধকার, আত্মার অতল সেই অন্ধকার। তাকে আজ আপনি কী দেখবেন, তার মাঝে দেখার আর কী আছে ?

উত্তেজিত হ'য়ে বললুম,—কিন্তু সে-মেয়ে তো শেষ পর্য্যন্ত সব ফেলে-ছড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বললেন! তার বিয়ে তো শেষ পর্য্যন্ত হ'লো না! কোথায়, সহায়রামের গায়ে অসহিষ্ণু একটা ঠেলা দিলুম: তাকে তবে কোথায় ফেলে রেখে এলেন ?

—তাকে ফেলে রেখে এলুম ? সহায়রাম যেন ধাক্কা খেয়ে মেঝের উপর ছিটকে পড়লো: আমাকে দেখে তাই আপনার মনে হয় ? তাকে আমি ফেলে রেখে একা চলে' আসতে পারি ?

—সে তবে কোথায় ?

—আসছে, পরে আসছে। সহায়রাম টলতে-টলতে পশ্চিমের জানলার কাছে সরে' গেলো: ব্যস্ত হ'বেন না, নির্বিঘ্নে ঠিক সে এখানে এসে যাবে।

—কোথায় এসে যাবে ?

—কোথায় আবার! আমি যেখানে আছি, আপাততো এই মেসে। সহায়রাম ধারালো দাঁতে মসৃণ হেসে উঠলো: আমাকে ফেলে কোথায় সে যাবে শুনি ? আমাকে ছাড়া তার জায়গা কোথায় ?

বিস্ময়ে একেবারে পাথর হ'য়ে গেলুম। বললুম,—আপনি এ-সব কী বলছেন পাগলের মতো ? কী হয়েছে সব খুলে বলুন আমাকে। রাত করে' তাকে আপনি কোথায় রেখে এলেন ?

—আপনি এতো বুঝতে পারলেন আর এ-কথাটা আপনার মাথায় ঢুকলো না ? সহায়রাম কুঁজোর থেকে গড়িয়ে নিয়ে আরেক গ্লাশ জল খেলো। তারপর মুখ মুছতে-মুছতে: বিয়ের পোষাকে সে তো এখন আর আমার সঙ্গ নিতে পারে না—আমার পোষাকটা যে অবরের মতো দু'জনেই ধরা পড়ে' যাবো যে। তাই, বুঝলেন না, সম্প্রতি তাকে এক বন্ধুর বাড়িতে রেখে এসেছি। সেখানে সে তার সেই লাল বেনারসিটা বদ্‌লে নেবে,—পরবে আবার সেই সাদা, উদাস একখানি সাড়ি—তার সেই বিষণ্ণ পবিত্রতা। তার উদ্ধত সেই খোঁপাটা ভেঙে ফেলে দিয়ে দীর্ঘ একটা সে বেণী বানিয়ে নেবে—তার মুক্তির লঘুতায়। গয়নাগুলি খুলে ফেলে হাত দু'খানি রিক্ততায় কোমল করে' তুলবে, উড়ন্ত আঁচলে আবার আনবে সে সেই আকাশের বিস্তার। তারপর সে এখানে আসবে, চুপি চুপি, মধ্যরাত্রির নিঃশব্দতার মতো, আমাকে ডেকে নিয়ে যেতে।

—এটা পুরুষের মেস, প্রায় ধমকে উঠলুম: এখানে সে আসবে কী ?

সহায়রামকে ভারি করুণ শোনালো: যদি সে আসে, যদি সে হঠাৎ এসেই পড়ে ধরুন, আপনি কি এই ঘরে তাকে একটু জায়গা দিতে পারবেন না ?

—ও! আজ আপনাদের এখানে বাসর হ'বে বুঝি? তা আমি ঐ বারান্দায় গিয়েই শুতে পারবো। মুখের হাসিটা মুছে নিয়ে বললুম,—কিন্তু রাতেই সে ঠিক আসবে জানেন?

সহায়রাম জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থেকে ম্লান গলায় বললে,–কী করে' বলি কখন সে আসবে, বা একেবারেই সে আসবে কিনা।

লোকটার সম্বন্ধে, এইবার, এতোক্ষণে সমস্ত আশা ছেড়ে দিতে হ'লো।

যাকে বলে স্বপ্নগ্রস্ত, ব্যর্থ একটা বিরহী। আগাগোড়া কবিতার পৃষ্ঠায় বিচরণ করছে। ভিতরে শুধু একটা ভ্যাপসা ভাবাকুলতার দুর্গন্ধ।

কোথাও নিশ্চয় একটা ঘা খেয়েছে বুঝলুম। মেয়ে-সংক্রান্ত আঘাত, সন্দেহ নেই, তাই তার এই দুর্ব্বল মেয়েলিপনা। অসুস্থ চিত্তবিকারে আপন মনে অসম্ভব প্রলাপ বকে' চলেছে। আর আমারো হয়েছে অদৃষ্ট, বসে'-বসে' কেবল অন্যের প্রেমোপাখ্যান শুনি। এ লোক না বিদেয় হয়, কালকেই আমি ঘর বদলাবো।

শোবার উদ্যোগ করতে-করতে বললুম—আপনি এখানে ক'দিন আছেন?

গলার স্বরে লোকটা চমকে উঠেছে টের পেলুম: কে ক'দিন এখানে আছে কী করে' বলা যায়?

– তবু?

– বলা যায় না। আজ হোক, কাল হোক, সে এলেই আমি চলে' যাবো।

—দেখুন, অপরিমাণ নিষ্ঠুর হ'য়ে বললুম,—বাজে বকবার আমার সময় নেই। আমি এখন ঘুমুবো।

– ঘুম, ঘুম আমারো পাচ্ছে বৈ কি।

– বেশ, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে তবে শুয়ে পড়ুন।

—আলোটা সত্যি নেবাতে হ'বে?

—নেবাতে হ'বে না? নইলে ঘুমুবো কী করে?

—কিন্তু আলো নেবালে সে কী করে' বুঝবে বলুন আমি তার জন্যে এখনো জেগে আছি এখানে? লোকটা হাসতে গিয়ে কেঁদে উঠলো কিনা বুঝতে পারলুম না: এই আলোই তো আমার ইসারা, এই আলো দেখেই তো সে আসবে।

রুখে উঠলুম: না, আপনি আলো নেবান।

—নেবাচ্ছি, তার আগে আরেক্ গ্লাশ জল খেয়ে নিই।

—হ্যাঁ, তারপর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুম দিন। ঘরের অন্ধকারে দেয়ালের দিকে চেয়ে আজকের রাতের সমস্ত বিরহীকে সম্বোধন করে' বলে' উঠলুম: তুচ্ছ কে-একটা মেয়ে আপনার প্রেম উপেক্ষা করেছে বলে' আপনি কিনা শোবার জন্যে সামান্য একটা বিছানা পর্য্যন্ত নিয়ে আসেন নি? তার জন্যে কিনা আলো জ্বালিয়ে বসে' আছেন?

—না, আর আলো কোথায়? বাতাসে লোকটার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলুম: এখন অন্ধকার—সেই অন্ধকার। যে-অন্ধকারে আপনি একদিন তাকে দেখেছিলেন।

—ভয় নেই, কালকের রোদে এই অন্ধকার গলে' যাবে। মিনতি করে' বললুম,—আপনি এখন দয়া করে' চুপ করুন। আমাকে ঘুমুতে দিন।

—আমি চুপ করলেই তো আবার সেই স্তব্ধতা। যে-স্তব্ধতায় সে একদিন আপনারো কাছে উচ্চারিত হ'য়ে উঠেছিলো।

অতএব নিজেকেই চুপ করে' যেতে হ'লো।

লক্ষ্য করলুম, লোকটা এখনো শুতে যায় নি। ঘরের মধ্যে দীর্ঘ পায়ে পাইচারি করছে।

বিরক্তিতে কঠিন হ'য়ে ঝলসে উঠলুম: বিভূতিবাবু!

আর অমনি, উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে, লোকটা হঠাৎ আলো জেলে দিলো।

—এ কী, আলো জ্বালালেন যে?

ভীত, বিবর্ণ গলায় লোকটাকে ভীষণ অপরিচিত মনে হ'লো: কে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে পড়লো না?

· কে আবার?

—কে কা'কে ডেকে উঠলো না নাম ধরে'?

—কই? আমিই তো আপনাকে ডাকলুম।

—আপনি? লোকটা নয়, তার বুকের ক'খানা পাঁজর একসঙ্গে হেসে উঠলো।

গম্ভীর হ'য়ে বললুম,–দেখুন বিভূতিবাবু, আপনি যদি এমনি করে' আমাকে ঘুমুতে না দেন, আমি এক্ষুনি গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দেবো।

—বিভূতি, বিভূতিবাবু—আপনাকে একটা কী মজার গল্পই যে বলেছি। লোকটা হাসিতে একেবারে উথলে উঠলো: কোথাকার কে-একটা মেয়ে, আর তার মুখে

কী একটা কা'র হতভাগ্য নাম! আর মাঝখান থেকে আপনারই আসছে না ঘুম। একেই বলে চমৎকার! না, ভয় নেই, আলো নেবাচ্ছি, আপনি ঘুমোন।

লোকটার হাসির সঙ্গে-সঙ্গে আলোটাও গেলো নিবে।

আতঙ্কিত, দীর্ঘ স্তব্ধতা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম হয়তো। হঠাৎ পাশ ফিরতে আমার পায়ের কাছে একতাল মাংস ঠেকলো, শক্ত, ঠাণ্ডা, স্তূপীভূত, একতাল মানুষের মাংস। চীৎকার করে' উঠলুম: কে?

সেই একতাল মাংস আমাকে যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরলো। অন্ধকারে মৃত, মলিন গলায় বললে,—আমি—আমি বিভূতি।

প্রবল আক্রোশে সেই আকর্ষণ ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। বললুম,—এ কী, আপনি—আপনি আমার বিছানায় উঠে এসেছেন কেন?

—ভীষণ, আমার ভীষণ ভয় করছে।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বেলে দিলুম। প্রবল একটা অট্টহাস্যের মতো সেই আলো ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে পড়লো।

—এ কী, আপনার কী হয়েছে?

—আমি ঘুমুতে পারছি না।

সত্যি, এমন ভয়ে-পাওয়া, উন্মত্ত দৃষ্টি আমি কখনো দেখি নি। আমার নিজেরই কেমন একটা ঠাণ্ডা ভয় করতে লাগলো। কাঠের মতো রূঢ় শুকনো গলায় বললুম, ঘুমুতে পারছেন না তো আমি কী করবো? তাই বলে' সটান আমার বিছানায় উঠে আসবেন নাকি? কোন্ দেশী ভদ্রলোক আপনি?

—কিছু মনে করবেন না, লোকটার সমস্ত মুখ ভয়ে জ্বলে' উঠেছে: হাত বাড়িয়ে আশে-পাশে একটা জীবন্ত লোকের ছোঁয়া পেতে ইচ্ছে করছিলো। জীবন্ত একটা ছোঁয়া পেলেই আর কোনো ভয় থাকে না।

—ভয়, আপনার ভয় কিসের?

লোকটা হেসে উঠলো, সেই হাসিতে শুধু হাসি ছাড়া তার মুখের আর কিছু দেখা গেল না। বললে,—ঘুম আসছিলো না যে।

লোকটা হয় পাগল, নয় নেশা করেছে।

—ঘুম আসছিলো না যে?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়তে পারলে আর ভয় কিসের? লোকটা আমার দিকে মিনতি করে' চাইলো: আপনার পাশ ঘেঁসে একটু শুলে কি এক রাতে আপনার খুব অসুবিধে হ'বে?

—কিন্তু আপনার ঘুমই বা আসছে না কেন?

—আমার কেবলই মনে হচ্ছে কী জানেন, লোকটা একবার চারদিক দেখে নিলো: সে এসেছে।

আমার মেরুদণ্ডটা সিরসির করে' উঠলো: কোথায়?

—মনে হ'লো যেন এই ঘরে। তাকে আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কী আশ্চর্য্য, এতোটুকু যেন তার তর সইছে না, লোকটা উদ্ভ্রান্তের মতো এখানে-ওখানে তাকাতে লাগলো: লাল, লাল সেই বেনারসিটা পর্য্যন্ত সে ছেড়ে আসতে পারে নি। অন্ধকারে আমি স্পষ্ট তার সেই লাল সাড়িটা উড়তে দেখলুম।

—আপনি স্বপ্ন দেখছিলেন। লোকটার উপর পুরো-পুরি রাগ করতে পারলুম না, বললুম—এতো রাতে কে আবার এখানে আসবে?

—তবু, কেউ আসছে—এ-কথা আপনার আজ মনে হচ্ছে না? ঐ দেখুন, শুনতে পাচ্ছেন না আপনি, কে কড়া নাড়ছে দরজার?

—কোথায়? হাওয়া খানিকটা।

—আমাকে কেউ ডাকছে না বাইরে থেকে?

—কই? একটা মোটর।

—আপনি একবার যাবেন নিচে, নিচেটা একবার দেখে আসবেন? আমার শুধু ভয় হচ্ছে সে এসে না শেষকালে ফিরে যায়। হয়তো, কে জানে, দরজার বাইরে সে আমার জন্যে চুপ করে' বসে' আছে কখন থেকে।

—আপনি পাগল হয়েছেন? বন্ধুতায় তার দিকে এবার এগিয়ে এলুম: যদি সে আসেও, কাল ভোরে আসবে। খানিক আগে আপনিই তো তা বলছিলেন।

—আমিই তা বলছিলুম, না? কিন্তু আপনার মনে হচ্ছে না, লোকটা হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হ'য়ে রইলো: আপনার মনে হচ্ছে না, এই অন্ধকারেই সে আমাকে খুঁজে ফিরছে দিকে-দিকে? সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারছে না এক মুহূর্ত্ত। না, আমি যাবো, লোকটা

হঠাৎ বিছানা থেকে উঠে পড়লো: আমি তাকে কোথায় ফেলে রেখে এসেছি?

—যাবেন তো, কাল ভোরে যাবেন, তাকে ধরে' ফেললুম: এখন আপনি শুয়ে পড়ুন, ঘুমোন আমার বিছানায়। আমি না-হয় আপনার শিয়রে বসে' হাওয়া করে' দিচ্ছি।

লোকটার তবু বিছানায় ফিরে যাবার নাম নেই। ঘরের দরজাটা খুলে ফেলবার জন্যে সে আমার হাতের মুঠোয় ছটফট করতে লাগলো। বললে,—কে জানে, কাল ভোরে যদি সে না আসে? যদি সে আর পথ খুঁজে না পায়?

—সে না আসে তো আপনি যাবেন, আপনি পাবেন পথ খুঁজে। সে যদি বেরিয়েই এসে পড়তে পারে, তবে আর আপনার সঙ্গে মিলতে তার বাধা কী? মাঝখানে এই একটা তো মোটে রাত।

লোকটা তবু বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

বললুম,—আপনি চলুন আমার বিছানায়। আমি বসছি আপনার পাশে। ভয় কী?

লোকটার তবু সাড়া নেই।

কঠিন হ'য়ে বললুম,—দেখুন বিভূতিবাবু—

লোকটা হঠাৎ আমার হাত ছাড়িয়ে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়লো বিছানায়।

—এ আবার কী চেহারা!

—আপনাকে আজ কতো রকম গল্পই যে বললুম একধার থেকে? কেন, আমার সহায়রাম নামটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না? রাম, রাম, সহায়রাম—যে-নামে ভূত পালায়। বলে'ই আবার সে একটা ঢেউ তুললে।

—বা, আপনিই তো তখন আমার কানের কাছে এসে চুপিচুপি বললেন,—'আমি, আমি বিভূতি।'

—আমি? লোকটা প্রখর গলায় প্রতিবাদ করে' উঠলো: কক্‌খনো না।

—তবে কে? ভয়ে আমার গলায় আর কোনো আওয়াজ নেই।

—তা আমি কী জানি? হয়তো কোনো আত্মা।

—আত্মা?

—কে জানে হয়তো বা সেই মেয়ে।

—মেয়ে?

—হ্যাঁ, যার আজকে এখানে আসবার কথা। লোকটার হাসি আর বিরাম মানছে না: উঃ, শেষকালে আপনাকে একটা ভূতের গল্প পর্য্যন্ত শুনিয়ে দিলুম। নিন্, আলো নেবান, লোকটা দিব্যি আমার বিছানাতেই লম্বা হ'লো: এবারে সত্যি-সত্যি ঘুমুতে হয়।

বলা বাহুল্য, চেয়ারে বসে' বাকি রাত আর আমি এক ফোঁটাও ঘুমুতে পারি নি।

আর, কিছুই আশ্চর্য্য নয়, নরম বিছানা পেয়ে লোকটা বিভোর হ'য়ে ঘুমুচ্ছে।

রাত আর নেই, ভোরের ছোঁয়াচ লেগে অন্ধকার ফিকে হ'য়ে এসেছে, দরজার কড়াটা সত্যি-সত্যি এবার নড়ে' উঠলো। আর আমিই শুনলুম প্রথম। লোকটা, সমস্ত রাত যে এমনি একটা শব্দ শোনবার জন্যে কান পেতে ছিলো, তারই কিনা কোনো হুঁস নেই।

দরজাটা খুলে দিলুম। ম্যানেজার।

ঘরের মধ্যে একবার তাকিয়ে ম্যানেজার আমাকে বাইরের বারান্দায় ডেকে নিলো। গলা নামিয়ে বললে,—আপনি সত্যি বলেছিলেন ক্ষিতীনবাবু, লোকটার নাম বিভূতি।

—কেন, কী হ'লো?

—সমস্ত বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করেছে।

আপাদমস্তক পাংশু হ'য়ে গেলুম: পুলিশ?

—হ্যাঁ, তাকে, বিভূতিকে ওদের চাই।

—কেন, বিয়ের সভা থেকে মেয়ে চুরি করে' এনেছে নাকি?

—আপনাকে বলেছে বুঝি তাই? ম্যানেজারের চোখের উপরে কপালটা আর খুঁজে পাওয়া গেলো না: চুরি নয়, খুন।

—বলেন কী মশাই?

—হ্যাঁ, বিয়ের সেই কনেকে সে খুন করে' এসেছে।

—মিথ্যে কথা। বিভূতি নয়। বিভূতি যে তাকে ভীষণ ভালোবাসতো।

—ভালোবাসতো! এতো দুঃখেও ম্যানেজার হেসে উঠলো: কিন্তু, ঐ, ম্যানেজার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো: ঐ ওরা এসে পড়েছে বাড়ির মধ্যে।

আমি তাড়াতাড়ি, কী করবো কিছু হদিস না পেয়ে, সোজা আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ঘুমন্ত বিভূতির গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে বললুম,—উঠুন, উঠুন শিগ্‌গির।

—ভোর হয়েছে? বিভূতি আস্তে পাশ ফিরলো: হ্যাঁ, এই উঠি।

তার উঠে পড়বার আগেই পুলিশ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে সদলে।

—দেখুন কে এসেছে আপনার জন্যে।

বিভূতি গোলমাল শুনে চোখের ঘুম ঠেলে অস্পষ্ট করে' চাইলো। একটুও চমকালো না। অল্প একটু হেসে আমার দিকে বন্ধুর মতো একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে। শান্ত, স্নিগ্ধ গলায় বললে,—আমি বলি নি সে আসবে? আমি বলি নি আমাকে ছাড়া সে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারছে না?

বেদে বিজ্ঞানের কথা

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

(৪)

জল

(১) জলের মধ্যে অমৃত ও রোগনিবারক শক্তি আছে তজ্জন্য জলের সদ্ব্যবহার করিবে।

অপস্বন্তরমৃতমপ্সু-ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।

দেবা ভবত বাজিনঃ। ঋগ্বেদ—১।২৩।১৯

অন্বয়ঃ—অপ্সু অন্তঃ অমৃতম্, অপ্সু ভেষজম্, (অস্তি) অপাম্ উত প্রশস্তয়ে—দেবাঃ বাজিনঃ ভবত।

অন্বয়ার্থঃ—অপ্সু অন্তঃ=জলের ভিতর, অমৃতম্=অমৃত আছে, অপ্সু ভেষজম্=জলে রোগনিবারক শক্তি আছে (তজ্জন্য), অপাম্ উত প্রশস্তয়ে=জলেরই উত্তম ব্যবহার করিয়া, দেবাঃ=হে দেবগণ (ঋষিগণ), বাজিনঃ ভবতঃ=বলবান হও।

বঙ্গানুবাদঃ—জলের মধ্যে অমৃত ও রোগনিবারক শক্তি আছে, তজ্জন্য—হে ঋষিগণ (বিদ্বান্‌গণ) জলের সদ্ব্যবহার করিয়াই তোমরা শক্তিমান হও।

(২) নদীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে।

অপো দেবীরুপহ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ।

সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্ত্বং হবিঃ। ঋগ্বেদ—১।২৩।১৮

অন্বয়ঃ—অপঃ দেবীঃ উপহ্বয়ে—নঃ গাবঃ পিবন্তি সিন্ধুভ্যঃ হবিঃ কর্ত্ত্বং।

অন্বয়ার্থঃ—অপঃ দেবীঃ উপহ্বয়ে=জলদেবীকে আহ্বান করি, নঃ গাবঃ পিবন্তি=আমাদের গবাদি সকলে যাহা পান করে, সিন্ধুভ্যঃ হবিঃ কর্ত্ত্বম্=নদীর প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে।

বঙ্গানুবাদঃ—পবিত্র জলকে আমি অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহা পান করিয়া আমাদের গবাদি তৃষ্ণা নিবারণ করে। অতএব নদীকে রক্ষার জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা করিবে।

(কিন্তু হায় আজকাল আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিকাংশ নদীর জল নষ্ট হইয়া যাইতেছে—কেই বা উহা রক্ষার জন্য চেষ্টা করে। কেই বা বেদের আদেশ পালন করিতে চায়?)

(৩) জল সর্ব্ব রোগের চিকিৎসক। (Hydropathy)

অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভেষজা।

অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ॥

ঋগ্বেদ—১।২৩।২০

অন্বয়ঃ—সোমঃ মে অব্রবীৎ—অপ্সু অন্তঃ বিশ্বানি ভেজসা, অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্ অপঃ চ বিশ্বভেষজীঃ।

অন্বয়ার্থঃ—সোমঃ=অমৃতময় পরমাত্মা, মে অব্রবীৎ=আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, অপ্সু অন্তঃ=জলের মধ্যে, বিশ্বানি ভেষজা=সর্ব্ব ওষধি (বর্ত্তমান আছে), অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্=অগ্নিও সর্ব্বত্র কল্যাণকারী, আপঃ চ বিশ্ব ভেষজীঃ=জলও সর্ব্বরোগের চিকিৎসক।

বঙ্গানুবাদঃ—অমৃতময় পরমাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন—যে জলের মধ্যে সমস্ত ওষধি বিদ্যমান এবং অগ্নি সর্ব্বত্র কল্যাণকারী এবং জল সর্ব্বরোগের চিকিৎসক।

(অর্থাৎ—গরম জল ও শীতল জলের ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিবে)। আজকাল জল চিকিৎসায় নানাবিধ কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য হইতেছে। ইহাকে Hydropathy বলে।

(৪) নদীর নিকট সর্ব্বরোগের ঔষধ প্রার্থনা করা হইতেছে—

সিন্ধুপত্নীঃ সিন্ধুরাজ্ঞীঃ সর্ব্বা যা নদ্যঃ স্থন।

দত্ত নস্তস্য ভেষজং তেনাবোভুনজামহৈ॥

অথর্ব্ববেদ ৬।২৪।৩

অন্বয়ঃ—সিন্ধুপত্নীঃ—সিন্ধুরাজ্ঞীঃ যঃ সর্ব্বাঃ স্থল নঃ—তস্য ভেষজম্ দত্ত তেন বঃ ভুনজামহৈ।

অন্বয়ার্থঃ—সিন্ধুপত্নীঃ=সিন্ধুর পত্নী, সিন্ধুরাজ্ঞীঃ—সিন্ধুর রাণী, [অর্থাৎ সমুদ্র তোমাদের পালক ও রাজা] যাঃ সর্ব্বা নদ্য=যে সকল নদী আছে, নঃ=আমাদিগকে, তস্য ভেষজম্

সর্ব্ব রোগের ঔষধ, দত্ত=দাও, তেন=তোমাদের সহায়তায়, ভুনজামহৈ=ভোজনাদি করিব।

বঙ্গানুবাদ :—হে নদীসকল সমুদ্র তোমাদের পালক ও রাজা—তোমরা যত নদী আছ—সেই সেই নদীসকল—আমাদিগকে সর্ব্ববিধ রোগের ঔষধ দান কর। তোমাদের সহায়তায় আমরা ভোজ্য পদার্থ সকল উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে পারিব।

[সর্ব্ব সাধারণকে এই মন্ত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে—যদি সুস্থ শরীরে সম্যক্ আহারাদি করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে চাও—তবে নদীর নিকট প্রার্থনা কর—অর্থাৎ নদীর জল অপবিত্র না করিয়া পবিত্র জ্ঞানে দেবী সম্বোধন পূর্ব্বক জলপান কর—সর্ব্ববিধ রোগের হাত হইতে ত রক্ষা পাইবে, অপরন্তু ক্ষুধার সহিত অন্নাদি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।]

আর আমাদের গঙ্গা দেবীর জলে Septic Tank. সংযোগ করিয়া পবিত্রকে অপবিত্র করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পাটকল বড় না আমাদের জীবন বড় ?

(৫) উৎকৃষ্ট পানীয় জল আবশ্যক। তজ্জন্য নদীসকল পরিষ্কার রাখিবে। ও পবিত্র বলিয়া মনে রাখিবে।

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তুপীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ॥ যজুর্ব্বেদ ৩৬। ২

অন্বয় :—দেবী আপঃ অভিষ্টয়ে পীতয়ে নঃ ভবন্তু শম্ যোঃ নঃ অভি স্রবন্তু।

অন্বয়ার্থ :—দেবীঃ=দিব্য গুণযুক্ত, আপঃ=জল, অভিষ্টয়ে=অভীষ্ট কার্য্যের জন্য, পীতয়ে=পানের জন্য, নঃ=আমাদের প্রতি (কল্যাণকারিণী) ভবন্তু=হউক, শম্=রোগ নাশ করিয়া, যোঃ=ভয় দূর করিয়া, নঃ=আমাদের, অভি=নিকট, স্রবন্তু=প্রবাহিত হউক।

বঙ্গানুবাদ :—দিব্য গুণযুক্ত পানীয় জল অভীষ্ট কার্য্যের জন্য আমাদের প্রতি কল্যাণকারিণী হউক রোগ নাশ করিয়া এবং ভয় দূর করিয়া আমাদের নিকট প্রবাহিত হউক।

[অর্থাৎ জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে জল দেবী জ্ঞান করিয়া—যাহাতে পানীয় জল কোনরূপে অপবিত্র না হয়—সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। তাহা হইলেই তোমরা নীরোগী হইয়া স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইবে।]

কিন্তু পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীগুলি আজকাল সর্ব্ববিধ অপবিত্র দ্রব্যের আধার হইয়াছে—এমন কি পুষ্করিণী জলে বাহে প্রস্রাব করা, সর্ব্ব রোগের আধার রোগীর বিছানাদি সমস্ত ধৌত করা, এক কু-অভ্যাস জন্মিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসী মধ্যে কেহ বারণ করিলেও শুনে না, বরং গালাগালি দেয়। ফলে পল্লীগ্রামগুলি সর্ব্বব্যাধির আধার হইয়াছে। তাহার উপর আবার কচুরিপানা কে পরিষ্কার করিবে ?

(৬) স্নানের মন্ত্র—(অবগাহন স্নান বিশেষ উপকারী)

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তঃ মা সংসৃজ বর্চসা॥

ঋগ্বেদ ১।২৩।২৩

অন্বয় :—আপো অদ্য অনুচারিষং রসেন সমাগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তং মা বর্চসা সংসৃজ॥

অন্বয়ার্থ :—অদ্য আপো অনুচারিষং=অদ্য স্নান হেতু যে প্রবেশ করিতেছি। রসেন সম গস্মহি=জল রসে সঙ্গত হইয়াছি। পয়স্বানগ্ন আগহি=হে জলস্থিত অগ্নি তুমি আইস। তঃ মা বর্চসা সংসৃজ=তুমি আমাকে তেজ পূর্ণ কর।

বঙ্গানুবাদ :—অদ্য স্নান হেতু জলে প্রবেশ করিতেছি জল রসে সঙ্গত হইয়াছি—হে জলস্থিত অগ্নি আইস আমাকে তেজঃপূর্ণ কর। অবগাহন স্নানে শরীরের সমস্ত গ্লানি নষ্ট করে ও দেহের তেজ বৰ্দ্ধিত করে।

(৭) তবে যাহাতে নদী জলপূর্ণ থাকে—তজ্জন্য ভগবানের আরাধনা করাও চাই।

প্র সু মহে সুশরণায় মেধাং গিরং ভরে
নব্যসীং জায়মানাং।
চ আহনা দুহিতু র্বক্ষণাসু রূপামিনানো
অক্রুণোদিদং নঃ॥

ঋগ্বেদ ৫।৪২।১৩

বঙ্গানুবাদ :—আমি মহান্ ও রক্ষাকারী পরমাত্মাকে হৃদয়ের সহিত নূতন ও সদ্যোজাত স্তব প্রদান করিতেছি। তিনি তাঁহার কন্যা স্বরূপ পৃথিবীর হিতের নিমিত্ত নদী

সকলকে রূপবিধান করিয়া—এই বলে আমাদের ব্যবহারার্থ সম্পাদন করুন।

[প্রত্যেক কার্য্যেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা চাই। মানুষ ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু ভগবান উহা পূরণ করিবার একমাত্র মালিক। ইহা স্মরণ রাখিতে ভুলিও না। তাই আমাদের প্রার্থনা করিতে হইবে—যেন তিনি কৃপা করিয়া নদীগুলি জলপূর্ণ করতঃ স্রোতস্বিনী করিয়া দেন।]

(৮) মরুৎগণের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা—

উদীরয়থা মরুতঃ সমুদ্রতো যূয়ং
বৃষ্টিং বর্ষয়থা পুরীষিণঃ।
ন বো দস্রা উপ দস্যন্তি ধেনবঃ
শুভং যাতামনু রথা অবৃৎসত॥ ঋগ্বেদ ৫।৫৫।৫

বঙ্গানুবাদ :—হে মরুৎগণ—তোমরা অন্তরিক্ষ হইতে বারি বর্ষণ কর। হে জল সম্পন্ন! তোমরা বৃষ্টিপাত কর। হে শত্রুনাশকগণ! তোমাদের ধেনুরূপ মেঘ সকল - কখনও যেন শুষ্ক হয় না। সুন্দরভাবে গমনকারী মরুৎগণের রথ সকলও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে।

[অর্থাৎ—Man proposes, but God disposes

মানুষ করে আশা—
ঘটান জগদম্বা।

ইহা যেন হৃদয়ে সদাই জাগরিত থাকে। তবেই তোমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।]

(৯) কিন্তু জলদেবতাদ্বয়—মিত্র ও বরুণ—তাঁহারাই জল উৎপাদন করেন—ও জলের স্বামী - সুতরাং তাঁহাদের সেবা করা কর্ত্তব্য।

দিবি ক্ষয়ন্তা রাজসঃ পৃথিব্যাং
প্রবাং ঘৃতস্য নির্ণিজো দদীরম্।
হব্যাং নো মিত্রো অর্যমা সুজাতো
রাজা সুক্ষ তো বরুণো জুষন্ত। ঋগ্বেদ ৭।৬৪।১

বঙ্গানুবাদ :—হে মিত্র ও বরুণ! দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে তোমরা জলের স্বামী। তোমাদেরই উৎপাদিত মেঘ জলকে রূপ প্রদান করে। মিত্র সুজাতা অর্য্যমা এবং রাজা ও বলবান বরুণ আমাদের দত্ত হব্য সেবা করুন।

[অর্থাৎ ঋষিগণ অবগত ছিলেন যে মিত্র ও বরুণের সংযোগে জল উৎপন্ন হয় যেমন Hydrogen (উদজান) ও Oxygen (অম্লজান) উভয়ের সংযোগে জল উৎপন্ন হয়]

আমাদের শাস্ত্রে জলকে পঞ্চভূতের মধ্যে গণ্য করে বলিয়া অনেকের ধারণা যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা জল প্রস্তুত হয়, তাহা বেদের সময়ে কেহই জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু তাহা সত্য নহে—যেহেতু নিম্নলিখিত ঋক্ হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে সে সময়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপেই অবগত ছিলেন।

তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃতমন্ত্রে—

(১০) মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসং
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা। ঋগ্বেদ ১।২।৭

ইহার বঙ্গানুবাদে—আমাদের পূজনীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

"পবিত্র বল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে আমি আহ্বান করি। তাঁহারা ঘৃতাহুতি প্রদানরূপ কর্ম্ম সাধন করেন।

বলা বাহুল্য ইহা উক্ত ঋকের আধ্যাত্মিকভাব। কিন্তু এই শ্লোকের বস্তুগত ভাব গ্রহণ করিলে অন্যরূপে অনূদিত হয়।

এরূপ ভাব গ্রহণ ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই পণ্ডিতেরা স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদের ১ম।৩য় সূক্তে। ১০-১২ ঋকে যে সরস্বতীর বন্দনা আছে—ঐ বন্দনা বা স্তোত্র প্রথমতঃ—বাগ্‌দেবীপক্ষে অনূদিত হয়। অন্যদিকে —নদীপক্ষে (অন্যরূপ অনূদিত হয়।)

এ সম্বন্ধে যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবার ইচ্ছা আছে।

কেবল ঋগ্বেদ সংহিতায় কেন—আমাদের বাঙ্গালা ভাষার কবিগুরু ভারতচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁহার বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থেও সুন্দরের মুখ দিয়া ঐ রূপ দুই প্রকার ভাব সমন্বিত শ্লোকাদি রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন—

একটী—দেবীপক্ষে, অপরটী—বিদ্যাপক্ষে।

ঋগ্বেদের ১ম।২।৭ মন্ত্রের ব্যাখ্যা বস্তুগতভাবে দেখানতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। মন্ত্রটী পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে—তথাপি অন্যরূপ অনুবাদ দিবার সময় পুনরায় উদ্ধৃত করা দোষাবহ হইবে না। সে মন্ত্রটী এই—

মিত্রং হুবে পূতদক্ষং বরুণঞ্চ রিশাদসং
ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা।

এখানে জল পদার্থটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী বর্ণনা করা হইয়াছে।

যে দুইটী বস্তু যোজনা করিয়া জল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা এই—মিত্র ও বরুণ। এই দুইটীই Gas বাষ্প—উহাদের ইংরাজীতে Hydrogen and Oxygen বলে।

প্রথমে দেখা যাউক—"ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা।" ইহার অর্থ বস্তুগতভাবে কি হইতে পারে।

সায়ণাচার্য্য বলেন—

ঘৃতং অর্থে জল,

ঘৃতাচীং অর্থে বৃষ্টির জল, বাষ্পীয় জল,

ধিয়ঃ অর্থে বুদ্ধিঃ, জ্ঞানং বা

সাধন্তা = যাহা দ্বারা সাধিত হয়।

সুতরাং ধিয়ং ঘৃতাচীং সাধন্তা অর্থে—বুদ্ধিদ্বারা বাষ্পীয় জল উৎপন্ন করিতে হইলে [অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল উৎপন্ন করিতে হইলে,]

"মিত্রং বরুণং চ হুবে।"

Hydrogen + Oxygen = Water.

অর্থাৎ—

মিত্রং = উদ্জান = Hydrogen

বরুণং = অম্লজান = Oxygen

হুবে = আহ্বান করি। বা গ্রহণ করি।

এক্ষণে দেখা যাউক—মিত্রং শব্দের কি কি অর্থ হইতে পারে। সচরাচর দেখা যায় মিত্র অর্থে সঙ্গী।

মিত্র শব্দ—মি ধাতুর উত্তর ক্ত অথবা মিদ্ + ক্ত (মি) মিনোতিমানং করোতি—সুতরাং মিত্র অর্থে পরিমাপক সঙ্গী অর্থাৎ ইহা দ্বারা অন্যান্য পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়।

যেরূপ Hydrogen দ্বারা অন্যান্য স্থানের গুরুত্ব মাপা হয়—

সেইরূপ মিত্র দ্বারা আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মিত্র অর্থে সঙ্গী—সুতরাং ইহাতে প্রকাশিত হইতেছে, মিত্র বরুণের সঙ্গী। অর্থাৎ বরুণ জন্য মিত্রের বিশেষ আগ্রহ আছে।

বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন—Oxygen ও Hydrogenএর বিশেষ আগ্রহ অর্থাৎ Affinity আছে।

এরূপ অবস্থায় মিত্র ও উদজান শব্দ একার্থ বোধক হইল। উদান = যাহা অন্যকে উত্তোলন করিতে পারে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা লঘু।

তাহার পর বরুণ = বৃ ধাতু + উণন্ (বৃ = বরণ করা) অথবা গ্রহণ করা।

আমরা প্রাণ ধারণ জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহাই বরুণ (যেমন Oxygen)

এক্ষণে দেখা যাউক "মিত্রং" এই শব্দের কি বিশেষণ আছে—পূতদক্ষং। আর "বরুণং" শব্দের বিশেষণ রিশাদসং।

পূতদক্ষং—পূত = পবিত্র, শুদ্ধ বিমল

দক্ষঃতেজশক্তি বা তেজঃ সম্পন্নঃ

পূতদক্ষং—অর্থাৎ ব্যক্ত তেজোবিশিষ্ট। ইংরাজীতে (Kinetic Energy বিশিষ্ট বলা হয়)

আর "রিশাদসম্"—

রিশ = বধ করা—ক্ষয় করা—দাহ করা যেমন—

Oxygen—রক্তের মল বিনষ্ট করিয়া প্রাণদান করে।

অতএব উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইল—

যিনি জল প্রস্তুত করিতে ইচ্ছুক - তিনি পূতদক্ষং মিত্রং—Kinetic Energy বিশিষ্ট উত্তপ্ত Hydrogenকে রিশাদসংবরুণং—Oxydise করিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট Oxygen গ্যাসের সহিত যোজনা করিবেন। তাহা হইলে জল উৎপন্ন হইবে।

পাশ্চাত্য জগতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Cavendish ১৭৫১ খৃঃ এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন—ইহা সত্য।

আর আমাদের ঋগ্বেদ সংহিতায় ঐ প্রক্রিয়ার কথা কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উল্লিখিত আছে কে বলিবে ?

অনেকেরই ধারণা প্রাচ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা তত্ত্ব কেহই অবগত ছিল না—তাই তাহারা

"ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম্"

এই পাঁচটী ভূত আবিষ্কার করিয়াই নিশ্চিত হইয়া আছে।

ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায় Solid, Liquid, Energy (heat, light and electricity—Gas and Ether.

আবার উপনিষদ মতে

আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ—অদ্ভ্যপৃথিবী।

ঠিক সেইরূপ প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতেও Ether হইতেই ক্রমান্বয়ে matter and Energy প্রকাশিত হইয়াছে।

(১১) পরুচ্ছেপ ঋষিও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন

যুবো রিৎথাধি সদ্মস্ব পশ্যাম হিরণ্যয়ং
ধীভিশ্চন মনসা স্বেভিরক্ষভিঃ
সোমস্য স্বেভিরক্ষভিঃ।

ঋগ্বেদ ১—১৩৯—২

বঙ্গানুবাদ। হে কর্ম্মদক্ষ মিত্র! হে বরুণ!—তোমরা সূর্য্যের তেজ লাভ করিয়া জল প্রস্তুত কর। ঐ জল আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর। অতএব আমরা ক্রিয়া—কর্ম্ম ও জ্ঞান সোমরসে আসক্ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় (Laboratoryতে) তোমাদিগের কিরণময় উজ্জ্বল রূপ দর্শন করি।

[অর্থাৎ—একাগ্রচিত্তে ঐরূপ সাধনা করিলে মানবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা জলরূপে দেখিতে পায়]

তাহার পর বশিষ্ঠ ঋষি যাঁহার অপর নাম মৈত্রাবরুণ (অর্থাৎ মিত্রাবরুণের বিশিষ্ট উপাসক—সুতরাং তনয় স্বরূপ) তিনিও বলিয়াছেন—

(১২) প্রোরোর্মিত্রাবরুণা পৃথিব্যাঃ

প্রদিব ঋষ্বাদ্বাহতঃ সুদান্
স্পশো দধাথে ঔষধীষু বিক্ষ্‌বৃধগ্যতো
অনিমিষং রক্ষমাণা।

ঋগ্বেদ—৭।৬১।৩

বঙ্গানুবাদ। হে মিত্র ও বরুণ (তোমরা বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছ—তোমরা দর্শনীয় এবং মহান দ্যুলোকও অতিক্রম করিয়াছ) তোমাদের দান মনোহর। তোমরা ওষধি ও প্রজাগণের জন্য (জল) রূপ ধারণ কর। অর্থাৎ তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া জলরূপ ধারণ কর। তখন উহা দ্বারা ওষধী ও এই পৃথিবীর জীবগণ তোমার দানেই সজীব থাকে। সুতরাং তোমাদের দান অতীব মনোহর। (ক্রমশঃ)

পান্থনিবাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(৩)

এমনি কয়েকটি প্রাণী তেরো নম্বর মেসে বাসা বাঁধিয়াছে। কলিকাতা শহরে একটি লোকের থাকার খরচ কম নয়। থিয়েটার-বায়োস্কোপ এবং ট্রাম-বাসের খরচ না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের যাওয়া-আসা তো বন্ধ করা যায় না। এ-সব চালাইয়া কেরাণীর বেতনের অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। ফলে, দেশে সমস্ত পরিবার অভাবের তাড়নায় অস্থির হইয়া ওঠে, আর এখানেও আফিসের কাজের তাড়ায় ভদ্রলোকের প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে! কোনো দুঃখেরই শেষ দেখা যায় না। এই দুই দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির মধ্যে আছে মেস,—তরুলতার পত্র-মর্ম্মরে ও জলের কলকল্লোলে নন্দিত যেন একটি ওয়েসিস।

কিন্তু এও মায়া। কলকল্লোল শোনা যায় বটে, দূর হইতে সে হাসি, সে উল্লাস, সে বিরতিবিহীন সঙ্গীতলহরী শুনিলে ভালোই লাগে। কিন্তু এ কল্লোলও জীবনের নয়, মৃত্যুর। অতি ছোট লোভ, অত্যন্ত তুচ্ছ স্বার্থ, প্রতিদিনকার অত্যন্ত লজ্জাকর কলহ গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়া মানুষের মনকে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে।

অবিনাশবাবুর দেশের বাড়ীতে যায় নাই এ মেসে এমন একটি লোকও নাই। চিরটা কাল তিনি মেসে কাটাইতেছেন, বড়বাবুগিরিও অনেক—অনেক দিনের! এই দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ের তিনি অপব্যয় করেন নাই। দেশে জমিজায়গা কিছু করিয়াছেন এবং অল্পদিন হইল একটা পাকা বাড়ীও তুলিয়াছেন। চমৎকার বাড়ী। সেই বাড়ীটি তোলার পর হইতেই মাসে একবার মেসের কাহাকেও না কাহাকেও দেশে বেড়াইতে লইয়া যাইবার উপলক্ষে বাড়ীটি

দেখাইয়া আনেন। এই সূত্রে মেসের প্রায় সকলেই একবার না একবার তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া আসিয়াছে। এবং যাহারা গিয়াছে তাহারা তাঁহার আতিথ্য কোনোদিন ভুলিতে পারিবে না।

সে কী আতিথ্য! প্রচুর আয়োজনের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু যত বড় আন্তরিকতা থাকিলে মানুষ সুদূর পাড়াগাঁয়ে এইরূপ প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে এ পৃথিবীতে তাহা সুলভ নয়। বাড়ীতে কয়েকজন ভদ্রলোকের পদধূলি পড়িয়াছে বলিয়া ভদ্রলোকের সে কী আনন্দ! সমস্ত দিন ভদ্রলোক শুধু ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান। এখান হইতে কমলশহর দশ মাইল দূরে। সেখানকার কইমাছ বিখ্যাত। সকালে একজন লোক সাইকেলে ছুটিল কইমাছ আনিতে। কালীদহ হইতে আসিল কাঁচাগোল্লা এবং আরও যেন কি। বাড়ীতে সমারোহ পড়িয়া গেল।

ইহাই অবিনাশবাবুর সত্য পরিচয়। অথচ সেই অবিনাশবাবুকেই যদি আজ সন্ধ্যায় মুখুয্যের ঘরে বসিয়া নিরিবিলি নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা চালাইতে শুনেন, আপনারা কি মনে করিবেন? অথচ ইহাও সত্য।

অবিনাশবাবু বলিতেছিলেন,— এ কাণ্ড রোজই ঘটছে। তুচ্ছ একটা মাছের মুড়ো খাচ্ছে, খাক। সেজন্যে বলিনি। কিন্তু রোজ রোজ নিজেরাই বা খায় কি ক'রে? শুধু মাছের মুড়োই নয় মুখুয্যে, তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখো মাছের বড়খানিটি ওরই পাতে। আমি দেখিছি কি না।

মুখুয্যে একটু বিজ্ঞের মতো হাসিয়া বলিলেন,—এ আমি আগেই জানতাম। তোমাকে বলেছি কি না মনে নেই, কিন্তু ম্যানেজারী নেবার আগ্রহটা দেখলে না? ঘরের খেয়ে কেউ কি অমনি বনের মোষ তাড়ায়? হুঁ হুঁ!

অবিনাশ তাঁহার হাঁটুতে একটা চাপড় দিয়া বলিলেন, কিন্তু এ তো চলবে না, মুখুয্যে। এ সমস্ত অনাচার বেশী দিন চললে মেস টিকবে না। তোমাকে একটু লাগতে হ'য়েছে। এমন ক'রে হাল ছেড়ে দিলে হবে না।

মুখুয্যে নিঃশব্দে বোধ করি অবিনাশের কথার যৌক্তিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন।

তারপর বলিলেন,— কি জান? ছেলেরা দেখছে-শুনছে···

বাধা দিয়া অবিনাশ বলিলেন,—ছেলেরা মানে? কতকগুলো চ্যাংড়া। ওরা মেসের জানেই বা কি, বোঝেই বা কি? ইস্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে কালকে এসে মেসে আর আজকে ওরাই হ'ল কর্ত্তা, আমরা কেউ নই?

মুখুয্যে একটু চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—মুস্কিল কি জান ভাই, জুটেছে কতকগুলো ফাজিল ছোকরা। একটা কথা বলতে গেলেই, মুখের ওপর জবাব দিয়ে বসবে।

—জবাব দিয়ে বসবে?

—বসবে কেন, বসেই তো।

– কি রকম?

– এই ধর না কেন, সেদিন কতকগুলো বালিশের অড়, চাদর-টাদরে সাবান দিয়েছিলাম। সেগুলো মেলে দিয়েছিলাম ওই সুমুখের তারে। হঠাৎ তোমার সুনীল এসে আমার চোখের সামনে সেগুলো সরিয়ে ফেলে দিলে। যদি বললাম, বাপু, ওগুলো সরিয়ে দিলে কেন? একটু কষ্ট ক'রে ছাদে গিয়ে কাপড়খানি মেলে দিয়ে এলেই তো চল্‌ত। তা ছোকরা পট্‌ ক'রে আমার মুখের ওপর জবাব দিলে, আপনারই ছাদে গিয়ে মেলে দিয়ে আসা উচিত ছিল। অতগুলো জিনিস মেলে দিয়ে সমস্ত তারটা দখল করা ঠিক হয় নি।

অবিনাশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—তুমি বললে না কেন···

—আবার বলব কি? বুড়ো বয়সে একরত্তি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতেও তো পারি না। মানে মানে সরে পড়লাম।

অবিনাশ বিরক্তভাবে বলিলেন,— হুঁঃ!

—এই ব্যাপার, অবিনাশ বাবু। তার চেয়ে বরং চল সরে পড়ি কোনো সুবিধামতো জায়গায়। এখানে আমাদের আর পোষাবে না।

—ছেড়ে যাব কি রকম? বিশ বচ্ছর আছি, ছেড়ে যাব? তা ছাড়া 'লীজ্' যে আমাদের নামে!

—'লীজ্' ছেড়ে দোব। ওরা তো লায়েক হ'য়েছে। ক্ষমতা থাকে নিজেরা 'লীজ' নিক।

কথাটা অবিনাশের মনঃপূত হইল না।

বলিলেন,—তার চেয়ে বরং একবার দাদুকে ডাকা যাক্। কি বল? আমাদের মধ্যে তিনিই তো প্রবীণ। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একবার পরামর্শ করা দরকার।

মুখুয্যে উপেক্ষার হাসি হাসিয়া কহিলেন,—তবেই হয়েছে! তাঁর যদি মনুষ্যত্ব থাকতো তবে আর ভাবনা

কি ? এখন তিনি হয়তো সুনীলের সঙ্গেই দাবায় বসেছেন। মাথার উপর বাড়ী ভেঙ্গে পড়লেও টের পাবেন না।

কথাটা মুখুয্যে মিথ্যা বলেন নাই। দাদু তখন দাবাতেই বসিয়াছিলেন, এবং ওই সুনীলের সঙ্গেই। সুনীলের বয়স নিতান্তই অল্প, কিন্তু দাবাটা খেলে ভালো। আর দাদুর দাবা একটা নেশা। আগে তাঁহার খেলা দেখিতে লোক জমিত। সে খেলা এখন আর নাই। চোখে ভালো নজর চলে না। সুনীলের কাছেও প্রায়ই তিনি হারেন, তবু সন্ধ্যাবেলায় দাবার ছকটি পাতিয়া সুনীলকে একবার হাঁক দেওয়া চাইই।

দাদুকে উঠাইতে অবিনাশবাবুকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। 'যাই' 'যাই' করিতে করিতেই দাদুর আধঘণ্টা দেরী হইল। যখন উঠিলেন তখনও কিন্তু মন পড়িয়া আছে দাবার ছকটির উপর। নিতান্ত না-দেখার ভুলে ঘোড়াটি তাঁহার বেঘোরে প্রাণ হারাইল। অথচ একটু নজর পড়িলেই ঘোড়াটিকে অনায়াসে বাঁচাইতে পারা যাইত। তাঁহার সমস্ত মন পড়িয়া ছিল সেইখানে। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতেও তিনি তারস্বরে প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পরাজয়টা মোটেই পরাজয় নয়।

সুনীলের উপর ইহার শোধ তুলিবার জন্য দাদুর মন ভিতরে-ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন,—বসুন।

দুজনের মুখের পানে বিব্রতভাবে চাহিয়া বসিতে বসিতে দাদু বলিলেন,—কি ব্যাপার ?

—বসুন, বলছি। তাড়া কি ?

ধমক খাইয়া দাদু নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

মুখুয্যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধভাবে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন,—দিন দিন মেসের ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে একবার চোখ চেয়ে দেখছেন ?

দাদুর দাবার নেশা কাটিয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে একবার ঘরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন,—ঠিক নজরে তো পড়ে নি ভায়া।

—একবার দৃষ্টি দিন। দিনরাত্রি আফিস আর দাবা নিয়ে থাকলে তো চলবে না। এতকালের মেসটা কি শেষটায় ভাঙবে ?

মুখুয্যে কথাটা আর ভাঙিয়া বলেন না। উৎকণ্ঠায় দাদুর তালু পর্য্যন্ত তখন শুকাইয়া উঠিয়াছে। কথাটা কি প্রশ্ন করিতে পর্য্যন্ত ভরসা পাইতেছেন না। তিনি একবার মুখুয্যের দিকে, একবার অবিনাশের দিকে সভয়ে চাহিতে লাগিলেন।

অবিনাশ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। এইবার কথাটা ভাঙিলেন।

কহিলেন,—মেসে তো আর থাকা চলে না দাদু। অনাচার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নতুন ম্যানেজারের কাণ্ডটা দেখছেন তো ?

দাদুর তখন উত্তর দিবার শক্তি নাই। দুইটা কাঠের ঘোড়া এবং একজোড়া কাঠের হস্তী দিয়া শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া আড়াই চালে তিনি শত্রু-পক্ষের রাজাকে কোণঠাসা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। অকস্মাৎ এ কী বিপর্য্যয় কাণ্ড !

শুষ্ক মুখে দাদু শুধু একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, কোনো অনাচারই এখন পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

—বলি, গেল দু'মাসের মধ্যে মাছের মুড়ো কোনো দিন পাতে পড়েছে ?

কপাল কুঁচকাইয়াও দাদু স্মরণ করিতে পারিলেন না, পড়িয়াছে কি পড়ে নাই।

চরিতার্থতার হাসি হাসিয়া অবিনাশ বলিলেন,—কপাল কোঁচকালে কি হবে ? পড়লে তো মনে পড়বে ? খাবার সময় একটু এদিক-ওদিক লক্ষ্য রাখবেন, তাহ'লেই টের পাবেন কার পাতে রোজ পড়ছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত দাদু অগাধ জলে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এখন মনে হইল, পায়ে যেন মাটি ঠেকিতেছে।

মুখুয্যে অবিনাশকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন,—আর সেই কথাটাও বল হে। সেই 'ফিষ্টের' কথাটা।

অবিনাশের কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

কহিল,—হ্যাঁ। পরশু রাত্রে একটু খাবার-দাবার আয়োজন হ'য়েছিল, মনে আছে দাদু ? হঠাৎ অত ঘটা কেন বলুন তো ?

—জানি না।

—ম্যানেজারের দেশের থেকে 'ফ্রেণ্ড' এসেছিল। বুঝলেন?

—বুঝলাম।

বলিয়া দাদু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শীর্ণ মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কহিলেন,—সবই বুঝলাম ভাই। কেবল এইটুকু বুঝলাম না অবিনাশ, যে তোমার বাড়ীতে মাছের মুড়োর অভাব নেই, বাড়ীতে লোকজন এলে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনেরও ত্রুটি কর না। এ তো নিজেই দেখে এসেছি। তোমার নজর এদিকে পড়ল কি ক'রে?

অবিনাশ ঝাড়িয়া উঠিলেন।

বলিলেন,—দেখুন দাদু, আমার বাড়ীতে যদি পাঁচ-জনের পায়ের ধূলো পড়ে সে আমি ভাগ্য ব'লে মানি। আপনি চলুন, যতদিন খুসী থাকুন তাতে আমি কৃতার্থই হব। কিন্তু এ তো বাড়ী নয়, মেস। এখানে কেউ কুটুম্বিতা করতে আসি নি। এখানে দেনা-পাওনার ব্যাপার। আমি আমার দেনা ন্যায্যগণ্ডা মিটিয়ে দোব, আর আমার পাওনা ন্যায্যগণ্ডা বুঝে নোব।

—তাই নাও ভাই। কিন্তু আমি বুড়োমানুষ, আমাকে ছাড়ো। আমার ওদিকে লগ্ন ব'য়ে যায়। খেতে বসবার আগে সুনীল ভায়াকে বাজি দুই দিয়ে দিতে হবে। কিছু মনে ক'রো না।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে দাদু বাহির হইয়া গেলেন।

দুই বন্ধু অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলেন,—অপদার্থ!

দাদু চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এ ব্যাপারের মীমাংসা অত সহজে হইল না। রবিবারে সন্ধ্যাবেলায় মেসের সভা বসিল। সভা নয়, হট্টগোল। সবাই নিজের নিজের কথা বলে, শুনিবার লোক নাই।

দাদুর আসিবার ইচ্ছা ছিল না। পাঁচজনের টানা-টানিতে পড়িয়া একবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে আসিয়া বসেন নাই। বাহিরে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন দেখিলেন সকলেই চীৎকারে মত্ত, তখন সুবিধা বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন,—একা নয়, সুনীল ভায়াকে শুদ্ধ লইয়া।

আর আসে নাই বিলাস। আলো নিভাইয়া দিয়া অন্ধকার গৃহকোণে সে নিঃশব্দে চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল।

বাহিরে তখন কলহ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। মাছের মুড়া, 'ফ্রেণ্ড', কাপড় মেলিবার স্থানাভাব, সে সব কথা তো উঠিলই, তা ছাড়া আরও বহু অভিযোগ উঠিল। যাহারা দিনের বেলায় বেলা করিয়া খায় তাহাদের অভিযোগ তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ তরকারী পায় না। যাহারা সকালে খায় তাহাদের অভিযোগ কতকগুলি বাবু বেলা করিয়া খায় বলিয়া ঠাকুর-চাকর সকালে ছুটি পায় না, ফলে রাত্রের রান্নার বিলম্ব হয়। যাহারা ইতিমধ্যে মেসের টাকা অগ্রিম জমা দিয়াছে তাহারা আস্ফালন করিল যাহারা দেয় নাই তাহাদের উপর। যাহারা টাকা দেয় নাই তাহারাও আস্ফালন করিয়া জানাইয়া দিল পনেরো তারিখের মধ্যে তাহারা কিছুতেই টাকা দিতে পারিবে না। এমনি সহস্র খুঁটিনাটি কথা উঠিল।

মুখুয্যে রাগিয়া বলিলেন, বুড়া বলিয়া ছেলেদের দল তাঁহাদের একেবারে বাতিল করিয়া দিতে চায়।

ছেলেরা জবাব দিল, ছেলেমানুষ বলিয়া বুড়ারা তাহাদের উড়াইয়াই দিতে চান। কেন? টাকা কি তাহারা কম দেয়?

অবিনাশবাবু জবাব দিলেন,—তবে আমার দ্বারা আর মেসের 'লীজ্' নেওয়া হবে না। তোমরা তো মুরুব্বি হয়েছ, তোমরাই নাও।

ছেলেরা বলিল,—বেশ, আমরা রাজি।

বলিল বটে, কিন্তু কে যে 'লীজ্' লইবে তাহাও ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

মেসের ব্যাপারে তপনের বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। নূতন আসিয়াছে বলিয়াও বটে, কতকটা নিরীহ বলিয়াও বটে। বসিয়া বসিয়া সে শুধু ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল। নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া সকলের এই প্রকার উষ্মা প্রকাশে তাহার বিস্ময় ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্মিত হইল এই দেখিয়া যে, ভুবনবাবু, যাহাকে সে অত্যন্ত সরল

এবং অত্যন্ত ভালোমানুষ বলিয়া মনে করিয়াছিল, চীৎকার করিতে তিনিই সকলের চেয়ে বেশী।

একটি কোণে হাঁটুর উপরে চিবুক রাখিয়া সে চুপটি করিয়া বসিয়া ছিল। অকস্মাৎ দ্বারের অন্তরাল হইতে কে যেন তাহাকে ইসারা করিয়া ডাকিল। সে বিলাস।

বাহিরে আসিতেই বিলাস তাহার হাতে একটা টান দিয়া বলিল,—ওখানে কি করছেন? চলুন, ছাদে যাই বরং।

তপনেরও বিরক্তি বোধ হইতেছিল। বলিল,—তাই চলুন।

ছাদে আসিয়া তপন কহিল,—মিথ্যে ক'দিনের জন্যে এখানে এলাম, বিলাসবাবু। আবার মেস খুঁজতে হবে কাল থেকে।

বিলাস বিস্মিত ভাবে বলিল,—মেস খুঁজতে হবে? কেন বলুন তো?

তপন বিরক্ত ভাবে বলিল,—তবে আর শুনলেন কি? দেখছেন না, নীচে কি কাণ্ড হচ্ছে? এ মেস কি টিকবে?

বিলাস হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—এই ব্যাপার! আমি বলি বুঝি আর কিছু! এমন কাণ্ড প্রতি তিন মাস অন্তর হয়। হৈ-চৈ, গোলমাল, মেস গেল গেল,—তারপরে আবার যে কে সেই।

তপন কথাটা বিশ্বাস করিয়াও করিতে পারিতেছিল না। বলিল,—তাই নাকি?

মাথা নাড়িয়া বিলাস বলিল,—হাঁ। ওর জন্যে ভাববেন না। আমি এসে অবধি ওই রকম দেখছি। এরা এক টুকরো মাছের জন্যে ঝগড়া ক'রেও মরবে, আবার প্রাণান্তে কেউ কাউকে ছাড়তেও পারবে না। এখন দিনকয়েক অমনি চলবে। তার পরে দেখবেন কেউ মেস ছাড়ার নামও করছে না।

(৪)

সকালে-সন্ধ্যায় তপন দুইটা ট্যুইশান করে। পনেরো টাকা করিয়া পায়। কিন্তু এই ত্রিশটি টাকার উপর তাহার ঘৃণার অন্ত নাই। ছাড়িতে পারে না, শুধু বাড়ীর ভাই-বোনগুলির মুখ চাহিয়া।

ছাত্র দুটিই গবেট। সকালেরটি থার্ড ক্লাসে পড়ে। বয়স চৌদ্দ-পনেরোর বেশী নয়। কিন্তু দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কলেবরটি এমনই ভারিক্কি হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় বাইশ-তেইশের কম নয়। এ বাড়ীতে মোটা হওয়ার এপিডেমিক লাগিয়াছে। কুকুর-বেরাল হইতে কর্ত্তা-গৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই অসম্ভব রকম মোটা। তাহার উপর নিয়মিত দুধ-ঘি পড়িতেছে। তা পড়ুক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে দুগ্ধ এবং ঘৃতের এক কণাও ছেলেটির মস্তিষ্কে পৌছিতেছে না, কেবলই মেদ বৃদ্ধি করিতেছে।

তবে বুঝিবার চেষ্টা আছে, পড়িবার জন্য শ্রমস্বীকারও করে। কিন্তু বুদ্ধিই এমনি মোটা যে কিছুতে বুঝিতে পারে না। এবং বহু ধ্বস্তাধ্বস্তির পর তপন যদি বা ব্যাপারটা বুঝাইতে সক্ষম হয়, ছাত্র পরের দিনই তাহা বেমালুম ভুলিয়া যায়।

সন্ধ্যার ছাত্রটিরও বুদ্ধি সেই প্রকারই। কেবল অত বোকা নয়, বরং ধূর্ত্ত। অত্যন্ত রোগা চেহারা। শীর্ণ মুখ। তাহাতে নাকের উপর ভাঁটার মতো চশমা। দিন রাত্রি কেশ ও বেশ লইয়াই আছে, আর মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে কেমন করিয়া মাষ্টারকে ফাঁকি দিবে।

কোনো বিষয় না বুঝিলেও কিছুতেই স্বীকার করিবে না যে, বোঝে নাই। আর তপন কোনো কঠিন বিষয়ের অবতারণা করিবামাত্র তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ উল্টাইবার চেষ্টা করে। হয় চট্ করিয়া ফুটবল খেলার গল্প আরম্ভ করে, নয়ত—

— মাষ্টার মশাই, একটু চা খাবেন?

—না। তারপরে শোনো—

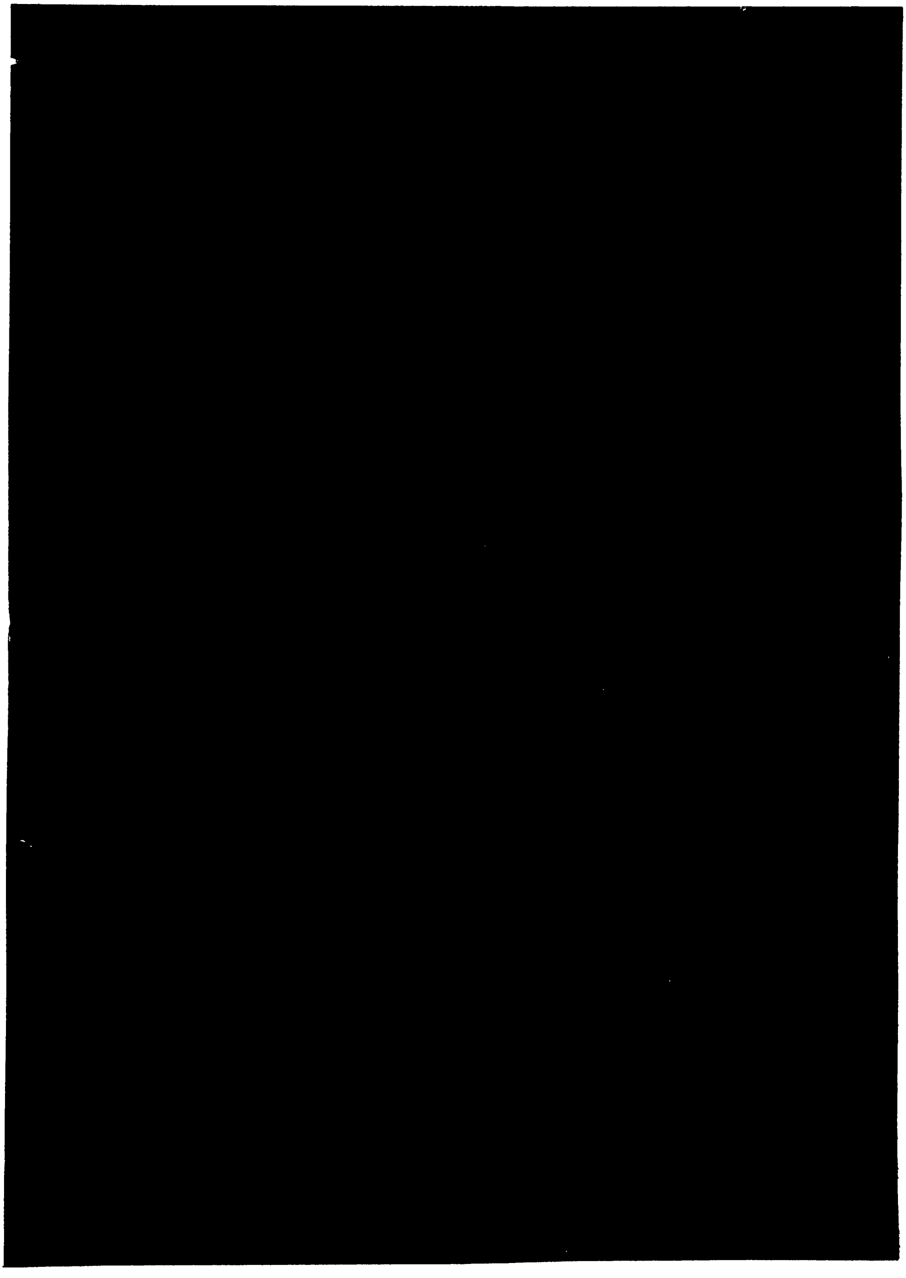
—তবে এক কাপ কফি?

—দরকার নেই। তারপরে শোনো—

এবারে ছেলেটি হাত জোড় করিয়া বলিল,—একটু খান, স্যার। আপনার দৌলতে আমারও একটু হবে। শরীরটা ভারী ম্যাচ্ ম্যাচ্ করছে।

তপন পেন্সিলটা খাতার উপর রাখিয়া হতাশভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসে।

এমনি চমৎকার দুটি ছাত্রের কাছ হইতে পড়ানোর নাম করিয়া টাকা লইতে তপনের বিবেকে বাধে। কিন্তু কি করিবে? তবে মনে-মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে কোথাও একটা ভালো চাকরী একবার জুটিলে হয়। সেই দিনই এই দুই গণ্ডমূর্খকে পড়ানোর দায় হইতে অব্যাহতি লইবে।



অজানার সন্ধানে

শিল্পী— শ্রীযুক্ত ভবন বর্ম্মা বি. এ. Bharatvarsha Halftone & Printing Works

এই প্রকার যখন তাহার মনের অবস্থা তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার আর একটা ট্যুইশান জুটিয়া গেল।

খবরটা আনিয়া দিল তপনের একটি মামাতো ভাই গভর্ণমেন্ট আফিসে চাকরী করে, সেই। তাহাদের অফিসের বড়বাবুর একজন গৃহশিক্ষক আবশ্যক।

সংবাদটা শুনিয়া তপন উল্লসিত হইল না। বরং ঠোঁট কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আবার ট্যুইশান ছোড়্‌দা? একটা চাকরী জোগাড় ক'রে দিতে পারো না? বড়লোকের গোমূর্খ ছেলে আর পড়াতে পারি না।

—ছেলে না রে, মেয়ে। শুনেছি বেশ বুদ্ধিমতী। অবশ্য তোর বয়সের কথা শুনে প্রথমে তিনি রাজি হন নি। আমার মুখে তোর স্বভাব-চরিত্রের কথা শুনে রাজি হ'য়েছেন। তার ওপর যখন শুনলেন স্বজাতি···

বাধা দিয়া তপন বলিল,—ও সব আবার কি কথা ছোড়্‌দা? স্বজাতি ব'লে ··

ছোড়্‌দা হাতের খাতাখানি দিয়া তাহার মাথায় একটা টোকা দিয়া হাসিয়া বলিল,—না, না, সে সঙ্কল্প নেই। আর ভয়-ই বা কি, অমন শ্বশুর পেলে···

তপন হাসিয়া বলিল,—না, না, শ্বশুরের দরকার নেই, দরকার একটা চাকরীর। পারো তো তাই একটা জোগাড় ক'রে দাও।

ছোড়্‌দা হাসিয়া বলিল,—সব হবে। আপাতত কাল বিকেলে আমার অফিসে একবার আস্‌বি। সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব।

ছোড়্‌দার হাসি তপনের ভালো লাগে নাই। তথাপি বিকালে তাহার অফিসে গেল, সুরেনবাবুর সঙ্গে দেখা করিল এবং তাঁহার মেয়েটিকে পড়াইতেও রাজি হইল। এ বাজারে কুড়ি টাকা মাহিনার প্রলোভন তো বড় সহজ নয়।

চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে। বেতের মতো লিক্‌লিকে। শীর্ণ দুটি হাতে দু'গাছি করিয়া সোনার চুড়ি ঢল্‌ঢল্‌ করিতেছে। মাথার চুল আলুথালু; পোষাক-পরিচ্ছদেও তেমন পারিপাট্য নাই।

মেয়েটি কেবল পড়ে, কেবল পড়ে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মুখে একটা বিবর্ণতা আসিয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে এবং এই বয়সেই কেমন কোল-কুঁজো হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার খাতা দেখিয়া তপন বুঝিতে পারে, এত পরিশ্রম তাহার বৃথা যায় নাই। মেয়েটি পড়াশুনায় ভালোই।

অত্যন্ত স্বল্পবাক্, শান্ত প্রকৃতির মেয়ে। এবং সে মেয়েও বড় নয়, ছোট। কিন্তু ছোটদার ঠোঁটের হাসিকে কি জানি না তপন আজও তাহার পানে ভালো করিয়া চাহিতে পারে না। এমন কি, আজ পর্য্যন্ত একদিন তাহার নামটাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। পাঁচজনের কথায় জানিতে পারিয়াছে তাহার নাম শ্যামলী। শ্যামবর্ণের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় বাপ-মা এই নাম রাখিয়াছেন।

তপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসে। দেখে, শ্যামলী পূর্ব্ব হইতেই নিজের আসনে বসিয়া বসিয়া একাগ্রমনে অধ্যয়ন করিতেছে। তপন তাহার স্কুলের রুটিনের দিকে চাহিয়া দেখে, আগামী কল্য কি কি বই পড়া হইবে। তারপর এক একখানা বই টানিয়া লয় এবং আপনার মনে পড়াইয়া যায়। নিজে সে ভালো ছেলে ছিল। বহু কথা যাহা বইতে নাই নানা প্রসঙ্গে তাহাও বলিয়া যায়। তাহার বলিবার ভঙ্গীটিও চমৎকার। অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও এমন সহজ করিয়া বোঝাইতে পারে যে শ্যামলী মুগ্ধ হইয়া যায়। তপনের দুই ঘণ্টা পড়াইবার কথা, কিন্তু তিন ঘণ্টার আগে আর কোনো দিন পড়ানো শেষ হয় না। এমন কি ফিরিবার পথেও ভাবিতে ভাবিতে আসে কোনো কিছু পড়াইতে বাদ গিয়াছে কি না। পড়ানোর মধ্যেও যে এত আনন্দ আছে তাহা সে এই প্রথম অনুভব করিল।

তাহার অপর দুইটি ছাত্রের মতো এ বাড়ীতে খাওয়ানোর আয়োজন তত নয়। তবু থাকে। কখনও কমলালেবুর সরবৎ, কখনও বা দুটি সন্দেশ।

শ্যামলীর ছোট ভাইটি বলিয়া দেয়,—মাষ্টার মশাই, দিদির নিজের হাতের তৈরী। কেমন হয়েছে?

তপন উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে,—তাই না কি? বাঃ, বেশ হ'য়েছে তো।

এবং শ্যামলীর পানে না চাহিয়াই বোঝে, লজ্জায় ও আনন্দে তাহার মাথা বইটির উপর আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয়। তাঁহার কথাতেও বোঝা যায় তপনের শিক্ষাদান-নৈপুণ্যে তিনিও খুশী হইয়াছেন। অবশ্য মুখে সে কথা বলেন না। বলেন,—

—আপনার পড়ানোর তো খুব সুখ্যাতি শুনছি, মাষ্টার মশাই। কিন্তু আমি ও-সব বুঝি না। এবারে যদি আপনার ছাত্রী ফার্ষ্ট হ'তে পারে তবে বলব, হাঁ।...

সুরেন্দ্রবাবুর মতো প্রবীণ লোকের মুখে 'মাষ্টার মশাই' ডাক শুনিয়া তপন অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু কিছু বলিতেও পারে না। শুধু ঘাড় নীচু করিয়া বলে,—দেখি তো।

(ক্রমশঃ)

আটাশ-বাড়ী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আটাশখানি বাড়ী নিয়ে ছোট্ট পল্লীখানি ;
উত্তরে তার কাঁচা সরাণ, দক্ষিণে তুফানি
নামে একটি নদী—
শিয়র দিয়ে
কুল্‌কুলিয়ে
বইছে নিরবধি।

বন্দিপাড়া ছাড়ি'
গোয়ালপাড়ার ধারেই আমার বাড়ী ;
পাশেই তারি—
খেয়াঘাটের পাকুড়গাছের তলে,
ভোর থেকে আজ ভৈঁরো আলাপ চলে
শানাই-বাঁশীর ভারী করুণ সুরে !
গোয়ালবাড়ীর নন্দরাণী যাচ্ছে কোথায় দূরে
বিয়ের পরে শ্বশুর-বাড়ী তার ;
ঘর থেকে তাই নদীর ঘাটের ধার
আপন জনের চল্‌ছে আনাগোনা –
নানানতর হাঁকে ডাকে কোনো কথাই যায় না কারো শোনা !
যাত্রা-আয়োজন
এম্‌নিতর ব্যস্ত সযতন।
দই-এর হাঁড়ী, রসকরা ও চিড়ে—
মেয়ে-জামাই পথে খাবে—শেষকালে তাও উঠ্‌ল নায়ে ধীরে।
—ঝুমুর-ঝুমুর - উলু-উলু—সঙ্গে সঙ্গে কান্না উঠ্‌ল কূলে ;—
নৌকো দিল খুলে'।

নন্দরাণী কেউ না আমার, গোয়ালবাড়ীর মেয়ে—
ছোটই হবে আমার 'মিলু'র চেয়ে।
নামটা জানি, চোখেও চিনি তারে ;
ফুল কুড়োতে আস্‌ত পথের ধারে।

—চল্‌ল সেই আজ প্রথম শ্বশুর-বাড়ী—
দশ বছরের বাপের বাঁধন, মায়ের মায়া ছাড়ি'।
দূর থেকে তার নৌকো দেখা যায়,
আমার জানালায়।
দাঁড়ের বাড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে' নিচ্ছে যেন তারে
কূল হ'তে কোন্ অকূল পারাবারে !

যতই বয়েস, যে জাতই সে হোক্—
সে ছিল এই পল্লী-মায়ের পরিবারের লোক !
আটাশ-বাড়ীর মন্দিরে তাই কোথায় যেন চিড়্ খেল আজ প্রাতে
ওই মেয়েটির বিদায়-বেদনাতে !



যাত্রামোহন সেন

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে চট্টগ্রাম প্রকৃতির খাসমহল। ইহার পদতলে বঙ্গোপসাগর। নদ-নদী-অরণ্য-শোভিত চট্টগ্রামে বাঙ্গলার ইতিহাসের কয়েকটি সুবৃহৎ অধ্যায় রচিত হইয়াছে। চট্টগ্রামে নির্ম্মিত জাহাজ এককালে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। চট্টলের লস্কর বিশ্ববিখ্যাত নাবিক। কি প্রাচীন কালে, কি আধুনিক কালে চট্টগ্রামে বাঙ্গলার বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নব্য রাজনীতি-ক্ষেত্রেও চট্টগ্রাম পশ্চাৎপদ নহে। সেই চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন ছিলেন বাঙ্গলার অন্যতম জননেতা।

যাত্রামোহন চট্টগ্রাম জেলার বারামা গ্রামে এক মহা সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ত্রাহিরাম সেন। যাত্রামোহনের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর তখন ত্রাহিরামের মৃত্যু হয়। ত্রাহিরামের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। সদ্যঃ পিতৃহীন দ্বাদশবর্ষীয় বালক সংসারে অসহায় হইয়া পড়িলেন, লেখাপড়া শিখিবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই বয়সেই তিনি তাঁহার এক আত্মীয়ের শিশু পুত্রগণের গৃহ-শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই সামান্য আয়ে তাঁহার নিজের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবে পড়াশুনা করিয়া তিনি তাঁহার গ্রামের বিদ্যালয় হইতে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর শিক্ষালাভার্থ চট্টগ্রাম সহরে আগমন করিলেন। এখানেও তিনি গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিয়া প্রশংসার সহিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

চট্টগ্রামের ডাক্তার অন্নদা খাস্তগীর কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। তিনি এই সময়ে একবার চট্টগ্রামে গমন করেন, এবং যাত্রামোহন যে স্কুলে পড়িতেন, সেই স্কুল পরিদর্শন করিতে যান। ডাক্তার খাস্তগীর ছিলেন দরিদ্রের বন্ধু। অনেক দুঃস্থ ছাত্র তাঁহার সাহায্যে লেখাপড়া শিখিত। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তাঁহার কাছে যাত্রামোহনের পরিচয় দিয়া বলিলেন, ছেলেটি স্কুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র। কিন্তু তাহার অবস্থা ভাল নয়; সেই জন্য তাহার উচ্চ শিক্ষা লাভে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ডাক্তার খাস্তগীর যাত্রামোহনকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া একটি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এই কলেজ হইতে যাত্রামোহন প্রশংসার সহিত এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ইহার পর ডাক্তার খাস্তগীরের তৃতীয়া কন্যার সহিত যাত্রামোহনের বিবাহ হয়। তাঁহার অপর তিন কন্যার সহিত যথাক্রমে মিঃ বি, এল, গুপ্ত আই-সি-এস, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র করুণা সেন এবং কলিকাতার ডাক্তার দাসের বিবাহ হইয়াছিল।

যাত্রামোহন বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে কলিকাতায় হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় পরিচালনের পরামর্শ দেন। কিন্তু যাত্রামোহন চট্টগ্রামেই প্র্যাকটিস করিবেন স্থির করেন। ডাক্তার খাস্তগীর পরিশেষে তাহার অনুমোদন করেন। চট্টগ্রামে তখন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। যাত্রামোহন তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং নিজ প্রতিভাবলে ও কার্য্যদক্ষতাগুণে অচিরে চট্টগ্রামের উকীল-সমাজের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন।

যাত্রামোহনের আট পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মনোমোহন সেনগুপ্তের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র ভারত-বিখ্যাত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাঙ্গালার অবিসম্বাদী নেতা। তৃতীয় পুত্র ডাক্তার এন, এম, সেনগুপ্ত এম-ডি, এফ-আর-সি-এসএরও অল্প বয়সে ইংলণ্ডে মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর এক পুত্র শৈলেন্দ্র সেনগুপ্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। যাত্রামোহনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র মিঃ আর, এম, সেনগুপ্ত বি-এ (ক্যাণ্টাব) বর্ত্তমানে "Advance" পত্রের পরিচালক। যাত্রামোহনের কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে অধুনা মাত্র দুইজন বর্ত্তমান। তাঁহারা চট্টগ্রামে বাস করেন।

যাত্রামোহনের সময়ে চট্টগ্রামের রাজনীতিক অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না। সেই জন্য যাত্রামোহন সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বাঙ্গালার রাজনীতিক নেতৃবৃন্দকে মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রামে আহ্বান করিয়া চট্টগ্রাম-

বাসিগণকে কংগ্রেসের বার্ত্তা শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজে চট্টগ্রামে রাজনীতিক আন্দোলন পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বয়ং সুবক্তা ছিলেন। চট্টগ্রামে তখন এমন কোন রাজনীতিক সভার অধিবেশন হইত না যাহাতে তিনি উপস্থিত থাকিয়া যোগদান না করিতেন। কেবল চট্টগ্রাম কেন, সার সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে বাঙ্গলায় প্রায় সকল প্রধান প্রধান রাজনীতিক সভা-সমিতিতে গমন করিতেন। একবার বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। সেই সভায় যাত্রামোহন এমন সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, চট্টগ্রামের বাহিরে সমগ্র বঙ্গে সুবক্তা বলিয়া তিনি খ্যাতি লাভ করেন। পূর্ব্ববঙ্গে সার সুরেন্দ্রনাথের সহিত চট্টগ্রামের যাত্রামোহন, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন, ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বহু রাজনীতিক সভার অধিবেশন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাত্রামোহন ছিলেন তখনকার কালের চরমপন্থী মতের পরিপোষক। তাই যখন বর্ত্তমান ভারত-শাসন-আইন (মণ্ট-ফোর্ড স্কীম) বিধিবদ্ধ হইলে সুরেন্দ্রনাথ সেই আইন স্বীকার করিয়া সার উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিলেন, তখন যাত্রামোহন আর সুরেন্দ্রনাথের মতের সমর্থন করিতে পারিলেন না—তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেন। যাত্রামোহন চিরজীবন চরম মত পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

একবার স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় কুতুব দিয়ার অন্তরীণগণের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য চট্টগ্রামে গিয়া যাত্রামোহনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। চিত্তরঞ্জনের চট্টগ্রামে অবস্থিতি কালে যাত্রামোহনের সভাপতিত্বে তথায় একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। চিত্তরঞ্জন এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় যাত্রামোহনের সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন চট্টগ্রাম-নেতার আতিথ্যে আমি যেমন মুগ্ধ হইয়াছি, ততোঽধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি, তাঁহার এই প্রাচীন বয়সেও এইরূপ চরম মতের পরিচয় পাইয়া। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সের (বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের) অধিবেশনে যাত্রামোহন সভাপতি রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতেও তাঁহার চরম রাজনীতিক অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়।

যাত্রামোহনের কর্ম্মশক্তি আদালতে আইনঘটিত তর্কবিতর্ক এবং সভাসমিতিতে রাজনীতিক বক্তৃতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। যাত্রামোহন জনহিতৈষণায়ও উদাসীন ছিলেন না। চট্টগ্রামে একটি টাউন হল নির্ম্মাণের জন্য চট্টগ্রাম এ্যাসোসিয়েসন উদ্যোগ আরম্ভ করিলে যাত্রামোহন এই সাধারণ অনুষ্ঠানের সাহায্যার্থ ২০০০০ টাকা দান করেন। টাউন হলটি নির্ম্মিত হইলে অনুষ্ঠাতৃবর্গ যাত্রামোহনের নামে টাউন হলটির নামকরণ করেন। যাত্রামোহন চট্টগ্রাম সহরে একটি (জে, এম, সেন ইনষ্টিটিউসন) এবং গ্রামে একটি (তাঁহার পিতা মাতার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ত্রাহি-মেনকা হাই স্কুল) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পত্নী বিনোদিনী সেনের স্মৃতিরক্ষাকল্পে গ্রামে একটি মধ্য ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, গ্রামবাসীদের উপকারার্থ তিনি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করিয়া দিয়াছেন, এবং গ্রামের রাস্তা-ঘাট সংস্কারার্থ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। চট্টগ্রামের ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল চেয়ারম্যান ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটি সমূহ স্থাপনে তিনি প্রচুর উৎসাহ দিতেন। স্ত্রীশিক্ষায়ও তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন। চট্টগ্রামের উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁহার হাত বড় অল্প ছিল না। তাঁহার শ্বশুর ডাক্তার খাস্তগীরও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার নামেই বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয়। স্বীয় মহানুভবতায় যাত্রামোহন চট্টগ্রামবাসীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। শাসন-সংস্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। যতদিন তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, ততদিন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে যাত্রামোহন পুত্রকে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহিত করেন। সেই হইতে যতীন্দ্রমোহন প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস কনফারেন্সে পিতার সহিত উপস্থিত থাকিতেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে মিঃ জে, এম, সেনগুপ্ত বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল কনফারেন্সকে চট্টগ্রামে আহ্বান করেন।

যাত্রামোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এই কংগ্রেসে একটি উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

যাত্রামোহন বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনকে চট্টগ্রামে আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহা মহা সাহিত্য-রথীরা যোগদান করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাত্রামোহন তাঁহার এক বণিক বন্ধুর জন্য ৬০০০০ টাকার দায়িত্বে জামিন হইয়াছিলেন। সহসা সেই বন্ধুটির মৃত্যু হয়। যাত্রামোহনের অন্যান্য বন্ধুরা এবং আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে মৃত বন্ধুর স্থাবর সম্পত্তি হইতেই টাকাটা সংগ্রহ করা হউক। কিন্তু যাত্রামোহন কাহারও পরামর্শ শুনিলেন না। তিনি বন্ধুর নাবালক পুত্রগণকে নিজের পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। তিনি তাহাদিগকে বিব্রত না করিয়া ঐ ৬০০০০ টাকা নিজেই প্রদান করেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে পীড়িত হইয়া যাত্রামোহন চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন করেন এবং পুত্র যতীন্দ্রমোহনের ১নং ওয়েলেসলী ম্যানসন ভবনে বাস করিতে থাকেন। তথায় ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩২৬, (১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর) তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে যাত্রামোহন রাওলাট এ্যাক্টের তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রামবাসী প্রতি বৎসর এই সময়ে (২রা নবেম্বর) কলিকাতায় ও চট্টগ্রামে তাঁহাদের পরলোকগত নেতার বার্ষিক স্মৃতি উৎসব করিয়া আসিতেছেন।

যাত্রামোহনের পুত্রভাগ্য অনন্যসাধারণ; তাই তিনি যতীন্দ্রমোহনের ন্যায় বঙ্গজননীর সুসন্তানকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

হামজুল্লি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল

(৫)

নলিনীর পিতা দীনেশ দাস বি-এ হেড্ মাষ্টারি ছেড়ে অসহযোগিতার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। দুঃখী লোক দীনেশ—বিপত্নীক। মেয়েকে মানুষ ক'রে ভাল বিবাহ দিয়েছিল, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে সে হ'য়েছিল বিধবা। বেচারা কংগ্রেসের হ'য়ে মাঝে মাঝে জেল যায় আর খদ্দর বেচে কষ্টে জীবিকা উপার্জ্জন করে। যারা তার নেতা, যাদের আনুগত্য করে সে—তারা মোটর চড়ে, কৌন্সিলে বক্তৃতা দেয় আর শতকণ্ঠে তাদের উদ্দেশ্য ক'রে ভক্তেরা বলে—বাহবা বাহবা বেশ!—

নলিনী আদরের মেয়ে—দেশ সেবার আব-হাওয়ায় মানুষ। সে বাপের বন্ধু-বান্ধবদেরও আদর পায়। কিন্তু পিতার মত তার মন শুদ্ধ নয়। নেতাদের বিলাসিতার সে বিদ্বেষী। তার পিতার দারিদ্র্যকে হীনতা ভাবে না নলিনী, কিন্তু যাদের তার পিতার মত আন্তরিকতা নাই, তারা কেন হবে ভোগী—এ সমস্যার উত্তর সে পায়নি কোনো দিন।

দীনেশ হেসে বল্‌তো - নেতা হওয়া শক্ত। প্রাণ দিতে পারে লক্ষ সেনা—নেপোলিয়ান হতে পারে ক'জন।

বাপের কাছে তর্কে হত সে পরাজিত কিন্তু সে তর্ক শেষ কর্ত্ত নেপোলিয়ানের মৃত্যু-কামনা করে।

আইন-ভাঙ্গা আন্দোলনে সে যখন প্রথম জেলে গেল—কারা-জীবনের সেই দিকটা সে দেখ্‌লে যে দিক্‌টা আবিল। যারা একটা আদর্শের জন্য স্বাধীনতাকে কারারুদ্ধ করেছে—ডালে নুন কম হ'লে তারা কেন কারা-রক্ষকের সঙ্গে হুজ্জত করে—সে রহস্যের মীমাংসা সে পেত না খুঁজে। সে দেখ্‌তো যশ মান নামের জন্য অনেক বন্দী লালায়িত। আত্মদানের আসল দিকটা নিজেকে প্রকাশ করলে না তার কাছে। তাই মুক্তি পেয়ে এসে সে পিতাকে বল্লে—জেলে গেলেই মানুষ শুদ্ধ হয় না।

—প্রেম নিয়ে গেলে হয়। পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করছি এই ভাবলে হয়।

—তবে কেন দেখলাম অত রেষারেষি। অনেককে দেখলাম আন্দোলনে যোগ দিয়েছে দেশকে ভালবেসে নয়—রাজপুরুষ বা ধনী লোকের উপর বিদ্বিষ্ট হ'য়ে।

তার পিতা বোঝালে সেটা ভুল। বিদ্বেষ করে লোকে অপরের বিদ্বেষ নিজের ঘাড়ে টেনে আনে।

নলিনী বুঝলে না। তার পিতার দারিদ্র্য, তার নিবিড় সাত্বিকতার মানে লোক যাচাই করে সে কেবল অপরকে হাল্কা দেখলে।

দ্বিতীয় বার জেলে গেল সে হুজুকে পড়ে। তাতে তার স্বেচ্ছাচারিতা বাড়লো। জীবনের মাঝে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি পেলে না। লক্ষ্যহারা হ'ল তার প্রাণ।

স্বাধীন বৃত্তির চেষ্টায় সে ঘুরলে অনেক কিন্তু তার প্রাণ ছিল শুষ্ক—অন্যের সংসারের সুখ তাকে উৎফুল্ল কর্লে না।

কমলাপতি সেনের গৃহ হ'তে ফিরে এসে সে পিতাকে জিজ্ঞাসা কর্লে—বাবা সংসারী লোক স্বার্থপর দাম্ভিক হয় কেন?

দীনেশ বল্লে—তা কেন হবে পাগ্‌লি। সুখ তো আছে অনেক কাজে। তারা সংসার ধর্ম্ম ক'রে সুখ পায়—প্রাণটাকে বাড়ায় না, দৃষ্টিকে বড় করে না।

নলিনী বিরক্ত হ'ল। পিতাকে বল্লে—আমরা যে নিগ্রহ সহ্য করছি সে তো এদের জন্য?

—নিশ্চয়। মহাসমরে কত লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে তাদের দেশের লোক সুখে থাকবে, স্বাধীন থাকবে বলে।

নলিনী বুঝ্‌লে না। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখলে—একদিকে মহা শ্মশান—রক্তের নদী। অন্য দিকে শান্ত পারিবারিক জীবন—তুচ্ছ স্বার্থে আত্মহারা স্বামী-স্ত্রী মোটা সোটা হাস্য-মুখ শিশু। তার পর ষষ্ঠীচরণ তার পায়ের কাঁটা তুলে দিচ্চে।

কি সব ছাই ভস্ম স্বপ্ন!

(৬)

একদিন ষষ্ঠী গেল প্রগতির বাড়ি। প্রগতির চক্ষে ছিল সহানুভূতি, হৃদয়ে ছিল ষষ্ঠীর প্রেমের প্রতি প্রেম।

মুকুলমণি নিজের হাতে-গড়া পান দিলে, বাজারের পান্তুয়া দিলে ষষ্ঠী-খুড়োকে খেতে। তৃপ্ত হয়ে ষষ্ঠী বল্লে—বৌমা আমার জোনাকী।

দেবী নয়, হীরা নয়, জোনাকী। পাছে হেসে ফেলে সেই ভয়ে স্থানান্তরে গেল গৃহলক্ষ্মী।

প্রগতি জিজ্ঞাসা কর্লে—খুড়ো কস্তুরী-সুতার আর সন্ধান গেলে?

- ভাল ঝাড়ের তেউড়। বাপটি ষাঁড়ে চড়া।

- ষাঁড়ে চড়া? ওঃ! বৃষবাহন মহাদেব।

কস্তুরী-সুতার নাম নলিনী। বাপ খদ্দর বেচে। নলিনী খদ্দরের সেমিজ জ্যাকেট তৈরী করে—বাপ বেচে।

- বিয়ের কথা কি হ'ল?

- এক মাঘে কি শীত পালায় বাবা। সবুরের মেওয়া।

—সে কি খুড়ো তেনার প্রেম কি উপে গেল নাকি?

ষষ্ঠী হাস্‌লে। সে বল্লে—বাবা তা কি যায়? তক্ষকের কামড়।

প্রগতি বুঝলে যে খুড়ো আশা ছাড়েনি। সে বল্লে—আচ্ছা খুড়ো তোমার তো দেশ আছে, সমাজ আছে, তারা কি ওকে ঘরে নেবে—বিধবা তার ওপর জেল খাটা।

ষষ্ঠীচরণের হাসিতে প্রগতি মুগ্ধ হ'ল। বলিষ্ঠ দেহ, শিশু মন অনাবিল হাসি। জীবনকে তার জটিল ক'রে তোলেনি সাহিত্য-বিজ্ঞানের বেড়াজাল। কৃত্রিমতা জীবনের সহজ স্পন্দনগুলাকে চূর্ণ করেনি।

সে বল্লে—বাপ্‌জান। দেশ আর সমাজ। দাও থোও মাসি পিসি, না দাও তো কাদায় ঠাসি।

—কিন্তু আত্মীয় স্বজন আপত্তি কর্ব্বে তো।

—কও কেন কথা বাঁশ-ঝাড়ের। যদি ঘটে না থাকে ঘি, যদি তোমার নামের ডাকে না গগন ফাটে—তুমি বেটা ভ্যাগা। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাক—কেউ একফোঁটা জল দেবে না। আবার কাল যদি চড় মগ্‌ডালে—সব স্যাঙাৎ করবে হামজুল্লি যতক্ষণ না তুমি হও কুপোকাত। সমাজের কথা থো কর বাপজান।

প্রগতি দুঃখ পেলে—পল্লীসমাজ সম্বন্ধে ষষ্ঠীচরণের মত উদার লোকের মুখে এমন অনুদার বাণী শুনে। কিন্তু সে বিস্মিত হ'ল তার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে। প্রেমের সঞ্জীবন স্পর্শে তার মাথা খুলে গেল, না এ অভিজ্ঞতা তার বিচার-লব্ধ—প্রগতি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলে না।

'তাদের ভাবের আদান-প্রদানে বাধা পড়ল চক্রধর তরফ্‌দাসের আকস্মিক আবির্ভাবে। চক্রধর ব্যারিষ্টার—

মানুষটি উদার কিন্তু সভ্য সমাজের সুষ্ঠু অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য নিজেকে সে খর্ব্ব করেছিল। সে যদি কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হত সাতটার সময় সাক্ষাৎ কর্ত্তে সে ঘড়ি ধরে ঠিক সাতটারই সময় গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিত। সে কলিকাতার প্লাবিত রাজপথের বাধা মান্‌তো না—মহরম মিছিলের দুলদুলের জনতা রাজপথ বন্ধ ক'রে তাকে কর্ত্তব্য-পথ-চ্যুত কর্ত্তে পার্ত্ত না। যদি সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের দু এক মিনিট পূর্ব্বে বন্ধুগৃহের দ্বারদেশে উপনীত হত তাহ'লে সে ঘড়ি হাতে করে টহল দিত তার বাড়ির সম্মুখে। সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে তাকে বিপন্ন হ'তে হয়নি এমন নয়। একবার তাকে এক বন্ধুর সদর দরজার সামনে পাঁচ মিনিট ঘুরতে হয়েছিল। মানুষ কিছু একটা না ক'রে ফুটপাথে ঘুরতে পারেনা উত্তর হতে দক্ষিণ আর দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে। কাজেই তাকে শিষ দিয়ে গাইতে হচ্ছিল—ধনধান্য পুষ্পভরা। বন্ধুর বাড়ির পার্শ্বে এক প্রৌঢ় বাস কর্ত্ত—যার সংসারে ছিল তৃতীয় পক্ষের এক তরুণী ভার্য্যা আর মনের মধ্যে ছিল একটা নীচ সন্দেহ। যাক্ সে কাহিনী অবান্তর এ ইতিহাসে।

ঘরে ঢুকেই চক্রধর বল্লে—প্রগতি তোমাকে কতবার বলেছি ধুতির সঙ্গে সার্ট চলে না।

—বলেছ বটে। তুমি ষষ্ঠীখুড়োকে চেনো না।

কোনো অব্যক্ত কারণে ষষ্ঠীখুড়োকে আজ একটি খদ্দরের নীল সার্ট পরিধান কর্ত্তে হয়েছিল। চক্রধর ভাবলে তার কথায় অপরিচিত অপরাধ নিতে পারে। সে বিনয় সহকারে বল্লে—না নীল সার্ট চলে। আমি সাদা সার্টের কথা বলছিলাম। আর যে সাদা সার্টে দু জায়গায় আমের রস আর এক জায়গায় চায়ের দাগ লাগা।

প্রগতি বল্লে—দেখ আঁটি না চুষলে আম খাওয়া মঞ্জুর না। কি বল খুড়ো?

খুড়ো বল্লে—তেলি হাত ফোস্কে গেলি হবে না—তারই বা কি কথা!

নীল সার্ট, ভীম দেহ তার উপর প্রবচন। প্রথম সাক্ষাতেই তরফদার ষষ্ঠীকে ভালবেসে ফেল্লে।

প্রগতি তাকে ষষ্ঠী-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা শোনালে।

চক্রধর বল্লে—হুঁ! সম-বেদনা, সহ-কর্ম্ম, বিপদে সহায়তা। নলিনীর কিসের বেদনা ছিল তা ছিল না তাদের জানা। কাজেই সেদিকে ক্রিয়া অসম্ভব। শেষ না হয় তাকে বেদনা দিয়ে তার ভাগ নিতে হবে।

—সমান কর্ম্ম! হুঁ! খুড়োমশায় আপনি জেলে যেতে পারেন।

—তা বাবা যেমন নদী তেমনি ভেলা জোগাড় কর্ত্তে হবে।

বন্ধুরা অভিভূত হ'ল তার প্রেমের আন্তরিকতায়।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল। জেলে যাওয়া এখন বন্ধ। চুরি করে বা একটা কাকেও মেরে জেলে যাওয়া তাদের মনঃপূত হবে না। নলিনীর পিতা ধার্ম্মিক লোক—অহিংসা-নীতির পোষক।

শেষে মগজ-কম্পন অনুভূত হল ব্যারিষ্টারের মাথায়। সে বল্লে—হ'য়েছে। প্রগতি তোমার কি যে একটা কি আছে বৈধব্য-মূষল সভা।

—বৈধব্য দমন সমিতি।

—বেশ কথা। সেই সমিতির কর্ম্মী কর্ত্তে হবে খুড়ো মশায়কে আর সেই মহিলাকে। তিনি যখন দেশের কাজ করেন সামাজিক কাজ কর্ব্বেন নিশ্চয়।

এবার মস্তিষ্ক স্পন্দন অনুভব কর্ল্লে খুড়ো। সে বল্লে—ভারি জবর বুদ্ধি বার করেছেন ব্যারিষ্টার মশায়। আমাদের নফর কনিষ্টবল প্রথমে কোকেনের কেশ ধরতো। শেষে সে নিজে কোকেনের কারবার খুলে দিয়ে একেবারে বালাখানা বানিয়ে ফেল্লে।

সুতরাং গোটাকতক বিধবার বিয়ে দিতে দিতে নলিনী নিজে কনে সেজে বস্‌বে—চরম সিদ্ধান্ত কর্ল্লে তারা।

কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? সে প্রচেষ্টা একেলা কর্ল্লে প্রগতি দুর্গতির সীমা থাক্‌বে না তার।

চক্রধর তার সাহচর্য্য কর্ত্তে সম্মত হ'ল। কিন্তু সে তো সমিতির সভ্য নয়—কি অধিকার নিয়ে সে উপস্থিত হবে শ্রীমতী নলিনী দেবীর সম্মুখে।

প্রগতি বল্লে—বেশ সভ্য হও।

অগত্যা শ্রীযুক্ত চক্রধর তরফদার বি-এ (ক্যাণ্টাব) বার-এট্-ল সভ্য হ'ল বৈধব্য-দমন সমিতির।

(৭)

যশের ভাগ্য যার সে যশ পায়। বন্ধুরা পরামর্শ কর্ল্লে কিন্তু সাক্ষাৎ পেলে মুকুল তার গড়ের মাঠে।

এ যুগের তরুণী ছিল না মুকুলমণি। অর্থাৎ কেহ পরিচয় মাত্র করিয়ে দিলেও যদি কোন মহিলা তার সম্মুখীন হ'ত সে উপযাচক হ'য়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্ত—আপনার বাড়ি কোথা? আর পাঁচ মিনিট পরিচয়ের পর সে সেই বেয়াদবী কর্ত্ত যা শুনলে এ যুগ শিহরে উঠ্‌বে। সে পাঁচ মিনিটের আলাপে পরিচিতাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্ত—তার কয়টি ছেলে-মেয়ে।

ভিক্টোরিয়া মেমরিয়লের ধারে নিজের খোকাকে নিয়ে গাড়িতে বসে ছিল মুকুল। প্রগতি প্রবল বেগে মাঠের মাঝে বেড়াচ্ছিল পরিপাক যন্ত্রের কল্যাণকামী হ'য়ে। তার তিন বছরের পুত্র জননীর সঙ্গে হামজুল্লি করছিল গাড়ি হতে নেমে ছুটাছুটি করবার জন্য। মুকুল-মণি কল্পিত বিভীষিকাদের উল্লেখ করে তার অতি সবুজ উৎসাহকে দমন কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছিল।

—ওঃ! বাবা! ঐ দেখ।

ছুটি স্ত্রীলোক ঠিক সেই সময় গাড়ির পাশে এসে পড়েছিল। তারা মাতা-পুত্রের কথা শুনে তাদের দিকে তাকালে।

ছু'জন মহিলা তাকিয়েছে পুত্রের দিকে, সে ক্ষেত্রে পুত্রের কর্ত্তব্য তাদের অভিবাদন করা। সে বল্লে—বল নমস্কার! নমো কর।

পুত্র অভ্যাস মত নমস্কার করলে। কাজেই তারা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো। মুকুল হেসে বল্লে—নাম্‌তে চায়।

—খেল্‌তে দিন্ না—মজবুত হবে।—বল্লে একজন মহিলা যার নাম কাবেরী দেবী, যার বাড়ী আহমেদাবাদ।

অন্য জন, যার নাম নলিনী দেবী ওরফে কস্তুরী-সুতা বল্লে—ডান্‌পিটে না হ'লে ছেলে মানুষ হয় না। এস।

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া। মাষ্টার নন্তু লাফিয়ে প্রথম তার কোলে সেখান থেকে ঝাঁপাইঝুড়ে মাটিতে পড়েই শুকদেব গোস্বামীর মত মারলে ছুট।

কাজেই মুকুলমণিকে নামতে হল। তিনজনে হাসি-মুখে শিশুর বিক্রম দেখলে। শিশু গিয়ে একজনকে ধরলে মাঠে। যাকে ধরলে তার নাম প্রগতি মিত্র। সে শিশুর পিতা।

পুত্রকে নিরাপদ দেখে তার জননী সামাজিক কর্ত্তব্যে মন দিলে। নলিনীকে বল্লে—*ঠিক বলেছেন। ছেলেপুলে* হুটোপাটি করলে থাকে ভাল। তবে ভয় হয়।

—ঐ ভয়টাকে ভয় কর্ত্তে হবে। ভালমানুষে দেশ ছেয়ে গেছে—তাই স্বরাজের সাক্ষাৎ নাই।—বল্লে নলিনী।

সে প্রগতিকে লক্ষ্য করে দেখেনি। তার কথার ভঙ্গীতে মুকুলমণির মনে পড়লো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে যে ঐ রকম জোরের সঙ্গে কথা বলে।

কাবেরী হাস্‌লে, বল্লে—বাঙ্গালী বড় বিলাসী হয়েছে। আমরা যখন জেলে ছিলাম সব দেখলাম—ওঃ!

নলিনীর স্বদেশ-প্রেম এ কথায় আঘাত পেলে। সে বল্লে শ্লেষের সুরে—হ্যাঁ তাই হাজার হাজার কলেজের ছেলে জেলে ছিল। তাদের সবাই বাঙ্গালী—

ঠিক সেই সময় প্রগতি এসে পৌছিল সেস্থলে। বিস্মিত হয়ে সে বল্লে—নমস্কার! বাঃ! মুকুল—এঁর নাম কস্তুরী-সুতা।

মুকুল যেন আকাশ থেকে পড়লো। বিস্ময়ের স্রোত না সামলাতে পেরে সে বল্লে—ইনি গুজরাটের মেয়ে। ইনি জেল খেটেছেন।

প্রগতি তাকে নমস্কার করে বল্লে—ওঃ! মুকুলকে দেখিয়ে বল্লে—মারি ধনিয়াইন ছে। ফরবা যাওচ নাথি?

ফিরতে সবাই রাজি হল।

মুকুল একেবারে নলিনীর হাত ধরে বল্লে—আপনার কথা শুনেছি। আপনার খুব দেশ-ভক্তি। আপনি সত্যিই মহাত্মাজীর মেয়ে। নন্তু নমো কর।

তখন তার নয়নে তুরপুনের চাহনী ছিল না। কাজেই নন্তু তার হাত ধরে ফেল্লে। নলিনী তাকে কোলে নিলে।

তার হৃদয়ের এ চাবিকাটির সন্ধান অক্সফোর্ড, প্যারিস, এডিনবরা ঘুরে তারা পায় নি। আঃ গেল। কে জানতো তার হৃদয়ের পথ এত সোজা। প্রগতির পত্নী-ভক্তি বিপুলায়তন হল।

কস্তুরী-সুতা বল্লে—আমরা এক পথের পথিক, আপনারা ভিন্ন পথের।

স্বরে গুরুগিরির আমেজ নাই।

মুকুল বল্লে—আমাদের পথ স্বার্থের পথ, ভোগের পথ, আপনারা মহৎ।

মেয়েটা রেশমের কাপড় পরলেও ভালমানুষ—ভাবলে

কস্তুরী স্থতা। ছেলেটার পোষাক ডাহা বিলাতী। সেটা দাসবৃত্তি। কিন্তু সেই কার্পেট-বোনা আহ্লাদী পুতুলটার মত দাম্ভিক নয়। দেখ্‌তেও তার চেয়ে ভালো—তবে তার চুল-বাঁধা আর বেশ-বিন্যাসের ভঙ্গীতে তাকে স্থন্দরী দেখায় আচমকা। এ বৌ পানও সাজে—এর আঙ্গুলের ডগায় খয়েরের দাগ।

তারা গল্প করছিল আর ময়দানের প্রান্তে পায়চারি কর্চ্ছিল।

কাবেরী দেবী বাঙ্গালার নিন্দা করছিল। এরা করে কারণ বাঙ্গালী এদের দোকানে কাপড় কেনে। তারা আলস্থ (অলস) ইত্যাদি। প্রথমে প্রগতি ভদ্রতার খাতিরে কথা ওণ্টাবার জন্য বল্লে—তমো কলকাতামা কেট্‌লী বখত রহেসো—(কতদিন আর কলকাতায় থাকবেন ?)

কিন্তু সে এমন মুখরোচক প্রসঙ্গ পেয়েছে—সহজে থামে ? তখনও ভদ্রতা কর্ল্লে প্রগতি।

হুঁতমনে বাঙ্গালীনী ঘন্থ মুলাকাৎ লেবাণী ভলামন্থ করুছুঁ (আমি আপনাকে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নিতে অন্থরোধ করছি)।

তাদের খোকার দুষ্টামীর কথা শুনছিল নলিনী। তার কানে গেল তাদের কথা। সে গুজরাটি বোঝে না। ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—কি আলোচনা হচ্চে! বাঙ্গালীর কি কথা।

তারা হেসে সারাংশ বল্লে—প্রসঙ্গের। যুবতীর চক্ষে স্ফুলিঙ্গ এলো। সে বল্লে—মূর্খ বাঙালী। তাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে সবাই খায়। দেখ বোন্ কাবেরী। আমার কাছে চাল্ মেরো না—হাঁড়ির খবর জানি।

তার মাথার কাপড় খুলে গেল। সাগর উদ্দেশে—ইত্যাদি মনে পড়লো প্রগতির, আরও মনে পড়লো ষাঁড়ের শত্রু ও বাঘের কথা।

সে বন্যার স্রোত সহিতে পারে কার সাধ্য। কাবেরী হাঁমলে বল্লে—আমি ব্যাপারের কথা বলছি। বাঙ্গালীর সে মাথাটা খুব বড় আছে।

তার পর বাকী সময় সে প্রগতির সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়লের স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্ল্লে।

মুকুলমণির সঙ্গে কস্তুরীর দেশী অস্ত্রের কথা হ'ল। বোকা সব ডাক্তার, দাস-বৃত্তি তাদের, তারা কেহ দেশী অস্ত্র কিনতে চায় না।

—এক একবার মনে হয় এদের জন্য কেন আমরা এত কষ্ট সহ্য করি।

মুকুল এ স্থবিধা ছাড়লে না। সে বল্লে—আপনার মত মহাপ্রাণের উচিত অনাথাদের সেবা করা।

নলিনী হান্নার কথা ভাবলে। আরও অনেক উপার্জ্জন-ক্ষম উকীল ডাক্তারের শান্ত সংসারের কথা। সে বল্লে—দেশের মেয়েরা যদি মানুষ হত। তারা গোলামদের গোলামী করে আর ভাবে তারা দেবী, গৃহিণী।

মুকুলমণি আবার বিশ বাঁও জলে পড়লো। সে বল্লে—না আমি গরীব বিধবাদের কথা বলছি। যারা অনর্থক উৎপীড়ন সহ্য করে। অনেকে জানেন তো অবস্থার দোষে ওর নাম কি—

অত্যাচার যার উপর হয় কস্তুরীস্থতা তার মিত্র। সে বল্লে—হ্যাঁ—তা—দে—র কথা ভিন্ন।

মুকুল তাকে ধীরে ধীরে বৈধব্য-দমন-সমিতির কথা বোঝালে। তার স্বামী অর্থ দিয়ে, শক্তি দিয়ে সমিতির সেবা করে। সে যদি নলিনীর মত শক্তিশালিনী নারী কর্ম্মী পায় তো অনেক হিত হয়—বিধবাদের।

কস্তুরীস্থতা বিস্মিত হ'ল। ষষ্ঠীর কথায় বলা যেতে পারে—তার কাছে ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নাই। সে বল্লে—কি আশ্চর্য্য! আমি তো ওঁকে গোপালভাঁড় ভেবেছিলাম।

মুকুলমণির পতি-ভক্তি চোট্ খেলে। না, চিরকুমার! থাক ষষ্ঠী সেন। সে উত্তর দিলে না। অশিষ্টতা নিরর্থক। সে পুত্রের সঙ্গে কথা কহিলে—গাড়িতে যাবে ?

যদি খোলাখুলি অসন্তোষ প্রকাশ কর্ত্ত মুকুল, তা'হলে কস্তুরীস্থতা বিদ্রোহী হত। কারণ বিদ্রোহকেই সে এ দুর্ব্বিষহ জীবিকা-রণের প্রধান অস্ত্র বলে জানতো। কিন্তু এই কোমল-স্বভাব মহিলার তিতিক্ষার কাছে তাকে মস্তক অবনত কর্ত্তে হল।

সে বল্লে—রাগ করবেন না। বলছিলাম আপনার স্বামী খুব রসিক।

এবার মুকুলমণি তার টুঁটি টিপে ধরলে। সে বল্লে—বিলক্ষণ! অপর কেহ স্বামী নিন্দা কর্ল্লে নিশ্চয় কষ্ট পেতাম। আমরা ক্ষুদ্র—আমরা ছোট। খেলনা নিয়েই খেলাঘরে দিন কাটাই। আপনি বড়, আপনি ছোটর মন কি করে জানবেন, দিদি। আপনি তো বিয়ে-থাওয়া করেন নি।

সে হাসলে। উজ্জ্বল নয়নের কাতর চাহনী অপ্রস্তুত কর্লে স্বদেশ-প্রেমিকাকে।

দিদি! তাকে তো এত আপনার কেহ করেনি কোনো দিন—দাম্ভিক গোলামদের সংসার থেকে। মেয়েটা সত্যিই ভালো। মধুর! উচ্চ! যদিও সে কিম্বা তার স্বামী দেশের কাজে কোনো দিন জেলে যায়নি। নরম কাদা কমনীয় স্বভাবতঃ—কিন্তু সে গলে না। শক্ত লোহা কিন্তু যখন গলে সে জলের মত হয়। সে মুকুলের কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে—ছিঃ! ভাই রাগ কর না। আমারও বিয়ে হ'য়েছিল—তবে আমি স্বামী চিনিনি। ভোরের সূর্য্য ভোরেই অস্ত গিয়েছিল।

মুকুলের সহানুভূতি-ভরা চোখের উত্তেজনা আর তার নিজের মনের অব্যক্ত অসন্তোষ নলিনীর গোপন মনের কবাট খুলে দিলে। সে বল্লে—তবে তুমি যা বলছ তা কল্পনা কর্ত্তে পারি বুঝতে পারি না। স্বামী ছিল জীবনে এক বছর—যখন আমি ছিলাম মাত্র বারো বছরের মেয়ে।

তারা উভয়ে নীরব হ'ল। মুকুলের মনে জাগ্‌লো স্বামীর সমাজ-সেবার অত্যাবশ্যকতা। কে জানে আজীবন স্নেহ ভালবাসা পেলে এই গর্ব্বিতা রমণীর চরিত্র কি ভাবে ফুটে উঠ্‌তো। সে বল্লে—বুঝেছি, তাই আপনি দেশের কাজ কর্ত্তে সময় পেয়েছেন।

নলিনী জবাব দিলে না। মুকুল বল্লে—দেশের সেবা অনির্দ্দিষ্ট জনের সেবা। পরসেবা মানে—

এবার নলিনী যেন তার জীবনের বড় একটা প্রশ্নের জবাব পেলে। মুকুলের শান্ত ধীর চোখের চাহনীতে সে শান্ত জীবনের যেন ছায়া দেখলে। সে যেন চমক ভাঙ্গা সুরে বল্লে—ঠিক বলেছেন। সত্য কথা। অনির্দ্দিষ্ট, অচেনা, অজানার সেবা। নামজপ।

মুকুল গভীর জলে গিয়ে পড়ছিল। অনির্দ্দেশের সেবার কথা সে শুনেছিল প্রগতির সঙ্গে তরফদারের তর্কে। সে কথাটা ব'লে আজ তার স্পষ্ট মানে বুঝলে। সাকার নিরাকার পূজার মত। জয়মা কালীর কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা করা আর ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ হেঁয়ালীর অর্থ বোঝা।

নলিনী নিজের মনে বলতে লাগলো সেই অনির্দ্দিষ্টকে যখন নির্দ্দিষ্ট করি, তখন দেখি, যার সেবার জন্য এত লাঞ্ছনা-ভোগ, সে সেবা চায় না—হাসে। সচ্ছল যার অবস্থা সে স্বার্থপর, সে বিদ্রূপ করে আমাদের দেখে। আর আমাদের সহকর্ম্মীরা কে বড় কে ছোট তাই নিয়ে খুনোখুনি করে।

তারা দেখেনি প্রগতি এসে শুনছিল তাদের কথা। সে বলে ফেল্লে—আর বোধ হয় দেখেছেন দেশের সেবা অনেকে করে দেশবাসীকে ভালবেসে নয়। মহাত্মার প্রেম, দেশবন্ধুর নিঃস্বার্থ ভালবাসা—

নলিনী বল্লে—আড়িপাতা কি পাণ্ডিত্য নাকি?

সে হাসলে। সর্ব্বনাশ! নলিনী হাস্‌তে জানে! তার পর স্বামী-স্ত্রীতে তার অনুমতি পেলে সমিতিকে সাহায্য করবার। শুধু তাই নয়—সে প্রতিশ্রুত হল পরদিন তাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কর্ত্তে।

প্রগতি বল্লে—ষষ্ঠীবাবুকে জানেন? হামজুল্লি—

—খুব জানি। তিনি প্রায় আমার বাবার কাছে উপদেশ নিতে আসেন। বাবা বলেন লোকটি নির্দ্দোষ।

—ওঃ! সে বিষয়ে সন্দেহ আছে? হামজুল্লি করে, না, ঝাঁপাইঝোড়ে না—

নলিনী হেসে বল্লে—পাঁয়-পাঁয় কি একটা করেন।

—পাঁয়তারা।

গাড়িতে প্রগতি বল্লে—মুকুল সত্যি তুমি আমার আঁধার রাতের জোনাকি।

—চাঁদ কে?

আজ তার হারবার পালা। প্রগতি ভাবলে ভারী দামী শিক্ষা—বোবার শত্রু নাই।

(৮)

মেজাজ কমলাপতির মোটে ভাল ছিল না সেদিন। একে তো ষষ্ঠীচরণের কাজে শৈথিল্য, তার উপর শিক্ষিত লোকের বিজ্ঞান-বিরোধিতা। তা না হ'লে বঙ্গবাসী কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিজের পাকা ফোড়া না কাটিয়ে কয় ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাহায্যে তাকে ফাটিয়ে ফেলেছে। পাষ্টুর, লিষ্টার, মেচ্‌নিকফ জীবনপাত করে যে কোটী কোটী রক্তবীজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে গেল—বৈজ্ঞানিক করালীবাবু তাদের ধ্বংস-লীলা দেখ্‌তে পেলেন না—হায় অভাগিনী বঙ্গমাতা!

ঠিক্ সেই চিন্তার স্রোতে যেন ভেসে এলো প্রগতি মিত্র। শুধু আসা নয় - হাসিমুখে প্রবেশ।

—কি হে?

— তোমাদের মত পণ্ডিত মূর্খরাই দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাচ্চে। ষষ্ঠীখুড়োকে নিয়ে কি কর্চ্চ।

—ওঃ! সে স্ফূর্ত্তি ক'রে লেগে গেছে বৈধব্য-দমনের কাজে।

—উচ্ছন্ন দিলে দেশটা তোমরা।

—আমরা কারা?-- জিজ্ঞাসিল ডাক্তার মিত্র।

—তোমরা শিক্ষিতেরা—যারা আসল তত্ত্ব ভুলে বাজে কাজ কর। তোমাদের দোষে ইনকাম্ ট্যাক্সের ব্যাপারটা দেখ্‌ছ!

প্রগতির আনন্দ হ'চ্ছিল। ভাবছিল রাগই পুরুষের লক্ষণ। বল্লে—আমাদের দোষে আর কি হয়েছে?

—কি না হ'চ্চে। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি চীনের সঙ্গে আবার জাপানীর যুদ্ধ লেগেছে শুনছিলাম।

—কি ব্যাপার? সেফটি ক্ষুরে দাড়ি কেটে ফেলেছ?

ষষ্ঠীচরণ এলো—আর তত্ত্বানুসন্ধান হ'ল না। সে বল্লে - পেট্-কাটার লোক এসেছে।

—পেট্-কাটা কে? দেখ ষষ্ঠীখুড়ো তুমি অন্য কাজ দেখ। আমি বিজ্ঞানের অমর্য্যাদা আর দেখ্‌তে পারি না।

— লাও ঠেলা। কাট্‌লে তার পেট—তাকে বলবো কি গন্ধাকাটা না সূর্পনখা।

—অ্যাপেন্টিসাইটিস। বল তিন বার বল।

আচ্ছা তাই হ'ল—অ্যান্টিস্যান্টি। সে অ্যান্টিস্যান্টি যে হেঁচ্‌কী তুলছে।

—হেঁচকী তুলছে তা আমি কি করব। অমন ছবির মত কেটে দিলাম—ভারি সফল অস্ত্রোপচার। সর্জ্জারি শিখেছি—হেঁচ্‌কী ওঠার কি জান?

প্রগতি দেখ্‌লে বন্ধুর মেজাজ বড়ই খারাপ। বল্লে—আহাঃ, ভদ্রলোক কষ্ট পাচ্চে—একটা কিছু ব্যবস্থা কর।

সে বল্লে—সত্যি প্রগতি আমি জানি না। সেটা ফিজিসিয়ানের কাজ।

ষষ্ঠীর হৃদয় এখন পর-হিতে মশ্‌গুল থাকে সর্ব্বদা। সে বল্লে—থম্‌কি খেলে হেঁচ্‌কী থামে। যদি রোড়া ক'রে ধমক দাও তো—

—চুপ!—

—তা কি বল্‌ব? হেম কব্‌রেজ হিঙের ধোঁয়া দিয়ে হেঁচ্‌কী সারাতো।

হতাশ হলো ডাক্তার। সে নিঃশব্দে নীচে গেল রোগীর ব্যবস্থা কর্ত্তে।

প্রগতি বল্লে—কর্ত্তা রেগেছেন কেন?

—ভগা জানে। লোকটার পেট কেটে ফারদার্ফাই করেছে—এখন সে চুবড়ি হাতড়াচ্চে পটোল তোলবার জন্যে।

ষষ্ঠী এখন প্রায়ই নলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সমিতির অনেক কাজ করেছে তারা দুজনে। নলিনী যায় সফরে প্রচার কর্ত্তে, নিপীড়িতার উদ্ধার কর্ত্তে। ষষ্ঠী যায় তার সাথে। যাদের বাড়ী যায়, তারা প্রায় অশিক্ষিত লোক—তারা ষষ্ঠীর হামজুল্লিতে খুসি হয়। সে সব কথা প্রগতিকে বল্লে ষষ্ঠী। দুটা বিবাহ দিয়েছে তারা এই অল্প সময়ের মধ্যে।

—আর একটা মেয়ে ছেলে মট্‌কেছে—সিঁথি চায় সিঁদুর পরতে।—

- খুড়ো তোমার কি হ'ল?

—বলুনি বাবা। একেবারে পড়লো গাড়ি নদ্দামায়। শুনবে ভাইপো?

কিন্তু শোনা হ'ল না; কারণ, হাসিমুখে ডাক্তার গৃহে প্রবেশ কল্লে। টেলিফোন এসেছে একটু ডাবের জল খেয়ে রোগীর হিক্কা বন্ধ হ'য়েছে। সুতরাং খুড়ার নদ্দামায় পড়ার গল্প শুন্‌তে হ'ল।

একদিন তারা প্রচার কর্ত্তে গিয়েছিল নাটাগড়ু এক কর্ম্মকারের মেয়ের দুঃখ দেখে নলিনী বৈধব্য-জীবনের কঠোরতা সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করছিল—গ্রাম্য পথে ফেরবার সময়। পথের দু'পাশে সবুজ ধানের ওপর পূবের জোলো হাওয়া হামজুল্লি কর্চ্ছিল। তাদের ডগার ওপর সাঁতরাচ্ছিল পড়ন্ত রদ্দুর।

—বুঝে ফেল্লাম বাপ্‌জান ইশারা—ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো। ওঃ—নির্জ্জন জীবন—কত জ্বালা—এই সব বচনম বাপ্‌জান। আমি ভাবলুম এই তো মরশুম লে-লুম্ন্ করবার। বল্লাম—দেখুন আমারও প্রাণ ধাপার মাঠ। রোদের সময় রদ্দুর, বর্ষায় লে টুপ্‌টুপ্।

—বহুৎ আচ্ছা খুড়ো! সে কি বল্লে?

—সে তাকালে আমার বাগে। বাপ। যেন হারুছুতোর তুরপুন ঘোরাচ্চে। কিন্তু বাপ্‌জান ওস্তাদজি বলতো পাঁয়তারার মুখে তড়পানো ছেড়োনা। আমি সামলে নিয়ে বল্লাম—ওর নাম কি—দুত্তরি ছাই—ঢাক্‌ ঢাক্‌ গুড়গুড়ে কাজ কি?

তারা হাসলে। প্রগতি বল্লে—ঠিক্‌ কথা।

সে বল্লে—কাজ কি বাবা কথার মোচকোফেরে। আমি বল্লাম কি পরের মাথা রাঙিয়ে কি হবে? এই যদি—দুরতোর ছাই—হ্যাঁগা তুমি কেন আমায় বিয়ে করনা।

তারা হেসে উঠলো। একসঙ্গে বল্লে—তার পর।

—তার পর বাবা বৌ না হ'য়ে একেবারে শালি। দু' হাতে দুটো কান ধরে বল্‌লে—আর কখনো ও-কথা বল্‌বে। আমি নাক মল্লাম, মা কালীর দিব্বি গাললাম। সে কান্‌ ছেড়ে দিলে আমার। তার পর কামার বৌয়ের গল্প কর্ত্তে লাগ্‌লো।

এর পর চীৎকার না করবার উপায় নাই। সে শব্দের যখন রহস্য-ভেদ করবার জন্য হান্না ও মুকুলমণি সে ঘরে প্রবেশ কল্লে—তখন জিভ্‌ কেটে ষষ্ঠী পালালো।

সব শুনে মুকুল বল্লে—আমি জানতাম। বিয়ে সে কর্ব্বে না। কিন্তু কাজটা তার ভারি ভাল লেগেছে। সেদিন আমার বাড়িতে এসে বল্লে—বোন তোমার সেই নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট ভালবাসার মানে বুঝেছি।

হান্না বল্লে—থাম্‌। তুই কি থিয়েটার কচ্ছিস নাকি।

সে বোঝালে। বল্লে—না, সত্যি নলিনী বল্‌ছিল—কংগ্রেসের কাজে রাগ আস্‌তো, মহাত্মার ভাব আস্‌তো না। কিন্তু এ কাজে এক একটা মেয়ের একটু সেবা করি আর প্রাণ ভরে ওঠে আনন্দে। এখন যেখানে সে অত্যাচার দেখে সেখানে তার দুঃখ আসে রাগ আসে না।

ডাক্তার সেন বল্লে—আইন ক'রে হোমিওপ্যাথি বন্ধ করা উচিত। লোকটা বোধ হয় এতক্ষণে মারা গেছে।

(৯)

ডায়মণ্ড হারবার থানায় মহা গণ্ডগোল। সহরে পাঁচখানি ছাপানো কাগজ পাওয়া গেছে যার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা জাহান্নমের পথে ধাবমান। কি সর্ব্বনাশ! এমন প্যামফ্লেট কে এদেশে আন্‌লে?

বিদ্যুতের মারফত সংবাদ গেল কলিকাতায়। এস্‌ বি, আই-বি সব পরামর্শ দিলে কি করা উচিত। এস্‌-ডি-ও হাকিম অন্য হাকিমদের আর পুলিসের ছোট বড় বাবুদের নিয়ে মজলিশ করলেন। সব সরকারী কর্ম্মচারি তৎপর হ'ল। কেবল মুনসেফ্‌ বাবুরা—এ হাঙ্গামার কিছু শুনলেন না, আর শোনবার অধিকারও রাখেন না।

বামাচরণ চক্রবর্ত্তী এ এস্‌-আই রূপে কলিকাতায় ছিল আইন অমান্য আন্দোলনের সময়। কর্ম্মকুশলতার জন্য সে বাঙলা পুলিসের দারোগা হয়েছিল। লোকটা হুঁসিয়ার—দোষের মধ্যে মুদ্রাদোষ ছিল—চোখ্‌ পিট্‌পিটুনি।

সে চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে বল্লে—আজ্ঞে হুজুর কস্তুরী-সুতা এসেছে এখানে।

এস্‌-ডি-ও মিঃ মুখার্জ্জি সব বরদাস্ত কর্ত্তে পারে কেবল বামাচরণের চোখ পিট্‌পিটুনি সহ্য কর্ত্তে পারে না। সে বল্লে—তাতে আর কার কি এসে গেলো।

বামাচরণ বোঝালে। কস্তুরী-সুতা আইন-ভাঙ্গা আন্দোলনে দুবার জেলে গেছে। তবে এখন সে সামাজিক কাজ করে—বিধবার বিবাহ দেয়।

—বেশ করে।

বামাচরণ হতাশ হ'ল। হয়ত অপর কেহ কথাগুলা বল্লে—হাকিম শুনতো। বড় ইনস্‌পেক্টার নন্দেংচাঁদ বাবু ভুঘোর লোক। সে বল্লে—একবার তল্লাস কর্ত্তে ক্ষতি কি?

মিঃ মুখার্জ্জি বল্লে—দেখ্‌ছেন এ আতঙ্কবাদীদের ইস্তাহার। কস্তুরী-সুতা সে কাজে যাবে না।

কিন্তু সাবধানের বিনাশ নাই। আর একটা কিছু করা তো চাই। কস্তুরী-সুতা নফরকুণ্ডুর খালি বাঙ্‌লায় বাসা নিয়েছিল। সিদ্ধান্ত হ'ল যে ভোরের সময় বাঙ্‌লা ঘেরাও ক'রে খানা-তল্লাস করা হবে। যদি বিদ্রোহী প্যামফ্লেটের প্রচারক সে হয় তো নিশ্চয় সে কাগজ তার বাসায় পাওয়া যাবে।

রাত্রে কিন্তু নলিনী মৌড়ি-ভাঙা গ্রামে নিশি মণ্ডলের বাড়ি গিয়াছিল—তার কন্যা গঙ্গার বৈধব্য দমনের শুভ ইচ্ছায়।

ডাঃ সেন বিভীষিকাপুরের রাজার বিস্ফোটক কাট্‌বার জন্য সাত দিন কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল। তাই

ষষ্ঠীচরণ এসেছিল এই দমনকার্য্যে নলিনীর সহায়ক হয়ে। নলিনী রাত্রে কোনো গৃহস্থের সংসারে আশ্রয় নিত। তাদের কার্য্যালয় ছিল নফরকুণ্ডুর বাঙলায়।

ভোরে উঠে ডন বৈঠক করা ষষ্ঠীচরণ সেনের বহুদিনের অভ্যাস। সে নগ্ন দেহে মাত্র কৌপীন পরিধান ক'রে পিছনের একটা ঘরে দম্ করছিল। কে জানে নলিনী কখন আসে। কাজেই সে দিয়েছিল দরজা বন্ধ করে।

পুলিস প্রথমে বাড়ি ঘেরাও করলে। তার পর বড় ইনস্পেক্টার ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করলে। নিঃশব্দে তারা সে ঘরের দশদিক নিরীক্ষণ কর্ত্তে লাগ্‌লো দুষ্ট পত্রিকার খোঁজে।

যারা পিছনে ছিল তাদের মধ্যে ভগ্‌লু মিশির বুদ্ধিমান। তার উপর হুকুম ছিল যে কেহ যেন বাড়ির বাহিরে না যায়—বা কাগজপত্র না ফেলে তা' দেখবার। তার উচ্চাশা তাকে প্রণোদিত করলে একটু উঁকিঝুঁকি মারতে পিছনের ঘরে। সে ঘর থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাসের স্পষ্ট শব্দ আস্‌ছিল। সে কান পেতে শুন্‌লে, নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে দেখলে কিছু দেখা গেল না। সে জুড়িদারকে ডাক্‌লে—দুধ নাথোয়া কা ফসর ফসর করত হায় হো!

দুধনাথ ওঝা বালিয়া জেলা স্কুলে পড়েছিল—কাজেই তার মাথায় বুদ্ধির লহর খেল্‌তো। যখন শব্দ ভিন্ন অন্য কোনো অনুমানের ভিত্তি পেলে না সে জানালায় একটা টোকা মারলে। তাতে ফোঁসফোঁসানী ক্ষণিক বন্ধ হয়ে আবার অপ্রতিহত ভাবে চল্‌তে লাগলো। সে এবার জোরে ঠোক্কর মারলে জানালায়।

ষষ্ঠী ভাবলে পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা হামজুল্লি করছে। এমন কার্য্য পোড়োবাড়ি ভর্ত্তি হলে সে করেছে বহুবার অতীতকালে। সে ওঠ বোসের তালে বল্লে হৈঃ!

—হৈঃ!—আর সন্দেহ নাই। ভগ্‌লু মিশির আর দুধ্‌নাথ বড়বাবুকে খবর পাঠালে বক্স্‌ মিঞার মারফত।

বাড়ির ভিতর দিকের একটা জানালার এক টুকরা কাঠ্‌ ছিল ভাঙ্গা। বামাচরণ তার ফাঁকে দেখলে ঘরের ভিতর এক কৌপীনবস্ত বিরাট পুরুষ ওঠ্‌বোসের তালে তালে হুস্ হুস্ করে শব্দ কর্চ্চে।

এক্ষেত্রে দরজা ভাঙ্গাই সু- ব্যবস্থা—তারা স্থির কল্লে´।

দরজায় ঘা দিয়ে দরজা ভাঙবার উপক্রম হচ্চে অতি প্রভাতকালে এ মহা হামজুল্লি। লজ্জা নিবারণের জন্য ষষ্ঠী তাড়াতাড়ি একখানা কাপড় তুলে নিয়ে নিজের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন জড়ালে তখন শান্তিরক্ষকদের সমবেত চেষ্টায় কবাট্ গেল ভেঙ্গে।

তারা বেগে তাকে ধরলে। বিস্মিত ষষ্ঠীচরণ বাহিরে এসে দেখলে যারা তাকে ধরেছে তারা পুলিস। বিস্মিত পুলিস দেখলে একখানা খদ্দরের সাড়ি-জড়ানো ছদ্মবেশী এক দিব্য-কান্ত পুরুষ।

তার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ ভোরের শিশিরের মত উপে গেল। তারা তাকে গেরেফতার করে নিয়ে এস্-ডি-ওর বাঙলায় চললো।

সেদিন রবিবার। বৃহস্পতিবার রাত্রে মুখার্জ্জি যখন ফ্রিমেসন হলে খানা খাচ্ছিল তখন তার মেশন-ভ্রাতা ব্যারিষ্টার তরফদার রবিবার সাতটার সময় ডায়মণ্ড হারবারে তার বাসায় চা খেতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তখন সাতটা বাজতে তিন মিনিট—কাজেই সে ব্রাদার মুখার্জ্জির বাঙলার সামনে পায়চারি করছিল বুইক্ গাড়ি থেকে নেমে।

ঠিক্ যখন সাতটা বাজলো—পুলিসের মিছিল মুখার্জ্জির বাঙলায় প্রবেশ কল্লে। তার সঙ্গে গেল ব্যারিষ্টার তরফদার। সে গোলমালে ব্যাপারটা বুঝলে না। পাছে বিলম্ব হয় এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি কক্ষে প্রবেশ কল্লে´।

মিছিলও তখন ভিতরে এলো।

মহিলা বেশে ষষ্ঠীচরণকে দেখে এস্-ডি-ও বল্লে—এ কি ব্যাপার!

সে যে কস্তুরী-সুতা না তা সে বুঝলে।

ইনস্পেক্টার রিপোর্ট দিলে—কস্তুরী-সুতা ফেরার। কোনো ছাপা কাগজ পাওয়া যায় নি—বৈধব্য-দমন সমিতির কাগজ ব্যতীত। কিন্তু এই লোকটা একটা বন্ধ ঘরে হুস্ হুস্ করছিল—দরজা ভেঙ্গে তারা তাকে সাড়ি বিভূষিত দেখে সসন্দেহে নিয়ে এসেছে।

কি বিপদ! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় মুখার্জ্জি সভ্য-তালিকায় ব্রাদার তরফদারের নাম পড়ে বল্লে—আরে! কি ব্যাপার এ যে তোমার নাম।

বন্ধুর সরকারী কাজের কথা আড়ি পেতে শোনা নিশ্চয়ই ঘোর অশিষ্টতা। তরফদার তাই ষ্টেট্‌সম্যানের

চিত্র-কলায় মনোনিবেশ করেছিল। বন্ধুর কথায় সে চেয়ে দেখ্‌লে—সাড়ি পরা ষষ্ঠীচরণ। সে বল্লে—এ কি ষষ্ঠীবাবু?

সে বল্লে—খো করনা বাপজান। সেই কথা আমিও তো জানবার চেষ্টা করছি। সাত সকালে এ কি হামজুল্লি?

তখন কৈফিয়তের পালা পড়লো। পরস্পরের কথা শুনে যখন সবাই একটা প্রহসনের সন্ধান পেলে তখন এক কাণ্ড হল। মণিহারা ফণিনীর মত এক স্ত্রীলোক সদর্পে পুলিসের মানা উপেক্ষা করে সেই কক্ষে প্রবেশ কল্লে। সে শ্রীমতী নলিনী দেবী।

নলিনী বল্লে—এস-ডি-ও কে?

মুখার্জ্জিকে স্বীকার কর্ত্তে হল সে কর্ম্ম সে করে।

সে বল্লে—আমি কৈফিয়ত চাই। আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাসা বাড়ি ভেঙ্গে আমার সহকর্ম্মীকে কেন এখানে ধরে আনা হ'য়েছে?

চক্রধর তরফদারের আইন-ভরা মাথায় একটা ভাব এলো। সে বিনীত ভাবে নলিনীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বল্লে—আপনাকে পাছে গেরেপ্তার করে সেই ভয়ে আপনার ইজ্জত বাঁচাতে ষষ্ঠীবাবু আপনার সাড়ি পরে ধরা দিয়েছেন। লোকটা মহানুভব। আপনার সহকর্ম্মী এত উচ্চ—

—নিশ্চয়।

ভুল আইন বল্‌লে জজেরা যেমন করে তার দিকে তাকায় সেই চাহনীতে তাকিয়ে নলিনী বল্লে—নিশ্চয়।

—এখন ব্যাপারটা বুঝুন। তার পরিচয় পেলেই এস্‌-ডি-ও ওকে ছেড়ে দেন। না হলে একশো নয়ে জেল দেবেন।

নির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট ভালবাসার কথা নলিনীর মাথার মাঝে বিজলীর মত চম্‌কে গেল। ষষ্ঠীর নীরব স্বার্থত্যাগ তার জন্য। সে ষষ্ঠীর দিকে তাকালে। আহাঃ! বেচারা! তারই নিজের খদ্দরের সাড়ির ভিতর দিয়ে অনেকখানি ষষ্ঠীচরণ দেখা যাচ্ছিল। দেশের জন্য নয়, একজনের জন্য জেলে যাবার কঠোরতা তাকে ভোগ কর্ত্তে দেওয়া হবে নিষ্ঠুরতা।

পৃথিবীতে সকল যুগান্তর ঘটেছে মুহূর্ত্তের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। নলিনী মুখুজ্যে মশায়ের দিকে এগিয়ে বল্লে—আপনারা এঁর পরিচয়ের জন্য ব্যাকুল। তবে শুনুন বলি—ইনি আমার ভাবী স্বামী।

সভাগৃহে যেন বিস্ফোটক বিদীর্ণ হল। তরফদার মনে মনে বল্লে—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

আর ষষ্ঠীচরণ বল্লে—কি হামজুল্লি। মরদকী বাত, হাতী কি দাঁত।

এই কথা বলে সে দুপাক নাচ্‌লে।

সম্পাদকের মন্তব্য—

গত মাসে ভারতবর্ষে ছাপাখানার উপদেবতার কৃপা একটু বিশেষভাবে বর্ষিত হইয়াছে। ডাকনাম ও উপদ্রব বলিতে সাহস করিলাম না, কি জানি আবার যদি দৃষ্টি দেন। কৃপাটা শ্রীমান কেশবচন্দ্র গুপ্ত ভায়ার গল্পের উপরই বেশী হইয়াছে। ভায়ার এটা মহাগুরু-নিপাতের বৎসর। তাঁহার গল্পের নাম 'হামজুল্লি' হাসজুল্লিতে পরিণত হইয়াছে এবং ৫৮৫ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনের পর অন্যত্র হইতে ১০ লাইন উঠাইয়া লইয়া আসিয়া আমাদের অপ্রস্তুত, কেশব ভায়াকে ক্রোধান্বিত ও পাঠকগণকে ধাঁধায় ফেলিয়াছেন। পাঠকগণ ৫৮৫ পৃষ্ঠার ১৪ লাইনের "কস্তুরী-সুতা চিকিৎসককে বল্লে আপনি কি অস্ত্র ব্যবহার করেন?" এর পর ৫৮৬ পৃষ্ঠার ১৫ লাইনের "কি করে, বাধ্য হয়ে তাকে অস্ত্রচিকিৎসার উপযোগী কতকগুলো অস্ত্রের নাম করতে হোল"—থেকে ৫৮৭ পৃষ্ঠার ১৫ লাইন "দেশীর মধ্যে দমদম বুলেট যা জেনিভা"—পর্য্যন্ত পড়িয়া লইলেই এ ধাঁধার মীমাংসা পাইবেন।



লৌহ-যোগ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন-ভোর আমার এই লোহা নিয়ে কাট্‌লো। কঠিন কঠোর বজ্রাদপি দৃঢ় এ জিনিষটা থেকে রসের চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেলনা যে তাই নিংড়ে খানিকটা কিছু বের করে নেয়া যাবে। তবুও এই পূজোর বাজারে এর আলোচনা করতে হবে।

লৌহ-যোগের সাধনা করেন না এমন কেউ পৃথিবীতে নেই। আমি বা আমার 'দলীয়' অনেকে করেন তার প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক সাধনা আর অন্যে করেন তা' পরোক্ষ-ভাবে। কিন্তু করেনই;—না করলে—'নান্যেব গতিরন্যথা'। যে কোন ভাবে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে তার সাধনা করতেই হবে।

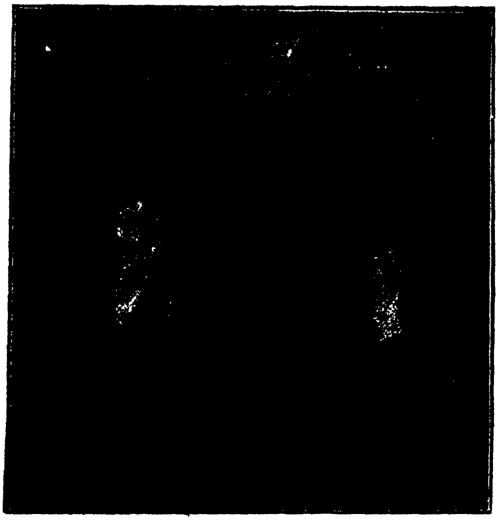
এক পা চল্‌বার উপায় নেই চারিদিকেই লৌহ-যোগ। কেশ-বিন্যাস বা বেশ-বিন্যাস—এদের যত কিছু সুরঞ্জাম সবই হয় লোহার কল-কব্জায়। আহারাদির ব্যবস্থা—শস্যাদি তরি-তরকারির জন্য প্রথমেই চাই—হল চালন বা ভূমিকর্ষণ,—লোহা ছাড়া হয় না। বিবাহে লোহাই প্রধান; সংসারের কাজ-কর্ম্মে চাই লোহা আগে। রেল ষ্টীমার, চলা-ফেরা—লৌহ-যোগের হাত এড়িয়ে হবার যো নেই। সংসার ঘর-করনা ছেড়েও নিস্তার নেই;—শেষ দিনে সঙ্গে লোহা চাই; আর সন্ন্যাস-যোগে লোটা কম্বলের সঙ্গে চিম্‌টায় লৌহ-যোগ পূর্ণভাবে প্রকট।



মিঃ এ, আর, দালাল এম-এ, আই-সি-এস (রিটায়ার্ড) ম্যানেজিং ডিরেক্টর

চিকিৎসায়—এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইও-কেমিক বা আয়ুর্ব্বেদী, কোথাও লৌহ-যোগ ছাড়া গত্যন্তর নাই। আইরণ, ফেরি, ফেরাম্ বা 'পুটিত'—সবই লৌহ-যোগ। এমন কি মুষ্টিযোগেও অনেক সময় লৌহ-যোগ দেখা যায়।

সংসারের বাঁধনের সোনার শৃঙ্খলের প্রধান অবদান



অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্লাষ্ট ফারণেস—একটু সরু হয়ে ঠেলে উঠেছে। আমরা দেখতে গেছি বলে চাদর মুড়ি দিয়ে "বাবু-ভেই" বলেছে

লোহা (নোয়া) ; আবার শান্তি রক্ষার ভীম-দর্শন পুলিশ অবতারের কঠোর শৃঙ্খল যোগেও লোহা। দেবাদিদেব ইন্দ্রের অপ্রতিহত বজ্রও পরাভব মানে এই লৌহ-যোগে এসে—সৌধছাদে লৌহ-যোগের দৃপ্ত ভঙ্গিমায়।

লোহার অলঙ্কার কেহ ব্যবহার করেনা সত্য কিন্তু অলঙ্কারের শীর্ষে স্থান পেয়েছে লোহা—পরিমাণে সে যতটুকুই হোক। অর্থাৎ রাশিকৃত স্বর্ণালঙ্কারের তুল্য অথবা তদপেক্ষাও সম্মানার্হ—ঐ সামান্য একটু লোহা। স্বর্ণের মূল্য বহুগুণ অধিক, কিন্তু সে স্বর্ণও আসে পাহাড় পর্ব্বতের গহ্বরপ্রদেশস্থ খনি হতে। লৌহ-যোগ ছাড়া তাকে স্বর্ণাবস্থায় আনা সম্ভবপর নয়, অলঙ্কারাবস্থায় তো দূরের কথা।

বাস্তবিক লোহার ন্যায় প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ভূধরে-সলিলে গহনে সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব; রাজা, প্রজা, যোদ্ধা-বোদ্ধা সকলের নিকট ইহার আদর; ধনী দরিদ্র, সন্ন্যাসী গৃহস্থ সকলের সহিত ইহার পরিচয়, বাংলা কবির মত ইংরাজ কবিও লোহার সুরে সুর মিলিয়ে গেছেন—



বাইরে থেকে দুটী ব্লাষ্ট ফারণেসের দৃশ্য— টাটা কারখানা

"Gold is for the mistress—
Silver for the maid.
Copper for the craftsman,
Cunning at his trade,
"Good,"—Said the Baron.
Sitting in his hall—
"Put Iron—cold Iron—
Is master of them all." *

এক কথায়, লোহার ক্রমোন্নতি মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতিরই নামান্তর। এইটেই লোহার ইতিহাস।

লৌহবিদ্ অনেকের মতে লোহা প্রথম তৈরী হয় মধ্য এসিয়ার অথবা পশ্চিম এসিয়ার এশিয়া-মাইনর প্রদেশে। অনেকের মতে লোহার প্রথম উদ্ভব ও ঔৎকর্ষ চীনে। কাহারও মতে মিশরে; আবার কেউ বা বলেন ভারতবর্ষে। ইহার ঔৎকর্ষের প্রমাণ ভারতবর্ষে যেমন পাওয়া যায় তেমন আর কোথাও নয়।



১৩। পৃথিবীর বৃহত্তম মোটর—৭৫০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন

লোহার বয়স

কবে কোথায় কাহার দ্বারা কি ভাবে লোহার প্রথম প্রচলন প্রবর্ত্তিত হয় তা' একটা প্রকাণ্ড আলোচনার বিষয়। বিষয়টা জটিল ও মতভেদও অনেক। লোহার বয়স নিরূপণ অতি মাত্রায় দুরূহ। মানব-সভ্যতা যত এগিয়ে চলেছে লোহার ঔৎকর্ষও ততই বেড়ে যাচ্ছে, অথবা লোহার ঔৎকর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাও ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে।

দু হাজার বছর আগের কুতুব মিনারের নিকটস্থ লৌহ-স্তম্ভ যে কি ভাবে তখনকার দিনে তৈরী হয়েছিল তা' লৌহবিদ্‌গণ এখনও ঠিক করতে পারেন না। নানা অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। আজ কোন লোহা তৈরী হ'লে কালই তাতে মরচে ধরে অথবা দুদিন পরে ধরবেই।—দীর্ঘকাল শীত-আতপ-বর্ষায় ফেলে রাখলে একেবারে অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে। কিন্তু দিল্লীর এই লৌহ-স্তম্ভ যুগ-যুগ ধরে শত-সহস্র শীত আতপ বর্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও এতটুকু মরচে ধরে নি। বাস্তবিক

* Rewards & fairies.

পক্ষে এর নির্ম্মাণ-কৌশল মিশরের পিরামিডের নির্ম্মাণ-কৌশল অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

অনেকে বলেন, কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ভারত-বাসীদের কোনরূপ আগ্রহই ছিল না এবং এই কারণেই লৌহ-বিজ্ঞান বিশেষরূপে জানা থাকলেও শিল্প হিসাবে এর ব্যবহারিক বিধির দিকে তাঁরা কোন নজর দেন নি। আদি, অকৃত্রিম ও সনাতন তাঁরা,—চিরদিনই রক্ষণশীল। পুরাতনের পরিবর্ত্তনে তাঁরা নারাজ। পিতা পিতামহ যা করে গেছেন সকল কাযে সেইটেই আঁকড়ে থাকতে তাঁরা অধিক আগ্রহান্বিত। লোহা সম্বন্ধেও তাই। শূর সেকন্দরের ভারত আক্রমণকালে যে প্রণালীতে তাঁরা লোহা প্রস্তুত করতেন, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান যুগেও দেশীয় পদ্ধতিতে লৌহ-নিষ্কাশন ঠিক তদবস্থায়ই রয়েছে।



৯। লৌহ কারখানার একাংশের সাধারণ দৃশ্য



১। লৌহের 'প্রথম-প্রভাত' বা পরিচয় বা জন্ম—আদিম যুগে পাতা পরা লোকটী বাতাস থেকে অগ্নি রক্ষা করছে। পাথরের যে বেড় দিয়েছিল - তা থেকে লোহা বেরিয়ে এল

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তা সত্বেও দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভ কি করে নির্ম্মিত হয়েছিল? আবু পাহাড় ও ধরের লৌহ-স্তম্ভ দুটিও এই ভাবের তৈরী। কোনারকের বালুকা-গর্ভে প্রাপ্ত বড়বড় কড়িগুলি বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

অনেকের মতে প্রাচীন লোহা যা পাওয়া গেছে তাতে দেড় হাজার বছর আগে তা তৈরী হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে তাঁরা টুটানখামেনের সমাধি মধ্যে প্রাপ্ত লৌহ নিদর্শনের নজির দেন। আমরা তার উত্তরে মহাভারতের নজিরে লৌহ শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন "লৌহ-ভীম" দেখাতে পারি। একখানা ছোরা, একখানা ছুরি বা একখানা তরবারী এক কথা—আর লোহার একটা আস্ত মানুষমূর্ত্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

লোহার এই প্রাচীনত্ব বহু আলোচনার বিষয়। এ সম্বন্ধে চারিদিকে বহু নজীর আছে। ভীম-তালের (নাইনিতাল অঞ্চলে) আশে পাশে প্রচুর নিদর্শন আজও বর্ত্তমান। কিংবদন্তী এই যে মহাভারতের যুদ্ধের প্রয়োজনীয় যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি ঐখানেই তৈরী হয়েছিল।

সভ্যতার চিহ্ন রেখা যতদূর পাওয়া যায় তাতে লোহার বয়স খৃঃ পূঃ ৬০০০ থেকে ৪০০০ বছর অনুমান করা যেতে পারে। ভারতে বৈদিক যুগে ও রামায়ণের যুগে

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বা লৌহবিদ্‌গণের মতে সাধারণতঃ মিশর, পশ্চিম এশিয়া, (এ্যাসিরিয়া) চীন বা ভারতবর্ষ লোহার জন্মস্থান হলেও প্রথমগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে তাঁরা স্থান দিয়েছেন। ভারতবর্ষের "জয়-জয়কার" হতে দেওয়া অনেকের মতেই ঠিক নয়। তাই তাঁদের অনেকেই অন্যকে প্রথম স্থান দিতে বিশেষ ব্যগ্র। অবশ্য কেউ যে ভারতকে প্রথম স্থান দেন নি তাও নয়। আমাদের মতে--ভারতেই এ 'মণির' প্রথম বিকাশ, আর



২। আদিম যুগের লৌহ প্রস্তুত প্রণালী—তদানীন্তন ব্লাষ্ট-ফারণেস

লোহার অভাব নেই। তার পূর্ব্বেও সভ্যতার অনেক নিদর্শন আছে। লৌহ-নিদর্শন তার সহগামী।

এই যে প্রাচীন লোহা!—'প্রথম দরশে' তা' কেমন ছিল? কোন্ কুলে কবে কোথায় এর প্রথম বিকাশ? কি ভাবে নিজালয়ে গোপন-বন-ভবনে এর প্রসার?—আজ বিশদ আলোচনা হয়ে উঠবে না। একদিনেই সব বলতে গেলে 'লৌহ-যোগে' সব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবেন। তাই মোটামুটি একটা আভাষ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

ভারতের বন-ভবনেই এর প্রথম প্রচার। "Treatise of Chemistry" বলেন—"ভারতেই সম্ভবতঃ এর 'প্রথম প্রভাত'—"It appears probable that iron was first obtained from its ore in India." *

এবার এই ভারতে কি ভাবে লোহা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হল তারই একটু পরিচয় দেব।

আবহমান কাল থেকে বাংলা লৌহ-যোগের সাধনা

* Treatise of Chemistry—Roscoe & Scheolemmer.

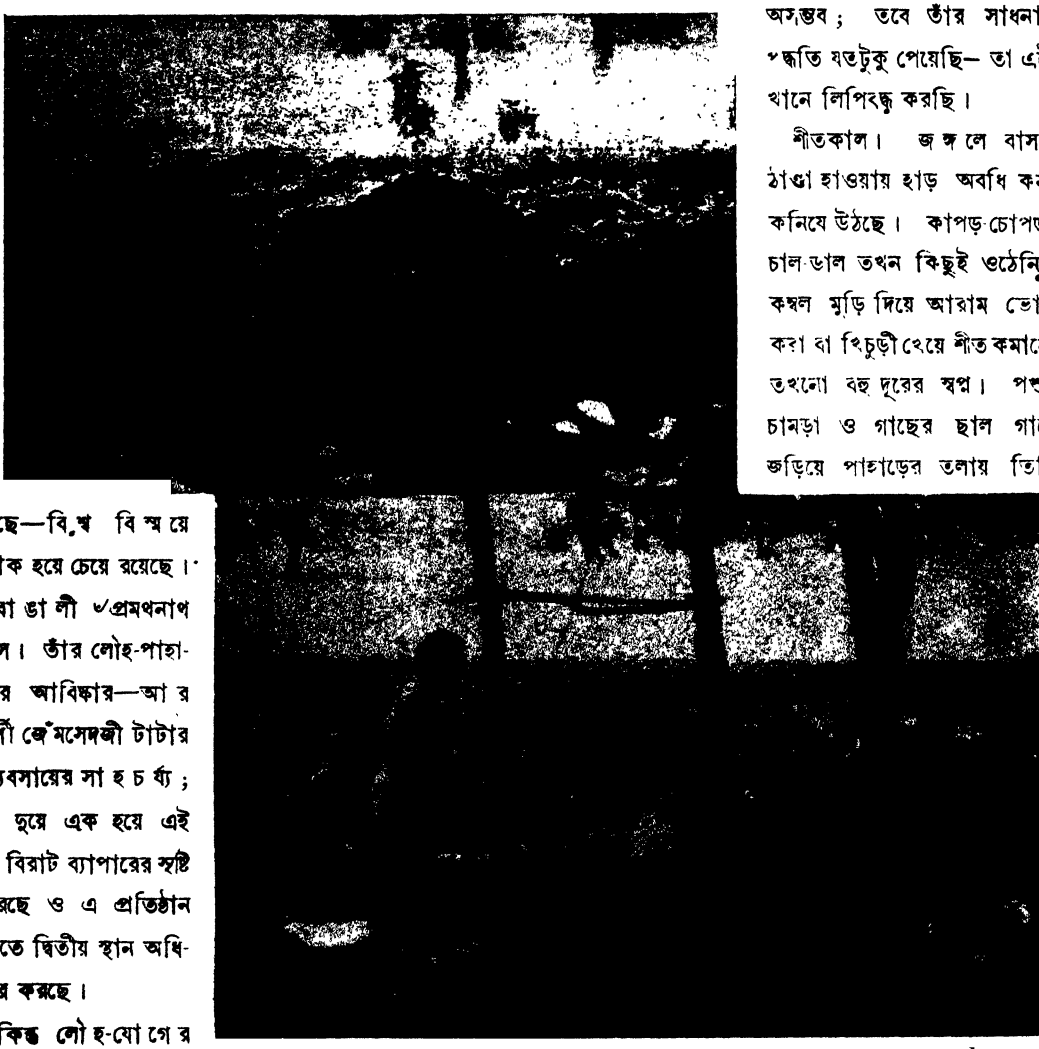
করেছে। তাই বোধ হয় শক্তি-সাধনাই বাংলার মুখ্য সাধনা। সর্ব্বপ্রকার পূজা দিতে আমরা শক্তি পূজারই অবতারণা করি। শক্তি-সাধক বাঙালী আর অগ্নি-সাধক পার্শী বাংলায় লৌহ-যোগের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখিয়েছেন—পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম লৌহ কারখানার সমাবেশ সম্ভব হয়েছে—বিশ্ব বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। এ বাঙালী ৺প্রমথনাথ বোস। তাঁর লৌহ-পাহাড়ের আবিষ্কার—আর পার্শী জেমসেদজী টাটার অধ্যবসায়ের সাহচর্য্য; এই দুয়ে এক হয়ে এই এই বিরাট ব্যাপারের সৃষ্টি করেছে ও এ প্রতিষ্ঠান জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করছে।

কিন্তু লৌহ-যোগের এ সাধনা একদিনে হয়নি। প্রমথনাথ ও জেমসেদজী টাটা এ যুগের লৌহ-যোগের মহাসাধক। তাঁরা সর্ব্বাংশে সর্ব্বথা ভারতের নমস্য।

লোহার প্রথম প্রভাত

এই লৌহ-যোগের যিনি প্রথম সাধক তাঁর বিশেষ পরিচয় দেওয়া বা কোন্ সুদূর অতীতে, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে, কোথাকার বন-ভবনে তাঁর সাধনা—তা আজ বলা অসম্ভব; তবে তাঁর সাধনার পদ্ধতি যতটুকু পেয়েছি—তা এই-খানে লিপিবদ্ধ করছি।

শীতকাল। জঙ্গলে বাস। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় অবধি কন্‌কনিয়ে উঠছে। কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল তখন কিছুই ওঠেনি। কম্বল মুড়ি দিয়ে আরাম ভোগ করা বা খিচুড়ী খেয়ে শীত কমানো তখনো বহু দূরের স্বপ্ন। পশুর চামড়া ও গাছের ছাল গায়ে জড়িয়ে পাহাড়ের তলায় তিনি এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে 'অগ্নিরক্ষা' করছেন—পাছে তা নিভে যায়। এমনি 'ডিউটী' তাঁরা পালা করে করতেন।



৩। লোহার আদিম যুগ—পুরাতন প্রথায় অন্ধযুগে লৌহ নিষ্কাশন।
(উপরে) একটা আস্ত ফারণেস্ লৌহ-প্রস্তরে বোঝাই। আঁচ দিবার ব্যবস্থা হচ্ছে।
(নীচে) পা দিয়ে হাপর সাহায্যে আঁচ দিয়ে লোহা গালানো হচ্ছে

কেন না একবার নিভে গেলে এখনকার মত তখন তো আর হঠাৎ জ্বালা যেত না। কাযেই অহোরাত্র আগুন রাখা দরকার। সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিধার ছিল তখনকার তাঁদের 'ক্লাব'। আর সেই আগুনে—পশুটা পাখীটা যিনি যা পেতেন— পুড়িয়ে নিয়ে সেবায় লাগাতেন।

সেদিন হাওয়ার বেজায় জোর। আগুন ঠিক রাখা দুরূহ। উপায়ান্তর না দেখে ছোট বড় নানা আকারের পাথরের বেড় দিয়ে হাওয়া আট্‌কাতে চেষ্টা করলেন। এমনি দু-এক দিন যায়। হঠাৎ তিনি একদিন দেখলেন যে কুণ্ডের আশে-পাশে ছোট ছোট ফাটলাকৃতি স্থানে কালো কালো শক্ত কি একটা জিনিষ জমাট বেঁধে রয়েছে। তাঁর কৌতূহল হ'ল—কি এ জিনিষ। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রেখে তিনি বুঝলেন যে ও জিনিষটা পাথর গলে বেরিয়ে এসেছে এবং যে পাথর তিনি অগ্নিকুণ্ড রক্ষার জন্য এনেছেন তার মধ্যে দু'চার খানা এমন আছে—যা থেকে এমনি একটা শক্ত জিনিষ তৈরী হতে পারে।

এই হ'ল প্রথম লোহা তৈরী আর ঐ কুণ্ডটাকে বলা যেতে পারে প্রথম ব্লাষ্ট ফারণেস্। ব্লাষ্ট—সে ফারণেস্ নিশ্চয়ই পেত। ছোট বড় পাথরের আশে পাশে ফোকর



৫। আধুনিক ব্লাষ্ট ফারণেস্—টাটার কারখানা। গলন্ত লোহা বের করবার জন্য সবাই তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে

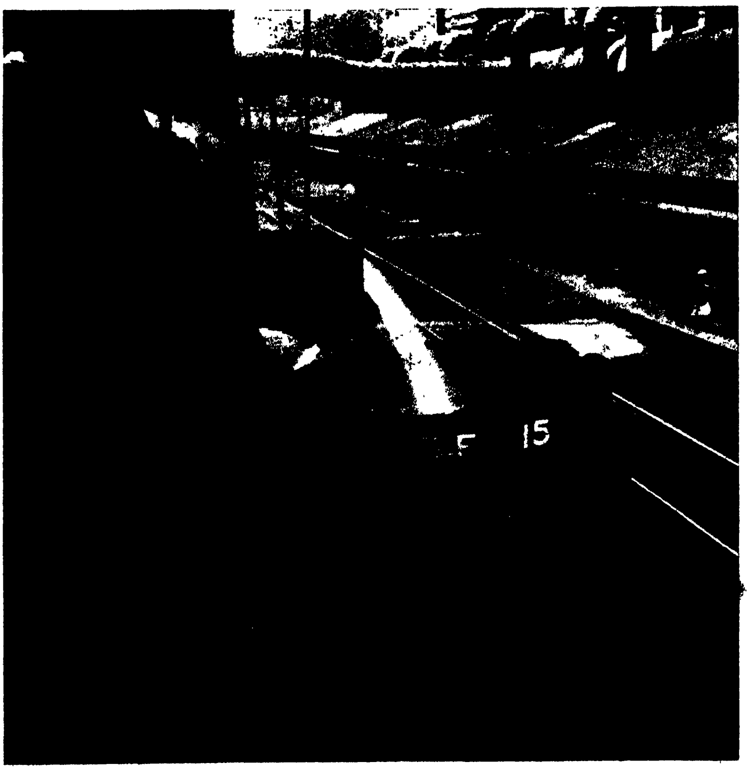


৮　　ব্লাষ্ট-ফারণেসের পারিপার্শ্বিক চিত্র—টাটার কারখানা

নিশ্চয়ই ছিল। ভেতরে অত বড় অগ্নিকুণ্ড আর বাহিরে অমন জোর বাতাস।

এই যদি হয় লোহার প্রথম প্রভাত অথবা লৌহ-যোগের প্রথম সূত্র তবে তা থেকে ধাপে ধাপে সে লোহা কি করে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে তা ভেবে বিস্মিত না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়।

পরের যুগে লোহা-নিষ্কাশনের জন্য ক্রমশঃ অন্য রকম হাপরের ব্যবস্থা হল। তাতে উনুনের মধ্যে বায়ু প্রেরণের



৬। বর্ত্তমান প্রথায় লোহা নিষ্কাশন—পাথর গলে লোহা হয়ে বেরিয়ে আসছে

ব্যবস্থা হওয়ায় আঁচ বেড়ে লোহা তৈরীর প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এল।

ক্রমশঃ চামড়ার হাপর করে তার সঙ্গে বাঁশের নল জুড়ে, ধূম নির্গমের পথ একটু বড় করে 'আদিম ফারণেস্'কে আর একটু উন্নত করে তোলা হল। অবশ্য এ সব প্রক্রিয়া ঠিক পর পরই যে হচ্ছিল তা নয়। এক এক যুগে এক একটা সংসাধিত হচ্ছিল।

ক্রমশঃ এ সব ফারণেসের (উনুনের) উন্নতি সুরু হোলো। তাতে এ দেশে কিছুকাল আগে এ সব ফারণেস্ যে অবস্থায় উন্নীত হোলো তা ছবিতে দেখান হচ্ছে। বিশেষ-মাটীর তৈরী এই উনুন ক্রমশঃ সরু হয়ে ঠেলে উঠেছে—কতকটা ছোট নীচু চিম্‌নী গোছ। তলা দিয়ে আগের উপায়ে হাওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাতে আঁচের জোর আগের চেয়ে বেশী হয়ে লোহা গালাবার সুবিধা অধিক হয়েছে।

আধুনিক পদ্ধতি

এইবার কি ভাবে অধুনাতন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্লাষ্ট ফারণেসে বাইরে থেকে নানা কলকারখানা সাহায্যে ব্লাষ্ট বা বাতাস পাঠিয়ে লৌহ যোগের সাধনা দ্বারা পাথর থেকে লোহা নিষ্কাশন করা হয় এবং সে সাধনার জন্য কত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হয় তার একটা আভাস মাত্র এই স্থলে দিচ্ছি—আলোচনা সময়ান্তরে হবে।

প্রাচীন পদ্ধতির আদিম ফারণেস ও আধুনিক পদ্ধতির পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ফারণেসের ছবি এ দুয়ের আকাশ পাতাল পার্থক্য অতি সহজেই বুঝতে পারা যায় যেন দুটী বিভিন্ন জগৎ। ব্লাষ্ট ফারণেসের কায হচ্ছে পাথর গলিয়ে লোহা বের করা। কি করে—তা' অবশ্য বর্ত্তমান সংখ্যায় আলোচ্য নয়।

এই আদিম প্রথার ফারণেসে 'মিতারা' * ৫।৬ ঘণ্টা কায করে' ৭।৮ সের লোহা তৈরী করে, আর সেই লোহাই তারা সবাই ব্যবহার করে। টাটা কারখানায় লোহা হয়

* সেখানে প্রত্যেকেই 'মিত' (মিত্র হইতে) ও মেয়েরা সব 'মিতিন'।

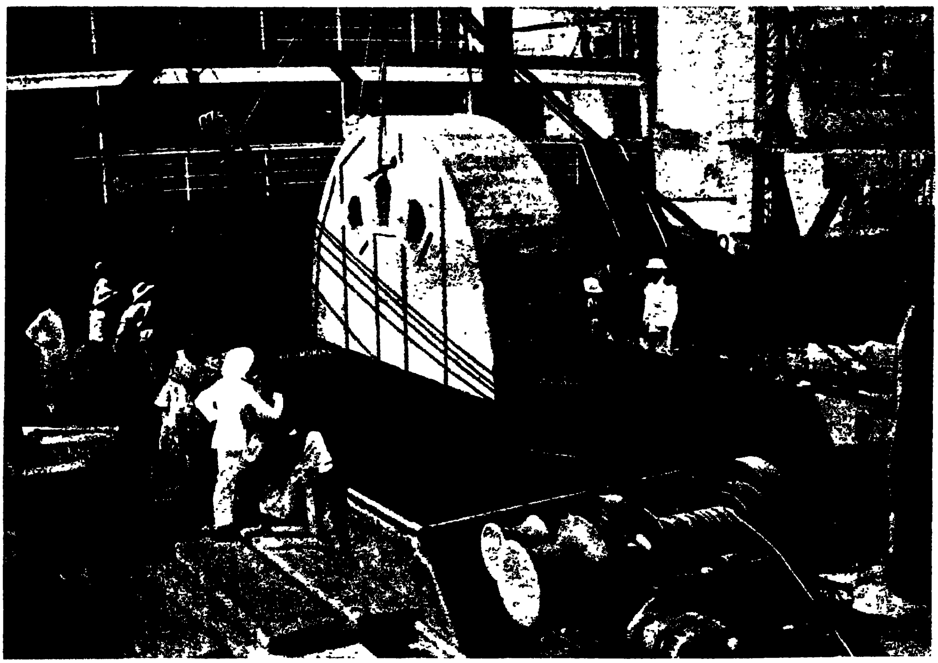
সময়ানুসারে রোজ প্রায় দুই সহস্র টন। এইখানে এই দুয়ের তফাৎ। একটা আদিম পদ্ধতির কারখানা; অন্যটী যুগানুযায়ী ব্যবসায়োপযোগী কারখানা।

এখন এই আধুনিক ফারণেস থেকে লোহা কি ভাবে নিষ্কাশিত হয়ে বেরিয়ে আসে ৫ ও ৬নং ছবি তার একটা ধারণা করিয়ে দিচ্ছে। প্রথম খানিতে দেখান হচ্ছে সবাই দাঁড়িয়েছেন যেন একেবারে মল্ল যুদ্ধে তৈরী হয়ে গলন্ত লোহার সম্মুখীন হবার জন্য। যিনি কিছুক্ষণ আগে ছিলেন সম্পূর্ণ পাথর তিনি এখন গলে বেরিয়ে আসবেন—একটা আগুনের নদী হয়ে—গলন্ত লোহারূপে। এজন্য শাবল

একত্র করলে সমগ্র কারখানাটী কি অবস্থায় পৌঁছোয় তা ৭।৮।৯নং ছবি একসঙ্গে দেখলেই অনেকটা অনুমান হবে।

টাটা তাঁর লৌহ-যোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই আজ তাঁর এই লৌহ-কারখানা সমগ্র পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ পর্য্যন্ত যেটুকু পরিচয় দিয়েছি তা একটা সামান্য কঙ্কালাভাস মাত্র।

যথাযথভাবে চালাতে হ'লে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার তারই উপযুক্ত অন্যান্য নানা প্রকার সাজ-সরঞ্জাম। এই সব সাজ-সরঞ্জাম আবার নিজেরাই এক একটী বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান।



১০। কারখানা তৈরীর কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে

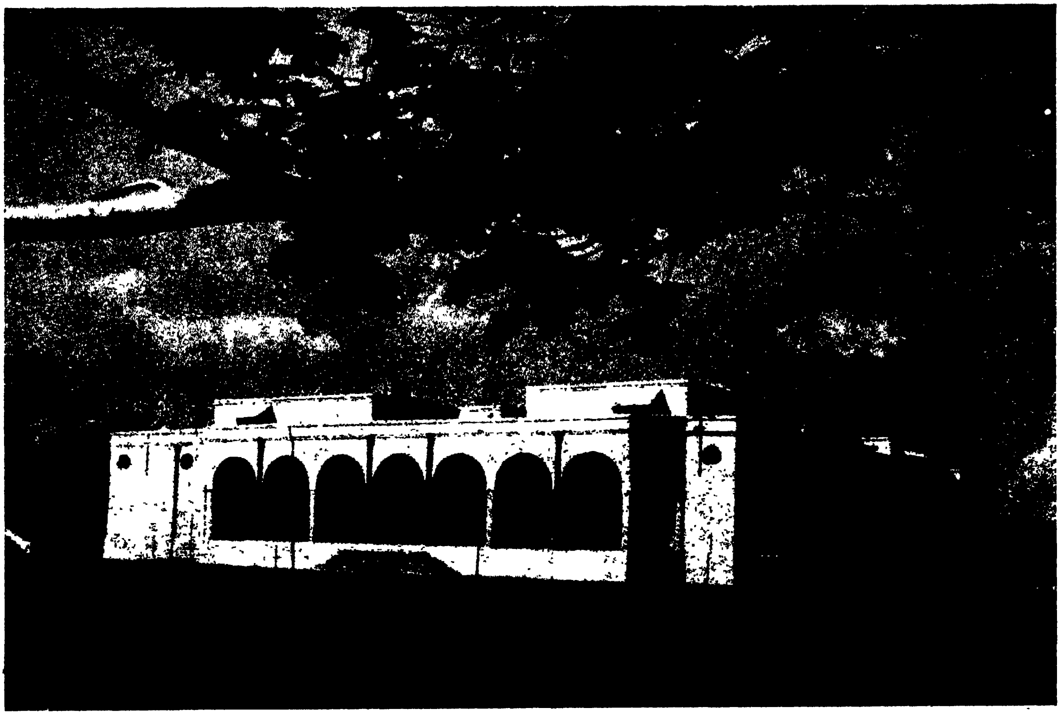
মারতে হবে, রাস্তা করতে হবে, মাটী সরাতে হবে। তবে তাঁর দর্শন মিলবে। যাঁরা দেখেন নি তাঁরা বুঝবেন না সে কী অগ্নিময়ী নদী! কী অসহনীয় উত্তাপ! সাধ্য কি কেউ কাছে যায়—একেবারে পুঞ্জীভূত বিরাট তেজ—স্বয়ং পাথর থেকে বেরিয়ে সামনে দিয়ে হুহু করে চলে গেলেন। সাধে কি আমরা পাথর থেকে দেবতা বানাই!

এমনি ধারা কয়েকটী ব্লাষ্ট ফারণেস্ সাধারণতঃ একত্র করে না চালালে ব্যবসায়োপযোগী হয় না। এই কয়েকটী

তার পর যখন এমন একটা উচ্চ স্থান সে অধিকার করেছে, তখন সে তো অমনিই তা করেনি! তার জন্যে বসাতে হয়েছে আরও নানারূপ কলকব্জার ঘর, মোটর-ঘর, শক্তিগৃহ বা বিদ্যুতাগার, ঢালাই-ঝালাই-পালিশ ঘর, বৈদ্যুতিক মেরামতি কারখানা, ইস্পাত প্রস্তুত কারখানা; লোহা ও ইস্পাতের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যাদির বিভিন্ন কারখানা ইত্যাদি।

যেখানে এতাধিক কার্য্যাদি চলছে তথাকার কায

চালাবার জন্তে কতরকম ব্যবস্থা আবশ্যক তা সাধারণ ভাবে অনুমান করা সহজ নয়। বাঙালীর অপবাদ বাঙালী শিল্পপ্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া বিষয়ে একেবারে বৈরাগ্য ভাবের পথিক। কয়জন বাঙালী পঞ্চবিংশতি বর্ষব্যাপী ব্যস্ত-কোলাহলময় এই বিরাট ব্যাপার দেখে এসেছেন? অথচ তা' কল্‌কাতা থেকে অধিক দূরে নয়—মাত্র ১৫৫ মাইল ও ৫ ঘণ্টার পথ। পৃথিবীর নানা স্থান হ'তে, কত দূর দেশ হ'তে, কত লোক দেখ্‌তে আসে। প্রাচ্যের এ বৃহত্তম লৌহ-কারখানা প্রকৃতপক্ষে বাংলা-দেশেরই মধ্যে। আজ তা শাসনপদ্ধতির সুবিধার জন্য অন্য প্রদেশের এলাকাভুক্ত হলেও বাস্তবিকপক্ষে তা' বাংলাভাষাভাষী ধলভূম পরগণার অন্তর্ভুক্ত। ধলভূম,—সিংভূম জেলায়—মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূম সংলগ্ন। এই মানভূম ও সিংভূম প্রকৃতপক্ষে বাংলার অংশ। বাংলাই এই দুই জেলার ভাষা। বাঙালীই এই দুই জেলার অধিবাসী। কিন্তু আজ তাদের শোচনীয় অবস্থা—ন যযৌ: ন তস্থৌ:। বেহার আঁকড়ে ধরে চেপে রেখেছে, উৎকল তাকে ছিনিয়ে নিতে প্রাণপণ করছে। হতাশ বাঙালী ফ্যাল্‌ফ্যালিয়ে চেয়ে রয়েছে। এই দুই জেলা স্বর্ণগর্ভা, যাবতীয় রত্ন-সম্ভারের হেথায় সমাবেশ। নানা রকম বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র এই দুই স্থানেই সম্ভব। দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তায় এ দুয়ের স্থান সব চেয়ে উচ্চে। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর, কারিগরী-শিল্প-প্রতিষ্ঠানাদি প্রসঙ্গে বৈরাগ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পরিচয়। লেখকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যাঁরা পারেন তাঁরা যেন একবার দেখে এসে এমন একটা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করেন ও বাঙালীর শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে অবতরণ বিষয়ে একটুও চিন্তা করেন।



২৮। লোহা-কারিগরী বিদ্যালয়—মেটালাজিক্যাল ও টেকনিক্যাল স্কুল

এই প্রতিষ্ঠানকে চালাবার জন্য এমন দুটি জিনিষ কর্ত্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা করতে হয়েছে যা ঐ জাতীয় কলকব্জার মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। একটী তথাকার ব্লুমিং মিলের ফ্লাই হুইল, অপরটী ৭৫০০০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন মোটর।

বাইশ হাজার লোক এই কারখানা চালাবার জন্য

প্রত্যহ প্রত্যক্ষভাবে আবশ্যক। পরোক্ষভাবে আরও অনেক লোক ঠিকাদারদের অধীনে নিযুক্ত। তারপর এখান থেকে লোহা নিয়ে কাছেই অন্যান্য কারখানায় টিন তৈরী হচ্ছে। নানারূপ যন্ত্রপাতি হচ্ছে। লৌহ-তার (wire) সংক্রান্ত নানারকম জিনিষ প্রস্তুত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক তার হচ্ছে। নানাবিধ ঢালাই-কায হচ্ছে। অনেকপ্রকার কলকব্জা হচ্ছে। কোথাও বা তেল, কোথাও বা গ্যাস, কোথাও বা রাসায়নিক কিছুর প্রণয়ন হচ্ছে—এমনি কত কি! সুতরাং একটা প্রকাণ্ড নগরীর সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বহু লোক-সমাগম; তাদের এবং আর সকলের যাতায়াতের যান-বাহন; উপরিউক্ত অতগুলি কারখানার কারিগরদের বস-বাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে হয়েছে। সুতরাং নিয়মানুগ শাসনতন্ত্রও গড়ে উঠেছে। কোর্ট কাছারী আদালত আমলা ফয়লা পেয়াদা হাকিম হুকুম ডাক্তার বন্দি রেল জেল কিছুই বাদ যায়নি। তার ওপর বংশবৃদ্ধি আছে। এই করে আজ সহর ও সহরতলীতে দেড়লক্ষ লোকের বাস।

৩৮ বর্গ মাইল স্থান জুড়ে এই সুন্দর সুরম্য সুসজ্জিত সহর। পাহাড় ও জঙ্গল ভেঙ্গে এর প্রতিষ্ঠা। আয়তনে যা' কলকাতার (৩৬ বর্গ মাইল) প্রায় সমান বা একটু বড়। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে এই সহরের নাম জেমসেদপুর।

এত বড় প্রতিষ্ঠানকে তর্জ্জনী হেলনে চালানো যার তার কায নয়। এজন্য তেমনি বড় বড় মাথারও প্রয়োজন। সেদিন পর্য্যন্ত তার প্রায় সবই ছিলেন পাশ্চাত্যের অধিবাসী। এখন ক্রমশঃ তার পরিবর্ত্তন হয়ে দেশীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্যবস্থাদির নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে। সব চেয়ে বড় যিনি—তিনি শ্রীযুক্ত এ, আর, দালাল, এম-এ, আই-সি-এস্ (রিটায়ার্ড)। ইনি ছিলেন বোম্বাইএর নগরাধ্যক্ষ। এখন এখানকার প্রধান পরিচালক (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)। আজ এই পর্য্যন্ত।

শেষ প্রশ্ন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ক্ষেমে তারে রাখিয়াছিলাম,
প্রেমে তারে ঢাকিয়াছিলাম,
দুদিনের পরিচয়
যেন তার সাথে নয়
চির'দিন্‌কার্‌ যেন জানা
সেথাও ছলনা দিল হানা।

খুব ভালো বাসিয়াছিলাম,
দেখা দিতে আসিয়াছিলাম,
বলিল সে অকারণ,
তুমি আর বহু জন
মোর চোখে সকলে সমান
কারেও না চায় বেশী প্রাণ।

আমি শুধু কহিয়াছিলাম
'বেশ!' আর দহিয়াছিলাম
একটু বিশেষ ঠাঁই
যার কাছে মোর নাই
অনুরাগ কোথা তার লেশ?
নিমেষেই সব হ'ল শেষ।

আঁখি জলে ভরিয়াছিলাম
বুক ফেটে মরিয়াছিলাম
বিদায়ের ব্যথাটুক্‌
আজো মনে জাগরূক
পথ পানে চেয়ে চেয়ে ভাবি
কিছু মোর ছিল না কি দাবী?

অমরবৃন্দ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহিণী থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। কাজেই শুইতে যাইবার বিশেষ তাড়া ছিল না। রাত্রি দশটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া লাইব্রেরী-ঘরে আসিয়া বসিলাম। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল।

নৈশ-প্রদীপের তৈল পুড়াইয়া কাজ করা আমার অভ্যাস নাই—ভারি ঘুম পায়। কিন্তু আজ স্থির করিলাম—গৃহিণী যখন বারোটার পূর্ব্বে ফিরিবেন না—তখন মাঝের এই দুই ঘণ্টা সময় কাজ করিয়াই কাটাইয়া দিব। 'বাংলা সাহিত্যের অমরবৃন্দ' নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিব মনে মনে আঁচিয়া রাখিয়াছিলাম; সম্পাদক মহাশয়ও প্রত্যহ তাগাদা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন কি শীঘ্র লেখাটা না দিলে তিনি আমার বাসায় আসিয়া আড্ডা গাড়িবেন, এমন ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তবুও কিছুতেই লেখাটা বাহির হইতেছিল না। আজ স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হোক্ প্রবন্ধের পত্তন করিব। একবার আরম্ভ করিতে পারিলে আর ভয় নাই।

টেব্‌লের আসনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিলাম। সম্মুখে টেব্‌ল-সংলগ্ন মেহগ্নির র‍্যাকের উপর বাংলাভাষায় যে-কয়-খানি অমর গ্রন্থ সারি দিয়া সাজানো ছিল—সেই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলাম।

প্রথমে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ধরা যাক। মধুসূদনের অমর সৃষ্টি কোন্ চরিত্র? রাবণ নিশ্চয় তাহাতে সন্দেহ নাই। রাবণকে লইয়াই প্রবন্ধ আরম্ভ করিতে হইবে; মন্দ হইবে না।

তার পর বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কোন্ সৃষ্টি অমর? কপালকুণ্ডলা? দেবী? সূর্য্যমুখী? ভ্রমর?—কি আশ্চর্য্য! বঙ্কিম কি পুরুষ-চরিত্র অঙ্কিত করেন নাই? তবে, কেবল নারীচরিত্রগুলিই মনে পড়িতেছে কেন?

যাক্—এবার রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার: কে কে আছে? চিত্রাঙ্গদা—'দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী'। আর? রাজা বিক্রম! হুঁ—হইতেও পারে! তা ছাড়া চোখের বালির বিনোদিনী আছে—

রবীন্দ্রনাথের পর কে? শরৎচন্দ্র। তাঁর রাজলক্ষ্মী, কমল, সুরেশ, সব্যসাচী, কিরণময়ী—

অতঃপর? শরৎচন্দ্রের পর কে? আর কেহ আছে কি!···টেব্‌লের ধারে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে * * * *

আমি আফিমের নেশা করি না। কিন্তু তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে চিরদিনের অভ্যাস মিশিয়া বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি মানস চক্ষে দেখিলাম —আমার সবুজ বনাত-ঢাকা টেব্‌লের উপর কচি কচি ঘাস গজাইয়াছে। শাখাযুক্ত কলমদানীটা কোন্ ফাঁকে দুটি নব-পল্লবিত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। চারিদিকে যে বই, খাতা ইত্যাদি ছড়ানো ছিল, সেগুলা পাথরের চ্যাঙড় মাটির ঢিবি বনিয়া গিয়াছে। গঁদের পাত্রটা বেবাক শিবমন্দিরে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অথচ আয়তনে কিছুই বাড়ে নাই,—আমি যেন বাইনকুলারের উল্টা মুখ দিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছি।

বড় ভাবনা হইল। আমার লেখার সমস্ত সরঞ্জাম যদি এইভাবে পাহাড় জঙ্গল বৃক্ষ ইত্যাদিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সম্পাদক মহাশয়কে কি দিয়া ঠেকাইয়া রাখিব? রচনার পরিবর্ত্তে দূর্ব্বাঘাস তিনি কখনই লইবেন না। তিনি তেমন লোকই নয়।

টেব্‌লের ওপারে বইয়ের র‍্যাক্‌টা ধোঁয়াটে একটা পাহাড়ের মত দেখাইতেছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন আয়-তনের বইগুলা তাহারি উত্তুঙ্গ চূড়ার মত আকাশে মাথা তুলিয়া ছিল। হঠাৎ খুট্ খুট্ শব্দ শুনিয়া ভাল করিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—দুইজন ঘোড়্‌সওয়ার একটা বইয়ের তলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে! পাহাড়ী রোমশ দুইটি ঘোড়ার পিঠে কম্বলের জিন্, তাহার উপর দুই সিপাহী আসীন। একজন হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। হিন্দুর মাথায় মুরেঠা, গায়ে আঙ্‌রাখা, পায়ে নাগরা, কোমরে তরবারি। মুসলমানের মাথায় টোপ, গায়ে কিংখাপের শিরমানি ও পায়জামা, পায়ে মখমলের জুতা। তাহারও রেশমী কোমরবন্দ্ হইতে শাম্‌শের ঝুলিতেছে।

দু'জনে আসিয়া আমার কলমদানের একটা বৃক্ষের তলে নামিল। গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া হিন্দু বলিল,—'খাঁ সাহেব, এইখানেই কোথাও আছে। আমার মনে আছে আমি পাহাড়ের গুহা থেকে সেটা ছুঁড়ে নীচের উপত্যকায় ফেলে দিয়েছিলুম।'

খাঁ সাহেবের চেহারা অতি সুন্দর; মুখে সামান্য দাড়ি আছে, কিন্তু তাহাতে গণ্ড ও চিবুকের গোলাপী বর্ণ ঢাকা পড়ে নাই। তাঁহার চোখের দৃষ্টি মেঘলা আকাশের মত ছায়াচ্ছন্ন—যেন দুঃখের গভীরতম তল পর্য্যন্ত তিনি ডুব দিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'তাই ত সিংহজী, এতদিন পরে সে-জিনিষ কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? যা হোক, চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। হয় ত ঘাসের তলায় চাপা পড়ে গেছে।—আসুন, খুঁড়ে দেখা যাক।' বলিয়া কোমর হইতে তরবারি বাহির করিলেন।

সিংহজী হাসিয়া বলিলেন,—'তলোয়ার রাখুন। সব কাজ কি তলোয়ারে হয়? আমি খোন্তা জোগাড় করছি।' এই বলিয়া সিংহজী আমার একটা কলম তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'চমৎকার খোন্তা পাওয়া গেছে। আপনিও একটা নিন।'

দু'জনে অম্লান বদনে আমার দুইটি কলম তুলিয়া লইয়া ঘাসের উপর এখানে-ওখানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম—কে ইহারা? কোথায় ইহাদের কথা পড়িয়াছি! একজনের মুখে শৃগালের ধূর্ত্ততা মাখানো, অন্যজন শার্দ্দুলের মত গম্ভীর। অথচ দু'জনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। কে ইহারা?

সিংহজী সহসা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন,—'পেয়েছি, পেয়েছি, খাঁ সাহেব। এই দেখুন' বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বস্তু তুলিয়া ধরিলেন।

খাঁ সাহেব নিকটে আসিয়া বলিলেন,—'সত্যিই ত! লাগিয়ে দেখুন, আপনারটা বটে কিনা।'

সিংহজী বলিলেন,—'আমি আমার আঙুল চিনি না?' বলিয়া নিজের বাঁ হাতটা তুলিয়া ধরিলেন। তখন দেখিলাম তাঁহার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা নাই। সিংহজী ছিন্ন আঙুল যথাস্থানে জুড়িয়া দিতেই সেটা বেবাক জোড়া লাগিয়া গেল।

এতক্ষণে ইহাদের চিনিলাম—আঙুল-কাটা মাণিকলাল ও মবারক আলি খাঁ!

মবারক বলিলেন,—'সিংহজী, আপনার হারানো নিধি ত আপনি খুঁজে পেলেন। এবার চলুন আমার হারানো নিধির সন্ধান করি।'

মাণিকলাল মিটি মিটি হাসিয়া বলিলেন,—'কে, দরিয়া বিবি?'

মবারক কিয়ৎকাল অধোমুখে রহিলেন, শেষে বলিলেন,—'সিংহজী, আপনি ত আমার সব কথাই জানেন। যে আমাকে সাপের মুখে পাঠিয়ে দিয়েছিল আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'শাহ্‌জাদি আলম্ জেব-উন্নিসা বেগম?'

'হ্যাঁ। তাকে কিছুদিনের জন্য পেয়েছিলুম, আবার হারিয়েছি।'

মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাঁকে খুঁজলেই পাবেন মনে হয়?'

মবারক বলিলেন,—'জানি না। কিন্তু তবু খুঁজতে হবে।'

'বেশ—চলুন।'

দুইজনে ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় পশ্চাতের পাহাড় হইতে পিল্ পিল্ করিয়া উইয়ের মত একপাল ভেড়া বাহির হইয়া আসিল। গড্ডলিকা-প্রবাহের পশ্চাতে একজন মেষ-পালক। তাহাকে দেখিয়াই মনে হইল পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু চিনি চিনি করিয়াও চিনিতে পারিলাম না। মেষ-পালক বয়সে প্রৌঢ়, দাড়ি-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন, স্কন্ধে উপবীত। মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য লাগিয়া আছে—যেন পৃথিবীর সমস্ত ধাপ্পাবাজি তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

মেষ-যূথ সবুজ মাঠের উপর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মেষ-পালক অনায়াস-পদে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তার পর একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া শ্যামল শষ্পশয্যায় শয়ন পূর্ব্বক মন্দিরের চত্বরে পা তুলিয়া দিলেন।

মাণিকলাল এতক্ষণ অশ্বের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; বলিলেন,—'লোকটা ত মহা পাষণ্ড! শিবমন্দিরে পা তুলে দিলে! অথচ ব্রাহ্মণ বলে বোধ হচ্ছে। আসুন

ত দেখি!' মেষ-পালকের নিকটে গিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'কে রে তুই – শিবমন্দিরের গায়ে পা তুলে দিয়েছিস! পা নামা ব্যাটা।'

মেষপালক পা নামাইয়া উঠিয়া বসিল। দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'তোমাদের সঙ্গে তরবারি রহিয়াছে দেখিতেছি। দুই জনেই বলবান। সুতরাং আমার অন্যায় হইয়াছে, এরূপ কার্য্য আর করিব না।'

মাণিকলাল কহিলেন,—'তুমি ব্রাহ্মণ বলেই আজ নিষ্কৃতি পেলে। কিন্তু এ-রকম ভাবে পা উঁচু করে শোবার উদ্দেশ্য কি?'

মেষ-পালক বলিল,—'পা উঁচু করিয়া শুইলে ধ্যান করিবার সুবিধা হয়। চেষ্টা করিয়া দেখিও।'

মাণিকলাল এই অদ্ভুত মেষ-পালকের কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—'তোমার নাম কি?'

মেষ-পালক মৃদুহাস্যে বলিল,—'আমার নাম জাবালি। উপবেশন কর।'

মাণিকলাল তখন দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। মবারকও পাশে বসিলেন।

মাণিকলাল সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'প্রভু, আপনি ভেড়া চরাচ্ছেন কেন?'

জাবালি বলিলেন,—'দেখ, ভেড়ার মাংস অতিশয় সুস্বাদু। তাহাদের প্রতিপালনে কোনও কষ্ট নাই। তাহারা আপনি চরিয়া খায়, আপনি বংশবৃদ্ধি করে। আমি বিনা ক্লেশে উহাদের মাংস পাইয়া থাকি। উপরন্তু উহাদের রোম হইতে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। সুতরাং অন্নবস্ত্র কিছুরই অভাব থাকে না।'

মবারক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'অন্ন-বস্ত্র ছাড়া মানুষের অন্য কাম্য কি নেই?'

জাবালি প্রতিপ্রশ্ন করিলেন,—'আর কি আছে?'

মবারক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—'রমণীয় প্রেম।'

জাবালি বলিলেন,—'বৎস, প্রেম একটা সংস্কার মাত্র—অতএব অন্যান্য সংস্কারের মত উহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু ক্ষুধা সংস্কার নয়—শীতের প্রকোপকেও সংস্কার বলা চলে না। উহারা সংস্কার-বিবর্জ্জিত উলঙ্গ সত্য—চোখ ঠারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। জগতে আর যাহা কিছু সকলই সংস্কার। দেখ, কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি শিবমন্দিরে পা তুলিয়া দিয়াছিলাম বলিয়া তোমরা আমাকে তিরস্কার করিতেছিলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, শিব কে? তাহার আবার মন্দির কিসের। ইহা যদি শিবের মন্দির হয়, তবে শিব নামক কোনো ব্যক্তি নিশ্চয় ইহার মধ্যে আছে। আমি আদেশ করিতেছি, আনো দেখি শিবকে এই মন্দির হইতে বাহির করিয়া।'

মাণিকলাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তখন জাবালি আবার বলিলেন,—'শিব এখানে নাই, সুতরাং ইহা শিবমন্দির নহে। অতএব ইহার গায়ে পা তুলিয়া দিলেও কোনোও অপরাধ হয় না। কিন্তু তোমরা দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ যখন আপত্তি করিতেছ, তখন সুবুদ্ধি-পরিচালিত হইয়া আমি সে-কার্য্য হইতে বিরত হইলাম।'

মবারক পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন,—'কিন্তু, নারীর প্রেম একটা সংস্কার মাত্র, এ যুক্তি কি সুবুদ্ধি-পরিচালিত?'

জাবালি কহিলেন,—'অবশ্য। শারীরিক ক্ষুধার তাড়নাই পুরুষকে নারীর প্রতি আকৃষ্ট করে; এই আকর্ষণ নারী-বিশেষের প্রতি নয়—নারী-সাধারণের প্রতি। ক্ষুধার সময় মৃগমাংস ও মেষমাংস যেরূপ সমান প্রেয়—নারী সম্বন্ধেও তাহাই, কোনও প্রভেদ নাই। কেবল, সুস্বাদু খাদ্য দেখিয়া যেরূপ লোকে লুব্ধ হয়, সুন্দরী নারী দেখিয়াও সেইরূপ লালায়িত হয়। এই লালসাকে প্রেম বলিতে চাহ বলিতে পার, কিন্তু তাহা ভ্রম। বস্তুতঃ, প্রেম বলিয়া কিছু নাই, মানুষ বংশানুক্রমে আত্ম-প্রতারণা করিয়া এই প্রেমরূপ সংস্কারের উদ্ভব করিয়াছে।—ভাবিয়া দেখ, তুমি যতদিন জেব্‌উন্নিসাকে না পাইয়াছিলে ততদিন দরিয়া বিবিকে লইয়া সন্তুষ্ট ছিলে; কিন্তু জেব্‌উন্নিসাকে পাইবামাত্র দরিয়া বিবির প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মিল। ইহার কারণ কি?'

মবারক দ্বিধা-প্রতিফলিত মুখে নীরব রহিলেন, সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। মাণিকলাল বলিলেন,—'প্রভু, আপনার কথাগুলি কড়া হলেও সত্য বলে মনে হচ্চে। নির্ম্মল থাকলে আপনার উপযুক্ত জবাব দিতে পারত। সে ভারি বুদ্ধিমতী—ঔরংজেব বাদশাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংস্কার থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছেন ত?'

জাবালি বিনয় সহকারে বলিলেন, 'দম্ভ করিতে নাই। দম্ভে বুদ্ধির মলিনতা জন্মে। তথাপি, আমি সম্পূর্ণ দম্ভ-মুক্ত হইয়া বলিতেছি যে আমার সংস্কার দূর হইয়াছে।'

মবারক ঈষৎ অধীরভাবে বলিলেন,—'সাহেব, আপনার বক্তব্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট হল না। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি লোক পৃথিবীর শতকোটি নারীর মধ্যে কেবল একটিকেই সারাজীবন ভালবেসেছে—অন্য স্ত্রীলোকের পানে মুখ তুলেও চায়নি; সেই স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে জগৎ অন্ধকার দেখেছে; কিন্তু তব্ অন্য নারীকে হৃদয় সমর্পণ করতে পারেনি। এই একনিষ্ঠা কি প্রেম নয়?'

জাবালি বলিলেন,—'বৎস, উহাই প্রেম নামে অভিহিত বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা একটি সংস্কারমাত্র। সংস্কার মাত্রেই দুঃখের কারণ, তাই প্রেম-পীড়িত ব্যক্তিরা সর্ব্বদা দুঃখ পায়। দেখ, ছাগজাতীয় জীব প্রেম নামক সংস্কার হইতে মুক্ত - তাই তাহাদের প্রেমজনিত দুঃখ নাই; বিশেষের প্রতি তাহার নিষ্ঠা নাই, তাই তাহার অনুরাগ সর্ব্বব্যাপী। তাহাকে বিশ্বপ্রেমিকও বলিতে পার। এই ছাগের অবস্থাই সকল মোক্ষাভিলাষীর কাম্য। উহাই ভূমা।'

মবারক বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, জাবালির কথার উত্তর দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। এইখানেই বোধ করি আলোচনা শেষ হইত, কিন্তু এই সময় মন্দিরের অপর পার্শ্বে দুইজন তর্করত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে দুইজন ধুতি-পাঞ্জাবী-পরিহিত যুবক মন্দিরের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, খদ্দরের বেশভূষা যেন তাহার বিশাল অঙ্গে ঠিক মানাইতেছে না; অন্যটি পরিপূর্ণ বাঙালী, শ্যামল সুশ্রী চেহারা, মুখ বুদ্ধির প্রভায় উজ্জ্বল।

রজতগিরিনিভ পুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল,—'তুমি ভুল করছ বিনয়। আমার হাতে যখন অস্ত্র নেই তখন আমি শুধু হাতেই লড়ব—কিন্তু তবু দুষ্টের পীড়ন চুপ করে পড়ে সহ্য করব না। আমি গোরার গুলি খেয়ে মরতে রাজি আছি, কিন্তু পাহারাওয়ালার রুলের গুঁতো আমার অসহ্য।'

বিনয় বলিল,—'বড়টা যখন তুমি স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত, তখন অপেক্ষাকৃত ছোটটায় আপত্তি কেন?'

গোরা বলিল,—'আবার ভুল করলে। আমার কাছে বন্দুকের গুলিটা তুচ্ছ, রুলের গুঁতোই বড়। কারণ ওতে আমার মনুষ্যত্বকে আহত করে, বন্দুকের গুলি তা পারেনা।'

বিনয় বলিল,—'তা যেন হল। কিন্তু এদিকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি যাতে হয় সেদিকেও ত দৃষ্টি রাখা দরকার।'

'উদ্দেশ্যটা তোমার কি শুনি?'

'দেশের মঙ্গল।'

গোরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—'না—কখনো না। আমাদের প্রথম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্চে মনুষ্যত্বের উদ্ধার। তুমি কি মনে কর, নিজের দাবীকে আঁকড়ে ধরে এক জায়গায় বসে থাকলেই সত্যের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হয়?'

বিনয় বলিল,—'তাছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় আর কি করা যেতে পারে? তোমার মতন গর্জ্জন করলে কোনো ফল হবে কি?'

'না, শুধু গর্জ্জনে কাজ হবে না, বর্ষণও চাই। আমাদের দেহ আছে, হাত পা আছে, সেই হাত পা দিয়েই কাজ করতে হবে। অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলতে হবে। কেবল প্রহার সহ্য করবার শক্তিকে পোক্ত করে তুললে কাজ হবেনা। ওটা জড়শক্তি—জীবশক্তি নয়।'

এই সময় মন্দির পার্শ্বে কয়েকজন লোক আসীন দেখিয়া বিনয় বলিয়া উঠিল,—'গোরা, তোমার বক্তৃতা থামাও—কারা রয়েছে।'

জাবালি হাত তুলিয়া উভয়কে নিকটে ডাকিলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে কহিলেন,—'স্বাগত! তোমরা উপবিষ্ট হও।'

গোরা ও বিনয় সসম্ভ্রমে ঋষিকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। জাবালি আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের মধ্যে কিসের বচসা হইতেছিল?'

বিনয় অল্প কথায় ঋষিকে তর্কের বিষয় বুঝাইয়া দিল। তিনি বলিলেন,—'ভাল, বুঝিলাম, তোমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চাও। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—স্বাধীনতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষের কী ইষ্টসিদ্ধি হইবে?'

বিনয় মৃদু হাসিয়া বলিল,—'একেবারে গোড়ার প্রশ্ন। গোরা, জবাব দাও।'

গোরা বলিল,—'স্বাধীনতাই চরম ইষ্ট নয়, ইষ্টসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র। আসল কাম্য—সুখ।'

জাবালি বলিলেন,—'যদি তাহাই হয় তবে সুখ লাভের জন্য দুঃখকে বরণ করিতে চাহ কেন?'

গোরা বলিল,—'বৃহত্তর দুঃখের হাত এড়াবার জন্য, যেমন গো-বীজের টীকা নিলে বসন্ত রোগের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।'

মাণিকলাল গোরাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, 'ঠিক কথা। আর একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে; যেমন, ক্ষুধার বৃহত্তর দুঃখ এড়াবার জন্য ঋষিবর মেষ-পালন রূপ অল্প দুঃখ স্বীকার করছেন।'

জাবালি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভাল। তোমাদের যুক্তি বিচারযোগ্য বটে। এখন বল দেখি, ভারতবর্ষ নামক বিশাল ভূখণ্ডকে বা তদ্দেশবাসী নরনারীকে স্বাধীন করিয়া তোমাদের লাভ কি হইবে? তোমরা নিজের চরকায় তৈল দিতেছ না কেন?'

গোরা বলিল,—'ভারতবর্ষই আমার চরকা, আমি তাতেই তেল দিতে চাই। ভারতবর্ষের ছত্রিশকোটি নর-নার সুখেই আমার সুখ।'

জাবালি কিয়ৎকাল তুষ্ণীভাব ধারণ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে শিরঃসঞ্চালন করিয়া কহিলেন, 'বৎস, তুমি পরের প্রতি মমতাসম্পন্ন হইয়া ভ্রান্তপথে চলিয়াছ—ও-পথে কাম্যলাভ করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষই বল, বা অন্য দেশই বল, উহা কতকগুলি মনুষ্যের সমষ্টি মাত্র। এই মনুষ্যগুলি নিজেদের সুবিধার জন্য কতকগুলি সমাজ বা গোষ্ঠির সৃষ্টি করিয়াছে। সকল সমাজের কাম্য এক নহে—এমন কি, পরস্পর বিরোধী। একে যাহা চাহে, অন্যে তাহা চাহে না। ব্যক্তিগত ভাবেও তদ্রূপ;—তুমি সাত্বিক ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহ, আর একজন মদ্য মাংস আহার করিয়া তামসিক ভাবে কালহরণ করিতে ভালবাসে। সুতরাং কেবলমাত্র স্বাধীনতা দ্বারা সকলকে একই কালে সুখী করা অসম্ভব। সে চেষ্টাও পণ্ডশ্রম।'

কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া গোরা বলিল,—'তবে, আপনার মতে, সার্ব্বজনীন সুখ লাভের উপায় কি?'

জাবালি বলিলেন, 'আত্মসুখের চিন্তায় অবহিত হওয়া। সকলেই যদি স্বার্থসন্ধ হইয়া নিজ নিজ সুখের কথা ভাবিতে থাকে তাহা হইলে অচিরাৎ তাহারা 'সুখবস্তু' লাভ করিবে। দেখ, কি সহজ উপায়। সকলে স্বার্থপর হও, আর কাহারও দুঃখ থাকিবে না।'

বিনয় ও মাণিকলাল হাসিতে লাগিলেন। গোরার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল, সে বলিল,—'প্রস্তাবটা বোধ হয় নূতন নয়—আগেও শুনেছি। কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে যখন সঙ্ঘাত বাধ্‌বে তখন ত দুঃখ আপনিই এসে পড়বে!'

জাবালি বলিলেন,—'সত্য। মনুষ্যজীবনের চরম প্রেয়ঃ কি তাহা মানুষ জানেনা বলিয়াই যতপ্রকার দুঃখের উদ্ভব হয়। কেহ মনে করে অর্থই সুখ, কেহ মনে করে স্বাধীনতা সুখ। এইজন্য, লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্নতা হেতু বিরোধের উৎপত্তি হয়। তুমি ভারতবর্ষকে সুখী করিতে সমুৎসুক। উত্তম কথা; যাহা বলিতেছি শোন। লোক-শিক্ষা দাও। মানুষকে বুঝাও যে, সংস্কার-বিমুক্ত হইয়া সুখের অন্বেষণই একমাত্র ইষ্ট। সুখ কি, তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে—তাহাকে নূতন করিয়া বুঝাইয়া দাও। যেদিন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবে সুখ নামক মানসিক অবস্থাই একমাত্র পরমার্থ—ঐহিক বিষয়-সম্পত্তি বা দারা-পরিজন নহে—সেদিন জগতে আর দুঃখ থাকিবে না।'

মবারক এতক্ষণ নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন; তিনি প্রশ্ন করিলেন,—'কিন্তু সুখ কাকে বলে সেটাও আগে জানা দরকার। সুখের সংজ্ঞা কি?'

জাবালি হাসিলেন, বলিলেন,—দুঃখ-সংযোগের বিয়োগই সুখ। ইহার অধিক কিছু বলিব না। গীতা নামক একটি গ্রন্থ আছে—উহাতে কিছু কিছু সত্য কথা বলা হইয়াছে; পাঠ করিয়া দেখিতে পার। শুনিয়াছি, আকবর শাহা উহা পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন।'

সহসা দূরে রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তধ্বনি ইঁহাদের আলোচনার জাল ছিন্ন করিয়া দিল। সকলে চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, একটি যুবতী ভয়ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে এবং দুইজন মাতাল পরস্পর গলা-জড়াজড়ি করিয়া স্খলিতপদে টলিতে টলিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

একটা মাতাল ভাঙা গলায় গান ধরিল,—'এসেছিল বক্‌না গরু পর গোয়ালে জাব্‌না খেতে—'

দ্বিতীয় মাতাল বলিল,—'If music be the food of love, play on—The man that hath no music in himself, nor is not moved by concord of sweet sounds—'

পলায়মানা যুবতী আবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিল, -'বাঁচাও—কে আছ রক্ষে কর—'

গোরা, বিনয়, মবারক ও মাণিকলাল একসঙ্গে উঠিয়া সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। গোরা জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হয়েছে ?'

স্ত্রীলোকটি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—'ওরা আমার পেছু নিয়েছে। আমি অভয়া।'

মাতাল দুটাও কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুদ্ধ মবারক তরবারি বাহির করিয়া তাহাদের কাটিতে উদ্যত হইলেন। মাণিকলাল ইসারায় তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা কারা ?'

এক নম্বর মাতাল তখনো ভাঙা গলায় গান গাহিতেছিল, সে গান বন্ধ করিল না। দ্বিতীয় মাতাল বলিল,—'কেন বাবা বদিয়াতি করছ--শিকার পালায়, পথ ছাড়ো। আমরা দু'জনেই নামকাটা সেপাই।'

মাণিকলাল তাহার নাসিকায় একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন; গোরা তাহার সঙ্গীতজ্ঞ সহচরের গালে একটি প্রকাণ্ড চড় কশাইয়া দিল। দু'জনেই ধরাশায়ী হইল। দ্বিতীয় মাতালটা শয়ান অবস্থাতেই মাথা তুলিয়া বলিল, 'এই ত বাবা অন্যায় করছ। মাতাল মেরে কোনো লাভ নেই—তার চেয়ে মদ মারো, মজা পাবে। গোকুলবাবুকেও ঐ কথাই বলেছিলুম—'

প্রথম মাতাল ক্ষীণকণ্ঠে গান ধরিল,—'দেহি পদপল্লবমুদারম্—'

মবারক তৎক্ষণাৎ তাহাকে একটি পদাঘাত করিলেন; সে একবার হেঁচ্‌কি তুলিয়া নীরব হইল।

এই সময় জাবালি সেখানে আসিয়া মাতাল দুটিকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, -'কি হইয়াছে ? ইহারা মদ্যপ দেখিতেছি। আহা, উহাদের মারিও না, ছাড়িয়া দাও।'

দ্বিতীয় মাতাল একটা হাই তুলিয়া বলিল,—'Amen! বেঁচে থাক বাবাজী—তোমার দাড়ির জয়জয়কার হোক। কিন্তু বাবা, মদ্যপ বল্‌লে প্রাণে বড় ব্যথা পাব। দেবেটা পাতি মাতাল, কিন্তু আমি—সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে—'

দেবেন্দ্র উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'নিমে, চুপ কর, গানটা গাইতে দে—' বলিয়া গান গাহিবার উদ্যোগ করিল—'সুরাপান করিনা আমি—'

নিমচাঁদ বাধা দিয়া বলিল,—'তুই শালা রামপ্রসাদের কি জানিস্ ? ক্যাডাভারাস্ চাষা কোথাকার। তুই মালিনী মাসীর গান গা—'

গোরা বলিল,—'চোপরও।—অভয়া, এ দুটোকে নিয়ে কি করি বল ত!'

অভয়া এতক্ষণে বেশ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল; হাসিয়া বলিল,—'ছেড়ে দিন। আচম্‌কা ভয় পেয়েছিলুম, নইলে ভয় পাওয়া আমার স্বভাব মনে করবেন না যেন, গৌরবাবু। তাছাড়া, মাতালের অভিজ্ঞতাও আমার জীবনে কম হয়নি।'

জাবালি বলিলেন,—'বৎসে অভয়া, তোমার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কারণ, আমি দেখিতেছি, সুরাসক্ত হইলেও ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার-মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা বিশেষ করিয়া তোমার দয়ার পাত্র।'

অভয়া ভক্তিভরে জাবালির পদধূলি লইয়া বলিল,—'প্রভু, আপনার বাণীই আমার জীবনের শান্তি। সংস্কার থেকে মুক্তি কখনো পাব কিনা জানি না, কারণ, দেখতে পাই একটা সংস্কার ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তার বিপরীত সংস্কারটা ঘাড়ে চেপে বসে। কিন্তু সেই পথেই চলেছি।'

জাবালি বলিলেন,—'সেই পথেই চল। উহাই একমাত্র পথ—অন্য পন্থা নাই।'

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'দেবী হিন্দ্রলিনীকে দেখছি না ? তিনি কোথায় ?'

হিন্দ্রলিনীর নাম শুনিবামাত্র জাবালির মুখে দুঃখের ছায়া পড়িল, চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইল। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'হিন্দ্রলিনী নাই—তিনি স্বর্গতা।' বলিয়াই সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'কিন্তু সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নাই। যবচূর্ণ খাসিতে ঈষৎ ক্লেশ হয় বটে কিন্তু তাহা যৎসামান্য। আমার মেষপাল লইয়া

আমি পরম সুখে আছি।' বলিয়া বদনমণ্ডল প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিলেন।

মবারক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন; তিনি মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ইতিমধ্যে, বোধ করি মাতালের গণ্ডগোলে আকৃষ্ট হইয়াই, অনেকগুলি নরনারী পাহাড়তলি হইতে বাহির হইয়া ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের সকলকে চিনিতে পারিলাম না, কয়েকজনকে আন্দাজে চিনিলাম। একজন আধ-পাগলা গোছের লোক একটা ভাঙা বেহালা লইয়া অনবরত তাহাতে ছড় চালাইতেছিল কিন্তু বেহালা হইতে আওয়াজ বাহির হইতেছিল না। মূর্তিমতী ইন্দ্রানীর মত একটি নারী মুখে গাম্ভীর্য্য, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে—মন্থরপদে আসিতে আসিতে পিছু ফিরিয়া ডাকিল—চারু!

তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। এমন আরও অনেক নরনারী আসিল, কাহাকেও দেখিয়াই চিনিলাম, কেহ চেনা-অচেনার সংশয়ময় সন্ধিস্থলে রহিয়া গেল।

দুইটি তরুণী হাত-ধরাধরি করিয়া নিঃশব্দে সকলের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল, কেহ তাহাদের লক্ষ্য করে নাই। দু'জনেই শ্যামবর্ণা, কৃশাঙ্গী—চেহারাও প্রায় একই রকম। বিনয়ের পাশ দিয়া যাইবার সময় বিনয় মুখ তুলিয়া তাহাদের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিল, বলিল,—'ব্যাপার কি। একেবারে যুগল রূপে যে!'

বুঝিলাম, দু'টিই ললিতা। একটি বিনয়ের, অন্যটি শেখরের।

বিনয়ের ললিতা মুখ টিপিয়া হাসিল, উত্তর দিল না। গোরার কাছে গিয়া নিম্নস্বরে বলিল,—'গৌরবাবু, সুচিদিদি আপনাকে ডাকছেন। এদিকে কিসের গোলমাল হচ্চে—তাই ডেকে পাঠালেন।'

গোরা বলিল,—'যাচ্চি। কিন্তু তার আগে—'

গোরা সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া নিমচাঁদ ও দেবেন্দ্র দত্তকে ঘাড় ধরিয়া তুলিল—বলিল,—'চল্—'

নিমচাঁদ বলিল,—'নিজে থেকেই যাচ্ছি বাবা—গলা-টিপি দাও কেন? ওটা যে বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে! To gild refined gold, to paint the lily, to throw a perfume on the violet—'

খট্ খট্! খট্ খট্! একটা বেসুরা শব্দে সকলে চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, একজন বৃদ্ধ মুসলমান একটা লাঠি কাঁধে ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া আসিতেছে এবং বিকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বারবার কি একটা বলিতেছে!

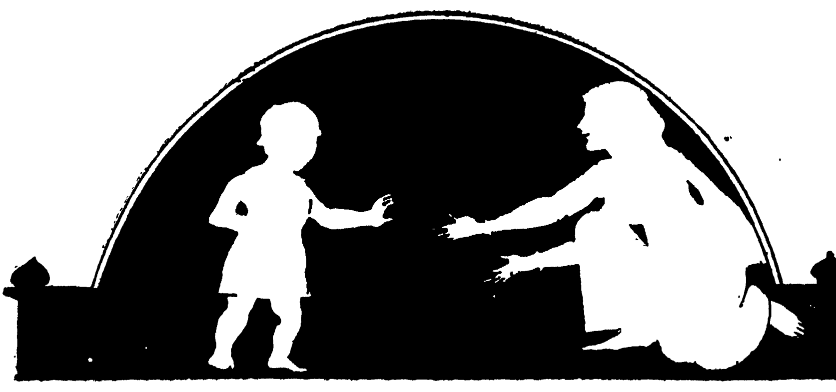
সকলে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল; মোহগ্রস্ত বৃদ্ধ লাঠি-কাঁধে তাহাদের প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল,—'তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায়!'

ক্রমশঃ পাগলা মেহের আলির কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। আমার সম্মুখে যে-দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল তাহাও অল্পে অল্পে ফিকা হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কানের কাছে সেই উৎকট খট্-খট্ শব্দ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

*　*　*　*

টেব্‌ল হইতে মাথা তুলিয়া দেখি, বহির্দ্বারের কড়া সজোরে নড়িতেছে। চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

গৃহিণী থিয়েটার দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।



কোজাগরী

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জাগো সখি,—আজি কোজাগরী—
আবর্ষ প্রার্থিত এই শরৎ-পূর্ণিমা বিভাবরী ;
সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ অমৃত আহরি'
স্ফুট ঋতু-শতদল 'পরে
আলোকের লক্ষ্মী এসে দাঁড়ালেন লঘু পদ-ভরে!
অনাহত শুভ্র শঙ্খ বাজে,—
অলক্ষ্য মুষ্টির বৃষ্টি মাঙ্গলিক লাজে
সর্ব্বশূন্য ফেলিছে আবরি'।
জাগো সখি,—জাগো,
চেয়ে থাকো,—
আজি কোজাগরী।

মুক্ত বাতায়ন—
চাহি' চাহি' ব্যথিয়া উঠিল সারা মন,—
বিভ্রান্ত নয়ন।
ইট, কাঠ, লোহা ও লক্কড়,
পুঞ্জীকৃত কঠিন প্রস্তর,
সাজাইয়া পর পর
কোন্ দুষ্টকর্ম্মা বসি' গড়িল এ বস্তু-সরীসৃপ—
কুদর্শন—শ্রীহীন, অশিব ?—
শঙ্কহর্ষ সচকিয়া পৃষ্ঠে, পুচ্ছ 'পরে,
দীর্ঘ দেহ আন্দোলিত করে
শত সন্ধিস্তরে
সেই সরীসৃপ
কুদর্শন—শ্রীহীন, অশিব।
তারি আন্দোলনে—
অবিরত গুরু-বিদলনে,
সহস্র জঞ্জাল-কণা,
ধূম, ধূলি—আবর্জ্জনা
জড়াইয়া,
দিকে দিকে ছড়াইয়া
কলঙ্কের রাশি,
নগরীর নভ-অবকাশ
ফেলিয়াছে গ্রাসি'।—
পূর্ণ রাহু-গ্রাস!

অভিমান ?—অভিমান বৃথা,
হে বাস্তব-ভীতা!
হেথা কোথা
প্রমুক্ত প্রান্তর সেই—মধ্যে প্রবাহিনী কলস্রোতা,—
ঊর্দ্ধে নীলঘন মায়া,
নিম্নে শ্যামচ্ছদ বনচ্ছায়া,—
তৃণাস্তীর্ণ পল্লী-পথ,—স্ফুটপুষ্প কুটীর-প্রাঙ্গণ—
গন্ধ ও রঙ্গণ ?
সভ্য শতাব্দীর অভিশাপ—
অভিশপ্ত প্রবাস-যাপন,—
শ্রমিক-জীবন!

কিন্তু হায় মিথ্যা পরিতাপ।...
আজি কোজাগরী—
আবর্ষ-প্রার্থিত এই শরৎ-পূর্ণিমা-বিভাবরী!
বাতায়ন ছাড়ি', এস ফিরে'
আমাদের গৃহমধ্য নীড়ে।
এস,—আঁখি 'পরে রাখি' আঁখি
চেয়ে থাকি—শুধু জেগে থাকি।
এস সখি, পরিপূর্ণ প্রেমে আমাদের
রচি নব-কোজাগরী—মিলনের আনন্দ-পূর্ণিমা।
দুটি তীর-সীমা—
আমাদের এই দুটি হিয়া
ছাপাইয়া,
পরিণত প্রণয়-স্রোতের
শুভ্র জ্যোৎস্না-ধারা

উৎসারিয়া, উচ্ছ্বসিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে
যাক্ ব্যেপে' জীবনের সর্ব্ব অবকাশে
অমৃতের ধারা—
বাধা-বন্ধহারা!

এ কি সখি! ফেলো দীর্ঘশ্বাস?
—দৃষ্টি যে উদাস?
প্রণয়েরে ক্ষুণ্ণ করে দারিদ্র্যের গ্লানি?
বস্তুর শাসন-পাণি,
ভাবময় হৃদয়-জগৎ—সেখানেও দণ্ড হানে তার?
—নিরুত্তর?—চোখে অশ্রুভার?···

দৃষ্টি ছলছল্,
তবু—তবু সহসা উদ্ভাসি'
উঠিল সে ম্লানমুখে হাসি
অমলিন, উজ্জ্বল -
ডাগর!
কোজাগরী—প্রাণের জাগর!
পার্শ্বে হোথা ক্ষুদ্র শয্যা 'পরে
শুভ্র শিশু প্রদীপকুমার—
তার
দীপ্ত মুখ জ্বল্ জ্বল্ করে,—
দুটি চোখে কনক-কজ্জল!

পুরুষস্য ভাগ্যং

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

না, ও-রকম ট্রেণ ইলা জন্মে দেখে নাই।

এত ছোট্ট ছোট্ট,—দূর হইতে মনে হয় যেন ছেলেদের খেলার গাড়ীর চেয়েও ছোট লাল হল্‌দে রংএর বিচিত্র গাড়ীগুলি—দেখিলেই হাসি পায়, ওতে করিয়াই দীর্ঘ তেরো মাইল পথ যাইতে হইবে!

পুলের উপর হইতে কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া তারা নামিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া। লাল কাঁকর-ছড়ানো প্ল্যাটফর্ম্ম পার হইয়া দেখা গেল করোগেট-শেড্ দেওয়া ওয়েটিং রুমও একটা আছে।

ইলা তার মামাতো ভাইকে ডাকিয়া বলিল, সেজদা, ও ওয়েটিংরুমের গরমে বস্‌তে পারবোনা তা বলে। বরঞ্চ বেঞ্চিটা বার করিয়ে দাও কুলীদের দিয়ে, বাহিরে দিব্যি ফুর্‌ফুরে হাওয়া।

রঙীন শাড়ী-পরা সুবেশা সুসজ্জিতা এতগুলি ভদ্র-মহিলাদের টিকিট ঘরের জানলা দিয়া দেখিতে পাইয়া ষ্টেশন-মাষ্টার হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, এই যে এ-ধারে লেডিস্ ওয়েটিংরুম, আপনারা বসুন—

ইলাই কথা কহিল—বলিল, ধন্যবাদ, আমরা বাইরে বস্‌ব যদি বেঞ্চিটা—

কথা শেষ করিবার আগেই ষ্টেশনমাষ্টার বেঞ্চিটার এক-প্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিয়া খানিকটা বাহির করিয়া আনিলেন, আর ডাক-পাড়াপাড়ি সুরু করিলেন, এই অর্জ্জুন—ওরে অর্জ্জুন—

অর্জ্জুন আসিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া বেঞ্চিটাকে বাহিরে আনিল।

ষ্টেশনমাষ্টার কোঁচা দিয়া ঝাড়িয়া বলিলেন—এবার বস্‌তে পারেন।

ইলারা বসিল; তাহার সেজদা অনুপম এধার-ওধার ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল।

দূরে ট্রামের লাইনের দুই পাশ দিয়া নামিয়া গেছে তৃণ-ভূমির শ্যামল আস্তরণ, মাটির ঘর, রাঙা রাস্তা, কচুরীপানায় ঢাকা জলখণ্ড আকাশের নীলশোভায় সাদা মেঘের ভেলা, শঙ্খচিলের ডাক—সব কিছু মিলিয়া সহরতলীর পল্লীগ্রাম-সুলভ ছবিটি সহুরে লোকেদের মন্দ লাগিবার কথা নয়, লাগিতেও ছিলনা।

যারা টিকিট কাটিতে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে

নিরক্ষর চাষাভুষার দলই বেশী, দু-একজন ধুতি-জামা-পরা ভদ্রবেশী দেখা যাইতেছিল.; কাহারও কাহারও নাকে চশমা এবং হাতে ছড়ি ও ঘড়ি ছিল, তবু তাহারাও যে সহরের নয় এ কথা কি জানি কেন কোথা দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল ; হয়ত গায়ের রং-এ, হয়ত বা ভীরু চাহনীতে, নয়ত নারী দেখিয়া প্রগল্‌ভতা করিবার সৎসাহসের অভাবে।

ইহাদের সামনে ইলার লজ্জা ছিলনা, ইলার বৌদিরও না, ইলার মামীমারও না। এই সব কলিকাতার বাহিরের লোকরা—ইহারা যেন মনুষ্যপদবাচ্য নয়। তাই তাহাদের সমবেত কলকণ্ঠে, ক্ষণে ক্ষণে উচ্চহাস্যে, চীৎকার করিয়া মনোভাব প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠার ভাব দেখা গেলনা।

যা কিছু দেখে, তাহাতেই তাহারা এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া ওঠে।

এখানকার ইঞ্জিন যে আবার জল নেয়, এখানে যে ফেরীওলা আসিতে পারে, গার্ডসাহেবও একজন আছে, ইহা যেন পরম বিস্ময়ের বস্তু।

বিশেষ করিয়া গার্ডসাহেব তাহার মালকোঁচামারা ধুতি ও কাঁধছেড়া কোটের দৈন্যে গার্ড-জনসুলভ ভড়ং দেখাইতে পারিতেছিলনা বলিয়া নাগরিকাদের কাছে একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়াই রহিল। মাথার টুপিতে লেখা ছিল 'গার্ড', অথচ পায়ে জুতা ছিলনা।

ইলার মতে এ বেশ 'অপূর্ব্ব'। সে কথা শুনিতে পাইয়া গার্ডেরও স্মরণ হইল, দেশে-বিদেশে যেখানে যত গার্ড আছে, এমন হীন পরিচ্ছদ কোথাও কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। সত্যই সে গার্ড পদের কলঙ্ক। কিন্তু কি-ই বা তার করিবার আছে, মাহিনা ত পনেরো টাকার বেশী নয়, বেশী হইবার সম্ভাবনাও নাই।

সেকেণ্ড বেল বাজিলে আর এক দফা হাসির হর্‌রা উঠিল।

ষ্টেশনমাষ্টার কোঁচা দোলাইয়া সবিনয়ে আসিয়া জানাইলেন—এবার টিকিট করিবার সময় হইয়াছে।

অনুপম সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট চাহিতে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন ; থার্ড ক্লাসে যেখানে ।৵০ ভাড়া সেখানে সেকেণ্ড ক্লাসের ফেয়ার ১৲, সেই জন্য এ লাইনে কস্মিনকালে কেহ কখনো সেকেণ্ড ক্লাসে যায়না, তাই সেকেণ্ড ক্লাস জোতাই হয়না, জুতিলেও তাহাতে বসিবার উপায় নাই, বহুকালের অব্যবহারে গদির নারিকেল ছোবড়া পোকায় কাটিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে, রেলোয়ে অফিসার কেহ গেলে তাহাতে খান দুই চেয়ার তুলিয়া দেওয়া হয়। এতগুলি লোকের চেয়ার ত গাড়ীতে ধরিবেনা !

অতএব ইণ্টার ক্লাসে যাওয়ার কথা উঠিল, তাহারও অসুবিধা এই, কয়েকখানি 'মান্থলি' আছে তাহারা ঐ কামরায় উঠিবে সুতরাং ভিড় হইবে। থার্ডের কামরাগুলি বড় বড়, বরঞ্চ তারই একটা দিক রিজার্ভের মত করিয়া দেওয়া যাক্‌, অনর্থক বেশী ভাড়া দিয়া লাভ কি ?

অনেক ভাবিয়া হল্‌দে টিকিট কাটাই স্থির হইল। অনুপম গন্তব্য স্থানের নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কত ভাড়া ? ষ্টেশনমাষ্টার জানাইলেন শনিবার আর মঙ্গলবার চার আনা, অন্য দিন তিন আনা।

তাহার কারণ এই প্রকাশ পাইল, শনি মঙ্গলবারে ওধারে হাটের জন্য বেশী লোক যাতায়াত করে, তাই ভাড়া বেশী ; তা ছাড়া বাসের কম্পিটিশনে এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। বাসও ঐ ভাবে কমায় বাড়ায়।

অনুপম বলিল—যদি বাসেও এক ভাড়া তবে বাসেই যাইনা কেন ?

ষ্টেশনমাষ্টার কোম্পানীর আশু লোকসানের কথা ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—বাসে কি মেয়েছেলে নিয়ে চড়া যায় মশাই ? না, চড়া উচিত ? এ হাত পা ছড়িয়ে দিব্বি যান; কোনো ভাবনা নেই। বাসে এক্সিডেণ্ট হতে কতক্ষণ ?

শেষ পর্য্যন্ত রেল কোম্পানীর টিকিটই কেনা হইল এবং মেয়েরা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

গাড়ীর একধারের দুইখানা বেঞ্চি তাঁরা সম্পূর্ণ দখল করিয়া বসিল। অন্য দিকে ময়লা কাপড়-পরা যাত্রীদল তাহাদের বোঁচকা বুঁচকি লইয়া উঠিল। কেহ খৈনী পিষিতে লাগিল, কেহ বিঁড়ি মুখে দিয়া দেশলাই খুঁজিতে বসিল, কেহ বা গাঁজার কলিকায় টান দিতে সুরু করিল। বিঁড়ি ও গাঁজার ধোঁয়ায় খকখক্‌ কাশিতে, প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাষার কিচিমিচিতে ইলারা ত রীতিমত বিরক্ত

হইয়া উঠিল, ছোট ভাই পুটুস্ বলিল—এই জন্যেই সায়েবরা থার্ড ক্লাসে যায়না।

ইলার বৌদি বলিল, সত্য।

ইলা চুপ করিয়া জানলার ধারে বসিয়া ছিল।

এই অশোভন পল্লীজন-সুলভ আবহাওয়ায় তাহাকে যেন মানাইতেছিল না। ক্যালিকো-মিলের জাফ্‌রাণী রং শাড়ী, কোঁচাটুকু মারাঠি মেয়ের মত পায়ের উপর পড়িয়াছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ফাঁস দেওয়া স্যাণ্ডেলের কিনারায়—হাতের জড়োয়া কঙ্কণ, গলার মাঝখানটিতে মুক্তার পেণ্ডেণ্ট, কাণে কয়েকটি ঝক্‌ঝকে শিশির-বিন্দুর মত হীরার কুচি-বসানো দুল, এধারে ওধারে মাথা নাড়িবার সময় দুলিতেছে—চূর্ণ-কুন্তল-বিজড়িত আল্‌গা এলোখোঁপা, সর্ব্বোপরি তার অনিন্দ্য-সুন্দর সুগৌর মুখশ্রী—সব মিলিয়া সে যেন একখানি রবিবর্ম্মার ছবি মলিন গাড়ীর ভাঙা বাতায়নের ধারে রাখা।

ষ্টেশন্‌শুদ্ধ লোক এবং গাড়ীর ভিতরের সমস্ত যাত্রী তারই মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

এ চাওয়া তার গা সহা হইয়া গেছে। যখন শিঙাপুর হইতে তার পিতা সিভিল সার্জ্জনের পদ হইতে পেন্‌শন লইয়া দেশে ফিরিতেছিলেন, তখন ডেকে সে প্রথম লক্ষ্য করিল, সে দেখিবার জিনিস হইয়া উঠিয়াছে, তার তখন প্রথম-যৌবন।

তার পর কলিকাতা সহরে দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। স্কুলের বাস হইতে পথিকের দৃষ্টি, কলেজের ক্লাসে প্রোফেসরের বিমুগ্ধ কটাক্ষপাত, সঙ্গীদের উন্মাদনা, জীবনের পথে বহু হতাশ প্রেমিকের চাঞ্চল্য দেখিয়া সে শুধু ভাবিয়াছে—এই পুরুষ জাতটা কি!

মারাঠী ভাটিয়াদের মধ্যে যারা খুব বেশী রকম রূপসী ইলার সঙ্গে তাহাদের উপমা খাটে। রবিবর্ম্মার বিখ্যাত ছবি সীতা শকুন্তলা মনোরমা—হয়ত ইলার সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য আছে বলা যায়।

ইলা বি-এ পাশ, ইলা ধনীকন্যা, ইলা শ্রীমতী, ইলার মত মেয়ে এই রেললাইন যতদূর গিয়াছে তাহার দুইধারের গ্রামে কোথাও দেখিতে পাইবার কথা নয়; তাই ইলাকে লোকে দেখিবে হাঁ করিয়া ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; ইলাও বিস্মিত হয় নাই। কিন্তু অনুপমের অস্বস্তি হইতেছিল। সেই এখন অভিভাবক, তার মানে আঘাত লাগিতেছিল।

—চাই শিবশক্তি মলম! কাটা সারে, খোঁচা সারে, সারে ক্ষত আদি। বাত সারে ব্যথা সারে সারে যত ব্যাধি।

ক্যানভাসারের চীৎকারে সকলে ফিরিয়া দেখিল। ক্যানভাসার সুর করিয়া বলিয়া চলিল—

শিবশক্তি মলমের গুণ দেখো বুঝে।

পুটুস স্বভাব-কবি—মিলাইবার লোভ সামলাইতে পারিলনা, বলিয়া ফেলিল—হারাইলে গরু তুমি তাও পাবে খুঁজে।

গাড়ীশুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল।

লোকটি ঈষৎ লজ্জিত হইয়া আপাততঃ শিবশক্তি মলমকে রেহাই দিয়া বলিতে লাগিল—নেবেন দাঁতের মাজন, ভালো মাজন আছে, দাঁতের গোড়া ফোলা কন্‌কন্ ঝন্‌ঝন্ কট্‌কট্ আদি ব্যবহার মাত্রে নির্ম্মূল হইবে, যাঁর দরকার দাদা ডেকে নেবেন। নেবেন—ঢাকার ভাস্কর লবণ—চোঁয়া ঢেঁকুর, বদহজম ··

নারীকণ্ঠে হাসির রোল উঠিল, সে বেচারা সুটকেশ বন্ধ করিয়া নামিয়া পড়িল।

অনুপম বলিল—জ্বালালে বাবা।

একজন নিম্নশ্রেণীর লোক বলিল—আজ্ঞে এই ক'রে এদের পেট চলে, কি করবে বলুন।

গাড়ী ছাড়িবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, ড্রাইভার কি কাজে গিয়াছে, আসিলেই গাড়ী ছাড়িবে।

ইলা জানলা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল, দুটি ক্যানভাসার পরস্পরের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসির আদান-প্রদান করিল।

একজন বলিল, কি বাজার পড়েছে মাইরি, এক পয়সার বৌনী হয়নি আজ।

সহসা মাইরি বলিবার কি প্রয়োজন ছিল ইলা বুঝিতে পারিলনা।

আর একজন জবাব দিল মাইরি আমারও তাই। এক শিশি ভাস্কর লবণ বিক্রী করলাম, তাও সে পয়সার খেয়ে ফেললাম বড় ক্ষিদে পেয়েছিল মাইরি। এখন কোম্পানীকে কি বলব ভাবছি। মাইরি!

আবার মাইরি! ইলা এ রকম বিচিত্র কথা কখনো শোনে নাই।

ইলা জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা দিন কত ক'রে বিক্রী কর?

একজন ভদ্র কুমারীর সোজা প্রশ্ন শুনিয়া ভদ্রবেশী দুটি লোক হঠাৎ কেমন হইয়া গেল। একজন সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল—এই কোনো দিন ছ আনা, কোনো দিন বারো আনা, কোনো দিন বা এক টাকা, কোনো দিন হয়ত কিছুই হলনা!

ইলা লক্ষ্য করিল এবারে সে একটাও 'মাইরি' বলিলনা!

ইলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি?

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ রকম নাম ইলা প্রত্যাশা করে নাই। মনে করিয়াছিল, নিম্নশ্রেণীর কোন পদবী হইবে। একবার তুমি বলিয়া ফেলিয়াছে, আর আপনি বলা মুস্কিল।

বলিল, দাঁতের মাজন কত ক'রে?

—দু পয়সা প্যাকেট।

দাও ত আট প্যাকেট।

ক্যানভাসার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর একজন আধপোড়া বিঁড়িটি হাতে লইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তাহাকেও ইলা বলিল—তুমিও দাও আট প্যাকেট।

ততক্ষণে ট্রেণ ছাড়িয়াছে, একটা আধুলি ফেলিয়া দিয়া যাত্রাক্ষণে দুটি হাসিমুখ দেখিয়া ইলার মন কি জানি কেন প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

গাড়ী যত না চলে তার চেয়ে শব্দ করে বেশী। নানা বাড়ীর উঠান, পোড়ো বাগান, রান্নাঘর, পুকুরঘাট একেবারে ঘেঁসিয়া রেলের লাইন।

একটা জায়গায় লাইনে গরু উঠিয়াছে বলিয়া ট্রেণ থামাইয়া ড্রাইভারকে লাঠি লইয়া নামিতে হইল। আর এক জায়গায় একটা কামরার চেন খুলিয়া গেল, তবু অ্যাক্‌সিডেণ্ট হইলনা; এবং কোনো দিন কোনো অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু সে কথা ইলা বিশ্বাস করিলেও ইলার বৌদি বিশ্বাস করিলনা, সে ছেলেপুলেদের কাছে আসিয়া বসিতে বলিল।

একটা ষ্টেশনের পর গাছপালা জঙ্গলের ঘন অন্ধকার দূর হইয়া সুরু হইল দিগন্তবিলীন সবুজ ধানের ক্ষেত। যতদূর অবধি দৃষ্টি যায় ততদূর অবধি শুধু মাঠ আর মাঠ। কোথাও কল্‌মিদল ঠেলিয়া শাল্‌তি চলিয়াছে একটি ছোট বধূকে লইয়া হয়ত তার বাপের বাড়ী। কোথাও কেহ মাছ ধরিতে বসিয়াছে বাঁশের পুলের উপর হইতে, কোথাও খেজুরগাছে পাখী উঠিয়াছে—খাঁটি বাঙ্‌লার নিজস্ব ছবি।

একটা ষ্টেশনে কতকগুলি মেছো মাছের ঝাঁকা লইয়া উঠিল, একজন তরীতরকারীর বাজরা।

অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে অনেক ষ্টেশনে তালা পড়িয়াছে।

বাসের প্রতিযোগিতায় যাত্রীসংখ্যা যারপরনাই কম। শিবশক্তিমলমওয়ালা প্রতি ষ্টেশনে নামিতেছে, ছেঁড়া হাফপ্যাণ্টপরা টিকিট চেকার চলন্ত গাড়ীর পাদানে দাঁড়াইয়া টিকিট দেখে এবং একজনও বিনা টিকিটের যাত্রী নাই দেখিয়া হয়ত মনে মনে অপ্রসন্ন হয়, কারণ একদিন ঐদিক হইতে বিলক্ষণ উপরি পাওনা হইত।

অনেকক্ষণ ইলা চুপ করিয়া আছে। উদার প্রকৃতির শ্যামল শোভা মানুষকে কথা বন্ধ করিয়া ভাবিতে নির্দ্দেশ দেয়।

অনেক দূরে ঝাপ্‌সা গাছপালায় মনে হইতেছে, যেন বৃষ্টি হইতেছে। একটু ঠাণ্ডা হাওয়াও দেয়। অনেক দিনের বিস্মৃত কথা মনে পড়ে—নীলসিন্ধুজলচুম্বিত সুদূর শিঙাপুরে কেমন করিয়া তার শৈশব কাটিয়াছে!

অনুপম বলিল, ডেষ্টিনেশন এসে গেছে, এবার নাব্‌তে হবে। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ট্রেণ যেখানে আসিয়া থামিল, সেখানে প্ল্যাটফর্ম্মের কোনো সন্ধান মিলিলনা।

লোক চলাচলের রাস্তা—যেখানে সারি সারি খড় বোঝাই গোরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ভর্ত্তি বাস হর্ণ দিতেছে, সেইখানে নামিতে হইবে, আপ ও ডাউন প্ল্যাটফর্ম্ম তাই।

রক্ষে করো মা, এমন দেশে মানুষে আসে, বলিতে বলিতে ইলার মামীমা আগে নামিলেন।

খুব কাছেই একটা গাড়ীর গোরু শিঙ্ নাড়িতে লাগিল দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওরে বাবা, গাড়োয়ান তোর গরু সাম্‌লা।

গাড়োয়ান হঃ হঃ করিয়া চীৎকার করিয়া গোরুর মাথাটা ঘুরাইয়া দিল।

গাড়ীর সার এবং ট্রেণের মাঝখান দিয়া যেটুকু সরু পথ পাওয়া গেল তাই ধরিয়া সকলে অগ্রসর হইল।

বড় বড় লম্বা চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া আসিয়া রাস্তা করিয়া দিতে সাহায্য করিলেন। সকলে বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন—আপনাদের টিকিটগুলো—

অনুপম টিকিট দিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কি টিকিট-কালেক্টর?

—আজ্ঞে না, আমি ষ্টেশন মাষ্টার। আপনারা কোথায় উঠ্‌বেন, উকীলবাবুর বাগানে?

অনুপম বলিল, হ্যাঁ। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন?

ষ্টেশন মাষ্টার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—এ রকম সম্ভ্রান্ত লোক উকীলবাবুর বাগান ছাড়া এ পাড়াগাঁয়ে আর কোথায় উঠ্‌বেন বলুন? জান্‌তে কোনো কষ্ট হয়না।

অনুপম যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল আপনার নামটি?

—আজ্ঞে আমার নাম হলধর ঘোষ। উকীলবাবুর ছেলে শোভনবাবু আমার ফ্রেণ্ড। ওগো বাছারা, তোমাদের টিকিটগুলো দিয়ে যেও অমনি—বলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার আর একদল পল্লীরমণীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইলা বলিল—চলো বাপু সেজদা, তোমার এখন আবার আলাপ করবার সময় হল, ওদিকে চা না খেয়ে মাথাটা ক্রমে ধ'রে উঠ্‌ছে—

ততক্ষণে বাগানবাড়ীর মালিক শোভনও আসিয়া পড়িয়াছে। বলিল, এসেছ তোমরা, ট্রেণটা আজ একটু আর্লি এসেছে। বিফোর-টাইম।

ইলা বলিল—কেন, রাঙাদা, ইনি কি এদিককার এক্সপ্রেস না কি?

পুটুস বলিল—আমরা আস্‌ব এক্সপ্রেসে? এ হল স্পেশাল!

ট্রেণ ছাড়িয়া দিয়াছিল, দাঁড়াও দাঁড়াও বলিতে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল, একদল যাত্রী উঠিল।

গ্রামের বারোয়ারী পূজার নিমন্ত্রণ আসিল।

ইলা বলিল, আমি দেখ্‌তে যাবো কেমন ক'রে ঠাকুর তৈরী করে, কক্ষণো দেখিনি!

শোভন বলিল—তৈরী ত হয়ে গেছে, রং লাগানোও হয়ে গেছে, হয়ত আজ সাজ পরানো হবে, এই ত দেখলাম মালাকার গেল।

চলো তাই দেখে আসি।

ইলা ও ইলার বৌদি সান্ত্বনা সন্ধ্যার মুখে বাহির হইল শোভনের সঙ্গে।

গ্রামের কর্ত্তাব্যক্তির দল এখানে ওখানে দাঁড়াইয়া তামাক খাইতে খাইতে গল্প করিতেছিলেন। ডে লাইটের আলোয়, উঁচু একটা চৌকীর উপরে টুল রাখিয়া মালাকার প্রতিমা সাজাইতেছিল। হঠাৎ নাগ্‌রা ও স্যাণ্ডেল পায়ে দুই তরুণীর সঙ্গে শোভনকে দেখিয়া সকলে বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

চেয়ার এবং বেঞ্চি আনিবার জন্য সকলেই একযোগে হাঁকাহাঁকি সুরু করিলেন। শোভন বলিল, কিছু দরকার নেই, আমরা একটু দাঁড়িয়ে দেখেই চ'লে যাব।

কালো শনের গোছা দুজনে দুই হাতে ধরিয়া পাকাইতে পাকাইতে শেষটা এক গোছ করিয়া ছাড়িয়া কিছু কিছু ছিঁড়িয়া লইতেই দেখাইল কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ। মা-দুর্গার কাঁধের দু-পাশ দিয়া তাই বিলম্বিত করিয়া একে একে লক্ষ্মী সরস্বতী ও কার্ত্তিকের মাথায়ও দেওয়া হইল। সিদ্ধিদাতার ওসব বালাই নাই। সিংহের কেশর-মাটির গড়াই ছিল, অসুরের চুল ও গালপাট্টার প্রয়োজন হইল। তার পর একে একে মুকুটে আঠা লাগাইয়া সাঁটিয়া দেওয়া হইতে লাগিল, ক্রমে জরীর সাজ, রাঙ্‌তার অলঙ্কার, পরে চালচিত্র।

দেখিতে দেখিতে রঙে রূপে দুর্গাপ্রতিমা মাটির পুতুল হইতে মহিমময়ী দেবীর বেশে রূপান্তরিত হইতে লাগিলেন।

তার পর যখন ঘাম তেল মাখানো হইল তখন স্বর্গীয় ভাবের যেটুকু বা বাকী ছিল তাও যেন পূর্ণ হইয়া গেল।

ইলাও দাঁড়াইয়া ছিল যেন ছবিটি। এমন প্রাণ ভরিয়া প্রতিমা-সজ্জা দেখিতে পাইয়া মন তার তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল।

আঠার নীল রং দেখিয়া সে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা ওটা কিসের আঠা যে এমন রং আর এত শক্ত ক'রে আঁটে?

মালাকার বলিল—কাঁইবিচির আঠা, তেঁতুলের বিচি বেঁটে তাই থেকে হয়। অন্য সব আঠা অশুদ্ধ।

এতক্ষণ ধরিয়া পল্লীমোড়লেরা ইলাকে যেন গিলিতে-ছিলেন,—কেহ কেহ মালাকরকে ধমকাইয়া খানিকটা সর্দ্দারী করিয়াও গেলেন।

সেদিন অন্ধকার পল্লীপথে শোভনের ক্ষণে ক্ষণে প্রজ্জ্বলিত টর্চ্চের আলোতে পা ফেলিয়া চলিতে চলিতে অজানা ফুলের উগ্র মধুর গন্ধে ঝিল্লীমুখরিত তরুবীথিচ্ছায়ায় ইলার মনে হইতে লাগিল কলিকাতার ত্রিতল বাড়ীর চেয়েও এই গ্রামখানি এক হিসাবে মন্দ নয়। এখানে কিছুকাল থাকা যাইতে পারে।

অষ্টমী পূজার সন্ধ্যারতির সময় গ্রামের মেয়ে পুরুষের ভিড়ে পথ করিবার উপায় নাই। ইলারা আসিয়া পড়িতেই সকলকে হটাইয়া মাতব্বররা রাস্তা করিয়া দিল।

কে একজন বলিল, চলে যান আপনারা ভেতরে চ'লে যান। ইলা সান্ত্বনা ও ইলার মামীমা বাঁশ-ঘেরা জায়গাটায় ঢুকিবার আগে জুতা দিয়া দিল অনুপমের জিম্মায়, তার পর প্রতিমার বামে দিব্য নিরাপদ জায়গায় গিয়া আরতি দেখিতে লাগিল।

ধূপ-ধূনার ধোঁয়ায় চারিদিক ভরিয়া গেছে। ঘণ্টা-শব্দকে ছাপাইয়া ঢাকের শব্দ চলিয়াছে। এক একবার ধূমের স্বচ্ছ আবরণ সরিয়া গিয়া প্রতিমার মুখ ভাসিয়া উঠিতেছে যেন হাসিতে দীপ্ত, কল্যাণে সুমধুর।

প্রণাম করিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ইলার হাতখানি কে ধরিয়া বলিল, দিদি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম।

ইলা চিনিতে না পারিয়া চাহিয়া রহিল। কে একজন বলিল, ইষ্টিশান মাষ্টারের বৌ গো।

মৃদু হাসিয়া ইলা বলিল—ও, নমস্কার।

সেও হাত তুলিয়া বলিল—নমস্কার ভাই।

তার পরেই যেন আর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, আমাদের বাড়ী যেতে হবে।

কতদূর?

ঐ ত, বলিয়া একদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সে অগ্রসর হইল।

দুইখানি মাত্র ঘর—তারি কোলে একফালি উঠান পাঁচীলে ঘেরা।

ইহারই নাম কোয়ার্টার্স! এত ছোট বাড়ীতে মানুষ দিনের পর দিন কি করিয়া থাকিতে পারে ভাবিয়া ইলা বিস্মিত হইল।

একখানা তক্তাপোষ পাতিতেই শয়ন-ঘর প্রায় ভরিয়া গেছে, বাক্স-প্যাটরা উপর উপর সাজানো, একটা খুলিতে হইলে সবগুলা নামাইতে হইবে। তাহারই মাঝখানে আবার আল্নায় ছবিতে কেলেণ্ডারে ঘর যেন ভারাক্রান্ত!

পাশের ঘরটা রান্নাঘর, সে ঘরের কালী-মলিন দেয়াল দেখিয়া ইলার ঢুকিতেই ভরসা হইলনা।

চৌকীর বিছানার উপরই তাহাদের বসিতে বলিয়া বৌটি হাতপাখা আনিয়া দিল। ইলা হাত বাড়াইয়া লইল, শীত একটু একটু পড়িয়াছে কিন্তু এ ঘরে অসহ্য গরম।

ইলাদের চাকরদের ঘরও এর চেয়ে কিছু বড়, সে ঘরে সে কোন দিন ঢোকে নাই।

ইলার মাসীমা বলিলেন—তোমার কি ছেলেমেয়ে?

বৌটি বলিল—চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। কোলেরটি এই মাস আষ্টেকের।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন আর এখন হবে-টবে না ত?

বৌটি মাথা নীচু করিয়া এই ত আবার—বলিয়া চুপ করিয়া গেল। বোঝা গেল সম্ভাবনা সন্দেহের অতীত নয়।

একটি ছেলে চিৎ হইয়া শুইয়া ছিল, আরেকটি তার পেটে বসিয়া হেট্ ঘোড়া হেট্ করিতে লাগিল।

একটি মেয়ে বলিল ক্ষিদে পেয়েছে। আরেকটি ইলার জুতা লইয়া চলিয়া গেল। একজন সান্ত্বনার কাছে আসিয়া বলিল, একটা পয়সা দাও।

বৌটি লজ্জিত হইয়া উঠিল। বলিল—কি অসভ্য ছেলে মা, পয়সা চাইতে না মানা করে দিয়েছি? এদিকে আয় শীগ্‌গির! আজ তোর ভাত বন্ধ,—বজ্জাত ছেলে!

সান্ত্বনা রুমালের গেরো খুলিয়া একটি আনী বাহির

করিয়া তার হাতে দিয়া বলিল—চাইলেই বা, কি হয়েছে। ছোট ছেলে—ওকে কি অমন ক'রে বকে? এসো বাবু, তোমার নাম কি?—বলিয়া তাকে কোলে তুলিয়া লইল।

বৌটি বলিল—ওর পায়ে কাদা, কি করছেন দিদি, আপনার কাপড় ময়লা হয়ে যাবে যে!

তা হোক্—বলিয়া সান্ত্বনা তাকে ভালো করিয়া কোলে বসাইয়া বলিল—বলো তোমার নাম কি?

এম্‌নি সময়ে একটি মেয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—তার ছোট ভাই নাকি তার নাকে খাম্‌চাইয়া দিয়াছে। বৌটি উঠিয়া দুষ্কৃতকারীর পিঠে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড় বসাইয়া বলিল, বাড়ীতে যদি লোক এল অম্‌নি পাজীগুলো কুরুক্ষেত্তর করবে। একটু যদি থির হয়ে বসে যে দুদণ্ড মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা কোক্।

এম্‌নি সময় হলধরবাবুর গলা শোনা গেল—কি হল রে হাবুল?

বৌটি ছুটিয়া বলিল—ওগো তুমি এখন যাও, উকীল বাবুর বাড়ীর মেয়েরা এসেছেন।

হলধরবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, ভালো করে বসাও ওনাদের, চা ক'রে দাও।

সান্ত্বনা ও ইলা, চায়ে যদিও তাহাদের আপত্তি হইবার কথা নয়, তবু বধূটির কষ্ট হইবে মনে করিয়া, একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল, না ভাই, চা এমন সময়ে আমরা খাইনা।

ছেলেমেয়েদের গণ্ডগোলে বৌটি বিব্রত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়াই উভয়েই সেদিনের মত উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আসি ভাই।

দিন মন্দ কাটিতেছিল না। পুকুরে স্নান, মাছধরা, বাগানে ছুটোপাটি করিয়া বেড়ানো, ক্ষেতের টাট্‌কা শাক্‌সবজি তুলিয়া খাওয়া—সব কিছুই holiday উপভোগের পক্ষে বেশ জিনিস। কিন্তু নূতন এক উপদ্রবের সৃষ্টি হইল।

গ্রামের যিনি জমিদার একদিন তাঁদের বাড়ীতে ইলারা বেড়াইতে গিয়াছিল। জমিদারের বয়স অল্প। এই বছরে ল পাশ করিয়াছে। কল্যাণ তার নাম। গ্রামের ও প্রজার কল্যাণের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু সে দৃষ্টি বুঝি ইলার শোভন রূপের দিকে না পড়িলেই ভালো ছিল।

কল্যাণের মা সান্ত্বনাকে—ইলার সাম্‌নেই বলিয়া বসিলেন এই মেয়েটিকে আমি বৌ করব।

দুইজনেই হাসিল, ভদ্রতার হাসিও বটে, উপহাসের হাসিও বটে।

কল্যাণের মা ছাড়িবার পাত্র নন, বলিলেন—হাসির কথা নয়, ছেলে পছন্দ ক'রে বসেছে, এখন তোমরা রাজী হলেই হয়। আমার ছেলেকে ত দেখেছ, দেখ্‌তে শুন্‌তেও কিছু খারাপ নয়, পড়াশুনোতেও ভালো। আমাদের জমিদারীর আয়ও বছরে প্রায় বারো চোদ্দ হাজার—একটু ভেবে জবাব দিয়ো মা—

তাই হবে—বলিয়া সান্ত্বনা উঠিল, ইলা ত' তার আগে দাঁড়াইয়াছে।

বাড়ীর বারান্দা হইতে খুব প্রকাণ্ড এক দীঘি দেখা যায়। আমবাগান জামবাগান লিচুবাগান অনেক দূর অবধি। ঘাটের পাশেই একটা সবেদা গাছ। ও-ধারে সারি সারি ইউক্যালিপটাস্ বনঝাউ, শিশুগাছ। উঠানের রাস্তার দুই পাশে ফুলের বাহার—দেশী বিদেশী—তার মাঝে জিনিয়ার রং সকলকে ছাপাইয়া গেছে। এই সমস্তেরই অধীশ্বরী হইতে পারে ইলা।

গোয়ালভরা গরু, মরাইভরা ধান, দাসদাসী, লোকজন, আশ্রিত স্ত্রী-পুরুষের ভিড় প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীটাতে যেন লক্ষ্মীশ্রী আনিয়াছে। স্বয়ং জমিদার কলিকাতায় পড়াশুনা করিয়া সেখানকারই মত কেতাদুরস্ত, চেহারাতেও ফিট্‌ফাট্। দূর হইতে দেখিলে বিশেষ খারাপ বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু তবু এই অজ্‌পাড়াগাঁয়ে শ্বশুরবাড়ী—ইলা ভাবিতে পারেনা।

বাড়ী আসিয়া ননদ-ভাজে একচোট্ খুব হাসিয়া লইল, পল্লীগ্রামের জমিদার-তনয়ের সুশিক্ষিত Calcutta girlএর প্রতি লোভ দেখিয়া।

কয়দিন ধরিয়া জমিদারের প্রতিনিধি আনাগোনা করিতে লাগিল, একটা জবাব পাইবার জন্য। খুব কড়া জবাব দেওয়া গেলনা। অবশেষে নরম করিয়া বলা হইল, মেয়ে এখন বিয়ে করবেনা, তাছাড়া কলকাতায় বাড়ী না হ'লে এই পাড়াগাঁয়ে থাকা তার পোষাবেনা।

ও-পক্ষের আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেলনা। উপদ্রব

আপনি বিদায় হইয়াছে ভাবিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইল; কারণ, উকিলবাবুকে ঐ জমিদারেরই জমিতে বাস করিতে হয় এবং তিনি ইলাদেরও নিকট আত্মীয়। খাজনা-টাজনা লইয়া তাঁর সঙ্গে না কিছু গোল বাধে এই ভাবনা ছিল। কিন্তু জমিদার লেখাপড়া শিখিয়াছে, কন্যাপক্ষের কথায় নাকি কিছু রাগ করে নাই, বরঞ্চ বলিয়াছে—আমি ত মাকে বরাবরই বলেছি এখানে কি ওঁরা থাক্‌তে পারেন।

ছুটি ফুরাইয়া গেল। সহরের দিকে ফিরিবার দিন ট্রেণের জানালা হইতে রহস্যমণ্ডিত পল্লব-ঘন বহু গ্রামের পরপারে অনেকদূরে দিগন্তরেখার গায়ে নারিকেল গাছের সারি। তার উপরে নীল চন্দ্রাতপের মত পল্লীগ্রামের উদার সীমাহীন আকাশ, সূর্য্যরশ্মিপ্রতিফলিত জলরেখা—যতই সে মিলাইয়া যাইতে দেখিল ততই তার মন কেমন করিতে লাগিল কতকটা যেন প্রিয়বিয়োগবিধুরতার মত।

ভালো লাগে ভালোবাসিতেও ইচ্ছা করে এই পল্লী ভবনের শান্ত প্রতিচ্ছবিকে। কিন্তু চিরদিন ধরিয়া সেখানে বসবাস করা কোনোমতেই হইতে পারেনা।

কতদিন পরে আবার সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে।

কলিকাতার বিচিত্র জীবন কিছুকাল উপভোগ করিতে না করিতে ডাক পড়িল কানপুরে,—সেখানে একটা চাকরী খালি আছে।

কাণপুরে তার দুই বন্ধু থাকে—বেলা আর সুষমা। দুজনেরই স্বামীর ওটা কর্ম্মস্থল।

একদিকে এক গেঞ্জীর কারখানা, আর একদিকে এক কাপড়ের মিল। তৃণহীন ধূসর প্রান্তর। বাঙ্গালী প্রতিবেশীর সংখ্যা যারপরনাই অল্প। আবহাওয়া দেখিয়াই সে বলিল—রক্ষে করো—এই কয়েকজন বিলেতফেরৎ neighbour নিয়ে থাকা আমার পোষাবেনা। তা ছাড়া সহর থেকে সাত মাইল দূরে এখানে না আছে গঙ্গা না আছে বৈচিত্র্য।

কানপুর হইতে গেল বম্বে। দাদারে এক নূতন স্কুল খুলিয়াছে শুধু বাঙালী মেয়েদের জন্য, শিক্ষয়িত্রী চাই।

বম্বে যাইতে শুধু তার ভালো লাগিল পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা আর অসংখ্য টানেল। বম্বে সহরের মধ্যে ভালো লাগিল জুহু, সমুদ্রসৈকত—কিন্তু সেখানেও প্রতিবেশী সমস্যা। তার বন্ধু বাঙ্গালীরা অধিকাংশই বাঙলাদেশকে ঘৃণা করে,—সে নাকি nasty জায়গা। বন্ধুদের সঙ্গে একচোট্ ঝগড়া করিয়া কলিকাতায়—তার সাধের কলিকাতায় সে ফিরিয়া আসিল ছয় মাস পরে।

এই ছয় মাসের মধ্যে তাহার পাড়ার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—আশেপাশে অনেকগুলি বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে এবং হইতেছে।

সে পোষ্টগ্রাজুয়েট ক্লাসেই ভর্ত্তি হইল।

রাত্রি আটটার পর তার বেড়ানো অভ্যাস—রাত দশটা অবধি ঘোরে।

কয়দিন হইল অসহ্য গরম পড়িয়াছে। বিকালে গা ধুইলেও আবার রাত্রে স্নান করিতে হয়। দশটা বাজিয়া গেলেও বাড়ীতে ফিরিতে ইচ্ছা করেনা।

সেদিন সান্ত্বনা হঠাৎ তাহাকে বারণ করিল—আর অতরাত অবধি একলা ঘুরিসনি, ইলা, গুণ্ডার উপদ্রব হচ্ছে—

ইলা বাধা দিয়া বলিল—তুমি রাখো রাখো, শিঙাপুরের মানুষ আমরা গুণ্ডার ভয় করি না।

কিন্তু সত্যই সেদিন ভয় করিবার কারণ ঘটিল।

একডালিয়া রোড হইতে যখন সে রাসবিহারী এভিনিউয়ে পড়িল, তখন একটা পানের দোকান হইতে যেন দু-তিনটা লোক কি বলিতে বলিতে তাহার পিছু লইল।

রাত একটু বেশীই হইয়াছে, ট্রাম বন্ধ হইয়াছে, এবং সামনে রাস্তায় ভদ্রাভদ্র একটিও লোক নাই।

কর্ণফিল্ড রোডে পড়িবার সময় তার মনে হইল লোকগুলা এখনো আসিতেছে, কিন্তু ফিরিয়া দেখিলে পাছে তারা মনে করে সে ভয় পাইয়াছে, এই জন্য ফিরিয়াও দেখিল না, যেমন চলিতেছিল চলিতে লাগিল, গতিটা একটু দ্রুত করিয়া দিল।

দুই দিকের বাড়ীই অন্ধকার, দু একটায় দ্বিতলে যা-ও বা আলো জ্বলিতেছে, সেখানে দাঁড়াইয়া সাহায্য প্রার্থনার চীৎকার করিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল, অথচ বুকের মধ্যে তখন টিপ্ টিপ্ সুরু হইয়াছে।

হিন্দুস্থান প্লটের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য বাড়ীর কোনো একটার দরজা খোলা পাইলেই আপাততঃ সে ঢুকিয়া পড়িত, কিন্তু দরজা কোনোটারই খোলা পাইল না।

অবশেষে কি একটা row করিতে হইবে, a scene create করা? না সে পারিবে না।

রস্তমজী ষ্ট্রীটে পৌঁছাইতে পারিলে শোভার বাড়ীতে বরঞ্চ ডাকাডাকি করা চলে, কিন্তু ততদূর যাইবার আগে পদশব্দ এবং বিপরীত রকমের কথাবার্ত্তা একেবারে দুই হাত পিছনে আসিয়া গিয়াছে।

নিঃশ্বাস দ্রুততর হইতে লাগিল। আরো কয়েক পা অগ্রসর হইয়া যে বাড়ীটা পড়িল, সে বাড়ীতে হয়ত আজ লোক আসিয়াছে, নীচে ওপর সমস্ত ঘরে আলো জ্বলিতেছে।

ঢুকিতে গিয়া দেখিল ফটকও খোলা এবং একজন কে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার কাছে গিয়া অস্ফুট কণ্ঠে ইলা বলিল, লোকগুলোকে জিগ্‌গেস্ করুন ত' তাদের মতলব কি, কেন আমায় ফলো ক'রছে!

তার পর চক্ষের নিমেষে এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। যুবকটি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই একজন তার নাকে ঘুসি মারিয়া বসিল। তাহাকে লাথি মারিয়া যদিও বা কাবু করা গেল, আর দুইজনে দুই পাশ হইতে আসিয়া ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিল, এবং যুবককে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন মারামারির আওয়াজ পাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তখন দুর্ব্বৃত্তরা প্রাণের মায়ায় সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সরিতে অবশ্য পারিলনা, ধরা পড়িয়া গেল।

যুবককে যখন তোলা হইল তখন তাহার কপালের পাশ দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইতেছে।

ইলা আতঙ্কে চোখ ঢাকিল।

যুবক ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিয়া গেল ঝি আর দরোয়ান সঙ্গে দিয়ে অনিল তুমি এঁকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো। ঐ মাঠটার পশ্চিমে ওঁর বাড়ী—দিনের বেলায় দেখা যায়।

সে রাত্রে ইলার ঘুম হইলনা।

বারান্দায় দাঁড়াইয়া সেই বাড়ীটা সে লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিল, যেটা সম্পূর্ণ নূতন তৈরী হইয়াছে এবং আজ হয়ত গৃহপ্রবেশ হইল।

কিন্তু দেখা গেলনা।

পরদিন উপকারীকে দেখিতে গিয়া দেখে কপাল ঢাকিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। তবু, দিনের আলোয় চিনিতে কষ্ট হইলনা—সে কল্যাণ, অখ্যাত পল্লীগ্রামের জমিদার—একদা তাহারই পাণিপ্রার্থী।

কল্যাণ বলিল, আপনি কাল আমায় চিনতে পারেননি?

অপ্রস্তুত ইলা বলিল—না। একটু অন্ধকার ছিল, তা ছাড়া মনের অবস্থা তখন—

কল্যাণ বলিল—দেখুন, ঠিক ধরেছি। আমি কিন্তু দেখেই চিনেছিলাম, নইলে বাড়ী বল্‌লুম কি ক'রে?

ইলা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখে কল্যাণ আজ নূতন মূর্ত্তিতে দেখা দিল, যে কল্যাণ তাহারই জন্য গুণ্ডার কাছে অপমানিত হইয়াছে, হারিয়া গেছে, আহত হইয়াছে। তবু তার বীরত্ব তার কপালে যেন জয়টীকা পরাইয়া দিয়াছে।

এমনি সময়ে কল্যাণের মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কেমন আছ মা—

ইলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন—থাক্ মা থাক্, শুনলুম সব। বড্ড বেঁচে গেছো। এবার ত ছেলের আমার কলকাতায় বাড়ী হয়েছে, আর ত আপত্তি করতে পারবেনা।

পুত্র-ভাগ্যবতীই বটে! ছেলের আঘাতের প্রসঙ্গে কোন কথাই নাই!

আপত্তি আজ ইলা করিবেনা, কিন্তু বাড়ীর জন্য নয়। বরঞ্চ এবার এ বাড়ী ছাড়িয়া সে নিভৃত পল্লীভবনে ফিরিয়া যাইতে রাজী, যেখানকার নারিকেল-পাতার মর্ম্মরধ্বনির আহ্বান এখনো তার কানে লাগিয়া আছে।

কিন্তু তাহার পাণিপ্রার্থী সহরের যুবকেরা বিবাহের সংবাদে শুম্ভিত হইয়া গেল, Introduction নাই, Tea party নাই, engagement নাই, একেবারেই

বি-বা-হ ইলার মত অতি আধুনিকার, তাও এক নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্য জমিদারের সঙ্গে !

জুনিয়ার খাস্তগীর বার-লাইব্রেরীতে বসিয়া দাস্তিদারকে বলিলেন—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেলে, এখনো আশা আছে—That lady. She's to stay where she is until I'm ready. No hanky panky.

নববধূ ইলার ক্রস্‌লি কার তখন কলিকাতা ছাড়াইয়া পীচ ঢালা রাস্তা দিয়া সোজা দক্ষিণে চলিয়াছে। দুই ধারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ দেখা দিয়াছে। কল্‌মিদল ঠেলিয়া শাল্‌তি চলিয়াছে। নববর্ষণে রৌদ্রদগ্ধ বিস্তীর্ণ ভূমি তৃণ-শ্যামল হইয়া উঠিয়াছে। সাতশো টাকা দামের বেনারসী চেলীর অবগুণ্ঠন সরাইয়া চন্দনচর্চ্চিত মুখটি বাহির করিয়া উৎসাহ-প্রদীপ্ত চোখে ইলা দেখিতে লাগিল, নিম্ন বঙ্গের জলধারাসিক্ত উদার অনন্ত সমতল ক্ষেত্রের উপর বিপুল আকাশ পিতৃ-স্নেহে নামিয়া আসিয়াছে—এবং দিক্‌চক্রবালে যেখানে সন্ধ্যার রাঙা ঘাটে দিনের চিতা জ্বলিতেছে সেখানে তাহার পরিচিত নারিকেল গাছের সারি যেন তাহাকেই হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তাহার কঙ্কণে তাহার সীমন্তে দিন-শেষের অস্তশেষরেখায় পল্লীলক্ষ্মী যেন আয়তির চিহ্ন আঁকিয়া দিলেন।

শিব

শ্রীজ্যোতির্মালা দেবী, বি-এ

(তোটক)

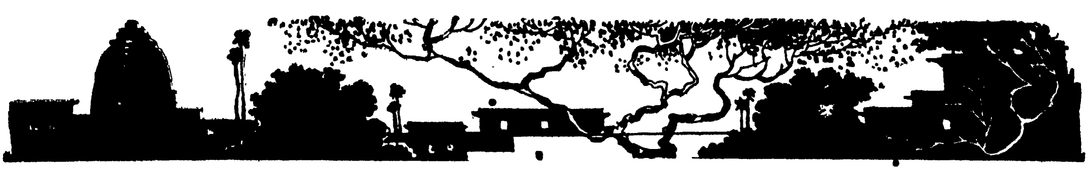
(লঘু-গুরু ছন্দ)

জয় সুন্দর ভৈরব রুদ্র বলী,
স্বন' ডম্বরু-মন্দ্র অরাতি দলি'।
ভয় ভঞ্জ' অরিন্দম ভীষণ হে,
শিব ! সাধন-সঙ্কট-নাশন হে !
তুমি ভীম হিমাচল ভক্ত-গতি,
নমি পুণ্যদ দিব্য অনন্ত যতী।

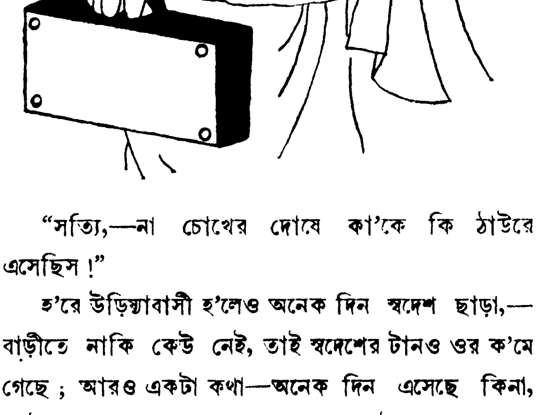
কর শ্যামল উষর প্রাণ-মরু,
মলয়ে তব ছন্দ' সুগন্ধ-তরু।
মম দুর্জ্জয়-ভাতি পরাণ-বঁধু !
ঝুর' চন্দন-কোমল দ প্তি-মধু।
শরণাগত-রক্ষক পদ্মকরে,
নমি চিন্ময় নিত্য অশঙ্ক বরে।

মম আকুল কম্পিত ভীতি শমি'
উদ' শঙ্কর ! শঙ্কিত চিত্ত রমি'।
করুণা-নত পাবন-নেত্র-করে
বরি চন্দ্রিল ! মূর্চ্ছিত পৃথ্বি 'পরে।
রচ' বাঞ্ছিত উজ্জ্বল নন্দন হে,
নমি মোক্ষদ ! বন্ধন-মোচন হে।

যত অধ্রুব বিপ্লব-ক্লেদ দহি'
ঘন মঞ্জুল কান্তি-প্রবাহ বহি'
ঝর' সান্দ্র শুভঙ্কর দেব-পতি,
কর উন্নত-সাধন উর্দ্ধ-ব্রতী।







(১)

আমাদের ভূতো খুড়ো নাকি অনেক দিন পরে গ্রামে ফিরেছে। সংবাদ শুভ, তাই বাড়ীর অনেক দিনের বুড়ো চাকর হ'রের মুখে খবর পেয়ে একটু বিস্মিত হ'লাম; সেই সঙ্গে অনেক দিনের মরচে-ধরা প্রাণটাও একটু আনন্দে যেন অল্প উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌লো।

আহাঃ—হাজার হোক,—তবু আমাদের সে—ই খুড়ো! যে খুড়োর পরামর্শে পাঠশালার ঘুমন্ত-গুরুমশা'য়ের টিকি জানালার গরাদের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে মজা দেখেছি, ইস্কুলে যাবার নাম ক'রে আত্মীয়স্বজনের সতর্ক দৃষ্টির ওপোরে ধূলো দিয়ে ছিপ হাতে নিয়ে সারা দুপুর—এ-পুকুর থেকে ও-পুকুর পর্য্যন্ত মাছ ধ'রে বেড়িয়েছি, গৃহস্থের বাগান ফলশূন্য ক'রে জিহ্বা-দেবতার তৃপ্তিসাধন ক'রেছি, সেই খুড়ো নাকি দেশে ফিরেছে!

যদিও সে দিন, কাল, বয়েস, এমন কি উৎসাহও নাই, পিতা মাতাও আমায় একমাত্র বধূর ভরসায় রেখেই নিশ্চিন্তে স্বর্গারোহণ ক'রেছেন, তবু, এই সব হারিয়েও মনে যেন কেমন একটা আনন্দ অনুভব ক'রলাম; মুখে ব'ললাম—

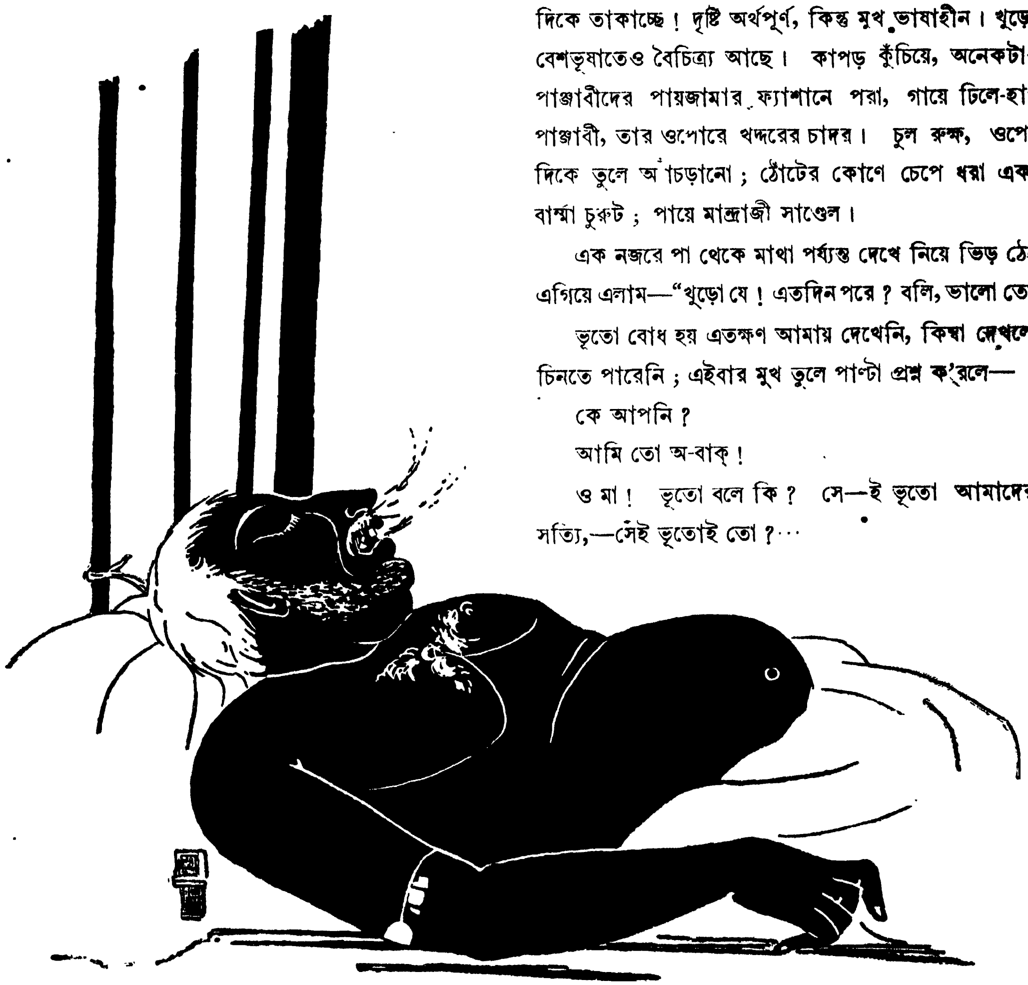
"সত্যি,—না চোখের দোষে কা'কে কি ঠাউরে এসেছিস!"

হ'রে উড়িষ্যাবাসী হ'লেও অনেক দিন স্বদেশ ছাড়া,—বাড়ীতে নাকি কেউ নেই, তাই স্বদেশের টানও ওর ক'মে গেছে; আরও একটা কথা—অনেক দিন এসেছে কিনা, তাই আমাকে একটু ভালোও বাসে। সবই ভালো,—তবে, চোখে একটু কম দেখে, আর জাত-ভাষাটাও ঠিক বদলে ফেলতে পারেনি। ব'ললে—

'মু' ভালো কড়ি' দেখিথিলি,—ভুল হব 'কাঁই ?—

কোমরের বটুয়ার মুখ খুলে গোটা দুই পাণ আর খানিকটা দোক্তা একসঙ্গে মুখ-বিবরে ফেলে, কাঁধের ওপোরে ফেলা মসী-মলিন গামছাখানায় হাত মুছতে মুছতে সে নিজের কাজে চ'লে গেল; আমিও উঠ্‌লাম।

খাট থেকে নেমে পায়ে পায়ে দরোজার দিকে এগুতে এগুতে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিলাম গৃহিণী মেঝের ওপোরে পাটি পেতে শুয়ে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা,—হাতের নভেলখানা পাতা-মোড়া অবস্থায় পাটির ওপোরে পতিত; আর চার বৎসর বয়স্কা বড় মেয়েটি তার মায়ের আদেশানুযায়ী তাঁরই মাথার কোঁক্‌ড়া কালো চুলের রাশি থেকে মাঝে



···গুরুমশা'য়ের টিকি জানালার গরাদের সঙ্গে বেঁধে···

মাঝে কতকগুলি একসঙ্গে স-মূল উৎপাটিত ক'রবার চেষ্টা ক'রছে; ওর নাম নাকি 'বেতো' চুল তোলা! গৃহিণীর হুকুমে ও রকম চুল দশটি তুললে একটি ক'রে পয়সা পাওয়া যাবে, তাই ওর এই আন্তরিকতা।

খুড়োর বাড়ীর কাছে এসে দেখ্‌লাম বারান্দায় দস্তুর-মত ভিড়,—যেন ঠাকুর উঠেছে।

এই ভিড় ঠেলে, কোনও রকমে গলাটাকে একটু লম্বা ক'রে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেখ্‌লাম, খুড়ো অনেক দিনের বন্ধ দরোজা খুলে, কপাটে হেলান দিয়ে টুলের ওপোর উপবিষ্ট; মাঝে মাঝে মুখ তুলে সামনের লোকগুলির দিকে তাকাচ্ছে! দৃষ্টি অর্থপূর্ণ, কিন্তু মুখ ভাষাহীন। খুড়োর বেশভূষাতেও বৈচিত্র্য আছে। কাপড় কুঁচিয়ে, অনেকটা—পাঞ্জাবীদের পায়জামার ফ্যাশানে পরা, গায়ে ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, তার ওপোরে খদ্দরের চাদর। চুল রুক্ষ, ওপোর দিকে তুলে আঁচড়ানো; ঠোঁটের কোণে চেপে ধরা একটা বার্ম্মা চুরুট; পায়ে মান্দ্রাজী সাণ্ডেল।

এক নজরে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলাম—"খুড়ো যে! এতদিন পরে? বলি, ভালো তো!

ভূতো বোধ হয় এতক্ষণ আমায় দেখেনি, কিম্বা দেখলেও চিনতে পারেনি; এইবার মুখ তুলে পাণ্টা প্রশ্ন ক'রলে—

কে আপনি?

আমি তো অ-বাক্!

ও মা! ভূতো বলে কি? সে—ই ভূতো আমাদের! সত্যি,—সেই ভূতোই তো?···

আর একবার ওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। হ্যাঁ, ভূতোই বটে! ঐ যে, বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙুল কাটার দাগ এখনও দেখতে পাচ্ছি!

আর,—ভূতো না হ'লে কে—ইনি এতদিন পরে তার

ভূতুড়ে ভিটের দরোজা খুলে বসতে আসবে? কথাটা মনে মনে বেশ ভালো করে ভেঁজে নিয়ে বললাম—

আমায় চিনতে পারছো না? আমি যে সে—ই মুকুন্দ গো! এই তোমার বাড়ীর আমবাগান পার হ'লেই আমার বাড়ী। মনে নেই?···সে—ই ছোটবেলায় যে কত খেলেছি,—কত মাছ ধ'রেছি, কত আম—জাম—চুরি ক'রে সমান ভাগ ক'রে খেয়েছি; আজ মনে পড়ছে না?

খুড়ো যেন চ'মকে উঠ্‌লো—ও হোঃ,—বাবাজী!



"···ভালো কড়ি' দেখিথিলা·"

তাই বল। আমি চিনতে পারি নি,—তার জন্যে ক্ষমা করো। আর, না চিনতে পারারই বা কি দোষ বল, দেশ ছেড়ে তো আর আজ বে'র হইনি! বেরিয়েছি সেই মান্ধাতার আমলে।

ব'ললাম—"তা বটে, এ-কথা তুমি ব'লতে পারো।

খুড়ো আর একখানা টুল এনে আমায় বসিয়ে, পাশে নিজের টুলখানাও টেনে নিলে, তার পরে একটা চুরুট বার ক'রে ব'ললে—"চ'লবে—?" ব'ললাম—"মাপ করো,—ও-গুলো বাদ দিয়েছি।"

খুড়ো একবার ভালো ক'রে সামনের দিকে তাকিয়ে, বার দুই খুক্ খুক্ ক'রে কেশে, গলা ঝেড়ে নিয়ে ব'ললে, কি জিজ্ঞাসা ক'রছিলে, এইবার বল।

ব'ললাম—জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম, এতদিন ছিলে কোথায়, কেমন ছিলে, কি ক'রছিলে এই সব।

খুড়ো জবাব দিলে—ছিলাম অনেক জায়গায়,—নাম ব'ললে চিনবে না; আর থাকার কথার উত্তরে জানাচ্ছি,—ছিলাম ভালোই, তবে, অন্য কাজ ক'রলেও তোমাদের মত কিছু কাজ করিনি বটে!

ব'ললাম—বে'-থা?

জিভ্ কেটে, খুড়ো যেন সগর্ব্বে উত্তর দিলে—

রাম কহঃ! বিয়ে ক'রবো আমি? না বাবাজী; ও-সব পায়ের শেকল তৈরী হ'য়েছে তোমাদের জন্যে, আমার জন্যে নয়। আমি কাজের মানুষ,—অবশ্য, তোমাদের মত কেরাণীগিরী ক'রবার জন্যে যে আমার জন্ম হয়নি, এ-কথা আমি হলপ্ ক'রে ব'লতে পারি। আমি কাজ ক'রতে চাই শুধু একার জন্যে নয়, দেশের জন্যে, দশের জন্যে; যাতে সকলের মঙ্গল হয়।

আর-একবার উপস্থিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ব'ললে—এই সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কত জায়গায় যে কত কাজ করলাম, কত সভা সমিতির সৃষ্টি করলাম, তার ইয়ত্তা নেই।

একবার দম নিয়ে প্রশ্ন করলে—কেন, খবরের কাগজে আমার নাম পড়নি?···ভৃগুরাম দেবশর্ম্মা?···

ব'ললাম ভৃগুরাম? কৈ? মনে প'ড়ছে না! আর, মনে প'ড়বেই বা কি বল, সময় কতটুকু পাই যে খবরের কাগজ প'ড়বো! সকাল না হ'তেই উঠে নাকে মুখে মুঠো দু'-তিন ভাত ডাল গুঁজে কোনও রকমে ট্রেণ ধরি,—যাতে অফিসে পৌঁছাতে দেরী না হয়, সে ভাবনা আছে ষোলআনা! তার ওপোরে সংসারের চিন্তা! বাড়ী ফিরিও অনেক রাত্রে; ডেলি-প্যাসেঞ্জারের কষ্ট তুমি আর কি ক'রে বুঝবে বল! কিন্তু সে কথা যাক,—ভূতো ব'লেই তোমাকে চিরকাল জানতাম, ভৃগুরাম আবার হ'লে কবে থেকে?

খুড়ো ব'ললে—মার আমার তো খেয়ে-দেয়ে আর কাজ

ছিল’ না, ছুনিয়ার ওঁছা নামটা আমার ঘাড়েই চাপিয়েছিলেন ব’লে আমাকেও কি তাই বইতে হবে! উঁহুঃ,—তা হবে না! তাই, নাম নিলাম ভৃগুরাম। নামটা অবশ্য একেবারে উল্টালাম না, মায়ের দেওয়া, তাই মায়াও হ’লো। সেই জন্তে মূলের ঐ “ভ”টুকু রেখে আর সব কেটে-ছেঁটে বাদ দিয়ে আবার নতুন ক’রে জোড়াতালি দিলাম; যাতে খোলও না চেনা যায়,—নলচেও না



“…আমি যে সেই মুকুন্দ গো,·· ছোটবেলায় কত খেলেছি…”

বাদ দিতে হয়, নামের মানেটাও হয় জাঁদরেল, আর নামটাও হয় আন্‌কোরা—টাট্‌কা। কি বল, মন্দ হ’য়েছে ?

উত্তর দিলাম—কে বলে! তবে আর একটা কথা,—হঠাৎ, এতদিন পরে এ গ্রামে আগমনের হেতু? খুড়ো ব’ললে—উদ্দেশ্য মহৎ, এবং কাজও খুব সোজা। চারিদিকের কাজ ক’রতে ক’রতে নিজের অভাগা জন্মভূমি—এই গ্রামের ছুঃখে প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো,—তাই আমার এখানে আসা, নইলে আসতাম না।

দরোজার বাইরে,—বারান্দায় জমা লোকগুলির দিকে তাকিয়ে ব’ললে—এই গ্রামের ছুঃখে, তোমাদের ছুঃখে প্রাণ কেঁদেছে ব’লেই—আজ আমি বাইরের কাজ ফেলে এসেছি



“…কে বিদে-Sী বন্ উদা-Sী ··”

তোমাদের ছুঃখ দূর ক’রতে; তোমরা কি আমাকে এ কাজে সাহায্য ক’রবে না?

কতকগুলি মিলিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—

“নিশ্চয়ই ক’রবো, নিশ্চয়ই।”

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, যারা সম্মুখে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তাদের বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে শুধু কৌতূহল ফুটে উঠছে, বিশ্বাস নাই। ঠোঁটগুলি পাণের ছোপে বিবর্ণ, তেলের ধারা মাথার তেড়ি থেকে গড়িয়ে ঘামের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে; পরনের কাপড় পেঁচ্ দিয়ে পরা, কারো গায়ে গেঞ্জি, কারো বা আঁচল জড়ানো, আবার কারো গায়ে বা কিছুই নাই। এই সাজ-পোষাকের লোকগুলি কৌতূহলী দৃষ্টিতে শুধু খুড়োর



···দৃঢ়হাতে কোদাল···ধ'রে···

দিকে নয়, আমার দিকেও তাকাচ্ছে দেখে বললাম—বাপু, আমি চাকুরী-জীবী ছা' পোষা' মানুষ, তোমাদের দলে আমি নেই, আর আমার দ্বারা সাহায্যও তোমরা কিছু পাবে না' এই ব'লে রাখলুম; তাতে তোমরা গ্রামেরই সংস্কার কর, সমাজেরই কর, আর চিত্ত-চরিত্রেরই কর; ও-সব আমার দ্বারায় হবে না।

হাতের বুড়ো আঙুল দুটো একত্রে উঁচু ক'রে ভৃগু ব'ললে—কুছ পরোয়া নেই; তুমি সাহায্য না ক'রলেও আমরা এতগুলি লোক যখন র'য়েছি, তখন, তোমার অভাব অনুভব যাতে না ক'রতে হয়, তাই ক'রবো। আগে ক'রবো গ্রামের সংস্কার, তার পরে সমাজের, তার পরে তুমি যা ব'ললে,—ঐ চিত্ত-চরিত্রের। সভা ক'রবো, সমিতি ক'রবো; প্রাণপাত ক'রেও এই গ্রামবাসীদের আমার কল্পিত আদর্শে শিক্ষিত ক'রে তুলবো। বুঝিয়ে দেবো তাদের দুর্ব্বলতা কোথায়, তারা অসহায় কতখানি!

বুঝলাম তর্ক নিষ্প্রয়োজন। ব'ললাম--খাওয়া-দাওয়া ক'রেই এসেছো? না এখনও সে পর্ব্ব বাকী?

মাথা চুলকে ও ব'ললে-"উহুঁ, তা তো হয়নি! বললাম—যাক গে, যা ক'রবার সব পরে ক'রো, আমার আপত্তি নেই; তবে আগে স্নান সেরে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

সামনের ভিড় সাফ্ হ'য়ে গেল। এরই একটু পরে ভৃগুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেখ্লাম গাঙুলীদের প'ড়ো বাড়ীর এই দিককার একটা ঘর—যেটা উপস্থিত গ্রামের তরুণদলের থিয়েটারের ক্লাব বলে এবং ওপোরে হাতে লেখা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে ঘোষণা করা হ'য়েছে, সেইখানে--কয়েকটি দর্শকের মধ্যে দাঁড়িয়ে উদয়-শঙ্করের আর্ট দেখিয়ে একজন গাচ্ছে—

"কে বিদে-S-ী বন্ উদা-S-ী বাঁ-S-র বাঁ-S-ী
বাজাও ব'নে,—
-S-র্ ে-S হাগে তন্দ্রা লাগে কু-S-ম রাগের
গুল্ বদনে॥"

* * * * *

ভগবান আমার সঙ্গে বাদ্ সাধ্লেন। সেই ছুটির দিন থেকেই দা'য়ে পা কেটে বিছানায় প'ড়লুম প্রায় এক মাসের মত। দিন কোনও রকমে কেটে যায়।···ডাক্তার আসে, পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে চ'লে যায়; একা ব'সে থাকি খাটের ওপোর—চুপ্ চাপ্ ক'রে, বাইরের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

দিনের বেলা এমনি একাই প্রায় কাটে, কারণ গৃহিণীর গল্প ক'রবার সময় হয় না; রান্নার কাজে, সংসারের কাজে

তিনি সদাই ব্যস্ত। কখনোও যদি বা শুভাগমন হয়, তা সেও কাজের জন্যই। হয়তো আমাকে খাওয়াতে, স্নান করাতে, কিম্বা এমনি একটা অতি আবশ্যকতায়; নয়তো অবাধ্য ছেলেমেয়ের পিঠে গোটাকতক কিল চড় পুরস্কার দিতে দিতে; সেও এক কর্ম্ম-নিরতা রূপে।

তাঁর মেজাজও অধিকাংশ সময় থাকে চড়া সুরে বাঁধা; কাজেই কথা ব'লতে হয় বেশ বুঝে-সুঝে, বিগ্‌ড়ালেই মুস্কিল, অন্ততঃ আমার পক্ষে; তাই বেশীর ভাগ সময়ই বাইরের দিকে চেয়ে কাটাতে হয়। দেখি—ভৃগুরাম দৃঢ়হাতে কোদাল কিম্বা কুড়ুল ধ'রে, দুই একটি সাঙ্গ-উপাঙ্গ নিয়ে কিম্বা একাই পথের দু'পাশের কচুগাছ আর আস্‌শ্যাওড়া ঝোপের বংশাবলী ধ্বংস ক'রছে। কবে, কোন্ যুগের কে কুঠারাঘাতে পৃথিবী কতবার নিঃক্ষত্রিয় ক'রেছিলেন জানিনে, কিন্তু এ যুগে, আমাদের এই ভৃগুরামের কচুগাছ ও আসশ্যাওড়া ঝোপ ধ্বংসের উৎসাহ যে তাঁর চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়, এ কথা আমি জোর গলায় ব'লতে পারি।

আরো দেখি,—ভৃগু নিজে নেমে এবং অপর দুই-এক-জনকেও নামিয়ে পচা পুকুর, মজা খানা থেকে দিনের পর দিন খেটে পানা তুল্‌ছে।

* * * * *

কিন্তু, সেদিন এক কাণ্ড ঘ'টে গেল। কাণ্ডটা এই—উমি গয়লানীর ছোট-খাটো বাড়ী, আর তার উঠোনের কাঁচা-মিঠে আমের গাছটি সর্ব্বজন-পরিচিত, প্রসিদ্ধও বটে! ছোট বেলায় আমরাও যে ও-গাছের আম চুরী ক'রে না খেয়েছি তা নয়। সেই গাছের প্রধান ডালটি পথের ওপোরে এমন ভাবে নুয়ে প'ড়েছে যে, আসতে-যেতে প্রায় মাথায় ঠেকে! ভৃগুরাম কুঠার হস্তে সেই আম-গাছটির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই উমি "রে, রে" শব্দে তেড়ে এলো—"বলি হ্যাঁ গা বামুন্ ঠাকুর! গাঁয়ে এসেছো,—এসেছো; ভালো মানুষের ছেলেটির মত কোথায় মুখটি বুজে ঘরে থাকবে, তা নয়, কোদাল কুড়ুল হাতে দিনরাত 'বেহ্ম-দত্যির' মত কাটাকুটি ক'রে বেড়াচ্ছ কেন বলতো?

ভৃগু সবিনয়ে বোঝাতে গেল—এ লোকহিতকর কাজ,… সকলের জ'ন্যেই…

কাল প্রভাত। এই সকালে গৃহলক্ষ্মীদের যা প্রথম কাজ, উমি বোধ হয় তাই সম্পন্ন ক'রছিল; তাই এক হাত গোময়-লিপ্ত ও অন্য হাতে,—পরিধেয়'র যে প্রান্তটি টেনেটুনে কোনও রকমে কান পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে, সেইটা এঁটে ধ'রে আছে; যাতে মাথার কাপড় খুলে বে-আবরু না হয়। চোখের দুই এক আঙুল ওপোরে তার ঘোমটার সীমা, তারই নিচে দেখা যাচ্ছে কষ্টিপাথরের মত নিকষ কালো রঙের মধ্যে উজ্জ্বল চোখ দুটি, আর সেই সঙ্গে দেখা যায় সম্মুখের উঁচু দুটি দাঁত মুখগহ্বরের প্রবেশ-পথে সতর্ক সৈনিকের মত সতত খাড়া পাহারা দিচ্ছে। কাপড়খানি নেমেছে মাত্র হাঁটু পর্য্যন্ত, তার পরে দেখা



"…নালিস পুলিশ যা হয়…"

যাচ্ছে কালো, শির ওঠা, ফাটা-ফাটা পা' দুখানি; নিরাভরণ হাত দুখানিও তার বৈধব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

দুই এক পা এগিয়ে এসে গোময়লিপ্ত হাতখানা এই নবীন সংস্কারকের মুখের কাছে নেড়ে খন্‌খ'নে স্বরে সে ব'লে উঠ্‌লো—

থামাও ঠাকুর তোমার হিতকর্ম! ও সবের জন্যে

আমার 'নোস্‌কান্‌' তো আর আমি ঘাড় পেতে সইবনা, আর আমগাছ কেটে রাস্তা ক'রতেও দেবনা।

বল গে' তোমার সেই হিতকরকে, যা পারে সে আমার ক'রে নেবে,—নালিশ, পুলিশ, যা হয়। একটা ঢোঁক গিলে গলায় আর একটু জোর দিয়ে ব'ললে—কেন গা, 'হক্‌' কথা ব'লবো তাতে ভয় কিসের? হিতকরের খাই



"মুখ ফিরিয়ে—জিভ কাটছেন…"

না পরি, যে তার নামে ভয় পাব! নিজের স্বোয়ামীর ভিটেয় থাকি, নিজের গতর খাটিয়ে খাই—কার বাবার ধার ধারি শুনি? এবার আসুক না কেউ আমার গাছে হাত দিতে, আমিও একবার দেখে নেব!

ব'লে, ফেলে রাখা সম্মার্জ্জনীটা হাতে নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই সকলে রণে ভঙ্গ দিলে।

* * * *

একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি।

এরই কয়েক দিন আগে, একদিন ভৃগুরাম এসে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে গেছে। ব'লেছে—

পুরানো সব কিছুরই যখন সংস্কার ক'রবার ইচ্ছায় বার হ'য়েছি, তখন সম্বন্ধটাই বা পুরানো রাখি কেন? আজ থেকে আমি তোমার ভাই হ'লাম।

গৃহিণীর কাছে গিয়ে ব'ললে—

এক কাপ্‌ চা খাওয়াতে পারো বৌদি? বেশ গরম থাকে যেন; একটু আদার রস দিতে পারো তো আরো ভালো হয়। সর্দ্দি হ'য়েছে, শরীরটাও তেমন ভালো নাই। চেয়ে দেখলাম, চিরমুখরা,—প্রখর-স্বভাবা গৃহিণীও কেমন যেন একটু লজ্জা পেয়ে ঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে জিভ্‌ কাটছেন।

সংস্কারক একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কি একখানা বইয়ের ওপোরে ঝুঁকে প'ড়েছেন দেখে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে প্রশ্ন ক'রলাম—তোমার আবার এ ঘোড়ারোগে ধ'রলো কেন?

তিনি তেমনি মৃদু স্বরেই জবাব দিলেন মুখপোড়ার আক্কেল দেখে।

ভৃগু সেদিন এক কাপ্‌ চা পেলে বটে, কিন্তু দিন সাত আট আর সে এপথে পদার্পণ করলে না কেন কে জানে! মনে ভাব্‌লাম গৃহিণীর কথা ওর কাণে গেল নাকি?

* * * *

এর পরের আর একটি সন্ধ্যায়—

ছোট খোকার লজেঞ্জুস কেড়ে খাওয়ার অপরাধে গৃহিণী যখন সিংহী বিক্রমে মেজ মেয়েটির পিঠে বেতের এক ঘা বসাতে উদ্যতা, সেই সময়ে চঞ্চল পায়ে এসে ভৃগুরাম সে ছড়ির তলা থেকে মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যেন আশ্চর্য্য রকম বাঁচিয়ে ফেললে।

ব'ললে—কর কি! এইটুকু মেয়ের ওপোরে এত বড় অত্যাচার? এতে কি আর ছেলে মেয়ে মানুষ হয়? তুমি কি বল দাদা?

ব'লে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত ক'রতেই হাসির

বেগে আমার পেটের ভেতর গুরু গুরু ক'রে উঠ্লো; হাসি চাপতে, উপায়ান্তর না দেখে দুই হাতে পেট চেপে ধ'রে মুখ নিচু ক'রতেই ভৃগু এগিয়ে এলো—কি হ'লো দাদা তোমার? বলি, হ'লো কি?···

ব'ললাম—পেটে ফিক্ ব্যথা ধ'রেছে।

ভৃগু আর কালবিলম্ব না ক'রে রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে



"···বোঝ'না দাদা···"

গেল, এবং পাঁচ সাত মিনিট পরে যখন গরম জলের বোতল হাতে নিয়ে পাশে এসে ব'সলো, তখন, খুব খানিকটা হেসে পেট হাল্কা ক'রেছি। ভৃগুকে গরমজলের বোতল হাতে ব্যস্ত হ'য়ে প্রবেশ ক'রতে দেখে, এই গ্রীষ্মের দুপুরে ভরা পেটের ওপোরে সেঁক নেবার কষ্ট কল্পনা ক'রে, তালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠ্লো।

কম্ প'ড়ে গেছে, সেঁক দেওয়া না হয় থাক্।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!—যেন কার ঝাড়ে কেঁ বাঁশ কাট্ছে!

ভৃগু ততক্ষণে পেটের ওপোরে দুই পর্দ্দা কাপড় বিছিয়ে বোতল চেপে ধ'রেছে।

ব'ললে - তুমি বোঝ'না দাদা, ও ব্যথা একটু থাকলেই পরে আবার ঝাঁ ক'রে বেড়ে ওঠে। তার চেয়ে একেবারে সারানোই ভালো। রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখ্তে নেই, মা ব'লতেন।

কাজেই সেক নেওয়ার কষ্ট সহ্য ক'রতে ক'রতে বিকৃত মুখে ব'ললাম—তার পর,—তোমার সংস্কারের কাজ চ'লছে কেমন?

কাজ?

কথাটা উচ্চারণ ক'রবার সঙ্গে সঙ্গে ভৃগুর হাতের গতি থেমে গেল; হতাশভাবে আকর্ণ-বিস্তৃত "হাঁ" ক'রে

ব'ললে—আ—র কাজ! কাজে বোধ হয় এইবার ইস্তফাই দিতে হয় দাদা!

ব'ললাম—সে কি হে! এতদূর এগিয়ে শেষে ইস্তফা দেবে? এও কি সম্ভব।

ভৃগু ব'ললে—কি আর করি বল! উমি গয়লানীর সেদিনের কাণ্ড তো জানোই, তার ওপোরে আবার নানা বাধা বিপত্তি! আরও একটা কথা—

ব'লে, একটু থেমে সদুঃখে ব'ললে—দুখের কথা বেশী আর কি ব'লবো দাদা! একটা প্রবন্ধ লিখে রেখেছি দেশের এই দুর্দ্দশার বিষয় নিয়ে; তা আজ পর্য্যন্ত শুনাবার মত একটা লোক পেলাম না। কত' দিন, কত' রাত জেগে,



পুঁটি ব'ললে···পাঁচালী আর শুনবেনা দাদা? ··

না খেয়ে, স্নান পর্য্যন্ত না ক'রে কত' যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পাতার পর পাতা লিখে গেছি—তার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু—

এই পর্য্যন্ত ব'লে সে হাতের বোতলটা নামিয়ে রাখলে; তার পরে ষোড়শী নাটকের জীবানন্দ চৌধুরী যেমন ব্যাকুল ভাবে এককড়ি নন্দীকে ডাক্তারের কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল, তেমনি ভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলে—আচ্ছা, সত্যি বল তো দাদা, এখানে কি শুনবার মত একটি লোকও নেই? কাজ না করুক, প্রবন্ধটা শুনতেও কেউ আসবে না?

সান্ত্বনার স্বরে ব'ললাম—দেখো ভৃগু, এ দেশ এখনো তোমার লেখা প্রবন্ধ শুনবার বা তার মর্ম্মার্থ বুঝ্‌বার মত হ'য়ে ওঠেনি; তবে লোকও যে জড়ো না হ'তে পারে —তাও নয়,— তার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে একটা ভোজ্-টোজ্ যদি দিতে পারো।

ভৃগু কিছুক্ষণ নীরবে কি ভেবে ব'ললে—আচ্ছা, তা—ই না হয় ক'রবো; কিন্তু দাদা তোমাকে আর বৌ-দিকে সে সমস্ত ব্যবস্থা করবার ভার নিতে হবে; যত খরচ লাগে আমি দেব। তবে আমার ও-সমস্ত ব্যবস্থা ক'রবার মত সময় হ'য়ে উঠ্‌বে না, কারণ, প্রবন্ধটা আরও দু' চার পাতা বাড়িয়ে সহজ ভাষায় এদের বুঝ্‌বার মত ক'রে তুলতে হবে তো!

ব'ললাম— বটে, বটে! আপত্তি আমাদের এক ফোঁটাও নেই, তবে পা-টা একটু সারুক আগে, তার পর।

* * * *

যথাসময়ে পা'ও সারলো।

ভৃগুর বাড়ীর সামনে খাটানো হ'লো এক প্রকাণ্ড সামিয়ানা;—চারিদিক লোক-জ'নেও ভ'রে উঠ্‌লো। শুধু দেখা গেলনা ভৃগুরামকে।

কারণ, সে তখনও এক কোণের ঘরে একা ব'সে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সে-ই প্রবন্ধটাকে আরও বাড়িয়ে —সহজ ভাষায় সুন্দর ক'রে লিখ্‌ছে। হয় তো তার সম্মুখে ঘুরছে দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ উন্নতির আন্তরিক চেষ্টা!

আজ সে এই গ্রামের তরুণদল ও ঐ সামিয়ানার যে সমস্ত প্রবীণেরা শিখা নেড়ে ও নামাবলী উড়িয়ে, পুত্র এবং পৌত্র সহ এসে ব'সে ছিলিমের পর ছিলিম,—তামাকের রাশি ধ্বংস ক'রছেন, সবিস্তারে বুঝিয়ে দেবে, তাঁরা বিশ্ব-মানব-জাতির আসনচ্যুত।

* * * *

খাওয়ার পরে প্রবন্ধ পাঠের কথা—

আরম্ভও হ'লো—

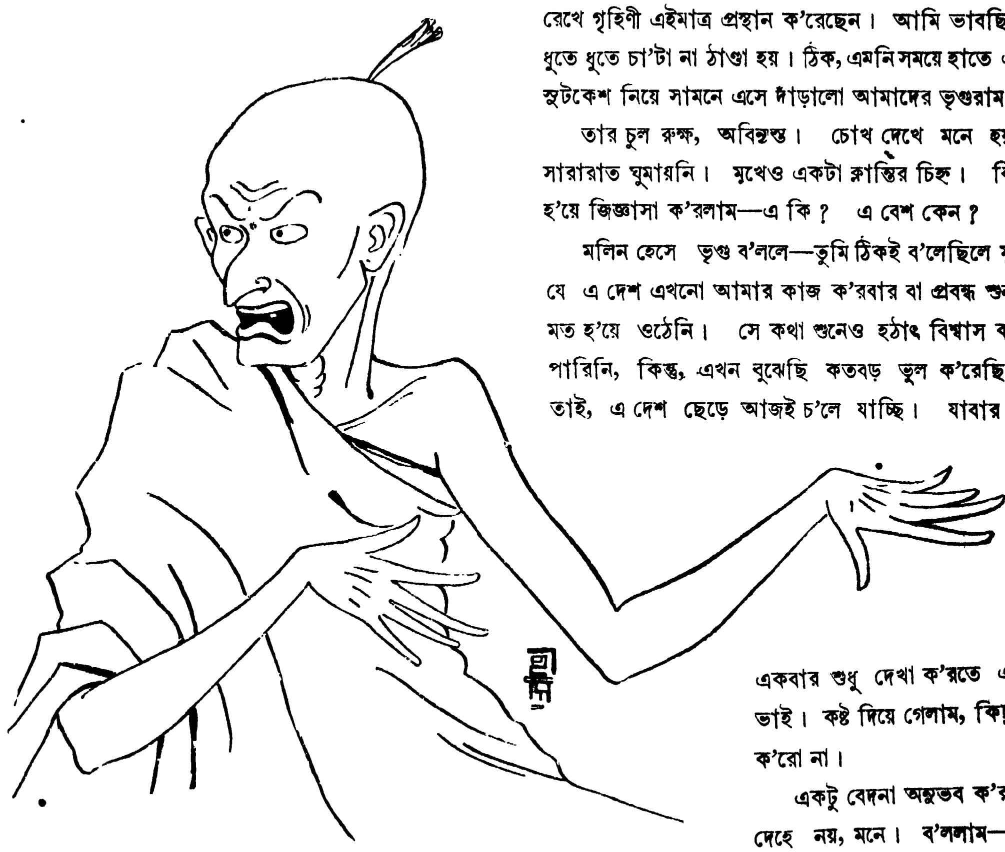
ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ! ···

চারিদিক থেকে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি উঠ্‌লো। তার পরে দেখা গেল, যাঁরা খেয়ে দেয়ে প্রবন্ধ-শুনবার আশা ক'রেই হোক বা আর বেশী কিছুর দুরাশা ক'রেই হোক ব'সে ছিলেন,— তাঁরাও হুঁকা রেখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রাচীরের

গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম, ভৃগুর সর্ব্বশেষ শ্রোতা দীনু ঠাকুর্দ্দাও নাতনীর হাত ধরে বার হ'তে হ'তে ব'লছেন—বাড়ী চল পুঁটি! 'বেতো' শরীর নিয়ে খাওয়া দাওয়ার পরে আর ব'সে থাকতে পারিনে।

পুঁটি ব'ললে—পাঁচালী আর শুনবেনা দাদা?

দাদা অবশিষ্ট দাঁতটি বার ক'রে বিকৃত মুখে নাতনীকে ব'ললেন—পাঁচালী না তোর মাথা! যত সব মেলেচ্ছ



"…সব…মেলেচ্ছ কাণ্ড…"

কাণ্ডকারখানা! পরে স্বগর্ত ব'ললেন—হরিবোল! হরিবোল্!! পার করো ঠাকুর।

দেখলাম, সামিয়ানার তলায় একা দাঁড়িয়ে ভৃগু তখনও অনন্ত উৎসাহে প্রবন্ধ পাঠ ক'রছে—

"তাই আমাদের বিশ্ববিখ্যাত কবি ব'লেছেন—

শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে,
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া ক'রে।"

সে উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম না।

* * * * *

পরদিন—বেলা প্রায় আটটা বাজে।

অফিস নাই, তাই বেলা ক'রে উঠেই মুখ ধুতে ব'সেছি। কিছু দূরে, ছোট একটা টুলের ওপোরে এক কাপ্ গরম চা রেখে গৃহিণী এইমাত্র প্রস্থান ক'রেছেন। আমি ভাবছি, মুখ ধুতে ধুতে চা'টা না ঠাণ্ডা হয়। ঠিক, এমনি সময়ে হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো আমাদের ভৃগুরাম।

তার চুল রুক্ষ, অবিন্যস্ত। চোখ দেখে মনে হয় যেন সারারাত ঘুমায়নি। মুখেও একটা ক্লান্তির চিহ্ন। বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলাম—এ কি? এ বেশ কেন?

মলিন হেসে ভৃগু ব'ললে—তুমি ঠিকই ব'লেছিলে মুকুন্দ, যে এ দেশ এখনো আমার কাজ ক'রবার বা প্রবন্ধ শুনাবার মত হ'য়ে ওঠেনি। সে কথা শুনেও হঠাৎ বিশ্বাস ক'রতে পারিনি, কিন্তু, এখন বুঝেছি কতবড় ভুল ক'রেছিলাম। তাই, এ দেশ ছেড়ে আজই চ'লে যাচ্ছি। যাবার সময় একবার শুধু দেখা ক'রতে এসেছি ভাই। কষ্ট দিয়ে গেলাম, কিছু মনে ক'রো না।

একটু বেদনা অনুভব ক'রলাম; দেহে নয়, মনে। ব'ললাম—একটু ব'সো, চা খাও…।

হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ও ব'ললে—না, সময় হ'য়ে গেছে; আবার এতখানি পথ হেঁটে গিয়ে ট্রেণ ধ'রতে হবে,—একটু আগে বার হওয়াই ভালো। ব'লে আর উত্তরের অপেক্ষা না রেখে সে বার হ'য়ে গেল।

মিনিট দুই তার পথের দিকে চেয়ে থেকে আমিও মুখ ধোওয়া সুরু ক'রলাম।

শ্রীমান চিন্তামণি করের চিত্র

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস, পিএইচ-ডি

প্রবীণদিগের পরিণত প্রতিভা আমাদিগের গৌরব ও গর্ব্বের বিষয়; কিন্তু কিশোরের কলাকুশলতা আমাদিগের প্রাণে



শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি

আশার সঞ্চার করে। বাঙ্গালী পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় আর অন্যান্য প্রদেশের সহিত পারিয়া উঠিতেছে না বলিয়া আমরা পরিতাপ করিয়া থাকি। রাজনীতি-ক্ষেত্রে বাঙ্গালী আর আপনার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে না দেখিয়া আমাদের ক্ষোভ হয়। কিন্তু যখন দেখি যে ভাব-জগতে



তটিনী

বাঙ্গালীর দানের প্রাচুর্য্য এখনও হ্রাস পায় নাই, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, শিল্পে বাঙ্গালী আজিও তাহার প্রাধান্য

হারায় নাই, তখন প্রতিযোগী পরীক্ষার বিফলতাজনিত অবসাদ আর থাকে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদিগকে নিরাময় দীর্ঘায়ু দান করুন, কিন্তু যদি তাঁহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার শক্তি লোপ পায়, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই অন্ধকার। সুখের বিষয় এখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন লেখকের অভাব

শ্রীমান চিন্তামণি করের বয়স এখনও খুব অল্প। তাহার কলেজের পাঠ কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহার চিত্রে যে কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাহার যে কয়খানি চিত্রের প্রতিলিপি ভারতবর্ষ, বিচিত্রা প্রভৃতি মাসিকে বাহির হইয়াছে তাহা পরিণত বয়স্ক শিল্পীর পক্ষেও অগৌরবের বিষয় হইত না। গত চৈত্রের ভারতবর্ষে চিন্তামণি কর অঙ্কিত "অজ বিলাপের" প্রতিলিপি বাহির হইয়াছে।



তরঙ্গায়িত ছন্দের কুহেলিকা

হইতেছে না, শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও অনেক তরুণ সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। এই প্রবন্ধে তাহাদেরই এক-জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। চিত্রের সৌন্দর্য্য নির্দ্দেশ করিবার যোগ্যতাও সাধনাসাপেক্ষ। আমার সে শক্তি নাই। হয় ত অনধিকার-চর্চ্চা করিতে গিয়া উপ-হাসাস্পদ হইব। কিন্তু আশা করি উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠক অক্ষমতার ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

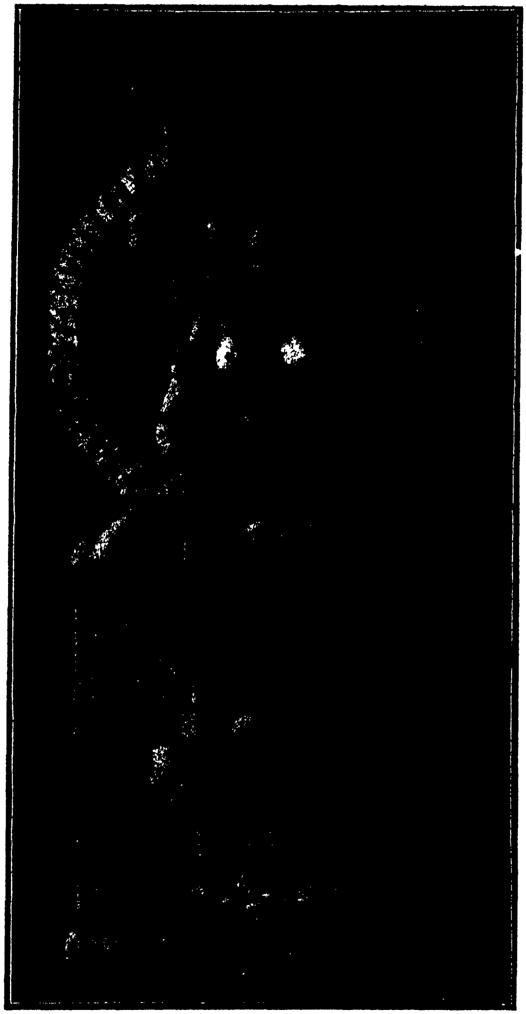
স্বর্গীয় রাজা রবি বর্ম্মাও ঠিক এই বিষয় অবলম্বন করিয়া একখানি ছবি আঁকিয়াছিলেন। রবি বর্ম্মার অজ বিলাপ বহু কলা-রসিকের সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু চিত্র হিসাবে বোধ হয় চিন্তামণির অজ বিলাপ রবি বর্ম্মার অজ বিলাপ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। দুইখানি চিত্রের technique অবশ্য এক নহে। রবি বর্ম্মা পাশ্চাত্য প্রথায় পৌরাণিক চিত্র আঁকিতেন। আর চিন্তামণির অঙ্কনরীতি সম্পূর্ণ

এ-দেশী। কিন্তু অন্য দিক দিয়া দুইখানি চিত্রের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের বিচার চলিতে পারে। ইন্দুমতীর মৃত্যু নিতান্তই আকস্মিক। পারিজাতের স্পর্শে তাহার জীবনের অবসান। সুতরাং তাহার দেহে মৃত্যুর মালিন্য থাকিবার কথা নহে। দ্বিতীয়তঃ প্রিয়তমার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে অজ যতই কাতর হউন না কেন, তিনি দিগ্বিজয়ী বীর—প্রাকৃত-জনের ব্যাকুলতা তাঁহাতে শোভা পায় না। উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আর্ত্তনাদ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অস্বাভাবিক। বালক চিন্তামণি ইন্দুমতীর দেহাবসানের চিত্র আঁকিবার



মৃত্যুরূপা কালী

সময় এই দুইটি কথা বিস্মৃত হয় নাই। তাহার ইন্দুমতী নিমীলিত-নয়না, বিস্রস্তবসনা, কিন্তু মৃত্যুর মালিন্য তাহার দেহকে বিকৃত করে নাই। অজের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে করিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাই অতর্কিতে প্রিয়তমের অঙ্কে তাহার দেহ এলাইয়া পড়িয়াছে। তাহার বসন-ভূষণ সংযত করিয়া সম্মুখে রাখিয়া অজ কাঁদিতে বসেন নাই। তাঁহার মুখে গভীর বিষাদের কালিমা সুস্পষ্ট ; কিন্তু সাধারণ লোকের মত অধীর হইয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিতে পারেন না। বিগলিত অশ্রুধারা বা ক্রন্দনজনিত মুখাবয়বের বিকৃতি ব্যতীত যে শোকের প্রকাশ সম্ভব, তাহাই চিন্তামণি অসাধারণ দক্ষতা সহকারে তাহার চিত্রে জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাহার চিত্রে কোথাও একটু আতিশয্য নাই। তরুণ



সরস্বতী

চিত্রকরের পক্ষে এই সংযম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় প্রথার পক্ষপাতী হইলেও শ্রীমান চিন্তামণি অযথা দেহাবয়বের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উদাসীন নহে। যদি কোন একটি বিশেষ ভাবকে সম্যকভাবে প্রকাশ

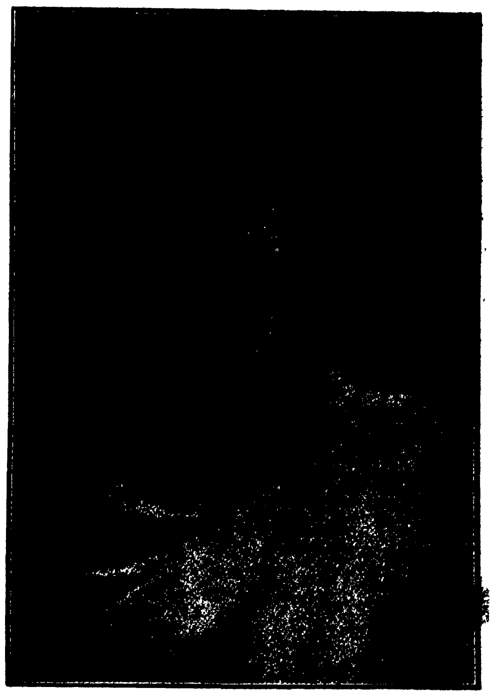
করিবার জন্য মনুষ্য-দেহের স্বাভাবিক রূপকে কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, তবে তাহার সার্থকতা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যেখানে দেহাবয়বের স্বাভাবিক গঠন-সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখিয়াও চিত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, সেখানে প্রকৃতির অনুসরণ করায় আপত্তি কি? প্রত্যেক শিল্পীরই একটা বিশিষ্ট অঙ্কন-রীতি অথবা নিজস্ব ভঙ্গী থাকে। কেহ বা গুটিকয়েক সবল রেখার সাহায্যে রূপ ও রসের সমাবেশ সাধন করেন, কাহারও বা কৃতিত্ব বর্ণসম্পাতে। চিন্তামণির চিত্রে বর্ণের সুষমাই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইলেও তাহার রেখা-গুলিও বেশ ভাবদ্যোতক।



শিশু ভাবুক

চিন্তামণি এখনও শিক্ষার্থী। সুতরাং সকল রকমের কলা সাধনার প্রয়াসই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই জন্যই এই তরুণ শিল্পী যেমন পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করিয়া ছবি আঁকিয়াছেন, তেমনই রূপকের ভিতর দিয়াও আপনার রসবোধের পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তরঙ্গায়িত ছন্দের কুহেলিকা একটি সুন্দর রূপক। তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; আর তাহারই ছন্দে ছন্দে মৃত্যুর ভিতর দিয়া নবীনের প্রকাশ হইতেছে, জন্ম ও পুরাতনের মৃত্যুর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে।

চিন্তামণির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস কেবল চিত্র-শিল্পেই নিবদ্ধ নহে। আমাদের দেশে প্রাচীন কালের ভাস্কর্য্যের যেরূপ প্রচুর নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, যে কারণেই হউক চিত্র-শিল্পের নিদর্শন তত বেশী দেখা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন কৃতী ভাস্কর নিতান্তই বিরল। এখন কয়েক জনে Clay modelling বা মৃন্ময় মূর্ত্তি গঠনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এইখানে চিন্তামণি রচিত দুইখানি মৃন্ময় মূর্ত্তি ও একখানি দারু-মূর্ত্তির প্রতিলিপি দিলাম। একখানি মৃন্ময় মূর্ত্তিতে আমাদেরই চির পরিচিতা সেই



শিল্পী—শ্রীমান চিন্তামণি কর

বাঙ্গলার বধূ প্রাণ পাইয়াছে যাহাকে "মা বলিতে প্রাণ আনচান করে"। আর একখানি দেবী সরস্বতীর। সরস্বতীর মুখে অপূর্ব্ব সুষমা প্রতিভাত হইয়াছে। দারু গঠিত বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের মুখাবয়বের কমনীয়তা এবং লাবণ্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুবিধা ও শিক্ষা পাইলে এই তরুণ শিল্পীর পক্ষে ভাস্কর্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শনও অসম্ভব নহে

সাময়িকী

দুর্গোৎসব—

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালী হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান উৎসব—দুর্গোৎসব। যে চিন্ময়ী জননীকে আমরা মৃন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করি,, সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা জননীর নানা রূপ। শরতে—প্রাচুর্য্যের কেন্দ্রে তিনি অধিষ্ঠিতা; তাঁহার যামিনী শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত; তিনি "ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনী"—সুহাসিনী, সুখদা, বরদা। কিন্তু মা কেবল স্নেহ দিয়া সন্তানকে প্রতিপালিত করেন না—তিনি অভয়া, তাই তিনি সন্তানকে "রিপুদল-বারিণী"রূপে শক্তি দান করেন। আবার সিদ্ধি তাঁহার আশীর্ব্বাদসাপেক্ষ—তিনিই কমলদলবাসিনী কমলা—তিনিই বিদ্যাদায়িনী বাণী। একাধারে মা'র এই সব বিভূতি-বিমোহন রূপের কল্পনা বাঙ্গালার দুর্গাপ্রতিমায় অভিব্যক্ত। বাঙ্গালা যখন সত্য সত্যই আনন্দমঠ ছিল, তখন সকল গুণে বিভূষিত বাঙ্গালী এই রূপে মা'র পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী মা—"দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত; দিগভুজা—নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"

সত্যই যখন মনে করি, এই মূর্ত্তি যাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহারা হিন্দু, তখন মনে হয় হিন্দুকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

শরতের নীলাম্বরে বিগলিতাম্বু শঙ্খধবল লঘু মেঘ মৃদু-শীতল পবনে ভাসিয়া ছায়ালোকক্রীড়া দেখাইতেছে; নিম্নে ধরণী—সরিৎ সরোবর বিকশিত শতদলে শোভাময়, বর্ষাবারিপাতে পুষ্টপ্রবাহ নদীর অমল জলে রবিকর জ্বলিতেছে, পতিত প্রান্তরে কাশ-কুসুমের শোভা, ক্ষেত্রে হরিতের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে—প্রাচুর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পবন সুখদস্পর্শ। গগনে গলিত স্বর্ণ। ভুবনে আনন্দ। জননী স্বয়ং আনন্দময়ী। তাই বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আনন্দ—

"মা যা'র আনন্দময়ী
সে কি নিরানন্দে থাকে?"

আজ সেই মা'র সাধনা ভুলিয়া—সেই ভক্তি হারাইয়া আমরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত। অন্নপূর্ণার অন্নসত্র আজ অন্নশূন্য- দেশ আজ দারিদ্র্যের কবলগত—দুঃখসমাচ্ছন্ন। শক্তিহীন কিরূপে দুঃখদুর্দ্দশাদৈন্য হইতে মুক্তিলাভ করিবে?

তাই আজ অতীতের দিকে সতৃষ্ণ নেত্রে চাহিয়া বাঙ্গালী আবার মাতৃমন্দিরে ভক্তির রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিতা মা'র পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। নিষ্ঠার পঞ্চপ্রদীপ একাগ্রতার গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া ত্যাগের উজ্জ্বল শিখায় সে মা'র আরতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাই আজ বাঙ্গালীর কণ্ঠে মা'র বন্দনাগীত উদ্গাত হইতেছে—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম,
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি, মা, শক্তি
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে॥"

জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। তাই বাঙ্গালী আজ মাতৃচরণে ভক্তি আনিয়াছে। মা তাহা গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর মনস্কাম সিদ্ধ করিবেন। সপ্তকোটি কণ্ঠ গগন-পবন পূর্ণ করিয়া মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করিবে—

"বন্দে মাতরম্।"

চারুচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক সার চারুচন্দ্র ঘোষ ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। কয় মাস মাত্র পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হইয়া তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া যখন গবর্ণরের আহ্বানে তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধু সার প্রভাসচন্দ্রের স্থানে বাঙ্গলা সরকারের শাসন পরিষদে সদস্য পদ গ্রহণ করায় আমরা

তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলাম, তখন কে জানিত, এত অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লোকান্তরিত হইবেন? ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করেন এবং আর নষ্ট স্বাস্থ্য লাভ করেন নাই। চারুচন্দ্র তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রতিভা ও সঙ্কল্পদৃঢ়তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। যশোহর জিলার বিদ্যানন্দকাটী গ্রাম দেবেন্দ্রচন্দ্রের জন্মস্থান। তিনি আলীপুরে উকীল সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। চারুচন্দ্র উকীল হইয়া



সার চারুচন্দ্র ঘোষ

বিলাতে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কয় বৎসর পরে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হয়েন। বিচারকরূপে তিনি ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার দ্বারা আপনার যশ সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব সম্বন্ধীয় মামলায় তিনি যে রায় দেন, তাহাতে গভর্ণর লর্ড লিটন বিব্রত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের লোক তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠায় আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় মোকর্দ্দমায়ও তাঁহার এই ন্যায়নিষ্ঠা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নীকে ও পুত্রকন্যাদিগকে তাঁহাদিগের এই দারুণ শোকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

মন্মথনাথ মিত্র—

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার সমাজে সুপরিচিত রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর পরলোকগত হইয়াছেন।



রায় মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। কুশাগ্রবুদ্ধি রাজা দিগম্বর মিত্রের একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র যখন অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তখন তাঁহার পুত্রদ্বয়—মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ শিশু। রাজা দিগম্বরের কলিকাতাস্থ (ঝামাপুকুর) গৃহে ইঁহাদিগের জন্ম হয়। যৌবনেই মন্মথনাথ সাধারণের কার্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে প্রবল আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতেই তাঁহার

জনসেবার ও দেশসেবার অনুরাগ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। এই সময় কলিকাতা বিডন বাগানে যে হাঙ্গামায় পুলিসের ব্যবহার সম্বন্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপিত হয়, সেই হাঙ্গামার রাত্রিতে কলিকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহার গৃহে (শ্যামপুকুরে) সমবেত হইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়ের" কার্য্যে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি জমীদার সভার এক জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি দুইবার কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং মেকেঞ্জী আইনের প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে ২৮জন সদস্য পদত্যাগ করেন, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন এবং সে সকলে অর্থসাহায্য দিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। হিন্দু অনাথাশ্রমের জন্য তিনি ১৫ হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান করেন। তিনি "ভারত-সঙ্গীত সমাজের" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সমাজের রঙ্গমঞ্চে একাধিক নাটকের অভিনয়ে আপনার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার সেরিফ মনোনীত হইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি কংগ্রেসে অর্থ সাহায্য করিতেন। মন্মথনাথ সামাজিক শিষ্টাচারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণকে তাঁহাদিগের শোকে সহানুভূতি জানাইতেছি।

বাঙ্গালায় স্ত্রী-শিক্ষা—

আচার্য্য সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্নী লেডী অবলা বসু নারীশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙ্গালায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সেদিন তিনি বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ বিবেচ্য। লেডী বসুর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মনে করেন, জাতির মানসিক, রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক হইলেও স্ত্রীলোকের ও পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র যখন ভিন্ন ভিন্ন তখন উভয়ের শিক্ষার ব্যবহারেও প্রভেদ থাকা প্রয়োজন। যে শিক্ষা স্ত্রীলোককে সুগৃহিণী ও সুজননী ক.র—স্ত্রীর ও মাতার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করে, সেই শিক্ষাই প্রয়োজন। আর প্রয়োজন হইলে নারীরা যাহাতে সংসারে ভারমাত্র না হইয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, তাহাও স্ত্রীশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাঙ্গালায় যে সকল বালিকা নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহাদিগের শতকরা ৯৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা-লাভ করিতেছে এবং অবশিষ্ট ৫ জন মাত্র অন্য সকল প্রকার শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কাযেই বাঙ্গালায় স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সমস্যা—প্রাথমিক শিক্ষার। বর্ত্তমানে এই প্রদেশে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত তাহা বালকদিগের জন্য কল্পিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের জন্যই উদ্দিষ্ট। সুতরাং তাহা সর্ব্বতোভাবে বালিকাদিগের উপযোগী নহে। শিক্ষার্থীকে



লেডী অবলা বসু

তাহার কার্য্যের উপযোগী করাই যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য, তখন স্ত্রীলোকদিগের জন্য কল্পিত শিক্ষা ভিন্নরূপ হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক।

লেডী বসু এই প্রসঙ্গে জাপানে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। যে জাপানকে কবি হেমচন্দ্র "অসভ্য" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছিলেন, সেই জাপানের দ্রুত উন্নতি অনেকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। তাঁহার মতে জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতিই এই উন্নতির কারণ। এ দেশে শিক্ষার সহিত লোকের দৈনন্দিন জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই; জাপানে তাহা নহে। তথায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে

গার্হস্থ্য জীবনের কর্ত্তব্য পালনের ও শিল্পের শিক্ষা প্রদত্ত হয়। এ দেশে যেমন সঙ্গীতাদির শিক্ষা প্রদত্ত হয়, জাপানে তেমনই গৃহপালিত পশুপালন, বস্ত্রধৌতকরণ, রন্ধন, অতিথি-সৎকার ও সামাজিক কর্ত্তব্যপালন বালিকাদিগের শিক্ষার বিষয়। যত দিন আমাদিগের দেশেও শিক্ষা দৈনন্দিন কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত না হইবে, তত দিন তাহা আশানুরূপ সুফল প্রসব করিবে না; জাতির উন্নতির গতিও দ্রুত হইবে না।

এই কথা স্মরণ করিয়াই তিনি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য লইয়া নারী-শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—

(১) যে শিক্ষায় নারী স্বামীর কার্য্যে সাহায্য করিতে ও সন্তানপালনে অধিক দক্ষ হইবেন এবং যাহাতে তিনি প্রয়োজন হইলে সম্মানিতভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবেন, প্রধানতঃ মাতৃভাষায় সেই শিক্ষা প্রদান।

(২) বাঙ্গালার নানা স্থানে—বিশেষতঃ মফঃস্বলে বিদ্যালয় স্থাপন।

(৩) উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা।

(৪) উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে উটজ শিল্পের উন্নতি সাধন।

(৫) সন্তানপালন সম্বন্ধে শিক্ষা-দানকল্পে জননীদিগের জন্য কথোপকথনচ্ছলে উপদেশ প্রদান-ব্যবস্থা।

(৬) স্ত্রী-শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে শিক্ষা দান।

(৭) উপযুক্ত পুস্তক সম্বলিত পুস্তকাগার ও পাঠগোষ্ঠী স্থাপন।

সমিতির এই কার্য্য বিশেষরূপ সাফল্যসম্পন্ন হইয়াছে।

এই কার্য্যে সমিতি শিক্ষয়িত্রীর অভাব উপলব্ধি করেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গলায় ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা ৪ লক্ষেরও অধিক। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জাতির কর্ত্তব্য আছে এবং সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তি-দিগের সাহায্যে সমিতি সেই কর্ত্তব্য পালনের পথ মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহাতে জাতির বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন না করিয়া বিধবারা সসম্মানে জীবিকার্জ্জনের উপায় করিতে পারেন, তাহা করাই সমিতির বিদ্যাসাগর বাণী ভবনের উদ্দেশ্য। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে দুইটি বাতায়নের ক্ষুদ্র গৃহে এই "ভবন" প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কলিকাতা কর্পোরেশন দত্ত ভূমিখণ্ডের উপর সমিতির নিজস্ব গৃহে ৬০জন বিধবা স্থান লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের শিক্ষার ও আহারের ব্যয়ভারও "ভবন" বহন করেন। পরলোকগতা হরিমতি দত্ত এই কার্য্যের জন্য ৩০ হাজার টাকা দিয়াছিলেন।

সমিতি স্থাপনাবধি নানা গ্রামে ৪০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সে সকলে ৫ হাজার ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

বাণী ভবনে শিক্ষা পাইয়া ৪০জন বিধবা শিক্ষয়িত্রীর কাযে, জন শুশ্রূষাকারিণীর কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং ২০জন শিল্প শিক্ষা দিতেছেন। কয়জন শিল্পজ পণ্যোৎপাদন দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনও করিতেছেন।

বাণী ভবনে ছাত্রীদিগকে কার্পাস, রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি বয়ন, রঞ্জন, সূচিশিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর প্রদর্শনীতে এই সকল শিল্পজ পণ্য অনেকের দৃষ্টি ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য, সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য ব্যতীত এইরূপ প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা ও ইহার উন্নতিসাধন সম্ভব হইতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠান যে সমাজের কল্যাণকামী ও জাতির উন্নতিপ্রয়াসী বাঙ্গালী মাত্রেরই সাহায্য প্রাপ্তির উপযুক্ত, তাহা বলা বাহুল্য।

মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসব—

আগামী বৎসরে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বয়স শত বৎসর পূর্ণ হইবে। কিরূপে এই স্মরণীয় ঘটনার স্মরণোৎসব সম্পন্ন হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য বাঙ্গালার স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় বিবৃত হইয়াছে, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে দেশীয় ভাষায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাদান ও য়ুরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য যেমন সংস্কৃত কলেজে, তেমনই আরবী ও উর্দ্দুতে অনুবাদ পুস্তকের সাহায্যে প্রতীচ্য চিকিৎসাপদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য মাদ্রাসায় ব্যবস্থা হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এ সব ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পর বৎসর শব-

ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হয়। হিন্দু ছাত্রদিগের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন। মতিলাল শীল প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলেজের হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ২,৩২৫ জন রোগী হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়, ২৫,৪৮৪ জন ঔষধ লইয়া যায় ও ৫৫ জন প্রসূতির প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। গত বৎসর ১৫,৯৩১ জন হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছে, ১,৬২,২৪৩ জন ঔষধ লইয়া



কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায়

গিয়াছে এবং প্রসূতি বিভাগে ২,০০০ স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে, উৎসবোপলক্ষে ২,৬৭,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত রোগীর চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সরকার উহার বার্ষিক ব্যয় ২৫,০০০ টাকা দিবেন। সভায় ঘোষণা করা হইয়াছিল, কুমার শ্রীযুক্ত কমলারঞ্জন রায় এই সৎকার্য্যের জন্য ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দেব এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই দুই জন ব্যতীত আরও কয়জন এই কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

পরলোকে গিরীন্দ্রনাথ—

আমাদের পরম সুহৃদ, 'ভারতবর্ষে'র বিশিষ্ট লেখক গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিগত ৩রা ভাদ্র তারিখে পেরিটোনাইটিস্ রোগে অকালে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে কত আমোদ-



গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত সুহৃদ্বর গিরীন্দ্রনাথের সহিত সেই সাক্ষাৎই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ? গিরীন্দ্রনাথ এম-এ ও বি-এল পাশ্ করিয়া প্রথমে কিছুদিন ভাগলপুরে ওকালতী করেন; তাহার পর মুনসেফ হইয়া বিহার প্রদেশের নানা স্থানে কাজ করেন। এই গুরুতর কার্য্যের সামান্য অবকাশ সময় তিনি সাহিত্য-সেবায় অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইয়া তিনি পুনরায় ওকালতী আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবায় অধিকতর নিবিষ্ট হন। বিধাতার বিধানে

এমন সুধী, বন্ধুবৎসল, অমায়িক গিরীন্দ্রনাথ সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

সম্মিলিত চেষ্টা—

বাঙ্গালায় নানা সম্প্রদায়ের লোকের আহ্বানে গত ১৫ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে যে সভাধিবেশন হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যে হিংসানীতি নানারূপ অনাচারে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার নৈতিক, অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার নিন্দা ও তাহার উচ্ছেদসাধনোপায় নির্দ্ধারণকল্পে এই সভা আহূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার জমীদার সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সভার উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। মফঃস্বলের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিরা এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার জনমত যে হিংসা-নীতির বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জনমত সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্যের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারায় কেহ কেহ হিংসাবাদ সম্বন্ধে বাঙ্গালার লোকের মনোভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। বাঙ্গালার মফঃস্বলে নানা স্থানে হিংসাবাদ দমন করিবার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইবার নিখিল-বঙ্গ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইল। আমরা আশা করি, ইহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে। সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে এই নীতির উচ্ছেদসাধনে সরকারকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে—(১) ইহার উচ্ছেদসাধনচেষ্টায় যদি কোথাও কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার প্রতীকারকল্পে তাহা সরকারের গোচর করা হইবে এবং (২) যুবক যুবতীর সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ ঘটিলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার পূর্ব্বে সরকার তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে সে বিষয় জানাইয়া সতর্কতাবলম্বনের সুযোগ প্রদান করিবেন।

বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্দ্দশা ও বেকার-সমস্যা যে বাঙ্গালায় এই অনিষ্টকর আন্দোলনব্যাপ্তির অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা সার জন এণ্ডার্সন স্বীকার করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার বেকার-সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি চেষ্টাও করিতেছেন। আলোচ্য সভায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য—

"বাঙ্গালায় বাঙ্গালীরা যেন অপরের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে। দক্ষিণ ভারতবাসীরা বাঙ্গালায় কেরাণীর কায পায়; উত্তর ভারতের লোক বাঙ্গালায় মোটর-চালকের কায করে; বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালায় পাচক ও ভৃত্য আমদানী হয়; 'পশ্চিম' হইতে কলের শ্রমিক আনয়ন করা হয়—আর বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান অন্য কোন প্রদেশে স্থান পায় না। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীর স্থান নাই। বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার বোম্বাইবাসী ব্যতীত আর কাহাকেও মোটর-চালকের ছাড় দেন না; মাদ্রাজে ও সামন্ত রাজ্যগুলিতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অথচ এই সামন্তরাজ্যগুলির প্রজারা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র অর্থোর্জ্জন করে। যখন অন্যান্য প্রদেশের ও রাজ্যের সরকার যে যাহার প্রজাদিগের স্বার্থরক্ষায় অবহিত তখন বাঙ্গালা সরকারেরও সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা যে স্থানেই কেন যাই না—রাজপুতনার সুন্দর নগর, মধ্য ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশ, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়—সর্ব্বত্র উর্বর প্রদেশে যে সমৃদ্ধির পরিচয় পাই, তাহা বাঙ্গালা শোষণের ফল। আজও বাঙ্গালায় যাঁহারা বহু শ্রমিককে কায দেন, তাঁহারা অন্য প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানী করেন।"

বাঙ্গালায় বাঙ্গালী যে "প্রবাসী" এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। আজ সেই কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করায় আমরা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরকে অভিনন্দিত করিতেছি।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর অধিকার যে সর্ব্বপ্রধান, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীর অতিরিক্ত উদারতার সুযোগ লইয়া অন্যান্য প্রদেশ বাঙ্গালায় শোষণনীতি পরিচালিত করিতেছে; আর বাঙ্গালার নিরন্ন লোক বেকার হইবার শঙ্কায় যে মনোভাব পোষণ করিতেছেন, তাহা যে সন্ত্রাস-বাদের অনুকূল তাহা বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্সন বলিয়াছেন।

গত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বরের একটি পাট কলের কার্য্য-বিবরণে প্রকাশ—সেই কলে ৬,২০০ জন লোক নিযুক্ত। ইহার মধ্যে ২২ জন য়ুরোপীয়; অবশিষ্টদিগের মধ্যে শতকরা ১২ জন মাত্র বাঙ্গালী, ৮৮ জন অন্যান্য প্রদেশের (শতকরা

৫৬ জন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের, ২০ জন মধ্য প্রদেশের ও ১০ জন যুক্ত প্রদেশের)। এই কলের মালিকরা ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দিয়াছেন এবং কলের ডাকঘর হইতে মণিঅর্ডারে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত টাকা বাহিরে গিয়াছিল। এক বৎসরে বাঙ্গালার পাটকলগুলির শ্রমিকদিগকে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বেতন হিসাবে প্রদত্ত হয়; ইহার মধ্যে ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকাই অন্যান্য স্থানের লোকরা পাইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ২ কোটিরও অধিক টাকা তাহারা তাহাদিগের গৃহে পাঠাইয়াছে।

বাঙ্গালীর আর্থিক দুর্গতির কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বাঙ্গালা যে হিংসানীতির তাণ্ডবে শঙ্কিত তাহা আমরা সকলেই জানি ও অনুভব করি। তাহার উচ্ছেদসাধন জন্য বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের লোকের ও সরকারের সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। আলোচ্য সভায় এই সমবেত চেষ্টার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, এই সভার ফলে দেশে এই জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বিত হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষিশিক্ষা—

বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণর সার জন উডহেড সফরে ঢাকায় যাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার সাধিত হইতেছে না এবং বাঙ্গালা সরকার অর্থ-সাহায্য না করিলে যে অদূর ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তাহাও মনে হয় না। অর্থাভাবে যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাযও বিস্তৃতিলাভ করিতেছে না, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি।

এখন জিজ্ঞাস্য, বর্ত্তমান অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাখিবার সার্থকতা আছে কি? গত মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবৃতিতে দেখা গিয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ১,২০৩ ছিল, ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১,০০৪ ও পর বৎসর ৯২৭ দাঁড়াইয়াছিল। অথচ এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শ্রেণীতেই ১,১৪১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালায় কলেজের ছাত্র-সংখ্যা ২০,৩২৩; তাহার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ হাজার ছাত্রও ছিল না। এই বিবৃতিতে সরকার স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিবার আগ্রহ ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। ইহার কারণ কি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিক কারণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ যখন লোপ করা হয়, তখনই পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানদিগের তুষ্টিসাধন জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা। কাযেই ঢাকা শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ যে সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে, বোধ হয়, ঢাকা কলেজে ও জগন্নাথ কলেজে ছাত্রসংখ্যা তদপেক্ষা অল্প ছিল না। এই অবস্থায় বহুব্যয়সাধ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা সার্থক হইয়াছে, বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্ত হইলে অনেক উন্নতি হইতে পারিত। আমরা বাঙ্গালা সরকারকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি।

তাহার পর সার জন কৃষিশিক্ষার উপযোগিতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে কয়টি কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, এজন্যও অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থাভাবের দিনেও কিন্তু বাঙ্গালা সরকার কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজ রক্ষা করিয়া বৎসর বৎসর অর্থব্যয় করিতেছেন! মুসলমানরা যদি স্বতন্ত্র কলেজ চাহেন, তবে তাঁহারা তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাই সঙ্গত। যে কারণে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই, বোধ হয়, কৃষিবিভাগের পরীক্ষাক্ষেত্র ঢাকার উপকণ্ঠে রক্ষা করা হইয়াছে। কৃষিবিভাগ রাজধানী কলিকাতা হইতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ায় যে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য, তাহা আমরা প্রায়ই অনুভব করিয়া থাকি। আমাদিগের বিশ্বাস, কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র কলিকাতার নিকটে আনিলে লোকের অনেক সুবিধা হয়। বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ গোপালনের ও মুর্গীর চাষের পক্ষে অসুবিধাজনক, সন্দেহ নাই। দিঘাপতিয়ার পরলোকগত কুমার বসন্তকুমার রায় তাঁহার উইলে রাজসাহীতে কৃষি কলেজ স্থাপন জন্য যে টাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহা এত দিন অব্যবহারে বাড়িয়াছে। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, কুমার শ্রীযুক্ত

হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী প্রভৃতি এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য বহুদিন হইতে বাঙ্গালা সরকারের দ্বারস্থ হইয়াছেন। কিন্তু আজও সরকার সে বিষয়ে কিছুই করেন নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যে কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্তই হইবে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নহে। বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী রাজসাহীতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন কি ?

ভারতের চাউল

অটাওয়ায় সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশের পণ্য বিক্রয়ে যে সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া অন্যান্য দেশের চাউল কিরূপে বিলাতের বাজারে ভারতের চাউলের স্থান অধিকার করিতেছে, সংপ্রতি তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট মাসে বিলাত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিলাতে চাউল আমদানী হইতেছে। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া চাউল আমদানী করিত বটে, কিন্তু কুইন্সলণ্ডে ধান্যের চাষ হয় বলিয়া তথায় জাপান হইতে ধান আনিয়া তাহার চাষ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই পরীক্ষা সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহারও পূর্ব্বে স্পেন হইতে বিলাতে চাউল রপ্তানীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। স্পেনে ধান্যের ফলন অধিক বলিয়াই স্পেন রপ্তানী করিতে পারিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে চাউল রপ্তানী করিবার জন্য এখনই ভারতবাসীর ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। কারণ, এ দেশে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়, তাহা দেশের লোকের আহার্য্য যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। মিষ্টার লতিফ চাউল রপ্তানী সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন—ভারতবর্ষের লোকের আহারের জন্য ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন হইলেও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ—৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন মাত্র। কাযেই ব্রহ্ম হইতে ভারতে চাউল আমদানী হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জাপান ও শ্যাম হইতেও চাউল আমদানীর কথা শুনা গিয়াছিল।

ভারতবর্ষ ছাড়িয়া বাঙ্গলার কথা ধরিলে আমরা দেখিতে পাই—বাঙ্গলার অন্নভোজী অধিবাসীরা প্রত্যেকে বৎসরে গড়ে ৫ মণ ৩০ সের চাউল আহার করে ধরিলে বাঙ্গালার লোকের জন্য প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ টন চাউলের প্রয়োজন। অথচ বাঙ্গালায় প্রায় ৯৬ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হয়। এই ৯৬ লক্ষ টন হইতেও আবার কিছু চাউল যে রপ্তানী হয় না, এমন নহে। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দের রপ্তানীর পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টন।

এই অবস্থায় বাঙ্গালাকে যদি তাহার চাউলের রপ্তানী-বাণিজ্য রক্ষা করিতে হয়, তবে ফশলের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে—যে জমীতে ধান্যের চাষ হয়, তাহার পরিমাণ বাড়াইয়া অন্যান্য ফসলের চাষ বন্ধ করা সঙ্গত হইবে না। পরন্তু যে সকল স্থানে জমী ধান্যের চাষের বিশেষ উপযোগী সেই সকল স্থানেই উহার চাষ বাড়াইলে ভাল হয়। প্রধানতঃ ত্রিবিধ উপায়ে ফশলের ফলন বাড়ান যায়—(১) উৎকৃষ্ট বীজ ব্যবহার, (২) জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, (৩) সেচের ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় অনেকটা পরস্পর-সাপেক্ষ। জমীতে সার দিলে জমীর উর্ব্বরতা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু সাধারণ (স্বাভাবিক বা কৃত্রিম) সার ব্যবহার ব্যয়সাধ্য; বিশেষ সার প্রয়োগফলে কয় বৎসরে জমী "জলা" হইয়া যায়। তখন তাহা "পতিত" রাখিতে হয় বা তাহা অন্যরূপে ব্যবহার করিতে হয় অর্থাৎ তাহাতে গোচর করা যায়—ইত্যাদি। কিন্তু জমীতে যদি বন্যার জল বহাইয়া পলী ফেলা যায়, তবে তাহাতে যেমন ব্যয়ও হয় না, তেমনই জমী কখন "জলা" হয় না। বিলাতে কোন কোন স্থানে কৃষকরা নদীর পলী-মলিন জল ক্ষেত্রে লইয়া পলী পতিত হইবার পর তাহা ছাড়িয়া দেয়। বাঙ্গালায় যে সকল স্থানে সম্ভব এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে অধিক ফলনের ধান্য ব্যবহৃত হইতেছে। এই সকল ধান্যের বীজের আরও উন্নতিসাধন করা যে সম্ভব, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাতে এই সব জাতীয় ধানের চাষ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জমীর উর্ব্বরতা ক্ষুণ্ণ হইলে উৎকৃষ্ট বীজেও আশানুরূপ ফল হয় না—সেই জন্যই জমীর উর্ব্বরতাবৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।

সেকালের সমৃদ্ধি—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বীরনগরে (উলায়) পল্লী-সংস্কার কেন্দ্রে যাইয়া সার ডানিয়েল হ্যামিল্টন বলিয়াছিলেন, সুন্দরবনে তাঁহার জমীদারী গোসাবায় এক নূতন জাতীয় গমের চাষ হইতেছে। উহা সম্রাট অশোকের রাজত্ব-কালেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। মহিঞ্জোদারোয় ভূগর্ভে যে নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সমাধিমধ্যে গম পাওয়া গিয়াছিল। কোন ধর্ম্মযাজক ঐ গম লইয়া তাহার চাষ করিয়া যে ফশল লাভ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই লইয়া সুন্দরবনে চাষ করিতেছেন। সংপ্রতি বিলাত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বিলাতে কর্ণেল জন ক্লিবর্ণের ক্ষেত্রে এই গমের বীজ বপন করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হইয়াছেন। এই গমের বীজ চার হাজার বৎসরেরও অধিক কালের। উমেদপুরের খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকদিগের কলেজে ঐ গমের ১৪·টি দানা বপন করা হয়। তাহাতে প্রতি একরে গড়ে ৩৪ ব্যুশেল ফশল পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম বৎসরের ফশলের বীজ লইয়া পর বৎসর চাষ করা হয় এবং তৃতীয় বৎসরের বীজ লইয়া কর্ণেল ক্লিবর্ণ চাষ করেন। তিনি যে ১৮৩টি বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার সকলগুলিই অঙ্কুরিত হয় এবং প্রত্যেকটি হইতে প্রায় ৭ ফিট উচ্চ ২০ হইতে ৩০টি শাখা হয়। বিদেশে এই গমের চাষ হইতেছে ; আর এ দেশে ? আমাদিগের কোন বন্ধু এ দেশ হইতে য়ুরোপে ফল পাঠাইবার উপায় ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালা সরকারের কৃষি বিভাগকে এক পত্র লিখিলে ঐ বিভাগের বিশেষজ্ঞ তাঁহাকে আলিপুরে "এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটীতে" অনুসন্ধান করিতে পরামর্শ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। ঐ সমিতির সম্পাদক কবুল জবাব দিয়াছেন—"The Society cannot advice you at all on this"—অর্থাৎ সমিতি এ বিষয়ে কোনরূপ পরামর্শ দিতে পারেন না !

বাঙ্গালায় শিক্ষা—

বাঙ্গালা সরকারের পক্ষ হইতে বাঙ্গালায় শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গালায় শিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে। ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে যে স্থানে ১৮,৯২,১৪১ জন ছাত্র বিদ্যালাভ করিতেছিল ১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে সেই স্থানে ২৮,৫৩,০৯৯ জন ছাত্র বিদ্যালয়ে ছিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যার হিসাব এইরূপ—

	৯২৭ খৃঃ	১৯৩২ খৃঃ	১৯৩৩ খৃঃ
কলেজে ···	৩০,৪৫৬	২৬,৯৩২	২৭,৮১৭
উচ্চ শ্রেণীতে ···	১,০৪,৬৩৩	১,২৮,৩২৩	১,৩৬,০৩৪
মধ্য শ্রেণীতে .	৯৭,৫৬৯	১,২৩,৪৬৭	১,২৪,৯৩৩
প্রাথমিক শ্রেণীতে	১৯,৪২,৭৪২	২৩,১৬,২৬০	২৩,৮৭,৩৩৮
বিশেষ শিক্ষায়	১,১৪,৪৭৬	১,২৫,২৭৯	১,২১,২৬৫
অন্যান্য বিদ্যালয়	৫৩,৫০৪	৬৩,১৬৪	৬৫,৭০৪

এই হিসাবে দেখা যায়, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় কলেজে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। যাঁহারা পুত্রাদিকে কলেজে শিক্ষা দেন, তাঁহাদিগের আর্থিক দুর্গতিই যে ইহার একমাত্র কারণ, এমন মনে হয় না। বোধ হয়, কলেজের শিক্ষায় যে জীবিকার্জ্জনের বিশেষ কোন সুবিধা হয় না, ইহা বুঝিয়াও লোক সে শিক্ষায় আগ্রহ হারাইয়াছেন।

কয় বৎসরে নানা শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	১৯২৭ খৃঃ	১৯৩২ খৃঃ	১৯৩৩ খৃঃ
কলেজ	৬৪	৬৮	৭০
উচ্চ স্কুল	১,০৪৫	১,১৫৭	১,১৮৬
মধ্য স্কুল	১,৭৫০	১,৯৬৯	১,৯৩৫
প্রাথমিক স্কুল	৫২,৮০৯	৬১,১৬২	৬২,৭১৯
বিশেষ শিক্ষার স্কুল	৩,১৫৫	৩,০৫০,	২,৮৬৩

বর্ত্তমান আর্থিক দুর্দ্দশাহেতু সরকারের রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছে। সেইজন্য সরকারের সকল বিভাগেই ব্যয় হ্রাস করা হইয়াছে এবং গত বৎসর শিক্ষাবিস্তার জন্য মোট ১,৩৫,২১,৪৩৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। শিক্ষার জন্য ব্যয়ের দুই-তৃতীয়াংশ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ছাত্রদত্ত বেতনের পরিমাণ ১,৮২,৬৫,১৭৭ টাকা।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ে শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যা এইরূপ—

	১৯২২ খৃঃ	১৯৩৩ খৃঃ
হিন্দু—		
শিক্ষায় উন্নত সম্প্রদায়	৮,৮২,৪২৫	৯,০৪,১৬৫

শিক্ষায় অনুন্নত	৮১,৯৫২	৪,৩৭,২২৯
মুসলমান	০৮,৮০৬৭৫	১৪,৭৭,১৪৫
দেশীয় খৃষ্টান	১৩,৫ ৭	১৭,৮১২
বৌদ্ধ	৯,৫৬৫	১২,৬৩২
য়ুরোপীয়	৯,৪৪৩	৯,৯৯৪
অন্যান্য সম্প্রদায়	১৩,৬৬৫	৪,০২৩

দেশীয় খৃষ্টান ও হিন্দুদিগের শিক্ষায় উন্নত সম্প্রদায়ের বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত বয়সের লোকের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষা লাভ করিতেছে। শিক্ষায় অনুন্নত সম্প্রদায় শিক্ষার উপয়োগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় এই সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫ গুণ হইয়াছে। নমঃশূদ্র ও পোদরা শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছেন এবং আপনারা বিদ্যালয় সংস্থাপনের ও বৃত্তিপ্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কিরূপ দ্রুত হইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত হিসাবে বুঝা যায়—

	১৯২৭ খৃঃ	১৯৩৩ খৃঃ
কলেজে	৪,৩০৫	৩,৬৬৮
উচ্চ শ্রেণীতে	১৬,০৫৮	২৭,২৩৪
মধ্য শ্রেণীতে	১৮,৫৭৪	৩০,৩৮৬
প্রাথমিক শ্রেণীতে	৯,৯৫,০৩০	১২,২৬,৭১১
বিশেষ শিক্ষায়	৭৫,২৭০	৮৫,৫৭৮
অন্যান্য বিদ্যালয়ে	৩০,৯০৩	৫৩,৫৬৮

মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক বাড়িয়াছে।

ার বিস্তারও যে দ্রুত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে বুঝা যায়—

	১৯২১ খৃঃ	১৯৩৩ খৃঃ
কলেজে	২২৩	৯২৪
উচ্চ শ্রেণীতে	১,০৪৪	৪,১৩৮
মধ্য শ্রেণীতে	১,৭.৬	৫,৫৫৬
প্রাথমিক শ্রেণীতে	৩,৩৩,৭০৪	৫,৮০,৩০৯

১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরে যেমন ছাত্রী অপেক্ষা ছাত্রের সংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী ৫ বৎসরে তেমনই ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এ দেশে শিক্ষা সম্বন্ধে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যে, শিক্ষায় উন্নত সম্প্রদায়ে যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষিত লোকের সমতুল্য লোক দেখা যাইতেছে, জনগণের মধ্যে তেমনই অজ্ঞতার অসাধারণ আধিক্য। কেবল অর্থাভাবই যে ইহার কারণ, এমন বলা সঙ্গত হইবে না। চিরদিনই সকল দেশ উচ্চশিক্ষায় অধিক মনোযোগ দিয়াছে। এ দেশেও ইংরাজশাসনে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে লোকের দারুণ দারিদ্র্যও এই দুরবস্থার জন্য কতকটা দায়ী। দেশের সাধারণ লোকের দারিদ্র্য যেরূপ তাহাতে তাহারা অধিক দিনের জন্য বালকদিগকে বিদ্যালয়ে—কায হইতে মুক্ত অবস্থায় রাখিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা সামান্য শিক্ষাই লাভ করে এবং তাহার পর পল্লীজীবনের পরিবেষ্টনে শীঘ্রই লব্ধ শিক্ষা ভুলিয়া যায়।

বাঙ্গালার শিক্ষা-সমস্যা আর্থিক সমস্যার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত এবং বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থার উন্নতিচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদেশে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যও অগ্রসর হইবে।

শিল্পকলা প্রদর্শনী—

বিগত ১৯ আগষ্ট হইতে ২২ আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রযত্নে একটি শিল্পকলা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। শিল্পী শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার নাগ মহাশয়ের বহু ছাত্র ও ছাত্রী তাঁহাদের শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ বহু প্রকার শিল্পসম্ভার প্রদর্শন করিয়া প্রদর্শনীর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মাছের আঁশ, ঝিনুক, কড়ী, শামুক, ছেঁড়া কাগজ, পেঁজা তুলা, গাছের পাতা, মোম, মাটি, রঙ্গিন পাথর, ভাঙ্গা কাঁচ প্রভৃতি সামান্য সামান্য বস্তুজাত শিল্প-সম্ভারের প্রদর্শনীতে সমাবেশ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন সহকারে এই প্রদর্শনীর সূচনা করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগে শিল্পকলা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্য লইয়াই প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। শুধুই বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীই যে উক্ত প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন তাহা নহে।

কলিকাতার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের বহু ছাত্র ও ছাত্রী প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া শিল্প-শিক্ষা লাভ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। এই প্রকার অনুষ্ঠানের সাহায্যেই বাঙ্গালার বিনষ্ট শিল্প-জিজ্ঞাসার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে; সেই কারণে এইরূপ প্রদর্শনী সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য।

ভারতের ঋণভার—

ভারত সরকারের যে ঋণ আছে অর্থাৎ যে ঋণ ভারতের রাজস্ব হইতে পরিশোধ করিতে হইবে—ভারতের রাজস্ব যাহার জন্য জামিন, তাহা লইয়া কিছুদিন হইতে কিছু আলোচনা চলিতেছে। কংগ্রেস একবার ইহার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আয়ার্লণ্ডকে যখন স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করা হয়, তখন তাহার ঋণ ভাগ করিয়া ইংলণ্ড কতকাংশ লইয়াছিলেন; ভারতবর্ষের ঋণ সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবস্থা করা সঙ্গত। কংগ্রেসই একবার ঋণ অস্বীকার করিবার কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। কোন্ ঋণ ভারতের কল্যাণকল্পে গৃহীত, কোন্ ঋণ নহে—তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া এখন ফল কি? অল্পদিন পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিষ্টার হোসেন ইমাম ভারতের ঋণভার লঘু করিবার উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিবেচনা করিবার জন্য এক কমিটী নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। সেই প্রস্তাবপ্রসঙ্গে সরকার পক্ষ হইতে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায়—

(১) ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারতের ঋণের পরিমাণ ছিল—৮৮২ কোটি টাকা।

(২) গত মার্চ্চ মাসে তাহার পরিমাণ—৯৭৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

(৩) ঋণের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রেলপথের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে।

(৪) ঋণের অনেকাংশই লাভজনক কাযে প্রযুক্ত।

এখন যে সেচের ব্যবস্থায়ও অনেক টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। ঋণের সুদ এখন হ্রাস করা হইয়াছে—তাহাতে আসল পরিশোধে সুবিধা হইতে পারে। আর যাহাতে ঋণ এ দেশেই গৃহীত হয়, তাহা করিলে টাকার সুদ দেশেই থাকে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষা—

বাঙ্গালায় স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদানের প্রয়োজন বহুদিন হইতে উপলব্ধ হইতেছে। পূর্ব্বে যদুনাথের 'শরীর-পালন' ও 'সরল শরীর-পালন', রাধিকাপ্রসন্নের 'স্বাস্থ্যরক্ষা', কানিংহামের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক পুস্তকের অনুবাদ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রদিগের পাঠ্য ছিল। বর্ত্তমানে এই বিষয়ে সরকার বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। মনোযোগ দিবার বিশেষ কারণও আছে। কারণ, গত কয় বৎসরে স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে ৬,৭০৯জন বালক ও ৫২৪ জন বালিকার পরীক্ষাফলে দেখা গিয়াছে, বালকদিগের মধ্যে শতকরা মাত্র ২৩ জন উপযুক্ত আহারে পুষ্ট, শতকরা ৬৭ জন কোন না কোনরূপ বিকৃতিবিড়ম্বিত এবং শতকরা ১৪ জনের চক্ষুর পীড়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-পরীক্ষায়ও আহারের দোষ প্রকাশ পাইয়াছে। যাহাতে দরিদ্র ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারে ও চশমা পায়, তাহার সুব্যবস্থা হইতেছে।

সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে শারীর শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। শারীর শিক্ষার নানা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ছাত্রদিগকে "স্কাউট" "গাইড" ও "ব্রতচারী" হইতেও উৎসাহিত করা হয়। এ বিষয়ে সরকার এই সব অনুষ্ঠানকে সাহায্য করিতেছেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় ব্যায়ামের জন্য যন্ত্রাদি, ক্রীড়ার ব্যবস্থা ও চিকিৎসক দ্বারা ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সরকার যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। দানের সর্ত্ত এই যে, বিদ্যালয়গুলিকে বৃত্তির টাকার দ্বিগুণ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু সকল বিদ্যালয় এই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই। ১৯২৯ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বরাদ্দ ৮০,৫০০ টাকার মধ্যে কেবল ৪৮,১৭২ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হইয়াছিল। সেই জন্য শিক্ষক প্রস্তুত প্রভৃতির জন্য কলিকাতায় কেন্দ্রী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহাতে ১৬,৭০৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

অন্যান্যরূপেও ছাত্রদিগের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চার ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

উচ্চ স্কুলে ও নর্ম্মাল ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষাকেন্দ্র হইতে সরকার শিক্ষক দিতেছেন। ইঁহারা স্বাস্থ্য-রক্ষা সম্বন্ধে আবশ্যক শিক্ষাদানও করিবেন। বর্ত্তমানে বাঙ্গালায় নানা স্থানে এইরূপ ৭০ জন শিক্ষক কায করিতেছেন। বিস্ময়ের বিষয়, ইঁহাদিগের ৩৬ জন মাদ্রাজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন।

শিক্ষার্থীদিগকে পাঠকালের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু স্থির হইয়াছে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী স্কুলসমূহের ছাত্রদিগকে "জলখাবার" দিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহার ফল পরীক্ষিত হইবে।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ছাত্রদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার চেষ্টাও হইতেছে এবং নানা বাধা বিঘ্ন থাকিলেও এই কায অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

গত ৫ বৎসরে সরকারের চেষ্টায় এ বিষয়ে সুফল ফলিয়াছে। এখন অভিভাবকরা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ছাত্র যদি দুর্ব্বলদেহ ও রোগজীর্ণ হয়, তবে তাহার পক্ষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ কোন লাভ হইতে পারে না; পরন্তু স্বাস্থ্য ভাল হইলে মনও সবল হয়। কিন্তু এখনও সকল অভিভাবক ইহা বুঝিতে পারেন নাই—সকলে ইহা বুঝিলে বাঙ্গালার ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির আশা করা যায়।

বীমা আইন—

এ দেশে জীবনবীমা কোম্পানীর প্রয়োজন যেমন অধিক, সেই প্রয়োজনে যে সকল বীমাকোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সে সকলে যাহাতে কোনরূপ অনাচারের ও ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনাপথ রুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে সতর্কতাও তেমনই প্রয়োজন। সেই জন্যই ভারত সরকার বীমাকোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমেরিকায় ৩ জন লোকের মধ্যে ২ জনের জীবন বীমা করা, আর এ দেশে ৫ শতে ১ জন মাত্র ঐ পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে যে এ দেশে বীমার পরিমাণ বাড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনই দেশীয় বীমাকোম্পানীগুলির "প্রিমিয়ম"-লব্ধ বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা এবং বীমা তহবিলের পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকা। এই অবস্থায় সতর্কতা-বলম্বনের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিবেন না।

অল্পদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের প্রাদেশিক সরকার কয়টি কোম্পানীর নাম "নির্ভরযোগ্য" কোম্পানীর তালিকা হইতে বর্জ্জন করিয়াছেন এবং সেই কয়টির মধ্যে কলিকাতার দেশীয়-পরিচালিত একটি প্রধান কোম্পানীর নাম ছিল। এই কোম্পানীই ইতঃপূর্ব্বে "কম্বাইণ্ড" বীমাকারীদিগের সহিত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। সুখের বিষয়, পরে মাদ্রাজ সরকার তাঁহাদিগের প্রচারিত আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু কি কারণে যে প্রথমে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সরকার বা কোম্পানী কেহই বীমাকারীদিগকে বা জনসাধারণকে জানাইয়া দেন নাই।

সে যাহাই হউক, আমরা মনে করি, এ দেশে যাহাতে দেশীয় বীমাকোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং সে সকল প্রতিষ্ঠান সুপরিচালিত হয়, তাহাই সকলের অভিপ্রেত। বর্ত্তমানে যে বীমা বিষয়ক কয়খানি মাসিকপত্রে বীমার বিষয় আলোচিত হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। সংপ্রতি বীমা ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কয়জন বাঙ্গালীর উদ্যোগে বীমার বিষয় আলোচনা ও মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন অভিজ্ঞতায় ও সাফল্যে বীমা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। ইনি "ষ্টাডি সার্কলের" সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং যিনি যৌবনে প্রসিদ্ধ সাংবাদিকদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বীমা-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সেই উদ্যোগী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার সম্পাদক হইয়াছেন। আমরা আশা করি, এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বাঙ্গালায় বীমাকার্য্যের উন্নতি হইবে। বর্ত্তমানে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যের জন্য সঞ্চয়ের উপায় হিসাবে বীমার প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির উন্নতি হয়, এবং লোক অনায়াসে দেশীয় কোম্পানীগুলির উপর নির্ভর করিতে পারে, তাহাই বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যিকের সম্মান—

ঢাকা মিউজিয়মের কার্য্যাধ্যক্ষ, খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট লেখক, আমাদের পরম

স্নেহাস্পদ শ্রীমান নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিএইচ্-ডি উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা পরম আনন্দ লাভ করিলাম। শ্রীমান্ নলিনীকান্ত বাঙ্গালার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীয়, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই জন্য তাঁহার এই সম্মান-প্রাপ্তিতে আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কগণকে ধন্যবাদ করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমান নলিনীকান্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া উত্তরোত্তর অধিকতর যশোলাভ করুন।

কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরে ভাইস্‌চ্যান্সেলার—

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা-মন্দিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত কানাইলাল গাঙ্গুলী, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিবর্গ সমভিব্যাহারে শিক্ষামন্দির পরিদর্শনে গমন করেন। তথাকার সমস্ত বিষয় দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন এবং মন্তব্য লিখিয়া যান, —"I visited the school to-day and was immensely pleased with what I saw. I wish all girls' schools in the province were inspired by the same spirit of service and efficiency as this school is."

শিক্ষামন্দিরের ছাত্রীগণ তাঁহাকে একটি অভিনন্দন প্রদান করে।

পরলোকে প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—

আমরা অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি মধুপুরে পরলোকে গমন করিয়াছেন। প্রিয়কুমারবাবু বেহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের অডিটার ছিলেন। প্রায় ২ বৎসর হইল তিনি উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার স্বগ্রাম আন্দুলিয়ায় (নদীয়া) আসিয়া বাস করিতে থাকেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যান। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সরকারী কার্য্যের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থরাজির মধ্যে আহোমসতী, মীবার নলিনী, গিরিকাহিনী, নীলাম্বর প্রভৃতির বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। বহু সাময়িক পত্রিকাদিতে তাঁহার প্রবন্ধাদি বাহির হইত।



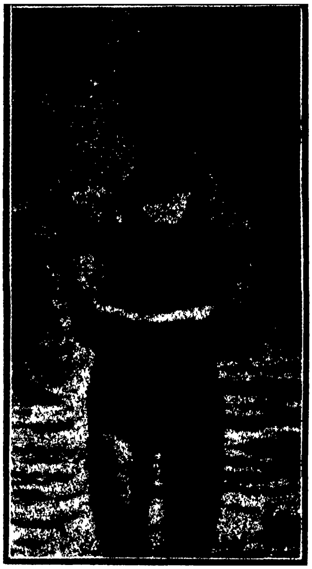
৺প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষে' তাঁহার 'আহোম রাজ্যের অতীত স্মৃতি' প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তিনি মানভূম পুরুলিয়া হইতে 'প্রতিষ্ঠা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বগ্রাম আন্দুলিয়ায় তাঁহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ 'কেদারনাথ স্মৃতি-লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীপাগল হরনাথ ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। তিনি পাঁচটি পুত্র, চার কন্যা ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

খেলাধূলা

সন্তরণ ঃ

শ্রীমান দুর্গাচরণ দাস কলেজ স্কোয়ার পুষ্করিণীতে কলিকাতা সুইমিং ও স্পোর্টস্ এসোসিয়শনের বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। পর পর চারিটি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে দুর্গাচরণ দাস তের বৎসর বয়সেই সন্তরণে যেরূপ পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে তিনি সন্তরণে ভারতের মুখ রক্ষা করতে পারবেন। নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতাগুলিতে তিনি প্রথম হয়েছেন ও পূর্ব্বের বিশিষ্ট সাঁতারুদের রেকর্ডও ভঙ্গ করেছেন।



দুর্গাচরণ দাস

২২০ গজ সন্তরণ :– সময়, ২ মিনিট, ৩৭২/৫ সেকেণ্ড।
ডি ভি মুলজীর রেকর্ড ভঙ্গ।

৪৪০ গজ সন্তরণ :—সময়, ৫ মিনিট, ৩৮৪/৫ সেকেণ্ড।
প্রফুল্ল ঘোষের রেকর্ড ভঙ্গ।

৮৮০ গজ সন্তরণ :—সময়, ১১ মিনিট, ৪০১/৫ সেকেণ্ড।
নলিনচন্দ্র মালিকের রেকর্ড ভঙ্গ।

১ মাইল সন্তরণ :—সময়, ২৪ মিনিট, ৮৩/৫ সেকেণ্ড।
নলিনচন্দ্র মালিকের রেকর্ড ভঙ্গ।

কলেজ স্কোয়ার ১১শ বর্ষ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় এক মাইল সন্তরণে শ্রীমান প্রথম হয়ে নিজ রেকর্ডও ভঙ্গ করেছেন। সময়, ২৪ মিনিট, ৭১/৫ সেকেণ্ড।

বেঙ্গল ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার ১০০ মিটার সাঁতারে সেণ্ট্রাল ক্লাবের রাজারাম সাহু প্রথম হয়েছেন। সময়, ১ মিনিট, ৮৩/৫ সেকেণ্ড। তিনি প্রফুল্ল ঘোষের পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ভঙ্গ করে ভারতীয় নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন।

ন্যাসনাল ক্লাবের নলিনচন্দ্র মালিক ৪০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইলে ও ১০০ মিটার চিত সাঁতারে প্রথম হয়েছেন। ৪৮ পয়েণ্ট পাওয়ায় 'বেষ্টম্যান' (bestman) পুরস্কারও তিনি লাভ



নলিনচন্দ্র মালিক

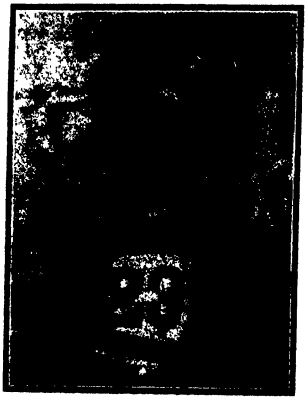
করেছেন। তারই জন্যে ন্যাসনাল ক্লাব ১১০ পয়েণ্ট করে টীম্ চাম্পিয়ানসিপ্ পুরস্কার পেয়েছে।

মেয়েদের দু'টি প্রতিযোগিতা ছিল। ১০০ মিটার সাধারণ সাঁতারে—কুমারী বাণী ঘোষ প্রথম—সময়, ১ মিনিট। ৫০ মিটার বুক সাঁতারে কুমারী নিরুপমা শীল (ন্যাসনাল) প্রথম হয়েছেন—সময়, ৫২২/৫ সেকেণ্ড।

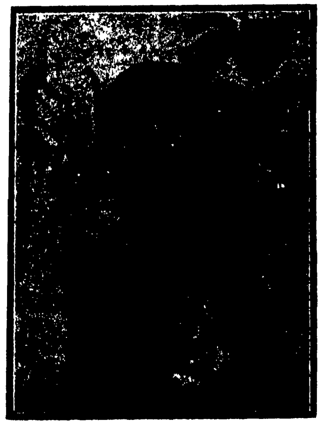
কলেজ স্কোয়ার সুইমিং প্রতিযোগিতায়, ছয় বৎসরের বালক জয়দেব জেঠি সন্তরণে আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়েছে। কালে সে যে একজন চমৎকার সাঁতারু হতে পারবে সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইহার ভগ্নি কুমারী জেঠি বালকদের সময়কেও হারিয়ে দিয়ে বালিকাদের ৩০ গজ রেসে প্রথম হয়েছে, মাত্র ২৯ সেকেণ্ডে।

৩০ গজ বালকদের ফ্রি ষ্টাইল (৪র্থ ডিভিসন রেসে)— জয়দেব জেঠি—প্রথম, সময় ৩৩½ সেকেণ্ড। এম্ সূর্য্যকান্ত —দ্বিতীয়। রূপসিং—তৃতীয়।



কুমারী যশোবন্তি জেঠি



মাষ্টার জয়দেব জেঠি



ওলিম্পিক্ স্পোর্টস্—১০০ মিটার মহিলা ফ্রি ষ্টাইল রেস

প্রথম—বাণী ঘোষ (ন্যাস্নাল এস্ সি)—সময় ১ মিনিট

দ্বিতীয়—লীলা ভড় (সেণ্ট্রাল এস সি)—সময়—১১ মিনিট—৫০ সেকেণ্ড —কাঞ্চন

৩০ গজ বালিকাদের চিত সাঁতার রেসে—কুমারী যশোবন্তি জেঠি—প্রথম, সময় ২৯ সেকেণ্ড। কুমারী শান্তি মুখোপাধ্যায়—দ্বিতীয়। কুমারী মহামায়া দত্ত—তৃতীয়।



কুমারী রমা সেনগুপ্তা
গঙ্গা পারাপার সন্তরণে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে

কুমারী মানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স মাত্র সাড়ে পাঁচ বৎসর। ১৬ ঘণ্টা ৩০ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করে সে



১১০ গজ ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক রেসে কে কে নন্দী—প্রথম অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছে। কুমারী মানু মাত্র ৪ মাস পূর্ব্বে সন্তরণ শিক্ষা করেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অষ্টম বার্ষিক স্মৃতি গঙ্গা পারাপার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আঠার জন প্রতিযোগী বাগবাজারের গোলাবাড়ী ঘাট থেকে সাঁতরাতে সুরু করে। ইহাদের মধ্যে ষষ্ঠবর্ষীয়া কুমারী রমা সেনগুপ্তা গঙ্গা পারাপার করে সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করেছে। সভাপতি মিঃ জে, এন, গুপ্ত নিজে কুমারী রমাকে বিশেষ পুরস্কার হিসাবে একটি মেডেল দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।



কুমারী মানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ প্রতিযোগিতায় ন্যাসন্যাল সুইমিং ক্লাবের শ্রীনলিনচন্দ্র মালিক সর্ব্বপ্রথম হয়েছেন, এবার তাঁর রেকর্ড ভাল হয় নি। ১৯২৮ সালে তিনি ইহাপেক্ষা অল্প সময়ে গঙ্গা পারাপার করতে পেরেছিলেন।

প্রথম ছয়জন প্রতিযোগীর ক্রমিক স্থান ও সময়—

১। এন্ সি মালিক (ন্যাসনাল)—সময়, ৩৩ মিনিট ৪০$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড।

২। এস্ সি ঘোষ (বাগবাজার)—সময়, ৩৬ মিনিট, ৫৩$\frac{২}{৫}$ সেকেণ্ড।

৩। এইচ এন কুণ্ডু (কোন দলের নহে) —সময়, ৩৮ মিনিট, ৯$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড।

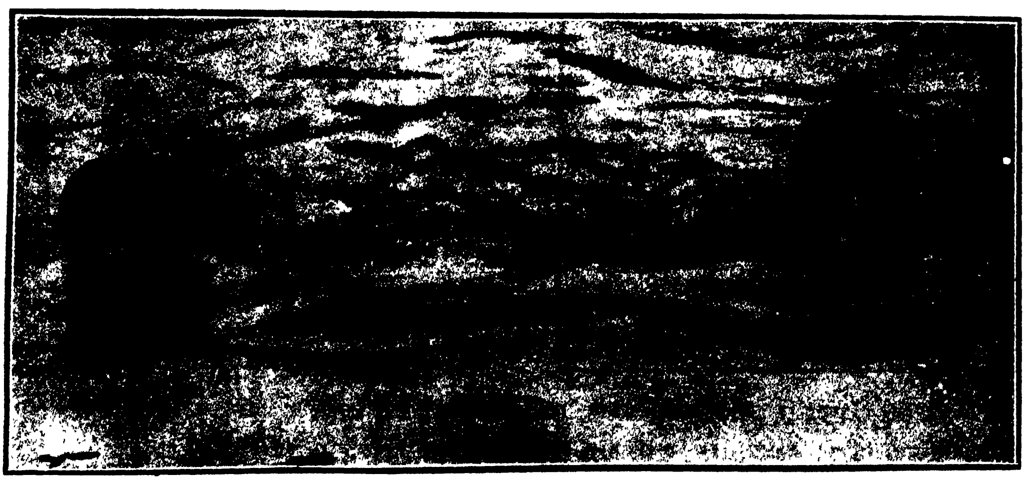
৪। এইচ সি দাস (সেণ্ট্রাল)—সময়, ৪২ মিনিট, ১৯ সেকেণ্ড।



ওলিম্পিক্ সন্তরণ স্পোর্টস্, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ারে, মহিলা সাঁতারু চতুষ্টয়
(২৮) কুমারী গীতাঞ্জলি পাল, (২৯) কুমারী নিরুপমা শীল, (১০) কুমারী লীলা ভড়, (২৩) কুমারী বাণী ঘোষ —কাঞ্চন



কুমারী যশোবন্তি ৩০ গজ রেসে সাঁতার দিচ্ছে



কুমারী নিরুপমা শীল (বামে) ৫০ মিটার বুক সাঁতারে প্রথম হচ্ছেন —কাঞ্চন

৫। সেখ সুলেমান (কোন দলের নহে)—সময়, ৪৫ মিনিট, ৯⅘ সেকেণ্ড।

৬। এস এন ভট্টাচার্য্য (আনন্দ স্পোর্টিং) সময়, ৪৮ মিনিট।

ক্রিকেট ঃ

বিলাতের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় নবাব পতৌদী ব্যাটিংএ প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কাউণ্টি ক্রিকেট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়ের প্রথম স্থান অধিকার এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার হ'লো। প্রথমবার ১৯০০ সালে স্বর্গত জাম সাহেব এভারেজ ৮৭·৫৭ করে প্রথম হয়েছিলেন। বোলিংএ পেন প্রথম হয়েছেন! নিম্নে লিষ্ট দিলাম :—

ব্যাটিং এভারেজ—(৮টা সম্পূর্ণ ইনিংস)

খেলোয়াড়ের নাম	খেলার সংখ্যা	নট্ আউট্	মোট রান	সর্ব্বোচ্চ ইনিংস্	এভারেজ
পতৌদী	১৫	৩	৯৪৯	২১৪ (নট্ আউট্)	৭৮·৭৫
হ্যামণ্ড	৩৫	৪	২৩৬৬	৩০২	৭৬·৩২
টিলডেসলি	৫১	৮	২৪৮৭	২৩৯	৫৭·৮৩
এইম্‌স্	৪৩	৬	২১১৩	২০২ (নট্ আউট্)	৫৭·১০
ও'কোনর	৪৯	৭	২৩৫০	২৪৮	৫৫·৯৫
কুক্	৪৫	৬	২১ ২	২২০	৫৪·৬৬
সাট্‌ক্লিফ	৪৪	৩	২০২৩	২০৩	৪৯·৩৪

বোলিং এভারেজ—(০ উইকেট)

খেলোয়াড়	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	এভারেজ
পেন	১২৮৫·৫	৪৬৩	২৬৬৪	১৫৬	১৭·০৭
লারউড্	৫১২·২	১০৩	১৪১৫	৮২	১৭·২৫
ভেরিটি	১২৮২·১	৫০০	২৬৪৫	১৫০	১৭·৬৩
ক্লে	৮৮৩	২৫৮	১৮২৯	১০৩	১৭·৭৫
কপ্‌সন্	৬৯৭·২	১৬৯	১৬৪৮	৯১	১৮·১০
জিম্ স্মিথ	১৩৯৮·৫	৩৪৬	৩২৪৮	১৭২	১৮·৮৮
বাউস্	১১৪১·৪	৩০১	২৮৬০	১৪৭	১৯·৪৫
ভোস্	১০৪৪	২১৪	২৮২২	১২৮	২২·০৪



দুর্গাচরণ দাস সাঁতার কাটছেন —কাঞ্চন



জি, দে
১১০ গজ রেসে চিত সাঁতার
কেটে প্রথম হয়েছেন —কাঞ্চন

এবার কাউণ্টি খেলায় লাঙ্কাসায়ার চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন, কিন্তু 'রেষ্ট অফ্ ইংলণ্ডের' সঙ্গে ৮ উইকেটে হেরে গেছেন।

স্কোর :—

চাম্পিয়ান কাউণ্টি : দুই ইনিংসে, ২০৬ ও ৩:৩০

রেষ্ট অফ্ ইংলণ্ড : দুই ইনিংসে, ৩৮৭ (৯ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ও ১৫৫ (২ উইকেট)—

ওয়্যাট ৮৫, হেনড্রেন ৫১, দু'জনেই নট্-আউট্।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যানের এ্যাপেন্ডিসাইটিসের জন্য অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনি এখনও গুরুতর পীড়িত, তবে আরোগ্যের পথে অতি ধীরে অগ্রসর



নবাব পতৌদী

হচ্ছেন। শ্রীমতী ব্র্যাডম্যান স্বামীর সংবাদে আশঙ্কান্বিতা হয়ে লণ্ডনাভিমুখে যাত্রা করেছেন।

ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম পক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ঘটনা-জার্ম্মানীতে ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। জার্ম্মান সরকারের তরফ থেকে এই প্রতিযোগিতার বিরাট উদ্যোগ আয়োজন চলছে। সমস্ত পৃথিবীতে "নারদের নিমন্ত্রণ" হয়েছে। পৃথিবীময় মস্ত একটা সাড়া পড়ে গেছে। যাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন, তাঁরা আদা-জল খেয়ে তৈরী হচ্ছেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হবার স্থির হলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে ক্রীড়াক্ষেত্র নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে প্রতিযোগিতা হ'তে পেলে না। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীতে আবার ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব হয়েছে। এক্ষণে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ক্রীড়াক্ষেত্রটি যথেষ্ট হবে না বোধ হওয়ায় বার্লিনের উপকণ্ঠে গ্রুনেওয়াল্ড (Grunewald) পল্লীতে নির্ম্মিত পূর্ব্বের ক্রীড়াক্ষেত্রটিকে আরও বৃহদাকারে ও নূতন ভাবে গড়া হচ্ছে। সংস্কার-কার্য্য শেষ হলে এক লক্ষ লোকের ক্রীড়া-কৌশল দেখবার স্থান এখানে হবে।



ওলিম্পিক গ্রাউণ্ড

পূর্ব্বে যেখানে সাঁতার কাটবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, তার ঠিক পাশেই লোকগুলি কার্য্যে নিযুক্ত, ছবিতে দেখা যাচ্ছে। পূর্ব্বের প্রধান বসবার জায়গা থেকে ফুটবল খেলবার মাঠের উপর দিয়ে যে বাঁধ তৈরী হয়েছিল, সেটা এখন নূতন ষ্টাডিয়ামের পশ্চিম দিকের বাঁক হয়ে পড়েছে।

রাগবী ঃ—

অল্ ইণ্ডিয়া রাগ্বী টুর্ণামেণ্ট খেলা শেষ হয়েছে। ক্যালকাটা ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটনকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে

ক্যালকাটা ১৩ পয়েন্ট, আর ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন ৩ পয়েন্ট করেছে।



কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের ১১শ বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার ১১০ গজ চিত সাঁতার

প্রথম—মিঃ এম ইব্রাহিম

ভারতীয়রা রাগ্‌বী খেলা পছন্দ করে না। কোন ভারতীয় রাগ্‌বী দল নেই। য়ুরোপীয়দের মধ্যে পুলিস, ক্যালকাটা ও মিলিটারীদল ব্যতীত অন্য ক্লাবেরও রাগ্‌বী টীম নেই।

ফুটবল :—

বহু ছোট ছোট ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখানে এখনও হচ্ছে। বাইরে বড় বড় টুর্ণামেণ্টও হচ্ছে। ইহা থেকে প্রতীয়মান হয় ফুটবল খেলা ভারতে কত বেশী লোকপ্রিয়। মোহনবাগান দ্বারভাঙ্গা শীল্ডের খেলায় এরিয়ানের কাছে দুই গোলে হেরে গেলো। তার শোধ তুললে জবাকুসুম কাপ্ ফাইনালে। প্রথম দিন ১ গোলে ড্র করে, পরের দিন (২-১) গোলে এরিয়ানকে হারিয়ে দিয়েছে। মোহনবাগান এই কাপ্ খেলায় পাঁচবার জয়ী হলো। ওদিকে এরিয়ানরা দ্বারভাঙ্গায় দ্বারভাঙ্গা শীল্ড ফাইনালে জামাল-পুরের কাছে (৩-১) গোলে হেরে গেলো।

আই এফ্ এর ভারতীয় খেলোয়াড়দল রাঁচিতে হোরস্‌ফিল্ড ইলেভেনের সঙ্গে চ্যারিটি খেলায় (৪-১) গোলে জিতেছে। তার পরদিন য়ুরোপীয়ান আই এফ্ এর খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলায়ও (২-১) গোলে জিতেছে।

হাজারিবাগে চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগান ইষ্ট ইয়র্কের কাছে দুই গোলে হেরে গেছে। মোহনবাগানের পাঁচজন ভালো ও নিয়মিত খেলোয়াড় খেলে নি। বিজয়ী ইষ্ট ইয়র্ক রামগড় রাজার প্রদত্ত গভর্ণরস্ কাপ্ ও ১১খানা রৌপ্যপদক পেয়েছে, মোহনবাগান রানার্স-আপ্ কাপ্ পেয়েছে।

ডারহাম্‌স্ বোম্বেতে রোভার টুর্ণামেণ্ট খেলতে গিয়েছিল। তারা সেখানে ইয়র্ক ও ল্যান্সের কাছে এক গোলে হেরে গেছে।

কালীঘাট লক্ষ্ণৌতে আই এফ্ সি শীল্ডে খেলতে যায়। গত বৎসর তারা ঐ শীল্ড জয় করেছিল। এবার ই আই আর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের কাছে এক গোলে হেরেছে।

কলিকাতার স্পোর্টিং ইউনিয়ন লক্ষ্ণৌতে ঐ শীল্ড খেলার দ্বিতীয় রাউণ্ডে কানপুরের ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নকে ৫ গোলে হারিয়ে দিয়েছে।



অর্দ্ধ মাইল ফ্লাটরেস (সাধারণ) আরম্ভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত

প্রথম— দুর্গাচরণ দাস

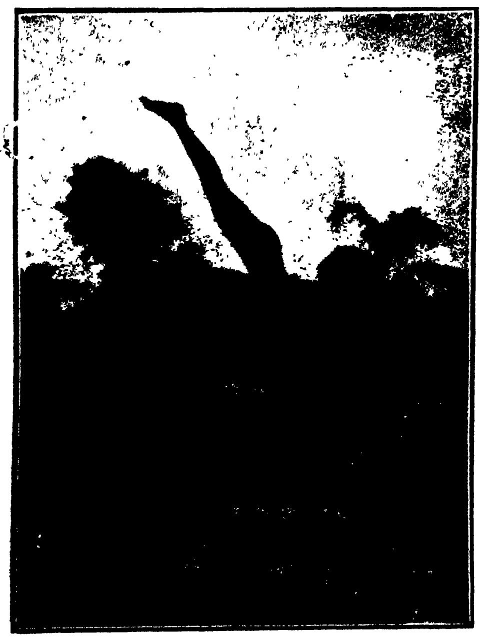
আই এফ্ এ পাটনায় ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারের

চ্যারিটির জন্য বাছাই ভারতীয়দল পাঠাতে সম্মত হয়েছেন। নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা বাছাই হয়েছেন।—এস্ ভট্টাচার্য্য (এরিয়ান), জি পাল (মোহনবাগান), এস মজুমদার (মোহনবাগান), এ গাঙ্গুলি (এরিয়ান), কে ভট্টাচার্য্য (মোহনবাগান), সামাদ (মহমেডান), এস চৌধুরী (মোহনবাগান)।



কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতার ৩০ গজ সাঁতারে বালিকা প্রতিযোগিনীগণ —কাঞ্চন

(এরিয়ান), ডি ঘোষ (হাওড়া), নাসিম (স্পোর্টিং), নুরমহম্মদ (ইষ্টবেঙ্গল), হামিদ (মোহনবাগান), এস্ চক্রবর্ত্তী (এরিয়ান), ভুলাল (ইষ্টবেঙ্গল), এ দেব



ফ্যান্সি ডাইভিং —কাঞ্চন

আসানসোলে, প্রীতি সম্মিলনী খেলায় মোহনবাগান ই আই আর এফ্ সিকে ৫ গোলে হারিয়েছে। ধানবাদে, ভারতীয় ও য়ুরোপীয়দের মিলিত দলকেও ২ গোলে হারিয়েছে। গোষ্ঠ পাল সেণ্টার ফরওয়ার্ড হয়ে ভালোই খেলেছিল, এস চৌধুরীও অতি সুন্দর খেলেছে। দেখা যাচ্ছে, মোহনবাগান এখানের চেয়ে বাইরে ভাল খেলে।

সিমলা শৈলে বিখ্যাত ডুরাণ্ড টুর্ণামেণ্ট খেলা হচ্ছে। গত দুই বৎসরের বিজয়ী গ্রপ্ সায়ার্স্ এক গোলে মিডিয়াম ব্রিগেডের কাছে হেরে যেয়ে সকলকে বিস্মিত করেছে। লিসেষ্টারস্ ও আর্গাইলদের খেলায় দু'দিন ড্র হওয়ায়, ফাইনাল খেলা পেছিয়ে গেলো।

আগামী সোমবার ফাইনাল খেলা আর্গাইল বনাম বি কর্পস্ সিগ্ন্যালের সঙ্গে হবে। আর্গাইল হাইল্যাণ্ডেরই জিতবার সম্ভাবনা বেশী। তবে খেলার কথা কিছু নিশ্চয় করে বলা যায় না।

ফলাফল :—

লিসেষ্টারস্ (২০)···সিমলা উইংস্ (০)

আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড (২)···কিংস্ ওন্ স্কটিস্ বর্ডার (০)

নরদাম্টন্স্ (৫)···ধর এফ্ সি (০)

চেশায়ারস্ (২-১) · ইষ্ট সারে (২-০)

৫ম মিডিয়াম ব্রিগেড (১)···গ্রপ্ সায়ার্স্ (০)

লাঙ্কাসায়ারস্···স্যাণ্ডেমোনিয়ন্স্ (আসে নাই)
দরসেট (৭)·· হিন্দু মহমেডান (০)
লিসেষ্টারস্ (৪) · এক্স্‌ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন (০)
১২নং লাইট্ ব্যাটারী কাইজার ইউনিয়ন (আসে নাই)
বি কর্পস্ সিগন্যাল (২)··দরসেট (১)
রয়াল এয়ার ফোর্স (২)···লাঙ্কাসায়ারস্ (১)
বি কার্পস্ সিগন্যাল (৩)···২০(এসি) স্কোয়াড্রন আর এ এফ্ (২)
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাই (৩ ০-১)···লিসেষ্টারস্(৩·০-০)



ওলিম্পিক স্পোর্টস্—১০০ মিটার পুরুষদের (ফ্রিষ্টাইল)
প্রথম – রাজারাম সাহু (সেণ্ট্রাল এস সি) সময়—১ মিনিট ৮$\frac{৪}{৫}$ সেকেণ্ড।
দ্বিতীয়—রাধাবল্লভ সাধু খাঁ (সেণ্ট্রাল)

রয়েল এয়ার ফোর্স (৬)···দরসেট 'সি' কোং (০)
বি কুর্পস্ সিগন্যাল (৪)·· কলেজিয়ানস্ (১)
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড হাই ৩)···চেশায়ারস্ (২)
লাঙ্কাসায়ারস্ (২)·· নরদাম্টনস্ ০)
লিসেষ্টারস্ (২) · ১২নং লাইট্ ব্যাটারী (০)
আর্গাইল ও সাদারল্যাণ্ড (০-১)·· মিডিয়াম ব্রিগেড ০ ০)

বিলিয়ার্ড ঃ—

পৃথিবীর বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসিপ্ খেলায় (২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত) মোট স্কোর ওয়াল্টার লিনড্রামের (খেলছে) ১০৭৫৩ আর ম্যাক্‌কোনাচির ১০৫৮১ হয়েছে। লিনড্রাম্ ৩৬৷৷০ মিনিটে ১০৭৫ এর 'ব্রেক' করেছেন। ইহাই নূতন 'বক্-লাইন' নিয়মাধীনে এখন পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড বলে বিবেচিত হবে।

৩০৷৯৷৩৪

সাধ

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

এই আঁখি আছে, প্রাণ আছে, আর, তুমি আছ নিরুপমা,
মনে বড়ো সাধ মরিবার আগে অমর করিব তোমা।
আর কিছু মোর আছে না-ই আছে, আশা আছে সুগভীর ;
তব মহিমায় এত বিশ্বাস নাই কোনো পূজারীর।
তুমি কী রতন, তোমার যতন আমিও কি ভালো জানি ?
তব তরে কিছু না করিলে নয়, করিলেও লাজ মানি।
আয়োজনে আমি হোতে পারি দীন, আবাহনে মহীয়ান,
তুমি যদি আজ পাষাণীও হোতে, তারি টানে পেতে প্রাণ।
মরম গভীরে যে সুর-ফল্গু হোলো তব অনুগমা,
প্লাবনে তাহার ধরণী রসিয়া হবে নন্দন সমা॥

এতদিন ছিলে স্বপনের সাথী নিরালা মনের চোখে
ভাবিনি তোমারে আবার কভু যে পাওয়া যায় মরলোকে।
তোমারে পেয়েছি এর পরে কি গো ধন-মানে মন যায় ?
আঁখির ধরাতে আছ যতদিন দেখিতেই আঁখি চায়।
বাহিরে দেখিব সকলের মাঝে, দেখিব আবার প্রাণে
এমনি করেই কখন যে তুমি রূপ নিবে গানে গানে।
তিলেকের দেখা তিলে তিলে দেখে রসাবেশ করি জমা,
রাগের তুলিতে নবতমরূপে গড়িব তিলোত্তমা॥

সে-রূপ জগতে কারো নয়, একা আমারি আবিষ্কৃত,
চিরকাল ধরি' এ গরবে আমি রহিব অপরাজিত।
তোমার মহিমা তোমাতেই গাঁথা, তারে কি ধরিতে পারি !
আমি না রচিব, সে-ও একা মোর, তারপরে সে সবারি।

কিছুকাল গেলে তুমিও র'বে না, আমি তো কোথাই যাবো,
আশেপাশে যাহা পরিচিত আজ সবি মিলে গেছে ;—ভাবো,—
তখনো বিশ্ব মানসসায়রে প্রীতির পদ্ম'পরে,
বলো দেখি ও কে চিরশোভমানা, নয়নে করুণা ঝরে !

—সে আমার তুমি, সাধের প্রতিমা, অনেকের মাঝে একা,
নিতু নব হয়ে ফুটে ওঠে তব এক একটি চারু রেখা।
গগন পবন পুলকে মগন পুলকিত যত হিয়া,—
আজি আছ মোর একেলার তুমি ;—সেদিনে বিশ্বপ্রিয়া।

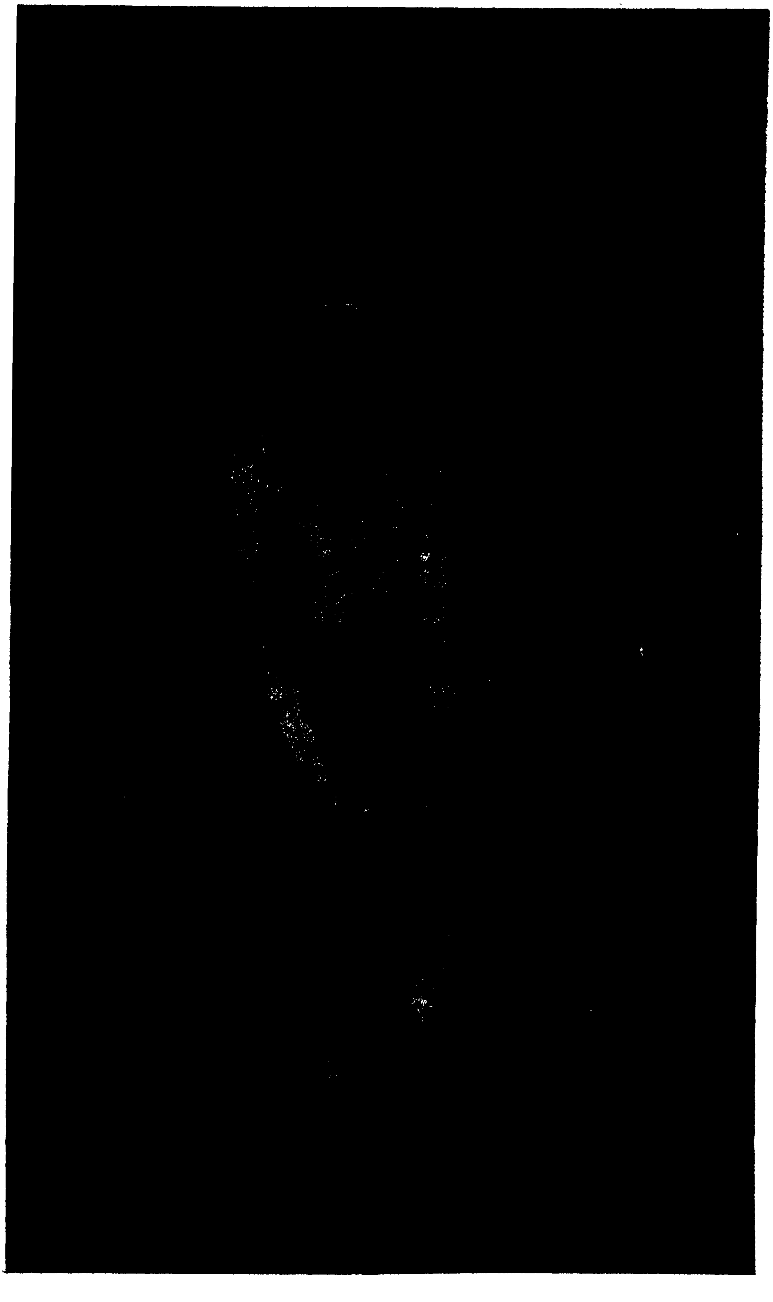
সকলের সাথে এ আঁখি মিশায়ে সেদিনো তোমারে চাই,
প্রাণ বলে শুধু তুমি আছ মোর, আমিও রয়েছি তাই।
তোমারি মিলনে মধুপূর্ণিমা, তুমি না থাকিলে অমা,
ভালো কি মন্দ সবি তোমা নিয়ে, তুমি কোরো শেষে ক্ষমা॥

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী প্রণীত উপন্যাস "ছায়াপথ"—১।০
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "ভারতীয়কৃষ্টি ও তাহার শিক্ষা" প্রথমভাগ—২॥০
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "রাইকমল"—১৲
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মায়ামৃগ"—২॥০
স্বামী সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত "ভেদাভেদ (দ্বৈতাদ্বৈত) সিদ্ধান্ত"—১৲, "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা"—২৲
শ্রীসারদাপ্রসন্ন দাস প্রণীত "দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ"—২৲
শ্রীরাজকুমার বসু প্রণীত "কাল্পনিক কথোপকথন"—২॥০
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অন্তরীক্ষ"—২৲
শ্রীনবজীবন ঘোষ প্রণীত ছেলেদের সচিত্র কবিতা পুস্তক "আনারস"—১৲
গৃহলক্ষ্মী রচয়িতা রমেশচন্দ্র গুপ্তের অপূর্ব্ব সামাজিক দেবলীলা "মাতৃপূজা" উপন্যাস—॥০
ডাক্তার শ্রীরমাপ্রসাদ রায় প্রণীত "সঙ্গীত-পরিচয়" প্রথম খণ্ড—॥০
শ্রীবুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "অসামান্য মেয়ে"—১
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত "রতি ও বিরতি"—১।০
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত প্রণীত ছেলেদের নাটক "আকাশ-পাতাল"—॥০
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের "ঢিকি মেঘ"—॥০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বি-এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত উপন্যাস "কালোমেয়ে"—॥০
শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত গল্পের বই "সেতু"—১॥০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিজ্ঞানের দিগ্বিজয়"—১৲
শ্রীআশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দুই নারী"—১৷০
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "তর্পণ"—২৲
শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মৃত্যুপণ"—১॥০
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "মৃগয়া"—॥০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjea for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৪১

প্রথম খণ্ড | দ্বাবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভাইটামিন

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস এম-এসসি

ভাইটামিন তত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

(১)

ভাইটামিন নামটী আমাদের সকলেরই সুপরিচিত হইলেও ভাইটামিন জিনিষটি যে কি তৎসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই জ্ঞানের গভীরতা খুব বেশী নয়। আমাদের পল্লীগ্রামে ভাইটামিনের নাম না জানিলেও কোনও বিশেষ অসুবিধা জন্মে না। কারণ 'প্রতি গ্রাসে মুড়ো খাওয়ার' মতই পল্লীর শাক সব্‌জী, মাছ-দুধ ও অপ্রতিহত নির্ম্মল রৌদ্রের কল্যাণে ভাইটামিনের অভাবজনিত অসুখ কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীর সহিত আমাদের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হইয়াছে,—জনাকীর্ণ বড় বড় সহরের ধূলি-ধূমের মধ্যে কৃত্রিম জীবন যাপন সুরু হইয়াছে,—বাসি পচা শাক সব্‌জী, কলছাঁটা সাদা চাউল ও ময়দা, দুধের বদলে 'অন্ধকার রুদ্ধ গৃহে' আবদ্ধ শুষ্ক খড়-ভোজী গাভীর বারি-বিনিন্দিত দুগ্ধ সহরবাসীর অবলম্বন হইয়াছে। ইহার ফলে স্বাস্থ্যনাশ ও আয়ু হ্রাস হইতেছে এবং নানারূপ ক্ষয়রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা জাতিগত ঔদাসীন্য ও কুসংস্কার বশতঃ পাশ্চাত্যের সঙ্গে সমান তালে চলিতে পারি নাই—আমরা অভিমন্যুর মত ব্যূহ-প্রবেশের মন্ত্র মাত্র শিখিয়াছি; আমরা সহরে বাস করিতে শিখিয়াছি অথচ সহরে বাস করিয়া কিরূপে ষোল আনা স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে হয় তাহা শিখিবার চেষ্টা করি নাই। স্বাস্থ্যের মূল উৎস খাদ্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান পরম কল্যাণকর; অথচ নব আবিষ্কৃত ভাইটামিন তত্ত্ব না জানিলে খাদ্যতত্ত্বের বার আনাই অজ্ঞাত রহিয়া যায়। সুতরাং মানব জাতির অশেষ উপকারী এই তত্ত্ব সম্বন্ধে এক্ষণে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

টাট্‌কা শাক সব্‌জী ও ফলমূলের অভাবে (Scurvy) স্কার্ভি রোগ জন্মে ইহা বহু কাল পূর্ব্বেই জাহাজের নাবিকগণের জানা ছিল। অভিজ্ঞতার ফলে তাহারা ইহাও জানিতে পারে যে, লেবুর রস স্কার্ভি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। অতঃপর মরু ও মেরু অভিযানের সময়ে স্কার্ভি রোগের আক্রমণ লক্ষিত হয় এবং ইহার কারণ ও নিরাকরণ সম্বন্ধে মনুষ্য জাতি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করে। লেবুর রস টাটকা অবস্থায় অতিশয় উপকারী হইলেও অনেক দিনের সঞ্চিত অথবা উত্তাপ দেওয়া লেবুর রস স্কার্ভি রোগে হিতকর নয় বলিয়া জানা যায়।

ইতোমধ্যে ইয়োরোপিয়ানদের আমদানী কল যাবা প্রভৃতি দেশে স্থাপিত হওয়ার পর কলের সাদা চাউলের ভাত যাহারা খাইতে লাগিল তাহাদের মধ্যে এক নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হইল · ইহাই বর্ত্তমানে বেরিবেরি নামে প্রসিদ্ধ। আজকাল আমাদের দেশে এ রোগের নাম না জানেন এরূপ লোক খুব বেশী নাই। গত শতাব্দীর শেষ ভাগে জাপান-নৌবহরে প্রতি বৎসর বহু লোক বেরিবেরিতে আক্রান্ত হইত এবং অনেকেই প্রাণ হারাইত। জাপান নৌ-সৈন্যের প্রধান চিকিৎসক শ্রীযুত টাকাকী (১৮৮০-১৮৯০) দেখিলেন যে, ঐ সমস্ত সাগরে ইয়োরোপ ও আমেরিকান নাবিকগণের কখনও বেরিবেরি হইতে দেখা যায় না। ইহাতে তাঁহার মনে হইল জাপানীদের খাদ্যের পার্থক্য বশতঃই ঐ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সৈন্যদের কল ছাটা চাউলের বরাদ্দ কমাইয়া বার্লি, মাংস ও শাক সব্‌জীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জমাট দুধেরও ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে জাপান-নৌবিভাগ হইতে বেরিবেরি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল,—টাকাকীর নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। টাকাকী যদিও বেরিবেরি রোগ জাপান-নৌ-সৈন্য হইতে দূর করিলেন, তথাপি তিনি বেরিবেরির প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সৈন্যদের খাদ্যে প্রোটিনের মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়াতে এবং জাহাজে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতেই তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার ধারণা দৃঢ় ছিল। গত শতাব্দীর শেষ দশকে যাবার বিখ্যাত ওলন্দাজ ডাক্তার শ্রীযুক্ত আইকম্যান (Eijkman) বহু সংখ্যক জেল পরিদর্শন করিয়া লক্ষ্য করিলেন, যেখানে কয়েদীরা কলছাটা সাদা চাউল খায়, সেইখানেই বেরিবেরি হয়; পরন্তু ঢেঁকিছাটা চাউল খাইবামাত্র ঐ রোগের আক্রমণ নিবারিত হয়। আইকম্যান আরও দেখিলেন যে, পায়রা এবং মুরগীদিগকে কলছাটা চাউল কয়েক দিন ধরিয়া খাওয়াইলে উহাদের ঘাড় বাঁকিয়া যায় এবং স্নায়বিক আক্ষেপ দেখা দেয়। এই স্নায়বিক রোগে উহারা শীঘ্রই মরিয়া যায়, অথচ এই ব্যারামে মরণোন্মুখ পাখীগুলিকে ধান বা চাউলের কুঁড়ো (rice polishing) খাইতে দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহারা রোগ-বিমুক্ত ও সতেজ হইয়া উঠে। আইকম্যানের পরীক্ষার ফলে স্থির হইল, ধানের তুষের নীচে যে পাতলা পদার্থটী থাকে, সেই পদার্থটীর বহু দিন ধরিয়া অভাব হইলে, মানুষের বেরিবেরি এবং পাখীদের পলিনই-রাইটিস (polyneuritis) বা স্নায়বিক আক্ষেপ নামে বেরিবেরির অনুরূপ স্নায়বিক রোগ জন্মে; এবং রোগ প্রকাশ পাইলেও ঐ পদার্থটী সেবনে উক্ত ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তখন পর্য্যন্ত জীবাণু বা 'টকসিনই' ব্যাধির একমাত্র কারণ বলিয়া লোকের ধারণা ছিল। কোনও পদার্থ বিশেষের অভাবে যে রোগ হইতে পারে এ ধারণা তখন পর্য্যন্ত লোকের মনে জাগে নাই। সুতরাং আইকম্যানও তাঁহার কালধর্ম্ম অনুসারে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, চাউলে শ্বেতসার বেশী থাকার দরুণ অন্ত্রের মধ্যে একপ্রকার 'টকসিন' (toxin) উৎপন্ন হয় এবং উহাই বেরিবেরির কারণ। পরন্তু চাউলের উপরের পদার্থটী খাইলে ঐ toxin জন্মিতে পারে না; অথবা জন্মিলেও নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং বেরিবেরি হয় না। ইহার কিছুদিন পরে হল্যাণ্ডের গ্রীনস্ (Grijns) নামে এক ব্যক্তি প্রচার করিলেন যে, বেরিবেরি প্রকৃত পক্ষে কোনও জীবাণু বা টক্‌সিনের দরুণ হয় না; পরন্তু খাদ্য মধ্যে একটী বিশেষ উপাদানের অভাবে হয় (deficiency diseases), এবং চাউলের উপরের পর্দ্দাটিতে সেই উপাদানটী পাওয়া যায়। ইহার কিছুদিন পরে (১৯১১ সালে) পোলাণ্ড দেশীয় কসিমির ফুঙ্ক (Casimir Funk) নামে একজন রাসায়নিক চাউলের কুঁড়া (rice polishing) হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে বেরিবেরিনাশক পদার্থটী পৃথক করিয়া (isolate) উহার মোটামুটি রাসায়নিক ধর্ম্ম (chemical properties) পর্য্যবেক্ষণের পর ঐ পদার্থটীকে ভাইটামিন (Vitamine)

আখ্যা প্রদান করিলেন। এদিকে ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রফেসর হপকিন্স্ (Hopkins) ও আমেরিকার ম্যাক কলম (Mc. Collum) নামে রাসায়নিক লক্ষ্য করিলেন যে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত বিশুদ্ধ শ্বেতসার, চর্ব্বি, প্রোটিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ পরীক্ষাগারের প্রাণীদের শরীরের বৃদ্ধি ও জীবন রক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। অথচ সামান্য পরিমাণে দুগ্ধ বা সুরাবীজের (yeast) নির্য্যাস উপরিলিখিত বিশুদ্ধ খাদ্য পদার্থের সহিত যোগ করিলেই প্রাণীগণের স্বাস্থ্য অটুট থাকে। ইহা হইতে ইঁহারা স্থির করিলেন যে, আমাদের সাধারণ খাদ্যে বহু পরিচিত শ্বেতসার, চর্ব্বি, প্রোটিন ও লবণ জাতীয় পদার্থ ভিন্ন আরও কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান অতি সামান্য পরিমাণে থাকে, যাহা না থাকিলে শরীরের সম্যক বৃদ্ধি অসম্ভব এবং যাহার অভাবে কতকগুলি বিশেষ পীড়ার আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। ম্যাক কলম (Mc. Collum) দুধের মাখনের প্রাপ্ত পদার্থটীর চর্ব্বিতে দ্রবনীয় 'এ' (fat soluble A) নাম দিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় হইতেই এ, বি, সি, প্রভৃতি বর্ত্তমান নামের প্রচলন আরম্ভ হইল। ক্রমে ফঙ্কের (Funk) আবিষ্কৃত বেরিবেরি-প্রতিষেধক পদার্থটী জলে দ্রবনীয় 'বি', স্কার্ভি রোগনাশক পদার্থটী জলে দ্রবনীয় 'সি' নামে পরিচিত হইল। খাদ্যস্থ এই অত্যাবশ্যক অপরিচিত পদার্থগুলির অন্য নামও অনেকে প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সে নামগুলির কোনটী অতি দীর্ঘ ও কোনটী বা দ্ব্যর্থক বোধ হওয়ায়, পরিশেষে ১৯২০ সালে বিলাতের রাসায়নিক ড্রামণ্ড (Drummond) ফঙ্কের প্রদত্ত ভাইটামিন নামই বজায় রাখিলেন। তবে শব্দের অন্তস্থ 'ই' অক্ষরটী তিনি রাখা উচিত বিবেচনা করেন নাই। কারণ শব্দটীর শেষে 'ই' অক্ষরটী থাকিলে অ্যামীনো (amino) অংশযুক্ত জৈব পদার্থ বুঝায়। ফলতঃ আবিষ্কৃত কোনও পদার্থেই ঐ group বা অংশ না পাওয়াতে ভাইটামিন (Vitmin) নাম সিদ্ধান্ত করিলেন এবং উপরি বর্ণিত পদার্থগুলিকে যথাক্রমে ভাইটামিন 'এ' ভাইটামিন 'বি' ও ভাইটামিন 'সি' আখ্যা প্রদান করিলেন।

গত ১০। ২ বৎসরের অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ উল্লিখিত ভাইটামিনগুলি ব্যতীত আরও অনেক নূতন ভাইটামিনের আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সবগুলি ভাইটামিনের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং জীবদেহের উপর প্রত্যেকের কি কি বিশেষ ক্রিয়া সে সম্বন্ধে অনেক নূতন ও মূল্যবান্ তথ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এ যাবৎ আবিষ্কৃত যাবতীয় ভাইটামিনই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যলাভের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। প্রকৃতির আদুরে সন্তান মানুষ সমস্ত ভাইটামিনগুলিই উদ্ভিদ্ এবং জীব জগৎ হইতে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত (ready made) অবস্থায় না পাইলে তাহার চলে না। পক্ষান্তরে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইতর প্রাণীদের অনেকেই এক বা একাধিক ভাইটামিন খাদ্যের সহিত না পাইলেও তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, গৃহীত সাধারণ খাদ্য হইতে ঐ সকল ভাইটামিন প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা উহাদের শরীরের মধ্যেই আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পায়রা এবং ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহির হইতে ভাইটামিন 'সি' বহুদিন পর্য্যন্ত সরবরাহ না করিলেও ইহাদের শরীরের কোন ক্ষতি হইতে দেখা যায় না। আর একটী বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভাইটামিনগুলি মেদ প্রভৃতির মত শরীরে সঞ্চিত হইতে পারে এবং কিছুদিন পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ ভাইটামিন খাদ্যের সহিত না পাইলেও দেহের সঞ্চিত ভাইটামিন শরীর-যন্ত্রকে নিয়মিত চালাইতে পারে। যখন এই সঞ্চিত ভাইটামিন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখনই ভাইটামিনের অভাবজনিত ব্যাধি (deficiency disease) প্রকাশ পায়। শরীরের বৃদ্ধির সময় এবং পরিশ্রম কালে ভাইটামিনের ব্যয় বেশী হয়; সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে অন্তঃসত্তা স্ত্রীলোক, শিশু, বালক ও পরিশ্রমশীল লোকদের পক্ষে ভাইটামিন সংযুক্ত খাদ্য বৃদ্ধ এবং অলস লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে আমরা প্রত্যেক ভাইটামিন সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

ভাইটামিন 'এ'

দুধের মাখনে, ডিমের পীতাংশে, কড্ হালিবাট প্রভৃতি মৎস্যের যকৃতের তৈলে, গবাদি তৃণভোজী পশুর যকৃতে, টাট্‌কা শাক সব্‌জীতে, বাঁধা কপি, লেটুস, পালং প্রভৃতি শাকে (পাতা যত পাত্‌লা ও সবুজ ভাইটামিনের পরিমাণও তত বেশী বলিয়া জানা যায়), বিলাতী বেগুন, আম প্রভৃতি

পাকা ফলে, টাট্‌কা পাকা লঙ্কায় এবং গাজরে এই ভাইটামিন সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়। আমাদের ল্যাবরেটরীর পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, চাঁই, ভেট্‌কী, চিতল, মৃগেল, রোহিত, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্যের লিভার তৈলে ভাইটামিন 'এ'র পরিমাণ কড্‌লিভার তৈলের অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম নয়। টেঙ্গরা, পুঁটি প্রভৃতি মৎস্যের লিভার তৈল পৃথক করিয়া পরীক্ষা করা অসম্ভব বিধায় ঐ সকল মাছ কাঁচা অবস্থাতেই আমরা ইন্দুরকে খাওয়াইয়া দেখিয়াছি যে, ক্ষুদ্র মৎস্যের মধ্যে 'পারসে' ও 'টেংরা'তেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাইটামিন 'এ' আছে। ভাইটামিন 'এ' বর্ণহীন তরল পদার্থ। ইহা তৈল বা চর্ব্বিতে দ্রব হয়। উদ্ভিদ্‌ জগতে ভাইটামিন 'এ'র জনক (precursor) কমলা রঙের কঠিন পদার্থ 'ক্যারোটিন' (carotine) দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাণীদেহে এই ক্যারোটিনই কিন্তু ভাইটামিন 'এ'তে পরিণত হয়। সুতরাং পূর্ব্বে উদ্ভিদ জগতের যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে ভাইটামিন 'এ' আছে বলিলাম, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, সেই সেই পদার্থে ক্যারোটিন প্রচুর পরিমাণে আছে। অবশ্য জীব-দেহেও যে ক্যারোটিন একেবারে থাকে না তাহা নয়। প্রাণীর লিভারে ভাইটামিন 'এ'র সঙ্গে সঙ্গে ক্যারোটিনও পাওয়া যায়। ক্যারোটিনও চর্ব্বিতে দ্রব হয়। মাখনের পীতাভ বর্ণ যে ক্যারোটিনের জন্যই হয় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ছাগ-দুগ্ধের মাখন পীতাভ নয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, উহাতে ভাইটামিন 'এ' নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ছাগ-দুগ্ধেও ভাইটামিন 'এ' আছে। এখন বুঝা যাইতেছে যে, ছাগের দুগ্ধ বা মাখনে ক্যারোটিন নাই পরন্তু ভাইটামিন 'এ' আছে। জীবগণ উদ্ভিদগণের নিকট হইতে এই ভাইটামিন পায়। উদ্ভিদ্‌গণ সূর্য্য-কিরণের সহায়তায় ক্যারোটিন তৈরী করে। জীবগণ স্বল্পায়াসে তাহা ভক্ষণ করিয়া উহার কতকটা ভাইটামিন 'এ' ও অবশিষ্ট অংশ ক্যারোটিন রূপে নিজেদের লিভারে সঞ্চয় করে ও প্রয়োজন মত শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহার করে। মানুষ কিন্তু সকলের উপর টেক্কা দিয়া পূর্ব্ব-প্রস্তুত ভাইটামিন 'এ'ই জীবদেহ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, মানুষ উদ্ভিদ্‌ জগৎ হইতে ভাইটামিন 'এ'র পূর্ব্বগামী ক্যারোটিনও কম পরিমাণে গ্রহণ করে না। এক সময়ে লোকের মনে সন্দেহঃ জন্মিয়াছিল যে, যদি ক্যারোটিনই ভাইটামিন 'এ'র জনক (precursor) হইবে, তবে কড্‌ প্রভৃতি গভীর জলের মাছ কিরূপে ক্যারোটিন পাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর এই—কড্‌ মৎস্য সমুদ্রের বালি খাইয়া নিশ্চয়ই বাঁচে না। অতি ক্ষুদ্র মৎস্য যাহা প্রায় সমুদ্রের উপরি ভাগে ভাসিয়া ভাসিয়া algæ, diatoms প্রভৃতি আণবিক উদ্ভিদ্‌ খায়, তাহারা নিশ্চয়ই ক্যারোটিন পায়। এই মৎস্যগুলিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মৎস্য গলাধঃকরণ করে এবং শেষোক্ত মৎস্য তদপেক্ষা বড় কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। এইরূপে অবশেষে কড্‌ যাহাকে খায় তাহার পেটে নিশ্চয়ই ভাইটামিন 'এ'র পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষকের কড়িতে তালুকদার, জমিদার, রাজা, মহারাজা যেমন ক্রমশঃ স্ফীতোদর হইতে থাকে, এও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার। ক্যারোটিনকে ভাইটামিন 'এ'তে পরিণত করিবার আর একটী 'কল' মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই হস্তগত করিয়াছে। সেটি হইতেছে আমাদের গোমাতা যিনি রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া মাঠের সামান্য তৃণ হইতে সতত ক্যারোটিন সংগ্রহ করিতেছেন এবং সেগুলিকে ভাইটামিন 'এ'তে পরিণত করিয়া দুগ্ধের সহিত আমাদিগকে সরবরাহ করিতেছেন। আজ বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গো-সেবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাইতেছেন—কোন্‌ ঘাসে কি পরিমাণে ক্যারোটিন ও অন্য খাদ্য আছে, কোন্‌ সার প্রয়োগে উহা কি পরিমাণে বাড়িতে পারে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা করিয়া গোজাতির দেহ পুষ্ট ও তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের দেশেও গরুকে সম্পদে বিপদে সঙ্গে রাখিবার বিধি শাস্ত্র দিয়াছিলেন। তাই গব্য না হইলে হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন অচল ছিল। আজ শাস্ত্রের বন্ধন শিথিল অথচ পাশ্চাত্যের দিব্য জ্ঞানও আমাদের নাই; তাই আজ গোমাতা অনাদৃত, নির্ব্বাসিত;—আর আমরা হতবীর্য্য, ভগ্নস্বাস্থ্য।

ক্যারোটিন হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (directly) ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হয় এবং শাক সব্জীতে ক্যারোটিন প্রচুর পরিমাণে আছে জানিয়া অনেকে বলিতে পারেন তাহা হইলে দুধ বা লিভার তৈলের কি প্রয়োজন? এ কথার উত্তরে বলিতে হয় যে, বিভিন্ন জীবের এমন কি একই জীবের

বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় বিভিন্ন পরিমাণ ক্যারোটিন ভাইটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত করিবার শক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং ভাইটামিন 'এ'র জন্য কেবলমাত্র শাক সব্জীর উপর নির্ভর করা সমীচীন নহে। আমাদের সাধারণ রান্নার তাপে ভাইটামিন 'এ' নষ্ট হইবার আশঙ্কা কম। এই ভাইটামিন বাতাসের অম্লজানের সংস্পর্শে অধিকক্ষণ ধরিয়া ক্রমাগত বেশী উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, মাখনকে ঘৃতে পরিণত করিলে তাহাতে ভাইটামিন 'এ' বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সম্প্রতি লাহোর হইতে গ্রেবাল (K. S. Grewal) জানাইয়াছেন যে, আমাদের দেশের জ্বাল দেওয়া দুধ দই করিয়া যে মাখন তোলা হয় সেই মাখনের ঘিতে Centrifuge করিয়া (কাঁচা) দুধ হইতে তোলা মাখনজাত ঘি অপেক্ষা কম ভাইটামিন থাকে; এবং ইনি ইহাও দেখিয়াছেন যে, বসন্ত কালের ঘিতে শীত কালের ঘি অপেক্ষা বেশী ভাইটামিন 'এ' থাকে। পক্ষান্তরে বিলাতী বেগুনের ভাইটামিন 'এ' ফুটন্ত জলের তাপে চারি ঘণ্টা ক্রমাগত উত্তাপ দিলে উহার শতকরা ১৮ অংশ মাত্র নষ্ট হয় বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জীব দেহের উপর ভাইটামিন 'এ'র কি ক্রিয়া তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। তবে ইহার অভাবে জেরোপথ্যালমিয়া (Xeropthalmia) নামে চোখের পীড়া, ফুসফুস, মূত্রকোষ (Kidney) প্রভৃতির পীড়া (যক্ষ্মা প্রভৃতি) অক্ষুধা, অজীর্ণ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। ভাইটামিন 'এ'র অভাবে যে চোখের পীড়া জন্মে বিগত মহাযুদ্ধের সময় হল্যাণ্ডের দরিদ্র কৃষক পল্লীতে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ক্রমাগত বহু দিন ধরিয়া মাখন তোলা দুধ খাওয়ানর ফলে ইহাদের চোখের পীড়া জন্মে। এমন কি, অনেক হতভাগ্য শিশু অন্ধ হইয়া যায়। পরে এই সব ক্ষেত্রে খাঁটী দুধ ও কড্‌লিভার তৈল খাইতে দেওয়ায় চোখের পীড়া সারিয়া যায়। ভাইটামিন 'এ'র অভাবে স্ত্রীলোকের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি লোপ পায় (due to failure in ovulation) এবং মানুষের শরীরের ব্যাধি প্রতিষেধক শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভাইটামিন 'এ'র অভাব হইলে প্রথমতঃ রাতকাণা লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমাদের পল্লীগ্রামে মাছের বা পাঁটার 'মেটে' খাইলে ইহা সারিয়া যায় বলিয়া জানা আছে।

মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ কতটা ভাইটামিন 'এ' প্রতি দিন আবশ্যক এ সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। সম্প্রতি আমেরিকার মিড্ জনসন্ কোম্পানী ভাইটামিন 'এ'র মাত্রা নির্দ্ধারণ ও অন্য কতকগুলি আবশ্যক তথ্য নিরূপণের জন্য ১৫০০০ ও ৫০০০ ডলারের দুইটী পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। সেদিন কেম্ব্রিজের একজন রাসায়নিক ইন্দুরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, অত্যধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ভাইটামিন 'এ'র প্রয়োগে ইন্দুরের লোম উঠিয়া যায় ও অন্যান্য কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া উহারা শীঘ্রই মরিয়া যায়। বলা বাহুল্য আমাদের সাধারণ খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' অত্যধিক হইবার আশঙ্কা কোনও কালেই নাই।

ভাইটামিন বি, (B_1)

ভাইটামিনের গোড়ার কথা বলিতে গিয়া বেরিবেরি প্রসঙ্গে শ্রীযুত টাকাকী, —আইকম্যান ও ফুঙ্কের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ফুঙ্ক (Funk) সর্ব্বপ্রথমে চাউলের কুঁড়ো (rice polishing) হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেরিবেরি নাশক ঘনীভূত পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভাইটামিন নাম দেন ইহাও বলা হইয়াছে। (Mc. Collum) ম্যাক কলম ও ডেভিস্ তাঁহাদের বিশুদ্ধ রাসায়নিক খাদ্যে চর্ব্বিতে-দ্রবনীয় ভাইটামিন যোগ করিয়া দেখিলেন তাহাতে প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না; পরন্তু তাহার সহিত দুগ্ধ বা yeast হইতে প্রাপ্ত জলে দ্রবনীয় একটী পদার্থ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া দিলেই পরীক্ষাগারের প্রাণীগণ স্বাভাবিক ভাবে বাড়িতে থাকে। এই পদার্থটীকে তাঁহারা জলে দ্রবনীয় ভাইটামিন 'বি' নাম দিলেন এবং ইহাকে ফুঙ্ক (Funk) আবিষ্কৃত পদার্থের সহিত অভিন্ন মনে করিলেন। ইতোমধ্যে গম ও ভুট্টার অঙ্কুরে এবং সুরাবীজে (yeast) এই ভাইটামিন আছে বলিয়া জানা গেল। এত দিন পর্য্যন্ত জলে দ্রবনীয় ভাইটামিন 'বি' একটীমাত্র পদার্থ বলিয়া লোকের ধারণা ছিল; কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্য হইতে বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্ত জলে দ্রবনীয় পদার্থটীর গুণের পার্থক্য দেখিয়া বাস্তবিক পক্ষে উহা একটী সামগ্রী কি না সে বিষয়ে লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। ভুট্টার অঙ্কুরের নির্য্যাস, পাখীর ও ইন্দুরের স্নায়বিক রোগ অথবা মানুষের বেরিবেরি রোগে

ফলপ্রদ হইলেও উহা পরীক্ষাগারের ইন্দুরের বৃদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী প্রমাণিত হইল। পক্ষান্তরে অটোক্লেভে (autoclave) (বেশী চাপে ষ্টীমে উত্তাপ দেওয়া) উত্তপ্ত সুরাবীজ (yeast) খাইতে দিয়াও প্রাণীদের বৃদ্ধি লক্ষিত হইল না—অথচ ভুট্টা নির্য্যাস ও autoclaveএ উত্তপ্ত yeast যখন একত্র (দুইটাই খুব অল্প পরিমাণে) দেওয়া হইল, তখন প্রাণীগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। সুতরাং বুঝা গেল প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বেরিবেরি নিবারক জলে-দ্রবনীয় ভাইটামিন ব্যতীত আরও একটী জলে-দ্রবনীয় ভাইটামিন আবশ্যক। ভুট্টা, চাউলের কুঁড়া প্রভৃতিতে প্রাপ্ত পাখীর স্নায়বিক রোগ, বা মানুষের বেরিবেরি প্রতিষেধক পদার্থ টা ভাইটামিন বি$_1$ (B_1) এবং অটোক্লেভের উত্তাপেও যেটি নষ্ট হয় না তাহা বি$_2$ (B_2) নামে পরিচিত হইল এবং ইহা বুঝা গেল যে yeast বা সুরাবীজে বি$_1$ (B_1) এবং বি$_2$ (B_2) দুইটাই একসঙ্গে থাকে। বি$_1$ (B_1) উত্তাপে সহজেই নষ্ট হয় কিন্তু বি$_2$ (B_2) উত্তাপে সহজে নষ্ট হয় না।

যব ও ভুট্টা চাউল ও গমের অঙ্কুরে বা গোটা বীজে (whole wheat ইত্যাদিতে) এবং yeastএর মধ্যে ভাইটামিন বি$_1$ (B_1) সাধারণতঃ বেশী থাকে। টাটকা শাকসব্জীতে, বাঁধা কপি, লেটুস, গোল আলু ও তাহার খোসাতে, পেঁয়াজে, চাউলের উপরের পর্দ্দাটিতে, প্রাণীর মগজ, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, মূত্রকোষ (kidney) ও ডিমের পীতাংশে মাছের ডিমে এই ভাইটামিন আগে যে দ্রব্যগুলির নাম করা হইয়াছে তাহার চেয়ে কম দেখা যায়। দুধে ভাইটামিন B_1 নাই বলিলেই চলে। Yeast প্রভৃতি ভাইটামিন বি (B) প্রধান খাদ্য খাইতে দিয়াও এই ভাইটামিন দুধে বেশী হইতে দেখা যায় নাই। ভাইটামিন B_1 বেরিবেরি রোগের একমাত্র মহৌষধ ও প্রতিষেধক ইহা যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে তখন আমাদের প্রচলিত খাদ্যের কোন্‌টিতে ইহা কি পরিমাণে আছে তাহা সকলেরই জানা উচিত। গমের অঙ্কুরে যে পরিমাণে ভাইটামিন B_1 থাকে তাহাকে ১০০ ধরিলে সেই অনুপাতে অন্য কোন্ পদার্থে উহা কত আছে তাহা নিম্নে দেখান গেল।

গমের অঙ্কুর	১০০
(Wheat bran) গমের ভূষি (বীজের খোসা) …	২৫
চাউলের অঙ্কুর …	২০০
(Pressed yeast) (সুরাবীজ পিষ্ট) …	৬০
শুষ্ক মটর শুঁটি …	৪০
মসুরি (lentils) …	৮০
ডিমের কুসুম …	৫০
গোমাংস …	১১
গোলআলু …	৪৩

আমাদের দেশে চাউলই যখন প্রধান খাদ্য তখন কলছাটা চাউল না খাইয়া যথাসম্ভব ঢেঁকিছাটা চাউল খাইতে চেষ্টা করা, অন্ততঃ একবেলা ভাতের বদলে রুটি খাইবার ব্যবস্থা করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিম প্রভৃতি খাইবার অভ্যাস করা আবশ্যক। অনেকে হয় তো বলিতে পারেন কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে এত ঢেঁকিছাটা চাউল পাওয়া সম্ভব হইবে কি? এ কথার মধ্যে সত্য আছে মানি, কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, এমন কল উদ্ভাবন করা বা বর্ত্তমান কলগুলিকেই এরূপভাবে চালিত করা যাইতে পারে যাহাতে চাউলের বেরিবেরি নাশক পদার্থ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষিত হয়। কল মানুষের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—মানুষ কলের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আজ আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট চাউলের কুঁড়ার উপকারিতার কথা নূতন করিয়া জানিলেও আমরা এখনও 'বিদুরের ক্ষুদের' কথা ভুলি নাই—ক্ষুদ যে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী নয় তাহা পুরাণেও দেখিতে পাই। তদ্ভিন্ন দুয়োরাণীর ছেলেকে "ক্ষুদের জাউ" ও ভাতের ফেন খাইতে দেওয়াতে সে আদুরে রাজপুত্রের চেয়ে শতগুণ বলশালী হইয়াছিল এ কথা পল্লীবৃদ্ধাদের মুখে এখনও শুনা যায়। যদি অগত্যা কল ছাটা মাজা চাউল খাইতেই হয় তবে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দান—ঘনীভূত বি$_1$ (B_1) সংক্রান্ত কোনও কৃত্রিম খাদ্য মাঝে মাঝে খাইয়া শরীর সুস্থ রাখা ও বেরিবেরির আক্রমণ প্রতিরোধ করা প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই অবশ্য করণীয়। তার পর রান্নার সময় চাউলের স্বল্পাবশিষ্ট জলে-দ্রবনীয় ভাইটামিনও যাহাতে ফেনের সহিত নর্দ্দামায় নিক্ষিপ্ত না হয় সে বিষয়ে গৃহলক্ষ্মীদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। ভাইটামিন B_1 বেরিবেরি ও 'এপিডেমিক ড্রপসি' রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ এবং রোগের আক্রমণ প্রতিরোধেও ইহার ক্ষমতা অদ্বিতীয়। তদ্ব্যতীত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও স্নিগ্ধ রাখিতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিতে ইহা নিতান্ত

প্রয়োজনীয়। ভাইটামিন বি,-এর অভাবে শরীরের বৃদ্ধিও স্থগিত হয়। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, খাদ্যের কার্বো-হাইড্রেট (শ্বেতসার ও শর্করা) পরিপাকে ভাইটামিন B_1 বিশেষ সহায়তা করে। আমিষভোজী প্রাণী অপেক্ষা শস্য-ভোজী প্রাণীর পক্ষে এই ভাইটামিন বেশী আবশ্যক। বহুমূত্র রোগে ভাইটামিন B_1 অতিশয় উপকারী বলিয়া অনেকের ধারণা। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন।

ভাইটামিন বি, সামান্য ক্ষার সংযোগে (উত্তাপ না দিলেও) কয়েক দিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। ক্ষার না থাকিলেও অধিকক্ষণ উত্তাপে উহা নষ্ট হইয়া যায়। সোডা বা অন্য ক্ষার-পদার্থ না থাকিলে বরং একটু অম্লভাব থাকিলে উহা আমাদের রান্নার তাপে বিশেষ নষ্ট হয় না।

শ্রীযুক্ত বীরেশচন্দ্র গুহ ও প্রফেসর ড্রামণ্ড (Drummond) প্রথমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গমের অঙ্কুর হইতে ঘনীভূত ভাইটামিন B_1 প্রস্তুত করেন। অল্প দিন হইল ইংলণ্ডে পিটারস্ ও জার্ম্মানীতে ভিণ্ডাউস (Windaus) অতিশয় ঘনীভূত B_1 দানাদার (Crystalline) অবস্থায় পাইয়াছেন। ইঁহারা এক মণ সুরাবীজ হইতে মাত্র ১০ মিলিগ্রাম এই প্রকারের বিশুদ্ধ ভাইটামিন বি, প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের প্রতি দিন ১ মিলিগ্রাম এই প্রকারের বিশুদ্ধ ভাইটামিন হইলেই চলিতে পারে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদায়-লগন্

শ্রীশান্তিপ্রকাশ মিত্র

তখনো আধেক-রাঙ্গা আকাশের ভালে,
সন্ধ্যা তারা জ্বলে ;
দলে দলে ক্লান্ত পক্ষ-ঘায়,
পাখী নীড়ে যায় ;
শান্ত সন্ধ্যা ঘনাইছে মিলনের উৎফুল্ল আশায় ;—
ধরণী মোহিত হেরি নিশীথের বাসক-সজ্জায়।

শিহরি কেতকী ধীরে সমীরে মাতায়—
সুরভী নেশায় ;
শ্লথ-তনু অজানা শঙ্কায়,
মিলন আশায়
ব্যাকুল বকুল ফুল্ল,—মধু-গন্ধে বিমুগ্ধ কানন ;
মধুপানে প্রমত্ত ভ্রমর হেরে প্রণয়-স্বপন।

সন্ধ্যারাগে গেয়েছিল মাধবী-মালতী
ব্যথিতের গীতি ;—
বিরহের পরুষ পরশে,
আকুল আবেশে—
কেঁদেছিলা মুগ্ধা বালা লুকাইয়া চঞ্চল অঞ্চলে ;
আঁধার স্বপন-ছায়া পড়েছিল কুঞ্চিত কুন্তলে।

সে শান্ত সন্ধ্যায় এল বিদায়ের ক্ষণ—
নিষ্ঠুর লগন্ !
সম্মুখে আনত-নেত্র বালা—
কম্পিতা বিহ্বলা !
আলোড়িত হ'ল প্রাণ, চাপিলাম রক্তাক্ত হৃদয় ;
ভাঙ্গিল আশার স্বপ্ন—অতীতের অমূল্য সঞ্চয়।

প্রণামান্তে দাঁড়াইল আমা'-পানে চাহি,—
মুখে বাক্য নাহি ;
নিখিলের স্বপন-মাধুরী—
ছিল নেত্র ভরি ;
রোধিলাম সঙ্গোপনে অন্তরের অসহ বেদনা ;
দমিয়া হৃদয় ভগ্ন, করিলাম কল্যাণ কামনা।

মৃদুল মলয় আনে অতীত আভাস—
সুধু দীর্ঘশ্বাস্ !
বক্ষ-ভাঙ্গা সে-দৃশ্য করুণ—
বেদনা দারুণ !
বাসন্তী বিদায় নিল, হাহাকার করে বনস্পতি ;
ব্যথায় শোণিত-সিক্ত সন্ধ্যাকাশ ধরে তপ্ত স্মৃতি !



পরিবর্ত্তন

শ্রীআশালতা দেবী

(২২)

এ-ঘরে পা দিবামাত্রই চৌকির উপর মৃদু মৃদু দুলিতে দুলিতে অনিল কহিল, "আর্টে সাহসিকতার মাত্রা নিয়ে এতক্ষণ আমাদের লড়াই চলছিল ; কিন্তু—' শিশিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, "তিনি বলতেই হবে একটু পিউরিটান,—আমাদের আলোচনার মাঝখানেই পালিয়ে গেলেন। কেন গেলেন বলুন তো ?"

তাহার এমন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের কোন জবাবই শিশির দিলনা।

"দেখুন, আমার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ চলুন আজ নিউ এম্পায়ারে যাবেন। সেখানে আজ যে ছবিটা আছে সেটা কাল আমি দেখেচি। প্রেমের গল্প। কিন্তু প্রেমলীলার কোন অংশই বাদ যায় নাই। সূক্ষ্ম থেকে আরম্ভ করে স্থূল অবধি সমস্ত পর্দ্দাগুলোরই গতিবিধি দেখান হয়েচে। এই কথাটাই আমি বলতে চাইছিলুম।"

শিশির কহিল, "থাক, আজ আর আমি সিনেমা যাবনা। আমার শরীর ভারি খারাপ রয়েচে।"

সুবোধ তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন যাবেনা ? শরীরের চেয়ে তোমার মন বেশি খারাপ। আর বাড়ীতে চুপ করে ব'সে থাকলে নিশ্চয় মনও তোমার উত্তরোত্তর ভালো হয়ে উঠ্‌বেনা।"

"তুমি যাবে ?" শিশির অভিমানভরা দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল।

"আমি ! বাঃ, এই যে তোমাকে বললুম সাতটার সময় এঞ্জিনিয়ার মিঃ মুখার্জ্জির আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার কথা। তিনি কাজের মানুষ, একদিন ফিরে গেলেও তাঁর ঢের ক্ষতি হবে।"

"তাহ'লে আমিও যাবনা।"

প্রদ্যোৎ ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিল, "স্বামী না গেলে আপনি যাবেননা। অতটা বাড়াবাড়ি করবেননা। এ যুগে ও অচল।"

মাধবী কহিল, "যুগ যেমনই হোক, মানুষের মন চিরদিনই সমান। তর্কের খাতিরে এ কথাটা আপনারা ভুলে যান কী করে ? কিন্তু শিশির তুই যেতে পারিস, সঙ্গে আমিও যাব।"

"নিশ্চয়। যাবে বই কি। সারা সন্ধ্যে একাটি বসে ও করবে কি ? আমি তো মিঃ মুখার্জ্জি দেখা করতে এলে তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকব।" সুবোধ মাধবীর দিকে চাহিয়া কহিল।

* * * *

বায়োস্কোপ শেষে মাধবীকে তাহাদের বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া অনিল কহিল, "চলুন আপনাকেও রেখে আসিগে। আপনাদের বাড়ী থেকে আমার বাড়ী সামান্য দূরে। ওইটুকু পথ না হয় হেঁটেই যাব।"

সারাপথ শিশির একটিও কথা কহে নাই, এখনও কিছু বলিলনা।

গ্যাসের নরম আলোয় পীচ্‌ঢালা রাস্তায় নিঃশব্দে মোটর ছুটিয়া চলিল।

অনিল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে এইমাত্র দেখা অভিনয়ের প্রসঙ্গ তুলিল।

শিশির সংক্ষেপে কহিল, "হ্যাঁ, মোটের উপর বেশ হয়েচে। প্রধান নায়িকা যিনি, তিনি দেখতে চমৎকার সুন্দরী"।

"তিনি কি আপনার চেয়েও সুন্দরী ?"

সেই তারাভরা আকাশের তলায় নিঃশব্দে শিশির একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদূরে উপবিষ্ট ওই লোকটার পানে চাহিল।

সেই একটি নিমিষেই তাহার কাছে ধরা পড়িল তাহাদের সভ্যসমাজের অনেক আর্টের আলোচনা, অনেক সাহিত্যের সমালোচনা, অনেক উচ্চ চিন্তাধারা বিনিময়ের তলায় গোপনে কিসের ইঙ্গিত প্রবাহিত হইতেছে।

বাড়ীর সামনে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। নিজেই হাত বাড়াইয়া দরজাটা খুলিয়া লইয়া কোন প্রকার সম্ভাষণ মাত্র না করিয়াই শিশির নিঃশব্দে অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল।

(২৩)

তখন রাত্রি বোধ করি দশটা হইবে। শয়নগৃহে আসিয়া দেখিল সুবোধ বাতির নীচে বসিয়া বই পড়িতেছে। অধরে মৃদু হাস্যের রেখা। সে অত্যন্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আসিয়াছিল বলিয়া সুবোধ জানিতে পারে নাই। এখন শিশির অত্যন্ত কাছে যাইয়া দাঁড়াইতেই বইটা ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিল।

"একলা ব'সে বই পড়ছিলে ? তবু আমাকে জোর করে পাঠালে ?"

"তুমি না গেলে ওরা ক্ষুণ্ণ হোত।"

"কারা ?"

"আমার বন্ধুরা।"

"তোমার বন্ধুদের কি এত দাম আছে যে তাঁদের উপরোধ রাখতে তুমি এমন করবে ?"

"তবে আসল কথাটা খুলে ব'লি। আমি যদি নিজেকে দিয়ে সর্ব্বদা তোমাকে ঘিরে রাখি তা'হলে তোমার আমার মধ্যেকার সম্বন্ধ কখনো সত্য হবেনা। অনেকের মাঝে রেখে, অনেকের সঙ্গে তুলনা করে তবেই তো আমাকে তুমি যথার্থ বুঝতে পারবে।"

"তাই পারচি।"

সুবোধ হাতের বইটা রাখিয়া একটু চঞ্চল হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কহিল, "কথাটার মানে ?"

"ভয় নেই গো, কথাটার মানে এই যে তোমার সঙ্গে পৃথিবীতে আর কারও তুলনা চলতে পারে এমন কথা আমি ভাবতেও পারিনে।"

"তোমাদের ঐ মস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধেই আমার লড়াই।"

"যত খুসী লড়াই কর। কিন্তু ঝি বললে, এখনও তুমি খাওনি। এ কথা কি সত্যি ?"

সুবোধ অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "তুমি আসবে বলে একটুখানি ব'সেছিলাম। এইবারে চ'লো।"

"তা'হলে আর একটিও কথা নয়। এস।"

খাওয়া দাওয়ার পরে ছাদে পাটি পাতিয়া সুবোধ ব'সিল। তখন মেঘ কাটিয়া গিয়া একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের অন্তরাল হইতে কৃষ্ণ-পক্ষের বিশীর্ণ চন্দ্র সবেমাত্র উঠিতেছিল।

শিশির কহিল, "তখন তোমার খাওয়া দাওয়ার দেরী হয়ে যাবে ব'লে তোমার কথার উত্তর দিলুমনা। কিন্তু এখন একটা কথা বলব রাগ কোরোনা। যতই ভাল হোক পুরুষমানুষের একটু জোর থাকা চাই। তোমার যেন তা-ই নেই। কেন তুমি আমাকে জোর করে তোমার কাছে ধরে রাখনা ?··· কেন ছেড়ে দাও ? কেন আমার বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, ভালো মন্দ যা কিছু সমস্তই তোমার পানে আকর্ষণ ক'রে নাওনা ? ইচ্ছে করলে তো জোর করেও নিতে পারো। আমি একটি কথাও কইবনা।"

সুবোধ মৃদু স্বরে কহিল, "কিন্তু ওই জোরের উপরেই আমার পৃথিবীর বিতৃষ্ণা। তোমার কাছে নিজে থেকে যতটুকু পাব, সেই আমার যথেষ্ট। তাতে কোন বস্তু পাওয়ার জন্যে যদি বহুদিন প্রতীক্ষা করে থাক্‌তে হয় সে'ও ভালো। তুমি যখন নূরপুরে থাকতে পারলেনা,—তখন, সত্যি কথা স্বীকার করবো, আমার মনে খুব আঘাত লেগেছিল। তোমাকে আমি যতটুকু জেনেছিলুম তা'তে এ জ্ঞান আমার হ'য়েছিল যে, অল্পশিক্ষিতা লঘুচিত্ত বিলাসিনী মেয়েদের মত পাড়াগাঁয়ে থাকা তোমার ধাতে সইলোনা, এমন কখনই হতে পারেনা। কিন্তু তবু সেই সব বঞ্চিত, মূঢ়, দুঃখী নর-নারীর সুখ-দুঃখের ধারা যখন তোমাকে স্পর্শমাত্র করলেনা, বরঞ্চ তোমার মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করলো, তখন আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও আমি তোমাকে এতটুকু জোর করতে পারলুমনা।"

"কেন পারলেনা? তুমি যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয় সব দিক দিয়ে আমার চেয়ে এত বড়, তখন জোর করাই তোমার উচিত ছিল। অবাধ্য ছেলে-মেয়েকে মা যখন জোর করে শাসন করেন তখন, তাঁর জোরটাই কি শুধু দেখতে পাও? আর সেই জোরের মধ্যে যত স্নেহ থাকে সেটা কি তুচ্ছ ক'রবার জিনিষ?"

"কি জানি শিশির, তোমার মত করে হয় তো আমি ভাবতে পারিনে। কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র সেই কবিতাটা মনে পড়চে, সেই যে সেদিন যেটা তোমায় পড়ে শোনাচ্ছিলাম—

'বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্,
এ কি দুঃসাহস!
কি আছে বা তোর,
কি পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা
এ নিবিড় আলো অন্ধকার
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রিদিন
একা অসহায়?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধা-তৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়-ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে?'

ছায়াঙ্কিত পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নার তলে, নির্জ্জন ছাদে সুবোধের সুমিষ্ট এবং সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে শিশিরের দুই চোখে কি জানি কেন জল পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল সত্যই সে যেন তাহার স্বামীর চেয়ে অনেক ছোট। এমন করিয়া ভালোবাসিতেও সে পারেনা। নিজেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া দিয়া ভালোবাসার জন্য এমন ত্যাগ করিতেও সে শেখে নাই।

(২৪)

শিশিরের মনের মধ্যে যে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন কাজ করিতেছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহার একটা বড় রকম কারণও ছিল। কিছু দিন হইতে ভিতরে ভিতরে দেহে মনে সে অত্যন্ত একটা ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল। অল্প দিন পরেই বুঝিতে পারিল তাহার সন্তান সম্ভাবনা হইয়াছে। আসন্ন মাতৃত্বের প্রতীক্ষা তাহার জীবনটাকে অনেক দিক হইতে যেন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া গেল।

কবির শ্রেষ্ঠ কল্পনা কোন একটা সৃষ্টির মধ্যে যখন ছাড়া পায় তখন তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি সার্থকতার আনন্দে যেমন বিভোর হইয়া থাকে, শিশিরের অন্তপ্র্কৃতিরও যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, যাহা কিছু এত দিন সঙ্গোপনে ছিল, তাহা যেন ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

নিজের রুচি নিজের শিক্ষা সভ্যতা লইয়া যে এত দিন নিজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহারই চিত্তে করুণার উৎস বাধানির্ম্মুক্ত হইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতেই সে জীবনটাকে খুব গভীর ভাবে দেখিতে সুরু করিল। ক্রমশঃ কেহ তাহাকে বুঝাইয়া না দিলেও সে বুঝিতে আরম্ভ করিল নূরপুরে দু'দিন থাকিয়াই সেই যে সে পলাইয়া আসিয়াছিল তাহার মধ্যে মানব আত্মার প্রতি কী সুগভীর অপমান লুকাইয়া ছিল। যাহারা আজ জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, শিক্ষায়, মনুষ্যত্বে সর্ব্বদিকে এত হীন, এত বঞ্চিত, তাহাদের প্রতি প্রীতির বদলে এমন বিতৃষ্ণা সে যে কেমন করিয়া দেখাইয়াছিল, সেই কথাটাই এখন ভাবিতে ব'সিলে তাহার বিস্ময়ের আর অন্ত থাকেনা।

কিন্তু দিন দিন শরীর তাহার অত্যন্ত অবসন্ন এবং দুর্ব্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

সুবোধ ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার দেখাইতে লাগিল, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া শিশিরের কাছে সর্ব্বদা থাকিতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নের উদ্ভাসিত আলোতে শিশির বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, সুবোধ তাহার মাথার কাছের একটা চৌকিতে বসিয়া ছিল।

শিশির হঠাৎ কহিল, "দেখ, একদিন তোমার জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে আমার মিল হয় নাই। সেদিন তুমি আঘাত পেয়েছিলে, কিন্তু কিছু ব'লোনি। চুপ করে অপেক্ষা করে ছিলে। কিন্তু তোমার বেদনার পরিমাণ কল্পনা করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য নয়। কারণ আমি তো জানি যে, তোমার কাছে আমিও যেমন সত্য, তোমার চিরজীবনের আদর্শও তেমনি সত্য। কত ব্যথা কত স্নেহ দিয়ে তিল তিল করে একে গড়ে তুলেচ। কিন্তু আর সে বিরোধ ঘটবেনা, আমার কাছে আর কোন দিন কোন দুঃখ তোমাকে পেতে হবেনা। আমার খুব মনে হচ্চে, এবার যেন সব দিক দিয়ে আমি তোমার সঙ্গে মিলতে পারব।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল, এমন অনির্ব্বচনীয় করুণতা প্রকাশ পাইল যে, সুবোধের সমস্ত চিত্ত মথিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শিশিরের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমার শরীর এখন দুর্ব্বল, এখন ওসব কথা থাক শিশির। তুমি ভালো হয়ে উঠলে ধীরে সুস্থে ওসব আলোচনা হতে পারবে।"

কিন্তু স্বামীর হাতের মধ্যে হাতখানা ধরাই রহিল, শিশির পুনশ্চ কহিল, "এ তো ধীরে সুস্থে হয়না। আমি বরাবর লক্ষ্য করে দেখেছি জীবনে যখন একটা বড় সত্যের উপলব্ধি হয়, তখন হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যায়। হঠাৎ যেমন আকাশ থেকে উল্কা ছুটে চলে যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে কহিল, "দেখ, একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করলুম, মেয়েমানুষে যতক্ষণ না মা হয় ততক্ষণ তার প্রকৃতির বিকাশ কিছুতেই হয়না। সে যে কি, আর কি নয়,—এ কথা মা হবার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খুব নিশ্চিত করে সে উপলব্ধি করতে পারেনা। এই সৃষ্টির বেদনাই তার নিজের কাছে নিজেকে চিনিয়ে দেয়।"

সুবোধ এইবারে একটুখানি তামাসা করিয়া কহিল, "সে কথা তোমরাই ভালো জান। আমি কি করে জানব বল? কিন্তু শিশির, তোমার শরীর যেমন খারাপ হয়ে যাচ্চে, আমি ঠিক করেচি ও-মাসে তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসব। লক্ষ্মীটি অমত কোরোনা, আমাকে যখনই বলবে আমি যাব।"

"আর তুমি কোথায় থাকবে?" শিশির মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল।

"তুমি কোথায় থাকতে ব'লো?"

"আমি বলছি, অনর্থক ক'লকাতায় না থেকে যারা তোমায় ভালোবাসে, তুমি যাদের ভালোবাস, তোমাকে যাদের একান্ত প্রয়োজন, তুমি সেইখানে নূরপুরেই যাওনা।"

"আমি জানতুম তুমি নিজের থেকে একদিন আমাকে তা-ই বলবে।"

"মুখে না বলি, মনে মনে যে এ কথা অনেক দিন থেকেই বলছিলুম তা কি বুঝতে পারোনি?"

"পেরেছিলুম বই কি, তোমার কোন কথা কি আমার কাছে লুকোন থাকে!"

(২৫)

শিশিরের প্রথম সন্তান পুত্রসন্তান হইল। স্বামীর মনের সঙ্গে তার যেটুকু ব্যবধান ছিল সুপ্ত ছেলের মুখের প্রতি অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সেটুকুও ঘুচিয়া গেল। ফুলের কুঁড়ির মত তাহার ওষ্ঠাধর এবং ঠিক সুবোধের মত তাহার প্রশস্ত ললাটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে মনে মনে কামনা করিতে লাগিল, খোকা যেন বড় হইয়া তাহার বাবার মত গভীরচিত্ত, তাঁহার বাবার মত অমনই উদার, অমনই পরদুঃখকাতর হয়।

এই একটি ক্ষুদ্র মানব-সন্তান তাহার কোলে আসিয়া তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিরুদ্ধ করুণার উৎসকে এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিল।

নূরপুরে সে যে পাঁচ ছয় মাস ছিল, তাহারই কতইনা স্মৃতি, কত ঘটনাবলী মনে আসিতে লাগিল। সেই যে তাহাদের গোমস্তা দেবেন্দ্র দত্তের ছেলেগুলা সকালবেলায় কাঙালের মত আসিয়া দাঁড়াইত। ন'খুড়ি যদি কোন দিন মেজাজ মত তাহাদের হাতে একটা নাড়ু বা একমুঠো খইমুড়ি জলপান দিতেন, তাহারা যেন একেবারে বর্ত্তাইয়া

যাইত। কী সব চেহারা! দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ায় নিয়মিত ভুগিয়া হাত-পাগুলা সরু সরু কাঠির মত দাঁড়াইয়াছে, এবং তাহারই অনুপাতে যকৃৎ ও প্লীহায় পরিপূর্ণ উদর অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোটরগত চোখ হলুদরঙের, দৃষ্টিতে সর্ব্বদাই একটা ম্লান, করুণ কুণ্ঠিত ভাব। হাতে একগাছি দুইগাছি করিয়া তামার মাদুলি তাবিজ বাঁধা। এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির জীবনে আছে কি? না আছে কোন আনন্দ, কোন প্রত্যাশা, কোন সুখ। অথচ তাহাদের তো কোন দোষ নাই। তাহারই কোলের উপর শায়িত সুন্দর সুকুমারকান্তি শিশুটির মত তাহারাও তো একদিন শুভ্র অমলিন মনখানি লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে পৃথিবীতে কেহ তাহাদের সাদরে বরিয়া লইলনা। সে পৃথিবী নিষ্ঠুর, নির্ম্মম। রোগে, অজ্ঞানতায়, দারিদ্র্যে সে পৃথিবী তামসময়।

"আহা বাছারা, বিনা দোষে তোরা কত কষ্টই না পাস!" মনে মনে বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত মনখানি ব্যথায় ভরিয়া উঠিল।

বস্তুতঃ তাহার শ্বশুরবাটীর গ্রামে পাঁচ ছয় মাস থাকিবার সময় এইটে সে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল—এখানকার শিশুদের জীবনের গভীর অন্ধকার। কিন্তু তখন যে সকল বস্তু লক্ষ্য করিয়া তাহার মনে কেবল বিতৃষ্ণাই জাগিয়াছিল, এখন আবার সেই সব ঘটনাই যখন একটি একটি করিয়া মনে পড়িতে লাগিল, তখন সমস্ত বিরাগ অন্তর্হিত হইয়া সেখানে জাগিয়া উঠিল একটা বিরাট স্নেহ।

সেখানে থাকিবার সময় তাহার শয়ন-গৃহের জানালা দিয়া সামনের আত্মীয় প্রতিবেশীর ঘরের অনেক ঘটনা সে একমনে পর্য্যবেক্ষণ করিত।

দেখিয়াছিল, শুধু কি দারিদ্র্যের জন্য সেখানকার ছেলেমেয়েরা কষ্ট পায়? তাহার চেয়ে ঢের বেশি পায় মায়েদের পর্ব্বত প্রমাণ অজ্ঞান এবং কুসংস্কারের জন্য।

সেই প্রতিবেশী আত্মীয়টির অবস্থা বেশ ভালোই। কিন্তু সে বাড়ীর বধূর তিন চারিটি সন্তান বছরের মধ্যে দশ মাসই রোগে ভোগে।

একদিন সে বলিয়াছিল, "দিদি, বছরের মধ্যে তিনটে চারটে মাস একটু নিয়ম ক'রে থাকলেই তো ছেলেগুলো ম্যালেরিয়ায় এত কষ্ট পায়না! এই যে জ্বরের উপরই খেতে দিচ্ছেন, পেটে সয়না তবু ঘন দুধ, সন্দেশ লুচি অবিশ্রান্ত কিছুই খাওয়ানোর বিরাম নেই। এগুলো কি ভালো হচ্ছে?"

তাহাতে প্রতিবেশী বধূটি উত্তর করিয়াছিল, "মা হয়ে ছেলেকে জেনে শুনে দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে কি করে খেতে দিই বল ভাই? আর যা ব'ল তা বল, ওইটি পারিনে।"

শিশিরের ইচ্ছা হইয়াছিল একবার বলে যে, রোগা ছেলেটাকে সহ্য না হইলেও ঘন দুধ খাওয়াইতে হইবে, তাহারই দুর্ব্বল পাকযন্ত্রটার প্রতি একটুখানি মমতা রাখিয়া সামান্য জল মিশাইয়া দুগ্ধটাকে কিঞ্চিৎ লঘুপাচ্য করিবার চেষ্টাটা জননীর পক্ষে এমনই কি মহাপাতক? কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও সে প্রশ্ন সে করে নাই।

আর করিবারই বা আছে কি? ওইটুকু সময়ের মধ্যেই যে অনেক দৃশ্য তাহার চোখে পড়িয়াছিল। সে যখন সেখানে ছিল তখন জন্মাষ্টমীর সময়ে জমিদার-বাড়ীতে নানা উৎসব যাত্রা কথকতার সঙ্গে আজকালকার আমদানী কোন একটা বায়োস্কোপের কোম্পানী খোলা মাঠে তাঁবু ফেলিয়া কয়েক দিন ধরিয়া বায়োস্কোপ দেখাইয়াছিল। ঘোষপাড়ার হরিদের বৌয়ের ছোট ছেলেটি কত দিন হইতে লিভারের ঘুসঘুসে জ্বর ও হুপিং কাসিতে ভুগিতেছিল। ভুগিয়া ভুগিয়া সেই এক বছরের ছেলেটার চেহারা হইয়াছিল এমনই কঙ্কালসার যে, ভয় হইত যে-কোন মুহূর্ত্তে বুঝি বা তাহার প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবে। হরির বৌ যেদিন জমিদারবাড়ীর নূতন বৌ দেখিতে সেই ছেলেটাকে বগলে চাপিয়া আসিয়াছিল, সেদিন তাহাকে দেখিয়া শিশির চমকাইয়া উঠিয়াছিল।

বায়োস্কোপের তাঁবুতে সঙ্কীর্ণ মেয়েদের জায়গায় অত্যন্ত জনতার মাঝে আবার সেই অত্যন্ত পীড়িত ছেলেটাকে কোলে করিয়া তাহারই পাশে তাহার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এমন মরণাপন্ন ছেলেকে লইয়াও যে কোন মা আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে পারে, এ ঘটনা তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে। তার পরে লোকের ঠেলাঠেলি ঠেলাঠেলির মাঝে রুদ্ধশ্বাস হইয়া ছেলেটা এমন কাসিতে সুরু করিল যে, সবারই মনে হইতে লাগিল এমনি করিয়া

কাসিতে কাসিতেই বুঝি কোন্ ফাঁকে তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রবীণাদের মধ্যে সহানুভূতিসূচক স্বরে কেহ কেহ বলিলেন, "আহা, এমন করে কষ্ট দিতে ছেলেটাকে কি সঙ্গে করে আনতে হয় বৌ?"

হরির বৌ প্রত্যুত্তরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কোথাও তো যাইনে, কোথাও যাবার জো নেই এই মুখপোড়া ছেলেটার জ্বালায়। কিন্তু আজ কি করে না এসে থাকি বল? ছবিতে চলে আর কথা কয়, গাঁ-খানটার লোকে এমন কখনো দেখিনি। আজ না এলে এ জনমে আর কি কখনো দেখতে পাবি? তুমিই বল দিদি?"—বলিয়া সমর্থনের আশায় সে শিশিরের মুখের পানে চাহিল। কিন্তু জবাব দিবে কি, শিশিরের কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে মাতৃ-স্নেহের অতুলনীয় গৌরব যুগে যুগে লোকে এতবার করিয়া বলিয়াছে, সেই নিবিড় সর্ব্বব্যাপী স্নেহও কেবলমাত্র অজ্ঞান এবং অশিক্ষায় কোথায় কোন্ অন্ধকারের অতল অবধি নামিয়া আসিতে পারে!

তাহার পরদিন সকালেই ছেলেটা মারা গেল। তখন তাহার মায়ের বুকফাটা কান্নায় পাড়ার আর সকলের মত তাহারও চক্ষু সজল হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তবুও ছেলের মা'কে সে মনে মনে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই। এবং অভিশপ্ত পল্লীসমাজের এমনি ধারা দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত মন বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

* * * * *

(২৬)

কিন্তু দোলনায় শায়িত তাহার খোকার দিকে চাহিয়া সে আজ নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে পারিল সেদিন সেই দুর্ভাগা ছেলেটার মৃত্যুতে তাহার মায়ের ক্লেশ বিশ্বসংসারের কোন মায়ের চেয়েই কম হয় নাই। কিন্তু এমনই কুসংস্কার এবং এমনই সর্ব্বব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে সে জন্মকাল হইতে মানুষ হইয়াছে যে, তাহার ছেলের মৃত্যুর জন্য অনেক পরিমাণে সে নিজেই যে দায়ী, এই ভয়ানক কথাটা উপলব্ধি করিবার মত জ্ঞান তাহার হয় নাই।

পল্লীর মায়েদের মনের অন্ধকার দেখিয়া এক সময় সে ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়াছিল, কিন্তু আজ সে ঠিক তাহার স্বামীর মত করিয়াই ভাবিতে পারিল, এমন করিয়া তাহাদের বিচার করিবার অধিকার আমার কোথায় আছে? জীবনের সর্ব্ববিধ সুখ, সৌভাগ্য, শিক্ষার আলোকের মাঝে বসিয়া নীচের তলার বঞ্চিত অন্ধকারবাসীদের প্রতি বিতৃষ্ণার কটাক্ষ করা সোজা। কিন্তু তাহার স্বামীর মত বিচার বিতর্ক না করিয়া কেবল সমগ্র হৃদয় দিয়া তাহাদের বঞ্চনার পরিমাণ অত্যন্ত স্নেহের সহিত অনুভব করিয়া তাহার একটুখানি অংশও দূর করিবার জন্য নিঃশব্দে চেষ্টা করা কত কঠিন!

সদরের ঘরে একটা পরিচিত জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। খোকার ঝি একমুখ হাসিতে হাসিতে আসিয়া কহিল, "ওমা! জামাইবাবু এসেচেন যে! বুঝি এই সকালের ট্রেণেই নামলেন। তা, দেখো দিদিমণি, এইবারে আমার পাওনা সোণার মটর মালা ছড়ার কথা ব'লতে ভুলোনা যেন।"

পরের মুহূর্ত্তে সুবোধ আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

"কোন্ ট্রেণে এ'লে?"

"এই সকালের এক্সপ্রেসে।"

"আগে চিঠিতে আসবার কথা কিছু লেখ নাই তো?"

"না, হঠাৎ তোমায় দেখবার ভারি ইচ্ছে হোল।"

"এবারে আমায় নিয়ে চল। একা তোমার কষ্ট হচ্ছে। আর আমারও একলা থাকতে ভালো লাগছেনা।"

"আর মাসখানেক পরে নিয়ে যাব।"

"কেন?"

"ক'লকাতার সে বাড়ীটা আর আমার পছন্দ হোল-না। এবারে পার্কের সামনে একটা বাড়ী দেখেচি। খোকা যদি বিকেলে বেড়াতে যায়, তোমার চোখের সুমুখেই থাকবে। সেইটে ঠিক করতে হবে। তোমার যাতে অসুবিধা না হয়, কিছু কিছু আসবাবপত্র আনিয়ে বাড়ীটা বাসযোগ্য করে তুলতে হবে।"

"আমি ক'লকাতায় থাকব এমন কথা তোমাকে কে বললে?"

"দেখ,—" সুবোধ মুখ নীচু করিয়া রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমাকে খুসী করতে তোমার যেখানে ভালো লাগে-না তুমি জোর করে সেখানে থাকবে, এমন কখনও হতে পারেনা।"

"কে বলেছে তোমাকে খুসী করতে থাকব?"

সুবোধ এইবারে মুখ তুলিয়া কহিল, "সত্যি করে ব'লো শিশির ? আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালোবাস, সেই ভালোবাসার উপর দোহাই দিয়ে তুমি যে নিজের স্বভাবের উপর অত্যাচার করবে তা আমি কিছুতেই সইবোনা।"

"আমিও তোমায় আর কিছু ব'লতে চাইনে, শুধু এইটুকুই জেনো আমি যে যেতে চাচ্ছি সে নিজের গরজেই।"

সুবোধ তথাপি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কথাটা যেন তাহার ঠিক বিশ্বাস হইতেছিলনা।

"এই ক'মাসে নূরপুরের কাজ কতদূর হোল ?"

"দশ বারো জায়গায় টিউবওয়েল বসিয়েচি। আমাদের সেই রাধাসায়ের আর কামারগড়ের যে পুকুর দুটো তুমি দেখেছিলে, কিছু টাকা খরচ করে সেগুলো খুব বড় করে কাটিয়েচি। এখন গরম কালেও অন্ততঃ জলের কষ্ট আর কারো হবেনা। আর ডাক্তারখানাটা তো তুমি দেখেই এসেছিলে। সেটা হওয়াতে এইটুকু উপকার হয়েচে— ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ডাক্তারের কাছে একটুখানি কুইনাইন এবং অনেকখানি ময়দার গুঁড়ো মেশান ওষুধ নেবার জন্যে লোকের তেমন ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবার প্রবৃত্তি আর নেই।"

(২৭)

অনেক দিন পরে ছেলে লইয়া শিশির যখন আবার নূরপুরে ফিরিয়া গেল, তখন সেখানে যেন একটা উৎসবের মত আরম্ভ হইল। এবং ইহারই সহিত মিশিয়া আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এবারে শিশিরের ব্যবহারেরও অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে। যাহা কিছু তাহার চোখে পড়িতেছে সমস্তই সে নূতন অর্থ লইয়া দেখিতেছে। বিশেষতঃ সন্তানের জননী হওয়ায় সবারই কাছে তাহার গৌরব এবং মর্য্যাদা যেন অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

খোকাকে দেখিতে আসার সারাদিনে বিরাম নাই। শিশিরও হাসিয়া মিষ্ট কথায় সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া ছেলে দেখাইতেছে। এবার তাহার ব্যবহারের মধ্যে এমন একটু নম্র আন্তরিকতা আছে, যে সকলেই মুগ্ধ হইতেছে।

এখানে আসিয়া অবধি সুবোধের সঙ্গে তাহার বড় একটা দেখা হয় নাই। সারাদিন অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে সে ব্যস্ত থাকে, আর সুবোধের নিজের কাজের বোঝাও বড় কম নয়। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য যে দুই একবার চোখা-চোখি হইয়াছে, তাহাতেই তাহার মুখের আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তিটুকু শিশিরের চোখ এড়ায় নাই।

এমনি করিয়া কিছু দিন কাটিয়া গেল। সেটা ভাদ্রের শেষ সপ্তাহ, এবারে আশ্বিনের প্রথমেই পূজা। আসন্ন পূজার উদ্যোগ আয়োজনে বাড়ীর সবাই ব্যস্ত। সেদিন সকাল হইতে খোকার শরীর ভালো ছিলনা। সন্ধ্যাবেলায় তাহার খুব জ্বর আসিল। শিশির ভয় পাইয়া বহির্ব্বাটী হইতে সুবোধকে ডাকাইয়া আনিল।

ডাক্তার বাবু আসিলেন। থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া দেখা গেল, জ্বর প্রায় ১০৫ ডিগ্রী। খোকার চোখ অত্যন্ত লাল হইয়াছে। মাঝরাত্রিতে জ্বর আরও বাড়িল। ডাক্তার ভয় পাইয়া কহিলেন, অত্যন্ত খারাপ টাইপের ম্যালেরিয়া। ব্রেণ আক্রমণ করিলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। মাথায় সর্ব্বক্ষণ বরফ দেওয়া প্রয়োজন।

তখন বর্ষাকাল। পল্লীগ্রামের রাস্তা কাদায় এমনই দুস্তর হইয়াছে যে মোটর, ঘোড়ার গাড়ী কিছুই চলেনা। শীঘ্র যাতায়াতের কোন উপায় নাই। বিশেষ করিয়া নূরপুর হইতে শাপুর পর্য্যন্ত কোন রাস্তাই নাই। তাহার পর হইতে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে বটে। নূরপুর হইতে শাপুর অবধি রাস্তাটা করাইবার জন্য সুবোধ অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন সরিকের কাছে একটি পয়সাও সাহায্যের জন্য বার করিতে পারে নাই। যাহা হোক গাড়ী চলিবার যখন রাস্তা নাই তখন তিন চার জন লোককে বরফ আনিবার জন্য তখনই সহরে পাঠান হইল। কিন্তু বরফ আসিয়া পৌছিবার অনেক আগে শেষরাত্রি হইতে খোকার ম্যানেঞ্জাইটিস্ সুরু হইয়া গেল। তাহার যন্ত্রণার্ত্ত চীৎকার এবং আরক্ত চক্ষুর পানে চাহিয়া সুবোধ অধীর হইয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল এবং এক একবার হাতের রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, আর কত দেরী ? আর কতক্ষণ পরে বরফ আসিয়া পৌছাইতে পারে ?

ভিতরে খোকার মুখের দিকে অশ্রুস্তম্ভিত নেত্রে চাহিয়া শিশির বসিয়া ছিল। সুবোধ সেখানে আসিয়া কহিল,

"আমি আর দেখতে পারিনে। ডাক্তার বলছে একমাত্র মাথায় বরফ দেওয়া ছাড়া এর অন্য কোন ওষুধ নেই। আমি নিজেই না হয় একবার যাই।"

শিশির ধীর স্বরে কহিল, "তুমি গেলেও সেই গরুর গাড়ী ছাড়া আর তো যাবার অন্য উপায় নেই। গরুর গাড়ীর চেয়ে যারা পায়ে হেঁটে গেছে তারা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। উতলা হ'য়োনা। বিশ্বাস করে থাকো।"

বরফ মণ হিসাবে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু যখন আসিয়া পৌছিয়াছে তখন খোকার মৃতদেহ প্রাঙ্গণে বাহির করা হইয়াছে।

শিশিরের মনে যে কতখানি লাগিয়াছে তাহা বাহির হইতে বোঝা গেলনা, কিন্তু সুবোধ এমনই অস্থির হইয়া উঠিল যে কোন কাজে আর লেশমাত্র মনঃসংযোগ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

শিশিরের কাছে আসিয়া কহিল, "কিসের জন্য আর আমরা এখানে থাকব? চল এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমার দিন রাত কেবলই মনে হচ্চে, তোমাকে এখানে নিয়ে এসে তোমার ধনকে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারলুমনা। তুমি কেন এখানে এলে শিশির?"

শিশিরের দুই চোখ দিয়া অশ্রান্ত ধারায় জল পড়িতেছিল, তথাপি সে স্থিরকণ্ঠে কহিল, "কেন তুমি অত উতলা হচ্চ? আমার খোকা যেমন করে গেছে তেমনই করে এ গাঁয়ের আরও কত খোকাখুকু গেছে। কাল আমি বামা পিসীর কাছে শুনছিলুম, তোমার এই ডাক্তারখানাটা হওয়ার আগে, ওবছর ওবাড়ীর বট্‌ঠাকুরের মেজছেলে হরিচরণের যখন অসুখ হয়েছিল তখনও ছিল এমনই বর্ষাকাল। রাস্তার অভাবে দ্বিগুণ চতুর্গুণ ফি দিয়েও সহরের ডাক্তারকে সহজে আসতে রাজী করান যায় নাই। উপযুক্ত চিকিৎসা ওষুধের অভাবে ছেলেটার প্রাণ গেল। আজ খোকা নেই বলেই সেই সব মায়েদের ব্যথা আমি নিজের ব্যথার সঙ্গে যেন এক করে বুঝতে পারচি। আমায় তুমি কোথায় যেতে বল? কোথায় যাব আমি? আমি কোথাও যাবনা। যেখান থেকে আমার খোকা গেছে সেইখানে থেকেই সেখানকার খোকাখুঁকীদের কষ্ট যদি একটুও দূর করতে পারি সেই চেষ্টা কোরব।"

সুবোধ বহুক্ষণ তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহার কিছুদিন পরেই গাঁয়ের লোক দেখিল, সরিকদের নিকট হইতে আর বৃথা সাহায্যের চেষ্টা না করিয়া সুবোধ নিজের খরচে নূরপুর হইতে যতদূর অবধি একেবারে রাস্তা নাই সেই সমস্ত পথটা বাঁধাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছে, মহা উৎসাহে মাপ জোক্ আরম্ভ হইয়াছে।

তখন ওবাড়ীর নকর্ত্তা পালেদের চণ্ডীমণ্ডপে আলবোলা টানিতে টানিতে মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন, "দেখলে ভায়া, এইজন্যেই ওই রাস্তাটার কথা সুবোধ যখন বারবার পাড়ত, তখন আমি চাঁদার কথাটায় কাণই দিইনি। মনে মনে নিশ্চয় জানতুম কিনা যে, আমরা চুপ করে থাকলে একদিন ও নিজের খরচেই সমস্ত করবে। দেখলে তো আমার কথা ফললো কি না!" বলিয়া নিজের বিজ্ঞতার এমন অসন্দিগ্ধ প্রমাণে নিজেই হো হো করিয়া আর একবার হাসিয়া উঠিলেন।

সমাপ্ত



অতীতের ঐশ্বর্য্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মরু-দেবতা

(মিশরের প্রাচীন প্রহেলিকা)

প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত জগতে আর কোথাও এমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না যার রহস্য মিশরের এই প্রহেলিকাময়ী মূর্ত্তি স্ফিঙ্‌সের (Sphinx) চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক !



মিশরের বৃহত্তম 'স্ফিঙ্‌স'

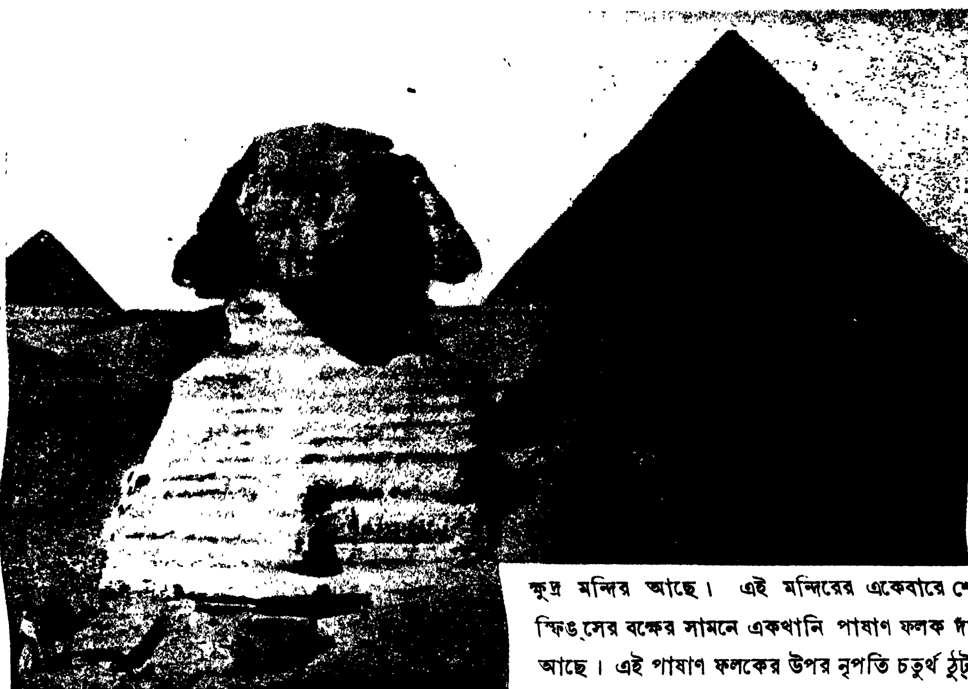
পশ্চাদ্‌ভূমিতে যে বিরাট পিরামিড দেখা যাচ্ছে এর নির্ম্মাণকর্ত্তা মিশরপতি ক্ষাফ্‌রা বা খুফু রাজের প্রতিমূর্ত্তি ব'লেও কেউ কেউ এই স্ফিঙ্‌সটিকে নির্দ্দেশ করেন)

মিশরের এই অদ্ভুত-গঠন প্রহেলিকাময়ী বিরাট মূর্ত্তিগুলিকে ঘিরে এতরকমের বিভিন্ন কাহিনী ও কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে তার সংখ্যা হয় না। একটা যেন অতীত মহৈশ্বর্য্যের মহান প্রতীকরূপে এই রহস্যাচ্ছন্ন প্রহেলিকাময়ী মূর্ত্তিগুলি বিশাল মরুভূমির অন্তহীন বালু সাগরে তাদের গগনস্পর্শী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফ্যারোয়াদের অবিনশ্বর কীর্ত্তি পিরামিডের অভ্রংলিহ চূড়াগুলিও যেন কুলমর্য্যাদায় এদের পাশে অবনতশীর্ষ বলে মনে হয়। স্ফিঙ্‌স সম্বন্ধে গ্রীসে যে সব পৌরাণিক কাহিনী শোনা যায়, মিশরের প্রচলিত কিংবদন্তির সঙ্গে তা' এমনভাবে বিজড়িত হ'য়ে পড়েছে যে সে জটিলতা বিচ্ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। মিশরের স্ফিঙ্‌সের তুলনায় গ্রীসের স্ফিঙ্‌সগুলি কোনো অংশে কম রহস্যময় নয়, তবে এতদুভয় প্রদেশের স্ফিঙ্‌সের উৎপত্তির ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ! মিশরের এই প্রহেলিকাময়ী বিরাট মূর্ত্তিগুলি সমস্তই পুং জাতীয়, কিন্তু গ্রীসের প্রত্যেক মূর্ত্তিটি স্ত্রী জাতীয়। স্কন্ধ দেশ হ'তে পাদমূল পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিগুলির সিংহ বা সিংহিনীর ন্যায় আকৃতি, কেবলমাত্র মুখখানি এদের মিশরে পুরুষ এবং গ্রীসে নারী ! গ্রীসের পৌরাণিক বিবরণে এই বিসদৃশ নারী-মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়—রাক্ষসী 'হার্‌প্যী'র বর্ণনায়। আধুনিক দেবদূতের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ এর কাছেই ঋণী ! যুগল পক্ষ সংযুক্ত এক নারী-মূর্ত্তি তাঁরা এই সিংহিনীতনু নারীরূপের অনুকরণেই সৃষ্টি করেছেন। মিশরে কিন্তু এই স্ফিঙ্‌স্ হ'চ্ছে অমোঘ রাজশক্তির মহাপ্রতীক্। সম্রাট্ স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার স্বরূপ— স্ফিঙ্‌স্ যেন মিশরের মরুপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত ক'রে এই বাণীই ঘোষণা করছে।

স্ফিঙ্‌স্ সম্বন্ধে একটা সাধারণ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে এরা মানুষের কাছে যে সমস্ত প্রহেলিকা এনে উপস্থিত

কয়ছে কোনো মানুষ কোনো দিন যদি তাদের এই সব রহস্যময় হেঁয়ালীর সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহ'লে ওরা সকলে সেদিন আত্মহত্যা করবে। এই বালকোচিত বচন মহামহিমামণ্ডিত বিরাট স্ফিঙ্‌স্ সম্বন্ধে যেমনি অবিশ্বাস্য—তেমনিই অশ্রদ্ধেয়।

মিশরের যেটি বৃহত্তম স্ফিঙ্‌স্ সেটি যে কবে নির্ম্মিত হ'য়েছিল সে সম্বন্ধে একটা সঠিক সন তারিখ এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নি, তবে বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন যে নৃপতি ক্ষাফ্‌রা যিনি মিশরে দ্বিতীয় পিরামিড নির্ম্মাণ করবার

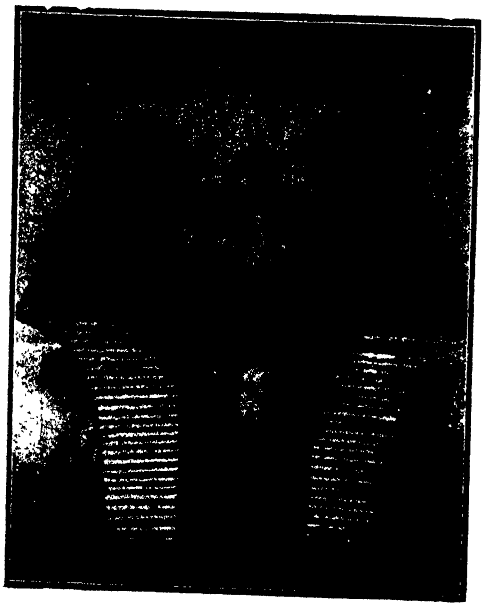


'হু'—মিশরীরা এই সুবৃহৎ 'স্ফিঙ্‌স্'কে বলে 'হু'। গীজের এই স্ফিঙ্‌স্ মূর্ত্তি দ্বিতীয় পিরামিডের দিকে পিছন করে পূর্ব্বমুখে নীলনদের উপত্যকার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে আছে। দক্ষিণে দ্বিতীয় পিরামিডটি দেখা যাচ্ছে

স্পর্দ্ধা দেখিয়ে গেছেন খুব সম্ভব এ তাঁরই রাজত্বকালে তৈরী হয়েছিল। এই অদ্ভুত বিরাট মূর্ত্তিটির প্রধান অংশ একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতকে কেটে রূপান্তরিত ক'রে গড়া হ'য়েছে এবং অপরাংশ পাথর কুঁদে তৈরী করে এনে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হ'য়েছে। দেহ তার সিংহের ন্যায়; কেশরী যেন গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে, কিন্তু মুখখানি মানুষের। কিরীটধারী সুদর্শন পুরুষ। কেবলমাত্র মিশরাধিপতি ফ্যারোয়াদের মস্তকে যে বিশেষ ধরণের রাজমুকুট থাকে এরও মস্তকে সেই মুকুটই শোভা পাচ্ছে। ললাটে মিশরীয় রাজফণী। সুতরাং এই স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি যে রাজপ্রতীক্ সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই বৃহত্তর স্ফিঙ্‌সের সম্মুখের দুই থাবার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই মন্দিরের একেবারে শেষ প্রান্তে স্ফিঙ্‌সের বক্ষের সামনে একখানি পাষাণ ফলক দাঁড়করানো আছে। এই পাষাণ ফলকের উপর নৃপতি চতুর্থ ঠুটমোসিসের একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত উৎকীর্ণ করা আছে। বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন সম্ভবতঃ একবিংশ পুরুষের রাজত্বকালে এটি এখানে স্থাপন করা হ'য়েছিল। ঠুটমোসিসের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে মিশরে এই প্রবাদ প্রচলিত যে একদা মহারাজ শিকার সন্ধানে ক্লান্ত ও অবসন্ন হ'য়ে মধ্যাহ্নকালে এই সুবৃহৎ স্ফিঙ্‌সের স্নিগ্ধ শীতল ছায়াতলে বিশ্রাম ক'রতে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এইখানেই নিদ্রিত অবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্তই এই পাষাণ-ফলকে উৎকীর্ণ ক'রে রাখা হ'য়েছে। এই স্ফিঙ্‌সের

নামকরণ করেছিলেন ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা—'হার্মেক্ষিশ' বা 'ক্ষেপরা'। মিশরে সে সময় এই হার্মেক্ষিশ্ ও ক্ষেপরা উভয়েই আদিত্য দেবতারূপে পূজিত হ'তেন। এই স্ফিংসের মূর্ত্তিটিও সূর্য্যের মর্য্যাদা লাভ করে এসেছে বরাবর। এ সম্বন্ধে মিশরের এক ভক্ত সৌর উপাসক লিখেছেন—"ভগবান আদিত্য দেবের বিরাট ও সুমহান মূর্ত্তি তাঁর মনোমত যোগ্য স্থানেই বিরাজমান! শক্তি তাঁর বিপুল তাই সহস্রাংশু তাঁর শিরস্ত্রাণ! 'মেম্ফিসের' মন্দিরে এবং নীলনদের উভয় তীরবর্ত্তী সমূহ নগর নগরীর সকল মন্দিরে তাঁর পূজা হয়। প্রত্যেক নরনারী সসম্ভ্রমে সম্মুখে তাদের বাহু



ক্ষাফ্রার প্রতিমূর্ত্তি—(মিশরপতি ক্ষাফ্রার এই প্রস্তর-মূর্ত্তি ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কোনো সুদক্ষ মিশরীয় ভাস্কর পাথর কেটে নির্ম্মাণ ক'রেছিলেন। অনেকের মতে গীজের স্ফিংস্ এই ক্ষাফরারই মূর্ত্তি এবং স্ফিংসের নির্ম্মাণ কাল চতুর্থ পুরুষের (Fourth Dynasty) সমসাময়িক)

বিস্তার ক'রে তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তির অভিবাদন জানায়। তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য কত নৈবেদ্য, কত পূজা, কত অভিষেক, কত 'বলি'ই না নিবেদিত হয় এই অতুল দেবতার চরণতলে।

পুরাকালে এই স্ফিংসের পদতলে এসে পৌঁছবার উপায় ছিল মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে বালুপৃষ্ঠে আঁকা সরু একটি পায়ে চলা পথ। এই পথ বেয়ে মরুভূমি অতিক্রম ক'রে যাত্রীরা এসে দাঁড়াত এক পাষাণ চত্বরের উপর। এই পাষাণ চত্বরের ক্রোড়ে আছে এক অপরিসর সোপানশ্রেণী। এই সোপানশ্রেণীর ত্রিচত্বারিংশ ধাপ উত্তীর্ণ হ'য়ে—সেই ক্ষুদ্র মন্দিরদ্বারে উপনীত হওয়া যায়—বিরাট স্ফিংসের বিপুলাকার যুগ্ম জঙ্ঘার মধ্যে সে মন্দিরটিকে ঠিক শিশুর



বিধ্বস্ত মরু-দেবতা—(বিশাল মরুভূমির বালুরাশির উপর যুগযুগান্ত ধ'রে বসে আছে এই বিরাট মূর্ত্তি। এই সুগম্ভীর পাষাণ প্রতিচ্ছবির মুখে ছিল রহস্যজড়িত স্মিত-হাস্য, মস্তকে ছিল ফণীভূষিত রাজমুকুট, চিবুকে ছিল কুঞ্চিত-কেশ সুশ্রী শ্মশ্রু! সর্ব্ব-বিধ্বংসী কালের প্রভাবে ও অত্যাচারী বিদেশীয়দের বর্ব্বর আক্রমণে এ মূর্ত্তি আজ বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত ও জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। সুদৃশ্য শ্মশ্রু আজ দেবতার চিবুক-চ্যুত! তাঁর বৃষস্কন্ধ আজ ক্ষয়-ক্ষীণ)

ক্রীড়নক বলে মনে হয়। পায়ে চলা পথ মরুভূমি ভেদ ক'রে যে পাষাণ চত্বরে এসে মিলেছে - সেটি প্রায় স্ফিংসের

বুক পর্য্যন্ত উঁচু। সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে নামতে প্রতিপদক্ষেপে বোঝা যায়—কি বিরাট এই মূর্ত্তি! একেবারে নীচেয় নেমে মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে এই বিপুল কীর্ত্তির পানে চেয়ে চেয়ে মনে হয়—এই বিরাট পাষাণস্তূপকে এ হেন অপরূপ রূপ দিয়েছেন যাঁরা—বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার পরম গৌরবটীকা তাঁদেরই ললাটে পরিয়ে দিয়ে ইতিহাস যোগ্যতমের যোগ্য সম্মান ও সত্যের পূর্ণ-মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন! কি রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত বেলায়, কি চন্দ্রালোকিত সুন্দর সন্ধ্যায়—এই অসীম বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমির জনহীন নিস্তব্ধ বুকে এই গগনস্পর্শী মূর্ত্তির সুগম্ভীর

স্ফিংসের উচ্চতার একটা সঠিক পরিমাপ নির্দ্দিষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ, অগাধ বালুকারাশি এমনভাবে এর পাদমূল আবৃত ক'রে রেখেছে যে তা' অপসারিত না ক'রে সঠিক মাপ পাওয়া সম্ভব নয়; অথচ এই বালুকারাশি অপসারিত করাও অত্যন্ত সুকঠিন কাজ! যেহেতু বায়ুবেগে বালুরাশি অবিরত উড়ে এসে স্ফিংসের পাদমূলে জড় হ'চ্ছে। তাই, বেদীমূলের পরিমাপ না ক'রে কেবলমাত্র এই মূর্ত্তির জানু আশ্রিত সেই ক্ষুদ্র মন্দিরের তলদেশ থেকে স্ফিংসের শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত উচ্চতা ৬৬ ফুট ধরা হয়েছে। এই মূর্ত্তি যে কি বিরাট তার কতকটা ধারণা হ'তে পারে



গীজের 'স্ফিংস'—(মিশরের এই 'স্ফিংস' আজও বিশ্বের বিস্ময় হ'য়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকেরা এখনো এই রহস্যময় মূর্ত্তির অর্থ আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ব'লেন অষ্টাদশ পুরুষের (Eighteenth Dynasty) রাজত্বকালে দেবতা হার্কেমিশের মূর্ত্তি ব'লে এটি উল্লিখিত হ'ত; কিন্তু চতুর্থ পুরুষের সময়—এমন কি তারও অনেক আগে থেকে যে পর্ব্বত কেটে এই মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'য়েছে সেটি একটি পুণ্য-গিরি রূপে গণ্য ছিল)

সৌন্দর্য্য—বিরাট ও মহান ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য—ও—মর্য্যাদা মানুষের মনকে বিস্ময়বিমূঢ় ও মোহাবিষ্ট ক'রে ফেলে। প্রাচীন কীর্ত্তির এই অতুলনীয় মহিমা অন্তরে অন্তরে মিশরের প্রতি একটা বিশিষ্ট সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়ে তোলে যেন!

এর মুখমণ্ডলের পরিমাপ থেকে। এ-কাণ হ'তে ও-কাণ পর্য্যন্ত মুখখানি চওড়া প্রায় ১৩ ফুট ছ' ইঞ্চি। নাকটিই তার পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি! ওষ্ঠাধর সাত ফুট সাত ইঞ্চি। মুসলমান আক্রমণের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা থেকে মিশরের এই

বিরাট স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তিও অব্যাহতি পায় নি। সেখ ও তৎপরবর্ত্তী মামেলুকদের অত্যাচারে স্ফিঙ্‌সের মুখ আজ ক্ষত-বিক্ষত! নাসিকা, শ্মশ্রু ও শিরস্ত্রাণ সব চেয়ে বেশী বিধ্বস্ত হয়েছিল। লণ্ডনের যাদুঘরে এই স্ফিঙ্‌সের সুচারু শ্মশ্রুর ধ্বংসাবশেষ কিয়দংশ সযত্নে রক্ষিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব কোনো প্রাচীন গ্রন্থে কিন্তু মিশরের এই বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভের কিছুমাত্র উল্লেখ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। খৃষ্ট পরবর্ত্তী প্রথম শতকে মাত্র প্লিনীর লেখায় স্ফিঙ্‌সের উল্লেখ আছে। প্লিনী ব'লেছেন জনশ্রুতি

গ্রীসের প্রাচীন 'স্ফিঙ্‌স্' ('স্ফিঙ্‌স্' এই কথাটি মিশরীয় নয়, এটি গ্রীক্ শব্দ। গ্রীক্‌পুরাণে এই অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমানবাকৃতি 'স্ফিঙ্‌সের' অস্তিত্ব ছিল। তাই মিশরের এই মূর্ত্তিকেও গ্রীকরা 'স্ফিঙ্‌স্' ব'লে উল্লেখ করেছে। কেউ কেউ গ্রীসে স্ফিঙ্‌সের আবির্ভাব মিশরের অনুকরণেই ঘটেছে বলেন, কিন্তু এরূপ অনুমানের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মিশরের স্ফিঙসের সঙ্গে গ্রীসের স্ফিঙ্‌সের কেবল যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে তাই নয়, একটা মূলগত ভাব ও ব্যবহারিক বিভিন্নতাও আছে। মিশরের 'স্ফিঙ্‌স্' পুরুষের মুখাবয়ব যুক্ত কিন্তু গ্রীসের 'স্ফিঙ্‌সের', হয় নারী নয় রাক্ষসের মুখ! এবং ডানা আছে। মিশরের স্ফিঙ্‌স্ দেবতা ও সম্রাটের তুল্য উপাস্য ও ধর্ম্মের অঙ্গরূপে পূজ্য। গ্রীসে 'স্ফিঙ্‌স্' স্থাপত্য-শোভা হিসাবেই বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হ'ত। রাক্ষস মুখ স্ফিঙ্‌স্ প্রায়ই অপঘাতে মৃত ব্যক্তির কবরে উৎকীর্ণ থাকে। কারণ, গ্রীসের ধারণা উনিই অপঘাত মৃত্যুর নায়ক। তা'ছাড়া, শিল্পজগতে এমন একটা যুগ একসময় এসেছিল দেখা যায় যখন এই অর্দ্ধপশু অর্দ্ধমানবাকৃতি মূর্ত্তি শুধু মিশর ও গ্রীসে নয়—আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য থেকে সুদূর মেক্সিকোর মায়াপুর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। রাক্ষসমুখ গ্রীক স্ফিঙ্‌সের পরিকল্পনা বরং অনেকটা বাবিরুষের যে নররাক্ষস মূর্ত্তি তার সঙ্গে মেলে।)

এইরূপ যে এটি ষড়বিংশ পুরুষের প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট দ্বিতীয় আমেশিসের সমাধি মঠ বা স্মৃতিমন্দির। মুসলমান আমলে এর নাম হ'য়েছে—'আবু-লা-হোল্' অর্থাৎ শঙ্কাজনক বা ভয়ঙ্কর! আরবেরা মনে করে ইনিই মরুভূমির আক্রমণ থেকে মিশরকে রক্ষা ক'রছেন, নইলে ঐ অপার বালু পারাবার মিশরের সমস্ত পল্লী ও শস্যক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন করে ফেলত! স্ফিঙ্‌স সম্বন্ধে আরও একটা জনশ্রুতি খুব বেশী রকম শোনা যায় যে এই বিরাট মূর্ত্তির আর একটি নাকি 'জোড়া' ছিল! কথাটা যে একেবারেই ভূয়ো তা নয়; এই সব জনশ্রুতি, লোকপ্রবাদ ও কিংবদন্তীর মূলে কিছু না কিছু সত্যের ইঙ্গিত থাকেই। প্রাচীন মিশরে কীর্ত্তিমান্ সম্রাটদের বিরাট প্রতিমূর্ত্তি জোড়া জোড়া নির্ম্মাণের রীতিই প্রচলিত ছিল। যদি প্রমাণ হ'য়ে যায় যে এই স্ফিঙ্‌স মূর্ত্তি মিশরের কোনো প্রসিদ্ধ নৃপতিরই প্রতিরূপ মাত্র, তাহ'লে এর জোড়া আর একটি থাকা সেকালে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না।



মিশরে এই বৃহত্তম স্ফিঙ্‌স আবিষ্কৃত হবার পর সেখানে আরও অনেক বিভিন্ন আকারের স্ফিঙ্‌স খুঁজে পাওয়া গেছে। সেগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত যেটি বড় সেটি ১৯১২ সালে ম্যাকে সাহেব আবিষ্কার করেন মেম্ফিস্ নগরে। এই স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি 'আলাব্যাষ্টার' নামক একপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরে নির্ম্মিত। এর নির্ম্মাণ-কৌশল ও গঠনভঙ্গী থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের

রাজত্বকালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিশরের একাধিক বড় বড় মন্দিরে প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে সারি সারি স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি স্থাপিত রয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হ'চ্ছে কার্ণাকের শ্রেণীবদ্ধ ক্রাইয়ো স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি। নদীর ঘাট থেকে বরাবর মন্দির-দ্বার পর্য্যন্ত পূজার্থীদের স্নান-বিশুদ্ধ দেহে দেবসন্নিধানে পৌছবার পবিত্র পথটি যেন সারিবন্দি স্ফিঙ্‌সের দল দু'ধারে গুঁড়ি মেরে বসে দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে! কার্ণাকের এই স্ফিঙ্‌স মূর্ত্তিগুলি সিংহের মত গুঁড়ি মেরে বসে আছে বটে, কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেষমুণ্ড! তার কারণ, কার্ণাকের মন্দিরে যিনি প্রধান অধিষ্ঠাতা দেবতা—সেই 'প্রভু আমন', স্মরণাতীত কাল থেকেই মেষমুণ্ডযুক্ত হ'য়ে কল্পিত ও পূজিত হ'চ্ছেন। আমাদের গণপতির যেমন হস্তীমুণ্ড, বা দক্ষপ্রজাপতির যেমন অজমুণ্ড, হয়ত' তেমনই কোনো পৌরাণিক কাহিনী এই 'আমন' দেবতারও মেষমুণ্ডের পশ্চাতে আছে। মেষমুণ্ড হলেও তথাপি এই স্ফিঙ্‌স্ মূর্ত্তিগুলি দর্শকের মনে বেশ একটা অতীব প্রিয় প্রভাব বিস্তার



গ্রীসের 'কুক্কুরী' স্ফিঙ স্—(প্রাচীন যুগের পরবর্ত্তী কালে শিলা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'স্ফিঙ্‌সের' গঠন পারিপাট্যেরও উৎকর্ষ হয়েছিল দেখা যায়)



স্ফিঙ্‌সের পশ্চাৎদিক—(পিছন থেকে এই বিরাট মূর্ত্তির ক্ষয় ও জীর্ণতা মহাকালেরই বিজয় ঘোষণা ক'রছে)

করে, এবং নদীতীরের স্নানের ঘাট থেকে এই মন্দিরের পথটুকুকে ঘিরে থেকে এরা কার্ণাকের মন্দিরের অটল মর্য্যাদা ও স্তব্ধ গম্ভীর পবিত্রতা যেন বহুগুণে বর্দ্ধিত ক'রে তুলেছে বলে মনে হয়।



মেম্ফিসের স্ফিঙ্‌স্ (সম্মুখ দিক)—(মেম্ফিস্ প্রদেশে প্রাপ্ত এই স্ফিঙ্‌স্ মূর্ত্তি পাথর কেটে জোড়া দিয়ে তৈরি। মিশরপতি দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের আমলে অর্থাৎ উনবিংশ পুরুষের রাজত্বকালে এই ধরণের স্ফিঙ্‌স্ নির্ম্মিত হ'ত)



মেম্ফিসের স্ফিঙ্‌স্ (পাশের দিক)

আরও একরকম স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি দেখতে পাওয়া গেছে, যাদের শ্যেনমুণ্ড! কিন্তু, আকৃতি সকলেরই পূর্ব্ববৎ— সেই সিংহসদৃশ সবল দেহ। বেদীর উপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তীক্ষ্ণনখর সংযুক্ত প্রচণ্ড থাবার নীচে নিগ্রো ও সিরীয়ান্ শত্রুদল নির্ম্মমভাবে বিদলিত হচ্ছে। এই মূর্ত্তি মিশরের সম্রাট্‌গণের রণ-দেবতার রূপ— সমর-প্রতীকরূপে তাঁরা এই শ্যেনমুণ্ড স্ফিঙ্‌স নানা আকারে ব্যবহার ক'রতেন। সম্রাটগণের প্রিয় ব'লে মিশরীয় শিল্পীরা রাজব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্যের উপর এই স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ ক'রে তার শোভাবৃদ্ধি ক'রতেন। রাজ-অলঙ্কারে, রাজ-পরিচ্ছদে, মণি মাণিক্যের আভরণে প্রাচীন মিশরের সুদক্ষ স্বর্ণকারেরা অতি নিপুণতার সঙ্গে এই শ্যেনমুণ্ড স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি নানা বর্ণের জহরত-সংযোগে নির্ম্মাণ ক'রতেন। যথাযোগ্য রঙীন পাথর বেছে বেছে বসিয়ে ধূম্রবর্ণ শ্যেনমুণ্ডযুক্ত ধূসরবর্ণ সিংহপদতলে গৌরবর্ণ



কার্ণাকের স্ফিঙ্‌স্—(অষ্টাদশ পুরুষের রাজত্বকালে নির্ম্মিত নৃপতি তৃতীয় থুট্‌মোসিসের নামাঙ্কিত স্ফিঙ্‌স্ মূর্ত্তি)

সিরীয়ান ও কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীদের চিত্র এমন চমৎকার ফুটিয়ে তুলতেন তাঁরা যে সে নির্ম্মাণ-কৌশলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। হীরামুক্তা ও চুনীপান্নায় তৈরী হ'লেও সে মূর্ত্তির মধ্যে ভাবাভিব্যক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হ'ত না। মেষমুণ্ড সিংহের সুগম্ভীর মূর্ত্তির মধ্যে একটা জয়গর্ব্বের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হ'ত। পদপ্রান্তে বিদলিত অসহায় কাফ্রী ও সিরীয়ানের মধ্যে একটা ভয়ব্যাকুল কাতরতা সুস্পষ্ট ফুটে উঠতো।

মাদুলী বা কবচ স্বরূপ ব্যবহারের জন্য একরকম ক্ষুদ্রাকৃতি স্ফিঙ্‌স্ মিশরে পাওয়া গেছে, বিশেষজ্ঞেরা

বলেন এ খুব প্রাচীন। দ্বাদশ পুরুষের শাসনযুগে এর প্রচলন ছিল। নানা রংয়ের পাথর কেটে ছোট ছোট

কিন্তু মাথাটি মানুষের। নৃমুণ্ডসংযুক্ত এই পশ্বাকৃতি ক্ষুদ্র স্ফিংস্ গুঁড়ি মেরে বসে নেই কিন্তু। গ্রীস দেশীয়



স্ফিংসের সমাধিগর্ভে—মিশরের বৃহত্তম স্ফিংস্ কেবল যে কালের প্রহারে জর্জ্জর তাই নয়, মরুভূমির অনন্ত বালুরাশির মধ্যে এর ক্রমশ সমাধি লাভ ঘটছে। এই চিত্রে স্ফিংসের পরিমাপ ও সমাধিগর্ভে তার কতটা অংশ প্রোথিত হয়ে আছে অঙ্কিত ক'রে দেখানো হয়েছে

—পরিমাপ—

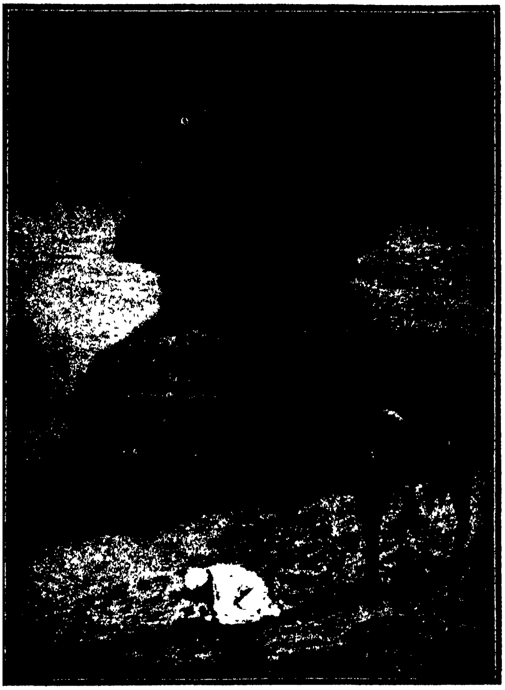
উচ্চতা		৭৫½ ফুট	মুখ—একাণ হইতে ওকাণ পর্য্যন্ত প্রস্থে		১৩½ „
দৈর্ঘ্য		১৬৪ „	বুক	ঐ	৩৬ „
সম্মুখের পা'	ঐ	৫৬ „	অধরোষ্ঠ		৭½ „
মুখ	ঐ	৩৩ „	নাক	(দৈর্ঘ্য)	৫½ „
(মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত)			কাণ	„	৫ „

১। উপস্থিত কেশবেশ এই পর্য্যন্ত আছে। ২। এ শ্মশ্রু বিচ্যুত হয়েছে। ৩। এই পর্য্যন্ত এখন বালুকাগর্ভের উপরে আছে। ৪। স্বপ্ন-লিপি ফলক ৫। ক্ষুদ্র মন্দির ৬। মন্দির প্রবেশ পথের চত্বর। ৭। তিরিশটি সোপান ৮। সোপান চত্বর। ৯। তেরটি সোপান। ১০। কাঁচা ইটের প্রাচীর। ১ । মরুভূমির বালুকারাশি।

করে এগুলি তৈরী হ'ত, বাহুতে বা কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য। এগুলির অবয়ব কোনো মাংসাশী হিংস্র জন্তুর মত,

স্ফিংসের মত পশ্চাতের দু'ই পায়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হ'য়ে বসে আছে, সুতরাং এদের সামনের দুটি পা' আর

অপরাপর স্ফিঙ্‌সের ন্যায় লম্বা ভাবে ছড়ানো নেই, সোজা-ভাবেই খাড়া মাটিতে ছোঁয়ানো। অর্থাৎ, ঠিক যেমন "হিজ্‌



"আবু-লা-হোল্"—: আরবরা স্ফিঙ্‌স্‌কে এই নামে অভিহিত ক'রেছিল। 'আবু-লা-হোল্' শব্দের অর্থ 'শঙ্কাজনক' (বা ভয়ঙ্কর)

মাষ্টারস্ ভয়েস্" গ্রামোফোন্ রেকর্ডের কুকুরটি উঁচু হয়ে বসে আছে দেখা যায় অবিকল সেই রকম।

মিশরের প্রাচীন বর্ণচিত্রের (Hieroglyph) মধ্যে কিন্তু স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায় না। মিশরের চারিদিকে স্ফিঙ্‌সের ছড়াছড়ি অথচ বর্ণচিত্রের মধ্যে তার অভাব দেখে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে এই স্ফিঙ্‌স মূর্ত্তিকে প্রাচীন মিশর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র ব'লে জ্ঞান ক'রত : তাই লিপি হিসাবে স্ফিঙ্‌সের চিত্র তাঁরা ব্যবহার করবার স্পর্দ্ধা করেন নি। কিন্তু, পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ মিশরের অধঃপতনের যুগে গ্রীক রোমান পার্শীয়ান ও আরব প্রভৃতি বিদেশীদের সংস্পর্শে এসে মিশরীয়েরা স্ফিঙ্‌সের প্রতি তাদের সেই প্রাচীন শ্রদ্ধা বিস্মৃত হ'য়েছিল ; ফলে, শেষ যুগের মিশরীয় বর্ণচিত্রে মাঝে মাঝে স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি ব্যবহার করা হ'য়েছিল দেখা যায়। 'নেব্' শব্দটি বোঝাবার জন্যই এই সময় স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তিকে বর্ণচিত্ররূপে নেওয়া হয়েছিল। 'নেব্' শব্দের অর্থ হ'চ্ছে 'প্রভু' 'স্বামী' 'রাজা' 'নাথ' ইত্যাদি নায়কার্থবাচক। মিশরের শেষ নৃপতিগণের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'নেক্‌তা নেবো'। ইনি ফ্যারোয়াদের বংশধর না হলেও জাতিতে খাঁটি মিশরীয় ছিলেন। ফ্যারোয়ারা পোষাকে পরিচ্ছদে অলঙ্কারে তৈজসপত্রে অস্ত্রে-শস্ত্রে স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি ব্যবহার ক'রতেন বটে কিন্তু বর্ণচিত্ররূপে রাজলিপিতে কখনও স্ফিঙ্‌সের মূর্ত্তি ব্যবহার করেননি।



পান্থনিবাস

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

(৫)

অনেক দিন পর্য্যন্ত তপন এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোনো কথা জানায় নাই; প্রাণপণে চাপিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। এত বড় একটা সংবাদ পৃথিবীতে অন্ততঃ আর একজন লোক জানিবে না এমন কথা মনে করিতেও কষ্ট হয়। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তপন মনে-মনে স্থির করিল, বিলাসকে বিশ্বাস করা যায়। ছোকরার মনের মধ্যে গোল নাই, কোনো জিনিসকে কদর্য্য রূপেও দেখে না।

তপন ভাবিয়া দেখিল, এ কথা বিলাসকে বলা যায়। এবং একদিন নিরিবিলি কথাটা পাড়িল। বেশী কিছু নয়, শুধু এইটুকু বলিল যে, একটি মেয়েকে সন্ধ্যার সময় সে পড়ায়।

কথাটা শুনিয়া বিলাস ছাদের এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত একবার ছুটিয়া আসিল। সে যেন হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়।

তারপর সুস্থ হইয়া বলিল,—মরেছেন! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, ও-কাজও করবেন না। আপনি তো মশাই, ভীষণ লোক। আমি ভাবতাম···

বিলাসের হাসি এবং ছাদের উপর ছুটাছুটি দেখিয়া তপন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কেবলই বোকার মতো হাসিতেছিল। কিন্তু তাহার শেষের কথা শুনিয়া বিরক্ত হইল; কহিল,—ওসব আবার কি বলছেন,—ভদ্রলোকের মেয়ের সম্বন্ধে?

কিন্তু বিলাস তাহাতে কিছুমাত্র দমিল বলিয়া মনে হইল না। ছাদের উপর তপনের যে চৌকিটা পড়িয়া পড়িয়া অপর্য্যাপ্ত রৌদ্র ও বৃষ্টি উপভোগ করিতেছে তাহাতে একটা তেহাই দিয়া বলিল,—আমার কথা এখন তেতো লাগছে মশাই, কিন্তু পরে বুঝবেন। জানেন তো,—"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কোথা কে ধরা পড়ে কে জানে!" বলিয়াই গান ধরিয়া দিল,—"বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে···"

কথাটা এমনি ভাবে উড়াইয়া দেওয়ায় তপন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। বিলাসও আর সকলের মতো ব্যাপারটিকে কদর্য্য করিয়া দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। তপনের মনে হইতেছিল, এ কথা বিলাসকে না বলিলেই ছিল ভালো। কেন মরিতে বলিতে আসিয়াছিল!

ব্যাপারটিও এমন কিছুই নয়। একটি মেয়েকে সে পড়ায়। এমন বহু মেয়েকে বহু ছেলে পড়ায়। ইহার মধ্যে দোষের যদি কিছু থাকিত তাহা হইলে মেয়েদের অভিভাবকেরাই সর্ব্বাগ্রে সাবধান হইতেন। অবশ্য পৃথিবীতে অমিশ্রিত ভালো বলিয়া কিছুই নাই। কোথাও কোথাও গোলযোগ যে ঘটে না এমনও নয়। কিন্তু কোনো ভালো জিনিসকে গ্রহণ করিতে গেলে এটুকু মন্দের আশঙ্কাকে মানিয়া না লইয়া উপায় নাই। অন্যথায় মেয়েদের লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

একটি মেয়েকে সে পড়ায়। সে মেয়ে তাহার পানে চটুল চোখে চাহেও না, তাহাকে গলাধঃকরণ করিবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়াও নাই। অথচ এমনি মানুষের মন যে, এই সামান্য এবং নিতান্ত সাধারণ কথাটা শুনিবামাত্র কেহ বা চোখ মট্‌কাইয়া হাসিবে, কেহ বা কাসিবে, কেহ বা ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি টানিয়া বলিবে, বেশ!

তপন বিরক্তভাবে একটু দূরে ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিলাস আসিয়া তাহার কাঁধের উপর হাত দিল। তপন কিছুই বলিল না। যেমন অন্যমনস্কভাবে দূরের দিকে চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

বিলাস আস্তে আস্তে বলিল,—রাগ ক'রেছেন?

তপন শুধু বলিল,—না। রাগ করব কেন?

—মশাই, আমি পাগল-ছাগল মানুষ। আমার কথায় কেউ রাগও করে না, কেউ গ্রাহ্যও করে না। আমার সঙ্গে তাই কেউ পরামর্শ করতে আসেও না। আসল কথা কি জানেন, মানুষের মন বুঝে মনের মতো কথা বলতে

আমি আজও শিখলাম না। অনেক ক্ষতিও হয় তার জন্যে।

একটু থামিয়া বিলাস আবার বলিল,—চুলোয় যাক মশাই। সেই জন্যে আমি কারও কথায় থাকিও না। আমি, বাবা, আসি যাই গুলি খাই, মাথা তো কখনও দেখি নি। বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বিলাস বলিল,—কিন্তু আমার মনে হয় মশাই, আপনি বরং ভালোই আছেন। মেয়েরা কাছের চেয়ে দূরে থাকলেই সাঙ্ঘাতিক। মেয়েদের সঙ্গ যারা পায় তাদের মনে পাপ জমে কম। যারা পায় না, যেমন আমাদের গোলোকবাবু···যাক্ গে মশাই, ও-সব পরের কথায় কাজ নেই। কিন্তু আপনি আমার গানটা শুনলেন না?

অস্থিরভাবে বাঁ হাতের উপর ডান হাত দিয়া চট্ করিয়া তালি মারিয়া বিলাস বলিল,—উঃ! বাদল গোঁসায়ের মতো গলা যদি পেতাম!

বিলাসের কথা শুনিয়া তপন হাসিয়া উঠিল। বলিল,—আপনার যত গান ছাদে, আর বাথরুমে। একদিন হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাইতে তো শুনলাম না।

বিলাস বিষণ্ণ ভাবে বলিল,—হারমোনিয়মে আমার সুবিধে হয় না।

—কেন?

—কি জানি, মশাই! হাত চলে তো গলা চলে না, গলা চলে তো হাত চলে না। ভাবই আসে না। তার চেয়ে মশাই এ ভালো—"বাংলা মা তোর···"

সেই রাত্রে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিল।

গ্রীষ্মকালে মেসের প্রায় সকলেই ছাদে শোয়। কেবল দাদু আসেন না। ভদ্রলোক অহিফেণ সেবনের পর একতলায় নিজের ঘরেই পড়িয়া থাকেন। আর আসে না তেতলার গোলোক বাবু। কেন যে আসে না তাহা সকলেই জানে, এবং নিজেদের মধ্যে টেপাটেপি করিয়া হাসেও। কেবল জানে না তপন। কোনো দিন জানিবার চেষ্টাও করে নাই।

রাত তখন বারোটা কিম্বা তাহারই কাছাকাছি। তখনও সকলে ঘুমায় নাই। এক এক জায়গায় জটলা পাকাইয়া শুইয়া ফিস্ ফিস করিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ নীচে কাহার স্খলিত কণ্ঠের চীৎকারে সকলেই লাফাইয়া উঠিল। এ মেসে এ চীৎকার কাহারও অপরিচিত নয়। মাসের মধ্যে দুই-একবার এইরূপ কাণ্ড হয়। তখন সকলেই সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসে। বিশেষ করিয়া আজ মাসের পয়লা তারিখ। আজ যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিবে এরূপ আশঙ্কা সন্ধ্যা হইতেই সকলে করিতেছিল।

সকলে যখন ছুটিয়া নামিয়া আসিল, তখন দেখা গেল, মোহিত বাবু বারান্দার রেলিং ধরিয়া বসিয়া সশব্দে হুড় হুড় করিয়া বমি করিতেছে। আর সেখানে এত দুর্গন্ধ উঠিয়াছে যে কাহারও কাছে যাইবার উপায় নাই।

এ সমস্ত বিষয়ে বিলাস সকলের অগ্রণী। সকলে যখন নাকে কাপড় দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া, তখন সে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া মোহিতের মুখ ধোয়াইয়া দিল, পরিধানের শ্লথ বস্ত্র ঠিক করিয়া দিল। তাহাকে কোলে তুলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিবার শক্তি তাহার ছিল না। বলিল,—উঠুন।

মোহিত উঠিবার কোনো লক্ষণ দেখাইল না। কম্পিত ডান হাতখানি বাড়াইয়া বিলাসের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল,—বিলাসবাবু, এই শেষ। আর কোনো দিন নয়।

বিলাস তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিয়া বলিল,—ও কি! পায়ে হাত দিচ্ছেন কেন?

মোহিত তেমনি ভাবে বসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—একশো বার হাত দোব। দোব না? আপনি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লে কি হবে, বুদ্ধিতে বড়। পায়ে হাত দোব না?

—আচ্ছা, বেশ। এইবার উঠুন।

—আজ্ঞে না। আগে আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলব যে, আর কোনো দিন মদ ছোঁব না, তারপর উঠ্‌ব।

বিলাস তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল,—আচ্ছা, খুব প্রতিজ্ঞা হ'য়েছে। এইবার উঠুন।

মোহিত টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে আসিল। তাহার তখন দাঁড়াইবার শক্তি নাই। শুধু মেঝের উপরেই সে শুইতে যাইতেছিল। বিলাস ধমক দিয়া বলিল,—আবার ও কি হচ্ছে? দাঁড়ান, বিছানাটা পেতে দিই।

মোহিত অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল,—আজ্ঞে না।

কিচ্ছু দরকার নেই। আমি এই পা-পোষের ওপর চমৎকার শোব।

এ কথায় বিলাস না হাসিয়া থাকিতে পারিল না; কিন্তু পাশেই গোলোক এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। এইবারে ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল,—কেন আবার ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন মশাই? বাইরে তো বেশ ছিল।

বিলাস চুপি চুপি বলিল,—বমি ক'রেছেন যে!

গোলোক কিন্তু অত খাতির করিয়া কথা বলিতে পারিল না। সে বেশ জোরে জোরেই বলিল,—আবার ঘরেও তো বমি করবেন? গন্ধে ভূত পালাবে। মাতালের কাণ্ড তো!

মোহিত সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝাঁকি দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—মাতালের কাণ্ড! আমি মাতাল? আলবৎ মাতাল! আমি মদ খাই। টাকা দিই তবে মদ খাই। কিন্তু তোমার মতো ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে তো চাই না।

হঠাৎ যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল। কিন্তু কথাটা মাতালের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য বলিল,—Nonsense!

মোহিত ইহার উত্তরে আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু বিলাস তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিল,—আবার কথা বলছেন? শুয়ে পড়ুন।

মোহিত নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া বলিল,—আজ্ঞে, এই শুলাম। ব্যস্, আর কথাটি কইব না।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পরিষ্কার করিয়া না বলিলে গোলোকের প্রতি অবিচার করা হইবে। গোলোক অসচ্চরিত্র নয়; বরং সাধারণতঃ আমরা যাহাদের সচ্চরিত্র বলি তাহাদেরই অন্তর্গত। কোনো প্রকার নেশা সে করে না, এমন কি পান-সিগারেট পর্য্যন্ত না। অন্য কোনো প্রকার বদখেয়ালও নাই। কেবল মোহিত যাহা বলিল, তাহার চরিত্রে সেই একটুখানি মাত্র কলঙ্ক।

কিন্তু তাও শুধুই চাওয়া, অত্যন্ত সঙ্গোপনে লুকাইয়া দেখা। কেহ এ কথা বলিতে পারিবে না যে, কোনো মেয়েকে দেখিয়া সে কোনো দিন হাসিয়াছে, কিম্বা কাহাকেও দেখিয়া রুমাল উড়াইয়াছে, অথবা অন্য কোনো প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছে। যাহাদের সে লোলুপ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, প্রায়শঃই তাহারা জানিতে পর্য্যন্ত পারে না যে, গোলোক তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ভালো-মন্দ নানা প্রকার মেয়েই তো আছে। বরং এমনও হইয়াছে যে, মেয়েদের চোখে চোখ পড়িলে সেই সর্ব্বাগ্রে চক্ষু নামাইয়াছে।

হয়তো এ এক প্রকার রোগ। মেয়েদের চোখে চোখ মেলিয়া চাহিতে পারে না, লুকাইয়া দেখে। তাহার ঘরের দক্ষিণের জানালা খুলিলেই ওদিকের বড় একটা বাড়ীর অন্দর মহল। তাহাদের মুক্ত জানালা দিয়া দেখা যায় গিন্নী, বউ, ঝি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখনও ঘরের ভিতরে, কখনও বা বারান্দা দিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। আর গোলোক তাহার ভাঙ্গা তক্তাপোষে শুইয়া একখানা বই আড়াল দিয়া অপাঙ্গে তাহাদের নিরীক্ষণ করিতেছে। বই আড়াল দেওয়া শুধু ও-বাড়ীর মেয়েদের ভয়ে নয়, মেসের ছেলেদের চোখেও ধূলি দেওয়ার উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু মেসের ছেলেদের কিছুই জানিতে বাকী নাই। অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মোহিত মাঝে মাঝে সে কথার উল্লেখ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেও চাপিয়া যায়।

ব্যাধিই বটে। হয় তো দেখিতে পায় শুধু দুখানি পা, নয় তো শাড়ীর প্রান্ত, বড় জোর সালঙ্কার মণিবন্ধ। জানালার পর্দ্দা প্রায়ই বন্ধ থাকে। কেবল ও-বাড়ীর একটি মেয়ে বড় বেহায়া। সে মাঝে মাঝে পর্দ্দাটা সরাইয়া দিয়া জানালার পাশের খাটখানিতে সুন্দর দেহ এলাইয়া দিয়া বুকের উপর একখানি বই রাখিয়া পড়িতে বসে। তাহার দিকে মেয়েটি চায় কি না, তাহা সে আজও ধরিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার দৃঢ় বিশ্বাস চায়। গোলোকের চেহারা মেয়েদের দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মতো নয়। কিন্তু নিজের চেহারা সম্বন্ধে সকল মানুষের মতো সেও যথেষ্ট সচেতন নয়।

মাঝে-মাঝে মেয়েটি ঠোঁট দুখানি ঈষৎ ফাঁক করিয়া কুন্দ দন্তে হাসে। কিন্তু সে হাসি পুস্তকের অংশবিশেষ পড়িয়া, অথবা তাহাকেই ইঙ্গিত করিয়া, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিবার কোনো উপায় নাই। তথাপি গোলোক তাহার ভাঙ্গা তক্তাপোষে শুইয়া মনে মনে পুলকিত হইয়া ওঠে এবং কিছুক্ষণের জন্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া যায়।

মাঝে মাঝে মেয়েটির স্বামী আসে। অতি সুপুরুষ চেহারা। এই বাড়ীটি, কিম্বা এই মেয়েটি অথবা তাহার স্বামী সম্বন্ধে কোনো কথাই গোলোক জানে না। জানা তাহার পক্ষে সম্ভবও নয়। তবু দীর্ঘদিন এই মেসে থাকিয়া এবং ইহাদের দেখিয়া সে ইহাদের সম্বন্ধে একটা কাহিনী নিজের মনেই তৈরী করিয়া লইয়াছে। সে কাহিনীর সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। মাঝে মাঝে তাহার অনুমানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ঘটনার মিল হয় না। তখন সে আবার সেই কাহিনীর কিছু অদল-বদল করিয়া প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে।

তাহার বিশ্বাস এই মেয়েটার স্বামী কাছেই কোথাও চাকরী করে, এবং সম্ভবতঃ ভালো চাকরীই করে। কিন্তু সে জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হউক, সেখানে বাসা করিয়া স্ত্রী লইয়া যাইবার সুবিধা নাই। হয় তো দেশে ভদ্রলোকের বাপ-মাও নাই। সেখানেও একা থাকিতে মেয়েটির নিশ্চয়ই আপত্তি আছে। তাই সে বারো মাস বাপের বাড়ীতেই থাকে।

হয় তো এ তাহার নিছক কল্পনা। ও ভদ্রলোক হয় তো মেয়েটির স্বামীই নয়। মেয়েটি বিধবা হইতেও পারে। অল্প বয়সে বিধবা হইলে অনেক মেয়েরই বাপ-মা তাহাকে নিরাভরণ করিয়া এবং থান পরাইয়া রাখেন না। কিম্বা হয় তো মেয়েটির এখনও বিবাহই হয় নাই। অত বড় অবিবাহিতা মেয়ে আজকাল অনেক বাড়ীতেই দেখা যায়। সিন্দুর? তা বটে! কিন্তু আজকাল সীমন্তের সিন্দুররেখা ক্রমেই যেরূপ শীর্ণ হইতে শীর্ণতর হইতেছে তাহাতে এতদূর হইতে মেয়েটির সীমন্তে সিন্দুর আছে কি না বলা কঠিন।

কিন্তু সে যাহাই হউক, গোলোকের ধারণা মেয়েটি বিবাহিতা এবং ওই ভদ্রলোকই তাহার স্বামী। এবং তাহার অনুমানের প্রমাণ স্বরূপ এ কথা উত্থাপন করা চলে কি না জানি না, কিন্তু ইহা সত্য যে, ভদ্রলোক আসিলে মেয়েটিকে আর মুক্ত বাতায়ন-পাশে খাটের উপর শুইয়া নভেল পড়িতে দেখা যায় না। সন্ধ্যা-বেলায় ঘরের আলো জ্বালিয়া চম্পক অঙ্গুলি দিয়া আর সে পর্দ্দা সরাইয়া দেয় না। বারে বারে আর সে কারণে-অকারণে ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে না। মেয়েটিকে আর সে-কয়দিন দেখা যায় না। শুধু তাহার সুতীক্ষ্ণ উচ্চ হাস্যধ্বনিতে গোলোকের রক্ত চঞ্চল হইয়া ওঠে। শনি, রবি দুইটা দিন। সোমবার সকালে ভদ্রলোক চলিয়া যায়। গোলোক অধীর ভাবে সোমবারের প্রতীক্ষায় থাকে। সোমবার সন্ধ্যায় আবার তাহার দেখা পাইবে।

কোনো মেয়ে তাহার পানে চাহিলেই ধারণা করিয়া বসিবে মেয়েটি তাহাকে ভালোবাসে, এ বয়স গোলোকের পার হইয়া গিয়াছে। মেয়েটি তাহাকে ভালোবাসে এমন সন্দেহ ভ্রম-ক্রমেও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সে নিজেও বিবাহিত। ভালোবাসার আস্বাদ তাহার অবিদিত নয়। সেও যে মেয়েটিকে ভালোবাসিয়া ফেলে নাই এ সম্বন্ধেও কোনো সংশয় নাই। তবু ওই এক আনন্দ!

মেসের জীবনে মানুষের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। স্নেহ-মায়া-মমতা এখানে দুর্লভ। মা নাই, বোন নাই, পত্নী নাই,—যাহারা পুরুষের জীবন মধুময় করিয়া তোলে, তাহাদের স্নেহস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার ফলে নারী সম্বন্ধে মানুষের মনের অন্ধকারে-অন্ধকারে বহু অপৌরুষেয় এবং লজ্জাকর কামনা বাসা বাঁধে। ইহাকে অভিশাপই বলুন, আর ব্যাধিই বলুন, ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া মেসের জীবনে কঠিন।

মধ্যে খোলার বস্তি। ওদিকে বড় বাড়ীটার আলোকোজ্জ্বল কক্ষে একটি মেয়ে সুকোমল শয্যায় শুভ্র-সুন্দর দেহ এলাইয়া আপনার মনে পড়ে, আর এদিকে সে। গোলোকের জীবনে ওই এক আনন্দ। ভালোবাসা নয়,—কৌতূহল। তাহার কাছে সুন্দরী তরুণীটি একটি অদ্ভুত রহস্য, উর্ণনাভের মতো তাহার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-গ্রাম অতি সূক্ষ্ম লূতাতন্তু দিয়া আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

(৬)

সেদিন দুপুর বেলায় সকলে আফিস চলিয়া যাওয়ার পর তপন চুপ করিয়া নিজের ঘরে একলা বসিয়া ছিল। আগের দিন ল্যাম্বেথ এণ্ড কোম্পানীর আফিসের চাকরীর আশা শেষ হইয়া গিয়াছে। সেখানকার আফিসের বড় বাবু তাহাদের নিকট আত্মীয়। তপন বি-এ পাশ করার পর হইতেই তিনি তাহাকে একটা চাকুরী করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি একটা

চাকুরী খালি হইয়াছিল। ল্যাম্বেথ কোম্পানী কয়েকটি বিদেশী ঔষধের এজেন্ট। আফিসটি বড় নয়। জন তিনেক সাহেব, জন তিনেক মেম এবং পঁচিশ-ত্রিশ জন বাঙালী কেরাণী কাজ করে। তাহাদের 'নমুনা বিভাগে' একটি কর্ম্ম খালি হয়। কাজ কিছুই নয়,—লেবেল ও খামের ঠিকানা লেখা। পঁচিশ টাকা মাহিনা। পেটের দায়ে তপন সেই চাকুরীরই উমেদার হয়। বড় বাবু অনেক আশা দিয়াছিলেন। কিন্তু গত কল্য তিনি তপনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যে, নিজের বিদ্যা, নিজের বুদ্ধি এবং নিজের জীবনের উপরও তপনের ঘৃণা হইয়াছে।

ট্যুইশান তাহার অনেকগুলি আছে। মাহিনাও এই চাকুরীটির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাহার উপর তো নির্ভর করা চলে না। ট্যুইশান আজ আছে, কাল নাই। সেই জন্যই তপন লেবেল-লেখা চাকুরীর প্রার্থী হইতেও সম্মত হইয়াছিল; এবং বহুদিন ধরিয়া বড় বাবুর বাসায় এবং আফিসে হাঁটাহাঁটি ও খোসামোদ করিতেছিল।

বহুদিন অর্থাৎ প্রায় বৎসর খানেক। তখনও এই চাকুরীটি খালি হয় নাই। ঘুরিতেছিল আশায় আশায়। বড় বাবু তাহাদের দেশের লোক, একটু আত্মীয়তাও আছে। এক কালে ইঁহাদের অবস্থা ভালো ছিল না। সে সময় নানা ভাবে ইনি তপনের পিতার নিকট হইতে বহু উপকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু বহু উপকার সত্ত্বেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। মনের দুঃখে কলিকাতায় অতি সামান্য বেতনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ক্রমশঃ পদোন্নতি হইতে হইতে অবশেষে বড় বাবু হন।

বড় বাবু হইলেও চাল বাড়ান নাই। নিজে প্রত্যহ বাজার করেন, এবং সংসারে একটি ভৃত্যের কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করেন। একজোড়া ছেঁড়া জুতা, এবং এক জোড়া গলাবন্ধ কোট, পোষাক বলিতে তাহাই। আফিসের পুরাতন লোকেরা বলে, ওই এক জোড়া কোটই তাহারা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। তাহাদের আরও বিশ্বাস আছে, এই আফিসে একটি চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে ওই দুটি কোটও পুত্রের গায়ে চড়াইয়া দিয়া কিছুকাল পরে তিনি বিশ্রাম লইবেন। কিন্তু সে কালের এখনও অনেক দেরী। এখন হইতে গোঁফে তেল দিয়া লাভ নাই।

তাহার পিতার কাছ হইতে পত্র লইয়া প্রথম যখন তপন বড় বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তিনি তাহাকে পরম সমাদরেই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যত দিন যাইতে লাগিল সমাদরও ততই মন্দীভূত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাহার নিজের উপরই বিতৃষ্ণা ধরিত। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হইত আর তাঁহার কাছে গিয়া কাজ নাই। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই সকল হীনতা গায়ে মাখিয়া বারে বারে তাঁহার দ্বারস্থ হইতে হইত।

নিকষকৃষ্ণ স্থূল দেহে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে সরিষার তৈল মর্দ্দন করা তাঁহার একটা বিলাস। তপনের তাঁহার সহিত দেখা করিবার সময়ও ছিল এইটা। বড় বাবু একখানি ছোট্ট মলিন বস্ত্র পরিয়া তাহার উপর একখানি গামছা জড়াইয়া তেল মাখিতেন, আর সে পাশে বসিয়া সাংসারিক অভাব-অভিযোগ বিবৃত করিত।

বড় বাবু সমস্তই ধীরভাবে শ্রবণ করিতেন। অবশেষে মাথা দোলাইয়া বলিতেন,—সবই তো বুঝছি হে, কিন্তু কি করা যায় বল? প্রথমত চাকরী কোথাও খালি নেই। আবার তাও বলি, আজকালকার ছেলেরা ওই বি-এ, এম-এ পাশই করে, কিন্তু কিচ্ছু শেখে না। আমার এসিষ্ট্যাণ্ট আছে,—এম-এ পাশ। কিন্তু তার অর্দ্ধেক কাজ আমাকেই ক'রে দিতে হয়।

বলিয়া অদূরবর্ত্তী গৃহিণীর দিকে একবার অপাঙ্গে চাহিতেন। উদ্দেশ্য স্বামীর বিদ্যাবুদ্ধির গভীরতা তিনি একবার উপলব্ধি করেন।

—সাহেব তখনই বলেছিল, মুখার্জ্জি, ও এম-এ-টেমে নিও না। ভালো দেখে চালাক-চতুর একটি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা ছেলে নাও। গ'ড়ে-পিটে মানুষ ক'রে নিতে পারবে। আমার মতিচ্ছন্ন! নিলাম তাকে। এখন নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। সাহেব আমার দুর্দ্দশা দেখে, আর হাসে।

গৃহিণী মনে মনে পতিগর্ব্বে পুলকিত হইয়া উঠিয়া মুখে বলিতেন,—তা বাপু, তুমি কতকাল রয়েছ। আর এরা ছেলেমানুষ, নতুন ঢুকেছে।

বড়বাবু বাধা দিয়া বলিতেন,—নতুন-পুরোনোর তো কথা নয় গিন্নি,—নতুন আমরাও একদিন ছিলাম। কিন্তু আমরা কোনো দিন এমন ভুল করতাম না। এরা ভুল

করবে পদে-পদে। অথচ অহঙ্কার আছে ষোলো আনা। কি? না, এম-এ পাশ!

গৃহিণী অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিতেন,—হাঁ গা, তা আমাদের কেষ্ট যে কাজ করে তাও একটা জুটিয়ে দিতে পার না তপনের জন্যে?

কেষ্ট বড়বাবুর আফিসের প্যাকার। মালপত্র প্যাক করে, আর বড়বাবুর বাড়ীতে বিনা বেতনে সকালে-সন্ধ্যায় ফাই-ফরমাস খাটে। তপন মাথা নীচু করিয়া এই সকল কথা শুনিত, আর মনে-মনে ভাবিত, ধরণী দ্বিধা হও!

নির্জ্জন গৃহকোণে একা বসিয়া তপন আপনার দুরদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ ভুবনদা হুঁকা হাতে প্রবেশ করিলেন।

—কি করছেন? স্নানাহার হ'য়ে গেছে?

তপন তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিয়া ভুবনদাকে বসিবার জন্য জায়গা দিল। বলিল,—বসুন। না, এখনও হয় নি। আপনার হ'য়ে গেছে নাকি?

—না, এই তো আস্‌ছি।

বলিয়া তাম্রকূট সেবনের ফাঁকে ফাঁকে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিলেন।

তপনের সঙ্গে ভুবনদা'র মাখামাখি খুব বেশী নয়। কতকটা নবাগত বলিয়া সে ভুবনদা'র সঙ্গে এখনও পর্য্যন্ত হাসি-তামাসা করে না। কে জানিত, এই ভদ্রতার জন্য সে এরূপ বিপদে পড়িবে!

একটা শোষ-টান দিয়া প্রচুর ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে ভুবনদা হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। তারপর কোঁচড় হইতে একটা চিরকুট বাহির করিয়া বলিলেন,—দেখুন তো একবার, হ'য়েছে কি না! আপনারা বিদ্বান লোক, তাতে হালফ্যাশানের ছেলে। আপনাদের একবার দেখিয়ে নেওয়া ভালো।

চিরকুটে লেখা আছে:

প্রিয়তমে,

তুমি তো কাঁদিতেছ বসিয়া ঘরের ভিতরে।
আমিও কাঁদিতেছি বসিয়া মেসের ভিতরে॥
মনে ভাবিতেছি বুঝি পাগল হইয়া যাই।
কাজ কর্ম্ম করিতেছি বটে কিন্তু মন ভালো নাই॥
বিধি যদি পাখা দিতেন উড়িয়া যাইতাম বাড়ী।
আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে দিয়া দিগ্‌ গড়ি॥
সাগর যদি কালি হইত মৈনাক লেখনী।
তোমায় কত ভালোবাসি জানাইতাম এখনি॥
একে মন উড়ু উড়ু প্রাণসখি তাহাতে
ডাকতেছে কোকিল।

তপন সুগভীর বিস্ময়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রতি চাহিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল,—হচ্ছে?

উহার পরে তাহার মতো শান্ত ছেলেরও [illegible]ও পরিহাস করিবার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল।

সে সোল্লাসে বলিল,—চমৎকার হচ্ছে। কিন্তু···

ভুবনবাবু হুঁকা তুলিয়া লইতেছিলেন। আবার নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন,—কিন্তু শেষটা এখনও মিল ক'রে উঠ্‌তে পারি নি। কোকিলের সঙ্গে কি মিল করা যায় বলুন তো? অবিশ্যি একটু ভাবলেই হয়, কিন্তু বেলা হ'য়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে এলাম। খেয়েই একবার যেতে হবে গরাণহাটায়। এক খদ্দেরের বাড়ী তাগাদায়। বিভ্রাট কত।

তপন একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া বলিল,—কোকিলের সঙ্গে মিল? উকিল দিয়ে মিল করা যায়। কিন্তু···

ভুবনবাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—উকিল আবার কি ক'রে আনা যায়?

চট্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পকেট হইতে ফাউন্টেন পেন বাহির করিয়া তপন বলিল,—আনি, দেখুন তো। বলিয়া শেষ লাইনের নীচে বসাইয়া দিল:

আমি যেন ফাঁসির আসামী আর তুমি যেন উকীল॥

এমন চমৎকার মিল দেখিয়া ভুবনবাবুর তাক্‌ লাগিয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই লাইনটির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত. কণ্ঠে বলিলেন,—সার্থক লেখাপড়া শিখেছিলেন মশাই। এ মিল আমি সাত জন্ম ঘুরে এলেও করতে পারতাম না। কথায় বলে 'বিদ্যের জাহাজ'! জাহাজই বটে মশাই! আশ্চর্য্য! বলিয়া কাগজের টুকরাটা ভাঁজ করিয়া কোঁচড়েও গুঁজিতে গুঁজিতে বলিলেন,—তবে লিখতে লিখতে আমারও কিছু কিঞ্চিৎ হবে। কি বলেন?

ভুবনবাবু খড়মের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

ভুবনবাবু চলিয়া যাওয়ার পরেও তপন অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। যে সময়কে যৌবনকাল বলে সে তাহাতে পদার্পণ করিয়াছে। কিছু লেখাপড়াও শিখিয়াছে যাহাতে, আজ না হউক, দুই দিন পরেও দু' মুঠা অন্ন সংস্থান করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইবে না। তাহার যে বয়স তাহাতে নারীর আকর্ষণ কম নয়। তথাপি বিবাহের নাম শুনিলে সে ভয় পায় এবং পিতামাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতে বিবাহ করিতে সম্মত হইতেছে না। আর এই ব্যক্তি যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়াও অবলীলাক্রমে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া বসিলেন। প্রথমা পত্নীর দীর্ঘদিনের স্মৃতি, বড় বড় ছেলেমেয়ের নিঃশব্দ কাকুতি, আত্মীয়-স্বজনের নিষেধ, কিছুই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না।

শুধু তাই নয়। ভুবনবাবু সর্ব্বপ্রকার প্রাচীনত্ব নির্ম্মোকের মতো ত্যাগ করিয়া অতীত যৌবনকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কি দুঃসাধ্য সাধনাই না করিতেছেন! সে বিদ্যাসাগরী চুলছাঁটা আর নাই, হাল-ফ্যাশানে ছাঁটিতেছেন। কলপের কল্যাণে কাঁচা-পাকা কেশরাজি ভ্রমরকৃষ্ণ হইয়াছে। মুস্কিল হইয়াছিল গোঁফ জোড়া লইয়া। সেখানে আর কলপ কাজ দিতেছে না দেখিয়া তাহাও অবশেষে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছেন।

অথচ ইহাকে বিড়ম্বনাও বলা চলে না। ভুবনবাবুর মুখে দুঃখের চিহ্নমাত্র নাই,—দুঃখেরও না, লজ্জারও না। ভাস্কর যেমন করিয়া তাহার সৃষ্টিকে নিখুঁৎ করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে, এই বৃদ্ধ নিজের দেহকে লইয়া সেইরূপ সাধনা সুরু করিয়া দিয়াছে।

হয়তো একটু ভয়ও আছে। ভরা যৌবনে পুরুষ মানুষের নিজেকে রমণীরঞ্জন করিবার কথাটা এমন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। কম মূলধনে বড় কারবার ফাঁদিবার চেষ্টা করিতে হয় ভয় তাহাদের পদে পদে। তাহাদেরই বহিরবয়বের চাকচিক্য সাধনে যত্নবান হইতে হয়। লোকচক্ষুকে ফাঁকি দিবার জন্যও নানা চেষ্টা করিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

বাংলা কবিতায় সংস্কৃত ছন্দ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ সম্বন্ধে বৈশাখ মাসের (১৩৪১) 'উদয়নে' রবীন্দ্রনাথ যে আলোচনা করেছেন, তা সকলেরই বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর কয়েকটি উক্তিকে উপলক্ষ ক'রে ও বিষয়ে আমার মনে যে কথাগুলি উদিত হয়েছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকদের কাছে তাই নিবেদন করব।

সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় অনুসরণ করা যায় প্রধানত' তিনটি রীতিতে। প্রথম রীতিটি হচ্ছে বাংলায় সংস্কৃত পদ্ধতিতে স্বরবর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ চালানো। দ্বিতীয় রীতি হচ্ছে "সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘহ্রস্ব স্বরকে সমান কোরে নিয়ে কেবলমাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা" করা। আর তৃতীয় রীতি হচ্ছে বাংলা উচ্চারণ-পদ্ধতি ঠিক রেখে সমস্ত অযুগ্ম ধ্বনিকে লঘু এবং যুগ্ম ধ্বনিকে গুরু গণ্য ক'রে সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ করা।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বহু কবি প্রথম পদ্ধতিতে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরগোবিন্দ লস্কর, বলদেব পালিত, ভুবনমোহন রায় চৌধুরী (ছন্দঃ কুসুম-রচয়িতা), শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু এঁদের কারও প্রয়াসই সফল হয় নি, অর্থাৎ বাংলায় সংস্কৃত ভঙ্গীর হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ চালানো সম্ভব হয় নি। কেন না ও রকম উচ্চারণ বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। উক্ত রচয়িতাদের মধ্যে শক্তিমান্

কবি বিজয়চন্দ্রের প্রয়াসকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। তিনি "ফুলশর" গ্রন্থে এ প্রণালীতে বহু সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় তর্জ্জমা করেছেন। অথচ তাঁর প্রয়াসও যে সফল হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। এসব কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সংস্কৃতের অনুকরণে বাংলা স্বরবর্ণে হ্রস্বদীর্ঘতার প্রচলন করতে গেলে এ কৃত্রিমতা বেশীক্ষণ সয় না। তার অসঙ্গতি অধিকাংশ স্থলে ব্যঙ্গ কাব্যেরই প্রয়োজন মেটাতে পারে।" এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ-প্রাণ দউড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে গুরুজন বশে কিচ্ছু হয় না,
বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি পিরহনে মান রয় না।

এটা হচ্ছে শিখরিণী ছন্দ, আর শিখরিণী হচ্ছে "বড়ো বড়ো গুরুগম্ভীর চালের ছন্দ"-গুলির অন্যতম। অথচ উপরের দৃষ্টান্তটিতে ধ্বনির গৌরব এবং গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে হাল্‌কা ব্যঙ্গের সুর ফুটে উঠেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। এ উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের "আষাঢ়ে" কাব্যের দুটি কবিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি হচ্ছে "কলি যজ্ঞ" অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত এবং অপরটি "কর্ণবিমর্দ্দন-কাহিনী" পজ্‌ঝটিকা ছন্দে রচিত। সংস্কৃত ভঙ্গীর হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণকে কেমন চমৎকার ভাবে ব্যঙ্গ কাব্যের প্রয়োজনে লাগানো যায়, এ দুটি কবিতা তার অতি সুন্দর নিদর্শন। বাহুল্য-বোধে কোনো অংশ উদ্ধৃত করলুম না। 'হায় হায় হায় দিন চলি' যায়' ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের কৌতুক-সঙ্গীতটিও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু স্থল বিশেষে গম্ভীর ভাবের প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যেও সংস্কৃত-পদ্ধতির হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণের ব্যবহার করা চলে। রবীন্দ্রনাথের "দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী" এবং "মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে" এবং দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" প্রভৃতি রচনার ছন্দ সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, এই রচনাগুলি প্রথমত' পাঠ বা আবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে রচিত নয়, সুর ক'রে গাইবার জন্যে রচিত। আবৃত্তি বা পাঠ করার সময় সংস্কৃত পদ্ধতির দীর্ঘ উচ্চারণ অস্বাভাবিক লাগলেও গানের সুরের মধ্যে তা লাগে না। কারণ গানের দীর্ঘ সুরের প্রবাহের মধ্যে দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ বিলীন হ'য়ে যায়, তাই তার অস্বাভাবিকতা আমাদের শ্রুতিকে পীড়া দেবার অবকাশই পায় না। দ্বিতীয়ত' ঐ রচনাগুলি সাধারণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ব'লে এদের মধ্যে মাত্রাসমাবেশ বিষয়েও যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অনুকরণে প্রত্যেকটি স্বরকে লঘুগুরু হিসাবে যথানির্দ্দিষ্ট ভাবে বিন্যস্ত ক'রে আবৃত্তিযোগ্য গুরুগম্ভীর কবিতা রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল কেউ রচনা করেন নি।

সংস্কৃত ছন্দকে অনুসরণ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে "সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ হ্রস্ব স্বরকে সমান কোরে নিয়ে কেবল মাত্র মাত্রা মিলিয়ে ছন্দ রচনা করা।" এ রীতির প্রবর্ত্তক হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, আর রবীন্দ্রনাথও এ রীতির সমর্থক। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত রীতির মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে: মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রতি পংক্তিতে সতেরো অক্ষর বা সিলেব্‌ল্ এবং প্রতি পংক্তি তিন পদে বিভক্ত; প্রথম পদের চার অক্ষরে আট মাত্রা (কাজেই প্রত্যেকটি ধ্বনিই গুরু), দ্বিতীয় পদের ছয় অক্ষরে সাত মাত্রা (ষষ্ঠ ধ্বনিটি গুরু) এবং তৃতীয় পদের সাত অক্ষরে বারো মাত্রা (দ্বিতীয় ও পঞ্চম ধ্বনি লঘু)। কাজেই এ ছন্দে পাচ্ছি প্রতি পংক্তিতে সতেরো অক্ষরে মোট ৮+৭+১২ অর্থাৎ সাতাশ মাত্রা। রবীন্দ্রনাথ এ ছন্দটিকে বাংলায় তর্জ্জমা করেছেন এ ভাবে—

যক্ষ সে কোনো জনা | আছিল আনমনা, |
সেবার অপরাধে প্রভুশাপে
হয়েছে বিলয়গত | মহিমা ছিল যত, |
বরষকাল যাপে দুখতাপে।
—"নবছন্দ," পরিচয়, ১৩৩৯, কার্ত্তিক

তৃতীয় পদে 'প্রভুর শাপে' এবং 'দুঃখতাপে' লিখ্‌লেও ক্ষতি হ'তো না। তা-ছাড়া, 'আনমনা'-কে 'উন্মনা' এবং 'বরষকাল'-কে 'বর্ষকাল' লিখ্‌লেও চল্‌তো রবীন্দ্রনাথের রীতি অনুসারেই। যাহোক্, বাংলা ছন্দে একই ধ্বনি বিভাগে একটানা বারো মাত্রা হয় তো ঠিক্ মতো চলে না, বারো মাত্রার মাঝে একটি ছেদের অপেক্ষা থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তৃতীয় পদের বারো মাত্রাকে ভেঙে সাত ও পাঁচ মাত্রায় বিভক্ত করেছেন। যথা—

সারা প্রভাতের বাণী
বিকালে গেঁথে আনি

ভাবিনু হারখানি
দিব গলে।

—ছন্দ, উদয়ন, ১৩৪১, বৈশাখ

কিন্তু সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দে তৃতীয় পদে সাত মাত্রার পরে ছেদ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক নয়, যদিও বাংলায় তা আবশ্যক ব'লেই বোধ হয়। কাজেই ওই তৃতীয় পদে সংস্কৃত মন্দাক্রান্তার দীর্ঘ চাল রক্ষা করা কঠিন। যাহোক্, এবার দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

"রম্য এ যে উপবন!"
কহে~~সখি~~ তখন
ফিরাইয়া নয়ন
চৌদিক-পানে।
"পুষ্পলতা মিলি-জুলি'
সমীরে হেলি-দুলি'
করিছে কোলাকুলি
অভেদ প্রাণে॥"

—স্বপ্নপ্রয়াণ, প্রথম সর্গ, ২৫।

এটাও মন্দাক্রান্তার বাংলা তর্জ্জমা। দ্বিজেন্দ্রনাথও বাংলা ছন্দের রীতি অনুসারে মন্দাক্রান্তার তৃতীয় পদটিকে সাত ও পাঁচ মাত্রায় বিভক্ত করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ রকম ছন্দ-তর্জ্জমায় রবীন্দ্রনাথ যুগ্মধ্বনিকে সর্ব্বত্রই দুই মাত্রা ব'লে গণ্য করেন, আর দ্বিজেন্দ্রনাথ শব্দ-মধ্যবর্ত্তী যুগ্মধ্বনিকে এক মাত্রার বেশি মর্য্যাদা দেন নি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ছন্দকে তর্জ্জমা করেন পুরোপুরি মাত্রিক ভঙ্গীতে, আর দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন যৌগিক ভঙ্গীতে। তাই রবীন্দ্রনাথ এসব স্থলে যক্ষ, দস্ত প্রভৃতি শব্দকে তিন মাত্রা এবং নির্জ্জন, বিচ্ছেদ প্রভৃতি শব্দকে চার মাত্রার মর্য্যাদা দিয়েছেন। আর দ্বিজেন্দ্রনাথ রম্য ও পুষ্প শব্দে দুই মাত্রা এবং চৌদিক শব্দে তিন মাত্রা গণনা করেছেন।

যাহোক্, এই তর্জ্জমা-রীতিটিকেও নির্দ্দোষ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "বাংলায় দীর্ঘধ্বনি-গুলিকে দুই মাত্রায় বিশ্লিষ্ট ক'রে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্য্যাদা থাক্‌বে না" (পরিচয়—১৩৩৯, কার্ত্তিক, পৃঃ ১৮২)। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তাতে সংস্কৃত ছন্দের মোট আয়তনটা পাবেন, তার ধ্বনিতরঙ্গ পাবেন না" (উদয়ন—১৩৪১, বৈশাখ, পৃঃ ১২)। তা-ছাড়া, এ রীতিতে সংস্কৃত দীর্ঘ ধ্বনির উদার গাম্ভীর্য্যটুকুও থাকে না। আর সব চেয়ে বড়ো কথা এই যে, এই পদ্ধতিতে মোট মাত্রা পরিমাণ ঠিক থাক্‌লেও ধ্বনিসংখ্যা একেবারেই স্থির থাকে না, আর ধ্বনি-বিভাগও অনেক স্থলেই (বিশেষত' দীর্ঘ পদের ক্ষেত্রে) সংস্কৃতের অনুযায়ী হয় না। ফলে এ রকম তর্জ্জমায় মূলের ধ্বনি-মর্য্যাদা তো থাকেই না, মূলের বাহ্যরূপটি পর্য্যন্ত বজায় থাকে না। কাজেই তর্জ্জমাকে মূলের অনুরূপ ব'লে চেনাই যায় না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

লজ্জা বলিল, "হবে
কি লো তবে,
কত দিন পরাণ রবে
অমন করি।
হইয়ে জলহীন
যথা মীন
রহিবি ওলো কতদিন
মরমে মরি"।

—স্বপ্নপ্রয়াণ, দ্বিতীয় সর্গ, ১২৫।

এটা হচ্ছে সংস্কৃত শিখরিণী ছন্দের বাংলা তর্জ্জমা; ভঙ্গীটা পুরোপুরি মাত্রিক নয়, যৌগিক—তাই "লজ্জা" শব্দে দুই মাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু এটাকে কি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বা বাহ্যসাদৃশ্য কোনো হিসাবেই শিখরিণী ছন্দ ব'লে চেনা যায়? শিখরিণীকে রবীন্দ্রনাথ "বড়ো বড়ো গম্ভীর চালের ছন্দের" অন্তর্গত ব'লে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপরের দৃষ্টান্তটিতে ধ্বনির গাম্ভীর্য্য বা দীর্ঘ চালের পদমর্য্যাদা কোনোটাই বজায় নেই; শিখরিণীর দীর্ঘ চাল এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পর্ব্বেই খণ্ডিত হয়েছে। তাই বাহ্যসাদৃশ্যের পরিশেষটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। অবশ্য তর্জ্জমা হিসাবে গণ্য না ক'রে যদি স্বাধীন বাংলা ছন্দ হিসাবে গণ্য করা যায়, তাহ'লে বল্‌তে হবে এটিতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব আছে।

শিখরিণী ছন্দের প্রতি পংক্তিতে সতেরোটি অক্ষর বা ধ্বনি এবং প্রতি পংক্তি দুই পদে বিভক্ত; প্রথম পদে ছয় অক্ষরে এগারো মাত্রা (প্রথম ধ্বনিটি লঘু) এবং দ্বিতীয় পদে এগারো অক্ষরে চোদ্দ মাত্রা (ষষ্ঠ, সপ্তম এবং একাদশ ধ্বনিটি গুরু)। সুতরাং এ ছন্দে প্রতি পংক্তিতে সতেরো অক্ষরে মোট মাত্রাসংখ্যা হচ্ছে ১১+১৪ অর্থাৎ পঁচিশ।

উপরের দৃষ্টান্তটিতে দেখ্‌ছি দ্বিজেন্দ্রনাথ শিখরিণীর প্রথম পদের এগারো মাত্রাকে ভেঙে সাত ও চার মাত্রার দুটি পর্ব্ব রচনা করেছেন, আর শিখরিণীর চোদ্দ মাত্রার দ্বিতীয় পদটিকে ভেঙে নয় ও পাঁচ মাত্রার দুটি পর্ব্ব রচনা করেছেন। তাই তাঁর এই অভিনব ছন্দটির আসল প্রকৃতিটি ধরা পড়ছে সাত, চার, নয় ও পাঁচ মাত্রার চারটি পর্ব্বে। অথচ শিখরিণীর মাত্রিক প্রকৃতি নির্ভর করছে এগারো ও চোদ্দ মাত্রার দুই পদের উপর। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথের রচিত উক্ত দৃষ্টান্তের প্রতি পংক্তিতে শিখরিণীর ন্যায় মোট পঁচিশ মাত্রা থাক্‌লেও এটিতে শিখরিণী ছন্দের আভাসটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ শিখরিণীকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন এ ভাবে—

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমাসনে
যা-খুসি কহি কত।

এখানে দেখ্‌ছি রবীন্দ্রনাথ শিখরিণীর প্রথম পদটিকে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো ভাঙেন নি, এক বিভাগের মধ্যেই এগারো মাত্রার সমাবেশ করেছেন। কিন্তু শিখরিণীর দ্বিতীয় পদটিকে তিনিও দু ভাগে বিভক্ত করেছেন; প্রত্যেক ভাগেই সাত মাত্রা। অতএব রবীন্দ্রনাথের এ দৃষ্টান্তটির আসল রূপ নির্ভর করছে ১১ + ৭ + ৭ মাত্রার তিন বিভাগের উপর। তাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের রচিত দৃষ্টান্ত-দুটিকে অভিন্ন ব'লে মনে করার কোনো সঙ্গত কারণই নেই। অথচ এই দৃষ্টান্ত-দুটি একই শিখরিণী ছন্দের মাত্রিক রূপান্তর। সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ পদকে বাংলায় বিভিন্নরূপে খণ্ডিত করার ফলেই এই পার্থক্য ঘটে। অথচ এ পদ্ধতিতে সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ পদকে অখণ্ডিত অবস্থায় রূপান্তরিত করাও সম্ভব ব'লে মনে হয় না। অতএব সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করার এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিও সমীচীন ব'লে স্বীকার্য্য নয়। এ পদ্ধতিতে বহু নব নব বাংলা ছন্দোবন্ধ উদ্ভাবিত হ'তে পারে; কিন্তু এ পদ্ধতিতে সংস্কৃত ছন্দকে যথোচিতভাবে রূপান্তরিত করা যায় না।

সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করার তৃতীয় পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ। এ রীতি অনুসারে অযুগ্ম ধ্বনিকে লঘু এবং যুগ্মধ্বনিকে গুরু ব'লে গণ্য করতে হয়। এ রীতিতে সংস্কৃত ছন্দের মোট মাত্রা পরিমাণ ও ধ্বনিসংখ্যা দুটোই বজায় থাকে; কাজেই এ রীতিতে সংস্কৃত ছন্দের বাহ্য রূপটা অনেকটা অক্ষুণ্ণ থাকে। আর এ জন্যেই এই রীতিকে ছন্দ-তর্জ্জমার শ্রেষ্ঠ উপায় ব'লে গ্রাহ্য করা যায়। সত্যেন্দ্রনাথ 'কুহু ও কেকা'তে সর্ব্বপ্রথম এই রীতির প্রবর্ত্তন করেন। তার পর আধুনিককালে কালিদাস রায়, যতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নজরুল ইস্‌লাম প্রমুখ কোনো কোনো কবি এই রীতির অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ রীতিটিকেও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলা যায় না। কেন না এ রীতিতেও সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ ধ্বনির ঔদার্য্য বাংলায় রক্ষা করা যায় না এবং সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ পদকেও অখণ্ডিত ভাবে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায় না। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে না। প্রথমেই মন্দাক্রান্তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—

পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল্,
কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি' আজ
মন্দ্র মন্থর বচন কও;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ!
দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চ'লে যাও—
অঙ্গে হর্ষের পড়ুক্ ধুম।"

—সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, যক্ষের নিবেদন

স্রগ্ধরা ছন্দ মন্দাক্রান্তার প্রায় অনুরূপ (প্রবাসী—১৩৮, ফাল্গুন, পৃঃ ৭২০ দ্রষ্টব্য), কিন্তু তার চাল আরও দীর্ঘ এবং তার ধ্বনিও আরও গম্ভীর। স্রগ্ধরা ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত ক'রে দেখা যাক্ কেমন হয়—

সন্ধ্যার সুন্দর পটের গায়
এঁকেছেরে তুলি কার
চিত্র সুন্দর এমন হায়!
সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ-জাল
ম্লান হ'য়ে দূরে ওই
অস্ত যাত্রার বিদায় চায়।
কার ওই কণ্ঠের মধুর রব
মুখরিত করি দিক্
ভরল আজ মোর সুধায় প্রাণ;
বৃক্ষের পল্লব-ছায়ায় সব

কত যে রে শ্যামা পিক
ময়না বুল্‌বুল্‌ বিলায় তান।

মন্দাক্রান্তার ন্যায় স্রগ্ধরারও প্রতি পংক্তিতে তিন পদ। কিন্তু মন্দাক্রান্তার পংক্তিগুলি অসমপদী, আর স্রগ্ধরার পংক্তিগুলি সমপদী। মন্দাক্রান্তা ও স্রগ্ধরার প্রতি পংক্তির তৃতীয় পদটি অবিকল এক; মন্দাক্রান্তার দ্বিতীয় পদের আদিতে একটি লঘু ধ্বনি বসালেই স্রগ্ধরার দ্বিতীয় পদ পাওয়া যায়; আর মন্দাক্রান্তার প্রথম পদের শেষ দিকে একটি লঘু ও দুটি গুরু ধ্বনি যোগ করলেই হয় স্রগ্ধরার প্রথম পদ। আসল কথা এই যে, এ ভাবে মন্দাক্রান্তার অসমান পদগুলিকে সমান ক'রে নিয়েই স্রগ্ধরার উৎপত্তি হয়েছে। এ উপলক্ষে "চিত্রলেখা" ছন্দের গঠন-প্রণালীটিও আলোচনার যোগ্য। এ ছন্দটি হচ্ছে মন্দাক্রান্তা ও স্রগ্ধরার মধ্যবর্ত্তী। এ ছন্দের প্রথম পদটি মন্দাক্রান্তার প্রথম পদের সঙ্গে অবিকল এক; আর দ্বিতীয় পদটি স্রগ্ধরার অনুরূপ; তৃতীয় পদটি তিন ছন্দেই অবিকল এক। এর দ্বারাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধ্বনি ও পদের যোগ-বিয়োগের সাহায্যেই সংস্কৃত সাহিত্যে বহু ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। যা-হোক্, এবার শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এ ছন্দের চাল অতি দীর্ঘ এবং এর ধ্বনিও খুব গম্ভীর। তাই বাংলায় এ ছন্দকে রূপান্তরিত করা কিছু আয়াসসাধ্য। তবু চেষ্টা করা যাক্—

একদিন বুদ্ধ অশোক-রাজের ত্রিশরণের
ধর্ম্মের ছায়ায় বিশ্বজন,
আর তোর অশ্ব-ঘোষের ভাসের কালিদাসের
কাব্যের সুধায় মুগ্ধ মন,
তিব্বত চীন তো তোমার ক্ষেমের মহা প্রেমের
ধর্ম্মের জোরেই সভ্য হয়,—
তোর বুক-স্তন্য পিয়াই জগৎ এত মহৎ,
নয় এর কিছুই মিথ্যা নয়।

—স্মৃতিযজ্ঞ (লেখক), উদয়ন—১৩৪১, শ্রাবণ

এর প্রতি ছন্দ-পংক্তি দুই পদে বিভক্ত এবং প্রথম পদের বারোটি ধ্বনি ও দ্বিতীয় পদের সাতটি ধ্বনি লঘুগুরু হিসাবে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে বিন্যস্ত। এ ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করার সময় প্রথম পদের বারোটি ধ্বনিকে তিনটি চতুঃস্বর (tetrasyllabic) পর্ব্বে বিভক্ত করতে হয়েছে এবং দ্বিতীয় পদকে বিভক্ত করতে হয়েছে দুই পর্ব্বে। প্রথম পদের পর্ব্ব-তিনটি যথাক্রমে অন্তলঘু, দ্বিতীয়ান্তগুরু এবং অন্তগুরু; দ্বিতীয় পদের পর্ব্ব-দুটি যথাক্রমে তৃতীয়-লঘু চতুঃস্বর এবং মধ্যলঘু ত্রিস্বর (trisyllabic)। এ হচ্ছে এ ছন্দের ধ্বনিবিন্যাস-রীতি। আমার মনে হয় সংস্কৃত কিংবা ঐ জাতীয় কোনো ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে হলে ওসব ছন্দের প্রতি পংক্তি বা পদকে যথাসম্ভব চতুঃস্বর পর্ব্বে বিভক্ত ক'রে নিয়ে যথারীতি লঘুগুরু ধ্বনিবিন্যাস করা উচিত। অন্য রকম পর্ব্ব বিভাগ করলে কান সহজে প্রসন্ন হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সত্যেন্দ্রনাথ শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন এ ভাবে—

সিন্ধুর রোল | মেঘে ভিড়্‌ল আজ, | গরজে বাজ |
বিদ্যুৎ বিলোল | রক্ত চোখ!
ঝঞ্ঝার দোল | সারা সৃষ্টি ময় | জাগে প্রলয় |
তাণ্ডব্‌ বিভোল্‌ | ছায় দ্যুলোক।
বৃষ্টির স্রোত | করে বিশ্ব লোপ; | নিয়েছে খোপ |
নিশ্চুপ কপোত | নিশ্চপল;
পর্জ্জন্যের | চলে শূন্যে রথ, | ধ্বনি মহৎ; |
নির্জ্জন নীপের | কুঞ্জতল॥

—বেলা শেষের গান, বিদ্যুৎ-বিলাস

সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রে কাজী নজরুল ইস্‌লামও ঠিক্ এই ভঙ্গীতেই শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। যথা—

উত্রাস ভীম | মেঘে কুচ্‌কাওয়াজ; চলিছে আজ, |
সোন্মাদ সাগর | থায় রে দোল |
ইন্দ্রের রথ | বজ্রের কামান | টানে উজান |
মেঘ-ঐরাবত | মদ্‌-বিভোল।
যুদ্ধের রোল | বরুণের জাঁতায় | নিনাদে ঘোর, |
বারীশ্‌ আর্‌ বাসব | বন্ধু আজ।
সূর্য্যের তেজ | দহে মেঘ-গরুড় | ধূম্রচূড়, |
রশ্মির ফলক | বিঁধ্‌ছে বাজ॥

—ছায়ানট, পূবের হাওয়া

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে ধ্বনিবিন্যাসগত কিছু কিছু ত্রুটি আছে। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের নিয়ম অনুসারে 'বজ্রের কামান' না লিখে 'অশনির কামান', 'বারীশ্‌ আর্‌ বাসব'-এর স্থলে 'সিন্ধুর বাসব' এবং 'ধূম্রচূড়'-এর পরিবর্ত্তে

'ধূমাভ-চূড়' লিখ্‌লে ঠিক্ হ'তো। যাহোক্, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়ের দৃষ্টান্তেই পর্ব্বগঠনের ত্রুটি আছে ব'লে মনে করি। প্রত্যেক পংক্তির প্রথম পর্ব্বে তিনটি ও দ্বিতীয় পর্ব্বে পাঁচটি ধ্বনির সমাবেশ করা হয়েছে। এই দুটি পর্ব্ব কানকে কিছু পীড়া দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ রীতি হচ্ছে প্রতি পর্ব্বে চারটি ধ্বনির সমাবেশ করা। উক্ত দুটি পর্ব্বে এই সাধারণ রীতি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এ জন্যই ও-দুটি পর্ব্ব কানকে প্রসন্ন করতে পারছে না। প্রথম পর্ব্বে ধ্বনি তিনটি এবং দ্বিতীয় পর্ব্বে পাঁচটি—দুই পর্ব্বের এই ধ্বনিসংখ্যাগত পার্থক্যটাও আবৃত্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তা-ছাড়া, স্বরবৃত্ত ছন্দে কোনো কোনো পর্ব্বে তিনটি ধ্বনি স্থাপন করা গেলেও এ ছন্দ পাঁচ ধ্বনির পর্ব্ব একেবারেই সহ্য করতে পারে না। তাই উপরের দৃষ্টান্ত-দুটিতেই দ্বিতীয় পর্ব্বটাই সব চেয়ে শ্রুতি-কটু। সুতরাং এ ছন্দের সাধারণ রীতি অনুসারে তিন এবং পাঁচ ধ্বনির পর্ব্ব-দুটিকে ভেঙে যদি চার ধ্বনির দুটি পর্ব্ব রচনা করা যায় তাহ'লেই সব বন্ধুরতা ঘুচে যায়। শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের সব-প্রথম দৃষ্টান্তটিতে তাই করা হয়েছে। সেজন্যেই ওটিতে কোথাও খট্‌কা লাগে না। সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করার সময় বাংলা ছন্দের এই চতুঃস্বর-পরায়ণতার নিয়মটি মনে রাখা বিশেষ দরকার।

সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুলের দৃষ্টান্ত-দুটিকে আমিই সংস্কৃত ছন্দের অনুযায়ী ক'রে সাজিয়েছি। তাঁরা পর্ব্ব বিভাগ ও মিলের খাতিরে একে ভেঙে ভেঙে সাজিয়েছিলেন। সংস্কৃত ছন্দকে ওভাবে পর্ব্বে পর্ব্বে ভেঙে সাজাবার কোনোই প্রয়োজন নেই এবং পংক্তি-মধ্যে মিল স্থাপনেরও কোনো আবশ্যকতা নেই,—পংক্তিপ্রান্তিক মিলটা অবশ্য থাকা দরকার। সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম পর্ব্বের সহিত চতুর্থ পর্ব্বের এবং দ্বিতীয় পর্ব্বের সহিত তৃতীয় পর্ব্বের মিল রেখেছেন। কিন্তু এরকম মিল স্থাপনের কোনো আবশ্যকতা ছিল না। আমার দৃষ্টান্তটিতে শুধু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বের মধ্যে মিল রয়েছে ;—এ রকম না ক'রে প্রথম পংক্তির তৃতীয় পর্ব্বের সহিত দ্বিতীয় পংক্তির তৃতীয় পর্ব্বের মিলও রাখা যেতে পারত এবং সেটা একটু অভিনবও হ'তো। কিন্তু তাও অত্যাবশ্যক নয়।

এবার অন্য রকম একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। 'মালিনী' একটি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দ। এ ছন্দটিকে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন এভাবে—

উড়ে চ'লে গেছে বুল্‌বুল্, শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণনির্ভর।
রাগিণী সে আজি মন্থর, উৎসবের কুঞ্জ নির্জ্জন ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর মঞ্জীরের ক্লিষ্ট নিক্কণ॥

—কুহু ও কেকা, রিক্তা

এ ছন্দের প্রতি-পংক্তি দুই পদে বিভক্ত। প্রথম পদে আটটি ধ্বনি—প্রথম ছ'টি লঘু এবং তার পরের দুটি গুরু ; দ্বিতীয় পদে সাতটি ধ্বনি—তার মধ্যে দ্বিতীয় ও পঞ্চম ধ্বনি লঘু। এ ছন্দের প্রথম পদকে বাংলায় রূপান্তরিত করা সহজ, কোনো অসুবিধাই নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পদকে রূপান্তরিত করা যাবে কি ভাবে? সত্যেন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পদটিকে দুই পর্ব্বে বিভক্ত করেছেন—একটি মধ্যলঘু ত্রিস্বর পর্ব্ব এবং অপরটি দ্বিতীয়লঘু চতুঃস্বর পর্ব্ব। বাংলার অন্যান্য কবিরাও সত্যেন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মালিনী ছন্দের প্রতি পংক্তির দ্বিতীয় পদটিকে অন্য ভাবেও রূপান্তরিত করা যায়। যথা—

উড়ে চ'লে গেছে বুল্‌বুল্, শূন্য পিঞ্জর হেথায় হায় ;
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, পূর্ণ যৌবন বৃথাই যায়।
রাগিণী সে আজি মন্থর, কুঞ্জ নির্জ্জন গতোৎসব ;
ভেঙে দিবে বুঝি অন্তর ক্লিষ্ট উন্মন নূপুর-রব॥

এখানেও দ্বিতীয় পদে দুই পর্ব্ব। কিন্তু প্রথম পর্ব্বটি দ্বিতীয়-লঘু চতুঃস্বর এবং দ্বিতীয় পর্ব্বটি আদি-লঘু ত্রিস্বর। এ ভাবেও মালিনী ছন্দের রীতি ঠিক্ রাখা যায়। কেন না এখানেও মালিনীর দ্বিতীয় পদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম ধ্বনিটি লঘু আছে। যাহোক্, এ দ্বিতীয় পদটিকে দুটি মধ্যলঘু ত্রিস্বর পর্ব্ব ও একটি গুরু ধ্বনির যোগেও বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। যথা—

উড়িয়া গেছে সে-বুল্‌বুল্, মুক্ত দ্বার পিঞ্জরের হায় ;
ঝরিয়া গেল ফাগুন-ফুল যৌবনের জীর্ণতার প্রায়।
রাগিণী আজি নীরব হায়, সঙ্গীতের ব্যর্থ উৎ-সব ;
ভাঙিয়া দিবে হৃদয়টায় সঞ্জীবের ক্লান্তিময় রব॥

এখানে দ্বিতীয় পদের মতো প্রথম পদটাকেও বদলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে সমস্ত পংক্তিটাই কয়েকটি পাঁচ মাত্রার

পদে বিভক্ত হ'য়ে গেল। অথচ মালিনী ছন্দের লঘুগুরু ধ্বনি সমাবেশ অব্যাহতই আছে।

এবার অন্য একটি ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা করা যাক্। 'পুষ্পিতাগ্রা' একটি সুন্দর বৈচিত্র্যময় ছন্দ। এ ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পংক্তি একরূপ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তি একরূপ। তার ধ্বনিবিন্যাসপ্রণালী নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাবে—

ঝলকে ঝলকে রক্ত-স্রোত মরণ-জয়
পথে পথে মৃত্যু-রাজের বিষাণ বাজাক হায়;
পলকে পলকে খড়্গাঘাত কিরণময়
দিকে দিকে মুক্তি-রথের কেতন উড়াক বায়!
আজিকে আসনে যৌবনের বসুক দুখ,
তারি তরে শঙ্খ-নিনাদ জাগাক মরণ-গান;
ছিঁড়িয়া আনিয়া হৃৎকমল দে সুখটুক,—
তারি পায়ে অঞ্জলি হায় তরুণ-জীবন-দান।

—'যৌবন-বোধন', (লেখক) প্রবাসী—১৩৩০, ভাদ্র, পৃঃ ৬৮৩

অর্থাৎ এর প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে বারোটি ধ্বনি; তার প্রথম ছ-টি লঘু এবং তৎপরের ধ্বনিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি লঘু। দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে তেরোটি ধ্বনি; তার মধ্যে প্রথম চারটি লঘু এবং তৎপরের ধ্বনিগুলির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম ধ্বনিগুলি লঘু। ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ ছন্দের জোড় ও বিজোড় পংক্তির পার্থক্যটা অতি সামান্য। বিজোড় পংক্তির পঞ্চম ও ষষ্ঠ ধ্বনি-দুটির মধ্যে একটি অতিরিক্ত গুরুধ্বনি স্থাপন ক'রে জোড় পংক্তিগুলিতে একটু বৈচিত্র্য আনা হয়েছে। এই অতিরিক্ত ধ্বনিটিকে বাদ দিলে সব পংক্তিই এক রকম হ'য়ে যেত। যাহোক্, উপরের দৃষ্টান্তটিতে বিজোড় পংক্তিগুলিকে ত্রিস্বর পর্ব্বে এবং জোড় পংক্তিগুলিকে চতুঃস্বর পর্ব্বে বিভক্ত করা হয়েছে। এ রকম না ক'রে আরও নানা প্রকারে পর্ব্ব-বিভাগ ক'রে 'পুষ্পিতাগ্রা' ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সব রকমের দৃষ্টান্ত না দিয়ে উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিকেই সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে দেখানো যাক্—

ঝলকে ঝলকে রক্ত-বন্যা উচ্ছল
পথে পথে মৃত্যু-রাজের বিষাণ বাজাক্ হায়;
পলকে পলকে খড়্গাদীপ্তি জ্বল্ জ্বল্
দিকে দিকে মুক্তি-রথের কেতন উড়াক্ বায়।

আরও একরকম দেখাচ্ছি—

ঝলকি'-ওঠা শোণিত-ধারায় মরণ-জয়
পথে পথে মৃত্যু-রাজের বিষাণ বাজুক্ হায়;
পলকে আজি খাঁড়ার আঘাত কিরণ-ময়
দিকে দিকে মুক্তি-রথের কেতন উড়াক্ বায়।

এ দৃষ্টান্ত-দুটিতে শুধু প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিকেই পরিবর্ত্তিত ক'রে দেখানো গেল। পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এ ভাবে দ্বিতীয়-চতুর্থ পংক্তিকেও নানা ভাবে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

আর দৃষ্টান্ত বাড়াবার প্রয়োজন নেই। আশা করি উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, সত্যেন্দ্র-নাথের প্রণালী অবলম্বন ক'রেও একই সংস্কৃত ছন্দকে পর্ব্ব-বিভাগের বৈচিত্র্য অনুসারে বহু বিভিন্ন উপায়ে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রকারের রূপান্তরের ছন্দোগত ধ্বনিরস এক নয়। একেক রকম পর্ব্ব বিভাগে একেক রকম ধ্বনিরস দেখা দেয়। কোনো সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করবার সময় কি ভাবে পর্ব্ব বিভাগ করা দরকার তা সম্পূর্ণরূপে কবির অভিরুচি অর্থাৎ ধ্বনিরসবোধের উপর নির্ভর করে।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি থেকে আরও একটি কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত বা অন্য কোনো ভাষার ছন্দের অনুকরণ না ক'রেও এ পদ্ধতিতে বাংলায় বহু নূতন নূতন মৌলিক ছন্দ উদ্ভাবন করা যেতে পারে। তা-ছাড়া, সংস্কৃত ছন্দের আভাস নিয়েও বাংলায় বহু নূতন ভঙ্গীর ছন্দ রচনা করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে পারি, "নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার সখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন।"

যাহোক্, আমরা দেখলাম যে, সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় তর্জ্জমা করার প্রয়াস হয়েছে চার উপায়ে। প্রথমটি হচ্ছে খাঁটি সংস্কৃত পদ্ধতি। ভারতচন্দ্র থেকে বিজয়চন্দ্র পর্য্যন্ত অনেকেই এ পথে চলেছেন। কিন্তু কারও প্রয়াসই সফল হয়েছে বলা যায় না। আজ কালও দিলীপকুমার-প্রমুখ কয়েকজন এই রীতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে লঘুগুরুনির্ব্বিশেষে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দের

শুধু মাত্রা পরিমাণ স্থির রাখা। এ রীতির উদ্ভাবয়িতা হচ্ছেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ রীতির বহু দৃষ্টান্ত আছে তাঁর "স্বপ্ন-প্রয়াণ" কাব্যে। এ রীতিটিকে বল্‌তে পারি, 'মাত্রিক রীতি'। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ মাত্রা গণনা করতেন যৌগিক কায়দায়। তৃতীয়টি হচ্ছে 'খাঁটি মাত্রিক রীতি'। এ রীতির উদ্ভাবয়িতা হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এ রীতির প্রধান ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এ রীতিতে সংস্কৃত ছন্দের মাত্রা পরিমাণ ঠিক্ থাক্‌লেও ধ্বনি-সংখ্যা স্থির থাকে না ব'লে তর্জ্জমায় মূল ছন্দের কিছুমাত্র সাদৃশ্য অবশিষ্ট থাকে না। তর্জ্জমা থেকে মূল ছন্দকে চেনবারও উপায় থাকে না। দ্বিজেন্দ্রনাথের রীতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

কিন্তু এমন ভাবেও তো তর্জ্জমা করা যেতে পারে যাতে সংস্কৃত ছন্দের প্রতি পদের মাত্রা পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্বনিসংখ্যাও বাংলায় স্থির থাকবে। যদি এ ভাবে মাত্রা পরিমাণ ও ধ্বনিসংখ্যা যুগপৎ স্থির রাখা যায় তবে সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে না। 'মালিনী' ছন্দকেই আশ্রয় করা যাক্—

কোথা যে উড়িয়া গেছে মোর
বুল্‌বুলি পাখী, নাহিকো হেথা;
ফাগুন গেল যে, খোলো দোর,
আসুক জীবনে মরণ-ব্যথা।

এ হচ্ছে পূর্ব্বোক্ত মাত্রিক রীতির তর্জ্জমা। মালিনী ছন্দের প্রতি পংক্তির প্রথম পদে দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে বারো মাত্রা। এ তর্জ্জমাতে ঐ মাত্রা পরিমাণ ঠিক্ আছে, কিন্তু ধ্বনিসংখ্যা ঠিক নেই। ও ছন্দের প্রথম পদের ধ্বনিসংখ্যা হচ্ছে আট এবং দ্বিতীয় পদের সাত। এ দৃষ্টান্তটিতে তা নেই ব'লে একে মালিনীর অনুরূপ মনে করার কোনো হেতুই নেই। এবার ও-ছন্দের মাত্রা পরিমাণ ও ধ্বনিসংখ্যা যুগপৎ স্থির রেখে তর্জ্জমা করা যাক্—

কোথায় গেছে হায় গো উড়ে,
নাই মোর আর তো সে বুল্‌বুল্;
ফুরায়ে যায় ফাগুন কি রে,
জীবন যৌবন সব কি ভুল?

এখানে প্রথম পদে আটটি ধ্বনিতে দশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় পদে সাতটি ধ্বনিতে বারো মাত্রা আছে। সুতরাং মাত্রিক রীতির চেয়ে এ রীতিতে তর্জ্জমা মূলের অধিকতর অনুরূপ হয়েছে। এ রীতিটিকে বল্‌তে পারি 'স্বরমাত্রিক' রীতি, কেন না এ রীতিতে মূলের স্বরসংখ্যা অর্থাৎ ধ্বনিসংখ্যা এবং মাত্রা পরিমাণ দু-ই যুগপৎ ঠিক থাকে। কিন্তু এ রীতিতেও তর্জ্জমায় মূলের সম্পূর্ণ আনুরূপ্য পাওয়া যায় না। কেন না, মূল সংস্কৃত ছন্দের সমস্ত ধ্বনিই লঘুগুরু বিশেষে সুনিয়মিত ভাবে বিন্যস্ত থাকে। কিন্তু উক্ত স্বরমাত্রিক রীতিতে মূলের মোট ধ্বনি সংখ্যা ঠিক্ থাক্‌লেও ধ্বনিগুলিকে লঘুগুরু বিশেষে সুনিয়মিত ভাবে সাজানো হয় নি। তাই এই রীতিকে 'অনিয়মিত স্বরমাত্রিক' বলাই সমীচীন। কিন্তু যদি মাত্রা-পরিমাণ এবং ধ্বনিসংখ্যা স্থির রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির লঘুগুরু বিন্যাসটাও ঠিক্ রাখা যায় তাহ'লেই মূল ছন্দের গঠনগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্যই পাওয়া যাবে। এবার উপরের স্বরমাত্রিক রীতির দৃষ্টান্তটিতে ধ্বনিগুলিকে মালিনী ছন্দের ভঙ্গীতে লঘুগুরু বিশেষে সুনিয়মিত ভাবে বিন্যস্ত ক'রে দেখা যাক্ কেমন দাঁড়ায়—

গেছে গো উড়ে কোথায় হায়,
নাই গো নাই আর সে বুল্‌বুল্;
ফুরায়ে এলো ফাগুন মাস,
হায় রে নাই তার কোথাও ভুল।

এটি হচ্ছে 'নিয়মিত স্বরমাত্রিক' রীতি। আর, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ রীতিতে মালিনী ছন্দের আকৃতি অর্থাৎ তার গঠন রূপটি অবিকল বজায় আছে। কাজেই সংস্কৃত ছন্দের যথাসম্ভব অনুরূপ তর্জ্জমা ক'রতে হ'লে এই রীতি অবলম্বন করাই সঙ্গত। অবশ্য এ রীতিতে সংস্কৃত ছন্দের দীর্ঘ ধ্বনির উদার গাম্ভীর্য্য বাংলায় ধরা যাবে না। আর এ রীতিতে বহু বিভিন্ন প্রকারে পর্ব্ব বিভাগ করা যায় ব'লে মূল সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিরূপটিকে স্থির রাখা যায় না। এ প্রবন্ধে মালিনী ছন্দকে নিয়মিত স্বরমাত্রিক রীতিতে যে কয় ভঙ্গীতে তর্জ্জমা করা হয়েছে, সবগুলি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে। যাহোক্, এই 'নিয়মিত স্বরমাত্রিক' রীতির প্রবর্ত্তক হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ। আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী। এই অনুবর্ত্তীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'রামধনু' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থে উক্ত 'নিয়মিত স্বরমাত্রিক' ছন্দের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

সংস্কৃত ছন্দকে যে কয় রীতিতে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে বা হ'তে পারে, এবার তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত একত্র সমাবিষ্ট ক'রে এবং সে সম্বন্ধে দুয়েকটি মন্তব্য ক'রেই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি। নিম্নোদ্ধৃত সবগুলি দৃষ্টান্তই সংস্কৃত মালিনী ছন্দের বাংলা রূপান্তর—

১। খাঁটি সংস্কৃত রীতি—

বিহগ শিশিরপাতে ধূনিলা আর্দ্র পাখা
স্বনিল পবন কুঞ্জে, মর্ম্মরে শুষ্ক শাখা
মলিন বন-উপান্তে, শীতগীতিপ্রসঙ্গে
বিরচিল ~~কবি~~ গাথা মালিনী সর্গভঙ্গে॥

—বিজয়চন্দ্র, ফুলশর (হেঁয়ালি), শিশিরে

২।—(ক) যৌগিক ভঙ্গীর মাত্রিক রীতি—

কবি যথায়
এল তথায়,
নাচিতে নাচিতে ভঙ্গি-ভরে।
কতই ভাণে
এ ওর পানে
হাসিয়া হাসিয়া ইঙ্গিত করে।
কবির কাছে
দ্বিগুণ নাচে,
বাজনায় করে কান-জখম।
তাল ফোটায়,
জ্ঞান ছোটায়,
হাব ভাব করে কত রকম॥

—দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বপ্ন-প্রয়াণ, চতুর্থ সর্গ।৩।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ এ রীতির অনুসরণ করেন নি।

(খ) খাঁটি মাত্রিক রীতি—

কোথা যে উড়িয়া গেছে মোর
বুলবুলি পাখী, নাহিকো হেথা ;
ফাগুন গেল যে, খোলো দোর,
আসুক জীবনে মরণ ব্যথা।

রবীন্দ্রনাথ এ রীতির সমর্থক। তিনি এ রীতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র রচনা করেছেন। কিন্তু কবিতা-রচনায় কেউ এ রীতির অনুসরণ করেছেন ব'লে জানি নে। • শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনের মেঘদূতের অনুবাদ অনেকটা এই রীতি-অনুযায়ী। উক্ত গ্রন্থে আমার লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩। স্বরবৃত্ত রীতি—

কোথায় আজি গেল উড়ে
বুলবুলি সে, নাই গো নাই ;
ফুরায়ে যায় ফাগুন যে রে,
তরুণ জীবন বৃথাই ভাই।

যথাস্থানে এ রীতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। কিন্তু এ রকম একটা রীতি হওয়া অসম্ভব নয়। মাত্রিক রীতি যেমন সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনিসংখ্যা নিরপেক্ষ, এ রীতিটি তেমনি মূল ছন্দের মাত্রা পরিমাণ-নিরপেক্ষ। অর্থাৎ মাত্রিক রীতিতে যেমন মূল ছন্দের মাত্রাপরিমাণ ঠিক থাকে কিন্তু ধ্বনি-সংখ্যা ঠিক থাকে না, এ রীতিতে তেমনি মূল ছন্দের ধ্বনি-সংখ্যা ঠিক থাকে কিন্তু মাত্রাপরিমাণ স্থির থাকে না। এ দৃষ্টান্তটির প্রতি পদে মালিনী ছন্দের ধ্বনি-সংখ্যা (৮+৭) ঠিক আছে, কিন্তু মাত্রাপরিমাণ (১০+১২) স্থির নেই।

৪।—(ক) অনিয়মিত স্বরমাত্রিক রীতি—

কোথায় গেছে হায় গো উড়ে,
নাই মোর আর তো সে বুলবুল ;
ফুরায়ে যায় ফাগুন কি রে,
যৌবন জীবন সব কি ভুল ?

এ রীতির তর্জ্জমায় মূল ছন্দের ধ্বনি-সংখ্যা ও মাত্রাপরিমাণ দুই যুগপৎ স্থির থাকে। এ দৃষ্টান্তটির প্রথম পদে মালিনী ছন্দের প্রথম পদের আটটি ধ্বনিতে দশ মাত্রা, এবং এর দ্বিতীয় পদে মালিনীর দ্বিতীয় পদের অনুরূপ সাতটি ধ্বনিতে বারো মাত্রা ঠিক আছে। কিন্তু মূল ছন্দের মতো লঘুগুরু বিশেষে ধ্বনির সুনিয়মিত সমাবেশ নেই। এই রীতিটিও কেউ অনুসরণ করেছেন ব'লে জানি নে। কিন্তু এ রকম রীতিও যে চালানো যায় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

(খ) নিয়মিত স্বরমাত্রিক রীতি—

উড়িয়া গেছে সে-বুলবুল, শূন্য পিঞ্জর হেথায় হায় ;
ঝরিয়া গেল ফাগুন-ফুল, পূর্ণ যৌবন বৃথাই যায়।
রাগিণী আজি নীরব হায়, কুঞ্জ নির্জ্জন গতোৎসব ;
ভাঙিয়া দিবে হৃদয়টায় ক্লিষ্ট উন্মন নূপুর-রব॥

—সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, রিক্তা (পরিবর্ত্তিত)।

এখানে শুধু যে প্রতি পদের ধ্বনি-সংখ্যা এবং মাত্রাপরিমাণ যুগপৎ স্থির আছে তা নয় ; মালিনীর লঘুগুরু হিসাবে ধ্বনি-

সমাবেশ রীতিটিও অক্ষুণ্ণ আছে। সুতরাং বাহ্য গঠন-সাদৃশ্যের দিক্ থেকে এ রীতিটাই যে নিখুঁত এবং সব চেয়ে উপযোগী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ রীতির উদ্ভাবয়িতা হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ রীতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এবং দোষ কি কি, তাও পূর্ব্বেই আলোচনা করেছি।

এ চারটি রীতি ছাড়া যৌগিক বা সাধারণ পয়ার ছন্দের রীতিতেও সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা যায়, এ কথা বলাই বাহুল্য। যথা—

বুল্‌বুল উড়িয়া গেছে,
পিঞ্জরে সে তো নাই;
ফাল্গুন ফুরায়ে গেল,
যৌবন বৃথা তাই।

মালিনীর অনুকরণে এ দৃষ্টান্তটির প্রথম ও দ্বিতীয় পদে যথাক্রমে আট ও সাত 'অক্ষর' স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এটিকেও কোনো মতেই মালিনীর অনুরূপ ব'লে চেনা যাচ্ছে না।

উপরের তৃতীয় (অর্থাৎ স্বরবৃত্ত) রীতির দৃষ্টান্তটি সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুসারে পনেরো 'অক্ষর' বা ধ্বনির সমস্ত ছন্দই 'অতিশর্করী' নামক সাধারণ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং মালিনীও অতিশর্করীর প্রকারভেদ মাত্র। কাজেই উপরের তৃতীয় রীতির দৃষ্টান্ত-টিকে মালিনী বলা না গেলেও এটিকে অনায়াসেই অতি-শর্করী বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের আদি যুগে অর্থাৎ বৈদিক যুগে দেখ্‌তে পাই ছন্দ ছিল শুধু ধ্বনিসংখ্যাগত, সূক্ষ্ম মাত্রানিরপেক্ষ। অর্থাৎ বৈদিক ছন্দে ধ্বনিসংখ্যার সমতাই পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম হিসাবের মাত্রার সমতা পাওয়া যায় না। আলোচ্য দৃষ্টান্তটিকেও ঐ ধরণের অতিশর্করী ছন্দ বলা যেতে পারে, কেন না এটিতেও ধ্বনিসংখ্যার সমতা আছে কিন্তু মাত্রার সমতা নেই। যাহোক্, বেদোত্তর যুগে দেখ্‌তে পাই অধিকাংশ স্থলেই ছন্দ-পংক্তির সমস্ত ধ্বনিকেই লঘুগুরুভেদে বহু বিভিন্ন রীতিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই ভাবেই অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্, জগতী, শর্করী প্রভৃতি সাধারণ ধ্বনিসংখ্যাগত ছন্দের বৈচিত্র্যভেদে বহু নূতন নূতন ছন্দের উৎপত্তি হয়েছে। আর এই বৈচিত্র্যসৃষ্টির সময়েই লঘুগুরু ধ্বনি এবং পদের যোগবিয়োগের দ্বারা একই ছন্দ থেকে বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন ছন্দ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্দাক্রান্তা ছন্দ থেকে চিত্রলেখা এবং স্রগ্ধরা ছন্দ কিরূপে উৎপন্ন হয়েছে তা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। এই তিনটি ছন্দের সঙ্গে মালিনীর তুলনা করলে আমার কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন হবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে স্পষ্ট করা যাক্—

(১) "যক্ষের দুঃখের করহে অবসান
যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ"—(মন্দাক্রান্তা)

(২) যক্ষের দুঃখের কর আজি অবসান,
যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ—(চিত্রলেখা)

(৩) যক্ষের দুঃখের পাষাণ-ভার কর আজি অবসান,
যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ—(স্রগ্ধরা)

(৪) ঘুচায়ে আজি এ শোক-ভার | যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ
ঘুচায়ে আজিকে যক্ষের | দুঃখ, কান্তার জুড়াও প্রাণ
কিংবা, ঘুচায়ে আজিকে ব্যথার ভার | যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ
—(মালিনী)

মন্দাক্রান্তা ছন্দের দ্বিতীয় পদের শেষ ধ্বনিটির পূর্ব্বে একটি অতিরিক্ত লঘু ধ্বনি বসালেই সেটির নাম হয় 'চিত্রলেখা'। আবার চিত্রলেখার প্রথম পদের শেষে একটি অতিরিক্ত আদিলঘু ত্রিস্বর পর্ব্ব যোগ করিলেই পাওয়া যায় স্রগ্ধরা ছন্দ। এই তিন ছন্দেই প্রথম চারটি এবং শেষের সাতটি ধ্বনির সমাবেশরীতি অবিকল এক। চিত্রলেখা বা স্রগ্ধরার প্রথম পদটি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এদের দ্বিতীয় পদের শেষে একটি অতিরিক্ত গুরু ধ্বনি যোগ ক'রে দিলেই সেটা হয় মালিনী। মন্দাক্রান্তা, চিত্রলেখা, স্রগ্ধরা এবং মালিনী এই চার ছন্দেরই শেষের পদটি অবিকল এক, তাও লক্ষ্য করা দরকার। তা-ছাড়া, স্রগ্ধরা ছন্দের প্রথম পদের সঙ্গে তৃতীয় পদের তুলনা করলে দেখা যাবে এ দুটি পদের ধ্বনি-সমাবেশ রীতি একই, কেবল প্রথম পদের দ্বিতীয় গুরু ধ্বনিটি তৃতীয় পদে লঘু হয়েছে। আর, চিত্রলেখা বা স্রগ্ধরার দ্বিতীয় পদের সঙ্গে 'মধুমতী' ছন্দের তুলনা করলে দেখা যাবে এ দুটিও অবিকল এক। এ ভাবে সংস্কৃত ছন্দগুলির মধ্যে পারস্পরিক তুলনামূলক আলোচনা করলে সংস্কৃত ছন্দের অন্তর্নিহিত বহু রহস্য আবিষ্কার করা যেতে পারে; এবং এ পথে ছন্দান্বেষীরাও অনেক নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করতে পারেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ছন্দোরীতি সম্বন্ধেও একটি কথা বলা

দরকার। পূর্ব্বে বলেছি তিনি মাত্রা গণনা করতেন যৌগিক ছন্দের ভঙ্গীতে। কিন্তু তিনি সব সময় সমভাবে এ রীতির অনুসরণ করেন নি। বোধ করি নিজের অলক্ষ্যেই তিনি অনেক সময় খাঁটি মাত্রিক রীতির অনুসরণ করেছেন। উপরের (২-ক) দৃষ্টান্তের 'ভঙ্গি-ভরে' এবং 'ইঙ্গিত করে' এ পর্ব্ব-দুটির মাত্রা সমাবেশের দিকে লক্ষ্য করলেই আমার কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। খাঁটি মাত্রিক রীতিতে এ পর্ব্ব-দুটিতে আছে যথাক্রমে পাঁচ ও ছয় মাত্রা, আর যৌগিক রীতিতে পাওয়া যাবে যথাক্রমে চার ও পাঁচ মাত্রা। কাজেই এ পর্ব্ব-দুটিতে মাত্রিক সমতা নেই, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ একটিতে মাত্রা গণনা করেছেন মাত্রিক রীতিতে আর অপরটিতে যৌগিক রীতিতে। ঐ ভাবে ও দুই পর্ব্বে মাত্রিক সমতা স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক কালে আমাদের কান কিছুতেই তা স্বীকার করবে না। আমাদের কানে 'ভঙ্গিভরে'-তে পাঁচ মাত্রা বেশ ভালো শোনায়, কিন্তু 'ইঙ্গিত করে'-তে পাঁচ মাত্রা গণনা করতে খট্‌কা লাগে। অর্থাৎ আধুনিক বিচারে মাত্রিক রীতিটাই স্বীকার্য্য (রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন), যৌগিকটা নয়। আধুনিক কালে মাত্রিক রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'-র যুগে, 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-রচনার বহু পরে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনা করেছিলেন তখন তিনি স্বভাবতই যৌগিক পদ্ধতিতে মাত্রা গণনা করতেন, কেন না খাঁটি মাত্রিক পদ্ধতি তখনও উদ্ভাবিত হয় নি। কিন্তু তথাপি যে তিনি স্থানে স্থানে খাঁটি মাত্রিক রীতির অনুসরণ করেছেন সেটা তাঁর তীক্ষ্ণ ধ্বনিরস-বোধের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। বাস্তবিক যেখানেই তিনি খাঁটি মাত্রিক রীতির অনুসরণ করেছেন সেখানেই আমাদের কান খুশি হয়, অন্যত্র হয় না। উপরের দৃষ্টান্তটিতেই তার প্রমাণ আছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

গাধায় চড়ি'
লাগায় ছড়ি
অদ্‌ভুত-রস কিম্পুরুষ।
দুটি অধরে
হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে মানুষ॥

—স্বপ্নপ্রয়াণ, চতুর্থ সর্গ, ১।

এখানে 'অদ্‌ভুত-রস,' 'কিম্পুরুষ' এবং 'লম্ব-উদর' কথা-তিনটিতে আমাদের কান যেমন খুশি হয়, যৌগিক রীতিতে তেমন হ'তে পারত না। এ-সব কারণেই বল্‌তে হয় আধুনিক কালে খাঁটি মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথ বটে, কিন্তু তাঁর অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলা যায় এ রীতি প্রবর্ত্তনের অগ্রদূত। আমি অন্যত্র লিখেছি, "রবীন্দ্রনাথের ছন্দের আলোচনায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-কাব্যের ছন্দের আলোচনা করাও বিশেষ প্রয়োজন মনে করি" (বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—পৃঃ ১৯-২০)। এ প্রয়োজন শুধু মাত্রিক রীতির ইতিহাস উদ্ধারের জন্যেই নয়, অন্যান্য কারণেও বটে। কেন না রবীন্দ্রনাথের উপর স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দের প্রভাব আরও কোনো কোনো ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়। যাহোক, উপরের দৃষ্টান্তটিতে পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের সহিত ছয় মাত্রার পর্ব্বের কেমন সুন্দর সমাবেশ হয়েছে, তাও লক্ষ্য করা দরকার। বাংলায় এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল। স্বপ্নপ্রয়াণের বহু বিচিত্র পর্ব্বসমাবেশ রীতিরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, শুধু দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণেই নয়, আধুনিক যুগের অন্য কোনো কোনো কবির রচনাতেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

(১) স্বর্ণ-শক্রধনু, রতনে খচিত তনু,
চূড়া শিরোপরে।

—মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, ময়ূরী

(২) পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে।

—ঐ, ঐ, বসন্তে

এখানে 'স্বর্ণশক্রধনু' এবং 'চঞ্চল' এই শব্দ-দুটিতে ধ্বনি-পরিমাণের হিসাব হয়েছে আধুনিক মাত্রাবৃত্ত রীতিতে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মধুসূদনও দ্বিজেন্দ্রনাথের ন্যায় অলক্ষ্যেই এ দুটি জায়গায় মাত্রিক রীতির অনুসরণ করেছেন। কেন না, উক্ত দুটি কবিতার অন্য সর্ব্বত্রই যৌগিক রীতিই অনুসৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মানসীর (১৮৮৭ খৃঃ) পূর্ব্বে আধুনিক যুগের কোনো কবিই মাত্রাবৃত্ত পদ্ধতির অনুসরণ করেন নি। কিন্তু

মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির রচনায় স্থানে স্থানে সম্ভবত' কবির অজ্ঞাতসারেই মাত্রিক ভঙ্গী দেখা দিয়েছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই আভাসগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মাত্রিক ছন্দ উক্ত কবিদের কানে স্বীকৃত হ'লেও তাঁদের মনে প্রত্যক্ষ হ'য়ে দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এ ছন্দকে প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার ক'রে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবাহন ক'রে এনেছেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষার অরুণালোকের মতো মানসীর পূর্ব্বে স্বপ্নপ্রয়াণ, ব্রজাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস পাওয়া গিয়াছিল। স্বপ্নপ্রয়াণ মানসীর পূর্ব্বে রচিত এবং ব্রজাঙ্গনা স্বপ্নপ্রয়াণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু তথাপি এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলা ছন্দের ইতিহাসে মানসীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং আর কোনো কাব্যই সে স্থানের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না। কারণ মানসীর সময় থেকেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে নব-মাত্রাবৃত্ত রীতির প্রবর্ত্তন হয়েছে।

উদয়-পথের সহযাত্রী

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

(আষাঢ়, ১৩৪০, ১০৫ পৃষ্ঠার পর)

(৪)

নরওয়ে ত্যাগ ক'রে ৮ই জুন সকালে সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্‌ম্ অভিমুখে যাত্রা করি। সেই দিনই সন্ধ্যায় উক্ত সহরে উপস্থিত হই। রেল-ষ্টেশনে একটি ভদ্রলোক আমার হাতে একখানি পত্র দিলেন। পত্রের লেখিকা মাদাম ভেনেক্।* এই আড়ম্বরশূন্য পত্রবাহক ভদ্রলোকটীই শ্রীযুক্ত ভেনেক—চেকোশ্লোভেকিয়ার 'কন্‌সল্'। ষ্টেশনে 'প্রেস্‌রিপোর্টার' এবং ফিল্মের গোলমাল চুকে গেলে ইনিই আমাদের হোটেল ইত্যাদি ঠিক্ ক'রে দিলেন। আমরা মাত্র আড়াই দিন এ দেশে ছিলাম—এই ভেনেক-দম্পতী সহরের সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়ে এবং নানাভাবে আমাদের সাহায্য ক'রে বিশেষ ভাবেই উপকৃত করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য স্থানের মধ্যে নাগরিকগণের সভাগৃহই (Town Hall) প্রধান। এই মনোরম সভাগৃহ প্রথম দৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের বলেই মনে হয়েছিল—কিন্তু পরে জানলাম এর নির্ম্মাণকর্ত্তা এখনো বর্ত্তমান! তিনি হচ্ছেন এ রাজ্যের রাজভ্রাতা। এই সভাভবনের বিভিন্ন কক্ষগাত্রে, প্রাচীরে ও ছত্রতলে রাজভ্রাতার স্বহস্তে অঙ্কিত ও উৎকীর্ণ যে সমস্ত অসংখ্য চিত্রাবলী আছে তা' এতই সুন্দর এবং কলাসৃষ্টির দিক্ দিয়ে এতই অভিনব ও মনোরম যে কেবলমাত্র উচ্চ প্রশংসার দ্বারা

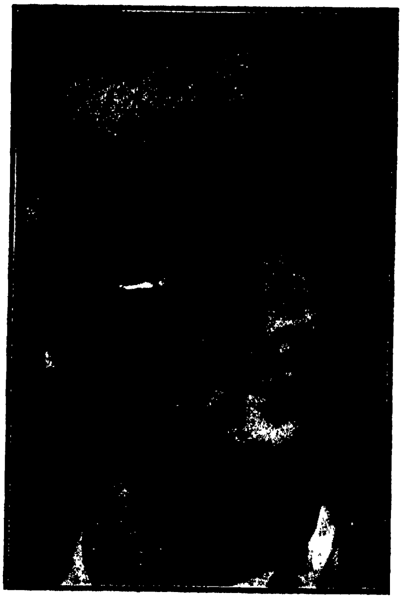


রাশিয়ান কৃষক (ফটো—তিমিরবরণ)

তাহার সঠিক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। চিত্র ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের এই অত্যদ্ভুত পরাকাষ্ঠার নিদর্শন আমাদের সকলকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত ক'রে দিয়েছিল। এই সমস্ত

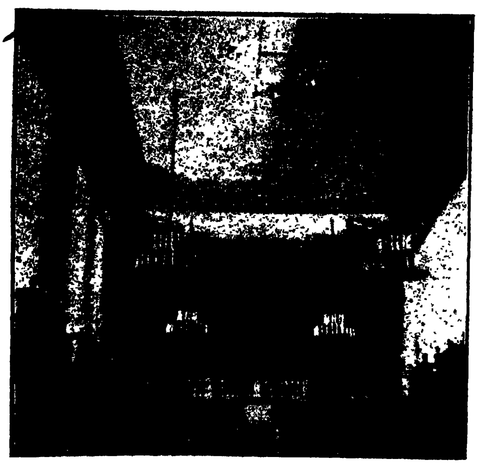
* আমি পূর্ব্ববারে মাদাম 'ভেনেক' (Vanek)এর কথা লিখেছিলাম। ইনি অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের বান্ধবী। আমি তাঁরই পরিচয়পত্রে 'প্রাগ্'এ (চেকোশ্লোভেকিয়া) এই মহিলাটীর সহিত পরিচিত হই। মাদাম 'ভেনেক্' সেখানকার শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিদ্বজ্জন সমাজে আমাদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং নানা ভাবে সাহায্য করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে আবদ্ধ করেছেন।

মনোমুগ্ধকর বিচিত্র ও বিরাট্ কারুকার্য্য যে-কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের। কিন্তু আবাল্য রাজ-



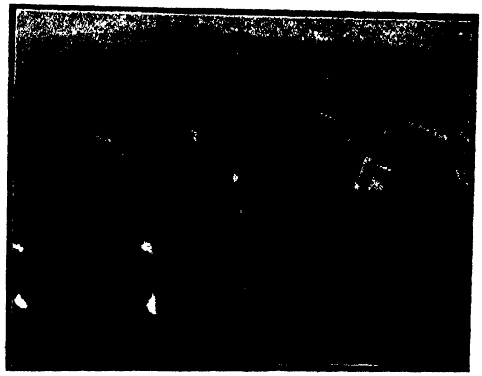
সাপুড়ে বেশে শঙ্কর

পরিবারের বিলাস-ব্যসনে লালিত এই রাজশিল্পীর অসীম ধৈর্য্য সাধনা ও শ্রমসহিষ্ণুতা এবং সর্ব্বোপরি কারু ও কলা-

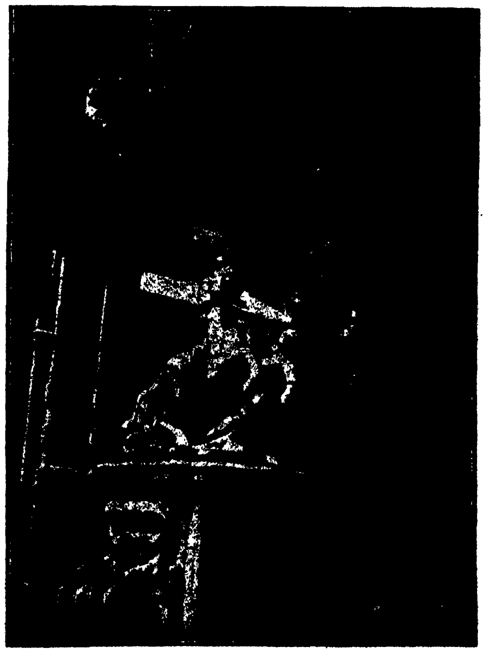


সাল্জ্‌বুর্গ—ম্যাক্স রীনহার্ট থিয়েটার—ধূমপান কক্ষ—ছত্রতল-চিত্র (ফটো—উদয়শঙ্কর)

সৃষ্টিক্ষেত্রে তাঁর এই অনন্যসাধারণ রসবোধ সৌন্দর্য্যানুভূতি সুরুচি ও সংস্কৃতি আমাদের অধিকতর বিমুগ্ধ করেছিল।



সেতুর উপর। পশ্চাতে সুদূরে দুর্গপ্রাসাদ দৃশ্যমান। বাম দিক হইতে—দেবেন্দ্রশঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর, রিচার্ড ও বিষ্ণুদাস (ফটো—রাজেন্দ্র)

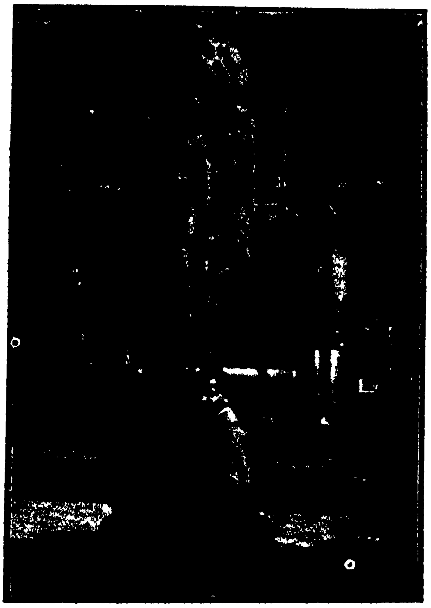


সাল্জ্‌বুর্গের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি (ফটো—তিমিরবরণ)

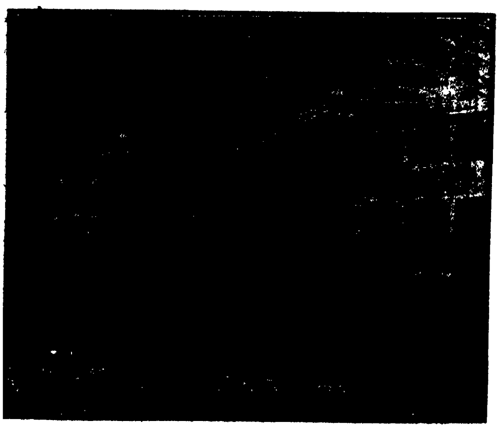
এই সভাভবনের একটি কক্ষ শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রঙীন কাচখণ্ড দ্বারা আশ্চর্য্য উপায়ে নির্ম্মিত। নানাবিধ বিচিত্র সংগ্রহ

সমম্বয়ে এই টাউন হলটিকে একটি 'মিউজিয়ম্' বলা চলে।

সেই দিনই অর্থাৎ ৯ই জুন রাত্রে আমাদের রয়্যাল থিয়েটারে নৃত্যাভিনয় ছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বেই আমাদের দুরাত্রি অভিনয়ের সমস্ত টিকিট নিঃশেষে বিক্রয় হ'য়ে গেছে শোনা গেল। রাজা এবং রাজপরিবারস্থ সকলেই নাচ দেখবার জন্য সেই রাজকীয় নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলেন। দেবেন্দ্রশঙ্করের কিরাতনৃত্য, উদয়শঙ্করের রাধাকৃষ্ণ এবং শিবনৃত্য বারম্বার পুনরাবৃত্তি ক'রেও দর্শকদের অবিরাম করতালি ও পুনরাহ্বান ধ্বনি উচ্চারণ হ'তে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না। উদয়শঙ্করের অসিনৃত্যের পর রয়্যাল বক্সে বৃদ্ধ রাজাকে ঐ ধরণের তরবারী কৌশল অনুকরণ ক'রতে



একটি প্রস্তরমূর্ত্তি। ষ্টক্‌হল্‌মের একটি প্রধান রাজপথ পার্শ্বে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটি দেখিলে ভারতীয় ভাস্কর্য্য শিল্পের কথা মনে হয়। মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান বিষ্ণুদাস শিরালী



সাল্‌জবুর্গ—উন্মুক্ত রঙ্গালয় (ফটো—উদয়শঙ্কর)



ষ্টকহল্‌ম্ টাউন হল (ফটো —তিমিরবরণ)

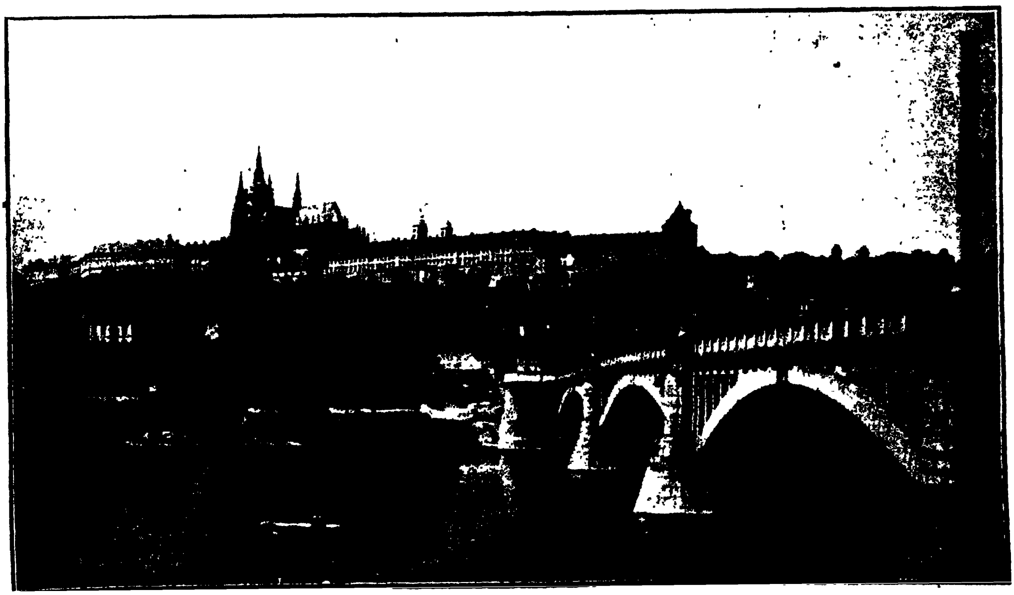
দেখা গেল, পরে তিনি উদয়শঙ্করের অসিচালনা কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা ক'রেছিলেন। শোনা গেল এখানকার রাজা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কোন অভিনয়ে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেননি, কিন্তু আমাদের নৃত্যাভিনয়ে তিনি দু' দিনই শেষ পর্য্যন্ত সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রেছিলেন।

পরের দিন আমরা এখানকার প্রসিদ্ধ "জাতীয় উদ্যান" দেখতে গিয়েছিলেম। এ স্থানের একটা উল্লেখযোগ্য

বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য যা লক্ষ্য করলাম সেটা হ'চ্ছে এই যে এখানকার অধিবাসীরা আদিম যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী বজায় রাখবার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এই উদ্যানের বিভিন্ন দিকে সুইডেনের বিভিন্ন প্রদেশের লোকের বাস। তাঁরা আধুনিক সভ্যতা ও রুচি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজ নিজ প্রদেশের জাতীয় প্রাচীন পোষাক পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান। এক প্রদেশের রীতিনীতি ও পরিচ্ছদাদি অন্য প্রদেশ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এতটুকু দেশের মধ্যে এত বেশী পার্থক্য দেখে মনে হ'ল ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে যে বিভিন্ন প্রাদেশিকতা দৃষ্টিগোচর হয় সে আর এমন কি বেশী! তবে এদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আদর্শ সত্ত্বেও একটা একতা বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রচেষ্টা আছে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা অন্ততঃ সপ্তাহে দু' একবার মিলিত হ'য়ে সহরের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ও রীতিনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখেন। এঁদের প্রাচীন প্রথায় নির্ম্মিত বাসভবন ও পর্ণকুটীরগুলি দেখলে মনে হয়—বর্ত্তমান সহর থেকে বহু দূরে কোন পুরাতন যুগের জনপদে এসে পড়েছি। এই উদ্যানে নানা দেশীয় জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর বিরাট্ সংগ্রহ আছে। একটি কৃত্রিম উপসাগরে নানাবিধ জলচর

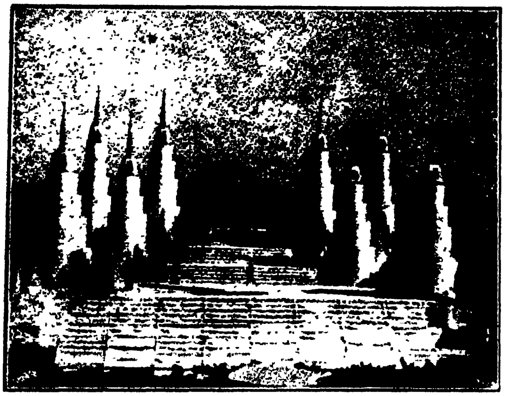


ইন্দ্রনৃত্য (বার্লিনে—প্রকাশ্য নৃত্যের পূর্ব্বে রিহার্সাল—ওয়েষ্টেন থিয়েটারে)



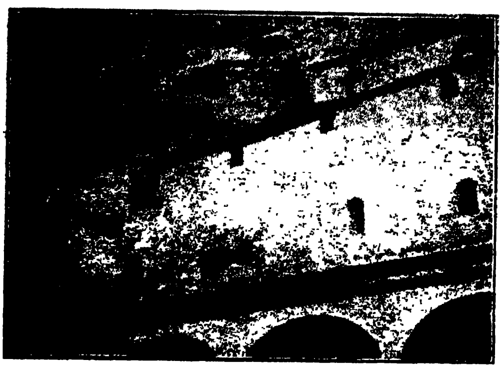
মেনেস সেতু ও দুর্গ—প্রাগ্

পশুপক্ষীতে পূর্ণ। এই উপসাগরের ধারেই একটি প্রকাণ্ড বাড়ীর লম্বা ছাদের উপর বড় একটি রেস্তোরাঁ আছে। সেদিনের বৈকালিক চা-পানাদি আমরা এইখানেই সেরে নিলাম। প্রায় দু'শ' সুন্দরী তরুণী পরিচারিকা তা'দের নানাবর্ণের বিভিন্ন জাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে এখানে



সমুদ্রতীরে থিয়েটার—মন্টি কার্লো বেলাভূমি হইতে ৫০ গজ মাত্র ব্যবধানে অবস্থিত। কেবল গ্রীষ্ম-কালে খোলা হয়। (ফটো—রাজেন্দ্র)

অতিথিদের পরিচর্য্যা করে। হাল ফ্যাসানের আধুনিক সভ্য পরিচ্ছদ এই সমস্ত বিচিত্র পোষাকের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।



১২০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত গির্জা—সালজবুর্গ
(ফটো—তিমিরবরণ)

পরের দিন আমরা এই সহরের উপকণ্ঠে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের (প্রসিদ্ধ Thiel Family—বিখ্যাত Thiel Museum এই পরিবারেরই সম্পত্তি) সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন ক'রতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেম। এখানে অনেক জ্ঞানী গুণী শিল্পী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য আমাদের হ'য়েছিল। আমরা সারাদিন চিরপরিচিতের মত লম্ফঝম্ফ দৌড়াদৌড়ি ও উচ্চ কোলাহলে এঁদের প্রকাণ্ড উদ্যানটীকে মুখরিত ক'রে রেখেছিলাম। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে ভেনেক্-দম্পতী এবং আরো অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া ভ্রমণ আমাদের এইখানেই শেষ হ'ল। এ দেশের স্মৃতি আমরা জীবনে বিস্মৃত হ'তে পারব না। প্রাকৃতিক দৃশ্যবৈচিত্র্যে কি স্থলে—কি জলে—কি আকাশে এমন সুরম্য ভূমি আর কোথাও আমাদের নজরে পড়ে নি। এ বিষয়ে সুইজার্ল্যাণ্ড এবং ইটালীর খ্যাতি অনেকের মুখে শুনতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের চোখে এই উত্তর ইয়োরোপের প্রান্তিক উপদ্বীপটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হল। ইয়োরোপের আকাশ অধিকাংশ সময়েই ধূম্রাচ্ছন্ন ও কুহেলিকাবৃত থাকে—কিন্তু এ দেশের আকাশের মত মনোরম শোভা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আজ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিনি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর চির নূতন বসন্তের গানে গেয়েছেন—

"হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ,
হাসির আঘাতে তার, মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে···"

এখানে কবিবর বসন্তের আকাশকে ধ্যানমগ্ন গাম্ভীর্য্যের প্রতীক বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এখানে—? উচ্ছল চঞ্চল বহুবর্ণচ্ছটাবিভাসিত বিচিত্র আকাশ যেন পুষ্পধনুর মত ধ্যানমগ্না তাপসীরূপিণী পর্ব্বতমাল্য পরিশোভিতা ধরিত্রীর তপোভঙ্গ করতেই ব্যস্ত। এখানকার অসংখ্য রঙের লুকোচুরী খেলার বর্ণনা অসম্ভব—আমরা শুধু মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকতেম।

সুইডেনের রাজাকে ইয়োরোপের আদর্শ নরপতি বলা যায়। রাজ-পরিবার বা রাজপুত্রের জন্য কোন পৃথক্ বিদ্যালয় নেই বা তাদের শিক্ষার জন্য কোনও বিশেষ রাজোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। সকলের সঙ্গে সাধারণ ভাবেই রাজ-পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও স্কুল বা কলেজে

যেতে হয়। অঙ্কন বিদ্যায় বা স্থাপত্য শিল্পে রাজভ্রাতার মত পারদর্শী শিল্পী অন্য কোন দেশে বর্ত্তমানে আছেন কি-না সন্দেহ। তাঁর হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য স্বচক্ষে না দেখলে সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।

এখান থেকে আমরা 'ফিন্‌ল্যাণ্ড (Finland) বা



সাল্‌জবুর্গ—উন্মুক্ত রঙ্গালয়

হাজার হ্রদের দেশে রওনা হ'লাম। নানা প্রকার দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত চলে পরের দিন আমরা



সৈন্যাধ্যক্ষের অতিথি। দণ্ডায়মান—দেবেন্দ্র, বেচু, ব্রিজ বিহারী উপবিষ্ট—বিষ্ণুদাস, উদয়শঙ্কর, সেনাপতি জেনারেল ক্লাকাণ্ডা ও রবীন্দ্রশঙ্কর (ফটো—রাজেন্দ্র)

এ দেশের রাজধানী Helsingforsএ উপস্থিত হ'লাম। দেশটা বিশেষ বড় নয় তথাপি এখানে আমাদের পাঁচ দিন নৃত্যাভিনয় করতে হয়েছিল। এদেশে যাবার পথে Rewalএ নৃত্য প্রদর্শনের বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এত টাকা বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে নারাজ হওয়াতে সেখানে নাচের আসর না দিয়েই প্রস্থান ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেম।



উদয় দর্শনার্থী জনতা—রিগার রেল ষ্টেসন। ভারতীয় নর্ত্তক দল রিগা নগরে পৌছিবামাত্র তাঁহাদের দেখিবার জন্য রেল ষ্টেসনের সম্মুখে ভিড় জমিয়া যায় (ফটো—তিমিরবরণ)



ষ্টকহল্‌ম্ জাতীয় উদ্যানে। রেস্তোর‍্যার সম্মুখে বেদীর উপর কয়েকজন পারিচারিকা তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদে উপবিষ্টা। পশ্চাতে দণ্ডায়মান কেদার-শঙ্কর। দক্ষিণে উপবিষ্ট উদয়শঙ্কর (ফটো—রাজেন্দ্র)

এর পরে আমরা ল্যাট্‌ভিয়ার (Latvia) রাজধানী রিগাতে নৃত্য প্রদর্শন করি। এই সহরে আসতে হলে তিন ঘণ্টা ষ্টীমারে পরে ট্রেণে যেতে হয়। এই সামান্য

জলপথটুকু কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। জলপথের দুধারে এবং জলের মধ্যে অসংখ্য পাহাড়। সেদিন আবার কুয়াসায় সবদিক আচ্ছন্ন ছিল। আমরা তো কোন রকমে নিরাপদে পৌঁছেছিলাম। কিন্তু খবর পেলাম—ঐ ষ্টীমারই পরের দিন ঐ পথে চড়ায় আট্‌কে পড়েছিল।



মোজার্টের প্রতিমূর্ত্তি—সাল্‌জ্‌বুর্গ

এখানকার পালা সাঙ্গ করে আমরা ২১শে জুন "কভ্‌নো"তে (Kovno বা Kaunas) এলাম। 'কভ্‌নো' লিথুয়ানিয়ার রাজধানী। ইয়োরোপের একটি

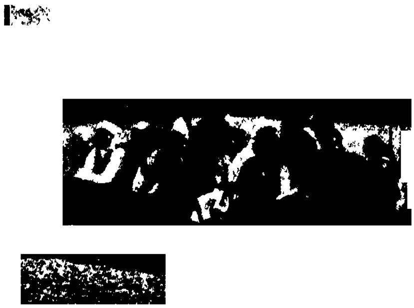


ক্ষুদ্র ট্রেণ (ফটো—তিমিরবরণ)

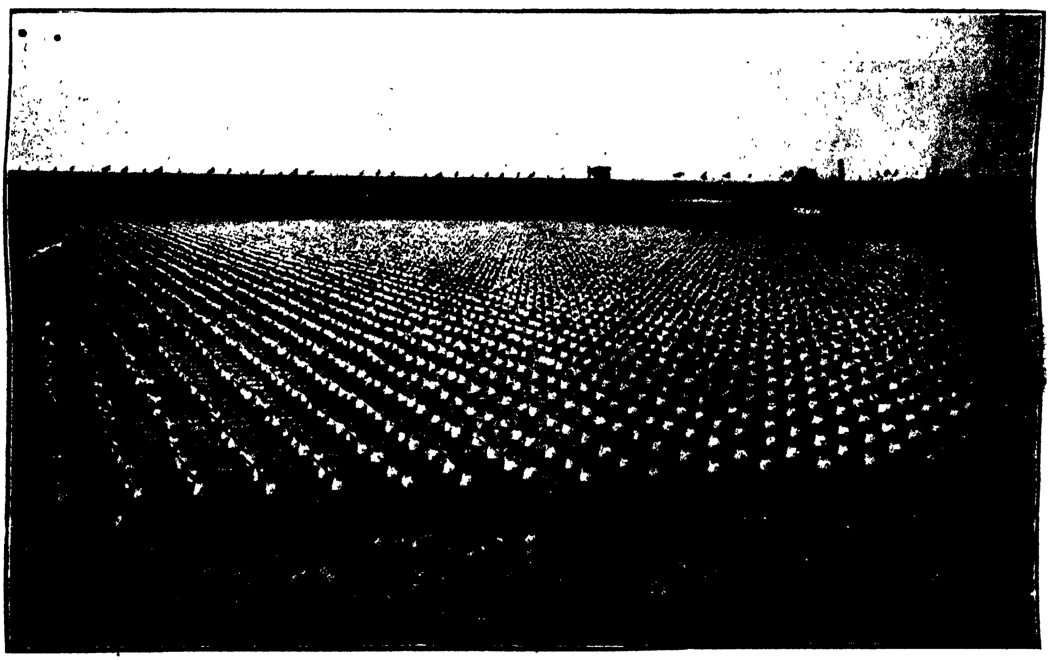
স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক দেশের রাজধানী যে এতো অপরিচ্ছন্ন হতে পারে তা আমরা পূর্ব্বে কল্পনা করতেই পারি নি। এ দেশে পাথরের রাস্তা এক শত বৎসরের মধ্যে মেরামত হয়েছে বলে মনে হল না। এখানে ট্রাম্ বা মোটরবাস্ নাই। আছে শুধু 'ট্যাক্সি' আর বেলুন টায়ার সংযুক্ত ঘোড়ার গাড়ী। এই বেলুন টায়ার গাড়ীগুলি কিন্তু ঘোড়া বা আরোহী কার যে সুবিধার জন্য তৈরী হ'য়েছিল তা' এ দেশের রাস্তার গুণে ঠিক্ বোঝা গেল না। একটী ছোট ট্রেণ সহর প্রদক্ষিণ করে ঘুরে বেড়ায়। তা'ও এত ছোট যে মনে হয় ধাক্কা লাগলেই উল্‌টে যাবে। এখানকার সমস্ত জিনিষেরই ভীষণ চড়া দাম। হোটেলের চার্জ্জও ইয়োরোপের অন্যান্য সহরের ভাল হোটেলের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু হোটেলের ভিতরে দুর্গন্ধে থাকা কঠিন। এই হোটেলটী এখানকার প্রেসিডেণ্টের বাড়ীর ঠিক্ সম্মুখে, কাযেই প্রধান বলা যেতে পারে। ঘরে শুধু কম্বল ও বালিশ। বিছানার চাদরের খোঁজ করাতে জবাব পেলাম—আপাততঃ সেগুলি রজকালয়ে আছে। এখানে 'সামার' থিয়েটারে আমাদের অভিনয় ছিল। নামটি বেশ—কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল—অভিনয় বটে। আমাদের দেশে সখের যাত্রা বা থিয়েটারের আট্‌চালার মত কতকটা। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছিলেন বৃষ্টি হলে দর্শকের দর্শন দুরূহ হবে। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদের দুদিনের আসরে—একদিনও বৃষ্টি হয় নি, কাযেই এখানকার পালাও নির্ব্বিঘ্নে শেষ হয়েছিল। এর পরে আমরা উত্তর জার্ম্মাণীর কয়েকটি সহরে নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন করি—যথা—Bad Elster, Bad-Kissengen, Mainz, Wild-bad, Wiess-baden, Bad-Kreuznach, Werzburg, Baden Baden, Baden-wielder, Villingen, Reiehen hall, Munchen এবং Phorzine। পরে অস্ট্রিয়ায় Bad-Ischl, Salzburg প্রভৃতি। এতগুলি "Bad" (ব্যাড্) যুক্ত সহরের নাম দেখে কেউ যেন মনে না করে বসেন এগুলি সত্যই খারাপ সহর! জার্ম্মাণীতে "Bad" শব্দের অর্থে "Bath" অর্থাৎ স্নান। এই সমস্ত দেশে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ আছে—সেই জন্য গ্রীষ্মের সময় দেশ দেশান্তর হ'তে এখানে বহু লোক সমাগম হয়। তাঁরা শুধু এই উষ্ণ জলের প্রস্রবণে স্নান এবং ঐ জল পান করবার জন্য আসেন। এখানে সকলেরই বিশ্বাস এই জল পান ক'রলে যে কোন প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। আমাদের দেশেও অনেক তীর্থ স্থানে এই প্রকার বহু 'কুণ্ড' আছে এবং সেগুলিরও

এবম্বিধ মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এই সব প্রস্রবণের ধারেই জল পান করবার জন্য কাঁচের গ্লাস ভাড়া পাওয়া যায়। তাছাড়া অনেকের 'প্রাইভেট্ গ্লাস'ও জলওয়ালাদের কাছে রাখা থাকে। সে গ্লাস মালিক ভিন্ন অপর কেউ ব্যবহার করতে পায় না।

অস্ট্রিয়ার সাল্জ্‌বুর্গ (Salzburg) এর মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সহর আমরা খুব কমই দেখেছি। চতুর্দ্দিকে পাহাড়ের আবেষ্টনীর মধ্যে সহরটাকে দেখে মনে হয় যেন পাহাড় কেটে এই সুন্দর সহরটী নির্ম্মিত হয়েছে। এই দেশেই, এই মনোরম পারিপার্শ্বিক নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যেই অমর সঙ্গীতনায়ক মোজার্ট (Mozart)এর জন্ম। পুরাতন রাজপ্রাসাদ পাহাড়ের উপরেই অবস্থিত। তাছাড়া সেখানে একটি গ্রামও আছে। প্রাচীন কারু-শিল্পে এবং নানাবিধ দুর্লভ দ্রব্য সংগ্রহ সমন্বয়ে এই রাজপ্রাসাদটী বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে সহরের দৃশ্যও অতি মনোরম। প্রাসাদে একটি অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রে সকালে ও সন্ধ্যায় ৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রাচীন সঙ্গীত ধ্বনিত হয়। এখানে পুরাকালের কয়েদীদের ঘর—তাদের উপর নির্ম্মম



ষ্টকহল্‌ম্—ন্যাশনাল গার্ডেন্স। রেস্তোর‍াঁর সম্মুখে চাতালে জাতীয় পরিচ্ছদ ভূষিতা সুইডিস নারীগণের সহিত ভারতীয় দলের রহস্যালাপ (ফটো—রাজেন্দ্রশঙ্কর)



"Sokol" উৎসব—প্রাগ্ Tyr's এর শতবার্ষিক জন্ম দিন উপলক্ষে বালিকাদের কুচ কাওয়াজ

উৎপীড়নের নমুনা রাজাদের বিলাসিতার নিদর্শন ইত্যাদি অতীতের বহু স্মৃতি এখনো বর্ত্তমান। এখানে "Festpiel Haus"এ (Reinhert Theatre) আমাদের অভিনয় ছিল। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী ও অভিনেতা Max Reinhart



কার্লসবাদের উষ্ণ প্রস্রবণ (ফটো—রাজেন্দ্র)

এই মনোরম নাট্যপীঠের নির্ম্মাতা। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই আমরা সেই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করেছি। কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুদৃঢ় রঙ্গালয় আমরা



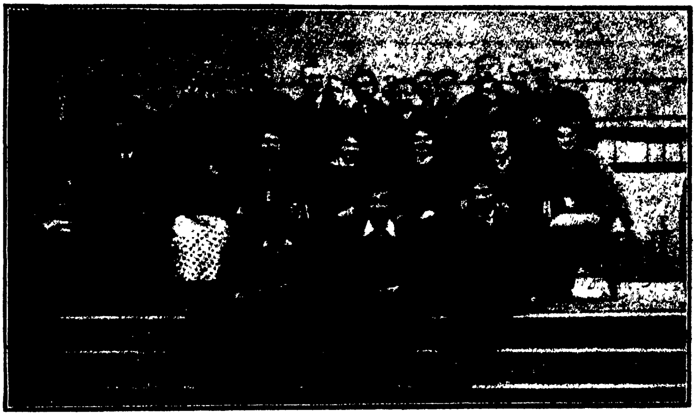
ম্যাডাম প্যাককোভস্কার গৃহে অতিথি পশ্চাতে (বাম দিক হইতে) ম্যাডাম ভেনেক, শিমকী, উদয়শঙ্কর, রবীন্দ্র-শঙ্কর, কুমারী প্যাককোভস্কা, বিষ্ণুদাস শিরালী, তিমিরবরণ, ম্যাডাম প্যাককোভস্কা সম্মুখে (বাম দিক হইতে)—মিঃ লেইকটার, ম্যাডাম লেইকটারোভা, দেবেন্দ্র-শঙ্কর, রাজেন্দ্রশঙ্কর

এই প্রথম দেখলাম। ইহার নির্ম্মাতা Max Reinhart যৌবনে দরিদ্র ছিলেন। তিনি প্রকৃত শিল্পী। শিল্পীর সমস্ত সুবিধা অসুবিধার এবং অভাব অভিযোগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বিরাট্ গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহের মধ্যে উৎসাহের প্রেরণা আপনা থেকেই জেগে উঠে। এরূপ রঙ্গালয়ে কৃতিত্ব দেখানো যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই। এখানে আমাদের শেষ অভিনয় হয় ১৭ই জুলাই। আমরা ১৮ই তারিখে প্যারী অভিমুখে রওনা হ'লাম।

আপাততঃ ইংল্যাণ্ড বাদে (সেখানে আমাদের পরে যাওয়া হয়েছিল। সে খবর ভবিষ্যতে জানাবার ইচ্ছা আছে) সমগ্র ইয়োরোপ ভ্রমণ এইখানেই আমাদের শেষ হল। অন্যান্য বহু স্থানে নৃত্যাভিনয়ের নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও এত শীঘ্র প্যারীতে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ—আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সমালোচকবর্গ এবং আমেরিকান 'শো' ম্যানেজার (Impressario) প্যারীতে আমাদের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। এই সমস্ত সমালোচক-চূড়ামণিদের অনুকূল সমালোচনার উপরই আমাদের আমেরিকায় যাওয়ার ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছিল। ১৯৩১ সালে আমাদের আমেরিকায় যাওয়া একরকম স্থির ছিল—কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে ভারতীয় অভিনেতৃদলকে এঁরা নিয়ে যান তাঁদের শোচনীয় ব্যর্থতাই আমাদের পূর্ব্ববারের চুক্তিভঙ্গের কারণ। তা'ছাড়া, ভবিষ্যতে আর কোন ভারতীয় দলকেই আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হবে না এই রকম একটা কঠিন পণ করেছিলেন সে দেশের প্রমোদনায়কেরা। কিন্তু ইয়োরোপে আমাদের সফলতায় এঁদের সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আমাদের "ইম্প্রেসারিয়ো" মিঃ হুরোক্ নিজ স্কন্ধে এ দায়িত্ব না রেখে নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ নৃত্য ও সঙ্গীত সমালোচকগণকে নিজব্যয়ে প্যারীতে আনিয়ে তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। লেখা বাহুল্য, পরে তাঁদের উচ্ছ্বসিত সমালোচনা নিউইয়র্কের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হ'য়েছিল। ফলে আগামী ডিসেম্বরে আমাদেরও ভূগোলের অপর গোলার্দ্ধে যাওয়া সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। ইতোমধ্যে আমরা আর একবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করেছিলাম। এই সমস্ত শফরের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে, গোটাকয়েক প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ মাত্র ক'রে ইয়োরোপের ভ্রমণ বৃত্তান্তের উপর আপাততঃ যবনিকাপাত করতে ইচ্ছা করি।

এই ব্যাপারটী ঘটেছিল "চেকোশ্লোভেকিয়ার রাজধানী

গ" (Prague) সহরে। বুদাপেষ্ট থেকে মোটরবাসে হ। সীমান্তের রক্ষী সৈন্যগণ 'বাস্' আটক করলে। সন্ধ্যা। পরের দিন সায়াহ্ন ৬টায় প্রাগ্ এ আমাদের নয়। কাযেই এখানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলে না। এরাও অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ক রাখতে চায়। অনেক অনুনয় —শেষে উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর বন্ধুত্বের উল্লেখ ক'রে ভয়-ন, কিছুতেই ফল হ'ল না। ফোন পর্য্যন্ত ব্যবহার ক'বার তি পেলুম না। নিরুপায় হ'য়ে মাইল দূরে এদের 'অফিসার'-এর গেলাম। তিনি তখন মগ্ন। তবু ডাকাডাকি করে তাঁকে তুললাম। সদ্যজাগ্রত স্ত্রী উভয়েই উঠেছিলেন। এ আশ্রম-পীড়া দেওয়ার জন্য সঙ্কুচিত হ'লাম, কিন্তু উপায় । আমাদের দুঃখের কাহিনী প্রয়োজনের গুরুত্ব জ্বলন্তভাষায় করবার পরও তাঁর নির্ব্বিকার স্তিমিত চক্ষু দেখে বিশেষ পেলাম না। তথাপি, আমা-যাবার অনুমতি তাঁকে দিতে কারণ তাঁর গুণবতী স্ত্রী আমা-হ'য়ে তাঁকে বিশেষ পীড়াপীড়ি ত লাগলেন। যাই হোক্ পরের 'প্রাগে' পৌছতে আমাদের ৯॥টা বেজে গেছ'ল। অর্থাৎ নয় আরম্ভ হবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৩॥ ঘণ্টা পরে আমরা থিয়েটারে নামলুম। বহু পূর্ব্ব হ'তেই 'হাউস্' বিক্রয় হ'য়ে গেছে পেয়েছিলাম। দূর থেকে থিয়ে-র সম্মুখে অসম্ভব ভীড় দেখে জনতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মোটরবাসের আলো নিভিয়ে পিছনের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমাদের ম্যানেজার তো উন্মত্তের মত এসে বললেন "শীঘ্র প্রস্তুত হয়ে নিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা ক'রে সকলে বসে আছেন।" আর মুহূর্ত্তমাত্র

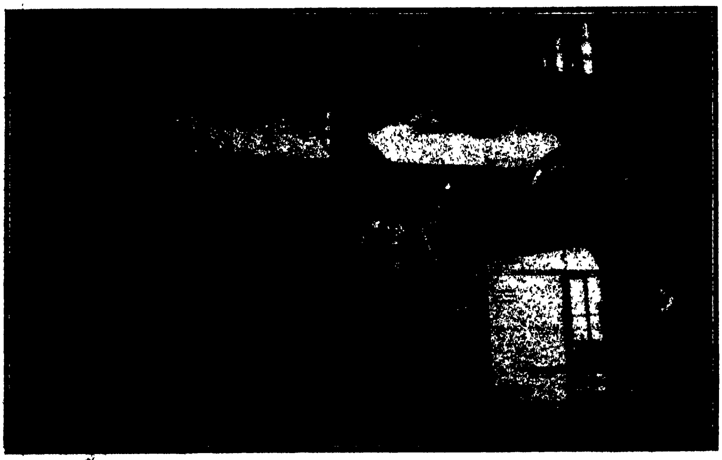


শিল্পী-সঙ্ঘ পশ্চাতে দণ্ডায়মান—১। বেচু, ২। ডাক্তার লাভাক, ৩। উদয়শঙ্কর, ৪। বিষ্ণুদাস শিরালী চেয়ারে উপবিষ্ট—কেদারশঙ্কর চৌধুরী, কনকলতা, শিমকী, ম্যাডাম টুককোভা, ম্যাডাম ভেনেক্ ও শিল্পীগণ প্রথম সারিতে - রবীন্দ্র, দেবেন্দ্র ও তিমির (ফটো—রাজেন্দ্র)



ষ্টকহল্মে ভারতীয় দল বাম দিক হইতে—রাজেন্দ্রশঙ্কর, উদয়শঙ্কর, বেচু, অমলা, শিরালী, ম্যাডাম ভেনেক, শিমকী, কনকলতা, কেদারশঙ্কর (ফটো—তিমিরবরণ)

বিলম্ব না করে তিনি আমাদের অভিনয় আরম্ভ ক'রে দিতে ব'ললেন। কিন্তু সাজ-সজ্জার দরুণও সকলের একটু বিলম্ব হবেই, কাযেই আমাকেই সর্ব্বাগ্রে 'স্বরোদ' নিয়ে সেই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন হ'তে হ'ল! তাড়াতাড়িতে ক্ষৌর কার্য্যের পর্য্যন্ত সময় পেলাম না। আরম্ভের পূর্ব্বে ম্যানেজার আমাদের বিলম্বের কারণ সবিস্তারে সবাইকে জানিয়ে দিলেন বটে; তবু, সেই সুদীর্ঘ অপেক্ষায় উত্যক্ত দর্শক মণ্ডলীর কাছে যে কী ব্যবহার পাবো সে সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কা রইল। যবনিকা উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই বিকট কোলাহল এবং করতালি সুরু হ'ল—সে আর থাম্‌তেই চায় না। মনে হল— এই বুঝি দেরী হওয়ার দরুণ প্রতিশোধ নিতে এরা ক্ষেপে গিয়েছে। প্রথমেই আমাকে হাতে



ম্যাক্স রীনহার্ট থিয়েটার—সাল্‌জ্‌বুর্গ (দেওয়াল চিত্রের নমুনা)

পেয়েছে—কী যে করবে কে জানে? যা থাকে কপালে—চোখ বুঁজে বাজ্‌না তো আরম্ভ করে দিলুম। কোনো দিকে না চেয়ে একমনে বসে বাজ্‌না শেষ করলুম। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কানে এল সেই উন্মত্ত কোলাহল এবং ষ্টেজে "ধুপ্‌-ধাপ্‌" করে কি সব ঠিক্‌রে এসে পড়্‌তে লাগ্‌ল। দর্শকেরা কি যেন ছুঁড়ে মারছে!—উঠে পালাব কি না ভাব্‌ছি—একটা গায়ে এসে পড়াতে দেখ্‌লাম, সেগুলি ইট পাট্‌কেল বা পলা পনির বা পচা ডিম নয়—ছোট ছোট সুন্দর ফুলের তোড়া!—তখন বুঝ্‌লাম—এই কোলাহল আনন্দ-পরিতৃপ্ত অনুরাগের,—হতাশা-ক্ষিপ্ত বিরাগের নয়।

এই আনন্দধ্বনি এবং পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আমাদের 'নৃত্যাভিনয়' শেষ কর্ত্তে রাত্রি একটা বেজে গেল। শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অনুরাগীবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণে বিদায় কর্ত্তে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। পরের দিন দেখা গেল স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলিতে সীমান্ত-রক্ষীদের অযথা অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচার সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য এবং আমাদের জনপ্রিয়তার বিষয়ে বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একটি কাগজ মন্তব্য করেছেন - একটা কোনো 'শো' দেখবার জন্য দর্শক-বৃন্দের এরূপ সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা শান্তভাবে অপেক্ষা করা ইয়োরোপে এই প্রথম। অর্থাৎ অন্য যে-কোন ব্যাপারে দর্শকেরা টিকিটের মূল্য ফেরৎ নিয়ে চলে যেতেন। অথচ আশ্চর্য্য যে এই 'শো'তে একজন লোকও টিকিটের মূল্য ফেরৎ চান নি। ও-দেশের সংবাদ-পত্রের মতে এই ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভিনব—এবং উদয়শঙ্করের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘ্য।

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুশেল্‌স্-এর একটি ঘটনা নানা কারণে এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। ওখানে ব্রিটিশ পরিচালিত একটি ভাল হোটেল আছে। উদয়শঙ্কর সাধারণতঃ হোটেলের ভাল ঘরগুলিই ভাড়া করেন। এ ক্ষেত্রে এরা আপত্তি করে, যে, ভারতীয়দের নীচের ঘরে থাকতে হবে। উদয়শঙ্কর বললেন আমরা যেখানেই গিয়াছি সম্মানের সহিত ভাল ঘরেই থেকেছি—এ ধরণের কথা কোথাও এ পর্য্যন্ত শুনিনি। এর উত্তরে ব্রিটিশ্‌ হোটেলওয়ালা বললেন—'আমরা যে 'ব্রিটিশ্‌'! তোমরা সব দেশেই সম্মান পেতে পার, কিন্তু—আমাদের কাছে সে আশা ক'রতে পারো না—ইত্যাদি"। এই নিয়ে বাধলো তুমুল ঝগড়া। আমরা সদলে জবরদস্তি ঘর দখল করলাম। ব্রিটিশ ম্যানেজার পুলিশ ডাক্‌লেন। আমরাও ফোন করে তাদের বড় কর্ত্তাকে আনালাম। তিনি এসে ব্রিটিশপুঙ্গবকে যা বল্লেন তার সার মর্ম্ম হচ্ছে "আজ যে বিখ্যাত শিল্পী ও গুণীকে দেখবার জন্য দেশ দেশান্তর থেকে বড়লোক এই সহরে এসে

ভীড় করেছেন, তাঁকে তোমরা নির্লজ্জের মত কোন্ সাহসে অপমান কর? বর্ণবিদ্বেষ বা প্রভুত্ব তোমাদের নিজেদের দেশে গিয়ে চালিয়ো—এ দেশে ও-সমস্ত হীন ব্যবধান চল্‌বে না” এই বলে তিনি হোটেলের রিজার্ভ করা সব সেরা ঘরগুলি পর্য্যন্ত নিজ হাতেই আমাদের জন্য খুলে দিলেন। পরে-অবশ্য ব্রিটিশ ম্যানেজার তাঁর ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে আমাদের অন্যান্য সুবিধার বন্দোবস্তের ত্রুটী করেননি। *

বর্ণবিদ্বেষ অল্প বিস্তর ইয়োরোপের সব দেশেই আছে। প্যারীতে একটী বড় কাফেঁ আছে; নাম “লা কুপোল” (La coupole)। সেখানে শুধু আর্টিষ্ট এবং বিদেশী লোকেরই বেশী আমদানী এবং সব সময়ে ভীড় লেগেই আছে। এখানে পাঁচ শত জন একত্রে ভোজন করতে পারে। একদিন আমরা এখানে সান্ধ্য-ভোজন কর্চ্ছি, একজন নিগ্রো প্রিন্স আহারের পর বল্‌রুমে ঢুক্‌তে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় - সম্ভবতঃ তাঁর নিকষ কালো চাম্‌ড়ার জন্য। নিগ্রো প্রিন্স কিন্তু এই বলে শাসিয়ে গেলেন “সাত দিনের মধ্যে আমি আবার আস্‌ব। তখন কিন্তু তোমরা আমাকে সেলাম করে বল্‌রুমে যেতে দিতে বাধ্য হবে।” প্রিন্স সেইদিনই এই ব্যাপার



ষ্টকহল্‌ম্ – জাতীয় উদ্যান



লেখক—তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

* এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। ভারতের ঘরে বাইরে এবং পথে ঘাটে ‘ব্রিটিশ্’ ব’লে যাঁরা পরিচয় দিয়ে থাকেন তাঁদের ব্যবহারে ইংল্যাণ্ডের উপর আমাদের চিরকালই অভক্তি এবং বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু পরে লণ্ডনে এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য সহরে প্রায় এক মাস আমাদের নৃত্যাভিনয় হয়। তার ফলে আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছে। নিজেদের দেশে এরা সত্যই অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্রলোক। এ সমস্ত বিবরণ পরে জানাবার ইচ্ছা রইল।

বর্ণনা করে ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে চিঠি লেখেন – গবর্ণমেণ্টও তৎক্ষণাৎ ঐ কাফেতে নোটীশ দিলেন "আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গে অন্য কোন দেশের লোকের কোন প্রভেদ নেই। ভবিষ্যতে এ ধরণের অভিযোগ এলে তোমাদের 'প্রাইভেট্ ক্লাব' হিসাবে লাইসেন্স নিতে হবে। ফলে, কাফেওয়ালারা নিগ্রো প্রিন্সের কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ক'রে পরের দিন তাঁকে উক্ত কাফের নাচের মজলিসে পুনরায় যাবার জন্য অনুরোধ ক'রে পত্র দিয়েছিলেন।

ইয়োরোপে সার্দ্ধ বৎসর ভ্রমণে নানারূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমস্ত খবর দেওয়া আপাততঃ অসম্ভব। পরের বারে আমেরিকায় যাওয়ার খবর সংক্ষেপে জানাবার চেষ্টা ক'রব। ১৯৩১ সালে ৩রা মার্চ্চ প্যারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় "সাঁজ্ এলিজ্" (Champs Elysees) থিয়েটারে আমাদের প্রথম অভিনয় হয়। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত - ইংলণ্ড বাদে সমগ্র ইয়োরোপে আমরা চারি শতেরও অধিক নৃত্যাভিনয় প্রদর্শন ক'রেছি।

রাইকিশোরী

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেন

কীর্ত্তনওয়ালা বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিতেছিল—

"না পোড়ায়ো রাধা-অঙ্গ না ভাসায়ো জলে।
মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরি ডালে।"

এ-পাশে চিকের আড়ালে সব কয় জোড়া চোখ হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পাশের বর্ষীয়সী মহিলাটিকে জড়াইয়া ধরিয়া কিশোরী চুপি চুপি ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে কি হবে ফুলমাসীমা?" মহিলাটি অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "চুপ করে শোনো মা।"

চোখ মুছিয়া কিশোরী আবার কীর্ত্তনে মন দিল।... অভাগিনী রাধিকার কপালে কি আছে কে জানে! "জলদবরণ কানু'র দেখা সে পাইবে তো? যদি না পায়—"

সহসা পিছন হইতে কে কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বলি ওগো রাইকিশোরী, বারে বারে ডেকে পাঠাচ্ছি, যেতে যে চাচ্ছো না, পিণ্ডি গিল্‌বে কখন? ওটা না হ'লে তো চল্‌বে না—"

মুহূর্ত্তে স্বপ্নজাল টুটিয়া গেল। মামীমার ডাকে ভয়ে জড়সড় হইয়া কিশোরী উঠিয়া তাঁহার পিছু পিছু চলিল। যাইতে ইচ্ছা করে না—রাধিকার করুণ সুর যেন সহস্র বন্ধনে টানিয়া ধরে, বলে, "আর একটু শুনিয়া যা, অভাগী লো, এই অভাগীর দুঃখ আর একটু বুঝিয়া যা।"—কিন্তু থাকিবার তো উপায় নাই!

উঃ! চলিতে চলিতে পথের ইঁটে হোঁচট খাইল বুঝি। মামীমা রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, "একটু চোখ চেয়ে পা চালিয়ে এসো গো, অত ভাবে গদগদ হ'য়ে ঠমক করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌লে চল্‌বে না। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, কপালে বিয়ে জুটলে এ্যাদ্দিনে নাতির ঘরে পুতি হ'য়ে যেতো, ঢঙ্ করে কেত্তোন শুন্‌তে গেছেন না যেন ঢলে পড়েছেন। দেখো আবার পথেতেই যেন ঢলে প'ড়ো না।"

কিশোরী কথা কহিল না।

কিন্তু সত্যই সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সাত দিন ধরিয়া কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর সে কাঁদিতে পারে না। কিন্তু না কাঁদিয়াও পারে না। সারা দিন কত ছবি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়, সারারাত কত ব্যথা মনের মধ্যে গুমরিয়া মরে, সারা দিনরাত কতবার কত ছলে চোখ মোছে, মামীমার খোঁটা খাইয়া কতবার প্রতিজ্ঞা করে কিছুতেই আজ কীর্ত্তন শুনিতে যাইবে না,—কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই যখন অদূরের বারোয়ারীতলায় খোল করতাল বাজিয়া ওঠে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না;—ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সন্ধ্যার এই সুবিধাটুকু লাভ করিবার জন্য সারা দিন সে মুখরা মামীমার মন জোগাইয়া চলে। মামীমার ছেলেমেয়েগুলিকে দিনরাত আগ্‌লাইয়া, মামীমাকে কোনো কাজ করিতে না দিয়া নিজেই সব করিয়া, রুক্ষস্বভাব মামাবাবুকে

সর্ব্বরকমে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া সে সন্ধ্যার এই সুবিধাটুকুর প্রতিদান দেয়। খাটিতে অবশ্য তাহাকে বারো মাসই হয়—মামার গলগ্রহ বলিয়া গাধার মতই খাটিতে হয়—কিন্তু কীর্ত্তনের এই কয় দিন সে শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া চোখ মুখ বুজিয়া খাটিয়া চলিয়াছে। সাত দিন হইল কীর্ত্তন হইতেছে, আজ না-কি শেষ হইবে। অভাগিনী রাধিকার কপালে কি দাঁড়াইবে কে জানে।

বাড়ী ঢুকিতেই মামা চীৎকার করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "দূর করে দাও, বিষকাঁটালী মুখপুড়ী হতচ্ছাড়ীটাকে দূর করে দাও। এতখানি বয়েস হ'লো, এত রাতে বাড়ী ছেড়ে থাকে,—ওটাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিও না।"

মামী আবার ফোড়ন দিয়া বলিলেন, "বলি তোমার রাইকিশোরী ভাগ্নীটি কি ওখানে নাগর খুঁজে পেলো না কি গো, বাড়ীতে যে আর আস্‌তেই চায় না।"

বাড়ীতে ঢুকিয়াই কিশোরী অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। মামীমার ছোট ছেলে মেয়ে তিনটী একসঙ্গে জাগিয়া উঠিয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে, তাহাদের সমবেত চীৎকারে মামাবাবুর বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, আর মামীমাও ক্ষুন্নিবৃত্তির বিলম্ব দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন।

চোখের জল চাপিতে চাপিতে কিশোরী কাজে লাগিয়া গেল। ছোটদের কোনোটিকে নাচাইয়া, কোনোটিকে থাবড়াইয়া কোনোটির গায়ে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইল। মামীমা অক্লেশে খাইয়া ঘরে গেলেন। মামাবাবু গজ্‌গজ্‌ করিতে করিতে আবার ঘুমাইয়া প'ড়িলেন। সকলের শেষে এঁটো-কাঁটা ধুইয়া সে ঘরে আসিল।

পাশের ঘরে মামামামী থাকেন, এই ঘরে সে আর ছোট মামাত ভাই বোন দুটি শোয়।

ক্লান্তিতে বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেও ঘুম যেন আর আসিতে চাহে না।

কত কথা মনে আসে। কত কথা।···

মনে আসিতে পারে অনেক কথা,—সে "রাক্ষুসী", "বাপ টা"কে খাইয়াছে, "মা-টা"কে খাইয়াছে, এখন "মামা-টা"কে খাইবার জন্য তাহার কাঁধে আসিয়া ভর করিয়াছে; তাহার "পোড়াকপালে" বিবাহ জুটিতেছে না, এদিকে খরচের দায়ে "মামা-টা"র সর্ব্বনাশ হইয়া গেল; "সোমত্ত বয়েস" লইয়া সে "নাগরী"র মত "ঢলিয়া ঢলিয়া" বেড়ায়, কাজ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া "কলঙ্কিনী বিনোদিনী"র মত "ভাব ধরিয়া" দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার জন্য মামার মুখ "চুণ কালি"তে ঢাকিয়া গেল;—এমনি কত কথা এই নিভৃত শয়নে মনে আসিতে পারে, কিন্তু সে সব কথা রোজ রোজ নিত্য নূতন ভাবে শুনিয়া গা'-সহা হইয়া গিয়াছে,—সে সব কথা আজ আর মনে আসে না।···

কিন্তু রাধিকার আজ না-জানি কি-ই হইয়া গেল। মরিবে তো নিশ্চয়ই, তবুও যদি মরার আগে একবার কৃষ্ণের সহিত দেখা হয়—।···চোখ দুইটা অকস্মাৎ জলে ভরিয়া আসে। মুছিয়া ফেলে, আবার ভরিয়া আসে; আবার মোছে, আবার ভরিয়া আসে।···নাঃ, বড় মন খারাপ লাগিতেছে। ঘরের ভিতরটায় কেমন যেন একটা গুমট ভাব।

উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া কিশোরী জানালার পাল্লায় হেলান দিয়া বসিল।

আচ্ছা, রাধিকার অমন দশা কেন হইল? কিসের জন্য সে অমন করিয়া কাঁদিয়া মরিল? কীর্ত্তনওয়ালা অনেক কথাই বলিয়াছে—অনেক ব্যাখ্যাই করিয়াছে; সে সব সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, শুধু বুঝিয়াছে, রাধিকা কৃষ্ণকে বড় ভালবাসিত। তাই কৃষ্ণকে না পাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিল।

ভালবাসা!—কেমন সে জিনিষ তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু তাহা যেন একটু একটু চেনে, ভাসাভাসা ভাবে বুঝিতে পারে। কেমন যেন এক বিচিত্র অনুভূতি! কি যেন ভিতরে রহিয়াছে, বাহিরে আসিতে চায়, আসিতে পারে না। কোরকে আবদ্ধ সৌরভের মত বাহিরের পথ খুঁজিয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরে। বাহির হইতে না পারার বেদনায় চঞ্চল করিয়া তোলে। অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, কিন্তু কিসের যেন লজ্জায় কাহাকেও বলা যায় না।

মামীমা সময়ে অসময়ে "ভাব ধরিয়া" দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য যথেষ্ট খোঁটা দেন বলিয়া দুঃখ নাই; কিন্তু সত্যই এক এক সময় সে যেন কেমন হইয়া যায়। কাজ করিতে করিতে জানালা দিয়া যখন বাহিরের খোলা মাঠটার দিকে অতৃপ্ত-নয়নে তাকাইয়া থাকে, মনটা যেন কেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে; গাছের পাতার ফাঁক দিয়া দুপুরের আকাশ যখন ঘন-নীল হইয়া দেখা দেয়, চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সে স্পষ্ট

শুনিতে পায় কে যেন দূর—অতি দূর হইতে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে; নিস্তব্ধ রাত্রির মুক্ত বাতায়ন দিয়া জ্যোৎস্নাভরা পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটা কেন যেন জলে ভাসিয়া যায়,—কিছুতেই সাম্‌লানো যায় না।···

মন ব্যথায় টন্‌টন্ করে, তবু বড় ভাল লাগে। রাধিকার মত তাহার যেন কাহার জন্য মন কেমন করে। ইহাই কি, —গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে,—ইহাই কি—

"ভালবাসা?"

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মুখ দিয়া শব্দটি বাহির হইয়া যাইতেই কিশোরী চমকিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ রাত্রিতে চরাচর সকলে ঘুমাইতেছে, তবু যেন মনে হইল আকাশ বাতাসের সকলে কান পাতিয়া তাহার গোপন কথা শুনিয়া সমস্বরে টিট্‌কারী দিয়া উঠিল। কাঁপিতে কাঁপিতে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সে মরার মত নিশ্চল ভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল। ঘামে বিছানা ভিজিয়া যাইতেছে। জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িতে ভয় হয়—পাছে কেহ শোনে।···

অনেকক্ষণ।

ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসে। রাধিকা কহিয়াছিল, "সখি, মরিলে আমাকে পোড়াইও না, জলে ভাসাইয়া দিও না,—তমাল গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়ো। মরিয়াও যেন আমি কালো তমালগাছকে জড়াইয়া থাকিতে পারি। তমাল বড় ভালবাসি। কৃষ্ণ কালো তমাল কালো, তাই তমালকে বড় ভাল লাগে।···তমাল···ভারী মিষ্টি নামটা, না?···তমাল··

এঃ বেলা হইয়া গিয়াছে তো! ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কিশোরী চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশ পৃথিবী কাঁচা সোনার স্রোতে ভরিয়া গিয়াছে, ঘাসের মাথায় মাথায় হীরার টুক্‌রাগুলি জল্ জল্ করিতেছে, আকাশের অনে—ক দূর হইতে ভরতপাখীর অস্পষ্ট গান ভাসিয়া আসিতেছে।—বাহিরের প্রকৃতি যেন ছুটিয়া আসিয়া সুপ্তোত্থিতাকে সাদরে জড়াইয়া ধরিল। আনন্দোজ্জ্বল মুখে একবার চারিদিকে তাকাইয়া বারাণ্ডার এক কোণে অতিরিক্ত মনোযোগ সহকারে মার্জ্জনকার্য্যপ্রবৃত্তা ঝাঁটাহস্তা মামীমার থম্‌থমে মুখখানার দিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া কিশোরী জল আনিতে নদীতে চলিল।

উঠিতে বেলা হইয়া গিয়াছে, মামীমা খুব বকিবেন বোধ হয়। তা' বকুন,—কিন্তু শেষরাত্রে সে যা' স্বপ্ন দেখিয়াছে!!—

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
খঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা অঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙারি কৈল থেহা।—"

নদীর ধারটা এত ভাল লাগে! কদমতলা দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া-চলিয়া-যাওয়া ওপারের ওই সরু পথটার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে, "ওপারে বঁধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখী হয়ে উড়ে যেতে পাখা দেয়না বিধি॥"

নদীর জলে নীল আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কলসীতে জল ভরিতে ভরিতে কিশোরী মৃদুস্বরে গাহিতেছিল—

"কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিব।
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥ —"

সহসা ঘাড় ফিরাইয়াই সে লজ্জায় লাল হইয়া গেল। ঘাটে আর কেহ নাই, কিন্তু বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটার গোড়ায় বসিয়া কে একজন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার প্রতিটী অঙ্গবিভঙ্গ সে বিস্মিত নেত্রে লক্ষ্য করিতেছে।—দুইটী ভাসা ভাসা রহস্যভরা চোখ।

পা কাঁপিতেছে। কোনো দিকে আর তাকান যায় না। কলসীটি কোনো রকমে তুলিয়া লইয়া কিশোরী নত-মুখে ঘাটের উপরে উঠিতে লাগিল।

যে পিছল ঘাট! আর একটু হইলে পড়িয়া যাইতেছিল আর কি। লোকটি বলিল, "আহা—"।

স্খলিতচরণে কিশোরী বাড়ীর পথ ধরিল। অপরাজিতা বনের ধার দিয়া জোড়া বকুল গাছের আড়ালে আসিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া একবার লোকটির দিকে চাহিয়া দেখিল। হ্যাঁ, সে-ই তো! কীর্ত্তনের দলে যে কৃষ্ণ সাজে সেই লোকটাই তো বটে! উদাস দৃষ্টিতে ওপারের পথটির দিকে চাহিয়া আছে। দুইটি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ।

•

স্নানের সময় ঘাটে ফুলমাসীমার মেয়ে পদ্মর সহিত দেখা। পদ্ম কহিল, "কি ভাই কিশোরী, মন ঠাণ্ডা

হয়েছে তো? বাব্বা রে বাব্বা, এত কাঁদতে পার তুমি! আমার কিন্তু ভাই অত কান্নাকাটির পালা ভাল লাগে না। তবুও ভাল যে শেষটুকু ছিল।"

অল্প দিন হইল পদ্মর বিবাহ হইয়াছে। কান্নাকাটি তাহার ভাল লাগে না, মিলনের কথায় সে পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে। পদ্মর কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল, "কাল শেষ পর্য্যন্ত কি হয়েছিল ভাই?"

পদ্ম আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন শেষ পর্য্যন্ত ছিলে না তুমি? বোকা মেয়ে, কান্নাটুকুই নিয়ে গেলে, হাসিটুকু আর নিতে ইচ্ছে কর্‌ল না বুঝি? কাল যে তার পর রাধাকৃষ্ণে মিলন হ'লোগো।"

যাক্ মিলন হইয়াছে তবে।

কিন্তু সকলেই মিলনের কাহিনী শুনিল, তাহার আর শোনা হইল না। চোখ দুইটা অকস্মাৎ ভারী হইয়া আসে। ভিজা গামছা দিয়া চোখমুখ রগ্‌ড়াইয়া লইয়া কিশোরী বলিল, "কেমন করে হ'লো বল না ভাই!"

মৃদু হাসিয়া জলে ঢেউ তুলিতে তুলিতে পদ্ম বলিল, "রাধিকার তনু দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগলো। চারদিক তিনি শ্যামময় দেখতে লাগলেন। অনুক্ষণ শ্যাম নাম কর্‌তে কর্‌তে তাঁর সোণার অঙ্গ শ্যামবর্ণ হ'য়ে গেল। তিনি সম্বিৎ হারালেন।—ও কি ভাই, অমন কর্‌ছো যে?"

"না,—ও কিছু নয়,—কি যেন চোখে গিয়েছে তাই। হ্যাঁ, তার পর?—সম্বিৎ হারালেন, তার পর?"

"সখীরা পরামর্শ ক'রে একজনকে পাঠালো মথুরা-পুরীতে। সে যেয়ে কৃষ্ণকে বল্‌লো, 'ও কুবুজার বন্ধু, আমাদের রাইকে কি মনে পড়ে? আর যে যতই ভালবাসুক রাই-এর মত কেউ তোমাকে ভালবাস্‌বে না।' রাই-এর কথা শুনে শ্যাম চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে সখীর পিছু পিছু ছুটে এলেন ব্রজের পানে।"

কিশোরী রুদ্ধনিঃশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

"এদিকে সখীরা রাইএর অন্তিম দশা দেখে 'কালো যমুনার পারে' 'কালো তমালের তলে' 'নীল কমলের শেজে' তাঁকে শুইয়ে নয়নের কাজল দিয়ে তাঁর সারা গায়ে কৃষ্ণনাম লিখে দিতে লাগলেন।—অসাড় দেহে রাই পড়ে আছেন। কথাও বল্‌তে পারেন না, চোখও মেল্‌তে পারেন না, শুধু মুদিত চোখের দুই কোণ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে থাকে। নাকের কাছে তুলো ধর্‌লে বোঝা যায় এখনও দেহে প্রাণ আছে। সখীরা শঙ্কিত হয়ে এক একবার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'শ্যামচাঁদ এসেছেন রাই, চোখ মেলে ছাখো।' রাই প্রাণপণ শক্তিতে চোখের পাতা খোলেন, কিন্তু দেখেন সব ফাঁকি, দশ দিক শূন্য। খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে তাঁর চোখ নিভে আসে, শরীর আবার নেতিয়ে পড়ে। সখীরা রাইকে ধরাধরি করে নিয়ে অন্তর্জ্জলে রাখলেন। আর সময় নেই, শেষ মুহূর্ত্ত,—এমন সময় ওপারের পথে রথের ধ্বজা দেখা দিল। মথুরার পথ দিয়ে যমুনার পার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে কৃষ্ণ রাধিকার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে ডাক্‌তে লাগলেন,—'রাই, রাই!' রাধিকার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। চেতনা পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে তিনি কৃষ্ণের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। কদম কণ্টকিত হ'লো, জ্যোৎস্না সুধা ঢাল্‌তে লাগলো, দশ দিক পাগল করে বাঁশী বেজে উঠলো,—ও কি! কাঁদ্‌ছো না-কি ভাই?"

"দূর্।" কিশোরী তাড়াতাড়ি ডুব দিল। ডুব দিয়া তলাইয়া গিয়া কিশোরী জলের তলের মাটিতে মাথা কুটিতে লাগিল। চোখের জলে নদীর তলে দ্বিগুণ বেগে স্রোত বহিয়া যায়; যায় যাউক, টের তো কেহ পায় না।

পদ্ম চঞ্চল হইয়া কহিল, "যাই ভাই এখন। নিতে এসেছেন, কাল চলে যাবো, পার তো একবার যেয়ো।"

পদ্ম আগে আগে চলিয়া গেল। আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় কিশোরী দেখিল চোখভরা বিস্ময় লইয়া কীর্ত্তনদলের সেই কৃষ্ণ-সাজা ছেলেটী আবার সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের গোড়ায় আসিয়া বসিয়াছে।

সঙ্কুচিত হইয়া পাশ কাটাইয়া যাইতে গেলে ছেলেটীর চোখের জ্যোতিঃ যেন নিভিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তুমি—তুমি মল্লিকপুরের রায় বাড়ীর কিশোরী না?"

কিশোরী নতমুখে বলিল "হ্যাঁ।"

চলিয়া যাইতেছে এমন সময় ছেলেটী আবার বলে, "আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি কানু—কানাই,—ঘোষেদের বাড়ীর ছেলে। ছোটকালে একসঙ্গে খেল্‌তাম মনে নেই?"

ক্ষণকাল বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া থাকিয়া কিশোরী মাথা নীচু করিল। বলিল, "কি কর্‌ছো আজকাল?"

"এই, গাঁয়ে গাঁয়ে কীর্ত্তন গেয়ে বেড়াই। কীর্ত্তন আমার বড় ভাল লাগে। তোমারও লাগে, না?"

কিশোরী কথা কহিল না।

কানাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তা, তুমি এখানে এলে কি ক'রে?"

"মামাবাড়ী। বাবা-মা মারা যাবার পর থেকে এখানেই আছি।"

"তোমাকে ওঁরা খুব গঞ্জনা দেন, না?" গলার স্বরে যেন কোমলতা ঝরিয়া পড়ে। কিশোরী চুপ করিয়া রহিল।

কানাই বলিতে লাগিল, "অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, ভারী সুন্দর তুমি হ'য়েছো দেখ্‌তে কিশোরী! আজ সকালবেলা তোমাকে দেখে ভারী ভাল লাগ্‌লো! তুমি চলে গেলে তোমার পিছু পিছু হেঁটে তোমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে গেলাম। যাবার সময় শুনতে পেলাম বাড়ীশুদ্ধ সবাই তোমাকে বোক্‌ছেন। শুনে এত দুঃখু হ'লো যে চোখে জল এলো।—কিন্তু থাক, ওই আবার কে আস্‌ছেন। আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছো দেখ্‌লে আবার হয়তো তোমায় গঞ্জনা দেবেন। যাও তুমি।"

ছলছল চোখে কানাই নদীর ধার দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিল ক্রোধ-কম্পিত দেহ লইয়া মামা দ্রুতগতিতে তাহার দিকে আসিতেছেন।

সদর দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে দিবার তর সহিল না। হাত ধরিয়া হিড় হিড়্ করিয়া ভিতরে টানিয়া আনিয়া গলাতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া মামা কহিলেন, "বল শীগ্‌গীর ও ছোঁড়া কে? বল, নইলে তোকে আজ কুচি কুচি করে কেটেই ফেল্‌বো।"

"কে আবার হবে গো, নাগরী রাইকিশোরী থাক্‌লে বংশীধারী নাগরও আপনিই এসে জোটে।" মামীমা ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন।

পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইয়া কিশোরী থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। মামীমা রসাইয়া রসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমারও যেমন আক্কেল, তুমি কেন এমন অসময়ে ওখানে গেলে শুনি? বিনোদিনীর জলকেলি তো আর শেষ হয়েছিল না—"

বোঁ করিয়া মামার খড়ম ছুটিল। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া কিশোরী ঘুরিয়া পড়িয়া গেল।

রক্ত দেখিলে মাথায় খুন চাপে। মামা ছুটিয়া গিয়া বাগানের বেড়া হইতে একখানি বাঁখারি ভাঙ্গিয়া লইয়া ভূলুণ্ঠিতা কিশোরীর উপর আথালি পাথালি আঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশী—সর্ব্বনাশী আমার জাতকুলমান সব খেলে। দুধ দিয়ে কাল সাপ পুষ্‌ছি।—মর্—আজই মর্—আজই যেন তোকে পুড়িয়ে রেখে আস্‌তে পারি।"

প্রথম ধাক্কাতে মাটিতে পড়িয়া কপাল কাটিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বল দেহে আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কিশোরী জ্ঞান হারাইল।

মামীমা ক্রন্দন মিশ্রিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ওগো তুমি আর নিমিত্তের ভাগী হ'য়ো না গো, তুমি আর নিমিত্তের ভাগী হ'য়ো না। বাপরে বাপ, মেয়ে না তো কি রাই-উন্মাদিনী! ঘরে মন রইলো না, পরের হাত ধরে বেরিয়ে যাবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠলো গো, ওমা আমার কি হবে! বাপ-মা আঁতুড় ঘরে চোখে নুন দিয়ে কেন মেরে ফেলে নি! আমি এত ক'রে চোখে চোখে রাখি, এত ক'রে সাম্‌লে সাম্‌লে চলি, তবু সাত ছুতো করে দিনের মধ্যে সাতবার নদীর ঘাটে ছুটে যাবেই।"

চীৎকার ও কান্নার শব্দ এ বাড়ীতে নূতন নয়, কিন্তু আজ যেন মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। বামুন-মাসী, ছোট্‌-ঠানদি, বেনে-বৌ, কমলার-মা দরজা দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে যাইতেছিলেন, মামা ছুটিয়া গিয়া তাহাদের চোখের সম্মুখে দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তার পর কি ভাবিয়া কিশোরীর লুণ্ঠিত দেহখানি টানিতে টানিতে ঘরের মধ্যে রাখিয়া আসিলেন।

কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া ব্যবস্থা দিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আঘাতের গুরুত্ব অনুসারে বিকার দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়।

সূর্য্য ডুবুডুবু সময়ে কিশোরী চোখ চাহিল। পশ্চিমের জানালা দিয়া দিন শেষের ব্যথাভরা রোদটুকু মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল,—বড় সকরুণ!

মাথার কাছে কে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে? হাত বাড়াইয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া দেখে, মামাত বোন মিণ্টু।

মিণ্টু কাঁদিয়া ফেলিল। মা-র ভয়ে চুপি চুপি বলিল, "তুই মরে যাবি না কি রে দিদি?"

মিণ্টুর কথায় কিশোরীরও চোখে হু হু করিয়া জল আসে। মরণ? তাহা কি আর তাহার কপালে হইবে? মিণ্টুর মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি মরে গেলে তোর বড় কষ্ট হবে, না রে মিণ্টু?"

মিণ্টু দিদির বুকে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। কিশোরীর চোখে আবার জল আসিয়া পড়ে। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় জীবন যখন মরণের জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলে, পিছন হইতে ছোট ছোট বাহুগুলি কোমল বাঁধন দিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। চলিয়া যাইবার আগ্রহের মুখে ছাড়িয়া যাইবার ব্যথা জমিয়া ওঠে।

মিণ্টুর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কিশোরী স্নেহ-শীতল কণ্ঠে কহিল, "ছিঃ, আর কাঁদে না! এই তো আমি ভাল হয়ে উঠেছি। যাও এখন, খেলা করগে।"

আশ্বাস পাইয়া মিণ্টু চলিয়া যাইতেছিল, কিশোরী আবার ডাকিল, "জানালাটা ভাল ক'রে খুলে দিয়ে যা ভাই মিণ্টু!" মিণ্টু জানালা খুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সূর্য্য বুঝি ডুবিয়া গিয়াছে। রক্তে রাঙা ব্যথার সাগরে সূর্য্য বুঝি শেষ বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। মাথার রক্তে-ভেজা পটিটাতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা-র কথা মনে পড়ে। আর মনে আসে সেই কথাটা, "তোমাকে ওঁরা খুব গঞ্জনা দেন, না?" অনেক দূর হইতে ভাসিয়া আসে যেন।

বুকে পিঠে সারা গায়ে ব্যথা,—কেহ যদি একটু হাত বুলাইয়া দিত!···

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল। অতি মিষ্ট সুরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছে না? ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কিশোরী জানালা খুলিয়া দিল। তাই তো! মধ্য-রাত্রির জ্যোৎস্না যে করুণ সুরের সৃষ্টি করে তাহার মধ্য দিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া কে বাঁশী বাজায়? আর তো স্থির থাকা যায় না! কেমন করিয়া যেন-টানে!···

চুপি চুপি কিশোরী বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আস্তে, অতি আস্তে ঘরের পিছনের দরজাটি খুলিয়া আলুথালুবেশে খিড়কির দরজা পার হইয়া ছুটিয়া পথে বাহির হইল।

কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে শব্দ? নদীর দিক হইতে না? হ্যাঁ, নদীর ঘাটের দিক হইতেই তো।

পাগলের মত কিশোরী নদীর ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিল। খানিকটা যায়, আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকায়। কান পাতিয়া বাঁশীর সুর শোনে, আবার ছুটিয়া চলে।

"বাঁশী বাজাও, বাঁশী বাজাও, জোরে জোরে বাজাও গো,—শুনিতে পাই না, খুব জোরে জোরে বাজাও।"

মৃদু গানভরা জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়া, মিষ্টিগন্ধভরা জোড়া বকুলতলা দিয়া, নীল ফুলভরা অপরাজিতা বনের ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে কিশোরী কৃষ্ণচূড়াতলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

"থামাইও না,– ওগো, বাঁশী তোমার থামাইও না,—বাজাও, বাজাও, আরও জোরে জোরে বাজাও—"

নদীতে বান ডাকিয়া উঠিল দেখিতেছ না? ঐ যে কদমের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতেছে, ওই যে তমাল শাখা দোলাইতেছে, ওই যে পিয়াল ফুলের পরাগ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে,—রাসউৎসবে মাতিয়াছে সকলে আজ বুঝিতেছ না কি?

রথ কই—রথ? চাঁদের রথ? মথুরার রাজপ্রাসাদের মায়া ভুলিয়া বৃন্দাবনের ধূলার পানে ছুটিয়া আসে যে রথ, কই সেই রথ?

ওই বুঝি? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই-ই তো! জলে নামিয়াছে। ধূলার আকর্ষণে চাঁদের রথ যমুনা পার হইয়া আসিবার জন্য জলে নামিয়াছে! নীলজলে সোনার চাঁদ ঝলমল করিতেছে!

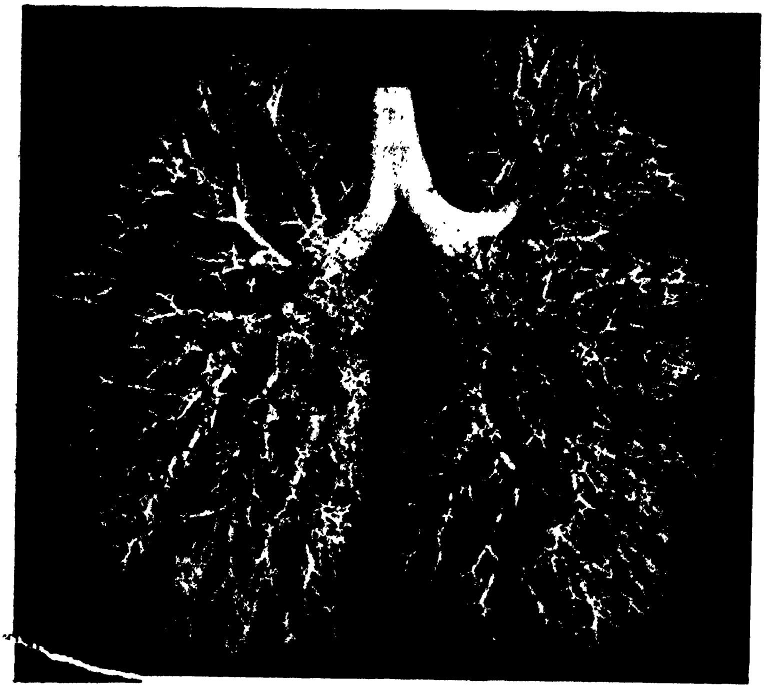
দেরী সহে না,—দেরী সহে না গো, আর আমার দেরী সহে না! পীতবাস! ময়ূরকণ্ঠ তনু! গোপন মধুর স্বপন গো! আমারে তুলিয়া লও, আমারে তুলিয়া লও, আমারে তুলিয়া লও।—

আকুল আগ্রহে কিশোরী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তের মধ্যে দশদিক পূর্ণ করিয়া বিপুল জলোচ্ছ্বাসের মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল। উদ্বেলিত তটিনীর উচ্ছ্বসিত স্রোতে ক্ষুদ্র তনুখানি কোন্ এক দূর দেশে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

ফুস্‌ফুসের কার্য্যকারিতা

ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ, এম-বি

আমাদের শরীরের প্রত্যেক অবয়বের যন্ত্রপাতির কার্য্যগুলি এরূপ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে যে উহার সবিশেষ গঠন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি আমাদের মনে জাগে না। যে মুহূর্ত্তে অতি সামান্য স্থানচ্যুতি ও বৈকল্য ঘটে, তখনই শরীরের প্রকৃতিগত নিয়মে আমাদের জানাইয়া দেয় ঐ স্থান অসুস্থ হইয়াছে। অনেক সময় আপনা-আপনি ইহার কার্য্যকারিতা পুনরায় ফিরিয়া আসে, আবার হয়তো ঐ অসুস্থ অংশটীর জন্য সুচিকিৎসার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।



শ্বাসনলী

হৃদয়, ফুস্‌ফুস্ বা পাকস্থলী বা শরীরের প্রত্যেক অঙ্গটী এমন কি রক্তধারা আপন আপন কার্য্য সমাধান করিয়া যাইতেছে। কেহই ইহাদিগকে যাত্রার বা বিরামের সাংকেতিক চিহ্ন দেখায় না। নিয়মিত কার্য্য করাই ইহাদের প্রকৃতিগত নিয়ম। সাধারণ লোকে হয়তো মনে করিতে পারেন যে জন্মাবধি ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য আপন মনে করিয়া যাইতেছে, তবে বিশ্রাম লয় কখন? ক্লান্তি কি বোধ করে না? আমরা ঐরূপ পরিশ্রম করিলে হয়তো মাসাবধি বা তদূর্দ্ধ কাল শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম লইতাম। কিন্তু শরীরের কোন অংশ আমাদের মতন বহুকাল বিশ্রাম করিতে পারে না। যদি আমরা কেবল ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রের কথা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাই নিশ্বাস ত্যাগের পর শ্বাস গ্রহণের ঠিক পূর্ব্বেই অল্প সময় বিশ্রাম করিয়া লয়। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্যের সহিত সামান্য বিশ্রাম লয় বলিয়া, একসময় বহুকাল বিশ্রামের আবশ্যক হয় না।

উপরিউক্ত সুন্দর চিত্রখানি হইতে ইহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে যে শ্বাসনলী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া শাখা-প্রশাখা ক্রমশঃ ক্ষীণ অবস্থায় সুস্থকায় ফুস্‌ফুসের সকল স্থানে বিস্তার লাভ করিয়া বহির্বায়ু হইতে অক্‌সিজেন নামক শক্তিশালী গ্যাস গ্রহণ করিয়া অপরিষ্কার ও বিষাক্ত গ্যাস বাহির করিয়া দেয়। উপরের আকৃতি হইতে এরূপ দৃষ্ট হয় যেন একটী বৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলে বাহিরের কোন রোগ-বীজাণু বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বাস গ্রহণের সময় নাসিকার দ্বারা মূল বায়ুনালীর মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। অধিকাংশ সময়ে শারীরিক দুর্ব্বলতা বা রোগ-প্রবণতার জন্য বা অন্য কোন কারণে ফুস্‌ফুস্ ক্ষীণবল থাকিলে প্রবিষ্ট রোগবীজাণু দ্বারা সর্দ্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া এমন কি ভয়ঙ্কর ক্ষয়রোগ পর্য্যন্ত হইতে

পারে! এই সমস্ত রোগের বীজাণুগুলি স্বীয় প্রভাব দ্বারা ফুস্‌ফুসের যে কোন অংশ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে আক্রমণ করিতে পারে। এমনও অনেক সময় দেখা যায় কোন রোগবীজাণু ফুস্‌ফুসের এক অংশ ধ্বংস করিতে করিতে রোগীর মৃত্যু শীঘ্র আনয়ন করে, এবং এক ফুস্‌ফুস্ হইতে অন্য ফুস্‌ফুসে গিয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে।

অধিকাংশ স্থলে আমরা সর্দ্দিকাশি প্রথমাবস্থায় উপেক্ষা করি বলিয়া ক্রমশঃ ইহা কঠিন রোগে দাঁড়াইয়া যায়। ইহার মূল কারণ বলিতে হইলে বলিব, যে, আমাদের নিজেদের দোষে অজ্ঞতা বশতঃ এ সমস্ত রোগ দ্বারা ফুস্‌ফুসের কত পরিমাণে ক্ষতি হইতেছে তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। কয়েক শত যক্ষ্মারোগী পরীক্ষা করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে সাধারণের বিচার-চক্ষে উহা সামান্য উপেক্ষা করিবার মতন সর্দ্দিকাশি হইলেও এক্‌স্‌রে দ্বারা ছবি উঠাইলে দেখা যায় উপরিউক্ত সুন্দর ফুস্‌ফুসের মধ্যে এক বা ততোঽধিক গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ মামুলি চিকিৎসা দ্বারা রোগী উপকৃত হয় না। অনেকে সাময়িক উপশমের জন্য কোন পরীক্ষিত ও কার্য্যকর ঔষধের নাম না জানা থাকায় মাদকদ্রব্য মিশ্রিত ঔষধাদি সেবনে ফুস্‌ফুসের ক্ষতি বৃদ্ধি করেন।

বায়ুনলীর পথে শ্লেষ্মা ঝিল্লির উৎপাদনে কাশির উদ্রেক হয়। ঐরূপ কাশি শুষ্ক ও ঘন হইলে অনেক সময়ে দুর্ব্বল রোগী কাশিতে কাশিতে ক্লান্তি বোধ করেন, কিন্তু কাশি সরল হইলে উঠাইয়া ফেলিতে কোনরূপ শক্তির দরকার হয় না। ছোট ছোট শিশুরা ঐ রকম সর্দ্দি কাশিতে নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এমন কি উহা মারাত্মক রোগে দাঁড়াইতে পারে।

কেবলমাত্র বাংলা দেশে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে শ্বাস রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উচিত উহার প্রতিকার ও কার্য্যকারী চিকিৎসায় উপায় অবলম্বন করা। প্রতীচ্য দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ যক্ষ্মা নিবাসে ও শ্বাস-যন্ত্রের পীড়ার নির্দ্দিষ্ট হাসপাতালে বহুকাল যাবত ফলপ্রদ রবির "সিরোলিন" ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন যে শ্বাসপ্রশ্বাস রোগে যে কোন অবস্থায় বিশেষতঃ প্রথম হইতে ব্যবহার করিলে "সিরোলিন" অসুস্থ ফুস্‌ফুস যন্ত্রকে সুস্থ ও সবল করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিবে! কেবল তাহাই নহে ইহা শ্লেষ্মা সরল করিয়া দেয়, হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। সুন্দর অথচ রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখাগুলি অল্প দিনের মধ্যেই পূর্ব্ব সুস্থাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান, চীন ও পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশে প্রত্যেক গৃহে "সিরোলিন" স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতেও অসংখ্য চিকিৎসক যে কোন প্রকারের শ্বাস রোগে ইহার ব্যবস্থা করিয়া 'সিরোলিনে"র উপকারিতা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ঠাকুরপো'

শ্রীষষ্ঠীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌদি' ওগো, ও বৌদিদি, দুত্তোর্ ছাই কেন যে ডাকি—
চেঁচিয়ে আমার ফাটলো গলা—শুনেও তবু শুনছো না কি?
খুকীটা যে ককিয়ে গ্যালো, তা'কেও ত' ছাই ধর্ত্তে পারো,
অনাছিষ্টি সকল তা'তেই, সকাল বেলা কলম ছাড়ো।
দাদার যেমন কাজের ছিরি, আন্‌লো ঘরে বৌ-কবি,
কাব্যি নিয়েই ব্যস্ত সদাই, হেজে মজে' যাক্‌না সবই!
ঝি মাগিটা এলোনা আজ, বাসন-কোসন রইল পড়ে',
কলেজের এই হ'চ্ছে বেলা, কে বলো তার খোঁজটা করে;
কাছারিতে যাবেন দাদা, তারই বা কোন্ যোগাড় দেখি,
সত্যি তুমি উঠ্‌বেনা ক'? ওমা, তোমার হ'ল এ কি!
মিলছে না ক' ছন্দ বুঝি, বন্ধ তাতেই সকল কাজ;
রান্না-বান্না চড়বে না কি?—চুপটী ক'রে থাক্‌বে আজ?
তুচ্ছ জিনিষ কর্ব্বে না ক'? ব্যস্ত তুমি মহৎ কাজে?
কাব্যি লিখেই পেট ভরাবে? খাওয়া দাওয়া নেহাৎ বাজে?
আচ্ছা থাকো; যাচ্ছি আমি, দাদার কাছে বল্‌ছি গিয়ে,
এই যে—এবার উঠ্‌লে দেখি,—সত্যি তুমি আচ্ছা-ইয়ে!—
এখন কেন বারণ কর, এখন কেন···না ভাই-না-ভাই···
শুধু কথায় হ'চ্ছে না আর, বায়োস্কোপের খর্চ্চাটা চাই॥

লৌহ-যোগ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামানন্দ দত্ত, এম-এসসি

আধুনিক ব্লাষ্ট ফারণেস্ থেকে লোহা কি ভাবে নিষ্কাশিত হয়ে বেরিয়ে আসে তার একটা কঙ্কালাভাস গত প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্লাষ্ট ফারণেসে লোহা কি করে বা কি থেকে তৈরী হয় সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয়নি। একটা কথা তাতে বলা হয়েছে—"যিনি কিছুক্ষণ আগে ছিলেন সম্পূর্ণ পাথর তিনি এখন গলে বেরিয়ে আসছেন একটা আগুনের নদী হয়ে—গলন্ত লোহারূপে। যাঁরা দেখেননি তাঁরা বুঝবেন না সে কী অগ্নিময়ী নদী! কী অসহনীয় উত্তাপ! সাধ্য কি কেউ কাছে যায়—একেবারে পুঞ্জীভূত বিরাট তেজ স্বয়ং পাথর থেকে বেরিয়ে সামনে দিয়ে হু হু করে চলে গেলেন। সাধে কি আমরা পাথর থেকে দেবতা বানাই!"

এখন এই যে পাথর এবার এরই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না করলে লৌহ-যোগের মূল আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আবার আলোচনা করলেও প্রবন্ধ হয় ত নীরস হয়ে পড়বে, কিন্তু উপায় নেই—এ যে লোহা, একেবারে নীরস!

প্রথমেই লোহাকে তার স্বরূপে পাওয়া যায় না। নানা প্রকারে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমশঃ লৌহাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শৈশবাবস্থায় এর বাস নানাভাবে ধরিত্রীগর্ভে বা পাহাড়-গাত্রে; তখন তার পাষণ যুগ—stone age। আকৃতিতে তখন তা' কেবলমাত্র প্রস্তর—যার নাম লৌহ-প্রস্তর বা Iron ore। ভূতত্ত্ববিৎ সন্ধান করে তাকে টেনে বের করেন ও তার মাতৃগর্ভ-সংলগ্ন অর্থাৎ খনি-সংলগ্ন কারখানাতে বড় বড় পাথরগুলিকে ভেঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট করে গাড়ী বোঝাই দিয়ে লৌহ-কারখানায় পাঠান। তখন তার middle age বা মধ্যযুগ। পরে অন্যান্য নানা দ্রব্যের সঙ্গে মিশে ঐ সব পাথর Blast Furnaceএ লৌহাবস্থা প্রাপ্ত বা Steel Furnaceএ ইস্পাতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তখন তার পূর্ণ লৌহ-যুগ, অর্থাৎ Iron age।



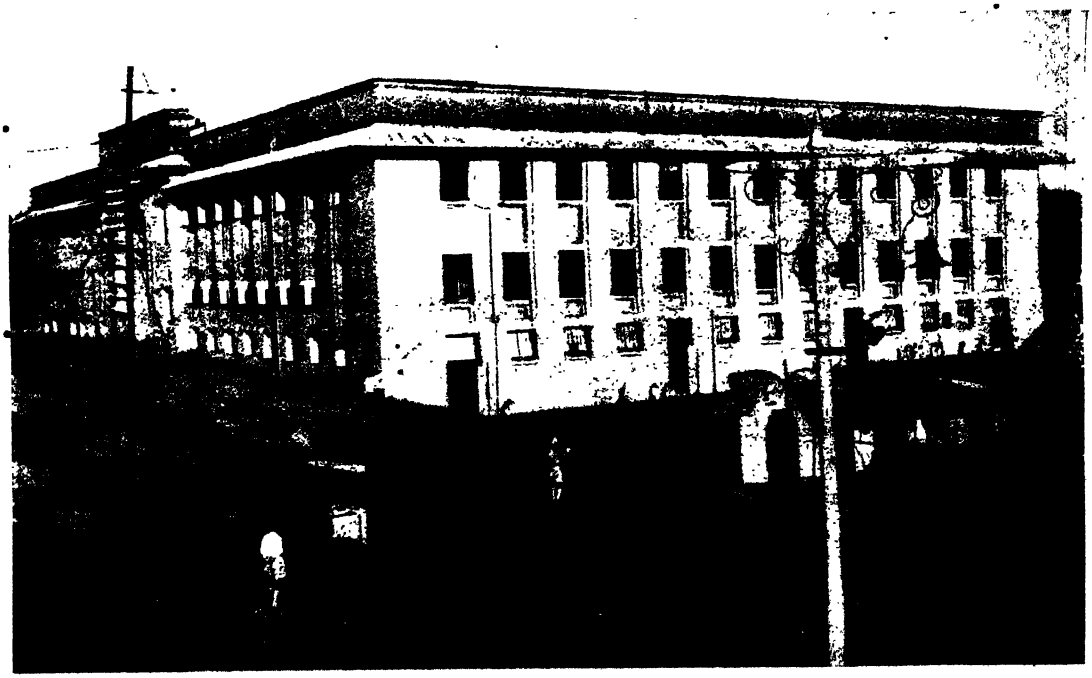
লৌহ-তীর্থের সূচনা

যে কোন প্রস্তর হতে কিছু আর লৌহ-নিষ্কাশন সম্ভবপর নয়; এজন্য চাই লৌহ-প্রস্তর অর্থাৎ যে সব প্রস্তরে লোহের ভাগ যথেষ্ট।

সাধারণতঃ লৌহ-প্রস্তর যেখানে পাওয়া যায় সেখানে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। এইরূপ সমষ্টির নাম খনি। এখন কিরূপ প্রস্তরকে আমরা লৌহ-প্রস্তর বলব? লোহা

যাতে আছে তাই লৌহ-প্রস্তর এ উত্তর ঠিক হবেনা, কারণ লোহার ভাগ সামান্য হ'লে তা' নিষ্কাশনের জন্য কারখানাদি সাজ-সরঞ্জামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। এতে খরচ অনেক। সুতরাং সেই পরিমাণে তা থেকে আদায় না হলে লোকসানের জন্য তা কার্য্যকর হয় না।

সুতরাং মোটামুটি দাঁড়ায় এই যে যে সকল প্রস্তর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যথেষ্ট পরিমাণে লৌহ-নিষ্কাশনের উপযোগী, তাহাকেই সাধারণতঃ লৌহ-প্রস্তর বলা যেতে পারে। কোন একটী খনিতে দেখা গেল যে সেখানকার ব্যবসায়োপযোগী ব'লে গৃহীত হবে। কিন্তু ঐ পরিমাণ লৌহ বিশিষ্ট কোন পাথরকে কার্য্য বা ব্যবসায়োপযোগী বলে গ্রহণ করতে পারা যায় না। এইরূপ অল্প পরিমাণ লৌহ-বিশিষ্ট পাথর থেকে লোহা নিষ্কাশন করতে এতাধিক ব্যয় হবে যে প্রতিযোগিতায় সে লোহা বাজারে দাঁড়াতেই পারবে না। তবে যদি অধিক পরিমাণ লৌহ-বিশিষ্ট সমস্ত প্রস্তর রাশি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় তখন অন্যান্য নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হয়ে ঐ পাথরই আবার কার্য্যকরী হয়ে দাঁড়াতে পারে।



জেনারেল আফিসাদি

প্রস্তরে লোহার ভাগ অতি অল্প, এবং সেই প্রস্তর থেকে কারখানায় লৌহ নিষ্কাশনের পর দেখা গেল যে লোহার বাজার দরাপেক্ষা নিষ্কাশন-ব্যয়ই অধিক—ব্যবসায়ের দিক দিয়ে দেখলে এরূপ প্রস্তরকে লৌহ-প্রস্তর বলা যেতে পারে না।

যদি কোন স্বর্ণ-প্রস্তরে ২½% সোনা পাওয়া যায় তবে তাকে উচ্চাঙ্গের সুবর্ণ-প্রস্তর বলে অভিহিত করতে পারা যায়। কোন প্রস্তরে ঐরূপ তাঁবা থাকলে তা কার্য্য ও

লৌহ-প্রস্তরের পুরাতন নাম খনিজ-লৌহ। কার্য্যোপযোগী লৌহ-প্রস্তরে সাধারণতঃ অন্যূন ২৫% লোহা দেখতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট খনিজ-লোহা বিশ্লেষণ করলে শতকরা ৬০।৬৫ ভাগ বা কখন-কখন আরও অধিক পরিমাণে লোহা পাওয়া যায়। এই হ'ল লৌহ-প্রস্তরের সাধারণ বর্ণনা এবং অনেক অভিজ্ঞের মতে এইটেই চলন্ত।

Ore কাকে বলে—এ সম্বন্ধে মার্কিণ লৌহবিদ্ পণ্ডিত Edwin Eckelএর অভিমত এখানে উদ্ধৃত করছি—

"An ore is a mineral; or association of minerals from which a metal can be profitably extracted under existing technical conditions."*

এই সকল প্রস্তরে এক বা একাধিক খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকিতে পারে। লৌহ খনিতে সাধারণতঃ প্রধান খনিজ-দ্রব্য লৌহ। এই সকল প্রস্তরে ধাতুর সমাবেশ এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার ব্যবসায়োপযোগী নিষ্কাশন সহজসাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন ১০% আইরণ অক্সাইড্ (Iron oxide) মিশ্রিত খানিকটা কাদা-মাটি উৎকৃষ্ট Iron ore হিসাবে পরিগণিত হবে; কিন্তু ২০% কিংবা ৩০% Iron Silicate বিশিষ্ট প্রস্তররাশি, নিষ্কাশন-বিষয়ে সকল প্রকার সুবিধা-অসুবিধা পর্য্যালোচনার পর, ব্যবসায়ের পক্ষে ore বলে মোটেই গৃহীত হবে না। তবে অনুমান, খনিবিদ্যার অধিকতর প্রসারণ ও জ্ঞানবৃদ্ধি, নিষ্কাশন প্রণালীর উন্নতি, অধিক পরিমাণ লৌহবিশিষ্ট oreএর হ্রাস এবং লৌহের প্রয়োজন ও ব্যবহারের অতিরিক্ত বৃদ্ধি হেতু কালে ore শব্দের ব্যবহার-ক্ষেত্রও যথেষ্ট প্রসারিত হবে।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁর মতে—It will be convenient and sufficiently accurate to define an ore deposit as a mass of ore, or ore-bearing material large enough to be considered commercially workable and whose grade, either without or after concentration, will repay handling. (Chap. IV)



ডিরেক্টর প্রাসাদ

খনিজ লৌহ বা লৌহ-প্রস্তরে কেবল যে লোহাই বর্ত্তমান তা' নয়। এতে নানা প্রকার ভেজালও যথেষ্ট আছে; সেগুলি অনেক সময় বিবেচনার বিষয়। এদের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বদাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; এবং কতকগুলি স্থান বিশেষে পাওয়া যায় বা যায় না; অথবা

---

* Iron Ores—Chap IV (By Edwin C. Eckel, Assoc: Am: Soc: C. I., Fellow, Geol: Soc: Am. Ist Edn.

খুব অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। যে পরিমাণেই হউক এদের অবস্থান মাত্রই বিবেচনার বিষয়।

প্রস্তরে লোহার ভাগ অধিক থাকলেও তাতে যদি গন্ধক (Sulphur) এবং টাইটেনিয়াম্ (Titanium) অল্লাধিক পরিমাণেও থাকে, তা' হলে লৌহ-নিষ্কাশন সুকঠিন হয়ে ওঠে। ভেজালের উদাহরণ স্বরূপ আমরা যে কোন প্রকার খনিজ-লৌহ নিতে পারি। উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট যে কোন প্রকারই হোক্ না কেন, সাধারণতঃ এতে Moisture, Silica এবং Aluminaর অস্তিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রকার খনিজ-লৌহে Combined water, Carbon dioxide, organic matter or lime প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; এবং সকল প্রকার oreএই অল্পাধিক পরিমাণে Sulphur, Phosphorus, Manganese, Titanium, Magnesia, Potash ও Soda বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন Oreএ Copper, Chromium এবং Nickelও পাওয়া যায়।



লৌহ-পাহাড়ের আবিষ্কারক—৺প্রমথনাথ বসু

সব ভেজাল তাদের জাতি হিসাবে বিভক্ত করলে আমরা এই রকম একটা তালিকা পেতে পারি। তালিকাটী সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উপযোগী; যথা—

Metallic—Manganese, Titanium, Chromium, Nickel, Copper.

Alkaline - Lime, Magnesia, Potash, Soda.

Acid—Silica, Alumina.

Volatile—Water, Carbon-dioxide, Organic matter.

Special Phosphorus, Sulphur.

যে পাথর থেকে লোহা তৈরী হয় তার অর্থাৎ লৌহ-প্রস্তরের একটু আভাস দেওয়া হল। সে পাথরকে খনিতে কি ভাবে নাড়াচাড়া করা হয়, কি ভাবে তা কারখানায় এসে একেবারে গলে অগ্নীময়ী নদী হয়, তার পর বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যবহৃত হয় তা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হবে। এখন সে খনিজ-লৌহ কোথায় কি ভাবে কত পরিমাণে আছে বা কি করে তাদের আবিষ্কার হ'ল তাও আলোচনা করার দরকার।

অন্য সব দেশ উপস্থিত বাদ দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষে

এ সম্বন্ধে কি ভাবে আজ অবধি কায হয়েছে তাই আজ একটু বলব।

লোহার কথা বলতে গেলেই কবিদের কথা—যা হয়ত ভীম-পরিচয়" "শত্রুর নিমন্ত্রণে" সংঘটিত হয়ে "ভ্রূকুটীর সহ গর্জ্জন" ও "রক্তের সনে রক্ত" মিশে ভারতের মৃত্তিকারাশি কত শত সহস্রবার রঞ্জিত করেছে তা কারও অবিদিত নেই।



প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর—জেমসেদজী টাটা

সেকালে বলেছি তা যুগপৎ স্মৃতির মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়। বাস্তবিক "বর্ম্মে বর্ম্মে কোলাকুলি" ও "খড়্গে খড়্গে রামায়ণের যুগ থেকে রণজিতের যুগ অবধি এরূপ নিমন্ত্রণের যত কিছু বর্ম্ম-খড়্গ-শাণিতাস্ত্র সব ভারতের লোহাতে

ভারতেই প্রস্তুত। আজ পর্য্যন্ত এর এত রকম প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে তা অবিসম্বাদিত সত্য বলেই ধরে নিতে পারা যায়।

আমাদের দেশে অনেক কিছুই ছিল এবং অনেক কিছু হারিয়েছে। লোহার প্রচলন ও লৌহখনিও চিরদিনই ছিল ও চিরদিনই আছে। তবে বোধ হয় তার অধুনাতন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রাক্তনে ছিল না। না থাকলেও তার সময়োপযোগী লৌহ-বিজ্ঞান নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল।



সার রতন টাটা

টুক্ করে একটী কথা এইখানে ছুঁয়ে যাবো যার সম্বন্ধে বেশী করে পরে বলব। সিংহলে লোহার অনেক কিছু আছে—ভাল ভাল লোহা। যা অনেকের বিশ্বাস খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বাংলা দেশ থেকে বাঙালীদের দ্বারা সেখানে নীত হইয়াছিল।

শাণিত যুদ্ধাস্ত্রাদিকে উৎকৃষ্ট করিবার প্রথা—সমগ্র পৃথিবীই জানে—ভারতেই বিদ্যমান ছিল। ভারত থেকে তা পাশ্চাত্যে প্রবেশ করত—ডামাস্কাস বন্দর হয়ে। এইজন্য তাকে Damascusএর সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হোতো। অবশ্য অনেকে আছেন যাঁরা বলবেন না এটা হয় তো মিশরে বা আর কোথাও হো'ত।

কিন্তু শুনে চমকে যাবেন যে শূর সেকন্দর ভারতে এসে পুরুরাজের নিকট থেকে আধমণটাক লোহা উপঢৌকন পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। তাঁর দেশে ও জিনিষটার অভাব ছিল নিশ্চয়, নইলে আমাদের দেশে এসে কি কেউ খানিকটা লোহা উপঢৌকন নেয়?

খৃঃ পূঃ হাজার দু হাজার বছর আগেও এমন সব প্রমাণ পাওয়া যায় যে লোহাকে পাশ্চাত্যে এমনি ভাবে গ্রহণ করা হোতো। সোনা রূপোর চেয়ে তার অধিক সমাদর হোতো—সে যে আমাদের "অয়স্কান্ত"। উল্লেখ আছে, একজন প্রকাণ্ড পাশ্চাত্য রাজা আর একজন প্রকাণ্ড পাশ্চাত্য রাজার সঙ্গে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হ'তে গিয়ে কিছু লোহা উপঢৌকন স্বরূপ দাবী করেন। এবং সে রাজা আবার তা দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। আরে, লোহা যদি ও দেশে তৎকালে প্রচুরই ছিল তা' হলে ব্যাপারটা কি আর ওরকম দাঁড়াতো?

এই যে সব 'পাশ্চাত্য লোহা'—নজীরানুসারে সে সব যে পদ্ধতিতে নিষ্কাশিত হোতো সে সব পদ্ধতি "ভারতীয়"। এখন কথা হচ্ছিল 'ভারতের লোহার'। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে যে লোহা এখানে নিষ্কাশিত হচ্ছে তার মূল কোথায়? কত তার ভাণ্ডার?

কথিত হয়—আমেরিকার হ্রদ-প্রদেশের (Lake Regionএর) লৌহ-প্রস্তর ভাণ্ডার নাকি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চাঙ্গের। কিন্তু অনেক লৌহবিদ—বাঙালী প্রমথনাথের আবিষ্কারের পর বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, যে দেশে এমন উচ্চাঙ্গের এতাধিক বৃহৎ ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে সে দেশে আরও যে এমনি ২।১টা ভাণ্ডার এখনও লুকিয়ে নেই এ কথা কোন্ পাষণ্ড জোর গলায় বল্‌তে যাবে?

ভারতের এ লৌহ-ভাণ্ডার গুপ্তধন হয়েই এতদিন লুকিয়ে ছিল। সে আজ দুই যুগেরও অধিক দিনের কথা। পর পর লৌহ-নিষ্কাশনের তিনটী প্রবল উদ্যম তখন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পর একমাত্র বরাকর কারখানাই সামান্যভাবে চলছে, এমন সময়ে ১৮৯৯ খৃঃ, জেনারেল ম্যাহন ভারতের লৌহ সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ সম্পূর্ণ কার্য্যকরী এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

পূর্ব্বের তিনটী উদ্যমের বিশদ পরিচয় আজ আলোচ্য নয়। জেনারেল ম্যাহন (Genl. Mahon) ছিলেন কাশীপুর শস্ত্র-কারখানার সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট। ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাত সম্বন্ধে তিনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। সে সব কথাও পরে বলব।

এদিকে কর্ম্মবীর জেমসেদজী টাটা—ভারতের দ্রব্যাদি বা কাঁচা মাল নিয়ে ভারতের লৌহ-যোগের সাধনা ও তদ্দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি ও বহুজন প্রতিপালন বিষয়ে বহুদিন হতেই একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা অন্তরে পোষণ করে আস্‌ছিলেন। দেশের মঙ্গল কামনার একটা উদ্দীপ্ত অগ্নি এই অগ্নি-উপাসকের তেজোময় চিত্তকে চিরদিন দীপ্তোজ্জ্বল করে রেখেছিল। তাই লৌহ-যোগ সম্বন্ধে কোন তথ্যই তিনি সংগ্রহ না করে ছাড়তেন না। তিনি, তাঁর পুত্রদ্বয় সার দোরাব টাটা ও সার রতন টাটা ও তাঁর দু'একজন অনুচর ভারতের লোহার দিকে বরাবরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেছিলেন।

তার ফলে মধ্যপ্রদেশের খনির সাহায্যে কারখানা বসিয়ে তা থেকে লোহা উৎপন্ন করাই তাঁরা স্থির করেন। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি? কারণ লৌহ-জগতের যুগান্তর এসে উপস্থিত হোল—বাংলা প্রদেশ হতে।

বাংলার কাঁচা মাল চিরপ্রসিদ্ধ। বাংলা কল্পতরু, বাংলা প্যাগোডা। কারিগরী বা শ্রম-শিল্পের জন্য অথবা তা থেকে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য চাই কল-কারখানা। কাঁচা মালই তার একমাত্র উপাদান বা অবলম্বন। এ যেমন একদিক দিয়ে মালিকের ঘরে তার লাভ এনে দেশের ধনবৃদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করবে, অপর দিক দিয়ে তেমনি বেকার সমস্যার সমাধান করে গৃহস্থের অন্নের সংস্থান করে অন্য দিকেও সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বাংলার বা তার আশে-পাশের এই সব অফুরন্ত কাঁচা মালকে কাযে লাগাবার কোন প্রচেষ্টা বাঙালীর আছে বলে মনে হয় না। এতে যে অর্থ দরকার, বাঙলা যে তা দিতে পারে না তা' একেবারেই নয়। অথবা সে পয়সা যে কাযে লাগালেই লোকসান যাবে এমনও মনে করবার কোন কারণ নেই।



৯ মিঃ ডি, সি, ড্রাইভার, M. A (Cantab), Bar-at-Law etc.
সহকারী প্রধান পরিচালক

বাংলার খনিজ সম্পদ অসাধারণ। লোহা, তামা, এ্যালুমিনিয়াম্, সোনা—নেই কি? উৎকৃষ্ট জাতীয় প্রচুর কয়লা, শক্তি যোগান দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই বিদেশীর হাতে। কোথাও শোষণের লীলায়িত ভঙ্গী, আবার কোথাও রত্নরাজি ভূগর্ভেই সঙ্গোপনে থেকে অবিরত দেখাচ্ছে তার উপহাসের ভ্রূকুটি-ভঙ্গী, ইঙ্গিতে আহ্বান করছে, তাতে যারা যোগসিদ্ধ হবার উপযুক্ত, তাকে আশ্রয় দেবে বলে—যে আশ্রয় থেকে আমরা চিরদিন বঞ্চিত হয়ে আছি—কারণ? "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"।

বাংলার কোন্ কোণে, কোথায় কি ভাবে রত্নরাজি

লুকিয়ে আছে, তার সন্ধান রাখলেন - বহু দূর দেশের আর এক কোণে সহস্রাধিক মাইল তফাতে বসে কর্ম্মবীর টাটা। রত্নের সন্ধানে বেরিয়ে রত্নের সাধক বাঙালী প্রমথনাথ যে রত্নের সন্ধান পেলেন, সে রত্নের অধিকতর কঠোর সাধনায় ব্রতী হয়ে সিদ্ধিলাভ করলেন পার্শী কর্ম্মবীর জেমসেদজী। যে সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন—সে এক যোগ-সাধনা, সে যোগকে আমরা বলি লৌহ-যোগ। তাঁর ও তাঁর পুত্রগণের সে সাধনার ফলে আজ টাটার বিখ্যাত লৌহ কারখানা - পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ও সকলের বিস্ময়োৎপাদনকারী।

দিক্ শূল

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র বি-এ

"শুক্রবার-দিন কি কাশী যেতে আছে, সে দিন যে দিক্‌শূল" এই কথা বলতে বলতে ভূপতিবাবুর স্ত্রী ভুবনমোহিনী ভূপতিবাবুর ঘরে এসে হাজির হলেন।

ভূপতিবাবু তখন পাঁপর-ভাজা সংযোগে চা-পানে ব্যস্ত ছিলেন; তিনি এক চুমুক্ চা পান করে পাঁপর-ভাজা চিবাইতে চিবাইতে বললেন "কে বললে শুক্রবার দিন কাশী যেতে নেই, একবার শুনি!"

ভুবনমোহিনী টেবিলটার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে বললেন "সে কি গো, এ কি আর কাউকে বলতে হয় না কি! এত হিঁদুয়ানী জান, আর এটা জান না যে শুক্রবার-দিন পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি, যাত্রা করলে দিক্‌শূল হয়?"

ভূপতিবাবু আর এক চুমুক্ চা তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করে বললেন "হ্যাঁ গো পণ্ডিত মশাই, থামুন, এখন শুনতে পারি কি, পণ্ডিত মশাইয়ের কোন্ টোলে পড়া হয়েছিল?"

ভুবনমোহিনী একটু পেছু হেঁটে বলে উঠলেন "ওমা, এটা জানবার জন্যে কি আবার টোলের পণ্ডিত হতে হয় না কি! তাই যদি তোমার ইচ্ছে, তুমি না হয় তো একবার পুরুই মশাইকে ডেকে পাঠাও না,—তিনি কি বলেন।"

ভূপতিবাবু পাঁপর-ভাজার অবশিষ্ট অংশের সদ্ব্যবহার করতে করতে শূন্য রেকাবীটা ঠেলে রাখলেন, এবং সেই সঙ্গেসঙ্গেই বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন "সে ব্যাটা কী জানে, তুমি আর জ্বালিও না আমায়।"

জিব কাটিয়া অতি ত্রস্তভাবে ভুবনমোহিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠলেন "তোমার জন্যে আমার মাথা-মুখ খুঁড়তে ইচ্ছে করে; সক্কাল বেলায় বামুনপুরুৎকে শুধু শুধু গালাগালি দিলে কেন বল তো!"

চায়ের বাটীটা নিঃশেষ করে ভূপতিবাবু একটু নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাদের দেশে বামুন ছাড়া কবে কে পুরুত হয়েছে আবার?"

ভূপতিবাবুর কথাটা শেষ হতে না হতে ভুবনমোহিনী বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় বললেন "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, গোরা সাহেব! বলি, আমাদের দেশে কত দিন আসা হয়েছে? স্বদেশী ছেলেগুলোর যেমন দশা, মুখপোড়ারা জেল্ খেটে মরছেন!"

ভুবনমোহিনী শেষের কথাগুলো একটু উচ্চ স্বরে বলেছিলেন; সেই শুনে তাঁদের পুত্র অমিয়কুমার কলেজের পড়া ছেড়ে তাহার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলে "কেন মা, স্বদেশী ছেলেগুলো আবার কী করলে, তোমার দেখি তাদের ওপর যত গোট্।"

ভৎর্সনা-সূচক স্বরে ভুবনমোহিনী পুত্রকে বললেন "আমি অন্যায় কিছু বলি নি বাপু, আমি তাদের ভালই বলেছি; কথাটা কী আগে শোন্……"

অমিয় তখন হাসতে হাসতে বললে "তুমি যখন মা 'শুভদিন' ছাড়া যাবে না, তখন এ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত নিলেই তো হয়; বাবা তো ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন, আর তুমিও তো কম কর না।"

ভুবনমোহিনী পুত্রের কথায় সম্মত হয়ে বললেন "আমি বাছা সকল বড়কেই ভক্তি করি, তবে ওঁর মত খুঁজে বার করতে পাগল হয়ে বেড়াই না।"

(২)

দক্ষিণ কলিকাতার একটা সোজা লম্বা রাস্তা। সেই রাস্তার উপরেই একটী অনতিবৃহৎ বাড়ী। রাস্তার ধারে চওড়া রকের বদলে একটুখানি খোলা জমি, এবং সেখানে গোটাকতক তথাকথিত পাতা-বাহার গাছ রয়েছে। বাড়ীটী দক্ষিণদোয়ারী এবং ত্রিতল। প্রথম ও তৃতীয় তলে একটী সম্পন্ন ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করেন,—এবং দ্বিতীয় তলে তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীভক্তানন্দ ঠাকুর সস্ত্রীক আশ্রমবাস করেন, ও সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তমণ্ডলী আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণ বন্দনায় ও সাময়িক উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীশ্রীভক্তানন্দ ঠাকুরের সস্ত্রীক আশ্রমবাস হেতু এই বাড়ীটী ভক্তবৃন্দের নিকট "ঠাকুর বাড়ী" নামেই অভিহিত হয়।

সন্ধ্যার সময় ভূপতিবাবু ঠাকুরবাড়ীতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলেন, এবং উঠানের পশ্চিম দিকের সিঁড়ী দিয়া দ্বিতলে উঠলেন, ও চক্‌মিলান বারাণ্ডা দিয়া যাইয়া দক্ষিণ দিকের একটী ঘরের দ্বারের পাশে জুতা খুললেন। ঘরটীতে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে দ্বারের পার্শ্বে দেওয়ালে তিনবার মাথা ঠুকলেন, এবং তাহার পর অতি সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে আসীন ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে ঠাকুরের পদধূলি নিলেন।

ঘরটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, এবং ঠিক্ হল-ঘর না হ'লেও দৈর্ঘ্যে বেশ বড়। এই ঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরমুখী হ'য়ে আসীন,—একটী ছোট তোষকের উপর অধিষ্ঠিত; যতটা বেশী সময় পারেন, তিনি ভক্তমণ্ডলীর মাঝে অনেকটা 'গরুড়াসনে'র মতন 'আসনে' বিরাজ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দক্ষিণে ভক্ত পুরুষগণ আসিয়া বসেন, এবং তাঁহার বামে ভক্ত মহিলাদিগের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভূপতিবাবু ঠাকুরের পদধূলি লইয়া পুরুষদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই "জয় ভক্তানন্দ জয়, জয় পতিতপাবন পাপতাপনাশন জয়" এই ভজন-সঙ্গীতে যোগদান করলেন। ভজন-সঙ্গীত শেষ হ'লে সকলেই মস্তক ভূমিতে প্রণত করলেন, এবং যতক্ষণ ঠাকুর অস্ফুট স্বরে আশীষ বচন বলতে লাগলেন, ততক্ষণ সকলেই ঐ ভাবে রইলেন।

আশীষ বচন শেষ করিয়া ঠাকুর প্রথমেই সহাস্যবদনে ভূপতিবাবুর দিকে চেয়ে বললেন "কি গো ভূপতি যে, তার পর কি রকম আছ", এবং সঙ্গেসঙ্গেই নিজ গলার গোড়ের মালাটা ভূপতিবাবুর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভূপতিবাবু অতি ভক্তিভরে মালাগাছাটী মস্তকে ঠেকাইলেন, এবং পরক্ষণেই ঘরের দেওয়ালের একটী হুকে অতি সন্তর্পণে ঝুলাইয়া রাখলেন; অন্য সব ভক্তেরা কাতরভাবে সেই মালার দিকে তাকাইয়া রইলেন।

"আপনার আশীর্ব্বাদে মঙ্গলেই আছি, ঠাকুরের ভক্তের কাছে কি অমঙ্গল আসতে পারে" এই কথা বলতে বলতে ভূপতি বাবু আবার বসলেন।

"তার পর তোমার কাশী যাওয়া হচ্ছে কবে" এই কথা ঠাকুর অতি ধীর ভাবে ভূপতিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সে বিষয়ে আদেশ নেবার জন্যেই তো আজ ঠাকুরের চরণ দর্শন করতে এলুম; শুক্রবার দিন যাবার জন্যে এক-রকম সব ঠিক্ করেছিলাম,—টিকিট্ও সেই মত কেনা হয়েছে, এখন শুন্‌ছি সে দিন নাকি দিক্‌শূল, না—একটা কী আছে" এই কথা বলে ভূপতিবাবু করজোড় করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ স্তিমিত নেত্রে থাকবার পর হঠাৎ বললেন "ও সব কিছু নয়, রাজকার্য্যে বাধা নেই।"

একজন ভক্ত উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "ভূপতি-বাবু কি কাশীতে রাজকার্য্যে যাচ্ছেন?"

ঠাকুর মুখটা একটু বিকৃত করে বললেন "আহা, রাজ-কার্য্য মানেই কী রাজার গদিতে বসতে যাচ্ছেন, তা নয়; টিকিট্ কেনাটা কী রাজকার্য্য নয়, রেল-কোম্পানী চালাচ্ছে কারা, সে কথাটা ভুলে যাও কেন।"

আর একজন ভক্ত বললেন "তা হলে ভূপতিবাবু কী ঠাকুরের জন্মতিথি-উৎসবে থাকবেন না?"

ভূপতিবাবু অতি বিনয়ের সহিত বললেন "এবার তো ইচ্ছে আছে কাশীধামে ঠাকুরের ও মাতাঠাকুরাণীর চরণ-পূজা করব, তা একটু পূর্ব্বে হতে না গেলে হবে কেন।"

ঠাকুর উদাস ভাবে বললেন "এরা এবারকার উৎসবে থিয়েটার করবে বলছে; তুমি কী বল ভূপতি?"

ভূপতিবাবু উৎসাহের সহিত বললেন "থিয়েটার তো উৎসবেরই অঙ্গ।"

ঠাকুর অত্যন্ত তৃপ্ত হয়ে বললেন "হ্যাঁ, এরা থিয়েটারটা নিজেরাই করবে বলছে।"

ভূপতিবাবু অতি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন "তা হলে কোন্ বইটা ঠিক্ হল,—"জন্মাষ্টমী" না "চৈতন্যলীলা" ?"

একজন ভক্ত ক্ষিপ্রতার সহিত উত্তর দিলেন "জন্মাষ্টমী বইখানাই ঠিক্ করা হোক্ ; ওঁর জন্মতিথিতে ওঁর জন্ম-কথাই অভিনয় করা উপযুক্ত মনে হয় ।"

ঠাকুর ঈষৎ হাস্য ক'রে, সেই ভক্তের দিকে তাকাইয়া বললেন "তোরা কী যে বলিস্, পাগল হলি না কি", এবং সেই সঙ্গেসঙ্গেই নিজ গলার এক গোছা ফুলের মালা হইতে এক গাছি মালা খুলিয়া লইয়া সেই ভক্তের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন।

"জন্মাষ্টমী" অভিনয়ের বিধিবন্দোবস্ত সে-দিন এই ভাবেই ধার্য্য হইল ;—এবং আরও ধার্য্য হইল যে, ভূপতিবাবুর পুত্র অমিয় তাহাদের বাড়ীর সকলকে লইয়া শুক্রবার দিন কাশী রওনা হইবে ; তাহার পরে জন্মতিথি-উৎসব অন্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে লইয়া ভূপতিবাবু কাশী রওনা হইবেন। অবশেষে ভূপতিবাবু সেই গোড়ের মালাটী অতি সন্তর্পণে পকেটের ভিতর রাখলেন, এবং ঠাকুরের পদধূলি নিয়ে বললেন "তা হলে আপনার আদেশ মত অমিয় শুক্রবার দিন সকলকে নিয়ে কাশী যাত্রা করবে।"

(৩)

"কী হল রে লতিকা, তোর আবার চোখে কী হল" এই কথা বলে ভুবনমোহিনী কাপড়-চোপড়ে ভর্ত্তি একটা সুটকেস্ সশব্দে ভূমিতে রাখলেন।

"কি জানি মা, চোখে কী পড়ল, বড় কর্‌কর্ করছে, চাইতে পাচ্ছি না" এই বলে লতিকা আঁচল দিয়ে চোক্ রগড়াইতে লাগল।

"আমি তো জানি এই রকম একটা কিছু হবে ; পুরুৎমশাই বললেন আজকে পুরোপুরি দিক্‌শূল, আজকে পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি" এই কথা বলতে বলতে ভুবনমোহিনী তাঁহার কন্যার চোকে ফুঁ দিতে লাগলেন।

"কর্‌করাণি তো কমছে না, তোমাকে আর ফুঁ দিতে হবে না" এই কথা বলে লতিকা বিরক্তির সহিত তাহার মাতাকে ঠেলে দিল।

"তোমার করকরাণি কমছে না, তা আমি কী করব মা, দিক্‌শূলের ফল যাবে কোথায়, মুনিঋষিরা কি মুখ্যু ছিল রে বাছা" এই কথা বলে ভুবনমোহিনী একটু সরে দাঁড়ালেন।

এই সময় ভূপতিবাবু মনোহারী দোকানের কতকগুলি জিনিষ কিনে নিয়ে এলেন এবং ঘরে প্রবেশ করেই বললেন "কি গো, দিক্‌শূল কী করলে ?"

"তোমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে পারছ না" এই কথা বলে ভুবনমোহিনী লতিকার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন।

ভূপতিবাবু সমস্ত শুনিয়া বললেন "এতে আর হয়েছে কী, চোখে কি পড়েছে, তাই কর্‌কর্ করছে, দু ফোঁটা গোলাপ-জল দিলেই তো হয়।"

"হয় তো, তুমি এনে দাও না, আমি তো ভাল বুঝছি না, —পুরুৎমশাইকে বলে পাঠাই, একটু চন্নামেত্তর দিয়ে যাবেন, শিশি করে সঙ্গে নেবো" এই কথা বলতে বলতে ভুবনমোহিনী স্বামীর হাত থেকে জিনিসগুলো ছিনাইয়া নিলেন।

"অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ! দু ফোঁটা গোলাপজল তো দাও, এখুনি সেরে যাবে ; আর সেই মুখ্যু পুরুৎটার কাছ থেকে চরণামৃত নিয়ে কী হবে,—আমি ঠাকুরবাড়ী থেকে চরণামৃত নিয়ে আসব,—'বাস্'এতে কতক্ষণই বা লাগবে" এই কথা বলতে বলতে ভূপতিবাবু জামার বোতামগুলো আবার বন্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

"কেন এক জনকে বড় করতে হলেই কি আর এক জনকে ছোট করতে হয়, এমন কথা তো ভূ-ভারতে শুনিনি" – ভুবনমোহিনীর এই কথাটা শেষ হতে না হতেই, অমিয় গোলাপ জলের শিশিটা হাতে নিয়ে পাশের ঘর থেকে এসে বললে "বেশ, নূতন যুগের শ্রীশ্রীঠাকুর আর পুরাতন যুগের পুরুৎমশাই নিয়ে তর্ক চলুক, আর ওদিকে লতিকাটা চোখ্ রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে খুন হোক্," এবং সঙ্গে সঙ্গেই লতিকার চোখে ফোঁটাকতক গোলাপ জল দিয়া দিল।



দেশীয় শিল্পের অন্তরায়

শ্রীঅনাথগোপাল সেন বি-এল

বর্ষার সন্ধ্যায় কলিকাতার এক সুপরিচিত ব্যবসায়ী বন্ধুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাম্রকূট ও চা'য়ের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম। বন্ধুটি বহু অর্থ খোয়াইয়া, অনেক দিনের আপ্রাণ চেষ্টা ও কঠিন পরিশ্রমের পর, ব্যবসায়টিকে দাঁড় করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রস্তুত কেমিক্যালস্, ঔষধ ও প্রসাধন-দ্রব্য বাজারে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। অর্থের অভাব ইঁহাদের এখন আর নাই। অধিকন্তু এই কারখানা হইতে এক্ষণে কতগুলি দেশী লোকের প্রতিপালনের উপায় হইয়াছে।

ইঁহারই অপর একটি বন্ধুও শনিবারের অবসর যাপনের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দেশী বিস্কুটের কারখানার মালিক—সঙ্গে অন্য কারবারও আছে। অবস্থা বেশ সচ্ছল। তার পর আর একটি বন্ধু আসিয়া জুটিলেন; তিনি দেশী ওয়াটার-প্রুফের কাজ করেন। তাঁহার কারবারও প্রথম দিককার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে ভালই চলিতেছে। ইঁহাদের সহিত দেশীয় শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একটি বন্ধু আমাকে খানিকটা অনুযোগের সুরে বলিলেন,—"মশায় ত অর্থনীতি সম্বন্ধে খুব প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শুধু বড় বড় থিওরি লইয়া আলোচনা করিয়া কি লাভ? দেশীয় শিল্পের প্রসার কেন আশানুরূপ হইতেছে না, দেশীয় ব্যবসায়ীদের দুঃখ দুর্গতি কিসে দূর হইতে পারে, এত বক্তৃতা ও প্রচার সত্ত্বেও কোথায় সত্যিকারের গলদ রহিয়াছে—এ-সব ক্ষুদ্র বিষয়ে একটু নজর দিন, আলোচনা করুন। তাহা হইলে আমরা যে বাঁচিয়া যাইতে পারি।"

"হাতে-নাতে যাঁহারা কাজ করিতেছেন এবং যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা পরিষ্কার ভাবে না জানাইলে, বাহির হইতে পণ্ডিতি আলোচনা করা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি?"—বিনীতভাবে এই কথা তাঁহাকে জানাইলে, তিনি দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তরায় সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতে কতকগুলি কথা আমাকে বলেন। তাহাই সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করিব।

দেশীয় শিল্পের প্রথম ও চিরন্তন সমস্যা যথেষ্ট মূলধনের অভাব। ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রতের প্রথম সূত্রপাত এই বাংলায় সুরু হয়। পরে বাংলা হইতে ইহা ক্রমে গোটা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময় হইতেই বাংলার Industrial Renaissance বা শিল্পযুগের আরম্ভ। সেই সময়ে দেশপ্রীতির নূতন প্রেরণায়, ছোটবড় নানাপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়িয়া উঠিতে থাকে এবং বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম চিরদিনের দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ে তাহার মূলধন প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এক দিকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্, বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান-কো অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ অনুষ্ঠান যেমন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্য দিকে তেমনি ছোট কলকারখানায় তৈরি গেঞ্জি, মোজা, কালি, কলম, নিব্, পেন্সিল, জুতা, সুটকেশ, ট্রাঙ্ক, বাক্স, সাবান, দাঁতের মাজন, ছুরি, কাঁচি, খেলনা, পুতুল, জ্যাম, জেলি, বিস্কুট, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি নানাবিধ স্বদেশী দ্রব্য আমরা বাজারে প্রথম দেখিতে পাই। উৎসাহের তুলনায় বড় কারখানার উপযোগী মূলধন যে তখন খুব বেশী পাওয়া গিয়াছিল তাহা নহে; উল্লিখিত অধিকাংশ শিল্পদ্রব্যই স্বল্প পুঁজি বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা প্রসূত। উৎসাহ তখন যেমন প্রবল ছিল, মূলধন তদনুপাতে তেমন প্রচুর ছিল না। স্বদেশী যুগ হইতে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীদিগকে মূলধনের জন্য যে অসুবিধা ভোগ এবং সংগ্রাম করিয়া আসিতে হইতেছে, তাহার নিবৃত্তি আজও হয় নাই, দেশীয় যৌথ কারবারের নিষ্ফল ব্যর্থতাই ইহার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। ব্যবসায়-বুদ্ধির অভাব, রাতারাতি বড় লোক হইবার আকাঙ্ক্ষা, অতিরিক্ত স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণে বাঙ্গালীর স্বদেশী যুগের অন্যতম কীর্ত্তি বেঙ্গল নেশন্যাল ব্যাঙ্কের ভরাডুবি হইয়া গেল; বাঙ্গালীর বুকের রক্ত দিয়া তৈরি বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ ডুবিতে ডুবিতে জনৈক ধনী বাঙ্গালীর অনুগ্রহে কোন প্রকারে রক্ষা পাইল। এই সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লড়াইয়ের সময় Currency



দুপুর বেলা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

Inflation বা মুদ্রাসম্প্রসারণ নীতির ফলে কিছু কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া এ দেশে যখন একসাথে কতকগুলি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িল, তখন তাহার মূলধন সংগৃহীত হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই সুযোগের কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার আমরা করিতে পারি নাই। বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়-সঙ্কোচ সুরু হইবার পূর্ব্বেই, কতকগুলি অপরিণামদর্শী ব্যক্তির কৃত কর্ম্মের ফলে এই সব কোম্পানীর অধিকাংশ জলবুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গিয়াছে—পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে—বহু হৃতসর্ব্বস্বের দীর্ঘশ্বাস এবং দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি একটা দারুণ অবিশ্বাস। তাহার উপর আসিয়া চাপিয়াছে বর্ত্তমান এই জগৎ-জোড়া দুর্গতি। আজ যে একদল বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব পণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান দুঃসময়ের পীড়ন এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কৃত কর্ম্মের ফল ভাল করিয়াই ভোগ করিতে হইতেছে। বলিতে গেলে একটিও দেশীয় ব্যাঙ্ক নাই যেখানে তাঁহারা প্রয়োজনে সামান্য অর্থের জন্যও হাত পাতিতে পারেন। দেশীয় ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারও তাঁহাদের জন্য রুদ্ধ-প্রায় বলিলেই চলে। কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ভগবান তাঁহার সহায়; তাই মূলধনের অভাবকেও অতিক্রম করিয়া ইঁহারা নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে আজও বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইঁহাদের সমস্যা আজ অন্য রকমের এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

সমস্যাটিকে এক-কথায় আমরা marketing problem কিম্বা জিনিষের বণ্টন বা বিক্রয় সমস্যা বলিতে পারি। মূলধনের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও স্বদেশী জিনিষ আজ প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনেক জিনিষও ভালই হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে জিনিষ ক্রেতাদের নিকট পৌঁছান যাইবে কি করিয়া। দেশী জিনিষের প্রতি শিক্ষিত ক্রেতাদের যতই দরদ থাকুক না কেন, দেশীয় দোকানদারগণের কিন্তু ইহার প্রতি একটি চিরন্তন বিরাগ বা বিরূপ ভাব চলিয়া আসিয়াছে। ইহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, দেশীয় শিল্পের প্রতি ইঁহারা কখনও তেমন প্রাণের টান অনুভব করেন নাই। অবশ্য এইজন্য দেশীয় শিল্পীদের কোন ত্রুটি নাই এ কথা আমরা বলিতেছি না। স্বল্প পুঁজি লইয়া কাজ করিতে যাইয়া অনেক সময়েই দেশী কারিগর বা শিল্পী রীতিমত জিনিষ সরবরাহ করিতে পারেন না। অনভিজ্ঞতা ও অন্যান্য কারণে জিনিষের ষ্ট্যাণ্ডার্ডও সকল সময় স্থির রাখিতে সক্ষম হন না। এইরূপ নানা ত্রুটি তাঁহাদের ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পের প্রতি দোকানদারগণের একটু দরদ থাকিলে তাঁহারা ক্ষতি স্বীকার না করিয়াও দেশীয় শিল্পের অনেকখানি সহায়তা করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা দেশীয় কারিগরের আর্থিক অসচ্ছলতা ও অতি-আগ্রহের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টাই সাধারণতঃ করিয়া থাকেন। দেশী জিনিষ ইঁহারা নগদ মূল্যে প্রায় কখনও ক্রয় করেন না। যাঁহাদের জিনিষ দয়া করিয়া রাখেন, তাঁহাদিগকেও নিতান্তই কৃপা করিতেছেন এই ভাবটাই ইঁহারা সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রয় করিয়া মূল্য দিবেন দেশী জিনিষের বেলা এইরূপ সর্ত্ত করা হয়। যাঁহাদের জিনিষের বেশ চাহিদা আছে এবং যাঁহারা ইঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবান, শুধু তাঁহাদের সহিত Sightএ অর্থাৎ একটা নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে পর, টাকা দিবার সর্ত্ত করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, এই সর্ত্তও দেশীয় দোকানদারগণ অনেক ক্ষেত্রে রক্ষা করেন না। অসামর্থ্যই যে সকল সময় ইহার কারণ তাহাও নহে। দেশীয় শিল্পীদের প্রতি দোকানদারগণের যে অহেতুক অবজ্ঞার ভাব আছে, তাহাই সাধারণতঃ এইজন্য দায়ী। অনেক সময় এমনও হয়, দেশী জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা উহার কারিগরের বিল না মিটাইয়া তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া রবিন্সন বার্লি, গোয়ালিনী মার্কা গাঢ় দুগ্ধ কিম্বা ঐরূপ অন্য কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশী জিনিষ নগদ মূল্যে আমদানি বা ক্রয় করিয়া থাকেন; নয় ত উহাদের হুণ্ডির টাকা মিটাইয়া দিয়া থাকেন। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের দোকানদারগণ দেশীয় শিল্পীকে উপবাসী রাখিয়া তাঁহাদেরই প্রাপ্য অর্থ দ্বারা বিদেশী জিনিষের মূল্য জোগাইতেছেন এবং তাহার ফলে দেশী কারিগরের মূলধনের অভাব তাহার জিনিষ বিক্রয় দ্বারাও অনেক সময়ে দূর হইতে পারিতেছে না! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এক্ষণে যে দুঃসময় চলিয়াছে, তাহাতে অবশ্য দোকানদারের অবস্থাও সচ্ছল নহে। এই অবস্থার ফলও পরিণামে

দেশীয় শিল্পকেই ভোগ করিতে হইতেছে। বিদেশী জিনিষের জন্য নগদ মূল্য দিতে হয়; অথচ আজকাল বেচা-কেনা কমিয়া যাওয়ায় ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই। তাই ইঁহারা অনেক সময় দোকানের মূলধন ভাঙ্গিয়া সংসার-খরচ চালাইতে বা দোকানের ঘরভাড়া, ইলেকট্রিক বিল, এ্যাসিষ্টাণ্টেরমাহিনা ইত্যাদিদিতে বাধ্য হন; এবং পরিশেষে দোকানদারের ক্ষতি, আংশিকভাবে হইলেও, দেশীয় শিল্পীর উপর আসিয়া পড়ে; কারণ সকলের দাবি মিটাইবার পর তাহার ভাগেই পড়ে ফাঁকি।

আজকাল এক শ্রেণীর দোকানদার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা অনন্যোপায় হইয়া দোকান খুলিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের সংখ্যাই বেশী; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকও আছেন। ইঁহাদের মূলধন নাই, ব্যবসাও জানেন না; কিন্তু দেশীয় শিল্পীদের নিকট ধারে জিনিষ পাওয়া যাইবে, ইহা ভালরূপেই অবগত আছেন। জিনিষ লইবার সময় ইঁহারা যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়া থাকেন এবং ধারে জিনিষ পাইবার যোগতা সম্বন্ধে মধ্যস্থ বন্ধুর সাফাই সাক্ষ্যেরও অভাব হয় না। তার উপর স্বদেশ সেবার সুযোগ লাভের জন্য ইঁহাদের এইরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম উপেক্ষা করাও কঠিন! সর্ব্বোপরি, দেশীয় শিল্পীর গরজ বড় বালাই। এইরূপ অনুরোধ উপরোধ লাভ দেশী কারিগর ও শিল্পীর ভাগ্যে সচরাচর বড় ঘটে না। সুতরাং এই সব অনন্যোপায় অনভিজ্ঞ নূতন ভদ্রলোক দোকানদারগণ তাঁহাদের দোকানের জন্য স্বদেশী মাল পান; কিন্তু যে সব স্বদেশবাসী মাল দেন তাঁহাদের অনেকেই মূল্যের টাকাটা পান না। এভাবে বেকার সমস্যা সমাধানেও ইঁহাদের অনিচ্ছাকৃত ক্রটী নিতান্ত সামান্য নহে!

ভাল বা বড় দোকান সহজে দেশী জিনিষ রাখিতে চায় না। বিজ্ঞাপনের পিছনে অর্থব্যয়, শিক্ষিত ক্রেতার দেশপ্রীতি ও জিনিষের নিজগুণে কোন জিনিষের চাহিদা যদি নিতান্তই বৃদ্ধি পায়, তখনই কেবল ইঁহারা ঐ সকল জিনিষ রাখিতে স্বীকৃত হন। একে জিনিষ প্রস্তুত ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ কুলানই এই সব শিশুশিল্প-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দুঃসাধ্য; তাহার উপর বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করা ইঁহাদের পক্ষে অনেক সময় বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া পড়ে। অন্য দিকে বহুদিনের পরিচিত বিদেশী জিনিষের বাজারে বিজ্ঞাপনের তেমন আবশ্যক হয় না; আর বিনা প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দিতেও তাঁহাদের অর্থাভাব নাই; মাল চালাইবার জন্য দোকানদারগণকেও তাঁহাদের খোসামোদ করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে। সাধারণের নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিলাসী ধনীর সৌখীন উপকরণাদি সর্ব্বপ্রকার পণ্যসম্ভার জাপান এরূপ অসম্ভব রকম সস্তায় সরবরাহ করিতে সুরু করিয়াছে যে উহা দেশীয় শিল্পের পক্ষে ত মারাত্মক হইতে পারে; অন্যান্য শিল্পপ্রধান পাশ্চাত্য দেশের পক্ষেও অত্যন্ত ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কলুটোলা, রাধাবাজার, ক্যানিং ষ্ট্রীটের বড় বড় দোকানদারগণ সর্ব্বদা এই সব নিত্য নূতন জাপানী মাল সস্তায় আনাইয়া অধিক লাভে বিক্রয়ের আশায় মাথা ঘামাইতেছেন। অন্যান্য জিনিষের সহিত ইহাদের মূল্যের এত পার্থক্য যে, লাভের অঙ্ক বেশী রাখিয়া এই সব জিনিষ বিক্রয় করা অনেকটা সহজসাধ্য। কলিকাতার এই সব বড় বড় পাইকারী দোকান হইতেই মফঃস্বলে মাল চালান হয়; কারণ মফঃস্বলের দোকানদারগণ ইঁহাদের নিকট হইতেই নিজেদের প্রয়োজনীয় বৎসরের মাল ক্রয় করিয়া নেন। অনেক দিনের ব্যবসা সম্পর্কের ফলে এবং অন্যান্য নানা কারণে ইঁহাদের মধ্যে একটা বাধ্য-বাধকতার সম্বন্ধ আসিয়া যায়। এবং মফঃস্বলের দোকানদারগণ কলিকাতার ব্যবসায়ীর নিকট হালফ্যাশনের বিষয় অবগত হইয়া অনেকটা তাঁহাদের উপদেশ অনুযায়ী মাল পছন্দ করিয়া থাকেন। কলিকাতার ব্যবসায়ীকে নগদ মূল্য দিয়া কিংবা সঙ্কীর্ণ সময়ের ম্যাদে মূল্য দিবার সর্ত্তে জাপান হইতে মাল আমদানী করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্যই হয় যত সত্বর সম্ভব এই মাল বিক্রয় করিয়া ফেলা। সেইজন্য মফঃস্বলের দোকানদারগণের নিকট ইঁহারা এই সব মাল চালাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এইভাবে বিনা আড়ম্বরে, প্রায় বিনা বিজ্ঞাপনে এই সব সস্তা জাপানী মাল সুদূর পল্লীগ্রামের নগণ্য বিপণিতে পর্য্যন্ত সহজেই স্থান লাভ করে!

এখানে আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাপানের মুদ্রা-সম্পর্কীয় নীতি এবং এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতা জাপানের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতার সমস্যাকে আরো গুরুতর করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানী ইয়েনের মূল্য ছিল শতকরা ১৫০৲ টাকা। সেই স্থলে স্বর্ণমান পরিত্যাগ ও মুদ্রানীতির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইহার মূল্য দাঁড়াইয়াছে এক্ষণে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা! জাপানী মাল এতটা সস্তা হওয়ার ইহাও একটি প্রধান কারণ। জাপানী ব্যবসায়ী তাহার জিনিষের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় এক শত ইয়েনই পাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের রৌপ্য-মুদ্রা ও জাপানের ইয়েনের মূল্যের মধ্যে এতটা তারতম্য হওয়ায় আমাদিগকে ১৫০৲ টাকা স্থলে এক্ষণে দিতে হইতেছে মাত্র ৭৫৲।৭৬৲ টাকা! ইয়েনের মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়া জাপান এইভাবে আমাদের বাজার নিজ পণ্যে ছাইয়া ফেলিবার অধিকতর সুযোগ পাইয়াছে। সেইজন্যই ভারতবাসী রৌপ্যমুদ্রার মূল্য এক শিলিং ছ' পেনি হইতে, বেশী কম না হইলেও অন্ততঃ এক শিলিং চার পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য এত দরবার, এত আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই দাবিটুকু তাহার আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয় নাই।

ভারতীয় শিল্পীদের আর একটি বিপত্তি এই যে, একই জিনিষ বিভিন্ন দোকানদার বিভিন্ন দরে বিক্রয় করে। ইহাতে ক্রেতাদের মনে নানারূপ সন্দেহের উদ্রেক হয়, এবং বিরক্তিরও কারণ ঘটে। ক্রমে দেশী ব্যবসায়ী ও তাহার জিনিষ উভয়ের উপরই একটা অনাস্থা আসিয়া পড়ে। কোন বিদেশী নামকরা জিনিষের বেলা কিন্তু সমস্ত বাজার ঘুরিয়া আসিলেও দামের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে না। নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা ঐ সব জিনিষ কেহ কম দরে বিক্রয় করিলে তাহার পক্ষে ভবিষ্যতে মাল পাওয়া কঠিন হইবে। কিন্তু দেশী জিনিষের বেলা অনেক দোকানদার তার প্রতিবেশীর খরিদদার ভাঙ্গাইবার জন্য কিম্বা বিদেশী জিনিষের হুণ্ডির টাকা পরিশোধ করিবার তাড়নায়, নিজ ইচ্ছামত লাভের অংশ কম ধরিয়া অথবা নিজের লাভ একেবারে বাদ দিয়া জিনিষ বিক্রয় করে। অনেক দেশীয় নামজাদা ও চলতি জিনিষের দরও সেইজন্যই অনেক সময় এক এক দোকানে এক এক রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

মূলধনের অভাব, মুদ্রানীতি সম্পর্কীয় অব্যবস্থা, দেশীয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্কের অসদ্ভাব, অনভিজ্ঞতা প্রভৃতি গুরুতর প্রতিবন্ধকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশীয় শিল্পীগণ তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের কাটতি বা বণ্টন সম্পর্কে দেশী ব্যবসায়ীর নিকট অধিকতর সহানুভূতি এবং ব্যবসানুমোদিত সঙ্গত ব্যবহার পাইলে তাহাদের অনেকখানি অশান্তি ও অন্তরায় দূর হইতে পারিত। এই অন্তরায়ের মূলে ব্যবসায়ীগণের ন্যায্য স্বার্থ কিছু বিদ্যমান রহিয়াছে বুঝিতে পারিলেও কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যাইত। কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকখানি বিপরীত সংস্কার, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, অন্যায় লাভের আশা আছে বলিয়াই আমাদের পরিতাপের কারণ হইয়াছে। এই অবস্থার আশু প্রতিকার হওয়া আবশ্যক। আজকাল কেনাবেচার ব্যবসায় বহু উচ্চশিক্ষিত দেশ-হিতৈষী লোক প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আমাদের বিশেষ নিবেদন তাঁহাদের কাছে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 'গিল্ড' বা সঙ্ঘ হইয়াছে। সেই সঙ্ঘের সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার্থ সকলকেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। ইহাতে সাময়িকভাবে কাহারও ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত লাগিলেও, সঙ্ঘের সাধারণ কল্যাণ সাধিত হইয়া পরিণামে সকলের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব হয়। দেশীয় দোকানদারগণের মধ্যে এরূপ কার্য্যকরী সঙ্ঘের অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে নিজেদের মধ্যে একতাবন্ধন দ্বারা অনাবশ্যক প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হইবে, সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি পাইবে, এবং ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও দেশের উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে।

অন্যদিকে দেশীয় কারিগর ও শিল্পীগণেরও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশেষ শিল্পের এরূপ কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যে না আছে তাহা নহে। কিন্তু ইহাদের শুধু কাগজপত্রে টিকিয়া থাকিলে চলিবে না—প্রকৃত সংহত-শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। আমরা এমন একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানের কথা জানি যাহার কোন কোন সভ্য নিজের জিনিষের মূল্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা স্থির করিবার পরও দিল্লী সিমলা যাইয়া ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গোপনে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার ও অপরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? সে কথা থাক্; প্রয়োজন হইলে বড় বড় সহরে বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর ও শিল্পীগণকে একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের নিজেদের পণ্যের জন্য এক একটি বৃহৎ স্থায়ী বিপণির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরশ্রীকাতরতা, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থজ্ঞান, ভেদবুদ্ধি, অসহিষ্ণুতা এইরূপ মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় জীবনে চিরদিন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রেরণা ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সব হীন প্রচেষ্টা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে আমাদের [illegible] কোন উপায় নাই।

কৃষক-বধূ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

পাঁচু পরের বাড়ী জন খাটত। বাপ মা যখন মারা যায় বয়স তখন তার তের বছর। পাড়াপ্রতিবেশীদের পরামর্শে বাসের ভিটা ও চাষের জমি বিক্রী করে গিয়ে উঠেছিল পশ্চিম পাড়ার হাজারি দাসের বাড়ী। হাজারি সঙ্গতিপন্ন চাষী। তার একটিমাত্র ছেলে। বার মাস জন-মজুর রাখতেই হয়। বললে "পাঁচু, এখন তোকে কিছুই দেব না। কেবল কাজ করবি আর খাবি। তার পর বড় হয়ে যখন চাষ আবাদ করতে শিখবি, আমি তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আর দু' বিঘে জমি করে দেব।"

পাঁচু বললে "আচ্ছা।"

মাঠের জমি কিনেছিল হারেজ আলি। সে বললে "নাবালকের সম্পত্তি আমার নেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বলে রাখছি—যখন ও চাষবাস করতে শিখবে, যে দামে নিয়েছি তার অর্দ্ধেক পেলেই জমি ওকে ফিরিয়ে দেব।"

কাজেও হল তাই। হাজারি তার কথা রাখল। এর এগার বছর পরে পাঁচু একদিন চোদ্দ বছরের বউয়ের হাত ধরে তার নতুন চালাঘরে গিয়ে উঠল। জামাইয়ের ঘর গুছিয়ে দিতে সঙ্গে এল শাশুড়ী। কিন্তু শাশুড়ীর বড় সংসার, অনেক কাজ; তাই থাকতে পারল না। দিন পনের পরে একদিন সকাল বেলা যাবার সময় মেয়েকে ডেকে বললে "ফুলি, ঘরে তোর আর কেউ নেই। যতক্ষণে যে কাজটা করবি ততক্ষণে তা হবে। নইলে অমনি পড়ে থাকবে। ভাত দুটো রাঁধবি, তবে আমার পাঁচু খেতে পাবে। এই বুঝে সুঝে কাজকর্ম্ম করিস। যেন পাড়ায় গিয়ে রাতদিন গল্প করিস নে।" মেয়ে কোন কথা বললে না। অনেক দূর পর্য্যন্ত মাকে এগিয়ে দিয়ে এসে কাজে মন দিল।

পাড়ার হিতৈষিণী একজন বাড়ীর উপর দিয়ে নাইতে যাবার সময় ডেকে বললে "হ্যাগা বউ, তোমার মা চলে গেল। তাইত গা, ছেলেমানুষ একলাটি ঘরে। একটা কেউ নেই কথা বলবার। আর পেঁচোই বা কি রকম। থাকুক না কেন বাপের বাড়ী দু' বছর। এত তাড়াতাড়ি আনবার কি দরকার? তুমি এক কাজ করো বউ, যখন সময় পাবে আমাদের বাড়ী গিয়ে বউদের সঙ্গে গল্প করো।" ফুলি কোন কথা বললে না, ঘাড় নেড়ে সায় দিল। তার পর কাজকর্ম্ম সব সেরে ফেলে কলসীটি নিয়ে সেও ঘাটের দিকে চলে গেল।

বিজ্ঞ চাষীর কাছে থেকে পাঁচু আর কিছু না হোক খাটিয়ে হয়েছিল খুব ভাল। সকালে দুটো ভিজে পান্তা ভাত খেয়ে মাঠে যেত, ফিরত বেলা তিনটে চারটেয়। তার পর স্নান আহার সেরে গরুর দড়া পাকান, ঝুড়ি বোনা প্রভৃতি ছোটখাট সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকত। বাড়ী এসেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করে নি। পরদিন সকালে পাঁচু ঘুম থেকে উঠে দেখে ফুলি রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। কাছে গিয়ে বললে "এত সকালে ভাত রাঁধছিস কেন? পান্তা ভাত নেই?"

—না।

—কেন, রাখিস নি কেন?

—ভিজে ভাত খেয়ে সারাদিন থাকা যায় না-কি?

নতুন বউয়ের মুখে কথাটা বড্ড মিষ্টি লাগল। পাঁচু হাসতে হাসতে বললে "থাকা যায় না ত এতকাল থাকলাম কি করে?" ফুলির এখনও লজ্জা ভাঙেনি। ভাল করে কথাই বলতে পারে না। পাঁচুর কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বঁটি নিয়ে তরকারি কুটতে বসল।

"তবে আমিও স্নানটা সেরে নেই" বলে পাঁচু তেল গামছা নিয়ে ঘাটে গেল।

সকাল বেলা গরম গরম ভাত খেয়ে মাঠে যাবার সময় পাঁচুর মনটা আজ বড় খুসী হয়ে উঠল। হাজারি খুব ভাল লোক। তার বাড়ীর মেয়েরাও তাকে খুব যত্ন করত।

কিন্তু খাওয়ার ভিতর এমন পরিতৃপ্তি সে কোন দিন পায় নি। হঠাৎ একটা পুলকের শিহরণ গায়ের উপর দিয়ে খেলে গেল। মনে মনে বললে "যে যতই ভাল হোক স্ত্রীর মত কেউ নয়।" তার পর কাজে অকাজে, সময়ে অসময়ে যে রামপ্রসাদী গানটা সে গেয়ে থাকে সেইটি গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে সে নিজের ক্ষেতে গিয়ে হাজির হল।

বিকেল বেলা পাঁচুকে ঘরে খেতে দিয়ে দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলি আস্তে আস্তে বললে "ঢেঁকি পেতে দেবে কবে?"

বৌ ছোট বলে পাঁচু ভাজুনীদের পয়সা দিয়ে ধান ভানিয়ে নিত। গ্লাসের জলটুকু সমস্ত নিঃশেষ করে দিয়ে পাঁচু বললে "তুই কি ধান ভানতে পারবি যে ঢেঁকি পেতে দেব?"

—না, পারবো না!

ফুলির এই স্পষ্ট অথচ গম্ভীর জবাবে পাঁচু হেসে বললে "আচ্ছা দেব, ঢেঁকি পেতে দেব, কালই।"

যে কথা সেই কাজ। ঢেঁকি পাতা হল। পাঁচুর মত ফুলিও তার কাজের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করে ফেলল। সকালে পাঁচু খেয়ে মাঠে বেরিয়ে গেলে ফুলি সাংসারিক কাজে লেগে যেত। গোয়াল মুক্ত করা, ঘর নিকান, বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেলে, সে ধান ভানতে আরম্ভ করত। তার পর অনেক বেলায় যেত ঘাটে নাইতে।

পাড়ার গিন্নীদের চোখে কিছুই এড়ায় না। ফুলিকে দেখলেই বলত "গাঁয়ে এবার যতগুলো নতুন বউ এসেছে, তার মধ্যে পাঁচুর বউয়ের মত মানুষ আমরা কখনও দেখি নি। এত গাওড়া! বাবা! কিই বা কাজ! তা বেলা হেলে পড়বে তবুও শেষ হয় না। তাইতে পেঁচোও বাড়ী আসে সন্ধ্যে বেলা। কি করবে? সকাল সকাল এলে ত আর ভাত পাবে না।" ফুলি এ-সব কথার কোন জবাব দিত না। আপন মনে নেয়ে বাড়ী এসে দুটো খেত, তার পর বসত কাঁথা শেলাইয়ে। বেলা যখন তিনটে চারটে বেজে যেত, পাঁচুর আসবার যখন সময় হোত তখন দিত ভাত চড়িয়ে।

সেদিন মাঠ থেকে এসে পাঁচু টোকা কাস্তেটা ঘরের দাওয়ার উপর রেখে দিতেই দেখতে পেল পাশে এক ধামা চাল। মনটা তার বড্ড খুসী হল। "ফুলি, তুই ত বেশ, এক ধামা চাল করে ফেলেছিস!" বলে আদর করে তার গালটা একটু নেড়ে দিতেই মৃদু হাসি ও লজ্জায় ফুলির কালো মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

২

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকাল বেলা পাঁচু মাঠে বের হবার সময় ফুলির হাত থেকে সুপারি ক'খানা নিয়ে মুখে দিয়েই বললে "সকালে করেই ফিরব, আজ আর তত কাজ নেই।" তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ফুলি বলে ফেলল "বল কি? তোমার আবার কাজ নেই?" পাঁচু হেসে বলল "কেন, আমি কি বড্ড কাজ করি? লোকে বলে বুঝি?" ফুলি বললে "লোকে বলে ঠিক উল্টো, আমি বলি।" "তুই বলিস? তবে তোর চেয়ে বেশী খাটিনে এটা ঠিক।" বলে তার হাসি হাসি মুখখানা একটু নেড়ে দিয়ে পাঁচু ঘর থেকে বের হয়ে গেল; কিন্তু উঠানের মাঝখান পর্য্যন্ত গিয়েই আবার ফিরে এসে বললে "ফুলি, তুই যে বলছিলি লোকে বলে ঠিক উল্টো, লোকে কি বলে রে?"

—লোকে বলে তুমি সময় মত ভাত পাও না বলে বাড়ী না এসে মাঠেই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বসে থাক।

"তাই না-কি? লোকে এই কথা বলে?" বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আজ আর ফুলি ধান ভান্‌ল না। বাকি কাজগুলো সব সেরে ফেলে ঘাটে গেল। ঘরনিকান কাদা জল গায়ে হাতে লেগে থাকল, ভাল করে ধুলোও না। অমনি তাড়াতাড়ি চলে গেল। বেলা তখন সাড়ে দশটার বেশী নয়। ঘাটে এক-ঘাট লোক কলবল করছিল। ফুলি যেতেই যেন একটু থেমে গেল। শিবির মা ঝামা দিয়ে পা ঘষ্‌ছিল, ফুলির দিকে তাকিয়ে বললে "ঘাটে এসেছি এ যুগের কথা নয়। কথায় কথায় এত বেলা হয়ে গেল, দেখ, আমাদের পেঁচোর বউ এসে পড়েছে।" আর একজন বললে "না—না, বেলা হয় নি। আজ বউটাই একটু সকালে এসেছে! কি বলিস বউ? সকালে আসিস নি?" ফুলি বললে "হাঁ, আজ অনেক আগেই এসেছি।" সকলে আশ্বস্ত হয়ে আবার গল্পে মন দিল। ফুলি তাড়াতাড়ি নেয়ে নিয়ে বাড়ী এসেই দিল রান্না চড়িয়ে।

পাঁচু দিনে তিনবার খায়। দুপুরের খাওয়া তার

যত অসময়েই হোক রাত্রে আর একবার চাই। হাজারির বাড়ী থেকে তার এ অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু সেখানে তিন বেলাই গরম ভাত হয়ে উঠত না বলে সকালে খেত পান্তা। ফুলি ঠিক করেছে তিন বেলাই রাঁধবে। আজ তার রান্না হয়ে গেল কিন্তু পাঁচু এখনও এল না। রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে অন্য দিনের আসবার সময়ও পার হয়ে গেল তবুও তার দেখা নেই। ক্রমে যখন সন্ধ্যা হয় হয়, ভাতও যখন শুকিয়ে কড়কড় হয়ে গেল, ফুলি যখন ভাবতে লাগল আবার একমুঠো চাল চড়িয়ে দেবে কি-না এমন সময় পাঁচু এক বোঝা জ্বালানী কাঠ মাথায় নিয়ে বাড়ী এল। দুম করে বোঝাটা উঠানের এক পাশে ফেলে ফুলির মুখের পানে তাকাতেই ফুলি হেসে ফেলল। পাঁচু খুসী হয়ে বললে "তাহলে তুই রাগ করিস নি বল? আমি ত ভেবেছিলাম তুই খুব রাগ করেছিস।" ফুলি বললে "তা যাহোক, এখন তুমি ভাত খাবে কি করে বল দেখি? শুকিয়ে কড়কড় হয়ে গেল। দেবো আর দুটো চড়িয়ে? এখনই হয়ে যাবে তোমার মুখ হাত ধোওয়া কাপড় ছাড়া হতে হতেই।" পাঁচু বললে "না না না না, শক্ত কড়কড় কি বলছিস, আমি লোহা খেয়ে হজম করতে পারি। সকালে করেই আসতাম। পটলের ক্ষেতের একটা দিক পগার কেটে বেড়া দিতে বাকি ছিল। মাটি ভয়ানক শক্ত। ভেবেছিলাম জল হলে তার পর দেব। আজ মাঠে গিয়ে দেখি লতাগুলো সব গরুতে খেয়ে গেছে। বেড়া না দিলে আর থাকবে না দেখে সেটা শেষ করে তবে এলাম।"

সন্ধ্যের পরে খেতে বসে পাঁচু বললে, "আজ আর নয়, এই শেষ, বুঝলি ত? বিছানাটা পেতে দে দেখি, খেয়ে উঠেই শুয়ে পড়ব।" ফুলি কি একটা বলতে গিয়ে আর বললে না। পাঁচু বললে "কই, বললি নে কি বলতে যাচ্ছিলি?" ফুলি বললে "একটা কাজ ছিল, না পার আজ থাকগে।"

—কি কাজ?

—দোকানে দরকার ছিল। মশলা-পাতি কিছু নেই।

—বলিস কি? এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল? এই ত সেদিন সব নিয়ে এসেছি। একটু কম কম করে খরচ করবি, জানিস?

—খরচ আমি যা করি লোকে চেয়ে নিয়ে যায় তার অনেক বেশী।

—লোকে চেয়ে নিয়ে যায়? বলিস কি?

—হাঁ, সব জিনিসই। সে তেঁতুল আর একটুও নেই। এখনই তুমি খেতে পাবে না। যে আসে সেই বলে বউ, একটু তেঁতুল দে না। দশ-বারো পলা তেল ধার করে নিয়ে গেছে, কেউ ত দেবারই নাম করে না।

পাঁচুর হাসি-মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে "চাইতেই আসুক, আর ধার নিতেই আসুক কাউকে কিচ্ছু দিবি নে। ছেলেমানুষ পেয়ে তোকে ঠকিয়ে নেয়।"

শোওয়া হল না। খেয়ে উঠে তেলের বোতল হাতে করে দোকানে গেল।

৩

ঘরের পিছনে, ঠিক বেড়ার ধারেই অনেক দিনের পুরাণ একটা সাজনা গাছ। সকালে উঠে পাঁচু দেখলে ফুলি রান্না চাপিয়ে দিয়ে সজিনার ফুল কুড়াচ্ছে। রাঁধবার কিছু নেই সেও জানত। তাই দুটো কুড়িয়ে দেবার জন্যে সেদিকে যেতেই পাঁচু দেখতে পেল পাড়ার হিমি কি কথা বলছিল, তাকে দেখেই সরে গেল। একটু খটকা লাগল। সকলে এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি, এত সকালে আড়ালে দাঁড়িয়ে কিসের গল্প। কিন্তু ফুলি কিছুই বললে না। তাই সেও কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। ফুল কুড়িয়ে ঝুড়ি ভর্ত্তি করে দিল।

পাঁচু খেয়ে মাঠে চলে গেল। ফুলি গোয়ালঘরটা মুক্ত করে সবে ঘর নিকাতে সুরু করেছে, এমন সময় হিমি আবার এসে দেখা দিল। বললে "কিরে বউ, আমার কথার কোন জবাব দিলি নে যে?"

—তুমি কি বলছ আমি বুঝতেই পারছিনে।

—তুই একটা হাবলি। বলছি ধান বিক্রী করবি? করিস ত বল, আমি নেব। তবে বাজার ছাড়া দুকাঠা করে বেশী দিতে হবে।

—সে ত আমি বলতে পারিনে। বাড়ী এলে জিজ্ঞেস করব।

—মর্ ছুঁড়ি, তোর কোন বুদ্ধি নেই। জিজ্ঞেস ত পেঁচোকে আমিও করতে পারি। বলছি তুই বেচবি কি-না বল্।

—আমি কি করে বেচব ? লুকিয়ে ?

হিমি প্রথমে কোন কথা বলল না, কেবল একটু মুচকে হাসল। তার পর আস্তে আস্তে বললে "নিবারণের বউ লুকিয়ে ধান বেচে বেচে অনেক পয়সা করেছে।" ফুলি বললে "পয়সা কি আমাদের দুজনের আলাদা আলাদা ?"

হিমি আবার কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ফুলি "না না না, আমি বেচব না" বলে সজোরে মাথা নেড়ে তার মুখের কথা বন্ধ করে দিল। "তবে আর কি হবে, যাই" বলে হিমি আরও মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে চলে গেল। কিন্তু কি ভেবে একটু পরে আবার ফিরে এসে বললে "দেখ্ বউ, তুই যেন আমার কথাটা পেঁচোকে বলিস নে। বুঝলি ?"

হিমি ধান-ভানুনী। পয়সা নিয়ে পরের ধান ভেনে দেয়। কখনও কখনও নিজে ধান কিনে চালও বিক্রী করে। কাজেই গিন্নীবান্নীহীন সংসারের ছোট ছোট বউদের ভুলিয়ে, পয়সার লোভ দেখিয়ে, কারবার তার চলে ভাল। এই রকমে অনেক নতুন পাতান সংসারের মাথা সে খেয়ে দিয়েছে।

বিকেলে পাঁচুকে খেতে দিয়ে ফুলি সব কথা খুলে বললে। পাঁচু নীরবে শুনল। তার পরে খেয়ে উঠে গেল বেহারীর কাছে। বেহারী হিমির ভাই। কিন্তু বনে না বলে থাকে আলাদা হয়ে। সে বললে "ও-রকম নালিশ শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। আমি কিছু করতে পারব না। তুমি ওকেই বল।" হিমি তখন সেখানেই ছিল, শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বললে "ওমা, এক ফোঁটা বউ, বাহাদুর ত কম নয় দেখছি। একেবারে দিনকে রাত করে দিল ! আমি ধান কিনতে গিয়েছি, না সে আমাকে ধান বেচবে বলে খোসামোদ করেছে ? চল্ দেখি তোর বউয়ের সাথে মুখোপালা করতে" বলে সে পাঁচুর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলল তার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে। গলার জোরে গাঁ ফাটিয়ে ফেলল। পাড়ার লোক জমা হয়ে গেল। উঠানে বসে ফুলি কুলোয় করে কি ঝাড়ছিল। একেবারে তার সুমুখে গিয়ে বললে "তুই কি রকম মানুষের মেয়ে লা ? তোকে আমি বলেছি লুকিয়ে ধান বেচতে ? না তুই আমাকে খোসামোদ করছিস কদিন ধরে কিনতে ?" অশ্রাব্য ভাষায় গালিও দিল বিস্তর। ফুলি যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বের হল না। হিমির পিছনে পিছনে পাঁচুও এসেছিল। কিন্তু সেও নির্ব্বাক হয়ে গেল তার গালি ও গলার চোটে। ভিড়ের ভিতর থেকে প্রৌঢ়া একটি স্ত্রীলোক বললে "গিয়েছে ওকে খোসামোদ করতে ! কোথাও ও যায় না, কারও সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত কয় না। নিজের কাজ করে। সময় পেলে ঘরেই চুপ করে বসে থাকে। ও গিয়েছে ওকে খোসামোদ করতে ধান কিনবার জন্যে !" তখন পাঁচু বললে "তোমাকে ও ডাকতে গিয়েছিল তোমার বাড়ী ?"

—না, তা যায় নি।

—তবে ডাকতে পাঠিয়েছিল কাউকে দিয়ে ?

—না।

—তবে ভোরবেলা লোকে যখন ঘুম থেকে ওঠে নি, আড়ালে দাঁড়িয়ে ওকে কি কথা বলতে এসেছিলে ?

হিমি থপ্ করে কোন উত্তর দিতে পারল না। পাঁচু বললে "আর কোন দিন এস না আমাদের বাড়ী। কোন দিনও না। যদি এস ত বিপদ ঘটবে। আজ আর কিছু বললাম না তোমাকে।" তার পর ঘর থেকে কুড়ুলটা বের করে বাবলা কাঠের গুঁড়িটা চেলা করতে লেগে গেল।

হপ্তাখানেক পরে একদিন রাত্রে শুতে গিয়ে ফুলি ঘুমন্ত স্বামীর গায়ে একটু চাপ দিয়ে বললে "দেখ, আজ সে গেলাসটার খোঁজ পেয়েছি। ডোবার ধারে বসে ওদের শিবি বাসন মাজছিল। তার কাছে রয়েছে দেখলাম।"

—নিয়ে এলিনে ?

—না, ভয় করতে লাগল।

পাঁচু দু-হাত দিয়ে তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে বললে "ভয় করতে লাগল কিরে ? আমাদের জিনিস লোকে চুরি করে নেবে, আর আমরা দেখেও আনতে পারব না, এ রকমে আমরা সংসার করব কি করে ? কাল সকালে নিয়ে আসিস।" তার বুকের উপর মাথা রেখে ফুলি নিঃশব্দে শুয়ে রইল। হাঁ, না, কিছুই বললে না।

পাশের বাড়ীটাই শিবিদের। পরদিন সকালে পাঁচু কাজে বেরিয়ে গেলে ফুলি আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখল শিবি সেই ডোবার ধারে বসে বাসন ধুচ্ছে। দু' একবার ইতস্ততঃ করার পর শেষে গেল তার কাছে। দেখলে গেলাসটা আধমাজা অবস্থায় পড়ে আছে। হাতে করে

নিয়ে বললে "এটা তোরা কোথায় পেলি ? এ যে আমাদের গেলাস। আমি নিয়ে চললাম।" "ও মা, পেঁচোদার বউ আমাদের গেলাস নিয়ে গেল। ও মা, পেঁচোদার বউ আমাদের গেলাস নিয়ে গেল" বলে শিবি চীৎকার করতে লাগল। কিন্তু মা ও ঠাকুর মা তখন পাড়ায় কাদের বাড়ী গিয়ে আসর জমিয়েছিল। শিবির হাঁকডাক তাদের কানে পৌছিল না।

পাঁচ মিনিটও হয় নি। ফুলি গেলাসটা আনাড় জায়গায় তুলে রেখে সবে উঠানটা ঝাঁট দিতে সুরু করেছে। এমন সময় শিবির মা নেকড়ে বাঘের মত এসে পড়ল। "গেলাস নিয়ে এসেছিস যে ? কার ও গেলাস ? তোর ? পেঁচো কিনেছে ? তার বড় ক্ষমতা। জন্ম গেল তার পরের বাড়ী ভাত মারতে মারতে, এ গেলাস সে দেখেছে কখনও চোখে ?" বলে নিজেই ঘরের মধ্যে ঢুকে, পাতি পাতি করে খুঁজে গেলাস বের করে নিয়ে এল। হিমি যেন এই জন্যেই কোথায় বসে ছিল—এসে বললে "ওর সঙ্গে ঝগড়া করছিস, দিদি, এখনই পেঁচো এসে বাড়ী ধেয়ে মারতে যাবে। তাকে একেবারে মেড়া করে রেখেছে যে।" আর একজন বললে "তাই ত, দেখেছি দেখেছি এরকম বউ ত কখনও দেখিনি। দুদিন ঘরে না আসতেই এ রকম কাণ্ড। ছি, ছি।"

সেদিন পাঁচুর ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। খেয়ে উঠে যখন শুনল গেলাসটা আবার কেড়ে নিয়ে গেছে, সোজা তাদের বাড়ী গিয়ে শিবির মাকে খুব রাগ ভরেই বললে "খুড়ি আমার গেলাস দাও।"

—কেন, গেলাস দেব কেন ?

—গেলাস কি তোমার ?

শিবির মা একেবারে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে "হাঁ, আমার। আমি কিনেছি তখন আমার নয় ?"

—কার কাছে কিনেছ ?

—কিনেছি তোর বউয়ের কাছে।

—বউয়ের কাছে ?

—হাঁ, তোর বউয়ের কাছে। চড়কের দিন এসে বললে "এই গেলাসটা নিয়ে আমায় একটা টাকা দাও। চুড়ি পরব।" আমি বললাম "গেলাস বিক্রী করবি, পাঁচু কিছু বলবে না ?" সে বলে "বলবে আবার কি ? এ আমার গেলাস। আমার মা দিয়েছে। তা সে কি বলবে ?" একটা টাকা দিয়ে কিনেছি, জানিস ?

পাঁচু চুপ করে রইল। চড়কের দিন বউ চুড়ি পরেছে এটা ঠিক। কিন্তু তার পয়সা সে দেয়নি। কোথায় পেয়েছে তাও জানে না। শিবির বাবা ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল। এতক্ষণ একটা কথাও বলে নি। এইবার হুঁকাটা দেওয়ালে হেলিয়ে রেখে নেমে এসে একটা চড় উঁচিয়ে বললে "হারামজাদা, ঘরের মাগ শাসন করতে পার না, পরের বাড়ী এসেছ কোঁদল করতে ? জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব যদি আবার কখনও আমার বাড়ী পা দাও।" শিবির মা বললে "বউয়ের কথা শুনে শুনে এই রকম হচ্ছে। সে ছুঁড়ি কি কম ? ওকে এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচতে পারে।" পাঁচুর মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলে উঠল। তখনই বাড়ী এসে বললে "গেলাস বিক্রী করেছিস কেন ?" তার মূর্ত্তি দেখে ফুলি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না। উঠানে একটা কাঠের চেলা পড়ে ছিল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পাঁচু মার চড়িয়ে দিল। সমস্ত পিঠের চামড়া চেলা কাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে উঠল। রক্তের ধারা বয়ে গেল। শেষে পাড়ার লোক এসে তার হাত থেকে ফুলিকে ছিনিয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে পূরে দিয়ে শিকল টেনে দিল। রাত্রে সে ভাত খেল কি-না তাও পাঁচু দেখল না। ঘরে গিয়েও শুল না। উঠানে একটা গরুর গাড়ী পড়ে ছিল। তারই মাচানের উপর গামছা পেতে শুয়ে পড়ল।

উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে শুয়েই রইল। অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম এল না। সকালে চোখ মেলেই দেখল ফুলি রান্না চড়িয়েছে। হঠাৎ তার মনের ভিতরটা কেমন করে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘাটের দিকে চলে গেল। হাত মুখ ধুয়ে, স্নান করে এসে যেন অপরাধীর মতই রান্নাঘরে প্রবেশ করল। ফুলির সমস্ত পিঠ ফুলে উঠেছে। সারা গায়ে কাটার দাগ, যেন তখনও রক্ত ফুটে বেরুচ্ছিল। দেখে পাঁচুর চোখ সজল হয়ে উঠল। বললে "গায়ের এত ব্যথা নিয়ে রান্না না করলেই হ'ত। আজ আর কোন কাজ করিস নে, চুপ করে শুয়ে থাকিস। কেন এমন কাজ করতে গেলি বল দেখি, তাই আমার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল।"

"আমি গেলাস বিক্রী করি নি। ওরা মিথ্যে কথা বলেছে তোমাকে" বলে ফুলি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

পাঁচুর আর খাওয়া হল না। এক নিমেষে তার মনটা যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। ভাতের থালা ফেলে রেখে বাইরে এসে হাত ধু'ল। তার পর গেল শিবিদের বাড়ী। সেইমাত্র শিবি বাসনগুলো ধুয়ে এনে দাওয়ার উপর রেখেছিল। তার থেকে গেলাসটা তুলে নিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললে "এই আমি গেলাস নিয়ে চললাম। বাপের বেটা যে হবে সে যেন যায় গেলাস কেড়ে আনতে।" শিবির বাবার দিকে একবার ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে এই বলিষ্ঠ যুবক আস্তে আস্তে বাড়ী চলে এল। শিবির বাবা উঠানে বসে দাঁত ঘষছিল, পাঁচুর মূর্ত্তি দেখে একটা কথাও বলতে সাহস করল না। পাঁচু প্রস্থান করলে শিবির মা আক্রমণ করল শিবির বাবাকে। "বাড়ী থেকে জোর করে জিনিস কেড়ে নিয়ে যায়। মারবে বলে ভয় দেখায়। একটা কথাও বলবার সাহস না থাকে ত পুরুষ মানুষ হয়েছিলে কেন?" খোচা খেয়ে শিবির বাবা তম্বি গম্বি সুরু করে দিল। অবশ্য বাড়ী থেকেই। তার চীৎকারে পাঁচু অবিচলিত থাকলেও বিচলিত হয়ে উঠল পাড়ার লোক। মেয়ে পুরুষ অনেক এসে জমা হল। বিচারক সেজে এক ব্যক্তি বললে "কি হয়েছে? কেন এত চেঁচাচ্ছ?" শিবির বাবা বললে "বাড়ী থেকে জিনিস কেড়ে নিয়ে যাবে, আর আমি কিছু বলব না?" লোকটি বললে "পাঁচুকে কেউ ডেকে আন্ ত, সে কি বলে শুনি।" পাঁচু এসে বললে "আমার জিনিস চুরি করে নেবে, আর আমি দেখেও নিয়ে আসব না? ইতর ছোটলোক কোথাকার।" শিবির বাবা বললে "মুখ সামলে কথা ক'স্ বলছি।"

—কেন, তোমার ভয়ে না-কি?

লোকটি বললে "শুনলাম, তোর বউ গেলাস বিক্রী করেছে?"

—মিথ্যে কথা। ওর মা বাড়ী যাবার দিন চুড়ি পরবার পয়সা ওর আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেছে। কাল এ কথা আমার মনে ছিল না।

"তবে আমরা আর কি করব। মর সব কামড়াকামড়ি করে" বলে সে লোকটি প্রস্থান করল।

৪

পাঁচুর শ্বশুরবাড়ী আধ ক্রোশ দূরে। খবরটা সেখানে গিয়ে পৌছিল বিকৃত ও অতিরঞ্জিত অবস্থায়। পাঁচু কার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। পুলিশ এসেছে। হয়ত এতক্ষণ ধরেও নিয়ে গেছে। শুনে শ্বশুর শাশুড়ি দুজনেই ছুটে এল। আবার কিছু ঘটে ভেবে পাঁচু সেদিন মাঠে বের হয়নি। নটের শাক বুনবে বলে উঠানের একধারে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। ফুলি মন দিয়েছিল কাঁথা শিলাইয়ে। এমন সময় তারা দুজন এসে পৌছিল। "যতখানি শুনেছেন ততখানি নয়" বলে পাঁচু ঘটনা যা ঘটেছিল সব খুলে বলল। শুনে লোকটি বললে "এও ত ভাল নয়, এও ত খুব খারাপ।"

ফুলির পিঠের দিকে নজর পড়তেই ফুলির মার গা শিউরে উঠল। বললে "ওকি হয়েছে রে তোর পিঠে? দেখি, দেখি, এদিকে সরে আয়, দেখি।" ফুলি হেসে বললে "তোর দেখতে হবে না, যা। ও কিছু হয় নি।"

সন্ধ্যে বেলা পাঁচুর শ্বশুর গেল হাজারির বাড়ী। বললে "এখানে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি শুধু আপনার কথা শুনে। আর পাঁচুও ছেলে নেহাৎ খারাপ নয়। কিন্তু পাড়ার লোক এরকম অত্যাচার করলে কি করে তারা বসত্ করবে?" হাজারি গ্রামের মোড়ল। রামের ছেলের সঙ্গে শ্যামের মেয়ের বিয়ে হলে ক'পয়সা দেনা পাওনা হয় তার থেকে আরম্ভ করে স্নানের ঘাটটা ঠিক সময়মত কাটা হল কি না তার তদারক করা পর্য্যন্ত তার কাজ। হাজারি বললে "এ রকম ব্যাপার এই নতুন নয়। কিন্তু কি করে এর প্রতিকার করা যায় তাই আমি ভাবছি। পাঁচুর মত নিবারণও আমার কাছে মানুষ হয়েছে। তবে সে উন্নতি করতে পারল না। খেটে খেটে যা কিছু করেছে সবই তার বউ লুকিয়ে চুরিয়ে বেচে, উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আরও অনেক বাপ-মা-মরা ছেলে এদের দৌরাত্ম্যে মানুষ হতে পারল না। তবে আপনার ভয় নেই। আপনার মেয়ে শক্ত আছে। সে এদের ফাঁদে পড়বে না।" পাঁচুর শ্বশুর বললে "কিন্তু এটা ত ভাল নয়। এতে শুধু ঐ ছেলেদের ক্ষতি হয় তাই নয়, এতে গ্রামেরও উন্নতি হয় না। সমাজ অধঃপাতে যায়।" হাজারি বললে "সবই ত বুঝি, কিন্তু

কর্ব্বি কি ? তবে উপস্থিত আমরা ঠিক করেছি যার নামে এই রকম দোষ হবে, উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে একঘরে করবার চেষ্টা করব।"

* * * *

স্বামীর আদর ও প্রতিবেশীর অনাদরের ভিতর দিয়ে দিন কাট্‌তে কাট্‌তে যখন একদিন ফুলির উপর এসে পড়ল মা হবার আদেশ, পাঁচু তার চিবুকটি ধরে বললে "তোকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একলা ঘরে কি করে থাকব বল দেখি ?" ফুলি হেসে বললে "তবে তুমিও চল।"

—সেই সঙ্গে জমিগুলোও নিয়ে যেতে হবে যে ? ফুলি হেসে বললে "ঠাট্টার কথা নয়। তুমি মাকে নিয়ে এস গে। আমি যাব না।"

—না না না। সেও বড় ঝঞ্ঝাট, সে হবে না। তুই বাপের বাড়ী যা। আমিও যাই কাঁকুড়ের ক্ষেতে কুঁড়ে বাঁধিগে। সেখানেই কাটাব রাত।

যা হোক পুরা আট মাস পরে ফুলি যখন ফিরে এল স্বামীর ঘরে, হৃষ্টপুষ্ট একটি ছেলে কোলে করে, তখন সে আর বালিকা নয়, পাকা গিন্নী। শত্রু-মিত্র পাড়ার লোক, সবাই এল দেখতে, করল আশীর্ব্বাদ। তার পর গেল চলে ফুলিকে তাদেরই মত একজন গিন্নী বলে মেনে নিয়ে।

কবির নিরঙ্কুশতার অর্থ কি ?

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক

কবি নিরঙ্কুশ, এ কথা আমরা অনেক দিন ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি। ইহার অর্থ কি এই যে কবি স্বেচ্ছাচারী এবং উচ্ছৃঙ্খল ? তাঁহার মনে যাহা আসিবে তাহা লিখিলেই কাব্য এবং ছাপাইলেই গ্রন্থ, ইহাই কি এই নিরঙ্কুশতার অর্থ ? কবির কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের সংযম কি নাই ? শিল্পকলার মধ্যে কাব্য একটী শাখা। কবি, চিত্রকর প্রভৃতি সকলেই শিল্প এবং কলাবিদ্যার উপাসক। এক শ্রেণীর লেখকেরা বলিয়া থাকেন যে শিল্পকলার জন্যই কলাবিদ্যার সেবা (art for art's sake); সুতরাং সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির নিয়মের বন্ধনে শিল্পীকে আবদ্ধ করিলে তাহার কল্পনাকে পঙ্গু এবং ক্ষমতাকে খর্ব্ব করা হয়। শিল্পী কোন উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলে তাঁহার সাধনা সফল হয় না। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে উদ্দেশ্য না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। শিল্পী যদি সৃজনের আনন্দেই রস সৃষ্টি করিয়া যান এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা না থাকে, তাহা হইলে সেই সৃষ্ট বস্তু "শিব গড়িতে বাঁদর" হওয়াই বেশী সম্ভব। মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চ ভাবগুলি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই জন্য সত্য প্রচার করাই আর্টের উদ্দেশ্য। অনেকের মতে মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলিও সত্য এবং নীচ বৃত্তিগুলিও সত্য, সুতরাং সত্য প্রচার করাই যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে উচ্চ সত্যগুলিই যে দেখাইতে হইবে তাহার কোন মানে নাই। রসসৃষ্টি আর্টের কার্য্য, রসের গুণ বিচার করিয়া রসসৃষ্টি শিল্পীর কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। ভগবৎ প্রেমের আনন্দ যেমন একটা সত্য, ভোগলিপ্সার আনন্দও তেমনি আর একটা সত্য; সুতরাং এক সত্যকে প্রচার করিতে হইবে, অন্যটীকে প্রচার করিতে হইবে না, ইহা এই শ্রেণীর লেখকদের মতে খাঁটী আর্টের কথা নহে। রসসৃষ্টি যখন আর্টের উদ্দেশ্য তখন ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, সামাজিক অনুশাসনের নিয়ম এবং নীতিবাদের আইন, এই সমস্ত মানিয়া কার্য্য করিতে, যাঁহারা যথার্থ শিল্পী, তাঁহারা বাধ্য নহেন। ইঁহাদের মতে কাব্যের সহিত ধর্ম্মের বা নীতির কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

এখন উপরের এই সমস্ত মতামতের আলোচনা করিতে হইলে "আর্ট", "সত্য",—এই সব কথার প্রকৃত অর্থ কি তাহা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন। আর্ট কি ? অন্তরের উপলব্ধিতে যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়, সেই সত্যকে সুন্দর রূপ দিয়া সৃষ্টি করার নাম আর্ট,—তাহা চিত্রেই হউক বা কাব্যেই হউক। অর্থাৎ আর্টে শুধু সত্য প্রকাশ করাই যথেষ্ট নহে। সে সত্যটী সুন্দর হওয়া চাই। এই "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"—ইহার প্রতিষ্ঠার নামই আর্ট। Art for art's sake এই জন্য একেবারে সত্য নহে। Art for truth's sake হইতেছে আসল কথা। ঈশ্বর প্রেমও সত্য, সম্ভোগ-লালসা সেও সত্য; কিন্তু শেষেরটী সুন্দরও নহে শিবও নহে,—সুতরাং শেষের এই ভিত্তির উপর রচিত যে কাব্য বা সাহিত্য, তাহা আর্ট নহে। এই গেল আর্টের কথা। এখন সত্য কি ? সত্য জিনিষটা সনাতন এবং চিরন্তন। তাহা চিরকালই আছে, তাহাকে নূতন আবিষ্কার (invent) করিতে হয় না। শিল্পী তাহাকে reveal করেন বা লোক চক্ষুর সমক্ষে ফুট ভাবে প্রকাশ করেন। এই সত্যের প্রকাশ (revelation of truth) হইতেছে শিল্পীর প্রধান কার্য্য। এই সত্য প্রচারের দ্বারা তিনি মানব-জীবনের যথার্থ সমস্যাগুলির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। উপনিষদে "সত্যম্ এবম্ আনন্দম্" একই কথা।

প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে। সকল

জাতিরই সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম এবং আনুষঙ্গিক জাতীয় ভাব দেশ কাল পাত্র হিসাবে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া একটা বিশেষত্বের ছাপে পড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্বসভার দরবারে এই বিশেষত্বটুকুই প্রত্যেক জাতির আত্ম পরিচয়। অন্য দেশের অনুকরণে এই বিশেষত্ব বর্জ্জিত হইলে বিশ্বসভার দরবারে, জাতীয়তার বিশেষত্ব বর্জ্জিত যে সাহিত্য, সেই সাহিত্য অজ্ঞাত-কুলশীল হিসাবে অবজ্ঞাত,—অর্থাৎ এই দরবারে প্রবেশ করিয়া নিজের স্থান লইবার তাহার কোন সসম্মান প্রবেশাধিকার পত্র নাই। জাতীয়তার বিশেষত্ব বজায় রাখিতে হইলে সাহিত্যে এই বিশিষ্টতা ত্যাগ করিলে চলিবে না ; কারণ সাহিত্যে ইহাই তাহার আভিজাত্য। সেই জন্য দেশ কাল পাত্র হিসাবে সাহিত্যের বা কাব্যের উপকরণ বিভিন্ন হইতেই হইবে। যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী, যিনি শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি এই বিশেষের মধ্যে বিশ্বকে স্ফুট ভাবে দেখাইতে পারেন। বিদেশের সাহিত্য হইতে ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু সেই ভাবগুলি গ্রহণ করিয়া বিশেষরূপে পরিপাক করিতে হইবে এবং জাতীয়তার বিশিষ্টতার ছাঁচে ঢালাই করিতে হইবে। তাহা না করিতে পারিলে এই সব বিদেশী ভাব অন্য দেশের সাহিত্যে খাপ খাইবে না।

যিনি যথার্থ কবি, যিনি যথার্থ শিল্পী, তাঁহার সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি মুক্ত-আত্মা, তিনি দেহ-প্রাণের, মন বা বিচার বুদ্ধির বন্ধন কাটাইয়া নিজের আত্মাকে সজ্ঞানে চিনিতে পারিয়া যথার্থ অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি বিশ্ব-প্রেমিক, তিনি সাধক, তিনি নিজের সমাজের এবং ধর্ম্মের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া সুস্থ দেহ এবং পবিত্র মনের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার সুস্থ মনের পবিত্র উচ্চ কল্পনার সাহায্যে তিনি যে কাব্য সৃষ্টি করিবেন, তাহা কখনই সমাজ, ধর্ম্ম বা নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। দার্শনিক তাঁহার তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে সমাজ, ধর্ম্ম এবং নীতির সূত্র স্থাপন করিয়া থাকেন। কবি সে সমস্ত বিচার-বিতর্কের ধার না ধারিয়াও, নানা প্রকার নিষেধ বাধা-বিধির সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিয়াও যে রস সৃজন করেন তাহাতে দার্শনিকের নীরস যুক্তি এবং তর্কের দ্বারা স্থাপিত যে সত্য, সেই সত্যই আপন প্রোজ্জ্বল কল্পনার আলোতে আরও পরিস্ফুট, আরও ভাস্বর করিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিয়া থাকেন। এই অর্থে কবি যখন কাব্য সৃষ্টি করেন তখন তিনি নিরঙ্কুশ ভাবেই সৃষ্টি করেন। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে মাধুর্য্য থাকে ; কিন্তু সেই মাধুর্য্যের খুঁটীনাটী সম্বন্ধে তিনি নিজে বাহজ্ঞানে কোন খোঁজ রাখেন না ; এই অর্থে তিনি কোন প্রকাশ্য উদ্দেশ্য লইয়া রচনা করেন না ! অর্থাৎ দার্শনিক তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা যে কার্য্য করেন, কবি শুধু কল্পনার অনুভূতির দ্বারা সেই কার্য্য করিয়া যান। উভয়েই সত্যের সাধক এবং সত্যের সন্ধানই আনন্দ। আমাদের মনের আনন্দ হইতেই বুঝিতে পারি যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি। দার্শনিক পরিপূর্ণ জ্ঞানে যে সত্যের সন্ধান পান, কবি তাঁহার অনুভূতির (intuition) বলে সেই সত্যেই পৌঁছান। সেক্সপীয়ার হ্যাম্লেট্ লেখার পর এ পর্যন্ত হ্যাম্লেট্ চরিত্রে যে সমস্ত গভীর ভাব, পরবর্ত্তী সমালোচক-গণের আলোচনায় প্রকটিত হইয়াছে, সে সমস্ত ভাবের খুঁটীনাটী লিখিবার সময় কবি অত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া লেখেন নাই—তাহা সত্যই তাঁহার কল্পনার খেলায় বাহির হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজে দার্শনিক না হইলেও হ্যাম্লেটের মত ঐ ধরণের একটা চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইহা কবি কল্পনার সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ফল। এই হিসাবে কবিকে একাধারে সমাজতত্ত্ববিদ ও নীতিতত্ত্ববিদ বলা যাইতে পারে। এই ভাবে কবি না জানিয়া নিজের অগোচরে সংস্কারকের কার্য্য করেন। কবির প্রবুদ্ধ মনের স্তরে (Conscious mind এ) কোন প্রকাশ্য উদ্দেশ্য না থাকিলেও তাঁহার মনের সুপ্ত স্তরে (Sub-conscious এবং unconscious mind) নিবদ্ধ শুদ্ধ ভাবগুলির অজ্ঞাত প্রেরণায় তিনি যে কাব্য সৃষ্টি করেন, তাহা আবিলতার পঙ্কে কখনই কলঙ্কিত হয় না। এইখানেই কবির স্বাধীনতার এবং নিরঙ্কুশতার পূর্ণ সাফল্য এবং সাহিত্যে স্বাধীনতার অর্থ ইহাই, স্বেচ্ছাচার নহে।



নায়েগ্রা প্রপাত

শ্রীসুধা সেন

আমেরিকা ও ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় ভগবানের সৃষ্টির অনেক বৈচিত্র্যই দেখে ধন্য হ'লাম। নায়েগ্রা প্রপাত তার ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। বাল্যকালে ভূ-পরিচয়ের ভিতর দিয়ে এই প্রপাতের বিরাট ব্যাপারের কথা কিছু জেনেছিলাম; তার পর নানা রকম প্রবন্ধাদির আলোচনায় কতবার নায়েগ্রা প্রপাতের সৌন্দর্য্য-বর্ণনা পড়া গিয়েছিল। এইবার সেই বিরাট ব্যাপার দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করলাম।

১৩'২ সালে আমেরিকা ভ্রমণের সময় মে মাসের ২৪শে তারিখে আমরা নায়েগ্রা সহরে উপস্থিত হলাম। আমরা বাফেলো (Buffalo) সহর থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ীতে এই সহরে এলাম। ইঞ্জিনবিহীন গাড়ীগুলি ট্রামের মতনই মনে হয়।

নদীর নামও নায়েগ্রা; এই নদীর ধার দিয়ে ট্রামের লাইন বসানো; সেজন্য গাড়ীতে বসে নদীর দৃশ্য বেশ উপভোগ করা যায়। নদীর অপর তীরে ছোট ছোট বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর দেখতে। নদীটিও বেশ বিস্তৃত, কিন্তু সে-রকম স্রোতস্বতী ব'লে মনে হ'ল না।

সহরে এসে আমরা নির্দ্দিষ্ট হোটেলে গিয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। ঘরে জিনিষগুলি রেখে পাশেই খৃষ্টীয়-যুবক-সমিতির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করলাম। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র এই সমিতির কাজ চলছে এবং তার জন্য আমাদের মত তীর্থযাত্রীদের যে কত সুবিধা তা স্বীকার না করে থাকা যায় না। এখানকার কর্ম্মসচীব মহাশয় তাঁর একজন সহকর্ম্মীকে আমাদের সঙ্গী করে দিলেন। আমরা একখানি মস্ত মোটরে চড়ে রওনা হ'লাম।

কাছেই একটী রমণীয় বাগান; তার ভিতর দিয়ে পথ ঘুরে গিয়েছে। সেই পথে অল্প দূর যেতেই জলের গর্জ্জন কাণে এল এবং পথ ঘুরবামাত্র প্রপাতটী দেখতে পেলাম। আমরা গাড়ী থেকে নেমে বাগানের রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দেখলাম।

এই দিককার প্রপাতকে "আমেরিকান প্রপাত" বলে; তার কারণ প্রপাতের এই অংশ আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের সীমানার অন্তর্গত। প্রপাতটীকে যত দেখি, মন ততই বিস্ময়ে অভিভূত হয়। বারে বারেই প্রশ্ন ওঠে "কোথা হ'তে আসে এত জল?" যে নদীকে পথের ধারে শান্তভাবে প্রবাহিত হয়ে যেতে দেখে এলাম, সেই একই নদী হঠাৎ এমন ক্ষেপে উঠল কেন? কোন্ ডাকের সাড়া পেয়ে কার উদ্দেশে এমন ভাবে উন্মত্ত হয়ে সে ছুটে যাচ্ছে? জলের স্রোতে বুকের পাথর ঠেলে নদী ছুটেছে; যেতে যেতে পথে অসমতল জমি পেয়ে নীচে নামবার কোনও ব্যবস্থা না দেখে ক্রোধে অন্ধ হয়ে সগর্জ্জনে ঝাঁপ দিয়েছে,—তাইতো এই প্রপাতের উৎপত্তি! এখানে প্রপাতের ভীষণ স্রোত দেখে স্বর্গগত কবি সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা মনে এল—

"সুড়সুড়িয়ে গুড়গুড়িয়ে বেরিয়ে এসে কৌতুহলে
গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গেলাম, ছড়িয়ে প'লাম শূন্যতলে"—

এই পিছল পথে বাধাও নেই, পিছনে টানও নেই, তাই নদী—

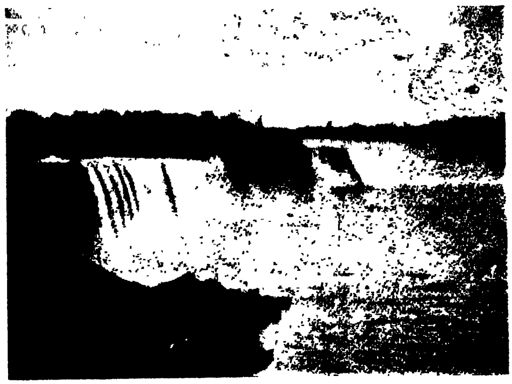
"লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে
ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হ'তে
চড়চড়িয়ে পাহাড় ফেড়ে
নৃত্য করে মত্ত স্রোতে:
শুষ্ক বিজন যোজন জুড়ে,
ঝঞ্ঝাঝড়ের শব্দ করে
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের
কাণে মোহন মন্ত্র প'ড়ে—

"পরাণ ভরে নৃত্য ক'রে" ছুটে চলেছে। প্রপাত হয়ে নেমে আসবার ঠিক উপরেই নদীর স্রোত এত বেশী যে পাথরে আঘাত পেয়ে তার সাদা সাদা ঢেউগুলির উদ্দাম ভাব দেখে মনে হচ্ছিল সমুদ্রেও বুঝি এ-রকম সদা-চঞ্চল ভাব নেই। নদী যেখানে প্রপাত হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে

সেখানে তো সাদা ধোঁয়ার মতন জল চারিধারে ছিটিয়ে পড়ছে। দিনের বেলা এই খরধার স্রোতের উপর সূর্য্যের রশ্মি পড়ে অপরূপ রামধনু-রংএর সৃষ্টি করে; নানা রংএর মাধুরী নিয়ে দুটী রামধনু অর্দ্ধবৃত্তাকারে জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে,—কি তার অপরূপ শোভা!

প্রপাতের অপর অংশের নাম "ক্যানাডিয়ান প্রপাত", সেটী ক্যানাডার অন্তর্ভুক্ত। এই অংশকে "Horse shoe Falls" নামেও পরিচয় দেওয়া হয়। নায়েগ্রা প্রপাতকে দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে দ্বীপের মতন কতকটা জমি মাঝে বিস্তৃত; তার নাম "Goat Island"। বিমান পথের আরোহীরা এই দ্বীপকে ছাগলের মাথার আকারে দেখে এই আখ্যা দিয়েছেন। এই দ্বীপটী যুক্তরাজ্যের অধীনে; নদীর উপর একটী সেতু দিয়ে দ্বীপে যাওয়া যায়। আমরাও সেই দ্বীপে গিয়ে দুপাশের প্রপাতের সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হলাম। ক্যানাডিয়ান প্রপাতের বিস্তৃতি অনেক বেশী এবং জলের স্রোতে পাথর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ঘোড়ার পায়ের খুরের মত হয়েছে। এই প্রপাতে প্রতি মিনিটে প্রায় ৯৩ কোটী ১৫ লক্ষ গ্যালন জলের ধারা পড়ছে। সমস্ত প্রপাতের উচ্চতা ১৬০ ফুট; কোনও কোনও স্থানে ১৮০ ফুটও আছে। আফ্রিকা মহাদেশের ভিক্টোরিয়া প্রপাত ইহা অপেক্ষা উচ্চতায় আরও বেশী; কিন্তু নায়েগ্রা প্রপাত গভীরতা এবং বিস্তৃতিতে পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রপাত ব'লে পরিগণিত।

আমেরিকান প্রপাতের নীচে যেখানে ঘূর্ণী বাতাস জলের ধারাকে উপরে তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে, সেই ঘূর্ণী বাতাসের গহ্বরের ধারে কাঠের সেতুতে দাঁড়িয়ে প্রপাতের সৌন্দর্য্য দেখবার ব্যবস্থা আছে;—১ ডলার বা ৪৲ টাকা করে টিকিট। পাহাড়ের ভিতর বৈদ্যুতিক লিফ্‌টে যাত্রীদের ঐ সেতুতে নামিয়ে দেওয়া হয়। অত কাছে দাঁড়িয়ে চারিধারের দৃশ্য খুব যে ভাল উপভোগ করা যায় তা নয়, তবে জলে ভিজে যাবার ভয়ে আপাদমস্তক রবারের টুপী-জামায় ঢেকে প্রচণ্ড বাতাসের মুখে জলের স্রোতে দাঁড়িয়ে এ-রকম অভিজ্ঞতা লাভে সারা শরীরে শিহরণের সাড়া দেয়। উপরে দাঁড়িয়ে ঐ পথে কয়েকটী যাত্রীকে যেতে দেখলাম; তাঁদের অবস্থা দেখে এবং অনবরত জলের স্রোতে পিচ্ছিল সেতুর চেহারা দর্শনে আমার নীচে নামবার বিশেষ উৎসাহ হল না। এই দুর্গম পথে যাওয়ার ফলে হাত পা ভেঙ্গে কোনই লাভ নেই; তাই "Maid of the Mist" ষ্টীমারে চ'ড়ে নদীর বুকে বেড়িয়ে প্রপাতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই বেশী পছন্দ করলাম।



প্রথম দর্শনে নায়েগ্রা

দুটী প্রপাতের মাঝে দ্বীপটীতে দাঁড়ালে স্পষ্ট দেখা যায়, একই নদী কি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হয় এই দ্বীপে বাধা পেয়ে দুদিকে দুটী প্রপাত হয়ে নদী নীচে ঝাঁপ দিয়েছে। কিন্তু নীচে আবার মিলন! আবার



নায়েগ্রার একটী ঘূর্ণাবর্ত্ত

দুই প্রপাতের জল একত্রে মিশে নাচতে নাচতে অণ্টারিয়ো (Ontario) হ্রদের দিকে ছুটে চলেছে। মাঝখানের এই দ্বীপটী যে খরধার জলের স্রোতে ভেঙ্গে ভেসে যায় নি, এইটাই আশ্চর্য্য।

আমরা আবার সেতুর উপর দিয়ে ঘুরে এধারের বাগানে

চলে এলাম। পাহাড়ে গহ্বরের পথে ষ্টীমারে উঠতে হবে বলে আমরা নিকটে ১৮০ ফুট নীচে নেমে এলাম। এই নিকটে যাবার ভাড়া ।৴০ করে ; তার পর আবার প্রত্যেকে ৩৸০ করে টিকিট কিনে ষ্টীমারে উঠে পড়লাম। ষ্টীমারে যাবার পথেও উপর থেকে প্রপাতের জলের কণা মুখে মাথায় ছড়িয়ে পড়ছিল, যেন ঝুরঝুরে বৃষ্টির ধারা। ষ্টীমারের উপরের বারান্দায় বসে চারিধারের শোভা দেখব ব'লে এখানেও সেই রবারের জামা টুপী পরবার ব্যবস্থা।

অপরূপ সাজে উপরের বারান্দায় গিয়ে আসন গ্রহণ করতেই ছোট্ট ষ্টীমারখানি মন্থরগতিতে চলতে আরম্ভ করল। যে নায়েগ্রা প্রপাতের ছবি এতকাল কল্পনায় এঁকেছিলাম, এখানে আসবার আগে স্বপনে যা দেখেছিলাম, সেই ছবি চোখের সামনে তার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার খুলে দাঁড়াল। প্রপাতটী দেখে মন এক অদ্ভুত ভাবে অভিভূত হয়ে গেল। এ কি প্রচণ্ড জলের রাশি, কোথায় এর উৎপত্তি, কোথায় বা এর শেষ! অল্পক্ষণ অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখে মনে হয় সাদা তুষারাবৃত প্রকাণ্ড পাহাড় বুঝি অবিশ্রান্ত ভাবে গড়িয়ে যাচ্ছে। জলের এই উদ্দাম ভাব দেখে মনে হয় এই বুঝি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এ খেলা তার ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হবে। কিন্তু সে তো নয়! সুপ্তির স্বাদ যে জানে না তার জড়তা কোথা থেকে আসবে? কাজেই এই দুরন্ত জলের রাশির নাচ বন্ধ কি করে হবে?

এই প্রচণ্ড জলের রাশি নীচে পড়ে ধোঁয়ার মত ছিটিয়ে চারিধার কুয়াশায় ঢেকে দিচ্ছে, আর সেই কুয়াশা ভেদ করে ছোট্ট ষ্টীমারখানি অগ্রসর হচ্ছে,—তাইতো তার নাম "Maid of the Mist" বা কুয়াশার কুমারী। এই ষ্টীমারে চড়ে আমরা চারিধারের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করলাম তা বর্ণনা করা যায় না।

মাঝে মাঝে জলের ঝাপটানিতে রবারের টুপী জামার উপরে অজস্র জলের ধারা ঝরে পড়তে লাগল—আর কাটা টুপীর ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য দেখবার সময় জলের ধারায় চোখ ধুয়ে যেতে লাগল, এ-ও কম আনন্দের ব্যাপার নয়। ষ্টীমার থেকেও দেখলাম অপর একদল যাত্রী ঘূর্ণী বাতাসের গহ্বরের কাছে সেতুর উপর নেমে এসে চারিদিকের দৃশ্য দেখছেন।

এই গহ্বরের উপরের অংশের নামই "Rock of the Ages"—শুনলাম জলের স্রোতে এই প্রপাতের পাহাড়ের অন্যান্য অংশ প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই ফুট ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে, কিন্তু এই অংশটুকু সেই সহস্রাধিক বৎসর আগেকার মতই এক-ভাবে এক স্থানে অবস্থিতি করছে।

আমরা দূর থেকেই ক্যানাডিয়ান প্রপাতটী দেখছিলাম, ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে একেবারে তার পাদদেশে উপস্থিত হলাম। কি তার গর্জ্জন, আর কি তার আস্ফালন। এখানে প্রপাতের গভীরতার জন্য জলের রং হাল্কা-সবুজ মনে হয়। জলের ধারার আস্ফালন এত বেশী যে ষ্টীমারের বারান্দায় বসেও জলের ধারায় অর্দ্ধ-স্নান হয়ে যাবার উপক্রম; এবং বাতাসের বেগে ভাল করে দেখাও সম্ভব নয়। এখানে নদী ১৫০ ফুট গভীর। আমাদের ষ্টীমারখানি উন্মত্ত স্রোতের তালে তালে দুলতে আরম্ভ করল। সহযাত্রীদের একটী ছোট ছেলে ভয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল; তার এ আনন্দের রস গ্রহণ করবার বয়স হয় নি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এ-ভাবে ষ্টীমারে না এলে দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

আমরা আধ ঘণ্টা নদীতে বেড়িয়ে সমস্ত প্রপাত এবং দুই তীরের সৌন্দর্য্য দেখে ফিরে এলাম। জলের স্রোতে বেড়িয়ে শরীর বেশ স্নিগ্ধ বোধ হ'ল।

তীরে এসে ষ্টীমার দাঁড়ালে আমরা নেমে আবার লিফ্‌টে করে উপরে এলাম। আহারাদির জন্য হোটেলে ফিরে আসতে হ'ল।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর নদীর ধারে পাহাড়ের কোলে বেড়াবার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। শুনলাম যে ট্রামে করে আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ান তীর মিলিয়ে কুড়ি মাইল বেড়িয়ে নদীর প্রায় মোহানা পর্য্যন্ত দেখে আসা যায়। একেই ইংরাজীতে "Gorge trip" ব'লে। আমরা সেই রকম বেড়াব স্থির করে সকালের পরিচিত বাগানের ধারে ট্রামে এসে উঠলাম।

নায়েগ্রা নদী আমেরিকান যুক্তরাজ্য এবং ক্যানাডাকে পৃথক করে রেখেছে। সেতু ভিন্ন এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে গতিবিধি অসম্ভব। আমরা সেই সেতুর কাছে উপস্থিত হলাম। এই সেতুর নাম "Falls view Bridge." বাস্তবিকই সেতুর উপর থেকে ট্রামে বসে প্রপাতের সৌন্দর্য্য একেবারে অতুলনীয়; সেতুর নামকরণ সার্থক হয়েছে।

সেতুটা পার হয়ে ক্যানাডার দিকে আসবামাত্র ট্রাম দাঁড় করিয়ে ইংরাজ কর্ম্মচারী এসে ছাড়পত্র (Passport) দেখতে চাইলেন। আমরা শুধু কয়েকঘণ্টার জন্য বেড়াতে যাচ্ছি শুনে কোনও প্রকার শুল্ক না নিয়ে নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দিলেন। তখন ট্রাম নির্দ্দিষ্ট পথে যেতে লাগল।

আমরা বাম দিকে খানিকদূর অগ্রসর হয়ে আবার মোড় ঘুরে ডান দিকে যেতে লাগলাম। এইবার ক্যানাডা রাজ্যের তীরের নদীপথ আরম্ভ হ'ল। ট্রামের অন্যান্য যাত্রীরা পথিমধ্যে তাঁদের গন্তব্য স্থানে যাবার জন্য নেমে গেলেন; তাঁরা এ দেশের অধিবাসী, নায়েগ্রা প্রপাত তো তাঁদের কাছে নিত্যকালের ব্যাপার। এ ভাবে বেড়ান তাঁদের নতুন নয়! সুতরাং সমস্ত গাড়ীখানি প্রকারান্তরে আমরা দুজন যাত্রী অধিকার করে বসলাম।

ভাগ্যক্রমে দিনটাও ছিল ভারী পরিষ্কার, দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত দেখা যায়। তীরের উপর দিয়ে যাবার সময় গাছপালার ফাঁকে অনেক নীচে নায়েগ্রা নদীর নীল জলের নাচ দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। ক্রমশঃ আমরা একটা বাঁকের কাছে এলাম। এখানে নদী পাথরে আঘাত পেয়ে হঠাৎ বেঁকে ছুটে পালিয়েছে। এইখানে একটা ঘূর্ণী আছে, অদ্ভুত তার জলের স্রোত। এখানেও জলের গভীরতা ১৫০ ফুট। এই ঘূর্ণী স্রোতের উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক তারে গাঁথা একটা ঝোলানো লোহার ঘর আছে। কোনও যাত্রী যদি ইচ্ছা করে আলাদা টিকিট কিনে এই ঘরে বসে শূন্যপথে ঘূর্ণীজলের উপর দিয়ে ক্যানাডার তীরেরই এক ধার থেকে অন্য ধারে যেতে পারে।

আমরা আর এ পথে না গিয়ে ট্রামেই অগ্রসর হ'লাম। আমেরিকান তীরে খরধার স্রোতের পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘূর্ণীস্রোতের উত্তাল তরঙ্গ দেখব ব'লে ধৈর্য্য ধরে রইলাম।

ক্রমশঃ আমরা একটা অপ্রশস্ত অধিত্যকার উপর অগ্রসর হলাম। এই স্থানটী নদীর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছে। অসমতল জমি, খুব গাছপালা দিয়ে ঘেরা এই স্থানটী ভারী সুন্দর। খানিক পরেই পথটী ঘুরে আবার নদীর ধারে এসে পড়েছে। ক্যানাডার ভিতরে যাবার সুযোগ হল না, দূর থেকে সহরের অল্পাংশ চোখে পড়ল।

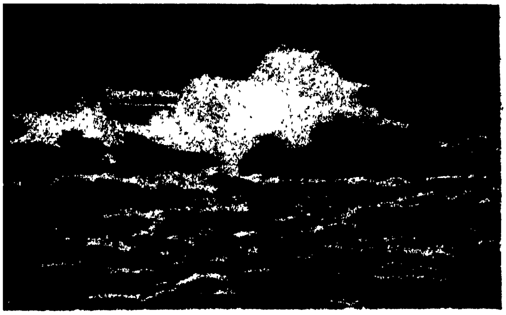
ক্যানাডার তীরে ১৩ মাইল বেড়িয়ে অন্য একটা সেতু পার হয়ে আবার আমেরিকান তীরে এলাম। আমেরিকান তীরের মুখে আবার ছাড়পত্র দেখাতে হ'ল এবং কি কারণে ক্যানাডার তীরে গিয়েছিলাম সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হল। এই ব্যাপারের জন্য সেতুর শেষে তীরটী এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে এই প্রশ্নকারীদের চক্ষুর



সঙ্কীর্ণ শৈলপথে প্রবাহিতা নায়েগ্রা নদী

অন্তরালে কোনও যাত্রীরই পালাবার উপায় নাই। যাহোক্, বেড়াবার উদ্দেশ্য জেনে তাঁদেরও শান্তি, আমাদেরও নিষ্কৃতি! আমাদের ট্রাম ছাড়ল।

তখন তীরের উপরের অংশ ছেড়ে ঢালু পথে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম এবং ট্রামখানি একেবারে নদীর ধারে

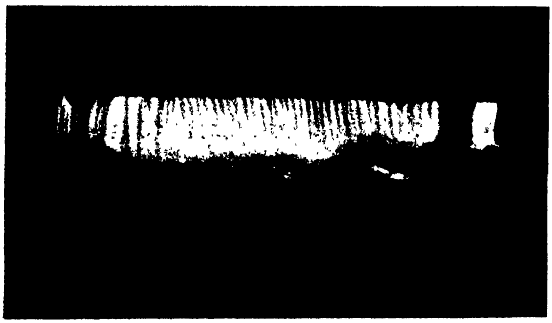


তরঙ্গ-সঙ্কুল নদী

পাহাড়ের কোল ঘেঁসে লাইনের উপর দিয়ে চলতে লাগল। পাহাড়ের কোলে এই অপরিসর স্থানকেই তো "Gorge" ব'লে। একেবারে নদীর ধার দিয়ে যাবার সময় মাঝে মাঝে জলের ধারা ট্রামের তলার অংশ ভিজিয়ে দিচ্ছিল। ক্রমশঃ নদীর বুকে ছোটবড় নানা মাপের পাথর

চোখে প'ড়ল এবং নদীর বেগও যেন বাড়তে লাগল। তার পরেই ঘূর্ণীর কাছে নদীর সে কি উদ্দাম ভাব দেখলাম! এ কি নাচের লহরী! তা তা থৈ থৈ করে নদী নেচে উঠেছে। আমাদের দেশেও হৃষীকেশে গঙ্গার নাচ দেখেছি। কিন্তু নায়েগ্রা নদীর নাচের কাছে সে নাচ কোথায় লাগে? জানি না কোন্ সুদূর সঙ্গীতের আভাষ এখানে এসে লেগেছে, যার তালে নায়েগ্রা নদী একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে! কত স্থানে বড় বড় পাথর সারি বেঁধে নদীকে বাঁধবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বৃথাই তাদের উদ্যোগ। নদীকে বাধা দেয় কে? সেই ভারী পাথর নাড়তে না পেরে তার উপর লাফিয়ে পড়ে সগর্জ্জনে নদী ঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। দেখে মনে হ'ল

"জোয়ার যখন আসে আর স্রোত যখন ছোটে
সাধ্য কি কার কোন বাঁধনে রাখতে পারে বেঁধে?"



প্রপাতের বর্ণ বৈচিত্র্য

যে সামনে আসবে তাকেই এই স্রোতের বশ্যতা স্বীকার করে এর সঙ্গেই ছুটে যেতে হবে। এখানে খড়কুটা তো কোন্ ছার, পাথরও ভেসে চলে যায়। জলের গভীরতা বেশী নয়, কিন্তু বেগ প্রচণ্ড!

ভগবান কি মহান শক্তি দিয়ে মানুষের চক্ষুর অন্তরালে বসে এই জগৎকে চালিত করছেন! তাঁর শক্তির প্রভাবে প্রকৃতিকে কত বড় করে তুলেছেন। তাঁর সৃষ্টি-রহস্য এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর আগে এত রকম উপায়ে এবং এত দিক দিয়ে নায়েগ্রা প্রপাতকে দেখবার সুবিধা ছিল না। তাই তখনকার দিনে দর্শকেরা উপর থেকে এই সদাই চঞ্চল অথচ গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি—নায়েগ্রা প্রপাত দেখে প্রকৃতির পূজা করে তৃপ্ত হ'তেন। দিনে দিনে মানুষ কত রকম উদ্ভাবনা শক্তিতে, নতুন বৈজ্ঞানিক বলে প্রকৃতিকে নিজেদের আয়ত্তাধীন করবার চেষ্টা করছে। সকলে যাতে সে সৌন্দর্য্য উপভোগের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থার ত ত্রুটী নাই।

রাত্রির গভীর অন্ধকারে এই প্রচণ্ড জলপ্রপাতকে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেতে দেয় নি। এই প্রপাতেরই খরধার স্রোত থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরী করে বেঁধে রেখেছে এবং সেই প্রবাহের শক্তিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে সমস্ত নায়েগ্রা প্রপাতকে আলোকিত করছে। আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ান প্রপাতের স্রোতকে নানাদিকে চালিত করে দুই রাজ্যের লোকেরাই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সংগ্রহ করছে। আমরা নায়েগ্রা সহরে পৌছবার আগে ট্রাম থেকে এই রকম একটী আমেরিকান তড়িৎ-আবিষ্কারক কারখানায় নেমে পড়লাম।

এখানে প্রতিদিনই নানা দেশের দর্শক আসেন। আমাদের সঙ্গেও কয়েকজন দর্শক জুটলেন। তার পর কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে একজন করে পথ প্রদর্শকের তত্ত্বাবধানে আমরা কারখানা দেখতে অগ্রসর হলাম।

এই কারখানার প্রায় ২৪০ ফুট নীচে নদী প্রবাহিত। সেইখানে নদীর স্রোতকে বেঁধে কি ভাবে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপাদন করে তাই দেখবার জন্য আমাদের লিফ্‌টে করে ২৪০ ফুট নীচে একটী ঘরে নামিয়ে দিল। কারখানার ভিতর বৈদ্যুতিক শক্তিতে সর্ব্বক্ষণ কত বড় বড় কলকব্জা ঘুরছে, তার শব্দে পথপ্রদর্শকের কথা শোনা যায় না; তাই ঘরের মাঝে মাঝে বেতার যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে।

এই কারখানাতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদন করে ৫০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত সমস্ত সহরে পাঠানো হচ্ছে। এত প্রকাণ্ড জলপ্রপাত থাকাতে এই সহরবাসীর কত সুবিধা হয়ে গেল। অফুরন্ত জলের রাশিকে মিথ্যা চলে যেতে এরা দেয়নি—তার স্রোতের অংশ বেঁধে এই ব্যাপার চলেছে। তার ফলে এ দেশবাসীর পক্ষে বৈদ্যুতিক প্রবাহের জন্য বেশী টাকা ব্যয় করতে হয় না।

কারখানাটী দেখার শেষে সহযাত্রীদের মোটরে হোটেলে ফিরে এলাম।

সন্ধ্যার অল্প আগেই আমাদের আহারাদি শেষ করে ঘরে বসে সারাদিন বেড়ানোর কথা আলোচনা করছি, এমন সময় খৃষ্টীয়-যুবক-সমিতির কর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে মোটর নিয়ে ক্যানাডার তীরে নদীর ওঁপার থেকে রঙীন আলোয় আলোকিত নায়েগ্রা প্রপাত দেখাবেন ব'লে আমাদের ডাকলেন। আমাদের তো মহা স্ফূর্ত্তি; মনের ইচ্ছা পূর্ণ হল!

রাঙ্গা আলো পড়ে আকাশের সীমান্ত-রেখা—লাল রংএ রঙীন হয়ে উঠেছে, তার ছায়া ঘন নীল জলের উপর পড়ে এক অপরূপ রংএর সৃষ্টি করেছে। ক্রমশঃ আলোর চিহ্ন চোখের অন্তরালে বিলীন হল এবং গাঢ় অন্ধকারে চারিধার ছেয়ে গেল। আমরা তখন ক্যানাডা যাবার পথে সেতুর উপর এলাম। নদী পার হবার সেতু তিনটাই আমাদের দেখা হ'ল। সেতুর শেষে আবার ছাড়পত্রের ব্যাপার!

এপারে এসে দেখি চারিধার আলোর ধারায় উদ্ভাসিত। ক্যানাডিয়ান প্রপাত থেকে যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপাদন ক'রে



বিমান হইতে নায়েগ্রার দৃশ্য

রাত্রি নয়টার আগে সে আলো জ্বলে না ব'লে আমরা তাঁদের সঙ্গে প্রথমে সহরের পথে গেলাম। নায়েগ্রা সহরের সুদৃশ্য বাগানে ঘেরা ছোট ছোট গৃহগুলি ভারী চমৎকার। নদীর ধারে জনসাধারণের জন্য একটা বাগান আছে। আরও অগ্রসর হয়ে নায়েগ্রা নদী ও অন্টারিও হ্রদের উপকূলে উপস্থিত হলাম। দূর থেকে অন্টারিও হ্রদকে সমুদ্র ব'লেই ভুল হয়। তখন সূর্য্যদেব অস্তগামী, তার

ক্যানাডা রাজ্যের অধিবাসীরা কতরকম সুখ-সুবিধা ভোগ করছে, তারির প্রতিদানে নায়েগ্রা প্রপাতকে যেন কৃতজ্ঞতা জানাবার অভিপ্রায়েই এই আলোর ব্যবস্থা! জলের স্রোতে যে তড়িৎপ্রবাহ পেয়েছে তার শক্তিতেই একশত বত্রিশ কোটী বাতির জ্যোতিঃ বিশিষ্ট কয়েকটী প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক আলো প্রস্তুত করে তার সামনে নানা রংএর রঙীন কাঁচের ফলক লাগিয়ে এই প্রপাতের স্রোতের উপর আলো ফেলছে

সাদা তুলোর মতন জলের স্রোতে রঙীন আলো প্রতিফলিত হয়ে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রপাতের উপর অংশের সমস্ত আকাশও আলোয় আলোকিত। আমেরিকান প্রপাতে আলো দেওয়াতে বেশ স্পষ্টই জলের স্রোত দেখা যায়, কিন্তু ক্যানাডিয়ান প্রপাতের স্রোত এত উন্মত্ত এবং তার চারিধার জলের বুদ্বুদে ও কুয়াশায় এত ঢাকা যে এই শক্তিশালী আলোও তার উপরে স্পষ্ট হয়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠে না।



নায়েগ্রার অনুকৃতি। নায়েগ্রা নদী ও প্রপাতের গতিবেগ ও ধ্বংসলীলা সংযত করিবার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য এই নকল নায়েগ্রা নির্ম্মিত হইয়াছে

আমরা গাড়ী থেকে নেমে একটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করলাম। তবে আমার কাছে দিনের বেলা প্রাকৃতিক আলোর ভিতর দিয়ে প্রপাতের শোভা অনেক উচ্চ স্তরের ব'লে মনে হয়।

রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলো পড়ে নীচের ক্ষিপ্ত জলরাশিকে কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল, মনে হ'ল যদি কারও অসাবধানে পদস্খলন হয় তাহ'লে কোন্ অতলে পড়ে তার অস্থি-মজ্জা চূর্ণ হয়ে যাবে!

প্রাণভরে শেষবার প্রপাতের সৌন্দর্য্য দেখে আমরা গাড়ীতে উঠলাম। এ দৃশ্য ছেড়ে ফিরে আসতে মন চায় না। প্রপাতের কাছে বসবাস করলেও বিতৃষ্ণা জাগে কি-না সন্দেহ।

সারাদিন কত ভাবে এ সৌন্দর্য্য দেখবার সুযোগ পেলাম সেজন্য অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল।

নায়েগ্রা সহরে ফিরে বন্ধুরা শুভ-ইচ্ছা জ্ঞাপন করে বিদায় নিলেন।

ঘরে ফিরে কেবল নায়েগ্রা প্রপাতের ভীষণ অথচ মনোহর রূপই চোখে ভাসতে লাগল—তার স্রোতের সে গর্জ্জন কানের কাছে আজও যেন অনুভব করি। সে মহান দৃশ্য জীবনে কি কোনও দিন ভুলতে পারব? কি জানি!

পরবাসী

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায় বি-এ

ওই যে গেল দিনের আলো
উঠ্‌ল ফুটে রাতের হাসি
তুই কি ভোলা বাঁধন খোলা
শুনিস্ নাকি পাগল বাঁশী?
ঘুমের মাঝে বোনা স্বপন
টুটবে যবে জাগ্‌বে তপন
মিছে মায়ার এ বীজ বপন
মন ভোলানো কথার রাশি-
তোর তো এ নয় রে আপন
তুই যে ভোলা পরবাসী॥

হরিনারাণ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

১

দুইটি নারী। বয়সের পার্থক্য অনেকখানি, তাই, নহিলে দু'টি সমান। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক; মন এক; পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রায় এক। ইহাদেরই বিরহ-কাহিনী লিখিতে বসিলাম।

একজনের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষ, অপরার দ্বিবর্ষ হইতে পারে। একটি মাসী, অন্যটি বোন্‌ঝি। একটির নাম মীনু, অপরটির নাম চিনু।

বাঙলার বাহিরের একটি শহরে, বড় রাস্তার উপরে মস্ত বড় বাড়ীর জানালার ধারে, চেয়ারে উপবিষ্ট মাসীর কোলে দাঁড়াইয়া, চিনু বলিল, মাসী, গাড়ী।

রাস্তা দিয়া একখানা এক্কা ছুটিতেছিল, মাসী মীনু বলিল, গাড়ীতে কে আসবে চিনু? বোন্‌ঝির নিকট হইতে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মাসী কহিল, হরিনারাণ আসবে না, চিনু?

চিনু বলিল, হরিনারাণ। আসবে। গাড়ী।

মাসী কহিল, হ্যাঁ, হরিনারাণ গাড়ী চ'ড়ে আসবে।

আর একখানা এক্কা দেখাইয়া বোন্‌ঝি বলিল, মাসী, গাড়ী—আবার।

মাসী বলিল, গাড়ীতে কে আসবে চিনু?

চিনুর স্মরণশক্তি মন্দ ছিল না, অথবা হরিনারাণ নামটা সে জপমালা করিতেছিল, বলিল, হরিনারাণ আসবে।

চিনুর মা সান্ধ্য প্রসাধন শেষ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সহাস-প্রফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন, দু'টিতে জানালা সম্বল করেছ ত?

চিনু মা'কে দেখিয়া আনন্দ সংবাদটা সদ্য সদ্য না জানাইয়া পারিল না; কহিল, মা হরিনারাণ, গাড়ী আসবে।

মেয়ের মা বলিলেন, কার হরিনারাণ আসবে চিনু মণি? তোমার, না তোমার মাসীর?

মেয়ে মাসীর উপর কোনরূপ দয়া মায়া প্রকাশ না করিয়াই কহিল, আমার হরিনারাণ।

মাসী বোন্‌ঝির পাতলা গালটি টিপিয়া দিয়া বলিল, ঠিক বলেছ চিনু সোনা, তোমার হরিনারাণ।

তা হ'লে মাসীর কি? বদরীনারাণ? তাই, তাই সই। কিন্তু বদরীনারাণের ব্যাপার কি? না। চিঠি, না—

তোমরা সব কোথা গো? আমার ডাইনে বাঁয়ে দু'টি চক্ষুই অন্ধ ক'রে তোমরা কোথায় লুকোলে গো?—বলিতে বলিতে পর্দ্দা ঠেলিয়া সুপ্রকাশ প্রকাশ হইলেন। টুপিটা, ওভারকোটটা আলনায় রাখিতে রাখিতে, মৃদু হাস্যে কহিলেন, মীনুদি'র চিঠিটিঠি এল?

মীনুর দিদি হীনু নৈরাশ্যব্যঞ্জককণ্ঠে কহিল, কৈ আর এল।

সুপ্রকাশ ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল, অ্যাঁ, বল কি, আজও এল না? আট আটটা দিন, আট আটটা রাত্রি অতিবাহিত হয়ে গেল, তবুও চিঠি নাহি এল। আর বিয়ে হয়েছে মাত্র আট বছর! ওঃ নীহারকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না, কিছুতেই না। আট দিন, আট রাত্রি, আট দ্বিগুণে ষোলখানা চিঠি আসার কথা; তা নয়, অ্যাঁ! না, আমি ক্ষমা করবো না। কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

মীনু কৌতুক ভরে জিজ্ঞাসিল, কি করবে, শুনি মশাই?

সুপ্রকাশ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিলেন; রাগিলে তাঁহার চোখ দু'টা নাচে, অধরোষ্ঠে সৌদামিনী খেলা করে। বলিলেন, কি করবো তা এখনও ঠিক করি নি বটে, তবে একটা কিছু করবো, যাতে ক'রে নিরেটটা বুঝতে পারে যে আমাদের মীনুদির অপমান আমাদের অসহ্য।

মীনু রঙ্গ-উচ্ছল কণ্ঠে কহিল, অপমানটা কিসের?

অপমান নয় আবার? ভীষণ অপমান, অসহ্য অপমান, নিষ্ঠুর অপমান। আট বছর মোটে বিয়ে হয়েছে, আট আটটা

দিন ছাড়াছাড়ি, আট দিনে আটচল্লিশ খানা চিঠি আসবে তা নয় একখানা পোষ্টকার্ডও নেই। এই দেখ না, আমাদের ত বাবু পনেরো বছর হয়ে গেল, পনেরো মিনিট যদি অদর্শন হয়, অমনি চিঠি। তোমার দিদি লিখে পাঠালেন, পনেরো বছর বলে মনে হচ্ছে। আমি বল্লুম, পনেরো যুগ। আসছি। না গো?

হীনু কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, ওমা, তা আবার নয়! আমাদের ত এ-ঘর ও-ঘর চিঠি। আসুক না নীহার, তার লম্বা কাণ দু'টো না ছিঁড়ি ত কি বলেছি। আমার বোন্‌কে চিঠি না লেখা? এত অপমান! এত অবজ্ঞা! এত অবহেলা! বেচারার ব'লে সারাদিন জানালায় ব'সে পিওনের লম্বা দাড়ী ভেবে ভেবে প্রাণ কণ্ঠাগত হোল—

মীনু দিদির স্বর অনুকরণ করিয়া বলিল, কণ্ঠাগত হোল; এই দেখ না, প্রাণটি কণ্ঠার গোড়ায় এসে ধুক্ ধুক্ করছে!

সুপ্রকাশ কহিলেন, না এর একটা বিহিত করতেই হবে। সুদীর্ঘ আট দিনে আটটি সুদীর্ঘ পত্র দূরের কথা, একটি ছত্রও এল না? হায় হায়, দেখে শুনে মীনুদি'কে কার হাতে সমর্পণ করলাম! নাঃ, ক্যান্সেল ক'রে দিয়ে ঘরেই রাখতে হচ্ছে দেখছি। তখন দেখবে মীনুদি, মিনিটে মিনিটে চিঠি পাবে।

কে চায় চিঠি? জান না?—

"চিঠিতে কি মেটে সাধ,
বিনা দরশনে?"

সুপ্রকাশ চিন্তাযুক্ত স্বরে কহিলেন, তা যা বলেছ ভাই মীনু। চিঠিতে কি মেটে সাধ, বিনা দরশনে? এই দেখ না, সেবার তোমার দিদি কলকাতায় গেলেন। সকালের দিল্লী মেলে উনি গেলেন, সন্ধ্যের লাহোর ফিমেলে শর্ম্মারামও উঠ্‌লেন। না গো?

পর্দ্দার বাহিরে দাড়াইয়া এক ব্যক্তি কহিল, আসতে পারি?

গৃহকর্ত্রী কহিলেন, আসুন।

আগন্তুক এই পরিবারের বন্ধু। নাম সুধাংশু। সিংহের সহিত এক অপিসে কর্ম্ম করেন, এই পরিবারেই থাকেন। ঘরে ঢুকিয়া, মীনুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মীনুদি'র রয়েল মেল্ এল?

সুপ্রকাশ স্ত্রীর পানে চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিলেন, চা দিতে বল।

হীনু বলিলেন, আর বলবেন না সুধাংশুবাবু! দিল্লী মেল্ আজও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।—তিনি চায়ের টেবিল গুছাইতে চলিয়া গেলেন।

সুপ্রকাশ কহিলেন, টিকি যখন বেঁধে রেখেছি, বাছাধনকে একদিন আসতেই হবে। তখন নাকের জলে, চোখের জলে ক'রে না ছাড়ি ত কি বলেছি। আমার ঐ একটিমাত্র শালী, স্ত্রীর একমাত্র সহোদরা, আজ বাদে কাল যিনি সহোদরার সপত্নীর স্বর্ণ সিংহাসনারোহণ করতে প্রতিশ্রুত, তাকে একখানিও চিঠি না দেওয়া! এই আমি তোমাকে বলে রাখছি সুধাংশু, তখন যদি আমি একটা কাণ্ড ক'রে বসি, তোমরা কিন্তু আমায় দূষো না।

সুধাংশু চিন্তাক্লিষ্ট গম্ভীর মুখে কহিল, রাগ হবার কথাই বটে! এই রকম সব গুরুতর কারণে খুন খারাপী পর্য্যন্ত হয়ে যায়। তবে বোস্ ততটা বোধ হয় করবে না। কি বল হে সিঙ্গী? হাজার হোক্, মীনুদি'র অবস্থা তিনি কি আর বুঝছেন না!

মীনু সরস হাস্যে কহিল, সমবেদনা জানিয়ে আর দরকার নেই, দয়াময়, খুব হয়েছে।

রাস্তা দিয়া একখানা এক্কা ছুটিয়া আসিতেছিল, চিনু সোল্লাসে কহিল, মাসী, গাড়ী।

মীনু জিজ্ঞাসিল, গাড়ীতে কে আস্‌বে চিনু সোনা?

চিনু নিশ্চিন্তকণ্ঠে বলিল, হরিনারাণ।

মাসী তাহার মুখখানিতে চুম্ দিয়া বলিল, কার হরিনারাণ চিনুমণি?

আমার হরিনারাণ!

গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল দেখিয়া চিনু বলিল, মাসী, হরিনারাণ? অর্থাৎ, হরিনারাণ আসিল কই?

সমদুঃখী মাসী বলিল, পাষণ্ড হরিনারাণদের দশাই ঐ, আসে না।

সুধাংশু কহিল, চিঠিও দেয় না।

চিনু বলিল, হরিনারাণ চিঠি। অর্থাৎ চিঠি দেয়।

মাসী বলিল, হরিনারাণ ভাল, বদরীনারাণ দুষ্টু। না চিনিমণি?

চিনু মাসীর উক্তি সমর্থন করিয়া বলিল, বদরী দুষ্টু। হরিনারাণ ভাল।

হীনু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, চল, চা দিইছি।

সুপ্রকাশ বাথরুমের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, চল। চা খেয়ে একটা বিহিত ব্যবস্থা ভেবে রাখতে হচ্ছে। আট আটটা দিন, নাঃ, অত্যন্ত অন্যায়। অসহ্য!

সুধাংশু বলিতে যাইতেছিলেন, অন্যায় ব'লে অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। আমার স্ত্রী নেই, তাই; থাকলে; আর এই রকম অপমান করলে, তৎক্ষণাৎ জুডিশিয়্যাল সেপারেশন উইথ্ পারমিশান টু ম্যারী এস্ মেনী ইফ্ পসিব্ল। মীনু দি, আপনি যদি আর্য্যরমণী হ'ন্, আপনারও উচিত, এই মুহূর্ত্তে ডাইভোর্স নোটিশ দেওয়া।

তাই হবে মশাই, তাই হবে। বুদ্ধির গোড়ায় একটু গরম চা দিয়ে নেবেন চলুন, বলিয়া মীনু চিনুকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসিল, গাড়ীতে কে আস্‌বে চিনু?

হরিনারাণ।

দিদিকে লক্ষ্য করিয়া মীনু কহিল, হরিনারাণটিকে আনাও বাপু। তোমার মেয়ের ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির আর সহ্য হচ্ছে না।

দিদি বলিলেন, মাসীর রোগ ধরেছে। রোগ সংক্রামক।

সকলে চায়ের টেবিলে বসিলেন।

মীনু কয়েকদিনের জন্য বোনের দেশে বেড়াইতে আসিয়াছে। পশ্চিম দেশ, জলহাওয়া ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্যে কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য ছড়ানো ও জড়ানো। মীনুর অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে কবিতার ছন্দঃ যতিমাত্রার সংযোগ আছে; তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ফুটিয়া আছে। রস-রসিকতায় সে পাস্ করা মেয়ে। লেখক তাহাকে মূর্ত্তিমতী কাব্য আখ্যায় আখ্যাত করিতে দ্বিধাযুক্ত নহেন।

সুপ্রকাশ ও সুধাংশু বারান্দায় গিয়া সিগারেট ধরাইলেন। মীনু দিদির পানে আড়চোখে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, কণ্ঠখানিকে করুণ করিয়া বলিল, তাই ত দিদি, আরও একদিন গেল?

তাহার দিদি হীনু বারান্দায় ধূমপানরত ব্যক্তিদ্বয়ের উদ্দেশে উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ওগো, শুনছ? সল্টের শিশিটা নিয়ে এস, মীনু দি'র বুঝি ফিট্ হোল!

কৃত্রিম অবসন্ন ভাবে মীনু হীনুর পিঠের উপর মুখ রাখিয়া মিটি মিটি হাসিতেছিল, পুরুষদ্বয় হৈ হৈ করিয়া আসিয়া পড়িলে গভীরতর আর একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মুখ তুলিয়া বলিল, অসহ্য। এক মুহূর্ত্ত পরে স্বর নীচু করিয়া বলিল, গরম!

সুপ্রকাশ বলিলেন, এতক্ষণে ঠিক বলেছ, মীনুদি, অসহ্য! একশ' বার, এক হাজার বার, এক লক্ষ বার অসহ্য! তুমি কিছু ভেব' না মীনু দি! সেই পাপিষ্ঠকে আমি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন না করি ত, তুমি আমার স্ত্রীর সতীনই নও। হ্যাঁ গা, আমি যদি ঐ রকম করতুম, তুমি বোধ করি এতক্ষণে সুবোধবাবুর ঘর আলো ক'রে বস্‌তে, কি বল?

কোনও সময়ে, সুবোধবাবু নামক ব্যক্তিটির সহিত হীনুর বিবাহের কথা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, দেখা-শুনা, অনুরাগ প্রভৃতিও (বোধ হয়) হইয়াছিল। সুবোধ-বাবু আজও অকৃতদার ও ইহাদের পারিবারিক বন্ধু থাকিয়া কৌতুকের মসলা সরবরাহ করিতেছেন। কিন্তু হীনু ঐ নামটা সহ্য করিতে পারে না। মেয়েদের স্বভাবই ঐ—শুনি; কিন্তু বুঝি না। শোনা কথায় প্রত্যয়ও করি না।

হীনু সত্য-সত্য রাগিয়া উঠিয়া বলিল, তাহ'লে বলবো নাকি? পনেরো বছর বিয়ে হয়েছে, পনেরো খানি চিঠিও লিখেছ?

সুধাংশু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, বলিল, দোহাই বৌদি, ঐটি করবেন না। গৃহবিরোধের ফলেই সোনার ভারত ছারখারে গিয়েছে; আর তার সর্ব্বনাশ বৃদ্ধি করবেন না।

অদূরে মাটীতে বসিয়া চিনু জাপানী মোটর গাড়ী চালাইতেছিল, মীনু ছুটিয়া গিয়া গাড়ী সমেত তাহাকে কোলে তুলিয়া জিজ্ঞাসিল, মোটরে কে আসবে চিনু?

চিনুর অভ্যস্ত জিহ্বা জবাব দিল, হরিনারাণ।

মীনু জিজ্ঞাসিল, হরিনারাণ চিঠি দিয়েছে, না?

চিনু বলিল, আসবে—হরিনারাণ। বাবা, মোটরে হরিনারাণ আসবে।

সুপ্রকাশ বলিলেন—কখন আসবে?

এখন!

হীনু জিজ্ঞাসিল, কার হরিনারাণ আসবে চিনু ?

আমার।

আর মাসীর বদরীনারায়ণ ?

চিনু উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বোধে মোটরের কলকব্জা পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিল।

মীনুদি'র প্রার্থিত পত্র না পাওয়ার দুঃখ সকলের মনকে এতই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে ব্রীজের টেবিলে, গেমের পর গেম্ চলিয়া রাত্রি ১১টা বাজিলেও আহার নিদ্রার কথা কাহারও মনে পড়িল না। উড়িষ্যা-প্রদেশ নিবাসী চিন্তামণি পাণ্ডা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, অগত্যা খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। সুপ্রকাশ আহারে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, মীনুদি'র চিঠি না আসা পর্য্যন্ত অন্নজল পরিহার! হীনুর পতিভক্তি অসীম, বলিলেন, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য সবাই জানে। সুধাংশু বন্ধুলোক, হতাশভাবে বলিলেন, আমিও সব তাতে ডিটো, কেবল সিগারেট ছাড়া। মীনু কহিল, কাল থেকে আমারও অনাহার। আর সেই সঙ্গে ব্যথার ব্যথী চিনুরও তাই। হা হরিনারাণ, থুড়ি, হা বদরীনারাণ।—হাসিয়া মীনু সকলের আগে ভোজনটেবিলের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করিল।

কিন্তু রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকার তাহার মনের মুখ দিয়া বলাইল, একখানি চিঠি লিখিতে কতখানি সময় লাগে ?

তাহার পর ঘুমাইয়া পড়িল।

২

কয়দিন পরের কথা।

ভরা শ্রাবণের আকাশে আজ শরতের পূর্ণ বিকাশ। ধরিত্রীর আজ যেন গাত্রহরিদ্রা।

মীনুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে অনেকক্ষণ। বর্ষার স্বাভাবিক আলস্যটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া শয্যা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। হীনু পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মীনুদি', হরিনারাণ এসেছে।

মীনু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, মশারীর বাহিরে আসিয়া দেখিল, দিদির কোলে চিনু, আর তাঁহার হাত ধরিয়া সাঁওতালদের কালো কালো নধর একটি ছেলে, মাথায় টুপি, পরণে নীলরঙের একটি হাফপ্যাণ্ট, তার উপরে মিলিটারী-পকেট সংযুক্ত খাকি সার্ট। সার্ট প্যাণ্ট বেল্ট প্রভৃতিকে তুচ্ছ করিয়া তাহার বিরাট ভুঁড়িটি সগৌরবে সপ্রকাশ। বয়স, চার ? হ্যাঁ, সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হইতে পারে।

মীনু কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ ভরিয়া দেখিয়া লইয়া, জোরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল; তার পর যতদূর সম্ভব হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, শেষ পর্য্যন্ত দয়া হোল বাপ হরিনারাণ ?

এইবার বদরীনারাণটি দয়া করলেই হয়।

মীনু বলিল, প্রাণের কথা টেনে বলেছ সিঙ্গী মশায়। আশীর্ব্বাদ করি, আজ যেন তোমার অফিসের সাহেব মরে, তুমি সাহেব হও।

হীনু বলিল, বালাই ষাট্, সক্কালবেলা! সাহেবটি বড় ভাল, খুব মিশুক, আর একটি বছর মোটে বিয়ে করেছে।

বুঝলে মীনুদি'—বলিতে বলিতে সিংহ মহাশয় অর্থাৎ হীনুর তিনি, মীনুর বোনাই, চিনুর পিতা সুপ্রকাশ দাড়ীময় সাবানের ফেনা ফলাইতে ফলাইতে প্রকাশ পাইয়া কহিলেন, রবিবারে রবিবারে অষ্ট্রেলিয়ান মেল্ যায় এখান থেকে, প্রতি মেলে আটখানি চিঠি পোষ্ট হবেই। আসেও শনিবারে শনিবারে আটখানি করে।

মীনু মুখখানা কাঁচু মাচু করিয়া কহিল, আর বলবেন না, সিঙ্গী মশাই, আর বলবেন না। এই মাত্র বিছানা ছেড়ে উঠছি, আবার হয়ত উপাধান আশ্রয় করতে হবে।

সিংহ মহাশয় সুর করিয়া বলিলেন,

বিরহ শয়নে কত বা শুইব ?
বিরহ যামিনী কত বা যাপিব ?
উপাধান বল কত ভিজাইব ?
শুকনো বালিশ আর যে নাই।

না, মীনুদি' আজ তোমার চিঠি আসবেই, তা দেখ, নিশ্চয় আসবে। আর যদিই না আসে, তাহ'লে কালই আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, নো য়্যাডমিশন হিয়ার।

মীনু বাতাহত কদলীকাণ্ড সম ধড়াস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, ওঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি মিষ্টার লায়ন ? ঐ নির্ম্মম কথাগুলো বল্‌তে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হবে না ?

সিংহ মহাশয় সাবান ঘষা তুলিটা সরাইয়া বলিলেন, বড্ডই নির্ম্মম মনে হচ্ছে কি মীনুদি' ? তা হ'লে বদলে

দেওয়া যাবে, কি জানি, সি-এস্‌-পি-সি-এ'র আইনে পড়ে যাব? মানুষকে যা খুসী কর, জীবজন্তুকে কষ্ট দিতে নেই, জান ত? কড়া আইন। না ভাই মীনুদি', তা'তে কাজ নেই, বরং লিখবো, নো ভেকেন্সি। কি বল?

মীনু সহাস্যে কহিল, কি বলবো, মহাত্মার অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, নইলে কাঁচী এনে কিম্বা দেশলাই জেলে দিতুম গোঁফের বাঁশ ঝাড় উজাড় ক'রে।

হীনু বলিল, দে না ভাই, সজারুর কাঁটা উপড়ে।

বড্ডই অসুবিধা হয়, না গো?—বলিয়া, বিদ্যুৎ বহ্নি কল্পনা করিয়া ত্বরিতপদে পলায়ন করিলেন। বলা বাহুল্য, হীনুর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তাঁহাকে অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিল না।

মীনু উঠিয়া আসিয়া হরিনারাণকে লইয়া পড়িল। চিরাচরিত প্রথামত নায়কের রূপ বর্ণনা আগেই করিয়াছি, নিয়ম-মাফিক কিঞ্চিৎ গুণ বর্ণনাও করিতে হয়। চিনু তাহাকে লইয়া গিয়া খেলার আসরে বসাইয়া দিল। ছেলেটি নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না। নায়িকার মুখের পানে নিবিদ্ধ-দৃষ্টি সেই যে বসিয়াছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার লইবারও যেন অধিকার নাই। চিনু যখন বলে, হরিনারাণ, গাড়ী চালাও। সে চালায়। চিনু যদি অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া সোহাগভরে বলে, হরিনারাণ, খা লেও। হরিনারাণ কাদা মাটী কুমড়ার খোসা কিছুই বাদ দেয় না। 'নাই' পাইলে শুধু জন্তুরাই নয়, মানুষও মাথায় ওঠে। চিনুর এক সময়ে মনে হইল, সংসারে সে একাই খাটিয়া মরিতেছে, ভাগীদার বসিয়া ফাঁকি দিতেছে, অমনি হুকুম হইল, হরিনারাণ খাড়া রহ ভেইয়া। (পাঠিকা চিনুর মুখের ভেইয়া সম্বোধন শুনিয়া ভড়কাইয়া যাইবেন না। অনেক স্থানে পিতা, পিতার জামাই ও তৎপুত্র সকলেই ভেইয়া।) হরিনারাণ খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার যুগ্ম শশ্রু মাথার দিব্য দিয়াও তাহাকে আর বসাইতে পারিলেন না। চীনু বাজার করিতে যাইবে, ভেইয়া আজ্ঞা ও ঝোড়া দুই-ই বহন করিয়া চলিল। চিনুর মনে হইল, মিন্সে বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য অঞ্চল বর্জ্জন করিতেছে না, চিনু বলিল, ভেইয়া তোম্ চলা যাও। হরিনারাণ ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অর্দ্ধ পথে ডাক পড়িল, হরিনারাণ, ইধার আ যাও। তম্মুহূর্ত্তেই হরিনারাণ প্রকট।

হীনু ঠাকুরকে রান্না-বান্নার আয়োজন গুছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতে, মীনু বলিল, দিদি চিনু সুখী। তার নারীজন্ম সার্থক।

হীনু হাসিয়া কহিলেন, ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট ত?

মীনু কহিল, মোষ্ট ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট।

শ্বশুরের সদাশয়তাটি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছে, বুঝলে না মীনুদি'? আর মেয়েটি নারীনাং জননীক্রমঃ। হবেই, না হয়ে পারে না।—অফিসের পোষাকে সজ্জিত হইয়া সিংহ সাহেব ঘরে ঢুকিলেন।

হীনু গর্জ্জিয়া উঠিলেন, কন্যা জননীক্রমঃ, না? মা ঐ রকম ওঠ বোস্ করায়?

সিংহ নির্ভীক, নির্ব্বিকার, কহিলেন, হুঁ।

ঐ রকম চলে যেতে বলে?

হুঁ।

হীনুর ক্রোধ ক্রমশঃই চড়িতেছিল, চিনুর মা ঐ রকম যাও যাও করে?

সিংহ যেন মরিয়া! বলিলেন, সে'টি ত প্রতি কথার মাত্রা। এই একটু পরেই দেখবে'খন মীনুদি, যাও যাও করেন কি না। অফিস যাবার সময়, তাম্বুল-রাগরঞ্জিত কি-বলে তাই থেকে একটু পাথেয় আদায় ক'রে নিয়ে যাত্রা করবো, তা নয়, যাও। তারপরে দেখ, বল্লুম সুবোধবাবুটি এই দেশেই যখন রয়েছেন, একদিন রাত্রে খেতে বলি, অমনি—যাও।

বটে যুধিষ্ঠির বটে! তাহ'লে বলি? বুঝলি ভাই মীনুদি, সুবোধবাবু নতুন গাড়ী কিনেছেন, মনের ইচ্ছেটা ভূতপূর্ব্বা হৃদয় জগদীশ্বরীকে নিয়ে একদিন হাওয়া খান্, মুখে বলেন, গাড়ী চালান খুব সহজ, কোন মেয়ে যদি শিখতে চায়, পাঁচ মিনিটে শিখিয়ে দিতে পারেন, এতই সোজা যে চিনুও শিখতে পারে। আসল কথা, চিনুর মা ত পারেই। শুনে শুনে একদিন আমি বল্লুম, একদিন যাই না? অমনি ছেলেবেলার সেই গেছো চণ্ডীদাস সুরু হোল—

অনল ভখিব সই,
সাগরে ডুবিব
নিদারুণ বাণী তব
যদি শুনি পুনঃই!

একবিন্দু সিভ্যালরী যদি থাকে!

হ্যাঁ, সিভ্যালরী করতে গিয়ে শুনি আর কি—'আর তুমি যদি জান্তে চাও অপমান? তাহ'লে শোন, এই সুবোধ আমার প্রাণেশ্বর।' নীহার শ্রীমানকে ক'দিন বাদেই যা শুনতে হবে কি বল ভাই মীনুদি? অবিশ্যি সে স্থলে নামটা বদলে যাবে। হঠাৎ ঘড়ি দেখিয়া, কি সর্ব্বনাশ! আটটা বাজে যে! চল, চল, লেট্‌ টি, লেট্‌ অফিস আর লেট্‌ ওয়াইফ নো গুড্‌।

ফাষ্ট ওয়াইফও সুবিধে নয় সিংহী, বলিয়া সুধাংশুর উদয়। ঢাকার নবাব বলেছিল জান ত? ফাষ্ট উইমেন এণ্ড শ্লো হর্সে'স্‌ আমার ধ্বংসের কারণ। গুড মর্ণিং, মীনুদি, রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে নিশ্চয়।

মীনু বলিল, টেলিগ্রামের ওপর আমার কিন্তু এক বিন্দু আকর্ষণ নেই সুধাংশু সায়েব। না থাকে তাতে স্পর্শের উত্তাপ, না থাকে প্রাণের ভাষা!

সুধাংশু মানিতে বাধ্য হইয়া বলিলেন, তা বটে!

হীনু বলিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রঙ্গই চলবে, আফিস-টাফিস যেতে হবে না?

ঐ! দেখলে ত মীনুদি! যাও যাও ছাড়া প্রেম-সম্ভাষণই নেই, স্বচক্ষে শুনলে ত?—সিংহ সাহেব টুপি বগলে বাহির হইয়া গেলেন।

স্বকর্ণে দেখলুম বৈ কি সিঙ্গী মশাই। বলিয়া মীনু চিনুকে কোলে লইয়া, সুধাংশুকে কহিল, সুধাংশু সায়েব, চিনুর হরিনারাণ কিন্তু এসেছে।

চিনু আবেগ সম্বরণে ক্লান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, হরিনারাণ ঘর। অর্থাৎ হরিনারাণ ঘরে গিয়াছে।

সুধাংশু সাহেব আনন্দ ধারণ করিতে না পারিয়া, তড়াক করিয়া আগাইয়া গিয়া, মীনুর কোল হইতে চিনুকে ছিনাইয়া লইয়া, লুফিতে লুফিতে, চুমিতে চুমিতে খানা-ঘরের উদ্দেশে চলিলেন।

মীনু বাথরুম হইতে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশে সামান্য সংস্কার সাধিয়া, কপালে সিন্দূর-বিন্দু আঁকিয়া চায়ের টেবিলে যোগ দিল।

অফিসযাত্রীরা প্রাতর্ভোজনান্তে তামাকে যাত্রা ভাল করিতেছিলেন; সিংহ কহিলেন, আজ যদি পাপিষ্ঠ ব্যক্তির চিঠি, তা সে খাম, পোষ্টকার্ড, বেয়ারিং যা হক, চিঠি না আসে, কাল সেই টেলিগ্রাম! কি বল মীনুদি? 'নো ভেকেন্সি'। এই পাকা কথা।

সুধাংশু রসান দিয়া কহিল, শেষকালে লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম, ত্রুটী মার্জ্জনীয়, একটা "ডোণ্ট মাইণ্ড" দিলে নির্দ্দোষ হয়, কি বল মীনুদি?

মুখটি করুণ, চোখ দু'টি করুণতর, আর কণ্ঠটি করুণতম করিয়া মীনু কহিল, যা ভাল বোঝেন সায়েব। আমাতে কি আর আমি আছি সায়েব, যে আপনাদের মত জ্ঞানী, গুণী, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, হৃদয়বান ব্যক্তিদের পরামর্শ দোব?

সিংহ চক্ষুদ্বয় পাকাইয়া কহিলেন, না মীনুদি' তুমি একদম কিচ্ছু ভেবো না। নরাধম নীহারের নো এনট্রেন্স ক'রে তবে আমি ছাড়বো। তাহ'লে মীনুদি, আমরা চলি। উইষ ইউ লং লেটার বা লেটার্স।—তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। মীনু বলিল, শুভেচ্ছার জন্যে বহু ধন্যবাদ।

টেবিল ছাড়িয়া দুই বোনে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, জাপানী রিকস্‌ গাড়ীখানির উপর চিনু আরোহণ করিয়াছে, চালকপদে বৃত হরিনারাণ গাড়ী টানিবে কি, হাত দুইটা খুঁজিয়াই পাইতেছে না। আর চিনু বিধিবহির্ভূত ভাষায় হরিনারাণকে তিরস্কার করিতেছে। প্রেমিকদিগের অসাধারণ ধৈর্য্যখ্যাতি! হরিনারাণ প্রেমিক, কাজেই সে গুণে বঞ্চিত নহে। মা ও মাসীকে দেখিয়া চিনু নালিশ করিল, হরিনারাণ টানতা নেই।

সওয়াল জবাবে হরিনারাণ কবুল করিল, হাম ঘর যাবেঙ্গে।

হাকিম সদাশয়, হরিনারাণকে মুক্তি দিয়া বলিলেন, হরিনারাণ সাব লোক, রিক্‌সা ঘেঁচেগা কেঁও? ও ত মোটর চালায়েগা!

চিনু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খেলনাগুলির দিকে চাহিতে লাগিল। মীনু বলিল, উস্‌ তরফ হ্যায়।

চিনু হরিনারাণকে আজ্ঞা দিল, মোটর লাও ভেইয়া।

ভেইয়া মোটর লইয়া আসিল। এই সময়ে হরিনারাণের মা পুত্রকে লইতে ও বৈবাহিকদ্বয়ার সহিত আলাপ করিতে আসিলেন। অনেক কথার মধ্যে যে কথাটা দরকারী, তাহা এই যে, আর দুই দিন পরে হরিনারাণ বশিদিতেই ফিরিয়া যাইবে। মেশন সাহেবদের স্কুলে পড়িবে।

চিনু বলিল, কভি নেহি যায়েগা। তাহার স্বর ও ভাব যেন বালিকা বয়সের কুইন্ ভিক্টোরিয়ার অনুরূপ।

মীনু চিনুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিল, হা চিনু, তুমি আমার চেয়েও দুঃখিনী। তুমি পেয়ে হারাতে বসেছ!

হীনু কহিল, তা যা বলেছিস্ ভাই। চিনু চিঠি না পাক্, আসলই পেয়েছে।

মীনু হাসিয়া কহিল, তুমিও যেমন দিদি? কে চায় চিঠি?

কিন্তু স্নান-কামরায় টবের ভিতরে এলাইয়া পড়িয়া মীনু নিজের মনে বলিল, যারা চিঠি লিখতে পারে না, তারা বিয়ে করে কেন গা?

লেখকের যদ্যপি উত্তর দিবার অধিকার (right of reply) থাকিত, তাহা হইলে বলিতাম,

চিঠিতে কি মেটে সাধ
বিনা দরশনে!

৩

হরিনারাণ থাকিল না, থাকিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না এবং অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, যাইবার সময়, বিদায় লইয়া যাইবার আবশ্যকতাটুকুও বুঝিল না। মাসীর কোলে চড়িয়া চিনু জানালায় মুখ বাড়াইয়া বসিয়া ছিল, তাই চোখের দেখাটুকু হইল। চিনু হর্ষভরে ডাকিতে যাইতেছিল, মাসী বুঝাইয়া দিল যে পিছনে ডাকিতে নাই; অবোধ বালিকা চিনুর এ বোধটুকু ছিল না, তবে গুরুজনদের কথার অবাধ্য নয়, আর ডাকিল না। মাসীকে জিজ্ঞাসিল, হরিনারাণ, গাড়ী?

মাসী বলিল, আবার গাড়ী চ'ড়ে আসবে।

চিনু বলিল, আমি গাড়ী যাব।

মাসী কহিল, খুব ভাল কথা। বিকেলেই আমরা যসিদি গিয়ে হরিনারাণকে দেখে আসবো। কেমন?

চিনুর পিতার প্রবেশ।

মীনু দি, কি খাওয়াবে বল? চিঠি এসেছে।

মীনু অতীব অনাগ্রহের সহিত কহিল, এসে থাকে এসেছে।

তোমার চাই নে ত?

তা কি আমি বলছি?

তবে খাওয়াও।

মীনু চটিয়া উঠিয়া বলিল, চল না খাবে চল না। ঠাকুর ত রেঁধে-বেড়ে ব'সে আছে। চল, গিলবে, চল।

সিংহ বলিলেন, সে হবে না। আমি স্নান সারি, সেই সময়ের মধ্যে তুমি স্বহস্তে অর্থাৎ শ্রীহস্তে যাহোক্ একটা কিছু রেঁধে খাওয়াতে রাজী হও ত বল, চিঠি দিই।

মীনু বলিল, আমি পারবো না, তার কথা নেই। আমার চিনু-সোনার হরিনারাণ চলে গেছে, তাইতেই চোখে জল ঝরছে, রান্নাঘরে ঢুকে আর কাঁদতে পারবো না।

চিনু বলিল, বাবা, হরিনারাণ, গাড়ী। আমি যাব?

যাবেই ত! পাজী দেখি মা। বলিয়া তিনি অফিসের পোষাক বদলাইতে গেলেন। হীনু রান্নাঘর পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, জিজ্ঞাসিলেন, হ্যাগা, মীনুদি'র মেল্ এল?

মেল্ কি ফিমেল্, কি আর কিছু, তা জানি নে; তবে একটা চিঠি এসেছে। মীনু দি তা চায় না।

মীনু যখন চায় না, তখন এস, আমরাই দেখি।

মীনু চীৎকার করিয়া উঠিল, খবর্দ্দার, ভাল হবে না বলছি যে আমার চিঠি খুল্‌বে—

সিংহ তদ্রূপ স্বরে কহিলেন, সে অবিশ্যি পড়বে।

তাই বই কি মশাই? খোল না একবার মজা দেখাচ্ছি।

দোহাই মীনু দি, মজার লোভ দেখিও না ভাই। মজার নামে আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। কৈ গো, তুমি গেলে কোথায়?

হীনু তাড়াতাড়ি পোষাক-কামরায় ঢুকিলেন।

সিংহ নাতি-উচ্চ কণ্ঠে মীনুকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিলেন, এই নাও চিঠি।

মীনু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। "খবর্দ্দার, ভাল হবে না" বলিতে বলিতে পোষাক-কামরায় ঢুকিয়া দেখিল, সিংহ মহাশয়ের হাতে একখানি পোষ্টকার্ড। হস্তলিপি প্রিয় ও পরিচিত। যেন দেখে নাই, বলিল, কৈ আমার চিঠি?

এই যে! তোমার তাঁর লেখা, কাজেই তোমার।

চিঠি ক্ষুদ্র, ইংরাজীতে ও সিংহ মহাশয়কে লিখিত। ভাবার্থ, আমি শনিবারে দেওঘরে পৌছিব।

এক ঝলকে চিঠিটা দেখিয়া লইয়া, মীনু সিংহ মহাশয়কে,

সদ্যঃ পরিত্যক্ত কোট, সর্ট, সার্ট প্রভৃতির পকেট আক্রমণ করিল। সিংহ মহাশয় বলিলেন, ও বেচারাদের ওপর রাগ করা বৃথা মীনু দি! ওরা একদম নির্দ্দোষ।

মীনু মুখ ফিরাইয়া, চক্ষু ঘুরাইয়া লইল, কিন্তু মশাইটি ত নির্দ্দোষ ন'ন ; দয়া ক'রে বলা হোক্, আমার চিঠি কই?

এ প্রশ্নটা আমাকে না ক'রে শনিবার রাত্রে অপর ব্যক্তিকে করলে ভাল হোত মীনু দি'! চিঠি তুমি চাও, বল না, এই দণ্ডে আমি পাঁচ সাতখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আর হ্যাঁ, তা'ও বলছি, প্রত্যেক খানায় নতুন ভাষা, নতুন ছন্দঃ, নতুন সম্বোধন, নতুন লিপি! না পারি, তোমার দিদির সতীনের গলায় মালা দিই। চাই কি, সুবোধ বাবুকেও ডেকে আন্তে পারি।

হীনু বলিল, জানা আছে গো জানা আছে। পনেরো বছরে পাঁচখানা চিঠি লিখে থাক ত ঢের, আস্থি কালের সেই "স্নেহের" ছাড়া ভাষার নতুনত্ব ত দেখলুম না।

কেন? জীবিতেশ্বরী, সর্ব্বাঙ্গানন্দদায়িনী, নয়নরঞ্জিনী, বিরহেতিনভুবনশূন্যকারিণী, কত ভাল ভাল সম্বোধন করতুম যে গো! সব ভুলে গেলে! এঃ।

খুব হয়েছে, অমন ভাল ভাল সম্বোধনগুলো সতীনের জন্যেই তোলা থাক্, বাজে-খরচে কাজ নেই। আপাততঃ স্নান করে নাও, সুধাংশু এসে বসে থাক্‌বেন।

এই যাই! মীনু দি' চিঠিখানা হাতে ক'রেও দেখবে না একবার?

আমার দায় পড়েছে ও চিঠিতে হাত দেবার! বলিয়া মীনু বাহির হইয়া গেল।

সিংহ সিংহিনীও বাহির হইয়া আসিলেন। সিংহ কহিলেন, তা যা বলেছ মীনু দি'! তিন ছত্রের চিঠি, হাতে করতে আমারই গা ঘিন্ ঘিন্ করছে। কিন্তু এর শোধ নেওয়া চাই মীনু দি। শনিবার একটা কাণ্ড করতেই হবে। দাঁড়াও, খেয়ে দেয়ে বসে বসে মতলব ভাঁজা যাবে।

হীনু চিনুকে খাওয়াইতে গেলেন। মীনু সেই ফাঁকে টেবিলে রক্ষিত পোষ্টকার্ডখানি তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল। ওঘরে কাহার পদশব্দ শ্রুত হইতেই, পরম অবজ্ঞাভরে চিঠিখানা ছুঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া সোফায় শুইয়া পড়িল।

আমরা হইলে বলিতাম, সখি, ও কাজটি তোমার ভাল হইল না। ঐ ক্ষুদ্র চিঠিতেও, সেই দুটি হস্তের স্পর্শ, সেই দুইটি নয়নের দৃষ্টি ও সেই মনটির ছোঁয়াচ লাগিয়া রহিয়াছে, এত অবজ্ঞা কি সাজে সখি?

ভোজন-টেবিলে মীনু অন্য মূর্ত্তিতে প্রকাশ। মোটে পাঁচটি পয়সা ব্যয় করিয়া তাহাকে একখানা চিঠি না লেখায় তাহার দুঃখে দুঃখীরা যখন তিন দিক হইতে, তিন রূপে ও তিন প্রকারে দরদ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সে বলিল, মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ বটে! যাঁর বাড়ীতে আসছে, বয়ঃজ্যেষ্ঠ দাদার সম্মান দিয়ে সেই গৃহস্বামীকে চিঠি লিখলে, কোথায় তার জন্যে ধন্যবাদ দেবে, কৃতজ্ঞ থাক্‌বে, তা নয়, আবার নিন্দে!

সিংহ মহাশয় কহিলেন, বেশ ভাই বেশ। আমার বাড়ীতে আস্‌ছে, আমায় চিঠি লিখ্‌ছে, আমাকে নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাক্‌তে তুমি দেবে ত মীনু দি? ভাল ক'রে ভেবে জবাব দিও কিন্তু। খাবে আমার সঙ্গে, গল্প করবে আমার সঙ্গে, শো—শো—শোবে আমার সঙ্গে। কেমন? রাজী?

মীনু বলিল, খুব, খুব, খুব রাজী!

দেখ, বুকে শেয়াল আঁচড়াচ্ছে না ত?

শেয়াল ছার, সিংহেরও প্রবেশ নিষেধ।

সিংহ মহাশয় সখেদে কহিলেন, কি, এত বড় কঠিন কথাটা তুমি আমায় বল্লে? আমার প্রবেশ নিষেধ! তবে কার প্রবেশ স্বাগত, শুনি? তা হচ্ছে না, মীনু দি', আমি তার আসা বন্ধ না করি ত কি বলিছি।

কি ক'রে বন্ধ করবে?

মনসা চিন্তিতং—উঁহু, তোমায় বলা হচ্ছে না। সুধাংশু, একটা টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে এস ত!

সুধাংশু তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। মীনু কহিল, আনুগত্যে ত্রেতার রামদাসরাও আপনার কাছে হার মান্‌ত সুধাংশু সায়েব।

তিনজনে কি পরামর্শ হইল, সুধাংশু বাহির হইয়া গেল। হীনু গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, কাজটা কিন্তু ভাল বলে মনে লাগছে না। সে বেচারা তিন সপ্তাহ বিরহজ্বরে ধুঁকে কুইনিন খেতে আসছে, তা'কে হতাশ করাটা কি ভাল হচ্ছে তোমাদের?

তাই বলে, তিন দিন ছুটী পাচ্ছি, কাশীটা না বেড়িয়েই

বা কি করি, বল ? তার ওপর মীনু দি কাশী দেখেন নি! তীর্থ ধর্ম্ম করার বয়সও ত' হোল।

মীনু বলিল, তা কে অস্বীকার করছে! ভালই ত, কাশী দেখা হবে। বদরীনারাণ ত আছেই, বিশ্বনাথকে বাদ দিই কেন ?

সিংহ মহাশয় বিপুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, এই ত আর্য্যরমণীর যোগ্য কথা। ছার সংসার, ছার স্বামী, পঞ্চাশোর্দ্ধে সিংহ সহ বনং ব্রজেৎ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুধাংশু ফিরিয়া আসিয়া, পোষ্ট অফিসের শীল মোহরাঙ্কিত রসিদখানি টেবিলের উপর কাচের কাগজচাপায় চাপা দিয়া রাখিলেন। সিংহ জিজ্ঞাসিলেন, কি লিখলে ?

ঐ-ই লিখলাম। কাশী যাচ্ছি, আসিবার কষ্ট স্বীকার করিও না। দরকার হইলে খবর দিব।

বাঃ বাঃ! বেড়ে হয়েছে। ঘরেও খেয়ো না, না ডাকলেও এসো না। চমৎকার। যেমন কুকুর, তেমনি, থুড়ি, যেমন ওল, তেমনই তেঁতুল হয়েছে। বুঝুন বাছাধন এখন, মীনু দি'কে চিঠি না লেখার ফলটি কেমন!

সত্য কথা বলিতে কি, আতপ তাপে পদ্মের মত মীনুর মুখখানি শুকাইয়া আসিতেছিল, শুকাইতে দিবে না সঙ্কল্প করিয়া মীনু বলিল, অরসিকেষু রস নিবেদন হয়ে গেল সিংঙ্গী ম'শায়। সে লোক বেঁচে গেল, ছ'ঘণ্টা ট্রেণের কষ্ট সইতে হোল না। আরামে ঘুম দেবে।

হীনু টেলিগ্রামের রসিদখানা নাড়িতে নাড়িতে ছদ্ম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সহানুভূতির স্বরে কহিলেন, বিশ্বনাথে আমি কিন্তু কিছু সান্ত্বনা পাচ্ছি নে। যে দিন কাল পড়েছে, নীহার যদি অন্য অন্নপূর্ণার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু মীনুদি আমাদের কাউকে ক্ষমা করবে না।

মীনু বলিল, না গো না, মীনুদি অভয় দিয়ে রাখছে, ক্ষমা করতে তার বাধবে না!

হীনু বলিলেন, মুখে তুমি যাই কেন বল না ভাই, সে অপরাধ কি ক্ষমা করা যায় ?

সিংহ সদুঃখে কহিলেন, তাই ত! তুমি যে আবার ভাবিয়ে দিলে গো। কিন্তু এখন কি করা যায় বল ত ? টেলিগ্রামটা ফেরান যায় না ? ওহে সুধাংশু, একবার পোষ্ট অফিসে যাবে না কি ? বল্লে বন্ধ করা যায় না ? সত্যিই ত, প্রায় তিন সপ্তাহের নির্ম্মম অদর্শন, তার পরে এই টেলিগ্রাম মুষল! নাঃ, বড়ই অন্যায় হয়ে গেল যে হে! বিবেকের দংশনে আমার যে অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে লাগল হে! ওহে সুধাংশু, একবার যাও না হে!

গিয়ে কিছুই হবে না, টেলিগ্রাম এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।

সিংহ আরাম-কেদারায় লম্বমান হইয়া পড়িয়া কাতর-কণ্ঠে কহিলেন—পৌঁছে গেছে, এরই মধ্যে! তাহ'লে উপায় ? আর একটা টেলিগ্রাম ক'রে এস, ইওর পি. সি. ষ্ট্যাণ্ডস্। অর্থাৎ তুমি এস। আরও অর্থাৎ, তোমারই জেদ বজায় রইল, মীনু দি হার স্বীকার করছেন।

সুধাংশু রঙ্গস্বরে গাহিলেন,

কি বোল্ বলিলে দাদা বল আর বার
মীনুদি'র মৃতদেহে হোল এবে জীবন সঞ্চার।

মীনু রাগিয়া বলিল, মীনু দি'র মৃতদেহ দেখলেন কোথায় মশাই ?

'ইউরেকা', 'ইউরেকা' শব্দে সিংহ উঠিয়া বসিলেন, টেলিগ্রাম করাই স্থির। কিন্তু বিনা সাজায় তা'কে ছাড়া হবে না।

হীনু জিজ্ঞাসিল—তার মানে ?

মানে, সে'ও আসুক, এদিকে সুধাংশুর সঙ্গে তোমরাও কাশী যাও। আমি থাকি। তার পর, আমারও শূন্য মন্দির, তারও ফাঁকা ঘর। দু'জনে গলা জড়াজড়ি ক'রে কান্না। সে বলবে দাদা, আমি বলবো, ভাই! মীনু দি'কে একখানি চিঠি লিখতে যদি, তাহ'লে এ দুর্দ্দশা তোমারও হোত না, আমারও না।

মীনু বলিল, সিঙ্গী মশাই, এই ভাল পরামর্শ হয়েছে, তাই কর।

হীনু চিন্তাযুক্ত ভাবে কহিলেন, কিন্তু তুমি দুর্ব্বল মানুষ, নীহার সাহেবের ধকল সইতে পারবে ত ?

সিংহ মীনুদি'র পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কি বল মীনু দি ; পারবো ?

পারবে গো পারবে। সে ব্যক্তি তথাগত বুদ্ধের শিষ্য, কোন ভয় নেই। বলিয়া মীনু মৃদু হাস্য করিল।

কার্য্যকালে এ প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল এবং ধার্য্য হইল, সে ব্যক্তি সকালের গাড়ীতে এখানে আসিবে। ইহাঁরা মধ্যাহ্নের গাড়ীতে গম্ভীরভাবে কাশী রওনা হইবেন।

বলিবেন, পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করা ছিল, প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। মীনু ইহাতেও অমত করিল না। একটু মৃদু সাজা দিতে দোষ কি ?

চিনু এতক্ষণ আপনার মনে, নিতান্ত একাকী খেলাঘরে হাঁড়ী কলসী গাড়ী প্রভৃতি নাড়াচাড়া করিয়া দুঃখের বোঝা বহিতেছিল, মীনু ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া চুমায় গণ্ড ভরাইয়া দিয়া বলিল, চিনু হরিনারাণ কই ?

চীনু বলিল, হরিনারাণ, গাড়ী, আসবে।

চল, আমরা জানালায় বসি গে। অভ্যর্থনা করবো।

৪

দুই দিন ধরিয়া প্লট গড়া ও ভাঙ্গা হইতে লাগিল। ষ্টেশনে নীহারকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করা হইবে, প্রথম দর্শনেই মীনুদি'র কাশীযাত্রার কথা বলা হইবে অথবা চলিয়া গিয়াছেন জানান হইবে, কিম্বা মীনু দি'কে কম্বল চাপা দিয়া রাখিয়া গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ দেওয়া হইবে, এই সকল জল্পনা কল্পনাই চলিতে লাগিল। মীনু দি বেল ফুলের গোড়ে গাঁথিবেন কিম্বা মৃণাল করধৃত অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম লইয়া নীহারকে অভ্যর্থনা করিবেন অথবা শ্রীমতীর মান করিবেন, এ সকল বিষয়েও নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় কোন একটা স্থির মীমাংসা হইবার পূর্ব্বেই শনিবারের সকাল আসিয়া পড়িল। বেলের গোড়েও গাঁথা হইল না, হনুমান-তলাও হইতে পদ্মও আনীত হইল না। ষ্টেশনে যাইতে হইল। নীহার ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চাপিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। কুশলাদি প্রশ্ন বিনিময়ের পর সে মীনুকে একান্তে পাইয়া কহিল, আজ রাত্রের গাড়ীতেই ফিরতে হবে।

মীনু আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কেন ?

বড্ড কাজ পড়েছে, এর পরে আর আসতে পারবো না।

মীনু চুপ করিয়া রহিল।

পাছে বরফ শীঘ্র গলিয়া যায়, তাই যেমন র‍্যাদার গুঁড়া চাপা দিতে হয়, মীনুদি'র দ্রবীভূত হইবার আশঙ্কায়, দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া সিংহ বলিলেন, এদিকে ভারী মুস্কিল হয়েছে ভায়া। ওঁরা দুই ভগ্নীই আজ দু'খানি হৃদয় ভেঙ্গে দিয়ে দুপুরের গাড়ীতে কাশী যাত্রা করছেন।

নীহার হাসিয়া বলিল, তাই নাকি ?—সে মীনুর দিকে চাহিয়াই এই প্রশ্ন করিল। মীনু উত্তর দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিল না।

কথা কহিতে কহিতে তাহারা যখন প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে যাইতেছে, ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া সিংহকে কহিলেন, আপনাদের 'বগী' এসে গেছে, দুপুরের টোয়েন্টি ওয়ান্ আপে এটাচ ক'রে দোব।

থ্যাঙ্কস্।

নীহার জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইতেছে, সিংহ মীনুদি'র পাশে আসিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, মীনুদি, গাড়ী বাতিল করাই ?

বাতিল করাবে কেন ?

সিংহ বলিলেন, ঐ দু'টি আঁখিরে। বুঝিতে বাকী কি আর আছে রে ! না মীনুদি', আকণ্ঠ তৃষা, জলের গ্লাস দেখিয়ে কেড়ে নিতে আমার মত জল্লাদের প্রাণেও বাজছে।

মীনু শুষ্ক কণ্ঠকে যথাসম্ভব সরস করিয়া বলিল, ভুল, সিঙ্গী মশাই ভুল। এ জলের গেলাস নয় মশাই, স্রেফ্ বেলের পানা।

সে তো শুধু তেষ্টাই বাড়ায় মীনু দি ; গলায় আটকায়ও।

তাই আটকাচ্ছে মশাই।

চিনু এতক্ষণ সিংহের হাত ধরিয়া গুটি গুটি চলিতেছিল, মীনু তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ছোট মুখখানিকে মুখের কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসিল, চিনু, হরিনারাণ কৈ ?

চীনু বলিল, হরিনারাণ, গাড়ী।

মীনু বলিল, আর বদরীনারাণ ?

'বদরীনারাণ' শব্দ শুনিয়া সকলেই এক সঙ্গে এদিকে ফিরিলেন ; নীহারও ফিরিয়াছিল। চিনু নির্ব্বিকার চিত্তে অপরিচিত ও আগন্তুককে দেখাইয়া দিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল, ঐ, বদরীনারাণ।

সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, মীনু তাহাকে এমন জোরে চুমা খাইল যে সে-বেচারী ভয় পাইয়া মা মা শব্দে কাঁদিয়া ফেলিল।

আহারাদির পর সভা বসিল। কাশীর গাড়ী বাতিল করা হইয়াছে। মীনু রাগিয়া টং হইয়া বসিয়া আছে। কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। তবে একটা কথা সে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সকলকে জানাইয়া দিয়াছে, আজ রাত্রে কখনই কলিকাতা যাইবে না। যে ব্যক্তির লইয়া যাইবার আগ্রহ,

যদ্যপি সে দুই চারি দিন (ও রাত্রি) থাকিয়া চিঠি না লেখার অমোঘ শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রস্তাব বা আগ্রহ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারে; অন্যথা নয়। সে রাবণের হল্লাঝোরা দেখিবে, তপোবনে চড়ুই-ভাতি করিবে, বাহান্ন বিঘায় গোলাপের চাষ দেখিবে, কুণ্ডেশ্বরী দর্শন করিবে, তবে যাইবে। দিদিকে চুপি-চুপি জানাইয়াছে, দেখা-টেখা নয়, আসল কথা হচ্ছে, আমরা যে পোঁটলাপুঁটলী নই, অফিসের সাহেবের মর্জ্জিতেই আমাদের চলতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না, এইটেই জানিয়ে দিতে চাই। ভগ্নীপতিকে সঙ্গোপনে বলিয়াছে, চিঠি না দেওয়ার মজাটা বুঝিয়ে দিই, কি বল সিঙ্গী মশাই! সিংহ কেশর স্ফীত করিয়া প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছেন। সুধাংশু সাহেব পালাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার মিথ্যা টেলিগ্রামের কথা নীহার ফাঁস করিয়া দিয়াছে। মীনুর রাগের সেই ত বড় কারণ। অত আদর জানাইয়া আসিতে মাথার দিব্যি দেওয়ার কি দরকার ছিল? বলিলেই ত হইত, মীনু এখন যাইবে না। তাহা হইলে, তাহাকে ত আর এত ছুটাছুটি, কষ্ট করিয়া, রাত জাগিয়া আসিতে ও রাত জাগিয়া যাইতে হইত না।

মাছির দৌরাত্ম্য, ট্রেণের ঝাঁকানি, বিশ্রাম অত্যাবশ্যক, কত ছল কত ছুতা করিয়া মীনু দম্পতীকে দিবানিদ্রায় প্ররোচিত করিল, উভয়ের কেহই তাহাতে সাড়া দিল না। নীহার বলিল, দিবানিদ্রা অভ্যাস নাই। মীনু ঝাঁপিয়া উঠিয়া কহিল, আমি কি কোন দিন দুপুরে শুই নাকি যে আজ শুতে যাব?

সিংহ মহাশয় সুবিধা পাইলেই, নীরবে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন, চিঠি লেখে নি, মীনু দি' মনে আছে ত?

নীহার রাত্রের গাড়ীতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিশেষ কিছু কেন, কিছুই বলিল না। সকলের সঙ্গে মীনুও তাহাকে উঠাইয়া দিয়া আসিল, রুমালও উড়াইল। এবং গাড়ীটা ছাড়িবামাত্র এদিক ওদিক একবার দেখিয়া মীনুর গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া বেশ একটু করুণ সুরে বলিয়া উঠিল, দিদি আমায় ধর ধর।

মীনু, সিংহ মহাশয় এবং কোথা হইতে এক লাফে অগ্রসর হইয়া সুধাংশু সাহেব—তিনজনে এক সঙ্গে ধরিয়া ফেলিয়া চলন্ত ট্রেণের নীচে পড়ার আশঙ্কা দূর করিলেন।

মীনু বলিল, ওঃ, পুরুষজাতি কি নিষ্ঠুর!

সিংহ বলিলেন, মীনুদি, ভারতনারীর যে উচ্চাদর্শ আজ তুমি প্রতিষ্ঠা করলে, ভারতের অনাগত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকবে।

সুধাংশু সাহেব বলিলেন, কলকাতার কাগজগুলোতে টেলিগ্রাম ক'রে দেবো নাকি?

মীনু ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, টেলিগ্রামের নাম আর মুখে আনবেন না মশাই, খুব হয়েছে।

মীনু চিনুকে লইয়া পড়িল; জিজ্ঞাসিল, চিনু, হরি-নারাণ?

চিনু ভদ্রলোক, এক কথার মানুষ; বলিল—হরিনারাণ, গাড়ী।

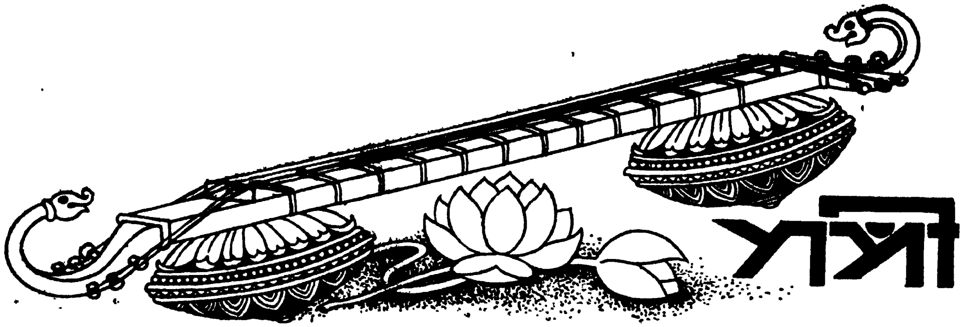
মীনু জিজ্ঞাসিল, আর বদরীনারাণ?

অদৃশ্য ট্রেণ দেখাইয়া চিনু বলিল, বদরীনারাণ, গাড়ী। মীনু তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল, নারাণদের দশাই ঐ, চিনু। মার'।

চিনু পরম সন্তুষ্ট; কহিল, হরিনারাণ, মাব্বো।

পরদিন, সকালে, সেই উপেক্ষিত, অনাদৃত, বিস্মৃত জানালায় আবার দুই নারীমূর্ত্তি প্রকট। একটির বয়স দুই, অপরটি কুড়ির পৃষ্ঠে দুই। উভয়েরই—নারাণ ও গাড়ী।





ভজন

কথা--শ্রীপ্রণব রায়　　　　　　　　　　　　　সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ

ভীম পলশ্রী—কাওয়ালী।

ওগো　　শ্যামল সুন্দর প্রিয়তম
　　হেরি　　একি অপরূপ রূপরাশি।
তন্দ্রাহারা এই চন্দ্রালোকে
　　ঝরে　　তোমারি মধুর সুধাহাসি॥
প্রেমমাখা তব দিঠি অনুপম
করিল সুন্দর আজি তনু মম,
চন্দ্রলেখা তুমি আমি কুমুদী গো
　　জনমে জনমে তাই ভালবাসি॥
ছিনু একেলা বসি'　সারা প্রহর গণি'
বাজে পরাণে মম তব চরণ ধ্বনি,
আজি　　বিরহ ভুলে মন-যমুনা-কূলে
　　শুনি　　পাগল-করা ঐ মোহন বাঁশী॥

০　　　　　　　　　১　　　　　　　　　+

সা সা II সা মা জ্ঞা রসা | সজ্ঞা -রসা ণ্ধা ণ্ | সা -গসা গা মা |
ও গো শ্যা ০ ম ল০ সুন্ ০০ দ র প্রি ০০ য় ত

৩

| গমা -পা পা পা I মা -া পা পা | ধপা -মপা জ্ঞা মা | জ্ঞমা -পণা পা মপা |
ম০ ০ হে রি এ ০ কি অ প০ ০০ রূ প রূ০ ০০ প রা০

| মজ্ঞা -মজ্ঞা -া সা I { মপা -া পা পা | পা -া দা মা | পা ধা ণা দা |
শি০ ০০ ০ ০ তন্ ০ দ্রা হা রা ০ এ ই চন্ ০ দ্রা লো

[পা র্সা -নর্রা র্সা　ণা পা মা গা |
| পা -া (-া -া) } I পা পা I { মা মা -মধা পা | পগা পমা গা গা |
কে ০ ০ ০ ঝ রে তো মা ০০ রি ম ০ ধু র

| সা গা গা মা | গমা -পদা -মপা -া } I মা -া পা পা | ধপা -মপা জ্ঞা মা |
সু ০ ধা হ্না সি০ ০০ ০০ ০ এ ০ কি অ প০ ০০ রূ প

| জ্ঞমা -পণা পা মপা | মজ্ঞা -মজ্ঞা -া সা II
রূ০ ০০ প রা০ শি০ ০০ ০ ০

০ ১ + ৩
-া -া II মা পা পা পা | পা -া জ্ঞা মা | পা ণা মা পা | র্সা -া র্সা র্সা I
প্রে ০ ম মা খা ০ ত ব দি ০ ঠি অ নু ০ প ম ০

I ণা র্সা র্সা র্রা | র্সজ্ঞা র্রর্সা ণধা ণা | ণা ধা মা মা | পা ণা দা পা I
০ ক রি ল সুন্ ০০ দ র ০ আ জি ত নু ০ ম ম

I পা -দা পদা পা | মরা -মজ্ঞা রা সা | সা গা গা গা | মা পা মা -গমা I
চন্ ০ দ্র০ লে খা ০০ তু মি আ ০ মি কু মু দী গো ০০

I পা ধা ণা র্সা | ণা ধণা ধা পা | গা -া গরা গা | মা -া -া -া I
জ ন মে জ ন মে০ তা ই ভা ০ ল০ বা সি ০ ০ ০

I মা -া পা পা | ধপা -মপা জ্ঞা মা | জ্ঞমা -পণা পা মপা | মজ্ঞা -মজ্ঞা -া সা II
এ ০ কি অ প০ ০০ রূ প রূ০ ০০ প রা০ শি০ ০০ ০ ০

সা ন্া II সা জ্ঞা জ্ঞা রা | জ্ঞা -া মা পা | রমা জ্ঞা রা সন্া | সা -া সা ন্া I
ছিনু এ কে লা ব সি ০ সা রা প্র হ র গ০ ণি ০ বা জে-

I সা জ্ঞা ঋজ্ঞা ঋা সা -া ঋসা ণ্া | সা ঋা জ্ঞা ঋা | সা -া পা পা I
প রা ণে০ ম ম ০ ত০ ব চ র ণ ধ্ব নি ০ আ জি

I পা পদা মা পা | পর্সা ণা র্সা মা | পা দা পর্রা র্রজ্ঞর্রা | র্সনর্সা -া (-া -া) I
বি র০ হ ভু লে ০ ম ন য মু না০ কূ০০ লে০০ ০ ০০

I র্সা র্সা I র্সা সর্রা সর্রাঃ র্সঃ | ণা র্সা ণা ধণা | পণা ণদা পমা পধা |
শু নি পা গ০ ০ল্ ক রা ০ ও ই০ মো০ হ ন০ বাঁ০

| ণর্সা -ণদা -পমা -পা I মা -া পা পা | ধপা -মপা জ্ঞা মা |
শী০ ০০ ০০ ০ এ ০ কি অ প০ ০০ রূ প

| জ্ঞমা -পণা পা মপা | মজ্ঞা -মজ্ঞা -া সা I II
রূ০ ০০ প রা০ শি ০০ ০ ০

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের চীন-সমস্যা

শ্রীঅমূল্যকুমার নাগ এম্-এ

ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল ঠিক যে ভাবে তাঁহার "চীন সমস্যা" (The Problem of China) নামক গ্রন্থে চীনদেশীয় হাবভাব, আচারব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও দর্শনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে অতীব নিখুঁত ও গভীর চিন্তাপ্রসূত সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ প্রতিদিনই কমিয়া আসিতেছে। রাসেল চীনদেশীয় পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপকরূপে বহুদিন তথায় বাস করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার "চীন সমস্যা"টি তাঁহারই ব্যক্তিগত চীনদেশীয় অভিজ্ঞতা। রাসেল বাস্তবিকই গভীর চিন্তাশীল। রাসেলের দর্শনে সমাধান অপেক্ষা সমস্যাই বেশী। এই সমস্যাগুলি তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয়। তিনি চীনদেশে থাকিয়াও কতকগুলি সমস্যারই জটিলতা দেখিয়াছেন। সমাধান যে নাই তাহা নহে, তবে খাঁটি চিন্তাশীলগণ সমাধান অপেক্ষা সমস্যারই অধিক সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কারণ সমস্যাগুলি ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলেই সমাধানগুলি স্বতঃসিদ্ধ বা অনায়াসসিদ্ধ হইয়া পড়ে। চীনদেশীয় লোকদের হাবভাব ও প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সে স্থানের রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি নিখুঁতভাবে ধরা যাইতে পারে। কাজেই রাসেল সর্ব্বপ্রথমেই চীনদেশীয় লোকদিগকে সর্ব্বদিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ন্যায় পক্ষপাতশূন্য মনীষীর চিন্তাবলী যে নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ কোন দেশের কোন লোক অপর কোন দেশের সমালোচনা করিতে গেলেই আপন দেশীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির দম্ভ করিয়া থাকে। রাসেলের প্রাণ এই অন্যায় দম্ভ হইতে একেবারেই মুক্ত। তিনি তাঁহার পুস্তকের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "চীনদেশীয়েরা যে আমাদের চেয়ে হীন এ কথা বিশ্বাস করিবার আমি কোন কারণ দেখিনা।" দম্ভনির্মুক্ত রাসেল-মনের অন্য কোন দেশের তথ্য সংগ্রহ করিবার যে শক্তি আছে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। চীনদেশের জাতীয়তার মূল প্রস্রবণ তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইয়োরোপীয় স্বাধীন জাতিগুলির মধ্যে যেমন প্রত্যেকেরই একটা জাতীয়তা আছে, চীনদেশেরও তেমনি একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়া চীন কখনও পরদেশীয় সভ্যতাকে হুবহু নকল করিয়া যাইতে পারিবেনা। চীন সর্ব্বদাই তাহার পূর্ব্বপুরুষ প্রদর্শিত সভ্যতাকে ধরিয়া থাকিতে চায়। তবে সে একেবারেই রক্ষণশীল নহে। পরিবর্ত্তন সে মানে। পূর্ব্বপুরুষ প্রদর্শিত সভ্যতাকে সে বৃদ্ধি করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু তাহাকে সে একেবারেই বাদ দিতে চায়না। কিন্তু চীনের ক্রমবর্দ্ধমান পাশ্চাত্যের অনুকরণ-লালসা দেখিয়া রাসেল অনেক সময়ে অনেক আশঙ্কাও করিয়াছেন। চীনদেশের মত একটা জাতীয়ত্বসম্পন্ন জাতি যদি পাশ্চাত্যানুকরণরূপ মোহে আবিষ্ট হইয়া পড়ে তবে বাস্তবিকই তাহার জাতীয় জীবন হীনতর হইয়া যাইবে। রাসেল চীনের এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এ বিষয়ে দুইটি বিরুদ্ধ ভয় আছে। প্রথমতঃ চীনদেশ সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য ধরণের হইয়া যাইতে পারে এবং আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছুতেই না রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সেই দেশ বিজাতীয় আক্রমণের ভয়ে জড়সড় হইয়া একেবারেই বিদেশীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বসিতে পারে।" এই দুইটিকেই রাসেল ভয়ের কারণ বলিয়া ধরিয়াছেন। এই সমস্তই প্রকৃতপক্ষে রাসেল-প্রদর্শিত চীন-সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যার মুখে চীন কোন্ সমাধান গ্রহণ করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

চীনের খাঁটি অবস্থা জানিতে হইলে শুধু তাহার রাজনীতিক অবস্থাগুলি জানিলেই হইবে না, অর্থনীতিক অবস্থাগুলিরও পরিচয় আবশ্যক। চীনদেশ বাস্তবিক পক্ষে কোন দিনই ভালরূপে কর্ষিত হয় নাই। এই কৃষিবিমুখ জাতিকে কি কৃষিপরায়ণ হইয়া আপনার প্রয়োজনীয় ফসল আপনারই উৎপন্ন করিতে হইবে, কিংবা জাপানই চীনের এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে, কিংবা অন্য কোন শ্বেতজাতিই ইহার ভার লইবে, ইহাই প্রকাণ্ড সমস্যার বিষয়। আমার জমি যদি পড়িয়া থাকে এবং আমি যদি স্বয়ং কৃষিকার্য্যে অক্ষম হই, তবে নিশ্চয়ই তাহা আমাকে অপরের সাহায্যে কর্ষিত করিয়া লইতে হইবে, কারণ আমার জমি না খাটাইয়া আমি বাঁচিতে পারিনা। এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে আমার জমির ভিতর যদি আর কাহাকেও স্থান দিতে হয় তবে তাহার সহিত আমার চুক্তিবদ্ধ হইতে হয়। ফল কথা হইতেছে এই যে, জাতির অর্থনীতির সহিত তাহার রাজনীতি আবদ্ধ। চীনের কৃষি-বিমুখতাও তাহার রাজনীতিক সমস্যার একটি কারণ। রাসেল মোটের উপর চীন সম্বন্ধে তিনটি রাজনীতিক সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন : প্রথমতঃ, চীনদেশ এক বা একাধিক শ্বেতজাতির করলগ্ন হইতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ চীনদেশ জাপানের দাস হইতে পারে ; তৃতীয়তঃ, চীনদেশ আপনি আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারে। এই সম্ভাবনাগুলি যে কতদূর সত্য ও গভীর চিন্তাপ্রসূত, তাহা যিনি গভীরভাবে চীনের অবস্থা অধ্যয়ন করিবেন তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাস্তবিক পক্ষে, চীনের রাজনীতিক গগনে এই তিনটির একটি না একটি অবস্থা সর্ব্বদাই ঘটিয়া আসিয়াছে। আজ চীন জাপানের সহিত সংগ্রামে ব্যস্ত। এই সংগ্রামের ফলে চীন হয়ত আপনার স্বাধীনতা আপনি বজায় রাখিবে, অথবা, জাপানের করতলগত হইবে। বাস্তবিকই রাসেল যে কয়টি সম্ভাবনা দিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত আমরা কিছুই খুঁজিয়া পাইনা।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রাসেলের চীনসম্বন্ধীয় সমস্ত সমস্যাগুলিরই আলোচনা করা অসম্ভব। সমস্ত সমস্যা আলোচনা করিতে গেলে এই প্রকার

চার পাঁচটি প্রবন্ধের প্রয়োজন। কিন্তু চীনদেশীয় সমস্যাগুলি বুঝিতে হইলে চীনের ঐতিহাসিক অবস্থাগুলি ভাল করিয়াই বুঝিতে হইবে, নচেৎ সমস্যাগুলি আয়ত্ত করা যাইবেনা। রাসেল যেভাবে চীনদেশীয় ইতিহাস আলোচনা করিয়া চীনবাসীদের রীতিনীতি, হাবভাব, স্বভাব ও ব্যবহার, মনস্তত্ব ও দর্শন বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

চীনজাতির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা বড়ই শক্ত। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী চীনবাসীদের কোন খবরই পাওয়া যায়না। প্রাচীন কালের চীনবাসীদের কোন ইতিহাস নাই। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন শতাব্দী হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাও গল্পাকারে ভারতীয় পুরাণের মতই বিক্ষিপ্ত। তবে নানা গল্প হইতে দেখা যায় যে প্রাচীন কালে চীনবাসীরা শিক্ষা দীক্ষায়, কৃষ্টি ও সভ্যতায় প্রাচ্যের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ন্যূন ছিলনা। চীনা সাহিত্যে যাহাকে "ইয়াও ও শূনের কাল" বলা হয়, তাহাই তাহাদের সবচেয়ে সুখময় সময়। প্রাচীন চীনবাসীদের মনে কুসংস্কার বলিয়া কোন জিনিস ছিলনা। তাহাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও অভাব ছিলনা। প্রাচীন কালে 'হরিদ্রা নদীর" (Yellow River) ভীষণ স্রোতে চীনদেশের গ্রাম কান্তার ভাসিয়া যাইত। ইয়াও, শূন ও শূনের পরবর্ত্তী ইউ সকলেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই স্রোত নিবারণ কল্পে সচেষ্ট ছিলেন। Legge এর Shu King নামক গ্রন্থে ইয়াওর যেরূপ চরিত্রবর্ণনা আছে তাহা হইতেই চীনদেশীয় নৃপতির আদর্শ সুস্পষ্ট হইয়াছে। ইয়াও সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—

"তিনি ছিলেন স্বভাবতঃই সম্ভ্রান্ত, বুদ্ধিমান্, গুণান্বিত ও চিন্তাশীল। তিনি ছিলেন অকপট, ভদ্র ও সকল প্রকার শিষ্টাচারে অভ্যস্ত। তাঁহার এই গুণরাশি রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকেও পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। যাঁহারা কৃতী ও পুণ্যবান্, তাঁহাদিগকে তিনি সম্ভ্রম করিতেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার স্বজনগণের যে নয়টি শ্রেণী ছিল তাহাদিগকেও ভালবাসিয়া তিনি এক করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রজাগণকে চালিত ও মার্জ্জিত করিয়া সকলকেই অতিশয় বুদ্ধিমান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহার রাজ্যের অসংখ্য খণ্ড রাজ্যকে মিলিত ও একত্র করিয়াছিলেন। ফলে, সমগ্র দেশ একটি মাত্র সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল।"

যদিও ইয়াওর চরিত্রের ভিতরেই আমরা চীনরাজার আদর্শ দেখিতে পাই, তথাপি কখনও কখনও কোন কোন চীন নৃপতির স্বেচ্ছাচার ও দাম্ভিকতায় চীনসাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। চীন অল্পবিস্তর রক্ষণশীল দেশ। কোন দিনই সে আমূল পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে নাই। বল্‌শেভিকবাদ চীনা মাটিতে আদৌ গজায় না। শি হুয়াং টাই নামক একজন নৃপতি একটু বল্‌শেভিক রকমের ছিলেন। তিনি দেশব্যাপী এক নূতনত্বের আন্দোলন আনিতে চাহিলেন। তাঁহার তিনটি প্রধান কীর্ত্তি আছে ; প্রথমতঃ হুনদিগের হাত হইতে রাজ্য রক্ষার জন্য প্রকাণ্ড দেওয়াল (Great wall) প্রস্তুত করা ; দ্বিতীয়তঃ সমুদয় করদরাজ্য ধ্বংস করা ; এবং তৃতীয়তঃ সমুদয় পুস্তক দগ্ধ করা। এই তিনটি কাজের জন্য আজ পর্য্যন্ত তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রখ্যাত হইয়া আছেন। তদ্ব্যতীত শি হুয়াং টাই এতই দাম্ভিক ছিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে যে কেহ কোন দিন রাজত্ব করিত তাহা তিনি স্মরণও রাখিতে চাহেন নাই। এই নিমিত্ত তিনি আপনার নাম রাখিলেন শি হুয়াং টাই, অর্থাৎ, "প্রথম নরপতি।" এবং চীনদেশের নাম যে ঠিক চীনদেশই হইয়াছে তাহার মূলেও শি হুয়াং টাই-ই আছেন। শি হুয়াং টাই চীনবংশোদ্ভূত। কাজেই তাঁহারই বংশের নামানুসারে তাঁহার রাজ্যের নাম চীন রাখা হইয়াছে। আজ যতখানি স্থানকে চীনসাম্রাজ্য বলা হয় প্রায় ততখানি স্থানই শি হুয়াং টাইর রাজত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে শি হুয়াং টাই চীনারক্তে-ভূত ছিলেননা। নানা দাম্ভিকতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি দেশমধ্য হইতে সমস্ত পুরাতন স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে চাহিলেন। কন্‌ফিউসিয়াসের স্মৃতিই চীনদেশে সবচেয়ে প্রবল। কন্‌ফিউসিয়াস্ ছিলেন চীনদেশের অতি প্রাচীন এক ঋষি। ভারতীয়েরা যেমন ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিকে আজ এই শত আন্দোলন ও প্রগতির মুখেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, চীনবাসীরা শত আন্দোলন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে কন্‌ফিউসিয়াসের সহজ সরল জীবন ভুলিতে পারেনা। ইহা হইতেই চীনবাসীদের মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। এবং মনস্তত্বই যে চীনসমস্যার এক কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ফল কথা, শি হুয়াং টাই তাঁহার নূতনত্বের আন্দোলন চীনদেশে আনিয়া পদে পদে কন্‌ফিউসিয়াসের শিষ্যগণের নিকট হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। বহু দিন পর্য্যন্ত জোর জবরদস্তি করিয়াও তিনি চীনা মাটি হইতে কন্‌ফিউসিয়াসানুরাগ বিতাড়িত করিতে পারিলেননা। শি হুয়াং টাইর পরেও চীনবাসীরা তাও ধর্ম্ম কিংবা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেও কন্‌ফিউসিয়াসের ধর্ম্মকে অধিকতর ভালবাসিতে লাগিল।

চীনের প্রাচীন ইতিহাস, মনস্তত্ব, ধর্ম্ম ও দর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া মনীষী রাসেলের প্রাণে বাস্তবিকই কতকগুলি সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে। যে সমস্ত পাশ্চাত্যগণ চীনসংস্কারকামী তাঁহাদিগকে তিনি কতকগুলি বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্যের কোন লোকই যাহাতে প্রাচ্যের কোন জাতিকে ছোট বা নীচ বলিয়া উপহাস না করেন, এ বিষয়ে তিনি বারংবার সাবধান করিয়াছেন। এই উপহাসের ফলে প্রাচ্যের জাতিগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। তাহার ফলে প্রাচ্যের কোন জাতির সহিত পাশ্চাত্যের কোন জাতির মিলন হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উপর প্রভুত্ব করাও দুঃসাধ্য হইবে। রাসেল চীনদেশের যে একটা জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আছে, তাহার উপর আঘাত করিতে সকলকে নিষেধ করিয়াছেন। যদি চীনদেশ একেবারেই পাশ্চাত্যানুকরণশীল হইয়া উঠে, তবে তাহা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয়ের পক্ষেই অমঙ্গলজনক। কিন্তু চীনকে স্বাধীনভাবে আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া প্রগতির মুখে টানিয়া লইতে অপরাপর জাতির সাহায্য করা উচিত। চীনের মত একটা রক্ষণশীল জাতির উপর রাজ্যলোলুপ কোন জাতি যদি ক্ষমতা বিস্তারে যত্নবান্ হয়, তবে তাহা উভয়ের এবং সমগ্র জগতেরই অকল্যাণজনক হইবে। আজ জাপান, ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া চীনের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে কৃতসংকল্প। কিন্তু ইহার শোচনীয় পরিণাম

সহজেই অনুমেয়। চীনকে অস্ত্রসাহায্যে জয় করিলেও কৃষ্টির দিকে সে তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবেই। কন্‌ফিউসিয়াস্‌কে চীন কোন দিন ভুলিতে পারিবেনা। তাও ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব চীনে তেমন গভীর হয় নাই। চীন কৃষ্টির দিক্‌ দিয়া ভারতের মতই রক্ষণশীল। সেখানে গিয়া নূতন সভ্যতা ও কৃষ্টি চালান একেবারেই অসম্ভব। এমন কি কোন কোন চীন নরপতিও আপন দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। আজিও যে চীনের যুবকগণের মধ্যে প্রগতির সাড়া পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে খাঁটি চীন ভাব খুবই কম। পাশ্চাত্যানুকরণ মোহ তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, চীনের অপর কোন জাতির আদর্শকে আপনার দেশে ফুটাইয়া তোলা একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই রাসেল বলিয়াছেন যে চীনদেশে সভ্যতা ও সাধনার দিক দিয়া কিছু অবদান করিতে হইলে দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত দরকার। প্রথমতঃ চীন যাহাতে পাশ্চাত্যানুকরণরূপ মোহে নিপতিত না হয়, কারণ সে ক্ষেত্রে সে পাশ্চাত্যে বুদ্ধিমান্‌ কিন্তু অসুখী জাতিগুলির দল বাড়াইয়া পৃথিবীর অশান্তি বৃদ্ধি করিবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে চীন যাহাতে বৈদেশিকের উৎপাতে একেবারেই ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া কোন প্রকার বৈদেশিক প্রভাবই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া না বসে। যাঁহারা চীনের সংস্কার সাধন করিতে চাহেন, তাঁহাদের চীন উপাদান বুঝিয়া তার পর সংস্কারান্দোলন করা কর্ত্তব্য। কোন রাজ্য-লোলুপ জাতি চীন অধিকারে শান্তি পাইবেনা। সভ্যতাপ্রচারক কোন সহানুভূতিসম্পন্ন জাতিই চীনের খাঁটি উন্নতি সাধন করিতে পারেন। রাজ্যলোলুপ জাপানের পক্ষে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের "চীনমন্ত্র" আজকের দিনে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে মনে করি।

আদি দ্বারবতী ও রৈবতক সন্দর্শনে

ডাক্তার শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, পিএইচ-ডি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এমনি করিয়াই উপরে উঠিতে লাগিলাম। ৩০।৪০টি সিঁড়ি উঠিয়াই বিশ্রামার্থ বসিয়া পড়িতে হয়; নচেৎ হৃদ্‌পিণ্ড লাফাইতে লাফাইতে শ্রান্তিতে ঝির্‌ ঝির্‌ করিতে থাকে। অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়া জুনাগড়ের দিকে চাহিয়া দেখি, অপূর্ব্ব দৃশ্য! বামে দাতার-পীর শিখর প্রথমে ঢালু হইয়া, পরে খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। রৈবতক পাহাড়ের নীচেই একটি উপত্যকা। উহাতে জুনাগড়ের জল সরবরাহের পুকুরটি সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল। তাহার আশ-পাশেও কতকখানি ফাঁকা জায়গা। উহাতে দিয়াশলাইর বাক্সের মত ছোট ছোট ঘরবাড়ীও দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পরেই আবার একটি পাহাড় যাহা জুনাগড়ের দেওয়ালে যাইয়া ঠেকিয়াছে। দুই পাহাড়ের মধ্যের ফাঁক আগুলিয়া উপরকোট দুর্গ ভীমকায় দৈত্যের মত শাদা কাল চিত্রিত দেহে দাঁড়াইয়া আছে! তাহারও ওপারে দেখা যাইতেছে ৩০।৪০ মাইল পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্র প্রদেশ,—অবিকল মানচিত্রের মত!

রাস্তায় দুইটি অপাপালি অর্থাৎ জলছত্র আছে। উভয়ত্রই পেট ভরিয়া জল খাইলাম,—বড়ই স্বাদু জল। বহু কৃষ্ণবদন হনুমানের সহিত রাস্তায় দেখা হইতে লাগিল। আধাআধি সিঁড়ি উঠিলে তাহার পরে আর গাছপালা নাই। উপর দিকে চাহিলে দেখা যায়, এক অখণ্ড প্রস্তর শিখর পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসরের বৃষ্টিধারায় স্থানে স্থানে ক্ষয় হইয়া উহাতে গর্ত্ত হইয়াছে। ঐ সকল গর্ত্তে শকুনেরা বাসা বাঁধিয়াছে। রৈবতক সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মাথার উপর দিয়া সিন্ধু-শকুনও (Sea-gull) উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। দিন বেশ পরিষ্কার ছিল—কিন্তু দূরের দৃশ্যগুলি তবু কেমন যেন ঝাপসা ও কুয়াসায় ঢাকা বোধ হইতে লাগিল। যমুনা রাও বলিল, উহাকে পাহাড়ী কুয়াসা (Hill mist) বলে। দূরের দৃশ্য কোন দিনই না কি ইহার অপেক্ষা পরিষ্কার দেখা যায় না। রাস্তায় পাশের গুটি দুই গুহায় সাধুর আস্তানা দেখিলাম। অর্দ্ধ পথে একটি দেবমন্দিরও আছে। উহাতে কি দেবতা প্রতিষ্ঠিত ভুলিয়া গিয়াছি।

৯টায় রৈবতক আরোহণ আরম্ভ করিয়াছিলাম, রাস্তায় প্রায় ২৫।৩০ বার বসিয়া বেলা একটার সময় যাইয়া জৈন মন্দিরে পৌছিলাম। প্রবেশ-দরজাটি ঠিক দুর্গদ্বারের মত।

প্রবেশপথ আটকাইয়া যে মোটা পাথরের দেওয়াল নির্ম্মিত, তাহাও দুর্গ দেওয়ালের মত খাঁজকাটা। লোকে যতক্ষণ জুনাগড় সহরে থাকে ততক্ষণ উহার দুর্গকে বলে উপর-কোট। আর রৈবতক পাহাড়ে চড়িতে আরম্ভ করিলেই এই জৈন মন্দিরের অবস্থান-ভূমিকেই উপরকোট বলে।

এই উপরকোটের দরজা দিয়া ঢুকিয়া রাস্তার পাশের এক বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িলাম। এখানে খাবারের দোকান আছে। যমুনা রাও কিছু পুরি, লঙ্কার তরকারি, লেউড়ি ও মিষ্টি কিনিয়া আনিয়া বলিল, "উঠুন।" কি সর্ব্বনাশ! আবার উঠিতে বলে যে? যমুনা রাও উপরে দেখাইয়া বলিল—আরও কিছু উপরে যে গোমুখীর মন্দির দেখা যাইতেছে, আমাদিগকে সেইখানে যাইতে হইবে। উহা হিন্দু তীর্থ এবং উহার আশে-পাশেও কয়েকটি হিন্দুর মন্দির আছে।—জৈন মন্দিরগুলিতে হিন্দুর আশ্রয় মিলে না! অগত্যা উঠিলাম। অনেক কষ্টে আরও ৬০।৭০টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গোমুখী পৌছিলাম। উহার প্রাঙ্গণে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত কক্ষ আছে। উহার একটি খালি ছিল, আর একটিতে একটি গুজরাটী পরিবার আশ্রয় লইয়াছিল। গোমুখীর মোহান্তকে বলিয়া যমুনা রাও একটি কক্ষ খোলাইয়া লইল এবং একখানা মলিন জীর্ণ তোষকও লইয়া আসিল। মোহান্ত মহাশয় অতি সদাশয় লোক। তিনি যখন শুনিলেন, আমরা নবাব আলি সাহেবের অতিথি এবং আমি 'ঢাকে বাঙ্গালা' হইতে আসিয়াছি, নবাব আলি সাহেবের মত এম্-এ পাশও করিয়াছি, তখন তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে চা খাইবার জন্য পর্য্যন্ত আদর করিলেন। চা প্রত্যাখ্যান করিয়া এক গ্লাস জল খাইতে চাহিলাম। মোহান্ত স্বহস্তে এক লোটা জল আনিয়া দিলেন। পান করিয়া,—আঃ—সমস্ত ব্যথা যেন জুড়াইয়া গেল।

গোমুখী একটি ঝরণা। পাহাড়ের গা ভেদ করিয়া জলধারা বাহির হইয়াছে। উহার নিকটেই গুটি দুই তিন মন্দির নির্ম্মিত। ঝরণার জল প্রথমে এক পাথরের চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়ে এবং উহা হইতে উপচাইয়া নিম্নতর আর একটি চৌবাচ্চায় পড়ে। প্রথম কুণ্ডের জল কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না, মোহান্ত স্বহস্তে উহা হইতে পানীয় জল তুলিয়া দেন। পরের চৌবাচ্চার জল ইচ্ছামত বাল্তি দিয়া তুলিয়া সংলগ্ন এক প্রকোষ্ঠে স্নানাদির জন্য ব্যবহার করা যায়। আমার প্রার্থনায় প্রথম চৌবাচ্চা হইতে মোহান্ত যে এক লোটা জল তুলিয়া দিলেন, তাহার মত অমৃতরস আমার জীবনেও আর আমি পান করি নাই। বেদে জলকে জ্যোতিরস এবং অমৃত কেন বলিয়াছে, এই গোমুখীর ঝরণার জল পান করিয়া তাহার উপলব্ধি হইল। বাঙ্গালা দেশে একমাত্র কুমিল্লায় রাণীদীঘির জলে এবং ফাল্গুন মাসে দিনাজপুর জেলায় আত্রেয়ীর জলে অনুরূপ আস্বাদ পাইয়াছি।

ঝাড়া আধ ঘণ্টা বিশ্রাম-কক্ষে বিশ্রাম করিয়া গোমুখীর দ্বিতীয় চৌবাচ্চা হইতে জল উঠাইয়া স্নান করিতে গেলাম। সঙ্গে কাপড় এবং তোয়ালে লইয়া আসিয়াছিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় কষ্টে বাহিত সেই কাপড় তোয়ালে এখন বেশ কাজে লাগিল, কারণ পরণের কাপড় ঘামে ভিজিয়া নিতান্ত অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। স্নানে যা আরাম হইল, তাহা অবর্ণনীয়। তাহার পরে পুরি এবং লঙ্কার তরকারীও অমৃতবৎ লাগিতে লাগিল। এ দেশে বড় বড়, ফাঁপা, প্রায় ঝালবিহীন এক রকম লঙ্কা পাওয়া যায়—আমাদের দেশে এবং শিলংএ সৌখীনদের বাগানে উহার চাষ দেখিয়াছি। শুধু এই লঙ্কা দিয়াই এ দেশে এক প্রকার তরকারী প্রস্তুত হয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা লঙ্কার ভয়ে বড় ভীত নহে,—আট গণ্ডার জায়গায় ছয় গণ্ডা দিলে মন না উঠিবার ব্যঙ্গচিত্রও একেবারে কাল্পনিক নহে। কিন্তু একেবারে নিছক্ লঙ্কারই তরকারী? বাপ্। ও খোদ বিক্রমপুর-বাসীরও চলিবে না। উহা যমুনা রাওএর রসনাই তৃপ্ত করুক্। যমুনা রাও বলিল—"বাবু, খাইয়া দেখ, ঝাল নহে।" ভয়ে ভয়ে মুখে দিয়া দেখি, সত্যই, অতি সামান্যই ঝাল। কাঁচালঙ্কার গন্ধটুকু পাওয়া যায় বলিয়া তৃপ্তিদায়ক। তখন ঐ সবুজ তরকারী সহযোগেই পুরি ও লেউড়ী ভক্ষণ করা গেল। জল পানান্তে বাহিরে যাইয়া আঁচাইলাম। দেখিলাম পার্শ্বের কোঠায় গুজরাটী পরিবার আরও উপরে একেবারে শিখরস্থ "আম্বা মা"এর মন্দিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রওনা হইয়াছে। একটি বালক, দুইটি যুবক, একজন বৃদ্ধা, এবং একটি ২৫।২৬ বছরের তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বধূ। ৪১৫ সিঁড়ি উঠিয়া যখন আমার অবস্থা কুরুসৈন্য দর্শনে অর্জ্জুনের মত, তখন ইঁহারা আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, "যমুনা রাও, পাণ ?"

যমুনা রাও বলিল, "পাণ তো এখানে মিলিবে না, বাবু।"

আমি কোলাহল করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"তাহা হইবে না ; সিঁড়ির আরম্ভে যে পাণের দোকান দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে তুমি এক দৌড়ে যাইয়া পাণ লইয়া আইস। নচেৎ 'হামারা প্রাণ তুরন্ত নিকাল যা' গা।"

শুনিয়া বধূটি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুদর্শন স্বামীটিও হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বাবুজি, আপনার তো পাণ দোষ বড় প্রবল।"

আমি অপরাধ কবুল করিলাম। বধূটি স্বামীকে চোখে চোখে কি ইঙ্গিত করিল। স্বামীটি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা গির্ণারজির উপরে আপনার পাণ বিরহে প্রাণ দিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদের সহিত পাণ আছে, আপনাকে দিতেছি!" মাথার পুটলিটি নামাইয়া যুবক তাহার ভিতর হইতে পাণ, সুপারি, চূণ এবং খয়েরচূর্ণ বাহির করিলেন। পাণগুলি ছোট ছোট এবং ফ্যাকাশে পাকা পাতার রঙ্গের। কিন্তু স্বাদ বড় চমৎকার। সোনার হাতে সোনার চুড়ী বাজাইয়া বধূটি নিপুণ হস্তে পান সাজিতে লাগিল এবং খিলি বানাইয়া স্বামীর হাতে দিল। ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া আমাকে দিলেন—আমি "জয় গির্ণারজি" বলিয়া মুখে পুরিয়া দিলাম। গির্ণার পাহাড়ের প্রায় শিখরে বসিয়া সুবর্ণ কঙ্কণ-মণ্ডিত হস্তের সাজা পাণের খিলি লাভ যদি তীর্থ-মাহাত্ম্য না হয়, তবে তীর্থ-মাহাত্ম্য আর কাহাকে বলে ?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবুজি, আম্বা মা যাইবেন না ?"

আমি বলিলাম—"মায়ের স্নেহের টান থাকিলে নিশ্চয়ই যাইব।"

গুজরাটী পরিবার 'আম্বা মা' যাইবার জন্য আরোহণ আরম্ভ করিল—আমিও কক্ষের মধ্যে যাইয়া পাণ মুখে সিগারেট ধরাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

গোমুখীর বিশ্রাম-কক্ষের বারাণ্ডায় বসিয়া পশ্চিম দিকে চাহিয়া কি অপরূপ দৃশ্যই চোখে পড়ে! গোমুখীর নীচেই কতকখানি স্থান প্রায় সমতল। এই সমতল স্থানটির উপর প্রায় ২০টি ছোট বড় জৈন মন্দির ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত। কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া জৈন ভক্তগণ এই দুর্গম পাহাড়ের উপরে এই মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। ইহাদের উপকরণের প্রত্যেকখানি পাথর পাহাড়ের নীচ হইতে আনিতে হইয়াছে। মন্দিরগুলিতে শ্বেত পাথরের কাজই বেশী,—রক্তিমাভ, ধূসর এবং বেলে পাথরও আছে। গোমুখী হইতে এই মন্দিরগুলির দৃশ্য অতি চমৎকার, কারণ, অনেকটা উপর হইতে দেখিবার সুবিধা পাওয়া যায় বলিয়া সমস্তগুলি মন্দিরই একবারে চোখে পড়ে! রৈবতক শৈলের একেবারে শীর্ষে "অম্বা মা"র মন্দির। গোমুখী হইতে উহা ক্ষুদ্র একটি খেলাঘরের মত দেখা যাইতেছিল—উঠিবার সিঁড়িটিও আগাগোড়া নজরে পড়িতেছিল!

জৈন মন্দির পার করিয়া পশ্চিমে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে, জুনাগড়ের উপরকোট দুর্গটি অস্পষ্ট দেখা যায়। দূরে দূরে দেখা যায় মানচিত্রের মত প্রসারিত সমগ্র সৌরাষ্ট্রভূমি। আরও দূরে দেখা যায়, একটা গোলাকার রেখায় দিক্‌চক্রবালে অতীব্র রূপালি আলো ঝিলিক মারিতেছে। বুঝা যায়, ৬০।৭০ মাইল দূরে উহাই সৌরাষ্ট্রের সমুদ্র-সৈকত। পশ্চিমাকাশের সূর্য্যের আলো সমুদ্রের জলে পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়া এই অনুজ্জ্বল রূপালি আভার সৃষ্টি করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জৈন মন্দির পর্য্যন্ত সিঁড়ির সংখ্যা প্রায় ৩১০০। গোমুখী ইহারও ৬০।৭০ সিঁড়ি উপরে। গোমুখী হইতে অম্বা মার মন্দির আরও শ-চারি পাঁচ সিঁড়ি হইবে। গোমুখী পর্য্যন্ত উচ্চতা দেখিলাম ৩৯০০ ফুট। নীচ হইতে এই পর্য্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য কিন্তু প্রায় দুই মাইল হইবে। স্থানে স্থানে সিঁড়ির প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া সিঁড়ির সংখ্যা দূরত্বের অনুযায়ী নহে। সিঁড়িটি ৪।৫ হাত প্রশস্ত, প্রত্যেক ধাপের উচ্চতা ৭।৮ ইঞ্চি। সিঁড়িতে উঠিতে ডান দিকে খদ, বাঁ দিকে পাহাড়ের গা। সামান্য দুই একটি স্থানে মাত্র সিঁড়িটি বেমেরামত দেখিলাম, নচেৎ আগাগোড়াই উহা অতি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই সিঁড়ি জৈন ভক্তদের কীর্ত্তি। সমস্তটা সম্ভবতঃ একজনের কীর্ত্তি নহে, কিন্তু এই বিষয়ে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। জৈন মন্দির হইতে 'অম্বা মা'এর মন্দির পর্য্যন্ত সিঁড়ি নির্ম্মাণে জৈন ভক্তদের কোন স্বার্থ নাই। এই সিঁড়ি কে নির্ম্মাণ করিল, তাহারও কোন খবর জানিতে পারি নাই। যথেষ্ট সময় হাতে না লইয়া বহু-বিস্তৃত

কীর্ত্তিসমন্বিত দ্রষ্টব্য স্থান দেখিতে গেলে নানা বিষয়েই অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। অম্বা মা শিখরের উচ্চতা ৪৬৯১ ফুট।

জৈনদের দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমিনাথ রৈবতকে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া রৈবতক জৈনগণের পরম পবিত্র তীর্থ। জৈন শাস্ত্রে বলে, নেমিনাথ যাদববংশীয় এবং কৃষ্ণের জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। নেমিনাথ যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহের দিন স্থির করা হয় এবং বিবাহ উৎসবের জন্য প্রচুর ভোজ্য পানীয় সংগ্রহ করা হয়। মাংসের জন্য যে সকল পশু পাখী জোগাড় করা হইয়াছিল, তাহাদের কাতর চীৎকারে নেমিনাথের বৈরাগ্যের উদয় হয়। পলাইয়া তিনি রৈবতক শিখরে যাইয়া আত্মগোপন করেন এবং কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সেই অবধি রৈবতক জৈন তীর্থ।

রৈবতক পর্ব্বতের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্মরণাতীত কাল হইতে ইহাকে তীর্থরাজে পরিণত করিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের আমলে ইহার পাদদেশে বহু অর্থ ব্যয়ে সুদর্শন তড়াগ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই। অসংখ্য তীর্থযাত্রী সেই পথে প্রত্যেক বৎসর যাতায়াত করে। সেই পথের ধারে, স্পষ্টই পথিকগণের সুবিধার জন্য,—জলাশয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, সম্রাট সুদূর পাটলিপুত্রে বসিয়াও সজাগ। সম্রাট অশোক তাঁহার গিরিলিপিগুলি সাধারণতঃ বহু পথিকের ব্যবহার্য্য বড় বড় সদররাস্তাগুলির ধারেই খোদিত করাইতেন। গির্ণারে যাইবার রাস্তার ধারে অশোকের গিরিলিপির অস্তিত্ব দেখিয়া, স্পষ্টই বুঝা যায়, এই রাস্তায় বহু লোক যাতায়াত করিত। যাদবগণের দ্বারবতী বাস কালেও এই রাস্তার কি পরিমাণ ব্যবহার হইত, মহাভারতের আদি পর্ব্বের সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গের বর্ণনা হইতেই তাহা উপলব্ধ হইবে—

"অনন্তর কিছুকাল পর্য্যন্ত সেই রৈবতক পর্ব্বতে যাদবগণের উৎসব হইতে লাগিল। ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় যাদব বীরগণ সেই গিরি সম্বন্ধীয় উৎসবে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। রৈবতক পর্ব্বতের উপত্যকা ও অধিত্যকা জুড়িয়া বড় বড় প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং নানা অলঙ্কারে সজ্জিত সেই সকল প্রাসাদ নানা প্রকার ভোগের জিনিসে পূর্ণ করা হইল। বাদক, নর্ত্তক ও গায়কগণ বিবিধ বাদ্য নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল। মহাবীর যাদবকুমারগণ সুন্দর বেশ ও অলঙ্কার পরিয়া সোনার রথে এদিক ওদিক যাতায়াত করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। হাজার হাজার নাগরিক দাসদাসী ও বাড়ীর মেয়েদের লইয়া দলে দলে গাড়ী করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। বহু লোক হাঁটিয়াও যাইতে লাগিল। মধুমত্ত বলরাম রেবতীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে চলিল তাঁহার বহু গায়ক অনুচর। যাদবগণের রাজা উগ্রসেনও (কংসের পিতা) সেই উৎসবে চলিলেন। তাঁহার সহিত শত শত রমণী এবং গায়ক। ...বহু যাদব বীর পৃথক্ পৃথক্ স্ত্রী ও গায়কগণে পরিবৃত হইয়া তথায় বিচরণ করিয়া সেই মহোৎসবের শোভা বাড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে সেই মনোহর ও আশ্চর্য্যজনক কৌতূহল (মেলা ?) প্রবর্ত্তিত হইলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একত্রে তথায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহারা দেখিলেন কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভদ্রাও সেই উৎসবে যোগ দিয়াছে। সুলক্ষণা সুভদ্রার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল্ করিতেছে—সঙ্গে তাঁহার অনেক সখী।" *

এই বর্ণনায় মনে হয়, দ্বারবতী হইতে রৈবতক পর্য্যন্ত যে দুই মাইল রাস্তা তাহার সমস্তটা জুড়িয়া ঐ আমলে এই উৎসবের সময় মেলা বসিত এবং অস্থায়ী ভাবে বহু দোকান-পশার বসিয়া যাইত। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাট বাজার বন্দর-গুলিতেও এখন বহু স্থায়ী এবং বিবিধ দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ দোকানের পত্তন হওয়ায় দেশে মেলার প্রভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। আমাদের বালককালেও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানেই কোন পুণ্যতিথি এবং তীর্থ স্নানাদি উপলক্ষ্য করিয়া বৃহৎ এবং দীর্ঘকালস্থায়ী মেলার সন্নিবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। বিক্রমপুরে ধলেশ্বরী তীরে কার্ত্তিকবারুণী উপলক্ষ্য করিয়া মাইল-দুই-মাইল স্থান জুড়িয়া মাসব্যাপী বৃহৎ মেলা বসিত। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে ঝুলন মেলায় অমনি গরিমা ছিল। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট সবডিভিসনে অমনি বড় বড় মেলা বসিতে দেখিয়াছি। হরিহরছত্র, নেকমর্দ্দন, ইত্যাদি দুই চারিটি মেলার গৌরব আজিও লোপ পায় নাই। মহাভারতের

* মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২০শ অধ্যায়। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ অবলম্বনেই উপরের অংশ উদ্ধৃত, কিন্তু ভাষা অপেক্ষাকৃত তরল করিয়া দিয়াছি।

বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, যাদবগণের উৎসবে রৈবতক যাইবার রাস্তায় এবং ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে অমনি বৃহৎ মেলা বসিত এবং হাজার হাজার লোক ঐ পথে যাতায়াত করিত।

চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সঙ্ রৈবতক আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় (৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি রৈবতকের নিম্নরূপ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন—

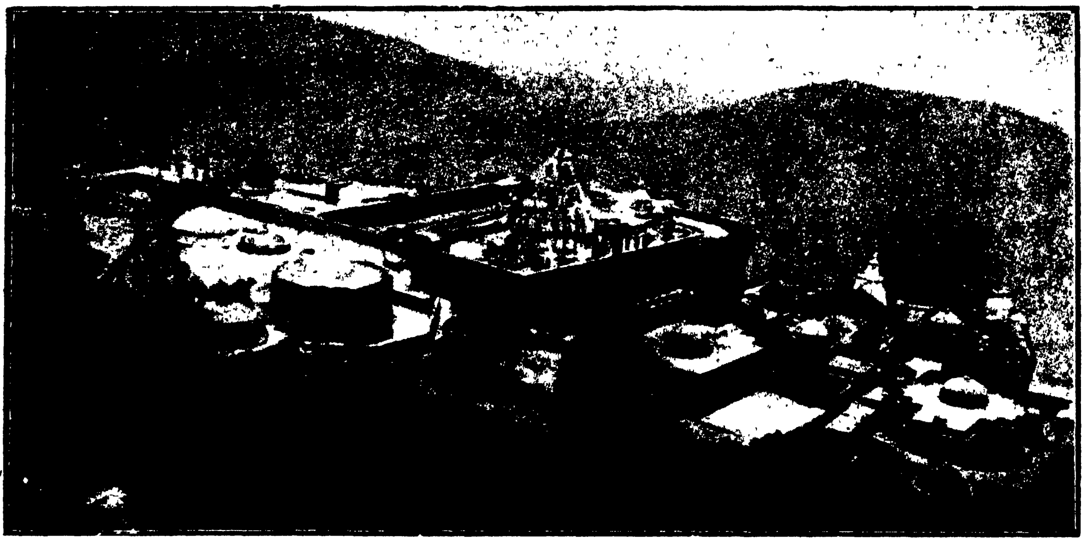
"সহরের অদূরে একটি পর্ব্বত, নাম উজ্জয়ন্ত। উহার শিখরে একটি সঙ্ঘারাম আছে। সন্ন্যাসীদের থাকিবার কুঠরিগুলি এবং গ্যালারিগুলি বেশীর ভাগই পাহাড়ের ধার খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে। পাহাড়টির সারা গায়ে ঘন জঙ্গল এবং জংলা গাছ। অনেকগুলি ক্ষুদ্র নদী উহার সীমার চারিদিকে বাহির হইয়া গিয়াছে। এইখানে সাধু সন্ন্যাসীগণ বিচরণ করেন এবং আসন করিয়া অবস্থান করেন। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ এই স্থানে আসিয়া মিলিত হ'ন এবং বাস করেন।"

ভারতের যেখানে যেখানে জৈন প্রাধান্য দেখিতে পাইয়াছেন, হিউএন সঙ্ তাহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। উপরের বর্ণনায় জৈনদের কোন উল্লেখই নাই দেখিয়া মনে হয়, এই সময় পর্য্যন্ত রৈবতকে জৈনগণ প্রবল হইতে পারেন নাই। পাহাড়ের উপরে জৈন মন্দির অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু উহাদের প্রাচীনতমটি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মাত্র।

শিখর দেশে 'অম্বা মা'র মন্দিরটিও খুব বেশী প্রাচীন নহে। মন্দিরে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, একটি পাথরকেই ভীমা প্রকৃতিরূপিণী জগন্মাতার প্রতীক বলিয়া পূজা করা হয়। রৈবতক-শীর্ষে উন্মুক্ত আকাশতলে জগন্মাতার যে ইহা উপযুক্ত পীঠস্থান, তাহা ঘোর নাস্তিককেও স্বীকার করিতে হইবে।

বিশ্রামান্তে প্রায় তিনটার সময় বিশ্রাম কক্ষ হইতে বাহির হইলাম।

যমুনা রাওকে বলিলাম—"যমুনা রাও, এবার চল অম্বা মা-জির মন্দিরে।"



জৈন মন্দির-সমূহ

যমুনা রাও বলিল—"বাবুজি, আপনি বড় ক্লান্ত হইয়াছেন; এই পাঁচশত সিঁড়ি উঠিতে আপনার এক ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে। তাহার পরে বিশ্রাম আধ ঘণ্টা এবং নামিতে আধ ঘণ্টা,—পাঁচটা বাজিয়া প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। আজ আর নামিবার সময় থাকিবে না। এখানে রাত কাটাইবার ব্যবস্থা সঙ্গে কিছু নাই। কাজেই অম্বা মা-জিকে এখান হইতেই নমস্কার দেওয়া ভাল।"

শুনিয়া মনটা ভারী দমিয়া গেল। অথচ যমুনা রাওর যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গোমুখীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে কাতর সতৃষ্ণ নয়নে বার বার

অম্বা মার মন্দিরের দিকে চাহিতে লাগিলাম। বহুদিন পরে ফিরিয়া প্রিয়ের সহিত দেখা হইলে দূর হইতে বারেক নয়নে নয়নে চাহিয়া সে যদি চিরদিনের মত অদৃশ্য হইয়া যায়, তবে অপর পক্ষের যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থা তেমনি হইল। বালকের মত অভিমান বুকে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—"চলিলাম—মা, চলিলাম। চিরদিনের মত চলিলাম—আর কোন দিনই দেখা হইবে না।" গোমুখী প্রাঙ্গণে দেখিলাম, এক স্থানে পাথরের গায়ে রাজশাহীর কে এক অমলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (কি অমনি কি এক নাম,—নামটি ঠিকমত মনে নাই) আমার যাইবার ১৫ দিন আগে গোমুখী দেখিতে যাইয়া নিজের নাম ও তারিখ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। কল্পনায় ধরিয়া লইলাম,—এই অমল ভট্টাচার্য্য নিশ্চয়ই অম্বা মাও দেখিয়া গিয়াছে, তাহার এই সৌভাগ্যে নেহাৎ অকারণে ঈর্ষা বোধ হইতে লাগিল!

গোমুখীর মোহান্তের নিকট বিদায় লইয়া, একটি সিকি গোমুখী মন্দিরে প্রণামী দিয়া ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হৃদয়ে নামিয়া চলিলাম। ফিরতি পথে জৈন মন্দিরগুলি দেখিয়া যাইব সঙ্কল্প ছিল; তাহাতেও যেন আর আগ্রহ রহিল না। তবু জৈন মন্দিরে প্রবেশের সদর দরজায় থামিয়া পড়িলাম এবং ঢুকিয়া গেলাম। দুই ধারে দাওয়ার উপরে কয়েকজন লোক বসিয়া ছিল। আমরাও যাইয়া উহাদের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম, এবং উহাদের মধ্যে একজনকে কর্ত্তা গোছের দেখিয়া তাঁহার সহিত নানা আলাপ জুড়িয়া দিলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা হিন্দুদিগকে জৈন মন্দিরে থাকিতে দেন্ না কেন? জৈনেরাও হিন্দু, ব্রাহ্মণ্য হিন্দুরাও হিন্দু।"

কর্ত্তা গোছের লোকটি বলিলেন,—"থাকিতে দিই না, কে বলিল আপনাকে? অতিথিদের জন্য ভিন্ন জায়গাই আছে। তবে আমাদের এখানে সন্ধ্যার পরে কিছু খাওয়া নিষেধ, তাই, অনেক হিন্দু এখানে থাকা পছন্দ করে না।"

কর্ত্তার হুকুমে আমাদের জন্য এক এক কাপ দুধ আসিল। দুগ্ধ পানান্তে পাণও জুটিল। মন্দিরগুলি ঘুরিয়া দেখাইবার জন্য কর্ত্তা একটি ছোকরা গাইড্ সঙ্গে দিলেন।

জৈন মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির কি বর্ণনা করিব? ধাপে ধাপে নামিয়া একে একে সমস্ত মন্দিরগুলিই ঘুরিয়া দেখিলাম। অসংখ্য উহাদের মূর্ত্তি, অজস্র উহাদের মধ্যে মণি মুক্তা মর্ম্মর স্ফটিকের কারুকার্য্য, অফুরন্ত উহাদের সৌন্দর্য্য। সমস্তটা মিলিয়া স্মৃতিতে যেন একটা তালগোল পাকাইয়া আছে। মন্দিরগুলির গর্ভ-গৃহে, পার্শ্ব গৃহে, গ্যালারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে পায়ে ব্যথা ধরিয়া গেল, চক্ষু ক্লান্ত হইয়া দর্শনবিমুখ হইয়া উঠিল,—মন হয়রাণ হইয়া গেল। বৃহত্তম মন্দির ও মূর্ত্তি নেমিনাথের। এতদিন পরে আজ শুধু স্পষ্ট স্মরণে আছে নেমিনাথের বৃহৎ স্ফটিকময় চক্ষু দুইটি এবং থুথু ছিটিবার ভয়ে মুখবাঁধা একটি সুন্দরী পূজারিণীর পূজার উপকরণ সজ্জায় নিঃশব্দ তদ্গতচিত্ততা।

গাইডকে দুই আনা বক্শিস্ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত কর্ত্তার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। জুতা মোজা ছাড়িয়া মন্দির দর্শনে যাইতে হইয়াছিল। তাহা পরিধান করিয়া এবার দ্রুত নামিতে সুরু করিলাম। নামিতে পারা যায় দ্রুত, কিন্তু উঠিবার কালে যেমন শ্বাসকষ্ট ও হৃৎস্পন্দনে অস্থির হইয়া পড়িতে হয়,—নামিবার কালেও উরুর মাংসপেশী দেখিতে দেখিতে ক্লান্ত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। নামিবার কালে মাত্র চারিবার পথে বিশ্রাম আবশ্যক হইয়াছিল। আধাআধি নামিয়াছি, এমন সময় দেখি একদল সাধু কষ্টে আরোহণ করিতেছে। অগ্রবর্ত্তী সাধুটিকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলাম,—"কেয়া সাধুজি, পুণ্যমে তো বহুৎ তখলিফ্ মালুম হায়।"

সাধুজি হাঁপাইতে হাঁপাইতে উত্তর দিলেন—"আর বাবা, ছেলেবেলা হইতে যত ডালরুটি খাইয়াছি, আর পাপ করিয়াছি, গির্ণারজি সব একদম হজম করিয়া দিবেন!"

মনে মনে বলিলাম,—"বেশ সাধু ভাই, বিশ্বাস থাকাই ভাল। আসলে কিন্তু ডালরুটিই হজম হয়, পাপ অত সহজে হজম হয় না।"

সিঁড়ির পাদদেশে যখন নামিলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। যমুনা রাও দোকান হইতে চা খাইল, আমি পাণ ও সিগারেট যোগে ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলাম। দুই ধারের জঙ্গল হইতে দলে দলে ময়ূর উড়িয়া আসিয়া নিকটবর্ত্তী দালানগুলির কার্ণিশের উপর, রাস্তার দুই পার্শ্বের গাছের

উপর বসিতেছিল ; কয়েকটি নির্ভয়ে দোকানগুলির নিকটে রাস্তার উপর হইতে খাদ্য খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। এই জৈন অহিংসার রাজ্যে তাহাদের কোন ভয়ই নাই। গাছে গাছে বহু বানরও দেখিলাম।

ঐ স্থানে সমবেত টাঙ্গাওয়ালাদের কাছে জানা গেল, মোটর যথাসময়ে আমাদের জন্য আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। নবাবআলি সাহেবের বাসা পর্য্যন্ত যাইতে টাঙ্গাওয়ালারা বেজায় ভাড়া হাঁকিল। ফিরিবার পথে পায়ে হাঁটিয়া রাস্তাটি ভাল করিয়া দেখিয়া যাইব এবং মৌর্য্য আমলের সুদর্শন তড়াগ কোথায় অবস্থিত ছিল তাহাও স্থির করিতে চেষ্টা করিব, মনে মনে অভিলাষ করিয়াছিলাম। সুভদ্রাহরণ কোথায় হওয়া সম্ভব, তাহাও দেখিবার ইচ্ছা ছিল। তাই ক্লান্তির যদিও আর অবধি ছিল না, তথাপি ধীরে ধীরে পায়ে হাঁটিয়াই চলিলাম।

মানচিত্রে দেখা যাইবে, দাতার-পীর পাহাড়ের জুড়ি উত্তরে যে এক পাহাড় আছে (নাম জানিতে পারি নাই) সেই পাহাড় ও গির্ণার পাহাড়ের মধ্যে একটি বেশ আয়ত উপত্যকা আছে। রৈবতক পাহাড় হইতে উহার উপর দিয়া ছোট ছোট ঝরণাও নামিয়া আসিয়াছে। এই ঝরণাগুলির নির্গম পথ আটকাইয়া যদি একটি বৃহৎ বাঁধ দেওয়া যায় তবে প্রায় সমগ্র উপত্যকাটি জুড়িয়া একটি বৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলাম, এরূপ কোন বাঁধের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় কি-না। কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়াও তেমন কিছু চোখে পড়িল না। কিছু দূর হাঁটিতেই রাস্তার দুই ধারেই দুইটি পাহাড়ে নদীর খাত দেখা দিল। দুটিরই মধ্য দিয়া ক্ষীণ এবং অগভীর জলস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। দামোদর কুণ্ড পার হইয়া বাঁ দিকের স্রোতটি একটি পুলের নীচ দিয়া দক্ষিণ দিকের স্রোতে যাইয়া মিশিয়াছে। পশ্চিম দিকে কিছু অগ্রসর হইলেই এই মিলিত জলস্রোতের খাতের আড়াআড়ি একটি প্রাচীন বাঁধের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। রাস্তা হইতে ইহা একেবারে পাহাড়ের গায়ে যাইয়া ঠেকিয়াছে। আমার বোধ হইল ইহাই সেই প্রাচীন মৌর্য্য আমলের বাঁধের ভগ্নাবশেষ। মানচিত্রে যথাস্থানে ইহা দেখান হইয়াছে। সুদর্শনকে আমরা হ্রদ ভাবিয়া প্রকাণ্ড ব্যাপার বলিয়া ঠাওরাইয়া রাখিয়াছি। শিলালিপিতে কিন্তু উহাকে হ্রদ বলে নাই, বলিয়াছে 'তড়াক'—অর্থাৎ দীঘি বা বড় জলাশয়। আমার বোধ হয়, পশ্চিম দিকে চলিতে হাতের ডান ধারে যে ভগ্ন বাঁধ দেখিলাম উহা দ্বারাই সুদর্শন তড়াক বা তড়াগের সৃষ্টি হইয়াছিল। গির্ণারের নীচের উপত্যকায় সুদর্শন হ্রদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তাহার মাইল-দেড়-মাইল দূরে ঐ প্রতিষ্ঠার কাহিনী পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া রাখিবার সার্থকতা দেখা যায় না। কাছেও তো অনেক পাহাড় পাথর আছে! কিন্তু ঐ ভগ্ন বাঁধটি হইতে পাশার গুটির আকৃতির শিলালিপি শৈল অতি অল্পই দূর। ইচ্ছা ছিল, নীচে নামিয়া যাইয়া বাঁধটি পরীক্ষা করিয়া দেখি। কিন্তু তখন সন্ধ্যা আসন্ন, ক্লান্তিতেও উদ্যমপ্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়।

শিলালিপির পাথর সমন্বিত মন্দিরটি ছাড়াইয়া সুভদ্রা হরণ প্রসঙ্গ মনে ভাবিতে ভাবিতে জুনাগড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই স্থান হইতে জুনাগড়ের পূর্ব্ব সিংহদ্বার আধ মাইলের বেশী হইবে না। মহাভারতের সুভদ্রাহরণ প্রসঙ্গ একটি অতি চমৎকার কাব্যরসস্পৃক্ত ঘটনা। কাশীদাস হইতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই উহাতে যথাসাধ্য রং ফলাইয়াছেন এবং বাঙ্গালী সাহিত্য রসিকগণের স্মৃতিতে উহা চির-উজ্জ্বল আনন্দময় চিত্রের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত। দ্রৌপদীর সম্বন্ধে পাঁচ ভাই মিলিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন, একজন যখন দ্রৌপদীর ঘরে থাকিবেন, তখন অন্য ভাইয়েরা কেহ সেই ঘরে যাইতে পারিবেন না। করিলে দ্বাদশ বর্ষ নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। দৈবক্রমে অর্জ্জুন সেই নিয়ম ভঙ্গ করিতে বাধ্য হওয়ায় নির্ব্বাসনে গেলেন। তিনি ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নির্ব্বাসনে যাইবার কালে অর্জ্জুনের বয়স বোধ হয় ২০।২২ বছরের বেশী নহে। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম কূলের সমস্ত তীর্থ দেখিয়া অবশেষে সৌরাষ্ট্রের দক্ষিণ কূলস্থ প্রভাস তীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন রৈবতক-রক্ষিত দ্বারবতীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রভাসের পূর্ব্বস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী দ্বারবতীর তখনও পত্তন হয় নাই। তিনি সেই খবর পাইলেন পিসতুত ভ্রাতা অভিন্ন হৃদয় অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন, অমনি তিনি প্রভাসে যাইয়া অর্জ্জুনকে লইয়া আসিলেন। প্রভাসে সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের চিত্র দিয়াই আমাদের নবীনচন্দ্রের 'প্রভাস' কাব্য আরব্ধ।



আলিবাবা ও ফাতিমা

শিল্পী—শ্রীযুত [illegible]নাথ [illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রভাস হইতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বাসের জন্য রৈবতক পর্ব্বতে লইয়া গেলেন এবং তথা হইতে উভয়ে দ্বারবতী পৌছিলেন। তাহার পরে রৈবতকের উৎসবে কিরূপে সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুন মোহিত হইলেন, মহাভারত হইতে সেই প্রসঙ্গ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ আমলে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মামাত পিসতুত ভাই-বোনে বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। সুভদ্রাকে দেখিয়া অর্জ্জুনের মুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ পরিহাসরসে অর্জ্জুনকে নানা কথা বলিলেন। বর্ত্তমান কালের ভাষায় অনুবাদ করিলে কথা-বার্ত্তাটা নিম্নরূপ হইয়াছিল—

কৃষ্ণ। সাবাস্ ভাই! বেশ সন্ন্যাস হচ্ছে! মেয়েটি সুভদ্রা, আমার বৈমাত্রেয় বোন্, সারণের সহোদরা; বিয়ে কর্ত্তে চাও তো বোঝ, বাবাকে বলি, আমি যেয়ে বল্‌লে তোমার ভাল হবারই কথা।

অর্জ্জুন। সুবিধা পেয়েছ, বলে নেও। আমি তো রক্ত-মাংসের মানুষ; তোমার বোন্‌টির যা' রূপ, এ বোধ হয় কাঠ পাথরও গলিয়ে দিতে পারে। অনেক ভাল জিনিসই তোমার হাত থেকে পেয়েছি। এখন তোমার চেষ্টায় যদি আমার এই কন্যারত্ন লাভ হয়, তবে যথার্থই আমার পরম মঙ্গল করলে। রহস্য ছেড়ে এখন কেমন করে সুভদ্রাকে পাব, তাই বল।

কৃষ্ণ। আমি বল্‌লেই তো বাবা স্বয়ংবরের আয়োজন করবেন। কিন্তু মেয়েদের মন তো জান? দেবাঃ ন জানন্তি। স্বয়ংবরে সুভদ্রা যদি তোমাকে বরণ না-ই করে? আমাদের ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কন্যা হরণ করে নিয়ে বিয়ে করা তো চল্‌তি প্রথা। তুমি তাই কর না কেন?

অর্জ্জুন। বেশ সোজা উপায়টি দেখিয়ে দিলে! যাদবগণের আতিথ্য গ্রহণ করে তাদের কুলকন্যা হরণ করে তাদের সঙ্গে একটা হেঙ্গাম বাধিয়ে দিই, দশ বিশটা খুন হয়ে যাক্, চমৎকার বিয়ে হবে!

কৃষ্ণ। তবে আর কি কর্‌বে? 'হা হতোঽস্মি' বলে কবিতা লিখ্‌তে আরম্ভ করে দাও! আমি বল্‌ছি, বিরোধ হবে না। তুমি যুধিষ্ঠিরের অনুমতি চেয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাও।

দূত যাইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া আসিলে একদা অর্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃগয়ার ছলে বাহির হইয়া গেলেন। "সুভদ্রা শৈলরাজ রৈবতকের অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ ও দেবগণের পূজা করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করাইয়া দ্বারকাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময় কামবাণপীড়িত কৌন্তেয় ধনঞ্জয় তদভিমুখে ধাবমান হইয়া সহসা সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী সুভদ্রাকে রথে আরোহণ করাইলেন। পুরুষ-ব্যাঘ্র অর্জ্জুন এইরূপে সুচিস্মিতা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিয়া হিরণ্ময় রথে স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া চীৎকার করিতে করিতে দ্বারকা নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তাহারা সকলে সর্ব্বতোভাবে দেবসভা সদৃশ সেই রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সভাপাল সমীপে অর্জ্জুনের বিক্রম বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সভাপাল তাহাদিগের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃত মহাঘোষণ যুদ্ধোদ্যোগঘোষিণী ভেরীধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল।"

ইহার পরে যাদবগণের সমর সভা আহ্বান, এবং কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জ্জুনকে সম্মান সহকারে ফিরাইয়া তাঁহারই হস্তে সুভদ্রাকে শাস্ত্রানুসারে সম্প্রদান সর্ব্বজনবিদিত ঘটনা।

শিলালিপির পাথর ছাড়াইয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, কোন্ স্থানে অর্জ্জুনের সুভদ্রাকে ধরিয়া রথে তোলা সম্ভব। সেই প্রাচীন কালের রাস্তাঘাট আজিও সেই সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার মতই আছে, ইহা জোর করিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কিন্তু বিশেষ পরিবর্ত্তন যে হয় নাই, সেই বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ নাই। দুই ধারে পাহাড়ের উচ্চ এবং দুরধিগম্য প্রাচীর। পশ্চিম-মুখ হইয়া চলিতে হাতের বাঁয়ে এক রাস্তা যাইয়া জুনাগড়ের পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। এই রাস্তার কোন শাখা নগর-প্রাচীরের বাহির দিয়া দক্ষিণ দিকে যায় নাই। কিন্তু উত্তরের পাহাড় এবং নগর-প্রাচীরের মধ্যে যে ফাঁক আছে, ঐ ফাঁক দিয়া একটি বেশ বিস্তৃত রাস্তা রৈবতকে যাইবার রাস্তা হইতে বাহির হইয়া রৈবতক পর্ব্বতমালার উত্তর দিক ঘেঁসিয়া পূব দিকে চলিয়া গিয়াছে। সুভদ্রাকে হরণ করিয়া অর্জ্জুন এই রাস্তায়ই ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের রাস্তাঘাটের সংস্থান দেখিয়া এই প্রকারই তো বোধ *হয়। মানচিত্রে 'ভগ্ন' শব্দটি যে স্থানে লিখিত, এমনি স্থানে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে গ্রহণ করিয়া রথে উঠাইয়া*

থাকিবেন। যাদবেরা সৌরাষ্ট্রে মাত্র ৭০।৮০ বছর কাল অবস্থান করিয়াছিল। মৌষল যুদ্ধের পরে অর্জ্জুন সমস্ত যাদববংশকে সৌরাষ্ট্র হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অল্পকালব্যাপী যাদব অধিকারের ফলেই সুভদ্রা হরণের মত এমন প্রসিদ্ধ ঘটনারও কোন স্মৃতিচিহ্ন আজ ঘটনাস্থানে নাই। এমন কাব্যরসিক প্রত্নপ্রেমিক ধনী কি ভারতবর্ষে কেহ নাই যিনি জুনাগড়গামী রাস্তা এবং ঐ রাস্তা হইতে উত্তরে প্রস্তুত রাস্তার সঙ্গম স্থলে অর্জ্জুন-সুভদ্রার যুগল মূর্ত্তি সমন্বিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের এই চিরনবীন রোমান্সকে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রূপ প্রদান করেন?

সহরে ঢুকিয়া যমুনা রাও একখানা টাঙ্গা ডাকাইয়া আনিল। সিগারেটের জন্য আট আনা গছাইয়া দিয়া এই সঙ্গীতানুরাগী দিনেকের সঙ্গী প্রিয়দর্শন যুবকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন দুপুরে নবাব আলি সাহেব সঙ্গে করিয়া পাব্লিক লাইব্রেরী ও কলেজ দেখাইয়া নিজের গাড়ীতে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলেন। দক্ষিণ হইতে গাড়ী আসিলে তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। একখানা কক্ষ একেবারে খালিই পাইলাম—আর—লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে,—কৃষ্ণের দ্বারবতীর দিকে চাহিয়া, রৈবতক শিখরের দিকে চাহিয়া অঝোরে চোখের জল ফেলিতে লাগিলাম। কেন, কেমন করিয়া বুঝাইব?

বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের উৎপত্তি ও পরিণতি

স্বামী সুন্দরানন্দ

খৃঃ পূঃ ৪৮৩ শতাব্দীতে ভগবান শ্রীবুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভের পর তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ রাজগৃহে সমবেত হইয়া "প্রথম বৌদ্ধ সম্মেলন" আহ্বান পূর্ব্বক তদীয় ধর্ম্মমত লিপিবদ্ধ করেন। সঙ্ঘনেতা স্থবীর মহাকাশ্যপ ইহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান তথাগতের সহচর ও প্রিয় শিষ্য স্থবীর আনন্দ "ধর্ম্ম" (Law of Buddhism) এবং স্থবীর উপালী "বিনয়" (Rule of Buddhism) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন। পরে সম্মিলিত ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে সঙ্গীতের ধরণে উচ্চারণান্তর সভার মন্তব্য পরিগৃহীত হয়। এই জন্য এই ধর্ম্মসম্মিলনী বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে "ধর্ম্মসংগীতি" নামে বিখ্যাত।

ইহার এক শতাব্দী পরে ধর্ম্ম ও বিনয় সম্বন্ধে ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ মীমাংসার জন্য বৈশালী নগরে দ্বিতীয় "ধর্ম্মসংগীতি"র অধিবেশন হয়। যাঁহারা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা "থেরবাদী" বলিয়া পরিচিত; এবং মতদ্বৈধতা বশতঃ যাঁহারা ইহাতে উপস্থিত না হইয়া কৌসাম্বী নামক নগরে একটী পৃথক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহাসঙ্ঘিকা বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থে প্রখ্যাত। এই দুইটী প্রধান মত পরবর্ত্তী এক শতাব্দীর মধ্যে অষ্টাদশটী মতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়।

থেরবাদের অর্থ স্থবীরবাদ। ইহা হইতে বৎসিপুত্র, মহিষাশক, ধর্ম্মগুপ্তিকা, সৌত্রান্তিক, সর্ব্বাস্তিবাদ, কাশ্যপিয়, সংক্রান্তিবাদ, সামান্তিয়, সন্নাগরিক, ভদ্রযনীয় ও ধর্ম্মোত্তরীয় এবং মহাসঙ্ঘিকা হইতে এক-ব্যবহারিক, গোকুলিক, বহুশ্রোতীয়, চৈত্তিক ও প্রজ্ঞাপ্তীবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রধানতঃ ভগবান শ্রীবুদ্ধের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ধারণা মূলে এই বিভিন্ন মতবাদ প্রসার লাভ করে। কোন সম্প্রদায় শ্রীবুদ্ধকে অতিমানব ও কোনটী তাঁহাকে ভগবান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আবার কোন মতে তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু হয় নাই বলিয়া ব্যাখ্যাত। এক সম্প্রদায় বলেন, শ্রীবুদ্ধের জীবনের ঘটনা যাহা পাওয়া যায় উহা সত্য নহে। অপর মতে জাগতিক সকল বিষয়ই মায়ার অন্তর্গত সুতরাং অবিশ্বাস্য ইত্যাদি। এই সকল মতানুসরণকারিগণ তাঁহাদের মতের সত্যতা প্রমাণার্থ শ্রীবুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক অনৈতিহাসিক ও অস্বাভাবিক গল্পের অবতারণা করিয়া থাকেন।

এই মতবাদসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য শ্রীবুদ্ধের মহানির্ব্বাণ লাভের দুই শতাব্দী পরে পাটলীপুত্র নগরে অশোকারাম বিহারে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের আহ্বানে তৃতীয় "বৌদ্ধধর্ম্ম সংগীতি"র অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক বয়োবৃদ্ধ বিখ্যাত ভিক্ষু যোগদান করিয়াছিলেন এবং স্থবীর মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য ইহাতে সভাপতির সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মতবিরোধপ্রযুক্ত অপর একদল ভিক্ষু ইহাতে যোগদান না করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারে সমবেত হইয়া পৃথক একটী সম্মেলন গঠন করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত সভা হইতে সর্ব্বাস্তিবাদ এবং পরে মহাযান মতের উৎপত্তি হয়।

রাজা অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্যরাজগণও বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অসংখ্য স্তূপ ও বিহার তাঁহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ পুষ্যমিত্র হত্যা করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করতঃ

শুঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা পুষ্যমিত্র ও অন্যান্য শুঙ্গরাজগণ হিন্দুধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্মের 'বাহন" সংস্কৃতভাষা বিশেষ প্রসার লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থাপনের জন্য স্মৃতি ও সংহিতাদি রচিত হয়। ভিক্ষুগণ এই সময় নিরুপায় হইয়া মগধরাজ্যের বাহিরে যাইতে বাধ্য হন। ইহার ফলে স্থবীরবাদিগণ সাঁচি এবং সর্ব্বাস্তিবাদিগণ মথুর প্রদেশান্তর্গত উরুমুণ্ড নামক নগরে যাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং প্রথমোক্ত সম্প্রদায় মাগধী বা পালী ভাষায়ই উহাকে রক্ষা করেন। কালক্রমে মথুরের সর্ব্বাস্তিবাদ মগধের সর্ব্বাস্তিবাদ হইতে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া 'আর্য্য সর্ব্বাস্তিবাদ' নাম ধারণ করে।

মথুর ও তক্ষশীলার গ্রীক্ রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা উভয় বাদকেই সমান ভাবে সমর্থন করিতেন। অতঃপর কুশানবংশীয় রাজা কণিষ্ক পেশোয়ারে রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি গোঁড়া সর্ব্বাস্তিবাদী ছিলেন। ইহাঁর সময় ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ বিস্তার লাভ করে। ইনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ বসুমিত্র ও অশ্বঘোষের সাহায্যে সুবিখ্যাত গান্ধার ও কাশ্মীর বৌদ্ধমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানার্থ একটী ভিক্ষুসম্মিলনী আহ্বান করেন। ইহা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উপর 'বিভাস' নামক প্রসিদ্ধ টীকা প্রণীত হয়। এইজন্য সর্ব্বাস্তিবাদিগণ 'বৈভাসিক' নামেও পরিচিত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৈভাসিকগণ ভারতের উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণে বিদর্ভ প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জ্জুন "শূন্যবাদ" সংকলন পূর্ব্বক মহাযান মতকে বিশেষ প্রসারিত করিয়াছিলেন। প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযান মতের প্রধান ত্রিপিটক। খৃষ্টির চতুর্থ শতাব্দীতে বসুবন্ধু "অভিধর্ম্মকোষ" রচনা করতঃ সৌত্রান্তিক এবং তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গ যোগাচার মত প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই শতাব্দীর শেষভাগে সৌত্রান্তিক, বৈভাসিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার এই চারিটি মত বৌদ্ধধর্ম্মে বর্ত্তমান ছিল। প্রথমোক্ত দুইটী মত নির্ব্বাণলাভের তিনটী প্রণালী, যথা, বুদ্ধজ্ঞান, প্রত্যেক বুদ্ধজ্ঞান ও অরহৎজ্ঞান এবং শেষোক্ত দুইটী কেবলমাত্র বুদ্ধজ্ঞান স্বীকার করেন। বুদ্ধজ্ঞানবাদিগণ আপনাদিগকে উন্নত মতাবলম্বী মনে করিয়া 'মহাযান' এবং অপর মতাবলম্বীদিগকে অবজ্ঞাভরে 'হীনযান' নামে অভিহিত করেন। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থান হীনযান এবং তিব্বত, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে মহাযানের প্রাধান্য বর্ত্তমান। মহাযান সম্প্রদায় তাঁহাদের মতবাদ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারার্থে অরহৎ সারীপুত্র মৌদ্গল্যায়ন, বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও আকাশগর্ভ প্রভৃতির দেবত্ব প্রচার করেন। কথিত আছে যে সম্রাট কণিষ্কের সময়ে শ্রীভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রথম নির্ম্মিত হয় এবং মহাযান মত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিপূজা বিশেষ বিস্তার লাভ করে। প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা, বিজয়া প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবী এই সময় হইতে পূজিত হন। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্য শঙ্কর ভগবান শ্রীবুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকল দেবদেবীকে একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপাভিব্যক্তি জ্ঞানে পৃথক্ পৃথক ব্রহ্মাকারা ধ্যানে সমন্বিত করতঃ হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত করিয়া লন। ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা বিস্তার লাভ করে।

মহাযান সম্প্রদায়ের পূর্ণ প্রাধান্যের সময় বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত এবং বজ্রযান বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মহাযান মতই ভারতীয় বৌদ্ধদের একমাত্র ধর্ম্মমত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহাযানের এক সম্প্রদায়কে বজ্রযান বলা হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত, কবি ও ভিক্ষুর নাম দৃষ্ট হয়। ইহাঁদের উপাসনা-পদ্ধতিতে তান্ত্রিক মতের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। হিন্দু তান্ত্রিক মত যে প্রধানতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের হিন্দু সংস্করণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভিক্ষু অসঙ্গবজ্র তদীয় শিষ্য উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রভূতির সাহায্যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ের উপাসনাপদ্ধতি গোপন ভাবে রক্ষার্থ সাধারণের অবোধগম্য "সান্ধ্যভাষা" নামক একটী ভাষা প্রবর্ত্তিত হয়। এই ভাষায় প্রত্যেক শব্দের ধর্ম্ম ও কাম বোধক দ্বিবিধ ব্যাখ্যা চলিত। এই ভাষায় "উপায়" শব্দে "পুরুষ", "প্রজ্ঞা" শব্দে 'স্ত্রী" এবং "অমৃত" শব্দে মদ্য বুঝায়। এই মতের প্রধান ব্যক্তিগণ সিদ্ধাচার্য্য বলিয়া সম্মানিত হইতেন এবং ইহাঁরা অদ্ভুত পরিচ্ছদ ও নরকঙ্কালাদি ধারণ করতঃ শ্মশানে ও অরণ্যে বাস করিতেন। স্ত্রী, মদ্য, মাংস এই মতে সাধনের অঙ্গ ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মে এই তান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে আচার্য্য শঙ্কর ও পরবর্ত্তী হিন্দু রাজগণের হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ ও উড়িষ্যায় আশ্রয় লাভ পূর্ব্বক তান্ত্রিক মতবাদে পরিণতি লাভ করে। এই সময় বঙ্গ ও উড়িষ্যায়ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মস্তকোত্তোলন করতঃ বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া লইতে থাকেন। বঙ্গের পালরাজগণ হিন্দু তান্ত্রিক মতের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে জনৈক পালরাজ 'উদন্তপুরী' নামক স্থানে এক বিরাট তান্ত্রিক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক অপেক্ষা বিদ্যা, নৈতিক চরিত্র এবং ধর্ম্মে উন্নত ছিলেন। ফলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাব সাধারণ্যে ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে। অতঃপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ বঙ্গে আগমন করিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের উপর সমান অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহার ফল স্বরূপ নবজাগ্রত হিন্দুধর্ম্ম কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম পতনের মুখে হিন্দুধর্ম্মের বিরাট অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া তাঁহার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হন।

তনুমনপ্রাণ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(লঘুগুরু ছন্দ)

ঝর' ঝর্ঝরি' আজি পরাণে···
সেথা যত মরু-জ্বালা মৌন, নিরালা—
তব বসন্ত-অবদানে
হোক প্রফুল্ল পল্লব ; হে রসবল্লভ,
নন্দিত কর' তব ভাষে।
যত পঙ্কিল কঙ্কর পঙ্কজি' ভরভর
উঠুক গন্ধি' গগনাশে।
হোক প্রতিটি পরাজয় সার্থক-সঞ্চয়
নব নব জয় উদ্ভাসি'।
রাতি বিষণ্ণ, বন্দী অরুণানন্দী
বর্ণে ছন্দি' উছাসি'
উষা মঞ্জরিকা যত হিম-মূর্চ্ছাহত
মৃত-সঞ্জীবন গানে
যেন দোলে নূতন নন্দন-দীপন-
মেলন তারণ-তানে।
এস তিমির-তুহিন দলি', প্রিয় হে!
দিব অন্তর অঞ্জলি, প্রিয় হে!
কর' কুহেলি-বাধা
সুরেলি গাথা
কণ্টক—কনকলি, প্রিয় হে!

কর' মানস উজ্জ্বল এসে
তব অতিমানস-রস- রাসে পরবশ
বন্ধন নাশি' নিমেষে।
নীল আরোহণ মম মণি-ইঙ্গিত সম
রঞ্জি' নিখিল নব ফাগে
চাহে বিষ অবরোহণ জিনি' অম্বর-স্বন
রণিতে গৌরব রাগে।
যত ছায়ালেখা পাণ্ডুর-রেখা
তব রূপ-ধ্যানে সাঁঝে
যেন অস্ত-বিলগ্না অহনা ধন্যা
বন্দে ;—চিন্তা মাঝে
যেন মায়া-শৃঙ্খল না ঝননে ;— ছল
ঈর্ষা উদার মন্ত্রে
হোক্ রূপান্তর-পণ— আত্ম-বিসর্জ্জন-
সুষমা-স্পন্দন তন্ত্রে।
এস তামস-নাশন প্রিয় হে!
এস অঘটন-সাধন প্রিয় হে!
যত বিষণ্ণ-ভাবন
বিচার-বিলসন
তুমি কর' বারণ—প্রিয় হে!

কর' কায়া মম রবি-রঙ্গী
দাও আশীর্ব্বাদে কৃপণ-প্রমাদে
দূরি' অনন্তে সঙ্গী।
চির- অলকানন্দা দীপ্তি অবন্ধ্যা
কর' হে অচল-প্রতিষ্ঠা।
যত ম্লান ভগ্ন-ব্রত, প্রাণ-স্বপ্ন হত,
মন্থর বিলাস-নিষ্ঠা—
তব মলয়োল্লাসে অভয়োদ্ভাসে
নবঘনশ্যাম-পরাগে
যেন নব চপলা ঝলি' দেহে সঞ্চলি'
নব সুর তালে জাগে।
যেন বিধবা আশা জপি' তব ভাষা
উছলে নবতনুভঙ্গী—
ভাঙি' লহরী লাস্যে অতীত দাস্যে,
নিগড়ে মুক্তি তরঙ্গি'।

এস দুরন্ত ঝলকে প্রিয় হে!
এস জ্বলন্ত পুলকে প্রিয় হে!
যবে জ্বলে অরুণ কম—
যুগ-পুঞ্জিত তম
মিলায় পলকে—প্রিয় হে!

লঘুগুরু ছন্দ মাত্রাবৃত্তেরই সগোত্র, কেবল ইহাতে সংস্কৃত ভঙ্গিতে আ ঈ উ এ ও দুই মাত্রা—এই তফাৎ।

বেদে বিজ্ঞানের কথা

রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর সি-আই-ই

(৫)

বায়ু—

(১) বায়ুর রূপ নাই। কিন্তু ইহার শব্দ শুনা যায়। বায়ুর অপর নাম বাত।

আত্মা দেবানাং ভুবনস্য গর্ভো
যথাবশং চরতি দেবঃ এষঃ।
ঘোষা ইদস্য শৃণ্বিরে ন রূপং
তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম ॥

ঋগ্বেদ ১০।১৬৮।৪

অন্বয়ঃ—এষঃ দেবঃ—দেবানাং আত্মা—ভুবনস্য গর্ভঃ যথাবশং চরতি—ইদস্য ন রূপং—ঘোষা শৃণ্বিরে তস্মৈ বাতায় হবিষা বিধেম।

অস্যার্থঃ—

এষঃ দেবঃ = এই দেব (বায়ু বা বাত)

দেবানাং আত্মা = দেবতাদিগের (প্রাণীগণের) আত্মা-স্বরূপ

ভুবনস্য গর্ভঃ = ভুবনের সন্তান স্বরূপ

যথাবশং চরতি = যথা ইচ্ছা বিহার করেন

ইদস্য ঘোষাঃ শৃণ্বিরে = ইহার নানা প্রকার শব্দ শুনা যায়

ন রূপং = ইহার রূপ নাই

হবিষা বিধেম = আইস—হবি দিয়া সেই বায়ুর পূজা করি

বঙ্গানুবাদঃ—এই বায়ু দেব প্রাণীগণের আত্মা স্বরূপ—ভুবনের গর্ভজাত সন্তান স্বরূপ—ইনি যথা ইচ্ছা বিহার করেন—ইহার শব্দই অনেক প্রকার শুনা যায়। আইস—হবি দিয়া সেই বায়ু দেবের পূজা করি।

(২) বায়ু সদাই চঞ্চল—

অন্তরিক্ষে পথিভিরীয়মানো
ন নিবশতে কত মচ্চ নাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা ঋতাবা
ক্বস্বিজ্জাতঃ কুত আবভূব ॥ ঋগ্বেদ ১০।১৬৮।৩

অন্বয়ঃ—অন্তরিক্ষে পথিভিঃ ঈয়মানঃ কতমৎ চ আহঃ ন নিবশতে—অপাং সখা—ঋতাবা প্রথমজা ক্বস্বিজ্জাতঃ কুতঃ আবভূব?

অস্যার্থঃ—

(এই বায়ু) অন্তরিক্ষে পথিভিঃ ঈয়মানঃ = আকাশপথে গতিবিধি করিবার সময়

কতমৎ চ আহঃ ন নিবশতে = কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না

অপাংসখা = ইনি জলের বন্ধু

প্রথমজা = জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন

(অর্থাৎ আগে বায়ু বেগে বহিতে থাকে—পরে বৃষ্টি হয়)

ঋতাবা = ইনি সত্যস্বরূপ

ক্বস্বিৎজাতঃ = ইনি কোথায় জন্মিয়াছেন (বল দেখি)

কুতঃ আবভূব = কোথা হইতে আসিতেছেন?

বঙ্গানুবাদঃ—এই বায়ুদেব—আকাশ পথে গতিবিধি করিবার সময়—কোন দিনই স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন না। ইনি জলের বন্ধু এবং জলের অগ্রে উৎপন্ন হয়েন।

(অর্থাৎ অগ্রে বায়ু বহিতে থাকে পরে বৃষ্টি হয়) বল দেখি—ইহার জন্মই বা কোথায় এবং কোথা হইতেই আসিতেছেন?

(৩) বায়ু অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করে

অজনয়ো মরুতো বক্ষণাভ্যো
দিবি আ বক্ষণাভ্যঃ। ঋগ্বেদ ১।১৩৪।৪

বঙ্গানুবাদঃ—হে বায়ুদেব—তুমি বৃষ্টি ও নদীদিগের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ।

অর্থাৎ—তুমিই মেঘ সকলকে চালিত করিয়া আন—যাহা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হয় এবং সেই বৃষ্টির জলে নদী সকল প্রবাহিত হয়।

(৪) বায়ু ভারাক্রান্ত হইলে নীচের দিকে আসে—আবার সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইলে উর্দ্ধ দিকে যায়।

ন্যগ্‌বাতোঽব বাতি

ন্যক্তপতি সূর্য্যঃ। ঋগ্বেদ ১০।৬০।১১

বঙ্গানুবাদ :—বায়ু ভারাক্রান্ত হইলে নীচেই থাকে, পরে সূর্য্যাদির উত্তাপে উত্তপ্ত হইলে উর্দ্ধগামী হয়।

(৫) বায়ু স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষে ক্ষিপ্রা গতিতে প্রবাহিত হয়। ইহার গতি রোধ করা কাহারও সাধ্য নহে।

ইমে যে তে সু বায়ো বাহ্বোজসোঽন্তর্নদী
তে পতয়ন্ত্যুক্ষণো মহি ব্রাধন্ত উক্ষণঃ।
ধন্বঞ্চিদ্যে অনাশবো জীরাশ্চিদগিরৌকসঃ
সূর্য্যস্যেব রশ্ময়ো দুর্নিয়ন্তবোঽহস্তয়ো দুর্নিয়ন্তবঃ॥

ঋগ্বেদ—১।১৩৫।৯

বঙ্গানুবাদ :—হে বায়ু এই যে তোমার বলশালী অল্প বয়স্ক বৃষ সদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট অশ্বগণ আছে, ইহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করিতেছে। ইহারা অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না। ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রাগতি ভৎসনায় ইহাদের গতি রোধ হয় না—সূর্য্যকিরণের ন্যায় ইহাদের গতিরোধ করা দুঃসাধ্য—হস্তদ্বারা ইহাদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য।

(৬) বায়ু ত্বষ্টার জামাতা—

বায়বৃতস্পতে ত্বষ্টুর্জামাতারদ্ভুত। ঋগ্বেদ ৮।২৬।২১

বঙ্গানুবাদ :—হে ত্বষ্টার জামাতা অদ্ভুত বায়ু ত্বষ্টা শব্দের অর্থ বিশ্বকর্ম্মা; এবং ত্বষ্টা সূক্ষ্মাকৃতের নাম অর্থাৎ Ether (আকাশাৎ বায়ুঃ)।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন—Ether কম্পান্বিত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়।

সুতরাং বায়ু ব্যোমে জামাতার ন্যায় অতি সমাদরেই বাস করেন। কিন্তু উহার স্ত্রীর নাম কোথাও উল্লেখ নাই।

(৭) বায়ু মৃদুমন্দ বহিলে সুখকর।

নির্যুবাণো আশস্তী নিযুত্বাঁ ইন্দ্র সারথিঃ
বায়বা চন্দ্রেণ রথেন যাহি সুতস্য পীতয়ে।

ঋগ্বেদ—৪।৪৮।২

অর্থাৎ—হে বায়ু তুমি অশান্তি দূর কর—তুমি, তোমার নির্যুৎগণ তোমার সারথি ইন্দ্র—তোমরা সকলেই সোমপানের জন্য আহ্লাদ কর, রথে আগমন করিয়া সুখ বিতরণ কর।

বায়ুর অশ্বগণের নাম নির্যুৎ।

(৮) ঝড় বা ঝঞ্ঝাবাত।

বাতস্য নু মহিমানং রথস্য
রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবি স্পৃশ্যাত্যরুণানি কৃণ্বন্নুতো
এতি পৃথিব্যা রেণমস্যন॥ ঋগ্বেদ ১০।১৬৮।১

অর্থাৎ—যে বায়ু রথের ন্যায় বেগে ধাবিত হন—তাঁহার বিষয় আমি বর্ণনা করিতেছি। ইহার শব্দ বজ্রের শব্দের ন্যায়, ইনি বৃক্ষাদি ভঙ্গ করিতে করিতে আসেন। ইনি চতুর্দ্দিক রক্তবর্ণ করিতে করিতে আকাশ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন। অপিচ পৃথিবীর ধূলি বিকীরণ করিতে করিতে চলিয়া যান।

(৯) বায়ু পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করেন।

সং প্রেরতে অনু বাতস্য বিষ্ঠা
ঐনং গচ্ছন্তি সমনং ন যোষাঃ।
তাভিঃ সযুক্‌সরথং দেব ঈয়তে
অস্য বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা॥২

ঋগ্বেদ ১০।১৬৮।২

অর্থাৎ—সুস্থির পদার্থ অর্থাৎ পর্ব্বতাদি পর্য্যন্ত বায়ুর গতিবশে কম্পমান হইতে পাকে। ঘোটকীরা যেমন যুদ্ধে যায়—তদ্রূপ এই বায়ুর দিকে গমন করে, তিনি সেই ঘোটকীদিগকে সহায় পাইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই সমস্ত ভুবনের রাজার ন্যায় চলিয়া যান।

(১০) আবার যখন অগ্নির পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হন—তাহার ফল কি ভয়ঙ্কর।

(হে অগ্নি) যদাতে বাত অনুবাতি
শোচিবপ্তেব শ্মশ্রু
বপসি প্রভূম। ১০।১৪২।৪

অর্থাৎ—হে অগ্নি, বায়ু যখন তোমার পশ্চাতে বহিতে থাকে, তখন আর রক্ষা নাই—নাপিত যেমন মানুষের শ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া দেয়, তেমনি ভাবে তুমি বায়ুর সাহায্যে বহু প্রদেশ একেবারে মুণ্ডন করিয়া দাও।

বায়ুর অপর নাম অগ্নিসখা। কারণ আগুন প্রজ্জ্বলিত

হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে তথায় বায়ু প্রবল বেগে আসিয়া জুটে।

(১০) পুনরায়—বায়ু হিতকর ও অহিতকর দ্বিবিধ আছে।

আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্রূপঃ
ত্বংহি বিশ্ব ভেষজো দেবানাং দূত ঈয়সে॥

ঋগ্বেদ—১০।১৩৭।৩

অন্বয়ঃ—(হে বায়ো)—ভেষজং বাহি আবাত—যদ্রূপঃ বি বাত বাহি—ত্বং হি বিশ্ব ভেষজঃ দেবানাং দূতঃ ঈয়সে।

অন্বয়ার্থ:—(হে বায়ু—তুমি)

ভেষজং বাহি আবাত্য=তুমি এই দিকে ঔষধ বহিয়া আন।

যদ্রূপঃ বি বাত বাহি=যাহা অহিতকর বায়ু, তাহা এই দিক হইতে বহিয়া লইয়া যাও।

ত্বং হি বিশ্ব ভেষজঃ=যেহেতু তুমিই বিশ্বসংসারের ঔষধ স্বরূপ।

দেবানাং দূতঃ ঈয়সে=তুমিই দেবগণের দূতস্বরূপ হইয়া যাও।

বঙ্গানুবাদ:—হে বায়ু—তুমি এই দিকে ঔষধ বহিয়া আন এবং যাহা অহিতকর তাহা এই দিক হইতে বহিয়া লইয়া যাও—যেহেতু তুমিই সংসারের ঔষধ স্বরূপ—তুমিই দেবতাদিগের দূত হইয়া যাও।

তাই—উলঋষিও বায়ুর আরাধনা করিতে করিতে বলিয়াছেন—

(১১) বাত আ বাতু ভেষজং
শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।
প্রাণ আয়ুঁষি তারিষৎ।১
উতবাত পিতাসি ন উত
ভ্রাতোতনঃ সখা।
স নো জীবাতবে কৃধি॥২
যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য
নিধির্হিতঃ।
ততো নো দেহি জীবসে॥৩

ঋগ্বেদ—১।১৮৬।১-৩

বায়ু ঔষধের ন্যায় হইয়া বহিতে থাকুন—তিনি কল্যাণকর ও সুখকর হউন। তিনি দীর্ঘ আয়ুঃ দান করুন।১

হে বায়ু—তুমি আমাদের পিতা ভ্রাতা ও সখা সদৃশ-এতাদৃশ তুমি আমাদের জীবনের ঔষধ করিয়া দাও।২

হে বায়ু—তোমার গৃহমধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে—তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও—আমাদিগকে জীবন দান কর।৩

(১২) বায়ুর নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ—

বায়ুর্যুংক্তে রোহিতা বায়ুররুণা বায়ুরথে অজিরা
ধুরি বোঢ়বে বহিষ্ঠা ধুরি বোঢ়বে।

ঋগ্বেদ ১।১৩৪।৩

বঙ্গানুবাদ:—বায়ুর নিত্য সঙ্গী রোহিত, অরুণ ও অজিরা ইহারা সকলেই বায়ুর ভার গ্রহণে নিপুণ। ইহাকেই বৈজ্ঞানিকেরা বলেন Ca·bon. Hydrogen and Oxygen.

এখানেও সেই রূপক (metaphor) ব্যবহৃত হইয়াছে বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ। নিযুৎ অর্থাৎ যাহার সহিত কোনরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় না। সুতরাং নিরন্তর সহগামী।

ইহার পূর্ব্ব ঋকে উহা স্পষ্ট করিয়া লিখিত আছে—

মন্দন্তু ত্বা মন্দিনো বায়বিন্দবো দৃস্মৎক্রাণাসঃ সুকৃতা
অভিদ্যবো গোভিঃ ক্রাণা অভিদ্যবঃ।
যদ্ধ ক্রাণা ইরধ্যৈ দক্ষং স চন্ত উতয়ঃ।
সধ্রীচীনা নিযুতো দাবনেধিয় উপব্রুবতু ঈং ধিয়ঃ॥

ঋগ্বেদ ১।১৩৪।২

বঙ্গানুবাদ:—হে বায়ু! মত্ততাজনক, হর্ষোৎপাদক, সম্যক্ প্রস্তুত, উজ্জ্বল হূয়মান সোমবিন্দু সকল তোমার অভিমুখে গমন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্ম্মকুশল প্রীতিযুক্ত, তোমার নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ তোমার উৎসাহ দেখিয়া হব্যস্বীকার জন্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞভূমিতে আসিতেছে। ইত্যাদি

(১৩) উল ঋষি বায়ুকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

যদদো বাত তে গৃহেঽমৃতস্য নিধির্হিতঃ
ততো নো দেহি জীব সে।

ঋগ্বেদ ১০।১৮৬।৩

অর্থাৎ

হে বায়ু—তোমার গৃহ মধ্যে ঐ যে অমৃতের নিধি সংস্থাপিত আছে—তাহা হইতে অমৃত লইয়া দাও, আমাদিগকে জীবন দান কর।

এই স্থানে টীকাকারগণ বলেন—পরম দয়ালু পরমেশ্বর জীবগণের হিতার্থে জল ও বায়ু সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ অবস্থায়

প্রদান করিয়া থাকেন—কিন্তু জীবগণ নিজ দোষেই ও নির্বুদ্ধিতা হেতু ঐ জল ও বায়ু বিষাক্ত করিয়া তুলে।

ঐ বিষাক্ত জল ও বায়ু বিশুদ্ধ করণের উপায় দুইটী—১ম—ঈশ্বরকৃত (২) জীবকৃত।

(১ম) অগ্নিরূপ সূর্য্য ও সুগন্ধরূপ পুষ্পাদি ও নিম্বকাদি বহুবিধ বৃক্ষ দ্বারা জল ও বায়ুর যেরূপ শুদ্ধি হয় তাহা পরমেশ্বর কৃত শুদ্ধি। এই সূর্য্য নিরন্তর সমগ্র জগতের রসকে প্রতপ্ত করিয়া উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লন আর পুষ্পাদির সুগন্ধ ও দুর্গন্ধকে নিবারণ করিয়া থাকে। এবং নিম্বকাদি নানাবিধ বৃক্ষও ঐরূপ বিশুদ্ধীকরণ জন্য পরমেশ্বর দিয়াছেন। অপর দিকে—মানব নিজ বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা এরূপ বিষাক্ত জল বায়ুকেও বিশুদ্ধ করিতে সমর্থ হন।

পরমেশ্বরের রচিত সমস্ত পদার্থের গুণ সকল বিচার করিয়া তদ্দ্বারা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করা—অর্থাৎ পরমাত্মা কোন পদার্থ কি জন্য সৃজন করিয়াছেন—তাহা জ্ঞাত হইয়া তদ্দ্বারা নিজ নিজ ইষ্ট সাধন করা।

কিন্তু হায় মানুষ এমন নির্ব্বোধ যে ইহা জানিয়া শুনিয়া ও দেখিয়াও ঐরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না।

তজ্জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্র হইতে অশ্বমেধ পর্য্যন্ত সমস্তই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এই কর্ম্মকাণ্ডে চারি প্রকার হোম করিতে হয়—

(১ম) সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরী কেশরাদি।

(২য়) মিষ্ট গুণযুক্ত গুড় ও মধু।

(৩য়) পুষ্টিকারক গুণযুক্ত দ্রব্য সকল যথা—ঘৃত, দুগ্ধ ও অন্নাদি।

(৪র্থ) রোগনাশক গুরুচী ও সোমলতাদি ওষধি প্রভৃতি। এই চারি প্রকার দ্রব্যের পরস্পর শোধন, সংস্কার ও যথাযোগ্য মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে যুক্তিপূর্ব্বক হোম করিলে—তাহা বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধিকারক স্বরূপ হইয়া সমগ্র জগতের সুখ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে।

এ বিষয়ে অধিক বলার প্রয়োজন নাই।

যেরূপ ডাউল ও ব্যঞ্জনাদিতে সুগন্ধ মসলা এবং চামচ্ বা হস্তদ্বারা ঘৃত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রক্ষেপ করিলে সমস্ত পদার্থই সুগন্ধিত হয়—সেইরূপ যজ্ঞ হইতে যে বাষ্প বা ধূম উত্থিত হয়, তাহা বায়ু ও বৃষ্টির জলকণা সমূহকে নির্দ্দোষ ও সুগন্ধিত করিয়া সমস্ত জগতের সুখদায়ক হইয়া থাকে।

এই হেতু ঐ সকল যজ্ঞাদি পরোপকারার্থেই সাধিত হয় এবং সংস্কৃত দ্রব্যাদির দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিগণ হোমাদি সুসম্পন্ন করিয়া নিজেও আনন্দ প্রাপ্ত হন।

তবে হোমের দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া এবং হোমকর্ত্তার হোম করিবার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাযুক্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই প্রকার যজ্ঞ করিলে যজ্ঞাদির সুফল সুনিশ্চিত পাওয়া যায়।

এই নিমিত্তই বেদে যজ্ঞাদির কর্ত্তা সম্বন্ধে বারম্বার লিখিত হইয়াছে।

অত্র প্রমাণম্ (শত পথ ব্রাহ্মণ বা ৫।অ ৩)

অগ্নের্ব্বৈ ধূমো জায়তে, ধূমাদভ্রমভ্রাদ্ বৃষ্টিরগ্নের্বা
এতা জায়ন্তে—তস্মাদাহ তপোজা ইতি।

(শঃ কাং ৫ অং ৩)

অর্থাৎ হোম জন্য যে যে দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইতে ধূম ও বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেন না, পদার্থ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উহাকে পৃথক্ পৃথক করিয়া দেওয়াই অগ্নির স্বভাব। এইরূপে পৃথক হইলে উহা লঘু হইয়া পড়ে—কাজেই বায়ুর সহিত আকাশে উত্থিত হয়। উহাতে যে জলীয় অংশ থাকে, তাহাকে বাষ্প বা তাপ কহে এবং যাহা শুষ্ক তাহা পৃথিবীর অংশ। এই উভয়ের সংযোগের নাম ধূম। যখন ঐ পরমাণু মেঘমণ্ডলে বায়ুরূপ আধারে ভাসিতে থাকে, তখন উহা পরস্পর মিলিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এই মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে ওষধি—ওষধি হইতে অন্ন—অন্ন হইতে ধাতু, ধাতু হইতে শরীর এবং শরীর হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে—

অন্নং ব্রহ্মোত্যচ্যকে জীবনস্য বৃহদ্ধেতুত্বাৎ
শুদ্ধান্ন জল বাস্বাদিদ্বারৈব প্রাণিনাং সুখংভবতি।

আর ঐ সকল পদার্থ অশুদ্ধ থাকিলে তদ্দ্বারা সকলের দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এবং শুদ্ধ হইলে তাহা হইতে প্রাণিগণের সুখোৎপত্তি হয়।

দুর্গন্ধদ্বারা বায়ু ও বৃষ্টির জল যে দোষযুক্ত হইয়া থাকে তাহা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই দোষ ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে পারে না; উহা মানুষেরই সৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য মানুষেরই উহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

এই জন্যই পরমেশ্বর মনুষ্যকে যজ্ঞ করিবার আদেশ

দিয়াছেন—যে মনুষ্য সমর্থ হইয়াও এই যজ্ঞানুষ্ঠান না করে —সে ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ হেতু পাপী হইয়া থাকে। এবং পরিণামে দুঃখ ভোগ করে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন—

যজ্ঞা দুর্গন্ধাদিবিকারস্তোৎপত্তির্মনুষ্যাদিভ্য এব ভবতি
তস্মাদস্য নিবারণমপি মনুষ্যৈরেব করণীয়মিতি।

ইহার পর কে বলিবে—যে যাগ যজ্ঞ হোমাদি নিরর্থক!

পূর্ব্বোক্ত কারণেই যজুর্ব্বেদের আদেশ এই—

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।
আস্মিন্ হব্যা জুহোতন। য—। অ ৩। ম ১।

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ—তোমরা বায়ু ও ঔষধি ও বর্ষার জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা সকলের হিতার্থে—ঘৃতাদি শুদ্ধ বস্তু ও সমিধ অর্থাৎ আম্র ও পলাশাদি কাষ্ঠ দ্বারা অতিথি রূপে অগ্নিকে নিত্য প্রকাশিত কর। এবং অগ্নিতে হোমোপযোগী পুষ্টিকারক পদার্থ দ্বারা উত্তমরূপে অগ্নিহোত্র করিয়া সকলের উপকার সাধন কর।

সমিধাগ্নিং—হে মনুষ্যা বায়ৌষধিবৃষ্টি জলশুদ্ধা পরোপকারায়।
ঘৃতৈঃ—ঘৃতাদিভিঃ শোধিতৈর্দ্রব্যৈঃ
অতিথিং—সমিধাগ্নিং
যূথং বোধয়ত—নিত্যং প্রদীপয়ত
অস্মিন্—অগ্নৌ
হব্যা—হোতুমর্হানি পুষ্টিমধুরসুগন্ধরোগনাশকৈর্গুণৈঃ যুক্তানি সম্যক্ শোধিতানি দ্রব্যাণি
আ জুহোতন—আ সমন্তাজ্জুহুত এবমগ্নিহোত্রং নিত্যং
দুবস্যত—পরিচরত
অনেন কর্ম্মণা সর্ব্বোপকারং কুরুত।

পুনশ্চ বেদে অন্যত্র লিখিত আছে

(১৪) বায়ু দ্বিবিধ—প্রাণবায়ু ও অপান বায়ু—

দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আসিন্ধোরা পরাবতঃ।
দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যন্যো বাতু যদ্রপঃ॥
ঋগ্বেদ ১০।১৩৭।২। অথর্ব্ববেদ ৪।১৩।১

অন্বয় :—ইমৌ দ্বৌ বাতৌ বাতঃ আসিন্ধোঃ আপরাবতঃ অন্যঃ তে দক্ষম্ আবাতু অন্য যদ্ রপঃ বিধাতু। (ব্যন্যো =পরান্যো)

অস্যার্থ :—

ইমৌ দ্বৌ বাতৌ=এই দুই বায়ু—পান অপান
বাতঃ=চলিতেছে
আসিন্ধোঃ=একটি সমুদ্র হইতে
আপরাবতঃ=দ্বিতীয়টি বহু দূর প্রদেশ হইতে
অন্যঃ=এক
তে=তোমার জন্য
দক্ষম্=বল
আবাতু=আনয়ন করে
অন্যঃ যদ্=অন্য যে
রপঃ=রোগ—পাপ
বিধাতু=বাহির করে।

বঙ্গানুবাদ :—প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু দুইই প্রবাহিত হইতেছে—অপান বায়ু সমুদ্র সদৃশ গভীর ফুস্ফুস হইতে আসিতেছে—এবং প্রাণবায়ু দূর বায়ুমণ্ডল হইতে আসিতেছে। প্রাণবায়ু তোমার জন্য বলসঞ্চার করিতেছে এবং অপান বায়ু তোমার শরীরের রোগ পাপকে শরীর হইতে বাহির করিতেছে।

(১৫) তজ্জন্যই স্বস্তিবাচনে বলা হয়—

মা তে প্রাণ উপদসন্মো
অপানো পিধায়িত।
সূর্য্যস্তাধি পতির্মৃত্যো
রুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ॥ অথর্ব্ববেদ ৫।৩০।১৫

অন্বয়ঃ—তে প্রাণঃ মা দসৎ—তে অপানঃ অপিধায়ী ত্বা—সূর্য্যঃ অধিপতিঃ মৃত্যোঃ রশ্মিভিঃ উদ্ আয়চ্ছতু।

অস্যার্থ :—

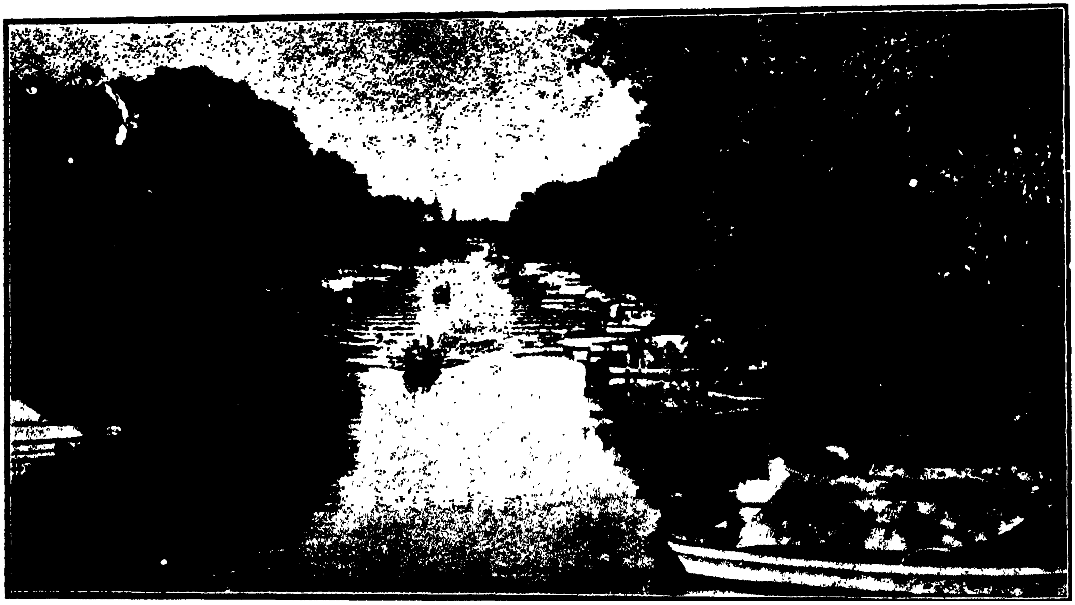
তে প্রাণঃ=তোমার প্রাণবায়ু
মা দসৎ=ক্ষীণ না হয়
তে অপানঃ=তোমার অপান বায়ু
অপিধায়ী=বন্ধ না হয়
ত্বা=তোমাকে
অধিপতিঃ সূর্য্যঃ=রাজা সূর্য্যদেব
মৃত্যোঃ=মৃত্যু হইতে
রশ্মিভিঃ=রশ্মি দ্বারা
উদ্ আয়চ্ছতু=উপরে উঠাইতেছে অর্থাৎ যেন রক্ষা করেন।

বঙ্গানুবাদ :—তোমার প্রাণবায়ু যেন ক্ষীণ না হয়, তোমার অপান বায়ু যেন বন্ধ না হয়—অধিপতি সূর্য্য স্বীয় রশ্মিদ্বারা তোমাকে মৃত্যু হইতে যেন রক্ষা করেন।

বলা বাহুল্য এ সকল প্রাণায়ামের কথা। সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ক্রমশঃ

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত্রি ৭টা ২০ মিনিটে সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হল্‌মের উদ্দেশে কোবেনহাউনের ট্রেনে চেপে বোসলাম। ষ্টক্‌হল্‌ম্‌কে চিরে। এর আগে সারা ইয়োরোপ বরাবর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ কোরেছিলাম কিন্তু ক্রমশঃ বুদ্ধিমান হোয়ে উঠ্‌লাম।



একটী প্রণালী—দূরে ষ্টকহলমের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে

ওদেশে কেউ কেউ ষ্টকহোম বলে, কিন্তু সেইটাই ওর প্রকৃত উচ্চারণ কি না সঠিক জানতে পারি নাই। যথাসময়ে ওদেশের ট্রেনের আগাগোড়া সমস্ত গাড়ীগুলি একটী সাধারণ গলিপথ (alley) দ্বারা সংযুক্ত। এই পথ দিয়ে এক বগি



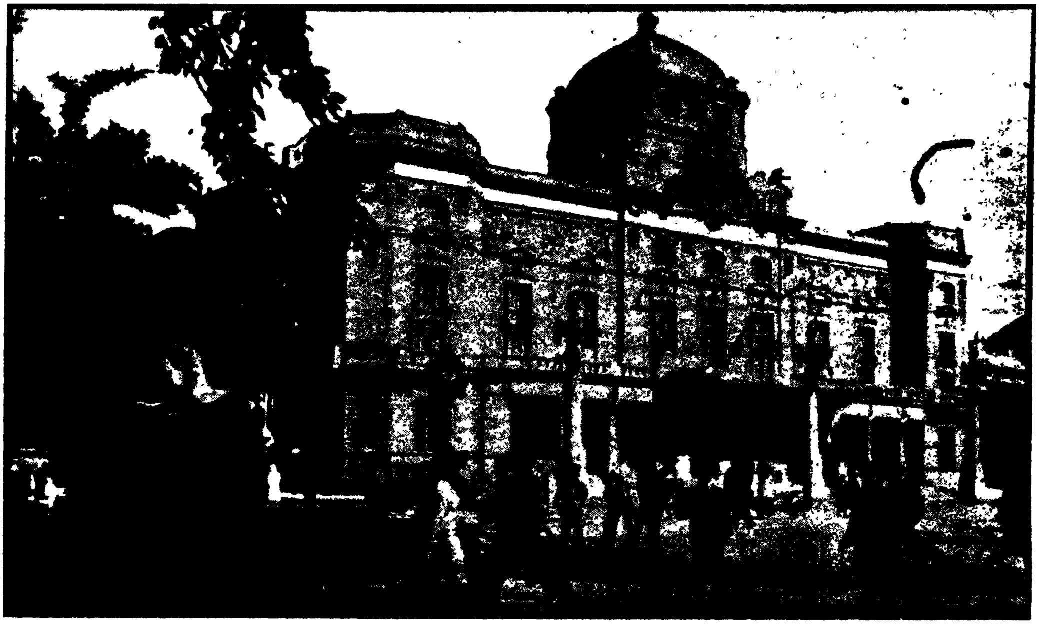
সেণ্ট্রাল ষ্টেশন—ষ্টক্‌হল্‌ম্‌



সহরের বাইরে সম্রাটের প্রাসাদ—ষ্টকহল্‌ম্‌

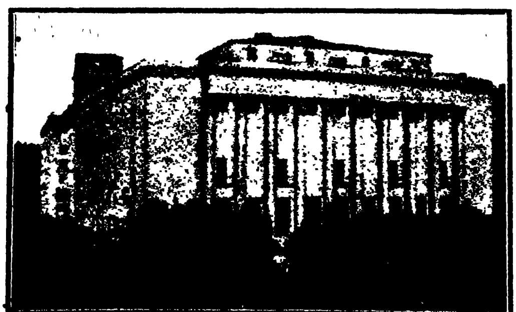
ট্রেনটী নোড়ে উঠে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম্মের লোকারণ্য থেকে বিদায় নিয়ে ছুটল মাঠের মধ্য দিয়ে অন্ধকারের বুক (bogey) থেকে অন্য বগিতে যাওয়া যায়। যখন একঘেঁয়ে ভ্রমণ অসহ হোয়ে উঠতো তখন মাঝে মাঝে এই গলিপথে

ভ্রমণ কোরে পা ছাড়িয়ে নিতাম, কখনও বা এই সময় আলাপও জোমে যেত সহযাত্রীদের সঙ্গে। এই ভ্রমণের সময় দেখেছিলাম এদিককার তৃতীয় শ্রেণী মোটেই ঘৃণ্য নয়। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, যাত্রীদের সম্মানের মাপ- তার বেশী যাত্রী বসে না, বোসবার স্থানও নাই। আমাদের দেশে যেখানে ২৪ জন বোসতে পারে সেখানে লেখা আছে "২০ জন বসিবে," আর বসে ৪০ জন। তাছাড়া এদিকে তৃতীয় শ্রেণীতে আর একটী সুবিধা পাওয়া যায় যা ডেনমার্ক,



ড্রামাটিস্কা থিয়েটার—ষ্টকহলম

কাঠিও খুব নীচু নয়। কেবল বোসবার আসনগুলি আমাদের দেশের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মত কাঠের,—গদি নেই। সুইডেন ও রাশিয়া ছাড়া ইয়োরোপের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। আমি বোলছি শোবার গাড়ীর সুবিধার কথা।



কনসার্টহাউস—ষ্টক্‌হল্‌ম



সিটী হল হইতে সন্ধ্যায় ষ্টকহলমের প্রাচীন অংশ

তৃতীয় শ্রেণীতে মাঝে মাঝে ভিড় থাকলেও গুঁতোগুঁতি নেই। এক একটী আসনে দুজনের আসন নির্দ্দিষ্ট, কাজেই অন্য কোথাও দ্বিতীয় শ্রেণীর নীচের যাত্রীদিগকে শোবার গাড়ীতে দক্ষিণা দিলেও জায়গা দেওয়া হয় না। কিন্তু এসব

দেশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা পৃথক দক্ষিণা দিলেই সে সুবিধা পায়। কাজেই এবার তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা কোরলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেণ কোবেনহাউন ফ্রি হাবার বন্দরে (free harbour) পৌছল। ট্রেনের কাছেই জাহাজ দাঁড়িয়ে



জলপ্রণালীর ওপর রাজপ্রাসাদ - ষ্টকহল্‌ম

দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল। অন্যান্য যাত্রীরা বেশ ঝাড়া হাত-পায়েই জাহাজে গিয়ে চোড়ে বোসল। আমার সঙ্গে ছিল একটী প্রকাণ্ড আকণ্ঠ-বোঝাই সুটকেস, একটা মাঝারি হাণ্ডব্যাগ



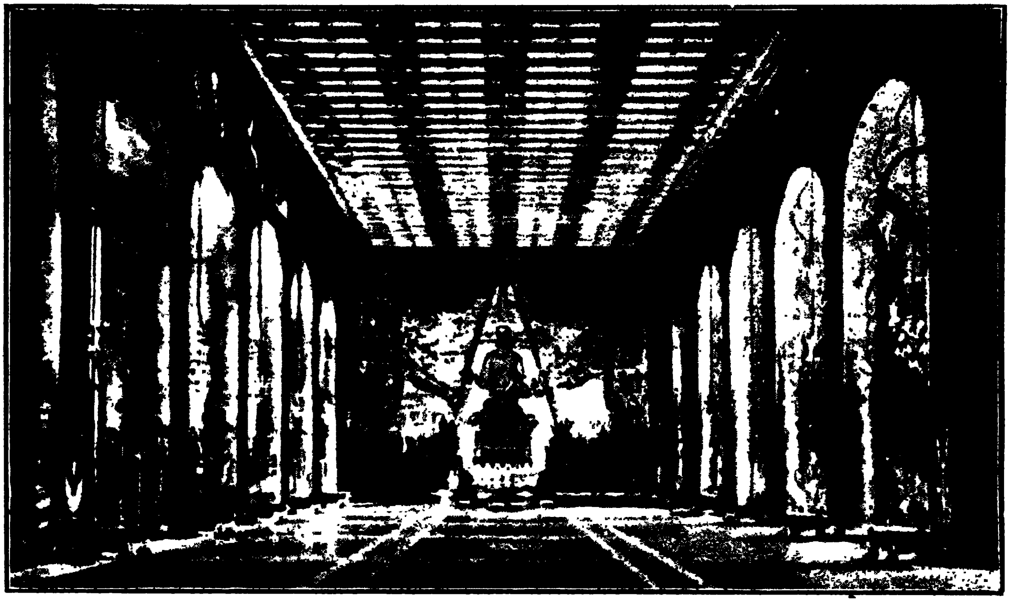
কিংস ষ্ট্রীট—ষ্টকহল্‌ম

এবং একটী বালিশ ও কম্বল। কাজেই প্রথমটা "পোর্টার, পোর্টার" কোরে চেঁচামেচি কোরে নিষ্ফল দৌড়োদৌড়ি কোরলাম। কিন্তু কুলীর টিকিটী পর্য্যন্ত দেখা গেল না। ওদিকে জাহাজ একবার বাঁশী দিলে, তাড়াতাড়ি নিজেই ঘাড়ে, হাতে, বগলে জিনিষগুলো পুরে দৌড় দিলাম। লণ্ডন থেকে অন্যান্য মালপত্র কুক কোম্পানীর মারফত ভাগ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম,—এখন নিজের সুবুদ্ধির জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে ঘুরতে হোলে শুধু সেদিন নয় পথে অনেক জায়গাতেই হয় মাল নয় আমি যে পোড়ে থাকতাম এ একেবারে নিঃসন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে কুক কোং মারফত মাল পাঠানর কথাটা ভবিষ্যৎ যাত্রীদিগকে বলা ভাল। কুক কোং যাত্রীদের মাল পত্র আগাম পাঠিয়ে দেওয়ার ভার নেয়। এর জন্যে তাদিগকে একটী স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিতে হয়। আমার জিনিষপত্র তাদিগকে দিতেই তারা এক এক সেট চাবি দাবী কোরল ও কাষ্টমসে দেখাবার জন্যে বাক্সপত্রর ভেতরের জিনিষের মোটামুটী ফর্দ্দ ছাপা ফর্মে কোরে দিতে বোল্লে। বাক্সর বা বিছানার ভেতরের জিনিষের নাম ধোরে ফর্দ্দ দিই নাই, ওরাও চায় নাই; খালি মোটামুটী "কাপড়, বিছানা, টয়লেট, ষ্টেশনারী" এইভাবে বর্ণনাপত্রে লিখেছিলাম। কুক কোং সযত্নে চট মোড়াই কোরে মালগুলি এখানকার আফিসে তাদের বাকী বকেয়া চুকিয়ে নিয়ে আমায় প্রত্যর্পণ কোরলে। বাড়ীতে বাক্স খুলে দেখি তার মধ্যে রিষ্টওয়াচের সোনার ব্যাণ্ডটী নাই। সঙ্গে সঙ্গে কুক কোম্পানীর এখানকার আপিসে লিখলাম। তারা লিখলে লণ্ডনের আফিসে। উত্তর এল কোন নম্বর বাক্সে ছিল ও জিনিষটার দাম কত? বাক্সের নম্বর দেওয়ার পর যথানিয়মে তা লণ্ডন আফিসে পাঠিয়ে জবাব পাওয়া গেল "ও বাক্স থেকে হারাবার কোনো কারণ নাই।" লিখিলাম "কারণ না থাকলেও হারিয়েছে এবং যখন আমার সমস্ত জিনিষ হারান, চুরি, জাহাজডুবি, এবং ড্যামেজ থেকে ইন্সিওর করা আছে তখন ওর দাম আমাকে দিতে হবে।" দীর্ঘদিন পর উত্তর এল "ইন্সিওরে জুয়েলারী বোলে উল্লেখ ছিল না; এবং আমাদের এই সঙ্গে পাঠান আইন দেখ—জুয়েলারী আমরা ইন্সিওর করি না।" তাদের আইনটা জানলাম বটে কিন্তু অত্যন্ত দেরীতে এবং আমার দামী ব্যাণ্ডটীর প্রতিমূল্যে।

জাহাজ বন্দর ছাড়ল ৭টা ৫০ মিনিটে। অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রের বুকের আলোড়ন ছাড়া বহির্জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক হারিয়েই আমরা চোল্লাম। অনন্ত অসীম বিশ্বের

স্নায়ুমণ্ডলে অতি ক্ষুদ্র জগতের মত আমাদের জাহাজটী মুষ্টিমেয় যাত্রীদের সুখ দুঃখ, হাসি গল্প, গাম্ভীর্য্য চাপল্য, ঔদার্য্য সঙ্কীর্ণতা, সঙ্গীত ও ক্রন্দন নিয়ে এগিয়ে চোলেছিল। স্পিরিট, তামাক, চা, সাবান, মোমবাতি, খাবার ইত্যাদি। আবার টোটা, দেশলাই, তাস, ওষুধ এ সবের প্রবেশ অধিকাংশ দেশেই নিষিদ্ধ। এক দেশ থেকে অন্য দেশে



সোনালী হল (City-hall)

ঝড়ের রাত্রে বন্ধ দরজা জানালার মধ্যে বোসে বাইরের মত প্রকৃতির হুঙ্কার যেমন লাগে তেমনি একটা অবিচ্ছিন্ন ক্রুদ্ধ অথচ রুদ্ধ গর্জ্জন ক্ষুব্ধ ও মথিত সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসছিল। ৯টা ২০ মিনিটে জাহাজ সুইডেনের বন্দর মালমো (Malmo)তে এসে নোঙ্গর কোরলে।

বৃটীশ প্রজাদের পক্ষে সুইডেনে আসতে গেলে সুইডেন কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের দরকার হয় না; তবে জিনিষপত্র যথারীতি খানাতল্লাস হয় এবং ডিউটী দেবার মত কিছু থাকলে তা আদায় কোরে নেয়। এখানে খানাতল্লাসীর তেমন কড়াকড়ি নাই, খালি বাক্সর ডালা খুলে 'ডিউটী দেবার মত কিছু নাই' বোল্লেই হোলো; বিশ্বাস কোরে ছেড়ে দ্যায়। সব দেশে প্রায় এক রকমের জিনিষের উপরই ডিউটী আছে, যথা, নূতন পোরবার পোষাক, সুতি, সিল্ক, লেস, ছুঁচের কাজ, পর্দ্দা, কার্পেট, হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল, জুয়েলারী, টাইপরাইটার, সেলাই কল, সুগন্ধ দ্রব্য, ঢুকলেই সে দেশের মুদ্রা বিনিময় কোরতে হয়। পূর্ব্বে ডেনমার্ক বা নরওয়েয়ের মুদ্রা সুইডেনে চোলত; কিন্তু এখন তা অচল। অবশ্য সুইডেনের মুদ্রা ডেনমার্ক ও নরওয়েতে এখনও চলে।



হাউস অব নোবিলিটী—(House of nobility)

মালমোতে ট্রেনে শোবার কামরায় গিয়ে একেবারে আশ্রয় নিলাম। শোবার বিছানা বালিশ ধোয়া চাদর সবই রেলকোম্পানী দেয়—মায় জল খাবার কাঁচের কুঁজো গেলাস পর্য্যন্ত। আমার কামরায় অপর একটি বার্থে আর এক



পার্লামেন্ট—ষ্টকহল্‌ম

ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে রাশিয়াবাসী ছিলেন; বিদ্রোহের সময় পালিয়ে ডেনমার্কে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই



বিচারালয়—ষ্টকহল্‌ম

আছেন। আমি রাশিয়া যাব শুনে তিনি অস্ফুটস্বরে বোল্লেন "শুয়ারকী বাচ্ছা সব, জীবন্ত নরক ওরা"। উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা কোরলাম "ব্যাপার কি? এখনও কি ওরা বাইরের লোকের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে?" অত্যন্ত ঘৃণাভরে তিনি বোল্লেন "ওরা আবার সভ্য হোলো কবে?" আমি একে একে তাঁর পরিচয় নিয়ে বুঝলাম ভদ্রলোকের আক্রোশের কারণ কি। তার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত ধনসম্পত্তি বলশেভিকরা কেড়ে নিয়ে দখল কোরেছে এবং তিনি যে আজও সপরিবারে বেঁচে সে নেহাৎ পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফলে।

রাত্রি বেশ নিশ্চিন্ত নিদ্রায় কাটলো। ভোরে উঠে বেশ পরিবর্ত্তন কোরে বাইরে গলিপথে এসে জানালার দিকে তাকালাম। এক রাত্রে দৃশ্যপটের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হোয়েছে। ডেনমার্ক ছিল শুধু সমতল ক্ষেত্র,—পাহাড়ের চিহ্নমাত্র তার সুদূর দিগন্তেও দেখা যেত না। আর আজ ট্রেন চোলেছে পাহাড়ের একবারে কোল দিয়ে। মাঝে মাঝে সমতল

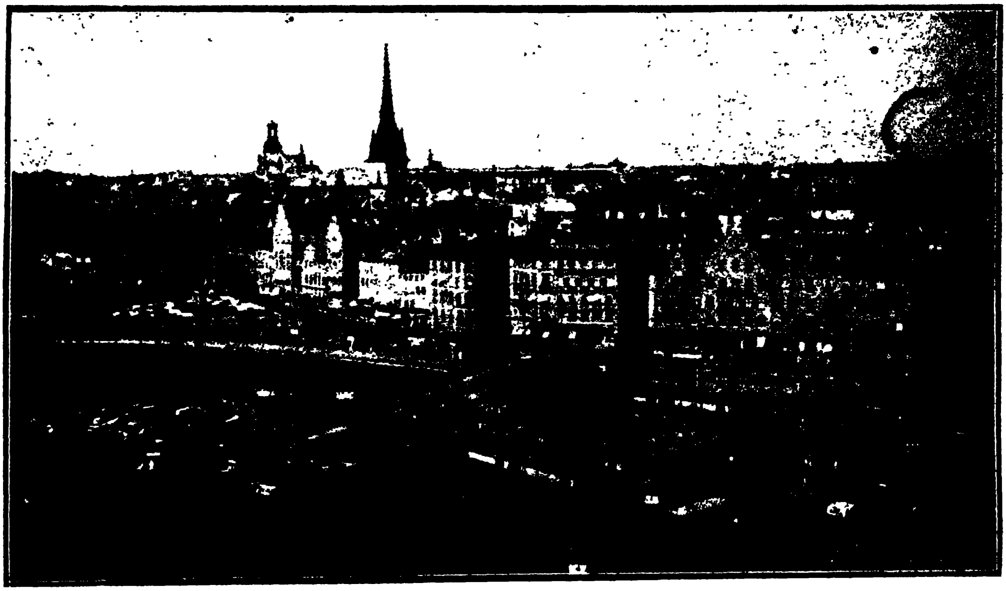


অপেরা হাউস - ষ্টক্‌হল্‌ম

ক্ষেত্র চোখে পড়ে; কিন্তু তার ওপরে বিচ্ছিন্ন ভাবে তুষারকণা ছড়িয়ে পোড়েছে—যেন কোনো অপটু হাতে কেউ শস্যক্ষেত্র-গুলির ওপর চূণকাম কোরেছে। গাছগুলির অধিকাংশই পত্রহীন—শুধু কাণ্ডগুলি সহস্র হাত মেলে রিক্তের মত দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়গুলিও শ্যামল নয়। নগ্ন পাথরগুলি খাড়া দাঁড়িয়ে। কোথাও কোথাও বরফের শুভ্র প্রলেপ। এ দৃশ্য বেশ লাগলো। আজ পর্য্যন্ত ইয়োরোপের পাহাড়ী সৌন্দর্য্য দেখি নাই; কাজেই আজকের প্রকৃতিশ্রীর মধ্যে নূতনত্ব ছিল। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে অপরূপ শ্রী প্রাণ ভোরে দেখতে লাগলাম।

সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে গাড়ী এসে যাত্রা শেষ কোরলে ষ্টক্‌হল্‌মে। ষ্টেশনে নেমেই খোঁজ কোরলাম 'গার্দেরোব'

অর্থাৎ মালপত্রের অফিস (left luggage office) কোন্ দিকে। কুলীকে বার-দুই মালগুলি দেখিয়ে 'গার্দেরোব' বোলতেই সে ঘাড় নেড়ে একটা ঘরে নিয়ে গেল। এখানে এক বৃদ্ধা মালের জিম্বায় ছিল। তাকে সব জিনিষগুলি



বন্দরের একাংশ হইতে ষ্টকহল্‌ম্

জিম্বা কোরে দিয়ে পরিবর্ত্তে একটা টিকিট নিয়ে সহর দেখতে বেরুলাম। এর পূর্ব্বে ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম মালপত্রগুলি পরিব্রাজকের পথের অন্তরায়। মালের ঝামেলা থাকলেই যেমন কোরে হোক একটা হোটেলে উঠে সেগুলোর ওজন থেকে মুক্তি নিতে হয়। এতে পাঁচটা হোটেল ঘুরে দামদর ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে জানার পক্ষে ভারী অসুবিধা হয়। তাছাড়া ষ্টেসন থেকে হোটেল পর্য্যন্ত যাওয়া ও আসার ট্যাক্সী বা কুলী ভাড়া অনর্থক লাগে; কারণ, দুচার দিন থাকতে গেলে একটা হাতব্যাগই যথেষ্ট।

ষ্টেসন থেকে বেরিয়ে সর্ব্বপ্রথম ঢুকলাম একটা রেষ্টুরাণ্টে। সকাল ন'টা হোলেও তখনও ভোরের আমেজ কাটে নাই—সহরে জাগরণের পূর্ণ চাঞ্চল্য তখনও দেখলাম না। এদিন আবহাওয়ার শৈত্য • ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের ৩ ডিগ্রী ওপরে ছিল।

প্রাতর্ভোজন শেষ কোরে সহর দেখতে বেরুলাম। এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছাড়া দেখবার অন্য বিশেষ কিছু আছে বোলে আমার জানা ছিল না। ষ্টেসনে কোনো গাইডও পিছু নেয় নাই। পায়ে হেঁটে সহরটা দেখবার জন্যে বেরুলাম। কিছু দূর গিয়েই পশুশালা চোখে পোড়ল—বৈশিষ্ট্য কিছু দেখলাম না। এর পর একটা প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সহরের এক প্রান্তে এসে পোড়লাম। লোকালয় শেষ হোয়ে সেখানে পাতলা জঙ্গলের সীমানা



একটী জলপ্রণালী—দুইধারে সহর—প্রণালীর ধারের রাস্তাটীর নাম—(strandvagen street)

সুরু হোয়েছে। সহরের কিনারা দিয়ে একটা খুব প্রশস্ত সরল রাস্তা গিয়েছে। এখানে সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা ঘোড়ায়

চড়েন শুনলাম। এ রাস্তাটায় কিছুক্ষণ চোলে আবার একটা রাস্তা ধোরলাম। এদিক ওদিক দিয়ে নানা রাস্তা পার হোয়ে এসে পড়লাম সমুদ্রের ধারে বন্দরের



১৯২২ সালের ষ্টকহলমের বাড়ী

কাছে। সহরের এই দিকটা বেশ পরিচ্ছন্ন এবং দেখতেও সুন্দর। সামনেই বন্দরে সমুদ্রের নীল জল, তার পর রাস্তা, রাস্তার অপর ধারে প্রাসাদোপম অনেকগুলি অট্টালিকা। এদের মধ্যে একটা নাট্যশালা ; নাম—ড্রামাটিস্কা টিয়েটার্ণ (Dramatiska Teatern) অর্থাৎ এখানে কেবল ড্রামা অভিনীত হয়। প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম সৌধ—বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ষ্টক্‌হল্‌মে সমুদ্র খালি এই এক জায়গাতেই সহরের কোলে মাথা গলায় নাই—গোটা সহরটাই যেন জলে স্থলে তৈরী। সাত আটটা পাশাপাশি দ্বীপ জুড়ে সমগ্র ষ্টক্‌হল্‌ম সহরের জন্ম। এই দ্বীপগুলির মধ্যের জলপ্রণালীগুলো সেতুবন্ধ। সহরের বুকের মাঝে আঁকা বাঁকা জলপ্রণালীগুলি বড় চমৎকার দেখায়। সহরের পুরানো বাড়ীগুলির ছাদ পাথর বা টালির দুচালা ; অর্থাৎ দুদিকে ঢালু যাতে ওপরে বরফ জোমে ছাদ ভারী কোরতে না পারে। কিন্তু বন্দরের কাছে কতকগুলি আধুনিক বাড়ী দেখলাম রিএনফোর্স্‌ড কঙ্ক্রিটের (re-enforced concrete) । ছাদগুলি আমাদের দেশের বাড়ীর মতই সমতল—এগুলিতে ওপরের বরফ সরাবার কি ব্যবস্থা আছে জানি না।

এখানকার ট্রাম বা বাস দুতলা নয়। ট্রামগুলি



একটা পার্ক (karlaplan) —ষ্টকহল্‌ম

দুখানা কোরে আগুপিছু জোড়া—একটা ধূমপায়ীদের জন্য, অন্যটা 'ভালো ছেলেমেয়েদের জন্যে'। রাস্তায় যানবাহন



ষ্টকহলমের একটা রাস্তা (Ostermalmsgatan)

বা লোকজনের ভিড় নাই। এখানে জীবন যেন ধীরমন্থর গতিতে চোলেছে—তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি নাই।

একটা রাস্তা ধোরে কয়েকটা প্রণালীর সেতু পার হোয়ে সিটী হল (City Häll) বা টাউন হলে পৌছলাম। পথে একটা সেতুর নীচে খানিকটা জল ঘিরে স্নানের বন্দোবস্ত করা হোয়েছে দেখলাম। জলের মাঝে গোল কোরে অনেকটা জায়গা বাইরের দৃষ্টি থেকে আড়াল কোরে দেওয়া হোয়েছে। আড়ালটা খালি জলের ওপর থেকেই উঠেছে যাতে নীচের জলস্রোত বাধা না পায়। এখানে পুরুষ ও নারী স্নানার্থীরা সাধারণতঃ স্নানের পোষাক পোরে স্নান করে; কাজেই সে দৃশ্যটা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাই ভাল।

এই প্রণালীটা পেরিয়েই সিটী হল,—রাস্তার বাঁ দিকে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। বাড়ীটার চেহারা দেখেই মনে হয় বেশ পুরোনো। প্রাসাদতুল্য বাড়ীর চার দিকে প্রশস্ত বারান্দা। তার পরই প্রায় তিন দিক ঘিরে একটা প্রণালীর স্বচ্ছ স্থির জল। ৫০ ওরে (ORE)* দর্শনী দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। নীচে অনেকগুলি পাষাণ-মূর্ত্তি আছে।

* ১০০ ওরে—১ ক্রোণা—১ শিলিং।

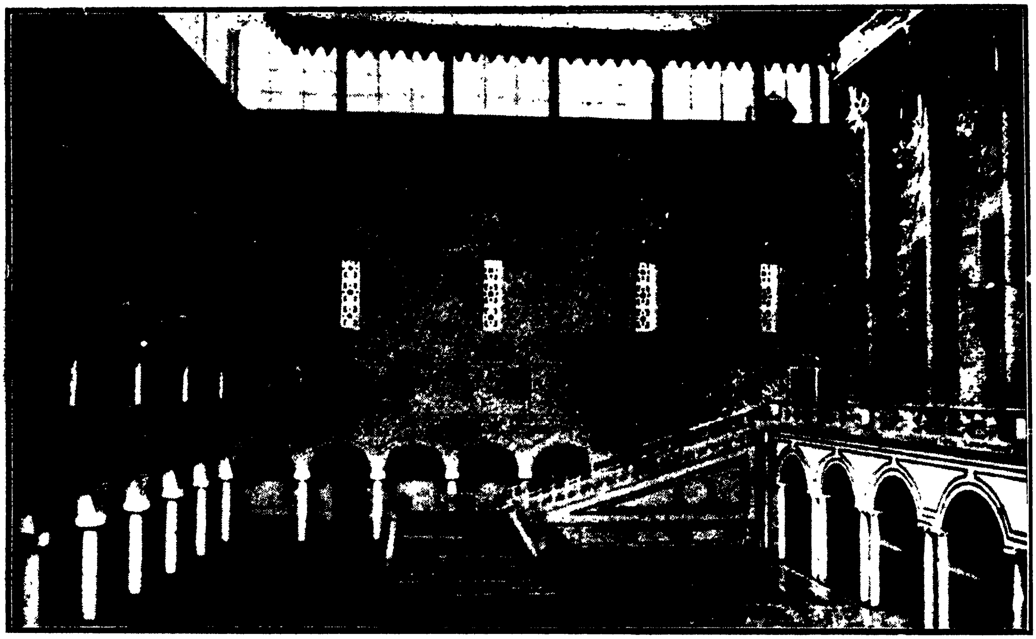
ওপরের একটা দিকে বোধ হয় দপ্তরখানা। ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘরে দেখি ১৫।২০ জন দর্শককে একটা লোক



সিটী হল—ষ্টকহলম্

সুইডিস ভাষায় দ্রষ্টব্যগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে। যদিও সে বোঝানর ভাষা আমার কাছে অবোধ্য ছিল তবু যাতে কোনো দ্রষ্টব্য না ছেড়ে যাই এই জন্যে আমিও সেই দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। একে একে অনেকগুলি কামরা দেখে গেলাম। অনেক ঘরের সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও উপকথা জড়িত, বুঝলাম। এর মধ্যে দুটী ঘর আজও আমার বেশ মনে আছে। একটী প্রকাণ্ড সোনালী হল। এর দেওয়াল সোনালী টুকরায় একদম মোড়া, গৃহসজ্জাগুলিও সোনালী। এই ঘরে একটী উপকথা বা শাস্ত্রীয় চিত্র আঁকা আছে যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর একটী ঘরেও কতকগুলি উপকথার চিত্র এবং কার্পেট বেশ মনে দাগ কাটে। সোনালী হলটীর পাশের একটী দরজা দিয়ে এসে দাঁড়ালাম একটী বিরাট কক্ষের ওপর। এটীকে হল বোল্লে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না—হল বোলতে যা বুঝি তার চেয়ে প্রকাণ্ড একটা খিলানওয়ালা কক্ষ। সম্ভবতঃ এটীতে সভাসমিতি হোতো বা হয়। এই সৌধটীর কয়েকটী কক্ষ ঐশ্বর্য্য ও স্থাপত্যের বিরাট প্রকাশ। সিটী হলের ওপর থেকে সহরের অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় এবং জল স্থল ও পাহাড়ের সমন্বয়ের অপরূপ রূপ প্রাণ ভরে উপভোগ করা যায়। শীতের প্রকোপে গাছগুলি পত্রহীন; কাজেই শ্যামলতা বর্জ্জিত। তবু সহরের বুকের মাঝের সর্পিল প্রণালীগুলি সহরটীকে এক অপূর্ব্ব শ্রী দান কোরেছিল।

এমনি একটী প্রণালীর ধারেই রাজপ্রাসাদ, পার্লামেণ্ট, অল্প দূরেই বিচারালয়, হাউস অব নোবিলিটী (House of nobility) প্রভৃতি। সহরের বাইরেও এখানকার সম্রাটের একটী প্রাসাদ আছে। ড্রামাটিক থিয়েটার ছাড়াও ষ্টক্হল্‌মে একটী অপেরা হাউস ও কনসার্ট হাউস আছে। এখানকার কিংস ষ্ট্রীট নামে একটী রাস্তা বড় চমৎকার দেখতে—ঠিক যেন কোনো প্রাসাদের তোরণ। দুটী বাড়ী রাজতোরণের দুটী থামের মত উঁচু হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মাথায় দুটো পতাকা সগর্ব্বে উড়ছে। এর পরের বাড়ীগুলি হুবহু এক রকমের—ঠিক যেন সুউচ্চ প্রাচীর চোলেছে। উঁচু থামসদৃশ বাড়ী দুটী একটী প্রকাণ্ড খিলান দিয়ে পরস্পর যুক্ত। সহরের রাস্তাগুলি সরল প্রশস্ত, সমান্তর ও পরিচ্ছন্ন। লণ্ডনের মত যান



সিটি হলের প্রকাণ্ড কক্ষ

বাহন keep to the left (বাঁয়ে রাখো)—ইয়োরোপে ও আমেরিকায় অন্য কোথাও এ নিয়ম নেই—সর্ব্বত্রই এর উল্টো।

বনজ সম্পদই সুইডেনের মূলধন। জঙ্গল থেকে উৎপন্ন শিল্পেই সুইডেন ধনী। দেশলাই, কাগজ, তরল কাঠ (wood pulp) ইত্যাদিতে সুইডেন অনেক টাকা বিদেশ থেকে আনে। ১৯৩৩ সালে সুইডেন ৫১৭০০০ টন কাগজ ও ৩১২০০০ টন পাল্প (mechanical) বিদেশে রপ্তানী কোরেছে। এখানকার রাষ্ট্র রাজতন্ত্র। অবশ্য ইংলণ্ডের মত পার্লামেণ্ট প্রভৃতি আছে।

ষ্টকহলমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ কোরেছিল; কিন্তু এখানকার অভিনয়, নাচঘর বা নারীদের কৃত্রিম রূপ-সজ্জা দেখবার অবকাশ ঘটে নি। কাজেই সে সম্বন্ধে নীরব থাকতে হোলো। ভাষার অনভিজ্ঞতায় আমি এ দেশটার সত্য পরিচয় থেকে বঞ্চিত হোয়েছি—যা দেখেছি তা কেবল এর বাইরের রূপ।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বাঙ্গালায় আসিয়া বসবাস করেন, শ্রীহর্ষ তাঁহাদিগের অন্যতম। শ্রীহর্ষের বংশধরদিগের এক শাখা হুগলী জেলার খন্যান ষ্টেসন হইতে তিন চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী দিগসুই গ্রামে উপনিবিষ্ট হন। ইঁহাদের কৌলিক পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়; এবং তাঁহারা বংশানুক্রমে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। এই বংশের অনেকেই ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপাধি ভূষিত হইয়া দেশ মধ্যে পাণ্ডিত্যখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীহর্ষ হইতে অষ্টাবিংশতি পর্য্যায়ভুক্ত বলরাম ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন এই বংশেরও অলঙ্কার। তাঁহার তিন পুত্র হরেকৃষ্ণ, রামজয় ও রামচন্দ্র। মধ্যম রামজয়ের পুত্র বিশ্বনাথ যখন অতি শিশু তখন রামজয়ের মৃত্যু হয়। জ্ঞাতিদের অত্যাচারে সদ্যঃ বিধবা রামজয়-পত্নী বিব্রত হইয়া শিশু পুত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী জীরাট গ্রামে পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দরিদ্র মাতুল-গৃহে বিশ্বনাথের উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। সামান্য বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া জননীর দুঃখ মোচনার্থ তিনি অল্প বয়সেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে স্থানীয় লবণ কুঠীর সাহেবেরা প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং সাহেবদিগের অনুগ্রহে বিশ্বনাথ মহলের দারোগার পদ প্রাপ্ত হন। জীরাট গ্রামের গোপীনাথ বিগ্রহের সেবায়েৎ গোস্বামীগণের নিকট হইতে তিনি কিছু ভূমি প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন।

বিশ্বনাথের চারি পুত্র দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর গঙ্গাপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হন। গঙ্গাপ্রসাদের বয়স যখন অল্প তখন বিশ্বনাথের নিমক-মহলের চাকুরী যায়, এবং তিনি চারিটি শিশু সন্তান লইয়া অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হন। এই সময়ে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্গাপ্রসাদের বয়স একাদশ বৎসর। বিশ্বনাথ এক সহৃদয় প্রতিবাসীর অর্থ সাহায্যে কলিকাতা কালীঘাটে আসিয়া দুর্গাপ্রসাদের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করেন।

দুর্গাপ্রসাদ কিছু দিন কালনায় মিশনারীদিগের স্কুলে লেখাপড়া করিয়া উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতায় এক আত্মীয় গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। সেখানে তিন বৎসর শিক্ষা লাভের পর দুর্গাপ্রসাদ একবার গৃহে আগমন করেন। এই সময়ে, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর জীরাটে গঙ্গাতীরে বিশ্বনাথ দেহত্যাগ করেন। তখন সংসার প্রতিপালন ও কনিষ্ঠ তিনটি নাবালক ভ্রাতাকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার ভার দুর্গাপ্রসাদের স্কন্ধে পতিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে দুর্গাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক আট

টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। এই বৃত্তির আট টাকা সম্বল করিয়া তিনি সংসারার্ণবে অবতীর্ণ হইলেন—স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন, এবং মাত্র দুই টাকায় নিজের খরচ চালাইয়া অবশিষ্ট ছয়টি টাকা নিয়মিত ভাবে গৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। শিশু তিনটির পিতা মাতা কেহই জীবিত ছিলেন না—বাটীর পুরাতন দাসী জাহ্নবীর যত্নে তাহারা মানুষ হইতে লাগিল।

দুর্গাপ্রসাদ আরও তিন বৎসর পড়িবার পর ভ্রাতৃগণের লালন পালন ও শিক্ষা বিধানের জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া আন্দুল স্কুলে শিক্ষকতা কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভার জাহ্নবী দাসীর উপর অর্পণ করিয়া ভাই তিনটিকে আন্দুলে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। এখন হইতে ভাই তিনটিকে শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। তিনজনেই আন্দুল স্কুলে পড়িতে লাগিলেন এবং বাড়ীতে দুর্গাপ্রসাদ স্বয়ং তাঁহাদের রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়াইতেন। এই জীবনের ব্রত তিনি পালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হরিপ্রসাদ শৈশবে গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়া শ্রবণ-শক্তি হারাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও মোটামুটি রকম লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। আর তৃতীয় গঙ্গাপ্রসাদ ও চতুর্থ রাধিকাপ্রসাদ সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া গঙ্গপ্রসাদ ডাক্তারী ও রাধিকাপ্রসাদ এঞ্জিনীয়ারিং পড়িতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে চারি ভ্রাতা উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। সিমলা কাঁসারীপাড়ার হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যার সহিত গঙ্গাপ্রসাদের বিবাহ হইল। ইনিই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গর্ভধারিণী সুপ্রসিদ্ধা জগত্তারিণী দেবী। এই সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ কলিকাতা বহুবাজার মলঙ্গা লেনে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। এইখানে ১৭৮৬ শকাব্দের ১৫ই আষাঢ় স্যার আশুতোষের জন্ম হয়।

মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে গঙ্গাপ্রসাদ ভবানীপুর অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তখনকার দিনে কবিরাজ মহাশয়গণের ন্যায় মেডিক্যাল কলেজের পাশ-করা ডাক্তাররাও অর্থোপার্জ্জন অপেক্ষা পীড়িত আর্ত্ত জনগণের রোগ-যন্ত্রণা দূর করাই অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদও লোকহিত-ব্রত গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সুচিকিৎসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল।

ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ কোমল-হৃদয়, সামাজিক, বন্ধু-বৎসল, উদার-চরিত্র লোক ছিলেন। বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধব, অতিথি-অভ্যাগতের সমাগম হইলে তিনি সাদরে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতেন—জলযোগ, আদর-আপ্যায়নের সীমা থাকিত না। বিবাহের নামে আজকাল যে পুত্র বিক্রয় চলিতেছে, গঙ্গাপ্রসাদ তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। পুত্র আশুতোষের বিবাহ দিবার জন্য গঙ্গাপ্রসাদ অনেক কন্যা দেখিয়াছিলেন। জীরাট-বলাগড়ের মুখুয্যে বংশের কৌলীন্য মর্য্যাদার দৌলতে কৃতবিদ্য গুণবান পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র দুর্লভ বস্তু ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদ নিজেও সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সুচিকিৎসক, পদস্থ সম্ভ্রান্ত মর্য্যাদা-সম্পন্ন সামাজিক ছিলেন। তথাপি তিনি আশুতোষের বিবাহে কপর্দ্দক মাত্র গ্রহণ করেন নাই। আজকাল অনেকে মুখে ছেলের বিবাহে পণ লইবেন না বলেন, কিন্তু এমন স্থানে ছেলের বিবাহ দেন যে না চাহিতেই কুবেরের ঐশ্বর্য্য পাওয়া যায়। গঙ্গাপ্রসাদ এরূপ মৌখিক পণপ্রথা বিরোধী ছিলেন না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণনগরের এক দরিদ্র অধ্যাপকের সুন্দরী কন্যাকে পুত্রবধূর পদে বরণ করিয়া গৃহে লইয়া আসেন। কন্যার পিতার কিছুই দিবার সামর্থ্য ছিল না। গঙ্গাপ্রসাদও কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশাও করেন নাই, গ্রহণও করেন নাই। বিবাহের পর অধ্যাপক শ্বশুর জামাতার জন্য সামান্য সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া তত্ত্ব পাঠাইতেন। তাহা যত সামান্যই হউক, বাড়ীর লোকদের সেই সমস্ত বস্তুর উচ্চ প্রশংসা করিতে হইত। কেহ সামান্য জিনিস বলিয়া উপেক্ষা করিলে বা নিন্দা করিলে গঙ্গাপ্রসাদ বিরক্ত হইতেন। তিনি বলিতেন, বৈবাহিক মহাশয় তাঁহাকে দেবীর মত বৌমা দিয়াছেন—তাহার বাড়া আর কি? ইহার উপর তিনি আর যাহা কিছুই দিন, তাহা বাহুল্য মাত্র।

বিপন্ন রোগীকে মোচড় দিয়া অজস্র অর্থ আদায় করা চিকিৎসকের অকর্ত্তব্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন

রোগী ডাকিতে আসিলে তিনি কখনও না বলিতেন না। তাঁহার মত ছিল—রোগীর বাড়ীতে ডাক্তার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ যাইতে বাধ্য। প্রথমে তাঁহার ফী দু' টাকা, পরে চারি টাকা হয়। কিন্তু অসমর্থ রোগী উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে না পারিলেও গঙ্গাপ্রসাদ চিকিৎসায় অবহেলা করিতেন না, এবং যে যাহা দিত তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

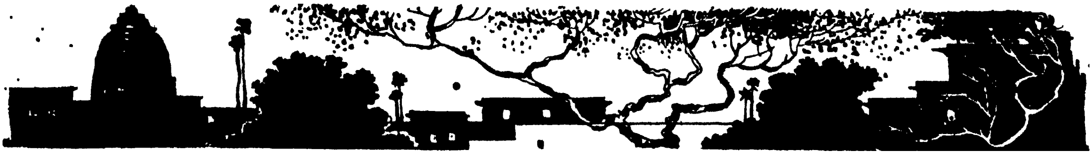
ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি—ছেলে মানুষ করা। প্রথম পুত্র—বংশের প্রথম পুত্র-সন্তান আশুতোষ জন্ম গ্রহণ করিবার পর হইতেই গঙ্গাপ্রসাদ সঙ্কল্প করেন যে তিনি ছেলেকে "মানুষ" গড়িয়া তুলিবেন। এই সঙ্কল্প তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন—আশুতোষকে "মানুষ"ই করিয়াছিলেন। পুত্রকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন—পুত্রের সুশিক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা, মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ে কোন শৈথিল্য করেন নাই। আশুতোষ একবার একখানা ব্লকম্যানের জিওগ্রাফি চাহেন। গঙ্গাপ্রসাদ পরদিন ইংরেজী বাঙ্গলা যতগুলি জিওগ্রাফি, ভূগোল ও যত রকম ম্যাপ ও মানচিত্র পাইলেন কিনিয়া আনিয়া আশুতোষকে প্রদান করিলেন। আর একবার আশুতোষ স্কুল হইতে শুনিয়া আসিয়া মজুমদার কোম্পানীর একখানা ছোট অভিধানের কথা পিতাকে বলেন। তাহার পর দিন বাজারে যতগুলি বাঙ্গলা অভিধান পাওয়া গেল, গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রকে আনিয়া দিলেন।

পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গঙ্গাপ্রসাদ বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। বাজারের খাবার খাইয়া পাছে আশুতোষের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তিনি একদিন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া এক খাবারের দোকানের সামনে দাঁড় করাইয়া দেখাইয়া দেন যে দোকানদার বাসী পচা খাবার গুঁড়া করিয়া টাটকা খাবারের উপকরণের সহিত মিশাইতেছে।

নিজের অবলম্বিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ের প্রতি গঙ্গাপ্রসাদের মনের ভাব কিরূপ ছিল, আশুতোষের প্রতি তাঁহার একটি উক্তি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কৌলীন্য-প্রথা আমাদের দেশে বংশগত হইয়া গিয়াছে। পিতার অবলম্বিত ব্যবসায় সাধারণতঃ পুত্র অবলম্বন করায় আমাদের সমাজে অনেক জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা বোধ হয় আমাদের দেশের মাটীর গুণ। অথবা, কেবল আমাদের দেশে কেন, অন্য অনেক দেশেও প্রায় পুত্রকে পিতার অবলম্বিত ব্যবসায়ই গ্রহণ করিতে দেখা যায়—যদিও তাহার ফলে সে সকল দেশে নূতন নূতন জাতি গড়িয়া উঠে না। বর্ত্তমান কালেও অনেক পরিবারে দেখা যায়, উকীলের পুত্র উকীল, শিক্ষকের পুত্র শিক্ষক, ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার হইতেছে। আশুতোষ এফ-এ পাশ করিবার পর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে মনে করিয়াছিলেন আশুতোষ এইবার ডাক্তারী পড়িবেন; অনেকে গঙ্গাপ্রসাদকে সেইরূপ পরামর্শও দিয়াছিলেন। পাঁচজনের কথায় ছেলের পাছে ডাক্তারীর দিকে ঝোঁক যায় এই জন্য গঙ্গাপ্রসাদ একদিন আশুতোষকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন, তোমাকে ডাক্তারীতে দিবার আমার ইচ্ছা নাই। ডাক্তারী বড় কঠিন ব্যবসায়। লোকের প্রাণ লইয়া নাড়া চাড়া। সর্ব্বদাই প্রাণ তুক্ তুক্ করে। দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। দিন নাই, রাত নাই সব সময়েই রোগীর বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। শরীরের উপর বড় জুলুম হয়। ডাকিতে আসিলে না বলিবার যো নাই—তাহাতে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়। তোমার ডাক্তারী পড়িয়া কাজ নাই।

আশুতোষের উকীল ও হাইকোর্টের জজ হইবার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারিয়া গঙ্গাপ্রসাদ আশুতোষকে একটী টুলের উপর দাঁড় করাইয়া বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করাইতেন। আশুতোষ যাহা হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতার কৃতিত্ব অনেকখানিই ছিল।

সন ১২৯৬ সাল, ২৯ অগ্রহায়ণ (ইংরেজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর) এই সহৃদয় চিকিৎসক লোকান্তরে প্রস্থান করেন।



ছেলেকে মানুষ করা

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্-এম্-এস্

অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে, ছেলে মানুষ-করা কাযটা খুবই সহজ;—ছেলেকে মানুষ করিয়া তুলিতে, কোনও বিশেষ জ্ঞান বা আয়াসের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা ছেলেকে মানুষ করা কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় ঠিক-ভাবে জানেন না। এমন কি, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকরাও এ বিষয়ে উদাসীন। আজকাল দেখা যায় যে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই কচি ছেলেদিগকে আদর করিতে হয় ও খাওয়াইতে হয়; এবং ৫।৬ বৎসর বয়স হইতে, বিদ্যালয়ে দিতে হয় – এইটুকুই জানেন, এবং ইহাতেই শিশুর প্রতি কর্ত্তব্যের শেষ হইল, এমনটি মনে করেন। ইহার মধ্যে একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, শৈশবে, শিশুরা যে আদর পায়, সেটুকু বেশীর ভাগ মা ও ভাইবোনদের নিকটেই পায়,—সখ করিয়া পিতা যেটুকু আদর করেন, মাত্র সেইটুকুই পিতার নিকটে পায়। পিতার সকল কাযের অবসর ঘটে, কিন্তু নিয়মিত ভাবে শিশুর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের সময় তাঁহার অল্প; কারণ, প্রবৃত্তির অভাব। সন্তানের প্রতি স্নেহ বা মমত্ব বোধের অভাবে যে ইহা ঘটে, তাহা বলিতেছি না;—এরূপ ঘটিবার প্রধান হেতু, পিতার মনে সন্তান পালনের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দায়িত্ববোধ খুবই আলগা ও ধোঁয়াটে।

সন্তান-পালনে এই ঔদাসীন্যের মূল কোথায়? ষাট-সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও, এদেশে একান্নবর্ত্তিতা ছিল। ঐরূপ পরিবারে, বর্ষীয়সীরাই সকল কায উপর-পড়া হইয়া করিতেন, এবং বয়োকনিষ্ঠরা তাহা দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতেন। তখন সংসারের কর্ত্তা বা কর্ত্রীর প্রাধান্য খুবই ছিল; এবং দিনের বেলা যুবক স্বামীরা প্রায় স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাইতেন না। কাযেই, পূর্ব্বের যে ধারা, তাহাই চলিয়া আসিয়াছে—গৃহস্থালীর সকল কাযই মেয়েরা করিয়া থাকেন, পুরুষরা বড় একটা সে দিকে ঘেঁসিতে চাহেন না। কিন্তু, এখন, একান্নবর্ত্তিতা ঘুচিয়াছে, এখন একাএকবর্ত্তিতার যুগ। কাযেই, এখন স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সহযোগিতা না করিলে চলিবে কেন—বিশেষতঃ যখন অধিকাংশ স্ত্রীই অশিক্ষিতা? তখনকার সংসারে, পাঁচ জনে চাঁদা করিয়া, অনেক দরদ দেখাইয়া, পরস্পরের কায উঠাইয়া দিতেন;—এখন ত আর সেটি নাই। কাযেই, এখন ছেলেকে কি করিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে হয়, তাহা স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই ভাল করিয়া জানিয়া, তবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই, স্বামী-স্ত্রীকে নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিতে হইবে। প্রাণী জগতে, আমরা দুইটি ঘটনা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করি; প্রথমটি, জীব পৃথিবীতে আসে, আপনার বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী বংশবৃদ্ধি করিয়াই মরিয়া যায়; অনেক প্রাণীদের মধ্যে, স্ত্রীলাভের জন্য ভীষণ যুদ্ধ হয়—বীর্য্য ও বিক্রমে যে প্রবলতম, সেই বংশবৃদ্ধির অধিকারী হয়। এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি এই যে, যখন বংশবৃদ্ধির অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকে না, তখন বড় বড় জানোয়াররা বংশবৃদ্ধি করিতেই চাহে না,—যেমন, পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায়। জীব মাত্রেই সুধু জীব রাখিয়া যাইতে চাহে না সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতীকই রাখিতে চায়। কিন্তু মানুষ কেবল ইহার ব্যতিক্রম করে। প্রাণী-জগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াও, মানুষ সকল অবস্থাতেই বংশ বৃদ্ধি করে,—অনেক স্থলে, অতিমাত্রায়ও তাহা করে; এবং দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অক্ষম সন্তানকে নানা উপায়ে ঠেলিয়া ঠুলিয়া বাঁচাইয়া বড় করে। আমি এমন বলিতেছি না যে, উপর্য্যুক্ত রুগ্ন, দুর্ব্বল বা অক্ষম শিশুগুলিকে হত্যা করা হউক—যেমন ভাবে এককালে গ্রীসের স্পার্টা নগরে অনুষ্ঠিত হইত। আমার বক্তব্য,– বিবাহের সময়ে, বেশ দেখিয়া-শুনিয়া তাহা করা উচিত,—যাহাতে প্রত্যেকেই উৎকৃষ্ট সন্তান সন্ততি রাখিয়া যাইতে পারেন। সকল মানুষেরই এই দায়িত্ব বোধ থাকা উচিত। পাশ্চাত্য-দেশে, বর্ত্তমান কালে, যে জনকরা মূঢ় (feeble-minded), তাহাদিগকে জোর করিয়া আলাদা রাখা হয়; এবং মূঢ় যুবতীদিগের ডিম্বকোষ কাটিয়া দেওয়া হয় (sterilization) —যাহার ফলে, জগতে আর মূঢ় লোকের সংখ্যা না বাড়ে।

তাহার পরে, বিবাহ হইলে, প্রত্যেক ভাবী-জনক-জননীর কর্ত্তব্য, শিশু-সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান সঞ্চয় করা।

আজকাল, সহজ ইংরাজীতে লিখিত এই ভাবের পুস্তকের অভাব নাই; এবং মাসিক পত্রিকাতে, বাঙ্গালা ভাষায় এ ভাবের আলোচনা নিতান্ত বিরল নহে। তাহা ছাড়া, এখন এ দেশে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালী ডাক্তারেরও অভাব নাই। কাযেই, গৃহস্থ একটু চেষ্টা করিলেই, এ বিষয়ে সকল জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। কিন্তু নাটক নভেলের মত এগুলি রোমাঞ্চকর ঘটনা-পূর্ণ নয় বলিয়া, এমন কি শিক্ষিতদের মধ্যেও এই বিষয়ে জ্ঞানলাভের চেষ্টাও জাগে না। জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এমন ঔদাসীন্য অমার্জ্জনীয়; এবং অভিভাবকদিগকে এই ঔদাসীন্যের মাশুল নিতান্ত কম দিতে হইতেছে না।

বর্ত্তমান কালে, দুর্ভাগ্য বশতঃ, এ দেশে শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব ভ্রান্ত ধারণা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। এ দেশে যে শিক্ষার প্রচলন আছে, তাহা সরকারের রাজকার্য্য পরিচালনার মতই। কাযেই, যাঁহারা সরকারী কায করিবেন না, বা বিদেশী পণ্যের দালালি করিবেন না, তাঁহারা যে কেন এই শিক্ষার জন্য মাতিয়াছেন, তাহা বুঝা কঠিন। এই শিক্ষার দোষ এই যে, ইহার আওতায়, মানুষের নৈসর্গিক বুদ্ধিবৃত্তির খর্ব্বতা ঘটে এবং ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ক্ষীণতা জন্মায়; ইহার চাপে, দেহ ক্ষীণ ও মন অযথা ভারাক্রান্ত হয়; এবং ইহার আবহাওয়ায়, মানুষ ঘোর স্বার্থপর ও নাস্তিক হইয়া উঠে। এখন প্রত্যেক শিশুর পিতামাতার পক্ষে ভাবিবার সময় আসিয়াছে,—এ শিক্ষায় লাভ কি? অথচ, দেহ ও মন-পঙ্গুকারী এই শিক্ষা ছাড়া, বর্ত্তমানে অপর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান না থাকায়, বাধ্য হইয়া ইহারই শরণাপন্ন হইতে হইতেছে। যে শিক্ষা মানুষকে আত্মস্থ করে না, যে শিক্ষা সর্ব্বদাই কামনার অগ্নিতে ঘৃতের আহুতি দিতে শিখায়, যে শিক্ষায় স্বাস্থ্যের স্থান নাই, তাহার আমূল পরিবর্ত্তনের সময় অনেক দিনই আসিয়াছে। কিন্তু সে কবে হইবে?

যখন সাধারণ্যে শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই, তখন প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য—যতটা বড় করিয়া সম্ভব, তত দিন বাড়ীতে পড়াইয়া, তবে বালকবালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা। কারণ, বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেই, উপর্য্যুপরি ও নানারূপ পরীক্ষার ঘূর্ণ্যাবর্ত্তে পড়িয়া, ছাত্র-ছাত্রীরা যতটুকু শিখে, তাহার শত গুণ উৎপীড়িত ও পিষ্ট হয়—দেহে ও মনে তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

বাড়ীতে শিশুর শিক্ষার ভার স্বয়ং পিতামাতাকেই লইতে হইবে—যেহেতু, প্রায় ছয় বৎসর বয়সের ভিতরেই, শিশুর সকল রকম মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার চূড়ান্ত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই বয়সেই শিশুর যে অভ্যাস, যে ধারণা, যে আচার ও আচরণ অভ্যস্ত হইয়া যায়, পরে আর তাহা বদলায় না। এই ভিত্তির উপরে, স্কুলে বা কলেজে, যে ইমারতই গড়িয়া তোলা হউক, তাহার কার্য্যকারিতা এই ভিত্তিরই উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এবং এই সঙ্গে আরো বলিয়া রাখি যে, জীবনের প্রথম কয়েক মাস, শিশুর দেহের ভিত্তিও, চিরকালের মত স্থাপিত হইয়া যায়। এই দুইটি বড় কথা প্রত্যেক জনক-জননীকে বারম্বার স্মরণে রাখিতে বলি—

শিশুর দৈহিক ভিত্তি, প্রথম ৩।৪ মাসেই; ও মানসিক ভিত্তি, ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে, চূড়ান্ত ভাবে, স্থাপিত হয়। ঐ ভিত্তির উপরে যতই রং-পালিশ চড়ান যাউক না কেন,—সে সব বাহিরের জৌলুষ, আসল-ভিত কিন্তু অনড়, অপরিবর্ত্তনীয়—এবং এত অল্প বয়স হইতেই সেরূপ হয়। এই খুব প্রয়োজনীয় কথা দুইটি সকলেরই মনে রাখা চাই। এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীকেও মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানের "কন্ধ-কাটা"-শিক্ষা—অর্থাৎ, মনোবৃত্তিকে বাদ দিয়া, পড়ান-বুলি মুখস্থ করান, এবং দেহকে ও মনকে জবরদস্তি আলাদা রাখা,—আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছে। পাশ্চাত্যরা এ বিষয়ে এখন হইতেই সুর তুলিয়াছেন; কিন্তু, এ দেশে, বিশ্ব-পণ্ডিতদের সে বালাই নাই। তাঁহাদের কবে টনক নড়িবে—এবং আদপে তাহা নড়িবে কি-না—তাহার ভরসায় কোন বাঙ্গালীর থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীকে ভিত্তি স্থাপনের ঐ দুইটি সময়ের উপরে খরদৃষ্টি রাখিয়া, নিজ হইতেই, নিজ নিজ শিশুর এক সঙ্গে, দেহ ও মনের উন্নতি ঘটানর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

এ স্থলে, জীবদেহের সম্পর্কে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় অপর কথার একটু আলোচনা করিব। জীব মাত্রেরই লক্ষ্য—আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনার্থ, জীব যে যে কায করে, তাহাকেই আমরা সেই জীবের আচরণ (behaviour) নামে অভিহিত করি। আচরণের পশ্চাতে থাকে, নয়টি সহজাত সংস্কার (instincts বা innate traits); সেই সংস্কারের তাড়নায়, জীব যা' কিছু কায সবই করে। সেই সংস্কারগুলি এই এই—

(১) পোষণ-সংস্কার—অর্থাৎ, ক্ষুধা বোধ হইলেই খাইবার চেষ্টা আসে।

(২) সঞ্চালন-সংস্কার—অর্থাৎ, কোনও বয়সে হামা-গুড়ি দেওয়া, কোনও বয়সে দাঁড়ান, কোনও বয়সে চলা প্রভৃতি দ্বারা, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাতায়াত দ্বারা দেহের মাংসপেশীগুলিকে সক্রিয় রাখিবার সহজ বুদ্ধি।

(৩) ভয় পাইলে, পলায়ন দ্বারা আত্মরক্ষার সংস্কার।

(৪) অভ্যস্ত দ্রব্যে ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হওয়া—যেমন কোনও খাদ্যের স্বাদ কটু হইলে, তাহা ফেলিয়া দেওয়া।

(৫) কৌতূহলী—পূর্ব্বের দেখাশুনা জিনিষের সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে এমন জিনিষ দেখিলেই সন্তর্পণে তাহা পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়া।

(৬) রাগিলে বা বাধা প্রাপ্ত হইলে—দ্বন্দ্বের চেষ্টা।

(৭) আত্মম্ভরিতা ও আত্মগ্লানির ভাব—আমাদের চেয়ে বড় ও ছোটদের নিকটে।

(৮) জনন-সংস্কার ও যৌন-সংস্কার।

(৯) গঠনমূলক বুদ্ধি।

প্রকৃতিদত্ত এই নয়টি প্রধান সংস্কার লইয়া আমরা জীবনযাত্রা সুরু করি। ক্রমশঃ, নানারূপ জ্ঞান (cognition) ও অভিজ্ঞতা (experiences) জন্মে। এই লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে, সহজাত সংস্কারগুলির যথার্থ সম্মিলনের ফল,—আমাদের "চরিত্র" (character); সহজাত জ্ঞান-গুলি হইল "স্বভাব"; পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয় হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহা আহৃত হয়, তাহাই "চরিত্র"। কিন্তু স্বভাব ও চরিত্র এই দুইএর মধ্যে প্রত্যেক মানুষের জীবনে জগাখিচুড়ির মত একটি জিনিষের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়—সেটি আবেগ বা হৃদয়োচ্ছ্বাস (sentiment)। এই আবেগ-ধর্ম্মটি বস্তুতান্ত্রিক অর্থাৎ বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই অলক্ষ্যে জন্মায়। কাযেই কতকগুলি আবেগ সাধারণ হইলেও, কতকগুলি ব্যক্তি বা সমাজগত হয়। জীবের জীবনে ইহার স্থান নিতান্ত কম নহে; বস্তুতঃ, আমাদের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি, নানাজাতীয় আবেগের সামঞ্জস্যীকরণের উপর নির্ভর করে। সেই সামঞ্জস্যীকরণ অতীব কঠিন কার্য্য। যে ব্যক্তি তাহা পারে, তাহার চরিত্রে এক দিকে সংযম, অপর দিকে আত্মমর্য্যাদাবুদ্ধি ও আত্মনির্ভরশীলতা দৃঢ়ভাবে গঠিত হইয়া উঠে। শিশু পালনে,—সংযম, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও আত্মনির্ভরতা শিক্ষার স্থান সর্ব্বাগ্রে,—এই কথাটি সকল অভিভাবককে ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে বলি।

উপরে খুব-সুস্থ জনক-জননীর খুব-সুস্থ সন্তানে কি কি হয়, তাহার একটা স্থূল-আভাষ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ঐ আদর্শ-অবস্থা সংসারে বিরল। তাহার কারণ প্রত্যেক শিশুর বেলা, আমাদিগকে দুইটি বড় কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; সে দুইটি এই—

(১) বংশগত অবস্থা।—সকল শিশু সকল সংস্কার সমান ভাবে পায় না;—কোন কোনটার একান্ত অভাব থাকিয়া যাইতে পারে; অথবা অস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। বংশগত দোষ গুণ অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা শত চেষ্টায় তাহাদিগকে স্বাভাবিক বা আদর্শ অবস্থায় আনিতে পারি না—যৎসামান্য তাহার উন্নতি ঘটাইতে পারি মাত্র।

(২) পারিপার্শ্বিক অবস্থা।—ইহারও প্রভাব নিতান্ত অল্প নয়। কিন্তু সুখের বিষয়, এই অবস্থার রদ-বদল করা অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমাদিগকে সযত্নে স্মরণ রাখিতে হইবে যে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিশুর দেহ ও মন উভয়েরই উপরে স্বতন্ত্র ভাবে কায করিতে পারে। বাড়ীর আবহাওয়া, আহারের ক্রটি, পোষাকের দোষ, অতি শ্রম, যথেষ্ট বিশ্রামের অভাব, বারম্বার সংক্রামক রোগ ভোগ প্রভৃতির ফলে, শিশুর দেহ চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; অথচ জন্ম হইতে এ সমস্ত বিষয়ে আমরা অবহিত থাকিলে, শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হয়। সেই রকম, দাস দাসীর সংসর্গ, বিদ্যালয়ের আবহাওয়া, পাঠ্য পুস্তক, বায়স্কোপ প্রভৃতির দোষে বা গুণে, চিরকালের মত, শিশুর নৈতিক অবনতি বা উন্নতি ঘটিতে পারে।

এতগুলি ধাপ পার হইয়া, আমরা এইবার গৃহস্থের সংসারের দিকে তাকাইবার অবসর পাইলাম। এখানে, আমার প্রথমে সমাজের কথাই উল্লেখ করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রকৃত সমাজ এখন নাই—এখন আমরা সকল বিষয়ে সুবিধাবাদী হইয়া পড়িয়াছি—যখন যেখানে ইচ্ছা, যেমন ভাবে ইচ্ছা, যে পথে ইচ্ছা চলিতেছি। কাযেই, আমাদের সমাজ নামে থাকিলেও, সে সমাজ মৃত। যে সমাজের কল্যাণে জাতির শিক্ষা-দীক্ষা,

সংযম সাধনা, নৈতিক উন্নতি ঘটিতে পারে; যে সমাজ আমাদিগকে আত্মস্থ ও স্বরাট্ করিতে পারে; যে সমাজ সৌভ্রাত্র ও বিশ্বপ্রেমের আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, সে সমাজ কৈ? একদিন এই সমাজ ছিল বটে, কিন্তু "তেহি নো দিবসা গতা।"

কাযেই "সংসারের" (family) কথা পাড়িতে বাধ্য হইলাম। একান্নবর্ত্তিতা আজ আর নাই,—যে একান্নবর্ত্তী পরিবার ছিল সহজ শিক্ষা ক্ষেত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র সংস্করণ; যে একান্নবর্ত্তী পরিবারে, from each according to his ability to each according to his needs, এই সূত্র অবলম্বিত হইত। এখন প্রত্যেক সংসারটি—স্বার্থপরতার ও বিলাসিতার কেন্দ্র। কাযেই ছেলেরা যে অসংযত, দুর্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কথা কি? যাহা আছে তাহাকে মানিয়া লইতেই হইবে। এবং তদনুসারে শিশু পালনের কথাই বলিতেছি।

সংসারে যদি পিতামাতা পরস্পরের মধ্যে শিশু পালন বিষয়ে সহযোগিতা থাকে তবেই সুফল ফলে। সুফল পাইতে হইলে, এইগুলি কর্ত্তব্য—

(১) শিশু-মন বুঝিতে হইবে।—শিশুর কি অভ্যাস দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কোন্ কোন্ জিনিষ শিশু "ভালবাসে" এবং শিশু কি "চায়"—প্রত্যেক হাতেই পিতা ও মাতা উভয়কেই এই তিনটি বিষয়ে বুঝিয়া চলিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে, শিশুর নৈতিক শিক্ষা সাঙ্গ হয়; কাযেই এই স্বল্প-সময়টুকুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা চাই। "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ"—এ কথাটি ভ্রান্ত। স্নেহ ও ভালবাসা, পাঁচ বৎসরের মধ্যে শিশুর ন্যায্য প্রাপ্য হইলেও, যদি তাড়না করিতেই হয়, তবে তাহা ঐ পাঁচ বৎসরের মধ্যেই হওয়া চাই; নতুবা, পরে তাড়না করা বিড়ম্বনায় দাঁড়ায়। এবং তাড়না, প্রথম পাঁচ বৎসরের যতটা গোড়ার দিকে তাহা হয়, ততই ভাল। শিশুর যে কোনও সৎ অভ্যাস তাহার জন্মকাল হইতেই করান চাই—নতুবা পরে ধরান বড় কঠিন। সময়ে আহার করা, মলত্যাগ করা, স্নান করা, বেড়ান, ঘুমান প্রভৃতি জন্মদিন হইতেই অভ্যাস করান চাই। খাইবার আগে হাত ধোয়া, খাইতে বসিয়া হাসি মুখে খাওয়া, ঠিক সময়ে উঠা, নিজের জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি সদভ্যাসগুলি দেখাইয়া দেওয়াই এবং ঐগুলি ঠিকমত পালিত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে অবহিতও হওয়া চাই।

(২) খাওয়া সম্বন্ধে বাহানা—জন্মায়, পিতামাতার খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে মতবাদ প্রচারের ফলে। পিতা, মাতা, বড় ভাই, বোন প্রভৃতি যদি খাইতে বসিয়া, "এটা বিশ্রী, ওটা ভাল নয়, সেটা দেখিলে বমি ঠেলিয়া আসে" ইত্যাকার সমালোচনা করেন, তবে শিশুও তাহা করিতে শিখে। সকলেরই উচিত, পাতে যাহা দেওয়া হয়, হাসি মুখে তাহা খাইয়া যাওয়া। "অন্ন কত বড় জিনিষ—পৃথিবীর উর্ব্বরাশক্তি ও সূর্য্য তেজের সমন্বয়"—এত বড় দুইটি শক্তি অন্নে আছে; আজ আমরা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছি, কত লোকের তাহাও জুটিতেছে না; এই অন্ন খাইয়াই আমরা এমন বড় ও স্বাস্থ্যবান হইয়াছি; অতএব এই অন্নকে প্রণাম করি ও ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করি"--এই ভাবের কথাবার্ত্তা মাঝে মাঝে খাইবার সময়ে বলা হইলে, কত ভাল হয়। এই ভাবে দুধের, শাক সব্জীর, ফলের গুণ কীর্ত্তন করা উচিত। বেশভূষা ও স্নানের বাহানা সম্বন্ধেও ঐ ভাবে চলা প্রয়োজন।

(৩) যথেষ্ট বিশ্রাম ও খেলার অবসর দিতে হয়।—শিশুরা খেলার ভিতর দিয়াই মানুষ হয়। আমরা একটা জটিল প্রশ্ন সমাধান করিতে যেমন শ্রান্ত হইয়া পড়ি, শিশুরা খেলা করিতে গিয়া তেমনি বা ততোঽধিক শ্রান্ত হয়। কাযেই, শিশুকে আপনার মনে খেলিতে ও প্রচুর ঘুমাইতে দিতে হয়। তার পরে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিশুদের ছয় বৎসর বয়সের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা সাঙ্গ হয় এবং শিশুরা যা' কিছু সবই দেখিয়া, অনুকরণ করিয়া, বারম্বার মহলা দিয়া, তবে তাহা শিখে। এই জন্য, শিশুরা মনে মনে বাটীর কাহাকেও আদর্শ পুরুষ বলিয়া বরণ করিয়া লয়; এবং সেই ছাঁচেই অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠে। এই জন্য, শিশু কখনো কর্ত্তা সাজিয়া হুকুম করে, কখনো বা দাসের মত কাহারো হুকুম পালন করে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মনোবৃত্তির বশে নিত্য এই পরিবর্ত্তিত আচরণ,—ইহাকে কতকটা "আস্কারা" দেওয়া চাই—অর্থাৎ শিশুর মনে যখন যে আবেগটা (sentiment) প্রবল হয়, তাহা ফুটিতে দেওয়া চাই—ধীরে, অতি ধীরে ও সন্তর্পণে, সেগুলিকে সুপথে ও সংযত সীমার মধ্যে পরিচালিত করিলেই যথেষ্ট হয়।

(৪) সংযম শিখান চাই।—"শাসনের" ফল কি? ফল, বাহিরে স্তব্ধতা, ভিতরে দারুণ বিক্ষোভ—অস্পষ্ট স্নায়ুজগতে তুমুল ঝড়;—কাযেই, অসংযমের রাস্তা পরিষ্কার হওয়া। কাযেই, শিশু কিছু অন্যায় করিলে, অকস্মাৎ শাসন না করিয়া, নানা পথে তাহার মনকে চালিত করিলেই বেশ সুফল পাওয়া যায়। শিশুর মন যেমন চঞ্চল, তেমনি পল্লবগ্রাহী। কাযেই, যে অন্যায়টা শিশু করিয়া ফেলিয়াছে, তদ্বিষয় হইতে সস্নেহে বিষয়ান্তরে তাহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া, ভ্রম দর্শন করান, এবং সস্নেহে অথচ কিঞ্চিৎ দৃঢ়তার সহিত দোষটি যাহাতে পুনর্ব্বার না হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া চাই। কোন একটি খাবারের জন্য শিশু জিদ্ ধরিলে, তখনকার মত শিশুর প্রিয় অপর কিছু তাহাকে দিয়া বলা ভাল যে—"তুমি সে জিনিষটি পাইবে, যদি না দ্বিতীয়বার তাহা পাইবার জন্য জিদ কর"; এই ভাবে, প্রত্যেক জেদের মুখে, তাহাকে মৃদু শাসন করিলে, সে আপনিই সংযম শিক্ষা করিবে। আসলে, আমরাই অতি-আদর দিয়া, অযথা মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া, নিজেরা "বল সে বাড়ী নাই" ইত্যাকার মিথ্যা আচরণ করিয়া, শিশুদিগকে অসংযমী করিয়া তুলি। কাপড়ের উপর কাপড়, খেলনার উপরে খেলনা, "চুপ কর, সন্দেশ দিব" বলা অথচ সন্দেশ না দেওয়া, নিজেরা অশনে ভূষণে বাক্যে ও ব্যবহারে অসংযত ব্যবহার করা—এইগুলি অলক্ষ্যে দেখিয়া ও শুনিয়া, শিশুরা অসংযমী হয়। শিশুকে বিজাতীয় পোষাকে বিভূষিত করা, এক পা চলিতে না দিয়া দুইবেলা গাড়ীতে স্কুলে যাতায়াত করান, স্নানের বা ভোজনের সময়ে দাসদাসীর বাহুল্য ও তোষামোদ এই সকলেতেই ছেলেরা বিগড়ায়। পিতামাতার অবস্থা যতই ভাল হউক, জন্মকাল হইতে শিশুর সকল কায তাহারই ঘড়ি ধরিয়া করান; সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ভাবে দৈনন্দিন কার্য্য করিতে দেওয়া বা শিখান; ভালবাসা ও স্নেহে পুষ্ট করা, কিন্তু "আদরে-গোবরে" ভরিয়া না দেওয়া;—এই চাই। অনেক পিতামাতা স্বভাবতঃ সংযমী নন, কিন্তু শিশুর সম্মুখে সংযমী এই ভাব দেখান বলিয়া, শিশুরাও ক্রমশঃ ভিতর-বাহির দু'রকম ব্যবহার করিতে শিখে।

(৫) নিবিষ্টচিত্ত হইতে শিখান চাই।—শিশুরা স্বভাবতঃই যখন যে দিকে মন দেয়, খুব প্রগাঢ় ভাবেই তাহাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়। যত গোল বাধাই আমরাই—বিশেষ করিয়া, বিদ্যালয়গুলি। আমরা দোষ করি, দুই রকমের। প্রথম দোষ করি, অনবরত নানা অবান্তর বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া—হয় ত' তাহাদের কাযের মধ্যে, ফরমাইস করি, নয় ত গল্প জুড়িয়া দিই, নয় ত হুজুগে লাগাইয়া দিই। আমাদের দ্বিতীয় রকমের দোষ,—তাহাদিগকে একই বিষয়ে অত্যধিক ক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়া—যেমন, একটানা, দশ পাতা হ্যাণ্ডরাইটিং লিখাই, বা অঙ্কের পর অঙ্ক কসাইয়া—ঘণ্টা কাটাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, কোনও শিশু, যে কোনও এক বিষয়ে, একটানা ১০ হইতে ২০ মিনিটের বেশী মন দিতে পারে না—এবং তাহাতেই তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়ে! শিশুদিগের সঙ্গে, কোনও বিষয়ে, আমরা শিশু সাজিতে পারি না—বৃদ্ধ-মন লইয়া তাহাদিগকে বিচার করি! যত গোল এই খানেই। পাকা গৃহিণী যেমন নবাগতা পুত্রবধূর নিকট হইতে সর্ব্ব বিষয়ে কর্ম্মপটুতা আশা করেন, আমরাও মনে করি—"আমরা পারি, আর ঐ শিশুটি পারিবে না?" স্কুলে, "ঘণ্টার" পর যত বা "ঘণ্টা" আসে, ততই বিষয়ের বাহুল্য ঘটে;—ফলে, একটা বিষয়ে মন দিতে না দিতেই, "ঘণ্টা" পাল্টাইয়া যায়—শিশুকে আবার চেষ্টা করিয়া পূর্ব্ব-"ঘণ্টার" বিষয়টিকে ভুলিতে, ও নূতন বিষয়টিকে গ্রহণ করিতে, হয়। ফলে, শিশুরা বড় হইয়া, পল্লবগ্রাহী ও চঞ্চলচিত্ত হয়, ফাজিল ও ফাঁকিদার হয়, চালাকি করিয়া সকল কায সারিতে শিখে। এ বিষয়ে দোষ কাহার? আমাদেরই পূরাপূরি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিব। শিশুরা ঝগড়া মারামারি করে এবং বাড়ীতে তজ্জন্য বকুনি খায়;—অর্থাৎ, তাহাদের নৈতিক স্খলন একটু আধটু হয়ই। শৈশব হইতেই, যাহাতে দিনের হিসাব সেইদিনই চুকাইয়া দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া শিশু পালন করিতে হয়। প্রত্যহ, শয়নের পূর্ব্বে, যাহাতে সেদিনকার দোষত্রুটি স্মরণ করিয়া, শিশুরা স্বয়ংই ভালমন্দ বিচার করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে পিতামাতার প্রকাণ্ড কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। আজ যাহার সঙ্গে শিশু ঝগড়া করিয়াছে, কাল যেন তাহাকে দূরে না রাখে—সরল প্রাণে তাহাকে যেন আবার কাল কোলে টানিয়া লইতে পারে—এভাবে শিশুকে গড়িয়া তুলিতে হয়। তেমনি, আজ যদি শিশু কোনও দোষ

করে, অপর কোনও দিন ভুলিয়াও তজ্জন্য শিশুকে বকিতে বা অপদস্থ করিতে নাই। স্বয়ং সদ্যঃ ক্ষমা করিতে এবং ক্ষমা করিতে শিখাইতে হয়—নতুবা শিশুরা কুবুদ্ধি, হিংসাপরায়ণ ও বদমেজাজী হয়।

(৬) কথায়, কাযে, ব্যবহারে সরলতা শিখান চাই।—"ক" অক্ষর দেখিলেই প্রহ্লাদের মনে "কৃষ্ণ" নাম জাগিত। তেমনি, শৈশব হইতেই, কোনও বাক্য, দ্রব্য, ভাব বা ইঙ্গিতের সঙ্গে, তাহার অর্থ, গুণ বা কার্য্যকে সংযোজনা করিতে শিখিয়া, শিশুরা তদ্বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করে। ছাত্ররা যেমন ঘড়িতে ১০টা বাজিলেই স্কুলের সময় আগত, এইটা বুঝে; ঘোড়া বিশেষকে দূর হইতে দেখিলেই নিজেদের গাড়ী আসিতেছে চিনিতে পারে; তেমনি, জাগতিক সকল শিক্ষাই কোনও-না-কোন শব্দ, রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া শিশুরা জ্ঞানলাভ করে। এই জন্য, শিশুদিগের সঙ্গে "ব্যবহারে"—সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সরল হওয়া চাই; "শিক্ষাকালে", যতদূর সম্ভব সহজ ভাষা ও জিনিষ অবলম্বনে শিক্ষাদান করা চাই; "শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি" একেবারে সহজ ও সুস্পষ্ট হওয়া চাই; এবং যখন যে পাঠ বা যে কাযে শিশুকে লইয়া নিযুক্ত থাকা হয়, তাহা যেন প্রাণপণে ও একান্ত ভাবেই করা হয়।

(৭) শৈশব হইতেই শিশুকে সাহসী হইতে শিখান চাই।—জুজু, ভূত বা অন্ধকারের ভয়; বিকট মুখোস বা চীৎকার; কদাকার বা বিকটাকার ব্যক্তি বা পোষাক বিশেষ;—কত রকমের অনর্থক ভয় দেখাইয়া আমরা শিশুকে ভীরু ও কাপুরুষ সৃষ্টি করি; এবং অযথা কুকুর প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া, নিষ্ঠুরও করি। যখন কেহ ভয় পায়, বা রাগে, বা তীব্রভাবে বিরক্ত হয়, তাহার ফলে, তখন হঠাৎ তাহার adrenal নামক গ্রন্থি হইতে খানিকটা রস তাহার রক্তে স্রুত হয়; ফলে, হৃৎপিণ্ড দ্রুত চলে, রক্ত চাপ বাড়ে, যকৃত হইতে কতকটা শর্করা রক্তে বাহির হইয়া পড়ে; এক কথায়, অকস্মাৎ ও প্রচণ্ড ভাবে কতকটা কায করিবার জন্য তাহার দেহ উদ্রিক্ত হয়—দৌড়াইয়া পলাইতে, বা অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে আকস্মিক প্রবল চেষ্টা জাগিয়া উঠে। শৈশব হইতে দেহের "স্বাভাবিক" প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়াই যৌক্তিক—প্রশ্রয় দিলে শিশু নির্ভীক, ক্রমশঃ বিচারক্ষম, সংযমী ও ক্ষমাশীল হইতে শিখে। নতুবা দেহের অযথা ক্ষয় হয়, মানুষ ভীরু ও কাপুরুষ হয়।

(৮) শিশুকে সামাজিক হইতে শিখাও।—মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলিয়াই, শিশু সামাজিকতা শিখে—কখনো রাজা সাজে, কখনো প্রজা এবং সকল সময়েই পাঁচজনের মনের মত হইতে শিখে। এই ভাবে, পরমত-সহিষ্ণুতা, হৃদ্যতা, সেবাধর্ম্ম, নৈতৃত্ব প্রভৃতি অনেক গুণই শিশু অলক্ষ্যে শিখিয়া লয়—বস্তুতঃ খেলার ভিতর দিয়াই শিশু সামাজিকতা শিখে। এই জন্য, একই সংসারে বহু শিশু থাকা পরম বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমানের বিদেশী ও বিজাতীয় শিক্ষার তাড়সে, জাতীয়তার ও ধর্ম্মের মূল উৎপাটিত এবং তৎস্থানে ভোগ-লোলুপতা প্রতিষ্ঠিত। এইদিক দিয়াও একান্নবর্ত্তিতার অভাব আজ বড়ই বোধ করা যাইতেছে। জন্ম শাসনের কুফলে, আজ শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজ ধ্বংসের পথে; অথচ, অশিক্ষিত সমাজের জনসংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে! আজকাল অধিকাংশ বাড়ীতে,—হয় ত একটি সন্তান মিলে। তেমন স্থলে, প্রকৃত খেলার সঙ্গীর অভাবে, সেই শিশু অত্যন্ত অসামাজিক হইয়া উঠে; নতুবা, পিতামাতার নিত্য সংসর্গে থাকিয়া, অকালপক্ক হইয়া উঠে। এই রকম শিশুদিগকে অত্যন্ত অল্প বয়সে—তিন বৎসর বয়স হইতে—স্কুলে না দিলে, ইহারা ঘোর স্বার্থপর ও অসামাজিক, এমন কি সমাজদ্রোহী, হইয়া উঠে।

(৯) সকলের প্রতি সম্মানবুদ্ধি-সম্পন্ন হইতে শিখান চাই।—কে কি ধর্ম্মমত-মত পরে গড়িয়া উঠিবে, তাহাতে আসে যায় না। যদি শৈশব হইতেই, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও দেহের প্রতি মর্য্যাদা-বুদ্ধি শিখান যায়; যদি শৈশব হইতেই ভাই-বোন ও প্রতিবেশীর প্রতি সম্ভ্রম-জ্ঞান শিখান যায়; শিশু যদি প্রথম হইতেই পিতামাতাকে যথার্থ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে শিখে; যদি শৈশব হইতেই, শ্রীভগবানের সুখস্পর্শ কত রূপে, কত গন্ধে, কত রসে, কত শব্দে, কত স্পর্শে আমরা পাইতেছি, তাহা শিশুদিগকে বুঝাইয়া ক্রমশঃ জগন্মাতার প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিতে পারি; তবে সে শিশু যখন বড় হয়, তখন সে প্রকৃতই একজন মানুষ হইয়া উঠে। পর-চর্চ্চা, পর-গ্লানি, মাৎসর্য্য, হিংসা—সমস্তই কোথায় ডুবিয়া যায়। এক দিকে, যেমন নিজ বাহুবলে আস্থা ও নিজ বিবেকে স্থিতি লাভ হয়; অপর দিকে, তেমনি কর্ত্তব্য-জ্ঞানের

সঙ্গে, শ্রীভগবন্মুখিতাও ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই ভাবে শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে, পিতা মাতা ও বড় ভাই বোনদিগকে সকল বিষয়ে উদার-হৃদয়, সরল ও সংযমী ও প্রফুল্লচিত্ত হইতে হইবে—পরসেবাব্রতে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, দৈহিক ও মানসিক ক্ষুদ্র পীড়াগুলিকে অবজ্ঞা করিতে শিখিতে হইবে, পরের দোষ ছাড়িয়া তাহাদের গুণেরই আলোচনায় রত হইতে হইবে, নিত্য দুইবেলা আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বাল্যকালে কোনও পুস্তকে একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, সেটি এই—কোনও সংসারে, প্রত্যেক শিশুকে একখানি ৩৬৫ পৃষ্ঠার সাদা খাতা দেওয়া হইত। সেই খাতায় দৈনন্দিন কাহার কাছে কি উপকার, বা ভাল ব্যবহার শিশু পাইয়াছে, তাহা টুকিয়া রাখিতে হইত, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠার শিরোদেশে "পিতা ও মাতা" এই দুই জনের নাম লিখিত হইত—কারণ, এ জগতে আমরা যাহা কিছু সুখ ভোগ করিতেছি, তাহা মাতা-পিতৃ প্রসাদাৎ—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যহই, শিশুদিগকে এই সৎকর্ম্মের হিসাবগুলি বারম্বার দেখিতে উৎসাহ দেওয়া হইত - ফলে, তাহারা দুনিয়ায় সকলকেই ভাল দেখিতে শিখিত।

(১০) মিথ্যা-ভানের প্রশ্রয় দিবে না।—বাড়ীতে শত চেষ্টা সত্ত্বেও, কোন কোন ছেলে মিথ্যা ভান করিতে শিখে—পড়া বা তাহার পক্ষে বিরক্তিকর কায এড়াইবার জন্য। মাথা ধরা, পেট ব্যথা, গা বমি প্রভৃতির ভান করিলে, না ধমকাইয়া, সে-বেলার বা সেদিনের মত, খাওয়া কমান বা বন্ধ করা এবং সারাদিন শুইয়া থাকিতে বাধ্য করাই সবচেয়ে উপযুক্ত ঔষধ। সেদিন বাড়ীতে খেলার সাথীরা আসিলে, "অসুখ হইয়াছে" বলিয়া, নীচে হইতেই তাহাদিগকে ভাগাইয়া দেওয়াই ভাল।

(১১) এই এই বিষয় গুলিতে পিতা ও মাতার সমান দৃষ্টি থাকা চাই—

(ক) চাকর বাকরদের সঙ্গে শিশুকে থাকিতে বা বেড়াইতে দিবে না। যে ছেলেরা রাতদিন চাকরদের হাতে খায়, তাহাদের কোলে ফিরে, চাকরদের হাতে মানুষ হয়—সে ছেলেরা নষ্ট হয়ই।

"হীয়তে হি মতিস্তাতঃ হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।"

(খ) শিশু কাহার সঙ্গে খেলে, কি বই পড়ে, কোন্ বায়স্কোপে কি দেখে, তাহার স্কুলের ও খেলার মাঠের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া কেমন—তদ্বিষয়েও দৃষ্টি রাখা চাই; এবং আবশ্যক হইলে, দল ভাঙিয়াও দেওয়া বাঞ্ছনীয়। স্মরণ রাখিবেন, খেলা, পাঠ ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াই "চরিত্র" গঠন করে।

(গ) জন্ম-রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে—কখনও চুপ করিয়া থাকিতে নাই বা মিথ্যা বুঝাইতে নাই। শিশুর বয়স ও বুদ্ধির মত, সহজ, সত্য কথায়, প্রথমতঃ গাছপালার দৃষ্টান্তে, পরে, আবশ্যক হয় ত, মানুষের কথাতেই তথ্য বুঝান ভাল। কিশোর বয়স্কদিগের নিকটে "যৌনতত্ত্ব" কেমন করিয়া প্রকট করা যায়, তাহা অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছি।

(ঘ) আত্মগ্লানির পথে কখনো শিশুকে ঠেলিয়া দিবে না।—সে শিশু, সে ছোট—কাযেই সে অবোধ; সে শিশু, কাযেই তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নাই; সে শিশু, কাযেই বাড়ীর সকলের ব্যবহার করা পুরাতন জিনিষই তাহার প্রাপ্য; সে শিশু, কাযেই সকলে তাহাকে ধমকাইয়া দাবাইয়া রাখিবে—এগুলি হইতে দিতে নাই। যদি কোনও রকমে শিশুর মনে "আমি দীন, আমি হীন," "আমি দীনদরিদ্র মূর্খ" ইত্যাকার গ্লানিকর হীনতার ভাব (inferiority complex) জাগে, সে শিশু বড় হইয়া সাহসে ভর করিয়া কোনও দিকে হাত বাড়াইতে পারিবে না—চিরকালের মত সে হীনতার ছাপ বহন করিবে - আজ যাহা সমস্ত বাঙ্গালীর হইয়াছে।

(ঙ) শিশু যাহাতে নিজে বেশ্ গোছাল হয়—নিজের জামা-কাপড়, জুতা-ছাতি, বিছানা-শেয, ঘর-দুয়ার ঝাড়া, পরিষ্কার রাখা, প্রভৃতি বিষয়ে—সামান্য সাহায্য ও ইঙ্গিত দিয়া মাত্র, শিশুকেই তাহা শিখাইয়া লইতে হয়। ঘন ঘন তদারক করিতে হয়—কোন ত্রুটি রহিয়া গেলে শিশুর দ্বারাই তাহা সংশোধন করাইতে হয়। নিজের গামোছায় সাবান দেওয়া, জুতা ঝাড়া, কাপড় কোঁচাইয়া রাখা, শুক্না কাপড় যথা-সময়ে তোলা, পেন্সিল, সাবান প্রভৃতি এখানে-ওখানে ফেলিয়া না আসা, বই ও খাতা ছিঁড়িতে আরম্ভ করিবামাত্র স্বহস্তে মেরামত করা—এ সবই করাইয়া লওয়া চাই।

(চ) শিশুকে ভাল বাসিতে আছে—কিন্তু আব্দার করিতে দিতে নাই। এবং তিন বৎসর বয়স হইতে, অল্প-অল্প করিয়া, শিশুকে সকল বিষয়ে আলাদা করিয়া দিতে

হয়—যাহাতে সে স্বাবলম্বী হইতে শিখে। আলাদা ঘরে শোয়া; নিজস্ব আন্‌লায় বা আলমারীতে নিজস্ব জিনিষ রাখা; ও কোন্‌টা ছিঁড়িল, হারাইল বা ফুরাইল, সময় হইতে তাহার হিসাব রাখা, ইত্যাদি শিখান চাই।

পরিশেষে, শিশুর জনক-জননী বা অভিভাবকগণের প্রতি আমার আর একটি দুইটি কথা বক্তব্য আছে। মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা উভয়ে যেন এক প্রাণ ও এক মন হইয়া সকল কায করেন—পিতা শাসন করিলেন, মাতা আদর দিলেন—এভাবে ভিন্নমুখী হইলে চলিবে না। যদি পিতা শিশুর কতক কায করিলেন, এবং মাতা অপর কতক কায করিলেন—এমন হয়, তাহা হইলে, উভয়ে, দিনান্তে সকল বিষয়ে আলোচনা করা চাই; এবং পরদিনের কর্ম্মপদ্ধতি, পূর্ব্ব-দিনে উভয়তঃ ঠিক করিয়া লওয়া চাই।

মনে রাখিতে হইবে—শিশু মানুষ করা সাধনা-সাপেক্ষ। সাধক-সাধিকার পক্ষে, সংযম, সুশিক্ষা, ঐকান্তিকতা, ধৈর্য্য এবং সদানন্দ ভাব থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বশিল্পী দেহ গঠনের ও সৌষ্ঠবের কাযটুকু করিয়া দিয়া, বাকী মন গড়িবার ভার মানব-শিল্পীর উপরেই দিয়াছেন—জনক-জননী, শ্রীভগবানের প্রতিভূ, মনে-প্রাণে এইটুকু গ্রহণ করিয়া কায করিবেন। তাঁহাদিগকে কত বিষয়ে ইঙ্গিত করিতে হইবে; কত বিষয় হাতে কলমে করিয়া দেখাইতে হইবে; কখনো আদর্শ পুরুষ সাজিতে হইবে, কখনো ধৈর্য্যের অচলায়তন হইতে হইবে; কখনো শিশুর সঙ্গে শিশু সাজিতে হইবে; কখনো গুরু হইয়া পূজা লইতে হইবে; কখনো কঠিন, কখনো কোমল হইতে হইবে। বাহিরে অভিভাবকের বয়সের ও অভিজ্ঞতার আবরণ থাকিলেও, ভিতরে, মনে ও প্রাণে, শিশু হওয়া চাই—শিশুর মত মন না করিলে, শিশুর সঙ্গে চলা বা শিশুকে ঠিক্‌ মত বুঝা কঠিন।

"আদর্শ" জিনিষটা শিশুরা যেমন চায়, জানে ও বুঝে, বড় হইয়া, আমরা তাহা ভুলিয়া যাই। এই জন্যই দেখা যায় যে, যেখানে আদর্শ পুরুষ যত বেশী দৃঢ়রূপে শিশুমনে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তত বেশী ও ভাল করিয়া, কায পাওয়া যায়। শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও তাহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যতই ভাল হউক, এবং শিক্ষক সরস্বতীর বরপুত্র হইলেও, ছাত্ররা যত না শিখে; তদপেক্ষা ঢের মন্দ বিদ্যালয়ে ও আবহাওয়ার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কম বিদ্বান শিক্ষকের নিকটে, ছাত্ররা রীতিমত মানুষ হইয়া উঠে, যেখানে শিক্ষক ছাত্রদের আদর্শ পুরুষ। সেই জন্যই, বারম্বার বলি, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পিতামাতাকে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীভগবানের প্রতিভূ সাজিতে হইবে—তবেই ছেলে মানুষ করা সম্ভবপর হইবে।

দরিদ্রের ব্যথা

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

দিনে দিনে পলে পলে হ'তেছে সঞ্চিত—
যে ব্যথা অন্তরে সদা দুঃখের লাগিয়া,
ন্যায় হ'তে পদে পদে হতেছি বঞ্চিত,
কাহারে জানাব তাহা কোন ভাষা দিয়া॥
নীরবে সহিতে থাকি কত অবিচার—
শিরে ধরি নির্ব্বিচারে কলঙ্ক-কালিমা।
বিদ্রোহী মনেরে করি শান্ত কত বার;
কে বুঝিবে কোথা মোর ধৈর্য্যের সীমা,
মর্ম্মে মর্ম্মে কত জ্বালা করি অনুভব।
অবহেলা অপমান সহিয়া সহিয়া
কি দিব উত্তর? কেন তবুও নীরব।
করুণায় বিগলিত হবে কার হিয়া॥

শ্রাবণের ধারা সম নিঝুম নিশীথে
যে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে অলক্ষ্যে সবার,
কে দিবে সান্ত্বনা সেথা তাহারে রোধিতে;
অথবা মুছাবে কেবা তপ্ত আঁখি ধার॥
নীড়চ্যুত বাত্যাহত বিহঙ্গের প্রায়
ভাগ্যহীন হয়ে একা ফিরি পথে পথে;
কোথায় মিলিবে স্থান কে বলিবে হায়;
অথবা ব্যথার ব্যথী বন্ধু হবে সাথে॥
কবে কোথা করিয়াছি কত মহাপাপ
দরিদ্রতা শতমুখে ঘিরিয়াছে তাই।
বাসনা কামনা রুদ্ধ শুধু অনুতাপ;
চাপা চাপা দীর্ঘ শ্বাস, শুধু নাই নাই

জাতীয় মহাসমিতি

এ বার জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের বোম্বাইয়ে অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের পর সরকার ইহার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে ও পরবৎসর কলিকাতায় যে দুইটি অধিবেশন হয়, সে দুইটিকে অধিবেশন-চেষ্টা বলিলেই



বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

সঙ্গত হয়। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই পুলিস প্রতিনিধিদিগকে গ্রেপ্তার করে ও অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার পর আইনভঙ্গ আন্দোলন প্রত্যাহারের ফলে এ বার কংগ্রেসের অধিবেশনে আর কোন বাধা প্রদত্ত হয় নাই।

লর্ড রিপণ যখন ভারতের বড় লাট, তখন ইলবার্ট বিলে বিচার বিষয়ে ভারতীয় রাজকর্ম্মচারিগণের ন্যায়-সঙ্গত ক্ষমতায় আপত্তি করিয়া য়ুরোপীয়রা যে আন্দোলন করেন, তাহাতেই ভারতবাসীরা বুঝিতে পারেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করিলে তাঁহারা কখনই প্রাপ্য অধিকার—তাঁহাদের জন্মগত অধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। সেই উপলব্ধির ফলে কংগ্রেসের উৎপত্তি। সেই জন্যই ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

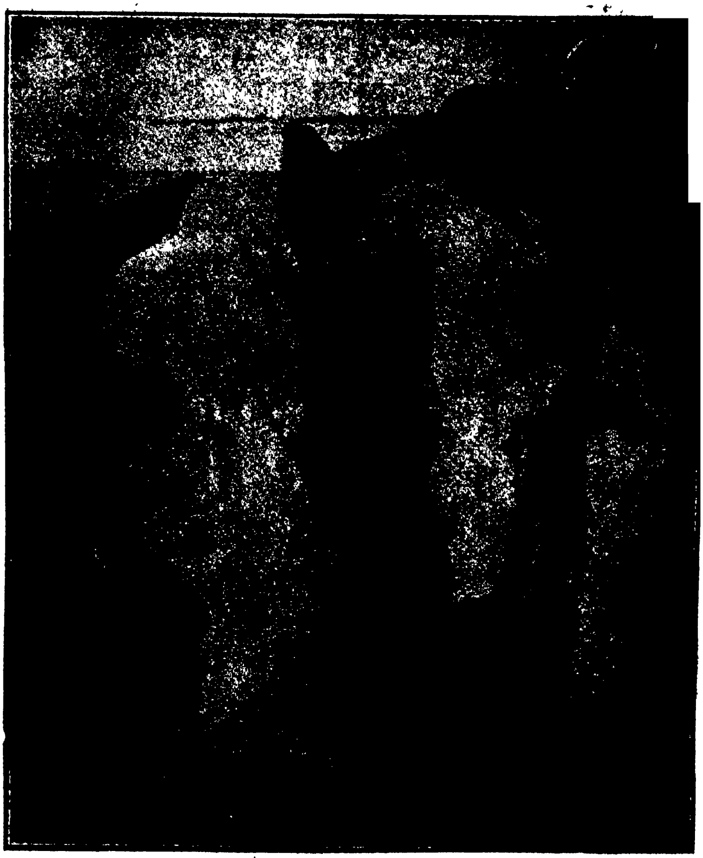
"যে নীরদ উঠি রিপণ-মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল-সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল।"

সে সময় (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালাই ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতেছে। তাই বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে বাঙ্গালার বরেণ্য ব্যবহারাজীব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, তখন কংগ্রেস বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই, ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। দেশের নানা প্রদেশের নেতৃস্থানীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা তাহাতে সমবেত হইয়া ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচনা করিতেন, অভাব ও অভিযোগের বিষয় সরকারকে জানাইয়া সে সকলের প্রতীকারচেষ্টা করিতেন। কিন্তু জাহ্নবীর পাবনী ধারা যেমন গোমুখীর মুখ হইতে বাহির হইবার পরই বিস্তৃতি লাভ করিয়া সাগরাভিমুখগামিনী হয়—দেশাত্মবোধ তেমনই এই কংগ্রেস হইতে প্রবাহিত হইয়া সমগ্র দেশে ব্যাপ্তিলাভ করিয়া আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে

এবং কংগ্রেসকে জাতির রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতাপ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার গঠনে ও আদর্শেও পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্থাপনাবধি ইহার অধিবেশনস্থানের ও সভাপতির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

বৎসর	অধিবেশনস্থান	সভাপতি
১৮৮৫	বোম্বাই	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরোজী
১৮৮৭	মাদ্রাজ	বদরুদ্দীন তায়াবজী
১৮৮৮	এলাহাবাদ	জর্জ্জ ইউল
১৮৮৯	বোম্বাই	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
১৮৯০	কলিকাতা	ফিরোজশা মেটা
১৮৯১	নাগপুর	আনন্দ চার্লু
১৮৯২	এলাহাবাদ	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩	লাহোর	দাদাভাই নৌরোজী
১৮৯৪	মাদ্রাজ	আলফ্রেড ওয়েব
১৮৯৫	পুণা	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৬	কলিকাতা	রহিমতুল্লা শিয়ানী
১৮৯৭	অমরাবতী	শঙ্করণ নায়ার
১৮৯৮	মাদ্রাজ	আনন্দমোহন বসু
১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	রমেশচন্দ্র দত্ত
১৯০০	লাহোর	নারায়ণ চন্দ্রাবরকর
১৯০১	কলিকাতা	দিনসা ওয়াচা
১৯০২	আমেদাবাদ	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯০৩	মাদ্রাজ	লালমোহন ঘোষ
১৯০৪	বোম্বাই	হেনরী কটন
১৯০৫	বারাণসী	গোপালকৃষ্ণ গোখলে
১৯০৬	কলিকাতা	দাদাভাই নৌরোজী
১৯০৭	সুরাট	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৮	মাদ্রাজ	রাসবিহারী ঘোষ
১৯০৯	লাহোর	মদনমোহন মালবীয়
১৯১০	এলাহাবাদ	উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ
১৯১১	কলিকাতা	বিষণনারায়ণ ধর
১৯১২	বাঁকিপুর	আর, এন, মুধলকার
১৯১৩	করাচী	সৈয়দ মহম্মদ
১৯১৪	মাদ্রাজ	ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯১৫	বোম্বাই	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	অম্বিকাচরণ মজুমদার
১৯১৭	কলিকাতা	ডাক্তার বেসাণ্ট



নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের শেষে মহাত্মাজী, কুমারী মণিবেন পেটেল ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের সঙ্গে যাইতেছেন

১৯১৮	দিল্লী	মদনমোহন মালবীয়
১৯১৮	(অতিরিক্ত) বোম্বাই	হাসান ইমাম
১৯১৯	অমৃতসর	মতিলাল নেহরু
১৯২০	(অতিরিক্ত) কলিকাতা	লালা লজপত রায়
১৯২০	নাগপুর	বিজয়রাঘব আচারিয়া
১৯২১	আমেদাবাদ	আজমল খাঁ
১৯২২	গয়া	চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৩	কোকনদা	মহম্মদ আলী
১৯২৪	বেলগাঁও	মোহনদাস গান্ধী
১৯২৫	কাণপুর	শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস সকল দলের রাজনীতিকদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ছিল। ঐ বৎসর সুরাটের অধিবেশনে মতভেদ হেতু অধিবেশন স্থগিত করিতে হয়। তদবধি—১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস মধ্যপন্থীদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া লক্ষ্ণৌ সহরে আবার সকল দলের প্রতিষ্ঠান হয়। তাহার পরবৎসর হইতেই ইহাতে অগ্রগামী রাজনীতিকদিগের প্রভাব প্রবল হয় এবং মধ্যপন্থীরা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন।

এ বার যিনি সভাপতি হইয়াছেন, তিনি বিহারবাসী—বিহারের জননায়ক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের

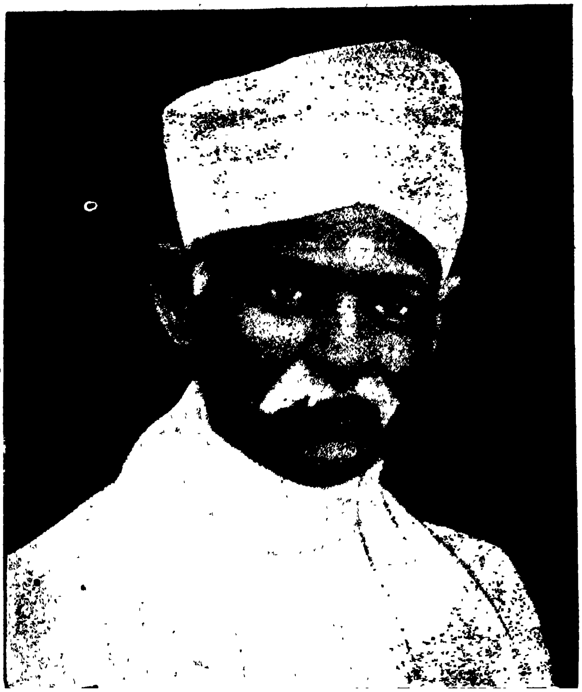


কংগ্রেস নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক

১৯২৬	গৌহাটী	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার
১৯২৭	মাদ্রাজ	ডাক্তার আনসারী
১৯২৮	কলিকাতা	মতিলাল নেহরু
১৯২৯	লাহোর	জওহরলাল নেহরু
১৯৩১	করাচী	বল্লভভাই পেটেল
১৯৩২	দিল্লী	শেঠ রণছোড়লাল
১৯৩৩	কলিকাতা	শ্রীমতী নেলী গুপ্তা
১৯৩৪	বোম্বাই	রাজেন্দ্রপ্রসাদ

শারণ জিলায় এক পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিহারে স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। প্রবেশিকা হইতে বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার পর তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও বি-এল পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন। এই ব্যবসায় তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করেন বটে, কিন্তু

তিনি দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিতেই আগ্রহশীল ছিলেন। যৌবনে যখন তিনি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয়ের



পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

প্রভাবে ভারত ভৃত্য সমিতিতে যোগ দিতে উদ্যোগী হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুমতি চাহিয়াছিলেন, তখন অগ্রজ মহেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাকে নিবারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি গান্ধীজীর প্রভাবে পতিত হয়েন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গান্ধীজী বিহারে চম্পারণে কৃষকদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই অনুসন্ধানের বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদিগের নাই। আমরা এইমাত্র বলিব যে, এই ব্যাপারে সরকার গান্ধীজীর মতই গ্রহণ করেন।

ইহার পর অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহাতে যোগ দেন ও বিহার বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্যে উহা পুলিস কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সম্পাদক ছিলেন। সেই অধিবেশনের পর স্বরাজ্য দল গঠিত হয় ও সেই দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেসের ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন প্রস্তাব বর্জ্জন করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কিন্তু পরিবর্ত্তনবিরোধী ছিলেন।

দেশসেবায় তিনি নানারূপে লাঞ্ছিত হইয়াছেন ও অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।

বিহারে ভূমিকম্পের অব্যবহিত পূর্ব্বেও তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এই ভগ্নস্বাস্থ্য নেতাকে কারারুদ্ধ রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ সরকার সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। তিনি মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়া বিপন্ন বিহারের সর্ব্বস্বান্ত অধিবাসীদিগকে সাহায্যদানকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারই তাঁহার সহযোগ প্রার্থনা করেন।

এ বার তিনি সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা একদিকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে। কংগ্রেসের যাহা কাম্য

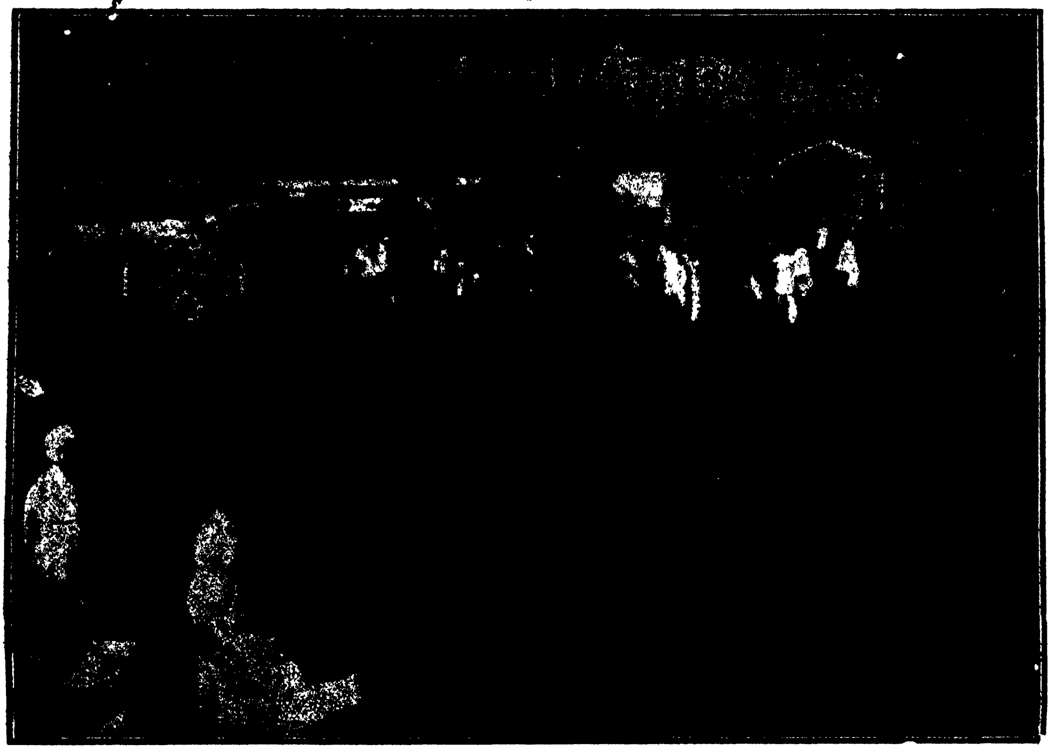


রাজাগোপাল আচারিয়ার সহিত মহাত্মাজীর কথোপকথন

—সেই স্বায়ত্ত-শাসনলাভ করিবার জন্য কিরূপ সাধনা করিতে হয়, তাহা তিনি আপনার জীবনে যেমন দেখাইয়াছেন, অভিভাষণে তেমনই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আর একদিকে তিনি তাঁহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসীদিগকে হতাশ করিয়াছেন। তিনি কোন কার্য্য-পদ্ধতি বিবৃত করেন নাই।

আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি স্বরাজ-সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করিয়া উপায়ের সন্ধান লাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা অবলম্বনের সময় সমাগম না হইলে তাহা বিবৃত করিয়া কোন ফল হইবে না, মনে করিয়া বর্ত্তমানে তাহা বিবৃত করিতে বিরত রহিয়াছেন।

কয় বৎসরের রাজনীতিক উত্তেজনার মধ্যে প্রকৃত কায করিবার অবসর অধিক ঘটে নাই। একদিকে আইনভঙ্গ আন্দোলন, অপরদিকে তাহা দলিত করিবার জন্য সরকারের চেষ্টা; একদিকে দেশের একনিষ্ঠ সাধকদিগের কার্য্য, অপরদিকে বহু স্বার্থসন্ধ লোকের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা—এই সকলের মধ্যে কেবল উত্তেজনার চাঞ্চল্য প্রবল হইয়াছে। একদিকে মহাত্মা গান্ধীর মত জননায়ক—আর একদিকে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মত তেজস্বী সহকর্ম্মীকে রাজরোষ-ভাজন করিবার জন্য ব্যস্ত গুপ্তচর; সকলেই কংগ্রেসের নামে কায করায় কংগ্রেসে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালায় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির নির্ব্বাচন-ব্যাপারে সে দিনও যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গান্ধীজী স্পষ্টই বলিয়াছেন—কংগ্রেসে যে সব অনাচার স্থানলাভ করিয়াছে, সে সকল দূর করিতে হইবে। ইহার উপর কংগ্রেস দলাদলিতে দুর্ব্বল হইয়াছে।



কংগ্রেস নগরে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণের লাঠি খেলা অভ্যাস

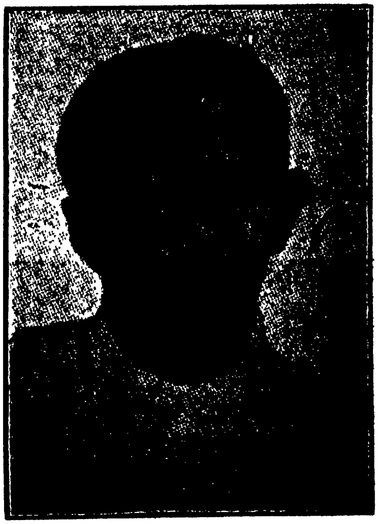
এই সব ত্রুটি দূর করিয়া কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে—আবার দেশের একমাত্র রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। সে কাযে সাফল্য লাভ করিবার পর পথিনির্দ্দেশ সফল হইবে।

এই সময় মহাত্মাজী কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে কোন দেশে সর্ব্বশ্রেণীর উপর প্রভাব সম্পন্ন নেতৃরূপে তাঁহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতার চালনদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন এবং তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিলেও কংগ্রেস যে তাঁহার প্রভাবে পরিচালিত হইবে, তাঁহাতে সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিয়াছেন, কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া গঠন-কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিলে তিনি এ দেশে স্বরাজের ভিত্তি দৃঢ় করিতে পারিবেন। সেই জন্যই তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়াছেন।

কংগ্রেসের গঠনে এবার কতকগুলি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ সহরে অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস যেমন বিবেচনা বিচারের কেন্দ্র ছিল, পরে তাহা তেমনই দৃশ্যপ্রধান হইয়াছিল। ফলে তাহার বিরাটত্বই কার্য্যের পক্ষে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছিল এবং সে ভার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর হস্তগত হইয়াছিল। এ বার স্থির হইয়াছে, প্রতিনিধিসংখ্যা ২ হাজারের অধিক হইবে এবং প্রতিনিধিরাই সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী নির্ব্বাচিত করিবেন।

বিবেচনা করিয়া আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহার আলোচনা করিব।



অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কে এফ নরীম্যান

অন্যান্য প্রস্তাবানুসারে কায করিবার নিয়ন্ত্রণভার এক বৎসর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

এবার কংগ্রেস পুনর্গঠিত হইবে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে দেশের লোকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারকেও পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কল্পনাতীত ছিল। প্রথমে লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ও পরে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে নির্ব্বাচনাধিকার স্থায়ী হইলে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে তাহা বিস্তার লাভ করে। এ বার নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে।



কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মহাত্মাজী বক্তৃতা করিতেছেন

এ বার কংগ্রেসে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে স্বদেশী শিল্প সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির প্রয়োজন

কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠক বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এখন কংগ্রেসকে সেই বৈঠকে নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবের বিচার করিয়া আবশ্যক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কংগ্রেসই এ দেশে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান এবং যতদিন স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাফলে দেশের ব্যবস্থাপক সভা প্রকৃত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানে পরিণতি লাভ না করিবে, ততদিন কংগ্রেসের প্রয়োজন শেষ হইবে না। কংগ্রেসকে এই দায়িত্ব স্মরণ করিয়া আপনার কার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে।



নিখিল ভারত কংগ্রেসের কয়েকজন মহিলা প্রতিনিধি

দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল দেশের নেতৃগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও ত্যাগে যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, তাহা জাতির কল্যাণকল্পেই স্থাপিত ও পরিচালিত। তাহা নানা অবস্থায় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর চেষ্টাই সপ্রকাশ। বাঙ্গালাকেও তাহাতে যথেষ্ট ত্যাগ ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এই কংগ্রেস হইতে নানা কল্যাণকর ভাব প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য—দেশে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করা। সে কার্য্যের স্বরূপ আজ আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই দেশাত্মবোধের উদ্বোধন প্রথমে বাঙ্গালায় হইয়াছিল এবং ইহার প্রথম ৩২ বৎসরের অধিবেশনে বাঙ্গালা হইতে ১২ জন মনীষী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী ২০টি অধিবেশনে বাঙ্গালীর মধ্যে কেবল চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় (শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর জন্মস্থান বা কর্ম্মক্ষেত্র বাঙ্গালা নহে) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্ব্বাচন করিয়াছেন। তাহাতে যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তর স্থানে বাঙ্গালা হইতে কেহই নির্ব্বাচিত হন নাই। এ সম্বন্ধে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, যে দক্ষিণ ভারতের চারিটি প্রদেশের প্রতি সুবিচার করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের কোন কোন প্রদেশের সদস্য সংখ্যা কমাইয়া দিয়া বা একেবারে বাদ দিয়া দক্ষিণ ভারতকে দিতে হইয়াছে। অন্যের উপর সুবিচার করিতে ত্যাগ করিতে হইল একমাত্র বাঙ্গালাকে। কংগ্রেসের সৃষ্টি পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ পাইয়া আসিতেছে। আজ ঘরোয়া বিবাদের বা দক্ষিণ ভারতের ছুতা করিয়া বাঙ্গালার ন্যায় প্রধান প্রদেশকে তাহার ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অধিকারে বঞ্চিত করা কিছুতেই উচিত হয় নাই।

পুনর্গঠিত কংগ্রেসে বাঙ্গালার কোন স্থান থাকিবে কিনা তাহা বাঙ্গালীকে নিজ শক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। বাঙ্গালী কি রাজনীতিক্ষেত্রে ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া থাকা আত্মসম্মানজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিবে না?

খেলা-ধূলা

ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া বিমান প্রতিযোগিতা ঃ

এবারকার বিশ্বজগতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'মিল্‌ডেন-হল—মেলবোর্ণ' বিমান প্রতিযোগিতা।

২০শে অক্টোবর, সকাল থেকে সহস্র সহস্র চক্ষু মিল্‌ডেন হল হ'তে মেলবোর্ণের আকাশপথে নিবদ্ধ ছিল। এই



সি ডব্‌লিউ এ স্কট—প্রথম হয়েছেন

সুদূর ১১,৩০০ মাইল পথ কত মরু প্রান্তর, নদ নদী, সাগর পর্ব্বত সমন্বিত—কত দিন, কত সপ্তাহ কেটে যায় অতিক্রম করতে। মানবের অসীম বুদ্ধি বলে ও দুর্জ্জয় সাহসে আজ এই সুদীর্ঘ পথও মাত্র তিন দিনে অতিক্রান্ত হলো। কিছুদিন আগে কেহ ইহা কল্পনাতেও আন্‌তে পারে নি।

অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে, মেলবোর্ণের ধনকুবের স্যর ম্যাক্‌ফারসন্ রবার্টসন্ ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে দুই প্রকার বিমান প্রতিযোগিতা একটি স্পীড্ রেস্, আর একটি হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেস্ ঘোষণা করেন। প্রথমটিতে যিনি প্রথম হবেন, তিনি পুরস্কার পাবেন দশ হাজার পাউণ্ড ও পাঁচশত পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ নির্ম্মিত একটি কাপ্। দ্বিতীয় পাবেন দেড় হাজার পাউণ্ড। হ্যাণ্ডিক্যাপ্ প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হবেন, তিনি লাভ করবেন দুই হাজার পাউণ্ড, আর দ্বিতীয় এক হাজার পাউণ্ড।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৪, শনিবার প্রভাত ৬-৩০ মিনিটে, মিল্‌ডেনহল থেকে বৈমানিকগণ যাত্রা সুরু করলেন। প্রথমে ৬৪ জন প্রতিযোগিতায় নাম দেন, কিন্তু কার্য্যকালে মাত্র কুড়ি জন যাত্রা করেন।

প্রতিযোগীদের মধ্যে বিখ্যাত বৈমানিক জিম্ মলিসন ও তাঁর পত্নী মিসেস এমি মলিসনও ছিলেন। এই দম্পতিই জয়ী হবেন ইহা সকলেই আশা করেছিলেন। ভাগ্য বিরূপ হ'লে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। তাঁরা ২৫৩৩ মাইল পথ তের ঘণ্টারও কম সময়ে অতিক্রম করে প্রথম অবতরণভূমি বোগ্‌দাদে পৌঁছিলেন সন্ধ্যা ৭-১০ (গ্রীণউইচ) সময়ে—অর্থাৎ গড়ে ঘণ্টায় ২০০ মাইলেরও অধিক বেগে উড়ে এসেছেন। সেখান থেকে ৮-৪৮ মিনিটে যাত্রা করে করাচীতে পরদিন বেলা ১০-১৫ (ষ্টাণ্ডার্ড) সময়ে পৌঁছান। ভারত-ভূমিতে

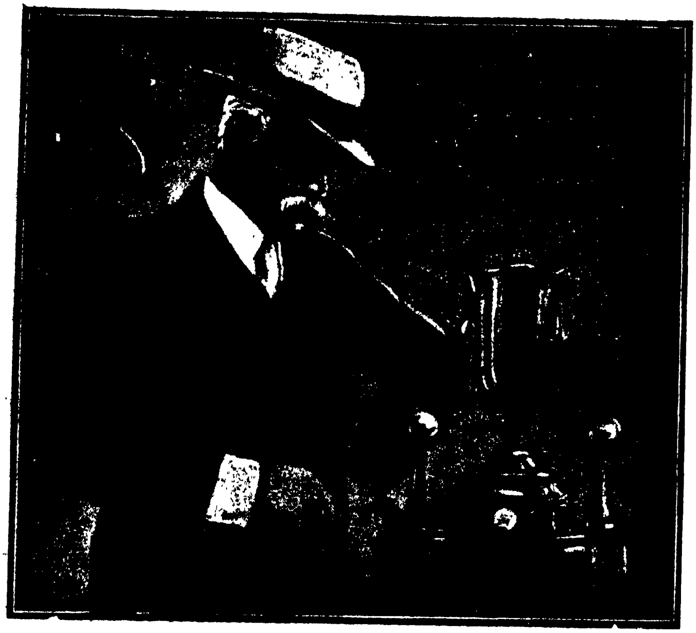


টি ক্যাম্পবেল—স্কটের সঙ্গী

তাঁরাই প্রথম অবতরণ করলেন। কিন্তু ভারতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের দুর্ভাগ্যের সূচনা আরম্ভ হলো।

সেখান থেকে ছ' ছ'বার যাত্রা করে বিমান খারাপ হওয়ার জন্য তাঁদের ফিরে যেতে হলো। যদিও রবিবার ভোর ২-৩৫এ তাঁরা যাত্রা করতে পারলেন, কিন্তু এলাহাবাদের পথ হারিয়ে জব্বলপুরে নামতে বাধ্য হলেন। সোমবার আরো গোলযোগ হওয়ায় শেষে প্রতিযোগিতা থেকে তাঁদের নিরস্ত হতে হয়েছে।

২৩শে অক্টোবর, সকাল ৫-৩৪ (গ্রীণউইচ) সময়ে বৃটিশ বৈমানিকদ্বয় সি ডব্লিউ স্কট্ ও টি ক্যাম্পবেল তাঁদের বিমানে মেলবোর্ণে পৌঁছিয়ে প্রথম হয়েছেন। এই দীর্ঘ যাত্রায় মোট সময় লেগেছে ৭০ ঘণ্টা, ৫৪ মিনিট, ১৮ সেকেণ্ড। মিল্‌ডেনহল থেকে বোগ্‌দাদ্ আসতে সময় লেগেছে ১৩ ঘণ্টা, করাচী আস্‌তে ২২ ঘণ্টা, এলাহাবাদে ২৭ ঘণ্টা, সিঙ্গাপুরে ৪০ ঘণ্টা আর মেলবোর্ণে প্রায় ৭১ ঘণ্টা।



মিল্‌ডেনহল—মেলবোর্ণ বিমান প্রতিযোগিতা রেসের পুরস্কার কাপ ও তার প্রদাতা—স্যর ম্যাক্‌ফারসন্ রবার্টসন্

স্কট্ ও ক্যাম্পবেল মলিসন দম্পতির আসবার ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট পরে রাত্র ৯টার সময় বোগ্‌দাদে পৌছান। ৯-৩৩ মিনিটে যাত্রা করে কোথাও না থেমে ৪৮৩০ মাইল পথ অতিক্রম করে রবিবার বেলা ২টা ৪৮ মিনিটে এলাহাবাদে অবতরণ করেন। তাঁদের ইঞ্জিন খুব চমৎকার চলেছে এবং তাঁরা গড়ে দশ হাজার ফিট উপরে উড়েছেন। এখানে পেট্রল বোঝাই করে নিয়েই ৩-৫০ মিনিটে যাত্রা



'গ্রস্‌ভেনর হাউস' ব্রিটিশ কমেট—ইহা প্রথম হ'য়েছে



হান্‌ কে ডি পার্মেণ্টার—দ্বিতীয় হ'য়েছেন

সকাল ১১-১০ মিনিটে মলিসন দম্পতি এলাহাবাদে পৌছলেন। কিন্তু তেলের পাইপ ভেঙ্গে যাওয়াতে ও ইঞ্জিনে

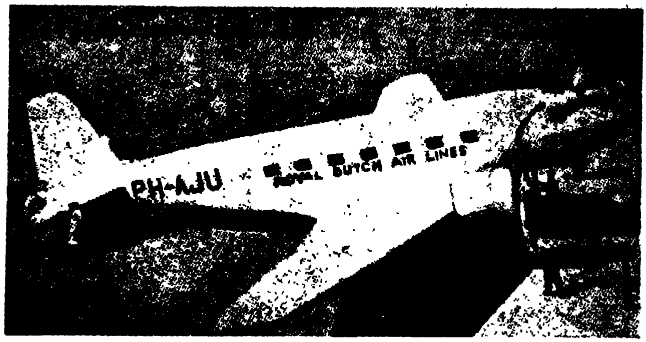
করেন। রাত্রি ১০-৩০ (গ্রীণউইচ), ভারতীয় সময় সোমবার ভোর প্রায় ৪টায় সিঙ্গাপুরে পৌছান। তাঁরা গড়ে ঘণ্টায় ১৭৮½ মাইল হিসাবে চলে দশ ঘণ্টায় সিঙ্গাপুরে আসেন। ১১-৪২ (গ্রীণউইচ) যাত্রা করে সোমবার সকাল ১১-৮ মিনিটে পোর্ট ডারউইনে অবতরণ করেন। টাইমুর সাগরের উপরে তাঁরা ঝড়ের মুখে পড়েছিলেন। মেঘস্তরের উর্দ্ধে বিমানপোত-খানিকে রাখ্‌তে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। ঐ সাগরের অর্দ্ধপথ তাঁদের একটি ইঞ্জিনে নির্ভর করে উড়তে হয়েছে, অন্য ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যায়। ইঞ্জিন মেরামত করে নিয়ে ১-৫৫ মিনিটে যাত্রা করেন। সার্লেভিলে ১০-৪০ (গ্রীণউইচ) পৌছান। ইঞ্জিন আবার বিকল হওয়ায় এথানে তাঁদের ২ ঘণ্টা ১৯ মিনিট দেরী হয়।

মিল্‌ডেনহল থেকে আসতে তাঁদের মোট দিন ২৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট লেগেছে। তাঁরা গড়ে ঘণ্টায় ১১৮·৯৪ মাইল বেগে উড়েছেন।

ফ্লেমিংটন রেসকোর্সে বিপুল জনতা তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করে। লেভারটন বিমান-ঘাটিতে তাঁরা পৌঁছাতেই ব্রিস্‌বেনের মহিলা বৈমানিক মিসেস রোজ বোনে ও মিস্ পেগি ডয়েল তাঁদের দুই গ্লাস বিয়ার ও দু'খানি স্যাণ্ড-উইচ দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। ভিক্টোরিয়া গবর্ণমেণ্টের চীফ্‌ সেক্রেটারী, লর্ড মেয়র ও এই বিমান প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠাতা স্যর ম্যাক্‌ফসারসন্ রবার্টসন্ বিমান বীরদ্বয়কে অভিনন্দিত করেন। তথন বিশাল জনতা তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করে



হান্‌স্ জে জে মোল—পার্মেণ্টারের সঙ্গী



'রাইট সাইক্লোন' ডাচ্‌প্লেন—ইহা দ্বিতীয় হয়েছে



এমি মলিসন করাচী বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করলে, করাচীর মেয়র মিষ্টার টিকামদাস কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হচ্ছেন

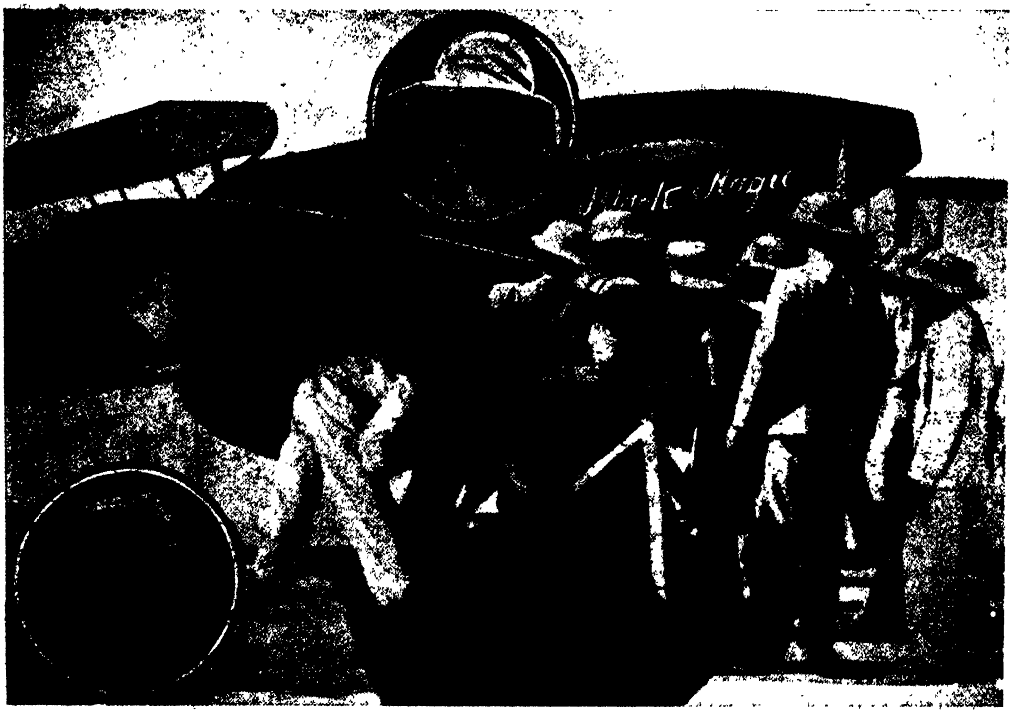
গাইতে লাগ্‌লো,—'For they are jolly good fellows'.

বিলাতের একখানি সংবাদপত্র মিঃ স্কটকে বিমান সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেছেন। ব্যবসাদাররা স্কট ও ব্ল্যাককে ছায়াচিত্র থেকে মিউজিক হল অবধি বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত করে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ফিরছেন।

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন, ডাচ বৈমানিকদ্বয় হার্ কে ডি পার্মেণ্টার ও হার্ জে জে মোল্ "রাইট সাইক্লোন" ডগ্‌লাস্ ডি সি ২ বিমানপোতে। ইঁহারা সকাল ৮-৮ (লোকাল সময়) ও সার্লেভিল ৮-৪৫ (গ্রীণ উইচ)। অন্ধকারে পথহারা হয়ে এলবারিতে নামতে বাধ্য হন। পরে বুধবার সকাল ১০-৫২ (লোকাল সময়) মেলবোর্ণে পৌছে দ্বিতীয় হয়েছেন। তাঁরা দ্বিতীয় পুরস্কারের পরিবর্ত্তে হ্যাণ্ডিক্যাপ্ রেসের প্রথম পুরস্কার নিয়েছেন।

তৃতীয় হয়েছেন, আমেরিকান্ বৈমানিকদ্বয় কর্ণেল রস্কো টার্ণার ও ক্লাইভ প্যাংবোর্ণ তাঁদের 'বোয়িং ট্রান্স্‌পোর্ট' বিমানে। ইঁহারা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

চতুর্থ স্থান পেয়েছেন, ক্যাথকার্ট জোন্স ও কে এফ্



এমি ও জিমি মলিসন ও তাঁদের বিমান "ব্ল্যাক-ম্যাজিক"—করাচীর বিমান-ঘাটিতে মেরামত হ'চ্ছে

শনিবার রাত্রি ১১-১১ মিনিটে বোগদাদ, রবিবার অপরাহ্ন ২-২০ মিনিটে করাচী, সন্ধ্যা ৭-২৪ মিনিটে এলাহাবাদ ও রাত্রি ১১-৩৫ মিনিটে কলিকাতা, ৪-৪৩ মিনিটে রেঙ্গুন, এলষ্টরে ভোর ৩-২৫ মিনিটে, সিঙ্গাপুরে সকাল ৭-২ (গ্রীণউইচ) পৌছান। তাঁরা বাম্পাং ত্যাগ করেন বেলা ৩-৫৭ (গ্রীণউইচ), কোয়েপাং থেকে যাত্রা করেন ৭-৫০, ডারউইনে পৌছান রাত্রি ১১টা (গ্রীণ উইচ), ডারউইন ত্যাগ করেন ওয়ালা ডি এইচ কমেট বিমানে। তাঁরা তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। উভয়ে ইংলণ্ডে ফিরে গেছেন, যাতায়াতের রেকর্ড স্থাপনা করতে।

ম্যাল্‌কম্ ম্যাক্ গ্রেগার ও হেনরী ওয়াকার চালিত 'মাইল্‌স্ হক্' বিমান পঞ্চম হয়েছে।

এত বড় দুরূহ বিপদসঙ্কুল অভিযানে দুর্ঘটনা না ঘটাই আশ্চর্য্য। দুর্ঘটনাও ঘটেছে—ফেয়ারী ফক্স প্রাক্ত সান্

জারভেসিওর কাছে চুরমার হয়ে আগুন লেগে যাওয়ায় তার পরিচালকদ্বয় এইচ ডি গিলম্যান ও জে কে সি বেনস জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। পাণ্ডার এস ৪, ওলন্দাজ বিমানখানি এলাহাবাদের বামরৌলি বিমান-ঘাটিতে নির্দ্দেশ-সূচক আলোকস্তম্ভবাহী মোটরের সহিত সংঘর্ষণের ফলে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। পরিচালক ডি এল অষ্টিস্ ও গেসেন ভরকার কথঞ্চিৎ অগ্নিদগ্ধ হ'য়েছিলেন।

হ্যাণ্ডিক্যাপ রেসে—মিঃ সি ডবলিউ স্কট ও মিঃ টি ক্যাম্পবেল—প্রথম, হার্ কে ডি পার্মেণ্টার ও হার্ জে জে মোল্—দ্বিতীয় এবং সি জে মেলরোজ—তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।



"বোরিংট্রান্স্পোর্ট" বিমান—তৃতীয় হ'য়েছে

স্কট্ ও ক্যাম্পবেল স্পীড রেসে প্রথম হওয়ায় হ্যাণ্ডিক্যাপ রেসের পুরস্কার পেতে পারেন না, তজ্জন্য হার্ পার্মেণ্টার ও হার্ জে জে মোল প্রথম পুরস্কার ও সি জে মেলরোজ দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।



সাঙ্কেতিক আলোকস্তম্ভবাহী মোটর—ইহার সঙ্গে সংঘর্ষণের ফলে "পাণ্ডার এস ৪" ওলন্দাজ বিমান বামরৌলিতে ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে



দমদম্ বিমানঘাটির সাঙ্কেতিক আলোকস্তম্ভ—৬০ মাইল দূর পর্য্যন্ত ইহার নিক্ষিপ্ত আলো দৃষ্ট হয়



ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার বিমান-প্রতিযোগিতার আকাশ পথ

ক্যাথকার্ট জোন্স ও ওয়ালা মিলডেনহল থেকে মেলবোর্ণ হয়ে লণ্ডনের লিম্পিনে ফিরে গেছেন ২রা নভেম্বর, বেলা ১-১৫ মিনিটে। তাঁদের ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া যাতায়াতে



ক্লাইড প্যাংবোর্ণ—তৃতীয় হ'য়েছেন



হেনরী ওয়ালার—'মাইল্‌স্‌হক' বিমানে পঞ্চম হয়েছেন

মোট সময় লেগেছে, ১৩ দিন ৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। ফিরতি পথে তাঁরা ৮টি স্পীড রেকর্ড স্থাপন করেছেন—তার মধ্যে ৫টি মেলবোর্ণ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে। ডারউইন থেকে সিঙ্গাপুর পৌঁছিতে সময় লেগেছিল ১০ ঘণ্টা ২০ মিনিট, গড়ে ঘণ্টায় ২০১·৭ মাইল বেগে।

রেসের জন্যে মিল্‌ডেনহল ও মেলবোর্ণের মধ্যে পাঁচটি অবতরণভূমি নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল, এইগুলিতে সকল প্রতিযোগীকেই নামতে হয়েছিল; অন্যত্র নামা না-নামা তাদের ইচ্ছাধীন। নিম্নে অবতরণভূমির নাম তাদের পরবর্ত্তী-ভূমির দূরত্ব প্রদত্ত হলো :—

মিলডেনহল হ'তে	বোগ্‌দাদ্‌	২৫৩০ মাইল
বোগ্‌দাদ্‌ হ'তে	এলাহাবাদ	২৩০০ „
এলাহাবাদ হ'তে	সিঙ্গাপুর	২২১০ „
সিঙ্গাপুর হ'তে	ডারউইন	২০৮৪ „
ডারউইন হ'তে	সার্লেভিল	১৩৮৯ „
সার্লেভিল হ'তে	মেলবোর্ণ	৭৮৭ „

মিল্‌ডেনহল থেকে মেলবোর্ণ —— মোট ১১,৩০০ মাইল

বিমান প্রতিযোগিতার অফিসিয়াল সময় :—

স্কট্‌ ও ক্যাম্পবেল সমস্ত পথ অতিক্রম করেছেন ৭০ ঘণ্টা, ৫৪ মিনিট, ১৮ সেকেণ্ডে। তাঁদের উড়িবার সময়, ৬৫ ঘণ্টা, ২৪ মিনিট, ১৩ সেকেণ্ড। হ্যাণ্ডিক্যাপ উড়িবার সময়, ৬৮ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৯ সেকেণ্ড।

পার্মেণ্টার ও মোলের সমস্ত পথ উড়িবার সময়—৯০ ঘণ্টা, ১৩ মিনিট, ৩৬ সেকেণ্ড। হ্যাণ্ডিক্যাপ উড়িবার সময়—৭৬ ঘণ্টা, ৩৮ মিনিট, ১২ সেকেণ্ড।



সাদা লাইন পথে স্পীড রেস প্রতিযোগিগণ বিমান পরিচালন করেছেন
কাল লাইন পথে হ্যাণ্ডিকাপ্ রেস প্রতিযোগিতা হ'য়েছে

হ্যাণ্ডিকাপ্ রেসের উড়িবার সময় :—

সি জে মেলরোজ	৭৯ ঘণ্টা	১৭ মিঃ	৫৫ সেঃ
ডি ই ষ্টোডার্ট ও কে জি ষ্টোডার্ট	৭৯ „	৩২ „	৩০ „
ম্যাক্ গ্রেগার ও ওয়াকার	৮২ „	৪৩ „	৩৪ „
জি ডি হিউয়েট ও সি ই কে	৮৫ „	৪২ „	২৮ „
এম্ হ্যানসেন	৮৭ „	৪৫ „	২১ „

বিলিয়ার্ড—

ওয়ালটার লিন্‌ড্রাম্ পৃথিবীর বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতায় ডেভিসকে ৮৭৫ পয়েণ্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। লিন্‌ড্রামের মোট স্কোর ২৩,৫৫৩, ডেভিসের ২২,৬৭৮। ইনি ৩৪ মিনিটে হাজার স্কোর করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ক্রিকেট ঃ—

দিল্লীতে ক্রিকেট ক্লাব অফ্ ইণ্ডিয়া বনাম ইউনিভারসিটি অকেসনালদের খেলা ড্র হয়েছে। স্কোর :—ক্রিকেট ক্লাব—২২৩ ও ২১৮ (৬ উইকেট্), অকেসনাল—২১৭ ও ৫৯ (৬ উইকেট্)।

ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে সি কে নাইডু ১০৪ রান করে নট্ আউট্ রয়ে গেছেন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড় এল এন কনষ্টান্‌টাইন্ ২৮ রান্ দিয়ে অকেসনালদের ছয়টা উইকেট্ নিয়েছেন। অকেসনালদের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ স্কোর করেছেন, ওয়াজির আলির ৯৭, তার পরেই এস্ ব্যানার্জ্জি ৪৯।

ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলা

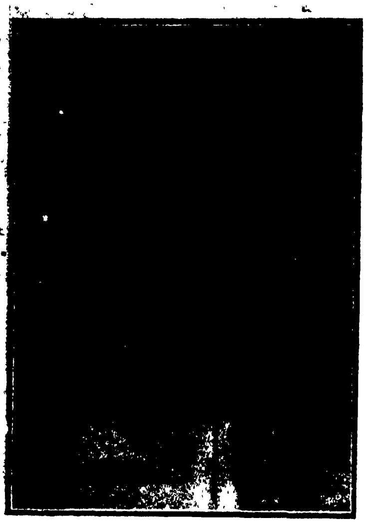


ওয়াল্‌টার লিন্‌ড্রাম্
পৃথিবীর বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়

আরম্ভ হয়েছে। প্রথম রাউণ্ডে মান্দ্রাজ মহীশূরকে এক দিনেই এক ইনিংস্ ও ৩৩ রানে হারিয়েছে। স্কোর : মহীশূর—৪৮ ও ৫৯ ; মান্দ্রাজ—১৩০

শরীরচর্চ্চায় বাঙ্গালী—

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে শরীর চর্চ্চায় যে জাগরণের যুগ এসেছে তার পথ প্রদর্শকদের মধ্যে ললিত রায়ের নাম



শ্রীমান ললিত রায়

উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙ্গলা দেশের এক নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর শরীরচর্চ্চার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। স্যাণ্ডো প্রভৃতি যশস্বী ব্যায়াম বীরদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যায়ামচর্চ্চা আরম্ভ করেন। বাঙ্গলা দেশে ও বাঙ্গলার বাহিরেও অনেক স্থানে অদ্ভুত ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করে তিনি সকলকে চমৎকৃত করেছেন। তিনি বুকের ওপর ৪।৫ টন ওজনের রোলার অবলীলাক্রমে পার করাতে পারেন। লৌহ শিকল ছিন্ন করতে ইনি বিশেষ পারদর্শী। তাঁর রিংয়ের খেলাই সকল খেলার মধ্যে চমকপ্রদ এবং শৈশবকাল হতে এই খেলার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তিনি রিংয়ের খেলায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। বিষ্ণুবাবুর নিকট হইতে শরীর চর্চ্চার কৌশলাদি শিক্ষা করেন, এবং বর্ত্তমানে তাঁর শরীর শিক্ষা কলেজের শিক্ষকরূপে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন।

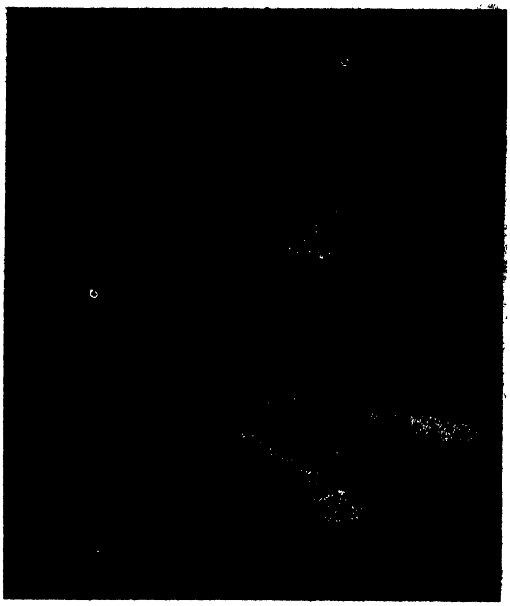
— বাঙ্গলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন এণ্ডারসনের বাটীতে একবার লৌহ গোলকের ক্রীড়া প্রদর্শন করে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে আজ সুদূর আমেরিকা হতেও তাঁর ডাক এসেছে। আশা করি তিনি বিদেশ থেকে জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এসে মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিবেন।

শ্রীমান নির্ম্মল কাঞ্জিলাল স্বর্গীয় ডাঃ যদুনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয়ের পৌত্র। বাল্যকালে এঁর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে কোন এক আত্মীয়ের নিকটে অনুপ্রেরণা পেয়ে শরীর চর্চ্চায় মন দেন। কালে ঐকান্তিক আগ্রহ ও সাধনা দ্বারা আদর্শ শরীর গঠন করতে সমর্থ হন। উত্তরকালে রোমান রিংএর (Roman Ring) খেলায় পারদর্শিতা লাভ করেন। ফুটবল খেলায় তাঁর সমধিক যোগ্যতা আছে। ১৯২৮ সালে বেঙ্গল টেক্‌নিক্যালে পঠদ্দশায় গোবরবাবু তাঁকে আদর্শ স্বাস্থ্যের (Best Physique) জন্য রৌপ্যপদক দিয়েছেন। শারীরিক ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শনের জন্য ও ফুটবল খেলায় অনেক পদক



শ্রীমান নির্ম্মল কাঞ্জিলাল

ও Trophy পেয়েছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের শরীর শিক্ষা কলেজে আছেন। সম্প্রতি তিনি স্বাধীনভাবে মোটর ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করছেন। তাঁর বয়স ২৬ বৎসর। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।



শ্রীমান গোপীনাথ পাল

শ্রীমান গোপীনাথ পাল বাল্যকাল থেকেই ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি গিরিশ পার্কে ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাবে ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয়ের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা করেন। ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তীর নিকট 'জুজুৎসু' শিক্ষা করেন। ১৯৩০ সালে মাড়োয়ারীদের বড়বাজার যুবক সভার ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন। পরে শ্রীযুক্ত জে, কে, শীলের স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল কাল্চারে জুজুৎসু ও জিম্ন্যাস্টিক্ বিভাগের শিক্ষক নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীযুক্ত শীলের নিকট বক্সিং শিক্ষা করেন। গত বৎসর প্রসিদ্ধ জাপানী জুজুৎসু বীর Mr. Shinzo Takagakiর সহিত পরিচিত হয়ে তাঁকে জুজুৎসু দেখিয়ে প্রীত করেন। পরে তাঁর নিকট থেকে আরো উন্নত শ্রেণীর জুদো শিক্ষা করেন। জাপানীরা জুজুৎসুকে জুদা বলে। স্কুল অফ্ ফিজিক্যাল কাল্চার থেকে জুদো প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশের জুজুৎসু বীরদিগকে সংবাদপত্র মারফৎ আহ্বান করেন। কিন্তু কেহই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন নি। গত ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রতিষ্ঠিত অল্ ইণ্ডিয়া সেবা সমিতি বয়েজ স্কাউট্ এসোসিয়েশনের ফিজিক্যাল কাল্চার শীল্ড এলাহাবাদ থেকে তিনি ও তাঁর চারজন মাড়োয়ারী ছাত্র জয় করে আনেন। শ্রীমান পালের বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। এত অল্প বয়সেই সর্ব্বশ্রেণীর ব্যায়ামে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। জোড়াসাঁকো ব্যায়াম সমিতি নামে একটি ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে তিনি বহু বালক ও যুবকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেছেন।



বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির স্পোর্টসে গৌরহরি দাস ফ্যান্সি সাঁতার কাটছেন। ইনি প্রথম হয়েছেন

সন্তরণ—

পাঞ্জাব সুইমিং স্পোর্টস' চ্যাম্পিয়ান-সিপ প্রতি-যোগিতায় কলিকাতার বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি যোগ দিয়ে ওয়াটার পোলো খেলায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে জয়লাভ করেছেন। গৌরহরি দাস একাই অনেকগুলি গোল দিয়েছিলেন।

সাময়িকী

কংগ্রেস—

এবারের কংগ্রেসে দু'টি প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে। একটি —মহাত্মা গান্ধী বোম্বাইয়ের কংগ্রেসের পর, কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেসের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি কংগ্রেসের সভ্যপদও ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে এবং অধিকতর কার্য্যকরী ভাবে কংগ্রেসের ও দেশের সেবা করিবার অভিপ্রায়েই তিনি বিদায় লইয়াছেন।

দ্বিতীয়—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতির অবলম্বন। কংগ্রেসের নূতন গঠন বিধিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য সংখ্যা কমাইয়া ১৬৬ করা হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাঙ্গালীর স্থান হয় নাই। কংগ্রেসে নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—

কংগ্রেস জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জাতীয়তার দিক হইতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সম্বন্ধে স্পষ্ট বক্তব্য ব্যক্ত করাই কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। জাতীয়তা-বিরুদ্ধ কোন ব্যাপার কংগ্রেস-অনুমোদিত হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কংগ্রেস কর্ত্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেস তাহা না করিয়া 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত প্রতিনিধিরা ব্যবস্থা পরিষদে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কোন কথাই বলিবেন না—পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটও দিবেন না। তাহার ফল হইবে, সরকারী ও মুসলমান প্রতিনিধিদের ভোটের জোরে বাঁটোয়ারা প্রস্তাবগুলি ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়া যাইবে। ফলতঃ কংগ্রেসের মনোনীত সভ্যগণের কার্য্যগতিকই প্রকারান্তরে বাঁটোয়ারা গৃহীত হইতে সাহায্য করিবে। এই প্রয়োজনীয় সমস্যার কোন কথা না বলিবার অনুজ্ঞা দিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার কি উদ্দেশ্য তাহা বোধগম্য হয় না।

কংগ্রেসের এইরূপ মনোভাবের সঙ্গে একমত হইতে না পারিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিলাষে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কংগ্রেস জাতীয় দলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই দলভুক্ত প্রতিনিধিরা ব্যবস্থা পরিষদে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। তাই কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী বোর্ড প্রচার করিতেছেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস-বিদ্রোহী, তাঁহাদের পক্ষে যাঁহারা ভোট দিবেন, তাঁহারা কংগ্রেসের শত্রুতা করিবেন। শ্রীযুত কে এম্ মুন্সী বোম্বাইয়ে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "পণ্ডিত মদনমোহন, শ্রীযুত আণে প্রভৃতি কংগ্রেস-বিদ্রোহী। জাতি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারিবেন না।" অথচ তিনিও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে গর্হিত ও জাতীয়তা-বিরোধী তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারত-শাসনের একটা প্রধান সূত্র হিন্দু ও মুসলমানদিগকে দুইটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শ্রেণীতে পরিণত করা—যাহাতে তাহারা একযোগে ভারতের সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে কথা বলিতে না পারে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মূলে যে নীতি কার্য্য করিতেছে, তাহা জাতীয়তার বিরোধী।"—তথাপি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিরা কথা বলিতে পারিবে না, সকলকে নির্ব্বাক থাকিতে হইবে! কারণ,—তিনি 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' নীতির পক্ষে বলিতেছেন, "এই বাঁটোয়ারা সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতিপ্রসূত। মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহদংশের বিশ্বাস যে ইহাতে তাহাদের পরম লাভ হইবে। এখন যদি ঐ বাঁটোয়ারা অগ্রাহ্য করিবার কথা বলা যায় তবে তাহাদের প্রাণে আঘাত লাগিবে এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরম্ভ হইবে।"

অপূর্ব্ব যুক্তি! সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টি করিবার জন্যই যদি বাঁটোয়ারার চাল দেওয়া হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করাই কংগ্রেসের প্রধান ও একমাত্র কর্ত্তব্য। আজ বাঙ্গলার সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা, তাহাকে

বাঁচিতে হইলে বাঁটোয়ারা নাকচ করিতেই হইবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাঙ্গলার অভিমত পরিষদের নির্ব্বাচন ব্যাপারে বাঙ্গালীকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গলার ভোটারদের প্রতি আবেদনে বলিয়াছেন, "…উক্ত জাতীয়তা বিরোধী বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিতে ও বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে যেরূপ 'না গ্রহণ না বর্জ্জন' প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ অসঙ্গত। কংগ্রেসের পক্ষে ইহার চিরানুসৃত নীতির পরিপন্থী প্রস্তাব গ্রহণ করা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অনিষ্টকারিতা অকপটে স্বীকার করিয়াও, পরিষ্কার ভাবে উহা পরিহার না করিয়া, বোম্বাই অধিবেশনে কংগ্রেস উহা ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে—বিশেষতঃ ইহার প্রকোপে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ধ্বংস অনিবার্য্য। **জাতীয় দলের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অর্থ, বাঁটোয়ারা সমর্থন।"

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাকে আমি বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ অপেক্ষা অল্প ক্ষতিকর বিবেচনা করি না। দেশবাসী নিজেদের চেষ্টাতেই যেমন লর্ড মর্লির সেই "নির্দ্ধারিত সত্য"কে নাকচ করাইয়াছিলেন, আজও সেইরূপ, যদি তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান, তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধিতে যতটা জাতীয়তা-বিরোধী ফন্দী বাহির করা যাইতে পারে—সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত তাহাই—ইহা জানিয়াও দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য এড়াইয়া চলিতেছেন। এই সিদ্ধান্তের সামান্য একটা অংশের পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য মহাত্মার পক্ষে নিজের জীবনপণ করিবার যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের দ্বারা এই আপত্তিকর সিদ্ধান্ত বর্জ্জন করাইবার জন্য দেশবাসীর সর্ব্বসর্ব্বস্ব পণ করা আবশ্যক। বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার পক্ষে ইহা মরণ-বাঁচন সমস্যা। যদি এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে গত ত্রিশ বৎসরে যে কার্য্য সাধিত হইয়াছে, সেই সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে।"

কলিকাতায় অতিথি—

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জননায়ক—"সীমান্ত গান্ধী" নামে পরিচিত খাঁ আবদুল গফুর খাঁ দীর্ঘকাল সরকারের আদেশে বন্দী থাকিবার পর মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কলিকাতায় আসিয়া ও অন্যান্য স্থানে খাঁ সাহেব হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতির কথা বলিয়াছেন। কলিকাতার কর্পোরেশন ইঁহাকে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। খাঁ সাহেব কেবল মুসলমানদিগেরই নহে—হিন্দুদিগেরও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। গঠনকার্য্যে তাঁহার



সীমান্ত গান্ধী

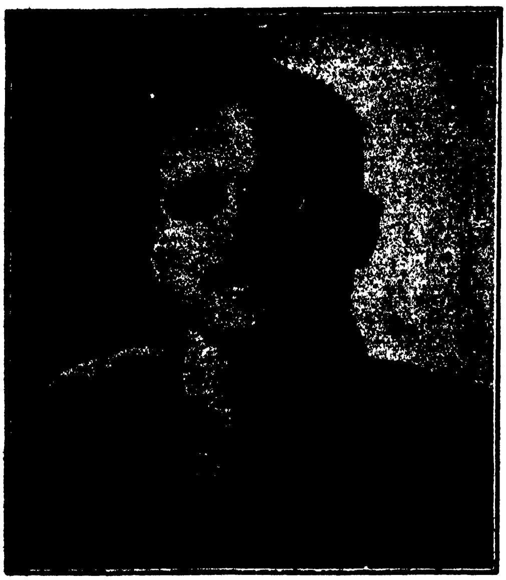
অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় "লাল কোর্ত্তা" দল গঠনেই পাওয়া গিয়াছে।

তাঁহার দেশের লোক তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করেন, তাহার প্রমাণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এ-বার বোম্বাইয়ে যে স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার নামকরণ তাঁহার নামেই হইয়াছিল। তিনি সীমান্ত প্রদেশে "লাল কোর্ত্তা" দল গঠিত করিয়াছিলেন—এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সরকার বিপ্লবাত্মক দল [illegible]ছিলেন। সেদিন—বোম্বাইয়ে তিনি এই দলের

গঠনেতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৫ শত সদস্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের কায আরম্ভ হয়। ইহার উদ্দেশ্য—মুক্তি, সত্য ও প্রেম এবং ইহা অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলিয়াছেন, সীমান্তবাসিগণের সামাজিক ও অন্যবিধ উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠার ৩ মাসের মধ্যে যে ইহার সদস্যসংখ্যা ৪০ হাজার হয়, তাহাতেই ইহার প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। খাঁ সাহেব বলিয়াছেন—সরকার এই প্রতিষ্ঠান চূর্ণ করিবার জন্য ইহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার সহিত রাজনীতির কোন সম্বন্ধ ছিল না।

অশান্ত য়ুরোপ—

অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল পূর্ব্বে মনীষী কার্লাইল য়ুরোপের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, যেন দুইটি কটাহে বিপরীত-স্বভাব বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতেছে—কবে যে



রাজা আলেকজাণ্ডার

এই উভয় কটাহে সঞ্চিত বিদ্যুতের সম্মিলনে সর্ব্বনাশ হইবে, কে বলিতে পারে? সাম্রাজ্যবাদ, সমরসজ্জা বৃদ্ধি, মারণাস্ত্র উদ্ভাবন, বাণিজ্যের তৃষ্ণা—এই সকলে য়ুরোপকে অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাহার প্রথম প্রকাশ ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর (প্রুশিয়ার) যুদ্ধে। তাহার ফলে কূটবুদ্ধি জার্ম্মাণ রাজনীতিক বিসমার্কের চেষ্টায় জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য সংগঠন। সে কথা ফ্রান্স কখন ভুলিতে পারে নাই—আলসেশ ও লোরেণ প্রদেশদ্বয় হারাইয়া ফ্রান্সের বক্ষে যে বেদনা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় কিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। ফরাসী নর্ত্তকী অর্থার্জ্জনের জন্য নৃত্যনৈপুণ্য দেখাইতে জার্ম্মাণীতে গিয়াছিল। তাহার কলানৈপুণ্যের প্রশংসায় বার্লিন সহর মুখরিত হয় এবং জার্ম্মাণ সম্রাট রঙ্গালয়ে তাহার নৃত্য দেখিয়া তাহাকে "সম্মানিত" করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নর্ত্তকী সম্রাটের উপস্থিতিতে—তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ নৃত্যকলা দেখাইতে অস্বীকার করে। কৈশর দ্বিতীয় উইলিয়ম তাহাকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নর্ত্তকী উত্তর দেয়—"আমার বক্ষে আলসেশ ও লোরেণের ক্ষত বিদ্যমান।" তদবধি য়ুরোপে কেবলই অশান্তির বৃদ্ধি হইয়াছে—নানা প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি ও সন্ধি বহ্নিকে কেবল ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সার্ভিয়ার রাজকুমারের হত্যা উপলক্ষ করিয়া তাহার লেলিহান শিখাসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়া সমগ্র য়ুরোপ গ্রাস করিতে উদ্যত হয়।

এককালে নেপোলিয়নকে য়ুরোপের মানচিত্রকর বলা হইত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের অবসানে য়ুরোপের মানচিত্র নূতন করিয়া অঙ্কিত হয়। রুসিয়া আপনার মানচিত্রে আপনি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল—য়ুরোপের অবশিষ্ট অংশগুলি বিজেতারা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে গঠিত করেন। ইরাকে ও প্যালেষ্টাইনেও তাহাই হইয়াছে।

কিন্তু য়ুরোপ শান্তিলাভ করে নাই। গত ৯ই অক্টোবর এই অশান্তির পরিচয় আবার হত্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জুগোশ্লাভিয়া রাজ্য সমরাস্ত্র সৃষ্টি। সেই রাজ্যের রাজা আলেকজাণ্ডার অশান্তি নিবারণের উপায় আলোচনা করিবার জন্য ফ্রান্সে আসিতেছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যেমন, তাঁহাকে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও তেমনই বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী পুলিসের সব সতর্কতা ব্যর্থ করিয়া আততায়ী মার্সেলসে রাজাকে হত্যা করিয়াছে। তাঁহাকে অভ্যর্থনা

করিতে যাইয়া ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবও নিহত হইয়াছেন। আততায়ী একজন ক্রোট। ক্রোটিয়া পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল—জার্ম্মাণ যুদ্ধের পর তাহাকে জুগোশ্লাভিয়ার অংশ করা হইয়াছে। ক্রোটরা তাহাতে অসন্তুষ্ট—তাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চাহিতেছে।

জার্ম্মাণ যুদ্ধারম্ভের সময় এমনই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ধূম যেমন পর্ব্বতে বহ্নির পরিচয় প্রদান করে, এই ঘটনায় তেমনই য়ুরোপের অন্তর্নিহিত অশান্তির পরিচয় সপ্রকাশ। কত দিনে–কিসে এই অশান্তির অবসান হইবে কে বলিতে পারে? এ রোগের ভেষজ রণসজ্জাবৃদ্ধিতে নহে; পরন্তু তাহাতে রোগ আরও প্রবল হইয়া উঠে। যত দিন প্রতীচী তাহার উৎকট প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে, সংযত হইতে না শিখিবে, ততদিন যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, এমন আশা করা যায় না।

আর এই সব ঘটনায় প্রতীচীর রক্তসিক্ত পথ অবলম্বনের স্পৃহা—পশুবলে প্রত্যয়ের পরিচয়ই পরিস্ফুট।

শিল্প-সংগঠন—

গান্ধীজী প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগের পূর্ব্বে উটজ শিল্প সংগঠন ও সংরক্ষণ জন্য যে প্রস্তাব কংগ্রেসে গ্রহণ করাইয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপযোগী। তিনি দরিদ্র ভারতের দারিদ্র্যের প্রতীকরূপে প্রতিভাত। তিনি যখন কংগ্রেসকে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনে সম্মত করান, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঠনকার্য্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি যখন ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন, তখন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ সেই গঠনচেষ্টার কথাই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে গ্রামে গঠনকার্য্যে আর কাহারও মনোযোগ হইবে না। হইতেছেও তাহাই। এ বার মহাত্মাজী যে প্রস্তাব কংগ্রেসে গ্রহণ করাইয়াছেন, তাহার ফলে নিখিল-ভারত পল্লীশিল্প সমিতি গঠিত হইবে। এই সমিতির কায—

গ্রাম্য শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সংরক্ষণ এবং পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগের শারীরিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন।

তাঁহার অসাধারণ শক্তির প্রয়োগফলে যে এই সমিতি সাফল্য লাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই।

য়ুরোপের কলকব্জার মোহে আচ্ছন্ন হইয়া একদিন আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদিগের সাধ্যাতীত সেইরূপ কলকব্জা ব্যতীত শিল্পের দ্বারা সমৃদ্ধি বৃদ্ধির অন্য পথ নাই। আর বিদেশী ব্যবসায়ীরা বলিয়া আসিয়াছেন বিদেশের কলকারখানার জন্য উপকরণ অর্থাৎ কাঁচা মাল উৎপন্ন করাই ভারতবর্ষের নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ও কার্য্য। কিন্তু সে ভ্রম এখন ঘুচিয়াছে। এখন দেখা গিয়াছে, দেশের পক্ষে উটজ, স্বল্পপরিসর ও বৃহৎ ত্রিবিধ শিল্পেরই প্রয়োজন। উটজ শিল্পসমূহের সহিত দেশের অর্থ-নীতিক ও সামাজিক সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ এবং সেই জন্যই সেগুলি কলকারখানার প্রবল প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে। বিশেষ এই সকল শিল্পে নানারূপ উন্নতি সাধন করা যায়।

কিরূপে বাঙ্গালার কৃষির উন্নতিসাধনফলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে; কিরূপে বাঙ্গালার মরণাহত ও উটজ শিল্পসমূহ পুনরায় সমৃদ্ধ হইতে পারে; কিরূপে বাঙ্গালায় স্বল্পায়তন শিল্প ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা এখন বাঙ্গালার কল্যাণকামী মাত্রেরই বিশেষ চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে গঠিত সমিতির দ্বারা যদি বাঙ্গালায় উটজ শিল্পের উন্নতি সাধনে সাহায্য হয়, তবে তাহা আমরা পরম কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিব।

বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর প্রয়োজন যেমন বাঙ্গালীই অনুভব করিতে পারেন, বাঙ্গালার সমস্যা তেমনই বাঙ্গালীকেই সমাধান করিতে হইবে—আর কাহারও দ্বারা তাহা হইবে না। সরকার এ কাযে সাহায্য করিতে পারেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশের লোকের সাহায্য ও সহযোগ ব্যতীত সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই। এ বিষয়ে বাঙ্গালার শিক্ষিত লোকদিগের কর্ত্তব্যই বিশেষভাবে বিবেচ্য ও আলোচনীয়।

বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালা—

গত ১৮ই কার্ত্তিক (১৩৪১) ৺কাশীধামে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতা বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে "বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্ম্মশালা"-

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালার উদ্বোধনে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কারুকার্য্য খচিত সুবিশাল এই ধর্ম্মশালা গৃহটিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সম্মত সর্ব্বপ্রকার আরামদায়ক ও স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠানের দ্বারা মনোমোহনবাবু কেবল যে পিতার স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন তাহা নহে; তিনি এতদ্দ্বারা জনসাধারণের বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের বহুদিনের একটি অভাব মোচন করিয়া সকলের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। আমরা তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

অধ্যাপকের কৃতিত্ব—

কলিকাতা বিজ্ঞান-কলেজের ফলিত গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ



শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু

ডি-এস্‌সি পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল নব্য তরঙ্গ-বিজ্ঞানের কতকগুলি জটিল সমস্যা লইয়া। আধুনিক বিজ্ঞানজগতে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রোয়েডিঙ্গেরের (E. Schroedinger) নাম জগতে বিখ্যাত। তিনি ১৯২৬ সালে যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ যে তরঙ্গ এই পরিকল্পনা-অনুগ একটি নব্য তরঙ্গ-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় সেই শ্রোয়েডিঙ্গেরের প্রবর্ত্তিত পন্থা অবলম্বনে তাঁহার তথ্যানিচয় ভারতবর্ষ, জার্ম্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রখ্যাত মুনীক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরনল্ড্ জমেরফেল্ৎ ও ব্রিটিশ রাজ্যের ডারুইন্ ও ফাউলার নামক অধ্যাপকদ্বয় তাঁহার গবেষণা পরীক্ষান্তে তাঁহাকে ডক্টর অব্ সায়েন্স্ উপাধির যোগ্যতম পাত্র বলিয়া একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। ডাঃ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে প্রথম বিভাগে বি-এস্‌সি (অনার) ও এম্-এস্‌সি (ফলিত গণিত) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকগত স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়া প্রাকৃত বিজ্ঞানে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি এ সম্পর্কে ভারতীয় বহু কৃতবিদ্য অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া "স্যর আশুতোষ সুবর্ণ পদক" প্রাপ্ত হন। তিনি পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিতগণিতের অধ্যাপক ও বাঁকুড়া কলেজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে তিনি খুব লোকপ্রিয়, গণিতের বিশুষ্ক অঙ্ক ও নীরস গদ্যময় ভাবধারায় তিনি আশ্চর্য্য রকম রসসৃষ্টি করিয়া ছাত্রগণের মনোহরণে বেশ সুপটু, এইটিই তাঁহার অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য। লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে তিনি বেশ সুনিপুণ, এবং বহুবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্র, দর্শন ও উচ্চ সঙ্গীতকলায় তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার নিবাস জোগ্রাম, জেলা বর্দ্ধমান; তিনি কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বসুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার আদি বৈষ্ণব কবি মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ) ও শ্রীচৈতন্যভক্ত সত্যরাজ ও রামানন্দের তিনি বংশধর। ইঁহার পিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ব্যবহারাজীব ও কবি। ইঁহার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বহু কাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ—

শ্রীযুক্ত শচীপতি রায় মহাশয় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। শস্য শ্যামলা বাংলার প্রধান ফসল পাটের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে পল্লী সম্পদের ত কথাই নাই, জমীদার, ব্যবসাদার প্রভৃতির শ্রীর বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। তাই, সারা বাংলায় ইহার উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কি উপায়ে এই বৃহৎ

কৃষিকে সীমাবদ্ধ করিতে পারা যায় তাহা নিরূপণ করিতে চিন্তাশীল দার্শনিকও হার মানিয়া যান। সহজ কথায় বলিতে পারা যায়, প্রয়োজনানুযায়ী ফসল উৎপন্ন করিলে এই কূট তর্কের সমাধান হয়। সে বিষয় ভাবিলে দেখিতে পাওয়া যায়, বাংলায় পাট চাষ ব্যাপারে দুইটী কথাই "প্রয়োজন" ও "উৎপাদন" এক বিরাট হেঁয়ালি মাত্র।

আমাদের এই প্রদেশে যে সকল বিশেষজ্ঞ বা জ্ঞানী ব্যক্তি এই কৃষির নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা কেবল "উৎপাদনের" উপর তাঁহাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। যত কিছু আইন, বিধান ও প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা চলিতেছে সব এই উৎপাদনের উপর অর্থাৎ নির্বুদ্ধি কৃষকের উপর।

ব্যবস্থাপকেরা "প্রয়োজনের" দিকটায় একেবারে দৃষ্টি দিতেছেন না, অর্থাৎ ক্রেতার দিকটা একেবারে ভুলিয়া যাইতেছেন। যদি ক্রেতার কি পরিমাণ দ্রব্য প্রয়োজন তাহাই নিরূপিত না হয় তবে চিন্তাশীল ব্যবস্থাপকের উৎপাদনের উপর সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। এই প্রদেশব্যাপী কৃষিকে সীমাবদ্ধ করিতে হইলে সুধু কৃষকের উপর আইন চলিবে না —কঠিন আইন করিতে হইবে ক্রেতার উপর, কারণ তাঁহারাই বাংলার এই প্রধান সম্পদকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহার প্রধান কারণ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, কোনও বৎসর কোনও ক্রেতা সুবিধা দরে বা ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিয়া ২।৩ বৎসরের মত উহা গুদামজাত করিয়া ২।৩ বৎসরের জন্য নীরব থাকেন। ফলে, পর পর এই ২।৩ বৎসর পাট উৎপন্ন হইতে রহিল ও ক্রেতা অভাবে কৃষিজাত সমস্ত পাট জমিয়া রহিল—এ দিকে পয়সা অভাবে কৃষকের অবস্থা দিন দিন সঙ্কটাপন্ন হইতে চলিল। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য এক পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। ইহা বিশদভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় উহা বিশেষ কার্য্যকর হইবে না, যেহেতু—

(১) এই আইন কেবল মাত্র বাংলার জন্য বিধিবদ্ধ হইতেছে, কিন্তু পাট কেবল বাংলায় নয়, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামেও জন্মায়। তাই, একটা প্রাদেশিক আইন লইয়া সমস্ত কৃষি নিয়ন্ত্রিত হইবে না। যদি কোনও আইন করিতে হয় তবে উহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হওয়া উচিত।

(২) কত প্রজা, কত জমিতে পাট চাষ করে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আর একবার জরীপ করিতে হইবে। ফলে দাঁড়াইবে আরও ৩ বৎসর কাল অর্থাৎ যতদিন জরীপ শেষ না হয়, ততদিন পাটের কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইবে না। পরন্তু গরীব কৃষককে পুনরায় জরীপের ব্যয় বহন করিতে হইবে ও সরকার বাহাদুরকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

(৩) এই কৃষির নিয়ন্ত্রীকরণের ভার ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এই বোর্ড সাধারণতঃ অর্দ্ধ শিক্ষিত, স্বার্থপর পল্লিবাসী দ্বারা গঠিত হয়। তাঁহারা যে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা প্রতীয়মান হইতেছে।

(৪) কৃষি নিয়ন্ত্রীকরণে কৃষকের সঙ্গে গোলযোগ হইলে তাহার সমাধানের যে ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে পাট চাষই একেবারে বন্ধ হইবে।

(৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে একটা বিশাল ও ব্যয়সাধ্য কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে—ইহার ফলে নিঃসহায় কৃষক নূতন মামলায় পড়িয়া ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইবে।

(৬) চাষ প্রকৃতির লীলার উপর নির্ভর করে,—অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ইহার শত্রু। সে ক্ষেত্রে কৃষি সম্বন্ধে কঠিন ব্যবস্থা হইলে, প্রয়োজনানুরূপ কৃষিজাত পাওয়া দুর্ঘট হইবে।

তাই, কৃষকের উপর কড়া আইন করিয়া ক্রেতাকে বাহিরে রাখিলে কিছুই সুফল দর্শাইবে না। সেজন্য পাট ক্রয় নিয়ন্ত্রীকরণের জন্য বিশেষ কোনও আইনের প্রয়োজন। ইহাতে প্রত্যেক বৎসর কি পরিমাণ পাট প্রয়োজন তাহা কৃষককে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, ক্রমে সে প্রয়োজনানুরূপ চাষ করিতেই স্বতঃই বাধ্য হইবে; কারণ কেহ নিজ দ্রব্য পচাইয়া বা জমাইয়া নষ্ট করিতে চাহে না।

সরকার বাহাদুর এক ব্যয়সাপেক্ষ প্রচার কার্য্য দ্বারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাতে কতকগুলি বক্তা পল্লীগ্রামে বক্তৃতা করিয়া চাষ কমাইবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে নিরক্ষর কৃষক কতটা মন দিবে তাহা বুঝা যাইতেছে।

ইহার পরিবর্ত্তে সরকার যদি অন্য প্রকার প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করেন, মনে হয়, উহা সাফল্য লাভ করিবে। মানুষকে শিক্ষা দিবার স্থান হইতেছে ইউনিভারসিটি।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি পাট সম্বন্ধে কোনও বিভিন্ন বিষয় স্কুল ও কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে এই প্রকার প্রচার কার্য্য গুরুতর কার্য্য করিবে ও এত ব্যয়-সাপেক্ষ হইবে না। কারণ স্কুল ও কলেজে আজ কাল কৃষক সন্তানগণও পড়াশুনা করিতেছে। সে ক্ষেত্রে তাহারা যদি অতি শৈশব হইতে প্রাপ্ত বয়স পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে শিক্ষা পায় তাহা হইলে তাহারা পাট চাষের কি ব্যবস্থা করিলে পল্লী সম্পদ অটুট থাকিবে তাহ অক্ষরে অক্ষরে প্রণিধান করিতে পারিবে। ফলে অনায়াসে পল্লীগ্রামের মঙ্গল সাধিত হইবে।

ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র—

গত ৬ই অক্টোবর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক মৃগেন্দ্রলাল মিত্র অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিতরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ঐ দিন প্রভাতে মোটরে রাঁচি



ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র

যাইবার জন্য বাহির হইবেন, এমন সময় সহসা তাঁহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে বর্দ্ধমান জিলার একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার অগ্রজ ভারত সরকারের সামরিক বিভাগে চাকরীব্যপদেশে পঞ্জাবে থাকিতেন। তিনি তথায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধ্য প্রদেশে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালায় সরকারী চাকরী আরম্ভ করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল স্কুলে অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হয়েন। এই সময় তিনি বাঙ্গালায় অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেন। তখন বাঙ্গালা ভাষায় রচনার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার পত্নীর ও এক বন্ধুর সাহায্যে পুস্তকখানি রচিত ও মার্জ্জিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি য়ুরোপে গমন করেন এবং এডিনবরা ও ব্রাসেলসে উপাধি লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করেন। ক্যাম্পবেল স্কুল হইতে তাঁহাকে ডায়মণ্ড হারবারে বদলী করা হইলে তিনি সরকারী চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া নানা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। কার্মাইকেল



মৃত্যুশয্যায় মৃগেন্দ্রলাল মিত্র

কলেজে তিনি অস্ত্রচিকিৎসায় অধ্যাপনা করিতেন এবং অস্থি চিকিৎসায় তাঁহার নৈপুণ্য অসাধারণ বলিয়া স্বীকৃত হইত।

প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা হেমলতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি অস্ত্রচিকিৎসার উপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য লিষ্টার এন্টিসেপ্‌টিক এণ্ড ড্রেসিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আমরা তাঁহার পরিজনগণকে তাঁহাদিগের শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

অধ্যাপকের মৃত্যু—

মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দিল্লী হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সুপরিচিত সুরেন্দ্রকুমার সেন সহসা লোকান্তরিত হইয়াছেন।



অধ্যাপক সুরেন্দ্রকুমার সেন

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ডাক্তারের পরীক্ষায় শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাওয়ায় চাকরী লাভ করেন নাই। দেশে ফিরিয়া তিনি আজমীর মেয়ো কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন এবং পরে দিল্লী হিন্দু কলেজে অধ্যক্ষ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের কর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন। প্রকৃত অধ্যাপকের সকল সদ্‌গুণ তাঁহার ছিল এবং সেইজন্য তিনি ছাত্রদিগের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাও যেমন অসাধারণ ছিল, বিদ্যানুরাগও তেমনই প্রবল ছিল। ছাত্রদিগের জন্য, তিনি সর্ব্বদাই ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১লা অক্টোবর ছুটীর পর যে দিন কলেজে কাজ আরম্ভ হয় সে দিন তিনি ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন ও তাঁহার ছাত্রদিগের তিন জনের পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাঁহার আরোগ্য লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিতেছিলেন। এই সময় সেন মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং তাহার পরেই তাঁহার প্রাণান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে কেবল যে এক-জন বিদ্যানুরাগী অধ্যাপকের তিরোভাব হইয়াছে, তাহাই নহে - এক জন প্রকৃত বিদ্বান, অমায়িক, দেশসেবাপরায়ণ বাঙ্গালীর জীবনান্ত হইল।

তাঁহার অকালমৃত্যু আমাদিগের পক্ষে এক জন স্নেহ-ভাজন বন্ধুর মৃত্যুশোক।

পরলোকে সুরেন্দ্রভূষণ সেন—

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার সুরেন্দ্রভূষণ সেন মহাশয় গিরিডিতে অবস্থিতি কালে গত ২৫এ অক্টোবর (১৯৩৪) হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকে গমন



সুরেন্দ্রভূষণ সেন

করিয়াছেন। পরদিন মোটরে তাঁহার শব দেহ কলিকাতায় আনয়ন পূর্ব্বক পুষ্পমাল্য ভূষিত করিয়া সময়োচিত অনুষ্ঠান

সহকারে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলার কারখানা হইতে নিমতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া গিয়া দাহ করা হয়। বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালক শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া লোকান্তর যাত্রীর প্রতি তাঁহাদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মৃত্যু কালে সুরেন্দ্র-ভূষণের বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সেই বেঙ্গল কেমিক্যালের ন্যায় সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের গুরু ভার গ্রহণ করিয়া তিনি অসাধারণ যোগ্যতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে ২৬এ অক্টোবর শুক্রবার বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা ও কার্য্যালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ৫ই নভেম্বর এলবার্টহলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে শোক সভা হইয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবুর বিধবা পত্নী ও পাঁচ কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যার আর্ণেষ্ট হরলিক, বার্ট—

হরলিক্স মলটেড মিল্ক কোম্পানী লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্যার আর্ণেষ্ট হরলিক, বার্ট, প্যারী নগরে অবস্থিতি কালে গত ৭ই অক্টোবর (১৯৩৪) পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি হরলিক দুগ্ধ ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার জেমস হরলিক, বার্টের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ক্রীড়া-কৌতুকে স্যার আর্ণেষ্ট অতীব উৎসাহী ছিলেন। বন্দুক চালনায় সিদ্ধহস্ত, সুদক্ষ গোল্‌ফ ক্রীড়ক, মোটর চালনায় অতুলনীয় স্যার আর্ণেষ্ট হরলিক উৎকৃষ্ট পোলো খেলোয়াড় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি পনি ঘোড়া ছিল,—তাহাদের লইয়া তিনি প্রতি বৎসর খেলা-ধূলায় যোগ দান করিয়া বহু পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিঃ পিটার কান্‌লিফ হরলিক এক্ষণে পিতার ব্যারনেট-সীর (ব্যারনেট উপাধির) উত্তরাধিকারী হইলেন।

পরলোকে অধ্যাপক শীতলচন্দ্র—

বিগত ৬ই কার্ত্তিক সূর্য্যাস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পরম বন্ধু, ভারতবর্ষের খ্যাতনামা লেখক, সুপণ্ডিত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জীবন-জ্যোতিঃ মিলাইয়া গিয়াছে। সাহিত্য যাঁহার জীবনের জীবন ছিল, যে সাহিত্য সেবায় তিনি জীবনের দিনগুলিকে আহুতির ন্যায় উৎসর্গ করিতেন, সুখে দুঃখে যে-সাহিত্য তাঁহার সম্মুখে বিশাল হইয়া জগৎকে আড়াল করিয়া দিত, সেই সাহিত্য-সেবক মহা-প্রয়াণ করিয়াছেন। এই সাধনার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল 'ভারতবর্ষ'। তিনি 'ভারতবর্ষে'র প্রথম বর্ষ হইতেই নানা ভাবে এই পত্রের সেবা করিয়া গিয়াছেন। এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবন অধ্যাপনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। অধ্যাপনা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি সাহিত্য-সেবায় বিরত হন নাই। তাঁহার ন্যায় মহানুভব সুহৃদের পরলোক গমনে আমরা বড়ই শোকানুভব করিতেছি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের জমা খরচ—

বিগত চার বৎসর ধরিয়া অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য সমস্ত সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি নিদারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করিতেছে। বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘকেও এই দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী মিঃ সেমুর জ্যাক্‌লিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের জমাখরচ সম্বন্ধে একটী কৌতূহলজনক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ জ্যাকলিন্ বলিয়াছেন ১৫ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ৫৭টী রাষ্ট্র সভ্য মিলিয়া ৩২৫ লক্ষ পাউণ্ড্ দিয়াছেন। ইহার ভিতর বাড়ী নির্ম্মাণের ও অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানের খরচা ধরিয়া সঙ্ঘ দপ্তরখানা ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড্ খরচ করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিসের জন্য খরচ হইয়াছে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড্ এবং স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের খরচ ৮৭৪,০০০ পাউণ্ড্। গত তিন বৎসর গড়পড়তা হিসাবে বাৎসরিক খরচ হইয়াছে ১,১০৬,০৯০ পাউণ্ড। মিঃ জ্যাক্‌লিনের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাপেক্ষা কম খরচায় সঙ্ঘ-কার্য্য চলিতে পারে না।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom) গত পনর বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড্ দিয়াছেন। ইহার জন্য সঙ্ঘের স্থায়ী জিনিসগুলির উপর যুক্তরাজ্যের আংশিক দাবী রহিয়াছে। তাহার ভিতর বাড়ীর স্বত্ব, আসবাব পত্র, পুস্তক এবং আধুনিক বেতারের

সরঞ্জামও রহিয়াছে। যুক্তরাজ্যের বহু হিসাবে এইগুলির মূল্য ১৫০,০০০ পাউণ্ড্।

উল্লিখিত অর্থ সঙ্ঘের বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে লাগিতেছে। রাজনীতিক ক্ষেত্র বা আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা বিশ্বশ্রমিক আফিসের কার্য্য ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশেষ বিভাগগুলি যেরূপ প্রয়োজনীয় কাযের অনুষ্ঠান করিতেছে তাহা প্রত্যেক সভ্য দেশকেই করিতে হইত। সঙ্ঘ যেন এইরূপ কার্য্যানুশীলনের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের কার্য্য এই কেন্দ্রে অল্প খরচায় সাধিত হইতেছে। বিভিন্ন দেশ তাহা হইতে উপকৃত হইতেছে। সঙ্ঘেই সকল কাযের অনুশীলন না হইলে দেশগুলিকেই নিজে নিজে এইরূপ কার্য্যানুশীলন বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্যই করিতে হইত এবং তাহাতে প্রত্যেকেরই অনেক বেশী খরচ করিতে হইত। সঙ্ঘের কোষাধ্যক্ষ মহাশয় ইহার একটী উদাহরণও দিয়াছেন। যেমন সিঙ্গাপুরের স্বাস্থ্য আফিস। সিঙ্গাপুর আফিসের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ, রকফেলার ফাউণ্ডেসান্ ও প্রাচ্য দেশগুলি অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরে এই আফিসের খরচা ৬০০০ পাউণ্ড। শতকরা বিশ ভাগের খরচ কমানোর সময় আফিসের পরিচালক দেখাইয়াছেন যে সমস্ত দেশের বন্দরে বন্দরে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা বেতারে জানাইয়া তিনি প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশের নৌ বিভাগের লক্ষ লক্ষ টাকার সাশ্রয় করিয়া দিতেছেন। নচেৎ রোগ সংক্রামিত বন্দরে প্রবেশ করিলেই জাহাজকে অনেক টাকা কোয়ারেন্‌টিনের জন্য খেসারৎ দিতে হইত। সঙ্ঘ-কার্য্যের সুযোগ লইয়া বিভিন্ন দেশ কিরূপে প্রচুর অর্থের সাশ্রয় করিতে পারেন এবং কিরূপ সুবিধা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্ত দেশের জন্যই বিহিত করিতেছে ইহা তাহার সামান্য একটী উদাহরণ।

সঙ্ঘ-দপ্তরখানার ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড খরচার ভিতর ৩৫ লক্ষ পনর বছর ধরিয়া খরচ হইয়াছে দপ্তরখানার বিশেষ বিভাগের কাযের জন্য। রাজনীতিক সমস্যার জন্য গিয়াছে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। তাহা হইলেও রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এইরূপ খরচ সেই হিসাবে নিতান্ত মাত্রই। যাতায়াতের সুবিধা ও সুযোগ বাড়িয়া যাওয়াতে পৃথিবী যেন ছোট হইয়া আসিয়াছে সুতরাং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য দেশের সহিত সমন্বয় কার্য্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্মিলনী বা সমিতি বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য রাষ্ট্র-সঙ্ঘে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিভিন্ন দেশকে নিজ হইতে তাহার অনুষ্ঠান করিতেই হইত এবং তাহা হইলে খরচের দিক দিয়া দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত সামান্য হইত না। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এরূপ স্থলে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের যাহা খরচ হইয়াছে তাহা সত্যকার কার্য্যানুষ্ঠানেই ব্যয়িত হইয়াছে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আয় সম্বন্ধে মিঃ জ্যাকলিন্ বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের যে সমস্ত অর্থ এখনও কতিপয় দেশের নিকট পাওনা রহিয়াছে, তাহার কথা উক্ত আয়ের হিসাবে তিনি ধরেন নাই। গত বৎসর রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পাওনা অর্থের পরিমাণ ছিল ১,১৭৯,২৪৩ পাউণ্ড — (এগুলি আদায় হয় নাই)। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসর এপ্রিল মাসে সেই পরিমাণ ৯৯০,৩৯৫ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ সঙ্ঘের আয়-ব্যয়ের হিসাবের শতকরা ৭½ ভাগ অর্থ এখনও আদায় হয় নাই।

চীন দেশের নিকট ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত ৩২৪,৯৩৩ পাউণ্ড পাওনা ছিল। পরে চীন সঙ্ঘ-ব্যবস্থাপক সভাতে বলে যে সমান ভাগে এই দেনা প্রতি বৎসর শোধ দিয়া ২০ বৎসরে মিটাইয়া দিবে। এবং সেই হইতে চীন প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে দেনার টাকা দিতেছে।

আর্জেন্‌টিনের কাছে পাওনা হইয়াছিল ১৩৩,০৭৮ পাউণ্ড। ১৯৩৩ সালে আর্জেন্‌টিন্ তাহার ভাগের দেয় অর্থ সঙ্ঘে দিয়াছে এবং বলিয়াছে সে দেনা ক্রমশঃ মিটাইয়া দিবে।

ল্যাটিন্ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির নিকট পাওনা হইয়াছিল ৩২৫,৮০৭ পাউণ্ড। বাকি ২০৮,৫৭৭ পাউণ্ড অন্যান্য রাষ্ট্রের নিকট পাওনা হইয়াছিল। অর্থ-নৈতিক সঙ্কটই তাহার কারণ। ক্রমশঃ এইগুলি আদায় হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় অনাদায়ী টাকার শতকরা ৫০ ভাগই উদ্ধার হইয়াছে। এই হিসাবে পাওনা টাকার মোট পরিমাণের এখন মাত্র শতকরা ৩½ ভাগ অনাদায় রহিয়াছে।

প্রতি বৎসর সঙ্ঘের ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বাকি টাকা সম্বন্ধে আলোচনা ও সেগুলি আদায় করিবার

রীতিমত প্রচেষ্টার বিধান করা হয়। সভ্য-সভ্যাদিগের যে সকল ... যোগ দিয়াছেন, সেগুলির ব্যয় নির্ব্বাহের ভিতর রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য কাহাকে কত পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে—পরিমাণ নির্ণয় সমিতি তাহা স্থির করেন। বিশেষ বিশারদদের লইয়াই এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। অধুনা অর্থসাহায্য পরিমাণ সঙ্ঘ সভ্যাদিগের ভিতর ১০.৩টী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। ১৯২৬ হইতে এই বিহিত পরিমাণ চলিতেছে। এই পরিমাণ অনুযায়ী যুক্তরাজ্য দিতেন ১০৫ ভাগ, ফ্রান্স ও জার্ম্মানি ৭৯, ইটালী ও জাপান ৬০ ভাগ। এবং লাকসেমবুর্গ, লাইবেরিয়া ইত্যাদি দেশগুলিকে মাত্র একভাগ করিয়া দিতে হয়। এই দেশগুলির প্রত্যেককে ১৯৩৪ সালে দিতে হইবে ১,২০৪ পাউণ্ড। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে আমেরিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য না হইয়াও জন্য যুক্ত রাজ্যের সমানই অর্থসাহায্য করিয়াছেন।

১৯৩২ সালে ব্যয় সংক্ষেপ করার ফলে সঙ্ঘের হিসাবে, ৫০,২৮১ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের ব্যয়ের জন্য ধরা হইয়াছিল ১৩০,০০০ পাউণ্ড ; কিন্তু বিশেষ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া খরচ হইয়াছে মাত্র ৩০,০০০ পাউণ্ড। ১৯৩৩ সালে ৮,৩০১ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত ছিল। চলতি বছরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাৎসরিক আয়-ব্যয় হিসাবে শতকরা ৪১ ভাগ পাইয়াছেন এবং মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ।

১৯৩৫ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব হইয়াছে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড। ইহার ভিতর ২০,০০০ পাউণ্ড ধরা হইয়াছে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নূতন গৃহে দপ্তরখানা স্থানান্তর করিবার জন্য

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীব্রজমোহন দাশ সম্পাদিত "জলধর-কথা"—২৲

শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত "সিনেমা"—২৲

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "পথের শেষে" উপন্যাসের নাট্যরূপ "বাংলার মেয়ে"—১।০

শ্রীআমোদিনী ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "দীপের দাহ"—২৲

কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত "গানের মালা"—১।০

শ্রীপ্রসন্নকুমার সাহা বণিক্য প্রণীত "তবলা তরঙ্গিণী" দ্বিতীয় খণ্ড—২৲

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার প্রণীত "গীতিকুঞ্জ"—৸০

শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত "বাড়তির পথে বাঙালী"—৩॥০

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মনের খেলা"—১৲

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত "ছেলেদের বার্ষিকী"—১।০

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মানুষ ও দেবতা"—১॥০

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত উপন্যাস "রূপান্তর"—॥০

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "নেপথ্য"—১৲

শ্রীশান্তা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দুহিতা"—১৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ছেলেদের "আজব-দেশে অমলা"—॥০

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা"—২৲

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, বি-এল প্রণীত উপন্যাস "অতি-বোগাস"—১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত ছেলেদের "কিং কঙ্"—১৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ প্রণীত কিশোর উপন্যাস "ডানপিটে"—১৲

স্বামী আত্মবোধানন্দ প্রকাশিত "শ্রীশ্রীমহাপুরুষজীর কথা ও সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত"—১৲

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত ডিটেকটিভের গল্প "শোণিতাঞ্জলি"—৸০

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত গল্পের বই "অরণ্য-পথ"—১৲

শ্রীসুরুচিবালা চৌধুরাণী প্রণীত উপন্যাস "উৎসবের আলো"—১।০

স্বামী কালিকানন্দ প্রণীত "উহর মীমাংসা"—॥০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সরমা"—১৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা বি-এ প্রণীত নাটক "মারাঠা-মোগল"—১৲

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত নাটক "শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ"—১।০

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত ছেলেদের "হাসিকান্না"—॥০

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "বিবর্ত্তন"—১৲ "ঝড়"—২৲

শ্রীব্রজমোহন দাশ প্রণীত উপন্যাস "বে-ইমান"—১৲

শ্রীগিরিবালা দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মুকুটমণি"—২৲

শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "দান"—২৲

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjea for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta